প্রবাসী

সচিত্র মাসিক পত্র

৩৩শ ভাগ, দ্বিতীয় খণ্ড

কার্ত্তিক—চৈত্র

১৩৪০

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত

বার্ষিক মূল্য ছয় টাকা আট আনা

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

চিত্র-সূচী

লেখকগণ ও তাঁহাদের রচনা

ভ্রম-সংশোধন—১৩৫০ চৈত্র সংখ্যায় ৮৩৩ পৃষ্ঠায় কলিকাতা বধিরমূক শিক্ষালয় সম্বন্ধে যে সংবাদটি দেওয়া হইয়াছে, তাহা ঠিক নহে। ঐ শিক্ষালয়ের কোন শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী বধির মূক নহেন এবং ছিলেন না।



পল্লী শোভাযাত্রা

কানন কর্মকার

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড | কার্ত্তিক, ১৩৪০ | ১ম সংখ্যা

বাংলা পরিভাষা

শ্রীরাজশেখর বসু

অভিধানে 'পরিভাষা'র অর্থ সংক্ষেপার্থ শব্দ। অর্থাৎ যে শব্দের অর্থ সীমাবিশিষ্ট বা সুনির্দ্দিষ্ট তা পরিভাষা। যে শব্দের অনেক অর্থ, সে শব্দও যদি প্রসঙ্গ-বিশেষে নির্দ্দিষ্ট অর্থে প্রযুক্ত হয় তবে তা পরিভাষা স্থানীয়। সাধারণতঃ 'পরিভাষা' বললে এমন শব্দ বা শব্দাবলী বোঝায় যার অর্থ পণ্ডিতগণের সম্মতিতে স্থিরীকৃত হয়েছে এবং যা দর্শন-বিজ্ঞানাদির আলোচনায় প্রয়োগ করলে অর্থবোধে সংশয় ঘটে না।

সাধারণ লোকে কথাবার্ত্তায় চিঠিপত্রে অসংখ্য শব্দ নির্দ্দিষ্ট অর্থে প্রয়োগ করে, কিন্তু বিদ্যাচর্চ্চার জন্য করে না, সেজন্য আমাদের খেয়াল হয় না যে সে-সকল শব্দ পারিভাষিক। 'স্বামী, স্ত্রী, গাই, ষাঁড়, বন্ধক, তামাদি, লোহা, তামা, চৌকো, গোল' প্রভৃতি শব্দের পারিভাষিক খ্যাতি নেই, কারণ এ-সকল শব্দ অতিপরিচিত। বিলাতে একটা নূতন ধাতু আবিষ্কৃত হ'ল, আবিষ্কর্ত্তা তার পারিভাষিক নাম দিলেন 'এলুমিনিয়ম'। বহুদিন এই নাম কেবল পণ্ডিতমণ্ডলীর গবেষণায় আবদ্ধ রইল। এখন এলুমিনিয়মের ছড়াছড়ি, কিন্তু নামের পারিভাষিক খ্যাতি অক্ষুণ্ণ আছে। 'প্লাটিনম এলুমিনিয়ম ক্রোমিয়ম' প্রভৃতি নাম বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতের সৃষ্ট, সেজন্য পরিভাষা রূপে খ্যাত। 'লোহা তামা সোনা' প্রভৃতি নাম পণ্ডিতাগমের পূর্ব্ববর্ত্তী, তাই অখ্যাত। পণ্ডিতগণ যদি বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গে 'প্লাটিনম এলুমিনিয়ম' প্রভৃতি নামজাদা শব্দের পাশে স্থান দেন, তবে 'লোহা তামা সোনা'ও পরিভাষা রূপে খ্যাত হবে। যে শব্দ সাধারণে আলগা ভাবে প্রয়োগ করে তাও পণ্ডিতগণের নির্দ্দেশে পরিভাষা রূপে গণ্য হ'তে পারে। সাধারণ প্রয়োগে রুই পুঁটি চিংড়ি তিমি সবই 'মৎস্য'। কিন্তু পণ্ডিতরা যদি যুক্তি ক'রে স্থির করেন যে 'মৎস্য' বললে কেবল বোঝাবে—কান্‌কো-যুক্ত হাত-পা-বিহীন মেরুদণ্ডী অণ্ডজ (এবং আরও কয়েকটি লক্ষণ যুক্ত) প্রাণী, তবে 'মৎস্য' নাম পারিভাষিক হবে এবং চিংড়ি তিমিকে বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গে মৎস্য বলা চলবে না।

বিদ্যাচর্চ্চায় যত পরিভাষা আবশ্যক, সাধারণ কাজে তত নয়। কিন্তু জনসাধারণেও নূতন নূতন বিষয়ের পরিচয় লাভ করছে সেজন্য বহু নূতন পারিভাষিক শব্দ অবিদ্বানেও শিখছে। যে জিনিষ সাধারণের কাজে লাগে তার নাম লোকের মুখে মুখেই প্রচারিত হয় এবং সে নাম একবার শিখলে লোকে সহজে ছাড়তে চায় না। পণ্ডিতরা যদি নূতন নাম চালাবার চেষ্টা করেন তবে সাধারণের তরফ থেকে বাধা আসতে পারে। বাংলা পরিভাষা সঙ্কলনকালে এই বাধার কথা মনে রাখা দরকার।

আমাদের দেশে এখনও উচ্চশিক্ষার বাহন ইংরেজী ভাষা। নিম্নশিক্ষায় মাতৃভাষা চালাবার চেষ্টা হচ্ছে। শিক্ষা উচ্চই হোক আর নিম্নই হোক, মাতৃভাষাই যে শ্রেষ্ঠ বাহন তা সকলে

ক্রমশঃ বুঝতে পারছেন। মাতৃভাষায় প্রয়োগের উপযুক্ত পরিভাষা যতদিন প্রতিষ্ঠালাভ না করবে ততদিন বাহন পঙ্গু থাকবে। অতএব বাংলা পরিভাষার প্রতিষ্ঠা অত্যাবশ্যক। বাংলা দেশ যদি স্বাধীন হ'ত, রাজভাষা যদি বাংলা হ'ত, বহু নব নব দ্রব্য ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব যদি এদেশে আবিষ্কৃত হ'ত, তবে আমাদের পরিভাষা দেশীয় ভাষার বশে স্বচ্ছন্দে গ'ড়ে উঠত এবং বিদ্বান্ অবিদ্বান্ নির্ব্বিশেষে সকলেই তা মেনে নিত, যেমন ইংলাণ্ডে হয়েছে। কিন্তু আমাদের অবস্থা সেরূপ নয়। এদেশে যে বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া হয় তা অতি অল্প, যা হয় তার সংবাদ ইংরেজীতেই প্রকাশিত হয়। সুতরাং বাংলা ভাষার জন্য পরিভাষা সঙ্কলিত হলেও তার প্রতিদ্বন্দ্বী থাকবে পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত ইংরেজী শব্দ। দেশের পণ্ডিতমণ্ডলী একমত হয়ে একটা বাংলা পরিভাষার ফর্দ মেনে নিতে পারেন, এমন প্রতিজ্ঞাও করতে পারেন যে তাঁদের পুস্তকে প্রবন্ধে ভাষণে বিলাতী শব্দ বর্জ্জন করবেন (অবশ্য চাকরির কাজে তা পারবেন না)। কিন্তু পরিভাষা দ্বারা সূচিত দ্রব্য যদি বিদেশ থেকে আসে এবং সাধারণের ব্যবহারে লাগে, তবে নূতন নাম চালানো কঠিন হবে। বিদেশ থেকে আয়োডিন আসে, প্রেরকের চালানে ঐ নাম লেখা থাকে; দোকানদার ঐ নামেই বেচে, তাকে 'এতিন' বা 'নীলিন' শেখানো অসম্ভব। তার মারফৎ জনসাধারণেও ইংরেজী নাম শেখে। যাঁরা মাতৃভাষায় বিদ্যাবিতরণে অগ্রকর্ম্মী হবেন, তাঁদের পক্ষেও দেশী নামে নিষ্ঠা বজায় রাখা শক্ত হবে। তাঁরা বিদ্যা অর্জ্জন করবেন ইংরেজী পরিভাষার সাহায্যে আর প্রচার করবেন বাংলা পরিভাষায়—এই দ্বৈভাষিক অবস্থা সহজ নয়। তাঁদের নানা ক্ষেত্রে স্খলন হবে। যাদের শিক্ষার জন্য দেশী পরিভাষার সৃষ্টি, তারা যদি ইংরেজী নাম ছাড়তে না চায় তবে শিক্ষকও বিদ্রোহী হবেন। বাংলা ভাষায় প্রয়োগযোগ্য পরিভাষা আমাদের অবশ্য চাই, কিন্তু সঙ্কলনকালে ভুললে চলবে না যে ব্যবহারক্ষেত্রে ইংরেজীর প্রবল প্রতিযোগিতা আছে।

সাধারণে 'আয়োডিন, অক্সিজেন, মোটর, কার্বুরেটর, কলেরা, ভ্যাক্‌সিন' প্রভৃতি শব্দে অভ্যস্ত হয়েছে, এগুলির বাংলা নাম চলবার সম্ভাবনা দেখি না। কিন্তু কয়েকটি নবরচিত বাংলা শব্দের চলন সহজেই হয়েছে, যথা—'উড়ো-জাহাজ, বেতারবার্ত্তা, আবহসংবাদ'। কতকগুলি বিকট শব্দও চলছে, যেমন 'আইন-অমান্য-আন্দোলন'। রবীন্দ্রনাথ 'আবশ্যিক' শব্দ রচনা করেছেন, কিন্তু তার খবর কেউ রাখে না, 'বাধ্যতামূলক' প্রবল প্রতাপে চলছে। এই প্রচলন খবরের কাগজ দ্বারা হয়েছে। বৈজ্ঞানিক পরিভাষার প্রচারে এ সাহায্য মিলবে না। বিভিন্ন লেখকের পুস্তকে প্রবন্ধে যদি একই রকম পরিভাষা গৃহীত হয়, তবে প্রচার অনেকটা সহজ হবে।

এদেশে বহু বৎসর থেকে পরিভাষা সঙ্কলনের চেষ্টা হয়ে আসছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের দপ্তরে অনেক পরিভাষা সংগৃহীত হয়েছে, 'প্রকৃতি' পত্রিকায় প্রায় প্রতি সংখ্যায় পরিভাষা প্রকাশিত হচ্ছে। তা ছাড়া অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি নিজের প্রয়োজনে পরিভাষা রচনা করেছেন। এইসকল পরিভাষার প্রায় সমস্তই প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রে প্রচলিত শব্দ, অথবা সঙ্কলয়িতার স্বরচিত সংস্কৃত শব্দ। এপর্য্যন্ত আয়োজন যা হয়েছে তা নিতান্ত কম নয়, কিন্তু ভোক্তা বিরল। তার একটি কারণ—একই ইংরেজী শব্দের নানা প্রতিশব্দ হয়েছে কিন্তু কোনটি গ্রহণযোগ্য তার নির্ব্বাচন হয় নি। সঙ্কলয়িতা নিজের রচনায় তাঁর পছন্দমত শব্দ প্রয়োগ করেন বটে, কিন্তু সাধারণ লেখক দিশাহারা হয়। আর এক কারণ—সংগ্রহ বৃহৎ হলেও অসম্পূর্ণ। সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল কারণ ইংরেজী পরিভাষার বিপুল প্রতিষ্ঠা।

আজকাল বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ যে ভঙ্গীতে লেখা হয় তা লক্ষ্য করলে আমাদের বাধা কোথায় আর সিদ্ধি কোন্ পথে তার একটু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বিভিন্ন লেখকের রচনা থেকে কয়েকটি নমুনা দিচ্ছি

গ্রামোফোন-রেকর্ড)। 'Master'টি পরিষ্কার করিয়া ইহার উপর Bronze Powder ছড়ান হয়। Powder যাহাতে ইহার প্রত্যেক groove-এর ভিতর উত্তমরূপে প্রবেশ করে তাহা দেখিতে হইবে। পরে Electroplate করিয়া ইহার উপর Copper deposit করা হয়; এই deposit পরিমাপ অনুযায়ী পুরু হইলে ইহাকে master হইতে পৃথক করা হয়। Master-এর music lines তখন এই Copy-র উপর উঠিয়া আসে। এই Copy-কে Original বলা হয়।

লেখক পরিশেষে বলেছেন—'টেক্‌নিক্যাল ডিটেইল্‌স্-এর মধ্যে যাই নাই'। না গিয়ে ভালই করেছেন। ইনি ভাষার দৈন্যের প্রতি দৃক্‌পাত করেন নি, যেমন-তেমন উপায়ে নিজের বক্তব্য প্রকাশের চেষ্টা করেছেন। আর

একটি নমুনা দিচ্ছি। প্রবন্ধ আমার কাছে নেই, কিন্তু নামটি কণ্ঠস্থ আছে, তা থেকেই রচনার পরিচয় হবে—

'নেত্রজনের উপস্থিতিতে অসিতীলিনের উপর কুলহরিণের ক্রিয়া'।

এই লেখক তাঁর বক্তব্য বোধগম্য করবার জন্য মোটেই ব্যস্ত নন, বিভীষিকা দেখানোও তাঁর উদ্দেশ্য নয়। ইনি নবলব্ধ পরিভাষা নিয়ে কিঞ্চিৎ কসরৎ করেছেন মাত্র। একজন প্রথিতনামা মনীষীর রচনা থেকে উদাহরণ দিচ্ছি—

'মণিসমূহের নিয়ত সংস্থান অসংখ্যপ্রকার। কিন্তু তৎসমুদায়কে ছয়টি মূল সংস্থানে বিভক্ত করিতে পারা যায়। এই ছয় মূল সংস্থানের প্রত্যেকে দ্বিবিধ, স্তম্ভাকার (prismatic) এবং শিখরাকার (pyramidal)। এইসকল সংস্থান বুঝিবার নিমিত্ত মণির মধ্যে কয়েকটি অক্ষরেখা কল্পিত হইয়া থাকে। কোন নিয়তাকার মণির দুই বিপরীত স্থানকে মনে মনে কোন রেখা দ্বারা যোগ করিলে তাহার অক্ষরেখা পাওয়া যায়। যথা, দুই বিপরীত কোণ, কিংবা দুই বিপরীত পার্শ্বের মধ্যস্থল, কিংবা দুই বিপরীত ধারের মধ্যস্থল।'

লেখকের বক্তব্য অনধিকারীর পক্ষে কিঞ্চিৎ দুরূহ হতে পারে, কিন্তু তাঁর পদ্ধতি যে বাংলা ভাষার প্রকৃতির অনুকূল তাতে সন্দেহ নেই। একজন লোকপ্রিয় অধ্যাপকের রচনার নমুনা—

'[illegible] করা ছাড়া আরও অনেক প্রক্রিয়া দ্বারা পদার্থ হইতে ইলেকট্রন বাহির করা যায়। রঞ্জনরশ্মি কোন পদার্থের উপর ফেলিলে, বা সেই পদার্থ রেডিয়মের ন্যায় কোন ধাতুর নিকট রাখিলে সেই পদার্থ হইতে ইলেকট্রন নির্গত হয় ...বেশী কিছু নয়, কোন পদার্থ একটু বেশী উত্তপ্ত হইলে উহা হইতে ইলেকট্রন নির্গত হইতে থাকে।'

এই লেখক ইংরেজী শব্দ নির্ভয়ে আত্মসাৎ করেছেন, তথাপি মাতৃভাষার জাতিনাশ করেন নি।

বাংলা ভাষার উপযুক্ত পরিভাষা সঙ্কলন একটি বিরাট কাজ, তার জন্য অনেক লোকের চেষ্টা আবশ্যক। কিন্তু এই চেষ্টা সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে একই নিয়ম অনুসারে করা উচিত, নতুবা পরিভাষার সামঞ্জস্য থাকবে না। প্রথম কর্তব্য—সমস্ত বিষয়টিকে ব্যাপক দৃষ্টিতে নানা দিক্‌ থেকে দেখা, তাতে বিভিন্ন বিভাগের প্রয়োজন সম্বন্ধে কতকটা আন্দাজ পাওয়া যাবে, উপায় স্থির করাও হয়ত সহজ হবে। এই প্রবন্ধে কেবল সেই দিগ্‌দর্শনের চেষ্টা করব।

সকল বিদ্যার পরিভাষাকেই মোটামুটি এই কয়টি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে—

বিশেষ (individual)। যথা—সূর্য্য, বুধ, হিমালয়।

দ্রব্য (বস্তু, substance ; অথবা সামগ্রী, article)। যথা—কাষ্ঠ, লৌহ, জল ; দীপ, চক্র, অরণ্য।

বর্গ (class)। যথা—ধাতু, নক্ষত্র, জীব, স্তন্যপায়ী।

ভাব (abstract idea)। যথা—গতি, সংখ্যা, নীলত্ব, স্মৃতি।

বিশেষণ (adjective)। যথা—তরল, মিষ্ট, আকৃষ্ট।

ক্রিয়া (verb)। যথা—চলা, ঠেলা, ওড়া, ভাসা।

বলা বাহুল্য, এই শ্রেণীবিভাগ সর্বত্র স্পষ্ট নয়। কতকগুলি শব্দ প্রয়োগ অনুসারে দ্রব্য বর্গ বা বিশেষণ বাচক হতে পারে। কতকগুলি শব্দ দ্রব্যবাচক কি ভাববাচক তা স্থির করা কঠিন, যেমন দেশ, কাল, আলোক, কেন্দ্র।

দেখা যায় যে এক এক শ্রেণীর শব্দ কোনো বিদ্যায় বেশী দরকার, কোনো বিদ্যায় কম দরকার। জ্যোতিষে ও ভূগোলে বিশেষবাচক শব্দ অনেক চাই, কিন্তু অন্যান্য বিদ্যায় খুব কম, অথবা অনাবশ্যক। দ্রব্যবাচক শব্দ রসায়নে অত্যন্ত বেশী, জীববিদ্যায় (botany zoology anatomy ইত্যাদি) কিছু কম, খনিজবিদ্যায় (mineralogy) আর একটু কম, ভূতবিদ্যা (physics) ও ভূতত্ত্বে (geology) আরও কম, দর্শন ও মনোবিদ্যায় প্রায় নেই, গণিতে মোটেই নেই। বর্গবাচক শব্দ জীববিদ্যায় খুব বেশী, রসায়ন ও খনিজ বিদ্যায় অপেক্ষাকৃত কম, অন্যান্য বিদ্যায় আরও কম। ভাব বিশেষণ ও ক্রিয়া বাচক শব্দ সকল বিদ্যাতেই প্রায় সমান। সকল বিদ্যার পরিভাষা যদি একযোগে বিচার করা যায় তবে দেখা যাবে যে মোটের উপর দ্রব্যবাচক শব্দ সবচেয়ে বেশী, তার পর যথাক্রমে বর্গবাচক, ভাব-বিশেষণ-ক্রিয়া-বাচক এবং বিশেষবাচক শব্দ।

ইংরেজী পরিভাষার ফর্দ সম্মুখে রেখেই সঙ্কলয়িতাকে কাজ করতে হবে, অতএব ইংরেজী পরিভাষার স্বরূপ বিচার করা কর্তব্য, তাতে উপায়ের সন্ধান মিলতে পারে। ইংরেজী পরিভাষা জাতি অনুসারে এইরূপে ভাগ করা যেতে পারে—

a. সাধারণ ইংরেজী শব্দ। যথা—iron, solid।

b. প্রচলিত অন্য ভাষার শব্দ। যথা—lesion, canyon, breccia, typhoon, totem।

c. গ্রীক লাটিন (আর্বী সংস্কৃত বিরল) প্রভৃতি প্রাচীন ভাষার শব্দ বা তার যৌগিক রূপ অথবা অপভ্রংশ।

যথা—atom, spectrum, alcohol, ferrous, vertebrate।

d. কৃত্রিম পদ্ধতিতে রূপান্তরিত গ্রীক লাটিন বা অন্য শব্দ। যথা—glycerine, methanol, aniline, farad।

ইংরেজী বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাদিতে দেখা যায়—যেখানে ভুল বোঝবার সম্ভাবনা নেই সেখানে c d র সঙ্গে সঙ্গে a b অবাধে চলে। কিন্তু যেখানে স্পষ্টতর নির্দেশ বা সংক্ষেপ আবশ্যক, সেখানে a শব্দ প্রায় চলে না, তৎস্থানে c d প্রযুক্ত হয় এবং b কিছু কিছু চলে। যথা—iron implements, iron salts, spirit of wine, knee-cap, shedding of leaves; অথচ ferrous (বা ferric) sulphate, alcohol metabolism, patellar fracture, deciduous leaves।

বাংলা ভাষার জন্য পরিভাষা সঙ্কলনকালে নিম্নলিখিত উপাদানের যোগ্যতা বিচার করা যেতে পারে—

ক। সাধারণ বাংলা শব্দ।

খ। হিন্দী উর্দু ফার্সী আর্বী শব্দ।

গ। ইংরেজী পারিভাষিক শব্দ (পূর্ব্ববর্ণিত a b c d)।

ঘ। প্রাচীন বা নবরচিত সংস্কৃত শব্দ।

ঙ। মিশ্র শব্দ, অর্থাৎ কৃত্রিম পদ্ধতিতে রূপান্তরিত বা যোজিত বিভিন্ন-জাতীয় শব্দ।

পরিভাষা যদিও মুখ্যতঃ বাঙালীর জন্য সঙ্কলিত হবে, তথাপি অধিকাংশ শব্দ যাতে ভারতের অন্য প্রদেশবাসীর (বিশেষতঃ হিন্দী উড়িয়া মরাঠী গুজরাটী প্রভৃতি ভাষীর) গ্রহণযোগ্য বা সহজবোধ্য হয় সে চেষ্টা করা উচিত। তাতে বিভিন্ন প্রদেশের ভাববিনিময়ের সুবিধা হবে। পূর্ব্বোক্ত c d শব্দাবলী সকল ইউরোপীয় ভাষায় চলে। ভারতের পক্ষে গ ঘ এর সেইরূপ উপযোগিতা আছে।

আধুনিক ইউরোপীয় ভাষাসমূহের সঙ্গে গ্রীক লাটিনের যে সম্বন্ধ, তার চেয়ে বাংলা হিন্দী প্রভৃতির সঙ্গে সংস্কৃতের সম্বন্ধ অনেক বেশী। সেজন্য এদেশে সংস্কৃত পরিভাষা (ঘ) সহজেই মর্য্যাদা পাবে। ইংরেজী পরিভাষার (গ) উপযোগিতাও কম নয়, তার কারণ পরে বলছি। এই দুই জাতীয় পরিভাষার পরেই সাধারণ বাংলা শব্দের (ক) স্থান। এরকম শব্দ সাধারণ বিবৃতিতে অবাধে চলবে, যেমন ইংরেজীতে a চলে। তার পরে খ এর, বিশেষতঃ হিন্দী-উর্দু শব্দের স্থান; কারণ, হিন্দী-উর্দু সুসমৃদ্ধ ভাষা, বাংলার প্রতিবেশী, এবং ভারতের বহু অঞ্চলে বোধ্য। বাংলায় ফার্সী আর্বী শব্দ অনেক আছে। যদি উপযুক্ত শব্দ পাওয়া যায় তবে আরও কিছু ফার্সী আর্বী আত্মসাৎ করলে হানি নেই। পরিশেষে মিশ্র শব্দের (ঙ) স্থান। এরূপ শব্দ কিছু কিছু দরকার হবে। যদি 'focus' বাংলায় নেওয়া হয়, তবে focussed = ফোকসিত, long-focus = দীর্ঘ-ফোকস।

বাংলা পরিভাষা সঙ্কলনের সময় ইংরেজী শব্দের প্রতিযোগিতা মনে রাখতে হবে। বিদ্যালয়ের ছাত্র বাধ্য হয়ে বাংলা পাঠ্যপুস্তক থেকে দেশী পরিভাষা শিখবে। যিনি বিদ্যালয়ের শাসনে নেই অথচ বিদ্যাচর্চ্চা করতে চান, তাঁর যদি মাতৃভাষায় অনুরাগ থাকে তবে তিনি কিছু কষ্ট স্বীকার করেও দেশী পরিভাষা আয়ত্ত করবেন। কিন্তু জনসাধারণকে বশে আনা সহজ নয়। বিদ্যা মাত্রের যে অঙ্গ তাত্ত্বিক (theoretical), তার সঙ্গে সাধারণের বিশেষ যোগ নেই। বিদ্যার যে অঙ্গ ব্যবহারিক (applied), সাধারণে তার অল্পাধিক খবর রাখে। তাত্ত্বিক অঙ্গে দেশী পরিভাষার প্রচলন অপেক্ষাকৃত সহজ, কারণ জনসাধারণের রুচির বশে চলতে হয় না। কিন্তু ব্যবহারিক অঙ্গের সহিত বিদেশী দ্রব্য ও বিদেশী শব্দের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সাধারণ লোকে পথে হাটে বাজারে কর্ম্মস্থানে যে বিদেশী শব্দ শিখবে তাই চালাবে, এর উদাহরণ পূর্ব্বে দিয়েছি। এই বাধা লঙ্ঘন করা চলবে না, ব্যবহারিক অঙ্গে বহু পরিমাণে বিদেশী শব্দ মেনে নিতে হবে।

মাতৃভাষার বিশুদ্ধিরক্ষাই যদি প্রধান লক্ষ্য হয় তবে পরিভাষা-সঙ্কলন পণ্ড হবে। পরিভাষার একমাত্র উদ্দেশ্য—বিভিন্ন বিদ্যার চর্চ্চা এবং শিক্ষার বিস্তারের জন্য ভাষার প্রকাশশক্তি বর্দ্ধন। পরিভাষা যাতে অল্পায়াসে অধিগম্য হয় তাও দেখতে হবে। এ নিমিত্ত রাশি রাশি বৈদেশিক শব্দ আত্মসাৎ করলেও মাতৃভাষার গৌরবহানি হবে না। বহু বৎসর পূর্ব্বে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় লিখেছেন—

'মহৈশ্বর্য্যশালিনী আর্য্যা সংস্কৃত ভাষাও যে অনার্য্যদেশজ শব্দ অজস্রভাবে গ্রহণ করিয়া আত্মপুষ্টি সাধনে পরাঙ্মুখ হন নাই, তাহা সংস্কৃত ভাষার

অভিধান অনুসন্ধান করিলেই বুঝিতে পারা যায়। প্রাচীনকালে জ্ঞান বিজ্ঞান বিষয়ে যে সকল বৈদেশিকের সহিত প্রাচীন হিন্দুর আদান প্রদান চলিয়াছিল, তাহাদের নিকট হইতেও সংস্কৃত ভাষা ঋণস্বীকারে কাতর হয় নাই।...আমাদের পক্ষে সেইরূপ ঋণগ্রহণে লজ্জা দেখাইলে কেবল অহম্মুখতাই প্রকাশ পাইবে।' (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, সন ১৩০১)

বাংলা ভাষার জননী সংস্কৃত হ'তে পারেন, কিন্তু গ্রীক ফার্সী আর্বী পোর্তুগীজ ইংরেজীও আমাদের ভাষাকে স্তন্য-দানে পুষ্ট করেছে। যদি প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য সাবধানে নির্ব্বাচন ক'রে আরও বিদেশী শব্দ আমরা গ্রহণ করি, তবে মাতৃভাষার পরিপুষ্টি হবে, বিকার হবে না। অপ্রয়োজনে আহার করলে অজীর্ণ হয়, প্রয়োজনে হয় না। যদি বলি— 'ওয়াইফের টেম্পারটা বড়ই ফ্রেট্‌ফুল হয়েছে', তবে ভাষা-জননী ব্যাকুল হবেন। যদি বলি—'মোটরের ম্যাগ্‌নেটোটা বেশ ফিন্‌কি দিচ্ছে', তবে আমাদের আহরণের শক্তি দেখে ভাষাজননী নিশ্চিন্ত হবেন।

ইউরোপ আমেরিকায় যে International Scientific Nomenclature সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে তার দ্বারা জগতের পণ্ডিতমণ্ডলী অনায়াসে জ্ঞানের আদানপ্রদান করতে পারছেন। এই পরিভাষা একবারে বর্জ্জন করলে আমাদের 'অহম্মুখতা'ই প্রকাশ পাবে। সমস্ত না হোক, অনেকটা আমরা নিতে পারি। যে বৈদেশিক শব্দ নেওয়া হবে, তার বাংলা বানান মূল-অনুযায়ী করাই উচিত। বিকৃত ক'রে মোলায়েম করা অনাবশ্যক ও প্রমাদজনক। এককালে এদেশে ইতর ভদ্র সকলেই ইংরেজীতে সমান পণ্ডিত ছিলেন, তখন general থেকে 'জাঁদরেল', hospital থেকে 'হাসপাতাল' হয়েছে। কিন্তু এখন আর সে যুগ নেই, বহুকাল ইংরেজী প'ড়ে আমাদের জিবের জড়তা অনেকটা ঘুচেছে। সংস্কৃত শব্দেও কটমটির অভাব নেই। কেউ যদি ভুল উচ্চারণ ক'রে 'যাচ্ঞা' কে 'যাচিঞা', 'জনৈক' কে 'জৈনিক', 'মোটর'কে 'মটোর', 'গ্লিসারিন' কে 'গিল্‌ছেরিন' বলে, তাতে ক্ষতি হবে না—যদি বানান ঠিক থাকে।

এখন সঙ্কলনের উপায়চিন্তা করা যেতে পারে। আমাদের উপকরণ—এক দিকে দেশী শব্দ, অর্থাৎ বাংলা সংস্কৃত হিন্দী ইত্যাদি; অন্য দিকে ইংরেজী শব্দ। কোথায় কোন্ শব্দ গ্রহণযোগ্য? ধরা-বাঁধা বিধান দেওয়া অসম্ভব। মোটামুটি পথনির্দ্দেশের চেষ্টা করব।

১। আমাদের দেশে বহুকাল থেকে কতকগুলি বিদ্যার চর্চ্চা আছে, যথা—দর্শন, মনোবিদ্যা, ব্যাকরণ, গণিত, জ্যোতিষ, ভূগোল, শারীরবিদ্যা প্রভৃতি। এইসকল বিদ্যার বহু পরিভাষা এখনও প্রচলিত আছে। শাস্ত্র অনুসন্ধান করলে আরও পাওয়া যাবে এবং সেই উদ্ধারকার্য্য অনেকে করেছেন। এই সমস্ত শব্দ আমাদের সহজেই গ্রহণীয়। এই শব্দসম্ভারের সঙ্গে আরও অনেক নবরচিত সংস্কৃত শব্দ অনায়াসে চালিয়ে দেওয়া যেতে পারে। গণিতে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ বর্গ ঘাত (power) প্রভৃতি প্রাচীন শব্দের সঙ্গে নবরচিত কলন (calculus), অবঘাতন (evolution), উদ্‌ঘাতন (involution) সহজেই চলবে। বর্ত্তমান কালে এইসকল বিদ্যার বৃদ্ধির ফলে বহু নূতন পরিভাষা ইউরোপে সৃষ্টি হয়েছে। তার অনেকগুলির দেশী প্রতিশব্দ রচনা করা যেতে পারে। কিন্তু যে ইংরেজী পারিভাষিক শব্দ অত্যন্ত রূঢ় (যেমন focus, thyroid) তা যথাবৎ বাংলা বানানে নেওয়াই উচিত।

২। কতকগুলি বিদ্যা আধুনিক, অর্থাৎ পূর্ব্বে এদেশে অল্পাধিক চর্চ্চিত হলেও এখন একবারে নূতন রূপ পেয়েছে, যথা—ভূতবিদ্যা, রসায়ন, খনিজবিদ্যা, জীববিদ্যা। এইসকল বিদ্যার জন্য অসংখ্য পরিভাষা আবশ্যক। যে শব্দ আমাদের আছে, তা রাখতে হবে, বহু সংস্কৃত শব্দ নূতন ক'রে গড়তে হবে, পাওয়া গেলে কিছু কিছু হিন্দী ইত্যাদি ভাষা থেকেও নিতে হবে; অধিকন্তু, ইংরেজী ভাষায় প্রচলিত পারিভাষিক শব্দ রাশি রাশি আত্মসাৎ করতে হবে।

৩। বিশেষবাচক শব্দ আমাদের যা আছে তা থাকবে, যেমন—'চন্দ্র, সূর্য্য, বুধ, হিমালয়, ভারত, পারস্য'। যে নাম অর্ব্বাচীন কিন্তু বহুপ্রচলিত, তাও থাকবে, যেমন—'প্রশান্ত-মহাসাগর'। কিন্তু অবশিষ্ট শব্দের ইংরেজী নামই গ্রহণীয়, যথা—'নেপচুন, আফ্রিকা, আটলাণ্টিক'।

৪। দ্রব্যবাচক শব্দের যদি দেশী নাম থাকে, ত রাখব, যেমন—'স্বর্ণ লৌহ' বা 'সোনা লোহা'। যদি না থাকে তবে প্রচুর ইংরেজী নাম নেব। বৈজ্ঞানিক বস্তু যে-নামে পরিচিত, সেই নামই বহুপরিমাণে আমাদের মেনে নিতে হবে। রাসায়নিক ও খনিজ বস্তু এবং যন্ত্রাদি (যথা—মোটর, এঞ্জিন, পাম্প, স্কেল, লেন্স, থার্ম্মিটার, ষ্টেথস্কোপ) সম্বন্ধে এই কথা

থাটে। রাসায়নিক মৌলিক পদার্থের তালিকায় স্বর্ণ লৌহ গন্ধক প্রভৃতি নামের সঙ্গে সঙ্গে অক্সিজেন ক্লোরিন সোডিয়ম থাকবে। ফরমুলা লিখতে ইংরেজী বর্ণই লিখব (কারণ, ইংরেজী বর্ণমালা আমাদের অপরিচিত নয়), অঙ্ক বাংলাতেই লিখব। সাধারণতঃ লিখব—'লৌহ কঠিন, পারদ তরল। লেখবার কালি তৈয়ার করতে হিরাকষ লাগে'। কিন্তু দরকার হলেই নির্ভয়ে লিখব—'ফেরস সলফেট, অর্থোডাইক্লোরো-বেনজিন, ম্যাগনেসাইট, রুমকফ্‌ কয়েল, ইলেকট্রন'। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা রাসায়নিক পরিভাষা রচনায় আশ্চর্য কৌশল দেখিয়েছেন। কিন্তু সে পরিভাষা কল্পান্তেও চলবে না। 'এন্টিমনি থায়োফস্ফেট' এর চেয়ে মণীন্দ্রবাবুর 'অন্তমনসগুল্বভাস্ফেত' কিছুমাত্র শ্রুতিমধুর বা সুবোধ্য নয়। রামেন্দ্রসুন্দর লিখেছেন—'ভাষা মূলে সঙ্কেতমাত্র'। আমরা বিদেশী পারিভাষিক শব্দকে রূঢ়-অর্থ-বাচক সঙ্কেত হিসাবেই গ্রহণ করব এবং তার প্রয়োগবিধি শিখব। যাঁর কৌতূহল হবে তিনি 'অক্সিজেন, এন্টিমনি' প্রভৃতি নামের ব্যুৎপত্তি খোঁজ করবেন, কিন্তু সাধারণের পক্ষে রূঢ় অর্থের জ্ঞানই যথেষ্ট। জীববিদ্যাতেও ঐ নিয়ম। 'কাষ্ঠ, অস্থি, পুষ্প, অণ্ড' চলবে; 'প্রোটোপ্লাজ্‌ম্‌, হিমোগ্লোবিন, ক্রোমোসম, ভাইটামিন' মেনে নিতে হবে।

৫। বর্গবাচক শব্দের প্রাচীন বা নবরচিত দেশী নাম সহজে চলবে, যথা—'ধাতু, ক্ষার, অম্ল, লবণ, প্রাণী, মেরুদণ্ডী, তৃণ'। কিন্তু যেখানেই শব্দ রচনা কঠিন হবে সেখানে বিনা দ্বিধায় ইংরেজী নাম নেওয়া উচিত। বোধ হয় বর্গের উচ্চতর শাখায় (element, compound, phylum, order, genus, species, endogen, ungulata) দেশী নাম অনায়াসে চলবে। কিন্তু নিম্নতর শাখায় বহুস্থলে ইংরেজী নাম মেনে নিতে হবে, যেমন—'হাইড্রোকার্বন, অক্সাইড, গোরিলা, হাইড্রা, ব্যাকটিরিয়া'।

৬। ভাব বিশেষণ ও ক্রিয়া বাচক শব্দের অধিকাংশই দেশী হতে পারবে। survival, symbiosis, reflection, polarization, density, gaseous, octahedral, decompose, effervesce প্রভৃতির দেশী প্রতিশব্দ সহজে চলবে। কিন্তু রূঢ় শব্দ ইংরেজীই নিতে হবে, যথা—'গ্রাম, মিটার, মাইক্রন, ফারাড'।

বহুস্থলে একটি ইংরেজী শব্দের সঙ্গে সঙ্গে তৎসম্পর্কিত (cognate) আরও কয়েকটি শব্দ নিতে হবে। 'ফোকস, ফিনল, অক্সাইড, মিটার' এর সঙ্গে 'ফোকাল, ফিনলিক, অক্সিডেশন, মেট্রিক' চলবে। ছাপাখানার ভাষায় যেমন 'কম্পোজ করা' চলছে, রাসায়নিক ভাষায় তেমনি 'অক্সিডাইজ করা' চলবে।

৭। বাংলায় (বা সংস্কৃতে) কতকগুলি পারিভাষিক শব্দ আছে যার ইংরেজী প্রতিশব্দ নেই, যথা—শুক্লপক্ষ, পতঙ্গ (winged insect), উদ্‌বৃত্ত (circle cutting equinoctial at right angles), ছায়া (both shadow and transmitted light), উপাঙ্গ (limb of a limb)। পরিভাষার তালিকায় এইসকল শব্দকে সযত্নে স্থান দিতে হবে।

৮। দেশী পরিভাষা নির্ব্বাচনকালে সর্ব্বত্র ইংরেজী শব্দের অভিধা (range of meaning) যথাযথ বজায় রাখার চেষ্টা নিষ্প্রয়োজন। যদি কোনো কোনো স্থলে দেশী শব্দের অর্থের অপেক্ষাকৃত প্রসার বা সঙ্কোচ থাকে তবে ক্ষতি হবে না—যদি নিরুক্তি (definition) ঠিক থাকে। প্রসার, যথা অঙ্গুলি = finger; toe। সঙ্কোচ, যথা fluid = তরল; বায়বীয়।

৯। বিভিন্ন বিদ্যায় প্রয়োগকালে একই শব্দের অল্পাধিক অর্থভেদ হয় এমন উদাহরণ ইংরেজীতে অনেক আছে। এরূপ ক্ষেত্রে বাংলায় একাধিক পরিভাষা প্রয়োগ করাই ভাল; কারণ, বাংলা আর ইংরেজী ভাষার প্রকৃতি সমান নয়। যথা—sensitive mind, sensitive balance, sensitive photographic plate। sensitive শব্দের সমান ব্যঞ্জনা (connotation) বিশিষ্ট বাংলা শব্দ রচনার কোনও প্রয়োজন নেই, একাধিক শব্দ প্রয়োগ করাই ভাল। পক্ষান্তরে এমন বাংলা শব্দও আছে যার সমান ব্যঞ্জনা বিশিষ্ট ইংরেজী শব্দ নেই, যেমন 'বিন্দু' = drop; point; spot। এস্থলেও ইংরেজীর বশে একাধিক শব্দ রচনা নিষ্প্রয়োজন।

যাঁরা বাংলা পরিভাষার প্রতিষ্ঠার জন্য মুখ্য বা গৌণ ভাবে চেষ্টা করছেন, তাঁদের কাছে আর একটি নিবেদন জানিয়ে এই

প্রবন্ধ শেষ করছি। সঙ্কলনের ভার যাঁদের উপর, তাঁদের কি রকম যোগ্যতা থাকা দরকার? বলা বাহুল্য, এই কাজে বিভিন্ন বিদ্যায় বিশারদ বহু লোক চাই। তাঁদের মৌলিক গবেষণার খ্যাতি অনাবশ্যক, কিন্তু বাংলা ভাষায় দখল থাকা একান্ত আবশ্যক। যে সমিতি সঙ্কলন করবেন, তাঁদের মধ্যে দু-এক জন সংস্কৃতজ্ঞ থাকা দরকার। এমন লোকও চাই যিনি হিন্দী-উর্দু পরিভাষার খবর রাখেন। যদি কোনো হিন্দীভাষী বিজ্ঞান-সাহিত্য-সেবী সমিতিতে থাকেন তবে আরও ভাল হয়। সর্কোপরি আবশ্যক এমন গুণী লোক যিনি শব্দের সৌষ্ঠব ও সুপ্রয়োজ্যতা বিচার করতে পারেন, বিশেষতঃ সঙ্কলিত সংস্কৃত শব্দের। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের আহ্বানে যাঁরা পরিভাষা সঙ্কলন করেছেন তাঁরা সকলেই সুপণ্ডিত এবং অনেকে একাধিক বিদ্যায় পারদর্শী। তথাপি বিভিন্ন সঙ্কলয়িতার নৈপুণ্যের তারতম্য বহুস্থলে সুস্পষ্ট। columnar, vitreous, adamantineএর প্রতিশব্দ একজন করেছেন—'স্তম্ভনিভ, কাচনিভ, হীরকনিভ'। আর একজন করেছেন—'স্তাম্ভিক, কাচিক, হৈরিক'। শেষোক্ত শব্দগুলিই যে ভাল তাতে সন্দেহ নেই। বিভিন্ন ব্যক্তি কর্তৃক প্রস্তাবিত শব্দের মধ্যে কোন্‌টি উত্তম ও গ্রহণযোগ্য তার বিচারের ভার সাধারণের উপর দিলে চলবে না; সঙ্কলন-সমিতিকেই তা করতে হবে। এনিমিত্ত যে বৈদগ্ধ আবশ্যক তা সমিতির প্রত্যেক সদস্যের না থাকতে পারে, কিন্তু কয়েক জনের থাকা সম্ভব। অতএব, পরিভাষা-সঙ্কলন বিভিন্ন ব্যক্তি দ্বারা সাধিত হলেও শেষ নির্ব্বাচন মিলিত সমিতিতেই হওয়া বাঞ্ছনীয়।

সীমন্তিনী

শ্রীসুশীলকুমার দে

সুন্দরি, তুমি একদিন শুভরাতে
এলে বধূবেশে সলজ্জ-আঁখিপাতে;
চারিদিকে আলো, হাসি উতরোল,
শানায়ের সুর, শঙ্খের রোল,
সীঁথিতে সিঁদুর পরাইয়া দিনু, রাখিনু হাতটি হাতে।

রস-পরিহাসে, ভূষণের ভঙ্গীতে,
রক্ত-চরণে অলক্ত-ইঙ্গিতে
বাসরের রাতি আনে গৌরব
ভাস্বর-ভাতি রূপ-সৌরভ,—
ভরিল জীবন এ কোন্ নূতন আনন্দ-সঙ্গীতে?

মুগ্ধের মত, জানি না সুখে কি দুখে,
মালাটি বদল করি কম্পিত-বুকে;
চাঁপার বরণে চেলি ঝলমল,
হাতে কঙ্কন, পায়ে বাজে মল,—
তবুও ভাগ্য-ভীরু আমি চাহি মুখপানে উৎসুকে।

বাহিরে সে-দিন শ্রাবণের নতমেঘে
ক্ষান্তির স্থির ক্লান্তি রয়েছে জেগে';
ফোটে না জ্যোস্না, ডাকে না ত পিক,
আঁধারে এলায়ে পড়ে চারি দিক
জাগি' ক্ষণে-ক্ষণে বিদীর্ণ দূর বিদ্যুত-হাসি লেগে'।

ধূপধূমারুণ তরল তরুণ আঁখি
শুভদৃষ্টিটি আঁখিতে দিল কি আঁকি'?
সাতটি পাকের কঠোর-মধুর
আনিল কি মায়া-বাঁধন বধূর?
পড়ে গাঁটছড়া জীবনে জীবনে, প্রাণে প্রাণে পড়ে তা' কি?

ঘর ছাড়ি' তুমি প্রভাতে চলিলে ঘরে,
চোখে জল ঝরে, কনকাঞ্জলি করে;
মোর সুখে-দুখে—দুধে-আল্‌তায়
ডুবালে চরণ নব মমতায়,
পড়ে কমলার আলিপনা বুঝি চিত্তের চত্বরে।

ফুলশয্যার লজ্জামধুর হাসি,
ফুলমাঝে যেন ফোটে ফুল একরাশি ;
কূজন-আভাস অজানা গানের,
স্ফুটন-সুবাস অচেনা প্রাণের
দীপহীন গৃহে সুমন্দ বায়ে সুগন্ধে রহে ভাসি'।

অভিশাপ-মাঝে এল কি স্বস্তিবাণী ?
প্রলাপের মাঝে এল রাগিণীর রাণী ?
সুখতারা এ কি ভাগ্য-নিশির ?
নিদাঘের বুকে নিটোল শিশির ?
আশা-নিরাশায় করে উন্মনা বালিকার মুখখানি।

তখনো সাঙ্গ হয়নি পুতুল-খেলা ;
(এখনো কি শেষ হয়েছে ?— কাটে যে বেলা !)
আলুথালু বেশ, কোথায় ভূষণ,
চরণে লুটায় মাথার বসন,
কুণ্ঠাবিহীন লঘুগতি, শুধু লঘুহাস্যের মেলা।

চাহ মুখপানে বিস্মিত স্মিতমুখে,
মুক্ত বেণীটি দোলে পিঠে, দোলে বুকে ,
চোখে ছিল শুধু চোখের আদর,
চুমায় তখনো ভরেনি অধর,
স্পন্দিত নহে সারা দেহ-মন ছন্দিত-সুখে-দুখে।

তারপর এলে ফাল্গুন-পুষ্পিতা,
রাগ-রশ্মির চুম্বনে চমকিতা ;
জানি না সে-দিন করিল চয়ন
কি মাধুরী-মোহ মুগ্ধ নয়ন,—
ছিলে মধুময়ী মাধবীমাসের বাসনায় বাঞ্ছিতা।

নবযৌবন-গরবী সে-দেহখানি
বেঁধে রাখি দেহ-বন্ধনে বুকে টানি' ;
আঁখি'পরে আঁখি, অধরে অধর,
দু'টি কথা লাগি' শ্রবণ কাতর,
সুবাসে আতুর করে সে-তনুর প্রফুল্ল ফুলদানি।

নববধূ তুমি তরুণী লজ্জাবতী,
অঙ্গে তোমার অনঙ্গ লভে রতি ;
শুধু রাগহীন মৃদু গুঞ্জন,
শুধু বাণীহীন মধু-ভুঞ্জন,
কলকৌতুক-ঝলকে ঝরণা চলে একটানা গতি।

হেরি আমি শুধু অপাঙ্গ-ভঙ্গিমা,
চারু-চরণের রূপময় রঙ্গিমা,
কানের দুলটি অলক জড়ায়,
চুলের ফুলটি পুলক ছড়ায়,
হেরি বিমোহন নম্র গ্রীবায় সরমের অরুণিমা।

ছিলে না মরমী, ছিলে না ব্যথার ব্যথী ;
ছিলে বুকে শুধু মাধুরী মূর্ত্তিমতী ;
তবু অপরূপ রূপ-মহিমায়
জাগে না ত দেহ দেহের সীমায়,—
কোথা আনন্দ বন্ধনহারা স্বেচ্ছা-ছন্দ-গতি।

রূপ-রচনায় কোথা রস-মূর্চ্ছনা,
সুধার ক্ষুধায় করে না ত উন্মনা ;
জাগে না অতনু তনু-অনুরাগ,
মর-কুসুমের অমর পরাগ,
স্নেহরসহীন দেহ-দীপে কোথা দীপক-উন্মাদনা।

যে-বিধাতা রচে ক্ষণ-খেয়ালের ভরে
বর্ণের শত খেলা অকৃপণ করে,
তাহারি কি তুমি ক্ষণ-কৌতুক,
শূন্যের জলধনু-যৌতুক,
রঙীন রূপের জল-বুদ্বুদ আলস্য-অবসরে ?

জাগিল না তাই মুখে কথা, বুকে ব্যথা ;
ছিল মোহ, তবু নাহি ছিল ব্যাকুলতা ;
নদীজলে ঝরা আলোর মতন
রূপ-রঙে ঢাকে অতল চেতন ;
শান্তি সে নহে, ক্লান্তির শুধু অচপল সুস্থতা,

আত্মবিহীন আত্মদানের স্রোতে
সেই সুখহীন সুখের উৎস হ'তে,
সরিল আবিল আবেগ যখন
ভরিল পূর্ণ প্রীতি কি তখন
দু'টি দেহ-তট ছাপি' দু'টি প্রাণে ভাবের ওতপ্রোতে ?

পঞ্চশরের খর ফুলশর দিয়ে
রচিনি মিলন-রজনী আমরা, প্রিয়ে ;
গৃহ-দেবতার পুণ্য সদন—
কবে বিদগ্ধ হয়েছে মদন !
স্বস্তির স্থির আলোক ঢেকেছে অজানা অভাবনীয়ে।

ভাষামাঝে তাই নাহি কিছু ভাষাতীত,
আশামাঝে তাই নাহি কিছু আশাতীত ;
গানে নাহি ছিল অজানা গমক,
প্রাণে নাহি ছিল চকিত চমক ;
গৃহ-দীপ তাই হয়নি আকাশ-প্রদীপ অকুণ্ঠিত।

আঁকে শুধু তব নিপুণ গৃহিণীপনা
দেহ-দেহলীতে আরাধন-আল্পনা ;
চাওনি বুঝিতে যাহা বুঝিবার,
যাওনি খুঁজিতে যাহা খুঁজিবার ;
হাতের নাগালে পাওয়া-মাঝে কোথা না-পাওয়ার কল্পনা ?

ছিলে নিশিদিন সংসার-বিহ্বলা,
সংশয়হীন হাসিতে ছিল না ছলা ;
ধরে ধীর-শোভা সিঁদুর সীঁথির,
ভরে সন্তার পূজা-আরতির,
প্রাঙ্গণময় বহে নির্ভয় বাতাসটি আলো-ঝলা।

পিতামহদের যাহা গচ্ছিত নিধি,
যাহা শুভ, যাহা ধ্রুব জীবনের বিধি,
স্নেহের দৃষ্টি পিতার মাতার,
নীরব আশিস্ গৃহ-দেবতার,
শিশুর কাকলি রহে ঘেরি' তব কল্যাণ-সন্নিধি।

গৃহমন্দিরে হে চির-অনিন্দিতা,
মনোমন্দিরে হয়েছ কি বন্দিতা ?
চেতন-বনের ঘন ছায়াতল
চকিত আলোকে হয়েছে উতল ?
তনুর অতলে ভাব-তনু তব হয়েছে কি ছন্দিতা ?

স্বপন-কৃপণ গৃহ-অঙ্গনতলে
ছিলে অচপল গৌরব-শতদলে ;
যাহা এলোমেলো, যাহা উচ্ছল
রহে নিরাময় নিয়মে অচল ;
শৃঙ্খলা আনি' বাঁধিলে আমারে স্বর্গের শৃঙ্খলে।

অন্তরতলে যেথা ছিনু আমি একা
সেথা আসি' কভু দিয়েছিলে তুমি দেখা ?
যেথা মুছে যায় লোক-চরাচর,
অন্তরযামী জাগে অগোচর,
এঁকেছ কি সেথা ব্যথার বর্ণে কভু আল্পনা-লেখা ?

মরমের পথে নহে, জীবনের পথে
জয়ন্তী, এলে অনায়াস-জয়রথে ;
কভু দুর্গমে রুদ্র-বিষাণ
বাজেনি, ওড়েনি প্রেমের নিশান,
জাগায়ে বহ্নি-বরণে দীপ্ত মনের সে-মন্মথে।

ঋদ্ধির আর সিদ্ধির সুখথরে
বেদনাবিহীন আদরের অনাদরে,
মালা-বদলের মালাটি গলায়
কবে খ'সে পড়ে পায়ের তলায়,
অন্তর-ধন ডুবে বাহিরের ব্যর্থ আড়ম্বরে।

দরদী সে কোথা, ঘরণী রয়েছে ঘরে ;
প্রাণের পাত্র পঙ্ক-তলানি ভরে ;
সুখের ফাগুন বলে—'যাই যাই',
বুকের আগুন হ'য়ে আসে ছাই ;
শুধু বাহিরের কল্যাণে কোথা কল্যাণ অন্তরে ?

জর্জ্জরি' রহে চির-মৃত্যুর জরা,
কালো হ'য়ে আসে আঁধারে আলোর ধরা ;
ভেঙে' চুরে' দিয়ে দেহের দুয়ার
উছলি' উঠে না স্নেহের জুয়ার,
কোথা সে-হরষ প্রাণ-রসায়ন, পরশ পাগল-করা।

কোথা সে অজানা খনির মণির ভাতি,
রাখিনু বক্ষে বাহু-হারে যা'রে গাঁথি ;
চারি-চক্ষের প্রথম চাওয়ার
আলোক, পুলক মলয়-হাওয়ার,
কোথা আজ সেই কিশোর-কালের বাসর-রাতির সাথী।

বিজলী-উজল কোথা সে সজল হাসি ;
অধর আদরতরে চির-উপবাসী।
কোথা সেই রাগ, পুণ্য-পাপের
লহে যাহা ভাগ তপের তাপের ;
সব থেকে যা'র কিছু নাই সে যে নিজগৃহে পরবাসী।

কাটে দিনযামী নিয়মের অনুগামী,
আজ তুমি শুধু জায়া, আমি শুধু স্বামী ;
জানি ওগো জানি সে-দোষ আমার,
তুমি এনেছিলে যা' ছিল তোমার,
ছিল বাহিরের বিনোদন রূপ, আমি ছিনু মধুকামী।

ঝটিকা-ভ্রূকুটি অসহ আঁখিতে জাগে,
কভু বিদ্রূপ-বিদ্যুত আসি' লাগে ;
প্রতিদিবসের কুশ-অঙ্কুর,
বেদনা বাক্য-বিষশঙ্কুর ;
স্তুতি-নুতি-মাঝে গুমরি' গোপনে পরাজয় জয় মাগে।

কোনো দিন যাহা লওনি ত সন্ধানি'
আজ কেন সেই মমতার অভিমানী ?
চোখে ছিল শুধু ঘুমের কাজল,
জাগরণ-লোকে হয়নি সজল ;
নাহি আশ্লেষ-বিশ্লেষ-রসে কামনার কল্যাণী !

তবু একদিন এনেছিনু তোমা'তরে
যা' ছিল আমার উন্মুখ অন্তরে,
আমার সত্য, আমার স্বপন,
যা' ছিল ব্যক্ত, যা' ছিল গোপন,
লাভ-ক্ষতি যাহা নবযৌবন-পশরাটি মোর ভরে !

ছিল আনন্দ অমৃতগন্ধভরা,
দুর্লভ দুখ সুখের স্পন্দহরা ;
ছিল অঙ্কুর আশার তরুর, —
কোথা ছায়াটুকু মর্ত্ত্য-মরুর ?
তুমি ছিলে কোথা আপনার মনে আপনি স্বতন্তরা !

পথে যেতে লাগে পথের পঙ্ক-ধূলি,
আপনা' হারাই আপনার ভুলে ভুলি' ;
বালু-কঙ্করে জীবন ঊষর,
প্রাণের পিয়াসী ধূলায় ধূসর,
অয়ি সুচরিতে, চরিতবিহীনে নিয়েছ কি বুকে তুলি ?

করেছ কখনো মরণ শরণ হেসে' ?
দাঁড়ায়েছ কভু মরণ-হরণ-বেশে ?
আপনারে-পাওয়া পরম সে-দান
করে না ত যা'রা সুখ-সাবধান ;
নাওনি ত কেড়ে, দাওনি ত ছেড়ে আপনারে নিঃশেষে :

তুমি ছিলে শুধু সুরীতির অনুরাগী,
আমি জেগেছিনু পরমা পীরিতি লাগি' ;
রত্নের দীপ গৃহ-ধরণীর
জ্বালে না ত, হায়, দেহ-অরণীর
অগ্নিমন্থ-মন্ত্রে যে-শিখা অন্তরে রহে জাগি'।

এসেছিলে কভু অতল অশ্রুতলে
যেথা চিরদিন চিত্তের মণি জ্বলে,
বেদনা-মথিত চেতনা-সাগর,
যেথা অতন্দ্র স্বপ্ন-জাগর,
মেরুসমুদ্র-সমান-নিথর আলোছায়া-শতদলে ?

কঠোরা স্বামিনি বিমোহিনি নিষ্ঠুরা,
তব স্বরে নাহি জাগে ছেঁড়া তান্‌পুরা ?
গুণী তবু পারে জাগাতে নিবিড়
চকিত সুরের সাহসের মীড়,
ভাঙা যন্ত্রের বিরস বিলাপে আলাপের রস-স্বরা।

শুধু মিথ্যার পশরাটি শিরে ধরি'
আসে না মৃত্যু, পলে পলে মোরা মরি ;
বুঝি অবেলায় ভুলের খেলায়
যাহা ছিল সব হারা'ল হেলায়,
নিরমাল্যের ফুল-চন্দন ধূলাতলে রহে পড়ি'।

আঁখির পাহারা প্রেমহারা জেগে থাকে,
নাহি স্নেহ-চাবি, তবু দেহ-দাবী রাখে ;
শ্মশানের মাঝে গুঞ্জন-গান
মধুপাত্রের ভূঞ্জন-ভাণ
প্রতিদিবসের স্ফীত সজ্জায় ভীত লজ্জায় ঢাকে।

যে-দীর্ঘপথ ঘর-বাহিরের মাঝে
ডাকে সে আমারে নিত্য প্রভাতে সাঁঝে,
যেথা চঞ্চল আলো আকাশের,
যেথা অঞ্চল ওড়ে বাতাসের,
রস-অর্ণবে যেথা স্বর্ণের বর্ণের খেলা রাজে।

পথে পথে তাই করি' প্রেম-মাধুকরী
পথের পথিক চলে দিবা-বিভাবরী ;
কে জানে কোথায় কি অর্ঘ্য রয়,
আশা-নিরাশার স্বর্গ-নিরয় ;
পথের জ্যোৎস্না ডাকে যারে তার গৃহদীপ রহে পড়ি'।

কোথা চাতকের চিরতৃষ্ণার ধারা,
অসীমার আশা সীমার বাঁধনহারা !
লবণাম্বুর তলে পায় লয়
মধু-উৎসের নিভৃত-নিলয় ?
সে-অতলে ডোবে রসের গাগরী ভরিতে সাহসী যা'রা ?

মত্ততা-স্রোত মাথায় আমার বহে ?
চক্ষে অনল, কণ্ঠে গরল দহে ?
কুৎসিতে তবু করি' সুন্দর
কৈলাস-চূড়ে কে বাঁধিবে ঘর ?
কে উরিবে আসি' বুকের শ্মশান-কালিমার কালিদহে ?

ছাড়াছাড়ি পথ, তবু একসাথে চলি ;
আপনায়' আড়াল করি' আপনারে ছলি ;
প্রেমে আজ প্রাণ নহে ইন্ধন,
গৃহ-বিভবের রহে বন্ধন ;
শীতের উষার তুষার ঢেকেছে অলির কুন্দকলি।

তবুও চিত্ত তোমারে ঘেরিয়া ঘুরে ;
মিথ্যা, তবুও সত্য জীবন জুড়ে' ;
তুমি জয়, তবু তুমি পরাজয় ;
তুমি ভয়, তবু তুমি বরাভয় ;
ঘূর্ণীর স্থির চির-উদাসীন বিন্দুটি যেন স্ফুরে।

স্বামী-সোহাগের সিঁদুরটি তবু জ্বলে
আজো অভাবের অবগুণ্ঠনতলে :
ছান্‌নাতলার শুভদৃষ্টির
আছে কি সে-মায়া রস-সৃষ্টির ?
স্বপনে-গোপন বহে কি অশ্রু কলহাস্যের ছলে ?

বৈশাখ-দিনে মেঘের কোমল কায়া
আপনার মনে চলে রচি' ক্ষণ-ছায়া ;
ধরার রুক্ষ বক্ষের তল
হয় না সরস, হয় না শীতল,
ছায়া শুধু নহে, চাহে সে নিবিড় বুকে-ঝরে-পড়া মায়া।

চেয়ে রয় কবে শ্রাবণের শুভখনে
ঝরিবে সে-ধারা বিপুল বিপ্লাবনে ;
কতদিন আর আলোর দহন
চিরতৃষাতুর করিবে বহন ?
কবে মিলনের পাত্র ভরিবে প্রাণের নিমন্ত্রণে ?

মত্ত মেঘের দিগন্ত-উৎসবে
আঁধার-পাথার চারিধার ঘিরে র'বে,
ডুবে যা'বে সারা ধরার চেতন,
হ'য়ে দিশাহারা কাঁদিবে বেদন,—
আবার শ্রাবণ-মিলন-রজনী ফিরিয়া আসিবে কবে ?

কোণার্কের মন্দির

শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু

পুরী শহরের পূর্বদিকে, প্রায় বিশ মাইল দূরে, কোণার্কের সূর্য্যমন্দির অবস্থিত। মন্দিরটি সমুদ্রের কূল হইতে প্রায় এক ক্রোশ দূরে। পুরী হইতে কোণার্কে যাইবার দুই তিনটি পথ আছে। তাহার মধ্যে একটি পথ প্রায় সমুদ্রের সহিত সমান্তরালভাবে কোণার্কের দিকে গিয়াছে। এ পথটির সবটুকুই বালির উপর দিয়া যাইতে হয়। দক্ষিণ দিকে উচ্চ বালিয়াড়িতে সমুদ্র ঢাকিয়া থাকে বলিয়া দেখা যায় না। কেবল কখনও কখনও বালির পাহাড়ের ফাঁক দিয়া সমুদ্রের ঘন নীল রেখা শ্রান্ত পথিকের চোখ জুড়াইয়া দেয়। উত্তর দিকে বহুদূরে কৃষ্ণবর্ণ বৃক্ষশ্রেণীর অন্তরালে গ্রাম, সেগুলি প্রায়ই দেখা যায় না। উন্মুক্ত বালুর প্রান্তর, তাহার মধ্য দিয়া চলিতে চলিতে কখনও বা দু-একজন পথিকের সঙ্গে দেখা হয়, কখনও বা হয় না। কোথাও কোথাও দু-একটি মন্দির আছে, তাহাও অবিরাম হাওয়ার স্রোতে বালির আঘাতে প্রায় পুঁতিয়া গিয়াছে। দূর গ্রামের পুরোহিত দিনান্তে একবার বিগ্রহকে ফুল ও জল নিবেদন করিবার জন্য আসিয়া আবার তাড়াতাড়ি গ্রামে ফিরিয়া যান। এই সমস্ত মিলিয়া কোণার্কের পথটিকে এমন করিয়া রাখিয়াছে যে পথিকের মন স্বভাবতই অবসন্ন ও ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে।



সিংহাসনের উপর রাজা নরসিংহদেব ও তাঁহার পুরোহিতের মূর্ত্তি



পিষ্টের সর্ব্বনিম্ন স্তরে হস্তী-শিকারের ছবি

এই পথে পুরী হইতে ছয় সাত ক্রোশ অগ্রসর হইলে দূরে কোণার্কের সূর্য্যমন্দিরটি দেখা যায়। মন্দিরের চারিপাশে একটি ঘন ঝাউয়ের বন আছে এবং তাহার মধ্যে অসংখ্য পাথরের টুকরা ইতস্ততঃ স্তূপের মত পড়িয়া আছে। আমি যেবার প্রথম কোণার্কে যাই তখন প্রায় সন্ধ্যা নামিয়া আসিয়াছে। চারিদিকে বিশাল মন্দিরের ভগ্নস্তূপ, কোথাও জনপ্রাণী নাই, পথও অন্ধকারে দেখা যাইতেছে না। যাহাও আছে তাহাও বার-বার সম্মুখের সু-উচ্চ বালির পাহাড়ের দ্বারা প্রতিহত হইতেছে; আর সকলের উপরে ঝাউপাতার সেই উদাস মর্ম্মরধ্বনি! সব মিলিয়া চিত্তকে যেন অবসন্ন করিয়া দিল। মনে হইল, এমন স্থানেও কি শিল্প বাঁচিয়া

থাকিতে পারে? এ যেন অতীত ভারতের শ্মশানের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি।

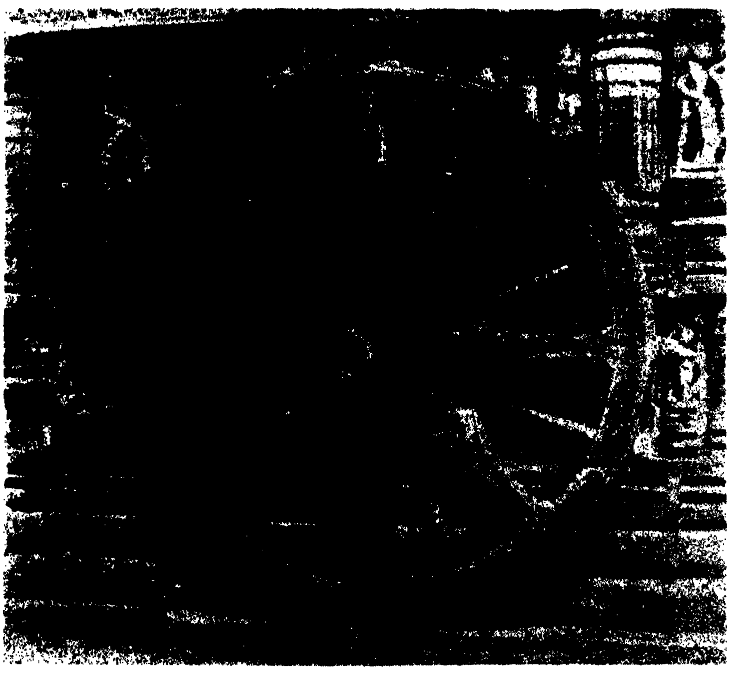
শুধু আমার নহে, যাঁহারাই প্রথম বার কোণার্ক দেখিতে যান, তাঁহাদেরই মনে এমনি একটি ভাবের উদয় হয়। কিন্তু প্রথম দর্শনের হতাশা যখন কাটিয়া যায় এবং মন্দিরের অপূর্ব্ব গঠন ও অসংখ্য মূর্ত্তিরাজি যখন ধীরে ধীরে আমাদের মনকে বর্ত্তমান হইতে সরাইয়া অতীত ভারতের জীবনধারার মধ্যে ভাসাইয়া দেয়, তখন চিত্ত নব পরিচয়ের আনন্দে ভরিয়া উঠে।

বাস্তবিক কোণার্কের মন্দিরের মধ্যে ভারতবর্ষের স্বাধীন অবস্থার যে ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার তুলনা ভারতে পাওয়া দুষ্কর। কোন্ শিল্পী যে ইহার



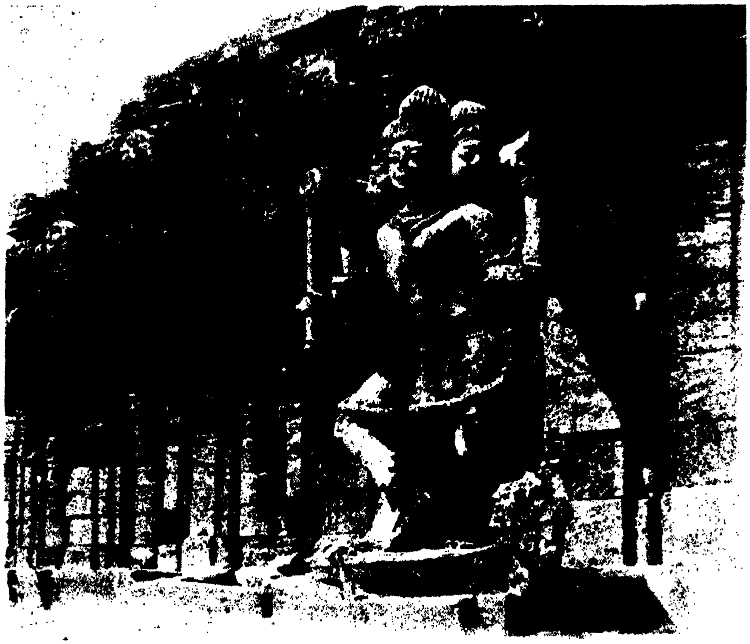
মন্দিরের দক্ষিণ দিকে অশ্বের মূর্ত্তি

পরিকল্পনা করিয়াছিলেন তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না বটে, তবে বার-বার বলিতে ইচ্ছা করে যে তিনি ধন্য, কেন-না যে বস্তু তিনি সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন তাহা যে শুধু বিরাট তাহা নহে, রসের প্রাচুর্য্যে, প্রাণের আবেগে ও পরিপূর্ণতায় তাহার সমকক্ষ আর কোথাও দেখা যায় না।



রথচক্র

কোণার্কের মন্দির রচিত হইবার বহু পূর্ব্বকাল হইতে উড়িষ্যায় মন্দির গঠনের একটি বিশেষ রীতি প্রচলিত হইয়া আসিতেছিল। যাঁহারই কিছু অর্থ হইত, তিনি সমাজে প্রতিপত্তি লাভের জন্য একটি মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া স্থায়ী কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতেন। এই সকল মন্দিরের মধ্যে নানাবিধ মূর্ত্তি খোদিত করিবার রীতি প্রচলিত ছিল।



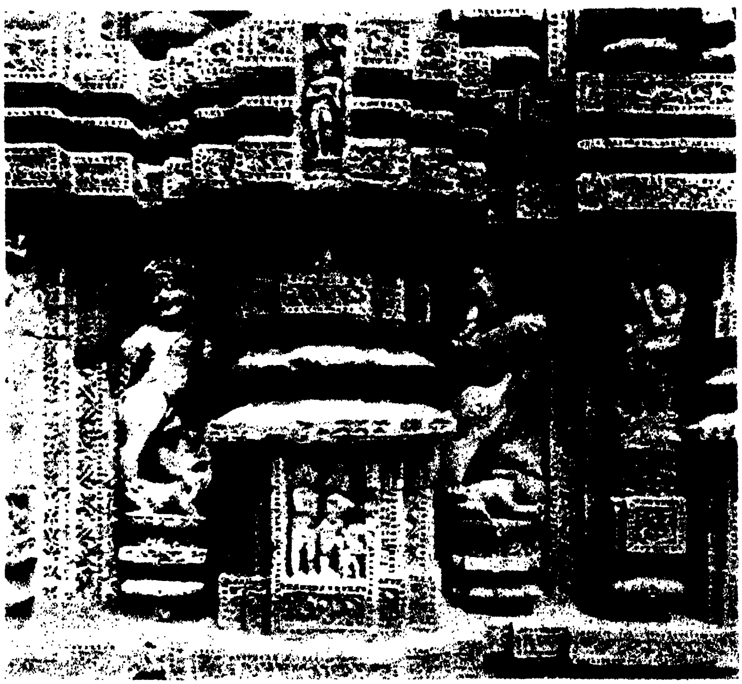
নৌকা-বাহনে নৃত্যশীল ভৈরব

নরসিংহদেব অমিতবিক্রমে সৈন্যসামন্ত লইয়া গৌড়ের সুলতানগণকে পর্য্যন্ত পরাস্ত করিয়া আসিয়াছেন। নরসিংহ-দেবের সাম্রাজ্য বঙ্গের উপকণ্ঠ হইতে গোদাবরী নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। দেশে ধনসম্পদ প্রভূত পরিমাণে সঞ্চিত হইয়াছে এবং লোকের মনে ভোগ ও স্বাধীনতার ভাব প্রবল হইয়া রহিয়াছে। শিল্পী এই সকলের মধ্যে পালিত হইয়াছেন, তিনি নিজের রচনার মধ্যে ইহাকেই রূপ দিবার চেষ্টা করিলেন।

কোণার্কের দেবতা সূর্য্য। তিনি অমিতবিক্রমে তাঁহার রথ বিশ্বসংসারের উপর দিয়া চালিত করিতেছেন; বিশ্বে যাহা কিছু জীবন্ত, যাহা কিছু তেজোময় সব তাঁহারই তেজের দ্বারা প্রদীপ্ত। তিনিই তাহাদের স্রষ্টা, পোষক ও

কোথাও নারীর মূর্ত্তি, কোথাও হস্তীকে ধর্ষিত করিয়া সিংহের মূর্ত্তি, কোথাও বা যক্ষরক্ষগণের মূর্ত্তি দিয়া শিল্পিগণ মন্দিরকে অলঙ্কৃত করিতেন। আলপনা দিয়া যেমন গৃহের দেওয়ালকে সজ্জিত করা হয়, ইহা যেন তাহারই অনুরূপ। তাহাদের সজ্জার মধ্যে কোন গূঢ় অর্থ নাই, শুধু শোভাবৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত স্থান নির্ব্বাচন করিয়া শিল্পিগণ নিস্তার পাইতেন।

কিন্তু কোণার্কের শিল্পী দেখিলেন যে এমন মূক মন্দির ও মূক সজ্জায় কোনও লাভ নাই। তিনি তাহারই মধ্যে অর্থযোজনার চেষ্টা করিলেন। উড়িষ্যার যে-যুগে কোণার্কের মন্দির রচিত হইয়াছিল তাহা ইতিহাসে খুবই প্রসিদ্ধ। তখন গঙ্গা-বংশের ফুল



...পৃষ্ঠে নানাবিধ কাল্পনিক জীবজন্তুর মূর্ত্তি

সংহারক—তাই তিনি এই বীর্য্যময় যুগের উপযুক্ত দেবতা হইলেন। শিল্পী সূর্য্যদেবের যে মন্দির রচনা করিতে গেলেন তাহাতে এই কথাটিই সুস্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করিবার সঙ্কল্প করিলেন।

উড়িষ্যায় রেখ ও ভদ্র দেউল রচনা করিবার যে রীতি ছিল, শিল্পী তাহাদের দুইটিকে লইয়া একটি বিশাল পিষ্টের (pedestal) উপরে স্থাপনা করিলেন ও পিষ্টের দুই পাশে বারটি করিয়া চব্বিশটি চক্র ও সম্মুখে সাতটি অশ্ব যোজনা করিয়া সমস্ত মন্দিরটিকে একটি রথের আকারে পরিণত করিলেন। মন্দিরটি যখন সম্পূর্ণ অবস্থায় ছিল তখন তাহার উচ্চতা দুইশত ফুটেরও অধিক ছিল। অতএব তাহা যে একটি পর্ব্বতের মত বিশাল ছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। রথের



পিষ্টের উপর নারী ও নাগ-নাগিনীর মূর্ত্তি

চাকাগুলি আজও টিকিয়া আছে, সেগুলি প্রত্যেকে নয়-দশ ফুট উচ্চ; তাহাদের উচ্চতা হইতেই মন্দিরের আয়তন কল্পনা করা যাইতে পারে।

মন্দিরটি রচিত হইলে শিল্পী এইবার তাঁহার [illegible] মনোনিবেশ করিলেন। সূর্য্যদেব জীবনের দেবতা। অতএব তাঁহার রথের উপর যে মূর্ত্তি থাকিবে তাহা জীবনের সকল ক্ষেত্র হইতেই সংগৃহীত হইবে। তাই সর্ব্বনিম্ন স্তরে শিল্পী নানা ছন্দে বন্য জীবজন্তুর



মন্দির হইতে জল-নিষ্কাশনের নালী

চিত্র অঙ্কিত করিলেন। বন্য হস্তী, অশ্ব, মৃগ প্রভৃতি জন্তু হেলিয়া দুলিয়া চলিতেছে, কোথাও বা খেলা করিতেছে, কোথাও বা পরস্পরের প্রতি কামভাবে আকৃষ্ট হইয়া বদ্ধ অবস্থায় রহিয়াছে এমনি নানা মূর্ত্তির দ্বারা নীচের শ্রেণীটি অলঙ্কৃত হইয়াছে। তাহার উপরে উঠিলে নরনারীর চিত্র পাওয়া যায়। কেহ বন্য বরাহ শিকার করিতেছেন, কেহ বা অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া যাইতেছেন, কোথাও বা পদাতিক তাঁহার স্ত্রীপুত্র লইয়া পথে অগ্রসর হইতেছেন, কোথাও বা নরনারী পরস্পরকে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করিয়া আছেন, কোথাও বা মাতা স্বীয় পুত্রকে তুলিয়া ধরিয়া নয়ন ভরিয়া দেখিতেছেন—এমনি বহুবিধ মূর্ত্তির দ্বারা এই স্তরটি সজ্জিত হইয়াছে।

এই সকল মূর্ত্তি এত প্রাণবান, এত সতেজ যে তাহার বর্ণনা করা যায় না। শিল্পীদের মনে কোথাও মিথ্যা লজ্জা ছিল না। বহুস্থানে দেখা যায় তাঁহারা জটাকমণ্ডলুধারী সন্ন্যাসী-প্রবরকে নারীর সহিত অঙ্কিত করিয়া ব্যঙ্গ করিয়াছেন। সন্ন্যাসীদের প্রতি এইরূপ বিদ্রূপের ভাব কয়েক স্থানে খুবই [illegible] নিঃসন্দিগ্ধভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। দেশ তখন বীরের

ধর্ম্মে প্লাবিত। তখন ভোগের কাল, ত্যাগের সময় কোথায়? এই কথা শিল্পী যেমন নির্ভীকভাবে ভাবিয়াছেন, তেমনি দক্ষতার সহিত প্রকাশ করিয়াছেন।

পিষ্টের উল্লিখিত অংশ হইতে আরও উপরে উঠিলে



নারীমূর্ত্তি

ক্রমশঃ নরনারীর কামভাবাপন্ন মূর্ত্তি কমিয়া আসে এবং তাহার পরিবর্ত্তে শুধু নর্ত্তকী, নারী অথবা দেবতার মূর্ত্তি অথবা, অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ স্থানে, রাজার শোভাযাত্রা অথবা যুদ্ধ-যাত্রার চিত্র দেখা যায়। এখানে কামভাবের চিত্র আদৌ নাই। জীবনের যে প্রকাশ আদিরসের মধ্যে হইয়া থাকে তাহাকে নীচে সম্মানিত স্থান দিয়া শিল্পী যেন আরও উপরে, আরও সূক্ষ্ম রসের সন্ধানে আসিয়াছেন। সেখানে নৃত্যের তালে তালে, ভৈরবের সংহারের রূপের মধ্যে সেই একই সূর্য্য-দেবতার জীবন-স্রোতের পরিণতি প্রকাশিত হইতেছে।

আরও উপরে উঠিলে আমরা দেখি শিল্পী দেবতাকেও ছাড়িয়া দিয়াছেন, শুধু নারীর মূর্ত্তি দিয়াই শিখরের উচ্চতম প্রদেশের পার্শ্বদেশকে সজ্জিত করিয়াছেন। আরও উচ্চে উঠিলে আমরা এইবার একটি পরমাশ্চর্য্য রচনার সন্ধান পাই। মন্দিরের চূড়ার কিয়দংশে একেবারে কারুকার্য্য নাই। শিল্পী তাহাকে সাদা রাখিয়াছেন, কিন্তু ঠিক তাহারই উপরে চূড়ায় একটি কুম্ভ স্থাপনা করিয়া তাহার উপর একটি পূর্ণবিকশিত কমল স্থাপনা করিয়া মন্দিরের সজ্জা শেষ করিয়াছেন। ষোড়শদল পদ্মটিকে রূপ দিবার জন্যই কি শিল্পী তাহার নীচে কিয়দংশ সাদা রাখিলেন, অথবা এইরূপ সাদা রাখার পিছনে তাঁহার অন্য কোনও অভিপ্রায় ছিল? সময়ে সময়ে মনে হয় শিল্পী যেমন জীবজন্তুর নিত্যলীলার মধ্যে, মানুষের কাম ক্রোধ ও বাসনার মধ্যে, নৃত্যে গীতে সেই একই সূর্য্যদেবের লীলাভূমি দেখিয়াছেন, তেমনি ইহাও বলিতে চাহিয়াছেন যে শূন্যতার অন্তরেও সেই দেবতার ঐশ্বর্য্য প্রকাশিত হইতেছে—এবং এই সকলগুলি মিলিয়া সূর্য্যদেবের লীলাকমলের ষোড়শ দল রচিত হইয়াছে। যদি তাহাই সত্য হয়, তবে ইহাকে শিল্পীর পক্ষে পরমাশ্চর্য্য রচনা বলিতে হইবে। যে সাহসিকতার বশে তিনি কামনার বহুবিধ চিত্রকে মন্দিরের দেহে স্থান দিয়াছেন, এখানে তাহারই পূর্ণতম বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়।

বস্তুতঃ এরূপ শক্তি ভারতের আর কোনও স্থাপত্য-রচনার মধ্যে পাওয়া যায় না। যে শক্তির বশে মানুষ জীবনের সকল প্রকাশকেই এক সূত্রে গ্রথিত করিতে পারে, তাহাদের মহিমায় পূর্ণ করিতে পারে, তাহা অপেক্ষা একটি



আর একটি নারীমূর্ত্তি

স্বাধীন দেশের আরও বড় কি সম্পদ হইতে পারে তাহা বলা যায় না।

মধ্যভারতের খাজুরাহোর মন্দিরেও অবশ্য আমরা কোণার্কের মত নানাবিধ মূর্ত্তি দেখিতে পাই। এমন কি

সেখানকার তক্ষণ-কার্য্য সময়ে সময়ে কোণার্ক অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে হয়। নারীদের কমনীয়তা, তাঁহাদের সলজ্জ পদক্ষেপ যেমন ভাবে সেখানে ফুটিয়াছে উড়িষ্যায় হয়ত তাহার তুলনা হয় না। কিন্তু খাজুরাহোর পিছনে কোনও শিল্পীর বিরাট মনের পরিচয় পাওয়া যায় না। তাঁহাদের দক্ষতা হয়ত বেশী, কিন্তু মন কোণার্কের মত বিশাল নহে। মন্দিরের রচনা-কৌশলে পদে পদে তাঁহাদের ভীরুতা ধরা পড়ে। মন্দির যেন উচ্চে উঠিবার আকাঙ্ক্ষায় ভারাক্রান্ত। পদে পদে তাহার বাধিয়া যাইতেছে, কিছুতেই সে তাহার বিস্তারের শেষ যেন খুঁজিয়া পাইতেছে না। আত্ম-প্রকাশের চেষ্টা মন্দিরের গঠনে এতই প্রকাশিত হইয়াছে যে তাহাতেই গঠনের অন্তর্নিহিত দৃঢ়তাকে অনেকখানি যেন ক্ষুণ্ণ করিয়া দিয়াছে। খজুরাহোর মন্দিরে তরুণের উর্দ্ধে উঠিবার ব্যাকুল চেষ্টা ফুটিয়া উঠিয়াছে বটে, কিন্তু কোণার্কের সেই বিপুল শক্তি, প্রশান্ত মেঘগম্ভীর আত্মস্থ ভাব এখানে কোথায়? কোণার্কের শিল্পী সেই শক্তির বশে ভাল মন্দ সকল জিনিষকে একটি বিরাট ঐক্যের সূত্রে যোজিত করিয়া দিয়াছেন। তাহারই মহিমায় সমস্ত মন্দির যেন উদ্ভাসিত হইয়া আছে।

আজও অসংখ্য ভগ্ন প্রস্তররাশির অন্তরালে থাকিয়া, কত দিনের কত আঘাত সহিয়া কোণার্কের মন্দির সে যুগের যে জ্বলন্ত চিত্রটি আমাদের সম্মুখে ধরিয়া রাখিয়াছে তাহার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া শেষ করা যায় না। রাত্রির অন্ধকারে, ঝাউবনের মর্ম্মরতানের সহিত কোণার্কের মন্দির যেন আমাদের সমস্ত হৃদয়কে ধীরে ধীরে অধিকার করিয়া লয়।

বহুদিন পূর্ব্বে উড়িষ্যার একটি ক্ষুদ্র পল্লীতে একজন শিল্পীর সহিত আমার পরিচয় হইয়াছিল। দরিদ্র লোক, দিনের অন্ন তাঁহার অতি কষ্টে সংস্থান হয়, তবু তিনি তালপাতায় লেখা একখানি শিল্পশাস্ত্র অতি সযত্নে কাঠের সিংহাসনের উপর রাখিয়া দিয়াছেন। তিনি তাহা নিত্য পূজা করেন, ধূপধুনা দেন, ফুলচন্দন দিয়া অর্চ্চনা করেন, কখনও তাহাকে অনাবশ্যকবোধে পরিত্যাগ করেন নাই। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "বন্ধু, সে যুগ ত' আর নাই, তোমার আদর ত' কেহ করিবে না; তবে কেন শুধুই পুরাতনের এই স্মৃতিটুকু ধারণ করিয়া রাখিয়াছ?" শিল্পী উত্তর করিলেন, "আমাদের যুগে হয়ত কিছু হইবে না, কিন্তু দেখিবেন, আমাদের যাহারা সন্তান, তাহাদের আবার আদর হইবে। তাহারা মানুষ হইবে, দেশ তাহাদের পুনরায় মূল্য দিবে। নিজের জন্য নয়, তাহাদেরই জন্য এগুলিকে আজও সযত্নে রাখিয়া দিয়াছি।" কথাটিতে অন্তরে বড় বল পাইয়াছিলাম। বস্তুতঃ আজ হয়ত আমরা হীন ও অধঃপতিত হইয়াছি, কিন্তু তাই বলিয়া সেই দুঃখেই বদ্ধ হইয়া থাকিব কেন? যে প্রচণ্ড শক্তির বশে একদিন আমাদের দেশে কোণার্কের মত মন্দির রচিত হইয়াছিল, আবার হয়ত এমন দিন আসিবে যখন আমরা তাহার যথাযথ মর্য্যাদা দিতে পারিব।

আজ ভারতের বহু দুঃখ-বেদনার অন্তরালে কি আমরা সেই শুভ ভবিষ্যতের অরুণ আলোক দেখিতে পাই না?

সন্ধি

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ

দ্বিতীয় খণ্ড

নীহারিকার কথা

১১

বেলা ১১টার সময় ডাঃ পাকড়াশী ও সুরথ বাবু কিশোরের সঙ্গে আসিলেন। শঙ্কর পরে আসিল। ডাঃ পাকড়াশী অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন এবং দুই ডাক্তারে পরামর্শ করিয়া দাদাকে বলিলেন, কারবাঙ্কল এখন যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে ইহাকে বসাইয়া দেওয়া অসম্ভব, অস্ত্র করিতে হইবে, আর যেরূপ তাড়াতাড়ি বাড়িয়া চলিতেছে, খুব শীঘ্র অস্ত্র করা দরকার। আমি দাদার কাছে একথা শুনিয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম। কারণ, পূর্ব্ব হইতেই আমার মনে অত্যন্ত ভয় জন্মিয়াছিল, মা অস্ত্রোপচার কিছুতেই সহ্য করিতে পারিবেন না। দাদা ও কিশোর আমাকে অনেক বুঝাইল, শঙ্করও আসিয়া তাহাতে যোগ দিল। অবশেষে আমি অগত্যা অস্ত্র করাতে সম্মত হইলাম। তখন কে জানিত, মলম লাগাইয়াও কত জনের কারবাঙ্কল আরাম হইয়াছে।

এরূপ স্থির হইল, পরদিনই বেলা ১০টার সময় ডাঃ পাকড়াশী ও সুরথ বাবু আসিয়া অস্ত্র করিবেন। সেজন্য তাঁহারা কিশোরকে অনেক উপদেশ দিলেন, এবং কি কি জিনিষপত্র কিনিতে হইবে, তাহার ফর্দ্দ দিলেন। ডাঃ পাকড়াশীকে ১৬৲ টাকা ফী দেওয়া হইল, কিন্তু অস্ত্র করার জন্য তিনি লইবেন ৫০৲ টাকা।

যাহা হউক, জিনিষপত্রের ফর্দ্দ লইয়া কিশোর ও শঙ্করের সহিত দাদা বাজারে বাহির হইল। মাকে অস্ত্র করার কথা বলা হইল না, আমি সারাদিন তাঁহার কাছে বসিয়া রহিলাম। তাঁহাকে কেবল ফলের রস খাইতে দেওয়া হইল। সন্ধ্যার সময় দাদা জিনিষগুলি লইয়া ফিরিয়া আসিল, শঙ্করও তাহার সঙ্গে আসিল। কিশোর তাহার হাসপাতালের কাজ সারিয়া রাত্রি ১০টার সময় আসিবে, এরূপ বলিয়া পাঠাইয়াছে।

মা'র জ্বর আজও খুব বাড়িয়া চলিল। আমি মাথায় আইস্‌-ব্যাগ দিয়া বসিয়া রহিলাম। আমি যখন আহার করিতে গেলাম, তখন দাদা ও শঙ্কর বসিল, কিন্তু আমি কিছুই খাইতে পারিলাম না। আমি আসিয়া দেখি, কিশোর আসিয়াছে। কিশোর শঙ্করকে বলিল—"যাও এবার তোমাদের ছুটি, আমি এখন বসি।" আমাকে বলিল—"আপনিও এখন একটু ঘুমিয়ে নিন।" কিন্তু শঙ্কর বলিল—'কিশোর, তুই ত কাল রাত জেগেছিস, আজ তুই ঘুমো গিয়া, আমি এখন বসি, নীরুদেবী আপনিও শুয়ে পড়ুন।" দাদা বলিল—"আর আমি? তোমরা রাত জাগবে, আর আমি বুঝি সুখে নিদ্রা যাব?"

আমি বলিলাম—"দাদা তুমি ত ব'সে ব'সে ঘুমুবে, তার চাইতে বিছানায় গিয়ে শোও। শঙ্কর বাবুও এ-সব বিষয়ে নেহাৎ আনাড়ি। কিশোর বাবু, আপনি এতক্ষণ হাসপাতালে খেটে এসেছেন, আপনিও গিয়ে বিশ্রাম করুন, আমি এখন বসি, আপনি ৩টার সময় আসবেন।" এই বলিয়া আমি মা'র মাথার কাছে বসিয়া পড়িলাম। প্রমীলা তফাতে দাঁড়াইয়া ছিল। সেও আমার কাছে আসিয়া বসিল। দাদা তাহার বন্ধুদের লইয়া অন্য ঘরে গেল।

আমি কিছুক্ষণ পরে দেখিলাম, প্রমীলা বসিয়া ঝিমাইতেছে। তাহাকে শুইতে পাঠাইয়া দিয়া আমি একলা মা'র কাছে বসিলাম ও তাঁহার মাথায় আইস্‌-ব্যাগ দিতে লাগিলাম। কিন্তু আইস্‌-ব্যাগ দেওয়া সত্ত্বেও ডিলীরিয়াম আরম্ভ হইল। আমি তখন কিশোরকে ডাকিয়া আনিলাম, ও আমরা দুই জনে মা'র মাথার দুই পাশে বসিলাম—কিশোর আইস্‌-ব্যাগ ধরিল, আমি মাথায় বাতাস দিতে লাগিলাম। কিশোর থার্ম্মোমেটার দিয়া দেখিয়া বলিল—"জ্বর ১০৪ ডিগ্রী উঠেছে, সেই জন্যই ডিলীরিয়াম হচ্ছে। ওষুধ আর এক দাগ খাওয়ান যাক।"

আমি বলিলাম—"এই রকম বেশী জ্বর হচ্ছে, শরীর

খুব দুর্ব্বল, এর মধ্যে অপারেশন করা কি ভাল হবে ?"

কিশোর বলিল—"জ্বর ক্রমে কমে যাবে, এখন অপারেশন না করলে কেস্ যে আরও খারাপ হয়ে পড়বে। ম্যালিগ্ন্যাণ্ট টাইপের কারবাঙ্কল, ধাঁ ধাঁ ক'রে বেড়ে যাচ্ছে।"

মা বেহুঁস অবস্থায় যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছিলেন, এবং মধ্যে মধ্যে ভুল বকিতেছিলেন। একবার বলিলেন—"ছেলেটি বড় ভাল, কৃষ্ণনগরে বাড়ি, আমার নীরীর সঙ্গে বেশ মানাবে, বড় ভাল ছেলে।" এই প্রলাপ-বাক্য শুনিয়া কিশোর আমার দিকে তাকাইয়া যেন একটু হাসিল। আমি মুখ ফিরাইয়া বসিলাম। আবার কিছুক্ষণ পরে মা বলিলেন—"তোরা আমাকে নিশ্চয়ই মেরে ফেলবি। ওঃ আমি বিয়ে দেখে যাব, তোরা আমাকে মারিসনে, মারিসনে।" মার এই-সব কথা শুনিয়া আমি আর সেখানে বসিতে পারিলাম না। আমি চক্ষু মুছিতে মুছিতে আমার বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িলাম। এই সময় শঙ্কর উঠিয়া আসিল এবং কিশোরের কাছে বসিল। এই ভাবে রাত্রি কাটিল।

পর দিন বেলা ১০টার সময় ডাঃ পাকড়াশী আসিলেন। কিশোর তাহার আগেই সুরথ বাবু ডাক্তারকে লইয়া আসিয়াছিল। শঙ্কর আর বাড়ি যায় নাই, এখানেই ছিল। ডাক্তারেরা মাকে একবার ভাল করিয়া দেখিলেন। তখন জ্বর খুব কম ছিল। তখনই অপারেশন করা স্থির হইল। সুরথ বাবু ক্লোরোফর্ম্ম করিলেন ও নাড়ী ধরিয়া বসিলেন, কিশোর ঘড়ী ধরিল, ডাঃ পাকড়াশী ছুরি চালাইলেন। আমি ক্লোরোফর্ম্ম করিতেই পাশের ঘরে গিয়া বসিয়াছিলাম। ভয়ে আমার বুক কাঁপিতে লাগিল। আমি কত ক্ষণ সেভাবে কাটাইয়াছিলাম, আমার হুঁস ছিল না। পরে দাদা আসিয়া আমাকে যখন ডাকিল—"নীরু, আয় দেখে যা", আমি তাঁহাকে বলিলাম—"মা বেঁচে আছেন ত, দাদা ?" দাদা বলিল—'হাঁ, চোখ চাইছেন, তবে বড় যন্ত্রণা হচ্ছে।" আমি গিয়া দেখিলাম, ডাক্তারেরা ড্রেসিং শেষ করিয়াছেন। আমাকে দেখিয়া কিশোরের চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সে বলিল—"আপনি বড্ড ভয় পেয়েছিলেন, ঈশ্বরের ইচ্ছায় নির্ব্বিঘ্নে শেষ হয়েছে।"

শঙ্কর বলিল—"আমি ত আগেই বলেছিলাম, ডাঃ পাকড়াশীর হাত খুব সাফাই।"

দাদা বলিল—"অপারেশন ত হ'ল, এখন শেষটা কি রকম দাঁড়াবে সেই ত কথা।"

আমরা একটু দূরে দাঁড়াইয়া এই সব আলাপ করিতেছিলাম। ডাক্তার দুই জন তখন মায়ের পাশে চৌকীতে বসিয়াছিলেন। সুরথবাবু যন্ত্রপাতি ধুইতে ধুইতে কিশোরকে ডাকিলেন, কিশোর গিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিল। পরে ডাঃ পাকড়াশী বাহির হইলেন, আর সকলেও তাঁহার সঙ্গে বাহিরে গেল। আমি অমনি মার কাছে গিয়া তাঁহার মাথায় হাত দিয়া বসিলাম। মা আমার দিকে চোখ মেলিয়া চাহিয়া বলিলেন "আমার পিঠে অস্ত্র করেছে, উঃ বড় যন্ত্রণা, পিঠ নাড়তে পারছি না।" আমি বলিলাম—"মা, তুমি একভাবে পড়ে থাক, নড়াচড়া ক'রো না।" এই বলিয়া আমি বাতাস করিতে লাগিলাম।

দাদা আসিয়া বলিল—"ডাক্তারেরা লাইব্রেরী-ঘরে বসেছেন, তারা এখনই যাবেন, তাদের টাকা দিতে হবে।"

আমি বলিলাম—"যা দিতে হবে দিয়ে দাও, আর যা-যা বলেন নোট ক'রে রাখ।"

দাদা বলিলেন—"কিশোরবাবু নোট করছেন, আমি যাই, তুই একবার আসবি না ?"

আমি বলিলাম—"আমি আর গিয়ে কি করব, দাদা, যা করতে হয় তুমিই কর। আমি এখন মা'র কাছে বসি, তাঁর বড় যন্ত্রণা হচ্ছে।"

প্রমীলা ইতিমধ্যে আসিয়া বসিয়াছিল। সেও এতক্ষণ ভয়ে জড়সড় হইয়া অন্য ঘরে ছিল, কাছে আসিতে সাহস করে নাই।

ডাক্তারদের বিদায় করিয়া দিয়া দাদা তাহার বন্ধুদের সহিত মা'র কাছে আসিল। কিশোর আমাকে বলিল—"এই দেখুন, ডাঃ পাকড়াশী এই-সব ইন্‌ষ্ট্রাকশন (উপদেশ) দিয়াছেন।" এই বলিয়া সেগুলি পড়িয়া শুনাইল।

পরে বলিল—"এই প্রেসক্রিপ্‌শন্ অনুসারে ওষুধ এনে এখন খাওয়াতে হবে, আমি সে ওষুধ এনে দিয়ে যাচ্ছি। আমার কলেজ আছে।"

আমি বলিলাম—"ওষুধ নিয়ে আসুন; এখানে খেয়ে যাবেন। আর কলেজের ছুটির পর একবার আসবেন।"

কিশোর বলিল—"আমি মেসে খেয়েই কলেজে যাব, বৈকালে নিশ্চয়ই আসব।"

শঙ্কর বলিল—"ওষুধ নিয়ে তোর আর আসতে হবে না, আমি তোর সঙ্গে যাচ্ছি, আমিই ওষুধ নিয়ে আসব। সুকুমার, তুমি বাড়ি থাক।"

আমি বলিলাম, "দাদা, তোমার আজ কলেজে যাওয়া হবে না।"

এই বলিয়া আমি কিশোর ও শঙ্করের সহিত বাহিরে আসিলাম, দাদা ও প্রমীলা মা'র কাছে রহিল। আমি সভয়ে কিশোরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ডাক্তারেরা কি ব'লে গেলেন, কিশোরবাবু? অনেক সময়ে অপারেশন করার পরও বিপদ ঘটে। মা'র শরীর কিন্তু খুব দুর্ব্বল।"

কিশোর বলিল,—"সেই জন্যেই ত এই ওষুধ দিয়েছেন, এখন খুব ভালরূপে ওআচ্ করা দরকার। আমি আবার চারটার সময়ই আসব, আর রাত্রে ওআচ্ করবো। জ্বর বোধ হয় ক্রমে বাড়বে। নড়াচড়া করতে দেবেন না, খুব সাবধান।"

এই বলিয়া কিশোর শঙ্করের সহিত বাহির হইয়া গেল। আমি আবার মা'র কাছে গিয়া বসিলাম। মা'র জ্বর আবার বাড়িতে লাগিল। শঙ্কর ওষুধ লইয়া আসিল। আমি সেই ওষুধ তিন ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইতে লাগিলাম। দাদা ও শঙ্কর আহার করিয়া মা'র কাছে আসিয়া বসিল, প্রমীলা আর আমি খাইতে গেলাম। আমি খাইয় আসিয়া দাদাকে বলিলাম—"আমি এখন বসি, তোমরা বিশ্রাম কর'গে, আবার রাত জাগতে হবে।" শঙ্কর বলিল, "আপনারও ত বিশ্রামের দরকার।" আমি বলিলাম, "প্রমীলা আসুক, আমি এখানেই একটু গড়িয়ে নেব'খন, ঘুম আর এখন আসবে না।"

এই ভাবে দিন কাটিল। কিশোর চারিটার সময় আসিয়া মা'র নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিল—"নাড়ী আরও দুর্ব্বল দেখছি, কিন্তু টেম্পারেচার ত তেমন বাড়ে নাই।"

আমি বলিলাম, "টেম্পারেচার ত ১০১, অন্যদিন এরূপ জ্বরে ত কথা বলতেন, আজ যেন কেমন আচ্ছন্ন ভাব দেখছি।"

কিশোর বলিল, "আমি এখনই সুরথবাবুর কাছে যাচ্ছি, তাঁকে একবার এনে দেখাই কি বলেন।"

আমি বলিলাম, "বেশ ত।"

দাদা তখন আসিয়া বলিল, "অবস্থা কেমন দেখছেন, কিশোরবাবু?"

কিশোর বলিল, "আমি তেমন বুঝতে পারছি না। নাড়ীর অবস্থা ভাল বোধ হচ্ছে না। আমি ডাক্তারকে এখ্খুনি নিয়ে আসছি।"

এই বলিয়া কিশোর চলিয়া গেল এবং এক ঘণ্টা পরেই সুরথবাবুকে সঙ্গে করিয়া আসিল। সুরথবাবু নাড়ী পরীক্ষা করিয়া মুখ গম্ভীর করিলেন এবং তাড়াতাড়ি একটা প্রেস্‌ক্রিপ্‌শ্যন্ লিখিয়া ওষুধ আনিতে পাঠাইলেন। শঙ্কর ওষুধ আনিতে ছুটিল। আমি ডাক্তারের ভাব দেখিয়া নিতান্ত ভীত হইলাম এবং দাদাকে বলিলাম—"তুমি একবার ডাক্তারবাবুকে ভাল ক'রে জিজ্ঞেস কর, অবস্থা কেমন।"

দাদা ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিল, ডাক্তার বাহিরে আসিলেন এবং লাইব্রেরী-ঘরে বসিলেন। কিশোর ও দাদা তাঁহার নিকটে গেল। আমি দরজার কাছে দাঁড়াইয়া তাঁহাদের কথা শুনিতে লাগিলাম। তাঁহাদের আলোচনার ভাবে বুঝিলাম, অবস্থা খুব সঙ্কটাপন্ন। আমি দাদাকে ইঙ্গিত করিয়া ডাকিয়া আনিয়া বলিলাম, "ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞাসা কর, তাঁর সঙ্গে কন্‌সাল্ট্ (পরামর্শ) করবার জন্য আর এক জন ডাক্তার আনালে কেমন হয়?" এই সময় কিশোরও আমার কাছে আসিল। আমার কথা শুনিয়া ডাক্তারবাবুর কাছে গেল। সুরথবাবু বলিলেন—"সে ভালই, ডাঃ পাকড়াশীকেই আনতে পারেন।" এই কথা শুনিয়া কিশোর তখনই ডাঃ পাকড়াশীকে আনিবার জন্য ছুটিল। আমি সুরথবাবুকে যাইতে দিলাম না। তিনি বসিয়া রহিলেন। আমি আবার মা'র কাছে গিয়া বসিলাম। আমার বড় কান্না পাইতে লাগিল। দাদাও সেখানে আসিয়া বসিল। এই সময়ে শঙ্কর ওষুধ আনিল, ডাক্তারবাবু আসিয়া আবার নাড়ী দেখিয়া সেই ওষুধ খাওয়াইয়া দিলেন।

কিশোর প্রায় ৮টার সময় ডাঃ পাকড়াশীকে সঙ্গে করিয়া আসিল। তিনিও রোগীর অবস্থা দেখিয়া মুখ ভার করিলেন এবং দুই ডাক্তারে পরামর্শ করিয়া আর একটা ওষুধ লিখিয়া দিলেন। কিশোর সেই ওষুধ আনিতে ছুটিল, ডাঃ পাকড়াশী অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ওষুধ আসিলে তিনি সেই ওষুধ

খাওয়াইয়া দিয়া সুরথবাবুকে চুপে চুপে কি বলিয়া তাঁহার ফী লইয়া প্রস্থান করিলেন। আমি কিশোরকে ঘরের বাহিরে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "ইনি কি বললেন আপনি স্পষ্ট ক'রে বলুন।"

কিশোর বলিল—"নাড়ীর অবস্থা খুব খারাপ, ডাক্তার ষ্টিমুলেণ্ট্ দিয়েছেন, এতে ক্রমে ভাল হ'তে পারে।"

আমি বলিলাম—"তবে সুরথ বাবু ডাক্তার এখানে থাকুন।"

কিশোর বলিল—"হাঁ, তাঁকে রাখাই উচিত, আজ রাত্রিটা বড়ই আশঙ্কাজনক।"

দাদা আমাদের কথা শুনিতেছিল। সে বলিল,—"আপনি আর কি পরামর্শ দেন?"

কিশোর বলিল—'ডাক্তারের যা সাধ্য তা-ত করাই হচ্ছে। এখন ঈশ্বর ভরসা।"

এই কথা শুনিয়া আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম। কিশোর বলিল- "আপনি উতলা হবেন না। মা'র কাছে গিয়া বসুন। সুরথ বাবুর কাছে যাই। তিনিও মাঝে মাঝে এসে নাড়ী দেখবেন।

ঔষধ খাওয়ানোর প্রায় দুই ঘণ্টা পরে মা একবার চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন। তাঁহার যেন হুঁস হইয়াছে বোধ হইল। তখন কিশোরকে ডাকিলাম, ডাক্তার বাবুও আসিলেন। দাদা ও শঙ্কর আসিল। ডাক্তার নাড়ী পরীক্ষা করিলেন। মা চক্ষু চাহিয়া অতিক্ষীণ স্বরে বলিলেন, "জল।" আমি তাঁর মুখে এক চামচে জল দিলাম, তিনি আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া দুই ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। আমি আঁচল দিয়া চক্ষু মুছিয়া দিলাম।" মা আবার চক্ষু মেলিয়া চারি দিকে তাকাইলেন, কাহাকে যেন খুঁজিতেছেন, পরে কিশোরকে দেখিতে পাইয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন, তাঁহার মুখ যেন উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি ইসারায় কিশোরকে কাছে ডাকিলেন। কিশোর কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই ক্ষীণ কণ্ঠে বলিলেন,—

"বাবা, নীরীকে তোমার হাতে সঁপে দিয়ে গেলুম।" এই বলিয়া আবার চক্ষু মুদিলেন। আমি তাঁহার কথা শুনিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাহিরে গেলাম।

ডাক্তার বাবু আর সকলকে বলিলেন, "আপনারা আর ভিড় করবেন না, বাহিরে যান।"

তখন দাদা ও শঙ্কর বাহিরে গেল। ডাক্তার বাবু আবার নাড়ী দেখিলেন, আমি আবার ঘরে গিয়া শয্যাপার্শ্বে মায়ের মুখের দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। কিশোর তফাৎ হইতে দেখিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে ডাক্তার বাবু উঠিয়া বাহিরের ঘরে গিয়া বসিলেন।

রাত্রি প্রায় সাড়ে এগারটার সময় আমি টের পাইলাম, মা যেন জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলিতেছেন। আমি দাদাকে ডাকিলাম, দাদা ও কিশোর আসিল। কিশোর আসিয়া নাড়ী দেখিয়া ডাক্তার বাবুকে ডাকিয়া আনিল, তিনি নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—"নাড়ী পাওয়া যাচ্ছে না, শ্বাস উঠেছে।" এই বলিয়া তিনি বাহিরে গেলেন। কিশোর ও দাদা তাঁহার সঙ্গে গেল। আমি ইহার অর্থ কি বুঝিতে না পারিয়া ভয়ে নিতান্ত অভিভূত হইয়া বসিয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পরে দাদা আসিয়া বলিল—"ডাক্তার ব'লে গেলেন, আর রক্ষা নেই।" এই বলিয়া দাদা কাঁদিয়া ফেলিলেন। আমিও দাদার কথা শুনিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলাম।

আমাদের কান্না শুনিয়া কিশোর ও শঙ্কর আসিল। তাহারা দাদাকে ধরিয়া বাহিরে লইয়া গেল। পরে কিশোর আসিয়া আমার কাছে দাঁড়াইয়া আমাকে বাহিরে যাইতে বলিল। আমি উঠিলাম না, মা'র গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। প্রমীলাও অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

ক্রমে মায়ের অবস্থা আরও খারাপ হইতে লাগিল। আমরা সকলে তাঁহার চারি পাশে বসিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলাম। রাত্রি একটার সময় সব শেষ হইল, আমার স্নেহময়ী জননী আমাকে অকূল সাগরে ভাসাইয়া প্রস্থান করিলেন।

তৃতীয় খণ্ড
কিশোরের কথা

১

এই অল্প কয়েক দিনের মধ্যে যে ঘটনা ঘটিল, তাহা পূর্ব্বে কখন স্বপ্নেও ভাবি নাই। কোন্ এক অচিন্ত্য শক্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়া, যাহাদের সঙ্গে আমার কোন দিন আলাপ-

পরিচয়ের সম্ভাবনা ছিল না, সেই একটি পরিবারের সহিত অকস্মাৎ জড়িত হইয়া পড়িলাম। সুকুমারের মা যে-দিন মারা যান, আমি তার পর দিন শুধু ভদ্রতার খাতিরে তাহাদের বাড়িতে গেলাম। সুকুমার আমাকে লাইব্রেরী-ঘরে বসাইয়া রাখিয়া বোধ হয় তাহার ভগিনীকে সংবাদ দিতে গেল। অল্প ক্ষণ পরেই আসিয়া বলিল—নীরু শোকমূর্চ্ছিত হইয়া শয্যাগ্রহণ করিয়াছে। আমি যে তাহার ভগিনীর সহিত দেখা করিতে আসিয়াছি একথা তাহার মনে কেন আসিল জানি না। আমি বলিলাম—"আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসিনি, আপনারা কেমন আছেন জানতে এসেছি।" সুকুমার বলিল—"আমরা ত এক রকম আছি, কিন্তু নীরুকে নিয়েই মুস্কিল হয়েছে। সে কাল থেকে জল-বিন্দু মুখে দিচ্ছে না।" আমি বলিলাম, "হঠাৎ এরূপ বিপদ ঘটবে আমরা কখন ভাবতেও পারিনি। তাঁর মনে একটা গুরুতর আঘাত লেগেছে। প্রকৃতিস্থ হ'তে কিছু সময় লাগবে। আপনাদের কোন জিনিষপত্র কেনবার দরকার হ'লে আমাকে বলবেন, এনে দেব।" সুকুমার বলিল—"আচ্ছা, কাল আপনি একবার আসবেন। আপনার উপর আমাদের যতটা দাবি আর কারু উপর ততটা নেই। হবিষ্যি করবার জন্য ভাল ঘি কোথায় পাওয়া যাবে, আপনি একটু খোঁজ করবেন।" আমি খোঁজ করিব বলিয়া চলিয়া আসিলাম।

আমি পর দিন সকালে অনেক খোঁজ করিয়া এক সের গাওয়া ঘি কিনিলাম এবং তাহা লইয়া সুকুমারদের বাড়িতে গেলাম। সুকুমার ঘি পাইয়া খুব সন্তুষ্ট হইল। আজ আমি তাহার সঙ্গে নীরু দেবীর ঘরে গিয়া দেখিলাম, তিনি শয্যায় শুইয়া চক্ষু মেলিয়া দেওয়ালের দিকে তাকাইয়া আছেন। আমার আগমন জানিয়াও একটুও নড়িলেন না, বা মাথায় কাপড় টানিয়া দিলেন না, বা কোন প্রকার লজ্জার ভাব দেখাইলেন না। যে ভাবে পড়িয়াছিলেন সেই ভাবেই রহিলেন। সুকুমার আমাকে সেখানে রাখিয়া অন্য ঘরে গেল। আমি মিনিট-পাঁচেক বসিয়া রহিলাম, কোন কথা বলিলাম না, পরে উঠিয়া আসিলাম। প্রমীলা বলিল, "আজ দুই দিন ঐ এক ভাবেই পড়িয়া আছেন, কোন কথা বলিতে গেলে বিরক্ত হন, অনেক জেদ করাতে কাল রাত্রে একটু দুধ খেয়েছিলেন। কাল সন্ধ্যাবেলা দাদা এসেছিলেন, তাঁর মুখের দিকে চেয়ে কেঁদে ফেললেন, দাদা কত বুঝালেন।" আমি বলিলাম, "কাঁদা ভাল।" এই বলিয়া আমি চলিয়া আসিলাম। আমার বুকের মধ্যে খপ্ করিয়া একটু বিঁধিল। আমি কি তবে তাঁর কেউ নয়? আমাকে যেন চিনিতেই পারিলেন না। আমার অদৃষ্ট।

ইহার পরে দুই দিন আমি আর সুকুমারদের বাড়িতে যাই নাই। তৃতীয় দিন সন্ধ্যাবেলা শঙ্কর আসিল। সে হাসিতে হাসিতে বলিল, "কি রে কিশোর, আমাদের এক যাত্রায় পৃথক ফল হ'ল"

আমি বলিলাম—"সে কি রকম?"

শঙ্কর বলিল, "আমি তোকে সঙ্গে ক'রে প্রমীলাদের বাড়ি নিয়ে গেলুম, তোর ভাগ্যে হ'ল স্ত্রীলাভ, আর আমার ভাগ্যে হ'ল বন্ধুহানি।"

"বন্ধুহানি কি রকম?"

"বুঝলি না, তোর সঙ্গে আলাপের পূর্ব্বে নীরু দেবীর সঙ্গে আমি ত খুব বন্ধুত্ব জমিয়ে নিয়েছিলুম।"

"তা গেল কিসে? এখনও ত তাঁর সঙ্গে তোমার খুব ভাব আছে।"

"সে ভাব আর কয় দিন থাকবে রে? তুই কি আর থাকতে দিবি?"

"কেন দেব না? আমার হাত কি?"

"তুই যে তাঁর বাগ্‌দত্ত স্বামী।"

"তিনি যদি আমাকে স্বামী ব'লে স্বীকার না করেন?"

"করবেন বই কি। মার মৃত্যুকালের আদেশ, তা কি কেউ অমান্য করে?"

"আমার বিরুদ্ধে তাঁর যে মস্ত প্রেজুডিস্ (প্রতিকূল সংস্কার) তা কি ভুলতে পারবেন? আমি হচ্ছি স্ত্রীজাতির অবমাননাকারী পাপাত্মা দুঃশাসন, মনে আছে ত?"

"হাঁ, মনে আছে।"

"আর তাঁর লেখা প'ড়ে আমি যেরূপ বুঝেছিলেম, তিনি হয়ত বিয়েই করবেন না।—এতদিন ত করতে রাজী হন নাই।"

"কিন্তু জানিস ত শেক্সপীয়ার স্ত্রীজাতির কি নাম দিয়েছেন—"ফ্রেল্‌টী, দাই নেম ইজ ওম্যান!"* তাঁর মত

* "হে নারী, চঞ্চলমতি নাম ত তোমারি।"

বদলাতে কতক্ষণ? যা'ক সে কথা, আমি এখন ওদের বাড়িতে যাচ্ছি।"

"বন্ধুত্ব রক্ষা করতে বুঝি?"

"হাঁ, তাদের এই বিপদের সময় আমাদের আত্মীয়-স্বজনদের খোঁজখবর নেওয়া উচিত নয় কি? তুইও আমার সঙ্গে চল।"

আমি বলিলাম 'শঙ্করদা, তোমার সঙ্গে তাদের একটা মিষ্ট সম্বন্ধ আছে, তুমি অবশ্যই যাবে। কিন্তু আমার সঙ্গে ত এখন পর্য্যন্ত কোন সম্বন্ধ হয় নি। আমি গেলে বরং তোমাদের আলাপের ব্যাঘাত হবে।"

শঙ্কর "তাই বুঝি?" বলিয়া চলিয়া গেল। আমি শঙ্করের সঙ্গে সুকুমারদের বাড়ি গেলাম না বটে, কিন্তু শঙ্করের সহিত নীরু দেবীর কি কথাবার্ত্তা হয় তাহা জানিবার জন্য আমার মনে কৌতূহল জাগিয়া রহিল। সেজন্য শঙ্কর কখন ফিরিয়া আসে তাহা দেখিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া রাস্তার ধারের বারান্দায় বসিয়া রহিলাম। প্রায় এক ঘণ্টা পরে শঙ্করকে আসিতে দেখিলাম। সে আমাকে ডাকিল, আমি তাহাকে উপরে আসিতে বলিলাম। সে বলিল 'না রে, এখন আমার সময় নেই, বড্ড দেরি হয়ে গেছে। তুই কাল সকালে একবার ওদের বাড়িতে যাস, বিশেষ কথা আছে।" এই বলিয়া শঙ্কর দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

আমাকে কে ডাকিয়াছে সুকুমার, না নীরু দেবী, কেন ডাকিয়াছে, শঙ্করের সঙ্গেই বা তাহাদের কি কথা হইয়াছে, জানিবার জন্য আমি উৎসুক হইলাম। কিন্তু শঙ্কর কোন কথা প্রকাশ না করিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল, ইহারই বা অর্থ কি? এই সকল ভাবিতে ভাবিতে আমি রাত্রে ঘুমাইয়া পড়িলাম। পর দিন সকালে সাতটার সময় সুকুমারদের বাড়িতে গেলাম।

সুকুমার আমাকে দেখিবামাত্র নীরু দেবীর কাছে লইয়া গেল। নীরু দেবী তাঁহার মায়ের ঘরে বিছানায় শুইয়া ছিলেন। আমাকে দেখিয়া উঠিয়া বসিলেন, এবং অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন,—"দেখুন, সুরথবাবু ডাক্তার সেদিন বৈকালে এসে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ছিলেন, সেজন্য তাঁকে কিছু দিতে হবে। যা দিতে হয় আপনিই নিয়ে দিয়ে আসবেন।"

আমি বলিলাম—"আচ্ছা, আমি তাঁকে একবার জিজ্ঞেস ক'রে আসি, পরে কাল টাকা নিয়ে যাব। আপনি কেমন আছেন?"

নীরু দেবী দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "আমি আর কেমন থাকব? আমি যা আশঙ্কা করেছিলুম, শেষটায় তাই হ'ল। মা যে এত শীঘ্র আমাদের ছেড়ে যাবেন, তা স্বপ্নেও ভাবি নাই।"

এই বলিয়া তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। আমি সান্ত্বনা দিয়া বলিলাম,—"কেস্ (case) যে হঠাৎ এত খারাপ হবে তা ডাক্তারেরাও মনে করেন নাই। মা বুড়ো হয়েছিলেন, অপারেশন করার শক্ (ধাক্কা) সহ্য করতে পারলেন না। এ সকল ঈশ্বর-ইচ্ছা ঘটনা, মানুষের এতে কোন হাত নেই। আপনি এ ভাবে প'ড়ে থেকে আর শরীর খারাপ করবেন না।"

আমার এই কথার পর তিনি আর কিছু বলিলেন না। আমিও উঠিলাম। বাহিরে গেলে সুকুমার বলিল, "কিশোর বাবু, আপনি চা খেয়েছেন?—এখানে চা প্রস্তুত।" আমি বলিলাম—"আমি চা খেয়ে বেরিয়েছি, এখনই কলেজে যেতে হবে। আমি সুরথবাবুর কাছে শুনে কাল এসে টাকা নিয়ে যাব।" আমি এই বলিয়া বাহির হইলাম।

ইহার পরে সুকুমার তাহার মায়ের শ্রাদ্ধ যথাসময়ে সম্পন্ন করিল। আমাকে পূর্ব্ব হইতে তাহাদের বাড়িতে গিয়া দেখিয়া-শুনিয়া কাজকর্ম্ম করিবার জন্য আমার বাসায় আসিয়া সুকুমার বলিয়াছিল। আমি ত সময়-মত গিয়া কাজকর্ম্মের সাহায্য করিলাম। শঙ্করও আসিয়া যথারীতি কাজ করিল। নীরু দেবীর সহিত নেহাৎ কাজের কথা ভিন্ন আমার বিশেষ কোন কথা হয় নাই। কিন্তু আমার সম্বন্ধে তাঁহার মনোগত ভাব কি তাহা বুঝিতে না পারিয়া আমি সর্ব্বদা উৎকণ্ঠিত থাকিতাম। সাহস করিয়া কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি নাই। আবার সদ্যমাতৃশোকাতুর ব্যক্তিকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করাও নিতান্ত অশোভন ও হৃদয়হীনতার পরিচায়ক বলিয়া বোধ হইল।

২

শ্রাদ্ধের প্রায় কুড়ি দিন পরে একদিন সন্ধ্যার সময় সুকুমার আমার বাসায় আসিল। আমি বলিলাম—"কি হে, কি মনে

ক'রে ?" সুকুমার আমাকে এখন 'তুমি' বলে, আমিও তাহাকে 'তুমি' বলি।'

সুকুমার বলিল,—"তুমি যে আর আমাদের বাড়িতে যাও না, ব্যাপার কি ?"

আমি বলিলাম—"কোন দরকার ত পড়ে নাই, দরকার পড়লে তোমরাই ডেকে পাঠাবে জানি।"

সুকুমার হাসিয়া বলিল—"ও, সেই ডাক্তারের টাকা দেওয়ার কথা ? কিন্তু এবার যাওয়ার খুব বেশী প্রয়োজন হয়েছে। নীরুর ভাবগতিক বড় ভাল বোধ হচ্ছে না। আজ বৈকালে তাদের কলেজের কয়টি মেয়ে এসেছিল, তারা কি একটা সমিতি করেছে, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমি যতদূর বুঝতে পারি, পুরুষদিগকে দমন করা—তার নাম দিয়াছে 'নারীপ্রগতি সমিতি'। নীরুকে তারা সেই সমিতির সেক্রেটারী করতে চায়। আজ তারা এ-সম্বন্ধে অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত আলোচনা করেছিল। নীরুর মত ত তুমি জানই, 'একে মনসা তায় ধুনোর গন্ধ।' সে এ-সম্বন্ধে পূর্ব্বে অনেক লেখালেখি করেছে।"

আমি হাসিয়া বলিলাম—"হাঁ, দিবাকর শর্ম্মার সঙ্গে।"

সুকুমারও হাসিয়া বলিল—"সেই পাপাত্মা দুঃশাসনের সঙ্গে। এখন দিবাকর শর্ম্মা কি চুপ ক'রে থাকবে ? নীরু যাহাতে এই হুজুগে না মাতে, তোমার সেই চেষ্টা করা উচিত।"

আমি বলিলাম—"আমি কি করতে পারি ভাই ? তিনি আমার কথা শুনবেন কেন ?"

"কেন শুনবে না ? মা ত তাকে তোমার হাতেই সঁপে দিয়ে গিয়েছেন। অবশ্য এখনও বিয়ে হয় নাই, এত শীঘ্র হ'তেও পারে না।"

"তিনি যে বিবাহে সম্মত হবেন, তার নিশ্চয়তা কি ?"

"আমি তবে সে কথা পাড়ব ?"

"না ভাই, এখন সে কথা পাড়া উচিত নয়। তাড়াতাড়ির প্রয়োজন কি ? আমি যে-ভাবে আছি, সেই আমার ভাল।"

"কিন্তু এই উপস্থিত অনর্থ নিবারণের উপায় কি ?"

"দেখা যাক, ব্যাপার কতদূর গড়ায়। এ সকল সভা-সমিতি একটা হুজুগ বইত নয়, কিছুদিন পরে আপনিই থেমে যাবে। আমার বিবেচনায় এসব কথা নিয়ে ঘাঁটাতে গেলেই তার বিপরীত ফল হবে।"

"আচ্ছা দেখা যাক, তুমি মধ্যে মধ্যে যেও। একেবারে নির্লিপ্ত হয়ে ব'সে থাকা উচিত নয়।"

এই বলিয়া সুকুমার বিদায় হইল। "আমি যে-ভাবে আছি, সেই আমার ভাল" এই কথা আমি বারে বারে মনে আন্দোলন করিতে লাগিলাম। এই ব্লিসফুল আন্-সার্টেন্টি, এই মধুর অনিশ্চয়তাই, আমার জীবনের সম্বল। আমি ইহাকে ছাড়িলে কি লইয়া বাঁচিয়া থাকিব ? এই ভাবে আরও কয়েক দিন কাটিল।

এক দিন সন্ধ্যাবেলায় শঙ্কর আসিল। যে-শঙ্করকে আগে দেখিবার জন্য আমি পাগল হইতাম, এখন তাহাকে দেখিলে মনে একটা অনিশ্চিত আশঙ্কার উদয় হয়। সময়ের পরিবর্ত্তনে আমাদের মানসিক অবস্থার কত পরিবর্ত্তন ঘটে!

শঙ্কর আসিয়া বলিল,—"কি রে কিশোর, তুই যে আর সুকুমারদের বাড়িতে বড় যাস না ? তোর কি হয়েছে ?"

আমি বলিলাম, "তুমি সেখানে গিয়েছিলে নাকি ?"

শঙ্কর বলিল, "আমি সেখান থেকেই আসছি। তোকে একটা নতুন খবর দিচ্ছি।"

আমি বলিলাম, "নীরু দেবীর বুঝি বিয়ে ?"

"না রে না—তিনি বিয়ে ক'রবেন না, সেই খবর।"

"বেশ ত। তোমাকে আজ বললেন বুঝি ? তুমি বুঝি নিজেই বিয়ে করবার প্রস্তাব করেছিলে ?"

শঙ্কর হাসিয়া বলিল, 'আমার ততদূর ধৃষ্টতা নেই। এই যে তোর মুখ বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে দেখ্‌ছি। তবে সব কথা বলি শোন।"

এই বলিয়া শঙ্কর পকেট হইতে একটা খাতা বাহির করিয়া বলিতে আরম্ভ করিল। তাহার মর্ম্ম এই—

বেথুন কলেজের কতকগুলি মেয়ে একটা সমিতি গঠন করিয়াছে, তাহার নাম দিয়াছে "নারীপ্রগতি সমিতি।" নীরু দেবী তাহার সেক্রেটারী হইয়াছেন। আজ সেই সমিতির নিয়মাবলী স্থির করা হইল। নীরু দেবী শঙ্করকে তাঁহাদের একজন চ্যাম্পিয়ন (সহায়ক) বলিয়া জানেন, সেজন্য তাহাকে সেই নিয়মাবলী দেখাইয়াছেন এবং উহা ছাপাইতে কত খরচ পড়িবে তাহা একটা প্রেসে গিয়া জানিয়া আসিতে অনুরোধ

করিয়াছেন। যাহারা এই সমিতির সভ্য হইবে তাহাদিগকে কতকগুলি প্রতিজ্ঞায় স্বাক্ষর করিতে হইবে। সেগুলি এই—

১। আমি নারীজাতির সর্ব্বপ্রকার হিতসাধনকে জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিলাম।

২। নারী মাত্রেরই মানুষের সর্ব্বপ্রকার অধিকার আছে, ইহা আমি মানিয়া লইতেছি।

৩। আমি নিজের স্বার্থহানি করিয়া কোন পুরুষের অধীনতা স্বীকার করিব না।

৪। আমি যতদূর সম্ভব স্বাবলম্বনবৃত্তি গ্রহণ করিব।

৫। আমি যতদূর সম্ভব দেশহিতকর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিব।

আমি এই সব শুনিয়া বলিলাম,—"শঙ্কর-দা নারীপ্রগতি সমিতির প্রতিজ্ঞাপত্র ত শুনলাম, কিন্তু এতে ত নারীর এরূপ কোন প্রতিজ্ঞা নেই যে আমি বিয়ে ক'রব না।"

শঙ্কর বলিল—"স্পষ্ট সেরূপ কোন প্রতিজ্ঞা নেই বটে, তবে পুরুষের অধীনতা স্বীকার করবে না, এই প্রতিজ্ঞা ত আছে। এর মানেই বিয়ে না করা।"

আমি বলিলাম—"কিন্তু পুরুষেরা যদি প্রতিজ্ঞা করে যে, তারা নারীকে অধীনে না রেখে মাথায় ক'রে রাখবে, তবে ত বিয়ে করবে?"

শঙ্কর বলিল—"প্রতিজ্ঞা ত অনেক সময় অনেকেই করে, তা পালন করে কয় জন?"

আমি বলিলাম—"আচ্ছা বেশ। এতে পুরুষদের জাহন্নামে যাবার কোন কারণ নেই। নারীরা যদি চিরকুমারী থাকেন, তবে পুরুষেরাও চিরকুমার থাকবে। আর শঙ্কর-দা, তুমি যখন নারীদের চ্যাম্পিয়ন অর্থাৎ পাণ্ডা হয়েছ, তখন আশা করি তুমিই এ বিষয়ে পথ দেখাবে।"

শঙ্কর হাসিয়া বলিল—"আমাকে কিন্তু শীঘ্র বিয়ে করবার জন্যে বাড়ি থেকে তাগিদ আরম্ভ করেছে। আমি তবে এখন উঠি। কালই আবার আমাকে এটা নিয়ে আসতে হবে।"

এই বলিয়া শঙ্কর বিদায় হইল। শঙ্করের সঙ্গে নীরু দেবীর যেরূপ মাখামাখি ভাব দেখছি, আমার বোধ হয় সে নীরুকে ভালবাসে এবং সেজন্য বাপমায়ের তাগিদ সত্ত্বেও বিয়ে করতে রাজী হচ্ছে না। কিন্তু নীরু দেবী কি তাকে বিয়ে করবেন? তাঁহার এই নারীপ্রগতির সেক্রেটারী হওয়া ভাল হইল। সেক্রেটারী হইয়া এখন তিনি শঙ্করকে হঠাৎ বিবাহ করিতে পারিবেন না। সুতরাং সে-সম্বন্ধে এখন নিশ্চিন্ত থাকা যাইতে পারে। কিন্তু তাহাতে আমার সুবিধা কি হইবে? আমি কি তবে আলেয়ার পশ্চাতে ধাবিত হইতেছি? আমার এখন দূরে পড়িয়া থাকা উচিত নহে। সুকুমার যথার্থই বলিয়াছে, আমার এখন নির্লিপ্ত থাকা ভাল নয়, মধ্যে মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ করা আবশ্যক।

ইতিমধ্যে এক বিষম বিপর্য্যয় উপস্থিত হইল। ভারতের রাজনৈতিক গগন কিছুকাল যাবৎ ঘনঘটাসমাচ্ছন্ন হইয়াছিল। অকস্মাৎ বজ্রপাতের ন্যায় মহাত্মা গান্ধীর আইন-অমান্য নীতি ঘোষিত হইল। দেশের শত শত নরনারী লবণ প্রস্তুত, বিলাতী জিনিষ বয়কট ও মাদকদ্রব্যের দোকানে পিকেট করিয়া কারাবরণ করিতে লাগিলেন। সমগ্র ভারতে এক মহা আন্দোলনের সাড়া পড়িয়া গেল। শুদ্ধান্তঃপুরবাসিনী ভদ্রমহিলাগণ পর্য্যন্ত জাতীয় পতাকা হস্তে কলিকাতার রাজপথে বাহির হইলেন। মহাত্মা গান্ধীর অহিংস-নীতি অবলম্বন করিয়া এই সকল নারীবাহিনী বিলাতী কাপড়ের ও মদ গাঁজার দোকানে পিকেটিং আরম্ভ করিলেন।

আমি ইহার মধ্যে একদিন প্রাতঃকালে সুকুমারদের বাড়িতে গেলাম। সুকুমার আমাকে লাইব্রেরী-ঘরে বসাইল। নীরু দেবী প্রমীলার সঙ্গে সেখানে আসিলেন। আমাকে দেখিয়া তিনি বলিলেন,—"এই যে আপনি এসেছেন। ভাল আছেন ত?"

আমি হুঁ বলিয়া মাথা নাড়িলাম।

তিনি বলিলেন—"আপনি দেশের কোন খবর রাখেন, না কেবল কলেজ আর মেস—মেস আর কলেজ করেন?"

আমি হাসিয়া বলিলাম—"তা'ও করি, আবার দেশের খবরও কিছু কিছু রাখি।"

তিনি বলিলেন—"মহাত্মা গান্ধী ইতিপূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে নন-কো-অপারেশন ঘোষণা করেছিলেন, এবার সিভিল ডিস্‌ওবিডিয়ান্‌স্‌ ঘোষণা করেছেন, জানেন ত? এ-সম্বন্ধে কলেজের ছাত্র ও ছাত্রীদিগের কি কর্ত্তব্য তা ভেবে দেখেছেন?"

আমি বলিলাম—"না, এখনও এ-সব বিষয় নিয়ে আমি কোন চিন্তা করি নাই।"

এই সময়ে প্রমীলা বলিল—"কিশোর-দাদা, দিদিরা একটা নারীপ্রগতি সমিতি করেছেন, দিদি তার সেক্রেটারী হয়েছেন।"

আমি বলিলাম—"হাঁ, আমি সে-কথা শুনেছি।"

নীরু দেবী বলিলেন—"আপনি ত নারীপ্রগতির বিরোধী। হয়ত আপনি এবার তার সমালোচনা ক'রে একটা মস্ত প্রবন্ধ লিখবেন।"

আমি হাসিয়া বলিলাম—"এখনও কি আপনি আমাকে আপনাদের শত্রু মনে করেন?',

নীরু দেবী বলিলেন—"তা করি বইকি। চিতেবাঘ কি কস্মিন্‌কালে তার গায়ের ডোরা বদলাতে পারে?"

সুকুমার কোথা হইতে আসিয়া বলিল—"চিতেবাঘ গায়ের ডোরা না বদলাইয়াও তার রক্ষকের নিকট পোষ মানতে পারে।"

নীরু দেবী বলিলেন,—"আমি আগে যে প্রশ্নটা তুলেছিলুম, তার উত্তর কি? বর্ত্তমান রাজনৈতিক আন্দোলনে আমাদের কর্ত্তব্য কি? যখন সমগ্র ভারতবর্ষ আজ মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে সাড়া দিচ্ছে, আমরা তরুণতরুণী দল কি বিলাসের আরামে ঘরের কোণে ব'সে থাকব? আমরা ভারত-দুহিতারা কিন্তু তা পারব না। আমাদের নারীপ্রগতি সমিতি এ বিষয়ে আমাদের কর্ত্তব্য স্থির করেছে।"

সুকুমার বলিল—"অর্থাৎ তোমরা এক নারীবাহিনী গঠন ক'রে পতাকা উড়িয়ে, হৈ হৈ ক'রে রাস্তায় বেরবে, আর তাই দেখে ইংরেজ সৈন্য দেশ ছেড়ে চম্পট দেবে।"

নীরু দেবী ঈষৎ কোপকটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন,—"তুমি থাম দাদা, কেবল ঠাট্টা! কেন, আমরা দোকানে দোকানে পিকেট করব। তোমরা ভীরুর দল পুলিসের ভয়ে নড়বে না, তা আমি বিলক্ষণ জানি।"

নীরু দেবীর নয়ন-কোণ হইতে যেন বিদ্যুৎশিখা ছুটিতেছিল, আমি তাহা দেখিয়া স্তম্ভিত হইলাম এবং মনে উত্তেজনা অনুভব করিলাম। সুকুমার কিন্তু তাহার বিদ্রূপ ছাড়িল না।

সে বলিল,—"তোমরা কবে সেই অভিযানে বেরবে? আমি আর কিছু না করি, অন্ততঃ তামাসা দেখতে তোমাদের পেছনে পেছনে যাব।"

নীরু দেবী আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন,—"আপনিও কি সেই তামাসা দেখার দলে?"

আমি গম্ভীর ভাবে বলিলাম, 'আমি এখনও আমার কর্ত্তব্য স্থির করিনি। ভেবে দেখি। আমি তবে এখন আসি।"

আমি এই বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম।

ক্রমশঃ

সেকালে পণ্ডিতের আদর

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

দেশের জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ এবং বিস্তৃতিসাধন অনেক পরিমাণে নির্ভর করে দেশের বৈষয়িক সম্প্রদায়ের সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতার উপর। দেশের মধ্যে যাঁহারা সম্পন্ন তাঁহাদের আন্তরিক উৎসাহ ও সাহায্য পাইলে তবেই দেশের পণ্ডিত-সমাজ নিশ্চিন্তমনে ও সাগ্রহে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনায় মনোনিবেশ করিতে পারেন। এক দিকে উদরান্নসংস্থানের জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা এবং অন্য দিকে দেশের জনসাধারণের—বিশেষ করিয়া বৈষয়িক সমাজের অবজ্ঞা, উপেক্ষা বা অনুগ্রহদৃষ্টিপাত—এই উভয়ের মধ্যে পড়িয়া যেখানে শিক্ষিত সমাজকে অশান্ত ও অস্থির হইয়া উঠিতে হয় সেখানে প্রকৃত পাণ্ডিত্যের আশা খুবই কম। বড়ই দুর্ভাগ্য ও দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের দেশে বর্ত্তমান কালে পণ্ডিতমণ্ডলীর অবস্থা অনেকটা এইরূপ—তাই প্রকৃত পাণ্ডিত্য লাভের আকাঙ্ক্ষা অপেক্ষা কেবল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার আগ্রহ আজ অনেক বেশী দেখিতে পাওয়া যায়।

অথচ অনতিপ্রাচীন কালেও এই দেশে জনসাধারণের মধ্যে পণ্ডিতের যেরূপ সম্মান ছিল তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়—অনেক সময় সেই সম্মানের বিবরণ পড়িতে পড়িতে উপকথা বলিয়া সন্দেহ হয়। প্রত্যেক সম্পন্ন গৃহস্থ তখন নানা উপায়ে দেশের শিক্ষার উন্নতিকল্পে সাহায্য করিতেন। দ্বারপণ্ডিত ও সভাপণ্ডিত প্রত্যেক ভূস্বামীর পাণ্ডিত্যপ্রিয়তার সাক্ষ্য দিত। পূজাপার্ব্বণ ও বিবাহাদি উৎসব উপলক্ষে পণ্ডিত-বিদায়ের প্রথা এবং এই প্রসঙ্গে সমবেত পণ্ডিতবর্গের মধ্যে শাস্ত্রীয় বিচারের দ্বারা পাণ্ডিত্যের উৎকর্ষাপকর্ষ নির্ণয় ও বিশিষ্ট পণ্ডিতের বিশিষ্ট সম্মান প্রদর্শনের রীতি পণ্ডিতগণকে উৎসাহিত করিত—দেশমধ্যে পাণ্ডিত্যের উৎকর্ষসাধনের সহায়তা করিত। অনেক সমর্থ গৃহস্থ পণ্ডিতদিগের বার্ষিক বৃত্তি ব্যবস্থা করিয়া বা নিজব্যয়ে চতুষ্পাঠী পরিচালনের বন্দোবস্ত করিয়া দেশে পাণ্ডিত্যের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিতেন। বৈষয়িক সমাজ এইরূপ কার্য্যকে অন্যতম অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। ফলে কালোচিত কৃষ্টির প্রবাহ দেশে অব্যাহত থাকিত। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিতে গেলে—

> "আমাদের যুদ্ধবিগ্রহ, রাজ্যরক্ষা এবং বিচারকার্য্য রাজা করিয়াছেন, কিন্তু বিদ্যাদান হইতে জলদান পর্য্যন্ত সমস্তই সমাজ এমন সহজভাবে সম্পন্ন করিয়াছে যে, এত নব নব শতাব্দীতে এত নব নব রাজার রাজত্ব আমাদের দেশের উপর দিয়া বন্যার মতো বহিয়া গেল, তবু আমাদের সমাজ নষ্ট করিয়া আমাদিগকে লক্ষ্মীছাড়া করিয়া দেয় নাই। রাজায় রাজায় লড়াইয়ের অন্ত নাই—কিন্তু আমাদের মর্ম্মরায়মাণ বেণুকুঞ্জে, আমাদের আম-কাঁঠালের বনচ্ছায়ায় দেবায়তন উঠিতেছে, অতিথিশালা স্থাপিত হইতেছে, পুষ্করিণীখনন চলিতেছে, গুরুমহাশয় শুভঙ্করী কষাইতেছেন, টোলে শাস্ত্র-অধ্যাপনা বন্ধ নাই, চণ্ডী-মণ্ডপে রামায়ণ-পাঠ হইতেছে এবং কীর্ত্তনের আরাবে পল্লীর প্রাঙ্গণ মুখরিত।"

এ দেশে পণ্ডিতগণের কিরূপ আদর ও সম্মান ছিল প্রাচীন গ্রন্থাদি হইতে তাহারই আংশিক পরিচয় বর্ত্তমান প্রবন্ধে প্রদত্ত হইবে।

প্রসিদ্ধ কবি রাজশেখর তাঁহার 'কাব্যমীমাংসা' নামক গ্রন্থের 'রাজচর্য্যা' প্রকরণে পণ্ডিতবর্গের উৎসাহ ও সাহায্য-দান সম্বন্ধে রাজার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—রাজাকে কবিসমাজ বা কবিসভা প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে; কাব্যপরীক্ষার জন্য সভা স্থাপন করিতে হইবে। এই জন্য নির্ম্মিত বিস্তৃত সভাগৃহে কবি, বেদবিৎ, পৌরাণিক, স্মার্ত্ত, ভিষক্, জ্যোতিষী ও শিল্পী প্রভৃতির জন্য স্থান নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। এই সভার যাঁহারা সভ্য অর্থাৎ দেশের মধ্যে যাঁহারা বিদ্বান্ এবং শিক্ষিত তাঁহাদিগকে (মধুর উৎসাহপূর্ণ বাক্যে) তুষ্ট এবং (অর্থাদি সাহায্যদ্বারা) পুষ্ট করিতে হইবে; উপযুক্ত পাত্রে পারিতোষিক প্রদান করিতে হইবে; উৎকৃষ্ট কবি ও তাঁহার কাব্যের যথোপযুক্ত সম্মান করিতে হইবে। অন্য দেশ হইতে সমাগত বিদ্বান-দিগের সহিত রাজা নিজে অথবা কর্ম্মচারীদিগের মারফত আলাপ পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা করিবেন এবং যতদিন তাঁহারা সেই রাজার শাসিত দেশে অবস্থান করেন ততদিন

তাঁহাদিগের যথোচিত সৎকার করিতে হইবে। তাঁহাদের মধ্যে যদি কেহ বৃত্তিকামী অর্থাৎ সাহায্যপ্রার্থী হন তাহা হইলে তাঁহাকে সেই দেশেই অধিষ্ঠিত করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে; কারণ রাজা সমুদ্র-সদৃশ—সমুদ্র যেরূপ রত্নের আকর রাজাও সেইরূপ পুরুষরত্নের একমাত্র আশ্রয়স্থল। তাহা ছাড়া, রাজা এইরূপ আচরণ করিলে রাজার যাহারা উপজীবী সেই সামন্ত প্রভৃতিও রাজার অনুকরণ করিবে এবং পণ্ডিতপালন-ব্রতে ব্রতী হইবে। মহানগরে কাব্য-শাস্ত্র পরীক্ষার জন্য ব্রহ্মসভা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে এবং সেই পরীক্ষায় যাঁহারা উত্তীর্ণ হইবেন তাঁহাদিগকে ব্রহ্ম-রথে চরাইতে হইবে ও মাথায় পাগড়ী পরাইয়া দিতে হইবে।

রাজশেখরের এই সকল উক্তি কেবল মতবাদমাত্র কিংবা ভিত্তিহীন আশামাত্র নহে। তাঁহার কথাগুলি প্রায়শই প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ প্রাচীন রাজগণের আচরণ অবলম্বনে উপনিবদ্ধ। তাঁহার লেখা হইতেই জানা যায় যে বাসুদেব, সাতবাহন, শূদ্রক, সাহসাঙ্ক* প্রভৃতি রাজা পণ্ডিতদিগকে প্রচুর পরিমাণে দান ও সম্মান করিতেন; বস্তুতঃ, এ বিষয়ে তাঁহারা ছিলেন অন্য রাজাদিগের আদর্শ। শাস্ত্রীয় পরীক্ষাও তাঁহার উদ্‌ভাবিত নূতন জিনিষ নহে, তাই তিনি লিখিয়াছেন উজ্জয়িনী নগরীতে কাব্যকার বা কবিদিগের পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল। কালিদাস, মেণ্ঠ, অমর, রূপ, সুর, ভারবি, হরিচন্দ্র ও চন্দ্রগুপ্ত প্রভৃতি অধুনা প্রখ্যাত এবং অপ্রখ্যাত কবিগণ এখানেই পরীক্ষিত হইয়াছিলেন। তাহা ছাড়া, অতিপ্রাচীনকালে পাটলিপুত্রে শাস্ত্রকারগণের পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল। এখানে বর্ষ, উপবর্ষ, পাণিনি, পিঙ্গল, ব্যাড়ি, বররুচি ও পতঞ্জলি প্রভৃতি পণ্ডিতগণ পরীক্ষিত হইয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন।

রাজারা পণ্ডিতগণকে যেরূপ সম্মান ও অর্থসাহায্য করিতেন তাহার কোনও বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত রাজশেখর দেন নাই। এ-বিষয়ের কতকগুলি বিবরণ নানা প্রাচীন পুস্তকে পাওয়া যায়।

প্রাচীন তাম্রশাসনে মাতাপিতা ও নিজের পুণ্যযশোভিবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের ধর্ম্মকৃত্য সম্পাদনার্থ রাজাদিগের ভূমিদানের যে উল্লেখ দেখা যায় তাহাতে মনে হয় শাস্ত্ররক্ষা ও শাস্ত্রালোচনার সৌকর্য্যবিধান এই দানের অন্ততঃ গৌণ উদ্দেশ্য ছিল।

ময়ুরভট্ট-রচিত 'সূর্য্যশতক' নামক প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থের বৈদ্যনাথ পায়গুণ্ডেকৃত টীকা* হইতে জানা যায় যে মহারাজাধিরাজ শ্রীহর্ষ নিজ প্রাসাদসমীপে নির্ম্মিত সুন্দর দুই গৃহে সপরিবার বাণভট্ট ও ময়ুরভট্টের বাসের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন এবং এবং ময়ুরভট্টের সূর্য্যশতক পাঠে নিরতিশয় প্রীত হইয়া তাঁহাকে গজ, অশ্ব, রথ, গ্রাম, বসন, আভরণ দোলা† এবং ধনরত্নাদি দান করিয়াছিলেন। বৈদ্যনাথের এই উক্তির ঐতিহাসিক সত্যতা কতদূর তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিবার উপায় নাই—তবে তাঁহার সমসময়ে কি অনতি-পূর্ব্বে রাজা ও ভূস্বামিগণ পণ্ডিতদের সম্বন্ধে এইরূপই ব্যবহার করিতেন এবং সেই দৃষ্টান্তেই বৈদ্যনাথ এইরূপ লিখিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

'পবনদূত' নামে দূতকাব্যের রচয়িতা ধোয়ী কবি সেনবংশীয় লক্ষ্মণসেনের সভাসদ্ ছিলেন। তিনি তাঁহার পবনদূতের উপসংহারে লিখিয়াছেন ‡—তিনি গৌড়েশ্বর লক্ষ্মণসেনের নিকট হইতে দন্তিব্যূহ, স্বর্ণনির্ম্মিত, চামর এবং স্বর্ণদণ্ড লাভ করিয়াছিলেন। নৈষধচরিতকার শ্রীহর্ষ কান্যকুব্জের রাজার নিকট হইতে তাম্বুলদ্বয় এবং আসনলাভ রূপ উৎকৃষ্ট সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।§ ভোজরাজ নূতন কবিতা শুনিয়া এরূপ তৃপ্ত হইতেন যে কবিকে অনেক সময় কবিতার প্রতি অক্ষরের জন্য লক্ষ মুদ্রা দান করিতেন। ভোজরাজ সম্বন্ধে ভোজপ্রবন্ধ-কারের এই উক্তি অতিশয়োক্তিরঞ্জিত হইতে পারে কিন্তু একেবারে অলীক নহে। ভোজরাজের পাণ্ডিত্যানুরাগ ও

* এই সাহসাঙ্কই নবরত্নের আশ্রয়দাতা বিক্রমাদিত্য। পণ্ডিতের আশ্রয়দাতা-হিসাবে বিক্রমাদিত্যের নাম সর্ব্বজনবিদিত। বিক্রমাদিত্য এই নাম যেন পণ্ডিতের আশ্রয়দাতারই প্রতিশব্দরূপে পরিণত হইয়াছে। তাঁহার দৃষ্টান্ত অনেকে অনুসরণ করিতেন। তাঁহারই অনুকরণে বাংলার রাজা লক্ষ্মণসেন তাঁহার সভায় পঞ্চরত্ন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

* এই টীকার একখানি পুথি এশিয়াটিক সোসাইটীর গভর্ণমেণ্ট-সংগ্রহে আছে।

† প্রাচীন ভারতের সৌখীন সমাজে দোলার ব্যবহার বিশেষ প্রচলিত ছিল। রাজশেখর তাঁহার 'কাব্যমীমাংসা' গ্রন্থে কবির গৃহের যে সাজসজ্জার বর্ণনা করিয়াছেন তাহার মধ্যেও দোলার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

‡ দন্তিব্যূহং কনককলিতাং চামরং হৈমদণ্ডং
যো গৌড়েন্দ্রাদলভকবিক্ষ্মাভৃতাং চক্রবর্ত্তী। (১০১ শ্লোক)

§ তাম্বূলদ্বয়মাসনঞ্চ লভতে যঃ কান্যকুব্জেশ্বরাৎ—
নৈষধচরিতের শেষ শ্লোক।

বদান্যতার ফলে তাঁহার সভায় নানাদেশীয় পণ্ডিত সমবেত হইতেন একথা মনে করা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না।

পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত ও নানাবিধ কাব্যাদির টীকাকার বৃহস্পতি রায়মুকুট 'গৌড়াবনীবাসব' জলালউদ্দীনের নিকট হইতে ছয়টি উপাধি পাইয়াছিলেন। 'রায়-মুকুট' উপাধিদানের সময় বিশেষ আয়োজন করা হইয়াছিল। এই উপলক্ষে 'তাঁহাকে হাতীর উপর চড়াইয়া নানাবিধ বৈধ স্নান করান হইয়াছিল। তাঁহাকে একগাছি হার দেওয়া হইয়াছিল তাহাতে অনেক হীরামাণিক লাগান ছিল—তাহাতে তাহা ঝলমল করিতেছিল। তাঁহাকে যে কুণ্ডল দেওয়া হইয়াছিল—তাহাও ঝক্‌ঝক্ করিত। দুই হাতে 'রতনচুর' দেওয়া হইয়াছিল; তাহাতে দশ আঙ্গুলে দশটি আঙটি এবং তাহাতে হীরা লাগান ছিল। দুইটি ছাতা দেওয়া হইয়াছিল, অনেকগুলি ঘোড়া দেওয়া হইয়াছিল।'*

শাস্ত্রের ও পাণ্ডিত্যের প্রতি উড়িষ্যার মহারাজ প্রতাপ-রুদ্রদেবের প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। 'ভক্তিবৈভব' নামক নাটকের রচয়িতা কবিডিণ্ডিম রাজগুরু জীবদেব তাঁহার নিকট হইতে আটটি স্বর্ণচামর, স্বর্ণ ছত্র ও ডিণ্ডিম উপহার পাইয়াছিলেন।† ইহা জীবদেবের নিজের কথা তিনি ভক্তিবৈভব নাটকের প্রস্তাবনায় এইরূপ লিখিয়াছেন। মনে হয়, তিনি বিশিষ্ট সম্মানজনক উপহারগুলির কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। কবি এবং রাজগুরু হিসাবে তিনি হয়ত রাজার এবং অন্যান্য সম্পন্ন গৃহস্থের নিকট হইতে সাধারণ সাহায্যলাভে বঞ্চিত হন নাই।

এই সেদিনকার কৃষ্ণনগরাধিপতি প্রসিদ্ধ জমিদার কৃষ্ণচন্দ্রের সভা বাংলার ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সম্প্রদায়ের লীলানিকেতন হইয়া উঠিয়াছিল। পণ্ডিতদিগের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য তিনি কিরূপ আগ্রহান্বিত ছিলেন বুনো রামনাথের প্রতি তাঁহার ব্যবহারের সর্ব্বজনবিদিত বৃত্তান্তই তাহার প্রমাণ। সম্পন্ন গৃহস্থ ও জমিদারদিগের ব্যয়ে পরিচালিত একাধিক চতুষ্পাঠী বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত সেই প্রাচীন ধারা বাংলা দেশে অনেকটা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। তবে দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হয় যে বর্ত্তমানে এই সমস্ত অনুষ্ঠানে আন্তরিকতার অভাব এবং তাহার স্থলে নিছক নিয়মরক্ষার ভাব অনেক ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। তাই এই ধারা বর্ত্তমান থাকিলেও পণ্ডিতদিগের অবস্থা এখন আর পূর্ব্বের মত সচ্ছল নহে। অনতিপ্রাচীন কালেও কিন্তু রাজারাজড়াদের নিকট হইতে নানা অবসরে প্রচুর ও মূল্যবান্ উপহার পাওয়ার ফলে লক্ষ্মী-সরস্বতীর চিরবিরোধ সত্ত্বেও দেশের পণ্ডিত-সম্প্রদায়ের অবস্থা তেমন মন্দ হওয়া দূরে থাকুক—অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ সচ্ছলই ছিল। প্রাচীন ভারতের 'কুলপতি'গণ দশ সহস্র ছাত্রের আহার বাসস্থান জোগাইতেন; ইহা হইতে তাঁহাদের সম্পন্ন অবস্থার অনুমান করা অযৌক্তিক নহে। রাজশেখর তাঁহার কাব্যমীমাংসার কবিচর্য্যা প্রকরণে কবির দৈনন্দিন চর্য্যার যে বিবরণ দিয়াছেন অভাবের গুরুভারে ক্লিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে তাহা আদৌ সম্ভবপর নহে। তাঁহার বর্ণিত কবির গৃহ ও সাজসজ্জা আধুনিক যুগের মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ও অনশনক্লিষ্ট সাহিত্যিকের কল্পনার বাহিরে। ইহা কি সে-যুগের পণ্ডিত-সম্প্রদায়ের আর্থিক অবস্থার ইঙ্গিত প্রদান করে না?

---

* বৃহস্পতি রায়মুকুটকৃত অমরকোষের পদচন্দ্রিকানাম্নী টীকার ভূমিকাত্র। এই টীকার পুথি ইণ্ডিয়া অফিস্ লাইব্রেরীতে আছে এবং তাহার বিবরণ ঐ লাইব্রেরীর ক্যাটালগের দ্বিতীয় খণ্ডের ৯৫৪-৬ সংখ্যক পুথির বিবরণমধ্যে আছে। ঐ বিবরণ অবলম্বনে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় উপরিলিখিত বর্ণনা দিয়াছিলেন (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ৩৮শ খণ্ড, পৃ. ৬০)।

† অষ্টৌ হাটকচামরাণি কনকচ্ছত্রং ডমড্ডিণ্ডিমং
যো লব্ধা প্রথিতপ্রতাপবিভবশ্রীরুদ্রদেবেশ্বরাৎ।

ভক্তিবৈভব নাটকের একখানি পুথি এশিয়াটিক সোসাইটীর গভর্ণমেণ্ট-সংগ্রহে আছে।

দেবীদাস রায়ের সিন্দুক

শ্রীমনোজ বসু

মাসখানেক মাত্র নিরুদ্দেশ থাকিয়া উমানাথ বাড়ি ফিরিয়াছে কাল রাত্রে। এত শীঘ্র ফিরিবার কারণ, মঠবাড়িতে মেলা লাগিয়াছে, ভাল ভাল কীর্ত্তনিয়ারা আসিয়াছে, বিশেষ করিয়া এবার সোনাকুড়ের বালক-সঙ্কীর্ত্তনের আসিবার কথা। খবরটা কাকপক্ষীর মুখে কি করিয়া তাহার কানে পৌঁছিয়াছিল।

বড় ভাই ক্ষেত্রনাথ দাওয়ায় বসিয়া সকালবেলার মিষ্ট রোদ সেবন করিতে করিতে একখানা দলিলের পাঠোদ্ধারের চেষ্টায় ছিলেন। দলিলটি বহু পুরাণো, পোকায় কাটা, জায়গায় জায়গায় ছিঁড়িয়া এমন পাকাইয়া গিয়াছে যে, এক একটা জট খুলিতেই একটি বেলা লাগে।...উমানাথ সোজা সেইখানে উঠিয়া তড়বড় করিয়া আপনার বক্তব্য বলিতে লাগিল।

বিস্মিত চোখে ক্ষেত্রনাথ একবার মুখ তুলিয়া দেখিলেন। কথা শেষ হইলে প্রশ্ন করিলেন—জগদ্ধাত্রীর বাড়ি কবে গিয়েছিলে?

—কুড়ি-বাইশ দিন আগে।

—হৃদয় ছিল সেখানে?

—না।

হুঁ—বলিয়া ক্ষেত্রনাথ চুপ করিয়া নিজের কাজ করিতে লাগিলেন। তারপর হাতের দলিল সযত্নে ভাঁজ করিয়া রাখিয়া বলিলেন—আমি জগদ্ধাত্রীর চিঠি পেয়েছি পরশুদিন। এখন তোমার ঐ বিশ দিনের বাসি খবর শুনে লাভালাভ নেই—

দলিল বাক্সবন্দী করিয়া ধীরেসুস্থে পরম নিশ্চিন্তভাবে তিনি তামাক ধরাইয়া বসিলেন। এবার বলিবার পালা তাহার। কণ্ঠ চিরদিনই প্রবল, আজও তাহার অন্যথা হইল না। বাক্যের তূণ একেবারে নিঃশেষ হইয়া গেলে ক্ষেত্রনাথ অন্য কাজে চলিয়া গেলেন, তাহার পরেও উমানাথ সেখানে একইভাবে বসিয়া রহিল।

ঘণ্টা দুই পরে বাড়ির মধ্যে গিয়া তরঙ্গিনীর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা। তরঙ্গিনী ভালমানুষের ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—বটঠাকুরের সঙ্গে কি কথা হচ্ছিল?

অর্থাৎ এবার দ্বিতীয় কিস্তি। উমানাথ চুপ হইয়া রহিল।

তরঙ্গিনী আবদারের ভঙ্গীতে মোলায়েম সুরে বলিতে লাগিল - তা বল, বল না গো—। মেয়েমানুষ, ঘরের কোণে পড়ে থাকি, কামাই-ঝামাই ক'রে এলে এদ্দিন পরে, ভালমন্দ কত নিয়ে এলে, দেখে এলে, শুনে এলে—বল না দুটো কথা, শুনি—

উমানাথ বলিল,—জগদ্ধাত্রী দিদি ওঁরা দেশে ঘরে ফিরেছেন, তাই বলছিলাম দাদাকে—।

—শুকুকন্তে? মস্তবড় খোসখবর, গামছা বখশিষ্ দিই? তরঙ্গিনী হাসিয়া যেন গলিয়া পড়িতে লাগিল। গামছা হাতে সে মাথা মুছিতেছিল, সেইটা পরম পুলকে সে স্বামীর দিকে আগাইয়া ধরিয়া বলিতে লাগিল—পুরুষের ত মুরোদ হ'ল না যে, জন্মের মধ্যে পরিবারের হাতে একটা কিছু দিই এনে... তা আমি দিচ্ছি এই গামছা বখশিষ্—

মনে মনে আহত হইয়া উষ্ণকণ্ঠে উমানাথ বলিল,—গামছা বখশিষ্ কেউ আমায় দেয় না—

তরঙ্গিনী তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিয়া লইল—না, তাও দেয় না। হাসিয়া কহিতে লাগিল—গামছা ত দেয় না, উত্তম-মধ্যম দেয় কি-না ব'লো ত একদিন—

উমানাথ এ কথায় একেবারে ক্ষেপিয়া গেল।

—মহা মিথ্যুক তোমরা। বখশিষের কত শাল-দোশালা এনে দিচ্ছি এ যাবৎ, তবু বার বার ঐ কথা। উত্তম-মধ্যম দেয়...দিলেই হ'ল অমনি? ডাকো দিকি দশ গ্রামের সভা, ডাকো একবার এদিককার যত কবিওয়ালা—। বলিতে বলিতে উত্তেজনার মুখে কবিতা বাহির হইয়া আসিল—

হরেক কবি হরবোলা—
সবার উপর ময়রা ভোলা,
তাঁর শিষ্য সহায়রাম,
গুরুর পায়ে কোটি প্রণাম—।

গুরু সহায়রামের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া অবশেষে সে কিঞ্চিৎ শান্ত হইল।

তরঙ্গিনী কিন্তু একবিন্দু রাগ করে নাই, তেমনি হাসিভরা মুখ। খানিক পরে উমানাথের রাগ পড়িয়া আসিলে পুনরপি প্রশ্ন হইল—ঠাকরুণের ওখানে স্থিতি হয়েছিল ক'দিন, ওগো?

উমানাথ সদম্ভে বলিতে লাগিল—ক'দিন আবার, যাবার পথেই পড়ল বলেই ত! দলের সমস্ত লোক হাটখোলার পাশে উনুন খুঁড়ে নিল, আমি ত আর তা পারি নে? হাজার হোক পজিসন আছে একটা—

বলিয়া পজিসন-মাফিক গম্ভীর হইল।

তবু তরঙ্গিনী সমীহ করিল না। বলিল—তা জানি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করছি, পজিসনটা টিকলো কি করে? অতিথ ব'লে হাতজোড় করে গিয়ে তাঁর উঠোনে দাঁড়ালে?

কথাবার্ত্তার ধরণে মনে মনে শঙ্কিত হইলেও উমানাথ মুখের আস্ফালন ছাড়িল না।—আমার বয়ে গেছে। হঠাৎ দেখা হ'ল, তারপর আমারি হাত ধ'রে টানাটানি, সে কি নাছোড়বান্দা... কিছুতে শুনবেন না।

—তারপর?

—তারপর বিরাট আয়োজন। জগদ্ধাত্রী দিদি আর বাকী রাখেন নি কিছু। দুধ-ঘি, সন্দেশ-রসগোল্লা, মাছমাংস বাটির পর বাটি আসছে পাতের ধারে; ফুরোয় না—

গম্ভীর কণ্ঠে তরঙ্গিণী কহিল—খাওয়া-দাওয়ার পরে?

উমানাথ চমকিয়া গেল। ঝড় প্রত্যাসন্ন। সে পলাইবার পথ খুঁজিতে লাগিল। কিন্তু তাহার আবশ্যক হইল না। ছোটবৌ আসিয়া ঢুকিল; তার পিছনে মেজবৌ। দুটিই অল্প বয়সী। ক্ষেত্রনাথের মেজ ও ছোট ছেলের বৌ। বিয়ে এই বছর দুই তিন মাত্র হইয়াছে।

জলচৌকীর পাশে তেলের বাটি নামাইয়া রাখিয়া ছোট-বৌ বলিল—নাইতে যান কাকাবাবু, রাত্তিরে ত উপোষ করে আছেন। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তা, আমাদের ডাকতে পারলেন না—এমনি আপনি। এক দৌড়ে নেয়ে আসুন... নয় ত দেখবেন কি করি—। বলিয়া দুটি বৌ মুখোমুখি চাহিতেই ছোটবৌ খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

দেয়াপাড়া-জাগুলগাছি অঞ্চলে যাঁহাদের গতায়াত আছে উমানাথ চাটুজ্জে অর্থাৎ ছোট চাটুজ্জের পরিচয় তাঁহাদিগকে দিবার দরকার নাই। বর্ষার সময়টা এই সর্ব্বসমেত মাস চারেক বাদ দিয়া বছরের বাকী দিনগুলি ছোট চাটুজ্জের দলের গাওনা লাগিয়াই আছে। দলটা কিন্তু হিসাবমত উমানাথের নয়, সে বাঁধনদার মাত্র। এবং রাহাখরচ ও টাকাটা-সিকিটা ছাড়া প্রাপ্তিও এমন কিছু নাই। তাই ঘর-বাহিরের ক্রমাগত হিতোপদেশ শুনিতে শুনিতে এক একসময়ে উমানাথ প্রতিজ্ঞা করিয়া বসে, ছোটলোকের সমাজে ছড়া কাটিয়া বেড়াইয়া পিতৃপুরুষের মান ইজ্জত যা ডুবিয়াছে ডুবিয়াছে—আর ডুবাইবে না। দিন কতক বেশ চুপচাপ কাটিয়া যায়, সে দিব্য বাড়ি বসিয়া খাইতেছে, বেড়াইতেছে, ঘুমাইতেছে,—হঠাৎ কেমন করিয়া খবর উড়িয়া আসে, অমুক গ্রামে ভারী হৈ-চৈ—তিন দলে কবির লড়াই, কার্ত্তিক দাস তার শিষ্য অভয় চরণ আর বেহারী ঢুলিকে লইয়া পূব অঞ্চলের সমস্ত বায়না ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া আসিতেছে। পরদিন সকাল হইতে আর ছোট চাটুজ্জের সন্ধান নাই, খেরোবাঁধা খাতাখানাও ঐ সঙ্গে অন্তর্দ্ধান করিয়াছে।

বিকালের দিকে মঠবাড়ি হইতে খোলের আওয়াজ আসিতে উমানাথ শশব্যস্তে ঘরে ঢুকিয়া চাদর কাঁধে ফেলিল। বগলে যথারীতি গানের খাতা রহিয়াছে।

—দাঁড়াও ছোটদাদু, আমি যাচ্ছি—

ছ-সাত বছরের নিতাইচন্দ্র, কাল মারামারি করিতে গিয়া ফুলপাড় সৌখীন ধুতিখানার ক'জায়গায় ছিঁড়িয়া আনিয়াছে, তরঙ্গিনী তাহাই মেরামত করিতে লাগিয়াছে। উবু হইয়া বসিয়া বসিয়া নিতাই মনোযোগের সঙ্গে শিল্পকার্য্য দেখিতেছিল, তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—আজকে আর থাক রাঙাদিদি, উ-ই দাও। ছোটদাদু মেলায় যাচ্ছে, আমি যাব—

তরঙ্গিনী মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল—যাও তাই। ছোটদাদু সন্দেশ কিনে খাওয়াবে—

তারপর তরঙ্গিনী নাতিকে কাপড় পরাইয়া সুন্দর করিয়া কোচা দিয়া দিল। গায়ে পরাইয়া দিল, সবুজ একটি ছিটের জামা। ফুটফুটে মুখখানি অতি যত্নে আঁচলে মুছাইয়া মুগ্ধচোখে কহিল—বর পাত্তোরটি চলেছেন। বৌ নিয়ে আসা চাই কিন্তু নিতু বাবু।

উদ্দেশে কিল তুলিয়া নিতু বলিল—বুড়ী!

—বুড়ী বলেই ত বলছি, মাণিক। কাজ করতে পারিনে, তোর কাকীরা মনে মনে কত রাগ করে। এমন বৌ নিয়ে আসবে যে দু'বেলা আমাদের কাজকর্ম্ম রান্নাবান্না করে খাওয়াবে, কোলে করে সকাল বিকাল তোমায় পাঠশালায় দিয়ে আসবে... কেমন?

নিতু লজ্জা পাইয়া একদৌড়ে পলাইয়া গেল।

তারপর হাসিতে হাসিতে উমানাথের দিকে ফিরিয়া বলিল—তুমিও একটা জামা গায়ে দাও, শীতের দিন—এতে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না গো—

উমানাথের অত অবকাশ নাই। কাঁধের চাদরের উপরেই একটা কামিজ ফেলিয়া সে পা বাড়াইল। পিছন হইতে তবু বাধা।

—শোন—

তরঙ্গিনী কহিতে লাগিল—ভাসুর ঠাকুর খেতে বসে বড্ড দুঃখ করছিলেন; আমায় শুনিয়ে শুনিয়ে সব বলছিলেন—।

ভূমিকার রকম দেখিয়া উমানাথের মুখ শুকাইল। এক-কথায় হাঁ-না করিয়া সরিয়া পড়িবার ব্যাপার ইহা নহে। ওদিকে খোল করতালের ধ্বনি ক্ষণপূর্ব্বে থামিয়া গিয়াছে; অর্থাৎ গৌরচন্দ্রিকা সারা হইয়া নিশ্চয় এইবার পালা আরম্ভ হইল।

তরঙ্গিনী বলিল—তুমি সাতেও থাক না, পাঁচেও থাক না। অমন দাদা—বাপের মতন বললেই হয়—তাঁর সঙ্গে এসবের কি দরকার ছিল বল ত?

উমানাথ সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিল—কিন্তু কথাটা মিথ্যে নয়। সহায়রামের ভিটে থেকে এক সরষেই বিক্রি হয় বছরে কত টাকার? এত কাল জগদ্ধাত্রী দিদি বিদেশে পড়ে ছিলেন, নিতে-থুতে আসেন নি—এখন কিছু না দিলে চলবে কেন?

তরঙ্গিনী ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া তীব্রকণ্ঠে কহিল—এই যুক্তিগুলো কার শেখানো? জমাজমি আমাদের কি আছে, না আছে কোন দিন তুমি চোখ মেলে দেখেছ, না খবর রাখ? জগদ্ধাত্রী-দিদির মায়ায় বড্ড টনক নড়ল। অনাথা বিধবা মানুষ—আপন পেটে ভাত জোটে না, সে তোমাকে নেমন্তন্ন ক'রে চর্ব্বচোষ্য খাওয়ায়, এ সমস্তই কেবল ভাইয়ে ভাইয়ে লাগিয়ে ঘর ভাঙবার মতলব।

কিন্তু শেষ কথাগুলি উমানাথ বোধ করি শুনিলই না। সহসা উচ্ছ্বসিত হইয়া কহিতে লাগিল—সত্যি বউ, দিদি বড্ড অনাথা। সত্যিই তাঁর পেটে ভাত জোটে না। সমস্ত শুনেছ তা হলে! কোত্থেকে শুনলে?

তরঙ্গিনী আঙুল তুলিয়া দেখাইল।—ঐ ভাঙা দেরাজটা খুলে দেখ। দেশে এসেছেন শ্রাবণ মাসে, সেই অবধি হপ্তায় হপ্তায় চিঠি। হৃদয় ঠাকুর-পো পৈতৃক শত্রুতা সাধতে লেগেছে, ও-ই হয়েছে আজকাল মন্ত্রী, সে যা শিখিয়ে দেয় ঠাকরুণ তাই লেখেন—।

উমানাথ আর্দ্র স্বরে বলিল—কিন্তু অবস্থা দিদির সত্যিই বড় খারাপ। সাক্ষী আমি নিজে। নিজের চোখে দেখে এসেছি। দেখে জল আসে চোখে।

—তারই মধ্যে ত এই নেমন্তন্ন-আমন্তন্ন—দুধ-ঘি-মিষ্টি-মেঠাই! মানে বুঝতে পার? তরঙ্গিনী সপ্রশ্নদৃষ্টিতে চাহিল।

—কিছু না, কিছু না,—। উমানাথ ঘাড় নাড়িয়া কহিতে লাগিল—সমস্ত বাজে কথা বউ, আমি ওঁর বাড়ি নিজেই গেছলাম। খেতে বসেছি, হঠাৎ বৃষ্টি এল। তারপর বাইরের বৃষ্টি থামল ত ঘরের বৃষ্টি আর থামে না। ভাতের থালা নিয়ে কোথায় গিয়ে বসি—লজ্জায় দুঃখে দিদি মুখ তুলতে পারেন না। আর সেই মোটা মোটা বীরপালা চালের ভাত সহায়রাম রায়ের মেয়ে, গুরু সহায়রামকে গড় না ক'রে তিনটে জেলার কেউ কবির আসরে নামতে সাহস করে না—তাঁর মেয়ের এই রকম হাল! বলিতে বলিতে উমানাথের কণ্ঠ ভারী হইয়া আসিল; হঠাৎ অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া জামাটা পরিয়া এইবার অত্যন্ত তাড়াতাড়ি পড়িয়া গেল।

গান চলিতেছে!

বকুল ও মাধবীলতার কুঞ্জবন, তাহারই পাশে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া মূল গায়েন মুখরা বৃন্দাদূতীর বিদ্রূপ-বাণী বিনাইয়া বিনাইয়া বলিতে লাগিল—

বৃন্দা কহিতেছে—সুখে আছ ত মথুরার রাজা? তোমার নবসঙ্গিনীকে পাশে লইয়া ত্রিভঙ্গঠামে একবার দাঁড়াও—দেখি, বাঁকা শ্যাম আর কুব্জা

নায়িকার মিলিয়াছে কেমন? মনে কি পড়ে বন্ধু কোথায় কবে এক রাখাল ছেলে বাঁশী বাজাইত—আর কাঞ্চন-লতা কুলের বধূ, কুল ভাসাইয়া কলসী ভাসাইয়া ছুটিয়া আসিয়া পায়ে লুটাইত? আজিকার এই সুখবাসরের মধ্যে গজদীপের আলোয় হঠাৎ যদি একটি ম্লান মুখ-চন্দ্র তোমার মনের দরজায় সসঙ্কোচে পলকের জন্য তাকাইয়া যায়, তাহাকে দূর করিয়া দিও মহারাজ, দুঃস্বপ্নকে মনে ঠাঁই দিতে নাই…

শ্রোতাদের মুখে মুখে ম্লান হাসি। যুগান্ত-পারের একটি সর্ব্বব্যাপী বিরহ-ব্যথা গানের সুরে কাঁপিয়া কাঁপিয়া শীতক্লিষ্ট ক্ষীণ জ্যোৎস্নার মধ্যে সকলের বুকের মধ্যে পাক খাইয়া বেড়াইতে লাগিল। উমানাথ তদ্গত হইয়া শুনিতেছিল। নিতাই ফিস্ ফিস্ করিয়া ডাকিল—ছোট দাদু!

তারপর গায়ে নাড়া দিয়া আবার ডাক দিল।

উমানাথ কহিল—চুপ!

মিনিট কতক চুপ করিয়া নিতাই ছেঁড়া কানাতের ফাঁকে আকাশের দিকে চাহিয়া আপন মনে কত কি বকিতে বকিতে আঙুল ঘুরাইতে লাগিল। আবার প্রশ্ন করিল—শোন ছোট দাদু, জয়ন্তী বলে কি, আগে নাকি আকাশ হাতে পাওয়া যেত—একদিন এক বুড়ী ঝাঁটার বাড়ি দিয়েছিল—সত্যি?

উমানাথ টানিয়া তাহাকে আরও কোলের কাছে আনিল।

—ঐ শোন্ খোকা, গান শোন্—

—না, বাড়ি চল—

মুখ না ফিরাইয়া উমানাথ বলিল—হুঁ।

আরও খানিক বসিয়া থাকিয়া নিতাই আস্তে আস্তে সামিয়ানার বাহিরে আসিল। তাকাইয়া দেখিল, ছোট দাদু কিছুই টের পায় নাই, তেমনি এক মনে গান শুনিতেছে।

গায়ক তখন গাহিতেছে—

ওগো মাধব, গোকুলে চাঁদ ওঠে না, ভ্রমরের গুঞ্জন নাই, যমুনা কলধ্বনি ভুলিয়া গেছে আর তোমার গরবিনী রাই আজ ধুলায় পড়িয়া আছে। দশমী দশায় কণ্ঠ তাহার নিরুদ্ধ, শ্বাস বহে কি না বহে; কবরী খুলিয়া পড়িয়াছে, চোখের জলে শতধারা নদী বহিতেছে; সখীরা তাহাকে ঘিরিয়া তোমার নাম কত শোনায়, ক্ষীণ কাঞ্চন-রেখা তনু ঈষৎ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠে—কিন্তু চোখ মেলিবার ক্ষমতা নাই। অভাগিনী এতদিনে মরিয়া জুড়াইল বুঝি…

কৃষ্ণ অভয় দিলেন—ভয় করিও না। সখি বৃন্দা, তোমাদের কিশোর রাখাল আবার ফিরিয়া যাইবে…

একজন দোয়ার আসরের পাশে সরিয়া তামাক খাইতেছিল, হাত নাড়িয়া উমানাথকে কাছে ডাকিল। কহিল—কেমন গান শুনছেন ছোট চাটুজ্জে মশাই?

উমানাথ বলিল—খাসা।

উঁহু—বলিয়া লোকটা ঘাড় নাড়িল। বলিল—আরে মশাই, মাথুর পালা হ'ল এর নাম—চোখের জলে এতক্ষণ সতরঞ্চ ভিজে যাবার কথা। এ পালা কিছু বাঁধতে পারে নি। আর এ যা শুনলেন, শুনলেন; শেষটা একেবারে কিছু হয় নি। আপনাকে মশায়, পালাটা আগাগোড়া একবার ঠিক ক'রে দিতে হবে। কর্ত্তাবাবু বলছিলেন আপনার কথা—

উমানাথ ঘাড় নাড়িল।

ইতিমধ্যে নিতাই ছুতারপটী, লোহাপটী, তরকারীর হাট পার হইয়া সার্কাসের তাঁবুর চারিদিকে বার আষ্টেক ঘুরিল। কিন্তু সুবিধা কোনদিকে নাই, তাঁবুর কোথাও একটু ছেঁড়া রাখে নাই। দরজার সামনে পরদা টাঙানো, তার ফাঁক দিয়া একটু-আধটু নজর চলে বটে, কিন্তু সেখানে জনকয়েক এমন মারমুখী হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে ভিতরে চাহিতে সাহসে কুলায় না।

ওদিকে এক সারি দোকানে বড় বাহার করিয়া গ্যাসের আলো জ্বালিয়া দিয়াছে, ঠিক যেন দিনমান। ছেলে-ছোকরার ভিড় সেখানটায় কিছু বেশী। একটা দোকানের সামনে গিয়া নিতু অবাক হইয়া গেল, তাহার বয়সী আরও তিন-চারিটি ছেলে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছে। অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার, একটা ইঞ্জিন আর তার সঙ্গে খান তিনচার রেলগাড়ী—পূজার সময় মামার বাড়িতে যে গাড়ী চড়িয়া গিয়াছিল, অবিকল তাই তবে অতিশয় ছোট—আবার লাইনও পাতা রহিয়াছে। দোকানী দম দিয়া ছাড়িয়া দেয়, গাড়ী লাইনের উপর গড়গড় করিয়া একবার আগাইয়া যায়, আবার পিছাইয়া আসে…

মজা আরও আছে অনেক। এদিকে নাগরদোলা ঘুরিতেছে, পাশের একটা দোকান হইতে রকমারী বাঁশীর সুর আসিতেছে, মাঠে বাজী পোড়ান হইতেছে, শোঁ-শোঁ করিয়া হাউই আকাশে উঠিয়া তারা কাটিতেছে…অন্য ছেলে কয়টি ছুটিয়া বাজী দেখিতে গেল। নিতাই আগাইয়া গিয়া ইঞ্জিনের গায়ে সন্তর্পণে একটু আঙুল বুলাইয়া দেখিল।

—নেবে খোকা? পয়সা আছে কাছে?

হুঁ—বলিয়া রাঙাদিদির কাছ হইতে আসিবার সময় কয়টা পয়সা আনিয়াছিল, তাহাই বাহির করিয়া দেখাইল।

দোকানী কহিল—ওতে হবে না ত, টাকা লাগবে। কার সঙ্গে এসেছ? যাও বাবাকে ডেকে নিয়ে এস, দশটা অবধি আমার দোকান খোলা আছে। যাও—

নিতুর অদৃষ্ট ভাল, ছোট দাদু অবধি যাইতে হইল না, সামনেই পড়িয়া গেলেন ক্ষেত্রনাথ। রোজ বিকালেই ক্ষেত্রনাথকে মেলায় আসিতে হয়। সঙ্কীর্ত্তনের আকর্ষণে নয়; মেলার মধ্যে চারিদিককার গ্রাম হইতে বিস্তর খেজুর গুড় আমদানী হয়। প্রতি বছর এই সময়টায় তিনি কিছু গুড় কিনিয়া রাখিয়া বর্ষাকালে দক্ষিণের ব্যাপারীরা আসিয়া পড়িলে ছাড়িয়া দেন। এই প্রকারে দু-পয়সা লভ্য হইয়া থাকে।

নিতাই ক্ষেত্রনাথকে জড়াইয়া ধরিল। ক্ষেত্রনাথ কহিলেন—এসেছ আজ আবার? কি বলবে বলে ফেল—দেরী কেন দাদা, ক্ষিধে? বাড়ি থেকে পা বাড়ালেই ক্ষিধে অমনি সঙ্গে সঙ্গে পিছু নেয়—

নিতাই হাসিয়া আবদারের সুরে কহিল—কর্ত্তাদাদু ইদিকে একবার এস—শীগগীর এসে দেখে যাও—

—গাঁট খালি—এই দেখ, আজ কিছু হবে না—

কিন্তু উল্টাগাঁট উঁচু হইয়া রহিয়াছে, নিতুর সেদিকে নজর আছে। বলিল—না কর্ত্তাদাদু, আমার ক্ষিদে পায়নি—সত্যি পায়নি—বিদ্যের কিরে। তুমি একটিবার এসে শুধু দেখে যাও...

গাড়ী ও ইঞ্জিনের দাম দোকানী হাঁকিল পাঁচ সিকা।

অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া ক্ষেত্রনাথ বলিতে লাগিলেন—দিনে ডাকাতি করতে এসেছ এখানে? ঐ ত টিনের পাত, জিল-জিল করছে, তিনটে দিনও টিকবে না। আয় খোকা, চলে আয়—কি হবে ও দিয়ে? আমরা নেব না—

দোকানী নিরুত্তরে স্প্রিঙে দম দিতেছিল। ছাড়িয়া দিতে ইঞ্জিন লাইনের উপর ছুটিতে সুরু করিল।

—চলে আয়—বলিয়া ক্ষেত্রনাথ নিতুর হাত ধরিয়া টানিলেন, কিন্তু সে নড়ে না। আর একবার টান দিতে দোকানের খুঁটি জাপটাইয়া চীৎকার শব্দে নিতাই কান্না জুড়িয়া দিল।

—সব তাতে তোমার ইয়ে—না? পাজী কাঁহাকা—

ক্ষেত্রনাথ যত টানেন তত জোরে সে খুঁটি আঁটিয়া ধরে। তারপর খুঁটি ছাড়াইয়া গেল ত ঝাঁপ ধরিতে যায়। নাগাল না পাইয়া সেইখানে মাটির উপর আছড়াইয়া পড়িল।

—ছুঁসনি, ছুঁসনি—অ হতচ্ছাড়া ছেলে, দিলি বুঝি এই রাত্তিরে ছুঁয়ে?

শঙ্কিত ব্যস্ত স্ত্রীকণ্ঠ। সে মেলায় আসে নাই, রাস্তার ধারে ছইওয়ালা একখানা গরুর গাড়ীতে বসিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। গণ্ডগোল ও ছোটছেলের কান্না শুনিয়া কয়েক পা আগাইয়া উঁকি দিয়া ব্যাপারটা দেখিতেছিল। একদিকে স্তূপাকার বাঁশের চাঁচাড়ি পড়িয়াছিল, সেইখানে বসিয়া মেলার যাবতীয় বাঁশের কাজকর্ম্ম হইয়াছে—স্ত্রীলোকটি স্পর্শদোষ বাঁচাইতে ছুটিয়া তাহার উপর উঠিল। লোক জমিয়া যাইতেছে দেখিয়া ক্ষেত্রনাথ নিতুকে ছাড়িয়া এক পাশে দাঁড়াইলেন।

জনমত ক্ষেত্রনাথের প্রতিকূলে। যার যেমন খুশী মন্তব্য করিতে লাগিল।—আচ্ছা গোঁয়ার গোবিন্দ হে! মেরেই ফেলেছিল ছেলেটাকে।—শাসন করতে হয় বলে এমনি শাসন?...রক্ত পড়ছে যে—লোকটা কে হে?—ধরে জেলে দেওয়া উচিত..

নিতুর হাতে-পায়ে আঁচড় লাগিয়া দু-এক ফোঁটা রক্ত পড়িতেছিল, তাহা ঠিক।

ক্ষেত্রনাথকে যাহারা চিনিত তাহারা অত দরদ দিয়া সম্বর্দ্ধনা করিতে পারিল না। বলিল—যা হবার হয়েছে চাটুজ্জে মশায়, রাগ না চণ্ডাল—আর দাঁড়িয়ে থাকবেন না তুলে নিন নাতিকে, বাড়ি গিয়ে কাটা জায়গায় তেলটেল দিন গে।...হাঁটিয়ে নেবেন না যেন—গাড়ী ক'রে চলে যান।

স্ত্রীলোকটি ইতিমধ্যে নির্ব্বিঘ্ন স্তূপ হইতে নামিয়া নিতুকে কোলে তুলিয়া শান্ত করিতে বসিয়া গিয়াছে। প্রৌঢ়া বিধবা; দেহ ক্ষীণ বটে, কিন্তু কণ্ঠস্বরের জোর যেমন অসামান্য তেমনি উহা যেন মধু ছড়াইতে ছড়াইতে বহিয়া যায়। ক্ষেত্রনাথের দিকে এক পলক তীব্র দৃষ্টি হানিয়া বিধবা কহিল—পয়সাকড়ি চিত্তেয় সঙ্গে নিয়ে উঠবে না কি?

অতিশয় সঙ্গীন প্রশ্ন। উচিতমত উত্তর দিতে গেলে মেলাক্ষেত্রে আবার একদফা দুর্যোগ ঘটিবার সম্ভবনা। বিশ গ্রামের লোকের সম্মুখে ক্ষেত্রনাথের আর তাহাতে উৎসাহ নাই। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, যাহাকে লইয়া এত লোকের

এমন দুশ্চিন্তা, চক্ষের পলকে সেই নিতাইচন্দ্র লাফ মারিয়া উঠিয়া পুনশ্চ দোকানের খুঁটি আঁটিয়া ধরিয়া দাঁড়াইল।

বিধবা বলিল—দাও না গো দোকানী, ছেলেমানুষ ধরে বসেছে—দিয়ে দাও সস্তা করে।

দোকানী বলিতে লাগিল—একটাকার কম দেওয়া যায় না মা, কল বলেই না এত দাম। এই গাড়ীটে নিন, চার পয়সায় দিচ্ছি। চাকা আছে, চোঙ আছে, কিন্তু টানতে হবে দড়ি বেঁধে—

—আমরা দড়ি বেঁধেই টানব, কি বল খোকা? বলিয়া চারপয়সার গাড়ীটা তুলিয়া সে নিতুর হাতে দিল।

ক্ষেত্রনাথ চিনিতে পারেন নাই, কিন্তু রঙ্গস্থলে হৃদয় রায় আসিয়া পড়িতেই পরিচয় প্রকাশ পাইল। হৃদয়ের হাতে একবোঝা হাটের বেসাতি। বলিল—আমার কেনাকাটা হয়ে গেছে, এইবার গাড়ীতে চলুন দিদি—

অর্থাৎ চল্লিশ বছর পরে জগদ্ধাত্রী বাপের বাড়ির গ্রামে ফিরিতেছে, হৃদয় মুরুব্বি হইয়া লইয়া যাইতেছে। দূর জ্ঞাতিসম্পর্কের এই দিদিটির প্রতি ভক্তি তাহার যেরূপ, গুরুজনদিগের প্রতি সেই প্রকার ভক্তি এই কলিযুগের দিনে লোকে যেন শিক্ষা করিয়া রাখে।

জগদ্ধাত্রী ডাকিল—গাড়ীতে এসো খোকা—এবং নিতুকে কোলে তুলিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল।

নিঃশব্দ গ্রামপথ। ক্বচিৎ কখনও মেলার ফিরতি দু-একটি লোকের সঙ্গে দেখা হইয়া যায়। বালুপথে গরুর গাড়ীর শব্দ হইতেছে না। গাড়ীর পিছনে পিছনে ক্ষেত্রনাথ ও হৃদয় পাশাপাশি চলিয়াছেন। খানিকক্ষণ পরে হঠাৎ ক্ষেত্রনাথ কথা কহিয়া উঠিলেন—ভটচায বাড়ি এত বড় ব্যাপার, তার মধ্যে হৃদয় নেই। তোমার সেজছেলেকে জিজ্ঞাসা করলাম, বল্লে—বাবার পেটের অসুখ, নেমন্তন্নে আসবে না। নিজে না গিয়ে গাড়ী পাঠালেই ত জগদ্ধাত্রী আসতে পারত।—

হৃদয় অপ্রস্তুতের ভাবে নানা প্রকার কৈফিয়ৎ দিতে লাগিল—সে জন্যে নয়...এমনি গিয়েছিলাম ওদিকে; দিদি বললেন, এত বড় মেলা হচ্ছে, দেশবিদেশ থেকে মানুষজন আসছে, দেখে আসিগে একবার।...গাড়ী ভাড়া-টাড়া ওঁরই সব —আমার কি গরজ পড়েছে বলুন...

ওদিকে ছইয়ের মধ্যেও মৃদুকণ্ঠে কথাবার্ত্তা সুরু হইয়াছে। নিতুর মতে এ জগতের একটি লোকও ভাল নয়।

—কর্ত্তাদাদু?

—মারে।

—মেজ কাকী, ছোট কাকী?

—তারাও।

বাবা এবং কাকাবাবুরা বাড়ি আসিবার সময় তার জন্য নানারকম জিনিষ লইয়া আসে, সে হিসাবে ভালই; কিন্তু অপরাধ তাদের, আবার চাকরী করিতে চলিয়া যায়; বাড়ি থাকিতে বলিলে, কথা শোনে না—মিছা কথা বলিয়া ফাঁকি দিয়া ভুলাইয়া চলিয়া যায়।

—আর আমি? জগদ্ধাত্রী সমস্যাময় প্রশ্ন করিয়া বসিল—আমি কেমন লোক, বল ত নিতুবাবু—

নিতাই চুপ করিয়া রহিল।

জগদ্ধাত্রী বলিল—এই গাড়ী কিনে দিলাম তোমায়, আমি ভাল না?

নিতাই কহিল—তোমার গাড়ী মোটে চলে না, কলের গাড়ী ভাল।

—আচ্ছা কিনে দেব ঐ কলের গাড়ী—হাসিমুখে জগদ্ধাত্রী বলিল—কিনে দেব, যদি এক কাজ করতে পার—

উৎসাহের প্রাবল্যে নিতাই খাড়া হইয়া বসিল।

—দাও—

—বললাম ত, একটা কাজ করতে হবে—

—কি বল, এক্ষুনি করব—। নিতাই গরুর গাড়ী হইতে লাফাইয়া তখনই কাজে প্রবৃত্ত হইতে যায় আর কি।

জগদ্ধাত্রী হাসিয়া তাহার হাত ধরিয়া ফেলিয়া বলিল—আমায় যদি বিয়ে কর নিতুবাবু...করবে?

সঙ্কীর্ণ গ্রামপথ, পথের ধারে ছোট ছোট ঝোপজঙ্গল... আকাশে শীতের নির্জ্জীব অস্পষ্ট চাঁদ নিকটে-দূরে এখানে ওখানে কয়খানা ঘুমন্ত খোড়ো ঘর...হঠাৎ তাহার মধ্যে কোথা দিয়া কি হইয়া গেল—যেন এক বৈঠার আঘাতে একটি ডিঙা চল্লিশ পঞ্চাশ বছর উজান ঠেলিয়া গেল—গাড়ীর পিছনে চলিতে চলিতে ক্ষেত্রনাথ সেই কথা কয়টি শুনিতে লাগিল—আমায় বিয়ে করবে, আমায় বিয়ে করবে গো?

বছর চল্লিশ পরে লোকনাথ ঠাকুরের মেলায় জনারণ্যের

মাঝখানে ক্ষেত্রনাথ কয়েক মুহূর্তের জন্য আজ জগদ্ধাত্রীকে দেখিয়াছেন, দেখিয়াছেন বটে—তাহাও বড় ঝাপসা রকম, বয়সকালের চোখের সে দৃষ্টি নাই—রাত্রিবেলা কোন কিছু ভাল করিয়া দেখিতে পান না, সেই ক্ষণিকের দেখা মূর্ত্তি ভুলিয়া গিয়াছেন...কোন কালের কোন মূর্ত্তিই মনে নাই; কেবল মনে আসিতেছে, কারণে-অকারণে খিল খিল করিয়া হাসি...আবার সঙ্গে সঙ্গেই জলভরা অভিমানাহত ডাগর ডাগর চোখ দুটি...

—আমায় বিয়ে করবে? ও দাদা, বিয়ে করবে আমায়?

ক্ষেত্রনাথের বৌদি সম্পর্কের এক নিঃসন্তান বিধবা তাহাদের বাড়িতে থাকিতেন। এতটুকু মেয়ে জগদ্ধাত্রী বেড়াইতে আসিলে বৌদিদি আদর করিয়া চুল বাঁধিয়া খয়ের-টিপ পরাইয়া গিন্নীর ঝাঁপি হইতে আলতা-পাতায় পা ছোপাইয়া অনেক শিখাইয়া পড়াইয়া তাহাকে ক্ষেত্রনাথের কাছে পাঠাইতেন। ক্ষেত্রনাথের বয়স বেশী, বুদ্ধিও বেশী। নায়িকার শুভ প্রস্তাবের প্রত্যুত্তরে স্বামিত্বের প্রথম সোপানস্বরূপ তার পিঠের উপর যে বস্তু উপহার দিত তাহাতে জগদ্ধাত্রী ব্যথায় যত না হউক অভিমানে চতুর্গুণ কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিত।...সেই সব কথা মনে পড়িতে লাগিল।

সেদিন উমানাথ বাড়ি ফিরিল যখন চাঁদ ডুবিয়া গিয়াছে। অত রাত্রেও ক্ষেত্রনাথের ঘরে আলো। উমানাথ খিড়কী ঘুরিয়া বাড়ির মধ্যে ঢুকিবার মতলবে টিপিটিপি কয়েক পা পিছাইয়াছে, কিন্তু ক্ষেত্রনাথের চোখকে হয়ত ফাঁকি দেওয়া যায়, কান ভারী সজাগ! বলিলেন—কে? কেও? উমা? এই ঘরে এস; তোমার জন্যে বসে আছি কেবল—

হয়ত সত্যই তাহার অপেক্ষায় বসিয়া ছিলেন, কিন্তু নিতান্ত যে হাত-পা কোলে করিয়া চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন তাহা নহে। তিনটা দলিলের বাক্সই খুলিয়া ডালা তুলিয়া রাখা, প্রদীপে এক সঙ্গে অনেকগুলা সলিতা ধরাইয়া দেওয়া হইয়াছে, চোখে চশমা-আঁটা, স্তূপীকৃত দলিলের মধ্য হইতে একখানা বাছিয়া ক্ষেত্রনাথ মেজের উপর উবু হইয়া যেন ঐ দলিলখানির উপর স্তিমিত চোখের সকল দৃষ্টিশক্তি ঢালিয়া দিয়া পড়িতেছিলেন।

উমানাথ কহিল—এখনো শোন্ নি আপনি?

এটা কিছু নূতন ব্যাপার নয়, আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই ইহাতে। বৈষয়িক ব্যাপারে ক্ষেত্রনাথের সতর্কতা চিরদিনই অপরিসীম, এ বিষয়ে দিনরাত্রি জ্ঞান নাই। দলিলের বাক্সগুলি থাকে শোবার ঘরে ঠিক শিয়রের কাছ-বরাবর, প্রত্যেকটি দলিলের গায়ে একটুকরা করিয়া কাগজ আঁটা, তাহাতে ক্ষেত্রনাথের স্বহস্তে লেখা স্থূলমর্ম্ম। শীতকালে এক একদিন কাগজপত্র ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া রৌদ্রে দেন, সমস্ত বেলা নিজে পাহারা দিয়া পাশে বসিয়া থাকেন, আবার নিজের হাতে সমস্ত গোছাইয়া নূতন কাপড়ের দপ্তরে সাজাইয়া বাঁধিয়া রাখেন। এমন অনেক দিন হইয়া থাকে, নিষুপ্ত গভীর রাত্রি, এক ঘুমের পর ক্ষেত্রনাথের মনে কি রকম একটা গোলমাল লাগিল, উঠিয়া আলো জ্বালিয়া বাক্স খুলিলেন, তারপর দু-চারিটা দলিল বাহির করিয়া নিবিষ্ট মনে খানিক পড়িয়া দেখিয়া তবে নিশ্চিন্ত হইয়া শুইতে পারেন। গৃহিনী গত হইবার পর হইতে ইদানীং রোগটা আরও বাড়িয়া গিয়াছে।

উমানাথ কহিল—রাত একটা-দুটো বেজে গেছে। আর রাত জাগবেন না দাদা।

ক্ষেত্রনাথ বাহিরের পানে চাহিলেন; কিন্তু জানলা বন্ধ, কি দেখিবেন? বলিলেন—রোসো। তাড়াতাড়ি কাগজপত্র তুলিয়া রাখিলেন, বলিলেন—এস এদিকে, সিন্দুকটা ধর দিকি—

—কোন্ সিন্দুক?

বিরক্ত মুখে ক্ষেত্রনাথ বলিলেন—সিন্দুক কটা আছে তোমাদের বাড়ি? বাক্সের কথা বলছি নে, ঐ সিন্দুক।

অনেক পুরাণো সেগুন কাঠের অতিকায় সিন্দুক, কাঠগুলি কাল পাথরের মত হইয়া গিয়াছে। এমন জিনিষ আজকালকার দিনে হয় না। আগে উহার সমস্ত গায়ে ফুল-তোলা অপ্সরী-আঁকানো বিস্তর সাজপত্র ছিল, দু-একটা করিয়া খুলিয়া পড়িতে পড়িতে এখন তার চিহ্নমাত্র নাই। ইদানীং ইহা বড় একটা ব্যবহারেও আসে না। এখানে সেখানে তক্তার জোড় ফাঁক হইয়া ঘরের এক কোণে অবহেলিত ভাবে পড়িয়া রহিয়াছে।

খানিক টানাটানি করিয়া উমানাথ কহিলেন—চার-পাঁচ মণের ধাক্কা দাদা, নড়ে চড়ে না একটু।

—ভাল ক'রে ধর—বলিয়া ক্ষেত্রনাথ সিন্দুক ধরিয়া প্রাণপণ বলে ঝুলিয়া পড়িলেন। কিছুতে কিছু হয় না।

পরিশ্রমের ফলে হাঁপাইতে লাগিলেন, বলিলেন—দেবীদাস রায়ের সিন্দুক এর নাম—নড়বে কি সহজে? মধ্যে আবার তোমার ঐ সহায়রাম আর সার্ব্বভৌম ঠাকুরের গুষ্টীর পিণ্ডি বোঝাই করা। এই রাত্রে খুলে যে সব বের করে ফেলা, সেও ত মহা হাঙ্গামের ব্যাপার—

চিন্তান্বিত মুখে ক্ষেত্রনাথ চুপ করিলেন। উমানাথ বলিল—এখন কি ওসব হয়? দরকার হ'লে সকালবেলায় মানুষ জন ডেকে সরিয়ে ফেলা যাবে—

—বুদ্ধির জাহাজ! ক্ষেত্রনাথ চটিয়া উঠিয়া বলিতে লাগিলেন—খুব কথা বল্লে তুমি, সকাল বেলা লোক জানাজানি হয়ে যাবে না? যা করবার এখুনি করতে হবে।—সহসা যেন সমাধান দেখিতে পাইয়া বলিলেন—এক কাজ কর দিকি, চালির থেকে বালিশ বিছানা সব পাড়ো। ঐগুলো সিন্দুকের উপর সাজিয়ে রেখে দাও, বাইরে থেকে সিন্দুক যাতে দেখা না যায়। মনে হবে, এখানে কেবল বিছানাপত্তোর গাদা করা রয়েছে।

সিন্দুক ঢাকা হইয়া গেল। ক্ষেত্রনাথ আলো ধরিয়া এদিক ওদিক ভাল করিয়া দেখিলেন। দেখিয়া খুশী হইলেন। বলিলেন—জগদ্ধাত্রী ত জগদ্ধাত্রী, শ্মশান থেকে সহায়রাম রায় উঠে এলেও আর ধরতে হচ্ছে না।

সিন্দুকের ইতিহাস উমানাথ সমস্ত জানে এবং আজ জগদ্ধাত্রী যে গ্রামে আসিয়াছে সে কথাও কানে গিয়াছে। অতএব এখনকার আয়োজন দেখিয়া ব্যাপার বুঝিতে বিলম্ব হইল না, বলিল—এই ত ভাঙাচোরা খানকতক তক্তা—কি-ই বা জিনিষ—এ দেখে তারপরে কি আর জগদ্ধাত্রী দিদি দাবী করতে আসবেন? আর করেনই যদি, অনাথা বিধবার জিনিষ—দিয়ে দেওয়া উচিত—

রুক্ষ দৃষ্টিতে চাহিয়া ক্ষেত্রনাথ বলিলেন—কোন্‌টা কার জিনিষ, সে আমাদের সেকেলে স্বত্বাস্বত্বির কথা। তুমি তার কি খবর রাখ যে বলতে এসেছ?

তাড়া খাইয়া উমানাথ নিরুত্তর হইল। ক্ষেত্রনাথ তামাক সাজিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, উমানাথ ধীরে ধীরে চলিয়া যাইবার উদ্যোগে আছে। কিঞ্চিৎ হাসিয়া সদয় কণ্ঠে কহিলেন—ভায়া আমার মনে মনে ভাবেন, দাদা দেশের লোককে ফাঁকি দিয়ে বিষয়-আশয় করেছে...। জগদ্ধাত্রী আমায় এক চিঠি দিয়েছিল—দেখেছ?

—দেখেছি।

আশ্চর্য্য হইয়া ক্ষেত্রনাথ কহিলেন—কোন্ চিঠি দেখেছ? কি লেখা আছে বল ত?

—দেশে ফিরে অবধি দিদি ত ঢের চিঠি লিখেছেন। সেই যে সহায়রাম কাকার ভিটেবাড়ির দরুণ টাকা চেয়ে লিখেছিলেন—

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন—ও ত হৃদয় রায়ের চিঠি—হৃদয় শিখিয়ে দিয়েছে, জগদ্ধাত্রীর হাতের লেখা। আগের চিঠি দেখেছ?

—তাতেও ঐ। লিখেছেন, বসতবাড়ির দরুণ না দাও—ঘর সারাতে হবে, তারই সাহায্য বলে দাও গোটা পাচেক টাকা—

ক্ষেত্রনাথ অসহিষ্ণু ভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—সে আগের কথা বলছি নে। তুমি সে সময় বিষ্ণুপুরে বেহালা বাজিয়ে বেড়াও। সহায়রাম রায় মারা গেলেন। জগদ্ধাত্রী সেই সময় দিল্লী থেকে চিঠি লিখেছিল। চিঠি নয়—সে আমার দলিল। দেখেছ?

উমানাথ তাহা জানে না। ক্ষেত্রনাথ বলিতে লাগিলেন—গোড়া না জেনে বলতে নেই। বিয়ের পর-বছর জগদ্ধাত্রীকে নিয়ে গেল পশ্চিমে। সহায়রাম খুড়ো মারা গেলে খবর দিলাম, কেউ এল না। জগো লিখলে, বাবার জিনিষপত্তোর যা আছে, তুমি নিও; তুমি নিলেই বাবার তৃপ্তি হবে। ঐ হৃদয়ের বাপ বরদাকান্ত রায় মশায় তখন বেঁচে। তিনি এসে বাদী হলেন, বলেন—আমরা হলাম নিকট জ্ঞাতি; সহায়রামের অস্থাবর আমাদের ডিঙিয়ে ক্ষেত্তোর চাটুজ্জে পর্য্যন্ত পৌঁছয় কি ক'রে? লোক ডাকাডাকি, মহা হুলস্থুল কাণ্ড। জিনিষের মধ্যে ত খান কতক পিঁড়ি-বারকোষ আর ঐ দেবীদাস রায়ের সিন্দুক—ছাইভস্মে বোঝাই। আমারও জেদ—তাই বা ছাড়ব কেন?

ছাই ভস্ম? এই অঞ্চলের একটা বিখ্যাত বস্তু এই সিন্দুক, যা লইয়া সহায়রাম রায় পালা বাঁধিয়াছিলেন। এখনও ক্ষেত নিড়াইবার মরসুমে চাষাভূষার মুখে উহার দশ বিশটা কলি মাঝে মাঝে শুনিতে পাওয়া যায়। ক্ষেত্রনাথ সিন্দুক

খুলিয়া দেখেন নাই, খুলিলে হয়ত দেখিতেন—ছাইভস্ম নয়, ভাল ভাল সোনা ফলিয়া আছে। সহায়রামের গানের দুটি ছত্র উমানাথের মনে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল—

সিন্দুকের মধ্যে সোনার বৃক্ষ, বৃক্ষে ফলে সোনা,—
আকাশের চাঁদ দিব রে পেড়ে (ও বাপ) সিন্দুক খুলিব না।...

নিজের ঘরে আসিয়া উমানাথ দেখিল, তরঙ্গিনী দুয়ার ভেজাইয়া অঘোরে ঘুমাইতেছে। একটা জানালা খুলিয়া দিতেই টাটকা বুনো ফুলের গন্ধ আর সঙ্গে সঙ্গে সিন্দুকের পালার কথাগুলি একটির পর একটি যেন বাহিরের ঘন অন্ধকারের মধ্য হইতে ভাসিয়া আসিতে লাগিল। কত রাত্রি অবধি যে আপনার মনে গুণ-গুণ করিতে করিতে অবশেষে এক সময় ঘুমাইয়া পড়িল; ঢাকা-দেওয়া খাবার পড়িয়া রহিল, খাওয়া হইল না।

দেবীদাস রায় সম্পর্কে জগদ্ধাত্রীর ঠাকুরদাদা—সহায়রাম রায়ের কি রকমের খুড়া হইত। বাপ ছিলেন দশকর্ম্মান্বিত ব্রাহ্মণ, দু-দশ ঘর যজমানের কল্যাণে কায়ক্লেশে সংসার চলিত। কিন্তু দেবীদাস ওপথেই গেল না, দিনরাত কেবল কুস্তি লড়িয়া লাঠি ভাঁজিয়া ছোটলোকের ছেলেদের সঙ্গে বেড়াইত। মজা টের পাইল বাপের জীবন-অন্তে। বয়স তাহার তখন কুড়ি-বাইশ। নিত্যকর্ম্মপদ্ধতি খুলিয়া অবাধ্য স্মরণশক্তিকে বশে আনিবার রীতিমত প্রয়োজন পড়িয়া গেল। ঠিক এই সময়ে এক যজমান-বাড়ি কি একটা ব্যাপারে যৎপরোনাস্তি অপদস্থ হইয়া আসিয়া মনের ঘৃণায় দেবীদাস নিরুদ্দেশ হইয়া যায়; লোকে বলিত—নবদ্বীপের কোন টোলে পড়িতে গিয়াছে। পড়াশুনা কতদূর কি হইয়াছিল জানা নাই; মাস ছয়েকের মধ্যেই একদিন সকাল বেলা দেখা গেল, দেবীদাস ফিরিয়া আসিতেছে—সঙ্গে দু'খানা গরুর গাড়ী। একটা হইতে নামিল, বেশ গোলগাল-গড়ন হাসিমুখ একটি বধূ, অন্যটি হইতে নামান হইল ঐ বিশালকায় সিন্দুক।

মেয়েরা আড়ি পাতিতে গিয়া দেখিয়াছে, নববধূ গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত প্রদীপের সামনে তালপাতার পুঁথি লইয়া নিবিষ্ট মনে বসিয়া থাকিত আর দেবীদাস খাটের অপর প্রান্তে অনেকটা দূরে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া ঘুমাইত কি, কি করিত কে জানে? মোটের উপর বোঝা যাইত, সরস্বতী-সম্পর্কিত ব্যাপারগুলাকে তখনও দেবীদাস সসম্ভ্রমে পাশ কাটাইয়া চলে।

তারপর কেমন করিয়া বলিতে পারি না, বধূর সঙ্গে ভাব জমিয়া আসিল। এক একদিন রাত্রে টিপিটিপি ঘরে ঢুকিয়া দেবীদাস অধ্যয়নরতা বধূর যৌবনস্নিগ্ধ তদ্গত মুখের দিকে প্রলুব্ধ চোখে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিত। তবু সম্বিৎ হয় না দেখিয়া একটানে বালিশ বিছানা বধূ ও পুঁথিসুদ্ধ খাটখানি জানলার দিকে হুড়মুড় করিয়া টানিয়া লইত, বধূ চমকিয়া সলজ্জভাবে তাড়াতাড়ি বই বন্ধ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইত, মুখে ঈষৎ বিরক্তির ছায়া। তখনই সে ভাব সামলাইয়া একটু হাসিয়া বলিত—অমনি করতে হয়? এসে সাড়া দেও নি কেন?

দেবীদাস হাসিমুখে চাহিয়া থাকে।

বধূ বলিত—খাট্ সমেত টেনে নিলে, তোমার গায়ে জোর ত খুব—

দেবীদাস সগর্ব্বে পেশীবহুল সুপুষ্ট হাত দু'খানা নাড়িয়া বলিত—ভারী ত! এতে আর জোরটা কি লাগে? আচ্ছা ঐ সিন্দুকটাও চাপিয়ে দেও খাটের উপর। তারপর যেমন বসেছিলে তেমনি থাকো। দেখো—

আবার হাসিয়া বলিত—এ বসে বসে কেবল তালপাতা নাড়া নয়।

বিস্ময়ে বধূর চোখ কপালে উঠিত।—সত্যি পার?

দেখ—বলিয়া দেবীদাস বধূটিকে ছোট্ট একটি তুলার পুঁটুলীর মতো শূন্যে তুলিয়া ধরিত। তারপর লুফিয়া টানিয়া বুকের মধ্যে আনিতে গেলে বধূ কাঁপিয়া চেঁচাইয়া উঠে।

তাহাকে মাটিতে নামাইয়া দিয়া হাসিয়া দেবীদাস বলে—ভয় পেয়েছ বড্ড? তারপর সদয় কণ্ঠে বলে—আর ভয় দেব না।

একদিন দুপুর রাত্রে দু-জনে ঘুমাইয়া আছে। খুট-খুট শব্দ হইতেছে। বধূ জাগিয়া উঠিয়া ভয়ে স্বামীর বুকের মধ্যে লুকাইল। ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিল—শুনছ?

দেবীদাসেরও ঘুম ভাঙিয়াছে। আস্তে আস্তে উঠিয়া বসিল। বলিল—চোরে সিঁধ কাটছে বোধ হয়। কিছু ভয় নেই, তুমি আমায় ছাড় ত একটু, লক্ষ্মি।

অনেক করিয়া বধূকে সে ঠাণ্ডা করিল।

খন্-খন্, ভস্-ভস্, মাটি ঝরিয়া পড়িতেছে। ছোট সরু জানালা, তাহারই নীচে সিঁধ কাটিতেছে। অন্ধকারের মধ্যে অনেকক্ষণ তাকাইতে তাকাইতে দৃষ্টি খুলিয়া গেল। নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া দেবীদাস জানলার পাশে বসিয়া আছে। ক্রমে গর্ত্ত কাটা হইয়া গেল। খানিকক্ষণ চুপচাপ, তারপর একটা কাল মাথা সিঁধের মুখে ভিতরে আসিতেছে।

বধূ ব্যস্ত হইয়া আঙুল দিয়া দেখাইল—ঐ—

চুপ—বলিয়া দেবীদাস তাহাকে থামাইয়া দিল। বলিল —মানুষ নয়, ও লাঠির মাথায় কাল হাঁড়ি। আগে ঐ পাঠিয়ে পরখ করে কেউ পাহারা দিয়ে বসে আছে কি-না। চুপ চুপ—

হাঁড়ি ঘরের মধ্যে অনেকখানি আসিয়া এদিকে-ওদিকে নড়িয়া চড়িয়া আবার বাহির হইয়া গেল।

আবার চুপচাপ। তারপর দেখা গেল, অতি সন্তর্পণে গর্ত্তের আলগা মাটির উপর দিয়া ধীরে ধীরে আগাইয়া আসিতেছে সত্যকার মাথা। অন্ধকারে দেবীদাসের মুখে তীক্ষ্ণ হাসি খেলিয়া গেল। চোর আর একটু আসিতেই তাহাকে জাপ্টাইয়া ধরিয়া হো হো করিয়া সে হাসিয়া উঠিল।

নিতান্ত ছেলেমানুষ চোর, একেবারে ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল—আমি কিচ্ছু জানিনে ঠাকুরমশাই, আমায় ওরা ঠেলে পাঠিয়েছে—আমি নতুন লোক—

—ওরা কারা?

সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল জন দুই-তিন দাওয়া হইতে উঠানে লাফাইয়া পড়িল।

দেবীদাস হাসিয়া বলিল—যা হতভাগা বেকুব বেল্লিক—আর কাঁদিসনে, যা চলে—

বলিয়া দোর খুলিয়া তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া পলায়মান একটি আবছা মূর্ত্তি লক্ষ্য করিয়া দেবীদাস ছুটিল।

বাড়ির সীমা ছাড়াইয়া বিল। লোকটি ছুটিতে ছুটিতে বিলে গিয়া পড়িল। শুকনার সময়, বিলে জল-কাদার সম্পর্ক নাই। দেবীদাস তীরের মত ছুটিয়াছে। কাছাকাছি আসিয়া বলিল—আর পালাবি কতদূর? বিলে এসেই যে ভুল করলি, বেকুব গাধা কোথাকার। এখানে গা-ঢাকা দিবি কোথায়?

কিন্তু সে ভাবনা ভাবিবার আগেই চোর একটা উঁচু আল বাধিয়া পড়িয়া গেল। দেবীদাস কাছে আসিয়া পড়িল, কিন্তু গায়ে হাত দিল না। বলিল—এখন ধরব না—ওঠ বেটা, ছোট্টু—। শেষে তুই ভাববি, পড়ে না গেলে দেবীদাস রায় ধরতে পারত না—

লোকটি কিন্তু উঠিল না, পড়িয়া পড়িয়াই কাতরাইতে লাগিল। পড়িয়া গিয়া তাহার পা ভাঙিয়াছে। অতএব দৌড়িয়া ধরিবার বাসনা স্থগিত রাখিয়া দেবীদাস আপাতত চোরকে কাঁধে করিয়া আসিল। দিন তিনেক ধরিয়া স্বামি-স্ত্রীতে বিস্তর তদ্বির করিয়া তাহাকে খাড়া করিয়া তুলিল।

একদিন বধূ জিজ্ঞাসা করিল—কি মতলবে এসেছিলি বাবা?—জানিস্ ত আমরা ভিখিরী বামুন—

অনেক রকমে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া জানা গেল, এদেশে গুজব রটিয়াছে—দেবীদাস রায় বিবাহ করিয়া সিন্দুক ভরিয়া বিস্তর টাকা আনিয়াছে। লোভে পড়িয়া অনেকে তাই নিশিরাতে এই বাড়ি হাঁটাহাঁটি করে—

বধূ বলিল—টাকা নয়, সোনার তাল। সিন্দুকে সোনার গাছ আছে—তাল তাল সোনার ফলন হয়...সে আমি দেখাব না ত—কিছুতেই না।

তারপর মৃদু হাসিয়া সিন্দুকের ডালা উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিল। অগণিত তালপাতার পুঁথি। তাহারই কয়েক বোঝা তুলিয়া উল্টাইয়া পাল্টাইয়া সিন্দুকের ভিতর দেখাইল। অজস্র পুঁথি, তা ছাড়া আর কিছু নাই।

বধূ বলিল—আমার বাবা মস্ত বড় সার্ব্বভৌম পণ্ডিত, মরবার সময় সিন্দুক-বোঝাই এই সব ধনরত্ন দিয়ে গেছেন—এর এক টুকরা আমি কাউকে দিতে পারব না বাপু—

এক বছরের আগ-পাছ স্বামী-স্ত্রী অপুত্রক মরিলেন। দেবীদাসের স্থাবর-অস্থাবর সকল সম্পত্তি সহায়রামে বর্ত্তাইল। সহায়রামের পৈতৃক তেজারতির কারবার ছিল; কিন্তু এক দুরারোগ্য রোগে সমস্ত মাটি করিয়া দিল, সহায়রাম পালা লিখিতেন—যাত্রার পালা, কীর্ত্তন-কথকতার পালা—দুইকানে যাহা শুনিতেন, পালায় বাঁধিয়া বসিয়া থাকিতেন। বন্ধকী কাগজ-পত্র অন্দরে গিন্নির বাক্সে তালাবন্ধী হইয়া থাকিত, দেবীদাস রায়ের সিন্দুকটি কেবল সহায়রামের নিজস্ব সম্পত্তি—ওটি থাকিত বাহিরের চণ্ডীমণ্ডপে। ভোরবেলা সকলের

আগে উঠিয়া আসিয়া সিন্দুকের উপর বসিয়া বসিয়া সুর ভাঁজিতেন। খাগের কলম ও হলদে কাগজের খাতা বাহির হইত। লোকজন আসিতে সুরু হইলে খাতা কলম আবার সিন্দুকে ঢুকিত।

প্রৌঢ় বয়সে সহায়রামকে বড় শোকতাপ পাইতে হয়। তিনটি ছেলে ওলাউঠায় মরিয়া গিয়া একেবারে নির্ব্বংশ হইলেন। আগে যা একটু কাজকর্ম্ম দেখিতেন ইহার পরে তাহা একেবারে বন্ধ হইয়া গেল—বড় একটা বাড়ির মধ্যেই আসিতেন না, সমস্ত দিন ও অনেক রাত্রি অবধি সিন্দুকের উপর চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন। এক এক সময়ে গানের খাতা খুলিয়া সুর ধরিতেন, সুর খুলিত না, গলা আটকাইয়া যাইত, চোখের জল খাতার উপর টপ-টপ করিয়া ঝরিয়া পড়িত।

এই সময়ে জগদ্ধাত্রীর জন্ম।

মেয়ের যতদিন বিবাহ হয় নাই, মেয়ে ছাড়া কিছুরই খোঁজ রাখিতেন না। গিন্নি মারা গেলেন, মেয়ে শ্বশুরবাড়ি চলিয়া গেল, সহায়রামের যাহা-কিছু ছিল মেয়ের বিবাহে উজাড় করিয়া দিয়া দিলেন,—দিলেন না কেবল ঐ সিন্দুক। নিরালা খোড়ো ঘরে কর্ম্মহীন বৃদ্ধের জীবনান্তকাল পর্য্যন্ত ঐ সিন্দুক ও গানের খাতা সম্বল হইয়া রহিল। উমানাথ সেই সময়ে রাতদিন বুড়ার সঙ্গে লাগিয়া থাকিত। তার অনেক দিন পরে সহায়রামের মৃত্যুর পর তাঁহাকেই গুরু বলিয়া ভণিতা দিয়া উমানাথ কবির দলে গান বাঁধিতে সুরু করিয়াছে।

পরদিন বেলা বোধ করি প্রহরখানেক হইবে, জগদ্ধাত্রী সন্তর্পণে পা ফেলিতে ফেলিতে ভিতরের উঠানে দাঁড়াইল। পরণে তাহার অতি জীর্ণ একখানি মটকার থান, স্নান হইয়া গিয়াছে, ভিজা চুলের উপর ফেরতা দিয়া আঁচল জড়ানো।

—কই গো মানুষ-জন কোথা?

প্রথমটা জবাব আসিল না। আরও দু-একবার ডাকাডাকি করিতে তরঙ্গিনী বাহির হইল। দাওয়ায় পিঁড়ি পাতিয়া দিয়া মুখ কালো করিয়া প্রণাম করিতে আসিল। জগদ্ধাত্রী তাড়াতাড়ি পা সরাইয়া বলিল—ছুঁয়ে দিও না, দিদি। তোমাদের কর্ত্তাদের সঙ্গে কাজ রয়েছে, কাজ সেরে এই পথে অমনি মঠবাড়ির মচ্ছবে যাব। তুমি ত উমানাথের বউ—বাড়ির গিন্নি হয়েছ এখন। সেদিনকার উমানাথ—তার আবার বউ, সে হ'ল গিন্নি-ঠাকরুণ। বলিয়া হাসিতে গিয়া তেমন করিয়া হাসিতে পারিল না। বলিল—কি সুন্দর সোনার সংসার আগ্‌লে বসে আছিস্ বউ, দেখে হিংসে হয়।

সেজবৌ ও ছোটবৌ ঘাটে গিয়েছিল। সমস্তটা ঘাটের পথ বক-বক করিতে করিতে এখন আসিয়া রান্নাঘরে কাঁখের কলসী নামাইল। অচেনা মানুষ দেখিয়া কপাটের আড়ালে দাঁড়াইয়া গেল। জগদ্ধাত্রী ডাকিল—ইদিকে আয়, ঘোমটা দিচ্ছিস যে বড়। আমায় কুটুম্ব ঠাওরালি নাকি? মুখ তোল—তোল শিগ্‌গির—

ঘোমটা টানিয়া শান্ত সভ্যভব্য হইয়া থাকা ছোটবৌর পক্ষেও বিষম দুরূহ ব্যাপার। মুখ তুলিয়া একবার চাহিয়া আবার সে ঘাড় নামাইল।

জগদ্ধাত্রী বলিল—আমার যে ছোঁবার জো নেই, ওগো ও গিন্নিঠাকরুণ, এখানে এসে দে দিকি এই দুষ্টু মেয়ে দুটোর পিঠে দুটো কিল বসিয়ে—

তরঙ্গিনী আসিয়া উভয়ের ঘোমটা খুলিয়া দিল। খুশী হইয়া জগদ্ধাত্রী বলিতে লাগিল—বাঃ বাঃ, চাঁদের মত মেয়ে—লক্ষ্মী-সরস্বতী দুটি বোন।...হ্যালো, ও মেয়েরা, টিপি-টিপি হাস্‌ছিস্ যে বড়। জানিস্, আমি কে?

বধূরা বোকা নয়। ছোটবৌ বলিল—আপনি পিসিমা—

কৃত্রিম রাগ দেখাইয়া জগদ্ধাত্রী বলিল—জবাব শোন একবার। পিসিমা! গুণের নিধি শ্বশুরঠাকুর বলে দিয়েছেন বুঝি? কেন শুধু মা হ'লে দোষটা কি? হ্যাঁরে, মা বেঁচে আছেন ত?

ছোটবধূর মুখ মলিন হইয়া গেল।

জগদ্ধাত্রী বলিল—নেই? খেয়ে-দেয়ে অবসর হয়েছিস্?

নানা কথায় বেলা বাড়িয়া আসিল। বহুকাল পূর্ব্বে যখন এ-যুগের এই সব নূতন মানুষের দল পৃথিবীকে দখল করিয়া বসে নাই, তখন এই গ্রামের মধ্যে এই বাড়ির চতুঃসীমায় এই উঠানের ধূলার উপর অতীতের আর এক দল কিশোর-কিশোরী দিনের পর দিন যে-সব হাসি ও অশ্রু



কৃষ্ণ ও বিদুর

শ্রীদুর্গাশঙ্কর ভট্টাচার্য

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

ছড়াইয়া বেড়াইত সেই ক্ষীণ বিস্মৃত কণিকাগুলি একজনে কুড়াইয়া ফিরিতেছে, আর দুই জন তাহারই মুখের দিকে চাহিয়া একেবারে মগ্ন হইয়া বসিয়া আছে। হঠাৎ বাহিরে অনেকগুলি গলার আওয়াজ শুনিয়া জগদ্ধাত্রী চুপ করিল।

ছোটবউ খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল—গল্পে গল্পে ফাঁকি দিয়ে কত বেলা করে দিলাম, আপনি কিচ্ছু টের পান নি। এত বেলায় মচ্ছবে গিয়ে আর হবে কি?

জগদ্ধাত্রী উত্তর করিল না। কান পাতিয়া ক্ষণকাল বাহিরের কথাবার্তা শুনিয়া একসময়ে সে উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল—হৃদয়ের গলা চিনিস তোরা? ও কি হৃদয় কথা বলে? উঁহু—এখনও আসে নি, আচ্ছা মানুষ!

মেজবৌ বলিল—আপনি বসে বসে গল্প করুন মা, আমি কাপড় ছেড়ে জলটল এনে দিচ্ছি. তার পর রান্না চাপিয়ে দেবেন। বেশ ত হচ্ছিল...আপনি ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়লেন—

মৃদু হাসিয়া জগদ্ধাত্রী বলিল—গল্প করব ব'লে আসিনি মা, রান্না করব বলেও আসিনি...এসেছি কাজে। হৃদয়ই মুস্কিল করলে। ক্ষণ পরে বলিল—বাড়িতে ট্যা-ভ্যা করছে না—তোদের বুঝি সে পাট হয় নি এখনও?

ছোটবৌ ভালমানুষের মত মেজবৌকে দেখাইয়া কহিল—হয়েছে মেজদির একটা—সাত বচ্ছরের ছেলে। মেজদিও এবার পনেরোয় পড়েছে।

তাহার কানের পাশে কতকগুলি চুল উড়িতেছিল, খপ করিয়া তাই ধরিয়া আচ্ছা করিয়া টানিয়া মেজবৌ ছোটবৌকে শাস্তি দিল। সম্পর্কে ছোট জা, বয়সেও বোধ করি কিছু ছোট, শাস্তির কষ্টে সে হাসিয়া ফেলিল।

মেজবৌ বলিতে লাগিল—ছেলে একলা আমার নয় মা, ওর-ও। বল্ তুই আভা, ছেলে তোর নয়। বল্।

আভা তাহা বলিতে পারিল না। বলিল—ছেলে আমাদের তিন শাশুড়ী-বৌয়ের। বলিয়া রান্নাঘরে তরঙ্গিনীর উদ্দেশে হাত তুলিয়া দেখাইল। বলিতে লাগিল—বড়-জা মারা যাবার থেকে নিতু থাকত মামার বাড়ি। গেল বছর থেকে এখানে আছে। সেই থেকে আদর দিয়ে দিয়ে মেজদি ওকে যা ক'রে তুলেছে—

মেজবৌ ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—আর তুই বড্ড ভাল, না? মিথ্যে কথা বলিসনে আভা, তাহলে তোর সমস্ত কীর্ত্তি ব'লে দেব এক্ষুনি। জগদ্ধাত্রীর দিকে চাহিয়া হঠাৎ আর এক প্রশ্ন করিল—আপনার ছেলেমেয়ে নেই?

স্মিতমুখে জগদ্ধাত্রী কহিল—কে বললে নেই? এই ত কতগুলি রয়েছিস তোরা—

উঠানের প্রান্তে ডালপালায় আচ্ছন্ন ছোট একটি পেয়ারা গাছ। সহসা নজরে পড়িল, গাছের নীচের দিককার ডালপালাগুলি ভয়ানক আন্দোলিত হইতেছে। সর্ব্বাগ্রে নজর পড়িল মেজবৌয়ের।

—কে রে? দু-একটা কুশী পড়েছে, হতভাগাদের জ্বালায় থাকবার জো নেই। কে রে তুই, কথা বলিসনে?

ছোটবৌ আগাইয়া উঁকি দিয়া দেখিয়া কহিল—আবার কে? সেই ডাকাত। ইস্কুল-টিস্কুল এরই মধ্যে হয়ে গেছে তোমার? কখন এসে সুড়-সুড় করে গাছে চড়ে বসেছ... নেমে এস এক্ষুনি—

ডাকাত বিনাবাক্যে নামিয়া আসিল। বাড়ির মধ্যে একমাত্র ছোটকাকীকে সে যৎকিঞ্চিৎ সমীহ করিয়া থাকে।

ছোটবৌ বলিতে লাগিল—সে দিন মানা করে দিইছি, তবু ডালে ডালে হনুমানের মত লাফাতে লেগেছ—হাত-পা ভেঙে পড়ে মরবে যে কোন্ দিন—

উচ্চকণ্ঠে পাড়া জানাইয়া বিশেষতঃ একজন বাহিরের লোকের সামনে এই প্রকার তুলনামূলক আলোচনায় নিতাই অপমান জ্ঞান করিল। ঘাড় ফিরাইয়া হাত তুলিয়া বলিল—মারব।

ছোটবৌ হাসিয়া বলিল—ইস্, কত্ত বড় মুরোদ! আয় দিকি কাছে এগিয়ে, কে কাকে মারে...আয়—

নিতাই আর আগাইল না, তা বলিয়া পরাজয় স্বীকারও করিল না। স্বস্থানে দাঁড়াইয়া বীরোচিত ভঙ্গিতে পুনশ্চ কহিল—মারব—

জগদ্ধাত্রী উঠানে নামিয়া আসিল। কহিল—গুরুজনকে মারতে চাচ্ছ...এই তোমার বুদ্ধি হয়েছে খোকা, ছিঃ—

এবারে খোকার নজর পড়িল জগদ্ধাত্রীর উপর। মারব—বলিয়াই বোধ করি তাহার মনে হইল ভয় দেখাইবার এই মামুলী কথায় তেমন আর জোর বাঁধিতেছে না। সহসা আর এক পন্থা ধরিল, বলিল—দে, আমায় রেলগাড়ী দে—

—কাল যে দিলাম—

—সে ছাই গাড়ী। কলের গাড়ী দিবি বলেছিলি, দে এক্ষুনি।

জগদ্ধাত্রী হাসিতে হাসিতে বলিল—রেলগাড়ী আমি গড়াই নাকি? মেলার থেকে কিনে ত দেব—

অতএব জগদ্ধাত্রী নিতান্তই বেকায়দায় পড়িয়া গিয়াছে। দে এক্ষুনি—বলিতে বলিতে উদ্যত হাতে নিতাই তীরবেগে ছুটিয়া আসিল। ছোটবৌ তাড়া দিয়া উঠিল—খবরদার ছেলে, ছুঁয়ে দিও না ওঁকে—শুদ্ধ কাপড়চোপড় প'রে মঠবাড়ি যাচ্ছেন—

নিতাই ছুঁইল না, থূঃ থূঃ করিয়া মুখের সমুদয় চিবানো পেয়ারা জগদ্ধাত্রীর পায়ে ঢালিয়া দিল। দিয়াই পলাইতেছিল, জগদ্ধাত্রী ধরিয়া ফেলিয়া ঠাস্-ঠাস্ করিয়া পিঠে দিল দুই চাপড়। প্রবল চীৎকারে নিতাই আছড়াইয়া মাটিতে পড়িল।

তরঙ্গিনী কোথায় ছিল, হাঁ-হাঁ করিয়া আসিল। সকলের দিকে অগ্নিদৃষ্টি হানিয়া বিনাবাক্যে সে ছেলে কাড়িয়া লইয়া গেল। ঘরের মধ্যে গিয়া নিতুর কান্না থামিল। তাহাকেই সম্বোধন করিয়া তরঙ্গিনী তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিতে লাগিল—আর যদি কারও কাছে যাস হতভাগা ছেলে, মেরে একেবারে খুন করে ফেলব। শত্তুরের হাতে ছেলে ফেলে দিয়ে সব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাসা দেখে—

তাহার পর কয়েক মুহূর্ত্ত নিস্তব্ধতা। কোন দিক দিয়া কোন সাড়া আসিল না দেখিয়া এবারে তরঙ্গিনী ঘরের আড়া-খুঁটিগুলিকে শুনাইয়া বলিতে লাগিল—মিছরির ছুরি! গ্রামসুদ্ধ মানুষ ডাকাডাকি, কি সমাচার? না—জমিদারী তালুকদারী সমস্ত ফাঁকি দিয়ে খাচ্ছে, তার সালিশী হবে। আবার ভিতরে এসে কত রঙ্গরস! ছেলে খুন করবার মতলব—ধনে-প্রাণে মারতে এসেছে আমাদের।

মেজবৌ কখন উঠিয়া গিয়াছে। ছোটবৌ মুখ লাল করিয়া নখ খুঁটিতে লাগিল। জগদ্ধাত্রী কথা কহিল, কিন্তু কণ্ঠস্বরে উত্তাপ নাই, বলিল—ছেলেকে অত আদর দিও না বউ, একটু শাসন করলে ছেলে খুন হয়ে যায় না—

ঘরের মধ্য হইতে জবাব আসিল—পেটের ছেলেকে শাসন করুক গিয়ে লোকে—।

ম্লান হাসি হাসিয়া জগদ্ধাত্রী বলিল—তা যে নেই।

মুখের কথা কাড়িয়া তরঙ্গিনী বলিতে লাগিল—ভগবান দেয় নি। সে অন্তর্যামী—সব বোঝে, খুনে মেয়েমানুষের কোলে দেবে কেন? যে যেখানে ছিল সব শেষ করে আমার সংসারে নজর দিতে এসেছে—

—কি, কি বল্‌লি? জগদ্ধাত্রী বাঘিনীর মত উঠিয়া চক্ষের পলকে উঠানের এই প্রান্ত অবধি আগাইয়া আসিল। বলিতে লাগিল—বুঝি গো বুঝি, খাওয়া জিনিষ উগবে দিতে বড্ড লাগে। কিন্তু এত দেমাক? দর্পহারী আছেন, এখনও চন্দ্রসূয্যি আছে। আমি আর কি বলব? গলা আটকাইয়া আসিল, সামলাইয়া লইয়া বোধ করি যাহাতে সেই দর্পহারীর কান পর্য্যন্ত পৌছিতে পারে এমনি উচ্চকণ্ঠে কহিতে লাগিল—ছেলের দেমাকে মরে যাচ্ছিস, তবু যদি নিজের ছেলে হ'ত! খোঁটা দেবার জিনিস এ নয় বউ, এক দণ্ডে কার যে কি হয় কেবল ঐ উপরওয়ালা জানে—

মুহূর্ত্তের জন্য জগদ্ধাত্রীর বোধ করি একটি অতি চরমক্ষণের কথা মনে পড়িয়া গেল। নূতন গিন্নীপনার আনন্দে লজ্জায় তখন দিনগুলি উড়িয়া চলিয়া যায়। জগদ্ধাত্রী ছ-মাসের অন্তঃসত্ত্বা। স্বামী কণ্ট্রাক্টরী কাজ করিতেন, দুপুরের পর দিব্য পান চিবাইতে চিবাইতে ভাল মানুষ বাহির হইয়া গেলেন। ঘণ্টা দুই পরে তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিল, সর্ব্বাঙ্গ রক্তে ভাসিতেছে, চক্ষু মুদ্রিত, এক উঁচু পাঁচিলের উপর হইতে পড়িয়া গিয়া প্রাণটুকু ধুকধুক করিতেছিল, বাড়ি আনিবার পথে তাহা নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। জগদ্ধাত্রী আছাড় খাইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িল; একবার জ্ঞান হয়, আবার তখনই অজ্ঞান হইয়া পড়ে। পরের দিন প্রসব করিল অপরিণত একটি রক্তপিণ্ড, মানব-শিশু বলিয়া তাহাকে চিনিবার জো নাই। মা হইয়া নিজের শিশুকে সত্যই সে খুন করিয়াছে। তারপর কতদিন গিয়াছে, এখনও মাঝে মাঝে সেইসব মনে পড়িয়া দৃষ্টি তাহার ঝাপসা হইয়া আসে।...

বাহিরে তখন অনেকগুলি কণ্ঠ চীৎকারের যেন প্রতি-যোগিতা চালাইয়াছে। হৃদয় ব্যস্ত হইয়া আসিয়া ডাকিল—দিদি, আসুন তো শিগ্‌গীর। তারপর হাসিয়া গলা খাটো করিয়া বলিতে বলিতে সঙ্গে চলিল—আচ্ছা এক মজা হয়েছে। বিপিন চক্কোত্তি-টক্কোত্তি সবাই হাজির, তারই

মধ্যে ক্ষেত্তোর-দা আপনাকে সাক্ষী মেনে বসেছেন। এইবার আপনি সব কথা বলুন গিয়ে---

ক্লান্তকণ্ঠে জগদ্ধাত্রী বলিল---ওর মধ্যে আর আমাকে কেন? আমি বাইরের দিকে থাকব। তুমি যা হয় কর গিয়ে হৃদয়, ঐ গণ্ডগোলে আমাকে টেনো'না---

---সে কি? হৃদয় আশ্চর্য্য হইয়া কহিল---গণ্ডগোল কোথায়? এত ঠিকঠাক ক'রে শেষকালে পিছিয়ে গেলে চলে? বলিয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিল। বলিতে লাগিল---আমার দিদি, এক কথা। ষাটটি টাকা দেব, নগদই দেব, কাল চান কালই পাবেন। আপনি গিয়েই ঘর মেরামত আরম্ভ করতে পারবেন। কিন্তু দশ জনের মোকাবেলা জমিটা নির্গোল হওয়া চাই---

একটু চুপ থাকিয়া মৃদু মৃদু হাসিয়া আবার বলিল---বাপের বাড়ির গ্রাম---কার সামনে বেরুতে লজ্জা হচ্ছে বলুন ত? ক্ষেত্তোর-দা রয়েছেন ব'লে বুঝি তাই---

জগদ্ধাত্রী তীক্ষ্ণস্বরে বলিল---আমি কাউকে গ্রাহ্য করি না, চল

গ্রামের অনেকেই আসিয়াছেন। বিপিন চক্রবর্ত্তী মহাশয় বয়সে সকলের বড়; এতক্ষণ যা কথাবার্ত্তা হইয়াছে জগদ্ধাত্রীকে সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিলেন। মাঝখানে হৃদয় বাধা দিয়া বলিল---ও সেটেলমেণ্টের কথা ধরবেন না আপনারা, ট্যাকে দু-পয়সা গুজতে পারলে 'হয়'কে সচ্ছন্দে 'নয়' করা যায়। সহায়রাম জেঠার বসতবাড়ি ছিল সিদ্ধ নিষ্কর। তিনি মারা যাবার পর ঘরদোর পড়ে গেল, ভিটের উপর এক হাঁটু জঙ্গল হয়ে পড়ল। তারপর ক'বছর পরে ক্ষেত্তোর-দা ওঁর উত্তর-বাগের বেড়াটা ঘুরিয়ে ও জমিটাও ঘিরে ফেললেন। আমি বললাম---ক্ষেত্তোর-দা, কাণ্ডটা কি? জবাব দিলেন---ওরা দেশে ঘরে এসে যখন দাবি করবে তখন ছেড়ে দেব; পোড়ো জায়গাটুকু বেড় দিয়ে নিলে ওদিকে মজা দীঘি পড়ে যায়, দু-পাশে আর বেড়া বাঁধতে হয় না, অনেক খরচ আসান হয়।...তখন কেউ বাদী হয় নি, ঝগড়া করতে কার মাথা ব্যথা পড়েছে? এবার জগদ্ধাত্রী দিদি এসে তাঁর পৈতৃক ভিটে চাচ্ছেন---অনাথা বেওয়া মানুষ, আপনারা দশ জনে বিচার করুন।

ক্ষেত্রনাথ গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন---মিথ্যে কথা---

বিপিন চক্রবর্ত্তী বলিলেন---তা হলে তুমি যা বলবে, বল ক্ষেত্তোরনাথ---

ক্ষেত্রনাথ ক্রুদ্ধ কণ্ঠে ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন---আমি কিছু বলব না চক্কোত্তি মশায়, আমি ত বলেছি---আমি এক কথাও বলব না। ও-ই বলুক। উত্তেজনার বশে স্বর কাঁপিতে লাগিল, বলিলেন---হৃদয়ের সঙ্গে যোগ-সাজস ক'রে বড় আজ বাদী হতে এসেছে, ও বলুক আজ আপনাদের দশজনের সামনে---ওর বিয়ের পরদিন, ফাল্গুন মাসের সতেরই তারিখ---তারিখটা পর্য্যন্ত বলে দিলাম, কুলীন বরযাত্রীরা বেঁকে বসল, মর্য্যাদা না পেলে খাওয়া-দাওয়া করবে না, সহায়রাম খুড়ো চোখে অন্ধকার দেখলেন---সেই সময় কে রক্ষে করলে? আমার মা'র বাজুবন্দ কেশব দত্তের কাছে বন্ধক দিয়ে চল্লিশ টাকা এনে দিলাম, খুড়ো আমার হাতখানা ধ'রে কেঁদে ফেল্লেন। বললেন, মেয়ে আমার রাজার ঘরে গেল---সে কিছু নিতে থুতে আসবে না। তোমার এ টাকা শোধ করতে পারি ভাল, না পারি জমাজমি বাড়ি ঘর-দোর সমস্ত তোমার। থাকত যদি কেশব দত্ত বেঁচে, সে বলত; এখন ও-ই বলুক---

জগদ্ধাত্রী আগড়ের বাঁশ ধরিয়া অন্য দিকে চাহিয়াছিল, তাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন---বল সব। সহায়রাম কাকা মাদুরে বসে, তুমি খাটের পাশে দাঁড়িয়েছিলে লাল বেনারসী পরে। অনেক বরযাত্রী বউ দেখতে এল সেই সময়---বল তুমি, যে সত্যি নয়; আমি এক কথায় সমস্ত ছেড়ে দিচ্ছি।

জগদ্ধাত্রী কথা বলিল না, তেমনি মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। জবাব দিল হৃদয়। বলিল---কিন্তু আমরা শুনেছি সে টাকা শোধ হয়ে গিয়েছে; তা ছাড়া চল্লিশ টাকায় অতটা নিষ্কর জমি হতে পারে না।

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন---তোমরা স্বপ্নে শুনেছ। চল্লিশ টাকা কি বলছ---কেশব দত্তের কাছ থেকে বন্ধক ছাড়িয়েছিলাম তার ডবল আশী টাকা দিয়ে। তার উপর আরও কত বছর হয়ে গেল, সুদের সুদ তস্য সুদ ধরব না? কত টাকা হয় তা হলে? সিকি পয়সা রেহাত দিচ্ছিনে। একটু থামিয়া বলিতে লাগিলেন---আজ হৃদয় তোমার বড় আপনার হ'ল জগদ্ধাত্রী, কোথায় ছিল সেদিন ওরা? ওর বাপ বরদাকান্ত

ত সেখানেই ছিলেন, চল্লিশটা পয়সা দিয়ে কোন সুহৃৎ সাহায্য করে নি।

জগদ্ধাত্রী একবার হৃদয়ের মুখের দিকে চাহিল। তারপর বলিল—বাবা কেশব দত্তের টাকা শোধ ক'রে দিয়েছিলেন—

অগ্নিদৃষ্টিতে চাহিয়া ক্ষেত্রনাথ বলিলেন—তোমার কাছে টেলিগ্রাফ হয়েছিল বুঝি ?

—বাবা চিঠি লিখেছিলেন।

—দেখাও চিঠি।

জগদ্ধাত্রী একটু ইতস্তত করিয়া কহিল—এত দিনের চিঠি...তাই কি থাকে!

ক্ষেত্রনাথ অধীর কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন—থাকে, থাকে—সত্যি হ'লে সমস্ত থাকে। আমার কাছে টুকরো কাগজখানি অবধি রয়েছে। পাঠশালে যে দাগা বুলিয়েছি তা পর্য্যন্ত খুঁজলে পাওয়া যায়। বলিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন—এত কথা শিখিয়ে দিতে পেরেছ হৃদয়, আর একখানা চিঠির জোগাড় ক'রে রাখতে পারনি ?

হৃদয়ও মহাক্রোধে সমুচিত জবাব দিতে যাইতেছিল, নিবারণ মজুমদার মধ্যবর্ত্তী হইয়া কলহ থামাইয়া দিল। নিবারণ কহিল—মোটের উপর আপনি ঠকে গেলেন চাটুজ্জে মশায়, জগদ্ধাত্রী ঠাকরুণকে সাক্ষী মেনে ছিলেন আপনিই—

ক্ষেত্রনাথ হাতমুখ নাড়িয়া কহিতে লাগিলেন—কিসের ঠকা ? ও মিথ্যেবাদী, মহাপাপী—যা বলবে তাই হবে নাকি ? আইন-আদালত রয়েছে, মামলা করে নিকগে। আমার আজ চল্লিশ বছরের দখল, গ্রামের সমস্ত লোক দেখছে. মিথ্যে বলে ও কেবল নিজের পরকাল খোয়ালে—আমার কি ?

নিবারণ কহিল—গ্রামের সব লোক আপনার দিকে সাক্ষী দেবে তাই বা কি ক'রে জানলেন ?

ক্ষেত্রনাথ কহিলেন—দিও ঐ দিকে সাক্ষী, গ্রাহ্য করিনে। এটা কোম্পানীর রাজত্ব—আমার দলিল রয়েছে, জরিপের রেকর্ড—তার উপর মতি বিশ্বেসের মেয়াদী কবুলতি। বিপিন চক্রবর্ত্তীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—চক্কোত্তি মশায়, আপনি বসুন একটু। যখন পায়ের ধুলো পড়েছে মতি বিশ্বেসের কবুলতিটা একবার দেখে যান—

দ্রুতপায়ে ক্ষেত্রনাথ ঘরে গেলেন। ঘরের কোণে দেবীদাস রায়ের সিন্দুক বিছানায় বালিশে বিলুপ্ত হইয়া রহিয়াছে, কোন চিহ্ন নজরে পড়ে না। ক্ষেত্রনাথ দলিলের দুই নম্বর বাক্স খুলিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে কবুলতি লইয়া বাহিরে আসিলেন।

—দেখুন, দেখুন, রেজেষ্টারীর তারিখটা হ'ল কোন্ সাল ? হিসেব ক'রে দেখুন, তেত্রিশ বছর হয়ে গেছে। বিশ্বেস জঙ্গল বেটে চাষবাস করবে এই চুক্তিতে মেয়াদী বন্দোবস্ত। আপনি ত বৈষয়িক লোক বলুন এবার দখলি-স্বত্ব প্রমাণ হয় কি না ?

ফিরিবার পথে বিপিন চক্রবর্ত্তী কহিতে লাগিলেন—আমি বুড়োমানুষ, অনর্থক আমাকে এই সব হাঙ্গামে টেনে আনা। কেঁদে করবি কি মা জগদ্ধাত্রী, ওর আর কোন উপায় নেই। বাঘের মুখ থেকে মানুষ ফেরে, কিন্তু ক্ষেত্তোর চাটুজ্জের হাত থেকে বিষয়-সম্পত্তি ফিরেছে কেউ কোনো দিন শোনে নি। সেবারে কি হল, ঐ বামুনডাঙার ভড়েদের সঙ্গে ? ভড়েদের সেজবাবু এত লাফালাফি, হেনো করেঙ্গা তেনো করেঙ্গা—শেষকালে দেখি ক্ষেত্তোরনাথ ওয়াশীলাতশুদ্ধ আদায় ক'রে নিলে। মনে পড়ছে না নিবারণ ?...

বিকালবেলা ক্ষেত্রনাথ সেই চণ্ডীমণ্ডপেই বসিয়াছিলেন। মাদুরের উপর একদল প্রজা-পাটক। গোমস্তা রাখাল হাতি দাখিলা লিখিয়া টাকা লইতেছিল। নানারূপ গল্প হইতেছিল, বিশেষ করিয়া ওবেলাকার বিজয়কাহিনী। রাখাল একবার মুখ তুলিয়া বলিল—ঠাকরুণের শ্বশুরবাড়িরা ত খুব ধনী লোক—

হা—হা করিয়া হাসিয়া ক্ষেত্রনাথ কহিলেন—খুব ধনী—বুঝলে, একেবারে রাজা রাজবল্লভ। আমার ভায়া একদিন গেছলেন সেখানে। তার মুখে রাজবাড়ির বর্ণনা পাওয়া গেল। ভাঙা পাঁচিলের উপর একখানা দোচালা, নারকেল পাতার ছাউনি, অগুন্তি ফুটো। শুয়ে শুয়ে দিব্যি চাঁদের আলো পাওয়া যায়—

রাখাল বলিল—দেশেও ত ওদের বিস্তর জমিজমা ছিল, সে সব কি হয়ে গেল ?

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন—দেনাও ছিল একরাশ। সবাই মরে-হেজে গেল, মহাজনেরা আর সবুর করলে না। এখন থাকবার মধ্যে ঐ দোচালা অট্টালিকা আর বিঘেখানেক আমবাগান—

বলিতে বলিতে হাসির মধ্যে অকারণেই ক্ষেত্রনাথ রুখিয়া উঠিলেন—কিন্তু আমি এই বলে দিলাম রাখাল, আমার কাছে যেন সিকি পয়সার প্রত্যাশা না করে। তোমাকে হুকুম দেওয়া রইল, উমানাথ হোক আর সে নিজেই হোক যদি এসে প্যান-প্যান করে—সিকিপয়সার সাহায্য না পায়। মিথ্যেবাদী হাড়বজ্জাত সব! ব্যবহারটা কি রকম দেখলে? টাকার অভাব হয়েছে...আগে যদি আসত আমার কাছে, এসে কেঁদে কেটে পড়ত, আমি কি ফেলে দিতে পারতাম, না দিইছি কোন দিন?

রাগের বশে এ কথাটা মনে পড়িল না, জগদ্ধাত্রী সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকেই পনর-বিশখানা চিঠি লিখিয়াছে।

ক্রমে বেলা পড়িয়া আসিল। বাহিরবাড়ির সীমানায় ঘন সন্নিবিষ্ট তল্তা বাঁশের ঝাড়, তার ওদিকে রাস্তা, রাস্তার পরপারে সহায়রাম রায়ের সেই পোড়ো ভিটা বাড়ি। সেখানে আজকাল সরিষাক্ষেত; হলুদ বরণ অজস্র ফুল ফুটিয়াছে। ক্রমে দু-একজন করিয়া লোক কমিতে আরম্ভ করিল। কি কথায় উঠিল বাতাবী লেবুর গল্প; হইতে হইতে আধমুনে কৈলাস। এই কৈলাসটি কে, কোথায় তাঁর জন্ম, সে খবর কেউ জানে না। গল্প আছে, আধ মণের কমে তাঁর পেট ভরিত না। একবার কেন রাজবাড়িতে তিনি অতিথি হন। বিকাল বেলা সরকার মহাশয়ের কানে গেল, ব্রাহ্মণ তখন পর্য্যন্ত অভুক্ত। বৃত্তান্ত কি? অতিথিশালায় ছুটিয়া আসিয়া দেখেন, সিধায় যে আধ-সেরখানেক চাউল দেওয়া হইয়াছিল, কৈলাসচন্দ্র স্নানাদির পর সে-ক'টি মুখে ফেলিয়া এক ঢোক জল পাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছেন, আর কি করিবেন?

সেকালের কথা কহিতে কহিতে অকস্মাৎ ক্ষেত্রনাথ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন—কি দিনকালই ছিল! স্বর্গে গেছেন তাঁরা, সে-সব মানুষও আর আসবে না—তেমন হাসি-ফূর্ত্তিও আর হবে না কোন দিন। একটা নিঃশ্বাস চাপিয়া বলিতে লাগিলেন—মনে হয় যেন কালকের কথা, স্পষ্ট চোখের উপর ভাসছে...কিন্তু কোথায় বা কে?

আরও ঘোর হইয়া আসিল। রাখাল কাগজপত্র তুলিয়া রাখিয়া বাহিরে আসিয়া দাড়াইল। ক্ষেত্রনাথও আসিলেন। হঠাৎ যেন তাঁহার নজরে ঠেকিল, আবছা মতন একটা লোক অতিশয় মন্থর গমনে রাস্তা পার হইয়া সরিষাক্ষেতে ঢুকিয়া পড়িল।

—দেখ ত, দেখ ত, একবার রাখাল।

অত দূর অবধি স্পষ্ট করিয়া ঠাহর হয় না, তবু যেটুকু নজরে পড়িল তাহাতেই ক্ষেত্রনাথ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন—নিশ্চয় বাইতি পাড়ার সৈরভী, বদমায়েসের ধাড়ী। ভেবেছে, অন্ধকারে বুড়ো দেখতে পাবে না কিছু—

কাঁপিতে কাঁপিতে লাঠি লইয়া নিজেই নামিয়া পড়িলেন। সামনে উমানাথকে আসিতে দেখিয়া বলিলেন—ছুটে যাও, গিয়ে ঐ মাগীর চুলের মুঠো ধরে নিয়ে এস এখানে। তোলাচ্ছি আমি সর্ষে ফুল। হিড়হিড় ক'রে টেনে নিয়ে এস—

উমানাথ বলিল—উনি জগদ্ধাত্রী দিদি। মঠবাড়ির মচ্ছব থেকে ফিরে এলেন এতক্ষণে—

ক্ষেত্রনাথ আরও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—নবদ্বীপের মা-গোঁসাই এলেন! বের ক'রে দিয়ে এসোগে। মামলা ক'রে দখল নিয়ে তারপরে যেন আমার ক্ষেতে ঢোকে।

উমানাথ ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। ক্ষেত্রনাথ কিছু কাল গুম হইয়া থাকিয়া বলিলেন—ঘরভেদী বিভীষণেরা পিছনে আছ, তা বুঝেছি। গালমন্দ না দিতে পার গিয়ে ভাল কথায় কি বলা যায় না—দিদি, যা তুলেছ তুলেছ—আর তুলো না; এখন ফুল তুললে সর্ষের ফলন হবে না—

উমানাথ কহিল, উনি সর্ষেফুল তুলছেন না। ভিটের উপর গিয়ে আছড়ে পড়লেন—কাঁদাকাটা করছেন না, কিছু না। দুপুর বেলাতেও ঐ রকম আর একবার দেখুন।

আরও খানিক দাঁড়াইয়া উমানাথ আবার কহিল—আমি বললে কি যাবেন? আপনি গিয়ে একবার দেখে আসুন।

অর্থাৎ স্থূলকথা, তাহার দ্বারা এ-কাজ হইবে না। ক্ষেত্রনাথ তখন পায়ে পায়ে নিজেই চলিলেন।

সরিষা-ক্ষেতের এক পাশে বড় একটি দেবদারু গাছ, তাহার গোড়ায় আসিয়া দেখিলেন—অনতিস্পষ্ট জ্যোৎস্না উঠিয়াছে, সেই আলোকে প্রথমটা নজরে আসিল না—তারপর দেখিলেন,—হলুদ-বরণ ফুলের মধ্যে সাদা কাপড়ে ঢাকা আবছা একটি মূর্ত্তি মাটির উপর একেবারে ডুবিয়া আছে। ক্ষণকাল চুপ থাকিয়া ক্ষেত্রনাথ মনে মনে অতিষ্ঠ হইয়া

উঠিলেন; কথা বলিতে হয়, তাই যেন বলিলেন—কেও? জগো?

জগদ্ধাত্রী চমকিয়া উঠিয়া গভীর কণ্ঠে ডাকিল—পল্টুদা!

সেইখানেই ক্ষেত্রনাথ বসিয়া পড়িলেন। দুইজনে চুপচাপ। চল্লিশ বছর পরে মুখোমুখি বসিয়া কিসের নেশায় মন ঝিমাইয়া আসিতেছে।...

হলুদ রঙের ফুলেভরা জনশূন্য নিস্তব্ধ ক্ষেতের উপরে আলতারাঙা পা ফেলিয়া ঘরের লক্ষ্মীরা এঘরে ওঘরে সন্ধ্যা দেখাইয়া ফিরিতে লাগিলেন। সামনের আশশ্যাওড়া ও ভাটের জঙ্গলের উপর দেখিতে দেখিতে গড়িয়া উঠিল, দক্ষিণী কারিগরের তৈরি প্রকাণ্ড আটচালা ঘর একখানি। ভিতরে জোড়া তক্তপোষে ফরাসের উপর ঝক্‌ঝকে সাপের মাথায় হুঁকাদান, তার উপর রূপাবাঁধানো হুঁকা; কলিকায় তামাক পুড়িয়া যাইতেছে, ও পাড়ার বৈকুণ্ঠ চাটুজ্জে হাত বাড়াইয়াছেন, কিন্তু হুঁকার নাগাল পান নাই। পাশার দান পড়িতেছে, চীৎকারে ঘর কাঁপিয়া যাইতেছে, ফিরিয়া তাকাইবার ফুরসৎ কাহারও নাই। বৈকুণ্ঠ আসিয়াছেন, কেদার-নাথ বরদাকান্ত আসিয়াছেন, আরও কে কে যেন নজর যায় না। বাড়ির মধ্যে দমাদম ঢেঁকির পাড় পড়িতেছে, নাড়ু-ভাজার গন্ধ—কানে পৈতা জড়ানো ফর্শা রঙ কে খড়ম খট্‌খট্‌ করিতে করিতে দীঘির দিক হইতে এই দিকে আসিতেছে। কে ডাকিয়া উঠিল—ও জগো, ঘুমুসনি—ওঠ, দুটো খেয়ে নিগে আগে, তারপর—

চুপ, চুপ, চুপ! নিঃশ্বাসেরও যেন শব্দ না হয়, উহারা কত কি কথা কহিতেছে—ভাল করিয়া শুনিতে দাও।...

অনেকক্ষণ পরে ক্ষেত্রনাথ বলিয়া উঠিলেন কেন তখন অত বড় মিথ্যে কথা বললে? হৃদয় তোমার আপনার হ'ল? ঘর সারাবার টাকার দরকার। আমায় যদি আগে গিয়ে ভাল ভাবে বলতে জগো, দু-পাঁচ টাকা দেবার সঙ্গতি আমার কি নেই?

—বড়বাবু! রাখাল হাতির কণ্ঠস্বর। সে বাড়ি যাইতেছিল, রাস্তা হইতে বলিয়া গেল—আমি চল্‌লাম।

ক্ষেত্রনাথ একবার কাসিয়া চারিদিক তাকাইয়া বলিলেন—এখানটা ছিল পথ, তুমি পাল্কীর মধ্যে উঠে বসলে। কপালে সোনার সিঁথিপাটি ছিল—না?

—পথ ওদিকে। এটা বাইরের উঠোন। তুমি সমস্ত ভুলে গেছ। বলিয়া একটু থামিয়া ম্লান হাসিয়া জগদ্ধাত্রী আবার বলিল—কতদিন পরে বাপের বাড়ি এসেছি পল্টুদা, চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর পরে—

ক্ষেত্রনাথ তাহারই কথার প্রতিধ্বনি করিলেন—গিয়েছিলে একরত্তি মেয়ে, ফিরে এলে কি রকম—

—তোমারও কি সে সব আছে? চুল পেকে গেছে, সামনের দাঁত নেই—

—তা হোক, তা হোক। ক্ষেত্রনাথ ব্যাকুল হইয়া সমস্ত যেন চাপা দিতে চাহেন। বলিলেন—তুই আর পল্টুদা বলে ডাকিসনে জগো, ডাক শুনে চমকে উঠি—গায়ের মধ্যে কেমন ক'রে ওঠে যেন; মা মরার পর থেকে ও নাম ভুলে বসে আছি। আজকাল দশ গ্রামের লোকে আমায় মানে, গণে—এর মধ্যে ছেলেবয়সের ঐ ডাক-নাম—না-না, ও বলে আর ডাকিস নে, বুঝলি?

বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

হিমে সরিষা বন ভিজিয়া গিয়াছে, ঝিঁঝি ডাকিতেছে, চাঁদের আলো তীক্ষ্ণ ছুরির মত গাছপালা বিদীর্ণ করিয়া মাটিতে আসিয়া পড়িয়াছে। নিশুতি গ্রাম; চারিদিক কি মায়ায় থমকিয়া আছে। উঠিয়া দাঁড়াইয়া ক্ষেত্রনাথ ডাকিলেন—চল যাই।

তারপর বলিলেন আমার টাকাটার একটা কিনারা ক'রে দে জগদ্ধাত্রী, তোর বাপের ভিটে তোরই থাকুক। ঐ আশীটা টাকা দে—সুদ-টুদ আর চাইনে...সরষে-কলাই আব-কাঠালে যাই হোক কিছু ঘরে ত উঠেছে।

জগদ্ধাত্রী জবাব দিল না, একটুখানি হাসিল। কয়েক পা গিয়া রাস্তায় পড়িয়া বলিল তুমি আমায় শুধু চারটে টাকা দিতে পার, দাদা? দু'টাকা এই আসবার গরুর গাড়ী ভাড়া, আর দু-টাকা ফিরে যাবার।

—টাকা? ক্ষেত্রনাথ উচ্চবাচ্য না করিয়া খানিক ক্ষণ পথ চলিতে লাগিলেন। তারপর মুখ ফিরাইয়া বলিলেন—এক কাজ কর। তোমাদের সেই দেবীদাস রায়ের দরুণ সিন্দুকটা আছে আমাদের বাড়ি। সেবারে চিঠি লিখেছিলে, তাই এনে রেখেছি। আর সিন্দুক আছেই বা বলি কি ক'রে—আছে ক'খানা তক্তা। ঐটে আমায় দিয়ে যাও, পাঁচ টাকা

দেব। এতকাল টানাটানি করলাম জিনিষটা—মায়াও বসেছে—যাক গে—

চুপ করিয়া থাকিয়া ক্ষণকাল জগদ্ধাত্রীর ভাবটা বুঝিলেন। বলিলেন—নিতান্ত না দিতে চাও, নিয়ে যেতেও পার। গচ্ছিত জিনিষ, স্বচ্ছন্দে নিতে পার। গাড়ীভাড়া পড়বে কিন্তু অনেক, সেটা হিসেব ক'রে দেখো।

সিন্দুকের বৃত্তান্ত হৃদয়ও শুনিল। শুনিয়া সে লাফাইয়া উঠিল।

—আপনি নিশ্চয় হাতে-নাতে ধরে ফেলেছিলেন দিদি, নইলে ও বুড়ো কি স্বীকার করবার পাত্তোর? ওটা আমার চাই। এই এক জমি নিয়ে কত দিন আপনার পিছনে ঘুরলাম, কত পয়সা ব্যয় করলাম, সমস্ত গেল ফেঁসে।

বলিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে বলিতে লাগিল—বাবাকে একদিন না-হক দশকথা শুনিয়ে চোখের সামনে দিয়ে হিড় হিড় ক'রে ক্ষেত্তোর-দা ঐ সিন্দুক ঘরে তুলেছিল, ও-ই আবার আমি ওর ঘর থেকে টেনে বের করব। কড়ায় গণ্ডায় সমস্ত শোধ তুলব, তবে আমি বরদাকান্তর বেটা। সেগুন কাঠের জিনিস—পাঁচ টাকা কি—আমি দশ টাকা দেব, আমাকে দিন।

পরদিন জগদ্ধাত্রী আসিল। সঙ্গে হৃদয়ও আছে। বলিল—সিন্দুকটা কি রকম আছে, দেখি একবার। ক্ষেত্রনাথ যেন এসব কিছুতে নাই, এমনিভাবে ঝনাৎ করিয়া চাবি ফেলিয়া তামাক খাইতে লাগিলেন। উমানাথ উহাদের লইয়া ঘরে ঢুকিল। বালিশ-বিছানা সিন্দুকের উপর হইতে নামান হইয়া গেল।

কড় কড়—কড়াৎ। প্রকাণ্ড লোহার তালা কতকাল মরিচা ধরিয়া আছে, গোড়ায় কিছুতে চাবি ঢোকে না; অনেক ঝাকাঝাঁকি টানাটানি করিতে করিতে অবশেষে শিকলের মাথা ভাঙিয়া ঝুলিয়া পড়িল। উমানাথ ডালা তুলিয়া ধরিল।

বিশ্রী ভাপসা গন্ধ। তারপর স্রোতের জলের মত আরশুলার ঝাঁক বাহির হইতে লাগিল। সিন্দুকের ভিতরটায় অতলস্পর্শী অন্ধকার।

হৃদয় উঁকি দিয়া বলিল—বাপ রে, তালপাতার আঁস্তাকুড়! ঝেঁটিয়ে ফেল—ঝেঁটিয়ে ফেল। ভিতরের ঐ দু-দিক তলা-মাথা কেমন আছে, দেখি আগে—। বলিয়া ঝাঁটার অভাবে সে নিজেই দুই হাতে একবোঝা ঝপ করিয়া ফেলিয়া দিল, তারপর আর এক বোঝা। তালপাতার পুঁথি, পুঁথির উপর চিত্র-বিচিত্র কাঠের পাটা, ক'খানা তুলোট কাগজের পুঁথিও রহিয়াছে। হাতে পড়িতে সমস্ত টুকরা হইয়া মাটিতে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

—রোসো, রোসো, সব যে গেল। উমানাথ ব্যাকুল হইয়া তাড়াতাড়ি হৃদয়কে হটাইয়া দিল!

হৃদয় বলিল—একেবারে ফেলি নি ত। তোমাদের উনুন ধরাতে কাজে লাগবে।

উমানাথ তখন মাটির উপরে ছড়ানো ছিন্নবিচ্ছিন্ন টুকরাগুলি সাজাইতে লাগিয়া গিয়াছে। হৃদয়ের দিকে মুখ না ফিরাইয়া কহিল—এ সব সোনার গুঁড়ো হৃদয়, এ চিনবার ক্ষমতা তোমার নেই। এই সার্ব্বভৌমের পুঁথির স্বাদ নিতে দেশদেশান্তর থেকে পড়ুয়া ছুটে আসত। সে কবিলোক।

পূর্ব্বগামী মহাজনেরা তাঁহাদের অতি আদরের যে কথাগুলি উত্তরপুরুষের জন্য যত্ন করিয়া পুঁথির পাতায় গাঁথিয়া রাখিয়া নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে চক্ষু মুদিয়াছিলেন তাহাদের এই অবহেলার বেদনা তাহার বুকে আসিয়া আঘাত করিতে লাগিল। বলিল—এই খাতাগুলোয় রয়েছে সহায়রামের গান, ধানক্ষেতে চাষাভুষোর মুখে একদিন শুনে এসো! তারা ভুলে যায় নি।...কিন্তু এটা কি?

একখানি লম্বা আকারের খাতায় গোল গোল মোটা হরপে গঙ্গাস্তোত্র, দাতাকর্ণ এবং আরও কত কি উপাখ্যান। উমানাথ পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে জিজ্ঞাসা করিল এটা আবার কার গান?

জগদ্ধাত্রী হাতে লইয়া একটুখানি দেখিয়া খাতা ঢাকিয়া ফেলিল।

—কি ওটা?

—এ বাজে। এ দেখে কি হবে? বলিয়া জগদ্ধাত্রী হাসিতে লাগিল।

উমানাথ দৃঢ়কণ্ঠে বলিল—দেবীদাস রায়ের সিন্দুকে বাজে জিনিষ থাকে না দিদি, আপনি চিনতে পারেন নি। দিন্ আমাকে—দেখব। বলিয়া হাত বাড়াইল।

জগদ্ধাত্রী হাসিতে হাসিতে বলিল—তা বই কি! আমার হাতের লেখার খাতা, আমি চিনি নি। একটু থামিয়া বলিল—আজকে মেয়েরা নাচতে নাচতে ইস্কুলে যায়, আর আমাদের সময়—ও বাবা! বলত, লেখাপড়া শিখলে মেয়ে বিধবা হবে। সার্ব্বভৌমের মেয়েও বিধবা হয়ে এক বছর বেঁচে ছিলেন।

ক্ষেত্রনাথ ইতিমধ্যে কোন্ সময়ে পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাঁহার দিকে তাকাইয়া বলিল—পন্টুদা, মনে পড়ে এই খাতা আর শিশুবোধক তুমি চুরি ক'রে এনে দিয়েছিলে।...সকালবেলা উনি তিন-চার ছত্র ক'রে লিখে দিয়ে যেতেন—পাঠশালে সমস্ত দিন ধরে যত মার খেতেন, বাড়ি এসে তার শোধ তুলতেন আমার উপর—সমস্ত দিন ধরে সেই ভয়ে দাগা বুলিয়ে রাখতে হত। কত কীর্ত্তিই করা গেছে!

পুঁথিপত্র নামাইয়া সিন্দুক ক্রমশঃ খালি হইতে লাগিল। মাঝের তক্তা ভাঙিয়া গিয়াছে, সমস্ত জোড় আলগা হইয়া গিয়াছে, তলাটাও একদম নাই। হৃদয়ের প্রতিশোধের উষ্ণতাও ক্রমশঃ শীতল হইয়া আসিল। টাকা দিয়া এই বস্তু কিনিয়া বাড়ির পথেই ত অর্দ্ধেক গুঁড়া হইয়া যাইবে। মুখে বলিল ইস্, একদম গিয়েছে।

জগদ্ধাত্রী বুঝিল, ইহা কায়দায় ফেলাইয়া দাম কমাইবার চেষ্টা। উদ্বিগ্ন ভাবে কহিল—নেবে না নাকি? না-ই যদি নেবে এই টানা-হেঁচড়ার কি দরকার ছিল?

হৃদয় বলিতে লাগিল—নেব না বলছে কে? কিন্তু আগে ত জানতাম না, এই দশা। দশ টাকা আমি দিতে পারব না।

উমানাথ বলিল—আমি রাখব দিদি, আমি দশ টাকা দেব। সরুন, পুঁথিপত্তর তুলে ফেলি, গানের খাতা তুলে ফেলি—বলিয়া সহায়রামের গানের খাতা কপালে ঠেকাইয়া সে সিন্দুকে তুলিল। বলিতে লাগিল—বরাতক্রমে ঘরে এসেছে এমন সিন্দুক ত জীবন থাকতে ছাড়ছি নে। দশ টাকা চান—যা চান, দেওয়া যাবে। সর হৃদয়, তোমার পিছনে আরও কি কি সব রয়েছে।...

সমস্ত সাজাইয়া তুলিয়া উমানাথ সিন্দুকের ডালা বন্ধ করিল। ক্ষেত্রনাথের দিকে তাকাইয়া দেখিল, তিনি নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া আছেন। তারপর জগদ্ধাত্রীর হাতের দিকে নজর পড়িতে বলিল—ওটা আবার কি বাইরে রাখলেন, আপনাদের সেই হাতের লেখার খাতা?

জগদ্ধাত্রী হাসিয়া বলিল—এটা বিক্রী করব না, নিয়ে যাব। তারপর বলিল—টাকাটা কালকে চাই উমানাথ, খুব সকালে রওনা হয়ে যাব। আজ বিকেলের দিকে একটা গরুর গাড়ী ঠিক ক'রে রেখো, হৃদয়।

হৃদয় বিরক্ত কণ্ঠে বলিল—আমি পারব না। ক'দিন ধরে এই ক'রে ক'রে কিছু কাজকর্ম্ম হচ্ছে না। আজ আমার আদায়ে বেরুতে হবে। আপনি আর কাউকে বলুন।

সকলের পিছনে ক্ষেত্রনাথ নির্ব্বাক পাথরের মত দাঁড়াইয়া এতক্ষণ কি ভাবিতেছিলেন তিনিই জানেন, এইবার কথা কহিয়া উঠিলেন। বলিলেন—গাড়ী আমি ঠিক ক'রে দেব। আর এত বেলায় হৃদয়ের বাড়ি অদ্দূর নাই গেলে জগদ্ধাত্রী। কাল এখান থেকেই এমনি চলে যেও। হৃদয় বরঞ্চ এক সময় কাউকে দিয়ে তোমার জিনিষপত্তোর যা আছে পাঠিয়ে দেবে।

—তা দেব—বলিয়া একটু ব্যঙ্গ ভরা হাসি হাসিয়া বলিল—অঢেল জিনিষপত্তোর! ফুটো ঘটি আর থান দুই কাঁথা—দেব পাঠিয়ে বিকেল বেলা।

সকলে চলিয়া গেল, রহিল কেবল ক্ষেত্রনাথ ও জগদ্ধাত্রী। ক্ষেত্রনাথ বলিল—জগো, দিয়ে দে আমার আশী টাকা, আমি তোর জিনিষপত্তোর বাপের ভিটে—সমস্ত ছেড়ে দিচ্ছি। আমি ত বাঁচি তা হলে।

জগদ্ধাত্রী হাসিল।

—না পারিস টাকা দিস এর পর। সত্যি তুই চাস্?

জগদ্ধাত্রী চুপ করিয়া রহিল। তারপর বলিল—তুমি মাঝে মাঝে দু-এক টাকা পাঠিয়ে দিও। জায়গা-জমি ত পেটে খাওয়া যায় না।

পরদিন খুব ভোরে গরুর গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। মেজ-বউ ছোটবউ অনেক আগেই উঠিয়াছে। বলিল—ভুলে যাবেন না মা, আসবেন আবার।

আঁচলের প্রান্তে চোখ মুছিয়া জগদ্ধাত্রী বলিল—সোনার রাজ্যি তোদের মা, ছেড়ে যেতে মন কি চায়?

ক্ষেত্রনাথ আসিয়া ডাকিলেন—শোনো।

তাহাকে একান্তে ডাকিয়া পাঁচটি টাকা হাতে দিলেন। বলিলেন—সিন্দুকের দাম।

জগদ্ধাত্রী আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—এ কি? দশ টাকার কথা ছিল যে। উমানাথ কোথায়?

—মঠবাড়িতে কীর্ত্তন শুনতে গেছল, রাত্তিরে আর ত ফেরে নি। তার কথায় কি হবে? দরদস্তরের সে জানে কি? নেহাৎ ব'লে ফেলেছে বলেই, নইলে ভাঙা সিন্দুক কি কাজে লাগবে? ইচ্ছে হ'লে তোমার জিনিস নিয়ে যেতে পার।

জগদ্ধাত্রী ভাবিতে লাগিল।

ক্ষেত্রনাথ প্রশ্ন করিল—কি বল? নিয়ে যাবে? ঐ রকম বেকায়দা জিনিস গরুর গাড়ীতে যাবে বলে বোধ হয় না, অন্য রকম ব্যবস্থা করতে হবে।

জগদ্ধাত্রী বলিল—দাও, তোমার যা খুশী। আসা-যাওয়ার ভাড়া গেল চার—হাতে থাকল এক টাকা। তাই ভাল। বলিয়া ম্লান হাসিয়া হাত পাতিল।

ক্ষেত্রনাথ টাকা দিয়া দাতন করিতে করিতে একটু ওদিকে যাইতে ছোটবৌ পুনশ্চ আগাইয়া আসিয়া সসঙ্কোচে বলিল—মা ছোঁব আপনাকে?

জগদ্ধাত্রী হাসিয়া বলিল—মুচির মেয়ে নাকি তুই যে ছুঁলে জাত যাবে?

নত হইয়া সে জগদ্ধাত্রীর পায়ে প্রণাম করিল। বলিল—সকালবেলা নেয়ে-টেয়ে নিয়েছেন কি-না তাই বলছিলাম। আপনার পায়ের ধুলো নি একটু যাবার বেলা—

জগদ্ধাত্রী ছোট মেয়ের মত তাহাকে জড়াইয়া কোলে তুলিয়া লইল। অশ্রু আর বাধা মানিল না, ঝরঝর করিয়া গাল বহিয়া ঝরিতে লাগিল। ছোটবৌর চিবুকে আঙুল ছোঁয়াইয়া আঙুলের অগ্রভাগ চুম্বন করিয়া বলিল—রাজরাণী মা তুই আমার—পোড়াকপালীর পায়ে হাত তুই কেন দিবি মা? আচ্ছা, চল্লাম এবার। তোর খুড়শাশুড়ী এখনও ঘুমুচ্ছেন বুঝি। নিতাই কোথায় রে—ঘুমুচ্ছে?

—হুঁ—

—আচ্ছা, চল্লাম। ও পন্টুদা—ক্ষেত্রনাথ মুখ ফিরাইয়া তাকাইতে জগদ্ধাত্রী বলিল—আচ্ছা, মেলার ঐ রেলগাড়ীটার দাম ঠিক ঠিক কত নেবে বল ত—

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন—বললে ত পাঁচসিকে। এক টাকার কম দেবে কি?

—এই টাকাটা দিয়ে নিতুকে ওটা কিনে দিও।—বলিয়া আঁচলের প্রান্ত হইতে ক্ষেত্রনাথের দেওয়া পাঁচ টাকার একটি টাকা বাহির করিয়া দিল। আবার হাসিয়া বলিল—গরুর গাড়ীর চার আর রেলের গাড়ীর গেল এক। লাভে রইল আমার এই খাতাখানা—তবু বাপের বাড়ির একটা জিনিষ—

জীর্ণ মটকার থানের আঁচলে সেই কীটদষ্ট বহু পুরাতন দাগাবুলানো হাতের লেখার খাতাখানা যত্ন করিয়া জড়াইয়া লইয়া জগদ্ধাত্রী গাড়ীতে গিয়া বসিল।

ক্যাঁচ-কোঁচ শব্দ করিয়া আর্ত্তনাদ করিতে করিতে অসমান গ্রাম্য রাস্তার উপর দিয়া গরুর গাড়ী চলিয়াছে। চলিতে চলিতে হঠাৎ কি রকমে গরুর কাঁধের ফাঁস খুলিয়া গিয়া গাড়ী একটুখানি থামিল। অল্পদূরেই সহায়রাম রায়ের পরিত্যক্ত ভিটার উপর শিশির-স্নাত হলুদ-বরণ সরিষা-ফুলের সমুদ্র। প্রভাতের শান্ত নিস্তব্ধ গ্রাম। চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ক্ষেত্রনাথ দেখিতেছিলেন। হঠাৎ কি মনে হইল, বাক্স হইতে আরও পাঁচটি টাকা লইলেন। এক মুহূর্ত্ত ইতস্ততঃ করিলেন, তারপর গাড়ীর পিছে পিছে এক রকম ছুটিয়া গিয়া ডাকিয়া থামাইয়া টাকা কয়টি জগদ্ধাত্রীর হাতে দিলেন।

—এই নাও। হ'ল ত? ঘর সারতে হয়, যা করতে হয়, কর গিয়ে—আমি আর কিছু জানি নে। যেন একজন কাহার উপর বড় অভিমান করিয়া বিদায় হইয়া যাইতেছে—নিজের মান বজায় রাখিতে হইবে, তাহাকেও ঠাণ্ডা করিতে হইবে এমনি একটা ভাব। ক্ষেত্রনাথ বলিতে লাগিলেন—ভায়া আমার বেশ মানুষ। দশ টাকা হুকুম ক'রে নিজে ত গা ঢাকা দিয়েছেন, এখন মর শালা তুই টাকার জোগাড় করে।

জগদ্ধাত্রী অবাক বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল দেখিয়া গাড়োয়ানের উপর হাঁক দিলেন—চালা, চালা—বেলা বাড়ছে না? থেমে রইলি কেন?

কিন্তু উমানাথ যে ইচ্ছা করিয়া গা-ঢাকা দিয়াছিল তাহা নহে। সকালে জগদ্ধাত্রী চলিয়া যাইবে, তৎপূর্ব্বেই তাহার বাড়ি ফিরিবার একান্ত সঙ্কল্প ছিল। কিন্তু মঠবাড়িতে বালক-সঙ্কীর্ত্তন আসিয়াছে, অনেকক্ষণ অবধি চুপ করিয়া সে

গান শুনিল, তারপর সে থাকিতে পারে নাই, নিজেই দলের মধ্যে উঠিয়া দাঁড়াইল। শেষরাতে গান ভাঙিল, তখন আর বাড়ি-ঘরের কথা উমানাথের মনে নাই। বৈষ্ণব-সেবার ডাক আসিল, উমানাথ তখনও মনে মনে সুর ভাজিতেছে।...

সেই প্রথম দিনের দলটির কর্ত্তা আসিয়া মনে করাইয়া দিল—ছোট চাটুজ্জে মশায়, মনে আছে ত আমাদের মাথুর পালাটা ঠিক ক'রে দেবার কথা ?

কীর্ত্তনীয়াদের থাকিবার জন্য খড়ে ছাওয়া প্রকাণ্ড মণ্ডপ। তাহারই একদিকে কেরোসিনের ডিবাটা সরাইয়া লইয়া উমানাথ বসিল। খেরো-বাঁধা খাতা বাহির হইল, আর বাহির হইল সহায়রামের পুরাণো গানের খাতা—দেবীদাস রায়ের সিন্দুকে যাহা পাওয়া গিয়াছে। খাতার সঙ্গে দড়ি দিয়া বাঁধা পেন্সিল থাকিত। অবশিষ্ট রাত্রিটুকু না ঘুমাইয়া উমানাথ পালা লিখিয়া চলিল ...

বৃন্দা বলিতেছে—ওগো অকরুণ শ্যাম, তোমার বিরহে বৃন্দারণ্য শ্মশান হইয়াছে, তোমার পথ চাহিতে চাহিতে গোপীরা অন্ধ হইয়া গেছে, তোমার সোহাগিনী রাই শীর্ণ চতুর্দ্দশী-চাঁদ হইয়া ধুলার পড়িয়া রহিয়াছে. প্রাণের স্পন্দনটুকু তাহার বুঝি এতদিনে নিঃশেষে থামিয়া গেল...

দূতীকে কৃষ্ণ অভয় দিলেন—ভয় করিও না সখী বৃন্দা, আমি ফিরিয়া যাইতেছি। আমার রাইকমল আমার কৈশোরের সেই বৃন্দাবন—কিছুই মরে নাই। আবার আমি ফিরিয়া যাইব, ম্লান কুসুম শতদল হইয়া ফুটিয়া উঠিবে...

...পীত ধড়া পরিয়া হাতে মুরলী লইয়া মথুরার রাজা কতকাল পরে আবার রাখাল বেশে কৈশোরের বৃন্দাবনে চলিলেন। আকাশে চাঁদ উঠিল, যমুনা উজান বহিতে লাগিল, হারাণো কালের বাঁশীর ধ্বনি আবার গোকুল বৃন্দাবন আকুল করিয়া বাজিতে লাগিল।...দুরন্ত কালার ভয়ে ভূমিশয্যা ছাড়িয়া চকিতে শ্রীমতী মুখ ঝাঁপিয়া বসিলেন। আঁচল ধরিয়া গদগদ কণ্ঠে কৃষ্ণ কত কি কহিতেছেন। কুঞ্জবৃক্ষের শাখাগ্রে কোকিল ডাকিতে লাগিল।...

উমানাথ গান লিখিয়া চলিয়াছে। ক্রমে সকাল হইয়া গেল।

শত বৎসর পরে

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ

১৭৭২ খৃষ্টাব্দে, ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দিল্লীর বাদশাহের দেওয়ান-রূপে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বাংলা ও বিহারের শাসনভার গ্রহণের সমসময়ে রাজা রামমোহন রায় ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, এবং ১৮৩৩ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর ব্রিষ্টল নগরে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। তাহার পর শত বৎসর গত হইয়াছে, এবং এই মহাপুরুষের শতবার্ষিক শ্রাদ্ধ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইতেছে। শত শত সুনিপুণ কণ্ঠ রাজা রামমোহন রায়ের প্রশস্তি পাঠ করিতেছে। এই মহোৎসবের সময় আর একটি কথা স্মরণ করা যাইতে পারে। রাজা রামমোহন রায় স্বজাতির উন্নতির জন্য যে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা এই শত বৎসরে আর কতদূর অগ্রসর হইয়াছে ? তাঁহার প্রধান দুইটি কার্য্য,—ধর্ম্ম-সংস্কার এবং সতীদাহ-দমনে সরকারের সহায়তা। এই দুই কার্য্যের মূল এক,—যুক্তিবিরুদ্ধ সংস্কার গত শত বৎসরের শিক্ষার ফলে হিন্দুর চিত্ত কতদূর শুদ্ধ হইয়াছে, যুক্তিবিরুদ্ধ সংস্কারের পসার কতদূর কমিয়াছে ? সতীদাহের প্রচলন হিন্দুর হৃদয়ের একটি বিশেষ অভাব সূচিত করে। সেই অভাবটি হইতেছে, মনুষ্যজীবনের জন্য যথোচিত মমতার অভাব। সাধারণ আত্মহত্যা বা নরহত্যা অপেক্ষা স্বর্গার্থে বা পরোক্ষভাবে কোন ঐহিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আত্মবলি এবং নরবলি অধিকতর নির্ম্মমতার পরিচয় দেয়। সরকার আইন পাস করিয়া সতীদাহ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং এই প্রথা অনুষ্ঠানের আর সম্ভাবনা নাই।* কিন্তু সতীদাহ হিন্দুহৃদয়ের যে নির্ম্মমতা

* এখনও মধ্যে মধ্যে কোথাও কোথাও সহমরণ ও সতীদাহ বা তাহার চেষ্টার সংবাদ খবরের কাগজে বাহির হয়; কিন্তু এরূপ কাজ বা চেষ্টা যে প্রশংসনীয় নহে, সেরূপ মন্তব্য খবরের কাগজে সচরাচর দৃষ্ট

এবং যে কুসংস্কার সূচিত করিত, শত বৎসরের শিক্ষার ফলে তাহা কতটা বিদূরিত হইয়াছে, তাহার হিসাব করা কর্ত্তব্য।

ইংরেজ যখন এদেশের শাসনভার গ্রহণ করেন তখন এদেশে নানাপ্রকার আত্মবলি এবং নরবলি-প্রথা প্রচলিত ছিল। যেমন ধর্ণা, গঙ্গাসাগরে পুত্র বিসর্জ্জন, গঙ্গাজলে আত্মবিসর্জ্জন, শিশুকন্যা হত্যা, সতীদাহ, স্ত্রীকে স্বামীর শবের সহিত জীবন্ত অবস্থায় মাটিতে পুঁতিয়া ফেলা ইত্যাদি। ধর্ণা অর্থ কোন ব্যক্তির অপর কাহারও উপর কোনও দাবি থাকিলে বা দাবি করিবার ইচ্ছা থাকিলে, সেই দাবিদারের কোনও অস্ত্র কিংবা বিষ হাতে করিয়া অপর পক্ষের বাড়ির দ্বারে গিয়া উপবাস আরম্ভ করা, এবং দাবি পূরণ না হইলে প্রায়োপবেশন করিয়া বা বিষ খাইয়া বা অস্ত্রাঘাতে আত্মহত্যা করা। সেকালে কোনও দাবিদার এইরূপে ধর্ণা দিলে অপর পক্ষও উপবাস আরম্ভ করিত এবং তাহার বাড়িতে লোকের যাতায়াত বন্ধ হইত। ১৭৯৫ সালের ২১ কানুন (Regulation) পাস করিয়া সরকার কাশীর ব্রাহ্মণগণের আচরিত ধর্ণা এবং এই শ্রেণীর অন্যান্য আচরণ দণ্ডনীয় করিয়াছিলেন, এবং বাংলা-বিহার-উড়িষ্যায় ধর্ণা নিবারণের জন্য ১৭৯৭ সালের ৫ কানুন পাস করিয়াছিলেন। ১৮০২ সালের ৬ কানুনে গঙ্গাসাগরে এবং গঙ্গার আর কয়েকটি ঘাটে পুত্রবিসর্জ্জন দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া বিহিত হইয়াছিল।

এই সকল অনাচার হিন্দুর দ্বারা অনুষ্ঠিত হইলেও ইহাদিগকে প্রকৃত হিন্দু সভ্যতার অঙ্গ বলা যাইতে পারে না, কেন-না হিন্দুর প্রামাণ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণের বচনে ইহাদের বিধি নাই। সকল দেশেই সভ্যতার পশ্চাতে একটা বর্ব্বরতার ছায়া থাকে। যেমন ইউরোপে ডাইনি (witch) দাহ করা। বৈজ্ঞানিকেরা সভ্যতার সঙ্গে বিজড়িত বর্ব্বরতার অবশিষ্টকে বলেন folk-lore, লোকশাস্ত্র। পুত্রবিসর্জ্জনের মত প্রথা শাস্ত্রে বিহিত হয় নাই। এইগুলি দেশাচার, লোকাচার বা স্থলবিশেষে কুলাচার মূলক। সুতরাং সরকার আইন করিয়া এই সকল অনাচার রহিত করিয়া দিতে কোন সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। কেন না এই সকল অনাচার নিবারণের ফলে শাস্ত্রে বিধিবদ্ধ হিন্দুধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ করা হয় না। কিন্তু যে-সকল স্মৃতি-নিবন্ধ (Digest) অনুসারে সেকালের আদালতের পণ্ডিতগণ ব্যবস্থা দিতেন, সেই সকল নিবন্ধে স্ত্রীর মৃতপতির অনুগমনের বা সতীদাহের বিধান ছিল। সুতরাং সতীদাহ নিবারণ করা কর্ত্তব্য কি-না, এই বিষয়ে ইংরেজ রাজপুরুষগণের বিশেষ সন্দেহ ছিল। সুপ্রীম কোর্ট কলিকাতা শহরে সতীদাহ নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। কলিকাতার অধিবাসীরা শহরের বাহিরে গিয়া সতীদাহ সম্পাদন করিত। বাংলা-বিহারের শাসনভার গ্রহণ করিয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত সরকার কলিকাতা শহরের বাহিরে সতীদাহ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করেন নাই। গভর্ণর-জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলী ১৮০৫ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে লিখিত একখানি চিঠিতে নিজামত আদালতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কিরূপ সহমরণ হিন্দুশাস্ত্রসম্মত। এই চিঠির উত্তরে নিজামত আদালতের জজেরা আদালতের পণ্ডিতগণের ব্যবস্থা লইয়া ঐ সালের ৫ই জুন তারিখে উত্তর দিয়াছিলেন, গর্ভবতী, ঋতুমতী, নাবালিকা বা শিশুসন্তানবতী বিধবার সহমরণ শাস্ত্রসম্মত নহে, এবং মাদক দ্রব্য খাওয়াইয়া কোন বিধবাকে সহমরণে ব্রতী করাও কর্ত্তব্য নহে। নিজামত আদালতের এই উত্তর পাওয়ার অনতিকাল পরেই (৩১শে জুলাই) লর্ড ওয়েলেসলী পদত্যাগ করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি সতীদাহ সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থাই করিয়া যাইতে সমর্থ হন নাই। ইহার সাত বৎসর পরে, ১৮১২ সালে, এবং তারপর ১৮১৫ এবং ১৮১৭ সালে সরকার নিজামত আদালতের উপদেশমত ম্যাজিষ্ট্রেটগণের উপর আদেশপত্র পাঠাইয়া কোন কোন বিধবার সহমরণ নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। ১৮১৮ সালে কয়েক জন হিন্দু এই সকল আদেশ-পত্র প্রত্যাহার করিবার জন্য সরকারের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন। রামমোহন রায়ের উদ্যোগে এই আবেদনের বিরুদ্ধে আর কয়েক জন হিন্দু একটি পাল্টা আবেদন পাঠাইয়াছিলেন। এই পাল্টা আবেদনের ব্যবস্থা করিয়া রামমোহন রায় সতীদাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং এই ১৮১৮ সালেই "সহমরণ বিষয়" প্রথম পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। হিন্দুশাস্ত্রে দৃঢ়বিশ্বাসী রামমোহন রায় কেন যে সতীদাহ নিবারণে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন, এই পুস্তিকার নিম্নোদ্ধৃত কয়েক ছত্র পাঠ করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে—

প্রথমে প্রবর্ত্তকের প্রশ্ন।—আমি আশ্চর্য্য জ্ঞান করি যে তোমরা সহমরণ এবং অনুমরণ যাহা এদেশে হইয়া আসিতেছে তাহার অন্যথা করিতে প্রয়াস করিতেছ ॥

নিবর্ত্তকের উত্তর।—সর্ব্ব শাস্ত্রেতে এবং সর্ব্ব জাতিতে নিষিদ্ধ যে আত্মঘাত তাহার অন্যথা করিতে প্রয়াস পাইলে তাঁহারাই আশ্চর্য্য বোধ করিতে পারেন যাঁহাদের শাস্ত্রে শ্রদ্ধা নাই এবং যাঁহারা স্ত্রীলোকের আত্মঘাতে উৎসাহ করিয়া থাকেন ॥ (গ্রন্থাবলি, ১৬৭ পৃ.)

এই উত্তর শুনিয়া প্রবর্ত্তক সতীদাহের অনুকূল শাস্ত্রসকল আবৃত্তি করিলেন। প্রত্যুত্তরে নিবর্ত্তক বলিলেন---

এ সকল বচন যাহা কহিলে তাহা স্মৃতি বটে এবং এ সকল বচনের দ্বারা ইহা প্রাপ্ত হইয়াছে যে স্ত্রীলোক সহমরণ ও অনুমরণ করে তবে তাহার বহুকাল ব্যাপিয়া স্বর্গভোগ হয় কিন্তু বিধবা ধর্ম্মে মনু প্রভৃতি যাহা কহিয়াছেন তাহাতে মনোযোগ কর ॥......ইহাতে মনু এই বিধি দিয়াছেন যে পতি মরিলে ব্রহ্মচর্য্যে থাকিয়া যাবজ্জীবন কালক্ষেপ করিবেন অতএব মনুস্মৃতির বিপরীত যে সকল অঙ্গিরা প্রভৃতির স্মৃতি তুমি পড়িতেছ তাহা গ্রাহ্য হইতে পারে না যেহেতু বেদ কহিতেছেন।

যৎ কিঞ্চিন্মনুরবদত্তদ্ভেষজং ॥

যাহা কিছু মনু কহিয়াছেন তাহাই পথ্য জানিবে। এবং বৃহস্পতির বচন ॥

মন্বর্থ বিপরীতা যা সা স্মৃতির্ণ প্রশস্যতে ॥

মনুস্মৃতির বিপরীত যে স্মৃতি তাহা প্রশংসনীয় নহে। বিশেষত বেদে কহিতেছেন।

তস্মাদু হ ন পরায়ুষঃ স্বঃ কামী প্রেয়াদিতি ॥

যেহেতু জীবন থাকিলে নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে আত্মার শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনের দ্বারা ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইতে পারে অতএব স্বর্গ কামনা করিয়া পরমায়ুসত্ত্বে আয়ুর্ব্যয় করিবেক না অর্থাৎ মরিবেক না। অতএব মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি আপন আপন স্মৃতি বিধবার প্রতি ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্মই কেবল লিখিয়াছেন এই নিমিত্ত এই শ্রুতি ও মন্বাদি স্মৃতি দ্বারা তোমার পঠিত অঙ্গিরা প্রভৃতির স্মৃতি সকল বাধিত হইয়াছেন যেহেতু স্পষ্ট বিধি দেখিতেছি যে স্ত্রীলোক পতির কাল হইলে পর ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা মোক্ষ সাধন করিবেন। (গ্রন্থাবলি, ১৬৯-১৭০ পৃ.)।

"সহমরণ বিষয়" প্রথম পুস্তিকা প্রকাশিত হইবার পর 'প্রায় এক বর্ষ অতীত হইলে" ইহার এক প্রতিবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮১৯ সালে "সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সংবাদ" নাম দিয়া রামমোহন রায় এই প্রতিবাদের এক প্রত্যুত্তর প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই দ্বিতীয় পুস্তিকার যে-সকল প্রতিবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল ১৭৫১ শকাব্দায় (১৮২৯ সালে) প্রকাশিত "সহমরণ বিষয়" তৃতীয় পুস্তিকায় রামমোহন রায় তাহার উত্তর দিয়াছিলেন। সতীদাহ দমন করা উচিত কি-না এই সম্পর্কে সরকারী কাগজে বিস্তর আলোচনা থাকিলেও ১৮২৮ সাল পর্য্যন্ত সরকার কার্য্যত নিশ্চেষ্ট ছিলেন। ১৮২৮ সালের ৪ঠা জানুয়ারি তারিখের লিখিত মন্তব্যে তৎকালের গভর্ণর-জেনারেল লর্ড আমহার্ষ্ট লিখিয়াছিলেন—

"The report of our different officers do not appear to me to point out any specific course, short of absolute prohibition by which this barbarous practice could be suddenly checked or the number of victims very considerably reduced. But I think there is reason to believe and expect that, except on the occurrence of some very general sickness such as that which prevailed in the lower parts of Bengal in 1825, the progress of general instruction and the unostentatious exertions of our local officers will produce the happy effect of gradual diminution, and, at no very distant period, the final extinction of the barbarous rite of *Sati.*"

লর্ড আমহার্ষ্ট সতীদাহ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নিষেধ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না; তাঁহার ভরসা ছিল শিক্ষার বিস্তারের ফলে এবং সরকারী কর্ম্মচারিগণের আড়ম্বরশূন্য চেষ্টার ফলে অদূর ভবিষ্যতে এই প্রথা লুপ্ত হইবে। লর্ড আমহার্ষ্টের পরবর্ত্তী গভর্ণর-জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক অন্য প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার ১৮২৯ সালের ৮ই নবেম্বর তারিখের সুপ্রসিদ্ধ মন্তব্যের প্রথমাংশে তিনি লিখিয়াছেন—

"Every day's delay adds a victim to the dreadful list, which might perhaps have been prevented by a more early submission of the present question."

"এক এক দিনের বিলম্বের ফলে নারী-বলির সংখ্যা যে এক একটি করিয়া বাড়িয়া যাইতেছে, আরও পূর্ব্বে এই প্রশ্ন উত্থাপন করিলে তাহা নিবারণ করা সম্ভবপর হইত।"

বেণ্টিঙ্ক কৌন্সিলের দ্বারা ১৮২৯ সনের ১৭ কানুন বিধিবদ্ধ করিয়া সতীদাহ বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। তাহার পূর্ব্বে রামমোহন রায়ের সঙ্গেও তিনি পরামর্শ করিয়াছিলেন। উপরোক্ত মন্তব্যে রামমোহন রায়ের অভিমত সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—

I must acknowledge that a similar opinion as to the probable excitation of a deep distrust of our future intentions, was mentioned to me by that enlightened Native Rammohun Roy, a warm advocate of the abolition of *Suttee* and of all other superstitions and corruptions, engrafted on the Hindoo religion, which he considers originally to have been a pure deism. It was his opinion that the practice might be suppressed, quietly and unobservedly, by increasing the difficulties and by indirect agency of the Police. He apprehends that any public enactment would give rise to general apprehension, and the reasoning would be, "While the English were contending for power, they deemed it politic to allow universal toleration, and to respect our Religion, but having obtained the supremacy, their first act is a violation of their professions, and the next will probably be, like the Mahomedan conquerors, to force upon us their own Religion."

অর্থাৎ রামমোহন রায় সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কানুন পাস করিয়া সতীদাহ-প্রথা নিবারণের পক্ষপাতী ছিলেন না তাঁহার অভিমত ছিল, পরোক্ষভাবে নীরবে, পুলিসের সহায়তায় এই কর্ম্মের অনুষ্ঠান অসম্ভব করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। কানুন পাস করিয়া সতীদাহ-প্রথা একেবারে নিষেধ করিয়া দিলে লোকের মনে সন্দেহ হইবে, সরকার প্রজার ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিবেন না বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, এইবার তাহা ভঙ্গ করিলেন; ইহার পর এদেশের লোককে জোর করিয়া খৃষ্টান করা হইবে।

রামমোহন রায় সতীদাহ নিবারণের প্রণালী সম্বন্ধে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ককে যে পরামর্শ দিয়াছিলেন, অনেক ইংরেজ রাজপুরুষও সেই পরামর্শই দিয়াছিলেন। কিন্তু বেণ্টিঙ্ক এই পরামর্শ গ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই। সতীদাহ বিষয়ক কানুন পাস হইবার পনের দিন পরে, ১৮২৯ সালের ১৯শে ডিসেম্বর, বাংলা, বিহার এবং উড়িষ্যার বহু সহস্র হিন্দু এই কানুনের বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদ-পত্র দাখিল করিয়াছিলেন। সরকার প্রতিবাদিগণকে প্রিভি কৌন্সিলে আপীল করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন, এবং তদনুসারে তাঁহারা আপীল প্রেরণ করিয়াছিলেন। ১৮৩০ সালের ১৬ই জানুয়ারি রামমোহন রায়, কালীনাথ রায়, হরিহর দত্ত প্রমুখ ৩০০ শত হিন্দু সতীদাহ নিবারণের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইয়া লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ককে একখানি অভিনন্দন-পত্র প্রদান করিয়াছিলেন। এই সালের নবেম্বর মাসে রাজা রামমোহন রায় যখন ইংলণ্ড যাত্রা করেন তখন সতীদাহপ্রথা নিবারণের অনুকূলে ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টের বরাবরে বহু হিন্দুর স্বাক্ষরিত একখানি আবেদনপত্র সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের সমক্ষেই প্রিভি কৌন্সিল সতীদাহের অনুকূল আপীল অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য, আপীলে জয়ী হইয়া রাজা আর দেশে ফিরিয়া আসেন নাই, শত বৎসর পূর্ব্বে ব্রিষ্টলে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন।

বেণ্টিঙ্ক পূর্ব্বোক্ত মন্তব্যে প্রসিদ্ধ সংস্কৃতবিৎ হোরেস উইলসনের অভিমত সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

Mr. Wilson considers it to be a dangerous evasion of the real difficulties to attempt to prove that Suttees are not "essentially a part of the Hindoo Religion."

উইলসন মনে করেন, "সতীদাহ হিন্দুধর্ম্মের ঠিক অঙ্গ নহে" এইরূপ প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিলে প্রকৃত বাধা অতিক্রম করা হয় না, এড়ান হয় মাত্র, এইরূপ এড়ান বিপজ্জনক।

বিজ্ঞানেশ্বরের "মিতাক্ষরা" (রচনাকাল আনুমানিক ১১০০ খৃষ্টাব্দ) হইতে আরম্ভ করিয়া জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের "বিবাদভঙ্গার্ণব" (Colebrooke's *Digest* নামক বিখ্যাত ইংরেজী অনুবাদ ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত) পর্য্যন্ত স্মৃতিনিবন্ধ পাঠ করিলে সতীদাহকে শাস্ত্রবিহিত হিন্দুধর্ম্মের অঙ্গীভূত বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী মেধাতিথির মনুস্মৃতিভাষ্যে (৫।১৫৫) দেখা যায়, সহমরণ ধর্ম্ম নহে, অধর্ম্ম; এবং এ যাবৎ যত ধর্ম্মসূত্র পাওয়া গিয়াছে তন্মধ্যে বিষ্ণুস্মৃতি ভিন্ন আর কোনও সূত্রে সহমরণের ব্যবস্থা দেখা যায় না। রাজা রামমোহন রায়ের সময়ে এই সকল গ্রন্থ প্রচলিত ছিল না; তথাপি তিনি সহমরণকে প্রকৃত হিন্দুধর্ম্মের বহির্ভূত উপধর্ম্মের মধ্যে গণ্য করিয়া অসামান্য সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

সহমরণে দুই প্রকার নরমেধযজ্ঞের একত্র সমাবেশ দেখা যায়—সতীর পক্ষে আত্মবলি, এবং যে-সকল শ্মশানবন্ধু সতীকে দাহ করে, তাহাদের পক্ষে নরবলি। নরবলি এবং আত্মবলি প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ জর্ম্মণ সমাজবিজ্ঞানবিৎ লিপার্ট লিখিয়াছেন—

Uncivilized man, unused to thinking in matters not connected with the immediate care of life, is unable either to apprehend vividly the agonies of death or to sympathize with the sufferings of others. This relative callousness of the savage removes from the way of certain barbarous customs an obstacle which seems insuperable to our practical thinking. What we call "sensitiveness" in these matters is actually the result of thought. If a man lacks practice in thinking, then he also lacks this sensitiveness. The subjects and facts with which we have to deal in this entire chapter (Chapter XI—Human Sacrifice) are proof that such a sensitiveness is not innate in mankind.*

অর্থাৎ বর্ব্বর অবস্থায় জীবনধারণের জন্য উপস্থিত যাহা প্রয়োজনীয়, মানুষের তাহা ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ে চিন্তা করিবার অভ্যাস না থাকায় বর্ব্বর মানুষ সম্যকরূপে মৃত্যুযন্ত্রণা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না এবং অন্যের যাতনায় সমবেদনা অনুভব করিতে পারে না। আমাদের বিচারে নিষ্ঠুর প্রথাগুলির অনুষ্ঠানের যে-সকল বাধা অতিক্রম করা অসাধ্য আমাদের তুলনায় নির্ম্মম বর্ব্বরগণের নিকট সেরূপ বাধা উপস্থিত হয় না। এই সকল বিষয়ে আমরা যাহাকে 'বেদনানুভূতি' বলি তাহা প্রকৃতপ্রস্তাবে চিন্তার ফল। যে মানুষের চিন্তা করিবার অভ্যাস নাই, তাহার এই বেদনানুভূতি থাকে না। এই অধ্যায়ে (Chapter XI—Human Sacrifice) যে-সকল বিষয় এবং যে-সকল ঘটনা আলোচিত হইবে, তাহা সপ্রমাণ করে, যে এই বেদনানুভূতি মানুষের জন্মগত নহে (চিন্তাজনিত)।

* Julius Lippert, *The Evolution of the Culture*, English translation by G. P. Murdock, London, 1931, p. 419.

নরবলি এবং আত্মবলি সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রে যে-সকল প্রমাণ পাওয়া যায়, † তাহাও অধ্যাপক লিপার্টের সিদ্ধান্ত সমর্থন করে। এই সকল প্রমাণ হইতে দেখা যায়, চিন্তাশীলতায় সর্ব্বাগ্রগণ্য ব্রাহ্মণ জাতির মধ্যেই এই বেদনানুভূতি সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল ছিল, সকল প্রকার নরবলি এবং আত্মবলি তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। এক দিকে ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণানুগত ক্ষত্রিয়, এবং আর এক দিকে নানা প্রকার নিষ্ঠুর আচারপরায়ণ ইতর জাতিনিচয়, এই উভয়ের মধ্যে যাহাতে অত্যন্তসংসর্গ এবং শোণিতমিশ্রণ না ঘটে, এই জন্যই বোধ হয় আদৌ অস্পৃশ্যতা ও অসবর্ণ বিবাহের নিষেধ বিহিত হইয়াছিল। এই সকল বাধা সত্ত্বেও দীর্ঘকাল আচারশুদ্ধি, এমন কি শোণিতশুদ্ধি রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই; সুতরাং সহমরণের মত অনাচার ব্রাহ্মণ-সমাজেও বিস্তার-লাভের অবসর পাইয়াছিল। সেই অধঃপতনের সময় মিতাক্ষরাকার বিজ্ঞানেশ্বর মেধাতিথির প্রতিবাদ করিয়া সহমরণের শাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; এবং পরবর্ত্তী স্মৃতিনিবন্ধে বিজ্ঞানেশ্বরের কথারই প্রতিধ্বনি শুনা যায়। কি মহান্ উদ্দেশ্য লইয়া বেণ্টিঙ্ক সতীদাহ-প্রথা নিবারণ করিয়াছিলেন, তাঁহার মন্তব্যের উপসংহার ভাগের এই কথাগুলিতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়—

The first and primary object of my heart is the benefit of the Hindus. I know nothing so important to the improvement of their future condition, as the establishment of a purer morality, whatever their belief, and a more just conception of the will of God. The first step to this better understanding will be dissociation of religious belief and practice from blood and murder. They will then, when no longer under this brutalizing excitement, view with more calmness, acknowledged truths. They will see that there can be no inconsistency in the ways of Providence, that to the command received as Divine by all races of men, "No innocent blood shall be spilt," there can be no exception and when they shall have been convinced of the error of this first and most criminal of their customs, may it not be hoped, that others which stand in the way of their improvement may likewise pass away, and that thus emancipated from those chains and shackles upon their minds and actions, they may no longer continue as they have done, the slaves of every foreign conqueror, but that they may assume their just places among the great families of mankind? I disavow in these remarks or in this measure any view whatever to conversion to our own faith. I write and feel as a Legislator for the Hindoos, and as I believe many enlightened Hindoos think and feel.

শেষ পংক্তিতে বেণ্টিঙ্ক অবশ্য রাজা রামমোহন রায় এবং তাঁহার বন্ধুগণকে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছেন, "আমি বিশ্বাস করি, জ্ঞানালোকে আলোকিতচিত্ত অনেক হিন্দুও আমার মত চিন্তা করেন এবং অনুভব করেন।" বেণ্টিঙ্কের এই মন্তব্য লেখার পরে শতাধিক বৎসর গত হইয়াছে; রাজা রামমোহন রায়ের দেহত্যাগের পরে শত বৎসর গত হইয়াছে। এই শত বৎসর কাল প্রবল বেগে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার চলিয়াছে। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে সতীদাহ, গঙ্গাসাগরে পুত্রবিসর্জ্জন, ধর্ণা দিয়া (প্রায়োপবেশন করিয়া) আত্মহত্যা প্রভৃতি যে-সকল নিষ্ঠুর আচার অধঃপতিত হিন্দুর হৃদয়ের নির্ম্মমতা সূচিত করিত, সেই নির্ম্মমতা এখন সম্পূর্ণ বিদূরিত হইয়াছে কি? মনুস্মৃতিতে (৮।৪৯) বিহিত হইয়াছে, খাতকের নিকট হইতে প্রাপ্য টাকা আদায় করিবার জন্য মহাজন "আচরিত" অনুষ্ঠান করিতে করিতে পারে। মেধাতিথি লিখিয়াছেন—

"আচরিতমভোজনগৃহদ্বারোপবেশনাদি।"
অর্থাৎ, অনাহারে খাতকের দরজায় বসিয়া থাকার নাম "আচরিত"

সুতরাং ধর্ণা বলিতে এখন যা বুঝায় প্রাচীনকালে তাহাকেই "আচরিত" বলিত। কোন কোন স্মৃতিকার "প্রায়োপবেশন" "আচরিত" শব্দের প্রতিশব্দরূপে ব্যবহার করিয়াছেন। বর্ত্তমানে জেলখানায় বা অন্যত্র যে প্রায়োপবেশন অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহা খাতককে লক্ষ্য করিয়া অনুষ্ঠিত প্রাচীন তন্ত্রের "আচরিত" নহে, পাশ্চাত্য hunger-strike। আমাদের দেশের শাস্ত্রে প্রায়োপবেশনে মৃত্যুর নিন্দা দেখা যায়। বৈখানসস্মার্ত্ত-সূত্রে বিহিত হইয়াছে (৫।১১), "ব্যর্থ প্রায়োপবেশনে মৃত ব্যক্তির শব দাহ করা কর্ত্তব্য নহে।" বিষ্ণুস্মৃতিতে (২২।৪৭) অনশন করিয়া আত্মহত্যাকারীর অশৌচ গ্রহণ নিষিদ্ধ হইয়াছে।

† নরবলি এবং আত্মবলি বিষয়ক প্রস্তাবে এই সকল প্রমাণ আলোচিত হইবে। কতক প্রমাণ *Memoirs of the Archaeological Survey of India*, No. 41এ আলোচিত হইয়াছে।

আখড়াইয়ের দীঘি

শ্রী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

কয়েক বৎসর পর পর অজন্মার উপর সে বৎসর নিদারুণ অনাবৃষ্টিতে দেশটা যেন জ্বলিয়া গেল। বৈশাখের প্রারম্ভেই অন্নাভাবে দেশময় হাহাকার উঠিল। রাজসরকার পর্য্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। সত্যই দুর্ভিক্ষ হইয়াছে কি-না তদন্তের জন্য রাজকর্ম্মচারী-মহলে ছুটাছুটি পড়িয়া গেল।

এই তদন্তে কান্দী সাবডিভিসনের কয়টা থানার ভার লইয়া ঘুরিতেছিলেন রজতবাবু ডি, এস, পি, সুরেশবাবু ডেপুটি, আর রমেন্দ্রবাবু কো-অপারেটিভ ইন্সপেক্টর। অতীত কালের সুপ্রশস্ত বাদশাহী সড়কটা ভাঙিয়া-চুরিয়া গো-পথের মত মানুষের অব্যবহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। তাহার উপর ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের ঠিকাদার মাটির ঢেলা বিছাইয়া পথটিকে আরও দুর্গম করিয়া তুলিয়াছে। কোনরূপে তিন জনে এক পাশের পায়ে চলা পথরেখার উপর দিয়া বাইসিক্ল ঠেলিয়া চলিয়াছিলেন।

বৈশাখ মাসের অপরাহ্নবেলা। বিদগ্ধ আকাশখান ধূলাচ্ছন্ন ধূসর হইয়া উঠিয়াছে। কোথাও কণামাত্র মেঘের রেশ নাই। হু হু করিয়া গরম বাতাস পৃথিবীর বুকের রস পর্য্যন্ত যেন শোষণ করিয়া লইতেছিল। একখানা গ্রাম পার হইয়া সম্মুখে এক বিস্তীর্ণ প্রান্তর আসিয়া পড়িল। ও-প্রান্তের গ্রামের চিহ্ন এ-প্রান্ত হইতে দৃষ্টিতে ধরা দেয় না। দক্ষিণে বামে শস্যহীন মাঠ ধূ ধূ করিতেছে। গ্রামের চিহ্ন বহু দূরে দিগ্বলয়ে কালির ছাপের মত বোধ হইতেছিল।

রজতবাবু চলিতেছিলেন সর্ব্বাগ্রে। তিনি ডাকিয়া কহিলেন—নামছি আমি। আপনারা ঘাড়ের উপর এসে পড়বেন না যেন। তিন জনেই বাইসিক্ল হইতে নামিয়া পড়িলেন। সঙ্গীরা কোন প্রশ্ন করিবার পূর্ব্বেই তিনি বলিলেন—কই মশাই, সামনে গ্রামের চিহ্ন যে দেখা যায় না। এদিকে দিবা যে অবসানপ্রায়।

রমেন্দ্রবাবু কোমরে ঝুলান বাইনাকুলারটা চোখের উপর ধরিয়া কহিলেন—দেখা যাচ্ছে গ্রাম, কিন্তু অনেক দূরে। অন্ততঃ পাঁচ-ছ মাইল হবে। রজতবাবু রিষ্টওয়াচটার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—পৌনে ছ'টা। এখনও আধ ঘণ্টা তিন কোয়ার্টার দিনের আলো পাওয়া যাবে। কিন্তু এদিকে যে বুক মরুভূমি হয়ে উঠল মশাই। আমার ওয়াটার ব্যাগে ত এক বিন্দু জল আর নেই। আপনাদের অবস্থা কি?

রমেন্দ্রবাবু কহিলেন—আমারও তাই। সুরেশবাবু, আপনার অবস্থা কি? আপনি যে কথাও বলেন না, দৃষ্টিটাও বেশ বাস্তব জগতে আবদ্ধ নয় যেন। ব্যাপার কি বলুন ত?

সুরেশবাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন—সত্যিই বর্ত্তমান জগতে ঠিক মনটা নিবদ্ধ ছিল না। অনেক দূর অতীতের কথা ভাবছিলাম আমি।

রজতবাবু সাগ্রহে বলিয়া উঠিলেন—অতীত যখন তখন ইণ্টারেষ্টিং নিশ্চয়, চাই কি রোমাণ্টিকও হ'তে পারে। তৃষ্ণানিবারণের জন্য আর ভাবতে হবে না। উঠে পড়ুন গাড়ীতে। গাড়ীতে চলতে চলতেই আপনি গল্প বলতে সুরু করুন। আমরা শুনে যাই। কিন্তু এই চার-পাঁচ মাইল পথ কভার করবার মত গল্পের খোরাক হওয়া চাই মশায়!

সুরেশবাবু আপনার জলাধারটি খুলিয়া আগাইয়া দিয়া বলিলেন—আমার জল এখনও আছে। আপনারা জল পান ক'রে একটু সুস্থ হন আগে।

জলপানান্তে সুরেশবাবুকে সর্ব্বাগ্রে স্থান দিয়া রজতবাবু বলিলেন—আপনি কথক। আপনাকে আগে যেতে হবে।

সকলে গাড়ীতে চড়িয়া বসিলেন।

সুরেশবাবু বলিলেন—আপনাদের জলের চিন্তার কথা শুনেই কথাটা আমার মনে পড়ল।

পিছন হইতে রমেন্দ্রবাবু হাঁকিলেন—দাঁড়ান মশাই দাঁড়ান। বাঃ আমাকে বাদ দিয়ে গল্প চলবে কি রকম?...বেশ এইবার কি বলছিলেন বলুন। একটু উচ্চকণ্ঠে কিন্তু।

সুরেশবাবু বলিলেন—যে রাস্তাটায় চলেছি আমরা এ রাস্তাটার নাম জানেন? এইটেই অতীতের বিখ্যাত

বাদশাহী সড়ক। এ রাস্তায় কোন পথিক কোন দিন জলের জন্য চিন্তা করে নি। ক্রোশ-অন্তর দীঘি আর ডাক অন্তর মসজিদ এ-পথের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত নির্ম্মিত হয়েছিল। দীঘিগুলি এখনও আছে—

বাধা দিয়া রজতবাবু প্রশ্ন করিলেন—কিন্তু ডাক-অন্তর মসজিদটা কি ব্যাপার?

—ডাক-অন্তর মসজিদের অর্থ হচ্ছে এক মসজিদের আজানের শব্দ যত দূর পর্য্যন্ত যাবে তত দূর বাদ দিয়ে আর একটি মসজিদ তৈরি হয়েছিল। এক মসজিদের আজান-ধ্বনি অপর এক মসজিদ থেকে শোনা যেত। এক দিন ভাবুন—দেশ-দেশান্তরব্যাপী সুদীর্ঘ এই পথখানির এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত একসঙ্গে আজান-ধ্বনি ধ্বনিত হয়ে উঠত। ওই—ওই দেখুন পাশের ওই যে ইটের স্তূপ—ওই একটি মসজিদ ছিল। আর প্রতি ক্রোশে একটি দীঘি আছে। তাই বলছিলাম এ-রাস্তায় কেউ কখনও জলের ভাবনা ভাবে নি।

রমেন্দ্রবাবু কহিলেন—বাদশাহী সড়ক যখন তখন কোন বাদশাহের কীর্ত্তি নিশ্চয়। কিন্তু কোন্ বাদশাহের কীর্ত্তি মশাই?

—ঠিক বুঝতে পারা যায় না। ঐতিহাসিকেরা বলতে পারেন। তবে এ-বিষয়ে সুন্দর একটি কিংবদন্তী এদেশে প্রচলিত আছে। শোনা যায় না-কি কোন বাদশাহ বা নবাব দিগ্বিজয়ে গিয়ে ফেরবার মুখে এক সিদ্ধ-ফকীরের দর্শন পান। সেই ফকীর তাঁর অদৃষ্ট গণনা ক'রে বলেন, রাজধানী পৌঁছেই তুমি মারা যাবে। বাদশাহ ফকীরকে ধরলেন—এর প্রতিকার ক'রে দিতে হবে। ফকীর হেসে বললেন—প্রতিকার? মৃত্যুর গতি রোধ করা কি আমার ক্ষমতা? বাদশাহও ছাড়েন না। তখন ফকীর বললেন—তুমি এক কাজ কর, তুমি এখান থেকে এক রাজপথ তৈরি করতে করতে যাও তোমার রাজধানী পর্য্যন্ত। তার পাশে পাশে ক্রোশ-অন্তর দীঘি আর ডাক-অন্তর মসজিদ তৈরি কর।

সুরেশবাবু নীরব হইলেন। রজতবাবু ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করিয়া উঠিলেন—তারপর মশাই, তারপর?

হাসিয়া সুরেশবাবু বলিলেন—তার পর বুঝুন না কি বাদশাহ রাজধানী পৌঁছেই মারা গেলেন। কিন্তু কত দিন তিনি বাঁচলেন অনুমান করুন। এই পথ, এই সব দীঘি, এত-গুলি মসজিদ তৈরি করতে যত দিন লাগে তত দিন তিনি বেঁচেছিলেন।

রজতবাবু বলিলেন—হাম্‌বাগ—বাদশাহটি একটি ইডিয়ট ছিলেন বলতে হবে। তিনি ত পথটা শেষ না করলেই পারতেন—আজও পর্য্যন্ত তিনি বেঁচে থাকতে পারতেন।

রমেন্দ্রবাবু গাড়ী হইতে নামিবার উদ্যোগ করিয়া কহিলেন—দাঁড়ান মশাই—এ পথের ধুলো আমি খানিকটে নিয়ে যাব, আর মসজিদের একখানা ইট।

সুরেশবাবু কহিলেন—আর একটা কথা শুনে তারপর। পথ ত ফুরিয়ে যায় নি আপনার।

রজতবাবু তাগাদা দিলেন—সেটা আবার কি?

—এদেশে একটা প্রবচন আছে—সেটার সঙ্গে আপনার পরিচয় থাকা সম্ভব। পুলিস রিপোর্টে সেটা আছে—

রমেন্দ্রবাবু অসহিষ্ণু হইয়া বলিলেন—চুলোয় যাক মশাই পুলিস রিপোর্ট। কথাটা বলুন ত আপনি।

—তাড়া দেবেন না মশাই। গল্পের রস নষ্ট হবে। কথাটা হচ্ছে 'আখড়াইয়ের দীঘি'র মাটি. বাহাদুরপুরের লাঠি, কুলীর ঘাটি'। এই তিনের যোগাযোগে এখানে শত শত নরহত্যা হয়ে গেছে। রাত্রে এ-পথে পথিক চলত না ভয়ে। বাহাদুর-পুর বিখ্যাত লাঠিয়ালের বাস। কুলীর ঘাটিতে তারা রাত্রে এই পথের ওপর নরহত্যা করত। আর সেই সব মৃতদেহ গোপনে সমাহিত করত আখড়াইয়ের দীঘির গর্ভে।

রজতবাবু বলিয়া উঠিলেন ও, তাই না কি? এই সেই জায়গা!

সুরেশবাবু উত্তর দিলেন—তার কাছাকাছি এসেছি আমরা।

রজতবাবু কহিলেন—এখনও পুজোর আগে এখানে চৌকীদার রাখবার ব্যবস্থা আছে।

—আর তার দরকার নেই বোধ হয়। এখন এরা শাসন মেনে নিয়েছে।

রমেন্দ্রবাবুর গাড়ীখানি এই সময় একটা গর্ত্তে পড়িয়া লাফাইয়া উঠিয়া পড়িয়া গেল। রমেন্দ্রবাবু লাফ দিয়া কোন-রূপে আত্মরক্ষা করিলেন। সকলেই গাড়ী হইতে নামিয়া

আগাইয়া আসিলেন। গাড়ীখানা তুলিয়া রমেন্দ্রবাবু বলিলেন—যন্ত্র বিকল। এখন ইনিই আমার ঘাড়ে চেপে যাবার মতলব করেছেন। একখানা চাকা ধাক্কায় বেঁকে টাল খেয়ে গেছে। আমাদের হাতের মেরামতের বাইরে।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া উঠিতেছিল। রজতবাবু অস্পষ্ট সম্মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—এ যে মহা বিপদ হ'ল সুরেশবাবু?

—কি করা যায়?

হাসিয়া সুরেশবাবু বলিলেন পথপার্শ্বে বিশ্রাম। মালপত্র নিয়ে পেছনের গোযান না এলে ত উপায় বিশেষ দেখছি নে।

আপনাকে বিপদের হেতু ভাবিয়া রমেন্দ্রবাবু একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি তখনও গাড়ীখানা লইয়া মেরামতের চেষ্টা করিতেছিলেন। রজতবাবু কহিলেন—ঘাড়ে তুলুন মশায় বাহনকে। তবু একটা বিশ্রামের উপযুক্ত স্থান দেখে নেওয়া যাক।

বাইসিক্লে ঝুলান ব্যাগ হইতে টর্চ্চটা বাহির করিয়া সুরেশবাবু সেটার চাবি টিপিলেন। তীব্র আলোক-রেখায় সম্মুখের প্রান্তর আলোকিত হইয়া উঠিল। অদূরে একটা মাটির উঁচু স্তূপ দেখিয়া সুরেশবাবু কহিলেন—এই যে সম্মুখেই বোধ হয় আখড়াইয়ের দীঘি। চলুন ওরই বাঁধাঘাটে বসা যাবে।

রজতবাবু বলিলেন—হ্যাঁ, অতীত যুগের কত শত হতভাগ্য পথিকের প্রেতাত্মার সঙ্গে সুখদুঃখের কথাবার্ত্তা অতি উত্তমই হবে।

এতক্ষণে হাসিয়া রমেন্দ্রবাবু কথা কহিলেন—আর বাহাদুরপুরের দু-একখানা লাঠির সঙ্গে যদি সাক্ষাৎ হয় সে উত্তমের পরে অযোগ্য মধ্যম হবে না। কি বলেন?

কোমরে বাঁধা পিস্তলটায় হাত দিয়া রজতবাবু কহিলেন—তাতে রাজী আছি।

* * *

প্রকাণ্ড দীঘিটা অন্ধকারের মধ্যে ডুবিয়া আছে। শুধু আকাশের তারার প্রতিবিম্বে জলতলটুকু অনুভব করা যাইতেছিল। চারি পাড় বেড়িয়া বন্য লতাজালে আচ্ছন্ন বড় বড় গাছগুলিকে বিকট দৈত্যের মত মনে হইতেছিল। চারদিক অন্ধকারে থম থম করিতেছে। দীঘিটার দীর্ঘ দিকের মধ্যস্থলে সে আমলের প্রকাণ্ড বাঁধাঘাট। প্রথমেই সুপ্রশস্ত চত্বর। তাহারই কোল হইতে সিঁড়ি নামিয়া গিয়াছে জলগর্ভে। সিঁড়ির দুই পার্শ্বে দুইটি রাণা। একদিকের রাণা ভাঙিয়া পাশেরই একটা সুগভীর খাতের মধ্যে নামিয়া গিয়াছে।

ঘাটের চত্বরটির ঠিক মধ্যস্থলে তিন জনে আশ্রয় লইয়াছিলেন। এক পাশে সাইক্ল তিনখানা পড়িয়া আছে। ছোট একখানা সতরঞ্চি রমেন্দ্রবাবুর গাড়ীর পিছনে গুটান ছিল সেইখানা পাতিয়া রমেন্দ্রবাবু বসিয়াছিলেন। পাশেই সুরেশবাবু আকাশের দিকে চাহিয়া শুইয়া আছেন। রজতবাবু শুধু চত্বরটায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন।

সুরেশবাবু বলিলেন—সাবধানে পায়চারী করবেন রজতবাবু। অন্যমনস্কে খাদের ভেতরে গিয়ে পড়বেন না যেন। দেখেছেন ত খাদটা?

হাতের টর্চ্চটা টিপিয়া রজতবাবু বলিলেন—দেখেছি।

আলোক-ধারাটা সেই গভীর গর্ত্তে তিনি নিক্ষেপ করিলেন। সুগভীর খাদটার গর্ভদেশটা আলোকপাতে যেন হিংস্র হাসি হাসিয়া উঠিল। রজতবাবু কহিলেন—উঃ, এর মধ্যে পড়লে আর নিস্তার নেই। ভাঙা রাণাটার ইটের ওপর পড়লে হাড় চূর হয়ে যাবে।

তিনি এদিকে সরিয়া আসিয়া নিরাপদ দূরত্ব বজায় করিলেন। আলোক নিবিবার পর অন্ধকারটা যেন নিবিড়তর হইয়া উঠিল। ওদিকে পশ্চিম দিক্‌প্রান্তে মধ্যে মধ্যে বিদ্যুদ্দীপ্তি চকিত হইয়া উঠিতেছিল। সুরেশবাবু নীরবতা ভঙ্গ করিয়া কহিলেন—কে কি ভাবছেন বলুন ত?

রমেন্দ্রবাবু বাধা দিয়া বলিলেন—ওদিকে কি যেন একটা ঘুরে বেড়াচ্ছে ব'লে বোধ হচ্ছে। কি বলুন ত?

সঙ্গে সঙ্গে দুইটা টর্চ্চের শিখা দীঘির বুক উজ্জ্বল করিয়া তুলিল। রজতবাবু কহিলেন—কই?

রমেন্দ্রবাবু কহিলেন—ওপাড়ে ঠিক জলের ধারে। লম্বা মত—মানুষের মত কি ঘুরে বেড়াচ্ছিল বোধ হ'ল।

সুরেশবাবু হাসিয়া বলিলেন—দীঘির গর্ভের কোন অশান্ত প্রেতাত্মা হয়ত। কিংবা বাহাদুরপুরের লাঠিয়াল কেউ।

রজতবাবু কহিলেন—সে হ'লে ত মন্দ হয় না, একটা য়্যাডভেঞ্চার হয়, সময় কাটে। কিন্তু তার চেয়েও ভয়ঙ্কর

কিছু হলেই যে বিপদ। যাদের সঙ্গে কথা চলে না মশাই—সাপ বা জানোয়ার। ওটা কি ?

সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বাঁ-হাতের টর্চ্চটা জলিয়া উঠিল। ডান হাত তখন পিস্তলের গোড়ায়। সচকিত আলোয় দেখা গেল সেটা একগাছা ছিন্ন দড়ি।

সুরেশবাবু বলিলেন—গুড্ লাক্!—রজ্জুতে সর্পভ্রমে লজ্জা আছে, বিপদ নেই। কিন্তু সর্পে রজ্জুভ্রম প্রাণান্তকর।

সকলেই হাসিলেন। কিন্তু সে হাসি মৃদুমন্থর। আনন্দ যেন জমাট বাঁধিতেছিল না।

আবার সকলেই নীরব।

অকস্মাৎ দীঘির ওদিকের কোণে জল আলোড়িত হইয়া উঠিল। শব্দে মনে হয় কেহ যেন জল ভাঙিয়া চলিয়াছে। টর্চ্চের আলো অত দূর পর্য্যন্ত যায় না। আলোক-ধারার প্রান্তমুখে অন্ধকার সুনিবিড় হইয়া উঠে, কিছু দেখা গেল না।

রমেন্দ্রবাবু কহিলেন—এখনও বলবেন আমার ভ্রম!

সুরেশবাবু কথার উত্তর দিলেন না। তিনি নিবিষ্টচিত্তে শব্দটা লক্ষ্য করিতেছিলেন। শব্দটা নীরব হইয়া গেল।

সুরেশবাবু আরও কিছুক্ষণ পর বলিলেন—ভ্রমই বোধ হয়। জলচর কোন জীবজন্তু হবে।

গরম বাতাসের প্রবাহটা ধীরে ধীরে বন্ধ হইয়া চারিদিক একটা অশান্তিকর নিস্তব্ধতায় ভরিয়া উঠিয়াছে।

সুরেশবাবু আবার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিয়া উঠিলেন—নাঃ, শুদ্ধ রমেন্দ্রবাবুকে দোষ কেন—আমরা সকলেই ভয় পেয়েছি। সিগারেট খাওয়া পর্য্যন্ত ভুলে গেছি মশাই। নিন্, একটা ক'রে সিগারেট খাওয়া যাক।

রজতবাবু বলিলেন—না মশাই, একেই আমি ওতে অভ্যস্ত নই, তার ওপর খালি পেটে শুক্‌নো গলায় সহ্য হবে না, থাক।

—আসুন তবে রমেনবাবু—আমরা দু-জনেই...ও কি ?

মানুষের মৃদু কণ্ঠস্বরে তিন জনেই চকিত হইয়া উঠিলেন।

কে যেন আত্মগত ভাবেই মৃদুস্বরে বলিতেছিল—তারা, তারাচরণ! এইখানেই ত ছিল। কোথা গেল ?

রজতবাবুর হাতের টর্চ্চটা প্রদীপ্ত রশ্মিরেখায় জলিয়া উঠিল।

রমেন্দ্রবাবু রুদ্ধ স্বরে বলিলেন—এদিকে, এদিকে, ভাঙা রাণাটার পাশে জলের ধারে। ওই, ওই। কিন্তু দপ্ দপ্ ক'রে জলছে কি ? চোখ কি ?—ওই—ওই—

দীর্ঘ রশ্মিধারা ঘুরিল। সঙ্গে সঙ্গে সুরেশবাবুর টর্চ্চটাও প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। জলের ধারেই দীর্ঘাকৃতি মনুষ্যমূর্ত্তি দাঁড়াইয়া ছিল। আলোকচ্ছটার আঘাতে চকিত হইয়া সে রশ্মির উৎস লক্ষ্যে মুখ ফিরাইল। রমেন্দ্রবাবু অস্ফুট চীৎকার করিয়া পড়িয়া গেলেন। সুরেশবাবুর হাতের টর্চ্চটা নিবিয়া গিয়াছিল। অদ্ভুত—অতি ভীতিপ্রদ সে মূর্ত্তি।

দীর্ঘ বিবর্ণ চুল, দীর্ঘ দাড়ি গোঁফে সমস্ত মুখখানা আচ্ছন্ন। অস্বাভাবিক দীর্ঘ কৃষ্ণবর্ণ দেহখানা কর্দ্দমলিপ্ত। কোটরগত জলন্ত চোখ দুইটিতে আলো পড়িয়া ঝক ঝক করিতেছিল। সে মূর্ত্তি ধরণীর সজীবতার সর্ব্বমাধুর্য্যবর্জ্জিত মাটির জগতের বলিয়া বোধ হয় না।

রজতবাবুও স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তবু তিনি কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া প্রশ্ন করিলেন—কে ? কে তুমি ? উত্তর দাও! কে তুমি ? নিথর নিস্তব্ধ মূর্ত্তির মুখের পেশীগুলি ঈষৎ চঞ্চল হইয়া উঠিল, একটা অদ্ভুত ভঙ্গীতে অধররেখা ভিন্ন হইয়া গেল। সে ভঙ্গিমা যেমন হিংস্র তেমনি ভয়ঙ্কর।

রজতবাবু আকাশ লক্ষ্যে পিস্তলটার ঘোড়া টিপিলেন। সুগভীর গর্জ্জনে নিবিড় অন্ধকার চমকিয়া উঠিল। বৃক্ষ-নীড়াশ্রয়ী পাখীর দল কলরব করিয়া উঠিল।

সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত আর একটা গর্জ্জনে চারিদিক কাঁপিয়া উঠিল। একটা বিকট হিংস্র গর্জ্জন করিয়া সে বিকট মূর্ত্তি লাফ দিয়া ছুটিয়া আসিল। সে মূর্ত্তি তখন জানোয়ারের চেয়েও হিংস্র—উন্মত্ত। রজতবাবুর বাঁ-হাতের টর্চ্চটা হাত হইতে পড়িয়া গেল। ডান হাতে পিস্তলটা কাঁপিতেছিল। অন্ধকারের মধ্যে গুরুভার কিছু পতনের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আহত পশুর মত একটা আর্ত্তনাদ ধ্বনিয়া উঠিল।

রজতবাবু কহিলেন—সুরেশবাবু, শিগ্ গির টর্চ্চটা জালুন। আমারটা কোথায় পড়ে গেছে।

সুরেশবাবুর হাতের আলোটা জলিয়া উঠিল।

রজতবাবু কহিলেন,—এখানে আসুন—খাদের মধ্যে।

খাদের মধ্যে আলোকপাত করিতেই রজতবাবু বলিলেন—মানুষই। কিন্তু মরে গেছে বোধ হয়। ঘাড় নীচু ক'রে পড়েছে! ঘাড় ভেঙে গেছে।

সুরেশবাবু ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন—ভগ্ন ইষ্টক-স্তূপের মধ্যে হতভাগ্যের মাথাটা অর্দ্ধ-প্রোথিত হইয়া গিয়াছে। যন্ত্রণার আক্ষেপে উর্দ্ধমুখে সমগ্র দেহখানা কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। উপর হইতে রমেন্দ্রবাবু সভয়ে কাহাকে প্রশ্ন করিলেন—কে? ও কি? কিসের শব্দ?

ক্ষণিক মনোযোগ সহকারে শুনিয়া সুরেশবাবু কহিলেন—গাড়ী। গরুর গাড়ীর শব্দ।

* * *

গন্তব্য থানায় পৌছিতে বাজিয়া গেল বারোটা।

তিনটি বন্ধুতেই নীরব। একটা বিষণ্ণ আচ্ছন্নতার মধ্যে যেন চলাফেরা করিতেছিলেন। শবদেহটা গাড়ীতে বোঝাই হইয়া আসিয়াছে।

সেটা নামান হইলে রঞ্জতবাবু সাব ইন্সপেক্টরকে বলিলেন লোকটাকে এখানকার কেউ চিন্‌তে পারে কি-না দেখুন ত।

মুখাবরণ মুক্ত করিয়া দারোগা চমকিয়া উঠিলেন। রঞ্জতবাবু প্রশ্ন করিলেন—চেনেন আপনি?

—না। কিন্তু এ কি মানুষ?

জমাদার পাশে দাঁড়াইয়াছিল, সে কহিল—আমি চিনি স্যর। এ একজন দ্বীপান্তরের আসামী। আজ দিন-দশেক খালাস হয়ে বাড়ি এসেছে। সেদিন এসেছিল থানায় হাজিরা দিতে। বাহাদুরপুরের লোক, নাম কালী বাগ্দী।

—বেশ। তা হ'লে রিপোর্ট লেখ। একটা গামছায় বাঁধা কোমরে ওর কি কতকগুলো ছিল—দেখ ত সেগুলো কি?

অনুসন্ধানে বাহির হইল একখানা কাপড়, ছোট ঘটী একটা, কয়খানি কাগজ। কাগজগুলি একটা মোকর্দ্দমার নথি ও রায়। নথিগুলিতে বহরমপুর জেলের ছাপ মারা—জেল-গেটে জমা ছিল। সঙ্গে একখানি চিঠি, হাইকোর্টের কোন উকীলের লেখা—এরূপভাবে দণ্ডাদেশের গুরুত্ব বৃদ্ধির জন্য আপীল করা অস্বাভাবিক ও আমাদের ব্যবসায়ের পক্ষে ক্ষতিজনক। সেইজন্য ফেরত পাঠান হইল।

রঞ্জতবাবু নথিটা পড়িয়া গেলেন—

সেসন্স কোর্টের নথি। ১৯০৮ সালের ৫নং খুনী মামলার ইতিহাস। সম্রাট বাদী—আসামী কালীচরণ বাগ্দী।

অভিযোগ: আসামী তাহার পুত্র তারাচরণ বাগ্দীকে হত্যা করিয়াছে। সাক্ষী তিন জন।

প্রথম সাক্ষী মোবারক মোল্লা। এই ব্যক্তি বাহাদুরপুরের নান্‌কারদার, অবস্থাপন্ন ব্যক্তি। এই ব্যক্তিকে সরকার পক্ষের উকীল প্রশ্ন করেন—

—কালীচরণ বাগ্দীকে আপনি চেনেন?

উত্তর—হ্যাঁ। এই আসামী সেই লোক।

—কি প্রকৃতির লোক কালীচরণ?

—দুর্দ্ধর্ষ লাঠিয়াল।

—আপনার সঙ্গে কি কালী চরণের কোন ঝগড়া আছে?

—না। সে আমার ওস্তাদ। আমি তার কাছে লাঠিখেলা শিখেছি।

তারাচরণ বাগ্দীকে আপনি জানতেন?

হ্যাঁ। ওস্তাদ কালীচরণেরই ছেলে সে।

—আচ্ছা, এটা কি ঠিক যে, কালীচরণ তারাচরণকে ভাল দেখতে পারত না?

—না। তবে ছেলেবেলায় তারাচরণ খুব রুগ্ন দুর্ব্বল ছিল ব'লে ওস্তাদের ছেলেতে মন উঠত না। বলত, বেটাছেলে যদি বেটাছেলের মত না হয়, তবে সে-ছেলে নিয়ে করব কি?

—তারপর, বরাবরই ত সেই রকম ভাব ছিল?

—না। তারাচরণ বারো-তের বছর বয়স থেকে সেরে উঠে জোয়ান হ'তে আরম্ভ হলে ওস্তাদের চোখের মণি হয়ে উঠেছিল সে।

—কালীচরণ কি তারাচরণকে আখড়ায় মারত না?

—হ্যাঁ, ভুল করলে ওস্তাদের হাতে কারও রেহাই ছিল না, নিজের ছেলে বলে দাবির ওপর—

—থাক ওকথা। আচ্ছা আপনি কি জানেন কুমীর ঘাটিতে রাত্রে পথিক খুন হয়?

—জানি। শুনেছি বহুকাল থেকে—বোধ হয় একশো বছর ধরে এ কাণ্ড ঘটে আসছে।

—কারা এসব করে জানেন?

—না।

—শুনেন নি?

—বহু জনের নাম শুনেছি।

—আপনাদের গ্রামের বাগ্দীদের নাম—এই কালীচরণ, তার পূর্ব্বপুরুষ—এদের নাম জানেন কি?

—শুনেছি।

সরকারপক্ষের উকীলের আর কোন জিজ্ঞাস্য নাই।

আসামীপক্ষের উকীল সাক্ষীকে জেরা করিতে ইচ্ছা করেন না।

দ্বিতীয় সাক্ষী এলোকেশী বাগ্দিনী। মৃত তারাচরণ বাগ্দীর স্ত্রী। বয়স আঠারো বৎসর।

প্রশ্ন—এই আসামী কালীচরণ তোমার শ্বশুর?

—হ্যাঁ।

—আচ্ছা বাপু, তোমার স্বামীর সঙ্গে কি তোমার শ্বশুরের ঝগড়া ছিল?

—না।

—কখনও ঝগড়া হ'ত না?

—ঝগড়া হ'ত বইকি। কতদিন টাকাপয়সা নিয়ে ঝগড়া হ'ত। কিন্তু তাকে ঝগড়া থাকা বলে না।

—কিসের টাকাপয়সা নিয়ে ঝগড়া?

—খুনের, ডাকাতির। আমার শ্বশুর—আমার স্বামী মানুষ মারত। ডাকাতিও করত।

—কেমন ক'রে জানলে তুমি?

—বাড়িতে শাশুড়ীর কাছে শুনেছি, আমার স্বামীর কাছে শুনেছি, এদের বাপবেটার কথায়-বার্ত্তায় বুঝেছি। আর কতদিন রক্তমাখা টাকা গয়না জলে ধুয়ে পরিষ্কার করেছি।

—তোমার স্বামী তারাচরণকে কে খুন করেছে জান?

—জানি। আমার শ্বশুর খুন করেছে। আমি নিজে চোখে দেখেছি।

বিচারক প্রশ্ন করেন—তুমি নিজের চোখে খুন করা দেখেছ?

—হ্যাঁ হুজুর, সমস্ত দেখেছি।

বিচারক আদেশ করেন—কি দেখেছ তুমি, আগাগোড়া বল দেখি।

সরকারপক্ষের উকীলকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা বন্ধ করিতে আদেশ দেওয়া হইল। সাক্ষীর উক্তি:—

হুজুর, শ্রাবণ মাসের প্রথমেই আমি বাপের বাড়ি গিয়েছিলাম। শ্রাবণের সাতাশে আমার ছোট বোনের বিয়ে ছিল। আমার স্বামী পঁচিশে তারিখে সেই বিয়ের নিমন্ত্রণে এখানে আমার বাপের বাড়িতে আসে। আরও অনেক কুটুম্বসজ্জন এসেছিল। জাত বাগ্দী আমরা হুজুর, সকলেই আমাদের লাঠিয়াল। আর ছোট জাতের আমোদে আহ্লাদে মদই হ'ল হুজুর প্রধান জিনিষ। বড় বড় জোয়ান সব দিবারাত্রি মদ খেয়েছে আর ঘাটি-খেলা খেলেছে।

বিচারক প্রশ্ন করেন—ঘাটি-খেলা কি?

—হুজুর ডাকাতি করতে গিয়ে যেমন ভাবে লাঠি খেলে, গেরস্তের ঘর চড়াও ক'রে বাইরের লোককে আটকে রাখে, সেই খেলার নাম ঘাটিখেলা। সেই খেলা খেলতে খেলতে আমার স্বামীর সঙ্গে আমার দাদার ঝগড়া হয়। তিন তিন বার আমার স্বামী আমার দাদার ঘাটি ভেঙে দিয়ে বলেছিল—এ ছেলেখেলা ভাল লাগে না বাপু, যদি মরদ তোদের কেউ থাকে, তবে নিয়ে আয়। সেই নিয়ে ঝগড়া। মনের রাগে দাদা রাত্রে খাবার সময় আমার স্বামীর কুলের খোঁটা তুলে অপমান করে। আমার ননদ নীচ জাতের সঙ্গে বেরিয়ে চলে গিয়েছিল—সেই নিয়ে কুলের খোঁটা। স্বামী আমার তখনই উঠে পড়ে সেখান থেকে চলে আসে। আমার সঙ্গে দেখা পর্য্যন্ত করেনি হুজুর তাহ'লে তাকে আমি সেই অন্ধকার বাদল রাতে বেরুতে দিতাম না। আমি যখন খবর পেলাম তখন সে বেরিয়ে চলে গেছে। আমিও আর থাকতে পারলাম না—থাকতে ইচ্ছাও হ'ল না। যে মরদ স্বামীর জন্যে আমার সমবয়সীরা আমাকে হিংসে করত তার অপমান আমার সহ্য হ'ল না। আর আমাকে সে যেমন ভালবাসত—

সাক্ষী এই স্থলে কাঁদিয়া ফেলে। কিছুক্ষণ পর আত্মসম্বরণ করিয়া আবার বলিল—অন্ধকার বাদল রাত্রি সেদিন—কোলের মানুষ নজর হয় না এমনি অন্ধকার। পিছল পথে বার-বার পা পিছলে পড়ে যাচ্ছিলাম। গ্রামের বাইরে এসে আমি চীৎকার ক'রে ডাকলাম—ওগো ওগো! ঝিপ্ ঝিপ্ ক'রে বৃষ্টির শব্দে আর বাতাসের গোঙানীতে সে শব্দ সে বোধ হয় শুনতে পায় নাই। শুনলে সে দাঁড়াত—নিশ্চয় দাঁড়াত হুজুর। তবে আমি তার গলা শুনতে পাচ্ছিলাম। বাতাসটা সামনে থেকে বইছিল। সে গান করতে করতে যাচ্ছিল, বাতাসে সে-গান পিছু দিকে বেশ ভেসে আসছিল।

সাক্ষী আবার নীরব হইল।

কিছুক্ষণ পর সে আবার আরম্ভ করিল—

আমি প্রাণপণে যাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু পিছল পথে তাড়াতাড়ি চলবার উপায় ছিল না। সামনে থেকে জলের ফোঁটা কাঁটার মত মুখেচোখে বিঁধছিল। হঠাৎ একটা চীৎকার শব্দ কানে এসে পৌঁছুল—বাবা, বাবা! শেষটা আর শুনতে পেলাম না। চিনতে পারলাম যে আমার স্বামীর গলা, ছুটে এগিয়ে যেতে গিয়ে পথে পড়ে গেলাম। উঠে একটু দূর এগিয়ে যেতেই দেখি একজোড়া আঙরার মত চোখ ধক্ ধক্ ক'রে জ্বলছে। এই চোখ দেখে চিনলাম সে আমার শ্বশুর। আমার শ্বশুরের চোখের তারা বেরালের চোখের মত খয়রা রঙের, সে চোখ আঁধারে জ্বলে। অন্ধকারের মধ্যে চলে চলে চোখে তখন অন্ধকার সয়ে গিয়েছিল, আমি তখন দেখতেও পাচ্ছিলাম। দেখলাম আমার শ্বশুর একটা মানুষকে কাঁধে ফেলে আখড়াইয়ের দীঘির পাড় দিয়ে নেমে গেল। বুক ফেটে কান্না এল—কিন্তু কাঁদতে পারলাম না। গলা যেন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, চোখে যেন আগুন জ্বলছিল। আমিও তার পিছন নিলাম।

সাক্ষীকে বাধা দিয়া বিচারক প্রশ্ন করিলেন—তোমার ভয় হ'ল না?

সাক্ষী উত্তর দিল—হুজুর, আমরা বাগ্দীর মেয়ে। আমাদের মরদে খুন করে, আমরা লাস গায়েব করি। হুজুর, আমার হাতে যদি তখন কিছু থাকত তবে ঐ খুনেকে ছাড়তাম না।

সাক্ষী অকস্মাৎ উত্তেজিত হইয়া কাঠগড়া হইতে বাহির হইয়া পড়িয়া আসামীকে আক্রমণের চেষ্টা করে। তাহাকে ধরিয়া ফেলা হয় ও তাহার উত্তেজিত অবস্থা দেখিয়া সেদিনকার মত বিচার স্থগিত রাখিতে আদেশ দেওয়া হয়। সাক্ষী কিন্তু বলে যে সে বলিতে সক্ষম এবং আর সে এরূপ আচরণ করিবে না।

সে কহিল—তারপর দীঘির গর্ভে দেহটাও পুঁতে দিলে সে আমি দেখলাম। তখন পশ্চিম আকাশে কাস্তের মত এক ফালি চাঁদ মেঘের আড়ালে উঠছিল। অন্ধকার অনেকটা পরিষ্কার হয়ে এসেছে। সেই আলোতে পরিষ্কার চিনতে পারলাম খুনী আমার শ্বশুর। সে বাড়ির দিকে হন হন ক'রে চলে গেল। আমি পিছু ছাড়ি নাই। বাড়িতে এসে লাফ দিয়ে পাঁচিল ডিঙিয়ে সে বাড়ি ঢুকল। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। অল্পক্ষণ পরেই কে বুক ফাটিয়ে কেঁদে উঠল। চিনলাম সে আমার শাশুড়ীর গলা, কিন্তু একবার কেঁদেই চুপ হয়ে গেল—

এই সময় আসামী বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল—আমি তার মুখ চেপে ধরেছিলাম। হুজুর, আর সাক্ষী-সাবুদে দরকার নাই। আমি কবুল খাচ্ছি। আমিই আমার ছেলেকে খুন করেছি। হুকুম পেলে আমি সব বলে যাই।

বিচারক এরূপ ক্ষেত্রে বিবেচনা করিয়া আসামীকে স্বীকারোক্তি করিবার আদেশ দিলেন।

আসামী বলিয়া গেল—হুজুর, আমরা জাতে বাগ্দী, আমরা এককালে নবাবের পল্টনে কাজ করতাম। আজও আমাদের কুলের গরব লাঠীর খায়ে, বুকের ছাতিতে। কোম্পানীর আমলে আমাদের পল্টনের কাজ যখন গেল তখন থেকে আমাদের এই ব্যবসা। হুজুর, চাষ আমাদের ঘেন্নার কাজ; মাটির সঙ্গে কারবার করলে মানুষ মাটির মতই হয়ে যায়। মাটি হ'ল মেয়ের জাত। জমিদার বড়লোকের বাড়িতে এককালে আমাদের আশ্রয় হ'ত। কিন্তু কোম্পানীর রাজত্বে থানা-পুলিসের জবরদস্তিতে তারাও সব একে একে গেল। যারা টিকে থাকল তারা শিং ভেঙে ভেড়া ভালমানুষ হয়ে বেঁচে রইল। তাদের ঘরে চাকরি করতে গেলে এখন নীচকাজ করতে হয়, গাড়ু বইতে হয়, মোট মাথায় করতে হয়, জুতো ঘুরিয়ে দিতেও হয় হুজুর। তাই আমরা এই পথ ধরি। আজ চার পুরুষ ধ'রে আমরা এই ব্যবসা চালিয়ে এসেছি। জমিদারের লগ্দীগিরি লোক-দেখান পেশা ছিল আমাদের। রাত্রির পর রাত্রি চামড়ার মত পুরু অন্ধকারে গা ঢেকে কুলীর ঘাটিতে ওৎ-পেতে বসে থেকেছি। মদের নেশায় মাথার ভেতরে আগুন ছুটত। সে নেশা ঝিমিয়ে আসতে পেত না। পাশেই থাকত মদের ভাঁড়। সেই ভাঁড়ে চুমুক দিতাম। অন্ধকারের মধ্যে পথিক দেখতে পেলে বাঘের মত লাফ দিয়ে উঠতাম। হাতে থাকত 'ফাব্ড়া'—শক্ত বাঁশের দু-হাত লম্বা লাঠি, সেই লাঠি ছুঁড়তাম মাটির কোল ঘেঁষে। সাপের মত গোঙাতে গোঙাতে সে লাঠি ছুটে গিয়ে পথিকের পায়ে লাগলে আর তার নিস্তার ছিল না। তাকে পড়তেই হ'ত। তারপর একখানা বড় লাঠি তার ঘাড়ের ওপর দিয়ে চেপে দাঁড়াতাম, আর পা দুটো ধরে দেহটা উল্টে দিলেই ঘাড়টা ভেঙে যেত।

এই সময় একজন জুরী অজ্ঞান হইয়া পড়ায় আদালত সেদিনকার মত বিচার বন্ধ রাখিতে আদেশ দিলেন।

পরদিন বিচারক ও জুরীগণ আসন গ্রহণ করিলে আসামীকে তাহার বক্তব্য বলিতে আদেশ দেওয়া হইল। আসামী বলিতে আরম্ভ করিল—

কত মানুষ যে খুন করেছি তার হিসেব আমার নেই। সে-সময় কোন কথা কানে আসে না হুজুর। তাদের কাতরাণি যদি সব কানে আসত, মনে থাকত হুজুর, তা'হ'লে সত্যি পাথর হয়ে যেতাম। মনে পড়ে শুধু দুটি মানুষের কথা। যেদিন আমার বাপের কাছে আমি হাতেখড়ি নি, আর আমি আমার ছেলে তারাচরণকে যেদিন হাতেখড়ি দিই, এই দু-দিনের কথা মনে আছে। সরল বাঁশের কোঁড়ার মত দীঘল কাঁচা জোয়ান তখন তারাচরণ। অন্ধকার রাত্রে শিকারের গলায় দাঁড়িয়ে বললাম—দে পা-দুটো ধ'রে ধড়টা ঘুরিয়ে দে। সে থর থর ক'রে কেঁপে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। আমিই শিকার শেষ করলাম, কিন্তু মনটা কেমন সেদিন হিম হয়ে গেল। মনে পড়ে গেল প্রথম দিন আমিও এমনি ক'রে কেঁপেছিলাম। তারপর হুজুর, অভ্যেসে সব হয়—ক্রমে ক্রমে তারা আমার হয়ে উঠল গুলিবাঘ। পালকের মত পাতলা পা—পাথরের মত শক্ত ছাতি—শিকার পথের ওপর পড়লে আমি যেতে-না-যেতে সে গিয়ে কাজ শেষ করে রাখত। ঘটনার দিন হুজুর—

আসামী নীরব হইল। সে পানীয় জল প্রার্থনা করিল। জল পান করিয়া সে কহিল—সেদিনের সে ভুল তারাচরণের, আমার ভুল নয়। তবে সে আমার ভাগ্যের দোষ। আর নয় ত যাদের খুন করেছি তাদের অভিসম্পাতের ফল। তবে এ যে হবে এ আমি জানতাম—আমার বাবা বলেছিল—আমাদের বংশ থাকবে না—নির্ব্বংশ হ'তেই হবে।

আবার আসামী নীরব হইল। আসামী কাতর হইয়া পড়িয়াছে বিবেচনা করিয়া আদালত কিছুক্ষণ সময় দিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু আসামী তাহা চাহে না। সে কহিল—আর শেষ হয়েছে হুজুর। তবে আর একটু জল। পুনরায় জলপান করিয়া সে বলিয়া গেল—

সেদিন তারার আসবার কথা নয়। কুটুম্ববাড়িতে বিয়ের নিমন্ত্রণে গিয়ে বিয়ের রাত্রেই সে চলে আসবে, এ ধারণা আমি করতে পারি নাই হুজুর। সেদিন অন্ধকার রাত্রি। ঝিপ ঝিপ ক'রে বাদলও নেমেছিল। আমার বৌমার কাছে শুনেছেন আমার চোখ অন্ধকারে বেরালের মত জ্বলে। আমার চোখেও আমি সেদিন ভাল দেখতে পাচ্ছিলাম না। সর্ব্বাঙ্গ ভিজে হিম হয়ে যাচ্ছিল। ঘন ঘন আমি মদের ভাঁড়ে চুমুক দিচ্ছিলাম। দু-পহর রাত পর্য্যন্ত শিকার না পেয়ে বিরক্ত হয়ে উঠে আসছি—এমন সময় কার গানের খুব ঠাণ্ডা আওয়াজ শুনতে পেলাম। বাতাস বইছিল আমার দিক থেকে আওয়াজটা বাতাস ঠেলে উজানে ঠিক আসছিল না। সেদিন হাতে পয়সাকড়ি কিছু ছিল না। মানুষের সাড়া পেয়ে মদের ভাঁড়ে চুমুক মেরে অভ্যেস-মত লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। অন্ধকারে চলন্ত মানুষ নড়ছিল, মারলাম ফাবড়া। লাস পড়ল। সে কি চীৎকার ক'রে বললে কানে এল না। ছুটে গিয়ে গলায় লাঠি দিয়ে উঠে দাঁড়াব—শুনলাম—বাবা—বাবা—আমি—

কথাটা কানেই এল, কিন্তু মনে গেল না, তার গলা আমি চিনতে পারলাম না। লাঠির ওপরে দাঁড়িয়ে বললাম এ-সময়ে বাবা সবাই বলে।

আসামী নীরব হইল। আবার সে বলিল—পেয়েছিলাম আনা-ছয়েক পয়সা—আর তার কাপড়খানা।

আবার সে নীরব হইল। কিন্তু মিনিটখানেকের মধ্যেই সে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল।

*　*　*

রায়ে বিচারক দণ্ডাদেশের পূর্ব্বে লিখিয়াছেন—যুগ-যুগান্তরের সাধনায় মানুষ ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিয়া ন্যায়-অন্যায়ের সীমারেখার নির্দ্দেশ করিয়াছে। তাঁহারই নামে সৃষ্টি ও সমাজের কল্যাণে অন্যায় ও পাপের রোধ হেতু দণ্ডবিধির সৃষ্টি হইয়াছে। ঈশ্বরের প্রতিভূ-স্বরূপ বিচারক সেই বিধি অনুসারে অন্যায়ের শাস্তিবিধান করিয়া থাকেন। এই ব্যক্তির যে অপরাধ, বর্ত্তমান রাষ্ট্রতন্ত্রের দণ্ডবিধিতে তাহার যোগ্য শাস্তি নাই। এক্ষেত্রে একমাত্র চরমদণ্ডই বিধি। আমার স্থির বিশ্বাস, সেই জন্যই সমগ্র বিশ্বের অদৃশ্য পরিচালক তাহার দণ্ডবিধান স্বয়ং করিয়াছেন। চরমদণ্ড এক্ষেত্রে সে গুরুদণ্ডকে লঘু করিয়া দিবে। ঈশ্বরের নামে বিচারকের আসনে বসিয়া তাঁহার অমোঘ বিধানকে লঙ্ঘন করিতে পারিলাম না। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-বাস ইহার শাস্তি বিহিত হইল।

* * *

রায় শেষ হইয়া গেল।

তিন জনেই নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিলেন। মনের বিচিত্র চিন্তাধারার পরিচয় বোধ হয় প্রকাশ করিবার শক্তি কাহারও ছিল না।

অকস্মাৎ রমেন্দ্রবাবু কহিলেন—একটা কথা বলব সুরেশ বাবু?

মৃদুস্বরে সুরেশবাবু বলিলেন—বলুন।

—পুলিস একজিকিউটিভ আপনারা দু-জনেই ত এখানে রয়েছেন। ওর দেহটা আর মর্গে পাঠাবেন না। ওই আখড়াইয়ের দীঘির গর্ভেই ওকে শুয়ে থাকতে দিন।

ভারতে মুদ্রানীতি

শ্রীঅনাথগোপাল সেন

কোন দেশের আর্থিক উন্নতির সহিত সেই দেশের মুদ্রা-সম্পর্কীয় নীতির অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে, এ কথা ভুলিলে আমাদের বর্ত্তমান যুগে চলিবে না। অথচ ইহা বলা বোধ হয় মোটেই অত্যুক্তি হইবে না যে এ সম্পর্কে আমাদের অত্যন্ত জ্ঞানাভাব। আমাদের বিদ্বজ্জন-সমাজে আজও এমন লোকের অসদ্ভাব নাই যাঁহারা মনে করেন এবং অসন্দিগ্ধ চিত্তে বলিয়াও থাকেন, "গভর্ণমেণ্টের আর ভাবনা কি, টাকা তৈরি করিবার জন্য টাকশাল রহিয়াছে, যখন যত খুশী টাকা ও নোট প্রস্তুত করিয়া লইলেই হইল।" রহস্য এই যে, শ্রোতাদের মধ্যেও এ-সব বিষয়ে অনেকের ধারণা অনেকটা পরকালতত্ত্বের ন্যায়ই অস্পষ্ট হওয়ায়, তাঁহাদের পক্ষেও নীরব গাম্ভীর্য্যের সহিত এ-সব বিজ্ঞজনোচিত উক্তি মানিয়া লওয়া ভিন্ন গত্যন্তর থাকে না। কিন্তু বিষয়টি মোটেই হাস্যরসাত্মক নহে, পরন্তু ইহা যেমনি জটিল তেমনি আমাদের পক্ষে মারাত্মক; কারণ আমাদের ব্যবসাবাণিজ্য, অন্নবস্ত্র,- এক কথায়, আমাদের জীবন-মরণের অনেকখানি ইহার হাতে। বৃটিশ-শাসনে "শান্তি ও শৃঙ্খলা" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; আমাদের ধনরত্ন চোর-ডাকাত-ঠগের হাত হইতে অনেকটা নিরাপদ হইয়াছে; সিপাই-শান্ত্রী, আইন-আদালত, জজ-কঁউসিলি সকলে মিলিয়া ধর্ম্মরাজের চতুর্দ্দোল সগৌরবে বহন করিতেছে—এ সবই সত্য এবং এ-সব কথা আজকাল আমাদের স্কুলের ছোট ছোট বালকেরাও জানে। কিন্তু যাহা আজিকার দিনে আমাদিগকে ভাল করিয়া বুঝিতে ও শিখিতে হইবে তাহা হইতেছে এই যে, বর্ত্তমান যুগে শান্তি ও শৃঙ্খলার মধ্যেও নিপুণ অদৃশ্য হস্তে পরস্বাপহরণ চলিয়াছে এবং এক জাতি অপর জাতির দৌলতে ফাঁপিয়া উঠিতেছে। ইহারই নাম scientific exploitation বা বৈজ্ঞানিক পন্থায় অর্থমোক্ষণ। এইরূপ নীরব প্রক্রিয়ার ফল শত শত নাদির শার লুণ্ঠন অপেক্ষাও অনেক দুর্ব্বল জাতির পক্ষে ভয়ানক হইয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে অর্থশাস্ত্রেরই একটি বড় অধ্যায়—ভারতীয় মুদ্রাতত্ত্ব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

মুদ্রা মানুষের দেনা-পাওনা মিটান সম্পর্কে মধ্যস্থ হইয়া কার্য্য করে এবং এই ভাবে বিভিন্ন মানুষ ও দেশের মধ্যে পণ্য-বিনিময়ের সুবিধা করিয়া দেয়। ইহা ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে জামিন-স্বরূপ দাঁড়াইয়া বিক্রেতাকে বলিতে থাকে, "তুমি তোমার পণ্যের বিনিময়ে অন্য কোন পণ্য দাবি করিও না, তাহার পরিবর্ত্তে আমাকে গ্রহণ কর, আমি তোমার সকল প্রয়োজন মিটাইব।" এইরূপ ব্যাপক যাহার প্রয়োজনীয়তা তাহা এমন একটা বস্তু হওয়া আবশ্যক যাহা আকারে বা পরিমাণে বিস্তৃত হইবে না এবং যাহাকে রক্ষা করিতে বা হস্তান্তর করিতে অসুবিধা হইবে না। অধিকন্তু তাহা টেকসই হইবে এবং জগতে তাহার নিজের একটা প্রয়োজনীয়তা বা ন্য থাকিবে। এই কারণে সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে স্বর্ণ,

রৌপ্য ইত্যাদি ধাতু মুদ্রাজগতে একাধিপত্য করিয়া কৌলীন্য লাভ করিয়াছে। কোন দেশের গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলেই মুদ্রা প্রস্তুত করিয়া ধনী হইতে পারেন না; কারণ তাঁহাকে স্বর্ণ, রৌপ্য ইত্যাদি ধাতু বাজার হইতে মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে হইবে এবং সাধারণ নিয়মানুযায়ী ধাতুর যাহা মূল্য তাহাই মুদ্রার মূল্য-স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। এখানে কাগজের তৈরি নোটের কথা উঠিতে পারে। তাহার উত্তর এই যে, কাজকর্ম্মের সুবিধার জন্য সকল দেশের গভর্ণমেণ্ট নোটের প্রচলন করিলেও নোটের বিনিময়ে টাকা বা মুদ্রা দিবার আইনসঙ্গত দায়িত্ব গভর্ণমেণ্টের সর্ব্বদাই রহিয়াছে এবং তদ্দরুণ তাঁহাকে স্বর্ণ বা রৌপ্য তহবিল পৃথক করিয়া রাখিতে হয়। কোন গভর্ণমেণ্ট যখন নোটের বিনিময়ে স্বর্ণ বা রৌপ্য দিতে অসমর্থ হন (যেমন স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিয়া ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে সম্প্রতি ঘটিয়াছে) তখন সেই গভর্ণমেণ্টের আর্থিক অবস্থা কোন বিশেষ কারণে সঙ্কটাপন্ন এবং এই ব্যবস্থা সাময়িক বুঝিতে হইবে।

গভর্ণমেণ্টের ন্যায় সরকারী টাকশালে স্বর্ণ বা রৌপ্য জমা দিয়া নিখরচায় মুদ্রা প্রস্তুত করিয়া লইবার অধিকার সকল সভ্যদেশের প্রজাবর্গেরও সাধারণ অবস্থায় রহিয়াছে। এই অধিকার হইতে আমরা ভারতবাসী ১৮৯৩ সালের আইনদ্বারা বঞ্চিত হইয়াছি এবং সম্ভবতঃ তাহারই ফলে উল্লিখিত ভ্রান্ত ধারণার উৎপত্তি হইয়াছে।

এখানে একটা কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক। সমর-ঋণ, আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি কর্ম্মদ্বারা পাশ্চাত্য দেশসমূহ আত্মকৃত ব্যাধির সৃষ্টি করিয়া সঙ্কটকালে যে-সকল বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইতেছে, সেই সকল বর্ত্তমান আলোচনায় ধর্ত্তব্য নহে। সহজ স্বাভাবিক অবস্থায় অর্থনীতির যে-সকল হিতকর মূলসূত্র সভ্যদেশে অনুসৃত হয়, সেই সব সূত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই ভারতের অবস্থা বিচার করিতে হইবে। উপরোক্ত আলোচনা হইতে আমরা এইরূপ দুইটি সাধারণ নীতি বা সূত্রের পরিচয় পাইয়াছি—(১) প্রত্যেক দেশের প্রধান মুদ্রার বাহিরের নির্দ্দিষ্ট মূল্যের সহিত তাহার অন্তর্গত ধাতুর মূল্যের কোন প্রভেদ থাকিবে না; (২) সর্ব্বসাধারণের সরকারী টাকশাল হইতে টাকা প্রস্তুত করিয়া লইবার অবাধ অধিকার থাকিবে। দুর্ভাগ্যবশতঃ ভারতে ইহার কোনটাই বিদ্যমান নাই। অর্থশাস্ত্রে যাহাকে অন্ত্যজ বা হীন মুদ্রা (Base or token coin) বলে, ভারতের রৌপ্যমুদ্রা সেই শ্রেণীর। ইহার ধাতুর মূল্য অপেক্ষা গভর্ণমেণ্ট-নির্দ্ধারিত মূল্য প্রায় দ্বিগুণ। বিশ্বের আর কোন উন্নতিশীল জাতির প্রধান মুদ্রার এরূপ হীন অবস্থা আছে বলিয়া আমরা অবগত নহি। প্রথম নীতির ব্যতিক্রম ঘটিলে দ্বিতীয় নীতিকেও পরিহার করা ভিন্ন উপায় থাকে না। অন্যথা স্বল্প মূল্যের ধাতুদ্বারা অধিক মূল্যের মুদ্রা লাভ করিয়া রাতারাতি ধনী হইবার সহজ কল্পনায় সকলেই চঞ্চল হইয়া উঠিবে।

অবাধ বাণিজ্য ও বিভিন্ন দেশের দেনা-পাওনা সহজে নিষ্পত্তি করিবার জন্য আর্থিক ব্যবস্থা যথাসম্ভব সহজ ও সরল হওয়া আবশ্যক। প্রত্যেক দেশের মুদ্রা যদি পূর্ণ মূল্যের স্বর্ণ বা রৌপ্য ধাতুর উপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের দায় মিটাইবার জন্য মুদ্রার অপ্রতুল হইলে প্রয়োজন অনুযায়ী যদি সরকারী টাকশাল হইতে উহা প্রস্তুত করিয়া লওয়া বিধিমত সম্ভব হয়, তাহা হইলে অন্তর ও বহির্বাণিজ্যের দেনা-পাওনা মিটান সম্পর্কে অনেক সমস্যার হাত হইতে আমরা মুক্তিলাভ করিতে পারি। এমন কি যুদ্ধবিগ্রহ আদি গুরুতর ও অস্বাভাবিক অবস্থার ফলে আন্তর্জ্জাতিক দেনা-পাওনার তুলাদণ্ড একদিকে অতিরিক্ত ভারী হইয়া অধিকাংশ স্বর্ণ বা রৌপ্য এক দেশ হইতে অপর দেশে উধাও হইবার সম্ভাবনা না ঘটিলে (সম্প্রতি পাশ্চাত্য দেশে যাহা ঘটিয়াছিল) ইহা অপেক্ষা সুব্যবস্থা মুদ্রাব্যাপারে আর কিছু হইতে পারে না। বিষয়টি আরও পরিষ্কার করিয়া বলিবার চেষ্টা করা যাক্। যদি দুইটি পরস্পর-সংশ্লিষ্ট দেশের প্রধান মুদ্রায় কোনরূপ ঘাটতি না থাকে, অর্থাৎ যদি উহাদের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ মূল্য একই হয়, এবং দুইটি দেশই যদি স্বর্ণমানের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহা হইলে মুদ্রানীতির মারপ্যাচে কোন পক্ষের ঠকিবার কোনরূপ সম্ভাবনা থাকে না এবং তাহাদের মধ্যে দেনা-পাওনা স্থির করা বা মিটানও সহজ হইয়া দাঁড়ায়। আমেরিকার ডলার, ইংলণ্ডের ষ্টার্লিং ও ফ্রান্সের ফ্রাঁ মুদ্রার কোন্‌টিতে কি পরিমাণ স্বর্ণ আছে, আমরা জানি। সুতরাং জোগান ও চাহিদার সাধারণ নিয়মানুসারে অন্যান্য জিনিসের ন্যায় স্বর্ণের বাজার-দর কম-বেশী হইলেও

তিনটি দেশের স্বর্ণমুদ্রার আপেক্ষিক মূল্য ঠিকই থাকিবে এবং দেনা-পাওনা মিটাইতে গিয়া কাহাকেও বিনিময়ের হেরফেরে পড়িয়া ঠকিতে হইবে না। রৌপ্যমুদ্রাবিশিষ্ট দেশসমূহের সম্বন্ধেও সেই একই কথা প্রযোজ্য। যদি এক দেশে স্বর্ণমুদ্রার ও অপর দেশে রৌপ্যমুদ্রার প্রচলন থাকে, তাহা হইলেই উহাদের মধ্যে হিসাব-নিকাশের সময় কিছু গোল হইবার সম্ভাবনা। কারণ, স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিনিময়ের হার কোনও ধাতুর সাময়িক আধিক্য বা অল্পতা হেতু কখনও কখনও কম বা বেশী হইতে পারে এবং তাহার ফলে পরস্পরের মধ্যে দেনা-পাওনার পরিমাণ নড়চড় হইয়া যাইবার সম্ভাবনা ঘটে। কোন ভারতীয় ব্যবসায়ী ১৫,০০০ পাউণ্ড ষ্টার্লিং মূল্যের বিলাতী কাপড়ের "অর্ডার" দিবার সময় যদি বিনিময়ের হার প্রতি টাকায় ১ শিলিং ৬ পেনি হয়, তাহা হইলে তাহাকে মূল্য বাবদ ২,০০,০০০ টাকা দিলেই চলিবে। কিন্তু তাহার পরেই যদি রূপার দর পড়িয়া গিয়া বাট্টার হার ১ শিলিং ৮ পেনি দাঁড়ায়, তাহা হইলে তাহাকে ঐ জিনিষের জন্য ২,২৫,০০০ টাকা মূল্য দিতে হইবে। কেবল বাট্টার দরুণ তাহাকে এ ক্ষেত্রে ২৫,০০০ টাকা বেশী দিতে হইতেছে! ঠিক তেমনি যদি কোন ইংরেজ বণিক আমাদের দেশে বাট্টার হার এক শিলিং ৬ পেনি থাকা কালীন ২,০০,০০০ টাকার পাটের অর্ডার দেয়, আর মূল্য দিবার সময় বাট্টার হার ১ শিলিং ৪ পেনি হয় তাহা হইলে তাহাকে ১৫০০০ পাউণ্ডের পরিবর্ত্তে মাত্র ১৩,৩৩৩ পাউণ্ড ৬ শিলিং ৮ পেনি দিলেই চলিবে। দুই দেশের মুদ্রা যদি দুই ভিন্ন ধাতুর হয়, তাহা হইলে মূল্যের এইরূপ তারতম্য এবং তদ্দরুণ একের লাভ ও অপরের ক্ষতি সময় সময় অনিবার্য্য। কিন্তু তাহাও অনেকটা নিবারণ করিতে পারা যায় যদি সরকারী টাকশাল হইতে মুদ্রা তৈরি করিয়া লইবার অবাধ অধিকার জনসাধারণের থাকে। কি ভাবে, তাহা বলিতেছি। বিনিময়ের হার কমিলেই কেমন করিয়া আমদানী মালের দর বৃদ্ধি এবং রপ্তানী মালের দর হ্রাস পায় তাহা উপরের দৃষ্টান্ত হইতে আমরা দেখিয়াছি। ইহার ফলে বিদেশী পণ্যের আমদানী কমিতে থাকে ও দেশী পণ্যের রপ্তানী বৃদ্ধি পায়। আমদানী অপেক্ষা রপ্তানী বেশী হইলেই তাহার মূল্য দিবার জন্য অধিকতর টাকার আবশ্যক হয় এবং তজ্জন্য অধিকতর রৌপ্যেরও প্রয়োজন হয়। ফলে রৌপ্যের মূল্যের পুনঃবৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা ঘটে এবং বিনিময়ের হার পূর্ব্বাবস্থা বা সমতা (parity) লাভ করিবার চেষ্টা করে। আমাদের লেন-দেন প্রধানতঃ ইংলণ্ডের সহিত। তারপর আর যে-সকল দেশের সহিত আমাদের বাণিজ্যাদির দরুণ আর্থিক সম্পর্ক তাহাদেরও অধিকাংশ স্বর্ণমানবিশিষ্ট। ভারতে রৌপ্যমুদ্রার পরিবর্ত্তে স্বর্ণের প্রচলন হইলে বিনিময়ের কবলে পড়িয়া আমাদিগকে এভাবে ভুগিতে হইত না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা অর্থশাস্ত্রের সহজ ও স্বাভাবিক নিয়মগুলি হইতে বিচ্যুত হইয়া কেবলই সমস্যার পর সমস্যায় পতিত হইতেছি এবং শতছিদ্র-বিশিষ্ট মৃৎপাত্রে বারিধারণের ব্যর্থ প্রয়াসের ন্যায় আমাদের মুদ্রা-সমস্যা-সমাধানের সকল চেষ্টা প্রতিহত হইতেছে। সেই ব্যর্থ চেষ্টার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এক্ষণে আলোচনা করিব।

দাক্ষিণাত্যে হিন্দু-প্রাধান্য চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকায় সহস্রাধিক বৎসর যাবৎ স্বর্ণমুদ্রাই এতদঞ্চলে একাধিপত্য করিয়া আসিতেছিল। উত্তর-ভারতে মুসলমান রাজত্বকালে স্বর্ণ ও রৌপ্য দ্বিবিধ মুদ্রারই প্রচলন ছিল; কিন্তু বাদশাহগণ রৌপ্যমুদ্রাকেই অধিকতর প্রাধান্য দিতেন। স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার হার নির্দ্দিষ্ট করা ছিল না—মুদ্রামধ্যস্থিত ধাতুর মূল্য অনুযায়ী হার স্থির করা হইত। এদিকে ধাতুর মূল্য পরিবর্ত্তনশীল; ইহাতে কাজকর্ম্মের অসুবিধা হয় দেখিয়া ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইহাদের মধ্যে একটা নির্দ্দিষ্ট হার বাঁধিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু ধাতুর বাজার-দর স্থির না থাকায় নির্দ্দিষ্ট হারে দ্বিবিধ মুদ্রার (Bimetalism) প্রচলন অসম্ভব হয় এবং ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে আইন-প্রণয়ন দ্বারা সমগ্র ভারতের জন্য এক তোলা ওজনের রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন বিধিবদ্ধ করা হয়। দেনা পরিশোধের জন্য স্বর্ণমুদ্রা লইতে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আর বাধ্য রহিলেন না। এইরূপে দ্বৈত মুদ্রার পরিবর্ত্তে ভারতে এক রকম মুদ্রার (monometalism) প্রচলন হয়। কেন যে স্বর্ণের পরিবর্ত্তে রৌপ্যের উপর কর্ত্তৃপক্ষের সুনজর পতিত হইল তাহার কারণ বুঝিতে পারা যায় না। কিন্তু এই নির্দ্ধারণই ভারতের পক্ষে কাল হইয়া দাঁড়াইল। কেমন করিয়া তাহা পরে বলিতেছি।

১৮৩৫ সালের আইন দ্বারা স্বর্ণমুদ্রা রদ করা হইলেও

জনসাধারণ তাহাদের কাজকর্ম্মের জন্য স্বর্ণমুদ্রা দাবি করিতে লাগিল। ফলে ১৮৪১ সালে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সরকারী রাজকোষে স্বর্ণমোহর গ্রহণ করিবার আদেশ প্রচার করিতে বাধ্য হইলেন। মোহরে ও টাকায় একই ওজনের (এক তোলা) সোনা ও রূপা ছিল এবং কয়েক শতাব্দী যাবৎ সোনার দর রূপা হইতে প্রায় পনর-গুণ বেশী চলিয়া আসিতেছিল, সেই কারণেই এক মোহরের মূল্য পনর টাকা বলিয়াই জনসাধারণ এতকাল জানিয়া আসিয়াছে। কিন্তু ইতিমধ্যে ক্যালিফোর্ণিয়া ও অষ্ট্রেলিয়ায় বিস্তৃত স্বর্ণখনি আবিষ্কারের ফলে সোনার দাম কমিতে সুরু করিল এবং জনসাধারণ ১ মোহর = ১৫ টাকা, এই পুরাতন হার অনুযায়ী কোম্পনীর দেনা সোনায় মিটাইয়া লাভবান হইতে লাগিল।

সরকারের নিকট যাঁহার ত্রিশ টাকা দেনা ছিল তিনি দুই মোহর দিয়া রেহাই পাইলেন; অথচ সোনার দর পড়িয়া যাওয়ায় বাজারে ২ মোহরের মূল্য তখন হয়ত ২৮ টাকার বেশী নয়। ইহাতে গভর্ণমেণ্টের গুরুতর ক্ষতি হইতে লাগিল এবং ১৮৫২ সালে গভর্ণমেণ্ট নোটিফিকেশ্যান দ্বারা রাজকোষে মোহর গ্রহণ পুনরায় রহিত করিয়া দিলেন। কিন্তু দেশে স্বর্ণমান প্রচলনের জন্য তীব্র আন্দোলন সুরু হইল। প্রত্যেক রাজস্বসচিব ভারতের প্রকৃত মঙ্গল উপেক্ষা করিতে না পারিয়া স্বর্ণমানের স্বপক্ষে অভিমত প্রকাশ করিলেন; এমন কি ১৮৬৪ সালে একটি স্কিমও তখনকার রাজস্বসচিব খাড়া করিলেন। কিন্তু এত আন্দোলন সত্ত্বেও ভারতসচিবের অনুগ্রহ না হওয়ায় আমাদিগকে দুধের সাধ ঘোলে মিটাইতে হইল। ভারতবাসীরা প্রকৃতই স্বর্ণমুদ্রা চাহে কি-না তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য ইংলণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়ার টাকশালে প্রস্তুত স্বর্ণমুদ্রা মাত্র ভারত-গভর্ণমেণ্ট তাহাদের পাওনার পরিবর্ত্তে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। এইরূপ জোড়াতাড়া দেওয়া নীতিতে কেহই সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না এবং দেশীয় টাকশালে প্রস্তুত পুরাদস্তুর স্বর্ণমানের জন্য আন্দোলন বাড়িয়াই চলিল। ফলে যেমন সর্ব্বদা আমাদের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে —একটি রয়্যাল কমিশন আমাদের দাবি পরীক্ষার জন্য বসিল। তাঁহারাও জনমতের আন্তরিকতা ও যুক্তির সারবত্তা স্বীকার করিয়া স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠার অনুকূলেই মত প্রকাশ করিলেন; কিন্তু পরিণামে কিছুই হইল না।

১৮৭১ সালে জার্ম্মানী রৌপ্যমান পরিহার করিয়া স্বর্ণমান গ্রহণ করে। ডেনমার্ক, হলাণ্ড, নরওয়ে, সুইডেন প্রভৃতি দেশও জার্ম্মানীর পদাঙ্কানুসরণ করে। ফ্রান্স, বেলজিয়ম, ইটালী প্রভৃতি যে-সকল দেশে দ্বৈত মুদ্রার প্রচলন ছিল তাহারাও উভয় মুদ্রার বিনিময়ের হার ঠিক রাখিতে অসমর্থ হইয়া রৌপ্যমুদ্রার অবাধ তৈরি বন্ধ করিয়া দেয়। ফলে রূপার চাহিদা হঠাৎ অত্যন্ত হ্রাস পাইয়া তাহার মূল্য খুব কমিয়া যায়। এই সঙ্কট সময়ে ভারতবর্ষেও স্বর্ণমান প্রচলনের জন্য বিখ্যাত রাজস্বসচিব স্যর রিচার্ড টেম্প্‌ল আর একবার বিশেষ চেষ্টা করেন। কিন্তু ১৮৭৪ সালের মে মাসে—তাঁহার পদত্যাগের একমাস পরেই. ভারত-গভর্ণমেণ্ট কোন কারণ প্রদর্শন না করিয়াই তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। ইহার পরিণাম ভারতের পক্ষে অত্যন্ত খারাপ হইয়া দাঁড়ায়। ১৮৭২ সাল ও ১৮৯৩ সালের মধ্যে প্রতি টাকার মূল্য ২ শিলিং হইতে ১ শিলিং ৩ পেনিতে নামিয়া আসে। ফলে সস্তা রূপা খুব অধিক পরিমাণে ভারতবর্ষে আমদানী হইতে আরম্ভ হয় এবং তাহা মুদ্রায় পরিণত হইয়া বাজারে ছড়াইয়া পড়ে। প্রয়োজন-অতিরিক্ত মুদ্রা বাজারে চলিতে থাকায় অর্থনীতির জোগান ও চাহিদার সাধারণ নিয়মানুসারে ভারতে জিনিষের দর চড়িয়া যায়। পক্ষান্তরে ইউরোপে সোনার দর রূপার তুলনায় চড়া থাকায় সেখানকার জিনিষের দর কমিতে থাকে। সেই কারণে ভারতীয় পণ্যের চাহিদা বিশ্বের হাটে কমিয়া গিয়া বিদেশী জিনিষের চাহিদা ভারতের হাটে অত্যধিক বৃদ্ধি পায় এবং ইহাতে ভারতের গুরুতর অর্থহানি ঘটিতে সুরু করে। ভারত-সরকারের ক্ষতির পরিমাণও প্রতি বৎসর বাড়িয়া চলিতে থাকে। ভারত-সরকারকে প্রতি বৎসর প্রায় ৩॥ কোটি পাউণ্ড ষ্টার্লিং "হোম চার্জ্জেস্" দরুণ বিলাতে পাঠাইতে হয়। ইংরেজ আমলাতন্ত্রের ও গোরা সৈন্যবাহিনীর মাহিনা, ভাতা, পেন্সন, ভারতীয় রেল ও পূর্ত্ত বিভাগের জন্য ধার করা টাকার সুদ, বিলাতের ইণ্ডিয়া অফিস ও হাই কমিশনার অফিসের খরচাদি বাবদ এই টাকা আমাদিগকে দিতে হয়। ইহা ভারতের পক্ষে নিছক ক্ষতি কিংবা ইহার বিনিময়ে আমরা যাহা পাই তদ্দ্বারা আমাদের ক্ষতিপূরণ হয়, সে-বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে। যাঁহারা টাকা দেন তাঁহাদের এক মত এবং যাঁহারা টাকাটা

পান তাঁহাদের অবশ্য অন্য মত। যাহা হউক, বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই বিরাট ও বিরোধী বিষয় লইয়া আলোচনার প্রয়োজন নাই। মূল বিষয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করা যাক্। টাকার দর ২ শিলিং থাকাকালীন "হোম চার্জ্জেস" দরুণ প্রায় ৩॥ কোটি পাউণ্ড ষ্টার্লিং পরিশোধ করিতে আমাদিগকে যত টাকা দিতে হইত, টাকার দর যখন ১ শিলিং ৩ বা ৪ পেনিতে নামিয়া আসিল, তখন আমাদিগকে তদপেক্ষা একেবারে এক-তৃতীয়াংশ বেশী দিতে হইল। অর্থাৎ কেবল বাট্টার হেরফেরের জন্য আমাদের দেনা ১ কোটি ১৭ লক্ষ পাউণ্ড (অর্থাৎ ১৭ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা) প্রতি বৎসর বৃদ্ধি পাইয়া গেল! শুধু তাহাই নহে, বাট্টা বা বিনিময়ের হারের এরূপ অনিশ্চয়তার দরুন বিদেশের সহিত বাণিজ্য করা কঠিন হইয়া উঠিল ; কারণ কাহারও পক্ষে লাভ-ক্ষতির পরিমাণ স্থির করিয়া কার্য্য করা আর সম্ভব রহিল না। বিনিময়ের হার নামিয়া যাওয়ায় আমাদিগকে যে অতিরিক্ত টাকা দিতে হইল তাহাও আমাদিগকে পণ্য বিক্রয় করিয়া সংগ্রহ করিতে হইল এবং তাহার মূল্য ও বাট্টার জন্যই আমরা আবার কম করিয়া পাইলাম। টাকার মূল্য হ্রাস পাওয়ায় ভারত-সরকার তাঁহার তহবিলের ঘাট্‌তি পূরণ করিবার জন্য লবণ-কর ইত্যাদি বৃদ্ধি করিলেন। ফলে যাহারা পূর্ব্বেই একবার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল তাহাদেরই উপর পুনরায় জুলুম হইল। ভগবান যে বিপুল নৈসর্গিক ঐশ্বর্য্য ভারতকে দান করিয়াছেন, সেই ঐশ্বর্য্য আহরণ করিতে হইলে প্রভূত অর্থের প্রয়োজন। অর্থের প্রধান হাট লণ্ডন। সেখানে সমস্ত কারবার স্বর্ণের মারফতে হয় ; ভারতবর্ষের কারবার রৌপ্যে ; আবার তাহারও মূল্যের কিছু স্থিরতা নাই। কাজেই বাট্টার গোলমালে বিদেশীয় অর্থ ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য-বিস্তারের সহায়তার জন্য তেমন আসিতে পারিল না। এক হিসাবে ইহাও আমাদের পক্ষে ক্ষতিকর হইল।

এই সব কারণে ১৮৭৮ সাল হইতে ১৮৯২ সাল পর্য্যন্ত স্বর্ণমান প্রচলন ও রৌপ্যমুদ্রার অবাধ নির্ম্মাণ স্থগিত রাখিবার জন্য বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসা-সঙ্ঘ প্রভৃতি হইতে জোর আন্দোলন চলিতে থাকে। ১৮৭৮ সালে ভারত-সরকার স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে একটি স্কিম পেস করিলেন বটে, কিন্তু ভারতসচিব তাহা নাকচ করিয়া দিলেন। এই দিকে ১৮৬৭ সাল ও ১৮৯২ সালের মধ্যে যে চারিটি আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক বৈঠক বসে, ভারত-সরকার তাহার সহযোগিতায় বিনিময়ের হার নির্দ্দিষ্ট করা যায় কি-না সেই চেষ্টাও করিতে লাগিলেন। সেই দিকেও নিরাশ হইয়া ১৮৯২ সালে ভারত-গভর্ণমেণ্ট পুনরায় ভারতসচিবের নিকট নিম্নলিখিতরূপ একটি প্রস্তাব প্রেরণ করেন—(১) স্বর্ণমান প্রচলন উদ্দেশ্যে সর্ব্বসাধারণ কর্ত্তৃক টাকশাল হইতে রৌপ্যমুদ্রা প্রস্তুত রহিত করিয়া দেওয়া হউক ; (২) তদ্বিনিময়ে স্বর্ণমুদ্রা প্রস্তুতের অবাধ অধিকার সর্ব্বসাধারণকে দেওয়া হউক ; (৩) স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠার পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েক বৎসরের গড় হার পরীক্ষা করিয়া স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার মধ্যে বিনিময়ের হার নির্দ্ধারণ করা হউক ; (৪) বিলাতের মুদ্রাকে দেশীয় মুদ্রার ন্যায় এদেশে চলিতে দেওয়া হউক এবং রৌপ্যমুদ্রার সহিত ইহার বিনিময়ের হার ১ শিলিং ৬ পেনি নির্দ্দিষ্ট করা হউক। ভারতসচিবের নির্দ্দেশ-মত হার্সেল কমিটি এই প্রস্তাব পরীক্ষা করেন। তাঁহাদের নির্দ্ধারণ অনুযায়ী ১৮৯৩ সালে যে মুদ্রা-আইন বিধিবদ্ধ হয় তাহার ফলে ভারতীয় টাকশালে সাধারণ কর্ত্তৃক রৌপ্যমুদ্রা প্রস্তুত বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল ; কিন্তু অবাধ স্বর্ণমুদ্রা প্রচলনের কোন ব্যবস্থা করা হইল না। ভারতীয় রাজকোষ হইতে টাকা দিয়া গভর্ণমেণ্ট সর্ব্বসাধারণ হইতে স্বর্ণমান ও স্বর্ণমুদ্রা ১ শিলিং ৪ পেনি হারে (১ শিলিং ৬ পেনি নহে) গ্রহণ করিবেন ইহাই মাত্র স্থির হইল। এই ব্যবস্থার একটি প্রধান দোষ এই থাকিয়া গেল যে, গভর্ণমেণ্ট স্বর্ণমুদ্রা বা স্বর্ণমানের পরিবর্ত্তে টাকা দিতে বাধ্য থাকিলেও টাকার বিনিময়ে স্বর্ণ দিবার কোন বাধ্যবাধকতা তাঁহাদের রহিল না। এই অবস্থায় স্বর্ণমুদ্রা ও হীন রৌপ্যমুদ্রার মধ্যে গভর্ণমেণ্ট-নির্দ্ধারিত ১ শিলিং ৪ পেনি হার স্থির রাখা সম্ভব হইতে পারে না। কারণ বাট্টার হার বাঁধিয়া দেওয়া হইল কিন্তু বাজারের দুইটি ধাতু বা মুদ্রার পরিমাণ স্বাভাবিক নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হইবার পথ রুদ্ধ করিয়া দেওয়া হইল।

১৮৯৩ সালের পরেও রূপার দর কমিয়াই চলিল এবং বিনিময়ের হার ১ শিলিং ১$\frac{1}{2}$ পেনি পর্য্যন্ত নামিল। ১৮৯৮ সালে ভারত-গভর্ণমেণ্ট অবিলম্বে স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠার জন্য পুনরায় একটি প্রস্তাব প্রেরণ করিলেন। তাহার ফলে ফাউলার কমিটি নামে যে কমিটির নিয়োগ হইল তাঁহারা ভারত-

গভর্ণমেণ্টের প্রস্তাবের অনুকূলে মত প্রকাশ না করিলেও পূর্ণ স্বর্ণমান প্রচলনের পক্ষেই মত নির্দ্ধারণ করিলেন। তাঁহাদের প্রস্তাবের তাৎপর্য্য এইরূপ—(১) বিলাতের স্বর্ণমুদ্রা (সভারিন) ভারতে অবাধে চলিতে পারিবে; (২) ভারতীয় টাকশালে অবাধে স্বর্ণমুদ্রা প্রস্তুত হইতে পারিবে; (৩) স্বর্ণ অবাধে আমদানী ও রপ্তানী হইতে পারিবে (ইহা পূর্ণ স্বর্ণমানের একটি প্রধান লক্ষণ); (৪) গভর্ণমেণ্ট স্বর্ণের বিনিময়ে টাকা দিবেন বটে কিন্তু নূতন টাকা আর প্রস্তুত করিতে পারিবেন না, যে-পর্য্যন্ত না সর্ব্বসাধারণের প্রয়োজনের অতিরিক্ত স্বর্ণমুদ্রা বাজারে ছড়াইয়া পড়ে; (৫) হীন মূল্যের টাকা প্রস্তুত করিয়া গভর্ণমেণ্ট প্রতি টাকায় যে ৷৶০, ৷৵০ আনা লাভ করেন তাহা সরকারী সাধারণ তহবিলে জমা করা হইবে না। ইহা দ্বারা স্বর্ণমান প্রচলনের উদ্দেশ্য একটি স্বতন্ত্র স্বর্ণ তহবিল (Gold Standard Reserve) খোলা হইবে, যাহাতে সমস্ত রৌপ্যমুদ্রা ইহার সাহায্যে ধীরে ধীরে কিনিয়া লওয়া যাইতে পারে; (৬) গভর্ণমেণ্টকে যে অর্থ ভারতবর্ষে ব্যয় করিতে হয় টাকার পরিবর্ত্তে তাঁহারা তাহা স্বর্ণমুদ্রায় করিবেন; (৭) বিনিময়ের হার ১৲ শিলিং ৪ পেনি হিসাবে ধরা হইবে এবং টাকা হীনমুদ্রা হইলেও জনসাধারণ কর্ত্তৃক তাহার ব্যবহার সীমাবদ্ধ করা হইবে না।

স্বর্ণমানের প্রধান উপকরণ বা উপাদান নিজ দেশে অবাধে স্বর্ণমুদ্রা-প্রস্তুতের অধিকার। এই গোড়ার অধিকারটি বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষের আপত্তির দরুণ ভারতবর্ষকে দেওয়া হইল না। স্বর্ণ-তহবিল ধীরে ধীরে রৌপ্যমুদ্রাকে টানিয়া লইয়া স্বর্ণমানের পথ প্রশস্ত করিয়া দিবে, স্বর্ণ-তহবিল সৃষ্টির এই উদ্দেশ্যটিও ভারতসচিব অনেকটা ব্যর্থ করিয়া দিলেন। প্রথমতঃ এই স্বর্ণ-তহবিল ভারতবর্ষে না রাখিয়া ষ্টার্লিংএ রূপান্তরিত করিয়া বিলাতে রাখা হইল। দ্বিতীয়তঃ, এই তহবিলের একটা অংশ ভারতের রেলপথ-নির্ম্মাণে ব্যয় হইতে লাগিল। তৃতীয়তঃ, অতিরিক্ত টাকার আবশ্যক হইলে রৌপ্য খরিদের মূল্য দিবার জন্য স্বর্ণ-তহবিলের একাংশ রৌপ্য-মুদ্রা রূপে ভারতবর্ষে রক্ষিত হইল। ভারতীয় পণ্যের মূল্য দিবার জন্য বা অন্য কারণে ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে স্বর্ণ পাঠাইবার প্রয়োজন হইলে ভারতসচিব বাজার-দর অপেক্ষা কম মূল্যে তাহাদের নিকট হইতে স্বর্ণ গ্রহণ করিয়া কাউন্সিল্ বিল বেচিতে সুরু করিলেন এবং এইরূপ বেচা-কেনার কোনরূপ পরিমাণ বা সীমানির্দ্দেশ করা হইল না। ফলে বিদেশ হইতে ভারতে স্বর্ণ প্রবেশের পথ রুদ্ধ হইয়া গেল। যে স্বর্ণ ভারতের প্রাপ্য এবং যাহা ভারতে আসিতে পারিলে নানা উপায়ে ভারতের ধনবৃদ্ধির সহায়তা করিতে পারিত তাহা বিলাতেই রহিয়া গেল, এবং তথায় আমাদের নামে জমা থাকিলেও অল্প সুদে ইংলণ্ডের ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে ব্যবহৃত হইতে পারিল। এত বড় একটা বিরাট ধনভাণ্ডারের কর্ত্তৃত্ব করিতে পাওয়া সহজ সুবিধা নহে। ইহাতে ইংলণ্ডের মর্য্যাদা ও ধনবল বাহিরে যেমন বাড়িয়া গেল আমাদের ধন পরহস্তগত হওয়ায় তাহা সম্ভব হইল না। ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, নোটের টাকা দিবার জন্য যে পৃথক তহবিল (Paper Currency Reserve) রাখা হয় তাহা হইতে ১৯০৫ সালে ৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার স্বর্ণ জাহাজে করিয়া বিলাতে পাঠান হয়। ইহার অনুকূলে এই যুক্তি প্রদর্শন করা হয় যে, টাকা প্রস্তুতের জন্য ইংলণ্ডে রৌপ্য খরিদকালে ভারতবর্ষ হইতে স্বর্ণ আনাইয়া লইতে তিন-চার সপ্তাহ বিলম্ব ঘটিত—ইহাতে সেই অসুবিধা আর হইবে না!

এখানে কাউন্সিল বিলের পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। আমাদিগকে প্রতি বৎসর হোম চার্জ্জেস্ দরুণ যে অর্থ বিলাতে দিতে হয় তাহার জন্য স্বর্ণ আবশ্যক। কিন্তু আমাদের মুদ্রা স্বর্ণমুদ্রা নহে। বাজার হইতে স্বর্ণ ক্রয় করিয়া জাহাজে করিয়া বিলাতে পাঠাইবার হাঙ্গামা ও খরচ এড়াইবার জন্য নিম্নলিখিত পন্থা অবলম্বন করা হইত। বিলাতের ব্যবসায়ীকে ভারতীয় পণ্য ক্রয় করিবার জন্য মূল্য দিতে হইবে; পক্ষান্তরে ভারতসচিব ভারতবর্ষ হইতে 'হোম চার্জ্জেস' বাবদ বহু অর্থ পাইবেন। সামান্য কিছু খরচ ও কমিশন ধরিয়া ভারতসচিব ইংরেজ ব্যবসায়ীর নিকট হইতে তাহার দেয় স্বর্ণ-মুদ্রা গ্রহণ করেন এবং তদ্বিনিময়ে তাহার বরাবর ভারত-সরকারের উপর একটি 'পে অর্ডার' দেন। ইহারই নাম কাউন্সিল বিল বা ড্রাফ্‌ট্‌স্। ইংরেজ ব্যবসায়ী ইহা ভারতীয় পাওনাদারের নিকট পাঠাইয়া দেন এবং তিনি এখানকার ট্রেজারী হইতে উহা ভাঙাইয়া লয়েন। বিশেষ তৎপরতার

প্রয়োজন হইলে অতিরিক্ত খরচ লইয়া টেলিগ্রামে অর্ডারটি পাঠান হয় এবং তাহাকে টেলিগ্রাফিক ট্রান্সফার বলে। ১৮৯৩ সাল পর্য্যন্ত হোম চার্জ্জেসের পরিমাণ অনুযায়ী কাউন্সিল বিল বিক্রয় করা হইত। কিন্তু ১৮৯৩ সাল হইতে এই বিল যথেচ্ছ পরিমাণে ভারতসচিব বিক্রয় করিতে আরম্ভ করেন। ইহার কুফল উপরে উল্লেখ করিয়াছি। বিলাতী পণ্যের মূল্যের দরুণ বা অন্য কারণে আমাদিগকে ইংলণ্ডে টাকা পাঠাইতে হয়। আবার ভারতসচিবেরও এদেশে টাকা পাঠাইবার প্রয়োজন হয়। এই অবস্থায় ভারতীয় ট্রেজারীতে টাকা জমা দিয়া আমরা 'রিভার্স কাউন্সিলস্' ক্রয় করিয়া আমাদের পাওনাদারের নিকট পাঠাইয়া দিলে তিনি তাহা ভারতসচিবের নিকট হইতে ভাঙাইয়া লইতে পারেন। এই কাউন্সিল বিল ও রিভার্স কাউন্সিল সদা-পরিবর্ত্তনশীল বিনিময়ের হার ঠিক রাখিবার অন্যতম উপায়-স্বরূপ ব্যবহৃত হইত। নির্দ্দিষ্ট হার হইতে টাকার মূল্য কমিবার সম্ভাবনা হইলেই রিভার্স কাউন্সিল বিক্রয়ের দ্বারা বাজার হইতে চলতি টাকার পরিমাণ হ্রাস (contraction of currency) করিয়া ফেলা হইত, পক্ষান্তরে টাকার মূল্য বাড়িবার উপক্রম করিলেই ভারতসচিব কাউন্সিল বিল বিক্রয় করিতে সুরু করিতেন এবং তদ্দরুণ ভারতীয় ট্রেজারী হইতে টাকা বাহির হইয়া বাজারে ছড়াইয়া পড়িত। ফলে বাজারে টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি (expansion of currency) পাইয়া তাহার মূল্য আর বাড়িতে পারিত না। অতিরিক্ত পাচান মুদ্রানীতিকে বাঁচাইবার জন্য ইহাকে অন্যতম ব্যর্থ চেষ্টা বলা যাইতে পারে।

এক্ষণে ১৮৯৯ সাল হইতে ১৯১৬ সাল পর্য্যন্ত যে-ভাবে কাজ চলিতে লাগিল তাহার স্বরূপ সংক্ষেপে দিতেছি :

(১) টাকা ও বিলিতী সভারিন (পাউণ্ড-ষ্টার্লিং) এই দ্বিবিধ মুদ্রাই আইনসঙ্গত প্রকৃষ্ট মুদ্রা (legal tender) রূপে গণ্য হইত; (২) সভারিনের মূল্য ১৫ টাকা নির্দ্দিষ্ট ছিল (অর্থাৎ ১ শিলিং ৪ পেনি = ১ টাকা); (৩) স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে রৌপ্যমুদ্রা দাবি করা চলিত; (৪) কিন্তু রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে স্বর্ণমুদ্রা দাবি করা চলিত না, তবে প্রয়োজন অনুযায়ী ও সাধ্যমত তাহা দেওয়া হইত; (৫) টাকার মূল্য ১ শিলিং ৪ পেনির নিম্নে নামিতে চাহিলে রিভার্স কাউন্সিল বিক্রয় করিয়া যেমন তাহার মূল্যহ্রাস ঠেকান হইত, তেমনি টাকার মূল্য বাড়িবার উপক্রম করিলে উল্লিখিত ৩য় দফার বিধান অনুযায়ী বাজারে চলতি টাকার পরিমাণ বাড়াইয়া ও স্বর্ণমুদ্রার পরিমাণ কমাইয়া ফেলিয়া টাকার মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবন্ধকতা করা চলিত।

এদিকে গভর্ণমেণ্টের মুদ্রানীতি সম্পর্কে কঠোর সমালোচনা এক ভাবেই চলিতে থাকে এবং বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ইংলণ্ডের বর্ত্তমান রাজস্বসচিব স্যর অষ্টিন চেম্বারলেনের সভাপতিত্বে ১৯১৪ সালে এক কমিশন নিয়োগ করেন। তাঁহারা অনেক গবেষণা করিয়া ভারতবাসীরা স্বর্ণমুদ্রা বিশেষ চাহেন না এবং ভারতের জন্য রৌপ্যমুদ্রা ও নোট প্রচলনই প্রশস্ত, ইহাই নির্দ্ধারণ করেন এবং ঘটনাচক্রে 'গোল্ড এক্সচেঞ্জ ষ্ট্যাণ্ডার্ড' নামে যে অভিনব মুদ্রানীতির প্রচলন হইয়াছে তাহাই সম্পূর্ণ সমর্থন করেন! এদিকে ১৯১৪ সালে ইউরোপে লঙ্কাদহন পালা সুরু হয়, এবং বিশ্বব্যাপী অবস্থা-বিপর্য্যয়ের সহিত ভারতের এই অস্বাভাবিক মুদ্রার ব্যবস্থাও একেবারে ভাঙিয়া পড়ে। লড়াইয়ের সাজসরঞ্জাম, মালমশলা জোগাইবার জন্য ভারতের রপ্তানী অসম্ভব বৃদ্ধি পায়; অথচ প্রধান দেশসমূহ যুদ্ধে ব্যপৃত থাকায় ভারতে তাহাদের পণ্যের আমদানী স্বভাবতই অত্যন্ত হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। ভারত-সরকারকে বৃটিশ সরকারের পক্ষে ছয় বৎসরে ২৪ কোটি পাউণ্ড ষ্টার্লিং (অর্থাৎ ৩৬০ কোটি টাকা) ব্যয় করিতে হয়। এদিকে লড়াইয়ের দরুণ কোন দেশই অন্যান্য জিনিষের ন্যায় রৌপ্যকেও হাতছাড়া করিতেছিল না। এই কারণে ও অন্যান্য কতকগুলি সমবেত কারণে রূপার দর অভাবনীয় রূপে বৃদ্ধি পায়। ১৯১৫ সালে প্রতি-আউন্স রৌপ্যের মূল্য ২৭ পেনি ছিল; ১৯২০ সালে তাহা ৮৯ পেনিতে আসিয়া দাঁড়ায়! অতিরিক্ত রপ্তানীর মূল্য দিবার জন্য যে অতিরিক্ত কাউন্সিল বিল বিলাত হইতে আসিতে লাগিল তদ্দরুণ এবং বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের বরাতি উল্লিখিত লড়াইয়ের ব্যয়-সঙ্কুলনের দরুণ যে অত্যধিক টাকার প্রয়োজন হইল তাহার জন্য অগ্নিমূল্যে রৌপ্য খরিদ করিতে হইল। হিসাব-বহির্ভূত এই বিরাট ব্যয়সঙ্কুলনের জন্য ভারত-গভর্ণমেণ্টকে অতিরিক্ত কর ধার্য্য করিতে এবং ১৯১৭-১৯ সাল মধ্যে ১০০ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করিতে হয়। বিপাকে পড়িয়া

১৯১৯ সালে স্মিথ কমিটি নামে একটি কমিটি নিয়োগ করা হয়। ইঁহারা রৌপ্য মূল্যের এতাদৃশ বৃদ্ধি দেখিয়া বিনিময়ের হার ১ শিলিং ৬ পেনি স্থলে একেবারে ২ শিলিং নির্দ্ধারিত করিলেন। বিলাতের দেনা দিবার জন্য ভারতে যে রিভার্স কাউন্সিল বিক্রয় করা হইত তাহার দাবি মিটাইতে হইত বিলাতের গোল্ড ষ্টাণ্ডার্ড রিজার্ভ ও পেপার কারেন্সী রিজার্ভ হইতে। এই তহবিলের স্বর্ণ কোম্পানীর কাগজ ও অন্যান্য সিকিউরিটিতে খাটান হইত। টাকার মূল্য ১ শিলিং ৬ পেনি থাকাকালীন এই সব সিকিউরিটি খরিদ হইয়াছিল কিন্তু এক্ষণে ভারত-সরকার রিভার্স কাউন্সিল ২ শিলিং দরে বিক্রয় করায় ভারত-সচিবকে প্রতি-টাকায় ৬ পেনি করিয়া বেশী দিতে হইল এবং ফলে ৪০ কোটি টাকার উপর ভারত-সরকারের ক্ষতি হইয়া গেল। এই সময়ে চারিদিক হইতে বিলাতে অর্থ পাঠাইবার ধুম পড়িয়া গেল। বিনিময়ের হার এতটা বাড়িয়া যাওয়ায় বিলাতী মালের দর আমাদের দেশে সস্তা হইল এবং আমাদের মালের দর বিলাতে চড়িয়া গেল। ফলে অত্যধিক আমদানী বৃদ্ধি ও রপ্তানী হ্রাস পাইয়া দেশ হইতে অর্থ বাহির হইয়া যাইতে লাগিল। এদেশীয় ইংরেজ বণিক যাহারা এদেশে যুদ্ধের সময় বহু টাকা রোজগার করিয়াছিল তাহারাও এইরূপ উচ্চ বাট্টার হারের সুবিধা গ্রহণ করিয়া লাভের কড়ি সব বিলাতে পাঠাইতে লাগিল। ভাগ্যান্বেষীরা এই সময়ে লাভে বিলাতে টাকা পাঠাইয়া পুনরায় বাট্টার হার নামিলে লাভে টাকা এদেশে ফিরাইয়া আনিবেন মতলবে খুব রিভার্স বিল কিনিতে লাগিল। ফলে টাকার বাজার জুয়ার আড্ডায় পরিণত হইল এবং চারিদিকে একটা গুরুতর বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইল। স্মিথ কমিটির একমাত্র ভারতীয় সদস্য স্যর দাদিবা দালাল টাকার মূল্য ২ শিলিং হার নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে পূর্ব্ব হইতেই খুব জোর আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন। ফলত, তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী কিরূপ অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিল তাহা স্যর ষ্টানলী রিডের নিম্নলিখিত মন্তব্য হইতে বুঝিতে পারা যাইবে :—

A policy which was avowedly adopted to secure fixity of exchange, produced the greatest fluctuations in the exchanges of a solvent country and widespread disturbances of trade, heavy losses to the Government and brougt hundreds of big traders to the verge of bankruptcy.

স্মিথ কমিটির নিতান্ত অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্ত বজায় রাখিতে অসমর্থ হইয়া ১৯২১ সাল হইতে ১৯২৫ সাল পর্য্যন্ত ভারত-সরকার নিশ্চেষ্টভাবে ঘটনাস্রোতে গা ভাসাইয়া দিলেন—যদি দৈবাৎ সুদিনের নাগাল পাওয়া যায় এই ভরসায়। ১৯২৫ সালে ষ্টার্লিঙের মূল্য ১ শিলিং ৬ পেনিতে আসিয়া স্বর্ণমূল্যের সমান দাঁড়াইল এবং গভর্ণমেণ্ট টাকার মূল্যও ১ শিলিং ৬ পেনি অপেক্ষা যাহাতে অধিক না হয় তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ১৯২৬ সালে হিল্টন্ ইয়ং কমিশন 'গোল্ড বুলিয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ড' প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব করিলেন। তাহার প্রধান সূত্রগুলি এইরূপ—যদিও আইনতঃ স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন করা হইবে না, তথাপি স্বর্ণদ্বারাই জিনিষের মূল্যের পরিমাপ করা হইবে এবং রৌপ্যমুদ্রার মূল্য আইন করিয়া স্বর্ণের সহিত পাকাপাকি রকমে বাঁধিয়া দেওয়া হইবে। ভারত-গভর্ণমেণ্ট উক্ত বাঁধা হারে যথেচ্ছ পরিমাণ স্বর্ণমান সর্ব্বসাধারণের নিকট ক্রয় ও বিক্রয় করিতে বাধ্য থাকিবেন; কিন্তু পরিমাণে কেহ ১০৬৫ তোলা বা ৪০০ আউন্সের কম সোনা দিতে বা চাহিতে পারিবেন না। * নোট বা টাকার পরিবর্ত্তে যে-কোন উদ্দেশ্যে ন্যূনকল্পে উক্ত পরিমাণ স্বর্ণমান দাবি করা চলিবে। স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন বন্ধ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে সাধারণের চাহিদা-মত স্বর্ণমান দিবার নিয়ম করায় অর্থের পরিমাণ সঙ্কোচন ও প্রসারণ দ্বারা বিনিময়ের হার ঠিক রাখা অধিকতর সহজ হইবে, এই ব্যবস্থা হইতে ইঁহারা এই সুবিধা আশা করিলেন। একটি "রিজার্ভ ব্যাঙ্ক" প্রতিষ্ঠা করিয়া মুদ্রা-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করিবার ভার তাহার উপরে দিবার জন্য অতিপ্রয়োজনীয় একটি প্রস্তাবও ইঁহারাই করিলেন। এতকাল গভর্ণমেণ্ট বিনিময়ের যে হার নির্দ্দেশ করিয়া আসিয়াছেন তাহা স্থির রাখা সম্বন্ধে তাঁহাদের আইনতঃ কোন দায়িত্ব ছিল না। এক্ষণে ঐ দায়িত্ব গভর্ণমেণ্টের উপর বিধিমত আরোপিত হওয়ায় বাট্টার অনিশ্চয়তা অনেকটা হ্রাস পাইল। কিন্তু বাট্টার এই হার নির্দ্ধারণ করা লইয়া তুমুল তর্ক উপস্থিত হইল। উক্ত কমিশনের সুবিখ্যাত ভারতীয় সদস্য স্যর পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস ১ শিলিং ৬ পেনি হার নির্দ্ধারণের বিপক্ষে

* আইন-প্রণয়ন কালে ৪০ তোলার অনধিক স্বর্ণ ক্রয় করিতে গভর্ণমেণ্ট বাধ্য নহেন ইহাই নির্দ্ধারিত হয়।

ঘোর আপত্তি উত্থাপন করিয়া ১ শিলিং ৪ পেনি হার সমর্থন করিলেন। তিনি নানা প্রকারে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিলেন যে, ১ শিলিং ৪ পেনিই স্বর্ণের সহিত রৌপ্যের স্বাভাবিক হার। ১৮৯২ সালে হার্সেল কমিটি এই হারই নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন এবং ইহাই পঁচিশ বৎসর কাল (১৮৯২ হইতে ১৯১৭ পর্য্যন্ত) চলিয়া আসিতেছিল। লড়াইয়ের অভাবনীয় বিভ্রাটের দরুণ ইহার ব্যতিক্রম ঘটিলে ১৯১৯ সালে স্মিথ কমিটি নিতান্ত গায়ের জোরে এই অস্বাভাবিক সাময়িক অবস্থাকে স্থায়ী করিবার চেষ্টা করেন—ভারতের ভাগ্যে তাহার পরিণামও ভয়াবহ হয়। ভারত-গবর্ণমেণ্ট যখন এই ২ শিলিং হার রক্ষা করিবার নিস্ফল চেষ্টা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন, তখন (১৯২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে) বিনিময়ের হার স্বাভাবিক নিয়মে ১শিলিং ৪ পেনির কাছাকাছি নামিয়া আসিয়াছিল। সরকারী কাগজপত্র হইতে তিনি ইহাও দেখাইতে চেষ্টা করেন যে, স্বর্ণের সহিত রৌপ্যের যাহা স্বাভাবিক হার তাহার কিছু ঊর্দ্ধে হার নির্দ্ধারণ করিবার মতলব ভারত-সরকার পূর্ব্ব হইতেই পোষণ করিতেছিলেন। তিনি আরও বলেন যে, গভর্ণমেণ্ট তরফ হইতে প্রয়োজন অনুযায়ী মুদ্রার স্বাভাবিক প্রসারণ (expansion of currency) বন্ধ করিয়া বাট্টার স্বাভাবিক হার বেশী করিয়া দেখাইবার চেষ্টা হইয়াছে। বাট্টার হার ১শিলিং ৬ পেনি হইলে ভারতের সর্ব্বপ্রকারে কিরূপ অকল্যাণ হইবে তাহাও তিনি বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, ভারতের কৃষিজীবী ও অন্যান্যের দেনার পরিমাণ প্রায় ৮০০ কোটি টাকা। ইহার অধিকাংশ দেনা যখন করা হয় তখন টাকার মূল্য ১ শিলিং ৪ পেনি ছিল। এক্ষণে উহার মূল্য ১ শিলিং ৬ পেনি ধরা হইলে টাকার মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া হেতু দেনার পরিমাণ প্রকৃতপ্রস্তাবে শতকরা ১২॥ আনা বৃদ্ধি পাইয়া যাইবে। ভারতের এই অসহায় গরিবদের কথা ভুলিলে চলিবে না। বিনিময়ের হার অকারণে বেশী না ধরিয়া ১ শিলিং ৪ পেনি ধরিলে বিদেশে আমাদের মালের মূল্য ষ্টার্লিঙের হিসাবে কম পড়িবে এবং বিদেশী মালের মূল্য টাকার হিসাবে এদেশে বেশী পড়িবে ; সুতরাং আমাদের আমদানী কমিয়া রপ্তানী বৃদ্ধি পাইবে ; বাণিজ্যের গতি (balance of trade) আমাদের অধিকতর অনুকূল হইবে—ফলে ধনাগম হইয়া দেশের সমৃদ্ধি বাড়িবে। ইহাতে জিনিষের মূল্য চড়িলেও এতদ্দেশীয় শতকরা ৭৯ জন কৃষিজীবী তাহাদের কৃষিজাত পণ্যের মূল্য বেশী পাইয়া লাভবানই হইবে। লেখাপড়া জানা অল্প বেতনের চাকুরিয়াদের কিছু কষ্ট হইবে সত্য কিন্তু তাহাদের সংখ্যা বিবেচনা করিয়া তাহা ধর্ত্তব্য নহে। মজুরদের মজুরী লড়াইয়ের সময়ে অপ্রত্যাশিত ব্যবসা-স্ফীতির দরুণ এতটা বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, জিনিষের দর কিঞ্চিৎ বাড়িলেও তাহাদের বর্দ্ধিত মজুরীর ষোল আনাতে হাত পড়িবে না। "হোম চার্জ্জেস" বা বিদেশীয় অন্য দেনার জন্য আমাদিগকে যে টাকা বেশী দিতে হইবে তাহা অতিরিক্ত শুল্ক ও অন্যান্য পাওনা ও সুবিধা দ্বারা পোষাইয়া যাইবে। বলা বাহুল্য, কমিশনের অন্যান্য সদস্যগণ তাঁহার মতের সহিত এক মত হইতে পারেন নাই, এবং ১৯২৭ সালের মুদ্রা-আইনে অন্যান্য সর্ত্ত সহ তাঁহাদের অনুমোদিত বাট্টার হারই বিধিবদ্ধ হয়। এই মুদ্রানীতির নামকরণ হইল গোল্ড বুলিয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ড (Gold Bullion Standard)।

১৯২৯ সালের সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত দুনিয়ার আর্থিক অবস্থা ভালর দিকেই চলিল। কিন্তু তাহার পর হইতেই অপ্রতিহত গতিতে পণ্যদ্রব্যের মূল্য হ্রাস ও সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের অধোগতি হইতে সুরু করিল এবং দেশে দেশে বেকার সমস্যা বাড়িয়া চলিল। ১৯৩১ সালের নবেম্বর মাসে ইংলণ্ড স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের রৌপ্যমুদ্রাও স্বর্ণ হইতে সম্বন্ধচ্যুত হইয়া পুনরায় ষ্টার্লিঙের সহিত যুক্ত হইল। বাট্টার হার ১ শিলিং ৬ পেনিই রহিল। কিন্তু স্বর্ণের সহিত নহে ষ্টার্লিঙের সহিত। ষ্টার্লিঙের সহিত সম্বন্ধ হেতু ইহাকে 'ষ্টার্লিং এক্স্চেঞ্জ ষ্ট্যাণ্ডার্ড' বলা হয়। স্বর্ণমান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ষ্টার্লিঙের মূল্য যেমন অনির্দ্দিষ্টরূপে অনেকখানি নামিল, আমাদের রৌপ্যমুদ্রাও সঙ্গে সঙ্গে তেমনি নামিলেন। আজ পর্য্যন্ত সেই অবস্থাই চলিয়াছে—রাজার জয়ে জয়, রাজার ক্ষয়ে ক্ষয়। রাজভাগ্য অনুসরণ করা পরম সৌভাগ্য সন্দেহ নাই, কিন্তু একটা ক্ষোভ এই যে, গোল্ড এক্স্চেঞ্জ ষ্ট্যাণ্ডার্ড, ষ্টার্লিং এক্স্চেঞ্জ ষ্ট্যাণ্ডার্ড, বুলিয়ান এক্স্চেঞ্জ ষ্ট্যাণ্ডার্ডপ্রভৃতি স্বর্ণমানের

স্থিতিশীল করা বহুরূপ আমরা রাজ-অনুগ্রহে দেখিলাম কিন্তু স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠায় পুনঃ পুনঃ প্রতিশ্রুতি এবং বহু তোড়জোড় সত্ত্বেও স্বর্ণমানের সহজ সুন্দর রূপটির দর্শন আমাদের ভাগ্যে ঘটিল না।

আমদানী হ্রাস ও রপ্তানী বৃদ্ধি পাইয়া যাহাতে ধনাগম ও পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি হয় তদুদ্দেশ্যে দুনিয়ায় সব জাতিই আজ নিজ নিজ মুদ্রামূল্য যথাসম্ভব হ্রাস করিয়া বিনিময়ের সুবিধা গ্রহণের চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু আমাদিগকে ১৯২৭ সাল হইতে বহু প্রতিবাদ সত্ত্বেও সেই যে ১ শিলিং ৬ পেনি হারের সহিত বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে সেই বন্ধন হইতে আজও আমাদের মুক্তি ঘটিল না। তবে আমাদের একটি পরম সান্ত্বনা এই, অর্থশাস্ত্রের মুদ্রাতত্ত্বের অধ্যায়ে আমাদের দান নাকি অমূল্য, বড় বড় পণ্ডিতেরাও নাকি ইহা হইতে অনেক নূতন তথ্য জানিতে এবং অনেক চিন্তার খোরাক সংগ্রহ করিতে পারেন।

উলুখড়

শ্রীশান্তা দেবী

সংসার এতদিন আরাম আনন্দ আলস্য বিলাস সুখ সৌভাগ্যের ভিতর দিয়াই স্বচ্ছন্দ গতিতে চলিয়াছিল। আজ সেখানে মৃত্যুর করাল ছায়া পড়িয়া চিন্তা ও জীবনযাত্রার ধারা হঠাৎ মোড় ফিরিয়া গিয়াছে। কুবেরের আশীর্ব্বাদে খেলাধূলা আমোদ প্রমোদের সঙ্গেই এ সংসারের পরিচয়, যম-রাজার দরবারে দাঁড়াইয়া লড়াই করিতে ইহাদের আজ পর্য্যন্ত হয় নাই। তাই এই অনভ্যস্ত কাজে যে যত ব্যস্ত হইতেছে সে ততই ভুল ও গোল করিতেছে।

গাড়ী-বারান্দায় দুইখানা মোটর গাড়ী দাঁড়াইয়া। চালকেরা সন্ত্রস্ত। দরোয়ান উপর হইতে ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "ডাক্তার সাহেবকে এখনি আন্‌তে যেতে হবে, বহুজী বল্‌লেন—আর এক মুহূর্ত্ত দাঁড়াবে না।"

পর মুহূর্ত্তেই বাবুর খাস চাকর নামিয়া আসিয়া বলিল, "দুপুর বেলা যে ওষুধের কথা ডাক্তার সাহেব লিখে দিয়েছিলেন সেটা ত আনিয়ে রাখা হয়নি। আগে বাথগেট থেকে সেটা এনে তারপর যেন ডাক্তারের কাছে গাড়ী যায়।"

কিন্তু গাড়ী ততক্ষণ অনেক দূর চলিয়া গিয়াছে। অগত্যা দ্বিতীয় গাড়ীখানাই বাথগেটের দোকানে ছুটিল। সিঁড়িতে চাকরবাকরেরা গরম জল ঠাণ্ডা জল লইয়া ক্রমাগত ছুটাছুটি করিতেছে। উপরে উঠিলেই তাহাদের গলার আওয়াজ ক্ষীণ এবং পায়ের শব্দ মৃদু হইয়া আসিতেছে কিন্তু নামিবার বেলা সিঁড়িতে পা দিতে না দিতেই চিরকালের অভ্যাসমত পঞ্চমে গলা চড়িতেছে।

একটি অল্পবয়স্কা মেয়ে দ্রুতপায়ে সিঁড়ির কাছে আসিয়া বলিল, "তোমরা কি একদিনও গলা জাহির না ক'রে থাক্‌তে পার না? ফের যদি কারুর গলার আওয়াজ শুনি ত সব্বাইকে এক সঙ্গে বার ক'রে দেব।"

মেয়েটির বয়সের ওজন একেবারেই নাই বলিয়া দুই তিনটি দাসদাসী জবাবদিহি করিবার জন্য সমস্বরে গলা উঁচু করিয়াই সুরু করিল, "দিদিমণি, ডেকে ডেকে সাড়া না পেলে কি ..."

কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই নীচ হইতে একটি মহিলাকে উঠিতে দেখিয়া সব কয়জন একেবারে চুপ হইয়া গেল। মহিলাটির বয়স বছর বত্রিশ হইবে; অতি ক্ষীণ দীর্ঘ দেহযষ্টি জড়াইয়া কালো ভোমরা পাড়ের শুভ্র একখানি শান্তিপুরে শাড়ী একটা জীর্ণ গরদের হাতকাটা জামার উপর দিয়া ঘুরিয়া চাবির গোছা সমেত আঁচলটি পিঠে দুলিতেছে, মাথায় কাপড় নাই, একরাশি কালো চুল, অযত্নে হাতে জড়াইয়া এলো খোঁপা বাঁধা, তাহাতে কাঁটা ফিতার বালাই নাই। রুদ্ধ অশ্রুর আবেগে তাহার শ্যামবর্ণ মুখখানি লাল হইয়া উঠিয়াছে, মমতা-মাখা কালো চোখ দুটির করুণ দৃষ্টি অতি গভীর দেখাইতেছে।

ছোট মেয়েটির পিঠে হাত দিয়া নবাগতা জিজ্ঞাসা

করিল, "কেমন আছেন রে এখন?" ছোট মেয়েটি ভীত উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল, "কি জানি কেমন, ছুটো গাড়ী ত ডাক্তার আর ওষুধ আনতে গিয়েছে; বাবাও আজকে সারাদিনই বাড়িতে বসে আছেন। সেই যে তুমি গেলে তখন থেকে ত দেখছি উপরেই ঘোরাঘুরি করছেন। আমাদের ত মোটে যেতেই দিচ্ছে না কাছে, ডাক্তার নাকি গোলমাল একেবারে বারণ করেছে।"

রোগীর ঘরের সম্মুখের বারান্দায় আর একটি সালঙ্কারা বধূবেশা মেয়ে দাঁড়াইয়া একটা ওষুধের গোলা প্রস্তুত করিতেছিল। ইহাদের দেখিয়া হাতের ঔষধটা নামাইয়া একটা শ্বেত পাথরের টেবিলে রাখিয়া বলিল, "এস ভাই এস, তোমার কথাই হচ্ছিল।" সে কথার উত্তর না দিয়া অশ্রুমুখী মেয়েটি বলিল, "কিছু কি ভালর দিকে যাচ্ছে ভাই?..."

ডান হাতটা ঘুরাইয়া ঠোঁটের কোনটা একটু বাঁকাইয়া গম্ভীর মুখে বধূ বলিল, "আর ভাল? জ্ঞান বেশ টনটনে রয়েছে, কথাবার্ত্তা বেশ কইছেন, কিন্তু এদিকে ত সবই বিগড়ে যাচ্ছে। নিজেও সব বুঝছেন, তাই একে ওকে দেখতে চাইছেন। এই মাত্রই বলছিলেন—'কল্যাণী সেই যে গেল এখনও এল না। শেষে কি দেখাই হবে না?' "

শুনিতে শুনিতে কল্যাণীর মুখ বেদনায় ক্লিষ্ট হইয়া উঠিল, আঁচল দিয়া তাড়াতাড়ি আপনার উদ্গত চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া সে শুধু সংযত হইবার চেষ্টায় বলিল, "এই ওষুধটা দেবে বুঝি এখন!"

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই কল্যাণী রোগীর ঘরের ভিতর চলিয়া গেল। একটি প্রশস্ত চার-কোণা ঘরের এক পাশে ছোট একটি আলমারী, শ্বেত পাথরের ছুটি জল চৌকির উপর কতকগুলি বই খাতা ইত্যাদি; তাহার সম্মুখে একখানি গালিচা পাতা, দেওয়ালে একটি বৃদ্ধের প্রতিকৃতির নীচে একটি হরিনামের ঝুলি টাঙানো, ছবিটিতে বেলফুলের একটি শুষ্কমালা ঝুলিতেছে তাহার নীচে একগোছা ধান। অন্যদিকে ছোট ছুটি কাপড়-ঢাকা টেবিলে নানারকম ঔষধ ও পথ্য, তাহার পাশে ছুটি হাতলহীন চেয়ার ও নীচু একটা কাঠের চৌকির উপর এক কুঁজা জল। ঘরের মাঝখানে একহারা একটি কালো খাটে শুভ্র বিছানার উপর শীর্ণ একটি মানুষ গরদের চাদর চাপা দিয়া পড়িয়া আছেন। শিয়রের কাছে শ্বেতবসনা নর্স বসিয়া। কল্যাণী খাটের এক পাশে বসিয়া ধীরে রোগীর গায়ে হাত রাখিল। রোগী তাহার দিকে মুখ ফিরাইয়া ছুই হাতে ব্যাকুলভাবে কল্যাণীর সর্ব্বাঙ্গে সস্নেহ স্পর্শ বুলাইয়া বলিলেন, "এতক্ষণে এলি মা? কাছে কাছে থাকিস্ বাছা, কখন আছি কখন নেই কে জানে?"

মুখের কাছে ঝুঁকিয়া কল্যাণী বলিল, "আমার ননদ হঠাৎ অসুখে পড়েছেন তাই আসতে একটু দেরী হয়ে গেল। কিন্তু আজ রাত্রে আর যাব না, এইখানেই থাকব। তুমি কিছু ভেবো না মা।"

মা বলিলেন, "আয় মা, কচি মেয়ের মত একটু কোলের কাছে ঘেঁষে বোস্। তুই যে আমার কোলের মেয়ে, যাবার সময় বুকটা সেই সুখে একটু ভরে নিয়ে যাই। বাপ ত সেই কবে ফেলে চলে গেছে, এইবার মাও চল্‌ল। চোখের পাতায় পাতায় রেখে তোকে মানুষ করেছিলাম, পরের ঘরে সঁপে দিয়ে কত ভেবেছি কত কেঁদেছি। কখনও তোর মুখ একটু ম্লান দেখলে রাত্রে আর ঘুম আসত না। এখন চিরদিনের মত ওপারে গিয়ে কি ক'রে কাটাব জানি না। তোর মুখের দিকে তাকাবার কেউ রইল না মা এ সংসারে। আশীর্ব্বাদ করি চির স্বামী-সোহাগিনী হস্।"

কল্যাণী মা'র বুকের ভিতর মুখ গুঁজিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। আবার এক মুহূর্ত্তেই আত্মসম্বরণ করিয়া লইয়া বলিল, "মা, অত দুর্ব্বল শরীর নিয়ে এত কথা বলো না, অমন করে ভেবো না। একটু চুপ ক'রে শুয়ে থাক, আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দি।"

কিছুক্ষণ ঘর নিস্তব্ধ হইয়া রহিল, মা পাশ ফিরিয়া শুইলেন। কল্যাণী বাঁ হাতের উপর মুখ রাখিয়া মেঝের দিকে তাকাইয়া কি একটা চিন্তায় মগ্ন হইয়াছিল। ঘরে নীল ঢাকনির তলায় স্বল্পতেজ বৈদ্যুতিক আলো জ্বলিতেছিল। হঠাৎ মা শীর্ণ অঙ্গুলি দিয়া কল্যাণীকে ঠেলিয়া বলিলেন, "আমার লোহার সিন্ধুকের চাবি যে তোর আঁচলে ক'দিন আগে বেঁধে দিয়েছিলাম দেখি সেটা।"

কল্যাণী চাবি দেখাইল। মা বলিলেন, "খোল দেয়ালের গায়ের আলমারীটা।" কল্যাণী একটু বিরক্ত হইয়া বলিল, "এখন কেন মা ওসব? তুমি সেরে উঠে যা হয় করো।"

মা বলিলেন, "আমি সারব কি না-সারব তোর চেয়ে তা কি আমি কম বুঝি? আমায় ছেলে-ভোলাতে হবে না, যা বলছি কর্।"

কল্যাণী দেওয়ালের গায়ে গর্ত্ত করিয়া বসানো লোহার সিন্ধুকটি খুলিতেই মা বলিলেন, "বাক্স তিনটে এইখানে নিয়ে আয়।"

নীরবে-আসীন নর্স সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কল্যাণীকে চুপি চুপি বলিল, "আমি একটু বাইরে বসি গিয়ে।"

বৃদ্ধা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "তোমাকে কোথাও যেতে হবে না বাছা এখন; একবারটি নিরঞ্জন, বৌমা, বুলবুল আর কাত্যায়নীদের ডেকে নিয়ে এসে এইখানেই ব'স।"

পা টিপিয়া টিপিয়া নর্স বাহিরে চলিয়া গেল। কল্যাণী গহনার বাক্স তিনটি মা'র খাটের উপর আনিয়া রাখিয়া আবার ধীরে ধীরে মা'র কপালে হাত বুলাইতে লাগিল। এই সমস্ত ব্যাপারের সাহায্যে মৃত্যুকে আসন্ন বলিয়া মানিয়া লওয়াটা তাহার মনকে দুঃসহ পীড়া দিতেছিল, তবু কি বলিতে কি বলিয়া মাকে চটাইয়া ফেলিবে ভাবিয়া সে কোনো মতামত প্রকাশ করিল না।

নর্সের পিছন পিছন হাঁপাইতে হাঁপাইতে কল্যাণীর দাদা নিরঞ্জন আপনার বিপুল দেহভার টানিয়া প্রায় ছুটিয়াই ঘরে ঢুকিলেন। তাঁহার মুখে চোখে ব্যাকুল সপ্রশ্ন ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে, বধূ বাহিরেই কাজে ব্যস্ত ছিলেন, মাথার ঘোমটা আর একটু বেশী টানিয়া দিয়া শাশুড়ীর পায়ের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। নিরঞ্জনের বালিকা কন্যা বুলবুল হতবুদ্ধির মত বিস্ফারিত চোখে সকলের মুখের দিকে চাহিতে চাহিতে খাটের পাশে বসিয়া পড়িল। গৃহিণীর ভগিনী কাত্যায়নী দিদিকে দেখিতে দেশ হইতে কয়েকদিন মাত্র সপুত্র আসিয়াছেন। রোগীর ঘরে নানা স্বেচ্ছাচার হয় বলিয়া তিনি বড় সে ঘরে যান না, আপনার নির্দ্দিষ্ট ঘরে গঙ্গাজল গঙ্গামাটি তুলসীমালা ইত্যাদি লইয়াই ব্যস্ত থাকেন। নর্সের ডাকে তিনি, 'ও মাগো কি হলো গো দিদির?' বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে দিদির গায়ের উপর আসিয়া পড়িলেন। কাত্যায়নীর পুত্র গণেশ ঘরের ভিতর ঢুকিতে ইতস্তত করিয়া দরজার নিকটেই দাঁড়াইল।

নিরঞ্জন ব্যস্তভাবে কাত্যায়নীকে মাতার নিকট হইতে একটু সরাইয়া একটা চেয়ারে বসাইয়া দিয়া মার মুখের কাছে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া বলিলেন, "মা, তোমার কি বড় অসোয়াস্তি লাগছে, এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন মা? ডাক্তার ত ঘণ্টা খানিকের মধ্যেই এসে পড়বেন খবর পেলাম।"

মা বলিলেন, 'না বাবা, তার জন্যে ব্যস্ত হই নি। তোদের সবাইকে একবার একসঙ্গে দেখে নি, দুটো কথা মন খুলে বলে নি। এর পর আর ক্ষমতা যদি ভগবান নাই রাখেন। এই জিনিষ পত্রগুলোরও ত একটা ব্যবস্থা ক'রে যেতে হবে।"

খাটের উপর গহনার বাক্স দেখিয়া নিরঞ্জন বিরক্ত হইয়া বলিল, "ওসব আবার এখন কেন? ওর ব্যবস্থা করবার কি আছে বুঝতে পারছি না। ওর যা ব্যবস্থা তা ত আপনিই হয়ে পড়বে। তোমার কাউকে কিছু বল্‌বার কি দেবার ইচ্ছা থাকে ত বল, আমরা তোমার ইচ্ছামত ক'রে দেব।"

কল্যাণী বলিল, "মা, দাদা ত ঠিক কথাই বলছেন। আমাদের অদৃষ্টের দোষে তুমি যদি আমাদের ছেড়েই চলে যাও, তখন যা বুঝিয়ে দেবার-নেবার সে ত করতেই হবে। তুমি যেমন এতদিন সব কর্‌ছ তেমনি দাদাও করবেন। কিন্তু এখন কেন মা, শুধু শুধু দুর্ব্বল শরীরে ও সব কথা বলে নিজেকে ক্লান্ত কর্‌ছ, আমাদেরও দুঃখ দিচ্ছ?" বলিতে বলিতে কল্যাণীর চোখের জল আবার বাঁধ ভাঙিয়া ছুটিল।

মা ক্ষীণ হাসিয়া বলিলেন, "ওরে, তোরা অমন ক'রে কি আমার মরণ ঠেকিয়ে রাখতে পারবি? আমার কাজ ফুরিয়েছে, এখন যাওয়াই যে আমার মঙ্গল। আমার শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করতে বাধা দিস্ নে। আমার হিসাব-নিকাশ চুকিয়ে নিতে দে। আর আমার সময় নেই আমি জানি।"

নিরঞ্জন বাক্স তিনটার চাবি খুলিয়া মা'র একেবারে হাতের কাছে আনিয়া দিল। গৃহিণী প্রথমেই এক তাড়া কাগজপত্র বাহির করিয়া বলিলেন, "নাও বাবা, তোমাদের ঘরবাড়ির দলিলপত্র দেখেশুনে নাও। কোনোদিন ত এসব কিছু করতে হয় নি। এইবার নিজের বুঝে নিজের মত ক'রে করো।"

নিরঞ্জন অস্পষ্ট স্বরে বলিল, "এই সব বাজে কাজ নিয়ে এমন ক'রে আয়ুক্ষয় করার মানে বুঝতে পারি না।"

সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া একটা বাক্সের তলা হইতে

কতকগুলি গিনি মুঠায় করিয়া তুলিয়া গৃহিণী বধূর হাতে দিয়া বলিলেন, "ঝি-চাকরদের ডেকে একটা একটা দাও।"

বাড়ীর যত চাকর দাসী আসিয়া মাটিতে শুইয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া এক-একটা মোহর লইয়া বাহিরে গিয়া দাঁড়াইল। পাকা সোনার এক ছড়া সরু লম্বা দড়িহার বাহির করিয়া তারপর গণেশকে হাতছানি দিয়া ডাকিয়া বলিলেন, "এ আমার মায়ের গলার হার বাবা, তোমার বউকে দিলাম; সর্ব্বদা গলায় রাখতে বলো।" তারপর রেশমে গাঁথা এক জোড়া লবঙ্গ ফুলের কঙ্কণ তুলিয়া বলিলেন, "কাতু, মার হাতে এ গয়না কতদিন দেখেছিলি মনে আছে বোন? এ জোড়াটি দিদিকে মনে ক'রে পরবি।" কাতু কাঁদিতে কাঁদিতে গহনা আঁচলে বাঁধিলেন; গৃহিণী একটি পেটা সোনার হাঁসুলি তুলিয়া বলিলেন, "আমার সাধের সময় আমার শাশুড়ী দিয়েছিলেন, নাতিকে দিয়ে যাব মনে করেছিলাম। তা নাতিই চোখে দেখলাম না। এটি তোর জ্যাঠাইমার নাতিকে দিস্ বাছা, কালই হয়ত তারা আসবে।"

নিরঞ্জন মুখ নীচু করিয়া বসিয়াছিল, হাঁসুলিটা হাতে লইয়া মুখ তুলিয়া বলিল, "মা, তুমি আর কত কথা বল্‌বে?"

মা বলিলেন, "যে কটা বলতে পারি এই শেষ বলে নিতে দে বাবা। আমার বুলবুল দিদি, এদিকে আয় ত ভাই। গলার এই সাতনহর খুলে শাশুড়ী আমার মুখ দেখে ছিলেন, এটি তোর বিয়ের দিনে পরিস্ ভাই। আর বৌমা লক্ষ্মী, এই সরস্বতী হার ছড়া তোমায় দিলাম, তোমার শ্বশুরের প্রথম রোজগারের টাকায় গড়ানো।"

বধূ শাশুড়ীকে প্রণাম করিয়া হারটি গলায় গলাইয়া লইল। মা এই বার কল্যাণীকে কাছে টানিয়া লইলেন, "আমার মা লক্ষ্মী, বাপমায়ের এক মেয়ে তুই। তোকে কি-ই বা দিতে পেরেছি, মা? বড় সাধ ছিল, বড়ঘরে বিয়ে দেব, তাও অদৃষ্টে হ'ল না। বাপ-মাকে ক্ষমা করিস্, বাছা। মনে যা সাধ ছিল তেমন ক'রে ত দিতে পারলাম না। তবে মেয়ে তুই, মা'র গহনার দাম টাকার চেয়ে অনেক বেশী জানিস ত? এই ক'খানা তাই তোকে দিয়ে গেলাম।"

কল্যাণী মুখ নীচু করিয়াই বলিল, "থাক্ না মা এখন।" মা বলিলেন, "না, আমার সাম্‌নে সব পরতে হবে। কাতু, এক একখান ক'রে পরিয়ে দে দিকি ভাই। নিজের চোখে একবার দেখে যাই।"

আটপৌরে গহনার বাক্সে চুড়ি বালা, হার দুল আংটি সোনার ফুল-কাঁটা চিরুণী, তাগা প্রভৃতি প্রায় চল্লিশ ভরির গহনা ছিল। সেগুলি সব নিঃশেষ করিয়া পরাইয়া কাত্যায়নী হাত গুটাইতেই গৃহিণী অন্য বাক্সটি দেখাইয়া দিলেন। নিরঞ্জন একবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "এটা কাকে দিচ্ছ?" মা বলিলেন, "কল্যাণীকেই।"

হীরার কণ্ঠি, হীরার কঙ্কণ, হীরার দুল, হীরার আংটি, মুক্তার মালা, মুক্তার চুড়ি, জড়োয়া বালা, জড়োয়া তাবিজ, পরাইতে পরাইতে কাত্যায়নীর চোখ বিস্ময়ে ঠিকরাইয়া আসিতে লাগিল। পল্লী বধূর চক্ষে ইহা আলাদিনের ঐশ্বর্য্য। কল্যাণী সঙ্কোচে জড়-সড় হইয়া ঘামিয়া উঠিতেছিল, আর থাকিয়া থাকিয়া আঁচলে চোখের জল মুছিতেছিল।

কাত্যায়নী বলিলেন, "হ্যাঁ দিদি, এ কত হাজার টাকার গয়না হবে ভাই?"

গৃহিণী বলিলেন, 'মনে কি আছে ছাই ভাল ক'রে। পচিশ-ত্রিশ হাজার হবে, কিছু বেশী-কমও হতে পারে। মেয়েকে আর ত কিছু দেবার আমার নেই, শুধু গয়নাই ক'খানা পরিয়ে দিচ্ছি। কল্যাণী, একবারটি উঠে দাঁড়া ত মা, দেখি কেমন মানিয়েছে।"

কল্যাণী মাকে প্রণাম করিয়া সজল চক্ষে আরক্ত মুখে উঠিয়া দাঁড়াইল। মণিমাণিক্যের দ্যুতিতে মরণের শিয়রে যেন উৎসবের আলো জ্বলিয়া উঠিল। সকলের বিস্মিত মুগ্ধ দৃষ্টি কল্যাণীর উপর। বিধবা গৃহিণী কতকাল পূর্ব্বে অলঙ্কার প্রসাধন ছাড়িয়া দিয়াছেন; তাঁহার যে এত গহনা ছিল তাহা তাই যেন আজ ঘরের লোকেও নূতন করিয়া আবিষ্কার করিল। নিরঞ্জন আরক্ত মুখে কি বলিতে গিয়া ফিরিয়া দেখিল পিছনে বাঙালী ও ইংরেজ দুই ডাক্তার দাঁড়াইয়া বিস্ফারিত নেত্রে কল্যাণীকে দেখিতেছে। নিরঞ্জনের উপর চোখ পড়িতেই বাঙালী ডাক্তার বলিলেন, "রুগীর ঘরে এত গহনার একজিবিশন হচ্ছে কেন?" নিরঞ্জন বিরক্তিতে মুখটা বাঁকাইয়া বলিল, "মা'র খেয়াল।" কল্যাণীর দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি তুলিয়া সে মুখ নামাইয়া লইল।

গৃহিণীর আনন্দোজ্জ্বল মুখের দিকে তাকাইয়া ইংরেজ

ডাক্তার বলিলেন, "রোগীর ইচ্ছায় এখন আর বাধা দিও না। তবে এখানে আর যেন অযথা বেশী গোলমাল না হয়।"

বাগবাজারের গলির ভিতর গলি। স্‌র্য্যের আলো কখনও এখানে পড়ে কি-না একবার মাত্র দেখিয়া বলা শক্ত। প্রতি দরজার মুখের কাছেই প্রতিবাসীর আঁস্তাকুড়। পথিকদের অনেক কষ্টে বাঁকিয়া চুরিয়া ডিঙ্গাইয়া পা ফেলিবার জন্য এক বিঘৎ পরিমাণ পরিষ্কার ভূমিখণ্ড প্রতি পাদক্ষেপে আবিষ্কার করিয়া চলিতে হয়। সেটুকুও শুষ্ক নয়, এমনই দুর্ভাগ্য।

পুরানো দু-তিন মহলা একটি বাড়ির সামনে একটা মোটর গাড়ী আসিয়া থামিল। কয়েকটি বালিকা উলঙ্গ শিশু কোলে এবং হাতে ধরিয়া গাড়ী দেখিতে একেবারে সেই আবর্জ্জনার রাশির ভিতর আসিয়া দাঁড়াইল। খোলা চুলের উপর ঘোমটা টানিয়া শোকক্লিষ্টা সাশ্রুনয়না কল্যাণী একটি ছেলের হাত ধরিয়া গাড়ী হইতে নামিল। পথের লোকের সকৌতুক দৃষ্টি এড়াইবার জন্য সে কল্যাণীকে প্রায় টানিয়া উঠানের ভিতর লইয়া গেল। একটা ছোট উঠানের পর একটুখানি পায়ে-চলা বাঁকা পথ পার হইয়া আর একটা বাঁধানো উঠান। তাহারই প্রান্তে কল্যাণীদের বাড়ির অংশ। উপরের একখানি ঘর ছাড়া এদিকটা সবই একতলা।

কল্যাণী সোজা উপরে গিয়া নিজের ঘরের মেঝেতে লুটাইয়া পড়িল। সে সব শেষ করিয়া আসিয়াছে। শুধু মা'র মৃত্যু নয়, শ্রাদ্ধ শান্তি সব। যত দিন শ্রাদ্ধ হয় নাই, মনে হইত মার পীড়া, মা'র মৃত্যু যেন একটা দুঃস্বপ্নের বিভীষিকা মাত্র। সত্য সত্য মা যেন কোথায় হাওয়া খাইতে গিয়াছেন, আবার কখন অলক্ষিতে আপনার ঘরে ঢুকিয়া পুরানো সোনার চশমা জোড়া পরিয়া শ্বেত পাথরের চৌকির পাশে ঝুঁকিয়া বসিয়া সংসারের হিসাব লিখিতে থাকিবেন, নয় ত তসরের থান পরিয়া নিভৃতে একমনে কালো পাথরের উপর মটর ডালের বড়ি দিতে থাকিবেন, অথবা হয়ত দেখা যাইবে মা খাটে শুইয়া পাকাচুল-সন্ধানে-নিরতা বুলবুলকে পাড়াগাঁয়ের নীলকণ্ঠের যাত্রার গান শুনাইতেছেন। মা'র তীক্ষ্ণ মধুর কণ্ঠস্বর যেন হঠাৎ স্পষ্ট কানে বাজিয়া উঠিত। যেন মনে হইত ওই আলিসার উপর মা'র শাদা কাপড়খানা এখনও উড়িতেছে। গান শেষ না করিয়াই এই বুঝি মা বৃষ্টির ভয়ে কাপড় তুলিতে চলিলেন। পিঠ ভরা এলোচুলের উপর বৃষ্টির ফোঁটা মুক্তার মত ঝরিয়া পড়িল।

কিন্তু হায়, কাল যে পাঁচ-ছয় শত লোক মিলিয়া খাইয়া দাইয়া হাসিয়া কাঁদিয়া বকিয়া বকাইয়া হাজার রকমে কল্যাণীর চেতনা ফিরাইয়া দিয়াছে। মা নাই, নাই, নাই, মা তাহার চিরদিনের মত বিদায় লইয়াছে। আর সে বাড়িতে থাকা যায় না। মা'র মৃত্যুর দিনটা যত পিছনে চলিয়া যাইতেছিল ততই মমতা দিয়া মৃত্যু-ক্ষতকে ঢাকা দিয়া বাড়ির প্রতি কোণে কোণে তাহার এতকালের মাকে সে আবার সকলরূপে গড়িয়া দেখিতেছিল। কাল তাহার মায়ায়-গড়া সে মাতৃমূর্ত্তি হাজার লোকে টানিয়া ফেলিয়া দিয়াছে। তাই সে দূরে পলাইয়া আসিয়াছে। এখান হইতে আজ চৌদ্দ বৎসর সে তাহার মাকে মানস-চক্ষে যখন যেমন খুশী তেমনি সহস্র কাজে ঘুরিতে দেখিয়াছে। আবার তেমনি করিয়া এই দূর হইতে সে দেখিবে তাহার চিরজীবন্ত কর্ম্মময়ী মাকে। মৃত্যুর দুঃসহ রূপ এই দূরত্বের ছায়ায় ম্লান হইয়া মিলাইয়া থাকিবে।

কল্যাণী উঠিয়া বসিল। এমন করিয়া ধরাশয্যা লইয়া পড়িয়া থাকিলে হয়ত আবার দশজন সান্ত্বনা দিতে আসিয়া তাহাকে যন্ত্রণা দিয়া মারিবে। ঘরে কয়দিন হাত পড়ে নাই, বিছানার চাদরটা অত্যন্ত ময়লা, আলনায় কুড়ি দিনের কাপড় ঝুলিতেছে, জিনিষপত্রে সাত পুরু ধূলা, এইগুলাই না হয় ঠিক করা যাক্।

জানলার পাশ দিয়া দুই-একজন যাওয়া আসা করিতেছিল, কল্যাণীকে গম্ভীর মুখে কাজে মগ্ন দেখিয়া কেহ ভিতরে ঢুকিতে সাহস করিল না। অতি-পরিচিত পদশব্দ পিছনে শোনা গেল। কল্যাণী বালিশে পরিষ্কার ওয়াড় পরাইতেছিল, মুখ তুলিল না। সে আসিয়া পিছন হইতে কাঁধের উপর ধীরে হাত রাখিয়া বলিল, "এসেই অমনি কাজ-কর্ম্ম না হয় নাই করলে। ও পড়ে থাক্ গিয়ে। এস এইখানে একটু বসি।"

কল্যাণী দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই স্বামীর কাঁধে মাথা রাখিয়া কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিল।

স্বামী তাহাকে খাটের উপর বসাইয়া মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, "বাইরে কাজে জড়িয়ে গিয়ে আমার শেষ সময় একবার দেখাও হ'ল না। বড় দুঃখ থেকে গেল। যাবার সময় হয়েছিল গিয়েছেন, তোমাদের সকলকে রেখে গেলেন,

এ ত ভাগ্যের কথা. এতে অধীর হোয়ো না কল্যাণী। মানুষের মন দুঃখ পায়; কিন্তু ভেবে দেখ এতে দুঃখের কি কিছু আছে?"

কল্যাণী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "মা যাওয়ার চেয়ে বড় দুঃখ মেয়েমানুষের আর কিছু নেই।"

স্বামী বলিলেন, "আছে বই কি। ভগবান তোমাকে সে দুর্ভাগ্য দেন নি, তাই বুঝতে পারছ না আজ। মনটা ঠাণ্ডা হ'লে পৃথিবীতে কোন্ দুঃখ সবার বড় আস্তে আস্তে বুঝতে পারবে।"

স্বামীর উপদেশে সত্য থাকিলেও কল্যাণীর শোকক্লিষ্ট হৃদয়ে কথাটা তীরের খোঁচার মত দুঃসহ লাগিল। সে কোনো জবাব দিল না, শুধু "মা, মাগো" বলিয়া দুইহাতে মুখখানা একবার ঢাকিল। হীরালাল সান্ত্বনা দিবার কোনো চেষ্টা না করিয়া খাট ছাড়িয়া উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। নিঃসঙ্গ কল্যাণী আবার উঠিয়া ঘরের কাজে মন দিল। ঘর গোছাইয়া স্বামীর বিকালের জলখাবার সাজাইয়া আসন পাতিয়া সে হীরালালকে ডাকিতে গেল। খাইতে বসিয়া হীরালাল অন্যদিন পারত পক্ষে কথা বলে না। কিন্তু আজ এতদিন পরে কল্যাণী বাড়ি আসিয়াছে, তাহার কাছে একেবারে চুপ করিয়া থাকিতে নিজেরই অস্বস্তি লাগিতেছিল। হীরালাল বলিল, 'মা'র বুদ্ধি এত বয়সেও আশ্চর্য তীক্ষ্ণ ছিল। শোবার আগের দিন পর্য্যন্ত না কি খাতাপত্র সব নিজে দেখে লিখে গিয়েছেন।"

কল্যাণী উৎসাহিত হইয়া বলিল, "হাঁ, আমার জ্ঞান হয়ে অবধি মাকে কখনও একদিনের একটা হিসাব বাদ দিতে দেখি নি।" হীরালাল বলিল, "অমন বিবেচনাও স্ত্রীলোকের প্রায় দেখা যায় না। তার উপর ত সজ্ঞানেই প্রায় গিয়েছেন।"

কল্যাণী বলিল, "সত্যি, যাকে যা বল্‌বার কইবার কোনোটি এতটুকু ভোলেন নি; শুনলে অবাক্ হবে।"

হীরালাল উৎসাহিত হইয়া বলিল, 'সংসারের সব দিকে নিশ্চয়ই সুব্যবস্থা ক'রে গিয়েছেন। পরে গোলমাল বাধবার পথ রেখে কি আর তিনি যাবেন?"

এতটা বৈষয়িক প্রশ্নে কল্যাণীর সদ্য-শোকাহত মন সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। স্বামী যে ক্রমেই স্পষ্টতর করিয়া ঘরের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটির খোঁজ করিবেন বুঝিতে পারিয়া তাহার মন খুলিয়া কথা বলিবার স্পৃহা কমিয়া আসিতেছিল। তাহার মা না হইয়া দূরসম্পর্কীয় কোনো বর্ষীয়সীর কথা হইলে স্পষ্ট বৈষয়িক প্রশ্নে মৃত্যুর মর্য্যাদাহানি নিশ্চয় সে অনুভব করিত না। কিন্তু এই নিকটতম সম্পর্কের ক্ষেত্রে শুধু বিয়োগবেদনাকেই বহুদিন ধরিয়া নানা সুখদুঃখ হাসিকান্না প্রেম ও ভক্তির বিচিত্র রসের ভিতর দিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া পাইতে ইচ্ছা করিতেছিল। অসংখ্য স্মৃতির স্পর্শে বেদনা যত গভীর হইতে গভীরতর রূপে বার বার জাগিয়া উঠিবে, ততই যেন তাহার মাতৃঋণের বোঝা একটু একটু করিয়া হাল্কা হইবে।

কথার জবাব না পাইয়া হীরালাল বলিল, "সন্তান বলতে ত মাত্র তোমরা দুই ভাইবোন; তাছাড়া মা'র জিনিষপত্র, স্ত্রীধন, সে ত মেয়েই পায়। এর ভিতর গোলমালের ত কোনো কথাই নেই। তবে তোমার অবস্থা ত ভাল নয়, সেটাও যদি বিবেচনা ক'রে থাকেন ত যথার্থ কাজ হয়েছে।"

কল্যাণী একটু বিরক্তির সুরেই বলিল, "আমার আবার অবস্থা? ছেলে না পিলে না যে তার জন্যে ভাব্‌তে হবে? মেয়েছেলের বিয়ে দিয়ে যাওয়া মানেই তার একটা ব্যবস্থা ক'রে যাওয়া। তার উপর আবার বেশী কিছুর আশা কেন আমি করতে যাব? অবস্থা আমার যেমনই হোক্ সে আমারই অদৃষ্ট; তার জন্যে তাঁরা কেন দায়ী হতে যাবেন?" হীরালাল বলিল, "ছেলেপিলে আজ নেই বলে কোনোদিন থাক্‌বে না এমন ত কথা নেই। তাছাড়া যেটা আছে সেটাকে অষ্ট-প্রহর অত পর নাই ভাবলে। আমি চোখ বুজলে তুমিই ত তার সব। তখন তার ভাল কিসে হয় দেখবে না?"

কল্যাণী বলিল, "ওসব কথা বলে আর আমায় মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দিও না। ও আমারই ত ছেলে, ওর জন্যে প্রাণপাত আমি করবই; কিন্তু যারা ওর পর তাদের টাকা দিয়ে ত ওকে সুখে রাখতে চাওয়া যায় না।"

হীরালাল বলিল, "প্রাণটা সত্যি সত্যি পাত করতে হ'লে আর টাকাটাকে অত অবহেলার জিনিষ মনে হবে না। ও ছেলেটাত পর, তার জন্যে সত্যিই কিছু বলছি না। তোমারই পেটে ভাত না পড়লে ও সব ভাবুকতা আর টিঁকবে না। যার কাছে হাসিমুখে নিজের দাবি বলে যা

চেয়ে নিতে পার্‌তে ভায়ের কাছে চোখের জলে তারি জন্যে ভিক্ষার মত হাত পাততে হবে।"

কল্যাণী বলিল, "যেদিন হবে, সেদিনও এই মনে করে মনে একটা তৃপ্তি হবে, যে মরার সময় মা'র কাছে টাকার কাঙাল হয়ে যাইনি, মা হারাবার শোকটা অন্তত ছিল খাঁটি।"

হীরালাল অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিল, "তুমি কি সত্যি সত্যি কিছুই পাও নি?"

কল্যাণী মুখ ফিরাইয়া চোখের জল লুকাইয়া বলিল, "অমন সময় মার কাছে কি একটা কাণা কড়িও চাওয়া যায়?"

হীরালাল আরও ব্যগ্রতার স্বরে বলিল, "কিন্তু তিনি নিজে—? তিনি কি তোমার কোনো ব্যবস্থাই ক'রে গেলেন না। ছেলে রাজ ঐশ্বর্য্য ভোগ করবে, আর মেয়েটাকে কি পথে বসিয়ে গেলেন?"

কল্যাণী বলিল, "অমন ক'রে কেন বল্‌ছ? তোমার হাতে তিনি কি আমায় সঁপে দিয়ে যান নি? তোমার অন্নে আমার কি দাবী নেই?"

হীরালাল বলিল, "অন্ন ত আমার আছে অষ্টরম্ভা! আমায় কে দেখে তার ঠিক নেই, আমি যাব পরের দায় নিতে! সে যাক্ গে— এখন পষ্ট ক'রে বল দেখি, মা তোমায় কি দিয়ে গেলেন?"

কল্যাণী ইতস্তত করিতে লাগিল, ইচ্ছা করিতেছিল বলে, "কিছুই না," কিন্তু মিথ্যাটা মুখে বাধিল তাই বলিল, "গহনাগাঁটি ত প্রায় সবই আমায় পরিয়ে দিয়েছিলেন।"

হীরালাল সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল, "প্রায় সব মানে? তাতেও কি বৌ আধাআধি বখরা করেছেন? সে সব কত টাকার হবে শুনি? পাঁচ-সাত হাজার হবে, না আরও কম?"

কল্যাণী ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল, "অত আমি জানি না" বলিয়া চোখের জল মুছিতে মুছিতে বাহিরে চলিয়া গেল।

হীরালাল পিছন হইতেই বলিল, "জিনিষগুলো দেখাও না দেখি, কোথায় আছে? পরিয়ে ত তিনি দিয়েছিলেন, কিন্তু তুমি যেখানে সেখানে ফেলে আস নি ত ছেলেমানুষী ক'রে?"

কল্যাণী জানিত আদালতেও যেখানে ফাঁকি চলে, সেখানেও তাহার স্বামীর হাত এড়াইয়া সে যাইতে পারিবে না। স্ত্রীর মনের একটা সাময়িক শোকাবেগকে হীরালাল এতখানি সম্মান দিতে রাজি নয় যাহার জন্য গহনার কথাটা দুই-চার দিন চাপা দেওয়া যায়। কল্যাণী বলিল, "না, না, মা'র গহনা ফেলে আসব, আমি কি এতই পাগল? সে আমি লোহার সিন্দুকে তুলে রেখেছি।"

হীরালাল বলিল, "তোমার ঐ পচা সাতকেলে লোহার সিন্দুকটায়? ওর চেয়ে ত ক্যাওড়া কাঠের সিন্দুকও মজবুত! চল দেখি একখানাও আছে না চোরের পেটে গেছে।"

চাবি খুঁজিতে অনেক সময় গেল। কাপড়ের আলমারীর তলার থাক হইতে চাবি বাহির হওয়া পর্য্যন্ত হীরালাল কল্যাণীর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতে ও অসহিষ্ণু ভাবে প্রশ্ন করিতে লাগিল, "লোহার সিন্দুকের চাবি আবার খুঁজে বেড়াতে হয় শুনি নি কখনও।" "কোথায় রেখেছ বল, আমিই বার করছি।" "বাপের বাড়িতে ত আর যাওনি, তবে যাবে কোথায়" ইত্যাদি;

চার পুরুষ পূর্ব্বেকার মরিচাধরা জীর্ণ আলমারী ক্যাঁচ কোঁচ করিয়া খুলিল, কিন্তু তাহাতে কল্যাণীর পুরাতন গহনার বাক্স ও দুই-চারিটি কীটদষ্ট দলিলপত্র ছাড়া আর কিছু নাই। হীরালাল চীৎকার করিয়া উঠিল, "কল্যাণী, তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? ঠিক ক'রে বল গহনা কোথায়, নয়ত এখুনি পুলিসে খবর দেব।"

কল্যাণী মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল, তারপর শ্রান্ত দৃষ্টি স্বামীর মুখের দিকে তুলিয়া বলিল, "দেখছ আমার মনের ভুল? মা'র ঘরের সিন্দুকেই চাবি দিয়ে রেখে এসেছি, এ বাড়ি মোটে আনাই হয় নি। আসবার সময় আনব মনে ক'রে ভুলে গেলাম।"

হীরালাল বলিল, "এখন আর গাড়ী চেয়ে পাঠাবার সময় হবে না, চাইলেও তোমার সুচতুর ভাই ঠিক কারণটি বুঝবে চল আমিই একটা ঠিকে গাড়ী ক'রে তোমায় পৌঁছে দি, চট্ ক'রে জিনিষ গুলো নিয়ে আসবে।"

কল্যাণী একেবারে কাঠের মত আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইল "মায়ের শেষ সময়ে তুমি একবার গিয়ে দাঁড়াতে পারলে না, আর এরি মধ্যে দুদিন না যেতেই তোমার সঙ্গে আমি গয়না আনতে যাব? যেতে পারব না।"

হীরালাল রাগিয়া আগুন হইয়া বলিল, "তা যাবে কেন

ভাই শলাপরামর্শ দিয়ে গয়না কটা হাত ক'রে নিয়েছে; আমায় বলতেই সাহস হচ্ছে না, আন্‌তে যাবে কোন্ লজ্জায়!"

কল্যাণী বলিল, "লজ্জার কথা ত বটেই। এখনও মা'র নিঃশ্বাস ও বাড়ির হাওয়ায় মিশে রয়েছে, আর আমি যাব গয়না বুঝে নিতে! জামাইকে তারা কি মনে করবে একবার ভাবছ না? এমন ক'রে তুমি যদি আমার মাথা হেঁট করাও তাহ'লে আর যে আমি বাপের বাড়িতে মুখ দেখাতে পারব না।"

সিন্দুকের চাবি বন্ধ করিয়া আঁচলে বাঁধিয়া কল্যাণী রান্না-ঘরে চলিয়া গেল। আপাতত যাই হউক, হীরালাল যে তাহাকে বাপের বাড়ি হইতে দুই-চারি দিনেই গহনা আনিতে বাধ্য করিবে সে বিষয়ে কল্যাণীর মনে কোনো সন্দেহই ছিল না। অথচ দাদাও তাহার এত ব্যগ্রতাকে ভাল চক্ষে দেখিবে না। নিঃসন্তান ভগ্নীকে মা'র এত অজস্র উপহার দেওয়ায় এমনিতেই দাদার মনে সন্দেহের অঙ্কুর দেখা দিতেছে, তাহার উপর ভগ্নীপতির লুব্ধতার পরিচয় পাইলে ত সোনায় সোহাগা হইবে। এ লজ্জা অপেক্ষা সত্যই গহনা কটা দাদাকে তখনি সঁপিয়া দিয়া আসিলে ভাল হইত।

সে রাত্রি কাটিয়া গেল। মৃত্যুবেদনা ভুলিতে কল্যাণী তাহার নিজের ঘরে আসিয়াছিল; কিন্তু দুই দিক্ দিয়া তাহার দুই পরমাত্মীয় শুলের আগুন জ্বালিয়া ক্ষত মুখে রক্ত ঝরাইতে বদ্ধপরিকর হইয়াছে। এমন সময় কোথায় পাইবে সে শান্তি, কোথায় বা সান্ত্বনা? স্বামী পাছে কোনো সূত্রে গহনার কথা পাড়িয়া বসে এই ভয়ে কল্যাণী পঞ্চ ব্যঞ্জন রাঁধিয়া, ঘর গোছাইয়া সেলাই করিয়া আপনাকে এক মুহূর্ত্ত বিশ্রাম দিল না। কিন্তু তাহারই মধ্যে যতবার হীরালালের সহিত চোখাচোখি হয়, বুঝিতে পারে সে কিছু একটা বলিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছে। দুই বারই খাইবার সময় ছেলেকে অনেক যত্ন করিয়া আনিয়া স্বামীর পাশে বসাইল, হীরালাল কথা বলিবার সুযোগ পাইল না। স্বামীর আগে ঘুমাইতে যাওয়ার অপরাধ জীবনে সে কোনো দিন করে নাই, আজ শরীর খারাপ লাগার ছুতায় সর্ব্বাগ্রে বিছানায় গিয়া সে চোখ বুজিয়া শুইল। হীরালাল ঘরের ভিতর অসহিষ্ণুভাবে কিছুক্ষণ ঘুরিয়া কল্যাণীকে ঠেলা দিয়া দুই-একবার ডাক দিল। কিন্তু ভাণ-করা ঘুম ভাঙানো সহজ নয়।

অনেক রাত্রে সত্য সত্যই ঘুম ভাঙিয়া কল্যাণী দেখিল ঘরের চারি দিকের জানালা বন্ধ করিয়া আলো জ্বালিয়া হীরালাল সমস্ত বাক্স ও আলমারীর ভিতর কি খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। আঁচলের চাবিটাও আঁচলে নাই দেখিয়া কল্যাণী লজ্জায় চোখ ফিরাইল।

ভোর বেলা আর দশ বাড়ির মত কল্যাণীর বাড়িও রান্নাঘরের ধোঁয়ায় অন্ধকার হইয়া উঠিয়াছে। আঁচল দিয়া চোখ ঘসিতে ঘসিতে তাহারই ভিতর বসিয়া ঝি হলুদ লঙ্কা বাটা সুরু করিয়া দিয়াছে। কল্যাণী হাতপাখা চালাইয়া চায়ের জলটা নামাইবার চেষ্টায় আছে। ছেলেটা তখনও বিছানার মায়া কাটাইতে পারে নাই। হীরালাল হঠাৎ আসিয়া বলিল, "ঝি সাম্‌নের গলির দোকান থেকে চার পয়সার জিলিপি আন দেখি।" বাবুকে এত সকালে জিলিপির লোভে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতে ইতিপূর্ব্বে সে দেখে নাই। বিস্মিত হইয়া মশলামাখা হাতেই পয়সা লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। হীরালাল অত্যন্ত মোলায়েম স্বরে বলিল, "কল্যাণী, মাকে এত ভালবাসতে তিনি ভালবেসে যা তোমাকে দিলেন, সেগুলো কি কাছে কাছে রাখতেও ইচ্ছা করে না? দাদারা শোকাতাপা মানুষ, তাঁদের ঘরে কে কখন আস্‌ছে যাচ্ছে, কিছু যদি নিয়ে সরে পড়ে, তাঁরা দেখতেও পাবেন না। এ সময়টা জিনিষগুলো কাছে এনে রাখো। তারপর সবাই সাম্‌লে উঠলে যেখানে ভাল বোঝ রাখলেই হবে। মায়ের সিন্দুকের চাবি ত তোমারই কাছে ছিল মনে হচ্ছে। তুমি আপনি খুলে নিয়ে এলে চাইবার সঙ্কোচও থাক্‌বে না। লক্ষ্মীটি, যাও নিয়ে এস, হারিয়ে ফেল্‌লে দুঃখ রাখবার ঠাঁই পাবে না।"

কল্যাণী বুঝিল গহনাগুলি না দেখিতে পাওয়া পর্য্যন্ত স্বামীর মনে শান্তি নাই, অন্য চিন্তাও নাই এবং সে যতক্ষণ তাঁহার এই ইচ্ছার পথে বাধা সৃষ্টি করিবে, ততক্ষণ গহনার অধিকারিণী হইলেও সে-ই হইবে তাঁহার পরম শত্রু। অন্য সময় হইলে আজও সে একবার ন্যায়-অন্যায় শোভন-অশোভন লইয়া তর্ক তুলিত। কিন্তু আজ আর তাহার ততখানি জেদ করিবার ক্ষমতা ছিল না। সে বলিল, "যাব বই কি আন্‌তে, তবে চাবি যখন আমার কাছেই রয়েছে, তখন ভয়ের ত কোনো কথা নেই। আজ গেলেও যা, দুদিন বাদে গেলেও তা।"

হীরালাল বলিল, "সে ঠিক কথা। কিন্তু দুজনে মিলে একবার ফর্দ্দের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে যদি কিছু না মেলে তার কথাটা টাট্‌কা টাট্‌কা মনে ক'রে বল্‌তে পারবে। কত মানুষ এসেছে গিয়েছে, দেরী করলে ভুল-চুক কিছুই শোধরানো যাবে না। হতেও ত পারে যে তোমায় দেবেন লিখে রেখে ভুলে একটা ভাল জিনিষ বাকী রেখে দিয়েছেন। আমি যত মনে করেছিলাম, এখন দেখছি জিনিষ তার চেয়ে অনেক দামী।"

কল্যাণী বলিল, "ফর্দ্দ মিলিয়ে জিনিষ আদায় করতে আমি পারব না। যা আছে তাই থাকবে।"

হীরালাল বলিল, "তুমি না পার আমিই নেব। তোমার মায়ের হাতের ফর্দ্দে ত কারুর টুঁ শব্দ করবার অধিকার নেই।"

রাগে আগুন হইয়া কল্যাণী বলিল, "কেন তুমি মায়ের হাতের ফর্দ্দ আমার আলমারী থেকে নিয়েছ ?"

হীরালাল অম্লান বদনে বলিল, 'তুমিই ত কাল আলমারী দেখতে গিয়ে ফর্দ্দ বাইরে ফেলে রেখেছিলে। আমি না তুল্‌লে কোন্ চুলোয় যেত জান্‌তেও পারতে না।"

কল্যাণী চুপ করিয়া রহিল। শেষ পর্য্যন্ত তাহাকে গহনা আনিতে যাইতেই হইল।

চাবি কল্যাণীর কাছেই ছিল। কিন্তু মা'র ঘর হইতে গহনার বাক্স বাহির করিয়া লইয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া চলিয়া যাইতে কল্যাণীর লজ্জা করিতেছিল। নিজের জিনিষ বলিয়া কহিয়া লইয়া গেলেও লোভীর অপবাদ না পাইয়া রক্ষা নাই, না বলিয়া লইয়া যাওয়া ত প্রায় চুরির মতই লজ্জাকর। মা'র পরিত্যক্ত ঘরের সেই খাটখানার উপরই কল্যাণী বাক্স খুলিয়া গহনাগুলা একবার আন্দাজমত মিলাইতে বসিল। চোখের জলে তাহার দৃষ্টি ঝাপসা হইয়া যাইতেছিল, স্মৃতির ভিড়ে মন বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতেছিল। মা যেন তাহারই পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। আজও কি সেদিনকার মত নিজের হাতে তাহাকে সাজাইতে বসিবেন ?

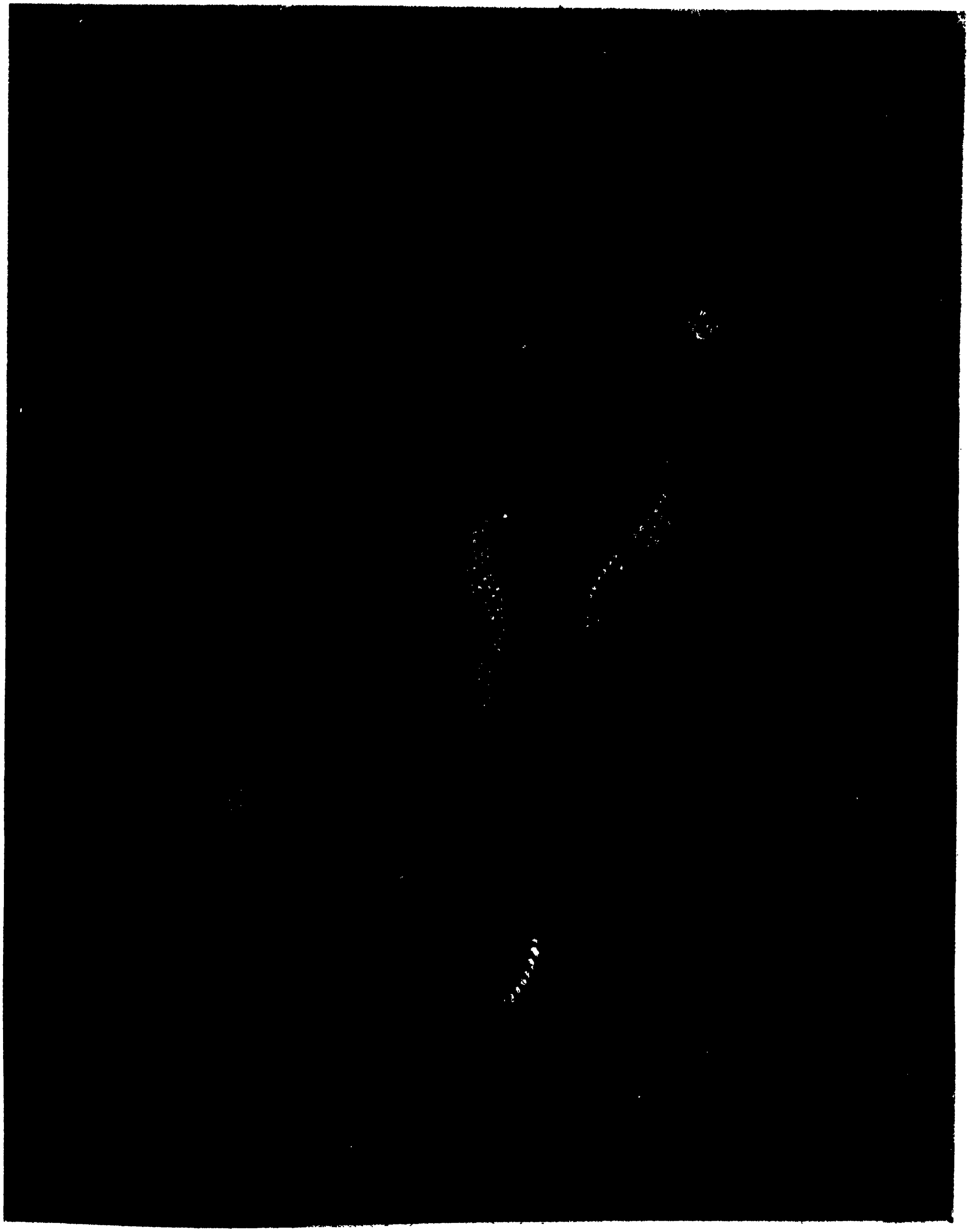
হীরামুক্তার গহনাগুলা গুণিতে গুণিতে কল্যাণীর কেবলই মনে হইতেছে, তাহার কি স্মৃতিবিভ্রম হইল ? তিনবার চারবার পাঁচবার গুণিয়াও দেখিল হীরার কণ্ঠী হীরার চুড় জোড়া ও আর যেন কি মিলিতেছে না। সোনার গহনার বাক্স নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল সেখানেও নাই। খালি ঘর হইতে কি তবে চোরে লইয়া গেল ? এই গুলাই সবচেয়ে দামী। নিশ্চয় সেদিন সে বাক্সে তুলিতে ভুলিয়া গিয়াছিল। যদি দাদা বৌদিরা কেউ তুলিয়া রাখিয়া থাকে তবেই রক্ষা, না হইলে সর্ব্বনাশ। হীরার গহনা জীবনে সে কোনোদিনই হয়ত পরিবে না, এবং অর্থের প্রয়োজনে বিক্রয় করিতে যে হাত উঠিবে এমন কথা আজ ত বিশ্বাস হয় না। কিন্তু সে যাহাই হউক, চোরের হাতে মাতৃস্মৃতিমণ্ডিত অলঙ্কারগুলি ত তুলিয়া দেওয়া যায় না ? সবার উপরে আছে তাহার স্বামীর ভয়, নিজের ক্ষতি যেমন করিয়া হউক্ সে সহ্য করিতে পারিবে. কিন্তু অসাবধানতার জন্য এমন মূল্যবান জিনিষগুলি গিয়াছে জানিতে পারিলে স্বামীর হাতে আর রক্ষা থাকিবে না।

দীর্ঘ দিবানিদ্রার মাঝখানে নিরঞ্জনের স্ত্রী অনুপমা অর্দ্ধ তন্দ্রায় পাশ ফিরিয়া শুইতেছেন, কল্যাণী গহনার বাক্স দুটা হাতে করিয়া ঘরে ঢুকিল। বাক্স রাখার শব্দেও অনুপমা চোখ মেলিল না দেখিয়া অগত্যা কল্যাণী ডাক দিয়া বলিল, "বৌদি, আমি এসেছি ভাই।" কপালে বলীরেখা টানিয়া আধখানা চোখ খুলিতে খুলিতে অনুপমা শুধু বলিল, "বোসো।" কিন্তু পিসির গলার আওয়াজ পাইয়া বুলবুল পাশের ঘর হইতে ছুটিয়া আসিয়া দুই হাতে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিল। অনুপমার অর্দ্ধ-উন্মীলিত চক্ষু আবার বুজিয়া আসিতেছে দেখিয়া কল্যাণী বড়ই অস্বস্তি অনুভব করিতেছিল, বলিল, "আমার যে যাবার সময় হ'ল বুল্‌বুলি মা। এদিকে তোমার মা আবার ঘুমিয়ে পড়ল। গয়নাগুলো নিয়ে যাব, সে কথা বলাই হল না।"

বুলবুল মাকে ঠেলা দিয়া সজোরে চীৎকার করিয়া বলিল, "মাগো ওঠ না। পিসিমা বাড়ি চলে যাবেন এখ্‌খুনি।"

কন্যার ঠেলায় ও চীৎকারে আঁচলে চোখমুখ মুছিতে মুছিতে অনুপমা উঠিয়া বসিল, "ঠাকুরঝি, এসেই চল্‌লে ? এত তাড়া কিসের ?"

সলজ্জে কল্যাণী বলিল, "এমন কিছু না। এই মা'র গয়না কটা একটু নেড়ে চেড়ে দেখব, উনিও একটু দেখবেন আজ ছুটির দিন। তাই বাড়ী নিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু ভাই, সেদিন গোলেমালে কোথায় কি রেখেছি, এখন বল্‌তেও ভয় করছে, ক'খানা হীরের গয়না ত মেলাতে পারছি না।"



বসন্তের স্পর্শ

শ্রীকিরণময় ধর

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

অনুপমা যথাসম্ভব চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল, "সে কি কথা ভাই ? এও কি হয় ? নিশ্চয় গায়ে দিয়ে বাড়ি চলে গিয়েছিলে।"

কল্যাণী হাসিয়া বলিল, 'জন্মে হীরের গহনা পরলাম না, এখন মা'র কাজ না শেষ হতেই হীরে জহরৎ পরে বেড়াব, আমি কি পাগল বৌদি ?"

বুলবুল মার মুখখানা দুই হাতে নিজের দিকে ঘুরাইয়া বলিল, 'মা, মা, শোন একটা কথা ?"

মা বিরক্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাহার হাত ধরিয়া দরজার দিকে ঠেলিয়া দিয়া বলিল "তুই যা দেখি, নিজের পড়াশুনো কর্ গিয়ে। বুড়োর মত সাত কথার মাঝখানে এসে তোকে কে বলতে বল্‌লে ? শীগগির যা বল্‌ছি।"

বুলবুল সেইখানেই দাঁড়াইয়া বলিল, "আমি যাচ্ছি, কিন্তু তুমি মা বড্ড ভুলে যাও। সেদিন যে বাবা ঠাকুমা'র ঘর থেকে বেরোবার পর আমাকে হীরের কণ্ঠি আর চুড় পরিয়ে দিলেন, সেগুলো ত ঠিক ঠাকুমারই গয়নার মত। তুমি রাখলে তারপর তোমার বাক্সে। পিসিমাকে দেখাও না একবার, বাবা হয়ত ওই ঘরেই পেয়ে নিয়ে এসেছিলেন।"

অনুপমা বলিল, "দূর, সে পোক্‌রাজের গয়না, কে ওঁর কাছে বাঁধা দিতে এসেছিল, তাই বোধ হয় খেলা ক'রে তোকে পরালেন। সে দেখে কি হবে ?"

কল্যাণী চমকিয়া উঠিল, "না থাক্, আমি সে সব দেখতে চাই না। এগুলোর যদি কোনো সন্ধান পাও ত আমাকে বলো, বৌদি। মা'র জিনিষ চোরছ্যাচড়ের পেটে যাবে এ মনে করতেও কান্না আসে। লক্ষ্মীটি ভাই, তুমি যেমন করে পার' পুলিস ডেকেই হোক্ আর যাই ক'রে হোক জিনিষ দুটোর খোঁজ ক'রে রেখো, না হ'লে দুঃখের সীমা ত থাক্‌বেই না, উপরি শ্বশুরবাড়িতে আমার লজ্জা রাখবার ঠাঁই থাক্‌বে না। ননদ দেওর সবাই সে ফর্দ্দ দেখেছে, আমার আঁচলেই বাঁধা ছিল। এখন যদি গিয়ে বলি যে বাপের বাড়িতেই চোরে নিয়ে গেছে, তাহলে সাত কুটুমে মিলে আমার ভাইকেই যে গা'ল দেবে সে কি ক'রে সইব বল ত ? ভাই, তোমার দুটি হাতে ধরে বলছি ; তুমি এর যা হয় একটা বিহিত করো।"

অনুপমা মুখ গম্ভীর করিয়া বলিল, 'নিজের ঘরদোর ভাল করে খুঁজে তারপর এত বড় দোষটা দিলে পারতে ঠাকুরঝি। কেনই বা এখানে ফেলে যাওয়া, আর কেনই বা এত পুলিশ-পেয়াদার কথা ? যা হোক, আসুক তোমার ভাই, তাঁকেই বলে দেখব এখন।"

কল্যাণী কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। কিন্তু এত দামী গহনা হারাইয়া বাড়ি ফিরিলে তাহার যে লাঞ্ছনার অন্ত থাকিবে না এ বিষয়ে তাহার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। ঝড়ের মুখে পড়িলে মানুষ তৃণকেও আশ্রয় করে। তাই আর কোনো পথ খুঁজিয়া না পাইয়া সে বলিল, "থাক্, দাদার সঙ্গে পরামর্শ আমিই করব, বৌদি। আজকের দিনটা এখানেই কাটিয়ে কাল তখন যাবার ব্যবস্থা করলেই হবে।" কথা বলিতে তাহার ভাল লাগিতে ছিল না। গহনা সমেত বাক্স দুটা লইয়া সে মা'র ঘরেই ফিরিয়া গেল। লোহার সিন্দুকে বাক্স দুটি তুলিয়া ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া সে জানালার কাছে চুপ করিয়া বসিল। এই দিনটা ও রাত্রিটা অন্তত গহনার খোঁটা সহিতে হইবে না। আজ মা থাকিলে হয়ত তাঁহার কোলের ভিতর আশ্রয় লইলে এই সন্দেহ ভয় ও লজ্জার দ্বন্দ্বের ভিতর তাহাকে ঘুরিয়া মরিতে হইত না। মাকে বলিত, "মাগো, তুমি শিশুকালে যেমন অনায়াসে আমার সকল সমস্যা মিটিয়ে দিতে, আজ তেমনি ক'রে শুধু মুখের উপর হাত বুলিয়েই আমার সকল সংগ্রাম শেষ করে দাও না মা।" তাহা হইলে এক রাত্রির শান্তির জন্যও তাহাকে এমন করিয়া পলাইয়া বেড়াইতে হইত না।

বুলবুলের কথায় বিশ্বাস করিয়া গহনা দেখিতে চাহিতে সে কিছুতেই পারিবে না। প্রথম বিবাহের পর ভাঁড়ার হইতে চাকরকে মিষ্টি চুরি করিতে দেখিয়া কত দিন সে চোরের লজ্জার ভয়ে আপনি লজ্জিত হইয়া পলাইয়াছে, আজ সে ভাইকে চোর সন্দেহ করিবে কি করিয়া ? বাক্সের ভিতর ঐ গহনা দেখিতে পাওয়ার চেয়ে যেন তাহার অন্ধ হইয়া যাওয়াই ভাল ! কিন্তু বাড়ি ফিরিবামাত্র স্বামী যখন ফর্দ্দ লইয়া মিলাইতে বসিবে তখনও ত মা ধরিত্রী তাহার এ পরম লজ্জা দূর করিতে বুকের ভিতর তাহাকে ডাকিয়া লইবেন না। স্বামী ত তাহার সকলের আগে কিছু না শুনিয়াই নিরঞ্জনকে চোর স্থির করিয়া লইবেন এবং বিধাতা না করুন হয়ত চৌর্য্যের কিনারা করিতে এখানেই আসিয়া

উপস্থিত হইবেন। স্বামী ও ভ্রাতার লোভ ও হিংসার দুরন্ত অনলের গ্রাস হইতে তাহার মনের স্নেহ ভালবাসার কোমল অঙ্কুরগুলিকে বাঁচাইয়া রাখিবে কি করিয়া? তাহার স্বামী-গর্ব্ব ও ভ্রাতৃগর্ব্বের মাঝখানে আপনি দাঁড়াইয়া সে এত দিন দুই দিক রক্ষা করিয়াছিল; কিন্তু আজ যখন পরস্পরের আঘাতে সে দুইটি সৌধই এক সঙ্গে তাঁহাদের সকলের চোখের সম্মুখে ধূলিসাৎ হইয়া পড়িবে তখন উভয়ের লজ্জার বোঝা লইয়া সে লুকাইবে কোন্ খানে?

সন্ধ্যা হইয়া আসিল, কিন্তু কল্যাণী আলো জ্বালিল না। ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বাহিরের গুঁড়া বৃষ্টির ঝাপটা আসিয়া তাহার চোখে চুলে ও উত্তপ্ত ললাটে শীতল স্পর্শ দিয়া যাইতেছিল। কল্যাণী বাল্যের অতীত স্মৃতির ভিতর ডুবিয়া ভাবিতেছিল চৌদ্দ বৎসর আগেকার তাহার জীবনের আনন্দময় মুহূর্ত্তগুলির কথা। গাত্রহরিদ্রার দিনে তাহার বালক দাদা নিরঞ্জন স্কলারশিপের টাকা জমাইয়া তাহাকে যখন সোনার হার গড়াইয়া আনিয়া দিয়াছিল তখন সে বলিয়াছিল, "দাদার গয়নার সঙ্গে অন্য গয়না মেশাব না। আজ শুধু এইটাই আমি পরব। হাতে আমার রুলি থাকলেই হবে।"

বিবাহের পর স্বামী তাহাকে ঠাট্টা করিত, "কি এমন হার দিয়েছে ভাই যে অষ্টপ্রহর না পরে থাকতে পার না? আমি যে অমন তাবিজ দিলাম তাত একবার সূর্য্যির মুখ দেখতে পেলে না।" কল্যাণী বলিল, "তা যাই বল বাপু, নিজের মায়ের পেটের ভাইয়ের চাইতে কাউকে বেশী ভাল বাসতে পারব না।"

বাহিরে নিরঞ্জনের গলা শোনা গেল, "কি রে কলি, গয়না হারিয়েছে নাকি? তাই একেবারে আঁধার ঘরে খিল দিয়েছিস। খোল দরজা কি হয়েছে শুনি।"

কল্যাণী বলিল, "বৌদির কাছে কি কিছুই শোননি। ক'খানা হীরের গহনা পাচ্ছি না, বাক্সেই সব ছিল, তুমি ত জানই। যদি না পাওয়া যায় দাদা, ত তোমাকেই এখন কোথা থেকে এনে দিতে হবে। তারপর আমি আস্তে আস্তে দাম শোধ করব কিম্বা আর যা ভাল হয় ব্যবস্থা করব। আপাতত ও বাড়ির কাছে আমার বাপের বাড়ির মুখ রক্ষা করতেই হবে।"

কল্যাণী দাদার দুই পায়ের উপর মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িল।

নিরঞ্জন বলিল, "দেখ্ কলি, যা ঢাকা যাবে না, তা তোর কাছে, অন্ততঃ ঢাকতে চেষ্টা আমি করব না। ও গয়না মা হাজার বার বৌকে বলেছিলেন বুলবুলের বিয়ের যৌতুক দেবেন; শেষকালে তাঁর কি মতি হ'ল নাতনীর কথা একবার মনেও করলেন না, মেয়েকেই সব ঢেলে দিয়ে গেলেন। কিন্তু তুই ত ওর পিসি, তুই জানিস ও সব কথা। দুখানা গয়না আমি তার গায়ে দিয়ে যদি তুলে রেখে থাকি, তার জন্যে আমাকে লজ্জা না দিয়ে পারলি না? আমি জোর ক'রে কেড়ে নিলেও তুই ফিরে চাইবি না এ বিশ্বাস আমার এতদিন ছিল।"

কল্যাণী বলিল, "দাদা, আমি সত্যি বলছি বুলবুলকে ও গয়না দেবার কথা আমি কোনো দিন ঘুণাক্ষরেও জানতাম না। তা জানলে সেদিন মা'র সামনেই আমি ও গয়না খুলে তাকে পরিয়ে দিতাম। আমার নিজে পরার চেয়ে তা হাজার গুণে বড় আনন্দের কথা হত।"

নিরঞ্জন হাসিয়া বলিল, "তাই যদি হ'ত, তবে আজ মা'র কাছে বাহবা পাবি না বলে মনটা একেবারে বদলে গেল কি করে?" কল্যাণী বলিল, "দাদা, তুমিও আমাকে ভুল বুঝবে? তুমি কি জান না যে তোমারই মানের জন্যে আমি তোমার কাছে ও গয়না ভিক্ষা চাইছি। মা'র নিজের হাতে পরানো গহনা যদি আমি ও বাড়িতে দেখাতে না পারি তোমাকে তাহলে তারা কি বলতে বাকি রাখবে বল ত!"

নিরঞ্জন ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল, 'তারা মানে? গৌরবে বহুবচন ত? তোমার স্বামী-রত্ন ছাড়া আর কার এত বড় আস্পর্দ্ধা হবে যে আমার মায়ের গয়না নিয়ে আমাকে কথা শোনাতে আসবে? নিজে ত শ্বশুরবাড়ির ঘাড় মুচড়ে যা কিছু আদায় করেছিলেন সব জলে দিয়ে শেষ করেছেন. এখন স্ত্রীর মাথায় হাত বুলিয়ে শাশুড়ীর সব গয়না ক'টা আত্মসাৎ না করলে হবে না?"

কল্যাণী ম্লানমুখে বলিল, "কেন মিথ্যে তাকে গাল দিচ্ছ? তার পাওনা টাকা সে যা খুশী করেছে, গয়নাও কারুর কাছে সে ত চাইতে আসেনি। গাল যা দেবে আমাকেই দাও।"

নিরঞ্জন বলিল, "বেশ ত ভাল কথা। তবু যদি কোনো কথাই ওঠে, তাহলে বলো যে ও ক'টা গয়না তুমিই ভাইঝিকে পরিয়ে দিয়েছ। যা তোমার স্বামীর পাওনা নয়, সে বিষয়ে এটুকু বল্‌তে তোমার ভয় হওয়া উচিত নয়।"

কল্যাণী স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। এ-কথার উত্তর তাহার মনে স্পষ্ট থাকিলেও মুখে সে কিছু উচ্চারণ করিতে পারিল না। তাহার নীরবতায় নিরঞ্জনই লজ্জা পাইয়া যেন কৈফিয়তের সুরে বলিল, "দেখ্, মেয়েটার বারো বছর বয়স হ'ল, আজ বাদে কাল বিয়ে দিতে হবে! অথচ তার জন্যে গয়না টাকা কিছুই ত করে রাখ্‌তে পারিনি। যে কটা টাকা ছিল মার কাজে সব খরচপত্র হয়ে গেল; একটা দায় উদ্ধার হতে গিয়ে অন্য দায়ে যে একেবারে জড়িয়ে পড়লাম। বাড়িতে সন্তান বল্‌তে ত ঐ একটি। তোরও আর নেই, আমারও নেই। ওর বিয়েতে তুই যদি ক'খান গয়না দিস পিসির মত কাজ হয় না কি? আমার একলার সামর্থ্যে ওর ভাল বিয়ে কি আর হবে?" নহরপুরের সম্বন্ধটা ত গহনার অভাবেই ভেঙে যাবে মনে হচ্ছে।"

কল্যাণী বলিতে পারিল না "আজ গয়না কটা দাও। বিয়ের সময় আমি পরিয়ে দিয়ে যাব।" সে শুধু বলিল, "মার কাজের আগে যদি দাদা, এ কথাগুলো বল্‌তে ত সকল দিক দিয়ে সহজ আর সুন্দর হত। এত লোক-জানাজানি হয়ে পড়ত না।" নিরঞ্জন বলিল, "হীরালাল তোকে বেশ পাখীপড়া করে সব মুখস্থ করিয়েছে দেখ্‌ছি। ঠাকুরমার গহনা নাত্‌নীকে পরিয়ে দিলে মহাপাপ হয় কি-না, তাই লোক জানাজানি হলে সমাজে আর কেউ মুখ দেখাতে পাবে না?"

নিরঞ্জন আর না দাঁড়াইয়া মুখ অন্ধকার করিয়া বোঝাই নৌকার মত দুলিতে দুলিতে আপনার বিপুল দেহভার টানিয়া বাহির হইয়া গেল, দরজা পার হইতে হইতে একবার মুখ ফিরাইয়া শেষ অস্ত্র ছাড়িয়া গেল, "তোমার সতীনের গুষ্টির ভোগের জন্যই আমার মা এত সখ করে গয়না গড়িয়ে-ছিলেন দেখছি।"

ভোরের আলো ভাল করিয়া ফুটে নাই। গাড়ীবারান্দা ঢাকা ফুটপাথগুলির উপর তখনও খাটিয়া-মাদুর কিম্বা শুধু কাঁথা পাতিয়া দোকানী পসারী গাড়োয়ান কুলি প্রভৃতির দল নিদ্রা দিতেছে। কল্যাণী মোটর হইতে আপনার দরজায় নামিল। তাহার জ্ঞাতি দেবর সদর দরজাটা খুলিয়া বলিল, "কি বৌদি, কাক কোকিল না ডাক্‌তে বাপের বাড়ি ছেড়ে দৌড়, কিছু সরিয়ে আন্‌লে নাকি?" কথার উত্তর না দিয়া শুধু মৃদু হাসিয়া কল্যাণী ক্ষিপ্রপদে আপনার উপরের ঘরে চলিয়া গেল। হীরালালের সদ্য পরিত্যক্ত শয্যা পড়িয়া আছে। সে এই মাত্র উঠিয়া বাহির হইয়াছে বোধ হয়। চকিত দৃষ্টিতে চারিধারে চাহিয়া কল্যাণী আঁচলের চাবি দিয়া লোহার সিন্দুকটা খুলিয়া ফেলিল, গহনার বাক্সটা তাহার ভিতর সন্তর্পণে রাখিল এবং মায়ের হাতের লেখা ফর্দ্দটা বাহির করিয়া চাবি বন্ধ করিয়া দিল। ফর্দ্দটা হাতে করিয়া তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই চোখের জলের বড় বড় ফোঁটা তাহার উপর ঝরিয়া পড়িল। কল্যাণী ফর্দ্দটা মাথায় ঠেকাইয়া বুকে চাপিয়া তারপর তাহা কুটি কুটি করিয়া ছিঁড়িয়া পথের দিকের জানালা দিয়া ফেলিয়া দিল।

তারপর উনানের ধোঁয়ার ইসারার ডাকেও নয়, কল-তলায় ঝিয়ের বাসন নামানোর ঝঙ্কারেও নয়, শুধু শুধু কেন যে কল্যাণী ব্যস্ত হইয়া রান্নাঘরে চলিয়া গেল বোঝা গেল না। পথের মাঝখানে হীরালালের সহিত দেখা। "কি গো, কখন এলে? গয়নাগাঁটিগুলো রাখ্‌লে কোথায়?"

কল্যাণী চোখ না তুলিয়াই বলিল, "দাঁড়াও, উনানের আঁচটা দিয়ে নি আগে, কালকের বাসি দুধটুধগুলো পড়ে আছে, তার একটা ব্যবস্থা করতে হবে, নইলে সব ছিঁড়ে নষ্ট হয়ে যাবে।"

হীরালাল বলিল, "ঝি এসে আগুন দেবে এখন, তোমার আবার ঘুঁটে কয়লা ঘাঁটতে যাওয়া কেন? তার চেয়ে চল না জিনিষ কটা দেখি। ঠিকঠাক ক'রে রাখ্‌তেও ত হবে। আমাদের যা বাড়ি যেখানে সেখানে ফেলে রাখা চল্‌বে না।"

কল্যাণীকে প্রায় টানিয়াই হীরালাল উপরে লইয়া চলিল। ঘরের ভিতর ঢুকিয়াই দরজাটা হুড়কা দিয়া বন্ধ করিয়া বলিল, "সবাই এখনও ওঠেনি; এর পর আর দিনের আলোয় ঘরে দোর দেওয়া চল্‌বে না, এই বেলা ওপাটটা চুকিয়ে ফেলা ভাল।"

সিন্দুক খুলিয়া কল্যাণী গহনার বাক্স বাহির করিল,

তাহার চাবিও খুলিয়া দিল। নূতন খেলনা দেখিলে শিশু যেমন দুই চোখে তাহার মনের সমস্ত ক্ষুধা ভরিয়া ব্যগ্রভাবে সেই দিকে ছুটিয়া যায় তেমনি আগ্রহে হীরালাল দুইহাতে ব্যস্তভাবে বাক্স দুটি জড়াইয়া ধরিল। গহনার পর গহনা বাহির করিতেছে আর তাহার চোখে লোভ ও বিস্ময়ের যুগল শিখা জ্বলিয়া উঠিতেছে। হীরালাল হাতের আন্দাজে গহনা-গুলির ওজন দেখিয়া একে একে রাখিতেছিল। প্রোমোশন প্রত্যাশী ছাত্রীর মত ভয়ে ভয়ে কল্যাণী এতক্ষণ নীরবে একদিকে বসিয়া ছিল; সব গহনাগুলি দেখা হইতেই মধুর তৃপ্তির হাসি হাসিয়া বাক্স বন্ধ করিয়া সে সিন্দুকে তুলিতে চলিল। হীরালাল বাধা দিয়া বলিল, "কিন্তু মিলিয়ে ত দেখা হল না। দেখি কাগজখানা।" কল্যাণী সিন্দুকের চাবি লাগাইতে লাগাইতে বলিল, "সে সব হবে এখন পরে। সংসারে কত কাজ পড়ে রয়েছে দেখতে পাচ্ছ না?" চাবিটা ছিনাইয়া লইয়া হীরালাল বলিল, "কাজ থাকে তোমার আছে, আমার ত নেই। আমি মিলিয়ে নিচ্ছি, তুমি নিজের কাজ কর গিয়ে।"

কল্যাণী দরজার বাহিরে যাইতেই হীরালাল গর্জ্জিয়া উঠিল, "ফর্দ্দ কি করলে শুনি? দেখ্‌তে পাচ্ছি না ত।"

কল্যাণীর মুখখানা এক মুহূর্ত্তে রক্তহীন হইয়া গেল। সে বাহির হইতেই বলিল, "আমি একটু পরে আস্‌ছি তুমি ততক্ষণ খোঁজ।"

মিনিট পনের পরে সে যখন ফিরিয়া আসিয়া চোরের মত সন্তর্পণে দরজার কোণ হইতে ভিতরে উঁকি মারিয়া দেখিল তখন হীরালাল সুদখোরের সুদ মিলানোর ভঙ্গীতে খাতাকলম লইয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া একটা ফর্দ্দের পাশে ক্রমাগত দাগ কাটিতেছে। আরও কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া কল্যাণী বুঝিল খাতায় গহনারই ফর্দ্দ। ভয়ে ও বিস্ময়ে সে পাথরের মূর্ত্তির মত জমিয়া গেল। হীরালালই খানিক পরে সরোষে লাফাইয়া উঠিয়া বারান্দায় আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া ঝাঁকি দিয়া তাহার চেতনা ফিরাইয়া দিল। রাগে তাহার চোখের রঙ গোলাপী হইয়া উঠিয়াছে, ভ্রূ দুটি বাঁকিয়া বিড়ালের পিঠের মত ফুলিয়া উঠিয়াছে। চটিয়া সে অকথ্য একটা গালি দিয়া বলিল, 'হীরের গহনাগুলো কোন্—কে দিয়ে এলে শুনি?"

কল্যাণী বলিল, "চল ঘরে গিয়ে দেখছি।" ঘরে আসিয়া সে ফর্দ্দের খাতায় হাত দিতেই হীরালাল বাঘের মত এক লাফ দিয়া আসিয়া তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া খাতাটা কাড়িয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিল, "ফের আমার খাতায় হাত দেবে ত আস্ত রাখব না। এক সের দুধ লোক্সান যাচ্ছিল তাই ন্যাকামী করে তার তদারক করতে আসা হল। এদিকে কত হাজার টাকা চুরি করে ওই জোচ্চোর ভাইটাকে দিয়ে আস্‌তে এতটুকু বাধল না। কার হুকুমে গয়না তাকে দিয়েছিস্, ফর্দ্দ তাকে দিয়েছিস্ বল্।" হীরালাল কল্যাণীর চুলের মুঠি চাপিয়া ধরিল। কল্যাণী গলা নামাইয়া বলিল, "চুলটা ছাড়, অসভ্যতা করো না। এখুনি কোথা থেকে কে এসে পড়বে। গয়না আমি কাউকে দিয়ে আসি নি। তুমি ভদ্রলোকের মত বস দেখি।"

"তুই যদি না দিয়ে থাকিস্ তবে সে হতভাগা চুরি করেছে, আমি লিখে দিতে পারি। আমি কালই উকিলের চিঠি দেব তার নামে, দেখি সে কেমন ফিরিয়ে না দেয়।"

কল্যাণী বলিল, "উকিলের চিঠি দেবে, কিন্তু ও ফর্দ্দ ত তোমার নিজের হাতের লেখা। কোন্ উকিল ও ফর্দ্দ দেখে তোমার চিঠি লিখতে যাবে?"

হীরালাল বলিল, 'তুমি ফর্দ্দ চুরি করেছ তোমাকে হয় এনে দিতে হবে, নয় সাক্ষী হতে হবে। আমি এমনি ছেড়ে দেব মনে করো না। হীরালাল শর্ম্মাকে কি এতদিনেও চেন নি?"

কল্যাণী বলিল, "আমি প্রাণ গেলেও তোমাদের মোকদ্দমায় সাক্ষী হব না। দুই কুল উজ্জ্বল করবার আর কি পথ পেলে না?"

হীরালাল বলিল, "কুলরত্ন দুটিকে জোড়ে যখন পেয়াদায় ধরে নিয়ে যাবে তখন একটা ছেড়ে সাতটা প্রাণ গেলেও সাক্ষী না দিইয়ে ছাড়বে না। বাজে কথা আর জ্যাঠামি ছেড়ে এখন বল দেখি গয়না কি করলে? ভাইকে যদি বাঁচাতে চাও স্পষ্ট কথাটি বলো। তুমি জান গয়না না পেলে আমি কোনো চেষ্টা বাকি রাখব না?" ঢোক গিলিয়া গিলিয়া কল্যাণী বলিল, "নহরপুরের জমিদার বাড়িতে বুলবুলের বিয়ের কথা হচ্ছে, তারা দেখতে আসচে তাই খানদুই গয়না তাকে পরিয়ে দিয়ে এসেছি। ও আবার সময় মত একদিন আন্‌লেই হবে।"

হীরালাল মুখ বাঁকাইয়া বলিল, "পিসি বদান্যতা ক'রে সব চেয়ে দামী গয়না ক'খানা না পরিয়ে দিয়ে পারলেন না ?"

কল্যাণী বলিল, "ওই গুলোই তার বিশেষ পছন্দ, ছেলেমানুষ! তা ছাড়া বড়ঘর থেকে দেখতে আসছে, খেলো গয়না পরালে নানা কথা উঠবে।"

কল্যাণীর কথা না থামিতেই হীরালাল বলিল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাপ, মেয়ে, বেয়াই সবাই চালাক আছে বুঝেছি। বিধাতা বুদ্ধি দেন নি কেবল তোমার ঘটে। তাই ফর্দ্দখানাও বড়লোক বেয়াইকে দেখাবার জন্যে দিয়ে এসেছ। বিনা ফর্দ্দে তোমার ছোটলোক ভাই গয়না দেবে ভেবেছ? ভাগ্যে আমি একটা নকল রেখেছিলাম, না হলে তোমার ভিজে বেরালের মত মুখ দেখে অত টাকা যে গেছে তা ত জানতেই পারতাম না। সব জোচ্চোর, যেমন ভাই তার তেমনি বোন।"

কল্যাণী গত রাত্রে খায় নাই, আজও তাহার বাড়িতে অন্ন জুটিল না। হীরালাল বলিয়া দিয়াছে গহনা আদায় করিয়া না আনিলে আজ আর বাড়িতে স্নান আহার নাই। জলগ্রহণ না করিয়াই কল্যাণী আবার বাপের বাড়ি চলিল। জ্ঞাতির দল ভিড় করিয়া গাড়ীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। মেজ বৌএর একি নূতন খেলা? এই আসিয়া বাড়িতে পা দিল আবার এখনি বাপের বাড়ি চলিল! বড়লোকের মেয়ের রঙ্গ বোঝা ভার!

গাড়ী বাহির হইয়া যাইতেই হীরালাল সমস্ত গহনা লইয়া ব্যাঙ্কে চলিয়া গেল।

ঘরে ঢুকিতেই নিরঞ্জন বলিল, "কিরে পুলিস-পেয়াদা সঙ্গে আছে না কি? সবাইকে বেঁধে নিয়ে যাবি?"

কল্যাণী কাঁদিয়া ফেলিল, "দাদা, এমন ক'রে তোমরা আমায় যন্ত্রণা দিও না। আমি আর সহ্য করতে পারি না।"

নিরঞ্জন নরম হইয়া বলিল, "সাধ করে কি আর বলছি? দশ হাজার টাকার গহনার কমে নহরপুর বিয়ে দেবে না বলছে, তার উপর নগদ টাকা, বরাভরণ, খাওয়া দাওয়া সবই আছে। এদিকে আমার ত সম্বল শুধু এই বাড়িটা, আর তুই হাত উপুড় করে দুখানা গহনাও দিতে পারিস্ না।"

দুই দিন অনবরত ভাবিয়া কল্যাণী এ সমস্যা মিটাইবার যত রকম উপায় ছিল সব মনে মনে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়াছে। সে ফর্দ্দ ছিঁড়িয়াছে, মিথ্যা বলিয়াছে, কোনো ফল পায় নাই। শেষ চেষ্টার জন্য আজ তার আসা। নিজেকে সম্বরণ করিয়া সে বলিল, "দাদা, আমার মায়ের বংশে বুলবুল ছাড়া আর কেউ নেই। এসব জিনিষ তার গায়েই মানায় কিন্তু এখুনি তাকে গহনা দেওয়া শিবেরও অসাধ্য। আমার অদৃষ্ট খারাপ না হলে তোমাদের মান রাখবার জন্যে এমন করে সর্ব্বস্বপণ আমায় করতে হত না। তাতেও দেখছি কারুর কাছে কারুর মাথা উঁচু রাখতে পারলাম না; তুমিও আমায় বিশ্বাস করলে না, বুঝলে না; সেও ঠিক তাই। যাক্, কোনো কুলই যখন রাখতে পারলাম না, আমার আর লজ্জা ভয় নেই। আমার সব গয়না আমি লেখাপড়া করে বুলবুলকে দিয়ে যাচ্ছি, আমার মরার পরে তোমরা আদায় করে নিও। আজ শুধু ওই ক'খানা আমায় দাও, হাতে না ক'রে আমি জলস্পর্শ করতে পাব না।"

ঠোঁটের কোণটা নাবাইয়া হাসিয়া নিরঞ্জন বলিল, "তোমাদের ভোল্ বুঝি না বাপু। এও কি গয়না আদায় করবার একটা ফন্দি? তুই মরবার পর আমি কি বেঁচে থাকব যে আমায় খৎ লিখে দিয়ে যাচ্ছিস্? আর গয়নাও ত ততদিনে বিক্রী হয়ে তোমার স্বামীর ব্যাঙ্কে টাকা হয়ে বাড়তে থাকবে, পাব কোথায় তা আমি?"

কল্যাণী বলিল, "আচ্ছা, তুমি দিও না। তবে যতক্ষণ না গয়না পাব ততক্ষণ আমার মুখে জলবিন্দু পড়বে না। আমার মায়ের পেটের ভাই হয়ে তুমি কেমন তা সহ্য কর আমি দেখব।"

বেলা বাড়িয়া চলিল। কল্যাণী মা'র ঘরেই বসিয়া দ্বিপ্রহরের আকাশের বারিহীন শুভ্র মেঘের দিকে অপলকে চাহিয়া ছিল। মনটা চাহিতেছিল অমনি লঘু, অমনি ভারহীন স্থির হইয়া মুক্ত আকাশের বুকে পড়িয়া থাকিতে। মান মর্য্যাদার ভয় জীবনের মায়া আজ তাহার ঘুচিয়া গিয়াছে।

তাহার মনকে বাস্তবে ফিরাইয়া আনিল হীরালালের পদশব্দ। ঘরে ঢুকিয়াই সে বলিল, "কি গো, এত দেরী? এখনও কি করছ?" কল্যাণী চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, দুই চক্ষু ভরিয়া হীরালালের লুব্ধ ও ক্রুদ্ধ মুখের ছবি দেখিল; তারপর শান্তগতিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া বলিল, "তুমি একটু দাঁড়াও, আমি এখুনি নিয়ে আসছি।"

নিরঞ্জনের রুদ্ধ দরজায় ধাক্কা দিয়া কল্যাণী বলিল, "দাদা, বৌদি, একটিবার বাইরে এস। বুলবুলিকেও ডাক।"

ঘরের ভিতর তিনজনই ছিল, বাহির হইয়া আসিল। কল্যাণী বলিল, "তোমরা তিনজনেই জান সে গয়না তোমাদের কাছে আছে। যে হোক একবার বার ক'রে দাও। আমি গয়না নিয়ে যাব না। শুধু একবার হাতে করব। তারপর উপবাস ভঙ্গ ক'রে নিজের বাড়ি চলে যাব। মা বুলবুলের অকল্যাণ করব না।"

কল্যাণীর মুখের চেহারা দেখিয়া নিরঞ্জন গয়না বাহির করিয়া আনিল। সকলকে কল্যাণী মা'র ঘরে লইয়া গেল। বুলবুলি দুইটা রেকাবীতে সন্দেশ ও ফল লইয়া আসিল। কল্যাণী স্বামীর দিকে রেকাবী দুইটা ঠেলিয়া দিয়া বলিল, "ওগো, একটু মিষ্টিমুখ কর।" বিস্মিত হীরালাল ভয়ে ভয়ে একটা সন্দেশ তুলিয়া মুখে দিল। কল্যাণী গহনাগুলা দাদার হাত হইতে লইয়া বলিল, "ওগো, আমাদের খোকার ত বিয়ে দিতে হবে। আমার ঘরের মেয়েই ঘরে নিয়ে যাব। বুলবুলিকে আজই আমি এই গয়না দিয়ে আশীর্ব্বাদ করে গেলাম। নহরপুরে আর কাজ নেই, ঘরেই থাক ঘরের মেয়ে। আমার আর কে বা আছে, ও সব গয়নাগাঁটি আমার বৌ-ই পরবে।"

নিরঞ্জন ও হীরালাল পরস্পরের দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাইতে লাগিল। কল্যাণী ইতিমধ্যে মা'র দেয়ালে-টাঙানো ধান্যগুচ্ছ হইতে ধান ছিঁড়িয়া বুলবুলের মাথায় দিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছে। স্বামীর হাতেও কয়েকটা ধান গুঁজিয়া হাতখানা বুলবুলের মাথার উপর সে-ই উপুড় করিয়া ধরিল। সকলের বিস্ময় ভাঙিবার পূর্ব্বেই সে নিজেই শাঁখটা তুলিয়া বাজাইয়া দিল।

বাড়ি ফিরিবার সময় হীরালাল গাড়ীতে স্ত্রীকে বলিল, "এ বাপ্‌, কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা। যাক, দাদা যদি আর না বিয়ে করেন ত বাড়িখানা খোকাই পাবে।"

মুসলমান সভ্যতার ধারা ও প্রাচীন জ্ঞানচর্চ্চা

শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো, এম্‌-এ, পি এইচ-ডি

ইস্‌লাম বলিতেই ইতিহাসের সহিত অপরিচিত অমুসলমানের মনে ধ্বংসের বিরাট মূর্ত্তি ভাসিয়া উঠে। বস্তুতঃ, ইস্‌লামের অভ্যুত্থান যেন প্রলয়ের মহাপ্লাবন। হজরত মহম্মদের মৃত্যুর পর সহসা ইহার ঝটিকাবিক্ষুব্ধ তরঙ্গোচ্ছ্বাস আরব-মরুর বেলা-ভূমি অতিক্রম করিয়া বিধাতার রুদ্ররোষের ন্যায় পূর্ব্ব-রোম বা বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য ও ইরানের সাসানী সাম্রাজ্যের উপর প্রচণ্ড বেগে আপতিত হইল। আরব জাতির এই বিপুল বিজয়-অভিযান ও ইস্‌লাম-প্রচারকে কোন কোন ঐতিহাসিক গথ, ভাণ্ডাল প্রভৃতি অসভ্য জাতি কর্ত্তৃক পশ্চিম-রোমক সাম্রাজ্য ধ্বংসের সহিত তুলনা করিয়া থাকেন। কিন্তু আরব জাতি ও উক্ত জাতিসমূহের প্রসারকে একই পর্য্যায়-ভুক্ত করা যায় না। কেন-না, গথ ভাণ্ডাল প্রভৃতির পশ্চিম-দক্ষিণ ইউরোপ ও উত্তর-আফ্রিকায় রোমের সভ্যতা ও সাম্রাজ্য ধ্বংস উপচিত জনশক্তির মহাপ্লাবন ছাড়া আর কিছুই নহে। এ সমস্ত জাতির কোন অনুপ্রেরণা ছিল না, জগতকে তাহাদের নূতন কিছু দেওয়ার ছিল না। কিন্তু ইস্‌লাম এশিয়ার ফরাসী-বিপ্লব; আরব জাতি এ বিপ্লবের অগ্রদূত। ইস্‌লামের বিজয় প্রাচীন সভ্যতার রাহুগ্রাস কিংবা বর্ব্বর পশুবলের তাণ্ডব নহে। পৌত্তলিকতা ও পৌরহিত্যবর্জ্জিত উন্নততর একেশ্বরবাদ, সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতার ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত অভিনব ধর্ম্মরাজ্যের আদর্শ লইয়া মুসলমান বিশ্ববিজয়ে বহির্গত হইয়াছিল। নূতনের সহিত ঘাতপ্রতিঘাতে পুরাতনের পরাজয় ও আংশিক ধ্বংস অনিবার্য্য। যে-কারণে রাজতন্ত্র-প্রধান ও রাজশাসিত ইউরোপ ফরাসী-বিপ্লবের প্রচণ্ড আঘাতে ভাঙিয়া পড়িয়াছিল ঠিক সেই কারণেই সমসাময়িক পূর্ব্ব রোমক সাম্রাজ্য, পারস্য ও হিন্দুস্থান ইস্‌লামের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারে নাই।

মানব-আত্মার যেমন ধ্বংস নাই, তেমনি জাতির আত্মা-স্বরূপ

সভ্যতারও সম্যক বিনাশ নাই। ইহা জরাজীর্ণ ক্ষয়রোগগ্রস্ত জাতিকে ত্যাগ করিয়া নূতন জাতিকে বরণ করে। বিজিত জাতির সভ্যতা অপেক্ষাকৃত কম সভ্য বিজেতাগণকে প্রায়ই জয় করিয়া থাকে। মুসলমান গ্রীস জয় করিবার বহুশতাব্দী পূর্ব্বে গ্রীক-জ্ঞানচর্চ্চা মুসলমান-রাজ্যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। মুসলমানেরা সঙ্গীত ও দর্শনকে বনাম গ্রীস হইতে গ্রহণ করিয়াছিল। সঙ্গীত ও দর্শনকে আরবী ভাষায় মুসিকি ও ফলসফা করা হইয়াছে। আরিস্ত (Aristotle), আফ্‌লাতুন্‌ (Plato) ও জালিলুস্‌ (Galen) গ্রীক হইলেও মুসলমানেরা নিতান্ত আপনার করিয়া লইয়াছে। জ্ঞানরাজ্যে মুসলমান জাতিভেদ ও ধর্ম্ম-বৈষম্য বিচার করে নাই। সমস্ত বিজিত জাতির জ্ঞানভাণ্ডার অনুসন্ধান ও উদ্ধার করিয়া মুসলমান উহার সংরক্ষণ ও প্রচার করিয়াছে। আমরা এই প্রবন্ধে প্রধানতঃ মুসলমান কর্ত্তৃক প্রাচীন জ্ঞানচর্চ্চা এবং প্রসঙ্গক্রমে মুসলমান সভ্যতার ক্রমবিকাশের সংক্ষেপ আলোচনা করিব।

হজরত মহম্মদের পরবর্ত্তী প্রথম খলিফা-চতুষ্টয়ের রাজ্যকালকে (হিঃ ১১-৪১) ইস্‌লামের স্বর্ণযুগ বলা হয়। উহা ধর্ম্মনিষ্ঠার সত্যযুগ, কিন্তু সভ্যতা ও জ্ঞানচর্চ্চার শৈশব মাত্র। মরুবাসী আরব সবেমাত্র তখন শহুরে হইয়াছে; লুঙ্গী-চাদর ছাড়িয়া সুসভ্য ইরানীয়দের অনুকরণে পায়জামা, মোজা, টুপী ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। পয়গম্বরের সময় মক্কা-মদিনায় যে-কয়জন লেখাপড়া জানিত তাহাদের সংখ্যা হাতের আঙুলে গণনা করা যাইত। এ-সময়েও অবস্থা সেরূপই ছিল। কোরাণশরীফ, জেহাদ ও বেহেশ্‌ত্‌ (স্বর্গ) ছাড়া অন্য কোন বিষয় তখন খাঁটি মুসলমানের চিন্তার অতীত ছিল। আরবদের মধ্যে একদল ছিল কপটাচারী (মোনাফেক্‌); সুবিধাবাদ ছাড়া অন্য কোন ধর্ম্মবিশ্বাস তাহাদের ছিল না। তাহারা সুজলা সুফলা সিরিয়া, মিশর ও ইরাকের সুরম্য উদ্যানবাটিকায় বিজয়লব্ধ ঐশ্বর্য্য ও নারী-সৌন্দর্য্যে ভূস্বর্গ সৃষ্টির স্বপ্নে বিভোর। মহাত্মা আলীর মৃত্যুর পর ওম্মীয়গণ খেলাফৎ অধিকার করিল। ইহারা ছিল নামেমাত্র মুসলমান; অধিকাংশই হজরত কর্ত্তৃক মক্কা-অধিকারের পর দায়ে ঠেকিয়া ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল। ওম্মীয়গণের শতবর্ষব্যাপী রাজত্বকাল সাম্রাজ্যগর্ব্বিত আরব জাতির বীরত্ব-গৌরবে উদ্ভাসিত হইলেও উহা নিরঙ্কুশ ভোগলালসার আবিল প্রবাহে কলঙ্কিত। মুসলমানেরা ওম্মীয় খেলাফতকে জ্ঞানহীন ধর্ম্মহীন যথেচ্ছাচার এবং পাপ ও ব্যভিচারের যুগ বলিয়া থাকেন। আরব জাতির নৈতিক জীবনে ইহা যেন ইস্‌লাম-প্রতিষ্ঠিত সংযমের কঠোর নিগড়ে আবদ্ধ চিরস্বাধীন, ভোগলোলুপ, অতৃপ্ত বেদুঈন প্রকৃতির বিদ্রোহ—মুসলমান সাম্রাজ্যে 'পিউরিটান রেজিম'-এর পর 'রেষ্টোরেশান'।

দ্বিতীয় ওমর ও হিশাম ব্যতীত এই বংশের খলিফাগণ প্রকাশ্যে মদ্যপান করিতেন। দ্বিতীয় বলিদ (Walid) একটি শরাবের চৌবাচ্চা তৈয়ার করাইয়াছিলেন। উহাতে ডুব-সাঁতার দিয়া মদ খাওয়াই ছিল তাঁহার পরম আনন্দ। তাঁহার হাতে কোরাণশরীফেরও লাঞ্ছনার অবধি ছিল না। একদিন কোন কারণে তিনি তীরধনু লইয়া কোরাণের উপর চাঁদমারী (target) করিতে আরম্ভ করেন। এই প্রসঙ্গে লিখিত তাঁহার কবিতার একছত্র—

> "When thou meetest thy Lord on the last judgment morn,
> Then cry unto God 'By Walid I was torn."*

একমাত্র দ্বিতীয় ওমর ছাড়া এ-বংশের কোন খলিফা বিজিত জাতিদের মধ্যে ইস্‌লাম-প্রচারের কোন চেষ্টা করেন নাই, বরং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে বাধা দিয়াছিলেন। তাঁহাদের সময়ে নিয়ম ছিল, শুধু কল্‌মা পড়িলে কেহ মুসলমান হইবে না, সঙ্গে সঙ্গে সুন্নৎ হওয়া চাই। কিন্তু এত করিয়াও আরব ছাড়া অন্য জাতীয় অমুসলমান ইস্‌লাম গ্রহণ করিলে তাঁহাদের সময়ে জিম্মিরা জিজিয়া বা মুণ্ডকর হইতে রেহাই পাইত না। ইস্‌লামের অনুশাসন না মানিলেও আরবেরা ইস্‌লামকে তাহাদের মৌরসী সম্পত্তি মনে করিত। আরব ছাড়া অন্য কেহ ইস্‌লাম গ্রহণ করিয়া মুসলমান সাম্রাজ্যে নাগরিকের পূর্ণ অধিকার লাভ করুক ইহা তাহাদের অভিপ্রেত ছিল না। সঙ্গীত, প্রাচীন আরব কবিতা, মহম্মদ ও তাঁহার পরবর্ত্তী খলিফা-চতুষ্টয় ছাড়া অন্য বিষয়ক, যথা—প্রাচীন পারস্য ও দক্ষিণ-আরবের রাজবংশের ইতিহাস ও যুদ্ধকাহিনী—তাঁহাদের কাছে বিশেষ সমাদৃত হইত। তাঁহাদের ধারণা ছিল, মরুবাসী বেদুঈনের তাঁবুই প্রকৃত মনুষ্যত্ব শিক্ষার শ্রেষ্ঠ স্থান। সেজন্য বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে শিক্ষাসমাপ্তির জন্য

* *Umayyads and Abbasides;* trans. by Margoliouth, p. 104.

রাজপুত্রদিগকে নিরক্ষর বেদুঈনদের কাছে পাঠাইয়া দেওয়া হইত। লেখাপড়া ও স্কুলমাষ্টারকে আরবেরা ঘৃণার চক্ষে দেখিত; কেন-না, প্রাচীন রোমে যেমন গ্রীক ক্রীতদাসগণ শিক্ষকতা করিত, প্রধান প্রধান শহরে এই সময় মাওয়ালারাই ছেলে পড়াইত। এজন্য একটি চলিত কথা ছিল—তাঁতী ও মাষ্টারের মূর্খতা। এই সময় প্রকৃতপক্ষে আরবেরা অর্দ্ধসভ্য অবস্থায় ছিল। রাজ্যের হিসাবনিকাশ কিংবা কোন দপ্তরে আরবদের চাকরি দেওয়া হইত না। যে-দেশের মাটিতে চাষ হয় না, যে-জাতি যতদিন কৃষিকে অবজ্ঞা করে ততদিন সে-দেশে সভ্যতার অভ্যুদয় হয় না। বাস্তবিকপক্ষে আরব সভ্যতা বলিয়া কোন বস্তু নাই। আরবের মরুবেষ্টনীর বাহিরে প্রাচীন আসীরিয় বাবিলনীয় ও ইরানীয় সভ্যতার মহামিলন-ক্ষেত্র তাইগ্রীস্ ও ইউফ্রেটিস্ নদীর মধ্যবর্ত্তী ভূভাগে যে সভ্যতা আব্বাসী খলিফাদের সময় গড়িয়া উঠিয়াছিল উহা মুসলমান সভ্যতা। এই সভ্যতা বিজিত মাওয়ালাগণের কীর্ত্তি। তাহারাই প্রাচীন সভ্যতার জ্ঞানভাণ্ডার হইতে দর্শন, সঙ্গীত, গণিতশাস্ত্র, জ্যোতিষ, রসায়ন, প্রকৃতিবিজ্ঞান ইত্যাদি আহরণ করিয়া আরবের শূন্য ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াছে।

ইস্‌লাম জাতিভেদ ও বর্ণভেদ স্বীকার করে না; মানুষ মাত্র না হউক, অন্ততঃ মুসলমানেরা পরস্পর সমান। খোদাতালার রাজ্যে আরব-হাবসী ধনী-দরিদ্র, ব্রাহ্মণ-শূদ্রে তফাৎ নাই। তাঁহার দরবারে শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি সংকার্য ও পুণ্যের পরিমাণ—ঐশ্বর্য্য কিংবা বংশমর্য্যাদা নহে। কিন্তু ওমীয়-বংশের রাজত্বকালে রাষ্ট্র ও সমাজে ঐস্লাম্য সাম্যের স্থলে প্রীতির এবং বর্ণবিদ্বেষ একত্রে স্থান অধিকার করিল। এই সময়ে মনুষ্য জাতির তিন ভাগ পরিকল্পিত হইত, যথা—আরব, মাওয়ালা (ইরানী, গ্রীক প্রভৃতি বিজিত জাতি যাহারা ইস্‌লাম গ্রহণ করিয়াছিল) এবং আহেল-ই-কেতাব, অর্থাৎ য়িহুদী ও খৃষ্টান যাহারা মুসলমানদের পূর্ব্বে অপৌরুষেয় গ্রন্থ বাইবেল ও পেণ্টাটিউক পাইয়াছিল। এই তিন শ্রেণীর মধ্যে আরব ষোল-আনা মানুষ, মাওয়ালা অর্দ্ধ-মনুষ্য, এবং আহেল-ই-কেতাব অমানুষ (non-men) অর্থাৎ, মনুষ্য-পর্য্যায়ের অন্তর্গত নহে। আরবের ভাষা, আরবের ধর্ম্ম এবং আরব-প্রভুত্ব মেরুদণ্ডহীন সুসভ্য গ্রীক ইরানী প্রভৃতি বিজিত জাতিসমূহকে বাস্তবিকপক্ষে এতই অভিভূত করিয়াছিল যে, আরবীভাবাপন্ন মাওয়ালারা নিজেদের ছোট জাত বলিয়াই মনে করিত। আরব-কন্যার সহিত মাওয়ালার বিবাহ শূদ্র ও ব্রাহ্মণীর প্রতিলোম-বিবাহের চেয়েও অধিকতর নিন্দনীয় ছিল। কথিত আছে, এক আরব-কন্যা একজন পরম বিদ্বান ব্যক্তিকে বিবাহ করিয়াছিল। বর আরবী ভাষায় দিগ্‌গজ পণ্ডিত হইলেও স্ত্রীকে বাসরঘরের বাতি নিবাইতে বলিবার সময় ধরা পড়িলেন। তিনি জাতিতে আরব ছিলেন না। স্বামীর অশুদ্ধ আরবী উচ্চারণ শুনিয়া স্ত্রী তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে তালাক দিলেন। কোন মাওয়ালা আরব-কন্যা বিবাহ করিয়াছে, এই সংবাদ সরকারী কর্ত্তৃপক্ষের কর্ণগোচর হইলে স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিতে বাধ্য হইত, এবং এই অপরাধের জন্য মাথার চুল ও চোখের ভুরু কামাইয়া মাওয়ালাকে দু-শ ঘা বেত দেওয়া হইত।* প্রসিদ্ধ কবি নুছেবের পুত্র তাঁহার আরব-প্রভুর কন্যার প্রেমে পড়িয়াছিল; এবং কন্যার অভিভাবকগণও এ বিবাহে সম্মতি প্রকাশ করিয়াছিল। ইহা শুনিয়া কবি তাঁহার হাবসী গোলাম-দিগকে হুকুম দিলেন, ছেলেকে বেদম প্রহার করিয়া যেন তাহার এ বাতিক দূর করে; কারণ মাওয়ালা-কবি তাঁহার পুত্রের এরূপ অভিলাষ অমার্জ্জনীয় অপরাধ বলিয়া মনে করিলেন। মাওয়ালাদের মধ্যে যাঁহারা শিক্ষা, চরিত্রের উৎকর্ষতা ও জ্ঞানে আরবদের চেয়ে শতগুণ শ্রেষ্ঠ ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে এক দল ছিলেন দাস-মনোভাবসম্পন্ন আরব-ভক্ত—যে ভক্তি ব্রাহ্মণের প্রতি সদ্ধর্ম্মী শূদ্রের ভক্তির সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। শুধু ওম্মীয় রাজত্বকালে নয়, যখন আব্বাসী খলিফাদের দরবারে মাওয়ালাদের পূর্ণ প্রাধান্য, তখনও এই শ্রেণীর মাওয়ালাদের অহেতুকী আরব-ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। খলিফা মনসুরের দরবারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ইবন্-উল-মোকাপ্‌ফা একজন ইরানীয় মাওয়ালা ছিলেন। বসোরা শহরে একজন বিশিষ্ট পারস্যবাসীর বাড়িতে এক বৈঠকে ইবন্-উল-মোকাপ্‌ফা প্রশ্ন তুলিলেন—পৃথিবীর মধ্যে কোন্ জাতি বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ? উপস্থিত ব্যক্তিরা স্থান ও পাত্র বিবেচনা করিয়া বলিল—ইরানী জাতি। ইবন মোকাপ্‌ফা বলিলেন—ইহা ঠিক নহে; ইরানী জাতি মহাপরাক্রান্ত বিস্তৃত সাম্রাজ্য

* *Ummayyad and Abbasides*, p. 119.

স্থাপন করিয়াছিল বটে, কিন্তু নিজেদের প্রতিভাবলে তাহারা নূতন কিছু আবিষ্কার করে নাই। তিনি একে একে গ্রীক্ প্রভৃতি সমস্ত প্রাচীন জাতির দাবি খণ্ডন করিয়া এ বিষয়ে আরবদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিলেন। তিনি বলিলেন, যদিও দুর্ভাগ্যক্রমে আমি আরব-বংশে জন্মগ্রহণ করি নাই, তবুও আরব জাতিকে জানিবার ও বুঝিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে।

মাওয়ালাদের মধ্যে বিদ্যাবুদ্ধি কর্ম্মকুশলতা ও সাহসে ইরানীরা ছিল অগ্রণী। ইহাদের সংখ্যাও ছিল অন্যান্য জাতীয় মাওয়ালাদের অপেক্ষা অনেক বেশী। সুতরাং ইসলামের ইতিহাসে আরব-মাওয়ালা বিরোধ আরব ও ইরানীয় জাতির প্রাচীন শত্রুতার নূতন রূপ,— সেমেটিক ও আর্য্যসভ্যতার অভিনব শক্তিপরীক্ষা বলা যাইতে পারে। ইরানীদের মধ্যে সকলেই ইবন্-উল মোকাপ্‌ফার মত আরবী-ভাবে বিভোর, আরব-মাহাত্ম্যে মন্ত্রমুগ্ধ ও কায়মনে আরবভক্ত ছিল না। ইস্‌লাম গ্রহণ করিয়া অগ্নিউপাসক মুমূর্ষু ইরানীয় জাতি পুনর্জীবন লাভ করিয়াছিল। আরব-বিদ্বেষ ছিল ইরানের এই নূতন জাতীয়তাবাদের মূলমন্ত্র। ইরানী মাওয়ালাগণ রাজনীতিক্ষেত্রে ওম্মীয় যুগে অখণ্ডপ্রতাপ আরব-শক্তির বিরুদ্ধে মাথা তুলিতে পারে নাই। আরবেরা যাহাদিগকে তলোয়ারের জোরে জয় করিয়াছিল তাহারা কাগজে-কলমে এই পরাজয়ের প্রতিশোধ লওয়ার জন্য একটি আরব-বিদ্বেষী বিদ্বৎসমাজ প্রতিষ্ঠা করে। ইহার নাম ছিল শু-উব্বী, ইহারা সাম্যবাদী নামেও পরিচিত ছিল। ইস্‌লামের সাম্যবাদ প্রধানতঃ মুসলমান সমাজ ও রাষ্ট্রে নিবদ্ধ ছিল। কিন্তু শু-উব্বীরাই সর্ব্বপ্রথম প্রচার করিয়াছিল— শুধু মুসলমানেরা পরস্পর সমান নহে, মানুষ মাত্রই সমান। ইস্‌লাম অপেক্ষাও অধিকতর উদার এই সাম্যবাদ ছিল শু-উব্বীদের প্রতিপাদ্য বিষয়। আরবের বিরুদ্ধে পৃথিবীর যে-কোন জাতির পক্ষে ওকালতী করা, আরব জাতিকে অন্যান্য জাতির চেয়ে সভ্যতা, জ্ঞান ও চরিত্রগুণে হেয় প্রতিপন্ন করাই ছিল সাম্যবাদীদের লেখনী-চালনার উদ্দেশ্য। আরবভক্ত ও আরববিদ্বেষী উভয় পক্ষেই ইরানীরা বাদ-প্রতিবাদ চালাইত। লেখাপড়া, চুল-চেরা যুক্তিতর্ক ওম্মীয় যুগের আরবেরা অবজ্ঞার চক্ষে দেখিত। এই দুই দলের বিরোধ ও বাদপ্রতিবাদের ফলেই মুসলমানের দৃষ্টি প্রাচীন সভ্যতা ও জ্ঞানচর্চ্চার প্রতি সর্ব্বপ্রথম আকৃষ্ট হইয়াছিল। আরবভক্তরা খলিফাগণকে লইয়া গর্ব্ব করিলে সাম্যবাদীরা ফেরায়ুন (পিরামিড নির্ম্মাতাগণ), নিমরুদ, খসরু, সীজার, সোলোমন, আলেকজাণ্ডার এবং ভারতবর্ষের সম্রাটগণের কীর্ত্তি বর্ণনা করিয়া প্রতিপক্ষকে নির্ব্বাক করিত। নবী রসুলের কথা উঠিলে সাম্যবাদীরা বলিত—বাবা আদমের পর এক লক্ষ চব্বিশ হাজার রসুল-পয়গম্বরের মধ্যে হুদ (Hud), সালেহ, ইস্‌মাইল ও হজরত মহম্মদ এই চারিজন মাত্র আরব-বংশে জন্মিয়াছেন। জ্ঞানে শ্রেষ্ঠতার তর্ক উঠিলে একা কোরাণশরীফেই আরবী-পাল্লা ভারী হইয়া উঠিত। আরবী-বিদ্বেষীরা এক্ষেত্রে সুবিধা করিতে না পারিয়া গ্রীক ও হিন্দু দর্শন, ইরানীয়, খল্দীয় ও প্রাচীন মিসরের জ্যোতিষ, বিজ্ঞান ইত্যাদির নজীর উপস্থিত করিত।

আরব্যোপন্যাসের স্বপ্নপুরী, আরব-বিক্রমাদিত্য খলিফা হারুণ-অল্-রশিদের রাজধানী বাগদাদ নগরী ছিল মধ্যযুগে বিশ্বভারতীর প্রিয় নিকেতন। উদারচেতা ও মুক্তবুদ্ধি আব্বাসী খলিফাদের আশ্রয়ে শু-উব্বীরা বিশেষ প্রাধান্যলাভ করে। ওম্মীয়-বংশের ধ্বংস ও আব্বাসী খেলাফতের প্রতিষ্ঠা নবজাগ্রত ইরানী জাতির দ্বারাই প্রধানতঃ সাধিত হইয়াছিল। এজন্য রাজবংশ আরব, রাজকীয় ভাষা ও ধর্ম্ম আরবী হইলেও আব্বাসী খেলাফতের প্রথম ভাগকে পারস্য-প্রাধান্যের যুগ বলা হয়। শু-উব্বীদের প্রভাবে গোঁড়া মুসলমান সমাজের সঙ্কীর্ণতা বহু পরিমাণে দূরীভূত হওয়াতে এ-সময়ে মুসলমান সভ্যতা অতিদ্রুত উন্নতিলাভ করে। খলিফা মনসুর হইতে মামুনের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত (খৃঃ ৭৫৪—৮৩৩) মুসলমান সভ্যতার স্বর্ণযুগ। যৌবনের উচ্ছৃঙ্খলতার অবসানে মুসলমান সমাজ এ-সময়ে প্রৌঢ়ত্বে পদার্পণ করিয়াছে। বাধাহীন জ্ঞানচর্চ্চা ও স্বাধীন চিন্তার অবকাশ কিংবা প্রবৃত্তি ইহার পূর্ব্বে মুসলমানদের মধ্যে দেখা যায় নাই। বালক ও প্রবীণের মনোবৃত্তি, জ্ঞান ও চিন্তাশক্তির যতখানি তারতম্য, আব্বাসী খলিফার একজন দরবারী আলেম্ (পণ্ডিত) এবং প্রথম চারি খলিফার সমসাময়িক একজন আন্‌সার্ অর্থাৎ মদিনাবাসীর মধ্যে এ-সমস্ত বিষয়ে ততখানি তফাৎ ছিল বলিলেও অত্যুক্তি

হয় না। বিশ্রুতকীর্ত্তি খলিফা মনস্থর, হারুণ-অল-রশিদ এবং এবং মামুনের দরবারে জ্ঞানচর্চ্চার বিবরণ হইতে এই উক্তির সার্থকতা বুঝা যাইবে।

খলিফা মনস্থর

মনস্থর নিষ্ঠাবান মুসলমান হইলেও শাস্ত্রচর্চ্চায় জায়েজ, না-জায়েজ, হারাম ও হালাল বিচার করিতেন না। ইস্‌লামের অনুশাসনে মুসলমানের ফলিত জ্যোতিষ (astrology) আলোচনা নিষেধ। মনস্থর সর্ব্বপ্রথমে এই নিষেধ উপেক্ষা করিয়া জ্যোতিষ শাস্ত্রের সমাদর করিয়াছিলেন। তাঁহার দরবারী জ্যোতিষীর নাম ছিল নো-বখ্‌ত। নো-বখ্‌তের দ্বারা লগ্ন ও শুভমুহূর্ত্ত বিচার না করাইয়া খলিফা এক পা-ও চলিতেন না। ইনি ও ইঁহার বংশধরগণ বহু জ্যোতিষ গ্রন্থ ফার্সী ভাষা হইতে আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন। মনস্থরের গুণগ্রাহিতায় আকৃষ্ট হইয়া কয়েক জন হিন্দু জ্যোতিষী বাগদাদ গিয়াছিলেন। এই সমস্ত পণ্ডিতের সাহায্যে অল্‌-ফজরি ব্রহ্মগুপ্তের ব্রহ্ম-সিদ্ধান্ত (*Sind-hind*) ও খণ্ড-খাণ্ডক (Ar-kand) নামক জ্যোতিষ গ্রন্থের আরবী অনুবাদ প্রকাশ করেন। মনস্থরের রাজত্বকালে পঞ্চতন্ত্রের করটক-দমনক উপাখ্যান ইস্‌লামের বহু পূর্ব্বে ফার্সী ভাষায় তর্জ্জমা হইয়াছিল। মনস্থরের আদেশে ইবন্‌-উল-মোকাপ্‌ফা এই ফার্সী তর্জ্জমার আরবী অনুবাদ (*Kalitawa Damna*) করেন। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের চর্চ্চাও মনস্থরের সময় হইতে আরম্ভ হয়। জুরজিস (George) নামক সিরিয়ান খৃষ্টান ছিলেন তাঁহার দরবারী হকিম। তিনি সিরীয়, গ্রীক ও আরবী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন।

খলিফা মনস্থরের পুত্র মেহ্‌দীর রাজত্বকালে মানী প্রভৃতি তার্কিকগণের গ্রন্থ আরবী ভাষায় তর্জ্জমা হওয়ায় শিক্ষিত মুসলমানদের ধর্ম্মবিশ্বাস শিথিল হইয়া পড়ে। ইহার ফলে ইস্‌লামে চার্ব্বাকদের ন্যায় একদল কুতার্কিক দেখা দেয়—ইহাদিগকে জিন্দিক বলা হইত। এই গভীর জ্ঞানসম্পন্ন, চিন্তাশীল, অবিশ্বাসী তার্কিকদের তর্কের হামলায় ইস্‌লামের আলেম-সমাজ পরিত্রাহি ডাক ছাড়িলেন। চার্ব্বাকেরা যেমন বৈদিক ক্রিয়াকলাপ, পরজন্ম, ঈশ্বরের অস্তিত্ব, ইত্যাদিকে যুক্তি ও উপহাসের তীব্র বাণে বিদ্ধ করিয়া লোকসমাজে হেয় প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন, সেইরূপ জিন্দিকদের তর্কের বিরুদ্ধে রসুল, কোরাণ ও খোদাকে রক্ষা করা সেকেলে মৌলানাদের অসাধ্য হইয়া উঠিল। কেন-না, প্রকৃত মুসলমানেরা ধর্ম্মকে লৌকিক যুক্তির বহু উর্দ্ধে মনে করে। মৌলানা ও গোঁসাইরা এ বিষয়ে একমত—অর্থাৎ "বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহু দূর।" গোঁসাইরা "কৃষ্ণনিন্দা" শুনিলে কানে আঙুল দিয়া "স্থানত্যাগেন" দুর্জ্জনকে বর্জ্জন করেন। কিন্তু মৌলানারা ছিলেন অন্য ধাতের লোক কথায় আঁটিয়া উঠিতে না পারিলে তাঁহারা সকল যুক্তির সেরা "লাঠ্যৌষধি" ব্যবস্থা করিতেন। "ইস্‌লাম গেল" রব তুলিয়া তাঁহারা অন্ধবিশ্বাসী জনসাধারণকে ক্ষেপাইয়া তুলিতেন, কিংবা খলিফার দরবারে নালিশ করিয়া জিন্দিকদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করিতেন। কিন্তু ইহাতেও জিন্দিক-বাদ ধ্বংস হইল না; মুখে হার না মানিলেও জিন্দিকদের কাছে মৌলানারা মনে মনে পরাজয় স্বীকার করিতেন কেন-না ভাবের ঘরে কেহ বেশীদিন চুরি করিতে পারে না। খলিফা মেহ্‌দী বুঝিতে পারিলেন, যুক্তিদ্বারা কুতার্কিকগণকে পরাস্ত করিয়া ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠা করিতে না পারিলে যুক্তি-তর্কের যুগে ইস্‌লামের প্রভাব ক্রমশঃ খর্ব্ব হইবে। মৌলানারা নিরুপায় হইয়া জিন্দিকগণের প্রদর্শিত পথে বিরুদ্ধবাদী তর্ক ও দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু ধর্ম্মে দৃঢ়বিশ্বাস থাকাতে অমুসলমান-শাস্ত্র চর্চ্চার বিষক্রিয়া ইহাদের উপর দেখা গেল না। পরবর্ত্তী কালে বরং এই বিষকে হজম করিয়া ইমাম গজ্জালী অমর হইয়াছেন। তাঁহার পবিত্র লেখনী ইস্‌লামকে নূতন রূপ দিয়াছে। তাঁহার কৃপায় বহু জিন্দিক নিজেদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া ধর্ম্মবিশ্বাস ফিরিয়া পাইয়াছে। জিন্দিকগণের সহিত বাদ-প্রতিবাদের ফলে এই সময়ে ইল্‌ম্‌-ই-কালাম বা ইস্‌লামীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

খলিফা হারুণ-অল-রশিদের সময় বাগদাদ শুধু মুসলমানের শহর ছিল না। সকল দেশের ও সকল ধর্ম্মের লোক তখন বাগদাদে বাস করিত। ইহারা তখন অনেকে রাজদরবারে চাকরির লোভে আরবী শিখিত। খলিফা হারুণ বাগদাদে এক বাণীধাম প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার নাম ছিল বায়েৎ-উল-হিক্‌মৎ (*Bait-ul-Hikmat*)

বা Academy of *Sciences*—অবশ্য হিক্‌মৎ বলিতে Arts এবং Science দুই-ই বুঝায়। খৃষ্টান, য়িহুদী ও হিন্দু পণ্ডিতেরা এখানে অনুবাদকের কাজ করিতেন। তাঁহাদের স্ব-স্ব ভাষার প্রাচীন গ্রন্থসমূহ—যাহা তথায় সযত্নে সংরক্ষিত ছিল—এই সময় তাঁহারা আরবীতে অনুবাদ করেন। ইস্‌লামের অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া খলিফা হারুণ তর্ক ও দর্শন শাস্ত্র চর্চ্চার বিরোধী ছিলেন। তাঁহার ভোগক্লিষ্ট দেহ নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হওয়ায় চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রতি তিনি সমধিক অনুরক্ত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার দরবারী চিকিৎসকদের মধ্যে বেশীর ভাগ আরব কিংবা মুসলমান ছিল না। হারুণের মন্ত্রী বরামকী-বংশীয়েরা হিন্দু আয়ুর্ব্বেদের বিশেষ ভক্ত ছিলেন। ইঁহাদের পূর্ব্ব-পুরুষ প্রাচীন বাল্‌হীক (Balkh) দেশের নববিহার নামক বৌদ্ধ সংঘারামের অধ্যক্ষ ছিলেন। 'বরামক'* না-কি সংস্কৃত শব্দ 'পরমক' শব্দের বিকৃতি। বরামক ব্যক্তিবিশেষের নাম নহে। কেহ কেহ বলেন, এই পরমক বা বরামক ভারতবর্ষীয় ছিলেন। যাহা হউক ইঁহার বংশধরগণ ইসলাম গ্রহণ করিবার পরেও ভারতবর্ষের সহিত যোগসূত্র অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য তাঁহারা অনেক পণ্ডিতকে ভারতবর্ষে পাঠাইতেন। তাঁহারা অনেক হিন্দু-চিকিৎসককে বাগদাদে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। হিন্দু-চিকিৎসকদের মধ্যে ইবন্-ই-দহন (ধনিন ?) বাগদাদের সরকারী চিকিৎসাগারের (*Dar-us-shifa*) প্রধান কবিরাজ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। জুর্জীজেয়দন কৃত *Ulum-i-Arab* নামক পুস্তকে নিম্নলিখিত হিন্দু-কবিরাজ ও হিন্দু-আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়।

১। মন্‌কা হিন্দী ইনি পারস্য ভাষা জানিতেন। ইহায়া-বিন্-বারমক ইঁহাকে খলিফা হারুণের চিকিৎসার জন্য ভারতবর্ষ হইতে লইয়া গিয়াছিলেন। অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ তিনি ফার্সী ভাষায় তর্জ্জমা করেন।

২। ইবন্-ই-দহন্—ইঁহার একখানা পুস্তকের নাম উন্‌সান্‌কর বা এই রকম কিছু। অপরখানির নামও দুর্ব্বোধ্য।

৩। সালেহ্-বিন্-ভেলা—রশিদের সময় ইনি ইরাকে চিকিৎসা-ব্যবসায় করিয়া অত্যন্ত যশস্বী হইয়াছিলেন।

৪। শানক্—বিষ-সম্বন্ধে ইনি এক পুস্তক লিখিয়াছিলেন। ইহা প্রথমে ফার্সী, পরে ফার্সী হইতে আরবীতে অনুবাদ করা হয়।

'তবকাৎ-উৎ-তিব্বা'র (*Tabqat-ut-tibba*) গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, আব্বাসী খেলাফতের সময় বাগদাদে অনেক হিন্দু চিকিৎসক, জ্যোতিষী ও দার্শনিক ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে কন্‌কা (কঙ্কায়ন ?) শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ও শ্রেষ্ঠ জ্যোতিষী ছিলেন। অন্যান্য পুস্তকের মধ্যে মন্‌জহল ও বাখর (ভাস্কর ?) নামক দুইখানি পুস্তকের নাম পাওয়া যায়।

আরবী ভাষায় তর্জ্জমা-করা কয়েকখানা হিন্দু গ্রন্থের নাম—

১। জুদর প্রণীত প্রাণী, উদ্ভিদ ও ভূতত্ত্ব সম্বন্ধীয় পুস্তক।

২। *Rausa-ul-Hindia* হিন্দুস্থানের স্ত্রীরোগ-সম্পর্কীয় গ্রন্থ।

৩। *Rai-ul-Hind-fil-ajnas-ul-Hayyiat u Samumha*—বিভিন্ন জাতীয় সর্প ও তাহাদের বিষ।

৪। *Kissa-hubut-i-Adam*—সৃষ্টিপ্রকরণ (মনু-সংহিতা ?)

৫। *Biafar* (?)—সঙ্গীতের তানলয় প্রকরণ।

ইস্‌লাম-সরস্বতীর বরপুত্র খলিফা মামুনের সময় বাগদাদে বিদ্যাচর্চ্চার ইতিহাস আমরা পরে আলোচনা করিব।

* Alberuni's India, Trans. by Sachau, Preface. p. xxx—xxxiii.

খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া পাহাড় এবং কামাখ্যা

শ্রীঅবনীনাথ রায়

শিলং সম্বন্ধে লিখতে একটু সাবধান হ'তে হয়, এই জন্যে যে পূর্ব্বে এই পাহাড় সম্বন্ধে কেউ কেউ লিখতে গিয়ে কিছু ভুল করেছেন এবং তাই অবলম্বন ক'রে সেখানে নানা গল্পের সৃষ্টি হয়েচে। কোন ভ্রমণকাহিনীর লেখক না-কি লিখেছিলেন যে, শিলং থেকে চেরাপুঞ্জি যাওয়ার পথে দু-ধারে কমলালেবুর বাগান দেখতে পাওয়া যায়। আর কোন গল্প-লেখক না-কি লিখেছিলেন যে, একটি লাল রঙের ত্রিতল বাড়ির প্রকোষ্ঠে কোন প্রণয়িনী তার প্রণয়াস্পদের জন্যে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছে। বলা বাহুল্য, এ দুটি উক্তির মধ্যে যাঁরা কখনও শিলিং যান নি তাঁরা কোন অসামঞ্জস্য দেখতে পাবেন না, বরঞ্চ লেখকের পর্য্যবেক্ষণশক্তির তারিফই করবেন, কিন্তু আসলে এ দুটি ঘটনা ওখানকার লোকের হাস্যোদ্রেক করে। কেন-না, শিলং থেকে চেরাপুঞ্জি যাওয়ার পথে কোন কমলালেবুর বাগান নেই; শুধু নেই নয়, থাকা অসম্ভব। বিরাট পাহাড়ের পঞ্জর ভেদ ক'রে যে সাবধানতার সঙ্গে সেখানে সে-পথ নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তার পাশে বাগান দূরে থাক কোন বৃক্ষেরই অস্তিত্ব নেই বললেই হয়। আছে এক পাশে গভীর খাদ, আর এক পাশে দুরধিগম্য পর্ব্বতশ্রেণী। দ্বিতীয়তঃ, কমলালেবুর গাছ শিলং থেকে চেরার পথে ত নেই-ই, এমন কি চেরাপুঞ্জিতেও নেই। তার কারণ চেরাপুঞ্জির যে আবহাওয়া সে আবহাওয়া কমলালেবুর গাছ জন্মানোর পক্ষে অনুকূল নয়—অত বৃষ্টিতে ও-গাছ জন্মায় না। কমলালেবুর বাগান হচ্চে চেরাপুঞ্জি থেকে আরও পাঁচ-ছয় মাইল নীচে যেখানে অত বৃষ্টি নেই অথচ বৃষ্টির আবহাওয়া আছে, যেখানে খুব শীত নয়



কৃত্রিম হ্রদ—শিলং



বড়বাজার—শিলং

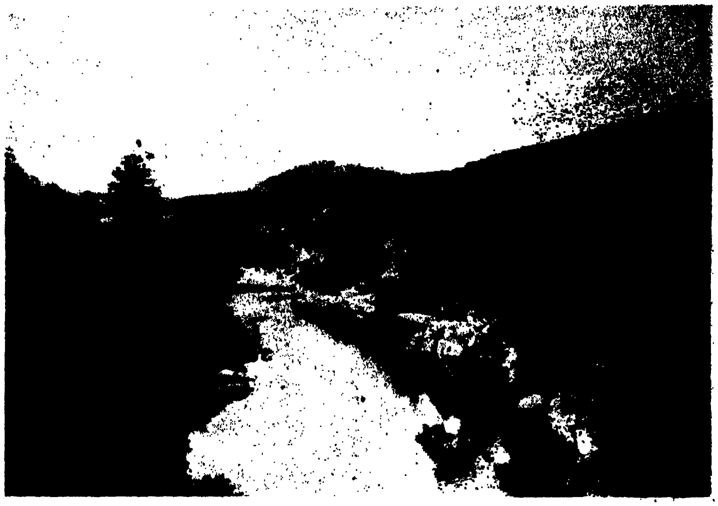
অথচ সমতলভূমির চেয়ে শীত বেশী। কমলালেবুর বিরাট আড়ত হচ্চে ছাতকের বাজার—ওদিককার সমস্ত লেবু সেখানে জড়ো হয়। চেরাপুঞ্জিতেও যথেষ্ট আমদানি হয় এবং দামে সস্তা। এক ভার অর্থাৎ বত্রিশটার দাম দু-আনা থেকে তিন আনা। শিলঙে লেবু চেরাপুঞ্জির চেয়ে একটু মাগ্‌গি, কেন-না, ঐ দিক থেকেই লেবুর আমদানি হয়। চেরাপুঞ্জির নীচে শেলাপুঞ্জি প্রভৃতি জায়গায় লেবুর বাগান, বাগানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় চাইলেই বাগানের খাসিয়া মালিক খুব খুশী হয়ে লেবু খেতে দেয়। লেবুগুলি যেমন বড় তেমনি রসে ভরা।

দ্বিতীয় নালিশ, লাল রঙের ত্রিতল প্রকোষ্ঠে অপেক্ষমাণা প্রণয়িনীর কথা। শিলঙে কোন ত্রিতল প্রকোষ্ঠ নেই, এমন কি ইঁটের বাড়িই নেই। সব বাড়িই কাঠের, এমন কি লাট-সাহেবের বাড়ি এবং সেক্রেটারিয়েট আপিস পর্য্যন্ত। এর কারণ হচ্চে অতিরিক্ত ভূমিকম্প। ভূমিকম্প



খাসিয়া কুটীর

সেখানকার নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার বললেই হয় এবং কাঠের বাড়ি না হয়ে চুণ-সুরকির বাড়ি হ'লে সে যে কোন্ কালে ধসে গুঁড়ো হয়ে যেত আমি তার সাক্ষ্য দিতে পারি। রাত্রে শুয়ে ঘুমুচ্চি হঠাৎ ঘরবাড়ি খাটপালঙ্ক থর থর ক'রে কাঁপতে সুরু করল এবং কেঁপে কেঁপে এক সময় আপনি থেমে গেল—খাটের লোক খাটেই ঘুমুতে লাগল, ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে হৈ-চৈ বাধিয়ে দিলে না। আবার একদিন সন্ধ্যার সময় আলো জ্বেলে বসে



বড়পানি পুলের উপর হইতে পশ্চিম দিকের দৃশ্য

পড়ছি, হঠাৎ ঘরবাড়ি টেবিল-চেয়ার সব দুলতে আরম্ভ করল—সে অনেকক্ষণ—পাশের ঘর থেকে বন্ধু বেরিয়ে এলেন—আমরা খবরের কাগজের কি একটা বিষয় আলোচনা করতে লাগলুম—আমাদের অধিকৃত বসবার আসন কিন্তু ইতিমধ্যে দুলেই চলেচে, আবার আপনিই সে এক সময় থেমে গেল। শঙ্খ ঘণ্টাধ্বনি ত দূরের কথা, লোকের নিত্যকাজেও এ কম্পন ব্যাঘাত জন্মায় না। শুনলুম দশ-বার ঘণ্টা পর্য্যন্ত না-কি এই ভূমিকম্প স্থায়ী হয়—অবশ্য অবিচ্ছেদে নয়, মাঝে মাঝে থেমে যায় আবার হয়। অতএব বোঝা যাচ্ছে যে নায়িকা ত্রিভূমিক উচ্চ শীর্ষে আরোহণ ক'রে দূরাগত নায়কের পথের দিকে তাকিয়ে থাকলে গল্পের সেটিঙের দিক থেকে যত মনোজ্ঞই হোক শিলঙে অন্ততঃ তার উপায় নেই!

শিলং থেকে চেরাপুঞ্জি ৩৩ মাইল পথ। এ পথের একটু আভাস আগেই দিয়েছি। বাস্তবিক যখন ৫০০০ ফুট উচ্চিতির উপর দিয়ে মোটর বা 'বাস' চলে এবং এক পাশের অতলস্পর্শী খাদ এবং আর এক পাশের ভীমকান্ত

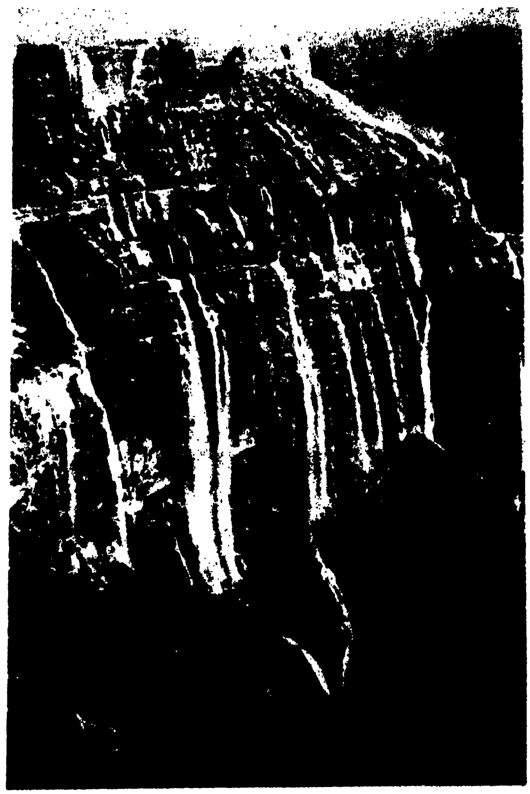
অনড় পর্ব্বতশ্রেণী মনুষ্যচালিত তরঙ্গবতী এই যন্ত্রের দিকে গভীর বিস্ময়ে চেয়ে থাকে তখন এই পার্ব্বত্য রাজ্যে যে অনধিকারপ্রবেশ করেছি এ-কথা স্পষ্টই মনে আসে। প্রায় অর্দ্ধপথে শিলং থেকে ১৮ মাইল ডম্‌পেপ।



'এলিফ্যান্ট' জলপ্রপাত

এই জায়গাটা এদিকে সবচেয়ে উঁচু ছয় হাজার ফুট হবে। এখানকার গেটে চেরাপুঞ্জি থেকে আগত এবং চেরাপুঞ্জিগামী দুই দল মোটর এসে পৌঁছলে তবে গেট খুলে দেওয়া হয়। এর পর চেরাপুঞ্জি নেমে যেতে হয়, কেন-না, চেরাপুঞ্জি মাত্র ৪০০০ ফুট উঁচু। ডম্‌পেপ থেকে চেরা পর্য্যন্ত ৬ মাইল রাস্তার সৌন্দর্য্যের সমারোহ ভাষার দ্বারা বর্ণনা করতে পারি আমার এমন ক্ষমতা নেই। কেবল এটুকু মনে আছে যে চেরার পথে বাঁ দিকে গহ্বরের যে বিশালতা এবং তারই পরপারে অপরাহ্ণের রৌদ্রালোকিত পর্ব্বত-শ্রেণীর যে অপার্থিব সৌন্দর্য্য দেখেছি এবং দেখে যে আনন্দ লাভ করেচি তার সঙ্গে তুলনা দিতে পারি এমন আর কিছুই মনে পড়ে না। ছোটবেলায় নানাবর্ণ-রঞ্জিত চিত্র দেখে বালক-মন যেমন অনাবিল আনন্দে পুলকিত হয়ে উঠত বোধ হয় একমাত্র সেই আনন্দের সঙ্গেই এই আনন্দের তুলনা দেওয়া যায়।

১৮৬৬ সাল পর্য্যন্ত খাসিয়া এবং জয়ন্তিয়া পাহাড়ের জেলা-সদর ছিল চেরাপুঞ্জি। ১৮৬৬ সালে এই সদর কাছারি চেরাপুঞ্জি থেকে শিলঙে নিয়ে আসা হয়। আরও ৮ বছর অর্থাৎ ১৮৭৪ সালে শিলং আসামের রাজধানী ব'লে পরিগণিত হয়।



মৌসমাই-জলপ্রপাত

চেরাপুঞ্জি থেকে আরও তিন মাইল গেলে মোস্‌মাই-জলপ্রপাত দেখতে পাওয়া যায়। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে যে ভীষণ ভূমিকম্প হয় তারই ফলে এই জলপ্রপাত ফেটে চৌচির হয়ে গেছে। আমি যখন দেখতে গিয়েছিলুম তখন জানুয়ারি মাস। সুতরাং জল ছিল না। কিন্তু ঐ ভূমিকম্পের

আগে মৌস্‌মাই পৃথিবীর মধ্যে তৃতীয় জলপ্রপাত ব'লে বিখ্যাত ছিল শুনেছি। মাটির থেকে এটা ১৮০০ ফুট উঁচু। জলপ্রপাতের প্রসঙ্গে আর একটা কথা মনে পড়ল। সেটা হচ্ছে এই যে খাসিয়া এবং জয়ন্তিয়া পাহাড়ে যতগুলি জলপ্রপাত আছে ভারতবর্ষের আর কোন পাহাড়ে তত নেই। মৌস্‌মাইকে নিয়ে ৮টি জলপ্রপাতের নাম আমিই বল্‌তে পারি—আরও দু-একটা থাকা বিচিত্র নয়। এলিফ্যান্ট জলপ্রপাতটি শিলং থেকে ৭ মাইল দূরে এক নিভৃত কন্দরে অবস্থিত। বীডন এবং বিশপ—এ দুটি পাশাপাশি বললেই হয়। শহর থেকে কাছেই। প্রথমটির থেকে ইলেক্‌ট্রিসিটি



সরলগাছের বন ও পথ—শিলং

তৈরি হচ্ছে এবং সেই বিদ্যুৎশক্তি আলোর আকারে সমস্ত শিলং শহরে সরবরাহ করা হচ্ছে। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এবং তাঁহার ভায়েরা এই ইলেক্‌ট্রিক্ কোম্পানীর কর্ণধার। স্প্রেড্ ঈগল্ জলপ্রপাতটির নাম থেকেই বোঝা যায় যে সেটি দেখতে ঠিক যেন একটি ঈগল পাখী ডানা মেলে উড়ছে এম্‌নি।

চেরাপুঞ্জির রোপওয়ে একটি দ্রষ্টব্য ব্যাপার। চেরাপুঞ্জির



কামাখ্যা মন্দির

পর্ব্বতশ্রেণীর ঠিক নীচেই হচ্ছে শ্রীহট্টের সমতলভূমি—আকাশ যদি পরিষ্কার থাকে, তবে শ্রীহট্টের এই সমতলভূমি পাহাড়ের উপর থেকে প্রত্যূষে এত সুন্দর দেখায় যে তা বর্ণনাতীত। মনে হয় কে যেন একজন শিল্পী অত্যন্ত যত্ন ক'রে মাটির উপর একখানি সবুজের গাল্‌চে বিছিয়ে দিয়েছে এবং সেই গাল্‌চের উপর গলিত রৌপ্যের ধারা এঁকে-বেঁকে বয়ে যাচ্ছে—এই ধারাগুলি হচ্ছে নদী এবং অন্যান্য জলাশয়। শ্রীহট্টের দিকে পাহাড়ের পাদমূলেই হচ্ছে ভোলাগঞ্জ শহর। থাপায় করে নাম্‌লে ভোলাগঞ্জ চেরা থেকে ৯ মাইল পথ। থাপা মানে মোড়ার মত একটা যান, যেটাকে পিঠে বেঁধে ও-দেশের লোক পাহাড়ের পথে ওঠা-নামা করে। সাধারণতঃ রোগী এবং স্ত্রীলোকেরা এই থাপায়

চড়েন—তাও খাসিয়া স্ত্রীলোকেরা নয়। সুস্থ ব্যক্তি হেঁটেই ওঠা-নামা করেন, যদিচ এ ওঠা-নামার ব্যাপারটা পরিশ্রমসাধ্যও বটে এবং সময়ও ব্যয় হয় যথেষ্ট। এই অসুবিধা দূর করবার উদ্দেশ্যে রোপওয়ে কোম্পানী পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে স্তম্ভ পুঁতেছেন এবং সেই স্তম্ভে রোপ লাগিয়ে ভোলাগঞ্জ পর্য্যন্ত মাল-চলাচলের এক ব্যবস্থা করেছেন। এই পথে ভোলাগঞ্জ



রামকৃষ্ণ মিশনের কয়েক জন কর্ম্মী

৬ মাইল হবে এবং কোন মাল ভোলাগঞ্জ থেকে চেরা পৌঁছতে এবং চেরা থেকে ভোলাগঞ্জ পৌঁছতে ৪৫ মিনিট সময় লাগে। 'রোপ' মানে এখানে মোটা লোহার তার। শুধু মালই এই পথে পাঠান হয়—আলু এবং মাছ প্রচুর আমদানি হয় দেখলুম। মাঝে মাঝে ইঞ্জিন বিগড়ে এই মাল মধ্যপথে আটকে থাকে, এদিকেও আসে না, ওদিকেও যায় না। সুতরাং খুব নির্ভরযোগ্য নয় ব'লে এ-পথে এখনও ডাক পাঠানো হয় না। যদি ক্রমশঃ উন্নতি ক'রে এই পথে মানুষের গমনাগমনের ব্যবস্থা ভবিষ্যতে হয় তবে খুব সুবিধা হবে, কিন্তু সে সম্ভাবনাও হয়ত সুদূরপরাহত, কেন-না, এখন শিলং থেকে শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত সোজা মোটরের পথ খোলা হয়েছে। গত মার্চ্চ মাসে আসামের গবর্ণর এই পথ খুলেছেন। সুতরাং মনে হয় এখন অধিকাংশ পথযাত্রী ঐ পথেই যাতায়াত করবেন। কিন্তু তবু এ কথা স্বীকার্য্য যে, রোপওয়ে কোম্পানী দেশের একটি প্রকৃত অসুবিধা দূর করতে চেষ্টা করেছেন এবং ঐ কোম্পানীতে অনেক শ্রমিকের চাকরি জুটেছে। তাঁরা উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিয়ে এবং আর্থিক লোকসান সহ্য ক'রে সম্প্রতি একজন সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ারও নিযুক্ত করেছেন।

রোপওয়ের নিকটেই রামকৃষ্ণ আশ্রম। এই প্রতিষ্ঠানটির কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। খ্রীষ্টীয় মিশনের তরফ থেকে ওয়েলশ প্রেস্‌বিটেরিয়ান, রোমান ক্যাথলিক, চার্চ্চ অব গড, ইউনিটেরিয়ান চার্চ্চ প্রভৃতি পাদ্রীরা খাসিয়া জয়ন্তিয়া পাহাড়ে



শেলা মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী

প্রায় এক শত বৎসর ধরে কার্য্য করছেন। এর ফলে এই পাহাড়ের প্রায় এক-চতুর্থাংশ অধিবাসী খৃষ্টান হয়ে গেছেন। খৃষ্টান হয়ে এদের চাকরি-বাকরিরও সুবিধা হয়। কিন্তু সাধারণ খাসিয়া গৃহস্থ খৃষ্টান হয়ে যে-রকম বিলাসী হয়ে ওঠেন তাই দেখে খাসিয়াদের মধ্যে যাঁরা চিন্তা করতে শিখেছেন তাঁরা এখন এর কুফল বুঝতে পেরেছেন। তাঁরা যে সংবাদপত্র চালান তাতে এখন এই কথাই প্রচার করছেন যাতে বেশী লোক খৃষ্টান না হয়। যখন এই রকম অবস্থা তখন রামকৃষ্ণ মিশন ওখানে গিয়ে তাঁদের একটি শাখা খুলতে চাইলেন। চেরাপুঞ্জি যদিচ শিলঙের ডেপুটি কমিশনারের আয়ত্তাধীনে, তবুও জমির উপর সেখানে অধিকার তাদের রাজার। এই রাজার নাম চেরাপুঞ্জির সিম অর্থাৎ মোড়ল। এই সিমের রাজদরবার, মন্ত্রী প্রভৃতি রাজার সমস্ত উপকরণই আছে। সিম রামকৃষ্ণ মিশনকে জায়গা দিতে স্বীকৃত হলেন, কিন্তু এই সর্ত্তে যে, তাঁরা সেখানে কোন প্রকার ধর্ম্মপ্রচার করতে পারবেন না—এমন কি ধর্ম্মের কোন উৎসব করাও তাঁদের পক্ষে নিষিদ্ধ। তাঁরা খুব-জোর স্কুল ক'রে ছেলে পড়াতে

পারেন। রামকৃষ্ণ মিশন তাই করেছেন; অনেকগুলি খাসিয়া ছেলে বাংলা তাদের দ্বিতীয় ভাষা নিয়েছে। প্রথম শ্রেণীর তিনজন ছাত্র আমাদের সঙ্গে বাংলা ভাষায় কথাবার্ত্তা কইলেন এবং তাঁরাই আমাদের রোপওয়ের কাছ থেকে আশ্রমে নিয়ে গেলেন। এই চেরাপুঞ্জির আশ্রমের এবং চেরা থেকে আরও বার মাইল নীচের পথে শেলাপুঞ্জি আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রভানন্দ এক অদ্ভুত কর্ম্মী। তিনি সমস্ত খাসিয়া এবং জয়ন্তিয়া পাহাড়টি যেন একেবারে মুখস্থ ক'রে ফেলেছেন। আজ তিনি শিলং, কাল চেরাপুঞ্জি এবং পরশু হয়ত শিলচরের পথে। খাসিয়া ভাষায় তিনি অসাধারণ ব্যুৎপন্ন এবং উক্ত ভাষায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা মনোগ্রাহী বক্তৃতা দিতে পারেন। খাসিয়া ভাষায় তিনি একখানি হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারির বই লিখচেন দেখে এসেচি এবং 'কা খুবর খাসি' নাম দিয়ে একখানি দ্বৈভাষিক (খাসিয়া এবং বাংলা) পাক্ষিক সংবাদপত্র চালাবেন স্থির হয়ে গেছে।

উপরে সিমের যে সাবধানতার কথা উল্লেখ করেছি সেটা অস্বাভাবিক নয়। কেন-না, মুসলমান সম্প্রদায়ও ওখানে ধর্ম্মপ্রচারের চেষ্টা করেছিলেন, বিশেষ সফল হ'তে পারেন নি। বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের এই ধর্ম্মপ্রচারের চেষ্টা দেখে ওঁরা একটু ঘাবড়ে গেছেন—নিজেরা কোথায় আছেন ঠাহর পাচ্ছেন না। মুসলমানদের ধর্ম্মপ্রচারের অসুবিধার কারণ তাঁদের চেষ্টার ত্রুটি নয়—কারণ এদের দুই দলের খাদ্যের অসামঞ্জস্য। মুসলমানেরা শূকরের মাংসকে বলেন 'হারাম', আর খাসিয়া পরমানন্দে শূকর এবং গরুর মাংস গলাধঃকরণ করেন, বিশেষ ক'রে শূকরের।

এইখানে খাসিয়া জাতি এবং তাদের আচার-পদ্ধতির কথা কিছু বল্‌লে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। খাসিয়া এবং জয়ন্তিয়া পাহাড়ের অধিবাসীদের প্রধানতঃ তিন উপজাতিতে ভাগ করা যায়:—(১) চেরাপুঞ্জি থেকে শিলং পর্য্যন্ত যে বিস্তৃত মালভূমি তার অধিবাসীর নাম খাসি বা খাসিয়া, (২) জয়ন্তিয়া পাহাড়ের অধিবাসী অর্থাৎ পূর্ব্বদিকে কাছাড়ের সংলগ্ন প্রদেশের অধিবাসীদের নাম সিন্টেং এবং (৩) পশ্চিমে গারো পাহাড়ের সংলগ্ন প্রদেশের অধিবাসীদের নাম লিঙ্গাম্। খাসিয়া স্ত্রীলোকেরা স্বাধীন, তাদের কোন পর্দ্দা নেই। তারাই বাজারে সমস্ত বেচা-কেনা করে, হিসাবে এক পয়সা ভুল করে না এবং ক্রেতাকে এক পয়সা ঠকায় না। বাস্তবিকই এঁদের সততা অনুকরণযোগ্য। এখন পর্য্যন্ত চেরাপুঞ্জি, শিলং প্রভৃতি অঞ্চলে চৌর্য্যবৃত্তি অপরিজ্ঞাত। খাসিয়া সভ্যতায় পুরুষেরা গৌণ, তাদের অধিকাংশ বাড়িতেই থাকে। স্ত্রীলোকেরা অত্যন্ত পরিশ্রমী—দোকান রাখা থেকে আরম্ভ ক'রে পথের ধারে ব'সে পাথর ভাঙা পর্য্যন্ত কুলীর কাজ সব মেয়েরাই করে। চেরাপুঞ্জি খাসিয়া-কৌলীন্যের পীঠস্থান। প্রকৃত খাসিয়া জাতি অর্থাৎ যাদের রক্তে কোন প্রকারের মিশ্রণ হয়নি এবং যাদের জীবন শহরের আবিলতায় পঙ্কিল নয় তাদের চেরাপুঞ্জিতেই দেখতে পাওয়া যায়। শিলং শহরে চারিপাশের গ্রামের এবং পাহাড়ের খাসিয়া স্ত্রীলোকেরা এসে জড়ো হয়েচে ব'লে এবং তাদের জীবন কিঞ্চিৎ অস্বাভাবিক ব'লে প্রকৃত খাসিয়া স্ত্রীপুরুষের টাইপ শিলঙে কম। খাসিয়া স্ত্রীলোকদের সুন্দরী বলা যেতে পারত যদি তারা আর একটু লম্বা হ'ত। তাদের গায়ের রং উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, চক্ষু দীর্ঘায়ত, নাক একটু থ্যাবড়া, পাহাড়ে পথে ওঠা-নামা করার জন্য পায়ের মাংসপেশী সবল এবং সুপুষ্ট।

খাসিয়া জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে যথেষ্ট গবেষণা হয়েছে ব'লে আমার জানা নেই। ইউরোপীয় পণ্ডিতদের কৃপায় আমরা জান্‌তে পেরেছি যে, খাসিয়া জাতি ইন্দো-চীনের মন্ আনাম পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। ভাষার তরফ থেকে বর্ম্মীদের সঙ্গে খাসিয়াদের নিকট-সাদৃশ্য আছে ব'লে মনে হয়। বর্ম্মীদের মত খাসিয়ারাও পুরুষদের নামের পূর্ব্বে ইংরেজী 'ইউ' এই অক্ষরটি ব্যবহার করে। রেভারেণ্ড এইচ রবার্টস্ একখানি খাসিয়া ভাষার ব্যাকরণ লিখেছেন। তাঁর উপক্রমণিকায় বলেছেন যে, অল্পদিন আগেও খাসিয়ারা ব্রহ্মদেশের সঙ্গে সংবদ্ধ ছিল এবং তাদের রাজার বশ্যতা স্বীকার করত। প্রত্যেক বছর খাসিয়া পাহাড় থেকে ব্রহ্মদেশের রাজার নিকট করের চিহ্নস্বরূপ একখানি কুঠার পাঠানো হ'ত।

ভারতবর্ষের পার্ব্বত্য জাতির সংখ্যা এক কোটি ষাট লক্ষ। আসাম প্রদেশের অর্দ্ধেক লোক পার্ব্বত্য পর্য্যায়ভুক্ত। ১৯৩১ সালের আদমসুমারীর বিবরণে জানা যায় যে, খাসিয়া জাতির মোট সংখ্যা ১৭১৯৫৭। তার মধ্যে ৩৯২৮০ জন খৃষ্টান।

খাসিয়ারা মাতৃপ্রধান জাতি। তাদের মধ্যে স্ত্রী হচ্ছেন সম্পত্তির অধিকারিণী এবং পরিচালিকা। স্বামী বিয়ের পর স্ত্রীর বাড়িতে আসেন। সন্তানসন্ততিগণ তাদের নামের শেষে মায়ের উপাধি গ্রহণ করে। খাসিয়া ভাষায় একটা প্রবাদ হচ্চে "long jaid na ka kynthei" অর্থাৎ স্ত্রী থেকেই জাতি। সমগ্র খাসিয়া জাতি বিভিন্ন বৃহৎ বহির্বিবাহক (exogamous) গোষ্ঠীতে বিভক্ত, অর্থাৎ কোন গোষ্ঠীর লোক সেই গোষ্ঠীতে বিয়ে করতে পারে না। সাধারণতঃ শিশুসন্তান, তাদের মা এবং মাতামহীকে নিয়েই খাসিয়া পরিবার। বিয়ের আগে পুরুষ যা রোজগার করবে তার উপর অধিকার তার মায়ের। আর বিয়ের পর যা রোজগার করবে তার উত্তরাধিকার হচ্চে স্ত্রীর এবং সন্তানের।

এই সন্তানের মধ্যে আবার প্রথম দাবি কন্যার।

সাধারণতঃ বর-ক'নের মত-অনুসারে বিয়ে স্থির হয়। বর মেয়ের নাম নিজের বাপকে জানিয়ে দেয়। বরের বাবা আবার এই বিষয় মেয়ের বাপকে জানায় এবং মেয়ের যদি কোন আপত্তি না থাকে তবে পাকা কথাবার্ত্তা স্থির হয় এবং তার পর বর একদিন কন্যার বাড়িতে গিয়ে বিয়ে ক'রে নিয়ে আসে। বিবাহ-বিচ্ছেদ খাসিয়াদের মধ্যে অতি সাধারণ প্রথা। একজন স্ত্রীলোক ত্রিশবার স্বামী বদল করেছে এমন দৃষ্টান্তও আছে। স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে যে-কোন রকমের মনোমালিন্য হলেই বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়। এ-বিষয়ে অবশ্য স্বামীর ইচ্ছার চেয়ে স্ত্রীর ইচ্ছারই মূল্য বেশী।

খাসিয়া ভাষায় উ ব্লেই (u Blei) শব্দ ভগবান-অর্থবাচক। নমস্কারের প্রতিশব্দ রূপে ওরা বলে খুব্লেই (Khublei) অর্থাৎ ভগবানের আশীর্ব্বাদ আপনার উপর বর্ষিত হোক। খাসিয়াদের ধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্ম বলা যায়, কিন্তু তার মধ্যে কুসংস্কারই সর্ব্বপ্রধান। মৃত পূর্ব্বপুরুষের প্রেতাত্মার পূজা, ভূতের উদ্দেশে পূজা এবং বলিদান—এই সব এখনও এই জাতির মধ্যে প্রচলিত দেখতে পাওয়া যায়। থেল্‌ন নামক এক কাল্পনিক সাপের পূজা এরা করে শুনতে পাই। জনশ্রুতি এই যে, এখনও এই সর্পরাজের সামনে এরা নরবলি দেয়। এর সত্য মিথ্যা নির্দ্ধারণ করা শক্ত। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে, এপ্রিল, মে এবং জুন মাসে খাসিয়ারা সন্ধ্যার পরে এই রক্তান্বেষীদের ভয়ে ঘরের বার হয় না। নাকের মধ্যে দিয়ে রবারের নল লাগিয়ে মস্তিষ্ক থেকে রক্তমোক্ষণ করা না-কি এই পূজার রক্ত-সংগ্রহের একটি অঙ্গ।

খাসিয়ারা মৃতদেহ দাহ করে। স্বর্গ সম্বন্ধে খাসিয়াদের বিশ্বাস বেশ মজার। কেউ মরে গেছে এই কথা বোঝাতে হ'লে তারা বলে, অমুক ভগবানের বাড়িতে পান খাচ্ছে। কারণ খাসিয়ারা ভয়ানক পান খায় এবং অফুরন্ত পান খেতে পাওয়াই তাদের কল্পনায় সবচেয়ে বেশী সুখ। যেমন আমেরিকার লাল ইণ্ডিয়ানরা বলে যে স্বর্গে চমৎকার চমৎকার শিকারের জায়গা আছে।

খাসিয়াদের উপজাতি সিন্টেংদের মধ্যে 'কে টারোহ' নামে দেবীকে পূজা করার প্রথা আছে। আমাদের শীতলাদেবীর মত এই দেবী বসন্ত রোগের অধিষ্ঠাত্রী। কারুর বসন্ত হ'লে এরাও বলে দেবীর কৃপা হয়েচে এবং সেটা এদের মতে খুব সৌভাগ্যের লক্ষণ, কেন-না এরা বিশ্বাস ক'রে বসন্ত রোগী ঐ দেবীর চুম্বন পায়। এই কারণে বসন্ত রোগীর বাড়ি এরা পবিত্র ব'লে মনে করে এবং কেউ কেউ ইচ্ছা ক'রে নিজের শরীরে বসন্ত রোগ সংক্রামিত করেছে এমন দৃষ্টান্তও আছে।

খাসিয়া জয়ন্তিয়া পাহাড়ে খৃষ্টান পাদ্রীদের আবির্ভাবের পূর্ব্বে খাসিয়াদের কোন লিখিত ভাষা ছিল না। কিন্তু একটা মজার ব্যাপার এই যে, কোন কোন জায়গায় খাসিয়া ভাষা বাংলা হরপে লেখা সুরু হয়েছিল, এ রকম প্রমাণ পাওয়া যায়। খাসিয়াদের দলিলপত্র বাংলা অক্ষরে লেখা কোন কোন জায়গায় দেখা গেছে।

ওয়েলশ মিশনের পাদ্রীরা ওদেশে রোমান্ বর্ণমালার সাহায্যে খাসিয়া ভাষা লেখা প্রবর্ত্তন করেছেন। পূর্ব্বেই বলেছি, এরা প্রায় এক-শ বছর ধরে ধর্ম্মপ্রচারের কাজে ঐ পাহাড়ে আছেন। কিন্তু ভাষার ভিতর দিয়ে ধর্ম্মপ্রচারই এদের উদ্দেশ্য ব'লে ভাষার কোন উন্নতি হয় নি। খাসিয়া ভাষায় বাইবেল তর্জ্জমা করা হয়েছে এবং বাইবেল-সংক্রান্ত আরও দু-একখানা বই লেখা হয়েছে। মিশনরি-পরিচালিত দু-একখানা ছোট ছোট মাসিকপত্রও আছে, কিন্তু সে কেবলমাত্র ঐ ধর্ম্মের কথাতেই বোঝাই। এর ফল হয়েছে এই যে, খাসিয়াদের যে একটি নিজস্ব জাতীয় চিন্তার ধারা, শিক্ষা এবং

সভ্যতা ছিল সেটি ধর্ম্মের চাপে একেবারে পিষ্ট হয়ে গেছে। এখনও এদের মধ্যে বহু উপকথার প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়। সে গল্প এত দীর্ঘ যে, একবার বলতে সুরু করলে রাত কাবার হয়ে যেতে পারে। তার বর্ণনা-চাতুর্য্য যেমন মনোরম, তার ঘটনা-বিন্যাসও তেমনি হৃদয়গ্রাহী।

এই সব গল্প এবং উপকথা থেকে এই আন্দাজ করা সম্ভবপর যে, খাসিয়াদের এককালে একটি বিশিষ্ট সাহিত্যিক চিন্তার ধারা এবং হয়ত সাহিত্যও ছিল। কিন্তু সে-সব এখন লুপ্তপ্রায়। এই জাতির মধ্যে শ্রীযুত শিবচরণ রায় একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। তিনি ভগবদ্গীতা খাসিয়া ভাষায় অনুবাদ করেছেন এবং ভারতের কাল্‌চার এবং সভ্যতা সম্পর্কে অনেক-গুলি বই নিজের ভাষায় লিখেছেন। কিন্তু আর কেউ এই কাজ করেন নি, যদিচ এখন তাঁদের মধ্যে শিক্ষিত স্ত্রী-পুরুষের অভাব নেই। মোট কথা, আমার বক্তব্য এই যে, যে-ভাষায় ভগবদ্গীতার শ্লোক অনূদিত হ'তে পারে সে-ভাষার অন্তর্নিহিত শক্তিকেও অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু উৎসাহ এবং চর্চ্চার অভাবে এই ভাষা এতদিন পুষ্টিলাভ করতে পারে নি। চেরাপুঞ্জি এবং শেলাপুঞ্জির রামকৃষ্ণ মিশন যদি এই কাজে একটু মনঃসংযোগ করেন তাহ'লে খাসিয়া ভাষা তথা খাসিয়া সাহিত্যের যথেষ্ট প্রসার হ'তে পারে।

পাঠকদের কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্যে এখানে এক থেকে দশ পর্য্যন্ত যথাক্রমে খাসিয়া সংখ্যাবাচক শব্দ লিখচি:—'ওয়ে অথবা শি', আর, লাই, সাও, সান, ইন্রেও, নিট, ক্রা, খাণ্ড্রাই, শিফাউ।

আমি চেরাপুঞ্জিতে একটি খাসিয়া-পরিবার দেখতে গিয়েছিলুম—গৃহস্বামীর নাম এল্‌জিকিশোর রায়। এ-নাম যে বাংলা আর্য্যকিশোর থেকে উদ্ভূত তা বোধ হয় আন্দাজ করা যেতে পারে। গৃহস্বামী আমাদের চা এবং ভিজে চিঁড়ে ও চিনি দিয়ে সাদরে অভ্যর্থনা করলেন। তাঁর অনেকগুলি ছেলে—তাদের নাম ব্রডার, টেণ্ডার, য়ণ্ডার, ইনভেডার ইত্যাদি। এই নাম-নির্ব্বাচনেও খ্রীষ্টীয় প্রভাব। কেন-না, নিজস্ব কোন ঐতিহ্য এদের মনে নেই। ছেলেগুলি সকলেই ওখানকার রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলে পড়ে। তাদের উপাধি কিন্তু রায় নয়, মায়ের উপাধি অনুযায়ী ব্রডার ডলিং ইত্যাদি। গৃহস্বামী নিজে এবং স্ত্রী, পুত্র এবং স্ত্রীর মাকে নিয়েই এই পরিবার গঠিত। ইনি শ্রীহট্ট অঞ্চলে ব্যবসা করেন, সুতরাং বাংলা জানেন, কিন্তু সে বাংলার সঙ্গে আমাদের পশ্চিম প্রদেশীয় বাংলা মেলে না। অতএব মিঃ রায়ের সঙ্গে আমার মন খুলে আলাপ করার সুবিধা হ'ল না, রামকৃষ্ণ মিশনের একজন কর্ম্মী মধ্যস্থ হ'য়ে তাঁর বাংলা আমাকে এবং আমার বাংলা তাঁকে বুঝিয়ে দিতে লাগলেন কিন্তু এল্‌জিকিশোরের ফর্ম্যালিটি-বিহীন 'তুই' সম্বোধন সেদিন আমার খুব মিষ্টি লেগেছিল।

আকৃতি, প্রকৃতি এবং চিন্তার প্রণালী দিয়ে বিচার করতে গেলে খাসিয়াদের সঙ্গে বাঙালীর খুব মিল দেখতে পাওয়া যায়। এখনও ও-জাতি বিদেশীদের খুব পক্ষপাতী, বিশেষ ক'রে বাঙালীর। এর কারণ এই যে, এক সময়ে বাঙালীদের সঙ্গে এদের রক্তের মিশ্রণ হয়েছিল। এই পার্ব্বত্য জাতি যখন লুঠ-তরাজ ক'রে বেড়াত তখন শ্রীহট্ট, কাছাড় প্রভৃতি অঞ্চল থেকে মেয়ে ধরে এনে এরা বিয়ে করেছিল। যাদের বংশে এই বাঙালী রক্তের মিশ্রণ আছে তারাই এখনও কুলীন—তাদের উপাধি জাইড্‌খার। চেরাপুঞ্জির যিনি সিম বা রাজা তিনি বাঙালীর মতই ধুতি পরেন এবং ধুতিই তাঁর দরবারের পোষাক। খাসিয়াদের নামের কোন বৈশিষ্ট্য নেই আগেই বলেছি, কিন্তু 'জগদীশ' প্রভৃতি বাঙালী নামও তাদের আছে দেখেছি। রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম শ্রেণীর একটি ছাত্রের নাম আগে ছিল 'বিথ গ্যান'—ওঁরা তার সংস্কৃত বা বাংলা রূপ দিয়েছেন 'বেদজ্ঞান'।

হিন্দুধর্ম্ম এবং হিন্দুসভ্যতা এখনও বিকৃতভাবে বেঁচে আছে জয়ন্তিয়া পাহাড়ের নার্তিয়াং ব'লে একটি গ্রামে। এই গ্রামটি চারিপাশে পাহাড় দিয়ে ঘেরা, বাইরের সভ্যতা থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন। এই গ্রামখানি শিলঙের জোয়াই মহকুমার অন্তর্গত। শিলং থেকে জোয়াই ৩৩ মাইল এবং জোয়াই থেকে নার্তিয়াং তের-চৌদ্দ মাইল। পাহাড়ের ভিতর দিয়ে উঁচু-নীচু সরু পথ—ঘোড়ার পিঠে চড়ে কিংবা হেঁটে ভিন্ন যাতায়াতের আর কোন যানবাহন নেই। শুনেচি শিলং থেকে শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত যে নতুন মোটরের পথ খোলা হয়েচে তার থেকে এ জায়গাটা কাছে পড়বে। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পর্ব্বতবেষ্টিত এই ক্ষুদ্র গ্রামের মন্দিরের পূজারী একজন বাঙালী। তাঁকে

বাঙালী ব'লে অবশ্য গৌরব বোধ করবার কিছু নেই, কেন-না, বাঙালীর কোন গৌরবই তিনি বহন করেন না, অপর পক্ষে গাঁজা এবং অনুরূপ প্রক্রিয়ায় তাঁর অত্যাসক্তি। কিন্তু তবুও এই গ্রামের নেংটি-পরা লম্বা চুলওয়ালা রুক্ষদর্শন লোকগুলি এঁকে খাতির করে এবং সন্ধ্যার সময় সকলে মিলে বাংলা ভাষায় কীর্ত্তন করতে বসে, যে ভাষার এক বর্ণও তারা বোঝে না এবং না-বুঝে আবৃত্তি করে ব'লে ভাষাও বিকৃত হয়ে গেছে। এই পাহাড়ের অন্তরশায়িত গ্রামখানিতে এখনও দুর্গাপূজা হয় এবং সপ্তমী পূজার দিন সকালবেলা জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকলে শাঁখ বাজায়। এই শঙ্খধ্বনি পাহাড়ের কোলে প্রতিহত হয়ে হয়ে ঐ চতুঃসীমার মধ্যেই প্রতিধ্বনিত হয়ে ঘুরে বেড়ায়।

এতক্ষণ আমি চেরাপুঞ্জির কথা বলেচি, এইবার শিলঙের কথা ব'লে প্রবন্ধ শেষ করব। শিলঙের প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং পাইন গাছের বর্ণনা নতুন ক'রে করবার দরকার নেই, বহু ভ্রমণকাহিনীর লেখক সে-কাজ আগেই করেছেন। আর শিলং যে একটি স্বাস্থ্যনিবাস সে-কথাও সকলের বিদিত। অতএব সেখানকার নৈসর্গিক দৃশ্যের কথা বলব না।

শিলং পিকের উপরে উঠে চারি পাশের পাহাড়গুলির একসঙ্গে একটি পরিপূর্ণ দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। এক পাশে নজরে পড়ে চেরাপুঞ্জি যাওয়ার সাদা পথটি সাপের মত এঁকে-বেঁকে ক্রমশঃ পাহাড়ের কোলে মিশিয়ে গেছে। আর এক পাশে খাসিয়াদের একটি নিভৃত পল্লী যেখানে বাজার নেই, হাট নেই, দোকানপসারী নেই, নিত্যপ্রয়োজনীয় আহার্য্য দ্রব্য কিনতে যাদের বহু পথ অতিক্রম ক'রে শহরে আসতে হয় এবং গাড়ী বোঝাই ক'রে মাসখানেকের মত রসদ সংগ্রহ ক'রে নিয়ে যেতে হয়। আধুনিক সভ্যতাকে তুচ্ছ ক'রে তবু এই পল্লীবাসীরা বেঁচে আছে এবং পাহাড়ের বুক খুঁড়ে তারই ভিতর আলু এবং ধানের চাষ করছে।

শিলঙের দু-একটা জিনিষের কথা আমি কিন্তু কোন-দিন ভুলতে পারব না। প্রথম হচ্চে সেখানকার পাইন বৃক্ষের সমারোহ—যেদিকে তাকাই পাহাড়ের গা জুড়ে দীর্ঘ পাইনের বন বাতাসে সোঁ সোঁ করচে। এর প্রাচুর্য্যের যেন আর শেষ নেই—ছোট, মাঝারি এবং বড় সব রকম মাপের গাছে পাহাড় বোঝাই। জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মাসে যখন খুব বাতাস হয় তখন রাস্তার লাল ধুলো উড়ে পাইন গাছগুলিতে লেগে লেগে তাদের চেহারা একেবারে লাল হয়ে যায়—যেন এখনই হোলি খেলে উঠল। আর মনে থাকবে লাটসাহেবের বাড়ির পাশে হ্রদের কথা। পাঁচ হাজার ফুট উঁচুতে জলাশয় যে সুলভ নয় সে-কথা আন্দাজ করা সহজ। তবু এখানে একটি হ্রদের সৃষ্টি হয়েচে। এই হ্রদের পুরো নাম ওয়ার্ডস্ লেক—আসামের চীফ্ কমিশনার স্যর উইলিয়াম ওয়ার্ডের নামানুসারে। হ্রদটি দেখতে খুব সুন্দর।

শিলং থেকে চেরার পথে ৫॥ মাইল গেলে আপার শিলঙে পৌছান যায়। শিলং থেকে আপার শিলং আরও উঁচু এবং সেখানে শীতও বেশী। খুব গরমের সময় শিলঙের টেম্পারেচার ৮০ ডিগ্রী হয় এবং খুব শীতে ২৭ পর্য্যন্ত নামে। তখন বরফকণা পড়ে। শিলঙের জনসংখ্যা ১৯৩১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী ২৬৫৩৬।

আপার শিলঙে একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান হচ্ছে সরকারী কৃষিক্ষেত্র। এক বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে এই ফার্ম্ম স্থাপিত। সেখানে আলুর চাষ হচ্চে দেখলুম এবং কৃত্রিম উপায়ে তা দিবার যন্ত্রের মারফৎ ডিম থেকে বাচ্চা ফোটান হচ্ছে। সেখানে ২৭টি গরু, ৪টি ষাঁড়, ৩১টি বাছুর, ২৩টি বলদ, ২টি টাট্টু ঘোড়া, ৩৭টি ছাগল এবং ৮টি ভেড়া আছে। একটি গাই ২২ সের পর্য্যন্ত দুধ দেয়। ওখানে গরুর এবং ছাগলের খাঁটি দুধ পাওয়া যায় এবং এই ফার্ম্মটি আসাম-সরকারের একটি বিশেষত্ব।

শিলং থেকে নামবার পথে গৌহাটি। গৌহাটির কামাখ্যা মন্দির হিন্দুদের এক প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। বলা বাহুল্য, কামাখ্যা পর্ব্বত শিলঙের উচ্চতার তুলনায় কিছুই নয়—এই পর্ব্বতের সবচেয়ে উচ্চ চূড়ায় ভুবনেশ্বরীর মন্দির এক হাজার ফুট উঁচু। কালিপুর আশ্রম ৪০০ ফুট উঁচু, কামাখ্যা দেবীর মন্দির ৮০০ ফুট। মন্দিরের ভিতর দারুণ অন্ধকার। প্রদীপের ভীরু আলোকের সাহায্যে অনিশ্চিত পদক্ষেপে ওঠা-নামা করতে হয়। নীলপর্ব্বতে দেবীর মন্দিরের একটি ছবি এই সঙ্গে দিচ্ছি। এর মধ্যে চারু এবং কারু শিল্পের ভূয়ো ভূয়ঃ প্রমাণ আছে এমন মনে হয় না। কামাখ্যা মন্দিরের পাণ্ডাদের ব্যবহার আমার সবচেয়ে ভাল লাগল।

যাত্রীদের কাছ থেকে জুলুম ক'রে পয়সা নেওয়ার অভ্যাস

এদের আদৌ নেই। সামান্য যে যা দেয় তাইতেই খুশী। সর্ব্বদাই হাসিমুখ। নারাণ পাণ্ডা কয়েক মিনিট সময়ের মধ্যেই আমাদের জন্য চায়ের ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিলেন মনে আছে। এ-কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, কামাখ্যা পর্ব্বতের পাণ্ডামহল এত গোঁড়া নয় যে, চায়ের উপর এদের অপক্ষপাত আছে।

পাহাড়ের পাশ দিয়েই ব্রহ্মপুত্র বয়ে যাচ্ছে। পাহাড়ের উপর থেকে দূরগামী ষ্টীমার চোখে পড়ে। আবার তার উল্টো দিকে আসাম-বেঙ্গল-রেলওয়ের দূরবিসর্পিত লৌহপথ। দূরে বনান্তরেখার কোলে এই জলপথ এবং স্থলপথ ক্রমশঃ মিশে গেছে।

জাতীয় জীবনে ঠাকুরমার দান

শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

গাঁয়ের এবং সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীর জীবন-প্রবাহ বুঝতে হ'লে, আমাদের চলে যেতে হয় সেই দূর বনানীর সবুজ ছায়ায় যেখানে মুক্ত আকাশের উদার বিস্তৃতি এসে ধরা দিয়েছে দেশের ছড়ায়, গাথায়, নৃত্যে, আলপনায় আর রূপ-কথার স্বপ্নপুরীতে। কিন্তু আরও নিভৃত কোণে মাটির সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালিয়ে যে-ঠাকুমাটি উবুথুবু হয়ে বসে মালা জপচেন তাঁকে আমরা অনেক সময়েই উপেক্ষা ক'রে চ'লে আসি। আমরা ভুলে যাই যে, জাতীয় জীবনে ঠাকুমার কি অমূল্য দান, শুধু যার জন্যে বাংলার গাঁয়ে গাঁয়ে এখনও সমস্ত রসকলা-প্রতিভা জাইয়ে আছে, যার ঝোলাঝুলি ঝেড়ে আমাদের এই হীন প্রাণধারণের গ্লানি সুন্দর হয়ে ওঠে।

বাংলা দেশের গাঁয়ে শিশু যখন জন্ম নেয়, তার সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয় এই ঠাকুমাটির। ঠাকুমার উলুধ্বনির মধ্যে শিশুকে ঘরে আনা হয়। সেখানে শিশুর জন্মের পূর্ব্বেই তিনি 'আটকলাই' ভেজে রাখেন, এই আটকলাই-উৎসবে পাড়াপরশীর সঙ্গে তিনি শিশুর পরিচয় ক'রে দেন। এখন শিশু ধীরে ধীরে হামাগুড়ি দিতে শিখেছে, তার সামনে ঠাকুমার অবিশ্রান্ত চীৎকার 'হাত ঘুরোলে নাড়ু দেব, এমন নাড়ু কোথায় পাব?' এরূপ কিছুদিন করার পর দেখা যায়, শিশু আর হামাগুড়ি দিতে চায় না, সে হাত ঘুরোতে চেষ্টা করছে, অমনি ঠাকুমা তার হাত ধ'রে বলেন, 'সন্দেশ দিলাম, রসগোল্লা দিলাম, চাইক্যা রাখলাম, কোন্ বিড়ালটা খাল রে?—গোড় ম্যাও গোড় ম্যাও, কুতু কুতু কুতু!' ঠাকুমার এখানে উদ্দেশ্য যাতে শিশু তাড়াতাড়ি হাঁটা শিখতে পারে। শিশুকে নিয়ে আর ঠাকুমার ব্যস্ততার সীমা নেই। সন্ধ্যায় উঠানে আনাচে-কানাচে ঘুরে ঠাকুমা শিশুর কৌতূহল লক্ষ্য ক'রে আওড়ান,

আয় চান্দ আয়,
চান্দের কপালে চান্দ টিপ দিয়ে যা।
মাছ কুট্‌লে মুড়ো দেব,
ধান ভান্‌লে কুড়ো দেব,
কালো গরুর দুধ দেব,
দুধ খাবার বাটি দেব,
চান্দের কপালে চান্দ টিপ দিয়ে যা।

ঠাকুমার ছড়া শুনে ও চাঁদ দেখে শিশু তন্ময় হয়ে পড়েছে, তার এখন ঘুমের দরকার, তার ঘুম আসবে বেতের দোল্‌নায় নয়,

ঘুমপাড়ানী মাসী পিসি
ঘুমের বাড়ি এসো,
খাট নাই পালঙ নাই
খোকনের চোখে বস।

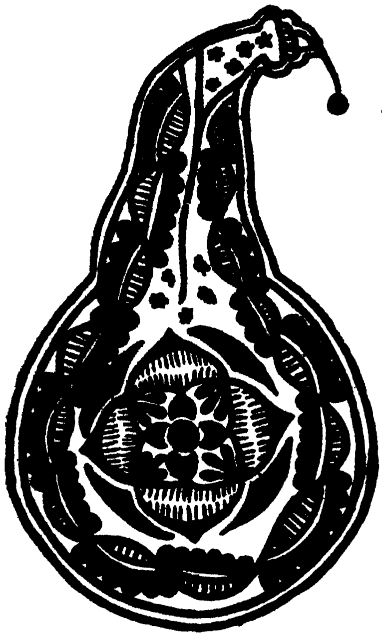
ঠাকুমার বাড়িতে খাট পালঙ ইত্যাদি আসবাবপত্র নেই, অতএব ঠাকুমা তাকে খোকনের চোখের উপর বসতে বলছেন।

খোকন এখন একটু বড় হয়েছে, সে কথা বলতে চায়, ঠাকুমা তাকে উৎসাহ দিয়ে বলেন,

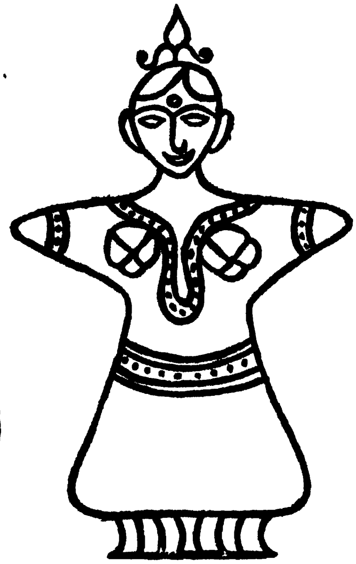
নাটার মত চোখ ক'রে, বাটার মত মুখ ক'রে
খোকন আমার কথা বলে।

এই ওঠা-পড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশু এখন একটু বড় হয়েছে। এখন তার একটি স্বাভাবিক ক্রীড়াস্পৃহা দেখতে

পাওয়া যায়। বাড়ির আর কেউ তা লক্ষ্য না করলেও, ঠাকুমার চোখ এড়ায় নি, তিনি বুঝতে পেরেছেন যে, খেলা এখন শিশুর সহজ ও স্বাভাবিক আত্মবিকাশের সহায়তা করবে। কিন্তু তিনি এমন একটি খেলা বাত্‌লিয়ে দিলেন



ঠাকুরমার থলে



আহ্লাদী পুতুল

যাতে শিশুর বেগ পেতে না হয়—যে খেলা অনুকরণ ক'রেই শিখতে পারবে। শিশুরা এখন 'খুটিমুটি' নিয়ে খেলা করে। ঠাকুমা নারিকেলের ডগা দিয়ে একটি ঢেঁকী তৈরি ক'রে দিয়েছেন। ছোট ছেলেরা বন থেকে বাজার ক'রে আনে আর মেয়েরা রাঁধাবাড়া করে। সেই মাটির ভাত মাটির পিঠে নিমন্ত্রিত বনের গাছগুলিকে খেতে দেয়। এ সবের তদারক কিন্তু করছেন ঠাকুমা। তিনি রাঁধাবাড়ার কাজে ভুলচুক ঠিক ক'রে দিয়ে কে কোথায় বসবে তাও ব'লে দিচ্ছেন।

এর পরের অবস্থায় শিশুদের আর একটি মাত্র বিষয় নিয়ে থাকতে দেখা যায় না, হাজার রকম খেলায় তাদের অনুরাগ দেখতে পাওয়া যায়। ঠাকুমা এখন তাদের পুতুল খেলার জন্য পুতুল গড়ে দিচ্ছেন, এই পুতুল গড়তে গাঁয়ের ঠাকুমারা একেবারে সিদ্ধহস্ত। দু-মিনিটের মধ্যেই একটি মাটির ঢেলাকে এখানে ওখানে একটু টিপে দিয়েই সুন্দর একটি পুতুল তৈরি ক'রে ফেলেন। শুধু পুতুলই নয়, নানা পশুপক্ষীও গড়ে দেন। আমাদের মনে হয়, এই পুতুল গড়ার ধারা বহু প্রাচীন। অতীতের কত-না প্রাচীন স্মৃতির আভাস পাওয়া যায় এই পুতুলগুলির মধ্যে। ঠাকুমার গড়া এই পুতুল কিংবা পশুপক্ষীর মধ্যে এমন একটি ভঙ্গী দেখতে পাওয়া যায় যা আধুনিক' কোন পুতুলেই দেখতে পাওয়া যায় ন ছেলে-মেয়েরা পুতুলের বিয়ে দেবে, ঠাকুমা যে ক'নে-পুতুলটি গড়বেন তার সারা গায়ে মাটির গয়না দিয়ে ভ'রে দেবেন। এই পুতুলগুলি আবার যাতে সহজে ভেঙ্গে না যায় সে জন্যে ছাইয়ের আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। ঠাকুমা বোঝেন, কত সময় আগুনে রাখলে পুতুলটির লাল রং হবে অথবা কাল রং হবে।

শিশুরা এখন পাঁচ-ছয় বছরের হয়েছে, এ সময় তাদের মধ্যে কল্পনা বিলাসী শিশুমনের স্পর্শ পাওয়া যায়। তারা এই সময়ে নানারূপ অদ্ভুত, রোমাঞ্চ-পূর্ণ পরীর গল্প রাক্ষসের গল্প শুনতে অত্যন্ত ভালবাসে। আজ বাংলা দেশে যে ঠাকুমার ঝুলি, ঠাকুমার গল্প, ঠাকুমার থলে— কত আবিষ্কার হয়েছে, কেউ যেন মনে না করেন যে, এ গল্পগুলি ঢাকঢোল নিয়ে প্রকাশ্য স্থানে যাত্রা গান ইত্যাদির অনুরূপ করা হয়। ঘরের কোণে বসে মালা জপতে জপতে ঠাকুমা এই সব শিশুদের নিয়ে গল্পগুলি ক'রে থাকেন। রাক্ষসখোক্কসের গল্পে তাদের কল্পনাশক্তিকে আরও বাড়িয়ে তোলেন। ঠাকুমা শুধু তাদের সামনে এই অপূর্ব্ব রূপকথা দিয়ে মায়াপুরীই সৃষ্টি ক'রে ক্ষান্ত হন না, যাতে তাদের বাস্তব জীবনের সঙ্গে পরিচয় ঘটে, সেজন্য কত খুল্লনার বারমাসী, কত কাঞ্চন-মালার যোগিনীর বেশ, কত সওদাগরের নদীর ঘাটে নৌকা ভিড়ানো—গল্পের ভিতর দিয়ে তাদের সামনে একটি জীবন্ত রূপ ফুটিয়ে তোলেন। এই সব গল্পে পারিপার্শ্বিক অবস্থায় শিশুর মন শুধু সহানুভূতিতেই ভ'রে উঠত না,



দীপালি—জলে প্রদীপ ভাসান



চিবুড়ী—খেলা



প্রহসনে ঠাকুরমার নৃত্য

ঠাকুমা সমাজের কড়া নিয়ম, বাধাবন্ধন সত্ত্বেও আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন এই গাথা ও ছড়ার মধ্য দিয়ে একটি স্বাস্থ্যকর আবহাওয়া ও শিশুর মনে পরস্পরের প্রতি একটি স্বাভাবিক ভাব ফুটিয়ে তুলতে। সমাজে যখন ভালবাসার প্রকাশ্য স্থান নেই, সদর দরজা যখন তার পক্ষে একেবারেই বন্ধ তখন সন্ধ্যাবেলার অন্ধকারে ঘরের দাওয়ায় বসে, মদনকুমার মধুমালাকে ভালবেসে বলে,

কোথায় পাব কলসী কন্যা কোথায় পাব দড়ি
তুমি হও গহীন গাঙ আমি ডুইব্যা মরি।

এই ছড়া ও গাথার পিছনে বাংলার কত দৈনন্দিন জীবনের সুখদুঃখের চিত্র, কত শত কাহিনী আত্মগোপন ক'রে রয়েছে তার সংখ্যা নেই। এই সব সংগ্রহের আশায় গ্রামে গিয়ে যখন ঠাকুমার কাছে বসেছি তখন তাঁদের ভাটিয়াল সুর শুনে মনে হ'ত যেন আবার সেই হারানো অতীতের কোলে ফিরে এসেছি,—আবার ছোট শিশু হয়ে নবজন্ম নিয়েছি। ঠাকুমা নাতিপুতিকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন ধোপার মেয়ে কাঞ্চনমালার সঙ্গে গাঁয়ের জমিদার-পুত্রের ঘটল ভালবাসা। পুকুরের ঘাটে জমিদার-পুত্র এলে

পুষ্করিণীর চাইর ধারে রে ফুটল চাম্পা ফুল,
ছাইরা দেয়ে চেংরা বন্ধু খাইরা বান্ধ চুল।

কিন্তু জমিদার-পুত্র কাঞ্চনমালার প্রেমে পাগল,

আখির পুতলী করি মুই বন্ধুরে রাখিব।
লোকে জানাজানি হৈলে পলকে ঢাকিব॥
বারে বারে বন্ধু মোরে যাওরে ভাড়াইয়া।
বিরলে পাইলে বন্ধু না দিব ছাড়িয়া॥

পরের দিন রাত্রে আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কাঞ্চনমালা ছাড়া পান। কিন্তু

সত্য ভঙ্গ হইল রে কুমার পারুলাম না আসিতে।
মা ও বাপ জাইগ্যা আছে আসিবাম কেমনে॥

এ সত্ত্বেও কাঞ্চনমালার চিত্ত এত উদভ্রান্ত যে নিজের সমস্ত সত্তা ভুলে গিয়ে

ঘর কইলাম বাহির রে বন্ধু
পর কইলাম আপন।
অবলার কুলভয় হইল দূষমণ॥"

এখানে ঠাকুমা তার নাতিপুতিকে ধাপ্পাবাজী দিয়ে ঠাণ্ডা রাখতে চেষ্টা করছেন না, এই রুদ্ধ সমাজে ভালবাসায় অনেক বিপদ, মা-বাপ ত জেগে থাকবেই, প্রকৃতিও এর অন্তরায় হবে, তাই

"আসমানেতে কাল মেঘ ডাকে ঘন ঘন।
হায় বন্ধু আজি বুঝি না হইল মিলন॥

বাপ-মা কাঞ্চনমালাকে কত রকমে বোঝাতে চেষ্টা করছেন, কিন্তু যা চিরন্তন সত্য, সেই কথারই আভাস দিচ্ছেন ঠাকুমা

যৈবন হ'ল ভারী রে বন্ধু যৈবন হ'ল ভারী।
সে যে ধান নয় চিড়া নয়, ডোলেতে ভরিব আনি॥

তার জন্যে আমি

বাপ ছাড়বাম মাও ছাড়বাম বাড় ঘরের আশা।
দেশ ছাড়িয়া লইবাম আমি জঙ্গলাতে বাসা।।

কিন্তু সমাজ ও জমিদার এদের ভালবাসা মোটেই ক্ষমার চক্ষে দেখল না, কঠোর শাস্তির আয়োজন চলল। কিন্তু



মহিষমর্দ্দিনী

একদিন দেখা গেল, কাঞ্চনমালা ও জমিদার-পুত্র গ্রাম থেকে উধাও হ'য়ে চলে গেছে, কারণ তাদের কাছে

বন্ধু রে পাইলে আমার কিসের জাতিকুল।

এই চলে-আসার মধ্যে গাঁয়ের নদী, গাঁয়ের নরনারী, আপন কুঁড়ের কথা মনে ক'রে মন আপনা থেকেই ব্যাকুল হয়ে উঠবে, ঠাকুমা তাও বুঝিয়ে বলছেন

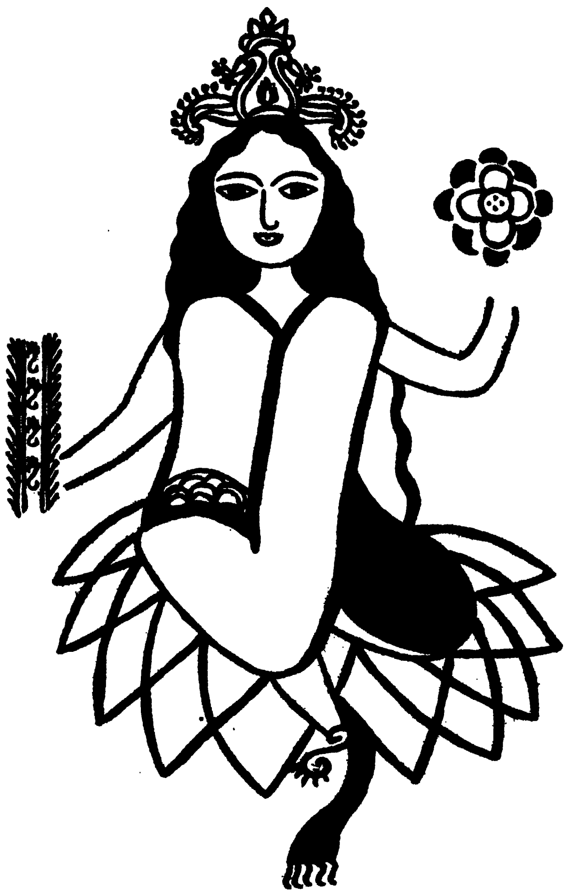
বাপেতে কাঁন্দিবে রে কুমার কালিকা বিয়ানে।
অভাগিনী মায়ে মাথা ভাঙ্গিবে পাষাণে।।
রাত্রি না পোষাইলে দেখবাম তোমার আমার বাড়ি।
রাত্রি না পোষাইলে দেখবাম পাড়ার নরনারী।।
রাত্রি না পোষাইলে দেখবাম সেই না বাগের ফুল।

তাদের—

জন্মের মত ছাইড়া আইলাম মা ও বাপের কুল।

এখন দু-জনে হয়েছে সাথী, নতুন দেশে এসে কাঞ্চনমালা করেন ঘরের কাজ, আর জমিদার পুত্র কাচেন কাপড়। কিন্তু এ-দেশের রাজকন্যা রুক্মিণীকে জমিদার-পুত্র ভালবেসে বসলেন। তাই বিদেশ ঘুরে আসি ব'লে কাঞ্চনমালাকে ফাঁকি দিয়ে তিনি চ'লে এলেন। এক মাস গেল, দু'মাস গেল, সারা বছর ঘুরে এল, জমিদার-পুত্র তবুও এল না দেখে কাঞ্চনমালা নদীর ঘাটে ব'সে গায়

কোন্ দেশ হইতে আইলা নদী রে যাইবা দূরের পানে।
দুক্ষিনীর দুক্ষের কথা কইও বন্ধুর কানে।।
দূরে থ্যাকা আইলরে ডিঙ্গা পাল খাটাইয়া।
এই ডিঙ্গায় নি আইছে সাধু বন্ধের খবর লইয়া।।



দেয়ালে লক্ষ্মী আলপনা

আমার লাগ্যা আনব বন্ধে হীরামতীর ফুল।
দুই কোটা চোহের জলে দিবাম সেই ফুলের মূল।।
গেল রে গেল রে বন্ধু এত দিনের আশা।
আজি রাত্রি পোষাইলে কাইল দিনের আশা।।

কাইল দিন চইল্যা গেল কাল হইল কাল।
অপযশী হইলাম রে বন্ধু দুঃখেরি কপাল ॥

বহুদিন ঘুরে ফিরে পাগলিনীর বেশে কাঞ্চনমালা নিজের বাড়িতে ফিরে এসে শুনতে পেলেন

বিয়া কইরা রাজার পুত্র সুখে বস্থা থায়।
স্বপ্নেও একদিন কন্যারে না জিগায় ॥

কিন্তু জমিদার-পুত্রের মত কাঞ্চনমালা সমাজের কাছে ক্ষমা পেলেন না—তাঁর নারীত্বের জন্য। তিনি জনমের মত শেষ-বার জমিদার-পুত্রকে দেখে চ'লে এলেন ভরা নদীর ঘাটেতে। তার মরার খবর যা'তে কেউ না জানে, তাই তিনি সবাইকে ডেকে বলছেন,

আমি মইরাছি নদী না বলিও কারে।
টুনীপঙ্খী নাহি জানে না কইও বন্ধুরে।।
নদীর বিরিক্ষি লতা ঘুমাও পাখী ডালে।
আমার কথা না কহিও বন্ধুর নিকটে।

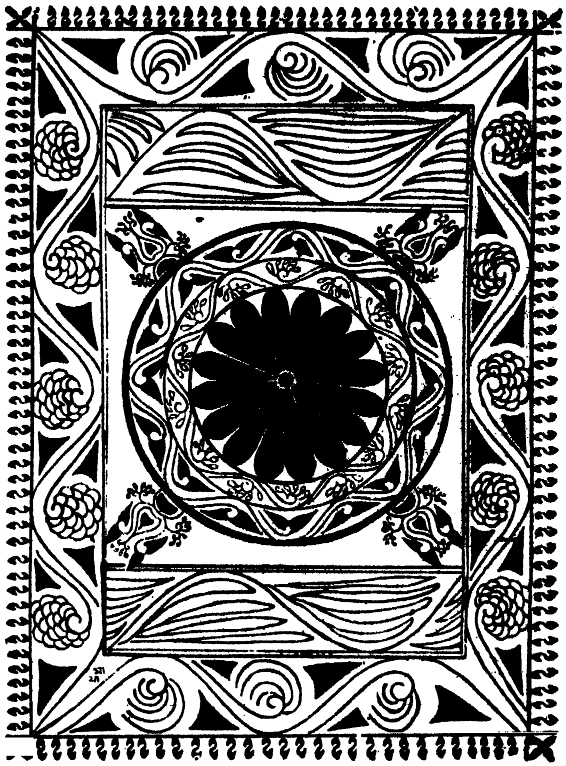
জীবনের ব্যর্থতায় কাঞ্চনমালা জমিদার-পুত্রকে অভিশাপ দিতে পারলেন না, তিনি যে জমিদার-পুত্রকে ভালবাসেন এই সত্যই নারীর কাছে যথেষ্ট এবং তাই সহজেই জমিদার পুত্র ক্ষমা পেলেন। তিনি ব'লে গেলেন

না লইও না লইও বন্ধু কাঞ্চনমালার নাম।
তোমার চরণে বন্ধু আমার শতেক পরণাম ॥

গাঁয়ের লোক, পশু, পাখী—কেউ জানল না কাঞ্চনমালার কথা, কিন্তু সন্ধ্যার সময় ঘরের দাওয়ায় বসে ঠাকুমাটি তাঁর নাতিপুতির কাছে এঁকে দিলেন সমাজের সুখদুঃখের একটি স্মৃতি, নারীজীবনের অসাধারণ চরিত্রবল,—কিরূপে সে দুঃখের গ্লানিতে পুড়ে নীরবে আত্মদান করল।

ঠাকুমা এখন ছেলেমেয়েদের বাইরে ছুটাছুটি ক'রতে পাঠিয়ে দেন। তারা এখন, 'চোখ বান্দা', 'পালান পালান', 'কুমীর কুমীর', খেলা করে। মেয়েরা কুমীর হয় আর ছেলেরা তার বাচ্চা নিতে এসে বলে, "এ গাঙে কুমীর নাই, হাপুস-হুপুস!"

বাংলা দেশে এই অবধিই মেয়ে ও ছেলের একসঙ্গে চলাফেরা দেখতে পাওয়া যায়, তারপর উভয়েই দু'টি বিভিন্ন দিকে চ'লে যায়। ছেলেরা এখন 'গোল্লাছুট', 'দাড়ে বান্দা' 'চিবুড়ী' ইত্যাদি খেলা করে। বিক্রমপুর অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায় অনেক সময় দশ-বার বছরের ছেলেরা ঠাকুমাটিকে 'চিবুড়ী' করে। তারা এখন বলে, "চি চট্কা আমের বোল, গাছে উঠে মারি শোল, শোলের কপালে ফোটা, খেড়ু মারি গোটা গোটা।" কি ক'রে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিত্‌বে, সেই নিয়ে সর্ব্বদা ব্যস্ত। আর মেয়েদের কাজ নিয়ন্ত্রিত করছেন ঠাকুমা ব্রতকথায়, ব্রতনৃত্যে। আনন্দে তারা মেঘকে পৃথিবীতে ডেকে আনে, বককে অসীম আকাশে উড়তে শেখায়। তাদের



পিঁড়ি চিত্র

সৌন্দর্য্যবোধ জেগে ওঠে ব্রত-আলপনায়, নির্ম্মাণ-স্পৃহা ফুটে ওঠে রন্ধন ইত্যাদি কার্য্যে, সৃজন-স্পৃহা ফুটে ওঠে সিকে, কাঁথা ইত্যাদি সেলাই করাতে, সংগ্রহ-স্পৃহা জাগানো হয় দূর্ব্বা, ফুল ইত্যাদি সংগ্রহ করতে দিয়ে। ঠাকুমা এখন তাদের খেলা কমিয়ে দিয়েছেন, ব্রতকথা, ব্রতনৃত্যই তাদের কাছে আদরের বস্তু, তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের আভাস পেতে সুরু করেছে এই সব ব্রতকথার মধ্য দিয়ে। ঠাকুমা এখন তাকে একটু রসিকতা ক'রে বলেন

দোল্ দোল্ দুলুনি।
রাঙা মাথায় চিরুণি।।
বর আসবে এখনি।
নিয়ে যাবে তখনি ॥

ঠাকুমার এই সব আল্পনা প্রায়ই গ্রাম্যজীবনের পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে গৃহীত। এই সব আল্পনায় মানুষ পাখী মাছ গাছ হাতী ঘোড়া চন্দ্র-সূর্য্য-তারা, এমন কি, হাট-বাজার রান্নাঘর ইত্যাদি সবই আঁকা হয়। ঠাকুমা



তকতি

তাদের মধ্যে একটু একটু ক'রে ধর্ম্মভাবও জাগিয়ে তুলছেন। কলাগাছের ডাঁটা দিয়ে কালীঠাকৃরুণ তৈরি ক'রে দেন, এই কালীঠাকৃরুণ মেয়েরা পূজো করে। প্রতি মাসেই একটি না-একটি ব্রত ঠাকুমার লেগেই আছে। কত ইতুরাল, মঙ্গলচণ্ডী, অরণ্যষষ্ঠীর ব্রতকথা তাদের সামনে বুঝিয়ে বলছেন। যে-বাড়িতে ঠাকুমা আছেন সে-বাড়িতে লক্ষ্মীপূজার আল্পনা সর্ব্বাগ্রে ঠাকুমাই দিবেন। ঘরের মেঝেতে লক্ষ্মীর পদ্ম ও পা এবং ঘরের দেয়ালে কিংবা 'খামে' অথবা লক্ষ্মীসরায় লক্ষ্মী একে দিলে পর ছেলেমেয়েরা সর্ব্বত্র লক্ষ্মীর আলপনা দিবে

ঠাকুমারা এইসব লক্ষ্মীর আলপনা, কুলাচিত্র, সরাচিত্র, পিঁড়িচিত্র করতে গ্রামের মধ্যে সবচেয়ে ওস্তাদ, পদ্ম আঁকবার খুব সোজা কতকগুলি নিয়ম তাঁদের জানা আছে,—সেই নিয়মানুসারে পদ্ম কিংবা লতা চটপট এঁকে ফেলতে পারেন। এই সব পদ্মের কিংবা লতার আবার কত সুন্দর নাম। 'পানপদ্ম', 'শতদল-পদ্ম,' 'স্থলপদ্ম', 'শঙ্খচূড় লতা,' 'গুঞ্জরীলতা', 'মোচালতা,' 'কলমীলতা'। ঠাকুমারা ছবি আঁকতে এত ওস্তাদ যে, কোন চিত্র ক'রতে নিয়ে গেলেই, প্রথমে যে রংটি যেখানে বসবে তারপর অন্যান্য রং কিংবা রেখা যথাস্থানে বসিয়ে দুই-তিন মিনিটের মধ্যেই একটি সম্পূর্ণ ছবি এঁকে ফেলতে পারেন। কিছুদিন আগে শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় 'দুর্গাপূজা" প্রবন্ধে আক্ষেপ ক'রে বলেছিলেন যে, বাঙালী অত্যন্ত ভাবপ্রবণ বলে তারা দুর্গাকে শক্তিরূপে গ্রহণ করতে পারল না, তার সঙ্গে জুড়ে দিল ছেলেমেয়েতে পরিপূর্ণ একটি সংসারের দৃশ্য। কিন্তু তিনি যদি ঘনিষ্ঠভাবে গাঁয়ের ঠাকুমাদের সঙ্গে পরিচিত থাকতেন তবে দেখতে পেতেন সরার উপর ঠাকুমারা দুই-তিন টানে কিরূপে মহিষাসুর বধোদ্যতা শক্তি-রূপিণী দশভূজা এঁকে ফেলেন। মনে হয়, এই ঠাকুমাদের কাছ থেকেই বোধ হয় উৎসাহ পেয়ে বাংলা দেশের অনেক মন্দিরে এরূপ শক্তিরূপিণী দুর্গার মূর্ত্তি আঁকা সম্ভব হয়েছিল। শুধু দুর্গা নয়, সরার উপর যে সব রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি এঁকে থাকেন তার মধ্যে ঠাকুমাদের একটি নিজস্ব সুস্পষ্ট ভাব আছে। ঠাকুমাদের আঁকা রাধাকৃষ্ণের সঙ্গে নলিয়া গ্রামের এই রাধাকৃষ্ণের হুবহু মিল দেখা যায়। এখানে রাধার ভঙ্গী কিরূপ অপূর্ব্ব, সুমোহন, চোখে মুখে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গে একটি গভীর তৃপ্তির আভাস, প্রাণের অফুরন্ত আনন্দের অনাবিল স্রোতের ঢেউ তার সুকোমল বাহু দুটির একটি অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে। ঠাকুমাদের অসীম ধৈর্য্য দেখতে পাওয়া যায় কাঁথা শেলাই, সিকে, তকৃতি অথবা আমসত্ত্বের ছাঁচ তৈরি করতে। মাটি পুড়িয়ে কিংবা পাথর খুদে নানা রূপ লতাপাতায় ঠাকুমারা এই সব ছাঁচ তৈরি করেন এবং তাইতে আমসত্ব দিয়ে থাকেন। আমসত্ব দেওয়ার দিন যদি বৃষ্টি হয় তবে ঠাকুমা একমনে বলে যান

রৈদ দে রে রৈদানী
চান্দের মার বকের হাত,
কলাতলায় গলা জল
চচ্চর্যায়া রৈদ পড়্।

চাউলের গুঁড়ার দুই-তিন টানের আল্পনায় যে-সব জোড়া মাছ, পাখী, পুরুষ-স্ত্রী, শিবদুর্গার যুগল ছবি আঁকা হয় তা ঐক্য ও ভালবাসার প্রতীক। এসব ছবি আঁকা তিনি মেয়েদের শিখিয়ে দিচ্ছেন, কারণ তিনি জানেন

আজ হেমৃরীর এদিক ওদিক
কাল হেমৃরীর বিয়ে,
হেমৃরীকে নিয়ে যাবে ঢাকের বাড়ি দিয়ে।
মা কান্দবেন, মা কান্দবেন ধুলায় লুটিয়ে।

বাপ কান্দবেন, বাপ কান্দবেন দরবারে বসিয়ে।
সেই যে বাপ টাকা দিয়াছে পেটরাটি ভরিয়ে।
ভাই কান্দবেন ভাই কান্দবেন আঁচল ধরিয়ে,
সেই যে ভাই কাপড় দিয়াছেন আলনাটি সাজিয়ে ॥

মা, বাবা, ভাইবোনের ভালবাসা, সমস্ত ঝগড়াবিবাদ এবং সব খেলাধূলার লীলাক্ষেত্র ছেড়ে গেলে যে তারা ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদবেন তারই ইঙ্গিত দেওয়া হয় এই ছড়ার মধ্যে। এখনও অনেক গ্রামে 'চোদ্দ প্রদীপ জ্বালা' উৎসবে মেয়েরা ঠাকুমার কাপড় ধ'রে তুলসী তলায়, ঘরের আনাচে-কানাচে, পুকুরঘাটে প্রদীপ ভাসিয়ে দেয়। এই ঠাকুমার কোলেপিঠে নিয়ত মানুষ হয়েছে যে, তার ভাবী শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার কথায় বাড়ির সবাই উদ্বিগ্ন, কিন্তু ঠাকুমার কোন চিন্তা নেই, তিনি আরও উৎসাহের সঙ্গে বলছেন

পুটু যাবে শ্বশুরবাড়ি সঙ্গে যাবে কে?
ঘরে আছে হাতীঘোড়া কোমর বাঁধাছে ॥
আমকাঠালের বাগান দেব ছায়ায় ছায়ায় যাতি।
চার মিনসে কাহার দেব পালকী বহাতি ॥
সরু ধানের চিড়ে দেব পথে জল খেতে।
চার মাগী দাসী দেব পায়ে তেল দিতে
উড়কী ধানের মুড়কী দেব শাশুড়ী ভুলাতে ॥

এখন আর ঠাকুমার নাতির দিকে বিশেষ লক্ষ্য নেই, কারণ সে এখন নিজের পায়েই নিজে চলতে শিখেছে। আমরা একদিন গাঁয়ের এক ঠাকুমার কাছে গেছি, ঠাকুমা শুনলেন যে তার নাতি গ্রামের কোন্ এক প্রতিবেশীর বাড়ীতে উপদ্রব করছে। অমনি ঠাকুমাটি আমাদের বললেন, "বাবারে, কি আর বলব, চিত্তিরি নাই সুখ, ভেবেছিলাম

আমার যেমন নিমাই তেমন আছে, কিন্তু এদিকে,
আমার তলদে নিমাইয়ের ডোরায়ে গেছে।

বাড়িতে বিবাহের ধূমধাম পড়ে গেছে। সবাই যখন 'বৃদ্ধি-শ্রাদ্ধ' নিয়ে ব্যস্ত, ঠাকুমা কিন্তু ওদিকে বিয়ের 'আনন্দ নাড়ু' তৈরি ক'রতে ছুটাছুটি করছেন। ঠাকুমা তাঁর হাত দুধ দিয়ে ধুয়ে ছেলেকে 'আশীর্ব্বাদ' করেন এবং এই সময় এয়োরা যে গান করে সে গানটি শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত ঠাকুমার সামনে ছেলেকে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। প্রথমে এয়োরা বলেন, যেন ছেলে ঠাকুমার কাছে জিজ্ঞেস করছে

আমি যাব সেই অশোকবনে, সীতারই অন্বেষণে
তারে আনতে গেলে কি কি লাগে গো?

তখন

সিঁথির ঐ সিন্দুর লাগে, বানিয়ার চন্দন লাগে
তারে আনতে গেলে এই সব লাগে গো ॥"



রাধাকৃষ্ণ

সবাই মিলে ছেলেকে বেঁধে তার চার পাশে মেয়েকে সাত পাক ঘোরাচ্ছে, ঠাকুমা কিন্তু এদিকে তাদের বরণ ক'রে নিয়ে আসবেন বাসরঘরে। যদিও বাসরঘরে বর ও কন্যায় জো-খেলার সময় আমোদ-আহ্লাদ ক'রে গান গাওয়া হয়

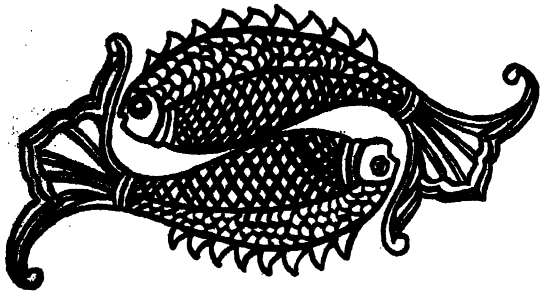
রাম যদি ঢালে পাশা
দাসী হব ঐ চরণে।

এদিকে,

সীতা যদি ঢালে পাশা
পণ করিব রাজ্যধনে।

কিন্তু ঠাকুমার এই সব ফাঁকা কথায় মন ভিজছে না, তিনি প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখতে চান। তার সোহাগভরা হাঁড়ি নিয়ে এলেন। তখন বরের মাথার মুকুটের এক অংশ আর ক'নের মাথার মুকুটের এক অংশ সোহাগভরা হাঁড়ির জলের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে খুব জোরে ঘুরিয়ে দিলেন। এখন যদি দেখেন মুকুটের ওই শোলার টুকরা দুটি পরস্পর সংযুক্ত হ'য়ে ঘুরছে, তবে ঠাকুমা বুঝবেন বর-ক'নের মধ্যে

খুব মিল হবে ; আর যদি ও ছুটি পৃথকভাবে ঘুরতে থাকে তবে ঠাকুমার গালাগালির চোটে তাদের দুজনের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হ'য়ে ওঠে। বর যখন বিয়ে ক'রে বাড়ি ফিরল, পাড়াপরশী সবাই তাদের দেখে আনন্দ করছে। ঠাকুমার



জোড়ামাছ—আলপনা

কিন্তু 'এক পাও বসবার' সময় নেই, তিনি রান্নাঘরের আবর্জ্জনা এক জায়গায় জড়ো ক'রে তার মধ্যে একটি টাকা লুকিয়ে রেখেছেন। বউ এসেই সেই আবর্জ্জনা পরিষ্কার ক'রে টাকাটি ঘরে নিয়ে আসবে। ঠাকুমা বউমাকে শিক্ষা দিচ্ছেন যে, আবর্জ্জনার মধ্যে থেকেও কিরূপে ঘরে লক্ষ্মী আনতে হয়। দ্বিতীয় বিবাহের সময় ঠাকুমার আর মনে আনন্দ ধরে না। নিজেই 'দৈবকঠাকুর' প্রহসনে, দৈবকঠাকুর সেজে গান ধরে দিয়েছেন,

"এলো রে দৈবকঠাকুর ভাণ্ডধুতরা খেয়ে
কন্যার মা দেয় না জাগা
পাগল পাগল বলে লো
পাগল পাগল বলে।"

বাস্তবিকই ঠাকুমা দৈবকঠাকুর প্রহসনে পাগল হ'য়ে যান। শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয় যখন সিউড়ীতে বিবাহের নৃত্যের জন্য নলিয়া গ্রাম থেকে জন কয়েক মহিলা এনেছিলেন তার মধ্যে একজন ঠাকুমা ছিলেন। দৈবকঠাকুর প্রহসন দেখে তিনি বলেছিলেন যে, এরা ত ঠাকুমা নয়। আমাদের দেশে এ যে আবার 'বড়াই বুড়ী' ফিরে এসেছে! তার ভাঙা ছাতি, লাঠি নিয়ে 'গুণে পড়ে' বলে দিচ্ছেন বউমার কয়টি ছেলে কয়টি মেয়ে হ'বে।

আবার ঠাকুমা নতুন ক'রে ঘরসংসার পাতলেন কিন্তু এর মধ্যে ঠাকুমার আর সেই আগেকার আনন্দ নেই। তাঁর সহজ সরল চিন্তার সঙ্গে এদের চিন্তা-ধারার মোটেই খাপ খায় না! তিনি ভাবী নাতিনাতিনীর আশায় বসে বসে যখন মালা জপতে থাকেন তখন বউমারা এসে গল্পের আব্দার ধরলে কোন রকমে দু-একটি গল্প শেষ ক'রেই ঠাকুমা বলে ওঠেন,

"আমার কথাটি ফুরোল
নটে গাছটি মুড়োল,
কেন রে নটে মুরোলি?
গরু কেন খায়।
কেন রে গরু খাস?
দুধ কেন হয় না।
কেন রে দুধ হ'স না?
বাছুর কেন খায় না।
কেন রে বাছুর খাস না?
ভাত কেন দেয় না।
কেন রে ভাত দিস্ না?
গোপাল কেন আনে না।
কেন রে গোপাল আনিস্ না?···

গোপালের জীবন এখন পৃথিবীর বিরাট কর্ম্মক্ষেত্রে ব্যস্ত, ঠাকুমার কথা কেন ফুরিয়ে আসছে তা তিনি নিজেই ব'লে দিলেন। একদিন সত্যি সত্যিই এমনি ক'রে ঠাকুমার কথা যখন সম্পূর্ণ ফুরিয়ে আসে তখন তাঁরই হাতেগড়া বাংলার ছেলেমেয়েরা তাঁর জন্য চোখের জল না ফেলে তাঁকে নিয়ে আনন্দে হল্লা করতে করতে ছুটে চলে ওই শ্মশানঘাটের দিকে।

এই প্রবন্ধের রেখাচিত্রগুলি শ্রীকুলজারঞ্জন চৌধুরী কর্ত্তৃক অঙ্কিত।

রাজঘাটের ব্রতনৃত্য

শ্রীগুরুসদয় দত্ত

দু-বছর আগের কথা। তখন বাংলার শিক্ষিত মেয়েদের মধ্যে নাচের প্রবর্ত্তন করবার চেষ্টা আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু যেমন অন্যান্য রসকলার ক্ষেত্রে, তেমনি নৃত্যকলার ক্ষেত্রেও বাংলার শিক্ষিত সমাজ আদর্শ খুঁজছিল অন্য প্রদেশ থেকে এবং অতীত যুগের পুঁথি ও মন্দিরগাত্র থেকে। বিশেষ ক'রে গুজরাট অঞ্চলের গরবা নাচের অনুকরণ করবার তখন খুব একটা হুজুক পড়েছিল। আমি কিন্তু শৈশব থেকেই জানতাম, বাংলা দেশে ভদ্র মেয়েদের মধ্যে এমন নৃত্য এখনও বেঁচে আছে, যা গরবার চেয়ে কোন অংশে কম নয়; এমন কি, ভঙ্গীর বলিষ্ঠতার দিক দিয়ে এর স্থান আরও উচ্চে। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে আমাদের দেশের ভদ্রসমাজ তখন এ-বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন।

বছর-দেড়েক আগে ফরিদপুর জেলার নলিয়া গ্রামে ব্রত-নৃত্য ও বিবাহ-নৃত্যের আবিষ্কার করবার সুযোগ আমার হয়েছিল। সে-সম্বন্ধে সচিত্র আলোচনা যখন নানা কাগজে প্রকাশ করেছিলাম, তখন বাংলার শিক্ষিত সমাজের মধ্যে খুব একটা সাড়া পড়ে। শান্তিনিকেতনের স্বর্গীয় জগদানন্দ রায় মহাশয় এ-বিষয়ে আমাকে লিখে-ছিলেন—"এমন নৃত্য যে আজও আমাদের দেশে আছে তাহা আজ আপনার রচনা হইতে জানিলাম।"



অঞ্জলি-নৃত্য



প্রণাম-নৃত্য

কিন্তু এর অল্পদিন পরেই আর একটি নৃত্য আবিষ্কার করবার সৌভাগ্য আমার হ'ল, যার তুলনায় নলিয়ার নৃত্যও ম্লান হয়ে গেল।

এই নৃত্যটির নাম ঘট-ওলানো নৃত্য। যশোহর জেলায় রাজঘাট অঞ্চলে এখনও এর প্রচলন আছে। রাজঘাট গ্রামটি

ভৈরব নদীর কূলে। ঐ গ্রামের কাছাকাছি বুনা নামক স্থানে শীতলা দেবীর একটি বহু প্রাচীন মন্দির আছে। কাছেই একটি বৃহৎ বটগাছের নীচে শীতলাতলা। চারি পাশের ঘাট-সত্তর খানা গ্রাম থেকে নানা বয়সের ইতর ভদ্র মেয়ে-পুরুষ দেবীর কাছে পূজা দিতে যায়। গ্রামলক্ষ্মীরা বন্ধ্যাত্ব, রোগ (বিশেষ ক'রে 'মায়ের অনুগ্রহ' অর্থাৎ বসন্ত রোগ) এবং নানা ব্যাপারের সুফলের জন্য দেবীর কাছে মানত করেন।

যেদিন পূজা হবে তার তিন বা পাঁচ কিংবা সাত দিন আগে যে গৃহস্থ মানত করেছেন তিনি অধিবাসের আয়োজন করেন। পাড়ার বয়স্কা মেয়েদের এই উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করা হয়। মানতকারিণী সেদিন উপবাসী থাকেন। মেয়েরা সমবেত হ'লে উলুধ্বনি সহকারে সকলে ঘাটে যান। মানতকারিণী কুলার উপর একটি পিতলের ঘট রেখে সেই ঘট ও কুলা মাথায় ক'রে জলে ডুব দেন। ঐ জলভরা ঘট ও কুলা ঘাট থেকে মাথায় ক'রে এনে ঘরের মধ্যে ঘটস্থাপনা করেন। তারপর সমবেত মেয়েরা সেই ঘরের মধ্যে সমস্ত রাত্রি জাগরণ করেন। জাগরণের সময় সমষ্টি-গীত হয়ে থাকে। প্রথমে হয় বন্দনা গান—

প্রথমে বন্দিলাম আমি শ্রীগুরুর চরণ
—আমার মানেক ও ধন, আমার আসরে কর রে আগমন।
তারপরে বন্দিলাম আমি শ্রীহরির চরণ— ইত্যাদি।



জোড়-নৃত্য

আরও দুটি গানের নমুনা দিচ্ছি—

(১) পদ্মের আসন পদ্মের চাটন*
পদ্মের সিংহাসন,
পদ্মের পাতায় জন্ম নিলেন সত্যনারায়ণ।



প্রণাম-নৃত্য

ঘট কেন নড়ে রে দেবী, আসন কেন টলে,
ঐ আসতেছেন মা-শীতলা
এই আসরের 'পরে।।

(২) ঝড়ি বৃষ্টি অন্ধকারে
গোপাল গেলেন নন্দের ঘরে।।



কুড়ে-মোড়া

আপন যদি মা ধন হ'ত
ক্ষিধের বেলায় ননী দিত।
কৃষ্ণধন আমার কোলে আয়,
আয় রে গোপাল করি কোলে—
তাপিত প্রাণ শীতল করি।।

* চাটন—চাটাই।

আপন যদি মা ধন হ'ত
ধুলা ঝেড়ে কোলে নিত ॥
কৃষ্ণধন আমার কোলে আয়
আয় রে গোপাল করি কোলে
তাপিত প্রাণ মন শীতল করি ॥
আপন যদি মা ধন হ'ত
হাতে তুলে বংশী দিত ॥ ইত্যাদি

এইরূপে ঘটস্থাপনার পর প্রতিদিন সেই কুলা নিয়ে মেয়েরা বাড়ি-বাড়ি মেঙে (পূজার জন্য চাল পয়সা ইত্যাদি দান সংগ্রহ ক'রে) বেড়ান। মেয়েরা যে-বাড়িতে যান বাড়ির গিন্নী সর্ব্বাগ্রে উঠানে একখানা আসন পেতে দেন। ঐ আসনের উপর কুলা ও ঘট নামিয়ে রেখে মেয়েরা তার চার দিকে নানারূপ সুন্দর ভঙ্গিতে নাচতে থাকেন। ঢাকের তালে তালে এই নৃত্য হয়। ঋষি-জাতীয় ব্যক্তিরা ঢাক বাজায়। এই থেকে নৃত্যের নাম 'ঘট ওলানো' ('ওলানো' কথাটার অর্থ নামানো)। প্রতিদিন এইরূপ নৃত্য হয়। নৃত্যকারিণীরা



বায়েনা-নৃত্য

নিকটবর্ত্তী তিন-চার গ্রাম অবধি গিয়ে থাকেন। নৃত্যের তৃতীয় বা পঞ্চম দিনে বুনার মন্দিরে ঐ কুলা ও ঘট নিয়ে গিয়ে পূজা দেওয়া হয়।

ধর্ম্মের সঙ্গে এই নৃত্যের মূলতঃ যোগ থাকলেও পল্লীবাসীর দৈনন্দিন জীবনের অনেক ব্যাপার এবং বহু হাসি-তামাসা এই নৃত্যের মধ্যে অতি সহজভাবে রূপায়িত হয়েছে। বন্দনা নৃত্য, প্রণাম নৃত্য, আড়ুয়া নৃত্য, বায়েনা নৃত্য ও কন্ধাদার নৃত্য মূল নাচের অঙ্গীভূত। আনুষঙ্গিক নাচের মধ্যে জোড় নৃত্য, ফুচে-মোড়া, পিঁপড়ে-মারা, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। হাস্যরসাত্মক নাচের মধ্যে ক্ষুদিরামের মাথাধরা, কুলপাড়া, বৈরাগী ডাকা ও তামাক পোড়ান বিশেষভাবে উপভোগ্য।

নাচের সঙ্গে সঙ্গে ঢাকীও মাঝে মাঝে গান ক'রে থাকে। দুটা গান এখানে দেওয়া হ'ল :—



বরণ-নৃত্য

(১)

ঘোষ গেছে বাথানেরে যশোদা গেছে ঘাটে,
শন্য (১) গোয়াল পায়ে গোপাল সকল ননী নোটে (২)।
ছড়ি হাতে নন্দরাণী যায় গোপালের পিছে,
লম্ফ দিয়ে উঠল গোপাল কদম্বেরি গাছে।
পাতায় পাতায় বেড়ায় কৃষ্ণ ডালে না দেয় পাও,
তলায় থেকে নন্দরাণী কপালে ঘা খায়।
নামারে নামারে গোপাল পেড়ে দিব ফুল
ডাল ভাঙ্গিয়ে তলায় পড়ে মজাবি দুকুল।
বেন্ধো না বেন্ধো না মাগো আর বেন্ধোনা এঁটে
তোমার বন্ধনে আমার বুক্ক (৩) যায় রে ফেটে।
কাল সকালে মাগো আমি মাতুল বাড়ি যাব
হাপনি (৪) বিক্রী হয়ে মা ননীর কড়ি দিব।
রাধিকারে না'য় উঠ্যায়ে কানাইর মনে খুসী
হালির (৫) কাটায় হেলান দিয়ে বাজায় মোহন বাঁশী ॥

(২)

পেঁচা নাচে পেঁচি নাচে নাচে পেঁচার মা;
চারি ধারে জুয়োড় (৬) পড়ে মধ্যি [illegible] না।
আমার আসন ছাড় মা লও অন্য ঠাঁই,
আর কি বলিব মা তোর শিবের দোহাই ॥

এই নাচের সন্ধান পেয়ে আমি নিজে রাজঘাট গ্রামে গিয়ে এক দল মেয়ে কলিকাতায় নিয়ে আসি। তাদের অভিভাবকেরা অনুগ্রহ ক'রে অনুমতি দিয়েছিলেন এবং কয়েক

(১) শূন্য। (২) লুটে। (৩) বক্ষ। (৪) আপনি। (৫) নৌকার হাল। (৬) জকার।

জন সঙ্গেও এসেছিলেন। ১৯৩২ সালের এপ্রিল মাসে গলষ্টন পার্কের লোকনৃত্য উৎসবে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির সম্মুখে ঐ নৃত্য দেখান হয়। সকলেই এর সৌন্দর্য্যে বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়েছিলেন। বিখ্যাত কলাবিৎ শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী মহাশয় এই নৃত্য দেখে আমাকে লিখেছিলেন—

We are really indebted to you for revealing to us a phase of cultural life of Bengal of which we had not the slightest idea before you discovered them.

—আপনার এই আবিষ্কারের পূর্ব্বে বাংলার সংকৃষ্টিগত জীবনের একটা দিকের সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণাই ছিল না। আপনি সেটি উদ্ঘাটিত করায় আমরা সত্য সত্যই আপনার কাছে ঋণী হয়ে রইলাম।

কিন্তু কেবল সৌন্দর্য্যের দিক দিয়ে নয়, শারীরিক ব্যায়াম হিসাবে এই নৃত্য মেয়েদের মধ্যে প্রচলিত সকল নৃত্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব'লে আমি মনে করি। স্বর্গীয় জগদানন্দ রায় মহাশয়ও এই উপকারিতা উপলব্ধি ক'রে বাংলার বালিকা-বিদ্যালয়গুলির মধ্যে এর প্রচলনের ব্যবস্থা করবার জন্য আমাকে বিশেষ অনুরোধ ক'রে চিঠি লিখেছিলেন।

ক'নে দেখা

শ্রীসীতা দেবী

রোমান্স জিনিষটা অনেকটা যেন অতর্কিত দুর্ঘটনার মত, ইংরেজী ভাষায় যাহাকে বলে য়্যাক্সিডেণ্ট (আকস্মিক ঘটনা)। কখন যে কাহার জন্য কোন্ পথে ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে তাহার ঠিকানা নাই। আমাদের অতিবেরসিক ডাক্তার পূর্ণেন্দু মিত্রেরও এই দশা হইল।

মেডিক্যাল কলেজ হইতে বাহির হইয়া অন্ততঃ তিন-চার বছর 'ভেরেণ্ডা' ভাজিয়া দিন কাটাইতে হয় না এমন সৌভাগ্যবান বাংলা দেশে বিরল কিন্তু পূর্ণেন্দুর প্রতি লক্ষ্মীঠাকুরাণীর শুভ দৃষ্টি ছিল। পাড়ার বিখ্যাত পসারওয়ালা ডাক্তার মহেন্দ্র চৌধুরীর সুনজরে সে হঠাৎ পড়িয়া গেল। ডাক্তারীতে মহেন্দ্র বাবুর নাম যেমন, বদমেজাজের জন্য খ্যাতিও তেমন। তিনি কেস্ লইয়াছেন জানিলে জুনিয়ার ডাক্তার, নার্স প্রভৃতি মনে মনে অনেকেই দুর্গানাম জপ করে। রোগী এবং রোগীর বাড়ির লোককে উচিত সত্য কথা বলিতে কোনো দিনই তিনি পশ্চাৎপদ নন, তবুও তাঁহার পসার দিনের দিন বাড়িতেছে, এবং ফিস্ ১৬্ টাকা হইতে সম্প্রতি ৩২্ টাকায় গিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে।

সেবা-শুশ্রূষায় কোনো ত্রুটি বা রোগীর ঘরে কোনো অপরিচ্ছন্নতা দেখিলে মহেন্দ্র ডাক্তার একেবারে মারমুখো হইয়া ওঠেন, এই সূত্রেই পূর্ণেন্দুর সঙ্গে তাঁহার পরিচয়। পূর্ণেন্দুর দাদার শ্বশুরবাড়িতে সেদিন একটা শক্ত 'অপারেশনে'র কথা। শ্বশুর বৃদ্ধ মানুষ, কয়েক দিন হইতেই পায়ে একটা ফোড়া লইয়া ভুগিতেছিলেন। না কাটিলে যখন চলিল না, তখনই বড় ডাক্তারের ডাক পড়িল। জিনিষপত্র গুছাইয়া দিয়া সাহায্য করিবার জন্য ডাক পড়িল পূর্ণেন্দুর।

পূর্ণেন্দু এমন নিখুঁৎ করিয়া সব ব্যবস্থা করিল যে, অমন যে ডাক্তার মহেন্দ্র চৌধুরী তিনিও রাগ করিবার বা গর্জ্জিয়া উঠিবার কোনো সুযোগ পাইলেন না। মোটের উপর ছোকরার সম্বন্ধে অতি উচ্চ ধারণা লইয়াই তিনি প্রস্থান করিলেন এবং ইহার পর প্রায় সর্ব্বত্রই নিজের সহকারী রূপে তাহাকে লইয়া যাইতে আরম্ভ করিলেন। পূর্ণেন্দু নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল।

মহেন্দ্র বাবুর পূর্ণেন্দুর সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা হইবার আর একটা হেতু ছিল। তাহা আর কিছুই নয়, পূর্ণেন্দুর চেহারা এবং বেশভূষা। মহেন্দ্র চৌধুরী নিজে ছিলেন পুরাদস্তর কুৎসিত। এজন্য না-কি যৌবনকালে তাঁহাকে বিশেষ ভুগিতে হইয়াছিল, প্রায় চিরকুমার থাকিয়া যাইতে হয় আর কি! সেই হইতে সুন্দর চেহারা দেখিলেই তিনি চটিয়া যান। পূর্ণেন্দু একে ত সুন্দর নয়, তাহার উপর বেশভূষার বাহার তাহার এমনিই যে দেখিলে আর কেহ দ্বিতীয় বার

ফিরিয়া চাহিবে না। মহেন্দ্রবাবুর এই সিম্‌প্লিসিটিটা বড়ই মনোহরণ করিল।

এক বৎসর ত পূর্ণেন্দু তাঁহার সহকারীর কাজ করিয়াই কাটাইয়া দিল। দ্বিতীয় বৎসর সোজা কেস্ বুঝিলে মহেন্দ্রবাবু নিজে না গিয়া অনেক জায়গায় একলা পূর্ণেন্দুকেই পাঠাইতে লাগিলেন। কালে যে তাঁর বহুবিস্তৃত প্র্যাক্‌টিস্ এই যুবকের হাতেই আসিয়া পড়িবে সে-বিষয়ে কাহারও সন্দেহ রহিল না।

মহেন্দ্র চৌধুরীর এক ভাগিনেয় ছিল ডাক্তার। মামার এই পক্ষপাতিত্বটা তাহার বড়ই চোখে লাগিল। মায়ের কাছে গিয়া নালিশ করিতেও সে ছাড়িল না। দিদি সুযোগ বুঝিয়া একদিন সশরীরে ভাইয়ের বাড়ি আসিয়া হাজির হইলেন। দুপুরবেলা ঘণ্টা-দুই মাত্র ভাইকে বাড়িতে দেখা যায়, সুতরাং খাওয়ার সময়ই কথাটা পাড়িতে হইল। ভাইয়ের আসনের কাছে একখানা পিঁড়ি টানিয়া লইয়া বসিয়া দিদি বলিলেন, "হ্যাঁ রে, একটা কথা শুনলুম, সত্যি?"

মহেন্দ্র বাবু ভাত মাখিতে মাখিতে গম্ভীরভাবে বলিলেন, "কি কথা তা না জানলে সত্যি কি মিথ্যে কি ক'রে বলব?"

দিদি বলিলেন, "তুই নাকি তোর সব প্র্যাক্‌টিস্ কোন্ এক পূর্ণেন্দু ব'লে ডাক্তারকে দিয়ে দিচ্ছিস্? ভাগ্নেটার জন্যে কিছু রাখবি না?"

ভাগিনেয় সমরের উপর মহেন্দ্রবাবু একেবারে খুশী ছিলেন না। সে অতিরিক্ত টেরি কাটে এবং এখনই তাহার দরজীর দোকানে ধার জমিয়া গিয়াছে। পাসও অতি কায়ক্লেশে করিয়াছে, ছোঁড়ার কোনো গুণই নাই।

দিদির কথায় ডাক্তার চটিয়া গিয়া বলিলেন, "প্র্যাক্‌টিস্ ত মামার বাড়ির মোয়া নয় যে ভাগ্নে ব'লে আদর ক'রে দিয়ে দেব? যোগ্যতা থাকলে নিজেই পাবে।"

ভাজের সঙ্কেত উপেক্ষা করিয়া দিদি আবার বলিলেন, "কেন আমার সমর কি ডাক্তারী পাস দেয়নি?"

মহেন্দ্রবাবু চেঁচাইয়া বলিলেন, "তোমার ছেলেকে ঘোড়ার ডাক্তারী বড়জোর করতে দেওয়া যায়, তার বেশী না। সেদিন মানুষ খুন করতে করতে বেঁচে গেছে, এক বুড়ীকে 'মর্ফিয়া' দিয়ে সাবড়েছিল আর কি, ভাগ্যে গিয়ে পড়েছিলাম।"

দিদি রাগে গজ-গজ করিতে করিতে উঠিয়া গেলেন। সমর তখন হইতেই পূর্ণেন্দুর চিরশত্রুতে পরিণত হইল।

পূর্ণেন্দুর কপাল হঠাৎ আরও খুলিয়া গেল। মহেন্দ্র বাবু হঠাৎ নিজে অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। এতকাল এমন পূর্ণ উদ্যমে খাটিয়াছেন যে, শরীর এখন বিশ্রামের জন্য বিদ্রোহ করিতে লাগিল। নিতান্ত বিপদ দেখিয়া ভদ্রলোক ছ-মাসের জন্য পাহাড়ে গিয়া থাকাই ঠিক করিলেন।

সকলেই আশা করিয়াছিল যে কোনো একজন প্রতিষ্ঠাবান চিকিৎসকের হাতে তিনি নিজের কাজের ভার দিয়া যাইবেন। তাহা না করিয়া যখন তিনি পূর্ণেন্দুকেই সব-কিছুর ভার লইতে অনুরোধ করিলেন, তখন বাড়ির লোক সুদ্ধ ভড়কাইয়া গেল।

গৃহিণী বলিলেন, "হ্যাঁ গা ও পারবে, ছেলেমানুষ?"

কর্ত্তা বলিলেন, "ভাল ডাক্তার হ'লেই হ'ল, বুড়োতে কি দরকার?"

যাইবার সময় পূর্ণেন্দুকে বলিলেন, "আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত মনেই যাচ্ছি, জানি তোমায় দিয়ে কাজের কোনো ক্ষতি বা গোলমাল হবে না। এক সেই পাগলা জমিদারের বাড়ির কেস্ এলে গোলযোগ বাধতে পারে।"

পূর্ণেন্দু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

মহেন্দ্র বাবু বলিলেন, "লোকটার একেবারে মাথা খারাপ। হিন্দু হ'লে হবে কি, অন্দর মহলের অবস্থা একেবারে নবাবী হারেমের মত। বাড়িতে মেয়েছেলের অসুখ হ'লে হাঙ্গামের আর অন্ত থাকে না।"

এ বিষয়ে আর কি জিজ্ঞাসা করা যায় পূর্ণেন্দু ভাবিয়া পাইল না, মহেন্দ্র চৌধুরীও বিদায় হইয়া গেলেন।

মাস-কয়েকের মত পূর্ণেন্দু ডাঃ চৌধুরীর বাড়িতেই আসিয়া আড্ডা গাড়িল। বড় ডাক্তার কখন যে তাহার 'কল' আসিবে তাহার ঠিকঠিকানা নাই। রাত তিনটায়ও কখনও কখনও গেটে ধাক্কা পড়ে।

প্রথম দিন-কতক ভালই এক রকম কাটিয়া গেল। ডাঃ চৌধুরীকে ডাকিতে আসিয়া বেশীর ভাগ লোক প্রথমতঃ পূর্ণেন্দুকে দেখিয়া ভড়কাইয়া যাইত, তবে আধাআধি অন্ততঃপক্ষে তাহাকে লইয়া যাইত। বাকি অর্দ্ধেক বৃদ্ধতর ডাক্তারের সন্ধানে প্রস্থান করিত।

সেদিন সকালে পূর্ণেন্দু সবে চা খাইয়া নীচে নামিয়াছে, এমন সময় ঝড়ের বেগে একটি মানুষ আসিয়া তাহার ঘরে

ঢুকিয়া পড়িল। অতিশয় ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "ডাঃ চৌধুরী কোথায় ? এখনও নামেন নি ?"

পূর্ণেন্দু বলিল, "তিনি ত এখানে নেই, চেঞ্জে গেছেন।"

যুবক এক রকম মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। হতাশ ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কবে ফিরবেন ?"

পূর্ণেন্দু বলিল, "ঢের দেরি আছে, মাস-পাচ অন্ততঃ।"

যুবক বলিল, "তা হ'লে উপায় ?"

মানুষটির রকম-সকম দেখিয়া পূর্ণেন্দু বেশ খানিকটা অবাক হইয়া গিয়াছিল, বলিল, "কি ব্যাপার না জানলে উপায়ের ব্যবস্থা কি ক'রে করব ? কোনো অসুখ-বিসুখ হয়ত আমি যেতে পারি, আমিই এখন তাঁর 'পেশেণ্টদের দেখছি।"

যুবকটি বলিল, "আপনাকে দিয়ে ত হবে না।"

পূর্ণেন্দু মনে মনে অত্যন্ত চটিলেও যথাসাধ্য ধীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কি কারণে ?"

যুবক কি যেন বলিতে গিয়া থামিয়া গেল। তাহার পর বলিল, "আমরা অল্প দিন হ'ল কলকাতায় এসেছি, বিশেষ জানাশোনা নেই এদিকে। বুড়োগোছের ডাক্তার কাছাকাছি কেউ আছেন বলতে পারেন ?"

সমর দিন-কয়েক এই বাড়িতে আসিয়া জুটিয়াছিল, পূর্ণেন্দুর উপর নজর রাখিবার উদ্দেশ্যেই। মুখে অবশ্য বলিত, "মানুষটা একেবারে একলা থাকবে, তাই একটু সঙ্গদান করছি।" সে এতক্ষণ ঘরের কোণে বসিয়া সিনেমা ম্যাগাজিনের ছবি দেখিতেছিল, হঠাৎ বলিয়া বসিল, "ওঁকে যত তরুণ ভাবছেন, তা উনি নয়, বড় ডাক্তার কি-না, তাই যৌবন প্রিজার্ভ ক'রে রাখতে পেরেছেন। কলকাতায় এ রকম আরও দু-চার জন বড় ডাক্তার আছেন, যাঁদের সত্তর বছর বয়সে লোকে চল্লিশ বছর ব'লে ভুল করে।"

যুবক বিস্মিত হইয়া বলিল, "তাই নাকি ? হ্যাঁ, এ রকম কথা শুনেছি বটে দু-এক জায়গায়। তা মাপ করবেন, আর একটা কথা জিগ্‌গেষ করি। আপনার বিবাহ হয়েছে ? হতবুদ্ধি পূর্ণেন্দু কিছু বলিবার আগেই সমর বলিল, "বিলক্ষণ, তা আবার হয়নি ? ঘরে ওঁর স্ত্রী এবং চারটি সন্তান বর্ত্তমান। মশায় কি ঘটকের ব্যবসা করেন ? তা আমার দিকে একবার তাকালে পারেন। আমার বয়স সত্যিই কম, বিবাহও হয়নি। ডাক্তারী পাস ক'রে বছর দুই ভাগ্যগুণে বেকার বসে আছি।"

তাহার কথায় কান না দিয়া লোকটি পূর্ণেন্দুর দিকে চাহিয়া বলিল, "অনুগ্রহ ক'রে তাহ'লে চলুন।"

পূর্ণেন্দু নিজের ব্যাগ ইত্যাদি গুছাইয়া লইয়া উঠিয়া পড়িল। লোকটি পাগল কি-না তাহাই সে ভাবিতেছিল, ডাক্তার ডাকিতে আসিয়া এ-সব খোঁজখবর লইতে সে ইতিপূর্ব্বে কখনও কাহাকেও দেখে নাই। লোকটি সম্পন্ন বলিয়াই বোধ হইল, বেশ দামী মোটরকার চড়িয়া আসিয়াছে।

রোগীর বাড়ি নিতান্ত কাছে নয় দেখা গেল। গাড়ী চলিয়াছে ত চলিয়াইছে। অবশেষে থামিল গিয়া ভবানীপুরে। মস্ত বাড়ি, আজকালকার মাগ্যি-গণ্ডার দিনে এত বড় বাড়ি একলা যে ব্যক্তি ভাড়া লইয়াছে, তাহার পয়সার অভাব অবশ্যই নাই।

যুবকের পিছন পিছন নামিয়া পূর্ণেন্দু অনেকগুলি ঘর অতিক্রম করিয়া চলিল। পিছনে একটা চাকর তাহার ব্যাগ লইয়া আসিতে লাগিল। একতলাটা পুরুষেরই রাজ্য দেখা গেল। বৈঠকখানা, লাইব্রেরী, অফিস এবং চাকরের ঘর। সিঁড়ি বহিয়া দোতলায় উঠিল, সেখানেও তাহার পথপ্রদর্শক না দাঁড়াইয়া তিনতলায় উঠিতে লাগিল। দোতলাটি মানুষে ভর্ত্তি, ঝি-চাকর গিজ গিজ করিতেছে, ছেলেপিলে ত পায়ে পায়ে বাধিয়া যাইতেছে। তবে পরিবারের কোনো মহিলার দর্শনলাভ পূর্ণেন্দুর ভাগ্যে জুটিল না।

তাহারা থামিল গিয়া তিনতলায়। বড় একটা ঘরের দরজার সামনে দাঁড়াইয়া, বিলাতী ছিটের মোটা পরদাটা তুলিয়া ধরিয়া যুবক বলিল, "আসুন।"

পূর্ণেন্দু প্রবেশ করিতে যাইবামাত্রই ঘর হইতে কয়েক জন মানুষ যে হুড়মুড় করিয়া পলায়ন করিল, তাহা সে বেশ বুঝিতে পারিল। বিংশ শতাব্দীর কলিকাতায় এত পরদার আধিক্য সে কোথাও দেখে নাই। ইহারা অতিরিক্ত প্রাচীন-পন্থী দেখা যাইতেছে।

ঘরের ভিতরটা বেশ দামী আসবাবে সাজান, মেঝেতে গালিচা পাতা। তবে আধুনিকতা সত্যই নাই, কারণ একদিকে যেমন আবলুশ কাঠের ছড়াছড়ি, অন্যদিকে পালঙ্কের তলায় গাদা-করা পিতল কাঁসার বাসন, এবং কোণে মাটির কলসীরও অভাব নাই। পালঙ্কের উপর পুরু বিছানা পাতা, তাহার উপর আবার একটি শীতলপাটি বিছান। একটি

প্রৌঢ়া মহিলা চোখ বুজিয়া শুইয়া আছেন। মাথার কাছে দাঁড়াইয়া একজন ঝি বাতাস করিতেছে, তাহারও মুখে ঘোমটা টানা। বৈদ্যুতিক পাখা থাকা সত্ত্বেও এ ভাবে বাতাস কেন করা হইতেছে তাহা পূর্ণেন্দু ঠিক বুঝিতে পারিল না।

যুবক চাকরের হাত হইতে ব্যাগ লইয়া একটা টিপয়ের উপর নামাইয়া রাখিল। পূর্ণেন্দুকে বলিল, "এঁরই অসুখ। সকালে হঠাৎ বললেন, বুকে ব্যথা, ব'লেই অজ্ঞান হয়ে গেলেন। কিছুতে জ্ঞান হয় না দেখে আমরা ব্যস্ত হয়ে ডাক্তারের খোঁজে গেলাম।"

পূর্ণেন্দু চেয়ার টানিয়া শয্যাপার্শ্বে বসিয়া রোগিণীকে পরীক্ষা করিতে লাগিল। বলিল, "এখন ত জ্ঞান হয়েছে দেখছি। কতক্ষণ আন্দাজ অজ্ঞান ছিলেন?"

যুবক অপ্রস্তুত ভাবে বলিল, "তা ত জানিনে, আমি তখনই বেরিয়ে গেলাম কি না?"

পূর্ণেন্দু আবার জিজ্ঞাসা করিল, "এর আগে কখনও এরকম হয়েছে, না, এই প্রথম?"

যুবক মাথা চুলকাইতে লাগিল, বলিল, "আমি এঁর বিষয় কিছুই বিশেষ জানিনে। উনি এত দিন বিদেশে ছিলেন, মাত্র দিন-দশ হ'ল এখানে এসেছেন।"

পূর্ণেন্দু একটু বিরক্ত ভাবে বলিল, "এঁর অবস্থা এখনও আশঙ্কাজনক, হার্ট অত্যন্ত দুর্ব্বল, এঁকে দিয়ে ত বকবক করান যায় না। এমন কাউকে ডাকুন যিনি এঁর বিষয় সব খবর দিতে পারবেন।"

যুবক পাশের ঘরের দরজার কাছে গিয়া ডাকিল, "ঝুনু, ও ঝুনু।"

ঝুম ঝুম করিয়া নূপুরের শব্দ হইল, এবং পূর্ণেন্দুর বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখে যেন উপকথার রাজকন্যা আসিয়া দাঁড়াইল। এত সুন্দর মেয়ে আগে সে কোথাও কখনও দেখে নাই এমন নয়. কিন্তু বাড়িটাই একে রহস্যময়, লোকগুলি পাগলাটে গোছের, মেয়েটির বেশভূষা বিচিত্র, পূর্ণেন্দুর বয়স অল্প, সব মিলিয়া কেমন যেন একটা গোলমাল হইয়া গেল।

মেয়েটির বয়স ষোলো-সতেরো হইবে। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ রং, মুখশ্রী নিখুঁৎ, মুখেচোখে বুদ্ধির দীপ্তি ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। পরণে বহুপুরাতন ধাঁচের লালকালো মিশান বালুচরী শাড়ী, গায়ে লাল চেলি জাতীয় কাপড়ের কাঁচুলি, পায়ে নূপুর, গলায় সাতনরী হার, হাতে পুরাতন ফ্যাশানের কঙ্কন। কোন্ জিনিষটি কি এবং কোন কালের, তাহা পূর্ণেন্দু অত বুঝিল না, খালি বুঝিল ঠিক এই ধরণের সাজসজ্জা করিতে আধুনিক কোনো মেয়েকে সে দেখে নাই। কি সুন্দর!

যুবক মেয়েটির কানের কাছে মুখ লইয়া ফিশফিশ করিয়া বলিল, "তুই ঘরে নাই এলি, পরদার ও-পার থেকে যা বলবার বল, আমি ডাক্তারকে ব'লে দিচ্ছি।"

মেয়েটি বলিল, "তোমরা সবাই পাগলাগারদে গেলে ঠিক হয়। অসুখবিসুখের সময়ও তোমাদের ঢং ঘোচে না।"

রাগের মাথায় মেয়েটি কথাগুলা একটু জোর গলায়ই বলিয়া ফেলিয়াছিল, কারণ পূর্ণেন্দু সবই শুনিতে পাইল। মুখের ভাব অবশ্য তাহার এক রকমই রহিল।

খাটের কাছে আসিয়া মেয়েটি বলিল, "উনি আমার মা, আপনি কি জানতে চান বলুন, আমি বলছি।"

যুবক তাড়াতাড়ি গিয়া ঘর হইতে বাহিরে যাইবার দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল।

পূর্ণেন্দুর যাহা কিছু জানিবার প্রয়োজন ছিল, তাহা সে একে একে জিজ্ঞাসা করিয়া গেল। মেয়েটি সব কথারই ভালভাবে উত্তর দিল, তাহার পর ডাক্তারের আর কিছু জানিবার প্রয়োজন নাই দেখিয়া, নূপুর বাজাইয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

নূপুরের শিঞ্জনটা কিন্তু আমাদের যুবক ডাক্তারের হৃদয়ে অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রতিধ্বনি জাগাইয়া ফিরিল। সে ঔষধ লিখিতে এবং রোগিণীর শুশ্রূষার ব্যবস্থা দিতে যথাসম্ভব দেরিই করিল, কিন্তু আর নূপুরের শব্দ শোনা গেল না।

অতঃপর উঠিয়া পড়িয়া সে যুবকের পিছন পিছন নামিয়া চলিল। একতলায় আসিয়া পড়িয়াছে, তখন দেখিল একটা বৈঠকখানা-গোছের ঘরের খোলা দরজার পথে একটি স্থূলাকায় প্রৌঢ় ব্যক্তি তাহার দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। গাড়ীতে উঠিতে উঠিতেই পূর্ণেন্দু গর্জ্জন শুনিতে পাইল, "হ্যাঁরে নবু, তোকে না মহেন্দ্র ডাক্তারকে ডাকতে পাঠিয়েছিলাম?"

যুবক দৌড়িয়া কি একটা কৈফিয়ৎ দিতে গেল। পূর্ণেন্দু দিন-দুপুরে স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে বাড়ি ফিরিয়া আসিল।

সমর তখনও নীচের ঘরে বসিয়া আছে। পূর্ণেন্দুকে

দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হে, আরব্য উপন্যাসের রাজ্যে ঘুরে এলে ?"

পূর্ণেন্দু বলিল, "ঠিক সে-রকম ত বোধ হ'ল না, তবে সবাই খানিকটা অদ্ভুত গোছের। এঁর কথাই তোমার মামা বলেছিলেন না কি ?"

সমর বলিল, "হ্যাঁ, বুড়ো রামনিধি দত্তের মাথা খারাপ, ভাবে নিজের জমিদারীতে যেমন যা খুশী করতে পায়, এখানেও তাই চল্‌বে। মেয়েদের ত ঘরে সিলমোহর ক'রে রাখার ব্যবস্থা। তারা স্কুলে পড়বে না, বাইরে বেরবে না, কোথাও যেতে আসতে হ'লে ঘেরাটোপ দিয়ে যাবে। অন্দরমহলে কোন নূতন চাকরের ঢোকা নিষেধ। নিতান্ত যে-সব কাজ ঝিয়ের দ্বারা চলে না তা করবার জন্যে গোটা-দুই বুড়ো চাকর আছে, দেশের। মামাকে সারা কলকাতা খুঁজে তারা বার করেছিল জমিদার-গিন্নীর অসুখের জন্যে। ভাল ডাক্তার ব'লে নয়, বুড়ো, বেরসিক এবং বদ্‌ দেখতে ব'লে কোনো অন্তঃপুরিকা হঠাৎ তাঁর সঙ্গে প্রেমে প'ড়ে যাবে এমন সম্ভাবনা নেই।"

পূর্ণেন্দু বলিল, "তা হ'লে আমাকেও ত পছন্দ হওয়া উচিত, বুড়ো বাদে আর সব কটা গুণ আমারও আছে।"

সমর বলিল, "কিন্তু বুড়ত্বটাই, হ'ল আসল। যৌবন থাকলে কোথায় কোন্‌ সূত্রে কি বিপদ ঘটবে তা বলা যায় না।"

পূর্ণেন্দু বলিল, "ঠিক কথা।"

রাত্রের খাওয়াটা মায়ের ওখানেই খাইতে হয়, না হইলে বিধবা মা কাঁদিয়া-কাটিয়া অনর্থ করেন। সংসারে তাঁহার আপন বলিতে ঐ একটি ছেলে, মেয়েটি বহুদিন হইল বিবাহ হইয়া পরের ঘরে চলিয়া গিয়াছে।

পূর্ণেন্দু নীরবে বসিয়া খাইতেছে, মা কাছে বসিয়া অনর্গল কথা বলিয়া চলিয়াছেন। পূর্ণেন্দু কোনো কথার উত্তরে বলিতেছে,. "হুঁ" কোনোটার উত্তরে বলিতেছে, "না"।

খানিক বাদে মা বলিলেন, "হ্যাঁ রে, তোকে অমন মনমরা দেখাচ্ছে কেন ? অসুখ-বিসুখ হ'ল নাকি ?"

পূর্ণেন্দু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "না, অসুখ করবে কেন ? ডাক্তারের কখনও অসুখ করে ?"

মা বলিলেন, "না তা আর কি কখনও করে ? ডাক্তারেরা একেবারে রোগশোকের অতীত। হ্যাঁ রে কথায় ত কান দিস্‌ না মোটে। বে-থা করবি-না ? বুড়ী মরলে ত একেবারে নিরঙ্কুশ, কোনো জ্বালাই থাকবে না।"

পূর্ণেন্দু বলিল, "নিরঙ্কুশ থাকাই ত ভাল। কাজ করবার বেশী সময় পাব।"

মা চটিয়া বলিলেন, "কাজ কার জন্যে রে ? ঘর-সংসার পরিবারই যদি না রইল, তাহ'লে কার জন্যে খেটে মরবি ? আজও সকালে ব্রজ ঘটক এসেছিল, সেই গোয়াবাগানের মেয়েটির কথা বল্‌লে। তারা ভারি ঝোলাঝুলি করছে। নগদে গহনায় আট-দশ হাজার না-কি দেবে। একদিন মেয়েটি দেখলে হয় না ?"

এ ধরণের কথা পূর্ণেন্দু পাস করিয়া বাহির হইয়া অবধি চলিতেছে। পূর্ণেন্দু খালি হাসিয়া উড়াইয়া দেয়, বলে, "দেখনা আর দিনকতক যাক্‌, তখন নিজেই মাসে আট দশহাজার আনব।" আজ বলিল, "ব্রজটা ত জ্বালিয়ে তুল্‌লে দেখছি। দিও ত একবার আমার কাছে পাঠিয়ে, সিধে ক'রে দেব।"

মা বলিলেন, "তা আর করবে না। কত গুণের ছেলে তুমি। ব্রজর দোষ কি ? তাদের ব্যবসাই ঐ, তারা বলবে না ?" বলিয়া উঠিয়া চলিয়া গেলেন। পূর্ণেন্দুও খাওয়া সারিয়া প্রস্থান করিল।

পরদিনও ভবানীপুরে যাইতে হইল, টেলিফোনে ডাক আসিল। সমরটা কপালক্রমে বাহির হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং নিজের সনাতন বেশভূষা ছাড়িয়া, পূর্ণেন্দু যে ধুতি-চাদর পরিয়া বাবু সাজিয়া বাহির হইয়া গেল, তাহা লক্ষ্য কেহই করিল না। উপকথার রাজকন্যার সামনে কখনও অমন উৎকট ফিরিঙ্গী পোষাক করিয়া যাওয়া যায় ? সে ভাবিবে কি ? মহেন্দ্রবাবু উপস্থিত থাকিলে প্রিয় শিষ্যের শোচনীয় অধঃপতন দেখিয়া মর্ম্মাহত হইয়া যাইতেন।

আজ কিন্তু রোগিণী ভিন্ন দ্বিতীয় কোনো নারীর সঙ্গে ডাক্তারের সাক্ষাৎ হইল না। হৃদরোগের চিকিৎসা করিতে গিয়া নিজেই যে একটা হৃদরোগ বাধাইয়া বসিল, তাহাতে পূর্ণেন্দু নিজের উপর অত্যন্তই চটিয়া গেল। কিন্তু মেয়েটি যে বড় চমৎকার ! যুবকের কথায় কেমন ঝঙ্কার দিয়া উঠিয়াছিল, উহাতেই তাহাকে কেমন মানাইয়াছিল ! নিজে ভালমানুষ বলিয়াই বোধ হয় পূর্ণেন্দুর খরখরে মেয়ে অত্যন্ত ভাল লাগিত।

সারাটা দিন অপ্রসন্ন চিত্তে কাজে ঘুরিয়া সন্ধ্যার সময় পূর্ণেন্দু মায়ের কাছে খাইতে চলিয়া গেল। মা রান্নাঘরে তাহার খাবার ঠিক করিতেছেন, সে হাতমুখ ধুইয়া একটু বিশ্রামের চেষ্টায় মায়ের খাটে লম্বা হইয়া শুইয়া আছে। এমন সময় বিনা বাক্যব্যয়ে ব্রজনাথ ঘটক আসিয়া ঘরে ঢুকিয়া পড়িল।

পূর্ণেন্দু বলিল, "কি খবর? খুব যে আমার পেছনে লেগেছ দেখছি।"

তাহাকে বসিতে বলা হয় নাই, তবু একটা চৌকী টানিয়া বসিয়া, ব্রজনাথ বিরলদন্তমুখে হাসি টানিয়া আনিয়া বলিল, "আপনাদের মত কৃতী, বিদ্বান পাত্রদের কৃপায়ই আমাদের দু-মুঠো জোটে। আপনারা মুখ ফেরালে আমরা যে মারা যাই?"

পূর্ণেন্দু খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'তা বেশ, একটু পরীক্ষা ক'রে দেখা যাক্ তোমার কৃতিত্ব কত। ভবানীপুরে—নং রোডের বাড়ি চেন?"

ঘটক বলিল, "ও আর চেনাচিনি কি? লিখে নিচ্ছি. খুঁজে নিলেই হবে।"

পূর্ণেন্দু বলিল, "আচ্ছা, বাড়ির কর্ত্তার নাম শ্রীরামনিধি দত্ত, কোথাকার যেন জমিদার। তাঁর বাড়ির একটি মেয়ের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ করতে হবে।"

ঘটক নোটবুক বাহির করিয়া পেন্সিল দিয়া নাম ঠিকানা লিখিতে লিখিতে জিজ্ঞাসা করিল, "মেয়ে কার? তাঁরই না কি?"

পূর্ণেন্দু বলিল, "না, তাঁর নয়, কার তা জানি নে। সম্ভবতঃ তার বাবা বেঁচে নেই।"

ঘটক জিজ্ঞাসা করিল, "মেয়ের নাম কি?"

পূর্ণেন্দু বলিল, "জানি নে।"

ঘটক বলিল, "তা হ'লে মশায় আমি সম্বন্ধ করব কি ক'রে? জমিদারের বাড়ি অমন দশ-বিশটি বিবাহযোগ্যা মেয়ে থাকতে পারে। তার ভিতর যে-কোনও একটি হ'লেই ত আপনার চলবে না?"

পূর্ণেন্দু অনাবশ্যক ঝাঁজের সহিত বলিল, "নিশ্চয়ই না। মেয়ের ডাক নাম ঝুনু, দেখতে খুবই ভাল, বছর ষোলো-সতেরো বয়স। বাকিটা যদি তুমি নিজে না খুঁজে নিতে পার, ত তুমি কিসের ঘটক?"

ব্রজনাথ উঠিয়া পড়িয়া বলিল, "দেখি চেষ্টা ক'রে। পরশু এই সময় আমি আসব," বলিয়া চলিয়া গেল।

মাঝের দিনটা পূর্ণেন্দুর মোটেই ভাল কাটিল না। সচরাচর রোগী চট্‌পট সারিয়া উঠিলেই সে খুশী হয়, এবার কিন্তু ভবানীপুরের রোগিণীর প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠিল। এত তাড়াতাড়ি ভাল হইবার দরকার কি ছিল? টাকার ত অভাব নাই, না-হয় আর এক দিন ডাক্তার ডাকিতই? আর একদিন যাইতে পারিলে, রোগিণীর কন্যাকে কি ছুতায় ঘরে ডাকিয়া আনা যায়, তাহাও পূর্ণেন্দু মনে মনে রিহার্সাল দিয়া রাখিয়াছিল।

ব্রজনাথ ঠিক সময় মতই আসিয়া উপস্থিত হইল, পূর্ণেন্দুকে নিরাশ করিল না। মাকে কোনোগতিকে রান্নাঘরে চালান করিয়া দিয়া পূর্ণেন্দু জিজ্ঞাসা করিল, "কি, খোঁজ পেলে?"

ব্রজনাথ বলিল, "খোঁজ পাব না কেন? খোঁজ পাওয়াই ত আমাদের ব্যবসা? কিন্তু মেয়ের নাম এবং বাপের নাম না জানাতে একটু গোলে পড়েছি। জমিদারের নিজের একটি মেয়ে বিবাহযোগ্যা, তারা তার বিয়েই আগে দিতে চায়।"

পূর্ণেন্দু অসহিষ্ণু হইয়া বলিল, "কি উৎপাত! দিতে চায়, দিক গিয়ে না? আমি কি বারণ করছি? আমি যে-মেয়েটির খোঁজ করতে বললাম, তার কি হ'ল?"

ব্রজনাথ বলিল, "মশায়, সেদিকেও বিভ্রাট! ঝুনু ব'লে দুটি মেয়ে আছে, দুইটিই বিবাহযোগ্যা, একটি জমিদারের শ্যালিকার মেয়ে, আর একটি তার মৃত ভ্রাতার। এখন কোন্‌টিকে আপনি পছন্দ করেছেন, কি ক'রে বোঝা যাবে?"

পূর্ণেন্দু নীরবে ভাবিতে লাগিল। তাহার পর বলিল, "আচ্ছা, যে-কোনো একজনের সঙ্গে সম্বন্ধ কর, তারপর মেয়ে দেখার সময় বোঝাপড়া করা যাবে।"

নিজের উপযুক্ততা সম্বন্ধে পূর্ণেন্দুর মনে অকারণ কোনো বিনয় ছিল না। তাহার মত ছেলে হাতে পাইলে কেহ যে সহজে ছাড়িবে না, চারিটি বিবাহযোগ্যার একটি-না-একটিকে তাহার গলায় ঝুলাইয়া দিতে চাহিবেই তাহা সে নিশ্চিত জানিত।

মা ছেলের জন্য ঘন দুধ লইয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, "খুব যে ঘটকের সঙ্গে ভিটির্ ভিটির্ গল্প হচ্ছে? মা বুড়ী বললেই যত খারাপ লাগে।"

পূর্ণেন্দু বলিল, "যাতে ঘটক আমার পিছনে আর না লাগে, তারই ব্যবস্থা করছি।"

মা অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "আহা!"

পূর্ণেন্দুর যতই তাড়া থাক, ব্রজনাথেরও তাহার চেয়ে কম কিছু ছিল না। জমিদার-বাড়ির মেয়ে, ঘটক-বিদায়টা ভালই পাইত, পূর্ণেন্দুও তাহাকে খুশী করিয়া দিত। আজকালকার মন্দা বাজারে এমন কেস ক'টাই বা হাতে পাওয়া যায়? পাত্রপাত্রীর দল সেয়ানা ও বেহায়া হইয়া এমনিতেই বলে ঘটকদের জাতব্যবসা মারিতে চলিয়াছে।

পরদিন দুপুরেই সে পূর্ণেন্দুর 'রুমে' গিয়া হাজির হইল। পূর্ণেন্দু তখন একটু বৃদ্ধ হাঁপানী রোগীকে লইয়া মহাব্যস্ত। একটা চেয়ার দেখাইয়া দিয়া ব্রজনাথকে বলিল, "বোসো।"

অনেক কষ্টে হাঁপানীর রোগী ত বিদায় হইল। তখন দরজাটা একটু ভেজাইয়া দিয়া পূর্ণেন্দু জিজ্ঞাসা করিল, "কিছু খবর আছে?"

ব্রজনাথ বলিল, "মশায়, ওরা অতি গোঁড়া পরিবার। বলে, মেয়ে দেখাতে আপত্তি নেই, তবে পুরুষ মানুষের সামনে বার করব না।"

পূর্ণেন্দু চটিয়া বলিল, "পুরুষ মানুষের সঙ্গে বিয়ে দিতে হ'লে তার সামনে বার করতেই হবে।"

ব্রজনাথ বলিল, "তা ত অবশ্যই। কিন্তু মেয়ে-দেখানোর জন্যে তাঁরা না-কি কখনও পুরুষের সামনে বার করেন না। আপনার মাতাঠাকুরাণী গিয়ে দেখলে তাঁরা সানন্দে রাজী আছেন।"

তাঁহারা যতই সানন্দে রাজী হন, পূর্ণেন্দুর একটুও আনন্দ হইল না। তাহার মা কি করিয়া চিনিবেন? সুন্দরী কন্যা ত তাহার চাই না, চাই ঝুনুকে।

তখনই তখনই কিছু ভাবিয়া না পাইয়া সে ঘটককে বলিল, "আচ্ছা যাও, ভেবে দেখি এখন। সন্ধ্যায় ও-বাড়ি একবার যেও।" ব্রজনাথ চলিয়া গেল।

ব্রজনাথ সন্ধ্যায় আসিল বটে, কিন্তু ভাল খবর কিছু লইয়া আসিল না। মহিলাদের মেয়ে-দেখানোর মত কিছু বদলায় নি। পূর্ণেন্দু রীতিমত ভাবনায় পড়িয়া গেল। শেষে মায়েরই শরণ লইতে হইবে না-কি? কিন্তু তাঁহাকে এ সব রোম্যাণ্টিক কাহিনী বলিতেই যে লজ্জা করে? ছেলে ডাক্তারী করিতে গিয়া প্রেমে পড়িয়া গিয়াছে, এ-কথা কি মায়ের সামনে বলা চলে? সুবিধামত একটা বৌদিদি বা বোনও নাই যে একটু কাজ উদ্ধার করিয়া দিবে।

মাকেই অবশেষে বাধ্য হইয়া বলিতে হইল। তিনি ত আকাশ হইতে পড়িলেন, বলিলেন, "হ্যাঁ রে পেটে পেটে তোর এত? আমি বলি ছেলে আমাদের একেবারে ভোলানাথ, কোনোদিকে মন নেই। আমি বাপু জমিদার-বাড়িটাড়ি যেতে পারব না। গরিব ব'লে আমাদের কি মান-সম্ভ্রম নেই? মেয়ের বাপের এত জাঁক কেন, হ'লই বা জমিদার?"

পূর্ণেন্দু অপ্রস্তুতও হইল, চটিয়াও গেল। বলিল, "বেশ না যাও না-যাবে, কিন্তু এর পর জন্মে আর আমার কাছে বিয়ের নাম উচ্চারণ করবে না।" মা কিছু বলিবার আগেই সে হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেল।

বৌদিদি বা বোন নিতান্তই যখন নাই, তখন কোনো বন্ধুপত্নীকে দিয়া কাজ উদ্ধার করা যায় কি-না তাহাই সে ভাবিতে বসিল। নিজে মহিলা সাজিয়া যাইতে পারিলে সবচেয়ে ভাল হইত, কিন্তু ও-সব কি আর বাস্তব জীবনে ঘটিয়া ওঠে? নাটক-নভেলেই চলে। দুনিয়াটা অতি "রটন্" জায়গা।

সকালবেলা পূর্ণেন্দুর মেজাজ অত্যন্ত খারাপ দেখা গেল। গুটিতিনেক পুরাতন রুগী আসিয়াছিল, তাহাদের ত খ্যাকাইয়া খ্যাকাইয়া অস্থির করিয়া তুলিল। সমর প্রায়ই কন্সাল্টেশন রুমে বসিয়া থাকিত, সে পূর্ণেন্দুর রকম দেখিয়া বলিল, "কি হে, বিক্রমাদিত্যের চেয়ারে বসেছ ব'লে মেজাজও সেই রকম হয়ে গেল না-কি?"

হঠাৎ টেলিফোনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, টিং টিং টিং। পূর্ণেন্দু ব্যস্তভাবে টেলিফোন ধরিয়া বলিল, "হ্যালো?"

যাক, বাঁচা গেছে। আবার ভবানীপুর হইতে 'কল' আসিয়াছে। সেই "হার্ট ডিজিজে'র রোগিণী। পূর্ণেন্দু এক রকম একলাফেই বাহির হইয়া চলিয়া গেল। সমর হাঁ করিয়া তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল।

বেলা ন'টা-দশটার সময়, বাড়িটা একটু খালি-খালি বোধ হইল। বৈঠকখানাগুলিতে বিশেষ কেহ নাই, এমন কি

জমিদারবাবুও না। যুবক এবং বালকের দল, স্কুল-কলেজের পথে বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

একটি বুড়োগোছের চাকর তাহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল। পরিচিত ঘরে তাহাকে ঢুকাইয়া দিয়া সে ব্যক্তি বিদায় হইয়া গেল, একটা ঝি আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করিল।

রোগিণীকে আজ বিশেষ অসুস্থ বলিয়া বোধ হইল না। খাটে শুইয়াই ছিলেন, পূর্ণেন্দু ঘরে ঢুকিবামাত্র মাথায় কাপড় দিয়া উঠিয়া বসিলেন। পূর্ণেন্দু ব্যস্ত হইয়া বলিল, "আপনি উঠবেন না, উঠবেন না!"

প্রৌঢ়া সস্নেহ হাসি হাসিয়া বলিলেন, "আমার শরীর ভালই আছে বাবা। আমার মেয়েটাকে দেখবার জন্যে তোমাকে ডেকেছি," বলিয়া হতবুদ্ধি পূর্ণেন্দুর মুখের দিকে চাহিয়া ঈষৎ মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "তার শরীরটা বিশেষ ভাল যাচ্ছে না।"

পূর্ণেন্দু ঢোঁক গিলিয়া বলিল, "তাঁর কি হয়েছে?"

বিধবা বলিলেন, "এই যে তাকে ডাকছি। যা ত রাধি, ঝুনুকে ডেকে আন্।"

ঝি পাশের ঘরে চলিয়া গেল। ঝুম্ ঝুম্ করিয়া শব্দ হইল, পরদা নড়িয়া উঠিল, এবং পূর্ণেন্দুর চোখের সম্মুখে আবার উপকথার রাজকন্যা আসিয়া দাঁড়াইল। আজ সে সত্যই রাজকন্যা সাজিয়া আসিয়াছে।

কিছুক্ষণ একদৃষ্টে নতুন রোগিণীর দিকে চাহিয়া থাকিয়া পূর্ণেন্দু মাথাটা নীচু করিয়া বলিল, "বিশেষ কিছু হয়েছে ব'লে মনে হচ্ছে না। একটা 'টনিক' লিখে দিয়ে যাচ্ছি, তাতেই ঠিক হয়ে যাবে।"

কাগজের প্যাড এবং ফাউণ্টেন পেন বাহির করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ওঁর নাম কি?"

মেয়ের মা বলিলেন, "শ্রীমতী মৃণালিনী দত্ত।" প্রেস্‌ক্রিপশন্ লিখিয়া দিয়া ডাক্তার চলিয়া গেল।

ঝুনুর মা হাসিয়া খাট ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলেন, নিজের মনেই যেন বলিলেন, "বাঁচা গেল বাবা। বড়ঠাকুরের আজগুবি সব মত, এমন সম্বন্ধটা আর একটু হলেই হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছিল। ডাক্তার শুনেই আমি বুঝেছি।"

ইহার পর ব্রজনাথের কাজ সহজেই চুকিয়া গেল। বিদায়ও দুই পক্ষ হইতে সে ভালরকমই পাইল।

ফুলশয্যার রাত্রে ঝুনু পূর্ণেন্দুর সাধ্যসাধনায় বেশীক্ষণ নীরব থাকিতে পারিল না। কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি না বলেছিলেন, আপনার বাড়িতে স্ত্রী আর চার ছেলে বর্ত্তমান?"

পূর্ণেন্দু বলিল, "আমি বলিনি, বলেছিল আমার এক বন্ধু।"

ঝুনু জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

পূর্ণেন্দু বলিল, "মিথ্যা কথা বলা তার স্বভাব। সে বেচারা স্বপ্নেও ভাবেনি যে আমার এত বড় একটা উপকার করছে।"

১৯

মাথাটা তখনও অবধি কেমন ভার হইয়া আছে, কোনও ভাবনাই ভাল করিয়া গুছাইয়া ভাবিবার ক্ষমতা নাই, তবু অজয়ের মনে হইতে লাগিল, হয়ত আজ আবার নন্দকে উপলক্ষ্য করিয়া নিজেকে নিজে আঘাত করিয়া বেদনা পাইবার এই সুযোগকে সে সৃষ্টি করিয়াছে। কে এই মহাশক্র একেবারে তাহার অস্তিত্বের মূলে আসন পাতিয়া বসিয়া এমন করিয়া তাহার তুচ্ছতম সুখেও বাদ সাধিতেছে। কতবার ভাবিয়াছে, নিজের মধ্যে দ্বিধা-বিভক্ত হইয়া ইহার সঙ্গে সে যুদ্ধ সুরু করিবে, কতবার যুদ্ধ করিয়াছেও, কিন্তু কোন্‌টি যে তাহার আসল 'আমি' বেশীক্ষণ তাহা ঠিক রাখিতে পারে নাই বলিয়া জয়-পরাজয়ে কোনও আগ্রহ শেষ অবধি তাহার অবশিষ্ট থাকে নাই। এমনই ভাবে চিরকাল চলিয়াছে। এমনই ভাবে চিরকাল চলিবেও। নিজেকে লইয়া এই সংশয়, নিজের সঙ্গে নিজের পক্ষপাতহীন এই সংগ্রাম কোনওদিন তাহার শেষ হইবার নহে।

বহুক্ষণ পথের উপরই অধোমুখে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর নীরবে অধোমুখেই ঘরে গিয়া একটা বই খুলিয়া বসিল। নন্দও পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘরে আসিল, কিন্তু সাহস করিয়া কোনও কথা কহিতে পারিল না। বাহিরে বসন্তের একটি অনির্ব্বচনীয় প্রভাতের অসীমতা ভরা আয়োজন ম্রিয়মাণ পুষ্প-পল্লবের মত ব্যর্থতায় ঝরিয়া যাইতে লাগিল।

হঠাৎ এক-সময় বই ছুঁড়িয়া ফেলিয়া অজয় কহিল, "বেশ ত আমরা দুজনেই? বেরুব ঠিক ক'রে তারপর দিব্যি চুপচাপ ব'সে আছি। এসো, বেরিয়ে পড়া যাক।"

নন্দ কহিল, "আমার আজ একটুও বেড়াতে ইচ্ছে হচ্ছে না।· আজকের দিনটা থাক্ না অজয়-দা। শরীরটাও তত ভাল নেই, শুয়ে থাক্‌তেই মন চাইছে।"

অজয় জেদ ধরিয়া কহিল, "তা কি হয়? আজ তোমার সঙ্গে আগে থাক্‌তে আমার কথা হয়ে আছে, তুমি এখন 'না' বল্‌লে চলে কখনো?"

নিজের ধরণে নন্দেরও জেদ কম নহে। আম্‌তা আম্‌তা করিয়া হাসিয়া কহিল, "আমি ত ঘরের মানুষ, আমার সঙ্গে আবার এত কথার আঁটাআঁটি কি? উনি এসেছিলেন, রোজ ত ওঁর সঙ্গে আপনার দেখা হয় না?...তাছাড়া কাল সুভদ্রদার সঙ্গে দেখা হতে তিনি বল্‌ছিলেন, আজ বরা'নগরে তাঁদের পার্টি না কি একটা আছে—"

অজয়ের হঠাৎ কি হইল, প্রায় গর্জ্জিয়া উঠিয়া কহিল, "তা বেশ, যেও না। সেকথা আমাকে আগে বল্‌লেই ত হ'ত। আজ কি খাবে-দাবেও না ঠিক করেছ?"

নন্দ এমন ভাবে চঞ্চল হইয়া উঠিয়া পড়িল, যেন এত বেলাতেও যে তাহাদের খাওয়া হয় নাই সেজন্য সে একলাই কেবল দায়ী। বলিল, "আপনি স্নান সেরে আসুন, তারপর আমি যাচ্ছি।"

স্নানের পর দুইজনে, বাহির হইতে আহারাদি সারিয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, মুক্তি পাওয়ার পর নন্দ যথাস্থানে ফিরিয়াছে কি-না সংবাদ লইবার জন্যই সম্ভবতঃ পুলিশের একজন লোক অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে। সেখানে আর মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব না করিয়া অজয় ছাতে চলিয়া আসিল এবং কাঠফাটা রোদ মাথায় করিয়া বহুক্ষণ সেখানে পায়চারী করিয়া বেড়াইল। বিশেষ কিছুই যে ভাবিল তাহা নহে। বীণার বিষণ্ণ মুখ জীবনে এই প্রথম দেখিয়াছে, সেই স্মৃতি ঈশানের একখণ্ড কালো মেঘের মত ক্রমে তাহার চিত্তাকাশ আবৃত করিয়া ঘনাইয়া আসিতেছে। আর কোনও কথা ভাবিবার অবকাশ আর বিশেষ নাই।

বেলা যখন প্রায় পড়িয়া আসিয়াছে, তখন নীচে আসিয়া দেখিল, নন্দ ঘুমাইতেছে। তাহাকে আর জাগাইল না। আজ একাকী শেষ একবার নিজের সঙ্গে মুখোমুখী করিবার ইচ্ছায় রৌদ্রপ্লাবিত সহরের পথে বাহির হইয়া পড়িল।



রাজা রামমোহন রায়

ব্রিগ্‌স্‌ কর্তৃক অঙ্কিত চিত্র হইতে

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা।

কিন্তু পথে বাহির হইয়াই তাহার কি হইল, নিজের দিকে আর তাকাইতে ইচ্ছা করিল না। যেন সেখানেও নন্দ ঘুমাইতেছে, তাহার ঘুম সে ভাঙাইতে চাহে না। এবারে তাহার ভিতরের এবং বাহিরের আকাশ জুড়িয়া বীণার জলভারাচ্ছন্ন চোখের দৃষ্টি নিবিড় হইয়া আসিল।

বরানগরের বাগান অজয়ের অজানা ছিল না। শেষ পর্য্যন্ত সেইখানেই আসিয়া সে পৌঁছিল।

নীচে গেটের কাছে রমাপ্রসাদ দাঁড়াইয়া অতিথিদের স্বাগত-সম্ভাষণ করিতেছিল, অজয়কে দেখিয়া এত উৎসাহিত হইল, যে নিজের কর্ত্তব্য সুদ্ধ ভুলিয়া গেল। বাগানের পথে, দীঘির ধারে ধারে কাঁকর বিছানো সবটুকু পথ অতিক্রম করিয়া সে অজয়কে উপরের বসিবার ঘরে পৌঁছিয়া দিয়া গেল।

পুরু গালিচা বিছানো ঘর। চেয়ার, টেবিল, সোফা, প্রভৃতি আসবাবগুলিকে দেয়ালের গা ঘেঁসিয়া সরাইয়া রাখিয়া সকলে মেঝের উপর গোল হইয়া বসিয়াছে। চিরাচরিত প্রথা মত এক দিকে মেয়েরা ও অপর দিকে ছেলেরা বসিয়াছে, এ-দলের সঙ্গে ও-দলের কথার আদানপ্রদান চলিতেছে না। এক কোণে একটু স্থান করিয়া বসিয়া অজয় বিপুল আগ্রহে সেই জন-সমাবেশের মধ্যে তিনিটি পরিচিত প্রিয় মুখের সন্ধান করিতে লাগিল। কিন্তু বীণা, ঐন্দ্রিলা, সুভদ্র, এ তিনের কাহাকেও কোথাও সে দেখিতে পাইল না।

বসিয়া বসিয়া দেয়ালে বিলম্বিত বিলাতি তৈলচিত্রের নকল এবং বিগত শতাব্দীর ধরণের বেলোয়ারী ঝাড় লণ্ঠন দেখিয়া যখন ক্লান্তি ধরিয়া গেল তখন উঠিয়া দুতলার খালি ঘর-গুলিতে সে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। একটা ঘরে প্রিয়-গোপাল জন-কয়েক লোক জুটাইয়া ব্রিজের আড্ডা জমাইয়াছেন, ইচ্ছা করিয়াই সেই দিকে গেল না। একটা ছোট ঘর একেবারে দীঘির ঠিক উপরেই জলটুঙ্গির ধরণে তৈয়ারী, সেইখানে আসিয়া হাঁপ ছাড়িল। দীঘির ওপারে খানিকটা ঘাসের জমি, সেইখানে ছেলেদের কেহ কেহ প্যারালাল বারের উপর চড়িয়া বসিয়াছে, কেহ কেহ দোলনায় দোল খাইতেছে। এপারে রান্না-বাড়িতে একদল মেয়ে রন্ধনে ব্যস্ত, তাহাদের মধ্যে সুলতা রহিয়াছেন, উপরের জানালায় অজয়কে দেখিয়া মৃদু হাস্তে তাহার সম্বর্দ্ধনা করিলেন।

সরিয়া আসিয়া আর-একটা জানালা হইতে ঝুঁকিয়া পড়িয়া দীঘির জলে মাছের খেলা দেখিতেছে, হঠাৎ পশ্চাতে মেয়েদের কোলাহল শুনিয়া ফিরিয়া তাকাইল। সুভদ্র, ঐন্দ্রিলা ও রাহু আসিয়া পৌঁছিয়াছে। সুলতা সম্ভবতঃ অজয়েরই সন্ধানে উপরে আসিয়াছিলেন, কহিলেন, "ও কি, বীণি কোথা ?"

সুভদ্র কহিল, "তাঁর শরীর ভাল নেই ব'লে আসতে পারলেন না।"

মেয়েরা আবার কোলাহল করিয়া উঠিল। সুলতা বলিলেন, "নিজের জন্মদিনে সবাইকে চড়িভাতিতে ডেকে তারপর শরীর ভাল নেই কি রকম ? কি অসুখ রে ইলু ?"

ঐন্দ্রিলা বলিল, "আমায় কিছু জিজ্ঞেস কোরো না সুলতাদি, আমি বাপু জানি টানি না কিছু।"

সুলতা বলিলেন, "বেশ ত মজা। অসুখ যদি কিছু হয়েও থাকে, তাই নিয়েই ত তার আসা দরকার। আমি যাচ্ছি তাকে আনতে।" বলিয়া হঠাৎ অধোমুখ অজয়ের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "অজয়বাবু, আপনি চলুন আমার escort হয়ে।"

অজয়ের সেখানে উপস্থিতি একেবারে অকল্পনীয় বলিয়াই সুভদ্র বা ঐন্দ্রিলা দুজনের কেহই তাহাকে প্রথমে লক্ষ্য করে নাই, তাহার নাম হইতেই উভয়ে সচকিত হইয়া ফিরিয়া তাকাইল। কিন্তু অজয় চকিত দৃষ্টি তুলিয়াই নামাইয়া লইল বলিয়া উহার পর আর কিছু দেখিতে পাইল না।

ঐন্দ্রিলার সঙ্গে কল্যকার প্রথম সাক্ষাতের ক্ষণটির মত আজও তাহার মন কি এক নামহীন বেদনার ভারে অবসন্ন হইয়া রহিল। মুখ হইতে বাক্যনিঃসরণ হইল না। সুলতা যে কি মনে করিয়া escort স্বরূপে তাহাকে সঙ্গে লইতে চাহিতেছেন, তাহা অপর কেহ না বুঝিতে পারিলেও সে বুঝিতে পারিয়াছিল। তাহার ভয় হইতেছিল, যদি ঐন্দ্রিলাও তাহা বুঝিতে পারিয়া থাকে। কিন্তু উত্তেজনা-বিব্রত দেহমন লইয়া সেখানে আর এক মুহূর্ত্ত দাঁড়াইতেও তাহার ইচ্ছা করিতেছিল না। সুলতা আর একবার আহ্বান করিতেই তাঁহার সঙ্গে সে নীচে নামিয়া গেল। তাহার জীবনে অদৃষ্টের আর-এক নিষ্ঠুর পরিহাস সুরু হইয়া গেল।

কিন্তু বীণাকে অবলম্বন করিয়া তাহার জীবনে একটি প্রমাত্মক নিষ্ঠুর নাট্যরচনা যে সুরু হইতে পারে ইহা অস্ফুটভাবে অনুভব করা সত্ত্বেও বীণা তাহার চিত্তকে কিছুমাত্র দুশ্চিন্তা-

ভারগ্রস্ত করিল না। বীণার সদা-চঞ্চল চিত্তবেগ, তাহার অফুরন্ত বেগবান্ হাসির স্রোত, তাহার চিরপ্রফুল্ল মুখশ্রী কেমন অলক্ষিতে তাহার সম্বন্ধে সমস্ত দুশ্চিন্তাকে ছাপাইয়া বড় হইয়া উঠে। তাহার নিজের যে কোনও দুর্ভাবনা নাই, এই কারণেই তাহার সম্বন্ধেও কিছু ভাবিতে ইচ্ছা করে না। সে যেন ঠিক পুরাপুরি মানুষ নহে, সে যেন খানিকটা আলোভরা, হাসিভরা চপল আনন্দ। কোনও হিসাব-নিকাশের বন্ধনে তাহাকে বাঁধা যায় না।

ইহা ছাড়া সদাহাস্যময় প্রফুল্লতার এই একটি মায়া আছে, যে-কোনও কারণে সেই হাসি ম্লান হইয়া যাইতে দেখিলে অলক্ষিতেই অপরের মনে একটা অকারণ অস্বস্তি জাগিয়া উঠে। অপ্রাকৃতকে ভয় করিবার মানুষের যে আদিম প্রবৃত্তি এই অস্বস্তি সেই জাতীয় হইতে পারে, কিন্তু ইহাকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আজ সকালে বীণা ম্লান মুখে ফিরিয়া আসিয়াছে, সমস্ত দিন তাহার সেই ম্লান মুখ অজয় এক মুহূর্ত্ত ভুলিতে পারে নাই। আজ তাহার জন্মদিন বলিয়াই যে সে আজ এত আগ্রহে অজয়কে চাহিতেছিল, ইহা বুঝিতে পারিয়া অজয়ের অনুশোচনা দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। জন্মদিনের এই উৎসবের আয়োজন না-জানি কতদিন ধরিয়া কত আগ্রহে সে করিতেছিল, কল্পনার কত কমনীয় রঙে এই দিনটিকে সে গড়িতেছিল, আজ নিজেই উৎসবে যোগ দেয় নাই, ইহা হইতেই কত বড় আঘাত সে যে বীণাকে আজ করিয়াছে তাহা সে বুঝিতে পারিল। বীণার সুন্দর মনটি হইতে সেই কুৎসিত আঘাতের শেষ স্মৃতিটিকেও প্রাণপণ চেষ্টায় মুছিয়া দিতে সে আজ কৃতসঙ্কল্প হইল।

বেশী কিছু তাহার করিতে হইল না। মোটরগাড়ী বারান্দার নীচে দাঁড়াইতেই দেখা গেল, বীণা উপর হইতে ঝুঁকিয়া পড়িয়া আরোহীদের দেখিবার চেষ্টা করিতেছে। অজয়ের সঙ্গে চোখোচোখী হইতেই ঠোঁটচাপা একটি গর্ব্বিত হাসিকে সে কিছুমাত্র লুকাইবার চেষ্টা করিল না। সেই হাসিটিকে অজয়ের ভাল লাগিল।

অজয়দের সঙ্গে সঙ্গে সেও তাড়াতাড়ি ড্রয়িংরুমে নামিয়া আসিল। সুলতা তাহাকে আপাদমস্তক দেখিয়া লইয়া বলিলেন, "ব'লে ত পাঠালি অসুখ করেছে, এদিকে ত বাবার জন্তে তৈরি হয়ে আছিস্।"

শাড়ীর আঁচলটাকে ঘুরাইয়া পরিয়া বীণা হাসিয়া উত্তর দিল, "বা রে, নিজের জন্মদিনে একটু সাজবও না বুঝি।"

সুলতা বলিলেন, "থাক্ থাক্, ঢের ন্যাকামী হয়েছে, এইবার চল্।"

কিন্তু বীণা একটা আসন টানিয়া লইয়া বসিল। আজ জন্মদিনে যে উৎসবকে সে এতদিন ধরিয়া প্রাণপণে কামনা করিয়াছে, সেই উৎসবের ক্ষেত্র এক মুহূর্ত্তে এইখানেই তাহার রচিত হইয়া গিয়াছে। ইহার বেশী আর কোনও উৎসবের সেদিন সত্যই তাহার প্রয়োজন ছিল না। বীণার দেখাদেখি অজয়ও তাহার নিকটের আর একটা আসন অধিকার করিয়া বসিল দেখিয়া সুলতা আর কিছুই বলিলেন না। একবার কৌতুক ভরা দৃষ্টিতে তাহাদের দেখিয়া লইয়া, "মামীমার সঙ্গে দেখাটা ক'রে আস্ছি" বলিয়া পা টিপিয়া উপরে উঠিয়া গেলেন।

তাঁহার এই ছল করিয়া সরিয়া যাওয়ার ভিতরকার অর্থটি অজয়ের দৃষ্টি এড়াইল না। কিন্তু বীণার কাছে আসিয়া তাহার চিত্ত স্বতঃই কেমন সহজ হইয়া যায়, সুলতার ব্যবহারে বিব্রত বোধ করাটা তাহার তাই অত্যন্ত হাস্যকর বলিয়া বোধ হইল। বীণার দিকে একটু ঝুঁকিয়া বসিয়া বলিল, "আমি ক্ষমা চাইতে এসেছি।"

বীণা বলিল, "এমন বেহিসাবী কথা কেন বলেন? ক্ষমা ত আগেই একবার চেয়ে রেখেছেন, এবং এসেছেন যে সেটা চোখেই এখন দেখতে পাচ্ছি।"

একটু পরে গলার স্বর একটু নামাইয়া আবার বলিল, "সেই ত এলেন, তখন এলেই ত পারতেন।"

অজয়ও মৃদু স্বরেই বলিল, "সে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করব ব'লেই এসেছি।" অন্তরের সহজ অনুভূতির কথাই বলিল, কিন্তু কোথা হইতে কি সুর আসিয়া তাহার কণ্ঠে লাগিল, লক্ষ্য করিল না যে বীণার কর্ণমূল কি এক অস্পষ্ট সুখাবেগের ইঙ্গিতে আতপ্ত হইয়া উঠিল। তাহার সেই কথা-কয়টির সুর বীণার অন্তরের কোন্ সুপ্ত তারে গিয়া আঘাত করিল, কি দুর্দ্দমনীয় চাঞ্চল্যে তাহার বুক দুরু দুরু করিয়া কাঁপিল।

ইহার পর আরও কিছুক্ষণ দুজনে পাশাপাশি বসিয়া মৃদু গুঞ্জনে তাহারা কথা কহিল। অতি তুচ্ছ বিষয়ে তুচ্ছ কথাগুলি আজ কোন্ মন্ত্রে অপরূপ হইয়া দেখা দিল। পরস্পর পরমাত্মীয় বোধে তাহারা নির্ব্বিরোধে সেই মুহূর্ত্ত-কয়টির কাছে আত্ম-

সমর্পণ করিল। তাহারা সেখানে প্রণয়ী নহে, পুরুষ এবং নারী নহে, অথচ একটি দৃঢ় কিন্তু অলক্ষ্য সখ্যের বন্ধনে তাহাদের দুইটি চিত্ত পরস্পরের সঙ্গে দুশ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা পড়িল, একটি অপূর্ব্ব স্নিগ্ধ মাধুর্য্য তাহাদের আচ্ছন্ন করিয়া জাগিয়া রহিল।

সুলতা যখন নীচে নামিয়া আসিলেন, তখন কিছুতেই আর দেরি করা চলিতে পারিত না। অজয় এবং বীণা বুঝিতে পারিল, এত দেরি করিয়া চড়িভাতির নিমন্ত্রিতদের প্রতি তাহারা সত্যই অবিচার করিয়াছে। সকলে মিলিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িল। পথে আসিতে সুলতা বীণার কানে কানে কহিলেন, "আচ্ছা, সত্যি ক'রে বল্ ত, আস্‌বি না ব'লে পাঠিয়ে আস্‌বার জন্যেই তৈরি হয়ে ছিলি কেন?"

বীণাও তাহার কানে কানেই বলিল, "আমি জান্‌তাম তোমরা আস্‌বে।"

সুলতা বলিলেন, "ইস্, গুন্‌তে সুদ্ধু শিখেছিস্?" অজয়কে যে তিনিই ডাকিয়া সঙ্গে আনিয়াছেন, সে কথাটা অপ্রকাশ থাকিয়া গেল।

তৈলচিত্রে ভারতীয় চিত্রকলার নহে, কিন্তু ভারতীয় তক্ষণ-শিল্পের আদর্শ অনুসরণ করিতে হইবে, একদল শ্রোতা জুটাইয়া বিমান এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতেছে এমন সময় সদলবলে বীণা আসিয়া উপস্থিত হইল। এবার আর কেবল মেয়েরা নহে, তাহাদের সঙ্গে ছেলেরাও কোলাহল করিয়া উঠিল। বিমান অগ্রসর হইয়া আসিয়া মৃদু হাস্যে কহিল, "অসুখ করলেই আপনার চেহারা খুব ইম্প্রুভ করে দেখছি।"

বীণা বলিল, "আপনি বলতে চান অসুখের কথাটা বানানো, এই ত? এত সহজে জিততে পারবেন না। অসুখ করেছিল, কিন্তু স্বীকার করছি সেরে গিয়েছে।" বলিয়া অপাঙ্গে অজয়ের দিকে চাহিল। বিপদ্ হইল অজয়ের। সে আসিয়া অবধি ঐন্দ্রিলাকেই লক্ষ্য করিতেছিল। তাহার জন্য ঐন্দ্রিলার মনের কোনও কোণে এতটুকুও যে স্থান আছে ইহা সে কখনও মনে করিত না, কিন্তু সে বীণাকে ভালবাসে এ ধারণাও কিছুতেই প্রাণ ধরিয়া ঐন্দ্রিলার মনে সে জন্মাইয়া দিতে পারে না। অথচ আজ সমস্ত-কিছু এমন ভাবে ঘটিতেছে যে ঐন্দ্রিলা কিছু বুঝিতে চেষ্টা করিলেই ভুল বুঝিবে। এই ভুলকে কি বলিয়া, কি করিয়া সে ভাঙিয়া দিবে? কিছু বলিবার উপলক্ষ্য ত ঘটে নাই, কেহ কিছু বলে নাই, শুনিতেও চায় নাই, যাহা কিছু ঘটিবার অত্যন্ত অস্পষ্ট আভাসে ইঙ্গিতে ঘটিতেছে। বীণাকে আঘাত করিয়া সে জানাইতে পারে, কিন্তু এই সদাহাস্যময়ীকে কোন্ অপরাধে সে আঘাত করিবে? তাহাকে উপেক্ষা করিয়াও আর লাভ নাই, আজ সমস্ত সন্ধ্যা যে ব্যবহার তাহার নিকট হইতে বীণা পাইয়াছে, তাহার পর কোনও উপেক্ষাকেই সে আর উপেক্ষা বলিয়া বুঝিতে পারিবে না। খুব ইচ্ছা করিতে লাগিল, ঐন্দ্রিলার সঙ্গে ব্যবহারে আজ অন্ততঃ নিজেকে পরিপূর্ণ করিয়া প্রকাশ করে। কিন্তু সে সময় ত আসে নাই। তাহার এই পরাজয়-চিহ্নিত দারিদ্র্যলাঞ্ছিত মূর্ত্তি দেখিয়া সে যদি ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া লয়? যদি তাহার সেই আত্মপ্রকাশকে অকল্পনীয় স্পর্দ্ধা মনে করিয়া কলকণ্ঠে সে হাসিয়া উঠে? ...ঐন্দ্রিলাকে সে নমস্কার করিল; দুটি হাতকে কপালে ঠেকাইয়া মৃদু হাসিয়া ঐন্দ্রিলা নীরবে প্রতিনমস্কার করিল।

সুভদ্র এককোণে দাঁড়াইয়া রমাপ্রসাদের সহিত কথা বলিতেছিল, অগ্রসর হইয়া বলিল, "এসমস্ত একেবারে চলবে না।"

সকলে একটু সচকিত হইয়া উঠিল। বীণা জিজ্ঞাসা করিল, "কি চলবে না?"

সুভদ্র বলিল, "এভাবে সব আলাদা হয়ে ব'সে থেকে কি লাভ? আজ পর্য্যন্ত দেখলাম না, সবাই সবাইকার সঙ্গে মিশছে, গল্প করছে। মাঝখানকার এই বৈতরণীটাকে বেঁধে দিতে হবে।"

ছেলেদের বা মেয়েদের কাহারও মুখের দিকে চাহিয়া আজ কিন্তু মনে হইল না, যে এই বৈতরণী পার হইতে কাহারও সত্যই কিছুমাত্র আপত্তি আছে। বীণা মৃদুস্বরে সুলতাকে বলিল, "গরজ থাকলে সুভদ্রবাবুকে কাণ্ডারী না ক'রেও বৈতরণী পার হওয়া যায়।"

সুলতা বলিলেন, "তোর মত গরজ সবার নেই সেটা ঠিক।"

বীণা বলিল, "গরজ না থাকে ত যে যেমন আছে থাক্ না।"

সুলতা বলিলেন, "গরজটা সকলের হয়ে সুভদ্রের আজ

প্রকারের এবং সেইটেই আজকের মতো অন্ততঃ যথেষ্ট হবে ব'লে বোধ হচ্ছে।"

সুভদ্র তখন সকলের মাঝখানে দাঁড়াইয়া whispering খেলাটা কি পদার্থ তাহাই ব্যাখ্যা করিতেছে। বলিতেছে, "সবাইকে যোগ দিতে হবে। প্রথমে ছেলেদের দিক্ থেকে whispering সুরু হবে। যে কোনও একটা কথা দিয়ে সুরু করলেই চলবে। একবারের বেশী কেউ শুনতে চাইলেও শুনতে পাবে না। whisperingএর সুরু কি কথা নিয়ে হয় সেটা নোট ক'রে রাখা হবে এবং শেষ হলে কোন্ কথা কি কথায় এসে দাঁড়ায় সবাইকে তা বলা হবে।"

ছেলেদের মধ্যে যে বাহিরের দিকে সকলের শেষে বসিয়াছিল সে তাহার প্রতিবেশীর কানে "রান্নার আর কত দেরি" বলিয়া কথা সুরু করিল। সুভদ্র চীৎকার করিয়া বলিল, "বিমান, ঐন্দ্রিলা দেবী, আপনারাও এসে বসুন।"

ঐন্দ্রিলা বলিল, "আমরা অন্ততঃ আর কিণ্ডারগার্টেনের উপযুক্ত নেই। whispering না ক'রেও অবাধে মিশতে পারছি।"

সুভদ্র "তা হোক, তবু এসে বসুন," বলিয়া নিজে বসিয়া পড়িল। বিমান এবং ঐন্দ্রিলা যেখানে দাঁড়াইয়া ছিল সেইখানে দাঁড়াইয়াই গল্প করিতে লাগিল। রাহু কখন পা টিপিয়া রান্নাঘরের দিকে প্রস্থান করিল কেহ লক্ষ্য করিল না।

ছেলেদের দিকে সকলের কানে কানে কথা বলা হইয়া গেলে শেষ ছেলেটি নাক মুখ চোখ লাল করিয়া উঠিয়া মেয়েদের দিকে গেল এবং সব-কাছে যাহাকে পাইল তাহার কানের ছয় ইঞ্চির মধ্যে মুখ লইয়া কতকটা উচ্চস্বরেই শোনা কথার পুনরাবৃত্তি করিয়া প্রায় ছুটিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া আসিল। মেয়েদের মধ্যে কানাকানি চলিতে লাগিল। কানাকানি শেষ মেয়েটির কাছে পর্য্যন্ত গিয়া পৌঁছাইলে সুভদ্র উঠিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি শুনেছেন বলুন।"

মেয়েটি বলিল, "আনারকলির দেশ।"

একটা কাগজের টুকরা হাতে তুলিয়া আনিয়া সুভদ্র বলিল, "whispering সুরু হয়েছিল, এই ব'লে,—'রান্নার আর কত দেরি'।"

সকলে একসঙ্গে উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিল।

ঐন্দ্রিলা বলিল, "কানাকানি ক'রে যে কথাটা সুরু হয়েছিল সেটা আমি না-হয় একটু চেঁচিয়েই জিজ্ঞাসা করছি। খুব বেশী রাত ক'রে আর কি দরকার?"

রাত করাতে অনেকেরই কিছুমাত্র আপত্তি ছিল না, কিন্তু খাওয়ার কথা হইতেই সকলে সে-বিষয়ে খুব উৎসাহ প্রকাশ করিল। সুভদ্র দমিবার পাত্র নহে সে কাহাকেও কিছুমাত্র আমল না দিয়া সেই মেয়েটিকে দিয়া আবার খেলা সুরু করাইল। "রাত এখনো কিছু হয়নি" বলিয়া কানাকানির সুরু হইল। একটু পরে দেখা গেল মেয়েদের মধ্যে একটি সকৌতুক চঞ্চলতা দেখা দিয়াছে। নীল-শাড়ীপরা চশমা-চোখে মেয়েটি তাহার প্রতিবেশিনীর কানে কানে কথাটা শেষ করিতেই পিঠে দস্তরমত দারুণ রকমের একটি মুষ্ট্যাঘাত লাভ করিল। চতুর্দ্দিকে হাসির একটা রোল উঠিল। সুভদ্র বহুকষ্টে সকলকে থামাইয়া আবার খেলা সুরু করাইল বটে কিন্তু শেষ মেয়েটি কিছুতেই তাহার নিকটতম প্রতিবেশী ছেলের কানে শোনাকথার পুনরাবৃত্তি করিতে রাজি হইল না। আঁচলে মুখ গুঁজিয়া উচ্ছ্বসিত আবেগে হাসিতে লাগিল। কথা যাহারা সুরু করিয়াছিল, তাহাদের বুঝিতে বাকী রহিল না যে ক্রমপরিবর্ত্তনের ফলে অত্যন্ত নির্দোষ কথাটির ভয়াবহ একটা মূর্ত্তি দাঁড়াইয়াছে, নিজেদের মধ্যে কানাকানি করিয়া তাহারা কথাটা জানিয়া লইল এবং সকলে মিলিয়া এ-উহার গায়ে গড়াইয়া পড়িয়া হাসিতে লাগিল। সুভদ্রের এবং অন্য কাহারও কাহারও অত্যন্ত আগ্রহাতিশয্য সত্ত্বেও হাসির কথাটা যে কি, ছেলেদের দিকের কাহারও তাহা জানিবার কোনও উপায় রহিল না।

মেয়েটিকে ডাকিয়া বীণা বলিল, "যা তা একটা বানিয়ে ব'লে দে-না বাপু, কানে কানে বলা হলেই ত হ'ল।"

মহা কোলাহলে সকলের খাওয়া শেষ হইলে দেখা গেল, রাত তখনও আটটা বাজে নাই এবং আকাশে সুন্দর জ্যোৎস্না উঠিয়াছে। দিনের বেলা অসহ্য গরম পড়িয়াছিল, সন্ধ্যা হইতে দক্ষিণ দিক্ হইতে ফুরফুরে হাওয়া দিতেছে। সে হাওয়ার স্পর্শ বেশ শীতল, শরীর জুড়াইয়া যায়। সুভদ্র কখন্ কোথায় বসিয়া খাইয়াছে কেহ তাহা লক্ষ্যও করে নাই, হঠাৎ সকলের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আমরা ঠিক করেছি আজ সকলে মিলে হেঁটে দমদম পর্য্যন্ত গিয়ে

ট্রেন্ ধর্‌ব। এখান থেকে তিন মাইলের কিছু বেশী হবে, এক ঘণ্টার বেশী লাগবে না।"

সকলেই খুব উৎসাহ প্রকাশ করিল। ঐন্দ্রিলা ছাতের আলিসার উপর ঝুঁকিয়া এককোণে আকাশের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সেও কোনও প্রতিবাদ করিল না। সুভদ্রের প্রস্তাব সে শুনিতে পাইয়াছে কিনা তাহা বোঝাও সহজ ছিল না।

সুভদ্র বলিল, "ঠিক হয়েছে আলাদা আলাদা দল ক'রে বেরনো হবে, এবং এক-এক দলে দুজন ক'রে ছেলে এবং দুজন করে মেয়েরা থাকবেন।"

এই অভিনব প্রস্তাব শুনিয়া অনেকেরই বুক দুরু দুরু করিয়া কাঁপিল, কিন্তু সুভদ্র যে বুদ্ধি করিয়া একজোড়ার সঙ্গে আর-এক জোড়া পরস্পর প্রহরার জন্য জুড়িয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়াছে ইহাতে সকলেই একটু আশ্বস্ত বোধ না করিয়াও পারিল না। ছেলেদের মধ্যে যাহারা লাজুক তাহারাও কোনও-না-কোনও সঙ্গীর পাল্লায় পড়িয়া কোনও-না-কোনও একটা দলে ভিড়িয়া যাইতে লাগিল। মেয়েরা মোটের উপর খুব সাহস দেখাইল। অনভ্যস্ততার মায়ায় অবলীলায় এবং দ্বিধা মাত্র না করিয়া তাহারা সম্পূর্ণ অপরিচিত ছেলেদের সঙ্গেও বাহির হইয়া পড়িতে লাগিল।

শেষ দল বাহির হইয়া গেলে দেখা গেল, ছয়টি মানুষ আর বাকী। সুলতা, বীণা, ঐন্দ্রিলা, সুভদ্র, অজয় এবং রাহু। ঐন্দ্রিলা বলিল, "আমাদেরও কি অর্ডিন্যান্স মানতে হবে?"

সুভদ্র বলিল, "নিশ্চয়।"

ঐন্দ্রিলা বলিল, "দুটো পুরো দল আর ত হবে না। আপনারা চারজন বেরোন, আমি রাহুকে নিয়ে যাচ্ছি।"

সুভদ্র বলিল, "তা কি হয়। রাহুকে নিয়ে আপনি একলা বেরবেন কিরকম? এ ত কল্‌কাতার পথ নয়, কত রকম বিপদ্ হতে পারে।"

সুলতা বলিলেন, "দাঁড়ান, আমি খুব ভালো ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি। অজয়বাবু বীণা আর আমি যাচ্ছি, সুভদ্রবাবুর দলে রাহু আর ঐন্দ্রিলা থাকবে।"

রাহু প্রচণ্ড আপত্তি তুলিয়া বলিল, সে কিছুতেই অজয়বাবুর সঙ্গে ছাড়া যাইবে না। সুলতা কিছুমাত্র না দমিয়া তাড়াতাড়ি কহিলেন, "বেশ, রাহুকেও আমি নিচ্ছি। দুটো দলই ভাঙা না হয়ে একটা দল অন্ততঃ পুরো হবে তাহলে।"

সুলতা যে কি মনে করিয়া এইরকম করিয়া দল গড়িবার ব্যবস্থা করিলেন তাহা বুঝিতে পারিয়া অজয় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ঘামিতেছিল, "চলুন অজয়বাবু" বলিয়া রাহু তাহাকে কিছু বলিবার অবকাশ না দিয়া প্রায় টানিয়াই নীচে নামাইয়া আনিল। সুলতা বীণাকে সঙ্গে করিয়া নামিলেন।

কিছুক্ষণ পথে দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ করিয়া ঐন্দ্রিলা বলিল, "সুভদ্রবাবু, আমায় একটা গাড়ী ডেকে দেবেন? দিদি মোটরটাকে বিদায় ক'রে দিয়ে গিয়েছে দেখছি। আমার শরীরটা একেবারে ভালো নেই, এতক্ষণই জোর ক'রে ছিলাম। একটু তাড়াতাড়ি বাড়ী ফির্‌তে চাই।"

সুভদ্র বলিল, "কাউকে কিছু না ব'লে আপনি চ'লে গেলে ওরা মহা চেঁচামেচি কর্‌বে।—একটুখানি চলুন না, কতটুকুই বা পথ!"

ঐন্দ্রিলা বলিল, "না না, আমায় সত্যিই যেতে হবে।"

সুভদ্র কিছুক্ষণ চুপ করিয়া ভাবিল, তারপর ধীরে ধীরে তাহার মুখে একটুখানি হাসি ফুটিয়া উঠিল। বলিল, "আপনি সত্যিই কিণ্ডারগার্টেন ছাড়াননি এখনো। শুধুশুধু বড়াই কর্‌ছিলেন।"

ঐন্দ্রিলা একথার জবাব না দিয়া মুখ নীচু করিয়া রহিল। সুভদ্র বলিল, "একটু তাড়াতাড়ি হেঁটে চলুন, এগিয়ে গিয়ে আপনার সুলতাদিদের ধর্‌ব।"

ঐন্দ্রিলা অত্যন্ত ত্রস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "না, সুলতাদিরা থাকুন। চলুন, আপনার সঙ্গেই যাচ্ছি।"

দুজনে পাশাপাশি চলিল, কিন্তু ঐন্দ্রিলা যে অত্যন্ত অনিচ্ছাতে তাহার সঙ্গে যাইতেছে এই কথাটি বেদনার মত হইয়া সারাক্ষণ সুভদ্রের মনে বিঁধিয়া রহিল। ঐন্দ্রিলার কুণ্ঠায় নিজে কুণ্ঠিত হইয়া অনেকখানি পথ তাহার সঙ্গে কোনও কথাই প্রায় সে কহিতে পারিল না। বাংলার তরুণ-তরুণীদের পরস্পরের সামাজিক মিলনের মধ্যেকার যে অপ্রাকৃত এবং কুৎসিৎ কুণ্ঠার আবরণকে মুক্ত করিয়া দিবে বলিয়া সে এতদিন ধরিয়া এত সাধনা করিয়াছে, আজ এই সুন্দরী তেজস্বিনী মেয়েটিকেই সেই কুণ্ঠা অনুভব করিতে দিতে তাহার অত্যন্ত ক্লেশ হইতে লাগিল। নিজে কুণ্ঠা বোধ

করিয়া অপরাধ করিয়াছে তাহাও সে অনুভব করিল। অবশেষে যখন দমদমের পথ আর অল্পমাত্র অবশিষ্ট আছে তখন সমস্ত সঙ্কোচ জোর করিয়া কাটাইয়া অকস্মাৎ সে কথা কহিল। বলিল, "পথ ত শেষ হয়ে এল। এত যে ভয় পেয়েছিলেন, ভয়ের কিছু ঘটল কি?"

এতক্ষণব্যাপী নীরবতার পর এত হঠাৎ সে কথাটা বলিল যে ঐন্দ্রিলা প্রথমতঃ চমকিয়া উঠিল, তার পর কিছুক্ষণ সুভদ্র কি বলিতে চাহিতেছে তাহা সে বুঝিতেই পারিল না। যখন বুঝিল হাসি দমন করিতে পারিল না।

সুভদ্র বলিল, "আমি জানি রাহুর সঙ্গে আপনি বেশ আসতে পারতেন, আস্তে চেয়েওছিলেন। কিন্তু ভয়ের কারণ হয়ত তাহলেই কতকটা ছিল।"

ঐন্দ্রিলা মুখে হাসি লইয়াই বলিল, "তা ত ছিলই।"

সুভদ্র বলিল, "তবে? আমার সঙ্গে এসে কোন্ অসু-বিধাটা আপনার হয়েছে বলুন। কি অপরাধে রাহুর চেয়েও escort হিসাবে আমি মন্দ।"

ঐন্দ্রিলা বলিল, "আপনি বেশ ভালো escort। সারাপথ চুপ ক'রে না থেকে যদি কথা বল্‌তেন তাহলে আরো বেশী নম্বর দেওয়া যেত।"

সুভদ্র বলিল, "এখন নম্বর দেওয়ার বেলায় যতই উদারতা দেখান্, গাড়ী ডাকতে বল্‌বার সময় আপনি কিছুমাত্র আমার প্রতি সুবিচার করেননি। আপনারা কেন এই সহজ কথাটা বুঝতে পারেন না, যে দুটো মানুষ পথ দিয়ে একসঙ্গে কিছুক্ষণ চল্‌লে কিম্বা একসঙ্গে ব'সে কিছুক্ষণ কথা বল্‌লে তাতে পৃথিবীর কোনো চণ্ডী কিছুমাত্র অশুদ্ধ হয় না। আমরা দুজনে এই পথটুকু হেঁটে আসবার ফলে আমাদের দুজনেরই পথটা হাঁটা হয়েছে, তাছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও আর-কোনো জিনিষের এতটুকু নড়চড় হয়নি। আপনি এও ভাব্‌বেন না যে আজ একদিন আপনি আমাকে আপনার সঙ্গে বেড়াবার অধিকার দিয়েছেন ব'লে আমি ক্রমাগত সেই অধিকার আমার আছেই মনে করতে থাকব এবং তার কোনো সুবিধা আপনার কাছ থেকে নেব। সমস্ত জিনিসকে একেবারে তাদের সহজ চেহারায় সহজ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখবার শক্তি আমার আছে, কিম্বা অন্যরকম ক'রে তাদের দেখবার শক্তি আমার নেই।"

ঐন্দ্রিলা বুঝিতে পারিল সুভদ্র উত্তেজিত হইতেছে। তাহাকে শান্ত করা প্রয়োজন। পূর্ব্বগামী দলগুলি তখন অদূরে ষ্টেশনের ধারে আসিয়া মিলিয়াছে; তাহাদের কোলাহল স্পষ্ট শোনা যাইতেছে। গতির বেগ মন্দীভূত করিয়া ঐন্দ্রিলা কহিল, "শুনুন সুভদ্রবাবু। কথাটাকে আমিও যে একেবারে চিন্তা করিনি তা নয়। এক সময় ছিল, যখন কিছু ভাববার প্রয়োজন যে আছে তাই আমার মনে হত না, সেজন্যে আমি কখনো ক্লাবেও আস্‌তাম না, আপনি লক্ষ্য ক'রে থাকবেন। কিন্তু কিছুদিন থেকে কথাটাকে আমি ভেবেছি। আমি সত্যিই স্বীকার করছি, আপনার সঙ্গে আসতে কুণ্ঠা বোধ ক'রে আমি আপনার প্রতি অবিচার করেছি। তার কারণ আপনি—আপনি।"

সুভদ্র বলিল, "আমি ত ঐটুকুই কেবল বলি। মানুষে মানুষে তফাৎ আছে তা ত আমি জানিই। মানুষ নির্ব্বিশেষে সকলেরই সঙ্গে রাত ন'টায় একলা পথে বেরিয়ে পড়া যায় তা আমি মনে করি না। আমার অভিযোগ হচ্ছে, আপনি আমাকে বেশ ভালো ক'রে জানেন, আপনি মনে মনে নিশ্চয় বুঝতে পারেন যে আমা হতে আপনার কোনো ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নেই, তবু আমাকে ভয় না ক'রে পারেন নি।"

ঐন্দ্রিলা বলিল, "ঐ জায়গাটায় আপনি একটু ভুল করেছেন। ভয় আপনাকে আমি একটুও করিনি। কিন্তু পৃথিবীতে আপনি ছাড়াও লোক আছে, সহজ জিনিসকে সহজভাবে দেখতে তারা অভ্যস্ত নয়।"

সুভদ্র বলিল, "তাদের তা দেখতে অভ্যস্ত করবার ভার আমাদের ওপর। তা না ক'রে তাদের ভয় পেলে অবস্থাটার কোনোদিনই কি প্রতিকার হবে?"

ঐন্দ্রিলা বলিল, "ভয়টা কাটাতে হবে স্বীকার করি, কিন্তু ভয় কাটাতে বললেই কাটানো যায় না।"

সুভদ্র বলিল, "যায়। আমি বলছি, যায়। আজকেই কি অনেকখানি ভয় আপনার কেটে যায়নি?"

ঐন্দ্রিলা বলিল, "ভয়টা যদি আপনাকে হত তাহলে অনেকখানি কেন একেবারেই কেটে যেত। কিন্তু আমি যাদের ভয় করি তারা সব আসছে পরে।"

সুভদ্র এক ঝটকায় সমস্ত তর্কের জাল দুহাতে সরাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি সত্যিই মনে করেন, আমরা এই

আধঘণ্টা এক সঙ্গে বেড়িয়ে আস্‌বার ফলে ভয়ঙ্কর কিছু অনর্থপাত ঘটবে ?"

ঐন্দ্রিলা অবলীলায় তর্ক করিতেছিল, হঠাৎ এই ভাবে আক্রান্ত হইয়া অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়িল। সুভদ্রের এ প্রশ্নের কি জবাব দিবে ভাবিয়া পাইল না। ইহা সত্য যে সুভদ্রের আজকার বেড়ানোর পার্টির গল্প কলিকাতার প্রায় প্রত্যেক বাঙালী ড্রইংরুমে এবং খাইবার টেবিলে কয়েকদিন ধরিয়া চলিবে। সমাজ সম্পর্কে যাঁহারা উদারনৈতিক বলিয়া নিজেদের প্রচার করেন, তাঁহারাও এই লইয়া নানারূপ মন্তব্য করিতে ছাড়িবেন না। ঐন্দ্রিলা এবং সুভদ্র সম্বন্ধে ত কথা তাহাদের দলের লোকদের মধ্যেই উঠিবে। কিন্তু এই-সমস্ত মন্তব্যকে সে কি সত্যই কিছুমাত্র ভয় করে ? নিজের মনের মধ্যে তাকাইয়া সে স্পষ্টই দেখিতে পাইল যে নিজের কাছে খাঁটি থাকিতে পারিলে পৃথিবীর কাহারও কোনও মন্তব্যকে সে সত্যই ভয় করে না। কিন্তু ভয়ের কারণ ত শুধু তাহাই নহে। এই যে তাহার চোখের সম্মুখে অজয় এবং বীণাকে লইয়া একটি বিচিত্র সংশয়ের সৃষ্টি হইতেছে, সে ত জানে ইহার মধ্যে অর্থ যতখানি অনর্থ তাহার চেয়ে বেশী, অথচ সমস্ত ব্যাপারটার মূলে দুইটি মানুষের অত্যন্ত সহজ মেলামেশা ভিন্ন আর কিছুই ত নাই। কিন্তু কতগুলি মানুষের জন্য কত দুঃখের আয়োজনই হয়ত ঐটুকুর সূত্র ধরিয়া নীরবে হইয়া চলিয়াছে। ইচ্ছা করিতে লাগিল, সুভদ্রকে সেই কথাটা বলে। এমন হইতে পারে, হয়ত তাহারই ভুল হইতেছে। হয়ত যে জিনিসকে সে সংশয় মনে করিতেছে, তাহার মধ্যে সংশয় কিছু নাই, বীণা এবং অজয় পরস্পরের কাছে খুব সহজভাবেই ধরা পড়িয়াছে। সুভদ্র সেবিষয়ে কি ভাবে তাহা অন্ততঃ সে জানিয়া লইতে পারিত কিন্তু পাছে ধরা পড়িয়া যাইতে হয়, এই ভয় আসিয়া বাধা দিল।

সুভদ্র মৃদুস্বরে বলিল, "আচ্ছা, এইটেকেই test case ক'রে দেখা যাক্। যদি সত্যি কিছু ঘটে তাহলে তর্কে আপনার জিত। আর কিছু যদি না ঘটে তাহলে হার মান্‌বেন, স্বীকার ক'রে যান।"

ঐন্দ্রিলা বলিল, "স্বীকার কর্‌ছি।"

দুইজনে ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া তফাৎ হইয়া গেল।

বীণা পথে বাহির হইয়াই বলিয়া উঠিল, "বা, সুলতাদি, কি সুন্দর রাস্তা!"

সুলতা বলিলেন, "তোর চোখে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবকিছুই এখন পরম সুন্দর লাগবে।"

কিন্তু বাস্তবিক জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রিতে আলোছায়া-বিচিত্র জনবিরল কৃষ্ণচূড় বীথিটির সত্যই অপরূপ শোভা হইয়াছিল। তবে ইহাও সম্ভবতঃ সত্য যে সেদিন সেই শোভাকে হৃদয়ঙ্গম করিবার ক্ষমতা বীণা অপেক্ষা বেশী আর কাহারও ছিল না। তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া ছিল, সমস্ত অস্তিত্বকে তাহার মধুময় মনে হইতেছিল। কি সে পাইয়াছে এবং কি সে পায় নাই, সেই হিসাব করিতে তাহার মন উঠিতেছিল না। বহুদিন পর হারাইয়া-যাওয়া অজয়কে সে ফিরিয়া পাইয়াছে, আজ সারা সন্ধ্যা তাহাকে সে কাছে পাইয়াছে, এখনও সে তাহার পাশেই আছে, এইটুকু জানাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট। সম্প্রতিকার মত উহার বেশী আর কোনও সুখ, ইহারও বাড়া আর কোনও সৌভাগ্য কল্পনা করাও তাহার ক্ষমতার বাহিরে। অজয়কে বলিল, "সত্যিই রাস্তাটা খুব সুন্দর দেখতে নয় ?"

অজয় বলিল, "সুন্দর বই কি ?"

বীণার কানের কাছে মুখ লইয়া সুলতা মৃদুস্বরে বলিলেন, "চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা।"

বীণা ঝঙ্কার দিয়া বলিল, "আচ্ছা, আচ্ছা, তুমি ত খুব সাধু আছ তাহলেই হ'ল।"

অজয় ব্যাপারটাকে অনুমান দ্বারাই বুঝিতে চেষ্টা করিল এবং ভুল করিল না।

বীণা বলিল, "সেদিনকার রাত্রে চাঁপাফুল কুড়নো মনে আছে আপনার ?"

দুর্দ্দমনীয় আবেগে অজয়ের সমস্ত চিত্ত আলোড়িত হইয়া উঠিল, সেদিনকার রাত্রির বিস্মৃতপ্রায় সুখাবেশ আবার তাহাকে অভিভূত করিল, জোরের সঙ্গেই বলিল, "সেদিনকার কথা কোনোকালেও ভুল্‌ব না।"

সুলতা সন্তর্পণে রাহুকে লইয়া পিছনে পড়িয়া গেলেন। এমনভাবে গতিবেগ কমাইতে লাগিলেন যাহাতে ক্রমে আর তাহাদের কথার গুঞ্জন শব্দ আর শুনিতে পাওয়া না যায়। রাহু অত্যন্ত ছটফট করিতে লাগিল, তাহাকে নানা অসম্ভব

গল্প শুনাইয়া থামাইয়া রাখিতে লাগিলেন। বলিলেন, আলিপুরে একটা বাঘ আসিয়াছে, তাহার লেজটা সমুখের দিকে এবং মাথাটা পিছনে। কথাটা শুনিতে খুবই অদ্ভুত শোনাইল কিন্তু রাহু অনেক ভাবিয়াও স্থির করিতে পারিল না, সত্যিই এই বাঘটা কি হিসাবে অন্য বাঘগুলির হইতে আলাদা। সাক্ষীস্বরূপে বীণাকে উপস্থিত করিবার জন্য চীৎকার করিয়া ডাকিল, "দিদি।" সুলতা অত্যন্ত জোরের সঙ্গে স্বীকার করিলেন, কথাটা সর্ব্বৈব তাঁহার বানানো, বীণার সাক্ষ্য একেবারেই অনাবশ্যক, কিন্তু রাহুর ডাক শুনিয়া অজয় এবং বীণা থামিয়া গিয়াছিল, সুতরাং চারজন আবার একসঙ্গে হইতে হইল। সুলতা বীণার কানে কানে কহিলেন, "রাহুকে আমি সাম্‌লাচ্ছি, তোরা একটু এগিয়ে গিয়ে ডান দিকের একটা রাস্তা ধ'রে বেরিয়ে যাস।"

বীণা বলিল, "তার পরে?"

সুলতা বলিলেন, "আমি রাহুকে নিয়ে এগিয়ে যাবার পর ইচ্ছে হয় এই পথ দিয়ে ফির্‌বি, নয়ত ডানদিকের কোনো রাস্তা দিয়েই ঘুরে যেতে পারিস্।"

অজয়কে লইয়া একলা হইয়াই বীণা কহিল, "রাস্তাটা চেনেন?"

অজয় কহিল, "না।"

বীণা করতালি দিয়া বলিয়া উঠিল, "বেশ হয়েছে। যেমন ভোরবেলা আসেননি, এখন তার শাস্তিস্বরূপ রাত দশটা অবধি আপনাকে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াব।"

বীণার এই শাস্তি-ব্যবস্থাতে তাহার কোনও দুঃসাহসিকতা যে আছে, তাহার সাবলীল হাসি শুনিয়া এবং তাহার স্নিগ্ধ সরল মুখের দিকে চাহিয়া অজয়ের তাহা একবারও মনে হইল না। বলিল, "ওরকম ক'রে যদি শাস্তি দেন, তাহ্‌লে ক্রমাগতই যে অপরাধ করতে থাক্‌ব।"

বীণা বলিল, "অপরাধ আপনি অমনিতেই অনেক কর্‌বেন, তা বেশ বুঝতেই পার্‌ছি, তার জন্যে কোনো প্রলোভনের আপনার দরকার হবে না।"

নানা কথায় সময় বহিয়া চলিল, কোন্ পথ দিয়া কোন্ পথে আসিয়া পড়িল, কাহারও সেদিকে লক্ষ্য রাখিবার কথা মনে হইল না। হঠাৎ বীণা বলিয়া উঠিল, "এ জায়গাটা আমার খুব জানা। বাঁদিক্ দিয়ে বেরিয়েই খুব পুরনো একটা দীঘি, তার পারে একটা ভাঙা পোড়ো বাড়ী। ভারি রোমান্টিক জায়গা। চারদিকে বন। চলুন, জায়গাটা দেখিয়ে আনি।"

অজয় বলিল, "বাঘটাঘ নেই ত?"

বীণা বলিল, "আপনার মতো বীরপুরুষ সঙ্গে থাকতে বাঘকে ভয় কি?"

বড়রাস্তা হইতে নামিয়া কাঁটাবনের মধ্যে দিয়া ক্ষীণ পথের রেখা ধরিয়া চলিয়া তাহারা তরুচ্ছায়াসমাচ্ছন্ন নিভৃত অন্ধকারের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। বীণা পথ দেখাইয়া আগে আগে চলিল, অজয় নিঃশব্দে তাহার অনুসরণ করিল। অন্ধকারের মধ্যে দিয়া বেশ কিছুক্ষণ চলিয়া হঠাৎ জ্যোৎস্না-দীপ্ত একটি প্রকাণ্ড দীঘির পারে আসিয়া বীণা বলিয়া উঠিল, "Thalata! Thalata!"

অজয়ের কবিচিত্তে সমস্ত জিনিষটি একটি অপরূপ সৌন্দর্য্যস্বপ্নের মত হইয়া দেখা দিল। সে বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া এই সৌন্দর্য্যের অনাবিল রসে তাহার অন্তর ভরিয়া লইতে লাগিল।

দীঘির যেদিক্‌টাতে তাহারা আসিয়া পড়িয়াছিল, সেদিক্ হইতে একটু দূরেই পুরানো ভাঙা একটা বাড়ী বনের অন্ধকারের গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার প্রায় সবকটা দেয়ালই খসিয়া পড়িয়াছে, একদিকের খানিকটা দেয়াল ভাঙা একটুখানি ছাত মাথায় লইয়া কোনওপ্রকারে খাড়া আছে মাত্র। বাড়ীটির ঠিক সম্মুখেই একটি বাঁধান আধ-ভাঙা ঘাট। বীণা নৃত্যচপল পায়ে ছুটিয়া গিয়া ঘাটের একটা পৈঠার উপর বসিয়া পড়িল। অজয়কে এবার সে ডাকিল না। হঠাৎ তাহারও মনের উপর স্তব্ধ জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রাত্রি, জনসমাবেশ হইতে দূরে সেই নিভৃত বনের রহস্যসমাকুল মায়া কি এক গভীর প্রভাব বিস্তার করিল। করতলে চিবুক ন্যস্ত করিয়া সে মন্ত্রমুগ্ধের মত নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিল, অজয় কখন নিঃশব্দে আসিয়া তাহার অনতিদূরে আর একটি পৈঠায় বসিল তাহা সুদ্ধ সে বুঝিতে পারিল না।

অজয় বলিল, "সত্যিই ভারি চমৎকার জায়গা। কাছেই কোথাও বেলফুল ফুটেছে, গন্ধ পাচ্ছেন?"

বীণা বলিল, "বাড়ীটার পেছনে প্রকাণ্ড বেলফুলের ঝাড়। গন্ধরাজ, রঙন, এমনকি আছে। কবে কে

বাগান করেছিল, তারা ম'রে কোন্‌কালে ভূত হয়ে গিয়েছে, কিন্তু ওগুলো আজও মরেনি।"

অজয় বলিল, "আপনি একটু বসুন এখানে, আমি কিছু ফুল সংগ্রহ ক'রে আন্‌ছি।"

বীণা বলিল, "আসুন, জন্মদিনের একটা উপহার আপনার কাছথেকে অন্ততঃ পাওয়া যাবে।"

ত্বরিত পদে অজয় উঠিয়া গেল। সে বুঝিতে পারিতেছিল না, সে কি করিতেছে। তাহারও অজ্ঞাতে এ কোন্ গোপন প্রভাব ধীরে ধীরে বীণা তাহার উপর বিস্তার করিতেছে। অথচ ইহাকে প্রভাব বলিয়া চিনিবার উপায় নাই, যদি চিনিতে পারিত, সতর্ক হইত। বীণাকে যেন ঘটা করিয়া, চেষ্টা করিয়া কোনও প্রভাব বিস্তার করিতে হয় না, যেন সৃষ্টির প্রথম দিন হইতে সকলের উপর তাহার প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াই আছে। অথচ প্রাকৃতিক নিয়মের মত ইহাকে বিনা দ্বিধায় মানিতে হয়, ইহাকে লইয়া বিচার-বিতর্ক নিষ্ফল।

একরাশ যুঁই গন্ধরাজ বেলফুল রঙনে রজনীগন্ধায় রুমাল বোঝাই করিয়া সে ফিরিয়া আসিল। বীণা যেখানে বসিয়াছিল, সেখানে তাহার পায়ের কাছে মাটিতে ফুলগুলিকে উজাড় করিয়া ঢালিয়া সে বলিল, "এই নিন্।"

বীণা বলিল, "ছি ছি, ও কি করলেন? ওগুলোকে মাটিতে রাখলেন কেন?" বলিয়া মুঠি মুঠি করিয়া ফুলগুলিকে আঁচলে উঠাইতে প্রবৃত্ত হইল। একটি রজনীগন্ধার গুচ্ছ লইয়া অজয়ের হাতে দিয়া সে বলিল, "এইটি আপনি নিন্।"

অজয় বলিল, "শিরোধার্য্য করা গেল।"

বীণা বলিল, "টিকি ত দেখ্‌ছি না আপনার মাথায়, শিরোধার্য্য আর কি ক'রে করবেন।"

উচ্ছ্বসিত হাসিগল্পের বান ডাকিতে লাগিল। কথার মাঝখানে কতগুলি ফুল হাতে লইয়া খোঁপায় পরিবার চেষ্টা করিতে করিতে অত্যন্ত স্বাভাবিক-সুরে বীণা বলিয়া উঠিল, "কোথায় কি গুঁজছি জানি না, ফুলগুলো খোঁপায় একটু পরিয়ে দেবেন?"

অজয়ের হঠাৎ চমক ভাঙিল। বুঝিতে পারিল, অবস্থা ক্রমেই বিপদসঙ্কুল হইয়া আসিতেছে। অথচ বীণা এমন সহজভাবে এই অনুরোধ করিয়াছে, যে, কোনও অজুহাতেই তাহাকে 'না' বলিবার উপায় আর নাই। কোনও কথা না বলিয়া নিঃশব্দে সে বীণার পশ্চাতে গিয়া ঝুঁকিয়া দাঁড়াইল, এবং কম্পিত হস্তে কয়েকটি ফুল কোনও-রকমে তাহার খোঁপায় গুঁজিয়া দিল।

বীণা বলিল, "যাক্, এইতেই হবে। বসুন।"

অজয় যন্ত্রচালিতের মত নিঃশব্দে আবার পূর্ব্বের জায়গায় আসিয়া বসিল। বীণা বলিল, "আপনাকে একটা কথা বল্‌ব, কিছু মনে করবেন না?"

অজয় মুখে ম্লান হাসি আনিয়া বলিল, "মনে আবার কি করব?" কিন্তু তাহার মনে মনে যে কি হইতেছিল তাহা একমাত্র অন্তর্যামীই জানেন।

বীণা একটা গন্ধরাজ লইয়া নাকের কাছে ঘুরাইতে ঘুরাইতে ধীরে বলিল, "আজ জন্মদিনে আপনার সঙ্গে একটা সম্পর্ক পাতাতে ইচ্ছে করছে।"

অজয় ভাবিল, ভালই হইল। হয়ত এই সম্পর্ক পাতানোর সূত্রে তাহাদের মধ্যে যে সম্পর্ক ক্রমে জটিল হইতে জটিলতর হইয়া চলিয়াছে তাহার একটা সহজ সমাধান হইয়া যাইবে। উদগ্রীব হইয়া বলিল, "সে বেশ ত। কি সম্পর্ক পাতাতে চান্ বলুন।"

বীণা একটু ভাবিয়া বলিল, "ঠিক বুঝতে পারছি না। আচ্ছা ভেবে দেখছি।"

অনেকক্ষণ নীরবে কাটিলে হঠাৎ সে মাথা ঝাড়া দিয়া বলিয়া উঠিল, "নাঃ, যেগুলো মনে পড়ছে তার একটাও মনে ধরছে না।"

অজয় আবার শঙ্কিত হইয়া উঠিল। পাছে অলক্ষিতে বিপদ্ কোনও দিক্ হইতে আসিয়া অকস্মাৎ ঘাড়ে পড়ে, এই ভয়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাড়াতাড়ি কহিল, "আমি বলি, আমি ত আপনার চেয়ে বয়সে বড়—"

বীণা বলিল, "থাক থাক, ঢের হয়েছে। এমনিতেই ত সর্দ্দারির জ্বালায় অস্থির, তার ওপর আবার বয়সে বড়র সম্পর্ক নিয়ে কাজ নেই।"

অজয় বলিল, "বয়সে ছোটর সম্পর্কই না হয় একটা নিচ্ছি।"

বীণা বলিল, "শুনুন। নিজেদের ফাঁকি দিলে চলবে না। এমন সম্পর্ক নিতে হবে যাকে জীবনে আমরা সত্য ক'রে তুলতে পারব। এইবার ভাবুন।"

অজয় এবারে ভাল করিয়া বীণার মুখের দিকে চাহিল। অন্তরের কি গভীর সরলতা এবং সত্যনিষ্ঠা হইতে সে এই কথা-কয়টি বলিল ভাবিয়া বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় তাহার মস্তক অবনত হইয়া আসিল। ইহার অন্তরে কোথাও কোনও আত্মপ্রবঞ্চনা নাই, যাহাকে সত্য বলিয়া অনুভব করে তাহাকে অকুণ্ঠিত ভাবে প্রকাশ করাই ইহার স্বভাব। ইহার নিকট হইতে কোন্ অকল্যাণ অজয় আশঙ্কা করিতেছে? যেখানে সত্য অনাবৃত সেখানে কোনও অকল্যাণ প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে না। বীণার সঙ্গে তাহার সম্পর্ক যাহাই হউক, সেই-সম্পর্কের মধ্যে কোনও অসত্য, কোনও অন্যায় কোনওদিন প্রশ্রয় পাইবে না, ইহা অনুভব করিয়া সে আশ্বস্ত হইল। সমস্ত মন সাহসে ভরিয়া বলিল, "তেমন সম্পর্ক আমাদের মধ্যে এখনই কি কিছু নেই?"

বীণা বলিল, "আছে নিশ্চয়। সেইটেরই একটা নাম খুঁজে বের করবার চেষ্টা করছি।"

অজয় বলিল, "বন্ধুত্বের সম্পর্ক?"

বীণা চুপ করিয়া রহিল। কিছুক্ষণ কাটিয়া গেলেও সে যখন কোনও কথা কহিল না তখন অজয় মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনার বুঝি মনে ধরছে না?"

বীণাও মৃদুস্বরেই কহিল, "মনে ধরা না ধরার ত কেবল কথা হচ্ছে না। আমি ভাবছিলাম, পৃথিবীতে বন্ধুত্বের সম্পর্ক সবচেয়ে কঠিন সম্পর্ক, আমাদের জীবনে আমরা তার মর্য্যাদা রাখতে পারব কিনা। বন্ধুত্বের ওপর দাবী যা তার কথা বোঝা সহজ, কারণ তার কোনো সীমা নেই। কিন্তু বন্ধুত্বের অধিকার বলতে যে কোনো জিনিসকেই বোঝায় না, তা কি সব সময় আমরা মনে রাখতে পারব?"

অজয়ও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া ভাবিল। বীণা বন্ধুত্বের এমন একতরফা ব্যাখ্যা কেন করিতেছে তাহা কিছু বুঝিতে না পারিয়াও সে কহিল, "চেষ্টা ত করতে পারব?"

বীণা উঠিয়া পড়িয়া বলিল, 'আচ্ছা বন্ধু, আজ থেকে চেষ্টা করা যাবে।"

অজয়ও উঠিল। কিন্তু হঠাৎ একটা বিভ্রাট ঘটিল। কিছুক্ষণ হইতে আকাশে মেঘসঞ্চার হইয়া জ্যোৎস্না ম্লান হইয়া আসিতেছিল, হঠাৎ গাঢ়বর্ণের মেঘে তাহা সম্পূর্ণভাবে আবৃত হইয়া গেল। বীণা বলিয়া উঠিল, "ঐ যাঃ।"

অন্ধকারের মধ্যে হইতে অজয় বলিল, "যেখানে আছেন দাঁড়িয়ে থাকুন, মেঘ কেটে যাওয়া পর্য্যন্ত।"

কিন্তু মেঘ কাটিল না। অন্ধকার গভীর হইতে গভীরতর হইতে লাগিল। বীণা বলিল, "এখন উপায়?"

অজয় বলিল, "বৃষ্টি যদি সুরু হয় তাহলেই বিপদ্। তার আগে যেমন ক'রে হোক বেড়িয়ে পড়তে হবে।" কিন্তু কথাটা শেষ হইতে না হইতে প্রবল বাতাসের সঙ্গে ফোঁটা ফোঁটা করিয়া বৃষ্টি পড়িতে সুরু হইল।

অন্ধকারে বীণাকে অস্পষ্ট একটু আভাসের মত দেখা যাইতেছিল, গায়ের চাদরটা লইয়া তাহার দিকে বাড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "এইটে ভালো ক'রে মুড়ি দিন।"

বীণা বলিল, "আপনি?"

অজয় ব'লিল, "আমার জন্যে ভাববেন না।"

কিন্তু বীণার জন্য ভাবিয়াও অজয় কিছুই সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিল না। বৃষ্টির বেগ বাড়িয়া চলিল, এবং বেশ বোঝা গেল অবিলম্বে কোথাও আশ্রয় না লইলে তাহাদের দুর্গতির একশেষ হইবে। বীণার গায়ের চাদর দেখিতে দেখিতে ভিজিয়া উঠিল।

হঠাৎ বিদ্যুতের আলোয় দেখা গেল ঘাটের চাতাল হইতে ভাঙা বাড়ীটার সিঁড়ি পর্য্যন্ত অস্ফুট একটি পথের রেখা রহিয়াছে। অজয় আর কিছুই চিন্তা করিল না, অন্ধকারে বীণার দিকে দক্ষিণ হাত বাড়াইয়া বলিল, "আমার হাতে হাত দিন।" বীণা তাহার প্রসারিত হাতে নিজের হাতটি স্থাপন করিলে, তাহাকে টানিয়া লইয়া সে দ্রুতবেগে সেই ভাঙা বাড়ীটার আশ্রয়ে গিয়া উঠিল। বৃষ্টি মুষলধারে নামিল।

গা হইতে ভিজা চাদরটা খুলিতে খুলিতে বীণা কলহাস্য করিয়া উঠিল। বলিল, 'বাবা, একে এই পেছল পথ, তার ওপর যা ক'রে আপনি টান দিলেন, আর একটু হলেই মুখ থুবড়ে পড়তে হত।"

অজয় বলিল, "মাপ করবেন, আপনাকে ভিজতে দে'খে আমার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছিল। কোথাও লেগে যায়নি ত?"

বীণা বলিল, "না। আপনি নিশ্চয় আমায় মনে মনে খুব গাল দিচ্ছেন।"

অজয় বলিল, "কেন, আপনাকে গাল দিতে যাব কেন?"

বীণা বলিল, "আপনাকে আমিই ত এনে এই বিপদে ফেল্‌লাম।"

অজয় বলিল, "এর মধ্যে আমার বিপদ্ আবার কোন্‌খানে? ভিজতে আমার ভালোই লাগে। আমি আপনার কথা ভাবছি।"

বীণা বলিল, "আমার কিন্তু খুব ভালো লাগছে। ভিজতেও ত বেশ ভালোই লাগছিল।"

অজয় হাসিয়া উঠিল। বলিল, "তাহলে শুধুশুধুই আপনাকে নিয়ে এই টানা-হেঁচড়াটা হল।"

বীণাও হাসিতে লাগিল। সেই অন্ধকারে জীর্ণ বাড়ীটার স্বল্পপরিসর আশ্রয়ের মধ্যে দুইজনে অত্যন্ত কাছাকাছি দাঁড়াইয়া আকাশ-পৃথিবীর অত্যন্ত নিবিড় নিরবকাশ আলিঙ্গনের মধ্যে তাহারা আবার তাহাদের চতুষ্পার্শ্বকে হারাইয়া ফেলিল। হাসিগল্পের স্রোত অফুরন্ত গতিতে বহিয়া চলিল। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎবিকাশের অবকাশে অজয় একএকবার বীণার সুন্দর হাস্যদীপ্ত মুখখানিকে দীপ্ততররূপে দেখিতে পাইতেছিল। আজ সমস্ত বিশ্বব্যাপী অন্ধ বিরূপতার মধ্যে ঐ একটিমাত্র মুখ এমন একটি বিশিষ্ট আত্মীয়তা লইয়া তাহার চোখে প্রতিভাত হইতেছিল, যে তাহার সম্বন্ধে শেষ কুণ্ঠার বাধাটিকেও অবলীলায় সে অতিক্রম করিল। এমন পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহাকে সে দেখিল, যেমন করিয়া ইতিপূর্ব্বে আর কোনও নারীকে সে দেখে নাই। এমনভাবে বীণার রূপরশ্মিতে নিজ অন্তরের সহস্রদীপে সে আগুন ধরাইল যেমন কখনও সম্ভব হইবে বলিয়া সে মনে করে নাই। বীণার হাসির ছোঁয়াচে তাহার সমস্ত চিত্ত হাস্যোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাহার মধ্যে কোনও বিচার-বিতর্ক সংশয়শঙ্কার জন্য তিলমাত্র স্থান রহিল না।

হঠাৎ আকাশ পৃথিবী কাঁপাইয়া চতুর্দ্দিকে আগুন ধরাইয়া ভীষণ শব্দে বজ্রপাত হইল। মনে হইল, জীর্ণ বাড়ীটা ধ্বসিয়া গেল। মনে হইল, তাহাদের দুইজনের মাঝখানে যেন বজ্র পড়িল। অজয়ের মনে হইল, কয়েক মুহূর্ত্ত তাহার সংজ্ঞা রহিল না। যখন জ্ঞান ফিরিয়া আসিল, দেখিল, বীণা প্রাণপণে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার বক্ষঃলগ্ন হইয়া আছে। একটুখানি সরিয়া বিদ্যুতের আলোয় তাহার মুখটি দেখিয়া লইতে গেল, কিন্তু বীণা অধিকতর শক্তিতে তাহাকে আঁকড়াইয়া ধরিল। অজয় পলকের মত দেখিল তাহার সদা-প্রফুল্ল হাস্যসমুজ্জ্বল মুখটি ভয়ের বিবর্ণতায় কুৎসিৎ হইয়া গিয়াছে। অপরিসীম করুণায় তাহাকে সে আরও কাছে টানিয়া লইয়া আশ্রয় দিল।

(ক্রমশঃ)

মহিলা-সংবাদ

স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসুর পৌত্রী, কলিকাতার ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত সুধাংশুমোহন বসুর কন্যা শ্রীমতী রমা বসু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এবার দর্শনশাস্ত্রে এম্‌-এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তিনি শতকরা পঁচাত্তর নম্বর পাইয়াছেন। এ-বিষয়ে যাঁহারা এ-যাবৎ প্রথম শ্রেণীর প্রথম হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে শ্রীমতী রমাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নম্বর পাইয়াছেন বলিয়া বিশ্বাস। শ্রীমতী রমা বসু আই-এ পরীক্ষায় দ্বিতীয় এবং বি-এ পরীক্ষায় দর্শনশাস্ত্রের অনার্সে সর্ব্বপ্রথম হইয়াছিলেন।

চব্বিশ পরগণা-নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিপদ দত্তের কন্যা শ্রীমতী চামেলী দত্ত এ-বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম্‌-এস্‌সি পরীক্ষায় পদার্থ-বিজ্ঞানে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীমতী চামেলী অনার্সসহ বি-এস্‌সি পরীক্ষা পাস করিয়া 'রায়-বাহাদুর অমৃতলাল মিত্র প্রাইজ' পাইয়াছিলেন।

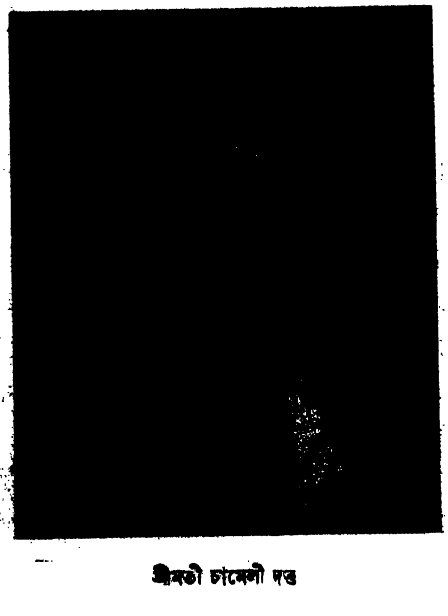
শ্রীমতী ভদ্রাদেবী মেহ্‌তা, জি-এ, পুণার মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয় হইতে চিত্র-বিদ্যা বিষয়ক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পি-এ উপাধি লাভ করিয়াছেন। গুজরাটী মহিলাদের মধ্যে শ্রীমতী ভদ্রা দেবী মেহ্‌তাই সর্ব্বপ্রথম এই পরীক্ষা পাস করিলেন।



শ্রীমতী ভদ্রা দেবী মেহ্‌তা,



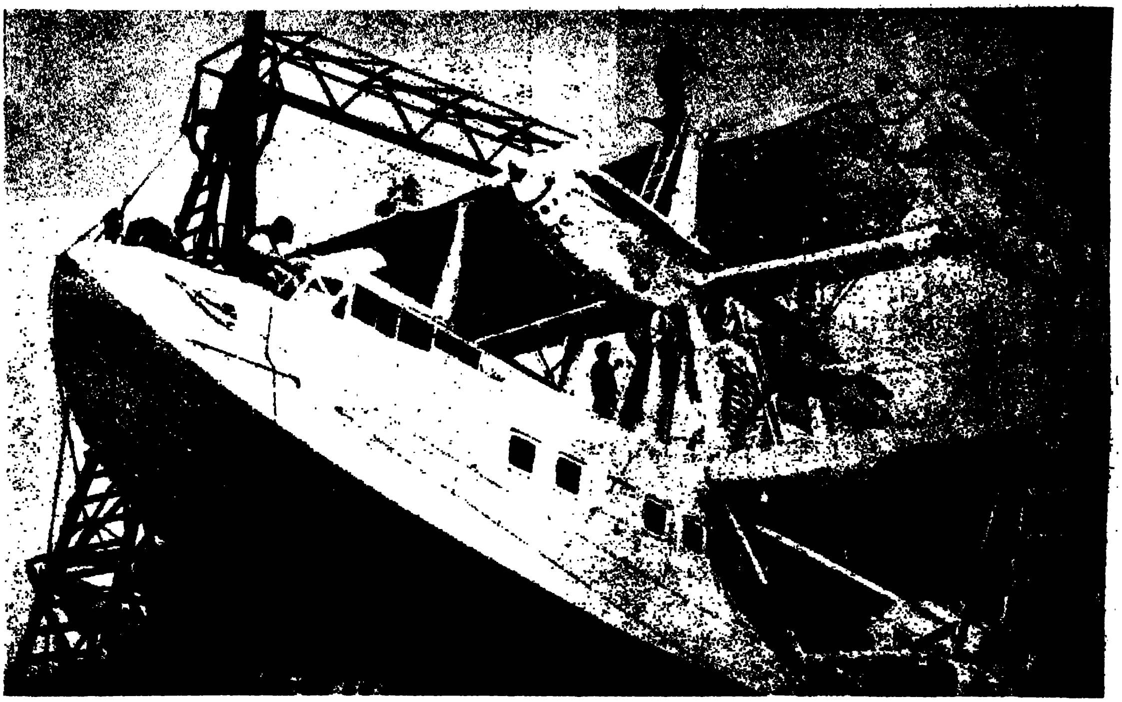
শ্রীমতী রমা বসু



শ্রীমতী চামেলী দত্ত

নূতনতম এরোপ্লেন—

সমুদ্রে যুদ্ধের জন্য বিলাতে এই এরোপ্লেনখানি নির্মিত হইয়াছে। ইহা আকাশেও উড়িতে পারিবে এবং সমুদ্রেও ভাসিতে পারিবে।



একটি বড় সমুদ্রগামী এরোপ্লেন

কয়লার তৈয়ারী বাড়ি—

আমরা কাঠের ও ইটের বাড়ি অনেক দেখিয়াছি। কিন্তু কয়লার যে বাড়ি হয় তাহা এ-যাবৎ আমাদের জানা ছিল না। সম্প্রতি আমেরিকার একটি শহরে সেখানকার বণিক্‌সংসদের জন্য কয়লার দ্বারা একখানি বাড়ি নির্ম্মিত হইয়াছে। চিত্র হইতে এই বাড়ির গঠনপ্রণালী বুঝা যাইবে।



কয়লার দ্বারা তৈরি বাড়ি

কাচ নির্ম্মিত ইষ্টকের বাড়ি—

এই ক্ষুদ্র পেট্রোল ষ্টেশনটি নি . াণ করিতে স্বচ্ছ কাচের ইট ব্যবহার করা হইয়াছে।



কাচের ইটের বাড়ি

বিলাতী-বেগুন গাছের দ্বারা বিষাক্ত গ্যাস পরীক্ষা—

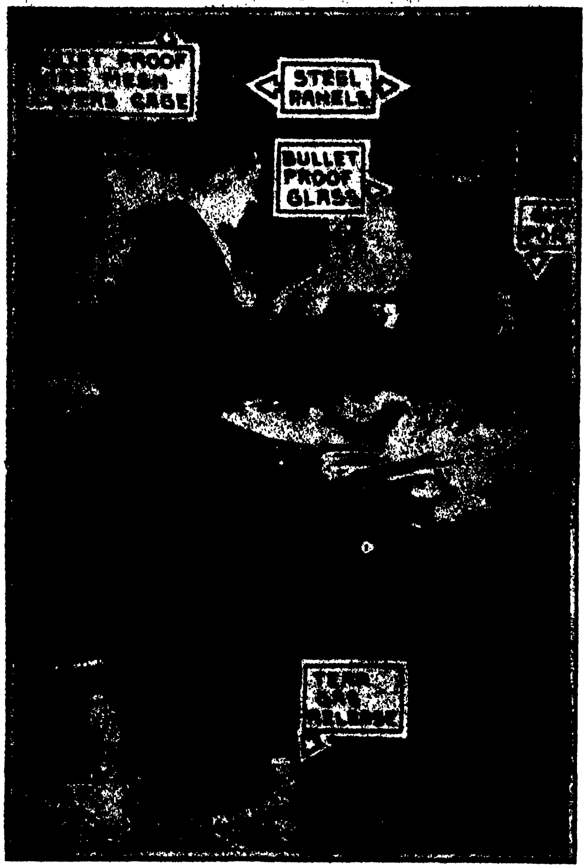
সম্প্রতি বিলাত হইতে যে ডাক আসিয়াছে তাহাতে প্রকাশ, বিষাক্ত গ্যাস বর্ত্তমান কিনা তাহা পরীক্ষার জন্ম ব্রিটিশ সাবমেরিন্ ও কয়লার খনিতে বিলাতী-বেগুনের গাছ ব্যবহৃত হয়। বিলাতী-বেগুনের গাছ মানুষের নাসিকার অপেক্ষা দুই শত গুণ, ক্যানারি পক্ষীর অপেক্ষা বাট হইতে এক শত গুণ এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট রাসায়নিক যন্ত্রের অপেক্ষা পঞ্চাশ গুণ অধিক গন্ধগ্রাহী। বিষাক্ত গ্যাস লাগিলে বিলাতী-বেগুন গাছের পাতা ঝরিয়া যায়।

নিরামিশাসী হিট্‌লার—

পৃথিবীর রাজনীতিজ্ঞদের মধ্যে অ্যাডল্‌ফ হিটলার সর্ব্বাপেক্ষা কঠোর পরিশ্রমী। শিকাগো শহরের 'টাইমস্' বলেন, "হিটলার ভীষণ পরিশ্রমের পরও বিশ্রাম করেন না—বিচিত্র রঙের এরোপ্লেনে জার্ম্মানীর নানা জায়গায় ঘুরিয়া বেড়ান। তিনি কখনও ধূমপান করেন না। ফলমূল, শাকসবজী, নারিকেল ও দুধ-ঘিই তাঁহার প্রধান খাদ্য।"

ব্যাঙ্কের ক্যাসিয়ারকে রক্ষা করিবার নূতন উপায়—

আমেরিকায় ব্যাঙ্কের ক্যাসিয়ারকে হত্যা করিয়া ডাকাতেরা বহু টাকা লুঠিয়া লইয়াছে। এখন ক্যাসিয়ারকে রক্ষা করিবার একটি উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। ক্যাসিয়ার এক খাঁচার মধ্যে থাকে। খাঁচাটি লোহার তার দিয়া ঘেরা। তারের ছিদ্র দিয়া বন্দুকের গুলি ঢুকিতে পারে না। লোককে দেখিবার জন্য ক্যাসিয়ারের সম্মুখে কাচ থাকে। এই কাচও গুলি



ব্যাঙ্কের ক্যাসিয়ারের ঘর

দ্বারা ভেদ করা যায় না। ক্যাসিয়ারের পায়ের কাছে অশ্রু-গ্যাস বর্ষণ করিবার একটি যন্ত্র থাকে। এই যন্ত্রট পা দিয়া চাপিলেই বাহিরের লোকদের উপরে অজস্রধারে গ্যাস বর্ষিত হয়। ইহাতে ডাকাতেরা অশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে অজ্ঞান হইয়া পড়ে।

পুস্তক পরিচয়

শঙ্করাচার্য্য—শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভৌমিক, এম্-এ, বি-এল প্রণীত। মূল্য ২॥০ আড়াই টাকা। প্রাপ্তিস্থান—আশুতোষ লাইব্রেরী, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

গ্রন্থখানি তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে মাধবাচার্য্য প্রণীত 'শঙ্করদিগ্বিজয়' নামক গ্রন্থ অবলম্বনে শঙ্করের জীবনী বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় ভাগে তাঁহার বেদান্ত ভাষ্যের সংক্ষিপ্ত সার বাংলায় দেওয়া হইয়াছে, মূল বেদান্ত সূত্রগুলিও সঙ্গে দেওয়া হইয়াছে। তাহা ছাড়া, সর্ব্ব বেদান্ত সিদ্ধান্তসারসংগ্রহ' নামক গ্রন্থ হইতেও অনেক শ্লোক অনুবাদ সহিত এই ভাগে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। তৃতীয় ভাগে শঙ্কররচিত কতকগুলি স্তোত্র সংগৃহীত হইয়াছে। সাধারণ পাঠক এই গ্রন্থখানিতে শঙ্করের সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় পাইবেন, সন্দেহ নাই।

শঙ্কর সম্বন্ধে ঐতিহাসিক এবং দার্শনিকদের মধ্যে অনেক বাদ-বিতণ্ডা হইয়াছে ও হইতেছে। সে সব সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থকার তাঁহার এই বইখানিকে পণ্ডাভারাক্রান্ত করিতে চাহেন নাই। এমন কি, শঙ্করের নামে প্রচলিত সমস্ত গ্রন্থাদির তালিকা সংগ্রহ করিয়া তাহার ভিতরে কোনগুলি শঙ্করের রচিত এবং কোনগুলি নয় এবং কেন—এসব বিচারও তিনি করিতে চাহেন নাই। কিন্তু সাধারণভাবে যাঁহারা শঙ্করের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু তাঁহাদের জিজ্ঞাসার উত্তর যে এই বইয়ে যথেষ্ট আছে, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

আজকাল বেদান্ত আলোচনার পরিসর ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিয়াছে—বিশেষতঃ শঙ্কর বেদান্তের দিকে অনেকেরই ঝোঁক দেখা যায়। এ ক্ষেত্রে এই বইখানার বহুল প্রচারই হওয়া উচিত।

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

আফ্রিকার জঙ্গলে—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র। আশুতোষ লাইব্রেরী—৫ নং কলেজ স্কোয়ার। মূল্য আট আনা। পৃঃ ১০১।

তিনটি অসমসাহসী ভারতীয় ছেলের এডভেঞ্চারের কাহিনী। আফ্রিকার জঙ্গলে গরিলা শিকার করিতে গিয়া তারা কতরকম যে বিপদে পড়িয়াছে তার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু শৌর্য্য বুদ্ধিমত্তা ও ক্ষিপ্রকারিতার গুণে সর্ব্বত্রই বিজয় লাভ করিল। ঘটনাগুলি রোমাঞ্চকর; পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া পারা যায় না। তা ছাড়া আফ্রিকার সম্বন্ধে শিক্ষণীয় বিষয়ও এত আছে যে, কেবলমাত্র শিশুরা নয়, অভিভাবক মহাশয়েরাও কতকটা উপকার পাইতে পারেন। ছেলেদের হাতে দিবার পক্ষে ইহা একখানা উৎকৃষ্ট বই।

কাশী—কুমারী লতিকা দেবী। জ্ঞান প্রিন্টিং ওয়ার্কস—৪৪ বাদুড় বাগান ষ্ট্রীট। মূল্য আট আনা। পৃঃ ৯১।

কাশীর পরিচয় পুস্তক। খুব সহজ ভাষায় লেখা। উল্লেখযোগ্য কোন বিষয় বাদ পড়ে নাই। বইখানা কাশী ভ্রমণকারীর কাজে আসিবে।

স্মৃতির দাম—শ্রীমণীন্দ্রনাথ মণ্ডল। প্রকাশক শ্রীশতদলকান্তি মণ্ডল, কশাড়িয়া, খেজরী পোঃ, মেদিনীপুর। মূল্য আট আনা। পৃঃ ১০০।

প্রথমেই পূর্ণপৃষ্ঠা গ্রন্থকারের ছবি; নীচে লেখা রহিয়াছে—দেশ, সমাজ ও সাহিত্যের সেবক শ্রীমণীন্দ্রনাথ মণ্ডল। বিজ্ঞাপনসম্বলিত ঐ ছবি ছাড়া এমন বই ছাপিবার আর কোন হেতু থাকিতে পারে না।

যোগ বিয়োগ—শচীন সেন। বাতায়ন পাবলিশিং হাউস, ১৪৪ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা। পৃঃ ১৬৪।

লেখকের ভাষা জোরালো ধারালো ছুরির মত মনে আসিয়া বিঁধে। চিন্তার মধ্যেও মৌলিকত্ব আছে। বাজারের গতানুগতিকার মধ্যে রচনার বৈশিষ্ট্য উপভোগ করিবার মত। কিন্তু উপন্যাস হিসাবে বইটি নিষ্কলঙ্ক নয়। কয়েক স্থানে লেখক নিজে মন্তব্য করিয়াছেন, পরে পাত্রপাত্রীর মুখেও সেই উক্তি বসাইয়া দিয়াছেন। ইহাতে চরিত্র জীবন্ত হইয়া উঠিতে পারে না। অনেক জায়গায় পাত্রপাত্রী বলিবার ঝোঁকে অবান্তর বিষয়ে আসিয়া পড়িয়াছে। মূল গল্পের সহিত যোগ না থাকায় সেখানে কথাবার্ত্তা অপেক্ষাকৃত অনুজ্জ্বল হইয়া রসভঙ্গ হইয়াছে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও লেখকের স্বকীয়তা পাঠককে বিমুগ্ধ করিবে।

শ্রীমনোজ বসু

ছোটদের বার্ষিকী—চতুর্থ বর্ষ, আশ্বিন ১৩৪০। সম্পাদক শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী। পপুলার এজেন্সী ১৬৩, মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১৲০।

এই বার্ষিক পুস্তকখানিতে নানাবিধ গদ্য ও পদ্য রচনা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া বহুসংখ্যক লেখক ও লেখিকার কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধ সম্পাদক মহাশয় সংগ্রহ করিয়াছেন। ফলে পুস্তকখানি ভিন্ন ভিন্ন বয়সের ছোট ছেলেমেয়েদের উপযোগী হইয়াছে। ইহা পড়িয়া তাহারা আনন্দ লাভ করিবে, এবং কিছু শিখিবেও। বহিখানির ছাপা, কাগজ, ছবি, বাঁধাই—সমস্তই উৎকৃষ্ট। প্রথম পৃষ্ঠাতেই আছে রবীন্দ্রনাথের ছড়া—

"—১—

"ক্ষান্ত বুড়ির দিদিশাশুড়ির
পাঁচ বোন থাকে কালনায়।
সাড়িগুলো তারা উনুনে বিছায়
হাঁড়িগুলা রাখে আলনায়।
কোন দোষ পাছে ধরে নিন্দুকে
নিজে থাকে তারা লোহাসিন্দুকে,
টাকাকড়িগুলো হাওয়া খাবে ব'লে
রেখে দেয় খোলা জানলায়,
নুন দিয়ে তারা ছাঁচি পান সাজে
চুন দেয় তারা ডালনায়॥"

র. চ.

এ বেলা ও বেলার গান—শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাসগুপ্ত প্রণীত। প্রকাশক—আশুতোষ লাইব্রেরী, ৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা; পটুয়াটুলী, ঢাকা।

[illegible] আটটি ছোট ছোট গল্প আছে। গল্পগুলি ছেলেমেয়েদের জন্য লেখা। [illegible] ভাষা [illegible] ও মিষ্ট। রচনাকৌশলও [illegible]! "[illegible]বরাল কেন [illegible]গা," "[illegible]কাটা [illegible]" গল্প শিশু-সাহিত্যের প্রথম শ্রেণীর রচনায় স্থান পাইতে পারে। প্রত্যেক গল্পের গোড়ায় ও মধ্যে দুইখানি ছবি আছে। ছবিগুলি যেন লেখার সহিত পাল্লা দিয়া চিত্র-শিল্পীর নিপুণতার পরিচয় দিতেছে।

সুন্দর রঙীন মলাট: ছাপা ও কাগজ ভাল। দাম আট আনা।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

[illegible]রাও—সখারাম গণেশ দেউস্কর প্রণীত। প্রকাশক শ্রীউপে[illegible] ঘর, ৫৮, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃঃ ১৪০, মূল্য বার আনা।

এই [illegible] লেখক মহারাষ্ট্রীয় ছিলেন, কিন্তু তিনি স্বদেশী যুগে বঙ্গ-ভাষায় [illegible] উদ্বোধক কতকগুলি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত "দেশের [illegible]" [illegible] বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। তাঁহার লিখিত বর্ত্তমান [illegible] বাজীরাওকে বাঙালীর কাছে বিশেষ পরিচিত করিয়া [illegible] পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল। আজিও এইরূপ [illegible] সুতরাং প্রকাশক ইহা পুনর্মুদ্রিত করিয়া বেশ [illegible]। ইতিহাস হইলেও এই গ্রন্থ পাঠকের কৌতূহল উদ্রেক করে। বিশেষতঃ মারাঠীভাষা হইতে অনূদিত বাজীরাও-এর বক্তৃতা ও চিঠিপত্রে [illegible] নিজের [illegible] কথা নিজের ভাষায় শুনিতে পাই। এই গ্রন্থের [illegible] বিশেষত্ব এই যে, মহারাষ্ট্রের স্থান ও ব্যক্তির নামগুলি [illegible] লিখিত হইয়াছে। পরিশিষ্টে বাজীরাও-এর গুরু শ্রীমদ্ ব্রহ্মেন্দ্র স্বামীর [illegible] আছে। আজকালকার ভারতীয় স্বরাজ-সাধনার দিনে মহারাষ্ট্র[illegible]রাজ্যের রক্ষা ও বিস্তারকর্ত্তা এই দুই গুরু-শিষ্যের ইতিহাস সকলেরই [illegible] কর্ত্তব্য।

শ্রীরমেশ বসু

মহাপ্রস্থানের পথে—শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল। আর্য্য পাবলিশিং হাউস, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট কলিকাতা। দাম দুই টাকা। পৃঃ ২৫৮।

কেদারবদরীর সম্বন্ধে অনেক বর্ণনা বাহির হইয়াছে, কিন্তু বর্ত্তমান গ্রন্থখানি সেই সকল গ্রন্থের সহিত সাধারণ গোষ্ঠীতে পড়ে না। তীর্থ ভ্রমণের সময়ে যে সকল সহযাত্রীর সহিত গ্রন্থকারের আলাপ-পরিচয় হইয়াছিল তাহাদের চরিত্রবর্ণনায় সমস্ত ভ্রমণের কাহিনীটি সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। কোন কোন চরিত্র যেন জীবন্ত হইয়া চোখের সামনে ফুটিয়া উঠে। মধ্যে মধ্যে লেখক যে সকল চিন্তাধারা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহার [illegible] আছে।

কিন্তু একটি কারণে অনেক স্থলে তাঁহার [illegible] বা ভাব দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। লেখকের মধ্যে ভাষায় ও ভাবে [illegible]প্রবণতা বর্ত্তমান। এ-বিষয়ে সংযম থাকিলে বইখানি হয়ত [illegible] শক্তিমান ও উপভোগ্য হইত। পথের কষ্টের কথাও যেন প্রয়োজনের অতিরিক্ত বলা হইয়াছে। গৌরীশঙ্কর অভিযানের মত ভ্রমণ হইলেও না হয় [illegible], কেদারবদরীর মত সুপরিচিত তীর্থে কষ্টের দীর্ঘ বর্ণনা [illegible] পীড়া দেয়, কারণ তাহার মধ্যে আজকাল আর কোনও রোমান্স নাই। বোধ হয় [illegible] একবার বলিয়াছিলেন, "The best friend of a writer is not his pen buf his eraser."

যাহাই হউক, সামান্য সামান্য দোষ ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও বইখানি বাংলা সাহিত্যে একটি সমাদৃত স্থান লাভ করিবে।

শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু

ভারত কি সভ্য?"—স্যর জন উড্রফের Is India Civilized গ্রন্থের মর্ম্মানুবাদ।

স্যর জন উড্রফ প্রণীত "Is India Civilized?" নামক গ্রন্থ ইংরেজী শিক্ষিত পাঠকের নিকট সুপরিচিত: উইলিয়ম আর্চার নামক ইংরেজ সাহিত্যিক "India and the Future (ভারতবর্ষ ও ভবিষ্যৎ) নামক গ্রন্থে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, ভারতীয় হিন্দুকে সভ্য বলিয়া গণনা করা যায় না। ইহার উত্তরে উড্রফ পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। এই গ্রন্থে তিনি অকাট্য যুক্তির দ্বারা দেখাইয়াছেন যে হিন্দুর ধর্ম্ম এবং সামাজিক আদর্শ অতি মহান, পৃথিবীর অপর কোনও জাতি এত বড় আদর্শ কল্পনা করিতে পারে নাই। তিনি ইহাও দেখাইয়াছেন যে, বাস্তব জগতে এই আদর্শ অনুসরণ করিয়াছে বলিয়াই হিন্দুজাতি এত দীর্ঘকাল ধরিয়া বাঁচিয়া আছে, পৃথিবীর অপর কোনও জাতি এতদিন ধরিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে নাই। হিন্দুর সভ্যতাকে জগতের চক্ষে উচ্চ করিয়া ধরিতে উড্রফের পুস্তক বিশেষ কার্য্যকরী হইয়াছে। হিন্দু যাহাতে আত্ম-প্রত্যয় না হারায় এজন্যও ঐ পুস্তক বিশেষ মূল্যবান। এত দিন কেবল ইংরেজী শিক্ষিত পাঠকই এই পুস্তক পাঠ করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। চট্টগ্রামের 'জ্যোতিঃ' পত্রিকার প্রবীণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীশঙ্কর চক্রবর্ত্তী মহাশয় ইহা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করিয়া বাঙালী পাঠকের হস্তে একটি বহুমূল্য গ্রন্থ উপহার দিয়াছেন। মূলের অর্থগৌরব অনুবাদে সম্পূর্ণভাবে রক্ষিত হইয়াছে। ভাষা অত্যন্ত প্রাঞ্জল হইয়াছে। আধুনিক ধর্ম্ম এবং সামাজিক সমস্যার উপর এই গ্রন্থখানি একটি অপূর্ব্ব আলোকপাত করিবে। এজন্য বর্ত্তমান সময়ে এই অনুবাদটি বিশেষ সময়োপযোগী হইয়াছে। প্রত্যেক বাংলা গ্রন্থাগারে এই পুস্তক আদরের সহিত রক্ষা করা উচিত। বাঙালীর ঘরে ঘরে এই পুস্তক সমাদৃত হইবে আশা করি। প্রাপ্তিস্থান—জ্যোতিঃ কার্য্যালয় চট্টগ্রাম এবং প্রধান প্রধান পুস্তকালয়। মূল্য ২৲। পুস্তকের ছাপা এবং বাঁধান উত্তম হইয়াছে।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়



ভারতবর্ষ

উড়িষ্যায় জলপ্লাবন—

সিন্ধুদেশ হইতে ব্রহ্মদেশ পর্যান্ত ভারতবর্ষের কোন-না-কোন প্রদেশে প্রতিবৎসরই জলপ্লাবন হইয়া থাকে। লোকের সম্পত্তিনাশ, জীবন-



উড়িষ্যায় প্লাবন



বিধ্বস্ত গ্রাম

নাশ, গো-মহিষাদি সমেত শস্যধ্বংস, পরিশেষে দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্লাবনের অনুসরণ করিয়া থাকে। এ-বৎসর উড়িষ্যার কটক জেলায় এইরূপ প্লাবন হইয়া গিয়াছে। লোকের ঘরবাড়ি, গো-মহিষাদি ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে, অনেকের জীবননাশও হইয়াছে, ভবিষ্যতে শস্যাদি হইবার আর আশা নাই। কটকজেলার জলপ্লাবনে যে ক্ষতি হইয়াছে তাহার একটি বর্ণনা

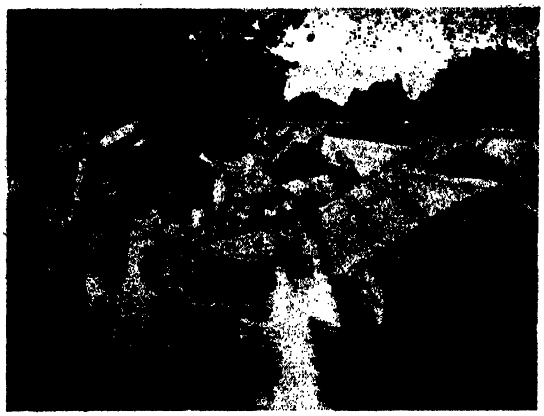


কয়েকজন লোক কাঠ অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে



আর একটি বিধ্বস্ত গ্রাম

সম্প্রতি বাহির হইয়াছে। তাহাতে প্রকাশ, এই জেলার ১৫৮টি গ্রাম বন্যায় প্লাবিত হইয়াছে, ৭২৯৭ খানি ঘর ধ্বংস হইয়াছে এবং ২৩৩টি



জলমগ্ন কটক শহর

গরু এবং ৯টি মানুষের জীবন নষ্ট হইয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ অনুমান আট লক্ষ টাকা। উড়িষ্যার এই বিপদে ভারতবাসী প্রত্যেকের যথাসাধ্য সাহায্য করা উচিত। নীচের ঠিকানায় টাকাকড়ি পাঠাইতে হইবে—



প্লাবনের দৃশ্য

Secretary or Treasurer, Orissa Flood Relief Committee, Nayasarak, P. O. Chandnichauk, Cuttack.

গয়া রামকৃষ্ণ কমিটির উদ্যম—

গত ১৯৩০ সালের ডিসেম্বর মাসে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী স্বামী নিগমানন্দ কা ঝাঁপলক্ষে গয়ায় অবস্থান কালে দরিদ্রের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করিবার অভিপ্রায়ে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। স্থানীয় সহৃদয় চিকিৎসক শ্রীযুক্ত বাবু শৈলেন্দ্রনাথ সেন-গুপ্ত, এইচ-এম্-বি মহাশয় দয়াপরবশ হইয়া উক্ত চিকিৎসালয়ের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। প্রত্যহ প্রায় ১০০ নরনারী চিকিৎসালয় হইতে ঔষধ পাইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত স্বামিজীর একান্ত চেষ্টায় নিম্নশ্রেণীর মধ্যে তিনটি নৈশ বিদ্যালয় গড়িয়া উঠে। এই তিনটি বিদ্যালয়ে বিনা বেতনে ছাত্রদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। দরিদ্র বালকদিগকে সাধ্যমত বিনা মূল্যে পুস্তকাদি দেওয়া হয়।

—

বাংলা

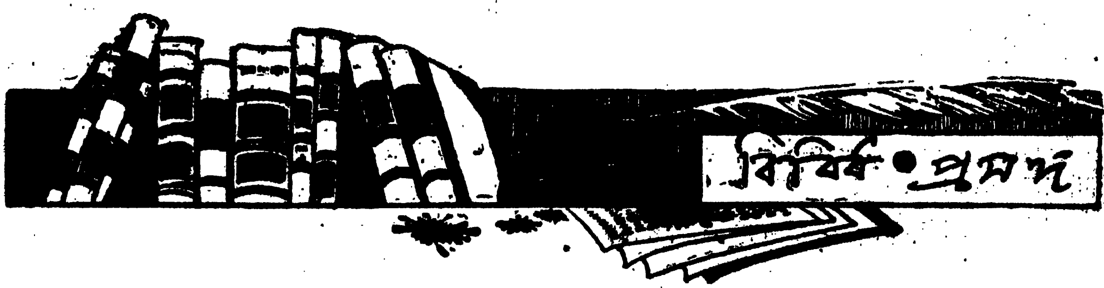
শ্রীনিকেতন শিক্ষাশিবির—

অধুনা বাংলা দেশের সর্ব্বত্র পল্লী সংগঠন কার্য্যের জন্য বিশেষ আগ্রহ জাগ্রত হইয়াছে এবং বিভিন্ন জেলায় পল্লীসমিতি স্থাপন করিয়া বহু কর্ম্মী কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই সকল কর্ম্মী যাহাতে পল্লীসমস্যা সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করিতে পারেন, তজ্জন্য শ্রীনিকেতনে প্রতিবৎসর শিক্ষা-শিবিরের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। এ-যাবৎ ১৯৫ জন কর্ম্মী এখান হইতে শিক্ষালাভ করিয়া গিয়াছেন।

এ বৎসর ৫ই অক্টোবর হইতে ৩১শে অক্টোবর (১৯৩৩) পর্য্যন্ত একটি শিক্ষা-শিবিরের ব্যবস্থা করা হইতেছে। শিক্ষা ও আহারাদির জন্য প্রত্যেক শিক্ষার্থীর মোট ব্যয় ১২৲ টাকা হিসাবে পড়িবে। নিম্নে শিক্ষিতব্য বিষয়গুলির উল্লেখ করা হইল :—

১। পল্লীসংগঠনের আদর্শ।
২। পল্লী-স্বাস্থ্য, সংক্রামক ব্যাধি এবং প্রাথমিক চিকিৎসা।
৩। পল্লীর প্রাথমিক শিক্ষা।
৪। সমবায় সংগঠন নীতি।
৫। ব্রতী সংগঠন।
৬। কুটীরশিল্প (ফিতা ও আসন বয়ন এবং রঙের কাজ)। ইহা ব্যতীত বিশ্বভারতীর খ্যাতনামা অভিজ্ঞ কর্ম্মিগণ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে প্রতি সন্ধ্যায় ছাত্রদের নিকট বক্তৃতা করিবেন।

১। প্রাচীন ভারতে পল্লীসংগঠন—বক্তা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন, এম-এ, ২। পল্লীসমস্যার গবেষণা—ডাঃ আমীর আলী, এম-এস-সি, পি-এইচ-ডি, ৩। ইউরোপে ও ভারতে পল্লীসংগঠন আন্দোলন—শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষ, ৪। পল্লীর শিল্পকলা—শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু, ৫। যুগোস্লাভিয়ার সমবায় পদ্ধতিতে স্বাস্থ্যোন্নতির প্রচেষ্টা—ডাঃ এইচ, টীম্বার্স, এম-ডি, ডি-টি-এম, ৫। পাশ্চাত্যে বালক সঙ্ঘ—ডাঃ পি সি পাল, বি-এস-সি, পি-এইচ-ডি। শিক্ষার্থীদিগকে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করিতে হইবে। সম্পাদক—পল্লী সেবাবিভাগ, সুরুল—পোঃ বোলপুর, বীরভূম।



অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত

বিলাতী ডেলী মেল ও মর্নিং পোষ্ট এবং অন্য কোন কোন কাগজ মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেটের হত্যা হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে যে, উক্ত হত্যা, "আইন ও শৃঙ্খলারক্ষা" দেশী মন্ত্রীদের হাতে হস্তান্তরিত করিবার প্রতিকূলে, চূড়ান্ত ও অকাট্য যুক্তি—বিশেষ করিয়া বাংলা দেশে। যদি ভারতীয় সব প্রদেশে—বিশেষ করিয়া বাংলা দেশে—পুলিস ও শাসন বিভাগের ভার দেশী মন্ত্রীদের হাতে বরাবর আজ পর্য্যন্ত থাকিত এবং যদি তাঁহাদের আমলে এই প্রকার হত্যা নিবারিত না হইয়া ঘটিতে থাকিত, তাহা হইলে ডেলী মেল ও মর্নিং পোষ্টের সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত মনে করা চলিত, এবং ইহা বলা সঙ্গত হইত, যে, যেহেতু দেশী লোকদের অধীনস্থ পুলিস ও শাসন বিভাগ বিপ্লববাদ, সন্ত্রাসবাদ ও রাজনৈতিক হত্যা বন্ধ করিতে পারে নাই, অতএব অতঃপর ঐ বিভাগের ভার আর তাহাদের হাতে ন্যস্ত থাকিবে না। কিন্তু এ পর্য্যন্ত—বিশেষ করিয়া বঙ্গে—"আইন ও শৃঙ্খলারক্ষা"র ভার দেশী মন্ত্রীদিগকে দেওয়া হয় নাই, সুতরাং বৈপ্লবিক চেষ্টা দমনে তাঁহাদের শক্তির কোন পরীক্ষা হয় নাই। অতএব, তাঁহাদের হাতে ঐ কাজের ভার পড়িবার বিরুদ্ধে কোন তথ্য বা যুক্তি উপস্থিত করা যায় না। পক্ষান্তরে, এ পর্য্যন্ত বিপ্লববাদ বিনাশের ও শান্তিরক্ষার ভার বরাবর ইংরেজ রাজপুরুষদের হাতে আছে। তাঁহারা এ পর্য্যন্ত রাজনৈতিক হত্যা বন্ধ করিতে পারেন নাই। সুতরাং এখন বরং ইহা বলাই যুক্তিসঙ্গত হইবে, যে, তাঁহাদিগকে তাঁহাদের যোগ্যতা প্রমাণ করিবার সুযোগ সিকি শতাব্দীর উপর ব্যাপিয়া দেওয়া হইয়াছে, এখন দেশী মন্ত্রীদিগকে সেই সুযোগ দেওয়া হউক।

এখানে মনে রাখিতে হইবে, যে, বিপ্লববাদের উচ্ছেদ সাধনার্থ দুই দিক্ দিয়া কাজ করা দরকার। প্রথম, দমনাত্মক কাজ; দ্বিতীয়, দেশের অধিবাসীদের মন প্রগতির অনুকূল নানা কাজে চালিত করিবার নিমিত্ত তাহাদিগকে রাষ্ট্রীয় সমুদয় ব্যাপারে যথেষ্ট ক্ষমতা প্রদান। এ পর্য্যন্ত কেবলমাত্র, বা অন্ততঃ প্রধানতঃ, দমনাত্মক উপায়সমূহই অবলম্বিত হইয়াছে, এবং তাহাতে দেশী লোকেরা যথেষ্ট বুদ্ধি, সাহস ও পদোচিত কর্ত্তব্যপরায়ণতা দেখাইয়াছে। বড় বড় বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্র আবিষ্কার, বেআইনী ভাবে ক্রীত, নির্ম্মিত ও রক্ষিত বন্দুক বোমা আদি আবিষ্কার, এবং বৈপ্লবিক আসামী গ্রেপ্তার দেশী পুলিস কর্ম্মচারীরাই করিয়াছে। সুতরাং দমনাত্মক কাজে দেশী লোকদের যোগ্যতা প্রমাণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় উপায় এ পর্য্যন্ত অবলম্বিত হয় নাই। তাহা অবলম্বন করিতে হইলে দেশী মন্ত্রীরা ইংরেজ রাজপুরুষদের চেয়ে যোগ্যতর পরামর্শদাতা ও কর্ম্মী হইবেন।

ডেলী মেল ও মর্নিং পোষ্ট পরিচালকদের মত রাজনৈতিক মতওয়ালা ইংরেজরা সন্দেহ করে, যে, ব্যবস্থাপক সভার নিকট দায়ী মন্ত্রীরা বৈপ্লবিক চেষ্টা দমনে পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করিবেন না, কারণ তাহা করিলে তাঁহারা ব্যবস্থাপক সভার বিশ্বাস এবং মন্ত্রিপদ হারাইবেন। এরূপ সন্দেহের সোজা মানে এই, যে, ভবিষ্যৎ ব্যবস্থাপক সভার সদস্যেরা বিপ্লবীদের সহায় বা প্রশ্রয়দাতা হইবেন, এবং দেশের লোকেরা ঐরূপ সদস্য-দিগকেই অধিকাংশ স্থলে নিজেদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবে। তাহাই যদি হয়, তাহার অর্থ হইবে এই, যে, ভবিষ্যতে গবর্ন্মেণ্টকে বিপ্লবপ্রার্থী অধিকাংশ জনগণের মতের বিরুদ্ধে বিপ্লবচেষ্টা দমন করিতে হইবে। দেশের অধিকাংশ লোক কখনও বিপ্লব চাহিবে কিনা, তাহা বলিতে আমরা অসমর্থ, এবং তাহা চাহিলে সেরূপ অবস্থায় গবর্ন্মেণ্ট বিপ্লববাদ দমন করিতে পারিবেন কিনা, তাহাও বলিতে পারি না। বর্ত্তমানে দেখা যাইতেছে, যে, সমুদয় সংবাদপত্র রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের বিলোপ চাহিতেছে, এবং সভা-

সমিতিতেও তাহার নিন্দা হইতেছে। তাহা সত্ত্বেও ডেলী মেল ও মর্নিং পোষ্টের দল উপরে বিবৃত সন্দেহ করে বলিয়া আমাদের মনে হয়। আমরা এরূপ সন্দেহ বর্ত্তমান অবস্থাতে ভিত্তিহীন মনে করি। ভবিষ্যতে যদি জনসাধারণ যথেষ্ট রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পায়, তাহা হইলে উহার অমূলকত্ব সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হইবে।

বিলাতী ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ানের মতে রাজনৈতিক হত্যা-কাণ্ড শাসনসংস্কারের প্রতিকূল কোন যুক্তির ন্যায্যতা প্রমাণ করে না।

ম্যাজিষ্ট্রেট-হত্যা সম্বন্ধে মহাত্মাজীর মত

মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট বার্জ সাহেবের হত্যা সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধীর মত জিজ্ঞাসা করায় তিনি এসোসিয়েটেড্ প্রেসের প্রতিনিধিকে ৩রা সেপ্টেম্বর বলেন :—

"It is needless for me to redeclare my absolute faith in non-violence and my utter disbelief in violence as a method for gaining political rights or political freedom. I, therefore, cannot but deeply deplore the assassination of the District Magistrate of Midnapur."

তাৎপর্য্য। "রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার কিংবা রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করিবার প্রণালী ও উপায়রূপে অহিংসাতে আমার একান্ত ও পূর্ণ বিশ্বাস এবং বলপ্রয়োগ ও হিংসায় সম্পূর্ণ অবিশ্বাস পুনর্ব্বার ঘোষণা করা আমার পক্ষে অনাবশ্যক। অতএব, আমি মেদিনীপুরের জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের হত্যার জন্য গভীর দুঃখ প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারি না।"

তিনি ঠিকই বলিয়াছেন।

এসোসিয়েটেড্ প্রেসের লোককে তিনি এই কথাগুলি ছাড়া আরও কিছু বলিয়াছিলেন। তাহা বাংলা দেশের কাগজগুলিতে বাহির হয় নাই, অন্যান্য প্রদেশের কাগজগুলিতে বাহির হইয়াছে দেখিতেছি। সেই কথাগুলিতে রাজনৈতিক হত্যার বিন্দুমাত্রও, সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ, সমর্থন বা দোষক্ষালন ছিল না—তাহা গান্ধীজীর পক্ষে অসম্ভব। তাহাতে ছিল, সন্ত্রাসবাদের কিছু উৎপত্তিব্যাখ্যা ও গবর্মেণ্টের কিছু সমালোচনা। তাহা মুদ্রিত করা ব্রিটিশ ভারতীয় আইন অনুসারে বেআইনী হইলে কোন প্রদেশেই মুদ্রিত হইত না, কিন্তু কেবল বাংলা দেশেই তাহা মুদ্রিত হয় নাই। ইহা হইতে অনুমিত হয়, যে, আইন বহিতে যাহা লেখা আছে তাহা পুঁথিগতভাবে সব প্রদেশের জন্য অভিপ্রেত হইলেও, প্রয়োগের বেলায় বাংলা দেশে কঠোরতর প্রয়োগ হয়।

রাজনৈতিক হত্যার জন্য মেদিনীপুরের দুর্নাম হইয়াছে। তাহা তাহাকে ভুগিতে হইবে। অহিংস অসহযোগ করিয়া সহায়সম্বলহীন সুদক্ষ নেতৃহীন বহুসংখ্যক গ্রাম্যলোক মেদিনীপুর জেলায় বারদোলী অপেক্ষাও যে অধিক দুঃখ ভোগ করিয়াছে, তাহার জন্য সহানুভূতি তাহারা কার্য্যতঃ মহাত্মা গান্ধীর নিকট হইতেও পায় নাই। পাইলে হয়ত মেদিনীপুরে সন্ত্রাসবাদ এত প্রবল হইত না।

কলিকাতায় স্বদেশী প্রদর্শনী

গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর কলিকাতার ওএলিংটন স্কোয়্যারে স্বদেশী জিনিষের প্রদর্শনী খোলা হইয়াছে। উহা এক মাস খোলা থাকিবে। দেখিতে খরচ কেবল চারি পয়সা। সুতরাং সকলেরই অন্ততঃ একবার গিয়া দেখা উচিত। পূজার বাজার করিবার সুবিধাও সেখানে আছে। ডাঃ স্যর নীলরতন সরকারের এই প্রদর্শনী খুলিবার কথা ছিল। ডুমরাওনের মহারাজার চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে হঠাৎ চলিয়া যাইতে হওয়ায় তাঁহার সহধর্ম্মিণী এই কাজ করেন। তাঁহাকে তাহা করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া কলিকাতার মেয়র শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু বলেন :—

স্বদেশী মন্ত্রের সাধনা এই বাঙ্গলা দেশেই প্রথম সুরু হয়।

বিগত ১৯০৬ সালে এই বাঙ্গলাই একান্তভাবে স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারে আত্মনিয়োগ করিয়াছিল; ভারতের অন্যান্য দেশ তখন তাহার সঙ্গে একত্র গমন করিতে পারে নাই। বলিতে কি 'স্বদেশী ব্রত' বাঙ্গলার নিজস্ব সম্পদ। বর্ত্তমানে এই প্রদর্শনীর যেরূপ বিরাট আয়োজন হইয়াছে, তেমন আর বহুকাল হয় নাই। পূজার পূর্ব্বে যখন প্রত্যেকেই অল্পবিস্তর নূতন দ্রব্যাদি ক্রয় করেন, তখন এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন অতীব সময়োপযোগী হইয়াছে। স্বদেশী প্রদর্শনীতে স্বদেশী মন্ত্রের প্রচার, স্বদেশীর আলোচনা এবং স্বদেশী দ্রব্য ও ব্যবসায়ীর সহিত পরিচয়,—সকলই সহজ হয়। বর্ত্তমান প্রদর্শনীতে প্রায় ২২৫টি ষ্টল খোলা হইয়াছে, প্রত্যেকটিই সুসজ্জিত। শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের দিক হইতে এই প্রদর্শনীর মূল্য অনেক; 'চার্ট' এবং 'মডেল' সাহায্যে তাহা বুঝাইয়া দিবার সুবন্দোবস্ত হইয়াছে। বেকার-সমস্যা সমাধানেও এই প্রদর্শনী সাহায্য করিবে; কি করিয়া অতি সহজে অতি অল্পব্যয়ে কুটীর-শিল্পের বিস্তার করা যায়, তাহা এই প্রদর্শনীতে বুঝাইয়া দেওয়া হইবে। সকলের আশীর্ব্বাদ এবং সহযোগিতা একান্ত আবশ্যক।

স্বদেশী জিনিষ ব্যবহারের ও উৎপাদনের, উভয় চেষ্টাই বাংলা দেশে হইয়াছে, কিন্তু কোন চেষ্টাই এখনও যথেষ্ট পরিমাণে হয় নাই। তাহার মধ্যে আবার ব্যবহারের চেষ্টা যত হইয়াছে, উৎপাদনের তত নয়। 'ব্যবহার' সম্বন্ধে অন্যান্য প্রদেশ অন্ততঃ প্রথম প্রথম বাংলার সমকক্ষ হয় নাই

বটে, কিন্তু 'উৎপাদন' বিষয়ে বাংলা অনগ্রসর থাকায় বোম্বাইয়ের মিলওয়ালারা কাপড় বেচিয়া বাংলা দেশ হইতে কোটি কোটি টাকা পাইয়াছে। বেশী দাম দিয়া বোম্বাইয়ের কাপড় কিনিয়া বাঙালীরা বোম্বাইকে ধনী করিয়াছে।

লেডী সরকার তাঁহার অভিভাষণে বলেন,

আর্থিক দুর্য্যোগের তীব্র পেষণে নিষ্পেষিত হইয়া আমাদের দেশের কত হতভাগ্য নরনারী অভাবে, অনাহারে, অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, তাহা অবর্ণনীয়। ইহার একমাত্র প্রতিকার শিক্ষার বিস্তার এবং শিল্পের প্রসার।

বিদেশী পণ্য বর্জ্জনই স্বাদেশিকতার যথেষ্ট পরিচয় নয়। স্বদেশী জিনিষ প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত করিয়া লোকের মনে উৎসাহ বর্দ্ধন করা এবং অলস ও অকর্ম্মণ্য জীবনের দুর্দ্দশা দূর করাই আসল স্বাদেশিকতা। স্বদেশী প্রচারই শিল্পপ্রদর্শনীর মুখ্য উদ্দেশ্য। আমাদের জীবনমরণের এই সন্ধিক্ষণে আমাদের সকলেরই বিলাসসামগ্রী পরিত্যাগ করিয়া মায়ের দেওয়া মোটা ভাত আহার করিয়া ও মোটা কাপড় পরিধান করিয়া শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অর্থোন্নতি করার জন্য দৃঢ় মনে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে। স্বদেশী ব্যতীত অন্য পথ নাই।

ভারতীয় কুটীরশিল্প সম্বন্ধে তিনি বলেন :—

বিদেশী বণিকদের লুণ্ঠননীতির ফলে আর্থিক জগতে যে দুর্য্যোগের সৃষ্টি হইয়াছে, আন্তর্জ্জাতিক যুদ্ধবিগ্রহ, ধনিক ও শ্রমিকদের অবিরাম বিবাদ তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল। আমাদের অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের আদর্শ ও কার্য্যপ্রণালীর মধ্যে অপর দেশের বাজার লুণ্ঠন করিবার প্রবৃত্তি পোষিত হয় না। ভারতের কুটীরশিল্পে শ্রমিকের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্য আরাধনা করিবার ইচ্ছা পূর্ণবিকাশ লাভ করিয়াছে। আমাদের দেশে ব্যবসা, বাণিজ্য, শিল্প প্রভৃতির যে বিস্তার-প্রচেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে তাহার মূলীভূত কারণ হইতেছে দেশের দারিদ্র্য দূর করা, দেশকে অবনতির পথ হইতে রক্ষা করা। অপরের অনিষ্ট না করিয়া নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখাই আমাদের বৈশিষ্ট্য, আমাদের উদ্দেশ্য।

তিনি ঠিকই বলিয়াছেন, যে,

বাঙ্গালীকে বাঙ্গালী রক্ষা না করিলে কে রক্ষা করিবে? আমাদের ভবিষ্যদ্বংশীয় তরুণতরুণীদিগকে ইহাই বলিতে চাই, যে, তাঁহারা যেন ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া স্বাধীনভাবে জীবনসংগ্রামে জীবিকানির্ব্বাহের উপায় নির্দ্ধারণ করিতে শেখেন। অন্ধ অনুকরণের যুগ চলিয়া গিয়াছে। এই ভীষণ প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার দিনে আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা একান্ত আবশ্যক।

—

আলোআর রাজ্যে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ

আলোআরের মহারাজা স্বীয় রাজ্য হইতে অস্পৃশ্যতা উঠাইয়া দিয়াছেন। ইহা সুসংবাদ। ইহার বিস্তারিত বৃত্তান্ত জানিতে কৌতূহল হয়।

—

বঙ্গে নারীহরণ ও নারীনিগ্রহ

১৯৩২ সালের ২৫শে আগষ্ট বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন চৌধুরী মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তরে তখনকার স্বরাষ্ট্রসচিব রীড সাহেব বঙ্গে নারীহরণ সম্বন্ধে একটি বিস্তারিত বর্ণনাপত্র সভার লাইব্রেরী-টেবিলে স্থাপন করেন। প্রত্যেক জেলার সংখ্যাবিশিষ্ট এরূপ সরকারী বর্ণনাপত্র পরে বা পূর্ব্বে আর কখনও দেওয়া হইয়াছে বলিয়া আমরা অবগত নহি। দুঃখের বিষয় উহা বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সরকারী কার্য্যবিবরণ পুস্তকে মুদ্রিত হয় নাই, উহার কোন কোন অংশ সমসাময়িক খবরের কাগজে দেওয়া হইয়াছিল। উহা হইতে সন ১৩৩৯ সালের ১৬ই ভাদ্রের "সঞ্জীবনী"তে উদ্ধৃত একটি তালিকা হইতে জানা যায়, যে, ১৯২৬,১৯২৭, ১৯২৮,১৯২৯,১৯৩০ ও ১৯৩১ সালে বঙ্গে মোট নারী-নিগ্রহের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৮২৬, ৯১৫, ৯৭৯ ১,০৫৩, ৯০৪ ও ৯৩৫। বর্ত্তমান বৎসরের ২২শে আগষ্ট বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় একটি প্রশ্নের উত্তরে বর্ত্তমান স্বরাষ্ট্রসচিব প্রেন্টিস্ সাহেব বলেন, যে, ১৯৩২ সালে মোট ২৬০টি নারীহরণের অভিযোগ পুলিসের নিকট পৌঁছে। কিন্তু তাহার আগের ছয় বৎসরের কোন বৎসরেই এইরূপ অভিযোগের সংখ্যা ৮২৬এর কম ছিল না। ১৯৩১ সালে ছিল ৯৩৫; তাহার পর বৎসরই কমিয়া একেবারে ২৬০টা। ইহা কি প্রকারে হইল? আর যদি প্রেন্টিস্ সাহেবের প্রদত্ত ১৯৩২ সালের নারীহরণ-অভিযোগের সংখ্যা ঠিকই হয়, তাহা হইলে যখন এ-বৎসর ঐ দিনই ২২শে আগষ্ট শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রশ্ন করেন,

"Is the Hon'ble Member aware that this class of crime is on the increase in Bengal ?"

"মাননীয় সভ্যমহোদয় কি জানেন, যে, এই শ্রেণীর অপরাধ বঙ্গে বাড়িতেছে ?"

তখন প্রেন্টিস্ সাহেব উত্তরে কেন বলিলেন,

"The figures fluctuate. They do not justify the definite conclusion that this class of crime is on the increase."

"সংখ্যাগুলা বাড়ে কমে। তাহা হইতে স্পষ্ট এই সিদ্ধান্ত করা যায় না, যে, এই শ্রেণীর অপরাধ বাড়িতেছে।"

প্রেন্টিস সাহেবের বলা উচিত ছিল, "১৯২৬ হইতে ১৯৩১ পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর অভিযোগের সংখ্যা ছিল আট শতের উপর, ১৯৩২এ হইয়াছে ২৬০; অতএব দেখা যাইতেছে, যে, অভিযোগের সংখ্যা খুব কমিয়াছে।" তিনি তাহা না বলায় এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না, যে, তিনি হয় রীড সাহেবের প্রদত্ত সংখ্যাগুলির বিষয় অবগত

ছিলেন না, কিংবা নিজের প্রদত্ত সংখ্যার উপর তাঁহার নিজেরই আস্থা ছিল না। আমাদের মনে হয়, রীড্ সাহেব যখন কোন একটা বৎসরের সংখ্যা দেন নাই, ক্রমাগত ছয় বৎসরের সংখ্যা দিয়াছিলেন এবং সেই ছয় বৎসরের সর্ব্বনিম্ন সংখ্যা ৮২৬ ও সর্ব্বোচ্চ সংখ্যা ১০৫৩ এবং প্রেন্টিস্ সাহেব কেবল এক বৎসরের (১৯৩২ এর) সংখ্যা দিয়াছেন ও তাহা ১৯৩১এর সংখ্যা ৯৩৫ হইতে কমিয়া একেবারে ২৬০এ দাঁড়াইয়াছে, তখন তাঁহার প্রদত্ত সংখ্যার শুদ্ধতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

অনেক দিন হইতে খবরের কাগজে বার-বার বলা হইতেছে, যে, নারীহরণের সংখ্যা বাড়িতেছে এবং বর্ত্তমান ফৌজদারী কার্য্যবিধি ও দণ্ডবিধি আইনের ব্যবস্থায় পুলিসের দ্বারা ঐরূপ অপরাধের দমন ও নিবারণ যথেষ্ট রূপ হইতেছে না। এ অবস্থায় উচ্চতর রাজপুরুষদের কাছে আসল সংখ্যার চেয়ে কম সংখ্যা পৌঁছা আশ্চর্য্যের বিষয় হইবে না। খবরের কাগজে এই অভিযোগ অনেকবার পড়িয়াছি, যে, অনেক জায়গায় অনেক সময় পুলিস এরূপ অভিযোগ লিপিবদ্ধ করে না। ব্যবস্থাপক সভায় প্রদত্ত সংখ্যা প্রকৃত সংখ্যা অপেক্ষা কম হইবার ইহাও একটা কারণ হইতে পারে।

কারণ যাহাই হউক, ব্যবস্থাপক সভায় কথিত সরকারী সংখ্যা নিশ্চয়ই ঠিক্ হইবে, ভিন্ন ভিন্ন নারীরক্ষাসমিতিগুলি যেন এরূপ মনে করিয়া নিশ্চিন্ত না-থাকেন। প্রত্যেকটি সমিতি তাঁহাদের এক এক জন কর্ম্মীর উপর এই ভার দিয়া রাখুন, যে, তিনি প্রত্যহ দৈনিক ও সাপ্তাহিক সংবাদপত্র হইতে নাম ধাম সহ এরূপ অভিযোগের একটি তালিকা প্রস্তুত করিবেন। তদ্ভিন্ন, খবরের কাগজে উঠে নাই, কিংবা পুলিসের ডায়েরীতে লিখিত হয় নাই, এরূপ ঘটনার তালিকাও ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মী যেন প্রস্তুত করেন।

—

নারীহরণের প্রতিকার

গবর্মেণ্টের আন্তরিক সহায়তা ব্যতিরেকে নারীহরণের যথেষ্ট প্রতিকার দুঃসাধ্য এবং সেরূপ সহায়তা পাইবার জন্য বিধিমত চেষ্টা বরাবর করিতে হইবে। কিন্তু কেবল গবর্মেণ্টের চেষ্টাতেই সম্পূর্ণ ফল পাওয়া যাইবে না। সর্ব্বসাধারণের সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ চেষ্টার একান্ত আবশ্যক। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কেই চেষ্টিত হইতে হইবে। উভয় সম্প্রদায় একযোগে কাজ করিলে আশু ফললাভের সম্ভাবনা। কিন্তু একযোগে কাজ করিবার অপেক্ষায় বসিয়া থাকিলে চলিবে না। প্রত্যেক শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের লোকেরা চেষ্টা করিতে থাকুন।

অনেক মোকদ্দমা হইতে অন্তঃপুরে অনেক বধূর উপর পৈশাচিক অত্যাচারের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। ইহার সামাজিক প্রতিকার কি হইতেছে?

হিন্দু সমাজের সামাজিক শাসন সম্বন্ধে আমাদের কিছু জ্ঞান আছে। এই জন্য আমরা যাহা বলিতে যাইতেছি, তাহা হিন্দু সমাজ সম্বন্ধে। আমাদের মধ্যে দেখা যায়, কোন পুরুষ মানুষ ব্যভিচার ও নারীহরণাদি দোষে দোষী হইলে তাহার সমাজ-বহিষ্কার ও পাতিত্য সব স্থলে সুনিশ্চিত নহে; তাহার দোষ আদালতে প্রমাণিত হইয়া গেলেও সব স্থলে সুনিশ্চিত নহে। আর, যদি দোষী ব্যক্তির নামে কোন মোকদ্দমা না হয়, বা মোকদ্দমায়, দোষ সত্ত্বেও, যদি আইনের মারপ্যাঁচে লোকটা খালাস পায়, তাহা হইলে ত কথাই নাই। সে বুক ফুলাইয়া সমাজে বিচরণ করিতে পারে। দোষী ব্যক্তির ধনবল থাকিলে ত তাহার 'সাতখুন মাপ'। হিন্দু সমাজেরই কেবল এইরূপ দোষ আছে, এমন নয়। কিন্তু সকলেরই নিজেদের দোষ সংশোধন সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। অন্য সমাজের মধ্যে যে-দোষ আছে, আমাদের সে-দোষ থাকিলে তাহা দোষ নয়, এমন মনে করা গুরুতর ভ্রম।

পুরুষদের পক্ষে ত ঐরূপ ব্যবস্থা। নারীদের পক্ষে ব্যবস্থা ঠিক্ ইহার বিপরীত। দোষী অথচ অনুতপ্ত কোন স্ত্রীলোককে ক্ষমা করিয়া সমাজে রাখিবার কথা আমরা এখন তুলিতেছি না। তাহাদিগকেও সমাজে রাখা উচিত। আমরা এখন বলিতেছি, সেই সকল বালিকা ও নারীদের কথা যাহাদের কোন দোষ নাই, ছলে বলে কৌশলে যাহাদের উপর দুর্বৃত্ত লোকেরা অত্যাচার করিয়াছে। এরূপ বালিকা ও নারীদিগকে সমাজচ্যুত করার মত অধর্ম্ম ও কাপুরুষতা আর নাই। প্রথমতঃ ত তাহাদিগকে অত্যাচার হইতে রক্ষা করা সমাজের একান্ত কর্ত্তব্য। তাহা যে আমরা অনেক স্থলেই করিতে পারি না, তাহা আমাদের একটা লজ্জাকর দোষ। তাহার উপর, যাহারা অত্যাচরিত হইল, তাহাদেরই দণ্ডবিধান

করা অত্যন্ত অন্যায়, এবং সমাজের পক্ষে আত্মঘাতী ব্যবস্থা। ইহা কিঞ্চিৎ সন্তোষের বিষয়, যে, আজকাল অত্যাচরিতারা সকল স্থলে সমাজবহিষ্কৃতা হন না, অনেকে আত্মীয়স্বজনের মধ্যে স্থান পান এবং কেহ কেহ তাহা না পাইলেও নারীকল্যাণ-আশ্রমে ও হিন্দু অবলা-আশ্রমে স্থান পান। যখন সকল অত্যাচরিতারাই আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে স্থান পাইবেন, তখন বুঝিব সমাজের কর্ত্তব্যবোধ এবং দয়ামায়া আছে। তদপেক্ষাও উত্তম অবস্থা হইবে তখন, যখন কোন নারী অত্যাচরিতা হইবেন না।

নারীহরণ আদি নিবারণের জন্য মহিলাদের সাহায্য একান্ত আবশ্যক। তাঁহাদের অধিকাংশ কেবলমাত্র অন্তঃপুরচারিণী। তাঁহারা কি ভাবেন করেন, জানিবার উপায় নাই; কিন্তু যাঁহারা অবরোধপ্রথা মানিয়া চলেন না, অন্তঃপুরের বাহিরে আসিয়া রাজনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষাবিষয়ক নানা কাজে যোগ দেন, তাঁহাদের এ-বিষয়ে কিছু ভাবিতে, বলিতে, করিতে বাধা নাই। তাঁহারা সকলে, বা অন্ততঃ তাঁহাদের অধিকাংশ, এই বিষয়ে পুরুষদের সহায় হইলে, ফললাভ অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে।

বালিকা ও নারীদের সাহস ও শক্তি বৃদ্ধি নারীহরণ নিবারণের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। তাহার জন্য তাঁহাদের জ্ঞানলাভ, শারীরিক বলবৃদ্ধি, নৈতিকশিক্ষা একান্ত আবশ্যক। তাঁহারা যাহাতে প্রতারিত না হন, প্রলোভন জয় করিতে পারেন, তাঁহাদের এইরূপ শিক্ষা হওয়া দরকার। বিপদে পড়িলেও আত্মহারা না হইয়া তাঁহারা যাহাতে আবশ্যক-মত অস্ত্র ব্যবহার দ্বারা আত্মরক্ষা করিতে পারেন, তাঁহাদিগকে এরূপ শিক্ষা গ্রামে গ্রামে, গৃহে গৃহে দিতে হইবে।*

অত্যাচরিতা হিন্দু নারীরা স্বসমাজে স্থান না পাইয়া যদি মুসলমান সমাজে আশ্রয় লইতে বাধ্য হন, তাহা যে হিন্দু-সমাজের পক্ষে কেবল জনক্ষয়ের কারণ ও অমর্ষ হয়, তাহা নহে; তাহা হইতে পুরুষানুক্রমে হিন্দুসমাজের প্রতি অবজ্ঞা ও দ্বেষ ঐ সকল নারীর বংশধর ও প্রতিবেশীদের মধ্যে সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ ভাবে বিস্তারিত হইতে থাকে।

—

নারীহরণের প্রতিকারার্থ আর্থিক সাহায্য

যাহারা নারীহরণ করে, সেই সব দুর্ব্বৃত্তদের সাহায্য করিবার লোক অনেক স্থলেই থাকে—নারীদের উপর অত্যাচারের সময় থাকে, এবং দুর্ব্বৃত্তদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা হইলে তাহাদের পক্ষ সমর্থনার্থ টাকার অভাবও তাহাদের বন্ধুগণ পূর্ণ করে। কিন্তু অত্যাচরিতা হিন্দু নারীদের পক্ষ হইতে দুর্ব্বৃত্তদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালাইবার জন্য যথেষ্ট টাকা অনেক সময়ই পাওয়া যায় না। তাহার কারণ অনেক। অত্যাচরিতারা প্রায়ই গরিব ঘরের মেয়ে এবং অনেক স্থলে "নিম্ন" শ্রেণীর। হিন্দুসমাজের ধনী, "উচ্চ" ও "ভদ্র" শ্রেণীর লোকদের অনেকেরই এই সব অত্যাচরিতাদের প্রতি প্রাণের টান নাই। তাহা থাকিলে তাঁহারা সবাই কিছু কিছু টাকা দিতেন। বঙ্গে এক এক বাঙালীর হাতে তত টাকা নাই সত্য, যত এক এক অবাঙালীর হাতে আছে। কিন্তু কোন বাঙালীর হাতেই কিছু নাই এমন নয়। যাহা নাই তাহা সহানুভূতি, কর্ত্তব্য-বোধ, দিবার প্রবৃত্তি। এক এক জনের হাতে খুব টাকা আছে, কিন্তু তাঁহারা প্রায়ই এ রকম কাজে কিছু দেন না। সরকারী চাপ পড়িলে বা খেতাবের লোভ থাকিলে তাঁহারা টাকা দেন। কিন্তু এক্ষেত্রে ওদুটি জিনিষের আবির্ভাব হইতে পারে না।

বঙ্গে হিন্দু সমাজের হিতের জন্য পূর্ব্বে পূর্ব্বে কোন কোন হিন্দুহিতৈষী মারোয়াড়ীরা বেশ অর্থ ব্যয় করিতেন, এখন

* ২৯শে ভাদ্রের 'সঞ্জীবনী'তে আছে :—সতীত্ব রক্ষায় প্রাণত্যাগ। ঝিনাইদহ—যশোহর।—ঝিনাইদহ থানার জৈলানপুর গ্রামের গাতিদার মৃত বিহারীলাল রুদ্রের বিধবা স্ত্রী কালী দাসী যখন তাহার বাড়ীর পশ্চাতে বাঁশের কঞ্চি সংগ্রহ করিতেছিলেন তখন এক দুর্ব্বৃত্ত মুসলমান অতর্কিতে আসিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলপূর্ব্বক কিছুদূর টানিয়া লইয়া গিয়া তাঁহার উপর বলপূর্ব্বক পাশবিক অত্যাচার করিতে চেষ্টা করে। দুর্ব্বৃত্তের প্রহারে তাঁহার অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হয়। অনন্যোপায় হইয়া তিনি তাহার টুঁটি টিপিয়া ধরিলে দুর্ব্বৃত্ত তাহাকে একটু ছাড়িয়া দেয় কিন্তু তৎক্ষণাৎ পুনরায় বলপ্রয়োগ করে। তাহাতেও সফল না হওয়ায় তাহার হস্তস্থিত একখানা দায়ের অপর দিক দিয়া আঘাত করে। তাহাতেও সফলকাম না হওয়ায় দায়ের তীক্ষ্ণ দিক দিয়া তাঁহার মাথায় ও শরীরের নানা স্থানে আঘাত করিয়া পলায়। মহিলাটিকে ঝিনাইদহ হাসপাতালে আনা হইয়াছে। তাঁহার শরীরের অনেক অংশ পচিয়া যাওয়ায় হাসপাতালে গত ৭ই সেপ্টেম্বর মৃত্যু হইয়াছে। ঝিনাদহের যুবকগণ তাঁহার দাহকার্য্য করিয়াছে। এই সম্পর্কে পুলিস আব্বাস নামক এক মুসলমানকে ধৃতকরিয়াছে। আসামী মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট স্বীকারোক্তি করিয়াছে বলিয়া শুনা যায়। আসামী বর্ত্তমানে হাজতে আছে।

বোধ হয় করেন না। কিন্তু নারীহরণ নিবারণের জন্য তাঁহাদের টাকা না-দিবার কোন কারণ নাই। মারোয়াড়ী ছাড়া গুজরাটী, কচ্ছী, সিন্ধী, হিন্দুস্থানী, বিহারী, মরাঠা, শিখ, তামিল এবং অন্ধ্রদেশীয়েরাও বঙ্গে বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করেন। তাঁহাদেরও এই কার্য্যে সাহায্য করা উচিত। পঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ও বালুচিস্থানে হিন্দুনারীহরণ খুব হয়। অতএব কলিকাতাপ্রবাসী ঐ সব প্রদেশের হিন্দুদের পক্ষে বাঙালী হিন্দুর ব্যথায় ব্যথী হওয়া স্বাভাবিক।

বিহার, উড়িষ্যা, আগ্রা-অযোধ্যা, পঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতিতে অনেক বাঙালী আছেন, যাঁহাদের অবস্থা স্বচ্ছল। তাঁহাদের এই একান্ত আবশ্যক সৎকাজে দান করা উচিত।

সকলেই যে বেশী কিছু দিতে পারিবেন, এমন নয়। এক পয়সা হইতে আরম্ভ করিয়া যিনি যত বেশী পারেন, দান করুন। লক্ষ টাকা দিলেও তাহার সদ্ব্যয় হইবে। মাসে মাসে কিছু দেওয়া আবশ্যক ও বাঞ্ছনীয়।

নারীরক্ষার জন্য প্রধান অপ্রধান কয়েকটি সমিতি আছে। কলিকাতার প্রধান যে-তিনটির ঠিকানা জানি, লিখিতেছি। যাঁহার যে-খানে ইচ্ছা, টাকা পাঠাইতে পারেন।

(১) শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, নারীরক্ষাসমিতি, ৬ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

(২) শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভাদুড়ী, সম্পাদক, নারীরক্ষা-কমিটি, বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দুসভা, ৩৬ হারিসন রোড, কলিকাতা।

(৩) স্বামী সত্যানন্দ, হিন্দুমিশনের সভাপতি, হিন্দু-সংরক্ষণ ভাণ্ডার, ৩২ বি, হরিশ চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা।

নারীরক্ষার একান্ত প্রয়োজনীয়তা

ভারতবর্ষ পরাধীন। পরাধীন ভারতবর্ষে স্বরাজ স্থাপনের জন্য অগণিত লোক নানা প্রকারে চেষ্টা, ত্যাগস্বীকার, দুঃখবরণ ও দুঃখ ভোগ করিয়া আসিতেছেন। তাহার প্রয়োজন ও গুরুত্ব অবশ্যস্বীকার্য্য।

কিন্তু শাসনপ্রণালী পরিবর্ত্তন অপেক্ষাও নারীরক্ষা অধিকতর আবশ্যক কাজ। জগতের ইতিহাসে এবং বর্ত্তমান জগতে নানারকমের গবর্ন্মেণ্ট, নানা রকমের শাসনপ্রণালী আছে। তাহাদের মধ্যে আপেক্ষিক উৎকর্ষ অপকর্ষ আছে বটে, কিন্তু এমন বলা যায় না, যে, বিশেষ কোন একটি রকমের গবর্ন্মেণ্ট ভিন্ন সমাজস্থিতি লোকস্থিতি হইতে পারে না।

অন্য দিকে ইহা অতি স্পষ্ট ও সহজবোধ্য সত্য, যে, নারীরক্ষা ব্যতিরেকে সমাজস্থিতি অসম্ভব। শাসনপ্রণালীর এক প্রান্তে যদি রুশিয়ার সোভিয়েট শাসনপ্রণালী এবং অন্য প্রান্তে যদি কোন স্বেচ্ছাকারী রাজার শাসনপ্রণালী অবস্থিত মনে করা যায়, তাহা হইলে ইহা কোথাও দৃষ্ট হইবে না, যে, কোথাও এমন নিয়ম বা রীতি প্রচলিত আছে, যে, দুর্বৃত্তেরা অবাধে যে-কোন বালিকা বা নারীকে হরণ করিবে, অথচ তাহার শাস্তি বা সামাজিক শাসন হইবে না। ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিবাহ ও বিবাহচ্ছেদের ভিন্ন ভিন্ন প্রথা প্রচলিত থাকিতে পারে, কিন্তু নারীরক্ষার প্রয়োজনীয়তা সর্ব্বত্রই স্বীকৃত।

ঋণসম্বন্ধীয় আইন

সম্প্রতি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা ঋণ, সুদ, প্রভৃতি সম্বন্ধে একটি আইন প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহার দ্বারা খাতকদের উপর অতিরিক্ত সুদখোর ঋণদাতাদের সকল রকম উপদ্রব নিবারিত হইবে না বটে, কিন্তু কিছু হইবে। বাংলার ভিন্ন ভিন্ন জেলায় সুদের হার কিরূপ বেশী, তাহা বঙ্গীয় ব্যাংকিং তদন্ত কমিটির রিপোর্ট হইতে জানা যায়। কোন্ জেলায় বার্ষিক শতকরা কত সুদ তাহা লিখিত হইতেছে।

বর্দ্ধমান ২৪ হইতে ১৭৫, বীরভূম ১৫ হইতে ৩৭॥০, বাঁকুড়া ১৫—২৫, মেদিনীপুর ১২—৭৫, হুগলী ১২—৩৭॥০, নদিয়া ৩৭॥০—৭৫, যশোর ১৮৸০—৭৫, খুলনা ২৫—৩৭॥০, মুর্শিদাবাদ ১৮—১২০, চব্বিশপরগণা ১৫—১৫০, ঢাকা ১২—১৯২, মৈমনসিং ২৪—২২৫, বাখরগঞ্জ ২৪—১০০, ফরিদপুর ১৫—১৫০, চট্টগ্রাম ১৫—৭৫, নোয়াখালি ২৪—৭৫, ত্রিপুরা ২৪—৭৫, রাজশাহী ১৮৸০—৭৫, পাবনা ৩৭॥০—৩০০, দিনাজপুর ২৪—৭৫, রংপুর ৩৭॥০—৬৬৷০, মালদহ ১০৸০—৭৫, জলপাইগুড়ী ১০—৫০, দার্জ্জিলিং ৩০—৬০, হাবড়া ১৭—১৭৫।

বঙ্গের অনেক জেলায় প্রায় অর্দ্ধেক চাষী ঋণগ্রস্ত। তাহাদের ঋণের মোট পরিমাণ ভয়ানক। যেমন ফরিদপুরের অনুমিত ঋণ ২ কোটি ৩০ লক্ষ, ঢাকার ৪ কোটি ৭৬ লক্ষ।

এক এক জনের ঋণ কোন কোন জেলায় গড়ে এক শত টাকার উপর।

—

স্বদেশী পরিচ্ছদ

বক্তৃতায় ও খবরের কাগজে স্বদেশী বুলি খুব শুনিতে, দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু যে-কোন প্রদেশের ছাত্র বা অধিকবয়স্ক লোকদের সভাসমিতির ছবি কাগজে বাহির হয়, দেখা যায় অনেকে ইউরোপীয় ধরণের কোট নেকটাই কলার পরিয়া আছেন—এমন কি সেদিন হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ঐরূপ একটি ছবিতে কাহারও কাহারও পরণে ঐ প্রকার কোট ইত্যাদি দেখিলাম। বঙ্গে কিছু কম। এমন দিনে অস্থায়ী লাট সাহেবের পরিচ্ছদ দেশী রকম দেখিলে তৃপ্তি হয়। ছত্তরীর নবাব এখন আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের অস্থায়ী গবর্ণর। কোন কোন ছবিতে তাঁহার দেশী পরিচ্ছদ দেখিয়াছি। কিছুদিন আগে পঞ্জাবেরও একজন অস্থায়ী গবর্ণর ছিলেন মুসলমান। তাঁহারও ঐ প্রকার পরিচ্ছদ ছবিতে দেখিয়াছিলাম। তাঁহারা হয়ত প্রকাশ্যে অধিকাংশ সময় ইউরোপীয় পোষাক পরেন, প্রকাশ্যে কখন কখন পরেন দেশী পরিচ্ছদ। কিন্তু তাহাও মন্দের ভাল।

—

বাহাওআলপুরকে প্রদত্ত ঋণ

পঞ্জাবের বাহাওআলপুর রাজ্যকে গবর্মেণ্ট এগার কোটি তেষট্টি লক্ষ টাকা ধার দিয়াছেন। যে কাজটির জন্য এই টাকা দেওয়া হইয়াছিল, তাহা লাভের না হইয়া লোকসানের সম্ভাবনাই বেশী হইয়াছে। খুব সম্ভব, সেই জন্য তথাকার নবাব ঋণশোধ করিতে পারিবেন না, এবং, সবটা না হোক, অনেক টাকাই তাঁহাকে গবর্মেণ্ট মাফ করিয়া দিবেন। ভারতীয় রাজস্ব-সচিব শুস্টার সাহেব এ-বিষয়ে ঠিক করিয়া কিছু বলেন নাই। ভারত-গবর্মেণ্টের রাজস্বের সকলের চেয়ে বেশী অংশ বাংলা দেশ হইতে লওয়া হয়। সুতরাং এই প্রায় বার কোটি টাকায় কয়েক কোটি দারিদ্র্য অনাহার রোগ ও অজ্ঞতা পীড়িত বাঙালী করদাতারা দিয়াছে। ব্রিটিশ-ভারতের, বিশেষ করিয়া বঙ্গের, প্রতি ভারত-গবর্মেণ্টের কর্ত্তব্যবোধ অন্তর্হিত হওয়া উচিত।

বাহাওআলপুর রাজ্যের নাম আগে বড়-একটা শুনা যাইত না। সম্প্রতি কিছু দিন হইতে উহার নরেশের হিন্দু প্রজাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টির বিষয় কাগজে দেখা যাইতেছে। নিখিলভারত শ্রদ্ধানন্দ স্মৃতিরক্ষা ট্রাষ্টের সম্পাদক পণ্ডিত ধর্ম্মবীর বেদালঙ্কার দিল্লীর 'ন্যাশন্যাল কল' নামক দৈনিকে লিখিয়াছেন, যে, হিন্দু প্রজাদের অভিযোগের প্রতিকার করিবার ব্যবস্থা এখনও ঐ রাজ্যে হয় নাই। হিন্দু সংবাদপত্রগুলির উপর যে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হইয়াছিল, তাহা প্রত্যাহৃত হয় নাই। আগেকার মত উচ্চহারে আয়কর নির্দ্ধারিত আছে। হিন্দু নারীদের উপর মারপিটের কোন অন্ত হয় নাই। বিনা কারণে হিন্দু কর্ম্মচারীদিগকে পদচ্যুত করা হইতেছে। বাহাওআলপুর শহরের দোকানদারদের উপর তাহাদের দোকানের প্রত্যেক তক্তপোষ ও রৌদ্র আটকাইবার ঝাঁপের উপর ট্যাক্স বসান হইয়াছে। প্রায় সকল দোকানদারই হিন্দু। এই সব অভিযোগ সত্য হইলে, এহেন নৃপতি বার কোটি টাকা দানের নিশ্চয়ই যোগ্যতম পাত্র।

—

দেশী রাজাদের রক্ষণ আইন

সমুদয় দেশী রাজ্যের প্রজারা স্বর্গসুখে আছে। তাহাদিগকে অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য কোন আইনের প্রয়োজন নাই। দেশী রাজ্যগুলির রাজারা নিতান্ত গোবেচারা ও অসহায়। তাহাদিগকে রক্ষা করা একান্ত আবশ্যক—বিশেষতঃ দুর্দ্দান্ত ও প্রবল পরাক্রান্ত সংবাদপত্রসম্পাদকদের অত্যাচার হইতে। এই জন্য একটি নূতন আইন হইতেছে।

অধিকাংশ দেশী রাজ্যে কোন সংবাদপত্র নাই। যে-গুলিতে দু-একটা আছে, তাহা ব্রিটিশ ভারতের সংবাদপত্রগুলার চেয়েও শৃঙ্খলিত। অধিকাংশ দেশী রাজ্যের প্রজাদের নিরক্ষরতা ও ভয়বিহ্বলতা এত বেশী, যে, অত্যাচরিত হইলেও তাহারা ব্রিটিশ ভারতের সংবাদপত্রসমূহে খবর পর্য্যন্ত দিতে পারে না। এরূপ অবস্থায়, ব্রিটিশ ভারতের সংবাদপত্রসমূহে দেশী রাজ্যের সমালোচনা কর্ত্তৃপক্ষের পক্ষে দুঃসহ হইলেই মোকদ্দমার ও শাস্তির ব্যবস্থা করার মানে দেশী রাজ্যগুলির শাসনপ্রণালীর উন্নতির পথ রুদ্ধ করা।

প্রস্তাবিত আইনটা কেন হওয়া উচিত, ভারত-গবর্মেণ্টের স্বরাষ্ট্রসচিব স্যর হ্যারি হেগ তাহার একটা বেশ চমৎকার কারণ দেখাইয়াছেন:—

"Let British India at the outset show that it was not entering the Federation with the States with a feeling of fundamental hostility to the form of Government that prevailed in the States. Let there be a general acknowledgment in British India that there were forms of Government within India other than democratic, but which were deep-rooted in the tradition, the sentiments and facts of history and which claimed protection against attempts to overthrow their administration or interfere with them or bring them into hatred or contempt. They could not build a Federation on the basis of intolerance."

হেগ্ সাহেব বলিতেছেন, যে, দেশী রাজ্যগুলিতে যে স্বেচ্ছাচারতন্ত্র চলিয়া আসিতেছে এবং যাহার অনুকূল মনোভাব বিদ্যমান, তাহা মানিয়া না লইলে ব্রিটিশ-ভারতের সঙ্গে দেশী রাজ্যসমূহের ফেডারেশ্যন হইতে পারে না। আমাদের উত্তর, "নাই বা হইল?" ব্রিটিশ-ভারতের জনসাধারণ ও দেশী রাজ্যসকলের জনসাধারণ এরূপ ফেডারেশ্যন চায় না। নৃপতিদের স্বেচ্ছাচারের অনুকূল মনোভাব তাঁহাদের নিজেদের মধ্যে থাকিতে পারে, কিন্তু তাঁহাদের প্রজাদের নাই।

ক্ষমতা স্যর হ্যারি হেগের স্বজাতির হাতে আছে, কিন্তু পৃথিবীর বর্ত্তমান ফেডারেশ্যনগুলির সম্বন্ধে জ্ঞান ভারতবর্ষের শিক্ষিত লোকদেরও আছে। যে-ফেডারেশ্যনগুলি সাধারণতন্ত্র, তাহাদের নিয়মই এই, যে, ফেডারেশ্যনে ভুক্ত এক একটি রাষ্ট্রও সাধারণতন্ত্র হওয়া চাই। অর্থাৎ ফেডারেশ নের সর্ব্বত্র একই রকমের গবর্ন্মেণ্ট প্রচলিত থাকা চাই।

ভারতবর্ষের ফেডারেশ্যনকেও ফেডারেশ্যন নামের যোগ্য করিতে হইলে ইহারও সব অংশের শাসনপ্রণালী গণতান্ত্রিক করিতে হইবে। অবশ্য ব্রিটিশ-ভারতের শাসনপ্রণালী এখন গণতান্ত্রিক নহে। কিন্তু আমরা তাহাকে গণতান্ত্রিক করিতে চাই। তাহাতে বাধা দেওয়া স্যর হ্যারি ও তাঁহার মত সাম্রাজ্যবাদীদের অভিপ্রায়। চাতুরীপূর্ণ বাক্যজাল বিস্তার তাহারই জন্য।

দেশী রাজ্যগুলিতে স্বেচ্ছাচারতন্ত্র প্রচলিত থাকিলে নরেন্দ্রদের মনোনীত প্রতিনিধিরা হইবে স্বেচ্ছাচারতন্ত্রের পক্ষে। ভবিষ্যৎ ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় তাহাদের সংখ্যা ও ইউরোপীয়দের সংখ্যা এরূপ হইবে, যে, তাহারা ব্রিটিশ-ভারতের নির্ব্বাচিত নানা পরস্পরবিরোধী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিনিধি-সমষ্টি অপেক্ষা প্রভাবশালী থাকিবে। ফলে, ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালী প্রজাতান্ত্রিক বা গণতান্ত্রিক হইতে পারিবে না। ইহা হোয়াইট পেপারেরও অভিপ্রায়। প্রস্তাবিত আইনটা সেই অভিপ্রায়ের সমর্থক।

ব্রিটিশ-ভারত ও দেশীভারতের শাসনপ্রণালীর মধ্যে স্থূল প্রভেদ এই, যে, দেশীভারতে শাসনকার্য্য চলে এক একটা রাজার ইচ্ছা অনুসারে, ব্রিটিশ-ভারতে চলে ইংরেজ রাজপুরুষদের ইচ্ছা অনুসারে। আমরা ঐ রাজপুরুষদের ইচ্ছার জায়গায় জনগণের ইচ্ছাকে বসাইতে চাই এবং বৈধ উপায়ে চাই। দেশীভারতের জনগণও দেশীভারতেও তাহাই চায়, এবং আমরা তাহাদের সাহায্য করিতে চাই। সেই বৈধ ও ন্যায্য চেষ্টায় হেগ-জাতীয় মনুষ্যেরা বাধা দিতে চান। বিদ্রোহ দ্বারা, বলপ্রয়োগ দ্বারা ব্রিটিশভারতে গণতান্ত্রিকতা প্রবর্ত্তন আইনের চক্ষে অপরাধ এবং দণ্ডনীয়, কিন্তু বৈধ চেষ্টা দণ্ডনীয় নহে। দেশীভারত সম্পর্কে এইরূপ বৈধ চেষ্টাকেও প্রকারান্তরে অপরাধ বানাইয়া দণ্ডনীয় করা প্রস্তাবিত আইনটার উদ্দেশ্য।

গোপনীয় সাঙ্কেতিক লিপি আফিস

ভারত-গবর্ন্মেণ্টের পররাষ্ট্র ও রাজনৈতিক বিভাগের (Foreign and Political Department-এর) গোপনীয় সাঙ্কেতিক লিপি শাখা (cypher branches) আছে। ইংলণ্ড হইতে যে-সব গোপনীয় টেলিগ্রাম সঙ্কেতে আসে তাহার কর্ম্মচারীদিগকে তাহা বুঝিয়া সোজা ভাষায় লিখিয়া ঐ বিভাগের কর্ত্তাদিগকে ও বড়লাটকে জানাইতে হয়। ঐ শাখা আফিসে এ পর্য্যন্ত কোন ভারতীয় লোককে নিযুক্ত করা হয় নাই। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় এ-বিষয়ে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র প্রশ্ন করায় কিছু তর্কবিতর্কের উদ্ভব হয়। মিঃ মাসুদ আহমেদ জিজ্ঞাসা করেন, উহাতে নিযুক্ত হইতে হইলে কি বিশেষ যোগ্যতা চাই। উত্তরে সরকারী কর্ম্মচারী মিঃ গ্র্যাহাম বলেন, "কাজ করিতে পারা চাই এবং সম্পূর্ণ বিশ্বাস-যোগ্য হওয়া চাই।" তাহার পর আরও কিছু কথা-কাটাকাটির পর রাজস্বসচিব স্যর জর্জ শুষ্টার বলেন, "শ্রীযুক্ত গয়াপ্রসাদ সিং অনেক বার এ বিষয়টির উত্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু ভারতীয়দের নিয়োগে বাধা এই, যে, সাঙ্কেতিক লিপি ইংলণ্ডীয় গবর্ন্মেণ্টের প্রবর্ত্তিত এবং তাঁহারা এই সর্ত্তে উহা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, যে, উহা কেবল ব্রিটিশ প্রজাদের দ্বারা ব্যবহৃত

হইবে। পররাষ্ট্র ও রাজনৈতিক বিভাগ এই বাধা অতিক্রম করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। আমি এই বিষয়টি পরীক্ষা করিতে অঙ্গীকার করিতেছি।" অতঃপর মিঃ যোশী জিজ্ঞাসিলেন, "ভারতীয়েরা কি ব্রিটিশ প্রজা নয়?" স্তর জর্জ উত্তর দিবার আগেই শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বলিলেন, "স্তর জর্জের কথার মানেই এই, যে, ভারতীয়েরা ব্রিটিশ প্রজা নয়।" তখন স্তর জর্জ শুষ্টার বলিলেন, 'আমার কথার ইহা অবশ্যম্ভাবী মানে নয়। আমি ঠিক নিয়মটি খুঁজিয়া দেখিব। আমি জানি, একটা টেক্নিক্যাল বাধা আছে।"

টেক্নিক্যাল বাধা যাহাই থাকুক, প্রকৃত বাধা এই, যে, ইংলণ্ডীয় গবর্মেণ্ট ভারতীয়দিগকে বিশ্বাস করেন না, যদিও এ-পর্য্যন্ত কন্‌ফিডেন্স্যাল (গোপনীয়) কাজে নিযুক্ত ভারতীয়েরা স্বদেশের উপকার করিবার জন্যও স্বদেশের পক্ষে অনিষ্টকর কোন গোপনীয় ব্যাপার প্রকাশ করে নাই।

ভারতীয়েরা ব্রিটিশ প্রজা বটে ও নয় দুই বিভিন্ন অর্থে;—তাহারা ব্রিটিশের প্রজা বটে, কিন্তু ব্রিটিশ-বংশজাত প্রজা নহে।

—

রামমোহন রায় শতবার্ষিকী

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর ব্রিষ্টলে রামমোহন রায় দেহত্যাগ করেন। আগামী ২৭শে সেপ্টেম্বর তাঁহার দেহান্তের পর শত বৎসর পূর্ণ হইবে। এই উপলক্ষ্যে কলিকাতায় ও বাংলা দেশের অন্য কোন কোন স্থানে তাঁহার প্রতি সম্মানপ্রদর্শনার্থ সভা ও বক্তৃতাদি হইবে। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও হইবে। ইংলণ্ড ও আমেরিকাতেও এইরূপ সভা বক্তৃতা প্রভৃতি হইবে। যাঁহারা বঙ্গে ও ভারতবর্ষের অন্যত্র সভা করিবেন, তাঁহারা সকলে রামমোহন রায় সম্বন্ধে প্রধান প্রধান জ্ঞাতব্য কথা জানিতে চাহিবেন। কলিকাতার রামমোহন শতবার্ষিকী কমিটির পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম যে ইংরেজী পুস্তক বাহির করিয়াছেন, তাহা সময়োপযোগী ও এ-বিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বহিখানির পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১৭০। তা ছাড়া ৭খানি উৎকৃষ্ট ছবি আছে। অথচ মূল্য আট আনা মাত্র। ইহাতে শিবনাথ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মন্মথনাথ ঘোষ, অমলচন্দ্র হোম প্রভৃতির লেখা আছে। বহিখানি ২১০-৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে রামমোহন শতবার্ষিকী আফিসে পাওয়া যায়।

—

রামমোহন সম্বন্ধে দেশী ও বিদেশী লোকদের মত

রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়াছিলেন। এই কারণে, তিনি যদি আর কিছুই না করিতেন, তাহা হইলেও ব্রাহ্মেরা তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিতেন। কিন্তু তিনি অন্যান্য ভারতহিতকর এবং জগদ্ধিতকর, কাজও করিয়াছিলেন। এই জন্য, যাঁহারা ব্রাহ্ম নহেন এমন বহুসংখ্যক লোকও তাঁহাকে শ্রদ্ধা করেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের জন্যও, যাঁহারা ব্রাহ্ম নহেন, এমন অনেক লোক তাঁহাকে শ্রদ্ধা করেন। তিনি যদি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন না করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে সম্মান দেখাইবার লোক হয়ত আরও কিছু বেশী হইত। যাহাই হউক, তিনি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়া থাকিলেও ব্রাহ্মসমাজের বাহিরের এমন অনেক প্রসিদ্ধ লোক তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, যাঁহাদের গুণগ্রাহিতা সাম্প্রদায়িক গণ্ডী অতিক্রম করিতে সমর্থ। এই সব গুণগ্রাহী লোকদের মধ্যে দেশী বিদেশী উভয় রকমের মানুষই আছেন। ইহাঁদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার জীবিত কালে তাঁহার সহিত পরিচিত ছিলেন। যেমন ফরাসী পর্য্যটক ও বৈজ্ঞানিক ভীক্তোর ঝাক্‌মোঁ (Victor Jacquemont)। তিনি তাঁহার Voyage dans l'Inde গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে লিখিয়াছেন :—

"Before coming out to India I knew that he was an able orientalist, a subtle logician and an irresistible dialectician ; but I had no idea that he was the best of men." (English translation from the original French.)

তাৎপর্য্য।

"ভারতবর্ষে আসিবার আগে আমি জানিতাম তিনি একজন যোগ্য প্রাচ্যবিদ্যাবিৎ, সূক্ষ্মবিশ্লেষণকারী নৈয়ায়িক এবং অজেয় তার্কিক; কিন্তু আমার ধারণাই ছিল না, যে, তিনি নরোত্তম।"

ইহার পর রামমোহনের চেহারা বর্ণনা করিয়া ঝাক্‌মোঁ বলিতেছেন—

"He never expresses an opinion without taking precautions on all sides, . . .

". . . He has grown in a region of ideas and feelings which is higher than the world in which his countrymen live ; he lives alone ; and though,

perhaps, the consciousness of the good he is accomplishing affords him a perpetual source of satisfaction, sadness and melancholy mark his grave countenance."

তাৎপর্য্য।

"সব দিকে সাবধানতা অবলম্বন না-করিয়া (অর্থাৎ আটঘাট না-বাঁধিয়া) তিনি কখনও কোন মত প্রকাশ করেন না।

"যে সব চিন্তা ও ভাবের রাজ্যে তাঁহার স্বদেশবাসীরা বাস করেন, তদপেক্ষা উচ্চতর মনোলোকে তাঁহার বয়োবৃদ্ধি হইয়াছে; তিনি একাকী থাকেন; এবং যদিও, হয়ত, তিনি যে হিতসাধন করিতেছেন, তাহার অনুভূতি তাঁহাকে সর্ব্বদাই আত্মপ্রসাদ দেয়, তথাপি তাঁহার গম্ভীর মুখমণ্ডলে বিষাদের চিহ্ন লক্ষিত হয়।"

বিস্তর সমসাময়িক ইংরেজ ভদ্রলোক ও মহিলা রামমোহন সম্বন্ধে তাঁহাদের উচ্চ ধারণা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সেগুলি সব ছাপিবার স্থান হইবে না। অন্য পাশ্চাত্য কয়েক জন বিদেশীর এবং এক জন ইংরেজের মত উদ্ধৃত করিব। রামমোহনের সমসাময়িক আমেরিকান চিকিৎসক ডাঃ বুট লিখিয়াছেন:—

"To me he stood alone in the single majesty of, I had almost said, perfect humanity. No one in past history, or in present time, ever came before my judgment clothed in such wisdom, grace and humility. I knew of no tendency even to error."

তাৎপর্য্য।

"তিনি আমার চক্ষে, প্রায় বলিয়া ফেলিয়াছিলাম, পূর্ণ মনুষ্যত্বের মহিমায় একাকী দণ্ডায়মান। অতীত ইতিহাসে বা বর্ত্তমান সময়ে আর কেহ আমার বিচারের সম্মুখে এরূপ প্রজ্ঞা, সৌম্যতা ও নম্রতায় মণ্ডিত হইয়া উপস্থিত হন নাই। আমি তাঁহাতে কোন ভ্রান্তিপ্রবণতাও জানিতাম না।"

থিয়সফিক্যাল সোসাইটির স্থাপয়িত্রী ম্যাড্যাম ব্ল্যাভাট্স্কী লিখিয়াছেন, যে, রামমোহন ছিলেন "one of the purest, most philanthropic, and enlightened men India ever produced," "ভারতবর্ষ সর্ব্বাপেক্ষা শুদ্ধচেতা, মানবপ্রেমিক ও জ্ঞানালোকে উজ্জ্বল যে-সব মানুষকে জন্ম দিয়াছেন, রামমোহন তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম।" তাহার পর ম্যাড্যাম ব্ল্যাভাট্স্কী তাঁহার সুমহৎ বুদ্ধিশক্তি, সুমার্জ্জিত শিষ্ট ব্যবহার, ভয়হীন নৈতিক সাহস, পূর্ণ নম্রতা, মানবপ্রেম-প্রবণতা, স্বদেশভক্তি, এবং জলন্ত ধর্ম্মভাবের উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন,

"...we have before us the picture of a man of the noblest type. Such a person was the ideal of a religious reformer...one searches the record of his life and work in vain for any evidence of personal conceit, or a disposition to make himself figure as a heaven-sent messenger."

তাৎপর্য্য।

"(এই সব গুণ লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারি, যে,) আমাদের সম্মুখে মহত্তম আদর্শের একটি মানুষের ছবি রহিয়াছে। এই রকম এই মানুষটি আদর্শ ধর্ম্মসংস্কারক ছিলেন। তাঁহার জীবন ও কর্ম্মের বৃত্তান্ত অন্বেষণ করিয়া কোথাও ব্যক্তিগত অহঙ্কারের কোন প্রমাণ কিম্বা নিজেকে স্বর্গ হইতে প্রেরিত দূত বলিয়া খাড়া করিবার কোন প্রবৃত্তির প্রমাণ পাওয়া যায় না।"

এইরূপ আরও অনেক প্রশংসাসূচক কথা ম্যাড্যাম ব্ল্যাভাট্স্কী বলিয়াছেন।

সুবিখ্যাত ফরাসী প্রাচ্যবিদ্যাবিৎ অধ্যাপক সিলভাঁ লেভি বলিয়াছেন:—

"Raja Rammohun Roy, father of modern India, was one of the most remarkable personalities of his age. While representing all that was best in the Indian tradition, he showed his special genius in a line where the Indians of today are the weakest—in translating into practice by the force of will the dictates of idealism...He fought with phenomenal heroism, against desparate odds, to realize his ideal. If India today wanted any model to shape her present destiny and future history, Rammohun should be the model. He was really the first to bring India abreast of universal history."

তাৎপর্য্য।

"আধুনিক ভারতবর্ষের জনক রাজা রামমোহন রায় তাঁহার যুগের বিশেষ লক্ষ্য করিবার মত অন্যতম পুরুষ ছিলেন। ভারতবর্ষের অতীত-কালাগত শ্রেষ্ঠ যাহা তাহা তাঁহাতে ছিল, আবার অন্য এমন একদিকে তাঁহার বিশিষ্ট প্রতিভার পরিচয় তিনি দিয়াছেন, যে-দিকে তাঁহার দেশের আজ-কালকার লোকেরা দুর্ব্বলতম—তিনি যাহা আদর্শ বলিয়া মনে করিতেন, ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগে তাহাকে নিজের আচরণে পরিণত করিতেন। যদি আজ ভারতবর্ষ নিজের বর্ত্তমান ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ ও ভবিষ্যৎ ইতিহাস গঠনের জন্য কোন আদর্শ চান, তবে রামমোহন সেই আদর্শ। তিনিই বস্তুতঃ ভারতবর্ষকে প্রথম বিশ্বেতিহাসে (অন্য সব জাতির সহিত) প্রগতিশীলদের দলে আনিয়াছেন।"

সিলভাঁ লেভি এইরূপ আরও অনেক প্রশংসা করিয়াছেন। কাহারও সব কথা উদ্ধৃত করিতে পারিতেছি না। আর দু-জন বিদেশীর কথা উদ্ধৃত করিয়া পরে আমাদের দেশের তিনজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির মন্তব্য উদ্ধৃত করিব। এক জন রামমোহনের সমসাময়িক ভারতপ্রবাসী ইংরেজ সম্পাদক মিঃ বাকিংহাম। তিনি ১৮১৮ সালে ভারতবর্ষে আসেন এবং রামমোহনকে ভাল করিয়া জানিবার তাঁহার খুব সুযোগ হইয়াছিল। তিনি লিখিয়াছেন—

"Rammohun Roy might have had abundant opportunities of receiving rewards from the Indian Government in the shape of offices and appointments, for his mere neutrality; but being as remarkable for his integrity as he is for his attainments, he has pursued his arduous task of endeavouring to improve his countrymen, to beat down superstition, and to hasten as much as possible those reforms in the religion and Government of his native land of which

both stand in equal need. He has done all this to the great detriment of his private fortune, being rewarded by the coldness and jealousy of all the great functionaries of Church and State in India, and supporting the Unitarian Chapel, the Unitarian Press and the expense of his own publications, besides other charitable acts, out of a private fortune, of which he devotes more than one-third to acts of the purest philanthropy and benevolence."

তাৎপর্য্য।

"রামমোহন যদি (গবর্মেণ্টের সমালোচনা না করিয়া) কেবল নিরপেক্ষ থাকিতেন, তাহা হইলে পদ ও চাকরির আকারে ভারতীয় গবর্মেণ্টের নিকট হইতে পুরস্কার পাইবার প্রচুর সুযোগ তাঁহার হইত কিন্তু বিদ্যাবুদ্ধির জন্য যেমন, সততার জন্যও তেমনি তিনি লক্ষ্যীভূত ছিলেন বলিয়া, তিনি স্বদেশবাসীদের উন্নতিসাধন, কুসংস্কার বিনাশ, এবং জন্মভূমির ধর্ম্ম ও শাসন-প্রণালীতে সমভাবে আবশ্যক সংস্কার যথাসম্ভব সত্বর সাধনরূপ শ্রমসাধ্য কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। তিনি তাঁহার ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রভূত ক্ষতি করিয়া এই সব করিয়াছেন। তাহাতে এই পুরস্কার পাইয়াছেন, যে, সরকারী বড় বড় পদস্থ ব্যক্তিদের এবং খৃষ্টীয় ইংলণ্ডীয় গির্জ্জার বড় বড় পাদ্রী দের অমৈত্রী ও ঈর্ষ্যার পাত্র হইয়াছেন। নিজের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইতে তিনি একেশ্বরবাদী মন্দির ও ছাপাখানা চালান, নিজের কেতাবপত্র মুদ্রণ ও প্রকাশ করেন, এবং নানাবিধ মানবহিতকর ও দয়াধর্ম্মের কাজ করেন। তাহাতে তাঁহার আয়ের এক-তৃতীয়াংশেরও উপর ব্যয়িত হয়।"

রামমোহন সম্বন্ধে অধ্যাপক ম্যাক্স মুলরের দীর্ঘ অভিভাষণের এক জায়গায় আছে:—

"The German name for prince is *furst*, in English first, he who is always to the fore, he who courts the place of danger, the first place in fight and the last in flight. Such a *furst* was Rammohun Roy, a true prince, a real Rajah, if Rajah also, like Rex, meant originally the steersman, the man at the helm."

তাৎপর্য্য।

"প্রিন্সের জার্ম্মান প্রতিশব্দ ফুর্স্ট, ইংরেজী ফার্ষ্ট, তিনি যিনি সর্ব্বদাই অগ্রণী, যিনি বিপদের জায়গাটি বাছিয়া লয়েন, যুদ্ধে প্রথম স্থান এবং পলায়নে শেষ জায়গা। রামমোহন রায় এইরূপ ফুর্স্ট ছিলেন, একজন সত্যকার প্রিন্স, বাস্তবিক রাজা—যদি লাটিন রেক্স শব্দটির মত রাজার মানে আদিতে ছিল কর্ণধার।"

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রামমোহন সম্বন্ধে তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন:—

"Sitting at the feet of Rammohun Roy, let us be imbued with his lofty spirit,—his love of country, his devotion to truth, his enthusiasm for progress—let us be regenerated by the touch of his example, and we shall then have acquired the impulse which will carry us on to and will help us to secure for ourselves a place among the progressive nations of the earth and to accomplish those high destinies which, I believe, are reserved for us in the decrees of Providence."

তাৎপর্য্য।

"রামমোহন রায়ের পাদপ্রান্তে শিক্ষার্থীরূপে উপবিষ্ট হইয়া, আসুন আমরা তাঁহার উচ্চাশয়তাতে অনুপ্রাণিত হই—তাঁহার স্বদেশপ্রীতিতে, তাঁহার সত্যপরায়ণতাতে ও প্রগতির জন্য তাঁহার সোৎসাহ উদ্যমে; আসুন আমরা তাঁহার দৃষ্টান্তের সংস্পর্শে পুনর্জন্ম লাভ করি। তাহা হইলে আমরা পৃথিবীর প্রগতিশীল জাতিদের মধ্যে স্থান লাভ করিতে পারিব, এবং বিধাতা তাঁহার বিধানে আমাদের জন্য যে-সব উচ্চ সৌভাগ্য রাখিয়াছেন, তাহা প্রাপ্ত হইব।"

পরলোকগত বিচারপতি স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন:—

"One thing, I believe, we all will be agreed upon—all sects, whether orthodox Hindus or progressive Brahmos, whether Mahomedans or Christians—that to Rammohun Roy is due the credit of forcibly pointing out to learned Hindus that religion does not require one to be a *yogi*, a *suttee*, or to go to the forest, but that home and society are the best surroundings of appropriate worship."

তাৎপর্য্য।

"আমরা গোঁড়া হিন্দু বা প্রগতিশীল ব্রাহ্ম, মুসলমান বা খ্রীষ্টিয়ান, যাহাই হই, এই একটি বিষয়ে আমি বিশ্বাস করি আমরা সকলে একমত হইব, যে, বিদ্বান্ হিন্দুদিগকে ইহা প্রত্যয়জনক ভাবে জানাইয়া দিবার প্রশংসা রামমোহন রায়েরই প্রাপ্য, যে, ধর্ম্মলাভের জন্য কাহারও "যোগী" বা "সহমৃতা" বা অরণ্যবাসী হইবার আবশ্যক নাই, কিন্তু গৃহপরিবার ও জনসমাজই যথাযোগ্য ভগবদারাধনার ও পরিবেষ্টন ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা।"

ভগিনী নিবেদিতা স্বামী বিবেকানন্দের সহিত হিমালয়ের পার্ব্বত্য লোকালয়সমূহে ভ্রমণ কালে তাঁহার কথাবার্ত্তার অনুলিপি রাখিয়াছিলেন। তাহা Notes of Some Wanderings with the Swami Vivekananda নাম দিয়া স্বামী সারদানন্দ পুস্তকাকারে বাহির করেন। তাহার ১৯ পৃষ্ঠায় আছে:—

"It was here, too, that we heard a long talk on Rammohun Roy, in which he [Swami Vivekananda] pointed out three things as the dominant notes of this teacher's message, his acceptance of the Vedanta, his preaching of patriotism, and the love that embraced the Mussulman equally with the Hindu. In all these things, he claimed himself to have taken up the task that the breadth and foresight of Rammohun Roy had mapped out."

তাৎপর্য্য।

"এখানেই রামমোহন রায় সম্বন্ধে স্বামীজীর দীর্ঘ ভাষণ শুনিতে পাই। তাহাতে স্বামীজী বলেন, শিক্ষাদাতা রামমোহনের বাণীর তিনটি প্রধান সুর, বেদান্তকে সত্য বলিয়া গ্রহণ, স্বদেশপ্রীতি প্রচার, এবং সেই মৈত্রী যাহা হিন্দু ও মুসলমানকে সমভাবে আলিঙ্গন করিয়াছিল। স্বামী বিবেকানন্দ দাবি করেন, যে, রামমোহনের ঔদার্য্য ও ভবিষ্যদ্দর্শিতা যে কাজের তালিকা ও পদ্ধতি নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছে, তিনি [স্বামী বিবেকানন্দ] সেই কাজ করিতেছেন।"

ভারতবর্ষে যাহারা ইংরেজী শিক্ষা পাইয়া লাভবান্ হইয়াছেন—যাঁহারা জ্ঞানী হইয়াছেন, দেশভক্ত হইয়াছেন, কর্ত্তব্যপরায়ণ হইয়াছেন; সংস্কার উন্নতি ও প্রগতি চাহিতেছেন,

ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন অংশের ও পৃথিবীর নানা দেশের সহিত মানসিক আদানপ্রদান করিতে পারিতেছেন, পৃথিবীর সমসাময়িক ইতিহাসে শ্রোতা দর্শক ও কর্মী হইতে পারিতেছেন— তাঁহাদের একটি কথা স্মরণ করা ও মনে রাখা আবশ্যক। যখন ইংরেজ-রাজত্বে ভারতবর্ষে কিরূপ শিক্ষা দেওয়া হইবে এই প্রশ্ন উঠে, তখন একদল লোক (ক্ষমতাশালী ইংরেজ রাজপুরুষেরা প্রায় সবাই এই দলে ছিলেন) কেবল সংস্কৃত আরবী পারসী ও কিছু দেশভাষা শিখাইবার পক্ষপাতী ছিলেন ; কিন্তু রামমোহন স্বয়ং প্রাচ্য বিদ্যায় পারদর্শী হইয়াও এবং সংস্কৃত শিখাইবার শিক্ষালয় স্থাপন করিয়াও ইংরেজী ভাষার সাহায্যে আধুনিক বিজ্ঞান ইতিহাস প্রভৃতি শিখাইবার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া লর্ড আমহার্ষ্টের নিকট একটি আবেদনপত্র পাঠাইয়াছিলেন। তখন তখন সেই চিঠি ফলদায়ক হয় নাই। কিন্তু পরে যে ইংরেজী শিখাইবার পক্ষপাতী "ইংলিশ পার্টি" নামক দলের উদ্ভব হয়, তাহার প্রভাবে এবং লর্ড মেকলের মন্তব্য পড়িয়া বড়লাট লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ইংরেজী শিক্ষা চালাইবার দিকে মত দেন। এই "ইংলিশ পার্টির" উদ্ভব সম্বন্ধে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত ভারতবর্ষের ইতিহাসের ষষ্ঠ খণ্ডে ১১০ পৃষ্ঠায় আছে :—

It is important to notice that the strongest influence in bringing this "English Party" into exsistence were the petition of Rammohun Roy and the practical experience of the Committee.

তাৎপর্য্য।

ইহা লক্ষ্য করা বিশেষ আবশ্যক, যে, ইংলিশ পার্টির উৎপত্তি যে-প্রবলতম প্রভাবের ফলে হয়, তাহা রামমোহন রায়ের আবেদনপত্র এবং কমিটির স্বীয় কার্য্যলব্ধ অভিজ্ঞতা।

মেকলের মন্তব্যেও রামমোহন রায়ের চিঠির প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়।

মহাত্মা গান্ধীর সঙ্কল্প

মহাত্মা গান্ধী অতঃপর কি কাজ করিবেন, এবং তাঁহার কার্য্যক্রম কিরূপ হইবে, তাহা জানিবার জন্য দেশব্যাপী কৌতূহল ছিল। তাহা এখন তৃপ্ত হইবে। তাঁহার সঙ্কল্পের বিষয় তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। প্রায়োপবেশন করায় গবর্মেণ্ট তাঁহাকে কারামুক্ত করেন। তিনি কারামুক্ত না হইলে ও জীবিত থাকিলে তাঁহাকে আগামী ১৯৩৪ সালের তেসরা আগষ্ট পর্য্যন্ত জেলে থাকিতে হইত। উক্ত তারিখ পর্য্যন্ত তিনি রাজনৈতিক কোন কাজই করিতে পারিতেন না—নিরুপদ্রব আইনলঙ্ঘন বা রাজনৈতিক অন্য কিছুই করিতে পারিতেন না। তিনি কঠোর চিন্তা ও প্রার্থনার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন; যে, আগামী বৎসরের ৩রা আগষ্ট পর্য্যন্ত তিনি জেলে যাইবার জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নিরুপদ্রব আইনলঙ্ঘন কোন প্রকারে করিবেন না। অনুন্নত হিন্দুদের সেবায় কালাতিপাত করিবেন। তাঁহার এই সঙ্কল্প সম্পূর্ণ ন্যায্য আত্মমর্য্যাদাবোধসঙ্গত এবং তাঁহার মহৎ চরিত্রের অনুরূপ হইয়াছে। প্রায়োপবেশন করিয়াছিলেন তিনি অনুন্নতহিন্দুসেবার সম্পূর্ণ সুবিধা পাইবার জন্য। জেলে গবর্মেণ্ট এবার তাঁহাকে সেই সম্পূর্ণ সুবিধা দিতে রাজী হন নাই। উপবাসে তাঁহার জীবন সঙ্কটাপন্ন হওয়ায় তিনি খালাস পাইয়াছেন এবং এখন অনুন্নতজনসেবার সম্পূর্ণ সুবিধা তাঁহার হইয়াছে। সুতরাং কারামুক্তিজনিত স্বাধীনতা ও সুবিধা তিনি যে-কাজের জন্য উপবাস করিয়া যে প্রকারে পাইয়াছেন, তাহা বিবেচনা করিয়া এখন সেই সুবিধা ও স্বাধীনতা অন্য কাজে লাগান তাঁহার পক্ষে উচিত হইবে না বলিয়া তিনি বুঝিয়াছেন। অবশ্য আগামী বৎসরের ৩রা আগষ্টের পর তিনি তাঁহার স্বাধীনতা রাজনৈতিক কাজেও লাগাইবেন—যদি তখনও জেলের বাহিরে থাকেন। কারণ, ঐ তারিখের পূর্ব্বে তিনি স্বয়ং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আইন অমান্য না করিলেও এমন অবস্থা ঘটিতে পারে, সরকারী কর্ম্মচারীরা এমন কিছু হুকুম বা বন্দোবস্ত বা ব্যবস্থা করিতে পারেন, যাহা মানিয়া চলা গান্ধীজীর পক্ষে অপমানকর ও অসম্ভব হইতে পারে।

গান্ধীজী যে নিজের কর্ম্মের গণ্ডী স্বেচ্ছায় সীমাবদ্ধ ও সংকীর্ণ করিলেন, তাহা কেবল নিজের জন্য ; অন্যেরা নিজ নিজ বিবেচনা অনুসারে স্বাধীনভাবে কাজ করিবেন। এই জন্য মহাত্মাজী বলিয়াছেন, যে, পুনায় কন্‌ফারেন্সের পর প্রকাশিত বর্ণনাপত্রে তিনি যে পরামর্শ দিয়াছেন, তাহার কোন পরিবর্ত্তন হইল না। তাঁহার এই সিদ্ধান্তেরও কোন প্রতিকূল সমালোচনা হইতে পারে না। ইহা সম্পূর্ণ সমর্থনযোগ্য।

মহাত্মাজী যখন আগে একবার জেল হইতে অনুন্নতহিন্দুসেবার কাজ করিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ও সুযোগ পাইয়াছিলেন, তখন সেই কাজে সমুদয় শক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন। তাহার পরোক্ষ ফলে তাঁহার দলের অনেক লোকই আইনলঙ্ঘনের কাজ ছাড়িয়া দিয়া অনুন্নতহিন্দুসেবায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, বা হইয়াছেন এইরূপ দেখাইতেছিলেন। পুনা কন্‌ফারেন্সের পর প্রকাশিত মিঃ আণের ব্যবস্থাপত্র বা আদেশপত্র এবং মহাত্মাজীর পরামর্শে কংগ্রেসওয়ালাদের দলবদ্ধ ভাবে আইনলঙ্ঘন নিষিদ্ধ হইয়াছে, কেবল ব্যক্তিগত ভাবে আইনলঙ্ঘনের অনুমতি ও স্বাধীনতা আছে। এই অনুমতির ব্যবহার বেশী লোক করিতেছেন না। যাঁহারা করিতেছেন, তাঁহারাও সকলে বা অনেকে মহাত্মাজীর দৃষ্টান্তে ব্যক্তিগত আইনলঙ্ঘন হইতে নিবৃত্ত হইবেন, এইরূপ অনুমান হইতেছে।

তাঁহার সঙ্কল্পজ্ঞাপক পত্রে সর্ব্বশেষে মহাত্মাজী যাহা বলিয়াছেন তাহা তাঁহার নিজের ভাষাতেই দেওয়া আবশ্যক।

"I must state the limitations of my self-restraint in clear terms. Whilst I can refrain from aggressive civil resistance, I cannot, so long as I am free, help guiding those who will seek my advice and preventing the national movement from running into wrong channels. It is an evergrowing belief with me that truth cannot be found by violent means. I would be guilty of disloyality to my creed if I attempted to put greater restraint on myself than I have adumbrated in this statement. If then the Government leave me free, I propose to devote this period to 'Harijan' service and, if possible, also to such constructive activities as my health may permit.

It is needless to repeat here that peace is as much a part of my being as civil resistance. Indeed a civil resister offers resistance only when peace becomes impossible. Therefore, so far as I am concerned and so long as I am free, I shall make all endeavour in my power to explore every possible avenue of honourable peace.

এই বাক্যগুলি হইতে বুঝা যাইতেছে, যে, গবন্মেণ্ট যতদিন স্বাধীনতা দিবেন, ততদিন গান্ধীজী অনুন্নতহিন্দুসেবা করিবেন এবং গঠনমূলক অন্য প্রকার কাজও করিবেন। জাতিহিতকর কার্য্যে নিযুক্ত যাঁহারা তাঁহার পরামর্শ চাহিবেন তাঁহাদিগকে পথ প্রদর্শন করিবেন এবং জাতীয় প্রচেষ্টার বিপথগমনে বাধা দিবেন। কেহ বলপ্রয়োগ ও হিংসার পথ অবলম্বন করিতে উদ্যত হইলে তিনি তাহাকে নিষেধ করিবেন, ইহা সহজবোধ্য। বলপ্রয়োগবাদী ও সন্ত্রাসবাদীরা কেহ তাঁহার পরামর্শ লইতে যাইবে, মনে হয় না। গেলে তাহাদিগকে নিবৃত্তিমূলক পরামর্শ দেওয়া তাঁহার পক্ষে সহজ হইবে এবং তাহাতে গবন্মেণ্টেরও কোন আপত্তি হইবে না। কিন্তু তিনি কি কেবল নিবৃত্তিমূলক পরামর্শই দিবেন, তাহাদিগকে কোন প্রকার কাজে প্রবৃত্ত হইতে পরামর্শ দিবেন না? যদি কোন গঠনমূলক কাজ করিতে পরামর্শ দেন, তাহা হইলেও গবন্মেণ্টের কোন আপত্তির কারণ হইবে মনে হয় না। কিন্তু কোন সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী হিংসার পথ ছাড়িয়া যদি অহিংস আইনলঙ্ঘক হইতে চায়, তাহা হইলে গান্ধীজী তাহাকে কি পরামর্শ দিবেন? নিবৃত্ত করিবেন কি? কিংবা তাঁহারই দলের কোন লোক ব্যক্তিগত ভাবে আইনলঙ্ঘন করিতে চাহিয়া তাঁহার পরামর্শ চায়, তাহা হইলে তাহাকে কি নিবৃত্ত করিবেন? না, নিবৃত্ত না-করিয়া উপায় ও প্রণালী নির্দ্দেশ করিবেন? এইরূপ প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদিত হয়। সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে মহাত্মাজী নিরুপদ্রব আইনলঙ্ঘন প্রচেষ্টার সহিত যোগ রাখিয়া তাহার বিন্দুমাত্রও সাহায্য করিলে গবন্মেণ্টের আপত্তি হইবে বোধ হয়।

আমাদের বক্তব্য এ নয়, যে, গবন্মেণ্ট যাহাতে আপত্তি করিবেন, গান্ধীজী তাহা হইতেই নিবৃত্ত থাকিবেন বা থাকিতে বাধ্য। আমাদের জিজ্ঞাস্য এবং জানিবার কৌতূহল কেবল এই, যে, গান্ধীজী ত স্বয়ং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আইন অমান্য করিবেন না সঙ্কল্প করিয়াছেন, কিন্তু অন্যেরা তাহা করিতে ইচ্ছুক হইয়া তাঁহার পরামর্শ চাহিলে সে পরামর্শ কি কেবল নিবৃত্তিমূলক বা গঠনমূলক কার্য্যে প্রবর্ত্তক হইবে? না, অহিংস আইনলঙ্ঘনের অবিরোধীও হইবে? যদি শেষোক্ত রকমেরও হয়, তাহা হইলে তাঁহার মূল সঙ্কল্পের সহিত তাহার সামঞ্জস্য থাকিবে কি?

—

গান্ধীজীর পুনঃপ্রায়োপবেশনের দূর সম্ভাবনা

গান্ধীজী তাঁহার সঙ্কল্পজ্ঞাপক বর্ণনাপত্রে ইহাও বলিয়াছেন, যে, যদি গবন্মেণ্ট তাঁহাকে আবার গ্রেপ্তার করেন, জেলে পাঠান এবং তথায় ও তখন অনুন্নতহিন্দুসেবার পূর্ণ সুযোগ না দেন, তাহা হইলে তিনি আন্তরিক প্রেরণা অনুভব করিলে আবার প্রায়োপবেশন করিতে দ্বিধাবোধ করিবেন না, তাহা করিলে, তাঁহার প্রাণহানির সম্ভাবনায় গবন্মেণ্ট যদি তাঁহাকে তখন ছাড়িয়া দেন, তাহা হইলেও তিনি

উপবাসভঙ্গ করিয়া প্রাণরক্ষা করিবেন না, মৃত্যু বরণ করিবেন।

আমরা এই সম্ভাবিত কারণে সম্ভাবিত আমরণ প্রায়োপবেশনের সমর্থন করিতে পারিব না। গত আশ্বিনের প্রবাসীর ৮৮৩ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত "অনুন্নতহিন্দুসেবা সম্বন্ধে গান্ধীজীর মনোভাব" শীর্ষক নিবন্ধিকা পড়িলে আমাদের অসামর্থ্যের কারণ বুঝা যাইবে। পুনরুক্তি অনাবশ্যক।

পণ্ডিত জওআহরলালের জ্ঞাপনপত্র

পুনা হইতে ১৪ই সেপ্টেম্বর পণ্ডিত জওআহরলাল সংবাদপত্রসমূহকে জানাইবার নিমিত্ত একটি জ্ঞাপনপত্র বাহির করিয়াছেন। তাহাতে বলিয়াছেন, বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার ও গান্ধীজীর মত-আদানপ্রদান চিঠি-লেখালেখির আকার ধারণ করিবে, এবং উভয়ের চিঠিগুলি প্রকাশিত হইবে। তিনি বলেন, তিনি সব বিষয় রাজনীতি ও অর্থনীতির দিক্ দিয়া সর্ব্বদা দেখিয়াছেন, ধর্ম্ম বা তদ্বিধ কিছুর দ্বারা তিনি প্রভাবিত হন নাই। তাঁহার মতে গান্ধীজীর কার্য্যপ্রণালী ঠিক্ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, এই জন্য তাঁহার নেতৃত্ব একান্ত আবশ্যক। কিন্তু পণ্ডিতজী অনুভব করেন, যে, তাঁহাদের লক্ষ্যস্থল অধিকতর স্পষ্ট রূপে নির্দ্দেশিত হওয়া আবশ্যক, যাহাতে তদ্বিষয়ে ভারতে ও বিশেষ করিয়া তাহার বাহিরে কোন ভ্রান্ত ধারণা না জন্মিতে পারে। তিনি অনুভব করেন, ধনিক সমাজশৃঙ্খলার আজকালকার ভাঙ্গনের দিনে তাঁহাদের পক্ষে জাতীয় প্রচেষ্টার একটি সুস্পষ্ট আর্থিক নীতি নির্দ্দেশ করা একান্ত আবশ্যক।

সেই নীতি যে কি হইবে, তাহা করাচী কংগ্রেসে জনসাধারণের মৌলিক অধিকারের বিবৃতি হইতে, পণ্ডিতজীর ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত নানা মত হইতে, এবং সম্প্রতি পাইয়োনিয়ারের প্রতিনিধিকে কথিত তাঁহার মতামত হইতে অনুমান করা যাইতে পারে। নিখিলভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনের ব্যবস্থা সম্বন্ধে পণ্ডিতজী বলেন, বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা করা কঠিন, তাহাতে বাধা আছে।

হোয়াইট পেপারের নাম হোয়াইট কেন

মিঃ জেম্স্ ইউরোপীয়দের প্রতিনিধিরূপে বিলাতী জয়েণ্ট পার্লেমেণ্টারী কমিটিতে গিয়াছিলেন। তিনি ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিয়া বক্তৃতায় বলিয়াছেন, হোয়াইট পেপার বিলাতে লোকের মনকে আলোড়িত করিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, একজন ব্যাঙ্ক-কেরানী হোয়াইট পেপারের ফলে ভারতবর্ষে সব বিলাতী ব্যাঙ্ক ও ইনসিওরেন্স কোম্পানী বাজেয়াপ্ত হইবে ভাবিয়া উত্তেজিত ভাবে তাঁহাকে প্রশ্ন করে। তিনি উত্তর দেন, হোয়াইট পেপারের ফলে ওরূপ কিছু হইবে না।' বিলাতে একজন বাস্-চালক তাঁহাকে সুধায়, হোয়াইট পেপারটাকে কেন হোয়াইট বলা হইয়াছে। মিঃ জেম্স্ কি উত্তর দিয়াছিলেন, বক্তৃতায় বলেন নাই। ইহা বলিয়াছিলেন কি, যে, উহাতে হোয়াইট অর্থাৎ শ্বেতকায়দেরই সমুদয় স্বার্থ রক্ষিত হইয়াছে বলিয়া উহার নাম হোয়াইট পেপার?

"নীরব উন্নয়ন-কার্য্য"

"অস্পৃশ্যদিগের সেবক সমিতি"র সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমৃতলাল ঠক্কর ইংরেজী "হরিজন" কাগজে "সাইলেণ্ট আপ্-লিফ্ট্ ওয়ার্ক" "নীরব উন্নয়ন-কার্য্য" নাম দিয়া কলিকাতায় কতকগুলি তরুণ মারোয়াড়ীর পরিচালিত চব্বিশটি দৈবসিক ও নৈশ বিদ্যালয়ের বর্ণনা প্রকাশ করিয়াছেন। মারোয়াড়ীদের সমিতির নাম "দলিত সুধার সমিতি"। তাঁহারা প্রধানতঃ তথাকথিত অস্পৃশ্যদের জন্য এই বিদ্যালয়গুলি চালান। এ-গুলিতে প্রায় এক হাজার বালক ও বালিকা পড়ে। সবগুলি যেন ছেলেমেয়েতে ঠাসা। ঠক্কর-মহাশয় দুটি দৈবসিক ও চারিটি নৈশ বিদ্যালয় দেখেন। বালিকা ও নারীদের জন্য রামবাগানের একটি নৈশ বিদ্যালয় দেখিবার জিনিষ। সেখানকার একটি ছাত্রী, দেখিলেন, তাহার শিশুটিকে লইয়া আসিয়াছে। ছাত্রীটি পড়িতেছে, শিশু মধ্যে মধ্যে স্তন্য পান করিতেছে। অন্যান্য শহরে মেয়েদের জন্য নৈশ বিদ্যালয়ের কথা বড়-একটা শুনা যায় না, কিন্তু এখানে জিনিষটি বাস্তব। ইহা সফল হইবার কারণ, শিক্ষা দেন শিক্ষয়িত্রীরা, বিদ্যালয় ভাল বাড়িতে অবস্থিত, তাহা বৈদ্যুতিক আলোকে আলোকিত, এবং অবৈতনিক তত্ত্বাব-ধায়িকার কাজ করেন একটি দয়াশীলা মহিলা—শ্রীযুক্ত সাধনচন্দ্র রায়ের পত্নী শ্রীযুক্তা ব্রহ্মকুমারী রায়।

বড় বড় ছাত্রদের মধ্যে অনেকে রাস্তায় জল দেয়, খোলা নর্দ্দমা পরিষ্কার করে, মাটির নীচেকার ড্রেন সাফ করে, ঝাড়ু-দারের কাজ করে, জুতা মেরামত করে, ইত্যাদি।

ঠক্কর-মহাশয় লিখিয়াছেন, শেঠ সীতারাম সেকসরিয়া প্রমুখ তরুণ মারোয়াড়ীবৃন্দ এই কাজটিতে প্রাণের সহিত হাত দেন গত জানুয়ারী মাসে। ঠক্কর-মহাশয় বলিয়াছেন শেঠজী, " I am sure, will blush when he sees his name mentioned," "তাঁহার নামের উল্লেখ দেখিয়া লজ্জিত হইবেন।" বিদ্যালয়গুলি কৃষ্টির সত্যকার কেন্দ্র হইয়াছে, যে-সব বস্তীতে সেগুলি অবস্থিত, তথাকার নরনারীরা সেগুলি খুবই পছন্দ করে।

"দলিত সুধার সমিতি" সস্তায় চাল বিক্রী করিবার দুটি দোকান খুলিয়াছেন। যে দামে চাল কেনা হয়, সেই দামেই বস্তীর চেনা লোকদিগকে এক মাসের ধারে চাল দেওয়া হয়। ক্রেতারা মাসান্তে বেতন পাইবামাত্র নিজেই দেনা শোধ করে। এপর্য্যন্ত লোকসান সামান্যই হইয়াছে। কেরোসীন তৈল প্রভৃতিও ঐ রকম সর্ত্তে বিক্রী করা হয়।

আর একটি ভাল কাজ ইঁহারা করিতেছেন—গরিব বস্তী-ওয়ালাদিগকে চিরঋণগ্রস্ততা হইতে উদ্ধার করিতেছেন। কাবুলী বা তাহার সমান অর্থগৃধ্নু বাণিয়া মহাজনের হাতে পড়িলে দেনদারের রক্ষা নাই। প্রতি মাসে টাকা-প্রতি এক আনা দু-আনা সুদে ইহারা টাকা ধার দেয়। একটি স্ত্রীলোক ৬০ টাকা কর্জ্জ করিয়াছিল, সুদই দিয়াছে হাজার টাকা অথচ অঋণী হইতে পারে নাই। সমিতির কর্ম্মীরা এই রকম দেনা রফা করিয়া শোধ দিয়াছেন এবং পরে দেনদারের নিকট হইতে মাসিক কিস্তিতে ঋণের টাকাটা আদায় করেন। দেনদার যাহা মাসে মাসে সুদ দিত, সেই পরিমাণ কিস্তিতেই কয়েক মাসে সমিতির নিকট তাহার সমস্ত দেনা শোধ হইয়া যায়। সমিতি এই প্রকারে কয়েক শত টাকা খাটাইয়া নূতন নূতন দেনদারকে ঋণমুক্ত করিতেছেন। তাহারা সমিতিকে কিস্তির টাকা ঠিক ঠিক দেয়, ঠকায় না। কাহাকেও ঋণমুক্ত করিবার চেষ্টা করিবার আগে অবশ্য তাহার পারিবারিক আয় ব্যয় অনুসন্ধান করা হয় ও অন্য সাবধানতা অবলম্বন করা হয়।

এই প্রকারে মারোয়াড়ীদের যে বাণিজ্যদক্ষতা ও হিসাব-নিপুণতা তাঁহাদিগকে হাজার হাজার টাকা উপার্জ্জনে সমর্থ করে, তাহা দরিদ্র নিরক্ষর সমাজদলিত লোকদের সেবায় ও উন্নয়নে নিযুক্ত হইয়াছে।

—

ভারতবর্ষের সমস্যা সম্বন্ধে পণ্ডিত জওআহরলাল

পণ্ডিত জওআহরলাল জেল হইতে মুক্তি পাইবার পর পাইয়োনিয়ার কাগজের একজন প্রতিনিধি নানা বিষয়ে তাঁহার



জওআহরলাল নেহরু

মত জানিবার নিমিত্ত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহার মতে,

ভারতবর্ষের সমস্যা, প্রথমতঃ, আদৌ বা মূলতঃ

অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক নহে ; এই সমস্তার সমাধান করিতে হইলে ভারতীয় সমাজকে নূতন ভিত্তির উপর সম্পূর্ণ পুনর্গঠিত করিতে হইবে। তাহার মানে, লাভ ও সম্পত্তির মালিক এখন যাহারা তাহাদের হাত হইতে যাহারা শ্রম করে অথচ নিঃস্ব তাহাদের হাতে উহা যাওয়া দরকার। মালিকরা স্বেচ্ছায় এই হস্তান্তর করণে রাজী হইবে এরূপ অনুমান করা যায় না।

ভারতবর্ষের আর্থিক অবস্থা অংশতঃ রাজনৈতিক অবস্থার ফল। ভারতীয় সমস্যাটিকে প্রধানতঃ অর্থনৈতিক বলিলে তাহার রাজনৈতিক কারণটিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয় না। ইহা কি সমীচীন ? পণ্ডিত জওআহরলালের বিবৃত এই সমস্যা শুধু যে ভারতবর্ষের নহে, তাহা তিনি নিজেই বলিয়াছেন। তিনি ঠিক রুশীয় আদর্শানুযায়ী সমাধান চান না, কিন্তু অনেকটা রুশীয় ধরণের বটে। রুশিয়াতে যে সামাজিক পুনর্গঠন হইয়াছে, ইউরোপের অন্য কোন কোন দেশে—যেমন ইটালী ও জার্মেনীতে—সেইরূপ চেষ্টা হওয়ায় প্রধানতঃ তথাকার মধ্যবিত্তেরা রাষ্ট্রশক্তি দখল করিয়া কম্যুনিষ্টদিগকে ঠেকাইয়া রাখিয়াছে। মধ্যবিত্তদের এই আত্মরক্ষার চেষ্টারই নাম ফাশীজ্‌মো বা বা ফাশীজম্‌। কম্যুনিষ্ট ও ফাশীষ্টদের বিবাদে ইউরোপের শান্তি নষ্ট হইয়াছে। ইংলণ্ডেও অপেক্ষাকৃত মৃদু রকমের কম্যুনিষ্ট ও ফাশীষ্ট দল আছে। ইউরোপের দেশগুলি বিদেশী কোন জাতির অধীন নহে। সেই জন্য তথাকার বিবাদ দেশী দুই দলের অন্তর্বিবাদ। রুশিয়ায় এক দল রাষ্ট্রশক্তি হস্তগত করিয়াছে। ইটালী ও জার্মেনীতে তাহার বিপরীত দল রাষ্ট্র-শক্তি অধিকার করিয়াছে। ভারতবর্ষে যদি নিঃস্ব ও ধনবানদের বিবাদ পাকাপাকি রকমের হয়, তাহা হইলে বিদেশী রাষ্ট্রশক্তি কোন একটা দলের পক্ষ অবলম্বন করিবে—সম্ভবতঃ ধনবানদের। তাহাতে বিবাদটা জটিল, কারণ তিন-কোণা (triangular), হইবে। এইরূপ জটিল অবস্থায় ভারতবর্ষের বিদেশীপ্রভুত্ব হইতে মুক্তিলাভ বর্ত্তমান অবস্থা অপেক্ষা কঠিনতর হইবে।

ভারতবর্ষের শ্রমিক ধনোৎপাদকেরা প্রধানতঃ কৃষক ; কারখানার শ্রমিকও এদেশে আছে বটে, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। আগ্রা-অযোধ্যায় যে কিষান প্রচেষ্টা হইয়াছিল, তাহা কৃষকদের অসন্তোষের ফল। পণ্ডিত জওআহরলাল বলিয়াছেন, আন্দোলকেরা ঐ অসন্তোষ জন্মায় নাই ; আগে হইতে স্বতঃ উহার উৎপত্তি হইয়াছিল, আন্দোলকেরা কেবল তাহা প্রকাশ করিয়াছিল ও চালিত করিয়াছিল। তাঁহার মতে ধনিক, জমিদার, ও বিশেষসুবিধাভোগী অভিজাতদের প্রাধান্যের ভিত্তির উপর গঠিত সমাজ জীর্ণ হইয়াছে, উহা আর টিকিবে না, উহাকে অন্য ভিত্তির উপর পুনর্নির্মাণ করিতে হইবে। তিনি বলেন, হোয়াইট পেপারটা সম্পূর্ণ অকেজো এবং উহা এমন একটা যন্ত্র যাহা চালান যাইবে না, অচল হইবে। উহাতে ভারতীয় সমস্যার সমাধান হইবে না। "আমরা যে ভারতবর্ষে স্বশাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছি, তাহার উদ্দেশ্য শাসনকার্য্যের ব্যয় কমান এবং কৃষকদের বোঝা লঘু করা। কিন্তু, ব্যয় হ্রাস হওয়া দূরে থাক্‌, স্যর মালকম হেলী অনুমান করিতেছেন, যে, প্রাদেশিক আত্মকর্ত্তৃত্বে ব্যয় বাড়িবে কয়েক কোটি টাকা করিয়া ! আমি ত খুশী, যে, হোয়াইট পেপারের প্রস্তাবিত শাসনপদ্ধতিটা একেবারে ওঁছা। ওটা যদি আংশিক ভাল ও আংশিক মন্দ হইত, তাহা হইলে উহার বিরোধিতা করা কঠিনতর হইত।"

বিঠলভাই ও সুভাষচন্দ্র

পণ্ডিতজী বলিয়াছেন, যে, তাঁহার ভারতবর্ষ ছাড়িয়া বিদেশে যাইবার কোন ইচ্ছা নাই। শ্রীযুক্ত বিঠলভাই পটেল ও শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু বিদেশে গিয়া তথা হইতে নিজেদের মত প্রচার করিতেছেন এবং ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলন ভবিষ্যতে কিরূপ হওয়া উচিত, তাহা নির্দ্দেশ করিতেছেন। পণ্ডিতজী সেরূপ কিছু করিবেন কিনা, এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে উহা বলিয়া থাকিবেন। বিঠলভাই ও সুভাষচন্দ্র অবশ্য স্বেচ্ছায় বিদেশে যান নাই, চিকিৎসিত হইবার প্রয়োজন হওয়ায় গিয়াছেন।

বিদেশে খোলাখুলি কথা অনেক বলা যায় বটে, কিন্তু সে-সব কথা ভারতবর্ষে প্রায়ই পৌঁছিতে দেওয়া হয় না, পৌঁছিলেও অচিরে তৎসমুদয়ের প্রকাশ ও প্রচার নিষিদ্ধ হয়। বিদেশ হইতে এদেশের কোন প্রকার আন্দোলন ও প্রচেষ্টার নেতৃত্ব ও পরিচালনা করা সম্ভবপর নহে। ইউরোপীয় কোন কোন দেশের—যেমন ইটালী, হাঙ্গেরী ও আয়ার্লণ্ডে—আন্দোলকেরা বিদেশে গিয়া আন্দোলন করিয়া যে ফল লাভ

করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষের আন্দোলকেরা ঠিক সেরূপ ফল লাভ করিতে পারিবেন না। কারণ, কোনও খ্রীষ্টিয়ান ও পাশ্চাত্য জাতির সহিত অন্য খ্রীষ্টিয়ান পাশ্চাত্য জাতিদের যেরূপ সহানুভূতির উদ্রেক হইতে পারে, প্রাচ্য ও অখ্রীষ্টিয়ান



শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু

ভারতবর্ষের প্রতি তাহা হইতে পারে না। পাছে কিছু সহানুভূতি হয়, এই জন্য মিস্ মেয়ো, মিসেস প্যাটি শিয়া কেণ্ড্যাল প্রভৃতির লেখা ভারতের কুৎসাপূর্ণ বহি প্রচার করা হইয়াছে। ভারতবর্ষের প্রতি সহানুভূতি না হইবার আরও একটি কারণ আছে। ভারতবর্ষ যত দিন স্বশাসন ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত থাকিবে, ততদিন তাহার পণ্যশিল্পের সম্যক্ উন্নতি হইবে না, তাহার কাঁচা মাল অন্য দেশে গিয়া কারখানায় প্রস্তুত পণ্যদ্রব্যে পরিণত হইয়া আবার এখানেই বেশী দামে রপ্তানী ও বিক্রী হইবে। এ অবস্থায় ভারতবর্ষ পণ্যশিল্পপ্রধান অনেক দেশের পণ্যদ্রব্যের প্রভূত কাটতির জায়গা। ভারতবর্ষকে স্বশাসক হইতে সাহায্য করিয়া সেই সব দেশ কেন নিজেদের বাণিজ্যের ক্ষতি করিবে?

এই সব কথা বিবেচনা করিলে, পণ্ডিতজী যে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া বিদেশে যাইতে চান না, তাহা সমীচীন সঙ্কল্প বলিতে হইবে। তবে, বিদেশে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অজ্ঞতা অত্যন্ত বেশী এবং সেখানে উদারচেতা নিরপেক্ষ লোকও কিছু আছেন। এই জন্য তথায় ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য ও সত্য প্রচার করা একান্ত আবশ্যক। এই প্রচার-কার্য্য অবহেলা করা উচিত নহে। বিঠলভাই ও সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিদেশী লোকদের অজ্ঞতা কিয়ৎ পরিমাণে দূর করিয়া দেশহিতসাধন করিতেছেন।

—

ভারতের উপবাসী জনগণ

ভারতবর্ষের সরকারী ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসের ডিরেক্টর-জেনারাল স্যর জন্ মেগাউ ডাক্তারদের নিকট প্রশ্নপত্র পাঠাইয়া তাহার উত্তরগুলি হইতে কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। যথা

(১) ভারতের জনগণের পুষ্টি সামান্যই [illegible]। ( ) তাহাদের গড় আয়ু যত হওয়া উচিত ছিল, তাহার অর্দ্ধেকেরও কম। (৩) যে দশ বৎসরে বৃষ্টির বিশেষ কমবেশী হয় নাই, তাহাতে প্রতি পাঁচটি গ্রামের মধ্যে একটিতে দুর্ভিক্ষ বা খাদ্যের দুষ্প্রাপ্যতা ঘটিতেছে। (৪) মৃত্যুর হার অত্যন্ত বেশী হওয়া সত্ত্বেও ভারতে খাদ্য-সামগ্রী ও অন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বৃদ্ধি অপেক্ষা লোকসংখ্যা বেশী বৃদ্ধি হইতেছে। (৫) যে-সব বালিকার এখনও স্কুলে পড়া উচিত, তাহাদিগকে পত্নী ও মাতা হইতে বাধ্য করা হয়, এবং তাহাদের অনেকে গর্ভধারণ ও প্রসবের ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে বাধ্য। (৬) ওলাউঠা, বসন্ত ও প্লেগের মহামারী সাধারণ ব্যাপার হইয়া

উঠিয়াছে। (৭) শিক্ষিত শ্রেণীর লোকেরা যে ঐরূপ অবস্থার সঙ্গীনতা উপলব্ধি করিয়াছে তাহার সামান্যই প্রমাণ পাওয়া যায়; অন্ততঃ তাহারা সমস্যাটি সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য কোন গঠনমূলক প্রস্তাব করে নাই, কিংবা তাহার সমাধানের কোন পদ্ধতি স্থির করে নাই।

এই দোষটা তাহাদের আছে বটে, এবং গবর্মেণ্টেরও যে এই দোষটা আছে, তাহাতে আমাদের দোষের ক্ষালন বা লাঘব হয় না বটে; কিন্তু গবর্মেণ্টেরও যে এই দোষটা আছে, তাহা মেগাউ সাহেব কেন বলেন নাই? যথেষ্ট প্রতিকার ত সরকারী ক্ষমতা প্রয়োগ ভিন্ন হইবার নয়।



শ্রীযুক্ত বিঠলভাই পটেল

ডাক্তার মেগাউএর মতে সমগ্র ভারতের শতকরা ৩৯ জন লোক সুপুষ্ট, শতকরা ৪১ জন সামান্য রকম পুষ্টি লাভ করে, এবং শতকরা ২০ জনের পুষ্টি অত্যন্ত কম।

তিনি রোগের আক্রমণেরও একটা আনুমানিক তালিকা দিয়াছেন। ভারতের মোট লোকসংখ্যা ৩৫ কোটি ৩০ লক্ষ। তন্মধ্যে রিকেটস্ বা বালাস্থিবিকৃতিতে আক্রান্ত ২৩৯৮০০, নৈশ

অন্ধতায় ৩৬৭১২০০, উপদংশে ৫৫০৬৮০০, প্রমেহে ৭৫৮৯৫০০, কুষ্ঠে ৪১৩০০, ফুসফুসের ক্ষয় রোগে ১৫৫৩২০০, অন্যবিধ ক্ষয়ে ৬৩৫৪০০, উন্মাদে ২৮২৪০০, বংশানুক্রমিক মানসিক পীড়ায় ৩১৭৭০০ এবং অন্ধতায় ১৯৪১৫০০ জন। নৈশ অন্ধতা আগ্রা-অযোধ্যায় আছে হাজারকরা ২৫·৩২ জনের, মধ্যপ্রদেশে ২·১৬ জনের, মান্দ্রাজে ২·১৮ জনের, পঞ্জাবে ৩·৮৮ জনের এবং বঙ্গে ১২·৮৮ জনের। আগ্রা-অযোধ্যার নীচেই বঙ্গে এই ব্যাধি খুব বেশী। এই ব্যাধি পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে হয় শুনা যায়। তাহা সত্য হইলে আগ্রা-অযোধ্যা ও বঙ্গের অবস্থা এ বিষয়ে সাতিশয় শোচনীয়।

—

আণ্ডামানে আরও বন্দীপ্রেরণ

জনমতকে অগ্রাহ্য করিয়া, জনমত যাহা চায় তাহার ঠিক উন্টা কাজ করা শক্তিমত্তা এবং দৃঢ় ও বলবৎ শাসনের লক্ষণ, স্বরাষ্ট্রসচিব স্যর হ্যারি হেগের ধারণা বোধ করি এইরূপ। কেন না, জনমত চাহিতেছে আণ্ডামানের জেল বন্ধ করিয়া দিয়া তথাকার বন্দীদিগকে ভারতবর্ষের জেলে আনয়ন। কিন্তু তাহা ত করা হয়ই নাই, অধিকন্তু নূতন করিয়া অনেকগুলি বন্দীকে আণ্ডামানে পাঠান হইয়াছে। তাহাদের অধিকাংশ বাঙালী। বড় বড় ইংরেজ রাজপুরুষেরা বার-বার বলিয়াছেন, যে, তাঁহারা সন্ত্রাসবাদ দমনে জনমতের সাহায্য চান। কিন্তু ইহার মানে বোধ হয় এই, যে, তাঁহারা নিজেদের মতেরই প্রতিধ্বনি এবং নিজেদের কাজের সমর্থন জনসাধারণের নিকট হইতে চান। মহাত্মা গান্ধী মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট বার্জ সাহেবের হত্যার যথোচিত নিন্দা করিয়া ও তাহাতে গভীর দুঃখ প্রকাশ করিয়া সন্ত্রাসবাদের উৎপত্তি ও স্থিতির কারণ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। হেগ সাহেবের মতে এরূপ ব্যাখ্যা সন্ত্রাসকদের সহিত সহানুভূতির পূর্ব্ববর্ত্তী ধাপমাত্র; যথা—

"It is a short step, as bitter experience has shown us in the past, from such explanations of the causes of a murder to sympathy with the murderers."

হত্যার কারণাবলীর ব্যাখ্যা যদি হত্যাকারীদের সহিত সহানুভূতির কাছাকাছি হয়, তাহা হইলে গবর্মেণ্টের বন্ধু ষ্টেট্‌স্‌ম্যানও সেই দোষে দোষী। বার্জ সাহেবের হত্যার পর লিখিত ষ্টেট্‌স্‌ম্যানের নিম্নমুদ্রিত কথাগুলিতে গোপনে বিপ্লবচেষ্টা ও রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড এবং বর্ত্তমান শাসন-প্রণালীকে কার্য্যকারণ রূপে খাড়া করা হইয়াছে, তাহা হেগ সাহেব দেখিয়াছেন কি? তিনি কি ষ্টেট্‌স্‌ম্যানের সম্পাদককে হত্যাকারীদের সহানুভূতিকারী বলিবেন?

The Royalist executive, as soon as it began to devote itself to the question, soon discovered that there must be very deep reasons indeed which lead every Viceroy to advocate reform and to realize that Indians have now a tremendous permanent grievance in the attempt to govern India from Whitehall. Moreover, despite the nitwits of the *Daily Mail,* it just cannot be done, and so long as the attempt is persisted in, so long as some Salisbury sitting at Home can publicly thrust in an oar to make the task of the Crown's representative difficult, so long as India's economic problems are viewed in the last resort, not from the angle of India's interests, but according to the views, of Mr. Montagu Norman, or some other City banker so long as the belief exists that avenues of employment and careers are denied to Indians, and that the bridge between the governing and the governed is only a drawbridge that can be swung up from the moat at will, leaving authority inaccessible in a fortress instead of being the organ of the public, just so long will you have underground revolution, and just so long will you have assassinations, the number of which only the permanent application of the sternest methods can possibly keep in check. We have to choose between the transfer of responsibility from Westminster to Indian soil or the permenent application of something approaching martial law. This last, a vacillating and in regard to India an ill-informed electorate, totally unfitted for its present responsibility for India, is also incapable of guaranteeing

ষ্টেট্‌স্‌ম্যান যাহা লিখিয়াছেন ভারতীয়দের অভিযোগ ঠিক তাহা না হইতে পারে, উহার কারণ নির্দ্দেশ ও প্রতিকার ব্যবস্থা আংশিক সত্যানুভূতির ফল হইতে পারে, কিন্তু এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই, যে, ষ্টেট্‌স্‌ম্যানের ব্যাখ্যায় বর্ত্তমান শাসন... আসিয়া পড়িয়াছে। এরূপ ব্যাখ্যা দ্বারা হত্যাকার্য্যের সমর্থন... তাহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা হয় নাই।

সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথপ্রমুখ কতকগুলি হিন্দু মুসলমান ও খ্রীষ্টিয়ান আণ্ডামানের বন্দীদের সকল অভিযোগ দূরীকরণ ও তাহাদিগকে ভারতবর্ষের জেলে আনয়নের সপক্ষে একটি মতজ্ঞাপনপত্র বাহির করেন। হেগ সাহেব তাহার উপরও এক হাত লইয়াছেন। ঐ জ্ঞাপনীটি, তাঁহার মতে,

"A manifesto which, whatever may have been its primary object, must have the effect of keeping alive the feeling of sympathy for the terrorist prisoners in the Andamans."

হেগ সাহেব তাহা হইলে কি ইহাই চান, যে, আণ্ডামানের ঐ বন্দীরা আইনসঙ্গত ন্যায্য মানুষিক ব্যবহার পাইতেছে না

সাধারণের এরূপ ধারণা জন্মিলেও তাহারা চুপ করিয়া থাকিবে? ঘোরতর অপরাধী লোকেরাও মানুষ। তাহাদের অপরাধের জন্য তাহাদের ন্যায্য শাস্তি পাওয়া উচিত। কিন্তু তাহারা আইনবহির্ভূত দুঃখ পাইলে তাহাদের সেই দুঃখমোচনের ইচ্ছা অপরাধের সহিত সহানুভূতি নহে। আণ্ডামানের ঐ বন্দীদিগকে রাজনৈতিক বন্দী বলায় হেগ সাহেব চটিয়াছেন, বলিয়াছেন তাহারা সন্ত্রাসক, রাজনৈতিক বন্দী নহে। বঙ্গের গবর্ণর ঢাকায় এক বক্তৃতায় যাহা বলিয়াছিলেন তাহাতে এই বুঝায়, যে, সন্ত্রাসকরা শাসনপ্রণালী ও শাসক মনুষ্যসমূহ পরিবর্ত্তনের জন্য হত্যাকাণ্ড আদি করে। ইহা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য, এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কেহ কোন দুষ্কর্ম্ম করিয়া দণ্ডিত হইলে তাহাকে রাজনৈতিক বন্দী বলিলে আভিধানিক কোন ভ্রম হয় না বলিয়াই আমাদের ধারণা।

আণ্ডামান হইতে বন্দীদের আনা হইবে, উহা দণ্ডবিধানার্থ উপনিবেশ (penal settlement) আর রাখা হইবে না, গবর্ন্মেণ্ট পরিষ্কার ভাষায় এরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। ১৯২১ সালের ১১ই মার্চ্চ ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় গবর্ন্মেণ্ট পক্ষ হইতে স্যর উইলিয়ম ভিন্সেণ্ট বলিয়াছিলেন :—

"We have now after consultation with the Secretary of State decided, subject of course to any advice from this Assembly, because this is a matter on which the influence of the legislature may very properly be exercised, to abandon the penal settlement altogether."

তাহার পর ঐ দিনেই তিনি আবার বলেন :—

"May I ask one question? I am very anxious to know in connection with this question of the Andaman settlement whether the action proposed by Government has the approval of the Assembly?"

সদস্যেরা উত্তর দেন, "হাঁ, মহাশয়।"

আগে যে-কারণে দণ্ডবিধানার্থ আণ্ডামানের ব্যবহার ত্যাগ করিতে গবর্ন্মেণ্ট সঙ্কল্প ও অঙ্গীকার করেন, তাহা এখনও বর্ত্তমান। স্যর উইলিয়ম ভিন্সেণ্ট বলিয়াছিলেন :—

"For some years we have had misgivings about this Settlement . . . It is at a great distance from the headquarters of Government, and it is impossible for us to control or supervise work effectively, and the Settlement is also unamenable to outside influences."

এখন আণ্ডামানে আবার বন্দী রাখিবার ব্যবস্থা করিবার সপক্ষে তিনটা যুক্তি দেখান হইয়াছে—(১) সন্ত্রাসকদিগকে দণ্ড দিবার ও দমন করিবার জন্য উহা আবশ্যক, (২) ভারতবর্ষীয় জেলসকলে স্থানাভাব, (৩) সন্ত্রাসকদিগকে ভারতীয় জেলে রাখিলে তাহারা জেলের নিয়ম ভঙ্গ করে ও অন্য কয়েদীদের মনে সন্ত্রাসবাদ সংক্রামিত করে। কিন্তু (১) আণ্ডামানে জেল তুলিয়া দিবার অঙ্গীকারের সময়েও সন্ত্রাসবাদ ও সন্ত্রাসক ছিল; (২) গবর্ন্মেণ্ট কত কাজে কোটি কোটি টাকা খরচ করেন, নূতন কয়েকটা জেল নির্ম্মাণও করিতে পারিতেন; (৩) যে-সব জেল কর্ম্মচারীর অকর্ম্মণ্যতায় এইরূপ নিয়ম ভঙ্গ ও সংক্রামণ হয় তাহাদিগকে পদচ্যুত করিয়া যোগ্যতর কর্ম্মচারী রাখা উচিত ছিল।

—

মেদিনীপুরে খানাতল্লাসী

বার্জ্ সাহেবের শোচনীয় হত্যার পর মেদিনীপুরে অনেকগুলি বাড়িতে খানাতল্লাসী হয়। তদুপলক্ষ্যে অনেকের উপর মারপিট ও অনেক আসবাবপত্র ধ্বংস হইয়াছে বলিয়া কাগজে সংবাদ বাহির হইয়াছে। তাহাতে একখানি এংলোইণ্ডিয়ান খবরের কাগজ বলিতেছেন, বার্জ সাহেবের হত্যার তুলনায় এগুলা সামান্য আঘাত ও ক্ষতি। তাহা সত্য। কিন্তু এরূপ তুলনাটাই যে অযৌক্তিক এবং আহাম্মকী। যে বা যাহারা বার্জ সাহেবকে খুন করিয়াছে, যুক্তি ও আইন অনুসারে এবং বিচারের পর তাহাদেরই শাস্তি হইতে পারে। কিন্তু যে হেতু কেহ কেহ খুন করিয়াছে, অতএব যদৃচ্ছাক্রমে অবিচারিত ভাবে অন্য কাহাকেও কাহাকেও ঠেঙাইতে ও তাহাদের জিনিষপত্র চুরমার করিতে হইবে, ইহা ব্রিটিশ আইনসঙ্গত নহে, ন্যায়সঙ্গতও নহে। এবম্বিধ সব অভিযোগের তদন্ত করিয়া যাহা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইবে তাহার প্রতিকার করিয়া তাহা পুনর্ব্বার হওয়া বন্ধ করা উচিত। 'সঞ্জীবনী' বলেন :—

"আমাদের প্রস্তাব যে কলিকাতার মেয়র বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি এবং সেক্রেটারীকে মিঃ গুপ্তের অভিযোগের তদন্ত করিবার জন্য অনতিবিলম্বে নিযুক্ত করা হউক। মেদিনীপুর হইতে কলিকাতায় অতি ভয়ঙ্কর সংবাদ আসিতেছে যে শুনিতেছে সেই বিশ্বাস করিতেছে। সুতরাং আমরা আবার বলি অবিলম্বে সমস্ত অভিযোগের তদন্ত করা হউক।"

—

গান্ধী-নেহরু পত্রালাপ

পণ্ডিত জওআহরলাল নেহরু তাঁহার মতজ্ঞাপন পত্রে গান্ধীজীর ও তাঁহার যে চিঠি-লেখালেখির উল্লেখ করিয়াছিলেন,

তাহা খবরের কাগজে প্রকাশের জন্ত দেওয়া হইয়াছে। আজ ৩১শে ভাদ্র চিঠি দুটির সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য কলিকাতার দৈনিক-গুলিতে প্রকাশিত হইয়াছে। পণ্ডিতজী তাঁহার চিঠিতে করাচী কংগ্রেসে প্রস্তাবিত ও নির্দ্ধারিত জনসাধারণের পৌরজানপদ জীবনের ভিত্তীভূত অধিকারগুলির (fundamental rightsএর) উপর জোর দিয়াছেন। তাঁহার চিঠিতে ইহাও বিশদ করা হইয়াছে, যে, শ্রীযুক্ত আণের ষ্টেটমেণ্ট দ্বারা কংগ্রেস ভাঙিয়া দেওয়া হয় নাই। এবিষয়ে গান্ধীজী ও আণে মহাশয় যাহা করিয়াছেন, তিনি তাহার সহিত একমত। সব কংগ্রেসওয়ালা যাহা করিবার অভিপ্রায় করিবেন তাহার অগ্রিম খবর গবর্ন্মেণ্টকে দিতে হইবে, ইহা তিনি হাস্তকর মনে করেন—যদিও তাঁহার মতে গান্ধীজীর পক্ষে ইহা ঠিক ও যথাযোগ্য বটে।

গান্ধীজীর চিঠিতে পণ্ডিতজীর চিঠির দফা দফা উত্তর আছে। মহাত্মাজীও মনে করেন, যে, স্বত্ববানদের স্বার্থ-সংকোচ না করিয়া জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি করা যাইবে না। পণ্ডিতজী দেশী রাজ্যের রাজাদের সম্বন্ধে যতদূর পরিবর্ত্তন চান, মহাত্মাজী ততদূর না গেলেও, ইহা মনে করেন, যে, ভারতবর্ষের একীভবনের জন্য নৃপতিদিগকে তাঁহাদের অনেক ক্ষমতা ছাড়িয়া দিতে এবং তাঁহাদের শাসিত প্রজাদের প্রতিনিধিস্থানীয় হইতে হইবে। ভারতীয় স্বাজাতিকতা ও পৃথিবীব্যাপী অন্তর্জাতিকতার সামঞ্জস্য রক্ষা সম্বন্ধে উভয়ে একমত। এই প্রকার নানা আদর্শের বিবৃতি সম্বন্ধে উভয়ের ঐকমত্য থাকিলেও, তাঁহাদের মধ্যে ধাতুগত (temperamental) প্রভেদ আছে। উপসংহারে গান্ধীজী বলিয়াছেন, যে, তিনি জানেন, বর্ত্তমানে এমন কোন শৃঙ্খলাবদ্ধ দল বা মণ্ডলী বা সংঘ ("organization") নাই, যাহা ব্যাপক দলবদ্ধ অহিংস আইনলঙ্ঘনের ভার বহন করিতে পারে। তাঁহার মতে, কংগ্রেসওয়ালাদের পক্ষে নিরুপদ্রব প্রতিরোধে যোগ দিতে অসামর্থ্য অনুভব করায় কোন দোষ নাই। তাহারা গঠনমূলক কাজ করিলেও দেশের সেবা করিবে, যেমন সাম্প্রদায়িক ঐক্যসম্পাদন, অস্পৃশ্যতাদূরীকরণ, এবং চরখা ও খদ্দরের সর্ব্বত্র প্রচলন। তিনি আশা করেন, যে, ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার অসহযোগ স্থগিত রাখা কিছু দিন লোকে ভুল বুঝিলেও, তাহার দ্বারা জাতীয়মঙ্গলসাধন প্রচেষ্টার ক্ষতি হইবে না।

নৃপতি ফৈজল

অল্পদিন হইল এদেশে সংবাদ আসিয়াছে যে, নৃপতি ফৈজল সুইজারল্যাণ্ডে ভ্রমণকালে ধমনী রোগের ফলে মৃত হইয়াছেন। ইঁহার মৃত্যুতে এশিয়াখণ্ডের অভিনব পুনর্জাগরণের যে-পর্য্যায় এখন চলিতেছে তাহার একজন অন্যতম প্রধান নায়ক যবনিকার অন্তরালে চলিয়া গেলেন। আরব দেশের হেজাজ অঞ্চলের এক সর্দ্দারের পুত্র ফৈজল, গত



নৃপতি ফৈজল

মহাযুদ্ধে নিজ জাতির স্বাধীনতার জন্য ইংরেজের [illegible] হইয়া তুর্কদিগের বিরুদ্ধে যে-অভিযান করিয়াছিলেন [illegible] এখন ইতিহাসের অংশবিশেষ। অর্থবল জনবল [illegible] ইত্যাদির দারুণ অভাব, বিভিন্ন আরব উপজাতির পরস্পরের প্রতি হিংসা—এই সকল বিপদ থাকা সত্ত্বেও ইনি যুদ্ধের প্রথম অংশে কিরূপ অসমসাহসের সহিত দুর্দ্ধর্ষ তুর্ক সেনাবাহিনীকে আক্রমণ করেন ও যথাসময়ে ইংরেজ সৈন্যের সাহায্য না পাওয়ায় ইঁহাকে কিরূপ ধৈর্য্য সাহস ও স্থিরবুদ্ধির সহিত বিষম বিপন্ন অবস্থা হইতে নিজ দলকে মুক্ত করিতে হইয়াছিল তাহাও এখন ইতিহাসে লিখিত হইয়াছে।

যুদ্ধশেষের পর পশ্চিম-জগতের কূটরাজনীতি ও সাম্রাজ্য-লালসার ফলে ইঁহার মিত্রদল ইঁহাকে ও সমস্ত আরব জাতিকে কিরূপ বিপদগ্রস্ত করিয়াছিল তাহাও এখনও সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয় নাই। কয়েকটি ইংরেজ (বিশেষতঃ একজন) এবং একজন প্রত্যক্ষদর্শী আমেরিকান সে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সেই সময়ে ইনি সিরিয়ার সিংহাসনচ্যুত ও ইঁহার ভ্রাতা হেজাজের গদী হইতে বিতাড়িত হ'ন। বহু ভাগ্যবিপর্য্যয়ের পর ইরাকের সিংহাসন ইঁহার ভাগ্যে আসে। সেখানেও বিদেশী ও স্বদেশী বহুবিধ চক্রান্ত ইঁহাকে অতিক্রম করিতে হয় এবং ইঁহার শেষ দিন পর্য্যন্ত ঐ কার্য্যেই কাটিয়া যায়।

স্বাধীনতার জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিয়া যে-সকল পুরুষ-সিংহ সর্ব্ব বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন এই অমিততেজা স্থিরবুদ্ধি আরবনৃপতি তাঁহাদের মধ্যে স্থান পাইবার উপযুক্ত, এ-বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। তাঁহার রাজনীতি পথ অনেকের নিকট অপ্রিয় বা হেয় মনে হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার শৌর্য্য, সাহস বা দৃঢ়প্রতিজ্ঞা সকল নিন্দার অতীত ছিল। ইঁহার মৃত্যুতে আরবজাতির সমূহ ক্ষতি হইল, সে-বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই।

—

বোধনা-নিকেতনের জন্য সাহায্য প্রার্থনা

[illegible] জেলার বাড়গ্রামে জড়বুদ্ধি ছেলেমেয়েদের রক্ষণাবেক্ষণ ও [illegible] "বোধনা নিকেতন" নামক যে আশ্রম খোলা হইয়াছে, [illegible] চলিতেছে। এই প্রতিষ্ঠানটির জন্য এককালীন দান ও [illegible]সাহায্যের একান্ত প্রয়োজন। অল্প বা বেশী, যিনি যাহা পারেন, ইহার সম্পাদক শ্রীযুক্ত গিরিজাভূষণ মুখোপাধ্যায়কে ৬।৫ বিজয় মুখুজ্যে গলি, ভবানীপুর, কলিকাতা, ঠিকানায় পাঠাইলে তাহা সাদরে ও কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হইবে। পূর্ব্বে যে দানগুলির প্রাপ্তি স্বীকৃত হইয়াছে, তাহার পর নিম্নলিখিত দানগুলি কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকৃত হইতেছে।

নন্দলাল মুখোপাধ্যায় ১০০, বিচারপতি সুরেন্দ্রনাথ গুহ ১০০, ডাক্তার অমূল্যরতন চক্রবর্ত্তী ১০০, মহারাজাধিরাজ বারভাঙ্গা ১০০, লেফটেন্যান্ট-কর্ণেল ফ্লেমিংগাও ৫০, রাজা নরসিংহ মল্ল দেব ৫০, মঃ এন সি নায়ার ৫০, বীরেন্দ্রনাথ রায় ৫০, বাঁকেবেহারী মিশ্র ৩৫, সুরেশচন্দ্র তালুকদার ২৫, অমৃতলাল চট্টোপাধ্যায় ২৫, ডাঃ সুধী চন্দ্র বসু ২৫, রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২৫, ডাঃ বি ত্রিবেদী ২৫, নন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় ১২, অনাথবন্ধু বসু ১২, অতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী ১০, চারুচন্দ্র ঘোষ ১০, শান্তা নাগ ১০, এ এন বাঁড়ুয্যে ১০, সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১০, অমরনাথ পালিত ১০, জ্যোতিষচন্দ্র নিয়োগী ১০, এস্ কে সেন ১০, ডাঃ জে সি মুখুজ্যে ৫, অমূল্যকুমার ভাদুড়ী ৫, শ্যামাদাস মুখোপাধ্যায় ৫, এস মিত্র ৫, সলিলকুমার রায় ৩ অবিনাশচন্দ্র সরকার ৫, বিজয়কুমার বসু ২, কালীপদ রায় ২, এবং ফণীভূষণ দত্ত চুনিলাল মিত্র, শিশিরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দুলালচন্দ্র সরকার, হেমচন্দ্র ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ দত্ত, তিনকড়ি ঘোষ, সুশীলকুমার লাহিড়ী, এস এন মুখুজ্যে, কালীমোহন সেন, ভূপালচন্দ্র রায় চৌধুরী, উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, মাখনলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমলচন্দ্র গাঙ্গুলী, এ এল চন্দ্র, ডি এম এস, ও এম এসসি প্রত্যেকে এক টাকা করিয়া। শান্তা দেবী ৫।

—

বিশেষ দ্রষ্টব্য

পূজার ছুটি :—পূজার ছুটির জন্য কার্ত্তিক মাসের প্রবাসী ৩রা আশ্বিন প্রকাশিত হইল। আগামী ৯ই আশ্বিন (২৫শে সেপ্টেম্বর) সোমবার হইতে ২২শে আশ্বিন (৮ই অক্টোবর) রবিবার পর্য্যন্ত প্রবাসী কার্য্যালয় বন্ধ থাকিবে। ছুটির ভিতর যে-সকল চিঠিপত্র ও অর্ডারাদি আসিবে, তাহা কার্য্যালয় খুলিবার পর যথোচিত সম্পাদিত হইবে।

১২০।২ আপার সার্কুলার রোড কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীমাণিকচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত



পল্লীচিত্র

শ্রীনন্দলাল বসু

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড | অগ্রহায়ণ, ১৩৪০ | ২য় সংখ্যা

স্থবিরা

কামিনী রায়

সামর্থ্য আমার যেদিকে যা ছিল আজ তার কিছু নাই।
নবীনেরা হোথা করে কত কাজ, দূরে বসি দেখি তাই।
ওদের বিপুল বলে-ভরা বাহু দ্রুতচ্ছন্দে যত চলে,
আনন্দের ঢেউ নেচে নেচে উঠে আমার হৃদয়তলে।
নূতন ভাবুক চিন্তায় তার দুঃসাধ্য সাধনে রত,
মরুর মাঝারে নন্দন বন রচিছে মনের মত;
বায়ুতে ভাসায় তার কল্পনার বিচিত্র অম্বর-যান,
তাহারি উপরে স্বপ্নতরী মোর নীরবে লইছে স্থান।
যাহা করি নাই, ওরা ক'রে যাক। স্বপ্নে কিবা চিন্তায়
পাই নাই যাহা, বড় ভাগ্য মানি, দেখি যদি ওরা পায়।
বীজের বপন যেই ক'রে থাক্ শুভ চিন্তা কামনার,
পালিয়া তরুরে যে ফলায় ফল, সমস্ত গৌরব তার।
ওদের কণ্ঠের উদাত্ত সঙ্গীত বহে মধু মূর্চ্ছনায়,
আমার অন্তর বাহিরিয়া আসি তারই স্রোতে ভেসে যায়।
এপারের গান ভ'রে লই প্রাণে য'দিন এপারে আছি,
ওপারের গানে কণ্ঠ মিলাব ওপারের কাছাকাছি।

নবীন কর্ম্মী

কামিনী রায়

বিশ্বকর্ম্মা, দয়া ক'রে দাও না কিছু কাজ
কর্ম্মশালায় তব,
বড় কাজে দিলেই হাত পাব দারুণ লাজ,
ছোট কাজেই রব।
যন্ত্র যেথা নির্ঘোষে তার কানে লাগায় তাল,
উত্তাপে যার রুদ্ধ শ্বাস, গাত্রে ধরে জ্বালা,
সহ্য আমার হয় কি না হয় আজ।
সইতে শিখি দিনে দিনে একটু দূরে থেকে,
করতে শিখি কর্ম্মী যারা তাদের দেখে দেখে,
পরতে শিখি শক্ত কাজের যোগ্য যেই সাজ,
চর্ম্ম বর্ম্ম নব।
বিশ্বকর্ম্মা, দয়া ক'রে দাও না কিছু কাজ
কর্ম্মশালায় তব

জুন, ১৯৩১

হিন্দু ভদ্রলোকের ভবিষ্যৎ

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ

অদূর ভবিষ্যতে হিন্দু ভদ্রলোকদের নির্ব্বংশ হওয়া আরম্ভ হইবে, বর্ত্তমানে এইরূপ আশঙ্কা করিবার বিশেষ কারণ উপস্থিত হইয়াছে। এইরূপ আশঙ্কার কারণ, ভদ্রলোকের মধ্যে বিবাহের সংখ্যা দিন-দিন কমিয়া আসিতেছে। পনর-কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে যে-বয়সের মেয়েরা কোলে-কাঁকে দুই তিনটি ছেলে মেয়ে সহ চলাফেরা করিত এখন সেই বয়সের মেয়েদের একগাদা পুস্তক লইয়া কলেজে যাইতে দেখা যায়, এবং কলেজ হইতে বাহির হ[ইবার] পরও বিবাহ ঘটে কয়জনের ভাগ্যে। সুতরাং ভদ্রলোকের সংখ্যার হ্রাস অবশ্যম্ভাবী; এবং এই হারে বিবাহের সংখ্যার হ্রাস চলিলে কালক্রমে বর্ত্তমান ভদ্রবংশগুলির লোপের সম্ভাবনা আছে।

এখানে পূর্ব্বপক্ষ বলিতে পারেন, যদি ভদ্রবংশ নির্ব্বংশ হয় তবে ভদ্রলোকের লোকসান নাই, বরং লাভ; কেন-না, তাহাতে হরিজনের এবং মুসলমানগণের সুযোগ বাড়িবে এবং কার্য্যতঃ পরার্থে আত্মবিসর্জ্জন করা হইবে। এমন মরণ কয় জাতির ভাগ্যে ঘটে। তারপর হরিজন এবং মুসলমান ঐতিহাসিকগণ এই আত্মোৎসর্গের কাহিনী অমরাক্ষরে লিখিয়া রাখিবেন।

পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বলা যাইতে পারে, অতীতের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, ভদ্রলোক নির্ম্মূল হইলে হরিজনের এবং মুসলমানগণের ক্ষতি বই লাভ হইবে না। যদি গৌর নিতাই অদ্বৈত প্রমুখ ভদ্রসন্তানগণ হরিনাম প্রচার না করিতেন, তবে হরিজনেরা এখন বোধ হয় আরবী ভাষায় ভগবানের নাম করিতেন। যদি কৃত্তিবাস এবং কাশীদাস বাংলা রামায়ণ মহাভারত রচনা করিয়া না যাইতেন, তবে তাঁহারা রাম লক্ষ্মণ সীতা হনুমানকে এবং ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ যুধিষ্ঠিরকে জানিতে পারিতেন কি-না সন্দেহ। ভদ্রবংশ নির্ব্বংশ হইলে হরিজনের মনের খাদ্য যোগাইবার লোক বোধ হয় সুলভ হইবে না।

হিন্দু ভদ্রলোকের অভাবে এ-দেশের মুসলমানগণেরও যে অসুবিধার সম্ভাবনা না-আছে এমন নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাস আলোচনা করিলে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এ-দেশের জমিদারেরা নবাব-নাজিমকে নিয়ম-মত পেশকস দিত না, কার্য্যতঃ অনেকটা স্বাধীন ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে করতলব খাঁ ওরফে মুর্শিদ কুলী খাঁ ওরফে জাফর খাঁ প্রথমতঃ সুবে বাংলা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ান, এবং পরে নবাব-নাজিমের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বাংলার জমিদারদিগকে পদদলিত করিয়াছিলেন। অধিকাংশ জমীদারই হিন্দু ছিল। রাজসাহীর জমিদার উদিৎনারায়ণ এবং ভূষণার জমিদার সীতারাম রায় বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। মুর্শিদ কুলী খাঁর জমিদার-দলনের বিবরণ পাঠ করিলে মনে হয় ইহার ভিতর যেন কম্যুনাল বা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের প্রভাব আছে। কিন্তু মুর্শিদ কুলী খাঁর জমিদারী বিলি বন্দোবস্তের ব্যাপারে সাম্প্রদায়িক পক্ষপাত দেখা যায় না, বরং হিন্দু পক্ষপাতই দেখা যায়। তিনি নাটোরের রামজীবন রায়কে উদিৎনারায়ণের রাজসাহীর জমিদারী এবং সীতারামের ভূষণার জমিদারী দান করিয়াছিলেন; এবং বর্দ্ধমান, নদীয়া ও দিনাজপুরের বিশাল জমিদারী তিনটি হিন্দুর হাতেই রাখিয়া দিয়াছিলেন। হিন্দু ভদ্রলোকের প্রতি এই পক্ষপাতের কারণ কি? এই পক্ষপাতের কারণ, দূরদর্শী মুর্শিদ কুলী খাঁ বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ভদ্রবংশীয় হিন্দু জমিদারের দ্বারা খাজনা আদায়-ওয়াশীল এবং জমিদারী শাসন যেমন ভাল চলিবে, অন্যের দ্বারা তেমন চলিবে না।

মুর্শিদ কুলী খাঁর জামাতা, বাংলার প্রথম স্বয়ম্ভূ নবাব-নাজিম সুজাউদ্দীন খাঁ বা সুজা খাঁ জমিদারগণের প্রতি বিশেষ সদয় ছিলেন, এবং সদ্ব্যবহার করিতেন। সুজা খাঁর পূর্ব্বে সুবে বাংলার প্রধান প্রধান রাজপদে লোক বহাল-বরতরফের ভার দিল্লীর বাদশাহী দরবারের হস্তগত ছিল। সুজা খাঁ নিজের বলে নবাব-নাজিমের মসনদে বসিয়া

উচ্চপদে নিজের লোক নিযুক্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার তিন জন মন্ত্রীর মধ্যে আলমচাঁদ এবং জগৎশেঠ এই দুইজন ছিলেন হিন্দু, এবং একজন—হাজি আহম্মদ ছিলেন মুসলমান। এই হাজি আহম্মদের অনুজ আলীবর্দ্দী খাঁ তখন পাটনার (বিহারের) নায়েব-নাজিম (deputy governor) ছিলেন।

সুজা খাঁর পুত্র সরফরাজ খাঁকে পরাজিত এবং নিহত করিয়া আলীবর্দ্দী খাঁ সুবে বাংলার নবাব-নাজিমের মসনদে আরোহণ করিয়াছিলেন। আলীবর্দ্দী খাঁর দুই জন মন্ত্রী ছিল। এক জন অগ্রজ হাজি আহম্মদ, এবং আর একজন রাজা জানকীরাম। জানকীরাম সোম-বংশীয় দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ ছিলেন। তাঁহার বংশধরগণ অদ্যাপি কলিকাতায় বর্ত্তমান আছেন। আলীবর্দ্দী খাঁ জানকীরামকে কত যে ভালবাসিতেন, কত যে বিশ্বাস করিতেন, দুইটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া তাহার পরিচয় দিব। নাগপুরের ভোঁসলে রাজা রঘুজী যখন সুবে বাংলা বিধ্বস্ত করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ সেনা পাঠাইতেছিলেন, তখন আলীবর্দ্দী খাঁ জানকীরামের পুত্র দুর্ল্লভরামকে উড়িষ্যার নায়েব-নাজিম নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বাংলার নবাব-নাজিমের হাতে দুইটি উচ্চপদ ছিল; একটি বিহারের (পাটনার) নায়েব-নাজিম, এবং আর একটি উড়িষ্যার (কটকের) নায়েব-নাজিম। মুর্শিদ কুলী খাঁর জামাতা সুজা খাঁ এক সময় উড়িষ্যার নায়েব-নাজিম ছিলেন; এবং শ্বশুরের মৃত্যুর পর এখান হইতে গিয়া মুর্শিদাবাদের মসনদ দখল করিয়াছিলেন।

দুর্ল্লভরাম সাধুসন্ন্যাসীভক্ত ছিলেন। তিনি যখন উড়িষ্যার নায়েব-নাজিম হইলেন, তখন রঘুজী ভোঁসলে তাঁহার সন্ন্যাসী-ভক্তি জানিতে পারিয়া কয়েক জন চরকে সন্ন্যাসীর বেশে কটক পাঠাইলেন। ভণ্ড সন্ন্যাসিগণ শীঘ্রই দুর্ল্লভরামের ভক্তি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইল। যখন রঘুজী ভোঁসলে ১৪,০০০ অশ্বারোহী সহ অবাধে আসিয়া কটক-দুর্গ অবরোধ করিল, সন্ন্যাসিগণ তখন সন্ধির জন্য দুর্ল্লভরামকে মারাঠা-শিবিরে যাইতে উপদেশ দিল। দুর্ল্লভরাম মারাঠা-শিবিরে গিয়া বন্দী হইয়া রহিলেন। কটক মারাঠাদিগের হস্তগত হইল। আলীবর্দ্দী খাঁ তিন লক্ষ টাকা দিয়া দুর্ল্লভরামকে মুক্ত করিয়া মন্ত্রীপদে নিয়োগ করিয়াছিলেন। নবাব আলীবর্দ্দী খাঁ মহৎলোক, তিনি মানুষ চিনিতেন না এমন কথা বলা যায় না।

আলিবর্দ্দী খাঁ তাঁহার অগ্রজ হাজি আহম্মদের মধ্যম পুত্র জৈনুদ্দীন আহম্মদ খাঁকে পাটনার নায়েব-নাজিম নিযুক্ত করিয়াছিলেন। জৈনুদ্দীন আহম্মদ খাঁ আলীবর্দ্দী খাঁর মধ্যমা কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। মির্জ্জা মাহমুদ সিরাজুদ্দৌলা ইহাদের পুত্র। মস্তফা খাঁ প্রমুখ পাঠান সেনাপতিগণ বিদ্রোহ অবলম্বন করিয়া জৈনুদ্দীন আহম্মদ খাঁকে হত্যা করেন। আলিবর্দ্দী খাঁ এই বিদ্রোহ দমন করিয়া রাজা জানকীরামকে পাটনার নায়েব-নাজিম নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে একজন সিরাজুদ্দৌলাকে পরামর্শ দিয়াছিল, 'তোমার পিতা পাটনার নায়েব-নাজিম ছিলেন। এই পদ তোমারই প্রাপ্য। সুতরাং চল, পাটনায় গিয়া জানকীরামকে পদচ্যুত করিয়া পাটনার গদি দখল করিয়া বস।' সিরাজ মুর্শিদাবাদ হইতে পলায়ন করিয়া, কয়েক জন অনুচরসহ পাটনার নিকটে গিয়া উপস্থিত হইয়া জানকীরামকে জবাব দিলেন। জানকীরাম সঙ্কটে পড়িলেন। সিরাজ অপুত্রক আলীবর্দ্দীর মনোনীত উত্তরাধিকারী এবং প্রাণাধিক প্রিয়। কিন্তু তিনি জানিতেন, সিরাজের তলব-মত তাঁহার শিবিরে গেলেই সিরাজ তাঁহাকে বন্দী করিবেন এবং তারপর পাটনা দখল করিবেন। নবাবের অনুমতি ভিন্ন সিরাজকে তিনি পাটনা ছাড়িয়া দিতে পারেন না এবং তাঁহার হুকুম মানিতে পারেন না। জানকীরাম সিরাজের হুকুম মানিলেন না, নগরের দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া নগর-রক্ষার সুব্যবস্থা করিলেন। নগরপ্রবেশের চেষ্টা করিতে গিয়া সিরাজের অনুচরগণ নিহত হইল এবং সিরাজ বন্দী হইলেন। এমন সময় স্বয়ং নবাব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রাণাধিক সিরাজের মুখখানি দেখিয়া তাঁহার সকল দুঃখ দূর হইল। সিরাজ মাতামহের নিকট জানকীরামের নামে বেয়াদবির অভিযোগ করিলেন। নবাব জানকীরামকে বলিলেন, 'একবার গিয়া সিরাজের সহিত দেখা করিয়া আইস।' তারপর সকল গোল মিটিয়া গেল।

রাজা জানকীরামের মৃত্যুর পর আলীবর্দ্দী খাঁ রাজা রামনারায়ণকে পাটনার নায়েব-নাজিম নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আলীবর্দ্দী খাঁর মৃত্যুর পর রামনারায়ণ নবাব সিরাজদ্দৌলার, এবং পরে লর্ড ক্লাইভের, বিশ্বাসভাজন হইয়াছিলেন।

নবাব মীরজাফর রামনারায়ণকে পদচ্যুত করিয়া আপন ভাইকে পাটনার গদিতে বসাইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু লর্ড ক্লাইভ তাহাতে সম্মত হন নাই। দিল্লীর বাদশাহ শাহ্‌আলম রামনারায়ণকে তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিবার জন্ম পীড়াপীড়ি করিতেছিলেন, এবং অবশেষে নবাব মীর-কাশিম তাঁহাকে এরূপ সবংশে হত্যা করিয়াছিলেন। ত্রিসঙ্কটে পড়িয়াও রামনারায়ণ যে-ভাবে বরাবর কর্ত্তব্য পালন করিয়াছিলেন তাহা বড়ই বিস্ময়জনক। বকলণ্ড সাহেবের চরিতাভিধানে আছে, রামনারায়ণ বিহারী ছিলেন। আমি এখানে ইতিহাস লিখিতেছি না, উদাহরণ-স্বরূপ কয়েকটি ঐতিহাসিক গল্প বলিতেছি মাত্র। সুতরাং ঐতিহাসিক প্রমাণের বিচার এখানে অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু সৈয়র-উল-মুতাখ্‌খরীনে এবং স্ক্রাফ্‌টনের ইতিহাসে (*Reflections on the Government, etc.*) দুর্ল্লভরামের সহিত রামনারায়ণের যেরূপ সাহচর্য্যের পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে অনুমান হয়, রামনারায়ণ জানকীরামের স্বগণ অর্থাৎ তিনিও বাঙ্গালী ছিলেন।

শেষ পর্য্যন্ত মীরজাফর এবং দুর্ল্লভরাম আলীবর্দ্দী খাঁর প্রধান উপদেষ্টা এবং প্রধান সেনাপতি ছিলেন। সিরাজুদ্দৌলা মসনদে বসিয়া মোহনলাল এবং মীরমদনকে ইঁহাদের স্থলাভিষিক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। এই আশঙ্কায় মীরজাফর এবং দুর্ল্লভরাম ইংরেজের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। মোহনলাল কায়স্থ ছিলেন। পলাশীর যুদ্ধের সময় শেষ মুহূর্ত্তে সিরাজুদ্দৌলা মোহনলালের উপদেশ উপেক্ষা করিয়া মীরজাফরের পরামর্শ-মত যুদ্ধ হইতে বিরত হওয়ায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

নবাব মীরজাফরের দেওয়ান ছিলেন মহারাজ নন্দকুমার। ১৭৬৫ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারি মীরজাফরের মৃত্যু হইয়াছিল। মৃত্যুশয্যা হইতে মীরজাফর গভর্ণরকে লিখিয়াছিলেন—

"If he should recover his health, he will acquaint the Governor fully with his affairs; but if it should happen otherwise, he commits the Nawab Najmu-d-daula, the Nawab Najabat Ali Khan, the Nawab Mubaraku-d-daula and the rest of his family together with Raja Nand Kumar to the care and protection of the governor and the gentlemen of the Council" (*Calendar of Persian Correspondence*, Vol. 1, No. 2548).

নবাব মীরজাফর নন্দকুমারকে বিশ্বস্ত স্বগণ মনে করিতেন। নবাব-নাজিমগণ যাহাকে এইরূপ মনে করিতে পারিতেন, জাতি বা ধর্ম্ম বিচার না করিয়া তাঁহাকে যোগ্যতা অনুসারে উচ্চপদে নিয়োগ করিতেন। যাহাকে এখন সাম্প্রদায়িক ভাব (communalism) বলে, তাঁহাদের তাহা ছিল না। ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা হিন্দু মুসলমানের চরিত্রের এই দিকটা বুঝিতে পারেন না। স্ক্রাফ্‌টনের ইতিহাসের কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। পলাশীর যুদ্ধের পর স্ক্রাফ্‌টন কয়েক বৎসর মুর্শিদাবাদে ছিলেন, এবং ১৭৬৩ সালে তাঁহার ইতিহাস মুদ্রিত হইয়াছিল। আলীবর্দ্দী খাঁ কর্ত্তৃক রাজা জানকীরামের পাটনার নায়েব-নাজিম পদে নিয়োগ সম্বন্ধে স্ক্রাফ্‌টন লিখিয়াছেন—

"Mirza Mahmud was made nominal Nabob of Patna. But the old man well knew, no Mussulman was to be trusted with the power annexed to that Nabobship, and therefore sent Joniram, a Gentoo, as deputy governor." (P. 51).

স্ক্রাফ্‌টনের "জনিরাম" জানকীরাম। আলীবর্দ্দী খাঁর রাজত্বের ইতিহাস পূর্ব্বাপর আলোচনা করিলে দেখা যায়, তিনি মুসলমান মাত্রকেই যে বিশ্বাসের অযোগ্য মনে করিতেন এমন কথা বলা যায় না। আলীবর্দ্দী খাঁ প্রভু সুজা খাঁর পুত্রকে পরাজিত এবং নিহত করিয়া রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং যাহারা মুর্শিদ কুলী খাঁর বংশের প্রতি আসক্ত ছিল, উপযুক্ত হইলেও এমন লোককে বিশ্বাস করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। আলীবর্দ্দী খাঁ যাহাদের সহায়তায় রাজ্যপত্তন করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা তখন জীবিত এবং বিশ্বস্ত ছিলেন সেই কয়জনের মধ্য হইতেই তাঁহাকে পাটনার নায়েব-নাজিম বাছিয়া লইতে হইয়াছিল। এক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক রাগদ্বেষের কোন অবকাশই ছিল না।

যদি অষ্টাদশ শতাব্দীর নবাব-নাজিমগণ রাজকার্য্যে হিন্দু ভদ্রলোকের সহায়তা এমন আবশ্যক বুঝিয়া থাকেন, তবে হিন্দু ভদ্রলোকের অভাব ঘটিলে ভাবী মুসলমান শাসনকর্ত্তাদের যে কোন অসুবিধা হইবে না, এমন কথা বলা যায় না। অবশ্যই শিক্ষার দ্বারা নূতন ভদ্রলোক গড়িবার আশা সকলেই পোষণ করিয়া থাকেন। কিন্তু ভদ্রবংশের যে সকল বংশগত গুণ আছে, এই সকল বংশ লোপ পাইলে দেশের মধ্যে সেই সকল বিশেষ গুণে গুণী লোকের অভাব ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং যাহাতে ভদ্রবংশগুলি নির্ব্বংশ না হয়, সেই দিকে হরিজন এবং মুসলমান সকলেরই দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

কিন্তু বর্ত্তমান কালে অন্ত কোন শ্রেণী হইতে ভদ্রলোকেরা

এরূপ অনুগ্রহ আশা করিতে পারে না। মহাযুদ্ধের পরবর্ত্তী এই যুগ জা'তে জা'তে বিরোধের যুগ। আমরা গ্রাম ছাড়িয়া শহরে আসিয়া বাস করিতেছি এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম্য-সমাজধর্ম্মও বিসর্জ্জন দিয়াছি। গ্রামের সকল জাতি, সকল ধর্ম্মী একই পরিবারভুক্ত এই বিশ্বাস গ্রামের সামাজিক ধর্ম্মের ভিত্তি। গ্রামের ছোট বড় জলাচরণীয়-অনাচরণীয়, সকলেই আপনাদিগকে পরস্পরের সহিত সম্পর্কিত মনে করিত, পরস্পরকে ভাই-চাচা-দাদা, মা বোন-পিসি-মাসী-দিদি বলিয়া সম্বোধন করিত। গ্রামে স্বতন্ত্র হরিজন ছিল না, কেন-না, সকলেই ছিল সকলের স্বজন। গ্রামের মুসলমানেরাও হিন্দু সমাজের সামিল হইয়া গিয়াছিল; তাঁহাদের ধোপা-নাপিত-গোয়ালাময়রা সবই হিন্দু ছিল। গ্রামের কোন ধনী হিন্দুর সহিত ধনী মুসলমানের বিবাদের আশঙ্কা উপস্থিত হইলে, তাহা নিবারণের একটা উপায় ছিল উভয়ের মধ্যে ধর্ম্ম-সম্বন্ধ স্থাপন। একটি গ্রাম্য প্রবাদ আছে, "গাঁয়ের মড়া খাঁয়ে পোড়ায়," অর্থাৎ গ্রামে যদি হিন্দু মড়া পোড়াইবার জন্য হিন্দু শ্মশানবন্ধু না পাওয়া যায়, তবে খাঁ-সাহেবকে অর্থাৎ ভদ্র পরিবারের মুসলমানকে ডাকিতে হইবে। সত্তর-আশী বৎসর পূর্ব্বে জৌনপুরের মওলানা কেরামৎ আলী সাহেব এবং ফরিদপুরের দুদুমিয়া কর্ত্তৃক ওয়াহাবী মত প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে হিন্দুর এবং মুসলমানের লৌকিক ধর্ম্মের মধ্যেও একটা সামঞ্জস্য সাধিত হইয়াছিল। অবশ্যই গ্রামের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ ছিল না, এমন নয়। গ্রামের টর্ণি মোক্তারগণ এবং তথাকথিত গ্রাম্য দেবতারা সদা-সর্ব্বদাই দলাদলি মামলা-মোকদ্দমা বাধাইবার চেষ্টা করিত। কিন্তু এখন যে নানা দিকে জা'তে জা'তে বিরোধ ও সাম্প্রদায়িক বিরোধ দেখা দিয়াছে তাহা মোটেই ছিল না।

আমরা যখন শহরে আসিলাম, তখন যদি গ্রামধর্ম্ম সঙ্গে আনিতে পারিতাম, শহরের নানাজাতীয় প্রতিবেশিগণকে গ্রামের হিসাবে দেখিতে পারিতাম, তবে এত বিপদ ঘটিত না। কিন্তু শহরে কেহ কাহারও নয়, সব আপ্ছে আপ্। আমাদের গ্রামের ভাইবন্ধুভাব স্বভাবসিদ্ধ ছিল; শহরের মৌখিক ভ্রাতৃভাব ফরাসী দার্শনিক রুষোর উপদেশমূলক। কিন্তু শহরের প্রতিযোগিতা সে-ভাবকে এদেশে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে দেয় নাই। এখন রুষোর দিন চলিয়া গিয়াছে, কার্ল মার্কসের যুগ আসিয়াছে। রুষো ছিলেন মৈত্রীর প্রচারক, কার্ল মার্কস সমাজে অন্তর্দ্রোহের (class-war) প্রবর্ত্তক। এই অন্তর্দ্রোহের হাওয়া এখন পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ভারতবর্ষ এই হাওয়া এড়াইতে পারে না। ইউরোপ হইতে আর এক হাওয়া আসিয়াছে, সাম্প্রদায়িক ভাবের হাওয়া। ইউরোপে প্রোটেষ্টাণ্ট ও রোমান ক্যাথলিকের দীর্ঘকালব্যাপী বিরোধের নিবৃত্তি হইয়াছে, কিন্তু ইহুদী-বর্জ্জন এবং ইহুদী নির্যাতন এখনও চলিতেছে। শহরে উপনিবিষ্ট সমাজের গায়ে এই দুই হাওয়া আসিয়া লাগায় তাহাতে বড় বড় ফাটল দেখা দিয়াছে। এখন সমাজকে কোন প্রকারে নাড়াচাড়া দিতে গেলেই এই ফাটল আরও বাড়িয়া যায়। ফাটল চাপিয়া জোড়া দিতে গেলে অন্য জায়গায়ও নূতন ফাটল দেখা দেয়।

পাশ্চাত্য ভাবের স্রোত দেশীয় সমাজে এই যে ভাঙনের সূত্রপাত করিয়াছে তাহা বিশেষ জটিল করিয়া তুলিয়াছেন আমাদের দেশনায়কগণ। শিক্ষার গুণে ইঁহারা চোখের কিছু দেখিতে পান না; ইঁহারা এই দেশের লোকের অবস্থা দেখেন চশমার পাথরের উপর ইংরেজী পুস্তকের পাতা আঁটিয়া তাহার দ্বারা। সুতরাং ইউরোপের শহরে শহরে নিত্য যে-সকল ঘটনা ঘটিতেছে এই দেশের শহরে পল্লীতে সর্ব্বত্র দেশ-নায়কগণ সেই সকল ঘটনার পুনরভিনয় দেখিতে পান। ইউরোপের শহরে শহরে বড় বড় কারখানা আছে। এই সকল কারখানার কল্যাণে দুইটি নূতন জাতির সৃষ্টি হইয়াছে—একটি মূলধনী জাতি, আর একটি বিশাল শ্রমিক জাতি। কার্ল মার্কস এবং তাঁহার শিষ্যগণের উপদেশের ফলে এই দুই জাতির মধ্যে দেবাসুরের যুদ্ধের মত যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। এদেশে তেমন মূলধনীও নাই, তত কারখানাও নাই, এবং কারখানার শ্রমিকের সংখ্যাও অতি অল্প। ভারতবর্ষের মধ্যে মূলধনীর এবং কারখানার শ্রমিকের সংখ্যা বেশী আছে বোম্বাই শহরে এবং আহম্মদাবাদ শহরে। কিন্তু দেশনায়কেরা বোম্বাই এবং আহম্মদাবাদের দিকে পিছন ফিরাইয়া ভারতবর্ষের আর সর্ব্বত্র দেবাসুরের যুদ্ধ দেখিতে পাইতেছেন, এবং নিজেরা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, বা শিবের ভূমিকা লইয়া দেবতাগণকে জয়ী করিতে চাহিতেছেন। আমাদের এদেশে এখন দেবতা হইতেছেন অনাচরণীয় অস্পৃশ্য হিন্দুজাতিনিচয়, এবং অসুর হইতেছেন ভদ্রলোক। ভদ্রলোকের মূলধন নাই, অথচ তাহাদিগকে পাশ্চাত্য মূলধনীগণের সকল পাপের [illegible]

হইবে, নতুবা ভারতবর্ষকে ইউরোপ করিয়া তোলা হইবে কেমন করিয়া। তার উপর স্মরণাতীত কাল হইতে এতগুলি লোককে অস্পৃশ্য অবস্থায় রাখার মহাপাপের শাস্তি ত আছেই। সুতরাং কি মুসলমান, কি হরিজন, কি দেশনায়কগণ, কাহারও নিকট হইতে হিন্দু ভদ্রলোকের কোন অনুগ্রহ পাইবার আশা নাই। তবে ইহারা এখন দাঁড়ায় কোথায়?

বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই উত্তরে বলিয়া উঠিবেন, গ্রামে ফিরিয়া যাও। যাহাদের গ্রামে ফিরিয়া গিয়া জীবিকা উপার্জ্জনের সম্ভাবনা আছে তাহারা শীঘ্রই ফিরিয়া যাইবে, পরামর্শের অপেক্ষা করিবে না। কিন্তু আমার বিশ্বাস, বর্ত্তমানে শহরবাসী অধিকাংশ হিন্দু ভদ্রলোকের পক্ষেই গ্রামে ফিরিয়া যাওয়া সুবিধাজনক হইবে না। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে আমার গ্রামের যে অবস্থা ছিল তাহার কথাই বলিয়াছি। তখন সেখানে জোতজমি সুলভ ছিল, প্রজারা অনুগত ছিল। এখন সেদিন আর নাই; জোতজমি দুর্ল্লভ হইয়াছে, জোতদারবিরোধী আইন কঠোর হইয়াছে, যে নিজে লাঙল চালাইতে জানে না তাহার পক্ষে মজুর দিয়া কাজ করান কঠিন হইয়াছে। পল্লীগ্রামে বিভিন্ন জাতির মধ্যে পূর্ব্ব সদ্ভাব আর নাই। সাতাশ-আটাশ বৎসর পূর্ব্বে যখন স্বদেশী আন্দোলন চলিতেছিল, এবং মুসলমানেরা ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিতেছিল, তখন আমার গ্রামের একজন বৃদ্ধ মাতব্বর মুসলমানকে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "তোমরা হিন্দুদিগকে ছাড়িতেছ কেন?" বৃদ্ধ বলিল, "হিন্দুরা কেতাবী নহে, তাহাদের সঙ্গে আমরা একত্র কাজ করিতে পারি না। ইসাইরা (খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীরা) কেতাবী।" তার উপর গ্রামের অনাচরণীয় হিন্দুরা এখন মনে করিতেছে, ভদ্রলোকেরা চিরকালই তাহাদের উপর জুলুম করিয়া আসিতেছে, এইবার তাহার প্রতিশোধ লইতে হইবে। এইরূপ অবস্থায় গ্রামে ফিরিয়া গেলে বিপদের সম্ভাবনা। অবশ্যই অনেক স্থলে গ্রামের অবস্থা হয়ত অন্যরূপ। কিন্তু আমার বিশ্বাস, যাহারা এখন শহরে আসিয়া বাস করিতেছে এবং গ্রামের সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়াছে, তাহাদের গ্রামে ফিরিয়া গিয়া জীবিকা উপার্জ্জনের ব্যবস্থা করা সহজ নহে। আবার শহরের ভদ্রলোকদিগের মধ্যেই বিবাহের সংখ্যা কমিয়া যাইতেছে। বেকারের সংখ্যা বাড়িতেছে বলিয়া যে কেবল বিবাহের সংখ্যা কমিতেছে তাহা নহে, যাহারা মোটা ভাত, মোটা কাপড় দিয়া স্ত্রী-পুত্র-কন্যা প্রতিপালন করিতে পারেন এমন লোকও এখন বিবাহ করিতে চাহিতেছেন না। আবার অনেক দম্পতী সন্তানপালনের ক্লেশ স্বীকার করিতে সম্মত নহেন। সুতরাং বাংলার ভদ্রবংশগুলি রক্ষা করিতে হইলে যে শুধু বিরাট বেকারসমস্যা সমাধান করিতে হইবে তাহা নহে, বিবাহসমস্যাও সমাধান করিতে হইবে, এবং সন্তানসংখ্যা কম করিবার (birth controi) যে-প্রথা প্রবর্ত্তিত হইতেছে তাহাও বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

একটা জাতি রক্ষার জন্য স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই আমাদের পিতৃপিতামহ এবং মাতৃমাতামহীদের মত কতকটা আরাম, কতকটা সুখ-শান্তি উৎসর্গ করিতে হইবে। ফরাসী দেশে সন্তানের সংখ্যা বেশী হইলে দম্পতীকে গভর্ণমেন্ট পুরস্কার দেয়। ইটালীতে স্বয়ং মুসোলিনী যুবক-যুবতীগণকে বিবাহবিষয়ে উৎসাহ দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ভদ্রসমাজের বেকারসমস্যা সমাধানের জন্য অনেকেই এখন চেষ্টা করিতেছেন। অ-বেকারগণ যাহাতে অবিবাহিত না থাকে, এবং বিবাহিতগণ যাহাতে সন্তানের সংখ্যা বৃদ্ধিতে ভীত না হয়, আর একদল কর্ম্মীর সেই দিকে মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। এই সকল কাজই অত্যন্ত কঠিন। যে-জাতি এতদিন এই দেশের জনসমষ্টির শীর্ষস্থানীয় ছিল, সেই জাতিকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য আর সকল আন্দোলন ত্যাগ করিয়া এখন জননায়কগণের এই দিকে মনোনিবেশ করা কর্ত্তব্য। বাঁচিয়া থাকিলে কৌন্সিলে আসন, মন্ত্রীপরিষদে আসন, যোগ্যতানুসারে সবই পাওয়া যাইবে! সুতরাং হিন্দু ভদ্রলোককে কি প্রকারে আদৌ বাঁচাইয়া রাখা যায় তাহার চেষ্টাই এখন ভদ্রবংশীয় কর্ম্মীদিগের প্রধান ব্রত হওয়া উচিত। এদেশের হিন্দু ভদ্রলোকদিগের কার্য্যকলাপ বিচার করিলে মনে হয়, তাঁহারা নিজের জাতি ছাড়া আর সকল জাতির সঙ্গেই বন্ধুত্বস্থাপনে ব্যস্ত। কিন্তু—"সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ।" এখন হিন্দু ভদ্রলোকের সর্ব্বনাশের সময় উপস্থিত হইয়াছে। এখন ভদ্রজাতীয় কর্ম্মিগণের নিজের জাতির দিকেও কিছু দৃষ্টি রাখা উচিত।

মৌভাণ্ডারের চিঠি

শ্রীপিনাকীলাল রায়

ভারতবিশ্রুত ধলভূম রাজাদের রাজধানী ঘাটশিলা। স্থানটি ব্যাঘ্র-ভল্লুক-ব্যাল্-নিষেবিত ভীষণ জঙ্গলাকীর্ণ বলিয়াই হউক, কিংবা সেই আদিম যুগের মানব—কোল, খেরোয়াল, সাঁওতাল, ভূমিজ প্রভৃতি অনার্য্যদিগের বাসভূমি ভাবিয়াই হউক, এতাবৎকাল কদাচিৎ কেহ এদিকে পদার্পণ করিতে সাহসী হইত। কিন্তু এক্ষণে বি-এন্-আর কোম্পানীর অনুকম্পায় সেই সমস্ত দুর্গম জঙ্গল ক্রমে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। কলিকাতা হইতে বোম্বাইগামী বোম্বাই মেল তাহার গতিমুখে পতিত দুর্ভেদ্য জঙ্গল ছিন্নভিন্ন করিয়া, ছোটবড় পাহাড় পর্ব্বতের শ্যামায়মান বক্ষপঞ্জর উৎখাত করিয়া দিয়া, দুর্ব্বার গতিতে চলিয়া গিয়াছে। তারপর একদিন 'গেলের পাঁচন' সম্পর্কে সুপ্রসিদ্ধ কাঠ-ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত শশধর মুখোপাধ্যায় মহাশয় জঙ্গলভার হরণের জন্য এই ঘাটশিলায় আসিয়া অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার কুঠারের অব্যর্থ সন্ধানে এক্ষণে এদেশের বনস্পতিবহুল জঙ্গলগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চারা গাছের আবরণে তাহাদের বিশাল বক্ষ আবৃত করিয়া পূর্ব্বগৌরব কোনো রকমে বজায় রাখিয়াছে।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বলিতে গেলে আমি অবশ্য অন্যান্য স্থানের তুলনায় বিশেষ রকম নাস্তানাবুদ হই নাই। কারণ আমার সীমানা-সরহদ্দের মধ্যে মহুয়া বৃক্ষের প্রাচুর্য্য সর্ব্বজনবিদিত। ধলভূমের আইন অনুযায়ী কি রাজা, কি প্রজা, কেহই মহুয়া বৃক্ষ কর্ত্তন করিবার অধিকারী নয়। এই সকল বৃক্ষ এদেশের একটি আয়ের সম্পত্তি। ইহার ফুলে মদ হয়, ফলে তেল হয়, আবার এদেশের জংলী অধিবাসীরা ইহার শুষ্ক ফুলগুলি পেষণ করিয়া এক প্রকার খাদ্য প্রস্তুত করে এবং সারা বর্ষাকালটা সেই খাদ্য তাহারা পরম তৃপ্তি সহকারে আহার করিয়া থাকে।

বসন্ত ঋতুর অবসানকালে অর্থাৎ চৈত্র মাসের শেষ হইতে সারা বৈশাখ মাস ধরিয়া মহুয়া বৃক্ষে ফুল ফুটিতে থাকে। সেই ফুলের সুগন্ধে ও মধুপানে মত্ত মৌমাছির মধুর গুঞ্জনে আমি তখন আত্মহারা হইয়া যাইতাম,—মহুয়া ফুলের



ঘাটশিলা রাজার গড়

গন্ধে মাতাল বসন্তানিলের মধুর পরশ পাইয়া প্রাণ আমার প্রমত্ত উল্লাসে নৃত্য করিয়া উঠিত। কারখানা-নিঃসৃত ধোঁয়ার বিশ্রী গন্ধে ফুল আর এখন সুগন্ধি ছড়াইতে পায় না—কারখানার উৎকট কলরবে মৌমাছির গুঞ্জন ঢাকা পড়িয়া যায়।

এই সময়ে মৌমাছির দল মহুয়া ফুলের মধু আহরণ করিয়া বড় বড় মধুচক্র রচনা করিত, আর রাজ্যের নরনারী আসিয়া জড় হইত সেই মধু খাইবার লোভে। সেই কবে কোন্ যুগে যে তাহারা মধু পান করিতে আসিয়া আমার নামকরণ করিয়াছিল মধুভাণ্ডার বা 'মৌভাণ্ডার' তাহা আমার স্মরণ নাই। এখন আর আমার সেই মধুর নামও নাই, গন্ধও নাই, তবুও লোকে আমাকে মৌভাণ্ডার বলিয়াই ডাকে। 'তাল পুকুর' নামটা আছে, কিন্তু তালগাছের কোন চিহ্ন নাই।

যাহা হউক, লোকে এখন মধুর মোহে এখানে আসে না—আসে খালি রৌপ্যের মোহে।

আজকাল কত দেশ-বিদেশের পথিক, পর্য্যটক, ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক, প্রত্নতাত্ত্বিক, কবি, ব্যবসায়ী, [illegible]

দুলাল বাষ্পীয় যানে এই পথ দিয়া যাতায়াত কালে জানিতে পারিয়াছে এই ঘাটশিলা ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানগুলি স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ অনুকূল। এই কারণে এই স্থানটি আজকাল একটি সুন্দর স্বাস্থ্যনিবাসে পরিণত হইয়াছে। প্রায়ই দেখা যায়, স্বাস্থ্যসম্পদে যে স্থান যত উন্নত, প্রাকৃতিক সম্পদেও সে-স্থান ততখানি সমৃদ্ধ। শুধু





আমাইনগরের অনতিদূরে একটি জলপ্রপাত
সুবর্ণরেখা নদীতে পতিত একটি জলপ্রপাত

জল-বাতাসের গুণে নষ্ট স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় না যদি না সেই নষ্ট স্বাস্থ্য পরিবেষ্টন প্রভাবের সহায়তা পায়। এখানে প্রাকৃতিক সৌষ্ঠবই যে প্রতিবেশ প্রভাব তাহা বলাই বাহুল্য। কথায় বলে, মনের বলই বল—মনে বল পাইলে শরীরও সুস্থ হইয়া উঠে। সুতরাং স্বাস্থ্য ও প্রাকৃতিক সম্পদের এই যে মণিকাঞ্চন সংযোগ ইহাই স্থানটিকে অনবদ্য মহিমায় মণ্ডিত করিয়া আজ বাংলার নরনারীকে ডাকিয়া আনিতেছে, জগতে বাঁচিয়া থাকার সার্থকতা দানের নিমিত্ত।

তাহার উপর ধলভূম রাজ্যের রাজধানী এই ঘাটশিলার সীমানার অন্তর্গত জঙ্গলাকীর্ণ পার্ব্বত্য স্থানগুলিতে যে এত ঐশ্বর্য্য সম্পদ লুক্কায়িত আছে তাহাই বা পূর্ব্বে কে জানিত! বি-এন্-আর কোম্পানীর কৃপায় সাত-সমুদ্র-তের-নদী পারের খনিতত্ত্ববিদেরা সেই ঐশ্বর্য্যের সন্ধান পাইয়া ছুটিয়া আসিল এই অসভ্য জংলীদের দেশে। এইচ. বি. লো. কোম্পানী কুঁদলকোচায় আবিষ্কার করিলেন সোনার খনি। বোম্বাইয়ের অক্লান্ত কর্ম্মী জামশেদজী টাটা গুরুমহিষানীর পার্ব্বত্য অঞ্চলে লৌহ-প্রস্তরের সন্ধান পাইলেন। কালীমাটির ভীষণ জঙ্গল কাটিয়া তথায় তিনি বসাইলেন সুবৃহৎ নগরী জামসেদপুর ও টাটানগর। কোম্পানীর নামকরণ হইল টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানী। কেপ কপার কোম্পানী রাখা পাহাড়ে ও মোষাবনীর সমতল প্রদেশে আবিষ্কার করিলেন তামার খনি। দেখাদেখি অনন্তপুর গোলড্ মাইনিং কোম্পানী কেন্দাডিতে বহু প্রাচীন কালের তাম্রপ্রস্তর উত্তোলনের খবর দেখিতে পাইয়া তাহারাও কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গেল এই কার্য্যে। পরিশেষে ইণ্ডিয়ান কপার করপোরেশন মোষাবনীর তাম্রখনি কিনিয়া লইয়া তাহাদের বিজয়-নিশান আনিয়া প্রোথিত করিয়াছে আজ আমারই বুকের উপর।

প্রাচীনত্বের দিক দিয়া দেখিতে গেলেও এই ঘাটশিলা বৌদ্ধযুগের আমলে বর্ত্তমান কালের চেয়ে যে কতটা

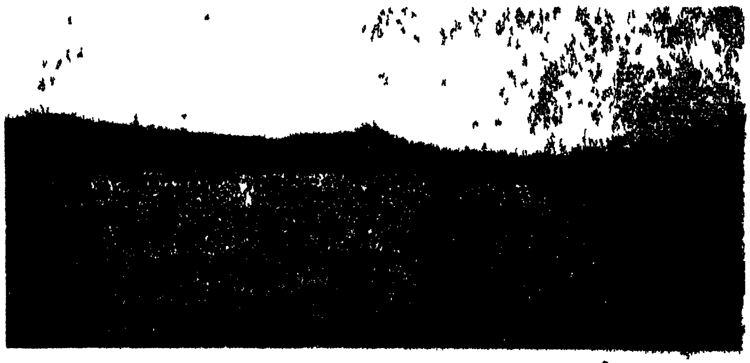


গড়ের একটি হাতী

সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা অনেকগুলি কারণে জানিতে পারা যায়। যে-ইতিহাসপ্রসিদ্ধ পার্ব্বত্য নদী সুবর্ণ-রেখা ইহার দক্ষিণ দিক ঘিরিয়া প্রবাহিতা, সেই নদীর তটপ্রদেশে এই ঘাটশিলা জনপদটি যুগযুগান্তকালব্যাপী কত

উত্থান-পতন ও বাধা-বিপ্লবের মধ্যে যে নিজেকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে, তাহার প্রধান কারণ হইতেছে ধলভূম রাজ-বংশীয়দের জাতীয় বিশিষ্টতা। এই যে ধলভূম রাজপ্রাসাদের ভিত্তিপ্রস্তর সুবর্ণরেখা নদীর গর্ভপ্রদেশে কবে স্থাপিত হইয়াছিল এবং কত কাল ধরিয়া যে এই প্রাসাদটি সুবর্ণরেখার তাণ্ডবলীলা তুচ্ছ করিয়া সগর্ব্বে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার সঠিক সংবাদ আজকালকার অশীতিবর্ষবয়স্ক বৃদ্ধেরাও দিতে পারে না। রাজা নবসিংহ ধবলদেব বাহাদুর ঘাটশিলা হইতে রাজধানী উঠাইয়া নবসিংহগড়ে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করিলে ঘাটশিলার প্রাসাদের উপর তিনি অনেকটা অমনোযোগী হইয়া পড়েন। অতীতের সেই শত শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে রীতিমত তত্ত্বাবধানের অভাবে প্রাসাদটি ক্রমে ক্রমে জীর্ণ মলিন অবস্থায় উপনীত হইয়া ইহার কতক অংশ নদীগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে, তবুও ইহার ভগ্নাবশেষ সুবর্ণরেখার গর্ভ হইতে এখনও নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় নাই। এখনও সুবর্ণরেখা সেই পূর্ব্বের মতই "রাজ মোহনের"* জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া সেই তেমনই প্রচণ্ড শক্তিতে আছড়াইয়া পড়ে এই প্রাসাদের ভিত্তিমূলে, ইহাকে উৎখাত করিয়া দিবার জন্য।

এই চেষ্টা আবহমানকাল ধরিয়া সুবর্ণরেখা করিয়া



মৌভাণ্ডারের কারখানার সম্মুখস্থ সুবর্ণরেখা নদীর দৃশ্য। ইহার দুই তীরে এ রয়্যাল রোপওয়ের টাওয়ারগুলি দেখা যাইতেছে। অদূরে — সিদ্ধেশ্বর' পাহাড়

আসিতেছে, কিন্তু এই প্রাচীন স্থপতির একখানি প্রস্তরও স্থানভ্রষ্ট করা দূরে থাক, বরং তাহার প্রচণ্ড শক্তি এই ভিত্তিগাত্রে যতই ব্যাহত হইয়াছে, ততই সে রাগে ফুলিতে ফুলিতে, তথায় একটা প্রবল ঘূর্ণাবর্ত্তের* সৃষ্টি করিয়া পূর্ব্ববাহিনী সুবর্ণরেখা বক্রগতিতে দক্ষিণবাহিনী হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে।



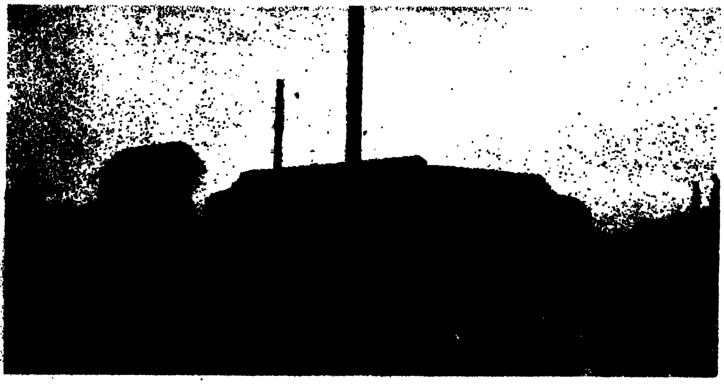
মৌভাণ্ডারের তামা ও পিতলের কারখানায় একপার্শ্বের দৃশ্য

ইহারই অপর পারে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ আমাইনগর। এই স্থানটি এককালে যে বিশেষ সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল তাহা অনেক প্রাচীন নিদর্শন দৃষ্টে বুঝিতে পারা যায়। মানুষের ব্যবহারোপযোগী প্রাচীনকালের লৌহনির্ম্মিত অস্ত্র, প্রস্তর-নির্ম্মিত বৃহৎ কটাহের ভগ্নাংশ এবং পালি ভাষায় উৎকীর্ণ শিলালিপির খণ্ড মৃত্তিকা গর্ভ হইতে রাখালবালক কিংবা কৃষকেরা সময়ে সময়ে কুড়াইয়া আনে। এখনও স্থানে স্থানে দেবালয় ও ইমারতের ভিত্তিপ্রস্তর ও ইষ্টকাদি দেখিতে

* ইহা একটি প্রবল ঘূর্ণাবর্ত্ত। নদীতে "ঢল" নামিবার কালে এক ক্রোশ দূর হইতে ইহার গর্জ্জন শুনিতে পাওয়া যায়।

* এই ঘূর্ণাবর্ত্তটির নাম কাহিলদহ।

পাওয়া যায়। কথিত আছে, অতি পুরাকালে সুবর্ণরেখা নদী ধলভূম ও ময়ূরভঞ্জ এই দুইটি রাজ্যকে পরস্পর পরস্পরের সহিত পৃথক করিয়া রাখিয়াছিল। এই নদীর উত্তরাংশে ধলভূম রাজ্য ও দক্ষিণাংশ ব্যাপিয়া ময়ূরভঞ্জ রাজ্য এককালে



রোলিং মিল (পিতলের শিট ও প্লেটের কারখানা), ব্রাস্ ফাউনড্রী (পিতল প্রস্তুত করিবার কারখানা), ওরবিন (খনি হইতে—এরিয়াল রোপের সাহায্যে তাম্রপ্রস্তরগুলি আসিয়া এই স্থানে পতিত হইতেছে) ও এরিয়াল রোপওয়ের দৃশ্য

এই জঙ্গলখণ্ডের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু মহারাষ্ট্র-সেনানায়ক ভাস্কর পণ্ডিত ও রঘুজী ভোঁসলের অতর্কিত আক্রমণে ও অযথা লুণ্ঠনে ইহাদের প্রভাব অনেকটা কমিয়া যায়।

এইরূপ একটা জনশ্রুতি প্রচলিত আছে যে, ময়ূরভঞ্জরাজ একদা বর্ষাকালে ধলভূমরাজের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়া বড়ই বিপদে পড়িয়া যান। তাঁহাকে সাত দিন ধরিয়া উপরোক্ত আমাইনগরের পারে বসিয়া থাকিতে হইয়াছিল। তিনি আসিয়া দেখিলেন, আকস্মিক ঢলে সুবর্ণরেখার দুই কূল পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং লীলাচঞ্চলা সুবর্ণ-রেখার সেই উদ্দাম নর্ত্তনের মধ্যে পাড়ি জমাইবার আশা তখনকার মত তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হইল। এদিকে আকাশও ক্রমে ক্রমে ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হইয়া বর্ষণ সুরু করিয়া দিল। অগত্যা পট্টবাসের ব্যবস্থা করিয়া সপ্তদিবসব্যাপী এই দারুণ দৈবদুর্যোগের মধ্যে নদীকিনারে তাঁহাকে অতিবাহিত করিতে হয়।

এই সময়ে এই স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্যে তিনি মুগ্ধ হইয়া পড়েন। তিনি মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন, এই সুবর্ণ-রেখার তীরে বর্ষাকালীন বাসোপযোগী একখানি আবাস-ভবন রচনা করাইবেন।

অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইল। নদীর অপর পারে অবস্থিত ঘাটশিলার রাজপ্রাসাদের চেয়েও চিত্তাকর্ষক একখানি মনোরম প্রাসাদ নির্ম্মিত হইল। অনেকে আসিয়া এই নবনির্ম্মিত প্রাসাদের আশপাশে নিজ নিজ বাসভবন নির্ম্মাণ করিয়া বসবাস করিতে লাগিল। অচিরে এই স্থান লোকজনে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল ও ক্রমে ক্রমে ইহা একটি ক্ষুদ্র নগরে পরিণত হইল।

সেই সময়ে আমাই সর্দ্দার নামে জনৈক বৃদ্ধ সাঁওতাল ইজারা বন্দোবস্ত লইয়া এই জঙ্গলমধ্যে বাস করিতেছিল। এই স্থানের সাঁওতালদের উপর তাহার যথেষ্টই প্রসার-প্রতিপত্তি ছিল। সকলে তাহাকে বেশ মানিয়া চলিত ও সর্দ্দার বলিয়া ডাকিত। এই আমাই সর্দ্দার তাহার লোকজনদের দ্বারা এই স্থানের ভীষণ জঙ্গল কাটিয়া দিয়া এই সময়ে রাজাকে বিশেষ সাহায্য করে। সেই কারণে ময়ূরভঞ্জ-রাজ সন্তুষ্ট হইয়া তাহার নামানুসারে এই জনপদটির নামকরণ করিয়াছিলেন আমাইনগর। কালের কুটিলগতিতে এখন আর সেই রাজপ্রাসাদের কোন চিহ্ন নাই। সেই সুদৃশ্য নগরীরও কোন অস্তিত্ব নাই। এখন আছে কেবল কয়েক ঘর মৎস্যজীবী, ধরা (ধীবর) আর সেই স্থানের নাম এখনও আমাইনগর এবং সুবর্ণরেখার সেই ঘাটটি এখনও আমাইনগরের খেয়াঘাট বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া আসিতেছে।

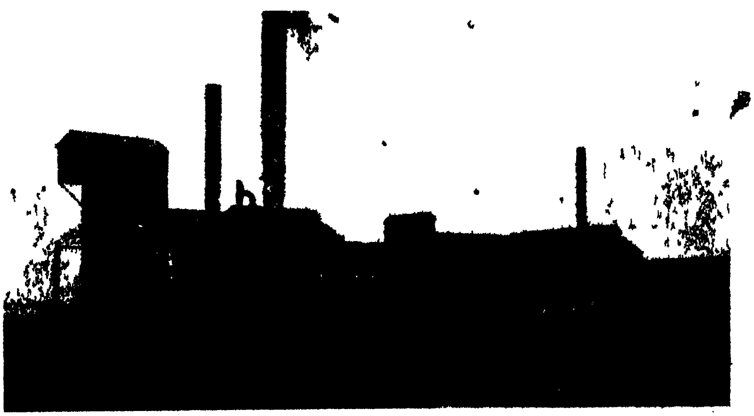
আমার অবস্থিতি এই আমাইনগরের খেয়াঘাট হইতে বেশী দূরে নয়। সকল সময়েই ঐ ঘাটটি আমার নজরে পড়ে। সারাদিন ধরিয়া কত নরনারী, কত পরিচিত ও অপরিচিত মুখ এই খেয়াঘাটে পার হইয়া থাকে, তাহার হিসাব কে রাখে? তবুও আমি বসিয়া বসিয়া দেখি, কত রঙ-বেরঙের বালক বৃদ্ধ, যুবক যুবতী, এপার হইতে যাইতেছে

ওপারে, আর ওপার হইতে আসিতেছে এপারে। এদেশের লোকের পুরুষোত্তমে যাইবারও এই পথ। পূর্ব্বকালে সুবর্ণরেখা নদীর উত্তর তটভূমি ব্যাপিয়া যে ভীষণ জঙ্গল সমস্ত সিংভূম এবং মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও মানভূমের কতকাংশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তাহাই ঝাড়খণ্ডের জঙ্গল নামে অভিহিত হইত। তখনকার কালে ঝাড়খণ্ডের তীর্থপিপাসু নরনারী পুরুষোত্তম যাইবার একমাত্র পায়ে হাঁটার পথ, এই আমাই-নগরের খেয়াঘাটে পার হইয়া, বর্ত্তমান ঘাটশিলা রাজার অধীন আটকোশী তরফের মধ্য দিয়া ময়ূরভঞ্জ রাজ্যে প্রবেশ করিত। ঐ যে ধূম্রজাল-বিজড়িত পাহাড়ের শ্রেণী মোষাবনীর তাম্রখনির পূর্ব্ব-দক্ষিণ দিক ব্যাপিয়া দিকচক্রবালকে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া দণ্ডায়মান আছে, উহাই "আটকোশীর পাহাড়"।

যাহা হউক, কতকাল পরে কালের কুটীল প্রবাহে এই আমাইনগর আবার হস্তান্তরিত হইয়া ঘাটশিলা রাজার অধীনে আসে। ধলভূম ও ময়ূরভঞ্জ পাশাপাশি দুইটি রাজ্য নিজ নিজ সুবিধা-অসুবিধার জন্য মিতালীসূত্রে আবদ্ধ হইয়া ময়ূরভঞ্জের রাজা তাঁহার অধীনস্থ আমাইনগর, হলুদ-পুকুর ও আটকোশী এই তিনটি স্থান ঘাটশিলার রাজাকে প্রদান করেন এবং তদ্বিনিময়ে তিনি প্রাপ্ত হন আটবাখরা ও বাইশবাখরা নামক দুইটি তুল্য আয়ের সম্পত্তি। এই রকম অদল-বদল ভাঙা-গড়া, উত্থান-পতন যুগযুগান্তকাল ধরিয়াই চলিতেছে,—ইহার বিরাম নাই।

একদিন হঠাৎ শুনিতে পাইলাম মোষাবনী তাম্রখনির অধিকারী ইংরেজ বণিকেরা মোষাবনীর তামার খনিটা উপড়াইয়া আনিয়া মৌভাণ্ডারের পথ-ঘাট, মাঠ-বাট, আর লোকজনের বসতি, সব তামায় মুড়িয়া একাকার করিয়া দিবে। শুনিয়া প্রাণটা আমার উল্লাসে নৃত্য করিয়া উঠিল। মনে করিলাম, এ যে হুবহু চিচিংফাঁকের ব্যাপার! রাতারাতি বড়লোক! যাহা হউক, এই শোনা কথা একদিন সত্য সত্যই সত্যে পরিণত হইল।

দেখিলাম মোষাবনী হইতে কোম্পানীর বড়সাহেব, ছোট-সাহেব ও অনেক সাহেবী পোষাক পরিহিত বাঙালী অফিসার আসিয়া আমার দ্বারে অতিথি! এই এতকাল এখানে বাস করিতেছি এমন অতিথি তো কোনদিনই



কারখানার আর একটি অংশ (পালভারাইজড্ কোল প্ল্যাণ্ট, কন্‌সেনট্রেশন্ প্ল্যাণ্ট, বেডিং বিন, রিভারবারেটোরী, কন্‌ভারটার ও রিফাইনারী ফারনেস্)

পাই নাই! অনেক অতিথিই আসে, কিন্তু এক-একজন অতিথি আসিয়া মনের অন্তরে এমন একটা ছাপ দিয়া যায় যাহা বহুদিন ধরিয়া, হয়ত-বা জীবনভোর সে জায়গাটায় সময়ে সময়ে খচ্‌খচ্ করিতে থাকে। তাহারা পরস্পর পরস্পরে কি যে বলা-কহা করিতে লাগিল আর আমার চতুর্দ্দিকটা অঙ্গুলি নির্দ্দেশে কি যে তাহারা দেখিতে লাগিল, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

যাহা হউক, দ্বারে অতিথি, অতিথি-সৎকার করিতে হইবে। তখন নদীর জল, গাছের ফল, পোরের চাল,* বনের শাক, আর গরুর দুধ দিয়া অতিথি-সৎকার করিলাম। পরে সাহেবী পোষাক পরিহিত বাঙালী অফিসারটির সহিত আলাপ জমাইয়া জানিতে পারিলাম, ইনি আমাদের মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের বড়ছেলে।

পরদিন হইতেই জঙ্গল-কাটা সুরু হইয়া গেল। স্থানে স্থানে তাঁবু খাটানো হইল এবং ঘরবাড়ি ও স্থাবর সম্পত্তির উপযুক্ত মূল্য লইয়া মৌভাণ্ডার ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার জন্য মৌভাণ্ডারের অধিবাসীদের উপর কোম্পানীর পরোয়ানা জারি

* এদেশের গৃহস্থেরা পৌষ ও মাঘ মাসে সারা বৎসরের জন্য যে চাউল তৈয়ার করিয়া রাখে তাহাকে পোরের চাল বলে।

হইয়া গেল—আমার অবস্থার পরিবর্তন আরম্ভ হইল। আমি যে শীঘ্রই বড়লোক হইব এই আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম। কিন্তু পিতৃপুরুষের ভিটা ছাড়িয়া, গ্রামের অধিবাসীরা যখন তাহাদের ঘরবার ভাঙিয়া লইয়া একে একে চলিয়া যাইতে



মোবাবোনি খনির উপরের দৃশ্য। হেডগিয়ার, কুলিং টাওয়ার, কম্প্রেশর হাউস প্রভৃতি।

সুরু করিল, তখন আমার বড়লোক হইবার যে উদ্দাম আনন্দ তাহা একেবারে নিরানন্দে পরিণত হইল। চিরদিন যাহারা আমার কোলে মানুষ হইয়াছে, আমার ধূলির প্রত্যেক পরমাণুটি পর্য্যন্ত যাহাদের দেহের সহিত আজন্মপরিচিত—যাহাদের মা-বাপ, ভাই-বোন, আমার কোলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, আবার আমারই কোলে মাথা রাখিয়া তাহাদের শেষ নিঃশ্বাসটুকু গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদেরই ছেলেপিলে, নাতিপুতীর দল, আজ না-কি আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে। নাঃ, এমনধারা বড়লোক হইতে আমি চাই না—এমনভাবে বাঁচিয়া থাকা, সে যে আত্মহত্যারই নামান্তর মাত্র! আমি যেমনটি ছিলাম আমাকে তেমনিভাবেই থাকিতে দাও—আমি সোনার কণ্ঠহার চাহি না, আমার সেই ফুলের মালাই ভাল। কিন্তু কে কাহার কথা শোনে? ইহারা বড়লোক আমাকে করিবেই।

ঐ যেখানে মঙ্গলার ঘরবাড়ি ছিল, দেখিতে দেখিতে সেইস্থানে পাওয়ার হাউস আর বয়লার হাউস খাড়া হইয়া উঠিল। সিধুর বাড়ির পাশটা জুড়িয়া স্মেল্‌টারের ইমারৎ নির্ম্মিত হইল। জ্যোৎস্না রাতে যে পিয়াল গাছটার তলায় মধু তাহার মোহন সুরের মাতন তুলিয়া বাঁশী বাজাইত, আর আমি তাহাই শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িতাম, সেইস্থানে 'ও্য় মিল' আর তাহার দুই পাশে দুইটি মিলের বড় বড় বিল্ডিং রচিত হইল। যে-মহুয়া বনের কুঞ্জে কুঞ্জে, মাদলের মোহন তানে নৃত্যপরা যুবতীর দল আমার কানে মধুবর্ষণ করিত, সেই স্থানটির আর কোন চিহ্নই নাই, সেখানে 'বৈমানিক রজ্জুমার্গে'র আন্‌লোডিং ষ্টেশন স্থাপিত হইয়াছে। নদীর ওপারের বিগুয়া সাঁওতালের মেয়ে ফুলী জ্যোৎস্নাময়ী নিশির ডাকে অতিষ্ঠ হইয়া যে অর্জ্জুন বৃক্ষের তলায় চুপি চুপি আসিয়া সিধুর সঙ্গে মিলিত, সেই নদী কিনারে পাম্পিং হাউস নির্ম্মিত হইয়াছে।

যেখানে গ্রামের মাতব্বরেরা বসিয়া পঞ্চায়তী করিত সেইস্থানে পাল্‌ভা-রাইজড্‌ কোল্‌ প্ল্যান্ট খাড়া হইয়া উঠিল। এই রকম ভাবে, আমার সমস্ত জায়গাটাই জোড়া হইয়া গেল—একটু স্থানও খালি পড়িয়া রহিল না যে নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচি।

এমনিভাবে আমি আষ্টেপিষ্টে বাঁধা পড়িয়া গেলাম। ভাল ভাল রাস্তাঘাট তৈরি হইল—সাহেবদের বসবাসের জন্য সাহেব লাইন তৈরি হইল—বাবু লাইন, ফোরম্যান লাইন, কুলী লাইন প্রভৃতি কত লাইন তৈরি হইতে লাগিল।

যাহা হউক, কোম্পানীর এই ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে হাটবাজার বসিল, খেলার মাঠ তৈরি হইল, শিখেদের গুরুদোয়ারা স্থাপিত হইল, খ্রীষ্টিয়ানদের উপাসনা-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল, ছোট ছোট ছেলের জন্য পাঠশালা-গৃহ নির্ম্মিত হইল। বাঙালীরা সকলে মিলিয়া খুলিল, সাধারণ পাঠাগার—তার নাম দিল মৌভাণ্ডার ইউনিয়ন ক্লাব। আধুনিক সভ্যতার অঙ্গ, থিয়েটারের ষ্টেজ কিনিয়া সেই ষ্টেজে অভিনয় সুরু করিয়া দিল তাহারা 'চন্দ্রগুপ্ত' 'সাজাহান' 'পরপারে' 'জয়দেব' আর 'আবুহোসেন'। কোম্পানীর জেনারেল আপিসের নামজাদা কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ নিয়োগী ও তাঁহার অধস্তন কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত [illegible]চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছোটবাবুর নেতৃত্বে ও তাঁহাদের গুণমুগ্ধ [illegible] বাঙালী ভদ্র যুবকের ঐকান্তিক চেষ্টায়, বৎসরে [illegible] দুর্গাপূজা, কালীপূজা, সরস্বতীপূজা ও আনুষঙ্গিক [illegible] হইতে

লাগিল। মোটের উপর, এই অল্প দিনের মধ্যে তাহারা এই সুদূর স্থানেও যাবতীয় সুখ ও সুবিধা, আমোদ ও প্রমোদ, অভাব ও অভিযোগ, দলাদলি ও কোলাকুলি প্রভৃতি যাহা কিছু লইয়া মানুষের জীবনযাত্রা, তাহার সমস্তই স্বদেশের মত তুল্যমূল্য ভাবেই উপভোগ করিতে লাগিল।

ছাড়পত্রের কাছারী

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

১৯২১ সাল, এপ্রিল মাস, ২১শে তারিখ। পারিসে আট নয় মাস কাটানো গেল। পারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হইয়া পারিসে অবস্থান করিতে ছিলাম। অধ্যাপক বলিলেন, 'ডিগ্রির মোহ তোমাদের মধ্যে খুবই প্রবল, তুমি এই মোহ ত্যাগ কর, লণ্ডনের ডক্টরেট পাইয়াছ, নিজ মাতৃভূমির বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজও পাইয়াছ, পারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপের প্রত্যাশায় আবার এক বৎসর ধরিয়া বসিয়া থাকা মানে অনর্থক একটি বছর নষ্ট করা। এইবার দেশে যাও, সেখানে ছাত্রদের পড়াও, নিজেও পড়াশুনা কর, কাজ কর, বই লেখ। কিছুদিন পরে তোমার কয়টা ডিগ্রি কেহ সে বিষয়ে খোঁজও লইবে না।" আমি বাড়ীমুখা হইয়া পড়িয়াছিলাম, গুরুর উপদেশ শিরোধার্য্য করিলাম, আর এক বৎসর অবস্থানের জন্য আর দরখাস্ত দিলাম না। স্থির করিলাম, এই বৎসরের বৃত্তি শেষ হইলেই ঘরে ফিরিব। হাতে এখন মাস চার পাঁচ আছে, এইবারে আমার চির-আকাঙ্ক্ষিত ইউরোপের Grand Tour সারিয়া ফেলিতে হইবে।

ইটালী ও জারমানী দেখিব, এবং সম্ভব হইলে গ্রীসও দেখিয়া আসিব—এই সঙ্কল্প ছিল। পূর্ব্ব হইতেই এই বিষয়ে প্রস্তুত হইতেছিলাম, এইবার লণ্ডনে গিয়া, এই তিন দেশে আমায় যাইতে দিতে ব্রিটিশ সরকারের যে আপত্তি নাই, তদর্থে আমার পাসপোর্ট বা ছাড়পত্রের উপর অনুমতি-লিপি লিখাইয়া আনিলাম। এইবার তত্তৎদেশের কন্সাল বা প্রতিনিধির নিকট হইতে অনুমতিসূচক ছাপ লইতে হইবে, অন্যথা সেই সকল দেশে প্রবেশ করিতে পারিব না। লণ্ডনে থাকিতে থাকিতে জারমান কন্সালের আপিসে গিয়া জারমানীর জন্য visa বা অনুমতি লইয়া আসি। জারমান কন্সালের আপিসে বিশেষ দেরী হয় নাই, গত মাত্রেই কার্য্য সমাধা হয়। প্রায় প্রত্যেক রাজশক্তির নিকট এই visa বা অনুমতির জন্য কিঞ্চিৎ করিয়া দক্ষিণা দিতে হয়।

ইটালী ও গ্রীসের জন্য visa লওয়া লণ্ডনে হইয়া উঠে নাই। পারিসে ফিরিয়া আসিয়া ইটালীর জন্য visa লওয়ার আবশ্যকতা হইল, কারণ প্রথমেই যাইব ইটালীতে। স্থির করিলাম, গ্রীসের জন্য visa ইটালীর কোনও নগর হইতেই লইব,—অনতিবিলম্বে ইটালী যাত্রা করিতে হইবে, পারিসে থাকিতে থাকিতে গ্রীক প্রতিনিধির আপিসে গিয়া অনুমতি লইবার সময় থাকিবে না।

সকাল সকাল প্রাতরাশ সমাধা করিয়া ইটালীর কন্সালের আপিসে গিয়া উপস্থিত হইলাম। পারিসে আপিস আদালত দোকান হাট খুলিয়া থাকে সকাল নয়টায় বন্ধ হয় বেলা বারোটায় আবার খোলে দুই ঘণ্টা পরে বেলা দুইটায়, এবং দুইটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত কাজকর্ম্ম চলে। দুপুরের দুই ঘণ্টা মধ্যাহ্ন-ভোজনের ও বিশ্রামের জন্য এই ব্যবস্থা। মিউজিয়ম দেখিতেছি—বেলা বারোটা বাজিতে মিনিট-পাঁচেক বাকী, এমন সময়ে মিউজিয়মের উর্দীপরা চৌকিদার হাঁক দিল, On ferme! On ferme! 'অঁ ফ্যার্ম্! অঁ ফ্যার্ম্!" অর্থাৎ "বন্ধ ক'রবে! বন্ধ ক'রবে!" দর্শকেরা আস্তে আস্তে বাহির হইয়া যায়। মিউজিয়ম বাড়ীর দরজা জানালা দুই ঘণ্টার জন্য বন্ধ হয়। বারোটার মধ্যে যাহাতে আমার কাজ চুকিয়া যায়, তজ্জন্য আপিস খুলিবার আগেই কন্সালের আপিসে গিয়া হাজির হইলাম। সকালবেলার মিষ্ট রৌদ্র, একটি সরু রাস্তার উপরে কন্সালের আপিস; আপিস বাড়ীটি একটি সেকেলে বাড়ী, পাঁশুটে রঙের পাথরের দেয়ালে সকালের রৌদ্র পড়ায় সুন্দর একটি কোমল স্বর্ণাভ ধূসর রঙের সমাবেশ হইয়াছে। রাস্তায় লোকচলাচল বেশী নাই। কন্সালের আপিসে পঁহুছিয়া দেখিলাম, আপিস বাড়ীর ফটকই তখনও খুলে নাই। পাসপোর্ট সংক্রান্ত ব্যাপার লইয়া আমার মত তিন চারি জন লোক দাঁড়াইয়া আছে। আপিস খুলিতে আরও মিনিট কয়েক দেরী, ইতিমধ্যে আর পাঁচ জন

লোক—মেয়ে পুরুষ আসিয়া হাজির হইল। রাস্তার ফটকের কাছে বেশ একটু ভিড় জমিয়া গেল। ইহাদের মধ্যে ভাল পোষাক পরা দুই চারি জনকে ইংরেজ বা আমেরিকান বলিয়া বোধ হইল; বাকী সকলে সামান্য ব্যক্তি, খুব সম্ভব ইটালীয়। ইতিমধ্যে কোথা হইতে এক পাহারাওয়ালা আসিয়া হাজির; ফরাসী পুলিসের পাহারাওয়ালা, মাথায় কপালের উপর কার্ণিশওয়ালা টুপি, গায়ে ঘন নীল-কৃষ্ণ পোষাক, তদুপরি কাঁধ-ঢাকা হাতা-বিহীন কেপ্-কোট বা ওভার-কোট। লোকটি আসিয়া সমবেত ব্যক্তিগণের সঙ্গে আলাপ জমাইতে শুরু করিল। আমায় জিজ্ঞাসা করিল—"কোন্ দেশের লোক আপনি?" আমি বলিলাম—"কি অনুমান হয়?" উত্তরে বলিল—"তুর্ক্?" আমি—"না। ফের অনুমান করুন।" —"ইতালীয়ঁ?" —আমি তখন বলিলাম, "না। আমি হইতেছি এঁ্যাদু—হিন্দু বা ভারতীয়।" তখন সে মন্তব্য করিল—'বড় দূর দেশ।" ইতিমধ্যে ফটকের ওপাশে উর্দীপরা একজন দরওয়ান বা চাকর দেখা দিল—আমাদের পাহারাওয়ালার সঙ্গে দুই একটি বাক্যালাপ আরম্ভ করিয়া দিল। খানিকক্ষণ এইভাবে কাটিবার পরে, আপিস লোহার ফটক খুলিয়া দিল, আমরা ভিতরে প্রবেশ করিলাম।

ছোট একটু আঙিনা, তাহার একধারে একটি ঢাকা বারান্দা, বারান্দার লাগাও ঘর। এইরূপ একটি ঘর আমাদের অপেক্ষা করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল, সেই ঘরে আমরা সকলে গেলাম। ঘরে কতকগুলি বেঞ্চি পাতা ছিল, আর খান-দুই-চার চেয়ার। এই ঘরের পাশেই আপিস-ঘর। একে একে কেরানীরা, ছোট বড় কর্ত্তারা আসিয়া আপিস-ঘরে ঢুকিতে লাগিলেন। ক্রমে সাড়ে নয়টা বাজিয়া গেল। চেয়ারগুলিতে বসিয়াছিলেন খুব দামী পোষাক পরা কতকগুলি আমেরিকান্ মেয়ে। বেঞ্চিতে দুই চারি জন নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তি বসিয়াছিল। আমরা ঘরে ও বারান্দায় পায়চারী করিতেছিলাম, এবং আপিসের কেরানীদের কখন দয়া হইবে, কতক্ষণে তাঁহারা কাজে বসিবার জন্য মনস্থির করিবেন, সতৃষ্ণ নয়নে উঁকি মারিয়া তাহাই দেখিতেছিলাম। চার পাঁচ জন কেরানীর মধ্যে দুই তিন জন মেয়ে ছিল। একটি আধাবয়সী মহিলা, কেরানী তিনি—ফরাসী কি ইটালীয় বোঝা গেল না,—দেখিলাম তিনি হাত-ব্যাগ হইতে আরশী, চিরুণী, ঠোঁটে লাগাইবার লাল রঙের কাঠি, পাউডারের বাক্স,—এই সব লইয়া খুব উৎসাহের সঙ্গে প্রসাধনে লাগিয়া গিয়াছেন। ভদ্রমহিলার চোখ বড় বড়, কিন্তু গাল দুইটা তুবড়িয়া গিয়াছে—অথচ দুই গালে টকটকে লাল রঙের দুই ছোব লাগাইয়াছেন, পথশ্রমে গালের ঠোঁটের মুখের রঙ কিছু নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে, তাই সংস্কার করিয়া লইতেছেন। ইউরোপের এই জিনিসটি আমার মোটেই ভাল লাগিত না—জিনিসটি হইতেছে বর্ষীয়সী বা প্রৌঢ়া মহিলাদের কাণ্ডজ্ঞানের অভাব। ষাট বৎসর বয়সের বৃদ্ধাও গালে রঙ মাখিয়া চুলে ফুল গুঁজিয়া নাচিয়া নাচিয়া চালবার ঢঙ করিয়া কুড়ি বৎসরের তরুণী সাজিবার চেষ্টা করে—এইরূপ দৃশ্য যুগপৎ হাস্যকর ও হৃদয়-বিদারক। মাথের ও ঠাকুরমায়ের গৌরব ইহাদের কাছে যেন কাম্য নহে—ইহারা চায়, চিরকাল তরুণী বা খুকী থাকিতে। যাউক্, অবশেষে দেখিলাম পরস্পর হাসি মস্করা ও কুশল প্রশ্নের পরে ইহাঁরা স্থির করিলেন, এইবার কাজে বসা যাইতে পারে। উপস্থিত অভ্যাগতেরাও একটু অধৈর্য্য হইয়া পড়িতেছিলেন। কে আগে আসিয়াছে, কে বা পরে আসিয়াছে, তাহার খবর কেহও রাখে নাই। কে আগে যাইবে? আমি আসিয়াছি বহু পূর্ব্বে—কিন্তু নিজেকে আগাইয়া না দিলে, কনুইয়ের খোঁচা দিয়া পথ না করিয়া লইলে, হয়তো পিছনেই পড়িয়া থাকিতে হইবে। এমন সময়ে আন্তর্জাতিক বিধি এবং আন্তর্জাতিক পৌর্ব্বাপর্য্য সম্বন্ধে ধরা-বাঁধা নিয়ম, ব্যক্তিগত ভাবে আমার সহায়তা করিল। কন্‌সালের কাছারীর উর্দ্দীপরা এক চাকর আসিয়া যে ঘরে আমরা ছিলাম সেই ঘরে ঢুকিয়া ফরাসীতে হাঁক দিল—"ব্রিটিশ ও আমেরিকান পাসপোর্ট যে সব মহিলা ও ভদ্রলোকের, তাঁরা অনুগ্রহ করিয়া আগাইয়া আসুন।" তারপরে ইংরেজীতে তরজমা করিয়া বলিল—Ladies and Gentlemen with British and American passports, please step forward. বুঝিলাম, ইটালীর সরকারী কাছারীতে এই ভাবে ইংরেজ ও আমেরিকান জাতির সম্মান রক্ষা করা হইয়া থাকে। বিভিন্ন জাতির পদ অনুসারে এইরূপ আগুপিছু ব্যবস্থা। চেকো-স্লোভাকিয়া, যুগোস্লাভিয়া, পোর্ত্তুগাল, গ্রীস, রুমানিয়া প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতির লোকেদের ডাক আসিবে সব শেষে। ব্রিটিশ-

সাব্‌জেক্ট-বিধায় আমার ছিল ব্রিটিশ ছাড়পত্র, সুতরাং "হংসমধ্যে বকো যথা" আমাকে ইংরেজ ও আমেরিকানদের সঙ্গেই আগাইয়া যাইতে হইল। কেন জানি না, কিন্তু মনে হইল আমার অগ্রগমন দেখিয়া অন্যান্য জাতির যে সব ব্যক্তি বসিয়া রহিল, তাহাদের দুই চারি জন যেন আমার দিকে আড়চোখে একবার দেখিল, দুই এক জনের গোঁফের আড়ালে যেন ঈষৎ হাসির বিদ্যুৎও খেলিয়া গেল। যাহা হউক, এ সব ঈর্ষ্যা-প্রণোদিত বিদ্রূপ-দৃষ্টি গা হইতে ও মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া আমি আপিস-ঘরে প্রবেশ করিলাম। দুই তিন জন কেরাণী বসিয়া আছে, ছাড়পত্রের ব্যবস্থা করা তাহাদেরই উপরে। কাজটি সহজ - পাসপোর্টখানি খুলিয়া দেখা, আমার ইটালী যাইবার জন্য ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে স্পষ্ট অনুমতি আছে কি না, তদ্দৃষ্টে কেরাণী "যাইতে পারে" এই অর্থে ইটালীয়ান সরকারের রবার ষ্ট্যাম্প দিয়া ছাপ মারিয়া দিল, তারিখ লিখিয়া দিল, যে কয় ফ্রাঙ্ক দক্ষিণা ধার্য্য আছে তাহা লইল, এবং কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিতে বলিয়া এক বড় কর্ত্তার কাছ হইতে রবার ষ্ট্যাম্পের পাশে সহি করাইয়া আনিয়া দিল। ব্যস, বেলা দশটার মধ্যেই কাজ চুকিয়া গেল।

ইটালীতে যথাকালে প্রবেশ করিলাম। সুইট্‌সারল্যাণ্ডের ভিতর দিয়া, আল্‌প্‌স্‌-এর সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়া ইটালীতে আসিলাম, মিলানের পথ দিয়া সরাসরি পঁহুছিলাম পাদুয়াতে। পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার সপ্তশততম স্মৃতি বার্ষিক উৎসব ছিল, সেই উৎসবে যোগ দিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিমন্ত্রণ হয়, আমরা কলিকাতার প্রতিনিধি হিসাবে পাদুয়ায় আগমন করি। পাদুয়ায় উৎসবের কয়দিন কাটাইয়া আমরা ভেনিসে আসিয়া উপস্থিত হই। ভেনিস দেখিবার সাধ বহু দিন হইতে ছিল, এতদিনে সে সাধ পূর্ণ হইল, চার পাঁচ দিন ধরিয়া ভেনিসে থাকিয়া শহরটির সম্বন্ধে একটা ধারণা করিয়া লওয়া গেল। ভেনিস্ দেখিয়া বার-বার আমাদের কাশ্মীর কথা আমার মনে হইত। ভেনিস মস্তবড় বন্দর। এখানে প্রায় সব জাতির কন্‌সাল বা প্রতিনিধি আছে। স্থির করিলাম, গ্রীসে যাইবার জন্য ছাড়পত্রে অনুমতির ছাপ এইখানকার কন্‌সালের কাছারী হইতেই লইব।

সকলেই জানেন, ভেনিস নগরী সমুদ্রের সঙ্গে যুক্ত কতকগুলি খালের উপর অবস্থিত। খালের পাশে পাশে সরু সরু রাস্তা, কোথাও বা খালের জলের উপরেই সব বাড়ী খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। যানবাহনের মধ্যে নৌকা, লগী-হাতে মাঝী পিছনে দাঁড়াইয়া চালাইয়া থাকে, এইরূপ সরু লম্বা এক প্রকারের নৌকা, যাহাকে Gondola 'গন্দোলা" বলে সেই নৌকা; এতদ্ভিন্ন ষ্টীমার ও ইলেক্‌ট্রিক লঞ্চও আছে। ঘোড়ার গাড়ী কি মোটরকার নাই, কারণ ইহাদের চলিবার পথ নাই। ডাঙ্গাপথে যাইতে হইলে হাঁটা ভিন্ন উপায় নাই।

গাইড-বুক বা বর্ণন-পুস্তক দেখিয়া গ্রীক কন্‌সালের আপিসের ঠিকানা বাহির করিলাম। সকালবেলা অন্য দুই একটা দ্রষ্টব্য স্থান দেখিয়া লইয়া কন্‌সালের আপিস খুঁজিয়া বাহির করিয়া, সেখানে পঁহুছিতে বাজিয়া গেল প্রায় পৌনে বারোটা। ফ্রান্সের মত ইটালীতেও আপিস কাছারী প্রভৃতি খোলা থাকে নয়টা হইতে বারোটা পর্য্যন্ত। ইটালী ফ্রান্সের চেয়ে বেশী গরম দেশ, এখানে দুপুরের আহারের পরে সকলে একটু নিদ্রা দেয় — এই দিবানিদ্রাকে বলে siesta "সিয়েস্তা"। তাহার পরে আবার বিকালের দিকে দুইটায়, কি তিনটায় আপিস খুলে। আমার দেরী হইয়া গিয়াছিল—অন্ততঃ আরও আধ ঘণ্টা আগে পঁহুছানো উচিত ছিল। যাহা হউক, যখন এতদূর যে মাসের প্রখর রৌদ্র হাঁটিয়া আসিয়াছি, তখন একবার না চেষ্টা করিয়া ফিরিব না। দোতালা বাড়ী, উপরের ছাতটি খাপরা বা খোলায় ঢাকা; ইটালীর প্রায় সব প্রাচীন বাড়ীই এই ধরণের খোলার চালযুক্ত। সমুদ্রের তীরে বড় সড়কের দিকে মুখ করিয়া বাড়ী, দোতালায় উঠিতে হয় পাশের একটি সরু গলি দিয়া। আপিস-ঘরের একটা জানালার সামনে গ্রীক ও ইটালীয়ান ভাষায় লেখা "গ্রীসের প্রতিনিধির কাছারী", এবং একখানা সাইনবোর্ডের কাঠের পাটায় নীলজমির এককোণে সাদা ক্রুশযুক্ত ও সাদা এবং নীল রঙের ডোরাকাটা গ্রীক নিশান আঁকা আছে। আমি পিছনের সিঁড়ি দিয়া উঠিলাম, কন্‌সালের কামরায় যাইবার দরজায় একটি ঘণ্টা বাজাইবার দড়ি ছিল সেই দড়ি ধরিয়া টান দিলাম, ভিতরে ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, খানিক পরে এক চাকর দরজার একটি মাত্র কপাট খুলিয়া অপ্রসন্ন মুখে ইটালীয়ান ভাষায় জিজ্ঞাসা করিল—"কি চাই?" বুঝিলাম, আপিস বন্ধ করিয়া ঘরে গিয়া বেচারী খাইবে

[illegible] আমি এক মু [illegible] [illegible]-[illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ইটালীয়ানে বলিলাম—"কন্‌সাল [illegible] দিয়া [illegible], আমার পাসপোর্টে visa করিতে হইবে।" সে [illegible] [illegible] করিতে পারিলেই বাঁচে, বলিল—"এখন হবে না, [illegible] [illegible] হ'চ্ছে, বিকালে কিংবা কাল সকালে আসবেন।" আমি [illegible] যাইতে প্রস্তুত ছিলাম না; আবার এতটা কে [illegible] আসে? আমি বলিলাম, "কন্‌সালকে গিয়া বল যে আমার ইংরিজি পাসপোর্ট আছে।" এখন ইংরেজ সরকারের [illegible] অপমান করা গ্রীসের [illegible] পক্ষে সাহসের—[illegible] কি [illegible] ব্যাপার হইবে, [illegible] অনুমান করিয়া ছিলাম। দেখিলাম অনুমান ঠিক। লোকটি আমার দিকে একটা [illegible] দৃষ্টি হানিয়া, দরজা আর একটু খুলিয়া রাখিয়া ভিতরে [illegible]। এক মিনিটের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"কন্‌সাল [illegible], তিনি ইংরেজীতে কথা কহিতে পারেন না।" [illegible] যদি এই বাহানার ফলে আমি চলিয়া যাই। আমি [illegible]—"Parla francese? পার্লা ফ্রাঞ্চেসে? ফরাসী [illegible]?" তখন অগত্যা সে আবার ভিতরে গেল, এবং [illegible] [illegible] [illegible] ফিরিয়া আসিয়া আমায় ভিতরে ডাকিয়া লইয়া গেল।

[illegible] আকারের একখানি ঘরে কাগজপত্রে বোঝাই [illegible] টেবিলের সামনে কন্‌সাল বসিয়া আছেন। তাঁহার সামনে দুই তিনখানি খালি চেয়ার। বড় রাস্তার উপরে কতক-গুলি জানালা, জানালাগুলি ইতিমধ্যে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আমি ঘরে ঢুকিতেই আমার দিকে তাকাইয়া ভদ্রলোক বলিলেন—"Ah, vous n'etes pas anglais! আ, ভু. নেৎ পা অঁগ্লে! আপনি তো ইংরেজ নন্।" আমি বলিলাম, "আমি [illegible] ভারতীয়।" তখন ভদ্রলোক একটু খাড়া হইয়া উঠিয়া বলিলেন, "হাঁ—আপনি ভারতীয়? বসুন মশায়, বসুন।" বলিয়া সামনের চেয়ার দেখাইয়া দিলেন। আমি বসিলাম। কন্‌সাল বলিলেন—"মহাশয়, আপনাদের কবি '[illegible] ত্যাগোর'-এর বই আমি পড়িয়াছি। আপনারা [illegible] [illegible] [illegible], অতি মহৎ জাতি।" তার পরে [illegible] [illegible] [illegible] বলিয়া আলাপ হইল। তিনি বলিলেন, [illegible] দেশে সংস্কৃতেরও চর্চা আথেন্সের বিশ্ববিদ্যালয়ে আরম্ভ হইয়াছে। তাঁহাদের একজন কবি আরবানীতে সংস্কৃত পড়িয়াছিলেন, "মাথাবারাতা" ও "রামাইআনা" হইতে অনুবাদ করিয়াছেন, 'নালা ও দামাইআন্‌তী'র উপাখ্যান অতি সুন্দর ভাবে মূল সংস্কৃত হইতে আধুনিক গ্রীকে অনুবাদ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতার সঙ্গে, অন্তত তাঁহার নামের সঙ্গে, প্রত্যেক শিক্ষিত গ্রীক পরিচিত। ভারতের সংস্কৃতিকে শিক্ষিত গ্রীকেরা অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখিয়া থাকে। এইভাবে তাঁহার সহিত অনেকক্ষণ ধরিয়া আলাপ হইল, আমিও যথাযোগ্য উত্তর দিতে ও প্রশ্ন করিতে লাগিলাম। প্রায় আধ ঘণ্টা হইয়া গেল—ভদ্রলোকের বিরক্তি নাই, ভারতবাসী আমি, রবীন্দ্রনাথের দেশের লোক আমি, ইলিয়াড অডিসীর দোসর মহাভারত রামায়ণ আমার জাতির মধ্যেই উদ্ভূত হইয়াছে, আমার সঙ্গে কথা কহিতে পাইয়া ভদ্রলোক বিশেষ খুশী। আমরা পরস্পর কার্ড বিনিময় করিলাম। তিনি দুই মিনিটে আমার পাসপোর্টে visa করিয়া দিলেন, এবং গ্রীসে ভ্রমণ সম্বন্ধে কতকগুলি উপদেশ দিলেন, রাজধানী আথেন্সের কতকগুলি ভদ্র অথচ সস্তা হোটেলের নাম ও ঠিকানা দিলেন, দুই-চারি জন বন্ধুর নিকট পরিচয়-পত্র দিলেন। আমি বিশেষ ধন্যবাদের সহিত করমর্দন করিয়া বিদায় লইলাম।

ছাড়পত্রের কাছারীতে এরূপ হৃদ্যতার পরিচয় বিশেষ দুর্লভ বস্তু। পরে আমার এই অভিজ্ঞতার কথা একজন মহারাষ্ট্রীয় বন্ধুকে বলি। তিনি বলিলেন, Rabindranath is the greatest ambassador India has ever sent out, তাঁহার প্রভাব ও গৌরবের ফলেই আমরা বাহিরে এতটা খাতির পাইতে পারি, তিনি ভারতের মত একটি বড় জাতির উপযুক্ত প্রতিনিধিই বটে। বাস্তবিক—একদিকে আমাদের প্রাচীন সাহিত্য, প্রাচীন কৃতিত্ব যেমন ইউরোপের শিক্ষিত জনকে আকৃষ্ট করে, তেমনি অন্যদিকে মহাত্মা গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভা সকলকে মুগ্ধ করিয়াছে।

ভারতের শাশ্বত গৌরবের সঙ্গে সঙ্গে, সেই গৌরবের [illegible] করিয়া আমাদের মহাত্মাজীর ও কবি [illegible] [illegible] ও প্রতিভা [illegible] [illegible]।

বরযাত্রী

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

১

ত্রিলোচনের বিবাহ। বরযাত্রীদের মধ্যে রাজেন, কে. গুপ্ত, গোরাচাঁদ আর ঘোঁৎনা আসিয়া হাজির হইয়াছে, গণশার অপেক্ষা,—সে আসিলেই এদিককার দলটা পূর্ণ হয়। ত্রিলোচন [illegible] মধ্যে এর পূর্ব্বেও আসিয়া কয়েক বার খোঁজ লইয়া গেছে, আবার তর্জ্জনীর ডগায় একটু দো লইয়া মুখ বাঁকাইয়া দক্ষিণ গালটা নির্দ্দয়ভাবে ঘষিতে ঘষিতে আসিয়া হাজির হইল; প্রশ্ন করিল—"এলো না?"

ঘোঁৎনা বলিল—"ওর মামা ওকে যেরকম আগলে বসে আছে দেখলাম..."

এমন সময় হালদারদের বাড়ির পাশের গলিটায় সাইকেলের ঘণ্টির আওয়াজ হইল এবং গণশা সবেগে নিষ্ক্রান্ত হইয়া এবং সবেগেই দলটির মাঝখানে প্রবেশ করিয়া, ব্রেক চাপিয়া নামিয়া পড়িল। জবাবদিহি হিসাবে বলিল—"গ—গ্ গণশাকে আটকায় সে এখনও মা—মায়ের পেটে।"

ছোকরা একটু তোৎলা; রাগিলে কিংবা উৎসাহিত হইলে এক একটা অক্ষর প্রায়ই দ্বিত্ব প্রাপ্ত হয়। ডানদিকের মুঠায় একটা হেঁচকা-টান দিয়া সামলাইয়া লয়।

রাজেন বলিল—"তোর কিন্তু না গেলেই ভাল হ'ত গণশা। একদিন হাটাহাটি ক'রে সাহেব যদি-বা ইণ্টারভিউয়ের জন্যে আজ ডাকলে, বরযাত্র যাওয়ার লোভে.."

ঘোঁৎনা বলিল—"তাতে আবার আজকাল চাকরির যা বাজার!"

গণশা বলিল—"তিলুর বিয়েতে আমি যাব না! এর পর আমার নি—নিজের বিয়েতে বলবি—গ—গ্ গণশা তোর গিয়ে কাজ নেই, তুই চা—চাকরির খোঁজ করগে।"

গণেশের কথাটা বলিবার হক্ আছে। সে ত্রিলোচনকে তাস খেলিতে শিখাইয়াছে, সিগারেট খাইতে শিখাইয়াছে, চলন্ত ট্রামে ওঠা-নামা করিতে শিখাইয়াছে, এবং নিয়মিতভাবে বায়স্কোপের সিরিয়াল-অসিরিয়ালে লইয়া গিয়া পৃথিবীর যত সিনেমা-হেয়ারোদের ন্যায় সুন্দর করিয়া তাহাকে অন্তর দিক দিয়া নায়ক করিয়া তুলিয়াছে।

শুধু তাহাই নহে। আপাততঃ এ বয়সে ঠিক করিয়া দাম্পত্য-নীতিতে জোর তালিম দিতেছে সে-ই, এবং বিশেষ করিয়া দাম্পত্যরাজ্যে [illegible] পূর্ব্বে বাসর-ঘরটি কি-ভাবে অতিক্রম করিতে হইবে তাহারও কৌশল-কায়দা [illegible] করা হইতেছে ঐ গণশারই নিকট।

ত্রিলোচন কৃতজ্ঞচিত্তে বলিল—"না, না, ওরে [illegible] করেচিস্। বৌদি আবার বাসরঘরের যা ভয় লাগিয়ে দিয়েছে; ভাবচি আর গলা শুকিয়ে যাচ্ছে আর জল খাচ্ছি। আর সঙ্গে বিয়ে সে একলাটি থাকলেই ঢিবিয়াটি হ'ত.. কার সওয়ালে যে কি উত্তর দোব, কার কানমলা সামলাব, কে গোঁফজোড়াটা নেড়ে দেবে...তার ওপর আবার গানের 'ফরমাস আছে, কারুর হেঁয়ালী আছে।"

কে. গুপ্ত ত্রিলোচনের পাশাপাশি তাহাদের ফুটবল টিমে ব্যাক খেলে। বলিল—"তা বটে; পাঁচটা ফরওয়ার্ডকে সামলাতেই হিম্‌সিম্ খেয়ে যেতে হয়।"

ত্রিলোচন বলিল—"ছ-জনে মিলে, আর এ একলা।... গোঁফজোড়াটা নয় ফেলে দোব গণশা, যতটা হালকা হয়। বিয়ে হয়ে গেলে আবার না হয় তখন..."

গোরাচাঁদ বলিল—"তাহলে ত নাককান কেটে, মাথা মুড়িয়ে বাসরঘরে ঢুকতে হয়।"

গণশা বলিল—"বরং ক কবন্ধ কাটা হয়ে ঢুকলে তো আরও ভাল হয়। দেখবে বরের গ-গ্ গলারই বালাই নেই, গাইতে বলা মিছে।"

ত্রিলোচন চিন্তিতভাবে বলিল—"তোদের তামাশা বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু আমার এদিকে যে কি হচ্ছে তা... আবার তার ওপর সকাল-সকাল লগ্ন পড়ে গেছে কপালগুণে।"

কে. গুপ্ত বলিল—"খুব ষ্টেডি থাকবেন মশাই, [illegible]

জুতোই প্রেস্ ক'রে ধরবে। একটা বড় দেখে নিতবর করে নিলে..."

গণশা একটু রাগিয়া উঠিল; বলিল—"বা-বাড়ির রায়োয়ান কি গা-গ গাড়ির সহিসকে তো আর নিতবর করবে না সবাই; সে-সব আপনাদের ছা-ছাতুর দেশে চলে।"

বেহারের ছেলে। সুদূর ছাপরার এক মফস্বলের স্কুল হইতে পাশ করিয়া কলিকাতার কলেজে পড়িতে আসিয়াছে, বাংলার ছেলের সঙ্গে এখনও কথায় আঁটিয়া উঠিতে পারে না,—কে. গুপ্ত চুপ করিয়া গেল।

ঘোঁৎনা বলিল—"বাসরঘরের ভয়ে যদি বিয়ে ছাড়তে হয় তো কলিশানের ভয়ে গাড়ী চড়াও ছাড়তে হয়।"

গোরাচাঁদের কথাবার্তায় প্রায়ই একটু আহার্য্যের গন্ধ থাকা নিয়ম, বলিল—"তাহলে কাঁটার ভয়ে মাছ খাওয়া ছাড়তে হয়।"

কবি রাজেন বলিল—"কণ্টকের ভয়ে গোলাপ ফুল ছাড়তে হয়।"

গণশা সাইকেলটা রাখিতে গিয়াছিল, আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"বরযাত্রীদের মালা এসেচে?"

ত্রিলোচন বলিল—"সে সব ঠিক আছে—মালা, গোলাপজল, এসেন্স।...আর আমি যাই দেখি গে—সবাই একটু মিষ্টিমুখ ক'রে যাবি তো?"

গোরাচাঁদ বলিল—"হ্যাঁ, যা শিগ্‌গীর যা। কি কি আছে রা?"

ত্রিলোচনকে ফিরাইয়া ঘোঁৎনা বলিল—"আর শোন। ওদিকে কে কে যাচ্চে বল্ তো,—বেশী ভেজাল বাড়লে আবার ফুর্ত্তি জমবে না।"

ত্রিলোচন বাঁ-হাতের আঙুলের পর্ব্ব গুণিতে গুণিতে বলিল—"বাবা এক, মেসো দুই, সেজপিসে, সহায়রাম বাবু—এই হ'ল চার, আর আর..."

বাংলা দেশ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ কে. গুপ্ত ভয়ে ভয়ে মনে করাইয়া দিল—"একজন পুরুত যাবে না?"

ত্রিলোচন গুণিল, "পুরুত—পাঁচ, দীনে নাপতে—ছয়। পুরুত-মশাই নিজে যেতে পারবেন না; তাঁর কাকা ঠাকুর মশাই যাবেন।"

গোরাচাঁদ একটু অস্বস্তির সহিত বলিল—"এই দু-জনেও মিষ্টিমুখ করবে তো?"

ঘোঁৎনা বলিল—"পুরুতঠাকুরের কাকা? সে বুড়ো তো রাতকাণা, আবার কালাও তার ওপর; কার সঙ্গে বিয়ে দিতে কার সঙ্গে দিয়ে দেবে!"

ত্রিলোচন বলিল—"তাকে দীনে সামলাবে।"

রাজেন বলিল—"একা দীনে-ব্যাটা সে ক'জনকে সামলাবে! ওদিকে সহায়রাম চাটুজ্যের যাওয়া মানেই বোতলের শ্রাদ্ধ।"

ত্রিলোচন বলিল—"সহায়রাম বাবু আর সেজপিসে রাত্তিরেই চ'লে আসবে; কাল তাদের আপিসের মেল-ডে কি-না,—ছুটি পেলে না।...বোতল?—দু-পাট সাফ হয়ে গেচে—এক ডজন্ চপ্, কাট্‌লেট্..."

গোরাচাঁদ বিরক্ত হইয়া বলিল—"কেন মিছিমিছি তিলুকে আটকাচ্চিস্ সবাই? সাজগোজে দেরি হ'য়ে যাবে, ভাল ক'রে একটু সাজতে হবে তো?—কথায় বলে বরসজ্জা।...ঐ সঙ্গে কিছু চপ্ কাট্‌লেট্ সরিয়ে ফেল গে তিলোচন, ট্রেনে কাজ দেবে।"

উপর হইতে ছোটবোন ডাকিল—"দাদা, গল্প ক'রছ—জামাকাপড় পরতে হবে না? বৌদি চন্দন-টন্দন নিয়ে বসে আছেন যে।"

গোরাচাঁদই উত্তর দিল—"তোদের সব তাড়াতাড়ি,—যাচ্চে কি-না।" ত্রিলোচনের গেঞ্জিতে একটা টান দিয়া বলিল—"আগে গিয়ে কি যেন মিষ্টিমুখের কথা বলছিলি—দেখেশুনে দিগে। তাড়াতাড়িতে ভুলে গেলে তোর মা'র মনে আবার শুভদিনে একটা খটকা থেকে যাবে।...ও সাজগোজের জন্যে ভাবিস্ নি—আজকাল আবার বেলা সাজগোজ করাটা ফ্যাশান নয়, না রে গণশা?"

গণশা বলিল—"তা বইকি, আজকাল বড্ডো..."

ত্রিলোচন পা বাড়াইল। গণশা হঠাৎ সামলাইয়া লইয়া বলিল—"মা—মালা, গোলাপজল, এসেন্স পাঠিয়ে দিগে, আর আমার জন্য একটা সিল্কের রুমাল আর তা—ও ভালো শাল পারিস্ তো,—পা-পালিয়ে এসেছি কি-না; আর দেখ..."

ত্রিলোচন দরজার নিকট ফিরিয়া দাঁড়াইতে গণশা বাঁ-হাতটা তুলিয়া সিগারেটের টিন ধাঁটে এই পরিমাণ একটা অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি মুদ্রা রচনা করিয়া বলিল—"বা—বরাবর একটা।"

উত্তরে ত্রিলোচন বাঁ-হাতের তর্জনী আর মধ্যমা আঙুল দুইটা তুলিয়া ধরিয়া হাসিয়া সংক্ষেপে বলিল—"সে হ'য়ে গেছে।...এই।"

গণশা বিরক্ত হইয়া গোরাচাঁদের দিকে চাহিয়া বলিল—"যে-বেচারা বিয়ের সময় একটু সাজগোজ করবে না তো ওর দিদিমাকে গঙ্গাযাত্রা করাবার সময় করবে? খ্যাটের গন্ধ পেলে তোর জ্ঞান থাকে না গোরে। আমায় আবার সা-স্যাক্ষী মানতে কে বলেছিল র‍্যা?—একটু অন্যমনস্ক হয়েছিলাম, অমনি—না রে গণশা?"

২

যেখানে বিবাহ সে গ্রামটার মূলনাম 'গোকুলপুর'; পরে 'কালসিটে গোকুলপুরে' দাঁড়ায়। কবে না-কি গ্রামের লোকেরা এক মাতাল গোরার দলকে উত্তম-মধ্যম দিয়া এই সামরিক খেতাবটা অর্জন করে। মুখে মুখে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া এখন শুধু 'কালসিটে'তে দাঁড়াইয়াছে।

বরযাত্রীর দলও প্রায় গোরার মতই শত্রুস্থানীয়, তাই গ্রামে কোন বরযাত্র আসিলেই ছেলে-ছোকরারা সুযোগমত কানে তুলিয়া দেয়—"এ যার নাম 'কালসিটে' মশাই, একটু সমঝে চলতে হবে।"

গ্রামটা ডায়মণ্ড হারবারের কাছাকাছি, ষ্টেশন হইতে মাইল তিন-চার দূরে।

বাড়িটা নিবিড় জঙ্গলে ঢাকা। গ্রামের সব বাড়িই এই রকম; যেখানে জঙ্গল নাই, সেখানে খানা-ডোবা; দু-একটা মাঝারি সাইজের পুকুরও আছে—সব জলে টইটুম্বুর। জলটা ঘাটের কাছে একটু দেখা যায়; তাহার পরই ঘন, সতেজ পানার কার্পেট।

সদর আর অন্দর আলাদা আলাদা, রশি দুয়েকের তফাৎ হইবে। উৎসব উপলক্ষে সদর বাড়ির সামনে একটি ছোট শামিয়ানা পড়িয়াছে। শামিয়ানার চারিদিকের খুঁটিতে কাচের পাত্রে মোমবাতির নিষ্প্রভ আলো,—মাঝখানে একটা তীব্রজ্যোতি গ্যাসের আলো,—বকমধ্যে হংসো যথা শোভা পাইতেছে। অন্দর-বাহির মিলিয়া আরও গোটাকতক গ্যাসের আলো।

শামিয়ানার মধ্যে বরের আসর। বর বিষণ্ণ মুখে বসিয়া আছে এবং দূরে পাড়ার কোন মেয়ের দল বাড়ির মধ্যে যাইতে দেখিলেই বাপরবর স্মরণ করিয়া অস্ফুটস্বরে বলিতেছে—"বাপরে, রক্ষা পারলে আজ!"

তাহাকে ঘেরিয়া তাহার বন্ধুবর্গ। সব চেয়ে কাছে গণশা, একটা মখমলের বালিস বুকে চাপিয়া ত্রিলোচনের দিকে ঘুরিয়া বসিয়া আছে। মাঝে মাঝে ত্রিলোচনও মুখটা বাড়াইয়া আনিতেছে এবং একটু কথাবার্তা হইতেছে।

একটু দূরে কর্তারা। বলা বাহুল্য, সকলেই অপ্রকৃতিস্থ কমবেশ করিয়া। সহায়রাম বাবু কন্যা-যাত্রীদের কয়েক জনের সঙ্গে বেশ জমাইয়া লইয়াছেন। তাঁহার বক্তব্য—তিনি কতশত জায়গায় বরযাত্র গিয়াছেন, কিন্তু এমন ভদ্র কন্যাপক্ষ কোথাও দেখেন নাই। নানারকম উদাহরণ দিয়া অশেষপ্রকারে কথাটা সাব্যস্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু মুস্কিল—তাঁহারা কোনরকমেই কথাটা মানিয়া লইতে প্রস্তুত নয়। তাঁহারাও মধ্যেও সব অল্পবিস্তর নেশা করিয়াছে এবং ধরিয়া বসিয়াছে—তাহারা অতি দীন, হীন, ইতর; বরপক্ষীয়েরাই বরং অতিশয় ভদ্র ও সম্মানার্হ—এ-গ্রামে এরকম বরযাত্রী আসে নাই।

কথাটা অমায়িক মৃদুহাস্যে, হাতজোড় প্রভৃতি বিনয়োচিত প্রথায় আরম্ভ হইয়াছিল; ক্রমেই কিন্তু সে-ভাবটা তিরোহিত হইয়া যাইতে লাগিল এবং একটা জেদাজেদির সঙ্গে সবার মুখ গম্ভীর হইয়া আসিতে লাগিল। ত্রিলোচনের পিসে একটু উগ্র হইয়া জড়িতস্বরে বলিলেন—"কেমনতর লোক আপনারা মশাই? একটা ভদ্রলোক সেই থেকে বলচে আপনাদের মত ভদ্রলোক দেখেনি, তা কোনমতেই মানবেন না?—ভারি জ্বালা তো!"

ওদিককার একজন তাঁহারই মত ভারী আওয়াজে উত্তর করিল—"আর আমাদের কথাটা বুঝি কিছু নয় তাহ'লে মশাই? আমরা এতগুলো ভদ্রলোক মিথ্যেবাদী হ'লাম?"

ত্রিলোচনের পিসের পোষকতা পাইয়া সহায়রাম বাবুর আত্মসম্মান ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। রাগিয়া গলা চড়াইয়া বলিলেন—"কটা ভদ্রলোক আছে আপনাদের মধ্যে গুণে দিন তো দেখি, চিনতে পারচি না। ভদ্দরলোকের মান রাখতে জানেন না, আবার..."

বোধ হয় বলিয়া দিতে হইবে না যে, তাঁহার উচ্চারণ আরও বেশী গাঢ় এবং অস্পষ্ট।

[illegible] থেকে [illegible] [illegible] শাসাইল—"[illegible] [illegible] বলাই, মনে থাকে যেন।"

একটা বাড়াবাড়ি রকম কিছু হইতে যাইতেছিল, কর্তাবাড়ির লোকেরা এবং কয়েক জন বাহির লোক আসিয়া তাড়াতাড়ি থামাইয়া দিল। সহায়রাম বাবু আর ত্রিলোচনের পিসেকে ধরিয়া সদরবাড়ির ঘরে উঠাইয়া লইয়া গেল এবং ওদিককার কয়েক জনকেও সরাইয়া আসরের নিদারুণ তত্রাতত্র সমস্তটা কতক হালকা করিল।

রাজেন তাহার নিজের লেখা কবিতা বিলি করিতে যাইতেছিল, খোঁৎনা তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাহাকে বসাইল, কানের কাছে মুখ দিয়া বলিল—"এই, সব খেপে রয়েছে, এখন আর ঘাঁটাস্ নি। বাঙ্লা পড়তে জানে না, ভাববে—ঠাট্টা করচে।"

রাজেন ক্ষুণ্ণ মনে বলিল—"তাহ'লে এগুনো কি হবে? এত কষ্ট ক'রে লিখলাম, ছাপালাম, কেউ পড়বে না?"

গোরাচাঁদ আশ্বাস দিল—"ভাবিস্ নি, আমি কাল শেয়ালদার মোড়ে বিলি করিয়ে দোব'খন। আজকাল একটা ছোঁড়া জোঠার সন্ন্যাসীপ্রদত্ত দদ্রুভৈরবের হ্যাণ্ডবিল বিলোয় কি-না,—সঙ্গে একখানা ক'রে তোর 'হর্ষোচ্ছ্বাস'ও দিয়ে দেবে।"

রাজেন কোন উত্তর দিল না; নাকমুখ কুঞ্চিত করিয়া পদ্যের বাণ্ডিলটা হাতের মধ্যে ঘুরাইতে লাগিল।

ত্রিলোচন ভীতভাবে গণ্‌শার দিকে মুখটা সরাইয়া লইয়া গিয়া বলিল—"দেখলি তো। পিসে আর সহায়রাম বাবুর কাণ্ডটা? ওদের আর কি? ওরা দু-জনেই তো এই গাড়িতে লম্বা দেবে; সব ঝোকটা গিয়ে পড়বে আমার ওপর। ভাবটা বুঝচিস্ তো? ব্যাটারা বাড়িতে মেয়েদের সব খবর দিতে গেল—আসরের শোধ বাসরে তুলবে।...দেখেছ?—গোলমালে আবার গানের অন্তরাটা দিলে ভুলিয়ে।...তারপরে কি র্যা গণ্‌শা?—'মুহ পঙ্কজ সোংরি সোংরি...' একটু মাথাটা সরিয়ে আন্, সুর ক'রেই বল্।"

গণ্‌শা মখমলের বালিসের উপর তর্জ্জনীর টোকা দিতে দিতে ত্রিলোচনের মুখের উপর ভাবব্যাকুল চোখ দুইটা তুলিয়া গুনগুন করিয়া গাহিতে লাগিল—

"মুহ পঙ্কজ [illegible] [illegible]
চিত [illegible] যা—[illegible]—যা..."

রাজেন সরিয়া আসিয়া ধীরে ধীরে মাথা [illegible]; এই গানের মাথায় নিজের গলাটা জুড়িয়া দিল—

"ব্যাকুল হোয়
নয়না দিদ আনন্ত নেহি
মানন্ত নেহি ..."

গণ্‌শা গাহিতেছিল—

"আ—আ—আনন্ত—নে—হে.."

রাজেনের হাতটা টিপিয়া বলিল—"তুই থাম্, এগিয়ে যাচ্চিস্ তা—তাড়াহুড়ো ক'রে।"

রাজেন এইরকম চারিদিকেই থাবা খাইয়া নেহাৎ অপ্রসন্নভাবে মুখটা ঘুরাইয়া বসিয়া রহিল। মনে মনে স্থির করিল—এমন জানিলে কখনই আসিত না। গণ্‌শার ব্যবহারে তাহার দুঃখটা বিশেষ করিয়া এই জন্য যে গানটি তাহার স্বরচিত, যদিও গণ্‌শার সুর দেওয়া। রাজেন 'বাসর-তাণ্ডব' নাম দিয়া মালোয়ার প্রদেশের রাজপুত-কাহিনী অবলম্বন করিয়া একটা নাটক লিখিতেছে। মালোয়ার-সামন্ত সুব্বা সিং বাসরঘরে রাজপুত বীরাঙ্গনা-পরিবৃত হইয়া অবগুণ্ঠনবতী বধূ মীরাবাঈয়ের উদ্দেশ্যে তন্ময় হইয়া গানটি গাহিতেছেন, এমন সময় খবর পাওয়া গেল—দুর্গপাদদেশে মুঘল সৈন্য!

এই সময় ত্রিলোচনের বিবাহের হাঙ্গাম আসিয়া পড়ায় নাটকটা আর অগ্রসর হয় নাই। রাজেন স্থির করিয়াছিল রাজপুতদের জিতাইবে; কিন্তু গণ্‌শার দুর্ব্যবহারে মেজাজটা অত্যন্ত তিক্ত হইয়া যাওয়ায় মনে মনে ভাবিতেছে—'গণেশ-শঙ্কর' নাম দিয়া একটা তোৎলা দাগাবাজ ব্রাহ্মণকে দাঁড় করাইয়া রাজপুতবাহিনীকে মুঘলের হস্তে বিধ্বস্ত করাইয়া দিবে।

গোরাচাঁদ কে. গুপ্তকে বলিতেছিল—"লুচিভাজার গন্ধ বেরুচ্চে; কি রকম খাওয়াবে কে জানে..."

এমন সময় ত্রিলোচনের পিতা ডাক দিলেন—"বাবা গোরাচাঁদ, শুনে যাও একটা কথা।"

গোরাচাঁদ কাছে গিয়া বসিল। ত্রিলোচনের পিতার চোখ দুইটি একটু রক্তাভ; বেশ অনায়াসেই যে চাহিয়া আছেন এমন ত বোধ হয় না। গোরাচাঁদের কাঁধের উপর কোমল-

তাহে শর্মা বলিয়া প্রশ্ন করিলেন—"বাবা, আমার ত্রিলোচন আর তোমরা কি আলাদা?"

গোরাচাঁদ এ প্রশ্নের কোন সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাইল না; কিন্তু প্রশ্নকর্তার অবস্থা দেখিয়া সহজে অব্যাহতি পাইবার আশায় উত্তর করিল—"আজ্ঞে না, আমরা সবাই আপনার ছেলের মতন; কিছু তফাৎ নেই তো। তিলুকে নিজের ভাই জেনেই তো এসেচি সব।"

"তাহ'লে একটি কথা—কেউ তোমরা এখানে অন্ন স্পর্শ ক'রো না আজ।"

গোরাচাঁদ একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। এ আবার কি ফ্যাসাদ! একটু চুপ করিয়া থাকিবার পর তাহার একটা সম্ভাবনার কথা মনে হইল; বলিল—"আজ্ঞে, আমরাও যা, তিলোচনও তাই; কিন্তু ওর আজকে বিয়ে ব'লে কিছু খেতে নেই. আর আমরা তো শুধু বরযাত্রী হয়ে এসেচি কি না।"

"সে জন্যে নয়। এদের আক্কেলটার কথা ভাবচি—আমাদের কি অপমানটা করলে, দেখলে না? আমি যৎপরোনাস্তি রেগেচি গোরাচাঁদ; এই আমি আর তোমাদের মেসো ব'সে আছি;—বর তুলে নিয়ে যাক্ তো আমাদের সামনে থেকে!"

গোরাচাঁদ ভীত হইয়া বলিল—"আজ্ঞে, সেটা কি ভাল হবে? খেতে বারণ করেন সে কিছু শক্ত কথা নয়, কিন্তু এরা যে-রকম অবুঝ আর বেয়াক্কেলে লোক দেখচি, বর না উঠতে দিলে একটা হাঙ্গাম—"

"ওরে, এই দিক্‌পানে...অন্দরে নিয়ে যা...ওই দিক দিয়ে ঘুরে যা .." কয়েকটা ভারী, দই ক্ষীরের তিজেল বাঁকে লইয়া, একবার এদিক একবার ওদিক করিতেছে। গোরাচাঁদ সতৃষ্ণ-নয়নে দেখিয়া লইয়া বলিল—"কি যে বলছিলাম,—হ্যাঁ, বর না উঠতে দিলে একটা হাঙ্গাম,—এমন কি না খেলেও একটা রীতিমত হাঙ্গাম করতে পারে। তাই বলছিলাম..."

ত্রিলোচনের পিতা গণশাকে ডাক দিতে যাইতেছিলেন। গোরাচাঁদ ত্রস্তভাবে বলিল—"আমি দিচ্ছি ডেকে, আপনি কষ্ট করতে যাবেন কেন?—হ্যাঁ, ও বরং চালাক আছে, যা বলে।"

গিয়া গণশাকে বলিল—"তিলুর বাবা ডাকচেন রে।" একটু চাপা-গলায় তাড়াতাড়ি টিপিয়া দিল—"দেখিস, যেন কোন আপত্তি করতে বল্‌নি; আজকে আমার বড় বেকায়দায় ফেলে খাওয়া বন্ধ করবে—তারপর ঘরটা উঠবে এদের ওপর।"

এই সময় কন্যাকর্তা গলায় গামছা দিয়া করজোড়ে বরের আসনের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সাধারণভাবে সভার সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"এইবার বরকে নিয়ে যাবার...কই, বেয়াই মশাই কোথায়?...এই যে..."

কাছে গিয়া বলিলেন—"তাহ'লে দাদা, অনুমতি দিন এইবার।"

গোরাচাঁদ, গণশা, ত্রিলোচন, সকলেই রুদ্ধশ্বাসে একটা বিষম দুর্ঘটনার অপেক্ষা করিতে লাগিল। ত্রিলোচনের পিতা একটু চুপ করিয়া রহিলেন, তাহার পর ধীরেসুস্থে উঠিয়া কন্যাকর্তাকে বুকে জড়াইয়া গদগদ কণ্ঠে বলিলেন—"তিলু তো তোমারই ছেলে ভাই...আজ যদি...ওফ্!"

গলাটা অশ্রুবদ্ধ হইয়া পড়ায় আর বলিতে পারিলেন না।

যাইবার সময় ত্রিলোচন বন্ধুদের দিকে একটি বিপন্ন, অসহায়-ভাবের দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গেল। কে. গুপ্ত একটু কাছে ছিল, সাহস দিয়া বলিল—"যান্, ভগবান আছেন।"

বর চলিয়া গেলে গোরাচাঁদ তাড়াতাড়ি ত্রিলোচনের পিতার নিকট গেল; ডাকিল—"জ্যেঠামশায়!"

ত্রিলোচনের পিতা শোকাচ্ছন্নভাবে মাথাটা হাতের তেলোয় ধরিয়া বসিয়া ছিলেন; মুখ তুলিয়া গাঢ়স্বরে বলিলেন—"কে, গোরাচাঁদ?—গোরারে, আজ যদি বাবা বেঁচে থাকত...ওফ্!"

গোরাচাঁদ বলিল—"আজ্ঞে হাঁ!...বলছিলাম—আর তবে না-খাওয়ার হাঙ্গামাটাও ক'রে কাজ নেই—কি বলেন?"

৩

বর চলিয়া গেলে কন্যাপক্ষের একজন আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"বরযাত্রীদের মধ্যে কাঁরা এই গাড়িতে ফিরে যাবেন যেন?"

ঘোৎনা বলিল—"হ্যাঁ, সহায়রাম বাবু আর বরের পিসেমশাই, তাঁরা ঐ ঘরে রয়েচেন।"

প্রশ্নকর্তা বলিল "দু-জন তাহলে। বলেন তো আপনাদের সবারই জায়গা ক'রে দিই; ক-জন আছেন সব মিলিয়ে?"

গোরাচাঁদ তাড়াতাড়ি সামনে আগাইয়া বলিল—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়। আছি—আমি এক, ঘোঁৎনা দুই—"

গণশা নীচু গলায় ধমক দিয়া বলিল—"খা-খ খালি 'খাই-খাই'; স্ত্রী-আচার দেখবি নি? রাজুকে খোঁ—খ খোঁজ নিতে পাঠালুম কি ক'রতে? আজ্ঞে না, আমরা একটু ফুর্ত্তিটুর্ত্তি করি, খাওয়া ত রোজই..."

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই ঠিক, একটু আমোদ-আহ্লাদ, গানবাজনা করুন। কই হে, এঁদের ডেকে নাও না তোমরা। শিবপুর থেকে এসেচেন, গানবাজনার দেশ; বলে—'গাইয়ে বাজিয়ে সুর, তিনে শিবপুর।"

সভার এক দিকে গানবাজনা হইতেছিল। একটি চুড়িদার পাঞ্জাবি-পরা ছোকরা দীর্ঘ কাঁধের উপর কেশভারাক্রান্ত মাথাটা প্রচণ্ড বেগে নাড়িয়া-নাড়িয়া গান গাহিতেছে, সাত আটটি সমবয়সী মন্দিরা বাজাইয়া, শিস দিয়া, হাততালি দিয়া, তুড়ি বাজাইয়া তাহাকে উৎসাহিত করিতেছে। আশপাশের আর সকলে সমস্ত দলটির মৃত্যুকামনা করিতেছে।

ভদ্রলোকের কথায় একজন বলিল—"আমরা তো তাই চাই। আপনারা দয়া ক'রে..."

গণশা সবার মুখপাত্র হইয়া বলিল—"মা-মাপ করবেন; আমাদের মধ্যে কেউ গা-গ গাইতে বাজাতে জানে না।"

ওদিককার একজন বলিল—"সে কথা শুনব কেন মশায়? সাদা কথাতেই আপনার অমন গিটকিরি বেরুচ্চে, গাইতে বসলে"

অপর এক ছোকরা জুড়িয়া দিল—"গিটকিরি ছাড়া তো কিছু বেরুবেই না।"

গণশা একটা রাগারাগি গণ্ডগোল করিতে যাইতেছিল রাজেন আসিয়া ধীরে ধীরে তাহার কাঁধে হাত দিয়া বলিল—"হাড় ক'খানির মায়া রাখ?"

গণশা ফিরিয়া বলিল—"কেন-কি হয়েচে?"

"তাহলে স্ত্রী-আচার দেখবার নাম ক'রো না; যা ক'রে বেঁচে এসেচি, আমিই জানি।—বাইরে দাঁড়িয়ে যাব কি না-যাব ভাবচি, একটা কেলে রোগা ছোঁড়া এসে বললে—'ভেতরে চলুন না; বাইরে কষ্ট করচেন কেন?'...দাঁড়িয়ে দেখচি, হঠাৎ কোথা থেকে এসে কাঁধের ওপর হাত দিয়ে—'কে মশাই আপনি?' ফিরে দেখি—ইয়া লাস, আমার পায়ের গোচ তার হাতের কবজি—পরে একজনের কাছে খবর নিয়ে জানলাম—কনের কাকা, নাম জগু-দা। থতমত খেয়ে বললাম—'বরযাত্রী—স্ত্রী-আচার দেখচি।'"

"শুনে সুখী হলাম। একলা যে?"

বললাম—"তারা আসব-আসব করচে।"

"শুনে সুখী হ'লাম, তাঁদের ডেকে নিয়ে আসুন। একটিতে আমার হাতের সুখ হবে না। 'কালসিটে'তে এসে স্ত্রী-আচার দেখবে, মাতলামির আর জায়গা পাওনি, নয়?"

আমি তো ভয়ে কেঁচোটি হ'য়ে সুড়সুড় ক'রে বেরিয়ে এলাম। দেখি সেই সে-কোণে হারামজাদা ছোঁড়াটা দাঁড়িয়ে মুচকে মুচকে হাসচে; যদি কখন শিবপুরে পাই ব্যাটাকে..."

গণশার রাগটা চড়িয়াই ছিল, আরও ক্ষিপ্ত হইয়া বলিল—"ইডিয়ট! ভী-ভ ভীরু কোথাকার!—বি-বিয়ে দেখতে এসে যদি স্ত্রী-আচারই দেখলাম না তো...চল সবাই দে-দেখি কে কি করে।"

গণশা দৃপ্তভাবে পা ফেলিয়া অগ্রণী হইল, আর সবাই সাহস এবং উৎসাহের অনুপাতে আগুপিছু হইয়া চলিল। রাজেন শুধু ভীরু অপবাদটা দূর করিবার জন্য গণশার পাশে রহিল। সদর ছাড়াইয়া একটু দূরে যাইতেই তাহার সঙ্গে দেখা। একটা গামছা কাঁধে ফেলিয়া এদিকেই আসিতেছিলেন, রাজেন দূর হইতে চিনাইয়া দিল।

কাছে আসিয়া রাজেনকে লক্ষ্য করিয়া একটা খস্‌খসে গম্ভীর আওয়াজে বলিলেন—"এই যে, সবাইকে ডেকে এনেচেন!"

রাজেনের মুখটা ফ্যাকাশে হইয়া গেল, আমতা-আমতা করিয়া বলিল—"আজ্ঞে না, মানে হ'চ্চে—এরাই সব বললে..."

ঘোঁৎনা আগাইয়া আসিয়া বলিল—'গোরাচাঁদ ব'ললে—বরং খেয়ে নিলে হ'ত; আমি বললাম—তাহ'লে ক'নের কাকাকে গিয়ে বললেই হবে, তিনি সব করচেন কর্ম্মাচ্চেন..."

রাজেন বলিল—"আমি বললাম—আর জগু-দা লোকও ভাল।"

গণশা বলিল—"লো—লোক ভাল শুনে আমি বললাম—চ-চল তাহ'লে আম্মো যাই, জগুদাদার সঙ্গে একটু আলাপপরিচয়ও হবে। সে—স্‌সে একটা মস্ত সৌভাগ্য কি-না।"

ভদ্রলোক বলিলেন—"বেশ, বেশ; কিন্তু দু-একটা জিনিষ এখনও বাকি আছে। যদি খিদে পেয়ে থাকে তো গোরাচাঁদ বাবু না-হয়..."

ঘোৎনা বলিল—"সেই খুব ভাল কথা। গোরাচাঁদ, তুই তাহ'লে...কোথায় গেল গোরাচাঁদ?"

সুরুতেই যেই ঘোৎনা "গোরাচাঁদ বললে" বলিয়া আরম্ভ করিয়াছিল, গোরাচাঁদ বহির্মুখী একটি ছোট্ট দলে ভিড়িয়া বেমালুম সরিয়া পড়িয়াছিল; তাহাকে পাওয়া গেল না।

ভদ্রলোক চলিয়া গেলে কেহ আর কোন কথা কহিল না। শুধু কে. গুপ্ত একটু ছাপরেয়ে ইডিয়াম মিশ্রিত করিয়া বলিল—"খুব হট্টাকট্ট জোয়ান; গ্র্যাণ্ড ফুল্ ব্যাক্ হয়, গোষ্ঠ পালের জোড়া।"

আরও ঘণ্টা-দুয়েক কাটিল। দলটা খানিকক্ষণ স্রোতের কুটাকাটির মত এদিক-সেদিক করিয়া কাটাইল। দু-এক জন সহায়রামবাবুদের সঙ্গে চলিয়া যাইতেও চাহিল; বাকী সবাই তাহাদের আটকাইয়া রাখিল।

খাওয়াদাওয়ার পর সবাই আবার আসরে আসিয়া জুটিল। ভাঙা আসর, এখানে-ওখানে এক-আধ জন শুইয়া গড়াইয়া আছে। আশেপাশেও লোক বিরল, আলোও বেশীর ভাগ নির্ব্বাপিত। গোরাচাঁদ একটা বালিসের উপর কাৎ হইয়া বলিল—"খাইয়েচে মন্দ নয়, তবে একটু একটেরেয় প'ড়ে গিয়েছিলাম এই যা।"

খানিকক্ষণ খাওয়ার আলোচনাই চলিল।

গোরাচাঁদ আবার বলিল—"রাজু, তোর পদ্যটা পড়-তো একটু শুনি। গোড়াটায় বেশ লিখেছিস্—

'আজকে সখা দিল পেয়ালায় ফুর্ত্তি সবার উছ্‌লে ওঠে।'"

ঘোৎনা বিরক্তভাবে বলিল—"আরে দুৎ,—উছলে ওঠে... তিলুর বিয়েটা জমতেই পেলে না, পদে পদে বাধা; এ যেন ...গণ্‌শা কোথায়?—তাকে দেখচি না যে?"

রাজেন বলিল—"তাই তো!"

শুইয়া বসিয়াই সকলে চারিদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল।

কে. গুপ্ত হঠাৎ ঘোৎনার কাঁধটা নিজের কাছে টানিয়া বলিল—"দেখুন তো, গণেশ বাবুর মতই না?"

ঘোৎনা বলিল—"তাই তো বোধ হচ্চে; অন্ধকারে ওখানে কি করছে ছোঁড়া?"

সদরবাড়ির বাঁ-দিক দিয়া একটা রাস্তা ষ্টেশনের দিকে গিয়াছে এবং তাহারই একটা সরু ফেকরি বন জঙ্গল, রাবিশ প্রভৃতির মধ্য দিয়া অন্দরবাড়ির পিছন দিকে হারাইয়া গিয়াছে। সেই রাস্তারই একটা বিচালির গাদার আড়ালে গণ্‌শাকে দেখা গেল—অতি সন্তর্পণে চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে আসিতেছে। বিচালিটা পার হইয়া বেশ সহজভাব ধারণ করিল। দলের মধ্যে আসিয়া সকলের উৎসুক প্রশ্ন নিবারণ করিয়া চাপা-গলায় বলিল—"চুপ।"

বসিয়া নিজেও একটু চুপ করিয়া রহিল। ঘোৎনা তাহার কাপড় থেকে একটা চোরকাঁটা ছাড়াইয়া লইয়া প্রশ্ন করিল—"কোথায় গিয়েছিলি রে গণ্‌শা?"

গণশা মুখটা একটু নীচু করিল; সবাই ঘেঁষিয়া আসিলে বলিল—"তি-তিলুর বাসরঘর দেখে এলাম।"

"সে কি!" "দুৎ মিচে কথা।" "মাইরি?"—বলিতে বলিতে সবাই আরও ঘেঁষিয়া আসিল। কে. গুপ্ত বলিল—"ত্রিলোচনবাবু আছেন তো?...কানটান...জামায় রক্তটক্ত..."

"আপনার ত্রিলোচন এখন সহস্রলোচন ইন্দ্র হয়ে ব'সে আছে—চা-চ্চারিদিকে অপ্সরী, কিন্নরী, ঠানদিদি..."

রাজেন কল্পনায় চিত্রটা আঁকিয়া লইয়া বলিল—"উঃ, যেতে হবে মাইরি।"

গণশা জানাইয়া দিল অভিযানটা বেজায় শক্ত। সরু রাস্তাটা একটু গিয়া আর নাই।"

তাহার পর দূরের গানবাজনা আর মাঝে মাঝে হাসির শব্দ লক্ষ্য করিয়া; ঘন আগাছার মধ্য দিয়া ছাই, গোবর, ভাঙা ইট, সুরকির গাদি প্রভৃতির উপর দিয়া বাড়ির পিছন দিকে পঁহুছিতে হইবে। সে আরও মারাত্মক জায়গা,—চাপ জঙ্গল, ঘুটঘুটে অন্ধকার। দুইটা ঘর পার হইয়া বাসরঘরটা। খড়খড়ি-দেওয়া পাশাপাশি দুইটা জানালা, শীতের জন্য বন্ধ। একটার জোড়ের কাছটা একটু ফাঁক হইয়া গিয়াছে আর অন্যটাতে একটা খড়খড়ির নীচের দিকে একটা ছোট্ট কালি উড়িয়া গিয়াছে।—"ভ-ভ ভগবানের দয়া"—বলিয়া গণ্‌শা বিবরণ শেষ করিয়া প্রশ্ন করিল—"বো-বোবা; চাও যেতে কেউ?"

ঘোৎনা বলিল—"আলবৎ যাব, এর আর বোঝাবুঝি কি আছে ?"

কে. গুপ্ত বলিল—"আপখোপ..."

ঘোৎনা ধমক দিয়া বলিল—"রাত্তিরে ঐ নাম করচেন ? আচ্ছা কাঠগোঁয়ার তো !"

কে. গুপ্ত ধাঁধায় পড়িয়া চুপ করিয়া গেল।

গণ্‌শা বলিল—"তবে হাঁ, জঙ্গলের ওদিকে খানিকটা ফাঁকা মাঠ আছে ; যদি তাড়া করে তো..."

গোরাচাঁদ প্রশ্ন করিল—"কি দেখলি জানালার ফাঁক দিয়ে গণ্‌শা ?—একবর বুঝি খুব সুন্‌..."

রাজেন বাধা দিল—"না থাক, বর্ণনা করলে আবার বাসি হয়ে যাবে।"

"সে করাও যায় না।"—বলিয়া গণ্‌শা সকলের উৎসুক-কল্পনাকে একেবারে চরমে উদ্দীপিত করিয়া তুলিল।

দুইটা জানালার মধ্যে হাতচারেকের জায়গা ; একটা রাজেন আর গণ্‌শা, অপরটা ঘোৎনা আর কে. গুপ্ত দখল করিল।

পথে গোরাচাঁদের পা-দুইটা হাঁটু পর্য্যন্ত একটা গোবরগাদায় ডুবিয়া গিয়াছিল। গণ্‌শার কানের কাছে ফিস্‌ ফিস্‌ করিয়া বলিল—"ওরে গণ্‌শা, বড্ড কুট-কুট করচে ; উঃ, কি করি বল্‌ত ?"

গণ্‌শার মন তখন অন্য রাজ্যে। একটা ষোড়শী আসিয়া ক'নের মুখের ঘোমটা তুলিয়া ত্রিলোচনকে বলিতেছে—"এই দেখ ভাই।...আহা বেচারী এই জন্যে মনমরা হয়েছিল গো। দেখ দিকিন কেমন..."

গোরাচাঁদ গণ্‌শার কাঁধটা একটু টিপিয়া বলিল—"শুন্‌চিস্‌ ? —গেলাম, মাইরি ; গোবরটা নিশ্চয় পচা ছিল..."

গণ্‌শা অন্যমনস্কভাবে প্রশ্ন করিল—"কি ক'রে জানলি ?"

গোরাচাঁদ খিঁচাইয়া বলিল—"কি ক'রে জানলি,—ভয়ানক কুটকুট করচে যে পা-দুটো।"

গণ্‌শা চোখ দুটো ছিদ্রপথে আরও ভাল করিয়া বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কেন ?"

গোরাচাঁদ নিরাশ হইয়া অপর জানালায় চলিয়া গেল ঘোৎনার আবার জুটে একটা টান দিয়া বলিল—"ঘোঁতু, পচা গোবরের কোন রকম ওষুধ..."

"না, হয় না ; ফেলে দে"—বলিয়া ঘোৎনা তাড়াতাড়ি আবার দৃষ্টিটা গবাক্ষবদ্ধ করিল।

ষোড়শী ঢলঢলে চোখ দুইটি তখন বরের মুখের উপর রাখিয়া আবদারে আবদারে সুরে বলিতেছে—"হ্যা ভাই বর, অমন চাঁদপানা মুখ একখানা দেখিয়ে দিলাম—মজুরি হিসেবেও একখানা গান..."

একটি কিশোরী বলিল—"হ্যালা সরীদি. জানিস্‌ না—দয়া করলে কি আকে রস দেয় ?—কানে মোচড় না দিলে কি গান বেরোয় ?"

ঘোৎনা কে. গুপ্তকে টিপিয়া ধীরে ধীরে বলিল—"দেখলেন ?—ঐটুকু মেয়ে অবলীলাক্রমে বিদ্যাসুন্দর আওড়ে দিলে !"

কে. গুপ্ত প্রশ্ন করিল—"সে আবার কি ?"

ঘোৎনা মুখ ঘুরাইয়া লইয়া মনে মনে বলিল—"তোমার মুণ্ডু, চাতুখোর !"

ওদিকে রাজেন গণ্‌শাকে প্রশ্নে প্রশ্নে বোঝাই করিতেছিল—"পোষ মাসে বিয়ে হয় না, না রে গণ্‌শা ?—ধর্‌, যদি তেমন তেমন হয় ?—আচ্ছা, মাঘ মাসে ?—মাঘ মাসের গোড়ায় দিন-টিন আছে কি-না খোঁজ রাখিস্‌ ?..."

ঘরের ভিতর কানমলার অনেকগুলি সমর্থনকারিণী জুটিয়া গেল। ত্রিলোচন ভয়ে ভয়ে হাত বাড়াইয়া বলিল "থামুন, থামুন ; আমি গাইব, তবে কথা হচ্চে—গানের অন্তরাটা হারিয়ে যাচ্চে—বাংলা নয় কি-না...যদি একবার ভেতরের বারান্দায় গণ্‌শাকে ডাকিয়ে পাঠান তো..."

গণ্‌শা তাড়াতাড়ি মুখটা সরাইয়া লইয়া অতিরিক্ত উৎকণ্ঠার সহিত ফিস্‌ ফিস্‌ করিয়া বলিল—"কি সর্ব্বনাশ বল দিকিন !—ইডিয়ট ! এক্ষুণি ওদিকে ডাক পড়বে, এখন কি করা..."

রাজেন দেখিতেই ছিল ; হাতটা একবার 'না'র ভঙ্গিতে নাড়িয়া গণ্‌শাকে টানিয়া লইল। গণ্‌শা শেষের দিকটা শুনিল—"...আমরা তোমার গণ্‌শা কি দ্যাপ্সা—এদের ডাকতে যাই আর কি..."

গোরাচাঁদ গণ্‌শা আর রাজেনের মাঝখানে মুখটা গুঁজিয়া

দিয়াছিল। হঠাৎ পায়ের চিড়চিড়ানিটা বাড়িয়া যাওয়ায় একরকম নাচিতে নাচিতেই সরিয়া আসিল। সঙ্গে সঙ্গে গণ্শাকে টানিয়া লইয়া চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল—"আবার চাগিয়েচে রে, গেলাম মাইরি..."

"তুই সব মাটি করলি; আয় তো এ দিকটা ফাঁকায় একটু স'রে।...সেই মেয়েটা এতক্ষণ বোধ হয়..."

পাশেই হঠাৎ দুয়ার খোলার আওয়াজ হইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে একরাশ এঁটো পাতা, খুরি, গেলাস দু-জনের মাথায়, কাঁধে, পিঠে সজোরে আছড়াইয়া পড়িল। তাহার পর তাহাদের ফিরিবার সঙ্গে সঙ্গেই—"ওগো বাবাগো, ডাকাত"—বলিয়া স্ত্রী-কণ্ঠে একটা চীৎকার, ঝনাৎ করিয়া দুয়ার বন্ধ, সশব্দে পতন, গোঙানি, বিভিন্ন কণ্ঠে হাঁকাহাঁকি, বিভিন্ন দিকে ছুটাছুটি,—সবগুলা যেন এক মুহূর্ত্তে সংঘটিত হইয়া বাড়িটাকে তোলপাড় করিয়া তুলিল।

দলটার যে যেখানে ছিল, একটু হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ভাবিবার সময় নাই, শুদ্ধ জীবধর্ম্মের প্রেরণায় কাজ—কোন রকমে বাঁচিতেই হইবে—যেমন করিয়াই হোক না কেন...

কে. গুপ্ত যেদিক হইতে আসিয়াছিল সোজা সেইদিকে ঘুরিয়া ছুট দিল, সদরের দিকে নয়, একেবারে সোজা।

"ঐ পালায়, পেছু নাও!"

"উত্তর দিকে ছুটেচে!"

ঘোঁৎনা পালাইবার উপক্রম করিয়া ঘুরিতেই একটা গাছে ধাক্কা লাগিল। বোধ হয় পেঁপে গাছ, খুব মোটা।

ওদিকে কে হাঁকিল—"না, বন্দুক না নিয়ে বেরিও না; খবরদার।...টোটা ভ'রে বেরুবে।"

ঘোঁৎনা তরতর করিয়া পেঁপে গাছটার উপর উঠিয়া পড়িল। একটু উপরে উঠিয়াই টের পাইল—কতকগুলা ডাল বাহির হইয়া একটা ঝোপ; আপাতত সেইখানটায় একটু থামিল।

গণশা গোরাচাঁদের কোমরের র‍্যাপারটা টানিয়া বলিল—"সা—সা—সামনেই ফাঁকা মাঠটা—শীগ্গির নেমে পড়।"

রাজেন বলিল—"তার চেয়ে চেঁচিয়ে বল—আমরা বরযাত্রী।"

"তুই আলাপ ক-করগে মুখ্যু।"—বলিয়া গণশা গোরাচাঁদকে একরকম টানিতে টানিতেই পা বাড়াইল।

পাশেই বাসরঘরে একটু যেন ধস্তাধস্তি হইতেছে। একজন বয়স্থার গলার আওয়াজ—"ওরে না, না, জানলা খুলিস্ নি, ওদের হাতে বন্দুক থাকে...ওরে অ নীহার! কি নির্ভয় মেয়ে সব বাবা আজকালকার!...

জানলাটা টানাহিঁচড়ানির মধ্যে খুলিয়া গেল। রাজেন একরকম লাফ দিয়াই গণশা গোরাচাঁদকে ধরিয়া ফেলিল। তাহার পরেই পাতলা আগাছার মধ্য দিয়া ছুট। হাত-কয়েক পরে জমিটা সামনে একটু নামিয়া গিয়াছে, তাহার পরেই ফাঁকা। তিনজনে ঢালুটুকু এক রকম লাফ দিয়াই কাটাইল...পরক্ষণেই ঝপাং—ঝপাং—ঝপাং করিয়া তিনটা শব্দ!

"ওরে পুকুরে পড়েচে, খিড়কির পুকুরে তিনটে..."

খিড়কির দরজা খুলিয়া গেল।—"লালঠেনে হবে না—গ্যাসলাইটটা নিয়ে আয়।"

"একটা টর্চ হ'লে হ'ত,...বরযাত্রীদের কাছে একটা আছে, নিয়ে আয়...তারা ঘুমোচ্চে বোধ হয়, জাগিয়ে দে..."

তিনজনে প্রাণপণে সাঁতার কাটিতে লাগিল। রাজেন বলিল—"এই তোর মাঠ? কি ভীষণ পানা রে বাবা! উফ্..."

গণশা বলিল—"ঘা-ঘ্ঘাস ভেবেছিলাম।...ডুবসাঁতার কাট..."

সমস্ত পাড়ায় সাড়া পড়িয়া গেছে। বেটাছেলের গলার আওয়াজ ক্রমেই বেশী শোনা যাইতেছে।—নানারকম প্রশ্ন, উত্তর, হুকুম—

"এই পুকুরে?"

"হ্যাঁ, ঘিরে ফেলো। লাঠি শড়কি—যাই হোক সবাই এক একটা হাতে রেখো, ভয়ঙ্কর লাস এক একটা..."

"রোঘো বাগ্দিকে খবর দেওয়া হয়েচে?" এটা যেন জগু-দার স্বর।

এক কোণ হইতে গগনবিদারক আওয়াজ আসিল—"এজ্ঞে এই যে মুই রামদা নিয়ে রয়েচি! নেমে পড়ব?"

এপার হইতে উত্তর হইল—"না, ঘিরে ফেল চারিদিক থেকে...ওরে কুকুর দু'টোকে খুলে দে।"

"দেখতে পাচ্চ কেউ?"

রোঘো বলিল—"যেন তিনটে মাথা ওদিকপানে.

গণশা ডুব দিল।

"...ছুটো।"

রাজেন ও গোরাচাঁদ ডুব দিল।

"...গোঁত্তা দিয়েচে সব।"

"নজর রাখিস।"

রাজেন মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিল—"কতক্ষণ ডুবে থাকা যায় ?"

গোরাচাঁদ প্রতিপ্রশ্ন করিল—"কতক্ষণ ভেসে থাকা যায় ? আমার পেটে জায়গায়ই ছিল না, তার ওপর জল ..."

রাজেন বলিল—"পানার জল।...উ, কি কামড়ায় র‍্যা ?"

গণশা বলিল—"মা-মাছ বোধ হয়, পো প্রোষা মাছ।"

রাজেন বলিল—"উঃ, পোষাই বটে ওদের,—ছিঁড়ে ফেললে।"

গোরাচাঁদ বলিল—"আবার পচা গোবরের চার পেয়েচে কি না...।"

যে টর্চ আনিতে গিয়াছিল, খিড়কির নিকট হইতে চেঁচাইয়া বলিল—"বরযাত্রীরা তো নেই জগু-দা, দু-জন খালি মদ খেয়ে নাক ডাকাচ্চে। 'ডাকাত পড়েচে' বলতে বললে —পড়ে থাক, উঠিও না।"

পুকুরের একদিক থেকে জগু-দার কর্কশ আওয়াজ হইল— "আপনারা তা'হলে কোন দিকে আছেন মশাই ? একবার টর্চটা বের করুন না।"

অপর একজন বলিল—"তারা আবার এই সময় কোথায় গেল ? পরের ছেলে ভাবনার কথা তো !..."

গোরাচাঁদ বলিল—"এই গণশা, এই তালে জানিয়ে দে, আমরা এখানে, কোন ভাবনা নেই..."

রাজেন বলিল—"আর টর্চটা ভিজে গেচে..."

গণশা বোধ হয় জানাইতে যাইতেছিল, কিন্তু ঠিক এই সময় পাশে একটা ঢিল আসিয়া পড়ায়, সে সঙ্গে সঙ্গে জলের মধ্যে ডুবিয়া পড়িল।

"ঐ যে, ঐ খানটায়...একটা ঘায়েল হয়েচে।"—সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকটা ছোটবড় ঢিল আসিয়া আশেপাশে পড়িল। একটা বন্দুকের আওয়াজও হইল।

আর দেরি করা চলে না। গোরাচাঁদ হাঁপাইতে হাঁপাইতে চেঁচাইয়া বলিল—"ঢিল ছুঁড়বেন না।"

রাজেন বলিল—"বন্দুকও ছুঁড়বেন না।"

একজন বাঁকাইয়া বলিল—"বটে, বটে। কি ছুতোতে তাহ'লে হুকুম হয় ?"

একজন হয়ার-গোছের ছোকরা ও-কিনারা থেকে বলিল— "ফুল ছুঁড়ুন,—চন্দনে ডুবিয়ে।"

গোরাচাঁদ দম লইয়া বলিল—"আমরা বরযাত্রীর দল।"

চারিদিকটা একটু নিস্তব্ধ হইয়া গেল, আধ মিনিটটাক মাত্র। তাহার পর সকলের বুদ্ধি ফিরিয়া আসিল। ওপারে কে একজন বলিল—"রসিক আছে তো !"

পেঁপের গাছে ঘোৎনা এই তালে বলিতে যাইতেছিল— "আমিও একজন আছি এখানে"; কিন্তু অবিশ্বাসের বহর দেখিয়া আর বলা হইল না।

পাশের কিনারা থেকে উত্তর আসিল—"ঐ যে শুনেচে— বরযাত্রীদের পাওয়া যাচ্চে না...ওরে আমার চালাক রে !"

তিনজন এই দিকেই অগ্রসর হইতেছিল; পায়ে মাটি ঠেকিল। রাজেন বলিল—"না, দিব্যি ক'রে বলচি—আমরা বরযাত্রী উঠলেই টের পাবেন। ..থু—থু—কি পানা রে বাবা !"

গণশা লম্বা ডুব গালিয়া অতিরিক্ত হাঁপাইতেছিল। রাজেন বলিল—"রঘুবাগ্দি এদিকে নেই তো ?"

আবার সেই উৎকট বক্রোক্তি—"বটে, বটে।—ওরে রঘুকে ডাক।"

তিনজনে আবার ঝপাঝপ্ করিয়া জলে পড়িল। তখন জগু-দার কণ্ঠের আওয়াজ হইল,—"আচ্ছা, উঠে আয়; কিন্তু এক এক ক'রে।—রঘু, তুই একটু ওদিকেই থাক, তোয়ের থাকবি কিন্তু ?"

রাজেন প্রথমে উঠিল। হাত-পা একরকম অবশ হইয়া গিয়াছে, সর্ব্বাঙ্গে পাঁক, পানা, কুটাকাটি। ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপুনি। কোমরে জড়ান র‍্যাপারের পরতে একটা বড় চাঁদামাছ লণ্ঠনের আলোয় চকচক্ করিতেছে। বুকটা হাপরের মত ওঠানামা করিতেছে; কোন রকমে দু'টো কথা ধাক্কা দিয়া বাহির করিল—"এই দেখুন।"

পূর্ব্বপরিচিত সেই কালো, লম্বা ছেলেটা বলিল—"বাঃ, কি চমৎকার !"

আর একজন বলিল—"চোখ জুড়িয়ে গেল !"

গোরাচাঁদ উঠিয়া আসিল।—রাজেনেরই মত; অধিকন্তু

কাপড়টা খুলিয়া গিয়াছে, নীচে আণ্ডারওয়্যার। রাজেন হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল—"এ গোরা।"

সেই কাজিল ছেলেটা হস্তের সংক্ষিপ্ততা লক্ষ্য করিয়া বলিল—"হাইক্যাণ্ডার গোরা বলুন!"

গণ্‌শা ফিরিয়াই আবার ডুব দেওয়ায় পিছনে পড়িয়া গিয়াছিল; অর্দ্ধমৃত অবস্থায় উঠিয়া আসিল। গোরাচাঁদেরই অনুরূপ, বাড়তির মধ্যে মাথায় একটা ছোট্ট কচুরিপানার চূড়া।

সেই ছেলেটা পেছন থেকে সম্ভ্রমের স্বরে বলিল—"কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ!"

"উঠেচে, উঠেচে,—ওই দিকে—" শব্দ করিতে করিতে চারিদিকের লোক আসিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইল।

একজন বলিল—"কি বলচে!—এরাও বরযাত্রী!...দড়ি নিয়ে এসো।"

অন্য একজন বলিল—"বরযাত্রীরা নেই কি-না, ধরা পড়ে তাদের জায়গা দখল ক'রে নিচ্ছে।"

সেই দুষ্টবুদ্ধি ছোকরাটা সামনে আসিয়া বলিল—"আরে, তাদের যে আমি ইষ্টিশানের দিকে যেতে দেখলাম। আর তাদের দেখলেই জগু-দা তক্ষুণি চিনে ফেলতো, না জগুদা?" বলিয়া একটা অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

"দেখতেও হ'ত না, গলা শুনেই চিনতাম"—বলিয়া একবার তাহার দিকে কেমন একভাবে চাহিয়া, হঠাৎ নিজের গলাটা পরিষ্কার করিবার দরকার পড়ায় জগু-দা সরিয়া গেল।

কন্যাকর্ত্তা বলিলেন—"তুই যেতে দেখলি তাদের?... তা হবে; কয়েক জন চলে যাবে ব'লে তখন গো-ও ধরেছিল ...আর তারা ছিল ছ-সাত জন।"

গোরাচাঁদ বলিল—"পাঁচজন ছিলাম।"

জগু-দা ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"আর তাদের মধ্যে একজন তোৎলা ছিল, সবচেয়ে হারাম..."

গণ্‌শা তাড়াতাড়ি দম লইয়া বলিল—"এই যে ম-মশাই, আম্মো রয়েচি; বে-বেজায়..."

"মা-মাই-রি! অমনি তো-তোতলা সেজে গেলে!"

কন্যাকর্ত্তা বলিলেন—"কিন্তু অত তোৎলা তো ছিল না!"

দুই-তিন জন ধূর্ত্তামি করিয়া বলিয়া গেল—

"একজন বোবা ছিল।"

"একজন খোনা ছিল।"

"একটা খোঁড়া ছিল।"

"তা এখনও হ'তে পারে।"

কন্যাকর্ত্তা প্রশ্ন করিলেন—"বরযাত্রী, তো ওদিকে কি করছিলে সব!"

তিনজনে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিল। রাজেন গণ্‌শাকে একটু ঠেলিয়া বলিল—"বল্ না রে।"

গণ্‌শা মুখটা খিঁচাইয়া বিরক্তভাবে কহিল—"আরে ছুৎ, আমার কথা বে-বেবেশী আটকে যাচ্চে, বি-বিশ্বাস করবে না।"

গোরাচাঁদ কহিল—"রাজেন বললে-দিব্যি খাওয়ালে ভদ্দলোকেরা, যাক,—তিলোচন বোধ হয় এতক্ষণ বাসরঘরে গান ধরেচে, বাড়ির পিছনে, দিব্যি নিরিবিলিতে..."

রাজেন জোগাইয়া দিল—"পুকুরধারটিতে বসে..."

"...দিব্যি নিরিবিলিতে পুকুরধারটিতে ব'সে একটু..."

গণ্‌শা থাকিতে পারিল না, বলিল—"আমি ব-বললাম—থাক্ দ-দরকার কি? মে-মেয়ে ছেলেরা রয়েচেন..."

গোরাচাঁদ গণশার দিকে একটা তির্য্যক দৃষ্টি হানিল; একটু উপস্থিতবুদ্ধি খরচ করিয়া বলিল—"আমি বললাম—মেয়েছেলেরা গান ধরলেই উঠে পড়ব তখন,—তাঁরা তো আমাদেরই বোনের তুল্য..."

রাজেন বলিল—"মার পেটের বোনের..."

কন্যাকর্ত্তা গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—"সব ধাপ্পাবাজি!... কেউ গেল থানায়?...রঘু!"

রঘু বাগ্দি পিছনেই দাঁড়াইয়াছিল; বলিল—"এজ্ঞে, এই যে আছি মুই।...আপনাদেরও যেমন হয়েচে কর্ত্তা,—ঐসব কথা পেত্তয় করেন। আয়েস ক'রে গান শোনবার কি নন্দনকানন রে! সব একেলে সৌখিন ডাকাত,—দেখচেন না!"

রঘুর উপস্থিতিতে এবং কথাবার্ত্তায় সবাই আরও ঘাবড়াইয়া গেল। রাজেন বলিল—"আচ্ছা, পুলিস ডাকবার আগে আমাদের কর্ত্তাদের কাছে নিয়ে চলুন না একবার, তাঁরা তো ভুল করবেন না।"

গোরাচাঁদ বলিল—"না-হয় বরের কাছে।"

কর্ত্তা শাসাইয়া উঠিলেন—"খবরদার, বরের কাছে যেন না নিয়ে যাওয়া হয়।"

পিছন থেকে একজন বৃদ্ধগোছের লোক বলিলেন—"আর দেখো, বরক'নে যেন ঘর থেকে না বেরোয়; কোথায় কে আছে, কত রকম বিপদ হ'তে পারে—দুর্গা—দুর্গা .. "

গুপ্ত-দা বলিল—"আচ্ছা, বরকর্ত্তার কাছেই নিয়ে চল সবাইকে। রঘু, পাশে পাশে থাকিস্।"

তিনজনেই নিজের নিজের মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া বলিল—"তাহ'লে একখানা ক'রে শুকনো কাপড় আর জামা…"

সমস্ত দলটাতে একটা চেঁচামেচি গোছের পড়িয়া গেল—

"মাইরি ?"

"ওঁদের জামাই সাজিয়ে নিয়ে যেতে হবে।"

"একটা চৌঘুড়ি নিয়ে এস।"

"যেমনভাবে উঠেছিলে সেই রকমভাবেই যেতে হবে; তাতেও যদি চেনে তবেই…"

সেই দুষ্টবুদ্ধি ছেলেটা বলিল—"দময়ন্তী নলকে অমন অবস্থাতেও কি ক'রে চিনেছিলেন ?

"বরং সে পানাগুলো খসে গেছে, আবার চাপিয়ে দাও।"

অগত্যা সেই অবস্থাতেই অগ্রসর হইতে হইল। দলটা রং-বেরঙের মন্তব্য প্রকাশ করিতে করিতে আগেপিছে চলিল।

সদরবাড়িতে মাঝখানের ঘরটিতে কর্ত্তা ও বরের মেসো এক জায়গায় মড়ার মত পড়িয়া। এককোণে পুরুতঠাকুর তাঁহার বধিরতার কল্যাণে গাঢ় নিদ্রায় অচৈতন্য। বাইরের বারান্দায় দীনে নাপতে কাজকর্ম্ম সারিয়া কর্ত্তাদের বোতলঝাড়া একটু প্রসাদবিন্দু পাইয়াছিল, তাহাতেই তাহার ষোলআনা ফলপ্রাপ্তি হইয়াছে।

দলটা বারান্দায় আসিয়া উপস্থিত হইল। গুপ্ত-দা "বেহাই মশাই !"—বলিয়া বরকর্ত্তাকে জাগাইতে যাইতেছিল, সেই ছেলেটা হঠাৎ সামনে আসিয়া বলিল—"দাঁড়ান, দাঁড়ান,—ওরাই আগে দেখাক—কে বরের বাবা, কে বরের মামা, কে বরের বোনাই. কে বরের… "

তিনজনে কটমট করিয়া চাহিল। গোরাচাঁদ বলিল—"কেন, ঐ তো বরের বাপ…"

গণ্শা টীকা করিল—"ভ-ভ্ভবতারণ বাবু।"

"ঐ বরের মেসো—অনন্তবাবু, ঐ পুরুতমশাই, কালা, রাতকাণা; বাইরে দীনে নাপতে।"

ছেলেটা দমিবার নয়; চোখ বড় বড় করিয়া বলিল—"সব খোঁজ নিয়েচে রে !"

একজন বলিল—"বোধ হয় শিবপুর থেকে ধাওয়া করেচে।"

অনেক ডাকাডাকি এবং পরে ঠেলাঠেলির পর ভবতারণবাবু "উঁ" করিয়া এক শব্দ করিলেন। দুই-তিন্ জন চীৎকার করিয়া প্রশ্ন করিল—"দেখুন তো—এই কি আপনাদের বরযাত্রী ?"

অনেক বার প্রশ্ন করায়, অনেক কষ্টে কর্ত্তা রক্তাভ চক্ষু দুটি চাড়া দিয়া অল্প একটু উন্মীলিত করিলেন, আরও অনেক চেষ্টার পর প্রশ্নটার একটু মর্ম্মগ্রহণ করিয়া অস্পষ্টস্বরে বলিলেন—"কে বাবা, লন্দিভিরিঙ্গি—খি্লোচনের বরযাত্র এশ্চো ? এক শিলুম্ চড়াও তো বাবা।"

তিনজনেই একরকম আর্ত্তস্বরেই চীৎকার করিয়া বলিল—"জ্যেঠামশাই, আমরা গোরাচাঁদ—রাজেন, গণেশ… "

"গজানন্, শিঃ তুই শেক্কালে বাপের বিয়ে দেখ্তেলি ?"—বলিয়া, অবশ অঙ্গুলি দিয়া সবাইকে সরিয়া যাইতে ইসারা করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইলেন। বৃথা পরিশ্রম ভাবিয়া তাঁহাকে আর কেহ জাগাইতে চাহিল না।

বরের মেসো অনন্তবাবুর এটুকুও সাড়া পাওয়া গেল না। গোরাচাঁদ নিরাশ ভাবে বলিল—"হা ভগবান।"

পুরোহিত মহাশয়কে তোলা হইল। কথাটা তাহাকে শোনাইতে এবং ভাল করিয়া বোঝাইতে সবিশেষ বেগ পাইতে হইল। তিনি বলিলেন—"ডাকাতরা বলচে বরযাত্রী ? তা আমি তো রাত্রে দেখতে পাই না বাবা, প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত তাদের বসিয়ে রাখো না হয় !"

গোরাচাঁদ অগ্রসর হইয়া পদধূলি লইয়া বলিল—"ন্যায়রত্ন মশাই, আমি গোরাচাঁদ।"

"গোরাচাঁদ—এসো দাদা; আজকের দিনে আর কি আশীর্ব্বাদ করব ? শীঘ্র একটি বিবাহ হোক্, কন্দর্পকান্তি হও…"

সেই সর্ব্বঘটের ছেলেটা একটু কাছে ঘেঁষিয়া চেঁচাইয়া বলিল—"কন্দর্পকান্তি আশীর্ব্বাদের আগেই হ'য়েচে !"

পাশ থেকে কে একজন বলিল—"মানস-সরোবরে চান ক'রে।"

ন্যায়রত্ন মহাশয় ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা

বইকি; তোমরা সুপুরুষ তো আছই; তা গোরারে, এঁরা কি বলচেন—ডাকাতরা নাকি বলচে তারা বরযাত্রী, কি অনাসৃষ্টি!...চিনে দাও তো দাদা।"

রাজেন বলিল—"এরা বলচে—বরযাত্ররা ডাকাত।"

ন্যায়রত্ন মহাশয় একটু ধাঁধায় পড়িয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—"ঠিক অর্থ গ্রহণ হচ্চে না,—ডাকাতরা বরযাত্রী, না বরযাত্রীরা ডাকাত?"

দলের একজন ডান হাতটা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া বলিল—"সামলাও ন্যায়ের ধাক্কা, এখন তৈলাধার পাত্র, না পাত্রাধার তৈল?—ডাকাতরা বরযাত্রী, না বরযাত্রীরা ডাকাত, উঁ?"

গণশা মরিয়া হইয়া হাতজোড় করিয়া বলিল—"ম-মশাই, আমি পারলে সো-সোজা ক'রেই বলতাম, কি-কিন্তু সত্যিই তোৎলা; দয়া ক'রে একবার বর ত্রি-ত্রিলুর কাছে নিয়ে চলুন; তারপর পু-পুলিসে দিয়ে দেবেন না হয়...উঃ, শী-শ-শীতে কালিয়ে গেলাম।"

বলা বাহুল্য, কথাবার্ত্তার ভঙ্গিতে অনেকের সন্দেহটা মিটিয়াই আসিতেছিল; বিশেষ করিয়া বয়স্কদের মধ্যে। তাঁহাদের মধ্যেই একজন বলিলেন—"তাই নিয়ে চল না-হয়, রঘুকে এগিয়ে দাও।" কর্ত্তা বলিলেন—"জগু, বাড়ির মেয়েদের তাহ'লে বলগে।"

দলটি তিনজনকে ঘিরিয়া উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। ঠানদিদি আর মেয়েরা বরের চারিদিকে ব্যূহ সৃষ্টি করিয়া বাহির হইতে পাওয়া খবরের টুকরাটাকরিগুলা লইয়া নিজের নিজের কল্পনাশক্তির পরিচর্চ্চা করিতেছিল। কর্ত্তা চেঁচাইয়া বলিলেন—"একবার বরকে বাইরে পাঠিয়ে দাও।"

"ওমা, কি অমঙ্গলে কথা...কি হবে! কোন মতেই না!" বলিয়া সবাই ব্যূহটা আরও সুদৃঢ় করিয়া ঘেরিয়া ফেলিল। বরকর্ত্তাকে নিজেই ভিতরে যাইতে হইল।

এমন সময় একটা কাণ্ড হইল। ঘোঁৎনা পুকুরের দিকটা খালি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খুব সন্তর্পণে পেঁপেগাছ হইতে নামিয়া চুপিসারে সদরবাড়িতে দলটির পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সেখানকার কথাবার্ত্তায় আত্মপ্রকাশের উৎসাহ না পাইয়া খুব সাবধানে বাড়ির মধ্যেও আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। ত্রিলোচনের দ্বারা সনাক্ত হইবার সুযোগটা হারানো কোনমতেই সমীচীন হইবে না ভাবিয়া—"কি হয়েছে র্যা গণশা? এত গোলমাল কিসের?" বলিতে বলিতে ভিড় ঠেলিয়া আসিয়া সামনে দাঁড়াইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে "অ্যাঁ! তোদের এ কি দশা!!"—বলিয়া হাত চোখ কাঁধের ভঙ্গি সহকারে একখানি নিখুঁত অভিনয় করিল।

তিনজনেই বলিয়া উঠিল—"ঘোঁৎনা যে! কোথায় ছিলি? দেখ না, এ ভদ্দরলোকেরা কোনমতেই..."

ঘোঁৎনা গাছের উপর হইতে পুকুরপাড়ের সব কথাই শুনিয়াছিল; বলিল—"তোরা যখন আমার বারণ না শুনে পুকুরের দিকে গান শুনতে গেলি..."

মুরুব্বিয়ানায় গোরাচাঁদের গা জ্বলিয়া উঠিল; গণশা বুঝিতে পারিয়া তাহাকে টিপিয়া থামাইল।

"...আমি ভাবলাম—দুত্তোর, একটু বেড়িয়ে আসা যাক। খানিকটা দূরে গেচি—এদিকে একটা সোরগোল! তাড়াতাড়ি ফিরলাম; একে অজানা জায়গা, তায় রাত্তির,—খানিকটা এদিক, খানিকটা ওদিক ক'রে শেষে পথ ভুলে একটা পেঁপে গাছে উঠে পড়লাম।"

—সবাই এই শেষের বক্তা সেই ফাজিল ছোকরাটির পানে চাহিল। তাহার ঠিক মক্কম জায়গাটিতে আসিয়া দাঁড়াইবার কেমন একটা গূঢ় শক্তি আছে,—ইতিমধ্যে কখন ঘোঁৎনার পাশটিতে আসিয়া জুটিয়া গিয়াছে। সে নিজের টিপ্পনীর পর আর কিছু না বলিয়া ঘোঁৎনার চারিদিকের লোকদের সরাইয়া দিয়া ঘোঁৎনাকে একটু সামনে আগাইয়া দিল। সকলেই দেখিল—তাহার পিছনে, কোমরে জড়ান র্যাপারের সঙ্গে বাঁধা দুইটা ডাঁটাসুদ্ধ পেঁপের পাতা—একটা শুকনো, একটা পাকা—মাঝারি সাইজের। গাছে থাকিতে কখন আটকাইয়া কাপড়ের সঙ্গে বাঁধা পড়িয়া গিয়াছে ঘোঁৎনার সাড় হয় নাই।

"দোসরা ধাপ্পাবাজ!...লাগাও চাঁটি..."—একটা গোলমাল উঠিতেছিল, এমন সময় শ্বশুরের সঙ্গে ত্রিলোচন আসিয়া রকে দাঁড়াইল।—

"সত্যিই যে তোরাই দেখচি! আমি বলি বুঝি ডাকাতই পড়ল। তা জলে ঝাঁপ দেওয়ার কুবুদ্ধি হ'ল কেন? আর কে. গুপ্ত কোথায়?...গোরা, তোর দাড়িতে একটা কি ঝুলচে?—মুখ তোল তো..."

দাড়িতে বোধ হয় একটা পানার শিকড় ঝুলিতেছিল, কিন্তু

মুখ তুলিবার তখন আর গোরাচাঁদের অবস্থা ছিল না—গোরাচাঁদেরও নয়, গণশ্যারও নয়, রাজেনেরও নয় ঘেঁৎনারও নয়।

*　*　*　*

সন্দেহ সম্পূর্ণ কাটিয়া যাওয়া মাত্র একটা রব পড়িয়া গেল—

"ওরে শুকনো কাপড় নিয়ে আয় তিনখানা।"

"কাপড়, জামা, র‍্যাপার—শীগ্‌গির।"

"চা করতে ব'লে দে—দেরি না হয়।"

"আহা, ভদ্দরলোকের ছেলে···বাসরঘর দেখবার ইচ্ছে হয়েছিল তো··"

সেই ছেলেটা বলিল—"স্পষ্ট ক'রে বললেই হ'ত জগু-দাকে !"

"ওরে, নিয়ে এলি কাপড় ? দেরি কেন ?"

কাপড় আসিল, দুইদিক হইতে। বাসরঘরের ভিতর হইতে লইয়া আসিল একটি কিশোরী। চারখানি বেশ চওড়াপেড়ে শাড়ী, চারখানি শায়া, চারখানি ব্লাউস্‌। একটু মিষ্ট, ধারাল হাসি হাসিয়া বলিল—"বাসরঘরে ওদের চারজনকে ডাকচেন।"

শিক্ষা এবং ব্যবসায়

শ্রীযোগেশচন্দ্র সেন, বি-এ (হারভার্ড)

ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপনার পর হইতেই বঙ্গদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা দ্রুত বিস্তার লাভ করিয়াছে। ইংরেজী শিক্ষা লাভ করিলেই সরকারী চাকুরি মিলিবে এই আশায় অনেকেই পাশ্চাত্য শিক্ষার দিকে ঝুঁকিয়াছিলেন। বাঙালী হিন্দু প্রথম হইতেই সরকারী চাকুরির মোহে পাশ্চাত্য শিক্ষা বরণ করিয়া লইয়াছিল। কেহ কেহ সরকারী উচ্চপদ লাভ করিল এবং কেহ কেহ আইন ও ডাক্তারী ব্যবসায়ে যথেষ্ট ধন এবং সম্মান অর্জ্জন করিল। তাঁহাদের দৃষ্টান্তে অধিকাংশ বাঙালী হিন্দু ছেলে স্কুল-কলেজে ছুটিয়া গেল। প্রায় শতবর্ষব্যাপী উচ্চ শিক্ষার ফলে বাংলার অলি-গলিতে বি-এ, এম্‌-এ উপাধিধারী সহস্র সহস্র যুবক বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি করিল, কেন-না সরকারী চাকুরিতে কেবল মুষ্টিমেয় লোকেরই অন্নসংস্থান হইতে পারে। উকীলের সংখ্যা এত বাড়িয়াছে যে মোকদ্দমা অপেক্ষা তাহাদের সংখ্যা বেশী, এবং ডাক্তারের সংখ্যা—অন্ততঃ শহরে রোগীর অনুপাতে অধিক মনে হয়।

পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে আর কিছু হউক আর না-হউক আমাদের আয়ের পরিমাণে জীবননির্ব্বাহের খরচ অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে যেখানে মোটা ভাত মোটা কাপড়ে চলিত আজ সেখানে বাহ্যিক আড়ম্বর এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, আয়ব্যয়ের কোন প্রকারেই সামঞ্জস্য রাখা যাইতেছে না। পাশ্চাত্য অর্থনৈতিকদের মতে ইহাই উন্নতির লক্ষণ; কেন-না অভাবের বৃদ্ধি হইতেই কর্ম্মেচ্ছা জাগরিত হয় এবং কর্ম্মোদ্দম হইতেই নিত্য নবীন বস্তু প্রস্তুত হইয়া পুরাতন ইচ্ছার তৃপ্তি এবং নূতন ইচ্ছার সৃষ্টি করে।

পাশ্চাত্য এবং আমাদের দেশের মূল প্রভেদ সহজেই চোখে পড়ে। সে-সব দেশে যেমন নিত্য নূতন অভাবের সৃষ্টি করা হয়, তেমনি তাহা মিটাইবার শক্তি ও সাধনা তাহাদের আছে। আমাদের দেশে পাশ্চাত্য অনুকরণে অভাব বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু তাহা মিটাইবার শক্তি এবং সাধনা কোথায় ? একে ত আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান, আমাদের মুখ্য কাজ কাঁচা মাল উৎপন্ন করা, তদুপরি প্রায় শতাব্দী-ব্যাপী 'লিটার‍্যারী' শিক্ষার ফলে আমরা শ্রমবিমুখ এবং শিল্পবাণিজ্যকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি। এই শিক্ষার কুফল আজ আমরা পদে পদে উপলব্ধি করিতেছি। তাই অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি, শুধু 'লিটার‍্যারী' শিক্ষা নয়, এমন কি

কোন প্রকার উচ্চ শিক্ষাকেই ব্যবসায়-বাণিজ্যের অন্তরায় বলিয়া মনে করিতেছেন।

ইহা ঠিক্ যে ম্যাট্রিক পাস করিলে মেধা থাক্ আর না-ই থাক্ প্রত্যেক ছেলেকে কলেজে পড়িতেই হইবে এরূপ অদ্ভুত যুক্তি কোন দেশেই শোনা যায় না। অন্যান্য দেশে উচ্চ প্রাথমিক শিক্ষালাভ করিয়াই অধিকাংশ যুবক কোন-না-কোন শিল্প অথবা বাণিজ্যে কার্য্য আরম্ভ করে। যাহারা মেধাবী অথবা ধনীর ছেলে তাহারাই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে। সরকারী চাকুরি, অভাবে ওকালতী অথবা ডাক্তারী এইগুলিই আমাদের জীবনের লক্ষ্য হওয়াতে অধিকাংশ যুবকই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভ করিতে ব্যস্ত হয়। বঙ্গদেশের বর্ত্তমান অবস্থায় জীবিকানির্ব্বাহের অন্য কোন উপায় না থাকায় অনেকে একপ্রকার বাধ্য হইয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে। উপাধি লাভ করিয়া পরে কি করিবে তাহারা তাহা জানে না। তাহাদের শিক্ষা-দীক্ষা তাহাদিগকে জীবনসংগ্রামে জয়ী হইবার কলকৌশল শিখায় নাই, তাই তাহারা স্রোতের বেগে ভাসমান তৃণের ন্যায় ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায়। যখন আর কিছু হইল না তখন তাহারা ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে ধাবিত হয়। বাংলায় আর একটি ভাব দেখা যায় যেন ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য কোন প্রকার বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন নাই। যাহাদের ওকালতীতে পসার হইল না অথবা অন্য কোন কর্ম্ম মিলিল না তাহারাই এক একটি 'বিজনেস্' বা ব্যবসা ফাঁদিয়া বসিলেন এবং এস্থলে সচরাচর যাহা হয় তাহাই হইল, অর্থাৎ অধিকাংশ স্থলেই ক্ষতিগ্রস্ত হইল। জীবনে কোন কাজই সাধনা ভিন্ন সিদ্ধ হয় না। ব্যবসায়ের জন্যও সাধনার প্রয়োজন। অনেকে নিজেদের নিষ্ফলতার কারণ দেখাইতে গিয়া বলিয়া থাকেন যে, তাঁহারা সাধু বলিয়াই সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। এরূপ যুক্তি আমাদের নিষ্ফলতার ব্যথাকে খানিকটা সহনীয় করিতে পারে বটে, কিন্তু বাস্তবিক সাধুতা কখনও নিষ্ফলতার কারণ হইতে পারে না। সাধুতার সঙ্গে সঙ্গে চাই কর্ম্মনিষ্ঠা, একাগ্রতা, শ্রমপরায়ণতা এবং সৎ বুদ্ধি।

আজ যে অবাঙালী বাঙালীর অন্ন মারিতেছে বলিয়া চারিদিকে আন্দোলন চলিতেছে, ইহার জন্য দায়ী কে? আমরা নয় কি? ম্যাজিষ্ট্রেট হইব, জজ্ হইব, ডাক্তার হইব, উকীল হইব, এই মন্ত্রই কি জন্মাবধি আমাদিগকে শিখান হয় নাই? ব্যবসা-বাণিজ্য অশিক্ষিত, অসাধু ছোটলোকের কাজ, শিক্ষিত বাঙালী যুবক কি এই প্রকার হেয় কাজ করিতে পারে? আমাদের শিক্ষাপ্রণালী যে-মনোবৃত্তি সৃষ্টি করিয়াছে সেই মনোবৃত্তি লইয়া আমরা যদি জীবনসংগ্রামে পশ্চাৎপদ না হই তাহা হইলে হইবে কাহারা? প্রতি দেশেই অধিকাংশ লোক জীবিকানির্ব্বাহ করে শিল্পবাণিজ্য দ্বারা। যখন আমাদের সুযোগ ছিল তখন আমরা অবহেলা করিয়াছি, তাই আজ বঙ্গদেশে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের বেকার-সমস্যা এত কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শস্য-শ্যামলা বঙ্গদেশে সম্পদের অভাব নাই, কিন্তু সে সম্পদ ভোগ করে অপরে। বাংলা ভিন্ন অন্যত্র প্রায় কোথাও অধিক পাট জন্মায় না, অথচ বাঙালীর চটের কল কয়টি আছে? মফস্বলে অধিকাংশ পাটই ইউরোপীয়েরা খরিদ এবং 'বেল' (bale) করেন, আমাদের অংশ ইহাতে কতটুকু? বাংলা এবং আসামে যে চা বাগান আছে সেগুলির অধিকাংশ মালিক কাহারা? বিহারে এবং বঙ্গদেশে যে কয়লার খনি আছে আমাদের স্বত্ব তাহাতে কতটুকু? বাঙালী নিজের সম্পদ হেলায় অন্যের হাতে তুলিয়া দিয়াছে, তাই আজ আক্ষেপে হাহাকার করে। কিন্তু ঈর্ষা করিয়া কোন লাভ নাই, যাহা হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে তাহা ফিরাইয়া পাইবার উপায় নাই। এখন আমাদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে। এখনও অনেক কিছু করিবার আছে যাহার সুষ্ঠু প্রয়োগ করিতে পারিলে বাংলার শ্রী ফিরিয়া আসিবে।

নিষ্ফলতার ছাপ আমাদের সর্ব্বাঙ্গে এরূপ ভাবে লাগিয়া গিয়াছে যে, আমরা আত্মবিশ্বাস হারাইয়াছি, তাই বাঙালী অবাঙালীকে বিশ্বাস করে এবং আপনাদের যেটুকু পুঁজি আছে তাহা অপরের হাতে তুলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত মনে অসার আমোদে দিন কাটায়। বাঙালীর টাকা থাকিলে কোম্পানীর কাগজ কেনে, বাড়ি কেনে, জমিদারী কেনে, কিংবা বিদেশী ব্যাঙ্কে আমানত রাখে, কেন-না বাঙালীকে কি বিশ্বাস করা যায়? দেখ না, বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের কি অবস্থা হইল! এরূপ যাহাদের মনোবৃত্তি, ব্যবসায়ক্ষেত্রে তাহারা কি অগ্রসর হইতে পারে? অনেক ব্যবসায়ে দেখা যায় না কি যে উপযুক্ত

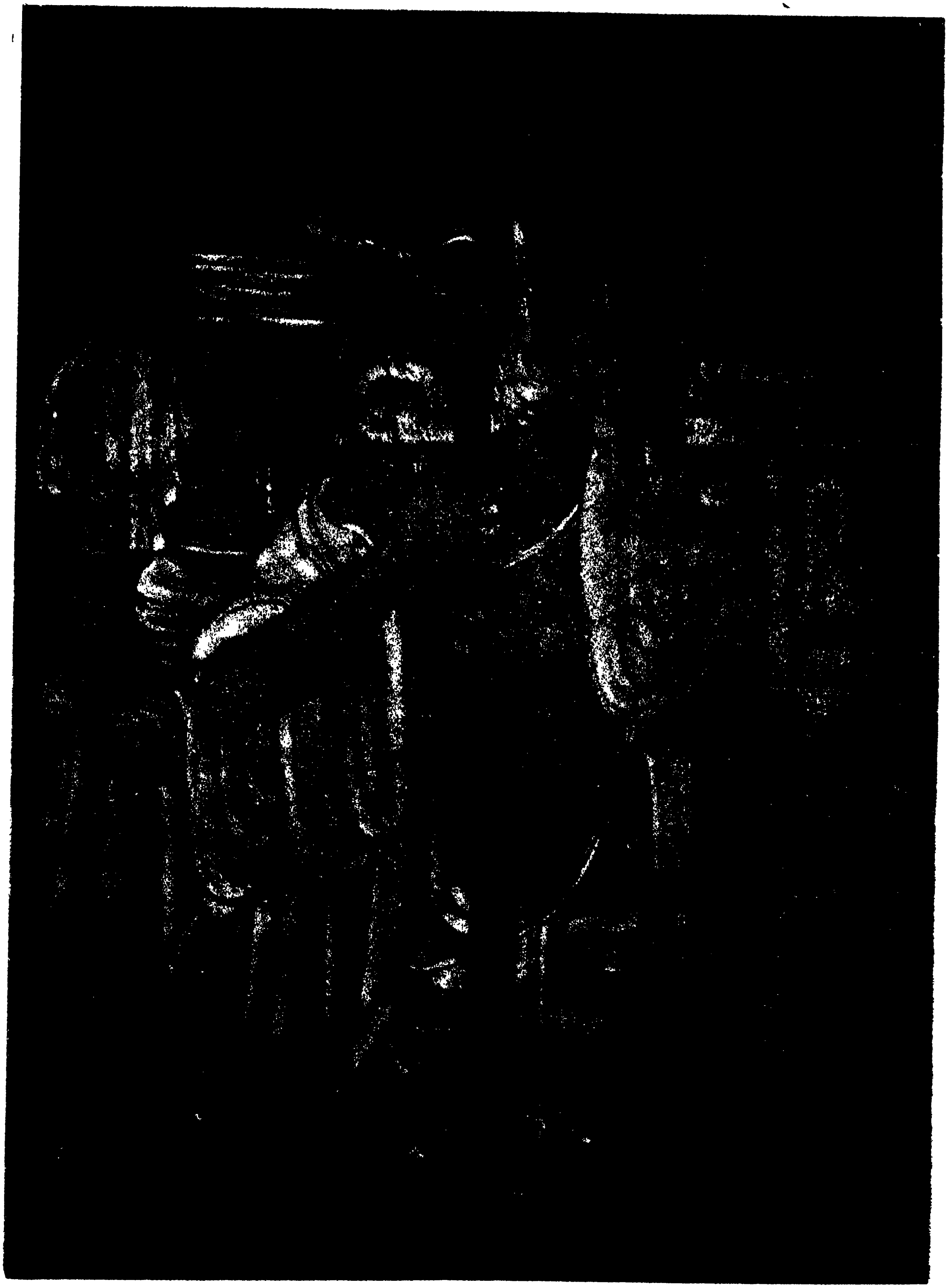
মূলধনের অভাবে ইহারা সফলতা লাভ করিতে পারিতেছে না। অনেক স্থলে আবার অনুপযুক্ত ব্যক্তির হাতে কার্য্যভার দেওয়াতেই লোকসান হইয়াছে, ইহাও কি দেখা যায় না? ইহার জন্য দায়ী কে?

বহু বর্ষব্যাপী ব্যবসায় এবং বাণিজ্য হইতে দূরে থাকাতে আমরা এগুলিকে কঠিন এবং উদ্যোগের অভাবে অশিক্ষিত এবং অসাধু লোকের কার্য্যক্ষেত্র বলিয়া মনে করিয়া আসিয়াছি। দায়ে পড়িয়া বাঙালী এখন ব্যবসায়ের দিকে অগ্রসর হইতেছে, কিন্তু ইহাও কতকটা সঙ্কল্প করিয়া নহে, অন্য কিছু সুবিধামত জুটিল না তাই। ইহার জন্য দায়ী আমাদের যুবকেরা নহে, যাঁহারা বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর কর্ণধার তাঁহারাই। কথায় কথায় শিক্ষিত যুবকদিগকে উপহাস করা, অথবা উপাধি তাহাদের উন্নতির অন্তরায় এইরূপ বলা আমাদের মুখে শোভা পায় না। অর্থকরী বিদ্যা এবং যে-বিদ্যা জীবনসংগ্রামে কৃতকার্য্য হইতে সাহায্য করে না, সেই বিদ্যার অপকারিতা বুঝিয়াও যখন আমরা তাহা দূর করিতেছি না তখন সে জন্য যুবকদিগকে দায়ী করা কি উচিত?

আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির দোষেই বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাদানের স্থান না হইয়া উপাধি-প্রস্তুতের কারখানা-স্বরূপ হইয়াছে। যেন-তেন-প্রকারেণ উপাধি বিতরণ করিতে পারিলেই বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করিলেন বলিয়া মনে করেন। আর ছাত্রেরাও অসংখ্য নোট বুক এবং বিশেষ চিহ্নিত স্থান মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা-সাগর উত্তীর্ণ হওয়াকেই শিক্ষার লক্ষ্য বলিয়া মনে করে। দোষ শিক্ষার নহে, শিক্ষাপ্রণালীর। অন্য দেশে স্কুল-কলেজে পাঠ শেষ করিলেই প্রকৃত শিক্ষার আরম্ভ হয়। স্কুল ও কলেজে আমাদিগকে বুঝিতে ভাবিতে এবং যাচাই করিতে শিক্ষা দেয়, বাস্তব জীবনে যখন এক একটি ঘটনা উপস্থিত হয় তখন আমরা শিক্ষা অনুসারে সেগুলি বুঝিতে চেষ্টা করি। পাশ্চাত্য দেশে অধিকাংশ ব্যক্তি উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে না সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা শিক্ষার পাটও উঠাইয়া দেয় না। সে-সব দেশে সন্ধ্যাকালে শিক্ষা দিবার জন্য বহু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং যাহারা উদ্যোগী, যাহারা উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করে তাহারা দিবসের কর্ম্মান্তে সেই সব বিদ্যালয়ে পাঠ করিয়া জ্ঞান বৃদ্ধি করে। যাহার যে দিকে ঝোঁক, সে সেই বিষয়ে পারদর্শী হইবার সুযোগ পায়। অনেক কোম্পানীর কর্ম্মকর্ত্তারা এইরূপ উদ্যোগী যুবকদিগের বৃত্তি দান এবং অন্যপ্রকারে উৎসাহিত করেন।

ইউরোপ এবং আমেরিকায় এখন চেষ্টা চলিতেছে to bring the factory into the school and the school into the factory, অর্থাৎ কারখানার ভিতরে স্কুলের আবহাওয়া আনা এবং স্কুলে কারখানার আবহাওয়া আনা। ইহার উদ্দেশ্য এই, যে থিওরি শিখান হয় তাহার সহিত কল-কারখানার সম্বন্ধ কোথায় তাহা ছেলেরা প্রথম হইতেই বুঝিতে পারে। সোভিয়েট রাশিয়ার খবর যাঁহারা রাখেন তাঁহারা জানেন যে পাঁচ বৎসরের প্ল্যান (Five-year's Plan) সফল করিবার জন্য লক্ষ লক্ষ কর্ম্মী কারখানায় লওয়া হইয়াছিল, যাহারা কলকব্জার বিষয় কিছুই জানিত না। তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রত্যেক কারখানায় স্কুল খোলা হইয়াছে এবং তাহাদিগকে কর্ম্মপটু করা হইতেছে। আমাদের শিক্ষার সহিত বাস্তব জীবনের সম্বন্ধ খুব কম। শিক্ষা যখনই বর্ত্তমানের সহিত যোগ হারাইয়া অতীতকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে তখন ইহা আমাদের উন্নতির অন্তরায় হয়। আমরা ভুলিয়া যাই যে, সমাজ স্থিতিশীল নহে—গতিশীল। কাজেই অতীতের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া যে থিওরি গঠিত হইয়াছে তাহা সামাজিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বদলাইয়া যাইতেছে। তাই এই প্রবহমান গতির সঙ্গে আমাদিগকে সুর মিলাইয়া চলিতে হইবে, নচেৎ আমরা উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিব না।

তাহা হইলে ইহা কি সত্য নয় যে, শিক্ষা উন্নতির অন্তরায় নহে, বরং শিক্ষার অভাবই উন্নতির পরিপন্থী। আমরা শিক্ষা বলিতে যাহা বুঝি তাহা প্রকৃত শিক্ষাই নয়, কেন-না যে-শিক্ষা জীবিকা-উপায়ের পথ প্রদর্শন না করে সে-শিক্ষার সার্থকতা কি? অতএব আমাদের শিক্ষা-প্রণালীকে কার্য্যকরী করিতে হইবে, যে-সব আবর্জ্জনা ইহাতে প্রবেশ করিয়াছে সেগুলি দূর করিতে হইবে। আরও মনে রাখিতে হইবে উপাধিলাভ শিক্ষার উদ্দেশ্য নহে, মানুষ গড়াই ইহার কাজ। আমাদের দেশে দেখিতে পাই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংসর্গ পরিত্যাগ করিলেই শিক্ষার পাট উঠিয়া যায়। চতুর্দ্দিকে এত পরিবর্ত্তন হইতেছে, এত সব



গৃহত্যাগ

শ্রীরামগোপাল বিজয়বর্গীয়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

নূতন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতেছে, আমরা যদি তাহার সন্ধান না রাখি তাহা হইলে বাস্তবজীবনে কৃতকার্য্য হইব কেমন করিয়া? আমরা যদি ইচ্ছা করিয়া স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করি তাহা হইলে জাগ্রত অবস্থা কেমন তাহা বুঝিব কি করিয়া। কল্পনা এবং ভাবুকতায় উৎকৃষ্ট সাহিত্যের সৃষ্টি হইতে পারে, কিন্তু পেটে অন্ন না থাকিলে ইহা উপভোগ করা যায় না।

শুধু পুঁথিগত বিদ্যায় ব্যবসা আয়ত্ত করা যায় না ইহা ঠিক, কিন্তু তাই বলিয়া এ-কথা ঠিক নয় যে, উচ্চশিক্ষা ব্যবসায়ে সফলতার অন্তরায়। ব্যবসায় এখন আন্তর্জাতিক ব্যাপার। ভারতের তুলার মূল্য নির্দ্ধারিত হয় লিভারপুল এবং নিউইয়র্কে এবং সেখানকার মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধি নির্ভর করে আমেরিকা, মিশর, পূর্ব্ব-আফ্রিকা এবং ভারতে উৎপন্ন তুলার চাহিদার উপর। সেইরূপ গম এবং অন্যান্য ভারতীয় কাঁচা মালের মূল্য বিভিন্ন দেশে উৎপন্ন ঐ জাতীয় মালের সহিত প্রতিযোগিতায় নির্দ্ধারিত হয়। বঙ্গদেশ ছাড়া অন্যত্র প্রায় পাট উৎপন্ন হয় না, কিন্তু ইহার মূল্য বিশেষভাবে নির্ভর করে উত্তর-আমেরিকা এবং দক্ষিণ-আমেরিকার চট এবং চটের থলির চাহিদার উপর। অতএব দেখা যাইতেছে, বর্ত্তমান যুগে কোন দেশই নিজের ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতর ব্যবসায় সঙ্কুচিত করিয়া উন্নত হইতে পারে না। বর্ত্তমানে যে পৃথিবীব্যাপী মন্দা চলিতেছে ইহার একটি প্রধান কারণ—প্রত্যেক দেশই নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ সংরক্ষণ করিতে গিয়া নিজের এবং অপরের ঘোর অনিষ্ট করিয়াছে।

আর্থিক স্বতন্ত্রতা প্রথম দৃষ্টিতে মঙ্গলকর বলিয়া মনে হয় কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, সকলেই যদি বিক্রেতা হয় তবে ক্রেতা জুটিবে কোথায়? আর কোন দেশই নিজের প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিষ উৎপন্ন করিতে পারে না, ইহা সত্ত্বেও যদি অন্য দেশের অপেক্ষা অধিক খরচে মাল উৎপন্ন করা যায় তাহা হইলে শুল্কের হার সেই পরিমাণে বৃদ্ধি না করিলে সেই সব শিল্প টিকিতে পারে না। শুল্কের সহায়তায় বিদেশে উৎপন্ন সস্তা মাল প্রবেশের পথ রুদ্ধ করিয়া স্বদেশে উচ্চমূল্যে প্রস্তুত মালের কাট্‌তি বৃদ্ধি করা যাইতে পারে, কিন্তু এ-কথা মনে রাখিতে হইবে যে মূল্যবৃদ্ধি হইলে ক্রেতার সংখ্যাও কমিয়া যাইবে। সব চেয়ে মুস্কিল এই যে, আমরা যদি বিদেশী মাল খরিদ না করি তাহা হইলে তাহারাও আমাদের মাল খরিদ করিতে পারিবে না, কেন-না বাণিজ্যের প্রসার মালের আদান-প্রদান দ্বারাই হয়।

ইহা ছাড়া আধুনিক ব্যবসায়ীকে আরও অনেক খবর রাখিতে হয়। যেমন মুদ্রানীতি। অধুনা অনেক দেশই স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিয়াছে, ইহাদের মুদ্রার মূল্য স্বর্ণে প্রতিষ্ঠিত মুদ্রার তুলনায় অনেক হ্রাস হইয়াছে। পূর্ব্বে জাপানী মুদ্রা ১০০ ইয়েনের মূল্য ছিল ১৩০৲ টাকারও অধিক, এখন হইয়াছে ৮০৲ টাকারও কম। জাপানীরাও ইহা স্বীকার করে যে, ইয়েনের মূল্য বেশী হ্রাস হওয়াতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে তাহারা এতটা সফলতা লাভ করিয়াছে। আমাদের দেশে অনেকের বিশ্বাস, টাকার মূল্য ১ শিলিং ৬ পেনিতে ধার্য্য করায় অন্যান্য দেশের সহিত প্রতিযোগিতায় আমাদেরও বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে।

মোট কথা, বর্ত্তমান যুগে ব্যবসায়ে কৃতিত্বলাভ করিতে হইলে কূপমণ্ডুক হইলে চলিবে না। আমাদের শিক্ষা-প্রণালীর দোষ পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে-শিক্ষা জীবিকা উপায়ের পথ প্রদর্শন করে না, সে-শিক্ষা সাধারণের পক্ষে শ্রেয়স্কর নহে তাহাও ঠিক। তাই বলিয়া সামান্য লিখিতে, পড়িতে এবং অঙ্ক কষিতে শিখিলেই যে ব্যবসায়ে সাফল্যলাভের সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপিত হইল এইরূপ মত একান্তই ভ্রান্ত বলিয়া মনে হয়। ব্যবসায়ক্ষেত্রে শিক্ষার বিশেষ কোন প্রয়োজনীয়তাও নাই এরূপ মত প্রচার হইলে আমাদের ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টই অধিক হইবে। ইউরোপ এবং আমেরিকায় পূর্ব্বে এই প্রকার মত প্রচলিত ছিল। অনেকে বলিতেন যে, পুথিগত বিদ্যা দ্বারা ব্যবসায়ে কৃতিত্ব লাভ করা যায় না, হাতে-কলমে শিখিতে শিখিতে তবে সাফল্য লাভ করা যায়। এখন সে-দেশে একথা প্রায় শোনা যায় না। উচ্চ ব্যবসায়িক শিক্ষার জন্য স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং দেখা গিয়াছে যে এইরূপ শিক্ষিত যুবকেরা হাতে-কলমে শিক্ষিত যুবকদের অপেক্ষা কার্য্যক্ষেত্রে অনেক সাফল্যলাভ করিয়াছে। ব্যবসায় এমন একটি পদার্থ নহে যাহাকে চতুর্দ্দিকের আবহাওয়া হইতে পৃথক করিয়া চালান যাইতে পারে। বৈজ্ঞানিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক—প্রত্যেকটির ঘাত-প্রতিঘাত ব্যবসায়ের উপর পড়িতেছে এবং ইহার ধারা পরিবর্ত্তিত করিতেছে। অতএব যাঁহারা ব্যবসায়ক্ষেত্রে উচ্চস্থান

অধিকার করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদিগকে উপরোক্ত প্রত্যেকটির খবর রাখিতে হইবে। সামান্ত গ্রাম্য ব্যবসায় অধিক শিক্ষা প্রাপ্ত না হইলেও করা যাইতে পারে, কিন্তু এস্থলেও আমরা বুঝি বা না-বুঝি তথাপি বহির্জগতের ছাপ গ্রামে পড়িবেই পড়িবে।

তাই শিক্ষাকে দূর করিয়া ব্যবসায়ে সাফল্যের যে দুঃস্বপ্ন আমরা দেখিতেছি তাহা ভবিষ্যতে স্বপ্নেরই মত মিলাইয়া যাইবে। যতই আমরা বর্হির্জগতের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে জড়িত হইতেছি ততই জীবনের প্রত্যেক বিষয়টি আরও জটিল হইতেছে। এগুলি বুঝিবার জন্য শিক্ষার প্রয়োজন। ভ্রান্ত মত পোষণ করিলে কিংবা বিপথে চলিলে আমরা গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে পারিব না। ফাঁকি দিয়া স্বর্গলাভ করার ইচ্ছা আমাদের একটি মজ্জাগত দোষ। বিদেশীয়দের দোষত্রুটি দেখাইলেই আমাদের দোষত্রুটির লাঘব হইবে না। অন্যকে ছোট করিলেই আমরা বড় হইব না। আমাদিগকে বুঝিতে হইবে—কি করিয়া তাহারা বড় হইল। তাহাদের গুণ এবং আমাদের দোষ খতাইয়া দেখিতে হইবে। তাহাদের সদ্‌গুণ গ্রহণ করিয়া যে-পন্থায় তাহারা উন্নতিলাভ করিয়াছে সেই পন্থা আমাদিগকে অবলম্বন করিতে হইবে। তৎসঙ্গে আমাদের যেটুকু বৈশিষ্ট্য আছে তাহাও রক্ষা করিতে হইবে। পাশ্চাত্য অর্থনৈতিক মত—অভাব-সৃষ্টিই সভ্যতার মূল, ইহা আমাদের সভ্যতার বিরোধী। আমাদের সভ্যতা বলে ভোগে সুখ নাই। অতএব আমাদের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য উৎকর্ষ,—যাহা তাহাদিগকে জীবনসংগ্রামে বলীয়ান করিয়াছে—তাহা যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু গ্রহণ করিতে হইবে। অধুনা জাপানের যে দ্রুত উন্নতি হইয়াছে তাহার মূল অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইব যে তাহারা নিজেদের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া পাশ্চাত্য শিল্পবিজ্ঞান আয়ত্ত করিয়া পাশ্চাত্যদের সহিত অনায়াসে প্রতিযোগিতা করিতে পারিতেছে। জাপান শুধু অনুকরণ করিয়া বড় হয় নাই। দৃঢ় অধ্যবসায়ের সহিত নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া শিল্পের অপূর্ব্ব উন্নতি করিয়াছে। জাপান যেমন গ্রহণ করিয়াছে তেমনই দানও করিয়াছে, তাই তাহাকে কলকব্জার জন্য পরমুখাপেক্ষী হইতে হয় না। আমরা চাই বিদেশ হইতে কলকব্জা আমদানী করিয়া সেগুলি বিশ-পঁচিশ কিংবা ততোধিক বৎসর চালাইয়া বিদেশীয়দের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে। যদি না পারি তাহা হইলে অমনি শুল্কবৃদ্ধি করিবার জন্য প্রবল আন্দোলন আরম্ভ করি। ইতিমধ্যে বিদেশে নূতন নূতন আবিষ্কারে এগুলির কার্য্যকারিতা (efficiency) কমিয়া আমাদের প্রস্তুত মালের মূল্য বিদেশের তুলনায় বাড়িয়া যায়। শুধু শুল্ক বাড়াইয়া ইহার প্রতিকার হইতে পারে না। শুল্ক মালের উপর চড়ান যায়, কিন্তু মগজের উপরে যায় না। আমরা কূপে আবদ্ধ হইয়া রহিব বলিয়া অপরকে কি সেইরূপ থাকিতে বাধ্য করিতে পারি?

আবেগের উচ্ছ্বাস আমাদের আছে, পরনিন্দায় আমরা পশ্চাৎপদ নহি, কিন্তু ক্ষণিক আবেগ অথবা পরনিন্দা কোন জাতিকে উন্নত করিতে পারে না। বাঙালীর দোষ অনেক আছে, আমরা অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া আবেগের বশে অনেক কিছু করিয়া ফেলি। স্বদেশী আন্দোলনের যুগ হইতে কত-না শিল্প বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সেগুলির অধিকাংশ আজ কোথায়? অর্থাভাব এবং অনুপযুক্ত লোকের হাতে পড়িয়া সেগুলি কি ধ্বংস হয় নাই? সেগুলি নষ্ট হইয়াছে বলিয়া ভবিষ্যতে আর আমরা কিছু করিব না, এরূপ বলাও কি কাপুরুষতার লক্ষণ নহে? অর্থ অপেক্ষা আমার মনে হয় উপযুক্ত পরিচালকের অভাবেই শিল্প-বাণিজ্যের বেশী ক্ষতি হয়। অন্যান্য ক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে যে বাঙালী উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে, তবে শিল্প-বাণিজ্যের বেলায় কেন পারিবে না? ইহার একটি কারণ ইহা নয় কি যে আমাদের কৃতি সন্তানগণ শিল্প-বাণিজ্যে বিমুখ?

ধীরে ধীরে বাংলার আবহাওয়া বদলাইতেছে। সাম্প্রদায়িক ভাগ-বাঁটোয়ারার ফলে বাঙালী হিন্দু লোভনীয় সরকারী চাকুরি ভবিষ্যতে বিশেষ পাইবে না। ইহাতে অমঙ্গল অপেক্ষা মঙ্গলই বেশী হইবে; কেন-না তাহা হইলে আমরা জীবিকা-অর্জ্জনের অন্য পন্থা খুঁজিতে বাধ্য হইব।

প্রত্যেক সভ্য দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষি, শিল্প এবং বাণিজ্য দ্বারা প্রতিপালিত হয়। এদেশে কেহ কেহ বলিতেছেন যে ভদ্র যুবকগণ লাঙ্গল ধরিয়া চাষ আরম্ভ করুক তাহা হইলেই অন্ন-সমস্যা মিটিয়া যাইবে। ভারতবর্ষের প্রত্যেক সেন্সাসে দেখা যাইতেছে যে কৃষি দ্বারা প্রতিপালিত লোকের

সংখ্যা ক্রমশই বাড়িয়া যাইতেছে, অথচ লোকসংখ্যা-বৃদ্ধির অনুপাতে আবাদি জমির বৃদ্ধি হয় নাই। ইহা ছাড়া উত্তরাধিকার আইনের (law of inheritance) দরুণ জমি এত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে যে তাহা চাষ করিয়া এক পরিবারের অন্ন সংস্থান হয় না, বরং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক লোককে জমির উপর নির্ভর করিতে হয় বলিয়া তাহাদের জীবনাদর্শ দিন-দিন হীন হইতেছে। তদুপরি কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য অত্যধিক হ্রাস হওয়াতে তাহাদের ক্রয় শক্তি একপ্রকার নাই বলিলেই হয়। এই অবস্থায় যদি ভদ্র যুবক লাঙ্গল হাতে করিয়া কৃষকের সহিত প্রতিযোগিতা করে তাহা হইলে তাহাদের এবং কৃষকের, উভয়ের অবস্থাই আরও হীন হইবে। মুষ্টিমেয় ভদ্রলোকের চাষ করিয়া জীবিকা-উপায় হইতে পারে, কিন্তু অধিক সংখ্যকের পক্ষে ইহা সম্ভব নহে। আর এক কথা মনে রাখা উচিত, কৃষি মৌসমি (seasonal) ব্যবসায়। বৎসরে ছয় মাসের অধিক কৃষককে হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকিতে হয়। আজকাল যেরূপ ব্যয় বৃদ্ধি হইয়াছে তাহাতে ছয় মাস কাজ করিয়া এক বৎসরের অন্নের সংস্থান করা সম্ভবপর নয়।

অতএব কৃষি দ্বারা বেকার-সমস্যার সমাধান করিবার ভ্রান্ত ধারণা পরিত্যাগ করিয়া আমাদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিতে হইবে শিল্প এবং বাণিজ্যের উৎকর্ষের জন্য। ইহাদিগকে দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করিতে হইলে প্র্যাকটিক্যাল বিজ্ঞান এবং বাণিজ্য-শিক্ষার বিস্তার হওয়া প্রয়োজন। এই শিক্ষা উপাধি-প্রস্তুতির কারখানা হইবে না, ইহা হইবে কতকাংশে স্কুল এবং কতকাংশে কারখানা। প্রকৃত শিক্ষা কখনও উন্নতির অন্তরায় হইতে পারে না। শিক্ষা-নামধারী যে অদ্ভুত প্রথা আমাদের দেশে প্রচলিত আছে তাহাই আমাদের অবনতির কারণ।

শিক্ষার ভিতর জাতিবিভাগ

ফ. ক. রাবিয়া খাতুন

শিক্ষা মানবের অন্তরের লুক্কায়িত গুণাবলীর বিকাশসাধন করে, মানবের চরিত্রগঠনের উপাদান সংগ্রহে সাহায্য করে। সুতরাং ইহা কাহারও ব্যক্তিগত বা জাতিগত সম্পত্তি নহে। সকলেরই শিক্ষার প্রয়োজন। যেহেতু শিক্ষা সকলেরই সমভাবে প্রয়োজনীয়, সেহেতু এই শিক্ষার ভিতর কোন ব্যক্তিগত বা জাতিগত বিভাগ না থাকাই বাঞ্ছনীয়। যাহা ভাল, যাহা শিক্ষণীয়, তাহা হিন্দুরও যেমন শিক্ষণীয়, মুসলমানেরও সেইরূপ। সক্রেটিস সেই শত শত বৎসর পূর্ব্বে যাহা প্রচার করিয়া গিয়াছেন তাহা শুধু আজ গ্রীসবাসীরা শিক্ষা করে না, সমস্ত জগৎ তাহার চর্চ্চা করে। অতি প্রাচীনকাল হইতে অন্য জাতির ভিতর যাহা ভাল, অপর জাতি তাহার অনুকরণ করিয়াছে। গ্রীকরা যদি বিজাতীয় জ্ঞানী লোকের অনুকরণ না করিত তবে তাহাদের সভ্যতা অতটা উন্নত ও বিস্তৃত হইত না।

বর্ত্তমান জগতেও উদাহরণের অভাব নাই। জার্ম্মাণরা আজ পৃথিবীর মধ্যে জ্ঞানবিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু তাহাদের শিক্ষা শুধু জার্ম্মাণ-জগতেই সীমাবদ্ধ নয়। তাহাদের ভিতর বড় বড় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত, বড় আরবী পারসী শাস্ত্রে জ্ঞানী-লোক আছে। সুতরাং শিক্ষা জিনিষটায় খুব উদার হওয়া উচিত। চণ্ডালের ভিতরও যদি কোন গুণ থাকে, তবে তাহা শিক্ষা করা উচিত।

আমাদের দেশে, বিশেষতঃ এই বাংলা দেশে, এই নিয়মের ভীষণ ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। আমাদের নিকট আমাদের শিক্ষাই বড়। অপরের ভিতর যে কোন শিক্ষণীয় জিনিষ থাকিতে পারে, সেটা মনে করা আমাদের ভিতর এক রকম অসম্ভব ব্যাপার।

অবশ্য আমি আমাদের হিন্দু ভাইদের কথা বলিতেছি না। তাঁহারা এ বিষয়ে যথেষ্ট উদার। তাঁহাদের শিক্ষার ভিতর

কোন গোঁড়ামি নাই। আমার বক্তব্যের বিষয়, আমার মুসলমান ভাইদের দ্বারা শিক্ষার নব আবিষ্কৃত পন্থা।

হিন্দু এবং মুসলমান আমরা এই দুই জাতি এই দেশে বাস করি। একই খাদ্য আমরা আহার করি, একই ভাষায় আমরা কথা বলি। প্রায় সকল বিষয়েই আমরা ও তাঁহারা এক, কিন্তু আমাদের শিক্ষা দাঁড়াইয়াছে দুই রকম এবং ইহা আমাদের মুসলমান ভাইদের চেষ্টায়। তাঁহারাই শিক্ষার উদার আদর্শ হইতে আমাদের অন্য পথে চালিত করেন। তাঁহারা মনে করেন, অন্য জাতির যাহা আদর্শ আমাদের তাহা পরিত্যজ্য। তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না যে, তাঁহাদের আদর্শের ভিতরে কতখানি শিক্ষণীয় বিষয় আছে। শিক্ষার প্রকৃত উদার ধারা হইতে তাঁহারা সরিয়া পড়েন, মাঝখান হইতে শিক্ষা দেন যাহাতে হিংসাদ্বেষ ও রেষারেষির ভাব বৃদ্ধি পায়।

মানবের মনের ভাব ব্যক্ত করিতে ভাষার প্রয়োজন। আমরা হিন্দুমুসলমান উভয়েই বাঙালী—বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। কিন্তু আমাদের মুসলমান ভাইদের জন্য আমরা বাংলা ভাষা হিন্দু ভাইদের মত ভাল জানি না। কারণ, হিন্দু ভাইরা বাংলাই শিখে, কিন্তু আমরা শিখি বাংলা, উর্দ্দু, আরবী, পারসী মিশ্রিত একটি খিচুড়ী। আমাদের ছেলেপিলেদের পাঠ্যপুস্তক লিখিত হয় অন্য কায়দায়, অথচ হিন্দুমুসলমান উভয়েই আমরা বাঙালী—বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। হিন্দু ভাইদের ছেলেপিলেরা যখন আকাশের প্রতিশব্দ 'গগন' পড়ে তখন আমাদের ছেলেপিলেরা আকাশের প্রতিশব্দ পড়ে 'আসমান'। অথচ এই আকাশের প্রতিশব্দ 'আসমানে' তাহার কোন কাজ হইবে না। পরবর্ত্তী জীবনে যখন সে হিন্দু ভাইদের ছেলেপিলেদের সঙ্গে স্কুলে পড়িবে তখন তাহার এই 'আসমানে' কোন ফল হইবে না। এইরূপে সে পিছনে পড়িয়া যাইবে।

আমার একটি আট বৎসরের মেয়ে আছে। স্কুলে তাহাকে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছি। একদিন বাসায় সে "চাণক্যশ্লোক" নামক পুস্তক হইতে কতকগুলি শ্লোক মুখস্থ করিতেছিল। পাশের বাড়ির গৃহকর্ত্রী তাহাকে শ্লোক মুখস্থ করিতে শুনিয়া আসিয়াই অমনি তাহার হাত হইতে বইখানি কাড়িয়া লইলেন এবং আমাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, 'মেয়েকে হিন্দুদের শাস্ত্র পড়াইতেছ, ব্রাহ্মণের সঙ্গে বিবাহ দিবে নাকি? মুসলমানের মেয়ে আবার চাণক্যশ্লোক পড়ে!' এই বলিয়া তিনি বইখানি ছিঁড়িয়া দুই টুকরা করিয়া ফেলিলেন।

এই ত আমাদের শিক্ষার অবস্থা। চাণক্য ঋষির অমৃত-তুল্য উপদেশ পড়িলে তাঁহাদের ধর্ম্মের অবমাননা হয়। অনেকে হয়ত বলিবেন, শিক্ষার ভিতর গোঁড়ামির কারণ আমরা অশিক্ষিত। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে তাহা নয়। অশিক্ষিত মূর্খদের কথা বাদ দিই—তাহারা ত এইরূপ গোঁড়ামির অনুকরণ করিবেই। কিন্তু আমাদের ভিতর বর্ত্তমান উচ্চশিক্ষিত 'এম-এ' 'বি-এ' 'ডি. লিট' সাহেবরাও যে শিক্ষার উদার সাম্যনীতির অবমাননা করিতেছেন। আমাদের মাননীয় ডক্টর শহীদুল্লাহ্, ডি. লিট সাহেব শুধু মুসলমান বালকবালিকার জন্য অনেক পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন এবং সেগুলি পড়ানও হয়। তাঁহার ঐ পুস্তকগুলির ভিতর উর্দ্দু আরবী এবং পারসী শব্দই বেশী ব্যবহৃত হইয়াছে, অথচ যাহা বাঙালীর ছেলের কোন দরকারেই লাগিবে না। সুতরাং এইরূপ শিক্ষার কোন ফলই হয় না—কেবলমাত্র কোমলমতি বালকবালিকাদের মস্তিষ্ক পীড়িত হয়। আমরা মুসলমান কিন্তু বাঙালী—বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। সুতরাং বাংলা ভাষা আমাদের হিন্দু ভাইদের মতই শিখিতে হইবে। এই বিষয়ে তাঁহাদিগের অনুকরণ না করিলে আমাদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকিবে।

দ্বিতীয়তঃ, মুসলমান ছাত্রদের জন্য অন্য ধরণের বিদ্যালয়—'মাদ্রাসার' কোন দরকার নাই। হিন্দু এবং মুসলমান আমাদের এই দুই জাতি জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত পাশাপাশি কাটাইতে হইবে। আমার ক্ষুদ্র মতানুসারে এই মাদ্রাসা-প্রণালী উঠাইয়া দিয়া আমাদের ছেলেপিলেদের হিন্দু ভাইদের ছেলেপিলেদের সহিত একসঙ্গে, এক ধরণে এক শিক্ষা দিতে হইবে।

আর একটি জিনিষ আমাদের ছেলেপিলেদের শিক্ষার অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। সেইটি হইতেছে গভর্ণমেণ্টের মুসলমান ছাত্রদের উপর অন্যায় দয়া (special scholarships for Muhammadan students)। ইহাতে হিন্দু ভাইদের ছেলেপিলেদের অসন্তুষ্ট করিয়া মুসলমান ছাত্রদের মাথা খাওয়া হয়। হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই ছেলে প্রতিযোগিতা করুক—যে বেশী শক্তিশালী সে-ই বৃত্তি পাইবে। এই বৃত্তিগুলি

হিন্দু ও মুসলমান উভয় শ্রেণীর ছাত্রদের ভিতরে তাহাদের গুণানুসারে বণ্টন করিয়া দেওয়া উচিত—জাতি অনুসারে নহে।

শিক্ষার গোঁড়ামি আমাদের সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করা উচিত। হিন্দু ভাইরা আমাদের চেয়ে সর্ব্ববিষয়ে উন্নত, সুতরাং তাঁহাদের অনুকরণ করিলে আমরাও উন্নত হইব। তাঁহাদের ভিতর যাহা ভাল তাহা আমরা গ্রহণ করিব। তাহাতে আমাদের কোন অপমান হইবে না এবং ভবিষ্যতে তাঁহাদের সহিত প্রতিযোগিতার ক্ষমতা অর্জ্জন করিতে পারিব।

আষাঢ়ে লেখা

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

তিনদিন ধরে মেঘ ক'রে আছে, রৌদ্রের নাই দেখা,
বন্ধ রয়েছে ধরা-পাঠশালে ধরাবাঁধা পাঠ শেখা!
অবিশ্রান্ত বৃষ্টি ঝরিছে, পথে লোক নাহি চলে,
কার্য্যের ধারা ভেসে গেছে সব বর্ষার ধারাজলে;
এমনই সময় শয্যার পাশে সহসা পড়িল দিঠি,
তুলিয়া দেখিনু—বন্ধুর লেখা জরুরী ডাকের চিঠি!
এই দুর্য্যোগে চলিবার মত কোনো কথা তাতে নাই,
শুধু সে লিখেছে, কাগজের তরে রচনা একটি চাই,—
যেমন-তেমন চায় না আবার, ঝকঝকে হ'তে হবে;
রূপে আর রসে ফেটে পড়ে যেন নূতনের গৌরবে!

চারিধার হ'তে বারিধারে যবে পড়িয়াছি সঙ্কটে,
তাহারই মধ্যে হেন বরাতের বাহাদুরি আছে বটে!
খাওয়া দাওয়া প্রায় বন্ধ যখন, উনোনে চড়ে না হাঁড়ি,
এদিকে ওদিকে প্যাচ্‌পেচে কাদা, ভিজে কাপড়ের কাঁড়ি;
বিছানাপত্র স্যাঁৎসেতে সব, ভাপ্‌সা গন্ধে ভরা,
কথা কহিবার লোকটি মেলে না, প'ড়ে আছি আধমরা,—
এমনই সময় বন্ধু আমার কাগজে গড়িয়া তরী,
পাঠাইল দ্বারে—ভাসিতে হইবে, বাঁচি ভাল, নয়, মরি!
একে দেহমন খিঁচ্‌ড়িয়ে আছে দৈবের তাড়নায়,
তাহার উপরে বন্ধুর প্রেম, এও যে এড়ান দায়!

সহসা সমুখে নজর পড়িতে, চেয়ে দেখি—মেঘদূত;
ছবি দেখাবার মত কবি বটে—অপূর্ব্ব অদ্ভুত!
ধনের খবর জানি না তাহার, মনের খবর জানি,
দুনিয়ার লোক তাই নিয়ে আজও করে নানা কানাকানি!
আমারই মতন হয়ত সে ছিল অভাবে ও অভিযোগে,
আমারই মতন হয়ত তাহারও গৃহিণী ভুগিত রোগে;
ছেলেটা কোথায় মাছ ধরিবারে গিয়েছে ক'দিন আগে,
ঠিকাঝিটা আজ ক'দিন আসেনি, বলিতে লজ্জা লাগে,—
বাসন হইতে গৃহমার্জ্জনা সারি' নিজে কোনমতে,
রাজবাড়ি হ'তে মাসহারা লাগি চেয়ে ছিল দ্বারপথে!

বলিহারি কবি—চারিধারে তার হেরিয়া হাজারো খুঁৎ,
আকাশ হইতে মেঘে টেনে এনে বানাইয়া দিল দূত!
তাও বুঝিতাম, রাজবাড়ি থেকে টাকা আনিবার হলে—
পেটের জ্বালায় নিরুপায় কবি পাগল হয়েছে বলে!
তা না হয়ে কি না কোথা রামগিরি, মনোরথে তাহে চড়ি,
আজ্‌গবী এক পাগ্‌লা প্রেমিক হাওয়ায় তুলিল গড়ি।
কোথা না-কি তারি প্রণয়িনী কাঁদে দারুণ বিরহতাপে,
কার শাপে হয়ে ছাড়াছাড়ি দোঁহে বড় দুখে দিন যাপে!
সংবাদবহ করিয়া মেঘেরে পাঠাল তাহারই ঠাঁই,
হেন মনোরম মধুর মিথ্যা, কেহ যাহা শোনে নাই!

ধূমজ্যোতিসলিলমরুতে আস্‌মানি মনোহারী—
প্রেমের পাথেয় সঙ্গে লইয়া হল তাই পথচারী!
চিরবিরহীর মানস-মরাল সাথে সাথে উড়ে তার,
পাখা ঝটপটি প্রাণ ছটফটি উঠে অভিসার!

কত কান্তার হয়ে যায় পার, গিরি অরণ্য কত,
খুঁজিয়া খুঁজিয়া চাহে সে চিনিতে বিরহিণী মনোমত ;
কনককবলয় ভ্রষ্ট হইয়া প্রকোষ্ঠ যার খালি,
ফুল দিয়া দিন গণিতে গণিতে নয়নে পড়েছে কালি ;
নীবির বাঁধন খসিয়া পড়িছে উদাসী মনের ভুলে,
কাঁদে দিনরাত, পড়েনাক হাত একবেণীবাঁধা চুলে !

উজ্জয়িনীর প্রাসাদ হ'তে রেবা কূলে কূলে চাহি
নটিনীর মত চলেছে বেদম বেতসের বন বাহি ;
কত না কুটজ কত না কেতকী কত কদম্ববন—
গন্ধ ধরিয়া প্রিয়-নিঃশ্বাস করিয়া অন্বেষণ ;
যেথায় যে কোনো রমণীয় মুখে রমণীর অধিকার,
বিদ্যুদ্দিঠি মেলিয়া তখনই নেহারে বারম্বার !
সেই ক তাহার বাঞ্ছিত প্রিয়া যক্ষবক্ষসাথ ,
মন্দ মন্দ মেঘের পক্ষ সঞ্চালি দিবারাতি !
নীলাঞ্জনবরণ পিঙ্গনয়ন, বারণবাহী—
চলিয়াছে মেঘ চিরদয়িতার সন্ধান শুধু চাহি !

ঐ যে—যাহার করতালিতালে নাচিছে ময়ূরদল !
উতলা কলাপ মেঘেরই বরণে বিথারিয়া চঞ্চল ;
গৃহপারাবত সঙ্গে হংস ঘেরি যার চারিধারে
পদ্মকরের কৃপাকণা চেয়ে ঘুরে মণ্ডলাকারে,
ঐ কি আমার প্রিয় বন্ধুর বাঞ্ছিত বিরহিণী ?
কাঞ্চীর তলে কটিতটে তবে বাজে কেন কিঙ্কিণী !
মদির নয়নে বিলোল চাহনী, কুসুমিত কেশপাশ !—
বিরহী আননে ফুটিবে কেমনে হেন হাসি-উল্লাস ?
পাণ্ডু-অধরা কৃশ-কলেবরা একবেণীধরা নারী—
নয়নভুলান রমণীর মাঝে তারে ত চিনিতে নারি।

যা-কিছু যেথায় সুন্দর আছে সৃষ্টি-গহনকোণে,
কবির দৃষ্টি এড়ায় নি কভু সে বিজলী-ঈক্ষণে !
চোখের তারায় প্রাণের ধারায় চলেছে অবাধ গতি,
কুড়ায়ে কুড়ায়ে অকূল প্রেমের আকুল শ্রদ্ধারতি।
বন্ধু আমার, চেয়েছ যা তুমি এ ভরা বাদল দিনে,
কিছুই তাহার পড়ে না যে চোখে এ আঁধারে পথ চিনে।
নূতনত্বের নাহিক গন্ধ, সেই একঘেয়ে কথা
শুধু মনে পড়ে এ বাদলে ঝড়ে বাড়াইয়া ব্যর্থতা।

ঝকঝকে লেখা—কোথা পাব ভাই, ভিতরে বাহিরে কালো
শ্যাম আষাঢ়ের যে ছায়া পড়েছে, সেথা যে মিলে না আলো

মাটির ধরণী বড়ই পুরাণো, পুরাণো মানবমন,
আরও পুরাণো যে চিরকেলে এই প্রণয়ের ক্রন্দন ;
বিজ্ঞান নহে, নূতন খোরাক জোগাবে যে বারমাস,
মানুষেরই সাথে চিরসাথী তার প্রণয়ের ইতিহাস ;
কবি কালিদাস জেনেশুনে তবু সেই পুরাতনী কথা—
ছন্দে গাঁথিয়া কি করিয়া ভাই লভিল সে অমরতা !
ফাঁকি দিয়ে কবি নাম কিনে গেছে মূর্খের বাঁধা হাটে,
আজিকার দিনে ঐ রদি মাল আর কি কখনও কাটে !
তারই সেই কথা কাগজে তোমার চলিবে না জেনেশুনে,
আষাঢ়ে মেঘের সেই ভিজে তুলো আবার তুলিনু ধুনে।

ভাল নাহি লাগে—টেনে ফেলে দিও ভিজে তোষকের মত
বিষম বর্ষা, তার পরে আর করিও না বিব্রত।

ওদিকে আবার কাজ আছে ঢের, দেখাশুনা তোলাপাড়া ;
জ্বরটুকু গেছে, ঘুমটা ভেঙেছে, গৃহিণীর পাই সাড়া ;
মেঘদূত দেখি—নিষ্ফল নয় ; তাঁহারই রুগ্ন চোখে
পালটি পড়িনু প্রেমের পুরাণ স্তিমিত বর্ষালোকে !
মনে হ'ল যেন, তাঁহারই মাঝারে কাঁদিছে আমার প্রিয়া,
ভাবি, কি উপায়ে ভুলাই তাহারে কোন্ সান্ত্বনা দিয়া।
বুকে রেখে যারে মিলে না স্বস্তি তারেই রেখেছি দূরে,—
সেই কথাটাই আবার শিখিনু পাগ্‌লা কবির সুরে !
—ঐটুকু দুধ—ফেলে রাখ কেন ? অনেক হয়েছে রাত—
ঘুমাও এবারে, ধীরে ধীরে গায়ে বুলাইয়া দিই হাত।

* * *

ঝর ঝর ঝর, ঝম্ ঝম্ ঝম্—আবার নামিল ধারা,
গড় গড় ক'রে মেঘের ডঙ্কা সজোরে দিতেছে সাড়া !
মন হ'তে মনে, প্রাণ হ'তে প্রাণে বহিছে বিজলী বাণী,
প্রেম যেথা আছে, দূরে কিবা কাছে, মনে মনে জানাজানি,
ঘনাইয়া উঠে মেঘের আঁধার বিরহ-অন্ধকারে,
ঝম্‌ঝমে ধারা বাজ্‌না বাজায় ছাদে ও বন্ধ দ্বারে ;
হিয়ার মাঝারে দুরু দুরু ক'রে গুরু গুরু দেয়া ডাকে,
বুকে বুক রাখি অস্থির মন, হায় ! কে বুঝায় কা'কে ?
মিলন বিরহ—দুই যে অসহ, সমান বেদনাভরা—
এ যেন হয়েছে মরণের সাথে দিনরাত ঘর করা !

মিলন

শ্রীঅমূল্যচন্দ্র ঘোষ

মা শিন্-এর বাবা ছিলেন পূর্ব্বতন ব্রহ্মরাজদের মণিপুরী ব্রাহ্মণ রাজ-পুরোহিতের বংশধর; মং টিন ছিল সেনাপতি মহাবান্দুলার বংশোদ্ভূত। শোয়ে দাগোন ফায়ার উচ্চভূমিতে বসে মা শিন্ ছবি আঁকত; ইরাবতীর নির্জ্জন তীরে বসে মং টিন্ কবিতা লিখত। দু-জনের ছিল ভারি ভাব।

তাদের দু-জনের মনের ঐক্য ছিল একটা জায়গায়—সেটা ব্রহ্মদেশের পুরাতন আভিজাত্য। কিন্তু তা ছাড়া দু-জনের প্রকৃতি বিভিন্নমুখী—মা শিন্ ধীর, স্থির, দৃঢ়চেতা; ললাটে ব্রাহ্মণকুমারীর অম্লান গরিমা; মং টিন্ দাম্ভিক, চঞ্চল, উগ্রপ্রকৃতি—বান্দুলা-বংশের উষ্ণ শোণিত শিরায় শিরায় প্রবাহিত।

ব্রহ্মরাজার অধিকার বিলুপ্ত হবার পর এই দুই প্রাচীন বংশ পুরাতন রাজধানী মান্দালয় থেকে এসে নূতন রাজধানী রেঙ্গুনে বসবাস আরম্ভ করেছেন। বহুদিন থেকে পুরুষানুক্রমে এই দুই বংশে সৌহার্দ্দ্য চলে এসেছে; তাই জন্মাবধি মা শিন্-এর সঙ্গে মং টিনের পরিচয়। মং টিন্ চিরকাল দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির; ছেলেবেলা থেকে মা শিন্ তার ছোট-বড় উপদ্রব সহ্য করেছে—বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মং টিনের মা শিন্-এর উপর একটা প্রভুত্বের, একটা অধিকারের ভাব জন্মেছে। মা শিন্ও জন্মাবধি মং টিনের আবদারে অত্যাচারে এতটা অভ্যস্ত হয়ে গেছে, যে, তার অধিকারের দাবিটা নির্ব্বিবাদে স্বীকার ক'রে নিয়েছে।

কিন্তু মেয়ের উপর এতটা প্রভুত্ব ভাল লাগছিল না মা শিন্-এর বাবার। মং টিনের পিতা এখন মৃত—সে এখন মুক্ত ও স্বাধীন। কোন কাজকর্ম্ম করে না। বংশানুক্রমিক বিষয়সম্পত্তির যা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাতেই তার স্বল্প অভাব মিটে যায়। স্বেচ্ছাচারী মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মত সে সমস্ত দিনটা ঘুরে ঘুরে বাঁশি বাজিয়ে কাটিয়ে দেয়। এ রকম একটা নিঃসম্বল ভবঘুরে ছেলের সঙ্গে মেয়ের এতটা মাখামাখি মা শিন্-এর বাবা কোন রকমে সহ্য করতে পারছিলেন না। কিন্তু ভীরুপ্রকৃতি ব্রাহ্মণের দুর্দ্দান্ত তেজস্বী মং টিন্‌কে কোন কথা বলবার সাহস ছিল না। তাই যত রোষ এসে চেপে পড়ত তাঁর এই ধীর প্রকৃতি মেয়েটির উপর। কিশোর বয়সের সঙ্গে সঙ্গে দুই দিকের এই নির্যাতন সয়ে সয়ে মেয়েটিও ক্রমে ক্রমে বয়সের অনুপযোগী গম্ভীর ও স্বল্পভাষী হয়ে পড়ছিল।

একদিন অপরাহ্নে ফায়ার সানুমত ভূমিতে বসে মা শিন্ ছবি আঁকছিল। হঠাৎ পিছন থেকে মং টিন্ এসে তার চোখ টিপে ধরলে।

"আঃ, কি কর, ছাড়, এখুনি বাবা দেখতে পেলে আর রক্ষে থাকবে না।" বলে মা শিন্ তার হাত ছাড়িয়ে দিলে।

রেগে উঠে মং টিন্ বল্‌লে, "আবার বাবার কথা? বুড়োটা যদি ফের তোমার গায়ে হাত দেয় তো তাকে খুন্ ক'রে ফেলব।"

"কি, আমার বাবাকে এমন কথা বল্‌লে? আর তোমার সঙ্গে কথা বল্‌ব না—" সক্রোধে মা শিন্ উঠে দাঁড়াল।

মং টিন্ তার হাত চেপে ধ'রে বল্‌লে, "রাগের মাথায় যা-তা ব'লে ফেলেচি, আমায় মাফ কর ভাই! আর কোনদিন এমন কথা বলব না। তোমার জন্যে কেমন কবিতা লিখে এনেচি, একটিবার দেখ।"

এঞ্জির ভিতর থেকে মং টিন মোড়ক করা একখানা কাগজ বার ক'রে খুলে ফেল্‌লে। দু-জনে বসে তখন কবিতা পড়তে লাগল।

মং টিন লিখেচে—ইরাবতীর তীরে সন্ধ্যার চাঁদ উঠেছে, চাঁদের আলোয় ইরাবতীর জল, ইরাবতীর দুই তীর প্লাবিত হয়ে গেছে। আশেপাশে দুই তীরে সাঁঝের আলো জ্বলে উঠেছে। চাঁদের আলোয় নদীতে সোনার নৌকায় রত্নাসনে বসে রাণী মা শিন্ শোভাযাত্রা করেছেন। তাঁর মাথায়

উপর রত্নের ঝালর দুলছে। পদতলে আবেগভরা দৃষ্টিতে রাণীর প্রেমিক কবি মং টিন্ তাঁর দিকে চেয়ে—রাণীর আঁখি অর্দ্ধোন্মুক্ত, লাস্যভরা মৃদুহাস্যে রাণী কবির দিকে চেয়ে আছেন। সখীরা রাণীর মাথায় চামর ব্যজন করছে, পরিচারকেরা চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে আছে।—শুধু নদীতে সোনার ঝিলিক খেলছে—ময়ূরপঙ্খীর চঞ্চুতে আলো ঠিকরে পড়ছে—এক ঝলক চাঁদের আলো রাণীর মুখে পড়ে তাঁকে স্বর্গের দেবীর মত দেখাচ্ছে।—

"এ ঠিক হয়নি, কবি, তুমি আমার মনের কথা ধরতেই পার নি।" ব'লে মা শিন্ বল্লে, "বরং এম্নি ধারা লিখলে পারতে—

বনের মধ্যে নদীর ধারে একটি ছোট কুটীর। সে কুটীর মং টিন্ ও মা শিনের। গভীর অন্ধকার, কিছুই দেখা যায় না। সেই গাঢ় অন্ধকারে নদীর বুকে ছোট্ট একখানি নৌকায় তারা চলেছে। নদী ফুলে ফুলে উঠছে—কালো জল খল্ খল্ ক'রে চলছে—ঘূর্ণাবর্ত্ত নৌকাকে গ্রাস করতে হাঁ ক'রে আসছে। এমনি সময় হঠাৎ নদী শান্ত হ'ল, আঁধার কেটে গেল, আকাশে ক্ষীণ চন্দ্রের একটু আলো দেখা গেল। সেই আলোতে মং টিন্ ও মা শিন্ তাদের কুটীর দেখতে পেয়ে আকাশের দিকে চেয়ে ভগবানকে প্রণাম করলে।—"

"নাঃ, সে কি হয়? আমি তোমায় যেমন চাই, তেম্নিই লিখেছি; কিন্তু তুমি কি এঁকেচ দেখি?" ব'লে মং টিন্ মা শিনের হাতের কাগজখানা নিয়ে খুলে ফেল্লে।—

দেখলে—পরিখা-তটে দুর্গশিখরে দাঁড়িয়ে তেজস্বী অশ্বপৃষ্ঠে মং টিনের মূর্ত্তি। নিম্নে পদতলে দিগন্তবিস্তারী শ্যামল ক্ষেত্র, দূরে বিসর্পিত গতিতে ইরাবতী এঁকে-বেঁকে চলেছে; উভয় তীরের অট্টালিকাশ্রেণীর শ্বেতশীর্ষ দেখা যাচ্ছে। পশ্চিম আকাশপ্রান্তে সূর্য্য ডুবে যাচ্ছে; তারই সোনালী আলো শ্যাম ধরণীর উপর থেকে আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে। সেই ধূসর অস্পষ্ট আলোর দিকে মং টিন্ চেয়ে আছে—ব্রহ্মের আকাশ থেকে সূর্য্যকে অস্ত যেতে দেখতে দেখতে নয়ন তার অশ্রুযোগে ভরে উঠেছে—অন্তর তার অভিমানে পূর্ণ হয়ে আসছে—বিদ্রোহী চিত্ত বল্গা-ছেঁড়া ঘোড়ার মত ক্ষিপ্র গতিতে ছুটেছে।—কিন্তু আকাশ তবুও অন্ধকার হয়ে আসছে—অস্তমান্ সূর্য্যের শেষরশ্মির এক ঝলক তার কপালে রাজটীকার মত ঝলমল ক'রে উঠেছে।

বেদনাব্যথিত চিত্তে গভীর আগ্রহে ছবি দেখতে দেখতে সোৎসাহে মং টিন ব'লে উঠল—"চমৎকার, চমৎকার এঁকেচ, শিল্পী! আমার মূর্ত্তি তুমি ঠিকই ধরেছ। তোমার ছবিতে ব্রহ্মের মনোবেদনা মূর্ত্ত হয়ে ফুটে উঠেছে—এটা আমি দশ জনকে দেখাবার লোভ সম্বরণ করতে পারছি না, বন্ধু!"

মা শিন্ বল্লে, "আমিও ভেবেচি. ছবিটা ভাল হ'লে এখানকার বাৎসরিক চিত্রপ্রদর্শনীতে দিয়ে দেখব।"

মং টিন্ বল্লে, 'ঠিক, ঠিক, সে ভারি মজা হবে কিন্তু। শেষ হ'লে আমায় দিও। আমি সব বন্দোবস্ত ক'রে দেব।"

কিন্তু এই ছবি নিয়েই তাদের কাল হ'ল। মা শিন্-এর বাবা এই ছবি দেখে মুখ গম্ভীর ক'রে রইলেন। প্রদর্শনীতে ছবি দেখে বাইরের লোকে সবাই যখন একমুখে সুখ্যাতি করতে লাগল, তখন তিনি প্রতিপদেই গভীর বিপদের আশঙ্কা করতে লাগলেন।

তার কিছুদিন পরেই মা শিন্দের ঘরে এক নূতন যুবক অতিথি আসতে লাগলেন। মা শিনের বাবার তাকে আদর-অভ্যর্থনাই বা কত! তাঁর বাবা সমস্ত ব্রহ্মদেশের নামকরা লোক,—অগাধ অর্থসম্পত্তি; ছেলেটিরই বা গুণ কত! সে বিলাত গিয়ে বৎসরখানেক হ'ল মস্ত পণ্ডিত হয়ে ফিরে এসেছে—এখন সে একাধারে উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী এবং ব্যবস্থাপক সভার সভ্য! এ যেন মণিকাঞ্চন-সংযোগ—এর কাছে মং টিন্ কোথায় লাগে! মিঃ বা থ-এর প্রশংসা শুনতে শুনতে মা শিনের কান বধির হয়ে যাবার উপক্রম হ'ল।

বা-থও এখন রোজই তাদের বাড়িতে আসেন—মা শিন্-এর চিত্রবিদ্যার কত প্রশংসা করেন। তার সঙ্গে গল্প করতে তিনি বড় ভালবাসেন—রোজই সন্ধ্যায় হয় বেড়াতে, না হয় থিয়েটারে বায়স্কোপে নিয়ে যান—অনেকক্ষণ ধরে ধরে কত দেশবিদেশের কথা, তার নিজের কৃতিত্বের কথা বলেন। বেচারী মা শিন্ বাপমায়ের মনের ভাব বুঝে কোনো কথা বলতে সাহস করে না—চুপ ক'রে থাকে। আর তিনিও

মৌনই সম্মতির লক্ষণ ভেবে সোৎসাহে অগ্রসর হন। মা শিন্ এখন আর বেরুতে পারে না। প্রাণটা তার হাঁপিয়ে ওঠে।

কিছুদিনের মধ্যেই মং টিন্ ব্যাপারটা বুঝতে পারলে। আগেকার মতই সে মা শিন্দের ঘরে যায়, কিন্তু মা শিন্-এর দেখা সে আর পায় না। যক্ষের মত তার বাবা দরজা আগলে বসে থাকেন। মং টিন্ ঘরে গেলেই তিনি বিব্রত হয়ে পড়েন—তাকে কোন রকমে তাড়াবার জন্যে উস্খুস্ করতে থাকেন। কোন দিন হয়ত বলেন, "মা শিন্-এর অসুখ।" কখনও বলেন, "সে বেড়াতে গেছে।" সে যে অপ্রয়োজনীয়, অনাদৃত অতিথি—এ-কথাটা বুঝতে পেরে অভিমানে ফুলে ওঠে। কোন রকমে শিষ্টাচার রক্ষা ক'রে বেরিয়ে পড়ে। নূতন সহায়ের সাহস পেয়ে মা শিনের বাবা একদিন তাকে বুঝিয়ে বলেই ফেল্লেন, "দেখ, তুমি এখন বড়-সড় হয়েছ, এখন আর তোমার ভবঘুরে হয়ে বেড়ানো উচিত নয়। লোকে কি মনে করে বল দেখি? আগে ভাল হও, বড় হও, তারপরে মা শিনের সঙ্গে দেখা ক'র।"

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে মং টিন্ ফিরে এসে রুদ্ধ আক্রোশে ফুলতে থাকে—কি করেছে সে? যার জন্য আজ এই নূতন উপদেশ? আজকাল মা শিনের, মা শিনের বাবার এসব অদ্ভুত আচরণের কারণ কি?—সে আর মা শিনের বাড়িতে যায় না; কিন্তু তার দেখা না পেয়ে ছটফট করতে থাকে। দিনের মধ্যে অনেক বার নানা অজুহাতে তাদের বাড়ির সামনে দিয়ে চলে যায়। কিন্তু তাদের বাড়িতে আর ঢোকে না। মধ্যে মধ্যে রাস্তার ধারে তাদের বাহির দরজার উপর একখানা মোটর গাড়ী দেখতে পায়—ভাবে এ আবার কে এল?

একদিন সে জনকয়েক বন্ধুর সঙ্গে কোথা থেকে গাড়ী ক'রে ঘরে ফিরচে, সন্ধ্যা হয়ে গিয়েচে, মা শিন্দের বাড়ির রাস্তা ধরেই গাড়ী চলেছে। তাদের বাড়ির কাছাকাছি হতেই দেখতে পেলে সেই মোটরখানা সেখানে এসে থামলো—মোটর থেকে সুবেশধারী এক যুবক বেরিয়ে এসে হাত ধরে এক কিশোরীকে নিয়ে বাড়িতে ঢুকল। ঠিক সেই সময় তাদের গাড়ী সামনের দরজা অতিক্রম করছে—উজ্জ্বল বিদ্যুৎবর্তিকালোক মেয়েটির মুখের উপর পড়েছে। এক লহমায় মং টিন চিনতে পারলে—বিচিত্র সাজ্য সাজে মা শিন্। জলের মত সব সোজা হয়ে গেল, তার মাথা ঘুরতে লাগ্ল।

সে মনে মনে সঙ্কল্প করলে, একবার মা শিন্-এর মুখের কথা সে শুনবেই। কোন রকমে লুকিয়ে লুকিয়ে একদিন তার সঙ্গে দেখা ক'রে বল্লে, "ও বাঁদরটা তোমার কাছে আসে কেন, মা শিন্?"

একটু ম্লান হাসি হেসে মা শিন্ বল্লে, "কেন আসে তা কি বোঝ না?"

"তাহলে তাকে তাড়িয়ে দাও না কেন?"

মা শিন্ বল্লে, "আমি ওকে আনিও নি, তাড়াতেও পারিনে। বাবামায়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি কিছু করতে পারিনে তো?"

"বটে, তুমি পার না? তবে তেমনি মেয়েই তুমি!" কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কক্ষান্তরে বা থ-এর আওয়াজ পাওয়া গেল। মুহূর্তে মং টিন্ মরিয়া হয়ে উঠলো; পারবে না তুমি তাহ'লে—জঘণ্য, বিশ্বাসহন্ত্রী কোথাকার!" ব'লে মা শিনকে একটা প্রচণ্ড ধাক্কা মেরে মং টিন্ সন্ধ্যার আঁধারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

"মাগো!" ব'লে মা শিন্ সশব্দে পড়ে গেল—দরজায় মাথা লেগে ঝন্ঝন্ করে উঠল। "কে রে, কে রে" ব'লে সকলে ত্রস্ত হয়ে ছুটে এল। খানিকক্ষণ পরে মা শিন্ ধীরে ধীরে উঠে বসতেই চারিদিক থেকে প্রশ্নবাণ এসে পড়তে লাগল। "ঘরে কে এসেছিল, কার সঙ্গে কথা বলছিলি, কে মারলে তোকে—" এই সব প্রশ্ন। মা শিন্ কোন কথার জবাব দিল না; শুধু বল্লে, "একটা কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে গিছলাম।"

* * *

গভীর রাত্রে মং টিন বাড়ি চলে গেল। সুপ্ত সিংহ আজ জেগেছে—নারীর অঞ্চলপ্রান্তে সে আর বাঁধা থাকবে না। ছিঃ এত অপদার্থ, এতই হেয়, এত বিশ্বাসঘাতিনী নারী? আর সে এরই মোহে এতদিন প্রলুব্ধ ছিল? মন তার ধিক্কারে ভরে এল।

সামনে কেমেন্দাইনের উন্মুক্ত প্রান্তর দিয়ে চলতে চলতে তার মনে হ'ল—এই সেই প্রান্তর, যেখানে তার পূর্ব্বপুরুষ মহাবীর বান্দুলা অসিহস্তে অমর খ্যাতি অর্জ্জন করেছিলেন। তারই বংশধর সে—তারই রক্ত তার ধমনীতে প্রবাহিত—গৌরবে তার বুক ভরে এল। সেখানকার খানিকটা

মাটি মাথায় দিয়ে সে বল্‌লে, "মহাবীর বান্দুলা, তোমার অযোগ্য বংশধর এতদিন নারীর মোহে আচ্ছন্ন ছিল; আজ তার মোহ কেটে গেছে, দেব! আশীর্ব্বাদ কর যেন তোমার পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে তোমার বংশের উপযুক্ত হ'তে পারি।"

শীতল নৈশবায়ু তা'র সমস্ত দেহে শিহরণ দিয়ে চলে গেল। চোখের উপর বান্দুলার অশরীরী মূর্ত্তি ভেসে উঠ্‌ল—আজ তার নব-জাগরণ! সেই জাগরণের বন্যায় মা শিন্, বা থ—সব ভেসে গেল! তুচ্ছ নারী, তুচ্ছ তার স্বার্থান্বেষী অর্থলোভী পিতা! মং টিন্ এমন একটা কিছু করবে, যাতে পৃথিবী বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে যাবে—তাকে চিরঅমর ক'রে রাখ্‌বে। তার কাছে বা থ তো কীটাণুকীট! আর রাজানুগ্রহভোজী বিদেশী মণিপুরী কুক্কুর! মং টিন্ তোমায় উপযুক্ত প্রতিশোধ দেবে—এর জন্য তার প্রাণ পর্য্যন্ত পণ! প্রাণ তো তার কাছে অতি তুচ্ছ!

মং টিনের গৃহত্যাগ কারও অজ্ঞাত রইল না। মা শিনের বাবা যেন হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচলেন—এখন নিশ্চিন্ত হয়ে পূর্ণোদ্যমে বা থ-এর দিকে মন দিলেন। এখন তাঁর হাসি যেন আর ফুরায় না—যখনই সুযোগ পান, মেয়ের সাম্‌নে মং টিনের নামে বিদ্রূপ করতে ছাড়েন না, আর বা থ-এর সঙ্গে বিয়ে হ'লে মেয়ে যে রাজরাজেশ্বরী হবে, সেটাও আকারে ইঙ্গিতে বল্‌তে কসুর করেন না। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত বা থ-এর সঙ্গে তাঁর কথাবার্ত্তা হয়, হাসাহাসি হয়, শলাপরামর্শ চলে। এমন কি, বা থ অনেক সময় মা শিনের সঙ্গে দেখা করবার সময় পায় না। দেখেশুনে মা শিন্‌ও নির্ব্বাক্ হয়ে গেছে—বিয়ের কথায় 'হাঁ'ও বলে না, 'না'ও বলে না।

শুধু যখন নিষুতি রাতে সকলে ঘুমিয়ে পড়ে, মুক্ত আকাশে তারাগুলো জ্বল্ জ্বল্ করতে থাকে, জানালার ভিতর দিয়ে চাঁদের আলো বিছানায় ছড়িয়ে পড়ে, তখন সে পরিখা-তটে দুর্গশিখরে দণ্ডায়মান মং টিনের ছবির দিকে চেয়ে থাকে, দুই চোখ তার জলে ভরে আসে, চুপি চুপি বলে—"নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন, পাষাণ! কি ক'রে তুমি আমায় ভুলে আছ, প্রাণাধিক? কোথায়, কোন্ অভিমানে চলে গেছ দেবতা?—যাবার আগে একবার বলে গেলে না—শুনে গেলে না, আমি তোমায় কত ভালবাসি?" অভিমানে বুক তার ভ'রে ওঠে, চোখের দুকূল ভাসিয়ে অশ্রুর বন্যা বয়ে যায়—চুম্বনে চুম্বনে ছবি ভিজে ওঠে। তবুও তো প্রিয়তম তার কাতর আহ্বান শোনে না—শরীরী হয়ে এসে দেখা দেয় না—প্রিয়ার নির্যাতন তো তার কানে পৌঁছায় না! সমস্ত রাত্রি ছবিখানা মা শিন্ বুকে ক'রে রেখে ক্লান্ত হয়ে ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঘুমিয়ে পড়ে।

তখন ব্রহ্মে বিদ্রোহভেরী বেজে উঠেছে—সে ভেরীর আহ্বানে আরাবতী, প্রোম, হেন্‌জাদা উন্মত্ত হয়ে ছুটেছে। চঞ্চল চরণে ক্ষিপ্ত নরনারী বিদ্রোহ পতাকাতলে সমবেত হয়েছে। তিন্তিড়ী বৃক্ষতলে তাদের অন্যতম নেতা মং টিন্ নির্ব্বিকারভাবে তাদের দিকে চেয়ে আছে—প্রাণে তার মায়া নেই, ভবিষ্যতের ভয় সে করে না; হিতাহিতজ্ঞানশূন্য। সে এখন মূর্ত্তিমান্ রণদানব। চক্ষে তার হিংস্র শ্বাপদের জ্বালা, বক্ষে তার আসুরিক প্রতিহিংসা। গ্রামের পর গ্রাম দগ্ধ হয়ে গেছে, সহস্র সহস্র লোক মরেছে, অসংখ্য গৃহ সমভূমি হয়ে গেছে—সে নির্ব্বাক্ নেত্রে দেখেছে। কত অসহায়া নারীর পতিকে হত্যা করছে,—কত আতুর বৃদ্ধের একমাত্র পুত্রকে ছিনিয়ে নিচ্ছে—কত বালকবালিকাকে অনাথ, পিতৃহীন করছে—তার পাষাণ হৃদয় একটুও টলছে না। সে যেন একটা উল্কা—খসে পড়বার আগে জ্বলে উঠেছে; একটা ধূমকেতু—চিরবিলীন হবার আগে পৃথিবী ধ্বংস ক'রে যাচ্ছে।

তবুও কি জানি কেন, সময় সময় অজ্ঞাতে তার নয়ন-কোণে অশ্রুসঞ্চার হয়—মা শিনের করুণ মুখখানা চোখের সাম্‌নে ভেসে ওঠে। সমস্ত অন্তর তার বিদ্রোহী হয়—বিতৃষ্ণায় মন ভরে যায়, প্রাণের ভিতর থেকে কে ব'লে ওঠে—"কি করচ, কি করচ, এ ভাল নয়, এ অন্যায়, এ অসঙ্গত।" সারা চিত্ত বাঁধন ছিঁড়ে বেরিয়ে আসবার জন্যে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু, না, এর উপায় নেই। এই তাকে করতে হবে, এই তার জীবন। এই তার জীবনের প্রায়শ্চিত্ত—প্রতিহিংসার পরিণতি—তার পরে, মরণ!

মরণ—মরণই কি?—হাঁ, তাই বটে; সর্ব্বসন্তাপহরণ মরণ! কিন্তু মরবার আগে সে একবার বুড়ো বামনটাকে

দেখে নেবে!—না, কাজ নেই, মা শিনের বাবা সে, তাকে ক্ষমা করছি। আর একবার দেখ্‌তে ইচ্ছা হয়—মা শিনের মুখখানি। সে কি এখনও তাকে মনে করে—তার জন্যে দু-ফোঁটা চোখের জল ফেলে?—এখনও কি সে শোয়ে দাগোনের সেই চাতালটার উপরে বসে মং টিনের ছবি আঁকে—ইরাবতীর ধারে তার প্রিয় জায়গাটিতে বসে প্রিয়তমের অপেক্ষা করে—মুখোমুখী হয়ে সন্ধ্যাকাশে তারা গুণবার প্রতীক্ষায় থাকে—কাজোন্ পূর্ণিমার রাতে ফুলডালি বর্তিকা নিয়ে মন্দিরদ্বারে আমার জন্যে কি তেম্‌নি ভাবে চেয়ে রয়? না, এ ভাবা এখন বাতুলতা, আমি বিদ্রোহী; তার কাছে, সারা জগতের কাছে, আমি ঘৃণিত, আমি মৃত। আমি নরঘাতী, আমি রাজদ্রোহী, দস্যু, পিশাচ! তার পাপের কথা, অপরাধের গুরুত্বের কথা স্মরণ ক'রে সে শিউরে ওঠে! খানিক পরে আবার সে ভাবে—হয়ত তার বিয়ে হয়েচে, স্বামী নিয়ে সুখে ঘর করচে; তার কথা হয়ত ভুলেই গেছে—আহা, সে সুখে থাকুক্, সে ভাল থাকুক্, এই সে চায়। সে তার অদৃষ্টের কুগ্রহ, তার কাছ থেকে সরে যাবে। আহা, তার জন্যে কতই দুঃখ না সে পেয়েছে, কতই নির্যাতন না সয়েছে! এখন সে সুখী হোক্। একটিবার মাত্র দূর থেকে তাকে দেখে সে চিরজন্মের মত বিদায় নেবে। দুই চোখ বেয়ে দু-ফোঁটা অশ্রুজল ঝরে পড়ে। মং টিন্ ত্রস্ত হয়ে হাতের পাতা দিয়ে চোখ মুছে ফেলে!

বছর প্রায় ঘুরে এল। বা থ-এর সঙ্গে মা শিনের বিয়ের কথা পাকাপাকি হ'ল, দিনক্ষণও ঠিক হ'ল। মা শিন্ কিন্তু তেম্‌নি পাষাণ প্রতিমার মত রইল—হাসে না, কাঁদে না, কোন স্ফূর্ত্তির নামগন্ধ তো নেই-ই, খেতে না বল্‌লে খায়ও না। মেয়ে দিন দিন শুকিয়ে কাঠ হ'তে লাগ্‌ল। মা একদিন লক্ষ্য ক'রে মহা ভাবনায় পড়লেন। আজ বাদে কাল মেয়ের বিয়ে—এখন শুকিয়ে শুকিয়ে শোলাকাঠ হচ্ছেন—এ কি মেয়ে, বাপু?

একদিন মেয়েকে জিজ্ঞাসা করলেন, "একি কাণ্ড বল্ তো?"

"কি, মা?"

"আজ বাদে কাল তোর বিয়ে, এখন এমন মন গুমরে চল্‌ছিস্ কেন?"

"কোথায়, কি দেখ্‌লে, মা?"

"মুখে হাসি নেই, কথা নেই, দিন্‌কে দিন বাতাসের আগে পড়ো—কোথায় বিয়ের কথায় স্ফূর্ত্তি হবে!"

"কেন, আমি তো বেশ আছি, মা!"

"বেশ আছ? তা আর আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি না? আমি কি চোখের মাথা খেয়েচি? এখনও সেই ভবঘুরে ডাকাত ছোঁড়াটার জন্যে মন-মরা হয়ে বসে আছ?"

"কা'র কথা বল্‌চ, মা?"

ঝঙ্কার দিয়ে মা বল্‌লেন, "আঃ, নেকী যেন, কিছুই জাননা। মং টিন্ গো, তোমার মং টিনের কথা বল্‌ছি।"

ধীরে মেয়ে উত্তর দিল, "হাঁ, মা, সত্যি বল্‌তে হ'লে তা'র কথা মনে পড়ে বইকি?"

সরোষে মা বল্‌লেন, "তার কথা ভুলে যাও। এমন সোনার চাঁদ ছেলের সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে; হাস, খেল, স্ফূর্ত্তি কর।"

মেয়ে নিরুত্তর।

"কি, আমার কথা শুনতে পেলে না?"

মুখ তুলে মেয়ে বল্‌লে, "ভুলে যাও বল্‌লেই তো ভোলা যায় না, মা?"

"ভোলো, আর নাই ভোলো, তার সঙ্গে তোমার বিয়ে হ'তে পারে না; তা তো তুমি জান?"

"তা জানি, মা।" ব'লে এতদিন পরে আজ হঠাৎ মা শিন্ কেঁদে ফেল্‌লে; বল্‌লে, "কেন বার বার সে কথা আমায় মনে করিয়ে দাও, মা—আমি কি তোমার পেটের মেয়ে নই—আমার ব্যথা কি তোমার লাগে না? আজ তোমরাই তাকে ঘরছাড়া ভবঘুরে, ডাকাত ক'রে তুলেছ।" দুই হাতে মুখ চেপে মা শিন্ ফুপিয়ে কেঁদে উঠ্‌ল—"কি সে তোমাদের করেছিল মা, যে তাকে সর্ব্বস্বত্যাগী করালে; তার মাথা গুঁজবার ঠাঁইটুকু রাখলে না? সে এখন ছন্নছাড়া, পথভ্রান্ত, তার মাথার উপর পুরস্কার দেওয়া হবে—সে এখন পালিয়ে পালিয়ে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে?"

মা আর কথা বলতে পারলেন না; খানিক পরে যাবার উদ্যোগ করলেন; মা শিন্ ততক্ষণে নিজেকে সংযত ক'রে স্বাভাবিক ধীরস্বরে বল্‌ল, "ভয় পেয়ো না, মা; মেয়ের কর্ত্তব্য কাজ তুমি আমার কাছে পাবে!"

মা শিন্-এর যেদিন বিয়ে সেদিন খবর এল, যে, একদল বিদ্রোহী এই দিকে পালিয়ে এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক থেকে সশস্ত্র শাস্ত্রী পাহারা, সিভিল ও মিলিটারী ফৌজ পদব্রজে, অশ্বারোহণে চারিদিকে ছুটল।—শহরকে কেন্দ্র ক'রে দশ-পনর ক্রোশ পরিধি বেষ্টিত স্থান তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজতে আরম্ভ করলে—বনবাদাড় সাফ ক'রে ফেল্‌লে—অলিগলি ছুটোছুটি করতে লাগল সমস্ত শহর কাঁপিয়ে তুল্‌লে। সে কথা অনুভবহীনা কলের পুতলী মা শিনের কানে পৌঁছল না। মা শিনের বাবার কিন্তু অমঙ্গল আশঙ্কায় বুক কাঁপতে লাগ্‌ল; কোন্ বিদ্রোহীর দল এদিকে এসেছে, মং টিন তার মধ্যে আছে কি-না, থাক্‌লে কি হবে, এই সব ভেবে তিনি কেবল "ফায়া" "ফায়া" জপ্‌তে লাগলেন।

বর এসেচে, এইবারে বিয়ে। পুরাতন ব্রহ্মরাজপদ্ধতি অনুসারে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের সমক্ষে কন্যাসম্প্রদান হবে। বাপ্ মেয়ে আন্‌তে গিয়ে দেখলেন, মেয়ে ঘরে নেই। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। চারিদিকে গোলমাল সুরু হ'ল, সকলেই ঘরে ঢুকে এধার-ওধার, আতিপাতি খুঁজতে আরম্ভ করলেন। নীল রঙের চশ্‌মা-পরা, দীর্ঘগুম্ফধারী অপরিচিত-গোছের এক ভদ্রলোক অতি পরিচিতের মত ঘরের সর্ব্বত্র সন্ধান ক'রে একখানা চিঠি বের করলেন। চিঠি মা শিন্-এর। পিতার উদ্দেশে লেখা। চিঠিতে লেখা ছিল—

পরম ভক্তিভাজন পিতা,

আবাল্য যাঁকে স্বামী ব'লে জানি, ধর্ম্মের কাছে তাঁকে ছাড়া আর কাউকে স্বামী ব'লে বরণ করতে পারলাম না; তাই চল্‌লাম। আমায় খুঁজবেন না; কারণ, জীবিতাবস্থায় আর আমার সন্ধান পাবেন না। আমার বাগদত্ত পতি—যাঁকে এ জীবনে বিয়ে করব না বলে আপনাদের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি—তিনি আজ জীবন্মৃত। আজই হোক্, কালই হোক্, ভগবানের ন্যায়ের দণ্ড তাঁর মাথায় পড়বেই। তাই আগে থেকেই মরণের পারে তাঁর প্রতীক্ষায় চল্‌লাম। সকলে আমায় ক্ষমা করবেন।— অভাগিনী মা শিন্

অপরিচিত পুরুষ পত্র পাঠ ক'রে মা শিন্-এর বাবার হাতে দিয়ে চলে গেলেন।

পাষাণের বাঁধ ভাঙল—পিতা কন্যার চিঠি হাতে ক'রে মাথা কুটতে লাগলেন—"ফিরে আয়, ফিরে আয়, মা শিন্; আদরিণী মেয়ে আমার, বড় অভিমানে চলে গেলি, মা? নির্ব্বোধ, অজ্ঞান বাপের চোখ তবু ফুটল না?—ওরে আমার আঁধার ঘরের মাণিক, আমার চোখের মণি, মা আমার, ফিরে আয়, ফিরে আয়!"—

উন্মত্তপ্রায় বৃদ্ধ ছুটে বেরুলেন।

সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক থেকে গণ্ডগোল উঠ্‌ল;—মং টিন, মং টিন ফিরেচে। নদীর ধারের রাস্তা বেয়ে তাকে ছুটে যেতে দেখা গেছে—সশস্ত্র পুলিস তার পিছনে তাড়া করেছে!

মুহূর্ত্তে বা থ উদ্যত হ'য়ে দাঁড়াল—এই তার সুযোগ এসেছে, এই তার উপযুক্ত সময়—এরই জন্যে সে এতদিন প্রতীক্ষা করছিল!—আজ সে নরঘাতক রাজদ্রোহীকে শাস্তি দেবে। আজ তার ব্যর্থ প্রেমের প্রতিহিংসা! উত্তেজনায় তার কপালের শিরাগুলো ফুলে উঠল—চোখ-মুখ লাল হয়ে গেল—প্রতিহিংসায় তার মাথার রক্ত গরম হয়ে উঠল। এঞ্জির পকেট থেকে ক্ষুদ্র একটি পিস্তল বার ক'রে সে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল।

বর্ষারম্ভে ইরাবতী স্ফীতা হয়ে উঠেছে। মং টিনের প্রিয় জায়গাটিতে নদীর বাঁকের কাছে জলস্রোতের প্রান্ত সীমায় এসে মা শিন্ বসে আছে। পরণে তার বিবাহের বেশ—মাথায় মল্লিফুলের মালা—ইরাবতীর কালো জলের দিকে সে নির্নিমেষ নয়নে চেয়ে আছে!

এক-একদিন এমনি সন্ধ্যায় তারা দু-জনে ইরাবতীর তীরে হেসে হেসে বেড়াত—বকুল ফুল নিয়ে মালা গাঁথতো, মং টিন্ তার জন্যে কাগজের নৌকা ক'রে জলে ভাসাত। আর আজ, আজ সে কোথায়?. মৃত্যুর এপারে কি একবার এসে দেখা দেবে না? এঞ্জি থেকে তার বড় আদরের মং টিনের সেই ছবি বার ক'রে বললে—"প্রাণাধিক, এই মূর্ত্তি তোমার, এই তোমার প্রকৃত মূর্ত্তি বলেছিলে। আজ সূর্য্য অস্ত গেছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে তুমিও কি অস্ত গেছ, প্রিয়তম? একটি বার এসে তোমার মা শিন্‌কে দেখা দেবে না? জীবনের এই সন্ধ্যায় মৃত্যুর কুয়াসার পারে—তোমার ললাটের শেষ সূর্য্যালোক কি আর একটি বারের জন্য দেখব না? হায় পথভ্রান্ত, মৃত্যুপথযাত্রী, ক্লান্ত, আশ্রয়হীন, একবার তোমার প্রিয়ার আহ্বানে তার চিরশীতল বুকে এস? সময় যে যায়!"

মা শিন্ উঠে দাঁড়াল; বস্ত্রাভ্যন্তরে কটিদেশ থেকে তীক্ষ্ণধার এক ক্ষুদ্র ছুরিকা বের ক'রে বললে, "আর তো সময় নেই? আমার এই শেষ মুহূর্ত্তে একটিবার তুমি এলে না, প্রিয়তম? শুনে গেলে না, আমি তোমায় কত ভালবাসি? মা শিন্ ছুরিকা তুল্‌ল—সন্ধ্যার অস্পষ্ট ছায়ালোকে শাণিত ফলা বিদ্যুতের মত ঝল্‌মল্ করে উঠল!

"মা শিন্, প্রিয়তমে, আমি এসেছি!" অপরিচিত পুরুষের ছদ্মবেশ ফেলে দিয়ে সহসা মং টিন্ ছুটে এসে তার প্রিয়দেহ জড়িয়ে ধরলে।

"এসেচ, প্রিয়তম, আমার কাতর আহ্বান তোমার কানে পৌছেচে? আঃ," গভীর আরামে শ্রান্ত মা শিনের দেহ মং টিনের বুকে এলিয়ে পড়ল।

"আজ জীবনের পরপারে আমাদের মিলন, মা শিন!" অনতিদূরে অশ্বপদ শব্দ অগ্রসর হ'তে লাগল—"আর কোন ভয় নেই, কারও সাধ্য নেই তোমায় আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারে।"

"গুড়ম্ গুড়ম্,"—বন্দুকের আওয়াজ মুখরিত হয়ে উঠল। শোঁ করে একটা গুলি মং টিনের কানের পাশ দিয়ে চলে গেল। অশ্বপদশব্দ আরও নিকটতর হ'ল; আবার বন্দুক গর্জ্জন ক'রে উঠল!

"মা শিন্, আজ আমাদের রক্তের বাসর! আরও জোরে সে মা শিন্‌কে জড়িয়ে ধরল—তার মাথা ঘুরে উঠল—পদতলে পৃথিবী কাঁপতে লাগল—বুকে অসহ্য যন্ত্রণা বোধ হ'ল—আলিঙ্গনবদ্ধ হাত শিথিল হয়ে এল।

মুহূর্ত্তের জন্য মা শিন্ রক্তাপ্লুত সেই প্রিয় দেহের দিকে চোখ মেলে চাইলে।—

তার নয়নে পলক পড়ছে না—চোখে অশ্রু ঝরছে না—নির্নিমেষ চেয়ে চেয়ে চারিদিক অন্ধকার হয়ে এল—সর্ব্বাঙ্গ অসাড়, অবশ বোধ হ'ল—

কানে পিতার কাতর আহ্বান ক্ষীণ হয়ে ভেসে আসছে—"মা শিন্, কন্যা আমার, ফিরে আয়—ফিরে আয়—"

মসীকৃষ্ণ আঁধারের গায় বা থ-এর প্রেতমূর্ত্তি হিংস্র চোখে চেয়ে আছে।

তারপর—ছিন্নমূল সহকারলতিকার মত আলিঙ্গনবদ্ধ প্রেমিক-প্রেমিকা চিরমিলনের কোলে চলে পড়ল।

ইরাবতী ঘোর নাদে উচ্ছ্বসিতা হয়ে উঠল—কালো জল কলহাস্যে ছুটে এল;

শোকাতুর পিতা, হিংসালোলুপ প্রণয়ী যখন তটপ্রান্তে এসে পৌছলেন, তখন নদী শুধু গভীর উপহাসে কবরীচ্যুত মল্লিফুলের মালা উপহার নিয়ে এল!

কাব্যে ভাব ও শৈলী

শ্রীবিনায়ক সান্যাল

আমাদের দেশের আলঙ্কারিকেরা বলেছেন, "বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্" অথবা "রমণীয়ার্থ প্রতিপাদকঃ শব্দঃ কাব্যম্" বা ঐরকম আর কিছু। অর্থাৎ তাঁরা বলতে চান যে, বাইরের সঙ্গে সংস্পর্শের ফলে আমাদের মনে যে নানা বিচিত্র ভাবের উদয় হয় তাকে সহৃদয় জনের উপাদেয় ও উপভোগ্য ক'রে প্রকাশ করাই সাহিত্য। এরই নাম ভাবের রসে রূপান্তর।

ভাব কেমন ক'রে রস হয়? বিভাব ও অনুভাবের মধ্য দিয়ে সঞ্চারী বা ব্যভিচারী অন্যান্য ভাবের পরিপোষকতায় হয় ভাবের রসে পরিণতি। কাব্যপ্রকাশ বলেছেন—

> "কারণান্যথ কার্য্যাণি সহকারীণি যানি চ
> রত্যাদেঃ স্থায়িনো লোকে তানি চেন্নাট্যকাব্যয়োঃ।
> বিভাবা অনুভাবাশ্চ কথ্যন্তে ব্যভিচারিণঃ
> ব্যক্তঃ স তৈ র্বিভাবাদ্যৈঃ স্থায়ী ভাবো রসঃ স্মৃতঃ।"

অর্থাৎ নাটক এবং কাব্যে রতি প্রভৃতি স্থায়ী ভাবের যে কারণ, কার্য্য ও সহকারী কারণ, তাদের যথাক্রমে

বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী নাম দেওয়া হয় এবং এই বিভাবাদির দ্বারা প্রকাশিত যে স্থায়ী ভাব তার নাম রস।

আমাদের বাইরে যে জগৎ তার সঙ্গে আমরা বিচিত্র সম্বন্ধসূত্রে বাঁধা। আমাদের মনের সঙ্গে তার সংস্পর্শে রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা, বিস্ময়, শম (নির্বেদ) মোটামুটি এই নয়টি এবং আরও অনেকগুলি ভাবের উদ্ভব হয়। এই নয়টি মূলভাবকে বলা হয় স্থায়িভাব, শাখাভাবগুলির নাম সঞ্চারী বা ব্যভিচারী।

এই ভাবগুলি (emotion) কিন্তু লৌকিক, যেহেতু এরা আমাদের মনের বিরাগ-অনুরাগ, কামনা-বেদনার রঙে রঙীন। অর্থাৎ বহির্বিশ্বের সঙ্গে যে স্বার্থের সম্বন্ধে আমরা জড়িত এই বিরাগ-অনুরাগের মূলে স্বার্থের সেই চিরন্তন প্রেরণা। কোন বস্তুকে আমরা ভালবাসি, কোনটিকে বা ঘৃণা করি। কেন? যে সামাজিক রীতি-নীতির আবহাওয়ায় আমরা মানুষ, বাইরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক অনেকটা তারই প্রভাবে গড়ে ওঠে। অর্থাৎ কোনও বস্তুর সহিত আমাদের যে প্রীতি বা অপ্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হয় সামাজিক মানুষের বিশেষ শিক্ষা-দীক্ষা তার জন্য অনেক পরিমাণে দায়ী, তাই ভাল লাগা—না-লাগার আদর্শ দেশে দেশে কালে কালে ভিন্ন।

তবুও কোথায় যেন মানুষের মনের একটা অখণ্ড ঐক্য আছে। ভূগোলের সীমারেখার বাইরে মনের সেই নিভৃত নন্দনে আনন্দের নিত্যলীলা। সেখানে জাতিতে জাতিতে ধনী দরিদ্রে, উচ্চে নীচে প্রভেদ নেই—সকলেই প্রেমের ফাগ অঙ্গে মেখে হোলি খেলায় মেতে ওঠে। এই মণিমঞ্জুষার কুঞ্চিকা আছে কবির কাছে—এই রহস্যলোকের পথ দেখিয়ে দেয় কাব্য। কেমন ক'রে তা বলি।

মনে করুন, আপনার কোন অন্তরঙ্গ বন্ধুর মৃত্যু হয়েছে, আপনি শোকে একান্ত অভিভূত হয়েছেন। এক্ষেত্রে আপনার মনে শোকভাবের মূল বা আলম্বন কারণ বন্ধুর মৃত্যু অথবা বিনষ্ট বন্ধু। এইটি আলম্বন বিভাব। তারপরে তাঁর সৎকার, তাঁর বিয়োগ, তাঁর স্ত্রীপুত্রাদির কাতরতা এইসব উদ্দীপক কারণে শোকভাব ক্রমশঃ তীব্র ও ঘনীভূত হয়ে উঠল; অতএব ঐগুলি উদ্দীপন বিভাব। তারপরে আপনার মনের সঞ্চীয়মান শোক উদ্বেলিত হয়ে দৈব নিন্দা, ভূমিপতন, উচ্ছ্বাস, বিবর্ণতা, রোদন প্রভৃতি নানা বিকার ও প্রকারে অভিব্যক্ত হ'ল; এগুলি হ'ল অনুভাব। অবশেষে এর সঙ্গে নির্বেদ, মোহ, স্মৃতি, গ্লানি জড়তা প্রভৃতি বহু ব্যভিচারী বা শাখাভাব সংযুক্ত হয়ে মূল স্থায়িভাবটিকে পরিপুষ্ট ক'রে তুলল। "তোকৈর্বিভাবৈরুৎপন্নাস্ত এব ব্যভিচারিণঃ" অর্থাৎ স্বল্প বিভাব থেকে উৎপন্ন যে ভাব তাকে বলা হয় ব্যভিচারী মূল—ভাবের পরিপোষণই হ'ল এর কাজ। কারণ আলঙ্কারিকদের মতে পরিপোষ ব্যতীত ভাবের রসত্ব হয় না—"পরিপোষ-রহিতস্য কথং রসত্বম্।" যা হোক্, এই রকমে মূল—ভাবটি ক্রমে এক অপূর্ব্ব প্রপানক রসে রূপান্তরিত হ'ল। কিন্তু এদের বিভাব-অনুভাবাদি সংজ্ঞা দিতে হ'লে এগুলিকে কাব্যনাটকে আরোপিত করা চাই। অর্থাৎ অন্য কথায় কাব্য সংশ্রয়ে এই লৌকিক ভাবগুলিকে অলৌকিক বিভাবত্বে পরিণত করা চাই। বিশ্বজগতের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে আমাদের মনে ক্রমশঃ যে-সকল ভাব উদ্ভূত হয়, **বাসনা বা সংস্কার রূপে** সেগুলি আমাদের স্মৃতির মধ্যে স্থায়ী হয়ে যায়। যখন লৌকিক বিভাব ও অনুভাব কবির রচিত চিত্রে সমর্পিত হয়ে নিখিল অনুরাগীর হৃদয়কে স্পর্শ করে তখনই তারা অলৌকিকত্ব প্রাপ্ত হয় এবং পাঠকের প্রসুপ্ত বাসনায় আঘাত ক'রে রমণীয় ভাবের উদ্বোধন করে।

আলঙ্কারিকেরা স্পষ্টই বলেছেন যে, লৌকিক ভাবগুলি যে-পর্য্যন্ত না অলৌকিকত্ব প্রাপ্ত হয় সে-পর্য্যন্ত তারা কাব্যের বিষয় হ'তে পারে না। কোন বস্তুর লৌকিক সত্তা ও ভাবসত্তা এক জিনিষ নয়। শিল্পী তাঁর কল্পনা বা অন্তঃপ্রেরণার সাহায্যে একটি সম্পূর্ণ নূতন জগৎ সৃষ্টি করেন,—যেখানে ভাবগুলি সকলপ্রকার সম্বন্ধ-নিরপেক্ষ হয়ে সহজ স্বরূপে প্রকাশিত হয়।

"হেতুত্বং শোকহর্ষাদের্গতেভ্যো লোকসংশ্রয়াৎ
শোকহর্ষাদয়ো লোকে জায়ন্তাং নাম লৌকিকাঃ।
অলৌকিক বিভাবত্বং প্রাপ্তেভ্যঃ কাব্যসংশ্রয়াৎ
সুখং সঞ্জায়তে তেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যোঽপীতি কা ক্ষতিঃ॥"

—সাহিত্যদর্পণ

সেইজন্য লৌকিক জগতে শোকহর্ষাদির যে-হেতু তা আমাদের শোক এবং হর্ষই দিয়ে থাকে, কিন্তু মনের মণিকক্ষে সম্বন্ধবিরহিত অবস্থায় তারাই আমাদের অনবচ্ছিন্ন আনন্দের কারণ হয়। সাংসারিক লাভক্ষতির প্রসঙ্গ অসঙ্গত ভাবে যুক্ত থাকে না ব'লে কাব্যের

কল্প-কাননে দুঃখের মৃণালে লাবণ্যের শতদল ফুটে ওঠে। মনুষ্যজীবনে মৃত্যু একটি শোকাবহ বস্তু, মৃতব্যক্তির সহিত আমাদের ব্যক্তিগত অথবা সমাজগত সম্বন্ধ যতই অধিক হয়, মৃত্যুজনিত শোকের মাত্রাও হয় ততই অধিক। কিন্তু সেই মৃত্যু-ঘটনাকে অবলম্বন ক'রে কবি যখন কাব্য রচনা করেন তখন তিনি এই পার্থিব শোককে কল্পরথে অপার্থিব সৌন্দর্য্যধামে নিয়ে যান, তাই করুণরসাত্মক কাব্য পড়েও আমরা দুঃখিত না হয়ে হই আনন্দিত। উৎকট শারীরিক যন্ত্রণার অভিব্যক্তিও যে সুন্দর ও আনন্দময় হ'তে পারে তার উদাহরণ মাইকেল এঞ্জিলোর Dawn বা "উষা" ছবিখানি। মদিরারস-বিহ্বল পাশবিকতাও যে মনোগ্রাহী হ'তে পারে তার জলন্ত দৃষ্টান্ত কবি বর্ণসের "Jolly Beggers," পরলোকের পথে যে চলে গেছে সে জীবিত থাক্‌লে ব্যক্তি ও সমাজগত কোন সুবিধা অসুবিধা হ'ত কি-না এ মাপকাঠি দিয়ে শিল্পের বিচার করা চলে না, আর করলেও সেই অকরুণ বিচারপ্রক্রিয়া প্রতিপাদ্য করুণ রসের চেয়ে নিতান্ত কম করুণ হয়ে ওঠে না। মনে রাখতে হবে কাব্যের আনন্দও লোকোত্তর আনন্দ। লটারীতে লাখ টাকা পাওয়া গিয়েছে শুনলে কার না আনন্দ হয়? তাহলে এই অভাবিত অর্থপ্রাপ্তির ব্যাপারকেও কি বল্‌তে হবে কাব্য? না, সাংসারিক লাভ-লোকসানের বুদ্ধি থেকে উদ্ভূত যে আহ্লাদ তার অলৌকিকতা কোথায়? 'ধীজনস্য আহ্লাদস্য ন লোকোত্তরত্বম্।' প্রয়োজনে আনন্দ নেই—তাই সে অসুন্দর; অভাবের ঘরে রসদ জোগানই যে তার কাজ। প্রয়োজনের অতীত যা তাই ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্যে মহীয়ান—সুন্দরের মন্দিরে তাই সহৃদয়জনের আনন্দময় পরিচয়পত্র!

তবেই দেখা গেল বিভাবের সাহায্যে বাসনারূপে অবস্থিত রতি প্রভৃতি স্থায়িভাব রস অথবা রসাস্বাদনের অঙ্কুর অবস্থায় উপনীত হয়। অর্থাৎ একে বলা যেতে পারে তথ্যের সত্যে রূপান্তর। কোন্ কুহক এই অসাধ্য সাধন করে? কবিপ্রেরণা বা কল্পনা। বুদ্ধির দিক থেকে বিচার-বিমর্শের সাহায্যে বহির্জগৎ (আমাদের আত্মকেন্দ্রের বাহিরে যে জগৎ) থেকে আমরা পাই সত্যের সন্ধান—অনন্ত কার্য্যকারণ-পরম্পরার শৃঙ্খলে বাঁধা যে সত্য তাকে আমরা লাভ করি অবিমিশ্র বিচারবুদ্ধির সহায়তায়। কিন্তু দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক আজীবন সাধন ক'রেও যে সত্য বস্তুর সন্ধান পান না, কবি অন্তঃপ্রেরণার বলে চকিতে প্রবুদ্ধসম্বিতে সেই শাশ্বত সত্যের সাক্ষাৎ লাভ করেন। এই অন্তঃপ্রেরণাকে (intuition) কাণ্ট বলেছেন তর্কবুদ্ধির অতীত বিচারশক্তি যা কামনাবিহীন হয়েও আনন্দ দান করে। এই আনন্দকে 'সাহিত্যদর্পণ'কার তুলনা করেছেন ব্রহ্মাস্বাদের আনন্দের সঙ্গে। অপূর্ণ প্রকৃতির মধ্যে যে পরিপূর্ণতার ব্যঞ্জনা রয়েছে—পরিচ্ছিন্ন বিশ্বলয়ের মধ্যে সম্পূর্ণ সঙ্গীতের যে অভ্রান্ত ইঙ্গিত রয়েছে কবি-মনে তার অনির্বচনীয় সুষমাটুকু ধরা পড়েই। বুদ্ধির দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে যা সত্য, আত্মসাধনার ক্ষেত্রে যা কল্যাণ, কবিকল্পনার দিক থেকে তাই আবার সুন্দর। তাই ইউরোপে প্লেটো ও ভারতে পুণ্যতপা ঋষিরা পুনঃপুনঃ ঘোষণা করেছেন এই সত্যশিবসুন্দরের বাণী। আনন্দময় সত্যের অপর নাম সুন্দর—হৃদয়ের কাজ আনন্দ দান ও আনন্দ গ্রহণ। কবি দেখেন হৃদয় দিয়ে—তাই কবির স্বপ্নলব্ধ সত্য হয় সুন্দর। কীটস্‌ও তাঁর Grecian Urn কবিতায় অনেকটা এই ভাবেরই ইঙ্গিত করেছেন।

কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ কাব্যের সূত্র দিয়েছেন emotion recollected in tranquillity। আবেগের প্রথম মুহূর্ত্তে যখন মনের ওপর কেবল এসে লেগেছে ভাবের একটা প্রকাণ্ড ধাক্কা (আলঙ্কারিকদের মতে উদ্দীপনা) তখন প্রকাশ সম্ভব নয়, কেন-না সেটা আত্মপ্রকাশের পূর্ব্বে ব্যাকুলতার অবস্থা। সংবেদনার পরে যখন ঐ ভাব সম্বন্ধে সম্বিৎ জেগে ওঠে, অর্থাৎ আবেগময় অস্ফুট ভাবকোরক যখন মনোলোকে (imagination) সৌন্দর্য্যময় প্রফুল্ল প্রসূনে রূপান্বিত হয়, বহিঃপ্রকাশের প্রসঙ্গ আসে তখনই। অন্তঃপ্রেরণাবলে কবি সুন্দরকে লাভ করেন, বহিঃপ্রকাশের কুশলতায় তাকে সহৃদয়জনের হৃদয়সংবেদ্য ক'রে তোলেন, ভাবকে রসে পরিণত করেন। নূতন মৃৎপাত্রের যে প্রচ্ছন্ন মৃদু সৌরভ আছে তা যেমন তাতে জল না ঢাল্‌লে বোঝা যায় না, সেই রকম সহৃদয় জনের হৃদয়ে রতি প্রভৃতি অব্যক্ত অবস্থায় বর্ত্তমান থাকে,—কাব্যপাঠ অথবা শ্রবণে মনের সেই রুদ্ধ উৎস সহসা মুক্ত হয়ে যায়—প্রাণে অপূর্ব্ব সৌরভ তরঙ্গিত হয়ে ওঠে। এই অবস্থায় ভাব রসরূপ লাভ করে। কারণ, 'আস্বাদ্যতে ইতি রসঃ'—ভাবের আস্বাদিত অবস্থার নামই

রস—অনাস্বাদিত ভাবকে 'রস' সংজ্ঞা দেওয়া যায় না, কিন্তু প্রকাশ আরম্ভ হয় আনন্দসম্বিতের অবস্থায় (conscious) এবং কবি স্মৃতি থেকে উদ্ধার করে সেই আবেগময় সান্দ্র মুহূর্তের অপরূপ আলেখ্যখানি আমাদের মনের সামনে ধরে দেন। এই যে শক্তি যার বলে কবি অন্তঃপ্রেরণা দ্বারা উপলব্ধ যে সত্য তাকে সময়ান্তরে স্মৃতি থেকে উদ্ধার করেন, তারই নাম দিয়েছেন কোল্‌রিজ 'গৌণ কল্পনা'।

Aesthetic experience, আলঙ্কারিকরা যাকে বলেছেন 'ভাব', যদি হয় শিল্পের প্রধান উপাদান তবে সেই ভাবের "সাধারণীকরণ" হ'ল তার প্রাণ—'ব্যাপারোঽস্তি বিভাদের্ণাম্না সাধারণীকৃতিঃ'—অর্থাৎ এককথায় যে-পর্য্যন্ত ভাব রসে রূপান্বিত বা প্রপানক অবস্থায় উপনীত না হচ্ছে সে-পর্য্যন্ত তাকে শিল্পকাব্য বলা চলে না। কারণ ভাবের উন্মেষের পূর্ব্বে যে অন্তঃপ্রেরণা সেটা হ'ল কবি বা শিল্পীর একান্ত নিজস্ব—তার সঙ্গে সহৃদয় জনের সংবেদনা বিন্দুমাত্র নেই। কিন্তু কেবল কবিমনের ভাব-কল্পনায় তো কাব্যের সৃষ্টি হয় না—হয় সেই কল্পনাকে আস্বাদ্যমান রূপ দেওয়াতে। অন্য কথায় রসানুষিক্ত না হ'লে কোন বাক্যই কাব্য হয় না, শব্দ রমণীয়ার্থ প্রতিপাদক না হ'লে কাব্যহিসাবে গণ্য নয়। এই যে বহিঃপ্রকাশ এর পূর্ব্বে আত্মপ্রকাশ (অনুভাব) বলেও একটা বস্তু আছে। আবেগতরঙ্গের গভীর আঘাত যখন হৃদয়-উপকূলে প্রথম এসে লাগে তখন সেই, আলোড়নের (overflow) মধ্যে অস্ফুটতার আভাস আছে। উপলব্ধির ব্যাকুলতা আছে, কিন্তু সম্পূর্ণতার আনন্দ নেই। আমাদের মনেও কোন ভাব ঠিকমত অনুভূত হয় না যতক্ষণ না সেই ভাবের পূর্ণমূর্ত্তিখানি আমাদের মনের পটে আঁকা হয়ে যায়—মানসপটের এই চিত্র অশরীরী—এই মূর্ত্তি—ভাবমূর্ত্তি।—

"ন ভাবহীনোঽস্তি রসো ন ভাবো রসবর্জ্জিতঃ"—নাট্যশাস্ত্র

বাস্তবিক ভাববর্জ্জিত রস অথবা রসবর্জ্জিত ভাবের কল্পনা অসম্ভব। অস্ফুট আবেগের চিন্ময় প্রকাশই তো ভাব। চিন্ময় ভাবকে বাঙ্ময় রসে অভিব্যক্ত করলে হয় কাব্য। কিন্তু পূর্ব্বসিদ্ধ বস্তুই কেবল ব্যক্ত হ'তে পারে—যেমন, প্রদীপের আলোয় আগে হ'তে আছে যে জিনিষ তারই প্রকাশ সম্ভব রসও পূর্ব্বসিদ্ধ। ভাব যে কবিমনে অলৌকিকরূপে আস্বাদিত সে-বিষয়ে সন্দেহ কি?

আর এক কথা, কবির মনোভাব সকলের হয় কেমন ক'রে? দুষ্মন্ত-শকুন্তলার প্রেম, যক্ষের বিরহ নিখিলমানুষের চিত্তে স্পন্দন আনে কেন? স্থায়ী ভাব যেখানে আছে সেখানেই বীজাঙ্কুর ন্যায়ে রসের সম্ভাবনা ধরে নিতে হবে। স্থায়ী অর্থাৎ মূল ভাবগুলি বা তার কোন কোনটি বাসনা বা সংস্কাররূপে প্রত্যেক মানুষের মনে বিরাজ করে। সেই মগ্ন চৈতন্যের অবস্থাকে ধ্বনি, সুর বা রঙের আঘাত দিয়ে জাগিয়ে তোলাই শিল্পের কাজ (প্রকাশ)। সেইজন্য সহৃদয় জন ভিন্ন অন্য কেউ রসের আস্বাদনে সমর্থ নয়। রবীন্দ্রনাথের নানা বয়সের নানা ভাবের রচনা ভিন্ন ভিন্ন লোককে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আঘাত করে; রতি পর্য্যন্ত যার দৌড় সে শৃঙ্গার-রসাত্মক কাব্যগুলি পড়ে আনন্দ পায়, অধ্যাত্ম অনুভূতির দ্যোতক গীতাঞ্জলির কবিতাগুলি তার অন্তরকে স্পর্শ করে না। অনেকে এমন কথাও বলে থাকেন, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার যে-বিকাশ তাঁর যৌবনের লেখা কাব্যগুলিতে দেখা গিয়েছে—গীতাঞ্জলি ও তৎপরবর্ত্তী কোন কাব্যের ভিতরই তা আর ফিরে পাওয়া গেল না; অথচ রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এবং শান্তরস-পিপাসু পাঠকমাত্রেই ঐগুলিকেই তাঁর কাব্যগগনের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক ব'লে মনে করেন। তবেই দেখা যায়, সহৃদয় হ'লে বাসনাপরায়ণ হওয়া চাই। আইনস্টাইনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কথোপকথনে এক জায়গায় জার্ম্মান মনীষী বলছেন—'ভাবের বস্তুকে ঠিক বিশ্লেষণ ক'রে বোঝান কঠিন। ঐ যে লালফুলটি আপনার টেবিলের ওপর দেখছি ওটা হয়ত আমার এবং আপনার কাছে এক বস্তু নয়।" কবি উত্তর করলেন—"হাঁ, কিন্তু তবুও আশ্চর্য্য এই যে ব্যক্তিগত রুচি বিশ্বজনীন রুচির মধ্যে অহরহ লীন হয়ে যাচ্ছে।"

কথাটা দাঁড়াল এই রকম।—লালফুলটি আমি দেখলাম সম্পূর্ণ আমার দৃষ্টি দিয়ে, অর্থাৎ ফুলটি আমার মনে ব্যঞ্জনার দ্বারা যে ভাবটি জাগিয়ে তুলল অপরের মনে হয়ত ঠিক সেই ভাবটি জাগাতে পারেনি। ফুলের সংস্পর্শে এসে আমার কল্পকাননে যে ভাবকুসুম ফুটে উঠল তারই অতীন্দ্রিয় সুষমাটুকু রসজ্ঞের সামনে মনোজ্ঞরূপে ধরে দেওয়াই তো কাব্য। কিন্তু যে-ভাব আমার সম্পূর্ণ নিজস্ব আবেগের পরিণতি তা সহৃদয় মাত্রেরই

উপভোগ্য হয় কি কারণে? যা একান্ত ব্যক্তিগত (personal) তা-ই সর্ব্বসম্মত হয় কোন্ মায়ায়? এর উত্তরে আলঙ্কারিকেরা বলেন, "বাসনা" (দরদ) যাদের আছে, ব্যঞ্জনার দ্বারা অনুভবের শক্তিও আছে তাদের, রূপদক্ষের আলেখ্যে এই ব্যঞ্জনা থাকে প্রচুর। দুষ্মন্ত শকুন্তলার যে প্রেম, ব্যঞ্জনার দ্বারা তা আমার নিজস্ব হয়ে যায়—বিশেষ বিভাব সামান্য বিভাবে পরিণত হয়। যখন নাট্যালয়ে শকুন্তলার অভিনয় দেখি তখন আমার যদি এই বোধ থাকে যে, আমি অন্যের প্রণয়ের চিত্র দেখচি তাহ'লে তা থেকে আনন্দের চেয়ে লজ্জা পাওয়ার কথাই বেশী। তাহ'লে ব্যঞ্জনা হ'ল চারুশিল্পের সেই অবাচ্য শক্তি যা ব্যক্তিগত আনন্দ বেদনাকে বিশ্বের সকাশে অনায়াসে প্রকাশ করতে পারে। যা পাঠকের মনে এই ভাব জাগাতে পারে—'পরস্য ন পরস্যেতি মমেতি ন মমেতি চ'—পরের অথচ ঠিক পরের নয় আমার অথচ ঠিক আমার নয়। কোল্‌রিজ একে বলেছেন "willing suspension of unbelief," কিন্তু কোন কিছুকে পরিহার করা যায় যদি সেটা পূর্ব্ব থেকেই বর্ত্তমান থাকে। আসলে অভিনয় জিনিষটাকে আমরা বিশ্বাসও করি না, অবিশ্বাসও করি না। শিল্পের ক্ষেত্রে বাস্তব অবাস্তবের প্রশ্নই অবান্তর। এই ব্যঞ্জনাকেই কেউ বলেছেন, "communication" কেউ-বা "contagion." শকুন্তলার দর্শনে দুষ্মন্তের অনুরাগ পরিমিত হওয়াই সম্ভব, কিন্তু কাব্য-নাটকে আরোপিত সেই ভাব জনে জনে সঞ্চারিত হয়ে সীমাহীন অপরূপতা লাভ করে। এই কারণেই রসকে বলা হয় অলৌকিক। প্রথম উদ্দীপনার সময়ে যা থাকে একান্ত ব্যক্তিগত, ভাবপরিণতির কালে তাই হয় সম্বন্ধবিরহিত, শাশ্বত ও অমেয়। ইউরোপীয় মনীষীরা বলেন আবেগকে সম্বন্ধবিচ্ছিন্ন, কামনাশূন্যরূপে কল্পনা করলে হয় ভাবের উৎপত্তি, তারই অপর নাম সৌন্দর্য্য—নিঃস্বার্থ বা নৈর্ব্যক্তিক আনন্দ। যে জিনিষ কামগন্ধশূন্য (disinterested) তা সহজেই সকলের গ্রহণীয় হয়। কারও মাতা, কন্যা, বধূ নয় বলেই উর্ব্বশী বিশ্বের প্রেয়সী।

'সাহিত্য-দর্পণ'কার বলেছেন—'রস্যমানতামাত্রসারত্বাৎ প্রকাশ শরীরাৎ অনন্য এব হি রসঃ' অর্থাৎ আস্বাদ অথবা চর্ব্বণাই সার অথবা সামাজিকজনের উপাদেয়তার কারণ

হওয়াতে সংবিৎস্বরূপ থেকে জ্ঞানরূপতা প্রাপ্ত যে রত্যাদিভাব তাই হ'ল রস। আনন্দচমৎকার সম্বলিত ভাব সামাজিকজনের উপাদেয় হয় বলেই তাকে বলা হয় রস। এখানে প্রকাশ শরীরের অর্থ করা হয়েছে সংবিৎ স্বরূপ থেকে জ্ঞানরূপ লাভ করেছে যে রতি প্রভৃতি ভাব; তা হ'লে বিশ্বনাথের মতে কাব্যের প্রকাশ একটা conscious activity. যে-বিভাবাদি কারণের কার্য্য হ'ল ভাব সেইগুলি অবচেতন মনের স্বতঃপ্রবর্ত্তিত ক্রিয়া হলেও প্রকাশের পূর্ব্বে ভাবের অবস্থায় তারা সংবিৎ অথবা চেতনার স্তরে এসে দাঁড়ায়। এই চেতনার অভাবে ভাব কিছুতেই রস্যমান অবস্থায় পৌছতে পারে না। ভাবটিকে কোন রূপ-মায়া দিয়ে প্রকাশ করলে, ধ্বনিতরঙ্গের কোন্ আঘাত দিলে দরদীজনের মনের তারে সহজেই তা'র ঝঙ্কার উঠবে ঐন্দ্রজালিক কবি সে রহস্য ভাল ক'রেই জানেন। সত্যই "মূল্যহীনেরে সোণা করিবার পরশপাথর হাতে আছে" একমাত্র কবির।

কাব্যের কতটুকু ভাব (emotion) আর কতটুকুই বা তা'র প্রকাশ এর আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখি এর মধ্যে প্রকাশের অংশই বেশী। কেবল প্রথম উদ্দীপনার আবেগ ছাড়া এর সবটাই প্রকাশ। রস যদি কাব্যের প্রাণ হয় তাহ'লে বলতে হয় শিল্প প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। বাস্তবিক বাসনারূপে ভাব তো সকলের মনেই বিরাজিত, তাকে বাস্তবতার ঊর্দ্ধে অলৌকিকের রাজ্যেও নিয়ে যান হয়ত অনেকে, কিন্তু তাঁদের ত আমরা কবি বা শিল্পী বলি না। কবি তিনি যাঁর ইন্দ্রজালে মনঃকল্পিত (intuitively realized) ভাব কথাশরীর নিয়ে রসের উদ্বোধন করে। যিনি লৌকিক মূর্ত্তির (image) সাহায্যে অলৌকিকের ব্যঞ্জনা করেন—যিনি পার্থিব বস্তুর উপর সেই অপার্থিব আলোকপাত করেন যা আকাশে-বাতাসে কোথাও নাই—আছে কেবল ধ্যানের গহনতায় তিনিই কবি—রূপের রাজ্যে অরূপের পূজারী তিনি। প্যারসের মর্ম্মরস্তূপ যখন ফিডিয়সের মায়াদণ্ডের স্পর্শে সঞ্জীবিত ও রূপান্বিত হয়ে ওঠে তখনই জন্ম হয় কাব্যের। মূক প্রকৃতির অন্ধ অনুকরণ কখনই কাব্য হ'তে পারে না। এরিষ্টটল-এর 'imitation' আসলে অনুকরণ নয়—অনুকীর্ত্তন বা সঞ্জীবন (expression)। লৌকিককে আদর্শ সম্ভাবনার রাজ্যে নিয়ে গিয়ে শব্দচিত্র

দিয়ে তার ব্যঞ্জনামূলক অভিব্যক্তি। শিল্পে বাস্তবতা অথবা অনুকৃতির স্থান নেই। কাব্যে সঙ্গীতে শিল্পে পরিচিতের প্রত্যাশা কেউ করে না। "What we are"-এর প্রবেশ নিষেধ সেখানে—কবির কল্পরথ ছাড়া সেই অপরূপের রাজ্যে আর কে নিয়ে যেতে পারে?

এখন বিচার্য্য হচ্ছে—যা একান্ত মনের জিনিষ, যা অলৌকিক, তা লৌকিক রূপ দিয়ে বাঞ্জিত হয় কেমন করে? কবি বা শিল্পী উপলব্ধ ভাবের দ্যোতক এমন একটি প্রতীক সৃষ্টি করেন, শব্দে সুরে, রঙে-রেখায় যেটা তার প্রতীয়মান যে অর্থ তাকে অতিক্রম ক'রে নিগূঢ় ব্যঙ্গ্যার্থের ইঙ্গিত করে অর্থাৎ কবি প্রতীকের সাহায্যে এমন একটা ঘটনা (occasion) সৃষ্টি করেন যা পাঠক বা দর্শকের চিত্তে আঘাত ক'রে কবিচিত্তের অনুরূপ ভাবের উদ্‌বোধ করতে পারে। এই প্রতীককে (image) ধারণ ক'রে আছে আবার ভাষা,—ছন্দোময় ধ্বনিময় অপার্থিব সুর। কবি প্রাতে উঠে দেখলেন আকাশ-বাতাস কেমন যেন উদাস, কেমন অশ্রুভারাতুর—তাঁর মনে হ'ল পাখীদের কলগানে যেন অশ্রুবাষ্পের রেশ রয়েছে—বিশ্বসঙ্গীতের সঙ্গোপনে কোথায় যেন অনন্ত বিরহের ইঙ্গিত। বহির্বিশ্ব থেকে উদ্দীপিত হয়ে কবি চলে গেলেন কল্পনার রাজ্যে যেখানে তাঁর বিরহ নিখিল-বিরহের সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে গেল—সমস্ত আবেগ শান্ত হয়ে গেল। তখন তাঁর চেষ্টা হ'ল এই বিশ্ব-বিরহের ভাবটিকে ভাষারূপ দিয়ে ভক্তের হৃদয়ে জাগিয়ে তুল্‌তে। যে পরিমাণে যে-রচনা ব্যঞ্জনাদ্বারা অতীন্দ্রিয়ের ইঙ্গিত আন্‌তে পারে—ভাষার পথে ভাষাতীতের আভাষ দিতে পারে সেই পরিমাণে তা সার্থক, সুন্দর ও দরদীজনের হৃদয় সংবাদী হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিরহের আর্ত্তি এইভাবে প্রকাশ করলেন—

"কোন্ গুণী আজ উদাসপ্রাতে
মীড় দিয়েছে কোন্ বীণাতে গো,
ঘরে যে আর রইতে পারিনে।"

অথবা

"পথের হাওয়ায় কি সুর বাজে,
বাজে আমার বুকের মাঝে,
বাজে বেদনায়—আমার ঘরে থাকাই দায়।"

"ঘরে যে আর রইতে পারিনে", "আমার ঘরে থাকাই দায়"—এই কথাগুলি দিয়ে কবি আমাদের মনোলোকের রুদ্ধ দুয়ার খুলে দিয়েছেন, এদের যে বাচ্যার্থ তাকে বহুগুণে অতিক্রম ক'রে একটু অন্তর্গূঢ় বেদনার ব্যঞ্জনা করেছেন। বিরহব্যাকুলতা—'ঘরে যে আর রইতে পারিনে" এই চিত্রটির (image) মধ্যে মূর্ত্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। প্রকাশের অর্থ কবিমনের সমগ্র ভাবটির প্রতিলিপি দেওয়া নয় সহৃদয়জনের রুদ্ধ বাসনাকে বিশেষ একটি প্রতীক দিয়ে আঘাত ক'রে জাগিয়ে তোলা। 'প্রকাশ' মানেই হ'ল 'প্রচার'। শিল্পসৃষ্টির মধ্যে কবি দেন এমন কিছু যা আমরা কেবল অনুভব করতে পারি, সম্পূর্ণ অনুভূতিটিকেই প্রকাশ করা কখনই সম্ভব নয়। কবি নিজে কোন একটি অনুরোধের দ্বারা উদ্‌বুদ্ধ হন সত্য, কিন্তু এটিকে যথাযথভাবে রূপান্বিত করা অসম্ভব। সেই জন্য শিল্পীকে ভাবপ্রকাশের জন্য প্রতীকের (medium) সাহায্য নিতে হয়। এই প্রতীকের মধ্যবর্ত্তিতায় লেখক ও পাঠকের মনে অনির্ব্বচনীয়ের বাণী-বিনিময় হয়ে যায়। কাব্যের ঈথরপথে ভাবের তড়িত্তরঙ্গ রসজ্ঞের চিত্ততটে আহত হয়ে রসের স্রোতে উথলে ওঠে। কবি যে চারুচিত্র পাঠকের সামনে ধরেন সেটা পূর্ব্বাপর অনুভূতির রশ্মিপাতে সমুজ্জ্বল—আবেগের অশ্রুজলে ব্যাকুল। প্রথমটা মনে হ'তে পারে ভাব ও চিত্র এরা দুটো স্বতন্ত্র বস্তু, কিন্তু আসলে তা নয়। প্রকাশের পূর্ব্বে এই অশরীরী অনুভূতিই কবির মনের পটে রূপের রেখায় আঁকা হয়ে যায়—ভাবময় রূপ, রসময় অপরূপতায় মিলিয়ে যায়। কাব্য কেবল রূপ অথবা কেবল সংবেদনা, অথবা ঐ দুয়ের সমষ্টি নয়—শান্ত ও সমাহিত মনে ভাব বা আবেগের অনুধ্যান।

বিভাব ভাবের উদ্দীপক (exciting cause)। একটি সুন্দর সুকুমার গোলাপফুল দেখলাম, তার সুষমা ও সৌরভ ইন্দ্রিয়পথে প্রবেশ ক'রে আমার সমস্ত অন্তরিন্দ্রিয়কে বিবশ ক'রে দিল। এই রকম ক'রে রূপরসশব্দস্পর্শগন্ধ আমাদের ইন্দ্রিয়পথে প্রবেশ ক'রে আমাদের মনের পটে রং ফিরিয়ে দেয়। তখন আমরা চোখে দেখি না, কানে শুনি না, মন দিয়ে সব দেখি শুনি। বহির্বিশ্ব থেকে যে-সব ইন্দ্রিয়ানুভূতি আমরা পাই মনের মধ্য দিয়েই তা আমাদের প্রাণকে স্পর্শ করে। কবির একটিমাত্র ইন্দ্রিয় আছে, সেটি হ'ল তাঁর মন। তাই তিনি সময়-সময় চোখ দিয়ে শোনেন এবং

কান দিয়েও দেখেন। তাই তিনি আকাশকে দেখেন বীণার মত, আর রবিরশ্মিগুলি তাঁর কাছে সেই বীণার তন্ত্রী। আঘাত যখন লাগল, মনে যখন জাগল, বাঁধন ভাঙার গান উঠল বেজে; তখন পাগলা ঝোরার সেই উপচে-পড়া দিশাহারা ধারার মধ্যে আছে কেবল আবেগ— আছে উন্মাদনা, আছে নটরাজের নৃত্যবিক্ষোভ; সেই বিক্ষোভে হয় কায়িক ও মায়িকের বিনাশ, প্রলয়ের পরে জাগে সৃষ্টি, বিরূপকে পাই আমরা অপরূপ রূপে। ছড়িয়ে পড়া আবেগগুলি যখন সমাহিত হয়ে আসে তখনই জন্ম হয় ভাবের (emotions)। এই ভাবের সঙ্গে আছে 'আবিঃ' অর্থাৎ প্রকাশ (significant expression), আলঙ্কারিকের ভাষায় যাকে বলা হয় 'অনুভাব'। কবির মানস-সরে বিভাবাদির বিচিত্রদলে ফুটে উঠে এই ভাবের পদ্ম। কবি যখন বলেন আমার প্রেম একটি রক্তবর্ণ গোলাপের মত— বীণার তারে ঝঙ্কৃত একটি রাগিণীর মত, তখন এটাকে কবির খেয়াল বা পাগলের প্রলাপ ব'লে উড়িয়ে দেবার কিছুই নেই। আগেই বলেছি কবি দেখেন মন দিয়ে; বর্ণগন্ধ তাঁর মনোলোকে— কেবল বর্ণগন্ধমাত্রই নয় তারা এক একটি বিশেষ ভাবের প্রতীক। প্রতীক মনে হলেই ভাবের কথ মনে আসে, ভাব জাগলে প্রতীকও দূরে থাকে না; তাই কবির হৃদয়ে ভাবে ও অনুভাবে এমন মাখামাখি স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের এমন অপূর্ব্ব সঙ্গম।

আর্ট আমাদের সমগ্র অনুভূতির চিত্র এবং সেই অনুভূতি কতকগুলি বস্তুগত ও ভাবগত উপাদানের সমষ্টি। মনে করুন, একটি লাল ফুল দেখা গেল, সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে একটা ইন্দ্রিয়ানুভূতি জাগল। অবশ্য এই ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও (sensation) অন্যনিরপেক্ষ নয়; লাল বল্‌তেই মনে হয় এটা শাদা হল্‌দে সবুজ বা অন্য কোনও রং নয়, লালই। এই রং সম্বন্ধে আমাদের যে ইন্দ্রিয়ানুভূতি প্রতীক হিসাবে তার নাম দেওয়া গেল লাল। কিন্তু লাল সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়গোচরতা এবং সংবেদনা ত এক জিনিষ নয়, প্রথমটি দ্বিতীয়টির সামান্য অংশ মাত্র। সুতরাং 'লাল' এই সংবেদনা বা অনুভূতির প্রতীক হিসাবে কেবলমাত্র 'লাল' শব্দটি অসম্পূর্ণ।

সমগ্র অনুভূতির সংক্রমণের জন্যও এই প্রতীকেরই সাহায্য নিতে হবে, তাছাড়া উপায় নেই; কিন্তু কেবল কথা ত সে কাজের যোগ্য নয়। অনুভূতি ব্যতীত কোন প্রতীকেই তার অখণ্ড রূপটি পাওয়া যায় না,—সে কারণ তার যতটুকু সঞ্চারযোগ্য নয় ততটুকু সঙ্কেত করা চলে মাত্র এবং সেই জন্য কথা ছাড়াও ছন্দ এবং সুরের, রেখা ও রঙের আশ্রয় নিতে হয়। কারণ দেখা গিয়েছে মানুষের মনের উপর এদের একটা অতীন্দ্রিয় প্রভাব আছে। কাব্যের মধ্যে যে-সকল ছন্দ নিরূপিত হয়েছে তার কোনটি গম্ভীর, কোনটি বা চটুল সুরের দ্যোতক। সেই জন্যই আমরা মনে করি নির্ব্বাসিত যক্ষের রসঘন বিরহের ভাবটি মন্দাক্রান্তার মধ্যে যেমন সুন্দর অভিব্যক্ত হয়েছে অন্য কোনও ছন্দেই তেমন হতে পারে না। মানুষের মনোভাবের কোনটাই বেশ সরল বা অমিশ্র নয়, এবং সেই জন্যই সহজে সঞ্চারযোগ্যও নয়, তাকে ব্যঞ্জনার দ্বারা ইঙ্গিত করতে হয়। শিল্পীর রসরচনায় আমরা যে ব্যঞ্জনা পাই, তা আমাদের মনের তারে অপরূপ রসমূর্চ্ছনা জাগিয়ে দেয়,—আমাদের আত্মাকে সীমাহীনের ব্যাকুলতায় উৎকণ্ঠিত ক'রে তোলে। যা পেয়েছি তাকে ঠিকমত পাওয়া হয়নি—যা দেখেছি তাকে ঠিকমত দেখা হয়নি—এটা আমাদের স্বতঃই মনে হয়। তাই চারুচিত্রের মধ্যে আমরা অবাক বিস্ময়ে দেখি তাকে যা আমাদের মনকে আড়াল ক'রে চোখের দেখা দিয়েই এতকাল ভুলিয়ে রেখেছিল। অপ্রত্যাশিতের সাথে এই সাক্ষাৎ—মনের নেপথ্যে অভাবিতের সাথে এই যে রহস্যময় পরম পরিচয় এই তো সৌন্দর্য্য; এর মধ্যে 'কেন', 'কিন্তু', নেই,—এ মূক বিস্ময়ের আত্মবিস্মৃত আনন্দ। শিল্প-শৈলী দূতী নয়, পরিচিতের কাছে পরিচিতের সংবাদ বয়ে বেড়ান এর কাজ নয়—জানা হ'তে অজানার পথে এর নিত্য অভিসার। অজানার সাথে এই মিলনের দৌত্য যে-রচনা যে পরিমাণে করতে পারে শিল্প-হিসাবে সেই রচনা তত সার্থক।

আলঙ্কারিকেরা কাব্যের এই ভাববহন শক্তিরই নাম দিয়েছেন ব্যঞ্জনা।

প্রতীয়মানং পুনরন্যদেব বস্ত্বস্তি বাণীষু মহাকবীনাম্‌।
যত্তৎ-প্রসিদ্ধাবয়ব-বাতিরিক্তং বিভাতি লাবণ্যমিবাঙ্গনাসু ॥

মহাকবিগণের রচনায় বাচ্যার্থের অতিরিক্ত যে প্রতীয়মান অথবা ব্যঙ্গ্যার্থ আছে সেটা বাস্তবিকই অপূর্ব্ব যেমন

মৃন্ময়ীর দেহে হস্তপদাদি অবয়বের অতিরিক্ত একটি অপার্থিব লাবণ্য লীলায়িত হয় এই ব্যঙ্গ্যার্থও তেমনি তার স্পষ্টার্থকে অতিক্রম ক'রে প্রকাশিত হয়।

শম্বুকবধের পরে অযোধ্যায় ফিরবার পথে শ্রীরামচন্দ্র পূর্ব্বদৃষ্ট দণ্ডকারণ্য দেখে ব'লে উঠলেন—

"এতে ত এব গিরয়ো বিরুবন্ময়ূরা:
তান্যেব মত্তহরিণানি বনস্থলানি।
আমঞ্জু-বঞ্জুল-লতানি চ তান্য-মূনি
নীরন্ধ্র নীল নিচুলানি সরিত্তটানি॥—উত্তররামচরিত

এই ময়ূরের কেকাধ্বনি-মুখরিত পর্ব্বত, এই মত্তহরিণ-সুশোভিত বনস্থলী আর ঐ নিবিড় নীল বেতস-কম্পিত নদীতট। অভিরাম বনপ্রকৃতির এ এক মনোরম বর্ণনা; কিন্তু কেবল বর্ণনার মনোহারিত্বই এর রমণীয়তার একমাত্র কারণ নয়, কবি এই নিসর্গচিত্রের ভিতর দিয়ে এক গভীর করুণার উদ্দীপন করেছেন। এই দৃশ্য দেখে রামচন্দ্রের পূর্ব্বস্মৃতি জেগে উঠেছে—সেই সুখের দিনের কথা মনে পড়েছে যেদিন এই বনভূমিতেই তিনি জনকনন্দিনীর সঙ্গে প্রেমের নন্দন রচনা করেছিলেন। হায়! সেই জীবনাধিকা দেবীপ্রতিমা আজ কোথায়? বাচ্যের অতিরিক্ত এই ব্যঙ্গ্যধ্বনিটুকু আছে বলেই এই শ্লোকের অপরূপতা!

শিল্পের প্রকাশ মনের একটা সচেতন ক্রিয়া। বস্তুর সঙ্গে সংস্পর্শে ঐন্দ্রিয়জ্ঞান, তার থেকে সংবেদনা (feeling) এবং কল্পনার ক্ষেত্রে তার শমতা। এরই নাম অন্তঃপ্রকাশ (inner expression)। এর পরে বহিঃপ্রকাশ, যার বিদেশীয় অভিধা হ'ল technique—দেশীয় নাম রস, অথবা ভাবের আস্বাদ্যমান রূপ। এই রসের উপর খুব জোর দিয়েছেন ভারতীয় রসজ্ঞেরা; তাঁরা স্পষ্টই বলেছেন যে রসসম্পৃক্ত না হ'লে কোন বাক্যই কাব্য হবে না, কেন না নিত্তনৈমিত্তিককে নিয়ে হ'ল বাক্যের কারবার 'fact' বা ঘটনার মানুষের-দেওয়া প্রয়োগসিদ্ধ প্রতীক (empirical symbol)। কিন্তু কাব্যের জগৎ অপরূপের জগৎ—বস্তুজগতের অবিকল নকল নয়। অলোকের মণিকার হলেন কবি; তাঁর অতীন্দ্রিয় লোককে যা ব্যঞ্জিত করে তাই হ'ল রস। Technique বা রস কেবল রূপ অথবা কেবল ভাব নয়,—ব্যক্তের মধ্যে অব্যক্তের অঙ্কুর—দূর দিগ্‌বলয়ে পরিচিত জগতের সাথে কল্পলোকের অপ্রত্যাশিত মিলন। এই মিলন ঘটান শিল্পী,—ধ্বনির তরঙ্গ, ছন্দের হিল্লোলে, বর্ণচ্ছটার অপরূপ আলিম্পনে। অতীন্দ্রিয় ভাবের সঙ্কেত হিসাবে সব যুগেই ভাস্কর এবং চিত্রশিল্পীদের মধ্যে কেউ কেউ মানুষের মূর্ত্তিকে বিচিত্ররূপে পরিবর্ত্তিত করেছেন। তাঁরা বলেন বস্তুকে অবিকৃত রেখে বস্তুব্যঞ্জিত অতীন্দ্রিয় সত্তাকে প্রকাশ করা সম্ভব নয়, যেহেতু পরিচিত মূর্ত্তির সঙ্গে পরিচিত ভাবেরই সংযোগ। রবীন্দ্রনাথের অঙ্কিত মূর্ত্তিগুলি এক-একটি অধ্যাত্মভাবের দ্যোতক; সম্ভবতঃ তিনি মনে করেন অবিকৃত মূর্ত্তি সূক্ষ্ম ভাবরূপকে প্রকাশ করতে সমর্থ নয়। এই প্রসঙ্গে মিশরের কারুমূর্ত্তিগুলির, প্রাচীরগাত্রে উৎকীর্ণ অজন্তা ও ইলোরার মূর্ত্তিগুলির উল্লেখ করা যেতে পারে। আমরা জানি হিন্দুরা দেবদেবীর যে-সকল মূর্ত্তি কল্পনা করেন সেগুলি হুবহু মানুষের মত নয়। তাঁদের ধারণা মানসীর মানুষী রূপ দিলে তাঁর দেবভাব ক্ষুণ্ণ হয়। প্রতীক-পূজা পুতুল-পূজায় পরিণত হয়। কিন্তু যাঁরা বস্তুসত্তাকে অক্ষুণ্ণ রেখে বিষয়ের অতীত ভাবের সূচনা করেন তাঁরা বস্তুর আধ্যাত্মিক মূল্যকে স্বীকার করেন এবং সেইজন্যই তাঁদের শিল্পলিপি সমৃদ্ধতর। এরূপ ব্যঞ্জনা যে অসম্ভব নয় তা বড় বড় রূপদক্ষের শিল্প দেখলেই বোঝা যায়; দৃষ্টান্ত, "ভিনস্ অভ মিলো" অথবা মনালিসা। আর কবি বা শিল্পীর মনেও ত এই প্রাকৃতিক জগতই অপ্রাকৃত লোকের বাণী বহন করে আনে তবে প্রাকৃত প্রতীকের সাহায্যে অপ্রাকৃতের দ্যোতনাই বা অসম্ভব হবে কেন?

এই প্রতীক কল্পনার বৈশিষ্ট্যেই কাব্যও হয়ে পড়ে mystic। যে-কাব্য যে-পরিমাণে বস্তুনিরপেক্ষ ভাবসত্তাকে উপলব্ধি ক'রে বস্তু থেকে পৃথক কোন প্রতীকের সাহায্যে সেই ভাবকে প্রকাশ করবার জন্য চেষ্টিত হয়, সেই কাব্য সেই পরিমাণে দুর্ব্বোধ্য হয়ে পড়ে। এই যে technique of symbolism এটা ততই বেশী দুরবগাহ হয় প্রয়োগসিদ্ধ না হ'য়ে এটা যত বেশী স্বেচ্ছানুমত হয়। কতকগুলি ভাবের সঙ্গে বিশেষ কতকগুলি প্রতীকের সংযোগ আছে অর্থাৎ দেখা গিয়েছে সেই সেই বস্তুর প্রসঙ্গে সেই সেই ভাবের কথা লোকের মনে স্বতঃই উদিত হয়: সুতরাং সেই প্রয়োগসিদ্ধ প্রতীকগুলি ব্যবহার করলে পাঠকের বা দ্রষ্টার বুঝবার অসুবিধা হয় কম; কিন্তু symbolটি যদি শিল্পীর সম্পূর্ণ

মনগড়া হয় তবে তার ব্যঞ্জনা গ্রহণ করা সাধারণের পক্ষে সম্ভব হয় না। যেমন সাদা এই রঙটার সঙ্গে সরলতা এবং পবিত্রতার সংযোগ প্রত্যেক মানুষের মনে আছে;—যখনই একটি স্বচ্ছ-সুন্দর শ্বেত-শতদলের চিত্র দেখি বা তার বর্ণনা কাব্যে পাঠ করি তখনই আমাদের মনে নির্ম্মলতা ও পবিত্রতার ভাব উদিত হয়। আকাশে পুঞ্জিত মেঘের উপর রক্তরবির বর্ণচ্ছটাকে মানবমনের অনুরাগের রক্তরাগ হিসাবেই চিরদিন কবিরা দেখে এসেছেন, কিন্তু এই রকম দৃশ্য দেখলে শিল্পী টর্ণরের মনে মৃত্যু ও বিনাশের ভাবই জেগে উঠত—নীলাকাশে রক্তরাগের ঐ যে তরঙ্গ ও-যেন আমাদের মর্ম্মকোষ থেকে উচ্ছিত রুধিরধারা; তাই তিনি "কার্থেজের পতন" এই চিত্রে ধ্বংসের প্রতীক হিসাবে রক্তাকাশের পরিকল্পনা করেছেন। ছায়াবাদী (mystic) কবিরা তাঁদের রসরচনায় সেই সমস্ত উপমা প্রায়ই ব্যবহার করেন যা তাঁদের বিশেষ মানসিক অবস্থার ফল এবং যার সঙ্গে সাধারণ মনের পরিচয় অতি সামান্য। ছায়াবাদ (mysticism) আসলে প্রকাশ-শৈলীর বৈশিষ্ট্য ছাড়া আর কিছুই নয়। কেবলমাত্র প্রকাশ-বৈশিষ্ট্যে রসের কত (effect) তারতম্য হয় তা বেশ অনুভব করা যায় যখন আমরা মনোযোগের সঙ্গে কীর্ত্তন-গান শুনি। সাধারণ রাগরাগিণীই কীর্ত্তনের ঢঙে এক কমনীয় মাধুর্য্যের ধারায় আমাদের চিত্তকে অমৃত-সিঞ্চিত করে। এই symbol-কে বেশী প্রয়োগসিদ্ধ করতে গিয়ে আবার শিল্পশৈলী সময় সময় অত্যন্ত কৃত্রিম হয়ে পড়ে। কবি তখন নিজের ছন্দে কথা ক'ন না, নিজের সুরে গান করেন না, কতকগুলি সনাতন মামুলি উপমার খোলস চাপিয়ে ভাববস্তুকে হাঁটিয়ে নিয়ে বেড়ান 'রণপা'র উপরে। ভাব সেখানে কল্পনার আকাশে মুক্তপক্ষে ওড়ে না, একহাত উঁচু খড়মের ভারে প্রতি পদেই খুঁড়িয়ে চলে। সূর্য্য অস্ত গেলে কমলের মুখ মলিন হ'ল, চাঁদের জন্য চকোর কেঁদে কেঁদে আকুল হ'ল, নীল সরোবরে কৌমুদীর প্রভায় কুমুদিনীর মুখ হ'ল উজ্জ্বল। হ'ল সবই, কিন্তু পাঠকের মনে তার কোন ক্রিয়া হ'ল না। প্রেমিক-প্রেমিকার ধ্যানতন্ময়তা ও আগ্রহের ভাব কি এতে ক'রে আমাদের মনে একটুও বেশী মুদ্রিত হ'ল? কিন্তু বিদ্যাপতি যখন বললেন,—

"লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেল।"

কিংবা কবি বর্ণসের বীণায় যখন বেজে উঠ্ল,—

"And I will love thee still, my dear,
Till all the seas gang dry"—

তখন বুঝ্লাম প্রেমিক-হৃদয়ের সেই অসাধারণ আকুতি। সে প্রেম কি অসীম যা প্রিয়তমকে জন্মজন্মান্তর ধ'রে বুকে রেখেও তৃপ্ত হয় না—সমস্ত সাগর-বারি নিঃশেষ হয়ে গেলেও যার পিপাসার নিবৃত্তি হয় না!

কাব্যশিল্পের সৌন্দর্য্য অখণ্ড সমগ্রতার সৌন্দর্য্য। কাব্যে ঘটনা এক সময় থেকে আর এক সময়ে চলে যাচ্ছে—চিত্রে স্থাপত্যে স্থূলের প্রসার আমাদের দৃষ্টিকে ব্যাহত করবার চেষ্টা করছে; কিন্তু আমরা যদি খুঁটিনাটির প্রতি পৃথক্ মনোযোগ দিই তবে শিল্প-দৃষ্টি ক্ষুণ্ণ হবে, আমরা ব্যাপকতাকে (breadth) হারাব। এই যে খণ্ডকে অখণ্ডরূপে দেখা, অংশকে পূর্ণরূপে অনুভব করা আমাদের দেশে এর দার্শনিক নাম 'সমূহাবলম্বন' (synoptic vision)। চোখ পৃথক পৃথক প্রত্যেক পদার্থের উপর পড়ছে বটে কিন্তু প্রতীতি হচ্ছে একটি, অক্ষর ভিন্ন ভিন্ন আছে বটে, দেখছি শব্দ। সেইরকম ভাব (ভাবোপলব্ধির প্রত্যেক ক্রিয়া) এবং রূপ—দুটি পৃথক্ বস্তু হ'লেও আমরা সমূহাবলম্বন জ্ঞানে তাদের সম্মিলিত রসরূপে প্রতিভাত দেখি।

প্রত্যেক চারুশিল্পের উদ্দেশ্য হ'ল সহৃদয়জনের মনে একটা প্রভাব উৎপন্ন করা—নিজের মনে যে ভাব উৎপন্ন হয়েছিল ঠিক সেই ভাবটিকেই জাগিয়ে তোলা কিন্তু অন্য 'মিডিয়মে'র সহায়তায়; যেমন বীঠোভেনের "মুন লাইট্ সোনাটা,"—সুরের ধ্বনি দিয়ে জ্যোৎস্নানিশীথিনীর মায়াটিকে শরীরিণী ক'রে তোলা। ডিকুইন্সি একে বলেছেন "idiom in alio," প্রত্যেক শিল্পরচনাই কল্প-বস্তুহিসাবে নিজের মধ্যেই সম্পূর্ণ একটি স্বতন্ত্র জগৎ—এই জগতের বাইরে আর অন্য কিছু নেই। সুতরাং এখানে বাইরের সঙ্গে মিল খুঁজতে যাওয়া কেবল নিষ্ফল নয়, নিতান্ত অসঙ্গত; কারণ কোন বিষয় সম্বন্ধে কল্পনা করার অর্থই হ'ল তাকে বস্তুজগৎ থেকে পৃথক্ ক'রে এক স্বতন্ত্র রাজ্যে নিয়ে যাওয়া, যেখানে সব জিনিষেরই গতি সেই একের (monad)

দিকে,—সব ধারারই অভিসার এক মুক্তিসঙ্গমে। আমরা বাইরের জগতে পাই বিক্ষেপ ও বিচ্ছিন্নতা—ঐন্দ্রিয়জ্ঞানের মূলেই রয়েছে এই পার্থক্য-বোধ। এটা সাদা, অর্থাৎ কাল বা লাল বা অন্য কোন রঙ্ নয়। "এটা এ নয়" অথবা "এটা অপরটা থেকে পৃথক্,"—বস্তুজগতকে দেখবার এই হ'ল চিরন্তন রীতি। শিল্পলোকে সব ভাবকেই,—কারণ সেখানে বস্তু নেই, আছে বস্তুসম্বন্ধে আমাদের ভাব,—আমরা দেখি এক মহাভাবের প্রকাশরূপে; তাই সেখানে আছে কেবল সংহতি ও সুষমা, সৌন্দর্য্য ও শান্তি—রূপে-রসে গন্ধে-গানে তাই সেখানে এমন মধুর গলাগলি। "Alio," অর্থাৎ রূপকের সাহায্য নেওয়া, অর্থাৎ সুর দিয়ে রঙ অথবা গন্ধ দিয়ে গানকে জাগিয়ে দেওয়ার মানেই হ'ল বিশ্বসৃষ্টির সেই অন্তরতম সঙ্গতিরই ইঙ্গিত করা।

বিখ্যাত ইহুদী মনীষী স্পিনোজা বলেছেন, "Omnis existentia est perfectio," সত্তা মাত্রেই সম্পূর্ণ, অথবা যা চিরন্তন তাই সুন্দর। শিল্পের দৃষ্টিতে সকল সত্তাই এক অনাদি সত্যের প্রকাশরূপে প্রতিভাত হয়। শিল্পের অলোকলোকে বিচ্ছিন্নতা ব'লে কিছু নেই, আছে সমীকরণ—ভেদবুদ্ধি নেই, আছে প্রেমের অঞ্জন। যুগে যুগে চারুকলায় স্থানকালের অতীত সেই মহাসত্য মূর্ত্ত হয়ে এসেছে, রূপরস-শব্দবর্ণগন্ধের পঞ্চপ্রদীপ জেলে কালে কালে কবিকুল অনঘ উপচারে ও অনিন্দ্য ভঙ্গিতে সুন্দরের বন্দনা ক'রে এসেছেন। সেই অনবদ্য বন্দনা-গীতে নিখিলমানবের জীবন নন্দিত।

বাংলার রেশম-শিল্প

শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষ

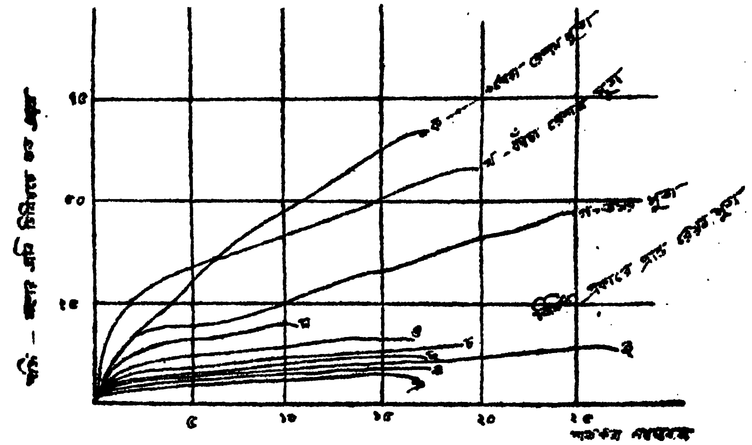
রেশমের বর্ত্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ

রেশম সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া সাধারণ লোকে প্রশ্ন করিয়া থাকেন, "মেকি রেশমের (আর্টিফিশিয়াল সিল্ক বা রেয়ন্) সঙ্গে প্রতিযোগিতায় রেশম টিকিতে পারিবে কি?" সাধারণ লোক কেন, অনেক বৈজ্ঞানিকেরও এই ভুল ধারণা আছে। মহাযুদ্ধের সময় ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে ভারত-গবর্ণমেণ্ট শ্রীযুক্ত লেফ্রয় সাহেবকে বিলাত হইতে আনাইয়া রেশম-শিল্পের উন্নতিকল্পে অনুসন্ধানে নিযুক্ত করেন। তিনি এবং আন্সোর্জ সাহেব সমস্ত ভারতবর্ষে অনুসন্ধান করিয়া তিন খণ্ড বৃহৎ রিপোর্ট প্রকাশ করেন। কিন্তু উপরোক্ত ভুল ধারণার দরুণ লেফ্রয় সাহেবের প্রস্তাবানুসারে কোন কার্য্যই হইল না। অথচ তাহার পর প্রায় পনের বৎসরের ভিতর জাপানের রেশম-উৎপাদন তিনগুণ বাড়িয়া গেল। আবার ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে কৃষি-কমিশন মন্তব্য লিখিলেন যে, ভারতবর্ষে রেয়নের যেরূপ আমদানি বাড়িতেছে তাহাতে রেশম টিকিতে পারে কি-না সন্দেহ, অতএব রেশম-শিল্পের উন্নতিকল্পে কোন কার্য্য গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে বিবেচনা প্রয়োজন। এই রিপোর্ট লিখিবার প্রায় পাঁচ বৎসরের মধ্যেই এত রেশম আমদানি সুরু হইল যে ভারত-গবর্ণমেণ্ট টারিফ-বোর্ডকে ভারতের রেশম-উৎপাদন শিল্প রক্ষার জন্য আমদানি রেশমের উপর শুল্ক বসাইবার বিষয় বিবেচনা করিতে পরামর্শ দিতে বাধ্য হইলেন। টারিফ-বোর্ড এখন এই সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতেছেন।

পশম (উল), রেশম এবং কার্পাসের সুতার ন্যায় রেয়ন এক প্রকার আলাদা সুতার মত ব্যবহৃত হইতেছে। কাঠ ঔষধ-সাহায্যে গলাইয়া এই সুতা প্রস্তুত হয়। এই উদ্ভিজ্জ সুতা রেশমের ন্যায় জান্তব সুতার গুণবিশিষ্ট হইতে পারে না। চাকচিক্য ইত্যাদি ছাড়া যে-সকল গুণের জন্য রেশমের আদর সেগুলি হইতেছে শক্তি (ভারবহনক্ষমতা), স্থিতিস্থাপকতা এবং ছিঁড়িবার পূর্ব্বে লম্বমানতা। রেশম ও রেয়নের এই গুণগুলির তুলনার জন্য এক নম্বর চিত্র দিলাম। এই চিত্র বুঝাইবার জন্য মোটামুটি কিছু বলা প্রয়োজন। রেশমের

সুতা মিহি এবং ইহা কত মোটা বা সরু বুঝাইবার জন্য ডিনিয়র নামক ফরাসী ওজন সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হয়। প্রায় সওয়া ডিনিয়রে এক গ্রেণ হয়। প্রায় ৪৯২ গজ রেশম সুতার ওজন যদি এক ডিনিয়র হয়, তাহা হইলে এই সুতার মাপ (অর্থাৎ কত মোটা) হইল ১ ডিনিয়র এবং ইহাকে ১ ডিনিয়র সুতা বলে। ঐ পরিমাণ সুতার ওজন যত বাড়িবে সুতা তত মোটা হইবে। সাধারণতঃ ১৪ ডিনিয়রের কম মাপের সুতার প্রায় ব্যবহার নাই এবং ইহাও এত মিহি যে আমাদের তাঁতীরা ইহা প্রায় ব্যবহার করে না। আমাদের তাঁতীরা সাধারণতঃ ৩০।৩২ ডিনিয়র সুতার কাজ করে। সুতার শক্তির পরিচয়ের জন্য ইহা কত ভার বহন করিতে পারে দেখিতে হয়। চিত্রে বাঁ দিকে খাড়া দাঁড়ির পাশে অঙ্ক সুতা মাপের প্রতি ডিনিয়রে কত গ্রাম ওজন বহন করিতে পারে দেখাইতেছে। এক গ্রামের ওজন প্রায় ১৫৷৷০ গ্রেণ। রবারকে টানিলে লম্বা হয় কিন্তু ছাড়িয়া দিলে আবার ছোট হইয়া যত লম্বা ছিল সেইরূপ হয়। ইহার নাম স্থিতিস্থাপকতা। রেশম প্রভৃতি সুতার স্থিতিস্থাপকতা গুণ কতক পরিমাণে আছে। কিন্তু রেশম সুতাকে টানিয়া যদি খুব লম্বা করা হয় তাহা হইলে এই গুণ নষ্ট হয় এবং যত লম্বা হইয়াছে সেইরূপই থাকে এবং যখন আর টান সহ্য করিতে না পারে তখন ছিঁড়িয়া যায়। চিত্রের তলদেশে যে অঙ্ক আছে তাহাতে বুঝায় ছিঁড়িবার সময় সুতা শতকরা কত লম্বা হইয়াছে (লম্বমানতা)। লম্বমানতা যদি হয় শতকরা ২০, তাহা হইলে বুঝায় যে ১০০ হাত সুতাকে টানিয়া ১২০ হাত করিলে তবে ছিঁড়িবে। চিত্রে সুতা প্রথমে উপরে উঠিয়াছে এবং ক্রমে ডানদিকে বাঁকিয়াছে। এই বাঁকন স্থিতিস্থাপকতার পরিমাণ নির্দ্দেশ করিতেছে। ইহার বেশী লম্বা হইলে স্থিতিস্থাপকতা নষ্ট হয়।

এখন চিত্র দেখিয়া সকলেই বুঝিতে পারিবেন, রেশম, তসর এবং রেয়নের এই তিন গুণ কত তফাৎ। সকল গুণেই রেশম রেয়ন অপেক্ষা প্রায় তিনগুণ পরিমাণ ভাল, রেয়ন কখনই রেশমের সমকক্ষ হইতে পারে না। রেয়নের একটা বাহ্য চাকচিক্যে লোকে প্রথমে ভুলিয়া গিয়াছিল এবং অজ্ঞ লোকে এখনও ভোলে। রেয়নের সস্তা দামও ইহার কাটতির



১। রেশম, তসর ও রেয়নের তুলনা

একটি কারণ। যাহারা রেশমের কদর বুঝে তাহারা রেয়নে প্রথমে ভুলিলেও আবার রেশমের দিকে ঝুঁকিয়াছে। বিলাত ও আমেরিকায় আবার রেশমের কাটতি বাড়িতেছে। আর লোকে যাহাতে রেশম মনে করিয়া রেয়ন কিনিয়া না ঠকে, সেইজন্য সভাসমিতি করিয়া রেশমের গুণের প্রচার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। আমেরিকাই জাপানের রেশম সুতার প্রধান বাজার। জাপান এই প্রচারের জন্য আমেরিকায় এক বড় দপ্তর খুলিয়াছে এবং জাপান হইতে কয়েক জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে এই কার্য্যের জন্য পাঠাইতেছে। জাপান এই কার্য্যে আমেরিকায় ১৮ লক্ষ ইয়েন এবং ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে ২ লক্ষ ইয়েন ব্যয় করিবার বরাদ্দ স্থির করিয়াছে। গত অক্টোবর মাসে প্যারিসে এক আন্তর্জাতিক রেশম-প্রচার-সমিতির অধিবেশন হইয়াছে। এইরূপ প্রচারের ফলে রেশমের কাটতি যে বহুগুণ বাড়িবে ইহা এক প্রকার নিশ্চয় করিয়াই বলা যাইতে পারে। যাহারা রেশম উৎপাদনের বন্দোবস্ত করিতে পারিবে তাহারা বহু অর্থ উপার্জ্জন করিবে। বঙ্গদেশ এই উপার্জ্জনের অংশ পাইতে পারে কি-না তাহাই আলোচনা করিব।

রেয়ন প্রস্তুতপ্রণালী অল্পদিনের আবিষ্কার, ১৯২০ খৃষ্টাব্দে

সমস্ত পৃথিবীতে মাত্র ৫০ হাজার পাউণ্ড রেয়ন সুতা উৎপন্ন হয় এবং ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে হয় ৪৬৭০ লক্ষ পাউণ্ড। নূতন জিনিষ বলিয়া এবং বড় বড় কারখানায় বহু পরিমাণ উৎপাদন করিতে পারা যায় বলিয়া ইহার উৎপাদন এত দ্রুত বাড়িয়াছিল। এখন আর এরূপ বাড়িবার সম্ভাবনা কম, কারণ এখন চাহিদা-পরিমাণ উৎপন্ন হইতেছে। রেয়নের উৎপাদন এবং ব্যবহার যখন এইরূপ দ্রুত বাড়িয়াছিল তখন রেশমের উৎপাদনও কমে নাই, বরাবরই প্রায় প্রতি বৎসর শতকরা ছয়গুণ করিয়া বাড়িয়াছে। রেয়নের নূতনত্বের মোহ কাটিয়া গিয়াছে এবং উপরের যে প্রচারের কথা বলিয়াছি তাহার দরুণ রেশমের সহিত রেয়নের প্রতিযোগিতার দিনও কাটিয়া গিয়াছে বা শীঘ্রই যাইবে। তবে কতক জিনিষে রেয়নের ব্যবহার থাকিবে। যাহাতে লোকে না ঠকে সেইজন্য ইতালীতে এই আইন হইয়াছে যে, যে-কাপড়ে রেয়ন ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাকে সিল্ক বা রেশম বলিয়া পরিচয় পর্য্যন্ত দেওয়া নিষিদ্ধ।

নানা দেশে এখন রেশম উৎপাদনের আয়োজন হইতেছে। জাপান যত রকম সম্ভব আধুনিক উন্নত পন্থা ও যন্ত্র গ্রহণ করিয়া রেশম-উৎপাদক দেশ-সকলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে জাপানের অধীন কোরিয়া এবং ফর্মোশাতেও রেশম, উৎপাদনের জন্য যথেষ্ট আয়োজন হইয়াছে ও হইতেছে॥ চীনও জাপানের ন্যায় উন্নত প্রণালী গ্রহণ করিতেছে এবং অনেক স্থানে করিয়াছে। এই কার্য্যে আমেরিকার রেশম-ব্যবসায়ীরা চীনকে অর্থ ও পরামর্শ দ্বারা সাহায্য করিতেছে। লিগ্ অফ্ নেশন্সের তরফ হইতে একজন বিশেষজ্ঞকে চীনে পাঠান হইয়াছে। রুশিয়া, জার্মানী, ব্রেজিল, মেক্সিকো, ইরাক এবং আফ্রিকাতেও রেশম উৎপাদনের চেষ্টা হইতেছে। জাপানী বিশেষজ্ঞ ও কলকব্জা আনাইয়া রুশিয়া এই কাজ আরম্ভ করিয়াছে এবং ইহারই মধ্যে রুশিয়ার রেশম আমেরিকার বাজারে বিক্রয় হইতেছে।

. উনবিংশ শতাব্দের ষষ্ঠ দশকে বঙ্গদেশ হইতে প্রায় দেড় কোটী টাকার কেবল রেশম সুতাই বিদেশে চালান যাইত। বিলাতের বাজারে বাংলার রেশমেরই প্রসিদ্ধি ছিল। তারপর চীন-জাপান বাজারে নামে। তখন হইতেই বাংলাকে হটিতে হইয়াছে এবং কয়েক বৎসর যাবৎ বাংলার রেশমের স্থান পৃথিবীর বাজার হইতে লুপ্ত হইয়াছে। ইহার একমাত্র কারণ বাংলার শিল্পকে উন্নত করিবার প্রকৃত চেষ্টা ও আয়োজনের অভাব। কোন্ বিষয়ে চেষ্টা ও আয়োজন দরকার তাহা ক্রমে বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

রেশমের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ব্যবসায়ীদের কি ধারণা তাহার আভাসও দিতেছি। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে এক বৃহৎ কারখানার কর্ত্তা বৎসরে এক লক্ষ পাউণ্ড এণ্ডি গুটি সরবরাহ করিতে পারিলে আমাকে অগ্রিম টাকা দিতে প্রস্তুত ছিলেন। ফ্রান্সের লিয় শহর রেশম-বয়নের জন্য বিখ্যাত। এখানকার চেম্বার অফ্ কমার্সের সভাপতি ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে আমাকে বলিয়াছিলেন, "কোন এক নমুনার রেশম বহু পরিমাণে সরবরাহ করিতে পারেন ত বাজার প্রস্তুত আছে। আপনার নমুনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট না হউক, যে-নমুনা দিবেন, মাল সেই নমুনা-মাফিক হওয়া চাই।" লণ্ডন শহরে ঐ সময় ডুরাণ্ট্ বিভান্ নামক বহু পুরাতন রেশম ব্যবসায়ীদের ডিরেক্টর আমাকে বলেন, বাংলার রেশম নমুনা-মাফিক সরবরাহের বন্দোবস্ত না থাকাতেই বাজার হইতে লুপ্ত হইয়াছে। নমুনা-মাফিক সরবরাহের বন্দোবস্ত করিতে পারিলেই আবার ইহার কাটতি বাড়িবে। এই কোম্পানী কাশ্মীরে উৎপন্ন সমস্ত রেশমের দালালী করেন।

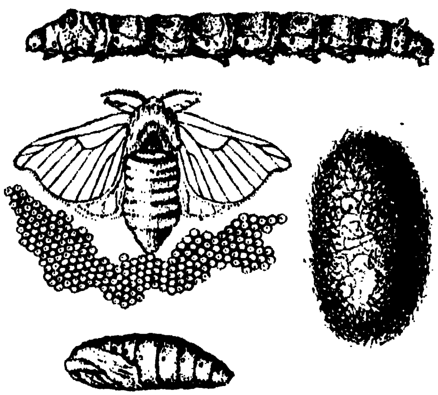
এখন সহজেই বুঝা যাইবে যে রেশমের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সন্দেহের কোন কারণ নাই।

রেশম-শিল্প বলিতে কি বুঝায়

রেশম-শিল্পের মোটামুটি দুইটি বিভাগ :—(১) রেশম উৎপাদন (production), (২) রেশমের ব্যবহার (utilization.)

উৎপাদন-শিল্প—রেশমকীট বা পলুকে পালন করিয়া রেশম উৎপাদন করিতে হয়। পলু তুঁতের পাতা খায়। অতএব প্রথমে তুঁতের চাষ করিতে হয়। ঘরের ভিতর বাঁশের ডালাতে রাখিয়া পাতা খাওয়াইলে পলু বড় হইয়া মুখ হইতে রেশম-তন্তু বাহির করিয়া এই তন্তু পর্দ্দায় পর্দ্দায় নিজের দেহের চতুর্দ্দিকে লাগাইয়া গুটী বা কোয়া তৈয়ারী করে এবং এই গুটীর ভিতর ভেক বদল করিয়া পুত্তলি হয়। নিদ্রিত পুত্তলির রক্ষার জন্যই গুটীর সৃষ্টি। পলু কিছুদিন

পরে আবার ভেক বদল করিয়া প্রজাপতি বা চোকৃড়া চোকড়ী (চকোর চকোরী) হইয়া পুত্তলি-কোষ ভাঙিয়া এবং গুটী ভেদ করিয়া বা কাটিয়া বাহির হয়। কিছু পরেই চোকড়া চোকড়ীর মিলন হয় এবং সেই দিনই সন্ধ্যার সময় চোকড়ী



২। রেশম পলুর জীবনী। উপরে পলু, মধ্যে বাম দিকে চোকড়ী ডিম পাড়িতেছে, ডান দিকে গুটী এবং নীচে পুত্তলি গুটীর ভিতর হইতে বাহির করিয়া দেখান

ডিম পাড়ে। কিছুদিন পরে ডিম ফোটে এবং কীড়া বা পলু পাতা খাইয়া আবার গুটী করে। এইরূপে পলুর জীবনী চলিতে থাকে। ডিম হইতে আবার ডিম পাড়া পর্য্যন্ত পলুর জীবনীর এক চক্র। চক্রের পর চক্র চলিতে থাকে।

গুটী হইতে না ছিঁড়িয়া রেশমের থাই বাহির করিয়া লইলে রেশম সুতা পাওয়া যায়। যন্ত্রসাহায্যে এই কার্য্য করিতে হয়। ইহাকে বলে কাটাই করা (reeling) একটি গুটীর থাই অতি সরু। ইহা উঠাইতে পারা যায়, কিন্তু ইহাতে কোন কাজ হয় না। অনেকগুলি গুটীর থাই একসঙ্গে উঠাইতে হয় এবং যত বেশী থাই একসঙ্গে উঠান যাইবে সুতা তত মোটা হইবে। ইচ্ছামত যেমন প্রয়োজন কমবেশী গুটী হইতে সরু মোটা সুতা কাটিতে পারা যায়। পলু মুখের ভিতর হইতে যখন তন্তু বাহির করে তখন তন্তু এক প্রকার গঁদের মত লালায় ভিজা থাকে এবং গঁদ শুকাইয়া জমাট বাঁধিয়া গুটি শক্ত হয়। সুতা কাটিবার সময় গুটী গরম জলে সিদ্ধ করিয়া গঁদ নরম করিয়া দিতে হয়। অনেকগুলি থাই মিলিয়া সুতা হইয়া উঠিলে এই গঁদ আবার শুকাইয়া থাইগুলিকে একসঙ্গে জমাট বাঁধিয়া এক সুতায় পরিণত করিয়া দেয়।

উৎপাদন-বিভাগের কার্য্য হইল তুঁত চাষ করিয়া পলু-পালন এবং গুটী হইতে সুতা কাটাই। পলুপালন এবং সুতাকাটাই—দুই পৃথক শিল্প। পলুপালন কৃষকের উপশিল্প। কৃষক-পরিবার দুই-এক বিঘা তুঁত রাখিয়া অন্যান্য কাজের মধ্যে যে অবসর পায় সেই অবসর সময়ে এবং ছেলেমেয়েদের সাহায্যে পলুপালন করিয়া গুটী হইলেই বিক্রয় করিয়া দেয়। কৃষক নিজের গৃহে কাটাই করিতে পারে। কিন্তু কাটাই একত্রে না করিলে এক নমুনার সুতা উৎপাদন করা সহজ হয় না। সেই জন্য কাটাই-কার্য্য সর্ব্বত্রই পৃথক। যে-কেহ কাটানী নিযুক্ত করিয়া এবং গুটী কিনিয়া কাটাইকার্য্য চালাইতে পারে। বেশী সুতাকাটাই করিতে হইলে একত্রে অনেক কাটানী নিযুক্ত করিয়া কারখানা-শিল্পের মত চালাইতে হয়। ইহাতে বেশ লাভ হয়। রেশম-কাটাই কারখানাকে বাংলা দেশে বানক বলে।

কাটাই করিবার সময় গুটীর কিছু উপরের অংশ (ফেঁসো) এবং কিছু ভিতরের অংশ (টোপা) বাদ যায় এবং মধ্য স্তর হইতেই থাই উঠান যায়। বাদ অংশগুলিকে ঝুট (waste) বলে। যে গুটি হইতে চোকৃড়া কাটিয়া বাহির হইয়াছে তাহাও ঝুটের সামিল। বাংলা দেশে বৃদ্ধারা কাটা গুটী হইতে টাকু দিয়া 'মটকা' সুতা পাকায়। বিলাত, আমেরিকা ও জাপানে রেশমের ঝুট হইতে কলের সাহায্যে কার্পাস সুতার মত "পেঁজ' রেশম" সুতা (spun silk) প্রস্তুত করা হয়।

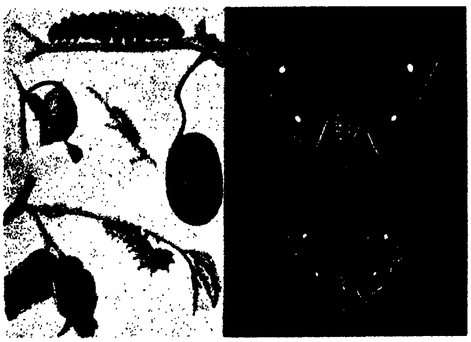
ব্যবহার-শিল্প—রেশমের সুতার বেশী ব্যবহার মোজা গেঞ্জি কাপড় বুননে। গুটী কাটাই করিয়া যে সুতা পাওয়া যায় তাহার সাধারণ নাম কাঁচা রেশম (raw silk)। নানা রকম বুননের জন্য সুতার নানা রকম পাইট করিতে হয়। কাঁচা রেশমেও কাপড় বোনা যায়, কিন্তু ভাল কাপড় বুনিতে পাইটের দরকার। প্রথমে বন্দি খুলিয়া বন্দি হইতে ফেরাই করিয়া কাঠের নল বা ববিনে জড়ান হয়। তার পর ববিন হইতে খুলিয়া পাক দিয়া অপর ববিনে উঠান হয়। আবার কয়েকটি সুতাকে একসঙ্গে পাকান হয়। নানাবিধ রং-করা কাপড় বুনিতে পাকোয়ান সুতার রং করা হয়। কাপড় বুনিয়া ধোলাই ও ইস্ত্রি করা হয়। ব্যবহার-শিল্পের নানা বিভাগের কার্য্য, যথা—পাকাই, রঙাই, বুনন, ধোলাই ইত্যাদি

উন্নত প্রণালীতে বিভিন্ন কারখানায় করা হয়। পাকদারেরা (throwsters) কেবল পাকাই কার্য্যই করে। পাকোয়ান সুতা একেবারে যত লম্বা প্রয়োজন নলিতে ভরিয়া দেয়, তাঁতীরা সঙ্গে সঙ্গে এই সুতা টানায় চড়াইয়া বুননকার্য্য চালাইতে পারে। যেখানে রঙীন সুতা দরকার সেখানে একেবারে রঙকরা সুতা লইয়া কার্য্য করে। কার্য্যের এইরূপ নানা বিভাগ হওয়াতে কার্য্য নমুনা-মাফিক উত্তমরূপে শীঘ্র শীঘ্র হয়।

আমাদের তাঁতীরা এখনও সেই পুরাতন প্রথায় নিজেরাই সুতা ফেরাই, সাফাই, পাকাই, রঙাই প্রভৃতি কার্য্য করে বলিয়া কার্য্য উত্তমরূপে একই নমুনা-মত হইতে পারে না, আর দেরিও যথেষ্ট হয়, কাজেই আজকাল তাহাদের পারিশ্রমিক পোষায় না। তাহার উপর জাপান আমেরিকা প্রভৃতি সকল উন্নত দেশেই বিজলী-চালিত তাঁতে বুনন হয়। বিজলীর সহিত হাতের প্রতিযোগিতা অসম্ভব।

তসর, মুগা ও এণ্ডি

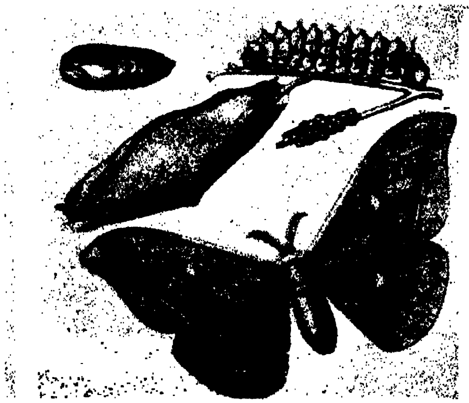
তসরও রেশমের মত আর এক প্রকার পলু হইতে পাওয়া যায়। এই পলুর জীবনী তিন নম্বর চিত্রে দেখান হইল।



৩। তসর পলুর জীবনী। ডান দিকে উপরে চোক্‌ড়ী নীচে চোকড়া। বাঁ দিকে ডালের উপর ডিমের স্তূপ ছোট ও বড় পলু এবং ডিম্বাকৃতিগুটী

ইহারা কুল, আসান, অর্জুন প্রভৃতি গাছের পাতা খায়। ইহাদিগকে রেশম পলুর মত ঘরে পালন করা যায় না, গাছে ছাড়িয়া দিতে হয়। ইচ্ছামত খাইয়া গুটী করে এবং গুটী সংগ্রহ করিয়া বিক্রয় করা হয়। তাঁতীরাই গুটি হইতে সুতা-কাটাই করিয়া কাপড় বুনে। পাখী ইত্যাদিতে অনেক পলু নষ্ট করে, আর ছোটনাগপুর অঞ্চলের আবহাওয়াতেই এই পলু পালন করা যায়, অন্যত্র তেমন হয় না। এই সকল কারণে তসর পলুর পালনকার্য্য কখনও বেশী বাড়িবে না।

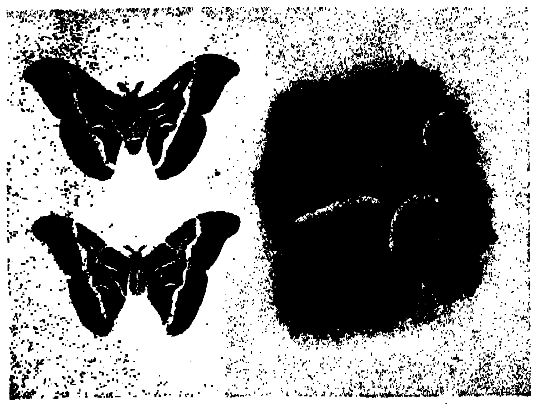
আসামের মুগাও একপ্রকার তসর। মুগা পলুও তসর পলুর মত বন্যভাবাপন্ন এবং গাছে ছাড়িয়া দিয়া পালন



৪। মুগা পলুর জীবনী। ডালে ডিমের স্তূপ ও পলু, পাতার ভিতর তৈরি গুটী উপরে বাঁ দিকে গুটী হইতে বাহির করিয়া দেখান পুত্তলি, নীচে চোকড়া

করিতে হয়। এই কার্য্যও কখনও বাড়িবে না। ৪ নং চিত্রে মুগা পলুর জীবনী দেখান হইল।

আসামের এণ্ডি পলু এরণ্ড বা ভেরেণ্ডা গাছের পাতা খায় এবং ইহাদিগকে ঘরে রাখিয়া রেশম পলুর মত পালন



৫। এণ্ডি পলু—চোক্‌ড়া চোক্‌ড়ী এবং পলু

করা যায়। এণ্ডি গুটী বড় হয়, কিন্তু এই গুটী হইতে রেশম, তসর বা মুগার মত এক থাই লম্বা সুতা কাটিয়া বাহির করা যায় না। গুটীকে সোডা দিয়া সিদ্ধ করিয়া

পিঁজিয়া তুলার মত সুতা পাকাইতে হয়। আসামে টাকু দিয়া সুতা পাকান হয়। ৫ নং চিত্রে এণ্ডি পলু ও চোকড়া দেখান হইল। এণ্ডি সুতা রেশম সুতার মত চাকচিক্যশালী নয় এবং রেশম অপেক্ষা ইহার দাম অনেক কম। রেশমের ঝুটের মত কলে এণ্ডি গুটী হইতে পেঁজা সুতা হয়। এই জন্য বেশী উৎপাদন করিতে পারিলে গুটীর কাটতি হয়।

সাধারণতঃ এণ্ডি, তসর এবং মুগাকেও রেশমের মধ্যে গণ্য করা হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রেশম হইতে ইহাদের পার্থক্য অনেক। রেশমের দাম বেশী, চাহিদা বেশী এবং রেশম-উৎপাদন শিল্পের উন্নতির ও বিস্তারের সম্ভাবনাও অনেক বেশী।

রেশম-উৎপাদন-শিল্প সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় এবং অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়

১। পলু পালন করিয়া গুটী উৎপাদন সর্ব্বত্রই কৃষক-পরিবারের উপশিল্পরূপে সাধিত হইলেই উত্তম হয়। তুঁতের পাতা সংগ্রহ করিয়া সমস্ত দিনরাত্রিতে চারি বার খাবার দিয়া ঘরের মধ্যে পালনকার্য্য অন্যান্য কার্য্যের অবসর সময়ে সাধিত হয়। এইরূপে উৎপন্ন গুটী যত সস্তায় বিক্রয় করিতে পারা যায়, বেতন দিয়া লোক রাখিয়া পালন করিলে তেমন পারা যায় না। অথচ অবসর সময়ে সাধিত পালনকার্য্য কৃষক-পরিবারের আয়ের উপায়স্বরূপ হয়। কার্য্যে পারদর্শিতা জন্মিলে এক এক পরিবার অনেক পলুপালন করিয়া মাস-দেড়েকের মধ্যেই কয়েক শত টাকা অর্জ্জন করিয়া লইতে পারে। জাপানে কৃষকদের জমি অল্প, কিন্তু পলুপালন-দ্বারা বহু কৃষক তাহাদের আয় দ্বিগুণ করিয়া লয়।

২। তুঁতচাষ—পলু পালন করিয়া গুটী পাইতে মাত্র ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ দিন সময় লাগে, কিন্তু তুঁত জন্মাইতে বেশী সময়ের প্রয়োজন। ভাল করিয়া তুঁতচাষ করিতে পারিলেই পলুপালনকার্য্যের অর্দ্ধেকেরও বেশী উদ্ধার হইয়াছে বুঝিতে হইবে। তুঁতচাষ শক্ত নয়, তবে জমি ভাল করিয়া তৈয়ার করিতে হয় এবং সার দিতে হয়। তুঁতচাষ কয়েক রকমে করিতে পারা যায়। ক্ষেতে বা অপর স্থানে ডাল লাগাইয়া ঝাড় বা ঝুপি তুঁত প্রায় ছয় মাসের মধ্যে এবং স্থানবিশেষে এক বৎসরের মধ্যেই তৈয়ারী হয়। একবার লাগাইলে আট-দশ বৎসর থাকে। সময়-মত সার খোঁড় ও নিড়ান দিতে হয়। ছোট তুঁত গাছ জন্মাইতে দুই-তিন বৎসর লাগে এবং বড় গাছ আট-দশ বৎসরের কমে হয় না। তবে গাছ জন্মাইতে পারিলে জীবনভোর পাতা পাওয়া যায়, আর কোন খরচ করিতে হয় না। যেখানে জল না দাঁড়ায় এমন যে-কোন স্থানে তুঁত জন্মে। বাংলার যে-কোন স্থানে বিনা জলসেচনেই তুঁত জন্মিতে পারে।

পলুপালনকার্য্যে তুঁতের প্রয়োজনীয়তাই প্রধান। এই কারণে জাপানে প্রত্যেক রেশম সম্বন্ধীয় স্কুলে, কলেজে এবং গবেষণা ও পরীক্ষাক্ষেত্রে তুঁতের বিশেষজ্ঞ নিয়োজিত হইয়াছেন। জাপানে প্রায় চারি শত প্রকার তুঁতের মধ্যে পরীক্ষা করিয়া নানা স্থানের ও ঋতুর উপযোগী আট নয়টির চাষ হয় এবং সমস্ত তুঁতই কলম হইতে উৎপন্ন করা হয়। দক্ষিণ-চীনে অনেক স্থানে তুঁতচাষী কেবল তুঁতচাষ করিয়া পলুপালকদিগকে পাতা বিক্রয় করে।

৩। রেশম-পলুর জাত—এখন নানা দেশে রেশম-পলুর বহু জাত বর্ত্তমান। কতক উৎকৃষ্ট, কতক নিকৃষ্ট। উৎকৃষ্ট জাত হইতে উৎকৃষ্ট এবং পরিমাণে বেশী রেশম পাওয়া যায়। জাতনির্ণয়ের প্রথম উপায় পলুর জীবনী। এক শ্রেণীর পলুর ডিম বসন্তকালে ফোটে, পলু মাসখানেক খাইয়া বড় হইয়া গুটী করে এবং আরও দশ-বার দিন পরে চোকড়া-চোকড়ী কাটিয়া বাহির হয় ও ডিম পাড়ে। এই ডিম কিন্তু প্রায় দশ মাস পরে আবার বসন্তকালে ফোটে। এই প্রকার জীবনীবিশিষ্ট পলুকে "একচক্রী" (univoltine or one-brooded) পলু বলা হয়। কারণ বৎসরে ইহাদের জীবনীর একচক্র মাত্র পূর্ণ হয়। কতক পলুর জীবনী বৎসরের সব সময়েই চক্রের পর চক্র হইতে থাকে। ইহাদিগকে "বহুচক্রী" (multivoltine, polyvoltine or many-brooded) পলু বলা হয়। জীবনীচক্র ছাড়া গুটীর আকার, গঠন, রং এবং গুটীর রেশমের পরিমাণ অনুসারে আবার নানা জাত আছে এবং এই জাত-সকল নানা দেশে বর্ত্তমান।

মোটামুটি হিসাবে প্রায় সমস্ত একচক্রী পলু বহুচক্রী পলু অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। জাপান, উত্তর-চীন, ফ্রান্স, ইতালী, বলকান্, তুরস্ক প্রভৃতি স্থানে এবং ভারতবর্ষের মধ্যে কাশ্মীরে একচক্রী পলু পালিত হয়। দক্ষিণ-চীন, ইন্দোচীন, শ্যাম,

ব্রহ্মদেশ ও ভারতবর্ষে আসাম, বাংলা এবং মহীশূরে বহুচক্রী পলু পালিত হয়। মোটামুটি ঠাণ্ডা দেশে একচক্রী এবং গরম দেশে বহুচক্রী পালনের চলন। বাংলা দেশে বড়পলু নামে একচক্রী পলু আছে, কিন্তু ইহা অপরাপর দেশের একচক্রী পলুদের অপেক্ষা বহুগুণে নিকৃষ্ট। ইহার পালনও বেশী হয় না।

গুটীতে রেশমের পরিমাণ, কত গজ খাই প্রত্যেক গুটী হইতে পাওয়া যায়, এবং খাই কত মোটা—এই তিনটি বিষয়ের তুলনা করিয়া একচক্রী ও বহুচক্রী পলুর পার্থক্য দেখাইতেছি। বহুচক্রী পলু ভাল হইলে নীচে যে ফল দেখাইলাম এইরূপ হয়। প্রায়ই ইহা হইতে নিকৃষ্ট ফল পাওয়া যায়। ফ্রান্স ও ইতালীতে একচক্রী গুটীতে প্রায় ৪ হইতে ৬ গ্রেণ রেশম থাকে এবং প্রায় এক হাজার কি এক হাজার দুই শত গজ খাই মিলে। চীন জাপানে সাধারণতঃ তিন-চার গ্রেণ রেশম এবং আট-নয় শত গজ খাই পাওয়া যায়।

	ব্রহ্মদেশে পালিত ইতালীয় একচক্রী পলু	বাংলার বহুচক্রী নিস্তারি পলু	বাংলার বহুচক্রী ছোটপলু	বহুচক্রী মহীশুরী পলু
গুটীতে সম্যক রেশমের ওজন কত গ্রেণ	৩॥	১॥	১।	১৸
গুটীর খাই কত গজ লম্বা	৮০০	৩০০	২৫০	৩৫০
১ ÷ ২৫০০০ ইঞ্চিকে এক মাপ ধরিয়া খাই কত মাপ মোটা : খাই ক্রমে সরু হইয়া যায়	২১-১৪	১৮-১০	১৪-১০	১৮-১০

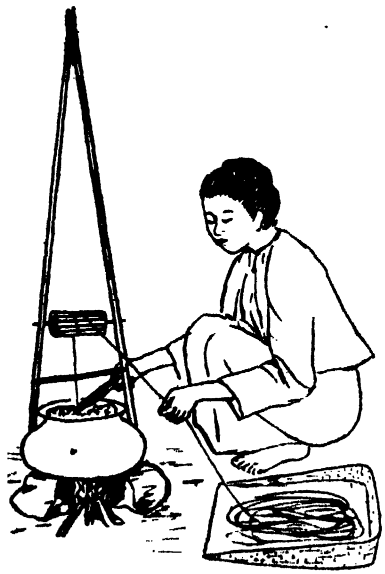
৪। পলুর রোগ ও ডিম সরবরাহ—পলুদের চারি প্রকার রোগ হয়, ইহাদের মধ্যে "পেব্রিন্" (কটা রোগ) নিতান্ত খারাপ। এই রোগে ফ্রান্স ও ইতালী প্রভৃতি দেশের সমস্ত পলুই মারা পড়িতে থাকে। তখন ফরাসী বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত লুই পাস্তুর অনুসন্ধান করিয়া ইহা কিসে হয় এবং কিরূপে নিবারণ করা যায় স্থির করিয়া দেন। চোকৃড়ীর দেহে অনুবীক্ষণ যন্ত্রসাহায্যে রোগের বীজ দেখা গেলে সন্তানেরও রোগ হয়। চোকৃড়ী ডিম পাড়িবার পর ইহার দেহটি কয়েক ফোঁটা জলের সহিত খলে মাড়িয়া ইহার এক ফোঁটা অনুবীক্ষণ যন্ত্রসাহায্যে পরীক্ষা করা হয়। যদি রোগের বীজ দেখা যায় তাহা হইলে তাহার ডিম ফেলিয়া দেওয়া হয়। সাধারণ লোকের পক্ষে এইরূপে পরীক্ষা করিয়া ডিম পালন করা সহজ নয়। জাপানে আইন আছে যে, কেহ নিজে ডিম উৎপাদন করিয়া পলু পালন করিতে পারে না। সমস্ত ডিমই সরকারী তত্ত্বাবধানে উৎপন্ন হয়। পলু-পালকেরা এই ডিম কিনিয়া লইয়া পালন করে। ফ্রান্স এবং ইতালীতেও সরকারী তত্ত্বাবধানে ডিম উৎপন্ন হয়। ভাল ফল পাইতে হইলে পরীক্ষিত ডিম ছাড়া পালন করা উচিত নয়। পলুপালনের উন্নতি এইরূপে ডিম উৎপাদনের বন্দোবস্ত ছাড়া সম্ভব নয়।

৫। পালনকার্য্য—পলুপালন করিয়া পালনকার্য্যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে হয়। পালনকার্য্য শক্ত না হইলেও পলুকে ভাল করিয়া খাদ্য দেওয়া, ভাল অবস্থায় রাখা এবং তাহার স্বভাব অনুসারে যাহাতে ভাল থাকে তাহার বন্দোবস্ত করিতে হয়। পালনে অনিয়ম হইলে পলু মরিয়া যাইতে পারে এবং ভাল গুটী না করিতে পারে। পালনকার্য্য দেখিয়া দুই-একবার বিবেচনা করিয়া পালন করিলেই এই কার্য্য আয়ত্ত করা যায়। সাধারণতঃ ডিম মুখাইবার পচিশ-ত্রিশ দিনের মধ্যেই গুটী হয়। একচক্রী পলু হইতে বৎসরে একবার বা এক বন্দ এবং বহুচক্রী হইতে ছয়-সাত বন্দ গুটী পাওয়া যায়। কিন্তু পর পর কিংবা কোলে পিঠে বন্দ পালন না করিয়া এক এক বন্দে বেশী করিয়া বৎসরে তিন কি চারি বন্দ পালন করাই ভাল। ইহাতে রোগ হইবার সম্ভাবনা কম আর একসঙ্গে অনেক গুটী হইলে একেবারে হাতে কিছু পয়সা আসিয়া যায়। বাংলা দেশের ঝুপি তুঁতের পক্ষে এইরূপ পালন সুবিধাজনক। একবার পাতা খাওয়াইয়া আবার পাতা হইলে আর এক বন্দ পালন করা যায়।

৬। গুটী হইতে সুতা-কাটাই—খড়বিচালী শণ পাটের দড়ি পাকাইতে যেমন নূতন নূতন গুছি খাওয়াইয়া বহু লম্বা দড়ি পাকান যায়, রেশম সুতা কাটাইও সেইরূপ পর পর খাই খাওয়াইয়া বহু লম্বা সুতা কাটা হয়। অতএব যে-গুটীর খাই লম্বা ও মোটা তাহাতে যত সুতা হয়, তাহা অপেক্ষা যে-গুটীর খাই ছোট ও সরু তাহাতে কম সুতা হয়। লম্বা খাইবিশিষ্ট গুটী হইতে ভাল সুতা হয়। এই কারণে উৎকৃষ্ট গুটীর সুতা

নিকৃষ্ট গুটীর সুতা অপেক্ষা ভাল হয়। এখন পলুর ভাল জাত হওয়ার প্রয়োজন বুঝা যাইবে।

ভাল গুটী হইলেও যদি কাটাই ভাল না হয় তাহা হইলে সুতা ভাল হইতে পারে না। রেশম-কাটাই প্রথার উন্নতির বিবরণ মোটামুটি দেওয়া যাইতেছে। ব্রহ্মদেশের কারেনদিগের মধ্যে যে-প্রথার চলন আছে ৬ নং চিত্রে তাহা দেখান হইল।



৬। ব্রহ্মদেশে কারেনদিগের মধ্যে রেশম গুটী কাটাই প্রথা

গুটীগুলিকে একটি মাটির ভাঁড়ে জলে সিদ্ধ করা হয় এবং লোহার চিমটা দিয়া নাড়াচাড়া করা হয়। কয়েকটি গুটী হইতে সুতা উঠাইয়া ভাঁড়ের মুখে যে দুইটি বাঁশ দাঁড় করান



৭। ব্রহ্মদেশে ইয়াবেন্‌দিগের মধ্যে রেশম গুটী কাটাই প্রথা

আছে তাহাতে আড়ভাবে লাগান এক টুকরা বাতার ছিদ্রের ভিতর দিয়া এবং তার পর বাঁশের চাকার উপর দিয়া বাঁ-হাত দ্বারা টানিয়া লইয়া ডালায় রাখা হয়। গুটীর ফেঁসো ইত্যাদি সবই সুতায় উঠে এবং সুতা অতি অপরিষ্কার ও মোটা



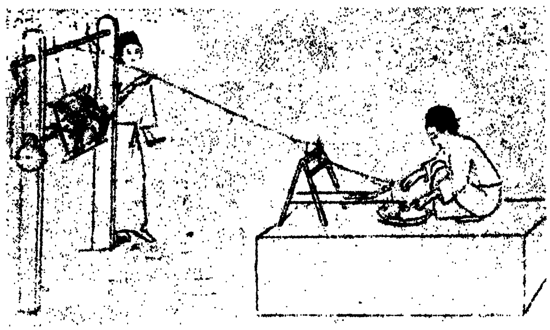
৮। জাপানে আদিম রেশম গুটী কাটাই প্রথা



৯। জাপানে যয় যাইএ কাটাই যন্ত্র—চরখী হাতে ঘুরান হয়

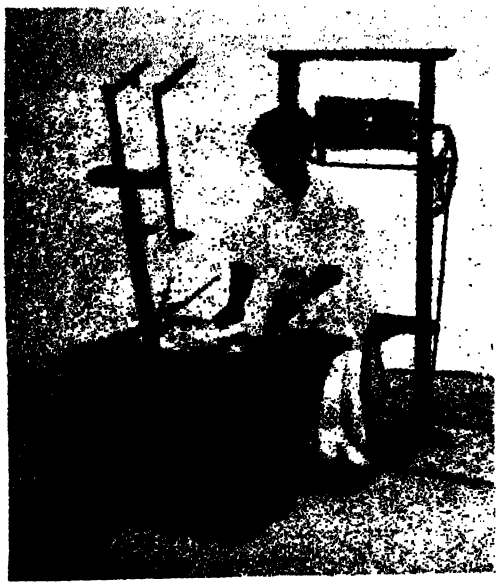
পাতলা হয়। ব্রহ্মদেশেরই অপর জায়গায় ইয়াবেন্‌দের মধ্যে কাটাই-প্রথা ঐরূপই, তবে সুতা গোল কাঠের উপর জড়ান হয় (৭ নং চিত্র)। জাপানেও আদিম কাটাই-প্রথা প্রায় এইরূপ ছিল (৮ নং চিত্র)। মহীশূরে প্রায় এই প্রথাতেই এখনও কাটাই হয়। ইহার পর জাপানে যে যন্ত্র ব্যবহৃত

হয় ৯ নং চিত্রে তাহা দেখান হইল। উন্নত ও ভাল কাটাই-প্রথা ও যন্ত্র ফ্রান্সে প্রথমে উদ্ভাবিত হয়। এই বিদেশী যন্ত্রকে সহজ ও সস্তা করিয়া বাংলা দেশে কোম্পানী বাহাদুরের আমলে যে-যন্ত্র গ্রহণ করা হয় বাংলায় এখনও তাহাই



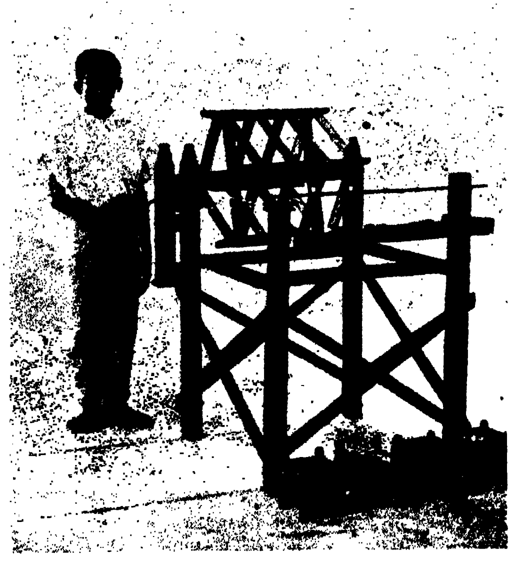
১০। বাংলার কাটাই যন্ত্র। সাধারণ যন্ত্র কিছু পরিবর্ত্তিত ও উন্নত

চলিতেছে। ১০ নং চিত্রে যে-যন্ত্র দেখান হইল তাহা প্রায় বাংলার প্রথানুযায়ী, কিন্তু কিছু পরিবর্ত্তিত ও উন্নত। কাটানী ঘাইএর উপর উবু হইয়া বসিয়া কাটাই করে এবং ঘুরানী দাঁড়াইয়া চরখী ঘুরায়। ঘরঘাইয়ের নীচে আগুন জ্বালাইয়া



১১। জাপানী পা-যন্ত্র—পায়ের সাহায্যে চরখী ঘুরান হয়

জল গরম করা হয়। বানকে বয়লার হইতে বাষ্প বা ষ্টীম দ্বারা জল গরম করা হয়। কিন্তু বানকেও কাটাই যন্ত্র এইরূপ। ইহাতে কাটানী কি ঘুরানী কেহই বেশীক্ষণ কাজ করিতে পারে না। এই যন্ত্রে দুই খাই সুতা একসঙ্গে কাটা হয়। ইংরেজী ১৮৭০ সালে বিলাতী যন্ত্র জাপানে আমদানি করা হয়। ঘরঘাইয়ের জন্য এই যন্ত্রকে সহজ করিয়া জাপানে যে যন্ত্র তৈয়ারী হয় ১১ নং চিত্রে তাহা দেখান হইল। কাঠের বাক্সটির ভিতর কয়লা জ্বালাইয়া জল গরম করিবার চুলা আছে। কাটানী বেঞ্চের উপর বসিয়া এক পায়ের সাহায্যে চরখী ঘুরায় এবং একসঙ্গে দুই খাই সুতা কাটে। এই "পা যন্ত্র" বাংলার কাটাই যন্ত্র অপেক্ষা অনেক ভাল। একজনেই এবং যেখানে ইচ্ছা যন্ত্রটি রাখিয়া কাটাই করিতে পারে। এই যন্ত্রের চরখী ছোট এবং দুইটি আলাদা চরখীতে দুই খাই সুতা জড়ান হয়। তারপর চরখী খুলিয়া লইয়া



১২। ফেরাই যন্ত্র—সহজ করিয়া তৈরি

মাটির উপর বসাইয়া ইহা হইতে বড় চরখীতে সুতা ফেরাই করিয়া উঠান হয় (১২ নং চিত্র)। ফেরাই করিবার সময় সুতা ছিঁড়িয়া থাকিলে জুড়িয়া দেওয়া হয় এবং সুতার ময়লা ইত্যাদি বাছাই হইয়া বহু দোষ কাটিয়া যায়। বাংলার কাটাই যন্ত্রে বড় চরখীতেই একেবারে কাটাই করিয়া ফেরাই না করিয়া সুতা চালান দেওয়া হইত, ইহাই বাংলার রেশমের অখ্যাতির প্রধান কারণ। বাংলা দেশের ঘরঘাইয়ে কাটা

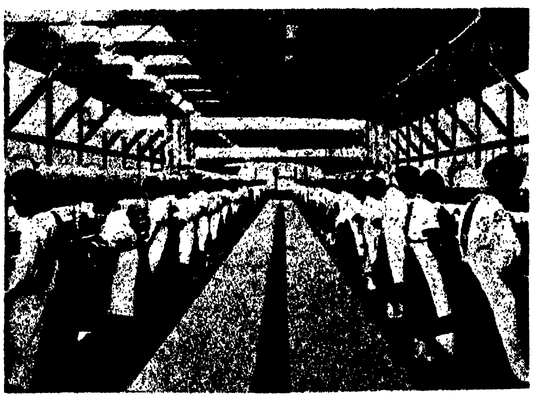
খংরু রেশমও এই যন্ত্রে কাটাই হয় এবং খংরুতে গুটীর ফেঁসো ইত্যাদি সব উঠাইয়া দেওয়া হয় এবং ছেঁড়া খাই জোড়া দেওয়া হয় না। খংরু ব্রহ্মদেশের এবং জাপানী আদিম প্রথায় কাটা মোটা পাতলা রেশমের মত সুতা। খংরু কখনও বিদেশে চালান যাইত না।

জাপানে প্রথমে বানকে বিলাতী যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। বিলাতী যন্ত্রের চরখী বড় এবং সুতা ফেরাই করিবার প্রথা



১৩। জাপানের বানক

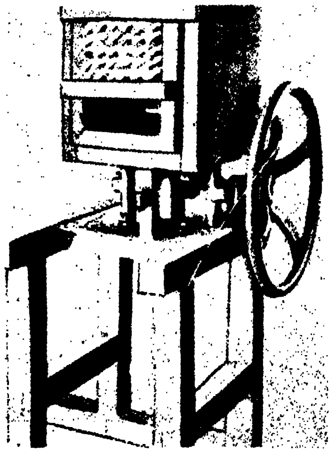
নাই। জাপান যখন বাজারের চাহিদা বুঝিতে পারিল তখন বানকের সমস্ত যন্ত্রের বড় চরখী বদলাইয়া, বহু ব্যয়ে ছোট চরখী করিয়া দিল এবং কাটাইয়ের পর ফেরাই অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া গ্রহণ করিল। জাপানে বানক-যন্ত্রের বহু উন্নতি



১৪। জাপানের বানক—প্রত্যেক কাটানী ২০খাই সুতা কাটে

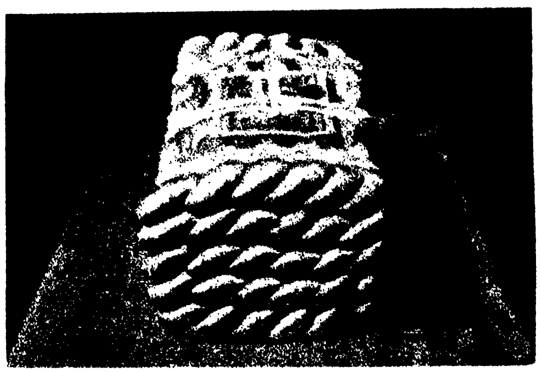
হইয়াছে (১৩ নং চিত্র)। সাধারণতঃ প্রতি ঘাইয়ে এক-এক জন কাটানী পাঁচ হইতে সাত খাই সুতা কাটে। এক প্রকার উন্নত যন্ত্রে এক এক জনে বিশ খাই সুতা কাটে (১৪ নং চিত্র)। বানকে গুটী অন্যত্র সিদ্ধ করা হয় এবং সিদ্ধ গুটী কাটানীদিগকে সরবরাহ করা হয়। এই গুটী লইয়া কাটানীরা একেবারে কাটাই করিতে থাকে।

ফেরাই করিবার পর রেশম চরখী হইতে ছাড়াইয়া লইয়া বন্দি পাকান হয় এবং ত্রিশটি বন্দিকে একত্রে বাঁধিয়া যন্ত্রের



১৫। বুক বা বাণ্ডিল তৈয়ারি যন্ত্র

(১৫ নং চিত্র) সাহায্যে চাপিয়া "বুক" বা বহি বা বাণ্ডিল করা হয় (১৬ নং চিত্র) এবং ত্রিশটি বহিতে এক "বেল" বাঁধিয়া কাপড় ও চাটাই মুড়িয়া চালান দেওয়া হয়।



১৬। রেশম সুতার বুক বা বাণ্ডিল

৭। সুতার গুণাগুণ—বিলাত আমেরিকাতেই রেশমের ব্যবহার বেশী। সেখানে কাঁচা রেশম হইতে বুনন প্রায় নাই; পাইট করিয়া তবে বুনন হয়। পাইট-কার্য্য সম্বন্ধেই

কলের সাহায্যে হয়। আর ঐ সকল সৌখীন দেশে সুতা মোটা পাতলা হইলে তাহা ব্যবহৃত হয় না, কারণ একই প্রকার মোটা সুতায় কাপড় না বুনিলে কাপড়ের জমি অসমান ও অসুন্দর হয়। সুতা মোটা পাতলা হওয়ার দরুণ, কিংবা ছেঁড়া মুখ জোড়া না থাকিলে, কিংবা অন্য কারণে কলে শীঘ্র শীঘ্র পাইট-কার্য্যের ব্যাঘাত হইলে লোকে সুতা পছন্দ করে না। এই সকল কারণে সুতার কি কি গুণ থাকা চাই তাহা স্থির করা হইয়াছে। সেই গুণগুলির সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতেছে।

প্রথম, সমস্ত সুতা যতদূর সম্ভব "সমান মোটা" হওয়া চাই। দ্বিতীয়, দোষহীনতা—সুতায় ফেঁসো লাগিয়া থাকিবে না; ছেঁড়া খাই জোড়া দিলে গিরার লম্বা লম্বা মুখ থাকিবে না; দুই-তিন খাই বা ছেঁড়া খাই সুতায় জড়িত থাকিবে না; সুতার পাইট ও বুননে ব্যাঘাত হয় এবং কাপড় অসুন্দর দেখায়—এইরূপ যাহা কিছু সবই দোষ। সুতা যত দোষশূন্য হইবে ততই ভাল। তৃতীয়, ফেরাই পাকাই কার্য্যে পাইটের সময় সুতা ছিঁড়িবে না বা যত কম ছিঁড়ে ততই ভাল।

এই সকল গুণাগুণ যাচাই করিয়া তবে এখন সুতা ক্রয়-বিক্রয় হয়। ১৩৩⅓ পাউণ্ডে এক বেল হয় এবং দশ বেলে এক লাট (lot) হয়। ক্রয়বিক্রয়ের পরিমাণ এক লাট। লাট হইতে বিভিন্ন বাণ্ডিলের পঞ্চাশ বন্দি সুতা বাহির করিয়া যাচাই করা হয়, কি কি যাচাই করা হয় সংক্ষেপে বলিতেছি—

(১) "সমান মোটা" কিনা ও তাহার পরিমাণ—(evenness.)

(২) দোষশূন্যতার পরিমাণ (cleanness and neatness.)

(৩) ফেরাইকালে কতবার ছিঁড়ে (winding)। এক ঘণ্টা দশ মিনিট ফেরাই করিয়া কতবার ছিঁড়িল দেখা হয়।

(৪) সরু মোটান্তর পরিমাণ (evenness deviation)। সুতা খাই জুড়িয়া জুড়িয়া কাটাই করিতে হয়। অতএব সমস্ত সুতাই বরাবর সমান মোটা হইবে এরূপ আশা করা যায় না। কিছু মোটা পাতলা হইবেই। যাচাই করিয়া দেখা হয় কত মোটা-পাতলা আছে।

(৫) গড় মোটা—লাটে মোটা পাতলা সুতার পরিমাণ যাচাই করিয়া গড় মোটা কত (average evenness.)

(৬) শক্তি (tenacity.)

(৭) স্থিতিস্থাপকতা ও লম্বমানতা (elongation).

(৮) আঁটভাব (cohesion)—কয়েকটি খাই লইয়া এক একটি সুতা কাটা হয়। কাঁচা রেশমে এই খাইগুলি কত আঁটভাবে লাগিয়া আছে তাহার পরীক্ষা।

(৯) সুতায় গঁদের পরিমাণ—সাবান দিয়া সিদ্ধ করিয়া গঁদ গলাইয়া দিয়া ধুইয়া শুকাইয়া দেখা হয়।

এই যাচাইগুলির মধ্যে প্রথম দুইটিই প্রধান। এই সকল যাচাই ছাড়া বাণ্ডিলগুলি চোখে দেখিয়া এবং হাতে অনুভব করিয়া কত শক্ত বা নরম, রং সমান ও সুন্দর কি-না, বন্দি ও বাণ্ডিলগুলি সুন্দর ও সুশ্রী ভাবে পাকান সাজান কিনা ইত্যাদি দেখিয়া সমস্ত যাচাই ও পরীক্ষার ফল যোজনা করিয়া লাটটি কোন্ শ্রেণীর সুতা বলিয়া ক্রয়বিক্রয় হইবে তাহা স্থির করা হয় এবং এই শ্রেণীবিভাগ দ্বারা মূল্য নির্দ্ধারিত হয়। ক্রেতাও বুঝিতে পারে কি গুণাগুণবিশিষ্ট সুতা ক্রয় করিতেছে। জাপান নিয়ম করিয়াছে যে সমস্ত চালানী সুতা যাচাই করিয়া শ্রেণিবিভাগের সার্টিফিকেট-সহ চালান দিতে হইবে। চীনও এইরূপ অনেকটা বন্দোবস্ত করিয়াছে ও করিতেছে। এইরূপে সমতাসাধন (standardization) না করিলে সুতা কাটৃতি হওয়া সম্ভব নয়।

৮। সুতা কত ভিজা তাহা নির্দ্ধারণ (কণ্ডিশন্ করা—conditioning)—কাঁচা রেশমের স্বভাব হইতেছে যে, ইহা যদি ভিজা স্যাঁতসেঁতে আব্‌হাওয়ায় থাকে তাহা হইলে জলীয় বাষ্প আকর্ষণ করিয়া লয়। আবার শুকনো স্থানে থাকিলে জলীয় বাষ্প ত্যাগ করিয়া শুকনো অবস্থা প্রাপ্ত হয়। আব্‌হাওয়ার গতিকে জলীয় বাষ্প কখন কম-বেশী হয় তাহার স্থিরতা নাই। আর জলীয় বাষ্পের কম-বেশীতে রেশমের ওজনের কম-বেশী হয়। ইহার দরুণ ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়েরই লাভ-লোকসান হইতে পারে। এই কারণে সুতা কণ্ডিসন্ করিয়া বিক্রয়ের প্রথা আছে। লাটের কয়েকটি বন্দি গরম করিয়া ইহাদের জলীয় ভাগ নিঃশেষ করিয়া ওজন দেখা হয় এবং এই নিঃশেষিত ওজনের শতকরা এগার ভাগ নিঃশেষিত

ওজনে যোগ করিয়া যে ওজন পাওয়া যায় তাহাই বিক্রয়ের ওজন ধরা হয়। এই ওজনকে কণ্ডিশন্ করা ওজন (conditioned weight) বলে।

জাপান বহুদিন পূর্ব্বে কণ্ডিশন্ করিয়া তবে রেশম চালান দিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিল। ইয়োকোহামা শহরের কণ্ডিশনাগার পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্ববৃহৎ। এখন জাপানে কোবে শহরে চালানী রেশমের জন্য দ্বিতীয় কণ্ডিশনাগার আছে। আর জাপানের ভিতর যেখানে যেখানে বয়নের জন্য রেশম সুতার বেশী ব্যবহার আছে সেই সেই স্থানে, এমন কি গ্রামেও, কণ্ডিশনাগার স্থাপিত হইয়াছে। আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে, ইংলণ্ডের লণ্ডন শহরে, ফ্রান্সের লিয়ঁ শহরে, ইতালীর মিলান শহরে এবং চীনের সাঙ্গাই ও ক্যাণ্টনে কণ্ডিশনাগার আছে।

রেশম-শিল্পের নানা বিভাগের সামঞ্জস্য

রেশমের ব্যবহার ও কাটতি মোজা কাপড় প্রভৃতি বুননের জন্য। ভাল সুতা না হইলে ভাল কাপড় হইতে পারে না। ভাল গুটী ও ভাল কাটাই হইলে তবে ভাল সুতা হয়। ভাল গুটীর জন্য ভাল জাতের পলু প্রয়োজন; আবার পলুপালনের সাফল্যের জন্য পরীক্ষিত নিরোগ ডিম প্রয়োজন। নিরোগ ডিম উৎপাদন সর্ব্বত্রই সরকারী তত্ত্বাবধানে না হইলে ভালরূপে হওয়া সম্ভব নয়। পলুপালক সঙ্গে সঙ্গে গুটী বিক্রয় করিয়া নগদ পয়সা পাইলেই সন্তুষ্ট হয় এবং বেশী বেশী গুটী উৎপাদন করিতে থাকে। সুতাকাটাইকারী ব্যাপারী বা বানক গুটী ক্রয় করে এবং গুটী না হইলে তাহাদের কার্য্য চলিতে পারে না। সুতা ক্রয় করে স্বদেশী বিদেশী বয়নকারী ও পাকদারেরা। পাকদারেরা বয়নকারীদিগকেই পাকোয়ান সুতা বিক্রয় করে। বয়নকারীরা যেমনটি চায় সেইরূপ সুতা কাটাই করিতে পারিলেই সুতা বিক্রয় হয়। বাজারে যেরূপ মালের কাটতি সেইরূপ মাল উৎপন্ন করিতে পারিলে বয়নকারীদের মাল বিক্রয় হয়। অবশ্য সর্ব্বত্রই যত সস্তায় সম্ভব মাল উৎপাদন ও বিক্রয় প্রয়োজন। এখন সহজেই বুঝা যাইবে, রেশম-শিল্পের ভিন্ন ভিন্ন শাখা কিরূপে পরস্পরের উপর নির্ভর করিতেছে। এই সকলের সামঞ্জস্য করিতে পারিলেই সমস্ত রেশম-শিল্পের উন্নতি। পরীক্ষা, গবেষণা, আধুনিক উন্নত পন্থা ও যন্ত্রপাতি দ্বারা জাপান সমস্ত শিল্পের সামঞ্জস্য সাধন করিয়াছে, তাই রেশম-শিল্পে অগ্রণী হইয়াছে এবং প্রভূত ধন সঞ্চয় করিতেছে।

রেশম-বয়ন গার্হস্থ্য তাঁতেই উত্তম হয় এবং এই তাঁত বিজলী-চালিত হইলে বয়নকার্য্য উত্তম ও শীঘ্র হয়।

রেশম-উৎপাদন-শিল্পে সরকারী সাহায্য

রেশম-উৎপাদন-শিল্প, বিশেষ করিয়া পলুপালনকার্য্য, সরকারী সাহায্য ব্যতীত কোন দেশেই সাফল্য লাভ করে নাই। এই কার্য্য কৃষকের উপশিল্প। যে কৃষকের বহু জমিজমা আছে, ধান কলাই আক্ প্রভৃতি বহু পরিমাণে উৎপন্ন হয়, সেইরূপ ধনী কৃষক প্রায়ই পলুপালনকার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না। যাহার জমি অল্প ও আয় কম তাহারই উপশিল্প দ্বারা উপরি আয়ের প্রয়োজন হয়। সর্ব্বত্রই এইরূপ কৃষকই পলুপালন করে এবং ইহাদের পক্ষে পলুপালন সমস্ত গৃহশিল্পের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপশিল্প। জাপানের কৃষকদের জমি অল্প, ইহাই জাপানের রেশম-শিল্পের চলনের এক প্রধান কারণ। এখন সহজেই বুঝা যাইবে, পলুপালনকার্য্যে সরকারী সাহায্য কেন প্রয়োজন। উপরে প্রদত্ত জ্ঞাতব্য বিষয়সকল হইতে দৃষ্ট হইবে যে, স্বল্প জমির মালিক দুঃস্থ কৃষক পরিবারের পক্ষে পলুপালনের সাফল্যের জন্য সরকারী সাহায্য ব্যতীত সমস্ত বন্দোবস্ত অসম্ভব। কোন কোন দেশে পলুপালনের সর্ব্ববিষয়ে উন্নতির জন্য পরীক্ষা ও গবেষণা প্রভৃতির ব্যয় ছাড়া তুঁতের জমি বৃদ্ধির জন্য, বেশী পরিমাণ পালুপালন করিয়া বেশী গুটী উৎপাদন করিলে এবং বেশীসংখ্যক কাটাই ঘাই চালাইলে সরকার হইতে অর্থসাহায্য করা হয়; কারণ পালনকার্য্যের বৃদ্ধি হইলে কাটাই ফেরাই পাকাই বয়ন এবং গুটী ও সুতার ব্যবসায়ে বহু লোকের জীবিকার উপায় হয়।

বিদেশ হইতে আমদানি বস্ত্র প্রভৃতির উপর সংরক্ষণ-শুল্কের প্রভাব

এখন বিদেশী চিনির উপর শুল্ক স্থাপন করাতে দেশে শীঘ্র আকের চাষ বাড়িয়া কত নূতন চিনির কল স্থাপিত হইয়াছে তাহা সকলেই অবগত আছেন। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, সুইজারলণ্ড, জার্ম্মানী, অষ্ট্রিয়া, রুশিয়া এবং আমেরিকায়

যুক্তরাষ্ট্রে আমদানি রেশমী বস্ত্র এবং পাকোয়ান সূতার উপর শুল্কের প্রভাব ঐ-সকল দেশের রেশম-শিল্পের উপর কিরূপ হইয়াছিল তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যাইতেছে।

ইংলণ্ডে যতদিন আমদানি বস্ত্র ও সূতার উপর শুল্ক ছিল ততদিন রেশম-শিল্প (বয়ন) বেশ ভালই চলিয়াছিল। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে শুল্ক উঠাইয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গেই রেশম-শিল্পের অবনতি হয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আবার শুল্ক স্থাপিত হইলে উন্নতি হইতে থাকে। ফ্রান্সে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দ হইতে শুল্ক স্থাপিত হয় এবং ঐ শুল্কের জোরেই ফ্রান্সের বয়ন-শিল্প টিকিয়া আছে। ইংলণ্ড যখন শুল্ক উঠাইয়া দিল অষ্ট্রিয়া তখন শুল্ক স্থাপন করিল এবং ইংরেজ কারিগর, ইংরেজের মূলধন এবং ইংলণ্ডে উদ্ভাবিত যন্ত্রের সাহায্যে অষ্ট্রিয়ার শিল্প গড়িয়া উঠিল। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের রেশম-বয়ন শিল্প পৃথিবীর মধ্যে প্রধান। পৃথিবীতে যত রেশম সূতা উৎপন্ন হইয়া বিক্রয় হয় তাহার অর্দ্ধেকের বেশী আমেরিকা আমদানি করিয়া ব্যবহার করে। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে পাকোয়ান সূতা এবং রেশমী বস্ত্রের উপর স্থল-বিশেষে শতকরা ষাট মুদ্রা পর্য্যন্ত শুল্ক স্থাপন করিবার পরই এই শিল্পের উন্নতি আরম্ভ হয়। এই সকল দেশেই কাঁচা রেশম বিনা-শুল্কে আমদানি করা হয়।

বাংলার রেশম-শিল্পের উন্নতি ও বিস্তারের জন্য এখন কি প্রয়োজন

প্রধান প্রয়োজন হইতেছে উপরে যে সামঞ্জস্যের কথা বলিয়াছি সেই সামঞ্জস্যসাধন। বাংলায় ব্যবহারশিল্প (utilization—বয়ন) এবং উৎপাদন শিল্প (production—পলুপালন ও সূতা-কাটাই) দুই-ই বর্ত্তমান, কিন্তু উভয়েরই বহু উন্নতি প্রয়োজন। তাঁতীরা মান্ধাতার আমলের যন্ত্র ও বয়নপ্রণালী ধরিয়া আছে। আধুনিক বাজারের সহিত তাহাদের সংযোগ স্থাপন আবশ্যক। তাহাদের মাল যত কাটিবে রেশম-শিল্পের অন্যান্য শাখার ততই উন্নতি হইবে। সূতা পাকাই এবং রঙাই কার্য্য পৃথক করিয়া তাঁতীদিগকে বয়ন বাহাতে শীঘ্র শীঘ্র হয় তাহার সাহায্য করিতে হইবে। এদেশে পাকাই ও রঙাই শিল্পের ক্ষেত্র রহিয়াছে। আর সাদা এবং নক্সাদার কাপড় বুনিবার জন্য বিজলী-চালিত জেকার্ড তাঁত গ্রহণ করিতে হইবে। সমতল বাংলা ভূমিতে নদী থাকিলেও জলস্রোতের সাহায্যে বিজলী উৎপাদন সম্ভব হয় ত হইবে না। কিন্তু হাতের কাছে কয়লা রহিয়াছে। কয়লার সাহায্যে বিজলী উৎপাদন করিয়া সস্তা বিজলীর সাহায্যে তাঁত চালাইতে পারিলেই আমাদের তাঁতীরা সকলের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে। এক কেন্দ্র-স্থানে, যেমন শ্রীরামপুর বয়নস্কুলে বিজলী তাঁতের ব্যবহার-শিক্ষার বন্দোবস্তের প্রয়োজন। বাজার বুঝিয়া তাঁতীরা কি বুনিবে তাহার বন্দোবস্ত এবং উৎপন্ন কাপড় নমুনার মত হইল কি-না এবং কোন দোষ আছে কি-না দেখিয়া চালান দিতে পারিলে শীঘ্র বাজার পাওয়া যাইবে। এখন ইহাই বয়ন-শিল্পের উন্নতির একমাত্র উপায়।

উৎপাদন-শিল্প বা পলুপালন ও সূতা-কাটাইয়ের উন্নতি কিরূপে সম্ভব, প্রায় পঁচিশ-ছাব্বিশ বৎসর নানাবিধ রেশম (এবং তসর ও এণ্ডি পলু) লইয়া কার্য্যের অভিজ্ঞতার ফলে আমার যতদূর জ্ঞান হইয়াছে তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি। ইহার জন্য প্রথম প্রয়োজন ভাল জাত্ পলু। ব্রহ্মদেশের রেশম-বিভাগ আমারই হাতে গঠিত। এখানে তের বৎসর পূর্ব্বে কার্য্য আরম্ভ করিবার সঙ্গে সঙ্গে মেমিও শহরে গবেষণাগার স্থাপন করিয়া পলুর উন্নতির কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলাম। ব্রহ্মদেশে বাংলার নিস্তারি ও ছোট পলুর মত দুই জাত বহু-চক্রী পলু ছিল। ইহাদের গুটী এত পাতলা এবং ফেঁসো এত বেশী যে, এক একটি গুটী হইতে দেড় শত হইতে দুই শত গজের বেশী থাই মিলিত না।

ইতালীয়, ফরাসী, চীনা ও জাপানী একচক্রী পলু লইয়া বহু পরীক্ষার ফলে বুঝিতে পারিয়াছি, ঐ সকল দেশ হইতে ডিম আনিয়া পালন করা অসম্ভব। তাহারা পরীক্ষিত নিরোগ ডিম পাঠাইলেও এখানে পলুদের পেব্রিন হয়। ঠাণ্ডা দেশে তাহাদের রোগ দেখা না দিলেও প্রতিবারই এখানে পেব্রিন হইয়াছে। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে যখন ইতালীতে ছিলাম তখন ঐ দেশের প্রধান রেশম গবেষণালয়ের কর্ত্তার সহিত পরামর্শ করিয়া চারি প্রকার ইতালীয় পলু লইয়া আসিয়াছিলাম। তাহাদেরও এখানে পেব্রিন হয় কিন্তু কম এবং ইহাদের এক জাত বহু বাছাই ও পরীক্ষা করিয়া মেমিওতে তিন বৎসর পালন করিতেছি। ইহা পেব্রিনশূন্য হইলেও এদেশের আবহাওয়ার দরুণ এবং গাছ তুঁতের পাতা না হইলে পালনকার্য্য সাধারণ লোকের পক্ষে

সম্ভব নয়। এদেশে থাকিতে থাকিতে পরে সম্ভব হয় কি-না বলা যায় না। ইহাদের ডিম ডিসেম্বর হইতে যে মাস পর্য্যন্ত চল্লিশ ডিগ্রি ঠাণ্ডায় রাখিতে হয়। এখন উৎকৃষ্ট একচক্রী পলু-পালনের সাফল্যের আশা কম।

নিস্তারি পলুর সহিত ইতালীয় পলুর সঙ্করতাসাধন করিয়াই উত্তম ফল পাইয়াছি। ইতালীয় চোক্ড়া এবং নিস্তারী চোক্ড়ীর সঙ্গমে উৎপন্ন ডিম সাধারণ নিস্তারি ডিমের মতই প্রথম বংশে ফুটে এবং এই সঙ্কর পলুর গুটীতে নিস্তারি গুটীর প্রায় দ্বিগুণেরও বেশী রেশম থাকে এবং এক একটি গুটী হইতে প্রায় ৬০০।৭০০ গজ খাই পাওয়া যায়। এই পলু সহজেই পালন করা যায়। এই সঙ্করের দ্বিতীয় বংশের ডিম কিন্তু সাধারণ ভাবে ফুটে না। এইরূপ সঙ্করের প্রথম বংশের ডিম পলুপালকদিগকে সরবরাহ করিতে পারিলে তাহারা এক বন্দেই সাধারণ নিস্তারি ছোট পলুর দুই-তিন বন্দের সমান ফল পাইবে। সুবিধামত স্থানে কোন কেন্দ্রে কার্য্যের বন্দোবস্ত করিতে পারিলে এইরূপ ডিম সরবরাহ করা কঠিন নয়। ইহা পলুর উন্নতির এক উপায়। জাপানে সমস্ত পলুই প্রায় বিভিন্ন একচক্রী পলুর সঙ্করের প্রথম বংশ হইতে পালিত হয়। কারণ এইরূপ সঙ্কর হইতে খাঁটি পলু অপেক্ষা বেশী রেশম পাওয়া যায়।

এইরূপ সঙ্করের পর পর বহু বংশ পালন করিয়া ইহা হইতে বহুচক্রী সঙ্কর পলু কয়েকটি পাইয়াছি। সঙ্করতা সাধন করিয়া বহুচক্রী সঙ্কর পাইতে প্রায় পাঁচ-ছয় বৎসর সময় লাগে। এই সকল সঙ্কর বহুচক্রী পলু ব্রহ্মদেশের প্রায় সর্ব্বত্রই পালিত হইতেছে এবং পলুপালনকার্য্যও বাড়িতেছে। ইহাদের গুটী শক্ত এবং গুটীতে প্রায় নিস্তারির গুটীর দেড়গুণেরও বেশী রেশম থাকে এবং এক একটি গুটী হইতে প্রায় পাঁচ-ছয় শত গজ খাই পাওয়া যায়। কাটাই করিয়া চীনা রেশমের মতই রেশম পাওয়া যায়।

এই সকল বহুচক্রী সঙ্করের বাট-সত্তর বংশ পালন করিয়া দেখিয়াছি যে ইহাদের গুণের ক্রমে ক্রমে কিছু লাঘবতা হয়। কিন্তু এই সকল সঙ্করের সহিত আবার ইতালীয় পলুর সঙ্করতা সাধন করিয়া উত্তম বহুচক্রী সঙ্কর পলু পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের গুটীতে প্রায় আড়াই হইতে তিন গ্রেণ রেশম থাকে এবং এক একটি গুটী হইতে ছয়-সাত শত গজ খাই পাওয়া যায়। এখন স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, গবেষণালয়ে উৎকৃষ্ট পলু উৎপাদন করা কঠিন নয় এবং বাংলার প্রয়োজনীয় বহুচক্রী উৎকৃষ্ট পলুর ডিম সরবরাহও কঠিন নয়।

জাপানে এপ্রিল হইতে অক্টোবর মাসের মধ্যে দুই কি তিন বন্দ পলু পালিত হয়। গুটী শুকাইয়া রাখিয়া সমস্ত বৎসর ধরিয়া কাটাই করা হয়। এই কাটাই কার্য্যে প্রায় পাঁচ লক্ষেরও উপর কাটানী কার্য্য পায়। বাংলার বহুচক্রী গুটীর দোষ এই যে, মাসখানেকের মধ্যে কাটাই না করিলে তার পর ভাল কাটাই হয় না। উপরে বর্ণিত প্রথম বংশ সঙ্কর গুটী সাত-আট মাস পর্য্যন্ত বেশ কাটাই হয়। বহুচক্রী সঙ্কর গুটী দুই-তিন মাসের বেশী ভাল থাকে না। কিন্তু পুনঃ পুনঃ সঙ্করতা দ্বারা যে উত্তম গুণবিশিষ্ট প্রায় একচক্রী গুটীর মত বহুচক্রী গুটী পাওয়া সম্ভব তাহা স্পষ্টই বোধ হইতেছে। অনেক বৎসরে ইহা সাধিত হইতে পারে।

পলুর উন্নতি কিরূপে সম্ভব হইয়াছে এবং কিরূপে আরও উন্নতি সম্ভব বলা গেল। এখন কাটাই কার্য্য কিরূপে সহজে এবং ভালরূপে হয় তাহা বলিতেছি। বাংলার দুর্ভাগ্য যে এখন এই বিষয় নূতন করিয়া গড়িতে হইবে। দশ-পনের বৎসর পূর্ব্বেও বাংলায় এমন বানক ছিল যেখানে পাঁচ-সাত শত কাটানী ও ঘুরানী কার্য্য করিত। বিলাতে বাংলার সুতার আদর কমিয়া যাওয়াতে এই সকল বানক বন্ধ হইয়া যায় এবং মোটা খংরু কাটাই চলিতে থাকে, ফলে পালনকার্য্য অনেক কমিয়া যায়। চীন-জাপান হইতে যেরূপ ভাল সুতা আমদানি হইতেছে তাহাতে মনে হয় খংরুর ব্যবহার ক্রমে বন্ধ হইয়া যাইবে। অতএব কাটাইয়ের ভাল বন্দোবস্ত শীঘ্রই প্রয়োজন। জাপানে কাটাই যন্ত্রের বহু উন্নতি হইয়াছে। দেখিয়া-শুনিয়া আমি ব্রহ্মদেশের জন্য ১১ নং চিত্রে প্রদর্শিত পা-যন্ত্রেরই আমদানি করিয়াছি। ইহাতে যে-কেহ তিন-চার মাস অভ্যাস করিয়া ভাল সুতা কাটিতে পারে এবং এই যন্ত্র বসিবার ঘরে রাখিয়াও কাজ করা যায়। এইরূপ যন্ত্র দশ-পনেরটি চালাইতে চালাইতে ছোট বানক করা যায় এবং ছোট বানক হইতে বড় বানক করা যায়। জাপানে এখনও এইরূপ পা-যন্ত্র হইতে বানক গঠিত হইতেছে। বানকের যন্ত্র জাপান হইতেই আনিতে হইবে। মাত্র চারি খাইয়ের ছোট

বানক যন্ত্রও পাওয়া যায়। তবে তাহার জন্য জলের কল, ষ্টীম্‌ এবং বিজলী আবশ্যক। পা-যন্ত্র এখন মান্দালয় এগ্রিকালচারেল কলেজে ইঞ্জিনিয়ারের কারখানায় তৈয়ারি হইয়া সরবরাহ হইতেছে। এক-একটির মূল্য পঁয়ত্রিশ টাকা। ১২ নং চিত্রে প্রদর্শিত ফেরাই যন্ত্রও এই স্থান হইতে সরবরাহ হয়। চারি খাই ফেরাই-যন্ত্রের মূল্য বাইশ টাকা, আট খাইয়ের জন্য প্রায় ত্রিশ টাকা। চারি ঘাইয়ের এবং আটাশ খাই সুতা কাটিবার উপযোগী ভাল জাপানী বানক যন্ত্র এখন জাপানে প্রায় পাঁচ শত টাকায় পাওয়া যায়। আনিবার খরচ স্বতন্ত্র। উপরোক্ত পা-যন্ত্র ও ফেরাই-যন্ত্র নমুনাস্বরূপ একটি করিয়া লইয়া আরও যেমন প্রয়োজন তৈয়ারি করিয়া লওয়াই যুক্তিসঙ্গত।

উৎপাদন-শিল্পের বিস্তারের উপায় হইতেছে এই। কৃষকদের প্রত্যেককে দশ কাঠা কিংবা এক বিঘা জমিতে তুঁত চাষ করিতে সাহায্য করিতে হইবে। ইহার জন্য তুঁতের ডাঁটা সরবরাহ করিতে হইবে। ভাল করিয়া লাগাইলে এক বৎসর পরেই, এমন কি ছয় মাস পরেই, পাতা পাওয়া যায়, তবে তৃতীয় বৎসরের পূর্ব্বে পাতার ফলন যথেষ্ট পরিমাণ হয় না। যথেষ্ট সার দিয়া ভাল করিয়া চাষ করিলে এক বিঘা হইতে বৎসরে প্রায় এক শত মণ পাতা পাওয়া যায়। মালদহে কোন কোন ক্ষেত্রে বিঘা প্রতি দুই-আড়াই শত মণ পাতা জন্মান হয়। প্রতি ত্রিশ মণ পাতা হইতে গড়ে এক মণ কাঁচা গুটী পাওয়া যায়। এক বিঘা তুঁত হইতে কৃষক-পরিবার পলু পালন করিয়া কম-পক্ষে বৎসরে তিন মণ গুটী পাইবে। রেশম সুতার দাম অতি কম হইলেও যদি প্রতি সের আট টাকা হয়, গুটী ষোল টাকা মণ দরে বিক্রয় হইবে। এখনকার অতি মন্দা বাজারেও এই পরিমাণ আয় কৃষক-পরিবার করিয়া লইতে পারিবে। বাজার ভাল হইলে বেশী পাইবে। এই পরিমাণ গুটী উৎপাদন করিতে চার-পাঁচ টাকার ডিম লাগিবে।

যে গুটী ক্রয় করিয়া কাটাই করাইবে তাহার কি আয় সম্ভব মোটামুটি আভাস দেওয়া যাইতেছে। এক মণ গুটী কাটাই করিতে একজন কাটানীর মোটা সুতার জন্য প্রায় সাত-আট দিন সময় লাগিতে পারে। মাসে পাঁচ-ছয় টাকা পারিশ্রমিক দিলে কত বিধবা ও বালিকা এই কাজ হৃষ্টচিত্তে করিবে। শুধু তিন-চারি মাস প্রত্যহ অভ্যাস ব্যতীত ভাল কাটাই করা যায় না। গুটী উৎপাদনের উপর এই কার্য্য নির্ভর করে। পল্লীতে যদি পঞ্চাশ বিঘা তুঁতের চাষ হয় তবে আয়—

৫০ × ১০০ = ৫০০০ মণ পাতা

এই পাতা হইতে ৫০০০ + ৩০ = ১৬৬ মণ গুটী

এই গুটী হইতে ১৬৬ + ১৫ = ১১ মণ সুতা

প্রতি সের ৮৲ হিঃ মূল্য—	৩৫২০৲
এবং ৩ মণ ঝুট মূল্য —	৬০৲
মোট	৩৫৮০৲

ব্যয়—মূলধন যাহা ফিরিতে থাকিবে—

১৬৬ মণ গুটী ক্রয়ের মূল্য ১৬৲ মণ হিঃ —	২৭৫৬৲
১০ জন কাটানীর ৩॥ মাসের বেতন ৬৲ হিঃ ৬ × ১০ × ৩॥—	২১০৲
২ জন কেরানীর বেতন ২ × ৬ × ৩॥—	৪২৲
২ জন অপর লোক —	৪২৲
কয়লা কাটাই করিতে ও গুটী শুকাইতে —	৩০৲
মোট	৩০৮০৲

মূলধন যাহা আবদ্ধ থাকিবে —

১০ কাটাই পা-যন্ত্র —	৩৫০৲
২ ফেরাই-যন্ত্র —	৬০৲
চালাঘর	৫০৲
গুটী শুকান ও রাখার আসবাব এবং অপর খরচ —	১৫০৲
মোট	৬১০৲

কাটানীরা যদি নিজের ঘরে কাজ করে তবে চালাঘরের প্রয়োজন নাই। এখন যেরূপ মোটা সুতা কাটাই করিয়া মান্দালয়ে আট টাকা সের দরে বিক্রয় হইতেছে তাহার উপর ঐ হিসাব দিলাম। উৎপন্ন যতদূর সম্ভব কম ধরা হইয়াছে। বিঘা-প্রতি এক শত মণের বেশী পাতা হইতে পারে, দশ মণ গুটীতেই এক মণ সুতা হইতে পারে এবং বিশ মণ পাতাতেই এক মণ গুটী হইতে পারে। ইহা ছাড়া সুতার দাম এখন নিতান্ত কম। পঞ্চাশ বিঘা তুঁতের বন্দোবস্ত করিয়া কার্য্য করিলে পাঁচ-ছয় শত টাকা আয় হয়, সাত-আট শত টাকা, এমন কি বাজার ভাল হইলে হাজার টাকাও হইতে পারে।

গুটী-উৎপাদক কৃষক-পরিবারগুলি মিলিয়া-মিশিয়া সমবায়ে যদি নিজেদের পুত্রকন্যাদের দ্বারা কাটাইয়ের বন্দোবস্ত করে, গুটী ক্রয় ইত্যাদির মূলধন খরচ করিতে হয় না অথচ কাটাইয়ের লাভ তাহাদেরই থাকে। জাপানে এইরূপ সমবায়ে কাটাই জন্য বড় বড় কারখানা আছে।

উৎপাদন-শিল্প এবং ব্যবহার-শিল্প উভয়ের জন্য সমিতি প্রয়োজন। সমস্ত উৎপাদক ও বয়নকারী সমিতির সভ্য হইবে। সমিতি বাজারের সহিত সম্পর্ক রাখিবে। উৎপাদন-কারীদিগকে কি রকম সুতা প্রয়োজন বলিয়া দিতে হইবে। এইরূপে একই নমুনার বহুপরিমাণ সুতা উৎপন্ন হইবে। সুতা দেখিয়া যাচাই করিয়া চালান দিলে বাজার মজুত রহিয়াছে। ব্যবহার-শিল্প সম্বন্ধেও প্রয়োজন একই রূপ। এইরূপ সমিতি দ্বারাই জাপান উন্নতি করিতে পারিয়াছে।

উপরে বর্ণিত কার্য্যের ভিত্তিস্বরূপ সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজন এক প্রধান গবেষণা-কেন্দ্র এবং পল্লীতে পল্লীতে কিছু কিছু তুঁতের চাষ। এই তুঁত হইতে তুঁতের চাষ বাড়িবে এবং ইহার সাহায্যে পলুপালনপ্রথা প্রদর্শিত হইবে। কার্য্যের বিস্তার হইলে কেবল ডিম উৎপাদন ও বিক্রয় করিয়া কত লোক জীবিকা করিয়া লইতে পারিবে। ডাঁটা হইতে উৎপন্ন ঝুপি তুঁত অপেক্ষা কলম হইতে উৎপন্ন ছোট গাছ তুঁত অনেক ভাল এবং প্রায় বিশ বৎসর থাকে। কলম উৎপাদন ও বিক্রয় করিয়া কত কৃষকের দু-পয়সা রোজগার হইবে। ভিন্ন সুতা কাপড় বিক্রয়ের দালালী করিয়া কত লোক দু-পয়সা পাইবে। রেশম-শিল্প অতি বিস্তীর্ণ। বুঝিয়া যত্নের সহিত করিলে কত লোক প্রতিপালিত হইতে পারে।

যাঁহারা জাপানের এই বিশাল শিল্পের নানা শাখার বিবরণ ও কার্য্যপ্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা Imperial Council of Agricultural Research, New Delhi দ্বারা প্রকাশিত Scientific Monograph, No. 8—The Silk Industry of Japan with notes on observations in U. S. A., England, France and Italy (মূল ৩৷৷৹) পাঠ করিবেন। ইহা হইতে বাংলার রেশম-শিল্পের উন্নতির জন্য বহু জ্ঞাতব্য বিষয় জানা যাইবে।

সন্ধি

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ

কিশোরের কথা

৩

পরদিন বৈকালে আমি ডিউটি করিবার জন্য মেডিক্যাল কলেজে যাইতেছিলাম, গোলদীঘির নিকটে অনেক পুলিসের ভিড় দেখিলাম। একটু অগ্রসর হইয়া দেখিতে পাইলাম একদল তরুণী নিশান হাতে করিয়া দোকানে দোকানে পিকেটিং করিতে বাহির হইয়াছেন। পুলিস প্রহরিগণ তাঁহাদিগকে অনুসরণ করিতেছে। তাঁহারা একটা মদের দোকানের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন, এবং পিকেট করা আরম্ভ করিলেন। আমিও কৌতূহলবশতঃ একটু দূরে অপেক্ষা করিলাম। এই তরুণীদলের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন নীরু দেবী। কিন্তু তিনি আমাকে দেখিতে পান নাই। একটি ভদ্রবেশধারী লোক মদের দোকানে ঢুকিতে যাইতেছিল, নীরু দেবী হাতজোড় করিয়া তাহাকে বলিলেন, "দেখুন আপনি ভদ্রলোক, আমরা আপনাকে অনুনয় ক'রে বলছি, আপনি মদ কিনবেন না।" এই বলিয়া তিনি আবার হাতজোড় করিলেন। সে লোকটা বোধ হয় আগে কিছু মদ খাইয়াছিল, সে তাঁহার মুখের পানে তাকাইয়া জড়িত কণ্ঠে বলিল, "বাঃ—তোফা। একটু ফুর্ত্তি করতে চাই বাবা, তাও তোমরা দেবে না?" নীরু দেবী বলিলেন, "আপনি ভদ্র-সন্তান, মদ খাওয়া যে কত বড় দোষের তা অবশ্য জানেন। ফুর্ত্তি করতে হয়, ঘরে গিয়ে আমোদ-প্রমোদ করুন। দোহাই আপনার, আপনি মদ খাবেন না।"

সে লোকটা জড়িত স্বরে বলিল, "কি বললে তুমি সুন্দরী, মদ খাব না, মদ খাব না। আমি নিশ্চয় মদ খাব না, যদি তুমি তোমার ঐ সুন্দর চাঁদ মুখে একটা চুমো খেতে দাও।"

এই কথা বলিতে-না-বলিতেই তাহার নাকের উপর প্রকাণ্ড এক ঘুসি পড়িল ও দরদর ধারায় রক্ত পড়িতে

লাগিল, এবং আর এক ঘুসিতে সে ধরাশায়ী হইল। আমার দক্ষিণ হস্ত যে এক মুহূর্ত্তের মধ্যে এই কার্য্য সম্পাদন করিল, তাহা আমি নিজেও বুঝিতে পারি নাই। এই সময় সেই নারীবৃন্দ "ব্র্যাভো" "ব্র্যাভো" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, এবং সেই মদের দোকানদার "পুলিস পুলিস" বলিয়া চেঁচাইলে কয়েক জন কনেষ্টবল আসিয়া আমাকে ধরিল। দেখিতে দেখিতে সেখানে বিস্তর লোক জমিয়া গেল। নারীগণ "বন্দেমাতরম্" "গান্ধীমহারাজকী জয়" ইত্যাদি বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। এই সময় একজন অশ্বারোহী পুলিস সার্জ্জেণ্ট আসিয়া ঘোড়া চালাইয়া দেওয়ায় জনতা ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। একজন উপরিস্থ পুলিস কর্ম্মচারী, বোধ হয় ইনস্পেকটার, আসিয়া আমাকে থানায় লইয়া যাইবার হুকুম দিল। তখন একটা বাস্ গাড়ীতে প্রহরিবেষ্টিত হইয়া আমি থানায় নীত হইলাম। রাত্রি আটটার সময় সুকুমার থানায় আসিল এবং আমাকে জামিনে খালাস করিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী উপযুক্ত জামিনদারের অভাবে আমাকে ছাড়িলেন না, পরদিন কোর্টে হাজির করিবেন বলিলেন। সুকুমার তাহাদের বাড়ী হইতে আমার জন্য অনেক খাবার আনিয়াছিল, আমি তাহা খাইয়া হাজত ঘরে শুইয়া রহিলাম।

পরদিন বেলা সাড়ে দশটার সময় চীফ্ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে আমাকে লইয়া গেল। আমি কোর্ট হাজত ঘরে বসিয়া আছি, এমন সময় সুকুমার, শঙ্কর, নীরু দেবী ও তাঁহার তিনটি সখী আমাকে দেখিতে আসিলেন। শুনিলাম সেই দিনই মোকদ্দমার বিচার হইবে।

শঙ্কর আমাকে বলিল, "কি রে কিশোর, তুই কবে থেকে এত বড় স্বদেশী হয়ে উঠলি? আমার যেটুকু গৌরব ছিল তা তুই একদিনেই হরণ করলি। কাল আমারই ঐ নারীবাহিনীর সঙ্গে বাহির হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু বাবা হঠাৎ জানতে পেরে আমাকে বেরুতে দিলেন না। তিনি আশা করেন, কালে আমি একজন মুনসেফ হয়ে তাঁর মুখ উজ্জ্বল করব। পরে আমি পালিয়ে এসে সব ব্যাপার শুনলুম। যাক সে কথা। এখন এই মাতৃযজ্ঞে নিজেকে পূর্ণাহুতি দিবি, না খ'সে পড়বি?"

সুকুমার বলিল, "কিশোর, আমি তোমার জন্য একজন উকীল ঠিক করেছি, তিনি তোমাকে ডিফেণ্ড (তোমার পক্ষ সমর্থন) করতে প্রস্তুত আছেন। তোমার মত কি?"

নীরু দেবী বলিলেন, "দেখুন, আপনি অবশ্য এসব ব্যাপারে মহাত্মা গান্ধীর মত জানেন। তিনি সকলকে নন-কো-অপারেশন করতে বলেছেন। এই জন্য দেখুন আমাদের কত শত ভাই-ভগিনী কোন প্রকারে আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা না ক'রে অম্লানবদনে কারা বরণ করছেন। আপনি কি তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবেন, না উকীল দিয়ে মোকদ্দমা চালাবেন?"

আমি বলিলাম, "আমি মোকদ্দমা চালাব না, তাঁদের পথ অনুসরণ করব।"

শঙ্কর হাসিয়া বলিল, "এবার তোর প্রেমযজ্ঞেরও পূর্ণাহুতি দেওয়া হবে।"

এই সময় পুলিসের একজন প্রধান কর্ম্মচারী আসিয়া আমাকে ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে লইয়া চলিল। আমার বন্ধুবর্গও আমার সঙ্গে সঙ্গে কোর্টে উপস্থিত হইল। ম্যাজিষ্ট্রেট আমার বিচার আরম্ভ করিলেন। সেই মাতালটি বাদী হইয়া প্রথমে এজাহার দিল। সে বলিল, সে মদ কিনিতে দোকানে ঢুকিতেছিল, এই সময় একটি স্ত্রীলোক তাহাকে বাধা দিল, সে বাধা না মানায় আসামী তাহাকে নাকে ঘুসি মারিয়া জখম করিল এবং আর এক ঘুসি দিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিল। নীরু দেবীকে অপমানসূচক কথা বলা সম্বন্ধে সে কিছুই বলিল না, এ-সম্বন্ধে কেহ তাহাকে জেরাও করিল না। পরে মদের দোকানদার জবানবন্দী দিল, সে ঐ মাতালের কথা সমর্থন করিল। ইহার পরে একজন কনেষ্টবল যে আমাকে প্রথম গ্রেপ্তার করিয়াছিল, সেও ঐ কথার সমর্থন করিল। একজন ডাক্তার বাদীর জখম পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহারও জবানবন্দী হইল। পরে ম্যাজিষ্ট্রেট আমার জবাব কি জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম—"আমি কোন জবাব দিব না।"

একজন উকীল টিটকারী দিয়া বলিলেন, "এ ছোকরা একজন নন্-কো-অপারেটার, মহাত্মা গান্ধীর চেলা। তবে ঐ লোকটাকে ঘুসি মারলে কেন বাবা? মহাত্মা গান্ধী ত অহিংসানীতি প্রচার করেন?"

বোধ হয় ইনি বাদীর উকীল। আমি তাঁহার কথার

কোন জবাব দেওয়া উচিত মনে করিলাম না; চুপ করিয়া রহিলাম।

ম্যাজিষ্ট্রেট সরাসরি বিচার শেষ করিয়া রায় লিখিলেন এবং হুকুম দিলেন,—আসামীর তিন মাস সশ্রম কয়েদ। পুলিস আমাকে তৎক্ষণাৎ কোর্টের হাজতে লইয়া গেল।

আমার বন্ধুগণ আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিল। নীরু দেবী মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন, "এবার আপনার জীবন সার্থক হইল।" এই বলিয়া তিনি আমার গলায় একটা বড় ফুলের মালা পরাইয়া দিলেন। তাঁহার সখীগণও সেই সঙ্গে আমাকে মালা পরাইলেন। আমি যেন হাতে স্বর্গ পাইলাম। যথাসময়ে আমাকে অন্য অনেক আসামীর সঙ্গে একটা গাড়ীতে জেলখানায় লইয়া গেল। আমার বন্ধুগণ তত ক্ষণ অপেক্ষা করিতেছিল। তাহারা "বন্দেমাতরম্" ইত্যাদি বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে আমাকে বিদায় দিল।

চতুর্থ খণ্ড

নীহারিকার কথা

১

কিশোরের গলায় মালা দিয়া তাহাকে জেলখানায় বিদায় করিয়া আমি বিষণ্ণ চিত্তে বাড়ী ফিরিলাম। যতক্ষণ কোর্টে ছিলাম, ততক্ষণ বিজয়ের উল্লাসে ও সখীদের সহিত হাস্যালাপে বেশ কাটিয়াছিল। যদি বল বিজয়ের উল্লাস কিসে? কিশোর প্রকৃত নির্দোষ হইয়াও বিজয়ী বীরের ন্যায় কারা বরণ করিল, ইহাতেই আমাদের উল্লাস। কিন্তু সন্ধ্যাকালে যখন বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম তখন সে উচ্ছ্বাস কাটিয়া গেল, ক্রমে বাস্তব জগতে আসিয়া পড়িলাম। দাদা গাড়ীর মধ্যে আমার সঙ্গে একটা কথাও বলে নাই, মুখ ভার করিয়া বসিয়াছিল। বাড়ী আসিয়া আহারাদির পর যখন ঘরে বসিলাম, তখন দাদা বলিল, "কেমন রে নীরু, কিশোরকে জেলে দিয়ে তোর কেমন লাগছে? মনে একটুও অনুতাপ হচ্ছে না?"

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "সে কি কথা? আমি তাঁকে কিরূপে জেলে দিলুম, আর তার জন্য অনুতাপই বা কিসের?"

দাদা বলিল, "তোর জন্যেই সে বেচারা জেলে গেল।"

"কি রকম?"

"তোর সেদিনকার উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতা, তোদের নারী-প্রগতির মেম্বরদিগের পিকেটিংএ সাহায্য করবার জন্য আহ্বান, তার সেই জন্য বীরত্ব প্রকাশ, পরে পুলিস কোর্টে তাকে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে না দেওয়া, এ সকল ত তোরই কীর্ত্তি। আমি যে-উকীল ঠিক করেছিলুম, তিনি বলেছিলেন, মোকদ্দমা ডিফেণ্ড (সমর্থন) করলে সত্য ঘটনা প্রকাশ পাবে, তাতে কিশোরের কিছুতেই জেল হ'ত না, বড়-জোর কুড়ি-পঁচিশ টাকা জরিমানা হ'ত।"

আমি একটু দমিয়া গিয়া বলিলাম, "আমি এত সব বুঝি না। উপস্থিত ক্ষেত্রে আমি যা কর্ত্তব্য বলে বুঝেছি, তাই করেছি। তিনি আমার কথা না শুনলেই পারতেন? শঙ্করবাবু ত পিকেটিংএ যান নাই।"

দাদা বলিল, "কিশোর কি তা পারে রে? সে যে এখন তোর জন্যে প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারে।"

আমি বলিলাম, "যাও, আমি কারু প্রাণ-ট্রান চাই নে, আমি চাই আমার কর্ত্তব্য কোন রকমে করে যেতে।"

দাদা বলিল, "তুই জানিস্ তোর কর্ত্তব্য হচ্ছে কিশোরকে বিয়ে করা। প্রথমতঃ, মায়ের মৃত্যুশয্যার আদেশ; দ্বিতীয়তঃ, কিশোর তোকে ভালবাসে—"

আমি বিরক্ত হইয়া বলিলাম, "তুমি থামো, থামো—বিয়ে বিয়ে ক'রে যদি আমাকে এ রকম জ্বালাতন কর, তবে আমি এক দিকে চলে যাব।"

"বটে কোথায় যাবি?"

"আমি কারু গলগ্রহ হয়ে থাকতে চাইনে। আমি কারু তাঁবে থাকব না। আমি নিজের পায়ে নির্ভর ক'রে দাঁড়াতে চাই।"

"এ বুঝি তোর সেই নারীপ্রগতি দলের সঙ্গে মেশার ফল। এত দিনের পড়াশুনো, বি-এ পাস করা, এসব বুঝি চুলোয় যাবে?"

"আমি প্রাইভেট ষ্টুডেন্ট হয়ে বি-এ পরীক্ষা দেব। এ-সব মত ত আমার চিরদিনই আছে তুমি জান। মা আমার এক বন্ধন ছিলেন, সে-বন্ধন ছিন্ন হয়েছে। এখন আমি অসীম গগনের উন্মুক্ত বিহঙ্গম।"

"কিন্তু মা তোকে যে-বন্ধনে বেঁধে গেছেন, সে-বন্ধন

কাটানো তোর সাধ্য নেই আমি বলছি। আমি এখন বুঝতে পারছি মা'র কতদূর ভবিষ্যৎদৃষ্টি ছিল।"

"তুমি যাই বলো, আমি সে-বন্ধন মানিনে। যখন আমি তোমার মত ভাইয়ের বন্ধনও ছিন্ন করতে প্রস্তুত হয়েছি, তখন আমি আর কোন্ বন্ধনে বাঁধা পড়ব ?"

"বেশ, বেশ, তোর যা খুশী তাই করিস্। আমরা ত দিব্বি খেয়ে-দেয়ে ব'সে গল্প করছি, এ-সময় কিশোর কি করছে জানিস্ ? সে জেলখানায় গিয়ে একটা মোটা চটের মত হাফপ্যাণ্ট প'রে, সন্ধ্যার সময় লোহার থালায় ক'রে মোটা চালের ভাত ও যৎসামান্য তরকারি কি জলের মত ডাল খেয়ে—তা'তে সকলের পেটও ভরে না—লোহার বাটিতে জল খেয়ে দু-তিন শ' চোরডাকাত খুনী গুণ্ডার সঙ্গে একটা লম্বা ঘরে, এক'টা ঢিপির উপর, মোটা কম্বল বিছিয়ে শুয়ে আছে,—আর আধ অন্ধকারে কড়িকাঠ গুণছে।"

দাদার এই সব কথা শুনিয়া আমার চোখে জল আসিল। আমি তাহা গোপনে মুছিয়া বলিলাম, "ওঃ, জেলে এত কষ্ট ! দাদা, তুমি কি বলছ ! তবে ভদ্রলোকেরা সেখানে কি ক'রে থাকেন ?"

দাদা বলিল, "জেলখানা ত ভদ্রলোকের জন্যে নয়। সেখানে কি কাজ করতে হয় শুনবি ? হাতুড়ী দিয়ে ইট ভাঙা, জাঁতায় গম ভাঙা, ঘানিতে সরষে পিষে তেল বের করা ইত্যাদি।"

আমি বলিলাম, "ভদ্রলোকদেরও এই কাজ ?"

দাদা বলিল, "জেলখানায় ভদ্রলোক ছোটলোকের কোন পার্থক্য নেই, সেখানে সবাই সমান। তবে কোন কোন সময় অনুগ্রহ ক'রে ভদ্রলোকদের লেখাপড়ার কাজ দেয়। কিন্তু আজকাল এত বেশী ভদ্রলোক জেলে যাচ্ছেন, যে, তাঁদের জন্যে এত লেখাপড়ার কাজ কোথায় পাবে ?"

আমি বলিলাম, "তুমি এ-সব খবর কি ক'রে জানলে, দাদা।"

দাদা বলিল, "আমি জেলকেরা লোকদের কাছে শুনেছি। যা এখন শুতে যা—রাত হয়েছে।"

এই বলিয়া দাদা উঠিল। আমিও আমার ঘরে গেলাম। কিন্তু আমি যে-সকল কথা শুনিলাম, তাহাতে আর আমার শয্যা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা হইল না। আমি মেঝের উপর একটা মাদুর পাতিয়া তাহার উপর শুইয়া পড়িলাম। মশার কামড়ে ও নানা চিন্তায় ভাল ঘুম হইল না। অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত কিশোরের কথা ভাবিতে ভাবিতে হৃদয় কারুণ্যে পূর্ণ হইল।

সকালে প্রমীলা আসিয়া আমাকে সেখানে দেখিয়া দাদাকে ডাকিয়া দেখাইল। দাদা বলিল, "কি রে নীরু, এ আবার কি ঢং ? তুই সারারাত্তির বুঝি এখানে শুয়েছিলি ?"

আমি চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিলাম, "হাঁ। এ আমার প্রায়শ্চিত্ত।"

দাদা দশটার সময় খাইয়া কলেজে গেল, আমি আহার করিবার সময় মাছ ও দুধ খাইলাম না। প্রমীলা অনেক সাধাসাধি করিল। আমি বলিলাম, "এও আমার প্রায়শ্চিত্ত।"

দাদা কলেজ হইতে আসিলে বেলা চারিটার সময় একজন ভদ্রলোক তাহাকে ডাকিলেন। দাদা বৈঠকখানায় তাঁহার সঙ্গে বসিয়া অনেক ক্ষণ আলাপ করিল এবং পরে আমাকে আসিয়া বলিল, "যিনি এসেছেন উনি হচ্ছেন কিশোরের বড় ভাই। টেলিগ্রাম পেয়ে কৃষ্ণনগর থেকে আজ সকালে এসে পৌচেছেন। কিশোর যে-মেসে থাকে সেখানে আছেন। উনি কিশোরের জন্য অনেক দুঃখ প্রকাশ করলেন। তাহাকে খালাস করবার কোন উপায় আছে কি-না আমাকে জিজ্ঞেস করলেন।"

আমি বলিলাম, "তুমি তাঁকে কি পরামর্শ দিলে ?"

দাদা বলিল, "পরামর্শ আর কি দেব ? আমি বললুম, কিশোর যখন নিজেকে ডিফেণ্ড (নিজের পক্ষ সমর্থন) করে নাই, তখন আর খালাসের উপায় কি ?" তিনি বলিলেন, "এ মোকর্দ্দমায় ত আপিল নেই, হাইকোর্টে মোশন করা যায়, কিন্তু তা'তে কোন ফল হবে ব'লে মনে হয় না। আমি কিশোরের সঙ্গে জেলখানায় গিয়ে দেখা করতে চাই. আমি ত সব জায়গা চিনি না, আপনি আমার সঙ্গে যাবেন ?"

—আমি বললুম, "তা অবশ্যই যাব, কাল সকালে যাওয়া যাবে।"

পরদিন দাদা সকাল সাতটার সময় বাহির হইয়া গেল, এবং বেলা এগারটায় সময় ফিরিয়া আসিয়া বলিল, তাহারা জেলখানায় গিয়া কিশোরের সঙ্গে দেখা করিয়াছে। কিশোর বেশ প্রফুল্লচিত্তে সেখানে আছে। তার দাদাকে হাইকোর্টে মোশন করিতে নিষেধ করিয়াছে। সে বলিল, "এই তিন মাস ত দেখতে দেখতে কেটে যাবে।"

দাদা আরও বলিল, "জেলখানায় রাজনৈতিক কয়েদীদের খাবার ও শোবার আলাদা ব্যবস্থা, বিশেষ কোন কষ্ট নাই।" এই কথা শুনিয়া আমি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

কিশোরের দাদা মেডিকেল কলেজে গিয়া জানিয়াছেন, কিশোর জেলখানা হইতে বাহির হইলে তাহাকে আর কলেজে পড়িতে দিবে না, কর্ত্তৃপক্ষ আপত্তি করিয়াছেন। এই জন্য তিনি অত্যন্ত দমিয়া গিয়াছেন। কিশোরের ছাত্রজীবন যদি এইরূপে মাটি হইয়া যায়, তবে বড়ই আক্ষেপের বিষয় হইবে। এখন এ-বিষয়ে কি কর্ত্তব্য তিনি তাহার পরামর্শ চান।

কিন্তু অনেক ছাত্র ত নন-কো-অপারেশন করিয়া স্কুল-কলেজে পড়া আপন ইচ্ছায় ছাড়িয়া দিয়াছে। ইহাতে এত আক্ষেপের কারণ কি? দাদা কিন্তু বারংবার বলিতেছে, "তোর জন্যই কিশোরের ভবিষ্যৎ জীবন নষ্ট হইল" ইত্যাদি। দাদার এই বাক্যবাণ আমার সহ্য হয় না। আমাকে এরূপে জ্বালাইলে আমি আর এ বাড়ীতে থাকিতে পারিব না। আমাকে অন্য পথ খুঁজিতে হইবে।

পরের দিন আমি বেথুন কলেজে গেলে প্রিন্‌সিপ্যাল আমাকে তাঁহার বসিবার ঘরে ডাকাইলেন। আমি তাঁহার সম্মুখে হাজির হইলে তিনি বলিলেন, "আমি জানতে পেরেছি তুমি, অরুনা সেন, লতিকা রায়, সুলেখা চাটুজ্যে আর চিত্রা ঘোষ—এই কয়জনে বাজারে পিকেটিং করতে গিয়েছিলে—তাই নিয়ে একটা হাঙ্গামা হয়েছে, ও কিশোর বাঁড়ুজ্যে নামে একটি যুবক ফৌজদারী কোর্টে সাজা পেয়েছে। এ-সব কথা সত্য কিনা?"

আমি বলিলাম, "হাঁ, সত্য।"

তিনি বলিলেন, "এই রকম বাজারে পিকেটিং করা তোমাদের পক্ষে কতদূর অন্যায় ও আইনবিরুদ্ধ তা তুমি অবশ্যই জান। এ-সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের সার্কুলারও আছে।"

আমি বলিলাম, "আমরা গবর্ণমেণ্ট কলেজে পড়ি ব'লে দেশের কাজ করতে পাব না, এ কেমন কথা? দেশের প্রতি ও আমাদের নিজের প্রতিও ত একটা কর্ত্তব্য আমাদের আছে।"

তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "আমি তোমার কোন আর্গুমেণ্ট (যুক্তি) শুনতে চাইনে। আমি তোমাদের কয়জনকে রাষ্টিকেট করবার জন্য রিপোর্ট করব।"

আমি বলিলাম, "আপনি যদি আপনার কর্ত্তব্য সেইরূপ বুঝে থাকেন, তবে তা-ই করবেন। আমার নিজের কথা আমি বলতে পারি, যে-শিক্ষা আমাদের মনুষ্যত্বলাভের পথে বাধা দেয়, আমি সে-শিক্ষা চাইনে। আমি কলেজ ছাড়তে প্রস্তুত আছি।"

তিনি তখন আমাকে চলিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিলেন। আমি বাড়ী চলিয়া আসিলাম। আমার পক্ষে এ ভালই হইল। আমার আর একটি বন্ধন ছিন্ন হইল। আর কিশোর যখন মেডিক্যাল কলেজ হইতে বিতাড়িত হইবে, তখন আমার আর আক্ষেপের বিষয় কি? বরং তাহার জন্য আমার আর কোন অনুতাপের কারণ থাকিবে না। কিন্তু দাদার গঞ্জনা আমাকে নিতান্ত অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। আমার কলেজ ছাড়া লইয়া দাদার সঙ্গে আমার তুমুল ঝগড়া হইয়া গেল। দাদা ক্রমাগতই বলিতেছে, আমি বি-এ পাস করিতে পারিব না, আমার দ্বারা সংসারের কোন কাজ হইবে না, যদি বিয়ে না করি তবে আমার জীবনই বৃথা হইবে, ইত্যাদি। আমার বোধ হয়, দাদার ভয় হইয়াছে আমি বিবাহ না করিয়া চিরদিন তাহার গলগ্রহ হইয়া থাকিব। আমার কিন্তু সেরূপ অভিপ্রায় একেবারেই নাই। আমি কাহারও গলগ্রহ হইয়া থাকিব না, আমি যেটুকু লেখাপড়া শিখিয়াছি তাহাদ্বারা নিজের জীবিকা উপার্জ্জন করিতে অবশ্যই পারিব। আমাকে এখন হইতেই সেই চেষ্টা করিতে হইবে, কারণ আমি এখন সম্পূর্ণ স্বাধীন, আমার সকল বন্ধন একে একে ছিন্ন হইয়াছে।

আমার যখন মনের এইরূপ অবস্থা, তখন শঙ্কর একদিন আমাদের বাড়ীতে আসিল। প্রমীলা ও আমি তখন লাইব্রেরী-ঘরে বসিয়াছিলাম। আমার হাতে একটা সেলাই ছিল, প্রমীলা তাহার বই পড়িতেছিল। আমি শঙ্করকে দেখিয়া বলিলাম, "আপনি এতদিন কোথায় ছিলেন? পিকেটিং করছিলেন বুঝি?"

শঙ্কর বলিল, "পিকেটিং করব না মুনসেফী করবার জন্য প্রস্তুত হব। আমার পূজনীয় পিতাঠাকুর মহাশয়ের কড়া আদেশ, আমি যেন এই গোলযোগের সময় বাড়ীর বাহিরে না যাই।

"এখন থেকেই তবে দাসত্বের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন। বেশ, বেশ। আমাকে একটা চাকরি জুটিয়ে দিতে পারেন?"

"কেন, আপনি এখন দাসত্ব করবেন কোন্ দুঃখে? আপনি ত কলেজে পড়ে বি-এ পাস করবেন।"

"আমার আর কলেজে পড়া হবে না। আমার নাম কাটা যাবে, সেদিন প্রিন্‌সিপ্যাল বলেছেন।"

"ওহো, সেদিনকার সেই পিকেটিং করবার জন্যে বুঝি? এই জন্যেই বাবা আমাকে সে দিন আটক করেছিলেন, এখন বুঝতে পারছি আমার না-যাওয়া ভালই হয়েছিল।"

"মুনসেফী পাওয়ার পক্ষে। কিন্তু আপনার বন্ধু সে-সব কথা মনে ভাবেন নাই।"

"কিশোরের কথা বলছেন? সে বর্ণচোরা আম—তার মনের ভিতরে কি আছে, বাইরে কেউ টের পায় না। জেলখানায় গিয়ে কেমন আছে একদিন গিয়ে দেখে আসব।"

"দাদা সে দিন দেখতে গিয়েছিল, তিনি বেশ ফুর্ত্তিতে আছেন।"

"ফুর্ত্তি হবে না? আপনি স্বহস্তে তার গলায় মালা পরিয়ে দিয়েছিলেন।"

"কিন্তু শুনলুন তাঁকেও মেডিক্যাল কলেজে আর পড়তে দেবে না। যাক সে কথা। আমি যে-কথা বললুম আপনি তার চেষ্টা দেখবেন। আপনি ত অনেক খবরের কাগজ পড়েন, তার বিজ্ঞাপন দেখে আমার জন্যে কোন মেয়েদের স্কুলে একটা টীচারের কাজ পাওয়া যায় কি-না খোঁজ করবেন।

"কিন্তু আপনি ত পরাধীনতা স্বীকার করবেন না প্রতিজ্ঞা করেছেন?"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "একে আর পরাধীনতা বলা যায় না। উদরান্নের জন্য আমাদিগকেও অন্য কাহারও গলগ্রহ না হয়ে চাকরি করতেই হবে। আমরা পরের গলগ্রহ হয়ে থাকতে চাই নে, স্বাবলম্বনবৃত্তি গ্রহণ করতে চাই।"

শঙ্কর বলিল, "অর্থাৎ কোন স্কুলের সেক্রেটারীর অধীনতার চেয়ে ঘরের আড়ালে স্বজনের অধীনতাটাই হ'ল বেশী দোষের। যাক সে কথা। কিন্তু সুকুমার আপনাকে চাকরি করতে দেবে ত?"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "দাদার সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়ে গেছে। আমি দাদার নিষেধ শুনব না। আমি কারু তাঁবে থাকব না।"

শঙ্কর বলিল, "বেশ। আমাদের ভবানীপুরে একটা নতুন মেয়েদের হাইস্কুল হয়েছে। সেখানে কোন টীচারের পদ খালি আছে কি-না আমি খোঁজ করব ও আপনাকে জানাব। সুকুমারের সঙ্গে দেখা হ'ল না—আর একদিন শীঘ্রই আসব। প্রমীলা, তোর পড়া কেমন চলছে? তুই পড়ার সঙ্গে নন-কো-অপারেশন করবি নাকি?"

প্রমীলা হাসিয়া বলিল, "আমার পড়া ভাল হচ্ছে না। বাড়ীতে যে গোলমাল চলচে—আমাকে কেউ পড়ায় না, আমি কি করব।"

আমি বলিলাম, "বাড়ীতে গোলমাল তাতে তোর কি? তোর কাজ তুই করবি।"

"আপনার হাতে ওখানা কি বই, শঙ্কর বাবু।"

শঙ্কর বলিল, "এ বই ত আপনার জন্যেই এনেছি—নারীপ্রগতি সম্বন্ধে মিসেস ফিলিপ স্নোডেনের একখানা নামজাদা বই। আপনি এখানা রাখুন, পড়ে দেখবেন। আমি তবে এখন আসি।" এই বলিয়া শঙ্কর বিদায় হইল।

২

তিন দিন পরে শঙ্কর আসিয়া আমার সঙ্গে দেখা করিয়া বলিল, "আপনি যথার্থই চাকরি করবেন নাকি?"

আমি বলিলাম, "হাঁ চাকরি করব বলেই ত স্থির করেছি। আপনি কোন সন্ধান পেলেন?"

শঙ্কর বলিল—"ভবানীপুরে যে-স্কুলের কথা বলেছিলুম সেখানে একজন য়্যাসিষ্ট্যান্ট টীচার নেবে। তারা গ্রাজুয়েট চায়, কিন্তু ত্রিশ টাকা মাহিনায় লেডি গ্রাজুয়েট কোথায় পাবে? তাই আমি সেক্রেটারী অতুল বাবুকে আপনার কথা বলায় তিনি এক রকম রাজি হয়েছেন। নতুন স্কুল, মাহিনা আপাততঃ ত্রিশ টাকা দেবে, পরে স্কুল স্থায়ী হ'লে এক বছরের মধ্যেই চল্লিশ টাকা হবে। আপনি রাজি আছেন?"

আমি উৎসাহিত হইয়া বলিলাম, "আমি খুব রাজি আছি। আমি একলা মানুষ, ত্রিশ টাকায় আমার খুব চলে যাবে।"

"এই বাড়ি থেকে যাতায়াত করতে পারবেন, বিশেষ কোন অসুবিধা নেই।"

"কিন্তু ট্রাম কি বাস্ গাড়ীতে আমি একলা কখনও

বেরুই নি, দাদা হয়ত আপত্তি করবে। সে দিকে থাকবার কোন সুবিধা হয় না? সে স্কুলের বোর্ডিং নেই?"

"বোর্ডিং হবার কথা হচ্ছে, বোধ হয় শীঘ্রই হবে। আপনারা স্বাবলম্বন-বৃত্তি অবলম্বন করতে যাচ্ছেন, অথচ সাহস ক'রে বাড়ীর বাইরে যেতে চান না?"

আমি লজ্জিত হইয়া বলিলাম, "আপনি সে-কথা অবশ্য বলতে পারেন। প্রথম প্রথম সঙ্কোচ বোধ হবেই ত, পরে সাহস বেড়ে যাবে। এখন দাদাকে রাজি করতে পারলে হয়। আমার চাকরি করার কথাতেই ত দাদা মুখ ভার ক'রে আছে, আমার সঙ্গে ভাল ক'রে কথা কয় না।"

শঙ্কর বাহির হইয়া দাদাকে ডাকিল এবং দাদা আসিয়া শঙ্করকে বলিল, "কি হে শঙ্কর. কি মনে ক'রে? আমার বিরুদ্ধে তোমাদের কি ষড়যন্ত্র হচ্ছিল?"

শঙ্কর বলিল, "নীরু দেবী নারী-স্বাধীনতার ধ্বজা উড়িয়ে এবার রাস্তায় বেরুবেন, সেই পরামর্শ হচ্ছিল।"

দাদা বলিল, "তুমিই দেখছি নীরু দেবীর মন্ত্রী হয়ে দাঁড়িয়েছ, কিন্তু ভাই যাই কর, নাম হাসিও না।"

আমি বলিলাম, "তোমরা ত চিরদিনই নারীদের উপহাস ক'রে এসেছ। তারা যা-কিছু করতে যাবে, তোমরা তাই ঠাট্টা ক'রে উড়িয়ে দেবে। সুতরাং সে ভয় করলে আমাদের চলবে না। আমাদের নিজের চেষ্টায় নিজের পথ খুঁজে নিতে হবে।"

দাদা বলিল, "নিজের পথ মানে ত কোন স্কুলে টীচারি করা।"

শঙ্কর বলিল, "উনি আপাততঃ সেই রকম একটা কাজ করতে চাইছেন। এখন তোমার মত হলেই হয়।"

দাদা বলিল, "আমার আবার মতামত কি? নীরু দেবী ত আমার মত-অনুসারে চলবেন না বলেছেন। উনি যা ভাল বোঝেন তাই করুন।"

আমি বলিলাম, "দাদা, তুমি রাগ ক'রো না। আমার যখন কলেজ থেকে নাম কাটা যাচ্ছে, তখন আমি কিছু না-ক'রে নিষ্কর্ম্মা ঘরে ব'সে থাকতে চাই নে। আমি একটা টীচারি করতে চাই, তাতে আমার প্রাইভেট বি-এ পড়াও চলবে। এতে আপত্তির কারণ কি হ'তে পারে?"

শঙ্কর বলিল, "এ ত ভাল কথাই, এতে তোমার অমত হবে কেন, সুকুমার?"

দাদা একটু নরম হইয়া বলিল, "কোথায় টীচারি করবে? মেয়ে-স্কুলের ত ছড়াছড়ি।"

শঙ্কর বলিল, "আমাদের ভবানীপুরে মেয়েদের জন্য একটা নতুন হাইস্কুল হয়েছে, সেখানে ত্রিশ টাকা মাহিনায় একটা কাজ পাওয়া যাবে। আমি সেই কথাই আজ বলতে এসেছি।"

দাদা বলিল, "ভবানীপুর এখান থেকে যাওয়া-আসা করা ত সোজা কথা নয়। তুমি আমি পারি, কিন্তু নীরু দেবী পারবেন কি? তাঁকে রোজ রোজ কে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবে? এ-পর্য্যন্ত তিনি ত কখনও রাস্তায় একলা বেরোন নি?"

আমি বলিলাম, "প্রথম প্রথম দু-একদিন সঙ্কোচ বোধ হবে, কিন্তু ক্রমে অভ্যাস করলে আর কোন ভয়-ভাবনা থাকবে না। আমাদের ত ঘরের কোণে আবদ্ধ হয়ে থাকলে চলবে না।"

দাদা বলিল, "অর্থাৎ ইংরেজীতে যাকে বলে নিজের কপালের ঘাম দিয়ে রুটি উপার্জ্জন তাই করতে হবে। বেশ তা-ই কর।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "শঙ্কর বাবু, শুনলেন ত, দাদার মত হয়েছে। আপনি কালই এসে আমাকে নিয়ে যাবেন, আমি সেখানে গিয়ে কাজ ঠিক ক'রে আসব। কখন আসবেন বলুন।"

শঙ্কর বলিল, "আমি কাল সকালে সেক্রেটারী অতুল বাবুকে ব'লে রাখব, আপনি স্কুলের সময় যাবেন। আমি এগারটার সময় আপনাকে নিয়ে যাব।"

দাদা বলিল, "আমিও তোমাদের সঙ্গে গিয়ে দেখে আসব। নীরু আমার সঙ্গে ফিরে আসবে।"

এই বন্দোবস্ত অনুসারে আমি দাদা ও শঙ্করের সহিত ট্রামে চড়িয়া ভবানীপুরে সেই স্কুল দেখিতে গেলাম। ট্রামে তখন অনেক ভিড় ছিল, খোলা গাড়ীতে অনেক পুরুষ-মানুষের সঙ্গে বসিয়া যাইতে আমার কেমন লজ্জা করিতে লাগিল। অনেক লোক হাঁ করিয়া আমাকে দেখিতে লাগিল। আমাদের দেশের তথাকথিত ভদ্রলোকেরাও কিরূপ অশিষ্ট। চারিদিকের কটাক্ষপাতের মধ্যে আমি ঘাড় নীচু করিয়া বসিয়া

রহিলাম। আমার একপাশে দাদা আর একপাশে শঙ্কর বসিল। আমার সম্মুখে যাহারা বসিয়াছিল তাহারা আড়চোখে আমাকে দেখিতে লাগিল। আমি নিতান্ত অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম। ধর্ম্মতলায় নামিয়া আমরা কালীঘাটের ট্রামে উঠিলাম। সে গাড়ীতে তত ভিড় ছিল না। আমরা সামনের সীটে বসিলাম। তাহাতে অনেকটা সুবিধা বোধ করিলাম। যাহা হউক, ভবানীপুরে ট্রাম যেখানে থামিল সেখান হইতে আমরা পদব্রজে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সেই স্কুলে পৌঁছিলাম।

শঙ্কর সেক্রেটারীর নিকট হইতে একখানা চিঠি আনিয়াছিল, আমি সেই চিঠি হাতে করিয়া হেড মিষ্ট্রেসের সঙ্গে দেখা করিলাম। দাদা ও শঙ্কর আপিস-ঘরে বসিল। হেড মিষ্ট্রেস্ মিস্ সাধনা কাঞ্জিলাল বি-এ, একটি ব্রাহ্ম মহিলা। তাঁহার বয়স প্রায় ৪০ বৎসর, মুখ গম্ভীর ও বিরস। আমি নিজের পরিচয় দিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলাম। তিনি সেক্রেটারীর চিঠি পড়িয়া আমাকে সম্মুখের একটা চৌকিতে বসিতে বলিয়া আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "আপনার বয়স ত খুব কম দেখছি। 'আপনি' বলব, না 'তুমি' বলব ?"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "আমাকে 'তুমি'ই বলবেন ?"

"বি-এ পড়া ছাড়লে কেন ?"

"ছাড়িনি, তবে কলেজে আর পড়ব না।"

"নন-কো-অপারেশন করেছ বুঝি ?"

"এক রকম তাই।"

"এ কাজে টিকে থাকবে ত ?"

"সেই রকমই ত ইচ্ছা।"

"অর্থাৎ বিয়ে না-হওয়া পর্য্যন্ত। এতদিন বিয়ে হয় নাই কেন ?"

"বিয়ের সঙ্গেও নন-কো-অপারেশন করেছি।"

"নন কো-অপারেশন ক'রে কয়দিন থাকবে, যে সুন্দর চেহারা।"

এই বলিয়া মিস্ কাঞ্জিলাল যেন একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। আমি বলিলাম, "আমাকে কোন্ ক্লাসে পড়াতে হবে ?"

তিনি বলিলেন "হাঁ, এখন কাজের কথা বলছি। চল, তোমাকে একবার সব ক্লাস কয়টা দেখিয়ে আনি। আজ তিন মাস স্কুল হয়েছে, এখনও উপরের ক্লাসে বেশী ছাত্রী হয় নাই—ম্যাট্রিক ক্লাসে মাত্র দুটি মেয়ে, ক্লাস নাইনে (IX) চারটি, ক্লাস এইটে (VIII) ছয়টি, ক্লাস সেভেনে (VII) বারটি, নীচের ক্লাসেই বেশী মেয়ে হয়েছে, প্রায় একশতটি। আর একজন গ্রাজুয়েট টীচার আছেন, শ্রীমতী রমলা চাটুজ্যে, তিনি আর আমি প্রথম দুই ক্লাসে পড়াই। তোমাকে ক্লাস এইট (VIII) আর ক্লাস সেভেনে (VII) পড়াতে হবে।"

এই বলিয়া তিনি আমাকে একে একে সব ক্লাসে লইয়া গেলেন। রমলা চাটুজ্যে এবং অন্যান্য টীচারদের সঙ্গেও আলাপ করিয়ে দিলেন। রমলার বয়স পঁচিশের কাছাকাছি, বেশ হাসিখুশী মানুষ। তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিয়া সুখী হইলাম, এবং দুই-একটি কথাতেই তাঁহার সঙ্গে আমার বেশ ভাব হইল।

হেড মিষ্ট্রেস্ এই সব দেখাশুনার পরে আমাকে বলিলেন, "আজ তুমি বাড়ি যাও, কাল থেকে পড়ানো আরম্ভ করবে। ঠিক এগারটার সময় ক্লাস বসে। তোমার বাড়ি কোথায় ? কোত্থেকে আসবে ?"

আমি বলিলাম, "আমার বাড়ি পটলডাঙ্গায়, আমার দাদার সঙ্গে আজ এসেছি, তাঁর একটি বন্ধুও সঙ্গে আছেন।"

"কিন্তু রোজ রোজ কি তাঁরা তোমায় সঙ্গে আনবেন ? তুমি ছেলেমানুষ, একলা কি ক'রে এতদূর আসবে ? আমরা অবশ্য পারি, তুমি কি পারবে ?"

"আমাকেও অবশ্য পারতে হবে। আমি আপনাদের মত স্বাবলম্বন শিক্ষা করতে চাই।"

তিনি বলিলেন, "বেশ, বেশ। আচ্ছা, তুমি আজ যেতে পার। কাল আর সব কথা হবে।"

এই বলিয়া তিনি আমাকে বিদায় দিলেন, আমি দাদার সঙ্গে বাড়ী আসিলাম।

৩

পরদিন শঙ্কর তাহার ল-ক্লাস হইতে দশটার সময় আমাদের বাড়ীতে আসিল। আমি তাহার সঙ্গে স্কুলে রওনা হইলাম। আমরা ট্রামের জন্য অপেক্ষা করিতেছি, এই সময়ে একটা লোক—বয়স তাহার কুড়ি-বাইশ, ফ্যাশন করিয়া চুলছাঁটা ও টেড়িকাটা, চোখে চশমা আঁটা,

নাকের তলায় এক ইঞ্চি লম্বা, সিকি ইঞ্চি চওড়া গোঁফ, তাহার দুই আগা ছাঁটা, পাখীর ডানামেলা-কলারযুক্ত গলাখোলা ময়লা শার্টের উপর ময়লা বুক-খোলা কোট পরা—একটু দূরে দাঁড়াইয়া দাঁত বাহির করিয়া আমাকে দেখিতে লাগিল। শঙ্কর তাহার প্রতি কোপকটাক্ষ নিক্ষেপ করায় সে বলিল, "বাবা, ফুর্ত্তি করতে যাচ্ছ, আমাকে সঙ্গে নেবে ?"

এই কথা শুনিয়া আমার আপাদমস্তক ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। আমার হাতে একটা চাবুক থাকিলে আমি তৎক্ষণাৎ তাহার মুখে এক ঘা বসাইয়া দিতাম। শঙ্করও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "ইউ ব্লাডি রাস্কেল্! তোর চোখ নেই, ভদ্রমহিলা চিনতে পারছিস নে ?"

সে লোকটা বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিল, "বাবা, ভদ্রমহিলা ত আজকাল সবাই হয়—ভদ্রমহিলার মুখে ঘোমটা থাকে, কপালে সিন্দূর থাকে,—ভদ্রমহিলা এরকম রাস্তায় বেরোয় না। তোমাদের কোথায় যাওয়া হচ্ছে, ইডেন গার্ডেনে, না নৌকাবিহারে ?"

শঙ্কর তাহার কথার উত্তর দিতে-না-দিতেই ট্রাম আসিয়া পড়িল, আমরা ট্রামে উঠিয়া পড়িলাম। আমার মন ঐ গুণ্ডাটার কথা শুনিয়া অত্যন্ত তিক্ত হইয়া উঠিল, কারণ আমি জীবনে কখনও এরূপ অপমানসূচক কথা শুনি নাই। আমার অত্যন্ত কান্না পাইতে লাগিল এবং একবার মনে হইল ট্রাম হইতে নামিয়া বাড়ী ফিরিয়া যাই। যাহা হউক, আমি অতি কষ্টে আত্মসংবরণ করিলাম। শঙ্করও ক্রোধে অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়াছিল, নিষ্ফল ক্রোধ চাপিতে গিয়া তাহার মুখ-চোখ বিকৃত ভাব ধারণ করিল।

আমরা তাড়াতাড়ি ট্রামে উঠিলাম বটে, কিন্তু ট্রামে অত্যন্ত ভিড়, বসিবার জায়গা পাওয়া কঠিন। আমাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া একটি বুড়া ভদ্রলোক সরিয়া বসিয়া আমাকে একটু জায়গা করিয়া দিয়া বলিলেন,—"মা, তোমাদের কি এরকম ট্রামে যাওয়া সাজে ?"

আমি কোন কথা না বলিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। শঙ্কর আমার পাশে দাঁড়াইয়া রহিল। আমাদের চোখমুখের ক্রুদ্ধ ভাব লক্ষ্য করিয়া সেই ভদ্রলোকটি বলিলেন, "তোমরা দুইজন বুঝি ঝগড়া ক'রে বাড়ী থেকে বেরিয়েছ ? তা মা যার সঙ্গে যাচ্ছ, তাঁর উপর রাগ করলে চলবে কেন ?"

শঙ্করের দিকে চাহিয়া আবার বলিলেন, "বাবা, তুমি বুঝি বসতে পারলে না ? আমি এখনই বৌবাজারের মোড়ে নেবে যাব, তুমি এখানে বসতে পাবে। বাবা, তুই একটা মিষ্টি কথা ব'লে মাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নিয়ে যাও।"

বৃদ্ধের এই সকল কথা শুনিয়া অতি দুঃখেও আমার হাসি পাইল। আমি অতিকষ্টে হাস্য সংবরণ করিলাম।

শঙ্কর বলিল, "আমাদের মধ্যে কোন ঝগড়া হয় নি।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "বেশ বাবা, বেশ। তোমরা কোথায় যাবে ?"

শঙ্কর বলিল, "ভবানীপুরে।"

"তুমি এবার আমার জায়গায় বসো" এই বলিয়া বৃদ্ধ নামিয়া গেলেন। শঙ্কর তাঁহার জায়গায় আমার পাশে বসিল।

একটু পরে আমি লক্ষ্য করিলাম, আমাদের সম্মুখের বেঞ্চে দুইটি যুবক আমাদের দিকে আড়চোখে তাকাইয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া কি বলিতেছে আর হাসিতেছে। আমি শঙ্করের গা টিপিয়া দেখাইলাম। শঙ্কর তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "আপনারা হাসছেন কেন ?"

একটি ছোকরা মুখ হইতে হাসি মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, "না—এমনি। আপনারা কোথায় যাচ্ছেন ?"

শঙ্কর বলিল, "ভবানীপুরে।"

সেই ছোকরাটি বলিল, "মাপ করবেন মশায়, একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি কি ?"

শঙ্কর বলিল, "কি বলুন।"

"আপনারা দুইটি ভাইবোন, না আর কিছু ? আমি বলছি ভাইবোন, ইনি বলছেন ভাইবোন নয়।"

"আপনার অনুমান সত্য নয়।"

"তবে কি ?"

শঙ্কর হাসিয়া বলিল, "উই আর ফ্রেণ্ড্স্, তবে একটা সম্পর্কও আছে।"

অন্য ছোকরাটি বলিল, "আপনারা কলেজে বুঝি একসঙ্গে পড়ছেন ?"

"না, আমি 'ল' পড়ছি, উনি বি-এ পড়েন।"

এই সময় গাড়ী আসিয়া ধর্ম্মতলায় থামিল, আমরা নামিয়া পড়িলাম। সেই ছোকরা দুটিও আমাদিগকে নমস্কার

করিয়া নামিল। আমরা কালীঘাটের গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম।

এই গাড়ীতে মোটেই ভিড় ছিল না। আমরা সকলের সামনে গিয়া দুখানা ছোট বেঞ্চে পাশাপাশি বসিলাম। আমি বলিলাম, "আঃ বাঁচা গেল। শঙ্করদা, আজ আমরা কি কুক্ষণে বাড়ী থেকে যাত্রা করেছিলুম।"

শঙ্কর হাসিয়া বলিল, "এই ত আমাদের বেশ একটা সম্পর্ক আছে। এতদিন এ-রকম ডাকেন নি কেন?"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "দরকার হয় নি ব'লে ডাকি নি। আজ আমার ট্রামে আসতে গিয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ হ'ল। প্রথমে সেই গুণ্ডাটা, তার পরে সেই মজার বৃদ্ধ, আর শেষটায় এই দুটি ছোকরা। সে গুণ্ডাটার কথা মনে হ'লে কিন্তু এখনও আমার সর্ব্বশরীর রাগে জ্বলে উঠে।"

"এতদিন ঘরের ভিতরে ছিলেন, বাহিরের ব্যাপার ত টের পান নি। সংসারের কর্দ্দমাক্ত পথে বার হ'লেই কাদার ছিটে সময় সময় গায়ে লাগে। এ-সব মনে ক'রলে আর পথ চলা হয় না।"

"তা ত দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে, আপনি আজ সঙ্গে ছিলেন ব'লে অনেকটা বাঁচোয়া। আমি একলা কি ক'রে এতটা পথ রোজ রোজ যাওয়া-আসা ক'রব তাই ভাবছি।"

"আমি ত রোজই সকালে ল-ক্লাসে যাই, যদি বলেন ত আমি রোজই আপনাকে সঙ্গে ক'রে আনতে পারি, ফেরবার বেলায়ও আমি আপনাকে সঙ্গে ক'রে বাড়ী পৌঁছে দিতে পারি, তবে আপনি যে-সময়ে আসবেন তখন গাড়ীতে ততটা ভিড় থাকবে না। প্রাতঃকালেও আমরা আজ যে-সময়ে বেরিয়েছিলুম তার একটু আগে বেরুতে পারলে এত ভিড় হবে না।"

"শঙ্কর-দা, আমি আপনাকে এতটা কষ্ট দিতে চাই নে। আপনার ল-ক্লাসের কাজ হয়ত তত শীঘ্র শেষ হবে না।"

"আমি ঠিক দশটার সময় আমাদের কলেজের সামনে ফুটপাথের উপর আপনার অপেক্ষা ক'রব, তবে যে-দিন আগে ছুটি হবে সেদিন আপনাদের বাড়ীতেও যেতে পারি।"

"শঙ্কর-দা, আপনি আমার জন্য যা করছেন, এই ঋণ কি ক'রে শোধ দেব জানি না।"

শঙ্কর হাসিয়া বলিল, "ঋণ শোধ দেবার দরকার নেই, পুঁজি হয়ে থাক, আর তার সুদ বাড়তে থাকুক।"

আমাদের এইরূপ নানাপ্রকার কথাবার্ত্তা হইতে হইতে আমরা ভবানীপুর আসিয়া পৌঁছিলাম। ট্রাম হইতে নামিলে শঙ্কর আমাকে সঙ্গে করিয়া স্কুলের সম্মুখের রাস্তা পর্য্যন্ত লইয়া গেল। ঘড়ী খুলিয়া দেখিলাম, আমি ১০ মিনিট লেট হইয়াছি।

স্কুলে ঢুকিতেই হেড মিষ্ট্রেস্ মুখ ভার করিয়া বলিলেন, "আজ প্রথম দিনই তুমি লেট ক'রে এলে, ঐ ঘড়ীর দিকে চেয়ে দেখ। তুমি নিজে স্কুল-কলেজে পড়েছ, সময়ের মূল্য অবশ্যই জান।"

আমি বলিলাম, "মাপ করবেন, আজ ট্রামের গোলযোগে একটু দেরি হয়েছে।"

"অন্য দিন সকাল সকাল বাড়ি থেকে বেরুবে।"

"তা অবশ্যি বেরুবো, তবে আমি যাঁর সঙ্গে আসি, তিনি ঠিক সময়ে এলে হয়।"

"ঐ যে যুবকটিকে তোমার সঙ্গে দেখলুম, উনি তোমার কে?"

"উনি আমার দাদার শালা, উনি আমাকে অনেক সাহায্য করছেন।"

"এ সব ছোকরাদের সঙ্গে তোমার বেড়ান ভাল দেখায় না। যাক সে কথা, এখন ক্লাসে যাও।"

হেড মিষ্ট্রেসের এই সব কথা শুনিয়া আমার মন বিরক্তিতে ভরিয়া উঠিল। এই লোকের অধীনে আমাকে চাকরি করিতে হইবে। ভগবান আমার সহায় হউন! আমার মন অত্যন্ত দমিয়া গেল। আমি অত্যন্ত বিষণ্ণ অন্তঃকরণে ক্লাসে গিয়া বসিলাম ও পড়ানোর কাজ আরম্ভ করিলাম। কিন্তু অন্যমনস্কভাবে পড়াইতে বসিয়া ভাল পড়ান হইল না, তাহা আমি নিজেই বুঝিতে পারিলাম। টিফিনের ঘণ্টায় রমলার সঙ্গে দেখা হইল। প্রথম দিনই আমাদের বেশ ভাব হইয়াছিল। আমি তাহাকে একটু নিভৃতে ডাকিয়া লইয়া বলিলাম, "ভাই আমার বুঝি এখানে চাকরি করা পোষায় না। আপনাদের হেড-মিষ্ট্রেস্ কি রকম লোক?"

রমলা বলিল, "সে-কথা আর ব'লো না, ভাই। ওঁর যে কত গুণ, তা ব'লে শেষ করা যায় না। আমিও ব্রাহ্ম,

কিন্তু উনি নিজেকে পরম ধাম্মিক ও কর্ত্তব্যপরায়ণ ব'লে মনে করেন। অন্যের কোন একটু ত্রুটি দেখতে পারেন না। অত্যন্ত খিটখিটে স্বভাব। বেশী বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিত থাকলে অনেকের যে দোষ হয় তাই। নিজের চেহারা ভাল নয়, সেজন্য যে-সকল মেয়েরা সুন্দরী তাদের ঈর্ষা করেন। উনি হয়ত অনেক লোকের সঙ্গে প্রেমে পড়তে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু ওঁর ঈপ্সিত পুরুষেরা বোধ হয় মেজাজ ও চেহারা দেখে ভয়ে পালিয়েছে। সেজন্য যদি কোন তরুণীর সঙ্গে কোন যুবককে মিশতে দেখেন, তবে উনি তা সহ্য করতে পারেন না।"

আমি বলিলাম, "ভাই, তোমার ত লোকচরিত্র অধ্যয়নের আশ্চর্য্য ক্ষমতা আছে। আমি আজ একদিনেই মিস্ কাঞ্জিলালের এই সকল গুণের কিছু কিছু আভাস পেয়েছি। তুমি কি ক'রে টিকে আছ ?"

রমলা বলিল, "কি ক'রে ভাই, যেখানেই চাকরি করতে যাব সেখানেই ত মনিবের মন জুগিয়ে চলতে হবে। তোমার আজ একেবারে নতুন ব'লে মনে এতটা কষ্ট হচ্ছে, ক্রমে এ-সব সয়ে যাবে।"

আমি কাহারও তাঁবে থাকিব না বলিয়া চাকরি করিতে বাহির হইয়াছি, তাহার পরিণাম কি তবে এই ?

বেলা চারিটার সময় স্কুলের ছুটি হইল। আমি বাহিরে আসিয়াই দেখিলাম, শঙ্কর অপেক্ষা করিতেছে। কিন্তু হেড মিষ্ট্রেসের গঞ্জনার পর শঙ্করকে সেখানে দেখিয়া আমি সন্তুষ্ট হইলাম না। তাহার সঙ্গে না গিয়াই বা করি কি ? আমি তাহার সঙ্গে মিলিত হইয়া দুই জনে ট্রামে গিয়া উঠিলাম। ধর্ম্মতলা পৌঁছিয়া আমি শঙ্করকে বলিলাম, "শঙ্কর-দা, এখন ট্রামে বেশী ভিড় নেই, আমাকে একটা সামনের বেঞ্চে তুলে দিয়ে আপনি বাড়ী যান। আমি নিজেই যেতে পারব, আপনাকে আর কষ্ট দেব না।"

শঙ্কর বলিল, "আপনার সঙ্গে যেতে আমার একটুও কষ্ট হয় না। আচ্ছা, আপনি এবেলা একলা যাওয়ার এক্সপেরিমেণ্ট (পরীক্ষা) ক'রে দেখুন। কাল সকালে সাড়ে নয়টার সময় আমি আপনাদের বাড়ী যাব।"

এই বলিয়া আমাকে একটা শ্যামবাজারের ট্রামে তুলিয়া দিয়া শঙ্কর চলিয়া গেল।

ক্রমশঃ

শ্রীহট্টের হিন্দুসমাজে অস্পৃশ্য জাতি ও নারীর স্থান

শ্রীকৃষ্ণপদ ভট্টাচার্য্য

দুই বৎসরেরও পূর্ব্বে হঠাৎ একদিন সংবাদপত্রে দেখিলাম সুনামগঞ্জ মহকুমার প্রায় দুই সহস্র পাটনী ও নমঃশূদ্র ইসলামধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছে। এই সংবাদ যখন চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল, তখন নিখিল-ভারত হিন্দু মহাসভার সভাপতি হইতে আরম্ভ করিয়া আর্য্য-সমাজ ও রামকৃষ্ণ মিশনের কর্ম্মিগণের ভিতরেও সাড়া পড়িয়া গেল। সকলের চোখে মুখেই যথাসম্ভব দুঃখদৈন্যের চিহ্ন পরিস্ফুট হইয়া উঠিল।

কলিকাতা হইতে আর্য্যসমাজের অক্লান্ত কর্ম্মী শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু আচার্য্য বেদশাস্ত্রী প্রভৃতি শ্রীহট্ট অভিমুখে ছুটিলেন। পুত্রকন্যার মৃত্যুতেও বুঝি মানুষ এত ব্যাকুল হয় না। সুখস্বাচ্ছন্দ্যকে তুচ্ছ করিয়া শুষ্কমুখে যখন সুনামগঞ্জে গিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন উচ্চ শ্রেণীর অনেক ব্রাহ্মণ কায়স্থ, তাঁহাদের মুখ হইতে এই সংবাদ শুনিয়া কেহ কেহ বলিলেন, "তাই নাকি ? আমরা ত ইহার কিছুই জানি না। তা ইহার আর কি প্রতিবিধান আপনারা করিবেন ? ইহা ত আমাদের এতদঞ্চলে সর্ব্বদাই হইতেছে। আজ না হয় সঙ্ঘবদ্ধভাবে জাত্যন্তরিত হইতেছে। নতুবা দুই-একজন করিয়া প্রায়ই মুসলমান হয়। আপনারা তথায় যাইবেন না, ফিরিয়া যাউন।" যাঁহারা জানিতেন তাঁহারা কহিলেন, "আপনারা কি পাগল হইয়াছেন ? ঐখানে গেলেই উহারা আপনাদের প্রাণসংহার করিবে।

অস্পৃশ্য জাতি মুসলমান হইলে আমাদেরই বা কি? আপনাদেরই বা কি? ব্রাহ্মণ কায়স্থ যদি স্ব স্ব স্তরে থাকেন তাহা হইলে হিন্দুধর্ম্ম বজায় রহিবে। অতএব সর্ব্বাগ্রে ব্রাহ্মণকে রক্ষা করুন।"

কিন্তু তাঁহারা যখন এই সাম্প্রদায়িকতাবাদী গোঁড়া সম্প্রদায়ের কথা না শুনিয়া সহস্র সহস্র নির্যাতিত অস্পৃশ্যের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহারা, প্রাণ-সংহারের পরিবর্ত্তে, এই মহাত্মাদের সেবা করিবার জন্য যুগপৎ সকলেই চঞ্চল হইয়া উঠিল। শত শত অস্পৃশ্য এই মহান হৃদয় সমাজ-সংস্কারকগণের চরণতলে প্রণত হইয়া তাঁহাদের প্রাণের বেদনা জানাইল।

তাহারা হিন্দু। কিন্তু হিন্দুর কোন অধিকারই তাহারা পায় না। হিন্দুর নাপিত ধোপা, মুসলমানগণ নির্ব্বিবাদে পাইতেছে, অথচ তাহারা হিন্দু হইয়াও সেই অধিকারে বঞ্চিত। দেবতার নিকট তাহাদের বেদনাভরা কণ্ঠের স্বর পৌঁছায় না। কারণ দেবমন্দিরের দ্বার অস্পৃশ্যদের জন্য চিররুদ্ধ। দূর হইতে দাঁড়াইয়া দেখাও তাহাদের ভাগ্যে বড়-একটা ঘটিয়া উঠে না। তাহাদের স্পৃষ্ট জল খাওয়া ত দূরের কথা, অনেক স্থলে ব্রাহ্মণ কায়স্থদের পুষ্করিণীর জলও না কি তাহারা স্পর্শ করিলে দুষ্ট হয়। ব্রাহ্মণ কায়স্থের নিকট তাহাদের সত্তা চণ্ডাল অপেক্ষাও ন্যূন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য নানা উপায়েই নির্যাতন চলে—সে সব ত সাধারণ কথা। কাজেই মুসলমান হওয়া ছাড়া তাহাদের আর অন্য উপায় কি? মুসলমান হইলে হিন্দুর নাপিত ধোপা সবই পাইবে, অথচ একটা বিশাল জাতির সকলের সহিতই একত্র পানাহার চলিবে—ইহাই হইল শ্রীহট্টের সমাজ-নাটিকার প্রথম দৃশ্য!

তারপর অন্যান্য জিলার সহিত তুলনা করিলে দেখা যায়, শ্রীহট্ট নিজের বৈশিষ্ট্যটুকু খুব ভাল রকমই বজায় রাখিয়াছে। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের গাঢ় সম্প্রীতি যখন ক্ষত্রিয়ত্বের প্লাবনে ভাসিয়া গেল, তখন বাংলার বিভিন্ন জিলায় একে অন্যের প্রতি সহানুভূতি দেখাইতেও কার্পণ্য করিতে লাগিলেন। তাহাতে প্রত্যেকের মধ্যেই উন্নত হইবার একটা রেষারেষির ভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। কায়স্থরা ক্ষত্রিয় হইতেই বৈদ্যেরা ব্রাহ্মণ হইলেন, সাহারা বৈশ্য হইলেন, সুযোগ বুঝিয়া অস্পৃশ্য জাতিরাও হিন্দুসমাজে যে যেখানে আধিপত্য খাটাইবার সুযোগ পাইতেছে, সে সেখানেই উন্নতিমার্গ ধরিবার চেষ্টা করিতেছে। তরুণেরা অবিদ্যার মোহপাশ ছিন্ন করিয়া সমাজ-সংস্কার-ব্রত অবলম্বন করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন, শুদ্ধি-আন্দোলন নির্ব্বিবাদে চলিতেছে, হিন্দু মুসলমান হইলেও তাহাকে পুনরায় হিন্দুসমাজে গ্রহণ করা হইতেছে, ধর্ষিতা নারীর স্থান যাহাতে সমাজে হয় এবং নারীনির্যাতন যাহাতে না হইতে পারে তৎপ্রতি অনেক কর্ম্মীরই দৃষ্টি পড়িয়াছে। নারীসম্প্রদায়ের মহীয়সী রমণীবৃন্দেরাও বক্তৃতা প্রসঙ্গে নারীধর্ষণ নিবারণের কথা বলেন।

কিন্তু বাংলার বিভিন্ন জিলায় যখন এইরূপ অবস্থা তখন শ্রীহট্টের ব্রাহ্মণ কায়স্থের সম্প্রীতি, ব্রাহ্মণত্ব ও শূদ্রত্বের ভিতর দিয়া আরও পাকাপাকি রকমে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা চলিতেছে। অর্থাৎ তাঁহারা চান যে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ বনাম সৎশূদ্র জাতি ব্যতীত অপরাপর সব মুসলমান হইলেও তাহাদের কোন ক্ষতি নাই।

শ্রীহট্টের কায়স্থগণের ক্ষত্রিয় হইবারও কোন লক্ষণ নাই। তাঁহারা ক্ষত্রিয়ই হউন, আর শূদ্রই হউন ব্রাহ্মণকে লইয়াই তাঁহারা পূর্ণাঙ্গ। অস্পৃশ্য জাতির প্রতি সহানুভূতি দেখান নিরর্থক।

তরুণেরা পিতৃপিতামহের জীর্ণ শীর্ণ লম্বা পুঁথির পাতাই উল্টাইতেছেন। সমাজসংস্কারের দুরূহ সমস্যার গ্রন্থিভেদ করা তাঁহাদের সাধ্যায়ত্ত নহে। সুতরাং শুদ্ধি-আন্দোলন করিবে কাহারা? তাঁহারা হয়ত টিকি নাড়িয়া স্মৃতিশাস্ত্রের ব্যবস্থাই দিবেন।

সমাজে ধর্ষিতা নারীর স্থান কোথায়—এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে নারীজাতি সম্বন্ধে কিছু বলিতে হয়।

এক সময় সমাজ নারীকে কত উচ্চ আসন দিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ ৺শ্রীশ্রীচণ্ডীতে মহামায়ার স্তব করিতে করিতে দেবগণ বলিতেছেন:—

"স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু ইত্যাদি। অতএব দেখা যাইতেছে, তখনকার সমাজে মহামায়ার অংশসম্ভূতা নারী জাতি অশেষ শ্রদ্ধার পাত্রী ছিলেন। তন্ত্রশাস্ত্রেও দেখিতে পাওয়া যায় অনেকস্থলেই নারীর প্রাধান্য বর্ণনা করা হইয়াছে—"স্ত্রিয় দেবাঃ স্ত্রিয় প্রাণাঃ স্ত্রিয় এব বিভূষণাঃ" স্ত্রীলোক প্রাণ-স্বরূপিণী, আভরণরূপিণী দেবতা। শ্রীশ্রীচণ্ডীতেও উল্লেখ

আছে, "মহামায়া প্রভাবেণ সংসারস্থিতিকারিণঃ।" তারপর নারীর অপরাধ যতই হউক না কেন তাহারা যে সর্ব্বদাই ক্ষমার্হা তাহার সাক্ষ্য দিতেছেন তন্ত্রশাস্ত্র, "স্ত্রীণাং শতাপরাধেন পুষ্পেনাপি ন তাড়য়েৎ।" সুতরাং নারীর উপর যে-কোন অবস্থায়ই অত্যাচার চলিতে পারে না—ইহা নিছক সত্য। ধর্ষিতা নারীকে সমাজে পুনর্গ্রহণ সম্বন্ধে শাস্ত্রের প্রমাণ খুঁজিলে আশা করি অনেক প্রমাণই পাওয়া যাইবে। কিন্তু আমি এখানে শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধৃত না করিয়া পুরাতন সমাজের দুই-একখানি চিত্র অঙ্কিত করিতেছি।

সকলেই বোধ হয় অবগত আছেন, বাংলার রাঢ়ী শ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণগণের মধ্যে তেত্রিশটি মেলবন্ধন আছে। হরিকবীন্দ্র বিরচিত 'মেলবন্ধন কারিকা'য় লিখিত আছে, নানা দোষের একত্র মিলনহেতু মেলের উৎপত্তি। পূর্ব্বে কুলীনসমাজে অসংখ্য দোষ প্রবেশ করিয়াছিল। গুণের পরিবর্ত্তে ব্রাহ্মণসমাজে দোষেরই সমধিক প্রাবল্য ছিল। হোসেন শাহের রাজত্বকালে দেবীবর মিশ্র আবির্ভূত হন। তিনিই দোষে দোষে মিলাইয়া কুলীনদের কুলবন্ধন করেন, ইহারই নাম মেলবন্ধন।

দোষ নাই যার।
কুল নাই তার॥

"দোষানামিহ মেলনাৎ সমুদিতা কুলজ্ঞেন বৈ" (কুলতত্ত্বার্ণব ৫২৫) আমি এখানে তাহারই দুই-একটা দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি, যথা—"ফুলিয়ামেল" এই মেলে নাদা, ধাঁধা, বারুইহাটি ও মূলুকজুরী দোষ আছে।

ধাঁধা নামক খালের নিকট হাসাই নামক এক থানাদার থাকিত। শ্রীনাথ চট্টের (চট্টোপাধ্যায়) দুই অবিবাহিতা কন্যা সেই খালে জল আনিতে যায়। হাসাই তাহাদিগকে ধরিয়া বলাৎকার করে। ঐ কন্যাদ্বয়ের একজনকে গদাধর বন্দ্যোপাধ্যায় বিবাহ করেন।

"অনাথ শ্রীনাথ সুতা ধান্ধাঘাট স্থলে গতা।
হাসাই থানাদারেণ যবনেন বলাৎকৃতা॥" (মেলমালা)

শ্রীনাথ চট্টের ধাঁধা দোষ। বারুইহাটি গ্রামের ব্রাহ্মণ কন্যাগণের অবারিত মুসলমান সংস্রবহেতু ঐ গ্রামে কেহ বিবাহ করিলে পতিত হইত। দেবীবর মিশ্রের কল্যাণে বারুইহাটির ব্রাহ্মণগণ কুলীন গণ্য হইলেন।

"সর্ব্বানন্দীমেল" রাঘব গাঙ্গুলীর (গঙ্গোপাধ্যায়) কন্যা অবিবাহিতা অবস্থায় কৈবর্ত্ত কর্ত্তৃক দুষ্ট হয় ও ঘরের বাহির হইয়া যায়। গোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় সেই কন্যাকে বিবাহ করেন। রাঘব গাঙ্গুলীর সঙ্গে সর্ব্বানন্দের কুলবন্ধন হয়। "পণ্ডিতরত্নীমেলে" সূর্য্য ঘোষালের কন্যাগণ অবিবাহিতা অবস্থায় নীচজাতি সংস্রব ও ভ্রূণহত্যা পাপে দুষ্ট হয়।

লক্ষ্মীনাথ যে-কন্যাকে বিবাহ করেন সে অবিবাহিতা অবস্থায় নীচজাতির এক পুরুষের সহিত দুষ্ট হয়। পণ্ডিতরত্নের পিতামহ (বিষ্ণু) উহাদের সহিত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ।

এইরূপ ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, পূর্ব্বে ঐরূপ করা হইত বলিয়াই হিন্দুজাতি আজও বিদ্যমান আছে। কিন্তু এখন সমাজে গোঁড়ামী এত অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, স্ত্রীকে যদি একজন মুসলমান বা অন্য কোন জাতি একবার ঘরের বাহির করিতে পারে, তাহা হইলেই সমাজ আর তাহাকে গ্রহণ করেন না। কাজেই অহিন্দু জাতিরাও সুযোগ বুঝিয়া হিন্দুনারীকে ফুসলাইতে অথবা অপহরণ করিতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধাবোধ করিতেছে না। কারণ তাহারা জানে, হিন্দুসমাজে ধর্ষিতার স্থান নাই। ফলে এইরূপ অবস্থাই দাঁড়াইয়াছে যে, প্রায় প্রত্যহই দুই-একটি হিন্দুনারীহরণের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। মৌলবী-বাজারের (শ্রীহট্ট) অন্তর্গত উত্তরভাগ গ্রামের ৺প্যারী দামের কন্যা অপহৃতা শ্রীমতী প্রতিভাবালা দামকে অনুসন্ধান করিতে গিয়া কুলাউড়া-যুবকসঙ্ঘের শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার পালচৌধুরী প্রায় ত্রিশটি অপহৃতা হিন্দুরমণীর সংবাদ দিয়াছেন। এই সমস্ত স্ত্রীলোককে মুসলমান-বসতিবহুল স্থানে রাখা হইয়াছে। ইহাদের অধিকাংশকেই ফুসলাইয়া অথবা অপহরণ করিয়া মুসলমানেরা লইয়া গিয়াছে। অনেকে হয়ত স্বেচ্ছায়ই বাহির হইয়া গিয়াছে।

নারীহরণের কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, অধিকাংশ স্থলেই পারিবারিক উৎপীড়নের জন্য স্ত্রীলোকেরা নিতান্ত অনিচ্ছাবশতঃও স্বামিগৃহ ত্যাগ করে, এবং সুযোগ বুঝিয়া অহিন্দুরাও ফুসলাইয়া অথবা হরণ করিয়া তাহাদের সর্ব্বনাশ করে। তাহারা যখন দেখিতে পায়, হিন্দুসমাজ ধর্ষিতাদিগকে তাহাদের গৃহ অথবা প্রকাশ্য বাজারে আশ্রয় লইবার উপদেশ দেন, তখন দ্বিগুণ উদ্যমে নারীহরণ করিতে আর সঙ্কোচ করে না। কিন্তু আমরা দেখাইতে পারি যে, পূর্ব্বে

যেরূপ ধর্ষিতা হিন্দুনারীকে সমাজে গ্রহণ করা হইত, সেরূপ মুসলমান মহিলাকেও শুদ্ধি করিয়া ব্রাহ্মণেরা বিবাহ করিতেন।

রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের যেমনি মেলবন্ধন আছে, বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণেরও ঠিক তেমনি পটী বন্ধন আছে। শব্দদ্বয় একই পর্য্যায়ভুক্ত। 'আনিয়াখানি'-পটীতে যবনসংসর্গ আছে। 'কুতুবখানি'-পটীতে দেখা যায় যে, কুতুব খাঁ নামক মুসলমান যে কন্যাকে বরণ করিয়াছিল, তাহাকে মথুরা মৈত্র বিবাহ করিয়াছিলেন ("বর্ত্তমান সমাজের ইতিবৃত্ত" শ্রীভাগবতচন্দ্র দাশ)। লালবিহারী কবিভূষণ লিখিয়াছেন, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণসমাজের কুলীনের পটীবন্ধন এবং রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণসমাজের মেলবন্ধনের মূলেও দুই-এক স্থানে ভিন্নজাতিসংস্রব সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়। এক বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ জনৈক মৈত্র একটি পরমাসুন্দরী মুসলমান মহিলাকে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া নাম "ভূষণা" রাখিয়া সেবাদাসী করিয়াছিলেন বলিয়াই বারেন্দ্র সমাজে "ভূষণাপটী" কুলীনের উদ্ভব হইয়াছে। সুতরাং ধর্ষিতা নারীকে সমাজে গ্রহণ সম্বন্ধে কোন অন্তরায়ই থাকিতে পারে না। অপিচ আমার মতে শুদ্ধি করিয়া অন্যজাতীয়া মহিলাকেও পূর্ব্বের ন্যায় সমাজে গ্রহণ করা উচিত। 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল, কিছুদিন পূর্ব্বেও নাকি পূর্ব্ববঙ্গে নদীতে নদীতে নৌকা (ভরা) বোঝাই করিয়া ঘাটে ঘাটে মেয়ে ফেরি করিয়া বিক্রয় করা হইত। এই সব কন্যা অন্ত্যজ শূদ্র ও মুসলমান বংশ হইতেই অধিকাংশ সংগৃহীত হইত। যে-সমস্ত ব্রাহ্মণসমাজে কন্যার অভাব পরিলক্ষিত হইত, তাঁহারা ঐ সকল কন্যার পাণিপীড়ন করিয়া সমাজের পুষ্টি করিতেন। ইহারা 'ভরার মেয়ে' বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। কাজেই ধর্ষিতা হিন্দুনারীকে সমাজে পুনর্গ্রহণ সম্বন্ধে যাঁহারা গোঁড়ামী করিতেছেন, তাঁহারা যেন একবার প্রাচীনের সন্ধানে ছুটেন।

শ্রীহট্ট হইতে প্রায় প্রত্যেক দিনই দুই একটি নারীহরণের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। এই অপহৃতা রমণীগণকে সমাজে পুনর্গ্রহণ সম্বন্ধে গোঁড়ার দল যে পাঁতি দিতেছেন তাহাতে এই ফল হইতেছে যে, অপহৃতা ধর্ষিতা নারী পাঁতির ধাক্কায় প্রকাশ্য স্থান অথবা অহিন্দুর অঙ্কলক্ষ্মী হওয়াকেই শেষ পর্য্যন্ত কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করে।

পারিবারিক অত্যাচার হিন্দুনারী কি পরিমাণ সহ্য করিতে পারে তাহা লেখনীর মুখে বর্ণনা করা যায় না। স্বামী ও শাশুড়ীর অত্যাচার যখন একান্ত অসহনীয় হইয়া উঠে, অত্যাচারের মূর্ত্তি যখন প্রজ্জ্বলিত 'হাতা' বা 'লৌহ শলাকার' ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়া অভাগিনীর কোমলাঙ্গে অভিশাপের চিহ্ন পর্য্যন্ত অঙ্কিত করিয়া দেয়, তখন নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে গৃহত্যাগ করিয়া নারীজীবনের প্রায়শ্চিত্ত করে। দিন-কয়েক পূর্ব্বেও এরূপ দুই-একটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। অনেক স্থলে আমি নিজেই স্বচক্ষে স্বামী ও শাশুড়ীর অত্যাচার প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ পাইয়াছি।

অনেক স্থলে অত্যাচার বংশগত মর্য্যাদাহিসাবেও হয়। মেয়ের পিতা হয়ত বংশগত মর্য্যাদায় বরের পিতা অপেক্ষা হীন। বিবাহের পর অর্থ সম্বন্ধে যদি একটু মনোমালিন্য হয় তাহা হইলেই স্বামী ও শাশুড়ীর প্রতিহিংসা অসহায়া বধূর উপর আত্মপ্রকাশ করে। পণপ্রথা ও কৌলিন্য মাহাত্ম্য এই সকল স্থানেই প্রকাশিত হয়।

যে-দেশের সামাজিক অবস্থা এইরূপ, সে দেশের অস্তিত্ব যে কতকাল বজায় রহিবে তাহা সহজেই অনুমেয়।

ধর্ষিতা নারী যে শুধু হিন্দু এমন নয়, মুসলমান নারীও দুর্বৃত্তদের দ্বারা নিগৃহীতা হইতেছেন। কংগ্রেস কমিটির পক্ষ হইতে নারী-রক্ষা-সমিতি গঠন করা কর্ত্তব্য। হিন্দুনারীই হউক আর মুসলমান নারীই হউক সকলকেই আমাদের রক্ষা করিতে হইবে।

আমাদের শেষ বক্তব্যে আমার জন্মভূমির প্রত্যেক ব্যক্তিকেই বোধ হয় বলিতে পারি যে, দুর্বৃত্তদের কার্য্যে যে পক্ষই সহানুভূতি দেখান না কেন ইহাতে উভয় পক্ষেরই সর্ব্বনাশ করিবেন সন্দেহ নাই। অনেক মুসলমান মনে করেন, ধর্ম্মান্তরিত করা মহাপুণ্যের কাজ। কিন্তু সেটা ফুসলাইয়া অথবা অপহরণ করিয়া নহে। ইসলামধর্ম্ম যাহার ভাল লাগিবে, সে মুসলমান আপনা হইতেই হইবে, এবং হিন্দুধর্ম্ম যাহার ভাল বোধ হইবে, সে হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিবে। ইহাতে বাধা দেওয়া অথবা ফুসলাইয়া অপহরণ করিয়া পাপবৃত্তি চরিতার্থ করিবার কি দরকার? ইহাতে প্রত্যেকেরই অবহিত থাকা কর্ত্তব্য।

স্বজাতি ভ্রাতৃবৃন্দ বোধ হয় খাপ্পা হইয়া উঠিবেন,

কিন্তু একথা অতি সত্য যে, এখন গোঁড়ামি করিবার সময় অতীত হইয়াছে। যাহাদিগকে লইয়া আমাদের অস্তিত্ব, সেই অস্পৃশ্য জাতি ও নারীকেই যদি আমরা কুসংস্কারের বশীভূত হইয়া দূর করিয়া দি তাহা হইলে হিন্দু জাতির অস্তিত্ব শ্রীহট্টের বক্ষ হইতে একেবারেই মুছিয়া যাইবে। আমরা মুসলমান সমাজকে যতই অপরাধী ভাবি না কেন, তাহাদের অপরাধ অপেক্ষা আমাদের অপরাধ সবদিকেই বেশী। হিন্দুসমাজ যাহাদের উপর সামাজিক ও পারিবারিক অত্যাচার করে, তাহাদিগকে যদি মুসলমান সমাজ আশ্রয় না দেয়, তাহা হইলে তাহাদের আশ্রয় প্রকাশ্য বাজার ছাড়া আর কোথাও থাকে না।

সামাজিক ও পারিবারিক অত্যাচারের ফলে কত সহস্র নারী বারাঙ্গনারূপে নারীত্বের মর্য্যাদা হিন্দু নামেই রক্ষা করিতেছে, তাহা একবার সমাজপতিগণ গবর্ণমেণ্টের ডায়েরীতে খুঁজিবেন।

যাহা হউক আমাদের শেষ অনুরোধ এই যে, সামাজিক ও পারিবারিক অত্যাচার যাহাতে নিরোধ হয় তৎপ্রতি সকলেই মনোযোগী হউন। ধর্ষিতাদিগকে সমাজ যাহাতে পরিত্যাগ না করেন সে-বিষয়ে প্রবল অন্দোলন করা দরকার। শুদ্ধি, সংগঠন ও সমাজসংস্কার ব্যতীত আমাদের উন্নতি অসম্ভব। আমরা এ-বিষয়ে শ্রীহট্টের প্রত্যেক ব্যক্তিরই দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

ঘ্যাঁট্

শ্রীসুধীন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী

উপবাসী মন খাই খাই করে,
পোলাও কালিয়া নাই---
বুভুক্ষুদের ভুখ্ মিটাইতে
ঘ্যাঁট্ আনিয়াছি তাই।
যাদের সাবেকী বাবুয়ানী রুচি
শ্রীঘরে এসেও যায় নাই ঘুচি,
তাঁহাদের মুখে রুচিবে কি ঘ্যাঁট্
আশঙ্কা সেইটাই।

জিহ্বা যাদের পেট হ'তে বড়,
আপাতত তারা দূরে সরে পড়,
এখানে ভিড়িও কেবল যখন
খিদে করে চাই চাই।
আলু ও কুমড়া, তাহার ওপর
থোড় বড়ি নহে—খাড়া বড়জোর,
আর মাঝে মাঝে কাঁচা কদলীটা
এই নিয়ে রাঁধি ঘ্যাঁট্।

'সার্চ্চ' কর যদি 'টার্চ্চ' পেতে পার,
ভিটামিন? পাবে সন্ধান তারও,
মিলিবে না ভাই যত খুঁজে মর
'প্রোটীন' কিম্বা 'ফ্যাট্'।
এ ঘ্যাঁট রাঁধেনি কোন ব্রাহ্মণ
উড়ে বংশজাত,
নাহি কেরামতি কলিমদ্দীর—
বাবুর্চ্চি বিখ্যাত।
ললিত হস্তে বাজায়ে কাঁকন
কেহ রাঁধে নাই এই ব্যঞ্জন,
তাই কারো কারো রসনায় ঘ্যাঁট্
লাগে বিস্বাদ এত।

এ ঘ্যাঁট্ রেঁধেছি আমরা ক'জন
স্বরাজী কালুতু মিলি,
ডাবু ভ'রে ভ'রে করিব 'রিপিট্',
যত পার লহ গিলি।
নাক উচাইয়া যে রহিবে দূরে
বুঝিব সে বেয়াকুব,
গারদে বসিয়া এই যে পেতেছ
সেইটাই জেনো খুব।

'নার্সে'র হাতে যেথা চুড়ি নাই,
যত 'সিস্টার' সবি দেখি ভাই,
রোগা দেহে যদি সে দাগা সয়েছ
অতএব রহ চুপ।
এখানে করো না মিছে ক্যাঁট্ ক্যাঁট্,
চেটেপুটে খাও রেধেছি যে ঘ্যাঁট্,
জাত যদি যায়—খালাসের পরে
গঙ্গায় দিও ডুব।

দমদম স্পেশাল জেল]

পুস্তক পরিচয়

রণ-ডঙ্কা (দ্বিতীয় সংস্করণ)—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক—এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স, লিঃ, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। দাম দশ আনা।

পুস্তকখানি শিশুদের জন্য লিখিত। ইহাতে বড় ও ছোট চারটি গল্প আছে। গল্পগুলির ভিত্তি ঐতিহাসিক সত্য এবং সবগুলিই মোগল যুগের। কিন্তু ভাষা ও বর্ণনাগুণে মধ্যকার ঘটনা, চরিত্র ও ক্ষেত্র কালের ব্যবধান সরাইয়া চোখের সামনে রূপ ধরিয়া দাঁড়ায়। তাহাদের ঘোর রণ-ডঙ্কা নিনাদই কানে বাজে না, রণাঙ্গনে নিষ্কাশিত অসি হাতে অতীতের সেই বীর যোদ্ধাগুলির মহত্ত্ব, ত্যাগ, প্রগাঢ় ভক্তি, বিপদে স্থৈর্য্যও প্রাণকে গভীরভাবে স্পর্শ করে। পুস্তকখানি আমাদের শিশু-সাহিত্যের একটি সম্পদ।

প্রত্যেক গল্পের গোড়ায় মধ্যকার বিষয়কে আশ্রয় করিয়া একখানি সুন্দর রেখা-চিত্র আছে। মোটা মলাটের উপরের রঙীন ছবিখানিও নামের অনুরূপ। ছাপা ও কাগজ ভাল।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

গল্পমাল্য—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ। প্রকাশক—শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ, ডায়মণ্ড হারবার। মূল্য দেড় টাকা। কাপড়ে বাঁধা। পৃঃ ২০৮।

প্রবীণ লেখকের কয়েকটি ভাল গল্প নানা মাসিকের পাতায় পড়িয়া ছিল; বহুদিন পরে সেগুলি পুস্তকাকারে পাইয়া রসিক পাঠক তৃপ্ত হইবেন। লঘু হাস্যপরিহাসের মধ্য দিয়া সরস চিত্র ফুটাইয়া তুলিয়া লেখক প্রচুর ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন, বিশেষতঃ যে-সব জায়গায় সরকারের প্রসাদপুষ্ট চাকুরিয়া শ্রেণীর জীবগুলির কথা আসিয়া পড়িয়াছে। আলোচ্য বইখানির মধ্যে 'সখীর বিপত্তি' 'প্রতিশ্রুতি পূরণ' 'সবজজ' ও ইন্দুর' 'ডেপুটী ও বাঁদর' প্রভৃতি গল্পগুলি চমৎকার উপভোগ্য হইয়াছে। 'সাহিত্যের মানহানি মামলা' পুস্তকের মধ্যে না থাকিলে ভাল হইত, কারণ সাময়িক ও ব্যক্তিগত বিরোধের ব্যাপার থাকায় লেখাটি রসোত্তীর্ণ হইতে পারে নাই।

পরিণাম—শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস, ৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা। পৃঃ ২১৩।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাঘটিত উপন্যাস। বিষয়টি সময়োপযোগী এবং লেখক এ সম্বন্ধে চিন্তাও করিয়াছেন, কিন্তু উপন্যাস হিসাবে বইখানি ভাল হয় নাই। মুখবন্ধে লেখক বলিয়াছেন—"এখানি গল্পেরই বই, প্রত্যক্ষভাবে কোনও উপদেশ দিবার উদ্দেশ্যে লিখিত নয়।" লেখকের হয়ত ইচ্ছা ছিল এইরূপ, কিন্তু ঘটিয়া গিয়াছে সম্পূর্ণ বিপরীত। 'রামসেবক' নামক বন্ধু চরিত্রের আমদানী কেবল সুরেন্দ্রনাথের সহিত তর্ক করিবার জন্য, তা ছাড়া উপন্যাসে ঐ প্রাণীটির অপর কোন প্রয়োজন ছিল না। দুই বন্ধুতে পাতার পর পাতা তর্ক চালাইয়াছে, তাহার যেন আদি-অন্ত নাই। আবার তর্ক ছাড়িয়া লেখক যেখানে নিছক গল্প বলিতে সুরু করিয়াছেন সেখানে ঘটনার গতি এমন দ্রুত যে, অনেকটা অস্বাভাবিকত্বের কোঠায় গিয়া পৌঁছিয়াছে। চরিত্রগুলিও কতক হইয়াছে একেবারে দেবতা, কতক নরকের কীট।

ইন্দ্রাণী—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস, ৬১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা। পৃঃ ২০৩।

বইখানা উপন্যাস। ঘটনাবাহুল্য নাই, কিন্তু ঘটনাটুকুর পরিণতি এমন সহজ, মনোবিশ্লেষণ ও বর্ণনাভঙ্গী এমন সরস ও সুন্দর যে স্বচ্ছন্দে এক নিঃশ্বাসে পড়িয়া ফেলা যায়। ভাষা লেখকের হাতে চমৎকার নমনীয় হইয়া পড়িয়াছে। যে-সব কারণে অচিন্ত্যবাবুর নিন্দা, তাহার সামান্যতম পরিচয়ও বইখানিতে নাই।

পাষাণপুরী—শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। আর্য্য পাবলিশিং কোং, ২৬ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃঃ ১৩৮। দাম দেড় টাকা।

পাষাণপুরী হইতেছে জেলখানা। অপরাধীকে জেলে পুরিয়া তাহার পাপের কালিমা মুছিতেছে না বরঞ্চ তাহার আত্মা দিনে দিনে নিষ্পিষ্ট হইয়া মরিয়া যায়—অজস্র চরিত্র-চিত্রের মধ্যে এই কথাটাই প্রকট হইয়া পড়িতেছে। বইটির কোন নির্দ্দিষ্ট প্লট নাই, অনেক মানুষ আসিয়া জমিয়াছে, অথচ প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র—কোথাও পড়িতে পড়িতে একঘেয়ে লাগে না। জায়গায় জায়গায় ভাবাতিশয্যে কিছু রসভঙ্গ হইয়াছে, তবু লেখকের কৃতিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। দু-চারিটা ভুল থাকিলেও মোটের উপর ছাপা ভাল।

শ্রীমনোজ বসু

সরল রামায়ণ—শ্রীমুকুন্দবিহারী চক্রবর্ত্তী, বি-এ। মূল্য ছয় আনা মাত্র।

বর্ণজ্ঞানবিশিষ্ট শিশুগণ যাহাতে রামায়ণের প্রসিদ্ধ কাহিনীর মর্ম্ম অবগত হইতে পারে সেই উদ্দেশ্যে সরল বাঙ্গালা পদ্যে এই পুস্তক রচিত হইয়াছে। এই পুস্তকের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে লক্ষ্মণ শব্দ ব্যতীত অন্যত্র সংযুক্তবর্ণ ব্যবহৃত হয় নাই। পুস্তকখানিকে সরল সুবোধ্য করিবার জন্যই এইরূপ করা হইয়াছে। ফলে সংযুক্ত বর্ণযুক্ত সংজ্ঞাশব্দগুলি বিচ্ছিন্ন শব্দের সাহায্যে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তাই কৌশল্যাকে আমরা কোশলতনয়ারূপে দেখিতে পাই; শত্রুঘ্ন এই পুস্তকে 'লক্ষ্মণানুজ' 'সুগ্রীব বানর পতির ভাই' প্রভৃতি নানা আকার ধারণ করিয়াছেন। গ্রন্থের উদ্দেশ্য সুষ্ঠু সন্দেহ নাই; তবে সংস্কৃত শব্দের বহুল প্রয়োগের ফলে শিশুগণের পক্ষে অন্যের সাহায্য ব্যতীত সর্ব্বত্র অর্থগ্রহণ করা সম্ভবপর হইবে কি না বলা যায় না।

বালরামায়ণ—মূল্য সাত আনা।

বালমহাভারত—মূল্য আট আনা।

এই দুইখানি পুস্তকের রচয়িতা শ্রীবিনোদলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। পূর্ব্ব সমালোচিত সরলরামায়ণের ন্যায় এই দুইখানি পুস্তকও শিশুদিগের উদ্দেশ্যেই লিখিত। পুস্তকের নামই ইহাদের বর্ণনীয় বিষয়ের পরিচয় দেয়। এ দুইখানি পুস্তকে সংযুক্তবর্ণ ব্যবহৃত হইলেও সংযুক্তবর্ণহীন সরল রামায়ণ অপেক্ষা ইহারা অপেক্ষাকৃত সরল ও সুবোধ্য হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। তবে রামায়ণ ও মহাভারত বিষয়ক একাধিক পুস্তক

বাজারে প্রচলিত রহিয়াছে; সেগুলি গদ্যে রচিত এবং এগুলি অপেক্ষা সরল ও সুবোধ্য।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

কৃষি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা—বাংলা সরকারের পাব্লিসিটি বিভাগ হইতে প্রকাশিত ও বিনামূল্যে বিতরিত। ৬৪,০০০ কপি ছাপা হইয়াছে। ৪৬ পৃষ্ঠাব্যাপী পুস্তিকাখানি সুখপাঠ্য ও নানা জ্ঞাতব্য তথ্যে পরিপূর্ণ। কিন্তু দুই-এক স্থানে অল্পাধিক ভ্রম দেখিতে পাওয়া যায়, যেমন ১৯৩০ সালে বাংলায় "ষণ্ডের সংখ্যা প্রায় ১০লক্ষ"। সরকার হইতে প্রকাশিত Agricultural Statistics of Bengal for 1929-30-এর ১৪-১৫ পৃষ্ঠার অঙ্কগুলি যোগ দিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বাংলায় ষণ্ডের সংখ্যা ১১ লক্ষ ৫৪ হাজার ৫৮৬, আর এই সংখ্যা "ascertained by a census held in 1930."

পুস্তিকাখানি সরকারী পাব্লিসিটি বিভাগ হইতে প্রকাশিত সুতরাং সরকারের কৃতিত্ব দেখাইতে ব্যস্ত; জনসাধারণের উপকার হয় কি না সেদিকে লক্ষ্য নাই। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, পশুখাদ্য হিসাবে "নেপিয়ার ঘাসই সর্ব্বোৎকৃষ্ট"। "সরকারের কৃষিক্ষেত্রসমূহে নেপিয়ার ঘাসের ডাঁটা গিনি ঘাসের মূল এবং জোয়ার ভুট্টা ও কলাইয়ের বীজ পাওয়া যায়, লোক তাহা লইয়া চাষ করিতে পারে।" বেশ! লোকে সরকারী কৃষিক্ষেত্র হইতে লইয়া যাইতে পারে, কিন্তু কতিপয় নিঃস্বার্থ ভদ্রমহোদয় তাঁহাদের জন্ত কৃষিক্ষেত্র হইতে বিনামূল্যে যে নেপিয়ার ঘাস বিতরণ করেন তাহার কথা উল্লেখ করিলে কি দোষের হইত? সরকারী রিপোর্টে তাঁহাদের প্রশংসা বাহির হয়; কিন্তু লোকহিতার্থ পুস্তিকায় তাঁহাদের নামধাম দিলে কি সরকারের মানের লাঘব হইত? আমরা জানি, সুখচর উদ্যান-কৃষি-সমিতির ক্ষেত্র হইতে রায় বাহাদুর গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিনামূল্যে নেপিয়ার ঘাসের ডাঁটা বিতরণ করেন।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

বাংলার নচিকেতা—গল্পদাদা রচিত। কোন এক ভাগ্যবতী জননীর অঞ্চলে স্বর্গের একটি ফুল ঝরিয়া পড়িয়াছিল। স্বর্গের সুরভি ছড়াইতে যখন সে ধীরে ধীরে পাপড়ি মেলিতেছিল, তখন হঠাৎ তাহার ডাক পড়িল। তার ক্ষুদ্র জীবনের মনোরম ছবি বেতারের গল্পদাদা আঁকিয়াছেন। যে পড়িবে তাহারই চোখে জল আসিবে।

বন্দীর বাঁশী—বেনজীর আহমদ রচিত কবিতার বই। "জাগো ওরে জাগো মোর প্রাণ," "এ মোর পুরস্কার" প্রভৃতি ছয়টি কবিতা আছে। কবিতাগুলি সুন্দর ও সুখপাঠ্য।

চন্দ্রেশ্বরানন্দ

ভারতের ধর্ম্মের ধারা—শ্রীরাধারমণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত। মূল্য বার আনা।

ক্ষুদ্র বই, ৯৩ পৃষ্ঠা। আলোচনা আছে বহু বিষয়ের, বিশেষতঃ "হিন্দু, জৈন বৌদ্ধ ও ব্রাহ্ম এই চারিটি হইল প্রধান ধারা।" আমরা মোটের উপর পুস্তকখানির প্রশংসা করি। গ্রন্থকার গোলে হরিবোল না দিয়া স্বাধীনভাবে মত প্রচারে সমর্থ। তিনি উদারভাবেই বিষয়-সমূহের বিচার করিয়াছেন। গ্রন্থকার যে ভারতের অবনতির মূল কারণটি নির্দ্দেশ করিয়াছেন সেইজন্ত আমরা তাঁহাকে ধন্তবাদ দিতেছি। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন, সংসারটাকে মায়া বলিয়া উড়াইয়া দিয়া চিরমুক্তির পথ খুঁজিতে গিয়াই "লোকে ঐহিক কর্ম্মে বিরত ও সংসারে বিরাগী হইয়া পড়িল।" বৌদ্ধধর্ম্ম, শঙ্করের মায়াবাদ এবং বৈষ্ণব ধর্ম্ম সকলেরই ঐ এক পরিণতি। "কাজেই আসিল দাসত্বশৃঙ্খল, প্রশস্ত হইল অবনতির পথ, ধর্ম্ম গেল পর্দ্দার আড়ালে আর ব্যবহারনীতি পর্য্যবসিত হইল উচ্ছৃঙ্খলতায় (পৃঃ ৯২)। গ্রন্থকার ব্রাহ্মধর্ম্মের আলোচনা অত্যন্ত সংক্ষেপে করিয়াছেন। তিনি যদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সবিশেষ আলোচনা করিতেন তাহা হইলে তিনি যে 'ধর্ম্মমতের সমন্বয়ে এক নূতন ধর্ম্মের প্রচার" আকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন, "যে ধর্ম্ম সমস্ত ভারতবাসীকে আকর্ষণ করিয়া উন্নতির পথে লইয়া যাইতে পারে" (পৃঃ ৯৩) তাহার সমস্ত মালমসলা ঐখানেই পাইতেন। তিনি হিন্দুধর্ম্মের অবনতির কারণটি নির্দ্দেশ করিয়া স্পষ্টই বলিয়াছেন, "হিন্দু সমাজের অবনতির গতিরোধকল্পে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এক প্রাতঃস্মরণীয় হিন্দুসংস্কারক জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্বর্গীয় রামমোহন রায়" (পৃঃ ৮৮)। গ্রন্থকার বুঝিয়াছেন সংসারবিরাগেই হিন্দুর সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে। গ্রন্থকার যে বলিয়াছেন রামমোহন জাতিভেদ প্রথার বিরোধী ছিলেন না, এটা তাঁর ভ্রান্তি। সে-বিষয়ের সবিশেষ আলোচনার স্থান ইহা নহে।

ঐতিহাসিক ভ্রান্তি পুস্তকের মধ্যে স্থানে স্থানে আছে। ঐতিহাসিক সমালোচনার সঙ্গে গ্রন্থকারের খুব বেশী পরিচয় নাই। তাই বুদ্ধদেবের সম্বন্ধে মামুলি ভ্রান্তি তাঁহার হইয়াছে। বৈদিক দেবতাদের রূপক বর্ণনাকে যে তিনি রূপবর্ণনা বা মূর্ত্তিবর্ণনা বলিয়াছেন, তাও একটা মস্ত ভ্রান্তি। যা হোক, আমরা সকলকে এই গ্রন্থখানি মনোযোগের সঙ্গে আদ্যোপান্ত পাঠ করিতে অনুরোধ করি—পাঠক বিশেষ উপকৃত হইবেন।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বেদান্তবাগীশ

কষ্টিপাথর

কালান্তর

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

...ইংরেজের আগমন ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক বিচিত্র ব্যাপার। মানুষ হিসাবে তারা রইল মুসলমানদের চেয়েও আমাদের কাছ থেকে অনেক দূরে—কিন্তু য়ুরোপের চিত্তদূতরূপে ইংরেজ এত ব্যাপক ও গভীর ভাবে আমাদের কাছে এসেছে যে আর কোনো বিদেশী জাত কোনোদিন এমন ক'রে আসতে পারেনি। য়ুরোপীয় চিত্তের জঙ্গমশক্তি আমাদের স্থাবর মনের উপর আঘাত করল, যেমন দূর আকাশ থেকে আঘাত করে বৃষ্টিধারা মাটির পরে; ভূমিতলের নিশ্চেষ্ট অন্তরের মধ্যে প্রবেশ ক'রে প্রাণের চেষ্টা সঞ্চার ক'রে দেয়, সেই চেষ্টা বিচিত্ররূপে অঙ্কুরিত বিকশিত হ'তে থাকে। এই চেষ্টা যে-ভূখণ্ডে একেবারে না ঘটে সেটা মরুভূমি, তার যে একান্ত অনন্যযোগিতা সে তো মৃত্যুর ধর্ম।...

যদিও আমাদের চারদিকে আজও পঞ্জিকার প্রাচীর খোলা আলোর প্রতি সন্দেহ উদ্যত করে আছে, তবু তার মধ্যে ফাঁক করে য়ুরোপের চিত্ত আমাদের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করেচে, আমাদের সামনে এনেচে জ্ঞানের বিশ্বরূপ মানুষের বুদ্ধির এমন একটা সর্ব্বব্যাপী ঔৎসুক্য আমাদের কাছে প্রকাশ করেচে, যা অহৈতুক আগ্রহে নিকটতম দূরতম অণুতম বৃহত্তম প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় সমস্তকেই সন্ধান সমস্তকেই অধিকার করতে চায়; এইটে দেখিয়েচে যে, জ্ঞানের রাজ্যে কোথাও ফাঁক নেই, সকল তথ্যই পরস্পর অচ্ছেদ্যসূত্রে গ্রথিত, চতুরানন বা পঞ্চাননের কোনো বিশেষ বাক্য বিশ্বের ক্ষুদ্রতম সাক্ষীর বিরুদ্ধে আপন অপ্রাকৃত প্রামাণিকতা দাবী করতে পারে না।

বিশ্বতত্ত্ব সম্বন্ধে যেমন, তেমনি চরিত্রনীতি সম্বন্ধেও। নতুন শাসনে যে-আইন এলো তার মধ্যে একটি বাণী আছে, সে হচ্ছে এই যে, ব্যক্তিভেদে অপরাধের ভেদ ঘটে না। ব্রাহ্মণই শূদ্রকে বধ করুক বা শূদ্রই ব্রাহ্মণকে বধ করুক, হত্যা-অপরাধের পংক্তি একই, তার শাসনও সমান,—কোনো মুনিঋষির অনুশাসন ন্যায়-অন্যায়ের কোনো বিশেষ সৃষ্টি প্রবর্ত্তন করতে পারে না।

সমাজে উচিত-অনুচিতের ওজন, শ্রেণীগত অধিকারের বাটখারাযোগে আপন নিত্য আদর্শের তারতম্য ঘটাতে পারবে না, এ-কথাটা এখনো আমরা সর্ব্বত্র অন্তরে অন্তরে মেনে নিতে পেরেচি তা নয়, তবু আমাদের চিন্তায় ও ব্যবহারে অনেকখানি বিপ্লব এনেচে সন্দেহ নেই। সমাজ যাদের অস্পৃশ্যশ্রেণীতে গণ্য করেচে তাদেরও আজ দেবালয়-প্রবেশে বাধা দেওয়া উচিত নয়, এই আলোচনাটা তার প্রমাণ। যদিও একদল লোক নিত্যধর্ম-নীতির উপর ভর না দিয়ে এর অনুকূলে শাস্ত্রের সমর্থন আওড়াচ্চেন, তবু সেই আপ্তবাক্যের ওকালতিটাই সম্পূর্ণ জোর পাচ্চে না। আসল এই কথাটাই দেশের সাধারণের মনে বাজচে যে, যেটা অন্যায় সেটা প্রথাগত, শাস্ত্রগত বা ব্যক্তিগত শাস্ত্রের জোরে শ্রেয় হতে পারে না, শঙ্করাচার্য্য উপাধিধারীর স্বরচিত মার্কা সত্ত্বেও সে শ্রদ্ধেয় নয়।

মুসলমান আমলের বাংলা সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টি করলে দেখা যায় যে, অবাধে অন্যায় করবার অধিকারই যে ঐশ্বর্য্যের লক্ষণ এই বিশ্বাসটা কলুষিত করেচে তখনকার দেবচরিত্রকল্পনাকে। তখনকার দিনে যেমন অত্যাচারের দ্বারা প্রবল ব্যক্তি আপন শাসন পাকা করে তুলত, তেমনি করে অন্যায়ের বিভীষিকায় দেবদেবীর প্রতিপত্তি আমরা কল্পনা করেচি। সেই নিষ্ঠুর বলের হার-জিতেই তাঁদের শ্রেষ্ঠতা অশ্রেষ্ঠতার প্রমাণ হোত। ধর্ম্মের নিয়ম মেনে চলবে সাধারণ মানুষ, সেই নিয়মকে লঙ্ঘন করবার দুর্দ্দাম অধিকার অসাধারণের। সন্ধিপত্রের সর্ত্ত অনুসারে আপনাকে সংযত করা আবশ্যক সত্যরক্ষা ও লোকস্থিতির খাতিরে কিন্তু প্রতাপের অভিমান তাকে স্ক্র্যাপ অফ পেপারের মতো ছিন্ন করবার স্পর্দ্ধা রাখে। নীতি-বন্ধন-অসহিষ্ণু অধর্ম্মসাহসিকতার ঔদ্ধত্যকে একদিন ঈশ্বরত্বের লক্ষণ বলে মানুষ স্বীকার করেচে। তখনকার দিনে প্রচলিত দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা, এই কথাটার অর্থ এই যে জগদীশ্বরের জগদীশ্বরতা তাঁর অপ্রতিহত শক্তির প্রমাণে, ন্যায়পরতার বিধানে নয়, সেই পন্থায় দিল্লীশ্বরও জগদীশ্বরের তুল্য খ্যাতির অধিকারী। তখন ব্রাহ্মণকে বলেচে ভূদেব, তার দেবত্বে মহত্ত্বের অপরিহার্য্য দায়িত্ব নেই, আছে অকারণ শ্রেষ্ঠতার নিরর্থক দাবী। এই অকারণ শ্রেষ্ঠতা ন্যায়-অন্যায়ের উপরে, তার প্রমাণ দেখি স্মৃতিশাস্ত্রে, শূদ্রের প্রতি অধর্ম্মাচরণ করবার অব্যাহত অধিকারে। ইংরেজ সাম্রাজ্য মোগল সাম্রাজ্যের চেয়েও প্রবল ও ব্যাপক সন্দেহ নেই, কিন্তু এমন কথা কোনো মূঢ়ের মুখ দিয়ে বেরোতে পারে না যে উইলিংডনো বা জগদীশ্বরো বা। তার কারণ আকাশ থেকে বোমাবর্ষণে শত্রুপল্লী-বিধ্বংসনের নির্ম্মম শক্তির দ্বারা ঈশ্বরত্বের আদর্শের তুল্যতা আজ কেউ পরিমাপ করে না। আজ আমরা মরতে মরতেও ইংরেজ শাসনের বিচার করতে পারি ন্যায়-অন্যায়ের আদর্শে, এ-কথা মনে করিনে, কোনো দোহাই পেড়ে শক্তিমানকে অসংযত শক্তি সংহরণ করতে বলা অশক্তের পক্ষে স্পর্দ্ধা। বস্তুত ন্যায়-আদর্শের সর্ব্বভূমিনতা স্বীকার ক'রে এক জায়গায় ইংরেজরাজের প্রভূত শক্তি আপনাকে অশক্তের সমানভূমিতেই দাঁড় করিয়েচে।

যখন প্রথম ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হোলো তখন শুধু যে তার থেকে আমরা অভিনব রস আহরণ করেছিলেম তা নয়, আমরা পেয়েছিলেম মানুষের প্রতি মানুষের অন্যায় দূর করবার আগ্রহ, শুনতে পেয়েছিলেম রাষ্ট্রনীতিতে মানুষের শৃঙ্খলমোচনের ঘোষণা, দেখছিলেম বাণিজ্যে মানুষকে পণ্যে পরিণত করার বিরুদ্ধে প্রয়াস। স্বীকার করতেই হবে আমাদের কাছে এই মনোভাবটা নূতন। তৎপূর্ব্বে আমরা মেনে নিয়েছিলুম যে জন্মগত নিত্য বিধানে বা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলে বিশেষ জাতের মানুষ আপন অধিকারের খর্ব্বতা আপন অসম্মান শিরোধার্য্য ক'রে নিতে বাধ্য, তার হীনতার লাঞ্ছনা কেবলমাত্র দৈবক্রমে ঘুচতে পারে জন্মপরিবর্ত্তনে। আজও আমাদের দেশে শিক্ষিতমণ্ডলীর মধ্যে বহুলোক রাষ্ট্রীয় অগৌরব দূর করার জন্যে আত্মচেষ্টা মানে, অথচ সমাজবিধির দ্বারা অধঃকৃতদেরকে ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে আত্মাবমাননা স্বীকার করতে বলে; এ-কথা ভুলে যায় যে ভাগ্যনির্দ্দিষ্ট বিধানকে নির্ব্বিরোধে মানবার মনোবৃত্তিই রাষ্ট্রিক পরাধীনতার শৃঙ্খলকে হাতে পায়ে এঁটে রাখবার কাজে সকলের চেয়ে প্রবলশক্তি। য়ুরোপের সংস্রব একদিকে আমাদের সামনে এনেচে বিশ্বপ্রকৃতিতে কার্য্যকারণবিধির সার্ব্বভৌমিকতা, আর একদিকে ন্যায়-অন্যায়ের সেই বিশুদ্ধ আদর্শ যা কোনো শাস্ত্রবাক্যের নির্দ্দেশে, কোনো চিরপ্রচলিত প্রথার সীমাবেষ্টনে

কোনো বিশেষ শ্রেণীর বিশেষ বিধিতে খণ্ডিত হোতে পারে না। আজ আমরা সকল দুর্ব্বলতা সত্বেও আমাদের রাষ্ট্রজাতিক অবস্থা পরিবর্ত্তনের জন্যে যে-কোনো চেষ্টা করচি, সে এই তত্ত্বের উপরে দাঁড়িয়ে, এবং যে সকল দাবী আমরা কোনোদিন মোগলসম্রাটের কাছে উত্থাপন করবার কল্পনাও মনে আনতে পারিনি, তাই নিয়ে প্রবল রাজশাসনের সঙ্গে উচ্চকণ্ঠে বিরোধ বাধিয়েছি এই তত্ত্বেরই জোরে যে-তত্ত্ব কবিবাক্যে প্রকাশ পেয়েচে— "A man is a man for a' that"।

আজ আমার বয়স সত্তর পেরিয়ে গেছে। বর্ত্তমান যুগে—অর্থাৎ যাকে ইউরোপীয় যুগ বলতেই হবে, সেই যুগে যখন প্রথম প্রবেশ করলুম সময়টা তখন আঠারো-শো খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি। এইটিকে ভিক্টোরীয় যুগ নাম দিয়ে এখনকার যুবকেরা হাসিহাসি ক'রে থাকে। য়ুরোপের যে-অংশের সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ, সেই ইংলণ্ড তখন ঐশ্বর্য্যের ও রাষ্ট্রীয় প্রতাপের উচ্চতম শিখরে অধিষ্ঠিত। অনন্তকালে কোনো ছিদ্র দিয়ে তার অন্নভাণ্ডারে যে অলক্ষ্মী প্রবেশ করতে পারে, এ-কথা কেউ সেদিন মনেও করেনি। প্রাচীন ইতিহাসে যাই ঘটে থাকুক, আধুনিক ইতিহাসে যারা পাশ্চাত্য সভ্যতার কর্ণধার তাদের সৌভাগ্য যে কোনোদিন পিছু হঠতে পারে, বাতাস বইতে পারে উল্‌টো দিকে, তার কোনো আশঙ্কা ও লক্ষণ কোথাও ছিল না। রিফর্মেশন্ যুগে, ফ্রেঞ্চ রেভোল্যুশন যুগে য়ুরোপ যে-মতস্বাতন্ত্র্যের জন্যে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের জন্যে লড়েছিল, সেদিন তার সেই আদর্শে বিশ্বাস ক্ষুণ্ণ হয়নি। সেদিন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ বেধে ছিল দাসপ্রথার বিরুদ্ধে। ম্যাট্‌সিনি-গারিবাল্ডির বাণীতে কীর্ত্তিতে সেই যুগ ছিল গৌরবান্বিত, সেদিন তুর্কির সুলতানের অত্যাচারকে নিন্দিত ক'রে মন্দ্রিত হয়েছিল গ্ল্যাড্‌ষ্টোনের বজ্রস্বর। আমরা সেদিন ভারতের স্বাধীনতার প্রত্যাশা মনে স্পষ্টভাবে লালন করতে আরম্ভ করেচি। সেই প্রত্যাশার মধ্যে একদিকে যেমন ছিল ইংরেজের প্রতি বিরুদ্ধতা, আর একদিকে ইংরেজচরিত্রের প্রতি অসাধারণ আস্থা। কেবলমাত্র মনুষ্যত্বের দোহাই দিয়ে ভারতের শাসনকর্ত্তৃত্বে ইংরেজের সরিক হতেও পারি এমন কথা মনে করা যে সম্ভব হয়েছিল—সেই জোর কোথা থেকে পেয়েছিলেম! কোন্ যুগ থেকে সহসা কোন্ যুগান্তরে এসেচি? মানুষের মূল্য, মানুষের শ্রদ্ধেয়তা হঠাৎ এত আশ্চর্য্য বড়ো হয়ে দেখা দিল কোন্ শিক্ষায়! অথচ আমাদের নিজের পরিবারে প্রতিবেশে, পাড়ায় সমাজে, মানুষের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য বা সম্মানের দাবী, শ্রেণীনির্ব্বিচারে ন্যায়সঙ্গত ব্যবহারের সমান অধিকারতত্ত্ব এখনো সম্পূর্ণরূপে আমাদের চরিত্রে প্রবেশ করতে পারেনি। তা হোক্, আচরণে পদে পদে প্রতিবাদসত্ত্বেও য়ুরোপের প্রভাব অল্পে অল্পে আমাদের মনে কাজ করচে। বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিসম্বন্ধেও ঠিক সেই একই কথা। পাঠশালার পথ দিয়ে বিজ্ঞান এসেচে আমাদের দ্বারে, কিন্তু ঘরের মধ্যে পাঁজিপুঁথি এখনো তার সম্পূর্ণ দখল ছাড়েনি। তবু য়ুরোপের বিদ্যা প্রতিবাদের মধ্য দিয়েও আমাদের মনের মধ্যে সম্মান পাচ্ছে।

তাই ভেবে দেখলে দেখা যাবে এই যুগ য়ুরোপের সঙ্গে আমাদের গভীর সহযোগিতারই যুগ। বস্তুত যেখানে তার সঙ্গে আমাদের চিত্তের, আমাদের শিক্ষার অসহযোগ সেইখানেই আমাদের পরাভব। এই সহযোগ সহজ হয়, যদি আমাদের শ্রদ্ধায় আঘাত না লাগে। পূর্ব্বেই বলেচি য়ুরোপের চরিত্রের প্রতি আস্থা নিয়েই আমাদের নবযুগের আরম্ভ হয়েছিল, দেখেছিলুম জ্ঞানের ক্ষেত্রে য়ুরোপ মানুষের মোহমুক্ত বুদ্ধিকে শ্রদ্ধা করেচে এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্বীকার করেচে তার ন্যায়সঙ্গত অধিকারকে। এতে ক'রেই সকল প্রকার অভাব-ত্রুটি সত্ত্বেও আমাদের আত্মসম্মানের পথ খুলে গিয়েচে। এই আত্মসম্মানের গৌরববোধেই আজ পর্য্যন্ত আমরা স্বজাতিসম্বন্ধে দুঃসাধ্যসাধনের আশা করচি, এবং প্রবল পক্ষকে বিচার করতে সাহস করচি সেই প্রবলপক্ষেরই বিচারের আদর্শ নিয়ে।...

ইতিমধ্যে ইতিহাস এগিয়ে চল্‌ল। বহুকালের স্তব্ধ এসিয়ায় দেখা দিল জাপানের উত্থান। পাশ্চাত্যেরই সংঘাতে সংস্রবে জাপান অতি অল্পকালের মধ্যেই বিশ্বজাতিসংঘের মধ্যে জয় ক'রে নিলে সম্মানের অধিকার; অর্থাৎ জাপান বর্ত্তমান কালের মধ্যেই বর্ত্তমান, অতীতে ছায়াচ্ছন্ন নয়, সেটা সম্যকরূপে প্রমাণ করল। দেখতে পেলেম প্রাচ্যজাতিরা নবযুগের দিকে যাত্রা করেচে। অনেকদিন আশা করেছিলুম, বিশ্বইতিহাসের সঙ্গে আমাদেরও সামঞ্জস্য হবে, আমাদেরও রাষ্ট্রজাতিক রথ চলবে সামনের দিকে, এবং এও মনে ছিল যে এই চলার পথে টান দেবে স্বয়ং ইংরেজও। অনেকদিন তাকিয়ে থেকে অবশেষে দেখলুম চাকা বন্ধ। আজ ইংরেজ শাসনের প্রধান গর্ব্ব ল এবং অর্ডর, বিধি এবং ব্যবস্থা নিয়ে। এই সুবৃহৎ দেশে শিক্ষার বিধান, স্বাস্থ্যের বিধান অতি অকিঞ্চিৎকর, দেশের লোকের দ্বারা নব নব পথে ধন উৎপাদনের সুযোগ সাধন কিছুই নেই। অদূর ভবিষ্যতে তার যে সম্ভাবনা আছে, তাও দেখতে পাইনে, কেননা দেশের সম্বল সমস্তই তলিয়ে গেল ল এবং অর্ডরের প্রকাণ্ড কবলের মধ্যে। য়ুরোপীয় নবযুগের শ্রেষ্ঠদানের থেকে ভারতবর্ষ বঞ্চিত হ'য়েচে য়ুরোপেরই সংস্রবে। নবযুগের সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যে কলঙ্কের মতো র'য়ে গেল ভারতবর্ষ।...

পরিচয়,—শ্রাবণ, ১৩৪০]

শালগ্রামবন্ধকের দলিল

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

পুরাণ বাঙ্গালায় এ পর্য্যন্ত নানারকম দলিল (আত্মবিক্রয়-পত্র, মনুষ্যবিক্রয়-পত্র প্রভৃতি) আবিষ্কৃত হইয়াছে। সম্প্রতি আমরা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত ৫২৬ সংখ্যক স্কন্দপুরাণের উৎকল-খণ্ডের একখানি পুথিতে এক নূতন রকমের দলিলের নকল পাইয়াছি।... দলিলের তারিখ ১০৯৬ বঙ্গাব্দ।

দলিলদাতা রামচন্দ্র শর্ম্মা, রামেশ্বর সেন মজুমদার মহাশয়ের নিকট পৈতৃক দুইটি শালগ্রামশিলা বন্ধক রাখিয়া দুইটি টাকা কর্জ্জ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে এ জন্য সুদ কিছু দিতে হয় নাই সত্য, তবে শালগ্রামসেবাজনিত পুণ্য সেন-মহাশয়েরই হইবে, এ-কথা লিখিয়া দিতে হইয়াছিল। বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাসের দিক্ হইতে ইহার মূল্য উপেক্ষণীয় নহে...।

নকল [।] ইয়াদি কীর্দ সকল মঙ্গলালয় শ্রীযুক্ত রামেশ্বর সেন মজুমদার চরিতেষু [।] শ্রীরামচন্দ্র শর্ম্মণাম্ পত্রমিদং [।] আগে আমার পিতামহ কামদেব চক্রবর্ত্তীর ২ দুই সালগ্রাম তুমার স্থানে বন্ধক রাখিয়া ২ দুই রূপৈয়া লইলাম [।] ঠাকুরসেবা করণে যে পুণ্য হএ সে তোমার [।] ওয়াদা জখন তুমী টাকা চাও তখন দিব [।] এই করারে টাকা না দি তবে এই পরে (?) ঠাকুর কুলারি (?) করিলাম [।] এমার একণে মাহিনার সহি আমার কীছু এলাকা নাই [।] আসল দুই তঙ্কা দিয়া ঠাকুর নেব [।] ইতি সন ১০৯৬ ছেয়ানর্ব্বই ১১ ভাদ্র।

শ্রীরামচন্দ্র শর্ম্মণাম্

ইসাদি	তারিক
শ্রীরামনাথ শর্ম্মা	ঠাকুর বনরঘুনাথ ঠাকুর ১
শ্রীরামকৃষ্ণ শর্ম্মা	রমন্ত ঠাকুর ১

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা,— প্রথম সংখ্যা, ১৩৪০]

আলোচনা

"বাঙ্গালা টাইপ ও কেস্"

'প্রবাসী' পত্রিকায় ১৩৩৯ সালের মাঘ সংখ্যায় শ্রীঅজয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের ধারাবাহিক "বাঙ্গালা টাইপ ও কেস" নামীয় প্রবন্ধের দ্বিতীয় ভাগে ৫১০ পৃষ্ঠায় কোন একটি ইংরেজী বর্ণের ধ্বনিতত্ত্ব সংক্রে সামান্ত লিখিত হইয়াছে।

প্রবন্ধলেখক স্ক, স্ন, স্ম প্রভৃতি বাঙ্গালা যুক্তাক্ষরগুলি শব্দের আদিতে বসিলে যে ভাবে উচ্চারিত হয়, তাহার সঙ্গে তুলনা করিয়া ইংরেজী 'snow'শব্দের জন্ত বাঙ্গালায় 'স্নো' লেখায়—উল্টা উৎপত্তি বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। তিনি নিজেই দেখাইয়াছেন বাঙ্গালার স্নান, স্নায়ু প্রভৃতি শব্দে "স্ন" আমাদের বিশুদ্ধ উচ্চারণ হয়; অথচ বিজ্ঞাপন প্ল্যাকার্ডে "মীরা স্নো"-এর পরিবর্ত্তে "মীরা-এস্‌নো" না দেখিতে পাওয়ায় প্রথমে তাহার এই শব্দটির অর্থাগম হয় নাই। ইংরেজী snow, snake, snail প্রভৃতি শব্দ বাঙ্গালায় স্নো, স্নেক, স্নেল (যদিও ইহাদের কোনটিও শুদ্ধ উচ্চারণ নয়; প্রকৃত শুদ্ধ উচ্চারণ—স্নোউ, স্নেইক, স্নেইল্—অবশ্য ইহার বিস্তৃত আলোচনা ছাড়া পরিষ্কারভাবে বোঝান যাইবে না) না লিখিয়া "এস্‌নো, এস্‌নেল, এস্‌নেক" লিখিতে হইবে বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি তাহার কারণ দেখাইয়াছেন, "ইংরেজী যে সকল শব্দের গোড়ায় এস্ (s) স্পষ্ট উচ্চারিত হয় এবং পরে এন্ (n) থাকে সেই সকল শব্দের প্রথম অক্ষরে স্ন-যুক্ত টাইপের পরিবর্ত্তে এস্ লিখিতেই হইবে,—গত্যন্তর নাই।" এছাড়া এও বলিয়াছেন যে, এস্ (s)-এর সঙ্গে এন্ (n) ব্যতীত অন্ত ধ্বনি বা বর্ণ যোগ হইলে লিখন বা উচ্চারণগত এরূপ বিড়ম্বনা ঘটিবে না—যেমন স্পেড, স্পাইডার, স্পেস্ (spade, spider, space) ইত্যাদি।

সরকার মহাশয় স্ক, স্ন, স্ম প্রভৃতির সঙ্গে snow-এ 'স্ন'-এ পার্থক্য কি ভাবে পাইলেন বুঝিতে পারিলাম না। তিনি যে বলিয়াছেন, ইংরেজী যে সকল শব্দের গোড়ায় এস্ (s) স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয় ও পরে এন্ (n) থাকে সেই 's'-এর উচ্চারণ 'স্' না হইয়া 'এস্' হইবে—তবে কি আমরা স্নান, স্নায়ু প্রভৃতির 'স্' স্পষ্ট করিয়া উচ্চারণ করি না? এস্ ইংরেজী 's' বর্ণটির নামমাত্র এবং তাহার ধ্বনি 'স্'। 's'-এর পরে 'n' থাকিলে এই 's'-এর উচ্চারণ 'স্' না হইয়া 'এস্' হইবে, এরূপ কোন কারণ ধ্বনিতত্ত্ব-বিজ্ঞান মতে দেখা যায় না। ইহার জন্ত ইংরেজী 's'-এর পরে 'n', অথবা শব্দের আদি মধ্য ও শেষ বলিয়া কোন বিশেষত্ব নাই। বিভিন্ন ভাষায় 'স্' ধ্বনি-নির্দ্দেশক বর্ণসমূহের রূপ ও নাম যেরূপই হউক না কেন মূলধ্বনি একই থাকে। শুধু তাহাই নয় সকল ভাষারই ব্যঞ্জনবর্ণসমূহ সাধারণতঃ হলন্ত হয়, সেজন্ত—বিশেষতঃ অস্বরান্ত (non-vocalized) ব্যঞ্জন বর্ণের পরে আর একটি স্বরবর্ণযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ থাকিলে প্রথম ব্যঞ্জনটি হলন্ত হইয়াই উচ্চারিত হইবে, এবং পর পর দুইটি ব্যঞ্জনবর্ণ যদি অস্বরান্ত থাকে ও তৃতীয়টি স্বর-যুক্ত হয় তাহা হইলে প্রথম দুইটির হলন্ত উচ্চারণ হইবে। যেমন—ইংরেজীতে expect (এক্সপেক্ট, এক্‌স্‌পেক্‌ট্), snow (স্নোউ—স্‌নোউ) হিন্দীতে নমস্তে (নমস্তে—নমস্‌তে), ভক্ত (ভক্ত—ভক্‌ত). উর্দ্দুতে রোশনাই, দোস্ত—দোস্‌ত ও বাঙ্গালায় স্নান (স্‌নান)। অবশ্য উচ্চের বিশেষত্বের জন্ত এই নিয়মের ব্যতিক্রম কোন কোন ক্ষেত্রে ঘটে, যথা—psychology (সাইকোলজি), psalm (সাম)।

এখন যদি কেহ কোন বিদেশীয় শব্দকে অশুদ্ধভাবে উচ্চারণ করিতে অভ্যস্ত হয় তাহা হইলে সেই অভ্যাসদোষ বা অজ্ঞানতার জন্ত অশুদ্ধ উচ্চারণ ও তদনুযায়ী লিখনকে বিশুদ্ধ বলিয়া মানিয়া লওয়া কোন মতেই উচিত নয় এবং তাহা নিজভাষার পক্ষেও বিশেষ অনিষ্টকর। সেজন্ত কোন কোন শিক্ষিত বাঙ্গালীর snow-কে এস্‌নো, station-কে এস্‌টেষন, stamp-কে এস্‌ট্যাম্প; পাঞ্জাবীর school-কে স (অঃ) কুল, road-কে রোড (অঃ);—মান্দ্রাজীর take-কে টেক (অঃ) প্রভৃতি বিকৃত উচ্চারণকে উচ্চারণ-প্রাদেশিকত্বের (provincialism in tongue or pronunciation) ভিতর ফেলিয়া ভাষায় প্রবেশ করিতে দেওয়া উচিত নয়।

সরকার মহাশয়ের প্রবন্ধের উদ্দেশ্য মহৎ। মুদ্রণকার্য্যের সুবিধা ও উন্নতির জন্ত এরূপ চেষ্টা বিশেষ প্রয়োজন ও প্রশংসনীয়।

শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য্য

সন্ধি-বিগ্রহ

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

ঘোড়সোয়ারের মত মোটা ডালের দু-পাশে পা ঝুলাইয়া বসিয়া নিতাইবাবু গভীর ভাবে চিন্তা করিতেছিলেন। ঝোঁকের মাথায় যা-হোক একটা কিছু করিয়া ফেলিবার বয়স আর তাঁহার নাই; প্রবীণ সেনাপতির মত সব দিক দেখিয়া-শুনিয়া অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া কাজ করিতে হইবে। কারণ, আজ ব্যাপারটা সত্যই অতিশয় ঘোরালো হইয়া উঠিয়াছে।

বহু নিম্নে বৃদ্ধ বটগাছের নিশ্ছিদ্র ছায়া মূলের চারি-পাশের স্থানটিকে অন্ধকার করিয়া রাখিয়াছে, গাছের ঝুরিগুলা সারি সারি দড়ির মত ঝুলিতেছে। বেলা মধ্যাহ্ন। নিতাই বাবু উদরের মধ্যে বৃশ্চিক দংশনের মত একটা জ্বালা অনুভব করিলেন, বুঝিলেন তাঁহার ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছে। তিনি কামিজের পকেট দুটা আর একবার ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কিছুই পাইলেন না। তুঁত ফল ও পেয়ারা যে ক'টা পকেটে ছিল তাহা বহু পূর্ব্বেই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। চিন্তিতভাবে নিতাইবাবু উপরের দিকে চোখ তুলিয়া চাহিলেন। এতক্ষণ একটা একটানা গুঞ্জনধ্বনি তাঁহার কর্ণে আসিতেছিল, কিন্তু মানসিক দুশ্চিন্তা হেতু তাহার কারণ তদারক করা হয় নাই। এখন দেখিলেন, তাঁহার মাথার প্রায় দশ-বার হাত উর্দ্ধে একটা মোটা ডাল হইতে প্রকাণ্ড অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি মৌমাছির চাক ঝুলিয়া আছে। নিতাইবাবু তাঁহার ক্ষুধার জ্বালা ও বর্ত্তমান সমস্যা ভুলিয়া কৌতূহলীভাবে কিছুক্ষণ মৌমাছিপূর্ণ চাকটার দিকে চাহিয়া রহিলেন, তারপর সন্তর্পণে দুটা ডাল নামিয়া বসিলেন। মৌচাকের সান্নিধ্য যে নিরাপদ নয় নিতাইবাবু তাহা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দ্বারা ভালরূপ জ্ঞাত ছিলেন।

অতঃপর শাখারূঢ় নিতাইবাবু আবার গালে হাত দিয়া ভাবিতে লাগিলেন। বটগাছের পাশ দিয়া পাকা রাস্তা গিয়াছে, রাস্তার ওপর পারে ঠিক বটগাছের সম্মুখেই প্রকাণ্ড হাতা-যুক্ত বাড়ির লোহার ফটক, ফটকের পাশে দরোয়ানের দেউড়ি। নিতাইবাবু যেখানে গাছের উচ্চশাখায় বসিয়া আছেন সেখান হইতে বাড়িখানা ও তাহার চতুষ্পার্শ্বের পাঁচিলঘেরা ভূভাগ পরিষ্কার দেখা যায়। এমন কি বাড়ি হইতে উঁচু গলায় কথা কহিলে শোনা পর্য্যন্ত যায়। বাড়ির মধ্যে কাহারা যাতায়াত করিতেছে তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিবারও কোন অসুবিধা নাই।

কিন্তু প্রধান অসুবিধা—নিতাইবাবুর পক্ষে—এই বাড়িতে প্রবেশ করা। প্রথমতঃ সদরে দরোয়ান আছে, সুতরাং সেদিক দিয়া প্রবেশ করা চলিবে না। পিছনের দেওয়াল ডিঙাইয়া বাগানে ঢোকা যাইতে পারে, কিন্তু তারপর? বাড়ির ভিতর মাথা গলাইবার উপায় কি? সেখানে বিন্দি আছে, দেখিলেই ধরাইয়া দিবে, দয়ামায়া করিবে না। তাছাড়া নিতাইবাবুর খুড়োমহাশয় স্বয়ং একটা চাবুক হাতে লইয়া বাড়িময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন এবং মাঝে মাঝে গর্জ্জন ছাড়িতেছেন। তাঁহার চক্ষুকে ফাঁকি দেওয়া সহজ হইবে না। অবশ্য, কোন রকমে একবার ঠাকুরমার কাছে গিয়া পৌছিতে পারিলে—

কিন্তু একটা কথা এইখানে বলিয়া রাখা দরকার,—নিতাই-বাবুর বয়ঃক্রম পূর্ণ নয় বৎসর।

অদ্য প্রাতঃকালে তিনি একটি গুরুতর দুষ্কার্য্য করিয়া বাড়ি হইতে প্রস্থান করিয়াছিলেন। কাল সন্ধ্যাবেলা জ্যেষ্ঠা ভগিনী একাদশবর্ষীয়া বিন্দুর সহিত তাঁহার ঝগড়া হইয়াছিল। ফলে চিরকাল যাহা হইয়া আসিয়াছে, বিন্দি কাকা ও বাবাকে সালিশ মানিয়া মোকদ্দমা জিতিয়া গেল। ক্রুদ্ধ নিতাইবাবু তখন চুপ করিয়া রহিলেন, কিন্তু আজ সকালে শয্যা হইতে উঠিয়াই সে-পরাজয়ের ভীষণ প্রতিশোধ লইলেন। নিতাইবাবু বিন্দির সহিত একশয্যায় শয়ন করিতেন। প্রভাতে বিন্দি ঘুম ভাঙিয়া দেখিল তাহার মাথায় খোঁপা নাই। বিহ্বলভাবে এদিক-ওদিক

তাহিতে দৃষ্টি পড়িল খোঁপাটি অবিকৃত অবস্থায় সম্মুখের দেয়ালে ঘুঁটের মত আটকাইয়া রহিয়াছে।

নিতাইবাবু নিজের কার্য্যের ফলাফল জানিবার জন্য আনাচে-কানাচে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন, বিন্দির চিল-চীৎকার কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র তিনি বুঝিলেন কাজটা ভাল হয় নাই, একটু বাড়াবাড়ি হইয়া গিয়াছে। তিনি নিঃশব্দে গৃহত্যাগ করিলেন।

তারপর পাড়ায় এদিক-ওদিক বেড়াইয়া, অনেক প্রতিবেশীর বাগান হইতে কিছু তুঁত ও পেয়ারা সংগ্রহ করিয়া বেলা দশটা আন্দাজ যখন দেখিলেন যে বাড়ির চাকর-বাকর তাঁহাকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছে তখন তিনি গোপনে এই বটগাছের শাখায় আশ্রয় লইয়াছেন এবং নিজে অলক্ষ্যে থাকিয়া প্রতিপক্ষের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন।

কিন্তু বিপদের কথা এই যে, রসদ একেবারে ফুরাইয়া গিয়াছে। খালি পেটে যুদ্ধ কতক্ষণ সম্ভব? নিতাইবাবু কল্পনার চক্ষে দেখিতে পাইলেন এই সময় কি কি খাদ্য বাড়িতে তৈয়ার হইয়াছে; তাঁহার মুখ লালসার প্রাবল্যে দীর্ঘভাব ধারণ করিল। কিন্তু তিনি কোমরের কসি শক্ত করিয়া বাঁধিয়া পা দুলাইতে লাগিলেন। কারণ, কল্পনার চক্ষে ভোজ্য বস্তুর সঙ্গে সঙ্গে আর একটি জিনিষ তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন—সেটি কাকার হাতের লিকলিকে সরু চাবুকটি।

অবশ্য প্রহার বস্তুটি নিতাইবাবুব জীবনে নূতন নয়। সামান্য কিলটা চড়টার কথা ছাড়িয়া দিই, সে ত নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা, কিন্তু যাহাকে 'সাতচোরের মার' বলে সেইরূপ দুর্জ্জয় প্রহারও তাঁহার ভাগ্যে বিরল নয়—প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। বাড়ির লোকের কেমন একটা অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, পাড়ায় চতুঃসীমায় কোথাও কোন দুর্ঘটনা ঘটিলেই সকলের সন্দেহ নিতাইবাবুর উপর আসিয়া পড়ে এবং সন্দেহটা যথার্থ, কি অলীক তাহা নিরাকরণ হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার পৃষ্ঠে ও মস্তকে নানাপ্রকার অপ্রীতিকর বস্তু বর্ষিত হইতে থাকে। এই ত সেদিন, নিতান্ত অকারণেই নিতাইবাবুকে অশেষ লাঞ্ছনা নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছে।

এ ব্যাপারে তাঁহার বিন্দুমাত্র দোষ ছিল না; এমন কি, কেমন করিয়া কি হইল, সে-বিষয়ে একটা ধোঁকার ভাব তাহার মনে রহিয়া গিয়াছিল। বিন্দু ছাতের উপর খেলাঘর পাতিয়াছিল, সেদিন তাহার খেলাঘরে চড়ুইভাতি ছিল। বিন্দু ব্যস্তসমস্তভাবে রান্নার যোগাড় করিতে করিতে গলার হারছড়া ছাতে ফেলিয়াই নীচে নামিয়া গিয়াছিল। এই সুযোগে নিতাইবাবু নেহাৎ পরিহাসচ্ছলেই হারটা গুড়ের বাটিতে ডুবাইয়া আবার যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহার মনে কোন দুরভিসন্ধি ছিল না; কেবল ইহাই উদ্দেশ্য ছিল যে, গুড়ের লোভে হারে পিঁপড়া লাগিবে এবং তারপর বিন্দু যখন না দেখিয়া আবার সেটা গলায় দিবে তখন একটা বিশেষ উপভোগ্য অভিনয় ঘটিয়া যাইবে।

অভিনয় কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত রকমের হইল। কিয়ৎকাল পরে বিন্দু চীৎকার করিতে করিতে নামিয়া আসিয়া খবর দিল যে, নিতাই তাহার হার লইয়া পলাইয়াছে। নিতাইবাবুকে ধরিয়া আনা হইল, কিন্তু তিনি সবেগে মাথা নাড়িয়া অভিযোগ অস্বীকার করিলেন। গুড়-মাখানোর কথাটাও অবস্থাগতিক দেখিয়া চাপিয়া যাইতে হইল। কিন্তু তাঁহার কথা কেহই বিশ্বাস করিল না। কাকা কর্ণে একটি প্যাঁচ দিয়া বলিলেন, 'কোথায় রেখেছিস নিয়ে আয়, তাহলে কিছু বল্‌ব না।'

কিন্তু যে-জিনিষের সন্ধান জানা নাই তাহা কি করিয়া আনা যাইতে পারে। নিতাইবাবু হার আনিতে পারিলেন না। কান্নাটি চড়ে উঠিল। তথাপি হার বাহির হইল না। তখন কাকা বেত আনিয়া নিতাইবাবুর পৃষ্ঠ ও নিকটবর্ত্তী আর একটা স্থান রক্তবর্ণ করিয়া দিলেন। নিতাইবাবুর মনে হইতে লাগিল যে, ইন্দ্রজাল-প্রভাবে যদি একটা সোনার হার তৈয়ার করিয়া আনিয়া দিতে পারিতেন তাহা হইলে দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহাই করিতেন। কিন্তু ভোজবিদ্যার পারদর্শিতা না থাকায় তাঁহাকে কেবল পড়িয়া-পড়িয়া মার খাইতে হইল।

কাকা অবশেষে ক্লান্ত হইয়া ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন,—বড় হয়ে এটা দাগী চোর হবে—একেবারে ফি্‌স্ট ক্লাস! নিয়ে যা ওকে আমার সামুখ থেকে।

ইহা দশ-বার দিন আগের ঘটনা। তারপর বিন্দু তাঁহাকে অনেক খোসামদ করিয়াছে, কিন্তু অত যার

খাইবার পর যে সকল নষ্টের গোড়া তাহার সহিত এক কথায় সদ্ভাব স্থাপন করা চলে না; নিতাইবাবু গর্ব্বিত ভাবে বিন্দুর সন্ধির প্রয়াস প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন এবং হার সম্বন্ধে একটা গভীর রহস্যময় নীরবতা অবলম্বন করিতেছেন। ইহার কয়েক দিন পরেই সামান্য বিষয় লইয়া কাল রাত্রে আবার বিন্দুর সহিত ঝগড়া বাধিয়া গেল। নিতাইবাবু তাঁহার সঞ্চিত ক্রোধ ও প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিয়া কাঁচির সাহায্যে বিন্দুর খোঁপা নির্ম্মূল করিয়া দিলেন।

গাছের ডালে ঠেসান দিয়া বসিয়া পা দুলাইতে দুলাইতে বিন্দুর লুপ্তবেণী মস্তকটির কথা স্মরণ হইতেই নিতাইবাবুর শুষ্ক মুখে একটু হাসি দেখা দিল। আর যাহাই হোক, বিন্দুকে দস্তরমত জব্দ করা হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এখন অন্ততঃ ছয় মাসের জন্য নিশ্চিন্ত—বিন্দু খোঁপা বাঁধিতে পারিবে না। নাঃ—বেড়া বিনুনিও নয়। খোঁপার জায়গাটায় মাংস বাহির হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু এই আনন্দ অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না, জঠরের বৃশ্চিকদংশন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। নিতাই-বাবু ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। একটা কাঠবিড়ালী অনেকক্ষণ হইতে পাশের একটা ডাল দিয়া ওঠানামা করিতেছিল, চোখে পড়িলেও নিতাই বাবু ভাল করিয়া লক্ষ্য করেন নাই। কাঠবিড়ালীটা দ্রুতপদে যাতায়াত করিতে করিতে তাঁহার কাছাকাছি আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িতেছিল, কালো কালো পেঁপের বিচির মত চোখ দিয়া তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া কিচিমিচি শব্দে মন্তব্য প্রকাশ করিতে করিতে চলিয়া যাইতেছিল। নিতাইবাবু এখন তাহার গতিবিধি চক্ষু দ্বারা অনুসরণ করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন, কাঠবিড়ালী প্রত্যেক বার নীচে হইতে উপরে আসিবার সময় একটি ছোট্ট ফল মুখে করিয়া আনিতেছে এবং সেটিকে একটি কোটরের মধ্যে রাখিয়া আবার ফিরিয়া যাইতেছে।

ক্ষুধার সহিত কৌতূহল যোগ দিয়া নিতাইবাবুকে স্থির থাকিতে দিল না। তিনি ধীরে ধীরে নিজের শাখা হইতে নামিয়া আসিয়া যে-শাখায় কাঠবিড়ালীর কোটর ছিল সেই শাখায় উঠিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি কোটরের কাছাকাছি পৌঁছিতে না পৌঁছিতে কাঠবিড়ালী তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া উত্তেজিত ভাবে কিচিমিচি করিয়া উঠিল; নিতাইবাবু তবু উঠিতে লাগিলেন। কাঠবিড়ালী তখন বেগতিক দেখিয়া কোটর ছাড়িয়া পলায়ন করিল এবং বহু উর্দ্ধে একটা সরু ডালে বসিয়া অবিশ্রাম নিতাইবাবুকে গালাগালি দিতে লাগিল।

নিতাইবাবু তাহার সমস্ত তিরস্কার অগ্রাহ্য করিয়া কোটরের সম্মুখে শাখার দুই দিকে পা ঝুলাইয়া বসিলেন, কোটরে উঁকি মারিয়া দেখিলেন অন্ধকার, কিছু দেখিতে পাইলেন না। মারের ভয় ছাড়া অন্য কোনও ভয় নিতাই-বাবুর শরীরে ছিল না, তিনি স্বচ্ছন্দে সেই অন্ধকার গর্ত্তের মধ্যে হাত ঢুকাইয়া দিলেন। উপরে কাঠবিড়ালীর চেঁচামেচি ও গালিগালাজ আরও তীব্র হইয়া উঠিল।

কনুই পর্য্যন্ত হাত প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়া নিতাইবাবু অনুভব করিলেন যে, তিনি কাঠবিড়ালীর বাসায় পৌঁছিয়াছেন, তুলার মত নরম তুল্‌তুলে একটি স্থান তাঁহার হাতে ঠেকিল। হাতড়াইতে হাতড়াইতে তিনি দেখিলেন, সেই নরম স্থানটিতে কাঠবিড়ালী তাহার রসদ সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। তিনি আর দ্বিধা না করিয়া এক খাম্‌চায় যত খানি পারিলেন সেই রসদ বাহির করিয়া আনিলেন।

কাঠবিড়ালী অতিশয় হিসাবী জন্তু। সন্তানসন্ততি এখনও জন্মগ্রহণ করে নাই, বর্ষাকাল আসিতেও অনেক দেরি আছে, ইহার মধ্যে সে ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবিয়া অনাগত দুর্দ্দিনের জন্য সঞ্চয় করিতে আরম্ভ করিয়াছে। নিতাইবাবু কোলের কাপড়ের উপর শুষ্ক ফলগুলি ঢালিয়া একে একে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। বেশীর ভাগই ছোট ছোট শুকনা ডুমুর, করমচা ও আরও কয়েক প্রকারের নামগোত্রহীন জংলী ফল। তাছাড়া কয়েকটা চীনাবাদাম, ছোলা ও কড়াইয়ের দানা পাওয়া গেল। সেগুলি নিতাইবাবু প্রাপ্তিমাত্র উদরসাৎ করিলেন। দু-তিনটা পুরাতন কাঁঠালবিচি ও হরীতকী ছিল, সেগুলি নিতাইবাবু একবার কামড়াইয়া থু থু করিয়া ফেলিয়া দিলেন। অখাদ্য!

কোটর হইতে আর এক খাব্‌লা বাহির করিয়া তিনি ক্ষুধিতভাবে পরীক্ষা করিলেন, কিন্তু আর চীনাবাদাম কিংবা ছোলা পাওয়া গেল না। তাহার পরিবর্ত্তে তিনি একটি

হারানো জিনিষ ফিরিয়া পাইলেন। কয়েক দিন পূর্ব্বে তাঁহার একটি কাচের রঙচঙা মার্ব্বেল হারাইয়া গিয়াছিল, সেটি রহিয়াছে দেখিলেন। নিতাইবাবু সেটি সযত্নে পকেটে পুরিলেন।

কাঠবিড়ালীটা তখনও উর্দ্ধে থাকিয়া তর্জ্জনগর্জ্জন ও লাফালাফি করিতেছিল, একটা কাঁটালবিচি তাহার উদ্দেশ্যে ছুঁড়িয়া মারিয়া নিতাইবাবু বলিলেন,—'চোর কোথাকার'। শব্দভেদী যুদ্ধে ক্রমশঃ অস্ত্রসস্ত্রের আমদানী হইতেছে দেখিয়া কাঠবিড়ালী রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল।

বিমর্ষ ভাবে আবার নিতাইবাবু স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া বসিলেন। অপ্রচুর ইন্ধনে তাঁহার জঠরের অগ্নি আবার দ্বিগুণ বেগে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। তিনি শাখায় হেলান দিয়া উর্দ্ধমুখে ভাবিতে লাগিলেন,—এখন আত্মসমর্পণ করিলে মারের মাত্রা কিছু কমিবে কি-না? বেলা দুটা বাজিয়া গিয়াছে, সূর্য্যদেব মাথার উপর হইতে পাশে ঢলিয়া পড়িয়াছেন; গাছের ছায়া বৃক্ষতল ছাড়িয়া সরিতে আরম্ভ করিয়াছে। নিতাইবাবু বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, এখন বাড়ি ফিরিলে হয়ত অন্নের উপর দিয়া ফাঁড়াটা কাটিয়া যাইতে পারে। এত বেলা পর্য্যন্ত অভুক্ত থাকার পর মা ও ঠাকুরমা নিশ্চয় তাঁহাকে রক্ষা করিবেন, হয়ত প্রত্যাবর্ত্তনের সংবাদ কাকার কানে না-উঠিতেও পারে। কিন্তু ওদিকে প্রতিহিংসাপরায়ণা বিন্দি আছে—সে ছাড়িবে না, নিশ্চয় কাকাকে গিয়া খবর দিবে। তখন কি হইবে?

নিতাইবাবু গভীর নিঃশ্বাস মোচন করিলেন। এ অবস্থায় কি করা যায়?

হঠাৎ বাড়ি হইতে উচ্চ কণ্ঠস্বর শুনিয়া নিতাইবাবু ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলেন। কান খাড়া করিয়া শুনিলেন দরোয়ান গাড়ীবারান্দার তলায় দাঁড়াইয়া বলিতেছে,—'কাঁহি নহি মিলা হুজুর। খোখাবাবু বিলকুল লা-পতা হো গয়ে।'

কাকাকে দেখা গেল না, কিন্তু তাঁহার ভারী গলার আওয়াজ শোনা গেল,—'ক্যা বেওকুফ্‌কা মাফিক বোল্‌তা হ্যয়। লা-পতা হোকে কঁহা যায়েঙ্গে? জরুর কঁহি ছিপে হুয়ে হ্যয়। মহল্লামে দেখা?'

'জী হুজুর।'

'যাও, ফিন্ আচ্ছি তরহসে খোজো।'

গাছের উপর নিতাইবাবু নিঃশব্দে দাঁত খিঁচাইয়া হাসিলেন। এই দুপুর রৌদ্রে দরোয়ানটা তাঁহাকে মিছামিছি চারিদিক খুঁজিয়া বেড়াইতেছে অথচ তিনি হাতের কাছেই রহিয়াছেন,—ভাবিতে বড় মধুর লাগিল। তিনি দেখিলেন, বিষণ্ণ ও বিরক্ত দরোয়ান আবার লাঠি হাতে বাহির হইতেছে।

বাড়ির ফটক হইতে বাহির হইয়া দরোয়ান নিতাইবাবুর গাছের ছায়ায় আসিয়া দাঁড়াইল। নাগরা জুতা খুলিয়া ভিতরের ধূলা ঝাড়িয়া আবার পরিধান করিল, পাগড়ীর পুচ্ছ দিয়া মুখের ঘাম মুছিল, তারপর অর্দ্ধস্ফুট স্বরে কি বলিতে বলিতে প্রস্থান করিল।

নিতাইবাবুর একবার ইচ্ছা হইল, দরোয়ানের মাথায় একটা কাঁটালবিচি কিংবা ঐ প্রকার কোনো দ্রব্য ফেলিয়া নিজের স্থিতিস্থান প্রকাশ করিয়া দেন। কিন্তু তিনি সে লোভ সংবরণ করিলেন। এত শীঘ্র আত্মপ্রকাশ করিলে চলিবে না। যদিও পেটের মধ্যে নেংটি ইঁদুর সবেগে ডন্ ফেলিতেছে, তথাপি ধৈর্য্য ধারণ করিতে হইবে। এখনও সময় উপস্থিত হয় নাই।

দরোয়ান চলিয়া যাইবার কিয়ৎকাল পরে নিতাইবাবু দেখিলেন, ঠাকুরমা বাড়ির ছাদের উপর উঠিয়া আলিসার ধারে দাঁড়াইয়া উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক চাহিতেছেন। নিতাইবাবুর মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, উৎসাহে তাঁহার মুখ দিয়া প্রায় বাহির হইয়া গেল—'ঠাকুমা, এই যে আমি এখানে।' কিন্তু 'ঠা—' পর্য্যন্ত বাহির হইতে-না-হইতে তিনি সবলে দাঁত দিয়া জিব কাটিয়া ধরিলেন। সর্ব্বনাশ! আর একটু হইলেই সব ফাঁস হইয়া গিয়াছিল!

ঠাকুরমা কিছুক্ষণ নিতাইবাবুর দর্শনাশায় ছাদের এদিক-ওদিক হইতে ব্যাকুলভাবে উঁকি মারিয়া অবশেষে নীচে নামিয়া গেলেন। যতক্ষণ দেখা গেল, নিতাইবাবু সতৃষ্ণনয়নে সেইদিকে তাকাইয়া রহিলেন। তারপর আবার ধীরে ধীরে ডাল ঠেসান দিয়া শুইলেন।

বাড়িতে যে বেশ একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে তাহার নিদর্শন মাঝে মাঝে পাওয়া যাইতেছিল। ঝি-চাকরগুলা অনবরত ভিতর-বার করিতেছিল। কাকা জলদগম্ভীর স্বরে মধ্যে মধ্যে তাহাদের ধমকাইতেছিলেন; একবার ঠাকুরমার সঙ্গে কাকার কথা-কাটাকাটি হইল—সে আওয়াজও অস্পষ্টভাবে

নিতাইবাবুর কানে পৌঁছিল। শেষে বেলা যখন চারটা বাজিয়া গেল তখন কাকা স্বয়ং খোঁজ করিতে বাহির হইলেন। নিতাইবাবু উপর হইতে গলা বাড়াইয়া তাঁহার ভ্রূকুঞ্চিত উদ্বিগ্ন মুখ দেখিয়া মনে মনে বেশ তৃপ্তি অনুভব করিলেন, আশা হইল আরও কিছুক্ষণ এইভাবে অজ্ঞাতবাস চালাইতে পারিলে হয়ত প্রহারের পালাটা একেবারে বাদ পড়িতেও পারে।

তিনি পুনশ্চ কোমরের কসি টান করিয়া দিয়া, চক্ষু মুদিয়া পা দুলাইতে লাগিলেন। শরীর কিছু নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়াছিল, মাথার উপর মৌচাক হইতে মৌমাছিদের একটানা গুঞ্জন শুনিতে শুনিতে ক্রমে তাঁহার ঈষৎ তন্দ্রাকর্ষণ হইল।

তন্দ্রার ঘোরে তিনি দেখিতেছিলেন, কোন অভাবনীয় উপায়ে একটা জীবন্ত কাঠবিড়ালী তিনি গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিয়াছেন, সেটা পেটের মধ্যে গিয়া নখ দিয়া তাঁহার অভ্যন্তরভাগ আঁচড়াইতেছে ও তাঁহাকে বাপান্ত করিতেছে। এইরূপ বিপন্ন অবস্থায় নিতাই বাবু ছুটিতে ছুটিতে ঠাকুরমার কাছে গিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'ঠাক্‌মা বড্ড খিদে পেয়েছে!' ঠাকুরমা তাঁহাকে কোলে লইয়া বসিতেই কাঠবিড়ালীটা তাঁহার দক্ষিণ কর্ণের ছিদ্রপথ দিয়া বাহির হইয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্নব্যঞ্জনপূর্ণ থালা কোথা হইতে সম্মুখে উপস্থিত হইল। নিতাইবাবু ভারি আনন্দিত হইলেন। শত্রুপক্ষ কেহ কাছে নাই; ঠাকুরমা সযত্নে অন্নব্যঞ্জন মাখিয়া নিতাইবাবুর ব্যাদিত মুখে গ্রাস দিতে যাইতেছেন এমন সময় নীচে হইতে কর্কশ গলার আওয়াজে তাঁহার চেতনা ফিরিয়া আসিল।

নিতাইবাবু চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন, সূর্য্য একেবারে পশ্চিম দিগন্ত রেখা স্পর্শ করিয়াছে এবং তাহার তির্য্যক্ রশ্মিতে যে-ডালে তিনি ছিলেন তাহা আগাগোড়া আলোকিত হইয়াছে।

নীচে দৃষ্টিপাত করিলেন, দরোয়ান ও বাড়ির একটা ঝি দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছে দৃষ্টিগোচর হইল।

দরোয়ান বলিল—'ঐসা বিচ্ছু লড়কা কভি নেই দেখা। দেখো তো, সবেরে উঠ্‌কে ভাগা আভিতক্ পতা নই! খোজ্‌তে খোজ্‌তে হমারা নাকমে দম আ গিয়া, দিনভর খানা পিনা কুছ নহি—'

ঝি বলিল,—'সত্যি বাপু, অমন ছেলেও দেখিনি কখনও—গিন্নিমা সমস্ত দিন মুখে জল পর্য্যন্ত দেন নি,—বিনু দিদি ত কেঁদেকেটে শুয়ে আছে! আচ্ছা, কি বজ্জাত ছেলে বল দিকিন্ দরোয়ানজী, খোঁপাটি মুড়িয়ে কেটে দিলে গা? একটু মায়া হ'ল্ না? না বাপু, ও ছেলের রকম-সকম মোটে ভাল নয়, যত বয়স বাড়ছে ততই যেন—'

দরোয়ান তিক্ত স্বরে বলিল,—'আরে মাই, হম্ বোল্‌তে হেঁ, তুম খেয়াল রাখনা, ই লড়কা বড়া হোকে ডাকু বনেগা—বম্ গোলা ছোড়েগা! ইয়াদ হ্যয়? উস্-দিন রাত আঠ বজে চারপাই পর শো কর্‌কে হমারা থোড়া নিদ্ আ গিয়া থা। লৌণ্ডা কিয়া কা—চুপসে হমারা টিক্‌মে ডোরি বাহ্‌কে চারপাইকা পায়াসে বান্ধ্ দিয়া। উস্‌কে বাদ ছোটে ভইয়াকো যাকে খবর দে দিয়া। ব্যস্, ছোটে ভইয়া জোরসে ফুকারিন, হম্‌ভি হড়বড়াকে উঠা—'

সহানুভূতিপূর্ণস্বরে ঝি বলিল,—'আহা মরে যাই। হেঁচকা লেগে টিকি ত তোমার সেদিন প্রায় উপড়ে গিয়েছিল। তারপর ছোটবাবু কত মারলেন, মার ত লেগেই আছে—কিন্তু তবু কি বজ্জাতি কমে—'

দরোয়ান বলিল,—'লড়কা না লড়কেকা দুম্! ছোটে ভৈয়াকা মার সে কুছ নহি হোগা, হম্‌কো একদফে সরকার সে হুকুম মিল যায়, হম্ ডাণ্ডাসে লৌণ্ডেকা বদমাসি নিকাল দে—'

লৌণ্ডা! লড়কেকা দুম্! এ পর্য্যন্ত নিতাইবাবু কোন রকমে সহ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু আর পারিলেন না। সক্রোধে পকেট হইতে সেই পুনঃপ্রাপ্ত মার্ব্বেলটা বাহির করিয়া দরোয়ানের মাথা লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়া মারিলেন।

নিতাইবাবুর লক্ষ্য ব্যর্থ হইবার নয়, মার্ব্বেল দরোয়ানের পাগড়ীর মধ্যস্থিত মুক্ত স্থানটিতে আসিয়া লাগিল, খট্ করিয়া একটি শব্দ হইল। দরোয়ান শূন্যে প্রায় চার হাত লাফাইয়া উঠিয়া বলিল,—'বাপ রে! জান গিয়া!' তারপর ঊর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া উত্তেজিত রাসভের মত চীৎকার করিতে লাগিল, 'উয়হ্ বৈঠা! পকড়া হুয়! ছোটে ভৈয়া, জলদি আইয়ে, খোখাবাবু পেঁড় পর বৈঠা হুয়!—হমারা শির ফোড় দিয়া! জল্‌দি আইয়ে! পকড়া হুয়!'

ঝি বৃক্ষাসীন নিতাইবাবুর হিংস্র মূর্ত্তি দেখিয়াই জিব কাটিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

দেখিতে দেখিতে চক্ষের নিমেষে বাড়িতে যে যেখানে ছিল আসিয়া বৃক্ষতলে জমা হইল, বাবা কাকা হইতে আরম্ভ করিয়া বাড়ির দেড় বছরের ছেলেটা পর্য্যন্ত কেহই বাদ গেল না। নিতাইবাবু দেখিলেন মুহূর্ত্তের অবিমৃষ্যকারিতার ফলে তাঁহার পলায়নের পথ একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তিনি ডালের উপর আর এক ধাপ উঠিয়া বসিলেন।

কাকা হাতের চাবুক আস্ফালন করিয়া বলিলেন,—'নেমে আয়।'

নিতাইবাবু মাথা নাড়িয়া বলিলেন,—"নামব না।'

কাকা রুদ্র কণ্ঠে কহিলেন,—'শিগ্‌গীর নেমে আয় বলছি হনুমানের বা—' বলিয়াই থামিয়া গেলেন। বাবা মুখ ফিরাইয়া হাসি গোপন করিলেন।

নিতাইবাবু বলিলেন,—'আগে বল মারবে না, তবে নামব।'

'মারব না? তোকে আজ জ্যান্ত মাটিতে পুঁতব। নাম্ শিগ্‌গীর।'

'তবে নামব না।'

'নামবি না? আচ্ছা, দাঁড়া তবে। এই বুদ্ধু সিং, গাছ পর চড়্‌হো, কান পকড়্‌কে উস্‌কো উতার লে আও!'

নিতাইবাবুর কান পাকড়িয়া নামাইয়া আনিবার প্রস্তাবটা খুব মুখরোচক হইলেও বুদ্ধু সিং দরোয়ানের তাদৃশ উৎসাহ দেখা গেল না। তাহার মস্তকের কেশবিরল মধ্যস্থলটি সুপারির মত ফুলিয়া উঠিয়াছিল, সে উর্দ্ধে একটি বক্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ক্ষীণভাবে বলিল,—'জী হজুর।'

নাগরা ও পাগড়ি খুলিয়া রাখিয়া দরোয়ান গাছে চড়িতে প্রবৃত্ত হইল। নিতাইবাবু প্রমাদ গণিলেন। এবার ত আর রক্ষা নাই।

হঠাৎ তাঁহার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলিয়া গেল। তিনি উপর দিকে উঠিতে উঠিতে বলিলেন,—'বুদ্ধু সিং, হমারা পাস আওগে ত হাম্‌ভি এই চাক্ মে খোঁচা দেঙ্গে! তুম্ হাম্‌কো লৌণ্ডা বোলকে গালি দিয়া থা—হাম্‌ভি তুমকো মজা দেখায়েঙ্গে।'—বলিয়া মাথার ইঙ্গিতে প্রকাণ্ড চাকটা দেখাইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেই বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া গেলেন।

দরোয়ান খানিকটা দূর উঠিয়াছিল, পিছলাইয়া নামিয়া আসিল; বলিল,—'হমসে নহি হোগা হজুর! মধমচ্ছিকা খোতা হয়—জান্ চলা যাগা।'

এই ক্ষুদ্র বালকের কূটবুদ্ধি দেখিয়া সকলে স্তম্ভিত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন।

ওদিকে নিতাইবাবুও স্তম্ভিত হইয়া মৌচাকের দিকে তাকাইয়া ছিলেন। এমন অভাবনীয় ব্যাপার যে ঘটিতে পারে তাহা কল্পনা করাও দুষ্কর। অস্তমান সূর্য্যের আলো পাতার ফাঁক দিয়া মৌচাকের উপর পড়িয়াছিল, মক্ষিকাপূর্ণ চাকটা অভ্রের মত আলোক প্রতিফলিত করিতেছিল। নিতাইবাবু বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে দেখিলেন, ঠিক তাহারই এক হাত দূরে স্থূল শাখার রুক্ষ গায়ে আটকাইয়া ঝুলিতেছে—বিন্দুর সেই হারানো সোনার হার! সোনার উপর সূর্য্যকিরণ পড়িয়া চিক্‌চিক্ করিতেছে, চিনিতে নিতাইবাবুর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব হইল না। ইহা সেই হার যাহা তিনি কয়েক দিন পূর্ব্বে গুড়ের বাটিতে ডুবাইয়া মাধুর্য্যমণ্ডিত করিয়া দিয়াছিলেন! এতক্ষণ কেবল ওই স্থানটা অন্ধকার ছিল বলিয়াই উহা চোখে পড়ে নাই।

কাঠবিড়ালী, কাক, পিপীলিকা প্রভৃতি ইতরপ্রাণীর আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে নিতাইবাবুর প্রগাঢ় অভিজ্ঞতা ছিল, সুতরাং কি করিয়া হারছড়া বৃক্ষের উচ্চ শাখায় আসিয়া দোদুল্যমান হইল তাহা অনুমান করিতে তাঁহার কষ্ট হইল না। তিনি বুঝিলেন মিষ্টান্নলুব্ধ কোনো ইতরপ্রাণীই এই কুকার্য্য করিয়াছে।

বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা সামলাইয়া লইয়া নিতাইবাবু বিজয়োল্লাসে হাস্য করিলেন; আজিকার যুদ্ধে এরূপ ভাবে ঘেরাও হইয়াও অবশ্যম্ভাবী পরাজয়কে তিনি যে অচিরাৎ সম্মানসূচক সন্ধিতে পরিণত করিতে পারিবেন তাহাতে আর সংশয় রহিল না।

নিম্নাভিমুখে তাকাইয়া তিনি বলিলেন,—'একটা জিনিষ পেয়েছি, বল্‌ব না।'

কাকা কথায় ভুলিবার লোক নয়, তিনি বলিলেন,—'বটে? জিনিষ পেয়েছ! আচ্ছা, আগে গাছ থেকে নেমে এস ত দেখি।'

'আগে বল মারবে না।'

বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কি জিনিষ পেয়েছিস্?'

একটু ইতস্ততঃ করিয়া নিতাইবাবু বলিলেন,—'বিন্দির হার।'

বিন্দু উপস্থিত ছিল, শুনিবামাত্র সে চীৎকার করিয়া উঠিল,—'আমার হার! ও কাকা, শিগ্‌গীর আমার হার দিতে বল।'

কাকা প্রশ্ন করিলেন,—'হার কোথায় পেলি?'

'বলব না। আগে বল মারবে না।'

কাকা বিবেচনা করিয়া বলিলেন,—'আচ্ছা, কম মারব। তুই হার নিয়ে নেমে আয়।'

'তবে নামব না। হারও দোব না।'

বিন্দু বলিল,—'ও কাকা—'

কাকা ও বাবা নিম্নস্বরে পরামর্শ করিলেন, তারপর কাকা দুঃখিত ভাবে বলিলেন,—'আচ্ছা আয়, মারব না।'

নিতাইবাবুর সন্দেহ হইল ইহার মধ্যে আইনের ফাঁকি আছে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'থাপ্‌পড়?'

'না—থাপ্‌পড়ও মারব না।'

'কানমলা?'

'না।'

'আচ্ছা, তবে যাচ্ছি।'

'হার নিয়ে আস্‌বি, তা না হ'লে—

সন্ধির সর্ত্ত রীতিমত পাকা করিয়া লইয়া নিতাইবাবু হারটি উদ্ধারের চেষ্টায় যত্নবান হইলেন। সূর্য্যাস্ত হইয়া গিয়াছিল, অতএব মৌমাছিদের পক্ষ হইতে আশঙ্কার বিশেষ কারণ ছিল না। নিতাইবাবু গুটি গুটি অতি সাবধানে মৌচাকের নিকটবর্ত্তী হইলেন। মৌমাছি জাতিটা অতিশয় স্নায়ুপ্রধান, একটুতেই চটিয়া যায়, ইহা নিতাই বাবুর জানা ছিল। তিনি একটি চক্ষু চাকের উপর নিবদ্ধ রাখিয়া হারের দিকে অগ্রসর হইলেন। নীচে যাহারা ছিল তাহারা বিশ হাত উর্দ্ধে হারটা দেখিতে পায় নাই, কেবল এই দুঃসাহসিক বালকের গতিবিধির দিকে চাহিয়া নিস্পন্দ হইয়া রহিল।

চাক নিস্তব্ধ, মৌমাছিদের বোধ করি তন্দ্রা আসিয়াছে। নিতাই বাবু হারের নাগালে আসিয়া আস্তে আস্তে হাত বাড়াইলেন। ভোঁ—! একটা ক্রুদ্ধ গুঞ্জন উঠিল। কয়েকটা মৌমাছি চাক হইতে উড়িয়া একবার পরিক্রমণ করিয়া আবার চাকে গিয়া বসিল। নিতাই বাবু বিদ্যুদ্বেগে হাত টানিয়া লইয়াছিলেন, কিছুক্ষণ নিশ্চল মূর্ত্তির মত বসিয়া রহিলেন।

আবার চাক্ নিস্তব্ধ—মৌমাছিরা নিশ্চয় নিদ্রালু। নিতাইবাবু পুনরায় ধীরে ধীরে হাত বাড়াইলেন। হারটা গাছের কর্কশ ত্বক হইতে ছাড়াইতে একটু শব্দ হইল—অমনি ভণ্‌ণ্‌—তিনটা মৌমাছি তাঁহাকে আক্রমণ করিল। একটা ঠিক নাকের ডগায় হুল ফুটাইয়া দিল, অন্য দুটা দুই গণ্ডে দংশন করিয়া আবার ফিরিয়া গিয়া চাকে বসিল।

নিতাইবাবুর নাসিকা ও গণ্ডদ্বয় আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিল, কিন্তু তিনি নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মত বসিয়া রহিলেন। একটু নড়িলে যে আত্মরক্ষার আর কোন উপায় থাকিবে না, চাক হইতে কোটি কোটি 'অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ মৌমাছি আসিয়া তাঁহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। নেহাৎ সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে বলিয়াই ইহারা সদলবলে বাহির হইতেছে না, কিন্তু আর বেশী ঘাঁটাইলে সন্ধ্যার দোহাই মানিবে না। তখন তাহাদের হুলের জ্বালায় না হোক এই বিশ হাত উচ্চ হইতে মাটিতে পড়িলে মৃত্যু অনিবার্য্য। অপরিসীম সহিষ্ণুতা সহকারে নিতাইবাবু আরও দু-মিনিট সেইভাবে বসিয়া রহিলেন। তারপর চাক যখন একেবারে নিঃশব্দ হইয়া গেল তখন তিল তিল করিয়া পিছু হটিয়া নামিতে আরম্ভ করিলেন।

পাঁচ মিনিট পরে, অন্ধকারপ্রায় বৃক্ষতলে নিতাইবাবু যখন নামিয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন তাঁহার মুখ দেখিয়া বাবা এবং কাকা চমকিয়া একসঙ্গে বলিয়া উঠিলেন,—এ কি! এ আবার কে?'

নিতাইবাবুর নাসিকা ও গাল দুটি এরূপ বিপর্য্যয় ফুলিয়া উঠিয়াছিল যে, উপস্থিত কেহই তাহাকে চিনিতে পারিল না।

* * * *

রাত্রে বিছানায় শয়ন করিয়া দুই ভাইবোনে কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল, তারপর বিন্দু আস্তে আস্তে বলিল,—'নিতাই, বড্ড ব্যথা করছে—না রে?'

নিতাইবাবু বলিলেন,—'হুঁ।'

বিন্দুর মনে আর রাগ ছিল না, সে বিগলিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—'নাকে একটু হাত বুলিয়ে দেব ভাই?'

নিতাইবাবুর নাকটি মাঝারি-গোছের শাঁকআলুর আকার

ধারণ করিয়াছিল, গণ্ডের স্ফীতিবশতঃ চোখ দুটিও প্রায় বুজিয়া গিয়াছিল; তিনি ক্রন্দনের প্রবল আবেগ ঢোক গিলিয়া বলিলেন,—'হুঁ।'

বিন্দু তাঁহাকে জড়াইয়া লইয়া সযত্নে নাকে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বলিল,—'কেন ভাই, তুই আমার চুল কেটে নিলি? তাই ত ভগবান রাগ ক'রে তোর নাক অমন ক'রে দিলেন।'

অনুতপ্ত ভাবে নিতাইবাবু বলিলেন,—'আর করব না।'

মানুষকে বুদ্ধিবলে পরাস্ত করিলেও, দৈবী প্রতিহিংসার হাত হইতে নিস্তার পাওয়া যে অসম্ভব তাহা নিতাইবাবুর হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল।

বিন্দু সস্নেহে তাঁহার স্ফীত রক্তিম গণ্ডে একটি চুম্বন করিয়া বলিল,—'লক্ষ্মি ভাই, আর কখ্খনো করিস নি।'

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া নিতাইবাবু বলিলেন.—'দিদি, তোর চুল আবার গজাবে।'

চুলের কথা নূতন করিয়া স্মরণ হইতেই দিদির দুই চোখ অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল, কিন্তু সে উদ্গত অশ্রু গিলিয়া ফেলিয়া বলিল,—'হ্যাঁ। তোর নাকও আবার ঠিক হয়ে যাবে, এবার ঘুমো।'

তারপর দুই ভ্রাতা-ভগিনী নিবিড় ভাবে পরস্পরের গলা জড়াইয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

স্বর্গীয়া কামিনী রায়

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন, এম-এ

প্রায় সত্তর বৎসর পূর্ব্বে যে মহীয়সী মহিলার জন্ম হয় গতবীরাষ্টমী দিবসে তিনি পরলোকে গমন করিয়াছেন। জীবনে যিনি কবিহৃদয়ের জন্য পণ্ডিতসমাজে সমাদর লাভ করিয়াছিলেন, নানা প্রকার ঘটনাবৈচিত্র্যের ঘাত-প্রতিঘাতের পর তাঁহার জীবনতরী সেদিন কূলে আসিয়া ভিড়িল। তাঁহার জীবনকালের মধ্যে দেশে ও সমাজে কি আমূল পরিবর্ত্তন হইয়াছে! তাহার জন্য তাঁহার ভাবনিষ্ঠায় কতই না আঘাত লাগিয়াছে! তবু তিনি সকল দেখিয়া শুনিয়া সকল সহিয়া গিয়াছেন, সংযতচিত্তে জীবনযাত্রার একপাশে দাঁড়াইয়া সব দেখিয়া লইয়াছেন, চিতার আগুনে সেই সংযমও নিবিয়াছে, এখন তিনি আছেন স্মৃতিমাত্রপ্রাণ হইয়া।

ভারতের প্রাচীন ও মধ্য যুগের কথা যাক্—কারণ যাঁরা বাঙ্গয়ের প্রাণস্পর্শিনী পদাবলীর ভক্তের আজ আর অভাব নাই। এমন কি, স্ত্রীশিক্ষা বলিতে আমরা আজ যাহা বুঝি বাঙালীর অতীত ইতিহাসে তাহা দুর্লভ হইলেও একেবারে অসম্ভব ছিল না। হটী বিদ্যালঙ্কারের কথা আমাদের সাময়িকপত্রে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। স্বর্ণকুমারী বসু ও অন্যান্য নারী-কবি বাংলা সাহিত্যের পুষ্টি সাধন করিয়াছেন। কবিত্বশক্তি পুরুষের মতই নারীর হৃদয়েও আবির্ভূত হইতে পারে, ইহা বঙ্গদেশে বহুবার প্রতিপন্ন হইয়াছে।

কিন্তু কামিনী রায়ের নাম ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালী মুগ্ধ হইয়া শুনিল চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের নিকট। আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ 'New Essays in Criticism' নামক পুস্তকে কথাপ্রসঙ্গে কামিনী রায়ের নাম করেন; তখনকার দিনে রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভাও ইহার শক্তিকে ম্লান করিতে পারে নাই।

বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে যে নূতন ভাব, নূতন শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছে. আচার্য্য শীল মহাশয় তাহার তিনটি লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—প্রথমতঃ, কল্পনার ঐশ্বর্য্য ও বিশালতা, যাহা ক্ষুদ্রকে বৃহৎ করিয়া দেখায়, যাহা আকাশে বাসা বাঁধে, যাহা বিনা ভিত্তিতে বিরাট সৌধ নির্ম্মাণ করে; দ্বিতীয়তঃ, আপনার মন লইয়া কবির ব্যাকুলতা, কবি শুধু আত্মচিন্তায় বিভোর, আপনার মন দিয়াই সকল জগৎ দেখেন, আপনার মনকেই সকল জগতের মধ্যে দেখেন; এই দুই লক্ষণ যে ভাবের, সেই দুই লক্ষণের কবিতায় রবীন্দ্রনাথ



কলিকাতার জাহাজঘাটে সন্ধ্যা
শ্রীসত্যকৃষ্ণ চৌধুরী

বিহারীলালের নাম সর্ব্বাগ্রে স্মরণীয়। কিন্তু ঐ নবীন ভাবের আর একটি লক্ষণ আছে। তাহা হইতেছে objective criticism of life, জীবন বহুমুখী, জীবনযাত্রার পথে যে-সব সঙ্গী আসিয়া মিলে তাহাদের কথা বিচার করিয়া গতি নির্দ্ধারণ করা; ইহাই ছিল সেই নূতন ভাবের তৃতীয় লক্ষণ। ইহাতে আচার্য্য শীল কামিনী সেনের কবিতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন; তখন অবশ্য কবির একটি মাত্র গ্রন্থই প্রকাশিত হইয়াছিল—"আলো ও ছায়া।"

ইং ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে 'আলো ও ছায়া' রচিত হয়। প্রথিতনামা কবি হেমচন্দ্র ইহার ভূমিকা লিখিয়া দেন। নবীন লেখিকার অসাধারণ প্রতিভা ও প্রকৃত কবিত্ব শক্তি, ভাবের গভীরতা, ভাষার সরলতা, রুচির নির্ম্মলতা এবং সর্ব্বত্র হৃদয়গ্রাহিতার প্রশংসা তিনি মুক্তকণ্ঠে করিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে তাঁহার নিজের গুণগ্রাহিতার পরিচয়ও তিনি দিয়াছেন। আজ বহুদিন পরে তাঁহার সেই পুরাতন কবিতার দীপ্তি এতটুকু ম্লান হয় নাই। তাঁহার সর্ব্বপ্রথম কবিতার তারিখ যাহা আমরা পাই তাহা ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ। যে কথা বর্ত্তমান যুগের গোড়ার কথা, সেই দশে মিলিয়া চলিবার কথা—
"আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে আসে নাই কেহ অবনী 'পরে
সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে"
তখনকারই রচনা।

'আলো ও ছায়া'র মধ্যে প্রধানতঃ কয়েকটি সুর কানে আসিয়া লাগে। মানুষের সুখ-দুঃখে কবির নিজের সুখ-দুঃখ ভুলিয়া নিজেকে বিলাইয়া দেওয়ার সুর। কৈশোরেই তাঁহার অদৃষ্টে অনেক দুঃখভোগ সঞ্চিত ছিল, জীবনের প্রভাতেই তিনি যে আঘাত পাইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার বুক ভাঙিয়া যাইতে চাহিয়াছিল, তাঁহার কণ্ঠ হইতে বড়ই খেদে বাহির হইয়াছিল—

বিষাদ, বিষাদ, সর্ব্বত্র বিষাদ,
নরভাগ্যে সুখ লিখিত নাই,
কাঁদিবার তরে মানব জীবন,
যতদিন বাঁচি কাঁদিয়া যাই।

কিন্তু দশের কথা ভাবিয়া জনকোলাহলের মধ্যে নিজের তুচ্ছাতিতুচ্ছ দুঃখকষ্টের কথা তিনি চাপিয়া রাখিলেন।

বিষাদ—বিষাদ—বিষাদ বলিয়ে
কেনই কাঁদিবে জীবন ভ'রে?
মানবের মন এত কি অসার?
এতই সহজে নুইয়া পড়ে?

দুইটা তুচ্ছ কাঁটা পায়ে ফুটিলই বা, নয়নজল বহিলই না হয়, তাহাতে কি? ধরণী ত শুধু দুঃখময় নহে। রবিতাপে ধূলিমাঝে জনতার কোলাহলে তিনি আপনাকে চিনিতে চাহিয়াছিলেন। নূতন উদ্যমে, নূতন আনন্দে তিনি আলো ও ছায়ার কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন, অশ্রু থাকিল তাঁহার একার জন্য, আনন্দ থাকিল সকলের সঙ্গে মিশিয়া ভাগ করিয়া লইবার জন্য।

এই নবীন আশা কি লইয়া? দেশের চিন্তা এই আশার সুরের এক প্রধান উপাদান। একতায় বলী, জ্ঞানে গরীয়ান্ ভারতসন্তান, ভারতশিশু বীরচরিত্র, গঙ্গাযমুনা, কৃষ্ণা গোদাবরী নর্ম্মদা কাবেরী পঞ্চনদ হইতে পুণ্য দেবস্তুতি উঠিতেছে, এই তাঁর আশার স্বপ্ন। দেশজননীকে উদ্দেশ করিয়াই তিনি বলিয়াছিলেন,

মরিব তোমারি কাজে, বাঁচিব তোমারি তরে,
নহিলে বিষাদময় এ জীবন কে বা ধরে।

তখনকার তরুণীহৃদয় শুধু কাল্পনিক দেশের ছবি লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারে নাই; বিশেষ করিয়া কুলী রমণীর উপর অত্যাচার ছিল তখনকার নারীনিগ্রহের স্বরূপ। কঠোরকণ্ঠে ভারতের নারীসমাজকে সম্ভাষণ করিয়া তিনি বলিয়াছেন,—

সুদূর প্রান্তরে কুলী নারী, সে-ও
ভগিনীর বোন, মায়ের মেয়ে;
ভাব তার দশা, আপন ভগিনী
দুহিতার মুখ বারেক চেয়ে।
কেমনে আমোদে কেটে যায় দিন,
সুখের স্বপনে রজনী যায়?
নারীর চরম দুর্গতি নেহারি,
নারীর হৃদয় টলে না তায়?

এই সময়ের রচনার মধ্যে দেখিতে পাই—কবির সংস্কৃত সাহিত্যে অনুরাগ, বিশেষ করিয়া সংস্কৃত গদ্যসাহিত্যের অমৃতত্ত্ব কাদম্বরীর প্রভাব; অচ্ছোদ-সরসীতীরে পবিত্রতা, সৌন্দর্য্য, যৌবনের ছবি, সে যে তাঁহার কাছে জীবন্ত ছিল; বৈশম্পায়ন, চন্দ্রাপীড়, মহাশ্বেতা, পুণ্ডরীক বহু বাঙালীর তরুণ বয়সের কল্পনার খোরাক জোগাইয়াছে, শুদ্ধ সংযত পবিত্র প্রেমের ভারতীয় চিত্র দিয়া তাহাদিগকে কল্পনায় সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। যাহা তিনি প্রাচীন সাহিত্যে পড়িয়াছিলেন, তাহা মূর্ত্ত হইয়া উঠিল, তাঁহার নিকট রসগ্রহণ করিয়া তাহা আবার সজীব হইয়া উঠিল।

'আলো ও ছায়া'র কাদম্বরীর চিত্র ভিন্ন অম্বার মধ্যেও পুরাণ-কথায় নবীনের সজীব স্পর্শ দেখিতে পাই। ইংরেজী ১৮৯১ সালে অম্বা রচিত হয়। তরুণী বিদুষীর নিকট মহাভারত বড় ভাল লাগিয়াছিল। মহাভারতকার ব্যাস-দেব যে-সকল নরনারীর চরিত্র তাঁহার অতুলনীয় লেখনী দিয়া আঁকিয়াছিলেন, তাহারা তাঁহার শৈশব হইতেই স্মৃতিপটে আঁকা হইয়া গিয়াছিল। জীবনে তিনি বহু-গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন, বিদেশী বহু কবি ও ঔপন্যাসিকের রচনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, কিন্তু তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেন যে, তাহাদের আঁকা ছবি বিদেশী ছবি, সে-ছবি যতই ভাল হউক, তাহার উপরে একটা ব্যবধানের অন্তরাল থাকে, আর অম্বা, সাবিত্রী ও দময়ন্তী যে নিতান্তই আমাদের আপনার জন। এইজন্য অম্বার চিত্র কবির নিকটে জীবন্ত, তাহাকে তিনি আপনার কল্পনা দিয়া স্পর্শ করিয়াছেন, পুরাণের কাহিনীকে ভাঙিয়া-চুরিয়া আবার গড়িয়াছেন। নিয়তির ক্রীড়নক হইয়া অম্বা মরিল; মরিল, কিন্তু সেই সঙ্গে ইচ্ছামৃত্যু দেবব্রতেরও মৃত্যুর ব্যবস্থা করিয়া গেল,—কঠোর তপস্যা দ্বারা প্রমাণ করিয়া গেল।—

…নারীর বল দেহে নহে, তাত !
মনে, প্রতিভায়, তার হৃদয়ের তাপে
আছে বল, আছে বজ্র, বিদ্যুৎ, অনল ;
নিরুদ্ধ অশ্রুর তার সঞ্চিত অন্তরে,
সমুদ্র সমান হ'য়ে, পারে ডুবাইতে
রাজা, রাজ্য,…পুরুষের দুর্দ্দান্ত প্রতাপ
করে ক্ষয়।…

আর সেই সঙ্গে নারীর অপমান ও তাহার প্রতিকারের কথাও বলিয়াছেন,—

নারী তার হত মান না যদি উদ্ধারে,
না যদি শিখায় লোকে প্রভাব আপন,
পুরুষের বাহুবল, মত্ত চিরদাহ'ন,
অহরহ দিবে ছিঁড়ে কুসুম কোমল
হিয়া তার,—জীবন যে ক'রবে শ্মশান।

পুরাণকে ভাঙিয়া গড়িয়া সময়োপযোগী করিয়া তোলার এই চেষ্টা আমরা 'পৌরাণিকী' গ্রন্থের একলব্য, দ্রোণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি চরিত্রচিত্রেও দেখিতে পাই।

'আলো ও ছায়া'র সঙ্গে সঙ্গে 'মাল্য ও নির্ম্মাল্য' চলিয়াছে ; ১৮৮১-১৯১৩ ; আরও কত লেখা যে অপ্রকাশিত অবস্থায়ই লয় পাইয়াছে তাহা কে জানে ? বনদেবী নামক কবিতা অপ্রকাশিত বাল্যে রচিত নাটক হইতে লওয়া। অন্যান্য কবিতাগুলি ভাবের আবেগে আকুল, ক্ষণে সন্তোষ, ক্ষণে বিষাদ, ইহাই তাহাদের প্রধান গুণ ; বিষাদকে দমন করিয়া জগৎপিতার উপর পরম নির্ভর রাখিয়া তিনি চলিতে চান, কারণ দেখিয়াছেন মাল্যকে নির্ম্মাল্যে পরিণত করিতে না পারিলে আর শান্তি নাই। তাই তিনি বলিতেছেন,—

পড়ে গিয়ে যদি কাছে পাই,
তবে প'ড়ে তাতে দুঃখ নাই।
কিন্তু কেন সাথে নাহি রও ?
ভয়ে দুঃখে অভিভূত প্রাণ,
নাহি বুঝি তোমার বিধান,
জানি শুধু, পিতা তুমি হও।

তাই মান অভিমান প্রকৃতি ও নগরীর বিবরণ দিয়া যাহার আরম্ভ, শেষ তাহার ভগবানের উপর নির্ভরে। মধ্যকার অবস্থায় বলিয়া—এই পুস্তকখানি কবির সকল রচনার মধ্যে সুষ্ঠু সুন্দর হইয়া মনের উপর স্নিগ্ধ শান্তির পরশ বুলায় না—কিসের যেন একটা অভাব থাকিয়া যায়।

ইং ১৯১৩-১৪ সালে 'অশোক সঙ্গীত' রচিত হয়। প্রিয় পুত্র অশোকের অকাল মৃত্যুতে শোকে আত্মহারা হইয়া জননী রচনা করিয়াছিলেন, ৫৮টি সনেট। প্রতি সনেটে কি গভীর শোক ফুটিয়া উঠিয়াছে, কি আকুলতা, কি আবেগ ! ভাষার কোথাও কিছুমাত্র আড়ম্বর নাই, পরিষ্কার মনের কথা বাহিরে আসিতেছে। চোখ ছাপাইয়া জল আসিতেছে, বলিতেছেন—

একবার ফিরে আয়, স্বপ্নের মতন.
বারেক শুনায়ে যারে মধুমাখা স্বর,
বলে যারে একবার যত অনাদর
যত কিছু দেখাইত যেন অযতন,—
ওরে কাঙালিনী মার অমূল্য রতন।
সে তাহার অতি যত্ন,—উদার অন্তর
করে নাই ক্ষুব্ধ তব। আজ ক্ষমা কর,
জ্ঞানে কি অজ্ঞানে কৃত ত্রুটি অগণন।

আবার বলিয়াছেন, দয়ালঠাকুর, এ ঠিকই হইয়াছে, পুত্রসৌভাগ্যবতী হইয়া যে অহঙ্কার হইয়াছিল, তাহা তুমি চূর্ণ করিলে, দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শুইয়া শিশুকে লইয়া যে মোহনীড় রচনা করিয়াছিলাম তাহা তুমি ভাঙিয়া দিলে; প্রভু এখন ডাকিয়া লও, আমাকে তোমার কাছে লইয়া যাও। কিন্তু সেখানে গিয়াই কি দেখা পাইব ? ধনী প্রভুর

দাসীর কর্ম্ম গেলেও একটা আশা থাকে প্রভুর যে-সন্তানকে সে নয়নের পুত্তলী করিয়া রাখিয়াছিল, কর্ম্ম না থাকিলেও সঙ্কোচে, সাহসে সে দিনান্তে একবার তাহার দেখা পাইতে পারে। মায়ের সে আশা আছে কি? কত বার নিজেকে সান্ত্বনা দিয়েছেন, কিন্তু মন মানে না, সংযমের নিগড় ভাঙিয়া শোকের বন্যা তাঁহাকে ভাসাইয়া লইয়া যায়, বলিতে বাধ্য করায়,—

ডেকেছি প্রত্যূষে নিত্য "ওঠ রে অশোক,
প্রতি কাজে, "অশোক রে—ও অশোক" ধ্বনি
ছিল মোর। শ্রান্ত শির উপাধানে রাখি
ডেকেছি, "অশোক আর, কি পড়ার ঝোঁক!
অনেক যে হ'ল রাত।"—দিবস রজনী
কেমনে কাটিবে এবে তোমারে না ডাকি?

তবু তিনি শেষ পর্য্যন্ত সংগ্রাম করিয়াছেন, সন্তানের মৃত্যুদিনে অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়া তাহাকে আকুল করিতে চাহেন নাই, দৃঢ়ভাবে উদ্গত অশ্রুবারি সরাইয়া বলিয়াছেন,—
"হে নির্ভীক, ধন্য হোক জন্মদিন তব।"

'সিতিমা' গদ্য নাটিকা ১৯১৬ সালে রচিত এবং শত দৃশ্যে সমাপ্ত। ইহার আখ্যানভাগ স্বল্প, দেশকালের সীমার অতীত। প্রেম প্রতিদান চাহে না, দিয়াই সন্তুষ্ট, তাই সিতিমা রাজান্তঃপুরের নর্ত্তকী হইয়াও কুমার উজ্জ্বলসিংহকে বিপদ হইতে বাঁচাইল, নিজের প্রাণ-বিনিময়ে তাঁহাকে দুর্নাম হইতে মুক্ত করিল, অসম সাহসে তাঁহাকে সম্পদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিল। ঘটনাবহুল হইলেও অন্যর নিকট ইহা দাঁড়াইতে পারে না, না শব্দ-সম্পদে, না চরিত্র-চিত্রণে।

বারো বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ইং ১৯২১ সালে কবির 'গুঞ্জন' প্রকাশিত হয়। সরলভাবে শিশুর ও শিশুর মায়ের ভাষায় কয়েকটি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন; তাহার মধ্যেও তাঁহার দেশপ্রেম, ভগবদ্ভক্তি, নীতিনিষ্ঠা ফুটিয়া উঠিয়াছে। ছোট ছেলের মুখে তিনি দিয়াছেন,—

হাজার হাজার মানুষ মরে
তবে কেন লড়াই করে?
মারামারি কাটাকাটি
সে তো ভাল নয়।
প্রাণটা যে দেয় দেশের তরে
মারে, মরে, ভালই করে,
পরে দেশটা লুটে খাবে
তা কি প্রাণে সয়?

তাহাকে ছেলেবেলা হইতেই বলিতে শিখাইয়াছেন :—

বড় পদ, বেশী টাকাকড়ি,
কেহ পায়, কেহ না হ পায়;
জান যদি আপনার দাম।
লজ্জা দুঃখ কেন হবে তায়?

তাই বলিয়া তিনি শিশুকে নীতির কথাই শুধু শিখাইতে ব্যস্ত ছিলেন না; আলো বাতাসের কথা বলিয়া উষার আলোকে, ফুলবনের সৌরভে তাহাকে জাগাইয়াছেন; শিশুকে বুকে জড়াইয়া সকল মায়ের ভাষা দিয়া বলিয়াছেন,—

থাক্ রে জড়ায়ে, জুড়ায়ে বুক
ওরে শিশু মোর, আমার সুখ,
তুই আমার সুখ!

চারি বৎসর পূর্ব্বে ইংরেজী ১৯২৯ সালে 'দীপ ও ধূপ' প্রকাশিত হয়। নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত, অযত্নে নষ্টপ্রায়, ১৮৯৩ হইতে ১৯২৯ পর্য্যন্ত বিভিন্ন সময়ে লিখিত ও বিভিন্ন ভাবের কতকগুলি কবিতা একত্র করিয়া এই পুস্তক প্রকাশিত হয়; কবির হৃদয় ছিল মন্দির, কাব্য লেখা ছিল ঈশ্বরেরই আরাধনা, সুতরাং তাঁর কবিতার 'দীপ ও ধূপ' নামকরণ সার্থকই হইয়াছে।

দীপ ও ধূপের কবিতাবলীর সম্বন্ধে দুই তিনটি কথা বলা যায়। জনস্রোত হইতে দূরে জীবন কাটাইলেও যে-ভাবাবেগ দেশকে উদ্বেল ও চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল তাহা তাঁহাকেও স্পর্শ করিয়াছিল, তাঁহার চিত্তকে স্পন্দিত করিয়াছিল। সংশয়জীবন দেশভক্তের আশঙ্কাকুল জননীকে উদ্দেশ করিয়া তিনি বলিয়াছেন,—

মা জননি, ও ছেলেটি তোমার একার নয়।
'আমার' ব'লে শক্ত ক'রে
ওরে ঘরে রাখবে ধরে,
মা জননি, তাও কি কভু হয়?
দশের তরে, দেশের তরে,
বিশ্ব লাগি বিশ্ব ঘরে
শুভক্ষণে যারা জনম লয়,
ঘরের পরের নাইকো জ্ঞান,
সবার ব্যথায় ব্যথিত প্রাণ,
সবার কাজটা আপন ভাবে,
সবার বোঝা বয়,
নাইকো কুল, নাইকো জাতি,
দেবতাদেরই হবে জ্ঞাতি।
নিজের পুণ্যে পরের পাপ
ক্ষয়ে যারা ক্ষয়,
একটি ঘরের গণ্ডী মাঝে
তারা কি মা রয়?
অনেক মায়ের ছেলে যে সে
একলা তোমার নয়।

কারাগারে দেশবন্ধু ও সুভাষচন্দ্রকে দেখিয়া তিনি তাঁহাদের আত্মত্যাগের মহত্বে মুগ্ধ হইয়া দেশবন্ধুকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন,—

মতে বা চিন্তায়
নাও যদি দিতে পারি পরিপূর্ণ সায়,
তবু তব হৃদয়ের মহত্বের স্বাদ
লভিয়াছি, অমৃত সে, করি ধন্যবাদ।

বাইকমে ও তারকেশ্বরে সত্যাগ্রহ তাঁহার চিত্তকে বিচলিত করিয়াছিল, আবার অসহযোগ প্রচারকের সত্যপথ হইতে স্খলন দেখিয়া তাহাকে তিরস্কার করিতে ছাড়েন নাই, বলিয়াছেন, একি করিতেছ?

বিদেশী দাসত্ব হ'তে উদ্ধারিতে হায়
নূতন দাসত্ব রজ্জু বাঁধিছ গলায়!

দেশসেবককে বিপথে যাইতে দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইয়াছেন, বলিয়াছেন, দেশের কাজ করিতে হইলে সন্ন্যাসী চাই, লোভীকে দিয়া কাজ হইবে না, কাজ করিবে তারাই,

দেশের মানুষে যারা ভালবাসে খাঁটি,—
দেশ তো মানুষ দিয়া, নহে দিয়া মাটি।

দেশের ভক্তি কিন্তু তাঁহাকে কখনও প্রেমের পথ হইতে, শান্তির পথ হইতে ভ্রষ্ট করে নাই।

নূতন যুগে প্রভাত নব।
আবার আমরা বাহির হব।
গেয়ে নূতন গান;
দেশের সাথে মিলবে দেশ
কালের ঘুচবে কালো বেশ
আলোয় ক'রে স্নান।

পুনরায় বলিয়াছেন,—

যুক্ত আছে সর্ব্ব নর, দেশ দেশান্তরে,
যুক্ত আছে গত, বর্ত্তমান;
অন্ধ সে, যে এ বন্ধন অস্বীকার করে,
আনে হিংসা, আনে অকল্যাণ।
স্বদেশীরে ভালবাসি, বিদেশীরে তাই
নাহি মোর অপ্রীতি, বিদ্বেষ;
মানব সর্ব্বত্র দুঃখী মানবের ভাই,
সর্ব্বত্র দারিদ্র্য, পাপক্লেশ।

তাই তিনি ধরায় দেবতা চাহিয়াছেন, বলিয়াছেন,—

ত্রিদিবে দেবতা নাও যদি থাকে,
ধরায় দেবতা নহিলে নয়।

বর্ত্তমান নারীজাগরণের যুগ। বহুভাবে সামাজিক, রাজনৈতিক আন্দোলনের ভিতর দিয়া, গত দশ বৎসরে যে-ভাবে নারীজাগরণ হইয়াছে ও হইতেছে তাহার সম্বন্ধে কি এই নারীকবির ভাবিবার কিছুই ছিল না? নারীনিগ্রহের সংবাদ পাইয়া তিনি কিভাবে ক্ষুব্ধ হইতেন! বাক্যবণিককে তিনি দু-চক্ষে দেখিতে পারিতেন না, যারা কাগজে কলমে বক্তৃতায় গানে দেশ উদ্ধার—তথা নারীনিগ্রহের প্রতীকার করিতে চায়, তাহাদিগকে তিনি ধিক্কার দিয়াছেন, লেখনী ও মসি দিয়া প্রেয়সীকে বাঁচান যাইবে না, তাহাদিগকে বাঁচাইতে হইলে বীর্য্য-অসি ও চরিত্রের তেজ চাই। দিতে হইবে জ্ঞানের আলোক, ন্যায় বিচার, দেহ প্রাণ দৃঢ় করিবার সকল সুযোগ সুবিধা, যাহাতে তাহারা চিরদিন ভয়েই না মরিয়া থাকে। নারীজাগরণে তাই তাঁর মনে একটা উল্লাস জন্মিয়াছিল, বলিয়াছিলেন, এইবার নারী-আত্মা বুঝি জাগিল, জগদ্ধাত্রী জগন্মাতা রূপে নারী বুঝি সন্তানের আগে দাঁড়াইল, মুক্তি-অনুরাগে যজ্ঞবেদীর পুরোভাগে সে ঐ ছুটিয়াছে, শাসনের দড়িদড়া, দাসত্বের হাতকড়া কিছুই তাহার গতিরোধ করিতে পারিল না। এই প্রসঙ্গে তাঁহার 'ঠাকুরমার চিঠি' বিশেষ উল্লেখযোগ্য, তাহাতে সরসভাবে তিনি নারীর কর্ত্তব্যের বিভিন্ন দিক্ দেখাইতে চাহিয়াছেন। ঠাকুরমা চাহিয়াছেন, ফ্যাশানের ব্যসনের বিষপানে মুগ্ধ না হইয়া নারী দেখুক তাহার কি বিশাল কর্ত্তব্যভার পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার হাতে মানুষ হইবে যে-ছেলে, সে প্রকৃতই মানুষ হইবে, আপন বোনের নিষ্কলঙ্ক মুখ মনে করিয়া পরের বোনের গায়ে পঙ্ক দিতে সে সঙ্কুচিত হইবে। হাট ঘাট রাজপথ কর্ম্মক্ষেত্র করিলে গৃহ যে লক্ষ্মীহারা হইবে, পারিবারিক বন্ধন যে শিথিল হইবে। ঠাকুরমার এই কথার উত্তরে নাতিনীর জবাব আসিল,

বিনা পুত্র পতি
ভাবিবার নাহি কিছু? নিজপুত্র হিতে
সহস্র পুত্রের কথা না হয় ভাবিতে?
যে দেশ আমার দেশ, তাহার কল্যাণ
শুধু গৃহকোণে বসি যদি করি ধ্যান,
তাহাই যথেষ্ট হবে?

নবযুগের নারী যে নানা দিক দিয়া আত্মার বিকাশ চাহিতেছে তাহার দাবি এই,

জায়া, মাতা হতে সবে পারি কি না পারি
সর্ব্বাগ্রে আমরা নারী, সর্ব্বশেষে নারী।

নাতবৌ অন্য উত্তর দিয়াছেন,—

আসল কথাটি এই—পুরুষে যা চায়
নারী তাই হতে পারে, তাই হ'য়ে যায়।

এইভাবে নারী-আন্দোলনের বিভিন্ন দিক দেখান হইয়াছে,—ইহার আনুষঙ্গিক ফল গৃহকর্ম্মে ও পারিবারিক ধর্ম্মে শিথিলতা, মানুষ-হিসাবে নিজের কর্ত্তব্যবুদ্ধির উদ্বোধন, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে পুরুষের মনে যে অভাববোধের সৃষ্টি, সেই অভাবের পূরণ, এই ভিন্ন ভিন্ন দিক কবি সরসভাবে দেখাইয়াছেন।

"দীপ ও ধূপে" প্রকাশিত কবিতাবলীর মধ্যে আর একটি নূতন দিক্ লক্ষ্য করিবার আছে, তাহা প্রাদেশিক বা গ্রাম্য ভাষায় রচিত কবিতা। কান্তকবি রজনীকান্ত তাঁহার সরস পদাবলীর মধ্যে হাসির গান গ্রাম্য ভাষায় রচনা করিয়াছেন, কিন্তু নিম্নে যে কয়টি পংক্তি উদ্ধৃত হইল তাহাদের করুণ রসের মধ্যে এমনি একটা সজীব ভাব আছে যে তাহার একটা সম্পূর্ণ নিজস্ব ধরণ স্বীকার করিতে হয়। বাখরগঞ্জের এক মুসলমান মাঝি নৌকাডুবি হইয়া মারা যায়; তাহার বিধবা স্ত্রী পুত্রকে আর নৌকায় পাঠাইতে সাহস করিত না। কিন্তু বালক পূর্ব্বকথা ভুলিতে পারিল না; গভীর রাত্রিতে নদীতে জোয়ার আসিতেছে, তখন ঘুমের মধ্যে সেই জোয়ারের শব্দে নদীর ডাক শুনিতে পাইল, সঙ্গে সঙ্গে তার পিতার ডাকও তাহার কাছে আসিয়া পৌছিল। বাহিরের যে ডাক মানুষকে মাতৃবক্ষনীড় হইতে কাড়িয়া লয় ইহা যে সেই ডাক।

গাঙ্গ যে মোরে বোলায় মাগো, গাঙ্গ মোরে বোলায়,
"আয় রে মাণিক, দোল খাবিরে ধলা ঢেউ দোলায়।
ঐ যে ঢেউর পাছে ঢেউ, তোরা দেখছ না কি কেউ?
মাথা তুল্যা, হাত বাড়ায়্যা, গাঙ্গ মোরে বোলায়—
মাগো, গাঙ্গ যে মোরে বোলায়।
আমি যখন নায়ে নায়ে কমু আসা যাওয়া
বাপজান যদি দোআ করে থামবে তুফান হাওয়া,
মাগো ধরুছি তোর পায়ে, কাইল যাইতে দিও নায়ে—
শোন্ তো মা, ও কার গলা?—"আয়রে মাণিক আয়।"
মাগো গাঙ্গ কি মোরে বোলায়?

* * *

আমি যখন সারেঙ্গ হমু, চালামু জাহাজ,
তোমার দিলটা ঠাণ্ডা হবে দেইখ্যা মোর কাজ,
আমার মনে লয়, বাপজান যেন কয়,
"মায়ের দুঃখ ঘুচাবি তো ঘর ছাড়্যা আয়—
মাগো আবার শোনা যায়—
"আয় রে মাণিক দোল খাবিরে ধলা ঢেউ দোলায়।"
গাঙই মোরে বোলায় নাকি বাপজানই বোলায়?
মাগো, বাপজানই বোলায়!

উপরে ছন্দের একটু বৈশিষ্ট্য আছে, শেষচরণের পূর্ব্বচরণে দুইটি মিল আছে—তাহা ভাবের সঙ্গে সমতা রক্ষা করিয়া অগ্রসর হইয়াছে।

ইং ১৯৩০ সালে তাঁহার অপ্রকাশিত ৬৪টি সনেট 'জীবন-পথে' নাম দিয়া প্রকাশিত হয়। এই সনেটগুলির মধ্যে অল্প কয়েকটি ভিন্ন আর সবই ছিল বহুবৎসর পূর্ব্বের রচনা; অন্তরের গভীর ভাবতরঙ্গের কতটুকু মানুষ প্রকাশ করিতে পারে?

আমারে কেমনে আমি খুলিয়া দেখাই,
হায় রে, সমস্ত মোর দেখাবার নয়।
কূলে কূলে আঁছাড়িছে যে তরঙ্গচয়
সাগরের গভীরতা নাই,—তাতে নাই।
দৃষ্টিবাণী হাস অশ্রু,—চাই কিনা চাই
দেখাইতে—ধরা পড়ে; তাহাতে কি হয়
তরঙ্গিত হৃদয়ের পূর্ণ পরিচয়?
কে তার আভাস দিবে অতলে যে ঠাঁই?

পঞ্চদশ বৎসরের বিবাহিত জীবনে যে ব্যাপক রসের আস্বাদ লাভ করিয়াছিলেন তাহা অতর্কিত কারণে একেবারে হারাইয়া ফেলিলেও পরলোকের আশায় ছিলেন, পাঁচ বৎসর পূর্ব্বেও যে লিখিয়াছিলেন,

আজ অশ্রু-আবরিত ক্ষীণ দৃষ্টি লয়ে
সেই সুদিনের তরে চেয়ে আছি পথ,
মোর দীর্ঘ তপস্যায় করুণার্দ্র হয়ে
দেবতা করুন পূর্ণ এই মনোরথ—
সেবি এই ধরণীরে, সুখে দুঃখে ভরা,
লোকান্তরে হই তব সখী যোগ্যতরা।

অন্তরের দেবতার কাছে তাঁর একটি মাত্র ভিক্ষা ছিল,

পালিতে নিদেশ, যোগ্য শক্তি যেন মিলে,
জীবনে বহিতে মৃত্যু তাও না ডরাই।

কামিনী রায় কবি ছিলেন, কিন্তু কথাশিল্পী ছিলেন না, বাছিয়া বাছিয়া শব্দ প্রয়োগ করা, বা শব্দপ্রয়োগের জন্য যত্ন স্বীকার করা তাঁর প্রকৃতিতে ছিল না। তাঁহার মধ্যে সকলের সঙ্গে মিশিবার যে একটা আগ্রহ ছিল, একটা democratic temperament ছিল, তাহাই কঠিন বা পেঁচাল ভাষা প্রয়োগের বাধা হইয়া দাঁড়াইত। তাই তিনি বলিয়াছেন:—

যারা দীন, মৌন মুখে
খাটে নিত্য দুঃখ সুখে
হাত দিয়া তাহাদের হাতে
কথা কব সহজ ভাষাতে।

ঠাকুরমার চিঠিতে তিনি সেই কথাই পাঠকসমাজে নিবেদন করিয়া গিয়াছেন—

মোটা মোটা কাপড় যেমন,
না হোক সৌখীন সজ্জা
শীত নিবারে, ঢাকতে পারে
কুলবধূর লজ্জা।

তিনিও বড় বড় ভাবের কথা যেমনই মনে আসিয়াছে, তেমনই বলিয়া গিয়াছেন। বহু বাগ্‌জাল বিস্তারে তাঁহার মত ছিল না,

বেশী কথা বলিও না, বলায়ো না মোরে;
কথা না দেখায় পথ।

তাঁহার মধ্যে বরাবরই একটা সঙ্কোচ ছিল, "পাছে লোকে কিছু বলে" তাই জীবনের প্রথমের রচনা; কিন্তু ক্রমে ক্রমে সে সঙ্কোচ কাটাইয়া উঠিতেছিলেন, ভাবিতেছিলেন, এ ত আমার গান নহে, যদি কিছু খ্যাতি, তৃপ্তি অর্জ্জন করিয়া থাকি তবে সে তৃপ্তি বিশ্ব-আত্মার, সে খ্যাতি গ্রহীতার মত দাতারও বটে।

আমার এ গান যদি ভাল লেগে থাকে।
হে সুহৃৎ, সাধুবাদ কোর না আমাকে।
নিভৃত অন্তরে তব আছে যেই কাণ
সেথায় নীরবে কত ঘুমাইছে গান,
একটি যে গীতস্পর্শে উঠেছে জাগিয়া
আমার সে গীত ছিল তাহারি লাগিয়া।

সকল প্রিয়জনের বিয়োগ-ব্যথায় হৃদয়ের অশ্রুজলে বহুবার ধৌত তাঁহার 'শ্রাদ্ধিকী'; তাহার ভূমিকায় তিনি বলিতেছেন,—

মৃত্যু যখন প্রিয়জনকে কাড়িয়া লয়, তখনই, জীবন হইতে কতখানি প্রেম, কতখানি আনন্দ হারাইলাম, একবার ভাল করিয়া বুঝিতে পারি। চরিত্রের যে মহত্ব, যে সৌন্দর্য্য, হৃদয়ের যে প্রীতি ও সহানুভূতি, আত্মত্যাগের কঠোরতার সহিত আত্মবিস্মৃতির যে অপূর্ব্ব মধুরতা, অতি নৈকট্যবশতঃ দেখিয়াও দেখি নাই, নিত্যব্যবহৃত বস্তুর ন্যায় যাহা বড়ই অভ্যস্ত হইয়া , মৃত্যুর বিদ্যুতালোক শোকাশ্রুর ভিতর দিয়া, তাহা আমাদের সম্মুখে উজ্জ্বল হইয়া প্রকাশ পায়। এই জন্য বিচ্ছেদ ও শোকের মধ্যেই আমরা প্রিয়জনের প্রকৃত মূর্ত্তি দেখিয়া, তাঁহাদিগকে ভাল করিয়া চিনিয়া লই। জীবনে তাঁহাদিগকে পদে পদে অবিচার করিয়া, মৃত্যুর পর অনুতাপ অশ্রুপাত ও গুণ স্মরণ দ্বারা কৃত অপরাধের কিঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত করিতে চেষ্টা করি।

আজ তাই লোকান্তরিত কবিহৃদয়কে ভাল করিয়া চিনিবার আমাদের এই চেষ্টা, গুণদোষ বিচারের নয়, তাঁহার সমগ্র দানটির স্বরূপ উপলব্ধি করিবার। তেজস্বী পিতার কন্যা, তেজস্বী স্বামীর পত্নী, শুদ্ধহৃদয়া কবি কামিনী রায় বয়সে যখন প্রবীণা, তখনও সরসতা হারান নাই, নবীনের অভিযান দেখিয়া ভীত হন নাই, যাহা আসিতেছে তাহাকে পূত করিয়া, সংস্কৃত করিয়া লইবার তাঁহার ক্ষমতা ছিল, তাঁহার দৃষ্টি সর্ব্বদা নিবদ্ধ থাকিত আত্মার উপর, দেহের অতীতে, অথচ তিনি নিছক কল্পনা লইয়া থাকিতে ভালবাসিতেন না। দেহের আশ্রয়ে যে চৈতন্য শক্তির অবস্থান, সকল কবিতায় সেই শক্তিই তাঁহার লক্ষ্য, এই লক্ষ্যের মহত্বই একটা উঁচু স্তরে তাঁহার আসন নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে।

শৃঙ্খল

কাপড় ছাড়িয়া মুখহাত ধুইয়া আসিয়া ঐন্দ্রিলা আলোটা নিবাইবে কি না ভাবিতেছে এমন সময় বাহিরে বারান্দায় হৃষীকেশের চটির শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। একটুখানি কাশিয়া দরজার বাহির হইতেই তিনি ডাকিলেন, "ইনু, ঘুমিয়েছ?"

তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া সে বলিল, "না মামাবাবু।"

হৃষীকেশ বলিলেন, "বীণা তোমার সঙ্গে ফেরেনি?"

ঐন্দ্রিলা তাড়াতাড়ি বলিল, "না, তবে এখুনি এসে পড়বে। আমরা সব দমদমা অবধি হেঁটে আসছিলাম, বৃষ্টির জন্যে পথে কোথাও আট্‌কা প'ড়ে থাকবে।"

শান্তস্বরে "আচ্ছা" বলিয়া হৃষীকেশ নিজের ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন। কিন্তু দুতলার সিঁড়ির পাশ হইতে হেমবালাকে চকিত ছায়া ফেলিয়া সরিয়া যাইতে দেখিয়া ঐন্দ্রিলা বুঝিল, ব্যাপার এত সহজে মিটিবার নহে।—প্রয়োজন হইলেই হেমবালার চিন্তাকে মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিবার ক্ষমতা এতদিনে সে অর্জ্জন করিয়াছিল, শুইয়া শুইয়া হৃষীকেশের বীণা সম্বন্ধে গভীর নিশ্চিন্ততাটিকে প্রদীপ্ত ধ্যানমন্ত্রের মত

করিয়া নিজের মনের সম্মুখে ধরিয়া রহিল। সত্যই ত দুশ্চিন্তার কোনও কারণ ঘটে নাই, নিজেকেও অকারণেই নানা ভয়-কল্পনা দিয়া এতক্ষণ সে পীড়িত করিয়াছে। প্রথমে কোনও সামান্য কারণে অজয়দের কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইয়া থাকিবে, বীণা সঙ্গে থাকিলে ওরূপ কারণ মিনিটে দশটা করিয়া ঘটিতে পারে; পরে দূর পল্লীর এক নির্জ্জন প্রান্তে বৃষ্টি তাহাদের পথরোধ করিয়াছে। ইহার মধ্যে অসাধারণত্ব কিছু ত কোথাও নাই।

অজয় যে সত্যই বীণাকে ভালবাসে না, আজই বিশেষ করিয়া সেই ধারণা কেন জানি তাহার মনে বদ্ধমূল হইয়া গেল। প্রথম পরিচয়ের দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত অজয়ের সমস্ত বাক্য এবং ব্যবহারকে মনে মনে ওজন করিয়া, বিশ্লেষণ করিয়া, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া বারম্বার সে সেই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে লাগিল। অজয় মুখ ফুটিয়া ঐন্দ্রিলাকে কোনও দিন কিছু বলে নাই। ঐন্দ্রিলা সম্বন্ধে মনোযোগের কিছুমাত্র বাড়াবাড়ি কখনও সে প্রকাশ করে নাই। কতদিন ঐন্দ্রিলাকে সামান্য একটু কুশল-প্রশ্ন পর্য্যন্ত সে করিতে ভুলিয়াছে। তবু কোন এক রহস্যময় উপায়ে তাহার নীরবতা, তাহার অমনোযোগ, তাহার অসৌজন্যের মধ্য দিয়াই ঐন্দ্রিলা সম্বন্ধে তাহার বিশেষ মনোভাবটি যেন প্রকাশ পাইয়াছে। ইহা ভিন্ন তাহার চোখের সেই কেমন এক রকম গভীর দৃষ্টি। ঐন্দ্রিলা আর সব-কিছুকে নিজের ভুল বলিয়া স্বীকার করিতে পারে, সেই দৃষ্টিকে কখনও সে ভুল করে নাই, করা সম্ভবই নহে।

নিজেকে সঙ্গে সঙ্গে ইহাও সে বুঝাইল, অজয় তাহাকে ভালবাসুক ইহা সত্যই সে কামনা করে না। নিরর্থক তাহাকে ভালবাসিয়া একটা মানুষ দুঃখ পায়, ইহা কেন সে চাহিবে? অজয়ের প্রেমের প্রতিদানে তাহাকে কিছুই ত সে দিতে পারিবে না? কিন্তু তাহার স্বভাবে তাহার আশৈশবের সত্যনিষ্ঠা। সত্য যত অপ্রীতিকরই হউক, নিজের কাছে তাহাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া লইতেই সে চায়। বীণা এবং অজয়কে অবলম্বন করিয়া এই যে চতুর্দ্দিকে মিথ্যার জাল বোনা হইতেছে, ইহাকে স্বীকার করিয়া লওয়াও ত মিথ্যাচার, তাহাই বা সে কেন করিতে যাইবে?

হঠাৎ ঝড়ের একটা ঝঙ্কার মত ঘরে ঢুকিয়া দুম্ করিয়া দরজাটাকে ঠেলিয়া বন্ধ করিয়া বীণা বলিয়া উঠিল, "ঘুমোওনি এখনও ইলু?"

অজয় সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইয়াই বীণাকে ঐন্দ্রিলা মনে মনে ক্ষমা করিয়া রাখিয়াছিল, বিছানায় উঠিয়া বসিয়া বলিল, "ঘুমোবার জো রেখেছ কিনা? কি হচ্ছিল এত রাত্ত ধ'রে?"

বীণা প্রায় রুদ্ধশ্বাসে বলিল, "সব বল্‌ছি।"

ঐন্দ্রিলা বলিল, "বোলো এখন, আমি ত পালিয়ে যাচ্ছি না। আপাততঃ ভিজে জামা-কাপড়গুলো ছাড়ো ত। কি ক'রে এলে, সাঁতরে?"

বীণা বলিল, "প্রায় তাই। গড়পাড়ের এদিক্‌টায় নৌকোয় এলে তাড়াতাড়ি বাড়ী আসা যেত। মোটরের এঞ্জিনে জল ঢুকে সে যা কাণ্ড!"

ঐন্দ্রিলা বলিল, "কার মোটরে এলে?"

বীণা বলিল, "ঐ যা, নামটা জিজ্ঞেস করা হয়নি। তা চেহারাটা দে'খে রেখেছি ভাল ক'রে। গাল-পাট্টা দাড়ি, মাথায় কালো কাপড়ের পাগ্‌ড়ি—"

ঐন্দ্রিলা বলিল, "বেশ কিছু টাকার শ্রাদ্ধ ক'রে এসেছ বোঝা যাচ্ছে।"

বীণা বলিল, "শ্রাদ্ধটা আমি করিনি, ওটা করেছেন অজয়-বাবু, আমি শ্রদ্ধার দানটা গ্রহণ করেছি।"

ঐন্দ্রিলা বলিল, "বড় কাজই করেছ। ভদ্রলোকের বুঝি অনেক টাকা, না?"

বীণা বলিল, "সত্যিই ত, ও কথাটা ভেবে দেখিনি।

ঐন্দ্রিলা বিছানা ছাড়িয়া নামিয়া পড়িল। বলিল, "আচ্ছা ভেবো এখন, পরে। সম্প্রতি ভিজে কাপড়গুলো ছাড়ো। এই ত সেদিন জ্বর থেকে উঠেছ।"

"এই ছাড়ছি", বলিয়া বীণা বিছানার একপাশে আসিয়া বসিয়া পড়িল। "কি করছ? বিছানাটাকে সুদ্ধ দিলে ভিজিয়ে" বলিয়া ঐন্দ্রিলা হাঁহাঁ করিয়া উঠিতেই সেও উঠিয়া পড়িল, তারপর নিজের মনে একটু হাসিয়া আলনার কাছে গিয়া কাপড় বদ্‌লাইতে প্রবৃত্ত হইল।

ঐন্দ্রিলা বলিল, "তোমার এমন ভাবান্তর ত প্রায় দেখা যায় না, কি হয়েছে তোমার আজ? ট্যাক্সি ভাড়া কত হয়েছে খোঁজ নিয়েছিলে? কতদূর থেকে আসছিলে?"

বীণা বলিল, "তা বেশ অনেক দূর থেকেই। মনমানার সেই পুরনো দীঘিটা মনে আছে? সেই যে ভাঙা বাড়ীটার ধারে, বনের মধ্যে, ইস্কুল থেকে যেখানে একবার আমরা outing করতে গিয়েছিলাম?"

নির্জ্জন তরুছায়াঘন নিবিড়তার মধ্যে এত রাত্রি পর্য্যন্ত বীণাকে লইয়া অজয় একাকী ছিল একথা শুনিতে পাওয়া মাত্র ঐন্দ্রিলার বুকের মধ্যটা কেমন করিয়া উঠিল। এধরণের চাঞ্চল্যের সঙ্গে জীবনে তাহার পরিচয় এই প্রথম। শুষ্ক মুখে একটা ঢোঁক গিলিয়া কষ্টে উচ্চারণ করিল, "ভিজে কাপড়গুলো ছাড়ো।" নিজের এই আকস্মিক উত্তেজনার কোনও কারণ অনেক ভাবিয়াও সে স্থির করিতে পারিল না।

ভিজা জামাটার হুক খুলিতে খুলিতে বীণা শ্লথ দেহে টানিয়া টানিয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিল। জামা খুলিয়া চুলের বাঁধন আল্‌গা করিয়া দিল, আগুল্‌ফ-লম্বিত সিক্ত কেশরাশি গুচ্ছে গুচ্ছে পিঠের উপর ছড়াইয়া পড়িল। শাড়ীটাকে খুলিয়া তাল পাকাইয়া আল্‌নার নীচে ফেলিয়া রাখিল। বলিল, "আজ আর একটু হলে দুজনকেই মরতে হ'ত।"

ঐন্দ্রিলা পূর্ব্বের মত সহজ স্বর ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "কি হয়েছিল?"

গা হইতে ভিজা কাপড় আরও কতগুলি খুলিয়া ফেলিয়া বীণা নীচু হইয়া পায়ের কাছ হইতে সেগুলিকে কুড়াইতে কুড়াইতে বলিল, "বজ্রপাত!"

ঐন্দ্রিলা বলিল, "সত্যিকারের? কোথায়?"

বীণা বলিল, "ভাঙা বাড়ীটার ছাতে।"

অন্য সময় হইলে হয়ত ইহা লইয়া ঐন্দ্রিলা রসিকতা করিতে ছাড়িত না; কিন্তু আজ সে আবিষ্কার করিল, অজয় এবং বীণার প্রসঙ্গ লইয়া রসিকতা করিবার প্রবৃত্তিও তাহার চলিয়া গিয়াছে। আল্‌না হইতে একটি পাট করা রাতের কামিজ এবং একটি কোঁচানো সরুপাড় ঢাকাই শাড়ী পাড়িয়া সেগুলিকে কোলে করিয়াই বীণা আবার আসিয়া বিছানায় একপাশে বসিল। তারপর হঠাৎ নিজের কোলে মুখ গুঁজিয়া উচ্ছ্বসিত আবেগে হাসিতে লাগিল। সেই যে হাসি সুরু হইল, কিছুতেই তাহা আর থামিবার নাম করে না।

ঐন্দ্রিলা বিরক্ত হইয়া কহিল, "তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? এত হাসির কি পেলে হঠাৎ?"

বীণা বলিল, "ওকে আজ খুব জব্দ করা গেছে।" বলিয়া দাঁতে ঠোঁট কামড়াইয়া পরম তৃপ্তির হাসি হাসিতে লাগিল।

ঐন্দ্রিলা বলিল, "তুমি মানুষকে জব্দ করবে, এ আর একটা বেশী কথা কি? ঐ করতেই ত আছ সারাক্ষণ।"

বীণা হাসিতে হাসিতেই বলিল, "জব্দটা এবারে আমি অন্ততঃ ইচ্ছে ক'রে করিনি, ভয়ে একেবারে জ্ঞান হারিয়েছিলাম।"

ঐন্দ্রিলা তীব্রস্বরেই বলিল, "কি কীর্ত্তি ক'রে এসেছ শুনি?" তার পরমুহূর্ত্তেই নিজেকে সম্বরণ করিয়া লইয়া কহিল, "যাই ক'রে এসে থাকো, আমায় কিছু শোনাতে হবে না বাপু, শুনতে আমি সত্যিই চাই না।"

বীণা উচ্ছ্বসিত হাসির মধ্যে একটুখানি দম লইয়া কহিল, "না শোনাই ভাল।" তারপর কিছুক্ষণ হাসির অবশিষ্ট আবেগটুকুকে বহিয়া যাইতে দিয়া যেন নিজের মনেই বলিল, "এমন ভীষণ লাজুক, মারাত্মক কিছু একটা না ঘটলে কিছুতে ওর সাহস হত না।...আমার যেমন কপাল! মনের মতন একটা মানুষ যদি বা জুটল, আকাশ ভেঙে বাজ না পড়লে কিছুতেই আর তার সাড়া পাবার জো নেই। সাড়া আজকেই যে খুব পেয়েছি তা নয়, তবু যতটা পেয়েছি তাই যে পাব সে আশা কি ছিল? আমি যে খুসিই হয়েছি তা ত বুঝতেই পারছ। এখন কেবল ভাব্‌ছি, কপাল-জোরে আজকেই নাহয় বাজ একটা পড়েছে, এর পরে উপায় হবে কি? আমি ইচ্ছে করলেই ত যখন তখন বজ্রপাত বা ভূমিকম্প ঘটাতে পারব না?"

ঐন্দ্রিলা কহিল, "থাক্ থাক্, অমন বিচিত্র বেশ নিয়ে আর এত রসের গল্প করতে হবে না। শীগ্‌গির কাপড় বদলে নাও, আমার বাপু ভয়ানক ঘুম পেয়েছে।"

বীণা উঠিয়া বলিল, "তুমি শোও, আমি দরজা বন্ধ ক'রে আলো নিবব এখন।"

সেদিন বহুক্ষণ ধরিয়া বহুযত্নে সে প্রসাধন সম্পন্ন করিল। অনুকূল ভাগ্যের কাছে অমনই করিয়া নিজের কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিয়া যখন আলো নিবাইয়া শুইতে গেল তখন ঐন্দ্রিলা ঘুমাইতেছে, অন্ততঃ ঘুমাইতেছে মনে করিয়া তাহাকে আর ডাকিল না। কিন্তু অকস্মাৎ অন্ধকারে অল্প একটু পাশ ফিরিয়া ঐন্দ্রিলা কহিল, "হাসি থাম্‌ল তোমার?"

চাদরটাকে টানিয়া গায়ে দিতে দিতে বীণা কহিল, "হ্যাঁ, আজকের মত।"

ঐন্দ্রিলা আর একটুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "এত হাস্‌বার কি হয়েছিল শুনি?"

বীণা আবার হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "বাজ পড়ার শব্দে ভয় পেয়ে ওকে জড়িয়ে ধরেছিলাম।"

বীণার পিঠে সশব্দে একটি চপেটাঘাত করিয়া ঐন্দ্রিলা আবার পাশ ফিরিয়া শুইল। অনেক ডাকাডাকি করিয়াও বীণা ইহার পর আর তাহার সাড়া পাইল না। তখন হাসিতে হাসিতেই বলিল, "জড়িয়ে ধরাটা আমার দিক্ থেকেই কেবল হয়নি, সেটাও তাহলে ব'লে রাখি।" ঐন্দ্রিলা তবু সাড়া দিল না, কিন্তু অনেক রাত অবধি কি একটা ভয়ের মত আবেগে রহিয়া রহিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। কি যে ব্যাপার বীণা কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। কিন্তু আজ কোনও কিছু লইয়াই খুব বেশীক্ষণ ভাবা তাহার সাধ্য ছিল না, একটু পরেই নিদ্রার সঙ্গে পরিপূর্ণ বিস্মৃতি আসিয়া সব আড়াল করিয়া দিল।

প্রভাতে বুকের মধ্যে এক অনামা বেদনার ভার লইয়া ঐন্দ্রিলার ঘুম ভাঙিল। যেন দুঃস্বপ্ন দেখিয়া পীড়িত হইতেছিল, নিদ্রাভঙ্গে স্বপ্নের মূর্ত্তিটা ভুলিয়া গিয়াছে, বিভীষিকার অবশেষটুকু মনে আছে। পূবদিকের তিনটা জানালার একটা তাহারা সর্ব্বদাই খুলিয়া শুইত, কাল ঝড় বাদলের জন্য সেটাও বন্ধ করিয়া শুইয়াছিল, তবু ঘরের মধ্যে সমস্ত-কিছু পরিস্ফুট হইয়াই চোখে পড়িতেছে। বুঝিল, মেঘ কাটিয়া গিয়াছে। কিন্তু উঠিয়া গিয়া বারান্দার দিকের দরজাটা খুলিয়া দিতে তাহার কেমন ভয় ভয় করিতে লাগিল। যেন সবকিছুর ঠিক সেই পূর্ব্বেকার মূর্ত্তি সে আজ আর দেখিতে পাইবে না; আকাশ, পৃথিবী, মেঘ, রৌদ্র, জীবনের আলোয় চোখ মেলিয়া অবধি যাহাকিছুর সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ঠতম পরিচয়, তাহাদের সকলেরই মধ্যে কি যেন এক প্রচ্ছন্ন প্রবঞ্চনা, আজ একমুহূর্ত্তে এতদিনকার সেই প্রবঞ্চনা ধরা পড়িয়া যাইবে।

অজয়কে সে ভালবাসে না, অজয়ের ভালবাসারও কোনও মূল্য যে তাহার কাছে আছে তাহাও নিজের মনে সে স্বীকার করিত না। তবু অজয়কে প্রথম পরিচয়ের দিন হইতেই সে শ্রদ্ধা করিত। তাহার কারণ, সে বিশ্বাস করিত, অজয় মনে যাহা অনুভব করে বাক্যে এবং ব্যবহারে কখনও তাহার অন্যথাচরণ করে না। অজয়ের সমস্ত বাক্য, সমস্ত ব্যবহারকে সে তাই একটি বিশেষ মূল্যে মূল্যবান্ করিয়া দেখিত। আজ তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, সে প্রবঞ্চিত হইয়াছে। তাহার মনের শ্রদ্ধাকে প্রথম হইতেই অজয় ফাঁকি দিয়া লইয়াছে। পৃথিবীর অপর যে-কোনও মানুষেরই মত নিজের আসল মূর্ত্তিটি লুকাইয়া চলাই অজয়েরও স্বভাব।

বীণা ঘুমাইতেছিল, অন্যদিনের মত আজ আর তাহাকে সে ডাকিয়া উঠাইল না। পরীক্ষার পড়ার তাড়া ছিল, তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুইয়া বই লইয়া বসিল। জোর করিয়া মনটাকে বাঁধিয়া ফেলিল। পৃথিবীতে শ্রদ্ধার যোগ্য মানুষ যদি কেউ নাই থাকে ত তাহা লইয়া দুঃখ করিয়া হইবে কি? পিতাকে দেবতার আসনে বসাইয়া পূজা করিত, কিন্তু মা এমন অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছেন যে তাঁহাকে ভাবিতে দুঃখ তাহার এখন ভয় করে। মামাবাবু বাকী আছেন, সে আশা করে শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাকে সে অটুট রাখিতে পারিবে। অজয়ের কথা কিছুতেই আর ভাবিবে না, এই সঙ্কল্পকে ধরিয়া থাকিতে গিয়াই সমস্ত দিন সে অজয়কে ভাবিতে লাগিল।

হেমবালা সেদিন কন্যা এবং ভ্রাতুষ্পুত্রী কাহারও সঙ্গেই ভাল করিয়া কথা কহিলেন না। এমন যে মন্দিরা, সেও কয়েকবার দিদিমাকে ডাকিয়া, তাঁহার শাড়ীর আঁচল ধরিয়া টানিয়া সাড়া না পাইয়া মুখ কালো করিয়া তাহার আয়ার কাছে ফিরিয়া গেল। ঐন্দ্রিলা এসমস্তই লক্ষ্য করিল, এবং সঙ্গেসঙ্গেই মন হইতে সব ঝাড়িয়াও ফেলিয়া দিল। কিন্তু বিকাল অবধি হেমবালাকে বার-পাঁচেক হৃষীকেশের মহলে আনাগোনা করিতে দেখিয়া তাহার একেবারেই ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। বীণা রান্নার ভাঁড়ারকে ব্যস্ত ছিল, তাহাকে ছাতে ডাকিয়া লইয়া কহিল, "মা বোধহয় একটা কিছু গোল পাকাবার চেষ্টায় আছেন।"

বীণা কহিল, "কি ক'রে বুঝলে?"

ঐন্দ্রিলা কহিল, "সকাল থেকেই ঘনঘন মামাবাবুর মহলে যাতায়াত চল্‌ছে।"

বীণা কহিল, "ও! তা ত জানিই। বাবা আমাকে একবার ডেকেও পাঠিয়েছিলেন।"

ঐন্দ্রিলা কহিল, "তাই নাকি? কই আমাকে ত কিছু বলনি।"

বীণা কহিল, "তুমি সকাল থেকে যেরকম মুখ ক'রে আছ, তোমার কাছে এগুতেই ভরসা পাইনি।"

ঐন্দ্রিলা কহিল, "কালকের ব্যাপার নিয়ে কথা ত? তা তোমাকে কি বললেন মামাবাবু? ফাঁসী দিতে চাইলেন?"

বীণা কহিল, "উঁহু। বল্লেন, তোমার পিসীমা এখনকার দিনের আদব-কায়দায় ত অভ্যস্ত নন্। তোমাদের কোনও ব্যবহারে তাঁর খুব বেশী খট্কা না লাগে এইটে তোমরা দেখো।"

ঐন্দ্রিলা কহিল, "তুমি কি বল্লে?"

বীণা কহিল, "আমি বললাম, তা পিসীমাদের সময়কার আদব-কায়দায় আমরাও ত অভ্যস্ত নই, কিসে তাঁর খটকা লাগ্‌বে বা লাগ্‌বে না তা আমরাই বা কি ক'রে বুঝ্‌ব?"

ঐন্দ্রিলা কহিল, "মামাবাবু শুনে হাস্‌লেন বুঝি?"

বীণা কহিল, "হাসির কথা শুনে বাবাকে হাস্‌তে কবে দেখেছ? অত্যন্ত গম্ভীর মুখ ক'রে বল্লেন, তুমি যা বলছ তাও সত্যি, তারপর চশমাটাকে নাকে তুলে দিয়ে বইয়ের ওপর ঝুঁকে বস্‌লেন।"

বৃদ্ধ-সম্পর্কিত একটি প্রীতি-স্নিগ্ধতা ভরা অনাবিল হাসির স্রোতে দুই বোনের মনের মধ্যেকার বিরূপতার আড়াল কোথায় নিশ্চিহ্ন হইয়া ভাসিয়া গেল।

বীণা কহিল, "কিন্তু পিসীমাই নাহয় এখনকার দিনের আদব-কায়দা জানেন না, যাঁরা জানেন তাঁরাও যে বড় সহজে ছেড়ে কথা কইবেন তা মনে কোরো না।"

ঐন্দ্রিলা কহিল, "আমি তা মনে করিনি। আমার সে ভয় তোমার চেয়ে বেশীই বরং আছে তা তুমি জানো। কেন, তারও পরিচয় পেলে নাকি কিছু?"

বীণা বলিল, "আজকের সন্ধ্যার আসরে একজনও কারও শুভাগমন হয়নি, লক্ষ্য করনি?

ঐন্দ্রিলা কহিল, "লক্ষ্য করিনি, কিন্তু তুমি বল্লে ব'লে এখন তাই মনে হচ্ছে বটে। তুমি বল্‌তে চাচ্ছ কালকের ব্যাপার নিয়ে বাইরেও কথা উঠেছে?"

বীণা কহিল, "উঠল ত বয়েই গেল।—কেউ আর আসুবে না, এই ত? তা না এলে আমি ত বাঁচি। সবাই আসেন আড্ডা দিতে, হাঙ্গাম পোয়াতে হয় ত আমার। কিন্তু আমি ভাবছি, সুভদ্রবাবুদের কি হল! লোকের কথায় ভড়কে গিয়ে আত্মজনকে ত্যাগ করবেন এমন আদর্শ-চরিত্র মানুষ তিনি ত অন্ততঃ নন্?"

পরদিন ভোরে ঐন্দ্রিলার নামে ডাকে সুভদ্রের একখানি চিঠি আসিল। সে লিখিয়াছে:

"তর্কে আপনারই জিত হয়েছে। হার-জিত এত শীগ্‌গির সাব্যস্ত হবে তা কিন্তু আমি মনে করিনি। প্রিয়ম্বদা ভোর থেকে কোর্টের কাগজপত্র দেখবার অবসর পাননি, তাঁর বাড়ীতে কোর্ট বসেছে। যে ক্লাব নিজে থেকেই উঠে গিয়েছে, হঠাৎ তাকে উঠিয়ে দেবার জন্যে বিশ্বসুদ্ধর উৎসাহ যদি দেখতেন।

"আমি আপনাকে এই চিঠি লিখছি এইজন্যে যে আমি এতদিন পরে সত্যিই আমার ভুল বুঝতে পেরেছি এবং যেহেতু আমার মতবাদ নিয়ে একদিন আপনার কাছেই সব-চেয়ে বেশী জোরের সঙ্গে আমি গর্ব্ব করেছিলাম, আপনার কাছেই সর্ব্বাগ্রে আমার ভুল স্বীকার করা উচিত।

"প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ক্লাবটাকে formally আজ থেকে উঠিয়ে দিচ্ছি। এদিক্ দিয়ে কিছু গ'ড়ে তোলবার আমার সমস্ত চেষ্টাই যে পণ্ডশ্রম তা কিছুদিন থেকে মনেমনে আমি অনুভব করছিলাম। আজ এ ধারণা আমার দৃঢ় হয়েছে, যে, মানুষে মানুষে সম্পর্কের মধ্যে আধাআধি রফার মত এমন বিড়ম্বনা আর কিছু নেই। আমি যাদের নিয়ে দল গড়তে চেয়েছিলাম, শেষ অবধি তাদের মধ্যে অনেকে পরস্পরকে চিন্‌তও না। যে পরস্পর-পরিচয়ের সূত্র ধ'রে প্রীতিতে সহানুভূতিতে সমাজ-জীবন সার্থক হয়, তার অত্যন্ত মারাত্মক অভাব আমার এই ছোট দলটির মধ্যে ছিল। কিন্তু কেবল আমরা দলটিকে দোষ দিলে হবে কি? এ অভাব দেশের সর্ব্বত্র। আমরা সভাসমিতিতে যাই, নিজের জায়গাটিতে ব'সে বক্তৃতা শুনি। উপাসনালয়ে যাই, নিজের জায়গাটিতে ব'সে বক্তৃতা শুনি। সামাজিক মিলনের ক্ষেত্রেও নিজের জায়গাটিতে ব'সে বক্তৃতা দিই বা বক্তৃতা শুনি। নিজের আশেপাশের মানুষগুলির মনের মধ্যে তাকিয়ে দেখি না। দশহাত ব্যবধান মাঝে রেখে কচিৎ যে কটাক্ষের খেয়া-পারাপার চলে, সেটা সমাজ-চৈতন্যের জিনিষ নয়, সমাজ-

সৃষ্টির পূর্ব্বেও পৃথিবীতে তার অস্তিত্ব ছিল। আসলে ও জিনিষ অসামাজিক এবং কোনো কোনো হিসাবে নরনারীর পরস্পরের প্রতি অশ্রদ্ধার দ্যোতক। আমি আজ খুব জোরের সঙ্গে অনুভব কর্‌ছি, নরনারীর পরস্পরের সম্বন্ধে এই অসামাজিক অশ্রদ্ধা অপরিচয় এবং অর্দ্ধপরিচয়ের মধ্যেই সব-চেয়ে বেশী প্রশ্রয় পায়।

"প্রিয়দাকে যাঁরা অনুযোগ করছেন তাঁদেরও আমি দোষ দিই না. কারণ আমি জানি, অর্দ্ধপরিচিতদের ঘনিষ্ঠ মিলনের যে সুযোগ সেদিন আমরা ক'রে দিয়েছিলাম তার অপব্যবহার হয়ত কোথাও কোথাও হয়েছে। ভবতোষদের এবং পুঁটিদের শেষ অবধি আমরা রাশ মানাতে পারিনি। আমার দুঃখ প্রিয়দার জন্যে। আপনাদের কথা ভেবেও দুঃখ পাচ্ছি, অকারণেই এই অপ্রীতিকর প্রসঙ্গে আপনাদের নাম জড়িয়ে গেল। প্রিয়দা আমাকে ক্ষমা কর্‌তে বাধ্য কেননা এসম্বন্ধে বহু পূর্ব্বেই তাঁর সঙ্গে আমার বোঝাপড়া হয়ে আছে। আপনাদের ক্ষমা চাইতে পারি সে-সাহস আমার নেই।

"আপনাদের করুণা উদ্রিক্ত করবার জন্যে লিখছি, আমার দু-একটি রোগিণী ছিলেন, চিকিৎসক হিসাবেও তাঁদের কাছে যাওয়া আমার নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। এঁদের একজনের কথা বলতে পারি, তাঁর অসুখটা মারাত্মক এবং আমার চিকিৎসায় তাঁর সেরে ওঠবার খুব বেশী সম্ভাবনা ছিল।"

হঠাৎ বীণার দিকে ফিরিয়া ঐন্দ্রিলা কহিল, "থাক্, অমন চমৎকার মুখ ক'রে আর তাকাতে হবে না। এই নাও, পড়।"

চিঠিটিকে আদ্যোপান্ত পড়িয়া আবারও তাহার স্থানে স্থানে চোখ বুলাইয়া লইয়া বীণা কহিল, "বেচারা সুভদ্রাবাবু!"

ঐন্দ্রিলা কহিল, "বেচারা কিজন্যে?"

বীণা কহিল, "অমনি খচ ক'রে লাগল! বেচারা এইজন্যে যে এত ত বুদ্ধিমান্ মানুষ, তবু একটা সহজ কথা এত কষ্ট ক'রে তাঁকে বুঝতে হল। কি লিখবে জবাবে?"

ঐন্দ্রিলা কহিল, "কি আবার লিখব? কিছুই লিখব না।"

বীণা কহিল, "না রে! ভদ্রলোক এত ক'রে ক্ষমা চেয়েছেন, তাও যদি সত্যিকারের অপরাধ কিছু হত। ক্ষমা করতে পারার এমন সুযোগ পুরুষমানুষের বেলায় ছাড়তে হয়? কিছু লিখবি না, কিরকম? আমি বলি, কাল বিকেলে চা খেতে ব'লে চিঠি লিখে দে।"

ঐন্দ্রিলা কহিল, "সে কাজ ত তোমার, তুমিই তাহলে কর।"

বীণা কহিল, "খুব যে সাহস বাড়ছে দেখছি। কাজের ভার আমাকে যদি দাও, অমি নিজের মত ক'রে করব। স্বয়ং গিয়ে ধ'রে নিয়ে আসব।—অজয়বাবুকেও অবিশ্যি আন্‌ব সেই সঙ্গে।"

ঐন্দ্রিলা কহিল, "তোমাকে বাধা দেবে কে?"

বীণা রন্ধনের তত্ত্বাবধান সমাধা করিতে নীচে চলিয়া গেলে দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া সুভদ্রের চিঠিটি আবার একবার সে পড়িয়া দেখিতে বসিল। চিঠিটির কোনো কোনো কথা হঠাৎ তাহার মনে লাগিয়াছে।

সে রাত্রিতে বাড়ী ফিরিয়া অজয় বুঝিতে পারিল, বজ্রপাত ভাঙা বাড়ীটার ছাতেই কেবল যে আজ হইয়াছে তাহা নহে তাহার জীবনের মাঝখানেও হইয়াছে। অথচ তাহার অন্তর্য্যামী জানেন এতবড় শাস্তি একটুও তাহার পাওনা নয়। বীণাকে তাহার ভাল লাগে একথা ত নিজের কাছে কখনও সে অস্বীকার করে নাই; খুব বেশী ভালই লাগে, কিন্তু তাহার হৃদয়ও ত নিঃসংশয় ভাবেই জানে, এই ভাল লাগার মূলে ঐন্দ্রিলা কতখানি। কিন্তু পৃথিবীর মানুষ কি আজ আর তাহা বিশ্বাস করিবে? ঐন্দ্রিলা বিশ্বাস করিবে?

বীণার সম্বন্ধে তাহার চিত্তগতি অত্যন্ত সহজ স্রোতেই চিরকাল বহিয়াছে। তাহার সম্বন্ধে কোনও সতর্কতা অবলম্বন করার প্রয়োজন কোনওদিন সে অনুভব করিত না, আজও করে নাই। বিমানের সঙ্গে, নন্দের সঙ্গে তাহার যে দ্বিধাহীন অসঙ্কোচ সম্পর্ক, বীণাকেও তেমনই সম্পর্কের মধ্যে কেন সে কাছে পাইবে না এ প্রশ্ন বারম্বার নিজেকে সে করিয়াছে। অবশ্য বীণা নারী, সেকথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হওয়া তাহার সাধ্য ছিল না, কিন্তু হওয়া কর্ত্তব্যও হইত না। বেচারি বীণা! অজয় না থাকিলে ভয়েই আজ হয়ত তাহার হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যাইত। তাহাকে আশ্রয় না দিয়া, নিষ্ঠুর হইয়া বুকের কাছ হইতে

দূরে ঠেলিয়া দিলেই বুঝি মনুষ্যত্বের পরাকাষ্ঠা হইত? এক ভয়াতুরা বিপন্না নারী, একটু আগে যে তাহাকে বন্ধু বলিয়া সম্ভাষণ করিয়াছে, ঐরূপেই বুঝি তাহার প্রতি পুরুষের কর্ত্তব্য, বন্ধুর কর্ত্তব্য করা হইত?

বীণার কথাও বলিতে হয়, ভয়ের প্রথম আবেগটা কাটিয়া যাইবামাত্র সেও অজয়কে মৃদু অথচ দৃঢ় হাতেই দূরে ঠেলিয়া দিয়াছিল। অজয়ও তাহাকে বাধা দেয় নাই। তারপর হইতে দুজনেই তাহারা এমন ব্যবহার করিয়াছে যেন মাঝখানকার এই কয়েকটা মুহূর্ত্ত সত্যসত্যই তাহাদের জীবনে আসে নাই, অথবা আসিয়া থাকিলেও তাহা লক্ষ্য করিবার মত কিছু নহে।

কিন্তু অন্যায় করে নাই, যত জোরের সঙ্গে নিজেকে তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল তত বেশী করিয়া তাহার বুকের ভিতরটা চঞ্চল হইয়া উঠিতে লাগিল। সে জানিত না, ঐন্দ্রিলা সত্যসত্যই কতখানি তাহার মনকে জানে। সামান্য একটু চোখের দৃষ্টির বিনিময়ে, ব্যবহারের একটু বিশেষ সলজ্জ আড়ষ্টতায় তাহার হৃদয়ের কত গভীর রহস্যই ঐ বুদ্ধিমতী মেয়েটির নিকট প্রকাশ হইয়া গিয়াছে। তাই, হয়ত যে কিছুই জানে না, বীণার কাছে ভুল জানিয়া ভুল বুঝিয়া তাহার চিত্ত পাছে চিরদিনের মত বিমুখ হইয়া যায় এই ভয়ে অজয়ের বুকের রক্ত হিম হইয়া জমিয়া যাইতে লাগিল। তাহার জীবনে সমস্যা-সংশয়ের যেন অভাব ছিল, তাই আজ আবার এই এক অভিনব এবং বিচিত্র সমস্যার উদ্ভব হইল। ক্লান্তিতে এমনইতেই তাহার দেহমন অবসন্ন হইয়া আছে, দুই পায়ের উপর সোজা হইয়া দাঁড়াইতে যাহার ক্লেশ বোধ হয়, সে কি শক্তি লইয়া এই সমস্যার সঙ্গে সংগ্রাম করিবে? তাহার সমস্ত অস্তিত্ব একটুখানি বিশ্রামের জন্য ক্ষুধিত হইয়া ছিল, স্থির করিল, সম্প্রতিকার মত আবার পলাইয়া আত্মরক্ষা করিবে।

হয়ত একটি সুখস্পর্শের স্মৃতি গোপনে গোপনে তাহার বুকের তারে অতি মৃদু করুণ সুরে আঘাত করিতেছিল, হয়ত নিজের কোনও ক্ষণিক দুর্ব্বলতাকে প্রাণপণে নিজের কাছে সে অস্বীকার করিতেও চাহিতেছিল, যে কারণেই হউক, নিজের চতুর্দ্দিকে নির্লিপ্ততার প্রাচীর রচিত করিয়া তাহার মধ্যে অতঃপর সে আত্মরক্ষা করিল। স্থির করিল, ধারাবর্ষণের শীতল আর্দ্রতার মধ্যে একটুখানি সুকোমল উষ্ণতায় যে-মানুষটা বীণার কমনীয় দেহের স্পর্শ পাইয়াছিল, সে অজয় নহে, আর কেহ। সে-মানুষটার সঙ্গে অজয়ের পরিচয় মাত্র চতুর্ব্বিংশ বৎসরের। অজয় যে তাহাকে চিরন্তন মনে করিতেছে, অন্তরতম মনে করিতেছে, ইহা মায়া।

কিন্তু দেখা গেল, দুপুর রাত্রি অবধি অজয় যে জলে ভিজিয়াছিল সে-জিনিসটা অন্ততঃ মায়া নহে। শেষরাত্রির দিকে সমস্ত শরীরে ব্যথা হইয়া জ্বর আসিল। মনে করিল, দুর্ব্বল শরীরে বহু উত্তেজনায় গাটা একটু গরম হইয়াছে, অল্পেতেই সারিয়া যাইবে। ফিরিয়া অবধি নন্দকে দেখিতে পায় নাই, হয় নিজেই কিছু না বলিয়া কোথাও সে চলিয়া গিয়াছে অথবা ঘটনাচক্র চলিয়া যাইতে তাহাকে বাধ্য করিয়াছে, পরদিন সমস্তদিন অনাহারে অন্ধকার গরাদে-দেওয়া স্যাঁৎসেঁতে ঘরটায় অজয় একলা পড়িয়া রহিল। বিকালের দিকে আগুনের মত হইয়া গা তাতিয়া উঠিল। এঁদো গলির এক মাথায় পোড়োবাড়ীর মত এই বাড়ীটা, কেউ যে সহসা এদিকে আসিয়া পড়িবে এমন ভরসা ছিল না। একবার ভাবিল, উঠিয়া গিয়া একটা গাড়ী ডাকে এবং কোনও রকম করিয়া সুভদ্রদের ওয়েলিংটন স্কোয়ারের বাড়ীতে চলিয়া যায়, কিন্তু সুভদ্রের সঙ্গে দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর কথার আদান-প্রদান সেদিন অতি সামান্যই হইয়াছিল। অজয় কেমন করিয়া জানিবে একেবারে সম্পূর্ণ করিয়া সুভদ্র তাহাকে ক্ষমা করিয়াছে কিনা।

রাত্রিতে ঘুমাইল, না অচেতন হইয়া রহিল, বুঝিতে পারিল না। সকালে উঠিয়া বুঝিল, আর ইচ্ছা করিলেও সুভদ্র বা অপার কাহারও আশ্রয়ে যাইবার তাহার উপায় নাই। সম্পূর্ণরূপে সে চলচ্ছক্তি-রহিত হইয়া পড়িয়াছে। কষ্টে উঠিয়া কুজা হইতে জল গড়াইয়া খাইতে গিয়া মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া গেল।

সমস্তদিন অর্দ্ধ-অচৈতন্য অবস্থায় কাটিল। যখনই ভাবিবার ক্ষমতা ফিরিয়া আসিল, উদ্ধারের নানা উপায় ভাবিয়া দেখিল। ভাবিল, প্রাণপণ জোরে চীৎকার করিবে, যদিই দূরের বড় রাস্তা বা আশপাশের কোনও বাড়ী হইতে কেহ শুনিতে পায়। কিন্তু সমস্ত বুকে এমন ব্যথা হইয়াছে, জোরে নিঃশ্বাস লইতে সুদ্ধ কষ্ট হয়। যদি পিওনটা কোনও

গলিতে আসিয়া পড়ে তবে তাহাকে দিয়া সুভদ্রকে সংবাদ দেওয়া যায়। কিন্তু পিওন কাহার চিঠি লইয়া আসিবে? যদি পিতার কাছ হইতে চিঠি আসে? পিতার কথা মনে হইতেই অজয়ের দুর্ব্বল বুকটা রুদ্ধ অশ্রুর বিপুল আবেগে শতধা হইয়া ভাঙিয়া যাইতে লাগিল। মনে পড়িল, তাহার সামান্য একটু মাথা ধরিলে উদ্বেগে তাহার বাবার আহারনিদ্রা ঘুচিয়া যাইত। একটুখানি তাহার গা তাতিলে তিনি মুহূর্ত্তের জন্য তাহার কাছছাড়া হইতেন না। যখন সে অনাহারে মরিতে বসিয়াছিল, তখন পিতার প্রতি কোনওদিন এতটুকু অভিমান তাহার হয় নাই, সে জানিত অবস্থাটাকে সে নিজে সাধ করিয়া ডাকিয়া আনিয়াছে, পিতাকে সেদিক্‌কার সমস্ত দায়িত্ব হইতে ইচ্ছা করিয়াই মুক্তি দিয়াছে। কিন্তু আজ যে সে সত্যসত্যই মরিতে বসিয়াছে, ইহা ত তাহার নিজের কোনও অপরাধের দরুণ হয় নাই।

ক্রমাগত ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া বুকের ব্যথা যখন আরও বাড়িয়া গেল তখন পিতার চিন্তাকেও জোর করিয়া মন হইতে দূর করিয়া দিল। বাহিরে মুষলধারে বৃষ্টি নামিয়াছে, অবিরাম বারিপাতের ঝর্ঝর শব্দকে কানে করিয়া দুর্ব্বল দেহে ঘুমাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল, ঘুম কিছুতেই আসিল না। এক-একবার তন্দ্রার মত ঘোর চেতনাকে আচ্ছন্ন করিয়া আসে, তখনই নিজের ঘোরতর বিপদের কথা মনে হইয়া চমকিয়া জাগিয়া যায়। মনটাকে শান্ত করিবার জন্য ঐন্দ্রিলাকে ভাবিতে চেষ্টা করিল, বুকের দ্রুত স্পন্দনের সঙ্গে মিলাইয়া সেই অপূর্ব্ব ধ্বনি-ঐশ্বর্য্য-ভরা নামটিকে বহুক্ষণ সে মন্ত্রের মত করিয়া জপ করিল। ক্রমে ভিতর এবং বাহিরের অন্ধকার ভরিয়া একটি আবেশময় সৌন্দর্য্যস্বপ্ন ধীরে তাহার চেতনাকে ঘিরিয়া মোহজাল বিস্তার করিল। আধঘুম আধ-জাগরণে আজও সে অনুভব করিল, এই অপরূপ আবেশ, তাহার চিত্তের এই আনন্দ-বেদনা-মিশান অভিনব ব্যাকুলতা ঐন্দ্রিলাকে ঘিরিয়া স্পন্দিত তরঙ্গিত হইতেছে বটে, কিন্তু ইহার কোথায় যেন বীণারও স্পর্শ অতি গভীর করিয়া রহিয়াছে। ঐন্দ্রিলার অনিন্দিত দেহকান্তি, তাহার দীপ্তিময় মন, এবং এ-সমস্তকে অতিক্রম করিয়া তাহার চতুর্দ্দিক্‌কার যে-একটি নামহীন বিপুল রহস্য হইতে এই সৌন্দর্য্য স্রোত সহস্রধারায় উৎসারিত হইতেছে, হাস্যময়ী বীণাই যেন হাত ধরিয়া তাহার পিপাসিত চিত্তকে সেই স্রোতের তীরে পথ দেখাইয়া লইয়া আসিয়াছে। নিজের প্রেমের জ্যোতিঃতে অজয়ের প্রেমকে সে দৃষ্টিদান করিতেছে। আধ চেতনায় ইহার বেশী স্পষ্ট করিয়া আর কিছু সে অনুভব করিল না। ধীরে নিদ্রা আসিয়া সব অনুভূতিকে মগ্ন করিয়া দিল।

জ্ঞান হইতেই প্রথমে অনুভব করিল, বাতাসে কি একটা পরিচিত উগ্র গন্ধ। কপালে কাহার করস্পর্শ। চোখ তুলিয়া দেখিল, সুভদ্র। কষ্টে উচ্চারণ করিল, "তুমি?"

সুভদ্র বলিল, 'নিতান্ত বাঁচা তোমার অদৃষ্টে আছে, তাই গিয়ে পড়েছিলাম। যাক্, এখনও কথা বল্‌বার চেষ্টা কোরো না, এই ওষুধটুকু খেয়ে ফেল, তারপর আবার চুপ ক'রে ঘুমোও।"

দেখিল, সুভদ্রের ওয়েলিংটন স্কোয়ারের বাড়ীতে তাহার পূর্ব্বেকার সেই ঘর। ওষুধ খাওয়া হইলে বারণ না মানিয়া আবার কথা কহিল। বলিল, "এখানে কখন এলাম?"

সুভদ্র বলিল, "এসেছ এরই মধ্যে একদিন। পরে সব শুনো এখন। সম্প্রতি কি রকম বোধ কর্‌ছ? জ্বরটা ত খুব ক'মে গিয়েছে।"

সুভদ্র আবার তাহার কপালে হাত রাখিল, দুর্ব্বল হস্তে চোখের উপর টানিয়া আনিয়া অজয় সেটাকে অশ্রুসিক্ত করিয়া দিল। সুভদ্র কিছুই বলিল না, অন্য হাতের আঙুলগুলিকে গভীর স্নেহে নীরবে তাহার চুলের মধ্যে চালনা করিতে লাগিল।

পাশের ঘরে বিমানের গলা শোনা গেল,

"Some little germ will find you some day...!"

সঙ্গে সঙ্গে বীণার, "Little germদের একটা খুব গুণ আছে, তারা কথায় কথায় কানের কাছে গলা ছেড়ে গান ধরে না।"

বিস্মিত ভীত দৃষ্টিতে অজয় সুভদ্রের মুখের দিকে চাহিল। মৃদু হাসিয়া সুভদ্র বলিল, "বীণা দেবী। রোজই দুবেলা আসছেন।" সঙ্গে সঙ্গেই একটা বড় চামচ হাতে গাছ-কোমর বাঁধা বীণা আরক্ত মুখে ঘরে ঢুকিল। তাহার মুখের স্বাভাবিক স্বচ্ছ রং যেন আগুন তাতে আরও স্বচ্ছ হইয়া গিয়াছে, ভিতর হইতে উষারুণের দীপ্তি ফুটিয়া বাহির হইতেছে।

অজয় সম্বিৎ লাভ করিয়াছে দেখিয়াই প্রায় ছুটিয়া সে তাহার কাছে আসিল, কহিল, "কেমন, যমরাজার ঘরবাড়ী লাগল কেমন? বাবা, এতরকম বিপদ্‌ও না নিজের জন্যে আপনি বাধাতে পারেন!"

বালিশে কনুয়ের ভর দিয়া উঠিতে চেষ্টা করিয়া অজয় ক্ষীণস্বরে কেবল কহিল, "আপনি!" সুভদ্র তাড়াতাড়ি তাহাকে শোয়াইয়া দিল।

বীণা দুইহাত কোমরে রাখিয়া রুখিয়া দাঁড়াইবার ভঙ্গি করিয়া বলিল, "হ্যাঁ আমি। তার কি?"

অজয় বলিল, "আপনি কেন এলেন কষ্ট করতে?"

বীণা কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া বলিল, "কষ্ট সবটাই প্রায় করা হয়ে গিয়েছে, কাজেই সে সম্বন্ধে কিছু করা এখন আর আপনার সাধ্যে নেই। আরও কষ্ট যাতে না করতে হয় এখন দয়া ক'রে সেই ব্যবস্থাটা করুন। একটু তাড়াতাড়ি সেরে উঠুন।"

অজয় কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। ভাবিবার ক্ষমতাও তাহার আর ছিল না। কিন্তু যে-সমস্যার সূত্রপাত মাত্র দেখিয়া ভয়ে সে জ্ঞান হারাইয়াছিল, তাহা যে বেশ জালের মত নিবিড় হইয়া ঘিরিয়া আসিতেছে, এবং সেই জালের মধ্যে সে যে নিরুপায় হইয়া জড়াইতেছে, ইহা বুঝিতে পারা সে-অবস্থাতেও তাহার কিছুমাত্র কঠিন হইল না। কিন্তু দেহমন ভরিয়া আজ তাহার এমন গভীর ক্লান্তির জড়তা, যে আজ আর ইহা লইয়া ভয়ও সে পাইল না।

চৌকা চেয়ারগুলির একটাকে টানিয়া লইয়া বীণা অজয়ের বিছানার পাশে বসিবার উদ্যোগ করিতেছে দেখিয়া সুভদ্র বলিয়া উঠিল, "বসছেন যে বড়? ওদিকে খাবার বসিয়ে এসেছেন উনুনের ওপর, মনে আছে?"

"ওই যাঃ, একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম," বলিয়া বীণা ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সুভদ্র বলিল, "তোমার ভাগ্য ভাল, তাই আমার মত চিকিৎসক আর বীণা দেবীর মত নার্স একসঙ্গে পেয়েছ।"

অজয় বলিল, "সেত হল, কিন্তু ওঁর সামনে বিছানায় শুয়ে থাকতে সুদ্ধ আমার লজ্জা করছে। ওঁকে কেন তোমরা আসতে দিলে?"

সুভদ্র বলিল, "আমরা আসতে দিলাম মানে? উনিই ত এসে আমাদের প্রথমে ডেকে নিয়ে গেলেন। তা উনি থাকাতে অপরাধটা কি হয়েছে? সেই থেকে যা উনি করছেন তোমার জন্যে!"

বীণার পায়ের শব্দ আবার শুনিতে পাওয়া গেল। দরজার চৌকাট পার হইতে হইতে সে বলিল, "আমায় ত খুব তাড়া দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন, জিনিষটা ঠিক হল কিনা আপনার গিয়ে দেখবার কথা ছিল তা বুঝি ভুলে গেছেন?"

সুভদ্র আসন ছাড়িয়া উঠিয়া বলিল, 'ঠিক কথা, চলুন যাচ্ছি।"

কিন্তু বীণা পরিত্যক্ত চেয়ারটিতে বেশ করিয়া গুছাইয়া বসিল, বলিল, "থাক্, আর যেতে হবে না। আমি নামিয়ে রেখে এসেছি।"

একটা তোয়ালেতে মুখ মুছিতে মুছিতে বিমান আসিয়া ঘরে ঢুকিল। ডানহাতের উল্টা পিঠে অজয়ের জ্বর পরীক্ষা করিয়া বলিল, "বেড়ে আছে অজয়। বর্ষা আর-একটু ভাল ক'রে নামুক, ঠিক করেছি, রোজ রাত্তিরে জলে ভিজব।"

বীণা বলিল, "আর কিছু লাভ না হোক, আপনার গলাটা তাহলে একটু ভাঙে।"

বিমান বলিল, "নিতান্ত ভগবান্ রসনায় ধার দেননি, তাইত গলার জোরটা অভ্যেস করেছি।"

বীণা বলিল, "ভগবানের এমন অপবাদ আপনি ছাড়া কেউ দেবে না।"

সুভদ্র বলিল, "দুদিন বেচারা না খেয়ে আছে ওকে খেতে দিয়ে দিলে হয় না?"

বীণা বলিল, "দিচ্ছি, জুড়োক। এইমাত্র ত উনুন থেকে নামল।"

অজয় বুঝিল, একটুক্ষণের জন্যও তাহার কাছছাড়া হইতে ঠিক তখনই বীণার ইচ্ছা করিতেছে না। কৃপা-পরবশ হইয়া কহিল, "একটু দেরি হলে কিছুই এসে যাবে না। তা-ছাড়া এইমাত্র ত ওষুদ খেয়েছি।" সুভদ্র কিছুই বুঝিতে পারিল না, কিন্তু সে অবাক্ হইতেছে লক্ষ্য করিয়া বীণা এরপর উঠিয়া পড়িল, এবং ট্রেতে করিয়া ধূমায়িত খাবারের বাটি, ফিডিং কাপ, জলের গেলাস ইত্যাদি আনিয়া পরম যত্নে অজয়কে আহার করাইল।

বিকালে পাঁচটায় একটু আগে বীণা আবার একবার

অজয়ের খবর লইতে আসিয়া দেখিল, সে ঘুমাইতেছে। ভয়ে ভয়ে কহিল, "কতক্ষণ ঘুমচ্ছেন?"

সুভদ্র কহিল, "আপনি যাবার পর থেকেই।"

বীণার গলার কাছটা কাঁপিয়া গেল, কহিল, "এবারে জাগিয়ে দেব?"

সুভদ্র চিকিৎসকোচিত গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিয়া কহিল, "নিশ্চয়ই না। ঘুমনোটাই ওর এখন সব চেয়ে বেশী দরকার। নিউমোনিয়া হবার সম্ভাবনা থাকলে রোগীকে যতটা বিশ্রাম দেওয়া যায় দিতে হয়।"

বীণা তবু বলিল, "কিন্তু ঘুমিয়ে আছেন, না কালকের মত মূর্চ্ছার ভাব এটা, তা দেখাও কি কর্ত্তব্য নয়?"

সুভদ্র অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বলিল, "উঁহু, মূর্চ্ছা এটা হতেই পারে না। আপনি কেন ভাবছেন? নিশ্চিন্ত মনে বাড়ী যান, যদি দরকার হয় আমিই আপনাকে খবর দেব।"

সে যে আসিয়াছিল, অজয়কে তাহা জানাইয়া যাওয়া হইল না বলিয়া অত্যন্ত ভারাক্রান্ত মনে, নতমস্তকে ধীরপদে বীণা গিয়া গাড়ীতে উঠিল। তাহার গাড়ী গলির মোড় ঘুরিয়া বাহির হইয়া গেলে সুভদ্র তাড়াতাড়ি বিমানের দরজায় গিয়া ঘা দিল। ঘুম জড়ান চোখে দ্বার খুলিয়া দিয়া চোখ হইতে দিনের আলোকে আড়াল করিয়া বিমান কহিল, "কেন বাবা এই গভীর রাত্রে হল্লা করতে এলে? কি ব্যাপার?"

সুভদ্র বলিল, "তুমি শীগ্‌গির যাও, বিমান। যে কেউ একজন ভাল ডাক্তারকে ডেকে আনো গে। আমি জানি সারিয়ে দিতে পারব। কিন্তু যদিই না পারি? নিজের হাতে রাখতে আর ভরসা পাচ্ছি না।"

বিমান কহিল, "ঐ কথাটা রোজ দুবেলা ক'রে তোমার বলা চাই? কি হয়েছে চল দেখিগে। আমি তোমায় বলছি, তোমার ওষুদেই ও সারবে।"

পরদিন খুব ভোরে উঠিয়াই বীণা দেখিল, ঐন্দ্রিলা আরও আগেই স্নান সারিয়া কাগজ পেন্সিল লইয়া বসিয়াছে। বলিল, "এখনো ত ভাল ক'রে অন্ধকারই কাটেনি, চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছ?"

ঐন্দ্রিলা বলিল, "না দে'খে আঁকা ছবি কি রকম দাঁড়ায় দেখছি।"

আর কিছু না বলিয়া বীণা মুখ ধুইতে চলিয়া গেল।

নীচে বসিয়া চা খাইতে খাইতে খবরের কাগজের পাতায় চোখ বুলাইতেছে এমন সময় হৃষীকেশ ধীরে আসিয়া টেবিলের একপাশে দাঁড়াইলেন। টেবিলের উপরে বাংলা ইংরেজি খবরের কাগজ আরও যে দুএকটা পড়িয়া ছিল, সেগুলিকে লইয়া একটু নাড়াচাড়া করিয়া বলিলেন, "অজয় কি এখন একটু ভালো আছেন?"

বীণা বলিল, "হ্যাঁ, একটু ভালো। কিন্তু খুব বেশী সাবধান না হলে একটুতেই নিউমোনিয়াতে দাঁড়াতে পারে।"

হৃষীকেশ একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া চিন্তান্বিত মুখে কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন, পরে বলিলেন, "তোমায় আজও কি যেতে হবে?"

বীণা বলিল. "যাওয়াই উচিত। না গেলে তাঁর খুবই অসুবিধা হবে।"

হৃষীকেশ বলিলেন, "তাঁকে দেখতে আর কে সেখানে আছেন?"

বীণা একটু বিপদে পড়িল। তাড়াতাড়ি ভাবিয়া লইয়া বলিল, "সুভদ্রবাবু আছেন, কিন্তু তিনি থাকা না-থাকা প্রায় সমান কথা। তিনি খুব ভাল চিকিৎসক বটে, কিন্তু রোগীর সেবা করতে মোটেই অভ্যস্ত নন।"

হৃষীকেশ বলিলেন, "ও জিনিস সবাই পারে না, সেটা ঠিক। কিন্তু তোমাদের নিয়ে আজ সকালে একটু গুরুসদয়-বাবুর বাড়ী যাব ভেবেছিলাম। তাঁর স্ত্রী খুব অসুস্থ তা জানো বোধহয়। অনেকদিন ধ'রে তোমাদের দু'বোনকে দেখতে চাচ্ছেন। তিনি তোমার মার বিশেষ বন্ধু ছিলেন।"

বীণা বলিল, "আর দুদিন পরে গেলে চলে না বাবা? অজয়বাবু আর-একটুখানি সেরে উঠলেই যাব।"

হৃষীকেশ মৃদুস্বরে বলিলেন, "তা চলে।" তারপর চুপ করিয়া রহিলেন।

একটু পরে একটু কাশিয়া লইয়া আবার বলিলেন, "তোমার পিসীমা বল্‌ছিলেন, অজয় যদি কিছু মনে না করেন তাহলে তিনি তার শুশ্রূষার ভার নিতে পারেন। তাতে তাঁর কিছু কি অসুবিধা হবে?"

বীণা বলিল, "পিসীমা? পিসীমা সেখানে কেন যাবেন?"

হৃষীকেশ বলিলেন, "তাতে দোষ কিছু ত নেই মা! তাছাড়া তোমরা হাজার হোক সবাই ছেলেমানুষ ত?

তোমার পিসীমার এসব বিষয়ে অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই অনেক বেশী। ও যখন ছোট ছিল, তখন হাতে কিছু কাজ না থাকলে আমায় বিছানায় শুইয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিত, নয়ত পাখা নিয়ে ব'সে হাওয়া করত। কখনো তাতে ওকে ক্লান্তি বোধ করতে দেখতাম না। অন্যের সেবা করতে ওর একটা আনন্দ ছেলেবয়স থেকেই ছিল। ও খুব আগ্রহ ক'রেই যেতে চাইছে।"

বীণা কি জবাব দিবে কিছুক্ষণ তাহা ভাবিয়া পাইল না। তারপর বলিল, "আমার কিন্তু একটুও ভালো লাগছে না। কে জানে, অজয়বাবু কি মনে করবেন? পিসীমার সঙ্গে তাঁর ত একদিন একটুখানিমাত্র পরিচয় হয়েছে। তিনি যা লাজুক, হয়ত অসুবিধা বোধ করতে পারেন।"

হৃষীকেশের মুখে আবার চিন্তার গভীর রেখাপাত দেখিতে পাওয়া গেল। বলিলেন, "হুঁ!" তারপর নীরবে বসিয়া দাড়িতে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

হঠাৎ বীণা বলিয়া উঠিল, "বাবা! আমি যাই এটা কি তুমি ইচ্ছে কর না?"

হৃষীকেশ তাড়াতাড়ি বলিলেন "না, তা ঠিক নয়। যাওয়া প্রয়োজন যদি হয় যেতে ত হবেই। তবে—"

বীণা বলিল, "না গিয়ে পারলেই ভালো, এই তোমার মনে হয়?"

হৃষীকেশ বলিলেন, "তাও ঠিক নয়। যাওয়াতে কিছুমাত্র দোষ আছে তা আমি মোটেই মনে করিনে। যদি তা করতাম তাহলে তোমাকে প্রথমেই তা বলতে আমার বাধা ছিল না।"

বীণা বলিল, "বাধা না থাকলেও তুমি আমায় বলতে না, তা আমি জানি। আমি নিজে যা ভালো বুঝেছি, চিরকাল তাই ত করতে পেয়েছি। কখন্ কোন্ কাজে তুমি আমায় বাধা দিয়েছ?"

হৃষীকেশ বলিলেন, "বাইরে থেকে বাধা দিলেই আসল জায়গাতে সব সময়ে ত বাধে না। তাছাড়া আমি যা বুঝব সেইটেই যে ঠিক বোঝা, তাই বা বলব কি ক'রে? যে-ধরণের জীবনযাত্রার অভিজ্ঞতা নিয়ে আমি বুড়ো হয়েছি, তোমাদের জীবনের ধারা ঠিক সেই খাতে ত বইছে না, তোমাদের কথা নিয়ে আমার বরং ভুল করবারই সম্ভাবনা বেশী।"

বীণা বলিল, "তুমি যে ঠিক এই রকমই ভাবো তা আমি জানি। কিন্তু ভুল করবার সম্ভাবনাই যে তোমার বেশী তা হয়ত ঠিক নয়। অজয়বাবুর ওখানে যাওয়া সম্বন্ধে কোন্ জায়গায় তোমার খটকা লাগছে আমার সেটা জানতে অন্ততঃ পারা দরকার, তুমি ভুল বুঝছ না ঠিক বুঝছ সেটা নিজে বিচার ক'রে তাহলে আমি দেখতে পারি।"

হৃষীকেশ আবার কিছুক্ষণ কাগজগুলি লইয়া টেবিলের একধার হইতে অন্যধারে সরাইয়া ভাঁজ করিয়া করিয়া রাখিলেন, তারপর বলিলেন, "তোমার পিসীমা বলছিলেন এই নিয়ে বাইরে একটা কথা উঠেছে।"

বীণা শক্ত হইয়া বলিল, "আমার একটি স্বজনহীন পীড়িত বন্ধুর বিপদে তাকে সাহায্য করছি, এ নিয়ে বাইরে কথা ওঠবার কি মানে?"

হৃষীকেশ বলিলেন, "তুমি এ নিয়ে উত্তেজিত হোয়ো না মা, তা হয়ে কিছু লাভ নেই। কথাটা উঠেছে এইটে জেনে নিয়ে বেশ ক'রে ভেবে কর্ত্তব্য স্থির কর।"

বীণা বলিল, "আমার কর্ত্তব্য স্থির করা আছে। বাইরে যতখুসি কথা উঠতে পারে।"

হৃষীকেশ একটু হাসিয়া বলিলেন, "কিন্তু মা, মানুষের জীবনে বাইরেটার ত স্থান আছে, সেটার দাবীও দাবী।"

বীণা বলিল, "একসঙ্গে সব দাবী সব সময় মানুষে মেটাতে পারে না। সম্প্রতি আমার বন্ধুর দাবী আমার কাছে এত বড় যে আর কোনো দাবী আর কারও আমার ওপর যদি থাকেও তার কথা আমার ভাববার সময় নেই।"

হৃষীকেশ মুখটিকে একটু কালো করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা", তারপর আসন ছাড়িয়া উঠিয়া ধীরগতিতে বাহির হইয়া গেলেন। যতক্ষণ দুতলার সিঁড়িতে এবং উপরে তাঁহার চটি জুতার শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল, বীণা কান পাতিয়া রহিল। তারপর তাড়াতাড়ি নিজেও উপরে উঠিয়া কাপড় বদলাইয়া নীচে নামিয়া আসিল এবং ড্রাইভারকে ডাকিয়া গাড়ী আনাইয়া অসময়েই বাহির হইয়া পড়িল।

বীণাকে হঠাৎ বাহির হইয়া যাইতে দেখিয়া ঐন্দ্রিলা প্রায় ছুটিয়াই তেতলার বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। বীণার মোটর দৃষ্টিপথের বাহিরে চলিয়া যাইবার পরও বহুক্ষণ সেস্থান ছাড়িয়া সে নড়িল না। কাল সন্ধ্যায় আড়ালে দাঁড়াইয়া

বীণার মুখে অজয়ের একটু ভাল থাকার সংবাদ সে শুনিয়াছে। তাহাতে যদিও তাহার দুশ্চিন্তা বিশেষ কিছু কমে নাই, তবু প্রথম দিন অজয়ের জ্বরে অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া থাকার সংবাদ শুনিয়া ভয়ে তাহার হাত-পা যেমন ঠাণ্ডা হইয়া আসিয়াছিল, সেই ভয়ের ভাবটা কাল একটু কমিয়াছিল। আজ আবার নূতন কি ঘটিল যে বীণা কাহাকেও কিছু না বলিয়া ভোর হইতেই তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল? হয়ত অসুখ বাড়িয়াছে, টেলিফোনে তাহার ডাক আসিয়াছে। হয়ত বীণা গিয়া অজয়কে দেখিতে পাইবে না। ঐন্দ্রিলা বুঝিতে পারিল, ভয়ের উত্তেজনায় তাহার সমস্ত শরীর থরথর করিয়া কাঁপিতেছে।

সেই ঝড়ের রাত্রির পর হইতে নিজের অবাধ্য মনটার সঙ্গে সে নিষ্ঠুর হইয়াই বোঝাপড়া আরম্ভ করিয়াছিল। বারম্বার নিজেকে বুঝাইতেছিল, বীণা তাহার পরমাত্মীয়া, অন্য সব কথা ছাড়িয়া দিলেও, বীণা সুখী হোক ইহাই তাহার কামনা করা উচিত। এমন হইতে পারে, অজয়ের অনভিজ্ঞ নমনীয় মন তাহাদের উভয়েরই সম্বন্ধে অব্যবস্থিততার দোলায় দুলিতেছে। ইহাও সম্ভব, ঐন্দ্রিলা ইচ্ছা করিলে, চেষ্টা করিলে বীণাকে পরাজিত করিয়া তাহার হৃদয় জয় করিতে পারে। কিন্তু বীণার প্রতি প্রচুর আন্তরিক স্নেহ সত্ত্বেও, সে যে তাহার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে নামিতেছে উহা চিন্তা করিতেও যেন তাহার গ্লানি বোধ হইতেছিল। নিজের মনে অন্ততঃ একটা জায়গাতে নিজেকে সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতার অতীত করিয়া সে ভাবিতে চায়। অন্ততঃ একটি মানুষের কাছে সে এমন মূল্য পাইতে চায় যে মূল্য একান্তভাবে তাহার একলারই পাওনা। যাহার জন্য বিনিময়ে ইচ্ছা হইলে সে কিছু দিতে পারে, নাও দিতে পারে। ইহা তাহার অহঙ্কার নহে। ভালবাসাকে এই রকম করিয়াই আশৈশব সে ভাবিত। যাহাকে ভালবাসিত, প্রতিদানের আশা না রাখিয়াই বাসিত, এবং কাহারও ভালবাসা ভিক্ষা করিয়া কিম্বা বিরোধ করিয়া পাইয়া তাহার মন ভরিত না। শৈশব হইতে আজ পর্য্যন্ত যেখানে তাহার যত বন্ধু জুটিয়াছে, তাহাদের কাহাকেও নিজে বাছিয়া সে জোটায় নাই, যদিও তাহাদের প্রায় সকলকেই অত্যন্ত নিঃস্বার্থভাবে সে ভালবাসিয়াছে। আবার সেই একই কারণে এমন অনেককে সে ভালবাসিয়াছে যাহারা কোনওদিন তাহার মনের সেইদিকটাকে ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারিবে না।

বীণার প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রশ্ন যদি নাও থাকিত, তবু একমাত্র এই কারণেই অজয়কে যে সে ভালবাসে ইহা তাহাকে সে জানিতে দিতে পারিত না। অজয় নিজে হইতে তাহাকে বুঝিয়া লইবে এই অপেক্ষায় শেষদিন পর্য্যন্ত তাহাকে বসিয়া থাকিতে হইত। সে অঘটন কিরূপে ঘটিত তাহা চিন্তা করিবার প্রয়োজনও তাহার কিছুমাত্র ছিল না, সুতরাং দুঃখভোগের জন্য সুনির্দ্দিষ্ট করিয়াই বিধাতা তাহাকে গড়িয়াছিলেন এবং নিজেও সে তাহা জানিত। তাই সব প্রকারে সব বিষয়ে অজয়ের নিকট হইতে নিজেকে দূরে রাখিয়া বীণার সঙ্গে তাহার মিলনের পথকে সুগম করিয়া দিবে ইহাই সে মনে মনে স্থির করিতেছিল।

কিন্তু এই তিনদিন নিজের মনকে সংযত করিয়া রাখা তাহার অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। আত্মপ্রবঞ্চনার চেষ্টা আবারও সে আরম্ভ করিয়াছিল। সুভদ্রের চিঠিটি বারবার বাহির করিয়া পড়িয়া অজয়কে নূতনতর দৃষ্টি লইয়া দেখিতে চেষ্টা করিতেছিল। সত্যই ত অপরিচয়ের মধ্যে কলুষ যত প্রশ্রয় পায় এত আর কিছুতে নহে। অজয় যদি তাহাকে ভালই বাসে, কেন সে সমস্ত বাধা দুই হাতে ঠেলিয়া একেবারে তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায় না, মুক্তকণ্ঠে বলে না, আমি তোমাকে ভালবাসি, অন্তরের পরমতম পরিচয়ে তোমাকে আমি কাছে পাইতে চাই? কেন সে এমন করিয়া চোরের মত নিজের চারিদিকে আড়াল রচনা করিয়া চলে, ভিখারীর মত অন্ধকারে লুকাইয়া হাত পাতে? অজয়ের চোখের যে গভীর দৃষ্টি একদা তাহাকে অভিভূত করিত, ভাবিতে চেষ্টা করিল, সে-দৃষ্টি কলুষিত। সে-দৃষ্টি সত্যকার ঐন্দ্রিলাকে দেখে না, দেখিতে চায় না। অপরিচয়ের পার হইতে যতটুকুকে দেখা যায় কেবল সেইটুকুই দেখে এবং সেটা শ্রদ্ধা করিয়া দেখিবার মত জিনিস নয়। অজয়ের সম্বন্ধে নিদারুণ বিরূপতায় মনকে ভরিয়া তুলিবে ভাবিতেছে, এমন সময় তাহার অসুস্থতার সংবাদে মুহূর্ত্তে সব ওলট পালট হইয়া গেল। ঐন্দ্রিলার সমস্ত আকাশ ভরিয়া একটি বিশীর্ণ শুষ্ক রোগ-পাণ্ডুর মুখ এবং একটি বেদনা-ভারাতুর আর্ত্তদৃষ্টি

জাগিয়া রহিল। কোথায় সে দৃষ্টিতে লালসার কলুষ? পৃথিবীতে দুঃখ যেন কোনও অপরাধ করে না, অথবা করিলেও তাহার কোনও অপরাধ অপরাধ নয়! সেই হইতে তাহার মনের উপর কোনও আত্মপ্রবঞ্চনার আড়াল আর অবশিষ্ট থাকে নাই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহা অনুভব করিবার অবকাশও লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

ঐন্দ্রিলার চিন্তাস্রোতকে ব্যাহত করিয়া পশ্চাৎ হইতে হৃষীকেশ ডাকিলেন, "ইলু!"

চমকিয়া ফিরিয়া ঐন্দ্রিলা বলিল, "কি মামাবাবু?"

হৃষীকেশ বলিলেন, "অজয়দের বাড়ীর কাছে কোন্ একটা জায়গা থেকে বীণা টেলিফোন কর্‌ছিল—"

ঐন্দ্রিলা তাড়াতাড়ি কহিল, "অজয়বাবুর অসুখ কি বেড়েছে?"

হৃষীকেশ কহিলেন, "চিন্তার কিছু কারণ নেই। তবে জান্‌তে চাচ্ছে, তুমি কি তাঁকে দেখ্‌তে যাবে? যদি যেতে চাও, আমি তোমাকে নিয়ে যাই। আরও আগেই আমার একবার বোধহয় যাওয়া উচিত ছিল।"

ঐন্দ্রিলা কিছুমাত্র না ভাবিয়াই কহিল, "হ্যাঁ, আমি যাব।"

যথারীতি দুতলায় হেমবালা তাহার পথরোধ করিলেন, কহিলেন, "কোথায় যাচ্ছিস্?"

সে কহিল, "অজয়বাবুকে দেখ্‌তে।"

হেমবালা কহিলেন, "তোর কি ধারণা, তুই এরই মধ্যে একেবারে স্বাধীন হয়েছিস্?"

সে কহিল, "দোহাই তোমার, তুমি এখন আমায় দেরি করিও না মা। আমি ফিরে এসে তোমার কথার জবাব দেব।"

তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে ফিরিয়া গিয়া হেমবালা নরেন্দ্রনারায়ণকে চিঠি লিখিতে বসিলেন।

(ক্রমশঃ)

মহিলা-সংবাদ

শ্রীমতী ভ্রমর ঘোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এবার প্রাচীন ভারতের ইতিহাস (Ancient Indian History) বিষয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন।

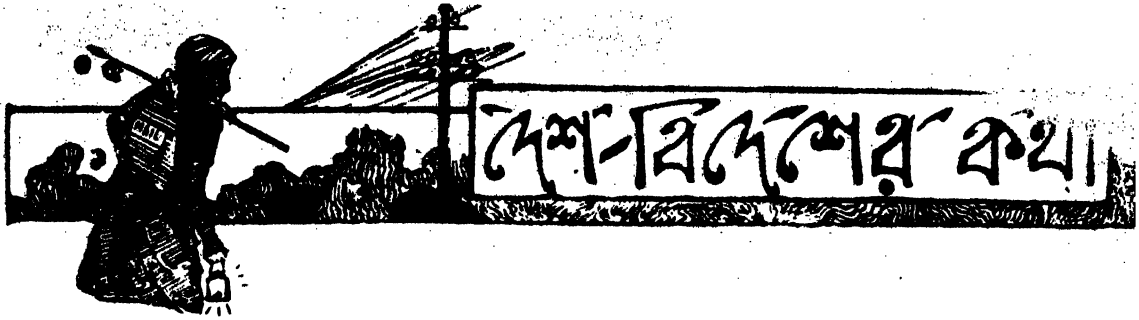
শ্রীমতী রজনীপ্রভা দাস আসামী মহিলাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হইতে এম্‌-বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তিনি এখন তিন মাসের জন্য শিলং পাস্তুর ইন্‌ষ্টিটিউটে অধ্যয়নে রত আছেন।



শ্রীমতী ভ্রমর ঘোষ



শ্রীমতী রজনীপ্রভা দাস



বাংলা

প্রফুল্ল জয়ন্তী—

গত ১লা আশ্বিন ঢাকার জনসাধারণের পক্ষ হইতে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়কে রমনা কার্জ্জন হলে সম্বর্দ্ধনা করা হয়। এই সভায় শহরের বহু গণ্যমান্য ও সকল সম্প্রদায়ের নবনারী সমবেত হইয়া আচার্য্যকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। অধ্যাপক শ্রীগঙ্গচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাচীন ভারতীয় আদর্শে বৈদিক মন্ত্রে আচার্য্যের অভ্যর্থনা ও প্রশস্তি পাঠ করেন। তাহার পরে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন দাস আচার্য্যের শ্রদ্ধাতর্পণ করেন এবং ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির পক্ষ হইতে চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকুমার দাস একটি অভিনন্দন-পত্র পাঠ করেন।

কার্য্যক্রম ও প্রশস্তি

ব্রহ্মপ্রণাম—

যো ভূতং চ ভব্যং চ সর্বং যশ্চাধিতিষ্ঠতি।
স্বর্যস্য চ কেবলং তস্মৈ জ্যেষ্ঠায় ব্রহ্মণে নমঃ॥

—অথর্ববেদ ১০।৮।১।

যিনি অতীত হইতে ভবিষ্যৎ পর্য্যন্ত সর্ব্বকালে অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন যিনিই কেবল পুণ্যময় স্বর্গীয়, সেই সকলের অপেক্ষা পুরাতন ও শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মকে নমস্কার।

আচার্য্য আবাহন—

কবিং সম্রাজং অতিথিং জনানাম্
গণানাং ত্বা গণপতিং হবামহে।
প্রিয়াণাং ত্বা প্রিয়পতিং হবামহে
নিধীনাং ত্বা নিধিপতিং হবামহে॥

—ঋগ্বেদ ৬।৭।১, ২।২৩।১ বাজসনেয়ী সংহিতা ১।৬৭ ২৩।১৯ মৈত্রায়ণী সংহিতা ৩।১২।২০, তৈত্তিরীয় সংহিতা ৭।৪।১২।১ তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ৩।৯।৬।১।

আপনি মনীষী শোভন জ্ঞানযুক্ত, সকল জনের সম্মাননীয় অতিথি, জনগণের নায়ক, আপনাকে আমরা আহ্বান করিতেছি। আপনি প্রিয়গণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রিয়, আপনাকে আমরা আহ্বান করিতেছি। আপনি সকল নিধিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নিধি, আপনাকে আমরা আহ্বান করিতেছি।...

আচার্য্যের পরিচয়—

আচার্য্যো ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী প্রজাপতিঃ।
প্রজাপতির্বি রাজতি, বিরাড় ইন্দ্রোহভবদ্ বশী।

—অথর্ববেদ ১১।৫।১৬।

এই আচার্য্য নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, ইনি ব্রহ্মনিষ্ঠ জ্ঞানব্রতী, ইঁহার বহু শিষ্য ও অনুচর, ইনি মানবদিগের মধ্যে বিশেষ শোভমান, ইনি মহৎ, ইনি শ্রেষ্ঠ হইয়াও সংযমী।

অয়ং কল্যাণো ঽজরো মর্ত্ত্যস্যামৃতো গৃহে। – ১০।৮।২৬।

ইনি পরম মঙ্গলের ইনি জরারহিত ও যুবার ন্যায় উদ্যমশীল, ইনি মর্ত্ত্যধামে অমর।

পূর্ণাৎ পূর্ণম উদচতি, পূর্ণম্ পূর্ণেন সিচ্যতে।
উতো তদ অদ্য বিদ্যাম যতস্ তৎ পরিষিচ্যতে॥১০।৮।

ইনি পূর্ণতা হইতে পূর্ণতা আহরণ করিয়া আনেন, ইনি পূর্ণকে পূর্ণের দ্বারা অভিসঞ্চিত করিয়া পূর্ণতর করেন তাঁহার দ্বারা কেমন করিয়া ইহা সম্ভবপর হয় সেই রহস্য অদ্য আমরা তাঁহার নিকটে জানিয়া লইব।

অকামো ধীরো অমৃতঃ স্বয়ম্ভূ
রসেন তৃপ্তো ন কুতশ্চনোনঃ। – ১০।৮।৪৪।

ইনি নির্লোভ, কামনারহিত, ধীর, অমর, বিদ্বান্, রসায়নশাস্ত্রে পরিতৃপ্ত, ইনি কাহারও অপেক্ষা ন্যূন নহেন।

আচার্য্য-বরণ—

ওঁ উদ্যল্লোঁকান্ অরোচয়ঃ। ইমাল্লোঁকান্ অরোচয়ঃ।
প্রজাভূতম্ অরোচয়ঃ। বিশ্বভূতম্ অরোচয়ঃ॥

আপনি উদিত হইয়া এই জগৎকে উজ্জ্বল করিয়াছেন। আপনি এই সকল লোককে উজ্জ্বল করিয়াছেন। আপনি আপনার সন্তানসদৃশ শিষ্যগণকে উজ্জ্বল করিয়াছেন। আপনি বিশ্ববাসীকে উজ্জ্বল করিয়াছেন।

ওঁ প্রতিপদ্ অসি প্রতিপদে ত্বা
অনুপদ্ অসি অনুপদে ত্বা,
সম্পদ্ অসি সম্পদে ত্বা,
তেজোঽসি তেজসে ত্বা।

আপনি সংবর্দ্ধনশীল, আপনাকে অধিকতর সম্বর্দ্ধনা জন্মাক, আপনি অন্বেষণকারী, আপনাকে অভিষ্ট বস্তু অন্বেষণ করিয়া প্রাপ্ত হউক আপনি অসামান্য সম্পৎশালী, আপনি অধিকতর সম্পৎ লাভ করুন আপনি তেজস্বী, আপনি অধিকতর তেজ প্রাপ্ত হউন।

ওঁ উদ্বর্ত্তয়ামি দেব ত্বাং যথেষ্টং চন্দনাদিভিঃ।

হে দেব, চন্দনাদি গন্ধদ্রব্যের দ্বারা আপনাকে আমরা অধিবাসিত করিতেছি।...

এষ তে বাসঃ।

এই আপনার অক্লান্ত চেষ্টার সাক্ষীস্বরূপ খদ্দরের পরিধেয়যুগল, আপনি অনুগ্রহ করিয়া গ্রহণ করুন।

প্রতিশ্রুৎকায়া অর্ত্তনং ঘোষায় ভষম্, অন্তায় বহুবাদিনম্, অনন্তায় মূকম্, মহসে বীণাবাদম্, ক্রোশায় তূণবধ্মম্, অবরস্পরায় শঙ্খধ্মম্। বনায় বনপম্, অন্যতো অরণ্যায় দাবপম্।

—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ৩।৪।১।১৩।

—বাজসনেয়ী সংহিতা ৩০।১৯।

প্রতিধ্বনির নিন্দাকারী, ঘোষণায় তীব্রকণ্ঠ, সীমার মধ্যে বহুশব্দকারী, অনন্তের মধ্যে মূক, পূজায় বীণাবাদনতুল্য, আহ্বানে বংশী-ধ্বনি-সদৃশ, সকলের আনন্দদায়ক, বনের মধ্যে বনরক্ষক, অরণ্যপ্রান্তের দেশের দাবানল-নিবারক এই শঙ্খ।

> শ'শ্রেয়ো বহূনাং যো রায়াম্ আনেতা, য ঈড়ানাং
> সোমো, যঃ সুক্ষিতীনাম।

যে শঙ্খ স্বয়ং সম্পদ্ বৃদ্ধি করে যে শব্দ আনয়ন করে, যে সকল স্তুতির ও প্রশংসার মধ্যে শ্রেষ্ঠ, যে সকল উত্তম দেশের মধ্যে মনোহর, সেই এই শঙ্খ।

> তবৈব যশসস্ তুল্য, সুশুভ্রস্ ভূব্যকণ্ঠক'।
> শ ঋাংঙ্খ শ্রী-সমাযুক্ত কল্যাণকৃৎ প্রগৃহ্যতাম॥

আপনার যশের তুল্য সুশুভ্র এবং আপনার উদ্বোধিনী বাণার ন্যায় ভূব্যকণ্ঠ, শ্রীসমাযুক্ত কল্যাণকর এই শঙ্খ হে কল্যাণকর, আপনি অনুগ্রহ করিয়া ইহা গ্রহণ করুন।

> এষ তে শঙ্খ।

এই আপনার শঙ্খ।..

আচার্য্যের মঙ্গল ও দীর্ঘায়ু কামনায় পুষ্পবৃষ্টি—

> উর্জ্জে ত্বা, বলায় ত্বৌজসে, সহসে ত্বা।
> অভিভূয়ায় ত্বা রাষ্ট্রভৃত্য' পর্য্যূহামি শত শারদায়।

আপনাকে আমরা উৎসাহে ও তেজে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতেছি, আপনাকে আমরা শক্তিতে নত করিতেছি, আপনাকে আমরা সত্য কহিবার সাহসে স্থাপন করিতেছি, আপনাকে মহত্বে ও শ্রেষ্ঠত্বে অবিচলিত করিতেছি আপনাকে আমরা অভ্যুদয়ে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছি, আপনি স্বদেশভৃত্য, আপনাকে আমরা দেশসেবার দুষ্কর ব্রতে অস্খলিত করিতেছি, আপনাকে আমরা শত শরতের শোভায় সুশোভিত দেখিতে চাহিতেছি।...

> শতং জীব শরদো বর্দ্ধমানঃ,
> শতং হেমন্তাং ছতম্ উ বসন্তান।

—অথর্ববেদ ৩।৩১।

আপনি শত শরৎ জীবিত থাকিয়া বর্দ্ধমান যশ লাভ করুন, আপনি শত হেমন্ত দর্শন করুন, শত বসন্তের আনন্দ সৌন্দর্য্য প্রাচুর্য্য সম্ভোগ করিয়া বালকে ও দেশকে বিভূষিত করুন।

> মহে নো অদ্য সুবিতায় বোধি।

আপনি আপনার মহৎ দৃষ্টান্তের দ্বারা অদ্য আমাদিগকে সুবিশেষ ভাবে মহত্ত্বের সাধনায় উদ্বোধিত করুন।

শান্তিপাঠ—

> শং নো বা তা বাতু, শং নস তপতু সূর্য্যঃ।
> অহানি শং ভবন্তু নঃ, শং রাত্রী প্রতি ধীয়তাম্।
> শং উষা নে ব্যুচ্ছতু'।—৭ ৬৯।১।

আমাদের নিকটে বায়ু মঙ্গল বহন করিয়া আসুক সূর্য্য হইতে মঙ্গল বিকীরিত হউক, আমাদের দিবস কল্যাণে নিযুক্ত হউক রাত্রি কল্যাণ প্রতিবিধান করুক, উষা আমাদিগকে কল্যাণে উদ্বোধিত করিয়া দীপ্তিমতী হউক।

> ওঁ শস্ত্বান্ত বিবস্য।
> সর্ব্বত্র বিশ্বের কল্যাণ হউক।

—বিষ্ণুপুরাণ।

১লা আশ্বিন, ১৩৪০
ঢাকা

ঢাকা-বাসীর পক্ষ হইতে
সম্বর্দ্ধনা-সমিতি

কৃতী শ্রীকেশবলাল দেব—

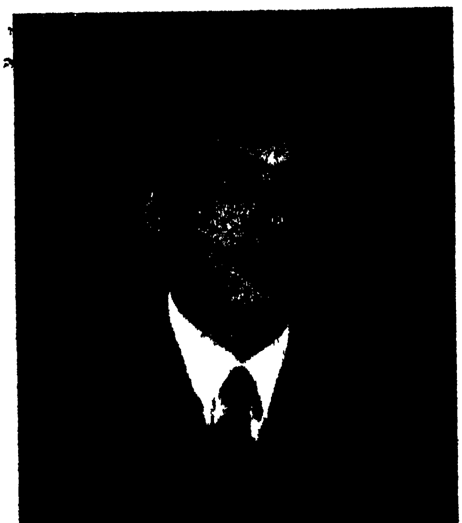
শ্রীযুক্ত কেশবলাল দেব বিলাতের লীডস্ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাপাখানা ও



শ্রীযুক্ত কেশবলাল দেব

আনুষঙ্গিক বিষয় শিখিয়া ডিপ্লোমা প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি বিলাতে থাকিয়া ফটোগ্রাফি শিক্ষা করিয়াছেন

বিদেশে বাঙালীর কৃতিত্ব—



ডাঃ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সেন

ডাঃ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১৯২৯ সনে এম্-বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে, ১৯৩২ সনে তিনি 'ডি ডয়টশে একাডেমি'র বৃত্তি লইয়া জার্ম্মানীতে গমন করেন। তিনি ম্যুনিক্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ গ্রোসের অধীনে থাকিয়া 'টিউবার-কিউলসিস্' রোগের কারণতত্ত্ব অনুসন্ধানে কিছুকাল ব্যাপৃত ছিলেন। পরে বার্লিনে গিয়া এই বিষয় আরও চর্চ্চা করেন। টিউবারকিউলোসিস রোগে খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া গত আগষ্ট মাসে তিনি 'ডক্টর' উপাধি লাভ করিয়াছেন।

গবেষকের কৃতিত্ব—

শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী দাক্ষিণাত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা করিয়া পি-এইচ-ডি উপাধি লাভ করিয়াছেন। তিনি স্তর যদুনাথ সরকারের অধীনে গবেষণা করিয়াছেন।



শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী

হরিজন ছাত্রগণের 'ফী' হইতে অব্যাহতি—

নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও মধ্যপ্রদেশের হাই স্কুল বোর্ড যথাক্রমে ৭ ও ৫ বৎসরের জন্ত হরিজন ছাত্রদিগকে পরীক্ষার ফী প্রদান হইতে রেহাই দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইহাতে মধ্যপ্রদেশে হরিজন ও আদিম জাতির ছাত্রগণের মধ্যে শিক্ষার বহুল প্রসার হইবে।

আচার্য্য রায়ের দান—

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ঢাকা পরিদর্শনকালে ঢাকা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে বাৎসরিক ২৫০ টাকা মূল্যের ড্রেসিং ও ঔষধ দানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

জগত্তারিণী স্বর্ণপদক—

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এ বৎসর জগত্তারিণী স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হইয়াছেন। কেদার বাবু রস-সাহিত্য রচনা করিয়া বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন



শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

করিয়াছেন। তিনি 'কাশীর কিঞ্চিৎ', 'চীনযাত্রী', 'আমরা কি ও কে', 'কবুলতি', 'ভাদুড়ী মহাশয়', 'কোষ্ঠীর ফলাফল', 'পাথেয়', 'দুঃখের দেওয়ালি' প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়াছেন।

রেডিয়াম চিকিৎসায় দান—

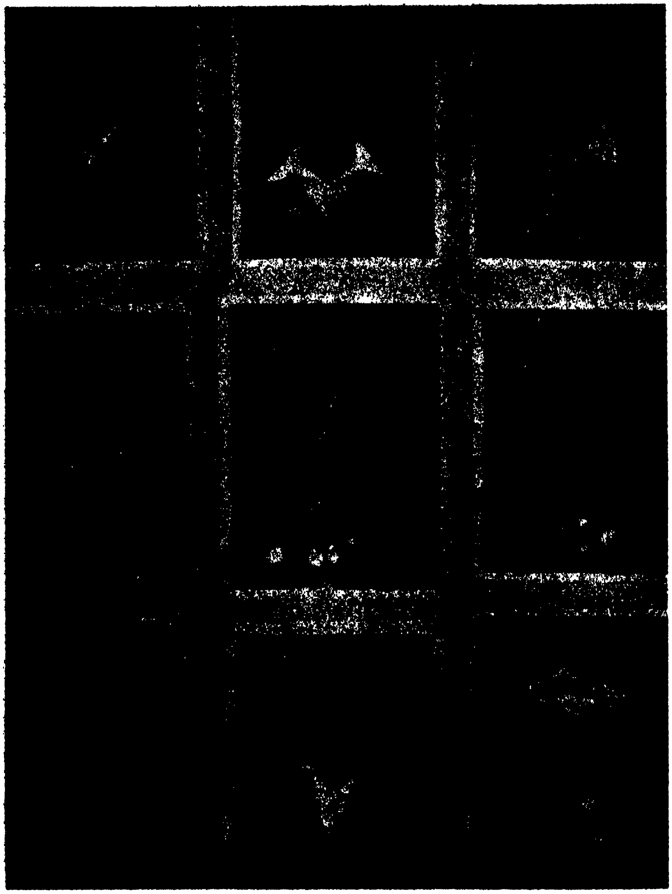
বরিশালের পরলোকগত ব্যারিষ্টার এন, গুপ্ত সি-আই-ই মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষাকল্পে তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুত বি-বি গুপ্ত ও শ্রীযুত আই-বি গুপ্ত কারমাইকেল কলেজ হাসপাতালে রেডিয়াম চিকিৎসা ব্যবস্থার জন্ত 'নলিনী গুপ্ত রেডিয়াম বিভাগ নামে একটি রেডিয়াম চিকিৎসা-বিভাগ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তাঁহাদের ব্যক্তিগত তহবিল হইতে পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

শ্রীরামপুর হাসপাতালে দান—

শ্রীরামপুরের জনৈক মাণিকলাল দত্ত স্থানীয় হাসপাতালের সংলগ্ন একটি চক্ষু চিকিৎসা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্ত তাঁহার উইলে ৫০ হাজার টাকা দান করিয়া গিয়াছিলেন। শীঘ্রই উক্ত বিভাগ খোলা হইবে।

মেদিনীপুরে জলপ্লাবন—

আমরা কটকের জলপ্লাবনের কথা ইতিপূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি। ঐ সময়ে মেদিনীপুরের কাঁথি ও তমলুক অঞ্চলেও প্লাবন হইয়াছিল। মেদিনীপুরের নদীমুখে ও কলিকাতা হইতে পুরী পর্য্যন্ত যে [illegible]



এলাহাবাদের সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃত কয়েক জন বালক-বালিকা

দিয়া যে খাল রহিয়াছে তাহার উত্তর পার্শ্বে বড় বড় বাঁধ আছে। বর্ষাকালে জলের চাপে এই বাঁধ ভাঙিয়া গিয়া চারিদিকে জল ছড়াইয়া পড়ে ও পথ ঘাট মাঠ প্লাবিত হইয়া যায়। বর্ত্তমান বর্ষের প্লাবনে ঐ অঞ্চল বিধ্বস্ত হইয়াছে। বিখ্যাত ইঞ্জিনীয়ার স্যর উইলিয়ম উইলকক্স এই বাঁধকেই যত নষ্টের মূল বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। এবারকার প্লাবনে কাঁথি অঞ্চলে প্রায় সাড়ে তিন শত ও তমলুকে প্রায় এক শত গ্রাম ভাসিয়া গিয়া তথাকার ধান-জমি নষ্ট হইয়াছে, লোকের গরুবাছুর মরিয়া গিয়াছে, ঘরবাড়িও ধ্বসিয়া পড়িয়াছে। এই সব অঞ্চলের ক্ষতির পরিমাণ প্রায় কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছে। এই সব অঞ্চলের অধিবাসীরা প্রধানতঃ কৃষিজীবী। তাহাদের দুর্দ্দশা সহজেই অনুমেয়। তাহাদের জন্য নানা সাহায্য-সমিতি খোলা হইয়াছে। যিনি যাহা দিবেন তাহাই সাদরে গৃহীত হইবে। মেদিনীপুর ফ্লাড রিলিফ কমিটির সম্পাদকের নিকট ২২৯, রসা রোড, টালীগঞ্জ—এই ঠিকানায় সাহায্যার্থ টাকাকড়ি পাঠাইতে হইবে।

পরলোকে শৈলসুতা দেবী—

শ্রীমতী শৈলসুতা দেবী সম্প্রতি পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি স্বামীর সহ জীবৎকালে ১৯২৮ সনের এপ্রিল মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে [illegible] দান করিয়াছিলেন। এই দানের উদ্দেশ্য সাধারণ বিজ্ঞান শিক্ষার ও ব্যাবহারিক বিজ্ঞান ও শিল্পের উন্নতি সাধন। তাঁহার মৃত্যুতে বাংলা দেশ এক স্বদেশহিতৈষিণী নারী হারাইল।

—

ভারতবর্ষ

এলাহাবাদে রামমোহন শতবার্ষিকী—

গত ২৯এ আশ্বিন ইংরেজী ১৫ই অক্টোবর রবিবার এলাহাবাদে বাণী মন্দিরের আনুকূল্যে স্বর্গীয় রাজা রামমোহন রায়ের শতবার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। অধ্যাপক নলিনবিহারী মিত্র, সভাপতি ও শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর বসু, সম্পাদক মহাশয়গণের বিশেষ উদ্যম ও উৎসাহে তাহার আয়োজন হইয়াছিল। বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের অবসরপ্রাপ্ত ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উৎসব দিবসের সভাপতিত্ব করিয়াছেন।

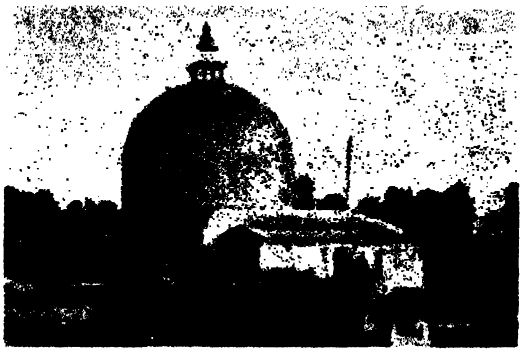
সঙ্গীত-বিদ্যায় প্রবাসী বাঙালীর কৃতিত্ব—

সম্প্রতি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে তথায় সঙ্গীত সম্মিলনী হইয়া গিয়াছে। ডক্টর দক্ষিণারঞ্জন ভট্টাচার্য্য ইহার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। সম্মিলনের সঙ্গীত ও নৃত্য প্রতিযোগিতায় মাধবী ভট্টাচার্য্য,

মায়া ভট্টাচার্য্য, রেবা দত্ত, শান্তিলতা ভট্টাচার্য্য, পরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বহু প্রবাসী বাঙালী বালক-বালিকা কৃতকার্য্য হইয়া পুরস্কার লাভ করিয়াছেন।

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলন—

গোরক্ষপুর হইতে শ্রীযুত ললিতমোহন কর লিখিতেছেন—আগামী ২৭, ২৮, ২৯এ ডিসেম্বর তারিখে বড়দিনের ছুটিতে গোরক্ষপুরে, প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের একাদশ অধিবেশন হইবে। তজ্জন্য গোরক্ষপুরের বাঙালীগণ পূর্ব্ব হইতে আয়োজনে ব্যাপৃত আছেন। একটি "কার্য্যচিন্তক



মহাপরিনির্ব্বাণ স্তূপ—কাশিয়া (মাথাকুয়ার)

পরিষৎ" গঠন করিয়া তাঁহারা নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের উপর কার্য্যভার অর্পণ করিয়াছেন:—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (অধ্যাপক) সভাপতি, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (এসিষ্টাণ্ট অ-ডিটর) কোষাধ্যক্ষ, শ্রীযুক্ত ক্ষিতিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (অধ্যাপক) সম্পাদক, শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (একাউণ্টস্ ডিপার্টমেণ্ট), শ্রীযুক্ত দিবাকর মুখোপাধ্যায় (অডিট ডিপার্টমেণ্ট) এবং শ্রীযুক্ত ললিতমোহন কর (অধ্যাপক) সহকারী সম্পাদক। বিশিষ্ট সাহিত্যানুরাগী মহোদয়গণকে মূল ও শাখা সভাপতির আসন গ্রহণ করিবার জন্য প্রার্থনাপত্র পাঠানো হইয়াছে।

প্রবন্ধগৌরবেই সাহিত্য-সম্মেলনের প্রতিষ্ঠা। প্রত্যেক বঙ্গ-সাহিত্য-সেবীর নিকট প্রার্থনা জানাইতেছি যে, সম্মেলনে পাঠের উপযোগী প্রবন্ধ পাঠাইয়া আমাদিগকে সহায়তা ও সম্মেলনকে সফলতা দান করুন। সম্মেলন এই কয়টি শাখায় বিভক্ত থাকিবে:—

সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, অর্থনীতি, বৃহত্তর বঙ্গ, সঙ্গীত ও শিল্প। ইহার মধ্যে যে-কোনও বিষয়ে হউক বিশেষজ্ঞের প্রবন্ধ পাইলে পরম উপকৃত হইব। আগামী পৌষের মধ্যে "অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিতমোহন কর, কাব্যতীর্থ, এম্-এ, বি-এল, গোরক্ষপুর, ইউ, পি,—এই ঠিকানায় প্রবন্ধ প্রেরিতব্য।

বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত প্রবাসী বাঙালীগণের একত্র হইবার এবং বঙ্গনিবাসী ভ্রাতৃগণের সাক্ষাৎলাভের সুযোগের একান্ত অভাব। উহা দূর করিবার জন্য প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে দশবার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। উত্তর-ভারতবর্ষের কেন্দ্ররূপে গোরক্ষপুর এ-বৎসর নির্ব্বাচিত হইয়াছে। ঐ স্থান বহুবিস্তৃত বি, এন্, ডব্লু রেলওয়েরও কেন্দ্র হওয়ায় দূরবর্ত্তী স্থানের প্রবাসী বাঙালীগণেরও যোগদানের সুবিধা হইবে। বঙ্গদেশ হইতেও প্রবাসী বাঙালীগণের প্রতি অনুরাগী বাঙালী সম্প্রদায়ের উপস্থিতি গোরক্ষপুর প্রবাসীরা আকাঙ্ক্ষা করেন। মহিলাদিগের জন্যও ব্যবস্থা থাকিবে।

গোরক্ষপুর অঞ্চল ভগবান বুদ্ধের লীলাভূমি। ঐতিহাসিক, দার্শনিক, ধর্ম্মজিজ্ঞাসু প্রভৃতি মনীষীরা এখানে অনেক দর্শনীয় বস্তু দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করিবেন, সন্দেহ নাই। শহর হইতে ৩৪ মাইল পূর্ব্বে, মোটর পথে কুশীনগরে বুদ্ধের মহাপরিনির্ব্বাণের স্থান—বৌদ্ধদিগের চারি মহাতীর্থের অন্যতম। এখানে তথাগতের প্রকাণ্ড শয়ান মূর্ত্তি ব্রহ্মাপ্রদেশের বৌদ্ধগণ স্বর্ণমণ্ডিত করিয়াছেন। গোরক্ষপুর হইতে উত্তরে ৬০ মাইল দূরে, নেপাল রাজ্যে রুম্মিন্ দেবী নামক স্থান আর একটি মহাতীর্থ। ইহাই প্রাচীন "লুম্বিনী উদ্যান," বোধিসত্ত্বের আবির্ভাব স্থান। এখানে সদ্যোজাত শিশু সিদ্ধার্থ, জননী মায়াদেবী ও মাতৃস্বসা প্রজাবতী গোতমীর মূর্ত্তি আছে। একটি জীর্ণ-সংস্কৃত অশোকস্তম্ভে ব্রাহ্মী অক্ষরে "এখানে বুদ্ধ শাক্যমুনি জন্মিয়াছেন" এইরূপ উল্লিখিত আছে। উপস্থিত নেপাল সরকার এখানে একটি যাত্রি-নিবাস ও গমনাগমনের প্রশস্ত রাস্তা নির্ম্মাণ করাইয়া দিতেছেন। প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগও খননকার্য্যে অনেক লুপ্ত স্মৃতিচিহ্ন উদ্ধার করিয়াছেন।



অশোক-স্থাপিত রুম্মিন্‌দেবী স্তম্ভ

"দোঁহা" রচয়িতা মহাপুরুষ কবীরের সাধনা ও সমাধির স্থান ১৬ মাইল দূরে, অতি সহজেই রেলে যাওয়া যায়। গোরক্ষনাথের সমাধি নগরের উপকণ্ঠে অবস্থিত। ইঁহার নাম হইতেই গোরক্ষপুর নাম হইয়াছে। নাথ-সম্প্রদায়ের বা "কানকাটা" যোগীদের ইহাই অন্যতর মহাতীর্থ। এ স্থানের ভূতপূর্ব্ব মহান্ত ৺গম্ভীরনাথের অনেক শিষ্য বঙ্গদেশীয়। তাঁহারা গুরুর সমাধি সুদৃশ্য মর্ম্মরপ্রস্তরে নির্ম্মাণ করাইয়াছেন।



জেনিভায় ভারতবর্ষ-সম্পর্কীয় আন্তর্জাতিক সভায় সভ্যগণ

এই সকল ও অন্যান্য ঐতিহাসিক স্থান দর্শনের ব্যবস্থা প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের ব্যবস্থাপকগণ করিয়া দিবেন।

গোরখপুরে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের যে সব শাখায় সভাপতিত্ব করিতে এ-পর্য্যন্ত যাঁহারা রাজী হইয়াছেন, তাঁহাদের নাম নীচে দেওয়া হইল।

সাহিত্য—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, কাশী।
সঙ্গীত—শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এলাহাবাদ।
দর্শন—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র, দিল্লী।
শিক্ষাবিজ্ঞান—শ্রীযুক্ত দেবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, আগ্রা।
ইতিহাস—শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, লক্ষ্ণৌ।
সাংবাদিকী—শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা।
অন্যান্য শাখার জন্য পত্রব্যবহার চলিতেছে।

বিদেশ

জেনিভায় ভারতবর্ষ-সম্পর্কীয় আন্তর্জ্জাতিক সভা—

ভারতবর্ষের মঙ্গলের জন্য ভারতের বাহিরেও আন্দোলন আবশ্যক। এই জন্য শ্রীমতী কুজিন্‌স্, ডক্টর প্রিভা, কুমারী রোলা (রোম্যা রোল্যার ভগিনী), কুমারী হকপ প্রভৃতি ভারতহিতৈষী বন্ধুগণ ১৯৩২ সনের অক্টোবর মাসে ভারতবর্ষের হিতের জন্য জেনিভায় আন্তর্জ্জাতিক সম্মেলন আহ্বান করেন। গত ১৯এ সেপ্টেম্বর এই সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুত ভুলাভাই দেশাই, শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু মিসেস্ হামিদ আলী এই সম্মিলনে উপস্থিত হইয়া ভারতবর্ষের নানা সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। ভারতবাসীর স্বাধীনতা লাভে পূর্ণ অধিকার, এরোপ্লেন হইতে বোমা বর্ষণের নিন্দা, ভারতবর্ষের জাতীয় ঋণ সম্পর্কে ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের মধ্যে আপোষের চেষ্টা প্রভৃতি সম্বন্ধে সম্মেলনে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল।

বিশ্বরূপ

শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

বেহার প্রদেশের একটি অখ্যাতনামা সবডিবিসনের ডাকবাংলায় সেদিন রাত্রে যাহারা আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে মিঃ ক্রিড, তাহার পত্নী ও আমাকেই উল্লেখযোগ্য বলা যাইতে পারে। অন্যান্য সকলে আমাদেরই সাঙ্গোপাঙ্গ ; কেহ চাপরাসী, কেহ খানসামা, কেহ চাকর।

আমরা বিকালের ডাকগাড়ীতে এখানে পৌছিলাম, কিন্তু লটবহর লইয়া আস্তানায় পৌছিতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া গেল। সাহেবী কেতায় এতটা যাত্রার পর এক কাপ চা না হইলে চলে না, বিশেষতঃ কাহারও বৈকালিক চা-ও হয় নাই, কাজেই ডাকবাংলার বারান্দায় টেবিল পাতিয়া মাখন ও রুটি সহযোগে উষ্ণ পানীয় গলাধঃকরণ করিতে আরম্ভ করা গেল।

ক্রিড্ বলিল, দেখ চ্যাটার্জ্জী, এখানকার চারিদিকে কেমন একটা অপূর্ব্ব আত্ম-সমাধির ভাব রহিয়াছে; মনে হয়, যেন সমস্ত দিক আপনার ভাবে আপনি বিভোর।

আমি দিগন্তে চাহিয়া ছিলাম। সম্মুখে কিছুদূর পর্য্যন্ত সবুজ মাঠ ; হয়ত ধানের, ঠিক বুঝা যাইতেছিল না। তাহার ওপারে বন ; তাহারও ওপারে বহুদূরে হিমালয়ের হিম-শিখর অস্পষ্ট হইতে অস্পষ্টতর হইয়া আসিতেছিল। শীতের প্রারম্ভ ; সান্ধ্য বাতাসে অদূরের মাঠে ঈষৎ কম্পন লাগিয়াছে। ডাকবাংলার সম্মুখে দুই একটি নামহীন ফুলের গাছে রঙীন ফুল ফুটিয়াছে ; গন্ধ নাই, বর্ণ আছে।

বাহিরের দৃশ্য দেখিতেছিলাম সত্য, কিন্তু তাহা মনে কোনও রূপ রেখাপাত করিতেছিল না।

বলিলাম, তা সত্যি।

ক্রিড্-পত্নী নিজের জন্য চা ঢালিতেছিল, বলিল, জান চ্যাটার্জ্জী, আমার ঐ টেরিয়ারটা ১৯৩০ সনের লণ্ডন 'শো'তে মেডেল পাইয়াছে।

জানিতাম সাহেবের সঙ্গে কথা হয় টেরিয়ার, নয় আবহাওয়া, 'dog show', 'flower show', নয় নারী-প্রগতিতে সমাপ্তি লাভ করিবে। বলিলাম, তাই না-কি?

ক্রিড কথাটা লুফিয়া লইয়া বলিল, শুধু তাই নয়—ঐ যে 'হাউণ্ড'টা দেখচ, ওটার বংশমর্য্যাদার কথা শুনিলে তুমি অবাক হইবে। ওটার বাপ ছিল সুইট্জারল্যাণ্ডে, মা আমেরিকায়। বাপের নামটা হয়ত জান—'ব্রিস্কো'—১৯২৪ সালে প্যারিসের 'শো'তে প্রথম প্রাইজ পায়। লর্ড রিবন উহাকে কিনিয়া লয় পাঁচশত পাউণ্ডে।

ক্রিডের বিবরণে অবাক না হই আকৃষ্ট হইতেছিলাম। একবার তাহার মুখের দিকে চাহিয়া 'হাউণ্ড'টির আপাদমস্তক লক্ষ্য করিলাম। ছুঁচলো মুখ, দীর্ঘ অবয়ব—উচ্চে তিন ফুট কি সাড়ে তিন ফুট—অদ্ভুতভাবে লাফাইয়া চলে—একান্ত নিঃশব্দে। পিতৃপুরুষের আভিজাত্যের চর্চ্চায় মন ইহার প্রতি সশ্রদ্ধ হইয়া উঠিতেছিল কি-না বলিতে পারি না, তবে মনে হইতেছিল, ইহাকে যেন এই অথর্ব্ব ভারতবর্ষে মানায় না। যেখানে মানুষের আহার্য্য প্রতিদিন ছয় পয়সা বলিয়া নির্দ্ধারিত সেখানে পথিপার্শ্বের কঙ্কালসার সারমেয়কুলকেই যেন যথাযোগ্য বলিয়া মনে হয়।

কথা বেশী জমিল না। একে শ্রান্তি তাহার উপর চিন্তা। ক্রমে অন্ধকার হইয়া আসিল। এখানকার আকাশের পরিধি বড়—অন্ধকার যেন আরও ঘনঘোর। হয়ত কৃষ্ণপক্ষের পরিপূর্ণতা আসিয়া পৌছিয়াছে। অন্ধকারের সমগ্রতায় আমাদের ডাকবাংলা, অদূরের বন, ওপারের হিমালয়—সমস্ত একাকার হইয়া গেল। আকাশে তারার সারি নীচের অন্ধকারের মুখ চাহিয়া আকুল হইয়া উঠিল; আমরা যে যাহার ঘরে ঢুকিয়া পড়িলাম।

পরদিন সন্ধ্যায় কাজ হইতে ফিরিতে দূর হইতেই ক্রিড-দম্পতিকে ডাকবাংলার বারান্দায় দেখা গেল। ধূসরতায় সমস্ত অস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কাছে আসিতেই ক্রিড ছুটিয়া আসিয়া বলিল, চ্যাটার্জ্জী, আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে।

হয়ত কিছু আঁচ করিতে চেষ্টা করিতেছিলাম কিন্তু কিছুই করিতে হইল না। ক্রিড-পত্নী আসিয়া প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল।

দুই জনের অপর্য্যাপ্ত ও অসমাপ্ত কথা হইতে আবিষ্কার করিলাম, পথচারী কোনও মোটরকার তাহাদের এই সাধের হাউণ্ডটির উপর দিয়া একান্ত নির্দ্দয়ভাবে তাহার চক্র নির্ব্বিবাদে চালাইয়া দিয়াছে? হয়ত হাউণ্ডের জীবনদীপ নির্ব্বাপিত হইবার আর বিশেষ বিলম্ব নাই। ডাক্তার ডাকিতে পাঠানো হইতে মোটরটিকে দাঁড় করাইয়া তাহার নম্বর লওয়া পর্য্যন্ত সকলই হইয়াছে, এ সকল মাত্র দশ মিনিট পূর্ব্বেকার কথা।

অদূরে কম্বলাসনের পার্শ্বে ক্রিড-পত্নী উপুড় হইয়া বসিয়া। কম্বলের উপর বোধ হয় হাউণ্ডটি পড়িয়া আছে, সন্ধ্যার অন্ধকারে স্পষ্ট কিছুই বোঝা যাইতেছিল না। ঘরের ভিতর আলো দেওয়া হইয়াছিল—আলোটা বাহিরে লইয়া আসিলাম।

চতুষ্পদ জীবটি একান্ত নিঃসহায় ভাবে শুধু পা কেন, সমস্ত দেহ ছড়াইয়া দিয়া নিঃশব্দে পড়িয়া আছে। মাঝে মাঝে চক্ষু মেলিতেছে, কিসের আবেশে পুনরায় বন্ধ করিয়া ফেলিতেছে। নাক ও মুখ দিয়া কখনও কখনও নিঃশ্বাসের সঙ্গে রক্ত আসিতেছে—দৃষ্টি অর্থহীন, শ্বাসকষ্ট সমধিক।

বলিলাম, মুখে চোখে জল দাও নাই?

ক্রিড মাথা নাড়িয়া বলিল, না। তাহারা উভয়েই যেন একান্ত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল।

বলিলাম, এক্ষেত্রে মানুষেরও যাহা হইত, হয়ত পশুরও তাহাই। ঠাণ্ডা জল মাথায় দেওয়ায় দোষ হইবে না।

জল আসিল। পরিচ্ছন্ন কাপড়ে জল লইয়া আস্তে আস্তে আমরা উহার নাকে ও মুখে দিতে আরম্ভ করিলাম। শ্রান্ত অসহায় পশু অর্থহীন দৃষ্টিতে দুই একবার আমাদের দিকে চাহিল; রক্ত ধুইয়া মেজেতে ধারা বহিল। দেখিলাম ক্রিড ও তাহার স্ত্রীর চক্ষু ছলছল করিতেছে। ক্রিড-পত্নীর এ দৃশ্য অসহ্য বোধ হইতেছিল—অত্যন্ত করুণ স্বরে বলিল, কিটি,...কিটি,...কিটি আমার বাঁচিবে তো চ্যাটার্জ্জী?

কথা কহিলাম না, কহিলে তাহার বিশেষ কোনও অর্থও হইত না। একদৃষ্টে কিটির দিকে চাহিলাম।

তালে তালে পাঁজরের স্পন্দন দেখা যাইতেছে—স্পন্দন সময়মতেই পড়িতেছে, তবে একটু দ্রুত; কখনও নাক দিয়া কখনও বা মুখ দিয়া বায়ু গ্রহণ ও পরিবর্জ্জন চলিতেছে। মনে হইতেছিল, আহত পশু যেন বেদনায় বেহুঁস।

ক্রিডও বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিল। সে ক্রমাগত কিটির মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত অত্যন্ত সন্তর্পণে ও আদরে হাত বুলাইয়া দিতেছিল। তাহার হাতের প্রতিটি ভঙ্গিতে মনে হইতেছিল যেন সে কিটির একটু ব্যথা দূর করিবার জন্য নিজের জীবন পণ করিতেও কাতর নয়; অদূরে ক্রিড-পত্নী নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া,—চক্ষু সজল,যেন মুমূর্ষু অতি নিকট কোনো আত্মীয়ের শয্যাপার্শ্ব অধিকার করিয়া আছে। এই বিষণ্ণ সন্ধ্যায়, এক অখ্যাতনামা ডাকবাংলার বারান্দায়, আমরা তিনটি মানব একদিকে দাঁড়াইয়া একটি পশুকে আসন্ন মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য বিশ্বনিয়ন্তার নিকট যেন চরম প্রার্থনা জানাইতে আরম্ভ করিলাম—কায়ে, মনে ও বাক্যে।

ক্রিড বলিল, এখানকার মোটরচালকদের খুব বেশী রকম শাস্তি হওয়া দরকার। লক্ষ্য করিয়াছ এখানকার রাস্তায় কত ছাগল বাঁধা থাকে? বল ত ত্রিশ মাইল বেগে গেলে মিনিটে কয়টা ছাগল মারা যায়?

হিসাব করিবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু বুঝিলাম ক্রিডের অকস্মাৎ এই দেশী ছাগভক্তির মূল কোথায়; তর্ক চলে না; বলিলাম, তা সত্য।

কিটি অস্ফুট বেদনা ধ্বনি করিয়া উঠিল। ক্রিড-পত্নী ছুটিয়া আসিল। বলিল, কিটি, কিটি, কি হইয়াছে?—যেমন করিয়া মা রুগ্ন ছেলেকে বলে। কিটি উত্তর দিল না, হাত পা ছুঁড়িতে লাগিল—হয়ত অসহ্য বেদনায়। আমি আরও ভাল করিয়া মাথায় জলের পটি লাগাইতে লাগিলাম—ক্রিড আরও সন্তর্পণে হাত বুলাইতে লাগিল।

ডাক্তার আসিলেন। বলিলেন, অ্যাক্সিডেণ্ট কেস তো?—ও কি কুকুর না কি? আমি যে শুনিলাম সাহেবের ছেলে।

ভাবিলাম, বড় মিথ্যা শোনেন নাই। ক্রিডকে বলিলাম তুমি কি পশুর ডাক্তার ডাকিয়া পাঠাও নাই?

ক্রিড হতভম্বের মত বলিল, তাহা তো বলি নাই। বলিলাম, ডাক্তার বাবু, আমাদের বিদ্যা মানুষের পক্ষেই খাটে না—তা পশু। আপনি একবার দেখুন তো।

ডাক্তার বাবু বিদ্যা-গৌরবে নত হইলেন। টর্চ্চ জ্বালিয়া তন্ন তন্ন করিয়া কিটির নাক, মুখ, চোখ দেখিলেন; বুকের হাড় কয়টা হাতড়াইয়া লইলেন, পা ও থাবা পরীক্ষা করিলেন।

মনে মনে হাসিতেছিলেন কি হাউণ্ডের সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিতেছিলেন জানি না, বলিলেন, এক্ষেত্রে আমাদের প্রথম ঔষধ মরফিয়া—তা' এখন, ভাল—কুকুরের পক্ষে কতকটা 'ডোজ' ঠিক হইবে তাহা তো জানা নাই।

ভাবিলাম, এটুকু আর অজ্ঞাত থাকিলেও ক্ষতি হইবে না। বলিলাম, আপনাকে মিথ্যা কষ্ট দেওয়া—পশুর ডাক্তার বোধ হয় আর সদর ছাড়া পাওয়া যাইবে না—নয়? সে তো ত্রিশ মাইল দূর।

ডাক্তার বাবু সায় দিলেন। ক্রিড-পত্নী আনমনে বলিল, ত্রি-শ-মা-ই-ল!

মানুষের ডাক্তার চলিয়া গেলেন। পশুর ডাক্তার আনিবার জন্য মোটর লইয়া লোক সদরে চলিয়া গেল, তবে ভোরের পূর্ব্বে যে তাহার আসিবার কোনো সম্ভাবনা নাই সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত রহিলাম। তবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত কিটি টেঁকে কি-না সন্দেহ।

রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত বসিয়া রহিলাম। এক একবার নিতান্ত বিরক্তি ধরিয়া যাইতেছিল। একটা কুকুর বই তো নয়? রোজ তো এমন কত কুকুর পথের ধারে পড়িয়া থাকিতে দেখি কে বা তাহাকে একটু জল দেয়, বরং রাস্তা জুড়িয়া থাকিলে একটা লাথি দিয়া চলিয়া যাই। হইলই বা ইহার পিতা স্যুইট্‌জারল্যাণ্ড-বাসী, হইলই বা ইহার মাতা কোনো ইয়াঙ্কি ধনীর লালিতা কন্যা—কি যায় আসে?

ক্রিডের দিকে চাহিলাম, তেমনি শোকার্ত্ত, বিহ্বল; ক্রিড-পত্নীর দিকে চাহিলাম, তেমনি সজলনয়ন। ভদ্রতায় বাধিয়া গেল, তেমনি বসিয়া জলের পটি দিতে লাগিলাম।

কিটির যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাবটা কাটিয়া একটু চেতনা আসিয়াছে; তাহাতে যন্ত্রণা বোধ সম্ভবতঃ বেশি হইতেছে। একটু বেশি অস্থিরতা—একটু বেশি কাতরানি। দূর হইতে মনে হয় যেন কোনো রুগ্ন মানব বেদনায় অস্ফুট ক্রন্দন করিতেছে; মানবের ও পশুর ক্রন্দনের ভাষা কি এক?

ক্রিড বলিল, তোমার তো কাপড় ছাড়াও হয় নাই; সারা দিন কাজের পর এক কাপ চা-ও তো পেটে পড়ে নাই। তুমি যাও।

বলিলাম, তোমারও তো তথৈবচ। এসো, সকলে এক একে যাই—পালা করিয়া রাত জাগা যাইবে।

ক্রিড বলিল, আচ্ছা, সে দেখা যাইবে—তুমি তো যাও। ফাঁক খুঁজিতেছিলাম; ভদ্রতা রক্ষা করিয়া নির্ব্বিবাদে উঠিয়া পড়িলাম। আমার কামরায় আসিয়া স্নান সারিয়া আহার করিলাম। আর যাইবার ইচ্ছা ছিল না—দরজার ফাঁক দিয়া দেখিলাম, ক্রিড-দম্পতি তেমনি বসিয়া মরণোন্মুখ পশুর সেবা করিতেছে—ক্লান্তি নাই, শ্রান্তি নাই!

অর্দ্ধরাত্রে অস্ফুট বেদনাধ্বনিতে ঘুম ভাঙিয়া গেল। চকিতে সন্ধ্যার ব্যাপারটা মনে পড়িয়া গেল। আস্তে আস্তে উঠিয়া দ্বারের কাছে আসিলাম। বারান্দায় বাতি জ্বলিতেছে, অদূরে ক্যাম্প খাটের উপর শুইয়া ক্রিড নিদ্রিত কি অর্দ্ধনিদ্রিত। সম্মুখে কম্বলাসনে বসিয়া ক্রিড-পত্নী পীড়িত কিটির গায়ে হাত বুলাইতেছে, মাঝে মাঝে জলের পটি মাথায় দিতেছে। পশু নিস্তব্ধ, নিশ্চল—শেষ হইয়া গিয়াছে কি-না কে জানে?

অবাক্ হইলাম। সারারাত্রি ধরিয়া এমন অক্লান্ত সেবা, এই তীব্র মমতা, এই উদার স্নেহ দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। কথা বলিবার ইচ্ছা হইল না। আমার চোখে সমস্ত জগৎ লেপিয়া মুছিয়া একাকার হইয়া গেল। মনে হইল, আকাশ, বাতাস, বৃক্ষ, লতা, মানব, পশু, নদ, নদী, বন, উপবন, পত্র, পুষ্প—সমস্ত বিশ্ব যেন অসাড় হইয়া এমন ভাবে নিশ্চল হইয়া পড়িয়া আছে, আর কে যেন এক মাতৃমূর্ত্তি অদৃশ্যে এমনি করিয়া সকলের মাথায়, হাতে, সর্ব্বদেহে তাহার অভয় হস্ত বুলাইয়া দিতেছে। রাত্রির সেই সম্মোহন শক্তি বড় ভয়ানক; সেবারতা ক্রিড-পত্নী মহিমময়ী রূপে আমার চক্ষে অমর হইয়া রহিল।

চার দিন পরের কথা। শহর হইতে ডাক্তার আসিয়াছিল, কিটি এখন অনেকটা ভালর দিকে। ডাক্তার বলিয়া গিয়াছেন, এখন আর কোন ভয়ের কারণ নাই, তবে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিতে এখনও উহার বেশ কিছুদিন লাগিবে।

সকাল আটটা। আমরা ডাক বাংলার সেই বারান্দাটিতে বসিয়া স-কলরবে চা পান করিতেছিলাম। একটু শীতের আমেজ লাগিয়া আসিয়াছে। দূরের পাহাড় আজ আর দেখা যায় না; বোধ হয় কুহেলি তাহাকে গ্রাস করিয়া আছে। মাঠের পারের বনও অস্পষ্ট।

পাশে কিটি অর্দ্ধশায়িত; এখনও দাঁড়াইতে পারে না। ক্ষণে প্রভু পরক্ষণেই প্রভু-পত্নীর দিকে তাকাইয়া সে লেজ নাড়িতেছিল। ক্রিড বলিতেছিল, কিটি বিস্কুট খাবে?

কিটি যেন মানুষের কথা বোঝে—মুখে যেন একটু হাসির লহর খেলিয়া যায়।

অর্দ্ধোলঙ্গ একটি মনুষ্যমূর্ত্তি দেখা গেল। উর্দ্দিতে বোঝা গেল, সে গ্রামের চৌকিদার। বলিল, সাহেব, বাঘ!

ক্রিড লাফাইয়া উঠিল। বলিল, হ্যালো, কোথায় বাঘ?

চৌকিদার বলিল, হুজুর, এই পাশের গ্রামেই একটা ঝোপে আশ্রয় লইয়াছে। আজ মাসখানেক যাবৎ এদিকে বাঘের বড় উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে। আজ এর কুকুর, কাল তার বাছুর।

বাধা দিয়া ক্রিড বলিল, আয়োর নেই মাংতা—চ্যাটার্জ্জী, চল দেখি।

বন্দুক প্রস্তুত হইল। ক্রিড-দম্পতি চলিল; বাধ্য হইয়া আমিও চলিলাম। অজুহাৎ ছিল না—নহিলে বাঙালী একান্ত ভীরু বলিয়া আমার বাকি জীবিত কাল পর্য্যন্ত বাক্যবাণ সহিতে হইবে। সঙ্গে টেরিয়ার চলিল।

প্রায় দেড় মাইল হাঁটিয়া গ্রাম পাওয়া গেল। চৌকিদার পথপ্রদর্শক। আনাচ, কানাচ, জলা রাস্তা ও বাঁক ঘুরিয়া ঘর্ম্মাক্ত দেহে প্রায় দশটার সময় একটা ডোবার ধারে উপস্থিত হইলাম। ডোবাটা অপ্রশস্ত ও অগভীর; জল অপেক্ষা পাঁক বেশী বলিয়া মনে হয়। পাশেই ক্ষুদ্র একটা বন—বনে নানা জাতীয় গাছ—গাছগুলি মাঝারি। ডোবার ধারে সেই বন ঘিরিয়া প্রায় বিশ-পচিশ জন লোক—বাঁশের লাঠি হাতে কি যেন পাহারা দিতেছে। চৌকিদার বলিল, সাহেব, তাড়া খাইয়া বাঘ এই বনের মধ্যে বাসা লইয়াছে। মনে হয়, ঐ যে বড় গাছটা উহার নীচে যে জঙ্গল তাহাতে মাথা লুকাইয়া শুইয়া আছে।

ক্রিড উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। চাহিয়া দেখিলাম চক্ষে তাহার অসহ উত্তেজনা—একেবারে হিংস্র পশুর মত। ক্রিড-পত্নী ব্রিচেস পরিয়া, টাই বাঁধিয়া পুরাদস্তুর সাহেব সাজিয়াছে—তাহার উন্মাদনাও ক্রিড অপেক্ষা কোনও অংশে কম নহে।

বলিলাম, তাই তো কি করা যায়?

ক্রিড বলিল, সোজা কথা। আমি এদিকে দাঁড়াই; তুমি ও মিলি এই লোক লইয়া ওদিক হইতে তাড়া দাও—বাপধন কোথায় যাইবে?

তাহাই ঠিক হইল। আমরা তিন দল বাঁধিয়া তিন দিক হইতে সেই গাছের গুঁড়ি লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইলাম; ক্রিড তাহার দল লইয়া জলার ধারে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

প্রথমে কিছুই দেখা গেল না। আমরা তিন দিক হইতে ক্রমাগত অগ্রসর হইতে লাগিলাম। জানিতাম, বাঘ, বিশেষতঃ চিতা, বড় হুঁসিয়ার। এমনি চুপ করিয়া বসিয়া থাকে যে বাহির হইতে কেহ বুঝিতেও পারে না এখানে কিছু আছে বা থাকিতে পারে।

আশে-পাশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গাছ, মাঝে মাঝে ঝোপ। নীচে কোথায়ও বা ক্ষুদ্র কাঁটার গাছ—কোথায়ও বা দুই-একটা বন্য ফুল। এ সব দেখিবার সময় ছিল না; পাশ ফিরিয়া দেখিলাম, ক্রিড-পত্নী অনেক বেশী অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছে; সর্ব্বদেহে তাহার অব্যক্ত উন্মাদনা।

চৌকিদারের কথা ঠিক। সহসা সেই লক্ষ্য স্থল হইতে কি যেন একটা বাহির হইয়া ঝোপ হইতে ঝোপের মধ্যে অন্তর্হিত হইতে লাগিল। আমরা বিশেষ কিছু দেখিতে পাইতেছিলাম না, শুধু ডালের ও পাতার দোলায় মনে হইতেছিল, এখান দিয়া যেন কি চলিয়া যাইতেছে।

পলায়মান ব্যাঘ্র প্রায় জলার একদিকে আসিয়া পড়িল। আমরা তখন প্রায় তাহার চারিদিক ঘেরিয়া ফেলিয়াছি। জলার ধারে একটি ক্ষুদ্র কুটীর—কি হেতু নির্ম্মিত হইয়াছিল জানি না; হঠাৎ ব্যাঘ্রপ্রবর একনিমেষে তাহার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। স্পষ্ট দেখিলাম, একটা প্রকাণ্ড চিতা।

ক্রিডের সাহস অদ্ভুত; হয়ত বা একেবারে মত্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কুটীরের দ্বারের মাত্র পাঁচ ছয়-গজ দূরে দাঁড়াইয়া সে ভিতরের দিকে চাহিল। ক্রুদ্ধ, ভীত ব্যাঘ্র তখন তাহার আসন্ন মৃত্যুর কথা মনে করিয়া এক কোণে ক্রমাগত স্ফীত হইয়া বাহিরের মনুষ্যকুলের প্রতি তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল—সে পরিশ্রান্ত, ভীত, একক ও অসহায়। বাহিরের মনুষ্য কুলে তখন অসীম ঔৎসুক্য—অপার উন্মাদনা, অপূর্ব্ব উদ্দীপনা—হত্যা চাই! রক্ত চাই!

ক্রিডের ডাক আরও অদ্ভুত। সেই ক্রোধোজ্জ্বল হিংস্র চক্ষু লক্ষ্য করিয়া সে গুলি ছুড়িল। মুহূর্ত্ত মধ্যে ভীষণ গর্জ্জন করিয়া ব্যাঘ্র লাফাইয়া উঠিল। বোধ হয় তাহার শেষ চেষ্টা - কিন্তু আর অগ্রসর হইতে হইল না; দ্বারপ্রান্তে আসিয়াই পড়িয়া গেল।

ক্রিড চীৎকার করিয়া বলিল, খবরদার, কাছে যাইও না, ও সব বুজ্‌রুকি।

কিন্তু উত্তেজনায় গ্রাম্য মনুষ্যের দলে কেহ তাহার কথা শুনিল না। মুহূর্ত্ত মধ্যে সকলে লাঠি হস্তে বাঘের তিন-চারি হাত দূরে তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

বুজ্‌রুকি হইতে পারিত বটে, কিন্তু বুজ্‌রুকি নয়। বাঘের কোমর বিদ্ধ করিয়া গুলি চলিয়া গিয়াছে; তাহার আর উঠিবার ক্ষমতা বিলুপ্ত। আমরা আগাইয়া আসিলাম।

সেই অসহায় হিংস্র দানব অসহ্য যাতনায় অস্থির হইয়া ক্রুদ্ধ কাতর দৃষ্টিতে ক্রমাগত এদিক-ওদিকে চাহিতেছিল। চক্ষু দিয়া যেন বজ্র ঠিক্‌রিয়া পড়িতেছে, রক্তে সমস্ত স্থানটা ভাসিয়া গিয়াছে মুখে শব্দ নাই; কখনও বা একটু-আধটু মুখবিকৃত করিয়া আপনার মৃত্যু-যাতনা প্রকট করিতে চেষ্টা পাইতেছে মাত্র। পাশে দাঁড়াইয়া মৃত্যুদূতগণ; কেহ আগ্নেয়াস্ত্রে কেহ বংশদণ্ডে সুসজ্জিত - এক অসহায় বন্যবীর যেন অন্যায় যুদ্ধে সমরাঙ্গনে মরণাহত!

গ্রাম্য লোকগুলির আর সহ্য হইতেছিল না। কাহারও ছাগল, কাহারও বাছুর, কাহারও কুকুর গিয়াছে। অজস্রভাবে লাঠি পড়িতে লাগিল। এই স্পষ্ট দিবালোকে মরণোন্মুখ দানব একবার মাত্র মুখব্যাদান করিয়া যেন ঊর্দ্ধে দেবতার কাছে কি প্রার্থনা করিল, পরক্ষণেই একবার অসহ্য কাতরোক্তি করিয়া যে চক্ষু বুজিল আর মেলিল না। বুকের স্পন্দন স্থির হইয়া সহসা জীবন ও মরণের সীমান ধসিয়া পড়িল। আহত পশুর জন্য ডাক্তার ডাকিবার পরিকল্পনাও কাহারও হইল না— তাহার তৃষ্ণার্ত্ত মুখে জলবিন্দু দিবার স্বপ্নও কেহ দেখিল না। শুধু বিশ্বনিয়ন্তা হয়ত উপর হইতে একটু করুণার হাসি হাসিলেন, আর নিম্নে ধরিত্রীর শ্রেষ্ঠ সন্তানগণ লগুড়াঘাতে অবাধে উহার এই অগাধ অসহায়ত্বের প্রতিশোধ গ্রহণ করিল।

চাহিয়া দেখি ক্রিড-পত্নী অসহ্য উন্মাদনায় মত্ত। চক্ষু হইতে অজস্রধারে হিংস্রতা ঠিকরিয়া বাহির হইতেছে!

চমক ভাঙিল, ক্রিড বলিতেছে, পাক্কা ছয় ফুট চার ইঞ্চি—একটা ছবি লইলে ভাল হইত; ক্যামেরাটা আনিয়াছ কি?

ভাবিলাম, বিশ্বদেবতার কাছেও কি কুকুরের আঘাত ব্যাঘ্রের আঘাতের চাইতে বেশী বাজে? মনে পড়িল সেই রাত্রের ক্রিড-পত্নীর দেবতুল্য মাতৃমূর্ত্তি আর আজ প্রভাতের এই অশোভন হিংস্র উন্মাদনা! সমগ্র মানবসমাজের বিরুদ্ধে এই অসহায় ব্যাঘ্রের অন্তিম দৃষ্টি আমার বুকে উজ্জ্বল হইয়া রহিল। তাহার ব্যথা কি ব্যথা নয়? - তাহার পিপাসা কি পিপাসা নয়? একের প্রতি এই উদার স্নেহ কি অন্যের প্রতি হিংস্রতার প্রতিশোধ মাত্র?— কে বলিবে ইহাই কি বিশ্বরূপ?

ভ্রম-সংশোধন

গত সংখ্যা প্রবাসীতে 'ভারতে মুদ্রানীতি' প্রবন্ধে ৬৭ পৃষ্ঠার ২য় স্তম্ভ ২১শ ও ২৪শ পংক্তিতে এবং ৭০ পৃষ্ঠার ২য় স্তম্ভ ১৫শ, ১৯শ ও ২০শ পংক্তিতে 'অর্দ্ধমান' স্থলে 'অর্থমান' পড়িতে হইবে

পঞ্চশস্য

বর্ত্তমান যুগের গৃহসজ্জা—



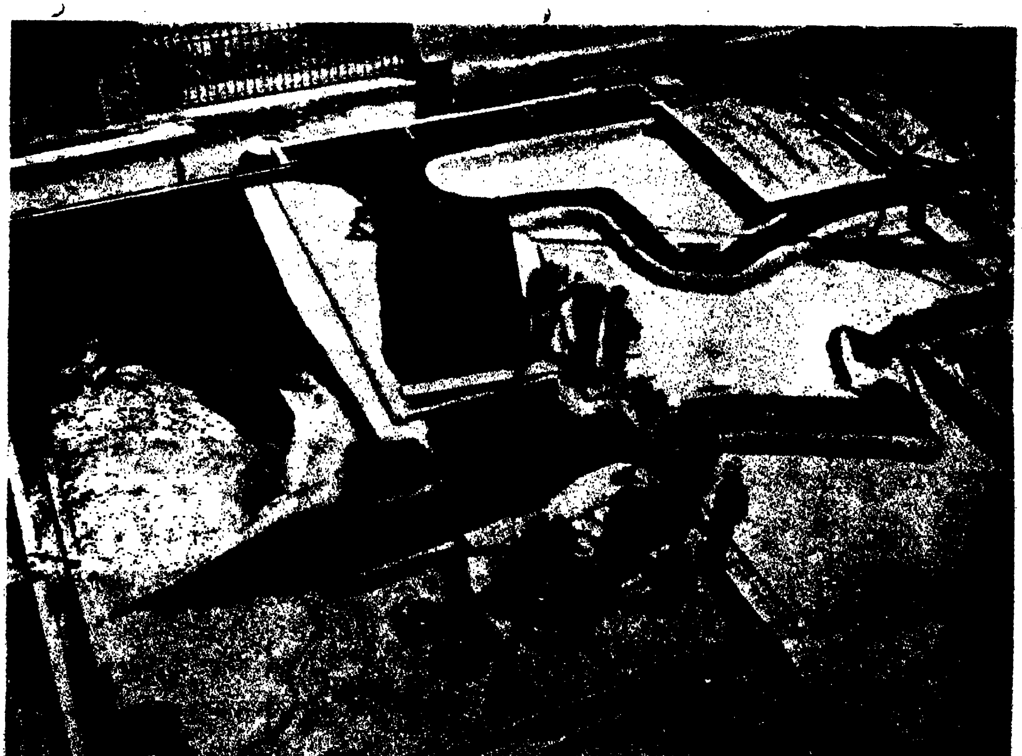
বর্ত্তমান যগের গহসজ্জার নিদর্শন—একটি পড়িবার ঘর

বর্ত্তমান যুগের গৃহসজ্জা আড়ম্বর ও বাহুল্য বর্জ্জিত, কিন্তু ইহা সত্ত্বেও কিরূপ সুন্দর তাহার ধারণা সঙ্গের দুইটি চিত্র হইতে হইবে।

জলপ্লাবন নিবারণের উপায় নির্দ্ধারণ—

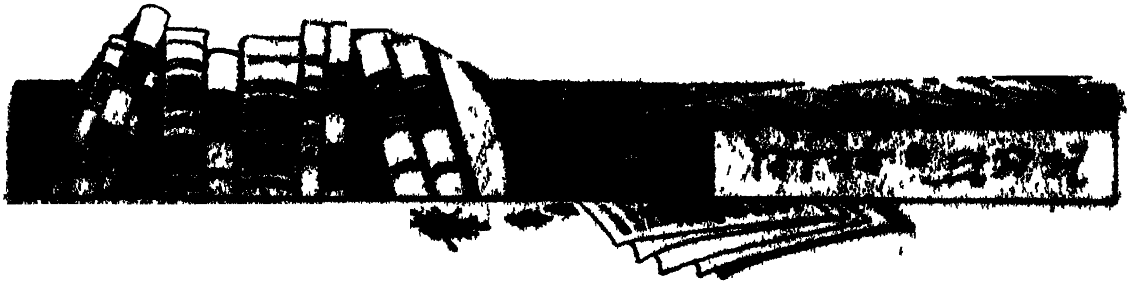
আমাদের দেশে জলপ্লাবন প্রায়ই হইয়া থাকে, কিন্তু কি করিয়া নিবারিত হইতে পারে, তাহার উপায় অনুসন্ধান হয় না, সুতরাং প্রতিকারও হয় না। পাশ্চাত্য দেশে ঠিক তাহার উল্টা। আমেরিকার এক জায়গায় জলপ্লাবন খুব বেশী হয় বলিয়া সেই জায়গাটির একটি কৃত্রিম 'মডেল' তৈরী করিয়া কিভাবে জল নিকাশন করা যাইতে পারে তাহা পরীক্ষা হইতেছে। এই পরীক্ষা সফল হইলে আসল জায়গায়ও সেই উপায় অবলম্বন করা হইবে।





উপরে—
বর্ত্তমান যুগের গৃহসজ্জার নিদর্শন- একটি বসিবার ঘর

কৃত্রিম মডেল তৈরী করিয়া জলপ্লাবন নিবারণের উপায় অনুসন্ধান



"[illegible] রাজনৈতিক দলের সম্মিলিত চেষ্টা

অনেক প্রধান প্রধান কংগ্রেসওয়ালা কিছু দিন হইতে এই ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন, যে, সমগ্রভারতীয় কংগ্রেস-কমিটির একটি অধিবেশন আহ্বান করা হউক এবং তাহাতে কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ কর্ম্ম-পন্থা নির্দ্দিষ্ট হউক। পুনায় কনফারেন্সের পর আগে মহাশয় ও গান্ধীজী যে অনুজ্ঞা ও মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে সকলে সন্তুষ্ট না-হওয়ায় ঐ প্রকার ইচ্ছা প্রকাশিত হইয়াছে। পণ্ডিত জওআহরলাল নেহরু কংগ্রেসের সেক্রেটরী। তিনি ইচ্ছা করিলে স্বয়ং কমিটির অধিবেশন করাইতে পারিতেন। কিন্তু তাহা করেন নাই; বলিয়াছেন, নির্দ্দিষ্টসংখ্যক সভ্য তাঁহাকে অনুরোধ করিলে তাহা করিবেন। মহাত্মা গান্ধীর এরূপ অধিবেশনে আপত্তি নাই—যদিও, তাঁহার মতে, অধিবেশন হইলে তাহার ফল কি হইবে তাহা আগে হইতেই বলা যায়। ইহার মানে বোধ হয় এই, যে, কমিটির অধিবেশন হইলে উহা অহিংস অসহযোগের এবং অহিংস আইনলঙ্ঘনের অনুকূল প্রস্তাব পুনর্ব্বার নির্দ্ধারণ করিবে।

যাঁহারা কমিটির অধিবেশন চান, তাঁহারা কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ কর্ম্ম-পন্থা নির্দ্দেশের জন্য তাহা চান। আমাদের মনে হয়, মহাত্মা গান্ধী যাহা বলিয়াছেন তাহা ঠিক্। কমিটির অধিবেশন হইলে কমিটি—সকলের মতে না হইলেও অধিকাংশের মতে—অহিংস অসহযোগের ও অহিংস আইন-লঙ্ঘনের পক্ষে প্রস্তাব ধার্য্য করিবেন। নূতন করিয়া ঐরূপ প্রস্তাব ধার্য্য করিয়া কোন লাভ নাই, কেন-না, যে-কারণেই হউক, আগে যে-সব কংগ্রেস-সভ্য অহিংস ভাবে আইন লঙ্ঘন করিয়াছিলেন তাঁহাদের অধিকাংশ এখন তাহা হইতে বিরত [illegible], কোন কারণে, নূতন উৎসাহের [illegible] [illegible] সেই পথের পথিক হইতে পারিবেন। কিন্তু [illegible] অহিংস আইনলঙ্ঘনের পক্ষে পুনঃ পুনঃ মত প্রকাশ করিলে অথচ কার্য্যতঃ সেই পথ অবলম্বন করিতে বিরত থাকিলে কংগ্রেসের সম্মান না বাড়িয়া কংগ্রেস বরং উপহাস-পরিহাসের পাত্রই হইবেন।'

পক্ষান্তরে, ইহাও অনুমেয় ও আলোচ্য, যে, কংগ্রেস অসহযোগ ও আইনলঙ্ঘন ত্যাগ করিবেন কি-না। কার্য্যতঃ অধিকাংশ অসহযোগী আইন অমান্য করিতে বিরত হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহারা সমবেত হইয়া কংগ্রেসের এ পর্য্যন্ত অনুসৃত নীতি পরিত্যক্ত হইল বলিতে রাজী হইবেন বলিয়া মনে হয় না। চিরকালের জন্য পরিত্যক্ত হইল, ইহা ত কেহই বলিতে পারেন না—কাহারও তাহা বলিবার অধিকার ও ক্ষমতা নাই। আপাততঃ আইনলঙ্ঘন স্থগিত রহিল বলিলে তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন হইবে, কতদিনের জন্য? 'অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য,' বলা কাজের কথা নয়; মহাত্মাজী নিজে স্থগিত রাখিয়াছেন এক বৎসরের জন্য। কিন্তু কোন কোন প্রাদেশিক নেতা—যেমন অন্ধ্রদেশীয় শ্রীযুক্ত পট্টাভি সীতারামায়া—মোটেই স্থগিত রাখেন নাই, পিকেটিং করিয়া এই সে দিন পুনর্ব্বার জেলে গিয়াছেন।

আলোচনা করিয়া অহিংস আইনলঙ্ঘন সম্বন্ধে কিছু মত প্রকাশ করিবার জন্য সমগ্রভারতীয় কংগ্রেস-কমিটির অধিবেশন কেন অনাবশ্যক মনে হইতে পারে, সংক্ষেপে তাহা বলিলাম। এখন কথা উঠিতে পারে, যে, আইনলঙ্ঘন সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া শুধু 'গঠনমূলক' কাজের ব্যবস্থার জন্য অধিবেশন হউক না? তাহারও যে প্রয়োজন আছে, এমন ত মনে হয় না। কারণ, কংগ্রেসওয়ালাদের কি কি গঠনমূলক কাজ করা উচিত ও আবশ্যক, তাহা মহাত্মা গান্ধী ও অন্য নেতারা অনেক বার বলিয়াছেন—পুনা কন্‌ফারেন্সের পরেও বলিয়াছেন। [illegible] [illegible] আছে, তদনুসারে কাজ করিলেই হয়।

পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় চাহিয়াছিলেন [illegible] ভারতীয় কংগ্রেস-কমিটির অধিবেশন এবং [illegible]



কামিনী রায়



এ্যান বেসাণ্ট

সকল স্বাজাতিক দলের সমবেত কন্‌ফারেন্স। এখন চাহিতেছেন কেবল সকল স্বাজাতিক দলের সমবেত কন্‌ফারেন্স। তাহাতে কথা উঠিয়াছে, কংগ্রেসের লোকেরা আগে কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ কার্য্যপদ্ধতি নিজেদের মধ্যে ঠিক করিয়া না লইলে সকল দলের কন্‌ফারেন্সে সম্মিলিত কার্য্যপদ্ধতি সম্বন্ধে কি প্রকারে মত প্রকাশ করিবেন? সকল কংগ্রেস-ওয়ালাদের বা তাঁহাদের অনেকেরই মত যদি ঐরূপ হয়, তাহা হইলে সকল দলের সম্মিলিত কন্‌ফারেন্স হইবার কোন সম্ভাবনা দেখিতেছি না। সকল স্বাজাতিক দল যে স্বরাজ লাভের সম্মিলিত চেষ্টা করিবেন, তাহারও সম্ভাবনা দেখিতেছি না।

—

সম্মিলিত চেষ্টার দুটি বাধা

কোন কোন উদারনৈতিক বলিয়াছেন, কংগ্রেস যে বলিয়াছে, তাহার লক্ষ্য পূর্ণ স্বরাজ বা পূর্ণ স্বাধীনতা, এই বুলি পরিত্যক্ত হইক। কংগ্রেসের লক্ষ্য সম্বন্ধে এই উক্তি প্রত্যাহার করিবার অধিকার ও ক্ষমতা একমাত্র কংগ্রেসেরই আছে। কংগ্রেসের অধিবেশন না হইলে প্রত্যাহার করা না-করার আলোচনা হইতে পারে না। এবং কংগ্রেসের অধিবেশন যে বর্ত্তমান অবস্থায় হইতে পারে না, তাহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং কংগ্রেসের পূর্ণস্বরাজের দাবি পরিত্যক্ত, প্রত্যাহৃত বা পরিবর্ত্তিত হউক, ইহা বলা নিষ্ফল। কংগ্রেসের অধিবেশন হইলেও উহা পরিত্যক্ত হইবে না, আমাদের ধারণা এই রূপ। আমরা নিজেরাও পূর্ণস্বরাজকেই ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টার একমাত্র যোগ্য লক্ষ্য বলিয়া মনে করি। তাহা প্রত্যাহার করিবার কোন কারণ দেখিতেছি না। মহাত্মা গান্ধী একাধিক বার বলিয়াছেন, তিনি স্বাধীনতার সারাংশ ('সব্‌স্ট্যান্স অব্‌ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স') লইতে রাজী আছেন। তাঁহার এই উক্তিতেই উদারনৈতিক নেতাদের সন্তুষ্ট হওয়া উচিত।

গত অক্টোবর মাসে এলাহাবাদে আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের উদারনৈতিকদের যে কন্‌ফারেন্স হয়, তাহার একটি প্রস্তাবের একটি অংশ এইরূপ :—

"This conference disapproves of the continuance of the policy of civil disobedience, which stands in the way of a united political action by all progressive parties."

তাৎপর্য্য। 'এই কন্‌ফারেন্স্‌ নিরুপদ্রব আইনলঙ্ঘন নীতি এখনও অনুসরণের প্রতিকূল মত ব্যক্ত করিতেছেন;—উহা প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলসমূহের সম্মিলিত রাজনৈতিক কার্য্যানুষ্ঠানের বাধা স্বরূপ হইয়া আছে।'

উদারনৈতিকদের মনের এই ভাবটাতে রাজনৈতিক পংক্তিভেদের আভাস পাওয়া যায়। কংগ্রেসওয়ালারা উদারনৈতিকদিগকে রাজনৈতিক হিসাবে অপাংক্তেয় মনে করেন, আবার উদারনৈতিকরাও কংগ্রেসওয়ালাদিগকে অপাংক্তেয় মনে করেন। এই জন্য কেহ কাহারও সঙ্গে রাজনৈতিক কোন সম্মিলিত চেষ্টা করিতে চান না। এরূপ জাতিভেদ ভাল নয়। রাজনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষাবিষয়ক বা অন্য প্রকার যে-যে বিষয়ে মতে মিলে তাহাতে একসঙ্গে কাজ করিবার বাধা কি? অবশ্য, যতক্ষণ না কংগ্রেস প্রকাশ্যভাবে বলিতেছে, 'আমরা অসহযোগ ও আইন অমান্য করা একেবারে ছাড়িয়া দিলাম,' ততদিন গবন্মেণ্ট কংগ্রেসকে বৈধ প্রচেষ্টা মনে করিবেন না বটে। কিন্তু উদারনৈতিকরা সরকারী ভঙ্গীর অনুরূপ ভঙ্গী করেন কেন?

গুজরাটের অমৃতলাল ঠক্কর, এলাহাবাদের হৃদয়নাথ কুঞ্জরু প্রভৃতি মহাত্মা গান্ধীর প্রতিষ্ঠিত অস্পৃশ্যসেবক সমিতির সভ্য ও কর্ম্মী, অথচ তাঁহারা উদারনৈতিক। "অস্পৃশ্য"দিগের সেবা অবশ্য সাক্ষাৎভাবে সামাজিক কাজ, কিন্তু ইহার রাজনৈতিক ফলও ফলিবে। এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক কাজের মধ্যে দাঁড়ি টানা কঠিন। আমাদের মনে হয়, যে রাজনৈতিক কাজ অসহযোগ বা আইনলঙ্ঘনের মত কিছু নয়, এবং যাহাতে সব স্বাজাতিক দল একমত, তাহাতে কংগ্রেস প্রভৃতি সব দল অনায়াসে ও নির্ব্বিঘ্নে একত্র কাজ করিতে পারেন। শুধু 'করিতে পারেন' বলিলে কম বলা হয়, তাঁহাদের সকলের একত্র এরূপ কাজ করা উচিত বলিলেই ঠিক বলা হয়।

—

সকল স্বাজাতিকের অনমুমোদিত একটি জিনিষ

আমরা এবারকার বিবিধ প্রসঙ্গে এপর্য্যন্ত যাহা লিখিয়াছি, তাহাতে কতকটা বুঝা যাইবে, যে, সমুদয় স্বাজাতিকের সমবেত কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন এবং তাহাতে

একটি সাধারণ কার্য্যপদ্ধতি নিরূপণ সহজ হইবে না। কিন্তু একটি কাজ অপেক্ষাকৃত সহজে সম্মিলিত ভাবে হইতে পারে। তাহা হোয়াইট পেপারটার বিরুদ্ধে সম্মিলিত মত প্রকাশ। মুসলমানদের মধ্যে যাঁহারা স্বাজাতিক নহেন এবং 'অবনত' শ্রেণীসমূহের হিন্দুদের মধ্যেও যাঁহারা স্বাজাতিক নহেন, অর্থাৎ যাঁহারা সমগ্রভারতীয় মহাজাতির মঙ্গল কিসে হইবে তাহা না ভাবিয়া কেবল নিজেদের সম্প্রদায় বা উপসম্প্রদায়ের স্বার্থসিদ্ধির কথাই কেবল ভাবেন, এই প্রকার ভারতীয়েরা ছাড়া আর কোন ভারতীয় হোয়াইট পেপারটা পছন্দ করেন না। এবং যাঁহারা পছন্দ করেন না, তাঁহাদের সংখ্যাই খুব বেশী। সকল দলের এই সব লোক একটি কন্‌ফারেন্স করিয়া হোয়াইট পেপারটার বিরুদ্ধে একটি সম্মিলিত প্রস্তাব ধার্য্য করুন না ?

—

হোয়াইট পেপারের বিরুদ্ধে সম্মিলিত মত প্রকাশের আবশ্যকতা

সকল স্বাজাতিক সমবেতভাবে হোয়াইট পেপারটার বিরুদ্ধে প্রস্তাব ধার্য্য করিলেই যে ব্রিটিশ মন্ত্রীমণ্ডল উহা পরিত্যাগ বা পরিবর্ত্তন করিবে, এরূপ আশা করিবার প্রয়োজন নাই। অনেক কাজ আছে, যাহা ফলাফলনির্বিশেষে কর্ত্তব্যবোধেই করা উচিত। হোয়াইট পেপার সম্বন্ধে যাহা করা উচিত মনে হইতেছে, তাহা ঐ জাতীয় কাজ।

তাহার একটা কারণও আছে। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ব্রিটিশ মন্ত্রীমণ্ডলের মুখপাত্ররূপে স্তর সামুয়েল হোর এই রূপ ভাণ করিতেছেন, যে, হোয়াইট পেপারটা মোটের উপর রাজনৈতিক-মতিবিশিষ্ট ('পোলিটিক্যালি-মাইণ্ডেড্') অধিকাংশ ভারতীয়ের অনুমোদিত, তদনুরূপ আইন না হইলে তাহারা বড় অসন্তুষ্ট হইবে। আমরা এটা তাঁহার ভাণ বলিয়াই মনে করি ; তবে ভ্রমবশতঃ বা ভ্রান্ত সংবাদপ্রাপ্তি বশতঃ তাঁহার ধারণা সত্য সত্যই ঐরূপ হইতেও পারে। তাহার উপর অধুনা ভারতে অল্পকাল প্রবাসী মিঃ হেল্‌স্ নামক একজন রক্ষণশীল পার্লেমেণ্ট-সভ্য খবরের কাগজে লিখিয়াছেন, যে, বিলাতের লোকেরা মনে করে, যে, কয়েকটা সেফ্ গার্ড বা 'রক্ষাকবচ' ছাড়া হোয়াইট পেপারের আর সব অংশ ভারতবর্ষের শতকরা নিরানব্বই জন লোক পছন্দ করে ও চায়। মিঃ হেল্‌স্ যদি ঠিক্ তথ্য জানিয়া থাকেন, তাহা হইলে বিলাতের লোকরা কি গুরুতর ভ্রমে পড়িয়া আছে ! আর বিলাতের লোকদের যা ধারণা, 'সভ্য জগতে'র ধারণাও তাই হইবে ; কারণ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে পৃথিবীর সংবাদ সরবরাহ হয় ইংরেজদের মারফতে। এই জন্য এই ভ্রমটা দূর করিবার চেষ্টা করা আমাদের সকলের একান্ত কর্ত্তব্য। হইতে পারে, যে, সম্মিলিত চেষ্টাও নিষ্ফল হইবে, কিংবা সামান্য পরিমাণেই ফলবতী হইবে। কিন্তু তাহা হইলেও কর্ত্তব্যবোধে চেষ্টা করা চাই। সত্য কি, তাহা জগতের লোককে জানান উচিত।

—

পরলোকগতা এনী বেসাণ্ট

থিয়সফিক্যাল সোসাইটীর শাখা পৃথিবীর সকল মহাদেশে ও দেশে আছে। শ্রীমতী এনী বেসাণ্ট এই পৃথিবীব্যাপী সভার নির্ব্বাচিতা নেত্রী দীর্ঘকাল ছিলেন। সম্প্রতি ৮৬ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। এই দীর্ঘ জীবনে তিনি এত কাজ করিয়া গিয়াছেন, যে, শুধু তাহার তালিকা দিতে গেলেও প্রবাসীর কয়েক পৃষ্ঠা পূর্ণ হইবে।

তাঁহার কর্ম্মজীবনের প্রথম অংশে ভারতবর্ষের সহিত তাঁহার কোন যোগ ছিল না। পরে যখন থিয়সফিষ্ট হইয়া তিনি ভারতবর্ষে আসিলেন এবং ভারতবর্ষকেই নিজের স্বদেশ বলিয়া গ্রহণ করিলেন, তখন এই দেশের কল্যাণের জন্য তিনি তাঁহার জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে সমগ্র শক্তি নিয়োগ করিলেন। কর্ম্মজীবনের প্রথম অংশে তিনি যোদ্ধ্রী ছিলেন, পরেও যোদ্ধ্রী ছিলেন। সকল মানুষের স্বাধীনতা ও কল্যাণ, জগতে শান্তির প্রতিষ্ঠা এবং সকল জাতি ও ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাব ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপন তাঁহার কাম্য ছিল।

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তিনি যাহা করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে কেবল দুটি বড় কাজের উল্লেখ করিব। তিনি ভারতবর্ষে স্বরাজস্থাপনের জন্য বিলাতে ও ভারতে সাতিশয় একাগ্রতা, উৎসাহ, সাহস, জ্ঞানবত্তা, পরিশ্রম ও সুশৃঙ্খলার সহিত চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহার নিমিত্ত হোমরুল লীগ স্থাপন, একাধিক সংবাদপত্র পরিচালন, পুস্তক ও পুস্তিকা প্রচার, সভা করিয়া নানাস্থানে বক্তৃতা, ভারতবর্ষে স্বরাজস্থাপনার্থ পার্লেমেণ্টে একটি আইনের খসড়া পেশ করান ইত্যাদি কাজ করিয়াছিলেন।

গবর্মেণ্ট এক সময়ে উত্ত্যক্ত হইয়া তাঁহার স্বাধীনতা হরণ করিয়াছিলেন।

তাঁহার দ্বিতীয় বড় কাজ এই, যে, তাঁহার রচিত গ্রন্থাদি ও তাঁহার প্রদত্ত বক্তৃতাদি দ্বারা পাশ্চাত্য উভয় মহাদেশে ভারতবর্ষের ধর্ম্ম দর্শন সাহিত্য ও কৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধাবান্ লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

তিনি আপনাকে ভারতীয় করিবার জন্য কিরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং কিরূপ ভারতীয় হইয়াছিলেন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে তাঁহার বাহ্য আচরণের বর্ণনা হইতে তাহা বুঝা যায়। দুটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্প্রতি একটি ইংরেজী প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, যে, তিনি যখন লাহোরে ট্রিবিউন পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন, সেই সময়ে শ্রীমতী এনী বেসাণ্ট লাহোর যান। যে বাড়িতে তাঁহাকে সম্মানিত অতিথি-রূপে রাখা হয়, তাহাতে পাশ্চাত্য ধরণের আসবাবের অভাব ছিল না, সেইরূপ আসবাবে সজ্জিত কক্ষ বেসাণ্ট মহোদয়াকে দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু তিনি চেয়ারে উপবেশন না করিয়া মেজের বিছান কার্পেটে দেশী রীতিতেই বসিতেন। সাংবাদিক শ্রীযুক্ত সেণ্ট নিহাল সিং একটি ইংরেজী প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, যে, তিনি একবার মান্দ্রাজে শ্রীমতী এনী বেসাণ্টের সহিত দেখা করিতে যান। তাঁহার বৃহৎ কামরাটিতে ঢুকিয়া দেখিলেন তাহার এক কোণে একটি নীচু বড় তক্তপোষের উপর পুরু তোষক বিছান, তাহার উপর তুষারশুভ্র চাদর পাতা রহিয়াছে। শ্রীমতী এনী বেসাণ্ট তাহার উপর হিন্দু রীতিতে বসিয়া কাগজের প্যাড হাঁটুর উপর রাখিয়া পেন্সিল দিয়া কি লিখিতেছেন।

তিনি আবার ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিবেন, তাঁহার এই ইচ্ছা প্রকাশ হইতেই বুঝা যায় তাঁহার ভারত-প্রীতি কিরূপ গভীর ছিল।

তিনি তাঁহার উইলে তাঁহার ভৃত্যদিগকে তাহাদের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত পূরা বেতন দিবার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। ইহা হইতে সাধারণ লোকদের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি, এবং তাঁহার ন্যায়পরায়ণতা ও দয়ালুতা বুঝা যায়।

ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা এখন ৩৫ কোটিরও উপর। সমগ্রভারতীয় সেন্সস রিপোর্টে লেখা হইয়াছে, যে, ভারতের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি কৃত্রিম উপায়ে বন্ধ না করিলে ভারতবর্ষের দারিদ্র্য ও মৃত্যুর হার আরও বাড়িবে। ফ্রান্স, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে এইরূপ উপায় অবলম্বিত হইয়া আসিতেছে। তাহাতে শিশুজন্মের হার বড় বেশী কমিয়া যাওয়ায় ইটালী প্রভৃতি দেশে প্রতিক্রিয়াও আরম্ভ হইয়াছে। লোকসংখ্যা সীমাবদ্ধ করিবার কৃত্রিম উপায় অবলম্বন সম্বন্ধে আলোচনা ভারতবর্ষে আগে হইতেই হইতেছিল। সেন্সসে পূর্ব্বোক্ত কথা বাহির হওয়ার পর আলোচনাটা বাড়িয়াছে। এই আলোচনা এখানে না করিয়া এই বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট শ্রীমতী এনী বেসাণ্টের জীবনের একটি ঘটনা ও তাঁহার একটি কথার উল্লেখ করিব।

তাঁহার কর্ম্মজীবনের প্রথম অংশে তিনি কোন কোন বিষয়ে মিঃ ব্রাডলর সহকর্ম্মিণী ছিলেন। ইংলণ্ডের গরিব লোকদের মঙ্গল হইবে মনে করিয়া তিনি ও ব্রাডল লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি নিবারণার্থ কৃত্রিম উপায় অবলম্বনের সমর্থক ও তাহার বর্ণনাযুক্ত একটি পুরাতন পুস্তিকা পুনর্মুদ্রিত করেন। তাহাতে বিলাতে তুমুল আন্দোলন হয় এবং শ্রীমতী এনী বেসাণ্টকে বহু দুঃখ ভোগ করিতে হয়। তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনে তাঁহার সহিত শ্রীযুক্ত সেণ্ট নিহাল সিং ও তাঁহার পত্নীর একবারকার সাক্ষাৎকারের সময় শ্রীযুক্ত সেণ্ট নিহাল সিংহের পত্নী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'লোকসংখ্যাবৃদ্ধি নিবারণের জন্য কৃত্রিম উপায় অবলম্বন সম্বন্ধে আপনি এখনও কি পূর্ব্বেকার মত পোষণ করেন?' শ্রীমতী এনী বেসাণ্ট খুব জোরের সহিত বলিলেন, 'নিশ্চয়ই নহে।'

অসবর্ণ বিবাহ সম্বন্ধে গান্ধীজীর মত

কিছু দিন হইল, মহাত্মা গান্ধীর এক ভ্রাতুষ্পৌত্রের সহিত আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের একটি কন্যার বিবাহ হইয়াছে। ইহা অসবর্ণ বিবাহ নহে, কিন্তু দুই বিভিন্ন প্রদেশের পাত্র-পাত্রীর বিবাহ। এই উপলক্ষ্যে মহাত্মাজী বলিয়াছেন, নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে অসবর্ণ বিবাহের তিনি সমর্থন করেন।

সন্তরণসামর্থ্য

সম্প্রতি রেঙ্গুনে শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার ঘোষ ৭৯ ঘণ্টা ২৪ মিনিট অবিরাম সন্তরণ করিয়াছেন। পৃথিবীতে এ-পর্য্যন্ত কেহ এত দীর্ঘকাল অবিচ্ছেদে সাঁতার দিতে পারে নাই।

বিঠলভাই পটেল

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার ভূতপূর্ব্ব সভাপতি বিঠলভাই পটেল মহাশয়ের মৃত্যুতে ভারতবর্ষের সাতিশয় ক্ষতি হইল। তিনি যে বিদেশে আত্মীয়স্বজনদিগের নিকট হইতে দূরে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, ইহা ঘটনাটিকে আরও শোকাবহ করিয়াছে। কিন্তু ইহা ভাবিয়া মনে সান্ত্বনা, শান্তি এবং সাত্ত্বিক প্রেরণা আসে, যে, আত্মীয়তা কেবল রক্তের সম্পর্কের উপর নির্ভর করে না, প্রত্যুত অনেক সময় ভাব চিন্তা আদর্শ ও জীবনের লক্ষ্যে যাহাদের সহিত ঐক্য থাকে, তাহাদের সহিত রক্তের সম্পর্কে সম্পৃক্ত লোকদের চেয়েও ঘনিষ্ঠতর আত্মীয়তা স্থাপিত হইতে পারে। 'উদারচরিতানান্ত বসুধৈব কুটুম্বকম্', ইহাও অতি সত্য কথা। এই জন্য, বিদেশেও পটেল মহাশয় ভারতীয় ও অভারতীয় আত্মীয় লাভ করিয়াছিলেন। রাষ্ট্রীয় কর্ম্মক্ষেত্রে সহযোগী, স্বদেশসেবায় আত্মোৎসৃষ্ট সুভাষচন্দ্র বসু যে নিজ কঠিন পীড়া সত্ত্বেও এবং পটেল মহাশয়ের সেবা করিতে গিয়া নিজে অধিকতর পীড়িত হইয়া পড়াতেও যে তাঁহার অন্তিম রোগে তাঁহার নিত্য সহচর ছিলেন, ইহা সুভাষচন্দ্রের পক্ষে স্বাভাবিক ও তাঁহার যোগ্য ব্যবহার বলিয়া সকলে উপলব্ধি করিয়াছেন, এবং ইহা তাঁহার স্বদেশীয়দিগের মর্ম্ম স্পর্শ করিয়াছে। বিদেশী ডাক্তার ও শুশ্রূষাকারিণীগণ জেনিভায় বিনা পারিশ্রমিকে তাঁহার চিকিৎসা ও পরিচর্য্যা করিয়া আপনাদের মহত্ত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং তাঁহার মহৎ গুণাবলী যে তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন, তাহাও প্রমাণিত করিয়াছেন।

পটেল মহাশয় অনেক বৎসর পূর্ব্বে বোম্বাইয়ের মেয়র রূপে প্রধানতঃ ঐ শহরের এবং পরোক্ষভাবে স্বদেশের সেবা করেন। পরে বিস্তৃততর কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার পর তিনি ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রথম নির্ব্বাচিত সভাপতি হন। এই কাজ সাতিশয় যোগ্যতার সহিত করিয়া তিনি সমধিক খ্যাতি লাভ করেন, এবং দেশের লোকের শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্জ্জন করেন। সভাপতির কাজে তিনি কন্সটিটিউশ্যন্যাল আইনের এবং ব্যবস্থাপক সভা পরিচালন রীতির সম্যক্ জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করেন। এই কাজের দ্বারা তাঁহার বুদ্ধিমত্তা, সাহস, তর্ক-বিতর্কের শক্তি, নিরপেক্ষতা ও স্বদেশপ্রেমও বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়। অতঃপর তাঁহার মত আইনজ্ঞ, বুদ্ধিমান, কৌশলী, নিরপেক্ষ, পরিশ্রমী ও নির্ভীক সভাপতি বলিয়া আপনাকে প্রমাণ করা অন্য কোন সভাপতির পক্ষে কঠিন হইবে—তাঁর চেয়ে বেশী পরিমাণে এই সব গুণের অধিকারী বলিয়া আপনাকে প্রমাণ করা ত আরও কঠিন হইবে।

স্বদেশসেবার পুরস্কার স্বরূপ কারাদণ্ড ও রোগভোগ তাঁহার হইয়াছিল। খালাস পাইবার পর তিনি চিকিৎসা করাইবার নিমিত্ত রুগ্নদেহে ইউরোপ যান। অসুস্থ শরীর লইয়াও তিনি নানা স্থানে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সত্য সংবাদ প্রচার করেন এবং ভারতের স্বাধীনতার দাবি ও তাহার যোগ্যতা প্রদর্শন করেন। আমেরিকায় তিনি ভারতবর্ষের স্বাধীনতার দাবি ও তাহার যোগ্যতা বিশেষ দক্ষতা সহকারে নানাস্থানে প্রচার করেন। ভারতবন্ধু ডাঃ সাণ্ডারল্যাণ্ড 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন, যে, ঐদেশে সর্ব্বত্র তাঁহার বক্তৃতা ও তাঁহার কথোপকথন শ্রোতাদের মনে ভারতবর্ষের কথা মুদ্রিত করিয়া দিয়াছিল; তাঁহার ফোটোগ্রাফ ও তাঁহার নানাবিধ স্বদেশসেবার বৃত্তান্ত আমেরিকার অনেক বড় বড় কাগজে বাহির হইয়াছিল; তিনি নানা কলেজে, থিয়েটারগৃহে, বড় বড় হলে, গির্জ্জায় ও বহুসংখ্যক সভা ও ক্লাবের সমক্ষে বক্তৃতা করিয়াছিলেন; অন্য কোনও ভারতীয় আমেরিকার নানা শহরে মেয়র প্রভৃতিদের দ্বারা এরূপ সম্মানিত হন নাই।

অহিংস স্বরাজসংগ্রামের এই নির্ভীক অক্লান্তকর্ম্মা যোদ্ধার দেহ যখন বোম্বাইয়ে আনীত হইয়া শ্মশানে ভস্মীভূত হয়, তখন লক্ষ লক্ষ লোক যে তাহা দর্শন করিতে আসিয়াছিল, ইহা হইতে তাঁহার প্রতি দেশের লোকদের প্রীতি ও শ্রদ্ধা কিয়ৎপরিমাণে অনুমান করা যায়। স্বদেশসেবার কাজ আমরা সকলে নিজ নিজ শক্তি ও সুযোগ অনুসারে করিলে তবেই তাঁহার প্রতি প্রকৃত সম্মান প্রদর্শিত হইবে।

[বিঠলভাই পটেল মহাশয়ের ছবি কার্ত্তিকের প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছে।

বাংলা অভিধান

বৃহতের সহিত অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রের সাদৃশ্য দেখাইয়া বলিতে পারা যায়, ইংরেজী ভাষায় যেমন ডাঃ মারের অক্সফর্ড অভিধান বৃহত্তম, বাংলা ভাষায় বিশ্বভারতী কর্তৃক খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশমান শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত বাংলা অভিধান সেইরূপ এপর্য্যন্ত প্রকাশিত অভিধানগুলির মধ্যে বৃহত্তম হইবে। আবার, ইংরেজী ছোট অভিধানগুলির মধ্যে পকেট অক্সফর্ড অভিধান যেমন নিত্যব্যবহার্য্য কাজের জিনিষ হইয়াছে, শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু কৃত "চলন্তিকা" অভিধান সেইরূপ নিত্যব্যবহার্য্য কাজের জিনিষ হইয়াছে। বস্তুতঃ, ইহা ইহা কোন কোন বিষয়ে ইংরেজী পকেট অক্সফর্ড অভিধানের চেয়ে বেশী মূল্যবান হইয়াছে। ইহার প্রথম সংস্করণ যখন বাহির হয়, তখন হইতেই ইহা আমাদের টেবিলে থাকে। দ্বিতীয় সংস্করণে ইহার শব্দসংখ্যা বাড়িয়াছে, অথচ ইহার নিত্য ও অনায়াস ব্যবহার্য্যতা রক্ষিত হইয়াছে। সংস্কৃত যে-সব শব্দ সাধারণতঃ বাংলা সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়, তৎসমুদয়ের অর্থ ইহাতে যেমন পাওয়া যায়, সাহিত্যে ব্যবহৃত 'দেশজ' চল্‌তি শব্দসকলের অর্থও তেমনি পাওয়া যায়। বিদেশী পারিভাষিক বহু শব্দের বাংলা প্রতিশব্দও ইহাতে আছে। সংবাদপত্রের লেখক পরিচালক সম্পাদক প্রভৃতি অর্থে 'সাংবাদিক' কথাটি আমরা প্রথমে রচনা করি ও চালাই। 'চলন্তিকা'য় ইহা নিবিষ্ট হইয়াছে দেখিয়া প্রীত হইলাম। 'প্রচেষ্টা' শব্দটি সম্ভবতঃ সংস্কৃতে আগে হইতেই ছিল। ইংরেজী 'মূভ্‌মেণ্ট' শব্দের প্রতিশব্দ রূপে উহা আমরা প্রথমে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করি। রাজশেখরবাবু এই অর্থ—"কোনো উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বহুলোকের চেষ্টা, movement ('শিশুমঙ্গল'-)" —দিয়াছেন। অভিধানখানির শেষে রাজশেখরবাবু যে পরিশিষ্টগুলি দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার প্রতিভা, বিদ্যাবত্তা ও বিচারশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রকৃত বাংলা ব্যাকরণের যে ভিত্তি রামমোহন রায়ের মত পূর্ব্বজ স্থাপন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, ব্যাকরণঘটিত পরিশিষ্টগুলিতে তাহা পুনঃস্থাপিত হইয়াছে। এই পরিশিষ্টগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের অবশ্যপাঠ্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইবার যোগ্য। তাহা নির্দ্ধারিত হউক বা না-হউক, বাংলাশিক্ষার্থী সকলে যেন ইহা অধ্যয়ন করেন।

—

কামিনী রায়

বঙ্গীয় মহিলা কবিদের শীর্ষস্থানীয়া শ্রীমতী কামিনী রায় মহোদয়া ৬৯ বৎসর বয়সে গত ২৭শে সেপ্টেম্বর দেহত্যাগ করিয়াছেন। অল্প কয়েক দিনের জ্বরে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। ২৩শে সেপ্টেম্বরেও তিনি, রামমোহন রায় শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মহিলাদের যে সভার অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে সভানেত্রীর কাজ করিয়াছিলেন। তিনি প্রধানতঃ কবি বলিয়াই প্রসিদ্ধি লাভ করেন; কিন্তু দেশহিতকর নানা কাজের সঙ্গে—বিশেষতঃ নারীদের ও নারী শ্রমিকদের হিতকর নানা প্রচেষ্টার সঙ্গে—তাঁহার যোগ ছিল। তিনি প্রমুখতার ও প্রসিদ্ধির প্রয়াসী ছিলেন না বলিয়া, বরং তাহাতে সঙ্কোচ বোধ করিতেন বলিয়া, হয়ত তাঁহার দ্বারা জনসেবা যতটা হইতে পারিত, ততটা হয় নাই। তাঁহার গভীর স্বদেশ-প্রীতি এবং দলিত জনগণের প্রতি সহানুভূতি অনেক কবিতায় প্রকাশ পাইয়াছে। নিজের শক্তি সম্বন্ধে যে সন্দিহানতা বশতঃ 'আলো ও ছায়া' রচিত হইবার অনেক পরে বাহির হয়—তাহাও লেখিকার নাম না দিয়া—সেই সন্দিহানতা বরাবর ছিল। এবারকার 'প্রবাসী'র প্রথম পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কবিতাটিতে এই বিনয়নম্রতার মাধুর্য্য লক্ষিত হইবে। এই সন্দিহানতা না থাকিলে হয়ত তিনি বাংলা সাহিত্যকে আরও অনেক কবিতা দিয়া যাইতে পারিতেন।

তিনি মহিলা কবি বলিয়া সচরাচর উল্লিখিত হইয়া থাকিলেও পুরুষ ও মহিলা সকল বাঙালী কবির মধ্যে তাঁহার স্থান উচ্চে। বাহ্য সৌষ্ঠব, লালিত্য ও ঝঙ্কার অপেক্ষা তিনি তাঁহার কবিতায় আন্তরিকতা, সরলতা, শুচিতা, সংযম এবং চিন্তা ও ভাবের প্রগাঢ়তার দিকে বেশী মনোযোগী ছিলেন বলিয়া মনে হয়। তাঁহার কবিতা পড়িয়া কাহারও মনে হইবে না, যে, নারী পুরুষের ক্রীড়নক।

—

মেদিনীপুরে "আইন ও শৃঙ্খলা"

মেদিনীপুরে, নামে না হইলেও, কাজে সামরিক আইন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। তাহার দ্বারা ঐ স্থান হইতে সন্ত্রাসবাদের উচ্ছেদ সাধিত হইবে কি না, এখন তাহা অনিশ্চিত হইলেও, তাহার উচ্ছেদ সাধিত হইবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু তাহার্থে

নূতন যে-সব ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার কার্য্যকারিতার পরীক্ষা সমাপ্ত হইবার, অন্ততঃ কতক দূর অগ্রসর হইবার আগেই খড়্গপুরের ইংরেজরা আরও কড়া ব্যবস্থা চাহিয়াছে। তাহাদের মতে এইরূপ বিধান জারি করা উচিত, যে, কাহারও কাছে লাইসেন্স না-করা অস্ত্র-শস্ত্র বারুদাদি পাওয়া গেলে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তাহার ফাঁসী হওয়া চাই। এরূপ ব্যবস্থার অন্যায্যতা ও অযৌক্তিকতা প্রমাণ করিতে যাওয়া অনাবশ্যক হইলেও কিছু বলিতে হইতেছে। ইউরোপীয়দিগকে খুন করিবার জন্যই যে কেহ কেহ বিনা লাইসেন্সে অস্ত্রশস্ত্র রাখে তাহা সত্য নহে, চুরিডাকাতীর জন্যও রাখে। চুরিডাকাতী যদি কেহ করে, কেবল তাহাতেই ফাঁসী হয় না। দ্বিতীয়তঃ, যাহার বাড়িতে ঐরূপ অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া যাইবে, সে যে নিজে তাহা সংগ্রহ করিয়াছে ও রাখিয়াছে, তাহা দস্তুরমত বিচারের পর প্রমাণিত হওয়া আবশ্যক। শত্রুতা সাধন জন্য বা পুলিসের দ্বারা পুরস্কৃত হইবার জন্য বা হওয়াতেও যে অন্য লোকে কাহারও কাহারও বাড়িতে ঐরূপ অস্ত্রশস্ত্র রাখিতে পারে, ইহা কল্পনা নহে। এরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে, এবং পরেও ঘটিতে পারে।

ও'ডনোভ্যান নামক এক ব্যক্তি আগে ভারতবর্ষে সরকারী কাজ করিত। এখন ভারতবর্ষের টাকায় বিলাতে পেন্সান ভোগ করিতেছে। সে ষ্টেটস্‌ম্যান কাগজে লিখিয়াছে, যে, অতঃপর কোন ইংরেজ মেদিনীপুরে নিহত হইলেই মেদিনীপুর জেলের যে-কোন দু-জন 'ভদ্রলোক' কয়েদীকে জেলের বাহিরে আনিয়া দেওয়ালে পিঠ ঠেসান দিয়া দাঁড় করাইয়া গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিলে সন্ত্রাস-বাদ বিনষ্ট হইবে। এই লোকটা ধরিয়া লইতেছে, যে, ভারতপ্রবাসী ইংরেজ কেবল ভারতীয়ের দ্বারাই নিহত হয়, ইংরেজের দ্বারা নিহত হয় না। ইহা সত্য নহে। দ্বিতীয়তঃ, সে ধরিয়া লইতেছে, যে, কোন ইংরেজ খুন হইলেই তাহা রাজনৈতিক খুন, ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা বা চুরিডাকাতীর জন্য খুন নহে। ইহাও সত্য নহে। তৃতীয়তঃ, ঐ লেখক ধরিয়া লইতেছে, যে, মেদিনীপুর জেলের প্রত্যেক "ভদ্রলোক" কয়েদী সন্ত্রাসবাদীদের দলভুক্ত বা তাহাদের সহিত উহাদের সহানুভূতি আছে। ইহাও সত্য নহে। চতুর্থতঃ, ঐ ব্যক্তি ধরিয়া লইতেছে, যে, ইংরেজ খুন হইলে বিচারের দরকার নাই, যাহাকে-তাহাকে ধরিয়া গুলি করিলেই প্রতীকার হইবে। বস্তুতঃ কিন্তু তাহার প্রস্তাব অনুসারে "ভদ্রলোক" কয়েদী ধরিয়া গুলি করিলে যে প্রকৃত খুনী তাহার শাস্তি না হইয়া যাহারা খুন করে নাই, তাহাদের শাস্তি হইবে; সুতরাং খুনীরা ভীত না হইয়া উৎসাহিত হইতে পারে। ঐ লেখক লিখিয়াছে, কোন কোন দেশে নাকি তাহার প্রস্তাব অনুযায়ী ব্যবস্থা আছে বা ছিল। তাহা সত্য কিনা, জানি না। কিন্তু ইংরেজরা মনে করেন, তাঁহারা মোটের উপর অন্য সব জাতির চেয়ে শ্রেষ্ঠ। সুতরাং অন্যেরা কোন একটা অদ্ভুত অন্যায় ব্যবস্থা অনুসারে চলে বলিয়া ইংরেজদিগকেও তাহা চালাইতে হইবে, শ্রেষ্ঠ ইংরেজরা এরূপ যুক্তিতে সায় দিবেন না।

আমরা যে দুটা প্রস্তাবের আলোচনা করিলাম, তাহা আলোচনার যোগ্য নহে। তথাপি আলোচনা হইতে অন্ততঃ এইটুকু লাভ হইবে, যে, লোকে বুঝিবে, সন্ত্রাসবাদ কতকগুলা ইংরেজের কি প্রকার বুদ্ধিভ্রংশের কারণ হইয়াছে।

মেদিনীপুরের কড়া ব্যবস্থার বিস্তারিত বিবরণ সংবাদ-পত্রের পাঠকেরা অবগত আছেন। তন্মধ্যে একটি রকম ব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। সেখানে কাহারও কাহারও বাড়ি পুলিসের ব্যবহারার্থ লইবার জন্য ২৪ বা ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তাঁহাদিগকে বাড়ি ছাড়িয়া দিতে বলা হইতেছে। ইহা অবশ্য নূতন ব্যবস্থা নহে। অন্যত্রও ইতিপূর্ব্বে এরূপ কাজ হইয়াছে। কিন্তু যাহা পুরাতন তাহাই ন্যায্য নহে। মেদিনীপুরে যাহা ঘটিয়াছে, তাহার সংবাদ পাড়য়া ইংরেজদের স্বগৃহ সম্বন্ধে ইংরেজী উক্তিটি মনে পড়িয়া গেল—"প্রত্যেক ইংরেজের গৃহ তাহার দুর্গ"। মেদিনীপুরের লোকদের গৃহ সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে, "প্রত্যেক মেদিনীপুরীর গৃহ সম্ভাবিত বা সম্ভাব্য পুলিস-আড্ডা।"

মেদিনীপুরে যাহাদের বাড়ি লওয়া হইয়াছে, তাহাতে তাহাদের অসুবিধা ও ক্ষতি হইতেছে, সুতরাং তাহারা দণ্ডিত হইতেছে। অথচ তাহারা কোন দোষ করিয়াছে এরূপ প্রমাণ করিবার কিংবা অনুমান করিবারও আবশ্যক নাই!

আশা করা যাইতে পারে কি, যে, যাহাদের বাড়ি লওয়া হইয়াছে, তাহাদের সেই বাড়ির উপর নিগ্রহ-পুলিস-ট্যাক্স

মঞ্জুর করা হইবে? তাহা হইলে তাহাও মন্দের ভাল বা শাপে বর মনে করা যাইতে পারিবে।

দেশ হইতে সন্ত্রাসবাদের ও সন্ত্রাসক কাজের সম্পূর্ণ তিরোধান আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে চাই। কিন্তু তদর্থে সরকারী যে-সব উপায় অবলম্বিত হইতেছে, তাহার সবগুলি ন্যায্য, যুক্তিসঙ্গত বা সমীচীন মনে করি না।

—

হিজলী জেলের খবর

হিজলী জেলে রাজনৈতিক কয়েদীরা কিরূপ ব্যবহার পায় সম্প্রতি সে-বিষয়ে খবরের কাগজে অনেক কথা লিখিত হইয়াছে। সেদিনকার আলবার্ট হলের সভাতেও অনেক কথা বলা হইয়াছে। এগুলি সমস্তই ভুক্তভোগী প্রত্যক্ষদর্শীর কথা। তাই বলিয়া আমরা গবর্ন্মেণ্টকে এগুলি বিনা তদন্তে সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে বলিতেছি না। কয়েদীদের থাকিবার সাধারণ ঘর, নির্জ্জন কারাকক্ষ, পরিধেয়, স্নানের ব্যবস্থা, খাদ্য, রোগে চিকিৎসা ও ঔষধ, হাসপাতালগৃহ, প্রভৃতি সকল বন্দোবস্তেরই দোষ দেখান হইয়াছে ও বলা হইয়াছে, যে, বন্দোবস্তগুলি জেল-বিধির বিপরীত জেল-বিধি অনেক ভাল। গবর্ন্মেণ্ট বলিতে পারেন, যাহা লেখা ও বলা হইয়াছে, তাহা মিথ্যা। কিন্তু গবর্ন্মেণ্ট যাহা বলিবেন, তাহা ত স্থানীয় কর্ম্মচারীদের প্রদত্ত বিবরণ অনুসারে বলিবেন। তাহাতে লোকের বিশ্বাস জন্মিবে না। কেন-না, আগে এই হিজলীতেই রাজনৈতিক বন্দীদের উপর গুলি চালান উপলক্ষ্যে যে সরকারী তদন্ত হয়, তাহা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছিল, যে, উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্ম্মচারীরা পর্য্যন্ত তৎসম্বন্ধে অপ্রকৃত কথা বলিয়াছিলেন। সেই জন্য আমরা বলি, নিজের সুখ্যাতি ও সম্মান প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্তই প্রকাশ্য তদন্ত করান গবর্ন্মেণ্টের উচিত। এরূপ প্রকাশ্য তদন্তে যদি সংবাদপত্রে প্রকাশিত এবং উক্ত সভায় বিবৃত সব বৃত্তান্ত মিথ্যা প্রমাণিত হয়, ভালই।

তবে, এমনও হইতে পারে, যে, এই সব বৃত্তান্ত সত্য, এবং কয়েদীদের জন্য জেল-বিধিতে যেরূপ ব্যবস্থা আছে তার চেয়ে কষ্টকর ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করা গবর্ন্মেণ্ট আবশ্যক ও বাঞ্ছনীয় মনে করেন। ইহা আমরা সত্য বলিয়া ধরিয়া লইতেছি না, কেবল আলোচনার জন্য অনুমান করিতেছি। কারণ, গবর্ন্মেণ্ট কোন কোন বিষয়ে কখন কখন অবস্থা বুঝিয়া কঠোরতর বা মৃদুতর ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। তাই বলিতেছি, যে, গবর্ন্মেণ্ট যদি মনে করিয়া থাকেন, যে, দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় জেল কোডের ব্যবস্থানুযায়ী আরামে কয়েদীদিগকে না রাখিয়া অধিকতর কঠোর অবস্থায় রাখা দরকার, তাহা হইলে সরকার প্রকাশ্যভাবে কোডের পরিবর্ত্তন করুন, সংশোধিত নূতন কোড প্রকাশিত হউক, এবং দেশে ও বিদেশে লোকে জানুক ভারতবর্ষের কারাগারে বন্দীদিগকে কিরূপ অবস্থায় রাখা হয়। নতুবা যদি ইহা সত্য হয়, যে, কোডে আছে অপেক্ষাকৃত মানবিক ও আরামদায়ক ব্যবস্থা কিন্তু হিজলীর জেল কর্ম্মচারীরা রাজনৈতিক বন্দীদিগকে রাখে অন্যবিধ ব্যবস্থায়, তাহা হইলে গবর্ন্মেণ্টকে এই বৈসাদৃশ্য ও বৈপরীত্যের জন্য দায়ী হইতে হয়। তাহা বাঞ্ছনীয় নহে।

হিজলী জেল সম্বন্ধে আর একটি অভিযোগ এই, যে, তথায় রাজনৈতিক বন্দীদিগকে বলপূর্ব্বক হাত তুলাইয়া ও মাথায় ঠেকাইয়া "সরকার, সেলাম" বলান হয় এবং তাহাতে আপত্তি করিলে আপত্তিকারীকে ডাণ্ডাবেড়ী সাজা দেওয়া হয়। এবিষয়েও যথাযোগ্য প্রকাশ্য অনুসন্ধান হওয়া কর্ত্তব্য। আমাদের ধারণা, মহাত্মা গান্ধী হইতে আরম্ভ করিয়া কোন রাজনৈতিক বন্দীই জেল কর্ম্মচারীদিগকে ভদ্রসমাজে প্রচলিত সম্মান দেখাইতে অনিচ্ছুক নহেন। মহাত্মা গান্ধী এরূপ সম্মান দেখাইয়া থাকেন। তাহার একটা কারণ, তিনি বন্দী হইলেও মানুষের মত ব্যবহার, ভদ্রলোকের মত ব্যবহার, জেলে পান। সব রাজনৈতিক বন্দী মহাত্মা গান্ধী নহেন, কিন্তু মানুষ তাঁহারা সকলেই এবং ভদ্র শ্রেণীর মানুষও বটে। সুতরাং তাঁহারাও ভদ্র মানবিক ব্যবহার পাইবার যোগ্য। ইংরেজীতে একটা কথা আছে, "The law is no respecter of persons," "আইন মানুষে মানুষে প্রভেদ করে না, সকলের উপর সমান ভাবে খাটে।" আমরাও তাহাই চাই। মহাত্মা গান্ধী ও বড় বড় নেতারা জেলে ভাল ব্যবহার পান, এবং ইহা যদি সত্য হয় যে অন্যেরা পান না, তাহা হইলে অসঙ্গতি দোষ ঘটে। সরকার বলিতে বাংলা ভাষায় সাধারণতঃ গবর্ন্মেণ্ট এবং কচিৎ প্রভু বা মালিক বুঝায়। জেলের উচ্চতম কর্ম্মচারীও গবর্ন্মেণ্ট নহেন, বা কয়েদীদের মালিক ও প্রভু নহেন। সুতরাং তাঁহাকে সরকার বলিলে গবর্ন্মেণ্টের অপমান করা হয়। ইংলণ্ড কোন

জেলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে কয়েদীরা "গুড্ মর্নিং, গবর্ন্মেণ্ট", বা "গুডমর্নিং, মাই লর্ড এণ্ড মাষ্টার" বলে বলিয়া আমরা কখনও শুনি নাই। বাংলা দেশে কেহ কাহাকেও "সরকার, সেলাম" বলিয়া অভিবাদন করে না। সেলাম শব্দটি আরবী। বাংলা দেশের মুসলমানেরা যখন উহা অভিবাদনার্থ ব্যবহার করেন, তখন তাঁহারাও "সরকার, সেলাম" বলেন না। উহা বাংলা দেশের কোন সম্প্রদায়ের লোকেরই অভিবাদন নহে। "সেলাম আলেকুম" বা "আলেকুম সেলাম"এর মানে "আপনি শান্তিতে থাকুন।" যদি ইহা সত্য হয়, যে, হিজলী জেলের কয়েদীদিগকে জোর করিয়া "সরকার, সেলাম" বলান হয়, তাহা হইলে কার্য্যতঃ তাহার মানে দাঁড়ায়, "হে প্রভু, বা, হে গবর্ন্মেণ্ট, আপনি শান্তিতে থাকুন এবং আমরা অশান্তিতে থাকি।" রাষ্ট্রীয় সব ব্যাপারই গম্ভীর। তাহাতে হাস্যরসের আবির্ভাব অবাঞ্ছনীয়—অনভিপ্রেত আবির্ভাবও অবাঞ্ছনীয়।

—

গুরুতর পীড়াগ্রস্ত বন্দী

পণ্ডিত জওআহরলাল নেহরু রাজনৈতিক বন্দী শ্রীযুক্ত মানবেন্দ্রনাথ রায় সম্বন্ধে খবরের কাগজে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহা হইতে জানা যায়, মানবেন্দ্রনাথ রায় জেলে কঠিন পীড়াগ্রস্ত এবং তাঁহাকে পড়িবার বহি ও লিখিবার কাগজ আদি সরঞ্জাম সামান্যই দেওয়া হয়।

আদালতের বিচারে মানবেন্দ্রনাথের প্রাণদণ্ড হয় নাই। সুতরাং তাঁহার বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার আদালতে স্বীকৃত হইয়াছে। জেল কোডেও চিকিৎসার ও ঔষধপত্র দিবার ব্যবস্থা আছে; দেহের খোরাক খাদ্য এবং মনের খোরাক পুস্তকাদি দিবার বিধানও আছে। অতএব, এই সমস্তই তাঁহার প্রাপ্য।

অন্য অনেক রাজনৈতিক বন্দীরও গুরুতর পীড়ার সংবাদ কাগজে বাহির হইতেছে বা লোকমুখে শুনা যাইতেছে। প্রসিদ্ধ দু-এক জন বন্দীর চিকিৎসাদির বন্দোবস্ত করিয়াই গবর্ন্মেণ্টের ক্ষান্ত ও সন্তুষ্ট হওয়া উচিত নহে। জেল কোডে বা অন্য কোন আইনে জেলকর্ম্মচারী ও তাহাদের উপর-ওয়ালাদের কতকগুলি বন্দীকে নমুনা স্বরূপ ভাল অবস্থায় রাখিবার ও অপর সকলকে অবহেলা করিবার কোন নিয়ম নাই। অতএব, গবর্ন্মেণ্টের এই রূপ হুকুম পুনঃ পুনঃ দেওয়া উচিত, যে, সকল বন্দীকেই জেল কোডের অনুযায়ী অবস্থায় রাখিতে হইবে।

—

বালিকা-বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রী নিয়োগ

নারীর অধিকার পূর্ণমাত্রায় সমর্থন করিতে গেলে বলিতে হয়, যে, যেমন মেয়েদের স্কুলকলেজে পুরুষ-শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়, ছেলেদের স্কুলকলেজেও তেমনি শিক্ষয়িত্রীর নিয়োগ হওয়া উচিত। (তাহা দু-এক স্থলে হইয়াছেও।) কিন্তু আমরা এখন তাহা বলিতেছি না। আমরা বলিতেছি, এখন আগেকার চেয়ে অনেক বেশী নারী বি-এ, এম্-এ পাস করিতেছেন এবং এখন তাঁহারা গণিত, পদার্থবিজ্ঞান, সংস্কৃত প্রভৃতি বিষয়েও পারদর্শিতা দেখাইতেছেন; অতএব, এখন যোগ্য শিক্ষয়িত্রী পাওয়া গেলে মেয়েদের স্কুলে পুরুষ-শিক্ষক নিযুক্ত করা উচিত নহে; মেয়েদের কলেজেও যোগ্য অধ্যাপিকা পাওয়া গেলে তাঁহাদিগকেই নিযুক্ত করা উচিত। একটা আপত্তি হইতে পারে, যে, মেয়েরা বিবাহ হইলে কাজ ছাড়িয়া দেন এবং তাহাতে পুনঃ পুনঃ শিক্ষাদাতার পরিবর্ত্তন রূপ অসুবিধা ঘটে। কিন্তু শিক্ষিতা মহিলাদের মধ্যে চিরকুমারীও আছেন, বিবাহের পরেও কেহ কেহ কাজ করেন বা করিতে প্রস্তুত, এবং অনেকে অনেক বৎসর অবিবাহিত থাকেন। তদ্ভিন্ন, ইহাও বিবেচ্য, যে, বেসরকারী অনেক বিদ্যালয়ে বেতন কম ও পদোন্নতি যথেষ্ট না হওয়ায় পুরুষ-শিক্ষকেরাও অনেকে একই স্কুলে দীর্ঘ কাল কাজ করেন না, সুতরাং তাহাতেও পুনঃ পুনঃ শিক্ষক পরিবর্ত্তন দোষ ঘটে; অথচ সেই কারণে পুরুষ-শিক্ষকের নিয়োগ বন্ধ করা হয় নাই।

—

রামমোহন রায় শতবার্ষিকী

রামমোহন রায়ের মৃত্যুর দিন ২৭শে সেপ্টেম্বরে প্রতি বৎসর নানা স্থানে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনার্থ সভার অধিবেশন হয়। এক শত বৎসর হইল তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া এ-বৎসর শতবার্ষিক সভা কেবল ২৭শে সেপ্টেম্বর না হইয়া তাহার আগে ও পরেও হইতেছে। এ-পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের বড় সব প্রদেশে এবং লণ্ডনে ও ব্রিষ্টলে সভা হইয়াছে। কলিকাতায় সার্ব্বজনিক উৎসব ডিসেম্বরের শেষে হইবে। বাংলা দেশের নানা জায়গায় সভা হইয়াছে। ঠিক যত

জায়গায় হইয়াছে তাহার তালিকা এখন আমাদের সম্মুখে নাই। বঙ্গের বাহিরে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্থানে ও অধিক উৎসাহে সভা হইয়াছে মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে। এপর্য্যন্ত তথাকার প্রায় পঞ্চাশটি স্থানে উৎসব অনুষ্ঠানের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। সভাস্থলে বক্তৃতাদি ছাড়া বার-তেরটি শহরে কোন-না-কোন বড় রাস্তার নাম রামমোহন রায়ের নাম অনুসারে রাখা হইয়াছে এবং তাঁহার বৃহৎ ছবিও অনেক শহরে টাউন হল বা অন্য সাধারণ হলে রক্ষিত হইয়াছে।

হাজারীবাগ জেলাকে পূর্ব্বে রামগড় বলিত। রামমোহন রায় কিছুকাল সেখানে ছিলেন। হাজারীবাগের উৎসব ১৮ই নবেম্বর আরম্ভ হইবে। প্রবাসীর সম্পাদককে সভাপতি হইতে আহ্বান করা হইয়াছে। কটকের উৎসব ১লা ডিসেম্বর আরম্ভ হইবে। সেখানেও প্রবাসী-সম্পাদককে যাইতে হইবে। গোরখপুরে উৎসব হইবে ২৭শে ডিসেম্বর। প্রবাসীর সম্পাদককে সভাপতির কাজ করিতে হইবে। পঞ্জাবের বড় বড় শহরে ডিসেম্বরের প্রথমার্দ্ধে সভা হইবে।

—

গোরখপুরে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন

এবার প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন হইবে আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের গোরখপুর শহরে, ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে। ঐ সময়ে ও তাহার পরেই ভারতবর্ষের নানা স্থানে অন্য অনেক সভা সমিতির অধিবেশন হইবে। সেইজন্য গোরখপুরে বেশী বাঙালী না যাইতেও পারেন। তথাপি গোরখপুরের বাঙালীরা উৎসাহের সহিত আপনাদের কর্ত্তব্য করিতে প্রস্তুত হইতেছেন। গোরখপুর জেলায় শিশু হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত মোট ৬৭৯ জন বাঙালীর বাস—গোরখপুর শহরে তার চেয়ে কিছু কম। এই ৬৭৯ জনের মধ্যে ৪০৩ জন পুরুষ, ২৭৬ জন নারী। এই অল্পসংখ্যক লোককে সম্মেলনের জন্য ন্যূনকল্পে হাজার টাকা সংগ্রহ করিতে হইবে। হাজার টাকা শুনিতে বেশী নয়। কিন্তু উপার্জ্জক সাধারণতঃ পুরুষেরাই, এবং ৪০৩ জন পুরুষের মধ্যে অ-রোজগারী শিশু বালক ও যুবক আছে। তাহা না ধরিলেও, ৪০০ জন প্রত্যেকে গড়ে আড়াই টাকা চাঁদা দিলে তবে হাজার টাকা হয়। খাস্ কলিকাতা শহরে বাঙালী পুরুষ আছে চারি লক্ষ। এই চারি লক্ষ লোকের নিকট হইতে মাথা-পিছু গড়ে আড়াই টাকা করিয়া চাঁদা সংগৃহীত হইয়া কখনও কোন কাজের জন্য দশ লক্ষ টাকা উঠিয়াছে কি? অথচ কলিকাতায় গোরখপুরের চেয়ে খুব বেশী ধনী বাঙালী আছে। অতএব গোরখপুরে হাজার টাকা সংগ্রহ তথাকার বাঙালীদের উৎসাহিতার পরিচায়ক।

গোরখপুর শহরে সাধু গোরক্ষনাথ ও গম্ভীরনাথের সমাধি ও অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থান আছে। তা ছাড়া সম্মেলনের উদ্যোক্তারা নেপাল রাজ্যে স্থিত অনতিদূরবর্ত্তী বুদ্ধদেবের জন্মস্থান লুম্বিনী এবং কাশিয়ায় স্থিত বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্ব্বাণের স্থান দেখাইবার বন্দোবস্ত করিতেছেন। এই জন্য আশা হয়, যাঁহারা অন্যত্র বড় বড় সভায় যাইবেন না, তাঁহারা—বিশেষতঃ নানা প্রদেশের প্রবাসী বাঙালীরা—ডিসেম্বরের ২৭, ২৮ ও ২৯ তারিখে কেহ কেহ গোরখপুর যাইবেন। বাঙালী জাতির যে ছোট ছোট অংশগুলি নানা জায়গায় বিচ্ছিন্নভাবে বাস করিতেছেন, বৎসরের মধ্যে একবার তাঁহাদের সংহতি-শক্তি এবং সংহতি-বোধের আনন্দ উপলব্ধি করিবার সুযোগ মূল্যবান্।

—

এলাহাবাদে বাঙালী মহিলাদের শিল্পপ্রদর্শনী

এলাহাবাদ জেলায় শিশু হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত গণনা করিয়া ৫১০৯ জন বাঙালী আছে; এলাহাবাদ শহরে তার চেয়ে কিছু কম। এই ৫১০৯ জনের মধ্যে মহিলার সংখ্যা ২৬৩০। তাহার মধ্যে তীর্থবাসিনী মহিলা অনেক আছেন, এবং শিশু ও বালিকার সংখ্যাও কম নহে। ইহা বিবেচনা করিলে বলা যাইতে পারে, যে, এলাহাবাদে যত বাঙালী মহিলা আছেন, বাংলা দেশের অনেক গ্রামের মেয়েদের সংখ্যা তার চেয়ে বেশী। সেইজন্য গত অক্টোবর মাসে এলাহাবাদের বাঙালী মহিলারা যে একটি শিল্পপ্রদর্শনীর আয়োজন করিয়াছিলেন, তাহা ছোট হইলেও তুচ্ছ নয়। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত কন্‌ফারেন্সের বিবরণ হইতে জানা যায়, যে, তাহাতে বাঙালী ওস্তাদ এবং বালক-বালিকাদের কৃতিত্ব বিশেষ প্রশংসার বিষয় হইয়াছিল। এলাহাবাদের বাঙালী মহিলাদের শিল্পপ্রদর্শনীতে তাঁহাদের অন্য রকম কৃতিত্ব আমরা এক দিন

গিয়া প্রত্যক্ষ করিলাম। এই প্রদর্শনীতে নানা রকমের ছবির, সূচী-শিল্পের, উল বোনার, কাঠের কাজের, চর্ম্মের কাজের ও নানাবিধ মিষ্টান্ন প্রভৃতির নমুনা প্রদর্শিত হইয়াছিল। চিত্র-বিভাগে তৈলমিশ্রিত রঙের ছবি, জলমিশ্রিত রঙের ছবি. প্যাষ্টেল, ভারতীয় পদ্ধতির চিত্র প্রভৃতি ছিল।

নানাবিধ ছবির জন্য শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরীর পত্নী, শ্রীমতী বেলা দত্ত, শ্রীমতী পূর্ণিমা দেবী ও শ্রীমতী রমা মুখোপাধ্যায় পুরস্কার পাইয়াছেন এবং শ্রীমতী ইন্দুলেখা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী আশা চট্টোপাধ্যায় প্রশংসাপত্র পাইয়াছেন। তদ্ভিন্ন পুরস্কার পাইয়াছেন—চর্ম্মের কাজের জন্য শ্রীমতী সাধনা গুপ্ত. নানাবিধ সূচীশিল্পের জন্য শ্রীমতী রমা মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা দত্ত, শ্রীমতী সবিতা মজুমদার, শ্রীমতী শোভাময়ী মিত্র, শ্রীমতী সবিতা চৌধুরী, শ্রীমতী সুখলতা ঘোষ বালিকা-বিভাগে শ্রীমতী কমলা সেন, শ্রীমতী তারা দত্ত, শ্রীমতী মায়া ভাদুড়ী; উলবোনার জন্য শ্রীমতী বেলা দত্ত। শ্রীমতী সুরমা রায় ও শ্রীমতী স্নেহলতা বসু বিশেষ পদক পাইয়াছেন।

এতদ্ভিন্ন প্রশংসাপত্র পাইয়াছেন নিম্নলিখিত শ্রীমতীগণ। মহামায়া দেবী, প্রভাবতী সেন, এন্ কে মিত্র, প্রতিমা ঘোষ, নিভাননী চট্টোপাধ্যায়, গীতা চট্টোপাধ্যায়, হিরন্ময়ী দত্ত, ঘোষজায়া, অন্য এক ঘোষজায়া, কমলা দেবী, সরোজা দেবী, কমলিনী রায়, বন্দ্যোপাধ্যায়জায়া; এবং নির্ম্মলেশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

—

বাঙালীর তৈরি মোটর গাড়ী

অনেক দিন হইল, কলিকাতা মিউনিসিপালিটি শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দাসকে একখানি মোটর গাড়ী নির্ম্মাণ করিবার ফরমাইস দিয়াছিলেন। তাহা প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে। কলিকাতা পুলিসের মোটর-যান বিভাগ উহা চালাইবার অনুমতি দিয়াছেন এবং রেজিষ্টরীভুক্ত করিয়া উহার নম্বর দিয়াছেন ৩৫৯৭৭। এই মোটর গাড়ীটি নির্ম্মাণ করিতে অনেক সময় লাগিয়াছে এবং ইহা খুব উৎকৃষ্ট হয় নাই, কিন্তু বেশ চলনসই হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে, যে, উপযুক্ত মূলধন ও যন্ত্রাদি থাকিলে বাঙালী কারিকর মোটর গাড়ীর এঞ্জিন আদি সমুদয় অংশ প্রস্তুত করিয়া বাজারে প্রতিযোগিতায় নামিতে সমর্থ।

—

কাঁথি জাতীয় বিদ্যালয়

মেদিনীপুর জেলায় সন্ত্রাসক দমন উপলক্ষ্যে কাঁথির জাতীয় বিদ্যালয় সরকারী হুকুম দ্বারা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই বিদ্যালয় দশ বৎসরের উপর প্রশংসার সহিত পরিচালিত হইয়া আসিতেছিল। অনেক উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী ইহার কাজের প্রশংসা করিয়াছেন। ইহার সেক্রেটরী ও পরিচালকগণ অহিংস নীতিতে দৃঢ়বিশ্বাসী। এই বিদ্যালয়ের সহিত সন্ত্রাসকদের সম্পর্কের কোন প্রমাণ থাকিলে গবর্ন্মেণ্ট নিশ্চয়ই ইহার ছাত্রদের ও পরিচালকদের নামে মোকদ্দমা চালাইতে পারিতেন।

এই প্রকার বিদ্যালয়ের উচ্ছেদ সাধনের প্রকৃত কারণ সম্ভবতঃ এই, যে, মেদিনীপুরের রাজপুরুষেরা স্বাধীন ভাবে পরিচালিত প্রতিষ্ঠান মাত্রেই রাজদ্রোহিতার বীজ নিহিত দেখিতে পান।

—

বিপ্লবের যুগ

১৯১৪ সালে যখন ইউরোপে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়, তখন হইতে নানা দেশে রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিতেছে। ইউরোপে আগে বড় সাম্রাজ্য যত ছিল, এক ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ছাড়া আর সমস্তই সাধারণতন্ত্র হইয়া গিয়াছে, আবার জার্ম্মেনী সাধারণতন্ত্র



বোম্বাই-এ আফগানিস্তানের ভূতপূর্ব্ব নৃপতি নাদির শাহ্ ও শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু

Photo : Devare and Co., Bombay]

হইবার পর হিট্‌লারের একনায়কত্বের অধীন হইয়াছে। রাজার অধীন ইটালীর দশাও তাই। স্পেনে বিপ্লব হইয়াছে।

আমেরিকার কিউবা দ্বীপে এখনও বিদ্রোহ ও বিপ্লব চলিতেছে। দক্ষিণ-আমেরিকার কোন কোন দেশের মধ্যে যুদ্ধ চলিতেছে। এশিয়ায় জাভা দ্বীপে এবং আনামে বিপ্লবচেষ্টা হইয়াছিল, তাহা দমিত হয়। শ্যাম দেশে একাধিক বার বিদ্রোহ হইয়াছে। চীনে ও জাপানে যুদ্ধের ফলে জাপান মাঞ্চুরিয়া এবং চীনের আরও কোন কোন অংশ দখল করিয়াছে। জাপানের মধ্যেও কিন্তু শান্তি নাই। সেখানেও গত কয়েক বৎসরে সন্ত্রাসকদের দ্বারা কয়েক জন উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ নিহত হইয়াছে। সম্প্রতি আফগানিস্থানের রাজা নাদির খাঁ নিহত হইয়াছেন। তাঁহার পুত্র সিংহাসনে বসিয়াছেন বটে, কিন্তু টিকিয়া থাকিতে পারিবেন কি-না, বলা কঠিন। চীন সাধারণ-তন্ত্রের অন্তর্গত কাসগড়ে মুসলমান বিদ্রোহ ও তাহার দমন, আবার বিদ্রোহ, ইত্যাদি চলিতেছে। মানুষের মন সর্ব্বত্র অশান্ত হইয়াছে। জেনিভায় নিরস্ত্রীকরণের বা যুদ্ধসজ্জা হ্রাসের জন্য কন্‌ফারেন্স একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় নাই বটে, কিন্তু জার্ম্মেনী উহার সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছে।

—

বৈজ্ঞানিক গবেষণার কেন্দ্র কলিকাতা

বিজ্ঞানের অনেক শাখায় গবেষণা কলিকাতায় অনেক বৎসর হইতে চলিয়া আসিতেছে। এখানে অনেক আবিষ্ক্রিয়াও হইয়াছে। অবশ্য, ভারতবর্ষের অন্য কোন কোন জায়গাতেও ভাল কাজ হইয়াছে—যেমন এলাহাবাদে। কিন্তু মোটের উপর কলিকাতাকে ভারতবর্ষে বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রধান কেন্দ্র বলা যাইতে পারে। এই জন্য এখান হইতে এমন এক খানি ইংরেজী বৈজ্ঞানিক পত্রিকা বাহির হওয়া আবশ্যক যাহাতে ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান বৈজ্ঞানিক গবেষকদের কাজের বৃত্তান্ত থাকিবে, এবং পৃথিবীর অন্যত্র যে-সব গবেষণা হইতেছে ও ফল যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহার সহজবোধ্য মনোজ্ঞ বিবরণ লিপিবদ্ধ হইবে। ইংরেজীতে ইহা বাহির করিতে বলিতেছি এই জন্য, যে, তাহা হইলে নানাবিধ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ভারতের সকল প্রদেশের লোকদের নিকট হইতে পাওয়া যাইবে, প্রবন্ধ-লেখা অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে, সংকলন সহজ হইবে, এবং পাঠক বেশী হইবে। বাংলায় "প্রকৃতি" আছে বাঙালীদের জন্য। তাহা ভাল। কিন্তু ইংরেজী একখানিও চাই। তাহা কতকটা ইংরেজী "নেচার" (*Nature*) পত্রিকার মত হইবে, কিন্তু কতক অংশ উহা অপেক্ষা সাধারণ পাঠকদের অধিকতর বোধগম্য ও প্রিয় করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। কারণ, ভারতবর্ষে শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বিস্তার ইউরোপের চেয়ে এখনও অনেক কম।

—

বৈজ্ঞানিক ও অন্যবিধ পারিভাষিক শব্দসংগ্রহ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সহযোগিতা করিয়া রবীন্দ্রনাথ বাংলা পারিভাষিক শব্দ সংগ্রহ করিতেছেন। প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্য্যন্ত শিক্ষা অচিরে বাংলায় দেওয়া হইবে। তাহার জন্য সব বিষয়ে বাংলায় পুস্তক লিখিতে হইবে। পারিভাষিক শব্দের সংগ্রহ এরূপ পুস্তক রচনা অপেক্ষাকৃত সহজ করিবে। তদ্ভিন্ন মাসিক পত্রাদির লেখকদের উহা খুব কাজে লাগিবে। অনেক পারিভাষিক শব্দ এখন ব্যবহৃত হয়। তাহার মধ্যে বাছাই করিতে হইবে। কিছু নূতন শব্দ সংস্কৃত ধাতু হইতে রচনা করিতে হইবে। কোন কোন শব্দ ঠিক ইংরেজীতে যেমন আছে তেমনি রাখিলেই চলিবে। রবীন্দ্রনাথের সংগ্রহে সংস্কৃত, মরাঠী, গুজরাটী, হিন্দী প্রভৃতি শব্দও থাকিবে। সুতরাং অন্য ভাষাভাষীদেরও উহা কাজে লাগিবে।

—

মারোয়াড়ী মহিলা সম্মেলন

ভারতবর্ষের যত জায়গায় মারোয়াড়ীরা থাকেন, তাঁহাদের মহিলাবৃন্দের একটি কনফারেন্স কলিকাতায় হইয়া গিয়াছে। শ্রীমতী জানকীদেবী বজাজ সভানেত্রী নির্ব্বাচিত হন। তাঁহার বক্তৃতায় এবং নির্দ্ধারিত প্রস্তাবগুলিতে অবরোধ-প্রথা, শিক্ষার অভাব, বিবাহসম্বন্ধীয় নানা কুরীতি প্রভৃতি সমালোচিত ও নিন্দিত হয়। মারোয়াড়ী মহিলাদের পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারকেও তিনি রেহাই দেন নাই। জাগৃতি মারোয়াড়ী সমাজেরও অন্দরমহলে পৌঁছিয়াছে, ইহা শুভ লক্ষণ।

—

ভিক্টোরিয়া মহারাণীর ঘোষণাপত্রের নূতন প্রয়োগ

ভারতীয়েরা যখন মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্রের দোহাই দিয়া স্বদেশে ইংরেজদের সমান উচ্চ উচ্চ চাকরি ও

অন্য সব সুবিধার দাবি করে, তখন জবাব এই দেওয়া হয়, যে, ঐ ঘোষণা-পত্র ত আইন নয়, ওটা একটা "সেরিমোনিয়্যাল ডকুমেণ্ট"—রাষ্ট্রীয় একটা অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে পঠিত একখানা কাগজমাত্র—আইনের মত উহা বলবৎ নহে। এখন কিন্তু ভারতসচিব স্তর সামুয়েল হোর বলিতেছেন, মহারাণী ঘোষণা-পত্রে বলিয়াছেন, তাঁহার ভারত-সাম্রাজ্যে তাঁহার সব জাতির ও ধর্ম্মের প্রজার অধিকার সমান। অতএব ভারতীয়েরা ভারতবর্ষেও ইংরেজদের চেয়ে সেরূপ কোন বেশী সুবিধা পাইতে পারে না যেরূপ সুবিধা সব দেশে তথাকার লোকেরা বিদেশীদের চেয়ে বেশী পাইয়া থাকে। অর্থাৎ কি-না, ভারতবর্ষের উপকূলে জাহাজ চালাইবার অধিকার ইংরেজদের ও ভারতীয়দের সমান সমান হওয়া চাই, ভারতে ভারতীয়দের কারখানা যেমন সরকারী সাহায্য পাইবে, ভারতে প্রতিষ্ঠিত ইংরেজদের কারখানাও সেইরূপ সরকারী সাহায্য পাইবার অধিকারী, ভারতীয় বা কোন প্রাদেশিক গবর্ন্মেণ্ট বা কোন মিউনিসিপালিটী ভারতীয় জিনিষকে বিলাতী জিনিষের চেয়ে বেশী পছন্দ করিতে পারিবেন না, ইত্যাদি! ইত্যাদি!! ইত্যাদি!!!

—

আগ্রা-অযোধ্যায়, পঞ্জাবে, ও বঙ্গে নারীহরণাদি অপরাধ

পঞ্জাবের ১৯৩২ সালের পুলিস-বিভাগের রিপোর্টে দেখা যায়, যে, সেখানে ঐ বৎসর নারীহরণ ও তদ্বিধ অপরাধের সংখ্যা ছিল ৫০৪। পঞ্জাবের লোকসংখ্যা ২,৩৫,৮০,৮৫২। আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের ১৯৩২ সালের পুলিস রিপোর্ট অনুসারে ঐ বৎসর তথায় ঐ প্রকার অপরাধের সংখ্যা ছিল ৭১১। ঐ প্রদেশের লোকসংখ্যা ৪,৮৪,০৮,৭৬৩। লোকসংখ্যা বিবেচনা করিলে পঞ্জাবে এই দুর্নীতির পরিমাণ বেশী। কারণ সহজেই অনুমেয়। বঙ্গে ১৯৩২ সালে ঐরূপ অপরাধ কত হইয়াছিল, পুলিস রিপোর্ট হস্তগত না-হওয়ায় এখনও জানিতে পারি নাই। পুলিস রিপোর্টের উপর বাংলা-গবর্ন্মেণ্টের মন্তব্যে জানা যায়, যে, ১৯৩১ অপেক্ষা ১৯৩২ সালে ঐরূপ অপরাধ ৯৫টা বেশী হইয়াছিল। ১৯৩১ ও ১৯৩২ সালের সংখ্যা দুটি দেওয়া উচিত ছিল। গবর্ন্মেণ্ট আগের মত এখনও পুলিসকে খুব হুঁসিয়ার থাকিতে বার-বার বলিতেছেন। হুঁসিয়ারীর ফলে কি অপরাধ বাড়ে?

—

জেলা স্কুলবোর্ড গঠন

প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য মৈমনসিংহ, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, দিনাজপুর, পাবনা ও বীরভূম, এই ছয়টি জেলায় গবর্ন্মেণ্ট জেলা স্কুলবোর্ড গঠন করিবেন বলিয়া গত সেপ্টেম্বর মাসে খবর বাহির হইয়াছিল। এই ছয়টির মধ্যে পাঁচটি মুসলমানপ্রধান বৃহৎ জেলা, কেবল একটিমাত্র—বীরভূম, হিন্দুপ্রধান ও ছোট জেলা। দার্জ্জিলিং ও চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য অঞ্চল বাদ দিলে বঙ্গে বীরভূমের লোকসংখ্যা সকল জেলার চেয়ে কম। এই ছয়টি জেলার হিন্দু ও মুসলমান অধিবাসীদের সংখ্যা নীচে দেওয়া হইল।

জেলা।	মুসলমান।	হিন্দু।
মৈমনসিং	৩৯,২৭,৫৫২	১১,৭৪,৩২৮
চট্টগ্রাম	১৩,২৬,২০৮	৩,৯২,৩৫২
নোয়াখালি	১৩,৩৯,০৫৫	৩,৬৬,৩৯১
দিনাজপুর	৮,৮৬,৭২৩	৭,৯৩,৮৩২
পাবনা	১১,১১,৭১২	৩,৫২,৩৬৭
বীরভূম	২,৫২,৯০৮	৬,৩৬,৪২৫

—

লিখনপঠনক্ষমের অনুপাতের হ্রাসবৃদ্ধি

বঙ্গের ১৯২১ সালের সেন্সস রিপোর্টের সহিত ১৯৩১ সালের সেন্সস রিপোর্টের হাজারকরা লিখনপঠনক্ষমের সংখ্যাগুলি তুলনা করিলে দেখা যায়, যে, বঙ্গের অধিকাংশ জেলায় ১৯২১ সালে হাজারকরা যত হিন্দু পুরুষ লিখন-পঠনক্ষম ছিল, ১৯৩১ সালে হাজারকরা তার চেয়ে কম হিন্দু পুরুষ লিখনপঠনক্ষম। কয়েকটি জেলায় হিন্দুদের লিখন-পঠনক্ষমের অনুপাত বাড়িয়াছে। মুসলমানদের মধ্যেও এই অনুপাতের হ্রাসবৃদ্ধি হইয়াছে। তাহাদের অনুপাত বেশী জেলায় বাড়িয়াছে, কম জেলায় কমিয়াছে। সমুদয় অনুপাতের সংখ্যাগুলি উভয় বৎসরের সেন্সস রিপোর্ট হইতে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন দত্ত কর্তৃক সংকলিত নীচের তালিকায় দেওয়া হইল।

হাজারকরা লিখনপঠনক্ষম পুরুষ।

	হিন্দু			মুসলমান		
জেলা	১৯২১	১৯৩১	হ্রাসবৃদ্ধি	১৯২১	১৯৩১	হ্রাসবৃদ্ধি
বর্দ্ধমান	২২৪	২২০	—৪	১৩৯	১৮১	+৪২
বীরভূম	২৪৯	১৭৪	—৭৫	১৮০	১১৯	—৬১
বাঁকুড়া	২৬১	১৯৩	—৬৮	২০৪	১৭১	—৩৩
মেদিনীপুর	২৩২	৩২৭	+৯৫	১৬১	২২৩	+৬২
হুগলী	২৬০	২৬৩	+৩	২১১	২৪২	+৩১
হাবড়া	৩০৫	৩২৫	+২০	১৭৫	২১৪	+৩৯
২৪-পরগণা	২৮৬	২৪১	—৪৫	১৮৫	১৪৪	—৪১
কলিকাতা	৫৯০	৫০৩	—৮৭	৩১০	৩৭৩	+৬৩
নদীয়া	২২৯	১৯৬	—৩৩	৪৯	৫৩	+৪
মুর্শিদাবাদ	২১২	১৬৬	—৪৬	৮২	৬১	—২১
যশোর	২৪৪	২১৩	—৩১	৯৫	৭৫	—১৯
খুলনা	২৮১	২১৮	—৬৩	১৪৭	১১৭	—৩০
রাজশাহী	২১৫	২০০	—১৫	৮০	১০৭	+২৭
দিনাজপুর	১৪[illegible]	১০৯	—৩৮	১৯২	১৫৭	—৩৫
জলপাইগুড়ি	১২৩	৮২	—৪১	১৪৩	১৩৪	—৯
দার্জ্জিলিং	২০৯	২০৬	—৩	২৬৬	২৮৯	+২৩
রংপুর	১৬৮	১৬৭	—১	৯৬	৯৯	+৩
বগুড়া	২৬৪	২৪৬	—১৮	১৬১	১৮০	+১৯
পাবনা	৩০৭	২৬৫	—৪২	৭৯	৭২	—[illegible]
মালদহ	১৪২	৮৯	—৫৩	৮৫	৫৬	—২৯
ঢাকা	৩২৭	২৮৭	—৪০	৮৩	১০৯	+২৬
মৈমনসিংহ	২৩১	২১৯	—১২	৫৯	৮৬	+২৭
ফরিদপুর	৩০৫	২৬৬	—৩৯	৭২	৮৩	+১১
বাখরগঞ্জ	৪১৬	৪৮২	+৬৬	১৫৭	১৪৭	—১০
ত্রিপুরা	৩৪৭	৪২৯	+৮২	১২০	৭৮	—৪২
নোয়াখালি	৩৩৩	৩৩০	—৩	১১৭	২০১	+৮৪
চট্টগ্রাম	৩৪৪	৩৩৭	—৭	৯৯	১২৯	+৩০
চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য অঞ্চল	১২৩	১৭৫	+৫২	৭৭	*	*

এই তালিকাটিতে, বঙ্গে ৫ ও তদূর্দ্ধ বয়সের পুরুষদের মধ্যে হাজারকরা কয়জন ১৯২১ ও ১৯৩১ সালে লিখন-পঠনক্ষম ছিল, তাহা দেখান হইয়াছে। ইহা হইতে জানা যায়, যে, (১) বর্দ্ধমান, কলিকাতা, নদীয়া, রাজশাহী, দার্জ্জিলিং, রংপুর, বগুড়া, ঢাকা, মৈমনসিং, ফরিদপুর, নোয়াখালি, ও চট্টগ্রাম, এই বারটি জেলায় হিন্দুদের মধ্যে লিখনপঠনক্ষমের অনুপাত কমিয়াছে এবং মুসলমানদের মধ্যে বাড়িয়াছে; (২) হুগলী ও হাবড়া এই দুই জেলায় হিন্দুদের মধ্যে অনুপাত যত বাড়িয়াছে, মুসলমানদের মধ্যে তদপেক্ষা অধিক বাড়িয়াছে; (৩) বীরভূম, বাঁকুড়া, ২৪-পরগণা, মুর্শিদাবাদ, যশোর, খুলনা, জলপাই-গুড়ি, পাবনা ও মালদহ, এই দশটি জেলায় মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুদের মধ্যে উহার হ্রাস বেশী হইয়াছে; (৪) কেবলমাত্র বাখরগঞ্জ ও ত্রিপুরায় হিন্দুদের মধ্যে বাড়িয়াছে ও মুসলমানদের মধ্যে কমিয়াছে; (৫) কেবলমাত্র মেদিনী-পুর জেলায় হিন্দুদের মধ্যে বৃদ্ধি মুসলমানদের মধ্যে বৃদ্ধি অপেক্ষা অধিক হইয়াছে; এবং (৬) কোন জেলাতেই মুসলমানদের মধ্যে হ্রাস হিন্দুদের মধ্যে হ্রাসের চেয়ে বেশী নয়।

বাংলা-গবর্মেণ্ট সাধারণ ভাবে সব ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার বিস্তারের জন্য একটি ব্যবস্থা ও ব্যয়ের বরাদ্দ রাখিয়া-ছেন। তাহার উপর অধিকন্তু মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য যে-প্রকার ব্যবস্থা ও ব্যয়ের বরাদ্দ আছে, হিন্দুদের জন্য তাহা নাই। সুতরাং মুসলমানদের মধ্যে

শিক্ষাবিস্তার হিন্দুদের চেয়ে দ্রুততর হইতে পারে। কিন্তু বিশেষ করিয়া হিন্দুদের মধ্যে অধিকাংশ স্থানে হ্রাস কেন হইবে?

লিখনপঠনক্ষমের হাজারকরা অনুপাত কমিবার একটা কারণ এই হইতে পারে, যে, শিশুরা নিরক্ষর, এবং ১৯২১-১৯৩১ দশ বৎসরে শিশুর সংখ্যা যেরূপ দ্রুত বাড়িয়াছে, শিক্ষাবিস্তার তত দ্রুত হয় নাই। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে শিশু যত অধিক হারে জন্মিয়াছে, হিন্দুদের মধ্যে তত নহে। অথচ লিখনপঠনক্ষমত্বের অনুপাত হিন্দুদের মধ্যেই অধিক স্থলে কমিয়াছে। এই সব কারণে আমাদের মনে হয়, বঙ্গের সেন্সসের লিখনপঠনক্ষমত্ব সম্বন্ধীয় অঙ্কগুলি নির্ভুল নহে। হিন্দুদের মধ্যে লেখাপড়ার প্রতি অনুরাগ হঠাৎ কমিয়া যাইবার কোন প্রমাণ বা কারণ আমরা জানি না।

বঙ্গে নারীদের লিখনপঠনক্ষমত্বের হার বৃদ্ধি

উপরে হিন্দু ও মুসলমান পুরুষদের মধ্যে লিখনপঠনক্ষমত্বের হারের হ্রাস-বৃদ্ধি দেখাইয়াছি। সকল ধর্ম্মের নারীদের সমষ্টির মধ্যে লিখনপঠনক্ষমত্বের হার কিন্তু বাড়িয়াছে দেখা যায়। ইহাতে রহস্য ঘনীভূত হইতেছে। ১৯২১ সালে ৫ ও তদূর্দ্ধ বয়সের নারীদের মধ্যে হাজারে ২১ জন লিখনপঠনক্ষম ছিল; ১৯৩১ সালে হাজারে ৩২ জন লিখনপঠনক্ষম ছিল।

বঙ্গে পুরুষদের লিখনপঠনক্ষমত্বের হার হ্রাস

আমরা পূর্ব্বে যে দীর্ঘ তালিকা দিয়াছি, তাহাতে প্রত্যেক জেলায় হিন্দু ও মুসলমান পুরুষদের মধ্যে লিখনপঠনক্ষমত্বের হারের হ্রাস-বৃদ্ধি আলাদা করিয়া দেখাইয়াছি। কিন্তু সমগ্র বঙ্গে সব ধর্ম্মের পুরুষদের সমষ্টির মধ্যে উহা মোটের উপর সামান্যই কমিয়াছে। ১৯২১ সালে বঙ্গের পুরুষদের মধ্যে হাজারকরা ১৮১ জন লিখনপঠনক্ষম ছিল, ১৯৩১ সালে ছিল ১৮০ জন। কিন্তু কোন কোন জেলায় বিশেষ রকম কমিয়াছে। যথা—

জেলা	১৯২১	১৯৩১	হ্রাস
বীরভূম	২১৬	১৫০	৬৬
বাঁকুড়া	২৩৭	১৮৫	৫২
২৪-পরগণা	২৫২	২০৭	৪৫
কলিকাতা	৫৩০	৪৭৬	৫৪
নদীয়া	১২০	১০৮	১২
মুর্শিদাবাদ	১৪২	১০৭	৩৫
যশোর	১৮১	১২৭	৫৪
খুলনা	২৩৯	[illegible]	[illegible]
দিনাজপুর	১৬১	১৩০	৩১
জলপাইগুড়ি	১১৩	৯২	২১
পাবনা	১৩৪	১১৭	১৭
মালদহ	১০৩	৬৮	৩৫
ত্রিপুরা	১৮০	১৬৫	১৫
চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য অঞ্চল	১১৩	৮৬	২৭

দার্জ্জিলিং, রংপুর ও ঢাকায় উভয় বৎসরের সংখ্যাগুলি প্রায় সমান আছে। ফরিদপুরে হ্রাস কম। অন্যান্য জেলায় বৃদ্ধি হইয়াছে। মেদিনীপুরে ও নোয়াখালিতে বাড়িয়া যথাক্রমে ২১৮ হইতে ৩১২ এবং ১৬৭ হইতে ২৩০ হইয়াছে। বাঁকুড়া ও বীরভূমে এত অধিক কমিবার কোন কারণ দেখান হয় নাই। নিকটবর্ত্তী মেদিনীপুর জেলায় হাজারকরা ৯৪ বাড়িয়াছে!

কলিকাতার হাজারকরা ৫৪ হ্রাস আরও রহস্যময়। এখানকার মিউনিসিপালিটীর চেষ্টায় ১৯২১ সাল অপেক্ষা ১৯৩১ সালে বিস্তর বেশী প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। তাহার ফলে কি লিখনপঠনক্ষমত্ব কমিয়া নিরক্ষরতা বাড়িয়াছে? তাহা হইলে ত মন্ত্রী স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহ-রায় কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর ক্ষমতা কমাইয়া অতি সৎ কাজ করিয়াছেন!

প্রদেশ ও দেশীরাজ্যসমূহে লিখনপঠনক্ষমত্ব

নীচের তালিকায় ১৯৩১ সালে প্রধান প্রধান প্রদেশ ও দেশীরাজ্যে হিন্দু ও মুসলমান পুরুষ ও নারীদের মধ্যে হাজারকরা লিখনপঠনক্ষমের সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে :—

	হিন্দু		মুসলমান	
	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী
আসাম	১৮৬	২৫	১১৫	১৬
বাংলা	২৬৩	৫০	১১৬	১৭
বিহার-উড়িষ্যা	১০২	৭	১০০	১১
বোম্বাই	১৭৮	২৬	১২১	১৬
ব্রহ্মদেশ	৩৩৮	১০৯	৩৭২	৬০
মধ্যপ্রদেশ-বেরার	১১৮	৯	২৬৫	৩৫
মান্দ্রাজ	১৮২	২৬	২২৯	২১
উ-প-সী-প্র	৪১৬	১০১	৪২	৩
পঞ্জাব	১৬৬	২৬	৫৮	৮
আগ্রা-অযোধ্যা	৯১	৯	৯৭	১৬
বড়োদা	৩১৫	৭২	৪২০	৭৯
গোআলিয়র	৬৯	৯	১৫৬	২৮
হায়দরাবাদ	৭০	৮	২০৫	৩৫
কাশ্মীর	১৮৭	১৯	৩৪	২
মহীশূর	১৬১	২৪	২৮৪	১০১
ত্রিবাঙ্কুড়	৩৯৯	১৪২	২৫৩	৬০
কোচিন	৪২৮	১৬৯	২৭৬	৪৯

মেদিনীপুরের কোন কোন লোকের সুবিধা!

মেদিনীপুর হইতে যাঁহারা নির্ব্বাসিত হইয়াছেন, তাঁহাদের সুবিধা এই যে, তাঁহাদিগকে নিগ্রহ-পুলিস ট্যাক্স দিতে হইবে না! তাই বটে ত? আরও সুবিধা এই যে তাঁহাদের মেদিনীপুরের ঘরবাড়ি বন্ধ থাকায় অতিথি আসিবে না, সুতরাং ১৪ হইতে ৩০ বৎসর বয়সের অতিথির আগমন-সংবাদ পুলিসকে দিতে হইবে না! যাঁহারা নির্ব্বাসিত হন নাই, কিন্তু কেবলমাত্র যাঁহাদের কোন-না-কোন ঘরবাড়ি গবন্মেণ্ট লইয়াছেন, তাঁহাদিগকে ঐ ঐ বাড়ির নিগ্রহ-পুলিস ট্যাক্স দিতে হইবে না এবং তথায় অতিথি-আগমনের সংবাদও পুলিসকে দিতে হইবে না—পুলিস স্বয়ংই যে তথায় আইনবলাৎ অতিথি।

—

বাঙালার সৈনিক কর্ম্মচারীর পদ প্রাপ্তি

দার্জ্জিলিঙের শ্রীযুক্ত জয় মজুমদার ইংলণ্ডের স্যাণ্ডহার্ষ্ট রয়্যাল মিলিটারী কলেজ হইতে সামরিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া লাণ্ডিকোটালের চেশায়ার রেজিমেণ্টে দ্বিতীয় লেফ্‌টেন্যাণ্ট পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

তাঁহার ভ্রাতা করুণ মজুমদার ইংলণ্ডের ক্র্যান্‌ওয়েল-স্থিত রয়্যাল এয়ার কোর্স কলেজে পড়িতেছেন, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে ব্রিটিশ বিমান বিভাগে কাজ করিবেন।

—

আশানন্দ ঢেঁকির স্মৃতিস্তম্ভ

আশানন্দ ঢেঁকি শান্তিপুরের এক জন বিখ্যাত শক্তিমান্ বাঙালী ছিলেন। তিনি ছিলেন মুখুজ্যে, অন্য লোকে যেমন অনায়াসে লাঠি ব্যবহার করে তিনি তেমনি সহজে ঢেঁকি ব্যবহারে সমর্থ ছিলেন বলিয়া তাঁহার 'ঢেঁকি' পদবী হইয়াছিল। গত ১২ই আশ্বিন বীরাষ্টমীর দিনে শান্তিপুরে তাঁহার স্মৃতিস্তম্ভের আবরণ উন্মোচিত হইয়াছে। শান্তিপুর-বাসীরা যথাযোগ্য কাজ করিয়াছেন। তথাকার শ্যামসুন্দর দৈহিক বল বৃদ্ধির উপায় শিক্ষা দিয়া ও তাহার দৃষ্টান্ত স্বয়ং প্রদর্শন করিয়া আশানন্দের স্মৃতি অন্য প্রকারে রক্ষা করিতেছেন।

বঙ্গের যেখানে যত অসাধারণ বলিষ্ঠ লোক ছিলেন, সকলেরই স্মৃতি কোন-না-কোন প্রকারে রক্ষিত হওয়া এবং শারীরিক উন্নতির চেষ্টা সর্ব্বত্র হওয়া আবশ্যক।

—

সন্ত্রাসন দমন সম্বন্ধে বঙ্গের গবর্ণর

কয়েক দিন পূর্ব্বে বঙ্গের গবর্ণর স্যর জন এণ্ডার্সন একটি বক্তৃতায় সন্ত্রাসবাদ ও সন্ত্রাসক দমনের সরকারী চেষ্টাকে যুদ্ধের সঙ্গে তুলনা করিয়া, এই চেষ্টা কি প্রকারে সফল হইতে পারে, তাহা নির্দ্দেশ করেন। সন্ত্রাসন দমনের জন্য গবন্মেণ্ট যত রকম উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার সমালোচনা আগে আগে করিয়াছি। সব গুলির সমর্থন করিতে পারা যায় না। গবর্ণর উল্লিখিত নির্দ্দেশে যাহা বলিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধে কিছু বলিতেছি না, যাহা বলেন নাই তাহারই সম্বন্ধে কিছু লিখিতেছি।

শত্রু নিপাত করিতে হইলে বর্ত্তমানে যাহারা শত্রু কেবল তাহাদেরই বিনাশের উপায় চিন্তা করিলে চলে না, যাহাতে নূতন নূতন লোক শত্রুভাবাপন্ন হইয়া শত্রুদলে যোগ দিয়া তাহার বল বৃদ্ধি না করে, তাহার উপায়ও চিন্তা করা আবশ্যক। কতকগুলি লোক ইংলণ্ডের শত্রু বিবেচিত হইয়াছে। ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের বর্ত্তমান সম্বন্ধের প্রতি অসন্তোষ তাহার মূলীভূত একটি কারণ। এই অসন্তোষ বিনষ্ট করিতে না পারিলে বর্ত্তমান শত্রুগণ বিনষ্ট হইলেও নূতন নূতন শত্রুর আবির্ভাব হইতে পারে। অতএব, ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের সম্পর্ককে ন্যায় ও মানবিক ভ্রাতৃত্বের ভিত্তির উপর স্থাপিত করিয়া অসন্তোষ দূর করা আবশ্যক।

বর্ত্তমান অসন্তোষ দূরীভূত না হইলে এবং নূতন করিয়া অসন্তোষ জন্মিবার কারণ ক্রমাগত উৎপন্ন হইতে থাকিলে, যাহারা ইংলণ্ডের প্রতি এবং ইঙ্গ-ভারতীয় বর্ত্তমান সম্পর্কের প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইবে, তাহারা যে সবাই সন্ত্রাসক হইবেই এমন নয়। হয়ত কেহ কেহ তাহা হইবে, হয়ত কেহই হইবে না। কিন্তু ইহাই সম্ভব বোধ হয়, যে, অধিকাংশ অসন্তুষ্ট লোক অহিংস উপায়ে আপনাদের অভীষ্ট সিদ্ধ করিবার চেষ্টা করিবে। বর্ত্তমান অপেক্ষা তাহা ভবিষ্যতে অধিক কার্য্যকর হইতে পারেই না, বলা যায় না।

—

বোধনা-নিকেতন

মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রামে প্রতিষ্ঠিত বোধনা-নিকেতন জড়বুদ্ধি ছেলেমেয়েদের দৈহিক ও মানসিক পরিচর্য্যা ও শিক্ষার দ্বারা তাহাদের উন্নতি বিধানের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার কাজ শৃঙ্খলার সহিত চলিতেছে। কিছু দিন হইল ঝাড়গ্রামের মহকুমা-হাকিম মহাশয় ইহা পরিদর্শন করিয়া ইহার খুব প্রশংসা করিয়াছেন। এখন ইহার ছাত্রসংখ্যা সাতটি এবং ছাত্রী একটি। ঝাড়গ্রামের রাজা নরসিংহ মল্লদেবের বদান্যতায় ইহার প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হইয়াছে। তাঁহার ম্যানেজার শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য নিকেতনটির বিশেষ শুভাকাঙ্ক্ষী। রাজা বাহাদুরের বদান্যতায় প্রতিষ্ঠানটির অনেক ঋণ শোধ ও অভাব মোচন হইয়াছে। কিন্তু এখনও অনেক ঋণ অপরিশোধিত আছে। এবং অভাব ত কার্য্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়াই চলিবে। সর্ব্বসাধারণের সাহায্যে সব অভাব দূর হইতে থাকিবে, আশা

আছে। 'প্রবাসী'র পাঠকেরাই সকলে কিছু দিলে অনেক হাজার টাকা হয়। যিনি যাহা দিবেন, অনুগ্রহ করিয়া বোধনা-নিকেতনের সেক্রেটরী শ্রীযুক্ত গিরিজাভূষণ মুখোপাধ্যায়কে ৬-৫ বিজয় মুখুজ্যে গলি, ভবানীপুর, কলিকাতা, ঠিকানায় তাহা পাঠাইলে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকৃত হইবে।

—

বঙ্গে জুতার ব্যবসা

বাংলার সরকারী চর্ম্মকারখানার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের মতে বঙ্গে বৎসরে প্রায় এক কোটি টাকার জুতা তৈরি হয়, এবং তাহার প্রায় সমস্তই বাঙালীরা ক্রয় করে। কিন্তু এত জুতা তৈরি ও বিক্রী করিয়া যে লাভ হয়, বাঙালী তাহা পায় না। প্রায় সমস্ত ব্যবসাটা আট শত চীনা ব্যবসাদারের অধিকৃত, এবং তাহাদের অধীনস্থ কারিকররা প্রায় সবাই বেহারী। জুতা প্রস্তুত ও বিক্রী করার কাজে সকল শ্রেণীর বাঙালীর প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। হিন্দু মহাসভার সুরাট অধিবেশনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়, যে, সামাজিক জীবনের জন্য আবশ্যক সব রকম শিল্প ও অন্য কাজ সকল শ্রেণীর হিন্দুর করণীয়। এরূপ প্রস্তাব করা ঠিকই হইয়াছে, কিন্তু সকল হিন্দু যে ইহার জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়াছিল তাহা নহে। চামড়ার এক প্রকারের কাজ আগে হইতেই সম্ভ্রান্ত হিন্দুরা সখ করিয়া করিয়া আসিতেছেন। রবীন্দ্রনাথের পুত্র ও পুত্রবধূ তাহা অনেক দিন হইতে করেন। বিশ্বভারতীর শ্রীনিকেতনে অলঙ্কৃত যে জুতা বিক্রী হয়, তাহা রূপোভিত্ত করেন ভদ্রসন্তানেরা। এলাহাবাদে মহিলাদের প্রদর্শনীতে তাঁহাদের নির্ম্মিত সুন্দর চামড়ার জিনিষ দেখিলাম। আগে বঙ্গে পুরুষেরাও জুতা কম পরিতেন, মেয়েরা ত পরিতেনই না। এখন পুরুষদের মধ্যে জুতার ব্যবহার বাড়িতেছে এবং নারীরাও অনেকে জুতা পরিতেছেন। সুতরাং জুতার ব্যবহার বাড়িয়াই চলিবে। এত বড় কারবারে সকল শ্রেণীর বাঙালীর বহুসংখ্যক লোকের জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারে। সরকারী টেক্নিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউটে জুতা-শিল্প শিখান হয় এবং তাছাড়া মফঃস্বলবাসী যুবকদিগকে হাতে-হাতিয়ারে শিক্ষা দিবার জন্য সরকারী শিল্পবিভাগ হইতে চলন্ত শিক্ষাকেন্দ্র নানাস্থানে স্থাপিত হইতেছে।

—

সমগ্রভারতীয় কংগ্রেস-কমিটির অধিবেশন

আজ ২৯শে কার্ত্তিক, ১৫ই নবেম্বর, দৈনিক কাগজে দেখিলাম, আগামী ডিসেম্বরে সমগ্রভারতীয় কংগ্রেস-কমিটির অধিবেশন হইতে পারে।

—

কৃষি-গবেষণায় বঙ্গে সরকারী ঔদাসীন্য

কৃষিবিষয়ক গবেষণা ও অনুসন্ধানের জন্য ভারত-গবর্ন্মেণ্টের একটি বোর্ড বা "তথ্‌ত" আছে। তাহার নামটা বড় লম্বা—অ্যাডভাইসরি বোর্ড অব্ দি ইম্পীরিয়াল কৌন্সিল অব এগ্রিকালচ্যার্যাল রিসার্চ। কৃষিবিষয়ক অনুসন্ধানের নিমিত্ত এই বোর্ডের নিকট সাহায্যের জন্য আবেদন বোম্বাই হইতে দুইটা এবং ব্রহ্মদেশ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, আসাম ও আগ্রা-অযোধ্যা হইতে একটা করিয়া আবেদন গিয়াছে। বাংলা দেশ হইতে একটাও যায় নাই। ইহা বাংলা-গবর্ন্মেণ্টের কৃষিবিষয়ে আপেক্ষিক ঔদাসীন্যের ফল। কবে দীঘাপাতিয়ার কুমার বসন্তকুমার রায় কৃষি-কলেজ স্থাপনার্থ প্রভূত অর্থ দিয়া গিয়াছেন, তাহা কিন্তু এখনও স্থাপিত হইল না।

—

বাঙালী কন্‌ষ্টেবল ও করিতে পারে না ?

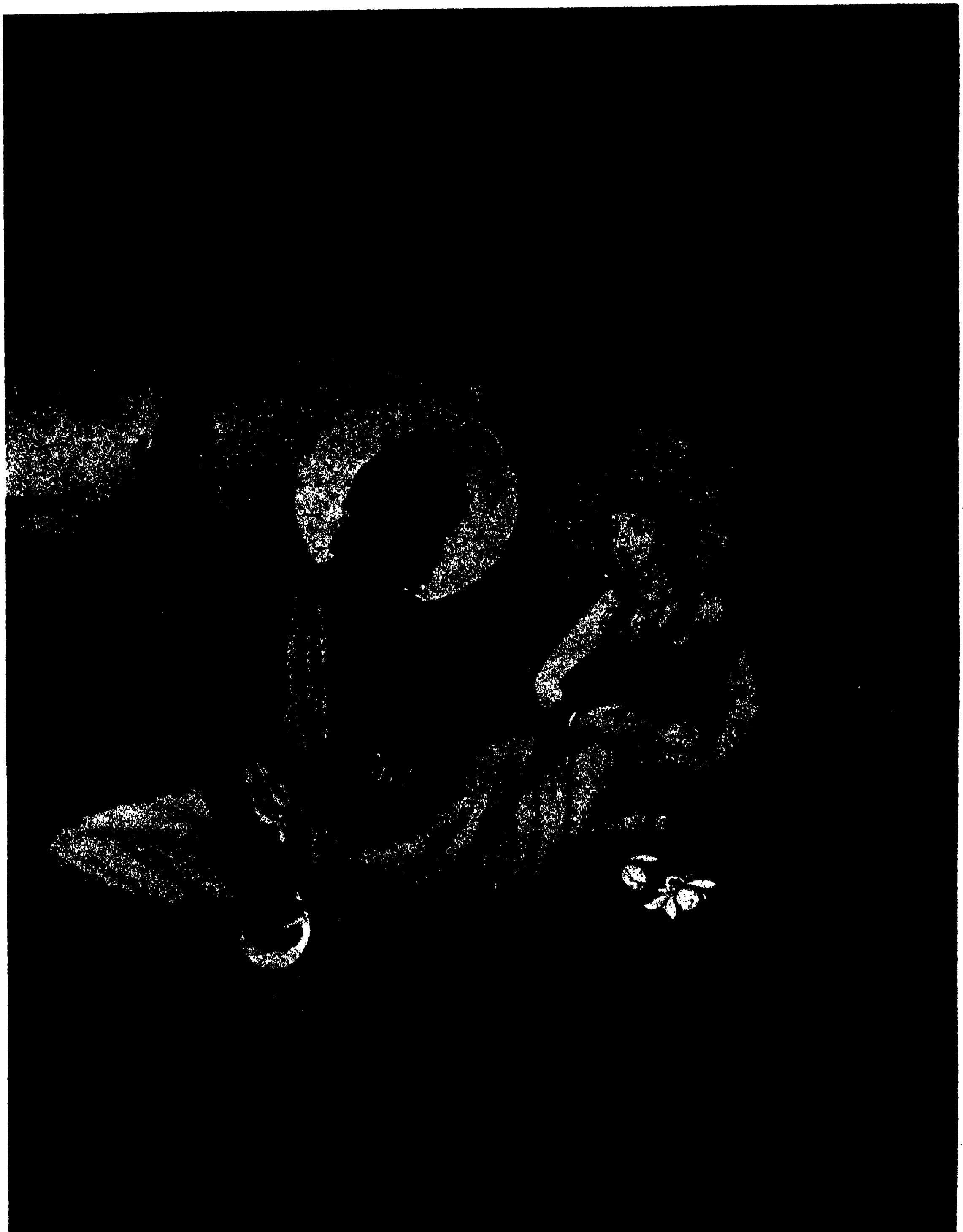
কিছুদিন হইল ৩০ জন লোক পুলিসের কাজে নিযুক্ত হয়। তাহার মধ্যে কেবল ৭ জন বাঙালী। বাংলা দেশে আগে যাহারা সৈনিক হইয়া যুদ্ধ করিয়াছে, সেই বাউরী বাগদী প্রভৃতি বলিষ্ঠ জাতিদের মধ্যে বলিষ্ঠ লোক এখনও আছে, এবং তাহাদের মধ্যে বেকারও অনেক আছে। তাহাদিগকে পুলিসের কাজে নিযুক্ত করা উচিত।

—

ঔদ্ভিদ ঔষধ

ভারতবর্ষে জাত নানা প্রকার উদ্ভিদ হইতে ঔষধ প্রস্তুত হয়। অনেক উদ্ভিদ বিদেশেও রপ্তানী হয়। তাহা উৎপাদনের জন্য পঞ্জাবে ও আগ্রা-অযোধ্যায় কৃষিক্ষেত্র স্থাপনের বন্দোবস্ত হইতেছে। বঙ্গেও হওয়া উচিত। এই সকল উদ্ভিদ বিদেশে রপ্তানী করার ব্যবসায়ে আমাদের আপত্তি নাই—তাহাতে লাভ আছে। কিন্তু বেশী লাভ হয় ঐ সকল উদ্ভিদ হইতে এই দেশেই ঔষধ প্রস্তুত করিলে। তাহা কিয়ৎ পরিমাণে হইতেছেও। ভাল করিয়া করিতে গেলে স্বর্গীয় মেজর বামনদাস বসুর "ইণ্ডিয়ান মেডিসিন্যাল প্ল্যাণ্টস্" নামক গ্রন্থ হইতে জানিয়া লওয়া উচিত, যে, কত শত ভারতীয় গাছগাছড়া ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয় ও হইতে পারে।

১২০।২ আপার সার্কুলার রোড কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীমাণিকচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত



বিষ্ণু ও শ্রী

শ্রীচিন্তামণি কর

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড | পৌষ, ১৩৪০ | ৩য় সংখ্যা

রবীন্দ্র-পরিচয়

কামিনী রায়

বাণীর পূজার দীপ জ্বলে যে যে ঘরে
সেথা এল চিঠি—এস দাও পরিচয়
রবীন্দ্রের। দীপগুলি মৃদু হেসে কয়—
বর্ত্তিকা কি লাগে সূর্য্যে চিনাবার তরে ?
তারি রশ্মি পরিচিত করে চরাচরে,
তাহারি উদয়ে হয় ধরার উদয়।
সাহিত্য-গগনে এই জ্যোতিষ্ক অক্ষয়,
ভারতীর বরপুত্র সত্য নাম ধরে।
তার পরিচয় গাই মেঘে ঝড়ে জলে
লয়ে তার প্রেমদৃষ্টি শুনি তার গীতে
সহসা চমকি উঠি, ধীরে পাতি কান
জানি মোর আপনার গূঢ় অন্তস্তলে
ইহাই বাজিতেছিল মোর অবিদিতে ;
এমনি নিত্যের পাই নূতন সন্ধান।

শতার্দ্ধ বরষ ধরি অকুণ্ঠিত হাতে
বিলাইলে গীতসুধা সন্ধ্যার প্রভাতে ;
ঢালিয়াছ বর্ষা সাথে সঙ্গীতের ধার
শুনিয়াছ তার সাথে বীণার ঝঙ্কার।
বাদলের সাথে তব বেজেছে মাদল,
একতারা পত্র 'পরে টুপ্‌টাপ জল।
গভীর নিশীথে যত শুনায়েছ গান
করিয়াছে সুশীতল কত তপ্ত প্রাণ,
এনে দেছে সুখস্বপ্ন অনিদ্র নয়নে
উষায় জেগেছে সুপ্ত ধূলার শয়নে।
হে বাণীর পুত্র, করি নমস্কার
ধন্য তুমি পেয়েছ যে ভার বিলাবার
জগতে আনন্দ আলো। সত্য কবি তুমি,
তুমি ভারতের রবি, ধন্য জন্মভূমি।

বাঙ্গালী প্রবর্ত্তিত প্রথম বাঙ্গালা সংবাদ-পত্র

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

বাঙ্গালার প্রথম বাঙ্গালা সংবাদ-পত্র কি তাহা লইয়া অনেক দিন ধরিয়া নানা বাদানুবাদ চলিতেছে। 'সমাচার-দর্পণ'ই যে প্রথম বাঙ্গালা সংবাদ-পত্র ইতিপূর্ব্বে আমি তাহাই প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। সমাচার-দর্পণ ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ২৩ মে* শনিবার প্রথম প্রকাশিত হয়।

কাহারও কাহারও ধারণা 'বেঙ্গল গেজেট' নামক একখানি সংবাদ-পত্র 'সমাচার-দর্পণে'র পূর্ব্বে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। গঙ্গাকিশোর বা গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য তাহা বাহির করেন। পাদ্রী লঙ্ ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে সমাচার-দর্পণকে প্রথম সংবাদ-পত্র বলিয়াছিলেন, কিন্তু পরে ১৮৫৫ ও ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে কোন ধাঁধায় পড়িয়া বেঙ্গল গেজেটকে প্রথম সংবাদ-পত্র বলিয়া বর্ণনা করেন। ইনি লেখেন যে, ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে বেঙ্গল গেজেট নামে প্রথম সংবাদ-পত্র বাহির হয়। গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য 'বিদ্যাসুন্দর', 'বেতালপঞ্চবিংশতি' প্রভৃতি পুস্তকের সচিত্র সংস্করণ বেচিয়া বেশ দু-পয়সা করেন। তারপর এই কাগজখানি বাহির করেন। অল্পকালের মধ্যে কাগজখানি উঠিয়া যায়। সম্প্রতি বেঙ্গল গেজেট সম্বন্ধে পুনরালোচনা হইয়াছে।† সেই আলোচনায় পূর্ব্বে পূর্ব্বে প্রকাশিত মতগুলি ছাড়া কয়েকটি নূতন মতের অস্তিত্ব জানা গিয়াছে। তবে বেঙ্গল গেজেটের ফাইলও পাওয়া যায় নাই—উহার সঠিক প্রকাশ-কালও জানিতে পারা যায় নাই।

পাদ্রী লঙ্ গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্যের গ্রন্থের কথা লিখিয়াছেন। বিদ্যাসুন্দর, বেতালপঞ্চবিংশতি বলিয়া তাঁহার কোন গ্রন্থ ছিল না।‡ এগুলি গঙ্গাকিশোরের। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য ১৮১৬ খৃষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার 'গভর্ণমেণ্ট গেজেটে' নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি প্রকাশ করেন :—

> "মেং ফেরিস এন কোম্পানি সাহেবের
> ছাপাখানায় সিত্র প্রকাষ হইবেক
> অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর পুস্তক
> অনেক পণ্ডিতের দ্বারা শোধিয়া শ্রীযুত
> পদ্মলোচন চূড়ামণি ভট্টাচার্য্য মহাস
> য়ের দ্বারা বর্ণ্য শুদ্ধ করিয়া উত্তম বাঙ্গলা
> অক্ষরে ছাপা হইতেছে পুস্তকের প্রতি
> উপক্ষণে এক২ প্রতিমূর্ত্তি থাকিবেক মূল্য
> ৪ টাকা নিরূপণ হইল জাহার লইবার
> ইচ্ছা হয় আপন নাম ছাপাখানায়
> কিম্বা এই আপিসে শ্রীযুত গঙ্গাকিশোর
> ভট্টাচার্য্যের নিকট পাঠাইবেন ইতি—"

তারপর ঐ সালেই তিনি রামচাঁদ রায়ের তৈয়ারী ছয়খানি ব্লক দিয়া অন্নদামঙ্গল নামক গ্রন্থ ফেরিস কোম্পানীর ছাপাখানা হইতে প্রকাশ করেন। ১৮২০ খৃষ্টাব্দের ত্রৈমাসিক 'ফ্রেণ্ড অফ্ ইণ্ডিয়া'র প্রথম সংখ্যায় (পৃ. ১২২-২৩) এই গঙ্গাকিশোর সম্বন্ধে সামান্য একটু বিবরণ বাহির হয়। তাহা হইতে জানা যায়—গঙ্গাকিশোর প্রথমে শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় কাজ করিতেন। তারপর বাঙ্গালা বই ছাপিয়া দু-পয়সা করিবার অভিপ্রায়ে ছাপাখানা করিবার কল্পনা করেন। কিন্তু আগে ছাপাখানা না করিয়া সাধারণের মন বুঝিতে চাহিলেন। যদি বইগুলির কাটতি হয় তাহা হইলে তিনি ছাপাখানা

---

* George Smith তাঁহার "The Life of William Carey" নামক পুস্তকে (পৃ. ২৪৫) লিখিয়াছেন ৩১এ মে। এটি ভুল।

† শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত "বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাস"—সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৩য় সংখ্যা, ১৩৩৮, পৃ. ১৭৮-১৮২।

‡ গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য-প্রকাশিত সকল গ্রন্থ সন্ধান করিয়া একত্র পাই নাই। যে-কয়খানির নাম জানিতে পারিয়াছি নিম্নে লিখিত হইল—অন্নদামঙ্গল, শ্রীভগবদ্গীতা, "গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী সংগ্রহ" [illegible] A Grammar in English and Bengalee [Ferris & Co ১৮১৬] Bengalee Regulations, Reprinted by Ganga Kissore Bhattacharjee, 1820। এ ছাড়া ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের পর যে-সমস্ত গ্রন্থ বেঙ্গল গেজেট প্রেসে ছাপাইয়াছিলেন নিম্নলিখিত একখানি পুস্তকের নাম জানিতে পারিয়াছি—১। শ্রীভগবদ্গীতা—বৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় [বাঙ্গাল গেজেট আফিসে মুদ্রিত ১২২৬]; পরে তিনি প্রেস বহড়া গ্রামে লইয়া যান। ঐ প্রেস হইতে তাঁহার মৃত্যুর পর ছাপা হইয়াছিল—২। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ। প্রকৃতিখণ্ড। ভাষা—রামলোচন দাস কর্ত্তৃক পঞ্চছন্দে বিরচিত; ["গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যমহাশয়ের বাঙ্গাল গেজেট যন্ত্রালয়ে শ্রীহরেন্দ্রসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা শ্রীভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়স্যানুমত্যানুসারে [illegible] বহড়া গ্রামে"]

করিবেন এই ভাবিয়া প্রথমে একেবারে নিজে প্রেস না করিয়া বুদ্ধিমানের মত পরের প্রেসে ছাপাইতে আরম্ভ করিলেন। এক য়ুরোপীয় কোম্পানীর* ছাপাখানায় ছাপিয়া যখন দেখিলেন বেশ বিক্রয় হইতেছে, তখন তিনি নিজে একটি আফিস ও একটি বইয়ের দোকান খুলিলেন। ছয় বৎসর ধরিয়া কলিকাতায় অনেক বই ছাপিলেন। তারপর অংশীদারের সঙ্গে বনীবনাও না হওয়ায় প্রেসটি তিনি দেশে লইয়া যান। সেখান হইতে তিনি বাঙ্গালার শহরে ও গ্রামে লোক পাঠাইয়া বই বিক্রয় করিতে লাগিলেন। এদিকে শ্রীরামপুর ছাপাখানা হইতে প্রথম সাপ্তাহিক পত্র সমাচার-দর্পণ প্রকাশিত হইল। ইহার দুই সপ্তাহ মধ্যে তিনি আর একখানি সাপ্তাহিক বাহির করেন। সত্বরই তাহা উঠিয়া যায়।†

লেখকের উক্তি হইতে বোঝা যায় যে, গঙ্গাকিশোর একখানি বাঙ্গালা সাপ্তাহিকের প্রথম প্রকাশক, আর তাহা সমাচার-দর্পণ প্রকাশের একপক্ষ মধ্যে প্রকাশিত হয়।

১৮৩১ খৃষ্টাব্দের মে-জুন মাসে প্রথম বাঙ্গালা সংবাদ-পত্র সম্বন্ধে বাদানুবাদ বাহির হয়। ১৮৩১ সালের ২৮এ মে তারিখের সমাচার-দর্পণে 'ধর্ম্মদত্ত' এই উপনাম দিয়া এক ব্যক্তি লেখেন যে, সমাচার-দর্পণই প্রথম বাঙ্গালা সংবাদ-পত্র। কিন্তু পর মাসের ৬ তারিখের সমাচার-চন্দ্রিকার অপর এক লেখক তাহার প্রতিবাদ করিয়া লেখেন—

"...৺গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য যিনি প্রথম অন্নদামঙ্গল পুস্তক ছবি সহিত ছাপা করেন তিনি বাঙ্গালা গেজেট নামক এক সমাচারপত্র সর্জ্জন করিয়াছিলেন তাহা নগরে প্রায় সর্ব্বত্র গ্রাহ্য হইয়াছিল কিন্তু ঐ প্রকাশক সাংসারিক কোন বিষয়ে বাধিত হইয়া তাঁহার নিজ ধাম বহড়া গ্রামে গমন করাতে সে পত্র রহিত হয় তৎপরে দর্পণাবতার ঐ লেখক মহাশয়কে দর্শন দিয়াছেন। অতএব এ পদার্থ প্রথমে ব্রাহ্মণ কর্তৃক অনেকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।"‡

এই বাদানুবাদের উত্তরে ডাঃ মার্শম্যান্ বলেন (সমাচার-দর্পণ, ১১ জুন, পৃ. ১৯৮) যে, সমাচার-দর্পণের প্রথম সংখ্যা বাহির হইবার দুই সপ্তাহ পরে বাঙ্গাল গেজেট বাহির হয় 'কদাচ পূর্ব্বে নহে'।‡ ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দের ১৫ই নভেম্বর ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সমাচার-দর্পণে (পৃ. ১৪৪) লেখেন,—

"আমরা অবশ্যই স্বীকার করি সমাচারদর্পণ উপকারক কাগজ এবং এতদ্দেশীয় ভাষায় যে কএক কাগজের সৃষ্টি হইয়াছে এ সকলের অগ্রজ অনুমান হয় ইহার পূর্ব্বে বাঙ্গালা গেজেট নামক এক সমাচারপত্র সর্জ্জন হইয়াছিল বটে কিন্তু অতি শৈশবকালে তাহার কালপ্রাপ্তি হয়। অতএব সমাচারদর্পণ প্রাচীন ও বিবিধ সংবাদপ্রদ।"‡

এ পর্য্যন্ত গৌণ প্রমাণেই এ সম্বন্ধে আলোচনা চলিয়াছে। যখন 'বেঙ্গল গেজেট' বাহির হয় তখনকার কোন বিবরণ আজ পর্য্যন্ত কেহ বাহির করেন নাই। ত্রৈমাসিক 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া'র প্রদত্ত মত সকলের চেয়ে পুরাতন। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সময়ের লোক হইলেও ১৬।১৮ বৎসর পরে তাঁহার স্মৃতির ভুল হওয়া বিচিত্র বা অসম্ভব নয়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বলেন, বিদেশীর প্রযত্নে বাঙ্গালা সমাচার পত্র প্রকাশিত হয় নাই।§ 'বেঙ্গল গেজেট' বাহির হইবার সময় তাঁহার বয়স ৪ কিংবা ৬ বৎসর। বিশেষতঃ ৩৮ বৎসর পরে তিনি যে উক্তি করিয়াছেন তাহাতে দেখা যাইতেছে তিনি প্রকাশকের নামটি পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছেন।

---

* Feris & Co.

† "The first Hindoo who established a press in Calcutta was Baboo-ram, a native of Hindoostan...... ......He was followed by Gunga Kishore, formerly employed in the Serampore Press, who appears to have been the first who conceived the idea of printing works in the current language as a means of acquiring wealth. To asertain the pulse of the Hindoo public, he printed several works at the press of a European, for which heaving obtained a ready sale, he established an office of his own, and opened a book-shop. For more than six years, he continued to print in Calcutta various works in the Bengalee language, he has now removed his press to his native village. He appointed agents in the chief towns and villages in Bengal, from whom his books were purchased with great avidity, and within a fortnight after the publication from the Serampore Press of the Samachar Durpan, the first Native Weekly Journal printed in India, he published another, which has since, we hear, failed—" *Friend of India*, quarterly number, No. 1, p. 122-28.

‡ এই বাদানুবাদের প্রথম উল্লেখ করেন—শ্রীশিবরতন মিত্র। সমাচার-চন্দ্রিকার উত্তরাংশ তিনিই প্রথম উদ্ধৃত করেন (বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবক, পৃ. ১৫৫)। অতঃপর শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সমাচার-দর্পণ' ও 'সমাচার-চন্দ্রিকা'র সম্পূর্ণ বাদানুবাদ উদ্ধৃত করেন। মার্শম্যানের উত্তর ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রথম উদ্ধৃত। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্তিটি সর্ব্বপ্রথম ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্ধৃত করেন।

§ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখিত সংবাদপত্রের ইতিবৃত্তের ইংরেজী অনুবাদ শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম উদ্ধার করেন। ইহা Englishman and Military Chronicle (8 May, 1852)এ প্রকাশিত [illegible] সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা (৩য় সংখ্যা, ১৩৩৮), পৃ. ১৭৯-৮০ দ্রষ্টব্য।

প্রকাশের বৎসর যে ভুলিতে না পারেন তাহাই বা কিরূপে বলা যাইতে পারে ?

এখন এই সমস্ত মতবাদ ছাড়িয়া দিয়া আমরা অন্যদিক দিয়া 'বেঙ্গল গেজেট' সম্বন্ধে কিছু বলিব। মুখ্য প্রমাণ না হইলেও তৎসদৃশ প্রমাণবলে আমরা এই কাগজ সম্বন্ধে নূতন তথ্য দিতে চেষ্টা করিব। 'বেঙ্গল গেজেট' যে বাহির হইয়াছিল সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা কে বাহির করিলেন ? গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য—না, অপর কেহ ?

১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ২৩এ মে 'সমাচার দর্পণ' বাহির হয়। তাহার পর জুলাই মাসের ৯ তারিখে আর একখানি বাঙ্গালা সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশের সংবাদ বাহির হয়। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ৯ই জুলাই তারিখে 'গভর্ণমেণ্ট গেজেটে' একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞাপনটির প্রতিলিপি নিম্নে প্রদান করিলাম—

HURROCHUNDER ROY

Having established a BENGALEE PRINTING PRESS and a WEEKLY BENGAL GAZETTE, which he publishes on Fridays, containing the Translation of Civil Appointments, Government Notifications and Regulations, and such other LOCAL MATTER as are deemed interesting to the Reader, into a plain, concise and correct Bengalee language, and having spared no pains or trouble to render it as interesting as possible, earnestly hopes that in consideration of the heavy expenses which he has incurred, Gentlemen who have a knowledge and proficiency in that language, will be pleased to patronize his undertaking, by becoming subscribers to the BENGAL GAZETTE. No publication of this nature having hitherto been before the Public, HURROCHUNDER ROY trusts that the community in general will encourage and support his exertions in the attempt which he has made, and afford him a small share of their Patronage.

Gentlemen wishing to become Subscribers to this WEEKLY PUBLICATION, will be pleased to send their names to HURROCHUNDER ROY, at his Press, No. 145, Chorebagan Street, where every information will be thankfully received. The Price of Subscription is 2 Rupees per month. Extras included.

Calcutta, Chorebagan Street, No. 145.

এই বিজ্ঞাপন হইতে অনেকগুলি খবর জানিতে পারা যায়। 'বেঙ্গল গেজেট' যে বাহির হইয়াছিল, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। সম্ভবতঃ বিজ্ঞাপন বাহির হইবার এক মাসের মধ্যে 'বেঙ্গল গেজেট' বাহির হইয়া থাকিবে। ১৮২০ সালের 'ফ্রেণ্ড অফ্ ইণ্ডিয়া' বলিয়াছে,—'সমাচার-দর্পণ' বাহির হইবার এক পক্ষের মধ্যে এই সাপ্তাহিক বাহির হইয়াছিল। পাদ্রী মার্শম্যানও তাহা সমর্থন করিয়া দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন, ইহার প্রকাশ সমাচার-দর্পণের 'কদাচ পূর্ব্বে নহে'। তবে ঠিক কোন্ তারিখে বাহির হইয়াছিল তাহা বলিবার মত উপকরণ এখনও আমাদের নাই। গঙ্গাধর বা গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য ইহার প্রকাশক ছিলেন না। পক্ষান্তরে প্রকাশক ছিলেন অপর ব্যক্তি—নাম, "হরচন্দ্র রায়"। বেঙ্গল গেজেট ছিল সাপ্তাহিক—প্রতি শুক্রবারে বাহির হইত। ১৪৫ নং চোরবাগান ষ্ট্রীটে ইহার কার্য্যালয় ছিল এবং এই স্থান হইতেই ইহা মুদ্রিত হইত। এই সাপ্তাহিকের ছাপাখানা হরচন্দ্র রায়ের সম্পত্তি ছিল। বেঙ্গল গেজেটে সরকারী কাজে কর্ম্মচারী বাহালের (Civil Appointment) তর্জ্জমা থাকিত। ইহাতে গভর্ণমেণ্টের বিজ্ঞাপন ও প্রবর্ত্তিত আইনের সংবাদ থাকিত। আর থাকিত পাঠকদের রুচিকর স্থানীয় সংবাদ। এখানির ভাষা সরল বাঙ্গালা। মূল্য ছিল ডাক-খরচ সমেত মাসিক দুই টাকা।

কাগজখানির মুদ্রণ ও প্রকাশস্থান ১৪৫ নং চোরবাগান ষ্ট্রীট। চোরবাগান ষ্ট্রীটের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। এখন চোরবাগান লেন আছে। ষ্ট্রীট লুপ্ত। কিন্তু এ ষ্ট্রীট কোথায় ছিল ? ১৭৯৫-৯৭ সালের আপ্‌জনের মানচিত্রে মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট, নেত্যদালাল ষ্ট্রীট ও মদন দত্ত ষ্ট্রীট আছে। Schlachএর মানচিত্রেও (১৮২৫) মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীটের দক্ষিণে পাওয়া যায় বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট। এই দুইটি রাস্তার মধ্যে একটা রাস্তার চিহ্ন আছে। সেখানে অনেকগুলা বাড়ির নম্বরও আছে। ১৪৫ নম্বরও আছে। যদি এইখানটা ১৪৫ নং চোরবাগান ষ্ট্রীট হয় তাহা হইলে বাঙ্গালীর প্রথম সাপ্তাহিকের এইটিই জন্মস্থান। আর এই জায়গাটা হওয়াও সম্ভব। কেননা, আজও এই জায়গাটাকে লোকে চোরবাগান বলে। মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীটের (পশ্চিমাংশে) শেষের দিকে যেখানে ইহা চীৎপুরের সহিত মিশিয়াছে সেখানে একটি ডাক্তারখানা আছে—নাম চোরবাগান ফার্ম্মেসি, চোরবাগান

ডিস্‌পেন্‌সারি। এখন এই প্রকাশক হরচন্দ্র রায় কে? কাগজপত্রে এইটুকু জানা যায় যে রামমোহন রায়ের আত্মীয় সভার সহিত তাঁহার সম্বন্ধ ছিল। তবে বহু অনুসন্ধানের পর তাঁহার সম্বন্ধে কয়েকটি সংবাদ জানিতে পারিয়াছি। প্রাচীন লোকের মুখে সংবাদ। সত্য হওয়া সম্ভব।—নাও হইতে পারে। তবে ভবিষ্যতে অনুসন্ধানের যদি কোন সুবিধা হয় তজ্জন্য কোন নজীর না থাকিলেও যাহা শুনিয়াছি তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম। হরচন্দ্র রায়ের বাড়ি শ্রীরামপুরে। তিনি কলিকাতায় থাকিবার সময় বহড়ার গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যকে মধ্যে মধ্যে পুস্তক মুদ্রণের জন্য অর্থসাহায্য করিতেন। তাঁহার কাগজ সাড়ে এগার মাস চলিয়া বন্ধ হইয়া যায়। তাঁহার ছাপাখানার নাম ছিল বাঙ্গাল গেজেটি আফিস—প্রেসও বলিত। তখন ছাপাখানাকে অনেকে Printing offices বলিত। কাগজখানি বন্ধ হইয়া গেলে গঙ্গাকিশোর ছাপাখানাটি হরচন্দ্র রায়কে কিঞ্চিৎ রজতখণ্ড দিয়া বহড়ায় লইয়া যান। হরচন্দ্রের পুত্রকন্যা ছিল না। তাঁহার আত্মীয় রামচাঁদ রায়ের পৌত্র শ্রীরামপুরবাসী (অধুনা নবদ্বীপবাসী) শ্রীযুক্ত হরিপ্রসাদ রায়ের নিকট এই সংবাদগুলি সংগৃহীত হইয়াছে।

পুনশ্চ।—আমার প্রবন্ধ লিখিত হইবার পর শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বেঙ্গল গেজেট' সম্বন্ধে আমাকে জানাইয়াছেন :—

'বেঙ্গল গেজেট' সম্বন্ধে যে বিজ্ঞাপনটি প্রবন্ধে উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা ১৮১৮ সনের ৯ই, ২৩এ ও ৩০এ জুলাই তারিখে 'গবর্মেণ্ট গেজেটে' প্রকাশিত হয়। তখন 'বেঙ্গল গেজেট' প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কাগজখানি প্রকাশিত হইবার কয়েক দিন আগেও 'গবর্মেণ্ট গেজেটে' উহার একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়াছিল। বিজ্ঞাপনটি এইরূপ :—

HURROCHUNDER ROY begs leave to inform his Friends, and the Public in general, that he has established a BENGALEE PRINTING PRESS, at No. 45, Chorebagaun Street, where he intends to publish a WEEKLY BENGAL GAZETTE, to comprise the Translation of Civil Appointments, Government Notifications, and such other Local Matter, as may be deemed interesting to the Reader, into a plain, concise, and correct Bengalee Language; to which will be added the Almanack, for the subsequent Months, with the Hindoo Births, Marriages and Deaths.

Advertisement for insertion in this Gazette, will be received at 2 Annas per line. English and Persian, the same Price.

Gentlemen wishing to become Subscribers to this Weekly Publication, will be pleased to send their Names to HURROCHUNDER ROY, at his PRESS, No. 45, Chorebagaun Street, where every information will be thankfully received.

The Price of Subscription is 2 Rupees per Month, Extras included. *Calcutta, 12th May, 1818.*

(*Government Gazette*, 14 May 1818.)

এই বিজ্ঞাপনটি হইতে স্পষ্ট জানা যাইতেছে, ১৮১৮ সনের ১২ই মে তারিখের অল্পদিন পরেই 'বেঙ্গল গেজেট' প্রকাশিত হয়। শ্রীরামপুর হইতে 'সমাচার দর্পণে'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়—এই বৎসরের ২৩এ মে তারিখে। 'বেঙ্গল গেজেট' 'সমাচার দর্পণে'র কয়েক দিন আগে, কি কয়েক দিন পরে প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা এখনও জোর করিয়া বলা যাইতেছে না। তবে 'বেঙ্গল গেজেট' প্রকাশিত হইয়া যাইবার পর হরচন্দ্র রায় যে বিজ্ঞাপন দেন তাহার নিম্নলিখিত পংক্তিটি অনুধাবনযোগ্য :—

"No publication of this nature having hitherto been before the Public...."

যাহা হউক, অনুসন্ধান যখন চলিতেছে তখন শীঘ্রই এ-সম্বন্ধে চরম কথা বলা সম্ভব হইবে।

উপরে গবর্ণমেণ্ট গেজেটের যে-যে সংখ্যার কথা বলা হইল তাহার সকলগুলিরই ফাইল কলিকাতার ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরীতে আছে।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শুভবিবাহ

শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়

বয়সের হিসাবে আরও কিছু দিন কেবল চাকরি করিয়াই কাটাইয়া দেওয়া চলিত। কিন্তু চাকরি করিব—সেভিংস-ব্যাঙ্কের একাউণ্ট খুলিব না এবং বিবাহের কথা উঠিলে আপত্তি করিব, জীবনযাত্রার এই নীতিটিকে আত্মীয়-আত্মীয়াদের কেউ বেশী দিন মুখ বুজিয়া বরদাস্ত করিতে সম্মত হইলেন না। প্রতিবাদের কণ্ঠগুলি ক্ষীণ হইয়াই আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু একদিন সেগুলি সপ্তস্বরার মত কানের দুয়ারে অবিশ্রান্ত আর্ত্তনাদ সুরু করিয়া দিল। এমন কি বিবাহ-বিষয়ে আমার এই ঔদাসীন্য সম্বন্ধে এমন সব ব্যাখ্যা সুরু হইয়া গেল যে অন্ততঃ সেগুলির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার জন্য বিবাহটা সারিয়া ফেলা প্রয়োজন মনে করিলাম। সৌভাগ্যক্রমে ভারতের যে-অংশে জন্ম, তাহাতে বিবাহটা সাধারণ ছেলের পক্ষে একটা দুর্ঘটনা; আমার তবু এখনও বাপ-মা দুই-ই বর্ত্তমান। আমার জন্য না হউক, তাঁহাদের দেখিয়া অনেকেই এখনও পীড়াপীড়ি করিতেছে, সুতরাং মত দিয়া ফেলিলাম। তাঁহারা চিরকাল পৃথিবীতে বসবাস করিবার ফরমান্ লইয়া আসেন নাই এ-কথা আমার জানা ছিল, কিন্তু পিসিমা বলিলেন—অদৃষ্ট নাকি নিজেকেই গড়িতে হয়, বাঁচিয়া আবার কে কাহার জন্য থাকে! যেটুকু সংশয় তখনও ছিল, সংসার ও জীবন সম্বন্ধে পিসিমার এই সারগর্ভ উপদেশ শুনিবার পর ধুইয়া মুছিয়া পরিষ্কার হইয়া গেল।

বিবাহ উপলক্ষ্যে যাহা-কিছু ঘটা প্রয়োজন, ঘটিল সবই। লক্ষ কথা না হইলে বিবাহ হয় না; তেমনি লক্ষ রকম আয়োজনের উৎপাত আছে। সেগুলি একে একে ঘটিতে লাগিল।

উৎসবের দিনে আমরা দূরের এবং নিকটের সকলকে স্মরণ করি। তাই দেখিতে দেখিতে সপ্তাহখানেকের মধ্যে আমাদের প্রকাণ্ড বাড়িটি যেন ধর্ম্মশালার আকার ধারণ করিল। ছোটপিসিমা তাঁর ছয়টি ছেলে এবং দুইটি মেয়ে লইয়া সকলের আগে আসিয়া পৌছিলেন। মেয়ে দুইটিই তাঁর বিবাহিত,—জামাই দুইটিও দুই চারি দিনের মধ্যে আসিয়া পড়িল বলিয়া ইঁহাদের উপস্থিতির হট্টগোল মিলাইতে-না-মিলাইতে—ছোটকাকাবাবু, কাকীমা, এবং তাঁহার দুইটি ছেলেমেয়ে এবং তাহার পর একে একে আরও অনেকের আবির্ভাবে বাড়িটি মুখর হইয়া উঠিল। লৌকিকতা বা সামাজিকতার খাতিরে আমরা সবাই আর একবার স্মরণ করিলাম যে, প্রয়োজনের দোহাই দিয়া আমরা নিজেদের মধ্যে কেমন একটি বিচ্ছেদের পরিখা খনন করিয়াছি। মনে হইল, বাড়িটা এত কাল অত্যন্ত পরিচিত কতকগুলি লোককে কোলে করিয়া কথা খুঁজিয়া না পাওয়ার জন্য চুপ করিয়া ছিল, এইবার নূতন কতকগুলি সাথী পাইয়া সে কলরব করিয়া উঠিয়াছে।

পিসিমার মেয়ে দুইটি—ললিতা আর অজিতা নিজেদের নবলব্ধ আবিষ্কারের আনন্দে দিবারাত্র এঘর-ওঘর করিতেছে। অকারণে দুই বোনে হাসাহাসি করিতেছে, আবার খানিক পরেই অহেতুক কলহ। অজিতার স্বামী নূতন পাস-করা উকীল, ললিতার স্বামী রেল আপিসের বড়দরের কর্ম্মচারী। ললিতা ছোট বোনের স্বামীকে লইয়া ঠাট্টা করিয়া যদি বলিল, সুবলকে এখন কতকাল কেবল গাছতলায় দাঁড়িয়ে কাটাতে হয় দেখিস্! অজিতার ঠোঁট দুটি অমনি ফুলিয়া উঠিল। চোখ লাল করিয়া বলিল, তোর বর একদিন আঠারো টাকা মাইনে পেত জানিস! সাহেবদের পায়ে কত তেল দিয়ে—

ললিতা ছোট বোনের রাগ দেখিয়া মনে মনে হাসে আর মুখে বলে, আমাদের কিন্তু তখন এত দরদ ছিল না। অজিতা কোন-কিছু বলিবার না পাইয়া হঠাৎ বলিয়া বসে—তুই মুখপুড়ী কেন এলি এখানে আমাদের জ্বালাতে?

পিসিমা আসিয়া তাড়াতাড়ি তাহাদের ঝগড়া মিটাইয়া

দেন। তাহাদের দু-জনের মধ্যে বয়সের তফাৎ মাত্র এক বছর।

চাকরি করিতেছিলাম মামার বাড়িতে থাকিয়া; কারণ বাবা বিদেশের বাসিন্দা। কাশী হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ে মোটা মাহিনায় অধ্যাপনা করেন, ছুটি বছরে অনেক, তবু বাংলা দেশে ফিরিবার অবসর তাঁহার হয় না। বিবাহের দিন স্থির করিয়া মামা তাঁহাকে চিঠি দিয়াছেন এবং তিনিও ছুটির জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন শুনিয়াছি। দুই এক-দিনের মধ্যে তিনিও মা এবং ভাইবোনগুলিকে লইয়া আসিয়া পড়িবেন। তখন বাড়ির অবস্থাটা কিরূপ দাঁড়াইবে মনে মনে তাহাই কল্পনা করিয়া বিব্রত বোধ করিতে লাগিলাম। ছোট ভাই মণিকে বছর-দুই দেখি নাই। সেটা এতদিনে দুষ্টুমীতে পাকা হইয়া উঠিয়াছে। সন্ধ্যাবেলায় একবার কোনক্রমে ঘুমাইয়া পড়িলে তাহাকে জাগান অসম্ভব হইত এবং ঘুম হইতে উঠিয়া সে কেমন চোখ বুজিয়া দুধ রুটি খাইত এই সব ভাবিয়া হাসিও আসিতেছিল।

বোনেদের মধ্যে গায়ত্রীই সবচেয়ে বড়। কাশীতে থাকিয়াই বাবা ধূম করিয়া তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন, কিন্তু বছর-দুই পরেই গায়ত্রী বিধবা হয়। কোলে তখন তার পাঁচ মাসের একটি ছেলে। এখন ছেলেটির বয়স ছয় সাত বছর। বাবা কিন্তু গায়ত্রী বা তার ছেলে কাউকেই কাছ ছাড়া করেন নাই। মা তাহার হাতের চুড়ি খুলিয়া থান পরাইতে পারিলেই সুখী হইতেন, কিন্তু বাবা বোধ করি সতের বছরের মেয়ের এই রূপটা কল্পনায় সহ্য করিতে পারেন নাই, তাই গায়ত্রী আজও হাতে একগাছি করিয়া চুড়ি এবং সরুপাড় কাপড় পরে। গায়ত্রী এখানে আসিলে—আমাদের দেশ হইতে যাঁহারা আসিবেন তাঁহাদের মধ্যে নিশ্চয়ই একটা উত্তেজনার সৃষ্টি হইবে।

বিবাহের তিন দিন আগে সবাই আসিয়া পড়িলেন। বাড়ির একটি ঘরও আর খালি নাই—ঘরে ঘরে বিছানা পড়িয়াছে, এক একটি ঘরে পাঁচ-ছয় জনকে স্থান দিয়াও সঙ্কুলান হইতেছে না।

প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় ছাদে জমা করিয়া সতরঞ্চি পড়িতেছে; বাবা, কাকা এবং মামারো সেখানে বৈঠক বসিতেছে। অজিতা, ললিতা, গায়ত্রী ও তার ছেলে একটি ঘরে, আমরা চার ভাই একটি ঘরে, দেশের কতকগুলি দূর-সম্পর্কের আত্মীয়-আত্মীয়া নীচের ঘরগুলিতে এবং মামা মামীরা...সমস্ত মিলিয়া মনে হইতেছে, মানবগোষ্ঠীতে আজ আর কোথাও বিচ্ছেদের পরিখা নাই; নদী ও পাহাড় যাহাদের আড়াল করিয়া রাখিয়াছিল আমার জীবনের একটি ঘটনাকে উপলক্ষ্য করিয়া তাহারা সব কত নিকটে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

গায়ত্রী আসিয়া বলিল,—দাদা সেখানে দিন আর কাটতে চায় না।

হাসিয়া বলিলাম,—বেশ ত, এইখানে চলে আয়।

—এখানে এসেই বা কি সুবিধে হবে? দিনরাত-গুলো কি ছোট হয়ে যাবে নাকি? তার চেয়ে যে ক'দিন এখানে আছি তার মধ্যে যেখানে যত বই পাও সব আমাকে খুঁজে এনে দাও দেখি। কিন্তু দোহাই দাদা, নাটক-নভেল নয়, ওগুলোর সবই এক কথা বলে।

বাংলা দেশের সাহিত্য সম্বন্ধে তাহার রায়টাকে নিঃসংশয়ে স্বীকার করিয়া লইবার মত কাপুরুষ আমি নই; তবু তর্ক না তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, তা হ'লে কি 'সাবিত্রীর ব্রতকথা' আর এই ধরণের বই-ই তোর জন্যে খুঁজতে আরম্ভ ক'রে দেব?

গায়ত্রী কহিল,—ওগুলো তোমার বউয়ের কাজে লাগতে পারে দাদা, খোঁজ করতে লেগে যাও। আমার জন্যে ও-সবও লাগবে না। যে-সব বই পড়লেই ফুরিয়ে যায় না—আমার পক্ষে সেই ভাল।

গায়ত্রীকে আশ্বাস দিলাম, হাঙ্গামা চুকিয়া গেলেই তাহার হুকুম পালনের চেষ্টা করিব।

বিয়ের আগের রাত।

মেয়েদের কণ্ঠে আজ সত্যই কল্লোল জাগিয়াছে। আজ তাহারা ঘুমাইবে না। ভোররাত্রে কি সব অনুষ্ঠান করিতে হয়; তাই ঘুম ভাঙিতে যদি দেরি হইয়া যায় এমন অসাবধান হইবার মত বোকা তাহারা নয়।

রাতটা বোধ হয় শুক্লাচতুর্দশীর। ছাদের ফুলগাছের টবগুলির উপর উগ্র জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িয়াছিল।

ছোট ভাইগুলি ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। [illegible]

[illegible] গুটি পাড়িয়েছে শাড়ির পাড়ে বাজারে ঝুলিতেছে ;—শহরের ইট-কাঠের জঞ্জালের মধ্যে এই বৃক্ষটি যে এত চমৎকার লাগিতে পারে এ-কথা আমার কোন দিন মনে হয় নাই। স্রোতের [illegible] ভুলিয়া ভাঁটুমিতে পা দিতে চলিয়াছি—শুইয়া শুইয়া সেই কথাই ভাবিতেছিলাম। জীবনে নিশ্চয়তার একটি মোহও যেমন আছে, আশঙ্কাও আছে তেমনি।

আজ রাত্রিতে যে-জ্যোৎস্না উঠিয়াছে পাঁচ দিন পরে ইহা যেমন অন্ধকার হইয়া যাইবে, আগামী রাত্রির শুভলগ্নটিকে ভবিষ্যতে একদিন দুঃখে, দারিদ্র্যে এবং সংশয়ে দুর্বহ করিয়া তুলিব কি-না তাই বা আজ বলিব কেমন করিয়া! জীবনের সমস্ত উদ্বেগকে প্রশান্তি দান করিবার জন্য আমরা আবার দুইটি স্নিগ্ধ চোখের স্নেহচ্ছায়ায় আশ্রয় খুঁজি ; তারপর সেই দৃষ্টির জ্বালা পচিয়া পচিয়া কত ঘরে বিষ হইয়া দাঁড়ায় এও ত নিজেই চোখে দেখিয়াছি। আমার মনের আঙিনায় যে-মেয়েটি কাল কুণ্ঠিত আলতা-পরা পায়ে নির্ব্বাক নতনেত্রে আসিয়া দাঁড়াইবে, তাহাকে কেবল যদি আমার সন্তানের জননী হইবার জন্য আসিতে হয়, তবে সে দুষ্কৃতির লজ্জা হইতে তাহাকে ও নিজেকে উদ্ধার করিব কেমন করিয়া ?

পাশের ঘর হইতে কোমল কয়টি নারীকণ্ঠ আমাকে আচ্ছন্ন-তন্দ্রা হইতে জাগাইয়া দিল। অজিতা, ললিতা আর গায়ত্রী—

গায়ত্রী অজিতাকে বলিতেছিল,—তুই আজ সমস্ত দিন এমন মুখ ভার ক'রে বসে আছিস্ কেন বল্ ত ?

অজিতার তরফ হইতে কোন সাড়া পাওয়া গেল না। গায়ত্রী বলিল,—তুই কিছু জানিস না-কি ললিতা ? ললিতা কণ্ঠে সামান্য একটু সহানুভূতি মিশাইয়া বলিল,—ওমা, তুমি কি এইটুকুও বুঝতে পার না বড়দি! সুবল যে এখনও এ বাড়িতে আসে নি।

সুবল অজিতার স্বামী।

গায়ত্রী বলিল,—তাও ত বটে। আমার খেয়ালই ছিল [illegible]। কিন্তু কেন এল না বল ত ?

[illegible] অজিতার কণ্ঠ শোনা গেল, বলিল,—কেন [illegible]।

[illegible]। কহিল,—তোর কাছে সবই চাল। [illegible] গেছে। গায়ত্রী বলিল,—তাই হবে।...তা এতে মন ভার করবার কি আছে ? ফিরে ত কাল, নিশ্চয় সে কাল আসবে।

অজিতা বলিল,—যে মানুষ, না আসতেও পারে। আসবার আগের দিন বলেছিল, বিয়ের দিন একেবারে আমার সঙ্গে যাবে। আমি তাতে রাজী না হওয়াতে কি বল্লে জান ? বল্লে, 'তাহলে তোমার বাপের বাড়িই বড় হ'ল! এই ক'দিন আমি কি করে থাকব তা তুমি ভেবেও দেখলে না।...আচ্ছা, সেই ভাল, আমি তাহলে না গেলেও তোমার কোন দুঃখ হবে না।...বেশ, সেই চেষ্টাই করা যাবে।'

—বলিতে বলিতে অজিতা হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিল। গায়ত্রী বলিল,—তুই একেবারে ছেলেমানুষ অজিতা, ঠাট্টা ক'রে একটা কথা বলেছে, তাইতেই কান্না! দেখিস্ কাল নিশ্চয়ই সে আসবে।

অনুমান করিয়া লইলাম যে, গায়ত্রী অজিতার মাথাটি বুকের কাছে টানিয়া লইয়া তাহার বিস্রস্ত কালো চুলের মধ্যে হাত বুলাইয়া দিতেছে। মিনিট-দুই বোধ করি নিঃশব্দে কাটিয়া গেল। তারপর শুনিলাম গায়ত্রী জিজ্ঞাসা করিতেছে—

—তোদের দু-জনের খুব ভাব, না অজিতা ?

অজিতা সাড়া দিল না, বোধ হয় লজ্জায় গায়ত্রীর আঁচলের মধ্যে মুখ লুকাইল।

ললিতা বলিল,—শুধু ভাব! যেন ওদের আগে আর কোন ছেলেমেয়ের বিয়েই হয় নি। তবু ওই ত চেহারা—

এবার অজিতা চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। বলিল,—বেশ, বেশ, তোরটি তো খুব ভাল, তা হলেই হ'ল। ললিতা কৌতুক করিয়া বলিল,—ভাল হোক, খারাপ হোক, আমি ত তাই ঢাক পিটোতে যাই নি।

অজিতা বলিল,—তুমি পিটোওনি, কিন্তু দেবেনবাবু কসুর করেন নি। যে-দিন এসেচ তার দু-দিন পরেই সংসার ফেলে রেখে হাজির হয়েচেন। আমাদের তবু অতদূর গড়ায় নি।

এমনি কথা-কাটাকাটি তাহাদের বোধ হয় সারা রাত্রি চলিত। হঠাৎ গায়ত্রী বলিল—আচ্ছা, এখন ছেলেমানুষী রেখে দু-জনে একটু চুপ করে শোও দেখি। সকলের কাজ তোমাদের কাল হবে।

তার কণ্ঠস্বরে কেমন একটা অবসাদ ও বিরক্তির সুর [illegible]। চতুর্দ্দশীর জ্যোৎস্না এখনও মিলিয়া [illegible]

বাহিরের ঘরে দেবেনবাবুর ঘুম হইতেছে কি-না ললিতা বুঝি চোখ বুজিয়া তাই ভাবিতেছে। অজিতা বোধ হয় কাল সকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া সুবলের বাড়ি চিঠিসমেত লোক পাঠাইবে। কিন্তু গায়ত্রী কি করিতেছে কে জানে? ছোট ছেলেটিকে সে বোধ হয় বুকের কাছে টানিয়া লইয়াছে, তার কচি আঙুলগুলি নিজের ঠোঁটের উপর চাপিয়া ধরিয়া অপলক দৃষ্টিতে ওপ্যালের মত বিচিত্র আকাশের দিকে চাহিয়া আছে।

লগ্ন রাত্রি আটটায়। কাজেই আমাদের এখান হইতে একটু সকাল-সকাল বাহির হইবার কথা। ভোর হইতে কলরব চরম হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু সন্ধ্যার পর হঠাৎ মেঘ করিয়া আসিল, কোথায় রহিল শ্রাবণ-পূর্ণিমার সমারোহ— মিনিট-কয়েকের মধ্যে বিজয়ী রাজার নগর-প্রবেশের মত ঝম্ ঝম্ শব্দ করিতে করিতে বৃষ্টি আসিয়া পড়িল। ছাদের হোগলার পাড় ছাপাইয়া বৃষ্টির জল উঠানটিকে কর্দ্দমাক্ত করিয়া তুলিল, মাটির ভাঁড় ও গেলাসের ভগ্নাবশেষগুলি ভিজিয়া কেমন একটা গন্ধ বাহির হইতে লাগিল এবং বর্ষণের কলরোলকে ছাপাইয়া পনের-কুড়িটি নারীকণ্ঠ এ-উহার সহিত প্রতিযোগিতা সুরু করিয়া দিল। এবার তাহাদের সাজিবার পালা। আজ বাড়িতে নূতন কোন অতিথির উপস্থিতির সম্ভাবনা নাই, তবু আজ তাহাদের দেহবিন্যাস না করিলে চলিবে না। এ বাড়ির ছেলেদের মধ্যে সবচেয়ে যে বড়, আজ সে বিবাহ করিতে চলিয়াছে।

চুল বাঁধিবার পালা বেলা তিনটা হইতেই সুরু হইয়াছিল। এখন তাহারা একে একে আমার পাশের ঘরটি অধিকার করিল। ঘরের প্রকাণ্ড খাটটি শাড়ীতে, ব্লাউসে বোঝাই হইয়া গিয়াছে, সদ্যস্নাতাদের উপস্থিতির ফলে, সাবানের উগ্র গন্ধে বাহিরের বাতাস পর্য্যন্ত বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে। যে টেবিলটার উপর বড় একটা আয়না রাখা থাকে তাহার উপর জমা হইয়াছে আল্‌তার শিশি, পাউডার, স্নো এবং সেণ্টের রকমারি বাক্স।

আমাদের গ্রামসম্পর্কীয়া এক খুড়ীমা সাদাসিদা একটি দিশী কাপড় পরিয়া বিয়েবাড়িতে ঘোরা-ফেরা করিতেছিলেন, অজিতাদের দল তাঁহাকেও ঘরের মধ্যে ধরিয়া আনিয়াছে। বয়স তাঁর প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি হইবে; পাড়াগাঁয়ের মেয়ে—দুই-তিনটি সন্তানের জননী, সাজগোছ করিতে তাঁহার বিলক্ষণ লজ্জা। তিনি বারংবার আপত্তি করিয়া বলিতেছেন,—ওমা, আমি এই বয়সে রঙীন শাড়ী প'রে বাহার দেব কি লো। তোরা পর, তাই দেখেই আমাদের চোখ জুড়োবে।

কিন্তু অজিতা নাছোড়বান্দা। সুবল আজ সকাল হইতেই এ-বাড়িতে হাজির হইয়াছে; সুতরাং সে ত আজ সাজিবেই এবং খুড়ীমাকেও না সাজাইয়া ছাড়িবে না। সে তার তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে অপর পক্ষের সমস্ত আপত্তি ডুবাইয়া দিয়া বলিল,—তাই আবার কখনও হয় নাকি! আমার ওই খয়ের রঙের বেনারসী-খানা নিয়ে পর। আর হাতে একগাছি ক'রে রুলি দিয়ে থাকাই কি ভাল দেখায় নাকি বাপু। মেজমামী বুড়ো বয়সে তিন সুট চুড়ি হাতে দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে—আমি নীচে গিয়ে এক সুট চেয়ে এনে তোমাকে দিচ্ছি। আর ঐ ড্রয়ারের মধ্যে দু-ছড়া হার আছে। মফ্‌চেন্‌টা আমার জন্যে রেখে দিয়ে বিছে হারটা তুমি গলায় দাও।

কথা শেষ করিয়াই অজিতা দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া নীচে নামিতেছিল। তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—গায়ত্রী কোথায় বল্ ত?

অজিতা একটু ভাবিয়া লইয়া বলিল,—কে বড়দি?...কই অনেকক্ষণ তাকে দেখিনি। বোধ হয় নীচের ঘরে পান সাজছে। কিন্তু তুমি যে এখনও জামা-কাপড় কিছুই পরনি, কপালে চন্দনও পরা হয়নি। এদিকে সাতটা প্রায় বাজে, সে খবর রাখ! কারও যদি এদিকে নজর থাকে! নাও, তুমি চট ক'রে মুখে হাতে সাবান দিয়ে নাও, আমি এখ্‌খুনি ছোটমামীকে চন্দন পরাবার জন্যে নীচে থেকে ডেকে আন্‌চি।

—বলিতে বলিতে সে নীচে নামিতে লাগিল।

বলিলাম,—তোকে আর ছোটমামীকে চন্দন পরাবার জন্যে মেহনৎ ক'রে ডেকে পাঠাতে হবে না। তার চেয়ে তোর বড়দি কোথায় ডেকে দে, সেই ভাল পাববে।

অজিতা সিঁড়ির মাঝখানেই থামিয়া গেল,—তার চোখে বিস্ময় ও বিরক্তি। একটু উপরে উঠিয়া আসিয়া বলিল,—তোমার কি বুদ্ধি-সুদ্ধি দিন-দিন কমছে নাকি মন্টু-দা? ওকে আজকের কোন কাজেই হাত দিতে নেই। তুমি দাঁড়াও আমি ছোটমামীকে এখ্‌খুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

অজিতা নীচে নামিয়া গেল।

আজ এই উৎসব-কলরোলের মাঝখানে গায়ত্রীকে কেন

খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই, সে-কথা এতক্ষণে বুঝিতে পারিলাম। আজ সমস্ত বাড়ির মধ্যে সে অবান্তর। নিজের দুরদৃষ্টের লজ্জা লুকাইবার জন্য সে কোথায় আত্মগোপন করিয়া আছে দেখিবার জন্য অজিতার সঙ্গে নীচে নামিয়া গেলাম।

রান্নাঘরের পাশটিতে ছোট যে-ঘরখানির মধ্যে ভাঁড়ারের সরঞ্জাম জমা থাকে তাহারই মাঝখানে গায়ত্রীর সন্ধান পাওয়া গেল। সামনে পান সাজিবার সরঞ্জাম—সুপারি, লবঙ্গ, এলাচের চারিদিকে ছড়াছড়ি; তাহারই মধ্যে ছোট ছেলেটিকে কোলে করিয়া তন্দ্রাগ্রস্তের মত গায়ত্রী বসিয়া আছে। এদিকে লোকজনের যাতায়াত অল্প, তাই কেউ তার ধ্যান ভাঙে নাই। সবাই মনে করিয়াছে গায়ত্রী এখন মন দিয়া পান সাজিতেছে—কিন্তু দেখিলাম পানগুলি সাজা হয় নাই; বসিয়া বসিয়া সে বোধ করি তার ছেলেটিকে মনের মত করিয়া সাজাইয়াছে। মনের মত করিয়া সাজাইয়াছে বটে, কিন্তু তার মধ্যে একটা অস্বাভাবিক নূতনত্ব ছিল। কোথা হইতে একটি ছোট্ট শাড়ী জোগাড় করিয়া সে তার ছেলেটিকে সাজাইয়াছে, তার চুলগুলির মাঝখানে একটি সিঁথি টানিয়া দিয়া কপালে পরাইয়াছে সিন্দুরের একটি টিপ; নিজের হার দিয়াছে গলায়, পায়ে দিয়াছে তোড়া! যে তারের বালা এককালে তাহার হাতে উঠিত সে দুইটি ছেলের নীচের হাতের পক্ষে অনেক বড়, তাই সেই দুইটি সে খোকার উপর-হাতে জামার উপর পরাইয়া দিয়াছে। পান সাজিয়া একটি বোধ করি সে খোকার মুখে দিয়াছে—ঠোঁট দুইখানি তার রাঙা টুকটুকে হইয়া উঠিয়াছে এবং কোথা হইতে খানিকটা আলতা কিংবা লাল রং সংগ্রহ করিয়া খোকার দুইটি পায়ে পরাইয়া দিতেও সে ভোলে নাই। এই বিচিত্র বেশভূষায় সাজিয়া খোকা যে বিলক্ষণ খুশী হইয়াছে সে-কথা ঘরে পা দিয়াই বুঝিতে পারিলাম; এখন একবার ঘরের বাহিরে গিয়া সকলের সামনে ছুটাছুটি করিয়া আসিতে পারিলে সে বাঁচে। কিন্তু গায়ত্রী তাহাকে কিছুতেই ঘরের বাহিরে যাইতে দিবে না—বোধ করি কেউ যদি তার ছেলের এই বিচিত্র রূপসজ্জা দেখিয়া পরিহাস করে, এই ভয়ে।

আমাকে দেখিয়া গায়ত্রী যেন বিব্রত বোধ করিল; সঙ্কোচের সহিত হাসিয়া কহিল,—কই, তুমি যে এখনও জামা কাপড় পরোনি দাদা! সময় ত বোধ হয় আর বেশী নেই।

—না, কিন্তু তুই বসে বসে ছেলেটাকে নিয়ে করেছিস্ কি?

গায়ত্রী বলিল,—কি আবার এমন! হঠাৎ ইচ্ছে গেল ওকে মেয়ের মত ক'রে সাজাই, সত্যি জান দাদা, খোকা যদি আমার ছেলে না হয়ে মেয়ে হ'ত—

তাহা হইলে গায়ত্রী কি করিত জানি না, কিন্তু আমি তাড়াতাড়ি ঘর হইতে চলিয়া আসিলাম। ব্যাপারটা হয়ত এমন কিছুই নয়, হয়ত অহেতুক একটা খেয়াল; কিন্তু আমার মনের মধ্যে গায়ত্রীর আজিকার আচরণ একটা বিচিত্র ব্যাখ্যা লইয়া হাজির হইল। ইতিপূর্ব্বে সে আমাকে অনেকবার বলিয়াছে—'ভগবান ভাগ্যি আমাকে মেয়ে দেননি' কিন্তু আজ এ-কথা সে বলিল কেমন করিয়া?

সমস্ত বাড়ির মধ্যে যখন উৎসবের হট্টগোল পড়িয়া গিয়াছে, ঘরে ঘরে পড়িয়াছে অঙ্গসজ্জার ধুম, তখন বাড়ির এক প্রান্তে সকলের অগোচরে বসিয়া সে কি আপনার গহন অন্তরশায়ী কোন কামনাকে রূপ দিবার চেষ্টা করিল!

বাহিরে এইবার কর্ম্মকর্ত্তাদের প্রবল চীৎকার সুরু হইয়াছে। বরের গাড়ী আসিয়া পৌঁছিয়াছে, কিন্তু এই প্রবল বৃষ্টির মধ্যে বরানুগমনকারীরা কি করিয়া যাইবে তাহার কোন ব্যবস্থাই না-কি হয় নাই। ছোটমামা বারকয়েক অকারণ ভিতরে-বাহিরে ছুটাছুটি করিয়া বাবার কাছে গিয়া বলিলেন,—তাহ'লে কয়েকখানা ট্যাক্সিই আনতে পাঠিয়ে দিই, কি বলুন?

বাবা বলিলেন,—সে ব্যবস্থা আরও আগেই করা উচিত ছিল। যাক্ গে, এখন কত তাড়াতাড়ি কি করতে পার তারই চেষ্টা কর।

ছোটমামা আর একবার অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া প্রায় ছুটিতে ছুটিতে বাহির হইয়া গেলেন।

মিনিট-কয়েকের মধ্যেই যাত্রার আয়োজন সম্পূর্ণ হইল। শাঁখ বাজিল, হুলুধ্বনি উঠিল।

মেয়েদের প্রসাধন এতক্ষণে সম্পূর্ণ হইয়াছে। কলরব করিতে করিতে নীচে নামিয়া আসিয়া তাহারা আমাকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। পুরাকালে যুদ্ধযাত্রার পূর্ব্বে পুরনারীগণ যেমন সৈনিককে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া প্রশস্তি-

বাক্য উচ্চারণ করিত, ইহারাও তেমনি করিয়া আমাকে কত রকমের উপদেশই না দিতে লাগিল। তাহাদের বিচিত্র বর্ণের শাড়ীর ঔজ্জ্বল্য, অলঙ্কারের ঐশ্বর্য্য এবং সুগন্ধির সুরভি বৃষ্টির কলরোলের মধ্যে মনের ভিতর ইন্দ্রজাল রচনা করিবার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু আমি বোধ করি ইহাদের জন্য ব্যাকুল ছিলাম না। যে-হতভাগিনী আপনার অনিচ্ছাকৃত অপরাধের লজ্জায় ইহাদের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইবার সাহস করে নাই—হয়ত ছাদের উপর হইতে লুকাইয়া তার দাদার এই জয়যাত্রা দেখিতেছে, ঘরের মধ্যে তার যে তন্দ্রা-তদ্‌গত মুখখানি কিছুক্ষণ আগে দেখিয়া আসিয়াছি—সেইটাই বারংবার আমার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিতেছিল।

দ্বারের কাছে আসিয়া গাড়ীতে উঠিবার পূর্ব্বে মাকে তাঁহার দাসী আনিবার আশ্বাস দিয়া গুরুজনদের প্রণাম করিলাম। শঙ্খ আর হুলুধ্বনি বৃষ্টির কলরোলকে ছাপাইয়া উঠিল।

ছোটমামা তাড়াতাড়ি গাড়ীর দরজা খুলিয়া দিয়া বলিলেন,—নে, নে, উঠে বোস্। লগ্নের সময় প্রায় উত্তীর্ণ হ'তে চল্‌ল।

গাড়ীটাকে আগাগোড়া ফুল দিয়া ময়ূরের মত করিয়া সাজান হইয়াছে।

আমাদের জীবনের প্রথম ও শেষ কাব্য রচনার জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠিয়া বসিলাম। মা মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

তাঁহাকে বলিলাম,—গায়ত্রী বোধ করি ছাদে দাঁড়িয়ে ভিজছে। তুমি ওর কাছে যাও। ও নিশ্চয়ই নিজেকে বড্ড একা মনে করচে।

ব্রহ্মাণ্ড কত বড় ?

শ্রীজ্যোতির্ম্ময় ঘোষ

ব্রহ্মাণ্ড কত বড় এ-প্রশ্ন মানুষের মনে উদয় হইলেও ইহার মীমাংসার কোন চেষ্টা বিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বে কখন হয় নাই। কারণ ব্রহ্মাণ্ড যে অসীম এবং অনন্ত এই ধারণাই মানুষের মনে চিরদিন বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে এবং বৈজ্ঞানিকও এমন কোন সূত্র পান নাই যাহার দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের আকার বা আয়তন সম্বন্ধে কোন গবেষণা চলিতে পারে। সুতরাং এ-সম্বন্ধে কোন চিন্তা মনে উঠিলেই আমরা এমন একস্থানে উপনীত হই 'বাচো যথা নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।'

কিন্তু গত কয়েক বৎসর যাবৎ ঠিক এই প্রশ্নই বৈজ্ঞানিকদিগের গবেষণার বিষয়ীভূত হইয়াছে। ইহার প্রথম সূত্রপাত ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে যখন আইন্‌ষ্টাইন্ তাঁহার 'সাধারণ আপেক্ষিক-তত্ত্ব' প্রকাটিত করেন। এই তত্ত্বের ফলে স্থান ও কাল সম্বন্ধে নানা প্রকার নূতন ভাবধারার সৃষ্টি হইল এবং সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের আকার ও আয়তন সম্বন্ধেও নানা প্রকার বিচার ও আলোচনা আরম্ভ হইল।

আইন্‌ষ্টাইনের নবাবিষ্কৃত মাধ্যাকর্ষণতত্ত্বের ফলে জানা গেল, যে-প্রদেশে বা যে-স্থানে কোন জড়পদার্থ বিদ্যমান, তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ ইউক্লিডীয় নহে। অর্থাৎ সে-স্থানে ইউক্লিডের জ্যামিতি খাটিবে না। সাধারণ ভাষায় এরূপ স্থানকে 'বক্রস্থান' বলা যাইতে পারে। এই কারণেই সূর্য্যের চতুর্দ্দিকস্থ স্থান 'বক্র' এবং সেই জন্যই সূর্য্যের নিকটস্থ প্রদেশের ভিতর দিয়া যে-সকল তারকার রশ্মি আমাদের কাছে আসে, সেগুলি ইউক্লিড-অনুমোদিত সরল পথে আসে না। এই অজ্ঞাতপূর্ব্ব ঘটনাটি এডিংটন-প্রমুখ জ্যোতির্বিগণ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ডি. সীটার নামক জনৈক বৈজ্ঞানিক

একটি মত প্রচার করিলেন যে, শুধু জড়পদার্থের নিকটবর্ত্তী স্থানই যে বক্র তাহা নহে, কোন জড়পদার্থ না থাকিলেও শূন্য স্থানও বক্র, অর্থাৎ শূন্য স্থানও এমন নহে যাহাতে ইউক্লিডের জ্যামিতি খাটিবে। ডি. সীটারের এই মত অনেকেই গ্রহণযোগ্য মনে করিলেন এই কারণে যে, এই মতানুসারে আকাশস্থ অতিদূরবর্ত্তী এক শ্রেণীর জ্যোতিষ্কের একটি অদ্ভুত গতির কারণ নির্ণয় করা যায়। এই জ্যোতিষ্কগুলির রীতি এই যে, ইহারা ক্রমাগত পৃথিবী হইতে (অর্থাৎ দর্শক হইতে) দূরে সরিয়া যাইতেছে। এই শ্রেণীর জ্যোতিষ্কগুলির মধ্যে যেটি যত বেশী দূরে, সেটি তত বেশী দ্রুত দৃষ্টিপথ হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছে। এই অদ্ভুত গতির কারণ ইতিপূর্ব্বে নির্ণীত না হওয়ায় এবং ডি. সীটারের মতানুসারে অনেকটা নির্ণীত হওয়ায় ডি. সীটারের মতটি অনেকের নিকট গ্রহণযোগ্য বলিয়াই প্রতীত হইল।

ডি. সীটারের মতানুসারে যখন দেখা গেল যে জড়পদার্থহীন শূন্য স্থানও বক্র, তখন গণিতের নিয়মানুসারে ইহাও প্রমাণিত হইল যে, জড়পদার্থহীন শূন্য ব্রহ্মাণ্ডও আমাদের পুরাতন ও চিরন্তন ধারণানুযায়ী অসীম এবং অনন্ত নয়। ব্যাপারটি কতকটা এইরূপ :—যদি আমরা বক্রতাহীন সমতলভূমিতে কোন একদিকে চলিতে থাকি, তাহা হইলে আমরা অনন্ত কাল ধরিয়া চলিলেও এই সমতলভূমির 'শেষ' বা 'সীমা' পাইব না। কিন্তু যদি একটা বক্রস্থানে (যেমন একটি প্রকাণ্ড গোলকের উপরিস্থিত প্রদেশে) কোন একদিকে চলিতে আরম্ভ করি, তাহা হইলে পুনরায় যেস্থান হইতে যাত্রা করিয়াছিলাম, সেইস্থানেই উপস্থিত হইব। এক্ষেত্রে সমগ্র প্রদেশটিকে অনন্ত বা অসীম বলা চলিবে না। এরূপ ব্রহ্মাণ্ডে কোন একস্থান হইতে একটি আলোকরশ্মি একদিকে বিকীর্ণ হইলে বহুকাল পরে পুনরায় সেইস্থানে ফিরিয়া আসিবে। সুতরাং আমাদের পক্ষে নিজের পৃষ্ঠদেশ সম্মুখে দেখিতে পাওয়াও অসম্ভব হইত না, যদি আমরা বহুকাল (বহু কোটি বৎসর) বাঁচিতে পারিতাম। ব্রহ্মাণ্ড প্রকৃত পক্ষে এইরূপ কি-না তৎসম্বন্ধে নিশ্চয়তা না হইলেও উপরোক্ত কারণবশতঃ ডি. সীটার-কল্পিত জগৎ বৈজ্ঞানিক-গণের আলোচনার বিষয়ীভূত হইল।

ডি. সীটার যেমন সম্পূর্ণ শূন্য একটি জগতের স্বরূপ সম্বন্ধে মত প্রচার করিলেন, তেমনি আইন্‌ষ্টাইন্‌ও একটি স্বরূপের কল্পনা করিলেন। যদি ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জড়পদার্থকে সর্ব্বত্র সমভাবে বিকীর্ণ করা যায় এবং সমস্ত জড়পরমাণুর মধ্যে পরস্পর কোন প্রকার আকর্ষণ-বিকর্ষণাদি শক্তি না থাকে তাহা হইলে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডটি একটি সসীম আকার ধারণ করিবে। এবং সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের আয়তন সমগ্র জড়সমষ্টির উপর নির্ভর করিবে। পরে দেখা গিয়াছে, আইন্‌ষ্টাইন্-কল্পিত এই জগৎ গণিতের নিয়মানুসারে স্থিতিপ্রবণ নহে।

প্রকৃত ব্রহ্মাণ্ডটি কিন্তু ডি. সীটার-কল্পিত জগতের ন্যায় হইতে পারে না। কারণ, আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি, সমগ্র স্থান শূন্য নহে। ইহা আইন্‌ষ্টাইন্-কল্পিত জগতও হইতে পারে না, কারণ ইহার জড়পদার্থ-সমূহ সর্ব্বত্র সমভাবে বিকীর্ণ নয়। আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের প্রকৃত স্বরূপ এই দুই স্বরূপের মাঝামাঝি হওয়াই সম্ভব।

১৯২২ সালে ফ্রীড্‌মান্ নামক বৈজ্ঞানিক আইন্‌ষ্টাইনের মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব সম্বন্ধে একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তাহাতে দেখা যায়, ব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপটি সম্পূর্ণ স্থির এবং অপরিবর্ত্তনীয় নাও হইতে পারে। পাঁচ বৎসর পরে ১৯২৭ সালে লে-মেত্র্ নামক পণ্ডিত পুনরায় ফ্রীড্‌মান-প্রকটিত মতগুলি এবং তৎমতানুসারে জ্যোতিষের কতকগুলি ফলাফল নির্ণয় করিয়া একটি অতি মূল্যবান গবেষণামূলক প্রবন্ধ লেখেন। ইহাতেও দেখা গেল যে, ব্রহ্মাণ্ডটিকে স্থির ও অপরিবর্ত্তনীয় মনে না করিয়া যদি ইহাকে ক্রমবিবর্দ্ধমান মনে করা যায় তাহা হইলেই জ্যোতিষের অনেকগুলি সমস্যার সমাধান হয়। অতিদূরবর্ত্তী এক শ্রেণীর জ্যোতিষ্কের যে অদ্ভুত গতির কথা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহারও কারণ এই মতানুসারে নির্ণীত হইতে পারে। এডিংটন-প্রমুখ কয়েকজন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক এই ক্রমবিবর্দ্ধমান জগতের কল্পনাটি ব্রহ্মাণ্ডের প্রকৃত স্বরূপ বলিয়া বিশ্বাস করেন। তবে এ-সম্বন্ধে স্থির-নিশ্চয়তা অদূর ভবিষ্যতে হইবে বলিয়া মনে হয় না।

উপরি উক্ত ক্রমবিবর্দ্ধমান জগতের পরিকল্পনাপ্রসূত গণনার সাহায্যে ব্রহ্মাণ্ডের আয়তন সম্বন্ধে যেটুকু জ্ঞান বা অনুমান আমাদের পক্ষে সম্ভব, তাহার কিঞ্চিৎ উল্লেখ

করা আবশ্যক। ব্রহ্মাণ্ড গোলকের বর্ত্তমান ব্যাস আনুমানিক ৬২৬৪৫৬৩৩২৮০০০০০০০০০০০০০ মাইল। অর্থাৎ আলোক-রশ্মি প্রতি সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল হিসাবে চলিলে উক্ত দূরত্ব অতিক্রম করিতে ১০৬৮ কোটি বৎসর লাগিবে। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে যে জড়পদার্থ আছে তাহার পরিমাণ সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা এইরূপে হইতে পারে—যদি আমাদের সূর্য্যটিকে একটি সাধারণ তারকা বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে দশ সহস্র কোটি সূর্য্যের সমষ্টিকে একটি তারকাপুঞ্জ বলা যাইতে পারে। এইরূপ দশ সহস্র কোটি তারকাপুঞ্জ একত্র করিলে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের সমান হইতে পারে। যদি বৈজ্ঞানিকগণের পরিকল্পিত ইলেকট্রনকে সমস্ত জড়পদার্থের অবিভাজ্য পরমাণু বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের ইলেক্‌ট্রনের সংখ্যা জানিতে হইলে একের পিঠে উন-আশীটা শূন্য দিতে হইবে। এই গণনাগুলি অভ্রান্ত সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন না হইলেও বৈজ্ঞানিকগণের বর্ত্তমান চিন্তাধারার পরিচয় ও ফল রূপে ইহার মূল্য আছে।

ব্রহ্মদেশে নারীর স্থান

শ্রীসুরুচিবালা রায়

পূবের আকাশের শুকতারাটি নিবিবার আগেই, আশপাশের ফুঙ্গি চাউঙ্গ (আশ্রম)গুলির ঘণ্টাধ্বনিতে গাঢ় ঘুম আমাদের হালকা হইয়া আসে। আশ্রমে আশ্রমে ফুঙ্গিরা তখন জাগিয়া উঠিয়া আশ্রম বালকদের সহিত তাঁহাদের শেষরাত্রির উপাসনা আরম্ভ করেন। সেই সুগম্ভীর এবং সুমধুর জাগরণীর ঘণ্টা কানে যাইতে যাইতেই, গৃহস্থঘরের গৃহলক্ষ্মীরা ধীরে ধীরে শয্যা ছাড়িয়া উঠিতে থাকেন, উপাসনা অন্তে ভিক্ষুরা ভিক্ষায় বাহির হইবেন, সুতরাং ইহারই মধ্যে রান্নার যা-কিছু শেষ করিয়া রাখিতে হইবে; নিদ্রালস চক্ষু দুটি তাঁহাদের আরও একটু বিশ্রাম চাহে, কিন্তু বিলম্বে পাছে ভিক্ষায় দিতে না পারিয়া সে দিনটিই তাঁহাদের ব্যর্থ হইয়া যায়, এ আশঙ্কা বিশ্রামসুখকে তুচ্ছ করিয়া দেয়। রন্ধনশালায় বাতি জ্বালিয়া, চুল্লীতে চুল্লীতে আগুন দিয়া, সেই শেষরাত্রিতেই ভক্তিপরায়ণা ব্রহ্মনারীরা তাঁহাদের দিনের কাজ আরম্ভ করিয়া দেন।

এই যে সেবার আকাঙ্ক্ষা ইহা মাতা-মাতামহীদের নিকট হইতে ক্রমে ক্রমে উত্তরাধিকারীসূত্রেই ইঁহাদের পাওয়া। ভিক্ষুকে ভিক্ষাদানের কাজে দিবসের কার্য্য যাঁহাদের আরম্ভ হয়, স্বামি-পুত্রকন্যার সেবায়, সামাজিক নানা ক্রিয়াকর্ম্মে যোগদানে, এবং আপনার স্বাস্থ্য সৌন্দর্য্য এবং তৃপ্তি সাধনের প্রতিও লক্ষ্য রাখিয়া, সাধারণতঃ আনন্দেই সে দিবস তাঁহাদের হয়, অবশেষে রাত্রিতে শিশুসন্তানগুলিকে শয্যায় শোয়াইয়া উহাদের বোধগম্য কোমল স্তোত্রগুলি মধুর সুরে গাহিতে গাহিতে পাশে শুইয়া মায়েরা বিশ্রামলাভ করেন, কচি কচি শিশুগুলি মায়ের ঘুমপাড়ানী সুরে ঘুমাইয়া পড়ে, অপেক্ষাকৃত বড়রা তাহাদের কচিকণ্ঠের আধো আধো ভাষায় মায়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনার কথাগুলি আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতে করিতে, কখন এক সময় নীরব হইয়া যায়। মাতা তখন হয়ত নিম্ন কণ্ঠে তাঁহার নিজের উপাসনা আরম্ভ করেন, অথবা কখনও কখনও নিকটস্থ কোন গৃহপ্রাঙ্গণে বা মুক্ত জায়গায় যেখানে বসিয়া পাড়ার লোকেরা গল্প গুজব বা হাস্য পরিহাস করিতেছে, সেখানে গিয়া যোগদান করেন।

দুই চারিটি নিতান্তই সাহেবী ভাবাপন্ন পরিবার ব্যতীত, বর্ম্মার মেয়েদের প্রকৃতি প্রায় সকল পরিবারেই এইরূপ। সংসারের প্রতিটি কাজ আপন হস্তে সম্পাদান করিয়া সংসারের বাহিরেও সকল কিছুতেই আপনাকে যুক্ত রাখিয়া বর্ম্মামেয়ে যে বিমল আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন, আমাদের বাংলা দেশে

তেমন আনন্দ হয়ত অতি অল্প মেয়ের ভাগ্যেই জুটিয়া থাকে।

স্বামী পিতা ভ্রাতা বা পুত্রের জন্য, সংসারে যে প্রাণপাত পরিশ্রম এবং সেবায় ইহাদের ভিতর যে একটি মহিমময়ী মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠে, তাহাতে কখনও দাসীত্বভাবটুকু ইহাদের মনের কোণেও জাগিতে পারে না। এই দাসীত্বভাবটুকু নাই বলিয়াই, কার্য্যে বা সংসারের কোন কিছুতে কোন বাধ্যতা বা কঠোরতা নাই বলিয়াই সেবায় এবং কার্য্যে বর্ম্মানারীর এত আনন্দ, এই আনন্দময় ভাবটিই বর্ম্মানারীর জীবনে স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্য্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সংসারটিকে মধুময় করিয়া রাখে। দাসীর ভাবে পুরুষও কখনও ইহাদের প্রতি তাচ্ছিল্য বা অবহেলার ভাব প্রকাশ করেন না, জীবনের প্রতি কাজে, ইহাদের প্রতি একান্তভাবে নির্ভর করিয়া, বর্ম্মার পুরুষও তাই সদানন্দ সুখী। পরস্পরের প্রতি এই একান্তবিশ্বস্ত নির্ভরতা এবং এই পরিপূর্ণ শ্রদ্ধার ভাবটুকু যেখানে থাকে না সেখানেই নিত্য ক্ষমাহীন অসংখ্য অনুযোগ প্রকাশ পাইতে থাকে, সংসার এবং সমাজের পক্ষে, ইহাতে যে অকল্যাণ সাধিত হয়, জাতির মেরুদণ্ড তাহাতে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের দিক দিয়া এই পরাধীন ব্রহ্মদেশ ইউরোপের কোন কোন স্বাধীন দেশের সঙ্গে তুলনায় দাঁড়াইতে পারে। সমগ্র দেশটায় নিরক্ষর অল্পই দৃষ্টিগোচর হয়। অতিক্ষুদ্র গণ্ডগ্রাম যেটি, পাঠশালা বসাইবার সুবিধা হয়ত যেখানে নাই, সেখানেও ফুঙ্গিচাউঙ্গ বা ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম একটি আছেই এবং গ্রামের শিশুসন্তানগুলিকে প্রাথমিক শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মগ্রন্থও কিছু কিছু পড়াইয়া মানুষ করিয়া তুলিবার ভার এইসব আশ্রমের ফুঙ্গিরাই গ্রহণ করেন। এই ফুঙ্গি বা ভিক্ষুরা সংসার সুখ এবং জীবনের সকল কিছু ঐহিক কামনা বিসর্জ্জন দিয়া, নিজের ধর্ম্মালোচনার সঙ্গে সঙ্গে দেশের যে কত বড় হিতসাধন করেন, ভারতবর্ষের অন্য যে-কোন প্রদেশের পক্ষেই তাহা অনুকরণযোগ্য।

মেয়েদের ভিক্ষায় এবং সাধারণের ভক্তির দানেই সাধারণতঃ আশ্রমগুলির ব্যয় নির্ব্বাহ হয়, কোন কোন আশ্রম, কোন কোন বিশিষ্ট ধনী ব্যক্তির দানেও চলে। ধর্ম্ম এবং এই সব ফুঙ্গিচাউঙ্গগুলির রক্ষণ সম্বন্ধে, এই সমগ্র দেশটার যে প্রবল আগ্রহ এবং যত্ন দেখা যায়, তাহাতে বিস্মিত হইতে হয়। গ্রামে বা শহরে যে-সব দরিদ্র পিতামাতা-পুত্র-কন্যার ব্যয়ভার বহন করিতে পারেন না, এই-সব আশ্রমগুলিই সস্নেহে উঁহাদিগকে আশ্রয় দেয়। আশ্রমের ফুঙ্গিদের পাণ্ডিত্যের কথা প্রচার হইলে, দূর দূরান্তর হইতেও বহু শিষ্য আসিয়া, ঐ আশ্রমে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া যায়। আশ্রমের সকল কাজ শিষ্যেরাই সম্পাদন করে, ঘাস জঙ্গল তুলিয়া, রাস্তাঘাট তৈয়ার করিয়া, দূরের বা নিকটের জলাশয় হইতে জল তুলিয়া, ছেলেরা পরম সুখে এসব আশ্রমে বাস করে। দারুণ গ্রীষ্মের দিনে নিকটস্থ পল্লীগুলির মেয়েরা মাথায় করিয়া কলসী কলসী জল আশ্রমে তুলিয়া দিয়া পুণ্যসঞ্চয় করে।

ফুঙ্গিদের আশ্রমের মত পৃথক্ স্থানে ভিক্ষুণীদের আশ্রমও আছে। আগ্রহ এবং উৎসাহ থাকিলে, এই ভিক্ষুণীদের মধ্যেও কেহ কেহ গভীর জ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন। বৎসর তিনেক আগে, ম্যাণ্ডালের কোন ভিক্ষুণী সংঘ হইতে একজন ভিক্ষুণী, বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান লাভ করিয়া, দার্জ্জিলিঙের কোন বৌদ্ধধর্ম্ম শিক্ষালয়ে মহিলাদের অধ্যক্ষ হইয়া গিয়াছেন।

এদেশে যদিও ছেলেমেয়েদের একই সঙ্গে পড়িবার রীতি আছে, তথাপি ফুঙ্গিচাউঙ্গগুলিতে মেয়েদের পড়িবার নিয়ম নাই, ফুঙ্গিরা কখনও মেয়েদের শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন না।

বালক বালিকা উভয়েই একই স্কুলে একই ভাবে অধ্যয়ন করিয়া থাকে, এখনও কনভেণ্ট জাতীয় বিদ্যালয়গুলি ব্যতীত ছেলেমেয়েদের পৃথক স্কুল কোথাও নাই। পূর্ব্বে, মেয়েরা স্কুলে খানিকটা বিদ্যালাভ করিবার পরই, স্কুল ত্যাগ করিয়া গৃহকর্ম্মে মনোযোগ দান করিত, কেবল পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন পিতামাতার কন্যারাই নিয়মিত কাল পর্য্যন্ত স্কুল কলেজে অধ্যয়ন করিয়া, উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিতা হইত, কিন্তু এখন প্রায় সর্ব্বত্রই পিতামাতার অবস্থানুসারে পুত্রের ন্যায় কন্যারাও একই ভাবে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া এবং পুরুষদের সঙ্গে কর্ম্মক্ষেত্রে সমান প্রতিযোগিতায় নামিয়া নিজেদের কর্ম্মদক্ষতার পরিচয় দিতেছে। পোষ্টাপিসের কেরাণী, উকিল, ব্যারিষ্টার, বড় বড় ব্যবসায়ী, মেয়েদের ভিতর আজকাল সর্ব্বদাই দেখা যাইতেছে। রেঙ্গুন হাইকোর্টেও একটি অতি উচ্চপদে একজন বি-এল পাস মহিলা উচ্চ মাহিনায় নিযুক্ত আছেন।

অতি শৈশব হইতেই একই সঙ্গে এবং একই ভাবে,

ছেলেমেয়েরা মানুষ হইতে থাকে বলিয়াই, বর্ম্মী পুরুষ কখনও বর্ম্মানারীকে অবলা ভাবিয়া, তুচ্ছ করিতে সাহস পায় না এবং অন্তঃস্থিত স্বাভাবিক ভাবগুলিকে, সামাজিক বিধানে কৃত্রিম উপায়ে, নষ্ট করিয়া না দেওয়াতে, দৈহিক বলে হউক, বা না হউক, যে সহজাত বীর্য্য এবং আত্মপ্রত্যয় নারীর বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পাইতে থাকে, বর্ম্মী নারী তাহারই উপর নির্ভর করিয়া সর্ব্বদা আপনাকে রক্ষা করিয়া রাখে। অবগুণ্ঠনে যত বিনম্রভাব এবং যত সৌন্দর্য্যই থাক্, লতার ন্যায় একান্ত ভাবে আপনাকে পরনির্ভর করিয়া রাখায়, যত কমনীয়তাই ফুটুক এবং উহা কবির কল্পনা বৃদ্ধির যত সহায়তাই করুক না কেন, ঘরের কোণেই একমাত্র তাহার মূল্য। প্রভাতের যুঁই ফুলটির মত বাহিরের আলো এবং রৌদ্রতাপ সে কোমল শ্রী নারী-প্রকৃতিকে ক্ষতবিক্ষতই করিয়া দেয়। বাংলার নানাদিকে আজ নারীর উপর নানারকম অত্যাচারের দিনে, সে কোমল শান্তশ্রীকে আজ সজ্জার পরিবর্ত্তন করিতে হইবে, অনেকবার ঠেকিয়া ঠেকিয়া বাংলা আজ সে কথা বুঝিতে শিখিয়াছে, বাংলার মেয়েকে তাই এতদিনে একহাতে হাতাবেড়ি ধরিয়া অপর হাতে লাঠিছোরা ধরানোর তুমুল আন্দোলন চলিয়াছে। আপনাকে রক্ষা করিতে হইলে আপনারাই শক্তির প্রয়োজন, বাংলার মেয়েরাও আজ একথা ঠেকিয়াই শিখিতেছেন।

এ দেশে মেয়েদের একাকী পথ চলায় কখনও কোন সঙ্কোচ বা আতঙ্ক দেখা যায় না। প্রভাত হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত কত ফিরিওয়ালী চোখে পড়ে, কত দূর দূরান্তর হইতে একাকী আসিয়া নির্ভয়ে, রাস্তায় ফিরি করিয়া বেড়ায়, গরুর গাড়ী বোঝাই করিয়া, কাঠ, খড় ঘাস ইত্যাদি লইয়া মেয়েরা নিজেরাই গাড়ী চালাইয়া শহরে আসিয়া বিক্রয় করিয়া যায়। সম্ভ্রান্ত ঘরের সুসজ্জিতা মহিলাদের পথ চলায় যে একটা মহিমময় তেজ ও গর্ব্বের সঙ্গে একটি অপূর্ব্ব বিনম্র শ্রী ফুটিয়া থাকে, তাহা দেখিলে মনে সম্ভ্রমেরই সঞ্চার হয়।

প্রতিদিন প্রভাতে, জানালাপথে রাস্তার পানে তাকাইলেই, এই সব শোভনশ্রী মহিলাদের সুন্দর একটি সাজি হাতে করিয়া বাজারের পথে চলিতে দেখা যায়, বাজারে তরকারী বা ফলমূলের পসরা সাজাইয়া যাঁহারা খরিদদারের অপেক্ষা করিতেছেন, তাঁহারাও নারী। তবে গরীব দুঃখীর মেয়েরাই সাধারণতঃ তরকারী ইত্যাদির দোকান করেন, কিন্তু বস্ত্রাদি বা হীরা মুক্তার দোকান কিংবা কোনও সৌখিন বিলাসের সামগ্রীর যাঁহারা দোকান করেন, তাঁহাদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলাদের সংখ্যাও কম নহে। পুরুষ দোকানদার প্রায় নাই-ই, থাকিলেও তাঁহারা মহিলাদের সাহায্যকারী মাত্র। রেঙ্গুন বা ম্যাণ্ডালে বা মৌলমিন, বেসিন ইত্যাদি বড় বড় শহরে, বড় বড় ব্যবসা চালাইয়া অতি সুশৃঙ্খলে নারীরা কাজ চালাইয়া থাকেন। দেখিলে বিস্মিতই হইতে হয় অধিকাংশ স্থলেই পুরুষ ইহাদের অংশীদার এবং সাহায্যকারী মাত্র।

কিন্তু কেবলমাত্র সংসারের বাহিরে কঠোর কর্ম্মস্থলেই যে বর্ম্মী নারীর এইরূপ প্রবল প্রতিপত্তি, তাহা নহে, সংসারের ভিতরে, ইহাদের যে কোমল স্নিগ্ধ মূর্ত্তিটি নিত্য ফুটিয়া উঠে, আত্মীয়-স্বজনের সেবায় অতিথি অভ্যাগতের অভ্যর্থনায়, গৃহপ্রতিষ্ঠিত 'ফায়ার' (বুদ্ধদেব) পূজা অর্চ্চনায় সে মূর্ত্তিটির বিকাশ হয় আরও মধুর রূপে।

অত্যন্ত সংক্ষেপে এবং অতি অল্প সময়ে, ইহারা রান্নাবান্না এবং খাওয়া দাওয়ার কাজ সম্পাদন করেন এবং এই কারণেই ইহাদিগকে কখনও গৃহকোণে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে দেখা যায় না। স্বভাবতঃই আনন্দপরায়ণ বর্ম্মীদের আনন্দ করিবার প্রবৃত্তিটুকু এখনও লুপ্ত হইয়া যায় নাই এবং এই জন্যই কোথাও না কোথাও নিত্য উৎসব ইহাদের লাগিয়াই আছে, গৃহকর্ম্ম সম্পাদন করিয়া বর্ম্মানারী পুত্রকন্যাসহ সুসজ্জিত হইয়া, সর্ব্বদা সে উৎসবে যোগদান করেন। আলোয়, ফুলে পল্লবে ভরা উৎসব রাত্রিগুলি ইহাদের মধুর রূপ এবং সাজ-সজ্জায় সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে।

বর্ম্মানারীর আর একটি বিশেষত্ব অতিথিসেবায়,—যত গরীব গৃহস্থই হউক না কেন, ভাতের হাঁড়িতে অতিরিক্ত দুই-তিন জনের ভাত সর্ব্বদাই ইহাদের রাঁধা থাকে, আহারের সময় হঠাৎ কেহ কোন কাজে আসিয়া উপস্থিত হইয়া পড়িলে না খাইয়া ফিরিয়া সে কিছুতেই যাইতে পারে না, যে কোন তরকারী এবং পরিমাণে যতটুকুই থাক্ না, টেবিলের মাঝখানে তরকারীর বাটিটি রাখিয়া টেবিলের চতুষ্পার্শ্বে বসিয়া স্ত্রীপুরুষ সকলে সেই একই বাটি হইতেই, সামান্য পরিমাণ তরকারী লইয়া লইয়া অত্যন্ত তৃপ্তিতে হাস্যপরিহাসের সহিত আহার সমাপ্ত করে। অভাবের দুঃখে বর্ম্মী নরনারী এখনও জর্জ্জরিত হইয়া পড়ে নাই, নিজে খাইয়া অপরকেও খাওয়াইতে তাই

ইহারা এখনও পারে, ছোট বড় ভেদাভেদের জ্ঞান, এখনও বর্ম্মাদের ভিতর তেমন তীব্রভাবে জন্মে নাই, তাই অতি সামান্য পরিমাণ সম্বল লইয়াও অসংকোচে সকলকেই গৃহে সাদরে আহ্বান করিয়া নিজেও তৃপ্ত হয়, অতিথিকেও তৃপ্ত করিয়া থাকে।

খুব কড়া বাঁধাবাঁধি না থাকিলেও, গৃহস্থসংসারে সামাজিক অনুশাসনগুলি প্রায় সকলেই মানিয়া চলিতে চেষ্টা করে, কাজেকর্ম্মে, উৎসবে এবং নিত্যকার গৃহকর্ম্মে ফুঙ্গিরা যে বিধান দিয়া থাকেন, সকলে অকুণ্ঠিতচিত্তে তাহা মানিয়া চলে। ধর্ম্ম কর্ম্মে এদেশে মেয়েদের যে বিপুল উৎসাহ দেখা যায়, তাহাতে মন মুগ্ধ হয়। বাংলা দেশের মত বারোমাসে তেরটি পরব ইহাদের লাগিয়াই আছে। যে-কোন গৃহে যে-কোন অনুষ্ঠান হয়, প্রতিবেশী ভগিনীরা আসিয়া আনন্দিত মনে তাহাতে যোগদান করেন, ইহার জন্য প্রতি গৃহে গৃহে, আলাদা করিয়া নিমন্ত্রণ করিবার প্রয়োজন হয় না, রাস্তায় রাস্তায় ঘণ্টা বাজাইয়া একজন কেহ, গৃহকর্ত্তা এবং কর্ত্রীর নাম করিয়া, প্রতিবাসী সকলকে, তাঁহাদের সসম্মান আমন্ত্রণ জানাইয়া যায় মাত্র। ইহা ছাড়া কোন ভয়াবহ মহামারী দূরী-করণার্থে বা অন্য কোনও কারণে পল্লীতে পল্লীতে যখন বারোয়ারী উৎসবের অনুষ্ঠান হয়, মেয়েরাই তখন সুন্দর সুসজ্জিত বেশে, কারুকার্য্যশোভিত বড় বড় রৌপ্য পাত্র হাতে লইয়া বাড়ি বাড়ি চাঁদা তুলিয়া বেড়ান।

ধর্ম্মকর্ম্ম স্বামি-স্ত্রী উভয়ে একই সঙ্গে করিয়া থাকেন, বর্ম্মাদের ভিতর অন্যধর্ম্মাবলম্বী খুব কমই দেখা যায়, সম্ভবতঃ অপূর্ব্ব শক্তিশালিনী এবং স্বধর্ম্মপরায়ণা বর্ম্মানারীদের যে আশ্চর্য্য প্রভাব সর্ব্বদা এদেশের পুরুষদের উপর আধিপত্য করিয়া থাকে, তাহাতেই বহুজাতির সহিত অবাধ সংস্পৃষ্টতা সত্ত্বেও এদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম এখনও পূর্ব্বেরই ন্যায় সমান তেজোময়। আমাদের দেশের মেয়েদের মত, কোনরূপ অপূর্ণতা ইহাদের নাই বলিয়াই, এক পরিপূর্ণ প্রবল শক্তির প্রভাবে এ দেশের মেয়েরা, সমাজে নানারূপ কদাচার ব্যভিচার থাকা সত্ত্বেও, জাতিকে সর্ব্বদা ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন।

সমাজের স্বয়ংবর প্রথা এবং কোর্টশিপের পর বিবাহের বিধান থাকিলেও মাঝে মাঝে পিতামাতাও পাত্রপাত্রী মনোনীত করিয়া দিয়া থাকেন, বিবাহের উৎসব কতকটা আমাদের বাংলা দেশের ব্রাহ্মবিবাহ পদ্ধতির অনুরূপ। বিবাহের পর কন্যাদের স্বামীসহ পিত্রালয়ে বাস করাই সামাজিক বিধান, অবশ্য চাকুরি ইত্যাদি উপলক্ষ্যে স্বামীকে বিদেশে যাইতে হইলে, পিত্রালয় ত্যাগ করিয়া পত্নীও স্বামীর অনুগামিনী হইয়া থাকেন। সমাজে বিবাহবিচ্ছেদ এবং বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে। পরস্পরের কোনও দোষ না থাকিলেও কেবলমাত্র উভয়ের ইচ্ছানুসারেই বিবাহবিচ্ছেদ হইতে পারে, সমাজে বিধবা বিবাহের ব্যবস্থা থাকিলেও অনেক মেয়েকেই চিরকুমারী থাকিতেও দেখা যায়, বিবাহের কোন বাধ্যবাধকতা বা সামাজিক নিন্দা নাই। অনেক কুমারী মেয়েই ভিক্ষুণী হইয়া সংসার ত্যাগ করিয়া আশ্রমে চলিয়া যান, আবার কাহাকেও কাহাকেও ভিক্ষুণীর বেশে সংসারের ভিতরে থাকিয়াই ধর্ম্মকর্ম্ম সাধন করিতে দেখা যায়। নিজেদের সকল সম্পত্তি তাঁহারা আশ্রমের কল্যাণে, বা কোন ফায়ার পাশে যাত্রীদের জন্য বিশ্রামাগার নির্ম্মাণ করিতে দান করিয়া নিজেকে সার্থক জ্ঞান করেন।

গৃহকর্ম্মে সংসারের সকল কিছুরই উপর নারীর প্রবল একাধিপত্য সর্ব্বদাই বিদ্যমান থাকে, স্বামীর উপার্জ্জনের পাইপয়সাটিও পত্নী অত্যন্ত কড়াবিধানে হিসাব করিয়া করিয়া স্বয়ং গ্রহণ করেন এবং ইহার পর সংসারের মাসিক ব্যয়, ধার শোধ, দোকানবাকী শোধ এবং অন্য যাহা কিছু, পত্নীই সমস্ত আপনি হিসাব করিয়া সংসারের সুব্যবস্থা করেন।

স্বামি-স্ত্রী উভয়েরই সম্পত্তিতে উভয়েরই তুল্য অধিকার থাকে, সম্পত্তি ক্রয় বিক্রয় বা ধার করা, ধার শোধ করা ইত্যাদিতে মেয়েরাই অগ্রণী থাকেন। পত্নীর স্বাক্ষর ব্যতীত কেবলমাত্র স্বামীকে ঋণদান করিলে মহাজনদিগকে ঠকিতেই হয়। স্বামীর মৃত্যুর পর উভয়ের সমস্ত সম্পত্তিরই অধিকারী পত্নীই হইয়া থাকেন। পুত্রকন্যার তখন সম্পত্তিতে কোনও অধিকারই থাকে না। অবশ্য বিধবা হওয়ার পর তিনি পুনরায় বিবাহ করিবার ইচ্ছা করিলে, পূর্ব্বেই সমস্ত সম্পত্তি পুত্রকন্যাদিগকে ভাগ করিয়া দিয়া থাকেন। সম্পত্তি বণ্টন করিবার কালে, পুত্র বা কন্যা বলিয়া কোন তোলাভেদই থাকে না, কন্যারাও পুত্রদেরই মত সমান অংশই পাইয়া থাকে।

আমাদের দেশে পোষ্যকন্যা গ্রহণ করিবার রীতি নাই, কিন্তু এদেশে পোষ্যকন্যা এবং পোষ্যপুত্র দুই-ই গ্রহণ করা হইয়া থাকে এবং এই নিয়ম থাকাতে গরীব দুঃখীর মেয়েদের নিরাশ্রয় হইয়া পথে ভাসিতে হয় না। ধনী আত্মীয়-স্বজনেরা প্রায়ই উহাদিগকে পোষ্যকন্যা রূপে গ্রহণ করিয়া সযত্নে লালন পালন করিয়া থাকেন।

অবশ্য বর্ম্মামেয়েদের পথে ভাসিতেও হয় না। অতি শৈশব হইতেই এমনই দৃঢ় উপাদানে মন ইহাদের গঠিত হইয়া থাকে যে, নিরাশ্রয় হইলেও বারো তেরো বছরের মেয়েটিও ফিরি করিয়াই হোক বা অন্য যে-কোন উপায়েই হোক, নিজের জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া চলিতে পারে, গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য পরপ্রত্যাশী ইহাদিগকে কখনও হইতে হয় না।

কত গরিব-দুঃখীর ঘরেও দেখিয়াছি, পিতৃমাতৃহীন হইলে অথবা স্বামী মারা গেলেও মেয়েরা নিরুপায় হইয়া হতাশ হইয়া পড়েন নাই, চোখের জল মুছাইয়া মনটিকে শক্ত করিয়া লইয়া ভবিষ্যতের ব্যবস্থার জন্য উঠিয়া বসিয়াছেন। আমাদের দেশের মত পুত্রকন্যাসহ পরের গলগ্রহ হইয়া, নিজের এবং সন্তানদের জীবনগুলিকে ইহাদের দুর্ব্বহ করিয়া তুলিতে হয় না।

হাসপাতালের কমিটির সদস্যরূপে, জেলের বেসরকারী পরিদর্শকরূপে বর্ম্মানারীরা সর্ব্বদা দেশের একটা মহৎ কাজে সাহায্য করিয়া আসিতেছেন। মাতৃরূপিণী, কল্যাণময়ী এই নারীদের সর্ব্বদা চোখের সম্মুখে দেখিয়া দেখিয়া জেলের দুর্দ্দান্ত কয়েদী বা হাসপাতালের বীভৎসতার ভিতর জীবনে হতাশ ক্লান্ত রোগীদের মনে যে কিরূপ আনন্দ ও আশার সঞ্চার হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়।

প্রকৃতপক্ষে নারী এবং পুরুষ উভয়ের মিলিত শক্তিতেই ব্রহ্মদেশের সুখ স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্য্য আজিও প্রায় অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। তুচ্ছ না করিলে নারীর শক্তিও যে অপরাজেয় হইতে পারে এবং সসম্মানে নির্ভর করিয়া থাকিলে, এই অপরাজেয় শক্তিই যে গৃহে এবং বাহিরে সর্ব্বত্র কল্যাণ সাধন করিতে পারে, ব্রহ্মদেশের নারীদের দেখিলে, এই কথাটি বেশ ভাল রকমেই বুঝিতে পারা যায়।

ছবির মালিক

শ্রীসুনীলচন্দ্র সরকার, এম-এ

এতকাল মেসে মেসে 'টু-সীটেড্' এমন কি 'থ্রি-সীটেড্' ঘরে থেকে বিরক্তি ধরে গেছে। অগুনতি লোকের সঙ্গে দিনরাত মেলামেশা ক'রে সাম্যজ্ঞান হওয়া দূরে থাক্—ঘোরতর অসাম্যবাদী হয়ে উঠেছি। লোক দেখলে গা জ্বলে যায়, নিরীহ ভদ্রলোকেরা কোনও কিছু জিজ্ঞাসা করতে এলে অকারণে রূঢ় হয়ে উঠি—মাঝে মাঝে কয়েকজন গায়ে-পড়ে আলাপ-জমানে লোককে উত্তম-মধ্যম দেবার আকাঙ্ক্ষা অতি কষ্টে দমন করেছি। বন্ধুরা চিন্তিতমুখে বললে, ব্যাপার কি রে, তোর হ'ল কি? বিনা কারণে এমন নিদারুণ একটা 'মিস্-অ্যানথ্রোপ্' হয়ে উঠলি কেন?

কিছুকাল গম্ভীর হ'য়ে থেকে মনের কথা ভেঙে বললুম—ভাই, নির্জ্জনতা চাই। এই বাজারের মধ্যে আর থাকতে পারি না, ভেতরটা একদম চাপা পড়ে যাচ্ছে—শুধু বাইরের নাড়াচাড়ায় ক্ষেপে যাবার উপক্রম হয়েছে। পারিস তো কোথাও খুব নির্জ্জনে একটা 'সিংগল্-সীটেড রুম্' জোগাড় করে দে—আর তা নইলে আর আমার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে আসিস্‌নি।

জনৈক বন্ধু বললেন,—একটা ঘরে একলা থাকতে চাস্? কত ভাড়া দিবি?

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললুম,—দশটাকার বেশী তো পারব না।

বন্ধুবর্গ কৌতুক-হাস্তে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলো। বললে,—না, না, ঠাট্টা নয়, সত্যি কত দিতে পারবি বল্—তাহ'লে নয় ক্যাল্‌কাটা হোটেলে, কিংবা—

ম্লানমুখে জানালুম, সত্যি ওর চেয়ে বেশী দিতে পারব না।

নিতাই আমার পিঠে মৃদু আঘাত করে বললে,—বেশ, বেশ, একেবারে অত মুষড়ে পড়ছিস্ কেন? ঐ দশ টাকাতেই তুই যেমন ঘর চাইছিস্ পাবি।

এর পর প্রায় সপ্তাহখানেক কেটে গেল। বন্ধুরা সম্ভবতঃ কথাটা ভুলেই গেছে। এদিকে রাগের মাথায় মেসের ম্যানেজারকে নানাবিধ 'ইডিয়মেটিক্' গালাগালি দিয়ে ফেলে নিজের অবস্থা সঙ্গীন করে তুলেছি। দুঃসহ বিরক্তিতে কেন যে এখনও আত্মহত্যা ক'রে বসছি না তাই ভেবে আশ্চর্য্য হচ্ছি এবং ঘরের মধ্যে যে কোনও মুহূর্ত্তে একলা হলেই হাতের মাংসপেশীগুলো ফুলিয়ে মুষ্টি উদ্যত ক'রে চীৎকার ক'রে উঠছি—

দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর,
লহ তব লৌহ, লোষ্ট্র, কাষ্ঠ ও প্রস্তর,
হে নব সভ্যতা।

কবিতার মধ্যে ঐ কথাগুলো—ঐ যে, 'লৌহ, লোষ্ট্র, কাষ্ঠ ও প্রস্তর'—চিবিয়ে চিবিয়ে এমন বিচ্ছিরি ক'রে উচ্চারণ করছি, যে তা'তে রাগ আরও হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে! কখন কি যে ক'রে বসি তার কিছুই ঠিক্ নেই।

এমন সময়ে গ্রীষ্মের আকাশে প্রথম মেঘাগমের মত বন্ধু নিতাই সুখবর নিয়ে উপস্থিত হ'ল। কল্‌কাতার অতি নির্জ্জন পল্লীতে তেতলার ওপর একখানি ঘর—সামনে প্রকাণ্ড ছাদ—আবার সেই ছাদের গা ঘেঁষে উঠেছে একটা প্রকাণ্ড অশথ গাছ। নিতাই যেদিন আমার বি-এ পাস করার খবর টেলিগ্রাম ক'রে জানিয়েছিল সেদিনও বোধ হয় এত আনন্দ হয়নি। সম্পূর্ণ ঘরটি—অবশ্য ঘরটাকে বিশেষ বড় বলা যায় না—একেবারে আমার—আর ভাড়ার কথা শুনলে আশ্চর্য্য হ'য়ে যাবেন, মাত্র ন'টি টাকা!

মহাসমারোহে ঘরে এসে উঠলুম। তক্তপোষ, একখান চেয়ার, একটা ছোট টেবিল, এবং আমার অর্গ্যান্‌টা ঘরের মধ্যে রাখতে ঘরের 'স্পেস্' যেন একটু কম বলে বোধ হ'তে লাগল। ঘর-সাজানো সম্বন্ধে আমার আবার কতকগুলো অদ্ভুত ধারণা আছে। কতকগুলো চকচকে আসবাবপত্র ঘরে পুরে দিলেই ঘর সাজানো হয় না। ঘরের সমস্ত সৌন্দর্য্য নির্ভর করে তার স্পেস্ বা ফাঁকা জায়গার ওপর। এই শূন্যতাটুকুই ঘরের প্রত্যেক জিনিষটিকে ফুটিয়ে তুলবে, তাদের মধ্যে একটা স্বাতন্ত্র্যের সৃষ্টি করবে। এই মনে করুন, দেয়ালে একরাশ রং-চঙে ছবি টাঙিয়ে রাখা চরম অসভ্যতার নিদর্শন। দেয়ালটা সস্তা কমার্সিয়াল আর্টের অত্যাচার প্রয়োগ করবার ক্ষেত্র নয়—ওকে কতকগুলো চমকপ্রদ রঙের সমষ্টিতে সং সাজালে চলবে কেন? ওকে একান্ত বিশিষ্টতা-বর্জ্জিত ভাবে নির্লিপ্ত হয়ে থাকতে দাও—যাতে ওর নিছক সাদার ওপর মন আপন খুশীতে কল্পনার আল্‌পনা এঁকে যেতে পারে। অবশ্য ছবি যে টাঙানো একেবারে বারণ, তা নয়। কিন্তু দু-একটা—বিশেষভাবে বাছাই-করা ছবি—যে ছবি জোর করে লোকের চোখ আকর্ষণ করে না, যে ছবির মধ্যে উত্তেজনার চেয়ে প্রসার বেশী বর্ণনার চেয়ে বিরতি বেশী—সেই ধরণের ছবি। নয় ত এমন কারুর ছবি—যা দেখে দেখে, ভেবে ভেবে, মনের আর শ্রান্তি নেই, অবসাদ নেই—

যাক্—এ বিষয় নিয়ে একটা আলাদা প্রবন্ধই লিখে ফেল্‌ব স্থির করেছি; কাজেই আসল গল্পটা আরম্ভ করা যাক্।

নূতন মেসে এই সিংগল্-সীটেড রুম্‌টিতে আসবার প্রায় এক সপ্তাহ বাদে প্রফুল্ল এসে হাজির। খুব ভাল ফটো তুলতে পারে ব'লে তার খ্যাতি আছে, একটা বাঙালী সিনেমা কোম্পানীর সে ক্যামেরাম্যান্। ওর সঙ্গে আমার শুধু বন্ধুত্ব নয়, সামান্য একটু আত্মীয়তাও আছে। বয়সে আমার চেয়ে একটু ছোট—তাই আমার নামের সঙ্গে 'দা' যোগ ক'রে ডাকে। আমি জানতুম, ও বাংলার বাইরে কোথায় সুটিংএ গেছে। হঠাৎ ওকে দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম। জিজ্ঞাসা করলুম—কি রে, তুই হঠাৎ কোথা থেকে এলি? তোর হাতে কাগজে-মোড়া ওটা কি?

প্রফুল্ল চিরকাল নিজেকে একটু রহস্যময় ক'রে তুলতে ভালবাসে। কিছু না ব'লে খুলে দেখালে—একটি মেয়ের একখানা বাষ্ট্ ফটোগ্রাফ—ফিতের মত সরু বর্ডার দিয়ে বাঁধানো, মেয়েটির বয়স আঠার-উনিশ হবে।

দেখতে ভালই, চোখ দুটি বেশ বড় বড়। কৌতূহল হ'ল, জিজ্ঞাসা করলুম, কার ছবি রে?

প্রফুল্ল গম্ভীর হয়ে বললে,—সে তুমি চিনবে না—

এ অবস্থায় প্রফুল্লকে জব্দ করবার একমাত্র উপায় যা জানা ছিল অবলম্বন করলুম। ছবিটা নির্লিপ্তভাবে কাগজে প্যাক করতে লাগলুম। মুহূর্ত্তে প্রফুল্লর গাম্ভীর্য্য খসে গেল—মুখটা হাসি হাসি ক'রে বললে,—দেওঘরে একটি মেয়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, তার ছবি। তারাও কলকাতায় ফিরে এসেছে, তাদের কলকাতার ঠিকানায় ছবিটা দিয়ে আসতে হবে। বাঁধান কেমন হয়েছে বল ত?

ছবিটা আবার বার করলুম। খুব নিরীক্ষণ ক'রে দেখতে লাগলুম—বাঁধানোর কৌশল নয়, মেয়েটিকে। খানিক-ক্ষণ পরে ভুরু কুঁচকে গম্ভীরভাবে বললুম, হ্যাঁ, বাঁধানো মন্দ হয় নি। কোথা থেকে করালি?

গর্ব্বের হাসি হেসে প্রফুল্ল বললে, আমি নিজের হাতে বাঁধিয়েছি। নীচের দিকে বেশী চওড়া কার্ডবোর্ড দেওয়ায় কি অদ্ভুত দেখাচ্ছে বল ত?

বাস্তবিকই ভাল দেখাচ্ছে, কিন্তু তার প্রধান কারণ এই যে, মেয়েটি সুন্দর। প্রফুল্লকে উদাসীন ভাবে জিজ্ঞাসা করলুম, মেয়েটির নাম কি?

'ছবিরাণী দত্ত—ছবিতে যা উঠেছে তার চেয়ে ঢের বেশী সুন্দর দেখতে'—ব'লে প্রফুল্ল অর্গ্যানে বিলম্বিত কয়েকটা 'কর্ড' বাজাবার চেষ্টা করতে লাগল।

বিরক্ত হয়ে বললুম,—কি প্যাঁ প্যাঁ করছিস, শোন্ না—ওরা কলকাতার কোথায় থাকে?

প্রফুল্ল হো হো ক'রে হেসে উঠল—কেন, সে খবরে তোমার দরকার কি?

ছবিটা আলগা ভাবে ধরেছিলুম, ওর হাসির আওয়াজে চমকে উঠে—কি হ'ল আন্দাজ করুন তো—ছবিটা গেল হাত থেকে পড়ে। ব্যস্ত হয়ে তুলে নিয়ে দেখি কাচটা নীচের দিকে অর্থাৎ যে দিকে চওড়া কার্ডবোর্ড দেওয়া আছে সেই দিকটায়—এধার থেকে ওধার পর্য্যন্ত ফেটে গিয়েছে। মহা অপ্রস্তুত হয়ে পড়লুম। প্রফুল্ল আশ্বাস দিয়ে বললে, যাক্ গে—আর একখানা নতুন কাচ লাগিয়ে দিলেই হবে। তবে এখন আর ছবিটা দেওয়া যাবে না। ছবিটা এখন এখানেই থাক্; আমাকে আজ রাত্তেই আবার দেওঘর যেতে হবে—

বললুম,—তোরি দোষ; যে জোরে হেসে উঠলি! এখন লোকদের কাছে কথার খেলাপ হ'ল তো?

—তা হবে কেন, ওদের কাছে তো আমি 'প্রমিস' করিনি যে এতদিনের মধ্যে দেব। যাক্ গে, যদি 'রোমান্স' করবার ইচ্ছে থাকে তো ঠিকানাটা জেনে রাখ—১২নং শ্যাম ঘোষের ষ্ট্রীট। এটর্ণি বাবু অবনীভূষণ দত্তের বাড়ি—বলতে বলতে প্রফুল্ল বেরিয়ে গেল।

ছবিটা টেবিলের ওপর উল্টে রেখে দিলুম।

এমন সময়ে বন্ধু শৈলেনের প্রবেশ;—বাঃ, বেশ ঘরটি পেয়েছিস তো!

আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বললুম,—দশ টাকায় ঘর পাওয়ার কথায় না হেসে উঠেছিলি? কেমন রে, কি বলিস?—'বলিস'-এর দন্ত্য 'স'টা একেবারে ইংরেজী S এর মত উচ্চারণ ক'রে দিলুম।

শৈলেন খুঁত ধরবার জন্যে চারদিকে চাইতে লাগল। থেকে থেকে ব'লে উঠল, তোর যেমন! ঘরসাজানো সম্বন্ধে কোন 'আইডিয়া' নেই—

শোন একবার কথা! ঘর সাজানো সম্বন্ধে আমার কোনও 'আইডিয়া' নেই! তাহলে পৃথিবীর মধ্যে কার আছে তাই জানতে চাই। শ্লেষের স্বরে জিজ্ঞাসা করলুম,—কেন, 'আইডিয়ার' অভাবটা কি দেখলি?

—বড় বড় দেওয়ালগুলো ফাঁকা পড়ে রয়েছে, লোকে অন্ততঃ একটা ক্যালেণ্ডারও ঝুলিয়ে দেয়।

হেসে বললুম,—ওইটিই আমি পারব না, ক্যালেণ্ডার টাঙানো আমার দ্বারা হবে না। দেওয়ালে থাকবে মাত্র একখানা ছবি যা—

শৈলেন বাধা দিয়ে ব'লে উঠল,—থাক থাক, ঢের হয়েছে। ছবি সম্বন্ধে আর 'লেকচার শোনবার আগ্রহ নেই। মুখে রাজা উজীর না মেরে সেই একখানি ছবি এনে টাঙিয়ে ফেললেই বন্ধুমানুষরা বেশী খুশী হবে।

আগের মুহূর্ত্তে কিছু ভাবিনি; হঠাৎ মাথায় বুদ্ধি এসে গেল। গম্ভীরভাবে উঠে টেবিলের ওপর উল্টে রাখা ছবিখানা নিয়ে দেওয়ালের একটা হুকে টাঙিয়ে দিলুম। মুহূর্ত্ত

পারলুম যে, শৈলেন অবাক হয়ে একবার ছবির দিকে আর একবার আমার মুখের দিকে চাইছে। কিন্তু সেদিকে যেন খেয়ালই নেই এমন ভাবে চেয়ারে ব'সে একটা চুরুট ধরিয়ে ফেললুম।

খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে শৈলেন আর আগ্রহ দমন করতে পারলে না। জিজ্ঞাসা করে ফেললে,—কার ফোটো রে?

চুরুটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে নির্লিপ্ত ভাবে বললুম,—মানিয়েছে কি না আগে তাই বল।

—সুন্দর মানিয়েছে—কিন্তু কে?

এমনভাবে ভুরুটা কুঁচকে চুপ ক'রে রইলুম যে, শৈলেন বেশ অপ্রতিভ হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি বললে,—বলতে যদি কোনো আপত্তি থাকে, তাহলে অবিশ্যি—

খুব মোলায়েম গলায় বললুম, না, আপত্তি আর কি? কিন্তু তখনও কিছু না ব'লে চুপ করে রইলুম। কি বলব তখন মনে মনে গুছিয়ে নিচ্ছি।

অবশেষে খুব অর্থপূর্ণ একটু হেসে বললুম, যখন না শুনে ছাড়বি না। এখন শুধু ছবিটা দেখছিস, আসছে অঘ্রাণ মাসে মেয়েটির সঙ্গে তোর পরিচয়ও হবে।

বলিস্ কি রে?—বলেই হঠাৎ শৈলেনের উৎসাহ কমে এল। একটু হেসে বললে, ও, ঠাট্টা হচ্ছে।

গম্ভীরভাবে বললুম,—তুমি অবিশ্যি তা ভাবতে পার আমার কোনও আপত্তি নেই।

শৈলেন হাসিমুখে বললে,—ও নিশ্চয় তোর কেউ আত্মীয়া—

আমি একটু বিরক্তির স্বরে বললুম,—হাঁ, আত্মীয়া না হ'লে আর এ ধরণের ঠাট্টা কাকে নিয়ে করব বল!

শৈলেন ভড়কে গেল। বললে,—তা এ খবর আমাদের দিস্‌নি কেন?

—আগে তো ঠিক ছিল না ভাই। আজই ঠিক্ হ'ল; তাই ত ছবিটা নিয়ে আসতে পারলুম, নইলে কি চাইতে সাহস করতুম?

মাঝে মাঝে আমার মাথায় এমনি দুষ্টুমির ভূত চাপে। শৈলেনকে একটা আস্ত উপন্যাস বানিয়ে বললুম। প্রায় এক বছর আগে শ্যাম ঘোষ ষ্ট্রীটের মোড়ে ছবিরাণীর সঙ্গে আমার দেখা। স্কুলের বাসের জন্যে সে দাঁড়িয়ে আছে। এমন সময় ভয়ানক বৃষ্টি। আমি ছাতিটা দিলুম অর্থাৎ দিতে চাইলুম, এবং ওরই কথায় শেষ পর্য্যন্ত ছাতির মধ্যে ওকে নিলুম। ও হঠাৎ স্বীকার ক'রে ফেললে 'ইন্‌ষ্টিটিউটে' আমার গান শুনেছে। তারপর ওর বাড়িতে নেমন্তন্ন, আলাপের ঘনীভূত অবস্থা এবং ক্রমশঃ প্রেম! খালি বাধা ছিলেন ছবির এটর্নী বাবা অবনীবাবু। আমি গরীব ব'লেই তাঁর আপত্তি; কিন্তু এবার দেওঘর থেকে ঘুরে এসে হঠাৎ তাঁর মত বদ্‌লে গেছে।

শৈলেন হাঁ করে শুন্‌লে, তারপরে সজোরে আমার দু'টো কাঁধ ধরে ঝাঁকানি দিতে লাগ্‌ল। আমার সত্যিসত্যিই বোধ হতে লাগ্‌ল, যেন ছবিরাণীর সঙ্গে আমার বিয়ে অবশ্যম্ভাবী এবং আসন্ন।

আমার যেমন স্বভাব! শৈলেন চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই কথাটা বেমালুম ভুলে গেলুম। কাজেই তার পরদিন যখন শৈলেন এসে বললে, তোর ছবিরাণীকে দেখে এলুম, তখন আর একটু হ'লেই ব'লে ফেলেছিলুম, কে ছবিরাণী?

শৈলেন ঠক্‌বার পাত্র নয়। সে আজ সকালে শ্যাম ঘোষের ষ্ট্রীটে অবনীবাবুর নাম-লেখা বাড়ি দেখে এসেছে, এমন কি শ্যাম ঘোষের মোড়ে সেই বাড়ির যে মেয়েটি বাসের জন্যে এসে দাঁড়িয়েছিল, আমার ঘরের ফোটোর সঙ্গে তার হুবহু মিল আছে।

ক্রমে এই উপকথাটা রাষ্ট্র হ'য়ে গেল। সেদিন আমি আর শৈলেন ব'সে আছি এমন সময়ে আমাদেরই মেসের এক বোর্ডার, নাম নয়নবাবু, 'ইকনমিক্স'এ এম্-এ, আমার ঘরে উপস্থিত হ'লেন। 'ইকনমিক্স' শাস্ত্রটা নয়নবাবুর চরিত্রের ওপর বেশ একটু ছায়াপাত করেছে, তবে একটু বিপরীতভাবে। অর্থাৎ দেশের অর্থনীতি নিয়ে তিনি মাথা না ঘামালেও শব্দের অর্থতত্ত্বের ওপর যে তাঁর বেশ দখল আছে, তা তাঁর শাণিত কথাবার্ত্তা থেকে বেশ বোঝা যায়। দেওয়ালে টাঙানো ছবিটা দেখে নিঃসংশয়ে বল্‌তে আরম্ভ করলেন,—ওহো, হতাশ প্রেম! তাই ত বলি ভদ্রলোক দিনরাত্ত মুখ গুঁজে এত লেখেনই বা কি, আর মেসের এই খাওয়া খেয়েও দিন দিন ফুলছেন কি ক'রে?

আমি একটু আহতভাবে অন্যদিকে চেয়ে চুপ করে রইলুম। শৈলেন বললে,—কিন্তু ও-কথা নিয়ে ওর সামনে ঠাট্টা করা উচিত নয়, নয়নবাবু।

নয়ানবাবু লজ্জিত হবার নাম মাত্র নেই। বলে চললেন—আর বলবেন না মশায়। ভেঙে ভেঙে হৃদয়টা একেবারে গুঁড়িয়ে ধূলো হয়ে গেছে। তবুও তো মশায় একদিনের জন্যেও খাওয়াদাওয়া অরুচি হ'ল না। দিব্যি ঘুরে ফিরে বেরোচ্ছি। ফুটবল খেলছি, সিনেমায় যাচ্ছি, চা খাচ্ছি; ওহো, ভাল কথা মনে—ওরে অতুল, সুনীলবাবুর জন্যে এক কাপ চা নিয়ে আয়—

তারপরে আবার—দেখুন সুনীলবাবু? নতুন কিছু একটা করুন। ও হৃদয়ভাঙা বড় পুরোণো হয়ে গেছে। বরং মশায় হাত-পা যাহোক একটা ভাঙুন, তবু একটু রোমান্টিক ব'লে মনে হবে। কিন্তু, আপনার মত ছেলে, প্রেমে হতাশই বা হলেন কেন?

অতিকষ্টে দুটো কথা মুখ দিয়ে বার করলুম, আমি গরিব—কথাটা বলতে গিয়ে সত্যিই আমার গলাটা কেঁপে গেল। এমন কি তখন একটু চেষ্টা করলে আমার চোখ দিয়ে দু-ফোঁটা জলও বেরিয়ে যেত।

অতুল চা নিয়ে এল। একহাতে আমার সামনে পেয়ালাটা ধ'রে আর এক হাত আমার পিঠে মোলায়েমভাবে বুলোতে বুলোতে নয়ানবাবু বললেন,—খেয়ে ফেলুন, খেয়ে ফেলুন। প্রেমে চায়ের মত উপকারী জিনিষ আর নেই—

সত্যিই রাগ হ'য়ে গেল; একজনের হৃদয়ের গভীরতম ব্যাপার নিয়ে,—হ্যাঁ গভীর ব্যাপার বৈ কি,—ছবিরাণীর সঙ্গে যে আমার মিলন হ'ল না, সে কি একটা কম 'ট্র্যাজেডি'? একটু কড়া সুরেই বললুম, দেখুন, কারুর হৃদয় নিয়ে—

নয়ানবাবু দ্রুতগতিতে বলে গেলেন,—আহা হা, চটেন কেন? আমি কি বুঝি না? বাস্তবিক বলছি, এই অবস্থা আমার অন্ততঃ পাঁচ বার হয়েছে। স্যুটকেসের মধ্যে পোটাসিয়াম্ সায়ানাইডের শিশি এখনও লুকানো আছে। দেখতে চান্ তো দেখাতে পারি। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি মশায়, যত উপকার পেয়েছি এই চা থেকে, তেমন আর কিছুতেই পাই না।

এর পর মেসে কারুর কাছে আর কথাটা গোপন রইল না। ব্যাপারটা নিয়ে অন্য সকলের আড়ালে শৈলেনের সঙ্গে হাসাহাসি করি। আবার শৈলেনের আড়ালে আপন মনে হাসি। শৈলেন মহা কৌতুকে বলে, ওরা সকলেই জানে, তুই ব্যর্থপ্রেমিক। অঘ্রাণ মাসে সকলকে নেমন্তন্ন করিস্।

আমি মনে মনে ভাবি, এই অঘ্রাণ মাস পর্য্যন্ত, তারপর শৈলেন হতভাগা আর আমার মুখ দেখবেন না।

প্রফুল্ল দেওঘর থেকে তখনও ফেরেনি। ছবিটা তখনও আমার ঘরে বিরাজ করছে। কয়েক বার ইতিমধ্যে ভেবেছি যে, অপরিচিতা মেয়ের ছবি নিয়ে রহস্যটা বেশী দূর চালানো উচিত নয়, কিন্তু নেহাৎ আলস্যেই আর ছবিটা নামানো হয়ে ওঠেনি।

এতদিন ক্রমাগত নির্জ্জনতা সন্ধানের পর, এই একান্ত-স্থিত মেসটির নীরব দীর্ঘ দিনগুলি আমার কেমন লাগছে এবং তাদের অবসরবহুল নিরুদ্বেগ ছায়া-রৌদ্রপাতে আমার মনের মধ্যে দ্রুত পরিবর্ত্তন ঘটছে কি-না, এসম্বন্ধে আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক। বাস্তবিক পক্ষে ভাল লাগছে কি মন্দ লাগছে, সেটা এখনও বুঝে উঠতে পারিনি। তবে একথা ঠিক যে, সন্ধ্যার ঝোঁকে হঠাৎ মনের মধ্যে একটু খুঁতখুঁতের আবির্ভাব হয়—কি যেন হওয়া উচিত ছিল, হচ্ছে না। ছাদের ওপর ইজিচেয়ারটা টেনে আকাশের দিকে চেয়ে বসে থাকি, দেয়ালের পাশে অশত্থ গাছটায় হাওয়া লাগে, কিন্তু বেচারা হাওয়ায় সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ ক'রে দোল খেতে লজ্জা বোধ করে, শহুরে মানুষ হয়েছে সে, একান্ত পাড়াগেঁয়ে গাছের মত অবাধে উৎসাহ প্রকাশ করা তার পক্ষে অসম্ভব। ছাদের আলসের ওপর দু-একটা পাখী দেখি, মনটা সাড়া দেয় না। মনে হয় আজকাল ওরা জ্ঞান-বৃক্ষের ফল খেতে আরম্ভ করেছে। একটু নিরর্থক ডাকা নেই, আকাশে বিনা কারণে পাখা মেলে দেওয়া নেই, শুধু নজর আছে ঐ উঠোনটার দিকে, যেখানে মাছকোটা হয় এবং উচ্ছিষ্ট পড়ে।

এই ক্রমশঃ জমে ওঠা বিরক্তিটুকু একদিন আমার 'চিন্তাধারা' নামক খাতায় ঢেলে দেওয়া গেল—কলিকাতা শহরে নির্জ্জনতা হচ্ছে একটা 'কমোডিটি' বা পণ্যদ্রব্য মাত্র। পাড়াগাঁয়ের সেই নির্জ্জনতা, যা বহিঃপ্রকৃতির একটা অংশ, যার মধ্যে মনে হয় যেন একটা ব্যক্তিত্ব আছে, যাকে উপভোগ করা যায়, অনুভব করা যায়, মনের মধ্যে এ কে নেওয়া যায়, তার সঙ্গে এই নির্জ্জনতায় তুলনা! আমার জো

মনে হয় কিছুকাল বাদে শহরের ভিড়টা আর একটু বাড়লেই ঘণ্টা হিসেবে নির্জ্জনতা ভাড়া পাওয়া যাবে।

অন্ততঃ সন্ধ্যার দিক্‌টায় কথা কইবার দু-একজন লোক না জুটলে হাঁপিয়ে উঠতে হয়। মনে হয় এই গুমট-ধরা বিশ-মণী নির্জ্জনতাটাকে শানের মেঝের ওপর আছাড় মেরে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ফেলি। কাজেই মাঝে মাঝে আমার ঘরে গানের আসর বসাতে আরম্ভ করেছি। আমার দু-জন গাইয়ে বন্ধু, আমি স্বয়ং, মেসের ঐ নয়ানবাবু, এবং তাঁর একটি একান্ত নিরীহ-গোছের বন্ধু,—সাধারণতঃ এই কয়জনই আমাদের গানের সভায় উপস্থিত থাকেন।

বাজে হৈ চৈ এবং বিশৃঙ্খল আনন্দ আমার পক্ষে একেবারে অসহ; কাজেই এই ক্ষুদ্র সভাটিকেও নিয়মের নিগড় পরিয়ে দিলুম। যথা, উপস্থিত গায়করা কেউ একই আসরে একটির বেশী গান গাইতে পারবেন না; সেই গানটি একেবারে নতুন হওয়া চাই অর্থাৎ গান যে-কোনও একটা হলেই চলবে, কিন্তু সেই গায়কের মুখে সেই গান অশ্রুতপূর্ব্ব হওয়া চাই; এবং সকলের এক একটি ক'রে গান গাওয়া শেষ হ'লেই পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমার ঘরটি সম্পূর্ণ খালি ক'রে দেওয়া চাই। অবশ্য অনেকেই এসব নিয়ম অপমানজনক ব'লে মনে করতে পারেন; কিন্তু বন্ধুরা আমায় চেনেন এবং সম্ভবতঃ আমার মস্তিষ্ক সম্বন্ধে মাঝে মাঝে একটু আধটু ইঙ্গিতও ক'রে থাকেন। কাজেই সকলে সকৌতুকে নিয়মগুলো মেনে নিলেন।

এম্‌নি একটা সভা। সেদিন রবিবার; সারাদিন বেশ গরম গেছে। সন্ধ্যাবেলা আমাদের গানবাজনা আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা হাওয়া দিলে, আর ঝির্‌ঝিরে বৃষ্টি ঝরতে লাগল, উৎফুল্ল হয়ে উঠলুম; ভোলাকে ডেকে ব'লে দিলুম পাঁপর ভেজে আনতে। সন্ধ্যার অন্ধকারে যখন বৃষ্টি নামে, তখন চায়ে ভিজিয়ে পাঁপরভাজা গলাধঃকরুন, দেখবেন গলার কাছ পর্য্যন্ত সুর ঠেলে আসছে। আমি প্রস্তাব করলুম শুধু আজকের দিনের জন্যে প্রত্যেকে দুখানা ক'রে গান গাইবেন। গাইবার মধ্যে আমি, আমার দুই বন্ধু, আর নয়ানবাবুর বন্ধু মনোজ। ঘরের তক্তপোষ বারান্দায় বার ক'রে দিয়ে জাজিম পেতে আসর করা হয়; তার মধ্যে আর নয়ানবাবুকে বসতে দিই না, আমার ছোট টেবিলটার কাছে ওঁকে বসিয়ে দিই—কারণ উনি আমাদের তালাধ্যক্ষ, ছন্দ ডিপার্টমেণ্টের কর্ম্মসচিব।

মনোজবাবু লোকটির একটু পরিচয় দেওয়া দরকার। নয়ানবাবুর বন্ধু বলি বটে, কিন্তু নয়ানবাবুর চেয়ে ঢের ছোট, বয়স তেইশ-চব্বিশ মাত্র। এখনও ওকে 'আপনি' বলি; কিন্তু ইচ্ছে আছে দু-একদিনের মধ্যেই 'তুমি' আরম্ভ করে দেব। পাতলা, সুশ্রী চেহারা; একটু সঙ্কুচিত আড়ষ্টভাব ওকে বেশ মানায়। জোরে হাসতে পারে না, সাবধানে কথা কয়। 'পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট' এ পড়ে; আমার সঙ্গে কিছুকাল সাহিত্য আলাপের পর একেবারে মুহ্যমান হয়ে গেছে। স্পষ্টই বুঝতে পারি আমার প্রতি সে বেশ শ্রদ্ধান্বিত হয়ে উঠেছে। গলাটি ভারি মিষ্টি; ওর গান আমার চেয়েও জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারে, মাঝে মাঝে এ আশঙ্কাও হয়। কাজেই মুরুব্বিয়ানা সুরে ওকে গাইতে অনুরোধ করি এবং ওর গানের প্রশংসা করি।

এ সম্বন্ধে কোনও তর্কই উঠতে পারে না যে মধুর সমাপ্তির ভার আমার ওপর। আমার দুই বন্ধুর চারটি গান হয়ে গেছে; কাজেই এবার মনোজের পালা।

মুদ্রাদোষের কথা আমি বলছি না; কিন্তু তা ছাড়াও যাঁরা লক্ষ্য করেছেন তাঁরা জানেন যে, প্রত্যেক গায়কেরই গান গাইবার সময় একটি নিজস্ব 'পোজ' আছে। আমি যখন গান ধরি, আমার দৃষ্টিটা তির্য্যক ভাবে ওপরদিকে চলে যায়। বিনয়ের অভ্যাস গান গাইবার সঙ্গে সঙ্গে চোখ বুজিয়ে মাথা দোলানো। ওর ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল আছে ব'লে বেশ মানিয়ে যায়। রাধামোহন অত কবিত্বের ধার ধারে না; বেশ সপ্রতিভভাবে সকলের দিকে সোজাসুজি চাইতে চাইতে হাসিমুখে গান ধরে; ভাবটা এই—কেমন, মজাটা টের পাচ্ছ? কিন্তু মনোজের 'পোজ'টি আমার সবচেয়ে সুন্দর লাগে। গান আরম্ভ করলেই ওর চোখটা অর্দ্ধেক বুজে যায়—যাকে বলে 'আধ-নিমীলিত আঁখি'। আর ওর স্বচ্ছ টলটলে দৃষ্টিটুকু তীক্ষ্ণ, চঞ্চল ভাবে এলোমেলো ঘুরে বেড়ায়।

আজকের ঐ অবান্তর বৃষ্টিটুকু সপক্ষে আছে, কাজেই শ্রাবণমাস না হ'লেও মনোজ ধরলে—'শ্রাবণ-ঘন-গহন মোহে'—মনে মনে ভাবলুম—এ গানটা কিন্তু নূতন নয়, এই

সেদিনও মনোজ এই গানটা আমার ঘরে বসে গেয়েছে। দেখলুম বন্ধুরাও চাওয়া-চাওয়ি করছে। ওকে থামিয়ে দেব কি-না ভাবছি। কিন্তু আর থামাতে হ'ল না।

'শ্রাবণ-ঘন-গহন মোহে, গোপন তব চরণ ফেলে' পর্যন্ত গেয়েই ও হঠাৎ এমন আচম্‌কা থেমে গেল যে, মনে হ'ল যেন 'নিশার মত নীরব' কাকে চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে।

বললুম, চলুক, চলুক। নিয়মের একটু ব্যতিক্রম হ'লেও গানটা ভালই লাগ্‌ছে।

অনুরোধে মনোজ দ্বিতীয়বার গানটা আরম্ভ করলে, কিন্তু ঠিক ঐ জায়গায় এসেই আবার আচম্‌কা থেমে গেল। বিস্মিত হয়ে চেয়ে দেখি, গান থেমে গেছে, কিন্তু ওর চোখে এখনও সেই চঞ্চল দৃষ্টি, হঠাৎ ও ব্যস্তভাবে উঠে পড়ল এবং ভাঙা ভাঙা কতকগুলো শব্দ যোজনা ক'রে বোঝাবার চেষ্টা করতে লাগ্‌ল, ওর একটা বিশেষ কাজ আছে। 'দেখুন, মানে আমি আর এখানে—মানে একটা ভয়ানক কাজ—হঠাৎ মনে পড়ল—নয়ানদা কিছু মনে করো না ইত্যাদি বল্‌তে বল্‌তে ও একেবারে মেসের বাইরে। আমরা অবাক হয়ে মুখ-চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলুম—ব্যাপার কি?

নয়ানবাবু শ্লেষের সুরে বল্‌লেন,—ও 'ইডিয়টে'র কথা ছেড়ে দাও। এতদিনেও মানুষ হ'ল না। পুরণো একটা গান ধরে ফেলেছিস্ ফেলেছিস্। তাতে এমন কি লজ্জার কথা থাক্‌তে পারে যে, একেবারে দৌড়ে পালাতে হবে!

রাধামোহন একটু মুচ্‌কি হেসে বললে, আহা বেচারী বড়ই 'ইনোসেণ্ট'। অত 'নার্ভাস' হয়ে গেল কেন বুঝলুম না। বোধ হয় তোর ঐ ছবির দিকে চেয়েই বেচারার মাথা ঘুরে গেছে। ঐদিকে চাইছিল দেখলুম।

বিনয় হেসে উঠল,—আরে ক্ষেপেছ? শুধু ছবি দেখেই 'নার্ভাস'! সুশীল, রাগ করো না ভাই, কিন্তু মনোজও হয়ত তোমার ঐ ছবিরাণীর এক হতাশ-প্রণয়ী।

নয়ানবাবু হেসে উঠলেন; বললেন,—আপনারাও যেমন! প্রেমিক চেনেন না মশাই? ঐ লাজুক,—মুখচোরা ছেলে প্রেম করবে? যাক্, বাজে কথা যাক্। সুশীলবাবু ধরুন।

আমার গানের পর সভা ভঙ্গ হ'ল। তখন রাত সাড়ে আটটা। বৃষ্টি থেমে গেছে; ভিজে হাওয়াটা ভারি আরাম-জনক বলে মনে হচ্ছে। এই সময়টা আমাদের মেস্‌টায় কেউই থাকে না বললে হয়। তার ওপর আবার রবিবার। এ সময়টা এ মেসের কোনও বোর্ডারের সঙ্গে কেউ যদি দেখা করতে চান্, তাহ'লে এখানে না এসে মাঠ, সিনেমা, থিয়েটার বা শ্বশুরবাড়িতে অনুসন্ধান করলেই সফল হবার সম্ভাবনা। নয়ানবাবু সভাভঙ্গের পরই দ্রুতগতিতে বেরিয়ে গেলেন। বাকি রইলুম শুধু আমি। মনে হ'ল, আউট্রাম ঘাট ছাড়িয়ে ষ্ট্র্যাণ্ডের ওপর সোজা খানিকটা বেড়িয়ে আস্‌তে পারলে আরাম পাওয়া যাবে। কিন্তু বেরোবার আগে একটু টাট্‌কা হয়ে নেওয়া দরকার।

নেয়ে এসে বেশ ফ্রেশ বোধ হ'তে লাগল। ফর্সা একখানা কাপড় পরে, গায়ে ধপ্‌ধপে একটা পাঞ্জাবী চড়িয়ে যখন আয়নার সামনে চুল আঁচড়াবার জন্যে দাঁড়ালুম, তখন আয়নার ভেতর নিজের চক্‌চকে, ফিটফাট চেহারাটা দেখে বেশ একটু তৃপ্তিবোধ করলুম। এমন কি দেয়ালে-টাঙানো ছবিটার দিকে চেয়ে মনে মনে বললুম,—তোমার সঙ্গে শুধু আমার ঠাট্টারই সম্পর্ক, ছবিরাণী। কিন্তু সম্পর্কটা যদি সত্যি হ'ত তাহলেও বিশেষ ঠকতে না।

সত্যি কথা বলতে গেলে, ঐ ছবিরাণীকে উপলক্ষ্য ক'রে বন্ধুবান্ধবের কাছে দিনের পর দিন প্রেমিকের ভূমিকা অভিনয় ক'রে এবং নিজের নিভৃত কল্পনায় সকৌতুকে ওর কথা ভেবে ভেবে ওর ওপর যেন একটা মায়া পড়ে গেছে। দুপুরে যখন একলা থাকি, দোরটা বন্ধ ক'রে দিয়ে এসে ছবিটার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলি,—

তুমি কি কেবলি ছবি?

যখন উত্তর মেলে না, তখন বলি—

ছবি নও, তুমি ছবিরাণী।

এধারে এত কাণ্ড, অথচ এই ছবিরাণী বেচারী তার কিছুই জানতে পারছে না—কথাটা ভেবে ভারি মজা লাগল। গলা ছেড়ে হেসে ফেলবার উপক্রম করছি, এমন সময় মনে হ'ল কে যেন দোরের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। সেদিকে না চেয়েই চুলেতে চিরুণীর শেষ টান দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করলুম,—কে?

চেয়ে দেখি মনোজ, আর তার পাশে একটি মহিলা!

খুব আশ্চর্য্য হলুম না; কারণ আমাদের এই অনবিরল মেসে মহিলার আবির্ভাব এই প্রথম নয়। ঐ কোণের ঘরটায়

রমেশবাবু তো একমাস সস্ত্রীকই রইলেন। এই সেদিনও নয়নবাবুর অসুখের সময় তাঁর মা আর বোন তাঁকে দেখতে এসেছিলেন।

আমার বন্ধুদের মধ্যে সকলেই শিক্ষিত এবং চতুর, ইংরেজীতে যাকে বলে স্মার্ট; কিন্তু 'মহিলাসমাজে তারা একেবারে অচল। হয় অন্যায় রকম চুপ ক'রে থাকে, নয় মরিয়া হয়ে একান্ত বেফাঁস কথা ব'লে বসে। কিন্তু মেয়েদের সামনে আমার অবিচলিত স্বাতন্ত্র্য এবং আমার সরস বচন-বিন্যাসের জন্যে বন্ধুরা আমাকে প্রশংসাও ক'রে থাকে এবং আমি নিশ্চয় জানি ঈর্ষ্যাও করে মনে মনে।

বেশ সপ্রতিভভাবে জিজ্ঞাসা করলুম,— নয়নবাবুর ঘর বন্ধ দেখলেন তো? এই পনের মিনিট আগে ভদ্রলোক তীরবেগে কোথায় বেরিয়ে গেলেন। খানিকটা ওয়েট্ ক'রে দেখবেন না-কি!

গলাটা পরিষ্কার ক'রে মৃদুস্বরে মনোজ বললে,— হুঁ।

'ভেতরে চলে আসুন'— ব'লে মনোজের কাঁধের কাছটায় হাত দিয়ে তাকে টেনে আমার ইজিচেয়ারে বসিয়ে দিলুম। আর একটি মাত্র চেয়ার— সেখানা মহিলাটির দিকে সরিয়ে দিয়ে বললুম,— বসুন।

তক্তপোষখানা গানের আসরের জন্যে বাইরে বার ক'রে দিয়েছি কাজেই আমাকে হয় মেঝেতে পাতা জাজিমে বসতে হয়, নয় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। অন্য কেউ হ'লে অপ্রতিভ হয়ে পড়ত, কিন্তু আমি অর্গ্যানটার ওপর হেলান দিয়ে এমন শোভন ভাবে দাঁড়ালুম যে, ওদের আর আপত্তি করবার কিছু রইল না।

আমারই ঘরের মধ্যে একটি পূর্ণযৌবনা নব্যধরণে সজ্জিতা মেয়ে! ভাগ্যিস প্রসাধনটা আগেই সারা হ'য়ে গিয়েছিল! হাতটা কচলাতে কচলাতে বেশ হাস্যপ্রফুল্ল গলায় আরম্ভ করলুম,— তারপর মনোজবাবু, আপনার ঋণ-শোধের কি ব্যবস্থা করলেন?

যা ভেবেছিলুম! মনোজ চমকে উঠল। দু'জনেই আমার দিকে চাইলে।

বললুম,— এখনও আপনার কাছে দুখানা গান পাওনা। আছে, এ কথা মনে আছে তো? আচ্ছা হঠাৎ ওভাবে—

মনোজের ভাবগতিক দেখে চুপ ক'রে যেতে হ'ল। ও লাজুক, তা জানি; কিন্তু এতটা বাড়াবাড়ি কি ভাল? মনে মনে একটু বিরক্ত হয়েই বললুম,— দেখুন, যদি আপনাদের 'আন্‌কম্ফার্টেবল্' বোধ হয় আমি না হয় ছাদে যাচ্ছি।

মনোজ আবার গলাটা পরিষ্কার ক'রে নিয়ে বললে,— দেখুন, আপনার সঙ্গেই একটু কথা আছে—

অবাক্ হলুম, কিন্তু বললুম,— বেশ ত, বলুন—

কিন্তু প্রায় আধমিনিটকাল মনোজ কিছুই বল্‌লে না, শুধু 'নার্ভাস' ভাবে এদিক ওদিক চাইতে লাগ্‌ল। তারপর হঠাৎ ব'লে উঠল,— সুশীলবাবু, ইনি আমার সিষ্টার। মনোজ ওকথা না ব'লে যদি বলত— ইনিই সেই কুন্দশুভ্র নগ্নকান্তি সুরেন্দ্রবন্দিতা উর্ব্বশী, তাহ'লেও তার গলায় অতটা উত্তেজনা বেমানান্ হ'ত না।

একটু হতবুদ্ধি হয়েই সস্মিত নমস্কারপর্ব্বটুকু সারলুম।

কিন্তু আরও হতবুদ্ধি হওয়া অদৃষ্টে ছিল। হঠাৎ আবিষ্কার করলুম, আমাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে ভাই বোনে বিপুল বেগে কথাবার্ত্তা আরম্ভ হয়ে গেছে। আর সেই লাজুক, মিতভাষী মনোজের গলা তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। মনে মনে এই তথ্যটা সেদিন নোট ক'রে রাখলুম যে, মোলায়েম মেজাজের লোকরা যখন রাগে তখন তাঁদের সেই অস্বাভাবিক ঝাঁঝটা একেবারে অসহ্য উৎকট ব'লে বোধ হয়।

বোঝা গেল মনোজ নিদারুণ রেগেছে। কিন্তু কার ওপর? যতটা আন্দাজ করতে পারছি, মনে হয় আমিও কোনও ক্রমে এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছি।

ভেবে কিছুই পেলুম না। ওদের কথোপকথনের অংশগুলো যথাসাধ্য বোঝবার চেষ্টা করতে লাগলুম।

মনোজ চাপা তীক্ষ্নস্বরে বলছে,— একে তুই আগে কখনও দেখিস্‌নি?

মেয়েটি স্থির ধারালো কণ্ঠে উত্তর দিচ্ছে,— কোথায় আবার দেখব?

একটা কথার উত্তরে আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে কতদিন তোকে বারণ করেছি। যা জিজ্ঞাসা করছি এক-কথায় তার জবাব দে। এর আগে তোদের আলাপ ছিল কি-না?

মেয়েটি বিদ্রোহের ভঙ্গীতে মুখ তুলে বললে,— দেখ

দাদা, তুমি পথে-ঘাটে, যেখানে-সেখানে আমার ও-রকম ক'রে অপমান ক'রো না—যা বলবার, বাড়ি গিয়ে বলবে।

মনোজ অনেকটা নরমস্বরে,—কিন্তু চোখের ওপর দেখছিস্ তো? কি ক'রে ওটা এখানে এল?

তার আমি কি জানি?

মনোজ আবার ক্ষেপে উঠল,—জানিস্ না মানে? তুই না দিলে -

—আমার জিনিসই নয়, আমি দেব কি? এর আগে কখনও চোখেও দেখিনি।

মনোজ চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল।—তবে কি তুই বলতে চাস যে, তুই জানিস্ না শুনিস্ না, আপনা হতে তৈরি হয়ে ওটা এখানে এসে হাজির হয়েছে?

মেয়েটিও দৃপ্তভাবে উঠে দাঁড়াল, বললে,—তুমি কি একটা কেলেঙ্কারি করতে চাও একটা অপরিচিত মেসে এসে? আমাকে ধমকাচ্ছ কেন? যাকে বলবার কথা তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে সাহস হচ্ছে না? বেশ আমিই বলছি, — দেখুন—

কিন্তু মেয়েটির আর কিছু বলতে হ'ল না। ওর পূর্ণ দৃষ্টি আমার চোখে লাগতেই বুঝতে পারলুম।

আমি কি মূর্খ। এতক্ষণ ধ'রে কেবলি মনে হয়েছে, মেয়েটি যেন চেনা, কোথায় যেন দেখেছি। প্রায় পনেরো মিনিট বাদে এতক্ষণে ওকে চিনলুম।

এমনি আমার বরাত, সেইদিনই সকালে আবার কবিত্ব করে' ছবিটার ওপর একটা যুঁই ফুলের মালা ঝুলিয়েছি!

আমার মনকে ধন্যবাদ। বিপদের মধ্যে তার কর্ম্মশক্তি আরও যেন বেড়ে যায়। এক সঙ্গে কতকগুলো মতলব বিদ্যুতের মত মাথায় খেলে গেল। কোন্‌টা করব? Excuse me for a minute, পেটটা কেমন করছে ব'লে অন্তর্ধান করব? না, কল্পিত ডাকের প্রত্যুত্তরে হঠাৎ চীৎকার ক'রে উঠব, দাঁড়ান, এক মিনিটের মধ্যেই যাচ্ছি। ঘরে লোক আছে।—কিংবা অবিচলিত গাম্ভীর্য্যে বেশ মোলায়েম করে বলব—উঃ ন'টা বাজে! কিছু মনে করবেন না। নয়ানবাবু এখনও ফিরলেন না দেখছি। কিন্তু আমি তো আর দেরী করতে পারি না—

[illegible]; কিন্তু তুর্ভাগ্য, দেখলুম নিজের অজান্তেই বেশ বিনীতস্বরে বলছি,—[illegible] 'এ্যাক্‌সিডেন্টের' ফলে

মনোজ তীব্র কণ্ঠে বাধা দিলে,—'অ্যাক্‌সিডেন্ট'! 'অ্যাক্‌সিডেন্ট' মানে আপনি কি বলতে চান্?

বুঝলুম নরম হ'লে এ যাত্রায় আর পরিত্রাণ নেই। গলাটা কঠিন ক'রে বললুম,—'হোয়াটস্ দ্যাট?' আমাকে শেষ ক'রতে দিন্।

মনোজ ভড়কে গেল। বুঝলুম আপাততঃ কোনও ভয়ের কারণ নেই এদের আমি সামলাতে পারব। কিন্তু ইতিমধ্যে নয়ানবাবু এসে পড়লেই মুস্কিল। মুখ দেখাবার আর উপায় থাকবে না।

নীচু অথচ দ্রুতস্বরে ছবিটার ইতিহাস ব'লে গেলুম; অবশ্য নিজের বোকামির দিকটা যথাসম্ভব বাঁচিয়ে। আমি যে ঐ ছবিটার সফল কিংবা বিফল প্রণয়ী ব'লে পরিচিত, একথা ওদের জানতে দেওয়ার চেয়ে গালে চুণকালি মেখে চৌরঙ্গী দিয়ে হেঁটে যাওয়াও সম্মানজনক। ওরা খানিকক্ষণ চুপ ক'রে রইল। আশান্বিত হয়ে দেখলুম, মেয়েটির মুখে হাসি ফুটেছে। কিন্তু মনোজ তখনও গম্ভীর। অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে আমায় জিজ্ঞাসা করলে,—কিন্তু একটি অপরিচিতা ভদ্রলোকের মেয়ের ছবি এভাবে আপনি মেস-শুদ্ধ লোককে দেখাচ্ছেন—এতে কত লোকে কত কথা ভাবতে পারে আপনি জানেন?

মেয়েটি বললে,—ভাবতে পারে কেন, নিশ্চয়ই ভাবছে। অন্য লোকের কথা ছেড়েই দাও। তোমার নয়ানদা না কে?—তাঁকেই জিজ্ঞাসা করো দেখি, ছবিটা সম্বন্ধে তিনি কি ভাবেন?

সর্ব্বনাশ। নয়ানবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেই তো গেছি। এ মেসে বাস করা তো অসম্ভব হবেই, এমন কি, কলকাতায় ট্রামে বাসে চড়াও বিপজ্জনক হয়ে উঠবে। ও লোকটি যে একেবারে মূর্ত্তিমান রয়টার।

শঙ্কিত হয়ে বললুম—দেখুন, নয়নবাবুকে জিজ্ঞাসা করা মানেই ঢাক পিটিয়ে দেওয়া। আপনার নাম নিয়ে সবাই আলোচনা করবে, সেটা কি ভাল হ'বে?

শ্লেষের সুরে মনোজ বললে,—আর ছবিটা নিয়ে যে পাঁচজনে আলোচনা করছে, তাতে কিছুই এসে যায় না, কি বলেন? নয়ানবাবুর ভয়টাই বড় হ'ল।

মেয়েটি তার দাদার দিকে চেয়ে উৎসুকভাবে জিজ্ঞাসা করলে,—তুমি তো ল' পড়ছ দাদা ; আচ্ছা, এতে মানহানির মোকদ্দমা হ'তে পারে না ?

মনোজ উত্তেজিত ভাবে বললে,—ঠিক কথা। নিশ্চয় হ'তে পারে।

মেয়েটি গল্প করার সুরে ব'লে যেতে লাগল কিন্তু, দাদা সে অনেক হাঙ্গাম। মিনি চৌধুরী একবার কি করেছিল জান ? আমাদের কলেজের মিনি চৌধুরী—যে ম্যাট্রিকে সেকেণ্ড হয়েছিল। মাসিক পত্রে তার ফোটো বেরিয়েছিল তো ? কলেজের একজন ছেলে,—আমরা সবাই তাকে চিনি—সেইটে কেটে কলেজের নোটিশ বোর্ডে টাঙিয়ে দিয়েছিল, মিনির দাদা কে জান ত ? ব্যারিষ্টার এ. চৌধুরী ? মিনি তাঁকে গিয়ে বলতে তিনি কি বললেন জান ? কলেজের পর একদিন মিনিকে সঙ্গে নিয়ে ছেলেটিকে 'ফলো' করলেন। অবিশ্যি পায়ে হেঁটে নয়, মোটরে। তারপর একটা নির্জ্জন জায়গা দেখে মোটর থেকে নেমে পড়েই তাকে আচ্ছা ক'রে হুইপ ক'রে দিলেন।

ব্যাপারটাকে আর বেশী দূর গড়াতে দেওয়া উচিত নয়। এসব আলোচনাও বিপজ্জনক। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে একান্ত নিশ্চিন্ত ভাবে আলস্য ভেঙে একটা সিগারেট ধরিয়ে ফেললুম। একটা হাই তুলতে পারলে ভাল হ'ত, কিন্তু হাই এলো না। গম্ভীর গলায় আরম্ভ করে দিলুম,—দেখ হে মনোজ—হ্যাঁ মনোজই বলব, কারণ তুমি আমার ঢের জুনিয়ার—তোমাদের বয়স এখন অল্প, সংসারের কিছুই বোঝ না। অবশ্য একথা আমি নিশ্চয় স্বীকার করব যে, আমার পক্ষে এটা খুবই অবিবেচনার কাজ হয়েছে। তুমি সাহিত্যের ছাত্র, ঝোঁকের মাথায় ছবিটা টাঙানোর 'হিউমার'টুকু তুমি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ। কিন্তু তারপরে খেয়াল ক'রে ওটাকে নামিয়ে রাখাই আমার উচিত ছিল। কিন্তু নিছক আলস্যের জন্যে তা না-করাই হয়েছে যত বিপত্তির কারণ। স্যায় জন্যে তোমার বোনের কাছে ক্ষমা চাইতেও আমি প্রস্তুত। কিন্তু এ ব্যাপারটাকে নিয়ে অনর্থক নাড়াচাড়া করলে কি হবে জান ? লোকে সবচেয়ে খারাপ যা তাই রটনা করতে লেগে যাবে। আমার তাতে বিন্দুমাত্র ক্ষতি নেই। কিন্তু তোমার বোনের নামটাই তাদের সকৌতুক চর্চার বিষয় হয়ে উঠবে। ছবিটা আমার ঘরে, অথচ তোমার বোনের সঙ্গে আমার কোনও কালে আলাপ ছিল না, একথা কেউ বিশ্বাস করবে ব'লে মনে কর ?

দু-জন চুপ।

বেশ আস্তে আস্তে প্রত্যেকটি কথা তীক্ষ্ণ ক'রে উচ্চারণ করে গেলুম,—অথচ ব্যাপারটা তলিয়ে না বুঝেই তোমরা আমাকে অপমান করলে। তোমার বোন্ যে ইঙ্গিত দিলেন—যাক্, সে সম্বন্ধে আমি আর কিছু নাই বললুম। একটু যদি ভেবে দেখ, আমার অন্যায়ের চেয়ে তোমাদের অন্যায়ের পরিমাণ ঢের বেশী।

মনোজ নরম হয়ে গিয়েছে, কিন্তু এখনও একগুঁয়েমি।— না, না, আমাদের ব্যবহার আপনি অন্যায় বলতে পারেন না—

মেয়েটি বিদ্রোহের সুরে ব'লে উঠল,—আমরা তো আইডিয়াল ব্যবহার করছি, অন্য কেউ হ'লে—

মেয়েটির চোখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে বললুম,—হুইপ করত !

ঘটনার নাটকীয় অংশটুকু এইখানেই আচমকা শেষ হয়ে গেল। আমার চোখের দিকে চেয়ে মেয়েটি উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল। মনোজ কটমট ক'রে চাইছে দেখে হাসিটা চাপবার চেষ্টা করলে বটে, কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখা গেল, সেই আওয়াজে নীচে থেকে অতুল ওপরে উঠে এসেছে এবং যথাসম্ভব আত্মগোপন ক'রে দোরের পাশ থেকে উঁকি মারছে।

ডাক দিলুম,—অতুল, শুনে যা—

অতুল দরজার সামনে এসে দাঁড়াল এবং সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটির হাসিও থামল।

মেয়েটির চেয়ারের পাশ দিয়েই দোরের কাছে গিয়ে বললুম,—এই নে তিনটে প্লেটে ক'রে খাবার নিয়ে আয় আর ঠাকুরকে চায়ের জল বসাতে বলে দে। দশ মিনিটের মধ্যে আসা চাই, বুঝলি ?

মনোজ আপত্তি ক'রে উঠল,—না, না, [illegible]বাবু, এখন আমরা—

ধমক দিয়ে বললুম,—আমার ঘরে খাবার খাওয়া তো এই নূতন নয় যে, তোমার লজ্জা করবে ! তবে তোমার [illegible] —আপনার লজ্জা করবে না কি

মিষ্টি হেসে,—না, লজ্জা নয়, কিন্তু এই রাত ন'টার সময়—

আমি হো হো ক'রে হেসে উঠলুম,—দেখুন, ব্যাপারটাকে কমিডি ক'রে তোলবার ঐ একমাত্র উপায়।

জানি, আমার উত্তপ্ত রসিকতায় মনোজের গাম্ভীর্য্য বিগলিত হবেই। চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিলে আমার আগেকার পরিচিত সেই লাজুক, অল্পভাষী, মধুরস্বভাব মনোজ। এমন কি, একটু ইতস্ততঃ ক'রে ক্রমশঃ ব'লে ফেললে,—কিছু মনে করবেন না সুশীলবাবু,—হঠাৎ—

তার কাঁধের ওপর একটা নাড়া দিয়ে তাঁকে থামিয়ে দিলুম।

শেষ পর্য্যন্ত ওদের বাড়িতে চায়ের নেমন্তন্ন।

ওরা যখন নীচে নেমে গেল, তখন আয়নার সামনে একবার না দাঁড়িয়ে পারলুম না।—সেই পুরণো হাসি হাসি মুখ! বললুম, One may smile and smile and be a villain—ঐ মুখের জোরটুক্ ছিল সুশীল মিত্তির, তাই এ যাত্রায় তরে গেলে—

ঐ যাঃ, ছবিটা যেখানে সেখানেই রয়ে গেল যে! যাবার সময় ওরাও ভুলে গেছে, আমারও খেয়াল নেই!

চেয়ারের ওপর উঠে ছবিটা পাড়লুম! হুঁ, ছবির চেয়ে ছবিরাণী ঢের ভাল। ভারি কৌতুক বোধ হ'ল—এবার তাহলে আমি ছবি থেকে ছবিরাণীতে উত্তীর্ণ হলুম? প্রথম আলাপ এই রকম রোমাণ্টিক্ তার ওপর আবার চায়ের নেমন্তন্ন। মেয়েটি যে-রকম সপ্রতিভ, আলাপটা দেখছি দ্রুত গতিতে অগ্রসর হবে। এমন কি অঘ্রাণ মাসে হয়ত বন্ধু শৈলেনের সঙ্গে চটাচটি না-ও হতে পারে।

—ও, ছবিটা নামিয়েছেন?

চম্‌কে দেখি ছবিরাণী!

—কি ভুল দেখুন! আসল জিনিষটাই ফেলে গিয়েছি। দাদাকে গলির মোড়ে দাঁড়াতে ব'লে আমি আবার এলুম।

—আপনি আবার কষ্ট করলেন কেন, মনোজই আসতে পারত।—কথাগুলো খুব সাধারণ ভাবেই বলবার চেষ্টা করছিলুম; কিন্তু আমার মাথায় তখন দুষ্টুমির নেশা লেগে গিয়েছে। মনোজ নিশ্চয় আসতে চেয়েছিল, ও নিজে জোর ক'রে এসেছে।

ছবিরাণী একটু যেন অপ্রতিভ হয়ে গেল, বললে,—দাদা ষ্টেশনরী দোকানে কি কিনছে, তাই আমি এলুম।—তারপর একটু হেসে,—'আপনার সঙ্গে একটু কথা আছে।'

—বলুন।

—আচ্ছা, আপনি কি শুধু ঠাট্টার খাতিরে ছবিটা টাঙিয়ে রেখেছিলেন?

প্রশ্নটা কেমন যেন ভাল লাগ্‌ল না, বললুম,—হুঁ, তা ছাড়া আর কি?

দেখি মুখ টিপে হাস্‌ছে।

মনে মনে সন্দেহ হ'ল, ও যেন আমার কাছে একটা স্বীকারোক্তি চায়। তাতে ওর আর কিছুই দরকার নেই, শুধু একটু আত্মপ্রসাদ আর কৌতুক।

বললুম,—ছবিটা নিন্।

সে-কথায় কান না দিয়ে ও বলে বস্‌ল,—তাই যদি হবে, তবে ছবির ওপর যুঁই ফুলের মালা কেন?

গম্ভীর গলায় বললুম,—জানি না, আজ সন্ধ্যেবেলা অনেক বন্ধু এসেছিল। তাদের মধ্যে কেউ ঠাট্টা ক'রে পরিয়ে দিয়ে থাকবে।

'ও' ব'লে ও ছবিটা নিলে। বোধ হ'ল যেন একটু নিরাশ হয়েছে। দয়া হ'ল। মনে মনে ওকে ক্ষমা করলুম। হাজার হোক্ কলেজের মেয়ে তো? একটু ভ্যানিটি থাকবেই। সে এমন কিছু দোষের কথা নয়।

হঠাৎ কখন ছোট টেবিলটার ওপর থেকে আমার 'চিন্তাধারা'খানা তুলে নিয়ে ও একনিমেষে একখানা পাতা বার ক'রে আমার চোখের সামনে ধরলে,—আর এটা?

দেখি কখন অন্যমনস্কভাবে পাতাটার ওপর থেকে নীচে পর্য্যন্ত ছোট ছোট অক্ষরে বোধ হয় পঞ্চাশ বার শুধু ছবিরাণী নামটাই লিখে গিয়েছে।

এর পর আমাকে আর কিছু বলবার অবসর না দিয়ে ও ছবিটা আমার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললে,—ছবিটা আপনিই রাখুন। চাপা হাসিতে তখন ওর গোটা মুখ ফেটে পড়ছে।

চেঁচিয়ে বললুম,—নিয়ে যান্ আপনার ছবি—
কিন্তু ততক্ষণে ও গলির মোড়ে।

'ট্রফি' কল্পনা ক'রে আত্মপ্রসাদ অনুভব করছে, এ ভাবনা যেন আরও অপমানজনক।

আমার জীবন থেকে এইখানেই ছবিরাণীর প্রস্থান। কিন্তু স্মৃতিটা বুকে কাঁটার মত খচ্ খচ্ করে। পাঁচ জন লোকে জানতে পারলে অবশ্য খুবই মুস্কিলে পড়তুম। কিন্তু ঐ অতিমাত্রায় আধুনিক মেয়েটি যে আমাকে তার একটা

প্রফুল্ল দেওঘর থেকে ফিরে আসতে ছবিটা তার হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিলুম। বাসে একদিন বিকেলে ছবিরাণীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল; বাধ্য হয়ে এক পয়সা দামের খবরের কাগজটায় গভীর মনোনিবেশ করলুম।

মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষা

শ্রীধীরেন্দ্রমোহন সেন

বর্ত্তমান যুগকে জ্ঞান-পথিকের যুগ বলা যাইতে পারে। বহুবর্ষশৃঙ্খলিত মানবের চিন্তার ধারা ক্রমে মুক্তি পাইয়া বিশ্বপ্রকৃতির রহস্যময় দুর্গম অন্তঃপুরে আলোকের প্লাবন আনিবার প্রয়াস পাইতেছে। যে-সকল দেবতা উপদেবতা এতদিন অজ্ঞান অন্ধকারে মানুষের স্কন্ধে ভর করিয়াছিল, আজ তাহাদের বিদায়ের পালা। বহুদিন পূর্ব্বেই বাসুকীর মস্তক হইতে পৃথিবীটাকে নামাইয়া তাহাকে নিষ্কৃতি দেওয়া হইয়াছে। সূর্য্যকে রথচ্যুত করিয়া স্থাণু ভাবে বসাইয়া, পৃথিবীটাকে সেকেণ্ডে উনিশ মাইল বেগে ছুটান হইতেছে। বজ্রহাতে ইন্দ্র ছুটি পাইলেন—তাঁহার আসন জুড়িয়া বসিল 'ইলেক্ট্রিসিটি'। ব্রহ্মাকে সৃষ্টির কাজ হইতে অবসর দেওয়া হইয়াছে, ক্রম-বিবর্ত্তনের ধারা (evolutionary process) না-কি সেই কাজ অনায়াসে করিতে পারে এবং করিয়া আসিয়াছে। এই সাম্রাজ্যের যুগে খেয়ালের রাজত্বের অবসান হইতে চলিল। সমস্ত বহির্জগৎ নিয়মের শৃঙ্খলে বাঁধা। কোথাও একটুকুও নড়চড় হইবার উপায় নাই। সৌরজগতের কোটি কোটি শশীভানুর অণু-পরমাণুটুকু হারাইবার ভয় নাই। চর্ম্মচক্ষে যাহা মানুষের অপদেবতার অপকর্ম্ম বলিয়া ভয় হইয়াছে, দেবতার আশিস্ ভাবিয়া আশ্বাস হইয়াছে অথবা প্রকৃতির অকারণ খেয়াল বলিয়া ধাঁধাঁ লাগিয়াছে—দূরবীক্ষণ বলিতেছে তাহা লোকলোকান্তরের প্রভাব, অনুবীক্ষণ প্রমাণ করিতেছে

জ্ঞানের জগতে দুই শ্রেণীর মানুষ দেখা যায়। একদল যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহাকেই চরম বলিয়া মানিয়া লইয়াছে। তাহার মধ্যেই তাহারা বাসা বাঁধিয়াছে, চারিদিকে দেয়াল তুলিয়াছে, পাছে সুস্পষ্ট জানার সীমার সহিত অজানার অস্পষ্টতা আসিয়া গোল বাধাইয়া দেয়। জ্ঞানের সংসারে ইহারা গৃহস্থ—সব অজানাকেই ইহারা জানার আসনে বসাইতে চায়, নূতন মাত্রকেই মানিয়া লইতে ইহারা পুরাতনের অনুশাসন খুঁজিয়া বেড়ায়। বিশ্বের সম্পদ্ যে জ্ঞান তাহা এ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইয়া উঠে। ক্ষেত্রবিশেষে তাহার সার্ব্বজনীনতা ঘুচিয়া গিয়া, তাহা কেবল স্বার্থান্বেষণের উপকরণমাত্র হইয়া দাঁড়ায়।

অন্যদল বসিয়া থাকিবার নয়। যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহার আনন্দ তাহাদের সম্মুখে লইয়া চলে। জানায় ও অজানায় ইহাদের জাতিভেদ নাই। তাই ইহাদের ধর্ম্মই চলা। জ্ঞান-জগতে ইহারা পথিক। নিত্য নূতন পথ পরিচয়েই ইহাদের আনন্দ, ইহাদের তৃপ্তি। ইহারা উপলব্ধি করিয়াছে, জ্ঞান কাহারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহে, সুতরাং এই ক্ষেত্রে হারাইবার কিছুই নাই, অথচ পাইবার আছে অনেক। যুগে [illegible] দেশে দেশে এই দুই শ্রেণীর মানুষ জন্ম লইয়াছে। [illegible] রেষারেষির মধ্য দিয়া চিরকাল জ্ঞানের [illegible]প্রসারণ হইয়াছে।

জীবাণুর অদৃশ্য শক্তিও অনেকাংশে তাহার জন্য দায়ী। শিক্ষিত লোক মাত্রেই নিঃসংশয়ে মানিয়া লয় যে, বাহিরের জগৎ কার্য্য-কারণের শৃঙ্খল নিয়ন্ত্রিত শক্তির লীলামাত্র।

মোটের উপর বলা যাইতে পারে বহির্জগতের অনেক সত্যই আজ শিক্ষিত জনসাধারণের পরিচিত, কিন্তু মনোজগৎ সম্বন্ধে কি সে কথা চলে? সে-ক্ষেত্রে আজও আমাদের গৃহস্থবৃত্তিই চলিতেছে। অতীতে আমাদের দেশে মনের কথা এত হইয়াছে, সুতরাং এ বিষয়ে জানিবার আর কি থাকিতে পারে? জ্ঞান যদি ব্যক্তিগত, কালগত ও জাতিগত না হয়, তবে প্রশ্নটা অসঙ্গত।

আমাদের মনের সহিত আমাদের পরিচয় আছে কি? উত্তর হইবে "আছে বই কি, আমাদের প্রতিদিনকার প্রত্যক্ষ পরিচয়।" আমার নিজের মনের কথা স্বয়ং যদি না জানি তবে কে জানে! হয়ত অন্তর্যামী জানেন, কিন্তু তাঁহার কথা ত এখানে হইতেছে না। মন কিন্তু কোন নিয়মে ধরা দেয় না। দেখ না, কবির মনে অকারণ পুলক হয়, কোলের শিশু অকারণ আনন্দে কলধ্বনি করে, গিন্নী খামকা রাগিয়া ওঠেন, জমিদার খামকা অত্যাচার করে, মায়ের মনে বিনা কারণে ভয় হয়, ঘুমের শেষে সকালবেলা অকারণ মনটা ম্লান থাকে, একটা গানের পদ, কোন একটা লোকের মুখ বা অতীতের কোন সুখস্মৃতি অকারণে মনে আনাগোনা করে— আরও কত কি মনটা করে, ভাবে, অনুভব করে যার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া দুঃসাধ্য। তবে খেয়ালের লীলা বাহিরের জগৎ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া মনোজগতে আসিয়া বাসা বাঁধিল।

সায়াল বলে - না, এখানেও নিয়ম আছে। তবে তাহার ধারা মানুষ এখনও সুস্পষ্ট বুঝিতে পারে নাই—তবে আরম্ভ হইয়াছে। খোঁজ চলিতেছে। কোথায় খোঁজা হইতেছে? যে যে ক্ষেত্রে মনের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার সর্ব্বত্র। মন যেখানে সহজ স্বাভাবিক সেইখানে, যেখানে রুগ্ন ও অস্বাভাবিক সেইখানেও; অপরিণত অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া যথাসম্ভব পরিণতির মধ্যে; মানুষের প্রতিদিনকার কাজেকর্মে, চালচলনে, ব্যবহারে, সাহিত্যে, শিল্পকলায়, ইতিহাসে, রূপকথায়, প্রাণিজগতে, পাগলাগারদে, আদিম মানবের রীতিনীতিতে, তথাকথিত সভ্যসমাজের সংস্কারে। তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে অপরিমিত, মনের প্রকৃতি ও ধর্ম সম্বন্ধে অনেক নূতন সত্যের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তথাপি এই কথা মানিতেই হইবে যে, অন্যান্য সায়ান্সের তুলনায় এক্ষেত্রে বৈষম্য অত্যধিক। নানা মুনির নানা মত। মতান্তরে তাঁহাদের মধ্যে মনান্তরও ঘটিয়াছে অনেক। গবেষকগণ এখন নিজেরাই প্রায় গবেষণার বিষয় হইয়া উঠিয়াছেন।

যাহা জনসাধারণের অকারণ বলিয়া মনে হয়, তাহারও কারণ আছে—তাহা 'গুহাস্থিত' সাধনালভ্য। যাহা-কিছু আজ আমার মনের খেয়াল বলিয়া মনে হইতেছে, যত্ন করিলে ঘটনাপরম্পরায় তাহার সূত্র আমাদের কাছে ধরা দেয়। আবার আপন হৃদয়-গহন-দ্বারে কান পাতিয়াও মনের গোপন-বাসীর কান্নাহাসির বারতা আমরা বুঝিতে পারি না। এই সব 'অকারণের' কারণ সন্ধান করিতে গিয়া এই সত্য বাহির হইয়া পড়িল যে, চেতনজগৎ মনোজগতের অতি অল্পাংশই জুড়িয়া আছে—মনের অধিকাংশই অচেতনের মধ্যে। পূর্ব্বে মন বলিতে চেতন-মন বুঝাইত। কিন্তু অধুনা মন কথাটি চেতন (conscious) কথাটি হইতে অনেক ব্যাপক। চেতন (the conscious) ও অচেতন (the unconscious) লইয়া এখানে মনোরাজ্যের সীমা। উৎসের বাহিরে যে প্রকাশ তাহার মূলে উৎসের অন্তরের অন্তঃসলিলা ধারার বিচিত্র লীলা। মনের বেলাতেও এই কথা সত্য। যতদিন উৎসতলের জলস্রোতের অস্তিত্ব মানুষের অগোচর ছিল, ততদিন তাহার বিচিত্র উচ্ছ্বাসকে মানুষের অকারণ খেয়াল বলিয়াই মনে হইয়াছে।

আমাদের অতীতের দিনগুলি তাহাদের সঞ্চিত স্মৃতির ভাণ্ডার লইয়া গেল কোথায়? কিশোর শৈশবের, যুবক কৈশোরের, প্রবীণ তার যৌবনবেদনারসে উজ্জ্বল দিনগুলিকে কি অন্যমনে ভুলিয়া থাকিতে পারে? কতক তাহারা ফিরিয়া পায়—কিন্তু বেশীর ভাগ যেন মনের কোন্ অতল তলায় তলাইয়া গিয়াছে যে. তার স্মৃতির আভাসটুকুও যেন আর নাই। সহজ অবস্থায় তাহাদের মেলা কঠিন। বিশেষ অবস্থার মধ্যে বা বিশিষ্ট পদ্ধতির মধ্যে তাহারা কিন্তু ধরা দেয়। এই বিস্মৃত স্মৃতির পথ ধরিয়া অধ্যাপক ফ্রয়েড 'চেতনে'র সীমা অতিক্রম করিয়া মনের 'অচেতনে' আসিয়া পৌঁছিলেন। তিনি প্রথম নির্দেশ করিলেন, বিস্মৃতি দুই প্রকারের

এক রকমের স্মৃতি আছে যাহারা মনের আগে চেতনার দ্বারে আসিতে বাধা পায় না। কিন্তু আর কতকগুলি বিস্মৃত স্মৃতি থাকে তাহাদের যেন 'চেতনে'র সীমানায় প্রবেশ নিষিদ্ধ। 'চেতন' তাহাদের বেলায় সতর্ক ব্যবধান যেন সৃষ্টি করিয়াছে—যেন তাহারা বিস্মৃতির অন্ধকার গহ্বর হইতে মাথা তুলিতে না পারে। এই যে মনের অন্ধকার বিস্মৃতির রাজ্য—ফ্রয়েড ইহারই নাম দিলেন 'অচেতন'। উৎসের যেমন অন্তরের প্রবাহই তার যথার্থ রূপ, বাহিরের ধারা তাহার সেই অন্তঃপ্রবাহের রূপান্তর মাত্র—ফ্রয়েডের মতে মনের প্রকৃত পরিচয় 'অচেতনে', 'চেতনে' নহে।

ফ্রয়েড মনোবিজ্ঞানে যুগান্তর আনিলেন। এতদিন মনোবিজ্ঞান শুধু মানুষের চেতনজগৎ লইয়াই ব্যস্ত ছিল, জ্ঞানের আসরে তার স্থান ছিল দর্শনের পরিষদরূপে, তাহার পশ্চাতে। এইবার যেন নিজের আসন নিজেই প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়াস পাইতে লাগিল—দর্শনের মুখাপেক্ষী হইতে সে তখন নারাজ। এই শতাব্দীতে তাহার দ্রুত পরিণতি আরম্ভ হইল। যে মানুষের মনকে এতদিন খেয়ালের ক্ষেত্র বলিয়া মনে করা হইত, এখন তাহার খেয়ালের পশ্চাতে নিয়মের সূত্র দেখা দিতে লাগিল। যে-স্বপ্নজাল ক্ষ্যাপামির নেশায় পাওয়া মানবমনের লীলা বলিয়া উপেক্ষিত হইত, বৈজ্ঞানিকেরা দেখাইতেছেন যে, তাহা অন্তঃস্থ 'অচেতন', আপনার নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হইয়া তাহা বুনিতেছে। অলৌকিক দৈবী শক্তির প্রভাব ভাবিয়া যেখানে আমাদের পিতা ও পিতামহেরা বিস্মিত ও ভীত হইয়াছেন, বিজ্ঞান প্রমাণ করিতেছে সেই শক্তি বাহিরের নহে, আমাদের মনের গোপন গুহায় তাহার জন্ম। মানসিক ব্যাধি ও বিকৃতি যাহার কারণ চিকিৎসকেরা খুঁজিয়া পাইতেন না, ফ্রয়েড সেখানে প্রথম পথ দেখাইলেন। বহির্জগতকে বিজ্ঞান যেমন কার্য্য-কারণ নিয়ন্ত্রিত প্রমাণ করিয়াছে, ফ্রয়েড প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ মনোজগতকেও তাহার অনুরূপ মনে করিতেছেন। এমন কি তাহারা মনোবৃত্তিসমূহের যে-সব নামকরণ (terminology) করিয়াছেন, তাহা দ্বারা মনের যান্ত্রিক স্বরূপই প্রতিপন্ন করিতেছেন। ইহার মধ্যে কি পরিমাণ সত্য নিহিত আছে তাহা এস্থলে বিচার্য্য নহে। অথচ দর্শনের 'আত্মা'র নেশার ঘোর কাটাইয়া, মনোবিজ্ঞান যখন বিজ্ঞানের সজীব রাজ্যে আসিয়া দাঁড়াইল তখন তাহার অগ্রগতি সহজ হইয়া উঠিল। পরিণত বিজ্ঞানের যে অবস্থা হয় মনোবিজ্ঞানের বেলায়ও তাহাই অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। নানাদিক দিয়া মানুষের কর্ম্মক্ষেত্রে এই বিজ্ঞানের নব আবিষ্কৃত তথ্যের প্রয়োগ আরম্ভ হইল। জ্ঞান-পথিক যাঁহারা, অভিনবের মত্ত উৎসাহে সহজ পথ হইতে অনেকে ভ্রষ্ট হইলেন। সাবধানী জ্ঞান-গৃহস্থেরা এই বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিকদের উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিলেন। যেহেতু সত্যগুলি তাঁহাদের সংস্কার-অবসন্ন মনের উপর কঠিন আঘাত করিল, তাঁহারা ভাবিলেন নীতি ও ধর্ম্মের ধামা দিয়া এই আগুনকে তাঁহারা চাপা দিবেন। পাশ্চাত্য সমাজে ও ধর্ম্মে এই দোটানায় বিপ্লব বাধিয়া গেল। লাভ ক্ষতির হিসাব-নিকাশের এখনও হয়ত সময় হয় নাই।

চিকিৎসাবিজ্ঞানে বৈজ্ঞানিকগণ যেমন নূতন পথ দেখাইলেন শিক্ষাক্ষেত্রে তাহারা চির-অবজ্ঞাত সহজ পথটিকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন—"এই পথ।" যে-শিক্ষার গর্ব্ব সভ্যসমাজ করিয়া আসিতেছে, দেখা গেলে তাহাতে মানুষের মনের বিকাশ অপেক্ষা বিকৃতি হইয়াছে অধিক। শিক্ষার নিকেতনগুলি তাহাদের কারখানা পদ্ধতিতে যেসব মানুষ তৈয়ার করিতেছে, তাহাদের অনেকেরই জীব-প্রকৃতি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাহাদের বাহিরের পালিশ নয়নশোভন হইলেও হইতে পারে, কিন্তু তাহাদের অন্তরের সঞ্জীবনী উৎস একেবারে শুকাইয়া যায়। কোমল শিশুচিত্ত শিক্ষার শাসনে ক্রমাগত পীড়িত হয়—কেহ-বা পলাইয়া রক্ষা পায়, কেহ-বা এই গুরুভাবের চাপে ভাঙিয়া পড়ে!

অথচ এই যে সহজ বিকাশের আদর্শ ইহা বাংলা দেশে নূতন আমদানি হইয়াছে একথা মানিতে পারা যায় না। বিগত চল্লিশ বৎসর ধরিয়া রবীন্দ্রনাথ বার বার এই পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। নির্দ্দেশ করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহার চেষ্টা, কর্ম্মক্ষেত্রেও প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি যে তাহার আদর্শ ইউরোপ হইতে পাইয়াছেন তাহা মনে হয় না। বরঞ্চ তাঁহার চিন্তা ও ভাবের বিকাশ প্রাচীন ভারতের এবং বাংলার বাউলদের ভাবধারার অনুক্রম হওয়াই সম্ভব। পুরাতন ভারতের শিক্ষাপ্রণালীও এই সহজ পথকে অতিক্রম করে নাই। কাল পরিবর্ত্তনের সহিত মানুষের

রক্ষা করিয়া সেই আদর্শকে গ্রহণ করিবার চেষ্টা যে তিনি করিয়াছেন—তিনি স্বয়ং একাধিক বার উল্লেখ করিয়াছেন। বাউলদের ভাবধারার সম্বন্ধে একটু আভাস দেওয়া এখানে হয়ত অবান্তর হইবে না। তথাকথিত শিক্ষা হইতে বঞ্চিত ও স্থলবিশেষে নিরক্ষর বাংলার বাউলদের গানে মানুষের মনের পরিকল্পনাটির আধুনিক মতের সহিত খুবই মিল আছে। বাহিরের জগতে 'অর্গ্যানিজমে'র ধর্ম্মে বা জৈবধর্ম্মে মনোবৃত্তির আভাস তাঁহারা পাইয়াছেন। 'নিঠুর গরজী'র গরজে 'মানস মুকুল' পীড়িত হয়, বিকশিত হয় না—তাহাকে ফুটাইতে হইলে তাহার সহজ পথে বিঘ্ন ঘটাইলে চলিবে না। সেই ধীর প্রতীক্ষা চাই। তখন মানস মুকুল আপনি ফুটিয়া উঠে, তাহার বাস বিশ্বে ছড়াইয়া পড়ে। সহজ পথের পথিক বলিয়া বাউলেরা নিজেদের "সহজিয়া" বলিয়াছেন। যে বিকাশে বিচিত্র মনোবৃত্তির সহজ সমন্বয় তাহাকেই ধর্ম্ম বলিয়াছেন। ইহাতে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ নাই, কৃচ্ছ্রসাধন নাই,—আছে নানা বৈষম্যের পরিসমাপ্তির গভীর আনন্দ। আধুনিক মনোবিজ্ঞান মনের পূর্ণ পরিণতির যে পথ নির্দ্দেশ করে এই পথের সহিত তাহার বিশেষ অনৈক্য নাই।

বিজ্ঞান ধীরপদক্ষেপে একাধিক শতাব্দীর বিচরণের যেখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, কবি তাঁহার দিব্য দৃষ্টিতে ফলে সেই ক্ষেত্রের দিকেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পৃথক পথে তাঁহারা একই তীর্থে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। ইউরোপে ও আমেরিকায় নবশিক্ষা প্রচেষ্টা (The New Education Movement) খুব বেশী দিনের ঘটনা নহে। সেখানে পুরাতন পন্থী বা জ্ঞানগৃহস্থদের সহিত বিরুদ্ধতা আজও প্রবল। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাক্ষেত্রে বোধ হয় সমাজমনের এই প্রবৃত্তির জন্য বিশেষ আনুকূল্যতা পান নাই। এমন কি যাঁহারা তাঁহার সহায়তায় ব্রতী অনেক ক্ষেত্রে অন্তরের অভ্যাসবশে নিজের অগোচরে শিক্ষার আদর্শের তাঁহারা প্রতিকূলতা করিয়াছেন। প্রতিকূলতার আর একটি কারণ থাকিতে পারে। এস্থলে তাহার বিশদ আলোচনা সম্ভব নহে, তথাপি তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে। আধুনিকতার নামে পাশ্চাত্য সমাজ এমন অনেক কিছু ঘটিতেছে যাহাতে আমাদের সুধী সমাজ বিচলিত হইতে পারেন। ও-দেশেও মনীষি-মনের উপর প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। আমেরিকার বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যাহারা নিজেদের অত্যন্ত আধুনিক বলিয়া গর্ব্ব করে, কার্য্যতঃ যে-প্রণালীতে শিক্ষার্থীদের গঠন করিতেছে তাহা সুস্থ কি-না সে সম্বন্ধে পাশ্চাত্য চিন্তাশীল ব্যক্তিগণও সন্দিহান হইয়া উঠিতেছেন। স্বাধীনতার নামে উচ্ছৃঙ্খলতা ও অভদ্রতা, অভিজ্ঞতার অজুহাতে উত্তেজনার মাদকতায় মনকে মত্ত করিয়া রাখা, সহজ হইবার জন্য মানবের আদিম অবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তন আত্মোপলব্ধির আড়ালে সঙ্কীর্ণ স্বার্থসিদ্ধি ইত্যাদি নানা উপসর্গ আধুনিকতার দেহে দেখা দিয়াছে। ভীত হইবার কারণ হয়ত যথেষ্ট বর্ত্তমান।

কিন্তু যে পথে আমাদের ডাক আসিয়াছে, তাহা আধুনিক পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ বা অনুসরণ নহে। বহু শতাব্দীর সাধনার ফলে ভারতের চেষ্টা যে সকল সত্য উপলব্ধি করিয়াছে সেই ভিত্তির উপরেই এই নূতনের প্রতিষ্ঠা। পাশ্চাত্যের অভিজ্ঞতার ফল আমরা গ্রহণ করিতে পারি, কিন্তু আমাদের সমস্যার সমাধান সে দেশের সমাজের আদর্শে নহে। আজ আমরা যখন জীর্ণ পুরাতনের উপর আঘাত করিতেছি, তখন ধ্বংসের উন্মত্ততায় সৃষ্টির আদর্শ যেন আমাদের মন হইতে লুপ্ত না হইয়া যায়। এ দেশে শিক্ষার ব্রত যাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন, সৃষ্টির দায় তাঁহাদেরই। সকলের একান্ত সমবেত চেষ্টায় নীরস ক্ষেত্রগুলিকে সরস করিয়া তোলা অসম্ভব নহে। শিক্ষার কেন্দ্রগুলি ভাঙিয়া নূতন করিয়া গড়িবার সামর্থ্য হয়ত আমাদের নাই—বাহিরের বাধাও বিস্তর। এবং আমাদের অধিকাংশই যে প্রণালীতে বর্দ্ধিত, নূতন পথে চলিবার প্রাণপণ প্রয়াস সত্ত্বেও, নিজের অগোচরে সেই চিরাভ্যস্ত পথেই মন নামিয়া আসে। নূতন আদর্শকে গ্রহণ করিবার সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন অন্তরায় আমাদেরই অন্তরে—আমাদেরই জীর্ণ সংস্কার।

সন্ধি

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ

চতুর্থ খণ্ড

নীহারিকার কথা

৪

এইরূপে প্রায় দুই মাস অতীত হইল। এখন আমার অনেকটা সাহস হইয়াছে। তবে শঙ্কর এখনও আমাকে সঙ্গে করিয়া স্কুলে লইয়া যায়, কোন কোন দিন আমাদের বাড়িতেও আসে, কিন্তু প্রায় প্রতিদিনই ট্রামে উঠিবার সময়ে ফুটপাথে তাহাকে দেখিতে পাই। ফিরিবার বেলা প্রায় প্রতিদিনই আমি একলা আসি। হেড মিষ্ট্রেস্ মিস্ কাঞ্জিলালের খিটখিটে স্বভাব সেইরূপই আছে, তবে আমি পূর্ব্ব হইতে অনেকটা সহনশীল হইয়াছি বলিয়া কোন রকমে কাজ চালাইতেছি।

একদিন সকালে সাড়ে নয়টার সময় আহারাদি শেষ করিয়া আমি স্কুলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইতেছি, এই সময় হঠাৎ কিশোর আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি তাহাকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম, "কিশোরবাবু যে! আপনি আজ কি ক'রে এলেন? আমি হিসাব ক'রে দেখেছিলুম আর দুদিন পরে আপনার খালাস হওয়ার কথা ছিল। আমরা দুই ভাইবোনে সকলে মিলে জেলখানার গেট পর্য্যন্ত গিয়ে আপনাকে অভিনন্দন ক'রে আনব এরূপ ঠিক ছিল।"

কিশোর হাসিয়া বলিল, "তবে আপনাদের—তোমাদের ফুলের মালা পাওয়ার জন্যে আমার আরও দুই দিন জেলে থেকে আসা উচিত ছিল, কেমন?"

আমি লক্ষ্য করিলাম, কিশোর আমাকে এই প্রথম "তুমি" বলিয়া সম্বোধন করিল। ইহা বোধ হয় সেই জেলে যাওয়ার দিন আমার মাল্যদানের ফল। আমি মনে মনে একটু হাসিলাম। পরে বলিলাম, "না, তা হবে কেন? আমরা আপনাকে কারামুক্ত দেখে অত্যন্ত সুখী হলুম। ও প্রমীলা—দাদা কোথায়? তোরা আয় দেখে যা, কিশোরবাবু এসেছেন।"

আমার ডাক শুনিয়া প্রমীলা বাহির হইয়া আসিল। দাদা তখন খাইতেছিল।" এই সময় আমাকে স্কুলে লইয়া যাইবার জন্য শঙ্কর আসিয়া উপস্থিত হইল। কিশোরকে দেখিয়া শঙ্কর আনন্দের আতিশয্যে তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিল।

আমি ঘড়ির দিকে তাকাইয়া বলিলাম, "কিশোরবাবু, আপনি শুনে আশ্চর্য্য হবেন, আমি একটা চাকরি নিয়েছি। ভবানীপুরে একটা মেয়েদের স্কুলে টীচারি। শঙ্কর-দা আমাকে প্রত্যহ সঙ্গে ক'রে নিয়ে যান। আমার হেড মিষ্ট্রেস্ ভয়ানক দুর্দ্দান্ত লোক, পাঁচ মিনিট দেরি হ'লে আর রক্ষা থাকে না। সুতরাং আমি এখন আর দেরি করতে পারছিনে। আপনি বসুন, দাদার সঙ্গে দেখা করুন। আর সন্ধ্যের পর আসবেন, তখন সব খবর শোনা যাবে। রাত্রে এখানেই খাবেন। বুঝলেন ত? শঙ্কর-দা চলুন তবে, আর দেরি করা যায় না। আপনাদের দুই বন্ধুর বিশ্রম্ভালাপের বিস্তর অবসর পাবেন।"

এই বলিয়া আমি বাহির হইয়া পড়িলাম। শঙ্কর আমার পিছনে পিছনে বাহির হইল। আমার কথা শুনিয়া কিশোর হতভম্বের মত বসিয়া রহিল। আমি প্রমীলাকে তাহার কাছে বসিয়া আলাপ করিতে ইঙ্গিত করিলাম।

সন্ধ্যার পর সাতটার সময় কিশোর আসিল। আমি তাহাকে ও দাদাকে খাইতে দিলাম, প্রমীলা তাহাদের কাছে বসিয়া খাওয়াইতে লাগিল। তাহাদের খাওয়া শেষ হইলে আমি প্রমীলাকে লইয়া খাইতে বসিলাম। তাহারা দুই জনে লাইব্রেরীতে বসিয়া পান খাইতে লাগিল ও নানা গল্প করিতে লাগিল। আমার খাওয়া শেষ হইলে আমি সেখানে যাইতেই দাদা উঠিয়া গেল, আমি সেখানে বসিলাম। ঘরের দরজা খোলা রহিল।

আমি কিশোরকে আর একটা পান দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম —"জেলখানায় কেমন ছিলেন, কিশোরবাবু?"

কিশোর পান খাইতে খাইতে বলিল, "ভালই ছিলাম।"

"খাওয়া-দাওয়ার বোধ হয় খুব কষ্ট হয়েছিল?"

"তুমি যতটা শুনেছিলে ততটা নয়, পলিটিক্যাল কয়েদীদের জন্য আলাদা বন্দোবস্ত।"

"কি কাজ করতেন?"

"কাজ কিছুই ছিল না। আমরা সকলে মিলে বেশ ফূর্ত্তিতে ছিলাম। শুনলাম আমি যাওয়ার আগে, কয়েক জনকে বাগানের জঙ্গল পরিষ্কার করতে দিয়েছিল। তারা জঙ্গল ত কেটেইছিল, তার সঙ্গে সঙ্গে বেগুন, লাউ, কুমড়া, ঢেঁড়স ইত্যাদি তরকারীর গাছও কেটে বাগান সাফ্ করেছিল। জেলর ধমক দিলে বলল, 'আমরা ত জানি, মশায়, এসবই জঙ্গল,—তোমার লাউ কুমড়া গাছ চেনে কে?' সেই অবধি তাদের কাজ করা রহিত হ'ল।"

"বেশ মজা ত। আপনাদের সময় কাটত কি করে?"

"এই গান, গল্প, অভিনয়, বক্তৃতা এসব খুব চলত।"

"আমি দাদার কাছে জেলখানার আরও যেরূপ ভয়াবহ বর্ণনা শুনেছিলুম, তা শুনে আমার রক্ত জল হয়ে গিয়েছিল।"

"সেই জন্যে বুঝি রাত্রে মাদুরে শুয়ে মশার কামড় খেয়েছিলে, আর মাছ দুধ খাওয়া ছেড়েছিলে।"

"এসব বুঝি দাদার কাছে শুনেছেন। ঐ একদিনমাত্র প্রায়শ্চিত্ত করেছিলুম, পরে দাদা জেলখানায় গিয়ে আপনাকে দেখে এসে যখন বললে, আপনার কোন কষ্ট নেই, তখন সে-সব ছেড়ে দিলুম।"

"কষ্ট ত আমার কিছুই হয় নাই, হ'লেও তুমি জেলে যাবার সময় আমার গলায় যে মালা পরিয়ে দিয়েছিলে সেই মালা ধারণ ক'রে আমি হাজার কষ্টও হাসিমুখে সহ্য করতে পারতাম। যাক্ সে কথা। তুমি চাকরি করতে গেলে কেন?"

"আমার কলেজে যাওয়া বন্ধ হয়েছে, তা বোধ হয় শুনেছেন। আপনাকেও ত আর কলেজে পড়তে দেবে না শুনলুম।"

"হাঁ, সুকুমার বলছিল বটে।"

"আমাকে ত ভবিষ্যতের জন্যে একটা রোজগারের পথ ধরতে হবে, আমি কারও গলগ্রহ হয়ে থাকতে চাই নে।"

"কেন, তোমাকে ত মা আমার হাতে সঁপে দিয়ে গিয়েছেন, তোমাকে সে ভাবনা ভাবতে হবে কেন?"

এই কথা শুনিয়া আমি একটু চিন্তা করিয়া বলিলাম, "দেখুন কিশোরবাবু, আপনার সঙ্গে আমার সব কথা পরিষ্কার হয়ে যায় সেই ভাল। আমি ইতিমধ্যে আপনার জীবনে যথেষ্ট লাঞ্ছনা ঘটিয়েছি, তাহাতে আপনার ক্ষতিও হয়েছে; আমি আর সেরূপ করতে চাইনে। এই দেখুন, মার যে আমাকে আপনার হাতে সঁপে দেওয়া আমি এ-সব আইডিয়া (ভাব) মোটেই পছন্দ করি না। আমি গরু-ভেড়া নই যে একজন আমাকে আর একজনের হাতে দিয়ে যাবে। আমিও মানুষ। আমারও একটা স্বাধীন মতামত আছে। আমি এসব সেকেলে ভাব মানিনে। একজন পুরুষ মানুষ কয়েকটা মন্ত্র পড়ার জোরে যে একজন নারীর স্বামী, পতি, ভর্ত্তা ইত্যাদি অপমানসূচক নাম গ্রহণ ক'রে তার দেহমন আত্মার মালিক হয়ে দাঁড়াবে, সে নারীর আর কোন স্বাধীনতা থাকবে না—এসব ভাব সম্পূর্ণ সেকেলে। এসব ভাব এই নারীপ্রগতির যুগে সম্পূর্ণ অচল। পুরুষ ও নারীর মিলন সম্পূর্ণ পরস্পরের স্বেচ্ছাধীন হওয়া উচিত। নারী পুরুষের সঙ্গে মিশতে পারে তার বন্ধুভাবে—"

কিশোর বলিল, "যেমন শঙ্কর দার সঙ্গে তোমার মেশামিশি চলছে।"

এই কথা শুনিয়া আমার অত্যন্ত রাগ হইল। আমি ভ্রূভঙ্গি করিয়া বলিলাম, "বটে! শঙ্কর যে আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু, দুই জনের এক আত্মা এক প্রাণ শুনেছিলুম, তার উপরে আপনার হিংসা হয়েছে দেখছি। আপনার এইরূপ মনোভাব প্রশংসনীয় নয়, কিশোরবাবু।"

কিশোর উত্তেজিত হইয়া বলিল, "শঙ্করের সৌভাগ্যে হিংসা করবার আমি কে? শঙ্কর ধনী পিতার সন্তান, তার জীবনে যথেষ্ট আশাভরসা প্রস্পেক্ট আছে, সে দেখতে সুপুরুষ,—আর আমি নির্দ্ধন, আমার যৌবনের যে আশাভরসা ছিল তা মাটি হয়েছে, আমার চেহারাও ভাল নয়—আমি কি তাকে হিংসা করতে পারি? তবে তুমি জেন তোমার উপর আমার একটা অধিকার আছে নীরু—সেই অধিকারের বলেই আজ আমি তোমাকে নাম ধরে ডাকছি—তোমার মা'র বাগ্‌দানের কথা ছেড়ে দিলেও আমি প্রথম দর্শনেই তোমাকে ভালবেসেছি,—সে ভালবাসা আমার প্রাণে আগুনের রেখায় গভীর দাগ কেটে দিয়েছে, তা কখন লুপ্ত হবে না, চাই তুমি আমাকে বিয়ে কর আর নাই কর।"

আমি ধীরভাবে বলিলাম, "কিশোরবাবু, উত্তেজিত হবেন না, আমি আপনাকে স্পষ্টই বলছি, আমি শঙ্করকে বিয়ে করতে ইচ্ছা করিনি, আমি কাহাকেও বিয়ে করব না। আমি আজীবন কুমারী থেকে আমাদের নারীজাতির উন্নতিসাধন ও

দেশের কাজে মনপ্রাণ উৎসর্গ করব, এই আমার সঙ্কল্প। আর আপনি যে ভালবাসার কথা বললেন, আমার তাতে কোন আস্থা নেই। আমার বিশ্বাস স্ত্রী পুরুষ—মানুষমাত্রেই কেবল নিজেকে ভালবাসে, অন্যকে যে ভালবাসার ভাণ করে সে নিজের জন্যেই। মানুষমাত্রেই সুবিধাবাদী। আপন আপন সুখস্বচ্ছন্দতার জন্য স্ত্রী পুরুষ মিলিত হয়—একসঙ্গে বাস করে, সন্তানও হয়, আবার কোন কারণে অসুবিধা হ'লে সে সম্বন্ধ ভেঙে যায়; অন্য দেশে আইনের বলে একদম পৃথক হয়ে যায়, আর আমাদের দেশে মনে মনে পৃথক হলেও ধর্ম্মের নামে বা সমাজের শাসনে একত্র থাকতে বাধ্য হয়। এরই নাম ত বিবাহ?"

কিশোর বলিল, "কিন্তু প্রেমের আকর্ষণ, প্রেমের বন্ধন কি কিছু নেই? নচেৎ একজনের জন্য আর একজন প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত হয় কেন?"

"প্রেমের আকর্ষণ কাকে বলেন? সে ত রূপের আকর্ষণ। ফুলের লাল রং দেখে প্রজাপতি আকৃষ্ট হয়, ময়ূরের বিচিত্র বর্ণের লম্বা লেজ দেখে ময়ূরী আকৃষ্ট হয়, সিংহের কেশর দেখে সিংহী আকৃষ্ট হয়—এ ত সারা বিশ্বে একই প্রকৃতির খেলা চলছে। আমার এই ফরসা রং দেখে রাস্তার লোকে হাঁ ক'রে তাকিয়ে থাকে, আবার আপনিও একদিন মা'র রোগশয্যার পাশে বসে তাকিয়ে ছিলেন। এ ত রূপের মোহ, মরুভূমিতে মৃগতৃষ্ণার ন্যায় এই রূপের মোহেই সকলে ভুলে আছে। এর মধ্যে প্রেম কোথায়?"

"প্রেম কোথায় তা তুমি বুঝবে না। তোমার হৃদয় দেখছি একেবারে পাষাণ—'পাষাণে নাস্তি কর্দ্দমঃ'—আমি যে তোমার মুখপানে তাকিয়ে ছিলাম, সে রাস্তার লোকের মত রূপের নেশায় নয়; মা যে আকর্ষণে তাঁর কুৎসিত ছেলের মুখ দেখেন ও সুখ পান সেই আকর্ষণে। তুমি দেশ-বিদেশের কবির লেখা কত কাব্য উপন্যাস ত পড়েছ, তাতে প্রেমের মহিমা কি দেখ নাই? আমাদের দেশের কোন স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসা কি লক্ষ্য কর নাই? তোমাদের এ বাড়িতেও ত সুকুমার ও প্রমীলার মধ্যে বিবাহের পর প্রেম কি প্রকারে জমে উঠেছে তাও লক্ষ্য কর নাই?"

"লক্ষ্য কিছু কিছু করেছি বইকি।"

"আমি অল্প কয়েক দিন এ-বাড়িতে যাতায়াত ক'রে তা বিলক্ষণ বুঝেছি। কিন্তু তুমি ধারকরা কতকগুলি মতবাদের আবর্জ্জনা দিয়ে তোমার অন্তরকে ঢেকে রেখেছ, সেই সকল কাঁটাবনের মধ্যে পড়ে তোমার হৃদয়ের স্বাভাবিক প্রেমকুসুম দল মেলতে পারছে না। পাথরের প্রাচীরের অন্তস্তলে প্রেম-নির্ঝরিণী চাপা পড়ে আছে, প্রাচীর ভেঙে দিলে সে স্নিগ্ধ সুশীতল রূপ ধারণ ক'রে প্রবাহিত হবে। তুমি যে রূপের আকর্ষণের কথা বললে, জীবজগতে তারও আবশ্যকতা আছে। উদ্ভিদের ফুলসকল উজ্জ্বল বর্ণদ্বারা পরাগরেণুবাহী পতঙ্গদের আকর্ষণ করে, নিম্ন প্রাণীদের মধ্যেও রূপের আকর্ষণে স্ত্রী-পুরুষ মিলিত হয়, কিন্তু সৃষ্টিরক্ষার কাজ শেষ হলেই সে আকর্ষণ আর থাকে না। মানুষের মধ্যেও রূপের আকর্ষণ স্ত্রী ও পুরুষকে মিলিত করে, কিন্তু পরে তা প্রেমের আকর্ষণে পরিণত হয়। সুতরাং তুমি প্রেমকে একেবারে উড়িয়ে দিতে পার না।"

"কিন্তু প্রেমে পড়লে মানুষের স্বাধীনতা থাকে না, সুতরাং প্রেম মনুষ্যত্বের অন্তরায়।"

"কেন স্বাধীনতা থাকবে না? কোন কোন বিষয়ে স্ত্রী যেরূপ স্বামীর অধীন, স্বামীও সেইরূপ অনেক বিষয়ে স্ত্রীর অধীন। উভয়ের দাম্পত্য প্রেম জন্মিলে উভয়ের মিলিত ইচ্ছায় সব কাজ সম্পন্ন হয়। তবে একত্র থাকতে গেলে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে সময় সময় দুই জনের মধ্যে মতভেদ হয় বইকি? এক বাড়িতে থাকলে সেইরূপ ভাই-বোনের মধ্যেও হয়, কিন্তু প্রেমের বলে সে পার্থক্য মিটে যায়। প্রেম মনুষ্যত্ব লাভের অন্তরায় নয়, বরং সহায়। প্রেম স্বার্থত্যাগ শিক্ষা দেয়, তাহা দ্বারাই মনুষ্যত্ব বিকাশ লাভ করে।

"কিন্তু আমি ত দেখতে পাই, পুরুষ স্ত্রীকে বিয়ে ক'রে এনে তাকে খাঁচার মধ্যে পোরে, তখন সে আর ইচ্ছামত কোথাও যেতে পারে না—এমন কি, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গেও মিশতে পারে না। শঙ্করবাবু ত আপনার প্রাণের বন্ধু, অথচ সেই শঙ্করবাবু আমাকে স্কুলে নিয়ে যান ব'লে আপনার ঈর্ষ্যা হয়েছিল, তবু ত আপনি আমাকে এখনও বিয়ে করেন নি।"

"বন্ধুত্ব ও দাম্পত্য প্রেমের মধ্যে অনেক পার্থক্য। ভিক্টর হিউগো বলেছেন,—Two friends *meet* in friendship, but two lovers *mingle*—বন্ধুর সহিত বন্ধুর মিলন হয়, তাহারা উভয়ে প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হ'তে পারে, আবার ঘটনা-

ক্রমে সে সূত্র ছিন্নও হ'তে পারে। কিন্তু দম্পতি প্রেমের দ্বারা একে অন্যের সহিত মিশে যায়,—যেমন দুই খণ্ড সোনা আগুনের তাপে গ'লে এক হয়, সেইরূপ দুইটি হৃদয় প্রেমাগ্নিতে গ'লে এক হয়ে যায়। তখন আর তাদের পৃথক করা যায় না। এই প্রেমের ধর্ম্ম আত্মসমর্পণ। সেইজন্য ইহা প্রেমাস্পদকে অন্যের সঙ্গে ভাগাভাগি ক'রে নিতে চায় না। আমি যাকে আত্মসমর্পণ করেছি, সে কেন অন্যের হবে, এরূপ ভাব ত স্বাভাবিক। একে তোমরা ঈর্ষা, হিংসা, জেলাসি (jealousy) বল আর যাই বল, এ-প্রকৃতি নিন্দনীয় নয়। তার পর, বিয়ে হ'লে স্ত্রীর স্বাধীনতা ত অনেকটা খর্ব্ব হবেই, গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালন করতে হ'লে স্বেচ্ছাচার চলে না। তবে আমাদের সমাজে যতটা কড়াকড়ি আছে, ততটা না-থাকাই উচিত। আমরা আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায় ইচ্ছা করলে তা শিথিল করতে পারি—অনেক পরিবারে কোন কোন স্থানে শিথিল হয়েছেও।"

"যে-বিবাহ দ্বারা নারীর স্বাধীনতা খর্ব্ব হয়, নারী তার জন্মগত অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়, আমি তার আবশ্যকতা স্বীকার করি না।"

"স্ত্রী ও পুরুষ লাইক্ দি টু পোল্স্ অব্ এ ম্যাগ্নেট্ এক খণ্ড চুম্বকের দুইটি বিপরীত ধ্রুবের ন্যায়) পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করবেই। ইহাই স্বভাবের নিয়ম বিবাহ না হ'লেও তারা মিলিত না হ'য়ে থাকতে পারে না। সেই জন্যে বনের পশু ও অসভ্য বর্ব্বর মানুষ ভিন্ন সকল সময়ের সকল মানুষই সমাজের মঙ্গলের জন্যে বিবাহের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার ক'রে এসেছে। তোমার নারী-প্রগতির অর্থ কি তবে মানুষের বর্ব্বরতা ও পশুত্বে ফিরে যাওয়া? আর স্বাধীনতা তুমি কা'কে ব'ল? এ-সংসারে বাস ক'রে কোনো মানুষই যার যা ইচ্ছা সে তা কখনও করতে পারে না। সুতরাং পুরুষ বল, স্ত্রীলোক বল, কারও প্রকৃত পক্ষে স্বাধীনতা নেই এই যে তুমি ভবানীপুরে মেয়েদের স্কুলে সামান্য একটা চাকরি নিয়েছ, সেখানে তোমাকে হেড্ মিষ্ট্রেসের ভয়ে কত সন্ত্রস্ত হয়ে চলতে হয়। এইরূপে সংসারে আমাদের প্রত্যেক কাজে, যেখানে অন্যের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ রেখে চলতে হয়, সেখানেই অন্যের ইচ্ছা দ্বারা আমাদের স্বাধীনতা খর্ব্ব না হয়ে থাকতে পারে না। পারিবারিক জীবনেও সেই কথা। বিবাহ না করলেই তুমি সব বিষয়ে স্বাধীন ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করবে, তা কখনও মনে ক'রো না। তবে এক বিবাহের বেলাই স্বাধীনতা গেল-বল কেন?"

"কিন্তু বিবাহ করলে নারীকে পুরুষের হাতে লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়, সকল পুরুষ ত সমান নয়।"

"আমার মতে বিবাহ না করলেই বরং নারীকে নানা লোকের হাতে অনেক বেশী লাঞ্ছনা ভোগ ও অপমান সহ্য করতে হয়। স্বামী নারীকে সেই সকল লাঞ্ছনা ও অপমান থেকে রক্ষা করে। বিবাহিতা নারীকে লোকে সম্মান না ক'রে থাকতে পারে না।"

"কিন্তু স্বামীর হাতের লাঞ্ছনা থেকে তাকে কে রক্ষা করবে?"

"স্বামীর হাতের লাঞ্ছনা খুব কম স্ত্রীলোকই ভোগ করেন, যিনি করেন সেটা তাঁর ভাগ্যের দোষ, তাঁর কর্ম্মফল। তা' বাস্তব জীবনে হাজারের মধ্যেও একটি মেলে কিনা সন্দেহ। এগুলি সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। একটি যুবক বি-এ পাস করেও কোন প্রকারে টাকা রোজগার করতে না পেরে মনের দুঃখে আত্মহত্যা করেছিল, তাই ব'লে কি আর সব ছেলেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া ছেড়ে দেবে?"

আমি এই তর্কের অবসান করিবার জন্য সব শেষে বলিলাম, "দিবাকর শর্ম্মা যে একজন ঘোর তার্কিক, তা আমি পূর্ব্বেই জেনেছি। এখন আপনার নিজের কথা বলুন। আপনি এখন কি করবেন?"

কিশোর বলিল, "আমি এখন দেশে যাব, মাকে অনেক দিন দেখি নাই। তার পর, দাদা এখানে এসেছিলেন, তাঁর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে আমার ভবিষ্যতের কর্ত্তব্য স্থির করতে হবে। তোমাকে অনেক জ্বালাতন করলাম, কিছু মনে ক'রো না, নীরু। আমি যে কথাগুলি বললাম, এগুলি আমার অন্তরের কথা, তুমি এগুলি একটু ভেবে দেখো।"

আমি বলিলাম, "আবার কলকাতায় এলে এখানে আসবেন।"

কিশোর বলিল, "তা বলতে পারি নে। হয়ত তোমার সঙ্গে এ জীবনে আর দেখা না-ও হ'তে পারে। তবে এখন আসি।"

এই বলিয়া কিশোর ছলছল নেত্রে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং একবার করুণ দৃষ্টিতে আমার পানে তাকাইয়া অশ্রু গোপন

করিবার জন্ম তাড়াতাড়ি ঘরের বাহির হইয়া গেল। আমিও অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলাম না। একবার মনে হইল, তাহাকে ডাকিয়া ফিরাই। কিন্তু আমার এই আকস্মিক দুর্ব্বলতায় লজ্জিত হইয়া বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িলাম।

৫

পরদিন সকালে দাদার সঙ্গে দেখা হইলে দাদা বলিল, "তুই কিশোরকে কি বল্‌লি? সে আবার আসবে না?"

আমি বলিলাম, "আমি তাঁকে বলেছি আমি বিয়ে ক'রব না। তিনি বোধ হয় আর এখানে আসবেন না।"

দাদা রুষ্ট হইয়া বলিল, "তুই একটা মস্ত ভুল করলি। এর জন্যে পরে অনুতাপ করতে হবে। মার মৃত্যুশয্যার আদেশ, তাও তোর কাছে কিছুমাত্র গণ্য হ'ল না।"

আমি বলিলাম, "দাদা, আমি ওসব সেন্টিমেণ্ট (ভাবপ্রবণতা) মানি নে। আমি যে ভাবে আছি, এই ভাবেই বেশ কেটে যাবে। আমার বিয়ের জন্য তুমি ব্যস্ত হয়ো না।"

আমার দিন সেই ভাবেই আরও কতক দিন কাটিত। ইতিমধ্যে একদিন মহা বিভ্রাট উপস্থিত হইল।

অন্য দিনের ন্যায় সেদিন শঙ্করের সহিত আমি বেলা সাড়ে দশটার সময় স্কুলে গেলাম। হেড মিষ্ট্রেস আমাকে তাঁহার ঘরে ডাকাইয়া বসিতে বলিলেন। তাঁহার সঙ্গে আমার এইরূপ কথাবার্ত্তা হইল:—

মিস্ কাঞ্জিলাল আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "শোন, আমাকে বাধ্য হয়ে তোমাকে একটা কথা ব'লতে হচ্ছে। আমাদের এই স্কুলের সুনামের জন্য আমি দায়ী। এই স্কুলের যাঁরা সব টীচার আছেন, তাঁদের সুনাম ও সচ্চরিত্রের উপরই স্কুলের সুনাম নির্ভর করে। তাঁদের স্বভাব চরিত্র দেখেই মেয়েরা শিক্ষা লাভ করে, সুতরাং তাঁদের চরিত্রে যাতে কোনরূপ কলঙ্ক বা সন্দেহ স্পর্শ না করে আমাকে তা দেখতে হবে।"

আমি বিরক্ত হইয়া বলিলাম, "আপনি আমাকে এসব কথা কেন বলছেন?"

তিনি বলিলেন, "তোমার সম্বন্ধেই ত কথা উঠেছে, তোমাকে ব'লব না তবে কাকে ব'লব? ঐ যে যুবকটি তোমাকে সঙ্গে ক'রে প্রত্যেক দিন স্কুলে আনে ও ছুটি হ'লে তোমাকে নিয়ে যায়, ওর সঙ্গে তোমার এতটা ঘনিষ্ঠতা হওয়ার কারণ কি?"

আমি বলিলাম, "উনি আমার দাদার শালা, আমাদের কুটুম্ব। উনি অনেক দিন থেকেই আমাদের বাড়িতে যাতায়াত করছেন, আমার সঙ্গে বন্ধুতা হয়েছে, তাই আমার সঙ্গে আসা-যাওয়া করেন। আপনাদের স্কুলে চাকরি করি ব'লে কি আমার কোন আত্মীয়বন্ধুর সঙ্গে মিশতে পাব না?"

তিনি বলিলেন, "মিশতে পার, কিন্তু একজন অবিবাহিতা যুবতী অর্থাৎ যাকে তোমরা বল তরুণী—তার একটি যুবকের সঙ্গে সর্ব্বদা এতদূর গলাগলি ভাবে বেড়ান ভাল দেখায় না। আর ঐ যুবকটির ভাবভঙ্গিও ভাল ব'লে বোধ হয় না। তাতে নানা জনে নানা কথা বলছে। তোমার সঙ্গে তার ভালবাসা হয়েছে কি?"

আমি কুপিত হইয়া বলিলাম, "আপনার এরূপ প্রশ্ন করবার কোন অধিকার নেই। আপনার অধীনে কাজ করি ব'লে আপনি আমাকে এরূপ অপমানসূচক কথা ব'লতে পারেন না।"

তিনি বলিলেন, "আহা, রাগ কর কেন? আমি দোষের কথা কি বলেছি? আমি বলি, যদি তোমাদের ভালবাসা হয়েই থাকে, তবে বিবাহ ক'রলেই ত সব গোল চুকে যায়, কারও কোন কথা বলবার যো থাকে না। নচেৎ তোমরা এখন যেভাবে চলাফেরা করছে, তাতে লোকে মনে করে কি? তুমি কারও মুখ বন্ধ ক'রে রাখতে পার? কেউ কেউ ঠাট্টা ক'রে বলছে, এদের কম্প্যানিয়নেট্ ম্যারেজ (সখ্য বিবাহ) হয়েছে। আমরা সেকেলে লোক, আমরা এ সব কথার মানেটানে বুঝি নে, আমরা বিবাহকে একটা ধর্ম্মসঙ্গত পবিত্র অনুষ্ঠান বলেই জানি, তা যে-কোন ধর্ম্মেরই হোক। এই কম্প্যানিয়নেট্ ম্যারেজ আমাদের দেশে কখনও ছিল না, শুনছি আমেরিকায় না-কি এর সূত্রপাত হয়েছে। আমি যত দূর বুঝতে পারি, সেটা একটা দুর্নীতিমূলক সম্বন্ধ বই আর কিছু নয়। আমি জানতে চাই তোমাদের ব্যাপারটা কি?"

আমি বলিলাম, "আমি সে-রকম বিয়ের কথা কখনও শুনি নাই। আমি আমার একটি বন্ধুর সঙ্গে স্কুলে আসি

ব'লে আপনার দুর্নীতিমূলক সম্বন্ধ কল্পনা করবার কারণ কি, আমি জানতে চাই। আপনি ব্রাহ্মসমাজের লোক, আপনারাই ত এদেশে স্ত্রীস্বাধীনতার পথ দেখিয়েছেন। আপনি নারী হ'য়ে নারীর স্বাধীনতা খর্ব্ব করতে চান?"

তিনি বলিলেন, "কিন্তু স্বাধীনতারও ত একটা সীমা আছে? স্বেচ্ছাচার ও স্বাধীনতা এক জিনিষ নয় মনে রেখ। সেই স্বেচ্ছাচারিতা ও ভদ্রসমাজের বহির্ভূত আচরণ দেখলেই নানা লোকের মনে নানা সন্দেহের উদয় হয়। তুমি কি ক'রে তাদের মুখ বন্ধ করবে? তার পর তোমাদের তরুণ বয়স, এত দূর মেশামিশিতে পদস্খলন হ'তে কত ক্ষণ লাগে? তুমি আমার ওপর রাগ ক'রো না। তুমি এখানে যে পবিত্র কাজ গ্রহণ করেছ, তাতে তোমাকে সর্ব্ব প্রকার সন্দেহের বাইরে থেকে আদর্শ জীবন যাপন করতে হবে, কারণ তোমার দৃষ্টান্ত দেখেই তোমার ছাত্রীরা তাদের চরিত্র গঠন করবে। তুমি তাকে বিয়ে করলে কারও কোন বলবার কথা থাকে না। তুমি ভেবে দেখ, আমি তোমার মায়ের বয়সী, তোমার ভালর জন্যেই এত কথা বললুম।"

আমি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলাম, "যেখানে চাকরি করতে এসে আমার চরিত্রের উপর এরূপ অযথা কলঙ্ক আরোপিত হয়, আমি সেখানে চাকরি ক'রতে চাইনে। বিয়ে করা না-করা আমার ইচ্ছাধীন। আমি আজই এ চাকরি রিজাইন (ত্যাগ) করব। আমি এতদিনে জানলুম, আমরা কেবল পুরুষদেরই গা'ল দিই, কিন্তু স্ত্রীলোকেই স্ত্রীলোকের প্রধান শত্রু।"

এই বলিয়া আমি উঠিয়া আসিলাম এবং তখনই ক্লাসে বসিয়া পদত্যাগপত্র লিখিয়া তাহা হেড মিষ্ট্রেসের নিকট পাঠাইয়া দিয়া বাড়িতে আসিলাম।

পর দিন সকালে সাড়ে নয়টার সময় শঙ্কর আমাকে লইতে আসিল। দাদা তখন বাড়ি ছিল না, প্রমীলা রান্নাঘরে রাঁধুনীর কাজের সাহায্য করিতেছিল। আমাকে লাইব্রেরী ঘরে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া শঙ্কর বলিল, "আপনার যে এখনও নাওয়া-খাওয়া হয়নি, স্কুলে যাবেন না?"

আমি বলিলাম, "আমি স্কুলে আর যাব না, কাল চাকরি রিজাইন্ (ত্যাগ) করে এসেছি।"

"কেন, কি হয়েছে?"

"হেড মিষ্ট্রেস্ বললেন, আমি যদি আপনাকে বিয়ে না করি, তবে আমাকে স্কুলে পড়াতে দেবেন না।"

শঙ্কর হাসিয়া বলিল, "বেশ ত, উত্তম কথা।"

আমি গম্ভীর হইয়া বলিলাম, "শঙ্কর দা, হাসবেন না। এ রকম অত্যাচারের কথা কখনও শুনিনি। আরও বিশেষ, মেয়ে মানুষ হয়ে মেয়ে মানুষের উপর অত্যাচার। আমার এই ব্যাপারে আমি নারী-প্রগতি বিষয়ে হতাশ হয়েছি। আমরা বাড়িতে গুরুজনের গঞ্জনা সহ্য করব না—কারও তাঁবে থাকব না ব'লে, স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়ে চাকরি করতে যাই; যে মনিবের অধীনে চাকরি করি সেও যদি অবিচার ক'রে লাথি ঝাঁটা মারে, তবে বাড়ির লোকেরা কি দোষ করল? আমরা যাকে স্বাবলম্বন বলি, তাও ত অন্যের তাঁবেদারী করা। তাতেই বা সুখ কোথায়?"

"সে কথা ত আমি আপনাকে গোড়াতেই ইঙ্গিত করেছিলুম। আসল কথাটা কি হয়েছে বলুন দেখি?"

"কাল হেড মিষ্ট্রেস আমাকে ডেকে নিয়ে বললেন, আপনি যে আমাকে সঙ্গে ক'রে স্কুলে নিয়ে যান, আবার সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসেন, ওটা না কি কারও কারও চক্ষুশূল হয়েছে। তারা সেজন্য আমার চরিত্রের উপর সন্দেহ করছে, আমাদের দু-জনের না-কি কম্প্যানিয়নেট ম্যারেজ (সখ্য বিবাহ) হয়েছে। স্কুলের সুনামের জন্য ও বালিকাদের উচ্চ আদর্শ রক্ষার জন্য আমাদের এই ব্যবহার হেড মিষ্ট্রেস্ সহ্য করবেন না। তবে যদি আমি আপনাকে রীতিমত কোন ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসারে বিয়ে করি, তবেই আমাদের সাতখুন মাপ হবে। যেখানে এরূপ অযথা চরিত্রের উপর দোষারোপ করা হয়, আমি সেখানে কিরূপে চাকরি করতে পারি? তাই আমি চাকরি রিজাইন ক'রে এসেছি।"

আমার এই কথা শুনিয়া শঙ্কর ক্ষণকাল চিন্তা করিল, পরে গম্ভীর ভাবে বলিল, "তা' বেশ করেছেন। ওরূপ অবস্থায় কেউ মিথ্যা কলঙ্কারোপ ও অপমান সহ্য ক'রে থাকতে পারে না। কিন্তু ঠাট্টা নয়, নীরুদেবী, আমিও আপনাকে একটা কথা সীরিয়স্‌লী (গম্ভীর ভাবে) বলতে চাই। অনেক দিন বলব বলব মনে করেছি, কিন্তু আজ আর না ব'লে থাকতে পারছি নে। আপনি কি যথার্থই বিয়ে করবেন না? চাকরিতে যে লাঞ্ছনা তা'ত হাড়ে হাড়েই বুঝতে পেরেছেন।"

আমি বলিলাম, "আর কি বলবেন বলুন।"

শঙ্কর বলিল, "নীরু দেবী, আমি কথার ঘোর-প্যাঁচ বুঝিনে, আমি সরল অন্তঃকরণের মানুষ, আমি সোজাসুজি ভাবে বলছি, আমি আপনাকে ভালবাসি, আপনি আমাকে বিয়ে করুন।"

আমি গম্ভীরভাবে বলিলাম, "আপনি এত দিন একথা বলেন নি কেন?"

শঙ্কর বলিল, "এতদিন বলার প্রয়োজন হয়নি তাই বলিনি। মনে করেছিলুম আর কতক দিন আপনার সঙ্গসুখ উপভোগ করব। কিন্তু ওদিকে বাড়িতে বিয়ে করবার জন্যে অত্যন্ত তাড়া দিচ্ছে। বাবা পয়সাটাই খুব ভালবাসেন, তিনি ছ-হাজার টাকা পাওয়ার লোভে একটি বার বছরের দুগ্ধপোষ্য বালিকার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ঠিক করতে যাচ্ছেন। শুনলুম তার চেহারা অতিকুৎসিত, আবার বিদ্যেও শিশুশিক্ষা তৃতীয় ভাগ পর্য্যন্ত। আমি তাকে কিছুতেই বিয়ে করব না, মাকে স্পষ্ট ক'রে বলেছি।"

"কিন্তু আমার সঙ্গে আপনার বিয়ে দিতে আপনার বাপ রাজি হবেন? আমরা ত তাঁকে পয়সাকড়ি কিছুই দিতে পারব না।"

"আমি তাঁদের অমতেই আপনাকে বিয়ে করব। কিন্তু আমি বাবার কথায় আমার জীবনের সুখ বিসর্জ্জন দিতে পারব না।"

"কিন্তু আপনি ত জানেন আমার মা মৃত্যুকালে আমাকে কিশোরবাবুর হাতে সমর্পণ ক'রে গেছেন। দাদা বলছেন, মায়ের আদেশ পালন করা আমার একান্ত কর্ত্তব্য।"

"কিন্তু কিশোর কি আপনাকে সুখী করতে পারবে?"

"অর্থাৎ আপনি বলতে চান, কিশোরবাবুর আপনার ন্যায় অর্থসামর্থ্য নেই, তাঁর নিজের কেরীয়র্ (জীবনযাত্রার পথ)ও আঁটি হয়েছে—ইত্যাদি।"

'তার মতামতও ত আপনার বিরুদ্ধে—"

"শঙ্কর দা—না, না, শঙ্করবাবু—আপনি না কিশোর বাবুর অন্তরঙ্গ বন্ধু, আপনারা দুই জনে দুই দেহে এক আত্মা?"

"এক সময়ে তাই ছিলুম, কিন্তু বাল্যকালের বন্ধুত্ব কি চিরদিন সমান থাকে?"

"তা জানি। আপনি যে আমাকে অনেক দিন থেকে ভালবেসেছেন তাও জানি। মায়ের অসুখের সময় কিশোর বাবু আমার কাছে ঘন ঘন আসতেন ব'লে আপনি তাঁকে ঈর্ষা করতেন—কেমন ঠিক কি-না?"

"আপনি ঠিক লক্ষ্য করেছেন। ভালবাসার ধর্ম্মই হচ্ছে এই রকম ঈর্ষা করা।"

'কিশোরবাবুও আমাকে সেকথা সেদিন শুনিয়ে গেছেন। সব শেয়ালেরই এক রা। আপনি যে আমাকে সঙ্গে ক'রে এতদিন স্কুলে নিয়ে যেতেন, কিশোরবাবু তা পছন্দ করেন নি, আমাকে সেকথা স্পষ্টই বলেছেন। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞেস করছি, আপনি আমার সঙ্গ-সুখ ভোগ করার কথা কি বলছিলেন?"

"আপনাকে আমি যে এতদিন সঙ্গে ক'রে স্কুলে নিয়ে যেতুম, তাতে কেবল আপনার সুবিধা আমি মনে করি নি, আমার নিজেরও তাতে সুখ ছিল।"

"বটে? কি রকম সুখ?"

"ভবভূতি বলেছেন,

অকিঞ্চিদপি কুর্ব্বাণঃ সৌখ্যৈর্দুঃখানপোহতি।

তত্তস্য কিমপি দ্রব্যং যোহি যস্য প্রিয়োজনঃ॥

অর্থাৎ—যে জন যাহার হয় প্রিয় অতিশয়।

কিছু তার না করিয়া তাকে সুখ দেয়॥

আপনার সঙ্গে বেড়ানই আমার সুখ, আপনার সঙ্গে কথা বলাতেই আমার সুখ, আপনার কোন একটু উপকার করতে পারলে আমার আরও সুখ।"

আমি বলিলাম, "আর কিছু?"

শঙ্কর আবেগভরে বলিল, "আরও যদি শুনতে চান, তবে আরও বলি, আপনার সঙ্গে পাশাপাশি বসা আমার সুখ, আপনার চুলের গন্ধে কাপড়ের গন্ধে অকস্মাৎ আপনার হাত স্পর্শে আপনার মুখপানে চাহিয়া, আপনার মুখে একটু হাসি দেখিয়া, আমার যে কত সুখ, কত মাদকতা—তা মুখে প্রকাশ ক'রে বলতে পারি নে।"

আমি উত্তেজিত হইয়া বলিলাম, "শঙ্করবাবু থামুন, থামুন,—আর শুনতে চাই নে। আমি এতক্ষণে বুঝিলাম, হেড মিষ্ট্রেস যথার্থ কারণেই আমাকে স্কুল ত্যাগ করতে বাধ্য করেছেন। আমার প্রতি আপনার এই সকল

হাবভাব নিশ্চয়ই অন্তের লক্ষ্যের বিষয় হয়েছিল। কি আশ্চর্য্য! আপনি এ রকম লোক?"

শঙ্করও উত্তেজিত হইয়া বলিল, "নীরু দেবী, রাগ করবেন না। আপনি আমার চিত্তের অবস্থা বুঝবেন না। আপনি আমার চিত্তে যে কিরূপ মোহ বিস্তার করেছেন তা আমার অন্তর্যামীই জানেন। আপনি আমার প্রতি দয়া করুন। নীরু, তুমি আমাকে পরিত্যাগ ক'রো না। তোমার বিচ্ছেদ আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারব না, আমি তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করছি।"

এই বলিয়া শঙ্কর আমার পদতলে বসিয়া পড়িল ও সতৃষ্ণ নয়নে আমার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

আমি বলিলাম, "শঙ্করবাবু, আপনি যে মোহে অভিভূত হয়েছেন, তার নাম লালসা। আপনার ঐ কামদৃষ্টি আমার প্রতি নিক্ষেপ ক'রে আমাকে আর কলুষিত করবেন না। আমি এত দিনে আপনার প্রকৃত চরিত্র বুঝতে পারলুম। আপনি উঠুন।"

এই সময়ে দাদা হঠাৎ ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল এবং শঙ্করকে তদবস্থায় দেখিয়া ও আমার শেষ কথাগুলি শুনিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, পরে ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল, "তোমাদের এ কি অভিনয় হচ্ছে? চমৎকার Tableux Vivant (তাব্লো ভিভ্যা)"

এই কথা শুনিয়া আমি সবেগে ঘরের বাহিরে চলিয়া গেলাম।

৬

শঙ্করের সহিত আমার যে ব্যাপার হইয়াছে, তাহা আমি দাদাকে মুখে কিছু না বলিলেও দাদা তাহা মনে মনে বুঝিল। আমি ভবানীপুরের স্কুলের চাকরি ছাড়িয়া দিয়াছি দাদাকে যখন এ কথা বলিলাম, তখন দাদা বলিল, "আমি ত আগেই তোকে বলেছিলাম যে তোর চাকরি করা পোষাবে না। শঙ্কর যে কেন তোকে গরজ ক'রে এই চাকরিতে ঢুকিয়েছিল, এখন ত তা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে।"

আমি বলিলাম, "দাদা, যা হয়ে গেছে তার আর আলোচনা না করাই ভাল। আমি কিন্তু নিকর্ম্মা হয়ে বসে থাকতে পারব না। তুমি আর একটা কাজ দেখ।"

দাদা মুখ ভার করিয়া বলিল, "দেখা যাবে।"

একদিন বৈকালে বেথুন কলেজের আমার দুইটি সখী অরুণা সেন ও সুলেখা চাটুজ্যে আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিল। আমি তাহাদিগকে দেখিয়া বলিলাম— "কি রে, আমার উপর আজ তোদের বড় অনুগ্রহ দেখছি। এতদিন পরে বুঝি মনে পড়ল?"

অরুণা বলিল, "তুই কি বাড়ি থাকিস্, আর তুই কি এখন আমাদের দলে আছিস? তুই হচ্ছিস্ মস্ত একজন টীচার,—আমাদের মত কত মেয়েকে বেত হাতে তাড়া করিস।"

আমি বলিলাম, "আমি সে কাজ ছেড়ে দিয়েছি।"

সুলেখা বলিল, "কেন, এত শীঘ্রই চাকরির আশ মিটলো?"

আমি বলিলাম, "সে অনেক কথা ভাই,—সেখানকার হেড মিষ্ট্রেসের সঙ্গে আমার বনিবনাও হ'ল না।"

অরুণা বলিল, "আবার বি-এ পড়্ না; বি-এ পরীক্ষা দে, পরে চাকরি করিস্।"

আমি বলিলাম, "কেন, আমার ত নাম কাটা গেছে— তোদেরও ত নাম কাটা যাবে প্রিন্সিপ্যাল বলেছিলেন।"

অরুণা বলিল, "নাম এখন পর্য্যন্ত কারও কাটা যায় নি। প্রিন্সিপ্যাল আমাদের সকলের নামে রিপোর্ট করেছিলেন, তার উত্তর এসেছিল—মেয়েদের এই প্রথম অপরাধ, তারা যদি ক্ষমা প্রার্থনা করে আর ভবিষ্যতে কোন পোলিটিক্যাল ডিমনষ্ট্রেশুনে (রাজনৈতিক আন্দোলনে) যোগ দেবে না ব'লে আণ্ডারটেকিং (কড়ার) দেয় তবে তাদের এবার কণ্ডোন্ (ক্ষমা) করা যাবে। আমরা সেই রকম প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করেছি। তুইও ত করতে পারিস?"

আমি বলিলাম, "না ভাই, আমি যে তোদের দলের সর্দ্দার, আমি সেরূপ করলে একটা ব্যাড্ এগ্জাম্প্ল সেট্ করা (মন্দ দৃষ্টান্ত দেখান) হবে, সেটা দেশের পক্ষে ভবিষ্যতে মঙ্গলের কথা নয়। আমি কলেজ ছেড়েছি ত একেবারেই ছেড়েছি। আর তোরা জানিস্নে ভাই, কিশোর কোর্টে সাজা পেয়েছে ব'লে তাকে আর মেডিক্যাল কলেজে পড়তে দেবে না। তার যখন এই দশা হ'ল, আমি কোন্ মুখ নিয়ে বেথুন কলেজে যাব।"

অরুণা একটু হাসিয়া বলিল, "তা' ত বটেই। দু-জনেরই এক দশা হওয়া উচিত। সে বেচারা এখন কোথায়?"

আমি বলিলাম, "দেশে গিয়েছে।"

সুলেখা বলিল, "তিনি দেশেই থাকুন। এদিকে যে কি ব্যাপার হচ্ছে, তিনি তার খোঁজ রাখেন কি?"

আমি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম—"কি ব্যাপার?"

সুলেখা বলিল—"তোমার এই যে ডুব দিয়ে দিয়ে জল খাওয়া।"

আমি একটু উষ্ণ হইয়া বলিলাম, "সে আবার কি? খুলে বল্ না, আমি এসব হেঁয়ালি পছন্দ করি নে।"

অরুণা বলিল, "খোলসা কথা এই, আমরা শুনতে পেলুম, শঙ্কর নামে একটি সুন্দর যুবক ল ক্লাসে পড়ে, তার সঙ্গে নাকি তোর কোর্টশিপ চলছে। সে ল-ক্লাস থেকে কি রোজ পালিয়ে এসে তোর অপেক্ষায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকে—পরে দু-জনে মিলে ট্রামে উঠে বেড়াতে যা'স। ল-ক্লাসের অনেক ছেলে এটা লক্ষ্য করেছে, আমার দাদার কাছে শুনলুম।"

এই মিথ্যা অপবাদ শুনিয়া আমার যেমন ভীষণ রাগ হইল তেমনই ঘৃণাও হইল। আমি কোনক্রমে আত্মসংবরণ করিয়া বলিলাম, "ভাই, তোরা যা শুনেছিস্ তার কতক সত্যি, কিন্তু অধিকাংশই মিথ্যা। শঙ্কর কে তা জানিস্? সে দাদার সম্বন্ধী, প্রমীলার ভাই। সে আমাদের বাড়িতে আসা-যাওয়া করে। সে-ই ত আমাকে ভবানীপুর স্কুলের চাকরি জুটিয়ে দিয়েছিল। ভবানীপুরে একলা ট্রামে যাওয়া অসুবিধা ব'লে সে আমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেত। এতে দোষ কি ভাই? এতে আবার কোর্টশিপের কথা কি হ'ল? আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে বেড়ানোই যদি আমাদের দোষ হয়, তবে আমরা স্বাধীনতার দাবি করি কিরূপে? যাদের মন কলুষিত, তারা সব বিষয়েই দোষ বা'র করে। যা'ক, আমি সে চাকরি ছেড়ে দিয়েছি, এখন যারা এরূপ মিথ্যা অপবাদ রটনা করে, তাদের মুখে ছাই পড়ুক।"

সুলেখা বলিল—"তাই ত, ভাই, তুই রাগ করিস্‌নে—আমি বলি এ কি কখনও সম্ভব হ'তে পারে? যে আমাদের নারী-প্রগতির সেক্রেটারী সে-ই সকলের আগে বিয়ে করবার জন্য পাগল হবে?"

আমি বলিলাম, "নারী-প্রগতির আর কি হয়েছে? আমি ত অনেক দিনই খোঁজখবর রাখিনে। আর কতজন মেয়ে প্রতিজ্ঞাপত্রে সই করেছে?"

অরুণা বলিল, "আমাদের প্রপাগাণ্ডা (প্রচার কার্য্য) কিছুই হচ্ছে না। তুই থাকবার সময় যে দশটা মেম্বার ছিল, তাদের মধ্যেও চারটি খসে পড়েছে।"

আমি বলিলাম, "তার মানে, তাদের বিয়ে হয়ে গেছে?"

সুলেখা বলিল, "তাই ত। মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার অভিভাবকদের যে মস্ত জেদ, তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে কয় জন মেয়ে সাহস ক'রে? তোর মত মেট্‌ল্ (তেজ) কয় জনের আছে?

অজ্ঞাতসারে আমার একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল। তাহা ঢাকিবার জন্য বলিলাম, "কিন্তু আরও ত কাজ আছে। নারী জাতির উন্নতিকল্পে শিক্ষাবিস্তার, দেশের হিতজনক কাজ, এসবও ত আমরা কিছু কিছু করতে পারি?"

অরুণা বলিল, "তা পারি বই কি। শিক্ষাবিস্তার মানে ত মেয়ে স্কুলের মাষ্টারি অথবা অন্য সময়ে পাড়ার দু-চার জন মেয়েকে পড়ানো। কিন্তু তার সময় কোথায়? সকলেই নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত। মাষ্টারি করা আমাদের পোষায় না। তুই-ই য'-কিছু করছিস্। তুই এখন কি করবি?"

আমি বলিলাম, "আমি আর একটা কাজ জোটাতে চেষ্টা করছি। কিন্তু কলকাতা আর আমার ভাল লাগছে না, এখানে যাতায়াতের বড় অসুবিধা। কোন একটা নিভৃত পল্লী হ'লে ভাল হয়, সেখানে আমি অনেক কাজ করতে পারব।"

অরুণা বলিল, "তোদের প্রমীলা কোথায়? তাকে ত দেখছি নে?"

আমি বলিলাম, "সে তার ঘরে ব'সে পরীক্ষার পড়া মুখস্থ করছে। দাদার খুব কড়া শাসন।"

"আচ্ছা, আজ তবে আমরা আসি" এই বলিয়া অরুণা উঠিল এবং তাহারা দুই জনে প্রস্থান করিল।

আমি সেই কোর্টশিপের কথা স্মরণ করিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইলাম। কি আশ্চর্য্য, কত সহজে লোকে অন্যের নামে দুর্নাম রটনা করিতে পারে, এখন বোধ হইল, ভবানীপুরের স্কুলের চাকরি ছাড়িয়া দেওয়া ভালই হইয়াছে। ঈশ্বর যা করান, মঙ্গলের জন্যই করান।

ইহার কয়েক দিন পরে দাদা একটা খবরের কাগজ হাতে করিয়া আসিয়া বলিল, 'নীরু, তুই কি যথার্থই চাকরি করবি; এই দেখ একটা কাজের বিজ্ঞাপন দিয়াছে।'

আমি উৎসাহের সহিত খবরের কাগজখানা খুলিয়া দেখিলাম,—ছোটনাগপুরের অন্তর্গত পলাশগড় রাজার রাজধানীতে একটি বালিকা-বিদ্যালয়ের জন্য একজন আই·এ পাস শিক্ষয়িত্রীর প্রয়োজন। বেতন মাসিক ৩৫৲ টাকা, স্কুলে বোর্ডিং আছে, তাহাতে বাস করিতে পারিবে ও সেখানে বিনা খরচে আহারাদি চলিবে। স্থান স্বাস্থ্যকর, রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকটে। সাত দিন মধ্যে আবেদন করিতে হইবে।

আমি বিজ্ঞাপন পড়িয়া বলিলাম, "দাদা, আমার পক্ষে এই কাজই ভাল। বোর্ডিঙে থাকা যাবে, মাহিনাও আমার পক্ষে কম নয়, ছোটনাগপুর স্বাস্থ্যকর জায়গা। তুমি কি বল?"

দাদা বলিল, "কিন্তু অত দূর তোকে যেতে দিতে পারি না। আমার মন কেমন করছে।"

আমি বলিলাম, "দাদা তুমি ভাবছ কেন? রেলের ধারে, আর বেশী দূরও ত নয়, সাত আট ঘণ্টায় যাওয়া যায়। ছুটি হ'লে তুমি গিয়ে আমাকে দেখে আসতে পারবে। যদি কোন অসুবিধা হয় তবে আমি চ'লে আসব।"

অনেক ভাবনাচিন্তার পর দাদা সম্মত হইল। আমি আবেদন পাঠাইলাম এবং দশ দিন পরে চিঠি আসিল যে, আমার আবেদন মঞ্জুর হইয়াছে। আমাকে অবিলম্বে সেখানে যাইতে হইবে।

আমি বাড়ি ছাড়িয়া কখনও বিদেশে যাই নাই। আমার সাজসরঞ্জাম জোগাড় করিয়া আমি দুই দিন পরেই দাদাকে সঙ্গে লইয়া যথাস্থানে যাত্রা করিলাম।

বর্দ্ধমান ছাড়াইয়া প্রাকৃতিক দৃশ্য আমার নিকট সম্পূর্ণ নূতন বোধ হইল। সুজলা-সুফলা শস্যশ্যামলা বঙ্গজননীর ক্রোড় ছাড়িয়া আমরা রুক্ষ শুষ্ক কঠিন প্রস্তরাকীর্ণ বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্য দিয়া যাইতে লাগিলাম। রেলের দুই পার্শ্বে কয়লার খনিগুলি যেন দৈত্যের মত মুখ ব্যাদান করিয়া অনল উদ্‌গীর্ণ করিতেছিল। ক্রমে আকাশের গায় মেঘের ন্যায় নীল পাহাড়ের রেখা ফুটিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে রেলগাড়ী সেই সকল ক্ষুদ্র পাহাড়ের ধার দিয়া যাইতে লাগিল। আমি সেই সকল তৃণগুল্মাচ্ছাদিত সবুজ বর্ণের পাহাড় একদৃষ্টে দেখিতে লাগিলাম।

আমরা যে ষ্টেশনে নামিলাম, সেখান হইতে পলাশগড় রাজবাড়ি প্রায় তিন মাইল। ষ্টেশনে বিস্তর ছইয়ে ঢাকা গরুর গাড়ী ছিল, আমরা অন্য কোন যান না পাইয়া তাহার এক-খানাতে উঠিলাম। আমি পূর্ব্বে কখনও গরুর গাড়ীতে চড়ি নাই, তাই নূতনত্বের জন্য প্রথমে বেশ স্ফূর্ত্তি অনুভব করিলাম; কিন্তু গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিলে সেই প্রবল ঝাঁকানি ও ঘটর ঘটর শব্দযুক্ত মন্থর গতিতে আমার ভয়ানক বিরক্তি বোধ হইতে লাগিল। দাদা বলিল, "কি রে, কেমন লাগছে? এ তো তোর কলকাতা শহর নয়, এখানে ঘোড়ার গাড়ী, মোটর গাড়ী ত নেই।"

আমি বলিলাম, "আমাদের সব রকম অভিজ্ঞতা লাভ করাই ভাল, দাদা। ঘাবড়ালে চলবে কেন?"

গাড়োয়ান বলিল, "আজ্ঞা বেশী সময় লাগবেক নাই, রাজবাড়ি হোই দেখা যাচ্ছে। আমার এ গরু ঘোড়াকেও হার মানাবেক।"

এই বলিয়া সে গরু দুটিকে কষাঘাত করিল, তাহারা অমনি হঠাৎ গতির বেগ বাড়াইল আর আমি কাৎ হইয়া দাদার ঘাড়ের উপর পড়িয়া গেলাম। তখন দু-জনেরই খুব হাসি।

আমরা যখন রাজবাড়িতে পৌঁছিলাম, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। এক জন রাজকর্ম্মচারী আসিয়া আমাদিগকে স্কুল বোর্ডিঙে লইয়া গেল।

এই স্কুলটি হাই স্কুল নহে, এম-ই স্কুল, তবে ক্রমে ইহাকে হাই স্কুলে পরিণত করার চেষ্টা হইতেছে। আর চারি জন শিক্ষয়িত্রী আছেন, আমাকেই হেড মিষ্ট্রেস হইতে হইবে। একথা শুনিয়া মনে একটু আনন্দ হইল। এখানে আর আমাকে সেই রুক্ষ স্বভাব মিস্ কাঞ্জিলালের ন্যায় কোন লোকের অধীনে কাজ করিতে হইবে না। এখন যিনি প্রধান শিক্ষয়িত্রী আছেন, তাঁহার নাম নিস্তারিণী ঘোষ। তিনি নিকটেই থাকেন, বোর্ডিঙে আসিয়া আমার সহিত দেখা করিলেন এবং আমাকে সকল দেখাইলেন। বোর্ডিং ঘর নূতন হইয়াছে,—ছয়টি কক্ষ, তাহার মধ্যে দুটি আমার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, একটি বসিবার ঘর, অন্যটি শয়ন-ঘর, আর চারিটি ঘরে বারটি বালিকা থাকে। এক জন পাচক

ব্রাহ্মণ ও একজন চাকরানী আছে। এখানকার আহারাদির ব্যয়ের জন্য প্রতি বালিকার নিকট হইতে মাসিক পাঁচ টাকা করিয়া লওয়া হয়, বাকী যাহা পড়ে তাহা রাজসরকার হইতে দেওয়া হয়। আমার খোরাকীখরচও রাজসরকার হইতে দেওয়া হইবে।

নিস্তারিণী আরও বলিলেন, এখন যিনি রাজা হইয়াছেন, তাঁহার নাম দেবরাজসিং, বয়স অল্প, প্রায় ত্রিশ বৎসর। তিনি বিলাত হইতে শিক্ষালাভ করিয়া আসিয়াছেন, স্ত্রীশিক্ষার দিকে তাঁহার অত্যন্ত উৎসাহ, স্ত্রীজাতির সর্ব্বপ্রকার উন্নতি-বিধানে তাঁহার বিশেষ যত্ন। সেই জন্য অনেক টাকা ব্যয় করিতেছেন। বালকদিগের শিক্ষার জন্যও একটা ভাল হাই স্কুল আছে।

আমরা এই সকল কথা শুনিয়া জিনিষপত্র যথাসম্ভব গোছগাছ করিয়া রাখিয়া আহারান্তে বিশ্রাম করিলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া আমি, বোর্ডিঙে যে-সব মেয়ে থাকে, তাহাদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করিলাম এবং তাহাদের দুই জনকে সঙ্গে লইয়া শ্রীমতী নিস্তারিণীর বাড়িতে গেলাম। তাঁহার বাড়ি স্কুলের নিকটেই কতকটা পল্লীর মধ্যে। মেটে দেওয়াল ও টালির চালা দেওয়া একখানা বড় ঘর, আর ছোট ছোট খড়ের চালা দেওয়া তিনখানা ঘর; ইহাদের মধ্যে একটা উঠান, বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। উঠানের এক পাশে কয়েকটা বেল যুঁই গোলাপ ফুলের গাছ। এই পাড়াগাঁয়ের বাড়িঘর আমি প্রথম দেখিলাম,—আমার বেশ ভাল লাগিল। নিস্তারিণী বিধবা, বয়স প্রায় ত্রিশ বৎসর হইবে, দুইটি শিশুপুত্র ও একটি কন্যা লইয়া সেই বাড়িতে থাকেন। তাঁহার নিবাস পূর্ব্ববঙ্গে। বিবাহের পূর্ব্বে হাই স্কুলে পড়িয়া ম্যাট্রিক পাস করিয়াছিলেন, বিবাহের পরে আর পড়িতে পারেন নাই। তাঁহার স্বামী বি-এ পাস করিয়া কি একটা চাকরি করিতেন, কয়েক বৎসর হইল মারা গিয়াছেন, কিছু সঞ্চয় করিয়া যাইতে পারেন নাই, সেই জন্য তাঁহাকে এই চাকরি করিয়া পুত্রকন্যাদের লালন-পালন করিতে হইতেছে। আমি তাঁহার এই বৃত্তান্ত শুনিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কেমন বোধ করেন? পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকার চেয়ে এই স্বাধীন ভাবে জীবিকা উপার্জ্জন আপনার কেমন লাগে?"

তিনি বলিলেন, "আমার এই অসহায় অবস্থায় স্বামীর বাড়ি কিংবা বাপের বাড়ি পরাধীন হয়ে থাকার চেয়ে আমি বেশ আছি। তবে স্বামীর সঙ্গে বাস ক'রে যেরূপ সুখে ছিলাম তার তুলনা হয় না।"

আমি বলিলাম, "স্বামীর সঙ্গে থেকেও ত তাঁর অধীন হয়ে থাকতে হ'ত?"

তিনি কতক ক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া বলিলেন—"আপনি বলেন কি? স্ত্রীলোকের স্বামীর সঙ্গে থাকার চেয়ে কি সুখ আছে? স্বামীর অধীন হইয়া থাকাকে কি কেউ পরাধীনতা মনে করে? প্রকৃত ভালবাসা জন্মিলে স্বামী-স্ত্রীতে কোন ভেদ থাকে না। এই ধরুন, যেমন রাধাকৃষ্ণের প্রেম—রাধা কখন কৃষ্ণের পায় ধরছেন, আবার কৃষ্ণ কখন রাধার পায় ধরছেন।"

এই বলিয়া তিনি একটু হাসিলেন। আমিও সেই হাসিতে যোগ দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচ্ছা, আপনার স্বামীর কথা মনে পড়লে এখনও আপনার মনে কষ্ট হয়?"

এই প্রশ্ন শুনিয়া তাঁহার মুখের হাসি অমনি মিলাইয়া গেল, তিনি ছল ছল নেত্রে বলিলেন, "সেকথা আর জিজ্ঞেস করছেন কেন? তবে প্রথম প্রথম যতটা অসহ্য ক্লেশ বোধ হ'ত, এখন ততটা নয়; ক্রমে সয়ে গিয়েছে।" এই বলিয়া তিনি আঁচলে চক্ষু মুছিলেন।

আমি হঠাৎ এরকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া নিতান্ত অপ্রতিভ ও লজ্জিত হইলাম। আমার হৃদয় যেন পাষাণ, যেমন কিশোর বলিয়াছিল—সকলে ত সেরূপ নহে।

বোর্ডিঙে ফিরিয়া আসিয়া দেখি, দাদা বাড়ি রওনা হওয়ার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে। আমি তাহাকে আর এক দিন থাকিয়া সব ভালরূপ দেখিয়া শুনিয়া যাইতে বলিলাম, কিন্তু দাদা বলিল, "আমার কলেজ কামাই হচ্ছে, আমি আর দেরি করতে পারিনে। যা দেখছি, তোর এখানে কোন অসুবিধা হবে ব'লে মনে হয় না। যদি কোন অসুবিধা ঘটে, তবে আমাকে চিঠি লিখিস, আমি এসে তোকে নিয়ে যাব।"

দাদা আহারাদি করিয়া বেলা দশটার সময় যাত্রা করিল, আমিও আহারাদি শেষ করিয়া আমার স্কুলের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম।

ক্রমশঃ

গোখলে বালিকা-বিদ্যালয়

শ্রীকনকলতা রায়

বাংলা দেশে স্ত্রীশিক্ষা বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। বালিকা-বিদ্যালয়গুলিতে সাহিত্য, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি বিষয়গুলি গতানুগতিক শিক্ষাদানে ত্রুটি লক্ষিত হইতেছে না। তথাপি স্ত্রীশিক্ষা আশানুরূপ উন্নতি লাভ করিতে পারিতেছে না দেখিয়া মহিলা সমিতির পরামর্শ অনুসারে নব প্রণালীতে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য লইয়া ১৯২০ সনে গোখলে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

গোখলে বালিকা-বিদ্যালয়ের সহিত অন্যান্য বালিকা-বিদ্যালয়ের তুলনা করিলে বহু পার্থক্য লক্ষিত হয়। প্রথমতঃ, ইহার একটি বিশেষ উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি আছে। বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, আমরা বহুস্থলে শিক্ষায়তনগুলিকে যন্ত্রে পরিণত করিয়া লইয়াছি। কিন্তু গোখলে বালিকা-বিদ্যালয় এই দোষ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত। পরন্তু ব্যক্তিগত যত্ন, জ্ঞানতৃষ্ণা, সৃষ্টি, আত্মপ্রকাশ ও আত্মোন্নতি ইহার উদ্দেশ্যের অঙ্গীভূত। দ্বিতীয়তঃ, আমাদের দেশে বালিকাদের শিক্ষাকাল অতিশয় অল্প। যে বয়স শিক্ষার প্রকৃষ্ট সময়, যে বয়সে মানসিক বৃত্তিসকল স্ফুরিত হয়, সেই সময়েই আমাদের দেশের বালিকাদিগকে বিবাহের জন্য বিদ্যালয় ত্যাগ করাইয়া লওয়া হইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থায় দীর্ঘ দশ বৎসর কাল কেবল মাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য অতিবাহিত করা পণ্ডশ্রম ব্যতীত আর কিছুই নহে। ইহা লক্ষ্য করিয়া গোখলে বালিকা-বিদ্যালয়ের শিক্ষাকাল আট বৎসর বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। এই আট বৎসরের মধ্যে এখানে যে বিষয়গুলি শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য শিক্ষণীয় বিষয়গুলি হইতে অনেক উন্নত এবং অনেকাংশে আই-এ পরীক্ষার জন্য অধীত বিষয়গুলির সমান। এই জন্য এখানকার পাঠ শেষ করিয়া অনেক বালিকাই অনায়াসে প্রবেশিকা এবং অল্পায়াসে আই-এ পরীক্ষা পাস করিতে পারে। এতদ্ব্যতীত, সাধারণ শিক্ষণীয় বিষয় ব্যতিরেকে সঙ্গীত, চিত্রাঙ্কণ বিদ্যা, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান ইত্যাদি বালিকাদের পরবর্তী জীবনে বিশেষ উপকারে আসে এরূপ অনেক বিষয় এখানে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। তৃতীয়তঃ, যাহার যে ভাষা তিনি তাহা যেরূপ



রন্ধন-শিক্ষা



গোখ্‌লে মেমোরিয়াল বিদ্যালয়



কিণ্ডারগার্টেন বিভাগ

শিক্ষা দিতে পারেন, অন্যে সেরূপ পারে না। ইহা বুঝিয়া প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে বাংলার জন্য বাঙালী, ইংরেজীর জন্য ইংরেজ এবং হিন্দী শিক্ষা দিবার নিমিত্ত হিন্দী ভাষাভাষী শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করা হইয়াছে।

প্রকৃত শিক্ষাদানই যে গোখলে বিদ্যালয়ের মূল উদ্দেশ্য, তাহা ইহার ছাত্রী-সংখ্যা হইতে জানা যায়। গোখলে বিদ্যালয়ে দুই শতের অধিক ছাত্রী লওয়া হয় না। ইহাতে বিদ্যালয়কে যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করিতে হয় বটে, কিন্তু তাই বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা কদাপি তাঁহাদের মূল নীতি লঙ্ঘন করেন না।

দুর্ব্বল দেহ যে সবল মনের বাসস্থান হইতে পারে না গোখলে বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা এই সত্যটি উপলব্ধি করিয়াছেন। গোখলে বিদ্যালয়ের বালিকাদিগের জন্য ব্যায়াম ও ক্রীড়ার সুন্দর বন্দোবস্ত আছে। ব্যায়াম ও ক্রীড়ায় বিশেষ পারদর্শিনী একজন য়ুরোপীয় মহিলা বালিকাদিগকে ব্যায়াম শিক্ষা দিয়া থাকেন। বিদ্যালয়গৃহসংলগ্ন তৃণাবৃত সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণটি ক্রীড়াক্ষেত্ররূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

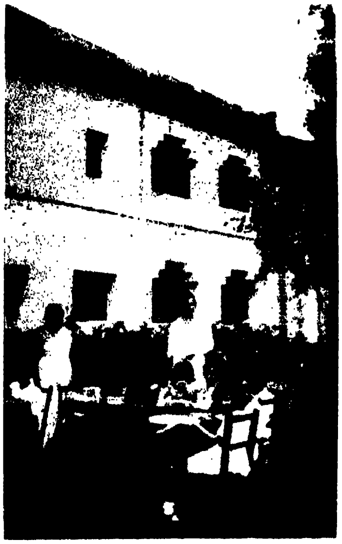
গোখলে বিদ্যালয়ভবনের দ্বিতলে বালিকাদিগের বোর্ডিং অবস্থিত। এস্থলে বিদ্যালয়গৃহ সম্বন্ধে কিছু বলিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সংলগ্ন প্রাঙ্গণসমেত গৃহটি ভবানীপুর অঞ্চলের সর্ব্বাপেক্ষা উন্মুক্তস্থানে কিঞ্চিদধিক চারি বিঘা জমির উপর অবস্থিত। ইহা এতদূর বৃহদবয়ববিশিষ্ট, যে,



সঙ্গীত-শিক্ষা

আপাতদৃষ্টিতে ইহাকে কোনও সরকারী অট্টালিকা বলিয়া ভ্রম জন্মে। এইরূপ গৃহের দ্বিতলে বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় বালিকারা প্রকৃতির আলো বাতাসের অভাব কদাপি বোধ করে না। এই গেল ইহার বাহিরের রূপ। ভিতরের দিক

হইতেও বিদ্যালয়ের স্বাতন্ত্র্যের অনুপাতে ইহার বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হইয়াছে। সাধারণতঃ কোন বোর্ডিং গৃহের কথা বলিলে বালিকাদের মনে একটা আতঙ্কের ভাব আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু কি-বা স্কুলে কি-বা বোর্ডিংে গোখলে বিদ্যালয়ের



ছেলে-মেয়েদের 'পার্টি

বালিকাদিগের দিকে তাকাইলে তাহাদের মুখে একটা প্রসন্নতাব্যঞ্জক চিহ্ন স্পষ্ট লক্ষিত হয়। এখানকার প্রত্যেক বালিকাকে তাহার স্ব স্ব প্রয়োজনীয় কার্য্য করিতে শিক্ষা দিয়া স্বাবলম্বন শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। পরন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যরক্ষার সাধারণ নিয়মাবলীর প্রতি সর্ব্বদা বালিকাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করা হয়।

বলা বাহুল্য, কিন্তু বলা প্রয়োজন যে, দেশের অবস্থা এবং অভিভাবকদিগের রুচির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যাহাতে বালিকারা সাধারণ সমস্ত পরীক্ষা দিতে পারে, তাহার উত্তম বন্দোবস্ত গোখলে বিদ্যালয়ে আছে। প্রতিবৎসর এখান হইতে বালিকারা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা ও আই-এ এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের জুনিয়ার ও সিনিয়ার পরীক্ষা দিয়া থাকে। এস্থলে বলা যাইতে পারে যে, ভারতবর্ষের মধ্যে অন্য কোনও দেশীয় বালিকাবিদ্যালয় এ পর্য্যন্ত কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হইবার সুযোগ পায় নাই।

আজকাল স্বায়ত্ত-শাসনের যুগ। এই স্বায়ত্ত-শাসন ব্যক্তিগত, সমাজগত, জাতিগত বা যে-কোন প্রকারেরই হউক না কেন ইহাতে যথেষ্ট মঙ্গল নিহিত আছে। গোখলে



ছেলেমেয়েরা খেলা করিতেছে

বিদ্যালয়ে বালিকাদিগকে এই স্বায়ত্ত-শাসন শিক্ষা দিবার প্রভূত সুযোগ দেওয়া হইয়াছে; তন্মধ্যে তাহাদের প্রতিষ্ঠিত



বাস্কেট বল

"হিতসাধন সমিতি" বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দৈবদুর্বিপাকে যাহারা দরিদ্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের প্রতি যে

সকলেরই একটা কর্ত্তব্য আছে, তাহা গোখলে বিদ্যালয়ের বালিকারা বুঝিয়াছে এবং প্রতিমাসে নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলিয়া গত কয় বৎসর যাবৎ তাহারা দুঃস্থ এবং আতুরদিগকে সাহায্য করিয়া আসিতেছে।

গোখলে বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার পর হইতে প্রায় ত্রয়োদশ বর্ষ অতীত হইতে চলিয়াছে। প্রতিষ্ঠার সময় ইহার ছাত্রীসংখ্যা ছিল মাত্র ছয়জন; দৈনন্দিন কার্য্য সম্পন্ন হইত ভবানীপুরস্থিত একটি একতলবিশিষ্ট ক্ষুদ্র গৃহের একটি ততোধিক ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে। তৎকালিক অবস্থার সহিত ইহার বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করিলে অনেক পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। আজ ইহার অবশ্যপ্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সমস্তই হইয়াছে— ইহার ছাত্রীসংখ্যা কিঞ্চিন্ন্যূন দুই শত, বাসগৃহ প্রাসাদ সদৃশ। যাঁহারা শিক্ষকতা কার্য্যে ব্রতী আছেন, তাঁহারা উদ্যমশীল, স্বার্থত্যাগী ও কর্ম্মপ্রবীণ। আর এই সকলের মূলে কেবলমাত্র ইচ্ছাশক্তি-সহায় এক নারীহিতৈষিণী রমণী বর্ত্তমান থাকিয়া সর্ব্বদা অনুপ্রেরণা দান করিতেছেন।

মহেশচন্দ্র ঘোষ

শ্রীবীরেশ্বর মুখোপাধ্যায়

মহেশবাবুর সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয় ১৯০৩ সালে। বাঁকুড়া জেলাস্কুলে শিক্ষকতার কার্য্য গ্রহণ করিয়া তথায় যাই। তখন বাঁকুড়া পর্য্যন্ত রেল হয় নাই। রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত রেলে আসিয়া তথা হইতে উটের গাড়ী করিয়া বাঁকুড়া যাইতে হইত। রাণীগঞ্জের নিকটেই দামোদর নদ; উহা নৌকায় পার হইয়া পরপারে উষ্ট্রযানে চড়িতে হইত। সমস্ত রাত্রি সেই অদ্ভুত গাড়ীতে বসিয়া বসিয়া ও ঢুলিয়া ভোর-বেলায় বাঁকুড়ায় পৌছিতে হইত। পথে কোনও সাঁকো যদি বে-মেরামত থাকিত, তাহা হইলে সেখানে নামিয়া হাঁটিয়া নদী পার হইতে হইত।

মহেশবাবু তখন আমারই মত একজন সহকারী শিক্ষক ছিলেন; বেতন ৫০৲। বাঁকুড়ায় স্কুলডাঙ্গায় যেস্থানে ব্রাহ্মসমাজ আছে, তাহারই ঠিক অপর পার্শ্বে একটা বাটিতে কয়েকটি স্কুলের ও কলেজের ছাত্র ও অধ্যাপক মিলিয়া একটি মেস করিয়াছিলেন। আমিও তথায় আশ্রয় পাইলাম। এইখানে থাকাতে মহেশবাবুর সহিত ঘনিষ্ঠতা হয় এবং তাহা ক্রমে অকৃত্রিম বন্ধুত্বে পরিণত হইয়াছিল।

আমরাও তখন নূতন কলেজ ছাড়িয়া বাহির হইয়াছি; অধ্যয়ন-স্পৃহা তিরোহিত হয় নাই। তাই এই সহকর্ম্মীকে বিদ্যার্থীর মত অধ্যয়ননিরত দেখিয়া সহজেই তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইলাম। শুনিলাম মহেশবাবু ব্রাহ্ম। প্রথমতঃ মনে একটু খট্‌কা লাগিল; কিন্তু ক্রমশঃ তাঁহার সদ্ব্যবহারে ও চরিত্রমাধুর্য্যে ঐ দ্বিধাভাব দূর হইয়া তাঁহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধার উদ্রেক হইল। সেই ব্রহ্মচারী নিরামিষাশী, একাহারী, কৃশকায় লোকটিকে বাঁকুড়ায় সকলেই অত্যন্ত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। মহেশবাবুর সত্যনিষ্ঠা অসামান্য ছিল। তাঁহার মুখে শুনিয়াছি, তিনি প্রথমে প্রাইভেট স্কুলে মাষ্টারী করিতেন— রামপুরহাট বা নলহাটি। স্কুলের ইনস্পেক্টর স্কুল পরিদর্শন করিতে আসিয়া তাঁহার কার্য্যকলাপে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন এবং তাঁহাকে গবর্ণমেণ্ট স্কুলে নিযুক্ত করিবার জন্য দরখাস্ত করিতে পরামর্শ দেন এবং উক্ত ইনস্পেক্টর বাবু বলেন, যে, এ বিষয়ে তিনি যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন। মহেশবাবুর বয়স তখন পঁচিশ বৎসর অতিক্রম করিয়াছে। বন্ধুগণ তাঁহাকে তাঁহার বয়স পঁচিশ বৎসর অপেক্ষা কম লিখিতে বলেন এবং তাঁহারা এই বলিয়া ভয় দেখান, যে, বয়সে না কুলাইলে সরকারী চাকুরি কিছুতে পাওয়া যাইবে না। মহেশবাবু কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া তাঁহার প্রকৃত বয়স দরখাস্তে লিখিলেন। দরখাস্ত খামে মুড়িয়া ডাকবাক্সে ফেলিবার পূর্ব্বে বন্ধুগণ আর একবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সত্যসন্ধ দরিদ্র মহেশবাবু তাহাতে ভ্রূক্ষেপও না

করিয়া ঐ দরখাস্ত ডাকে দিলেন। মহেশবাবু সরকারী চাকুরি পাইলেন।

বাঁকুড়ায় মহেশবাবু ব্রাহ্মসমাজের সংলগ্ন বাসায় থাকিতেন। সঙ্গে থাকিতেন তাঁহার এক জ্যেষ্ঠা ভগিনী ও এক ভাগিনেয়, নিমু। নিমু এখন একজন বিখ্যাত অধ্যাপক; লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক। তাঁহার ভাল নাম নির্ম্মলকুমার সিদ্ধান্ত। আমরা যখন বাঁকুড়ায় যাই তখন নিমুর বয়স নয়-দশ বৎসরের অধিক হইবে না, হয়ত বা কিছু কম হইবে। নিমুকে মহেশবাবু হাতে গড়িয়া মানুষ করিয়াছেন। মহেশবাবু তাহাকে বরাবর বাড়িতে পড়াইয়া সেকেণ্ড ক্লাসে স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় নিমু ১৫৲ টাকা বৃত্তি পায়। অতঃপর এখান হইতে এম-এ পাস করিয়া বিলাত যায়। মহেশবাবু নিজে শিক্ষক, তাই ছেলেদের পাঠ্যপুস্তক কি হওয়া উচিত তাহা তাঁহার বিশেষ জানা ছিল। যতদূর মনে হয় তিনি তাহাকে রয়্যাল রীডার সীরীজ পড়াইতেন; এবং সহজ ইংরেজী গল্পের মধ্য দিয়া ভাষা শিখাইবার জন্য তাহাকে রিভিউ অব রিভিউজ আপিস হইতে প্রকাশিত শিশুপাঠ্য পুস্তকমালার ('Books for the Bairns' Series) অনেকগুলি পুস্তক পড়িতে দিতেন। আনন্দের মধ্যে যে শিক্ষা হয় তাহাতে শ্রমবোধ হয় না—পরন্তু শাসনের শিক্ষা অনেক সময় ফলপ্রদ হয় না—হাজারীবাগে এ বিষয়ে তাঁহার সহিত অনেক কথা হইয়াছিল।

তাঁহার ও আমাদের বাসা স্কুলের নিকটেই ছিল; প্রায় প্রত্যহই দু-এক "ঘণ্টা" অবসর থাকিত। মহেশবাবু সে সময় অলসভাবে স্কুলে না কাটাইয়া বাসায় চলিয়া আসিতেন এবং ঘণ্টা পড়িবার পূর্ব্বেই স্কুলে যাইতেন। তাঁহার সেই ছোট ঘরটি ইংরেজী ও সংস্কৃত পুস্তকে পূর্ণ ছিল। বাংলা পুস্তকের মধ্যে বঙ্গবাসী সংস্করণের পুরাণাদি অনেকগুলি ছিল। আমরা যে সময়ে বাঁকুড়ায় ছিলাম, তখন শ্রদ্ধাস্পদ অম্বিকাচরণ সেন জেলা-জজ ছিলেন। জজ বাহাদুরের সহিত মহেশবাবুর আলাপ হইল। মহেশবাবু ও সেন মহাশয় তখন উভয়েই ঋগ্বেদ পড়িতেছিলেন। জজ সাহেবকে কাহারও বাড়িতে যাইতে দেখি নাই; কিন্তু দেখিলাম তিনি প্রায় প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে ঐ দরিদ্র শিক্ষকের কুটীরে উপস্থিত হইতেন; এবং কোনও দিন বারান্দায় কোনও দিন বা উঠানে বেতের মোড়ায় বসিয়া উভয়ে ঋগ্বেদের আলোচনা করিতেন। সময়ে সময়ে আমরাও একখানা বেঞ্চ টানিয়া লইয়া নিকটে বসিয়া নীরবে ঐ সদালাপ উপভোগ করিতাম; এইরূপে কোনও কোনও দিন রাত্রি ৯টা অতিবাহিত হইয়া যাইত, তখন জজ সাহেব বাসায় ফিরিতেন। প্রত্যহ সকালে বেড়াইতে যাওয়া তাঁহার অভ্যাস ছিল; আমরা তাঁহার মত সকালে উঠিতে পারিতাম না। তিনি সকালে উঠিয়া আমাদিগের বাসায় উঠানে দাঁড়াইয়া আমাদিগকে জাগাইতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে

"জাগো সকলে,
অমৃতের অধিকারী, তোমরা জাগো" ইত্যাদি

এই ব্রহ্মসঙ্গীতটি গাহিতে থাকিতেন। প্রায় এক ঘণ্টা বেড়াইয়া বাসায় ফিরিয়া লিখিতেন বা পড়িতেন। তৎপূর্ব্ব হইতে মধ্যে মধ্যে মাসিক কাগজে প্রবন্ধ দিতেন। 'প্রবাসী' তখন এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত হইত; যতদূর মনে হয় এই সময়েই 'প্রবাসী'তে তাঁহার এক-আধটি করিয়া প্রবন্ধ বাহির হইতে থাকে।

বিদ্যার এমন একনিষ্ঠ সাধক কম দেখিয়াছি। ঋগ্বেদ পড়িতে পড়িতে তাঁহার আবেস্তা পড়িতে ইচ্ছা হইল। মূল ভাষা শিক্ষা করিয়া মূল আবেস্তা পড়িতে লাগিলেন। তখন তিনি বৌদ্ধ-ধর্ম্ম সম্বন্ধে অধিক আলোচনা করেন নাই; পরে দেখিয়াছি বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থ সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান গভীর। হাজারীবাগে একখানি খাতা দেখাইলেন,—একখানি পালি গ্রন্থের অধিকাংশ রোমান অক্ষর হইতে বাংলা অক্ষরে রূপান্তরিত করিয়াছেন। তিনি আমরণ ছাত্রই ছিলেন এবং অধ্যয়নই যে ছাত্রের তপস্যা, তাহা তিনি বিশেষ করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন।

বাঁকুড়ায় থাকিতে দেখিতাম যে স্কুলের অধ্যাপনাক্রম প্রস্তুত করা হইতে লাইব্রেরীর জন্য পুস্তক-নির্ব্বাচনের ভার মহেশবাবুর উপর ন্যস্ত ছিল। অনেক স্কুলেই দেখা যায় শিক্ষকদের মধ্যে একটা দলাদলি ভাব থাকে; কিন্তু এই অজাতশত্রু বালকস্বভাব শিক্ষকের কোনও দল ছিল না। বরং সম্ভবতঃ তাঁহারই প্রভাবে বাঁকুড়ার স্কুলে দলাদলির সৃজন হয় নাই। মহেশবাবু সেকালের "এ" কোর্সের বি-এ। তাঁহার অপশুন্যাল বিষয় ছিল অঙ্কশাস্ত্র। এই জন্য স্কুলে তাঁহাকে ইংরেজী ও অঙ্ক পড়াইতে হইত, কিন্তু তাঁহার প্রাণের টান ছিল দর্শনশাস্ত্রে। দর্শনশাস্ত্র

সম্বন্ধে হাজারীবাগে তাঁহার যে কত বই দেখিয়াছি তাহাদের স্বরূপ বা মূল্য নির্ণয় করা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে।

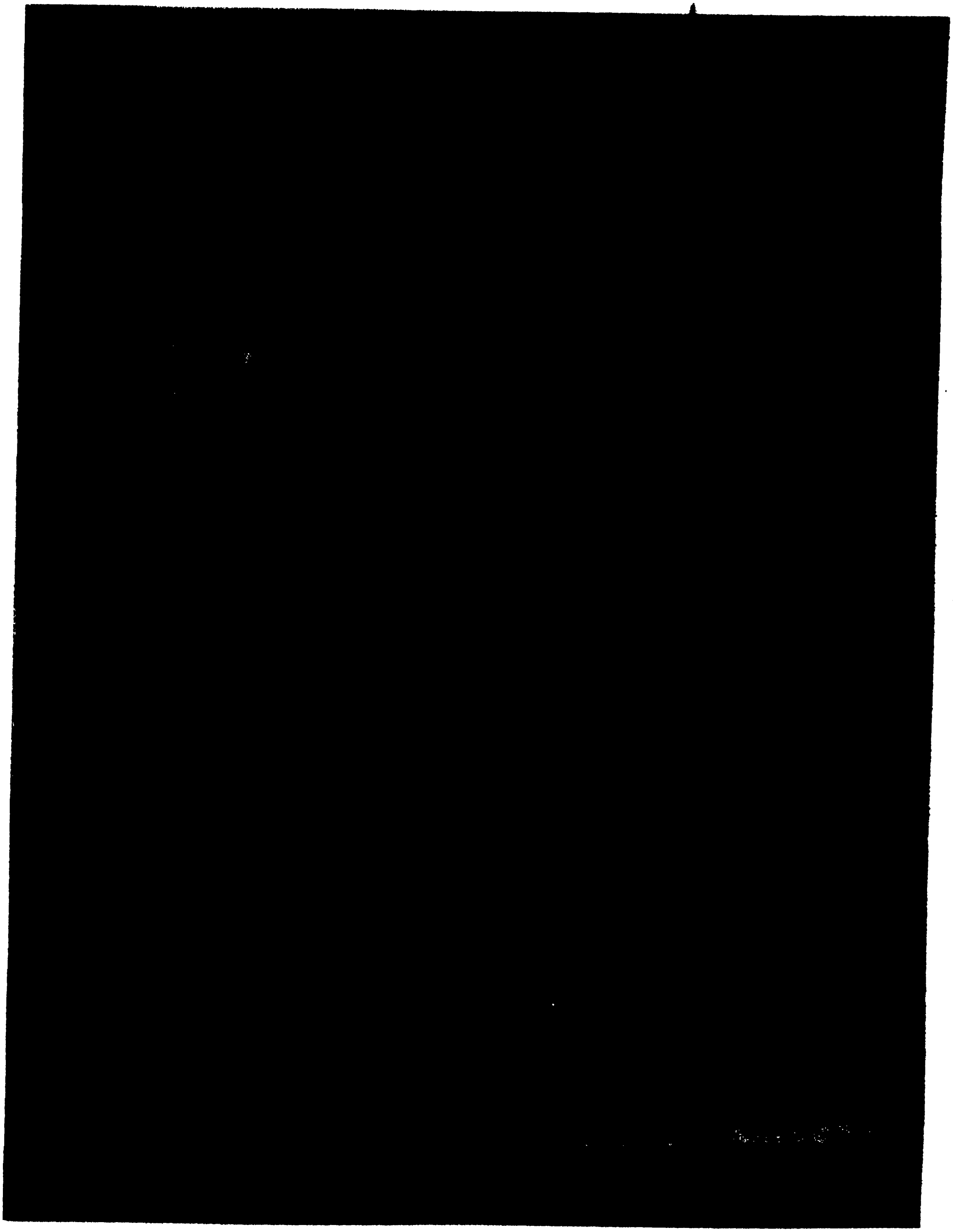
পুস্তক পাঠ ও পুস্তক খরিদ তাঁহাকে নেশার মত পাইয়াছিল। বাঁকুড়ায় আমি দেড় বৎসর ছিলাম; তখন দেখিয়াছি যে, তাঁহার সামান্য আয় হইতে সঞ্চয় করিয়া প্রতিমাসে দু-একখানি পুস্তক ক্রয় করিতেন। পরে দেখিয়াছি বিলাত হইতে প্রতিমাসে অনেকগুলি করিয়া পুস্তক আনাইতেন। বাঁকুড়ায় থাকিতে তিনি মধ্যে মধ্যে মধ্যবাংলার পরীক্ষক নিযুক্ত হইতেন। একবার উহার পারিশ্রমিকস্বরূপ পঞ্চাশ-ষাট টাকা পান; ঐ টাকায় সে-বার মনিয়ার উইলিয়মসের ইংরেজী সংস্কৃত অভিধান ক্রয় করেন। ঋগ্বেদ সম্যকরূপে বুঝিবার জন্য তিনি পাণিনি পড়িতে আরম্ভ করেন; এবং এলাহাবাদের পাণিনি আপিস্ হইতে ৪০৲ টাকায় পাণিনি ক্রয় করেন। এ সকল দৃষ্টান্ত দিবার কারণ আর কিছুই নহে; তবে আমাদের দেশের যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতবিদ্য এবং অর্থবান, তাঁহারা তাঁহাদের আয়ের কত অংশ পুস্তকক্রয়ে ব্যয় করেন তাহা কষিয়া দেখিবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারীকেই আমরা কৃতবিদ্য বলিয়া থাকি; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী কি বিদ্বান করে? সে কেবল বিদ্বান হইবার পথ দেখাইয়া দেয়।

এই যে বিদ্বান হইবার, জ্ঞানলাভ করিবার চেষ্টা তাঁহার সঙ্গের সাথী ছিল। রবার্ট ব্রাউনিঙের কবিতা অতিশয় দুর্বোধ্য। হাজারীবাগে গিয়া দেখিলাম তিনি ইংরেজী সাহিত্যের অনুশীলন করিতেছেন। শেক্‌স্‌পীয়ার, রবার্ট ব্রাউনিং, প্রভৃতি শেলি, কীট্‌স্, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ প্রভৃতি কবিদের কবিতা পাঠ করিতেছেন দেখিলাম। বলিলেন, দিনকতক দর্শন কমাইয়া ইংরেজী সাহিত্য পড়িয়া লই। গীতা তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল; এবং গীতা সম্বন্ধে তাঁহার অত্যন্ত সূক্ষ্ম দর্শন ছিল। 'প্রবাসী'র পাঠকগণ অনেক সময় তাহার পরিচয় পাইয়াছেন। তাঁহার পুস্তাকাগারে গীতার প্রায় কুড়িটি বিভিন্ন সংস্করণ ছিল। বাইবেল সম্বন্ধেও তাঁহার অনুসন্ধিৎসা কম ছিল না। মূল গ্রীক হইতে নিউ টেষ্টামেণ্টের স্থানে স্থানে যে কত পরিবর্তন হইয়াছে তাহা তিনি 'মডার্ণ রিভিউ'এ অনেকবার দেখাইয়াছেন।

বাঁকুড়ায় মহেশবাবুর বাসাতেই 'প্রবাসী'র রামানন্দবাবুকে প্রথম দেখি ও তাঁহার সহিত পরিচয় হয়। তিনি তখন এলাহাবাদ কায়স্থ পাঠশালায় কার্য্য করিতেন। তিনিও মধ্যে মধ্যে মহেশবাবুর বাসায় আসিতেন; এবং সেই সময়ে কথাপ্রসঙ্গে 'প্রবাসী'কে কলিকাতায় আনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। মনে আছে, আমি রবার্ট ব্রাউনিঙের ভক্ত শুনিয়া রামানন্দবাবু আমাকে বলেন, "তাহা হইলে ত আপনার ব্রাউনিং সাইক্লোপীডিয়া (Browning Cyclopaedia) থাকা উচিত।" তৎপরে আমি ঐ পুস্তক ক্রয় করি। আমি যখন 'ল'-পাস করিয়া স্কুলের শিক্ষকতা ছাড়িয়া বাঁকুড়া ত্যাগ করিব শুনিলেন, তখন রামানন্দবাবু বলিলেন, 'এবার আপনাকে 'প্রবাসী'তে লাগাইয়া দিব।" কিন্তু হায়, সে সৌভাগ্য আমার হয় নাই। রামানন্দবাবুর এ সমস্ত সামান্য বিষয় মনে থাকা সম্ভব নহে। কিন্তু আমার মনে বাঁকুড়ার স্মৃতির মধ্যে তাঁহার চিত্র উজ্জ্বল হইয়া আছে। যখনই কোনও সাহিত্যিক দেখিয়াছি, প্রাণের টানে তথায় ছুটিয়া গিয়াছি। কিন্তু ভাগ্যবশে যথোপযুক্ত সাহিত্যসেবা করিবার সুযোগ এ জীবনে হয় নাই। মহেশবাবুর বাসায় আর একজন সাহিত্যিককে দেখিয়াছিলাম—তিনি ঔপন্যাসিক শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস। তাঁহার বাড়ি ছিল বাঁকুড়ার সংলগ্ন "নূতন চটী" নামক পল্লীতে।

মহেশবাবু হাজারীবাগ হইতে প্রবেশিকা পাস করেন এবং হাজারীবাগের স্কুলেই কার্য্য করিতে করিতে অবসর গ্রহণ করেন। হাজারীবাগের ওকনী নামক পল্লীতে তাঁহার ভাগিনেয়ীর গৃহে তিনি বাস করিতেন। ঐ ভাগিনেয়ীর স্বামী পণ্ডিত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী বেদান্তবাগীশ, এম্-এ। মহেশবাবুর মুখে শুনিয়াছি ঐ বাড়িটি তাঁহারই তত্ত্বাবধানে নির্ম্মিত হয়। ধীরেনবাবু কলিকাতায় থাকেন। সময়ে সময়ে হাজারীবাগ আসেন।

গত ১৩৩৫ সালের পূজার বন্ধে হাজারীবাগ যাইব মনস্থ করিয়া মহেশবাবুকে একটি থাকিবার স্থান সন্ধান করিতে লিখি। আমি একাই যাইব জানিয়া তিনি তাঁহার বাসায় থাকিবার জন্য বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন; বাসায় কেবল তিনি ও তাঁহার দিদি—বয়স ৭০ বছরের বেশী। অনেক অনুসন্ধান করিয়া অন্যত্র আমার আহারের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। মহেশবাবুর এই দিদি বরাবর মহেশবাবুর



মেঘ দর্শনে

শ্রীরামগোপাল বিজয়বর্গীয়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

নিকটে থাকিতেন। মহেশবাবুর এই ভগিনীর সহিত আমি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের ভগিনী ডোরোথীর তুলনা করি। মহেশ বাবুর এই দিদি হাজারীবাগেই পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহাকে ভ্রাতৃশোক সহ্য করিতে হয় নাই। আমার হাজারীবাগ যাইবার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বহুকাল পরে মহেশবাবুর সাহচর্য্য লাভ এবং ভগবানের কৃপায় ষোল-সতের দিন আমার সেই সৌভাগ্য হইয়াছিল।

যখন আমি হাজারীবাগে তাঁহার বাসাতেই উঠিব স্থির হইল তখন মহেশবাবু শহরের মধ্যে তাঁহার বাসা কোথায় তাহার একটি নক্সা পাঠাইয়া দেন। হাজারীবাগ রোড ষ্টেশন হইতে মোটর-বাসে হাজারীবাগ পৌঁছিয়া আমি আমার বাক্স বিছানা একটি মুটের মাথায় দিয়া তাঁহার বাসাভিমুখে রওনা হইলাম। আমাকে নক্সার সাহায্য গ্রহণ করিতে হয় নাই; মুটেরাও তাঁহার বাসা চিনে। মহেশবাবু নক্সা পাঠাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন না। যেখানে মোটর-বাস থাকে, তথায় তিনি তাঁহার একজন ভৃত্যকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু মোটর-বাস সেদিন তথায় না থামায়, ঐ ভৃত্যের সহিত আমার দেখা হয় নাই। তাঁহার বাসার নিকটে গিয়া দেখিলাম যে তিনি বারান্দায় আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। জিনিষপত্র মুটের মাথা হইতে নিজে নামাইলেন। বারান্দা হইতে তাঁহার সহিত প্রথম কক্ষে প্রবেশ করিয়া হতভম্ব হইলাম;—এ যে একটি পুস্তকের দোকান। চারিধারে খোলা শেল্‌ফে অসংখ্য পুস্তকরাশি; মেঝের বেঞ্চের উপর এবং জানালার উপরেও বহু পুস্তক; মহেশবাবু যে বাড়িতে থাকিতেন তাহার প্রধান অট্টালিকায় তিনটি শয়নঘর; ঐ ঘর কয়টিই পুস্তকে পূর্ণ। প্রথম ঘরে সেই অগণ্য পুস্তক মধ্যে মাঝখানে তাঁহার ছোট একটি শয্যা এবং তাহারই সামনে একটি বৃহৎ টেবিল।

দ্বিতীয় ঘরটি আমার জন্য নির্দিষ্ট হইল। আমি বলিলাম, যে, কথায় ব'লে বাঁশ বনে ডোমকাণা; আমি যে ক'দিন থাকিব কোনও বই পড়িব না। আপনার মুখে বইয়ের কথা শুনিব। হইয়াছিলও তাই।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা তিনি খুব বেশী পড়েন নাই। আমি রবীন্দ্রনাথের কবিতার অনুরাগী জানিয়া আমি সেখানে থাকিতে থাকিতে রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি কবিতা-পুস্তক আনাইলেন। তাঁহার পত্রে পরে তিনি রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রশংসাসূচক অনেক কথা লিখিয়াছিলেন।

তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল ছিল না। ইদানীং ঢিলা পায়জামা পরিয়া বাড়িতে থাকিতেন; এবং বেড়াইতে যাইবার সময় একটি গেরুয়া রঙের পাগড়ী মাথায় বাঁধিতেন। অজানা লোক অনেক সময় তাঁহাকে পাঞ্জাবী বলিয়া ভুল করিয়াছে। তাঁহার মুখে শুনিয়াছি—একবার বেড়াইতে বাহির হইয়া পথে একজন পরিচিত ভদ্রলোকের সহিত দেখা হইল। তাঁহার সহিত রাস্তায় দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা বলিয়া অগ্রসর হইলেন। ঐ ভদ্রলোকের সহিত তাঁহার একটি বন্ধু ছিল; মহেশবাবু অগ্রসর হইলে শুনিতে পাইলেন যে, ঐ বন্ধুটি বলিতেছেন, "বাঃ ইনি ত বেশ বাংলা বলতে পারেন!"

তিনি একবার মাত্র যৎসামান্য অন্ন গ্রহণ করিতেন। তিনি নিরামিষাশী ছিলেন। প্রাতে উঠিয়া এক পেয়ালা কোকো ও কয়েকখানি বিস্কুট, বৈকালে ও রাত্রি ৯টার সময় ঐ প্রকার। রাত্রি ১০টা বাজিলেই শয়ন করিতেন।

এই "কোকো" কয়বারই তিনি স্বহস্তে প্রস্তুত করিতেন। অথচ বাসায় তাঁহার দুটি চাকর; একটি মালির কাজ করিত এবং পুস্তক মুছিত, আর একজন গৃহের অন্য কাজকর্ম্ম করিত। তিনি কাহাকেও নিজের কাজের জন্য কষ্ট দিতে চাহিতেন না। প্রাতে উঠিয়া পার্শ্বের ঘর হইতে শুনিতাম যে, কোন স্তোত্র বা গীতার কোন অধ্যায় বা স্বরচিত একটি সংস্কৃত স্তোত্র আবৃত্তি করিতেছেন। তাঁহার স্বরচিত স্তোত্রটি নিম্নে দেওয়া হইল। ইহা হাজারীবাগ স্কুলের ছাত্রদের ক্লাসের পাঠ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে আবৃত্তি হইবার জন্য রচিত হইয়াছিল।

এখানে দেখিলাম তাঁহার যাবতীয় বৌদ্ধ প্রবন্ধ 'প্রবাসী' হইতে কাটিয়া শেলাই করিয়া রাখিয়াছেন। পরে জানিতে পারি যে রামানন্দবাবু সেগুলি প্রকাশের ভার লইয়াছেন। হাজারীবাগের গণ্যমান্য ব্যক্তি মাত্রেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন এবং অনেকে তাঁহার বাসায় আসিতেন। হাজারীবাগে যাঁহারা হাওয়া পরিবর্ত্তন করিতে আসিতেন তাঁহারাও অনেকে তাঁহাকে ও তাঁহার লাইব্রেরী দেখিতে আসিতেন। অধ্যাপক শ্রীযুত গোপালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়া বলিলেন, "হাজারীবাগ আসিয়া

যদি আপনাকে দেখিয়া না যাইতাম তবে হাজারীবাগ আসা বৃথা হইত।"

তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল ছিল না বলিয়া তিনি সাধারণতঃ কোথাও যাইতে চাহিতেন না। কোথাও বদলী হওয়ার আশঙ্কা থাকিলে বইগুলির জন্য চেষ্টা করিয়া তাহা বন্ধ করিতেন। তাঁহার লাইব্রেরীর পুস্তকগুলির মূল্য অনুমান বিশ সহস্র টাকা। অনেক বড়লোকের ইহাপেক্ষা অধিক মূল্যের লাইব্রেরী আছে; কিন্তু একজন সামান্য শিক্ষকের পক্ষে ইহা অসাধারণ সন্দেহ নাই।

তিনি উইল করিয়া তাঁহার লাইব্রেরী কলিকাতায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে দান করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার জন্মভূমির হিতার্থে বার্ষিক কিছু কিছু দান করিতেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পরে যাহাতে উহা লোপ না হয় তাহারও ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার শেষ পত্র এই—

হাজারীবাগ
৪।৬।৩০

প্রিয় বীরেশ্বর বাবু,

আমি শয্যাশায়ী নড়িতে চড়িতে পারি না, বিছানাতেই সব করিতে হয়। ভবিষ্যৎ বিধাতার হাতে। অপরের দ্বারায় চিঠি লেখাইলাম। নমস্কার জানিবেন।

আপনাদের মহেশচন্দ্র ঘোষ

এই পত্রের উত্তর দিয়া পাঁচ-সাত দিন কোনও জবাব না পাইয়া মন সন্দেহান্বিত হইল; কারণ মহেশবাবু কখনও পত্রের উত্তর দিতে বিলম্ব করিতেন না; তার পরে 'অমৃতবাজার পত্রিকায় তাঁহার মৃত্যুসংবাদ পাঠ করিলাম।

সুদূর হাজারীবাগের নিভৃত কোণে বাণীর যে সাধনা চলিতেছিল তাহা শেষ হইয়াছে। একজন সামান্য বাঙালী শিক্ষক সংযম ও অধ্যবসায় দ্বারা যে জ্ঞানের বহু প্রকোষ্ঠে প্রবেশ লাভ করিতে পারে মহেশবাবু তাহা দেখাইয়াছেন। "বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে"—মহেশবাবু ইহার একটি দৃষ্টান্তস্থল। 'অমৃতবাজার পত্রিকা' যথার্থ ই লিখিয়াছে—"Hazaribagh has lost its greatest Bengali resident," (হাজারীবাগ তাহার মহত্তম বাঙালী অধিবাসী হারাইয়াছে)।

মহেশবাবুর স্বরচিত স্তোত্রটি এই—

নমস্তে জগদাধার ত্বং হি সত্যঃ সনাতনঃ।
স্রষ্টা পাতা প্রশাসিতা নমস্তুভ্যং পরাত্মনে॥ ১।
সর্ব্বজ্ঞোঽসি নিয়ন্তাসি, সর্ব্বভূতে সদাস্থিতঃ।
সর্ব্বসাক্ষী ত্রিকালেশো নমস্তুভ্যং পরাত্মনে॥ ২
ত্বমেকঃ সচ্চিদানন্দস্ত্বং হি ভূমা মহানসি।
বিদধাসি পরাং শান্তিং নমস্তুভ্যং পরাত্মন॥ ৩
শঙ্করস্ত্বং শিবোঽসিত্বং সর্ব্ববিঘ্ন বিঘাতনঃ।
কৃপাময়ঃ সুধাসিন্ধু নমস্তুভ্যং পরাত্মনে॥ ৪
মাতা নোঽসি পিতা নোঽসি বন্ধুর্নোঽসি সখা সুহৃৎ।
ত্বত্তঃ প্রিয়তরো নাস্তি নমস্তুভ্যং পরাত্মনে॥ ৫
দেহি পুণ্যং পবিত্রত্বং দেহি নো বিরজঃ পদম্।
ত্বং হি শুদ্ধো নিরঞ্জনো নমস্তুভ্যং পরাত্মনে॥ ৬
দেহি প্রীতিং সুনির্ম্মলাং দেহি ভক্তিং অহৈতুকীং।
ত্বমঃ পরাগতির্মুক্তি নমস্তুভ্যং পরাত্মনে॥ ৭
দেহি নঃ পরমং জ্ঞানং দেহি নো দিব্যমীক্ষণং।
ত্বং হি ধ্বান্তে ধ্রুবং জ্যোতির্নমস্তুভ্যং পরাত্মনে॥ ৮
অভিরামং মনোহরং সুন্দরং চারুদর্শনং।
পশ্যামস্ত্বামনুক্ষণং নমস্তুভ্যং পরাত্মনে॥ ৯

একজোড়া জুতা

শ্রীনরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

সেকালে বড়লোকদের ঘুম ভাঙাবার জন্যে না-কি বৈতালিক গানের ব্যবস্থা ছিল। এখন তার স্থান নিয়েছে এলার্ম ঘড়ি। অজিতের কিন্তু এ-দুয়ের কোনটারই দরকার নেই, কারণ প্রত্যহ ভোর না হতেই পাশের বাড়ির কলতলায় ভাড়াটে ও বাড়িওয়ালার মেয়েদের মধ্যে স্বাধিকার স্থাপনের প্রচেষ্টায় যে মৃদু বিতর্কের সৃষ্টি হয় সেটা ঠিক সঙ্গীতরসাশ্রিত না হ'লেও ঘুমভাঙানোর পক্ষে অব্যর্থ।

আজ রবিবার; আপিসের তাড়া নেই। একটু বেলা পর্য্যন্ত আরাম করলে কোনো ক্ষতি ছিল না, কিন্তু উপায় কই! অজিত এই ব'লে আক্ষেপ করতে করতে উঠে পড়ল যে. তার সজীব টাইমপীস্ একদিনের জন্যও স্লো যেতে জানে না।

ঘরের মধ্যে দু-বার পায়চারি ক'রে ঘুমটা ভাল ক'রে ছেড়ে গেলে অজিত ষ্টোভ জ্বালতে বসল। ষ্টোভ জ্বেলে চায়ের জলটা চাপিয়ে দিলে, তার পর টুথপাউডারের একটা বাহারি খালি শিশির ভেতর থেকে খানিকটা ছাইয়ের গুঁড়া বাঁ-হাতের তেলোর উপর ঢেলে ডানহাতে বুরুশটা নিয়ে নীচে নেমে গেল।

কলতলা থেকে ফিরে এসে চা-টুকু তৈরি ক'রে নিতে নিতে মনে পড়ে গেল আজ আবার বিকালে তার এক বন্ধুর বাড়ি নিমন্ত্রণ আছে। বন্ধুটি সম্ভ্রান্ত ঘরের লোক এবং অপর নিমন্ত্রিতদেরও অধিকাংশই সেই শ্রেণীর। সুতরাং বেশভূষার একটু আয়োজন করা চাই। আয়োজন আর কি, কাপড় একটা কাচাই, কিন্তু ভাল জামা তার একটাও নেই। সেই মান্ধাতার আমলের একটা তসরের পাঞ্জাবী, তাও আস্তিনের উপর সেদিন একটা দাগ লেগেছে। না কাচিয়ে পরা চলে না। কিন্তু ধোপার বাড়ি থেকে সাফ করিয়ে নেওয়ারও সময় নেই। হাতে পয়সা থাকলে একটা জামা কিনে আনা যেত কিন্তু মাসের শেষাশেষি কোন্ কেরাণীরই বা পকেট ভারি থাকে। ঘরেই কেচে নিতে হবে এই জামাটা।

একটা পেয়ালায় খানিকটা চা নিয়ে সে খেতে যাবে এমন সময় পাশের ঘর থেকে রমেন এসে ঢুকল। অজিত বাকি চা-টা একটা পেয়ালায় ঢেলে রমেন যাতে না দেখতে পায় এমন ক'রে দু-ফোঁটা গোলাপজল মিশিয়ে পেয়ালাটা তার দিকে এগিয়ে দিলে।

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে রমেন ব'লে উঠল,—এটা কি চা হে? গোলাপের গন্ধ পাচ্ছি যেন?

অজিত গম্ভীর হয়ে বললে,—হ্যাঁ ওটা রোজ-পিকো। এখানে পাওয়া যায় না, চা-বাগান থেকে একেবারে বিলাত চলে যায়। খুব দামী জিনিষ।

—তা তুমি যোগাড় করলে কোত্থেকে?

—আমার এক আত্মীয় চা-বাগানের ম্যানেজার কিনা; সেখান থেকে সে দু-পাউণ্ড পাঠিয়ে দিয়েছিল।

—আমায় দিও ত দু'টো—

—এখন আর কোত্থেকে দেব, আজই শেষ হয়ে গেল যে।

—যাক্, তবে আর কি হবে! হ্যাঁ ভাল কথা, আজ যে সাঁতারের প্রতিযোগিতা আছে সে-কথাটা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলুম। চল না যাবে দেখতে? তোমার ত ছুটি রয়েইছে।

—না ভাই, এখন আর আমার বেরুবার উপায় নেই, এক জন লোকের আসবার কথা আছে। তার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।

—থাক্‌গে, তবে আমিও যাব না ঐ ভীড়ের মধ্যে, তার চেয়ে বরং তোমার সঙ্গে খানিকটা গল্প করে যাই।...

অজিত ভাবলে,...ভাল বিপদ ত, এ যে কাঁটালের আটার মত ছাড়তেই চায় না! এদিকে কত কাজ রয়েছে—দাড়ী কামান, জামায় সাবান দেওয়া, জুতা বুরুশ করা, এসব করব কখন। আচ্ছা দাঁড়াও, তাড়াবার বন্দোবস্ত করছি!

ফস্ করে সে রমেনের কাছে পাঁচটা টাকা ধার চেয়ে

বল্‌লে। বল্‌লে, মাস কাবারেই দিয়ে দেব। ফল ফল্‌তেও বেশী দেরি হ'ল না। রমেন নিজের অক্ষমতা জানিয়ে সংসারের টানাটানি, অসুখ-বিসুখ প্রভৃতি কাঁদুনি গাইতে গাইতে হঠাৎ একটা ছুতো করে চলে গেল।

নিজের বুদ্ধিকে একটু তারিফ দিয়ে অজিত কাজে মন দিলে।

২

দুপুরে ঘণ্টা দুয়েক মাত্র ঘুমানো ছাড়া বাকি সমস্তটা দিনই অজিত তার প্রসাধন-কাব্যের উদ্যোগপর্ব্বে কাটিয়েছে।

জামাটা কেচেই শুধু সে ক্ষান্ত হয় নি। একটা ঘটীর মধ্যে কাঠকয়লার আগুন পূরে সেটা সে আবার ইস্ত্রি করেছে। কাপড়খানার পাট খুলতে এক জায়গায় খানিকটা ছেঁড়া বেরিয়ে পড়ে, সেটুকু ঢাকবার জন্যে অতি সন্তর্পণে আবার সেটা কোঁচাতে হয়েছে।

সবচেয়ে মুস্কিলে পড়েছিল সে জুতা নিয়ে। যে-জোড়া প'রে সে আপিসে যায় সেটা একেবারে ছিঁড়ে না গেলেও উপরকার চামড়াটার এমনি শোচনীয় অবস্থা হয়েছে যে, এককালে তার রংটা কি ছিল তা অনুমান করা কঠিন। নিমন্ত্রণের পোষাকের সঙ্গে জুতাজোড়া ঠিক খাপ খায় না ব'লে অজিত আর এক জোড়ার সন্ধান করতে লাগল তার পুরাণো জুতাগুলার মধ্যে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর সিন্দুকের পিছন থেকে একপাটি আর একপাটি বেরুলো কয়লার ঝুড়ি থেকে। কিন্তু পায়ে দিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে অজিত হতাশ হয়ে পড়্‌লো—দুপাটিই বাঁ-পায়ের। অগত্যা আগের জোড়ারই জীর্ণ সংস্কার ক'রে নিতে হ'ল। আগে দোয়াতের কালিটুকু নিঃশেষে লাগিয়ে শুকিয়ে নিয়ে তার পর পালিস্ মাখিয়ে যখন শেষ করলে তখন জুতাজোড়ার চেহারার বাস্তবিকই অনেক উন্নতি হয়েছে।

সন্ধ্যা হ'তে সাজগোজ সেরে অজিত আয়নার সামনে এসে দাঁড়াল। বারে বারে পরীক্ষা ক'রে দেখলে প্রসাধনে কোথাও খুঁৎ থেকে গিয়েছে কি-না। পাঞ্জাবীর ভাঁজটা হাত দিয়ে দু-বার সমান ক'রে নিলে। কপালটা অনাবশ্যক রগড়ে রগড়ে লাল ক'রে ফেললে। তার পর নিজের সুদৃশ্য ছায়ার প্রতি খানিক ক্ষণ একদৃষ্টে তাকাতে তাকাতে হঠাৎ একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে সে বেরিয়ে পড়ল।

৩

ভবানীপুরে বন্ধুর বাড়ির সামনে এর মধ্যেই অনেকগুলা ঘোড়ার গাড়ী ও মোটর জমা হয়েছে। অজিতও বাস থেকে নেমে আট আনা দিয়ে একটা ট্যাক্সি ভাড়া ক'রে এসেছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, সে যে মোটরে এসেছে এটা দেখবার জন্যে দ্বারের কাছে সে-সময় কেউ উপস্থিত ছিল না।

ভিতরে হলের মধ্যে যেতেই বন্ধুকে দেখতে পেলে। সে নিজে যে এক জন বিশিষ্ট অতিথি একথা অপর সকলকে জানিয়ে দেবার জন্যে বেশ একটু উঁচু গলাতেই বন্ধুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাসূচক আলাপ আরম্ভ করলে। কিন্তু বেশীদূর অগ্রসর হ'তে পারলে না। ঠিক সেই সময়েই কয়েক জন নূতন অভ্যাগত এসে পড়াতে তাদের অভ্যর্থনার জন্যে বন্ধু তাকে বসতে ব'লে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

অজিত একটা কোচের উপর এসে বস্‌ল। বেশ সাজিয়েছে চারদিকে! বড় বড় অয়েল পেণ্টিং, আয়না, ঝাড় লণ্ঠন, রেশমী পরদা ফুলের মালাতে ঘরখানি একেবারে ইন্দ্রসভা ক'রে ফেলেছে। ঘরের মধ্যে ছোট ছোট এক একটা দল বসেছে। সকলেই খুব প্রফুল্ল ভাবে গল্পগুজব হাসি তামাশা করছে।

সকলেরই এক একটা দল আছে, কেবল অজিতই একা। ঘরভরা লোক কিন্তু ওদের মধ্যে কেউই তার পরিচিত নয়। এত যে উৎসবমুখরতা, এত যে আনন্দের উচ্ছ্বাস তা ওকে কেন যেন স্পর্শই করতে পারছে না। বন্ধু মাঝে মাঝে এদিকে আসছে বটে, কিন্তু সব সময়েই সে এত ব্যস্ত যে, তাকে দাঁড় করিয়ে এক মিনিটও কথা কইবার উপায় নেই।

চুপ ক'রে বসে থাকতে থাকতে অজিত অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। দেওয়ালের গায়ে একখানা ছবির দিকে নিতান্ত মনোযোগের ভাণ ক'রে সে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। যেন চিত্র সম্বন্ধে সে কতই অভিজ্ঞ। কিন্তু কাঁহাতক আর একদিকে

ঘাড় ফিরিয়ে থাকা যায়। বিরক্ত হয়ে সে মুখ ফিরিয়ে নিতেই চোখাচোখি হয়ে গেল একটি তরুণীর সঙ্গে।

খোলা দরজার সামনে বারান্দার উপর দাঁড়িয়ে কয়েকটি মেয়ে গল্প করছিল। তার মধ্যে একটি যে তার দিকে লক্ষ্য করছিল অজিত এতক্ষণ তা জানতে পারে নি। হঠাৎ দৃষ্টি মিলিত হওয়ায় সে একটু বিব্রত ভাবেই অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নিলে, কিন্তু বেশীক্ষণ সে অবস্থায় থাকতে পারলে না। ভারি কৌতূহল হ'ল। মেয়েটি তার দিকে এখনও চেয়ে আছে কি-না দেখবার জন্যে অজিত আবার ঘাড় ফেরালে। হাঁ, এখনও এইদিকেই চেয়ে আছে বটে। এবার অজিত চট ক'রে চোখ ফিরিয়ে নিলে না; লক্ষ্য ক'রে দেখতে লাগল মেয়েটির সৌন্দর্য্য। তরুণী একটু ফিক ক'রে হেসে অন্যদিকে চাইলে। অমনি অজিতের কান পর্য্যন্ত লাল হয়ে উঠলো। হঠাৎ সে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়ল। একবার আসনের উপর সোজা খাড়া হয়ে উঠে পরক্ষণেই আবার নীচু হ'য়ে বাঁ হাতের উপর গালটা রেখে নূতন ভঙ্গীতে বস্‌ল; ডান হাতটা চুলের উপর দু-বার বুলিয়ে নিলে, কাপড়ের সেলাইটা পাঞ্জাবীর নীচে ঠিক ঢাকা আছে কি-না অতি সন্তর্পণে সেটা পরীক্ষা করলে, তার পর পকেট থেকে রুমাল বার ক'রে মুখটা মুছতে মুছতে আবার সোজা হ'য়ে উঠে বসে তরুণীর উদ্দেশে চোখ তুললে। কিন্তু ব্যর্থ হ'ল তার সব আয়োজন, মেয়েটি ইতিমধ্যেই ভিতরে চলে গিয়েছে। এমন সময় খাবার ডাক পড়াতে সকলে উঠে পড়ল। অজিতের তখন খাবার আগ্রহ নেই, কিন্তু বন্ধুর পীড়াপীড়িতে বাধ্য হয়েই সকলকার সঙ্গে গিয়ে বস্‌ল। খাওয়ার আয়োজন হয়েছে প্রচুর, খাচ্ছেও সকলে খুব পরিতৃপ্তির সঙ্গে; শুধু অজিত মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছে।

পাশের ঘর থেকে মধ্যে মধ্যে নারীকণ্ঠের আওয়াজ ও মৃদু হাসির শব্দ আসছে। অজিত ভাবছে, কে জানে হয়ত সেই নীলাম্বরা তরুণীটিও ওদের মধ্যে আছে। আচ্ছা, ও যে তখন ওর দিকে চেয়ে অমন ক'রে হাসলে ওটা কি প্রীতির হাসি না বিদ্রূপের? বিদ্রূপের কেমন ক'রে হবে, তার ত একটা কারণ থাকা চাই;—অতদূর থেকে সে যে তার কাপড়ের সেলাইটা দেখে ফেলেছে তাও ত মনে হয় না। দূর ছাই! ওসব কথা নিয়ে সে আর মাথা ঘামাবে না। মেয়েটি হয়ত মোটেই তাকে লক্ষ্য করেনি, হয়ত তার কোনো পরিচিত লোকের উদ্দেশেই হেসেছিল—সে বুঝ্‌তে পারেনি।

খাওয়া শেষ হ'তে অজিত বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই দেখতে পেলে বাইরের ঘরে সেই মেয়েটিই তার বন্ধুর সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। সে তাড়াতাড়ি সেখানে যাবার জন্যে জুতাটা পায়ে দিতে গিয়েই একেবারে আশ্চর্য্য হয়ে গেল। তাই ত, জুতাজোড়া ত এইখানেই ছিল, এর মধ্যে গেল কোথায়।

এদিক-ওদিক চারদিক খুঁজেও যখন দেখতে পেলে না, তখন অজিত দস্তুরমত চিন্তিত হয়ে উঠলো।

জুতাজোড়া ত চুরিই গেল দেখছি। এখন এই রাত্রে খালি-পায়ে বাড়ি ফিরতে হলেই ত মুস্কিল—চট্ ক'রে তার মাথায় একটা ফন্দি এসে গেল, আচ্ছা এখানে আরও ত অনেকগুলা জুতা পড়ে রয়েছে, এরই মধ্যে থেকে একজোড়া যদি সে পায়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ে তবে কে আর জান্‌তে পারবে। কাজটা ভাল হবে না, সন্দেহ নেই, কিন্তু এ-ছাড়া আর উপায়ই বা কি। খালি-পায়ে এত লোকের সামনে দিয়ে, বিশেষ ক'রে এই মেয়েটির সামনে দিয়ে, সে যাবে কেমন ক'রে। লুঙ্গীর উপর নেকটাই-পরা এক মাদ্রাজী ভদ্রলোককে দেখে সে একবার অত্যন্ত হেসেছিল, তার চেহারাটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। নাঃ, খালি-পায়ে সঙের মত সে কিছুতেই যেতে পারবে না, কিন্তু এদিকে আর অপেক্ষা করা চলে না, এখনই কেউ এসে পড়তে পারে।

একটু অন্ধকারের দিকে এগিয়ে অজিত একজোড়া জুতার মধ্যে পা ঢুকিয়ে দিলে—হ্যাঁ, ঠিক ফিট করেছে বটে। তাড়াতাড়ি বাইরে এল। দরজার কাছে বন্ধু জিজ্ঞাসা কর্‌লে, কি হে চললে না-কি।

—হ্যাঁ ভাই, আর রাত করব না—ব'লে মুখ না তুলেই অজিত হন্ হন্ ক'রে এগিয়ে চল্‌ল—তরুণীটির দিকে একবার তাকিয়েও দেখলে না।

একেবারে বড় রাস্তায় পড়ে অজিত নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। কপালের ঘামটা হাত দিয়ে মুছে নিলে,—বুকের মধ্যে তার তখনও টিপ টিপ করছে। কি কাণ্ডটাই ঘটে গেল আজ

কয়েক মিনিটের মধ্যে। অবসর পেয়ে অজিত এখন স্থির হয়ে ভাবতে লাগল, কাজটা সে খুব সহজেই শেষ করেছে এবং ধরাও পড়েনি, কিন্তু তাই ব'লে ওতে বিপদের আশঙ্কাও কম ছিল না। যদি ধরা পড়ত, কি লজ্জা, কি লাঞ্ছনার ব্যাপারই না হ'ত,—ওঃ, সে কথা ভাবতে গেলেও শরীর কেঁপে ওঠে। আচ্ছা, ধরা না-হয় সে পড়েইনি, কিন্তু মুহূর্ত্তের উত্তেজনায় সে যে অপকর্ম্ম ক'রে ফেলেছে সেটা কি একান্তই লজ্জাকর নয়?

ধীরে ধীরে অনুশোচনা এসে অজিতের সারা অন্তর ভরে গেল। তখন নিজের কাছে নিজের লজ্জা ঢাকতে সে একটা কিছু করবার জন্যে অধীর হয়ে উঠ্‌ল। কিন্তু করবারই বা আছে কি, প্রায়শ্চিত্ত?—হ্যাঁ, উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হয়, যদি সে এখনই বন্ধুর বাড়ি ফিরে গিয়ে সব কথা খুলে ব'লে তার মারফৎ জুতাজোড়া ফেরত দেয়। কিন্তু তার যদি এতই মনের জোর থাকবে তাহলে সামান্য কারণে সে অত বড় একটা অপরাধ ক'রে ফেল্‌বে কেন!

অজিত নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখলে। নূতনও নয়—অতি সাধারণ পুরাণো একজোড়া জুতা, এরই জন্যে তার প্রথম পাপাচরণ। ও কি!—জুতার উপরে একটা তালি নজরে পড়ায় সে চম্‌কে উঠ্‌ল। তাড়াতাড়ি হেঁট হয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখলে,—কি সর্ব্বনাশ, এ যে তার নিজেরই জুতা।

অপরের মনে ক'রে অজিত তার নিজেরই জুতাজোড়া চুরি করে এনেছে।

আমাদের অর্থসমস্যা ও কলকারখানা

শ্রীবিজয়কান্ত রায়-চৌধুরী, এম-এ

মানুষ সত্যের সন্ধান ও অনুশীলন করিতে করিতে শক্তির দেখা পাইয়াছে। বাষ্পীয় শক্তি (steam power) ও বৈদ্যুতিক শক্তি (electric power) তাহার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ইতিপূর্ব্বেই ধরা দিয়াছে এবং ক্রমে অণু পরমাণুর (electron proton) অন্তরে বিধৃত এক সূক্ষ্ম মহাশক্তি তাহার দৃষ্টির সম্মুখে ভাসিতেছে। এই সকল শক্তির পরিচয় পাইয়া বুদ্ধি ও প্রতিভা খাটাইয়া মানুষ নানা কলকারখানা আবিষ্কার করিয়া শক্তিকে নিজের কাজে লাগাইয়াছে। উদ্দেশ্য—ইহার দ্বারা মানবসমাজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও সম্পদ বৃদ্ধি হইবে। ইহাতে মানুষের কঠিন কায়িক শ্রমের লাঘব হইবে এবং অল্প সময়ের মধ্যে বহুগুণ প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপন্ন হইবে।

বাস্তবিকই কলকারখানার বিপুল বিরাট ও ক্ষিপ্র কাজ দেখিয়া আজকাল আশ্চর্য্য হইতে হইতেছে। রেল জাহাজ মোটর এরোপ্লেন বেতার মানবসমাজের গতি কি দ্রুত ফিরাইতেছে! কাপড়ের কল লোহার কারখানা তেলকল চালকল প্রভৃতি কি রাশি রাশি জিনিষ রোজ তৈরি করিতেছে! কয়লার খনি, পেট্রোল ও তৈলের খনিতে কলের সাহায্যে বিপুল জিনিষ উঠিতেছে। কৃষিকার্য্যেও কলের সাহায্যে বেশী উৎপাদনের উপায় হইতেছে। এত আবিষ্কার এত সুবিধা যখন মানুষের আয়ত্তের মধ্যে তখন মানুষের এত দুঃখ কেন? মানুষের সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিবার যখন এত ব্যবস্থা হইতেছে তখন এত দুঃখ, দারুণ অর্থসমস্যা ও শ্রেণী-বিরোধ কেন মানুষের জীবন দুর্ব্বহ করিয়া তুলিতেছে? আমাদের দেশের কথা না-হয় ছাড়িয়াই দিলাম, জগতের যে-সব দেশে কলকারখানার বিপুল প্রতিষ্ঠা সেখানেও কি হাহাকার! জগতের আকাশ-বাতাস যখন লক্ষ লক্ষ লোকের দুর্দ্দশায় ক্রন্দনে ধ্বনিত, তখন আমাদের ভাল করিয়া বুঝা ও ভাবা দরকার এই মহান্ কল্যাণের ক্ষেত্রে কি করিয়া এত অমঙ্গলের উদ্ভব।

ইহার কারণ খুঁজিতে গিয়া প্রথমেই চোখে পড়ে যে, কলের সাহায্যে যেমন অল্পসংখ্যক লোকের দ্বারা লক্ষ লক্ষ লোকের কাজ করা সম্ভব হইয়াছে, সেই সঙ্গে সেই লক্ষ লক্ষ লোক তাহাদের এতদিনের অবলম্বন হারাইয়া বেকার হইয়া পড়িতেছে। যেমন একটা কাপড়ের কলে এক শত তাঁতির দ্বারা দশ হাজার তাঁতির কাজ হইতেছে। ইহাতে কাপড় সস্তা হইতেছে এবং পূর্ব্বাপেক্ষা বহুগুণ কাপড় উৎপন্নের উপায় হইয়াছে; কিন্তু নয় হাজার নয় শত তাঁতির

জীবিকা গিয়াছে, তাহারা বেকার হইয়া হয় কৃষিকাজ ধরিয়াছে না-হয় অন্য বৃত্তি অবলম্বন করিতেছে। তাহাতে কৃষি ও অন্য কাজে দারুণ প্রতিযোগিতা আসিয়া জগতে দুঃখ বাড়িয়াছে বই কমে নাই। সকল ক্ষেত্রেই কলের দ্বারা বেকারের সংখ্যাই ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে। এমন কি, যেখানে কৃষিকাজেও কলের প্রবর্ত্তন হইয়াছে, সেখানে কৃষককেও বেকার করিয়া তুলিতেছে। কলের মোটর লাঙ্গল, শস্যকাটা কল, রোপণের কল প্রভৃতির সাহায্যে যাহা করা সম্ভব তাহাতে একজন কৃষক সামান্য জনকতক মজুরের সাহায্যে এত শত জন কৃষকের উপযুক্ত জমি চাষ আবাদ করিয়া সম্পন্ন হইতে পারে। সহজে বেশী উৎপন্ন হইবার সুবিধা যেমন একদিকে হইয়াছে, অন্যদিকে বেকারের সংখ্যা দ্রুত বাড়িতেছে। এখন এই বেকার-সমস্যাই বর্ত্তমান যুগে প্রধান সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

তারপর, যাহারা কল আঁকড়াইয়া পড়িয়া আছে এবং কলের কাজেই গতর খাটাইতেছে তাহাদেরই বা কি দশা! শুধু মুষ্টিমেয় জনকতক মালিক, ডিরেক্টর, ম্যানেজার বিপুল সম্পদের অধিকারী হইতেছেন, কিন্তু যাহাদের সাহায্যে কল খাটাইয়া তাঁহাদের বিপুল সম্পদ সৃষ্টি হইতেছে তাহারা কি দুর্দ্দশায় আছে তাহা একবার কুলিবস্তীগুলির দশা যাহারা দেখিয়াছেন তাঁহারাই জানেন। পরিশ্রমী মানুষের যে এত দুঃখ হইতে পারে তাহা কে জানিত? স্বামি-স্ত্রী পরিশ্রম করিয়া যাহা উপায় করে তাহাতে দুঃখে কষ্টে কোনরূপে চলে, কিন্তু যখনই কেহ অসুখে পড়ে কি মারা যায়, তখন তাহার স্ত্রীপুত্রের দুঃখ অবর্ণনীয়। কারণে অকারণে সামান্য দোষেই, কি মনিবের অল্প বিরাগের কারণ ঘটিলেই তাহার কাজটি যাইবে; ছেলেমেয়ে লইয়া কোথায় যাইবে এই আশঙ্কা তাহাকে সতত মানুষের অধম করিয়া রাখিয়াছে। এই দুর্দ্দশার দৃশ্য চোখে দেখিলে আর কলের দ্বারা কোন কল্যাণ হইবে এমন আশাই মনে আসে না। ধর্ম্মঘট কখন ইহার প্রতিকার করিতে পারে না। পর্য্যাপ্ত বেতনের দাবি করিয়া এবং কাজের সময় কমাইবার দাবি করিয়া ধর্ম্মঘট করিলে অনেক সময় ধর্ম্মঘটকারী মজুরদের অর্থকষ্টে পড়িয়া মাঝখানেই ধর্ম্মঘট মিটাইয়া ফেলিতে বাধ্য হইতে হয়, কারণ কারখানার কর্ত্তারা অনেক লাভ খাইয়া অনেক টাকা জমাইয়াছেন, অনেক দিন কল বন্ধ রাখিয়া তাঁহারা যে ক্ষতি সহ্য করিতে পারেন, 'দিন আনে দিন খায়' যে-সব মজুর তাহাদের পক্ষে তাহা সম্ভব নয়। আর যদিই বা শ্রমিকগণের জয় হইয়া বেতনবৃদ্ধির একটা রফা হয় তবে সেই বেশী টাকার দায় কারখানার মালিকরা উৎপন্ন জিনিষের দাম বাড়াইয়া সাধারণের উপর (indirect tax) চাপাইয়া দিবেন। ইহাতে মজুরদেরও প্রয়োজনীয় জিনিষ বেশী দামে কিনিতে হওয়ায় মজুরী বেশী পাওয়ায় তাহাদের অবস্থার প্রকৃত উন্নতি হয় না। ধর্ম্মঘটের ফলে কর্ত্তাদের বিপুল সম্পদ বাড়াইবার কোন অন্তরায় হয় না, শুধু সাধারণের ভাগ্যে ক্ষতি আসিয়া জুটে। মাঝে মাঝে দায়ে পড়িয়া বেতনবৃদ্ধি বা সামান্য দুই একটা বিষয়ে বা সুবিধা দিয়া মানুষে-মানুষের মধ্যে এই নিদারুণ বৈষম্য কখন দূর করা যাইবে না। চাই আমূল পরিবর্ত্তন।

রুষ দেশ এক আমূল পরিবর্ত্তনই ঘটাইয়াছে। অবস্থার বৈষম্য যাহাতে মানুষের কষ্টের কারণ না হয়, সকলেই যাহাতে এই বিপুল ধন উৎপাদনের ক্ষেত্র কলকারখানার সমৃদ্ধি ঠিকমত ভোগ করিতে পায় এজন্য সেখানে সমস্ত কলকারখানাকে সাধারণের সম্পত্তি করিয়া ষ্টেটের সাহায্যে চালাইতেছে। এ যেন সকল দেশ এক যৌথ পরিবারভুক্ত; সমাজ, অর্থনীতি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি সকলের কল্যাণ এক বিরাট কেন্দ্র হইতে সমস্ত বলি দেশের প্রতিনিধিগণ নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন। এমন ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে যে, মুষ্টিমেয় লোকের হাতে সাধারণের সুখসুবিধা দেওয়া আর সম্ভব নয়। সেখানে নাকি কাজ বেশ ভালই হইতেছে, শুনিতেছি অন্য দেশের তুলনায় সেই দেশের লোক কল্যাণের পথে দ্রুত আগাইয়া চলিয়াছে। আমাদের দেশে মনীষী নেতা স্বর্গীয় মতিলাল নেহেরু, পণ্ডিত জবাহরলাল নেহেরু, এবং বরেণ্য কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ রুষদেশে গিয়া সমস্ত দেখিয়া আসিয়াছেন। তাঁহারাও বলেন, কল ভালই হইতেছে।

জগদ্বিখ্যাত বিরাট কারখানার প্রতিষ্ঠাতা এবং শ্রেষ্ঠ ধনী হেন্‌রী ফোর্ড অন্য উপায়ে উভয় দিক বজায় রাখিয়া এইরূপ আমূল পরিবর্ত্তন না ঘটাইয়াও এই সমস্যার সুন্দর সমাধান হইতে পারে বলিয়াছেন। তাঁহার দুইখানি বইয়ে

('My Life and Work' এবং 'To-day and To-morrow') তিনি কিরূপে ইহার সমাধান করিয়াছেন, কি নীতি ও নিয়মে চলিয়া সকলেরই সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করিয়া বিরাট কারখানা গড়িয়া তুলিয়াছেন তাহা দেখাইয়াছেন। তাঁহার কারখানায় নাকি কেহই অসুখী নাই, নিজ নিজ কর্ম্মশক্তি ও বুদ্ধি খাটাইয়া শ্রমিক, কর্ম্মচারী প্রভৃতি সকলেই পরিমিত পরিশ্রমে স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার মধ্যে থাকিয়া অন্য সকল জায়গার অপেক্ষা এখানে বেশ ভাল বেতন ও বোনাস বা লাভের অংশ পাইতেছে। তাঁহার কারখানায় কখনও ধর্ম্মঘট হয় না, সকলেই বুঝিতে পারে যে কারখানায় তাহাদেরও কল্যাণ হইতেছে এবং উৎপন্ন জিনিষের দামও ব্যবস্থার গুণে যতদূর সম্ভব কম করিতে পারায় সাধারণের এই কারখানার সুবিধা ভোগের সুযোগ ঘটিয়াছে। তাঁহারই বই পড়িয়া এবং তাঁহার কাজ দেখিয়া মনে হয় তিনি কলকারখানার ভিতরের সত্য এবং কল্যাণের দিক উদার দৃষ্টিতে ধরিতে ও বুঝিতে পারিয়াছেন। তাঁহার বিখ্যাত বই 'To-day and To morrow' হইতে কয়েক স্থল সঙ্কলন করিয়া দিলাম :—

যদি অন্ততঃ জগতের প্রত্যেক লোকের যোগ্যতা অনুসারে ভালভাবে খাওয়া-পরার ও বাসের ব্যবস্থা না করিয়া দেওয়া হয় তবে মানুষের এই সভ্যতার কোনো অর্থই হয় না। এইটুকু না করিয়া তুলিতে পারিলে মানব সভ্যতা ব্যর্থ বলিতে হইবে।

মনীষী দার্শনিক নীট্সের মত এই লক্ষ্মীর বরপুত্রের দৃষ্টির আগে জগতের দারিদ্র্য অতি কুৎসিত আকারেই দেখা দিয়াছে,—দারিদ্র্য তাঁহাকে বেদনা দিয়াছে।—জগৎ দারিদ্র্যের কাছে হার মানিয়াছে। "কখনও এমন করিয়া হার মানিয়াছে যে দারিদ্র্যকেই গুণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছে।"

ভিক্ষা, দান প্রভৃতির দ্বারা অক্ষম ও দরিদ্রের প্রকৃত হিত হয় না, যে হিতচেষ্টা তাহাকে সক্ষম করিয়া তুলিয়া নিজের পায়ে দাঁড়াইয়া উপার্জ্জনের উপায় করিয়া দেয় না তাহা তাহার অ-হিতকারী।

আজ আমরা সবে বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছি যে, যে-আলোচনায় সাধারণ জনের কল্যাণ নাই তাহা বিফল।

কলকারখানার কর্ত্তারা এখনও বুঝিতে পারেন নাই যে, কলকারখানার অন্তরের সত্য হইতেছে সমস্ত মানব-সমাজের কল্যাণ, এবং কলকারখানাকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি মনে করা ভুল। যে মানুষ কল ক্রয় করে কিংবা চালায়, কল তাহার সম্পত্তি নহে; ইহা সর্ব্বসাধারণের।

আমরা যাহাকে কলকারখানার যুগ বলি তাহা আসলে হইতেছে শক্তির যুগ; এই শক্তিকে আয়ত্ত করিয়া মানুষ তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে জয় করিয়াছে এবং ইহারই কল্যাণে উৎপাদন অনেক বেশী এবং সস্তা করিয়া জগতের সকলেরই সম্পদভোগ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সুবিধা হইবে।

কঠোর কায়িক শ্রমের গুরুভার হইতে মুক্ত করিয়া মানুষের আধ্যাত্মিক ও মানসিক প্রতিভা বিকাশের সুযোগ ও অবসর দিবে—মানুষ তাহার অন্তর-রাজ্যের বিশাল সম্ভাবনীয়তাকে ফুটাইয়া তুলিতে পারিবে।

কারখানার কর্ত্তারা আজও ইহা ধরিতে পারেন নাই যে, কলকারখানা জগতে এক নূতন কল্যাণের যুগ আনিবে, ইহাকে তাঁহারা নিজের হীন স্বার্থ প্রচেষ্টায় লাগাইতে গিয়া এই দারুণ বৈষম্য সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছেন। কলকারখানা প্রকৃত পরিমাণে ধন বৃদ্ধিই করিয়াছে; কিন্তু ধন বিভাগের দোষে প্রথমত ইহা ধনীর ধন বাড়াইয়া দরিদ্রের দারিদ্র্যই বাড়াইয়া দিল। কারখানার মালিকরা বুঝিতে পারেন নাই যে কারখানা পৃথিবীকে নূতন রূপ দান করিবে।

জাতিবিরোধ এবং যুদ্ধও এই বৈষম্য ও দারিদ্র্যের ফল। যতদিন সাধারণ লোক দারিদ্র্যে কষ্ট পাইবে এবং মানুষ ঠিকভাবে চিন্তা করিতে না শিখিবে—জগতে এই যুদ্ধের ধ্বংস-লীলাও চলিবে। যুদ্ধ জগতকে রিক্ত করে মাত্র, কোন বিত্ত দান করে না। যুদ্ধ দারিদ্র্যের, বিশেষতঃ চিন্তার দারিদ্র্যের, ফল।

কলকারখানার মালিককে কলকারখানাকে সাধারণের কল্যাণের ক্ষেত্ররূপেই দেখিতে শিখিতে হইবে, যতদূর সম্ভব সস্তায় ভাল উপযোগী জিনিষ উৎপন্নের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে (ইহাকে ফোর্ড "service motive" বলেন), আর যাহাদের সাহায্যে কল চালাইয়া কলের লাভ ও উৎপাদন হইবে তাহাদিগকেও অংশীদার মত মনে করিতে হইবে,—বুঝিতে হইবে তাহাদের শ্রম ও কারখানার কর্ত্তার টাকা ও বুদ্ধি উভয়ে মিলিয়া এই লাভ হইতেছে সুতরাং

শ্রমিককে তাহার উপযুক্ত অংশ যতদূর সম্ভব বেশী বেতন ও লাভের অংশ দিতে হইবে (ইহাকে ফোর্ড "wage motive" বলেন), ইহাতে কারখানার শ্রমিকগণকেও প্রাণপণে ভাল ও বেশী উৎপাদনে উদ্বুদ্ধ করিবে। নতুবা সুফল দুরাশা।

কৃষকের কল্যাণও উদারচেতা কর্ম্মী ফোর্ডের দৃষ্টি এড়ায় নাই। তিনি দেখিলেন কলকারখানা অনেক আগাইয়া গিয়াছে আর কৃষি তাহার পুরাতন সংস্কার লইয়া এখনও বহু পিছনে পড়িয়া আছে—তাই সুদূর কৃষিক্ষেত্র হইতে লোক কারখানায় না টানিয়া যাহাতে কারখানার ছোট ছোট অংশ শহর হইতে গ্রামে দূরে দূরে বসাইয়া কৃষককেও মাঠের কাজের সঙ্গে তাহার অবসর সময়ে কারখানার কাজের সুবিধা দেওয়া হয় সেই চেষ্টা করিয়াছেন।

অনেকে মনে করেন, কল ও কৃষি আলাদা রকমের কাজ, পরস্পরে মিল নাই। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহারা বেশ খাপ খায়—কৃষিকাজের এক এক সময় কাজকর্ম্ম থাকে না, আবার কলকারখানার এক এক সময় মন্দা চলে। যদি দুইটি পরস্পর সহযোগিতার ক্ষেত্র পায় তাহাতে সকলের পক্ষে সস্তায় খাদ্য-দ্রব্য এবং অন্য প্রয়োজনীয় জিনিষ উৎপন্ন হইতে পারিবে।

সমগ্র মানবের কল্যাণের প্রেরণা জাগিয়াছে কর্ম্মী ফোর্ড-এর অন্তরে। আমরা প্রতি মানবকে জীবনের শ্রেষ্ঠ সুযোগ দিতে চাই যে সুযোগের সাহায্যে মানুষ বাঁচিয়া সুখ পাইবে।

রুষিয়ার বলসেভিক কর্ম্মীদের কাজ এবং হেনরী ফোর্ডের মত উদারদৃষ্টিসম্পন্ন কর্ম্মীর কাজ দেখিয়া আশা হয় যে, কলকারখানার মধ্যে মানুষের যে কল্যাণ নিহিত আছে তাহার স্ফুরণ একদিন হইবে। যেদিক দিয়াই দেখি প্রকৃত কল্যাণ ফুটাইতে হইলে মানুষকে হীন স্বার্থ ছাড়িয়া সমগ্রের মঙ্গল দেখিতে শিখিতে হইবে। নতুবা যাহা হইবে কল্যাণের আকর, যাহার সাহায্যে গড়িয়া উঠিবে লক্ষ্মী, শ্রীসম্পন্ন পরিপূর্ণ মানবসমাজ—তাহাই স্বার্থপর অসুর-স্বভাব লোকের হাতে হইয়া দাঁড়াইতেছে বিরোধ, বৈষম্য ও দুঃখের মূল। মানুষ নীচের বৃত্তি হইতে মুক্ত হইয়া সত্যকার দৃষ্টিতে জগৎ দেখিতে শিখিলে তাহার অর্থসমস্যা ও বৈষম্যের সমাধান হইবে। মানুষ শক্তির দর্শন পাইয়াছে, কিন্তু সত্যের দর্শন এখনও পায় নাই। তাই শক্তিকে পাইয়াও তাহার প্রকৃত কল্যাণ হয় নাই। যেদিন সে সত্যের দর্শন পাইবে, সেদিন হইতে শক্তিকে প্রকৃত মঙ্গলের পথে চালাইতে পারিবে। অল্প পরিমিত পরিশ্রমে জগতের সকল লোকেরই তখন সুখে-স্বচ্ছন্দে খাওয়া পরা ও বাসের ব্যবস্থা হইবে। সত্যের অনুশীলনে সৌন্দর্য্য শক্তি ও আনন্দে-ভরা এক নূতন যুগ আসিবে। তাই কলকারখানার ভিতরের প্রকৃত মঙ্গলকে ফুটাইতে হইলে মানুষকে প্রথমে সত্য দৃষ্টি লাভ করিতে হইবে।

বর্ত্তমানে কলকারখানা যে ক্রমাগত বেকারসমস্যা বাড়াইতেছে তাহারও কারণ সত্যদৃষ্টিহীন সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা। জগতের প্রত্যেক লোককে সুশিক্ষিত করিতে হইলে, প্রত্যেকের জন্য স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য পূর্ণ আবাস নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিতে হইলে, সকলের আনন্দবিধানের ক্ষেত্র ফুটাইতে হইলে, কলাবিদ্যা ও স্থাপত্যের দেশময় প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিতে হইলে কত কত লোকের কি বিপুল বিরাট কাজ পড়িয়া আছে তাহা ভাবিয়া উঠা যায় না। জগতে কাজের ক্ষেত্র অপরিসীম, অথচ মানুষ ব্যবস্থার দোষে, দৃষ্টিহীনতায় বেকার হইয়া পড়িতেছে। এখানে সমস্যা হইতেছে সমগ্রের। সত্যদৃষ্টি রাষ্ট্র ও সমাজের মনে পৃথিবীকে স্বর্গরাজ্যে পরিণত করিবার যে প্রেরণা আনিবে তাহাতে কাজের ক্ষেত্র ও পরিসর এত বাড়িবে যে বেকার-সমস্যার কথা তখন উঠিতেই পারে না। প্রত্যেকেই নিজ নিজ প্রকৃতি প্রতিভা ও অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রেরণা মত কাজের ক্ষেত্র পাইবে এবং কর্ম্ম তখন প্রাণে সৃষ্টির নিবিড় আনন্দ ও শক্তি জাগাইবে। হেনরী ফোর্ডের কথায় আবার বলি—

The function of the machine is to liberate man from brute burdens and release his energies to the building of his intellectual and spiritual powers for conquests in the fields of thought and higher action. অর্থাৎ—কঠোর শারীরিক পরিশ্রমের গুরুতার হইতে মুক্ত করিয়া কলকারখানা মানুষের মানসিক ও আধ্যাত্মিক প্রতিভা বিকাশের সুযোগ ও অবসর দিবে—মানুষ তাহার অন্তর-রাজ্যের বিশাল সম্ভাবনীয়তাকে ফুটাইতে পারিবে।

কলকারখানা মানুষকে বেকার করে নাই, কলকারখানা জগতে যে নূতন কল্যাণের যুগের সূচনা করিবে মানুষ তাহাকে ধরিতে ও বুঝিতে না পারিয়াই বেকার হইয়াছে। গতানুগতিক চিন্তার ধারা ও কাজের ধারা বদলাইয়া নূতন চোখে জগৎ দেখিতে শিখিতে হইবে।

দয়া কর

শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

ধূসর ধূলির তলে ধৃষ্টতার হ'ল অবসান,—দারুণ আঘাতে বারংবার
টুটিল না প্রাচীরের একখানি কঠিন পাষাণ—একটি কারার লৌহদ্বার।
ক্লান্তদেহ ব্যর্থশ্রমে, দিনান্তে সান্ত্বনা নাহি মনে, ক্ষীণশক্তি হ'ল ক্ষীণতর।
আজ নিঃসহায় ডাকে ঊর্দ্ধে চাহি কাতর ক্রন্দনে, "দয়া কর, তুমি দয়া কর।"

অন্তরে বাহিরে দৈন্য, অন্তরে বাহিরে হানাহানি, হীনতার বিষবাষ্পরাশি!
মাতৃমাংস ল'য়ে করে নির্লজ্জ নির্ম্মম টানাটানি প্রেতভূমে প্রভুত্বপ্রয়াসী!
নগরীর ধূলি ধূম্রে মিলিছে পল্লীর পঙ্কিলতা, অন্ধ রাত্রি পূতিগন্ধে ভরা!
মানুষের চিত্ত তাই ঊর্দ্ধশ্বাসে মাগি সহায়তা দেবলোকে হ'ল স্বয়ংবরা।

যে যৌবন জেগেছিল একদিন উদ্দাম উল্লাসে বাধার পর্ব্বত দীর্ণ করি,—
ছুটেছিল শতস্রোতে আকুল উচ্ছল কলোচ্ছ্বাসে মরুভূমি তুলিতে উর্ব্বরি,—
মধ্যদিনে শান্ত হ'ল ক্রমে তপ্ত বালুর বেলায়—শত কণ্ঠে তার কলধ্বনি ;
সন্ধ্যালোকে শান্ত চোখে ঊর্দ্ধপানে আজিকে সে চায়, বৈরী তার সমস্ত ধরণী!

বৈরী তার দশ দিক, বৈরী তার আপনার দেহ, বৈরী তার আশাহত মন
তাই খোঁজে দীননেত্রে সে সুদূর নক্ষত্রের স্নেহ ; কেহ যবে রহে না আপন,
সন্ধ্যাগমে ভঙ্গ দেয় প্রভাতের সঙ্গী ছিল যারা,—বিশ্ব যবে দিতে চায় ফাঁকি,
অঙ্গ যবে শ্লথ হয়, কণ্ঠ যবে হয় বাক্যহারা, তখন আকাশে চাহে আঁখি।

আছ কি আছ কি তুমি, হে বন্ধু,—হে নিখিল-নির্ভর? দেখিছ কি কী নিষ্ঠুর দাহ
জ্বলিতেছে লোভেদ্বেষে মানুষেরে করিতে জর্জ্জর? কি বীভৎস মৃত্যুর প্রবাহ
অবাধে চলেছে বহি! ছদ্মবেশী কোন্ আত্মঘাত সংক্রমিছে ধরণীর বুকে!
তুমি তাই আঁখি মেলে দেখিতেছ শুধু বিশ্বনাথ? হাসিতেছ অলস কৌতুকে?

সক্ষমের স্বার্থ স্ফীত অক্ষমের বক্ষোরক্তপানে,—কে করিবে তার পথরোধ?
আত্ম অবিশ্বাসী ভীরু হাস্যমুখ দাম্ভে অপমানে,—কে তাহারে দিবে শুভবোধ?
তুমি যদি নাহি রাখ,—তুমি যদি নাহি কর দয়া—সব দায় কর অস্বীকার
কে ঘুচাবে অমানুষ মানুষের মানবমৃগয়া, ছলেবলে আত্মীয়শিকার?

দয়া কর, দয়া কর, হে পিতা—এ মূঢ় পুত্রগণে, শান্ত হোক তোমার ভ্রূকুটি।
প্রভাতের পদ্মসম উদার আলোর আলিঙ্গনে বিকশি উঠুক বিশ্ব ফুটি।
রাত্রির দুঃস্বপ্ন যত মিশে যাক আঁধার অতীতে। হে কবি, নূতন তান ধর ;
শুনাও মঙ্গলগীতি, শান্তি দাও সন্তানের চিতে, দয়া কর, তুমি দয়া কর।

নারদের কলহপ্রিয়তা

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ

দেবর্ষির কলহপ্রিয়তার কথা সাধারণ্যে সুবিদিত। আমরাও বাল্যকালে সমবয়সীদের মধ্যে ছোট-খাট বিবাদের সূচনায় দুই হস্তের নখে নখে ঘর্ষণ করত নারদ নারদ শব্দে নৃত্য করিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয়। কেহ কেহ বলিবেন, কথাটা নিতান্ত গ্রাম্যজনের কল্পনাপ্রসূত; আর এই কত দিনেরই বা। যাহা হউক উল্লিখিত অপবাদের ভিত্তিমূল কোথায় খোঁজ করিতে ক্ষতি কি? সাহিত্যে উহার সমর্থনোপযোগী উপকরণ মিলে কি না দেখা যাউক।

একদা পর্ব্বতরাজ হিমালয়ের বহির্ব্বাটীতে উমা কুমারীদের লইয়া বিপুল উৎসাহে মাটির হরগৌরী গড়িয়া বিবাহ দিতেছেন। এমন সময় মুনিবর বীণাযন্ত্রে স্বরসপ্তকের সুমধুর ঝঙ্কার তুলিয়া তথায় আসিয়া উপনীত হইলেন এবং মহামায়াকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। দেবী কিঞ্চিৎ গর্ব্বিত ভর্ৎসনার ছলে বলিলেন, 'তুমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, এ কেমন ধারা তোমার আচরণ, বুঝি আমায় অল্লায়ু করিবে ভাবিয়াছ।' তদুত্তরে কোন্দলের ঠাকুরটি কহিলেন, 'আমায় বুড়া ঠাওরাইয়াছ, মনে করিয়া দেখ, তুমি যে বাবার মা হও। বটে, নাতি-জ্ঞানে এতটা উপহাসের হাসি! ভাল, সদাই তোমার একটা বুড়া থুথ্‌ড়ে বর জুটাইয়া দিতেছি।'

বিবাহের নামে দেবী ছলে লজ্জা পেয়ে।
কহি গিয়া মায়ে বলি বর গেলা ধেয়ে॥
আল্যা করি কোলে বসি হেঁদে ধরি গলে।
ওমা ওমা বলি উমা কথা কন ছলে॥
সখী মেলি খেলিনু বাহির বাড়ী গিয়া।
ধূলাঘরে দিতেছিনু পুতুলের বিয়া॥
কোথা হৈতে বুড়া এক ডেকরা বামন।
প্রণাম করিল মোরে একি অলক্ষণ॥
নিষেধ করিনু তারে প্রণাম করিতে।
কত কথা কহে বুড়া না পারি কহিতে॥
ছটা লাউ বাজা কান্ধে কাঠ একখান।
বাজাইয়া নাচিয়া নাচিয়া করে গান॥
ভাবে বুঝি সে বামন বড় কুন্দলিয়া।
দেখিবে যদ্যপি চল বাপেরে লইয়া॥

রাজা রাণী উভয়ে গিয়া তপোধনকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। উমা-মহেশ্বরের পরিণয় প্রস্তাবে বিলম্ব হইল না। সঙ্গে সঙ্গে লগ্নপত্রও হইয়া গেল। যথাকালে বর আসিয়া সভাস্থ হইলেন! বর ও বরের সাঙ্গোপাঙ্গদের হাবভাব দেখিয়া হিমালয় হতবুদ্ধি হইয়া বরের আসনে বসিয়া পড়িলেন। এদিকে বরও ভবানীর ভাবে ভুলিয়া শ্বশুরের আসন অধিকার করিলেন। পিতৃপুরুষের নাম, গোত্র, প্রবরাদি লইয়া একটু গোল বাধিল। বিধাতা কোন প্রকারে সামলাইয়া লইলেন। কন্যা সম্প্রদানান্তর মহিষী এয়োগণসহ স্ত্রী-আচার করিতে আসিলে,—

কেশব কৌতুকী বড় কৌতুক দেখিতে।
নারদেরে কহিলা কন্দল লাগাইতে॥
গরুড়ে কহিলা তুমি ভয় দেখাইয়া।
শিব কটিবন্ধ সাপ দেহ খেদাইয়া॥

খগরাজের হুঙ্কারে কটিবন্ধ সর্পগণ ঘাড় গুঁজিয়া পলাইল, বরের পরণের বাঘছাল খসিয়া পড়িল। মেনকা মাথার কাপড় টানিয়া দিয়া হাতের প্রদীপ নিবাইয়া দিলেন; এবং ঘরে যাইয়া গলা ছাড়িয়া নারদকে গালি পাড়িতে বসিলেন ও চোখের জলে ভাসিতে লাগিলেন।

কান্দে রাণী মেনকা চক্ষুর জলে ভাসে।
নখে নখে বাজায়ে নারদ মুনি হাসে॥
কন্দলে পরমানন্দ নারদের ঢেঁকী।
আঁকশলী পোয়া মোনা গড়ে মেকামেকী॥
পাখা নাহি তবু ঢেঁকী উড়িয়া বেড়ায়।
কোণের বহুড়ী লয়ে কন্দলে জড়ায়॥
সেই ঢেঁকী চড়ে মুনি কান্ধে বীণাযন্ত্র।
দাড়ী নড়ে ঘন পড়ে কন্দলের মন্ত্র॥ ... ...
নারদের মন্ত্রতন্ত্র না হয় নিষ্ফল।
পরস্পর এয়োগণে বাজিল কন্দল॥ ... ...
এইরূপে কন্দলে লাগিল ঝুটাঝুটি।
ডাকাডাকি গালাগালি মাথা কুটাকুটি॥

—অন্নদামঙ্গল

দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর-সভায় ব্রাহ্মণবেশধারী অর্জ্জুন কর্তৃক লক্ষ্যবেধন ও ব্রাহ্মণ রাজন্যের যুদ্ধোদ্যমে,—

দ্বন্দ্ব দেখি হরষিত দ্বন্দ্বপ্রিয় ঋষি।
ঘন করতালি দিয়া নাচেন উল্লাসী॥

লাগ লাগ বলিয়া সকলে ডাক ছাড়ে।
ক্ষণে ক্ষণে সকল রাজারে গালি পাড়ে॥
ব্যর্থ ক্ষত্রকুলে জন্ম ব্যর্থ তোমা সব।
একা দ্বিজ করিল সকলে পরাভব॥
কন্যা লৈয়া যায় যদি দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
কোন লাজে লোকে তোমা দেখাবি বদন॥
এত বলি ঊর্দ্ধবাহু নাচে তপোধন।
বাধিল তুমুল যুদ্ধ না যায় লিখন॥

—কাশীদাসী মহাভারত

সত্যভামার পারিজাত-প্রার্থনা ও শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক উহার আহরণ প্রসঙ্গে,—

কলহে সানন্দ বড় ব্রহ্মার নন্দন।
মুনি পথে যাইতে চিন্তেন মনে মন॥... ...
প্রভাতে উঠিয়া কৃষ্ণ কৈলা স্নানদান।
হেনকালে উপনীত মুনি ঢেঁকিযান॥
কলহ-বিদ্যায় বিজ্ঞ কন্দলপ্রিয় ঋষি।
কহেন কৃষ্ণের আগে গদগদ ভাষি॥—ঐ ঐ

শিব বরবেশে বৃষারোহণে চলিয়াছেন, দেবতারা যে যাহার যান-বাহনে তাঁহার সহযাত্রী হইলেন।

সভার আগে যান নারদ কলহ লঞা।
সাত খোকড়ি কন্দলি কাঁধেতে করিঞা॥

—কৃত্তিবাসী উত্তরাকাণ্ড

গর্গসংহিতায়,—

তদৈব নারদঃ প্রাপ্তো মুনীন্দ্রঃ কলহপ্রিয়ঃ।

—বৃন্দাবনখণ্ড, ১ম অ°

দেবীভাগবতে,—

নারদঃ কৌতুকপ্রেক্ষী সর্ব্বদা কলহপ্রিয়ঃ।
দেবকার্য্যার্থমাগত্য সর্ব্বমেতচ্চকার হ॥

—৪র্থ স্ক°, ২২শ অ°

হরিবংশে,—

জেতা জগতি গুহ্যানাং বিগ্রহাণাং প্রহোপমঃ।
গাতা চতুর্ণাং বেদানামুদ্গাতা প্রথমর্দ্ধিজাম্।
মহর্ষিবিগ্রহরুচির্বিদ্বান্ গান্ধর্ব্বকোবিদঃ॥
বৈরিকেলিকিলো বিপ্রো ব্রাহ্মঃ কলিবিবাপরঃ।
দেবগন্ধর্ব্বলোকানামাদিবক্তামহামুনিঃ॥
স নারদোঽথ ব্রহ্মর্ষির্ব্রহ্মলোকচরোঽব্যয়ঃ।

—হরিবংশপর্ব্ব, ৫৪তম অ°

স তু কেলিকিলো বিপ্রো ভেদশীলশ্চ নারদঃ।
সু.স্রষ্টানপি লোকেঽস্মিন্ ভেদয়ন্ ভতে রতিম্॥
কণ্ডূয়মান সততং লোকানটতি চঞ্চলঃ।
ঘটমানো নরেন্দ্রাণাং তন্ত্রৈর্ব্বৈরাণি চৈব হি॥

—বিষ্ণুপর্ব্ব, ১ম অ°

মহাকবি ভাসের নাটকে,—

[অন্তরীক্ষ হইতে অবতরণ করিতে করিতে নারদ বলিতেছেন।]
উৎপাদয়াম্যহরহর্বিবধৈরপায়ৈস্তন্ত্রীষু চ স্বরগণান্ কলহাংশ্চ লোকে॥

—অবিমারক, ৬ষ্ঠ অঙ্ক

[অবিমারক একটু অগ্রসর হইয়া নারদকে দেখিয়া বলিতে লাগিলেন।]
মিত্রেষু বৈরাণ্যুপপাদ্য যত্নানষ্টানি কার্য্যাণি শমীকরোতি॥—ঐ ঐ

নারদঃ। অহং গগনসঞ্চারী ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ। ব্রহ্মালোকাদিহ প্রাপ্তো নারদঃ কলহপ্রিয়ঃ॥

বৈরাণি ভীমকঠিনাঃ কলহাঃ প্রিয়া মে॥

—বালচরিত, ১ম অঙ্ক

বিষয়-বিশেষে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে, অথবা কোন কিছুর মীমাংসা করিতে হইলে পূর্ব্বপক্ষ-উত্তরপক্ষ, বিচার-বিতর্কের প্রয়োজন হয়। কখন কখন বিতর্ক হইতে বিতণ্ডা এবং পরিশেষে কলহের সৃষ্টি করে। উৎকৃষ্ট উদাহরণস্থল শ্রাদ্ধবাসরে পণ্ডিত-বিদায়ের সভা। ভেদনীতিও সত্যাবধারণে এবং নষ্ট কার্য্যের উদ্ধার সাধনে প্রযুক্ত হইবার রীতি আছে। নারদকে জ্ঞানী ভক্তদের অন্যতম বলা হয়। ইহাকে অনেক ক্ষেত্রে ভেদনীতি অবলম্বন করিতে দেখা যায়। সম্ভবতঃ সেই হেতু ইহার বিবাদের বিগ্রহত্ব লাভ ঘটিয়া থাকিবে। আর ঢেঁকির কচকচি চিরপ্রসিদ্ধ; তাই ঢেঁকি বাহনের পদে প্রতিষ্ঠিত।

মিথ্যার জয়

শ্রীসীতা দেবী

শিশির লোকটা অসাধারণ কিছু নয়, তবে একেবারে যে বৈশিষ্ট্যবর্জ্জিত তাহাও নয়। মধ্যবিত্ত ভদ্র বাঙালী ঘরের ছেলে যেমন ইস্কুল কলেজে পড়িয়া মানুষ হয়, সেও তাহাই হইয়াছিল, এবং পড়াশুনা খানিকদূর করিয়া, বিদ্যার বাজার-দর একেবারে কিছুই নাই দেখিয়া, অন্য পাঁচ জনের মত সেও হতাশ হইয়াছিল। তবে হাল ছাড়িয়া দেয় নাই। বৃদ্ধ পিতা অতি অসুস্থ, তাঁহাকে আর খাটান যায় না। সুতরাং সংসারের ভার যেমন করিয়া হোক শিশির এবং মিহির এই দুই ভাইকে বহিতেই হইবে, স্নান করিয়া নিত্য আসিয়া পিঁড়ার উপর বসিলেই ত আপনা হইতে অন্নব্যঞ্জন সামনে আসিয়া জুটিবে না?

ভাল কাজ কিছুই জুটিল না, তবে পিতার বন্ধুবর্গের সুপারিশে সওদাগরী আপিসে শিশিরের একটা কাজ জুটিয়া গেল। মিহির নিজেকে অতখানি খেলো করিতে কোনো মতেই রাজী হইল না, চটিয়া-মটিয়া একটা সিনেমা কোম্পানীতে ভিড়িয়া গেল। সেখানে ভাত না থাক, আর্ট আছে।

শিশির কিন্তু কেরানী-জীবনের ভিতর একেবারে ডুবিয়া গেল না। নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিল। অন্যান্য কেরানীর চেয়ে পোষাক তাহার ঢের ভাল, সস্তা বিড়ি সে খায় না, টিফিনের সময় আপিসের পাশের চায়ের দোকানেও ঢোকে না। সঙ্গে তাহার জিল্যাটিন পেপারে মোড়া স্যাণ্ডউইচ এবং থার্ম্মস্ ফ্লাস্কে চা থাকে। যা-তা খাইয়া লিভার পচাইবার ছেলে সে নয়। পান ত সাতজন্মেও ছোঁয় না। তা ছাড়া সময় পাইলেই লুকাইয়া লুকাইয়া সাহিত্য-চর্চ্চা করে। এখনও বিবাহ হয় নাই, এবং ঘরের দ্বিতীয় মানুষ মিহির কোনো সময়েই ঘরে থাকে না, কাজেই তাহার এ সব খেয়ালের খোঁজ কেহই করে না। বাড়িতে স্ত্রীলোক বলিতে এক প্রৌঢ়া জননী, তিনিও বাতের ব্যথায় এত কাতর যে ছেলেদের ঘরে সিঁড়ি ভাঙিয়া কোনো দিনই আসেন না। বোন একটা ছিল সে বছর দুই হইল শ্বশুরবাড়ি চলিয়া গিয়াছে।

কিন্তু স্ত্রীলোক হইতেই সব উৎপাত জগতে ঘটে, জ্ঞানীরা বলিয়াই থাকে, কোনো বিশেষ ব্যাপার ঘটিলে "তলায় কে মহিলা আছেন, খুঁজিয়া বাহির কর।" কাজেই শিশিরের সাহিত্যিক জীবনকে যিনি দিনের আলোয় টানিয়া বাহির করিলেন তিনিও একজন স্ত্রীলোক, যদিও ভদ্রমহিলা নন। নাম তাঁহার শ্রীমতী পূরবী। ভীমের গদার মত মারাত্মক এবং ভারাত্মক চেহারা, এ বাড়ির ঠিকা ঝি।

শিশির রাত্রি জাগিয়া সুন্দর একটি কবিতা লিখিয়া টেবিলে রাখিয়াছিল। চোখে ঘুম জড়াইয়া আসিতেছিল, কাগজখানা আর চাপা দেওয়া হয় নাই। সকালে শিশির নিত্যকার মত নীচে নামিয়াছে হাত মুখ ধুইবার জন্য, পূরবী আসিল ঘর ঝাঁট দিতে। নিপুণভাবে ঝাঁট দিয়া জঞ্জালের রাশ দরজার কাছে জড় করিয়া ইতস্ততঃ তাকাইতে লাগিল, এক টুকরা কাগজ যদি কোথাও পাওয়া যায়। বাবুরা যাহোক ঘর নোংরা করিতে পারে, দেখিলে কেহ বিশ্বাস করিবে না যে একবেলার জঞ্জাল, যেন সাত জন্মে ঘরে ঝাঁট পড়ে না।

এদিক-ওদিক চাহিয়া একখানা কাগজ পাওয়া গেল, টেবিলের নীচে পড়িয়া ছিল। দরকারী বলিয়া বিশেষ বোধ হইল না, কাটাকুটিতে ভর্ত্তি পুরান চিঠি বোধ হয়। কাগজ-খানাতে ধূলাবালির রাশ কুড়াইয়া, পুঁটলি পাকাইয়া পূরবী নীচে উঠানের কোণে যে আবর্জ্জনার টিন থাকে, তাহার মধ্যে ফেলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইল। গিন্নী তাহাকে বাজারের পয়সা আনিয়া দিলেন, সে হাসিমুখে বাজার করিতে চলিয়া গেল।

শিশির হাত মুখ ধুইয়া বাহির হইয়া নিজেই চা প্রস্তুত করিয়া পান করিল। আর কাহারও তৈয়ারী চা তাহার ভাল লাগে না। আর আছেই বা কে? ঠিকা রাঁধুনী ঝির যা মূর্ত্তি, তাহাদের চোখে দেখিলে আর হাতে খাইতে ইচ্ছা করে

মা, যতই কেননা তাহাদের কবিত্বপূর্ণ নাম হোক্। মা ত প্রায় সব কাজের বার, তবু ছেলেরা খাইতে বসিলে কোনো মতে কাছে আসিয়া বসেন। মাঝে মাঝে ছেলেদের বিবাহের কথা পাড়িতেও চেষ্টা করেন, তাহারা কানেই নেয় না। শিশির যে-রকম স্ত্রী চায়, তাহা সামান্য কেরানীর ভাগ্যে জুটিবে কেন? আর মিহিরের হৃদয়ে আজকাল এমন অসম্ভব ভীড় যে তাহার ভিতর আবার একটা স্ত্রীর জায়গা হওয়াই কঠিন।

শিশির বলিল, "আহা, চট কেন? কি এত দেখতে হয় আমাদের? সারাদিন ত আমার বাইরেই কাটে, আর তোমার ছোট ছেলে ত পারলে রাত্রেও বাড়ি আসে না। ভারি ত সংসার, তার আবার দেখা। নিতান্ত না পার, তোমার ঐ গদাইলস্কর ঝিয়ের মত আর একটি রেখে নাও, তা হলেই চলবে।"

মা বলিলেন, "আহা, ঝি রাখলেই সব কাজ হয় নাকি? আর ঝি রাখতে পয়সা লাগে না?"

শিশির বলিল, "ঝিয়ে পয়সা লাগে, আর বৌয়ে বুঝি পয়সা লাগে না? তাতে ত তোমার খুব উৎসাহ। সে বুঝি খাবে-দাবে না?"

মা বলিলেন, "যা যা, খালি জ্যাঠামী শিখেছেন ছেলে! বৌ আসবে অমনি শুধু হাতে নাকি? তার পর অবস্থারও ত তোর উন্নতি হবে।"

শিশির বলিল, "তার ঠিক কি? উন্নতি হ'তে পারে, অবনতিও হ'তে পারে। যা দিনকাল।"

ঝি বাজারের গেঁচকা হাতে ফিরিয়া আসিতেছে দেখিয়া শিশির তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল। স্ত্রীলোকের এত কুৎসিত চেহারা সে সহ্য করিতে পারিত না। তাহার কবিচিত্ত যেন একেবারে হাহাকার করিয়া উঠিত।

উপরে গিয়া দেখিল, ঘরদোর বেশ পরিষ্কার। ভালই, কিন্তু বড় বেশী পরিষ্কার বোধ হইতেছে যে? তাহার টেবিলের উপরের কবিতা-লেখা কাগজখানি কোথায় গেল?

শিশির ব্যস্ত হইয়া সারাঘর প্রথম তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতে লাগিল, কিন্তু কোথাও সে কাগজের চিহ্নমাত্রও দেখিতে পাইল না। নিরুপায় হইয়া তখন চেঁচামেচি লাগাইয়া দিল। মা সিঁড়ির কাছে আসিয়া উপর দিকে মুখ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি, হয়েছে কি? একেবারে চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করছিস্ কেন?"

শিশির বলিল, "যত দরকারী কাগজপত্র থাকবে সব কি ঝেঁটিয়ে ফেলে দিতে হবে নাকি? তুমি বাপু বারণ কোরো তোমার ঝিকে আমার ঘরে আসতে।"

পুরবীকে মা অতিশয় ভয় করিয়া চলেন। ঠিকা ঝি হইলে কি হয়, তাহার এমন ভারিক্কি চালচলন, সে-ই যেন বাড়ির গৃহিণী, পাঁচ বৌয়ের শাশুড়ী। তাহা ছাড়া দুর্জ্জয় খাটিবার গতর স্ত্রীলোকটার। রাঁধুনী নামে মাত্র আছে, আসলে বাড়ির সব কাজ একলাই করে পুরবী।

পুরবী পাছে শুনিতে পায়, সেই ভয়ে মা গলা নামাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, কি গেল আবার তোমার?"

শিশির বলিল, "আমার টেবিলের উপর একখানা দরকারী কাগজ ছিল, সেটা কি হ'ল?"

মা খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে রান্নাঘরের দরজায় গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁগা বাছা, ছেলেদের ঘর থেকে কোনো কাগজপত্তর ফেলেছ নাকি?"

পুরবী আপন বিপুল দেহ আন্দোলিত করিয়া সবেগে বাটনা বাটিতেছিল। বাটনা থামাইয়া কাংসকণ্ঠে বলিল, "কাগজ ফেলব কেন? ঝাঁট দিয়ে জঞ্জালগুলো খালি ফেলে দিয়েছি।"

শিশির আবার চীৎকার করিয়া বলিল, "কেউ ফেলেনি ত কাগজের কি পা বেরিয়েছে যে নিজেই উঠে চলে যাবে? ও সব আমি জানি না, কাগজ আমার চাই-ই। এ মন্দ নয়, ঘরেও জিনিষ রেখে নিশ্চিন্ত নেই।"

মা হতবুদ্ধি হইয়া কি করিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময় পুরবী বাট্‌না বাটা রাখিয়া সবেগে উঠিয়া পড়িল। মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় চল্‌লে বাছা? ধনে-বাটাটা না হলে বামুন-ঠাকরুণ ঝোলটা চড়াবে কি ক'রে?"

পুরবী ঝঙ্কার দিয়া বলিল, "একখানা বই দশখানা হাত ত নয়? বাট্‌নাও বাটব আবার কোথায় কি কাগজ খোওয়া গিয়াছে তাও খুঁজব? ঝকমারি এমন চাক্‌রিতে," বলিতে বলিতে ঝমঝম করিয়া কোথায় চলিয়া গেল।

শিশিরের দৃঢ় বিশ্বাস মা এই ছোটলোকের মেয়েটাকে অসম্ভব আস্কারা দেন। কথা শোনে না; সেই যেন মণিক-গিন্নী,

আর শিশিরই যেন চাকর। কেন টাকা দিলে আর ঝি ভূভারতে পাওয়া যায় না। না-কি? কিন্তু মনে মনে যতই বিদ্রোহ করুক, মুখে বলিবার কোন কথা তাহারও জুটিল না, গজ্ গজ্ করিতে করিতে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া গেল।

মিনিট দশ পরে তাল-পাকান একখানা কাগজ লইয়া পূরবী ফিরিয়া আসিল, সেখানা উঁচু করিয়া ধরিয়া চেঁচাইয়া ডাকিল, "দাদাবাবু, দেখ'সে এই কাগজ নাকি?"

শিশির বাহির হইয়া সিঁড়ির কাছে দাঁড়াইল। তাহার কবিতা-লেখা কাগজের মতই ত বোধ হইতেছে। তেমনি ঈষৎ ধূসর রং, ডোরাকাটা। চিঠির কাগজেই সচরাচর শিশির সাহিত্যচর্চ্চা করিয়া থাকে। বলিল, "হ'তে পারে, উপরে দিয়ে যাও।"

পূরবী কাগজখানা সিঁড়ির মাঝখানে রাখিয়া দিয়া হন্‌হন্ করিয়া বাহির হইয়া চলিল। মা উদ্বিগ্নভাবে বলিলেন, "আবার কোথায় চল্‌লি? আজ দেখছি ছেলের অদৃষ্টে আর ভাত নেই।"

পূরবী যাইতে যাইতে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "তা কি করব? গঙ্গায় একটা ডুব না দিয়ে আমার আর রান্নাঘরে ঢুক্‌বার জো আছে? সাত পাড়ার মেথরের ময়লা ঘেঁটে এলাম না?"

মা অবাক হইয়া বলিলেন, "ওমা, কেন গা?"

পূরবী বলিল, "ওপরের ঘরের একখানা ছেঁড়া কাগজ নিয়ে জঞ্জাল ফেলেছিলাম না? যা নিয়ে তোমার ছেলে অত কুরুক্ষেত্তর করলে। তা সে কাগজ ত টিনে ছিল না, জমাদারণী ততক্ষণ তাকে রাস্তার টিনে ফেলে এসেছে। সেখান থেকে খুঁজে আনলাম না?"

মা গালে হাত দিয়া বলিলেন, "ওমা কোথায় যাব!" পূরবী গঙ্গা নাইতে চলিয়া গেল।

মা ডাকিয়া বলিলেন, "ও বাবা, ও কাগজখানা ফেলে দে, কোথাকার নরককুণ্ড থেকে তুলে আন্‌ল! কোনো আক্কেল যদি আছে! আবার হাত পা ধুয়ে আয় ভাল করে।"

শিশিরের ঘর হইতে খালি একটা আওয়াজ শোনা গেল—হুঁ।

শিশির তখন যেন হাতে আকাশের চাঁদ পাইয়াছে, এমন মুখ করিয়া কাগজখানার দিকে তাকাইয়া আছে। তাহার কবিতা এ নয়, কিন্তু এ যেন অমূল্য রত্ন।

দলা-পাকান কাগজখানি একটি চিঠি। চিঠিখানি সম্পূর্ণ করিয়া লিখিয়া কোনো কারণে বাতিল করিয়া ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে, অথবা তাহারই হারাণ কবিতার মত ঝি-চাকরের মূর্খতায় আঁস্তাকুড়ে স্থান লাভ করিয়াছে। এক সখীর নিকট হইতে আর এক সখীর কাছে লিখিত। চিঠিখানি এই—

ভাই লীনা,

অনেক দিন তোকে চিঠি লেখা হয়নি। কাজে ব্যস্ত ছিলাম বললে মিথ্যে কথা বলা হয়। অকাজের চিন্তাই এখন আমার সমস্ত মনপ্রাণ জুড়ে বসে আছে, অর্থাৎ সংসারের জ্ঞানী ও গুণী জন যাকে অকাজ বলেন। সেই আমার অচেনা বন্ধুর ভাবনা। তাঁকে চোখে দেখিনি বললে ভুল হয়, কারণ এক পাড়ায়ই বাড়ি যখন, পথে যেতে আসতে তিনি আমার চোখে ধরা না পড়ে যাবেন কি ক'রে? পিয়াসী দুটি চোখ যে সকাল সন্ধ্যা তাঁরই আশায় এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে? তবে তিনি আমাকে কি আর দেখেছেন? ভাবে ভোলা কবি, পথ দিয়ে যখন হাঁটেন, তখনও তাঁর চিত্ত ভরে বিরাজ করে শ্বেতশতদলবাসিনী বীণাপাণির মোহিনী মূর্ত্তি, মাটির মেয়ে তাঁর চোখে পড়বে কি ক'রে?

কিন্তু কি যে আমায় বেশী মুগ্ধ করেছে, তার রূপ না তার অপূর্ব্ব উন্মাদিনী লেখনী—তা তোকে বোঝাতে পারব না ভাই। যেটাই হোক, আমি ত একেবারে ডুবেছি।

কিন্তু সামনে বড় দুর্দ্দিন ভাই, বড় সংগ্রামের আভাস পাচ্ছি। ভয়ে বুক কাঁপছে, কিন্তু নিজের নারীত্বের মর্য্যাদা রক্ষা আমায় করতেই হবে। বাপমায়ের কথা হিন্দুর মেয়ের পালনীয় বটে, কিন্তু এক্ষেত্রে নয়। তাঁরা চান আমাকে অর্থের পায়ে বলি দিতে। মাগো, ভাবতেও আমার গা শিউরে ওঠে! আমার কি উপায় হবে ব'লে দিতে পারিস? কাব্য উপন্যাসের নায়িকাদের পথই ধরব নাকি? কিন্তু পুরুষের কাছে নারীর প্রেমের সে মূল্য আজকাল আর আছে কি?

তোর হতভাগিনী
রীণি।

শিশির অনেক ক্ষণ অভিভূতের মত বসিয়া রহিল। কোন্ স্বপ্নলোক হইতে এই আকুল আহ্বান তাহারই কাছে

আসিয়া পৌঁছিল? একি বাস্তব ব্যাপার, না সেও স্বপ্ন দেখিতেছে? কে এই দময়ন্তীরূপিণী রীণি, কোন্ ভাবে-ভোলা কবির উদ্দেশে এই লিপিকা-দূতীকে প্রেরণ করিল? সে কেমন? কোথায় থাকে সে? শিশির এক নিমেষে ইট কাঠের তুচ্ছ অন্ধকার বাড়িখানা হইতে উড়িয়া কোন্ এক অপরূপ রোমান্সের রাজ্যে গিয়ে উপস্থিত হইল। সেখানে রাজপুত্র রাজকন্যার ছড়াছড়ি। দৈত্যপুরীর লৌহপ্রাচীর সেখানে প্রেমিকের অস্ত্রাঘাতে নিত্যই ধূলায় গুঁড়াইয়া যাইতেছে, বন্দিনী রাজকন্যার গাঁথা ফুলের মালা খসিয়া আসিয়া পড়িতেছে বিজয়ী বীরের গলায়। কিন্তু হায়রে কল্পনার পথ ধরিয়া এত শীঘ্র সে যেখানে পৌঁছিতে পারিল, বাস্তব জগতে সেখানকার পথ সে খুঁজিয়া বাহির করিবে কেমন করিয়া?

তাহার ধ্যান ভাঙিল নীচে হইতে মায়ের এবং বামুন-ঠাকরুণের সমবেত চীৎকারে। মা হাঁক দিতেছেন, "হ্যাঁরে বেলা কি হয়নি? কখন চান করবি. কখন খেতে বসবি? তোর আপিস আজ নেই নাকি?

বামুন-ঠাকরুণ চেঁচাইতেছে, "ও দাদাবাবু, ভাত যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল? এর পর আবার গরম ক'রে আন্‌তে বল্‌বে নাকি বাপু? সেই তখন থেকে মাছি বসার ভয়ে থাল আগ্‌লে বসে আছি।"

শিশির দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া হাতের চিঠিখানা দেরাজের ভিতর বন্ধ করিয়া স্নান করিতে নামিয়া গেল। অন্যদিন স্নান করিতে তাহার আধ ঘণ্টার উপর কাটিয়া যায়। আজ পাঁচ মিনিটের মধ্যেই মাথা মুছিতে মুছিতে সে বাহির হইয়া আসিল। কাপড় পরিয়া আসিয়া অতি অন্যমনস্ক ভাবে খাওয়া শেষ করিল এবং মসলা না খাইয়াই রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল।

হায়, রাস্তার দুই দিকের বাড়ির সারের ভিতর কোন্‌টার দিকে সে তাকাইবে? কোন বাতায়ন-পথে দুটি পিয়াসী কুরঙ্গনয়ন তাহারই আশায় পথের দিকে চাহিয়া আছে? সেই যে রীণির ভাবে ভোলা কবি, তাহা সে ধরিয়াই লইয়াছে। মানুষ অতিশয় আকুল আগ্রহে যাহা বিশ্বাস করিতে চায়, তাহা বিশ্বাস করিতে বেশী দেরি তাহার হয় না। ক্রমাগত দু-পাশে তাকাইতে তাকাইতে ত সে যাইতে পারে না? লোকে তাহাকে অতি জংলীভূত মনে করিবে যে? ইহারই ভিতর দুই বার সে হোঁচট খাইতে খাইতে সামলাইয়া গিয়াছে। কিন্তু আর সময়ই বা হাতে কই? আপিসে লেট্ হওয়া চলে না, বড়বাবুর মেজাজ যা, তিনি যে কবিত্বের অজুহাতে লেট হওয়া মার্জ্জনা করিবেন, তাহা ভুলিয়াও বোধ হয় না। শিশির ট্রামের অপেক্ষায় বড় রাস্তার মোড়ে আসিয়া দাঁড়াইল।

আপিসেও কিন্তু সে মাথা হইতে এ চিন্তা কিছুতেই দূর করিতে পারিল না। মেয়েটির বাড়ি নিশ্চয়ই তাহাদের বাড়ির খুব কাছে, না হইলে ঐ টিনের ভিতর তাহার চিঠি আসিবে কি করিয়া? কিন্তু চিঠিখানা রীণিই ফেলিয়া দিয়াছে, না লীনার পড়া হইয়া গেলে সে-ই ফেলিয়া দিয়াছে, তাহাই বা হতভাগ্য শিশির বুঝিবে কি করিয়া? কিন্তু প্রিয় সখীর এমন গোপন-কথায় পূর্ণ চিঠি এমনভাবে কেহ কি ফেলিয়া দেয়? অন্ততঃ চার টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ত ফেলিত? কে জানে মেয়েদের মধ্যে কি নিয়ম প্রচলিত। আচ্ছা. টিনটা ত তাহাদের বাড়ির খুবই কাছে, ইহার পর আর কত দূরে টিন আছে কে জানে? বাড়ি ফিরিয়া দেখিতে হইবে, এই দুই টিনের মধ্যবর্ত্তী রাজ্যেই তাহাকে হারামণির অন্বেষণে ঘুরিয়া ফিরিতে হইবে। কি করিয়া সে সন্ধান করিবে? না আবার ডান দিকেও খানিকদূরে একটা টিন আছে যে? তাহা হইলে অনেকখানি জায়গাই তাহাকে খুঁজিতে হইবে দেখা যাইতেছে। এ পাড়ায় বাঙালী ত খুব বেশী ঘর নয়, তাও তাহার ভিতর ছোটলোক অনেক, খুঁজিয়া পাওয়া খুব শক্ত হইবে না হয়ত। এখানে শিশির ভিন্ন আর কেহ তরুণ লেখক আছে নাকি কে জানে? তাহা হইলে কি আর শিশির জানিত না? অন্তঃপুরবাসিনী রীণি যাহার খবর পাইয়াছে, শিশির নিশ্চয়ই তাহার খবর পাইত। কাগজপত্রে লেখা যাহার বাহির হয় তাহাকেই লোকে চেনে, কাহার ঘরে কি লেখা আছে, তাহা ত আর পাড়ার লোকে দিব্য দৃষ্টিতে দেখিতে পায় না?

রীণি, রীণি, রীণি, কি মিষ্টি নামটি! ঠিক যেন রূপবতীর পায়ের নূপুরের নিক্কণ। নাম যার এত সুন্দর, না জানি সে দেখিতে কেমন। সুন্দরী না হইয়া যায় না। নিশ্চয়ই সুশিক্ষিতা এবং তরুণী, চিঠি হইতেই ত তাহা বোঝা যাইতেছে।

সহকর্মী অধরবাবু ডাকিয়া বলিলেন, "ও মশায়, রাস্তিরে

ঘুম হয় নি নাকি? জেগে জেগে যে ঘুমুচ্ছেন? বড়বাবুর পায়ের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে যেন।"

শিশির তাড়াতাড়ি খাতা টানিয়া লইয়া লিখিতে বসিয়া গেল। কিন্তু কাজ বেশী অগ্রসর হইল না, আবার নেশার ঘোর যেন তাহার চেতনাকে আচ্ছন্ন করিয়া আসিতে লাগিল। কোনমতে পাঁচটা বাজিলে সে বাঁচে, তাহার যেন কণ্টকাসন হইয়া উঠিয়াছে।

যাক্, ঠিক পাঁচটারই সময় পাঁচটা বাজিল. শিশিরের কিন্তু তত ক্ষণে অবস্থা সাংঘাতিক হইয়া উঠিয়াছে। বন্ধু-বান্ধব কাহারও জন্য আর এক মিনিটও না দাঁড়াইয়া সে এক রকম ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

বাড়ি আসিয়া চা জলখাবার খাইয়া আপিসের কাপড়েই লম্বা হইয়া খাটের উপর শুইয়া পড়িল। কি উপায়ে অন্বেষণ সুরু করা যায়? এ ত সত্যই উপকথা বা পুরাণের যুগ নয়, তখন তবু যা হোক কয়েকটা প্রচলিত নিয়ম ছিল। ঐতিহাসিক যুগেও দেশ হইতে রোমান্সের চিরনির্ব্বাসন ঘটে নাই। কিন্তু আধুনিক যুগটা হইতেছে সবার চাইতে ওঁচা; এখন যত রাজা-উজীর মারা যায়, কেবল মাসিক কাগজের পাতায়। বাস্তব জীবনের একটু কিছুতে রোমান্সের গন্ধ লাগুক দেখি, অমনি দশ দিক হইতে দশজনে লাঠি উঁচাইয়া আসিবে। পাশ্চাত্য জগতটা আছে বেশ, সেখানে কোনো কিছু করিতে বা ভাবিতে মানুষের আটকায় না। আর আমাদের এই সনাতন ভারতবর্ষ! রামঃ, এখানে ভদ্রলোকে বাস করে?

কিন্তু সে যাই হোক, শিশিরকে একটা উপায় ত ভাবিয়া বাহির করিতে হইবে? তাহার টাকাকড়ি নাই যে সে ডিটেক্‌টিভ লাগাইবে। বাড়িতে বোন বা বৌদিদি নাই যে তাহাদের সাহায্যে কিছু হইবে। ভাইকে দিয়া কিছু কাজ হইবে কি? কিন্তু তাহাকে বলিতেও যে লজ্জা করে!

সব চেয়ে সহজ হয় যদি পুরবীর সাহায্য পাওয়া যায়। সে এ পাড়ার দশ বাড়িতে কাজই করে বোধ হয়, বাকিগুলিতেও সারাক্ষণই যাওয়া-আসা করে গল্প করার লোভে। কিন্তু শিশির কোন্ মুখে তাহার কাছে এ-সব কথা বলিবে? মাথা কাটা যাইবে যে! অশিক্ষিতা নীচ শ্রেণীর স্ত্রীলোক সে, সমস্ত ব্যাপারটা কি কলুষিত দৃষ্টিতে সে দেখিবে তাহা ভাবিতেই শিশিরের দেহমন শিহরিয়া উঠিল। তবে উপায় কি?

মা ডাকিয়া বলিলেন, "ওরে কি করছিস্?"

শিশির জবাব দিল, "এই একটু শুয়ে আছি।"

মা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "অবেলায় শুলি কেন? অসুখ-বিসুখ করল নাকি?"

শিশির সংক্ষেপে বলিল, "না।" মায়ের উপরে উঠার সাধ্য নাই, কাজেই আর কিছু খোঁজ করিলেন না।

দুই দিন ধরিয়া শিশির প্রাণপণে ভাবিল, কিন্তু কূল-কিনারা কিছুই করিতে পারিল না। রীণির চিঠিখানি পড়িয়া পড়িয়া তাহার প্রত্যেকটি বর্ণ শিশিরের মুখস্থ হইয়া গেল, তাহার হাতের লেখার প্রত্যেকটি টান শিশিরের মস্তিষ্কে আলোক-চিত্রের মত সুস্পষ্টভাবে মুদ্রিত হইয়া গেল, কিন্তু উপায় কিছু মিলিল না। হতাশ হইয়া যখন সে পুরবীরই শরণ লইবার উপক্রম করিতেছে, তখন সকালবেলা দাড়ি কামাইতে কামাইতে মিহির হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা, তোমার হয়েছে কি বলতে পার?"

শিশির ভীষণ চমকাইয়া উঠিল, বলিল, "কেন কি আবার হবে?"

মিহির ক্ষুর চালাইতে চালাইতে বলিল, "মা বলছিলেন, তুমি নাকি ভয়ানক কি ভাবনায় পড়েছ, নাও না, খাও না, বেড়াও না। তাই তদারক ক'রে চিঠিখানা পড়ে দেখলাম। রীণি কে তাই জানতে চাও ত? তার জন্যে এত ভাবনা কি? লোক লাগালেই খবর পাওয়া যায়।"

মিহিরের অনধিকার চর্চ্চায় শিশিরের প্রথম অত্যন্তই রাগ হইল। কোন্ সাহসে হতভাগা তাহার চিঠিপত্র ঘাঁটিতে গেল? কিন্তু রাগিয়া লাভ কি? মনস্কামনা সিদ্ধ করিতে হইলে তাহাকে কথাটা কাহাকেও-না-কাহাকে বলিতেই হইবে একলা কিছু করিবার সাধ্য তাহার নাই। পুরবীর চেয়ে তবু মিহির ভাল, যদিও তাহার ভিতর দিয়া কথাটা ছড়াইবে অনেক দূর। মুখে বলিল, "লোক লাগাবার পয়সা কই? বিনা-পয়সায় কে আমার জন্যে খাটতে আসবে?"

মিহির বলিল, "তোমাকে কি আর ডিটেক্‌টিভ লাগাতে বলছি? এই ধর আমাদের ষ্টুডিওর রাসমণি। যত বুড়ী ঝি, আর ঘটকীর পার্ট করে। যত্র তত্র ঘোরায় তার জুড়ি নেই। টাকা দশ পনেরো খসাও, দেখ এখনি সব খবর এনে হাজির করবে।"

শিশির একটু ভাবিয়া বলিল, "তা দেওয়া যেতে পারে। কখন চাও?"

মিহির বলিল, "সন্ধ্যার সময় তার সঙ্গে দেখা হবে। কিন্তু তোমার সঙ্গে দেখা ত রাত বারোটার আগে হবে না, সুতরাং এখনই যদি দিয়ে যেতে পার ত ভাল।"

শিশির দেরাজ খুলিয়া টাকা বাহির করিয়া দিল। সামনের মাসে হাতখরচে অত্যন্তই টান পড়িবে, তা পড়ুক। মিহির মুখ মুছিতে মুছিতে জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ লোকালিটিতে খুঁজতে হবে, তার আন্দাজ আছে কিছু? চিঠিখানার খামটা পাও নি?"

অগত্যা চিঠি পাওয়ার ইতিহাস শিশিরকে সব খুলিয়া বলিতে হইল। মিহির বলিল, "ওঃ এ ত সোজা ব্যাপার। পনেরো টাকাও লাগ্‌বে না, দশেই যথেষ্ট হবে," বলিয়া পাঁচটা টাকা শিশিরকে ফিরাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

আজকের দিনটা শিশিরের তবু কিছু ভাল কাটিল। যদিও মিহির যে ষ্টুডিওর সকলকে বেশ রসাল করিয়া দাদার রোমান্সের কাহিনী বলিতেছে এই কথাটা ক্রমাগত তাহার মনে হুল ফুটাইতে লাগিল। লক্ষ্মীছাড়ার আর একটু যদি কাণ্ডজ্ঞান থাকিত। যাই হোক, শেষরক্ষা যদি হয় তবেই সকল দুঃখ, সকল লজ্জা সার্থক।

সে-রাত্রে মিহির বাড়িই আসিল না, কাজেই রাসমণির কৃতিত্বের কোন পরিচয়ও শিশির পাইল না। তার পরদিনটাও এই ভাবে কাটিল। তৃতীয় দিনে শিশির একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। ভাগ্যক্রমে সেদিন ছিল রবিবার। একটা সমস্ত দিনের টিকিট কাটিয়া, সকাল সকাল চা খাইয়া শিশির বাহির হইয়া গেল, মাকে বলিয়া গেল তাহার ফিরিতে অনেক দেরি হইতে পারে, তাহার জন্য যেন কেহ বসিয়া না থাকে।

প্রথমে গেল মিহিরের ষ্টুডিওতে, রবিবারে সেখানে কেহ নাই। দরোয়ানের কাছে খোঁজ লইয়া জানিল, আজ ম্যানেজারের বাড়ি মস্ত ভোজ, তাহার ভাই না কাহার বিবাহ, সবাই তাই সেখানে গিয়া জুটিয়াছে। বাড়ির ঠিকানা আবার দরোয়ান জানে না, তাহা বাহির করিতে শিশিরকে খানিক খোঁজাখুঁজি করিতে হইল। বাড়ি যখন অবশেষে সে আবিষ্কার করিল, তখন প্রায় বিকাল হইয়া আসিয়াছে। বিয়েবাড়ি, লোকে লোকারণ্য, তাহার ভিতর মিহিরের সন্ধান করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। মিহিরের যদিবা দেখা পাইল ত তাহাকে একলা পাওয়া যায় না। উল্টা সেই ম্যানেজারবাবুর হাতে ধরা পড়িয়া আদর-আপ্যায়নে হাবুডুবু খাইতে লাগিল। অনেক কষ্টে একবার একটু ছাড়া পাইয়া, সে মিহিরকে আড়ালে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "খোঁজ কিছু পেলে?"

মিহির নিশ্চিন্তভাবে বলিল, "এক দিন বড় ব্যস্ত ছিলাম, শুটিংটা তাড়াতাড়ি শেষ করতে হ'ল।"

মনের রাগ মনেই চাপিয়া শিশির জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার রাসমণি, না কি, সেই স্ত্রীলোকটিকে বলাও হয়নি?"

মিহির বলিল, "তা বলেছিলাম, তবে কতদূর কি ক'রে উঠল তা আর খোঁজ করা হয় নি?"

শিশির বলিল, "তার ঠিকানা কি?"

মিহির একটু অপ্রস্তুতভাবে বলিল, "সে অতি বিশ্রী জায়গা, তুমি খুঁজে পাবে না।"

শিশির চটিয়া বলিল, "সে আমি বুঝব, তুমি ঠিকানাটা ত দাও।"

এক টুকরা কাগজে ঠিকানা লইয়া সে ত বাহির হইয়া চলিল। বিশ্রী জায়গাই বটে! ভাগ্যে সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, না হইলে এই পথে তাহাকে পরিচিত কেহ যদি দেখিতে পাইত, তাহা হইলেই হইয়াছিল আর কি? ভাগ্যগুণে রাসমণি বাড়িতেই ছিল। শিশির নিজের পরিচয় দিয়া বলিল, "আমার সঙ্গে একবার বাইরে আসতে হবে।"

রাসমণি বলিল, "বাইরে কেন?"

শিশির বলিল, "তোমায় কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করতে হবে, এখানে করতে চাই নে।"

রাসমণি হাঁড়িচাচার মত গলায় বলিল, "কেন, এখানটার কি অপরাধ হ'ল? আপনি বসুন না?"

অগত্যা শিশিরকে বলিতেই হইল। যত তর্কাতর্কি করিবে তত দেরি হইবে। বসিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি খবর কিছু পেলে?"

রাসমণি বলিল, "খবর খানিক পেয়েছি, তবে ঠিক মিলছে না।"

শিশির একটু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি মিল্‌ছে না?"

রাসমণি বলিল, "আপনাদের বাড়ির কাছেই একটি মেয়ে

আছে, নাম উষারাণী, সবাই ডাকে রাণী ব'লে, রাঁণি ত কেউ বলে না। তবে বন্ধুবান্ধব ডাক্‌লেও ডাকতে পারে, বাড়ির লোকে না জানতে পারে।"

শিশির বলিল, "সেই মেয়েই যে তা জানলে কি ক'রে?"

প্রৌঢ়া বলিল, "ও পাড়ায় আর ত ডাগর আইবুড়ো মেয়ে দেখলাম না। এই এক মেয়ে, ইস্কুলের পাস দিয়ে কলেজের পড়া পড়ছে। দেখতে শুনতে ভাল, বয়স ষোল-সতেরো হবে, তাদের বাড়ির ঝিয়ের কাছে খোঁজ নিলাম, বন্ধুবান্ধবকে চিঠিপত্র সদাসর্ব্বদাই লেখে, ঐ ঝিই চিঠির কাগজটাগজ সব কিনে আনে। আপনি যেমন কাগজ পেয়েছেন, সে-রকম কাগজ দিনদশ আগেই মোড়ের দোকান থেকে সে কিনে এনেছে।"

বড়ই সন্দেহজনক সূত্র, তবু ইহাই ধরিয়া শিশিরকে অগ্রসর হইতে হইবে। গৃহস্বামীর নাম ঠিকানা, বাড়ির নম্বর প্রভৃতি ভাল করিয়া লিখিয়া লইয়া শিশির বিদায় হইয়া গেল। রাসমণির গুণপনায় বিশ্বাস তাহার অনেকটাই নষ্ট হইয়া গেল।

বাড়ি ফিরিতে রাত আটটা বাজিয়া গেল। না খাইয়া সারাদিন কাটাইয়াছে, তারই জন্য মায়ের কাছে খানিকটা বকুনি শুনিতে হইল, রাত্রেও খাওয়ার দেরি করিলে আর রক্ষা থাকিবে না। কাজেই খাওয়া-দাওয়া চুকাইতে ন'টা বাজিয়া গেল। হাতে সময় আর বেশী নাই, তবু মনের অস্থিরতার তাড়ায় শিশির একবার বাহির হইয়া আসিল। বাড়ির নম্বরটা খুঁজিয়া দেখিল। বাড়িখানা মন্দ নয়, রাস্তার উপর একতলায় সে ঘরখানা, সেটা বসিবারই ঘর বোধ হয়, বেশ সাজান-গোছান। অধিবাসীরা নিতান্ত দরিদ্র নয়, বোঝা গেল, রুচিটাও অপেক্ষাকৃত আধুনিক। খোলা জানালার পথে শিশির দেখিতে পাইল, একটি বছর দশ বারোর ছেলে এবং আর একটু ছোট একটি মেয়ে মাষ্টারের কাছে পড়িতেছে।

একটু ক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া শিশির সরিয়া আসিল। হাঁ করিয়া কতক্ষণই বা ভদ্রলোকের বাড়ির সামনে দাঁড়াইয়া থাকা যায়? কি উপায়ে ইহাদের সহিত পরিচয় করা যায়, তাহা এখন ভাবিয়া দেখিতে হইবে। বাড়ি ঢুকিতে ইচ্ছা করিতেছিল না কিন্তু আর কিছু করিবার নাই, অগত্যা বাড়ি ফিরিয়া সে শুইয়া পড়িল।

চোখে ঘুম আসিল না, ক্রমাগত আজগুবী যত ফন্দি তাহার মাথায় ভীড় করিয়া আসিতে লাগিল। কিন্তু কোনোটাই তাহার সম্ভবপর বলিয়া বোধ হইল না। ভাবিতে ভাবিতে কখন এক সময় সে ঘুমাইয়া পড়িল।

সকালে উঠিয়া চা খাইতে খাইতে সে স্থির করিল, অত রোমান্টিক প্ল্যান করিয়া আর কাজ নাই, দেশের যা সনাতন পদ্ধতি তাহাই অনুসরণ করা যাক্‌। আপিসে গিয়া শত অভাবের তাড়নায়ও যা কোনোদিন করে নাই, আজ তাহা করিয়া বসিল, মাহিনার কিছু টাকা অগ্রিম লইয়া বসিল। আপিস ছুটি হইতেই রাসমণির বাড়ি গিয়া দশটা টাকা হাতে দিয়া তাহাকেই ঘটকী নিযুক্ত করিয়া আসিল।

ইহার পর ব্যাপার দ্রুতবেগে অগ্রসর হইয়া চলিল। ছেলে নিজে সর্দ্দারী করিয়া বিবাহের ব্যবস্থা করিতেছে, ইহাতে মা বাবা অসন্তুষ্ট হইলেন বটে, তবে ছেলে বড় হইয়াছে, রোজগার করে, খুব বেশী কিছু তাহাকে বলা যায় না। ছেলে যে বিবাহ করিতেছে সেই ঢের। মেয়ে দেখিয়া পছন্দ হইলে আর সব কথা পাকা হইবে, বলিয়া ঘটকীরূপিণী রাসমণিকে বিদায় করা হইল। মেয়ের দিক ত রাজী হইয়াই আছে, বাংলা দেশের মেয়ের মা বাপ বিবাহ দিতে অরাজী আর কবে—পাত্র যদি নিতান্তই কুপাত্র না হয়?

শিশিরের বাবা, পিসেমশায় এবং মিহির ঘটা করিয়া গিয়া মেয়ে দেখিয়া আসিলেন। বাকি রহিল বেচারি শিশির, যাহার নাকি দেখিবার প্রয়োজন সব চেয়ে বেশী ছিল।

মিহির ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "দাদা, তোফা মেয়ে! তোমার কপাল ভাল, না হ'লে এমন ক'রে সন্ধান পাও?"

তোফা যে হইবে তাহা ত শিশির জানেই। তবু খুঁটিনাটি প্রশ্ন—যথা রং কেমন, বয়স কত হইবে, মুখশ্রী কেমন, ইত্যাদি নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে তাহার ইচ্ছা করিতে লাগিল, কিন্তু ছোট ভাইয়ের কাছে নিজেকে আর হাল্‌কা করা চলে না, কাজেই গম্ভীর হইয়াই রহিল। নিজে যে একদিন দেখিতে চায়, এ-কথাটা কৌশলে মাকে জানাইয়া দিল। দেনা-পাওনার কথাও চলিতে লাগিল। মিহির অযাচিত ভাবেই তাহাকে থাকিয়া থাকিয়া নানা খোঁজ দিতে লাগিল, - যথা মেয়ে লেখাপড়া খুব ভাল জানে, রীতিমত

সাহিত্য-রসসম্পন্না, গান, বাজনা, নাচ সবই নাকি তাহার আসে,—এক কথায় সত্য সত্যই অমূল্য রত্ন!

শিশিরেরও কনে দেখিবার দিন আসিয়া পড়িল। ভোরে ঘুম ভাঙিতেই তাহার মনে হইল, আজই যেন তাহার যথার্থ বিবাহের লগ্ন, পূর্ব্বদিকের অরুণরাগ আজ যেন বিশেষ করিয়া তাহারই জন্য এত প্রগাঢ় হইয়া ফুটিয়াছে! পাখীর ডাক, ভোরের আলো-বাতাস, সমস্ত কিছুর যেন একটা বিচিত্র বিশেষত্ব সে সকল ইন্দ্রিয় দিয়া অনুভব করিতে লাগিল।

মিহির উঠিয়া নীচে গেল। শিশিরও উঠিয়া চা তৈয়ারী করিবার আয়োজন করিতে লাগিল। দুই এক জন বন্ধু-বান্ধবকে খবর দিতে হইবে তাহার সঙ্গে যাইবার জন্য, একলা ত আর যাওয়া যায় না?

এমন সময় মহা উত্তেজিত ভাবে মিহির আসিয়া ঘরে ঢুকিল, বলিল, "দাদা, দেখ একবার ব্যাপারখানা! গোড়া থেকেই খালি মনে হচ্ছে, কিছু একটা গোলমাল আছে এর ভিতর, নইলে বাংলা দেশে আবার এত রোমান্স?"

শিশিরের মুখ শাদা হইয়া গেল, জিজ্ঞাসা করিল, "হয়েছে কি?"

মিহিরের হাতে একখানা মাসিক পত্র। খুলিয়া একটা জায়গা দেখাইয়া বলিল,—"এই দেখ।"

শিশির পড়িয়া দেখিল। একটি গল্প, পত্রাবলীর আকারে রচিত। গোড়ার চিঠিখানি অতি পরিচিত, যেখানি শ্রীমতি পূরবী আঁস্তাকুড় হইতে তুলিয়া আনিয়াছিলেন অবিকল সেইখানি, দুই-একটা শব্দ মাত্র বদল হইয়াছে। লেখিকার নাম শ্রীমতি উষারাণী দাস।

শিশির স্তব্ধ হইয়া গেল। মিহির বকিয়া চলিল, "আগে ভাল ক'রে খোঁজ নিতে হয়, তা না তুমি একেবারে সাতকাণ্ড সেরে বসলে। গল্প লিখতে বসে একটা পাতা ফেলে দিয়েছিল আর কি, কোনো কারণে পছন্দ হয়নি।"

শিশির চুপ করিয়াই রহিল। তাসের প্রাসাদ এমন করিয়া যে তাহার মাথায় ভাঙিয়া পড়িবে, তাহা দুই মিনিট আগেও কি সে ভাবিয়াছিল? মরীচিকার মায়ায় এ কোন্ মরুভূমিতে সে আসিয়া পড়িয়াছে? এখন উদ্ধারের কোনো পথ আছে কি?

দাদা কিছুই বলে না দেখিয়া মিহির খানিক বাদে জিজ্ঞাসা করিল, "আজকে দেখতে যাওয়ার কি হবে? বাবাকে ব'লে দিন পেছিয়ে দেব নাকি? পরে যা হয় ভেবেচিন্তে একটা ফন্দি বার করা যাবে।"

শিশিরের সম্মুখে সুন্দর একখানি কোমল করুণ মুখ ভাসিয়া উঠিল। সে মুখ শুধু সুন্দর নয়, বুদ্ধিতে সমুজ্জ্বল, কণ্ঠে তাহার বীণার ঝঙ্কার, ললিত চরণকমল তাহার নৃত্যচ্ছন্দে লঘুগতিতে পৃথিবীর উপর ছুঁইয়া যায়। বলিল, "না থাক, ভদ্রলোকদের কথা দেওয়া হয়েছে।"

বড় জাতি

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের লীলানিকেতন আসাম প্রদেশটি উত্তর, পূর্ব্ব এবং দক্ষিণ এই তিন দিকেই পর্ব্বতশ্রেণীদ্বারা বেষ্টিত। অতীতকালে এই পর্ব্বতমালা অতিক্রম করিয়া মোঙ্গোলীয় মহাজাতির বিভিন্ন শাখার লোকেরা আসামের পার্ব্বত্য অঞ্চল এবং সমতলভূমিতে আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিল। এই প্রদেশে যত বিচিত্র আদিম জাতির বাস, আমাদের দেশের আর কোথাও তত নহে। এই জন্যই, বহুদিন আগে মুলার সাহেব নানা জাতিদ্বারা অধ্যুষিত এই প্রদেশটিকে 'নানা জাতির মিউজিয়াম' ("A museum of nationalities") আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন।

আসামের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে যাহাদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার সুযোগ হইয়াছিল তন্মধ্যে 'হালাম' এবং 'সিন্টেং' নামক দুইটি জাতির সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে 'প্রবাসী'তে আলোচনা করিয়াছি, বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা বড় বা বড নামে যে এক বিরাট আদিম জাতিসমষ্টির কথা বলিতেছি, তাহারাই ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার আদিম অধিবাসী, আহোমদের আসামে

আগমনের বহুকাল আগে তিব্বতের অধিত্যকা অতিক্রম করিয়া ইহারা ব্রহ্মপুত্রের উত্তর অঞ্চলে আসিয়া আড্ডা গাড়ে। কালক্রমে বড জাতির বিভিন্ন শাখার লোকেরা ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ অঞ্চলে কোন স্থানে, এমন কি, বাংলা দেশের কোনো কোনো জেলায় পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে।

দরং, কামরূপ প্রভৃতি জেলায় যে একটি আদিম জাতি অসমীয়াদের নিকট কছাড়ী এবং বাঙালীদের নিকট কাছাড়ী নামে পরিচিত, তাহাদের আসল নাম বড় জাতি।* তাহাদের মধ্যে যে ভাষা প্রচলিত, তাহারও নাম বড় বা বড ভাষা। আসাম-বেঙ্গল রেলপথে যাঁহারা লামডিং পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহারা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন ডাওতুহাজা, মাহুর, মাইবং প্রভৃতি ষ্টেশনে কতকগুলি পাহাড়ী নরনারী ফলমূল বেচিতে আসে। পুরুষদের মাথায় দীর্ঘকেশ, কানে অনেকগুলা তামার আঙ্‌টী পরানো, তাহাতে বনফুল গোঁজা, স্ত্রীলোকদের মাথার সাম্‌নের দিকটা কামানো, গলায় পশুর হাড়, পুঁতি, কড়ি প্রভৃতির মালা, পরণের অপ্রশস্ত নোংরা বস্ত্রখণ্ডটি দিয়া হাঁটু পর্য্যন্তও ঢাকা পড়ে না। কাছাড় জেলার পাহাড়ী অঞ্চলে প্রধানতঃ ইহাদের বাস। ইহারা নিজেদের ডিমাশা নামে পরিচিত করে। আসামের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, অতীতে আহোমদের সঙ্গে লড়াইয়ে হারিয়া এক দল কাছাড়ী নিজেদের বাসভূমি পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ অঞ্চলে ডিমাপুরে আসিয়া রাজ্যস্থাপন করে। ডিমাশারা সেই দেশত্যাগী কাছাড়ীদেরই বংশধর। সমতলবাসীদের নিকট অবশ্য ইহারা বড়দের ন্যায় কাছাড়ী নামেই পরিচিত।

ভাষাতত্ত্ববিদগণের গবেষণায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, আসামের গোয়ালপাড়া জেলার রাভা এবং মেচ, শিবসাগর ও লক্ষীমপুর জেলার মোরাণ এবং চুটিয়া, নওগাঁ জেলার হোজাই এবং লালুং, পার্ব্বত্য গারো, গারো পাহাড়ের দক্ষিণদিকস্থ সমতলভূমির বাসিন্দা হাইজং এবং বাঙলা দেশের পার্ব্বত্য ত্রিপুরার অধিবাসী টিপ্‌রা প্রভৃতি জাতি-সমূহের ভাষা বড ভাষার সঙ্গে একজাতীয়। স্যর জর্জ্জ গ্রীয়ার্সন তাঁহার ভাষাসম্বন্ধীয় জরীপের তৃতীয় খণ্ডে (Linguistic Survey of India, vol. iii) বড ভাষা সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। উপরি উক্ত জাতি সমূহ বড় জাতির কুটুম্ব। বড় জাতি বলিলে, ব্যাপক অর্থে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার কাছাড়ী জাতি এবং তাহাদের এই সমস্ত উপজাতি সমষ্টিকে বোঝায়।

আদিম জাতি সমূহ সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখা যায়, তন্মধ্যে যাহারা হিন্দুদের নিকট-সংস্পর্শে আসিয়াছে তাহারাই হিন্দু সম্প্রদায়ের সামাজিক রীতি ও ধর্ম্মানুষ্ঠান ও ভাষা ইত্যাদি বহু পরিমাণে গ্রহণ করিয়াছে। বড় জাতির ক্ষেত্রেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। এই কারণেই, কাছাড়ী এবং গারোরা মূলতঃ একই জাতি হইলেও ইহাদের পরস্পরের মধ্যে রীতিনীতিসংক্রান্ত আকাশপাতাল প্রভেদ দেখা যায়, কেন-না, গারোরা দুর্গম পর্ব্বতের বাসিন্দা বলিয়া সমতলের কাছাড়ীদের ন্যায় হিন্দুপ্রভাবে প্রভাবান্বিত হয় নাই, কোনো কোনো বিষয়ে কিন্তু ইহাদের মধ্যে আশ্চর্য্য রকম মিল দেখিতে পাওয়া যায়। গারোদের সমাজে এমন কোনো কোনো আদিম প্রথা এখনও প্রচলিত আছে যাহা কোনো কালে কাছাড়ীদের মধ্যেও ছিল, কিন্তু বহুকাল যাবৎ লোপ পাইয়া গিয়াছে। অসমীয়া এবং বাংলা ভাষার প্রভাবে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় প্রচলিত বড ভাষার এতদূর রূপান্তর সাধন হইয়াছে যে, পাহাড়ী কাছাড়ীকে আজকাল দরঙের কাছাড়ীর ভাষা বুঝিতে যথেষ্ট বেগ পাইতে হয়,—যদিও মূলতঃ উভয়েই বড-ভাষী। বড়দের ভিন্ন ভিন্ন শাখার মধ্যে রাভা, মোরাণ, চুটীয়া, হাইজং প্রভৃতি কয়েকটি জাতির অধিকাংশ লোকই বড-ভাষা বর্জ্জন করিয়া অসমীয়া এবং বাংলা ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতেছে এবং হিন্দুধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে।

কোচ

কোচ জাতি বড জাতির আর একটি জাতি। আসামের দরং জেলায় এবং গারো পাহাড়ে কোচদের দেখিতে পাওয়া যায়।

---

* Boro(=Man) is the proper designation of the Kachari race. Lyall. *The Mikirs*, p. 4.

সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার "বাঙালীর উৎপত্তি" নামক প্রবন্ধে ইহাদিগকে কাছাড়ী বা বোড়ো বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। (বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় খণ্ড, বাঙালীর উৎপত্তি, তৃতীয় পরিচ্ছেদ) কথাটি কিন্তু বোড়ো নহে বড়। J. D. Anderson এ সম্বন্ধে বলেন—"Their own name for their race is Boro or Bodo (the o has the sound of the English o in hot) (Introduction to the *Kacharis* by Endle, p. xv.) The Kacharis নামক গ্রন্থ প্রণেতা Endle বলেন—...The people known to us as Kacharis and to themselves as Bada (Bara)...(*The Kacharis*, p. 4.)

কিন্তু প্রধানতঃ ইহারা আসামের বাহিরে উত্তর-বঙ্গে জলপাইগুড়ি, রংপুর, দিনাজপুর, কোচবিহার প্রভৃতি জেলায় বাস করে। আজকাল আসামের কোচরা সকলেই অসমীয়া ভাষায় এবং বাংলা দেশের কোচরা সকলেই বাংলা ভাষায় কথা-বার্ত্তা কহে। কিছুকাল আগেও কিন্তু ইহারা বড় বা বড ভাষায় কথা কহিত।*

উত্তর-বঙ্গের কোচরা সকলেই হিন্দু সমাজের কাশ্যপ গোত্র অবলম্বন করিয়াছে। তাহারা ব্রাত্যক্ষত্রিয় বলিয়া আত্ম-পরিচয় দেয়। তাহারা বলে, তাহারা রামচন্দ্রের পিতা দশরথের বংশধর। পরশুরামের কোপ হইতে নিষ্কৃতি-লাভ করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদের ক্ষত্রিয় পূর্ব্বপুরুষরা নাকি উত্তর-বঙ্গে পলাইয়া আসে।† সমগ্র 'বড়' জাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে কেবল মাত্র ইহাদের দেহে প্রভূত পরিমাণে দ্রাবিড়-রক্তের সংমিশ্রণ হইয়াছে। আসামের কোচদের শরীরে কিন্তু খাঁটি মোঙ্গোলীয় রক্ত বহমান। বাংলা দেশের কোচদের ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায় আছে, বিবাহাদিতে তাহারা হিন্দুদের বিভিন্ন অনুষ্ঠান-পদ্ধতির অনুসরণ করে এবং খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধেও গোঁড়া হিন্দুদের মত নানা বাছবিচার ইহাদের মধ্যে চলিত হইয়াছে। বাংলা দেশের উত্তর-পূর্ব্বাঞ্চলে কোচ ছাড়া মিমাল নামে 'বড়'-গোষ্ঠীর (tribe) অন্তর্গত আর একটি জাতি বাস করে।

কাছাড়ী ও গারোদের সহিত সেমা নাগাদের জ্ঞাতিত্ব

নাগা পাহাড়ে সেমা নাগা নামে একটি আদিম জাতি বাস করে। নৃতাত্ত্বিক ডক্টর হটনের গবেষণায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, ইহারা নাগা পাহাড়ের বাসিন্দা আঙ্গামী, আও, লোটা রেঙ্গমা প্রভৃতি নাগাদের স্বজাতি নহে। তাঁহার সিদ্ধান্ত এই যে, সেমারা 'বড়' জাতির সহিত সম্বন্ধযুক্ত এবং তাহারা কাছাড়ী ও গারো এই উভয় জাতিরই ঘনিষ্ঠ আত্মীয়।‡ খুব সম্ভব আহোমরা যখন ডিমাপুর নামক কাছাড়ী রাজধানী বিধ্বস্ত করে তখন কাছাড়ীদের কোনো এক সম্প্রদায়ের লোকেরা নিকটবর্ত্তী নাগা পাহাড়ে গিয়া বসতি করে। স্বজাতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সুদীর্ঘকাল নাগাদের প্রতিবেশীরূপে দুরধিগম্য পার্ব্বত্য অঞ্চলে বাস করায় যদিও ইহারা সেমা নাগা নামে নাগাদের অন্যতম শাখাতে পরিণত হইয়াছে, তথাপি কাছাড়ী এবং গারোদের সঙ্গে ইহাদের ভাষা এবং কৃষ্টিগত সাদৃশ্য আজও পর্য্যন্ত কিয়ৎ পরিমাণে বিদ্যমান রহিয়াছে। সেমা ভাষার অঙ্কবাচক শব্দগুলা কাছাড়ী ও গারোদের ভাষার অঙ্কবাচক শব্দগুলার প্রায় অনুরূপ।* ডিমাশারা (কাছাড়ী) সৃষ্টিকর্ত্তাকে বলে আলউ (Alow), সেমারা বলে আলহউ (Alhou)। ভাষা ছাড়া আর যে সমস্ত বিষয়ে এই তিনটি জাতির মধ্যে একটির সঙ্গে অপরটির মিল আছে, তাহা কাছাড়ীদের রীতিনীতি-বর্ণনাপ্রসঙ্গে আমরা উল্লেখ করিব।

কাছাড়ী (বড়)দের রীতিনীতি

দরং জেলায় যে-সমস্ত বড় বা কাছাড়ী বাস করে, তাহাদের বস্তীগুলা বেজায় নোংরা অপরিচ্ছন্ন। বাড়িগুলি খুব ঘেঁষা-ঘেঁষি ভাবে অবস্থিত। প্রত্যেক কাছাড়ী গৃহস্থই অনেকগুলা শূকর এবং অন্যান্য পশু পোষে। ইহাদের মূত্রপুরীষের দুর্গন্ধে কাছাড়ী গ্রামসমূহ চব্বিশ ঘণ্টা ভরপুর থাকে। কাছাড়ীরা বাড়ির চতুষ্পার্শ্বে গভীর পরিখা খনন করিয়া তাহার পাড়ে ইকড় এবং বাঁশ দিয়া মজবুত বেড়া তৈয়ার করে। ইহারা প্রায় সকলেই গুটিপোকার চাষ করে। ইহাদের তাঁতগুলা খুব সাদাসিদা ধরণের। কাছাড়ী-গৃহিণী এবং পরিবারের বয়স্থা মেয়েরা গুন্ গুন্ করিয়া গান গাহিতে গাহিতে কাপড় বোনে। মেয়েরা অবসর সময়ের সবটুকুই বস্ত্রবয়নে ব্যয়িত করে। অন্যান্য গৃহকর্ম্ম অবহেলা না করিয়াও তাহারা পারিবারিক আয়বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হয়। ধানের বীজও মেয়েরাই বুনিয়া থাকে।

কাছাড়ীরা নারীদের যথেষ্ট সম্মান করে, পরিবারে মাতা এবং জায়া গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিতা। কাছাড়ী-পুরুষ নিজের স্ত্রীকে রীতিমত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে, এ-কথা

---

* It can be proved that the aboriginal members of the Koch caste within quite recent times spoke the Boro language.—J. D. Anderson, Introduction to the *Kacharis* by S. Endle, p. xv.

† চুটিয়াদের মধ্যেও অনুরূপ জনশ্রুতি প্রচলিত।

‡ *The Sema Nagas* by J. H. Hutton, I. C. S. Page 6, foot-note.

* In comparing Tibeto-Burman languages it has been usual to choose for examination in the first place the numerals. Lyall, *The Mikirs*. p. 156.

বলিলে অতিশয়োক্তি করা হয় না। কি কুমারী অবস্থায়, কি বিবাহিত জীবনে, সকল সময়েই কাছাড়ী মেয়েরা প্রচুর স্বাধীনতা উপভোগ করিয়া থাকে কিন্তু তাহারা সাধারণতঃ এই স্বাধীনতার অপব্যবহার করে না। সতীত্বের মর্য্যাদাবোধ ইহাদের পুরামাত্রায়ই আছে। কাছাড়ীদের সামাজিক ব্যবস্থা অনুসারে নরনারী মাত্রেই সংযত জীবনযাপন করিতে বাধ্য। কাছাড়ী কুমারকুমারীদের মধ্যে অবৈধ প্রণয়লীলার কথা যে কখনও শোনা যায় না তেমন নহে, কিন্তু তাহা লোকচক্ষুর অন্তরালে অতিসঙ্গোপনে অনুষ্ঠিত হয়। দৈবাৎ, তাহা জানাজানি হইয়া পড়িলে প্রণয়িযুগল সমাজের কলঙ্কস্বরূপ বিবেচিত হয় এবং তাহাদের লজ্জার অবধি থাকে না। এরূপ স্থলে সমাজের মাতব্বরদের ব্যবস্থানুসারে ইহাদের পরস্পরকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইতে হয়, কিন্তু ইহাতে মেয়েটির বাপ-মায়ের আপত্তি থাকিলে, তাহার প্রেমাস্পদের নিকট হইতে কুড়ি হইতে পঁচিশ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা আদায় করা হয়। মেয়েটির গর্ভ উৎপন্ন হইলে কিন্তু ইহাদের পরস্পরকে পরিণীত হইতেই হয়।

কাছাড়ীদের ন্যায় গারোরাও নারীর সতীত্বকে অতি উচ্চে স্থান দিয়া থাকে। আগেকার দিনে গারোদের সমাজে ব্যভিচারী নরনারীর জন্য যে কিরূপ কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা ছিল তাহা ভাবিলে গায়ের রক্ত জল হইয়া যায়। সেকালে ব্যভিচারী গারো পুরুষকে ক্রীতদাসরূপে বেচিয়া ফেলা হইত, নতুবা তাহাকে হত্যা করা হইত। ব্যভিচারিণী নারীর কানের তেলো কাটিয়া ফেলা হইত, তাহার পোষাক-পরিচ্ছদ টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলা হইত, প্রতিবেশীদের ভৎর্সনায় তাহার জীবন দুর্ভর হইয়া উঠিত, এবং দ্বিতীয় বার অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত হইলে তাহার পক্ষে মৃত্যুদণ্ডের হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া অসম্ভব ছিল।

সেমা মেয়েরাও সতীত্বের মর্য্যাদাবোধ সম্বন্ধে সচেতন। ইহাদের প্রতিবেশী আও প্রভৃতি নাগাদের নিকট সতীত্বের মূল্য তো এক কানাকড়িও নহে। সমর্থ যুবতী অবিবাহিতা আও মেয়েরা রাত্রিবেলায় আলাদা একটি ঘরে তিনচার জনে একত্রে শয়ন করে। যুবকেরা মোরাং * হইতে সেখানে আসিয়া তাহাদের সঙ্গে সম্মিলিত হয়। প্রত্যেক মেয়েরই গণ্ডা গণ্ডা প্রণয়ী থাকে বটে, কিন্তু একসঙ্গে সে একাধিক প্রণয়ীকে নিজের কাছে ঠাঁই দেয় না। এইরূপে যৌবনোদ্গমের সঙ্গে সঙ্গেই ব্যভিচারের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিবার ফলে এই দাঁড়ায় যে বিবাহিত জীবনেও বারবনিতাদের সঙ্গে ইহাদের বড়-একটা প্রভেদ থাকে না।

এই অবৈধ এবং অবাধসংসর্গ কিন্তু ইহাদের নিকট দূষণীয় বলিয়া গণ্য নহে, এবং সেজন্য কোনো সামাজিক শাস্তির ব্যবস্থাও ইহাদের নাই। লোটা নাগাদের রীতিনীতি আলোচনা করিলে মনে হয় যে, দুর্নিবার বহু আদিম জাতির ন্যায় একদা ইহাদের সমাজেও যৌথবিবাহ প্রচলিত ছিল। কোনো লোটা-পুরুষ যখন দিনকতকের জন্য বাটী হইতে অন্যত্র যায়, তখন সে তাহার ভাইদের তাহার অনুপস্থিতিকালে নিজ পত্নীর পতিত্ব করিবার অনুমতি দিয়া যায়। কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর পর, তাহার বিধবারা তাহার ভাইয়ের সম্পত্তিতে পরিণত হয়। রেঙমা নাগাদের প্রথা ইহার চেয়েও খারাপ। কিন্তু সেমা নাগাদের মধ্যে অবৈধ সম্বন্ধ তো দূরের কথা "বিবাহের পূর্ব্বে কোনো যুবক কোনো যুবতীর গায়ে হাত দিলে পর্য্যন্ত তাহাকে জরিমানা দিতে হয়।"* অবিবাহিতা সেমা মেয়েদের উপর কড়া নজর রাখা হয় এবং কাছাড়ীদের ন্যায় সেমা মেয়েরাও পিতার স্নেহ, স্বামীর ভালবাসা এবং ছেলেদের শ্রদ্ধাভক্তি অপর্য্যাপ্ত পরিমাণেই পাইয়া থাকে। ভবিষ্যৎ জীবনে অধিকাংশ বালিকাই সুগৃহিণী ও সুমাতা বলিয়া পরিচিত হয়। সেমারা বহু বিষয়ে প্রতিবেশী নাগাদিগকে অনুকরণ করিয়াছে, কিন্তু দাম্পত্য ব্যাপারে একনিষ্ঠতা সম্বন্ধে নিজেদের জাতীয় মহান আদর্শ আজ পর্য্যন্ত তাহাদিগকে সুপথে রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছে।

অন্যান্য আদিম জাতির ন্যায় কাছাড়ীদেরও 'তিলগাছ' 'কুমড়া' 'বাঘ' প্রভৃতি বহু টটেম (Totem) আছে। তন্মধ্যে কেবলমাত্র বাঘ ছাড়া আর কোনো টটেমের প্রতি শ্রদ্ধা বা সম্মান প্রদর্শন করিবার রেওয়াজ তাহাদের মধ্যে নাই। কোনো বাঘ মরিয়াছে জানিতে পারিলে 'মসা-আয়ই'

* অবিবাহিত নাগা যুবকদের শুইবার ঘর।

* সেমা নাগা—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার। প্রবাসী, বৈশাখ ১৩২৫।

বা ব্যাঘ্র-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত লোকেরা এক জায়গায় জড় হইয়া মড়াকান্না জুড়িয়া দেয়।* কান্নাকাটি শেষ হইলে ঘরের মেঝে প্রভৃতি গোবর ও কাদাজল দিয়া নিকাইয়া ফেলে এবং ব্যবহার করা মাটির বাসন-কোসন ভাঙিয়া চুরিয়া ফেলিয়া দেয়। বাঘ মহাশয়েরা কিন্তু তাহাদের জ্ঞাতিবর্গকে তিলমাত্রও খাতির করিয়া চলেন কিংবা বাগে পাইলে ঘাড় মটকাইতে কসুর করেন বলিয়া শোনা যায় না। পিতার মৃত্যুর পর বড় ছেলে সম্পত্তির ভার গ্রহণ করে। ছেলেরা সাবালক হইয়া বিবাহাদি করিলে পর, পরস্পরের মধ্যে সম্পত্তি ভাগ-বাঁটোয়ারা করিয়া লইয়া আলাদা হইয়া যায়।

কাছাড়ীদের বিশ্বাস,—সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অসংখ্য 'মোদাই' বা অদৃশ্য ভূতযোনি-সমূহ দ্বারা পরিপূর্ণ। পাছে এই ভূতেরা তাহাদের অমঙ্গল ঘটায় এই ভয়ে তাহারা সর্ব্বদাই শঙ্কিত। কেহ পীড়িত হইলে ইহারা মনে করে যে, রোগগ্রস্ত লোকটির উপর 'মোদাই' ভর করিয়াছে। শূকর, ছাগল ইত্যাদি বলি দিয়া মোদাইগুলাকে খোশ-মেজাজে রাখাই ইহাদের ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ।

ইহাদের দুই প্রকার দেবতা আছে,—(১) গৃহদেবতা (২) গ্রামদেবতা। ইহাদের প্রধান উপাস্য গৃহদেবতার নাম 'বাতাউ'। 'সিজু' নামক বৃক্ষবিশেষ তাহার প্রতীক। কাছাড়ীদের গৃহ-প্রাঙ্গণে বেড়া-দিয়া-ঘেরা সিজু গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। আধিব্যাধি এবং দুর্ভিক্ষ এবং মড়ক ইত্যাদি সর্ব্ববিধ দৈবদুর্ব্বিপাকের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার উদ্দেশ্যে ছাগল, শূকর, মোরগ, কদলী, পান, সুপারি, প্রভৃতি বিবিধ উপচারে বাতাউকে খুশী রাখা হয়। বাতাউর পত্নীর নাম 'মাইনাও'। ইনি হইতেছেন ধান্যক্ষেত্রের রক্ষাকর্ত্রী। মাইনাও ঠাকুরাণীর মুরগীর ডিমের উপর প্রবল আসক্তি এবং ঐ জিনিষটি তিনি কাছাড়ী ভক্তদের নিকট হইতে প্রচুর পরিমাণেই পাইয়া থাকেন। গোয়ালপাড়া জেলার মেচেদের সিজুগাছের উপর ভক্তি কাছাড়ীদের চেয়েও অধিক। গারোরা সিজুগাছকে পূজা করে না বটে, কিন্তু ঐ গাছটিকে তাহারা শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকে। উহা তাহাদের নিকট 'শিজু' গাছ নামে পরিচিত। কাছাড়ীদের গ্রামদেবতাদের অধিকাংশই হিন্দু পৌরাণিক দেবদেবী; যথা—বুড়ামহাদেও, জলকুবের, রাম, কৃষ্ণ ইত্যাদি। বৎসরে তিনবার ধান্যসংগ্রহের কালে ইহারা তিনটি বড় রকমের পূজানুষ্ঠান করিয়া থাকে। কলেরা মহামারীরূপে দেখা দিলে উক্ত রোগের ভূতকে তাড়াইবার উদ্দেশ্যে তাহারা মরং পূজা নামে আর একটি বড় রকমের পূজার আয়োজন করে। ইহাদের পূজাপর্ব্ব দেউড়ি বা দেওধাইদের দ্বারা সম্পাদিত হয়। দুর্ভিক্ষ মড়ক ইত্যাদির প্রাদুর্ভাবকালে কিন্তু 'দেওধানী' নামক এক শ্রেণীর ভূতাবিষ্ট স্ত্রীলোকদ্বারা বিশেষ একটা পূজানুষ্ঠান করা হয়। ওঝা বা ওঝাবুড়া নামক আর এক শ্রেণীর লোকেরা নাকি শঙ্খ, কড়ি প্রভৃতির সাহায্যে গণনা করিয়া ভবিষ্যতের শুভাশুভ বলিয়া দিতে পারে।

হিন্দুদের ন্যায় কাছাড়ী জননীরাও সন্তানের জন্মদান করিবার পর একমাস কিংবা দেড়মাস কাল অশুচি থাকেন। অশৌচ অন্তে গায়ে 'শান্তিজল' ছিটাইয়া 'দেউড়ি' তাহাকে পরিশুদ্ধ করেন।

আগেকার দিনে প্রায় কাছাড়ী যুবকেরা মেয়েদের হরণ করিয়া লইয়া গিয়া বিবাহ করিত।* আজকাল এই প্রথা একপ্রকার লোপ পাইয়া গিয়াছে বলিলেই চলে। এখন কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবশ্য যুবকেরা নিজেরাই উদ্যোগী হইয়া নিজেদের বিবাহ ব্যাপার সম্পন্ন করে। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই ছেলে যৌবনে পা দিবামাত্র বাপ তাহার জন্য পাত্রীনির্ব্বাচনে ব্যাপৃত হয়, পাকা দেখা হইয়া গেলে পর, বিবাহের জন্য একটা শুভদিন অবধারিত করা হয়। নির্দ্দিষ্ট দিনে, বরপক্ষ নয় বোঝা খাদ্যদ্রব্য, ভারে ভারে পান সুপারি, মদ্যপূর্ণ বড় বড় মাটির বাসন এবং শূকর প্রভৃতি সহ কনের পিতার বাড়িতে গিয়া হাজির হয়। অধিকাংশ স্থলেই বর তাহাদের সঙ্গে যায় না। বরপক্ষ কন্যার বাটীতে পৌঁছিবামাত্র কন্যাপক্ষীয়েরা তাহাদের উপর 'কাচুপানি' নামে একটা তরলপদার্থ ঢালিয়া দেয়। ফলে তাহাদের সমস্ত শরীর জ্বালা করিতে থাকে, এমন কি ফোস্কা পর্য্যন্ত পড়ে। এই মারাত্মক রসিকতাটুকু কিন্তু তাহাদিগকে নীরবে উপভোগ করিতে হয়; মুখ ফুটিয়া আপত্তি প্রকাশ করা রীতিবিরুদ্ধ। এইরূপে বরপক্ষীয়েরা নাজেহাল হইলে পর

* মেচেদের মধ্যেও বাঘের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিবার রেওয়াজ আছে।

* মোরাণরা এখনও এপ্রিল মাসের বিহু পর্ব্বের সময় নিজ নিজ মনোনীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়া বিবাহ করে।

'পেটে খেলে পিঠে সয়' এই প্রচলিত প্রবাদবাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করা হয়। যুবা-বৃদ্ধ সকলে সার বাঁধিয়া বসে এবং কন্যা সবাইকে অন্নব্যঞ্জন পরিবেশন করে, তারপর হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া বিবাহিত জীবনের যাত্রা-পথে সমবেত জনমণ্ডলীর আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করে। দিবসের অবশিষ্টাংশ হাসি-হল্লায় কাটিয়া যায়। সন্ধ্যার প্রাক্কালে কন্যাকে তাহার স্বামী-গৃহে লইয়া যাওয়া হয়. বিবাহের যাবতীয় খরচ বরের বাপকেই বহন করিতে হয় তাহাকে ৪০৲ টাকা হইতে ৬০৲ টাকা পর্যন্ত কন্যাপণ বা 'গা-ধন' * (দেহের মূল্য) দিতে হয়, বরের পিতার 'গা-ধন' দিবার সঙ্গতি না থাকিলে প্রতিপণ স্বরূপ বরকে শ্বশুরালয়ে জনমজুর খাটিতে হয়। কেহ যদি নিজ পরিবারের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া শ্বশুরের পরিবারভুক্ত হইয়া যায়, তাহা হইলে শ্বশুর-শাশুড়ীর মৃত্যুর পর সে এবং তাহার স্ত্রী, তাহাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির মালিক হয়। এণ্ডল্ সাহেব বলেন, আগেকার দিনে কাছাড়ীদের সমাজে নাকি ভিন্নগোত্রে বিবাহ (exogamy) নিষিদ্ধ ছিল। আসাম গবর্ণমেণ্টের জাতি-তত্ত্ব বিভাগের ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্টর মেজর গার্ডন এ-কথার যাথার্থ্য সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। যাই হোক্, বর্ত্তমানকালে যার যে-গোত্রে খুশী বিবাহ করিতে পারে, মৃতদার ব্যক্তি স্বীয় পত্নীর ছোট বোনকে বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু জ্যেষ্ঠা শ্যালিকাকে সে মাতৃবৎ জ্ঞান করিতে বাধ্য। সাধারণতঃ ইহাদের মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত নাই, কিন্তু প্রথমা পত্নীর গর্ভে সন্তান না জন্মিলে কাছাড়ীরা কখনও কখনও দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করিয়া থাকে।

মৃতদেহকে গোর দেওয়া এবং সৎকার করা—এই উভয় প্রথাই ইহাদের মধ্যে প্রচলিত দুইটিরই আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানাদি অনেকটা একই ধরণের। অবস্থাপন্ন কাছাড়ীদের মৃতদেহ দাহ করা হইয়া থাকে।

সাধারণতঃ কেহ মরিলে পর তাহার মৃতদেহকে সমাহিত করিবার উদ্দেশ্যে নদীতীরে বহিয়া লইয়া যাওয়া হয়। স্ত্রীলোকদের শবানুগমন করা নিষিদ্ধ। দাহ-স্থানে পৌছিয়া সেখানকার অধিষ্ঠাতা অপদেবতার নিকট হইতে ভূমিখণ্ড কিনিবার উদ্দেশ্যে মাটির উপরে কয়েকটি পয়সা ছড়ান হয় এবং মৃতদেহকে মাটিতে রাখিয়া কবর খনন করা হয়। তার পর মৃতের আত্মীয় কুটুম্ব এবং অন্যান্য শবযাত্রীরা একটি শোভাযাত্রা গঠন করিয়া শবদেহ পরিক্রমণ করে। পুরুষদের বেলায় পাঁচবার এবং মেয়েদের বেলায় সাতবার প্রদক্ষিণ করা হয়। শব-পরিক্রমা সমাধা হইলে, মৃতদেহকে কবরে পুরা হয় এবং মৃতের নিকট-আত্মীয়েরা মাটি চাপা দেয়। অন্য কোন আত্মা যাহাতে মৃতের বিশ্রামের ব্যাঘাত জন্মাইতে না পারে, সেজন্য সমাধির চারি কোণায় চারিটি খুঁটি গাড়িয়া সেগুলিকে সূতা দিয়া বেষ্টন করা হয়। সঙ্গতিশালী ব্যক্তিদের কবরে টাকা এবং সাধারণ লোকদের কবরে পয়সা পুঁতিয়া রাখা হয়। সর্ব্বশেষে রৌদ্রবৃষ্টির কবল হইতে মৃতের আত্মাকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে সেখানে একটি চালাঘর তৈয়ার করা হয়। মেচরাও মৃতদেহকে সমাহিত করিয়া কবরের জায়গায় ছোট ঘর তৈয়ার করে।

'মিথাম গা-ধন-জানাই' 'মহু হা নাই' প্রভৃতি দু-একটি মাত্র ইহাদের নিজস্ব জাতীয় পাল-পার্ব্বণ আছে। অসমীয়া হিন্দুদের অনুকরণে ইহারা জানুয়ারী মাসে একবার এবং এপ্রিল মাসে আর একবার 'বিহু' উৎসব প্রতিপালন করে। জানুয়ারী মাসের উৎসব সাধারণতঃ ১২ই তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের কয়েক সপ্তাহ আগে হইতেই যুবকেরা কতকগুলি খোড়োঘর নির্ম্মাণে রত হয় এবং গুটিকতক লম্বা বাঁশ মাটিতে পুঁতিয়া সেগুলার চারিপাশে শুকনো ঘাস এবং খড় ইত্যাদি জড় করিয়া রাখে, উৎসবরাত্রে এগুলাতে আগুন ধরাইয়া দেওয়া হয়। ইহার সঙ্গে উত্তরায়ণ সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে পূর্ব্ববঙ্গে অনুষ্ঠিত 'ভেড়া-ঘর-পোড়া' উৎসবের সাদৃশ্য আছে। এপ্রিলের 'বিহু' পরবের প্রথম দিনে অসমীয়াদের মতন গরুগুলাকে নিকটবর্ত্তী নদী কিংবা পুষ্করিণীতে লইয়া গিয়া স্নান করানো হয়, এপ্রিলের উৎসব সাতদিন ব্যাপিয়া চলে। এই সপ্তাহকাল কাছাড়ীরা নাচ-গান, আমোদ প্রমোদ মদ্যপান ইত্যাদিতে একেবারে মাতিয়া উঠে, কেবলমাত্র এই সময়েই কাছাড়ীদের সংযমের বাঁধন প্রকাশ্যভাবেই একটু আলগা হইয়া যায়। সমতলের গারোরা দুইটি বিহুই প্রতিপালন করে। ডিমাসারা কেবলমাত্র একটি 'বিহু' উদযাপিত করে।

বড় জাতির প্রাচীন ইতিহাস

বড় জাতি বর্ত্তমানকালে অবজ্ঞাত এবং অখ্যাত হইলেও, ইহাদের অতীত ইতিহাস গৌরব মণ্ডিত। একদা আসাম-প্রদেশ

* কথাটা অসমীয়া ভাষা হইতে ধার করা।

এবং উত্তর-পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ স্থান বড় জাতির অধিকারভুক্ত ছিল। সমগ্র বড় জাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে কোচ এবং কাছাড়ীরাই সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে নরনারায়ণের রাজত্বকালে কোচজাতি গৌরবের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। নরনারায়ণের ভ্রাতা শিলারায় ছিলেন সারা উত্তর-পূর্ব ভারতের সমকালিক বীর সেনানায়কদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। আজও কাছাড়ীরা অন্যতম গ্রামদেবতারূপে তাহাদের সেই জাতীয় মহাবীরের পূজা করিয়া থাকে। কামাখ্যার মাতৃমন্দির, হাজোর হয়গ্রীব মাধবের মন্দির প্রভৃতি কোচরাজাদের বহু কীর্তিচিহ্ন কামরূপে এখনও বিদ্যমান।

১২২৮ খৃষ্টাব্দে আহোমরা পাতকোই পর্বত অতিক্রম পূর্বক আসামে প্রবেশ করিয়াই উক্ত পর্বতের পাদদেশস্থ ভূখণ্ডের অধীশ্বর মোরাণ এবং বরাহীদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। ইহাদিগকে পরাজিত করিয়া তাহারা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের বাসিন্দা চুটীয়াদের সহিত যুঝিতে আরম্ভ করিল। প্রায় দেড়-শ কিংবা দুই শত বৎসর কাল ইহারা আহোমদিগকে ঠেকাইয়া রাখিয়াছিল কিন্তু অবশেষে ইহারা হারিয়া গেল। অতঃপর পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইয়া আহোমরা কাছাড়ীদের সহিত লড়িতে আরম্ভ করিল (১৪৮৮ খৃঃ), কিন্তু চুটীয়া প্রভৃতির ন্যায় কাছাড়ীদেরও দুর্দ্দিন তখন ঘনাইয়া আসিয়াছে। প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও তাহারা আহোমদিগের সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিল না। পরাজিত কাছাড়ীদের মধ্যে একদল তখন ধনশিরি নদীতীরস্থ ডিমাপুরে আসিয়া নূতন রাজধানী স্থাপন করিল। আহোমেরা এখানে আসিয়াও আবার তাহাদের উপর চড়াও করিল, ডিমাপুর দখল করিয়া তাহারা এই সমৃদ্ধিশালী নগরীটিকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করিল।

কাছাড়ী রাজধানীর ভগ্নাবশেষ

আসাম-বেঙ্গল রেলপথের মনিপুর রোড ষ্টেশনের অনতিদূরে নামবার নামক এক নিবিড় জঙ্গলের ভিতর ডিমাপুরের ভগ্নাবশেষসমূহ আসাম-গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে সযত্নে রক্ষিত। নিকটেই কোনো কাছাড়ী রাজার কাটানো বহুশতবিঘা একটি প্রকাণ্ড দীঘি আছে। নামবার জঙ্গলের মাঝখানটা সাফ করিয়া ভগ্নাবশেষগুলাকে সারি সারি স্থাপিত করা হইয়াছে। ভগ্ন প্রাচীরগাত্রে খোদিত হরিণ, ময়ূর প্রভৃতি নানা পশুপক্ষী এবং লতা-পাতাগুলি একেবারে নিখুঁত। কিন্তু তন্মধ্যে একটি মাত্রও মনুষ্য মূর্ত্তি খোদিত নাই। এজন্য গেট সাহেব অনুমান করেন যে, কাছাড়ীরা তখন হিন্দু প্রভাব হইতে সর্ব্বপ্রকারে মুক্ত ছিল।* কাছাড়ীরা যে তৎকালে আহোমদের চেয়ে উন্নত জাতি ছিল, ডিমাপুরের ভগ্নাবশেষ তাহার অন্যতম প্রমাণ। তখনকার দিনে আহোমরা কাছাড়ীদের ন্যায় ইট দিয়া দালান তৈরি করিতে জানিত না।

নামবার জঙ্গলে কতকগুলা বৃহদায়তন প্রস্তরস্তম্ভ (monoliths) দেখিতে পাওয়া যায়। ওগুলা যে মৃতের উদ্দেশে নির্ম্মিত স্মৃতিস্তম্ভ তাহাতে সন্দেহ নাই। গারোরা মৃতের উদ্দেশে যে-সমস্ত খাঁজ-কাটা স্মৃতিস্তম্ভ (কিমা) নির্ম্মাণ করে সেগুলার সঙ্গে উপরোক্ত স্তম্ভগুলার আকৃতিগত সাদৃশ্য প্রায় ষোলো আনা। অধিকাংশ 'কিমা'ই ডিমাপুরের মনোলিথগুলার ধাঁচে খোদাই করা হয়। তফাৎ কেবল এইটুকু যে, 'কিমা'গুলা কাষ্ঠনির্ম্মিত এবং আয়তনে ছোট।

নামবার জঙ্গলে 'মনোলিথ' ছাড়া ইংরেজী y অক্ষর বা আমাদের হাড়িকাঠের মতন আকৃতিবিশিষ্ট আরও গুটিকতক প্রস্তরস্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়। গারোরা মৃতদেহ সংকার করিবার কালে দাহস্থানের নিকটে ঠিক এই আকারেরই 'গিলমিরং' নামে কাঠের খুঁটায় একটি ষাঁড়কে বাঁধিয়া রাখে, এবং উক্ত প্রাণীটির আত্মা পরলোকে গিয়া যাহাতে মৃতের সেবা করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে মৃতদেহ ভস্মে পরিণত হইবার আগেই তাহাকে হত্যা করে। সেমাদের মধ্যে সর্দ্দার এবং অবস্থাপন্ন লোকেরা উৎসবাদি উপলক্ষে এই প্রকার কাঠের স্তম্ভে রজ্জুবদ্ধ করিয়া গো-বধ করে। গারো এবং সেমাদের জ্ঞাতি কাছাড়ীরাও যে গো-বধ করিবার উদ্দেশ্যেই হাড়িকাঠের অনুরূপ স্তম্ভগুলা নির্ম্মাণ করিয়াছিল, তাহা স্পষ্টই বোঝা যায়। কিন্তু পরবর্তী কালে হিন্দুদের সংস্রবে আসিয়া তাহারা গো-হত্যা হইতে বিরত হয়, ফলে হাড়িকাঠের অনুরূপ স্তম্ভ নির্ম্মাণ প্রথাও তাহারা পরিত্যাগ করে। গারো

---

* The inference seems to be that at this time the Kacharis were free from all Hindu influences. E. A. Gait—*A History of Assam* p. 248.

এবং রেমারা হিন্দুধর্ম্মের আওতায় না আসায় নিজেদের এই জাতীয় প্রথাটিকে আজ পর্য্যন্ত বাঁচাইয়া রাখিয়াছে।

বড় জাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দুধর্ম্ম ও আচার অনুশাসনের প্রভাব

আর্য্যগণ খৃষ্টাব্দের প্রথম কিংবা দ্বিতীয় শতকে আসামে প্রবেশ করেন। কালক্রমে, আসাম প্রদেশটি তান্ত্রিক হিন্দুধর্ম্মের লীলাভূমিতে পরিণত হয়। চুটীয়ারা যে ছয় সাত শত বৎসর পূর্ব্বেই তান্ত্রিক হিন্দুধর্ম্মের প্রভাবে আসে তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। ইহারা ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতেই বিভিন্ন মূর্ত্তিতে কালীপূজা করিত এবং অসমীয়াদের ন্যায় কালীমন্দিরে নরবলি দিত।* প্রায় চারি শতাব্দী হইল বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিয়া মহাপুরুষ শঙ্করদেব আসাম প্রদেশটিকে বীভৎস তান্ত্রিকতার হাত হইতে উদ্ধার করেন। অসমীয়াদের দেখাদেখি হিন্দু চুটীয়ারাও তান্ত্রিক আচার অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম অবলম্বন করে। বর্ত্তমানকালে, কেবলমাত্র দেউড়ি এবং বরাহী চুটীয়ারা কিয়ৎপরিমাণে তান্ত্রিক হিন্দুধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া চলিতেছে। কোচদের হিন্দুধর্ম্মানুরক্তির কথা প্রবন্ধের গোড়াতেই বলিয়াছি। গারো পাহাড়ের বরকোচদের হাতে জল খাইতে কোনো কোনো উচ্চ শ্রেণীর অসমীয়ারও আপত্তি নাই। দরং জেলার বহুস্থানে 'কাছাড়ী গাঁও' নামে কতকগুলি বস্তী আছে। সেই সমস্ত বস্তীর লোকেরা পুরাপুরি হিন্দু বনিয়া গিয়াছে। কাছাড়ীদের মধ্যে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা দিন দিনই বাড়িতেছে। হিন্দু কাছাড়ীরা নিজেদের কোচ বলিয়া পরিচিত করে। মেচদেরও হিন্দুধর্ম্মের দিকে কিছু ঝোঁক দেখা যায়। কেহ কেহ 'বাথাউ'র পরিবর্ত্তে শিবের পূজা করে। কেহ মরিলে, তাহার পুত্র কিংবা কন্যাকে সাত, নয় কিংবা এগার দিনে কখনও বা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দিনই শ্রাদ্ধ করিতে হয়, রাভারা বলে যে তাহাদের আদিপুরুষ ছিলেন হিন্দু। তিনি নাকি একটি কাছাড়ী রমণীকে বিবাহ করিয়া জাতিচ্যুত হইয়াছিলেন। রাভারা অহিন্দু কাছাড়ীদের হাতে খায় না। কাছাড়ীদের কিন্তু রাভাদের স্পৃষ্ট অন্ন খাইতে আপত্তি নাই। পাতি প্রভৃতি ইহাদের কোনো কোনো উচ্চ সম্প্রদায়ের লোকদের শাক্ত হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ দেখা যায়। মোরাণদের মধ্যে প্রায় সকলেই বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী। ইহারা নিজেদের জাতি বড় জাতির সহিত কুটুম্বিতার কথা অস্বীকার করে। ইহারা গোমাংস কিংবা শূকর-মাংস খায় না এবং মদ্যপান করে না বটে কিন্তু কুক্কুট-মাংস এবং মাছ এবং কচ্ছপে ইহাদের অরুচি নাই। ইহারা মৃদঙ্গ, করতাল প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র-সংযোগে হরিসংকীর্ত্তন করে। হাইজং বা হাজংদের মধ্যে পরমার্থী এবং ব্যভিচারী নামে দুইটি হিন্দুসম্প্রদায় বিদ্যমান। পরমার্থীরা বৈষ্ণব এবং ব্যভিচারীরা শাক্ত। মোরাণদের ন্যায় পরমার্থী সম্প্রদায়ও শূকরাদির মাংস খায় না এবং মদ্যপান করে না। ব্যভিচারীরা কিন্তু প্রতিবেশী গারোদের ন্যায় খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে যথেচ্ছাচার চালায়। হিন্দুদের সহিত মেলামেশার দরুণ হাইজংরা আজকাল বিধবাবিবাহের উপর বিরূপ হইয়া উঠিয়াছে।

খৃষ্টান মিশনরীদের প্রচারকার্য্য

'বড়'-গোষ্ঠীর মধ্যে হিন্দুপ্রভাবের এই সমস্ত বিবরণ পাঠ করিলে, হিন্দুমাত্রেরই মন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠা স্বাভাবিক। কিন্তু, তাই বলিয়া এ-কথাটা ভুলিলে চলিবে না যে, এ বিষয়ে হিন্দুজাতির কোনই কৃতিত্ব নাই। অসমীয়া হিন্দুগণ তাঁহাদের প্রতিবেশী এই সমস্ত আদিম জাতিকে মহাপুরুষীয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় দিবার জন্য অনুমাত্র চেষ্টাও ত আজ পর্য্যন্ত করেন নাই। চুটীয়া, মোরাণ, হাইজং প্রভৃতি নিজেরাই ত অগ্রণী হইয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম এবং হিন্দু রীতি-নীতি একটু আধটু গ্রহণ করিয়াছে। বড়দের যে-সমস্ত উপজাতিকে হিন্দুজাতির সংস্রব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে কিন্তু খৃষ্টধর্ম্ম দ্রুত প্রসার-লাভ করিয়াছে। প্রায় তেইশ বৎসর পূর্ব্বে ফুলার সাহেব গারোদের সম্বন্ধে নিম্নোক্ত কথাগুলি লেখেন—"Garo villages are pretty numerous that have entirely become Christian. The missionaries are influencing very greatly the future development of the race. (J. B. Fuller: Preface to '*The Garos*' by Playfair, p. XVI.)। ইতিমধ্যেই, সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হইতে আগত 'মিস্' মহাশয়েরা গোটা পার্বত্য গারো জাতিটাকেই অন্ধকার হইতে আলোকে

* *A History of Assam*, by E. A. Gait, p. 40.

আনিতে সক্ষম হইয়াছেন।* প্রভু যীশুর প্রতি কতটা আনি না কিন্তু 'মিশনারীদের প্রতি অনুরাগ যে তাহাদের দিন দিন বাড়িতেছে, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে তাহা বলিতে পারি। কিন্তু মিশনরীদের কার্যক্ষেত্র ত কেবল গারোদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই। পরলোকগত এণ্ডল প্রভৃতির চেষ্টায় বহু কাছাড়ী নরনারী, জাতীয় ধর্ম্ম এবং রীতিনীতির উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। অথচ অবস্থা এমনি অনুকূল ছিল যে, হিন্দুরা একটু মনোযোগী হইলে, মণিপুরীদের ন্যায় কাছাড়ী, মেচ প্রভৃতি জাতির অধিকাংশ নরনারীকে হিন্দুসমাজভুক্ত করিয়া ফেলা মোটেই কঠিন হইত না।†

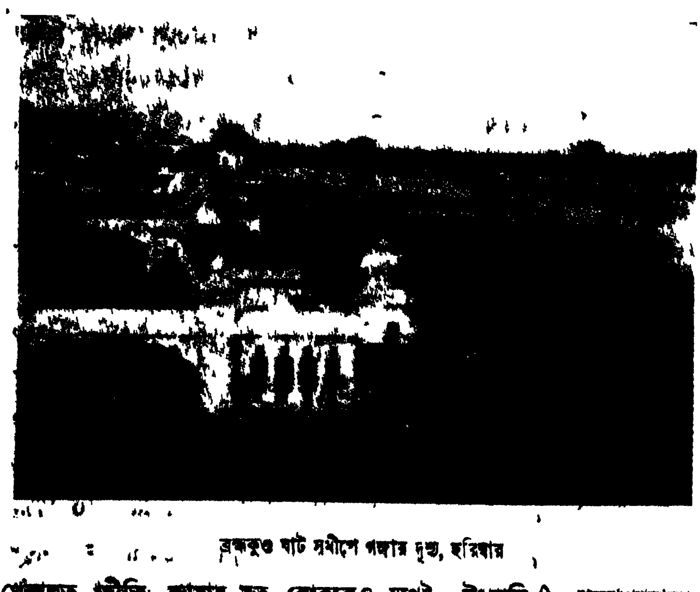
* সমতলের গারোরা অবশ্য হিন্দুদের দ্বারা বিশেষরূপেই প্রভাবিত হইয়াছে।

† এই প্রবন্ধ-রচনায় নিম্নলিখিত পুস্তকসমূহ হইতে অল্পবিস্তর সাহায্য পাইয়াছি।—(1) *The People of India*, by H Risley 2) *The Garos* by A Playfair (3) *The Sema Nagas* by J H. Hutton. (4) *The Kacharis* by the Rev S. Endle (5) *A History of Assam*, by E A Gait (6) *The Ao Nagas*, by J P Mills, I.C S (7) *The Lhota Nagas*, by J P Mills

কাপুর স্পেশালে কাশ্মীরের পথে

শ্রীহেমেন্দ্রমোহন রায়

বিচিত্রদর্শন কাশ্মীর প্রদেশ দেখার ইচ্ছা বহুকাল হইতেই হৃদয়ে পোষণ করিতেছিলাম, কিন্তু তাহা যে কখনও কার্য্যে পরিণত হইবে সে আশা বড় ছিল না। কারণ বাল্যাবধি ভ্রমণের নেশা বলবতী থাকিলেও এই সুদূর পথের ধোকলাত ভীতি আমার মত লোককেও যথেষ্ট উৎসাহিত করিতে পারে নাই। কিন্তু কাপুর কোম্পানীর 'পরিচালিত পর্য্যটন' (conducted toui) যখন বিজ্ঞাপিত হইল তখন আশার সঞ্চার হইল। কারণ উক্ত কোম্পানীর লোকেরা আমাকে এই বলিয়া প্রলুব্ধ করিলেন যে, তাঁহাদের তত্ত্বাবধানে গেলে আমাকে কোন ঝঞ্ঝাটই সহ্য করিতে হইবে না, পরন্তু খুব আরামেই যাইতে পারিব। তদনুযায়ী হঠাৎ যাওয়া মনস্থ করিয়া ফেলিলাম এবং বর্ত্তমান সনের ৭ই মে তারিখে রাত্রি সাড়ে আটটায় সস্ত্রীক তাঁহাদের স্পেশাল ট্রেনে রওনা হইয়া পড়িলাম।



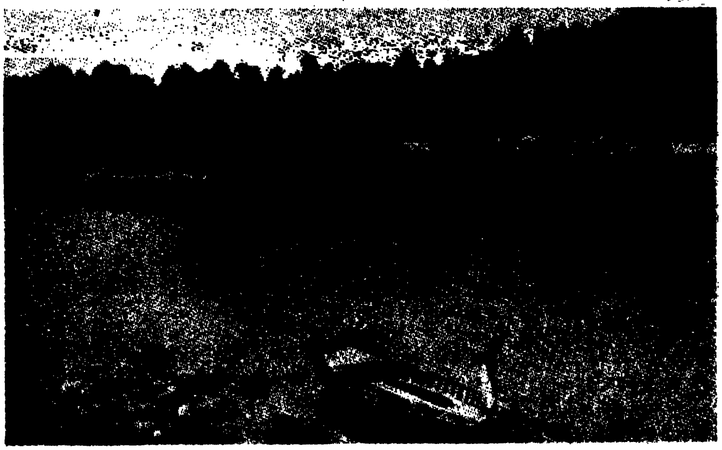
ব্রহ্মকুণ্ড ঘাট সমীপে গঙ্গার দৃশ্য, হরিদ্বার

পরদিন প্রভাতে বেনারসে ট্রেন পৌঁছিলে প্রায় সমস্ত দিনই তথায় অবস্থিতি হইল। কাশী বহুবার দর্শন হইয়াছে বলিয়া আর ট্রেন হইতে অবতরণের ইচ্ছা বড় ছিল না। তথাপি বাঙালীটোলা নিবাসী এক আত্মীয়ের সহিত দেখা করিয়া আসিলাম। অন্যান্য সহযাত্রীরা শহর পরিভ্রমণে গেলেন। প্রত্যাগমনান্তে নিজ নিজ গাড়ীতেই মধ্যাহ্নভোজন সমাধা হইল, কারণ আমাদের পরিচালকেরা যাত্রীদের আহার

সরবরাহের ব্যবস্থা তাঁহাদের নিজ নিজ কামরাতেই করিয়াছিলেন।

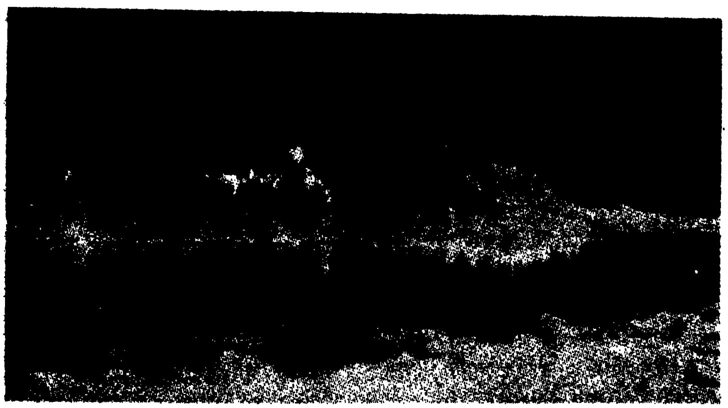
আমাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় আমরা স্বামী-স্ত্রী ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কন্যাসহ ৪ জন মাত্র ছিলাম। সুতরাং গৃহ-সুখের কোনও অভাবই গাড়ীতে অনুভব করিতে হয় নাই। এই ষ্টেশন হইতে একখানি 'রেষ্টরাঁ কার' ট্রেনে জুড়িয়া দেওয়া হইল এবং তাহা বরাবর সঙ্গে সঙ্গে চলিল। কাপুর কোং বাঙালীর উপযোগী নানাবিধ আহারের প্রচুর আয়োজন প্রায় সমস্ত পথই করিয়াছিলেন। রাত্রি ৮টায় লক্ষ্ণৌ ষ্টেশনে ট্রেন দুই ঘণ্টা কাল অবস্থিতি করিল। সান্ধ্য ভোজনের যেরূপ আয়োজন হইয়াছিল তাহার বিশদ পরিচয় দিতে গেলে প্রবন্ধের কলেবর অযথা দীর্ঘ হইয়া পড়িবে। অতএব আহারান্তে পাঠক আমাদের সহিত হরিদ্বার অভিমুখে প্রধাবিত হউন।

সমস্ত রাত্রি ছুটিয়া পরদিন অর্থাৎ ৯ই প্রত্যূষে যখন হরিদ্বারের সন্নিকটবর্ত্তী লকসর জংসন ষ্টেশনে গাড়ী পৌঁছিল, তখন এক অব্যক্ত আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলাম, কারণ হরিদ্বার ও হৃষীকেশ চিরদিনই আমাকে আকৃষ্ট করিয়া থাকে এবং বহুবার দেখিয়াও অতৃপ্ত রহিয়াছি। জানি না জন্মান্তরের কোনও আকর্ষণ এই স্থানের সহিত আমার আছে কিনা। নতুবা সুরধুনীর কল্লোলধ্বনিতে যে অজ্ঞাত সুর আছে তাহাতে আমার হৃদয়-তন্ত্রী এরূপভাবে সাড়া দেয় কেন। দেখিতে দেখিতে গাড়ী হরিদ্বারের পূর্ব্ববর্ত্তী ষ্টেশন 'জ্বালাপুর' (পাণ্ডাদের বাসস্থান) অতিক্রান্ত হইল এবং রেল লাইনের



স্বর্গাশ্রমের উপকূল হইতে পরপারস্থ মুনিকা রেতির একাংশ

পার্শ্বস্থিত 'ঋষিকুল' (ব্রহ্মচারী বিদ্যালয়) নামক বৃহৎ প্রতিষ্ঠানটির অট্টালিকাসমূহ দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল, এবং পরক্ষণেই বেলা প্রায় ৮॥টায় 'শিবালিক' শৈলরাজির পাদমূলস্থিত হরিদ্বার ষ্টেশনে পৌঁছিল। ইহার নৈসর্গিক অবস্থান এবং পতিতপাবনী ভাগীরথীর ব্রহ্মকুণ্ডস্থ ঘাটের নয়নমনহরা শোভা বোধ হয় অতুলনীয়। শহরটিও নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে এবং প্রশস্ত রাস্তা-ঘাট, কলের জল, বিজলীবাতি ইত্যাদি দ্বারা সুশোভিত। বাসোপযোগী ভাড়ার বাড়ি পাওয়া কঠিন বটে, তবে প্রাসাদোপম বহু ধর্ম্মশালা ইতস্ততঃ বিরাজ করিতেছে। তাহাতে সাত আট দিন পর্য্যন্ত যাত্রীদিগের অবস্থিতি করিতে দেওয়ার নিয়ম আছে। শহরটি ক্রমশঃ 'ভীমগোড়া'র দিকে প্রসারিত হইতেছে এবং অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর বাড়ি ঐ অঞ্চলে সম্প্রতি উঠিয়াছে। অনুমান হয় আর চার পাঁচ বৎসরকাল মধ্যে ইহা একটি বৃহৎ শহরে পরিণত হইবে। হরিদ্বার শহরের নিকট গঙ্গা দুইটি ধারায় বিভক্ত হইয়াছে,



লছমনঝোলার নিকটস্থ গঙ্গার দৃশ্য

তন্মধ্যে যে ধারাটি 'ব্রহ্মকুণ্ড', 'কুশাবর্ত্ত' প্রভৃতি ঘাট বিধৌত করিয়া প্রবাহিত, তাহাই শহরের অনতিদূরস্থ 'মায়াপুর' সান্নিধ্যে কৃত্রিম উপায়ে সংকীর্ণ পরিখায় নিয়ন্ত্রিত হইয়া গ্যাঞ্জেস কেনাল নামে অভিহিত হইয়া থাকে। অদূরবর্ত্তী



গঙ্গাতটস্থ পাষাণমণ্ডিত চত্বর, হরিদ্বার

অপর ধারাটি 'নীলধারা' নামে প্রসিদ্ধ এবং উহার তাণ্ডব গতি কনখলস্থ ল্যাণ্ডৌরার ঘাট ও দক্ষস্থান হইতে সুস্পষ্ট পরিদৃশ্যমান। যখন আমরা প্রাতরাশের পর হৃষীকেশ ও লছমনঝোলা গমনোদ্দেশে শহরে উপস্থিত হইলাম তখন



গঙ্গার পরপার হইতে শহর ও পশ্চাতে সূর্য্যকুণ্ডের পাহাড়

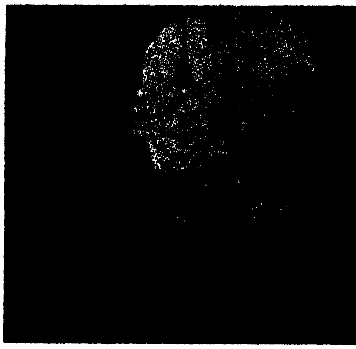
ট্যাক্সি ও মোটর-বাসের সংখ্যাধিক্যে বিস্ময় লাগিল। পঁচিশ মাইল দূরবর্ত্তী লছমনঝোলা পর্য্যন্ত যাইবার জন্য ট্যাক্সি ও বাস প্রভৃতি ঠিক হইয়া গেলেই আমরা সকলে রওনা হইয়া পড়িলাম। হৃষীকেশের রাস্তা বেশ ভাল তবে সকল নদী-নালার উপর সেতু নাই; কিন্তু পার্ব্বত্য প্রদেশে বর্ষা-ঋতু ব্যতীত শুষ্কপ্রায় নদীনালার উপর দিয়া মোটর-চলাচলের বিশেষ অসুবিধা হয় না, কেবল নদীগর্ভে অসংখ্য উপলখণ্ডের প্রাদুর্ভাব হেতু শরীরে অতিরিক্ত ঝাঁকুনি লাগে মাত্র। হৃষীকেশ অতি ক্ষুদ্র শহর হইলেও পরম রমণীয় স্থানে অবস্থিত বলিয়া চিত্তাকর্ষক। ইহার নীচে গঙ্গার কলনাদী জলস্রোত অপর পারস্থ হিমাচলের পাদদেশ ধৌত করিয়া চলিয়াছে। এখানেও বহু ধর্ম্মশালা বিদ্যমান, তন্মধ্যে কালীকম্বলীওয়ালার সুবৃহৎ ধর্ম্মশালা ও তদানুষঙ্গিক সাধুসেবার ব্যবস্থা এখানকার একটি দেখিবার জিনিষ। ভরতজীর মন্দির ও হৃষীকুণ্ড ছাড়া এখানে আর বড় কিছু দেখার নাই। আরও তিন মাইল অগ্রবর্ত্তী লছমনঝোলার অর্দ্ধ পথে গঙ্গাতটস্থ 'মুনিকা রেতি' ও পরপারস্থ 'স্বর্গাশ্রম' নামক সাধু-সন্ন্যাসীদের আশ্রমবহুল স্থানদ্বয় দেখিলে নয়নমন তৃপ্ত হয়। আমরা পদব্রজে এই



নীলধারার পরপারে গিরিশৃঙ্গে চণ্ডীদেবীর মন্দির

সকল স্থান এবং 'ঝুলা'-সেতু ও লছমনজীর মন্দির প্রভৃতি দেখিয়া পুনরায় নিজ নিজ মোটরে অধিষ্ঠিত হইয়া হরিদ্বার অভিমুখে গতিশীল হইলাম। উপরোক্ত 'মুনিকা রেতি' হইতে দশ মাইল মোটরবাহী উর্দ্ধগামী গিরিবর্ত্মটি অতিক্রম করিলেই টেহ্‌রীরাজের বর্ত্তমান রাজধানী হিমালয়ের ক্রোড়স্থিত নরেন্দ্র নগরে উপনীত হওয়া যায়। সেখানকার শুভ্র রাজপ্রাসাদটি সুদূর হরিদ্বার হইতেই চিত্রার্পিতের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হয়। এবার হরিদ্বারে অর্দ্ধকুম্ভযোগের পর বদরী-কেদার গমনোন্মুখী বহু নরনারীকে লছমনঝোলায় পথে দেখিলাম। তাহাদের জন্য স্থানে স্থানে অসংখ্য নূতন নূতন ভাণ্ডার নির্ম্মিত হইতেছে দেখা গেল। পূর্ব্ব হইতেই যে মেঘের সঞ্চার হইতেছিল তাহা হরিদ্বার প্রত্যাগত হওয়ার পূর্ব্বেই বারিধারায় পর্য্যবসিত হইল। ব্রহ্মকুণ্ডের ঘাটে

পৌঁছিয়া বর্ষণের মধ্যেই গলিত তুষারসদৃশ শীতলজলে অবগাহন ও তৎসংলগ্ন ৺গঙ্গাদেবীর মন্দির দর্শনান্তে বেলা প্রায় ২টায় পুনরায় ট্রেনে প্রত্যাগমনান্তে জঠরানলের তৃপ্তি-সাধন করা গেল এবং সমস্ত দিন অপেক্ষার পর রাত্রি ৮টায় আমরা অমৃতসর অভিমুখে পুনরায় যাত্রা আরম্ভ করিলাম। মধ্য-রাত্রে সাহারাণপুর ষ্টেশন অতিক্রম করিবার পর নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলাম, এবং গভীর রাত্রে পঞ্চনদের জলন্ধর প্রভৃতি শহর কখন যে ছাড়াইলাম তাহা আর জানিতে পারি নাই।



তোরণদ্বার হইতে লছমীনারায়ণ মন্দিরের দৃশ্য



লছমীনারায়ণের মন্দির, অমৃতসর

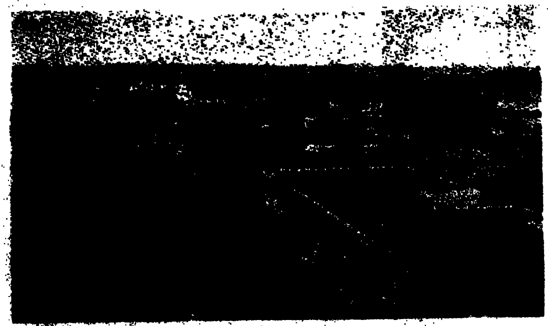
১০ই প্রভাতে বীরভূমি পঞ্চনদের ধর্ম্মমন্দির প্রসিদ্ধ অমৃতসরে যখন ট্রেন পৌঁছিল তখন যাবতীয় দৃশ্যের মধ্যেই যেন কিছু অভিনবত্ব আছে বলিয়া মনে হইল। প্রাত-রাশের পর কালবিলম্ব না করিয়া শহর ভ্রমণে বাহির হইয়া পড়িলাম। কলরবশূন্যতা এখানকার একটি লক্ষ্য করিবার বিষয়। শহরটি ঘন সন্নিবিষ্ট হর্ম্ম্যরাজিতে সুশোভিত। অপেক্ষাকৃত আধুনিক হইলেও বা বাণিজ্যে ইহাই পঞ্জাবের কেন্দ্রস্থল বলিয়া প্রতীয়মান হইল, কারণ কলিকাতার যাবতীয় প্রসিদ্ধ ব্যাঙ্কগুলির শাখা প্রতিষ্ঠান এখানে দেখিতে পাইলাম। 'দরবার-সাহেব' নামক জগদ্বিখ্যাত স্বর্ণমন্দিরটি চতুর্থ শিখগুরু রামদাস কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত ও পঞ্চম গুরু অর্জ্জুনদাস কর্ত্তৃক পরিসমাপ্ত এবং পরবর্ত্তী যুগে পঞ্জাবকেশরী মহারাজ রণজিৎ সিং কর্ত্তৃক স্বর্ণ-রঞ্জিত তাম্রফলকে মণ্ডিত হয়। ইহার বিশদ বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। তবে চতুর্দ্দিকে পাষাণমণ্ডিত 'অমৃত' সরসী-বক্ষে দেদীপ্যমান এই মর্ম্ম-মন্দিরের অবস্থানটি অপরূপ বটে। মন্দিরাভ্যন্তরের কারুকার্য্যও তদনুরূপ। পুষ্পসৌরভে আমোদিত গীতবাদ্য-সমন্বিত ধর্ম্মগ্রন্থের পূজার্চ্চনা বড়ই নয়ন-মন তৃপ্তিকর। রেলষ্টেশনের সন্নিকটে রণজিৎসিংহজী স্থাপিত 'রামবাগ' নামক বিটপীমণ্ডল ছায়াসুশীতল বিশাল উদ্যানটি এই শহরের একটি ভূষণ-বিশেষ। ইহার মধ্যে ঐ আমলের ইমারতাদিও বর্ত্তমান। শহরের উপকণ্ঠস্থ 'গোবিন্দ গড়' নামক দুর্গটি পঞ্জাবকেশরীর অন্যতম কীর্ত্তি। সম্প্রতি হিন্দু শ্রেষ্ঠী সম্প্রদায় কর্ত্তৃক শিখদিগের স্বর্ণ-মন্দিরের অনুরূপ এক দেবালয় প্রতিষ্ঠাকল্পে বহু অর্থব্যয়ে নির্ম্মিতপ্রায় লছমীনারায়ণের মন্দিরটিও এখানকার অন্যতম দর্শনীয় বস্তু সন্দেহ নাই। আর আছে কলঙ্ক-রাগে রঞ্জিত শহরের বক্ষঃস্থলে জালিয়ানওয়ালাবাগ নামক এক নাতিবৃহৎ কুঞ্জবন—যাহার নামে প্রত্যেক ভারতবাসীর হৃদয় বিষাদ ও ক্ষোভে আচ্ছন্ন হইয়া যায়। ইউরোপীয় পল্লীর শেষপ্রান্তস্থিত সুদৃশ্য খালসা কলেজটি এখানকার একটি বিরাট প্রতিষ্ঠান। কাঙড়া প্রদেশে যাইবার

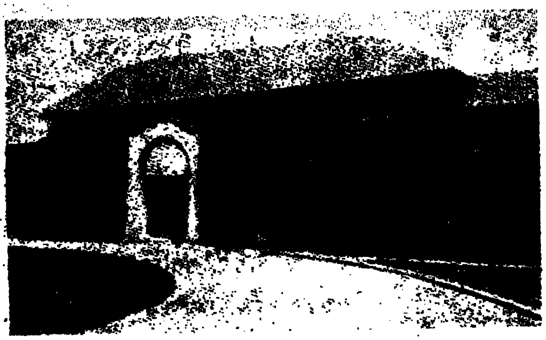


শিরকাপে গ্রীক মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ, তক্ষশিলা

শাখা রেল-লাইন এই অমৃতসর ষ্টেশন হইতে বিভক্ত হইয়াছে।

রাত্রি সাড়ে নয়টায় অমৃতসর ছাড়িয়া লাহোর পার হইতে না হইতে প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা কালব্যাপী ধূলার ঝড় উঠিয়া ট্রেনের কামরাগুলি ধূলিধূসরিত করিয়া দিল। পঞ্জাব অঞ্চলে ইহা 'আঁধি' নামে অভিহিত হইয়া থাকে এবং ইহার ফলে গরমের আতিশয্য সাময়িক লাঘব করিয়া দেয়, সুতরাং বেশ আরামেই নিদ্রা হইল। পরদিন প্রাতে ট্রেন 'গুজার খাঁ' ষ্টেশনে পৌছিলে দেখা গেল, আমাদের গাড়ীর একটি চাকার তৈলাধার (axle box) হইতে ধূম নির্গত হইতেছে এবং অনেক চেষ্টার পরেও যখন উহার আগুন নিবিল না তখন আমাদের 'বগি' গাড়ীর চারটি কামরাই খালি করিয়া উহা ট্রেন হইতে বিযুক্ত করা হইল এবং রাওলপিণ্ডি ষ্টেশন না পৌছা পর্য্যন্ত আমাদিগকে ট্রেনের অন্যান্য কামরায় সাময়িক ভাবে স্থানান্তরিত হইতে হইল। ইহাতে অনেক সময় অতিবাহিত হওয়ায় শেষোক্ত ষ্টেশনে আমরা নির্দ্দিষ্ট সময়ের দুই ঘণ্টা পরে অর্থাৎ বেলা নয়টায় পৌছিলাম।


সদরবাজার, রাওলপিণ্ডি


যাদুঘর, তক্ষশিলা

বর্ত্তমান রাওলপিণ্ডি অতি সুদৃশ্য আধুনিক শহর এবং উত্তর-ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ছাউনী অর্থাৎ সেনানিবাস। এখানকার প্রশস্ত রাস্তাঘাট এবং বাজার-হাট প্রভৃতি সকলই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তরুলতাসমাচ্ছন্ন একটি বৃহৎ কুঞ্জবন (park) এ শহরের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। প্রায় এক লক্ষ জনসংখ্যার মধ্যে অর্দ্ধেক ছাউনী-ভুক্ত। ইহা পঞ্চনদের মালভূমিস্থিত অতি স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া অনুমিত হইল। বেলা দুইটায় ট্রেন ছাড়িলে রেল-লাইনের উত্তর-পূর্ব্বদিকে কাশ্মীর অঞ্চলের তুষার-


বাজার, পেশাওয়ার


দুর্গ, জামরূদ

মণ্ডিত পর্ব্বতমালা দৃষ্টিপথে পড়িল। তখন কল্পনা-পথে কতকাল ধরিয়া যাহার স্বপ্ন দেখিয়া আসিতেছিলাম, তাহারই সান্নিধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি মনে করিয়া এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দে মন ভরিয়া গেল। ক্রমে বন্ধুর প্রদেশ দিয়া ট্রেন অতিক্রম করিতে করিতে এক গণ্ডশৈলমালার গর্ভে প্রবিষ্ট হইল এবং পরক্ষণেই টনেল হইতে বহির্গত হইয়া বেলা প্রায় তিনটায় খণ্ডশৈলসমাচ্ছন্ন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ তক্ষশিলা নামক স্থানে পৌঁছিল।

ইদানীং তক্ষশিলা নগণ্য স্থানে পরিণত হইলেও প্রত্নতত্ত্বের দিক হইতে বিশেষ সমৃদ্ধিশালী সন্দেহ নাই। কারণ প্রাচীন বৌদ্ধযুগে ইহা পঞ্চনদ প্রদেশের একটি রাজধানীরূপে বিরাজমান ছিল এবং কুশান-বংশের বহুমূল্যবান পুরাকীর্ত্তি-সকল অধুনা ভূগর্ভ হইতে আবিষ্কৃত হইয়া স্থানীয় 'যাদুঘরে' সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। এই যাদুঘর তক্ষশিলা ষ্টেশন হইতে মাত্র আধ মাইল দূরে অবস্থিত। উক্ত বংশের প্রখ্যাত রাজা কণিষ্কের প্রতিষ্ঠিত এবং চৈনিক



জাউলিয়াঁ শৈলশিরে বৌদ্ধযুগের ধ্বংসাবশেষ

পরিব্রাজক বর্ণিত বৌদ্ধবিহারেরও ধ্বংসাবশেষ খননকার্য্যের দ্বারা মৃত্তিকাগর্ভে প্রকট হইয়াছে ও হইতেছে। ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত পুরাকালীন তাম্রমুদ্রা ইত্যাদি এখনও এ অঞ্চলে কৃষকসন্তানেরা আহরণ করিয়া থাকে। তক্ষশিলা অধুনা 'সাহজিকা ধেড়ী' নামে নগণ্য গ্রামে পরিণত হইয়াছে বটে, কিন্তু একদা ইহার খ্যাতি-প্রতিপত্তি অপরাজেয় গ্রীক্ বীর অলিকসন্দরও অনুভব করিয়াছিলেন। ইহার পুরাকীর্ত্তি-



শিরকাপে কুণাল স্তূপ, তক্ষশিলা

সকল যে-যে স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার কোনটাই ষ্টেশন হইতে বেশী দূর নয়। 'শিরকাপ' মোরামরাডু ও জউলিয়াঁ নামধেয় তিনটি স্থানের শেষোক্তটি ছয় মাইল দূরবর্ত্তী এক শৈলশিরে অবস্থিত; এখানে বহু প্রস্তরমূর্ত্তি অখণ্ড অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে এবং তাহা এক্ষণে উপরিউক্ত যাদুঘরে স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছে। পরবর্ত্তী যুগে অর্থাৎ বাদশাহী আমলে এই সকল শিলামূর্ত্তি বিনাশের কবল হইতে যে কিরূপে রক্ষা পাইল তাহা এক সমস্যার কথা।

রাত্রি বারটার পর তক্ষশিলা ছাড়িয়া প্রভাতে উপজাতি-অধ্যুষিত প্রদেশান্তর্গত জামরুদ নামক ষ্টেশনে গাড়ী পৌঁছিলে অতিসন্নিকটেই ব্রিটিশদের ধূসরবর্ণ দুর্গটি দৃষ্টিগোচর হইল। প্রত্যূষেই পেশওয়ার ও ইস্‌লামিয়া কলেজ নামে দুইটি ষ্টেশন ছাড়াইয়া আসিয়াছি। এবার আমরা খাইবার গিরিসঙ্কট দিয়া ব্রিটিশ ও আফগান-রাজ্যের সীমানা লাণ্ডিখানা অভিমুখে চলিলাম।

জামরুদ ষ্টেশন হইতে লাণ্ডিখানা পর্য্যন্ত রেলপথটির ১৯২৫ সালে তদানীন্তন বড়লাট লর্ড রেডিং কর্তৃক সমারোহের সহিত উদ্বোধনকার্য্য সম্পন্ন করা হয়। জামরুদের পরেই পর্ব্বতারোহণ আরম্ভ এবং সমুদ্রগর্ভ হইতে



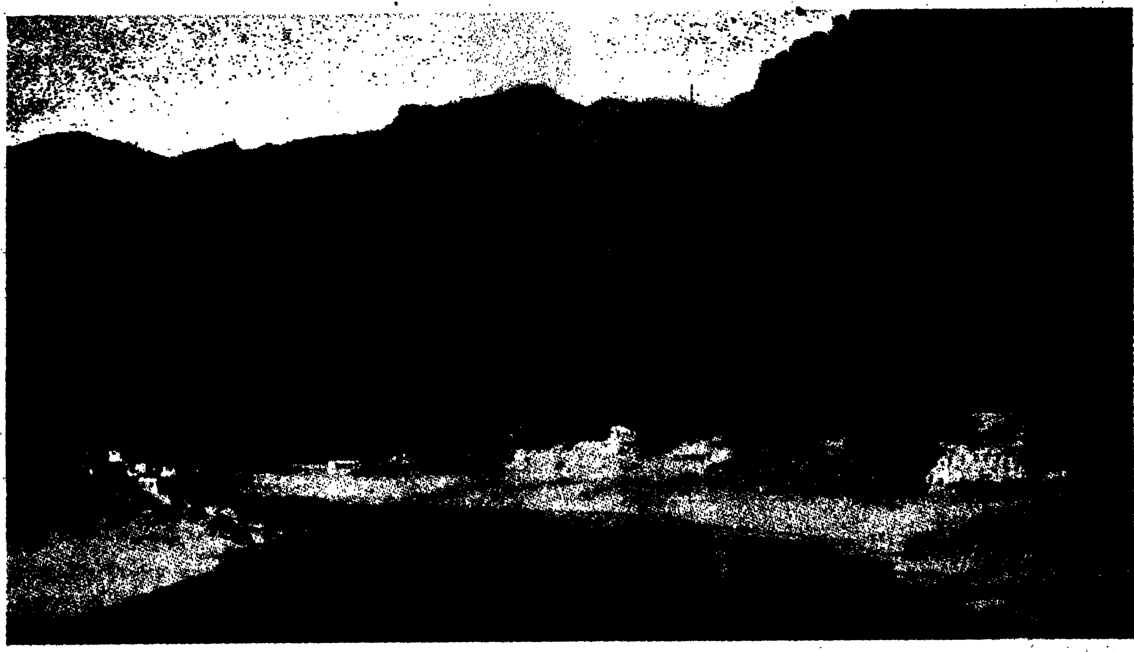
জগদ্বিখ্যাত স্বর্ণমন্দির, অমৃতসর

সাড়ে তিন হাজার ফিট উচ্চে অবস্থিত লাণ্ডিকোটাল নামক ব্রিটিশ সেনানিবাসে শেষ, তৎপর লাণ্ডিখানা পর্য্যন্ত অবরোহণ। এই সাড়ে তিন হাজার ফিট পর্য্যন্ত জামরুদ হইতে কুড়ি মাইল পথ আমাদের ট্রেনটি ঘুরিয়া ফিরিয়া চড়িতে লাগিল। যাঁহারা দার্জ্জিলিং গিয়াছেন তাঁহাদের নিকট পার্ব্বতীয় রেলপথের বিশেষ পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। তবে বড় লাইনের (broad gauge) রেল যে অঞ্চলে এত উপরে উঠিতে পারে সে ধারণা বোধ হয় তাঁহাদেরও নাই। এ অঞ্চলের ভীমদর্শন পাহাড়গুলি গাছ-পালাশূন্য। এই পর্ব্বতমালার বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়া একটি নির্ঝরিণী প্রবাহিতা, তাহারই ঊর্দ্ধে পর্ব্বতগাত্র কাটিয়া মোটর ও রেলপথ স্থাপিত হইয়াছে। রেলপথটি আধুনিক হইলেও এই গিরি-বর্ত্মের অস্তিত্ব বহু যুগ হইতেই আছে এবং এই পথেই আবহমান কাল হইতে ভারতবর্ষের উপর প্রবল পরাক্রান্ত জাতিদের রণাভিযান হইয়া গিয়াছে। এ অঞ্চলটা আফ্রিদি নামক এক জাতীয় দুর্দ্ধর্ষ ও নির্ভীক পাঠানদের আবাসভূমি। পূর্ব্বে ইহারা প্রধানতঃ লুটতরাজের উপরেই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। কিন্তু এখন ইংরেজদের সহিত বাধ্যবাধকতাসূত্রে আবদ্ধ হওয়ায় ইংরেজ সরকারের অধীনে বীরোচিত সৈনিকের কাজে অনেকেই জীবিকার্জ্জন করিয়া থাকে। কিন্তু তাই বলিয়া জাতিহিসাবে কাহারও পরাধীনতা স্বীকার করে না। গৃহ সম্পত্তির মধ্যে মৃৎপ্রস্তরের কুটীর ও গরু, ছাগল, ঘোড়া, উট ও বন্দুক। শেষোক্তটি উহাদের জীবনসঙ্গীস্বরূপ এবং প্রত্যেক গৃহস্থই উহা সংগ্রহের জন্য প্রাণপণ চেষ্টার ত্রুটি করিবে না। চাষ-আবাদের মধ্যে পাহাড়ের ছোট ছোট উপত্যকার গোধূম ব্যতীত অন্য কিছু বড়-একটা দেখা যায় না। আমাদের ট্রেন খাইবারের মুখে চেজাই ষ্টেশনে উপস্থিত হওয়া মাত্র প্রত্যেক গাড়ীতে এক এক জন সশস্ত্র সৈনিক আমাদের রক্ষণাবেক্ষণকল্পে অধিষ্ঠিত হইল এবং রেল লাইনের ধারে ধারে পাহারার জন্য ঐরূপ সৈনিককে মধ্যে মধ্যে দণ্ডায়মানও দেখিলাম। পর্ব্বত-গাত্রে মধ্যে মধ্যে ছোটবড় বহু কোটর দেখা গেল তাহাতে



খাইবার সঙ্কটের আফগান সীমান্তস্থিত 'লাণ্ডিখানা' নামক ব্রিটিশ ছাউনীর অস্পষ্ট দৃশ্য

বন্দুকহস্তে পাঠানগণ বিশ্রাম করিতেছে। শীতাতপ ও বারিপাত হইতে আত্মরক্ষা করতঃ অন্যের দৃষ্টির অগোচরে তাহারা এই গিরিসঙ্কট রক্ষা করিয়া থাকে এবং ইহারা



শৈলপাদমূলে স্বর্গাশ্রমের শেষভাগে 'লছমনঝোলা' সেতু অদূরে পরিদৃশ্যমান

মধ্যে গৃহপালিত পশুরাও আশ্রয় পাইয়া থাকে। ইহাদের গ্রামগুলি ক্ষুদ্র এবং মৃৎপ্রস্তরে গ্রথিত গৃহগুলি বুরুজ (turret) বিশিষ্ট ক্রীড়নক-দুর্গবিশেষ। তাহাতে দরজা-জানালার পরিবর্তে বন্দুকের গুলি চালাইবার সুবিধার্থে ছিদ্র রাখা আছে মাত্র। এই গিরিবর্ত্মে ভারবাহী উষ্ট্র ও অশ্বতরের সারি আফগান ও ব্রিটিশ রাজ্যাভিমুখে গমনাগমন করিতে দেখা গেল। রেলপথে এই গিরিমালা অতিক্রম করিয়া উভয় রাজ্যের প্রান্তসীমা লাণ্ডিখানা পর্য্যন্ত পৌঁছিতে চৌত্রিশটা সুরঙ্গ অতিক্রম করিতে হয়। আলি মসজিদ নামক স্থানের রেল ষ্টেশনটির নাম সাহ্গাই এবং জামরুদের পর এখানেই ইংরেজদের খাইবার সঙ্কটস্থিত প্রথম ছাউনী বা সেনানিবাস। ক্রমে নানারূপ অভিনব দৃশ্যের মধ্য দিয়া বেলা প্রায় সাড়ে সাতটায় লাণ্ডিকোটাল নামক বৃহৎ ছাউনী ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। ইহার পর লাণ্ডিখানা পর্য্যন্ত ছয় মাইল রেলপথটি ইদানীং সাধারণের গতিবিধির জন্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং এখানেই ট্রেনের গতিরোধ হইলে আমরা সকলে নামিয়া পড়িলাম এবং পদব্রজে সিকি মাইল দূরবর্ত্তী পর্ব্বত-সানুদেশস্থ ব্রিটিশ ছাউনী ও দুর্গ দেখিতে চলিলাম। স্থানীয় তহশীলদার সাহেব দুর্গমধ্যেই কাছারী করিয়া থাকেন। পর্য্যটকদল দুর্গের সিংহদ্বারে দণ্ডায়মান দেখিয়া তিনি ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দিলেন এবং তাঁহার কাছারীতে অপেক্ষা করিতে বলিয়া আমাদের আশপাশ বেড়াইয়া দেখার জন্য স্থানীয় ঠিকাদারদের তিনখানা মোটর-বাস সংগ্রহ করিয়া দিলেন। এই পাঠানবীরের আকৃতি-প্রকৃতি দেখিয়া প্রথমে তাঁহাকে ইংরেজ সৈনিক বলিয়া আমাদের ভ্রম হইয়াছিল। আমরা আরও তিন মাইল অগ্রসর হইয়া পথিপার্শ্বস্থ এক শৈলচূড়াস্থিত ফাঁড়ি বা আউটপোষ্ট হইতে লাণ্ডিখানার ব্রিটিশ ছাউনী ও তন্নিকটবর্ত্তী অপর এক শৈলশিখরস্থ আফগান সীমান্তের ফাঁড়ি স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। কাবুল নদ ও হিন্দুকুশ পর্ব্বতের গগনচুম্বী শৃঙ্গরাজি এই স্থান হইতে দৃষ্টিগোচর হইল। লাণ্ডিখানা পর্য্যন্ত যাইবার সময়াভাবে অবিলম্বে ষ্টেশনে প্রত্যাগত হইতে বাধ্য হইলাম। এই সকল অভিনব দৃশ্য আমাদের মহিলা সঙ্গীদের বিশেষ কৌতুকপ্রদ হইয়াছিল, কারণ ইতঃপূর্ব্বে বাঙালী ভদ্রমহিলারা বোধ হয় এই গিরিসঙ্কটের শেষ সীমায় পদার্পণ

করেন নাই। সপরিবার এতগুলি বাঙালী ভদ্রলোকের হঠাৎ আবির্ভাব এ অঞ্চলের লোকের কৌতুহলোদ্দীপক



খাইবার সঙ্কটের একটি সাধারণ দৃশ্য

হইয়াছিল সন্দেহ নাই, কারণ রেলষ্টেশনে আমাদিগের চতুর্দ্দিকে আফ্রিদি ও শিনওয়ারী সম্প্রদায়ের ভিড় জমিয়া গেল। তখন আমাদের পূর্ব্বোক্ত শরীররক্ষীদল উহাদিগকে ষ্টেশন হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিল, কারণ এতগুলি পাঠান-জাতীয় লোকের সান্নিধ্য নিরাপদ নহে। বেলা প্রায় সাড়ে নয়টায় আমাদের ট্রেনখানি পুনরায় জামরুদ অভিমুখে চলিল। আরোহণ ও অবরোহণ কালের শীতাতপের পার্থক্য বেশ অনুভূত হইতে লাগিল। দ্বিপ্রহরে যখন পেশাওয়ারে আমরা পৌঁছিলাম, তখন মেঘের সঞ্চার সত্বেও গরমে রীতিমত কষ্ট বোধ হইল। বৈকালে গ্রীষ্মের প্রকোপ লাঘব হইলে শহর দেখিতে বহির্গত হইলাম।

পেশাওয়ার বা 'পুরুষপুর' বৌদ্ধযুগে প্রচুর খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। ইহা পুরাকালে কণিষ্ক রাজের রাজধানী ছিল। মুসলমানী আমলের পর ইহা রণজিৎ সিংহের অধিকারভুক্ত হয়। বর্ত্তমানে ইহা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের রাজধানী ও সেনানিবাস হিসাবে বিখ্যাত। শহরটি বেশ বড়, জনসংখ্যা প্রায় সওয়া এক লক্ষ। ঘন সন্নিবিষ্ট অধিকাংশ বাড়ির উপরতলাগুলি কাষ্ঠ ও মৃত্তিকা সংযোগে নির্ম্মিত বলিয়া ইতঃপূর্ব্বে দু-এক বার অগ্নিকাণ্ডে প্রায় অর্দ্ধেক শহর পুড়িয়া ছারখার হইয়া যায়। গ্রীষ্মের আতপতাপ হইতে রক্ষার্থই গৃহনির্ম্মাণের প্রণালী বোধ হয় এখানে এইরূপ প্রচলিত আছে। হাটবাজারে নানা শ্রেণীর পাঠানজাতীয় লোকের সমাগম ও নানা প্রকার মেওয়া ফলের প্রাচুর্ভাব স্বতঃই বিদেশীয় লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সাহেবপাড়ার রাস্তাঘাট ও বাড়িঘর দেখিতে ছবির ন্যায় চমৎকার। কাবুল নদ হইতে আনীত নহর (canal) ও 'বালাহিসার' নামক প্রকাণ্ড দুর্গটি নগরপ্রান্তের শোভা বর্দ্ধন করিয়েছে। নহর ও 'বারা' নদীর সান্নিধ্যে অবস্থিত বলিয়া এ শহরে জলাভাব কখনও হয় না। স্থানীয় যাদুঘরে গান্ধারীয় ভাস্কর্য্য শিল্পের রত্নসম্ভার দেখিতে পাওয়া যায়। রাত্রি ১১টায় ট্রেন



খাইবার গিরিসঙ্কটের প্রবেশপথ

ছাড়িয়া গভীর রাত্রে সিন্ধুতটস্থ আটক শহর ও আকবরী দুর্গ অতিক্রম করিতে দেখা গেল। রাত্রিশেষে পুনরায় রাওলপিণ্ডিতে পৌঁছিলে সকলেই কাশ্মীর-যাত্রার উদ্যোগ-আয়োজনে ব্যাপৃত হইয়া পড়িলাম।

পুস্তক পরিচয়

বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, তৃতীয় খণ্ড, তৃতীয় সংখ্যা—শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য সঙ্কলিত। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, কাব্যতীর্থ, এম-এ মহাশয়-লিখিত ভূমিকা সমেত। কলিকাতা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ মন্দির হইতে শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। আট পেজী ।৵+১৭৮ পৃষ্ঠা, মূল্য ॥৵০ আনা।

ইহাতে পরিষদের পুথিশালার সংরক্ষিত হস্তলিখিত পুথির মধ্যে মাত্র দুই শতের বিবরণ আছে। বিবরণ সুলিখিত, ভূমিকা উপাদেয়। যাঁহারা প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনা করেন, তাঁহাদের নিকট নির্ঘণ্টটির মূল্য যথেষ্ট।

প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের স্বরূপ আজও আমাদের অপরিচিত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যে যৎসামান্য খোঁজখবর হইয়াছে তাহাতেই লোকের পূর্ব্ব সংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত করিতে বসিয়াছে। সাহিত্যের ভাণ্ডাগারে কি ছিল বা আছে, অনেকেরই জানা নাই অথবা অল্পই জানা আছে। দেশের নানা স্থানে যে-সকল পুথি-পত্র ছড়াইয়া রহিয়াছে তাহার কথা ছাড়িয়া দিলেও প্রতিষ্ঠানগুলিতে সঞ্চিত পুথিরাশির ভিতরে কি আছে, বিবরণের অভাবে তাহাও জানিবার উপায় নাই। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষীদের মতে দেশীয় ভাষার, বিশেষতঃ প্রাচীন সাহিত্যের যথাযথ অনুশীলন ব্যতীত প্রকৃত জাতীয় অভ্যুদয়ের আশা সুদূরপরাহত। পরিষদের অকৃত্রিম বন্ধুগণ সমীপে সানুনয় প্রার্থনা, সত্বর পুথির বিবরণ প্রকাশের একটা সুব্যবস্থা করিয়া সমগ্র বঙ্গবাসীর আন্তরিক কৃতজ্ঞতাভাজন হউন।

শ্রী [illegible] রায়

শাস্ত্রীয় ব্রহ্মবাদ ও ব্রহ্মসাধনা—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ। ২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্ম মিশন যন্ত্র হইতে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বাগ দ্বারা প্রকাশিত। মূল্য ১৲ টাকা, কাপড়ে বাঁধান ১।০ মাত্র।

এই গ্রন্থে পরিশিষ্ট বাদে ২০টি অধ্যায় আছে। এই ২০টি অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলির নামমাত্র পাঠ করিলেই গ্রন্থের উপাদেয়তা হৃদয়ঙ্গম হয়। অধ্যায়গুলি এই :—১ম অধ্যায়ে শাস্ত্র, ২য় অধ্যায়ে ব্রহ্মবাদ ও ব্রহ্মসাধন, ৩য় হইতে ৫ম অধ্যায়ে ঈশাদি ১২ খানি উপনিষদের ঋষি পরিচয় আর ৬ষ্ঠাদি ২০শ অধ্যায়ে যথাক্রমে আত্মা ও অনাত্মা, সসীম ও অসীম, নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, প্রেমতত্ত্ব, শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ সাধনের স্তরভেদ, বিশুদ্ধ ও সাংখ্যমিশ্রিত বেদান্ত, অবতারবাদ কর্ম্মযোগ, ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ, পরমত খণ্ডন, জীবাত্মার অমরত্ব, জীবের চরম অবস্থা—এই বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বস্তুতঃ দার্শনিক চিন্তার এই বিষয়গুলি আত্মস্বরূপ। তত্ত্বভূষণ মহাশয় এই বিষয়গুলি নির্ব্বাচন করিয়া দার্শনিক রাজ্যের পরম সার কথারই আলোচনা করিয়াছেন। ইহা যে প্রবীণ বয়সে অতি প্রবীণ চিন্তার নিদর্শন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

যাহা হউক, তত্ত্বভূষণ মহাশয় যত গ্রন্থ লিখিয়াছেন, আমাদের বোধ হয়, সর্ব্বাপেক্ষা এই গ্রন্থে তিনি শাস্ত্রীয় ব্রহ্মবাদ সম্বন্ধে তাঁহার নিজ মত অতি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র ও গীতা প্রভৃতি বেদান্তের প্রস্থানত্রয়ের গ্রন্থরাজি পড়িয়া বেদের অভ্রান্ততায় অবিশ্বাসী ব্রাহ্ম সমাজের একজন প্রতিনিধিস্থানীয় জ্ঞানবৃদ্ধ, বয়োবৃদ্ধ পাশ্চাত্য দর্শননিষ্ণাত মনীষীর হৃদয়ে যেরূপ প্রতিভাত হয়, এবং এতাদৃশ মনীষী এরূপ ক্ষেত্রে স্ব-পর মত সামঞ্জস্য করিয়া যেরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হন, এ গ্রন্থ তাহারই সুস্পষ্ট প্রকাশ। তিনি অতি সরস ভাষায় অতি প্রয়োজনীয় এবং অতি সূক্ষ্ম দার্শনিক কথাগুলি আলোচনা করিয়া যেভাবে স্বমত ব্যক্ত ও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহা মনে হয়, চিন্তাশীল লেখক মাত্রেরই অল্পাধিক অনুকরণীয়। যাঁহারা হৃদয়ে ব্রাহ্মভাব পোষণ করিয়া, অন্য কথায় বর্ত্তমান ক্রমোন্নতিবাদ অবলম্বন করিয়া সুতরাং বেদের অভ্রান্ততা অস্বীকার করিয়া বৈদিক শাস্ত্র আলোচনা করেন, তাঁহাদের পক্ষে গ্রন্থখানি যারপরনাই উপযোগী হইয়াছে, তাঁহাদের চিন্তাধারার পক্ষে ইহা একটি পরম সহায় হইয়াছে। ইহাতে ভাবিবার বুঝিবার ও অনুসন্ধান করিবার অনেক বিষয় সূচিত হইয়াছে সন্দেহ নাই।

ভাষা ও ভাবের গম্ভীরতা, সরলতা ও স্পষ্টতা, মনে হয় যেন অতুলনীয়। পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন সুধীগণ এতদ্দ্বারা নূতন আলোক লাভ করিয়া যে বিশেষ উপকৃত হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তবে বেদের অভ্রান্ততায় বিশ্বাসী, ঋষিদিগের ঐকমত্যে শ্রদ্ধাবান্, শঙ্কর রামানুজ প্রভৃতি আচার্য্যগণের সিদ্ধভাবে আস্থাবান্ হিন্দুর পক্ষে এই গ্রন্থ ঠিক তদ্ বিপরীত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে যাঁহারা শাস্ত্রে প্রবিষ্ট নহেন, তাদৃশ হিন্দুর বেদের অভ্রান্ততায় বিশ্বাস, শাস্ত্রে শ্রদ্ধা ঋষিদিগের সর্ব্বজ্ঞতা প্রভৃতি বিষয়ে বুদ্ধি বিচলিত হইবে। এ বিষয়ে তত্ত্বভূষণ মহাশয় যে কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহা একপ্রকার নিশ্চিত। অবশ্য যাঁহারা শাস্ত্রে প্রবিষ্ট, ন্যায় ও মীমাংসা শাস্ত্র গুরুর নিকট পড়িয়াছেন, তাদৃশ হিন্দুর পক্ষে ইহাতে নিরসনীয় পাশ্চাত্য ভাবধারার এবং অনুপাদেয় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিশ্রিত চিন্তাপ্রণালীর অতি সুন্দর পরিচয় লাভ হইবে। সুতরাং তাঁহারাও এই গ্রন্থ পড়িয়া তাঁহাদের কর্ত্তব্য ও বক্তব্য স্থির করিবার উত্তম সুযোগ লাভ করিবেন। ফলতঃ গ্রন্থখানি ক্ষুদ্র কলেবর হইলেও গ্রন্থ মতের অনুকূল ও প্রতিকূল সকল মতাবলম্বীর পক্ষে ইহা আদরণীয় বা দর্শনীয় হইয়াছে—ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। তত্ত্বভূষণ মহাশয় এতাদৃশ গ্রন্থ আরও লিখিয়া চিন্তাশীলগণের চিন্তাশীলতা বর্দ্ধিত করুন এবং বৈদিক হিন্দু সমাজের স্বমত স্থাপন ও পরমত খণ্ডনপটুতা জাগরিত রাখুন।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ

জাতিস্মর—শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। পি, সি. সরকার এণ্ড কোং, ২ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দেড় টাকা। ১৩৩৯।

তিনটি গল্পের সংগ্রহ। প্রাগৈতিহাসিক যুগ, বৌদ্ধ যুগ ও চন্দ্রগুপ্তের কথা লইয়া লেখক তিনটি উপাখ্যান রচনা করিয়াছেন, জাতিস্মর হওয়ার ব্যাপারটি সকলের মূলে রহিয়াছে, উহাই যেন যোগসূত্র। লেখকের রচনাভঙ্গী সুন্দর, গল্প বলিবার কৌশল তাঁহার আছে, ঐতিহাসিক আবহাওয়াও তিনি সৃষ্টি করিতে পারেন ; ক্রূর মনুষ্যচরিত্র আঁকিতে তাঁহার হাত কাঁপে না। চন্দ্রায়ুধ ঈষানবর্ম্মা ও সোমদত্তা যাঁহার সৃষ্টি, তিনি যে শক্তিমান্ লেখক, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। শরদিন্দু বাবু ইতিহাসের কঙ্কালে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছেন।

শেকোয়া—আশ্‌রাফ আলী খান। এম্পায়ার বুক হাউস, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। কার্ত্তিক, ১৩৪০। দাম এক টাকা।

মহাকবি ইকবালের কাব্যের বঙ্গানুবাদ। ইকবালের প্রতিভা আজ ভারতবাসীর গৌরবের বস্তু, কবির তেজস্বী ভাব ও প্রচুর শব্দসম্পদ তাঁহাকে কবিসমাজে সম্মানের আসন দিয়াছে। অনুবাদক এই কবিতাগুলি বাঙ্গালী পাঠককে পড়িবার সুযোগ দিয়াছেন,—তাঁহার ভাষাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে মধুস্বরে এবং ছন্দ প্রাণবন্ত, কবির চিত্র অস্পষ্ট হইলেও কবি-জীবনী, কবি-প্রশস্তি এবং সাজসজ্জা চমৎকার। কিন্তু এই 'শেকোয়া' বা ভগবানের নিকট জাতীয় অবনতির জন্য মুসলমানের অভিযোগ কাব্যে, হিন্দুর প্রতি যে কটাক্ষপাত করা হইয়াছে তাহা নিতান্তই অশোভন, তাহা বাদ দিয়া অনুবাদ করিলেই ভাল হইত। পাথর-নুড়ি বা জানোয়ার পূজার কথায় কাফরী ও হিংস্র জাতির সঙ্গে একই পঙক্তিতে ভারতের হিন্দু সমাজের নাম উল্লেখে, 'বোত্‌-খানার' নিন্দায় হিন্দু-বিদ্বেষ অতি স্পষ্ট; ইহা এই কাব্যের কলঙ্ক।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

সরল পোল্‌ট্রী পালন—শ্রীঅমরনাথ রায় প্রণীত। ২৫২ পৃঃ মূল্য ১৲ টাকা। দি ঘোষ নার্সারী কর্ত্তৃক ২৫ নং রামধন মিত্রের লেন হইতে প্রকাশিত।

পোল্‌ট্রী বলিতে হাঁস, মুরগী, গিণিফাউল প্রভৃতিকে একত্রে বুঝায়। বাংলা ভাষায় মুরগীর চাষ সংক্রান্ত দুই একখানি পুস্তক দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু পোল্‌ট্রী সম্বন্ধে ব্যাপকভাবে বড়-একটা পুস্তক দেখিতে পাওয়া যায় না। লেখক হাঁস, রাজহাঁস, মুরগী, গিনিফাউল, পেরু, পারাবত সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন; ইহাদের রোগের বিবরণ ও তাহার প্রতীকার সরল সহজ ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। পরিশিষ্টে ছাগ-পালন সম্বন্ধে একটি অধ্যায় সংযোজিত করিয়া লেখক গ্রন্থের কার্য্যকারিতা বৃদ্ধি করিয়াছেন। আশা করা যায়, বর্ত্তমান অন্ন-সমস্যার দিনে মধ্যবিত্ত ভদ্র-সন্তানগণ যাঁহারা পোল্‌ট্রী স্থাপনে পরাঙ্মুখ নহেন, তাঁহারা এই পুস্তক হইতে অনেক practical suggestions পাইবেন।

শ্রীগোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

নূতন যুগের নূতন মানুষ—শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। ইউ. এন. ধর এণ্ড কোং, ৫৮ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট ও ২ কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা, মূল্য এক টাকা। পৃ. ১১৯।

বইখানিতে লেনিন, মুসোলিনী, ডি-ভ্যালেরা, কামালপাশা, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও মহাত্মা গান্ধীর জীবনী গল্পচ্ছলে বলা হইয়াছে। এই সকল মহাপুরুষদের সম্বন্ধে বালকদের চিত্তে যাহাতে ঔৎসুক্য জাগে তাহারই জন্য বইখানি লেখা হইয়াছে, এবং সেদিক দিয়া মনে হয় ইহা ভালই হইয়াছে।

শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু

শরীর গঠন—মাষ্টার প্রফুল্ল সেনগুপ্ত প্রণীত। সিটি পাব্লিশিং হাউস, শিলচর (এ, বি, আর)। মূল্য এক টাকা।

পালোয়ানের মধ্যে শরীর-রক্ষা সম্বন্ধে যে-জাতীয় উপদেশ প্রচলিত আছে, ইহা তাহারই বই। ভয় হয় পাছে শিক্ষার্থীর মনে কতকগুলি কুসংস্কার প্রবেশ না করে। তাহারা যে কিছুমাত্র বৈজ্ঞানিক জ্ঞান লাভ করিতে পারিবে না এ-কথা নিশ্চিত।

লেখক দুই প্রকার ডন ও দুই প্রকার বৈঠকের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত। সেগুলির বর্ণনা আছে। বইটির মধ্যে সেইটুকু এবং ছবিগুলিকে রাখিয়া বাকি অংশ অনায়াসে বাদ দেওয়া চলে।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ

শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা—মূল, অন্বয় ও বাংলা ব্যাখ্যাসমেত। সিদ্ধেশ্বরী লাইব্রেরী, ১০৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ২৲ টাকা।

অন্বয় ও ব্যাখ্যা ভালই হইয়াছে। ছাপা ও কাগজও মন্দ নহে।

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

কুড়ান মুক্তা—মৌলবী একাজুদ্দিন আহ্‌মাদ্ প্রণীত। প্রকাশক এ. কে. মুহঃ ওবায়েদুল্লাহ্, জগৎপুর, জেলা ত্রিপুরা, পৃ. ১০৩; মূল্য ৸৹।

এই পুস্তকে প্রসিদ্ধ আরবী ও পারসীতে রচিত নানা গ্রন্থ হইতে "কুড়াইয়া একশত নৈতিক আমোদপূর্ণ গল্পের সরল বঙ্গানুবাদ" প্রকাশ করা হইয়াছে। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য সাধু। এই গ্রন্থপাঠে সহজে আরব ও পারস্যের লেখকদের সঙ্গে পরিচিত হইবার সুযোগ ঘটে। ভাষাও বিষয়ের উপযোগী হইয়াছে। দুই-এক জায়গায় গ্রন্থকার পূর্ব্ববঙ্গের রীতি অবলম্বন করিয়াছেন, যথা "হাসিয়া দিলেন" (হাসিয়া ফেলিলেন)।

কায়স্থ জাতির ইতিহাস (বঙ্গজ-সমাজ)—শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর রায় চৌধুরী প্রণীত ও সঙ্কলিত। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গুহ বিশ্বাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত, "দেবেন্দ্র-ভবন," কলেজ রোড, বরিশাল। মূল্য ৷৹।

কুলজী অবলম্বনে এই পুস্তকে গুহ-বংশের ইতিহাসের প্রথম খণ্ড সঙ্কলিত হইয়াছে। কুলজী-গ্রন্থে ইতিহাসের উপাদান থাকিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে, কিন্তু গ্রন্থকার কোন্ কুলজী-গ্রন্থ অবলম্বন করিয়াছেন সে-সম্বন্ধে কোন কথাই নাই। তবে প্রস্তাবনায় অনেক ঐতিহাসিক কথা আলোচিত হইয়াছে। কুলজী সম্বন্ধেও গ্রন্থকার ঐতিহাসিক বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন; যথা তিনি লিখিয়াছেন (পৃ. ১২) "প্রামাণ্য প্রাচীন গ্রন্থসমূহে কোথাও পঞ্চ ব্রাহ্মণ সহ পঞ্চ কায়স্থের আগমন প্রসঙ্গ স্থান প্রাপ্ত হয় নাই।"

শ্রীরমেশ বসু

শ্রীশ্রীকৃষ্ণায়ণ কাব্য—শ্রীসারদাপ্রসাদ ধর প্রণীত। প্রকাশক গ্রন্থকার স্বয়ং। ঠিকানা পোঃ খাগড়া, গোয়ালজোল, (মুর্শিদাবাদ) দাম এক টাকা।

লেখকের "অন্তর্নিহিত আনন্দময় পুরুষের অলক্ষ্য অনুপ্রেরণাই" তাঁহাকে এই সুশোভন ভক্তিরসাত্মক কাব্যখানি রচনায় অনুপ্রাণিত করিয়াছে। তাঁহার উদ্যম প্রশংসনীয়।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

শৃঙ্খল

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী

২১

নরেন্দ্রনারায়ণ ইতিমধ্যে আর একবার মাত্র হেমবালাকে চিঠি লিখিয়াছিলেন। লিখিয়াছিলেন,

"যতদিন আমাকে সম্পূর্ণ করিয়া তুমি জানিতে না, আমা হইতে তোমার কোনও অহিত হয় নাই। সুদীর্ঘ তেইশ বৎসর সুখে দুঃখে আমাদের এক সঙ্গে কাটিয়াছে, আমি কখনও তোমার কোনও ভয়ের কারণ হই নাই। আজ আমাকে পরিপূর্ণ করিয়া জানো বলিয়াই কি আমা হইতে তোমার অকল্যাণ ঘটিতে সুরু হইবে? তেইশ বৎসরের সেই গভীরতর পরিচয় অপেক্ষা আমার এক মুহূর্ত্তের একটা ভুলের পরিচয়ই কি তোমার কাছে বড় হইল? ইলুর কথা যদি বল, আমার প্রভাব তাহার উপর কোনও কালেই পড়ে নাই। সে বিবাহযোগ্যা, তাহার সম্বন্ধে এমন ব্যবস্থা অত্যন্ত সহজেই করা চলে যাহাতে কোনও কালেই আমা দ্বারা তাহাকে প্রভাবান্বিত না হইতে হয়। তুমি আমার চরিত্রের দিক্‌টাই কেবল ভাবিতেছ, কিন্তু তাহা অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান্ আমার মধ্যে কিছু কি আর নাই? আমার সুখের কথা ছাড়িয়া দিলাম, কিন্তু আমার মধ্যে আমার ভালমন্দ অতীত-ভবিষ্যৎ মিলাইয়া যে মানুষটা, সেটা কি কিছুই নহে?"

হেমবালা সে-চিঠির জবাব দেন নাই। নরেন্দ্রনারায়ণের প্রথম পত্রের সঙ্গে এইটিকেও তাঁহার হাতবাক্সের ডালার তলায় সমস্ত কাগজপত্রের নীচে গুঁজিয়া রাখিয়াছিলেন। আজ বহুকাল পর দুইটি চিঠিকেই বাহির করিয়া আদ্যোপান্ত আবার পড়িয়া দেখিলেন। একটিতেও এমন কোনও কথা নাই যাহার জবাব দেওয়া প্রয়োজন, যাহার জবাব তিনি দিতে পারেন। লিখিতে বসিয়া চিঠি-দুইটির কথা, নরেন্দ্রনারায়ণের কথা, নিজের কথার উল্লেখ মাত্র করিলেন না, লিখিলেন,

"আমি ফিরে যেতে রাজি আছি, যদি তুমি কথা দাও, অবিলম্বে ইলুর বিয়ের সব ব্যবস্থা কর্‌বে। দেখবে, বিয়ে তার মাতৃ-পিতৃবংশের, তার শিক্ষা-সহবতের যোগ্য হয়। আমার অনুরোধে তুমি ওকে কল্‌কাতায় ওর মামার কাছে থেকে পড়তে পাঠিয়েছিলে, সেজন্যে আমার কোনো দুঃখ নেই। আমার ভাইয়ের মত মানুষ হয় না। কিন্তু শোকে দুঃখে বিবাগী মানুষ, তাঁর মনটার এখন আর কিছু ঠিক নেই। সংসারে থেকেও তিনি আর এখন ঠিক এ সংসারের নয়। এমন কাজের ভার তাঁকে দিতে চাই না, যা তিনি নিজের মত ক'রে বহন কর্‌তে পার্‌বেন না। তা' ছাড়া, ন্যায়তঃ এবং ধর্ম্মতঃ একাজের ভার বাস্তবিক তোমার। কন্যা-সম্প্রদানের অধিকার পিতা হিসাবে তোমারই আছে, তুমি বর্ত্তমানে আমার নেই। তোমার সে কর্ত্তব্য করা হয়ে গেলে তারপর আমরা একসঙ্গে থাকব কি থাকব না, তা নিয়ে মাথা ঘামাবার আর কিছু দরকার থাক্‌বে না।"

সুভদ্র হৃষীকেশকে সিঁড়ির পথ দেখাইয়া উপরে লইয়া গেলে নীচে বসিবার ঘরে ঐন্দ্রিলাকে ডাকিয়া বীণা তাহার কানে কানে বলিল, "বাবা, তোর সঙ্গে আর পারা যায় না! অজয়বাবুর কি সত্যিসত্যিই কিছু হয়েছে, তিনি দিব্যি আছেন। খেটে খেটে সুভদ্রবাবুর এই ক'দিনে এমন অবস্থা হয়েছে, ওর মুখ দেখলে কান্না পায়। এত বুদ্ধি ক'রে তোকে ডেকে পাঠালাম, ওকে একটু cheer up কর্‌বার জন্যে, আর তুই বাবাকে সুদ্ধু সঙ্গে ক'রে নিয়ে এলি?"

ঐন্দ্রিলা বলিল "কি করব বল, তোমার মত এত বুদ্ধি ত আর সকলের ঘটে নেই। তোমার মনে যে সত্যি সত্যি কি আছে তা কি ক'রে বুঝব। তাছাড়া মামাবাবুকে আমি মোটেই সঙ্গে আনিনি, তিনিই বরঞ্চ আমাকে ডেকে আনলেন সঙ্গে ক'রে। নয়ত আমি যে আস্‌তাম না, তা ত জানোই।"

বীণা বলিল, "বাবা হঠাৎ কি মনে ক'রে চ'লে এলেন ভাই

ভাবছি। পিসীমার ভয়ে তোকে একলা ছাড়তে ভরসা হ'ল না ব'লে কি?"

ঐন্দ্রিলা বলিল, "তোমার পিসীমাকে ভয় আর কে না করে বল?"

চৌকা চেয়ারগুলির একটাতে ঐন্দ্রিলাকে বসাইয়া নিজে সে সেটার হাতার উপর আড় হইয়া বসিল। হাসিয়া বলিল, "বিমানবাবু এখনো প'ড়ে প'ড়ে নাক ডাকাচ্ছেন, জানিস্?"

ঐন্দ্রিলা বলিল, "শুনতে পাচ্ছি না ত।"

বীণা বলিল, "সত্যিই কি আর নাক ডাকছে? ঘুমচ্ছেন এত বেলা অবধি। তা ওপরে গিয়ে কান পেতে থাকলে হয়ত নাসিকা-গর্জ্জন শুনতেও পেতে পারিস্।"

ঐন্দ্রিলা কহিল, "শুনতে আমি কিছুমাত্র ব্যস্ত নই। তাছাড়া ওপরে হয়ত আমি যাবই না মোটে।"

বীণা অত্যন্তই অবাক্ হইয়া কহিল, "সে কি রে! অজয়বাবুকে দে'খে যাবি না?"

ঐন্দ্রিলা কহিল, "ভালই যদি আছেন ত ঘটা ক'রে দেখতে গিয়ে কি হবে? অসুখ বেড়েছে মনে ক'রে এসেছিলাম।"

একটুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আর কিছু ভাবিয়া না পাইয়া বীণা কহিল, "তা'হলেও এতদূর এসেছিস্, দেখা না ক'রে চ'লে গেলে ভদ্রলোক কি ভাববেন?"

ঐন্দ্রিলা একথার কোনও জবাব দিল না। তাহার কথা শুনিয়া, তাহার মুখের দিকে চাহিয়া হঠাৎ কি এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় বীণা কেমন অন্যমনস্ক হইয়া গেল। অজয় ভাল আছে জানিয়া তাড়াতাড়ি বড় সাধ করিয়া ঐন্দ্রিলাকে নিজের আনন্দের ভাগ দিতে সে আজ ডাকিয়া পাঠাইয়াছিল। সে জানে, ঐন্দ্রিলা নিজেকে লইয়া থাকিতে ভালবাসে, মানুষের সঙ্গ কোনওদিনই তাহার পছন্দ নয়। তাছাড়া, অবিবাহিতা মেয়ে নিঃসম্পর্কিত ছেলেদের মেসবাড়ীতে ডাকিলেই আসিয়া হাজির হয় না, তাহাও ঠিক। ঐন্দ্রিলার ও-সব দিকে আরও বেশীই আঁটা-আঁটি। আর কিছুতে সে আসিবে না জানিয়াই অজয়ের অসুখ উপলক্ষ্য করিয়া তাহাকে সে ডাকিয়াছিল, কথাটা পিসীমার কানে উঠিলেও ইহা লইয়া অতঃপর খুব বেশী গোলযোগ তিনি করিবেন না। শেষ অবধি আশা করে নাই যে ঐন্দ্রিলা আসিবে। সে যে আসিয়াছে ইহাই ত এক রহস্য। আসিয়াছেই যদি, অন্ততঃ বীণার মুখ চাহিয়াও তাহার আনন্দের ভাগ এতটুকু লইয়া গেলে কি ক্ষতি হইত? এতদূর আসিয়াও অজয়কে না দেখিয়াই সে চলিয়া যাইতে চাহিতেছে, তুচ্ছ ব্যাপার লইয়া এত বাড়াবাড়িও ত সে কখনও করে না?

একটুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "বাবা আর কত দেরি করবেন কে জানে?"

ঐন্দ্রিলা হাসিয়া কহিল, "দেরি করুন, আর নাই করুন, তোমার তাতে কিছু আসে যায় কি?"

বীণা কহিল, "কিছু না। তুইও ওঁর সঙ্গে সঙ্গে পালাবি না জানতে পেলেই আমি খুসি।"

ঐন্দ্রিলা কহিল, "আমি ত পালাবই, আর মামাবাবুও নিশ্চয়ই তাই আশা করবেন।"

বীণা কহিল, "হাঁ, তুই ত বাবাকে কতই জানিস! বাবা পৃথিবীতে কারও কাছ থেকে কিছু আশা করেন না। যদি ওঁর মনে হয়, একলা উনি বাড়ী ফিরে গেলে পিসীমা তাই নিয়ে রসাতল বাধাবেন, তাহলে চুপচাপ কোনো একদিকে চ'লে যাবেন দেখিস। আমরা বাড়ী ফিরবার আগে আর ওদিক্ মাড়াবেনই না। পিসীমা ভাববেন, বাবাকে রেখে আমরাই আগে চ'লে এসেছি।"

ঐন্দ্রিলা কহিল, "আসল কথা, থাকতে আমি চাই না। অজয়বাবু ত ভালই আছেন, থেকে কি করব?"

বীণা কহিল, "ভাল না থাকলে যেন তুই কতই করতিস। কিন্তু কথাটা তা নয়। অজয়বাবু যে পরিমাণে ভাল আছেন, সুভদ্রবাবু ঠিক সেই পরিমাণেই ভাল নেই। আর সেইজন্যেই তোকে থাকতে বলছি।"

ঐন্দ্রিলা কহিল, "তোমার ওসমস্ত পচা রসিকতা এখন রাখো ত? নিজেকে দিয়ে পৃথিবী-সুদ্ধুর বিচার কোরো না। তোমার কাছে জীবনটা না-হয় একটা তামাসা, হাসির অভিনয়। সবাই তা মনে করে না।"

বীণা আহত হইয়া কহিল, "দেখ, ঐ খোঁটাটা তুই আর আমাকে দিসনে। ও বিষয়ে কারও যদি কিছু বলবার অধিকার থাকে ত আমারই আছে, তোর নেই। জীবনে হাসিকান্না দুয়েরই সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে, ও দুয়ের একটাকেও তুই ভাল ক'রে জানিস না।"

ঐন্দ্রিলা একথার জবাবে একটু মুখভঙ্গি করিল মাত্র, সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা যাইতেছিল, তাই আর প্রতিবাদ করিল না।

সুভদ্র ভয় করিতেছিল, হৃষীকেশ প্রথমেই অজয়ের চিকিৎসার ভাল বন্দোবস্ত করিতে বলিবেন। এরূপ ক্ষেত্রে সাধারণতঃ মানুষে যাহা করে, কোথায় কে তাঁহার পরিচিত ভাল ডাক্তার আছে তাহার কাছে চিঠি লিখিতে বসিবেন। কিন্তু এদুয়ের কোনওটাই তিনি করিলেন না। চিকিৎসার কি ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা অবশ্য জানিতে চাহিলেন। "আমিই ওকে দেখছি" বলিতে গিয়া অকারণেই সুভদ্রের গলা কাঁপিয়া গেল। হৃষীকেশ কেবল "ও" বলিয়াই চুপ করিয়া গেলেন, বাহিরেও তাঁহার মুখে কোনও ভাবান্তর প্রকাশ পাইল না। সুভদ্রের কাছে অজয়ের রোগের বিবরণ পূর্ব্বাপর সমস্ত স্থির হইয়া শুনিয়া লইয়া হঠাৎ একসময় জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেশে ওর কে আছেন?"

সুভদ্র কহিল, "ওর বাবা আছেন।"

হৃষীকেশ বলিলেন, "তাঁকে ত অবশ্যই খবর দেওয়া হয়েছে।"

"না" বলিতে গিয়া এবারও সুভদ্রের গলা কাঁপিয়া গেল। একটু কাশিয়া গলাটাকে পরিষ্কার করিয়া লইয়া কহিল, "ভেবেছিলাম অল্পেতেই সেরে যাবে। খবর দিয়ে দেব কি?"

হৃষীকেশ আসন ছাড়িয়া উঠিতে উঠিতে কহিলেন, "হ্যাঁ, তা দিলেও হয়, খবর দিতে ক্ষতি ত কিছু নেই।"

নীচে আসিয়া ঐন্দ্রিলাকে কহিলেন, "আমার জন্যে তুমি তাড়াতাড়ি কোরো না মা, আমার বৌবাজারে একটু কাজ আছে, সেরে ফেরবার পথে তোমায় তুলে নিয়ে যাব।"

দুটি চোখে করুণ মিনতি ভরিয়া সুভদ্র ঐন্দ্রিলার দিকে চাহিল। কিন্তু ঐন্দ্রিলা কেন যে এত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে তাহা সে নিজেও জানে না। বলিল, "তোমাকে আবার কষ্ট ক'রে আসতে হবে না মামাবাবু। আমি তোমার সঙ্গেই যাচ্ছি।"

হৃষীকেশ বলিলেন, "অজয়ের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে?"

ঐন্দ্রিলা বলিল, "তুমি এক মিনিট বোসো, আমি চট ক'রে দেখাটা ক'রে আসছি।"

সুভদ্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দ্রুতপদে সিঁড়ি বাহিয়া সে উপরে উঠিয়া গেল।

ঐন্দ্রিলা আসিয়াছে এ-সংবাদ অজয়কে কেহ দেয় নাই। বীণা যে তাহাকে আসিতে ডাকিয়াছে তাহাও সে জানিত না। সিঁড়িতে কতকগুলি পায়ের শব্দ, খোলা দরজায় ঘরের মধ্যে চকিত একটুখানি ছায়াপাত, তারপরেই ঐন্দ্রিলা। অজয়ের প্রথমে মনে হইল, সে ভুল দেখিতেছে। এমনিতেই তাহার মনটা ঠিক স্বাভাবিক নহে, তদুপরি এই দীর্ঘদিনের কৃচ্ছ্র সাধন, অসুস্থতা,—আরও আগেই যে তাহার মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটে নাই তাহাই ত বেশী। মনের মধ্যে কোন্ এক জায়গায় বীণা এবং ঐন্দ্রিলা বহুদিন হইতেই একটি মাত্র মানুষের উপলব্ধিতে এক হইয়া মিশিয়া আসিতেছিল। সেই রোগেরই ছোঁয়াচ আজ কি তাহার চোখে লাগিয়াছে? মুহূর্ত্তের জন্য ভাবিল, বীণাকেই ঐন্দ্রিলা বলিয়া ভুল করিতেছে।

ঐন্দ্রিলা একটুক্ষণ থমকিয়া থামিয়া কহিল, "এই নাকি আপনার ভাল থাকবার নমুনা?"

যেন এক সঙ্গে একশটা ঢাকে কাটি পড়িল, এমনই ভাবে অজয়ের বুকের মধ্যে, কানের কাছে, সমস্ত শিরা-উপশিরা ভরিয়া চঞ্চল রক্তস্রোত কোলাহল করিয়া উঠিল। নিজে সে উঠিতে যাইতেছিল, সুভদ্র বাধা দেওয়াতে তাহা আর পারিল না। সে অসুস্থ, সে দুর্ব্বল, বহু তপস্যায় যে দেবতাকে আজ সে কাছে পাইয়াছে তাহার সম্মুখে নত মস্তকে উঠিয়া দাঁড়াইবার সাধ্যও তাহার নাই। নিজের এই অক্ষমতার গ্লানিতে তাহার দেহ যেন আরও অবসন্ন হইয়া আসিল।

ঐন্দ্রিলা কহিল, "কোনোদিনই ত শরীরে কিছু ছিল না, এখন ত হাড় ক'খানা কেবল বাকী আছে। বাবা, কি চেহারাই করেছেন, ভয় করে দেখলে!"

ঐন্দ্রিলা জানিত না, কাহাকে কি বলিতেছে। অজয়ের ভিতরটাকে কে যেন মোচড় দিয়া ভাঙিয়া থেঁৎলাইয়া রক্তাক্ত করিয়া দিল। হায়রে, তাহার শরীরে হাড় ক'খানাই কেবল অবশিষ্ট আছে বটে, আর এই যে তাহার বুক ভরিয়া রক্তস্রোতের দ্রিমিদ্রিমি তালে উদ্দাম নৃত্য, দুই চোখের দৃষ্টি ভরিয়া এই যে তাহার আলোকের তপস্যা, তাহার দেহের মধ্যে তাহার দেহাতীত এই যে প্রবলতর প্রখরতর জীবন্ত সত্তা, ঐন্দ্রিলার সে অন্তর্দৃষ্টি কোথায় যে এ-সমস্তকে সে দেখিতে পাইবে? এতদিন ধরিয়া এত প্রাণপাত সংগ্রাম, দিন হইতে

দিনে বিরামহীন এত দুঃখের সাধনা, কিছুতে সে অভিভূত হয় নাই, কিন্তু আজ তাহার সমস্ত সহনশক্তি মুহূর্ত্তে কে এমন করিয়া অপহরণ করিয়া লইল? পৃথিবীতে এই একটি মানুষ, একমাত্র যাহার দৃষ্টিতে নিজেকে দেবতার মত মহিমা-মণ্ডিত করিয়া ধরিবার তপস্যা ছিল তাহার জীবনে, তাহারই কাছে এমন একান্ত নিঃস্বতায় পরাজয়ে ধূলিধূসরিত দেহে ধরা পড়িয়া যাইবার অপযশ তাহার ললাটে লেখা ছিল কে জানিত? কে ঐন্দ্রিলাকে আসিতে বলিয়াছিল, কেন সে আসিল? মরিতে মরিতেও ত তাহার মুখখানি একবার দেখিতে পাইবার ইচ্ছাকে অজয় ভুলিয়াও মনে স্থান দেয় নাই।

যেন কিছুই হয় নাই এমনই ভাবে মুখে একটু হাসি লইয়া সে তাড়াতাড়ি আবার উঠিয়া বসিতে গেল। কিন্তু হাসি নিজে হইতেই মিলাইয়া যাইতেছে, অজয়ের সমস্ত দেহ থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। সুভদ্র হাঁ হাঁ করিয়া তাহার বিছানার পাশে ছুটিয়া আসিল। "কি করছ? তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে?" বলিয়া আবার জোর করিয়া তাহাকে শোয়াইয়া দিতে গেল। এবার অজয় বাধা দিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু দুর্ব্বল শরীরে শক্তিতে কুলাইল না। হঠাৎ একসময় শিথিল মাথাটাকে বালিশের উপর ঝুপ করিয়া ফেলিয়া মূর্চ্ছাতুরের মত সে এলাইয়া পড়িল। ঐন্দ্রিলা ভীত কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে সুভদ্রবাবু? অসুখটা আবার বাড়ল কি?" একটা ওষুধের বড়ি মধুতে মাড়িয়া অজয়ের জিভে ঠোঁটে মাখাইয়া দিতে দিতে সুভদ্র যেন নিজের মনে মনেই বলিতে লাগিল, "ও কিছু না, কিছু না, ও এক্ষুণি সেরে যাবে।" ফিরিয়া চোখ চাহিতে অজয়ের পাঁচ সেকেণ্ডের বেশী দেরি হইল না, কিন্তু এবারে ঐন্দ্রিলার দিক্ হইতে তুই চোখের ক্ষুধিত দৃষ্টিকে প্রাণপণে সে ফিরাইয়া রহিল। ঐন্দ্রিলা যেন সত্যসত্যই সেখানে নাই, যেন এতক্ষণ সে স্বপ্ন দেখিয়া পীড়িত হইয়াছে।

সুভদ্র বলিল, "এখন কেমন বোধ করছ?"

বহুদিন পর আবার আজ একসার পিপীলিকা অজয়ের মেরুদণ্ড বাহিয়া মস্তিষ্কের দিকে যাত্রা করিয়াছে। খুব যে ক্রুদ্ধ হইয়া সুরু করিয়াছিল তাহা নহে, কিন্তু বলিতে বলিতে ক্রোধে জ্ঞান হারাইল। বলিল, "ঐ একটা silly কথার জবাব যদি মিনিটে হাজার বা'রে দিতে হয় তাহলে যে কোনো সুস্থ লোকও কিছুক্ষণের মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে।"

অত্যন্ত বিপন্ন একটু হাসি মুখে লইয়া সুভদ্র ঐন্দ্রিলার দিকে ফিরিয়া চাহিতে গেল, দেখিল সে নিঃশব্দে কখন সেখান হইতে অন্তর্দ্ধান করিয়াছে।

সুভদ্রের দিক্ হইতে কোনও সাড়া না পাইয়া অজয়ও ফিরিয়া চাহিল। ঐন্দ্রিলাকে দেখিতে না পাইয়া কহিল, "উনি চ'লে গেলেন?"

সুভদ্র কহিল, "তাই ত দেখ্‌ছি।"

"তোমাকে কিছু না ব'লেই?"

"হয়ত বলেছিলেন, আমি শুনতে পাইনি।"

অজয়ের রাগ পড়িয়া গিয়াছে। বুকের কাছটা ফাঁকা। সেই শূন্যতাই এখন বেদনার মত হইয়া বাজিতেছে। অনুতাপ করিবে না এই সঙ্কল্প লইয়া প্রাণপণে নিজেকে সে কঠিন করিয়া তুলিতে লাগিল।

ঐন্দ্রিলাকে বিদায় করিয়া দিয়া বীণা উপরে আসিল, বিমানও ততক্ষণে আসিয়া জুটিয়াছে। বীণা ও বিমান একসঙ্গে হইলেই যেমন অকারণ কথাকাটাকাটির দ্বৈরথ যুদ্ধ বাধিয়া যায়, আজও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। ঐন্দ্রিলা চলিয়া যাইবার পর হইতে অজয় একটিও কথা কহে নাই। এমন যে সুভদ্র সেও আজ একটু দমিয়া গিয়াছে। কিন্তু উপরে আসিয়া অজয়কে একবার দেখিতে পাওয়া মাত্রই বীণার মনের উপর হইতে সমস্ত ভার যেন কোন্ মন্ত্রের মায়ায় পলক ফেলিতে নামিয়া গিয়াছে। সেই হইতে কথার উপরে কথা, হাসির উপরে হাসির স্রোত আছড়াইয়া পড়িয়া আহত প্রতিহত হইয়া আবর্ত্তে আবর্ত্তে অবিরাম গতিতে বহিয়া চলিয়াছে। অজয়ের আজ কিছু ভাল লাগিতেছে না, কিন্তু বীণা তাহা কেমন করিয়া বুঝিবে? বাহির হইতে অজয়ের মুখের চেহারা আজ সত্যই অনেক ভাল দেখাইতেছে, সুভদ্র বলিয়াছে ভয়ের কোনও কারণ আর নাই, আজ বীণা সুখী হইবে না ত সুখী হইবে কে?

কথার মধ্যে একটু দম লইয়া বীণা বলিল, "সুভদ্রবাবু যেন কি। এদিকে ত ছেলেমেয়েদের সেলাবার জ্বালায় চোখে ঘুম নেই, ইঁদুরে দেখে এমনই বিষম চমকে গেলেন যে তাকে দুমিনিটও থাকতে বসতে পারলেন না?"

বিমান বলিল, "বোধ হয় ভাবলেন আপনার দিকে আপনি একলাই যথেষ্ট। কোনো reinforcementএর আপনার প্রয়োজন থাকলেও আপনাকে সেটা জুটিয়ে দেওয়া এই তিনটি নিরীহ প্রাণীর পক্ষে নিরাপদ্ হত না।"

বীণা কহিল, "আপনাদের সকলের হয়ে সব কথার জবাব দেবার জন্যে কি বিমানবাবুকে রেখেছেন?"

বিমান কহিল, "জবাব আমি ওঁদের কথারও দিয়ে থাকি, সে ওঁরা বেশ ভাল ক'রেই জানেন। তা আপনি একেবারে একলা কথা ব'লে যদি সুখ পান ত আমি না-হয় চুপ ক'রে যাচ্ছি।"

বীণা কহিল, "তাই গেলেই ত বাঁচি।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বিমান কহিল, "কিন্তু একটা কথা। ঐন্দ্রিলা দেবী এমন হঠাৎ এসেই চ'লে গেলেন কেন? সুভদ্রই না হয় তাঁকে থাকতে বলেনি, আমিও ত একটা মানুষ বাড়ীতে ছিলাম?"

বীণা কহিল, "ঘরে শুয়ে নাক ডাকাচ্ছিলেন।"

বিমান কহিল, "সেটা আমার নাকের অপরাধ। আপনাদের উত্যক্ত করবার কোনও অভিপ্রায় আমার মনে ছিল না।"

বীণা কহিল, "জেগে থাকলে ত গান ধরতেন, তার চেয়ে ঘুমিয়ে নাক ডাকানো ভালো।"

বিমান বলিল, "তবেই দেখুন, আমার কোনো অপরাধ নেই। আশ্চর্য্য যে ঐন্দ্রিলা দেবী আমার কথাটা একবারও ভাবলেন না।"

বীণা কহিল, "ভেবেছিলেন হয়ত, কিন্তু তিনি যা serious মানুষ, আপনি তাঁকে ভাবিয়ে বিশেষ কিছু সুবিধে করতে পারবেন না। নিতান্ত অজয়বাবু অসুস্থ শুনে দেখতে এসেছিলেন, ভালো আছেন জেনেই আর অপেক্ষা করেন নি।"

হঠাৎ বিছানা হইতে অজয় বলিয়া উঠিল, "অত্যন্ত নিরাশ হয়ে ফিরে গেলেন বোধ হয়?"

সুভদ্র চাপা গলায় তাহাকে ধমক দিয়া উঠিল, কহিল, "কি আজে বাজে বকছ অজয়? না-হয় তুমি অসুস্থ, তুমি বদ্‌মেজাজী, সবাই জেনে নিচ্ছি। কিন্তু তোমার কাছেও এ ধরণের কোনো কথা শুনব আমরা তা প্রত্যাশা করি না।"

অজয়ও রুখিয়া উঠিয়া কহিল, "তুমি প্রত্যাশা কর বা কর না তাতে আমার কিছু আসে যায় না। সত্য যা তা আমার কাছে আজ শুনবে। আমি এই তোমাদের ব'লে দিচ্ছি, উনি আমায় দেখতে আজ এ বাড়ীতে আসেন নি। আমি রোগ-শয্যায় প'ড়ে প'ড়ে কেমন কাৎরাচ্ছি তাই দেখতে এসেছিলেন। শুনতে খুব খারাপ শোনাচ্ছে, কিন্তু কি করব, উপায় নেই। তবে সেই সঙ্গে এটাও বলছি, দোষটা কেবল তাঁরই নয়। আমাদের কারও কাছেই মানুষের মানুষ ব'লে কোনো মূল্য ত নেই, দুঃখের মূল্যে, দুর্গতির মূল্যে আমাদের মূল্য। এদেশে মানুষ-নারায়ণের চেয়ে দরিদ্র-নারায়ণ বড়। দয়া আমাদের সব-চেয়ে বড় ধর্ম্ম। দেবতার আসনে দুঃখকে বসিয়ে দু-হাজার বছর ধ'রে আমাদের এই সভ্যতা তৈরি হয়েছে। আঃ, আমার মেয়া ধ'রে গেছে, মেয়া ধ'রে গেছে। চারদিক্‌কার এই দুঃখ, দুর্গতি, রোগ, শোক, দারিদ্র্য, আর তার মধ্যে দেশজোড়া এই সভ্যতার আস্ফালন। আশ্চর্য্য যে আমাদের লজ্জাও নেই।"

বিমান বলিয়া উঠিল, "হ্যালো! এ কি কাণ্ড! যদ্দিন জর ছিল ভুল বকলে না, আজ টেম্পারেচার নেমে গিয়ে ডিলিরিয়াম সুরু হ'ল?"

অজয় লম্বা করিয়া একটা নিঃশ্বাস লইল, কহিল, "হ্যাঁ, এই লক্ষ্মীছাড়া দেশে খাঁটি কথা বলতে গেলেই সেটা ডিলিরিয়ামের মত শোনায়, তা জানি। আবার একটু মাথার গোলমাল না থাকলে খাটি কথা মুখ দিয়ে বেরোয়ও না দেখেছি। সেইজন্যেই আমার জীবনের সব চেয়ে গভীর উপলব্ধির কথাটা তোমায় যেদিন বলতে গিয়েছিলাম, প্রথমেই শ্যাম্পেনের প্রয়োজন হয়েছিল। ভাবছ, কোন্ কথায় থেকে কোন্ কথায় এসে পড়েছি। কেন বুঝছ না, যে, আজ যদি আমি সুস্থ থাকতাম, ভাল থাকতাম, কিছুতেই এ বাড়ীতে আস্‌বার কথা ঐন্দ্রিলা দেবীর মনে হত না।—যদি আমাদের আনন্দের ভাগ, গৌরবের ভাগ তাঁকে দিতে ডাকতাম, বাধা-নিষেধের আর অন্ত থাকত না। তিনি এসেছিলেন, কারণ আমি হার মেনেছি, পথ চলতে ধুলোর ওপর মুখ থুবড়ে পড়েছি, কারণ আমার গর্ব্ব করবার কিছু নেই, নিজের জন্যে কোনো মূল্য চাইবার আমার উপায় নেই, দুঃখের মূল্যে কৃপা বড় জোর কেবল চাইতে পারি।"

সুভদ্র বলিল, "ভাল কথা, জরে বেহুঁস হয়ে কথা

প'ড়ে ছিলে, কৃপা ক'রেও কেউ যদি সেদিকে না যেত ত খুব খুশী হতে ?"

অজয় বলিল, "জানি না, হয়ত হতাম না, কিন্তু ভাল ক'রে কিছু গুছিয়ে ভাববার, তর্ক করবার মত অবস্থায় আমার মনটা এখন নেই।"

বিমান বলিল, "কি জানি বাপু, কি যে এমন ভয়ানক মারাত্মক ব্যাপার হঠাৎ ঘটল, আমি ত ভেবে কিছু ঠিক করতে পারছি না।"

অজয় হাঁপাইয়া গিয়াছিল, থামিয়া থামিয়া কহিল, "ঐখানটায় তুমি ভুল করছ। মারাত্মক কিছুই ঘটেনি। আর আমি তা বলিও নি। তুমি ত জানোই এই রকম ক'রে কথাগুলোকে আজ আমি নতুন ভাবছি না। দুঃখও ত কম পাইনি, কিন্তু নিজের মধ্যে নিজের দুঃখ-দুর্গতিকে বড় হ'তে দিতে আমার আর ভাল লাগে না। আমি যদি কাল চুরি ক'রে জেলে যাই, তখন ত তোমরা দল বেঁধে নিশান উড়িয়ে আমাকে দেখতে আসবে না ? দুঃখ পাচ্ছি জেনেই বা কেন এল ? দুঃখ পাওয়াটাও ত এক সমানই পাপ ? সেই কথাটাই হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল, তাই উত্তেজিত হয়েছিলাম।"

সুভদ্র বলিল, "সম্প্রতিকার মত উত্তেজনাটা রাখ, নয়ত আবার জরজাড়ি কিছু বাধাবে। তখন তোমার মধ্যে তোমার সেই দুর্গতিকে বড় যদি আমরা নাও করি, তোমাকে নিয়ে আমাদের নিজেদের দুর্গতির শেষ থাকবে না।"

বীণা এতক্ষণ একটিও কথা কহে নাই। হঠাৎ উঠিয়া ধীরে দরজার দিকে অগ্রসর হইয়া গেল। পশ্চাৎ হইতে বিমান কহিল, "ওকি, কোথায় চলেছেন ?"

বীণা কহিল, "বাড়ী। বড্ড বেশী দেরি হয়ে গেছে, তাছাড়া অজয়বাবুর এখন একটু বিশ্রামের প্রয়োজন আর সব-কিছুর থেকে বেশী।"

তাহার মুখের চেহারা দেখিয়া প্রতিবাদ করিতে আজ বিমানেরও সাহসে কুলাইল না।

বীণাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া আসিয়া বিমান কহিল, "ব্যাপারটা আমার কেমন ভাল ঠেকছে না। কোথাও কিছু একটা গোল বেধেছে নিশ্চয়। দেখলে না, কারুকে কিছু না ব'লে হঠাৎ উঠে কি রকম চ'লে গেলেন ? ও রকম ধরণ ত ওঁর স্বভাব নয় ? অজয়ের মাথায় একবার রাগ চাপলে তার আর কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকে না। ওঁর কাছে শ্যাম্পেনের কথাটায় উল্লেখ কি না করলেই চলত না ?"

অজয় অতি ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল, "তোমার কি মনে হয়, কথাটা উনি লক্ষ্য করেছেন ?"

বিমান বলিল, "তোমার চেয়ে মেয়ে-জাতটাকে আমি ত একটু বেশী জানি ? আমি বলছি, তোমার অদৃষ্টে দুঃখ আছে, তুমি দেখে নিও।"

অজয়ের অদৃষ্টে দুঃখ যে-ছিল তাহাতে আর ভুল নাই, কিন্তু সে-দুঃখের উৎপত্তির ইতিহাসটা একটু অন্য প্রকার।

বিকালে চুল বাঁধিতে বাঁধিতে তেতলার বারান্দায় আসিয়া ঐন্দ্রিলা কহিল, "তোমার আজ কি হয়েছে বল ত দিদি ? শরীর ভাল নেই ব'লে ত স্নানাহারের হাত এড়ালে, সেই থেকে বাইরের কাপড়গুলো সুদ্ধ ছাড়নি, সারাটা দিন বারান্দাতেই কাটিয়ে দিলে। রাতটাও কি ঐখানেই কাটাবে স্থির করেছ ? অজয়বাবু ভাল আছেন, কোথায় তোমাকে আজ একটু খুশী দেখব—"

বীণা কহিল, "খুশীর আমার কিছু অভাব নেই। হঠাৎ আজ মারাত্মক রকম কুঁড়েমিতে ধরেছে। চল্, ছাতে বেড়াতে যাবি ?"

ঐন্দ্রিলা কহিল, "দাঁড়াও, চুল বাঁধাটা শেষ করি আগে।"

ছাতে গিয়া ঐন্দ্রিলাকে অকারণেই এক কোণে টানিয়া লইয়া গিয়া বীণা কহিল, "পুরুষ জাতের সঙ্গে আমার কোনো পরিচয় যদি থাকে ত তোকে আমি সত্যি বলছি ইন্দু, অজয় তোকে ভালবাসে।"

ঐন্দ্রিলা একমুহূর্ত্ত চুপ করিয়া রহিল, তারপর বলিল, "কিসে তোমার তা মনে হ'ল ?...তুমি পাগল। তোমার মাথা খারাপ হয়েছে।"

বীণা কহিল, "তুই হঠাৎ গিয়ে তেমনি হঠাৎ চ'লে আসায় বেচারা এমন ভীষণ upset হ'ল, যে আমি যা বলছি তাছাড়া আর কোনো অবস্থায় সেরকমটা হওয়া সম্ভবই হ'ত না।"

ঐন্দ্রিলা একটু হাসিয়া কহিল, "আমার ধারণা কিন্তু একেবারেই উল্টো। আমাকে দেখে ভদ্রলোক আজ যা মুখ করেছিলেন তা ত তুমি দেখনি, দেখলে আর এরকম বলতে না।"

বীণা কহিল, "আমি যা বলছি ঠিকই বলছি। আমার নিজের মনে অন্ততঃ কোনো সন্দেহ আর নেই।"

যুক্তিটা তাহার নিজের বক্তব্যের বিরুদ্ধে যাইতেছে কিনা না ভাবিয়াই ঐন্দ্রিলা কহিল, "অজয়বাবু সম্বন্ধে অত নিঃসন্দেহ হ'য়ো না। সাধারণ বিচারে যে-কথার যে-ব্যবহারের যে অর্থ দাঁড়ায়, ওঁর বেলাতে সে-সমস্তই উল্টো। একেবারে উল্টো দিক দিয়ে দেখে বিচার করলে হয়ত ওঁর সম্বন্ধে ঠিক কথাটা কতক বলা যায়।"

বীণা কহিল, "ও রে, সেকথা কি তুই আর আমার চেয়ে বেশী জানিস? তবু আমি তোকে বলছি, আমি ভুল করিনি।"

ঐন্দ্রিলার ললাটে এবার একটু ভ্রূকুটি দেখা দিল। অধীর হইয়া কহিল, "না, তুমি ভুল করছ না, তুমি সব জানো। চুপ কর দেখি এখন। এবিষয়ে আলোচনাটাকে অগ্রসর হ'তে দিতে আমি অন্ততঃ আর রাজি নই।"

বীণা কহিল, "বেশ, চুপ করছি।"

চুপ সে তখনকার মত করিল বটে, কিন্তু ঐন্দ্রিলাকে আবার একবার ওয়েলিংটন স্কোয়ারে ধরিয়া লইয়া গিয়া অজয়ের মুখোমুখি না দাঁড় করাইতে পারা পর্য্যন্ত তাহার অন্তর বিশ্রাম মানিল না। শীঘ্রই তাহার সুযোগও ঘটিয়া গেল। দুই বোনে সুলতার সঙ্গে দেখা করিয়া ফিরিতেছিল, হঠাৎ ড্রাইভারকে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে গাড়ী লইয়া যাইতে বলিয়া বীণা কহিল, "এই ক'দিনের মধ্যে একবারও দেখতে যাওয়া হয়নি। লক্ষীটি তুই বাধা দিস্‌নি। না-হয় তুই গাড়ীতে ব'সে থাক্‌বি চুপ ক'রে।" কিন্তু সেদিন বিমান বাড়ী ছিল, বীণার নিকট খবর পাইয়া ছুটিয়া আসিয়া গাড়ীর দরজায় মহা চেঁচামেচি সুরু করিয়া দিল। নিতান্ত পথে ভিড় জমিয়া না যায় এইজন্যই ঐন্দ্রিলাকে তাড়াতাড়ি উপরে আসিতে হইল।

বীণা আজ অজয়কে চোখে চোখে রাখিবে স্থির করিয়াই আসিয়াছিল। ঐন্দ্রিলাও ভাবিল, আসিয়াই যখন পড়িয়াছি, দিদির সন্দেহটা নিতান্তই অমূলক, না তার মধ্যে বস্তু কিছু আছে যতটা সম্ভব দেখিয়াই যাই। নিজেরও মনে এই সেদিন অবধি এই সন্দেহ ত আমার ছিল। অজয় তখনও দুর্ব্বল। মুখের রং আরও ফ্যাকাশে মনে হইল। কিন্তু আজ তাহার কোনও ব্যবহারে কিছুমাত্র অস্বাভাবিকতা বা উত্তেজনার লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। সেদিনকার ব্যাপারের পর সে একটু সতর্ক হইয়াছে কি? দুই বোনের সঙ্গে অত্যন্ত শান্ত সুস্থির চিত্তে সে কথা বলিল।

কেমন আছে, ঐন্দ্রিলা তাহা জানিতে চাহিলে, 'ভালই ত আছি" বলিয়া সে অন্য কথা পাড়িল। বলিল, এবার সারিয়া উঠিয়া নূতন একটা বই লইয়া পড়িবে। এক বৎসর দুই বৎসরে সেই বই শেষ হইবার নহে। ভারতে দুঃখবাদের উৎপত্তি এবং সেইসঙ্গে প্রতিপদে সমতালে তাহার অধোগতির ইতিহাস জুড়িয়া এই বই সে রচনা করিবে। উপনিষদের যুগ হইতে সুরু করিবে, নন্‌-কো-অপারেশনে আসিয়া থামিবে।

বীণা-ঐন্দ্রিলা সেদিন প্রায় ঘণ্টা-খানেক বসিয়া গেল। বিমানের প্রাণান্ত চেষ্টা সত্ত্বেও বীণা সেদিন একটি-দুটির বেশী কথা বলিল না। বাড়ী ফিরিবার পথে ঐন্দ্রিলা কহিল, "হল ত? কি বুঝ্‌লে এবারে বল।"

বীণা কহিল, "নূতন ক'রে কি আবার বুঝ্‌তে হবে?"

ঐন্দ্রিলা কহিল, "তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না। আসল কথাটা আমার কাছে থেকে শুনবে? ভাল ও কাউকেই বাসে না, তোমাকেও না, আমাকেও না, ওর মাথার সবটাই ওর নিজেকে দিয়ে ভর্ত্তি। সারাক্ষণ নিজের কথা ছাড়া আর কিছু ওকে বল্‌তে শুন্‌লে?"

বীণা গাড়ীর জানালায় বাহিরে চাহিয়া বসিয়াছিল, একথার জবাবে মৃদু হাসিল মাত্র।

পরদিন ভোরে উঠিয়াই বীণা সুভদ্রের একটুকরা চিঠি পাইল,

"অজয়ের জ্বর আবার খুব বেড়েছে। বিমান বাড়ি নেই। সময় ক'রে একটুক্ষণের জন্যেও যদি একবার আস্‌তে পারেন, বড় ভাল হয়।"

যে-লোকটি চিঠি লইয়া আসিয়াছিল, তাহাকে সঙ্গে করিয়াই বীণা ঊর্দ্ধশ্বাসে আসিয়া অজয়ের শয্যাপ্রান্তে হাজির হইল। বলিল, "কি ব্যাপার?"

তাহাকে একটু আড়ালে লইয়া গিয়া সুভদ্র কহিল, "কাল সন্ধ্যা থেকেই একটু ছটফট করছিল, তখন বুঝতে পারিনি কিছু। বার-বার বিছানা ছেড়ে উঠে পড়তে চাচ্ছিল, উঠতে দিইনি, তাই নিয়ে ঝগড়া করেছে; বলেছে, চিরকালই কি বিছানায় শুয়েই কাটিয়ে দেব? আমরা মেয়েদের মত

ঘুমিয়ে যাবার পর দুপুর রাত্রে হঠাৎ উঠে ছাতে চ'লে যায়, বাকী রাত সেইখানেই নাকি পায়চারী ক'রে বেড়িয়েছে। বেয়ারার মুখে নিজেই সব বল্‌ল। বিমান কাল রাত থেকে বাড়ী নেই। একলা ওকে নিয়ে কি বিপদে যে পড়েছিলাম। এখন আপনি একটু বসুন ত! কয়েকটা গাছ-গাছড়া সংগ্রহ ক'রে আন্‌তে হবে। সে আবার এমন জিনিষ, চাকর পাঠিয়ে হবার উপায় নেই।"

সুভদ্র চলিয়া গেলে অজয়ের শয্যাপ্রান্তে ফিরিয়া আসিয়া বীণা স্নিগ্ধ মৃদু কণ্ঠে ভর্ৎসনা ভরিয়া বলিল, "এমন কাণ্ড মানুষে করে? কি হয়েছিল আপনার বলুন ত?"

অজয় কহিল, "শুয়ে শুয়ে আর ভাল লাগছিল না। মানুষে কত আর ভুগতে পারে বলুন। ঠিক করেছিলাম, আর ভুগব না। জোর ক'রে অস্বীকার ক'রেই অসুখটাকে তাড়াব। কিছুই আমার হয়নি, এই ব'লে নিজেকে ফাঁকি দিতে গিয়েছিলাম।"

অজয়ের কথার ধরণে বীণার চোখে অলক্ষ্যে একটু জল আসিয়াছিল, চকিতে অঞ্চল প্রান্তে সেটুকু মুছিয়া লইয়া বলিল, "ছি, ওরকম করে কখনো? দেখুন ত নিজের কি দশা কর্‌লেন? কেবল বয়সই বাড়ছে, ছেলেমানুষি কি কোনোদিন ঘুচবে না? আপনাকে নিয়ে কি বিপদেই যে পড়া গেছে।"

অজয় বালিশে মাথাটাকে ক্রমাগত এপাশ ওপাশ করিতেছিল। তাহার মুখের কাছে ঝুঁকিয়া বীণা কহিল, "মাথার কি খুব যন্ত্রণা হচ্ছে? একটু হাত বুলিয়ে দেব?"

অজয়ের সম্মতির অপেক্ষা না করিয়াই বীণা তাহার শয্যাপ্রান্তে চেয়ারটাকে টানিয়া লইয়া তাহার বালিশের পাশে ঘেঁসিয়া বসিল। একটি হাতের উপর শরীরের ভার রাখিয়া আড় হইয়া বসিয়া তাহার জ্বরতপ্ত ললাটে, ত্রস্ত বিবর্ণ কেশরাজির মধ্যে অতি মৃদু অঙ্গুলি-চালনা করিতে লাগিল। মনে হইল, অজয়ের দেহের সমস্ত রোগযন্ত্রণা নিজের ঐ আঙুলগুলি দিয়া সে যেন শুষিয়া লইতেছে। অজয়ের অস্থিরতা ক্রমে দূর হইয়া গেল, গভীর আরামে তাহার দুই চোখ ভরিয়া তন্দ্রাবেশ নামিয়া আসিতে লাগিল। বীণা হাতটাকে এবার সরাইয়া লইয়া তাহাকে ঘুমাইতে দিবে কিনা ভাবিতেছে, এমন সময় ধীরে সে মাথা তুলিল। তারপর কোনও কথা না বলিয়া, বীণাকেও কোনও কথা বলিবার অবকাশ না দিয়া সেটাকে অকস্মাৎ সে তাহার কোলের উপর নিক্ষেপ করিল। ব্যাপারটাকে ভাল করিয়া উপলব্ধি করিবার আগেই বীণা দেখিল, তাহার কোলে মুখ গুঁজিয়া অজয় দুর্নিবার ক্রন্দনের বেগ রোধ করিতে গিয়া ভাঙিয়া পড়িতেছে। তাহার মাথাটাকে দুই হাত দিয়া তুলিয়া ধরিয়া বীণা বলিল, "কেন, কেন, কি হ'ল আবার? কেন আপনি ও রকম কর্‌ছেন?" বাহুতে ভর দিয়া বীণার পাশে উঠিয়া বসিয়া অজয় নতমস্তকে বলিতে লাগিল, "বন্ধু, আমার বন্ধু, ভাল লাগে, আমার ভাল লাগে, তোমাকে আমার ভাল লাগে, এই কথাটা তোমাকে কতদিন যে আমি বল্‌তে চেয়েছি, বল্‌তে পেয়ে আজ বেঁচে গেলাম।"

বীণা কহিল, "ভাল লাগে সে ত ভাল কথা, তাই নিয়ে এত অস্থির হবার কি আছে?"

অজয় কহিল, "কি ভাল যে লাগে তা বোঝাতে পার্‌ব না। নিজেও বুঝি না ভাল ক'রে সব সময়। আমার জীবনে আর কোনো সান্ত্বনাই ত নেই। তুমি যদি না থাক্‌তে, তোমাকে দিনান্তে একবার যদি না দেখতে পেতাম, তোমার হাসি না শুন্‌তে পেতাম, জ'মে পাথর হয়ে যেতে হত এতদিনে।"

তাহার মাথায়, কপালে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বীণা তাহার কপোল-লগ্ন এক বিন্দু অশ্রু মুছিয়া লইতেছিল, সেই হাতটিকে টানিয়া লইয়া অজয় তাহার উপর নিজের জ্বরতপ্ত ঠোঁট দুটাকে চাপা দিল, বীণা বাধা দিল না। অকস্মাৎ প্রাণপণ শক্তিতে বীণাকে কাছে টানিয়া অজয় তাহার কানে, তাহার আয়ত দুই চোখের পল্লবে, তাহার টলটলে নিটোল ললাটে, সুকুমার দুইটি অধরোষ্ঠে, সুডোল কণ্ঠতটে চুম্বনের পর চুম্বন বৃষ্টি করিয়া তাহার নিঃশ্বাস অপহরণ করিয়া লইল। তাহার কানে কানে বলিতে লাগিল, "বন্ধু, আমার বন্ধু, আমার বন্ধু, আমাকে ভুলিয়ে দাও, আমাকে ভুলিয়ে দাও, আমাকে ভুলিয়ে দাও।"

অজয়ের আলিঙ্গন-পাশ হইতে ধীরে নিজেকে মুক্ত করিয়া তাহার একটি হাতকে নিজের হাতে লইয়া বীণা বলিল, "কি তুমি ভুলতে চাও, বল?"

অজয়ের মুখে কিছুক্ষণ কথা জোগাইল না। হঠাৎ বাধা পাইয়া বিদ্রূপ মনটাকে গুছাইয়া লইবার সে সুযোগ পাইল।

ধীরে কহিল, "আমার নিজেটাকে। নিজেকে নিয়ে আমার সংশয় সমস্যার অন্ত নেই, নিজের সঙ্গে নিজের বিরোধেরও শেষ নেই। আমার হাঁপ ধ'রে গিয়েছে, আমি আর পারি না বন্ধু, তোমায় সত্যিই বল্‌ছি। নিজেকে বড় ক'রেই আমার যত দুঃখ, ভয়, দুরাশা আর ক্লান্তি। এই প্রতি মুহূর্ত্তে নিজেকে উঁচু ক'রে ধ'রে রাখবার চেষ্টা করতে গিয়ে আমি হাঁপিয়ে গিয়েছি, আমার শিরদাঁড়া ভেঙে পড়ছে। তুমি আমায় সব ভুলিয়ে দাও, তোমার হাসি দিয়ে; দুই চোখের দৃষ্টির স্নিগ্ধতা দিয়ে, গানের মত তোমার কণ্ঠস্বরের সুধা দিয়ে। তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে আমি ভুলে যাই যে সংগ্রাম কিছু আছে, কঠোর তপস্যায় নিজেকে ক্ষয় ক'রে পাবার যোগ্য সত্যই পৃথিবীতে কিছু আছে। ভুলে যাই পৃথিবীতে আমার আর কিছুতে প্রয়োজন আছে, আমাকে আর কারুর প্রয়োজন আছে। আমার চারপাশটাকেও তুমি ভুলিয়ে দাও, আমার পরিবার-পরিজন-প্রতিবেশী, আমার দেশ, সে-দেশের অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ।"

বীণার মুখে কি বেদনার রেখা গভীর হইয়া ফুটিয়াছে, তাহার চোখে জল নাই, দুই চোখের তারাতুর ক্লান্ত দৃষ্টি কোন্ সুদূরে আজ নিবদ্ধ। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "হয়ত ভুলিয়ে দিতে পারি। সে-মায়ামন্ত্র হয়ত সত্যিই আমার জানা আছে। কিন্তু তুমি আমার বন্ধু, আমাকেও তুমি বন্ধু ব'লে ডেকেছ। যা-কিছুতে তুমি বেদনা পাও তার থেকে তোমায় দূরে সরিয়ে নিতে পার্‌লেই তোমার সত্যিকারের বন্ধুর কাজ করা হবে কি না, তা আমায় ভেবে দেখতে হবে।"

অজয় অধীর হইয়া বলিল, "তুমিও তাই বল্‌ছ? তোমার কি প্রাণে দয়ামায়া নেই? আমার সুখের কোনো মূল্য তোমার কাছ থেকেও আমি পাব না?"

বাজার ঘুরিয়া বহুক্লেশে কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য গাছগাছড়া সংগ্রহ করিয়া সুভদ্র এই সময় ফিরিয়া আসিল। যতক্ষণ বিমান বাড়ী না আসিল, বীণা বসিয়া গেল। যাইবার সময় একটিও কথা বলিয়া গেল না। একাকী গাড়ীর মধ্যে তাহার দুই কপোল প্লাবিত করিয়া দুর্নিবার অশ্রুর স্রোত বহিয়া আসিল।

পরদিন বীণা অজয়কে দেখিতে গেল না। তার পরের দিনও না। রাত্রিতে ঐন্দ্রিলা জিজ্ঞাসা করিল, "অজয়বাবুকে দেখতে যাচ্ছ না? আবার কি হ'ল তোমাদের?"

বীণা বলিল, "নিজেকে ফাঁকি দেওয়ার পালা শেষ হয়েছে। সে নিজেকে ফাঁকি দিক্ এটাও এখন আর ইচ্ছে করি না।"

"তার মানে?"

"মানে যা তা তোমাকে আগেই বলেছি। আমাকে সে ভালবাসে না। আগে যাও একটু সন্দেহ মনে ছিল, এখন আর তার লেশমাত্র নেই। ভাল সে আমাকে বাসে না, তবু, তবু—"

"তবু কি?"

"তার আগে তুই সত্যি কথা একটা বল্‌বি?"

"সত্যি কথা ছাড়া আর কিছু বলা আমার স্বভাব নয় তা ত জানোই।"

"তা জানি" বলিয়া ঐন্দ্রিলার একটি হাত নিজের হাতে টানিয়া লইয়া বীণা কহিল, "অজয়কে তুই ভালবাসিস্?"

অজয় সম্বন্ধে বীণার প্রায় সমস্ত ব্যবহারকেই অসহ্য ন্যাকামী বলিয়া ঐন্দ্রিলার মনে হইত। ভাল না-হয় সে বাসেই, কিন্তু সে-কথাটাকে এত আড়ম্বরে ঢাক-ঢোল পিটাইয়া জাহির করিবার কি প্রয়োজন? যেন পৃথিবীতে সে-ই একা আজ প্রথম ভালবাসিতেছে। ধরিয়া লওয়া গেল অজয়ও বীণাকে ভালবাসে, কিন্তু ভালবাসা দেওয়া-নেওয়া ব্যাপারটা পৃথিবীতে এতই কি সহজ? সমস্যা কি নাই? সংশয় কি নাই? পাওয়ার পথে সহস্র বিঘ্নের কথা না-হয় ছাড়িয়াই দেওয়া গেল, পাইয়াও ত মানুষে হারায়? বীণা ইহারই মধ্যে এমন কি পাইয়াছে যে অজয় সম্বন্ধে নিজেকে একেবারে নিঃসংশয় ভাবিতেছে? এমন ব্যবহার করিতেছে যেন প্রতিবন্ধক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কোনও সম্ভাবনা কোথাও নাই। আজ যখন প্রতিবন্ধক এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্ভাবনাই বীণার চিত্তাকাশের সমস্তটাকে জুড়িয়াছে তখন তাহার সেই অতিশয়তাকেও অসহ্য ন্যাকামী বলিয়াই ঐন্দ্রিলার বোধ হইল। ঐন্দ্রিলাকেও যে সে দলে টানিবার চেষ্টা করিতেছে ইহাতে সে এত বিরক্ত হইল, যে ভাল করিয়া নিজের মনকে পরীক্ষা না করিয়াই গভীর আত্ম-প্রবঞ্চনার অন্তরাল হইতে বলিয়া উঠিল, "অজয় আমাকে ভালবাসে কেবল তাই ভেবেই তুমি খুশী নও

আমিও তাকে ভালবাসি এও তোমায় শুনতে হবে? সবাইকে নিজের মত ভাবা তোমার এক রোগ। ভালো আমি কাউকে বাসি-টাসি না বাপু।"

"তবে শোন্। আমাকে ভালবাসে না তবু সেদিন আমাকে বুকে ক'রে চুমো খেতে তার বাধেনি।"

"কি বাধেনি?" ঐন্দ্রিলার সারা দেহ আজ আবার কি গভীর উত্তেজনায় কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে।

বীণা বলিল, "বুকে ক'রে চুমো খেতে। আর আমি, আমাকে সে ভালবাসে না জেনেও বাধা দিতে আমার মন ওঠেনি।"

ঐন্দ্রিলা মুখ বাঁকাইয়া বলিল, "বিচিত্র মন!" তারপর একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "তোমাদের সবই বিচিত্র। তবু বলবে সে তোমায় ভালবাসে না? ভালবাসাটা কিসে তাহলে প্রমাণ হয়?"

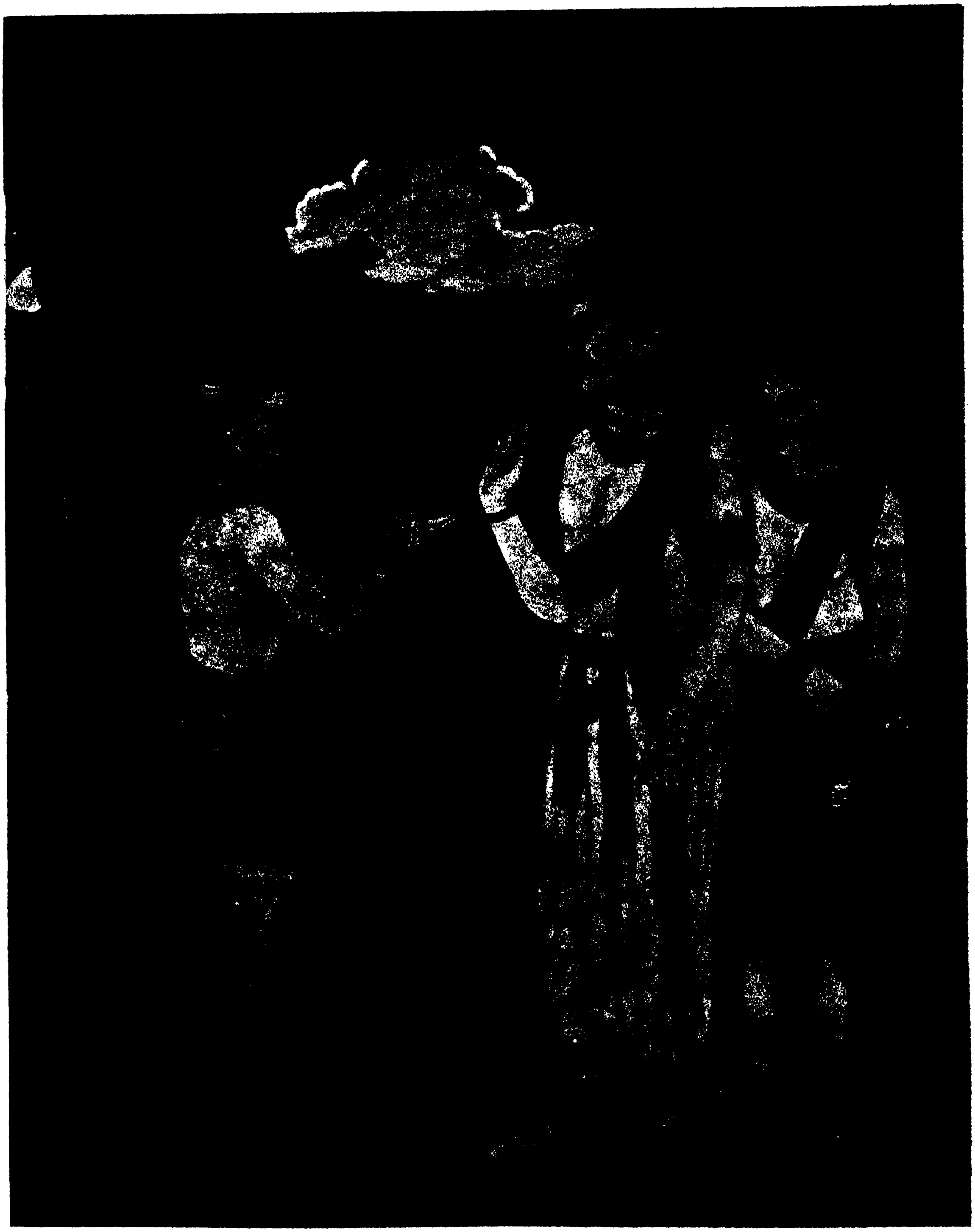
বীণা বলিল, "যাতেই হোক, প্রমাণ আমি কিছু পাইনি। আমার কথাটা বিশ্বাস কর্। আমাকে নিয়ে সে একটা কিছু ভুলতে চায়; কি তা আমি জানি না, নিজে সে স্পষ্ট ক'রে কিছু বলেনি। বলেছে, জীবনে তার অনেক দুঃখ আছে, আমি পারি তাকে সে-সমস্ত ভুলিয়ে দিতে। যেন ভালবাসা দুঃখ পেতে ডরায়। মানুষের আসল যা দুঃখ তা যে ভালবাসার জায়গাতেই তা কি আর আমি বুঝি না? সেই দুঃখের থেকে পরিত্রাণ চায় যে ভালবাসা তা ভালবাসা নামের যোগ্যই নয়।"

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া কাটিলে পর আবার সে-ই প্রথমে কথা কহিল। বলিল, "দেখ্, প্রথম থেকেই ভুল ক'রে সুরু করেছি। অনেক সময় অনেক কারণে মনে হয়েছে সে আমাকে ভালই বুঝি বাসে। এখন বুঝতে পারছি, ভালবাসাটা ছিলই, কিন্তু সে তোর জন্যে। আমার কাছে সব ব্যাপারটা এখন জলের মত পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। দেখতে পাচ্ছিস্ না, আমরা দু-জন পাশাপাশি, একবার একজনকে নিয়ে ভুল বেধে গেলে তারপর সব কিছুরই ভুল মানে বেরুনো কত সহজ?"

ঐন্দ্রিলা বলিয়া উঠিল, "আঃ, ঢের হয়েছে, থামো থামো। তোমার ধারণা পৃথিবীতে মানুষের মন জিনিসটাকে একলা তুমিই কেবল বোঝ, আর যারা আছে তাদের কারুর মাথায় কিছু নেই। বাজে কথা কতগুলো আর ব'লে কি হবে? এইবার চুপ কর। ভাল অনেকেই বাসে, কিন্তু তোমার মত এমন ক'রে মাথা খারাপ খুব বেশী লোকের হয় না।"

সেদিন বেড়াইতে আসিয়া ফিরিয়া যাইবার মুখে সুলতা কহিলেন, "এমন ক'রে কেন রয়েছিস্? কি হয়েচে রে, ইলু?"

ঐন্দ্রিলা কহিল, "কিছু না।" কিন্তু ক্রন্দনের মত একটা আবেগে তাহার মনের আকাশ থমথমে হইয়া রহিল। নিজের কাছে নিজের তাহার আজ এ কি পরাজয়? যে বস্তু তাহার নয় তাহা অন্যে পাইল বলিয়া কেন তাহার এই মর্ম্মদাহ? এ কি ক্ষুদ্রতা তাহার অন্তরে? তাহার মধ্যেকার আশৈশবের সেই তেজোদীপ্ত গর্ব্বিত মানুষটির কথা মনে পড়িয়া তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতে লাগিল। মনে পড়িল, অপরাধ করিলে তাহার মা যখন তাহাকে কঠোর শাস্তি দিতেন, সে বিন্দুমাত্র বেদনা প্রকাশ না করিয়া সেই শাস্তিকে গ্রহণ করিত। একবার মাতা সমস্ত দিনের জন্য তাহার উপর অনাহার-শাস্তি বিধান করিয়াছিলেন। সমস্ত দিনের শেষে বিকালে বাড়ীতে অতিথি-সমাগমের ফলে সে কথা ভুলিয়া গিয়া যখন অতিথিদের জন্য আনীত নানা উৎকৃষ্ট আহার্য্যে থালা সাজাইয়া তাহার সম্মুখে আনিয়া ধরিয়াছিলেন, সে নিজে তাঁহাকে শাস্তির কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিল। সেই তাহার আজ এ কি দুর্গতি হইয়াছে? অন্য তাহার কে যে তাহার জন্য এমন করিয়া সে দুঃখ ভোগ করিতেছে? কেন মনকে বারম্বার বাঁধিতে চাহিয়াও সে বাঁধিতে পারিতেছে না? যে পরাজয় তাহার নয়, কেন সেই পরাজয়ের গ্লানিতে এমন করিয়া তাহার অস্তিত্ব ভরিয়া উঠিতেছে? নানারূপে নিজের মনকে সে বুঝাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। মনে মনে বলিল, এমন হইতে পারিত, কলিকাতায় পড়িতে আসা হইত না। সে অবস্থায় বীণা কি করিতেছে, কাহাকে সে ভালবাসিতেছে, কেহ তাহাকে ফিরিয়া ভালবাসিতেছে কি না তাহা সে জানিতে পাইত না। জানিবার প্রয়োজনও হইত না। এখনই বা সে প্রয়োজন তাহার কেন হইতেছে? কিন্তু মন বুঝিল না। ক্রমে আত্ম-প্রবঞ্চনার আড়াল একটি একটি করিয়া সবগুলিই খসিয়া পড়িতে লাগিল, এমন কোনও কথা বাকী রহিল না যাহা বলিয়া নিজেকে সে ফাঁকি দিতে পারে। তবু



দিলীপ ও সুদক্ষিণার বশিষ্ঠাশ্রম গমন

শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

একবার শেষ চেষ্টা করিয়া ভাবিতে লাগিল, নিষ্কৃতি সত্যই কি নাই? অপরিচয়ের তীর হইতে দু-দিনে যে গভীরতম অন্তরের উপকূলে উত্তীর্ণ হইয়াছিল, তাহাকে দুদিনেই আবার অপরিচয়ের পারে নির্ব্বাসিত করা কি যায় না? নিজের উপর মানুষের এতটুকু জোর কেন থাকিবে না? ভালবাসাই যদি হয়, তাহাই বা মানুষের নিজের অপেক্ষা বেশী শক্তিশালী কেন হইবে?

পরের দিন ভোরের দিকে নরেন্দ্রনারায়ণ আসিয়া পড়িলেন। হৃষীকেশের মহলে, তাঁহার পড়িবার ঘরে পিতা-পুত্রীতে সাক্ষাৎ হইল। নরেন্দ্র ও হৃষীকেশ দুইজনে নিঃশব্দে মুখোমুখি বসিয়াছিলেন, ধীরে অগ্রসর হইয়া গিয়া ঐন্দ্রিলা পিতার পায়ের ধূলা লইল, কিন্তু তাহার সমস্ত মুখ-চোখ ভরিয়া আজ দুরপনেয় বিষাদের ছায়া। এতদিন পর পিতাকে দেখিতে পাইয়া কিছুমাত্র যে সে খুসি হইয়াছে এমন মনে হইল না।

নরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার পরীক্ষা কি হয়ে গিয়েছে?"

সে বলিল, "না, এখনো দিন দশ-বারো দেরি আছে।"

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়াছিল, নরেন্দ্র "আচ্ছা, যাও, তোমার পড়ার ক্ষতি হচ্ছে" বলিতেই সে-ঘর ছাড়িয়া চলিয়া আসিল।

হেমবালার মুখে হর্ষ বা বিষাদ কোনও কিছুরই আজ প্রকাশ নাই। ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে বইখানা এতদিনে প্রায় শেষ হইয়াছে, শেষের দিকে এক জায়গায় কতগুলি কথার কিছুতেই অর্থগ্রহ হইতেছে না, এমন সময় নরেন্দ্র আসিয়া দরজায় দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে ভিতরে আসিতে বলিয়া হেমবালা বইয়ের সেই পাতাটা উল্টাইলেন। তারপর হঠাৎ একসময় বইটা বন্ধ করিয়া বলিলেন, "বোসো।"

তাঁহার হইতে যথেষ্ট দূরেই স্থান নির্দ্দেশ করিয়া স্বামীকে বসিতে বলিয়াছিলেন। তবু নরেন্দ্র বসিলে নিজে আর-একটু সরিয়া বসিয়া বলিলেন, "দাদার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে?"

"হ্যাঁ।"

"দাদা কিছু জানেন না, সন্দেহও কিছু করেন নি।"

"তবে সত্যিই খুব খুশী হলাম।"

"ইলু? ইলু গিয়েছিল তোমার সঙ্গে দেখা করতে?"

"হ্যাঁ, এই ত এইমাত্র তার সঙ্গে দেখা হ'ল।"

কিছুক্ষণের মত স্তব্ধতা। তারপর হেমবালাই আবার কথা কহিলেন।

"আসবার আগে আমাদের ফেরবার সব ব্যবস্থা ক'রে রেখে এসেছ?"

"অন্যরকম ব্যবস্থা কোনোদিন কিছু করা হয়নি।"

"যে-কোনোদিন আমরা এখান থেকে রওনা হ'তে পারি?"

"যখন খুসি পার।"

"ইলুর পরীক্ষাটা হয়ে যাওয়া অবধি হয়ত অপেক্ষা ক'রে যাওয়াই উচিত হবে। আগে সেটা ভাবিনি, এখন মনে হচ্ছে, অনাবশ্যক ওকে উৎপীড়ন না করাই ভাল। তাছাড়া আমাদের অভিপ্রায় ওকে এখন বুঝ্‌তে দিতেও চাই না, সে-সব পরে সময় বুঝে বল্‌লেই হবে।"

"তুমি যা ভালো মনে কর তাই হবে।"

"দাদার ওপরে ইলুর বিয়ের ভার যদি দেওয়া চল্‌ত তাহলে তোমাকে কষ্ট ক'রে আস্‌তে আমি বল্‌তাম না।"

"তা জানি।"

"তবে এটা তোমাকে বল্‌তে পারি, বাইরে যেমনই দেখাক্‌, আসলে মনে মনে ইলু তোমাকে খুব বেশী ভালই বাসে। আমি যে ওর জন্যে এত করেছি, আমি ওর দুচক্ষের বিষ। তুমি বুঝিয়ে বল্‌লে বিয়ে করতে ও খুব সহজেই রাজি হয়ে যাবে।"

"আশা করি হবে।"

হেমবালা আবার কিছুক্ষণ অকারণেই কোলের বইটায় কয়েকটা পাতা উল্টাইলেন, তারপর বলিলেন, "আর একটা কথা গোড়াতেই তোমাকে আমার বলা দরকার। কোথাও কারুর কিছু বোঝবার ভুল থাকে, এ আমি চাই না। আমি যে ফিরে যাচ্ছি তার কারণ একমাত্র এই, যে, ফিরে যাওয়া ছাড়া আমার অন্য উপায় নেই। এদেশে মেয়েজাতকে এমন ক'রেই রাখা হয়েছে, যে কোনো অবস্থাতেই স্বামী ছাড়া তাদের আর গত্যন্তর কিছু না থাকতে পারে। চিঠিতে এসব লিখিনি, লেখা যায় না। তুমি অবস্থাটাকে মেনে নিতে রাজি আছ?"

নরেন্দ্র কহিলেন, "ফিরে যদি এস, কেন ফিরে এলে তা আমি কোনোদিনই জানতে চাইব না।"

বিকালে ঐন্দ্রিলাকে নিভৃতে ডাকিয়া নরেন্দ্রনারায়ণ যখন বলিলেন, তিনি তাহাকে ও তাহার মাকে ফিরিয়া লইতে আসিয়াছেন, তখন ঐন্দ্রিলা দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "আমি ফিরে যাব কি না, তা কিন্তু সম্পূর্ণই মায়ের উপর নির্ভর কর্‌ছে।"

নরেন্দ্র কহিলেন. "তিনি ত তোমাকে নিয়ে যেতেই চাইছেন।"

ঐন্দ্রিলা কহিল, "সে কথা নয়। আমি যাব কিনা ঠিক করবার আগে জান্‌তে চাই, সেবারে ছুটির পর মা কেন হঠাৎ এমন ক'রে, আমার সঙ্গে চ'লে এলেন। সেই থেকে ব্যাপারটাকে একদিনের জন্যে আমি ভুলিনি। এ নিয়ে আমার কতদিনের কত যে সুখশান্তি নষ্ট হয়েছে তার ঠিক নেই। ঐ সম্পর্কে একটাও কথা যদি অস্পষ্ট থাকে, আমি ফিরে যাব না, এ আমি ব'লেই দিচ্ছি। মায়েরই না-হয় উপায় নেই, কিন্তু আমি মাষ্টারী ক'রে খেতে পারব।"

হেমবালাকে নরেন্দ্র কহিলেন, "ইলু সব জান্‌তে চাচ্ছে, তুমি আমার ইতিহাস সমস্তই ওকে বল, আমার দিক্‌ থেকে কোনো বাধা নেই।"

হেমবালা কহিলেন, 'সে আমি কিছুতেই পারব না।"

নরেন্দ্র কহিলেন, "কাজটা দুরূহ, কিন্তু অনুমতি কর যদি ত আমি নিজেই বলি।"

হেমবালা কহিলেন, 'তাও তোমাকে আমি করতে দেব না।"

নরেন্দ্র কহিলেন, "কিন্তু তা না হ'লে মেয়ে যে যাবে না বলছে।"

হেমবালা কহিলেন, "না যাক্‌ না-ই যাবে।"

নরেন্দ্র একটুক্ষণ নতমস্তকে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া হঠাৎ বলিলেন, "তোমাকে নিয়ে যাব, বড় আশা ক'রে এসেছিলাম।"

হেমবালা কহিলেন, "আমি যাব।"

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীমদ্ভাগবত বলেছেন, "অবতারা হ্যসংখ্যেয়াস তত্ত্ব সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ।" যিনি নিখিলপ্রাণের আশ্রয় তাঁর অবতার অসংখ্য। যখনই মানব-সমাজে ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, তখনই এক এক জন মহাপ্রাণ মানবের আবির্ভাব হয় এবং তাঁর দ্বারা সমাজের সমস্ত গ্লানি দূরীভূত হয়।

ভারতের যখন দারুণ দুর্দ্দিন তখন মহামনীষী রাজা রামমোহন রায় আবির্ভূত হ'য়ে ভারতের মুমূর্ষু শরীরে নবজীবন সঞ্চারের সূচনা করেন। মহাত্মা রাজা রামমোহনের সাধনার উত্তরাধিকারী হন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

এই সময়ে একদিকে হিন্দুসমাজ বহুযুগসঞ্চিত কুসংস্কারে ও বুদ্ধিবিচারের অভাবে জড়ত্ব ও বর্ব্বরত্ব আশ্রয় ক'রে বিনাশের পথে চলছিল। আর অপর দিকে যুবকসম্প্রদায় নূতন ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের আস্বাদ পেয়ে ও বিজেতাদের ভিন্নপ্রকৃতির সভ্যতার মোহে স্বদেশের সংস্কৃতির ধারা হারিয়ে বিপথে বিভ্রান্ত হচ্ছিল। স্বাধীন চিন্তার যে নেশা তখনকার নব্য বঙ্গকে পেয়ে বসেছিল তার ফলে দেশের সমস্ত প্রতিষ্ঠান অনুষ্ঠান লণ্ডভণ্ড হয়ে যেতে বসেছিল। এ-কথা ঠিক যে না ভাঙ্‌লে গড়া যায় না। এই ভাঙনেরও দরকার হয়েছিল, এর মধ্যেও ভগবানের শুভসঙ্কেত দেখতে পাওয়া যায়।

এই ভাঙন রোধ ক'রে গঠনের কার্য্যে অবতীর্ণ হন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। তিনি ভারতের শ্রেষ্ঠ আদর্শের ভিত্তির উপরে সর্ব্বদেশের ও সর্ব্বকালের শ্রেষ্ঠ আদর্শ ও সত্যকে স্থাপিত করলেন।

এই শুভকার্য্যে তাঁর সহায় হলেন কেশবচন্দ্র। সৌম্যমূর্ত্তি কেশবচন্দ্র মহর্ষির সহিত মিলিত হবার আগেই মাত্র ১৮ বৎসর বয়সেই আত্মপ্রণোদিত হ'য়ে দেশহিতে মনোনিবেশ করেন।

১৮৫৬ সালে তিনি আমেরিকান ইউনিটেরিয়ান মিশনরী রেভারেণ্ড ডাল ও সুবিখ্যাত পাদরী লং সাহেবের সহিত সম্মিলিত হয়ে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি নামে এক সভা স্থাপন করেন এবং সেই সভার সংস্রবে কলুটোলায় তাঁর নিজের বাড়িতে একটি নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করেন, তাতে তিনি তাঁর বন্ধুদের নিয়ে শিক্ষা দিতেন। পর বৎসর তিনি আপনার বাড়িতে গুড উইল ফ্রেটার্নিটি নামে এক সভা স্থাপন করেন, তাতে তিনি প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য ধর্ম্মাচার্য্যদের গ্রন্থ থেকে অংশ নির্ব্বাচন ক'রে পাঠ করতেন, লিখিত প্রবন্ধ পড়তেন, অথবা মৌখিক বক্তৃতা দিতেন। এই সভাতে তাঁর ভাবী বাগ্মিতার সূত্রপাত হয়। কেশবচন্দ্রের সমাধ্যায়ী বন্ধু ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মধ্যম পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সত্যেন্দ্রনাথের অনুরোধে এক সভার অধিবেশনে মহর্ষি সভাপতিত্ব করেন এবং সেই সূত্রে যুবক কেশবের ধর্ম্মানুরাগ ও বাগ্মিতার প্রমাণ পান।

১৮৫৮ সালে কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর ক'রে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হন।

এর পরে ব্রাহ্মসমাজ নব নব কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করতে লাগল। কেশবচন্দ্র ঐ-সকল কার্য্যের উদ্ভাবনকর্ত্তা আর দেবেন্দ্রনাথ তার পৃষ্ঠপোষক হ'তে লাগলেন। ১৮৫৯ সালে ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপিত হ'ল এবং তাতে কেশব ও দেবেন্দ্রনাথ উপদেশ দিতে লাগলেন, এবং সেই উপদেশামৃত শোন্‌বার জন্যে তখনকার বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু সম্মানিত ছাত্র সেই বিদ্যালয়ে আকৃষ্ট হ'তে লাগলেন।

১৮৬০ সালে সঙ্গত সভা নামে ধর্ম্মালোচনার এক সভা স্থাপিত হয়। এই সঙ্গত সভাই ব্রাহ্মসমাজের আধ্যাত্মিক শক্তির উৎসস্বরূপ হয়েছিল। এখানে যুবকদল অসঙ্কোচে সর্ব্ববিধ প্রশ্ন আলোচনা করতেন, এবং যা সত্য ও পালনীয় ব'লে মনে হ'ত তা কার্য্যে পরিণত করবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হ'তেন।

'ইণ্ডিয়ান মিরার' পাক্ষিক পত্র প্রকাশ, কলিকাতা কলেজ স্থাপন, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার, ও নব্য যুবকদের উদ্বোধিত করার কর্ম্মে কেশবচন্দ্র আত্মনিয়োগ করলেন; এই সময়ে তাঁর প্রসিদ্ধ পুস্তিকা "ইয়ং বেঙ্গল দিস্ ইজ ফর ইউ" প্রকাশিত হ'ল। কেশব নব্যবঙ্গের অবিসম্বাদিত নেতা হ'য়ে দাঁড়ালেন।

১৮৬২ সালের ১লা বৈশাখ দিবসে কেশবচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের দ্বারা কলিকাতা-সমাজের আচার্য্যের পদে বৃত হন এবং ব্রহ্মানন্দ উপাধি প্রাপ্ত হন এবং কেশবচন্দ্রও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে মহর্ষি নামে পরিচিত করেন। ঐ দিন তিনি স্বীয় পত্নীকে ঠাকুরবাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন। এজন্য কেশবচন্দ্রকে কিছুদিনের জন্য বাড়ি থেকে বিতাড়িত হ'তে হয়। কেশবচন্দ্র পুনরায় স্বগৃহে স্বপরিবারের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে তাঁর প্রথম পুত্রের নামকরণের অনুষ্ঠান নবপ্রণীত ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন করেন।

কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মবন্ধু সভা নামে এক সভা স্থাপন করেন, তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার।

কেশবচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে একটি প্রধান সংস্কারকার্য্যে প্রবৃত্ত করেছিলেন—এতদিন পর্য্যন্ত উপবীতধারী উপাচার্য্যগণ ব্রাহ্মসমাজের বেদীতে আসীন হ'য়ে উপাসনার কার্য্য নিষ্পন্ন করতেন। কেশবচন্দ্রের প্ররোচনায় মহর্ষি দুই জন উপবীতত্যাগী উপাচার্য্যকে ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত করেন।

কেশবচন্দ্রের প্ররোচনাতে এই সময়ে দুইটি অসবর্ণ বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কেশবের প্ররোচনায় নিজে উপবীত ত্যাগ করলেও সমাজে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলন সমর্থন করতে পারলেন না। ব্রাহ্মসমাজে বিষম আন্দোলন উপস্থিত হ'ল। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কেশব-বিরোধী দলের হস্তগত হওয়াতে কেশবচন্দ্র "ধর্ম্মতত্ত্ব" নামক অপর এক পত্র প্রকাশ করতে আরম্ভ করলেন এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের উদ্দেশ্য প্রচার ও সমর্থন করতে লাগলেন।

কিন্তু কেশবচন্দ্রকে কলিকাতা-সমাজের সম্পাদকের পদ পরিত্যাগ করতে হ'ল। ব্রাহ্মধর্ম্মকে হিন্দুভাবে হিন্দুসমাজের মধ্যে প্রচার করা মহর্ষির চিরদিনের আদর্শ ছিল। সেই আদর্শের ব্যাঘাতের আশঙ্কাতেই তিনি কেশবচন্দ্রের হাত থেকে সমাজের কর্ত্তৃত্ব প্রত্যাহার করলেন, কিন্তু কেশবের প্রতি তাঁর স্নেহের হ্রাস হ'ল না।

১৮৬৫ সালে কেশবচন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও অঘোরনাথ গুপ্ত মহাশয়েরা পূর্ব্ববঙ্গে প্রচার করতে আসেন। এই সময়ে বহু যুবক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন, এবং পূর্ব্ববঙ্গ বেগে হুলস্থুল প'ড়ে যায়।

এই সময়ে কেশব মহিলাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য

ব্রাহ্মিকা সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে,

"কেবল নারীকুলের উন্নতির জন্ত ব্রাহ্মসমাজ যাহা করিয়াছেন, কেবল সেই কারণেই ইহার মস্তকে দেশহিতৈষী ব্যক্তিগণের আশীর্ব্বাদ-পুষ্প বৃষ্টি হওয়া উচিত।"

১৮৬৩ সালে কেশবচন্দ্রের অনুরোধে মহর্ষি মাঘোৎসবের সময়ে সমাজের বেদীর পার্শ্বে পর্দ্দার আড়ালে মহিলাদের বসবার বন্দোবস্ত করেন। ব্রাহ্মসমাজের তথা বাংলার ইতিহাসে এই প্রথম মহিলাগণ পুরুষদের সঙ্গে এক সভায় আসন গ্রহণ করলেন। মহিলাদের মধ্যে মহা উৎসাহের সঞ্চার হ'ল। এর পরে কেশবচন্দ্র মহিলাদের নিয়ে ডাক্তার রবসন নামক এক খ্রীষ্টীয় পাদরীর বাড়িতে সান্ধ্য সমিতিতে যোগ দিতে যান। শহরের বড় ঘরের মেয়েদের প্রকাশ্য স্থানে যাওয়া এই প্রথম। এই ব্যাপার নিয়ে সংবাদপত্রে মহা আন্দোলন হয়, এবং দেশের লোকে ব্রাহ্মদের সর্ব্বনেশে দল বলতে আরম্ভ করে। তখন বাংলা দেশে একটা প্রবাদ প্রচলিত হ'ল যে, জাত মারলে তিন সেন—হোটেলওয়ালা উইলসেন, ইষ্টিসেন আর কেশব সেন।

কেশবচন্দ্র অসাধারণ উদারতার বশে নানা দেশের ও নানা কালের ধর্ম্মপ্রচারক সাধু মহাত্মাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রকাশ্যভাবে প্রচার করতে আরম্ভ করেন; যিশুখৃষ্টের প্রতি ও মহম্মদের প্রতি যেমন তাঁর ভক্তি প্রকাশ পেল, চৈতন্যদেব, নানক প্রভৃতির প্রতিও তেমনি ভক্তি প্রকাশ পেতে লাগল। কিন্তু দেশের লোকে কেশবের খৃষ্টভক্তি দেখে তাঁকে খৃষ্টান মনে ক'রে মহা আন্দোলন উপস্থিত করলেন, এবং তার সঙ্গে কলিকাতা-সমাজের সভ্যেরাও যোগ দিলেন। কাজেই কেশবের সঙ্গে কলিকাতা-সমাজের বিচ্ছেদ অপরিহার্য্য হ'য়ে উঠল।

১৮৬৬ সালে কেশবচন্দ্র পৃথক্ ভাবে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করলেন এবং মহর্ষি কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের নাম পরিবর্ত্তন ক'রে নূতন নাম দিলেন আদি-ব্রাহ্মসমাজ।

কেশবচন্দ্র দৈনিক উপাসনা প্রবর্ত্তন করলেন। নবভক্তির আবেগে তাঁরা চৈতন্যদেবের ভক্তিতত্ত্ব আলোচনা করতে লাগলেন, এবং পথে পথে খোল করতাল সহযোগে সঙ্কীর্ত্তন ক'রে বেড়াতে লাগলেন। সেই কীর্ত্তনে প্রচারিত হ'তে লাগল—

নর-নারী সাধারণের সমান অধিকার,
যার আছে ভক্তি, পাবে মুক্তি, নাহি জাত-বিচার।

এই কথা এখনও উন্নতিশীল ব্রাহ্মদের মূলমন্ত্র হ'য়ে রয়েছে।

১৮৭০ সালে কেশবচন্দ্র বিলাতে যান। সেখানে মহারাণী ভিক্টোরিয়া থেকে সাধারণ লোক সকলে, এমন কি খৃষ্টান পাদরীরা পর্য্যন্ত, তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনে ত্রুটি করেন নি।

স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন ক'রেই তিনি দেশের সর্ব্ববিধ সংস্কার-কার্য্যে মনোনিবেশ করেন। ভারত সংস্কার সভা প্রতিষ্ঠা ক'রে তার সংস্রবে সুলভ সাহিত্য প্রচারের, নৈশবিদ্যালয় পরিচালনার, স্ত্রীশিক্ষা ও সার্ব্বজনীন শিক্ষার প্রচারের, এবং সুরাপান নিবারণের চেষ্টায় তিনি আত্মনিয়োগ করেন।

১৮৭২ সালে তিনিই চেষ্টা ক'রে ব্রাহ্মদের বিবাহ সম্বন্ধীয় বিধি প্রবর্ত্তন করান। এই সময়েই মহিলারা পর্দ্দার বাহিরে আসন গ্রহণ ক'রে উপাসনায় যোগ দিতে লাগলেন এবং দেশ থেকে পর্দ্দা উঠে যাওয়ার শুভসূচনা হ'ল। তিনি উদ্যোগী হয়ে বিধবা বিবাহ নাটক অভিনয় করান এবং নিজে একজন অভিনেতা হয়েছিলেন।

১৮৭৮ সালে কেশবচন্দ্র কোচবিহারের নাবালক মহারাজার সহিত তাঁর বালিকা কন্যার বিবাহ দিতে সম্মতি প্রকাশ করেন। অনেকে এই বিবাহের প্রতিবাদ করেন। কেউ কেউ বলেন যে, কেশবচন্দ্র ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ অন্তরে লাভ ক'রে এতে সম্মতি দিয়েছিলেন। শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার লিখেছেন যে, একদিন কেশব দেখেন যে মহারাজা ও সুনীতি দেবী পরস্পরের হাত ধ'রে ব'সে আছেন, এবং এতে তাঁদের পরস্পরের অনুরাগের পরিচয় পেয়ে পাতিব্রত্যের পবিত্র আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যই তিনি এই বিবাহে সম্মতি দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

কিন্তু এর ফলে আবার ব্রাহ্মদের মধ্যে দুই দল হ'ল। কেশবচন্দ্রকে সমাজের আচার্য্যের পদ থেকে অপসৃত করবার চেষ্টা যখন বিফল হ'ল তখন কেশবচন্দ্রের কার্য্যের প্রতিবাদ স্বরূপ অনেক ব্রাহ্ম স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপন করলেন, এবং সেই সমাজই এখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ নামে অভিহিত হচ্ছে।

কেশবচন্দ্র ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের নাম পরিবর্ত্তন ক'রে

নববিধান সমাজ রাখলেন এবং ভগ্ন সমাজকে পুনর্গঠন করতে চেষ্টা করতে লাগলেন।

এই গুরু পরিশ্রমে ও চিন্তায় উদ্বেগে তাঁর স্বাস্থ্য ভগ্ন হয়, এবং ১৮৮৪ সালে তাঁর প্রাণবিয়োগ ঘটে।

কেশবচন্দ্র লোকোত্তর মহামানুষ ছিলেন। কেশবচন্দ্র পরম ভক্ত সাধু মহাত্মা ছিলেন। তাঁর ঈশ্বরোপলব্ধি সত্য জীবন্ত, তাঁর বাণীর মধ্যে যেন অগ্নিজ্বালা নির্গত হয়। তাঁর নিকটে ঈশ্বরবিশ্বাস কিরূপ সত্য ও জীবন্ত ছিল তা তাঁর দু-একটি বাণী অনুধাবন করলেই বুঝতে পারা যায়। কেশব ছিলেন ব্রহ্মশক্তির অগ্নিময় অভিব্যক্তি, ব্রহ্মবাণীর প্রতিধ্বনি।

"The God of faith is the sublime I AM. In time He is always NOW, in space always HERE.

"As outwardly in all objects, so inwardly in the recesses of the heart, faith beholdeth the Living God.

"The eyes close, and the inward Kingdom revealeth God. The eyes open, and all objects in external nature reveal the resplendent spirit and breathe His presence. Thus within and without, faith liveth always in the midst of blazing fire, the fire of God's presence."—True Faith.

তাঁর কাছে বিশ্বাস মানে ব্রহ্মস্বরূপত্ব লাভের প্রয়াস—

"Faith is perpetual progress heavenward."

এই বিশ্বাস পরিপক্বতা লাভ করলে প্রেমোদয় হয় এবং সে প্রেম ঈশ্বর, মনুষ্য ও সর্ব্বজীবে সমভাবে পরিব্যাপ্ত হয়।

The maturity of faith is love, for love completeth the union which faith beginneth.

As love makes man one with Divinity, so, it makes man one with Humanity. Love is a heavenly passion that rolls ceaselessly onward. Love's growth is illimitable; it admits of infinite expansion...when it grows forth it knows no bound.

এই প্রেমের মূল হচ্ছে আত্মত্যাগ—

Self-sacrifice is a necessity in the kingdom of love. Love comes in when self has gone out. Love grows when self withers away.

কেশবচন্দ্র রাজা রামমোহনের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে পাশ্চাত্য জাতির সঙ্গে ভারতের আধ্যাত্মিক যোগ স্থাপন করতে সেদেশে গিয়েছিলেন, অথচ ভারতের স্বাতন্ত্র্য ও ভারতের বাণীকে তিনি কখনও বিস্মৃত হন নি। স্বাধীনতা ছিল তাঁর চরিত্রের একটি প্রধান বিশেষত্ব, এবং ভারতের জাতীয়তাবোধকে সুস্পষ্ট ভাবে উদ্বুদ্ধ করেন প্রথমে কেশবচন্দ্র। তাঁর কাছে স্বাধীনতা মানে দেহ-মনের সর্ব্বাঙ্গীন প্রমুক্তি, বুদ্ধির মুক্তি, বিশ্বাসের মুক্তি, আচারের মুক্তি, বিচারের মুক্তি। স্বাধীনতা সম্বন্ধে তাঁর বাণী প্রণিধানযোগ্য।

"স্বাধীনতাই হইল আদি শব্দ। অধীনতার শৃঙ্খলে শরীর-মনকে বদ্ধ হইতে দেওয়া হইবে না...দাস হওয়াই পাপ। আসক্তি-সংসারের রাজা হইলে মরিতে হয়। যে বাড়ীতে যাই রাগ বলে দেখ আমার কত দাস-দাসী, লোভ বলে দেখ কত আমার চাকর। দাসত্ববিধি সকলের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া একেবারে পোড়াইয়া মারিতেছে। হা বিধাতঃ, স্বাধীনতা যে মুক্তি, অধীনতা যে নরক!...ঈশ্বরের আমরা অধীন, এইজন্যই সম্পূর্ণ স্বাধীন।"—জীবনবেদ।

"হে দয়াময়, হে স্বাধীন পুরুষ, মহামন্ত্র স্বাধীনতা কী আশ্চর্য্য মন্ত্র। দয়া করিয়া যদি আমাকে এই মন্ত্রে দীক্ষিত করিবে, তবে আমার ও আমার ভাই-ভগ্নীর মঙ্গলের জন্য আমাদিগের সকলের মধ্যে স্বাধীনতার ভাব বৃদ্ধি করিয়া দাও।

অধীনতা মানুষকে মারিয়া ফেলিতেছে। স্বাধীনতা-প্রদাতা কোথায় রহিলে? মানুষ কেন এত কষ্ট পাইতেছে? অধীনতা-ভাবের সঙ্গে একবার যুদ্ধ আরম্ভ হউক। মা শক্তিরূপা, হুঙ্কারে শত্রুদল তাড়াও! আর পরের দাসত্ব করিব না! বুঝিতেছি মা, অধীনতা-দাসত্ব ভয়ানক নরক।"

কেশবচন্দ্রের পাপবোধ অসামান্য প্রবল ছিল। এই পাপবোধ তাঁহার অন্তরে অতি বাল্যকালেই প্রকাশিত হয়।

পাপ বল্‌তে কেশবচন্দ্র কি বুঝতেন তা তাঁর বাক্য থেকেই আমরা জান্‌তে পারি—

"চুরি ডাকাতি, পরদ্রব্যহরণকে পৃথিবীর অভিধানে পাপ বলে। যিনি তোমাদের নিকটে এখন কথা কহিতেছেন, ইঁহার অভিধানে পাপ গ্লানি, পাপ ব্যাধি, পাপ অসুস্থাবস্থা, পাপ দৌর্ব্বল্য, পাপ পাপ-করিবার সম্ভাবনা। আমি পাপকে পাপ বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকি নাই, পাপের সম্ভাবনাকে ভয়ঙ্কর দেখিয়াছি।...জড়তা দৌর্ব্বল্য আসক্তি কতই হৃদয়ের ভিতরে। ...দেখি কেবলই পাপ।

টাউন-হলের প্রসিদ্ধ বক্তৃতা Am I an Inspired Prophet—তার মধ্যেও এই পাপবোধের কথা আছে—

Whenever I go to my God to pray, I see that there is something terribly foul in me which must be cleansed. Actually I may not have committed all these sins. But what of that? A sinner is judged not by his actual performance of sinful deeds, but by his sinful propensities. The seat of corruption is not in the hand, but in the heart. Not what is actual, but what is potential, shows our real character. I take into account not only what I am today, but what I may be tomorrow. I see the roots of all vices and iniquities in my mind.

কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে তাঁর সমসাময়িক বহু মনীষী যে সাক্ষ্য রেখে গেছেন তা দেখ্‌লে আমরা বুঝ্‌তে পারি যে তিনি কত বড় প্রভাবশালী লোক ছিলেন।

ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় তাঁর 'সাহিত্যমঙ্গল' পুস্তকে লিখেছেন—

পাশ্চাত্যশিক্ষাপ্রপীড়িত, বেকন-বিলোড়িত-মস্তিষ্ক এপিকিউরাস-শিষ্যদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দিতে তিনিই অধিকতর সমর্থ, বিধিমতপ্রকারে উপযুক্ত। পাশ্চাত্য প্রত্যক্ষ বিজ্ঞানের অদ্যকার প্রধান প্রশ্ন—সামঞ্জস্য। নববিধানাচার্য্যের নব বিধানের অবতারণা সামঞ্জস্য ও সমন্বয়ের জন্য।

কেশবচন্দ্রের ধর্ম্ম যে সামঞ্জস্যের ও সমন্বয়ের এ কথা তিনি নিজেও ব'লে গেছেন।

The new faith is absolutely synthetical. Its life is in unity above everything else. It values synthesis above analysis, one above many.

As a member of the Universal Theistic Church, I have protested against all manner of sectarian antipathy and unbrotherliness, and advocated the unification of all churches and sects in the love of one True God. All nations are pressing forward to the Kingdom of God. Let not India sleep or lag behind. Rouse up the millions of her sons and daughters, and cast off the fetters with which they are enchained to idolatry and caste...Preach not lifeless dogmas or creeds; form no narrow sect or clan. Faith in the living God is your only creed—a creed of fiery enthusiasm and invincible power...And let your words be of love and peace, not of sectarian antipathy. Love all parties, and gratefully accept all that is good and true in each.

অতএব ভিক্টোরিয়া-মেমোরিয়াল-হলে কেশবের যে প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে তার কাছে বাইবেল, আবেস্তা, ঋগ্‌বেদ ও কোরান স্থাপন করা সঙ্গতই হয়েছে—কারণ সর্ব্বদেশের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মগুলির সমন্বয় হয়েছে তাঁর মধ্যে।

কেশবচন্দ্রের আন্তরিকতা ও অসাধারণ ওজস্বী বাগ্মিতার সাক্ষ্য বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি দিয়ে গেছেন—

Rev. R. T. Davis of England—

I have been reading Keshub Chunder Sen's addresses, and seem to be caught in a rhythm of flame, as if listening to a fervent living voice of a man of fire.

Swami Vivekananda—

The genuine orator exercises a sort of hypnotism over his audience. I have listened to many orators, Indian, English and American; but Keshabchandra Sen is easily the greatest of all.

N. G. Chandavarkar—

I have heard several orators both in this country and in England; but Keshabchandra Sen's oratory stands distinguished in my memory by the fact that it was the oratory of a God-inspired man...It is as a God-inspired man that Keshabchandra Sen deserves to live immortal in the hearts of his countrymen.

T. E. Stephens, Liberal leader—

Throughout this never-to-be-forgotten oration he held his audience spell-bound and enraptured. His voice so melodious and persuasive, seemed like music to responsive ears; and his words themselves at times were heard as if they were descending from a region of light and glory which the audience had not before experienced.

Surendranath Banerjea—

His was the word that broke the spell, that roused the sleeper from his sleep, and communicated the flutter of a new life into an all but dead system.

Robert Knight—

When Keshub speaks the world listens.

শিবনাথ শাস্ত্রী বলেছেন—

সেই কালের মধ্যে বঙ্গসমাজে চারিটি শক্তি দেখা দিল।...চারিটি মানুষ, কেশবচন্দ্র সেন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র ও দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, এই কালের মধ্যে বঙ্গবাসীর চিত্তকে বিশেষ ভাবে অধিকার করিয়াছিলেন।

বাস্তবিক কেশবচন্দ্রের কাছে বাংলা দেশ নানাপ্রকারে ঋণী। রাজা রামমোহন রায় যেমন বাংলা গদ্যকে আকার দিয়েছিলেন, কেশবচন্দ্র তেমনি তাতে প্রাণসঞ্চার করেছিলেন। রামমোহনের পরে মহর্ষি, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি গদ্য রচনার দ্বারা বাংলা ভাষাকে সৌষ্ঠবশালী করছিলেন বটে, কিন্তু কেশবচন্দ্র তাতে লালিত্য মাধুর্য্য আনয়ন করলেন, যা বঙ্কিমের হাতে অধিকতর পরিমার্জিত হ'ল। রামমোহনের পরে ও বঙ্কিমের পূর্ব্বে কেশবচন্দ্রের গদ্য রচনাই সরল সরস প্রাঞ্জল ভাবে অপূর্ব্ব শ্রীমণ্ডিত দেখতে পাই। সাহিত্যের ইতিহাসে কেশবচন্দ্রের এই দানের কথা আমরা বিস্মৃত হ'তে বসেছি। তিনি যে তাঁর শিষ্যমণ্ডলীর দ্বারা অনুবাদের ভিতর দিয়ে অন্য ভাষার ও অন্য ধর্ম্মের ভাবসম্পদের সহিত আমাদের পরিচয় সাধন করতে চেয়েছিলেন সে-কথাও আমরা ভুলে যেতে বসেছি। আর কেশবচন্দ্রই প্রথমে বাংলা রচনায় মিষ্টিসিজম্ আনয়ন করেন। একটি মাত্র উদাহরণ এখানে উদ্ধৃত ক'রে দেখাতে চাই তাঁর ভাষার লালিত্য ও ভাবের গূঢ়বাদ—

"সুখ কি পেয়েছ! তোমার সিঁদুরের মতো ঠোঁট দেখে আমার কালো ঠোঁট সিঁদুর হ'য়ে গেল। হাসিতে কেঁপে উঠলে! এ কী হয়েছে! আমি তোমার হাসিতে মিশিয়ে যাব।"

"তোমার প্রেমখানা ভারি কোমল, ফুলগুলোও টিপ্‌লে বোধ হয় যেন পাথর তোমার প্রেমের তুলনায়।

"হে পুণ্যময় জগদীশ, ইচ্ছা করে দৌড়ে গিয়ে গায়ে হাত দি তোমার! কেন এমন সুন্দর হ'য়ে এলে! আপনার মুখ আপনি আঁক, এ বেদেও নাই, কোরানেও নাই।"

কেশবচন্দ্র সাধক দ্রষ্টাঋষি ছিলেন। মানুষ অনেক আসে, অনেক চ'লে যায়। কে তাদের খবর রাখে। তারা অপর মানুষের প্রতিধ্বনি, তাদের গায়ে ধর্ম্মের ছাপ, সম্প্রদায়ের ছাপ, শাস্ত্রের ছাপ। মাঝে মাঝে হঠাৎ অগ্নিবরণ কেতন উড়িয়ে এক একজন মানুষ আসেন, যাঁরা গির্জ্জার নন, মসজিদের নন, কোনো বিশেষ দেশের বা কালের নন। তাঁরা পুরাতন জীর্ণতাকে উন্মূলিত ক'রে নবযুগের সৃষ্টি করেন, তাঁদের সংস্পর্শে জড় জীবন্ত হ'য়ে ওঠে। তাঁদের প্রাণ অগ্নিশিখার ন্যায় জ্যোতির্ম্ময়, দুরন্ত স্বাধীন তাঁরা, একমাত্র সত্যের পূজারী। তাঁরা চিরদিন যুবধর্ম্মী, অশান্ত, বিদ্রোহী, চলার মন্ত্র বিলাবার জন্য তাঁরা পথিক। কেশবচন্দ্র এই দলের একজন শ্রেষ্ঠ লোক ছিলেন। তাই আজ বাঙালী শ্রদ্ধানত মস্তকে তাঁকে প্রণাম করছে। তাঁর মহান্ আদর্শ বাঙালীকে অনুপ্রাণিত করুক।*

* পূর্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজে কেশবচন্দ্র-স্মৃতি সভায় পঠিত।

ছেলে-মেয়েদের একত্র বিদ্যা-শিক্ষা

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

বালক ও যুবকদের শিক্ষা যেমন আবশ্যক, বালিকা ও যুবতীদের শিক্ষাও যে সেইরূপ আবশ্যক, শিক্ষিত লোকদের মধ্যে ইহা এখন আর তর্কবিতর্কের বিষয় নাই মনে করা যাইতে পারে। কাহাদের শিক্ষা কিরূপ হওয়া উচিত সে-বিষয়ে আলোচনা অবশ্য হইতে পারে এবং হওয়া উচিত। তাহাতে এখন প্রবৃত্ত না হইয়া দেখিতে চাই, মেয়েদের শিক্ষা কি প্রকারে দেওয়া যাইতে পারে।

পুরুষদের শিক্ষার চেয়ে মেয়েদের শিক্ষা একটি কারণে বেশী প্রয়োজনীয় মনে করা যাইতে পারে। সেই কারণটি এই যে, কোন বাড়ির কর্ত্তা শিক্ষিত হইলেও ছেলে-মেয়ে সকলেরই শিক্ষার বন্দোবস্ত তিনি না করিতে পারেন। কিন্তু তাহার কর্ত্রী শিক্ষিতা হইলে তিনি সে-বাড়ির বালকবালিকা সকলেরই বিদ্যালাভের জন্য নিশ্চয়ই যত্নবতী হইবেন। এই কারণে বোম্বাই প্রেসিডেন্সির গোণ্ডাল রাজ্যের ঠাকোর সাহেব (অর্থাৎ রাজা) তাঁহার রাজ্যে বালিকাদের শিক্ষাই আগে আবশ্যিক (compulsory) করিয়াছেন।

ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষের কোন প্রদেশেই ছেলেদের ও মেয়েদের শিক্ষার জন্য সমান যত্ন করা হয় না, মেয়েদের শিক্ষার জন্য বেশী যত্ন করা ত হয়-ই না। এই জন্য সর্ব্বত্রই দেখা যায়, শিশু হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত পুরুষজাতীয় মানুষদের মধ্যে লিখনপঠনক্ষম যত লোক আছে, নারী-জাতীয় মানুষদের মধ্যে লিখনপঠনক্ষম লোকের সংখ্যা তার চেয়ে ঢের কম। বাংলা দেশকে শিক্ষায় অনেকটা অগ্রসর মনে করা হয়। বাংলা দেশেরই দৃষ্টান্ত লওয়া যাক্। ১৯৩১ সালের সেন্সস্ অনুসারে বঙ্গে পুরুষজাতীয় মানুষদের মধ্যে লিখনপঠনক্ষম ৪০,৭৮,৭৭৪ জন এবং নারীজাতীয় মানুষদের মধ্যে লিখনপঠনক্ষম ৬,৬৪,৫০৭ জন। লিখনপঠনক্ষম নারীর সংখ্যা লিখনপঠনক্ষম পুরুষের সংখ্যার ষষ্ঠাংশেরও কম। সুতরাং এখন বাংলা দেশের অধিবাসীদের ও বাংলা গবর্ণমেণ্টের নারীশিক্ষায় খুব বেশী মন দেওয়া উচিত। পুরুষদের শিক্ষার জন্য বঙ্গে যত প্রতিষ্ঠান আছে, নারীদের শিক্ষার জন্য তার চেয়ে বেশী প্রতিষ্ঠান থাকিলেও অন্যায় হয় না, উভয় জাতির শিক্ষার জন্য সমানসংখ্যক প্রতিষ্ঠান থাকা ত একান্ত আবশ্যক। কিন্তু বাস্তবিক আমরা কি দেখিতে পাই? ১৯৩০–৩১ সালের বঙ্গীয় শিক্ষারিপোর্টের পরবর্ত্তী রিপোর্ট এখনও আমরা পাই নাই, বোধ হয় উহা এখনও প্রকাশিত হয় নাই। সেই জন্য আমরা ১৯৩০–৩১ সালের রিপোর্টে মুদ্রিত অঙ্কগুলি এখানে ব্যবহার করিব। ঐ সালে ছেলেদের ও মেয়েদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর বিদ্যালয় কত ছিল, তাহা নীচের তালিকায় দৃষ্ট হইবে।

	উচ্চ ইংরেজী	মধ্য ইংরেজী	মধ্য বাংলা	প্রাইমারী
ছেলেদের	১০৫৫	১৮১৫	৫৪	৪২৭১২
মেয়েদের	৩৪	৫১	১২	১৬৯৭৭

এই তালিকায় দেখা যাইবে, যে, মেয়েদের প্রাইমারী শিক্ষার ব্যবস্থা যাহা কিছু আছে;

শিক্ষক প্রস্তুত করিবার জন্য ট্রেণিং স্কুলের সংখ্যা ৯২টি; শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত ট্রেণিং স্কুলের সংখ্যা ১০টি।

কেবল মেয়েদের জন্য কলেজ আছে ৪টি। তাহার মধ্যে একটি এ বৎসর উঠিয়া গিয়াছে। ছেলেদের জন্য আছে ৪৪টি। মেয়েদের জন্য যথেষ্ট কলেজ না থাকায় কিছু দিন হইতে অনেক ছেলেদের কলেজেও মেয়েরা পড়িতেছে।

মোটামুটি এই ধারণা অনেকেরই আছে যে, মেয়েদের শিক্ষার জন্য বঙ্গে যথেষ্ট বন্দোবস্ত ও সুবিধা নাই।

উপরে প্রদত্ত অঙ্কগুলি হইতে সে-বিষয়ে স্পষ্টতর ধারণা জন্মিবে। এই অবস্থার উন্নতি কি প্রকারে হইতে পারে, তাহা বিবেচনা করা দরকার।

গণিত প্রভৃতি নানা রকম বিজ্ঞান, ভূগোল ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ের জ্ঞান ছেলেদের যেমন দরকার, মেয়েদেরও তেমনি দরকার। সাহিত্য ও দর্শন সম্বন্ধেও মোটামুটি একথা খাটে। কোন কোন বিষয়ের অনুশীলন পুরুষদের যে-দিক্ দিয়া করা দরকার, মেয়েদের তার থেকে ভিন্ন দিক্ দিয়া করা দরকার, এরূপ একটি মতের অস্তিত্ব আমি অবগত আছি। তাহার আলোচনা আমি করিব না। এখানে আমি কেবল ইহাই বলিতেছি, যে, পুরুষ ও নারীর সাধারণ মানবত্ব বিবেচনা করিলে কতকগুলি বিষয়ের জ্ঞান উভয়েরই সমান আবশ্যক, স্বীকৃত হইবে। সেই বিষয়গুলি ছাড়া অন্য কতকগুলি বিষয় আছে, যাহা, মেয়েদের কার্য্যক্ষেত্রের বিশেষত্ব বিবেচনা করিলে, তাহাদের অবশ্য শিক্ষণীয়। বিশেষত্বটি এই যে, অধিকাংশ নারীকে পুরুষদের চেয়ে বেশী সময় ও শক্তি গৃহস্থালীর জন্য ব্যয় করিতে হয়। অতএব তাঁহাদের শিক্ষা পূর্ব্ববর্ণিত নানাদিকে পুরুষদের সমান হইতে পারে, কিন্তু তাছাড়া তাঁহাদিগকে গৃহস্থালীও শিখিতে হইবে। গৃহস্থালী বলিতে কেবল সংকীর্ণ কিছু—রন্ধন, গৃহমার্জ্জন ও বস্ত্র প্রক্ষালন—বুঝিলে চলিবে না, যদিও এগুলি তুচ্ছ নয় বরং অত্যাবশ্যক। পাশ্চাত্য দেশসমূহে ডোমেষ্টিক সায়েন্স বা গার্হস্থ্য বিজ্ঞান বলিতে কত কি বুঝায়, তাহা জানা দরকার। তাহার বর্ণনা এখানে করিব না।

আমেরিকাতে নারীদের শিক্ষা খুব অগ্রসর হইয়াছে। তথাকার নারী-শিক্ষার বিশিষ্টতা বৃদ্ধি ও রক্ষার জন্য যে সব চেষ্টা হইতেছে, তাহা ইণ্ডিয়া এণ্ড দি ওয়ারল্ড (India and the World) কাগজের গত এপ্রিল সংখ্যায় একজন আমেরিকান মহিলার লিখিত একটি প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত নিম্নমুদ্রিত বাক্যগুলি হইতে বুঝা যাইবে:—

"In the years that have passed since 1900, and specially in the last few years, efforts have been made to adapt more nearly to existing needs in the College currricula for women. Having proved their intellectual abilities, women now freely admit that they are now directly concerned with home, marriage, children and human relationships, and they wish to be prepared to deal effectively with these most fundamental matters."

তাৎপর্য্য—"১৯০০ সালের পরে, বিশেষ করিয়া গত কয়েক বৎসরে, কলেজে মেয়েদের শিক্ষণীয় বিষয়গুলি তাহাদের প্রয়োজনের অধিকতর অনুযায়ী করিবার চেষ্টা হইয়াছে। মেয়েরা [যে অন্যের মত উচ্চবিদ্যা আয়ত্ত ও পরীক্ষায় পাস করিয়া] নিজেদের বুদ্ধিশক্তি প্রমাণিত

সামাজিক নানা সম্পর্কের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ আছে, এবং তাহারা এই প্রকার সমাজ ভিত্তিভূত ব্যাপারসমূহের উপযুক্ত ব্যবহার করিবার জন্ত প্রস্তুত হইতে চায়।"

এইরূপ আরও অনেক কথা উদ্ধৃত করিতে পারা যায়। কেবল আর দুটি বাক্য উদ্ধৃত করিব।

"The White House Conference on Child Health and Protection included in its series of reports published in 1932 a report on "Education for Home and Family Life in Colleges." This showed that Colleges—men's, women's and co-educational, are showing an increasing tendency to provide courses that will help students to meet the responsibilities of marriage, parenthood, and family life."

"শিশুরক্ষা ও শিশুস্বাস্থ্য সম্বন্ধে হোয়াইট হাউস্ কন্‌ফারেন্স যে-সব রিপোর্ট ১৯৩২ সালে প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে একটি রিপোর্ট ছিল "গৃহস্থালী ও পারিবারিক জীবনের জন্ত কলেজে প্রদত্ত শিক্ষা" বিষয়ে। ইহা হইতে বুঝা গিয়াছিল যে, পুরুষদের, নারীদের, এবং সহাধ্যয়নের কলেজগুলির ক্রমবর্দ্ধমান গতি দেখা যাইতেছে, সেই সকল বিষয়ে শিক্ষা দিবার দিকে যেগুলি ছাত্রছাত্রীদিগকে বিবাহ, পিতৃত্ব, মাতৃত্ব এবং পারিবারিক জীবনের দায়িত্ব বহন করিতে সমর্থ করিবে।"

ইহা হইতে বুঝা যাইবে, আমেরিকায় মেয়েদের সাধারণ উচ্চশিক্ষা না কমাইয়া তাহাদিগকে পারিবারিক জীবনের জন্ত অধিক উপযুক্ত করা হইতেছে।

বালিকা ও নারীদের জন্ত বঙ্গে যথেষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নাই, তাহা আগে দেখাইয়াছি। বঙ্গের অধিবাসীরা এবং বাংলা গবর্ণমেণ্ট আন্তরিক চেষ্টা করিলে মেয়েদের জন্ত যথেষ্ট স্কুলকলেজ স্থাপিত হইতে পারে। বর্ত্তমানে সেরূপ আন্তরিক চেষ্টা নাই, ইচ্ছাও নাই। কিন্তু মেয়েদের শিক্ষা ত হওয়া চাই। সেই জন্ত কথা উঠিয়াছে যে, ছেলেদের জন্ত যত পাঠশালা, স্কুল ও কলেজ আছে, তাহাতে মেয়েদিগকেও ভর্ত্তি হইবার ও শিক্ষা লাভ করিবার সুযোগ দেওয়া হউক। তাহাতে মেয়েদের বিশেষ করিয়া যে-বিষয়গুলি শেখা দরকার, তাহা শিখিতে না পারিলেও ছেলে ও মেয়ে উভয়েরই সাধারণ শিক্ষণীয় বিষয়গুলি তাহারা শিখিতে পারিবে। কোন কোন কলেজে ছেলেমেয়েদের সহাধ্যয়নের বন্দোবস্ত আছে। ছেলেদের অনেক কলেজে মেয়েদের লওয়া হয় না। কোনও স্কুলে ছেলেমেয়েদের একত্র অধ্যয়নের ব্যবস্থার কথা আমরা অবগত নই। যে-সকল কলেজে মেয়েদিগকেও ভর্ত্তি করা হয়, তাহাদের কোন কোনটিতে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে একই অধ্যাপকের কাছে ছেলেরা ও মেয়েরা আলাদা পড়ে। ইহা সহাধ্যয়ন নহে। ইহার সুবিধা এই, যে ইহাতে আলাদা আলাদা কলেজগৃহ, লাইব্রেরী প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিবার এবং আলাদা আলাদা অধ্যাপক প্রভৃতি নিযুক্ত করিয়া তাহাদের বেতন দিবার ব্যয় বাঁচিয়া যায়। অসুবিধা এই যে, অধ্যাপকদিগকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হয়। কোন কোন কলেজে ছেলে ও মেয়েদিগকে একই সময়ে একই ক্লাসে আলাদা আসনে বসিয়া একই অধ্যাপকের কাছে পড়িতে [illegible]। ইহাকে সহাধ্যয়ন বলা যাইতে পারে। ইহারও সুবিধা এই যে আলাদা ঘরবাড়ি ইত্যাদি এবং আলাদা অধ্যাপকের বেতন বাঁচিয়া যায়। পাঠশালায় ছোট ছোট ছেলেমেয়ে একত্র পড়িলে তাহাতে নৈতিক ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা খুব কম। কিন্তু কৈশোরে, যৌবনের প্রারম্ভে ও যৌবনে ছেলেমেয়েদের সহাধ্যয়নে নৈতিক ক্ষতির সম্ভাবনা আছে, এইরূপ আশঙ্কা অনেকে করেন। কোন অনিষ্ট হইতেই পারে না, এমন বলা যায় না। কিন্তু [illegible] [illegible] শিক্ষিত ছেলেমেয়েদের মধ্যে এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible]

এই যে, সহাধ্যয়নের ব্যবস্থা হইলে এরূপ অনিষ্টের সম্ভাবনা বাড়িবে কিনা। আমাদের দেশে অতি অল্প দিন সংকীর্ণভাবে সহাধ্যয়ন চলিতেছে। তাহা হইতে লব্ধ অভিজ্ঞতা দ্বারা ফলাফলের বিচার করা চলে না। সামান্ত অভিজ্ঞতা অন্তদের হইয়া থাকিবে, আমার নাই। সুতরাং অভিজ্ঞতা-লব্ধ কিছু বলিতে আমি অসমর্থ। যাঁহারা অনিষ্টের কথা বলেন, তাঁহারা পাশ্চাত্য দেশের অভিজ্ঞতার উল্লেখ করেন। এইরূপ অভিজ্ঞতার বিষয়েও আমার কোন জ্ঞান নাই। আমি আমেরিকায় সহাধ্যয়নের ফলাফল সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণের জন্ত ভারত-বন্ধু সাণ্ডারল্যাণ্ড সাহেবকে চিঠি লিখিয়াছি।

পাশ্চাত্য দেশের ফলাফল দ্বারা সম্পূর্ণ বিচার করা এদেশে চলিবে না। তথায় স্ত্রী-স্বাধীনতা আছে। বঙ্গে পর্দ্দা কিছু কমিলেও এখনও অবরোধ প্রথা বিদ্যমান। বঙ্গের অবস্থা এইরূপ হওয়ায় এখানে সহাধ্যয়নে একটু পিকিউলিয়ারিটি (অদ্ভুতের আভাস) জন্মিয়াছে। যে যুবা-বয়সের ছেলেরা ও মেয়েরা একসঙ্গে পড়ে, তাহাদের মাতাপিতা অনেক স্থলেই নিজেদের নিকটসম্পর্কীয় লোক ছাড়া অন্ত পুরুষদের সম্মুখে বাহির হন না। এরূপ অবস্থায় ছেলেমেয়েদের সহাধ্যয়ন এবং অল্প একটু মেলামেশাও তাহাদের নিজেদের কাছে ঠিক স্বাভাবিক ও মামুলী একটা জিনিষ মনে না হওয়া বিচিত্র নয়। আমার মনে হয়, সহাধ্যয়নে যদি অনিষ্টসম্ভাবনা কিছু থাকে, তাহা হইলে সেই সব পিতামাতার ছেলেমেয়েদের অনিষ্ট-সম্ভাবনা কম হইবে যাঁহারা স্বয়ং কড়াকড় পর্দ্দা মানেন না। শান্তি-নিকেতনে সহাধ্যয়ন অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল চলিতেছে তাহাতে কুফল না হইবার একটি কারণ এই যে সেখানকার গৃহস্থেরা কঠোর অবরোধের অনুরাগী নহেন।

সমাজের বৃদ্ধবৃদ্ধারা প্রৌঢ়প্রৌঢ়ারা খুব পর্দ্দা মানিয়া চলিবেন এবং কিশোর-কিশোরী ও যুবক-যুবতীরা সহাধ্যয়ন করিবে, এরূপ ব্যবস্থা সুসঙ্গত ও সুসমঞ্জস নহে। হয়, অবরোধ শিশু হইতে বৃদ্ধ কাহারও জন্ত থাকিবে না, নতুবা সকলের জন্ত—অন্ততঃ কিশোরকিশোরী যুবকযুবতীদের ও প্রৌঢ়প্রৌঢ়াদের জন্ত—থাকিবে, ইহা অধিকতর সঙ্গত নিয়ম।

আমাদের দেশের অনেকে যে পাশ্চাত্য দেশের যুবকযুবতীদের মধ্যে নৈতিক শৈথিল্যের কথা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সহাধ্যায়ী যুবজনের মধ্যেই দৃষ্ট হয়, না তথাকার সামাজিক অবস্থাই ঐরূপ, তাহা তাঁহারা বলেন নাই। যদি তথাকার সামাজিক অবস্থাই ঐরূপ হয়, তাহা হইলে কেবল সহাধ্যয়নের উপরই দোষটা চাপান উচিত নয়। আসল কথা এই যে, নৈতিক বিষয়ে যে-দেশের সামাজিক অবস্থা যেরূপ, তাহা ছাত্রছাত্রী ও অন্ত যুবজনের জীবনেও প্রতিফলিত হইবে—তাহারা সহাধ্যায়ী হউক বা না হউক। অবশ্য ইহা সত্য, যে, সামাজিক কারণে যাহাদের মনের গতি খারাপের দিকে, সহাধ্যয়ন তাহাদিগকে তাহা চরিতার্থ করিবার কিছু বেশী সুযোগ দিবে। সমাজের সাধারণ নৈতিক অবস্থা উন্নত করিবার চেষ্টা করিব না, কেবল সহাধ্যয়ন বন্ধ করিয়া বা হইতে না দিয়া যুবজনদিগকে পবিত্র রাখিব, ইহা মনে করা বাতুলতা। পাশ্চাত্য দেশে নরনারীর সম্বন্ধগত পবিত্রতাকে তত উচ্চ স্থান দেওয়া হয় না, যত আমাদের দেশে দেওয়া হয়—অন্ততঃ আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে। সুতরাং পাশ্চাত্য দেশে সহাধ্যায়ীদের আচরণে যে দোষ যত সহজে ঘটিতে পারে, তাহা আমাদের দেশেও তত সহজে ঘটিবে, এরূপ মনে করা উচিত নয়।

সহাধ্যয়নের সপক্ষে শুধু যে আর্থিক সুবিধার কথা বলা যায়, এমন নয়। [illegible] ডক্টর প্যাট্রিক গেডিস্ বলিয়াছেন, "I believe all the more in the mutual education of the sexes as well as in their independent needs and disciplines।" অর্থাৎ—

নারীর ও পুরুষের নিজের নিজের স্বতন্ত্র প্রয়োজন আছে এবং সাধনা আছে বিশ্বাস করি, কিন্তু আমি ইহাও বিশ্বাস করি, যে, পুরুষ ও নারীর সাহচর্য্যে পরস্পরের শিক্ষা হয়।" ইহার মানে অবশ্য এ নয় যে, অসৎ জনেরও পরস্পর সাহচর্য্যে সুশিক্ষা হইবে।

একটি ছোট প্রবন্ধে এত বড় একটি বিষয়ের সম্যক্‌ আলোচনা হইতে পারে না। আমি যাহা লিখিলাম, তাহাতে চিন্তার উন্মেষ হইলেই সন্তুষ্ট হইব।

আমার মনে হয়, দেশের বর্ত্তমান আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করিলে আপাততঃ যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বনপূর্ব্বক সহাধ্যয়ন না চালাইলে নারীশিক্ষার বিস্তৃতি ও উন্নতি সুদূরপরাহত, কিন্তু যেখানে যেখানে, কেবল মেয়েদের জন্য বিদ্যালয় ও কলেজ স্থাপন ও পরিচালনের টাকা জুটিবে, সেই সব জায়গায় সেই প্রকার স্বতন্ত্র শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত করা বাঞ্ছনীয়। পুরুষ ও নারীর সাধারণ শিক্ষণীয় বিষয় ছাড়া এইসব নারীশিক্ষালয়ে নারীদের বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয়গুলি শিখাইবার বন্দোবস্ত হইতে পারিবে।

বঙ্গলক্ষ্মী—অগ্রহায়ণ ১৩৪০

নিউইয়র্কের শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান

শ্রীশরৎ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়

নিউইয়র্কের শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠানটি (The Bureau of Child Hygiene) আজ পঁচিশ বছরের উপর মহা উদ্যমে কাজ ক'রে আসছে। ১৯০৮ সনে সিটি গভর্ণমেণ্ট (City of New York) এ কাজ নিজেদের হাতে নেয়, যদিও এর অনেক আগে থেকেই এ আন্দোলন এদেশে চলে আসছে, তবু এর আগে গবর্ণমেণ্ট এ কাজের পূর্ণ দায়িত্ব কখনও হাতে নেয় নি। বিভিন্ন গির্জ্জা ও নানা রকম সমাজহিতৈষী সঙ্ঘগুলিই (Social Service Associations) নিজেদের মনের মত, সুবিধামত ও সামর্থ্য অনুযায়ী নিউইয়র্কের শিশু স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা করত।

এই সব সমাজহিতৈষী সঙ্ঘগুলির আন্তরিক উৎসাহেই কাজ চলছিল বটে, কিন্তু এর একটা দোষও ছিল। দোষ হ'ল এই যে ঠিক যেখানে দরকার, সেখানে হয়ত কাজ হ'ত না। কেন-না গির্জ্জা ও সাধারণ সঙ্ঘ তাদের সভ্যদের ছেলেমেয়েদের ব্যবস্থাই ক'রত। হয়ত, এরকম ব্যবস্থায় আপত্তি করাও চলে না। যে গির্জ্জার পয়সা বেশী তাদের ব্যবস্থা অবশ্য অন্য গরিব গির্জ্জাদের চেয়ে ভালই হ'ত। তাই অনেক সময় যারা প্রকৃত গরিব, এবং যাদের অভাব সত্যই বেশী, তাদের দুঃখ দূর করতে কেউ চেষ্টা করত না। এই সব দেখে নিউইয়র্কের সিটি গবর্ণমেণ্ট এদের সকলের দায়িত্ব নিজের হাতে নেয়। সমাজের শিশু-দায়িত্ব সব দেশেই স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নেওয়া উচিত। এখন আস্তে আস্তে অনেক দেশে নিচ্ছেও। নিউইয়র্ক শহরের শিশুমঙ্গলের ব্যবস্থা যদিও গবর্ণমেণ্ট করছে তবু এখনও অনেকগুলি "প্রাইভেট" সঙ্ঘও তাদের কাজ একেবারে বন্ধ করে নি।

বর্ত্তমানে এই নিউইয়র্ক শহরের মধ্যেই খাস গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে সত্তরটি শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান আছে। পাড়ার লোকসংখ্যার অনুপাতে এই সব প্রতিষ্ঠান খোলা হয়েছে। অর্থাৎ যে পাড়ায় যত বেশী লোক ও যত বেশী শিশু এবং যে পাড়ার আর্থিক অবস্থা যত বেশী খারাপ, সেই পাড়ায়ই প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয় ও সংখ্যার উপযুক্ত ডাক্তার, নার্স ও সমাজকর্ম্মী (social worker) নিযুক্ত করা হয়।

এই প্রতিষ্ঠানের ক্রমবিকাশের ইতিহাস খুবই সুন্দর। অতিক্ষুদ্র আরম্ভ থেকে আজ কত বড় বৃহৎ ব্যাপার! আগে লোকের ধারণাই ছিল না যে, শিশুদের স্বাস্থ্যের দায়িত্ব তাদের বাপ-মা ব্যতীত গবর্ণমেণ্ট নিতে পারে। আর আজ এরা নিজেদের গবর্ণমেণ্টের উপর সমস্ত ভার দিয়ে বেশ শান্তিতে বসে আছে। এ অবস্থায় আসতে যদিও যথেষ্ট সময় লেগেছে, তবু এই মানসিক পরিবর্ত্তনের ছবিটি দেখ্‌লে এখন খানিকটা অবাক্‌ হ'তে হয়।

পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগেকার লোকের মানসিক অবস্থা, চিন্তা, ধর্ম্মের গোঁড়ামী সবই বর্ত্তমানের চেয়ে অন্য রকমের ছিল। নূতন কিছু করতে তারা সহজে রাজী হ'ত না; যা পুরুষানুক্রমে চলে আসছে তাতেই তারা সন্তুষ্ট ছিল। শিশুস্বাস্থ্যের ক্রমবিকাশের সঙ্গে এ-দেশের দুটি অতি পুরাতন স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয়েছে এবং এই পরিবর্ত্তনই

যে এদের অনেক শিশুর প্রাণ রক্ষা করেছে সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এই ছুটি প্রথা সম্বন্ধে এখানে দু-কথা বলা সময়োচিত হবে মনে হয়।

শিশুস্বাস্থ্য ক্রমবিকাশের ইতিহাসের প্রথম ও প্রধান অধ্যায় বোধ হয় এদেশের জল পরিষ্কারের ব্যবস্থা। এবং দ্বিতীয় (প্রকৃতপক্ষে কোন্‌টি প্রথম—কোন্‌টি দ্বিতীয় তার খাঁটি বিচার করা বড় কঠিন) অধ্যায় হ'ল এদেশের দুধ গরম করার (pasteurization) ব্যবস্থা। আগে যখন বহুশিশু পেটের অসুখে বা অন্যান্য শিশুরোগে মারা যেত, তখন এরা উপায় খুঁজে পায় নি। কেন-না, তখন কেউ এর কারণ জানত না। চিকিৎসা-শাস্ত্রের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অনেক রোগের কারণ যখন জানার উপায় হ'ল তখন একটুখানি আশার আলো দেখা গেল। কিন্তু প্রথম প্রথম সাধারণ লোকে বিশ্বাস করতেই পারে নি যে জল বা দুধের দোষে শিশু মারা যায়। তাদের ধারণা ছিল, মৃত্যুর কারণ—শিশুর হজম শক্তি কম। যুগ-যুগান্তর থেকে পুরুষানুক্রমে যে ধারণা নিয়ে আমরা থাকি তা সহজে কেউই ছাড়তে চায় না। এরাও চায় নি এবং সহজে পারেও নি। এজন্য বিশুদ্ধ (pasteurized) দুধ চালাতে এদেশে প্রথম বড় কষ্ট পেতে হয়। লোকে নানা আপত্তি করে, বাধা দেয়। কিন্তু যখন সকলকে বেশ হাতে কলমে বুঝিয়ে ও দেখিয়ে দেওয়া হ'ল যে, দুধের সঙ্গে ও জলের সঙ্গে অনেক রকম রোগের জীবাণু শরীরে প্রবেশ করতে পারে—ও সেই সব জীবাণু নষ্ট করার একমাত্র উপায় হ'ল দুধ সিদ্ধ করা ও জল পরিষ্কার করা (chlorization) তখন অনেকের চৈতন্য হ'ল। ক্রমশঃ অনেকের আপত্তি আর থাকল না। আর এখন হয়েছে ঠিক এর উল্টো; অর্থাৎ এখন যদি কোথাও জল পরিষ্কার না করে—বা দুধ সিদ্ধ (pasteurize) না করে, তবে মহা হুলস্থুল পড়ে যায়।

জল ও দুধের সঙ্গে যে শিশুস্বাস্থ্য ও শিশু-মৃত্যুর অতি নিকট-সম্বন্ধ, তা এদের শিশুমৃত্যু-হার দেখলে বেশ সহজে বোঝা যায়। জল ও দুধ বিশুদ্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে শিশু-মৃত্যুসংখ্যা অনেক কমে গেছে। তাতেই স্পষ্ট প্রমাণ হয় জল ও দুধ থেকেই রোগ-জীবাণু গিয়ে শিশুদের ধ্বংস করত।

আমাদের দেশের অবস্থাও ঠিক এই রকম। আমরা এখনও সব জায়গায় জল ও দুধের সুব্যবস্থা করতে পারি নি, তাই আমাদের শিশুমৃত্যুর হার এখনও এত বেশী। তুলনার জন্য এখানে গবর্ণমেণ্টের রিপোর্ট থেকে তুলে দিচ্ছি। দেখে হয়ত অনেকে অবাক্ হবেন যে, বরিশাল জেলায় ১৯২৯ সালে হাজার-করা ৪৪৮টি শিশু এক বৎসর বয়স পূর্ণ না হতেই মৃত্যুমুখে পড়ে।

স্থানের নাম	বৎসর	হাজার-করা মৃত্যুহার
সমস্ত ভারতবর্ষ	১৯২৯	১৮৬.১(পুং) ১৭০ (স্ত্রী)
বাংলা দেশ	১৯২৯	১৮৫(পুং) ১৭৪.৩ (স্ত্রী)
বরিশাল জেলা	১৯২৯	৪৪৮(পুং ও স্ত্রী)
ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌স্	১৯২৯	৭৪
ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌স্	১৯৩০	৬৫

আমাদের দুধ-সরবরাহের দুরবস্থার কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। ভাল খাঁটি দুধ অনেক সময় বাজারে পাওয়া সুকঠিন। যা পাওয়া যায় তা যে সম্পূর্ণ রোগবীজশূন্য তা বলা যায় না; আমার মনে হয়, আমরা যে এখনও হাজার-করা হাজারটি শিশুর মৃত্যু দেখি না, তার কারণ আমাদের দুধ জ্বাল দিয়ে ব্যবহার করার নিয়মের জন্য। যে-কোনও কারণে হউক আমাদের পূর্ব্বপুরুষরা দুধ জ্বাল দিয়ে খাবার ব্যবস্থাটা ক'রে গিয়েছিলেন—এটা যে কত বড় আশীর্ব্বাদের কাজ তা বলা কঠিন। আমরা গরুর পূজা করি, গরুকে মায়ের মত মনে করি, গরুকে অপমান করলে তার প্রতিশোধের জন্য না করতে পারি বোধ হয় এমন কাজ নাই; কিন্তু আমাদের সেই গো-মাতার শারীরিক অবস্থা যা করেছি তা দেখলে চোখে জল আসে। গোমাতার সেবার নামে যে কঠোর নির্দ্দয়তা দেখাই, তা বোধ হয় "গো-মাতার সন্তান" ব্যতীত মানুষে সহজে দেখাতে পারে না। তবু আমরা হিন্দু ব'লে গর্ব্ব করি, গো-খাদকদের ঘৃণা করি। আর পাশ্চাত্য দেশের লোকেরা গরুকে মা বলে না, গরুকে পূজাও করে না। তবু তাদের দুধ নিতে হয় ব'লে তাদের যেমন যত্ন করে, তা দেখ্‌লে অবাক হ'তে হয়। তাদের খাবারের ব্যবস্থা, ঘরের ব্যবস্থা, শারীরিক উন্নতির ব্যবস্থা করতে এ সব দেশে যত কষ্ট করে, তা যে না দেখেছে তাকে কথায় বুঝান কঠিন হবে। শীতকাল হউক, গ্রীষ্মকাল হউক, গরুর সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা নিজেদের মতই করে, গরুর থাকবার ঘরের ব্যবস্থা কোনও রকমে

এদের নিজেদের ঘরের চাইতে কম নয়। গরুর খাবার জিনিষের ব্যবস্থা নিজেদের খাবার জিনিষের ব্যবস্থার চেয়ে কোনও অংশে হীন নয়। এমন কি, গরুর জলখাবার পাত্রটি পর্য্যন্ত প্রত্যেকের পৃথক্ ব্যবস্থা ক'রে রাখে, রোগ-চিকিৎসার ভার উপযুক্ত ডাক্তারের উপর দেয়। এক কথায়, এরা এদের গরুর যত্নের কোনও রকমে ত্রুটি করে না। এদের সঙ্গে তুলনায় যখন আমি আমাদের গোয়ালঘরের কথা ভাবি বা আমাদের গরুর খাবারের কথা ভাবি, তখন নিজেদের ধিক্কার না দিয়ে পারি না।

জলের বেলায় বোধ হয় আমরা সব চেয়ে বেশী হতভাগ্য। কলিকাতা বা ঐ রকম বড় শহরের কথা ছেড়ে দিয়ে অবশ্য আমি পল্লীর কথা ভাবছি; কেন-না আমাদের অধিকাংশ লোক পল্লীবাসী। একে আমাদের দেশের ভীষণ গরম, তাতে আমাদের ততোধিক ভীষণ দারিদ্র্য। পয়সার অভাবে অনেক পুকুর বহু বৎসর পর্য্যন্ত পরিষ্কার করা হয় না। বহু গ্রামে পুকুরও নাই। যাদের নাই, তারা অপর গ্রামের পুকুর ব্যবহার করে। ভীষণ রৌদ্রে অনেক পুকুরের জল গ্রীষ্মকালে শুকিয়ে যায়। আমরা ভগবানের উপর এত বিশ্বাস করি যে তাঁর দেওয়া বৃষ্টির আশায় দিন গণি। বৃষ্টি যদি না হয়, তবে হয়ত জলের অভাবে শুকিয়ে মরতেও খুব কুণ্ঠিত হব না। যা হোক, বর্ষাকালের কৃপায় পচা পুকুরগুলি কোনও রকমে যতটুকু সম্ভব জল আটকে রাখে। সেই জলটুকু আমাদের সমস্ত গ্রামবাসীর একমাত্র সম্বল। অনেক সময় আমরা একই মাত্র পুকুরে সকলে মিলে আমাদের সকল কাজ চালাই। বুড়া-বুড়ী, ছেলে-মেয়ে, যুবক-যুবতী এমন কি আমাদের গরু-বাছুরগুলির সম্বল ঐ একমাত্র পুকুর। আমাদের স্নান করা, বাসন মাজা, কাপড় কাচা ও অনেক সময় অনেকের শৌচকার্য্য পর্য্যন্ত ঐ একই জলে চালান হয়! ঠাকুরপূজা, আহ্নিক করা ত আছেই।

নিউইয়র্কের শিশু-মঙ্গলের কথা বলতে গিয়ে দেশের কথা অনেক বললাম। কিন্তু দেশের ছবিটি এমন ভাবে আমার চোখের সাম্‌নে ভাসছে যে একটু না ব'লে পারলাম না। এদেশেও পাড়াগাঁ আছে। এরাও জল ব্যবহার করে। অনেক জায়গায় জলের কলও নাই। কিন্তু এরা এদের বিচার-শক্তি ব্যবহার করে। যে জল খেতে হয়, সে জলে ময়লা ফেলে না, সে জলে কাপড় কাচে না, সে জলে শৌচ করে না।

নিউইয়র্কের শিশু-মঙ্গল কাজের একটি বিশেষত্ব আছে। এটা আগে ছিল না। আগে এরা শিশু-মঙ্গল প্রতিষ্ঠান খুলে সেখানে ডাক্তার ও নার্স রেখে দিত। যার দরকার হ'ত, সে তার শিশু নিয়ে কেন্দ্রে আসত। ডাক্তার তখন শিশুকে পরীক্ষা ক'রে ব্যবস্থা করতেন, উপদেশ দিতেন, দরকার হ'লে খাবার পর্য্যন্ত সরবরাহ করতেন। এখনও যদিও কেন্দ্রে ডাক্তার ও নার্স থাকে, তবে তাদের কাজ এখানে বেশী নয়—বিশেষতঃ নার্সের। সে সকালবেলায় ডাক্তারকে সাহায্য করার জন্য কেন্দ্রেই থাকে। বিকালে পাড়ার বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে শিশুদের দেখে আসে। শুধু শিশু নয়, মা'দেরও। এর বিশেষত্ব হ'ল এই যে, নার্স ঘরের অবস্থা, বাড়ির অবস্থা ও মায়ের দায়িত্ব এতে বেশী রকম বুঝতে পারে। মা'দের সঙ্গে নার্স বেশ বন্ধুত্ব ক'রে নেয়। মায়েরাও এ সুযোগ হারান না। এই বন্ধুত্বের ফলে সুবিধা আরও অনেক আছে। শুধু শিশুস্বাস্থ্য নয়, মা বাবা ও অন্যান্য সংসারের লোকদের স্বাস্থ্যের কথাও বাদ যায় না। ফলে হয় এই যে, যদি বাড়িতে কোনও লোকের কোনও সংক্রামক রোগ থাকে, তা সময়ে ধরা পড়ে ও উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়। এই নার্সগুলি যে কি মহৎ কাজ করছে তা এদেশের স্বাস্থ্য-নেতারা বেশ বুঝতে পারছেন। ধাত্রীবিদ্যাকে তাই এখন আর কেউ ছোট চোখে দেখে না। এদের স্থান এখন এদেশে বড় উঁচুতে।

সাধারণতঃ দুই বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শিশুদের এই বিভাগের নার্সদের তত্ত্বাবধানে রাখা হয়। কেন-না, শিশুদের জীবনের সঙ্কট এই বয়সেই বেশী। তার পরেও যদি অসুখ হয়, তার ব্যবস্থা যদি শিশুর আপন জনে না করতে পারে, তবে অবশ্য "সিটী" গবর্ণমেণ্ট করে। এদেশের আইনে কেউ বিনা চিকিৎসায় সম্ভবপক্ষে মারা যায় না। যার পয়সা খরচ করার সাধ্য আছে, অবশ্য সে তার নিজের ডাক্তারের কাছে যায়, বা কোন হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। কিন্তু যে অক্ষম তারও ব্যবস্থা হয়। তার ভার নেয় গবর্ণমেণ্ট। একটি আইন আছে যে হাসপাতাল যত ভাল হউক, বা যত দামী হউক, যদি কেউ কোনও মারাত্মক

রোগে প'ড়ে চিকিৎসা করাতে আসে, তবে তাকে চিকিৎসা করতেই হবে। কোনও হাসপাতাল অস্বীকার করতে পারবে না। চিকিৎসা ক'রে পরে গবর্ণমেণ্টকে তাদের খরচের জন্য দাবি করতে হয়। অবশ্য গবর্ণমেণ্ট হাসপাতালকে তার খরচ দেয় বটে, তবে সে এত কম যে তাতে হাসপাতালের লোকসান ব্যতীত লাভ কখনও হয় না। লাভ হউক, লোকসান হউক রোগীকে ফেরৎ দেওয়া অসম্ভব।

টাকা খরচের বেলায় আমেরিকার সঙ্গে বোধ হয় আর কোনও দেশের তুলনা করা চলে না। এদের আছে অগাধ, খরচ করেও অফুরন্ত রকমে। স্বাস্থ্যবিভাগ অজস্র টাকা খরচ করছে—তার হিসাব দিতে গেলে কোটীর অঙ্কে যেতে হবে। কিন্তু সামান্য এই পাড়ায় পাড়ায় শিশু-স্বাস্থ্য সম্বন্ধে এরা যা খরচ করছে সে-ও কিছু কম নয়। সাধারণতঃ কেন্দ্রগুলি গরিব পাড়াতেই খোলা হয়। তাই ভাড়া কম। গড়ে মাসিক পঞ্চাশ ডলার মাত্র ভাড়া দিতে হয়। ভাড়া ছাড়া ডাক্তার ও নার্সের বেতন, অন্যান্য লোকের বেতন, আলো, টেলিফোন, চেয়ার, টেবিল, ওজন করা, দুধ দেওয়া ইত্যাদি নানা রকমের খরচ আছে। গবর্ণমেণ্ট এ-সমস্তই বহন করে।

এ-দেশের লোক সাধারণতঃ বিনামূল্যে কিছু নিতে চায় না বা ভিক্ষা করা পছন্দ করে না। যতটা সম্ভব সকলে স্বাবলম্বী হ'তে চায়—যদি নিতান্ত অক্ষম না হয়। দুধের ব্যবসায়ীরা বিনা লাভে এই সব কেন্দ্রে দুধ বিক্রী করে —অবশ্য শুধু শিশুদের ব্যবহারের জন্য। লোকেরাও অপেক্ষাকৃত কম দামে শিশুদের দুধ পেয়ে সুখী হয়।

প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হ'ল পাড়ার শিশুস্বাস্থ্যের উন্নতি করা। ডাক্তার ও নার্সেরা সেইদিকেই সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখেন। সময়ে পরীক্ষা করা, টীকা দেওয়া, ওজন করা, উপযুক্ত খাদ্য ব্যবস্থা করা, শরীর ও ওজন হ্রাস-বৃদ্ধির হিসাব রাখা ইত্যাদি। কিন্তু স্বাস্থ্য ভাল রাখতে গেলে শুধু শিশু পরীক্ষা করলেই অনেক সময় হয় না। তার মা ও বাবা ও সংসারের অন্যান্য লোকের স্বাস্থ্যপরীক্ষাও দরকার হয়। নার্স এই সব ব্যবস্থা অতি সুন্দর ভাবেই করে। আর্থিক অবস্থা খারাপ হ'লে বোর্ড অব হেল্‌থ নিজে সে ভার গ্রহণ করে। আসল কথা, স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য যা-কিছু দরকার, টাকার অভাবে তা বন্ধ থাকে না।

এই শিশুপ্রতিষ্ঠানের এবং স্থানীয় বোর্ড অব হেল্‌থের সব কাজই বিনামূল্যে করা হয়; কেন-না, লোকের ট্যাক্স দিয়েই এই বোর্ড—এবং লোকের অসুখে বোর্ড অব হেলথই ভার নেয়। এই রকম উপায়ে গবর্ণমেণ্ট যে স্বাস্থ্য বিষয়ে অনেক ভাল কাজ করেছে ও করছে সে-বিষয়ে গর্ব্ব করার মত এদের যথেষ্ট কারণ আছে।

শিশুমঙ্গলের জন্য আমেরিকা যা করছে, আমরা যদি তার খানিকটাও করতে পারি তবে আমাদের অসম্ভব শিশু-মৃত্যুসংখ্যা অনেকটা কমবে, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। ভারতের ভবিষ্যৎ আশা ভরসা, স্বাস্থ্য সুখ শান্তি সবই নির্ভর করছে আমাদের শিশুদের উপর। যদি তাদের মানুষ হ'তে দেখতে চাই, তবে এখন থেকে সব রকমে তাদের যত্ন নিতে হবে। তাদের স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্য আমাদের অনেক স্বার্থ ত্যাগ করতে হবে, অনেক অর্থ খরচ ক'রতে হবে। তা নইলে আমরা এখন যেমন কোনও রকমে বেঁচে আছি, তারাও পরে এমনি সদাশঙ্কিত প্রাণে মরার মত বেঁচে থাকবে।

মহিলা-সংবাদ

এবার এলাহাবাদের সঙ্গীত-সম্মেলনে শ্রীমতী বীণাপাণি মুখোপাধ্যায় সঙ্গীতে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছেন। শ্রীমতী বীণাপাণির বয়স দশ বৎসর মাত্র।



শ্রীমতী বীণাপাণি মুখোপাধ্যায়

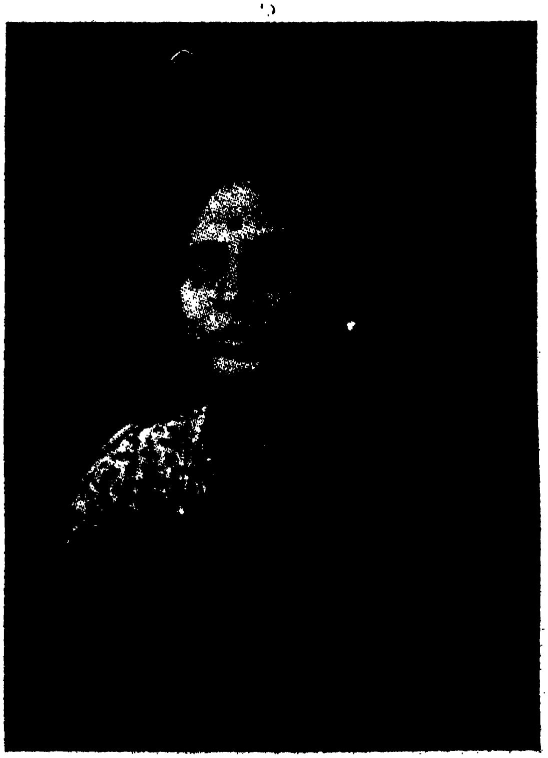


শ্রীমতী সরলাবাই নায়েক

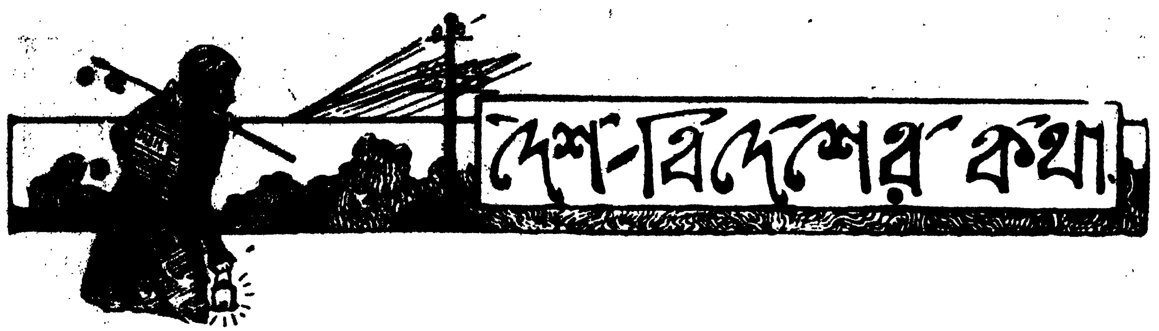
শ্রীমতী সরলাবাই নায়েক, এম-এ, গত নবেম্বর মাসে গোয়ালিয়র রাজ্য মহিলা সম্মেলনের উজ্জয়িনী অধিবেশনে সভানেতৃত্ব করিয়াছিলেন। তিনি পুণা সেবাসদনের অবৈতনিক লেডী স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য।

শ্রীমতী কমলাবাই এন্ বিজয়াকর আম্রোরীর মহিলাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইয়াছেন।

শ্রীমতী স্থবর্ণ ঘোষ কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হইতে চিকিৎসা বিষয়ে দ্বিতীয় ও অস্ত্র-চিকিৎসা বিষয়ে তৃতীয় স্থান লাভ করিয়া সম্মানের সহিত এম্-বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তিনি রোগনির্ণয় বিষয়ে স্বর্ণপদক, চিকিৎসা বিষয়ে ক্যালভার্ট পদক, ধাত্রীবিদ্যায় গুডিভ বৃত্তি লাভ করিয়াছেন।



শ্রীমতী কমলাবাই এন্ বিজয়াকর



বাংলা

চিত্রবিদ্যায় কৃতিত্ব—

শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার দত্ত বামহস্তে এই চিত্রখানি অঙ্কিত করিয়াছেন।



মহিলা কর্মীর মৃত্যু—

শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের কন্যা ও ময়মনসিংহের উকিল বাবু মণিভূষণ মজুমদারের পত্নী শ্রীমতী কল্যাণী মজুমদার ময়মনসিংহ মহিলা সমিতির সহকারী সম্পাদিকা ছিলেন। তিনি কিছুকাল নিজ বাড়িতে অবৈতনিক শিশু বিদ্যালয় পরিচালনা করিয়াছিলেন এবং তাঁতের ও দর্জীর ক্লাস খুলিয়া অনেক মহিলার শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি দরিদ্র ও অসহায় মহিলাগণের দ্বারা নানা প্রকার জিনিষ প্রস্তুত করাইয়া তাহা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া দিতেন এবং তাহাদিগকে নানা প্রকারে সাহায্য করিতেন। এতদ্ব্যতীত ময়মনসিংহের বহুবিধ সামাজিক ও শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার বিশেষ যোগ ছিল। দক্ষতার সহিত মহিলাসমিতির কার্য্য পরিচালনা করার জন্য তদানীন্তন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহোদয় তাঁহাকে একবার এক বিশেষ



কল্যাণী মজুমদার

পুরস্কার প্রদানে সম্মানিত করিয়াছিলেন। তিনি সম্প্রতি পরলোকগমন করিয়াছেন।

কৃতী শ্রীযুক্ত অনাথনাথ বসু—

শ্রীযুক্ত অনাথনাথ বসু কিছুকাল শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতা কার্য্য



শ্রীযুক্ত অনাথনাথ বসু

করিয়া বিলাত গমন করেন। সেখানে ১৯৩১ সনে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে শিক্ষক-ডিপ্লোমা প্রাপ্ত হন। তিনি সুইডেন, জার্ম্মানী, ডেনমার্ক ও অন্যান্য দেশের শিক্ষাপদ্ধতি আয়ত্ত করিয়াছেন। ভারতবর্ষের জাতীয় শিক্ষা সমস্যা সম্বন্ধে গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি ১৯৩২ সনে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম্-এ উপাধি লাভ করেন। পরে আমেরিকায় গমন করিয়া তথাকার শিক্ষা সম্বন্ধেও অনাথবাবু অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন।

ভারতবর্ষ

গোরক্ষপুর হইতে অধ্যাপক শ্রীললিতমোহন কর লিখিতেছেন—

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের আয়োজন এ বৎসর গোরক্ষপুরে হইতেছে তাহা পাঠকবর্গ অবগত আছেন। সময় আগতপ্রায়, ২৭-২৮-২৯এ ডিসেম্বর তারিখে অধিবেশন হইবে। অগ্রহায়ণের প্রবাসীতে মূল সভাপতি এবং সাহিত্য, দর্শন, সাংবাদিকী, শিক্ষাবিজ্ঞান-শাখার সভাপতিগণের নাম বাহির হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কুশলকুমার মুখোপাধ্যায় (অধ্যক্ষ, ফাইন আর্টস্ কলেজ, জয়পুর) ললিতকলা শাখার, অধ্যাপক ডাক্তার প্রসন্নকুমার আচার্য্য (এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়) বৃহত্তর বঙ্গ শাখার ও অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র মিত্র (বিদ্যাসাগর কলেজ, কলিকাতা) অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্ব শাখার সভাপতিত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে সম্মত, ইতিহাস ও সঙ্গীত শাখার সভাপতিদ্বয়ের অক্ষমতা জ্ঞাপন বশতঃ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (কাশী) ও সঙ্গীতবিদ্যা-পারদর্শী শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ সান্যাল (লক্ষ্ণৌ) ঐ ভারগ্রহণে অনুগ্রহপূর্ব্বক স্বীকৃত হইয়াছেন। সুলেখিকা শ্রীযুক্তা নিস্তারিণী দেবী সরস্বতী (কাশী) কৃপা করিয়া মহিলা বিভাগের সভানেতৃত্ব করিতে সম্মত হইয়াছেন।

গোরক্ষপুরের বাঙালীমাত্রই অভ্যর্থনা সমিতির সদস্য। স্থানীয় এডভোকেট্ শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দাস মহাশয় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি। শ্রীমতী সুজাতা দেবী মহিলা-বিভাগের সম্পাদিকা।

বঙ্গের ও বঙ্গের বাহিরের বাঙালী মহোদয়-মহোদয়াগণ যেন অনুগ্রহ-পূর্ব্বক প্রবাসের এই বাৎসরিক বঙ্গসম্মেলনে উপস্থিত হইয়া ইহাকে সাফল্যদান করেন ইহাই গোরক্ষপুর প্রবাসীরা প্রার্থনা করেন।

গোরক্ষপুর শহরের বহির্ভাগে অবস্থিত কলেজভবনে সম্মেলনের স্থান স্থির হইয়াছে। প্রতিনিধিগণও সেইখানে অবস্থান করিবেন। মহিলা-দিগের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা থাকিবে।

গোরক্ষপুর নগরের দর্শনীয় স্থান মন্দির ও তৎসংলগ্ন বাঙালী শিষ্যগণ প্রতিষ্ঠিত ৺গম্ভীরনাথের সমাধি। অদূরে, সহস্র বৎসরের পুরাতন, অথচ দেখিতে নূতন কারুকার্য্যবিশিষ্ট, নবাবিষ্কৃত, বিষ্ণুমূর্ত্তিসমন্বিত সুদৃশ্য মন্দির।

বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণ স্থান, কুশীনগর, মোটর পথে ৩৪ মাইল। যাতায়াতে ও দর্শনে প্রায় ৫ ঘণ্টা সময় লাগে। কবীরের সাধনা ও সমাধির স্থান রেলপথে ১৬ মাইল। বুদ্ধের জন্মস্থান, রুম্মিন্ দেঈ (লুম্বিনী উদ্যান) ৫০ মাইল দূরবর্ত্তী নৌতুনোওয়া ষ্টেশন হইতে ১২ মাইল পশ্চিমে। মোটরে যাইতে হইলে নেপাল রাজ্যের ভিতর দিয়া ঘুরিয়া যাইতে হয়। রুম্মিন্ দেঈতে অশোক স্তম্ভ আছে—উহাও নেপালের মধ্যে।

সম্মেলনের অধিবেশনের মধ্যেই কোন দিবস পূর্ব্বাহ্ণে কাশিয়া (কুশীনগর) দর্শনের ব্যবস্থা থাকিবে। অধিবেশনান্তে রুম্মিন্ দেঈ দর্শনের ব্যবস্থা থাকিবে।

গোরক্ষপুর যাইতে হইলে, মোকামাঘাট, পাটনা, কাশী বা লক্ষ্ণৌ হইয়া যাওয়াই সুবিধা। ই-বি-আরের কাটিহার জংশন হইতে ই, আই, আরের লক্ষ্ণৌ জংশন অবধি বি, এন্ ডব্লু, রেলের গাড়ি যায়, গোরক্ষপুর মধ্যে পড়ে। আসামের আমিনগাঁও হইতে একখানি এক্সপ্রেস্ গাড়ি, গোরক্ষপুর হইয়া, লক্ষ্ণৌ যায়। এলাহাবাদ হইতে কাশী হইয়া গোরক্ষপুরে গাড়ি যায়। ইহা সুবিধাজনক গাড়ি।

সকালে ও সন্ধ্যায়, গাড়ির সময়ে, প্রতিনিধিগণের সেবার জন্য শুশ্রূষুগণ (ভলাণ্টিয়ার্স) ষ্টেশনে উপস্থিত থাকিবেন।

কোনও জ্ঞাতব্য থাকিলে, "শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদক, অভ্যর্থনা সমিতি, সেণ্ট এণ্ড্রুজ কলেজ, গোরখপুর, ইউ পি" এই ঠিকানায় পত্র প্রেরিতব্য।

খদ্দর বিতরণ ও হরিজন সেবার জন্য দান—

ওয়াধোয়ানের শ্রীযুত মণিলাল কোঠারী বিনামূল্যে খাদি বিতরণ এবং হরিজন সেবার জন্য ৬০০০ টাকা সংগৃহীত করিয়াছেন। (১) অপ্রকাশ্য-নামা বন্ধু ২০০০ (২) লাখতার রাজা ১০০০ (৩) ওয়াধোয়ান রাজ ১০০০ (৪) শেঠ হরিদাস মাধব দাস ৫০০ (৫) স্যার প্রভাশঙ্কর পট্টনী ৫০০ (৬) হোলকার রাজ্য ২৫০ (৭) ভবনগর রাজা ২৫০ (৮) জেতসী রাজ্য ৪০০ (৯) রাজপুর রাজ্য ২০০৲।

অভিনব চরকা—

বাঙ্গালোরের মিঃ রাজগোপাল আচারিয়া এক অভিনব চরকার উদ্ভাবন করিয়াছেন। এই চরকায় প্রতি ঘণ্টায় ১০০০ গজ সূতা কাটা যায়। ইহার নূতন শিক্ষার্থিগণও ঘণ্টায় ৭০০ হইতে ৮০০ গজ সূতা কাটিতে পারে। সম্প্রতি নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনের গুজরাট শাখার উদ্যোগে আমেদাবাদের স্বদেশী প্রদর্শনীতে এই চরকা প্রদর্শিত হইয়াছিল।

পদ্মাতীরে

শ্রীপ্রমীলা দেবী

নববধূ সহ বাড়ি আসিয়া যেন নিষ্কৃতি পাইয়াছে এমনি ভাব দেখাইয়া মণীশ মাকে বলিল, "কি বিপদেই পড়েছিলুম, মা, ওকে নিয়ে পদ্মা পার হতে যে কি দুর্ভোগই আমার হয়েছে।"

মণীশদের পদ্মাপারে বাড়ি। গোয়ালন্দ হইতে যে-পথটুকু ষ্টীমারে অতিক্রম করিতে হয় তাহারই বর্ণনায় মণীশ মুখর হইয়া উঠিল। বলিল, "ষ্টীমারে ওঠার সময় এমনি কাঁপছিল যেন জলেই পড়ল; আমাকে তাই সারাক্ষণ পাহারা দিতে হ'ল, ঢেউ দেখে যেন না মূর্চ্ছা যান।"

মা হাসেন। পুত্রের পরিহাসের অন্তরালে লুক্কায়িত মমতার ভাবটি তাঁহাকে পরিতৃপ্ত করে। সহাস্যে বধূকে বলিলেন, "এদেশে কি মানুষ আসে না মা?"

সেদিন সারাদিন ধরিয়া বিবাহে সমাগতা আত্মীয়াদের নিকট বধূর পদ্মা-ভীতির বর্ণনা চলে। দেবর ননদরা বধূকে প্রশ্ন করে, "তোমাদের চৌবাচ্চায় কত বড় ঢেউ ওঠে বৌদি?"

কিশোরী বধূ। কিন্তু স্বভাবটি তার বালিকার মতই। সুতরাং সকলেই তাহার মনোরঞ্জনে সচেষ্ট, কখনও চোখ ছল ছল করিলেই শ্বশুর বলেন, "মন কেমন করছে মা? কলকাতা যেতে ইচ্ছে করেছে? আচ্ছা, আচ্ছা, আমি এক্ষুনি বলছি ওদের।"

কথাটা মণীশের কানে যাইতে বিলম্ব হয় না। সে নিঃশ্বাস ফেলিয়া ভাবে, "ভারী মজা, সাম্‌নে আমার এত বড় ছুটি, আর—" তার পর কোন্ ফাঁকে বধূর নিকট গিয়া বলে, "আবার মুখ ভার কেন? এ-বিচ্ছিরি দেশ ছেড়ে ত যাচ্ছই!"

কথা না বলিলে বধূর নিস্তার নাই। হাসি-কান্না-মেশান সুরে সে বলে, "কিন্তু কি ক'রেই যে যাব! আবার পদ্মা পার হতে হবে ভাবলেই কাঁপুনি ধরে যে!"

মণীশের হাসি পায়, কিন্তু মুখ গম্ভীর করিয়া বলে, "তাই ত দুদিন দেখে শুনে ভয় কমলে গেলে হ'ত না। আবার যদি কালবোশেখী ঝড়ই ওঠে—আমাদেরই ভয় হয় তখন।" বলিয়া বধূর কানের কাছে মুখ আনিয়া মৃদুস্বরে বলে, "আমার ছুটি শেষ হ'লে আমার সঙ্গে যাবে। আমি তোমায় মোটে ভয় পেতে দেব না, দেখো।"

মণীশের অনুনয়ে বধূ মাথা হেলাইয়া সম্মতি দেয়। আর মণীশ সানন্দে মার কাছে বলে,—"যা তোমার ভীতু বৌ, বাপ মাকে দেখবে কি, পদ্মাপার হতেই যে ওর ভয়। থাক না মা, আমার ছুটি হলে আমিই রেখে আসব 'খন।"

মা পুত্রের কথায় পুনরায় হাসেন। নববধূর সুন্দর মুখের প্রতি তাঁহারও মায়া পড়িয়া গিয়াছে, তথাপি স্বামীর নিকট পুত্রের কথাটাই রং ফলাইয়া বিবৃত করেন।

এইরূপে বধূর যাওয়ার কথা চাপা পড়িয়া গেল। কিন্তু সেই পদ্মা-ভীতি। বাড়িতেও সে ভয় হইতে রেবা নিস্তার পায় না। ঢেউয়ের আছাড়ে যখন পার ভাঙিয়া প্রবল শব্দে নদীগর্ভে ঠাঁই পায় গভীর রাত্রে তাহারই আওয়াজ রেবার কানে আসিয়া তাহাকে ঘুমাইতে দেয় না। পদ্মা তাহাদের বাড়ি হইতে বেশী দূরে নয়। তরঙ্গের সোঁ সোঁ গর্জ্জন কখনও তাহার কানে অস্ফুট কাৎরানির মত মনে হয়, আর কম্পিত ভীরু পাখীটির মত সে মণীশের বুকে আশ্রয় লইয়া চক্ষু মুদিয়া থাকে। মণীশ বলে, "ভয় কি, ও ঢেউয়ের শব্দ, না এত ভয় ত ভাল নয়। দাঁড়াও, তোমার ভয় ভেঙে দিচ্ছি।"

পরদিন সে রেবার আপত্তি না শুনিয়া তাহাকে গিয়া পদ্মার কূলে বেড়ায়। মণীশের স্বাধীন চলা-ফেরায় কেহ বাধা দেয় না। সুতরাং সকাল সন্ধ্যায় কখনও বা রাত্রিতেও তাহাদের ভ্রমণ চলে।

ধীরে ধীরে রেবার মন হইতে ভয়ের ভাব কাটিয়া যায়। এখন সে উত্তালতরঙ্গময়ী পদ্মার বুকে ছোট জেলে নৌকাগুলি যখন ঢেউয়ের মুখে নাচিতে থাকে তাহা দেখিয়া ঈষৎ শঙ্কা বোধ করিলেও সন্ধ্যায় অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের রক্তরাগরঞ্জিত অপেক্ষাকৃত শান্ত পদ্মার অপরূপ সৌন্দর্য্যে স্নিগ্ধ শান্তির আভাস পায়।

তারপর পূর্ণিমা নিশীথে জ্যোৎস্নাস্নাত পদ্মা যখন রূপালি বসনে সাজিয়া ভুবনভোলান রূপ ধরে তখন মুগ্ধ রেবা মণীশের মতই পুলকিত চিত্তে বলিয়া ফেলে, 'সত্যি, কি সুন্দর।'

মণীশ হাসে, বলে, "চিরযৌবনা পদ্মা—ষোড়শীর মতই রূপসী," তারপর রেবার কানের কাছে মুখ আনিয়া বলে, "তা ব'লে ভয় নেই গো, যতই রূপসী হোক না ও তোমার সতীন নয়।"

রেবা হাসিয়া মুখ বাঁকায়।

মণীশ বলে, "সত্যি, পদ্মা যে আমার কতকালের সঙ্গিনী জান না। ওর তীরে বসেই তোমার জন্য আরাধনা করেছি যে—তাই না এমনটি পেলুম।"

হেমন্তের স্বর্ণরঞ্জিত পল্লীশ্রী যখন আপনার সবুজ শস্য-সম্ভার লইয়া চোখে মায়াতুলিকা বুলায়, সেই সময়ে রেবা আবার পিত্রালয় হইতে শ্বশুরালয়ে আসিল। এখন আর পদ্মা তাহার ভীতি জাগায় না। মণীশের মনমোহিনীকে সেও প্রিয় চোখেই দেখে। তাই সহজেই এবার সকলের মাঝখানে সে আপনার স্থান করিয়া লইল।

মণীশ এবার আসে নাই। শাশুড়ীর উদার স্নেহে শাসনের বন্ধন ছিল না বলিয়া আদরিণী কন্যার মতই রেবা দেবর-ননদের দলে মিশিয়া গেল। বধূর সলজ্জ ভাব তাহার মনে ঠাঁই পায় না বলিয়া ছুটাছুটি করিয়া খেলিতে তাহার বাধে না। এইরূপে সে একদিন কাণামাছি হইয়া বাহিরে গমনোদ্যত শ্বশুরকে ধরিয়া ফেলিয়া সকলের অশেষ পরিহাসের পাত্রী হইল। শাশুড়ী মৃদু ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, "দুষ্ট মেয়ে, তুমি বড় দুরন্ত হচ্ছ মা আজকাল।" বধূর তাহাতেও চৈতন্য নাই। তাহার শৈশবচাঞ্চল্য এখানে যেন মুক্তি পাইয়া দ্বিগুণ হইয়া উঠিয়াছে। তাই কনিষ্ঠ দেবর নরুর কাছে ডাঁসা পেয়ারা চাহিয়া না পাইলে সে নিজেই গাছে চড়িয়া ননদ রেণুকে আশ্চর্য্য করিয়া দেয়, তারপর টো-পাকা পেয়ারায় অঙ্গুল বোঝাই করিয়া নরুকে বলে, "না দিলে ত বয়েই গেল, সাধলেই গোমর বাড়ে।"

শুধু গাছে-চড়া নয়, খিড়কীর পুকুরে সে সাঁতারও কাটে, সাঁতারে রেণুর সমকক্ষ হইতে প্রাণপণ চেষ্টা করে। কিন্তু নিরালম্ব হইয়া ভাসিবার কৌশলটুকু সে কিছুতে আয়ত্ত করিতে পারে না বলিয়া দাসীদের কলসী কাড়িয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাহাদের কাজের বাধা জন্মায়। তারপর সগর্ব্বে মণীশকে লেখে 'এখন আর আমি ভীতু নই। দেখবে, এবার তুমি এলে পদ্মায় সাঁতার কাটব।"

মণীশ উত্তর দেয়, 'তুমি সাহসী হয়েছ বেশ, কিন্তু এ-অভাগার আর কোন আশা রইল না। ঈশান কোণে কালো মেঘের সঙ্গে বাতাস যদি প্রবল হয়, তুমি ত আর ভয় পাবে না—'

কি রকম দুর্ব্বোধ্য চিঠি - রেবা নিঃশ্বাস ফেলিয়া ভাবে, "কি যে মানুষ বোঝা যায় না, ভয় পেলে বলবেন, 'ভীতু' আবার সাহস হ'লেও—কাঁদুনী গাওয়া—"

দোলের দিন রেবা এক কাণ্ড করিয়া বসিল। নরুকে রং দিতে গিয়া সে নিজেই আপাদমস্তক রঞ্জিত হইয়া ভীষণ লাঞ্ছিত হইল। শেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া অন্য ফন্দী আঁটিয়া নরুর পাঠগৃহের দ্বারের অন্তরালে লুকাইয়াছে, এমন সময় শাশুড়ী কি কাজে সে-ঘরে প্রবেশ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে বধূর পিচকারীর সবটুকু রং তাঁহার বক্ষে নিক্ষিপ্ত হইল।

অজ্ঞানকৃত অপরাধ এবং কতকটা পুত্রের দুষ্টামী বুঝিয়া রেবাকে তিরস্কার না করিলেও তিনি সেদিন গম্ভীর হইয়াই রহিলেন। আর সন্তপ্ত রেবা তাঁহাকে তুষ্ট করিবার উপায় খুঁজিতে লাগিল।

সকালে গৃহিণী নিতাইদাকে বাজারে পাঠাইবার সময় বলিতেছিলেন, "ছেলেরা কেউ খেতে চায় না, কি তরকারী যে তাদের দি, এঁচোড় যে কবে উঠবে—" হঠাৎ এই কথাটা মনে পড়িতেই রেবা উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। আমবাগানের ধারের কাঁটাল গাছটায় সে কাল দুইটি এঁচোড় দেখিয়াছে যে। অপেক্ষাকৃত আগে হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় এখনও তাহা কাহারও নজরে পড়ে নাই। গাছটিও বিশেষ বড় নয়, গুঁড়ি হইতে অল্পপরেই গাছটি দুই ডালে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। রেবা সেখানে অনায়াসেই উঠিয়া এঁচোড় আনিয়া শাশুড়ীকে প্রসন্ন করিবে।

বিকালের দিকে শাশুড়ী যখন ভাঁড়ারের কাজে ব্যস্ত অবসর বুঝিয়া রেবা তখন বাগানে গিয়া উপস্থিত হইল। তারপর গাছে চড়িয়া মাত্র একটি এঁচড় পাড়িয়াছে এমন সময় গৃহিণীর ভাগিনেয় বাগানের পথেই প্রবেশ করিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল এবং যাহাকে চোর মনে করিয়াছিল সে তাহাদের

বাড়ির বধূ রেবা,—বুঝিতে পারিয়া সে সহাস্যে চীৎকার জুড়িয়া দিল, "ও, মামীমা দেখবে এসো, তোমার বৌ কেমন গাছে চড়েছে।"

রেবার স্বভাব সকলেই জানে। শাশুড়ীও ছুটিয়া আসিয়া ভাগিনেয়ের হাস্যে যোগ দিলেন। রেবা তখন এঁচোড় ফেলিয়া মাটিতে মুখ লুকাইয়াছে। গৃহিণীর ভাগিনেয় মণীশের চেয়েও কিছু বড়। ভাসুর মানুষ, গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিতে পারেন না, তাই না রেবাকে এই লজ্জা পাইতে হইল। দুঃখে তাহার কান্না আসিতেছিল। আজ সকালে যে কার মুখই দেখিয়াছিল!

ভাগিনেয় চলিয়া গেলে গৃহিণী বধূকে বলিলেন, "পাগলী, এঁচোড় পাড়তে গেলি কেন?" রেবা এবার ছলছল চোখ তুলিয়া বলিল, "মা, আপনি যে তখন নিতাইদাকে বললেন।"

চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষে একদিন পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে পদ্মায় স্নান করিয়া আসিয়া বধূর খেয়াল অন্য দিকে বহিল। খিড়কির পুকুরে তাহার আশ মিটে না কেবলি শাশুড়ীকে বলে, 'চলুন না মা, পদ্মায় কি মজাই লাগল সেদিন।"

শাশুড়ী হাসিয়া বলেন, "পদ্মা কি তোমার বাড়ির পুকুর, মা? তুমি যে বাঙাল দেশের মেয়েদেরও হার মানালে বাছা—।"

রেবা তবুও অনুনয় করিতে ছাড়ে না, শেষে শাশুড়ীকে বিরক্ত হইয়া বলিতে হয়, "আচ্ছা, কাল যাওয়া যাবে, কি যে পাগলের পাল্লায় পড়েছি!"

তারপর সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত 'কাল' যখন আসিল, রেবাকে আর পায় কে? বোধ করি রাত্রেও এই পরম ক্ষণটির অপেক্ষায় ঘুমাইতে পারে নাই। ভোর হওয়ার আগেই সে নিদ্রাকাতর রেণুকে ঠেলিয়া তুলিয়া নিদ্রিত শাশুড়ীর পায়ে আপনার কোমল কচি হাত চাপিয়া বলিল, "উঠুন না মা, বেলা হয়ে যাবে যে।"

রাত্রিতে গরমের জন্য অনিদ্রায় ছট্‌ফট্ করিয়া ভোরের সুমিষ্ট হাওয়ায় শাশুড়ীর ঘুম যেন গাঢ় হইয়া আসিয়াছিল। এমন সময় বধূর ডাকে তন্দ্রাজড়িত স্বরে কোন প্রকারে বলিলেন, "চোখ যে চাইতে পারছি নে, মা—আজ না হয়—"

শাশুড়ীর কথার শেষটুকু বুঝিতে পারিয়াই শঙ্কিতা রেবা তাড়াতাড়ি বলিল, "তাহ'লে আপনি একটু ঘুমিয়ে নিন মা, আমরা না-হয় নিতাইদাকে তুলে নিয়েই যাই। আর কি-ই বা, এইটুকু ত পথ—"

শাশুড়ী ঘুমের ঘোরেই বলিলেন, "নিতাইকে নিয়ে যাবে? দু-জনই যে ছেলেমানুষ—ভেবে দেখ মা।"

রেবার তখন ভাবিবার অবসর নাই। সে নিতাইদাকে তুলিয়া খিড়কীর পথে ছুটিয়াছে। রজনীর ম্লান ছায়া তখনও ধরণীকে স্বপ্নজড়িত করিয়া রাখিয়াছে। নির্জ্জন পথ। শুধু ভোরের আকাশের সমুজ্জ্বল শুকতারাটি ইহাদের অপূর্ব্ব পুলক দেখিবার জন্যই যেন চাহিয়া আছে।

ছোট দলটি নিঃশব্দেই পথটুক পার হইল। পশ্চাতে পুরাতন ভৃত্য নিতাইদা বিরস মনেই চলিয়াছে। নিদ্রাভঙ্গে তাহার তাম্রকূট সেবন পর্য্যন্ত হয় নাই। গতি সেজন্য মন্থর। চঞ্চলা রেবা তাহাকে এমনি জ্বালাতন করে, মনীশ আসিলে এবার বৌকে শাসন করিতে বলিতে হইবে।

ঘাটে পৌছিয়া দু-জনে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। তখনও জনসমাগম হয় নাই। শুধু বাউরীদের একটি বউ কি কাজে অত ভোরেই আসিয়াছে। কিন্তু তাহার নিকট কোনও সঙ্কোচ নাই। রেবা আপন অবগুণ্ঠন মুক্ত করিয়া দিল। নিতাইদা তখন তীরের উপর বোধ করি তাম্রকূটের চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

ভোরের হাওয়ায় শীতের আমেজ লাগিতেছিল। রেণু তাড়া দিয়া বলিল, "বেশীক্ষণ নাইব না ভাই।"

"দাঁড়া, এক্ষুনি কি!" বলিয়া বাউরী বধূর দিকে ফিরিয়া বলিল, "তুমি কলসী আননি গা? একটা কলসী পেলে কেমন সাঁতার কাটতে পারতুম।"

রেণু হাসিয়া বলিল, "অত সাহসে কাজ নেই। বাড়াবাড়ি কোরোনা বৌদি। বড়রা কেউ সঙ্গে নেই, শেষকালে বকুনি খেতে হবে।"

যে-স্ত্রীলোকটি ঘাটে ছিল সে খানিকক্ষণ জলদেবীর মত দুই সখীর জলক্রীড়া দেখিয়া উঠিয়া গেল। রেবার আর সখ মিটে না—রেণু রাগ করিয়া বলিল, 'তুমি না ওঠ, আমি উঠছি, দেখছ রোদ উঠল কি রকম।"

রেবা আরও দূরে একটু সাঁতার কাটিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "আচ্ছা ভাই, তুমি ওঠ, আমি এই এলাম।"

রেণু সত্যই উঠিয়া পড়িল। তার পর ঘাটের এক প্রান্তে যেখানে শুষ্ক বলিয়া বস্ত্রাদি রাখিয়াছিল সেখানে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া রেণু কাপড় ছাড়িতেছে, এমন সময় যেন রেবার অস্ফুট আর্ত্তকণ্ঠ শুনিয়া, রেণু ফিরিয়া চাহিল, কিন্তু কোথায় রেবা! শুধু তরঙ্গের পর তরঙ্গ, সেই তরল মধ্যে একবার মাত্র দুখানি আশ্রয়প্রয়াসী বাহু উত্থিত হইল, তার পর কোন অতলে তলাইয়া গেল।

সংবাদ পাইয়া, মহেন্দ্রবাবু ছুটিয়া আসিয়া বজ্রাহতের মতই বসিয়া পড়িলেন। নিস্পন্দ বক্ষে যাঁহাকে খুঁজিলেন, কোথাও তাহার চিহ্ন নাই—নদীসৈকতে শুধু কম্পমানা কন্যার অর্দ্ধমূর্চ্ছিত দেহ পড়িয়া আছে; আর সকলের আদরিণী বধূকে খুঁজিয়া পাগলের মতই নিতাই নদীতল আলোড়ন করিয়া চলিয়াছে।

মুহূর্ত্ত মধ্যে লোকজনে সে স্থান পূর্ণ হইয়া উঠিল। অবিলম্বে জেলের দলও আসিয়া ঘিরিয়া ফেলিল। কিন্তু ব্যর্থ চেষ্টায়! ক্লিষ্ট চিত্তে কন্যা সহ মহেন্দ্র বাবু বাড়ি ফিরিলেন। মণীশকে সেদিন তার করা হইল, "রেবা পীড়িত, শীঘ্র এস।"

গৃহে পৌছিয়াই মণীশ বুঝিল, রেবা নাই। পুরী যেন শূন্যতায় ছাইয়া গিয়াছে। স্পন্দনহীন বক্ষে দুহাত চাপিয়া মনীশ বাহিরেই বসিয়া পড়িল। রেবাকে তবে কাল-রোগেই ধরিয়াছিল। কেহ তাহাকে কিছু বলিতে আসিল না। শুধু অন্তঃপুরে মাতার ক্রন্দন উত্থিত হইয়া মণীশকে জানাইল, রোগে নয়—সুস্থ আনন্দময়ী রেবা পদ্মাগর্ভে প্রাণ হারাইয়াছে।

ইহার পরে গৃহ যেন মণীশের অসহ্য হইয়া উঠিল। উন্মনার মত পদ্মাতীরে থাকিতেই তাহার ভাল লাগে। যেন আশা করে রেবার দেখা পাইবে। রেবা কি একবার অন্ততঃ বিদায় লইতে আসিবে না। মণীশের দৃষ্টি দূরদূরান্তর রেবাকে খুজিয়া ফিরিল। নৌকায়, চলাপথে বহু দূর পর্য্যন্ত কত যে প্রহরী নিযুক্ত হইয়াছে, কিন্তু রেবা যেন নিশ্চিহ্ন হইয়া আপনাকে লুকাইয়াছে। মণীশের চিরপ্রিয় পদ্মা, রাক্ষসীরূপেই তাহার প্রিয়তমাকে গ্রাস করিয়াছে।

আরও দুই বৎসর কাটিয়াছে। পিতামাতার অনুরোধে মণীশকে আবার বিবাহ করিতে হইল। বধূ নীলা রূপে রেবার সমতুল। কিন্তু তাহাতে বালিকার চাঞ্চল্য নাই, শিক্ষায় তাহার রূপকে যেন আরও দীপ্তিময়ী করিয়াছে। দেখিয়া সকলেই খুশী হইল, কিন্তু মণীশের বুকের ক্ষত জুড়াইল না।

নীলা সাহসী মেয়ে, ভয় তাহার মনে স্থান পায় না। তবু মনীশ এবার দেশে গেল না। বিবাহ অন্তেই বধূসহ আপনার কর্ম্মস্থল পাটনায় চলিয়া গেল। নীলাকে সে যথেষ্ট ভালবাসে, কিন্তু একটি দিনের জন্য তাহাকে কোথাও যাইতে দেয় না। পরিজনের স্নেহভিখারী নীলার মন ইহাতে কাঁদিতে থাকে। একগুঁয়ে মণীশ তাহা বুঝিবে না। ছুটি হইলেই সে নীলাকে লইয়া ভ্রমণে বাহির হয়। এইরূপে কত দেশ যে নীলা ঘুরিল, আগ্রা, দিল্লী, এবং বৌদ্ধযুগের গৌরবময় স্মৃতি সারনাথ, নালন্দার ধ্বংসস্তূপ কিছুই দেখিতে বাকি রহিল না। কিন্তু এত করিয়াও স্ত্রৈণ নামে খ্যাত মণীশ নীলাকে খুশী করিতে পারিল না। সে কেবল বলে, "দেশে চল না, ছাই ইটপাথর দেখে যে অরুচি ধরে গেল। পদ্মার রূপ শুধু কবির কাব্যেই রইল, চোখে আর দেখতে পেলুম না।"

সেবার পূজার ছুটিতে নীলা বাড়ি যাইবে বলিয়া ধরিয়া বসিল। মণীশ এবার দেওঘর, মধুপুর প্রভৃতি সাঁওতালের দেশের কত বিচিত্র সৌন্দর্য্যের বর্ণনা করিল, কিন্তু নীলা অটল। ইতিমধ্যে মার চিঠি আসিয়া আরও ইন্ধন যোগাইল। মা এবার মণীশকে অনেক অনুনয় করিয়া লিখিয়াছেন, "তোমাদের না দেখে, কি করেই যে থাকি...।" বাধ্য হইয়া মণীশ যাইতে রাজি হইল।

বহু দিন পরে পূজা এবার আনন্দে কাটিল। নীলার স্বভাবে সকলে মুগ্ধ। সবাই তাহাকে ভালবাসে। কিন্তু সে—স্নেহে কোন উচ্ছ্বাস নাই। অন্তঃসলিলার মত তাহা নীরবেই বহিয়া চলে। তাই নীলাকে লইয়া কেহ আনন্দ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইল না। পুকুর বাগান এমনি পড়িয়া রহিল। সেই কাঁটালগাছটি এখন অনেক ডালপালা মেলিয়া বহুবিস্তৃত হইয়াছে। গৃহিণী এখনও সেদিকে চাহিতে পারেন না। পেয়ারাবাগান দেখিলে এখনও রেবার হাসিতে উজ্জ্বল মুখটি মনে পড়ে কাজেই কোথাও যাওয়া হয় না। নীলা তাই নিজেই সব ঘুরিয়া দেখিল। তারপর মণীশকে একদিন বলিল, "পদ্মার ধারে বেড়াতে চল না! চাঁদের আলোয় পদ্মাকে না দেখলে যে দেখাই হ'ল না।"

মণীশ এ-কথায় ইতস্ততঃ করে। নীলা আবার বলে,

"লক্ষ্মীটি চল, আর ক'দিনই-বা, দিন ত ফুরিয়ে এল। তুমি ত আমায় রেখে যাবে না এখানে!"

নীলার কাতর অনুনয়ে মণীশ রাজি হয়। ভাবে ওর সামান্য সাধ কেনই-বা অপূর্ণ থাকে। একদিন মাত্র—তারপর আর সে নীলাকে এদেশে আসিতে দিবে না।

সেদিনও জ্যোৎস্নাময়ী রজনী। সেই চিরপরিচিত রূপসী পদ্মা আজও রূপের তরঙ্গ তুলিয়াছে। বুঝি আবার নীলাকে ভুলাইতে চায়। মণীশ নীলার হাত দৃঢ় করিয়া নিজের হাতে বাঁধিল। তারপর দুই চারি পদ মাত্র অগ্রসর হইয়াছে, মণীশের মনে হইল যেন কাহার অশরীরী ছায়া দুই বাহু বাড়াইয়া পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে, আর যাওয়ার উপায় নাই। মণীশ আড়ষ্ট হইয়া সেখানেই দাঁড়াইল। তাহার বাক্‌শক্তি বুঝি লোপ পাইয়াছিল, তাই নীলা যখন বলিল, "দাঁড়ালে কেন? যাবে না?" তখন সে প্রাণপণ শক্তিতে অস্ফুট কণ্ঠে বলিল, 'যাই।' কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে কি যে অঘটন ঘটিল—মণীশ শুনিতে পাইল, দিগন্ত ভেদ করিয়া হা হা হাসির অট্টরোলের মধ্যে কে আকাশের বুকে করুণ আর্ত্তনাদ তুলিল, "যাই গো—যাই।"

মণীশ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

জ্ঞান হইলে মণীশ দেখিল সকলের ব্যাকুল দৃষ্টির মাঝখানে সে নিজের শয্যায় রহিয়াছে। একদল নিশাচর পক্ষীর উড়িয়া যাওয়ার শব্দে সে না-কি ভয় পাইয়াছিল, শুনিয়া ম্লান হাসিল।

দিন দুই পরে মণীশ একটু সুস্থ বোধ করিলে জননী নিজেই গরজ করিয়া ছুটি ফুরাইবার আগেই পুত্র এবং বধূকে পাটনায় পাঠাইলেন। তাঁহার সাধ মিটিয়া গিয়াছিল।

ইহার পর তাহাদের আর দেশে আসা হয় নাই। ছুটি হইলে এখন নীলা দার্জ্জিলিং মুসৌরী দেখিতে আব্দার ধরে, কিন্তু পদ্মার নাম নাম মুখেও আনে না।

জয়নারায়ণ হাইস্কুল, কাশী

শ্রীরামচরণ চক্রবর্ত্তী, বি-এ, এল-টি

সেকালের কলিকাতায় যে কয়টি ইংরেজী ইস্কুল স্থাপিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে যে কয়টি জীবিত থাকিয়া এখনও ইংরেজী ভাষা শিক্ষা দিয়া আসিতেছে তাহাদের কোনটিই কাশীস্থ জয়নারায়ণ স্কুলের ন্যায় প্রাচীন নহে। ফলতঃ সমগ্র ভারতে বর্ত্তমান সময়ে ইহার ন্যায় প্রাচীন স্কুল একটিও নাই।* ইহা কাশীধামে বাঙালীর অন্যতম কীর্ত্তি। এই স্কুল প্রতিষ্ঠার ইতিহাস পাঠে প্রত্যেক বাঙালীই গৌরব অনুভব করিবেন, সন্দেহ নাই।

কলিকাতা খিদিরপুর ভূকৈলাসের প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী মহারাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল বাহাদুর ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে রোগগ্রস্ত হইয়া কাশীধামে আগমন করেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম চল্লিশ বৎসর। আয়ুর্ব্বেদীয় ও এলোপ্যাথিক চিকিৎসায় কোনও ফল না পাইয়া তিনি মিঃ হুইটলি (Mr. Wheatly) নামক স্থানীয় একজন ইংরেজ বণিকের চিকিৎসাধীন হন।* এই সূত্রে উভয়ের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধীয় আলোচনা চলিতে থাকে।†

* বঙ্গদেশে শ্রীরামপুর কলেজ কেরী, মার্শম্যান ও ওয়ার্ড কর্ত্তৃক ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়, জয়নারায়ণ স্কুল স্থাপনের চারি বৎসর পরে। অন্য প্রদেশে এ সময়ের ইংরেজী স্কুল একটিও আছে কি-না সন্দেহ।

* হুইট্‌লি সাহেব সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়, "a pious man held in esteem by all' classes who had some little medical skill which he exhibited in gratuitous relief to the poor."

মহারাজা ১৮১৮ সালের ১৮ই আগষ্ট তারিখে লণ্ডনের চার্চ্চ মিশনরী সোসাইটিকে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত স্কুলটির ভার লইবার জন্য যে পত্র লেখেন, তাহাতে আছে, "In respect of my complaint he (Mr. Wheatly) recommended some simple medicines but advised above all that I should apply myself to God in prayer to lead my mind into the truth and to grant me bodily heali g." ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, হুইট্‌লি সাহেব ঈশ্বরে কিরূপ ভক্তিমান্ ছিলেন।

† মহারাজ ধর্ম্মসম্বন্ধে অত্যন্ত উদার মত পোষণ করিতেন। নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ হইয়াও তিনি খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতি সমুচিত আদর দেখাইতে কুণ্ঠিত হন নাই। সকল ধর্ম্মের মধ্যেই সত্য নিহিত আছে, ইহা তিনি পূর্ণরূপেই বিশ্বাস করিতেন।

সৌভাগ্যক্রমে হুইট্‌লির চিকিৎসায় মহারাজা সম্পূর্ণরূপে নিরাময় হন এবং রোগমুক্তিজনিত কৃতজ্ঞতার স্থায়ী নিদর্শনে কিছু রাখিতে চাহিলে হুইট্‌লি তাঁহাকে একটি স্কুল স্থাপনের পরামর্শ দেন। তদনুসারে ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে কাশীধামে জঙ্গম-বাড়ির নিকটস্থ গরুড়েশ্বর মহল্লায় তাঁহার নিজ বাড়িতে মহারাজা স্কুলটি স্থাপন করেন।* ইতিমধ্যে হুইট্‌লি ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হন এবং মহারাজা তাঁহাকেই প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করেন। এই স্কুলে ইংরেজী, বাংলা, হিন্দী, সংস্কৃত ও ফার্সী ভাষা শেখান হইত। পাঠ্যবিষয় পাটীগণিত, ইতিহাস, ভূগোল, জ্যোতিষ ও পুলিস আইন ছিল।

মহারাজা কলিকাতায় অবস্থানকালে শ্রীরামপুরের পাদরীগণকে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্ত্তনের জন্য যথেষ্ট উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের সহিত কার্য্য করিতে দেখেন। তাঁহাদেরই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি কার্য্যে অগ্রসর হন। কলিকাতা স্কুল-বুক-সোসাইটির ন্যায় পাঠ্যপুস্তক-প্রকাশেও তাঁহার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু ইহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই।†

মিঃ হুইট্‌লির মৃত্যুর পর মহারাজা স্কুলের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তাকুল হইয়া পড়েন। এই সময়ে রেভারেণ্ড্ ডেনিয়ল্ করি (Rev. Daniel Corrie) কাশীধামে পাদরী (Chaplain) ছিলেন। তাঁহার সহিত এ-সম্বন্ধে মহারাজা পরামর্শ করেন এবং স্কুল পরিচালনের ভার চার্চ্চ মিশনরী সোসাইটির হস্তে অর্পণ করিতে স্থিরনিশ্চয় হন। মাসিক দুই শত টাকা আয়ের সম্পত্তি তিনি স্কুলে ন্যস্ত করিতে প্রতিশ্রুত হওয়ায় কলিকাতাস্থ চার্চ্চ মিশনরী এসোসিয়েশন স্কুলের ভার গ্রহণ করেন।*



মহারাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল—তুকৈলাস

* এই বিশাল ভবন নির্ম্মাণ করিতে মহারাজা ৪৮,০০০৲ ব্যয় করেন। চুণার পাথরের আচ্ছাদন দেওয়া এই গৃহে স্কুলটি ২৫ বৎসর অবস্থিত ছিল। এই গৃহ পরে হস্তান্তরিত হয়। ইহা এখন ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়াছে।

† উক্ত বিখ্যাত পত্রে তিনি লেখেন, "I am therefore anxious to have a printing press also established at Benares by which school books might be speedily multiplied and treatises on different subjects might be printed and generally dispersed throughout the country. Without this, the progress of knowledge must be very slow and the Hindus long remain in their very fallen state, which is a very painful consideration to a benevolent mind."

ইংরেজী শিক্ষার উপকারিতা সম্বন্ধে মহারাজা জয়নারায়ণ রাজা রামমোহন রায়ের সহিত একমত ছিলেন, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়।

* মহারাজা জয়নারায়ণ যতদিন জীবিত ছিলেন, স্কুল কমিটির হস্তে মাসিক ২০০৲ টাকা প্রদান করিতেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে কাশীর নিকটস্থ শিবপুর ও সিকরোল গ্রামস্থিত দুইটি বসতবাটী—যাহাদের মাসিক আয় ৩৫০৲ টাকা ছিল—তিনি স্কুলে দান করিয়া যান। চার্চ্চ মিশনরী সোসাইটি শিবপুর গ্রামস্থ সম্পত্তি ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ এলিস্ নামক ইংরেজকে ৮০০০৲ টাকায়, এবং সিক্রোল গ্রামস্থিত সম্পত্তি ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে মিঃ টেলর নামক ইংরেজ ভদ্রলোককে ৮৫০০৲ টাকায় বিক্রয় করেন এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থে কোম্পানীর কাগজ ক্রয় করেন। এইরূপেই স্কুলের এণ্ডাউমেণ্ট ফণ্ডের সূত্রপাত হয়। এই ভাণ্ডার বহু বিদ্যোৎসাহী মহানুভবের অনুগ্রহে ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইয়া ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ৪৫২০০৲ টাকায় পরিণত হয়। এই ভাণ্ডার বর্ত্তমান সময়ে চার্চ্চ মিশনরী ট্রাষ্ট এসোসিয়েশনের হস্তে ন্যস্ত আছে। ১৯১৬-১৭ খৃষ্টাব্দে স্কুলের ছাত্রাবাস নির্ম্মাণকালে এই ভাণ্ডার হইতে ১৫০০০৲ টাকা লওয়া হয়। এক্ষণে এই ভাণ্ডারে ২৭০০০৲ টাকা সঞ্চিত আছে এবং ইহা হইতে স্কুলের বাৎসরিক আয় ১০০০৲ টাকা।

১৭ই জুলাই (১৮১৮) তারিখে এই স্কুলের দ্বারোদ্‌ঘাটন উৎসব মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হয়। স্কুলের নাম রাখা হয় "মহারাজা জয়নারায়ণ ঘোষালের অবৈতনিক স্কুল।" ছাত্রগণ এখানে বিনা বেতনে পড়িতেন। দরিদ্র ছাত্রগণকে আহার ও অন্যান্য আবশ্যক দ্রব্যাদির ব্যয়নির্ব্বাহার্থ মাসিক বৃত্তি দেওয়া হইত। ছাত্রের অভিভাবকগণ ইচ্ছা করিলে স্কুলভাণ্ডারে অর্থসাহায্য করিতে পারিতেন। প্রথমে পঞ্চাশ জন ছাত্র স্কুলে প্রবিষ্ট হন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে শিক্ষকগণের বেতন বাবদ মাসিক মাত্র পঞ্চাশ টাকা ব্যয় হইত।

প্রথমে মিঃ এডলিংটন (Mr. Adlington) নামক একজন মিশনরী স্কুলের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে সকৌন্সিল বড়লাট লর্ড হেস্টিংস্ বাহাদুর এই স্কুলে বাৎসরিক ৩০৩৩৲ টাকা সাহায্য দিবার ব্যবস্থা করেন। স্কুল এই সাহায্য এযাবৎ পাইয়া আসিতেছে।*

মহারাজা জয়নারায়ণ ১৮২১ খৃষ্টাব্দে কাশীলাভ করেন।

১৮২৪ খৃষ্টাব্দের ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে স্বনামধন্য বিশপ হিবার (Bishop Heber) স্কুল পরিদর্শন করিয়া বিশেষ সন্তোষ লাভ করেন।†

মহারাজের মৃত্যুর পর তাঁহার বংশধরগণ বহুদিন যাবৎ এই স্কুলের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে থাকেন। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পুত্র রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল মহোদয় স্কুল-ভাণ্ডারে অর্থসাহায্য করেন।* ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে মহারাজা জয়নারায়ণের পঞ্চম প্রপৌত্র রাজা সত্যশরণ ঘোষাল বাহাদুর বর্ত্তমান স্কুলগৃহের দক্ষিণ দিকস্থ ভূমি ৫,০০০ মুদ্রা ব্যয়ে ক্রয় করিয়া দেন এবং তদুপরি স্কুল-ভবন নির্ম্মাণের জন্য সোসাইটির হস্তে ৬,৫০০ মুদ্রা অর্পণ করেন।

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত 'মহারাজা জয়নারায়ণ ফ্রি স্কুল' নামেই স্কুলটি চলিতে থাকে। এই বৎসর ইহার নাম 'মহারাজা জয়নারায়ণ কলেজ ও ফ্রি স্কুল' রাখা হয়। বলা বাহুল্য, কলেজটি বর্ত্তমান সময়ের কলেজগুলির মত ছিল না। স্কুলের সহিত মাত্র কলেজ ক্লাস যোগ করিয়া দেওয়া হয় এবং কলেজের ছাত্রগণের নিকট হইতে বেতন লওয়া হয়। কলেজ-বিভাগে ইংরেজী ক্লাস তিনটি, ফার্সী ও হিন্দী ক্লাস প্রত্যেকে দুইটি, বাংলা ক্লাস তিনটি এবং সংস্কৃত ক্লাস একটি ছিল। স্কুল-বিভাগে ইংরেজী ক্লাস ছয়টি, ফার্সী ক্লাস তিনটি এবং হিন্দী ক্লাস দুইটি ছিল। স্কুলের সর্ব্বোচ্চ ক্লাসে ফলিতজ্যোতিষ একটি পাঠ্যবিষয় ছিল।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে স্কুলের উত্তর দিকস্থ গৃহটি নির্ম্মিত হয়। এ-প্রদেশের তাৎকালীন ছোটলাট টমাসন (Thomason) সাহেবের নামানুসারে ইহার নামকরণ হয়। এই অংশেই কলেজ ক্লাস বসিত। কিন্তু ৩০।৩৫ বৎসর পরে কলেজ ক্লাস উঠিয়া যায় এবং স্কুলটি সাধারণ সাহায্যপ্রাপ্ত (aided) স্কুলে পরিণত হয়।†

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দ হইতে স্কুলের ছাত্রগণের নিকট বেতন লওয়া আরম্ভ হয়। প্রথমে উচ্চ শ্রেণীর বালকগণের নিকট হইতে মাসিক দুই আনা এবং নিম্ন শ্রেণীর ছাত্রগণের নিকট হইতে মাসিক এক আনা বেতন লওয়া হইত।

স্কুল স্থাপনের সময় হইতে এ-যাবৎ বহু অক্লান্তকর্ম্মা

---

* ইহা ভারত-গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রদত্ত দান। এরূপ নির্দ্দিষ্ট ও স্থায়ী অর্থসাহায্য ভারতের আর কোনও স্কুল এতদিন ধরিয়া প্রাপ্ত হয় কিনা সন্দেহ। এ সম্বন্ধে আগ্রা-অযোধ্যার শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর মহোদয়ের উক্তি এইরূপ :—

" * * the interesting and special character of the grant should not be affected. * * The Government has therefore engaged to show the grant separately in the accounts and to continue it as a fixed grant to the school irrespective of examination or attendance results, so long of course, as the school is efficiently managed. The grant should therefore be treated as part of the income of the school; but not as forming part of any grant-in-aid which, under the rules for Anglo-Vernacular Schools, the schools may earn. The amount of this latter grant should be determined under the rules."

উক্ত গ্র্যাণ্ট ব্যতীত সংযুক্ত-প্রদেশ গবর্ণমেণ্ট হইতে স্কুল বাৎসরিক ১০০০০৲—১২০০০৲ অর্থ সাহায্য পাইয়া থাকে।

† বিশপ হবার এই পরিদর্শন সম্বন্ধে তাঁহার Journalএ লিখিয়া গিয়াছেন :—

"The boys read Oordoo, Persian and English extremely well, and answered questions both in English and Hindoostanee with great readiness. * * The boys were fond of the New Testament, and I can answer for their understanding it. I wish a majority of English boys might appear equally well-informed."

* ইঁহার প্রতিষ্ঠিত চৌকাঘাট হাসপাতাল (Kalishanker Asylum) কাশীধামে রাজাজীর আর এক অপূর্ব্ব কীর্ত্তি। এই হাসপাতালে অন্ধ, খঞ্জ, আতুরগণ স্থান পাইয়া থাকে।

† কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে, পঞ্জাবে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে এবং এলাহাবাদে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এ প্রদেশে ইউনিভার্সিটি স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে এই স্কুল ও কলেজের ছাত্রগণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিতেন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ইহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন হয়।

মিস্‌নরী স্কুলের জন্য পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে রেঃ উইলিয়াম স্মিথ; রেঃ সি, বি, লিউপোল্ট; রেঃ ব্রক্‌লেস্‌বি ডেভিস; রেঃ ই, এইচ, এম্‌ ওয়ালার ডবলু; ডি, পি হিল প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মিঃ হিলের সময়ে স্কুলের ছাত্রাবাস নির্ম্মিত হয় এবং স্কুলের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি পরিদৃষ্ট হয়।

লক্ষ্ণৌ ইউনিভার্সিটির ভূতপূর্ব্ব ভাইস্‌-চ্যান্সেলর রায়-বাহাদুর ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, লাহোরের এসিস্‌টেন্ট বিশপ রেভারেণ্ড জন শরৎ চন্দ্র ব্যানার্জিপ্রমুখ বহু কৃতবিদ্য ব্যক্তি এই স্কুলের ছাত্র। যে-সময়ে ইংরেজী শিক্ষা প্রচারের কল্পনাও এ প্রদেশবাসীর মস্তিষ্কে স্থান পাইয়াছিল কি না সন্দেহ, সেই সময়ে লক্ষ্মী-সরস্বতীর বরপুত্র, দেশহিতব্রত মহারাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল বাহাদুর এই স্কুল স্থাপন করিয়া পাশ্চাত্য শিক্ষার পথ সুগম করিয়া দেন। বলা বাহুল্য, ভারতে ইংরেজী শিক্ষার ইতিহাসে মহারাজা জয়নারায়ণের নাম চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।



শিল্পীর পত্নী
শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়-চৌধুরী খোদিত মূর্ত্তি হইতে

পঞ্চশস্য



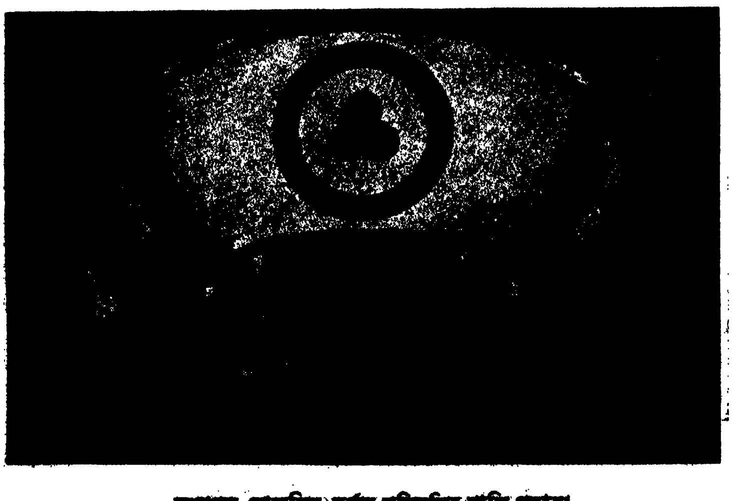
সভ্যতার জননী ও শান্তি পতাকা

কৃষ্টি ও সভ্যতা-ব্যঞ্জক পতাকা—

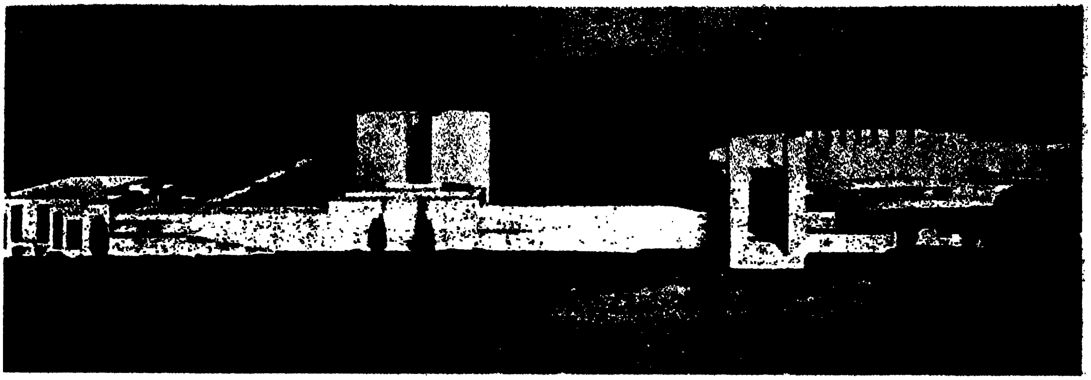
যুদ্ধে আহত ব্যক্তিদের সেবা ও শুশ্রূষার জন্য 'রেড ক্রস্ সোসাইটি' নামে একটি সমিতি আছে। এই সমিতির পতাকা দেখিলে সৈন্যেরা সেদিকে আর গোলাগুলি ছোঁড়ে না। গত যুদ্ধের সময়ে অনেক বহুমূল্য গ্রন্থ, পুস্তকালয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য ও চারুশিল্প নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কৃষ্টি ও সভ্যতার এই সকল সম্পদ যাহাতে ভবিষ্যতে আর বিনষ্ট না হয় সেজন্য বিখ্যাত শিল্পী নিকোলাস রোয়েরিক একটি পতাকা পরিকল্পনা করিয়াছেন। রেড্ ক্রস সোসাইটির পতাকার ন্যায় এই পতাকা দেখিয়া অতঃপর সৈন্যেরা সে দিকে গোলাগুলি ছোঁড়া হইতে নিরস্ত থাকিবে। রোয়েরিক-মহাশয়ের পরিকল্পিত পতাকা শান্তির অগ্রদূত হিসাবে অনেক দেশের মনীষীরা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

শিকাগোর মেলা—

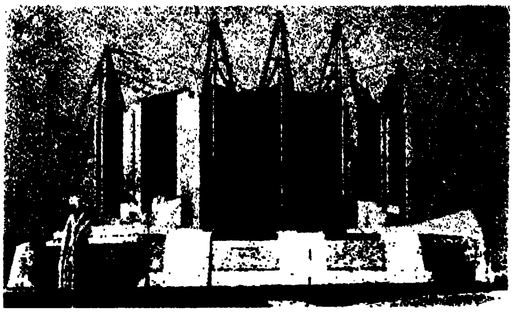
মার্কিনের শিকাগো শহরে সম্প্রতি একটি মেলা বসিয়াছে। ইহাতে জগতের অধিকাংশ দেশ যোগদান করিয়াছে। ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে 'ওয়ার্লড্ ফেয়ার' (বিশ্ব-মেলা)। মেলার দুইখানি চিত্র এখানে দেওয়া হইল।



অধ্যাপক রোয়েরিক কর্তৃক পরিকল্পিত শান্তি পতাকা



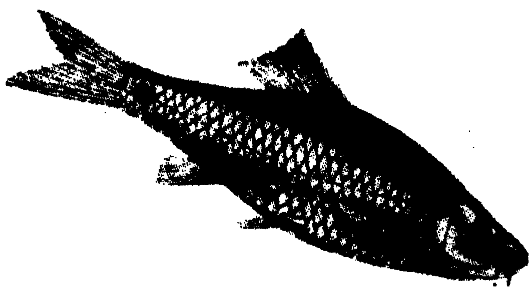
শিকাগো প্রদর্শনী—বিদ্যুৎ গৃহ



শিকাগো প্রদর্শনীতে স্থাপত্যের একটি অভিনব নিদর্শন

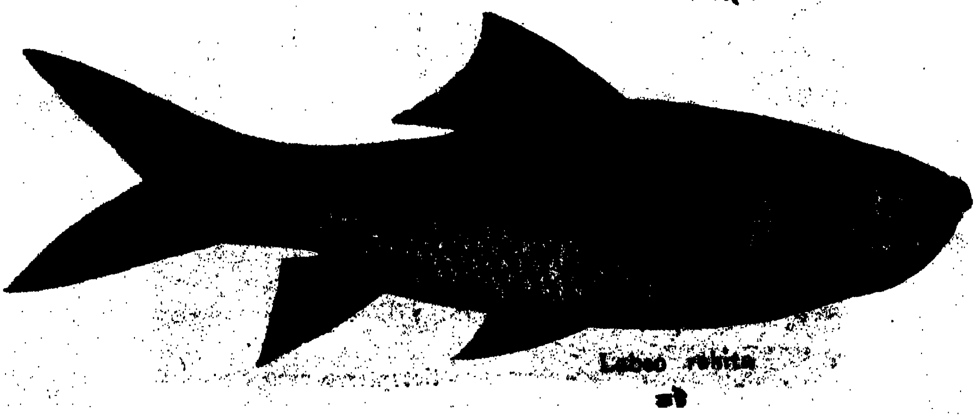
ম্যালেরিয়া-নিবারণে মৎস্য—

আমরা বাঙালীরা মৎস্যাশী। কিন্তু অন্যদিক হইতেও মৎস্যের উপকারিতা যে কত তাহা আমাদের অনেকেরই জানা নাই। ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য মৎস্যের বিশেষ প্রয়োজন। রুই, কাৎলা মৃগেল, কৈ, মাগুর, শোল, চিতল, ফলুই, বোয়াল, পুঁটি, চেলা প্রভৃতি মৎস্য মশার ডিম খাইয়া থাকে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, মশকবহুল ডোবা খানায় মৎস্য ছাড়িলে দু-তিন দিনের মধ্যেই উহারা চলিয়া যায়, মশার ডিমও আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বাংলা দেশের নদী-নালায় মৎস্যের অভাব ঘটিয়াছে। এখন রীতিমত মৎস্যের চাষ আরম্ভ হইলে বাঙালীর খাদ্যসমস্যারই সমাধান হইবে না, সঙ্গে সঙ্গে জাতিধ্বংসকারী ম্যালেরিয়া-রোগও অন্তর্হিত হইবে। এই বিষয়ে রায় বাহাদুর ডাঃ শ্রীগোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গবেষণা করিয়া মানব সমাজের, বিশেষ করিয়া ম্যালেরিয়াগ্রস্ত বাঙালীর অশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। গোপাল-বাবুর প্রবন্ধ ডিসেম্বর সংখ্যা 'মডার্ণ রিভিউ' কাগজে প্রকাশিত হইয়াছে।



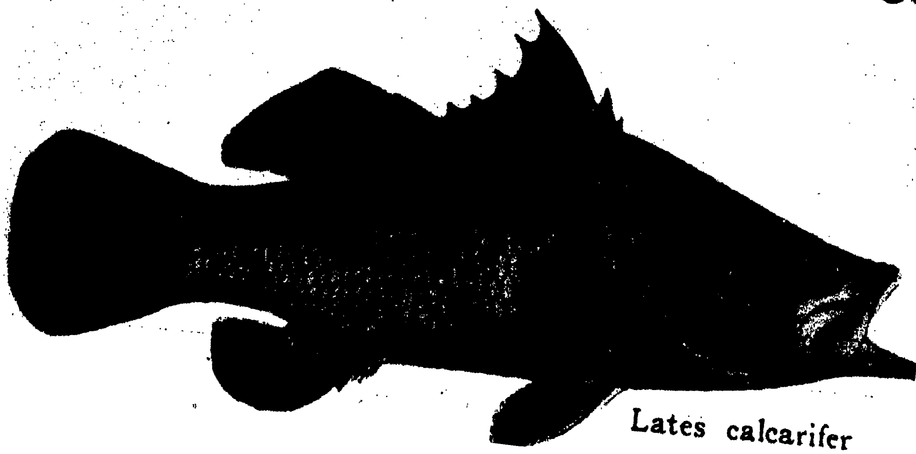
Barbus sophore

পুঁটি

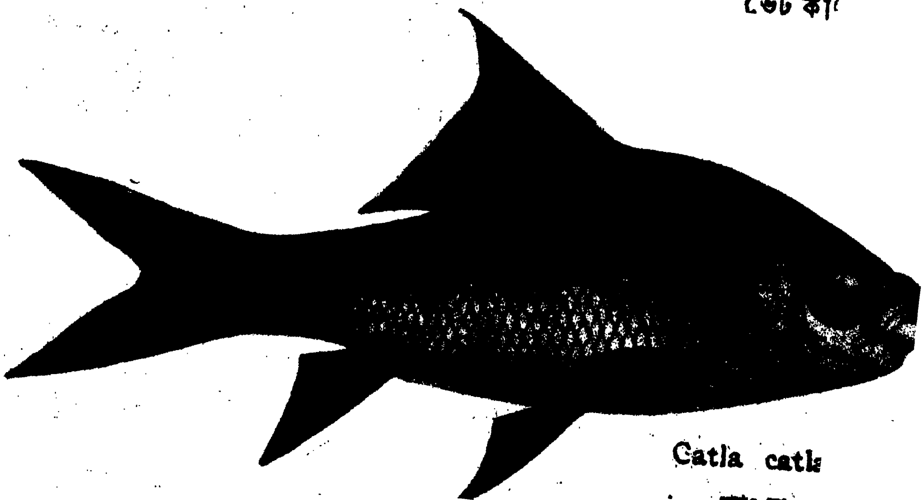


Labeo rohita

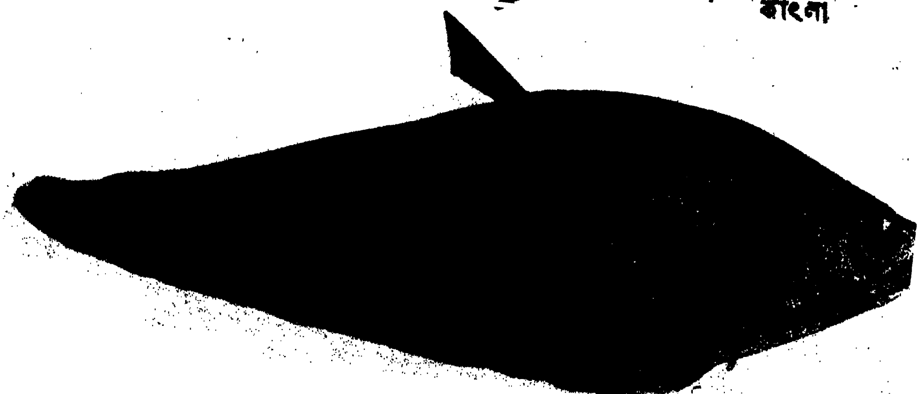
রুই



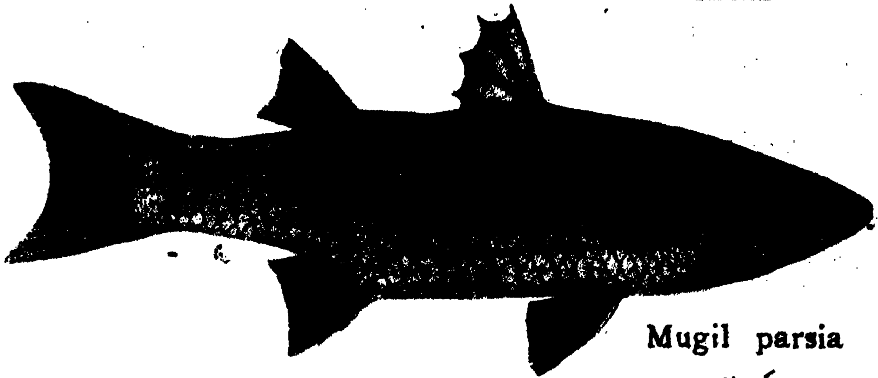
Lates calcarifer
ভেট কী



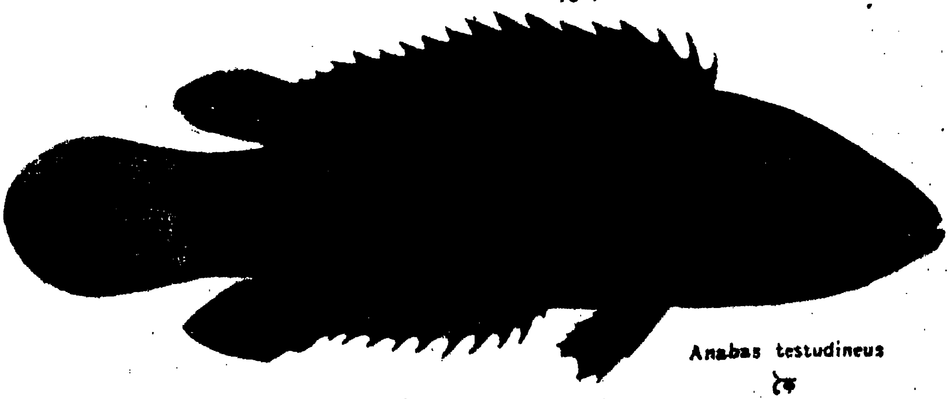
Catla catla
কাৎলা



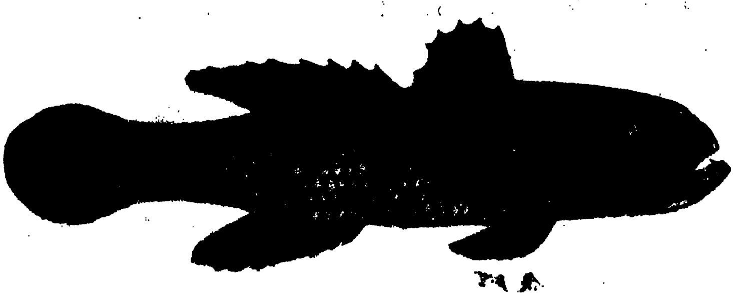
Notopterus notopter
[illegible]



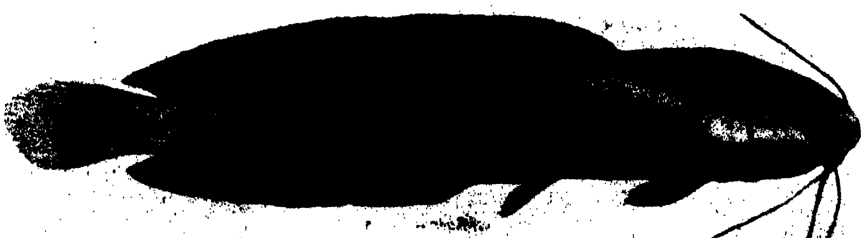
Mugil parsia
পার্শে



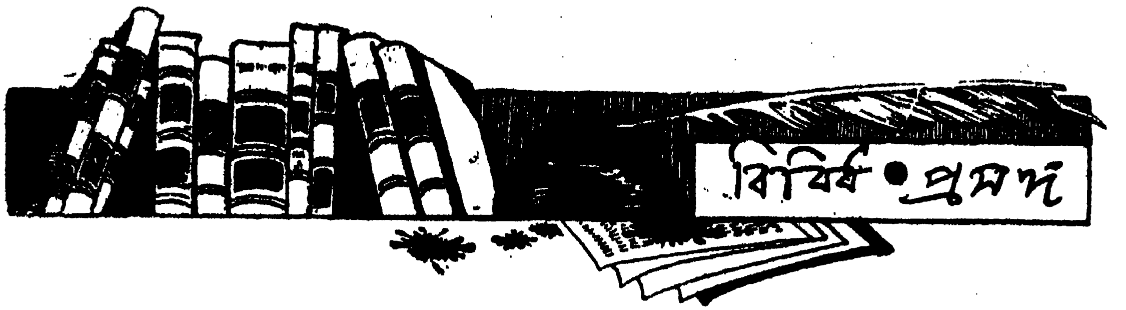
Anabas testudineus
কৈ



Mugil carsula
খরসুলা



Clarias batrachus
মাগুর



সেণ্ট্ এণ্ড্রুজ্ দিবসে ভোজান্তে বক্তৃতা

সেণ্ট্ এণ্ড্রুজ্ নামক খ্রীষ্টীয়ান সাধু স্কট্ল্যাণ্ডের অভিভাবক। স্কচ্রা তাঁহার সম্মানার্থ প্রতি বৎসর ৩০শে নবেম্বর একটি ভোজের ব্যবস্থা করেন। তাহাতে তাঁহারা এবং তাঁহাদের নিমন্ত্রিত অতিথিরা ভূরিভোজন এবং প্রচুর মদ্যপান করেন। তদনন্তর বক্তৃতা হয়। কলিকাতায় যে ভোজ হয়, তাহাতে বঙ্গের গবর্ণর, স্কচ্ না-হইলেও নিমন্ত্রিত হন এবং বক্তৃতা করেন। বর্ত্তমান গবর্ণর স্বয়ং স্কচ্। অতএব তিনি অন্যতম নিমন্ত্রক এবং স্বয়ং অতিথিও ছিলেন। যাহাদের স্বাস্থ্য কামনা করিয়া মদ্যপান ও বক্তৃতা করা হয়, "ভাইসরয় এণ্ড দি ল্যাণ্ড উই লিভ ইন্" ("বড়লাট এবং আমরা যে-দেশে বাস করি") তাহাদের মধ্যে অন্যতম। কতকগুলি লোক অন্যের সুস্থতা উৎপাদন, রক্ষা বা বৃদ্ধির নিমিত্ত মদ্যপান করিলে তাহার স্বাস্থ্য রক্ষিত, উৎপন্ন বা বর্দ্ধিত কি প্রকারে হইতে পারে, বৈজ্ঞানিকেরা সে-বিষয়ে গবেষণা করিতে পারেন। কিন্তু ইহা দেখা যাইতেছে, যে, ভারতপ্রবাসী ও বঙ্গপ্রবাসী স্কচ্রা এক শতাব্দীরও অধিক কাল ভারতের ও বঙ্গের স্বাস্থ্যকল্পে পান করা সত্ত্বেও আমাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় নাই।

যে-দেশে স্কচ্রা বাস করেন, তাহার এবং ভারতের বড়লাটের স্বাস্থ্যকল্পে মদ্যপানের প্রস্তাব করিয়া বঙ্গের গবর্ণর স্যর জন এণ্ডার্সন বক্তৃতা করেন। তিনি তাহাতে প্রধানতঃ বঙ্গের রাজনৈতিক ও আর্থিক অবস্থা এবং উভয়ের উন্নতি সম্বন্ধে তাঁহার মত ব্যক্ত করেন। তিনি প্রথমে রাজনৈতিক অবস্থার ও তাহার প্রতিকারের এবং পরে আর্থিক অবস্থা ও বেকার-সমস্যা সম্বন্ধে নিজের মত প্রকাশ করেন।

—

বঙ্গের রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে গবর্ণরের মত

স্যর জন এণ্ডার্সন বলেন, গত বৎসর বাংলা দেশ মোটের উপর রাজনৈতিক হিসাবে ঠাণ্ডা ছিল, যদিও সন্ত্রাসবাদের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সাধিত হয় নাই। তাঁহার মতে, এমন কোন অমোঘ ঔষধ নাই যাহার প্রয়োগ দ্বারা, এমন কোন শৌর্য্যব্যঞ্জক উপায় নাই যাহা অবলম্বন করিয়া, কোন সভ্য গবর্মেণ্ট তৎক্ষণাৎ এই ব্যাধির উচ্ছেদসাধন করিতে পারেন; দৃঢ়তার সহিত অবিরত সন্ত্রাসকদের বিরুদ্ধে চাপ দেওয়া, বলপ্রয়োগ করা, ইহার প্রকৃত ঔষধ। তিনি মনে করেন, সন্ত্রাসবাদ-সম্পর্কে এখন দেশের অবস্থা এক বৎসর আগেকার অবস্থার অপেক্ষা ভাল হইয়াছে—অপরাধের সংখ্যা কমিয়াছে এবং যাহারা অপরাধী তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করার কাজে গবর্মেণ্টের সহিত সহযোগিতা করিবার প্রবৃত্তি সর্ব্বসাধারণের মধ্যে দেখা যাইতেছে। "অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যাইতেছে, যে, কোন কোন বিষয়ে আইনকে আরও শক্তিশালী করিতে হইবে। তাহার উদ্যোগ হইতেছে।" গবর্ণরের এই উক্তিতে সর্ব্বসাধারণ আশ্বস্ত হইবে না—যাহারা সন্ত্রাসবাদী নহে বা তাহাদের সহিত সহানুভূতি করে না, তাহারাও সম্পূর্ণ আশ্বস্ত হইবে না।

সর্ব্বসাধারণে যাহাকে দমনাত্মক উপায় বলে, লাটসাহেব তাহাকে তাহা বলিতে বেশ রাজী নন। তিনি বলেন, ঐসব উপায়কে দমনাত্মক ("repressive") বলাটা একটা ফ্যাশন। "উহা রিপ্রেসিভ বা দমনাত্মক হইতে পারে, কিন্তু উহা আবশ্যক।"

অতঃপর লাটসাহেব বেলডাঙায় মুসলমানরা যে-সব উপদ্রব করিয়াছিল বলিয়া অভিযোগ হইয়াছে এবং যাহা বিচারাধীন,

সেই সম্পর্কে বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সভা, হিন্দু মিশন, এবং কলিকাতার মেয়রের সভাপতিত্বে আলবার্ট হলের সভা তাঁহাকে দুষ্টের দমনার্থ যেরূপ উপায় দৃঢ়তার সহিত অবলম্বন করিতে বলিয়াছিল, তাহার বিস্তারিত উল্লেখ * করিয়া বলেন :—

These are strong terms, but I can find nothing in them to which I would take exception. It happens that they were evoked by the alleged misdeeds of certain Moslems at Beldanga. But can that fact impair their general applicability?

তাৎপর্য্য। এগুলি শক্ত কথা, কিন্তু এগুলিতে আমি আপত্তি করিবার মত কিছু দেখিতেছি না। এইরূপ কথা প্রয়োগের কারণ বেলডাঙায় কতকগুলি মুসলমানের বিরুদ্ধে যে-সব দুষ্কর্ম্মের অভিযোগ হইয়াছে তাহা ("alleged misdeeds"): কিন্তু তাহাতে ঐ রকম সব কথার সাধারণ প্রযোজ্যতা কমিতে পারে কি?"

লাটসাহেবের কিঞ্চিৎপ্রচ্ছন্ন বক্রোক্তির সোজা মানে এই, যে, "হিন্দুরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে দমনাত্মক উপায় দৃঢ়তার সহিত অবলম্বন করিতে আমাকে অনুরোধ করিয়াছিল, কিন্তু হিন্দুরা অপরাধ করিলে তাহাদের বিরুদ্ধে এইরূপ অনুরোধ খাটিতে পারে না কি?" উত্তরে হিন্দুরা বলিবে, অবশ্যই পারে। লাটসাহেবের ইঙ্গিতের মধ্যে একটা মস্ত বড় ছিদ্র রহিয়াছে। কোন জায়গার মুসলমানরা হিন্দুদের উপর কখনও উপদ্রব করিলে হিন্দুরা একথা বলে না, যে, বিনাবিচারে তথাকার ও অন্য সব জায়গার বিস্তর মুসলমানকে—বিশেষতঃ যুবক মুসলমানদিগকে—অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বঙ্গে বা দেওলীতে বন্দী করিয়া রাখা হউক; হিন্দুরা চায়, যে, বিচারে দোষী বলিয়া প্রমাণিত লোকদেরই শাস্তি হউক। বিনা বিচারে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য শাস্তি বঙ্গে হিন্দুদেরই হইয়া আসিতেছে। অন্যদেরও তাহাই হউক, আমরা তাহা চাই না। দোষী হিন্দুদের শাস্তি না-হওয়াও হিন্দুরা চায় না। তাহারা চায়, বিচারানন্তর দোষ প্রমাণিত হইলে দোষীর শাস্তি। এরূপ দমনাত্মক ব্যবস্থার ("repressive measure"এর) তাহারা বিরোধী নহে, তাহারা বিনা বিচারে শাস্তিরূপ বেড়া-জালের ব্যবহারের বিরোধী; কারণ, এরূপ উপায় অবলম্বন করিলে দোষীর শাস্তি অনিশ্চিত (কেন-না, বিনা বিচারে যাহাদের শাস্তি দেওয়া হইতেছে, তাহাদের মধ্যে দোষী একজনও না থাকিতে পারে), কিন্তু বহুসংখ্যক নির্দ্দোষ লোকের শাস্তি নিশ্চিত বলিলেও চলে।

কেবলমাত্র দমনাত্মক উপায় অবলম্বন করিলে যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না, তাহা আমরা অগ্রহায়ণের 'প্রবাসী'তে লিখিয়াছিলাম। যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"শত্রুনিপাত করিতে হইলে, বর্ত্তমানে যাহারা শত্রু, কেবল তাহাদেরই বিনাশের উপায় চিন্তা করিলে চলিবে না, যাহাতে নূতন নূতন লোক শত্রু-ভাবাপন্ন হইয়া শত্রুদলে যোগ দিয়া তাহার বলবৃদ্ধি না-করে, তাহার উপায়ও চিন্তা করা আবশ্যক। কতকগুলি লোক ইংলণ্ডের শত্রু বিবেচিত হইয়াছে। ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের বর্ত্তমান সম্বন্ধের প্রতি অসন্তোষ তাহার মূলীভূত কারণ। এই অসন্তোষ বিনষ্ট করিতে না-পারিলে বর্ত্তমান শত্রুগণ বিনষ্ট হইলেও নূতন নূতন শত্রুর আবির্ভাব হইতে পারে। অতএব, ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের সম্পর্ককে ন্যায় ও মানবিক ভ্রাতৃত্বের ভিত্তির উপর স্থাপিত করিয়া অসন্তোষ দূর করা আবশ্যক।" [শত্রুনিপাতের অর্থ যে শত্রুকে বিনাশ করা বা তাহার শত্রুতাকে বিনাশ করা, ইহা উহ্য। প্রবাসীর সম্পাদক।]

১৯১৮ সালের ১১ই নবেম্বর গত মহাযুদ্ধ, সন্ধিসূত্র নির্দ্ধারণের জন্য, স্থগিত রাখা হয়। প্রতি বৎসর এই ১১ই নবেম্বরে ঐ ঘটনার স্মারক সভা আদি হয়। ঐ দিনটির নাম আর্মিষ্টিস্ দিবস। এ বৎসরকার আর্মিষ্টিস্ দিবসে বঙ্গের বর্ত্তমান লাট যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে তিনি সন্ত্রাসবাদ ও সন্ত্রাসকদল দমনের সরকারী চেষ্টাকে যুদ্ধের সহিত তুলনা করিয়া এই চেষ্টা কি প্রকারে সফল হইতে পারে তাহা নির্দ্দেশ করেন। তিনি যাহা বলেন, তাহাতে শত্রুসংখ্যার বৃদ্ধি

* লাটসাহেবের ঠিক কথাগুলি এই :—

When I hear, as I sometimes do, the need for vigorous measures being challenged I have sometimes wondered how far such an attitude had become an article of Hindu faith. In this connection you may be interested to hear of a communication I received in July this year—though in a different connection—from the Bengal Provincial Hindu Sabha. "It is needless to point out," they said, "that the entire Hindu community has been very shocked and alarmed at the move for effecting the release of those who have been already arrested and are awaiting their trial. It is also superfluous to add that the meting out of deterrent punishment to the miscreants is the only way to prevent the recurrence of similar trouble in future, and to restore in the minds of the Hindus their lost confidence in the authorities."

They went on to refer to a resolution adopted at a public meeting of Hindus, with the Mayor of Calcutta in the chair, advocating "the adoption of vigorous and strong measures for the apprehension of the culprits" and "meting out adequate punishment to them."

Another body, the Hindu Mission, wrote to me in almost identical terms, but added that "It is needless to point out to you that the meting out of deterrent punishment, the adoption of punitive measures or the imposition of collective fines to compensate Hindu sufferers are the only ways to prevent the recurrence of similar troubles in the future and to restore in the minds of the Hindus their lost confidence in the authority."

নিবারণের কোন উল্লেখ ছিল না। এইজন্য আমরা গত মাসে উপরে উদ্ধৃত মন্তব্য করিয়াছিলাম। শত্রুসংখ্যার বৃদ্ধি নিবারণেরও উপায় যে করা আবশ্যক, তাহা যে তিনি বুঝিয়াছেন, তাহা তাঁহার পরবর্তী, ৩০শে নবেম্বরের, বক্তৃতা হইতে বুঝা যাইতেছে। তিনি উহাতে বলিতেছেন:—

"So long as recruitment to the ranks of the terrorists goes on as it is still going on so long the poison of subversive doctrine is spreading among the rising generation, we cannot be said to be applying a radical cure; we are treating the malady symptomatically, but are we getting to the root of the disease? What is the disease and what is the cure, and how is the cure to be applied?"

তাৎপর্য্য। এখন যেমন সন্ত্রাসকদের দল বাড়িয়া চলিতেছে, সেইরূপ যতদিন বাড়িয়া চলিবে, বিপর্য্যাসক রাজনৈতিক মতের বিষ যতদিন উঠ্‌তি বয়সের লোকদের মধ্যে বিস্তৃত হইতে থাকিবে, ততদিন বলা চলিবে না, যে, আমরা রোগের জড় মারিবার ঔষধ প্রয়োগ করিতেছি আমরা ব্যাধির উপসর্গের চিকিৎসা করিতেছি কিন্তু উহার মূলে পৌঁছাইতেছি কি? ব্যাধিটা কি এবং ঔষধই বা কি, এবং সেই ঔষধ কি প্রকারে প্রয়োগ করিতে হইবে?

—

বঙ্গের লাটের মতে সন্ত্রাসবাদের নিদান

স্যর জন্ এণ্ডার্সন্ সন্ত্রাসবাদের যে মূল কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আমরা তাহা ভ্রান্ত মনে করি, এবং তাঁহার মত পদস্থ ব্যক্তির মুখ হইতে এইরূপ নিদান নিঃসৃত হওয়ায়, তাহার দ্বারা, ভারতীয় সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়কে লইয়া—বিশেষতঃ হিন্দু ও মুসলমানকে লইয়া—যে ভারতীয় মহাজাতি (Indian nation) গঠিত হইতেছে ও হইবে এবং যে স্বাজাতিকতার (nationalism) উদ্ভব হইয়াছে তাহার বিশেষ অনিষ্ট হইবে। কারণ, কংগ্রেস আদি অহিংস প্রতিষ্ঠান যে হিন্দুদের স্বার্থসিদ্ধির একটা ফন্দী, বহু বৎসর ধরিয়া বহু ইংরেজ মুসলমানদের মনে এই মিথ্যা ধারণা জন্মাইবার চেষ্টা করায় হিন্দু-মুসলমানের মিলিত চেষ্টার একটি বাধা জন্মিয়াছে। সন্ত্রাসকদের চেষ্টাও একটা সাম্প্রদায়িক স্বার্থসিদ্ধির উপায়, এই ধারণা জন্মিলে উক্ত বাধা প্রবলতর হইবে, অধিকন্তু মুসলমানেরা শুধু সন্দেহপরবশ নহে, উত্তেজিতও হইবে। তাহারা ভাবিবে, সন্ত্রাসন-চেষ্টা তাহাদের বিরুদ্ধেই প্রযুক্ত হইবে। সন্ত্রাসনের সম্পূর্ণ বিলয় আমরাও চাই। কিন্তু লাটসাহেবের ব্যাখ্যাত ভ্রান্ত মতের প্রচার না-করিয়াও এই [illegible] সাধিত হইতে পারে।

লাটসাহেব সন্ত্রাসকদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভিত্তিহীন নূতন মত প্রচার করায় আরও এই কুফল হইবার সম্ভাবনা, যে, হিন্দুমহাসভা, প্রাদেশিক বঙ্গীয় হিন্দুসভা, অন্যান্য হিন্দুসভা, বর্ণাশ্রম স্বরাজ্য সংঘ প্রভৃতি হিন্দু প্রতিষ্ঠানকে সরকারী লোকেরা সন্দেহের চক্ষে দেখিবে, এবং লাটসাহেবের মতের সমর্থক প্রমাণ সৃষ্টি ও সংগ্রহ করিবার চেষ্টাও হইতে পারে। এই সব কারণে তাঁহার এতদ্বিষয়ক সমুদয় কথা উদ্ধৃত করিয়া তাহার আলোচনা করা আবশ্যক। তিনি বলেন:—

There must be many people better qualified than I to give an accurate diagnosis, but most, I think, would agree that it originated in and to a large extent represents today an effort a desperate effort—on the part of certain elements of the Hindu community to advance the interests of that community.

Whether they genuinely regard the interests of the community as identical with a wider national interest seems to me for this purpose immaterial in face of the significant fact that the movement is essentially a Hindu movement. That does not, of course, mean that the whole Hindu community should be stigmatized. Far from it: there are active terrorists relatively few in number: there are those who sympathize unfortunately far more numerous, but the Government has every reason to recognize with gratitude the loyal and steadfast service and support given by a vast body of Hindus in public service outside.

Now, why should the movement make so strong an appeal to the limited section of the Hindu community to which I have referred? It can only be because the general atmosphere is favourable to the propagation of subersive doctrine. And why should this be? Opinions may differ on the point; but I, personally, think that part, certainly, of the reason is to be found in the gloomy tinge that the outlook, both political and economic, is apt to assume for the Hindu intelligentsia the educated middle class, the *bhadralog* youth. I can understand that to some extent at least.

So far, however, as the political outlook is concerned, I would venture to say this. With the development of democratic institutions, in which they avow their faith, the Hindu could not hope as a minority community in Bengal, to maintain intact the privileged position which in the past they have undoubtedly enjoyed under British rule. They gird at the communal award: that is a subject I am debarred from discussing. The award stands, as everyone knows, unless it is either rejected by Parliament or modified by agreement. But one thing can be said with confidence: under the new constitutional arrangements the Hindus will not and cannot be deprived of the opportunity of taking their part and pulling their weight in the public affairs of the country, except in so far as they themselves may spurn that offer. In my judgment, therefore, their political outlook is not nearly as black as it is sometimes painted.

সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য। সন্ত্রাসবাদের উৎপত্তি হইয়াছে, হিন্দুসমাজের কতকলোকের সেই সমাজের স্বার্থ-সিদ্ধির মরীয়া রকমের চেষ্টা হইতে। সন্ত্রাসক প্রচেষ্টা সারতঃ একটি হিন্দুপ্রচেষ্টা বলিয়া সন্ত্রাসকেরা হিন্দুদের স্বার্থ ভারতীয় মহাজাতির স্বার্থের সহিত অভিন্ন মনে করে কি না, তাহার বিচার অনাবশ্যক। অবশ্য তজ্জন্য সমগ্র হিন্দু সমাজকে দাগী করা

উচিত নয়। এই সমাজে অল্পসংখ্যক কর্ম্মিষ্ঠ সন্ত্রাসক আছে তদপেক্ষা অধিকসংখ্যক সহানুভাবী আছে, কিন্তু গবর্মেণ্ট কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করেন যে, সরকারী কাজে নিযুক্ত খুব বেশীসংখ্যক হিন্দু গবর্মেণ্টকে সাহায্য দিতেছে।

উক্ত অল্পসংখ্যক হিন্দুদের প্রাণ সন্ত্রাস-প্রচেষ্টায় কেন সাড়া দেয়? ইহার কারণ কেবল ইহাই হইতে পারে, যে, বিপর্য্যাসক মত প্রচারের পক্ষে সাধারণ পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুকূল। কেন অনুকূল? এ বিষয়ে মতভেদ থাকিতে পারে কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে আমি মনে করি, যে, নিশ্চয়ই অংশতঃ কারণটি এই, যে, হিন্দু তরুণ ভদ্রলোক, হিন্দু শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী, হিন্দু বুদ্ধিচালনাশীল শ্রেণীর রাজনৈতিক ও আর্থিক ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় প্রতীয়মান হইতে পারে। তাহা আমি অন্ততঃ কতকটা—বুঝিতে পারি।

রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমি ইহা বলিতে চাই :—

হিন্দুরা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে বিশ্বাস করে বলিয়া থাকে। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়রূপে সেই বিশেষ-অধিকারসম্পন্ন সম্প্রদায় থাকিতে পারে না, যাহা তাহারা ব্রিটিশ রাজত্বে এতাবৎ ছিল। তাহারা প্রধান মন্ত্রীর সাম্প্রদায়িক মীমাংসায় নাক সিঁটকায়; তাহার আলোচনা আমার পক্ষে নিষিদ্ধ। সবাই জানে, যে, ঐ মীমাংসা টলিবে না, যদি পার্লেমেণ্টের দ্বারা উহা পরিত্যক্ত না হয় বা ভারতীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়গুলির সম্মিলিত মীমাংসা দ্বারা উহা পরিবর্ত্তিত না হয়। কিন্তু একটা কথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায়, যে, হিন্দুদিগকে যে সুযোগ গবর্মেণ্ট দিতে চাহিতেছে, তাহা যদি তাহারা অবজ্ঞার সহিত প্রত্যাখ্যান না করে, তাহা হইলে তাহারা নূতন শাসনবিধি অনুসারে দেশের সার্ব্বজনিক কাজে যোগ দিবার এবং তাহাদের ওজন অনুযায়ী শক্তি প্রয়োগ ও প্রভাববিস্তার করিবার সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইবে না, হইতে পারে না। অতএব, আমার বিবেচনায়, তাহাদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ, কখন কখন যেরূপ কৃষ্ণবর্ণে চিত্রিত হয়, তাহার কাছাকাছি কালো নয়।

সন্ত্রাসবাদকে কেবল বাংলা দেশের কিংবা কেবল গত চার-পাঁচ বৎসরের অবস্থা হইতে উদ্ভূত মনে করা ভুল।

শাসনপ্রণালীর পরিবর্ত্তন, শাসক ও শাসিতের সম্বন্ধের পরিবর্ত্তন এবং শাসকসমষ্টির পরিবর্ত্তন করিবার চেষ্টা নানা দেশে নানা প্রকারে নানা কারণে হইয়াছে। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ প্রাধান্যের যুগে এই প্রকার প্রথম চেষ্টা ইতিহাসে সিপাহীবিদ্রোহ নামে পরিচিত। ইহা হইয়াছিল শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে সশস্ত্র বলপ্রয়োগ দ্বারা উদ্দেশ্যসিদ্ধির চেষ্টা। ইহা বাঙালীর, বঙ্গের বা কেবল হিন্দুর চেষ্টা নহে। ইহা ছিল হিন্দুমুসলমান উভয়ের ভারতীয় চেষ্টা। এই বিদ্রোহ দমিত হইবার পর মুসলমান সম্প্রদায়ের শক্তি ও প্রভাব কমাইবার চেষ্টা আরব্ধ হয়। অন্য বিস্তারিত বৃত্তান্ত যদি জানা না থাকিত, তাহা হইলেও ইহা হইতেই অনুমান হইত, যে, এই বিদ্রোহে মুসলমানদের হাত হিন্দুদের চেয়ে কম ছিল না।

ইহার পর ভারতবর্ষে ব্রিটিশ রাজত্ব লুপ্ত করিবার জন্য যে ষড়যন্ত্র হয়, ইতিহাসে ভারতীয় মুসলমান ওয়াহাবীদের সহিত তাহার নাম জড়িত। ষড়যন্ত্রকারী অনেকের শাস্তি হইয়াছিল; যাহাদের প্রাণদণ্ড হইয়াছিল, লর্ড মেয়ো দয়া ও রাজনৈতিক বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া তাহাদিগকেও আণ্ডামানে নির্ব্বাসিত করেন। প্রধান বিচারপতি নর্ম্যান এবং বড়লাট লর্ড মেয়োর হত্যার সহিত কেহ কেহ ওয়াহাবী ষড়যন্ত্রকে জড়িত করে, কিন্তু সকল লেখক তাহা করে না।

দলবদ্ধভাবে বিদ্রোহ না করিয়া এক একজন সরকারী কর্ম্মচারীকে বধ করিয়া গবর্মেণ্টকে ভয় দেখাইবার চেষ্টা অপেক্ষাকৃত আধুনিক। ১৮৯৭ সালে দাক্ষিণাত্যে প্লেগের আবির্ভাব হয়। প্লেগ দমনার্থ ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ পুনায় স্বাস্থ্য-রক্ষার ও স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য কতকগুলি ব্যবস্থা করেন। তাহা পালন করাইবার জন্য এক দল গোরা সৈন্য নিযুক্ত হয়। তাহাদের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ প্রচারিত হয়। তাহার ফলে, পুনার ইংরেজ কলেক্টর এবং ব্রিটিশ সৈন্য দলের একজন লেফ্‌টেন্যাণ্ট নিহত হয়।

বঙ্গের সন্ত্রাসকেরা প্রথম বোমা নিক্ষেপ করে বিহারে মুজঃফরপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কিংসফোর্ডের উদ্দেশে, কিন্তু তাহাতে মৃত্যু হয় দু-জন ইংরেজ মহিলার। ইহা ১৯০৮ সালের ৩০শে এপ্রিল ঘটে। অন্যান্য রাজনৈতিক হত্যাও তাহার কাছাকাছি সময়ে হইয়াছিল।

এই সকল হত্যা সম্বন্ধে জন্ বাক্যান্ (John Buchan) প্রণীত "লর্ড মিণ্টো" নামক পুস্তকে লিখিত হইয়াছে :—

"On the night of 30th April a bomb, intended for Mr. Kingsford, a former Chief Presidency Magistrate of Calcutta, was thrown into a carriage in which two English women were returning from the club at Muzaffarpur, and both ladies died of the injuries. A secret murder society, operating in Calcutta and Midnapur, was revealed, connected with the notorious Maniktalla gardens, and bomb factories were discovered in various quarters. In July there were ugly disturbances in Bombay consequent upon the prosecution of Tilak for sedition, and riots at Pandharpur and Nagpur. In September an approver was shot dead by two of the Muzaffarpur prisoners in the chief prison in Calcutta. In November there was another attempt to murder Sir Andrew Fraser, and a native Inspector of Police was shot in a Calcutta street."

সন্ত্রাসকদিগের নানা অপরাধ সম্বন্ধে বড়লাট লর্ড মিণ্টো ১৯০৮ সালের ৮ই জুন ব্যবস্থাপক সভায় বলেন :—

"I am determined that no anarchist crime will for an instant deter me from endeavouring to meet as best I can the political aspirations of honest reformers, and I ask the people of India, and all who have the future welfare of this country at heart, to unite in the

support of law and order, and to join in one common effort to eradicate a cowardly conspiracy from our midst."

সমগ্র ভারতীয় লোকদের উদ্দেশে কথিত লর্ড মিণ্টোর এই কথাগুলি হইতে সহজে বুঝা যায়, যে, তিনি কেবল বাঙালীদিগকে দোষী মনে করেন নাই।

ডক্টর এইচ্ সী ই জ্যাকারিয়স্ (H. C. E. Zacharias, Ph. D.) প্রণীত ও জর্জ য়্যালেন আন্‌উইন্ কর্ত্তৃক বর্ত্তমান ১৯৩৩ সালে প্রকাশিত "রিন্যাসেণ্ট ইণ্ডিয়া" নামক পুস্তকে লর্ড মিণ্টোর আমলের ও সুরাটের কংগ্রেস ভাঙিয়া যাইবার পরের সময়কার সন্ত্রাসকদের ভয়াবহ উপদ্রবসমূহের প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে :—

"With the Congress thus split and the forces of swaraj divided, the Bureaucracy could not fail to believe that it had already won half the battle. Its policy—obediently sponsored by Morley—henceforth was to cast to the Moderates some crumbs of comfort by taking another little step forward; but on the other hand, to repress ruthlessly the Extremists: little realizing, that this futile attempt at terrifying them, would only result in terrorism on the part of the wilder spirits amongst them. Five months after the Surat split a bomb had been thrown at Muzaffarpore in Bihar and two English women were killed. This was made the occasion for getting all inconvenient extremist leaders out of the way: Tilak was deported to Mandalay for as much as six years, Bepin Chandra Pal got off with six months and Aravinda Ghose was even—after a year—acquitted; but a Madras 'malcontent', Chidambaran Pillai, was sentenced to six years and a Moslem extremist, whom we shall encounter again in our narrative, Hasrat Mohani, to one year. Riots in Bombay, consequent upon Tilak's imprisonment, were put down with a heavy hand. But in 1909 new outrages occurred; a bomb was thrown—unsuccessfully—at the Viceroy, Lord Minto, and at Nasik the Collector was killed; in London an Indian student shot at a crowded meeting Sir W. Curzon Wyllie and Dr. Lalkaka of the India Office."

দিল্লী ভারতবর্ষের নূতন রাজধানী ঘোষিত হইবার পর বড়লাট লর্ড হার্ডিং যখন সরকারী জাঁকজমকের সহিত দিল্লী প্রবেশ করেন, তখন তাঁহার প্রতি বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। সেই বিষয়ে ডক্টর জ্যাকারিয়স তাঁহার পূর্ব্বোক্ত পুস্তকে লিখিয়াছেন :—

When in December 1912 he made his state entry into the new capital, Delhi, a miscreant threw a bomb at him which wounded him seriously; but, covered with blood, as he was, he turned to his companion in the carriage with the historic words: "No change, in any case—you understand? No change whatever in our policy!" And no change was made; on the contrary, by his identification in 1918 of the Indian Government with the Indian people in their attitude towards the Union Government over the question of the Indians in South Africa, he opened a new chapter in Indo-British relations; and if the chapter was short, it was not his fault, true gentleman and great Englishman that he was.

ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজত্বকালে সন্ত্রাসবাদের বৃত্তান্ত লেখা আমাদের উদ্দেশ্য নহে, সন্ত্রাসকদের সব কাজের উল্লেখও করিতে চাই না। আমরা কেবল বলিতে চাই, যে, ইহা বাংলা দেশে আবদ্ধ নহে, অন্য প্রদেশেও ইহা ছিল এবং এখনও আছে। ইহাও বলিতে চাই, যে, ইহার উৎপত্তি গোলটেবিল বৈঠক এবং প্রধান মন্ত্রীর সাম্প্রদায়িক নিষ্পত্তির বহু বৎসর পূর্ব্বে হয়, যখন বিশেষ করিয়া কেবল ভারতীয় বা বঙ্গীয় হিন্দুদেরই বর্ত্তমান নৈরাশ্যের বা অবসাদের কারণ ঘটে নাই ;—বলিতে চাই, যে, ইতিপূর্ব্বে, সরকারী ও বেসরকারী কোন ইংরেজের মনে স্যর জন এণ্ডার্সনের পূর্ব্বে একথা উদিত হয় নাই, যে, সন্ত্রাসবাদ হিন্দু সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার চেষ্টা হইতে উদ্ভূত। অন্যতম ভূতপূর্ব্ব ভারতসচিব লর্ড মর্লীর "রিকলেক্‌শুন্স" ("অতীতের স্মৃতি") নামক পুস্তকে ভারতীয় সন্ত্রাসবাদীদের কাজের উল্লেখ বহুস্থলে আছে, কিন্তু তিনি কোথাও ঘুণাক্ষরেও, এমন কথা বলা দূরে থাকৃ, ইঙ্গিতমাত্রও করেন নাই, যে, সন্ত্রাসবাদ হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক স্বার্থরক্ষার জন্য হিন্দুসাম্প্রদায়িক চেষ্টা। হিন্দুর সাম্প্রদায়িক স্বার্থরক্ষার জন্য সাম্প্রদায়িক চেষ্টা যাহা কিছু আছে, তাহা অহিংস ও আইনানুগ। হিন্দু মহাসভা, সনাতনধর্ম্ম মহামণ্ডল ইত্যাদিকে কংগ্রেসওয়ালারা পছন্দ করেন না,—সন্ত্রাসবাদীরা যে ঐ সব প্রতিষ্ঠানকে পছন্দ করে বা তাহাদেরই উদ্দেশ্যসাধনে নিযুক্ত, তাহার কোন প্রমাণ আমরা অবগত নহি।

বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গে যে টেরারিজম্ বা সন্ত্রাসবাদ আছে, তাহা আগেকার বিপ্লবচেষ্টা হইতে স্বতন্ত্র কিছু নহে। যাঁহারা গত পঁচিশ বৎসরের ঘটনাবলীর সহিত পরিচিত, তাঁহারা জানেন বিপ্লবচেষ্টার বা সন্ত্রাসবাদের একটা ধারা চলিয়া আসিতেছে—কখন তাহা প্রকাশ পায়, কখন বা ফল্গুর মত গুপ্ত থাকে। টেগার্ট সাহেবের লেখা সন্ত্রাসবাদের বৃত্তান্ত পড়িয়াও তাহাই মনে হয়। এবং তিনিও ইহাকে হিন্দুর সাম্প্রদায়িক স্বার্থরক্ষার জন্য হিন্দুসাম্প্রদায়িক চেষ্টা বলেন নাই। ডক্টর জ্যাকারিয়াসের "রিন্যাসেণ্ট ইণ্ডিয়া" পুস্তকের সূচীতে

দেখিতেছি, টেরারিজমের ("Terrorism"এর) বৃত্তান্ত, উল্লেখ বা প্রসঙ্গ আছে ৪৭,১৩০-১,১৫৩,১৫৫,১৯২,২১৩, ২৩৫,২৩৭,২৬১,২৭১,২৭৫,২৮৪ ও ২৯২ পৃষ্ঠায়। আমরা যে-সব ঘটনার উল্লেখ করিয়াছি, এই বহিতে তা ছাড়া আরও কোনও কোন ঘটনার উল্লেখ আছে। যেমন—১৯৩১ সালের জুলাই মাসে কার্গুসন কলেজে একজন মহারাষ্ট্রীয় ছাত্রের দ্বারা বোম্বাই লাটের প্রতি গুলি নিক্ষেপ, ১৯১৯ সালে পঞ্জাবে জালিয়ানওয়ালাবাগের কাণ্ড ও সামরিক আইনের আমলের নানা ব্যাপার, ১৯২১ সালে মালাবারের মুসলমান মোপলাদের বিদ্রোহ ও হিন্দুদের উপর অত্যাচার ("The horrors committed by the Moslem Moplahs against the Hindus in British Malabar," p. 211), আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের চৌরীচৌরায় ১৯২১ সালে জনতাকর্তৃক বাইশ জন পুলিশ কর্ম্মচারী হত্যা, ১৯২৪ সালে কলিকাতায় একজন পুলিস কর্ম্মচারীকে হত্যা, ১৯২৯ সালে বড়লাট লর্ড আরুইনের ট্রেনে দিল্লীর কাছে বোমা নিক্ষেপ, ১৯৩১ সালে নানা স্থানে বোমা নিক্ষেপ ও সরকারী ব্রিটিশ কর্ম্মচারী হত্যা, একজন ইংরেজ পুলিস কর্ম্মচারীকে হত্যা করিবার অপরাধে শেষ করাচী কংগ্রেসের পূর্ব্বে ঐ বৎসর ভগৎসিং প্রভৃতির ফাঁসী, ১৯৩১ সালের ডিসেম্বরে দুই জন বালিকার দ্বারা কুমিল্লায় ম্যাজিষ্ট্রেট হত্যা, এবং সর্ব্বশেষে ২৯২ পৃষ্ঠায় এই কথাগুলি :—

"Past history should teach us future action : India certainly would do well to realize by this time that putting a pistol at Britannia's head is worse than futile—it not only does not advance India's cause, but actually retards it. The two disastrous Satyagraha campaigns of 1932 and 1921, the terrorist disturbances of the Curzon period, the Mutiny of 1857, all go to prove it."

বৈধ ও অবৈধ, অহিংস ও সশস্ত্র প্রচেষ্টায় হিন্দুর আধিক্যের কারণ আলোচনা

সন্ত্রাসক প্রচেষ্টা যে হিন্দুসাম্প্রদায়িক স্বার্থরক্ষার প্রচেষ্টা স্যর জনের এইরূপ মনে করিবার কারণ তিনি এই বলিয়াছেন, যে, উহা সারতঃ ("essentially") হিন্দু প্রচেষ্টা। তিনি ইহাও বলিয়াছেন, হিন্দু সন্ত্রাসকরা অন্তরের সহিত হিন্দুদের স্বার্থকে বৃহত্তর ভারতীয় মহাজাতির স্বার্থের সহিত অভিন্ন মনে করে কিনা, তাহা আলোচনা করা তিনি অনাবশ্যক মনে করেন। কেন অনাবশ্যক মনে করেন, বুঝিলাম না। সন্ত্রাসক প্রচেষ্টা অবশ্য আইন-বিরুদ্ধ, হিংস্র ও অবৈধ। তাহার আলোচনা পরে করিব। যাহা আইন-সঙ্গত, অহিংস ও বৈধ, আগে তাহার আলোচনা করা যাক্। হিন্দু কি হিন্দু-অহিন্দু সব ভারতীয়ের জন্য কোন অহিংস আইনসঙ্গত ও বৈধ চেষ্টা করিতে পারে না? মুসলমান কি মুসলমান-অমুসলমান সব ভারতীয়ের জন্য অহিংস আইনসঙ্গত বা বৈধ কোন চেষ্টা করিতে পারে না? খ্রীষ্টিয়ানেরা কি খ্রীষ্টিয়ান-অখ্রীষ্টিয়ান সকলের জন্য তাহা করিতে পারে না? যদি ভারতীয় হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টিয়ান কেহই তাহা করিতে না পারে, তাহা হইলে অভারতীয় বিদেশী খ্রীষ্টিয়ান ইংরেজরা যে দাবি করেন, যে, তাঁহারা ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলমান প্রভৃতি অখ্রীষ্টিয়ানদিগকে তাহাদের মঙ্গলের জন্য শাসন করিতেছেন, কেবল সেই দাবিটাকেই কি সত্য বলিয়া মানিতে হইবে?

কিন্তু ইহা যদি সত্য হয়, যে, অহিংস আইনসঙ্গত ও বৈধ চেষ্টার ক্ষেত্রে ভারতীয় হিন্দু ভারতীয় হিন্দু ও অহিন্দুর, ভারতীয় মুসলমান ভারতীয় মুসলমান ও অমুসলমানের, এবং ভারতীয় খৃষ্টিয়ান ভারতীয় খ্রীষ্টিয়ান ও অখ্রীষ্টিয়ানের স্বার্থকে স্ব স্ব স্বার্থের সহিত সত্য সত্যই অভিন্ন মনে করিতে পারে, তাহা হইলে কেহ বা কোন দল ভ্রম, বুদ্ধিভ্রংশ, ইতিহাসের অপব্যাখ্যা বা অন্য কোন কারণে হিংস্র, আইনাবরুদ্ধ ও অবৈধ চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলে, তাহাদের পক্ষে কি ইহা মনে করা অসম্ভব, যে, তাহাদের স্বার্থ ও সমগ্র ভারতীয় জাতির স্বার্থ অভিন্ন? আলোচ্য সন্ত্রাসক প্রচেষ্টা সার্ব্বজনিক স্বার্থ-সিদ্ধির যথাযোগ্য বা প্রকৃষ্ট উপায় নহে, তাহা স্বীকার্য্য। কিন্তু সন্ত্রাসক হিন্দুরা হিন্দু-অহিন্দু সকলেরই জন্য হিংস্র পন্থা অবলম্বন করিয়াছে, এরূপ প্রকৃত চিন্তা বা ভিত্তিহীন কল্পনা কেন তাহাদের মনে উদিত হইতেই পারে না, বুঝা কঠিন। অবশ্য, তাহারা বাস্তবিক কি মনে করে, তাহা লাটসাহেব যেমন জানেন না, আমরাও তেমনি জানি না; কারণ, সন্ত্রাসকদিগের সহিত লাটসাহেবের যেমন, তেমনি আমাদেরও আলাপ-পরিচয় নাই। তাহারা তাহাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোন জ্ঞাপকপত্র বাহির করিয়াছে বলিয়াও অবগত নহি।

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা পরিবর্ত্তনের জন্য এ পর্য্যন্ত যত অসাম্প্রদায়িক সভাসমিতি, সংঘ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে

তাহার সভ্য ও সহায়কদের মধ্যে হিন্দুদের সংখ্যা অধিক হইবার স্বাভাবিক ও কৃত্রিম কারণাবলী সুবিদিত।

সমগ্র ভারতে হিন্দুরা সংখ্যায় অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের চেয়ে বেশী। মুসলমানেরা সংখ্যায় তাহার পরবর্ত্তী সম্প্রদায়। উক্ত সমাজমিতিতে হিন্দুর সংখ্যাধিক্যের ইহা একটি কারণ। হিন্দুরা সমগ্রভারতে শিক্ষায় মুসলমানদের চেয়ে অগ্রসর। ইহা আর একটি কারণ। স্বাভাবিক তৃতীয় কারণ এই, যে, হিন্দুদিগকে হিন্দুর একমাত্র বাসভূমি ভারতবর্ষের হিতাহিতের বিষয়ই ভাবিতে হয় বলিয়া তাঁহারা এই দেশেরই জন্য বেশী চিন্তা করেন; অন্যদিকে, মুসলমানদিগকে ভারতের বাহিরে স্থিত নানা মুসলমান দেশের মুসলমানদিগের হিতাহিতের বিষয় ভাবিতে হয় বলিয়া (যেমন এখন তাঁহারা প্যালেষ্টাইনে আরবদিগের মঙ্গল চিন্তা করিতেছেন), তাঁহারা কেবল মাত্র ভারতবর্ষের হিতেই আপনাদের সমুদয় চিন্তা, শক্তি ও অর্থ নিয়োগ করিতে পারেন না। তাঁহাদের প্রধান নেতা আগা খাঁ ত প্রায় বিদেশেই কাল যাপন করেন।

ভারতীয় অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সহিত মুসলমানদের যোগ কম হইবার প্রধান কৃত্রিম কারণ সুবিদিত। যখন কংগ্রেস স্থাপিত হয়, তখন কোন প্রকারে আইন অমান্য করিবার অভিপ্রায় বা কল্পনাও ইহার ছিল না। তখন ইহা সম্পূর্ণ আইনানুগ এবং রাজনৈতিক আন্দোলনার্থ স্থাপিত প্রতিষ্ঠান ছিল। কিন্তু তথাপি তখন হইতেই রাজপুরুষেরা মুসলমানদিগকে ইহা হইতে দূরে রাখিবার চেষ্টা নানা উপায়ে করিয়াছেন। এই মিথ্যা সন্দেহও মুসলমানদের মনে উদ্রেক করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, যে, ইহা হিন্দুদেরই মতলব-সিদ্ধির জন্য সৃষ্ট হইয়াছে ও পরিচালিত হইতেছে। যখন কংগ্রেস অসহযোগ ও অহিংস আইনলঙ্ঘন নীতি গ্রহণ করিল, তখন মুসলমানদের তাহাতে বেশী সংখ্যায় যোগ না-দিবার আগেকার কারণগুলি বিদ্যমান রহিল, যোগ দিবার কারণ কিছু বাড়িল না, বরং আইনভঙ্গজনিত শাস্তির ভয়রূপ যোগ না-দিবার একটি কারণ বাড়িল।

জাতীয় উদারনৈতিক সংঘ (ন্যাশন্যাল লিবার‍্যাল ফেডা-রেশন) অন্য একটি অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। ইহাতেও হিন্দুদের সংখ্যা পূর্ব্বোক্ত স্বাভাবিক কারণ সমূহের জন্য বেশী।

এই সব প্রতিষ্ঠান হয় আইনসঙ্গত কিংবা অন্ততঃ বৈধ (constitutional)—আমরা বর্ত্তমানেও কংগ্রেসকে কনষ্টিটিউশন্যাল বা বৈধ মনে করি। সে-বিষয়ে তর্ক উত্থাপিত হইতে পারে, কিন্তু অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি যে অহিংস এবং তাহারা যে দৈহিক বল ও অস্ত্রবল প্রয়োগের বিরোধী এবং গুপ্ত-প্রতিষ্ঠান নহে তাহা সুজ্ঞাত। অথচ এগুলিতেও স্বাভাবিক ও কৃত্রিম কারণে মুসলমানেরা শতকরা তত জন যোগ দেয় নাই, শতকরা যত জন হিন্দু তাহাতে যোগ দিয়াছে।

সুতরাং আইনবিরুদ্ধ, অবৈধ, হিংস্র, সশস্ত্র, ও গুপ্তষড়যন্ত্রমূলক কোন সমিতি, প্রতিষ্ঠান বা প্রচেষ্টায় মুসলমানদের সংখ্যা যে হিন্দুদের চেয়ে কম হইবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আপত্তি উঠিতে পারে, বঙ্গে ত হিন্দুর চেয়ে মুসলমানের সংখ্যা বেশী, সুতরাং এই প্রদেশে উহাতে মুসলমানদের সংখ্যা কম হওয়া স্বাভাবিক নহে। তাহার উত্তর এই, যে, বঙ্গে শিক্ষিত মুসলমানের সংখ্যা শিক্ষিত হিন্দুর সংখ্যার চেয়ে ঢের কম, এবং অন্য স্বাভাবিক ও কৃত্রিম কারণবশতঃ আইন-সঙ্গত, বৈধ, অহিংস ও প্রকাশ্য অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান-সমূহেও বঙ্গে হিন্দুদের চেয়ে মুসলমানদের যোগ কম। সুতরাং আইনবিরুদ্ধ, অবৈধ, হিংস্র ও গুপ্তষড়যন্ত্রমূলক সন্ত্রাসক-প্রচেষ্টায় বঙ্গে যে হিন্দুদের চেয়ে মুসলমানদের সংখ্যা কম, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তদ্ভিন্ন, ইহা সুজ্ঞাত এবং খবরের কাগজে আগে আগে এবং আজকালও প্রকাশিত সংবাদ হইতে ইহাই প্রমাণ হয়, যে, সন্ত্রাসকদের উপদ্রব বঙ্গে সীমাবদ্ধ আগেও ছিল না, এখনও নাই, এবং সব সন্ত্রাসক আগেও বাঙালী ছিল না, এখনও নহে। সুতরাং ভারতবর্ষের অন্যতম সংখ্যালঘু সম্প্রদায় মুসলমানরা ইহাতে হিন্দুদের সমান সংখ্যায় জড়িত না-হওয়া অস্বাভাবিক নহে।

কিন্তু এখন প্রশ্ন উঠিবে, সন্ত্রাসকদের মধ্যে সবাই হিন্দু, এক জনও মুসলমান নহে, ইহার কারণ কি? ইহার ঠিক উত্তর পাইতে হইলে প্রথমতঃ ইহা প্রমাণিত হওয়া আবশ্যক, যে, সন্ত্রাসক দলে কখনও কোন মুসলমান বা মুসলমানরা ছিল না এবং এখনও নাই। সন্ত্রাসক দলের পুরা তালিকা পুলিসের কাছেও নাই, সুতরাং সন্ত্রাসকরা সবাই হিন্দু, ইহা খাঁটি তথ্য কি-না, বলা যায় না। তবে, আমাদের এখন মুক্তটা [illegible]

পড়িতেছে, বঙ্গে এ পর্য্যন্ত পুলিস যাহাদিগকে সন্ত্রাসক বলিয়া গ্রেপ্তার করিয়াছে ও বিচারানন্তর বা বিনা বিচারে শাস্তি দেওয়াইয়াছে, তাহারা সবাই হিন্দু।

যদি ইহা ধ্রুব সত্য হয়, যে, বঙ্গের সন্ত্রাসক দলের সব লোকই হিন্দু, তাহার কারণ আমরা কেবল অনুমান করিতে পারি, নিশ্চিত কারণ পুলিসও খুব সম্ভব জানে না, জানিলেও তাহা প্রকাশিত হইবে না। কারণ সম্বন্ধে আমাদের অনুমান এইরূপ :—

সন্ত্রাসকদের কাজ গুপ্ত, গোপনীয়, হিংস্র, আইনবিরুদ্ধ, ষড়যন্ত্রমূলক, এবং তাহার জন্য প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত হইতে পারে, ও হইয়াছে। এই জন্য তাহাদের নেতারা ও তাহারা তাহাদের বিবেচনায় খুব বিশ্বাসযোগ্য লোককে ভিন্ন অন্য লোককে যদি না-লয় বা যদি টানিবার চেষ্টা না-করে, তাহা অস্বাভাবিক নহে। সম্ভবতঃ এই কারণে এ-পর্য্যন্ত রাজভক্ত মডারেট দলের কোন হিন্দু বা কংগ্রেসের ডোমীনিয়ন-ষ্টেটাস্-কামী অহিংসাপরমধর্ম্ম-বাদী হিন্দু সন্ত্রাসক দলের মধ্যে ধরা পড়ে নাই বা সন্ত্রাসক বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই। বহু বৎসর ধরিয়া ইংরেজ রাজপুরুষেরা মুসলমানদিগকে বিশেষ ভাবে রাজভক্ত বলিয়া প্রচার করিতেছেন, এবং মুসলমানদের সকলের চেয়ে বড়, প্রসিদ্ধ ও অধিকতমঅনুচর-বিশিষ্ট নেতারাও তাহা বরাবর বলিয়া আসিতেছেন। সুতরাং সন্ত্রাসকরা যদি মডারেট হিন্দু বা ডোমীনিয়ন-ষ্টেটাস্-কামী অহিংসাপরমধর্ম্মবাদী হিন্দু কংগ্রেসওয়ালাদের মত মুসলমানদেরও সান্নিধ্য ও সাহচর্য্য পরিহার করিয়া থাকে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। অবশ্য ইহা আমাদের অনুমান মাত্র। আমরা উপরে সমুদয় হিন্দু কংগ্রেসওয়ালারই উল্লেখ না করিয়া কেবল ডোমীনিয়ন-ষ্টেটাস-কামী অহিংসাপরমধর্ম্মবাদী হিন্দু কংগ্রেসওয়ালাদেরই উল্লেখ করিয়াছি এই জন্য, যে, ইহা নানা ষড়যন্ত্র-মোকদ্দমার সাক্ষ্যে ও দলিলদস্তাবেজে প্রমাণ হইয়াছে, যে, সন্ত্রাসক ও বিপ্লবীরা অহিংসাবাদ মানে না ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সহিত সম্পর্ক-শূন্য পূর্ণ স্বাধীনতা চায়; সুতরাং তাহাদের সঙ্গে সেই সব লোকের যোগ থাকিতে পারে না, যাহারা ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত ডোমীনিয়ন হইলে সন্তুষ্ট হইবে, এবং যাহারা অহিংসাকে "পলিসি" বা কেবল মাত্র আপাতসুবিধাজনক কর্ম্মনীতি মনে না-করিয়া সকল অবস্থায় পালনীয় অলঙ্ঘ্য ধর্ম্মনীতি মনে করে। বলা বাহুল্য, কংগ্রেসের এমন অনেক সভ্য আছেন, যাহারা অহিংসাকে পলিসি বলিয়াই অবলম্বন করিয়াছেন।

সন্ত্রাসক-প্রচেষ্টা যে সাম্প্রদায়িক হিন্দু-প্রচেষ্টা নহে, তাহার আরও অন্যতম প্রমাণ এই, যে, সন্ত্রাসকরা দেশী লোকদের মধ্যে যাহাদিগকে হত্যা করিয়াছে বা হত্যার চেষ্টা করিয়াছে, তাহারা অধিকাংশ স্থলে হিন্দু, মুসলমান নহে, এবং যাহাদের ধনসম্পত্তি হরণ করিয়াছে তাহারাও সবাই, অন্ততঃ অধিকাংশ স্থলে হিন্দু; হিন্দুদিগকে তাহারা একটুও রেহাই দেয় নাই।

—

১৯৩১-৩২ সালে ভারতবর্ষ

প্রতি সরকারী বৎসরের ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও অন্তর্বিধ ঘটনাবলীর একটি বৃত্তান্ত ও আলোচনা ভারত-গবর্মেণ্ট প্রকাশ করেন। কয়েক দিন হইল "ইণ্ডিয়া ইন্ ১৯৩১-৩২" ("১৯৩১-৩২ সালে ভারতবর্ষ") নামক পুস্তক বাহির হইয়াছে। ইহাতে টেররিজমের বৃত্তান্ত ও তাহার উপর মন্তব্য ১৪-১৬, ২৫-২৬ এবং ৭১-৭৫ পৃষ্ঠায় আছে। কিন্তু কোথাও বঙ্গের লাটসাহেবের অনুমিত ও বিবৃত টেররিজমের নিদান বা উদ্দেশ্যের আভাস পর্য্যন্ত নাই।

—

হোয়াইট পেপার কি গণতান্ত্রিক ?

বঙ্গের লাট ৩০শে নবেম্বরের বক্তৃতায় গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান-সমূহের ক্রমবিকাশের কথা ("development of democratic institutionss") উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি শিক্ষিত এবং ইংরেজ হইয়া কি সত্য সত্যই মনে করেন, হোয়াইট পেপারের প্রস্তাবগুলার দ্বারা ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিকতা প্রতিষ্ঠিত হইতে যাইতেছে ? কোন্ আধুনিক গণতন্ত্রে দেশের লোক-দিগকে ধর্ম্ম অনুসারে আলাদা আলাদা এবং অল্প ও অধিক অধিকারবিশিষ্ট শ্রেণীতে ফেলা হইয়াছে ? কোন্ গণতন্ত্রে মুষ্টিমেয় প্রবাসী বিদেশীদিগকে বিশেষ নাগরিক অধিকার এবং তাহাদের সংখ্যার অনুপাত অপেক্ষা অত্যন্ত বেশী অধিকার দেওয়া হইয়াছে ? কোন্ গণতন্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের, এবং

ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি অবলম্বনকারীদের আলাদা আলাদা প্রতিনিধি নির্বাচনের বিধান আছে? কোন্ গণতন্ত্রে একই ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে জাতি (caste)-বিভাগ অনুসারে প্রতিনিধির সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট আছে? কোন্ গণতন্ত্রে শাসকদের হাতে "রক্ষাকবচ," "বিশেষ দায়িত্ব," ব্যবস্থাপক সভার মতনির্ব্বিশেষে ও মতের বিরুদ্ধেও এবং আইন করিবার ক্ষমতা আছে? কোন্ গণতন্ত্রে সমগ্রদেশে আইনদ্বারা সংখ্যাভূয়িষ্ঠ ধর্ম্মসম্প্রদায়কে তাহাদের সংখ্যার অনুপাত অপেক্ষা কম প্রতিনিধি দেওয়া হইয়াছে? ইত্যাদি, ইত্যাদি।

—

বঙ্গের হিন্দু ও বিশেষ অধিকার

বঙ্গের লাট বলিয়াছেন, বঙ্গের হিন্দুরা এ-পর্য্যন্ত ব্রিটিশ রাজত্বে বিশেষঅধিকারবিশিষ্ট অবস্থায় ("privileged position"এ) অধিষ্ঠিত ছিল, এখন গণতান্ত্রিকতার বিবর্ত্তনে সে অবস্থা তাহাদের থাকিতে পারে না। বাঙালী হিন্দুরা যে অবস্থায় ছিল, তাহা তাহাদের শিক্ষা, দেশহিতৈষিতা, দানশীলতা, কর্ম্মশক্তি প্রভৃতির ফল। তাহারা "বিশেষ অধিকার" কিছুই চায় না। খাঁটি গণতান্ত্রিক ভাবে তাহাদিগকে প্রতিযোগিতা করিতে দেওয়া হউক। তাহা না দিয়া, তাহাদের শিক্ষা, দেশের জন্য পরিশ্রম ও দান, দানশীলতা, তাহাদের প্রদত্ত রাজস্ব, রাষ্ট্রীয় কার্য্যে যোগ্যতা প্রভৃতির বিবেচনা না করিয়া, আইনের জোরে তাহাদিগকে ব্যবস্থাপকসভাদিতে সংখ্যার অনুপাত অপেক্ষাও হীনবল করিবার আয়োজন হইতেছে। ইহা অদ্ভুত গণতান্ত্রিকতা!

—

সাম্প্রদায়িক নিষ্পত্তি সম্বন্ধে বঙ্গের লাট

বঙ্গের লাট বলিয়াছেন, সাম্প্রদায়িক নিষ্পত্তি সম্বন্ধে তাঁহার কিছু বলিতে অলঙ্ঘ্য বাধা আছে। কিন্তু ইহাও বলিয়াছেন, তাহা পার্লেমেণ্ট নামঞ্জুর করিতে পারে। তাহা সবাই জানে; ইহাও জানে, যে, সাম্রাজ্যবাদীরা যে-পার্লেমেণ্টে প্রধান, তাহা ঐ নিষ্পত্তি নামঞ্জুর করিবে না। লাট সাহেব আরও বলিয়াছেন, যে, নিষ্পত্তিটা ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় ও উপসম্প্রদায়ের সম্মিলিত মীমাংসার দ্বারা পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, ইহা সুবিদিত; কিন্তু ইহাও সুবিদিত, যে, নিষ্পত্তিটার দ্বারা যে যে-সম্প্রদায়কে ও উপসম্প্রদায়কে অন্যায়রূপে অত্যধিক অধিকার দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে সেগুলি ত্যাগ করা মানবপ্রকৃতিসুলভ নহে, সুতরাং তাহারা তাহা পরিত্যাগ করিবে না এবং ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় ও উপসম্প্রদায়ের সম্মিলিত মীমাংসাও হইবে না।

—

"পুলিং দেয়ার্ ওয়েট্"

বঙ্গের লাট বলিয়াছেন, যে, বঙ্গের হিন্দুদিগকে দেশের সার্ব্বজনিক কাজে ("in the public affairs of the country") অংশ গ্রহণ করিবার এবং তাহাদের "ওজন" অনুসারে অর্থাৎ শিক্ষার, প্রদত্ত রাজস্বের, আত্মোৎসর্গের, শক্তির ও সংখ্যার অনুপাতে শক্তি-নিয়োগ ও প্রভাব-প্রয়োগ করিবার সুবিধা দেওয়া হইবে—যদি তাহারা তাহা অবজ্ঞার সহিত অগ্রাহ্য ("spurn") না করে। "স্পার্ন্" করা হইবে কি হইবে না, তাহা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত। আপাততঃ ইহা সুস্পষ্ট এবং উচ্চতম রাজপুরুষদের কথার দ্বারাও তাহার সুস্পষ্টতা ম্লান হইতে পারে না, যে, প্রধানতঃ বঙ্গের যে-সম্প্রদায়ের ও যে-শ্রেণীর শিক্ষার জোরে, বুদ্ধিবলে, চেষ্টায়, আত্মোৎসর্গে এবং দুঃখবরণে স্বরাজ চিন্তনীয় হইয়াছে, এবং প্রধানতঃ যাহাদের প্রদত্ত রাজস্বে বঙ্গের ও ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় কার্য্য চলে, ব্যবস্থাপক সভা ও অন্যান্য প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানে তাহাদিগকে শক্তিহীন করা হইতেছে—কেবল মাথাগুন্তিতে তাহাদের যত জন প্রতিনিধি প্রাপ্য হয়, তাহাও তাহাদিগকে দেওয়া হইতেছে না। অতএব সরকারী সম্পর্ক যা-কিছুর সঙ্গে আছে, তাহাতে বঙ্গের হিন্দুরা তাহাদের "ওজন" প্রয়োগ করিবার সুবিধা পাইবে না, ইহা নিশ্চিত—তা লাটসাহেব যাই বলুন। কিন্তু বে-সরকারী প্রচেষ্টাসমূহে তাহাদের "ওজন" অনুযায়ী কাজ, এমন কি ওজনের অতিরিক্ত পরিশ্রম, আত্মোৎসর্গ ও দুঃখবরণ, তাহাদিগকে করিতে হইবে—বাঁচিয়া থাকিবার জন্য এবং বঙ্গের সভ্যতা ও কৃষ্টিকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্যই করিতে হইবে। হোয়াইট পেপারের ব্যবস্থা অনুসারে তাহারা সরকারী কোন কিছুতে ধারে কাটিতে পারিবে না, ভারেও কাটিতে পারিবে না।

—

বঙ্গের আর্থিক উন্নতি

বঙ্গের রাজনৈতিক বর্ত্তমান অবস্থা ও অনুমিত ভবিষ্যৎ অবস্থা সম্বন্ধে লাটসাহেব কিছু বলিয়া ৩০শে নবেম্বরের বক্তৃতায় আর্থিক অবস্থা ও তাহার উন্নতি সম্বন্ধেও কিছু বলিয়াছেন। প্রধানতঃ কৃষির ও কৃষকদের অবস্থার উন্নতির জন্য এবং পরোক্ষভাবে পণ্যশিল্প ও ব্যবসাবাণিজ্যের উন্নতির জন্য অনুসন্ধানার্থ গবন্মে´ণ্ট যে কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহার ফল দেখিয়া তবে মন্তব্য করা চলিবে।

লাটসাহেব যে পারিপার্শ্বিক অবস্থা ("general atmosphere) বিপর্য্যাসক মত প্রচারের অনুকূল ("favourable to the propagation of subversive doctrine) বলিয়াছেন, বঙ্গের আর্থিক অবস্থা উন্নত হইলে তাহার কিছু পরোক্ষ উৎকর্ষসাধন হইবে, স্বীকার করি। কিন্তু বিপ্লবপ্রচেষ্টা মূলতঃ ও প্রধানতঃ রাজনৈতিক অসন্তোষ হইতে উৎপন্ন। এই অসন্তোষই বিপর্য্যাসক মত প্রচারের অনুকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রধানতঃ উৎপন্ন করিয়াছে। সুতরাং ঐ অসন্তোষ দূর করা চাই। কিন্তু হোয়াইট পেপার ও সাম্প্রদায়িক নিষ্পত্তি দ্বারা তাহা দূরীভূত না হইয়া বরং বর্দ্ধিতই হইবে।

"বুর্জোআ"

আমরা উত্তম, অন্যেরা অধম—এই ভাবটা সর্ব্বত্র প্রাচীন কাল থেকে বিদ্যমান আছে। অন্যদের অধমতা বুঝাইবার নিমিত্ত নানা দেশে নানা ভাষায় নানা শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। গ্রীক ভাষায় যাহারা কথা বলিত না, গ্রীকরা তাহাদিগকে বার্বেরিয়ান বলিত, ইহুদীরা অন্য জাতির লোকদিগকে জেণ্টাইল বলিত, বৈদিক আর্য্যেরা অনার্য্যদের প্রতি দাস, দস্যু, ম্লেচ্ছ আদি শব্দ প্রয়োগ করিত, আচারনিষ্ঠ হিন্দুর চক্ষে অহিন্দুরা ম্লেচ্ছ, খ্রীষ্টিয়ানরা হিন্দুদিগকে হীদেন বা পেগ্যান বলে, মুসলমানেরা হিন্দুকে কাফের বলে। অন্যের প্রতি এইরূপ কোন-না-কোন শব্দ প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে অবজ্ঞাও সূচিত হয়।

পুরাকাল হইতে আগত এই সব অবজ্ঞামিশ্রিত শব্দ প্রায়ই কোন-না-কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোক ব্যবহার করে। তা ছাড়া, রাজনৈতিক দলাদলিপ্রসূত এই রকম শব্দও আছে। যেমন ইংরেজদের মধ্যে প্রগতিশীল, উদারনৈতিক বা মৌলিকসংস্কারপ্রিয় দলের লোকেরা রক্ষণশীল দলের লোকদিগকে টোরী বলে। আমাদের দেশে এক দলের লোক অন্য দলের লোককে চরমপন্থী, মডারেট ইত্যাদি আখ্যা দিয়া থাকে। আজকাল ইউরোপ হইতে আমদানী "বুর্জোআ" (Bourgeois) কথাটা ভারতীয় এক দল লোক প্রয়োগ করিয়া থাকে। তাহারা মনে করে, তাহারা রুশীয় কম্যুনিষ্টদের মতাবলম্বী এবং নিজেরা বুর্জোআ নহে। ইহা একটি ফ্রেঞ্চ কথা, মানে দোকানদার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক; অর্থাৎ অভিজাতও নয়, দৈহিক শ্রমজীবী, কারিগর, চাষী ইত্যাদিও নয়। আমাদের দেশে কিন্তু যাহারা অপরের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশার্থ এই শব্দটি ব্যবহার করে, তাহারা অনেকে বা অধিকাংশ নিজের খাদ্য নিজে উৎপাদন করে না, নিজের কাপড় নিজে বোনে না, দৈহিক শ্রমের কোন কাজ করে না। পরগাছার মত পরাবলম্বী পরশ্রমজীবী হওয়াটা যদি বুর্জোআর লক্ষণ হয়, তাহা হইলে ইহাদের অনেকেই বুর্জোআ, এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক ত বটেই। অনেকে মহাত্মা গান্ধীকে পর্য্যন্ত, শুধু বুর্জোআ নহে, বুর্জোআদের কর্ম্মচারী বলে! ছাত্রেরা পর্য্যন্ত অন্যের প্রতি বুর্জোআ শব্দ প্রয়োগ করিতেছে। ধর্ম্মভেদ, বৃত্তিভেদ, ভাষাভেদ, সামাজিক শ্রেণীভেদ প্রভৃতি কোন কারণেই অবজ্ঞাসূচক কোন শব্দ অন্যের প্রতি প্রয়োগ করা কাহারও উচিত নয়। নিখুঁত মানুষ কেহ নাই, কোন নিখুঁত মানবসমষ্টিও নাই। যেমন কোন মানুষই সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে অন্য কোন কোন মানুষের সাহায্য ব্যতিরেকে জীবনধারণ করিতে পারে না, তেমনি কোন শ্রেণীর মানুষও অন্যশ্রেণীনিরপেক্ষ অথচ সভ্য উন্নত কৃষ্টিশীল জীবন ধারণ করিতে পারে না। রুশিয়াতে কারখানার শ্রমিক এবং চাষীদের প্রাধান্য নামতঃ স্থাপিত হইয়াছে। অভিজাতদের উচ্ছেদ সাধিত হইয়াছে। রুশীয় মধ্যবিত্ত বুর্জোআদিগকে নিশ্চিহ্ন বা বিতাড়িত করিবার চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক কি কারখানার শ্রমিক ও ক্ষেতের চাষীরা প্রভু হইয়াছে? তাহা হয় নাই। তাহারা কতকগুলি নেতার বা একজন নেতার অধীন হইয়াছে—অর্থাৎ এক প্রকার মুখ্যতন্ত্র (oligarchy) বা একনায়কত্ব (dictatorship)

স্থাপিত হইয়াছে। তা ছাড়া, রুশিয়ার কারখানার শ্রমিক ও ক্ষেতের কৃষকেরা শ্রেণীনিরপেক্ষ হইতে পারে নাই। সেই দেশের নেতারা আমেরিকা হইতে অনেক হাজার শিল্পী এবং জার্মেনী হইতে অনেক এঞ্জিনিয়ার ও বিশেষজ্ঞ আমদানী করিতে বাধ্য হন। জার্ম্যান এঞ্জিনিয়ার ও বিশেষজ্ঞদিগকে তাড়াইয়া দিবার পর ঐ ঐ শ্রেণীর ফরাসী লইতে হইয়াছে।

তাহার সমালোচনা প্রকাশ করেন, তাহা হইলে তাহা পড়িতে মন লাগে না। হয়ত তাহাতে কিছু লাভও হয়। কিন্তু আমরা দেশের লোকেরা কতদিন আগে কি বলিয়াছিলাম, লিখিয়াছিলাম, করিয়াছিলাম, এতদিন পরে তাহার সরকারী বাসী সমালোচনা পড়িতে উৎসাহ হয় না। তার চেয়ে, সরকারী রিপোর্ট হইতে গোটাকতক তথ্য ও মৃদু রকমের প্রশংসা সংকলন করিয়া দেওয়া যাক্।

বঙ্গের শাসন-বিবরণ

বাংলা দেশের ১৯৩১-৩২ সালের অর্থাৎ ১৯৩১ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৩২ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের শাসন-বিবরণ বাহির হইয়াছে। ইহা বাংলা গবর্ন্মেণ্ট কর্ত্তৃক আমাদের নিকট বর্ত্তমান ১৯৩৩ সালের ২১শে নবেম্বর প্রেরিত হইয়াছে। যে-বৎসর ১৯৩২ সালের ৩১শে মার্চ্চ শেষ হইয়াছে, তাহার রিপোর্ট ঐ সালেরই ডিসেম্বরের মধ্যে বাহির করা সম্ভব কি-না জানি না—অসম্ভব ত মনে হয় না। ১৯৩২ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে বাহির হইলেও মনে হইত টাট্‌কা কিছু। কিন্তু তাহার পর প্রায় আরও এক বৎসর পরে রিপোর্টটি বাহির হওয়ায় উহা পুরাতন ইতিহাসের সামিল মনে হইতেছে।

আমরা যেমন গবর্ন্মেণ্টের সমালোচনা করি, গবর্ন্মেণ্টও এই রিপোর্টে তেমনি আমাদের অর্থাৎ সাংবাদিক প্রভৃতির সমালোচনা করেন। গবর্ন্মেণ্ট বলেন, সাংবাদিকদের স্বর বড় কড়া, তাহারা সরকারকে গালাগালি দেয় ইত্যাদি। কিন্তু গবর্ন্মেণ্টও কসুর করেন না। তফাৎ এই, যে, যদি গবর্ন্মেণ্ট মনে করেন, যে, কোন সাংবাদিক মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছে, তাহা হইলে নানা রকমের শাস্তি তাহার অদৃষ্টে ঘটে এবং তাহার আরও মারা যাইতে পারে; কিন্তু যে মানুষগুলির সমষ্টিকে গবর্ন্মেণ্ট বলা হয়, এবং "সরকার সেলাম" করিতে হয়, তাঁহারা যাহাই করুন না কেন, সাংবাদিকেরা বা দেশের কোন শ্রেণীর লোকেরাই তাঁহাদিগকে জবাবদিহি করিতে বা শাস্তি দিতে বা তাঁহাদের অন্ন মারিতে পারে না।

সে যাহাই হোক, দেশী সাংবাদিকেরা বা দেশের অন্য লোকেরা যাহা করে, বলে, যদি সরকারপক্ষ তখনি তখনি

বঙ্গের মিউনিসিপালিটী-সমূহ

সরকারী মতে বঙ্গের মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষ নিঃসন্দেহ বহুপরিমাণে ভাল কাজ করিয়াছেন। তাঁহাদের কার্য্যপরিচালনা সাধারণতঃ সততার সহিত, যদিও অনেক সময় ভীরু ভাবে, করা হইয়াছিল, এবং প্রায় সর্ব্বত্রই করদাতা ও কমিশনারদের মধ্যে উন্নতিসাধন বিষয়ে উৎসাহ দেখা গিয়াছিল—বিশেষতঃ সর্ব্বসাধারণের স্বাস্থ্যোন্নতি সম্পর্কে। গবর্ন্মেণ্ট আরও বলেন, যে, ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে, কমিশনারদিগকে সাধারণতঃ দুর্লঙ্ঘ্য বাধার সম্মুখীন হইতে হয়; রাস্তাগুলা আঁকা-বাঁকা ও অসমতল, খোলা নর্দামাগুলা এরূপ যে কোন যুক্তিসঙ্গত উপায়েই সেগুলাকে পরিষ্কার রাখা যায় না, খালি জায়গাগুলা অস্বাস্থ্যকর জঙ্গলে আচ্ছন্ন কিংবা ময়লা পুকুরে ও জলায় পূর্ণ, এবং করদাতারা নূতন ট্যাক্স বসাইবার দৃঢ় বিরোধী।

বঙ্গীয় জেলা-বোর্ড-সমূহ

সরকারী মতে মোটের উপর জেলাবোর্ডগুলির গত ১৯৩১-৩২ সালের কাজ উৎসাহজনক, ও তাহারা ক্রমমান আয় দ্বারা যত বেশী কাজ সম্ভব তাহা করিবার সফল চেষ্টা করিয়াছে; বাঁকুড়া ছাড়া, বঙ্গের আর সব জেলায় সরকারী কর্ত্তাদের সহিত ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডগুলির সম্বন্ধ সম্পূর্ণরূপে সন্তোষজনক ছিল। ইহার মানে বোধ হয় এই, যে, মফস্বলের লোকেরা স্ব স্ব প্রাচীন মফস্বলখ্যাতি এখনও ভুলিতে না-পারায় কিঞ্চিৎ স্বাধীনচিত্ততা প্রদর্শন করিয়াছিল।

সমবায়-সমিতিসমূহ

সমবায়-সমিতিসমূহের সংখ্যা গতপূর্ব্ব বৎসরের ২৩৬৭৬ হইতে বাড়িয়া গত বৎসর ২৩৭৭৭ হয়, সভ্যসংখ্যা ৮০৬৫৬৭ হইতে বাড়িয়া ৮১৭৭৬০ হয়, কাজ চালাইবার মূলধন ১৫·৭৯ লক্ষ হইতে বাড়িয়া ১৬·৩৩ লক্ষ হয়, এবং এই প্রচেষ্টায় নগদ যত টাকা খাটে তাহা ১৭·৫৯ কোটি হইতে বাড়িয়া ১১·২২ কোটি হয়।

সমবায় প্রচেষ্টা প্রধানতঃ ঋণদানেই ব্যাপৃত ছিল—যেমন কৃষিঋণদান। ঋণদান ছাড়া অন্য রকমের কাজ করিবার জন্যও কৃষিসমবায়-সমিতি ছিল; যথা, ক্রয়বিক্রয়-সমিতি, জলসেচন-সমিতি (বাঁকুড়া ও বীরভূমে ৮০৫টি সেচন-সমিতির ১১৫২২৪ বিঘা জমীতে জলসেচন করিবার কথা), সমবায় কৃষিসভা, দুগ্ধ উৎপাদন ও বিক্রয়ের সমবায় সমিতি।

কৃষিঋণ ছাড়া অন্য রকমের ঋণ দিবার সমবায় সমিতিও আছে।

কারিগরদের সমবায় সমিতি

অনেক রকমের কারিগরদের সমবায় সমিতি আছে। দুঃখের বিষয়, প্রেসিডেন্সি বিভাগে মধ্যগ্রামের চিকন্ সমিতির কারবার গুটাইয়া ফেলিতে হইয়াছে। বর্দ্ধমান বিভাগে ইলামবাজারের খেলনা-নির্ম্মাতারা ঋণ লইয়া কারবার চালাইতেছে। হুগলীর ঘোলসারার কংসবণিক সমিতি কাজ বন্ধ করিয়াছে, ইহাও দুঃখের বিষয়। বাঁকুড়া জেলার ৫টি শাঁখারী সমিতির মধ্যে চারিটি ঋণ গ্রহণের ভিত্তিতে কাজ চালাইতেছে। রাজশাহী জেলার ঘাটাগাঁওয়ের কলুদের সমিতি ঋণ গ্রহণ দ্বারা কাজ চালাইতেছে। পাবনা জেলার সুতাবাড়ার লোহ-কর্ম্মকারদের সমিতির কাজ মোটেই সন্তোষজনক হয় নাই। দিনাজপুরের টিনের পাতের কারিগরদের সমিতি স্থানীয় প্রতিষ্ঠান সকলের ফরমাইস পাওয়া সত্ত্বেও কিছু লোকসান দিয়া কাজ চালাইয়াছিল। পাবনা জেলার কামারপুরের সুতারদের সমিতি সম্ভবতঃ উঠাইয়া দিতে হইবে। ফরিদপুর জেলার বিক্রমপুর পাটিকর সমিতি লোকসান দিয়া কাজ চালাইয়াছিল। সাম্ভাশির সূত্রধর সমিতি ঋণ লইয়া কাজ চালাইয়া অল্প লাভ করিয়াছে। ঢাকার আটটি শাঁখারী সমিতি এ বৎসর কোন কাজ করে নাই, এবং তাহাদের ও ঢাকার শিল্প ইউনিয়নের মধ্যে বনিবনাও নাই। চট্টগ্রাম বিভাগে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার পিত্তলের কারিগর সমিতি লোকসান দিয়া কাজ চালাইয়াছিল; ইহার পরিচালকরা ধারে যে-সব জিনিষ বিক্রী করিয়াছেন তাহার মূল্য আদায়ে মন দেওয়া উচিত, কারণ তাহাতে ইহার মূলধনের অনেক অংশ আবদ্ধ আছে। পাহাড়তলী কলু সমিতি গুটাইয়া লওয়া হইয়াছে। পাঠানটুলী "আগ্রাবাদ যৌথ শিল্প সমিতি" অনেক লোকসান হওয়ায় দড়ি তৈরি করার কাজ বন্ধ করিয়াছিল; এখন ঋণ লইয়া আবার কাজ আরম্ভ করিয়াছে। মিরাজপুর কুম্ভকার সমিতি পুনর্গঠিত হইতেছে। আমীরাবাদ মহাদেবপুর গুড় প্রস্তুতি সমিতি কাজ চালাইয়া অল্প লাভ করিয়াছে। ইহা একখণ্ড খাসমহল জমি লইয়া তাহাতে আকের চাষ করে, এবং আক মাড়াইয়ের একটি কলও ইহার আছে। গুড়ের কাট্‌তি হইয়াছিল।

সরকারী রিপোর্টে কারিগর সমিতিগুলির এই যে বৃত্তান্ত আছে, তাহা পড়িলে মনটা দমিয়া যায়। ইহা হইতে বুঝা যায়, বঙ্গের কারিগরদের অবস্থা কোথাও সন্তোষজনক নয়। উপায় কি? সরকারী রিপোর্টে কেবল তথ্য দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু কারিগরদের কারবারের অবস্থা কেন খারাপ, এবং কিরূপেই বা তাহার উন্নতি হইতে পারে, সে-বিষয়ে কিছুই লেখা হয় নাই। এ-বিষয়ে কোন সরকারী অনুসন্ধান হইয়াছিল কি? বেসরকারী কোন সভা সমিতি বা একক কোন কর্ম্মী দেশী শিল্পীদের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহার উন্নতির কোন উপায়চিন্তা করিয়াছেন কি? বড় বড় কারখানার যুগে তাহাদের কৌলিক কাজ যদি না-ই চলে, তাহা হইলে তাহাদের অন্য কাজ জুটাইবার ব্যবস্থা হওয়া উচিত। সরকারী রিপোর্টে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা পড়িয়া ত মনে হয়, বঙ্গের নানা কারিগরশ্রেণীর লোকেরা হয় লয় পাইতেছে, নয় সকলেই চাষী হইয়া মাটি কামড়াইয়া পড়িয়া থাকিয়া বাঁচিয়া থাকিবার বৃথা চেষ্টা করিতেছে।

মৎস্যজীবীদের সমবায় সমিতি

গতপূর্ব্ব বৎসর মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সংখ্যা ও সভ্যসংখ্যা ছিল ১১২ ও ৪৫০৭, গত বৎসর ছিল ১০৮ ও ৪,১৫৩। চব্বিশ-পরগণার একটি সমিতির সভ্যদের আপোষে ঝগড়া মিটাইবার এবং মেদিনীপুরের একটি মোকদ্দমার উল্লেখ রিপোর্টে আছে। মৈমনসিংহের সমিতিগুলির অবস্থার উন্নতি হয় নাই। ঢাকার নয়ানদী রথখোলা সমিতি মাছ ধরিবার স্বত্ব সম্বন্ধীয় মোকদ্দমায় হারিয়া যাওয়ায় উঠিয়া যাইবে। ত্রিপুরার ধন্তেশ্বরী-বেতনা-পরা সমিতি লোকসান দিয়া কাজ চালাইতেছে। পাবনা নিম্ন-গঙ্গা সমিতি ঋণ গ্রহণ দ্বারা কাজ চালাইয়াছে। অন্যান্য সমিতির অধিকাংশ ঋণ লইয়া কাজ চালাইয়াছিল।

বঙ্গে মাছের চাহিদা ত খুব আছে। অথচ মৎস্যজীবী সমিতি কোনটিই ভাল না-চলিবার কারণ কি? সরকারী রিপোর্টে ত এ প্রশ্নের কোন জবাব পাইলাম না।

তন্তুবায় সমবায় সমিতি

গতপূর্ব্ব বৎসরে তন্তুবায় সমিতিগুলির সংখ্যা ও সভ্যসংখ্যা ছিল ৩৪০ ও ৬,১৪৫, গত বৎসর তাহা কমিয়া দাঁড়ায় ৩০৬ ও ৬,১০৩। সাধারণতঃ সকল ব্যবসা-বাণিজ্যে যে মন্দা চলিতেছে, তাহার ফলে এবং মিলের কাপড়ের প্রতিযোগিতার ফলে এই সমিতিগুলির অবস্থা খারাপ হইয়াছিল। বাগেরহাট বয়ন সংঘ একটি সমবায়প্রথানুযায়ী মিল; ইহার বিক্রী গতপূর্ব্ব বৎসর ছিল ৪৩,২৫১ টাকা পরিমিত, গত বৎসর তাহা কমিয়া ২০,৪৭৬ হয়, এবং লোকসান হয় ৪,৫৬২ টাকা। বাঁকুড়ায় ৬১টি সমিতি কমিয়া ৫৬ হয়; তন্মধ্যে ৪৫টি কাজ করিতেছে, ৮টি কাজ বন্ধ করিয়াছে, এবং তিনটি কাজ আরম্ভ করে নাই। চৌমুহানী সংঘের সহিত সংযুক্ত অনেকগুলি সমিতিকে লোকসান দিয়া কাজ চালাইতে হইয়াছে। নওগাঁ ও নীলফামারীতে পাটের জিনিষ বুনিবার পরীক্ষা চালান হইয়াছিল, কিন্তু তথাকার উৎপন্ন দ্রব্য বাজারে শীঘ্র বিক্রী হয় নাই। নীলফামারীর সমিতি উৎকৃষ্ট রকমের কার্পেট (গালিচা বা সতরঞ্চ) প্রস্তুত করিয়াছিল, কিন্তু ইহার ২১৫ টাকা লোকসান হয়। কার্পাস ও পশমের সূতা কাটিয়া তাহা বুনিবার জন্য কালিমপঙে একটি নূতন সমিতি গত বৎসর খোলা হইয়াছে।

—

রেশম সমবায় সমিতি

রেশমের গুটির চাষ, চরকায় বা কাঠিমে সূতা জড়ান, সূতা হইতে কাপড় বোনা প্রভৃতি নানা রকমের সমিতি আছে। গুটির সমিতির সংখ্যা ৮০ হইতে কমিয়া ৭৭ হয়। তন্মধ্যে ৬২টি মালদহে স্থিত। ইহাদের মূলধন ৯৩,৩৩৩ হইতে কমিয়া ৯২,১৮৬ হয় বটে, কিন্তু মুনাফা ৭৮৬ হইতে বাড়িয়া ১৪৮৫ হইয়াছিল। দোপুকুরিয়া সমিতি সহজে তাহার উৎপন্ন জিনিষ বিক্রী করিতে পারিতেছে না। জঙ্গীপুর রেশম সমিতির অল্প লাভ হইয়াছিল। পাঁচগাছিয়া বয়ন সমিতির অবস্থা অসন্তোষজনক। বিষ্ণুপুর রেশম তন্তুবায় সমিতি ঋণ গ্রহণ দ্বারা মন্দ চলে নাই।

জমিদারী সমবায় সমিতি

জমিদারী সমিতির সংখ্যা ৪। বঙ্গীয় যুবক জমিদারী সমিতি আর্থিক দিক্ দিয়া সফলকাম হইয়াছে, কিন্তু ইহার যে প্রাথমিক মূল উদ্দেশ্য যুবকদিগকে কৃষিকার্য্যে আকৃষ্ট করা, তাহাতে ইহা সামান্যই অগ্রসর হইয়াছে।

—

ম্যালেরিয়া-নিবারক সমিতি

ম্যালেরিয়া-নিবারক ও সর্ব্বসাধারণের স্বাস্থ্য রক্ষক সমিতিগুলির সংখ্যা ৮১১ হইতে বাড়িয়া ৮৬৫ এবং সভ্যসংখ্যা ১৭,৪৯৭ হইতে বাড়িয়া ১৭,৯৭১ হয়। এই সমিতির অনেকগুলি তাহাদের নিজ নিজ কার্য্যক্ষেত্রে সর্ব্বসাধারণের স্বাস্থ্যোন্নতির কাজ করিয়াছিল।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই প্রচেষ্টার প্রবর্ত্তক। ইহার দ্বারা দেশের উপকার হইতেছে। ইহার কার্য্যক্ষেত্র বৃদ্ধি বাঞ্ছনীয়।

মহিলাদের সমবায় সমিতি

মহিলাদের সমবায় সমিতি ছিল ৮টি। তাহার মধ্যে দুটি ভাল কাজ করিয়াছে। একটি টালা মহিলা সমিতি, অন্যটি নারী সমবায় মন্দির; ইহা ইহার সভ্যাদের তৈরি জিনিষ বিক্রী করে। তৎসমুদয়ের বেশ কাটতি আছে।

—

গ্রাম পুনর্গঠন সমবায় সমিতি

গ্রামগুলির পুনরুজ্জীবন ও পুনর্গঠনের জন্য সমবায় সমিতির সংখ্যা ৬ হইতে ৭ হইয়াছে। তাহাদের কাজ সাধারণতঃ ভালই চলিয়াছে। তন্মধ্যে প্রধান সমিতিগুলি বিশ্বভারতীর গ্রাম-পুনর্গঠন বিভাগ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত।

—

গৃহনির্ম্মাণ সমবায় সমিতি

দার্জিলিঙের গৃহনির্ম্মাণ সমবায় সমিতি ইহার সঙ্কল্পিত কাজ সম্পন্ন করিয়া এখন ঋণ শোধ করিতেছে। ঢাকার সমিতি ইহার কাজ শেষ করিয়া, খারাপ ভাবে কার্য্য পরিচালনবশতঃ দেনা শোধ করিতে পারে নাই। মৈমনসিংহ সমিতির কাজ ভাল চলে নাই ও লোকসান হইয়াছে। চরকাসন সমিতির কাজ ভাল চলিয়াছিল। কলিকাতা শহরতলী উপনিবেশ দমদমা রোডে ৯৩ বিঘা জমি নিজের ৭৬৬৭৮ টাকায় কিনিয়া ৫৬টি টুকরা সভ্যদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিয়াছে এবং তিনটি নিজের বিদ্যালয় ও কার্য্যালয় নির্ম্মাণের জন্য রাখিয়াছে। সভ্যেরা একটি বাড়ি নির্ম্মাণ করিয়াছে এবং তিনটি নির্ম্মিত হইতেছে।

—

ভদ্রাসন-সংলগ্ন কৃষিক্ষেত্র সমিতি

ম্যালেরিয়া-নিবারক সমিতিগুলির একটি কাজ গ্রামের আগাছা ও জঙ্গল সাফ করা। আগাছা ও জঙ্গলময় অনেক জায়গা গৃহস্থদের ভদ্রাসনসংলগ্ন। একবার সাফ করিলে সেই সব জায়গা আবার জঙ্গলাকীর্ণ হয়। যদি সাফ করিয়া তাহাতে তরকারী আদি লাগান হয়, তাহা হইলে আর আগাছা ও জঙ্গল জন্মে না, অধিকন্তু গৃহস্থের তরকারীর খরচ বাঁচে এবং উদ্বৃত্ত তরকারী বিক্রী হইতে কিছু লাভও হয়। এই প্রকার চিন্তার ধারা হইতে বঙ্গীয় ভদ্রাসনসংলগ্ন কৃষিক্ষেত্র সমিতির (বেঙ্গল হোম্ ক্রফটাস' য়্যাসোসিয়েশ্যনের) উৎপত্তি হয়। ইহার কার্য্যদ্বারা ইহার সভ্যশ্রেণীভুক্ত গৃহস্থেরা উপকৃত হইতেছে।

—

বঙ্গে নারীর উপর অত্যাচার বৃদ্ধি

কিছুদিন পূর্ব্বে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় একটি প্রশ্নের উত্তরে সরকারপক্ষ হইতে বঙ্গে নারী-হরণাদি অপরাধবৃদ্ধি সম্বন্ধে বলা হয়, "The figures did not justify the definite conclusion that this class of crime was increasing," "এই রকম অপরাধসম্বন্ধীয় সংখ্যাগুলি হইতে ঠিক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না, যে, এই শ্রেণীর অপরাধ বাড়িতেছে।" তাহার পর অল্পদিন আগে পার্লেমেণ্টে এ-বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হওয়ায় ভারতবর্ষের আণ্ডার-সেক্রেটরী অব ষ্টেট্ মিঃ বাট্‌লার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বাংলা-গবন্মে‌ণ্টের ঐ উত্তরটিরই পুনরাবৃত্তি করেন। অথচ ইতিমধ্যে বঙ্গের ১৯৩২ সালের পুলিস রিপোর্ট প্রস্তুত হইয়া গত ১৭ই অক্টোবর বাংলা-গবন্মে‌ণ্ট কর্ত্তৃক বিবেচিত হইয়া গিয়াছে এবং তাহাতে নারীদের উপর অত্যাচার-বৃদ্ধির কথা স্পষ্ট ভাষায় লিখিত হইয়াছে। পার্লেমেণ্টে বাট্‌লার সাহেব ইহার অনেক পরে পূর্ব্বোক্ত জবাব দেন। তিনি এ-বিষয়ে বাংলা-গবন্মে‌ণ্টকে জিজ্ঞাসা না-করিয়াই যে জবাব দিয়াছেন, তাহা হইতে পারে না। সুতরাং ইহাই মনে হয়, যে, মিঃ বাট্‌লার এখানে প্রশ্ন করিয়া পাঠাইবার পর এখানকার যে সরকারী কর্ম্মচারী তাঁহার প্রশ্নের জবাব দিয়াছেন, তিনি হয় ১৯৩২ সালের রিপোর্টটা প্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও তাহা না-দেখিয়া ব্যবস্থাপক সভায় প্রদত্ত আগেকার জবাবটা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, কিংবা ১৯৩২ সালের রিপোর্ট অবগত থাকা সত্ত্বেও জানিয়া-শুনিয়া অপ্রকৃত কথা বাট্‌লার সাহেবকে জানাইয়াছেন।

১৯৩২ সালের বঙ্গীয় পুলিস রিপোর্টের ২৩ পৃষ্ঠায় আছে :—

"Altogether, 284 and 459 cases under sections 366 and 354, respectively, against 212 and 387 in 1931, were disposed of as true during the year, of which 78 cases under section 366 ended in the conviction of 174 persons and 178 cases under section 354 in the conviction of 226 persons."

তাৎপর্য্য। পীন্যাল কোডের ৩৬৬ ও ৩৫৪ ধারা অনুসারে ১৯৩১ সালে ২১২ ও ৩৮৭টা সত্য মোকদ্দমা হয়, তাহা বাড়িয়া ১৯৩২ সালে ২৮৪ ও ৪৫৯টা সত্য মোকদ্দমা হয়। ১৯৩২ সালে তন্মধ্যে উক্ত ৩৬৬ ধারা অনুসারে ৭৮টা মোকদ্দমায় ১৭৪ জনের এবং ৩৫৪ ধারা অনুসারে ১৭৩টা মোকদ্দমায় ২২৬ জনের দণ্ড হয়।"

১৯৩২ সালের বঙ্গীয় পুলিস রিপোর্টের এই অংশের উপর সকৌন্সিল গবর্ণর বাহাদুরের মন্তব্য এই :—

"His Excellency in Council notes that cases of offence committed against women under sections 366 and 354, Indian Penal Code, showed an increase of 94 over the figure of the previous year—Burdwan, Nadia and Hooghly being the main contributors. As in the past, investigation into such cases will be pursued zealously with a view to check an evil which has been the object of public comment to a steadily increasing extent in recent years."

তাৎপর্য্য। সকৌন্সিল মহামহিম গবর্ণর বাহাদুর লক্ষ্য করিতেছেন, যে, নারীদের বিরুদ্ধে অপরাধ পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা সংখ্যায় ৯৪টা বাড়িয়াছে—প্রধানতঃ বর্দ্ধমান, নদিয়া ও হুগলী জেলায়। যে পাপাচারটার বিরুদ্ধে অধুনা কয় বৎসর সর্ব্বসাধারণের মন্তব্য বাড়িয়াই চলিয়াছে, তাহা দমন করিবার নিমিত্ত, অতীতকালে যেমন, [ভবিষ্যতেও তেমনি] উৎসাহের সহিত এইরূপ মোকদ্দমার তদন্ত করা হইবে।"

এইরূপ অঙ্গীকার ও আশ্বাসবাণী পূর্ব্বেও রাজপুরুষেরা উচ্চারণ করিয়াছেন। তাহার ফল বিশেষ কিছু হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ভবিষ্যতে কি হয়, দেখা যাক্। ইংরেজ রাজপুরুষদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি, যে, একটি ইংরেজ নারী বা বালিকা অপহৃতা হইলে কিরূপ হুলস্থুল ঘটে। এদেশে ভারতীয় শত শত নারীর সেইরূপ দুর্দ্দশা ঘটিতেছে। তাঁহাদের সতীত্ব ও সম্মান ইংরেজ নারীদেরই মত অমূল্য সম্পদ। অতএব, ভারতীয় ইংরেজ রাজপুরুষদিগকে প্রতিকার-চেষ্টা সম্পূর্ণ শক্তির সহিত করিতে হইবে।

কিন্তু সরকারী অঙ্গীকারের ফল কি হয়, তাহা দেখিবার জন্য অলসভাবে বসিয়া থাকিলে চলিবে না। দেশের লোকদিগকে গ্রামে, নগরে, জেলায় অত্যাচারনিবারক সভা স্থাপিত করিয়া উৎসাহের সহিত চালাইতে হইবে। তাঁহারা স্থানীয় বদমায়েস গুণ্ডাদের উপর নজর রাখিবেন, অসহায় নারীদিগকে রক্ষা করিবেন, অত্যাচার ও নারীহরণ হইলে দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালাইবেন এবং অপহৃতা অত্যাচরিতা নারীদের উদ্ধারসাধন করিবেন।

আইনের প্রয়োজনীয় সংস্কারের জন্য দেশব্যাপী আন্দোলন আবশ্যক। অত্যাচারীদের খুব কঠোর শাস্তি হওয়া চাই, অপহৃতা নারীদিগকে খুঁজিয়া না-পাওয়া গেলে বিচারে দোষী বলিয়া প্রমাণিত লোকদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হওয়া চাই, এবং যাহারা বার বার বা দলবদ্ধভাবে নারীহরণাদি করে, জেলে তাহাদের অস্ত্রচিকিৎসা দ্বারা তাহাদিগকে সং হইতে সমর্থ করা চাই। অপহৃতা নারীদিগকে যে-সব লোকের বাড়িতে লুকাইয়া লুকাইয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে লইয়া গিয়া তাহাদের উপর অত্যাচার করা হয়, বদমায়েসদের সহায়ক সেই সব লোকদেরও শাস্তি হওয়া চাই।

আগামী বড়দিনের সময় কলিকাতায় যে নারীরক্ষাবিষয়ক কন্‌ফারেন্স হইবে, তাহা একটি অতীব প্রয়োজনীয় কন্‌ফারেন্স। ইহার আলোচনা সুফলপ্রদ করিবার চেষ্টা সকল দেশহিতৈষীর কর্ত্তব্য। প্রবাসীর সম্পাদককে তখন কার্য্যান্তরে গোরখপুর যাইতে হইবে, ইহা আগে হইতেই স্থির ছিল। কিন্তু আমরা ঐ কন্‌ফারেন্সে উপস্থিত থাকিতে না-পারিলেও, উহার উদ্দেশ্যের সহিত আমাদের পূর্ণ সহানুভূতি আছে, তাহা বলাই বাহুল্য।

নারীহরণাদি অপরাধের সবগুলি লোকলজ্জা, গুণ্ডাদের ভয় প্রভৃতি নানা কারণে পুলিসের গোচর হয় না। কোন কোন স্থলে পুলিসকে জানাইলেও তাহারা কিছু করে না বা করিতে চায় না, এরূপ অভিযোগ প্রায়ই খবরের কাগজে বাহির হয়। সুতরাং পুলিস-রিপোর্টে যতগুলি সত্য মোকদ্দমার সংখ্যা দেওয়া আছে, প্রকৃত ঘটনা তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী ঘটে। অতএব, দেশের অবস্থা যে সাতিশয় লজ্জাকর ও ভয়াবহ, তাহা সহজেই বোধগম্য।

যে লজ্জাকর ও ভয়াবহ অবস্থা অন্যান্য প্রদেশে আছে, বঙ্গেও তাহা থাকিলে তাহা লজ্জাকর বা ভয়াবহ নহে, আমাদের মনের ভাব এরূপ নহে—আশা করি পাঠকপাঠিকাদেরও নহে। কিন্তু আমরা বাঙালীরা ভারতবর্ষে কাপুরুষ ও অতি-

অথম, এই ভাবিয়া পাছে কেহ ভগ্নোৎসাহ ও নিরুদ্যম হন, সেইজন্য অন্যান্য প্রদেশে কি ঘটিতেছে, তাহারও খবর রাখা দরকার। এইজন্য আমরা যে-তিনটি প্রদেশের ১৯৩২ সালের নারীহরণাদির সংখ্যা তথাকার পুলিস রিপোর্ট হইতে পাইয়াছি, তাহা নীচে দিতেছি—

প্রদেশ	লোকসংখ্যা	১৯৩২ সালে নারীহরণাদি অপরাধ
পঞ্জাব	২৩৫৮০৮৫২	৫০৪
আগ্রা-অযোধ্যা	৪৮৪০৮৭৬৩	৭১১
বাংলা	৫০১১৪০০২	৬৯৩

পঞ্জাবের লোকসংখ্যা বঙ্গের অর্দ্ধেকেরও কম। তাহা বিবেচনা করিলে আলোচ্য পাপাচারের প্রাদুর্ভাব বাংলা দেশ অপেক্ষা পঞ্জাবে অনেক বেশী। আগ্রা-অযোধ্যার লোক-সংখ্যা বাংলা দেশের চেয়ে কম, কিন্তু তথায় ঐ পাপাচারের প্রাদুর্ভাব বঙ্গের চেয়ে বেশী। কলিকাতার সংখ্যাগুলা বঙ্গীয় পুলিস রিপোর্টে নাই। কিন্তু তাহা ধরিলেও এই অপরাধে বাংলার স্থান অধমতম হয় না। এই সব তথ্য বিবেচনা করিলে মনে হয়, বঙ্গে এই পাপাচারের বিরুদ্ধে হিন্দু বাঙালীদের আন্দোলন ও চেষ্টায় অন্ততঃ এই ফলটুকু জন্মিয়াছে. যে, উহা এখানে পঞ্জাব ও আগ্রা-অযোধ্যার চেয়ে কিছু কম হইয়াছে। ইহাতে আমাদের উৎসাহ বাড়া উচিত, এবং এই পাপাচারের বিরুদ্ধে এবং নারী রক্ষার উদ্দেশ্যে আন্দোলন ও চেষ্টা আরও জোরে চালান উচিত।

অত্যাচরিতা নারীরা যে বহুস্থলে আজকাল আর আগেকার মত হিন্দুসমাজ হইতে বহিষ্কৃতা হন না, ইহাও সুলক্ষণ এবং আশার কথা।

সরকারী রিপোর্টে এবং তাহার উপর গবর্মেণ্টের মন্তব্যে বলা হইয়াছে, যে, বর্দ্ধমান, নদিয়া ও হুগলীতেই মোকদ্দমার বৃদ্ধি বেশী হইয়াছে। ইহা হইতে এরূপ সিদ্ধান্ত যেন কেহ না করেন, যে, ঐ তিন জেলার লোকেরা বিশেষ খারাপ এবং তথাকার পুলিস সর্ব্বাপেক্ষা অকর্ম্মণ্য। কারণ, ইহা হইতে পারে, যে, তথাকার লোকেরা ও পুলিস কর্ম্মচারীরা বিশেষ উৎসাহী হইয়া দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে বেশী মোকদ্দমা চালাইয়াছে। ১৯৩২ সালে কোন্ জেলায় কত মোকদ্দমা হইয়াছিল, তাহার তালিকা নীচে দিতেছি—

জেলা	মোকদ্দমার সংখ্যা	জেলা	মোকদ্দমার সংখ্যা
২৪পরগণা	৬২	জলপাইগুড়ি	৬
নদিয়া	৬৮	রংপুর	৪১
মুর্শিদাবাদ	৪৪	বগুড়া	১৯
যশোহর	২৩	পাবনা	২৪
খুলনা	১২	মালদহ	৫
বর্দ্ধমান	৩২	দার্জিলিং	৮
বীরভূম	২০	ঢাকা	৪৮
বাঁকুড়া	২	মৈমনসিং	৬৬
মেদিনীপুর	২৮	ত্রিপুরা	৪১
হুগলী	২৮	বাখরগঞ্জ	৩১
হাবড়া	৩	ফরিদপুর	০
রাজশাহী	২৪	নোয়াখালী	১১
দিনাজপুর	২৮	চট্টগ্রাম	৯

—

বঙ্গের উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় কন্‌ফারেন্স

কলিকাতায় লাটসাহেবের বাড়িতে সে-দিন বঙ্গের উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়গুলিতে প্রদত্ত ইংরেজী শিক্ষা সম্বন্ধে কন্‌ফারেন্স হইয়া গিয়াছে। কন্‌ফারেন্সটি সরকারের কল্যাণে (অর্থাৎ কি-না আওার অফিশ্যাল অস্পিসেজ) আরব্ধ, পরিচালিত ও সমাপ্ত হয়। অতএব, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে, যে, ইহা কোন সরকারী উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য হইয়া থাকিবে। বাংলা সরকার শিক্ষা-বিভাগ অপেক্ষা পুলিস-বিভাগে খরচ বেশী করেন, শিক্ষা অপেক্ষা ল এণ্ড অর্ডার অর্থাৎ আইনবাধ্যতা ও শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষায় বরাবর বেশী মনোযোগী—শিক্ষানীতি অপেক্ষা রাজনীতিতে সরকারের মনোযোগ বেশী। সুতরাং এই কন্‌ফারেন্স নামে শিক্ষাবিষয়ক হইলেও ইহা সরকারী রাজ-নৈতিক উদ্দেশ্য-প্রসূত মনে করিলে হয়ত মারাত্মক ভুল হইবে না।

কন্‌ফারেন্সের উপসংহার কালে শিক্ষামন্ত্রী গবর্ণর বাহাদুরের যে চিঠি পড়েন, তাহাতে উক্ত অনুমানের একটা ভিত্তি পাওয়া যায়। তাহাতে লাটসাহেব বলিয়াছেন, যে, ছাত্রদের মধ্যে বিপর্য্যাসক মতের প্রচার নিবারণ কন্‌ফারেন্সের আলোচ্য বিষয় সকল নির্দ্ধারণের সময় এই জন্য আলোচ্য-তালিকায় রাখা হয় নাই, যে, উহা প্রধান আলোচ্য বিষয়ের

রক্ষিত খাদ্য খাইবে না, কিন্তু বিবাদটি গবর্মেণ্ট অবহেলা করিবেন না। আমরাও ছাত্রদের মধ্যে বিপ্লবী মতের প্রচার পছন্দ করি না। লাটসাহেবের উক্তির উল্লেখ কেবল এই জন্য করিলাম, যে, কন্‌ফারেন্সটি ডাকিবার কারণ যে অন্ততঃ কতকটা রাজনৈতিক, তাহা তাঁহার চিঠি হইতে পরোক্ষ ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।

কন্‌ফারেন্স কাহাদিগকে লইয়া হইয়াছে, তাহাও অনুধাবনযোগ্য। যে-যে সরকারী বিভাগ ও কলেজের প্রতিনিধি ইহাতে ছিলেন, তাঁহারা তৎসমুদয়ের প্রধান ব্যক্তি। কেবল প্রধান গবর্মেণ্ট কলেজ প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রিন্সিপ্যালকে লওয়া হয় নাই। অথচ তিনি খুবই বিদ্বান্ ও যোগ্য লোক। এক জন ইস্লামীয় কলেজের প্রিন্সিপ্যালকে লওয়া হইয়াছিল, কিন্তু সংস্কৃত কলেজের সুপণ্ডিত প্রিন্সিপ্যালকে লওয়া হয় নাই। সরকারীসাহায্যপ্রাপ্ত দুটি মিশনরী কলেজের প্রিন্সিপ্যালকে লওয়া হইয়াছিল, কিন্তু সাহায্যপ্রাপ্ত অমিশনরী কোন কলেজের প্রতিনিধি লওয়া হয় নাই। সম্পূর্ণ বেসরকারী কোন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল কন্‌ফারেন্সে ছিলেন না, কেবল বিদ্যাসাগর কলেজ হইতে, উহার প্রিন্সিপ্যালকে নয়, অধ্যাপক জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে ডাকা হইয়াছিল। বেসরকারী উচ্চ বিদ্যালয়গুলিরই এরূপ কন্‌ফারেন্সকে ভয় করিবার বিশেষ কারণ থাকিতে পারে, কিন্তু উহাদের একটিরও প্রধান শিক্ষক বা অন্য শিক্ষককে ডাকা হয় নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে, যে, অধিকাংশ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি এই কন্‌ফারেন্সে ছিলেন না।

শিক্ষামন্ত্রী যাহা চান, তাহা তাঁহার বক্তৃতা হইতে বুঝা যায়। এখন বঙ্গে ঠিক্ কত উচ্চ বিদ্যালয় আছে জানি না। কন্‌ফারেন্সে বলা হইয়াছে বার শত। শিক্ষামন্ত্রী এই বার শতকে চারি শতে পরিণত করিতে চান, এবং বলেন, তাহা হইলে সেইগুলিকে গবর্মেণ্ট যথেষ্ট সাহায্য দিতে পারিবেন, এবং [illegible] শিক্ষকদের আর্থিক অবস্থা ভাল হইবে, এবং শিক্ষার উৎকর্ষও বাড়িবে। দুর্ভিক্ষের সময় যদি সব ক্ষুধিত লোককে প্রাণ-ধারণোপযোগী মোটা চাল না দিয়া অপেক্ষাকৃত অল্প লোককে খুব ভাল চাল ও পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়া যায়, তাহা হইলে যেমন [illegible] তাহাদের ভাল হয়, সেইরূপ [illegible] ও শিক্ষার [illegible] আছে [illegible]

মোটামুটি শিক্ষার ব্যবস্থা না-করিয়া যদি অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক ছাত্রছাত্রীকে শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাহাদের জন্য খুব বিদ্বান্ শিক্ষক, উৎকৃষ্ট লাইব্রেরী, প্রশস্ত ক্রীড়াক্ষেত্র, বিদ্যালয়ের অট্টালিকা ইত্যাদির ব্যবস্থা হইতে পারে বটে, কিন্তু বাকী বালকবালিকা যে অশিক্ষিত থাকিবে, তাহারা কি মানুষ নয়? তা ছাড়া, শিক্ষামন্ত্রী বিদ্যালয়ের সংখ্যা খুব কমাইয়া যেগুলি থাকিবে, তাহার সবগুলিকেই যে সরকারী সাহায্য দিতে চান, তাহার মধ্যে কি এই উদ্দেশ্য নাই, যে, এমন কোন ইস্কুলকে থাকিতে দেওয়া হইবে না, যাহার উপর সরকারী শিক্ষা-বিভাগের অক্ষুণ্ণ প্রভুত্ব না থাকিবে?

কর্তৃপক্ষ মোট ৪০০ উচ্চ বিদ্যালয় রাখিতে চান। বঙ্গীয় শিক্ষা-বিভাগের শেষ যে রিপোর্ট আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহা ১৯৩০-৩১ সালের। ঐ সালে বালকবালিকাদের জন্য মোট ১০৮৯ উচ্চ বিদ্যালয় ও তাহাতে মোট ২৬১৭৬১ জন ছাত্রছাত্রী ছিল। এখন সংখ্যা আরও বাড়িয়া থাকিবার কথা। যদি সংখ্যা ২৬১৭৬১ই আছে ধরা যায়, তাহা হইলে তাহাদিগকে চারি শত ইস্কুলে শিক্ষা দিতে হইলে তাহাদের প্রত্যেকটিতে ৬৫৪ জন ছাত্র বা ছাত্রীকে শিক্ষা দিতে হইবে। যদি এক একটি বিদ্যালয়ে ৮টি শ্রেণী থাকে ধরা যায়, তাহা হইলে প্রত্যেক শ্রেণীতে ৮০ জনের উপর ছাত্র থাকিবে। তাহা কি সুশিক্ষার অনুকূল? কিন্তু ব্যাপারটি এদিক দিয়া বিচার করা অনাবশ্যক। ইস্কুলের সংখ্যা ৪০০ করিলে সেগুলি এমন এমন কেন্দ্রে স্থাপিত হইবে, যে, বাড়ি হইতে দূরত্ব বশতঃ বিস্তর ছাত্র তথায় পড়িতে যাইতে পারিবে না। ইস্কুলের ছাত্রনিবাসেও তাহারা থাকিতে পারিবে না, কারণ অধিকাংশ বাঙালী ছাত্র গরিব, বাড়িতে থাকিয়া পড়ে বলিয়া পড়িতে পারে, হষ্টেলের খরচ দিবার সামর্থ্য তাহাদের নাই।

৪০০ শত ইস্কুলের প্রত্যেকটিতে গড়ে ৩০০ করিয়া ছাত্র থাকিলে মোট ১২০০০০ ছাত্র শিক্ষা পাইবে। ২৬১৭৬১ জন ১৯৩০-৩১ সালের ছাত্রের মধ্যে ১৪১৭৬১ জন বর্তমান অপেক্ষা উচ্চ উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হইবে। যেমন কোন শহর [illegible] একাধিক ইস্কুলকে মিলাইয়া একটি স্কুলে পরিণত করা

যাইতে পারে, কিন্তু বহুসংখ্যক বালক-বালিকাকে শিক্ষায় বঞ্চিত না-করিয়া বার শত স্কুলকে চারি শতে পরিণত করা যায় না। বার শত স্কুলের মধ্যে অনেকগুলির শিক্ষার আয়োজন যথাযোগ্য নহে, স্বীকার্য্য। দেশের লোক ও গবর্ন্মেণ্ট সেগুলিকে অর্থসাহায্য দিয়া উৎকৃষ্ট বিদ্যালয়ে পরিণত করুন। যেরূপ উন্নতি অর্থব্যয়সাপেক্ষ নহে, তাহার জন্যও নিয়মকানুন করুন। বিদ্যালয়ের সংখ্যা একদম ছাঁটিয়া দিয়া বিপ্লব ডাকিয়া আনা সমীচীন হইবে না।

ট্রেন্‌ড অর্থাৎ শিক্ষাদান বিদ্যায় শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা বাড়াইবার বন্দোবস্ত করিবার অনুকূল প্রস্তাবটি আমরা অনুমোদন করি।

কন্‌ফারেন্স এই সর্ত্তে একটি সেকেণ্ডারী এডুকেশ্যন বোর্ড গঠনের অনুকূল প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন, যে, তাহা গঠিত হইলে যেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক ক্ষতি না হয়। বোর্ডটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের সব নিয়ম-কানুন রচনা করিবেন ও উহার তত্ত্বাবধায়ক ও শাসক হইবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা ও তাহার জন্য শিক্ষণীয় বিষয়াদির নির্দ্ধারণ আমাদের বিবেচনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতেই থাকা উচিত। ইহা নিশ্চিত, যে, বোর্ডটির প্রভু হইবেন গবর্ন্মেণ্ট, এবং তাহার দ্বারা রচিত নিয়মাবলী প্রভৃতির প্রভাবে বিদ্যালয়ের সংখ্যা কমিবে, ছাত্র কমিবে, প্রবেশিকার পরীক্ষার্থী কমিবে, প্রবেশিকা পরীক্ষায় কম ছাত্র পাস হইবে, সুতরাং যথেষ্ট ছাত্রের অভাবে অনেক কলেজ দুর্দ্দশাগ্রস্ত, হয়ত বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। এখন পরীক্ষার ফী ও পাঠ্যপুস্তক বিক্রয় হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে নিট্ আয় হয়, বোর্ড যদি বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রতি বৎসর তাহা দেন, তাহা হইলে সেই অর্থপ্রাপ্তি দ্বারা কি উপরে উল্লিখিত অনিষ্টগুলির প্রতিকার হইবে? টাকাটাই সব নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ভিত্তি স্থাপিত হয় প্রবেশিকা পর্য্যন্ত শিক্ষার উপর। তাহা নিয়মিত ও পরিচালিত করিবার কার্য্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনই হাত না-থাকা কোনক্রমেই বাঞ্ছনীয় নহে।

—

পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচক কমিটির কীর্ত্তি ?

লাটসাহেবের বাড়ির শিক্ষা কন্‌ফারেন্সে শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচক কমিটির একটা অকাজ সম্বন্ধে কিছু আভাস দিয়াছিলেন। কিন্তু এই গুরুতর ব্যাপারটা কন্‌ফারেন্সের অন্য এক ব্যক্তির প্রতিবাদের পর চাপা পড়িয়া যায়। একেবারে চাপা কিন্তু পড়িল না। অমৃতবাজার পত্রিকার এক জন ওয়াকিব-হাল সংবাদদাতা রহস্য উদ্ভেদ করিয়াছেন। তাঁহার পত্রের প্রায় সমস্তটা ৩০শে নবেম্বরের অমৃতবাজারের একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে উদ্ধৃত হইয়াছে। তিনি বলেন, গত বৎসরের ৯ই ডিসেম্বর কলিকাতা গেজেটে কমিটির অনুমোদিত বহিগুলির তালিকা প্রকাশিত হয়। পঞ্চম-ষষ্ঠ ও সপ্তম-অষ্টম শ্রেণীর ঐতিহাসিক পাঠ্যপুস্তকগুলি সংশোধনাধীন ভাবে নির্ব্বাচিত হইয়াছে। বেচারা গ্রন্থকারদিগকে সংশোধন কি ভাবে করিতে হইবে, তাহার কিছু নমুনা সংবাদদাতা দিয়াছেন। শিক্ষামন্ত্রী আছেন মিঃ নাজিমুদ্দিন সাহেব। খাঁ-বাহাদুর মৌলাবখ্‌শ পাঠ্যপুস্তকনির্ব্বাচক কমিটির সেক্রেটরী, এবং মিঃ আবুল কাসেম ও খাঁ-বাহাদুর আজিজউল হক অন্যতম সভ্য। বঙ্গে, ভারতে বা পৃথিবীতে ইঁহারা ঐতিহাসিক বলিয়া বিখ্যাত নহেন। হুকুম হইয়াছে, যে, আলাউদ্দীন খলজি যে তাঁহার পিতৃব্য জালালুদ্দীন খলজিকে হত্যা করিয়া সিংহাসন দখল করেন, তাহা ঐতিহাসিক পাঠ্যপুস্তকে থাকিতে পাইবে না; সুলতান মুহম্মদ তুঘলকের পাগলামিপ্রসূত কোন অপকীর্ত্তির উল্লেখ থাকিবে না; শিখদের ইতিবৃত্ত বর্ণনায় জাহাঙ্গীর কর্ত্তৃক গুরু অর্জ্জুনের প্রাণবধের, আওরঙ্গজেব কর্ত্তৃক গুরু তেগ বাহাদুরের প্রাণবধের, এবং বাহাদুর শাহ কর্ত্তৃক বান্দা ও তাঁহার অনুচরদের হত্যার উল্লেখ থাকিতে পাইবে না; আওরঙ্গজেব কর্ত্তৃক হিন্দুদের উপর জিজিয়া কর স্থাপন, অনেক হিন্দু মন্দির ধ্বংস, দেবমূর্ত্তির অপমান, ইত্যাদির উল্লেখ থাকিবে না; এবং আফজল খাঁ ও শিবাজীর সাক্ষাৎকারের সময় আফজল খাঁই যে প্রথমে শিবাজীকে আক্রমণ করেন, তাহা লেখা চলিবে না, অথবা তাহা লিখিলে ইহাও লিখিতে হইবে, যে, আর মত শিবাজীই প্রথমে আক্রমণ করেন! এই সব মতামত কোন্ আধুনিক অভিজ্ঞানিক ঐতিহাসিকের ?

পাঠ্যপুস্তকনির্ব্বাচক কমিটির মুসলমান কর্তৃপক্ষ অবরলক্ষী দ্বারা ইতিহাসের অপলাপ করাইতে চান। তদ্দ্বারা সত্য লোপ পাইবে না, কেবল নিম্নশিক্ষার বিকৃতি হইবে। তাহা অবাঞ্ছনীয়।

কতকগুলি মুসলমান বাঙালী, দেখিতেছি, রাজত্ব পাইবার আগেই বাঙালী ঐতিহাসিক পাঠ্যপুস্তক লেখকদের উপর কার্য্যতঃ নূতন সিডিশ্যান আইন জারি করিতেছেন। বর্ত্তমান সিডিশ্যন আইনে ইংরেজ রাজত্বের প্রতি অশ্রদ্ধা ও বিদ্বেষ উৎপাদন দণ্ডনীয়, নূতন আইনে মুসলমান রাজত্বের প্রতি অবজ্ঞা ও বিদ্বেষ উৎপাদন দণ্ডনীয়—সম্পূর্ণ সত্য কথা লিখিলেও দণ্ডনীয়!

—

রামমোহন রায় শতবার্ষিকী

কাহারও শতবার্ষিকী দুই বার আসে না—রামমোহন রায়ের শতবার্ষিকী আর আসিবে না এবং তাঁহার দ্বিশতবার্ষিকীর জন্য আমরা কেহই বাঁচিয়া থাকিব না। অতএব শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন এই বৎসরের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে করিতে হইবে। আমরা তাহা করি, বা না-করি, তাহাতে তাঁহার কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি নাই—তিনি নিজের মহত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত আছেন ও থাকিবেন। আমরা আমাদের কর্ত্তব্য করিলে মনুষ্যোচিত কাজ করা হইবে; অধিকন্তু মানবজীবনের সকল বিভাগের সর্ব্বাঙ্গীভূত উন্নতির তিনি যে চেষ্টা করিয়াছিলেন ও যে আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহা উপলব্ধি করিতে পারিলে আমাদের জীবনও কতকটা সেই আদর্শের অনুযায়ী হইবে।

২৯শে, ৩০শে, ও ৩১শে ডিসেম্বর কলিকাতায় শতবার্ষিকীর শেষ উৎসব হইবে। ইহার সর্ব্বধর্ম্মসম্মেলনে রবীন্দ্রনাথ অভিভাষণ পাঠ করিবেন এবং ভারতবর্ষের নানা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বহু মনীষী প্রবন্ধ পাঠ করিবেন। মহিলা-সম্মেলনেও অনেক মনস্বিনী মহিলা প্রবন্ধ পড়িবেন। সাধারণ সম্মেলনে রাইট্ অনারেব্‌ল্ শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, স্যর সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্, শ্রীযুক্ত কে. নটরাজন্, শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ দেবধর, ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ প্রভৃতির প্রবন্ধ পঠিত হইবে। চতুর্থ অধিবেশনে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, অধ্যাপক বিজনচন্দ্র মজুমদার, অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার, শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী, অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক রুচিরাম সাহনী প্রভৃতির প্রবন্ধ পঠিত হইবে। তদ্ভিন্ন রামমোহন রায়ের হস্তলিপি প্রভৃতি প্রদর্শিত হইবে।

—

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন

'প্রবাসী' মাসিকপত্র এলাহাবাদ হইতে বঙ্গের বাহিরের বাঙালীদের মুখপত্র রূপে প্রথমে বাহির করা হয় বলিয়া ইহার নাম রাখা হয় প্রবাসী। ইহা বঙ্গে আসিলেও ইহা প্রবাসী বাঙালীদের হিতচিন্তা হইতে বিরত হয় নাই, এবং আমরা এখনও "নিজ বাসভূমে পরবাসী" আছি। বাঙালীদের উপর নানা প্রকারে আক্রমণ হইতেছে। সেই কারণে, বঙ্গনিবাসী এবং বঙ্গের বাহিরে অধিবাসী বাঙালীদের সংহতি রক্ষা ও বৃদ্ধি করা একান্ত আবশ্যক। প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের দ্বারা তাহা কিয়ৎ পরিমাণে সাধিত হয়। এই জন্য, বড়দিনে যে-সকল বাঙালী অন্যত্র অন্য কাজে যাইবেন না, তাঁহাদিগকে গোরখপুরে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশনে উপস্থিত হইতে অনুরোধ করিতেছি।

—

অঙ্গহীন ও জড়বুদ্ধিদের শিক্ষা

১৯৩১-৩২ সালের বঙ্গীয় শাসন-বিবরণের ১১০ পৃষ্ঠায় কালা-বোবা ও অন্ধদের শিক্ষার কিছু কিছু উল্লেখ আছে। জড়বুদ্ধি ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য কার্সিয়ঙে একটি বিদ্যালয় আছে। তাহাতে দেশী শিশু লওয়া হয় না, কেবল ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গী লওয়া হয়। ঝাড়-গ্রামে দেশী শিশুদের ও বালক-বালিকাদের জন্য বোধনা-নিকেতন ছয় মাস চলিতেছে। ইহা সর্ব্বসাধারণের নিকট হইতে এখনও যথেষ্ট সাহায্য ও সহানুভূতি পায় নাই, কিন্তু পাইবার যোগ্য।

—

টাটার লোহা ইস্পাতের কারখানা

জামশেদপুরে টাটা কোম্পানীর লোহা ইস্পাতের কারখানা ভারতবর্ষে বৃহত্তম। ভারতীয় এইরূপ কারখানার সংরক্ষণার্থ বিদেশী লোহাইস্পাতের জিনিষের উপর শুল্ক বসান হইয়াছে, এবং তাহাতে দেশের লোকে যত সস্তায় ঐ সব জিনিষ পাইতে পারিত, দাম তার চেয়ে বেশী দিতে হয়। টাটা কোম্পানী ঐ শুল্ক আরও কয়েক বৎসর বলবৎ রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন। সেই জন্য টারিফ বোর্ড সাক্ষ্য লইতেছেন। উড়িষ্যার পণ্ডিত নীলকণ্ঠ দাস লোহা-ইস্পাতের জিনিষের ক্রেতাদের পক্ষ হইতে একটি মন্তব্য-পত্রে পেশ করিয়াছেন এবং মৌখিক সাক্ষ্যও দিবেন। মন্তব্যপত্রে অন্যান্য কথার মধ্যে তিনি বলিতেছেন, যে, টাটাদের "পিগ" লোহা রপ্তানী হয় ১৯ টাকা টন দরে, কিন্তু ভারতীয় বাজারে বিক্রী হয় ৭৫ (অধুনা ৫৫) টাকা টন দরে; তাহাতে বিদেশী লোহা-ইস্পাত দ্রব্য নির্ম্মাতারা সুবিধা পায়। এরূপ বন্দোবস্ত কি ন্যায্য? বাস্তবিক দেখা উচিত, টাটারা সংরক্ষণ-বিধির সাহায্যে ক্রমাগত ভারতের বাজারে জিনিষ সস্তা করিতে পারিতেছেন কিনা, এবং ক্রমশঃ সংরক্ষণনিরপেক্ষ হইতে পারিতেছেন কি না।

—

কলিকাতা কর্পোরেশ্যনে মুসলমানদের চাকুরি পাইবার আব্দার

কলিকাতা কর্পোরেশ্যনের সমস্ত মুসলমান কাউন্সিলার ও অল্‌ডারম্যানী একযোগে যাহাতে তাঁহাদের সমধর্ম্মাবলম্বীরা শতকরা ৩৩⅓ ভাগ চাকরি পান তাহার দাবি করিয়াছেন। এই দাবি তাঁহারা সরকারী চাকুরি সম্বন্ধেও পূর্ব্বে করিয়াছিলেন এবং সরকারও রাজনৈতিক কারণে তাঁহাদের মনস্তুষ্টির জন্য অনেকটা স্বীকার করিয়াছেন। সরকারি চাকুরির বেলায় তাঁহারা বাংলা দেশে শতকরা ৫৫ জন অতএব চাকুরিও শতকরা ৫৫ ভাগ পাইবেন বলিয়া দাবি করেন। কিন্তু কর্পোরেশ্যনের চাকুরির বেলায় তাঁহারা সংখ্যানুপাতিক দাবি করেন না, অনেক বেশী চান।

১৯৩১ সালের কলিকাতার সেন্সস রিপোর্টে মুসলমানদের শতকরা অনুপাত ২৬.০০ বলিয়া দেখান হইয়াছে (রিপোর্ট, ১০৫ পৃঃ)। কর্পোরেশ্যনের অন্যতম কাউন্সিলার শ্রীযুক্ত দেবজীবন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই অনুপাত স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু সেন্সস রিপোর্টের ১ম পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, যে, লোকগণনার হিসাবে জাহাজের লোকও ধরা হইয়াছে।

"The population enumerated also includes persons who on the night of the census were within Indian territorial waters and arrived at Calcutta on some subsequent date or had left Calcutta just before the Census was taken."

ইহাতে জাহাজের কুলী, মাঝি, সারেঙ্গ প্রভৃতি, যাহাদের মধ্যে বেশীর ভাগই মুসলমান, তাহাদের ধরা হইয়াছে। তাহারা কলিকাতার অধিবাসী নয়। ইহাতে মুসলমানের অনুপাত বৃদ্ধি পাইয়াছে।

আর সেন্সসের সুবিধার জন্য কেল্লা ও ময়দানের, বন্দরের, খালের, হাবড়ার, টালিগঞ্জ ও সাউথ সুবর্বন মিউনিসিপ্যালিটির লোকগুলিকেও কলিকাতার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। ইংরেজী ১৯৩১ সালে কর্পোরেশ্যনের এলাকাধীন স্থানের মুসলমানের আনুপাতিক সংখ্যা শতকরা ২৫·২। আর এই এলাকা হইতে যদি গার্ডেনরীচ মিউনিসিপ্যালিটী বাদ দিই—এবং যাহা বাদ দিবার জন্য মুসলমানদের চেষ্টায় আলাহিদা আইন হইয়াছে, তাহা হইলে মুসলমানদের আনুপাতিক সংখ্যা শতকরা ২৩·৭ দাঁড়ায়। এই চাকুরির ভাগ-বাঁটোয়ারা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে। সুতরাং অদূর ভবিষ্যতে যখন গার্ডেনরীচ নিশ্চয়ই বাদ যাইবে, তখন ভাগ-বাঁটোয়ারার হিসাব গার্ডেনরীচের লোকসংখ্যা বাদ দিয়া করাই ভাল।

কিছুদিন পূর্ব্বে কাউন্সিলার শ্রীযুক্ত সনৎকুমার রায়-চৌধুরীর প্রশ্নোত্তরে জানা যায়, যে, মুসলমানেরা দেয় ট্যাক্সের মধ্যে শতকরা ৬ ভাগ দেয়। দেবজীবন বাবু বলিয়াছেন মুসলমানেরা শতকরা ৫.৬ ভাগ ট্যাক্স দেয়। আর এই শতকরা ৬ বা ৫.৬ গাডেনরীচের মুসলমানদের দেয় ট্যাক্স লইয়া। সুতরাং গাডেনরীচ বাদ দিলে মুসলমানদের দেয় ট্যাক্সের পরিমাণ কি দাঁড়ায়, তাহা দেখা উচিত। দেবজীবন বাবু দেখাইয়াছেন যে কুলী-মজুর বাদ দিয়া কর্পোরেশনের অধীনে

৫,১৯৭ জন কর্ম করে, আর ইহাদের মধ্যে ৭১৫ জন অর্থাৎ শতকরা ১৩'৭৫ জন মুসলমান।

কলিকাতা কর্পোরেশনের ভোটারের তালিকা দৃষ্টে জানা যায়, যে, মুসলমান ভোটারের সংখ্যা শতকরা ১৩র কম। ইহার কারণ মুসলমানেরা কম ট্যাক্স দেন।

সেন্সস রিপোর্টের কলিকাতায় (অর্থাৎ কেল্লা, ময়দান, খাল, বন্দর—যাহা উত্তরে কাশীপুর ঘাট হইতে দক্ষিণে আওহেড্ পর্যন্ত ধরা হইয়াছে) ইংরেজী জানা ২০ বা তদূর্দ্ধ বয়স্ক ব্যক্তির সংখ্যা হইতেছে ১৬২,১৯৪, আর ইহাদের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা ২২,২১৪। ইহাতে তাঁহাদের শতকরা অনুপাত দাঁড়ায় ১৩৬। আমরা ২০ বা তদূর্দ্ধ বয়স্ক লোকদের সংখ্যা ধরিলাম এই জন্য যে যাঁহারা কলিকাতা কর্পোরেশ্যনে চাকুরি করিতে আসিবেন তাঁহারা সকলেই সাবালক। এবং কলিকাতায় বিভিন্ন ভাষাভাষী বহু লোকের সমাগম থাকায় মিউনিসিপালিটীর কর্মচারীদের ইংরেজী জানা অত্যাবশ্যক।

কিছুদিন যাবৎ কলিকাতা কর্পোরেশ্যন চাকুরির জন্য একটি পরীক্ষার সৃষ্টি করেন। উক্ত পরীক্ষার জন্য ১৩০০ পরীক্ষার্থী উপস্থিত হন; উহার মধ্যে হিন্দু পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১২০০এর অধিক ছিল। বাকী ১০০এর মধ্যে মুসলমান খ্রীষ্টিয়ান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী থাকা সম্ভব; কিন্তু যদ্যপি আমরা বাকী সমস্ত মুসলমান বলিয়া ধরিয়া লই, তাহা হইলে মুসলমানের শতকরা অনুপাত ৭'৫ দাঁড়ায়। আমরা শুনিয়াছি পরীক্ষায় পাস হইয়াছেন এরূপ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৪০ এবং ইহাদের মধ্যে মাত্র এক জন মুসলমান। মুসলমানটির চাকুরি হইয়াছে; কিন্তু পরীক্ষোত্তীর্ণ হিন্দুদের মধ্যে অনেকে এখনও চাকুরি পায় নাই।

মুসলমানদের মধ্যে যোগ্য লোকের কিরূপ অভাব তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিব। মুসলমান নেতারা প্রায়ই বলিয়া থাকেন, যে, তাঁহাদের মধ্যে যোগ্য লোকের অভাব নাই, তবে তাঁহারা হিন্দুদের সহিত পাল্লায় যোগ্যতম বলিয়া বিবেচিত হন না। এইজন্য উঁহারা ন্যূনতম উপযুক্ততার (minimum qualificationsএর) দাবি করেন। কিন্তু যে-যে চাকুরির জন্য প্রতিযোগিতা পরীক্ষা নাই, সেখানে চাকুরির প্রার্থীর সংখ্যা হইতে সেই সেই চাকুরির যোগ্য ব্যক্তির সংখ্যা নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায়। আর যোগ্যতানির্ণয়ের এই উপায়টা (testটা) খুব সহজ, এমন কি ন্যূনতম উপযুক্ততার মাপকাটি অপেক্ষাও সহজ। কারণ ন্যূনতম উপযুক্ততা নির্দ্ধারণ করিবে অপর লোকে; কিন্তু প্রত্যেক পদপ্রার্থী নিজের মতে সেই পদের উপযুক্ত বলিয়া নিজেকে মনে করেন।

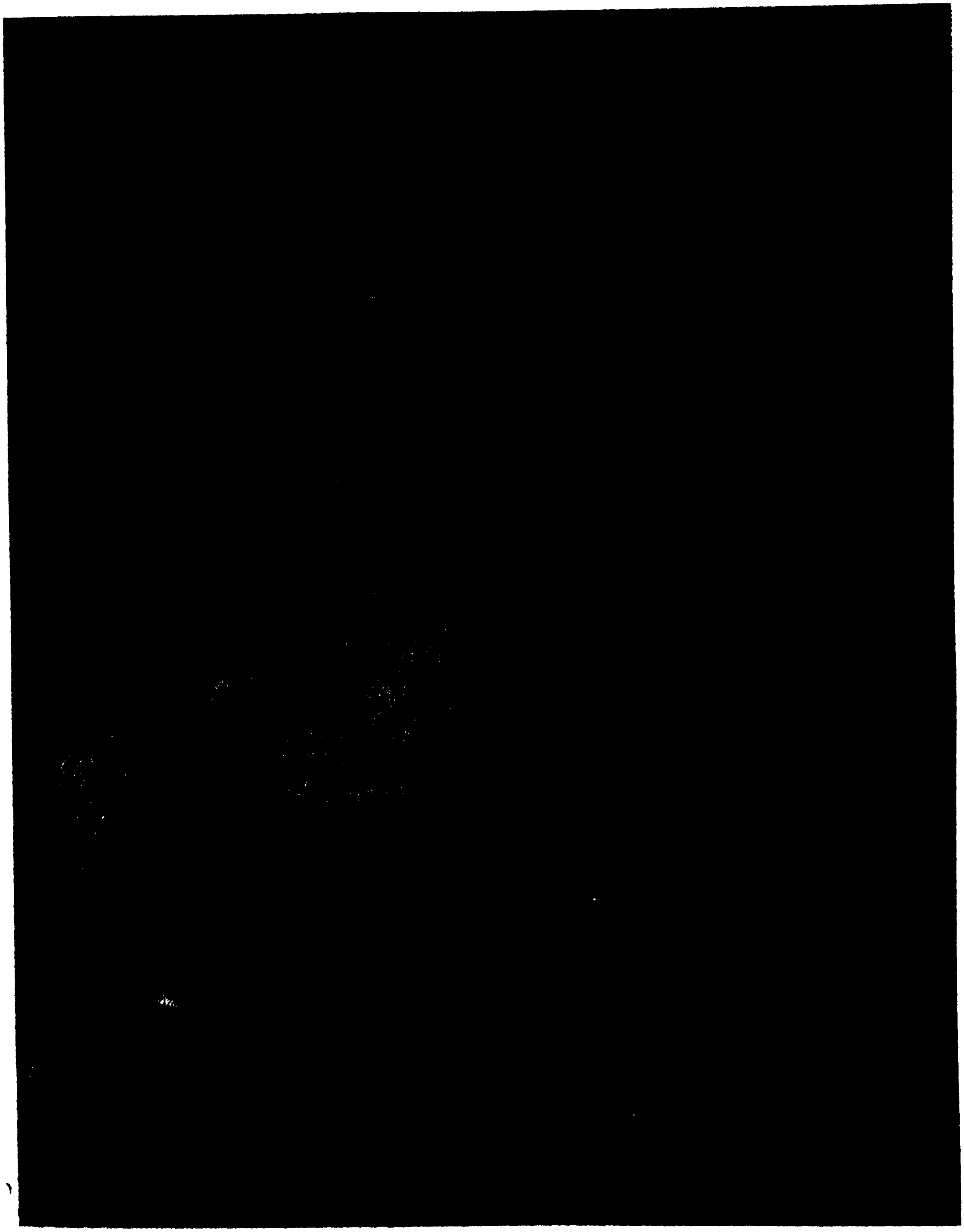
গত কয়েক বৎসরের মধ্যে কর্পোরেশ্যন দুইটি ডেপুটী চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার, চীফ ইঞ্জিনিয়ার, জুনিয়ার সিটি আর্কিটেক্ট, কলেক্টর, হেল্‌থ অফিসার প্রভৃতি পদের জন্য বিজ্ঞাপন দেন। ঐরূপ কয়েকটি পদের জন্য ৪১৪ জন প্রার্থী দরখাস্ত করেন। ইহাদের মধ্যে মাত্র ৩২ জন মুসলমান ছিলেন। ইহাতে মুসলমানদের মধ্যে যোগ্য লোকের অনুপাত দাঁড়ায় শতকরা ৮এর কম।

অথচ, মুসলমানরা দাবি করিতেছেন শতকরা ৩৩½। আমাদের মনে হয়, শীঘ্রই মুসলমানদের জন্য আলাহিদা ন্যায়-শাস্ত্রের সৃষ্টি করিতে হইবে।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

দ্রষ্টব্য :—বর্ত্তমান সংখ্যা 'প্রবাসী'র ৩৮৫ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত দ্বিতীয় চিত্রখানির ব্লক ভ্রমবশতঃ উল্টা বসিয়াছে।

১২০।২ আপার সারকুলার রোড কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীমাণিকচন্দ্র দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত



বল্লাল সেন ও কপোত
শ্রীঅযোধ্যালাল সাহা

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩৩শ ভাগ
২য় খণ্ড

মাঘ, ১৩৪০

৪র্থ সংখ্যা

ভদ্রলোকের কর্ত্তব্য

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ

দিন দিন বেকারের সংখ্যাবৃদ্ধি, অবিবাহিত-অবিবাহিতার সংখ্যাবৃদ্ধি, এবং বিবাহিতের মধ্যে জনন-সঙ্কোচ, এই ত্রিপাকে পড়িয়া বাঙ্গলার পুরাতন ভদ্রবংশগুলির নির্ব্বংশ হওয়ার সম্ভাবনা উপস্থিত হইয়াছে। এখন তাহাদের কি করা কর্ত্তব্য ?

ভদ্রবংশগুলির ভবিষ্যতে নির্ব্বংশের বা বিশেষ সংখ্যাহ্রাসের সম্ভাবনা আছে কিনা তাহার হিসাব-কিতাব করা তাহাদের প্রথম কর্ত্তব্য। নিজের জানাশুনার মধ্যে ২৫ বৎসরের বেশী বয়স্ক বেকার অবিবাহিত যুবকের এবং ২০ বৎসরের বেশী বয়স্ক অবিবাহিতা যুবতীর সংখ্যা কত, অবেকার অবিবাহিত যুবকের এবং প্রৌঢ়ের সংখ্যা কত, এবং শিক্ষিত দম্পতীর বংশবৃদ্ধির হার কিরূপ, তাহা গণনা করিলে ভবিষ্যতে কি ঘটিতে পারে তাহা অনুমান করা সম্ভব হইতে পারে। এইরূপ গুনতি করিয়া যিনি দেখিতে পাইবেন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দুশ্চিন্তার কোন কারণ নাই, তিনি নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারেন। কিন্তু যিনি বুঝিতে পারিবেন, দুশ্চিন্তার যথেষ্ট কারণ আছে, তাঁহার পক্ষে এক মুহূর্ত্তও উদাসীন থাকা কর্ত্তব্য নয়।

ভদ্রলোকেরা যখন গ্রামে ছিলেন তখন কতক ছিলেন ক্ষাত্রধর্ম্মী ভূম্যধিকারী। তাঁহারা গ্রামের প্রাচীনতন্ত্রের পঞ্চায়তের সহায়তায় গ্রাম শাসন করিতেন। আর বাকী ভদ্রলোকেরা কৃষি-গোরক্ষা-বাণিজ্যে রত থাকিয়া বৈশ্যধর্ম্ম পালন করিতেন। শহরে আসিয়া চাকুরী, ওকালতী, ডাক্তারী পেশা অবলম্বন করিয়া তাঁহারা অনেক দিন পর্য্যন্ত ব্রাত্য-ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম পালন করিতেছেন। সাবিত্রী (গায়ত্রী)-বর্জ্জিত ক্ষত্রিয়কে ব্রাত্যক্ষত্রিয় বলে। শহরে ভদ্রলোকেরা যে প্রভুত্ব করিতেছেন তাহা নিজের নামে নহে, বড় সাহেবের নামে। সুতরাং প্রকৃত প্রভুত্ববর্জ্জিত প্রভুদিগকে আধুনিক ব্রাত্য-ক্ষত্রিয় বলা যায়। এ-দেশের হিন্দু ভদ্রলোকদিগের পক্ষে ব্রাত্য-ক্ষত্রিয় ধর্ম্মগ্রহণ করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করা আর সম্ভবপর নহে। এখন যদি বাঁচিবার বাসনা থাকে, তবে ভদ্রলোকের ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম একেবারে ত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধ বৈশ্য-ধর্ম্ম পালন করা কর্ত্তব্য। শাসন-বিধির সংস্কার দেশে নূতন অবস্থার (environment-এর) সৃষ্টি করিবে। এই নূতন অবস্থার মধ্যে টিকিয়া থাকিতে হইলে ইহার সহিত আপনাদিগকে খাপ (adapt) খাওইয়া লইতে হইবে। এই খাপ-খাওয়ান ব্যাপার (adaptation to new environment) সময়সাপেক্ষ কঠিন ব্যাপার। এই দ্রুত পরিবর্ত্তনের যুগে এই ব্যাপার সুসম্পন্ন করিতে হইলে অনন্যকর্ম্মা হইয়া তাহার চেষ্টা করিতে হইবে; রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে সূচিত ক্ষত্রিয় মনোবৃত্তি ত্যাগ করিয়া একাগ্রভাবে বৈশ্যধর্ম্মের পালন করিতে হইবে। বর্ত্তমান যুগে বৈশ্যধর্ম্ম ক্ষত্রিয়ধর্ম্মকে পরাজিত করিয়াছে। অনেক বিদেশী বাঙ্গলায় আসিয়া প্রথমতঃ বৈশ্যধর্ম্মে সিদ্ধি

লাভ করিয়া পরে রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে। বাঙ্গালী ভদ্রলোক কিছুদিনের জন্য রাজনৈতিক আন্দোলন ছাড়িয়া যদি একাগ্রচিত্তে কৃষি-গোরক্ষা-বাণিজ্য-শিল্প আরম্ভ করে, তবে কালে উভয় কূলই রক্ষা করিতে পারিবে।

ভদ্রলোকের আর একটি কর্ত্তব্য ইতর জাতিকে বা হরিজনকে অপমান না করা। চাতুর্বর্ণ্য হিন্দুর নিকট হরিজন যেমন অস্পৃশ্য, মুসলমানও তেমন অস্পৃশ্য, খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীও তেমন অস্পৃশ্য। কোন হিন্দু সমাজসংস্কারক যদি মুসলমান এবং খৃষ্টানগণকে বলে, "আমরা হিন্দুরা তোমাদিগকে অস্পৃশ্য জ্ঞান করিয়া এতদিন তোমাদের প্রতি বড়ই অবিচার করিয়াছি; এস এখন তোমাদিগকে জাতে তুলিয়া লইয়া তোমাদের প্রতি সুবিচার করি"—এই প্রস্তাব শুনিয়া আত্মমর্য্যাদাজ্ঞানসম্পন্ন মুসলমানেরা বা খৃষ্টানেরা নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হইবে না, বরং অপমানিত বোধ করিবে, এবং হয়ত বলিবে, "আমরা তোমাদের বিচারের অধিকার স্বীকার করি না, সুতরাং তোমাদের অবিচার গ্রাহ্য করি না। এতদিন মনে করিতাম, উপায়ান্তর নাই বলিয়া, পরলোকে বিপদের ভয়ে, হিন্দুরা আমাদের সঙ্গে এইরূপ ব্যবহার করিয়াছে। কিন্তু যখন তোমরাই বলিতেছ তোমাদের এই বিচার অবিচার হইয়াছে, তখন অবশ্য এই অপরাধের বিচার হওয়া আবশ্যক। কিন্তু এই বিচার আমরা নিজেরাই করিব. এই অপরাধের শাস্তি আমরা স্বহস্তে দিব, তোমাদের বিচার চাহি না।" তথাকথিত হরিজন জাতিরা শীঘ্রই ভোটের অধিকারী হইবে, কাউন্সিলে নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যক আসন পাইবে, মন্ত্রী-পরিষদেও নির্দ্দিষ্ট আসন পাইবে। এখন তাহারা ভদ্রলোকের অনুগ্রহপ্রার্থী হইবে কেন, এবং তাহাদের দ্বারা স্পৃষ্ট হইবার জন্য ব্যাকুল হইবে কেন, তাহা বুঝিতে পারি না। অবশ্যই টাকার তোড়া লইয়া উপস্থিত হইলে যাহারা ভিখারী তাহারা ভিক্ষা লইতে আসিবে, যাহারা দরিদ্র তাহারা অর্থসাহায্য গ্রহণ করিবে; কিন্তু যাহাদের কিছুমাত্র আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান আছে, তাহারা অস্পৃশ্যতা-মোচনের প্রস্তাবে নিশ্চয় অপমানিত বোধ করিবে। ভদ্রলোকেরা যেমন ইতর জাতিকে অনাচরণীয় মনে করে, ইতর জাতির অধিকাংশ হিন্দুই ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর ভদ্রলোককেও অনাচরণীয় মনে করে, এবং তাহারা অনেকেই ব্রাহ্মণত্বের দাবি করে।

হিন্দু সমাজের ভিতরের খবর পাইতে হইলে সেন্‌সাসের বিবরণ পাঠ করা উচিত। ১৯৩১ সালের সেন্‌সাসের বিবরণে সেন্‌সাস কমিশনার (Census Commissioner) ডাক্তার হাটন (Dr. J. H. Hutton) লিখিয়াছেন—

"যেদিন স্যর হার্বার্ট রিস্‌লির মনে সামাজিক মর্য্যাদা অনুসারে বিভিন্ন হিন্দুজাতির তালিকা প্রস্তুত করিবার চেষ্টার সঙ্কল্প উদিত হইয়াছিল, পরবর্ত্তী সেন্‌সাসের ভারপ্রাপ্ত সকল কর্ম্মকর্ত্তাই সেই দিনকে নিশ্চয় অভিসম্পাত করিয়াছেন। রিস্‌লি অবশ্য বিভিন্ন জাতির নাসিকার উচ্চতার এবং স্থূলতার অনুপাত সম্বন্ধীয় তাঁহার প্রশংসনীয় মতের পরীক্ষা করিবার জন্য এই চেষ্টা করিয়াছিলেন। রিস্‌লির চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার চেষ্টামাত্রের ফল এমন উদ্বেগজনক হইয়াছে যে, মনে হয় যেন তাঁহার চেষ্টা সফলই হইয়াছে। কারণ প্রত্যেক সেন্‌সাস উপলক্ষ্যই বন্যার মত কদর্য্য আবেদনধারা প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হয়। এই সকল আবেদন অত্যন্ত সন্দেহজনক ঐতিহাসিক বিবরণে পূর্ণ। এই সকল আবেদনে অনেক তথাকথিত ঘটনা বা অনুমান সত্য বলিয়া গ্রহণের প্রার্থনা থাকে। সেন্‌সাস-বিভাগের এইরূপ ঘটনা বা অনুমান সত্য বলিয়া স্বীকার করিবার আইনতঃ কোন অধিকার নাই, এবং স্বীকার করিলেও সমাজে তাহার আদর হইবে না। অধিকন্তু, অনেক সময় অন্যান্য জাতির প্রস্তাবিত অনুমান সোজাসুজি অগ্রাহ্য করিবারও প্রার্থনা করা হয়। কারণ যে-জাতি নিজের সামাজিক পদ উন্নত করিতে চাহে, সে অন্যান্য জাতির পদোন্নতির স্বাভাবিক চেষ্টাকে যেন নিজের অধিকারে অনধিকার প্রবেশ মনে করে। প্রকৃত প্রস্তাবে, অন্যান্য উন্নত জাতির সমান পদলাভ করিলে কোন জাতিই তাহা পদোন্নতি বলিয়া স্বীকার করে না, অন্যান্য জাতির উপরে উঠিতে পারিলে তবে উন্নতি হইল মনে করে।"*

কোন ভদ্রলোক কোন অনাচরণীয় জাতির লোকের হাতের জল বা হাতের ভাত খাইলে শেষোক্ত জাতিকে কোন প্রকারেই তাহাদের আশানুরূপ সম্মান করা হয় না, কথঞ্চিৎ অনুগ্রহ করা হয় মাত্র; এরূপ অনুগ্রহ এই সকল জাতির সমাজনেতারা এখন আর চাহে না। এই সকল জাতির লোক ভদ্রলোকদের মত হুজুকপ্রিয় নহে, সুতরাং হুজুকে

* All subsequent census officers in India must have cursed the day when it occurred to Sir Herbert Risely, no doubt in order to test his admirable theory of the relative nasal index, to attempt to draw up a list of castes according to their rank in society. He failed, but the results of his attempts are almost as troublesome as if he had succeeded, for every census gives rise to a pestiferous deluge of representations, accompenied by highly problematical histories, asking for recognition of some alleged faith or hypothesis of which census as a department is not legally competent to judge and of which its recognition, if accorded, would be socially valueless. Moreover, as often as not direct action is requested against the corresponding hypothesis of other castes. For the caste that desires to improve its social position seems to regard the natural attempts of others to go up with it as an infringement of its own prerogative, its standing is in fact to be attained my standing upon others rather with them" (p. 488).

থাকিয়া তাহারা যে-কোনও দেশনায়কের হাতে এক গ্লাস জল তুলিয়া দিয়া বা কোনও মন্দিরে প্রবেশ করিয়া একেবারে কৃতার্থ জ্ঞান করিবে তাহা মনে করা যাইতে পারে না। পক্ষান্তরে এইরূপ ঘটনার অব্যবহিত পরেই গোঁড়ার দল যে উল্টা আন্দোলন আরম্ভ করিয়া থাকে তাহার ফলে হিন্দুসমাজে অন্তর্দ্রোহ উপস্থিত হইবার সম্ভবনা। এই আন্দোলন কেবল যে ভদ্র ও ইতরের মধ্যে বিবাদ ঘটাইবে তাহা নহে, বিভিন্ন ইতর জাতির মধ্যেও বিরোধ উপস্থিত করিবে। বিভিন্ন অনাচরণীয় জাতিও পরস্পরের অনাচরণীয়। ভদ্রলোকের মধ্যে এখন যাঁহারা নায়ক তাঁহাদের অধিকাংশই বিলাত-ফেরত অথবা পান-ভোজনে সকল প্রকার সঙ্কোচত্যাগী; ইঁহাদের প্রভাবে ভদ্রলোকের মধ্যে অস্পৃশ্যতার হ্রাস হওয়া সম্ভব হইলেও ইতর জাতির নিজেদের মধ্যে এই শ্রেণীর লোক না থাকায় ইহাদের আভ্যন্তরীণ অস্পৃশ্যতার মোচনের জন্য আন্দোলন করাই কঠিন। আমাদের মনে হয় না, কোন শিক্ষিত নমঃশূদ্র এম্-এল-সি স্বজাতীয়গণকে চামারের জল খাইতে অনুরোধ করিতে সম্মত হইবে। আজ যদি ব্রাহ্মণেরা চামারের জল খাইতে আরম্ভ করে, তবে নমঃশূদ্রেরা ব্রাহ্মণদের জল আর খাইবে না। এই সকল ব্যাপার লইয়া দলাদলি উপস্থিত হইলে বিপদের সম্ভাবনা আছে। বক্তৃতা দিয়া বা সংবাদপত্রে বিবৃতি প্রকাশ করিয়া পল্লীবাসী অশিক্ষিত লোকের মনের ঝাল ঝাড়িবার উপায় নাই, সুতরাং ইহাদের মধ্যে মনোমালিন্য উপস্থিত হইলেই শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা থাকে। তার পর বৎসরেক পরে শ্বেতপত্রানুযায়ী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলে ধুরন্ধরগণ যখন হিন্দুসমাজ সংস্কারের জন্য আইনের পর আইনের পাণ্ডুলিপি পেশ করিতে আরম্ভ করিবেন, তখন বেড়াআগুন লাগিয়া যাইবে। সুতরাং অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা করিয়া এইরূপ গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা উচিত।

দুর্ভাগ্যের বিষয় চিন্তাশক্তি যেন হঠাৎ শিক্ষিত হিন্দুর মস্তিষ্ক পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। বাঙ্গলার বৈষ্ণবদিগের মতে জীবাত্মার এবং পরমাত্মার ভেদাভেদ অচিন্ত্য; এখন দেখিতেছি বিষয় মাত্রেরই ভেদাভেদ শিক্ষিত হিন্দুর অচিন্তনীয় হইয়া উঠিয়াছে। সরকারের সহিত সহযোগের এবং অসহযোগের ভেদাভেদ অচিন্ত্য; কৌন্সিল-বর্জ্জনের এবং কৌন্সিলের কার্য্যকলাপ সমর্থনের ভেদাভেদ অচিন্ত্য; আইন-লঙ্ঘনের এবং আইন-পালনের ভেদাভেদ অচিন্ত্য; পূর্ণ স্বরাজের এবং হিন্দুসমাজে অন্তর্দ্রোহের ভেদাভেদ অচিন্ত্য; ফলকথা সকল প্রকার হিতাহিতের ভেদাভেদ এখন অচিন্ত্য হইয়া উঠিয়াছে। । এইরূপ বিশোদর অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ আশ্রয় করিয়া উচ্ছৃঙ্খল ভাবে কার্য্য করিতে গেলে বিপদ অনিবার্য্য।

অস্পৃশ্যতা অত্যন্ত জটিল ব্যাপার। সকল প্রকার অনাচরণীয়তা ইহার সহিত জড়িত। অস্পৃশ্যতা যে কেবল হিন্দুর মধ্যেই দেখা যায় এবং কেবল কতকগুলি হিন্দুই যে ইহা বাঞ্ছনীয় মনে করে এমন কথা বলা যায় না। আমেরিকার যুক্ত-রাজ্যের দক্ষিণ অংশে নিগ্রোদিগের সম্বন্ধে race segregation অর্থাৎ এক প্রকার অস্পৃশ্যতার ব্যবস্থা আছে, এবং ট্রেনে নিগ্রোদিগের জন্য স্বতন্ত্র কামরা নির্দ্দিষ্ট আছে। বর্ত্তমানে য়ুরোপে এবং আমেরিকার যুক্ত-রাজ্যেও বিভিন্ন মূল জাতির বা রেসের (race) মধ্যে যে বিরোধ দেখা যায়, এবং এই সকল রেসের মধ্যে একান্ত সংসর্গের যে কুফল দেখা যায়, তাহা লক্ষ্য করিয়া ডাক্তার আইকম্যান (Aikman) বলিয়াছেন—

"Difficult as it undoubtedly is, some form of mass segregation of races seems to be desirable but, by this term, I do not mean complete segregation. The ideal would seem to be that teachers, administrators, judges and doctors should have access to more backward races and that interchange of ideas should have full play."*

অর্থাৎ,—কঠিন হইলেও বিভিন্ন রেসের লোকদিগকে কোন প্রকারে পৃথক্ করিয়া রাখাই কর্ত্তব্য, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ করিয়া রাখা কর্ত্তব্য নহে। শিক্ষক, শাসক, বিচারক, চিকিৎসক অবশ্যই অনুন্নত রেসের মধ্যে প্রবেশ করিবেন এবং স্বাধীন ভাবে ভাবের আদানপ্রদান চলিবে।

অবশ্য এখানে বলা আবশ্যক ডাক্তার আইকম্যান য়ুরোপের বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে—যথা, অ্যাংলোস্যাক্সন এবং গ্রীকের মধ্যে বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপনও বাঞ্ছনীয় মনে করেন না।†

---

* "Race Mixture" by K. B. Aikman, M.D., M.R.C.P., *The Eugenist Review*, October, 1933, p. 164.

† "Among civilized peoples of the same Primary Race, intermarriage is less desirable than is commonly thought. Biologically there are the same possiblities of hybrid vigour and of degeneration and the distinction between Fair Caucasions and Dark Caucasions is probably important. Socially, however, the complexities of the civilized mind militate against the harmony of such married lives and this must have great weight with the eugenist" (p. 166).

আর্য্যাবর্ত্তের চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজের মধ্যে অস্পৃশ্যতা নাই। এক সময় অসবর্ণ বিবাহ এবং ব্রাহ্মণের শূদ্রের রাঁধা-ভাত খাওয়ার বিধিও যে ছিল; হেমাদ্রি, মাধব এবং আমাদের রঘুনন্দন কলিতে বর্জ্জনীয় আচার সম্বন্ধে যে-সকল পৌরাণিক বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা, এই সকল নিবন্ধকারধৃত আদিত্য পুরাণের বচন—

কন্যানামসবর্ণানাং বিবাহশ্চ দ্বিজাতিভিঃ।

* * *

ব্রাহ্মণাদিষু শূদ্রস্য পক্বতাদিক্রিয়াপি চ।

"দ্বিজাতিগণ কর্ত্তৃক অসবর্ণা কন্যা বিবাহ, ... শূদ্র কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণাদির রন্ধন ইত্যাদি কর্ম্ম লোকরক্ষার্থ কলিকালের আদিতে মহাত্মগণ নিষেধ করিয়া গিয়াছেন।"

চতুর্বর্ণের বহির্ভূত জাতিনিচয়ের মধ্যে কতকগুলি জাতি অস্পৃশ্যশ্রেণীভুক্ত। মনু বলিয়াছেন, চতুর্বর্ণ ব্যতীত কোন পঞ্চম বর্ণ নাই (১০।৪)। চতুর্বর্ণ ব্যতীত আর যে-সকল জাতি আছে তাহারা চতুর্বর্ণের অসবর্ণ বিবাহ বা অসবর্ণ সংসর্গ জাত। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে অস্পৃশ্যতার উপযুক্ত কারণ পাওয়া যায় না। কারণ চতুর্বর্ণের সীমার মধ্যে যাহাদের উৎপত্তি, তাহারা আকারে আচারে চতুর্বর্ণের অনুরূপই হইবে। সুতরাং তাহাদিগকে বহিষ্কারের কোন বিশেষ প্রয়োজন থাকিতে পারে না। মনুর মত যাঁহারা চতুর্বর্ণ-বাদী, তাঁহাদের মতে ব্রাহ্মণের শূদ্রাগর্ভজাত সন্তান নিষাদ। কিন্তু অন্যান্য শাস্ত্রে নিষাদের উৎপত্তির অন্য প্রকার বিবরণ আছে। ঋগ্বেদে "পঞ্চজনাঃ" পদ আছে। "নিরুক্ত"কার যাস্ক এবং "বৃহদ্দেবতা"কার শৌনক এই পদের অর্থ সম্বন্ধে নানা মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। তন্মধ্যে এক মতে পঞ্চজনগণ অর্থ চতুর্বর্ণ এবং পঞ্চমবর্ণ নিষাদ। যাস্ক ঋগ্বেদের "পঞ্চকৃষ্টি" অর্থ লিখিয়াছেন "পঞ্চ মনুষ্যজাতি।" মহাভারতের খিল হরিবংশে এবং কয়েকখানি পুরাণে নিষাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে এই আখ্যানটি আছে। বেণ নামে এক দুরাচার রাজা ছিলেন। ঋষিরা তাঁহাকে মন্ত্রপূত কুশের আঘাতে হত্যা করিয়াছিলেন—

মমন্থু দক্ষিণঞ্চোরু ঋষয়স্তস্য মন্ত্রতঃ।
ততোঽস্য বিকৃতো জজ্ঞে হ্রস্বাঙ্গঃ পুরুষো ভুবি॥
দগ্ধস্থূণাপ্রতীকাশো রক্তাক্ষঃ কৃষ্ণমূর্দ্ধজঃ।
নিষীদেত্যেবমূচুস্তমৃষয়ো ব্রহ্মবাদিনঃ॥
তস্মান্নিষাদাঃ সম্ভূতাঃ ক্রূরাঃ শৈলবনাশ্রয়াঃ।
যে চান্যে বিন্ধ্যনিলয়া ম্লেচ্ছাঃ শতসহস্রশঃ॥

(মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ৫৯ অধ্যায়, ৯৪-৯৭)

ঋষিগণ মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক তাঁহার দক্ষিণ ঊরু মন্থন করিয়াছিলেন। (সেই ঊরু) হইতে বিকৃত আকার, হ্রস্বাঙ্গ, দগ্ধ কাষ্ঠের মত (কৃষ্ণবর্ণ), রক্তচক্ষু কৃষ্ণকেশ বিশিষ্ট একজন পুরুষ পৃথিবীতে উৎপন্ন হইয়াছিল। ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ তাহাকে বলিলেন, 'নিষীদ' (উপবেশন কর)। তাহা হইতে পর্ব্বত এবং বনবাসী নিষ্ঠুর নিষাদগণ এবং বিন্ধ্যপর্ব্বতবাসী অন্য শতসহস্র ম্লেচ্ছগণ উৎপন্ন হইয়াছে।

ভাগবত পুরাণে (৪।১৪।৪৪) বেণ রাজার উপাখ্যানে নিষাদের এইরূপ বর্ণনা আছে—

কাককৃষ্ণোঽতিহ্রস্বাঙ্গো হ্রস্ববাহুর্মহাহনুঃ।
হ্রস্বপান্নিম্ননাসাগ্রো রক্তাক্ষস্তাম্রমূর্দ্ধজঃ॥

কাকের মত কৃষ্ণবর্ণ, অতি হ্রস্বাঙ্গ, হ্রস্ববাহুযুক্ত, মহাহনু, হ্রস্বপাদ, নত (স্থূল) নাসাগ্র, রক্তনেত্র, তাম্রবর্ণ কেশ।

মহাহনু অর্থ উচ্চ অস্থিবিশিষ্ট গণ্ডস্থল (high cheek-bones)। হ্রস্ব অঙ্গ (low stature), নিম্ন নাসাগ্র (broad nose)। কৃষ্ণবর্ণ, মহাহনু প্রভৃতি শারীরিক লক্ষণ বিন্ধ্যারণ্যবাসী ভিল, কোল, গোণ্ড, সাঁওতাল প্রভৃতি জাতি-নিচয়ে এখনও দেখা যায়। হরিবংশের ৫।২০ শ্লোকের টীকায় নীলকণ্ঠ লিখিয়াছেন—

"বিন্ধ্যনিলয়াঃ 'গোণ্ড' ইতি 'কোল' ইতি চ প্রসিদ্ধাঃ মধ্যদেশীয়াঃ।"

যখন চতুর্বর্ণ ব্যতীত একমাত্র পঞ্চম জাতি ছিল নিষাদ, তখন উভয় বিভাগের আকারগত এবং অরণ্যবাসীর আচার-গত গুরুতর প্রভেদ লক্ষ্য করিয়াই বোধ হয় চাতুর্বর্ণ্য হিন্দুগণ নিষাদগণকে ব্যবধানে রাখিবার জন্য (segregation) অস্পৃশ্যতা প্রবর্তিত করিয়াছিলেন। নিষাদের বেলা আকার এবং আচার দুইয়েরই বিস্তর প্রভেদ ছিল। যেখানে আকারগত প্রভেদ বিশেষ কিছু ছিল না, কিন্তু আচারগত এবং ধর্ম্মগত প্রভেদ ছিল, সেখানেও অস্পৃশ্যতার ব্যবস্থা দেখা যায়। অপরাদিত্য কৃত "অপরার্ক" নামক যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির (১।৭) টীকায় এই স্মৃতির বচনটি উদ্ধৃত হইয়াছে—

কাপালিকান্ পাশুপতান্ শৈবাংশ্চ সহকারকৈঃ।
দৃষ্ট্বাশ্চেদ্রবিমীক্ষেত স্পৃষ্ট্বাশ্চেৎ স্নানমাচরেৎ॥

"কাপালিকগণকে, পাশুপতগণকে, শৈবগণকে এবং [illegible]কে দেখিয়া সূর্য্যের দিকে দৃষ্টি করিবে, এবং স্পর্শ করিয়া স্নান করিবে।"

মাধবাচার্য্য কৃত পরাশর স্মৃতির ভাষ্যে "চতুর্বিংশতিমত" নামক প্রাচীন স্মৃতিনিবন্ধ হইতে এই বচনটি উদ্ধৃত হইয়াছে—

বৌদ্ধান্ পাশুপতান্ জৈনান্ লোকায়তিক-কাপিলান্।
বিকর্ম্মস্থান্ দ্বিজান্ স্পৃষ্ট্বা সচেলো জলমাবিশেৎ।
কাপালিকাংস্তু সংস্পৃশ্য প্রাণায়ামোঽধিকো মতঃ॥ *

* মাধবাচার্য্য কৃত ভাষ্য সহ পরাশরস্মৃতি (Bib. Ind.), প্রথম খণ্ড, ২৯৯ পৃঃ।

* "বৌদ্ধগণকে, পাশুপতগণকে, জৈনগণকে, লোকায়তিক (নাস্তিক)-গণকে, কাপিল (সাংখ্যবাদী)গণকে এবং আচারভ্রষ্ট দ্বিজগণকে দেখিয়া বস্ত্রসহ জলে অবগাহন করিবে। কাপালিকগণকে দেখিয়া অধিকন্তু প্রাণায়াম করিবে।"

এই সকল বচনে বৈষ্ণবগণের (পাঞ্চরাত্রগণের) নাম না থাকিলেও অন্য প্রকার অনেক বচনে বৌদ্ধ, জৈন এবং পাশুপত মতের সঙ্গে পাঞ্চরাত্র মতও নিন্দিত হইয়াছে। এইরূপ নিন্দার এবং শৈবাদিকে অস্পৃশ্য জ্ঞানের কারণ বেদবেদান্তপন্থীর সাম্প্রদায়িক সংস্কার।" সুতরাং শোণিতশুদ্ধি এবং ধর্ম্মশুদ্ধি রক্ষার জন্য আদৌ অস্পৃশ্যতা বিহিত হইয়াছিল। সাম্যবাদী বলিবেন, এইরূপ শুদ্ধিরক্ষার প্রবৃত্তি সঙ্কীর্ণতার পরিচয় প্রদান করে। এই প্রবৃত্তি সঙ্কীর্ণ হউক অথবা না হউক, যে ভয়ে প্রাচীন বৈদিক আর্য্যসমাজ অস্পৃশ্যতার বিধান করিয়াছিল, পরিণামে সেই সমাজ সেই ভয়ের হাত হইতে রক্ষা পায় নাই। শৈব-বৈষ্ণবাদি ধর্ম্ম বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডকে পরাজিত করিয়াছে। চাতুর্বর্ণ্য হিন্দুর এবং অস্পৃশ্য হিন্দুর আকৃতি পরীক্ষা করিলে দেখা যায় উভয় শ্রেণীতে শোণিত-মিশ্রণ যথেষ্ট হইয়াছে, এবং উভয় শ্রেণীর ধমনীতে যথেষ্ট নিষাদ শোণিত আছে। এই শোণিত-মিশ্রণই খুব সম্ভব হিন্দু জাতির অধঃপতনের অন্যতম কারণ।

এই ইতিহাসটুকু পাঠ করিয়া অনেকেই হয়ত বলিবেন, যাহা হইবার তাহা ত হইয়া গিয়াছে। যে-সকল হিন্দুর এখন আকারে এবং আচারে অনেকটা ঐক্য আছে, তাহাদের মধ্যে এইরূপ ভেদ থাকার সার্থকতা কি? সার্থকতা যাহাই হউক, মুখের কথায় যদি এই ভেদ তুলিয়া দেওয়া সম্ভব হইত, তবে বহুকাল পূর্ব্বে ইহা লোপ পাইত। বলপূর্ব্বক অস্পৃশ্যতা মোচনও সম্ভবপর মনে হয় না। তাহার কারণ আমি দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিব। শুনিয়াছি ঢাকা জেলার অন্তর্গত মুন্সীগঞ্জের কালীবাড়িতে অস্পৃশ্যগণ বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিয়াছিল। ফলে স্থানীয় অধিকাংশ ভদ্রলোক অস্পৃশ্য জ্ঞানে সেই মন্দির বর্জ্জন করিয়াছে। সুতরাং একটি মন্দির মাত্র অস্পৃশ্য হইয়াছে, কিন্তু মুন্সীগঞ্জে অস্পৃশ্যতা মোটেই ঘোচে নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে মুন্সীগঞ্জে কালীমন্দির সম্বন্ধে অস্পৃশ্যতা ঘুচাইতে হইলে যে-সকল ভদ্রলোক এখন মন্দির বর্জ্জন করিয়াছেন তাঁহাদের পরিবারের সকলকে গ্রেপ্তার করিয়া আনিয়া পরিত্যক্ত কালীমন্দিরে পূজা দেওয়াইতে হইবে। বাঙ্গলার ভাবী ব্যবস্থাপক সভায় অধিকাংশ হিন্দু সদস্য এই প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারেন, কিন্তু অহিন্দু সদস্যেরা বোধ হয় সম্মত হইবে না। সুতরাং বলপূর্ব্বক অস্পৃশ্যতা মোচন সহজ হইবে না। যে-শ্রেণীর হিন্দুরা মন্দিরে গিয়া পূজা দিয়া শান্তিলাভ করে তাহাদের কাছে এ সম্বন্ধে যুক্তিরও বিশেষ আদর হইবে না।

তথাপি আমার বিশ্বাস অস্পৃশ্যতা ঘুচিবার খুব বিলম্ব নাই। রাষ্ট্রবিধির পরিবর্ত্তনের ফলে অনাচরণীয় জাতির অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি এম্-এল্-সি রূপে বা সরকারী চাকুরী পাইয়া শীঘ্রই শহরে আসিয়া বাস করিবেন। ইঁহারা অবশ্যই শহরের ভদ্রসমাজে গৃহীত হইবেন, এবং ব্রাহ্মণ-কায়স্থাদির সহিত একত্র আহারাদি করিবেন। তারপর এই যৌবন বিবাহের এবং স্বয়ং বর-কন্যা নির্ব্বাচনের যুগে অসবর্ণ বিবাহ আরম্ভ হইতেও বিলম্ব নাই। সুতরাং শহরবাসী ভদ্র অনাচরণীয়গণের সহিত বিবাহ-সম্বন্ধ হইতেও বিলম্ব হইবে না। শহরে এরূপ একত্রে আহার-বিহার চলিলে গ্রামবাসীরাও তাহার প্রভাব এড়াইতে পারিবে না। মন্দিরে অস্পৃশ্যতা ঘুচিবে না; অস্পৃশ্যতা ঘুচিবে বিবাহের রেজেষ্টারী আপিসে। সুতরাং সমাজসংস্কার লইয়া বেশী হৈ চৈ না করিয়া ভদ্রবংশগুলি যাহাতে রক্ষা পায়, তজ্জন্য এখন ভদ্রলোকদিগের সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

শিক্ষাসংস্কারের মূলসূত্র

শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলার শিক্ষা-সম্বন্ধে আমার সংক্ষিপ্ত একটু অভিমত লিপিবদ্ধ করিতেছি।

বাংলা দেশের শিক্ষাসমস্যা বহুদিন যাবৎ শাসকমণ্ডলী এবং অভিজ্ঞ শিক্ষানুরাগীর আলোচনার বিষয়ীভূত হইয়াছে। য়ুনিভার্সিটি এ্যাক্ট, স্যাড্‌লার কমিশন, হার্টগ কমিটি প্রভৃতির গবেষণার ভিতর দিয়া আমরা এমন এক জায়গায় আসিয়া পড়িয়াছি—যেখান হইতে সমগ্রদৃষ্টির সাহায্যে এ-বিষয়ের কিছু সমাধান না হইলে ভবিষ্যতে প্রভূত অমঙ্গলের আশঙ্কা রহিয়াছে।

সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট যে একটি মন্ত্রণাসভা আহ্বান করিয়াছিলেন তাহারও উদ্দেশ্য এ-বিষয়ে প্রকৃত তথ্য নির্দ্ধারণ করিয়া শিক্ষার যথোচিত সঙ্কোচ বা প্রসারের ব্যবস্থা করা। ইহার পশ্চাতে কোন রাজনৈতিক চালবাজী নাই আপাততঃ ইহাই ধরিয়া লইতেছি।

প্রথম কথা, বাংলা দেশ সম্বন্ধে এই যে, এ প্রদেশের তথাকথিত অভিজাত সম্প্রদায় শিক্ষানুরাগী এবং তাঁহাদের মধ্যে উচ্চশিক্ষা অর্থাৎ সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞানের তথ্য সম্বলিত শিক্ষার বহুল বিস্তার হইয়াছে; কিন্তু সে অনুপাতে ব্যবহারিক শিক্ষা—যাহাতে কর্ম্মপটু, উপার্জনক্ষম মানুষ তৈয়ারী হয়, তাহার সুবিধা ও বিস্তৃতি নিতান্তই কম।

দ্বিতীয় কথা, দরিদ্র জনসমাজের অজ্ঞতা বিশাল এবং যেহেতু উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণ সরকারী চাকুরী এবং কতিপয় সুভদ্র বৃত্তির উপরই এ-যাবৎ মনঃসংযোগ করিয়াছেন, সেই হেতু ধনি ও দরিদ্র, উচ্চজাতি ও তথাকথিত নিম্নজাতি, ভদ্র ও চাষী, জমীদার ও রায়ত ইহাদের মধ্যে সংযোগ এবং পারস্পারিক শুভেচ্ছা নিবিড় হইতে পারে নাই।

তৃতীয় কথা, আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা নিতান্ত নিম্নস্তরের; কিন্তু মাধ্যমিক (উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়ের প্রদত্ত) শিক্ষাও [illegible], নিয়ন্ত্রণ, এবং দেশের পারিপার্শ্বিক সংহতি হইতে প্রায় সম্পূর্ণভাবে বিচ্যুত এবং এই সব বিদ্যালয়ের অধিকাংশেরই অর্থসামর্থ্য অল্প।

চতুর্থ কথা, দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া দূষিত, পঙ্কিল, সন্দেহাবিষ্ট, সাম্প্রদায়িক-ভেদবুদ্ধিদুষ্ট হওয়ায়, শিক্ষকের মর্য্যাদা ও কর্ম্মক্ষমতা বহুপরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।

পঞ্চম কথা, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃত্বের মধ্যে বণিক্, পণ্যসম্ভারের উৎপাদক, কৃষিসমাজ, ইহাদের অংশ নাই বলিলেই চলে।

ষষ্ঠ কথা, কলিকাতা শহরে কতিপয় কলেজে ছাত্রসংখ্যা এবং শিক্ষণীয় বিষয়ের আধিক্য হেতু অনেক স্থলেই শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে নৈতিক যোগ অত্যল্প এবং শিক্ষাপদ্ধতিও বহুল পরিমাণে পঙ্গু ও কেবল পরীক্ষা পাস করাইবার যন্ত্রস্বরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত এই সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্ত্তিতা রক্ষার অবসরও কম।

সপ্তম কথা, বেকার সমস্যা দ্রুতবর্দ্ধনশীল এবং তথাকথিত উচ্চশিক্ষিত যুবকের ধনোপার্জ্জনের পথ নিতান্ত সঙ্কুচিত হইয়াছে।

অষ্টম কথা, দেশের অর্থ নাই এবং সরকারী মহল দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষায়ই সর্ব্বদা ব্যাপৃত, সুতরাং রাজকোষ হইতে শিক্ষার জন্য অতিরিক্ত অর্থব্যয়ের সম্ভাবনা নাই।

এই সমস্ত কথা নিবিষ্টভাবে আলোচনা করিয়া [illegible] শিক্ষাসংস্কারকগণ যদি ধীরভাবে অগ্রসর হ'ন, [illegible] ফল হইতে পারে। কিন্তু শিক্ষাপ্রচেষ্টার পশ্চাতে যদি রাজনৈতিক অভিসন্ধি, সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার ভেদবুদ্ধি প্রবিষ্ট হয় তবে কুফলই প্রসূত হইবে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ আরও বিফল হইতে থাকিবে।

বর্ত্তমান অবস্থায় (১) মাধ্যমিক স্কুলসমূহ না কমাইয়া বরং আরও বাড়ান দরকার; প্রাতঃকালে ঐ সব স্কুলে (বিশেষতঃ গ্রাম্য অঞ্চলে) মেয়েদের শিক্ষার [illegible]

পারে এবং সন্ধ্যায় দরিদ্র চাষী ও মজুরের শিক্ষার বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে।

(২) প্রতি জেলায় একটি করিয়া জেলা শিক্ষা কমিটি স্থাপন করিয়া সেই কমিটির উপর সেই জেলার সমস্ত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানের ভার ন্যস্ত হইতে পারে।

(৩) সরকারী স্কুল-পরিদর্শকের সংখ্যা বহুপরিমাণে হ্রাস করিয়া সেই অর্থে শিক্ষকদের বৃত্তির বরাদ্দ বাড়ান যাইতে পারে।

(৪) প্রত্যেক বিদ্যালয়ের সঙ্গে পারিপার্শ্বিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া কৃষিক্ষেত্র, ছোট ছোট কুটীরশিল্প-কেন্দ্র এবং গ্রাম্যসেবাসমিতি প্রতিষ্ঠা করা যাইতে পারে।

(৫) বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক-সভায় বণিক্ ও কৃষকসমাজের প্রতিনিধি বৃদ্ধি করিয়া উচ্চশিক্ষাকে দেশের ধনবৃদ্ধির উপযোগী করা যাইতে পারে।

(৬) পাবলিক হেল্‌থ, ইনডাস্ট্রীজ, এগ্রিকালচার, কোঅপারেটিভ—এই চারি বিভাগের সঙ্গে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নিবিড়তর সংযোগ স্থাপন অতি প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে।

ট্যারা

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

এই পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে এমন বিশেষত্বহীন অবজ্ঞাত দৃশ্যপটের সংখ্যার হিসাব নাই। বর্ণ নাই, বৈচিত্র্য নাই, সমারোহ নাই, নিতান্ত নগণ্য পার্শ্বদৃশ্য! কিন্তু এগুলিকে বাদ দেওয়া চলে না। বাদ দিলে বিরাট নাটক হইবে অসম্পূর্ণ। তবু রঙ্গালয়ের ইতিকথায় মধ্যে ইহাদের উল্লেখ থাকে না।

দরিদ্র পল্লীর মধ্যে একখানি কুঁড়েঘর। সেই পটভূমির সম্মুখে ছোট একটি পরিবার—নয়ানের বুড়ী মা, নয়ান, নয়ানের স্ত্রী আর নয়ানের ন-দশ বছরের ছোট ছেলে ট্যারাকে দেখা যায়। এই পরিবারটির সঙ্গে গ্রামের ইতিহাসের নগণ্য একটু যোগ আছে। বুড়ী নয়ানের মা গ্রামের গৃহস্থ পরিবারে আত্মীয়তার বার্ত্তা বহন করিয়া লইয়া যায় গ্রাম-গ্রামান্তরের আত্মীয়-কুটুম্বের বাড়ি। সেখানকার বার্ত্তা বহন করিয়া আনে এখানে। বুড়ীর মত খুঁটিনাটি সমস্ত সংবাদ পরিপাটি করিয়া আদান-প্রদান করিতে কেহ পারে না।

নয়ান খাটে দিনমজুর। নয়ানের বউ—সেও গৃহস্থ বাড়িতে খাটে; বাসন মাজে, ক্ষারে সিদ্ধ কাপড় কাচে, ঢেঁকিতে ধান ভানে। ছোট ট্যারা অনুক্ষণ গাঁজা আফিংএর দোকানের সম্মুখে সারাটা দিনমান গুলিদাঁড় খেলে। সঙ্গী না থাকিলে সে একাই দু-জনের ভূমিকা অভিনয় করে—গুলিটাকে পিটাইয়া নিজেই দাঁড় লক্ষ্য করিয়া গুলি ছোঁড়ে। আবার দাঁড়-হাতে গুলি পিটাইয়া দাঁড় মাপিয়া চলে—বালি—দুলি—তাল—তম্পা—দেক্—নক্কা।

ট্যারা প্রকৃতির খেয়ালের সৃষ্টি। একটা চোক ট্যারা, আর অতি ক্ষুদ্র—দেখিয়া মনে হয় কাণা। তাহার উপর আছে জিহ্বার জড়তা।

কত গৃহস্থবধূ ট্যারাকে দেখিয়া করুণা করিয়া নয়ানের বৌকে বলে—আহা বাউরীবৌ ছেলেটি তোর কাণা!

ক্ষুদ্র চোখটা যথাসাধ্য বিস্ফারিত করিয়া জড়-জিহ্বায় ট্যারা বলে—না গো—ডেক—ডেকটে—পেছি আমি।

*   *   *

অকস্মাৎ জীবনে আসিল একটা উত্তেজনাপূর্ণ দৃশ্য।

সেদিন প্রভাতে তখন রজনীর কাল-পট ধীরে ধীরে অপসারিত হইতেছিল, নয়ানের মায়ের বুককাটা কান্নার সহিত দিবসের অভিনয় সুরু হইল। নয়ান গিয়াছিল কুটুম্ববাড়ি। সেখান হইতে কলেরা লইয়া ফিরিয়াছিল রাত্রে। প্রত্যূষে তাহার ভূমিকার শেষ হইয়া গেছে। তাহার পর সন্ধ্যায় প্রস্থান করিল নয়ানের বৌ। পরদিন সন্ধ্যায় গেল বুড়ী নয়ানের মা। পুরাতন পটভূমির সম্মুখে

সংক্রামকতার সকল প্রকোপ ব্যর্থ করিয়া ছোট্ট হাবা ট্যারা যে শুধু কেমন করিয়া রহিয়া গেল কে জানে!

* * *

ট্যারার জীবনের পশ্চাতের পটভূমির পরিধি বাড়িয়া গেল। ক্ষুদ্র ঘরখানি ভাঙে নাই। কিন্তু সে-ঘর মমতা করিয়া কথা কয় না, আহার দেয় না—সে শুধু দেয় স্মৃতিকে পীড়া। ট্যারা ঘর ছাড়িয়া গ্রাম্যপথখানির উপর আসিয়া দাঁড়াইল। গাঁজার দোকানটির সম্মুখেই সে আর গুলি-দাণ্ডা খেলে না। গুলি পিটাইয়া পিটাইয়া সম্মুখ দিকেই চলে—আর মাপে—তাল—তম্পা—দেক্—নক্কা।

যখনই প্রয়োজন অনুভব করে তখনই সম্মুখের গৃহস্থের দুয়ারে গিয়া বলে—থাকরুণ!

—কে—রে?

হাসিমুখে ট্যারা বলে—তেরা গো আমি। সেই যে মা আমার কাদ করতো!—আঁচলে মুড়ি লইয়া চিবাইতে চিবাইতে আবার খেলিয়া চলে। দ্বিপ্রহর পার হইলেই গ্রাম-প্রান্তের দেবায়তন হইতে ভোগের ঘণ্টা বাজে। ট্যারা যেখানে থাক ছুটিতে ছুটিতে গিয়া হাজির হইয়া এক পাশে পাতা পাড়িয়া বসিয়া যায়।

স্থানটি হিন্দুর খ্যাতনামা একটি তীর্থস্থল, একান্ন মহাপীঠের এক মহাপীঠ। অট্টহাসে দেবী ফুল্লরা—বিশেশ ভৈরব বিরাজমান। প্রবীণ মহান্ত পশ্চিম-দেশীয় সন্ন্যাসী। আবক্ষ শ্বেত শ্মশ্রু, অনাবৃত বিশাল দেহ, বাহুতে, পঞ্জরে কয়টা ক্ষতচিহ্ন দেখা যায়। এগুলি যুদ্ধের ক্ষতচিহ্ন। তিনি পূর্ব্বে ছিলেন সৈনিক—এখন লইয়াছেন সন্ন্যাস।

এই স্থানটির সহিত পরিচয় ট্যারার পূর্ব্ব হইতেই ছিল। কতদিন নয়ানের মা তাহাকে সঙ্গে লইয়া এখানে প্রসাদ পাইয়া গেছে।

সেদিন সন্ন্যাসী বলিলেন—আরে তুমি রোজ রোজ আলো। তুমি—কে—রে?

ট্যারা ঘাড় বাঁকাইয়া ছোট চোখটি পিট পিট করিয়া বলিল—আমি ত্যারা গো গোঁছাই বাবা!

দেবীর পুরোহিত ভূমিবৃত্তিভোগী স্থানীয় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ব্যঙ্গ-[illegible] বলিলেন—মায়ের দরবারে প্রসাদ পাবার রোজ [illegible] বাবা!

অনাথ। নয়ানের মায়ের নাতি—নয়ানের ছেলে।

সন্ন্যাসী বলিয়া উঠিলেন—আ-হা-হা-হা বাচ্চারে! 'আদার বুটী' 'পাথর টিপির' বিচার নেহি কোনো।

জঙ্গলের মধ্যে দেবী বিরাজিতা, তাই আদর করিয়া সন্ন্যাসী বলেন, বেটি আদার বুটী। আর পাষাণময়ী দেবী—তাই নাম 'পাথর টিপি'। অতঃপর সন্ন্যাসী ট্যারাকে বলিলেন—তুমি থাক হিয়া এ বেটা। থোড়াথুড়ি কাম করবি—মায়ীর পরসাদ পাবি—কাপড় ভি মিলবে। বুঝলি এ বাচ্চা!

ট্যারা ছোট চোখটি উপরে তুলিয়া মিট্ মিট্ করিয়া চাহিয়া রহিল। পুরোহিত বুঝাইয়া বলিলেন—ওরে গোঁসাই-বাবা বলচেন—তুই এখানেই থাক্। খেতে পাবি দু বেলা, কাপড় পাবি। গরু চরাতে পারবি?

প্রবল উৎসাহে ট্যারা বলিল—হিঁ—হোং—ত্যা—ত্যা।—ইদিকেই—ইদিকেই থালার গরু! খুব পারবো।

মুহূর্ত্ত কয় পরেই সে আবার বলিয়া উঠিল—একতা দামা দিয়ো গো আমাকে—বেশ! গায়ে দোব আমি!

ট্যারার জীবনে পশ্চাতের পটভূমি আবার পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। এবার পটভূমিতে রহিল নিবিড় বন-বেষ্টনীর শান্ত উদাসীনতার মধ্যে সুউচ্চ দেবভবন, নাটমন্দির, তাহার সম্মুখে পুষ্করিণী। মন্দিরের পিছনে আশ্রম—মহান্তের পঞ্চ-মুণ্ডীর আসন, ভোগমন্দির, গোশালা। অতি প্রত্যূষে উঠিয়া মহান্তজী দেওয়ালে ঝুলান ঘণ্টায় ঘা মারেন। ট্যারার ঘুম ভাঙিয়া যায়, সে চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে সন্ন্যাসীর অদূরে গিয়া দাঁড়ায়।

সন্ন্যাসী বলেন—জটা কোথা? আসে নাই উ আভি?

ছোট মাথাটি নাড়িয়া ট্যারা ইঙ্গিতে বলে—না।

—তব তুমি যাও। গরু বাহার কর। লেফ্ট টার্ন্ কুইক মার্চ! বাঁয়ে ঘুমো—জলদি যাও।

সন্ন্যাসী হাসিতে হাসিতে কুস্তির আখড়ায় চলিয়া যান। এ অভ্যাসটুকু এখনও তাঁহার যায় নাই।

ট্যারা কিন্তু গরু বাহির করিতে যায় না—সে চেষ্টা করে ঐ ঘণ্টাটা বাজাইতে। উঁচুতে ঝুলান ঘণ্টাটা ট্যারা নাগাল পায় না। অবশেষে আবিষ্কার করে সে একটা আঁকশী। সেই আঁকশীতে ঘণ্টার হাতুড়ীর দড়িটা আটকাইয়া ঘণ্টাটা বাজায় ঢং—ঢং।

শেষে আপন মনেই খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠে।

প্রভাত হইতেই মহাপীঠে লোকসমাগম হয়। প্রথমেই আসে কয়জন নিত্যযাত্রীস্থানীয় ভক্ত লক্ষ্মীকান্ত, শূলপাণি, চন্দ্রনাথ। লক্ষ্মীকান্ত প্রবেশ করে—মায়ী রাজা করো, রাজা করো। আরে ভেইয়া ভোলা—চা চড়াও রে দাদা।

দেবীর সম্মুখ পর্য্যন্ত সে আর যায় না। বোধ করি মনে মনেই মাকে প্রণতি জানাইয়া ভাণ্ডার-ঘরের দাওয়ায় মাদুর বিছাইয়া বসিয়া পড়ে।

ভোলা মহান্তের সেবাশুশ্রূষা করে, দেবীর ভোগ রান্না করে। সে জলন্ত ধুনিটার উপর বড় একটা মাটির হাঁড়িতে চায়ের জল চাপাইয়া দেয়।

লক্ষ্মীকান্ত হাঁকে—জটা—জটা—ওরে বেটা হারামজাদা, দুধ নিয়ে আয়।

অভ্যাসমত ঘাড় বাঁকাইয়া ট্যারা মানুষটিকে দেখিতেছিল। সে বলিল—উ এখনও আথে নাই গো।

পকেট হইতে ছোট একটি আয়না বাহির করিয়া লক্ষ্মীকান্ত দেখিয়া দেখিয়া সিঁথির সম্মুখের পাকাচুল তুলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সে বলিল—তুই বেটা আবার কোথা থেকে এলি? যত মড়া কি গাঙের ঘাটেই আসে রে বাবা!

ভোলানাথ হাসিয়া বলিল—ও হ'ল বাবার নতুন চেলা গো দাদা! তোমাদের গাঁয়ের নয়ানের মায়ের নাতি।

বিস্ময়-বিস্ফারিত চক্ষে অদ্ভুত মুখভঙ্গী করিয়া লক্ষ্মীকান্ত বলিল—লে বাবা! বাউরী হ'ল গোসাইয়ের চেলা! লে বাবা! এ বেটা শেয়ালমারা গোঁসাইকে নিয়ে ত জাত ধরম কিছু রইল না।

রাখালের হাতে শালগেরামের মরণ—শেয়ালমারা বসল মহাপীঠের গদীতে! তাড়াও হে বেটাকে—আজই তাড়াও।

জঙ্গলের বাহির হইতে শব্দ আসিতেছিল শঙ্করী—শঙ্করী! হর হর বোম্—হর হর বোম্।

এবার আসিল শূলপাণি। কাপড়-গামছা মাদুরের উপর রাখিয়া শূলপাণি বলিল—কি হ'ল? কা'কে তাড়াবে?

—গোঁসাইকে। বেটা শেয়ালমারা কি কখনও সাধু হয়? বেটা—শূলপাণি চীৎকার করিয়া উঠিল—তুম কৌন্ হায়? গদীয়ান মহান্ত হ'ল মোহান্ত জমীদারদের অধীন। বাজে লোকের বলবার কোন অধিকার নাই।

শূলপাণি শতখণ্ডে বিভক্ত পুরাতন জমিদার-বংশের সন্তান। লক্ষ্মীকান্তও চীৎকার করিয়া উঠিল—আমার মামাও জমিদার।

ব্যঙ্গ করিয়া শূলপাণি জবাব দিল—মামা—তুমারা মামা হায়। বাবা নাহি হায়।

লাফ দিয়া লক্ষ্মীকান্ত উঠিয়া পড়িল।

সন্ন্যাসী ইতিমধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি লক্ষ্মীকান্তকে ধরিয়া বলিলেন—কি হ'ল ভাগ্না, কি হ'ল ভেইয়া? মান যাও ভেইয়া, মান যাও।

লক্ষ্মীকান্ত সরোষে কহিতেছিল—মা কি জমিদারদের দাসী-বাঁদী রে বাপু? সাধু-সন্ন্যাসীর আচার-বিচার খারাপ হ'লে বলতে পাবে না লোকে?

মহান্ত বলিলেন—আলবৎ। রাগ মৎ করো ভাই। বৈঠো বৈঠো ভাগ্না। চা খাও। এহি লেও গাঁজা ভি খাও।

লক্ষ্মীকান্ত শান্ত হইল। সে ফিরিয়া গাঁজার পুরিয়াটা শূলপাণির সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া চুপ করিয়া বসিল। কোন কথা কহিল না। শূলপাণি গাঁজার সরঞ্জাম পাড়িয়া বসিল।

তারপর চা খাওয়া হয়, গাঁজার কলিকায় আগুন চড়ে।

গাঁজার কলিকাটা হাতে হাতে ফিরিতেছিল। ভোলানাথ শূলপাণিকে বলিল—দাও দাও—এ ভাই রাজাদাদা—বাবার নতুন চেলা বেটাকে এক দম দাও।

পুরা দমের ধোঁয়া বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া নির্ব্বিকার ভাবে শূলপাণি কলিকাটা আগাইয়া দিল।

ছোট ট্যারা ছোট চোখটি উপরে তুলিয়া সবিস্ময়ে বাবুদের মুখের দিকে চাহিয়া ছিল। শূলপাণি একটু একটু ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে ধূম-নিপীড়িত কণ্ঠে বলিল—নয়ানের মায়ের নাতি নয়? লে—লে—বেটা লে।

লক্ষ্মীকান্ত কলিকাটা হাত হইতে লইয়া কহিল—আর দিনকতক যাক্ দাদা। একটু বড় হোক। তারপর কত জোগাবে জুগিয়ো। তারপর আরম্ভ হয় আলাপ—

লক্ষ্মীকান্ত আপন মনেই বলে—মায়ের গদী হ'ল সাধু-পুরুষের গদী। সন্ন্যাসী কি হ'লেই হ'ল?

ভোলানাথ শূলপাণিকে বলিতেছিল—কাল যে তোমাদের গাঁয়ের ঈশ চৌধুরী একটা বাঘ মেরেছে রাজাদাদা। ইয়া! শালা দশ-বার সেরের তো কম নয়।

লক্ষ্মীকান্ত বলিতেছিল—সন্ন্যাসী মুখের কথা নয়, বাবা। বাবা—ফলের পরখ শাঁসে রসে, সোনার পরখ হয় ক'ষে, সাপের পরখ তার বিষে, সন্ন্যাসীর পরখ হয় কিসে?

শূলপাণি ভোলানাথের হাতটা ধরিয়া বলে—আজ তো এ আসছে—ও আসছে—সে আসছে। কিন্তু মায়ের সেবার বন্দোবস্ত কে করেছে শুনি? তিন-শো পঁয়ষট্টি বিঘে নাথরাজ ক'রে দিয়েছে কে?

ভোলা এবার লক্ষ্মীকান্তকে বলে—সে মাছের রং কি দাদা? লাল-সেরাক্!

লক্ষ্মীকান্ত বলিতেছিল—আরে বাবা—দাড়ি রাখলে যদি সন্ন্যাসী হয়, তবে তো সকল মুসলমানই সন্ন্যাসী। চুল রাখলে যদি সন্ন্যাসী হয় তবে তো সকল স্ত্রীলোকই সন্ন্যাসী। ফল খেলে যদি সন্ন্যাসী হয় তবে তো বনের সকল বানরই—

বলিতে বলিতে সে চট্ করিয়া উঠিয়া পড়িল। তাহার নজরে পড়িল দেবীর মন্দিরের সম্মুখে কয়জন যাত্রী এদিক্-ওদিক্ ঘুরিতেছে। বোধ হয় প্রণামীও দিয়া থাকিবে।

শূলপাণি বলে—শ্যামাচরণ রায় নবাব-দরবারে ছিলেন নায়েব—তাঁরই হ'ল এই কীর্ত্তি। তিন-শো পঁয়ষট্টি দিনের জন্তে তিনশো পঁয়ষট্টি বিঘে নাথরাজ জমি। তাতেই তার নবাব-সরকারে চাকরি গেল। নবাব বলেছিল—শ্যামাচরণ রায় নিমখারাম—হারামজাদ, কিন্তু কলম জিন্দা। সে নাথরাজ আর রদ্ হ'ল না।

ভোলাও এবার উঠিয়া পড়িল। লক্ষ্মীকান্তের উঠিয়া যাওয়ার উদ্দেশ্য সে বুঝিয়াছিল। সে জানে ধরিতে পারিলেই এখানে আধা বখরা বন্দোবস্ত পাকা।

শ্রোতা না পাইয়া শূলপাণি উঠিয়া গেল মহান্তের নিকট। ধূনির সম্মুখে বসিয়া মহান্ত ভস্ম মাখিতেছিলেন। শূলপাণি পাশে বসিয়া কহিল—লক্ষ্মীকান্ত কে? ও কথা কয় কেন?

মহান্ত বলিলেন—সচ্ কথা ভাই। ওর একৃতিয়ার কি?

ভাণ্ডার-ঘরের শূন্য দাওয়ার উপর ট্যারা একা বসিয়া রহিল।

সহসা তাহার কোন্ খেয়াল হইল কে জানে—শূন্য গাঁজার কলিকাটা তুলিয়া লইয়া সজোরে এক দম দিল।

দিবসের অগ্রগতির সঙ্গে যাত্রীর ভিড় বাড়ে, সমারোহে কোলাহলে নির্জ্জন বনভূমি মুখরিত হইয়া উঠে। ট্যারা এদিক-ওদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ায়। বনের মধ্যে গাছতলায় দাঁড়াইয়া ভোলা অম্বলশূলের ঔষধ দেয়—বাবার ধূনির ভস্ম। বলে—খাওয়ার পর এক কাঁকর-ভোর চূণ—আর এই ভস্ম। ব্যাস্—ভাল হতেই হবে। খাওয়া বারণ—শাক, অম্বল, গুড়, ডাল। দাও মায়ের প্রণামী সওয়া দশ আনা।

ওদিকে লক্ষ্মীকান্ত দেয় মাদুলী। আদায় করে সওয়া পাঁচ আনা।

ট্যারা পিছন হইতে বলে—পরখা পড়ে গেল গো তোমার।

ঘাসের ভিতর হইতে সে তুলিয়া ধরে একটা সিকি।

ওদিকে বলিদানের বাজনা বাজিয়া উঠে। সকলের সঙ্গে ট্যারা আসিয়া দাঁড়ায়। শূলপাণি কাপড় সাঁটিয়া হাড়িকাঠে আবদ্ধ পশুটার ঘাড় দলিয়া সরু করিবার চেষ্টা করে। ভোলা ও লক্ষ্মীকান্ত পা ধরিয়া টানে। যাত্রীরা করজোড়ে সভয়ে চীৎকার করে মা—মা!

বলিদান হইয়া যায়। রক্তাক্ত প্রাঙ্গণ-তলে আঙুল চুবাইয়া লইয়া শূলপাণি লক্ষ্মীকান্ত ললাটে আঁকে ত্রিপুণ্ড্রক। ট্যারাও রক্তে তাহার ছোট আঙুল একটি ডুবায়। সে আশ্চর্য্য হইয়া যায়—রক্তটা গরম রহিয়াছে!

অপরাহ্ণের দিকে আবার দেবস্থলে জনসমাগম হয়। এখন আসেন স্থানীয় ভদ্রলোকের দল। লক্ষ্মীকান্ত, শূলপাণিও আসে! ভবানীরঞ্জন রায় জমিদার-বংশের সন্তান—সে আসে একখানা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র লইয়া। মজলিস করিয়া যুদ্ধের সংবাদ পড়া হয়।

পশ্চাৎপদ জার্ম্মানী—মিত্রপক্ষের অগ্রগমন—আকাশ হইতে বোমাবর্ষণ। প্রৌঢ় মহান্ত খাড়া হইয়া বসিয়া সাদা দাড়ীর গোছায় গালপাট্টা বাঁধেন। শুনিতে শুনিতে বলিয়া উঠেন—মরদ্‌কা কাম হ্যায়। গুলী ছুটে সাঁই সাঁই। কামান গর্জ্জাতা দনা ন-ন-ন!

ভবানীচরণ জিজ্ঞাসা করে—আপনি কোথায় কোথায় গিয়েছিলেন যুদ্ধে?

মহান্ত আপনার ক্ষতচিহ্নগুলি দেখিতে দেখিতে বলেন—ইজিপ্ট, মণিপুর, কাবুল। ইজিপ্টমে খুব জোর লড়াই হইয়েছিল। তাঁবু গাড়কে বৈঠে রহিলাম হামি প্রোগ্রাম রাত

দিন। দুষমনকে পত্তা মিলল না। কাপ্তেনসাব হুকুম করলো কি—চলো পথ তৈয়ার করনে হোগা। লেও কুলাড় আও পানিকে বর্ত্তন। হাবিলদার বল্লো—হুজুর, বন্দুক সাথমে লেই লিই। কাপ্তেনসাব আঁক পাকায়কে বোলা নেই। হামি লোক গেলাম এক মাইল। হুঁয়া জঙ্গল কাটকে পথ বনানে লাগলাম। এক ঘণ্টেকে বাদ ভাই—কোথাসে কে জানে আসিয়ে গেলো উঁটকে পর দুষমন। বিশঠো উঁট আর এক এক উঁটকে পর ছ-সাত আদমী। চারি দিক্‌সে তো ঘের কর লিয়া উ লোক। বাস্—বন্দুক চালায়া দাঁই দাঁই-দনা-দন্। কাপ্তেনসাব তো ঘোড়াকে পর ছুটা। হামরা ছুটলো পায়দলমে। বহুৎ আদমী হামাদের মর্ গেলো। তাঁবুমে আয়কে এক সিপাহী বন্দুক লে কে গোলী কর দিয়া কাপ্তেন কো।

ট্যারা এক পাশে বসিয়া অবাক্ হইয়া শোনে। বড় ভাল লাগে তাহার গোঁসাই-বাবার গল্প। বিশেষ করিয়া কামানের আওয়াজের ওই শব্দটি দনা-ন-ন-ন-ন। সে আপন মনেই মুখস্থ করে দনা-ন-ন-ন-ন, দনা-ন-ন-ন-ন।

* * *

তিন বৎসর পর।

দৃশ্যপটের পরিবর্ত্তন বিশেষ কিছু হয় নাই। একটা বড় শিরীষ গাছ মরিয়া শুকাইয়া গেছে। তেঁতুল গাছগুলার ডাল কাটা হইয়াছে। নিবিড় বনশোভা যেন ঈষৎ শীর্ণ হইয়া আসিয়াছে।

পরিবর্ত্তন হইয়াছে ট্যারার। আকারে সে অনেকটা বড় হইয়াছে। মাথার কোঁকড়ান চুলগুলি ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া হইয়া বড় হইয়াছে। চলে সে খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া।

লক্ষ্মীকান্ত বলে—ওরে বেটা এত গাঁজা খাস নে। শেষে রক্ত বমি ক'রে মরবি। গাঁজা খেয়ে বেটার পায়ের শিরায় টান ধরেছে দেখ।

ট্যারা হি হি করিয়া হাসে।

লক্ষ্মীকান্ত সেদিন বলিল—বেটা যদি গাঁজাই খাবি ত একটু ক'রে দুধ খাস। ছাগল-টাগল দুইয়ে নিয়ে—চোঁ করে এক চোক বুঝলি!—বলিয়া সে নিজেই হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। ঘরের ভিতর হইতে ভোলা বলিল—বেটা দিনরাত গাঁজা খাচ্ছে দাদা—দিন রাত। এখানে ত খায়ই—আবার কিনেও খায়। আজকাল মায়ের পেণামীর পয়সা চুরি করছে বেটা।

ট্যারা হাসিতে হাসিতে বলিল—ভাগে টোর কম পড়ছে নয়?

—আ—হা—হা!

ভোলানাথ চটিয়া উঠিয়া বলিল—দেখ দাদা দেখ, বেটা বাউরীর আস্পর্দ্ধা দেখ।

ট্যারা বলিয়া উঠিল—ডোব ব'লে সেই কথাটি। সে-ই।

ভোলা এবার অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া বলিল—মরবি—মরবি—বামুনের অভিশাপে মরবি তুই।

ট্যারা হাসিয়া উঠিল, বলিল—টোকে না দিয়ে লয়। টোকে লোব টবে যাব। টোর মট সাটটা বামুন জলপান করি আমি।

ওদিক হইতে মহান্তের আগমন-ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছিল। স্নানান্তে তিনি ফিরিতেছিলেন—মায়ী হামার আমার বুঢ়ী গো—কিরপা কর মায়ী গো—পাথরঢিপি গো! দয়াময়ী গো!

ট্যারা ছুটিয়া পলাইয়া গেল। কহিল—গোঁথাই বাবা আছে বাবা। বেটা ছেয়ালমারা রাগলে রক্ষে ঠাকবে না বাবা!

ভোলা কহিল—দিচ্ছি বলে দাঁড়া, গোঁসাই বাবাকে—গাল দাও তুমি। পলায়নপর ট্যারা ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—সেই কথাটি—সেই।—বলিয়াই সে বনান্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেল।

লক্ষ্মীকান্ত বলিল—যানে দেও ভেইয়া। বেটা বড় বদ্‌মাস্। চায়ের দেরি কত দেখ।

ভোলা বলিল—চা ত হ'ল দাদা, দুধের হয়েছে টানাটানি। গরুতে দুধ দিচ্ছে না ভাল। মায়ের ভোগ হবে, না চা হবে?

—কেন? গরুতে দুধ ছাড়ালে না কি?

—না দাদা, এই সবে কচি বাছুর। কে জানে কেন যে দুধ দেয় না। ঐ বেটা শালা ট্যারার হাতে পড়ে সব মাটি হ'ল। খেতেই দেয় না হারামজাদা। গরু চরাতে যাবে—তাও হাতে এক বাঁশী।

মহান্ত আসিয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি প্রশ্ন করিলেন,—কেয়া রে ভোলা?

লক্ষ্মীকান্ত বলিয়া উঠিল—আপনার যেমন কাণ্ড—ট্যারাকে

রেখেছেন গরুর সেবা করতে। ও বেটাকে তাড়ান, আজই তাড়ান। বেটা গাঁজাল বদ্‌মাস্। গরুকে খেতে দেয় না—গরুতে দুধ দিচ্ছে না।

ভোলা কহিল—বেটা মায়ের পেণামী চুরি করছে আজকাল। আপনাকে গাল দেয়, বলে শেয়ালমারা! বিশ্বাস না হয় জিজ্ঞাসা করুন এই দাদাকে।

মহান্ত ক্রোধভরে বলিলেন—ভাগা দেও হারামজাদ সয়তানকে! টে—ঢ়া—এ টেঁ—ঢ়া!

কোথায় ট্যারা!

দ্বিপ্রহরে বলির বাজনা বাজিয়া উঠিল। ট্যারা ঠিক আসিয়া হাজির হইয়াছিল। বলি হইয়া গেল। লক্ষ্মীকান্ত, শূলপাণি ললাটে রক্তের ত্রিপুণ্ড্রক আঁকিয়া লইল। ট্যারাও পড়িল লাফ দিয়া। বুকে মুখে সে বীভৎস ভাবে রক্তের ছাপ মারিতেছিল। উষ্ণ রক্ত বাতাসের শৈত্যে জমাট বাঁধিয়া আসিতেছিল। তাহারই খানিকটা তুলিয়া লইয়া ট্যারা ঘাটে গিয়া পরম তৃপ্তি সহকারে চাটিয়া চাটিয়া খাইতে বসিল। ভোলানাথ আসিয়াছিল ঘাটে। সে শিহরিয়া উঠিয়া বলিল—রাক্ষস—বেটা রাক্ষস রে!

ট্যারা হি-হি করিয়া হাসিয়া কহিল—টোর রক্তটও এমনি ক'রে খাব আমি।

ভোলা ক্রোধে তাহাকে তাড়া করিল। ট্যারা ঝাঁপ দিয়া পড়িল জলে। সাঁতার দিয়া গভীর জলে মুখ ফিরাইয়া ভোলাকে বলিল—কচ্ কচ্ ক'রে টোর হাড় মাস রক্ট খাব আমি।

দারুণ ক্রোধে ভোলা একটা ঢেলা তুলিয়া ছুঁড়িয়া মারিল।

সঙ্গে সঙ্গে টুপ্ করিয়া ট্যারা জলে ডুব দিল। উঠিল গিয়া প্রায় মধ্যস্থলে। মাথা নাড়িয়া জলসিক্ত ঝাঁকড়া চুল ঝাড়া দিয়া সে আবার বলিল—কচ্ কচ্ ক'রে খাব।

ভোলাও আবার প্রাণপণ শক্তিতে ঢেলা ছুঁড়িল। ট্যারাও সঙ্গে সঙ্গে ডুব দিল। এবার উঠিল সে ওপারের কাছাকাছি। পাড়ে উঠিয়া সিক্ত বস্ত্রে সিক্ত দেহেই সে জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিল।

দারুণ ক্রোধে ভোলানাথ আশ্রমে ফিরিয়া শুনিল—বনমধ্য হইতে ভাসিয়া আসিতেছে বাঁশের বাঁশির সুর।

ভোলা মহান্তকে গিয়া বলিল—বাবা, হয় আমাকে রাখুন—নয় আপনার ট্যারা থাকুক।

এই সময়ে জটাধারী আসিয়া বলিল—বাবা, ট্যারা আজ গরু খোলে নাই।

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া মহান্ত বলিলেন—যাও তুমি গরু লিয়ে যাও। টেঁঢ়ার জবাব হো গিয়েসে।

ভোগের ঘণ্টা বাজিল। ট্যারা কোথা হইতে আসিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানটিতে পাতা পাড়িয়া বসিয়া গেল। ভোলা মহান্তকে গিয়া বলিল—ওই দেখুন বাবা—খাবার সময় বেটা ঠিক হাজির হয়েছে।

মহান্ত চুপ করিয়া রহিলেন—কোন কথা বলিলেন না। খাওয়া শেষ হইয়া গেলে ট্যারাকে গম্ভীরভাবে ডাকিলেন—টেঢ়া—এখানে শুন্।

ট্যারা মাথা নীচু করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। মহান্ত বলিলেন—তুমি সয়তান বন্ গিয়েছ। তুমি মায়ীর পরণামী পয়সা চুরি কর। গরুর যতন কর না। গাঁজা খাও তুমি হরদম। তুমার জবাব হইল। কাম্ তুম্‌সে নেহি চলে গা।

ট্যারা খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার সময় গোশালার দিকে কোলাহল শুনিয়া মহান্ত ডাকিলেন—জটা—জটা—এ জটা!

জটাধারী আসিয়া বলিল—আজ্ঞে বাবা ট্যারা মহা হাঙ্গামা আরম্ভ ক'রে দিয়েছে।

প্রবল রোষে মহান্ত বলিলেন—মারো হারামজাদকে।

জটা বলিয়া গেল—ভোলাবাবা বল্লেন ওর জবাব হয়েছে তুই গরুগুলোকে ঘরে বাঁধ। গরু খুলতে গেলাম ত ট্যারা আমাকে মারতে আসছে—বলছে আমার কাজ তুই করবি কেন? আমি বল্লাম, তোর যে জবাব হয়েছে। বেটা বজ্জাত—বলে কি বাবা—জবাব দিয়েছে কে? মায়ের গরু মা ত জবাব দেয় নাই আমাকে। আমি যাব কেন?

মহান্ত হাঁকিলেন—টেঁঢ়া—এ টেঁঢ়া।

গোশালা হইতে উত্তর আসিল—জাই গো বাবা, গরু বাঁধছি আমি।

কিছুক্ষণ পরই সে আসিয়া দাঁড়াইল। মহান্ত বলিলেন—সয়তান বদ্‌মাস!

ট্যারা নীরব। মহান্ত আবার বলিলেন—চিম্‌টাকে মারে হাড্ডি তোড় দেগা হাম।

তবুও ট্যারা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ভোলা কহিল, কাণা-খোঁড়ার আশী দোষ বাবা। ও বেটা কাণা খোঁড়া দুই-ই।

মহান্ত বলিলেন—যাও সয়তানী করবি না। গাঁজা খাবি না। মন লাগাকে কাম করবি। ধর্‌ বেটা, ভোলাদাদাকে পায়ে ধর্‌।

ঢিপ করিয়া একটা প্রণাম করিয়া ট্যারা লাফাইতে লাফাইতে চলিয়া গেল। গোশালার প্রাঙ্গণে আপন মনেই আরম্ভ করে—লেফ—টারন্‌—ফু'ক্‌ ম্রাচ!

দিন দুই পর দ্বিপ্রহর রাত্রে ভোলা আসিয়া মহান্তের দ্বারে মৃদু করাঘাত করিয়া ডাকিল—বাবা—বাবা!

—কে—কৌন্‌ হ্যায়?

—আমি—ভোলা।

—কেয়া রে, এত্‌না রাতে।

—একবার উঠে আসুন।

দরজা খুলিয়া মহান্ত বলিলেন—কি?

আসুন একবার আমার সঙ্গে। চুপি-চুপি একটু।

গোশালায় গিয়া দেখা গেল, ঘরের দরজা খোলা। ঘরের দুয়ারে দাঁড়াইয়া ভোলা ফস্‌ করিয়া একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়া ফেলিল। সচকিত আলোকে দেখা গেল—ট্যারা একটি গাইয়ের পেটের তলে শুইয়া শান্ত সন্তানটির মত স্তন-লেহন করিতেছে। দেশলাইয়ের কাঠিটা নিবিয়া গিয়াছিল; পুনরায় একটা কাঠি জ্বালিয়া ভোলা দেখিল—বিশালদেহ মহান্তের হাতের মুঠার মধ্যে ট্যারা নির্জ্জীবের মত ঝুলিতেছে। বাহিরের প্রাঙ্গণে ট্যারাকে নিক্ষেপ করিয়া মহান্ত বলিয়া উঠিলেন—সয়তান—হারামজাদ!

পর মুহূর্ত্তেই লাফ দিয়া উঠিয়া সেই নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে ট্যারা কোথায় ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

* * *

তিন চার বৎসর পর আবার ট্যারাকে একদিন দেখা গেল এই দৃশ্যপটের মধ্যে। তাহার পরণে গেরুয়া, মাথায় ঝাঁকড়া চুলে দুই চারিটা জটাও দেখা দিয়াছে, কাঁধে ঝোলা, হাতে একটা আঁকাবাঁকা লাঠি।

অতি প্রত্যূষে সে মহাপীঠে প্রবেশ করিল। হাত-পা ধুইয়া প্রথমেই সে ঘা মারিল সেই ঘণ্টাটায়। আশ্রমে প্রবেশ করিয়া হাঁকিল—শিবরাম—শিবরাম। বম্‌—বম্‌ শঙ্ক—র!

ভোলা সবে তখন উঠিয়াছে। মহান্তের দরজাটা বন্ধ। ট্যারা মহান্তের দরজার সম্মুখে গিয়া ডাকিল—বাবা—গোঁছাই বাবা!

পিছন হইতে ভোলা প্রশ্ন করিল—কে—কে—কে হে তুমি?

মুখ ফিরাইয়া ট্যারা হাসিয়া বলিল চিন্‌টে পারছ না—ভোলা গোঁছাই?

সাশ্চর্য্যে ভোলা বলিল—আরে তুই বেটা কোত্থেকে রে? এ যে একেবারে সন্ন্যেসীর সাজ—এ্যাঁ?

ট্যারা হাসিয়া বলিল—টোকে আর পেনাম করব না।

তারপর আবার প্রশ্ন করিল—গোঁছাই বাবা কোটা গো?

—বাবার বড় অসুখ রে।

ট্যারা ডাকিয়া উঠিল—গোঁছাই বাবা!

বাধা দিয়া ভোলা বলিল—ডাকিস্‌ না—ডাকিস্‌ না!

ভিতর হইতে গম্ভীর কণ্ঠের দুর্ব্বল সাড়া উঠিল—ভোলা!

ভোলা দরজা ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। মহান্ত বলিলেন—জল—মুখ ধোনেকা জল দে বেটা। কৌন্‌ রে—উ-কৌন রে?

দরজার পাশ হইতে ট্যারার মুখ উঁকি মারিতেছিল। সে হাসিয়া বলিল—আমি গোঁছাই বাবা!

ভোলা কহিল—সেই বেটা ট্যারা। কোথা থেকে সন্ন্যেসী সেজে সকালবেলাতেই এসে হাজির।

মহান্ত বলিলেন—টেঁড়া? আরে এতনা রোজ কাঁহা ছিলিরে বেটা? আও—আও—সামনে আও বেটা—একবার দেঁখে।

সন্তর্পণে ট্যারা আসিয়া ঘরের একপাশে দাঁড়াইল। ভোলা জল আনিতে চলিয়া গেল বোধ হয়। ট্যারাকে দেখিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন—আরে বাচ্চা একদমসে সন্ন্যাসী হো গেয়া!

অল্পক্ষণ নীরবতার পর আবার তিনি বলিলেন—ছোড় দেও, ছোড় দেও—এ মতলব ছোড় দে বাচ্চা। সাদী কর—বিয়া কর—সন্‌সার পাতাও। রহ যাও সন্‌সার মে—রহ যাও বেটা।

ট্যারা গম্ভীরভাবে বলিল—টাই করব বাবা। আর ভাব না।

কয়টি কথা বলিয়াই সন্ন্যাসী পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। চোখ মুদিয়া তিনি নীরবে শুইয়া রহিলেন। ট্যারা বাহিরে আসিয়া ভোলাকে বলিল—ডাও, বাবাকে জল দিয়ে এছো!

ভোলা চড়াইয়াছিল চায়ের জল, সে বিরক্তিভরে কহিল—তু বেটা বস্ ঐখানে। বেটা আমার সোহং স্বামী এলেন। দোব, জল দোব। শুধু কি জল দিলেই হবে? বেটা বুড়ো দিন-রাত ঘরদোর কাপড় ময়লা করছে।

বকিতে বকিতে সে এক ঘটি জল মহান্তের কাছে নামাইয়া দিয়া আসিল। সন্ন্যাসীর কণ্ঠস্বর পাওয়া গেল—কাপ্‌ড়া কৌপীন বদল্ দে ভোলা।

বাহির হইতেই ভোলা উত্তর দিল—দোব গো দোব! চানের সময় দোব। ভাঁড়ারের কাজ সারি, দাঁড়াও।

এদিকে চায়ের আসর জমিয়া উঠিল। সেই শূলপাণি—লক্ষ্মীকান্ত সকলেই আসিয়াছিল। ট্যারাও আজ মজলিসের একজন সভ্য। আজ সমস্ত কথাই হইতেছিল ট্যারাকে লইয়া। সে গল্প করিতেছিল—কট ডায়গা গেলাম বাবা, হরিড্ডার, কাচী, বড্ডিনাথ, কামরূপ, অড্ডুচ্যা, ডারকা—কট ডায়গা বলে। কট টপস্যা করলাম বলে।

শূলপাণি ঘুরিয়াছে অনেক, সে প্রশ্ন করে—কোথা কি দেখলি বল দেখি?

লক্ষ্মীকান্ত গিয়াছিল কাশী, সে বলিল,—আচ্ছা কাশীর কথাই বলুক ত আগে।

ট্যারা হি-হি করিয়া হাসিতেছিল। কহিল—বিঠ্যনাথ—বড্ডিনাথ কট ঠাকুর, ঠব কি মনে থাকে?

ভোলা বলিল—বেটা পয়লা নম্বরের মিথ্যাবাদী। কই বল দেখি বদ্যিনাথের ক'টা হাত?

গম্ভীর ভাবে ট্যারা বলিল—টা—চার পাঁচটা হবে। কে ডানে বাবা—ডে অণ্ডকার মণ্ডির!

মহান্ত ডাকিতেছিলেন—ভোলা—ভোলা!

ভোলা বিরক্তি ভরে বলিল দাদা, জ্বালালে বেটা বুড়ো, মরেও না, বাঁচেও না। দাও এখন কাপড় ছাড়িয়ে দাও—ময়লা পরিষ্কার ক'রে দাও।

লক্ষ্মীকান্ত পরামর্শ দিল—সাড়া দিস্ না তুই।

কিছুক্ষণ পর দেখা গেল ট্যারা মহান্তের ঘর পরিষ্কার করিতেছে।

ভোলা খুশী হইয়া বলিল—বেশ করেছিস্। রোজ করবি। বুড়ো মলেই আমি মহান্ত হব—তোকে চেলা বানাব। বুঝলি!

ট্যারা ভেঙাইয়া কহিল—ডা-ডা বেটা চোর বামুন টোর চেয়ে আমি বড় সাচু। টোর চেলা কে হবে—ডাঃ!

স্বার্থের খাতিরে ভোলা কথাগুলো হজম করিয়া যায়।

অপরাহ্নের দিকে পূর্ব্বের মতই ভদ্রজন আসেন সব। ভবানীরঞ্জন এখনও তেমনি সংবাদপত্রখানি লইয়া আসেন। মহান্তের ঘরে প্রবেশ করিয়া ভবানীরঞ্জন বলেন,—আজ কেমন বাবা?

মহান্ত কি একটা লইয়া দেখিতেছিলেন, সেটা পাশে রাখিয়া দিয়া বলিলেন—মায়ী হামার পাথর টিপি দয়া করছেন নাই ভাই। জীউ যায় না দাদা।

প্রসঙ্গটা পরিবর্ত্তন করিবার জন্য ভবানীরঞ্জন বলিলেন—কি—দেখছিলেন কি? ওটা কি?

বস্তুটি তুলিয়া ধরিয়া মহান্ত নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতে দেখিতে বলিলেন—মেডিল। লড়াইসে মিলেয়েছিল ভাই।

* * *

বাহিরে ক্রমশঃ সংবাদপত্রের আসর জমিয়া উঠে। হাস্য-পরিহাসের কলরবের মধ্যে মাঝে মাঝে রুগ্ন মহান্তের কণ্ঠস্বর পাওয়া যায়—ভোলা ভোলা!

অবশেষে ডাকেন—টেঁটা!

সঙ্গে সঙ্গে আশ্বস্ত-কণ্ঠের সাড়া পাওয়া যায়—ধরো তো বেটা থুক্ দানীটো ধরো তো।

মাঝে মাঝে ট্যারার তম্বী শোনা যায় ভোলার উপর—সে বলে, ডাও না বেটা বামুন। টোমার কাড আমি করব কেন? ডেকবি কাল চলে যাব আমি গাঁয়ে।

ভোলা বলে—ওরে বেটা বাউরী, গোঁসাইয়ের সেবা করতে পাওয়া তোর ভাগ্যি।

ট্যারা রাগিয়া আগুন হইয়া উঠে। বলে—ডোব বামুনের নেটার মেয়ে। জাট টুলে কটা কও টুমি টোর বামুন! ভোখ বলে টোমার বিড্ডে?—তারপর সে আপন মনেই বকে—

মহান্ত হ'ল টো আমার কি—আমাকে কি রাতা করে ডেবে? পুণ্যি—পুণ্যি—টাই না আমার পুণ্যি। মরুক আর ঠাকুক—আর আমি ভাব না।

দ্বিপ্রহর রাত্রে মহান্ত ডাকেন—ভোলা—ভোলা!

ট্যারা সাড়া দেয়—বাবা—গোঁসাই-বাবা কি বল্‌টেন?

*　*　*

দিন-কয় পরে সত্য সত্যই ট্যারা গ্রামের মধ্যে চলিয়া গেল। স্বজাতির মধ্যে তাহার মহা সমাদর হইয়াছে। পুরাতন ভিটিতে সে নূতন ঘরের বনিয়াদ সুরু করিয়া দিল। খায় কিন্তু মহাপীঠে।

ভোলা বলে—এদিকে খাবার সময় ত আছ দিব্যি। মহান্তের সেবা করতে বুঝি মাথা ধরল?

ট্যারা বলে—টু কি করবি টু? মহান্ত বুঝি অমনি হবি?

খাওয়া-দাওয়ার পর সে একবার মহান্তের দুয়ারে উঁকি মারিয়া বলে—বাবা—গোঁছাই বাবা!

ক্ষীণকণ্ঠে মহান্ত বলে—টেঁড়া।

—হঁ বাবা। ঘর আরম্ভ করলাম বাবা। ডেম্বাল ভিটে লেগেছি।

মহান্ত বলেন—বানাও, ঘর বানাও। সাদী করো।

এক মুখ হাসিয়া ট্যারা বলে—করব বাবা, নোটনের মেয়ে পর্য্যাকে। ছব ঠিক হ'য়ে গিয়েঠে বাবা। খুব ছোন্দর।

*　*　*

দিন-কয় পর প্রভাতে সংবাদ রটিয়া গেল, মহাপীঠের সাধুবাবা গত রাত্রে দেহ রাখিয়াছেন।

দলে দলে গ্রাম-গ্রামান্তর হইতে লোক ছুটিয়া আসিতেছিল। খোল-করতালের ধ্বনির সহিত হরিনাম আকাশ স্পর্শ করিতেছিল। সাধু-বাবার সৎকার হইবে।

মহাপীঠের জঙ্গলের ও-প্রান্তে নির্জ্জন প্রান্তরে তখন কাঁদিতেছিল একজন। সে ট্যারা। একটা কাঁটা গাছের গুঁড়ির উপর বসিয়া সে আকুল ভাবে কাঁদিতেছিল—গোঁছাই-বাবা—গোঁছাই-বাবা গো!

এই গাছটার তলে বসিয়া সে গরু চরাইত। গরুগুলি দ্বিপ্রহরে আসিয়া এরই ছায়াতলে দাঁড়াইয়া নিমীলিত চোখে রোমন্থন করিত। নদীর কূল হইতে বকের সারি দূরান্তর যাইবার পথে এই গাছটির উপর বসিত।

সেদিনও তখন কয়টা বক এই শূন্য স্থানটায় কয়টা পাক মারিয়া শূন্যপথে রব করিতে করিতে চলিয়া গেল।

কোন্ অদৃশ্য অন্তরালে বসিয়া মঞ্চ-শিল্পী আলোকধারার রূপ পরিবর্ত্তন করিতেছিলেন। গাঢ় ছায়ালোকের নিবিড়তার মধ্যে সেই প্রান্তরের বুকে ট্যারা অদৃশ্য হইয়া গেল।

বাংলা ধর্ম্ম-সাহিত্যের উড়িয়া পদ-কর্ত্তা

শ্রীপ্রভাত মুখোপাধ্যায়

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অনুপম সৌষ্ঠব কেবল বাঙালীর চেষ্টাতেই ফুটিয়া উঠে নাই। সে-যুগের সাহিত্য অ-বাঙালীর নিকটও ঋণী। আজ কয়েকজন উড়িয়া পদকর্ত্তার বিষয় আলোচনা করিব। এখানে পদ-কর্ত্তা কথাটির অর্থ কিছু ব্যাপকভাবে ধরিয়া ধর্ম্ম-বিষয়ক কবিতা-লেখক মাত্রকেই বুঝাইতে চাই। বাংলা দেশ ও উড়িষ্যার সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে যোগাযোগের সূত্র বহু পূর্ব্ব হইতেই খুঁজিয়া পাওয়া যায়। উভয় দেশে সমাজ-ধর্ম্মের সাদৃশ্য ধর্ম্ম-সাহিত্যকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। পঞ্চগৌড়ের মধ্যে উৎকল অন্যতম। চৈতন্য-পূর্ব্ব বৈষ্ণব সাহিত্যে গীতগোবিন্দের স্থান অতি উচ্চে। প্রচলিত মতানুসারে জয়দেব অজয়-তীরস্থ কেন্দুলীতে বাস করিতেন। কিন্তু জয়দেবকে অনেক প্রাচীন গ্রন্থে উৎকলীয় বলা হইয়াছে।*

গীতগোবিন্দের পিণ্ডীক শ্রীচন্দন কৃত অনুবাদ বাংলা দেশে প্রায় অপরিচিত। কিন্তু উড়িষ্যায় তাঁর বইটির বিশেষ সমাদর। কবি জানাইতেছেন "দিব্য সিংহদেব নৃপতি

* এ-বিষয়ে গত বৎসর আশ্বিন সংখ্যার 'পঞ্চপুষ্পে' আলোচনা করিয়াছি।

শেখর"এর "যুগল চরণে পশিলি শরণ" সুতরাং "মানস হেউ যো অধীর"। তারপর পরিষ্কার বাংলায়

একদিন নন্দসনে কৃষ্ণ গোষ্ঠে ছিল
যমুনার তীরে নন্দ রাধাকে দেখিল। হে
নন্দ বলে শুন রাধা বচন আমার
গগন আচ্ছাদি মেঘ কৈল অন্ধকার। হে

অন্যত্র

উমাপতি ধর কবি বচন মঞ্জুল
পল্লবায়ে বিষ্ণুজন মানস কেবল। হে
সন্দর্ভ শুদ্ধ বচন অজজন হিতে
"শরণ" হৈল জয়দেব চরণতলাতে। হে
শরণ-বৎসল জয়দেব মহাশয়
রাখিল হৃদয়-মাঝে নাশি সেহ ভয়। হে

অথচ এদিকে এমন কথারও প্রয়োগ দেখি "নুয়াচোর পার হয়।" গীতগোবিন্দের মত "গোপীচাঁদের পালা"ও উৎকলবাসীর মন আকর্ষণ করিয়াছিল। সে পালার হাড়ী-পা বা হাড়ীগুরু যে-সে লোক নয় "গোরখর চেলি মুহি শুনেছি কর্ণরে।"*

বাংলা ও উড়িষ্যায় ভাবসঙ্গমের স্বর্ণযুগ আসিল চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে। যে বৈষ্ণব ধর্ম্ম এতদিন বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত অস্তিত্বের জন্য যুদ্ধ করিতেছিল, তাহার ভাবোচ্ছ্বাস সমস্ত দেশ মথিয়া তুলিল। আনিয়া দিল সে নূতন প্রেরণা, নূতন ভাবধারা—যার ফলে রাজাধিরাজ হইতে পথের ভিক্ষুক একই উদ্দাম আনন্দে মাতিয়া উঠিয়াছিল। রাজনৈতিক জীবনে তার ফল যতই শোচনীয় হোক্ না কেন, উড়িষ্যার ধর্ম্মজীবনে সেদিন এক নূতন যুগের সূত্রপাত হইল।

চৈতন্য-পূর্ব্ব যুগেও বৈষ্ণব ধর্ম্ম উড়িষ্যায় বিদ্যমান ছিল। চৈতন্য-পূর্ব্ব পন্থীরা চৈতন্যের শ্রেষ্ঠত্ব মানিয়া লইলেও গৌড়ীয় মতবাদ মানিয়া লন নাই। তাঁহাদের মধ্যে উৎকলের শ্রেষ্ঠ ভক্ত-কবি ভাগবতকার জগন্নাথ দাস, অচ্যুতানন্দ, যশোবন্ত, অনন্ত ও বলরাম দাস উল্লেখযোগ্য।† উড়িয়া বৈষ্ণব-গ্রন্থে ইঁহারা "মহাপুরুষ" বলিয়া কীর্ত্তিত।

* চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ও ভক্ত অচ্যুতানন্দ দাসের রচনাতে দেখি গোরখ বা গোরক্ষনাথের পূজাপদ্ধতি উড়িষ্যাতে তখনও প্রচলিত। তিনি—"গোরক্ষনাথঙ্ক বিদ্যা বীরসিংহ আজ্ঞা মল্লিকানাথঙ্ক যোগ বাউঁদি প্রতিজ্ঞা"র কথা বর্ণনা করিয়াছেন। মল্লিকানাথ বোধ হয় মীননাথ।

† "অনন্ত অচ্যুত আদি যশোবন্ত বলরাম জগন্নাথ
এ পঞ্চ সখাহি নৃত্য করি গলে গৌরাঙ্গচন্দ্র সঙ্গত"
—যশোবন্ত দাসের 'শিবস্বরোদয়'

মাত্র জগন্নাথ ও বলরাম দাসের সামান্য উল্লেখ আমরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব গ্রন্থগুলিতে পাই।* অথচ গৌড়ীয় মতাবলম্বী বলিয়া রামানন্দ, শ্যামানন্দ, মাধবী দাসীর প্রশংসায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা পঞ্চমুখ।

নানা কারণে মনে হয় উৎকলীয় ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মধ্যে মতের সহিত মনের মিলও ছিল না।† সুতরাং নীলাচল হইতে সুদূরে থাকিয়া লিখিত ও ভিন্ন মতবাদ (গৌড়ীয় শুদ্ধভক্তি ও উৎকলীয় জ্ঞানমিশ্র) সম্বন্ধে রচনাগুলিকে চৈতন্য-যুগের একেবারে সঠিক ইতিহাস বলিয়া ধরিয়া লওয়া উচিত নয়। চৈতন্যদেব তাঁহার সন্ন্যাস জীবনের তৃতীয়-চতুর্থাংশকাল উৎকলে কাটাইয়া গিয়াছিলেন তাহা মনে রাখিতে হইবে। অবশ্য 'প্রেজুডিস' যে একতরফা নয়, তাহা দিবাকর দাস প্রভৃতির রচনা হইতে বুঝা যায়। বাংলা ধর্ম্ম-সাহিত্যের উড়িয়া বৈষ্ণব কবিদের অধিকাংশই গৌড়ীয় মতাবলম্বী ছিলেন।

ভাষাগত সাদৃশ্য, বাংলা ধর্ম্ম-সাহিত্যে উড়িয়া লেখকদের আকৃষ্ট হইবার আর এক কারণ। মধ্যযুগের বাংলা বৈষ্ণব-সাহিত্যে এমন অনেক কথা দেখিতে পাই, যাহা বাংলা ভাষায় এখন অপ্রচলিত হইলেও উড়িষ্যায় ও উড়িষ্যার স্থায়ী বাসিন্দা কয়েকটি বাঙালীর কথিত ভাষায় এখনও ব্যবহৃত হয়; যেমন—শুয়া, ঠেঙ্গা, যাউ, হানি (মারিয়া ফেলিয়া), ভোক (ক্ষুধা), তেবে (তখন) ইত্যাদি। তা-ছাড়া, তুণ্ডি, আগু, ভেট, দণ্ডবত, বুলে প্রভৃতি কথা উড়িষ্যার বাংলা কথিত ভাষায় এখনও চলে।‡

* দেবকীনন্দন দাসের বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবদিগ্‌দর্শন প্রভৃতি গ্রন্থে। চৈতন্যচরিতামৃতে বোধ হয় একবার মাত্র 'মহাসোয়ার' বলিয়া জগন্নাথ দাসের উল্লেখ আছে।

† দিবাকর দাসের 'জগন্নাথ চরিতামৃতে' দেখিতে পাই, মহাপ্রভু জগন্নাথ দাসকে "অতিবড়" উপাধি দেওয়ায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা রাগিয়া বলিলেন

"পুরুষোত্তম ত ন খিবা কেউঁ আম্ভে ভক্তি করিবা ?
পূর্ব্বে গোবিন্দ লীলাস্থান চাল যিবা শ্রীবৃন্দাবন
প্রতি সম বৎসরে আসন্তি......
অতিবড়ী পদে রখন্তি লেউটি বৃন্দাবনে যান্তি"

"মতে"র অমিলের কথা ১৩৩৮ সালের আশ্বিন সংখ্যা 'প্রবাসী'তে ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি।

‡ মধ্যযুগের বাংলা ভাষা অনেকখানি শুদ্ধ অবস্থায় আজও এই কথিত ভাষায় দেখিতে পাই। কারণ আধুনিক বাংলা ভাষার তুলনায় ইহা আরবী, ফার্সী, পোর্তুগীজ প্রভৃতি ভাষার সংস্পর্শে সামান্যই আসিয়াছিল। এই বিষয়ে ভাষা-তত্ত্ববিদ্‌দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

অনেক উড়িয়া কবি বাংলা ও মৈথিলী ভাষার মিশ্রণে উদ্ভূত ব্রজভাষায় পদ রচনা করিতে ভালবাসিতেন।* "কৃষ্ণ প্রেমের নিধান" (চৈঃ চঃ) রায় রামানন্দের একটি পদের অংশ চৈতন্য-চরিতামৃত হইতে উদ্ধৃত করিতেছি—

পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গে ভেল অনুদিন বাড়ল অবধি না গেল
না সো রমণ না হাম রমণী দুহু মনে মনোভব পশিল জানি
এ সখী সে সব প্রেম কাহিনী কানু ঠামে কহব বিছরব জানি।

অকিঞ্চন দাস রামানন্দের 'জগন্নাথবল্লভ' নাটক বাংলায় অনুবাদ করেন। "বঙ্গ-সাহিত্য পরিচয়" ২য় ভাগে অনুবাদের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইয়াছে।†

তারপর 'শ্রীরাধার দাসী"দের মধ্যে গণিত ও জগতের সাড়ে তিন 'পাত্র"দের মধ্যে অন্যতম মাধবী দাসীর পালা। মাধবীকে বাংলা বৈষ্ণব-সাহিত্যের "মীরাবাই" বলা চলিতে পারে। তাঁহার রচিত "নীলাচল হইতে শচীরে দেখিতে আইসে জগদানন্দ' কিম্বা

কলহ করিয়া ছলা আগে পহু চলিগলা
ভেটিবার নীলাচলে রায়··· নিতাই বিরহ অনলে ভেল ধন্দ।

প্রভৃতি কয়েকটি চমৎকার পদ আছে। মাধবী ভণিতাযুক্ত 'রসোপুষ্টি মনোশিক্ষা' নামে একখানি বই পাওয়া গিয়াছে।‡

সদানন্দ দাস নামে একজন উড়িয়া কবি মহাপ্রভুকে "হরি নাম মূর্ত্তি" আখ্যা দিয়াছিলেন। চৈতন্যদাস সঙ্কলিত পদকল্পতরুতে একজন সদানন্দ দাস রচিত "অখিল ভুবন ভরি হরিনাম বাদর বরিখয়ে চৈতন্য মেঘে" একটি পদ আছে, তবে সেটি উড়িয়া সদানন্দের কিনা বলিতে পারি না।*

'বঙ্গ-সাহিত্য পরিচয়ে'র' ২য় ভাগে জগন্নাথ দাসের 'রসোজ্জল" হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত আছে। যেমন—

"শুন বিনোদিনী ধনী আমার কাণ্ডারী তুমি
তোমার কাণ্ডারী কহ কারে" ইত্যাদি।

তবে ইনি ভাগবতকার অতিবড়ী জগন্নাথ দাস নন।

'প্রতাপরুদ্র" ভণিতায় "প্রাচীন পুঁথির বিবরণে" (৩য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা) একটি পদ আছে।

"তোমার লাগিয়া রাধা তোমা আরাধিনু
মনের মানস জত সকল সাধীনু।" ইত্যাদি।

স্বয়ং মহাপ্রভু যাঁহাকে "পিতা জ্ঞানে নমস্কার কৈল" সেই 'কানাই খুটিয়ার" একটি পদ 'অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী"তে উদ্ধৃত দেখি, যথা—

মনচোরার বাঁশী বাজিও ধীরে ধীরে।"
শেষে— কানাই খুঁটিয়া কয় মোর মন হেন লয়
বাঁশী হৈল অবলা বধিতে।

বৈষ্ণব-সাহিত্যে সুপণ্ডিত ৺সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের মতে 'অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী'র "যে দেশে আছিল বাঁশী সে দেশে মানুষ নাই' পদটিও কানাইয়ের রচনা।†

যিনি রাধার নূপুর কুড়াইয়া পাইয়াছিলেন, সেই দুঃখী বা কৃষ্ণদাস 'শ্যামানন্দ' নামে বৈষ্ণব-চক্ষে সমাদৃত। তিনি "দীন কৃষ্ণদাস" "দীনহীন কৃষ্ণদাস" প্রভৃতি ভণিতায় অনেক পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। গুরু গৌরীদাসের সম্বন্ধে লিখিতেছেন—

প্রেমে লম্ফ ঝম্প যার পুলকিত হুহুঙ্কার
ক্ষেণেকে রোদন ক্ষেণে হাস
তাঁর পাদ পদ্ম রেণু ভূষণ করিয়া তনু
কহে দীনহীন কৃষ্ণদাস॥

শ্যামানন্দ দাস ভণিতাও আছে।

আছে শুধু প্রাণ বাকী তাও বুঝি যায় সখী
কি করব কি হবে উপায়।
শ্যামানন্দ দাসে কয় শ্যাম ত ছাড়িবার নয়
পায় যদি ধর গিয়া পায়।

---

* শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার History of Bengali Language and Literatureএ লিখিতেছেন—

"These poets (রায় রামানন্দ, মাধবী ইত্যাদি) found it easier to adopt Brajabuli, than Bengali, as the former had in it a profuse admixture of Hindi which people of all parts of India spoke and understood."

† অকিঞ্চন দাস কি উড়িষ্যাতে থাকিতেন? ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরীতে অকিঞ্চন দাস রচিত "ভক্তিরসাত্মিকা" পুঁথিটি রক্ষিত আছে। তাহাতে এমন লাইনও দেখিতে পাই—

"জয় জয় নিত্যানন্দ করুণা সাগর
কৃপা কর নিতাইচান্দ মো বড় পামর।"

‡ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১ম সংখ্যা ১৩৩৪।

* বাঙ্গালী সদানন্দ দাসেরা ছাড়া পণ্ডিত বিনায়ক মিশ্র মহাশয়ের "ওড়িয়া সাহিত্যের ইতিহাসে" এই সদানন্দ দাস নামেই আরও দুইজন ওড়িয়া কবির সন্ধান পাই।

† সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১ম সংখ্যা ১৩৩৪।

শুধু শ্যামানন্দ ভণিতার পদও দেখিতে পাই "অপ্রকাশিত পদরত্নাবলীতে"।

শ্যামানন্দ পহুঁ আনন্দ মন্দিরে কল্পতরুর মুলে
রসে ঢল ঢল বসিলা নাগরী শ্যাম নাগরের কোলে। ইত্যাদি।

শ্যামানন্দের পাঠান শিষ্য শালেবেগ বা চৈতন্যদাসের একটি পদ চৈতন্যদাস সঙ্কলিত পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত আছে; যথা— "হের হো নীলগিরি রাজহি" ইত্যাদি। "অপ্রকাশিত পদরত্নাবলীতে" আর একটি পদ পাই "সাল বেগ পিয় নিরখি লাবণি।" ইত্যাদি।*

শ্যামানন্দের আর এক শিষ্য রাজা রসিক মুরারীর জীবনী গোপী-জন-বল্লভ হরি-চরণ-দাস অর্থাৎ গোপী-বল্লভ দাস লিখিয়াছেন।

তাহা ছাড়া যদুমণি দাস, কাহ্নুদাস, চম্পতি রায় (ইনি কৃষ্ণ চম্পতি রায় ভণিতায় উড়িয়া সাহিত্যে পরিচিত), রায় দামোদর প্রভৃতি উড়িয়া কবিরা অল্পবিস্তর ব্রজবুলীতে পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। 'ক্ষণদাচিন্তামণি'তে নাকি এইরূপ কয়েকটি পদ আছে। রাজা রামচন্দ্র দেবের সভাপতি রায় দামোদর দাস—চম্পতি রায়ের একটি পদ হইতে সামান্য উদ্ধৃত করিতেছি—

দিবস তাপই তপন খরতর রজনী তাপই তি অই আ
চন্দন রজ চূত মন্দির কিছু নাহি সখী সুখই আ
পরম কারণ পরম দারুণ মনে মনমথ রহতি আ
পন্থ হেরি হেরি বিকল লোচন কমল লোচন না মিলে আ।†

তার বহু বৎসর পরে যখন ঢেঙ্কানাল-রাজ মর্হাট্টা আক্রমণ প্রতিহত করেন, তখন কবি ব্রজনাথ বড় জেনা সে ঘটনাকে উপলক্ষ্য করিয়া "সমর তরঙ্গ" লেখেন। তাহার স্থানে স্থানে ব্রজবুলীর প্রয়োগ দেখিতে পাই। এক স্থানে নারীদেহের বর্ণনা সুরুচিকর না হইলেও অনুপ্রাসের গুণে সুখপাঠ্য; যথা—

লোল অপাঙ্গী কাঞ্চন ভঙ্গী ভঙ্গী-তরঙ্গী সঙ্গীত-রঙ্গী
কটিতট ক্ষীণা জঘন-বিপীনা পিরীত প্রবীণা সুরত-নবীনা
কোকিল বাণী কাম নিশানী সুরতরঙ্গ জানি সুরতক (?) দানি
মঞ্জুল বেণী নীল সুকেশী নাগর ফাঁসী নাগরী-হাসি
যৌবন ভারী মোহন পিয়ারী হোঁকে তিআরী হে পটুয়ারী।

অধুনা-লুপ্ত 'বঙ্গবাণী' মাসিক পত্রিকায় (পৌষ ১৩৩৪) শ্রীগৌরীহর মিত্র মহাশয় আরও দুইজন উড়িয়া কবির সন্ধান দিয়াছেন। দ্বিজ সনাতন বিদ্যাবাগীশ সমগ্র দ্বাদশ স্কন্ধ শ্রীমদ্‌ভাগবত বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। ইনি অনুমান দুই শত বর্ষ পূর্ব্বে কটক জেলায় কবিরপুর পোষ্ট আফিসের অধীন পুরুষোত্তমপুর গ্রামে বিদ্যমান ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থশালায় নাকি ইঁহার একখণ্ড পুঁথি আছে। তিনি গ্রন্থশেষে লিখিতেছেন—

অষ্টম স্কন্ধেতে ভাগবত ভাষামতে
মৎস্য মনু কথা চতুর্বিংশতি অধ্যায়েতে
সাধুগণ হিতে বিরচিল সনাতন
পূর্ণ হইল অষ্টম স্কন্ধের বিবরণ।

দ্বিজ সারলকবি 'বৃহদ্ বিরাট' নাম দিয়া মহাভারতান্তর্গত "বিরাট পর্ব্ব" লইয়া লিখিয়াছেন। মৃতকর্ম্মে বিরাট পর্ব্ব পড়ার প্রথা বাংলা দেশে স্থানে স্থানে এখনও প্রচলিত আছে। কবি ভণিতায় বলিতেছেন—

সারলার পাদপদ্ম করিয়া স্মরণ
রচিল সারল কবি উৎকল ব্রাহ্মণ।

কবির অনুপ্রাসের দিকে ঝোঁক আছে—

ভারতীকে ভাবিয়া ভারত বিরচিল
সারল কবিরে সারদার কৃপা হৈল।

'বঙ্গসাহিত্য পরিচয়ে'র প্রথম ভাগে 'বৃহদ্ বিরাটে'র কিয়দংশ উদ্ধৃত হইয়াছে।

কটকের প্রসিদ্ধ 'প্রাচী' গ্রন্থশালায় একটি সচিত্র বাংলা পুঁথি আছে। গ্রন্থশালার ব্যবহর্তা শ্রীবিচ্ছন্দচরণ পট্টনায়েক মহাশয়ের সৌজন্যে সেই পুঁথিটি পড়িবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। কবির নাম কিশোরদাস। তিনি বাঙালী না উড়িয়া সেইরূপ কোন আত্মপরিচয় দেন নাই। তাঁহার ভণিতার নমুনা দিলাম।

দুঃখ ভার লয়্যা সনে প্রবেশিল নিজাসনে
বিহরণ করে সখা মিশি
বসি রত্ন পালঙ্করে তাম্বুল যোগান করে
কিশোর দাসে আনন্দে ভাসি —হে

* শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় সম্পাদিত Typical Selections from Oriya Literatureএ সালবেগের আরও কয়েকটি পদ আছে। তন্মধ্যে একটির ভণিতা উল্লেখযোগ্য—

"কহে সালবেগ হীন জাতিরে জটে যবন
রাধা কৃষ্ণ পদে চিত্ত রহিলা গো।"

† অধ্যাপক শ্রীআর্ত্তবল্লভ মহান্তী মহাশয় সম্পাদিত "প্রাচীন ওড়িয়া পদ্যাপদাদর্শ" হইতে

অন্যত্র ভণিতা—

গৌর গদাধর পাদপদ্ম করি আশে
'কীর্ত্তন উজ্জ্বল' কৈল শ্রী কিশোর দাসে।

কবি হবুঁ, করিথিলে, হইয়া, কংহ প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

"কবিকর্ণ" (ইনি চৈতন্য-চন্দ্রোদয়কার কবিকর্ণপুর নন্) রচিত সত্যনারায়ণের পালাগুলি উড়িষ্যার ঘরে ঘরে সমাদৃত; ইনি আত্মপরিচয় দেন নাই। তবে এঁর নাম শঙ্করাচার্য্য। পালাগুলির script কীর্ত্তনউজ্জ্বলের মত উড়িয়া।* বৈষ্ণব ধর্ম্মের ভাবাবেগ শিথিল হওয়ার পর বাংলা ধর্ম্মসাহিত্যে উড়িয়া পদকর্ত্তাও আর দেখা দিল না।

* একটি পালা হইতে কিঞ্চিৎ নমুনা দিতেছি। পালার নাম "মদগাজী বিভা" পালা।

"ফকির কহিলা দোঁহে শুন সাবধানে
যেরূপ তোমার কৃষ্ণ হৈল বৃন্দাবনে।
রাম রহমানে দোঁহে এক করি লেপ
আমি সে গোবিন্দরূপ চক্ষু মেলি দেখ॥"

উড়িয়া গোপাল দাস বনাম গোপাল উড়ের "ছেঁড়াচুলে বকুলফুলে খোঁপা বেঁধেছ?, প্রেম কি ঝালিয়ে তুলেছ" কিংবা "হায়রে দশা কি তামাসা, বাসার জন্যে ভাবছ কেনে। হৃদকমলে দিতে বাসা, আশা করে কতই জনে" প্রভৃতি গানগুলি ধর্ম্মসাহিত্যের পর্য্যায়ে পড়ে না। 'প্রবোধচন্দ্রিকা'র গ্রন্থকার (যাঁহার লেখার প্রসিদ্ধ নমুনা "উচ্ছলচ্ছিকরাত্যচ্ছ নির্ঝরাম্ভ কণাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে") মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার মহাশয় নাকি উড়িয়া ছিলেন। তবে তিনি বাংলা ধর্ম্মসাহিত্যের জন্য কিছু লিখিয়াছেন কিনা জানি না। স্বর্গীয় রাও মধুসূদন রাও মহাশয় কয়েকটি ব্রহ্ম-সঙ্গীত বাংলায় রচনা করিয়াছিলেন।*

* এই প্রবন্ধ রচনায় সাহায্য করার জন্য আমি সহাধ্যায়ী বন্ধু শ্রীপ্রতুলানন্দ সেন, বি-এ ও আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান সলিলকুমার মুখোপাধ্যায়, বি-এ এ দু-জনের নিকট ঋণী। প্রবন্ধ ছাপিতে দিবার পর রায় রামানন্দ, কিশোর দাস ও আরও কয়েক জনের অপ্রকাশিত পদের সন্ধান কটকে পাইয়াছি।

সিমলা কালীবাড়ি

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার

ইংরেজরা তাহাদের জাতীয় বিশেষত্বের পরিচয়-স্বরূপ একটা কথা বলিয়া থাকে যে, তাহারা পৃথিবীর যে অংশেই যাক্ না কেন, সেখানে একটা 'ক্রিকেট ক্লাব' আর একটা 'গির্জ্জা'র প্রতিষ্ঠা করে। আধুনিক বাঙালী যেখানে প্রবাসী হয়, সেখানে সর্ব্বপ্রথমে একটা 'অবৈতনিক' নাট্য-সমাজ প্রতিষ্ঠিত করে; কিন্তু পূর্ব্বে, প্রবাসে, তাহারা বাঙালী স্কুল ও লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত করিত, এবং স্বগণের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে কালীবাড়ি বা হরিসভা স্থাপিত করিত। বঙ্গের বাহিরের বাঙালীর এই সব প্রতিষ্ঠানগুলির ইতিহাসের ধারাবাহিক আলোচনা যে আধুনিক বৃহত্তর বাংলার ইতিহাস-রচনার একটা মুখ্য উপাদান, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বিগত শতাব্দীর প্রথম ভাগে, উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষে ইংরেজ-রাজত্বের প্রতিষ্ঠা ও ক্রমবিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে অনেক ভাগ্যান্বেষী শিক্ষিত বাঙালী ঐ অঞ্চলে যাইতে আরম্ভ করেন। তাহার কারণ, বাংলার বাহিরে তখনকার দিনে ইংরেজীনবীশ দেশীয় লোক ছিল না বলিলেও হয়, এবং ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলা দেশই সর্ব্বপ্রথম ইংরেজীপন্থী শিক্ষা ও সভ্যতা গ্রহণ ও আয়ত্ত করিয়াছিল। তাহার ফলে, সরকারী দপ্তরের কর্ম্মচারী হইতে সুরু করিয়া, জজ, হাকিম, জজ-পণ্ডিত, উকীল, স্কুল ও কলেজের শিক্ষক, ডাক্তার প্রভৃতি প্রায় সকলেই বাঙালী ছিলেন। ইংরেজী শিক্ষাপ্রাপ্ত বাঙালীর প্রতিপত্তি ভারতবর্ষের প্রায় সকল স্থানেই ছড়াইয়া পড়িয়াছিল

এবং তাহাদের সাহায্য ব্যতীত ইংরেজ-শাসনতন্ত্রের কল তখনকার দিনে অচল হইত।

কিন্তু সেই সময় যাতায়াতের সুবিধা ছিল না। রেলপথ তখনও তৈয়ার হয় নাই। ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অন্য



স্বর্গীয় অভয়াচরণ ব্রহ্ম

প্রান্তে যাইতে হইলে, হয় জলপথে নৌকায়, কিংবা স্থলপথে গরু বা ঘোড়ার গাড়ীতে যাইতে হইত। এখনকার ছয় দিনের পথ 'উত্তরিতে' তখন ছয় মাস লাগিত। একবার দূর বিদেশে গিয়া পড়িলে স্বদেশে ফিরিয়া আশা কষ্টকর ছিল এবং অনেক সময়েই অনেকের ভাগ্যে তাহা ঘটিয়া উঠিত না। অনেকেই তাই কর্ম্মস্থলে চিরস্থায়ী বসতি স্থাপন করিতেন। ইঁহাদের বংশধরগণও পুরুষানুক্রমে সেইখানেই বসবাস করিতেন। প্রবাসী বাঙালী দ্বারা বিদেশে অর্জ্জিত অর্থ সেইখানকার বিবিধ জনহিতকর কার্য্যে ব্যয়িত হইত। এই সব প্রবাসী বাঙালীর বংশধরগণ আজ যুক্তপ্রদেশ, পঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ, রাজপুতানা—এমন কি সুদূর সীমান্ত-প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে স্থায়ী বাসিন্দা হইয়া আছেন।

অভাবের তাড়নায় বা উন্নতি-কামনায় বাংলার স্নেহশীতল কোল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যে-সব বাঙালী অজানা পথের যাত্রী হইত, তাহারা যাইবার সময় বাঙালী জাতির বিশিষ্ট সভ্যতা ও সংস্কার, সামাজিক বৈশিষ্ট্য ও ধর্ম্মজীবনের চিরাচরিত স্বাতন্ত্র্যটুকু সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইত এবং সুযোগ পাইলেই বৈদেশিক আবহাওয়ার মধ্যেই তাহাদের সঞ্জীবিত করিয়া তুলিত। বৈদেশিক পরিবেষের মধ্যেও বঙ্গের বাহিরের বাঙালীর একটা নিজস্ব এবং স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র বাঙালী সমাজ—এক-একটি ছোটখাট বাংলা দেশ গড়িয়া উঠিত ও তাহার ফলে বাঙালী স্কুল, লাইব্রেরী, কালীবাড়ি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলি বাঙালীর স্বাদেশিকতা ও বৈশিষ্ট্যের পরিচায়করূপে অতি সহজেই জন্মলাভ করিত। বাঙালীর এই মনোবৃত্তির বাহ্যিক নিদর্শনস্বরূপ তাই আজ আমরা সিমলা শৈল, দিল্লী, আম্বালা, লাহোর, রাওয়ালপিণ্ডি, পেশোয়ার এবং এমন কি, মুসলমান রাজ্য আফগানিস্থানের রাজধানী কাবুলেও বাঙালী-প্রতিষ্ঠিত ও বাঙালী-পরিচালিত কালীবাড়িগুলি দেখিতে পাই। বাঙালী স্কুল, কলেজ, লাইব্রেরীর ত কথাই নাই। এই সম্পর্কে সে-কালের 'প্রদীপ' ও 'প্রবাসী' ও একালের 'উত্তরা'র নাম অনেকেরই মনে পড়িবে।

এইখানে একটা কথা পরিষ্কার করা দরকার। শুধু হিন্দুধর্ম্মানুগত পূজার্চ্চনা বা ক্রিয়াকলাপাদির অনুষ্ঠানের সুবিধা-প্রদান যে এই সব কালীবাড়ি প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য ছিল,



স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

তাহা নয়। জন্মভূমির ক্রোড়চ্যুত বাঙালীদের পরস্পরের মধ্যে সামাজিকতা ও সৌহার্দ্দ্যের আদান-প্রদান, স্নেহপ্রীতির

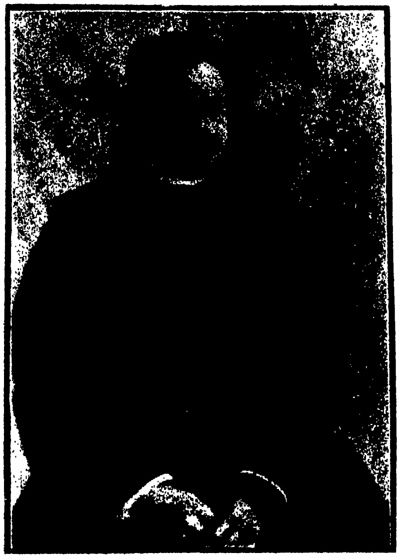


সিমলা কালীবাড়ির কারুকার্য্যখচিত প্রস্তর-নির্ম্মিত মন্দির

যোগসূত্র-বন্ধন এবং জাতীয় চরিত্র প্রস্ফুরণের জন্য একটি সাধারণ মিলনকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা এই সকল প্রতিষ্ঠানের অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। বঙ্গের বাহিরের যে-সব বাঙালী বিগত শতাব্দীর প্রারম্ভে এই সকল প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে বিদেশে বাঙালীর নিজস্ব সভ্যতা ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবার স্থায়ী ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের নিকটে বর্ত্তমানের প্রত্যেক প্রবাসী বাঙালী চিরকৃতজ্ঞ থাকিবেন।

এই প্রবন্ধে আমি ভারত-সরকারের গ্রীষ্মকালের রাজধানী সিমলা-শৈলস্থ বাঙালী প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত কালীবাড়ির কথা বলিব। বঙ্গের বাহিরে, এক বৃন্দাবনে অবস্থিত বাঙালী প্রতিষ্ঠানগুলি ব্যতীত, সিমলা কালীবাড়ির মত বাঙালীর নিজস্ব এমন একটি বিরাট প্রতিষ্ঠান আর কোথাও আছে বলিয়া আমার জানা নাই। অতীতের কোন্ শুভ মুহূর্ত্তে এই কালীবাড়িটি প্রথম রূপ ধারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহার জন্মপত্রিকা কেহই লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই। তবে, যতদূর জানা যায় তাহা এ যে, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে গুর্খাযুদ্ধে জয়ী হই ইংরেজরা সিমলা-শৈল অধিকার করে এবং ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে নবার্জ্জিত প্রদেশটি জরিপ করিবার জন্য তাহারা কলিকা হইতে কয়েক জন সামরিক কর্ম্মচারীদ্বারা গঠিত যে জরিপদল সিমলায় প্রেরণ করে, তাহার সঙ্গে ভুবনমোহন বন্দ্যোপাধ্যা রামগতি সান্ন্যাল, বৃন্দাবন হালদার, হরিশচন্দ্র রায়, গোবিন্দচন্দ্র হালদার প্রভৃতি কয়েক জন বাঙ্গালী কেরাণীও নক্সা এবং নকলনবীশরূপে সিমলায় আসেন। সিমলা তখন হিংস্রজন্তু-পরিপূর্ণ ভীষণ অরণ্য ছিল। এখন যেখানে ভারত-সরকারের 'রেলওয়ে বোর্ড' দপ্তরের বিরাট অট্টালিকা সগর্ব্বে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, তাহারই নিকটে কোন এক স্থানে এই জরিপ-দলের শিবির স্থাপিত হয়। জনপ্রবাদ, বর্ত্তমানে যেখানে কালীবাড়ি রহিয়াছে, সেখানে তখন এক সুবৃহৎ দেবদারু বৃক্ষতলে এক গুহার মধ্যে একজন তান্ত্রিক সাধু চণ্ডীদেবীর বিগ্রহ স্থাপন করিয়া তাহার পূজার্চ্চনাদি

করিতেন। অলৌকিক শক্তির অধিকারী বলিয়া এই সাধু স্থানীয় পার্ব্বত্য অধিবাসী ও গুর্খাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সম্মানভাজন ছিলেন। সেই সময়ে বাংলা দেশ হইতে ভারতের অন্যান্য অংশে তন্ত্রশাস্ত্রের যথেষ্ট প্রচার হইতেছিল



স্বর্গীয় রায়বাহাদুর শ্রীশচন্দ্র মিত্র

বলিয়া অনেকে অনুমান করেন, সাধু জাতিতে বাঙালী ছিলেন। জরিপদল সিমলায় আসিবার দুই তিন বৎসরের মধ্যেই সাধু দেহরক্ষা করিলে ভুবনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ জরিপদলের কয়জন বাঙালী গুহার নিকটে একটি কাষ্ঠনির্ম্মিত মন্দির প্রস্তুত করাইয়া তাহাতে সাধুর চণ্ডীবিগ্রহ ও তাহার পার্শ্বে একটি কালীমাতার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করাইয়া তাহাদের দৈনিক পূজার্চ্চনার ভার গ্রহণ করেন। তখন হইতে এই মন্দির 'কালীবাড়ি' বা স্থানীয় ভাষায় 'মাইজীকা মন্দর' নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে।

ইহার কিছুদিন পরে কালীবাড়িতে 'শ্যামলা' দেবীর বিগ্রহ ঘটনাচক্রে আনীত হয়। এই শ্যামলা দেবীর নাম হইতেই স্থানটির নাম প্রথমে 'শ্যাম্‌লা', পরে লোকমুখে রূপান্তরিত হইয়া 'সিমলা'য় পরিণত হইয়াছে। কালীবাড়িতে শ্যামলা দেবীর বিগ্রহ আনয়ন সম্বন্ধে যে মনোহর কাহিনীটি প্রচলিত আছে, তাহার উল্লেখ বোধ হয় এইখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সিমলা শৈলশ্রেণীর উচ্চতম শৃঙ্গ 'জ্যাকো হিল্' বা যক্ষ পর্ব্বতের গায়ে—আজ যেখানে 'রথনি ক্যাসেল্' নামক সুবৃহৎ অট্টালিকা অবস্থিত, তাহারই সীমানার মধ্যে কোনও স্থানে শ্যামলা দেবীর মন্দির ছিল। ১৮৩৪ সালে এক ইংরেজ বসতবাটি নির্ম্মাণের জন্য মন্দির ও তৎসংলগ্ন ভূমি ক্রয় করেন। গৃহনির্ম্মাণের সময় তাঁহার আদেশে মন্দিরটি ভাঙিয়া সমভূমি করান হয় ও শ্যামলা দেবীর বিগ্রহটি খাদে' নিক্ষিপ্ত হয়। তাহার পর গৃহপ্রবেশের প্রথম রাত্রি হইতে প্রতিরাত্রে গৃহস্বামী স্বপ্ন দেখিতে থাকেন যেন রক্তাম্বরবিভূষিত একদল অশ্বারোহী সেনা উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে তাঁহাকে হত্যা করিতে আসিতেছে! উপর্য্যুপরি কয়েক দিন এই একই রূপ স্বপ্নদর্শনে সাহেবের মনে ভীতির সঞ্চার হয়। তিনি তখন তাঁহার হিন্দু অনুচরদের পরামর্শ-মত শ্যামলা দেবীর বিগ্রহ খাদ্ হইতে উঠাইবার ব্যবস্থার জন্য এবং বিগ্রটিকে কোনও মন্দিরে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করাইবার জন্য সমস্ত ব্যয়ভার



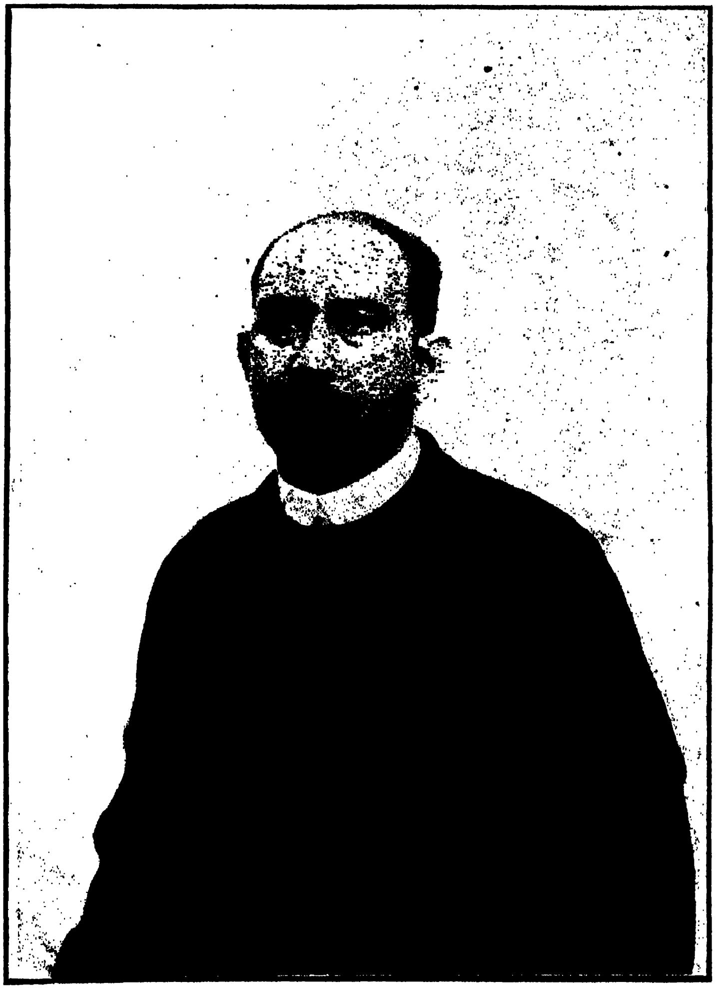
রায় চারুচন্দ্র সরকার বাহাদুর

বহন করিতে স্বীকৃত হন। কথাটা ক্রমশঃ স্থানীয় হিন্দু অধিবাসীদের নিকট ছড়াইয়া পড়ে। উত্তর-পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন স্থানে যে-সকল কালীবাড়ি আছে, তাহাদের অনেকেরই মূলে ছিলেন রামচন্দ্র ব্রহ্মচারী নামক একজন বাঙালী পরিব্রাজক। ঘটনাক্রমে ব্রহ্মচারী-মহাশয় ঐ সময় সিমলায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহার এক

জরিপদলের অন্যতম কর্ম্মচারী ভুবনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অশ্রান্ত চেষ্টার ফলে ১৮৩৫ সালে খাদ্‌ হইতে শ্যামলা দেবীর বিগ্রহের উদ্ধার সাধিত হয় ও যথারীতি অভিষেকান্তে কালীবাড়িতে বিগ্রহটির পুনঃ প্রতিষ্ঠা করান হয়। অভিষেকের ও তাহার আনুষঙ্গিক সকল ব্যয় সাহেব বহন করিয়াছিলেন। তখন হইতে শ্যামলা দেবীর বিগ্রহ সিমলার কালীবাড়িতে পূজিত হইতেছে।

১৮৪৩ সাল পর্য্যন্ত উল্লেখযোগ্য আর কোনও কথা জানা যায় না। ঐ বৎসরে কিন্তু ভারত-গবর্ণমেণ্টের দপ্তরের সঙ্গে অনেক বাঙালী কর্ম্মচারী সিমলায় আসেন। তাঁহারা দেখেন যে কালী-মন্দিরের স্থায়ী সেবাইতের কোনও ব্যবস্থা নাই এবং মন্দিরটির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। নবাগত বাঙালীদের উদ্যমে ও অর্থে মন্দিরটির কেবলমাত্র জরুরি সংস্কার-কার্য্যে হাত দেওয়া হয়। মন্দির-নির্ম্মাণ, সংস্কার ও রক্ষণের তহবিলের সেই প্রথম সূচনা হয়। এই তহবিলে ইন্দোরের মহারাজ হোল্‌কার ও সিমলা জিলার কয়েক জন পার্ব্বত্য স্বাধীন ভূপতি অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন। এই অর্থের সাহায্যে অল্পদিনের মধ্যেই জরাজীর্ণ কাষ্ঠনির্ম্মিত মন্দিরের স্থানে 'ধজ্জি'* নির্ম্মিত একটি মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং মন্দিরের দৈনিক পূজার্চ্চনা ও স্থানীয় বাঙালীদের দশকর্ম্মাদি সম্পন্ন করাইবার জন্য একজন বাঙালী পুরোহিত স্থায়িভাবে নিযুক্ত হন।

আজকাল সিমলায় অনেক হোটেল ও দোকানপত্র হইয়াছে। কোনও বাঙালী ভদ্রলোক এখন সিমলায় সপরিবারে বেড়াইতে আসিলেও স্থান ও আহারের জন্য বিশেষ অসুবিধা ভোগ করেন না। পূর্ব্বে কিন্তু উপযুক্ত আশ্রয়স্থানের অভাবে সকলকেই অত্যন্ত বিপদে পড়িতে হইত। এই অসুবিধা দূর করিবার উদ্দেশ্যে, এবং বাঙালী অতিথি-অভ্যাগতদের অস্থায়ী আশ্রয় দান করিবার জন্য,



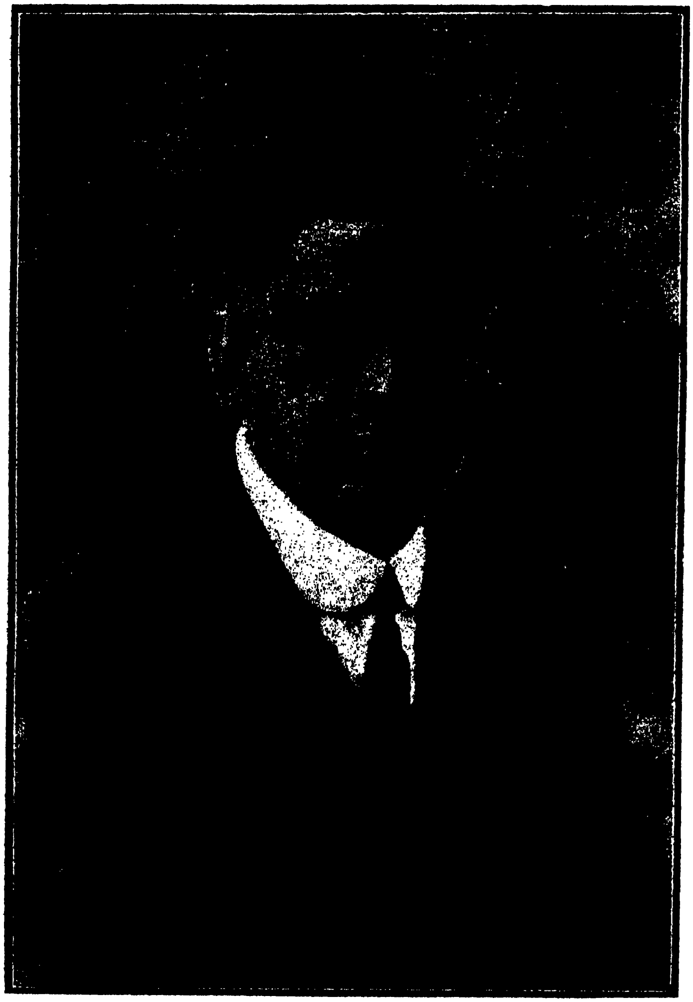
স্বর্গীয় হরিদাস গুপ্ত

মন্দিরের পার্শ্বেই তখন একখানি স্বতন্ত্র বাড়ি নির্ম্মিত হয় এবং তাহার একাংশে পুরোহিত মহাশয়ের থাকিবার স্থানও নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। তখন হইতে মন্দির ও তৎসংলগ্ন অতিথি মহলটির সংস্কার ও সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ স্থানীয় বাঙালীরা নিজেদের মধ্য হইতে চাঁদা করিয়া তুলিয়া আসিতেছেন।

উদ্যমের শিথিলতায় ও অর্থ এবং সংস্কারের অভাবে মন্দির ও

* কাঠের 'ফ্রেমে' বাড়ির কাঠামো তৈয়ার করিয়া পাথর ও মাটির দ্বারা ফাঁক ভরাট করিয়া ধজ্জির বাড়ি নির্ম্মিত হয়।

অতিথি-মহলটি কয়েক বৎসরের মধ্যেই পুনরায় জীর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়। ১৮৯০ সালে স্থানীয় বাঙালী সমাজের তৎকালীন নেতৃস্থানীয় অভয়াচরণ ব্রহ্ম মহাশয় ও উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মন্দির ও তৎসংলগ্ন অতিথি-মহলটির সংস্কারে হাত দেন।



স্যর ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র, কে-সি-এস-আই, কে-সি-আই-ই, সি-বি-ই

ইঁহারা দুইজনেই ভারত-গবর্ণমেণ্ট প্রেসে উচ্চপদে কর্ম্ম করিতেন। তাঁহাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে পুনরায় মন্দিরের সংস্কার সাধিত হয় এবং অতিথি-মহলটি একোধারে পঙ্গু ও অব্যবহার্য্য হইয়া পড়ায় তাহাকে ভূমিসাৎ করিয়া তাহার স্থানে 'ধজ্জি'-নির্ম্মিত একটি ত্রিতল বাড়ি নির্ম্মিত হয়। অভয়াবাবু ও উমেশবাবুর এই মহৎ কার্য্যে শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা, অর্থ ও গৃহ নির্ম্মাণের উপকরণাদি বিনামূল্যে বা অল্পমূল্যে সংগ্রহ করার দ্বারা এবং অন্যান্য নানা বিষয়ে সাহায্যদানদ্বারা আর একজন অক্লান্তকর্ম্মী সহায়তা করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম এখানে উল্লেখ করা উচিত; তিনি কালীবাড়ির তদানীন্তন পুরোহিত পণ্ডিত কালিকানন্দ ভট্টাচার্য্য।

১৮৯০ সালে অভয়াবাবু ও উমেশবাবুর চেষ্টায় কালীবাড়ির স্বার্থ ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত স্থানীয় হিন্দু জনসাধারণের এক সভা আহূত হয় এবং তাহাতে কালীবাড়ির কার্য্য পরিচালনার জন্য সর্ব্বপ্রথম একটি কালীবাড়ি পরিচালক-সমিতি গঠিত হয় এবং এই সমিতির হাতে কালীবাড়ি সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। সেই সভায় অভয়াবাবু ও উমেশবাবু নবগঠিত সমিতির প্রথম সভাপতি ও প্রথম সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন। তাঁহাদের সময়ে নানা বিষয়ে কালীবাড়ির যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। তাঁহাদের স্মৃতি সিমলা-প্রবাসী সকল বাঙালীর চিত্তে চির-জাগরূক থাকিবে।

বিগত শতাব্দীতে সিমলায় বাঙালীর কালীবাড়ির প্রতিষ্ঠার মূলে অজ্ঞাতনামা একজন বাঙালী সাধু ও ভুবনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, এবং তাহার স্থায়িত্বের ভিত্তিগঠনে অভয়াচরণ ব্রহ্ম মহাশয় ও উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং পণ্ডিত কালিকানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয়। তাঁহাদের পবিত্র স্মৃতি অক্ষয় হইবে।

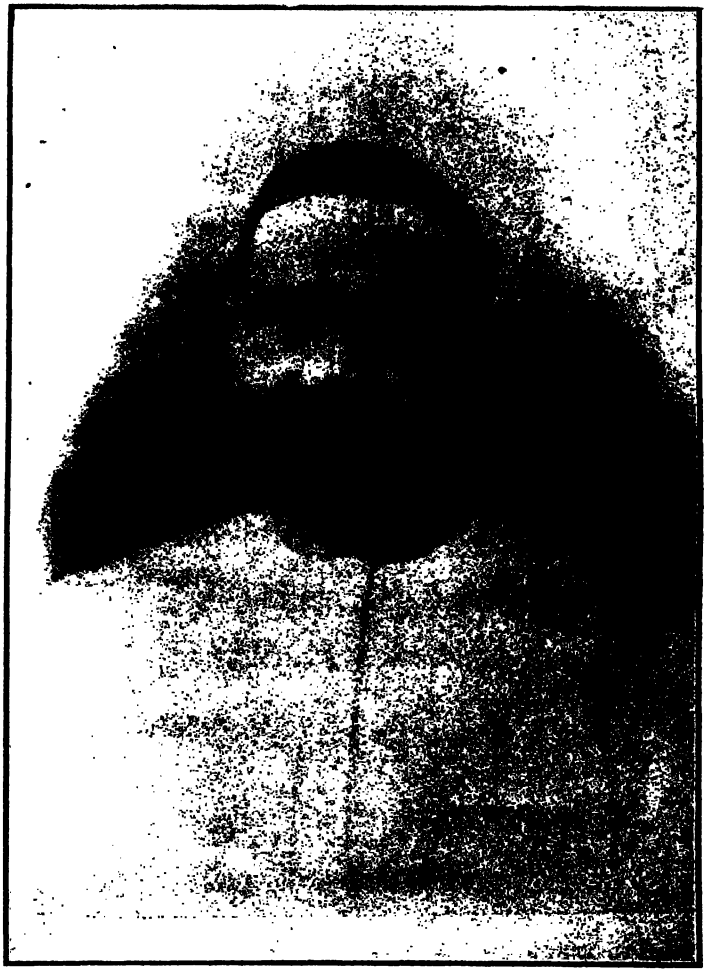
"... ... ...shall be
An echo and light unto eternity !"

ইহার পরের ইতিহাস, কালীবাড়ির উত্তরোত্তর উন্নতির ইতিহাস। কালীবাড়ির প্রথম অধিবেশনের কথা উপরে বলিয়াছি। তাহাতে গণতন্ত্রের বীজ বপন করা হইয়াছিল।

তাহার ফলে সিমলা-প্রবাসী বাঙালীরা কালীবাড়ি সম্বন্ধে ক্রমশঃই আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিতেছিলেন। ১৮৯৯ সালের এক সাধারণ অধিবেশনে কালীবাড়ির ভবিষ্যৎ পরিচালন সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

১৯০৩ সালে রায় শ্রীশচন্দ্র মিত্র বাহাদুরের সম্পাদকত্বের সময় কালী-বাড়ির স্থায়িত্ব ও ভবিষ্যৎ সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হয়। সেই সময়ে স্বনামধন্য স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্যর রাসবিহারী ঘোষ কার্য্যোপ-লক্ষে সিমলায় আসেন ও সিমলা কালীবাড়ির অবস্থা দর্শনে যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হন। তাঁহাদের দ্বারা 'খসড়া' প্রস্তুত করাইয়া শ্রীশবাবু কালীবাড়ির স্বার্থ ও সম্পত্তির স্থায়ী সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে একটি 'ট্রাষ্ট ডীড' (দলিল) আইনানুসারে রেজিষ্ট্রী করাইয়া লন। কালীবাড়ি পরিচালক সমিতি এই দলিল অনুসারে কালীবাড়ির সমস্ত সম্পত্তি কালীবাড়ির 'ট্রাষ্টী' সঙ্ঘে ন্যস্ত করিয়া দেন। কালীবাড়ির প্রথম 'ট্রাষ্টী' রায় চারুচন্দ্র সরকার বাহাদুর অল্প দিন হইল পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি ভারত-গবর্ণমেণ্টের স্বরাষ্ট্র-বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন।

কিছুদিনের মধ্যে মন্দির ও নাট-মন্দিরের অবস্থা পুনরায় অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়ে। অবশেষে তাহাদের অবস্থা এমন হয় যে, আর সংস্কার না করিলে চলে না। ১৯১০ সালে, অশেষ চেষ্টার পর, কালীবাড়ির তদানীন্তন সম্পাদক হরিদাস গুপ্ত মহাশয় এই সংস্কার সাধন করিতে বদ্ধপরিকর হন। সেই সময়কার সিমলা-প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে রায় চারুচন্দ্র সরকার বাহাদুর, রায় অবিনাশচন্দ্র কোঙার বাহাদুর, আই-এস্-ও, শ্রীযুক্ত স্যর ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র, কে-সি-এস্-আই, কে-সি-আই-ই, সি-বি ই, ডক্টর্ শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, রায় দাশরথি বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর, রায় কালিচরণ দত্ত বাহাদুর, শ্রীযুক্ত জানকীনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অবিনাশচন্দ্র নন্দী, শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কানাইলাল দত্ত, কেশবচন্দ্র রায়, সি-আই-ই প্রভৃতি কয়েক জন ভদ্রলোকের সাহায্যে হরিদাসবাবু ১৯১২ সালে মন্দিরের সংস্কারকার্য্যে হাত দেন। উপরোক্ত ভদ্রমহোদয়গণের মধ্যে অনেকেই মন্দির-নির্ম্মাণ তহবিলে যথেষ্ট অর্থসাহায্য করেন। কিন্তু, ১৯১৩ সালে হরিদাসবাবু এলাহাবাদে



স্বর্গীয় কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

বদ্‌লি হইলে সংস্কারকার্য্য বন্ধ হইয়া যায়। পরবর্ত্তী সম্পাদক কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অসাধারণ চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের ফলে ১৯১৫ সালে পুরাতন, জরাজীর্ণ কাষ্ঠ-নির্ম্মিত নাটমন্দিরের স্থানে বর্ত্তমানের প্রস্তর-নির্ম্মিত প্রশস্ত নাটমন্দিরটি প্রস্তুত হয়। ইহার পর কালিদাস বাবুরই উদ্যোগে ১৯১৮ সালে মন্দিরের বর্ত্তমান সুরম্য, প্রস্তর-গঠিত অট্টালিকার নির্ম্মাণকার্য্য সম্পন্ন হয়। এই কার্য্যে তিনি যে-দুই জন অক্লান্তকর্ম্মা সাহায্যকারী পাইয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম অমূল্যচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও বেচানাথ ঘোষাল। ইঁহাদের নিঃস্বার্থ সহায়তা ব্যতীত এত শীঘ্র এই সুবৃহৎ কার্য্যটি সুসম্পন্ন হইত কিনা সন্দেহ। এই দুই জন ব্যতীত আর যাঁহারা কালিদাস বাবুকে সাধ্যমত সাহায্য করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন শ্রীযুক্ত কাশীনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মিশ্র, শ্রীযুক্ত দয়ালচাঁদ মুখোপাধ্যায়, রায় সাহেব গয়াচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মন্দিরের তদানীন্তন পুরোহিত শ্রীযুক্ত দেবীচরণ ভট্টাচার্য্য মহোদয়গণ।



কালীবাড়ির নব-নির্ম্মিত সুরম্য অতিথি-ভবন

মন্দির ও নাটমন্দিরের পুনঃ নির্ম্মাণের সহয়তাকল্পে সিমলার তদানীন্তন প্রায় সকল বাঙালীই যথাসাধ্য অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহারা ব্যতীত আর যাঁহারা ঐ বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে নিম্নোক্ত কয় জনের নাম সমধিক উল্লেখযোগ্য। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত জনাইডিহি গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত মুকুন্দলাল লায়েক মহাশয়ের বদান্যতায় দেড় হাজার টাকা ব্যয়ে নাটমন্দিরের অঙ্গনটি এবং ১৯১৩ সালে শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দানে মন্দিরের পরিক্রমার স্থান মর্ম্মরপ্রস্তর-মণ্ডিত হইয়াছে। ১৯২৪ সালে দিল্লীর সুপ্রসিদ্ধ কণ্ট্রাক্টর্ শেঠ আলোপী প্রসাদ মহাশয় সাত হাজার টাকা ব্যয়ে মন্দিরের মধ্যে দেবীর বিগ্রহ স্থাপনের জন্য মর্ম্মররচিত একখানি অপূর্ব্ব সুন্দর পদ্মাসন প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছেন। ১৯৩০ সালে সিমলা জেলার অন্তর্গত জুব্বল রাজ্যের স্বাধীন নৃপতি রাণাসাহেব পাঁচশত টাকা ব্যয়ে নাটমন্দিরের অলিন্দে দুইটি মর্ম্মরস্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। পর বৎসর জয়পুরের বর্ত্তমান মহারাণী মহোদয়ার বদান্যতায় দেড় হাজার টাকা ব্যয়ে মন্দিরের জন্য দুইখানি রজতমণ্ডিত দ্বার নির্ম্মিত হইয়াছে।

১৯২৫ সালের শেষভাগ হইতে ১৯৩০ সাল পর্য্যন্ত রায়-সাহেব শ্রীযুক্ত শৈলেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কালীবাড়ির সম্পাদক ছিলেন। ১৮৯০ সালে নির্ম্মিত মন্দিরসংলগ্ন জীর্ণ অতিথি-মহলটির পুনর্নির্ম্মাণ করিবার কথা তাঁহার সময়ে

হয়, কিন্তু তিনি ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া পড়ায় কার্য্যতঃ কিছুই হয় নাই। অবশেষে ১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র সেন মহাশয় কালীবাড়ির সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন। এই অক্লান্ত কর্ম্মীর অসাধারণ উদ্যম ও নিঃস্বার্থ পরিশ্রমের ফলে,১৯৩১ সালের জানুয়ারী মাসে অতিথি-মহলটি ভূমিসাৎ করিয়া তাহার স্থানে ইষ্টকনির্ম্মিত চারিতল একটি অট্টালিকা নির্ম্মাণ আরম্ভ হয় এবং বৎসর শেষ না হইতেই কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। এই ব্যাপারে সুধীরবাবু যে অসাধারণ কর্ম্মকুশলতা দেখাইয়াছেন তাহার তুলনা নাই। এ-কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে তিনি এই কার্য্যে হাত



শ্রীসুধীরচন্দ্র সেন
কালীবাড়ির বর্ত্তমান সম্পাদক

না দিলে কালীবাড়ির নূতন অতিথি-মহলটি কেবলমাত্র স্বপ্নের মধ্যেই থাকিয়া যাইত! বাঙালী, বিশেষতঃ প্রবাসী বাঙালীমাত্রই চিরদিন সুধীরবাবুর এই অপূর্ব্ব কীর্ত্তি কৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্মরণ করিবে।

১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমেই এই নূতন গৃহটির নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হয়, এবং ঐ বৎসরের ১৩ই সেপ্টেম্বর তারিখে মণ্ডী-রাজ্যের স্বাধীন নরপতি লেফ্‌টেন্যাণ্ট হিজ্ হাইনেস রাজা স্যর যোগেন্দ্র সেন বাহাদুর, কে-



স্বর্গীয় বেচানাথ ঘোষাল

সি-এস-আই কর্ত্তৃক নবগৃহ-প্রবেশ উৎসব মহাসমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে।



স্বর্গীয় অমূল্যচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

মণ্ডীর রাজাসাহেব তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন যে, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ বাঙালী ছিলেন।

"It would have been a pleasure to anyone to preside over today's function, but the pleasure is all the greater in my case, because of a fact, which, I think, is not known to many of you, *i. e.*, that about a thousand years ago my ancestors hailed from your Province (Bengal).



স্তর ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র

সুরম্য মন্দিরের কোলে এই মনোহর অট্টালিকাটি দেখিয়া মনে হয়—

"O matre pulchra
Filia pulchrior !"—Hor.—

—সুন্দরী জননীর সুন্দরীতরা দুহিতা!

সিমলা-প্রবাসী বাঙালীদের বর্ত্তমানে যে-সব বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আছে, তাহাদের সবগুলিকে এই নূতন অট্টালিকাতে কেন্দ্রীভূত করা হইয়াছে।

এই নবগৃহ নির্ম্মাণে প্রায় পঁয়তাল্লিশ সহস্র মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছে। এই ব্যাপারে সিমলার প্রায় প্রত্যেক বাঙালী স্ত্রীপুরুষ—ধনী-নির্ধননির্ব্বিশেষে—অর্থসাহায্য করিয়াছেন। অর্থে ও সামর্থ্যে যাঁহারা সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের সকলের নাম উল্লেখ করা অসম্ভব। কিন্তু, প্রথম হইতেই, সিমলা-প্রবাসী বর্ত্তমান বাঙালী সমাজের নেতা অনরেবল স্তর ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র, কে-সি-এস্-আই মহোদয় এবং তাঁহার পত্নী, সিমলা-প্রবাসী বাঙালীর সর্ব্বপ্রকার হিতকর কার্য্যে অগ্রণী, শ্রীযুক্তা লেডী প্রতিমা মিত্র মহোদয়া প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ ব্যাপারে যে অসাধারণ চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন; নক্সা-প্রণয়ন, ব্যয়ের পরিমাণ নির্দ্ধারণ ও গৃহনির্ম্মাণ তত্ত্বাবধান ব্যাপারে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত মহাশয় দীর্ঘ এক বৎসর কাল ধরিয়া যে অমানুষিক পরিশ্রম করিয়াছেন, গৃহনির্ম্মাণ তহবিলের কোষাধ্যক্ষরূপে ও অর্থ-সংগ্রহে শ্রীযুক্ত অনাদিচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় যেরূপ সহায়তা করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন, নবগৃহে বিদ্যুতালোক সরবরাহ সম্পর্কে শ্রীযুক্ত সুধীরেন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় অযাচিত-



লেডী প্রতিমা মিত্র

ভাবে যে উপকার করিয়াছেন, এবং কালীবাড়ি-পরিচালক-সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর অর্থসংগ্রহে ও সাধারণ তত্ত্বাবধান সম্পর্কে যে পরিশ্রম করিতেছেন, তাহার জন্য তাঁহারা সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

গৃহনির্ম্মাণ সম্পর্কে অসংখ্য ছোট-বড় দানের মধ্যে আমি কেবলমাত্র একটির উল্লেখ করিব। বাংলা দেশের লাট-সাহেবের শাসন-পরিষদের সদস্য অনরেবল শ্রীযুক্ত জে. এ.

উডহেড, সি-আই-ই, আই-সি-এস মহোদয় ১৯৩১ সালে ভারত-গবর্ণমেণ্টের বাণিজ্য-বিভাগের সেক্রেটারীরূপে সিমলাতে ছিলেন। তিনি বাংলার সিভিলিয়ান। দূর প্রবাসে বাঙালীর এই লোকহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহায়তাকল্পে, কালীবাড়ির সম্পাদক মহাশয়ের একখানা চিঠি পাইয়াই তিনি এক শত টাকার একখানা 'চেক' পাঠাইয়া দেন। উড্‌হেড সাহেবের এই দানের একটু বিশেষত্ব আছে বলিয়াই এখানে তাহার উল্লেখ করিলাম।

দান, বিশেষতঃ দেবমন্দিরে দান, কখনও বৃথা হয় না। দেবতা মানুষের ঋণ ফেলিয়া রাখেন না—অপ্রত্যাশিতভাবে তাহা প্রত্যর্পণ করেন

> "... ... ...God
> Pays debts seven for one ; who
> Squanders on Him shows thrift."

সিমলা কালীবাড়ির নবগৃহ নির্ম্মাণের যাহা মোট ব্যয়, তাহা আজও সম্পূর্ণ আদায় হয় নাই। এ-বিষয়ে আমি সহৃদয় বঙ্গবাসীমাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। আশা করি, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহারা এ-সম্বন্ধে সাহায্যদান করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

সিমলা কালীবাড়ি সম্পর্কে যাঁহাদের নিকট সিমলার প্রত্যেক বাঙালী কৃতজ্ঞ, তাঁহাদের মধ্যে মাত্র কয়েক জনের বিষয় উল্লেখ করিলাম। তাঁহারা ব্যতীত আরও কত জানা ও অজানা কর্ম্মী নীরবে ও নিঃস্বার্থভাবে কাজ করিয়াছেন ও করিতেছেন, কে তাহার গণনা করিবে? কিন্তু তাঁহাদের সকলেরই স্মৃতি কীর্ত্তি, অক্ষয় ও অমর হইয়া থাকিবে, কারণ—

> "চলচ্চিত্তং চলদ্বিত্তং চলজ্জীবনযৌবনম্
> চলাচলমিদং সর্ব্বম্ কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।"

উত্তরে

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

বর্ষা তখন শেষ হইয়া আসিয়াছে। কলিকাতার মিঃ এন-গস্, ষ্টক্-ব্রোকার, সপরিবারে হঠাৎ দেশে আসিলেন। সঙ্গে খানসামা, বাবুর্চ্চি, বেয়ারা, দ্বারবান্, কুকুর, মোটর প্রভৃতি চেতন অচেতন বিস্তর সামগ্রী। বাড়িখানি শহরের প্রান্তভাগে—সুদৃশ্য ও নাতিবৃহৎ। মিঃ গস্ দশ বৎসর পূর্ব্বে এখানি নির্ম্মাণ করেন। কিন্তু এতকাল একরূপ খালি পড়িয়া ছিল। মফঃস্বল শহরের নানা অসুবিধা হেতু ছেলেরা ত কেহ আসিতই না, মিঃ গস্‌ও ইচ্ছা সত্ত্বেও কাজের ভীড় ঠেলিয়া আসিয়া উঠিতে পারিতেন না; এবং যখন অবসর ঘটিত তখন পশ্চিম বা উত্তর ভারতের অরণ্য ও শৈলমালাবেষ্টিত কোন স্বাস্থ্যকর স্থানেই সপরিবারে যাত্রা করিতেন। কিন্তু এবার কি মনে হইল, তিনি দেশে আসিলেন। নিরালা পল্লীটাও এক বেলার মধ্যে জম্ জম্ করিতে লাগিল।

মিঃ গসের বাড়ির নীচেই প্রকাণ্ড নদী। নদীটা সে সময় কানায় কানায় পরিপূর্ণ হইয়া কূল ভাঙিয়া, গ্রাম ভাসাইয়া, ক্ষেতের উপর দিয়া,মাঠ ডুবাইয়া বহিয়া যাইতেছে। তাহার পার স্পষ্ট চোখে পড়ে না। রাত্রিদিন তাহার বিরামহীন মৃদুগম্ভীর জলোচ্ছ্বাসধ্বনি তীরবাসীদের অন্তরে একটা আতঙ্ক জাগাইয়া রাখিয়াছে। সেইদিনই বিকালের দিকে পাইপ্ টানিতে টানিতে একটি প্রকাণ্ড কুকুর সঙ্গে লইয়া মিঃ গস্ পল্লীটা একবার ঘুরিয়া আসিলেন। শৈশব-সঙ্গীরা কেহ বড় একটা নাই; দুই একজন যাহারা আছে, সকলের সহিত আলাপ করা সম্ভব নয়। তাঁহাদের মাঝের ব্যবধানটা কেবল বিশ বৎসরের নহে—পরিবর্ত্তিত আচার, জীবিকা ও কথাঞ্চৎ প্রকৃতিরও। মিঃ গস্ সেদিন আর কোথাও গেলেন না, নদীর চাতালে ইজি-চেয়ারে বসিয়া পাইপ্ টানিতে লাগিলেন। কুকুরটাও তাঁহার পায়ের কাছে শুইয়া নদীর দিকে সোৎসুকে তাকাইয়া রহিল।

জেলেরা তখন মাছ ধরিতেছিল। হলদে, নীল, শ্বেত, গৈরিক নানা রঙের ছোট ছোট পাল তুলিয়া প্রায় সত্তর-আশীখানি ডিঙি সারি বাঁধিয়া উজানে দূরে চলিয়া যাইতেছে, আবার পাল নামাইয়া স্রোতের টানে ধীরে ফিরিয়া আসিতেছে। মিঃ গসের ইচ্ছা হইল দৃশ্যটা ছেলে-মেয়েদের ডাকিয়া দেখান। কিন্তু খানসামার মুখে শুনিলেন, মেমসাহেব ও মিসিবাবা—তাঁহার বড় মেয়ে খুকী—ছাড়া আর সকলে মোটর লইয়া বড় রাস্তা ধরিয়া কোথায় যেন হাওয়া খাইতে বাহির হইয়াছে। মিঃ গস্ একটু মনঃক্ষুণ্ণ হইলেন। কিন্তু বাড়ির দিকে মুখ ফিরাইতেই দেখিলেন, তাঁহার বড় মেয়ে খুকী দ্বিতলের জানালার গরাদে ধরিয়া দাঁড়াইয়া ডিঙিগুলির দিকেই এক দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে।

তিনি হাসিয়া উঁচু গলায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিরে খুকী, কেমন লাগছে?"

খুকী হাসিয়া উত্তর করিল—"খুব সুন্দর। আর তোমরা এখানে আসতে চাও না বাবা—"

মিঃ গস্ এ অনুযোগের উত্তরে হাসিতে লাগিলেন। তারপর নদীর দিকে আবার চোখ ফিরাইয়া ধীরে স্মৃতির মাঝে তলাইয়া গেলেন......

ঐ ত ডবিন্ সাহেবের আকমাড়াই কলের কারখানার কেরাণী ভবতারণ ঘোষের বাড়ি। মাত্র খান-দুই খড়ের চালা। কিন্তু বাড়িটার সম্মুখে ও পিছনে অনেকটা জমী। বড় বড় গোটা কয়েক আম, জাম, সজিনা ও নোনার গাছ—মনে পড়িতেছে বেড়ার এক কোণে একটা কুলের গাছও যেন ছিল। বৎসরে বৎসরে সে-গুলি পুষ্পিত ও ফলবান্ হইয়া উঠিত, এখনও উঠে। ভবতারণ যখন মারা যান, ছেলে নিবারণের বিবাহ হইয়াছে। সেও ঐ কারখানায় বিশ টাকা মাহিনায় কেরাণীগিরি করিতেছিল। কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর চাকরীটি টিকিল না। নূতন সাহেব আসিয়াই পুরাতন চাল উল্টাইয়া দিলেন। খুকী তখন ছয়মাসেরটি। নিবারণ একবার ভাবিল, মুহুরীগিরি করিবে। নতুবা খাইবে কি করিয়া? আর, এই গ্রামতুল্য জঙ্গলাকীর্ণ শহরে তাহাকে চাকরীই বা দিবে কে? পৈতৃক বিত্ত তাহার কিছু নাই; দেশ ও জমী-জায়গা বলিতে শহরপ্রান্তে ঐ ঠাঁইটুকু। তবে পিতার মুখে একবার শুনিয়াছিল, শহরের পাশেই একখানি গ্রামে তাহাদের বাড়ি-ঘর, বাগান-পুকুর, ক্ষেত-খোলা, বড় বড় মরাই প্রভৃতি ছিল। বাড়িতে দুর্গোৎসব হইত। তিনখানি গ্রামের লোক তিন দিন ধরিয়া খাইয়া-লইয়াও তাঁহাদের ভাণ্ডার শূন্য করিতে পারিত না। এত বড় ঘর তাঁহারা! অবশ্য এ-সব নিবারণের পিতাও চোখে দেখেন নাই, তাঁহার পিতামহীর মুখে শুনিয়াছিলেন। তখন কোথায় বা ছিল এই শহর, কোথায় ছিল ঐ রেল-পথ। কিন্তু এখন সে অতীত গৌরব স্মরণ করিয়া লাভ কি? পৃথিবীতে বাঁচিতে হইলে সবলের মতই বাঁচিতে ও জয়ী হইতে হইবে।

নিবারণের চেহারাটি ছিল পুরুষোচিত। ডবিন্ সাহেবের এক বন্ধু একবার কারখানায় বেড়াইতে আসেন। মানুষটি ভাল। তিনি নিবারণকে দেখিয়া তাহার পিঠ চাপ্ড়াইয়া বঙ্গভাষায় জিজ্ঞাসা করেন—"যুবক, টুমি কি বাঙালী?"

"হাঁ স্যার।"

"Strange. ঠিক জান?"

"হাঁ স্যার!"

অতঃপর সাহেব আর কিছু বলিলেন না। নিবারণও—সে মাসে কতগুলি আকমাড়াই কল বিলি হইয়াছিল খাতার উপর ঝুঁকিয়া পূর্ব্ববৎ হিসাব করিতে লাগিল।

কথাটা আজ সহসা নিবারণের মনে পড়িয়া গেল। সেই সাহেবের সহিত দেখা হইলেও হয়ত তাহার কোন সুবিধা হইতে পারে। কিন্তু তিনি কোথায় থাকেন এবং এখনও এ-দেশে আছেন কিনা তাহা ত সে জানে না। সে স্থির করিল, কলিকাতায় যাইবে। কিছুদিন সাহেব অঞ্চলে ও নানা আপিসে ঘোরাঘুরি করিবে। তাহার ফলে সাহেব অথবা যে কোন একটা চাকরী মিলিবারই সম্ভাবনা। না মিলিলে—না মিলিলে? তাহার পর কি হইবে সে কল্পনায় আনিতে পারিল না। তাহার সমস্ত চিত্ত জুড়িয়া দাঁড়াইল খুকুকে কোলে লইয়া স্মিতমুখী লীলা ও তাহাদের পশ্চাতে স্নেহময়ী স্থবিরা পিতামহী।

লীলার কাছে কথাটি ব্যক্ত করিলে সে বলিল—"এ ছাড়া আর উপায় কি?" যাইবার দিনও সে মুখে কিছু বলিল না; কিন্তু তাহার মনের কথাটি ফুটিয়া উঠিল সজল চোখদুটিতে।

খুকুও বিচ্ছেদ বুঝিল না, দুর্দ্দিনও জানিল না। তাহার মাতাকে সারাদিন অকারণ কান্নায় ব্যতিব্যস্ত করিয়া রাখিল। তাহাদের অভিভাবক হইলেন ভবতারণের বন্ধু পাশের বাড়ির রায়-খুড়ো। খুড়ো আজ জীবিত থাকিলে কত খুশী হইতেন!

এক মাসের মাহিনা নিবারণ আগাম পাইয়াছিল। টাকা কয়টি তখনও খরচ হয় নাই। অর্দ্ধেক টাকা লীলার হাতে দিয়া বাকী অর্দ্ধেক লইয়া সে কলিকাতায় রওনা হইল। তারপর পূরা দুই বৎসর সে যে গভীর সংগ্রাম করিয়াছে তাহা সে ও লীলা ছাড়া আর কেহ জানে না। সে রক্তহীন দুঃখ আজ মনে করিলেও শরীর শিহরিয়া উঠে। ঐ সময়ের মধ্যে একবার সে বাড়ি আসিয়াছিল। পিতামহী তখন স্বর্গগতা হইয়াছেন। লীলা ও খুকুর সে দারিদ্র্যক্লিষ্ট শীর্ণ ছবি আজও সে ভুলিতে পারিল না।

কলিকাতায় ফিরিয়া নিবারণ যখন একদিন সন্ধ্যার কাছাকাছি নিতান্ত হতাশ মনে চৌরঙ্গী দিয়া ফিরিতেছিল, দেখিল ডবিন্ সাহেবের সেই বন্ধুটি মোটর হইতে নামিতেছেন। সাহেব যাইতেছিলেন হোটেলে। নিবারণের অন্তর পুলকে নৃত্য করিতে লাগিল। সে ছুটিয়া গিয়া সেলাম করিয়া সাহেবের সম্মুখে দাঁড়াইলে সাহেব কিন্তু তাহাকে চিনিতে পারিলেন না। ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কি চাও?" বলিতে বলিতে পকেট হইতে 'পার্স'টি বাহির করিলেন।

নিবারণ দমিয়া গেল। তবুও আত্মপরিচয় দিয়া সংক্ষেপে অবস্থাটা বর্ণনা করিতেই সাহেব পার্সটি পুনরায় পকেটে রাখিতে রাখিতে বলিয়া উঠিলেন,—"Now I See, শুনিয়া ড়ঃখিট্ হইলাম। কাল আমার সহিট্ ডেখা করিও—" বলিয়া একখানি কার্ড বাহির করিয়া নিবারণের হাতে গুঁজিয়া দিয়াই হন্ হন্ করিয়া হোটেলে চলিয়া গেলেন।

নিবারণের ইচ্ছা হইল তখনই ছুটিয়া গিয়া লীলাকে সংবাদটি দেয়। কিন্তু তাহা সম্ভব নয় দেখিয়া মনের আনন্দে পথ দিয়া একরূপ ছুটিয়া চলিল। সেদিনটিও নিবারণের জীবনে আর একটি স্মরণীয় দিন। তাহার পর হইতেই দালালী করিয়া নিবারণের ভাগ্য দ্রুত পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। তাহার অল্পকাল পরেই সে লীলা ও খুকুকে কলিকাতায় লইয়া যায়। সেই হইতে দেশের সহিতও আর সম্পর্ক থাকে না। বাড়ি ঘর ভাঙিয়া-চুরিয়া ভিটা জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া উঠে। এমন কি, কিছুকাল ধরিয়া জায়গাটা পল্লীবাসী ও পথিকের একটা ভয়ের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

মিঃ গস্ কিছুতেই বুঝিতে পারিলেন না আয়ের কোন্ পথ ধরিয়া তাঁহার চাল বদলাইতে সুরু করিল। তিনি সাহেব-পাড়ায় বাড়ি করিলেন, গাড়ি কিনিলেন, বয়, খানসামা, কুকুর রাখিয়া, ধুতি-চাদর-হুঁকা ছাড়িয়া, আহার-পদ্ধতি ফিরাইয়া সাহেব হইয়া গেলেন। এমন কি, লীলারও পরিবর্ত্তন হইতে খুব বিলম্ব ঘটিল না। চাল দুরস্ত করিতে নিবারণ ঘোষ একবার বিলাত গেলেন এবং ফিরিয়া আসিয়াই হইলেন 'মিঃ গস্'! এখন তাঁহার বন্ধু-বান্ধবরাও কেবল সাহেব ও সাহেবী ভাবাপন্ন দেশী লোক। ছেলেরা, এমন কি, ছোট মেয়েটাও সেই মেজাজ পাইয়াছে। কিন্তু গোল বাধাইয়াছে ঐ খুকী। এতদিন ধরিয়া পাশ্চাত্য শিক্ষা দিয়াও কোন ফল হইল না। মেয়েটা তাহা সম্পূর্ণ পরিপাক ত করিলই, এখন আবার ঐ-সব চালের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। ভাইদের সে "সাহেব" বলিয়া ডাকে। তাহাকে পরিজনবর্গ "দিদিমণি" বলিয়া না ডাকিলে রাগিয়া আগুন! মিঃ গস্ মেয়ের পাগলামীতে মনে মনে হাস্য করিলেন। তাহার প্রতি স্নেহে তাঁহার অন্তর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

সেই সঙ্গে একটা দুশ্চিন্তাও দেখা দিল। মেয়েটা কিছুতেই বিবাহ করিবে না। বিলাত-ফেরৎ কত ভাল ভাল ছেলের সহিত তাহার সম্বন্ধ হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের কাহাকেও সে পছন্দ করিল না। তাহার পছন্দ হইয়াছে মিঃ রে'র এক আত্মীয় সেই গ্রাম্য গ্র্যাজুয়েটটিকে। কিন্তু তাঁহার মেয়ের উপযুক্ত পাত্র সে হইতেই পারে না। অবশ্য ছেলেটি যে নিতান্ত খারাপ তাহা বলা যায় না, বরং ভালই; স্বাস্থ্যবান্, শিক্ষিত, দেশে প্রচুর জমিজায়গা। ঘরও লেখা-পড়া জানা, কিন্তু কলিকাতায় বাড়ি নাই। ছেলেটি থাকে গ্রামে চাষ-বাসের কাজ লইয়া। বিবাহ হইলে খুকীকে চিরজীবন থাকিতে হইবে গ্রামে। কথাটা ভাবিলেই মন দমিয়া যায়। কিন্তু ও যা মেয়ে—স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিবে। এই ত এখানে আসিয়া অবধি ওর আনন্দ ধরে না।

মিঃ গস্ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া সেখানে পায়চারি করিতে

লাগিলেন। এই জীবন-যাত্রার প্রতি কেমন একটা বিতৃষ্ণা দেখা দিল। জানালার দিকে তাকাইয়া দেখিলেন, খুকী নাই। পাইপটা বহুক্ষণ নিভিয়া গিয়াছে। আবার তাহাতে আগুন দিয়া পেণ্টলুনের দুই পকেটে হাত পুরিয়া নদীর দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। নদীর চঞ্চল ও তরঙ্গময় গৈরিকধারায় সোনা ঢালিয়া পশ্চিমে কোমল কৃষ্ণ মেঘান্তরালে তখন সূর্য্য অস্ত যাইতেছে। ডিঙিগুলি পাল গুটাইয়া জাল ডুবাইয়া মাছ ধরিতে ধরিতে স্রোতের টানে ভাসিয়া চলিতেছিল। এই সময়টা ইলিশ মাছ উঠে প্রচুর।

মিঃ গসের সম্মুখে আসিয়া একখানা ডিঙি জাল উঠাইতেই তাহার মধ্যে এক জোড়া ইলিশ ধড়ফড়্ করিয়া উঠিল যেন জীবন্ত রূপা। মিঃ গস্ প্রায় ছুটিয়া ঘাটে নামিলেন। সেখান হইতে হাঁক দিলেন—"মাঝি—ও মাঝি—"

মাঝি ফিরিয়া দেখিল সাহেব। মিঃ গসের হাঁক শুনিয়া একজন খানসামা ছুটিয়া আসিল। সেও হাঁকিতে লাগিল—"এ মান্‌ঝি—"

মাঝি প্রথমে বলিল—"মাছ বিক্রীর নয়"—কিন্তু হাঁক-ডাকের প্রাবল্য দেখিয়া ঘাটে আসিয়া নৌকা ভিড়াইল।

মিঃ গস্ মাছ দুইটি কিনিতে রীতিমত দরদস্তুর সুরু করিলেন এবং মাঝিকে প্রাদেশিক ভাষায় কথা কহিয়া বুঝাইয়া দিলেন, তিনি সেখানকারই লোক, কোন পুরুষেই সাহেব নহেন। অনেক দরাদরির পর মাঝি মাছ দুইটি খানসামার হাতে তুলিয়া দিবার উপক্রম করিতে মিঃ গস্ হাত বাড়াইয়া দুই আঙুলে দুটিকে ঝুলাইয়া লইলেন। চলিতে চলিতে তাঁহার সাদা পেণ্টলুনের গায়ে মাছের কাঁচা রক্তের ছাপ লাগিয়া গেল। সে-দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। খানসামা কি ভাবিতেছে আজ তাহাও চিন্তা করিলেন না, মহানন্দে অন্দরে প্রবেশ করিয়াই মিঃ গস্ ডাকিলেন,—"কৈ গো? কোথায় গেলে?"

গস্-পত্নী তখন গৃহাভ্যন্তরে কি এক কর্ম্মে রত ছিলেন, এ কারণেও বটে—সুদীর্ঘ কাল এমন ডাক শুনেন নাই বলিয়াও—প্রথমটা বিস্মিত হইলেন। সেই ভাবেই বাহিরে আসিয়া দেখেন, মিঃ গস্ সহাস্যমুখে উঠানে দাঁড়াইয়া, হাতে দুটি মাছ।

গস্-পত্নীর মধ্য হইতে সহসা যেন বাঙালী গৃহলক্ষ্মী লীলা স্মিতমুখে বাহির হইয়া আসিল। তিনি স্বামীর মুখের দিকে এক ঝলক তাকাইয়া মাছ দু'টি তাঁহার হাত হইতে লইলেন।

খুকীও নামিয়া আসিয়াছিল। ভৃত্য বঁটি আনিলে সে বলিল,—"তুমি রাখ মা, আমি কুটব"

বহুকাল যাহা করেন নাই, একরূপ ভুলিয়াই গিয়াছিলেন, সেই গৃহকর্ম্মটিতে কি আনন্দ ছিল জানি না গস্-পত্নী—'না, তুই পারবি না। সর্ সর্—অত বড় মাছ নষ্ট হয়ে যাবে—" বলিতে বলিতে কন্যাকে সরাইয়া দিয়া বঁটি পাতিয়া সেখানে বসিয়া গেলেন।

তারপর মাছ দু'টি কাটিয়া-কুটিয়া পাকশালায় গিয়া নিজেই তাহা হইতে নানারূপ ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। রন্ধনে মা ও মেয়ের তেমন উৎসাহ পূর্ব্বে কখনও দেখা যায় নাই। কিন্তু রন্ধন সারিয়া যখন বাহির হইয়া আসিলেন, অগ্নি-তাপে ও শ্রমে গস্-পত্নীর মুখ চোখ লাল ও ঘর্ম্মাক্ত। ইতিমধ্যে ছেলেরাও হাওয়া খাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল। তাহারা দেখিল মা ও দিদি রান্না করিতেছে। দেখিয়া পরম কৌতুক অনুভব করিল।

মিঃ গস্ পত্নীকে কহিলেন "আজ আর টেবিলে খেতে ইচ্ছে করছে না, মাটিতে—"

অঞ্চলে মুখের ঘাম মুছিতে মুছিতে লীলা বলিল—'সে আমি জানি—"

সকলের আহারের ঠাঁই হইল প্রকাণ্ড দালানে—পিঁড়ি ও আসনাভাবে একখানি বড় সতরঞ্চি লম্বালম্বি ভাঁজ করিয়া পাতিয়া দেওয়া হইল। মিঃ গস্ তখনও কাংস্যপাত্র সম্পূর্ণ ত্যাগ করিতে পারেন নাই। গস্-পত্নী কন্যার সাহায্যে স্বহস্তে ভাত বাড়িলেন, ব্যঞ্জন সাজাইলেন। তারপর মিঃ গস্‌কে ডাকিতে গেলেন "এস গো, খেতে দিয়েছি।"

মিঃ গস্ তখন পেণ্টলেন ছাড়িয়া ধুতি পরিতেছিলেন। ত্যক্ত পরিধেয়টিকে হাত দিয়া ঠেলিয়া দিতে দিতে বলিলেন,—"যাই—এই খোলসটা আগে বিদায় করি—"

ছেলেরা সকলেই তাঁহার সহিত খাইতে আসিল। কিন্তু বড় ছেলের ঘোর আপত্তি—সে পা মুড়িয়া বসিয়া খাইবে না। এ ভাবে বসিয়া লোকে কি করিয়া খায় তাহা বুঝা তাহার বুদ্ধির অতীত। মিঃ গস্ তাহাকে এক ধমকে থামাইয়া বলিলেন—

"এবার থেকে সকলকে এই ভাবে খেতে হবে—" তারপর মেয়ের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—"কৈ তোরা বস্‌লি না?"

মেয়ে বলিল,—"তোমরা খাও। মা আর আমি একসঙ্গে খাব।"

মিঃ গস্ হাসিয়া আহারে প্রবৃত্ত হইলেন। একটু ব্যঞ্জন মুখে দিয়াই বলিয়া উঠিলেন—"বাঃ চমৎকার! কতকাল যে এমন রান্না খাইনি—"

মেয়ে বলিল,—"ওটা মা রেঁধেছে"—

মিঃ গস্ অপাঙ্গে একবার পত্নীর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন; দেখিলেন, লাল হইয়া উঠিয়াছে।

আহার যখন অর্দ্ধেক হইয়াছে, মিঃ গস্ বলিলেন—"দেখ, ভেবে দেখলুম, মিঃ রে'র আত্মীয় সেই ছেলেটি সত্যিই ভাল। ওর সঙ্গেই খুকীর বিয়ে দেব। তা-ছাড়া খুকীরও যখন পছন্দ—"

কন্যাকে লইয়া গস্-পত্নী তখন পরিবেশন করিতেছিলেন। বলিলেন—"ভালই ত। ওরে খুকী, ছেলেদের ভাত দিতে দিতে চলে গেলি কেন?"

মিঃ গসের কনিষ্ঠ পুত্র বলিল—"দিদির লজ্জা হয়েছে—"

নিবারণ দেখিলেন স্ত্রীর মুখ প্রসন্ন নয়। তখন আর কিছু বলিলেন না। আহারান্তে পুনরায় স্ত্রীর দেখা পাইলে কহিলেন - 'স্ত্রী-চরিত্র সত্যিই দুর্জ্ঞেয়—"

স্ত্রী কহিলেন—"পুরুষদের চেয়ে নয়—"

"তাই প্রথমে ঐ ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে চেয়ে এখন খুসী হতে পারছ না—"

"আর তুমিও প্রথমে আপত্তি করে এখন রাজী হ'য়ে পড়েছ—" তারপর ক্ষণিক নীরব থাকিয়া—"মেয়ে যাতে সুখী হয় আমি তাই চাই। কিন্তু সে-ছেলে কি আজও বিয়ে না ক'রে বসে আছে?"

"কি বলছ তুমি? আমার মেয়ের জন্ত চিরকাল বসে থাকবে—"

"বেশ তবে শীগ্‌গির দেখ—"

* * *

ইহারই মাস দুই পরে একদিন ঐ গৃহখানি মঙ্গল-ঘট ও আম্র-পল্লবে সুসজ্জিত হইয়া সাঁনাইয়ের সুরে ভোরের কোমল আলোকোদ্ভাসিত প্রশান্ত আকাশে সেই শুভ বার্ত্তাটি উড়াইয়া-ছড়াইয়া দিতে লাগিল। সারা-গৃহ আনন্দ কলস্বরে মুখর।

দ্বিপ্রহরে বৈঠকখানার ঢালা ফরাসে বসিয়া নিমন্ত্রণ-যোগ্য ব্যক্তিদের ফর্দ্দ প্রস্তুত হইতেছিল। পাড়ার গণ্যমান্য প্রায় সকলেই উপস্থিত। অম্বুরী তামাকের ধূম, খোস-গল্প ও হাসি-ঠাট্টায় ঘরখানি মশ্‌গুল্।

মিঃ গসের হাত হইতে গড়গড়ার নলটি লইতে লইতে ভুজঙ্গ দত্ত বলিলেন—"নিবারণ, তুমি দেশে আস কেবল আমাদের মনে দুঃখ দিতে—"

"কেন? কেন?"

"এ আনন্দের হাট ভেঙে দিয়ে আবার ত দু-দিন বাদে চলে যাবে—"

"না দাদা আর যাব না। যে-কটা দিন বাঁচি এখানেই কাটাব। জায়গাটা ভারি মিষ্টি—" বলিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। তাঁহার মনে হইল ঐ জলভারাতুর নদী, শস্যক্ষেত, গ্রাম, এ-সবার ঊর্দ্ধে নীলাকাশ ব্যাপিয়া যে মাধুর্য্য ও শ্রী ফুটিয়া আছে তাহার তুলনা আর কোথাও মিলিবে না। ইহা কেবল তাঁহার এই জন্মভূমির—বাংলার।

বর্ত্তমান যুগের অর্থশাস্ত্রীর সাধনা

শ্রীসুধাকান্ত দে

জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মানুষের অফুরন্ত চেষ্টার সাক্ষ্য আছে। বিদ্যার প্রত্যেক শাখায় বহু ব্যক্তি একনিষ্ঠভাবে নিযুক্ত থাকিয়া নব নব পথে যাত্রা করিয়া নূতন সত্যের আবিষ্কার ও উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। এই প্রচেষ্টার, এই আবিষ্কারের একটা ইতিহাস আছে, তাহা অস্বীকার করি না। কিন্তু অতীতের প্রতি আকর্ষণ নয়, বর্ত্তমান-নিষ্ঠাই অর্থশাস্ত্রের অন্যতম প্রধান অবলম্বন। বস্তুতঃ, অর্থশাস্ত্র ইতিহাস বা প্রত্নতত্ত্ব নহে, অর্থাৎ ইহার উদ্ভব হইতে আজ পর্য্যন্ত যে-সকল বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান, অনুষ্ঠান বা মতবাদ নানাবিধ উত্থান-পতনের মধ্য দিয়া বিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে, সেগুলির নবীনতম রূপই অর্থশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়। অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত সমুদয় অর্থতত্ত্ব ও মতবাদ সমুহ আলোচনা করিবার সার্থকতা নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু প্রকৃত অর্থশাস্ত্র বলিতে যা বুঝায় তাহার সহিত উহার ইতিহাসের একটা পার্থক্য-রেখা সর্ব্বদাই টানিয়া রাখিতে হইবে।

অর্থশাস্ত্রের উদ্দেশ্য যুগে যুগে কি একই প্রকার রহিয়াছে? এই প্রশ্নের উত্তর তখনই দেওয়া যায় যখন অন্য একটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর মিলে। সে প্রশ্ন এই—বিভিন্ন যুগে মানব-মন কি একই প্রকার ধ্যানধারণা, আদর্শ ইত্যাদি দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছে? ইহার উত্তরে অবশ্যই বলিতে হয়, না। প্রথমতঃ, বিদ্যার দিক হইতে বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, বিভিন্ন বিদ্যা অথবা উহার বিভাগগুলি পরস্পরের দাসত্ব হইতে মুক্তি লাভ করিলেও সকল যুগে সকল বিদ্যার প্রভাব সমতুল্য হয় নাই। কোন যুগে একটি বিশেষ বিদ্যা অত্যন্ত আদর লাভ করিয়াছে, অন্য যুগে অন্য বিদ্যা। যখন যে-বিদ্যা সবিশেষ সমাদৃত হইয়াছে তখন সে-বিদ্যা অন্যান্য বিদ্যাকে অল্পবিস্তর পরিবর্ত্তিত অথবা প্রভাবান্বিত করিয়াছে। এই সেদিন পর্য্যন্ত অর্থশাস্ত্র ইতিহাসের অন্তর্গত একটি বিদ্যারূপে পঠিত হইত। অর্থাৎ ইতিহাস হইতে স্বতন্ত্র বিদ্যারূপে অর্থশাস্ত্রের কোন সত্তা ছিল না, সুতরাং ইহার স্বতন্ত্র কোন চর্চ্চাও সম্ভবপর হইত না। আজ অর্থশাস্ত্র ইতিহাসের কোটর হইতে মুক্তিলাভ ত করিয়াছেই, উপরন্তু অর্থশাস্ত্রের বিভিন্ন শাখার কোন কোনটি ইতিমধ্যেই এরূপ গুরুত্ব লাভ করিয়াছে যে অচিরকাল মধ্যে সেগুলি ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যারূপে গৃহীত হইবার সম্ভাবনা জন্মিয়াছে। যথা, ব্যাঙ্কিং ও সিক্কা, আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য, সমবায়, বীমা ইত্যাদি। শুধু ইতিহাস নয়, আইন, নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, দর্শন, বিভিন্ন বিজ্ঞান প্রভৃতি নানাবিধ বিদ্যার যখন যেটির উপর জোর দেওয়া হইয়াছে সেটাই অর্থশাস্ত্রের উপর অল্পাধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। গাণিতিক অর্থশাস্ত্র, রাসায়নিক অর্থশাস্ত্র, এঞ্জিনিয়ারিং অর্থশাস্ত্র কথার কথা মাত্র নয়।

কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থাটা কি? আজিকার দিনে অর্থশাস্ত্রের বন্ধন-মুক্তি ঘটিয়াছে। উহা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে, ইহা আগেই বলিয়াছি। ইহার অর্থ এ নয় যে, আজ অর্থশাস্ত্র অন্যান্য বিদ্যার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখিতে চায় না। ব্যক্তিবিশেষ কোন কোন বিদ্যার দ্বারা অধিকতর অনুপ্রাণিত হইলেও আজ অর্থশাস্ত্রী মাত্রেরই মাত্রাজ্ঞান রহিয়াছে, কেহই অর্থশাস্ত্র আলোচনা করিতে গিয়া আত্মবিস্মৃত হন না। এঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারি, রসায়ন, অঙ্ক প্রভৃতি বিদ্যার ও বিদ্যার ব্যাপারীর সহায়তার প্রয়োজন আজ প্রত্যেক অর্থশাস্ত্রী পদে পদে অনুভব করেন। আইন, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব ইত্যাদি সামাজিক বিদ্যার ত প্রয়োজন হয়ই, সেগুলির কথা আর বেশী করিয়া বলিবার আবশ্যক নাই। এইজন্য বর্ত্তমান কালে যে-কোন অর্থশাস্ত্রের বই খুলিলে দেখা যায় যে তাহাতে একদিকে যেমন সমাজ-তাত্ত্বিকের প্রমাণিত নীতির বিস্তৃত প্রয়োগের উদাহরণ আছে, অন্যদিকে তেমনি রাশি রাশি উচ্চ-গাণিতিক তথ্য ও আনুষঙ্গিক তত্ত্বও স্থান পাইয়াছে। এইরূপে অর্থশাস্ত্র এক

বিশাল আকার পাইতেছে। সুতরাং বর্ত্তমান যুগের অর্থশাস্ত্র বলিতে এক সর্ব্বপ্রকারে স্বাধীন সত্তাবিশিষ্ট বহু অনুরূপ বিদ্যার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ এক বিপুল বিদ্যার কথাই বুঝিতে হইবে, সন্দেহ নাই।

২

যদি কেহ বলেন, 'বাপু হে, তোমার বর্ত্তমান যুগের অর্থশাস্ত্র কোন্ জিনিষ তাহা না হয় বুঝিলাম, কিন্তু এক কথায় বলিয়া দাও দেখি এই বিদ্যার মূল কথাটা কি?' তাহা হইলে আমি ক্ষণমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া তাঁহাকে বলিব যে, 'অর্থশাস্ত্রের মূলকথা হইল বাঁচিয়া থাকার কথা।'

কথাটা একটু খোলসা করিয়া বলা যাক্। প্রথমতঃ, পৃথিবীর পশুপক্ষি, জীবজন্তু তাবৎ প্রাণী বাঁচিয়া থাকিতে চায়। কিন্তু অর্থশাস্ত্র মানুষ ভিন্ন অন্য সমুদয় প্রাণীর কথা সাধারণতঃ বাদ দেয়, একেবারে বাদ দেয় বলিতে পারি না। কারণ গরুকে বাদ দিলে মানুষের জীবনধারণ মোটেই সহজ হয় না। গরুর দুধ, চামড়া, শিং সব-কিছুই বিবিধ সমস্যা সহ মানুষের কাছে উপস্থিত হয়। ঘোড়া, শূকর প্রভৃতি বিবিধ উপকারী ও খাদ্যজাতীয় জন্তুকে বাঁচাইয়া রাখা মানুষের স্বার্থ। ধান, গম হইতে আরম্ভ করিয়া জঙ্গলের কাঠ পর্য্যন্ত উদ্ভিদজাতীয় প্রাণিসমূহকে বাঁচাইয়া রাখা ও সযত্নে বর্দ্ধিত করা মানুষের স্বার্থ। তারপর জল, বাতাস, মাটি, সূর্য্যের তাপ, আকাশ কোন জিনিষের মূল্যই কম নয়,—না মানুষের নিজের বাঁচিবার পক্ষে, না তার প্রয়োজনীয় জীবজন্তুর বাঁচিবার পক্ষে।

দ্বিতীয়তঃ, মানুষ কি শুধু বাঁচিয়া থাকিয়াই সন্তুষ্ট হয়? সৃষ্টির আরম্ভ হইতে আজ পর্য্যন্ত মানুষ ও অন্যান্য জীবজন্তু কত প্রকারেই না বাঁচিয়া আছে ও বাঁচিতেছে! কিন্তু সকল প্রকার বাঁচিয়া থাকা একরূপ বাঞ্ছনীয়, এ-কথা নিশ্চয়ই কখনও বলা চলে না। সুতরাং বাঁচিয়া থাকার একটা ক্রম আছে, জীবনযাত্রার একটা ধারা আছে, যাহা মানুষের পক্ষে অবলম্বনীয় বিবেচনা করা যাইতে পারে। শুধু বাঁচিয়া থাকা বলিলে যথেষ্ট হয় কি? বরং যদি বলি, ভাল করিয়া বাঁচিয়া থাকা বা বাঁচার মত বাঁচিয়া থাকা, তাহা হইলেই কি অধিকতর সঙ্গত হয় না?

তারপর মানুষের শরীরটা টিকিয়া থাকিলেই ত সব হয় না। তার মানসিক, আধ্যাত্মিক ও অন্য বহুপ্রকার বিকাশের কথা ত ভাবিতে হইবে; তারও উপায় করিতে হইবে। অর্থশাস্ত্র এই সকল দিকে বিন্দুমাত্র মনোযোগ না দিয়া শুধু বাঁচিয়া থাকা, আধিভৌতিক ব্যাপারের—বিকাশেরও নহে—আলোচনা করিবে, এটা কেমন কথা? একদা কার্লাইল তথাকথিত অর্থশাস্ত্রের বিশেষ নিন্দা করিয়াছিলেন, তিনি অর্থশাস্ত্রকে নীতি ও সুবিচারের ভিত্তির উপর দাঁড় করাইতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, ইহা সকলেই জানেন। তাঁর যুক্তির সারবত্তা আজও অস্বীকার করা চলে কি? অর্থশাস্ত্রকে মন, আত্মা প্রভৃতি বিষয়ে একেবারে উদাসীন করিয়া দিলে, উহা যে-সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইবে সেগুলির কোন কার্য্যকর মূল্য থাকিবে কি?

আমি তবু বলিব, অর্থশাস্ত্র বাঁচিয়া থাকার উপরই জোর দিতে চায়। ভাল করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে অর্থশাস্ত্র অবশ্যই উপদেশ দেয়, কিন্তু যে মসলা বা উপকরণ লইয়া অর্থশাস্ত্র তার তত্ত্ব বা নিয়মসমূহ গড়িয়াছে তাহা হইতেছে মানুষ নিজে। টাকাপয়সা নয়, বাণিজ্য নয়, মানুষের মন বা আত্মাও নয়, কিন্তু মানুষকেই কেন্দ্র করিয়া অর্থশাস্ত্রীকে তাঁর শাস্ত্র গড়িতে হইতেছে। মানবজীবন চপল। জাতিতে জাতিতে এবং এক মানবের সহিত অন্য মানবের পার্থক্যের সীমা নাই। সুতরাং মানুষের কার্য্যকলাপ লইয়া কোন বিজ্ঞান গড়িয়া তোলা সহজ নয়। তা হোক, তাহাই অর্থশাস্ত্রীর সাধনা। এই সর্ব্বদাচঞ্চল মানুষকেই তাঁর গড়িবার ও বুঝিবার জন্য চেষ্টা করিতে হয় অবিরত ভাবে।

কিন্তু মানুষকে কেন্দ্র করিয়াছে অন্যান্য বিদ্যাও। নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস ইত্যাদি বিদ্যাগুলির কেন্দ্রও ত মানুষ। মনস্তত্ত্বের কেন্দ্রও মানুষ। তাহা হইলে এই সকল সামাজিক বিদ্যার সহিত অর্থশাস্ত্রের পার্থক্যটা কি? তাহা এই যে, আর কোন বিদ্যা মানুষের বাঁচিয়া থাকার সমস্যা লইয়া মাথা ঘামায় না। মানুষের নিশ্চয়ই ভাল করিয়া বাঁচিয়া থাকা উচিত। কিন্তু আগে ত তার বাঁচিয়া থাকিতে হইবে, তারপর ভালমন্দের প্রশ্ন উঠে। সেইজন্য মার্শ্যাল-প্রমুখ বিখ্যাত অর্থশাস্ত্রবিদগণ যদিও ভাল করিয়া বাঁচিয়া থাকার উপরও জোর দিয়াছেন, তথাপি আমি বলিতে চাই যে, বাঁচিয়া থাকার মধ্যেই অর্থশাস্ত্রের

মূলকথা নিহিত রহিয়াছে। যুগে যুগে মানুষের আদর্শ বদলায়। এই আদর্শ সময় ও কাল দ্বারা খণ্ডিত। অর্থাৎ আজ যা ভাল করিয়া বাঁচিয়া থাকা, তা চিরকাল ভাল ছিল না, ভবিষ্যতে থাকিবে তাহাও বলা চলে না। এদেশে যে আদর্শ ভাল, সে আদর্শ অন্য দেশও গ্রহণ করিবে বা করিতে সমর্থ, ইহাও বলা কঠিন হইতে পারে। সুতরাং যদি বলি বাঁচিয়া থাকাই অর্থ-শাস্ত্রের মূলকথা তাহাতে দোষটা কি ?

অর্থশাস্ত্র মন, সমাজ, শারীরিক গঠন, স্বাস্থ্য, আত্মা প্রভৃতি বিষয়কে অস্বীকার করে না। বস্তুতঃ প্রত্যেক অর্থ-শাস্ত্রীকে প্রসঙ্গত এ সকল বিষয় সম্বন্ধে অনেক কথাই আলোচনা করিতে হয়। জীবজন্তু মাত্রেরই স্বাস্থ্য, মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশ, অর্থশাস্ত্র কখনও কাম্য নয় বলিতে পারে না। পরন্তু তার বাঁচিয়া থাকার পক্ষে এগুলির যে নানাবিধ সমাবেশ প্রয়োজন হয়, তাহা অর্থশাস্ত্রী মাত্রেই স্বীকার করেন। ইহার কোনটাকেই অর্থশাস্ত্রী অযথা প্রাধান্য বা গুরুত্ব দিতে পারেন না। তাঁর পক্ষে মূলকথা ভুলিয়া অন্য কোন দিকে মনোযোগ দেওয়ার অর্থ বিদ্যা হিসাবে তাঁহার শাস্ত্রের পঙ্গুতা সাধন। ভিন্ন ভিন্ন বিষয় লইয়া ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যা গড়িয়া উঠিয়াছে এবং প্রত্যেক বিদ্যার সাহায্য তাঁহাকে লইতে হয়, তাহাতে তিনি ইতস্ততঃ করেন না ; কিন্তু তাই বলিয়া তিনি কোন এক বা অধিক বিদ্যার প্রতি একটুও বেশী পক্ষপাতিত্ব দেখাইতে পারেন না। অন্য সমুদয় বিষয় তাঁর নিকট অবান্তর ও গৌণ প্রয়োজন সাধক।

৩

আমি বারে বারে বাঁচিয়া থাকার উপর জোর দিতেছি। ইহাতে কেহ কেহ উপহাস করিতে পারেন। অর্থাৎ বাঁচিয়া থাকা, কি-না খাওয়া-পরা, না-কি আবার কোন শ্রদ্ধেয় বিদ্যার আলোচ্য বিষয় হইতে পারে। কেহ কেহ বলিবেন, বলিতে-ছিলে অর্থশাস্ত্র মানুষকে লইয়া আলোচনা করে, তাই বরং বল। বিদ্যার আদর্শটাও উচ্চ করিয়া ধরিতে হয়। খাওয়া-পরা যে নিতান্ত তুচ্ছ ব্যাপার। অর্থশাস্ত্রকে একটু উচুতে টানিয়া তুলিতে পার না কি ?

এই প্রকার যুক্তি তুচ্ছ বলিয়া উড়াইয়া দিবার মত নয়। প্রায় প্রত্যেক অর্থশাস্ত্রীই ইহার কোন-না-কোন জবাব দিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং তাঁহাদের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে আজ অর্থশাস্ত্র সাধারণের নিকট ধীরে ধীরে বিশেষ আদরলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

আজিকার দিনে বাঁচিয়া থাকাটাকে তুচ্ছ করিবার স্বভাব পৃথিবীতে অধিক পরিমাণে দেখা যায় না। কিন্তু যাঁরা ভারতীয় দর্শন লইয়া আলোচনা করিয়াছেন তাঁরা সাক্ষ্য দিবেন যে, তার প্রধানতম প্রতিপাদ্য বিষয় দুঃখ-নিবৃত্তি ও তজ্জন্য জন্মনিরোধ। বাঁচিয়া থাকা ত দূরের কথা, কি করিয়া আর কিছুতেই মানবজন্ম লাভ না করিব তাহার উপায় বলিয়া দাও—ইহাই ছিল জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান মানুষের ব্যাকুলতা। বুদ্ধদেব সেই পথেরই সন্ধান করিয়াছিলেন। মানুষকে দারিদ্র্য ও বিবিধ দুঃখ হইতে উদ্ধার করিবার ইহা যে একটা বড় উপায় তাহা অস্বীকার করা চলে না। তারপর মধ্যযুগে আমাদের দেশে ও ইউরোপে সহস্র সহস্র লোক দল ছাড়িয়া, লোকালয় ছাড়িয়া, কঠিন সন্ন্যাস ও ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিয়াছে, নানা প্রকারে নিজের শরীরকে দুঃখ-কষ্ট দিয়াছে ও মৃত্যুপণ করিয়াছে। মূলে সেই এক কথা। বাঁচিয়া না থাকাই পরমার্থ।

আজ আমাদের পক্ষে মানুষের এই সকল কীর্ত্তিকে উপহাস করা সহজ। কিন্তু বাঁচিয়া না থাকিবার স্পৃহা, বাঁচিয়া থাকিবার জন্য জলন্ত উৎসাহের অভাব, সমগ্র প্রাচ্য, বিশেষতঃ ভারতীয়, মন হইতে সম্পূর্ণ দূর হইয়া গিয়াছে কি ? আজ আমরা বলিতে শিখিয়াছি—

> বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।
> অসংখ্য বন্ধনমাঝে মহানন্দময়
> লভিব মুক্তির স্বাদ। এই বসুধার
> মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারম্বার
> তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত
> নানাবর্ণ গন্ধময়। প্রদীপের মতো
> সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বর্ত্তিকায়
> জ্বালায়ে তুলিবে আলো তোমারি শিখায়
> তোমার মন্দির মাঝে। ইন্দ্রিয়ের দ্বার
> রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার।
> যে কিছু আনন্দ আছে, দৃশ্যে গন্ধে গানে
> তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে।
> মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া,
> প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া।
>
> (শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : নৈবেদ্য)

কিন্তু ইহা নিতান্তই এ যুগের কথা এবং আজও [illegible]

মাত্র। প্রতি পদে অসংখ্য বিরোধ ও বাধার সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে বাঁচিয়া থাকা অত্যন্ত কষ্টকর ব্যাপার। বাঁচিয়া থাকিবার উগ্র আকাঙ্ক্ষা এবং সকল প্রকার বাধাকে পরাজিত করিবার জন্য উৎসাহ আমাদের মধ্যে কই?

বর্ত্তমান যুগে অর্থশাস্ত্র মানুষের মন ও মুখ সম্পূর্ণরূপে বাঁচিয়া থাকার দিকে ফিরাইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছে, যেন মৃত মানুষদের সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছে। কে বলিল বাঁচিয়া থাকা পাপ? কে বলিল বাঁচিয়া থাকা অন্যায়? ইহাই হইল অর্থশাস্ত্রের 'চ্যালেঞ্জ'। বাঁচিয়া থাকার জন্য ব্যবসা করি, চাকরি করি, চাষবাস করি, যতপ্রকারে পরিশ্রম করি না কেন তার মধ্যে অন্যায় ত নাই-ই, তুচ্ছতাও নাই। নিজের কাজকে নিজে অবশ্য পঙ্কিল করিয়া তুলিতে পারি। কিন্তু জীবনধারণের জন্য যে কাজই করি না তাহা কখনও তুচ্ছও নয়, আলোচনার অযোগ্যও নয়। এতকাল যে জিনিষ অবহেলা ও অবজ্ঞার মধ্যে পড়িয়া ছিল, অর্থশাস্ত্রী তাহারই উপর তাঁহার বৈজ্ঞানিক ধী ও শক্তি চালনা করিলেন। দেখিতে দেখিতে এক আশ্চর্য্য বিদ্যা গড়িয়া উঠিল। তখন দেখা গেল, কত সমস্যার পর সমস্যা আসিয়া জুটিয়াছে, আর সেই সমস্যার সমাধানের উপর লোকের, জাতির, সমগ্র মানব-সমাজের কল্যাণ নির্ভর করিতেছে।

কোন সমাজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উহার আর্থিক প্রচেষ্টাসমূহ ব্যাপকতর ও সর্ব্বাপেক্ষা প্রভাবশালী হয়, ইহা সমাজতাত্ত্বিক মাত্রেই স্বীকার করিবেন। সেই সমাজের আর্থিক ব্যাপার বিশ্লেষণ করিতে গেলেই অর্থশাস্ত্র একটা আন্তর্জাতিক বা বিশ্বজনীন রূপ পায়। তখন এই ব্যক্তিগত বাঁচার, জীবনধারণের, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথাই এক অপরূপ কবিত্ব ও ছন্দের মধ্য দিয়া প্রতিভাত হয়। বুঝা যায়, বিদ্যারূপে অর্থশাস্ত্র সবিশেষ যত্ন, অধ্যবসায় সহকারে গড়িয়া তুলিবার বস্তু বটে। অতিশয় আধ্যাত্মিক বিষয়ের সহিতও অর্থশাস্ত্রের অন্তর্গত বিষয় আলোচনা করা যাইতে পারে এবং তাহাতে অর্থশাস্ত্রের হীনপ্রভ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

অর্থশাস্ত্রের আলোচনার পূর্ব্বে এতকাল আমরা এই কথাটাই ভুলিয়া ছিলাম যে, বাঁচিয়া থাকার দিকে মনোযোগ না দিলে, আধিভৌতিক উন্নতিকে ভিত্তি না করিলে, কোন প্রকার উন্নতিই সম্ভবপর হয় না। আগে বাঁচিয়া থাকা চাই, তারপর ত সর্ব্ব প্রকার উন্নতির কথা ভাবা যাইতে পারে। এইরূপে যে জিনিষ তুচ্ছ ছিল তাহা অর্থশাস্ত্রীর সোনার কাঠির স্পর্শে মহীয়ান্ হইয়া উঠিয়াছে। চিন্তায় ও কাজের জগতে মানুষ বাঁচিয়া থাকাটা বিশেষ প্রীতির চোখে দেখিতে শিখিতেছে, তাহা লইয়া নানা দিক হইতে চিন্তা করিয়া জীবনটাকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতেছে,—বর্ত্তমান যুগের অর্থশাস্ত্রের ইহাই একটা মস্ত দান এবং এই দানের জন্য প্রত্যেক বিদ্যার ব্যাপারীর অর্থশাস্ত্রীর নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। বাঁচিয়া না থাকিবার চেষ্টা করাকে আজ আর কেহ গৌরবের বিষয় বলিয়া মনে করে না, এবং তজ্জন্যই বাঁচিয়া থাকাকে মনোরম ও ঐশ্বর্য্যপূর্ণ করিবার কত না প্রচেষ্টা দেখা যায়।

৪

বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। ভাল করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। ভাল করিয়া বাঁচিয়া থাকার অর্থ কি? ভাল খাইব, ভাল পরিব, ভাল বাড়িতে থাকিব। প্রত্যেক মানুষের ভাল খাওয়া-পরা ও ভাল বাড়িতে থাকার অধিকার আছে,—এখানে ভাল শব্দটির যথার্থ মানে আপাততঃ স্থির করিতে চেষ্টা করিতেছি না। প্রথম কথা এই যে, অর্থশাস্ত্র শিক্ষা দেয় যে প্রত্যেক মানুষের পক্ষে ভাল খাওয়া, পরা ও আশ্রয়ের দাবি বা চেষ্টা করা অন্যায়ও নয়, অস্বাভাবিকও নয়।

কিন্তু সহজ দাবি সম্বন্ধে সমস্যার আর অন্ত নাই। সকল মানুষই কি সমান ভাল খাওয়া, পরা ও আশ্রয় লাভের অধিকারী? যদি বল, হাঁ অধিকারী, তাহা হইলে প্রশ্ন—জগতে এত বৈষম্য ও দারিদ্র্য কেন? দারিদ্র্য দূর করা যায় কি? কেমন করিয়া যায়? সকল মানুষকে সমান করিবার উপায় কি? একবার সমান করিয়া দিলে চিরকালের জন্য সে অবস্থা বজায় রাখিবার উপায় কি? আর যদি বল অধিকারী নয়, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য—কেন অধিকারী নয়? সমাজে যে বৈষম্যের সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে কি অকল্যাণ হইতেছে না? সেই অকল্যাণ কমাইবার বা দূর করিবার কি উপায় আছে? ইত্যাদি।

এক কথায় এ-সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নহে। প্রত্যেকটি প্রশ্নের সহিত আরও শত শত প্রশ্ন জড়িত

রহিয়াছে। এগুলির মীমাংসার চেষ্টাও সর্ব্বত্র বা সর্ব্বস্থানে এক প্রকার হয় নাই। রুশ দেশ আজ যে বিস্তীর্ণ পরীক্ষা চালাইতেছে, তার শেষফল জানিতে এখনও দেরি আছে, এবং সে প্রথাকে সকল দেশ চরম বলিয়া মানিয়া লইতে প্রস্তুতও নহে।

মানুষ একা বাস করে না। সেইজন্য এক মানুষের সহিত অন্য মানুষের বিভিন্ন প্রকার সম্বন্ধ গড়িয়া উঠে। আর্থিক সম্বন্ধও ক্রমাগত বিভক্ত হইয়া যায়। ফলে ক্ষুদ্র সমাজে এক ব্যক্তিকে একসঙ্গে নিজের বহু অভাব মিটাইবার চেষ্টা করিতে হয়। কিন্তু সমাজের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে অভাব বাড়িয়া যায়, কোন এক ব্যক্তির পক্ষে তার বিভিন্ন অভাব মিটানো সম্ভবপর থাকে না, কর্ম্ম-বিভাগ আরম্ভ হয় এবং এই বিভাগ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর অবস্থায় গিয়া পৌঁছে। তখন এই সব বিভাগের পরস্পর সম্বন্ধ নির্ণয়ের পালা আসে। খাওয়া-পরা-আশ্রয় বলিতে ডাল-ভাত বা রুটি, বৎসরে দুইখানি কাপড়, যেমন-তেমন একখানা কুঁড়েঘর বুঝায় না। খাওয়া বল, পরা বল, আশ্রয় বল, প্রত্যেক দফার অবিশ্রান্ত পরিবর্ত্তন ও বিবর্ত্তন হইতেছে। ক্রমাগত আদর্শ বদলাইয়া যাইতেছে। কত অসংখ্য রকম পরীক্ষা যে হইতেছে কে তার ইয়ত্তা করিবে? কিন্তু এই পরীক্ষা, পরিবর্ত্তন ইত্যাদিতেও কর্ম্ম-বিভাগের কথা লুপ্ত হইয়া যায় না। একদিকে জগতের উৎপাদন যেমন ক্রমাগত বাড়িতেছে অথবা বাড়াইবার প্রয়াস চলিতেছে, অন্যদিকে সেইরূপ উৎপাদিত দ্রব্যকে যথাযথভাবে বণ্টন করিয়া দিবার সমস্যা দেখা দিতেছে। পরস্পরের যোগাযোগ ও উৎপাদিত দ্রব্যের আদান-প্রদান নানা আকার লাভ করে, আর তাহা নানা স্রোতে প্রবাহিত হয়—গরুর গাড়ী হইতে আরম্ভ করিয়া এরোপ্লেন পর্য্যন্ত। প্রত্যেকেরই সমস্যা ভিন্ন প্রকারের। আবার প্রত্যেক সমস্যার স্বাধীন সমাধান যথেষ্ট নয়; এমন সমাধান দরকার যাহাতে বিভাগের সহিত বিভাগের বা ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির সমন্বয় সাধন হইতে পারে। অর্থশাস্ত্রী ধৈর্য্যের সহিত এই সাধনায় ব্যস্ত।

বর্ত্তমান যুগে বিভিন্ন সভ্য দেশে এক একটি জীবনযাত্রার ধারা সকল লোকের পক্ষে স্থিরীকৃত। সকল দেশে এই মাপকাঠি যে একপ্রকার, তাহা নহে। তবে মোটামুটি একটা নিম্নতম ও ঊর্দ্ধতম সীমা-রেখা টানিয়া দেওয়া হইয়াছে। [illegible] খাদ্য ও বস্ত্র এমন হওয়া চাই যে তাহা শুধু যথেষ্ট নয়, স্বাচ্ছন্দ্য ও আরামজনক, স্বাস্থ্যবর্দ্ধক, শক্তিবর্দ্ধক, ইত্যাদি, ইত্যাদি। ঘরে যথেষ্ট আলোবাতাস আসিতে পারা চাই। কিন্তু খাওয়ার প্রশ্ন ভূমি, চাষ, ফসল, উৎপাদন, বণ্টন, যানবাহন, বাণিজ্য প্রভৃতি বিবিধ প্রশ্নের সহিত জড়িত। তদ্রূপ পরা বা আশ্রয়ও একটি মাত্র প্রশ্নে নিঃশেষিত নহে। প্রত্যেকের সহিত অসংখ্য প্রশ্ন জড়িত রহিয়াছে। তাহা ছাড়া মুদ্রা, সিক্কা, বিনিময় প্রভৃতি ব্যাপারও আছে। কোন অর্থশাস্ত্রী একটি প্রশ্নও ভুলিয়া যান না। কিন্তু এগুলির মধ্যে তাঁহার দিশাহারা হইলে চলে না। তাঁহাকে অনুক্ষণ তাঁহার মূলকথা—মানুষের খাওয়া-পরা ও আশ্রয়স্থানের সুব্যবস্থার কথা—মনে রাখিতে হয়, তাহা লইয়া তথ্য ঘাঁটিতে হয় ও তত্ত্ব খাড়া করিতে হয়। বর্ত্তমান যুগের অর্থশাস্ত্রীর সাধনা—কি করিয়া এই পৃথিবীতে জীবন-ধারণকে আরও সুখময়, স্বাচ্ছন্দ্যময় করিয়া তোলা যায়, কি করিয়া দারিদ্র্য-দুঃখ বহু পরিমাণে দূর করা যায়। কোন দৈব-শক্তি বা ঔষধ তাঁহার হাতে নাই। তাঁর মস্তিষ্কে অবিরত চিন্তা ঘুরিতেছে সেই আদিম খাওয়া-পরা ও আশ্রয়স্থান সম্বন্ধে—কিন্তু তাঁর হাতে পড়িয়া এই সকল জিনিষই বিদ্যা ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ও মর্য্যাদা লাভ করিতেছে।

মানুষের বাঁচিয়া থাকার শাস্ত্রকে সমৃদ্ধতর করিয়া তুলিতেছেন ইউরোপ ও আমেরিকার অর্থশাস্ত্রীরা। আমরা বাঙালীরাই কি পশ্চাতে পড়িয়া থাকিব ও তাঁহাদের শিখান-বুলি মুখস্থ করিয়া দুটি-চারটি পাসের পর জীবনকে ধন্য জ্ঞান করিব? না, মাতৃভাষার মধ্য দিয়া বহু একনিষ্ঠ ও অধ্যবসায়ী বিদ্বান্ তপস্বীর প্রয়োজন আছে যাঁহারা এই বিদ্যার বিভিন্ন শাখাকে নিজেদের বিশিষ্ট চিন্তার দান দ্বারা সমৃদ্ধ করিবেন। আমরা সে-দিনের কামনা করি, যে-দিন এই নবীনতম বিদ্যারও কোন কোন নূতন দিকের আবিষ্কার আলোচনার জন্য দেশ-বিদেশের পণ্ডিতেরা বাঙালী পণ্ডিতের নিকট আগমন করিবেন। এবং সেজন্য বিশ্ববিদ্যালয় ও বাঙালী জনসাধারণ আজ হইতে তাঁহাদের সহানুভূতি ও সাহায্য দিয়া বঙ্গভাষা-প্রেমিক অর্থশাস্ত্রবিদ্গণের উৎসাহ বর্দ্ধন করুন, [illegible] করি। আশা করি, এ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে।

লালবালু

শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত সরকারী খবর ছিল যে উড়োজাহাজ ছোটলাটকে লইয়া ভোর আটটার কিছু পূর্ব্বেই আসিয়া পৌঁছিবে, কাজেই সাতটা না বাজিতেই মাঠে ভিড় জমিতে সুরু করিয়াছিল। এই রাজকীয় আগমন প্রকাশ্য দিবালোকে হইলেও ইহা সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রকাশিতব্য ছিল না, কাজেই কথাটা অত্যন্ত সঙ্গোপনেই রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছিল।

হেমন্তের প্রভাত। সূর্য্য অনেক ক্ষণ উঠিয়াছে, কিন্তু কুয়াশা এখনও অদূরের আম্রবৃক্ষের অন্তরালে নববধূটির মত আত্মগোপন করিবার প্রয়াস পাইতেছিল। ছোট ছোট ঝোপ ও ঘাসের মাঝে মাকড়সা যে জাল বুনিয়াছে তাহাতে নিশীথের শিশিরবিন্দুগুলি ধরা পড়িয়া প্রভাতের আলোকে লজ্জায় লাল হইয়া উঠিতেছে। উত্তরের বাতাস এখনও বহে নাই, তথাপি বেশ শীত-শীত করিতেছে।

ব্যাপারটা অপ্রকাশ্য হইলেও মাঠে তাঁবু পড়িয়াছে আর সঙ্গে সঙ্গে চারিধার ঘিরিয়া পুলিস একটা বিরাট ব্যূহ রচনা করিয়া ফেলিয়াছে। সেই ব্যূহ ভেদ করিয়া যাঁহারা তাঁবুর নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন তাঁহারা সকলেই কৃতবিদ্য ও স্বনামধন্য। যাহারা এখনও ব্যূহের বাহিরে দাঁড়াইয়া তাঁবুর দিকে তাকাইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতেছে তাহারা 'পারিয়া'—বেওয়ারিশ! এই গৃহপালিত ও পথচারীর মধ্যে প্রভেদ এই যে, প্রথম দল উড়োজাহাজ অপেক্ষা উড়োজাহাজের মালিকের জন্য উদ্‌গ্রীব, আর দ্বিতীয় দলের ঔৎসুক্য মালিক অপেক্ষা মালের জন্য বেশী।

তাঁবুর সম্মুখের চেয়ারটা আরও একটু টানিয়া লইয়া রায়-বাহাদুর ভবানন্দ বলিলেন,—তাই তো, তাহা হলে ভোগাইবে দেখিতেছি—কপালে দুর্ভোগ থাকিলে—

কথাটা শেষ করিতে হইল না। জের টানিয়া রাজা হরিহরপ্রসাদ বলিলেন,—আর একটু পূর্ব্বে খবর পাইলেই তো হইত; এখন আর যাই-ই বা কি করিয়া, দূর তো আর কম নয়।

মিঃ প্রসাদ জেলার হাকিম। বলিলেন,—আপনাদের কষ্ট হইবে, কিন্তু কি করি? এই মাত্রই ত খবর পাইলাম। তা গল্পগুজব করিয়াই কাটানো যাউক।

ব্যাপারটা বিশেষ-কিছু নয় অথচ কিছু। হঠাৎ খবর আসিয়াছে, রাস্তায় উড়োজাহাজের কল সহসা বিগড়াইয়া গিয়াছে। পৌঁছিতে একটু বিলম্ব হওয়া স্বাভাবিক। মিস্ত্রি লাগিয়া গিয়াছে তবে মেরামত কতক্ষণে শেষ হইবে বলা যায় না। যে-ভাবে কাজ চালিতেছে তাহাতে বেলা নয়টা হইতে দশটার মধ্যেই পৌঁছিবার সম্ভাবনা।

কথাটা আরও একটু খুলিয়া বলা দরকার। উড়োজাহাজ নামিবার মাঠটা শহর হইতে প্রায় ষোল মাইল দূরে। এতটা পথ আসিয়া এখনই আবার ফিরিয়া যাওয়া এবং আবার আসা নিতান্ত সহজ নহে—মোটরকারে হইলেও। বিশেষতঃ উড়োজাহাজে যখন আর ঘণ্টা ও মিনিট দাগিয়া আসিবে না এবং কোনও কারণে দেরি হইয়া গেলে আফসোসেরও স্থান থাকিবে না, তখন একটু ধৈর্য্য ধারণ করিয়া যথাস্থানেই অপেক্ষা করা সঙ্গত ও সমীচীন।

ব্যাপারটা গুরু না হইলেও কোন কিছু নিশ্চিত কাজে কিঞ্চিৎ মাত্র বাধা পাইলেও মনটা ভাল থাকিতে পারে না। কেহ কেহ তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করে; কাহারও অসোয়াস্তি বা অন্যপথে চালিত হইয়া অকারণ উষ্মায় পরিণত হয়। রায়-বাহাদুরের ধৈর্য্য একটু কম; প্রসাদ সাহেবের এই গল্পগুজব করিবার কথাটা সাধারণ হইলেও তাহার কাছে কেমন বিশ্রী ঠেকিল। বলিলেন,—আপনাদের কি মশায়, লম্বা টি-এ, তা গল্পই করুন আর বিচারই করুন।

রায়-বাহাদুরের মেজাজ না জানিলে, লম্বা টি-এর সহিত এই প্রাতঃকালের গল্পগুজবের সম্বন্ধ বাহির হইবে না। প্রসাদ সাহেব প্রথমটি জানিতেন বলিয়াই একটু হাসিলেন মাত্র।

রায়-বাহাদুর তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—তা হাসুন

আর যাহাই করুন—এটা ডেমোক্রেটিক যুগ ; আমরা চাই ডেমোক্রেটিক পন্থা।

মিঃ প্রসাদ বলিলেন,—কেন, বলুন তো ?

রায়-বাহাদুর বলিলেন,—দেখুন না চাকরিগুলো সব কেমন। যাহার চাকরি যত বড় ধাপের তাহার সুবিধা তত বেশী। বড় চাকরি—তাহার পেনসন, তাহার ফার্লো, তাহার ওভারসিজ। সে চাকরিওয়ালাকে তাড়াইতে হইলেও অন্ততঃ ছয় মাস কমিশন বসিবে—চিঠি লেখালেখি চলিবে—তারপর যদি কিছু হয়। আর এই দেখুন, বাসার চাকরটা—সেও তো চাকরি ; বলেন, নেই মাংতা – তাহাকে যাইতে হইবে সেই মুহূর্ত্তেই ! কোথায় বা তাহার পেন্‌সন্—কোথায় বা তাহার ভবিষ্যৎ ! কেন বলুন তো ?—এ বৈষম্য কেন ?

কথাগুলির সারবত্তা থাকিলেও উহা অপ্রাসঙ্গিক। প্রসাদ সাহেব হাসিয়া বলিলেন,—তাহা তো ঠিকই, তবে বৈষম্য না থাকিলে জগতের গতিই যে বন্ধ হইয়া যাইবে।

রায়-বাহাদুর বলিলেন,—এটা তো অটোক্র্যাটের কথা। যেমন ইংরেজ বলে, আমরা আছি বলিয়াই তো তোমাদের এই উর্দ্ধগতি—আমাদের সহিত তোমাদের বৈষম্য যত বেশী থাকিবে, তোমাদের উন্নতি তত বেশী হইবে—মূল কথা তো এই ? হউক দেখি স্বরাজ, কোথায় থাকে সে কথা। স্বরাজ পাইলে, আমাদের দেশের উন্নতি কি বন্ধ হইয়া যাইবে, না আমরা সাত হাত জলের নীচে পড়িয়া যাইব ?

মিঃ প্রসাদ বলিলেন,—আহা তা নয়। কথাটা একটা বৈজ্ঞানিক সত্য। সেই 'নেগেটিভ ও 'পজেটিভ' পোলের কথা জানেন তো ? ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের মুণ্ডিত মস্তকও যেমন আজকাল অচল, আগুল্‌ফলম্বিত কেশদামও তেমনি পৌরাণিক। ফলে, পুরুষও বাবরি রাখিতে সুরু করিয়াছে—নারীও 'বব্‌ড্‌' চুলকে অতি আধুনিক রুচি-সম্মত বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে। শনৈঃ শনৈঃ সমতা আসিয়া যাইতেছে। কিন্তু এই আকর্ষণের পরেই আবার একটা বিকর্ষণ আছে ; তাহার ফলে আবার সেই মস্তক মুণ্ডন ও দীর্ঘ অলকদামের যুগে পৌঁছিতে হইবে—এই ত জগতের গতিচক্র।

তর্ক জমিয়া উঠিতেছিল—বিশেষ করিয়া ভবিষ্যৎ স্বায়ত্ত-শাসনের যুগকে লক্ষ্য করিয়া। কিন্তু রাজা-বাহাদুরের উহা ভাল লাগিল না। তিনি বলিলেন,—প্রসাদ সাহেব কি কখনও উড়োজাহাজে চড়িয়াছেন ?

মিঃ প্রসাদ বলিলেন,—আজ্ঞে না। রাজা-বাহাদুরের কি 'বউনি' হইয়া গিয়াছে নাকি ?

রাজা-বাহাদুর বলিলেন,—তা হইয়াছে বই-কি, তবে প্রথম প্রথম খরচ বড় বেশী ছিল—আজকাল তো শুনি কলিকাতায় নাকি দশ টাকায় আধ-ঘণ্টা চড়া যায়। আমার খরচ পড়িয়াছিল সাত শত টাকা।—সে এক মজার ব্যাপার।

সেখানে এমন কেহ ছিল না যে সে 'মজার ব্যাপারটা' আগাগোড়া অন্ততঃপক্ষে বার-দশেক শ্রবণ করে নাই, তথাপি সকলেই যেন সে-কথা শোনার জন্য একান্ত উদ্‌গ্রীব, এমন ভাব দেখাইলেন। গল্প আরম্ভ হইল।

রায়-বাহাদুরের দেহ একটু স্থূল। বহুক্ষণ পূর্ব্বেই তিনি চুপ করিয়াছিলেন এবং গল্পের মধ্যপথেই চেয়ারে বসিয়াই তাঁহার নাসিকা সহসা গর্জ্জন করিয়া উঠিল। রাজা হরিহর তাঁহার পাশেই ;—একটা ধাক্কা দিয়া রসিকতা করিয়া বলিলেন,—কি হে 'আজু রজনী হাম' নাকি ?

রায়-বাহাদুর চম্‌কিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—কি যে বল—ছেলেটার অসুখ আজ দশ দিন—'টাইফয়েড'। রাত্রে কি আর দুই চোখ লাগাইবার জো আছে ?

রাজা-বাহাদুর বলিলেন,—তবে আর এ দুর্ভোগই বা কেন ?

—তাহা আর ভাই তুমি কি বুঝিবে ?—ছেলেটার তো একটা গতি করতেই হইবে।

রাজা-বাহাদুর হাসিয়া বলিলেন,—কেন ছোটলাট কি 'বদ্যি' নাকি ?

রায়-বাহাদুরের মন এমনিই ভাল ছিল না—তিনি চটিয়া গেলেন। বলিলেন,—বদ্যি তো নয় বুঝিলাম ; তবে বাবা তোমারই বা এই রোগ কেন ? খাও-দাও স্ফূর্ত্তি কর—কাহারও তোয়াক্কা রাখ ? এই কলাচূড়া বাঁধিয়া মাঠে মাঠে ঘুরিবারই বা অর্থ কি ?

উপস্থিত সকলেই মুখ টিপিয়া হাসিলেন। কিন্তু রাজা-বাহাদুরের মুখ ক্রমশঃ কালো হইতে বেগুনি হইয়া গেল। বোঝা গেল, কথাটা যে বাঁক ধরিয়াছে তাহাকে ঐ পথে চলিতে দিলে,

পরিশেষে একটা কেলেঙ্কারি হইবার সম্ভাবনা, কারণ রায়-বাহাদুরের কথাগুলি উপস্থিত ভদ্রমহোদয়দের শতকরা নব্বই জনের পক্ষেই খাটে, আর খাটে বলিয়াই একে অন্যের নিকটে এ-সম্পর্কে শব্দমাত্র উচ্চারণ করিতে চাহে না। একটা বড় ব্যাপারের উল্লেখে বা অবান্তর কি অপ্রাসঙ্গিক সহস্র প্রকার বিষয়ের অবতারণা করিয়া সকলেই নিজেদের এই সুপরিস্ফুট দুর্ব্বলতাকে বিস্মৃতির মধ্যে গোপন করিতে প্রয়াস পায়। আর অপরের কথা উঠিলেই একটু মুখ টিপিয়া হাসিয়া প্রমাণ করিতে চাহে যে, সে নিজে এ সকলের বহু উর্দ্ধে—যদিও এই অবাধ ভাঁড়ামির অসারতা সে কখনও কখনও মনে প্রাণে অনুভব করে।

প্রসাদ সাহেব চতুর লোক। বলিলেন,—রায়-বাহাদুর যাহাই বলুন—ডাক পড়িলেই আসিতে হয়, কেউ প্রাণের টানে, কেউ পেটের দায়ে। আমরা নোকর - হাজিরা তো দিতেই হইবে। কিন্তু রাজা-বাহাদুরের কথা স্বতন্ত্র। মনিব আসিয়া প্রথমেই বলিবেন, রাজা বাহাদুর কোথায়?

গণপতি আইনব্যবসায়ী—রাজা-বাহাদুরের সান্ধ্য-মজলিসের লোক। বলিলেন,—তা নয়তো কি? নহিলে রাজা-বাহাদুরের কি?—ছেলের চাকরিও নাই—মেয়ের বিবাহও নাই।

রাজা-বাহাদুর স্তুতিতে সন্তুষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু মুখ খুলিলেন না।

প্রসাদ সাহেব বলিয়া চলিলেন,—তা যাহাই হউক, সে-বার প্যালেসে যে পার্টিটা হইল—সেটা, হ্যাঁ এ দুর্বৎসরে উল্লেখযোগ্য বটে। সত্য কথা বলিতে কি, তিনি এবার সমস্ত প্রদেশের সম্মান রক্ষা করিয়াছেন। তা সবসুদ্ধ কত টাকা খরচ হইয়াছিল রাজা-বাহাদুর?

রাজা-বাহাদুর বলিলেন,—আহা সে সামান্য ব্যাপারের কথা, তাহা আর কেন?

গণপতি বলিলেন,—আজ্ঞে, সেটা আপনার নিকট সামান্য হইতে পারে, তা আমাদের কাছে অসামান্য বটে।

রাজা-বাহাদুর হাসিয়া বলিলেন,—কি যে বল—তোমরা আবার ছাড় না। কত আবার হইবে?—হাজার-বার। তবে টাকাটা আমার তহবিল হইতে যায় নাই, প্রজারা 'মাথট' দিয়াছে। আর বল কেন? সেই নিয়ে এক মহালে তো একটা দাঙ্গাই হইয়া গেল—বলে 'চাঁদা' দিব কেন—খাইতেই পাই না!

আবার সুরু হইল। কেমন করিয়া সে বিদ্রোহী মহাল শাসনে আনিতে হইল, কয়টা মাতব্বরের হাত-পা ভাঙিয়া গেল—কাহার কাহার জেল হইল, রাজা-বাহাদুর বিনাইয়া বিনাইয়া তাহাই বলিতে লাগিলেন।

মোহিত ইঞ্জিনিয়ার। পেটের দায়ে এখানে হাজিরা দিতে হইতেছিল, কিন্তু এই অভিজাতদের দলে নিজেকে ঠিকমত খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারিতেছিল না। একদিকে সে রাজা-বাহাদুরের বন্ধুপ্রীতি, অন্যদিকে রায়-বাহাদুরের ভবিষ্যৎ চিন্তার গভীরতা অনুধাবন করিতে চেষ্টা করিতেছিল।

সূর্য্য তখন অনেকখানি উঠিয়া গিয়া হেমন্তের হিমকে তাতাইয়া তুলিয়াছে। সম্মুখে প্রশস্ত মাঠ; মাঝে মাঝে চুণ ফেলিয়া দাগিয়া দেওয়া হইয়াছে। একদিকে একটু ঢালু জমি—সেখানে রক্তবর্ণ পতাকা পুঁতিয়া বিপদের আশঙ্কা জানান হইয়াছে—যেন বিমানচারী রথকে সেখানে না নামান হয়।

মোহিত দূরে আকাশের শেষ সীমায় চাহিয়া ছিল। সহসা মুখ ফিরাইয়া মিঃ প্রসাদের দিকে চাহিয়া বলিল,—এ জায়গাটাকে 'লালবালু' বলা হয় কেন? এখানকার বালু কি বেশী লাল?

হঠাৎ একটা নতুন রকমের কথা পাইয়া সকলেই উন্মুখ হইয়া প্রসাদ সাহেবের দিকে চাহিল। প্রসাদ সাহেব বলিলেন,—বালু তো লাল নয়, তবে এই জায়গাটার ইতিহাস একটু লাল—সেটা 'মিউটিনি'র সময়কার কথা।

শ্রোতৃবৃন্দ উৎসুক হইয়া উঠিল।

প্রসাদ সাহেব বলিতে আরম্ভ করিলেন,—সেটা ১৮৫৭ সাল—তখন পঞ্জাব হইতে বিহার পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই এক বিরাট সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। 'স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ'—জাতিধর্ম্ম আর থাকে না—হয় মৃত্যু, নয় মুক্তি। এ পর্য্যন্তও তাহার ঢেউ আসিয়া পৌছিয়াছে।

এদিকে তখন বিলাতী নীলকরের দল। বিশ-পঁচিশ ঘর হইবে—এই ত্রিশ মাইলের মধ্যে। কেহ সপরিবারে, কেহ একাকী। খবর আসিল, বিদ্রোহী সৈন্যের একটি ভগ্নাংশ এদিকে আসিতেছে, বিধর্ম্মীদিগকে আর এদেশে বাস করিতে দেওয়া হইবে না। সৈন্যদল একান্ত বদ্ধপরিকর।

কথাটা বিদ্যুদ্বেগে ছড়াইয়া গেল। এই পঁচিশ ঘর

লোক প্রমাদ গণিল। ত্রিশ জন সক্ষম পুরুষ, দশ জন ছেলে-মেয়ে আর পনের জন নারী। কোথায় আশ্রয় মিলিবে? বৈঠক বসিয়া স্থির হইল—গোলমাল থাকা পর্য্যন্ত সকলে আসিয়া এক বাড়িতে বাস করিবে। পুরুষেরা সমস্ত রাত্রি জাগিয়া পাহারা দিবে—মেয়েরা খাদ্য জোগাইবে আর ছেলে-মেয়েরা দিনে চৌকি দিবে। মাসখানেকের মত রসদও সংগ্রহ হইয়া গেল।

এমন সময় গদাধরবাবু দৌড়িয়া আসিয়া বলিলেন,—একটা শোঁ শোঁ শব্দ শোনা যাইতেছে না?

সকলে উৎকর্ণ হইয়া উঠিলেন। রাজা-বাহাদুর তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া গিয়া দাঁড়াইলেন—একেবারে বাহিরে। অন্য সকলে তাঁহাকে অনুসরণ করিলেন। তাহার পর চলিল অজস্র গবেষণা।

রায়-বাহাদুর বলিলেন,—ঐ যে, উত্তর-পূব কোণে মেঘের পাশে কি দেখা যাইতেছে যে!

সকলে সেই দিকেই চাহিলেন। অনেক অনুসন্ধান চলিল। মেঘলোকচারী সেই বিমানপোত মেঘারণ্যে পথ হারাইল কিনা ভাবিয়া এই মর্ত্তালোকের জনকয়েক অধিবাসীর চিন্তা প্রখর হইয়া উঠিল। কিন্তু পরিশেষে উত্তর-পূর্ব্ব কোণে একটি বিহঙ্গম আবিষ্কৃত হইল মাত্র—আর শোঁ শোঁ শব্দ সহসা বাতাসে মিলাইয়া গেল।

হতাশ হইয়া সকলে ফিরিয়া আসিলেন। রায়-বাহাদুর ঘড়ি খুলিয়া বলিলেন,—আরে সাড়ে বারটা যে হইয়া গেল। ব্যাপার কি?

রৌদ্রের তেজে সকলের মুখেই ঘাম দেখা দিয়াছে; প্রাতরাশ পর্য্যন্তও অনেকের হয় নাই—কণ্ঠ ও তালু শুকাইয়া আসিতেছে।

গদাধরবাবু বলিলেন,—রায়-বাহাদুর একটু চা হউক—গলা যে শুকাইয়া চলিল।

রায়-বাহাদুর মুখ বিকৃতি করিয়া বলিলেন,—মন্দ তো ছিল না, এদিকে যে গীতাপাঠও হয় নাই কে জানিত কপালে এত দুর্ভোগ ছিল?

মোহিত মিঃ প্রসাদের দিকে চাহিয়া বলিল,—তারপর?

প্রসাদ সাহেব শুষ্কমুখে একটা পুরা আপেল চর্ব্বণ করিবার বৃথা চেষ্টা করিতেছিলেন। বোধ হয় ভাল লাগিল না। সেটা রাখিয়া পুনরায় আরম্ভ করিলেন,—হ্যাঁ, তারপর। সাহেবদের দুর্গ তৈরি হইল—পাহারা চলিতে থাকিল।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। চারি দিন পরে চরম সংবাদ পৌছিল, বিদ্রোহীর দল আসিয়া এই মাঠে আড্ডা গাড়িয়াছে, এখন আক্রমণ করিলেই হয়। সর্ব্বসুদ্ধ তাহারা এক শত, সঙ্গে বন্দুকও যথেষ্ট আছে। সাহেবকুল প্রমাদ গণিলেন।

কথায় আছে, ছলে, বলে বা কৌশলে। বল যেখানে পরাভূত সেখানে অন্য দুইটির শরণাপন্ন হইতে হয়। আবার বৈঠক বসিল—পরামর্শ চলিল।

ডল্টন সাহেবের এক সহিস ছিল, নাম শরণ সিং। শোনা গেল, শরণ সিঙের ভাই রঘুনাথ ও-দলের সর্দ্দার—তাহার কথায় সকলে উঠে, বসে। শরণ সিঙের ডাক পড়িল সাহেবদের বৈঠকে। শরণ সিং দশ বৎসর নকরি করিয়াছে—সেলামে সে ওস্তাদ; দৃষ্টি তাহার নকরির বাহিরে যায় না।

ডল্টন সাহেব বলিল,—দেখ শরণ সিং, কাজ হাঁসিল করিতে পারিলে ত্রিশ হাজার টাকা ইনাম। বিশ টাকার হিসাবী শরণ সিং হতভম্ব হইয়া গেল। গোপনে অর্দ্ধেক টাকা লইয়া রঘুনাথের হাতে সমর্পণ করিল। রঘুনাথের ভবিষ্যৎ দৃষ্টি অসীম—সে ভবিষ্যতের দিকে চাহিল।

এ হুজুগ আর বেশী দিন টিকিবে না। জোর মাসখানেক, মাস দুই। তারপর আবার যাহা তাহাই হইবে। ইহার মধ্যে ভবিষ্যতের জন্য কিছু সংগ্রহ করিয়া 'শেঠজী' হইতে পারিলে আপত্তি কিসের? রঘুনাথ বিষয়ী বিবেচক—বিচারে ভুল করিল না। সেদিন রাত্রিকালে ভ্রাতৃসহযোগে আপনাদের বন্দুক কয়টি সংগ্রহ করিয়া এবং যাইবার কালে বন্ধু-প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ সেগুলি সাহেবদের উপহার দিয়া ত্রিশ সহস্র মুদ্রা কোমরে বাঁধিল।

তারপর?—তারপর যাহা হইবার তাহাই হইল। মীরজাফরের ইতিহাস স্মরণ করুন। অবিলম্বে বিদ্রোহী সেনানী ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল—কিন্তু তাহারা ছত্রভঙ্গ হইবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে এই মাঠের বালু লাল হইল—কৃষ্ণ বক্ষের ভিতর হইতে রক্ত পড়িয়া বিশ্বাসহন্তার জয়তিলক আঁকিয়া দিল!

বিদ্রোহ থামিয়া দিনকয়েকের মধ্যেই শান্তি স্থাপিত

হইল। রঘুনাথ 'শেঠজী' হইয়া গদী চাপিয়া বসিল—শরণ সিঙের বাড়িতে সহিস বহাল হইল, শুধু এখানকার বালুর নামের পূর্ব্বে একটু লাল রং লাগিয়া রহিল মাত্র—স্মৃতির মত—অন্যায়ের প্রতিফলস্বরূপ।

এমন সময় সত্য সত্যই বাঘ আসিল। উত্তর-পূর্ব্ব কোণে একটা ক্ষুদ্র পক্ষীর মত কি যেন দেখা গেল - সঙ্গে সঙ্গে একটা শব্দ। রাজা-বাহাদুর উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন,—এবার আর কথা নয়, এবার সত্যি।

বাহিরে দাঁড়াইয়া আবার কল্পনা-জল্পনা চলিতে লাগিল। ক্রমে আকাশবিহারী রথ কাছে আসিল—শব্দ স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া উঠিল। বেলা এই তৃতীয় প্রহরে সকলে অস্নাত অভুক্ত অবস্থায় উর্দ্ধনেত্রে প্রখর সূর্য্যতাপ অগ্রাহ্য করিয়া স্বপ্নদৃষ্ট বিমানপোতাধিরূঢ় বন্ধুর জন্য তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন।

ক্রমে আরও নিকটে—আরও নিকটে—শব্দ আরও দ্রুত আরও স্পষ্ট। নিম্নে চঞ্চলতা বাড়িয়া উঠিল—কল্পনা দূরে রাখিয়া বাস্তবের জন্য মর্ত্ত্যবাসী আকুল হইল।

বিমানপোত ঠিক মাথার উপরে আসিয়া পড়িল—উর্দ্ধনেত্রে স্পষ্ট পড়া গেল—CT-VTR. তিনটি পক্ষ সঞ্চালন করিতে করিতে মেঘরথ মাথার উপর দিয়া উড়িয়া অগ্রসর হইয়া গেল।

রাজা-বাহাদুর অধৈর্য্য হইয়া আকাশকে প্রশ্ন করিলেন,—একি! নামিবার মাঠ ভুল করিল নাকি?

আকাশের দিকে চাহিয়াই গদাধরবাবু বলিলেন,—তাহা নয়, এমন করিয়াই যে নামে। এখনও কম চক্কর যে দিবে, তাহার স্থিরতা নাই।

তাহার পর আবার শুষ্কতা। ঘর্ঘর্ শব্দে বাম কাৎ ঘুরিয়া বিমানপোত আবার তাহার আসা-পথে চলিল। নরলোকের দৃষ্টি সে-পথে তাহাকে অনুসরণ করিল। আবার দিক ঘুরিল, পিছন ফিরিল, ক্রমশঃ নীচে—আরও নীচে এবং আরও নীচে আসিয়া একেবারে পদচক্র দিয়া ভূমি স্পর্শ করিল। স্পর্শ করিয়াই একেবারে সোজা দৌড়িয়া আসিতে লাগিল। তাঁবুর সম্মুখের উৎসুক প্রাণীর দল এই প্রকাণ্ড বিহঙ্গমের জন্য পথ ছাড়িয়া দিয়া ত্রাসে সরিয়া দাঁড়াইল।

গতি স্তব্ধ হইল—বিহঙ্গম শান্ত হইয়া দাঁড়াইয়া নিঃশ্বাস ফেলিল। কক্ষদ্বার খুলিয়া দুইটি শ্বেতকায় মানব নামিয়া আসিলেন। মিঃ প্রসাদ বলিলেন, His Excellency—

বাধা দিয়া একজন বলিল,—তিনি আসেন নাই—ট্রেনে আসিয়া এখানে উঠিবেন। আমি তাঁহার সেক্রেটারী।

রাজা-বাহাদুর বসিয়া পড়িলেন। রায়-বাহাদুর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া শুষ্কমুখে ঢোক গিলিবার চেষ্টা করিলেন।

মোহিত ঘড়ি খুলিয়া দেখিল, বেলা আড়াইটা। প্রসাদ সাহেব তখন শুষ্কমুখে হাসি টানিয়া তপশ্চারীদের পরিচয়-প্রদানে অগ্রসর হইয়াছেন; ইনি আমাদের রাজা-বাহাদুর—

মোহিতের কানে আর কিছু যাইতেছিল না। সে যেন চলচ্চিত্র দেখিতেছে; একই অভিনয়ের পুনরাবৃত্তি। শত শত বৎসরেও সেই অভিনয়ের বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই। সেই সনাতন নটের দল পুরাতন ভূমিকাই আবৃত্তি করিতেছে—শুধু বেশ-বিন্যাস একটু বদলাইয়া গিয়াছে মাত্র। সেই পুরাতন আকাশ, নিম্নে সেই পুরাতন ধরণী; বৃক্ষ, লতা, পত্র, পুষ্প তেমনি জড় ও অসার। দিগন্তবিস্তৃত রৌদ্রতপ্ত মাঠের মধ্যে এই ক্লান্ত দ্বিপ্রহরে অস্নাত ও অভুক্ত অবস্থায় তাহার মনে হইতেছিল, সে যেন একটা অসীম জড়ত্বের মাঝখানে ক্রমশঃ নিশ্চল হইয়া যাইতেছে—প্রস্তরীভূত দেহভার চলে না, মন স্থির—অসাড়। ইহাই কি মৃত্যু? মৃতের কি পরিবর্ত্তন নাই?

সবার অলক্ষিতে সে একটু বালু তুলিয়া দেখিল। সাদা বালু—ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই মিলে!

স্বপ্ন

শ্রীবীরেশ্বর সেন

আমরা সকলেই জানি যে, আমাদের মনের গতি অতি দ্রুত। কলিকাতায় বসিয়া একখানা পুস্তক পাঠ করিতেছি, নিমেষ মধ্যে মন চলিয়া গেল দিল্লী, লাহোর, লণ্ডন, নিউইয়র্কে, অথবা এই সকল স্থান অপেক্ষা কোটি কোটি গুণ দূরবর্ত্তী সূর্য্য, বৃহস্পতি, শনি বা কোন স্থির নক্ষত্রে। মনের গতির আর একটা প্রকার আছে যাহা ভাবিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয় এবং যাহা ঘটিয়া থাকে স্বপ্নাবস্থায়। যে-সকল ঘটনা আমাদের গোচর হইতে পাঁচ সাত মিনিট হইতে দশ পনর বৎসর লাগিতে পারে সেই সকল ঘটনা স্বপ্নাবস্থায় এক নিমেষের শতাংশেরও অল্প সময়ে মনে প্রতিভাত হইতে পারে। এতৎসম্বন্ধে মনস্তত্ত্ববিষয়ক পাশ্চাত্য অনেক পুস্তকে বহু কৌতূহলজনক আখ্যান আছে। সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্রে সেইরূপ আছে কি না জানি না। শুনিয়াছি কোন কোন পুরাণে আছে। আমি এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তিনটি গল্প মাত্র বলিব। প্রথম গল্পটি আরব-দেশীয় যাহা আমি ষাট-পঁয়ষট্টি বৎসর পূর্ব্বে পড়িয়াছিলাম বা শুনিয়াছিলাম। দ্বিতীয়টি গত মহাযুদ্ধের সময়ের একজন টেলিগ্রাফ সিগনালারের অভিজ্ঞতালব্ধ। তৃতীয়টি আমারই জীবনে ঘটিয়াছিল।

প্রথম গল্প

একজন আরব বোধ হয় একদিন রাত্রে মোটেই ঘুমাইতে পারে নাই। পরদিন সে যখন স্নান করিতে প্রস্তুত হইল, তখন তাহার তন্দ্রা আসিতেছিল। সে জলে একটা ডুব দিয়া মাথা তুলিয়া দেখিল যে, সে একজন হাব্‌শী বা কাফ্রী স্ত্রীলোক। নিকটে তাহার স্বামী দাঁড়াইয়া তাহাকে ডাকিয়া বলিল, "তোর স্নান করিতে কতক্ষণ লাগে? শীঘ্র চলিয়া আয়।" ইহা শুনিয়া সে তাড়াতাড়ি স্নান শেষ করিয়া তাহার স্বামীর সঙ্গে বাড়ি ফিরিয়া যায়। সেখানে সে সমস্ত দিনব্যাপী রন্ধনাদি গৃহকার্য্য করিল। এইরূপ বৈচিত্র্যহীন সংসারযাত্রায় দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস তাহার অতিবাহিত হইতে লাগিল। দুই-এক বৎসর পরে সেই পুরুষ (স্ত্রী-রূপা) একটি পুত্র প্রসব করিল। ইহার দুই বৎসর পরে তাহার একটি কন্যা হইল। আরও দুই বৎসর পরে তাহার একটি পুত্র জন্মিল। এই শিশুটি যখন দশ বৎসরের হইল, তখন সেই নারী একদিন প্রাত্যহিক নিয়মানুসারে স্নান করিতে প্রবৃত্ত হইয়া জলে ডুব দিয়া মাথা তুলিয়া দেখিল যে, সে যেমন পুরুষ ছিল তেমনই হইয়াছে। তখনই তাহার সমস্ত পূর্ব্বস্মৃতি ফিরিয়া আসিল। সে বুঝিতে পারিল যে, ডুব দিবার সময়ে ঝিমাইতে ঝিমাইতে নারীজীবনের স্বপ্ন দেখিয়াছিল। তাহার ইহাও মনে হইল যে, যখন এত বড় স্বপ্ন দেখিয়াছে তখন সে নিশ্চয়ই অনেক ক্ষণ জলমধ্যে ডুব দিয়া ছিল। ইহা ভাবিয়া সে পার্শ্ববর্ত্তী আর একজন স্নানকারীকে জিজ্ঞাসা করিল, "ভাই, আমি কতক্ষণ জলে ডুবিয়াছিলাম?" সে ব্যক্তি বলিল, "কতক্ষণ আর থাকিবে? জলে ডুবিয়া আর লোকে কতক্ষণ থাকিতে পারে? যেমন ডুব দিলে, অমনি মাথা তুলিলে।"

তখন সেই আরব বুঝিল যে, সে এক নিমিষেরও কোন ভগ্নাংশ সময়ে সেই দীর্ঘ স্বপ্নটা দেখিয়াছিল।

দ্বিতীয় গল্প

মহাযুদ্ধের সময়ে পশ্চিম-সীমান্তে যে-সমস্ত টেলিগ্রাফ কর্ম্মচারী কাজ করিত, তাহাদিগকে কখন কখন সমস্ত রাত্রি জাগিতে হইত। এ অবস্থায় মধ্যে মধ্যে তন্দ্রার আবেশ অবশ্যম্ভাবী। এইরূপ একজন তন্দ্রাপ্রবণ সিগ্‌নালারের নিকটে একটা লোক গিয়া একটা মেসেজ (message) দিল। তাহার শব্দগুলি শুনিয়া সিগ্‌নালার টাকা চাহিল। আগন্তুক আবশ্যক টাকা রাখিয়া বলিল, এই নিন্ টাকা। এই তিন চারি সেকেণ্ডের মধ্যে সিগ্‌নালারের তন্দ্রা আসিল এবং সে একটা স্বপ্ন দেখিল। সে যেন যুদ্ধক্ষেত্রের কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া সেখান হইতে পলায়ন করতঃ একেবারে

তাঁহার স্বদেশ ইংলণ্ডে চলিয়া গিয়াছে। সেখানে গিয়া তাহার প্রণয়িনীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে স্বীয় পলায়ন-বৃত্তান্ত বলিল এবং উভয়ে পরামর্শ করিয়া ইংলণ্ড ত্যাগ করিয়া অন্য দেশে গেল। সেখানে বিবাহিত হইয়া পাঁচ সাত বৎসর বাস করিল। পরে যুদ্ধের বিরতি হইয়াছে জানিয়া উভয়ে দেশে ফিরিয়া গেল। যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিবার পরই তাহার নামে ওয়ারেণ্ট বাহির হইয়াছিল। সেই ওয়ারেণ্ট লইয়া পুলিস তাহাকে অনুসন্ধান করিতে করিতে তাহারা স্ত্রীপুরুষে যে-বাড়িতে বাস করিতেছিল, সেখানে গিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। ইহার পর বিচারে তাহাকে গুলি করিয়া প্রাণদণ্ড করিবার আদেশ হইল। পূর্ব্বকথিত আগন্তুক টাকা দিবার সময়ে টাকার যে শব্দ হইয়াছিল, সেই শব্দই স্বপ্নমধ্যে তাহার গুলি করার শব্দ বলিয়া বোধ হইল, এবং তাহার স্বপ্ন ভঙ্গ হইল। সে তখন আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করিল সে কতক্ষণ অপেক্ষা করিতেছে। আগন্তুক বলিল, "টাকা ত এইমাত্র দিলাম।"

তৃতীয় গল্প

আমি স্বপ্নে যে-যে ঘটনা দেখিয়াছিলাম তাহা যদি বাস্তব হইত, তাহা হইলে পাঁচ মিনিটে তাহা সম্পন্ন হইত, কিন্তু স্বপ্নে দুই তিন সেকেণ্ডের অধিক লাগে নাই—ইহা নিম্নলিখিত বিবরণ হইতে প্রতীয়মান হইবে।

অনেক দিন হইল একবার উল্‌টা রথের দিন পুরী গিয়াছিলাম। রেলে টিকিট করিয়াছিলাম ইণ্টার ক্লাসের, কিন্তু ভিড়ের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতেও স্থান না পাইয়া প্রথম শ্রেণীতে অতি কষ্টে একটু স্থান পাইলাম। ট্রেন যাইতে যাইতে প্রথমে যে-স্থান হইতে জগন্নাথের মন্দির দেখা গেল, সেই স্থান হইতে যাত্রীদের মধ্য হইতে 'জয় জগন্নাথ' ধ্বনি উত্থিত হইল এবং অবিরত উত্থিত হইতে লাগিল।

মধ্যাহ্নে পুরীতে পৌঁছিয়া পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট একটা বাসায় গিয়া স্নানাহার করিয়া রথ দেখিতে বাহির হইলাম। ষ্টেশন হইতে রথ পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান লোকে লোকারণ্য। সকলেই যেন আনন্দে বিহ্বল। এরূপ বিপুল জনতার এমন আনন্দোচ্ছ্বাস পূর্ব্বে বা পরে, কি মাহেশের রথে, কি হরিহর ছত্রের মেলায় আমার আশী বৎসর বয়সের মধ্যে কোথাও দেখি নাই। প্রথমে বলরামের, পরে সুভদ্রার রথ চলিয়া গেল। তাহার পর জগন্নাথের রথ আসিতে লাগিল। দলে দলে লোক আগ্রে অগ্রে বাদ্য বাজাইতে বাজাইতে, গান করিতে করিতে, নাচিতে নাচিতে যাইতে লাগিল। একটি অর্দ্ধবয়স্কা ক্ষীণাঙ্গী অলঙ্কারহীনা রঞ্জিত-বস্ত্র-পরিহিতা মুণ্ডিতকেশা নারী কোন দলে না মিশিয়া হাসিতে হাসিতে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া নাচিতে নাচিতে যাইতেছিল।

এইরূপ নানা প্রকার হর্ষোচ্ছ্বাস দেখিয়া মনে দুই-একটা প্রশ্নের উদয় হইল। ভগবান্ স্বয়ং যদি সত্য সত্যই রথারূঢ় হইয়া লোকের সম্মুখ দিয়া যাইতেন, তাহা হইলে কি এমন আনন্দ, এমন উৎসব হইত? সঙ্গে সঙ্গে উত্তরও একটা মনে হইল—অনেক লোকই তাঁহাকে বিশ্বাস করিত না এবং উত্তেজিত হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিত। আরও একটা প্রশ্ন মনে হইল। যখন কোটি কোটি লোক বহুকাল হইতে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিয়া আসিতেছে যে, এই দারুমূর্ত্তিই স্বয়ং ভগবান্, তখন কি তিনি তাহাদের প্রতি সদয় হইয়া এই দারু-মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইতে পারেন না? এ প্রশ্নেরও একটা উত্তর মনে হইল। হিপ্‌নোটাইজার যখন কোন ব্যক্তিকে হিপ্‌নোটাইজ করিয়া তাহার হাতে এক টুকরা কাগজ দিয়া বলে যে এই সন্দেশ খাও, তখন সেই ব্যক্তি দৃঢ়বিশ্বাস করিয়া সেই কাগজখণ্ড চর্ব্বণ করিতে আরম্ভ করে বটে, কিন্তু কাগজে মোটেই সন্দেশের আবির্ভাব হয় না।

এইরূপ চিন্তা করিতেছি এমন সময়ে দেখিলাম, একটি স্থূলকায়া বৃদ্ধা, বোধ হয় গতিশীল রথের রজ্জু স্পর্শ দ্বারা অনন্ত পুণ্য লাভের আশায় রথের গন্তব্যপথের এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্বে তাহার সাধ্যমত দৌড়িতেছে। রথ তখন অতি নিকটবর্ত্তী। বৃদ্ধা রথচাপা পড়িবে ভাবিয়া আমি দৌড়িয়া গিয়া তাহাকে ধরিয়া টানিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কিন্তু তাহাকে টানিয়া দড়ীর নীচে দিয়া গলিয়া যাওয়া দুঃসাধ্য হইল। রথ তখন অতি সন্নিহিত ও বেগবান্। এমন সময়, দুই জন কন্‌স্টেবল আমাদিগকে টানিয়া হিঁচড়িয়া বিপন্মুক্ত করিয়া দিল। একটু আঘাত পাইলাম। তখন রথদেখা শেষ করিয়া সোজা বাসায় ফিরিয়া গেলাম এবং ক্লান্তিবশতঃ একখানা চার-

পাইতে শুইয়া পড়িয়াই নিদ্রিত হইলাম। দু-এক ঘণ্টা পরেই আমার নিম্নবর্ণিত স্বপ্নটা দেখিলাম—

আমার চাকর যেন আমাকে এই বলিয়া ডাকিল যে, জগন্নাথ, বলরাম এবং সুভদ্রা আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিতেছেন। আমি উঠিয়া মুক্তদ্বার দিয়া দেখিলাম যে, বাস্তবিকই দেবতাত্রয় আসিতেছেন এবং পঞ্চাশ-যাট গজ দূরে আছেন। তাঁহারা আসিলে আমি প্রণাম করিব কি-না এই চিন্তা মনে হইল। সিদ্ধান্ত করিলাম যে, প্রণাম করা একটা শিষ্টাচার মাত্র এবং যখন কোটি কোটি লোক তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া থাকে, তখন আমার মত কীটেরও প্রণাম করাই কর্ত্তব্য। এই ভাবিতেছি এমন সময়ে তাঁহারা আসিয়া একেবারে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ কারতে করিতেই জগন্নাথ বলিলেন, "ওহে তোমার সঙ্গে কোলাকুলি কারব।" আমি হাসিয়া বলিলাম, "আপনি কোলাকুলি করিবেন কেমন করিয়া? আপনার যে হাত—" আমার এই সত্য পরিহাস শুনিয়া সুভদ্রা ক্রুদ্ধ হইয়া সবেগে ঘুরিয়া বাহির হইয়া গেলেন। তিনি এত বেগে ঘুরিয়াছিলেন যে, তাঁহার ঘাগরাও ঘুরিয়া তাঁহার পায়ে জড়াইয়া গিয়াছিল। আমি বলরামের দিকে চাহিয়া দেখিলাম তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়াছে। যে বলরামকে দেখিয়া সৌতি অভ্যুত্থান করেন নাই বলিয়া তিনি সৌতিকে তৎক্ষণাৎ বধ করিয়াছিলেন, সেই বলরাম আমার পরিহাসে রক্তচক্ষু হইয়াছেন ইহাতে আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হইবারই কথা। কিন্তু আমার মনে কোনরূপ ভয় পরিস্ফুট হইবার পূর্ব্বেই জগন্নাথ আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়া বলিলেন, "দেখই না কেমন করিয়া কোলাকুলি করি।" এই বলিয়াই তিনি আমাকে জড়াইয়া ধরিলেন। তাঁহার নুলো হাতের একটা খোঁচা আমার পিঠে লাগিল। তাহার পরই নিদ্রাভঙ্গ। দেখিলাম আমার পিঠের নীচে একটা দেশলাইয়ের বাক্স রহিয়াছে। তাহারই একটু খোঁচা আমার পিঠে লাগিয়া আমার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল। খোঁচা লাগার পর ঘুম ভাঙিতে হয়ত দুই-এক সেকেণ্ড লাগিয়াছিল। ইহার মধ্যে সেই স্বপ্নটা দেখিয়াছিলাম। স্বপ্নে দেশলাইয়ের খোঁচাটা জগন্নাথের নুলো হাতের খোঁচারূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল।

আমার এই স্বপ্নবৃত্তান্ত দুই-একবার বন্ধুদের বলিয়াছিলাম। তাহারা সকলেই ধন্য ধন্য করিয়া আমাকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন; কেননা স্বয়ং জগন্নাথ কেবল যে আমাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়াছিলেন তাহা নহে, আমাকে আলিঙ্গনও করিয়াছিলেন।

সন্ধি

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ

চতুর্থ খণ্ড

নীহারিকার কথা

শিক্ষয়িত্রীর কার্য্যের অভিজ্ঞতা আমি ভবানীপুর স্কুলে কিছু কিছু অর্জ্জন করিয়াছিলাম। কিন্তু সেখানে অন্য আর এক জনের অধীনে কাজ করিতে হইত বলিয়া আড়ষ্ট হইয়া থাকিতে হইত। এখানে আমিই প্রধান শিক্ষয়িত্রী, আমি স্বাধীন ভাবে সকল কাজের বন্দোবস্ত করিতে লাগিলাম। নিস্তারিণী বয়সে আমার অনেক বড় এবং এখানে অনেক দিন কাজ করিতেছেন। আমি অনেক বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ লইয়া কাজ করিতে লাগিলাম। ইহাতে তিনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকিলেন। রাজবাড়ীর যেরূপ বন্দোবস্ত, তাহাতে আহারাদির কোন অসুবিধা ছিল না। তবে বোর্ডিঙে পশ্চিমে ঠাকুরের রান্না, আর ক্রমাগত কলাইয়ের ডাল খাওয়া ভাল লাগিত না। মেয়েদিগকে রন্ধন শিক্ষা দেওয়ার জন্য আমি মধ্যে মধ্যে তাহাদিগকে রাঁধিতে বলিতাম এবং আমিও তাহাদিগকে দেখাইয়া দিতাম। আর নিজের পয়সা দিয়া মধ্যে মধ্যে বাজার হইতে মাছ তরকারি আনাইয়া খাইতাম। এইরূপে গোছগাছ করিয়া বসিয়া আমি আমার নিজের পড়ায় মন দিলাম।

আমার পাঠ্য ইংরেজী সাহিত্য আমি অনেকটা পড়িয়াছিলাম। সে-সকল পুস্তকের ভাল নোট ছিল। সেই নোটের সাহায্যে অর্থ বুঝিতে কষ্ট হইত না। কিন্তু সংস্কৃত আমার

নিকট অত্যন্ত কঠিন বোধ হইত। একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের সাহায্য পাইলে ভাল হয়। সেজন্য আমি নিস্তারিণীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, সে রকম একজন ভাল পণ্ডিত এখানে পাওয়া যায় কি না? তিনি বলিলেন, এখানকার হাইস্কুলের প্রধান পণ্ডিত বীরেশ্বর বিদ্যারত্ন মহাশয় একজন খুব বড় পণ্ডিত, তিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন, তিনি প্রাতঃকালে এক ঘণ্টা সংস্কৃত পড়াইতে সম্মত হন কিনা জানিয়া আসিব। আমি এই কথা শুনিয়া নিস্তারিণীকে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে বলিলাম। নিস্তারিণী পরদিন আসিয়া বলিলেন, পণ্ডিত মহাশয় সকালে আটটার সময় আসিয়া এক ঘণ্টা পড়াইতে সম্মত হইয়াছেন, কিন্তু তিনি এজন্য কোন বেতন লইবেন না; তবে মাসের শেষে তাঁহাকে প্রণামী বলিয়া কিছু দিলে হয়ত তাহা অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

এই বন্দোবস্ত অনুসারে উক্ত পণ্ডিত মহাশয় এক দিন প্রাতঃকালে আসিলেন। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ খর্ব্বাকৃতি বৃদ্ধ, গোলগাল শরীর, দাড়ি গোঁফ কামান, মাথার চুল সব পাকা, বেশ হাসিখুশী মুখ, দেখিলে ভক্তি হয়। নিস্তারিণী তাঁহাকে বোর্ডিংএ পৌঁছাইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। আমি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পদধূলি লইলাম। তিনি আমাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

তিনি আমাকে নিরীক্ষণ করিয়া হাসিমুখে বলিলেন, "মা লক্ষ্মী, তোমাকে আপনি ব'লতে পারব না, তুমি ব'লেই সম্বোধন করব। কিছু মনে ক'রো না।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "আপনি আমার পিতৃস্থানীয়, আমাকে আপনার মেয়ের মতনই দেখবেন। আমার স্বর্গীয় পিতাও কলিকাতায় একজন খ্যাতনামা কলেজের অধ্যাপক ছিলেন।"

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, "তা না হবে কেন? 'আকরে পদ্মরাগানাং জন্ম কাচমণেঃ কুতঃ', পদ্মরাগমণির আকরে কাচ জন্মায় না, পদ্মরাগই জন্মায়। আমাদের জেলার রঘুনাথ বাবু একজন দেশবিখ্যাত লোক, তোমাদের ব্রাহ্মসমাজের একজন নেতা, বোধ হয় তাঁকে চেনো,— তাঁর দুইটি কন্যা অত্যন্ত বিদুষী হয়েছে, অনেক গ্রন্থও রচনা করেছে। রঘুনাথ-বাবুও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বংশে জন্মেছিলেন।"

আমি বলিলাম, "কিন্তু আপনি একটা মস্ত ভুল করলেন, পণ্ডিত মশায়। আমি ব্রাহ্ম আপনাকে কে বল্লে? আমি হিন্দুর মেয়ে, আমার বাবা নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ ছিলেন, প্রত্যহ সন্ধ্যাহ্নিক শিবপূজা করতেন।"

পণ্ডিত মহাশয় অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "বটে, বটে, শুনে খুব সন্তুষ্ট হলেম। আমার ত তা হ'লে মস্ত ভুল হয়েছিল, মা। কিন্তু মা, আমার যে ভুল হয়েছিল তা'তে আমার বিশেষ দোষ নেই। ব্রাহ্মণের মেয়ে এত বয়স পর্য্যন্ত অনূঢ়া থাকতে আমি এর আগে কখনও দেখিনি। মা তুমি কিছু মনে ক'রো না। আচ্ছা, তুমি সংস্কৃত কি কি বই পড়?"

পণ্ডিত মহাশয়ের মন্তব্য শুনিয়া আমি একটু লজ্জিত হইলাম। পরে বলিলাম, "আমার পাঠ্য হচ্ছে, শিশুপালবধ, প্রথম দুই সর্গ, আর শকুন্তলা।"

"তুমি কোনো ব্যাকরণ পড়েছ, মা?"

"আজ্ঞে, আমি কোনো সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়িনি, প্রথমে পড়েছিলুম বিদ্যাসাগর মশায়ের উপক্রমণিকা, পরে ব্যাকরণ কৌমুদী, কিন্তু তা'ও শেষ হয়নি, কেবল শব্দরূপ, ধাতুরূপ, কৃৎ, তদ্ধিত পড়েছি, চতুর্থ খণ্ড পড়া হয়নি।"

"একখানা ব্যাকরণ শেষ পর্য্যন্ত পড়া দরকার। মুগ্ধবোধ পড়লেই ভাল হ'ত, তা না ক'রে তুমি ঐ কৌমুদীই শেষ ক'রে পড।"

"কিন্তু কৌমুদী ৪র্থ খণ্ড ত আমার নেই?"

"তবে সে বই একখানা আনাতে হবে।"

এই কথার পরে তিনি সেদিনের মত বিদায় হইলেন।

পরের দিন তিনি যথাসময়ে পড়াইতে আসিলেন। আমি শকুন্তলা পড়া আরম্ভ করিলাম। পড়িতে পড়িতে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"পণ্ডিত মশায়, আমি ব্রাহ্মণের মেয়ে হয়ে এতদিন অবিবাহিতা আছি শুনে আপনি আশ্চর্য্য হয়েছিলেন, কিন্তু শকুন্তলা ঋষিকন্যা হয়ে যৌবনকাল পর্য্যন্ত অনূঢ়া ছিলেন কিরূপে?"

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন—"সে যুগে ঐ ব্যবস্থা ছিল, বিশেষতঃ ঋষিকন্যাদের পাত্র মেলা সহজ হ'ত না। কিন্তু তার ফলও ত ভাল হয়নি। ঋষিরা এই সকল দেখে-শুনে ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করেছিলেন। প্রথম দর্শনেই দুষ্মন্ত শকুন্তলার রূপে মুগ্ধ হলেন, শকুন্তলাও দুষ্মন্তকে দেখে গলে গেলেন,—দু-জনের মধ্যে অমনি মালা বদল ক'রে গান্ধর্ব্ব বিবাহ

হ'ল। কণ্বমুনি আশ্রমে ছিলেন না; তাঁর অনুমতির অপেক্ষা রইল না। একাজটা কি ভাল হ'ল? এর ফলও বিষময় হয়েছিল। এই জন্যই শাস্ত্রকার নারীকে কোন অবস্থায়ই স্বাধীনতা দেন নাই। মনু বলেছেন,—

"পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।
পুত্রশ্চ স্থবিরে রক্ষেৎ ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি।"

স্ত্রীলোক যখন কুমারী থাকে তখন তাকে পিতা রক্ষা ক'রবেন, যৌবনকালে অর্থাৎ বিবাহ হ'লে তাকে স্বামী রক্ষা ক'রবেন, পরে বার্দ্ধক্যে তাকে পুত্র রক্ষা ক'রবেন। কোন অবস্থায়ই স্ত্রীলোক স্বাধীন ভাবে থাকবার যোগ্য নহে।"

আমি বলিলাম, "পণ্ডিত মশায়, আপনার শাস্ত্রকারেরা নারীকে মানুষের মধ্যেই গণ্য করতেন না, সেই জন্য এই ব্যবস্থা করেছিলেন।"

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন—"তা করবেন না কেন? নারীকে তাঁরা কেবল মানুষ নয় দেবতা ব'লে গণ্য করতেন। সেই মনুই বলেছেন,—

"প্রজনার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হাঃ গৃহদীপ্তয়ঃ।
স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তিকশ্চন॥"

অর্থাৎ সন্তানজননী মহীয়সী নারীগণ পূজার যোগ্যা, তাঁহারা গৃহের দীপ্তি-স্বরূপ। গৃহে সেই সকল নারীর সহিত লক্ষ্মীর কোন ভেদ নাই। তাঁহারাই গৃহে লক্ষ্মীর ন্যায় বিরাজ করেন।

আমি বলিলাম, "পণ্ডিত মশায়, তা হ'লে নারী-জীবনের উদ্দেশ্য কি কেবল সন্তানপালন? গৃহস্থেরা গরুকেও ত বাছুর হওয়ার জন্য বাড়ীতে রাখে এবং পূজাও করে। একটি নারীর সহিত একটি গাভীর পার্থক্য কি, পণ্ডিত মশায়?"

পণ্ডিত মহাশয় একটু উষ্ণ হইয়া বলিলেন, "মা, শাস্ত্রকারের বাক্যের অমর্য্যাদা ক'রো না। তোমরা যত বড়ই বিদুষী হও, ঋষিদের বাক্যে অশ্রদ্ধা করতে পার না। নারীকে গাভীর সহিত তুলনা—বটে? কি আশ্চর্য্য!"

আমি লজ্জিত হইয়া বলিলাম, "পণ্ডিত মশায়, আমার অপরাধ হয়েছে, আমার প্রগল্‌ভতা ক্ষমা করুন।"

পণ্ডিত মহাশয় প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, "আমরা ক্ষমা ত করেই আছি। আজ বেলা হয়েছে, আমার স্কুল আছে, তোমারও স্কুল আছে—কাল এ-বিষয়ে আলোচনা করা যাবে।"

এই বলিয়া পণ্ডিত মহাশয় গাত্রোত্থান করিলেন। আমিও স্নানাহার করিতে গেলাম। বৃদ্ধ পণ্ডিত মহাশয়কে রাগাইয়া আমার অনুতাপ হইল। আমার বাক্‌সংযম শিক্ষা করিতে হইবে। তবে আমার বহুযত্নে পোষিত মতের বিরুদ্ধে কোন কথা শুনিলে আমার ধৈর্য্য থাকে না।

পরদিন সকালে পণ্ডিত মহাশয় পড়াইতে আসিয়া প্রথমেই বলিলেন, "মা, আগে তোমার সেই প্রশ্নের আলোচনা করা যাক। তোমার জিজ্ঞাস্য এই,—নারীজীবনের উদ্দেশ্য কি? কেবল সন্তানজনন? তাহা কখনও হইতে পারে না। কি পুরুষ কি স্ত্রী কাহারও জীবনের উদ্দেশ্য কেবল সন্তান উৎপাদন হ'তে পারে না। তা'হলে তারা ত পশুর সমান হবে। ধর্ম্মই জীবনে একমাত্র উদ্দেশ্য। সেই ধর্ম্ম লাভ করতে হ'লে আবার অর্থ চাই, আবার কাম অর্থাৎ কামনা চরিতার্থ করাও চাই। ইহার ফলে হয় মোক্ষ অর্থাৎ ঈশ্বরলাভ। এই জন্য ধর্ম্ম, অর্থ কাম ও মোক্ষকে চতুর্ব্বর্গ বলে। এই চতুর্ব্বর্গ লাভ দ্বারাই মনুষ্যজীবন সার্থক হয়। মনুষ্যজীবন সার্থক করতে হ'লে সকলকে বিবাহ ক'রে গৃহস্থ হ'তে হবে। কেহ কেহ আজীবন কৌমার্য্য অবলম্বন করেছিলেন দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত। তাহার বিপদ অনেক, হঠাৎ পদস্খলন হ'তে পারে, তা'হলেই সর্ব্বনাশ। দেবী-ভাগবতে আছে, ব্যাসপুত্র শুকদেব গুরুগৃহে পাঠ সমাপন ক'রে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ না করেই প্রব্রজ্যা অবলম্বন করতে অভিলাষ করেছিলেন, ব্যাসদেব তাঁকে দারপরিগ্রহ ক'রে গৃহী হওয়ার জন্য অনেক প্রকার উপদেশ দিয়েছিলেন। তার মধ্যে একটা উপদেশ বড়ই সুন্দর,—

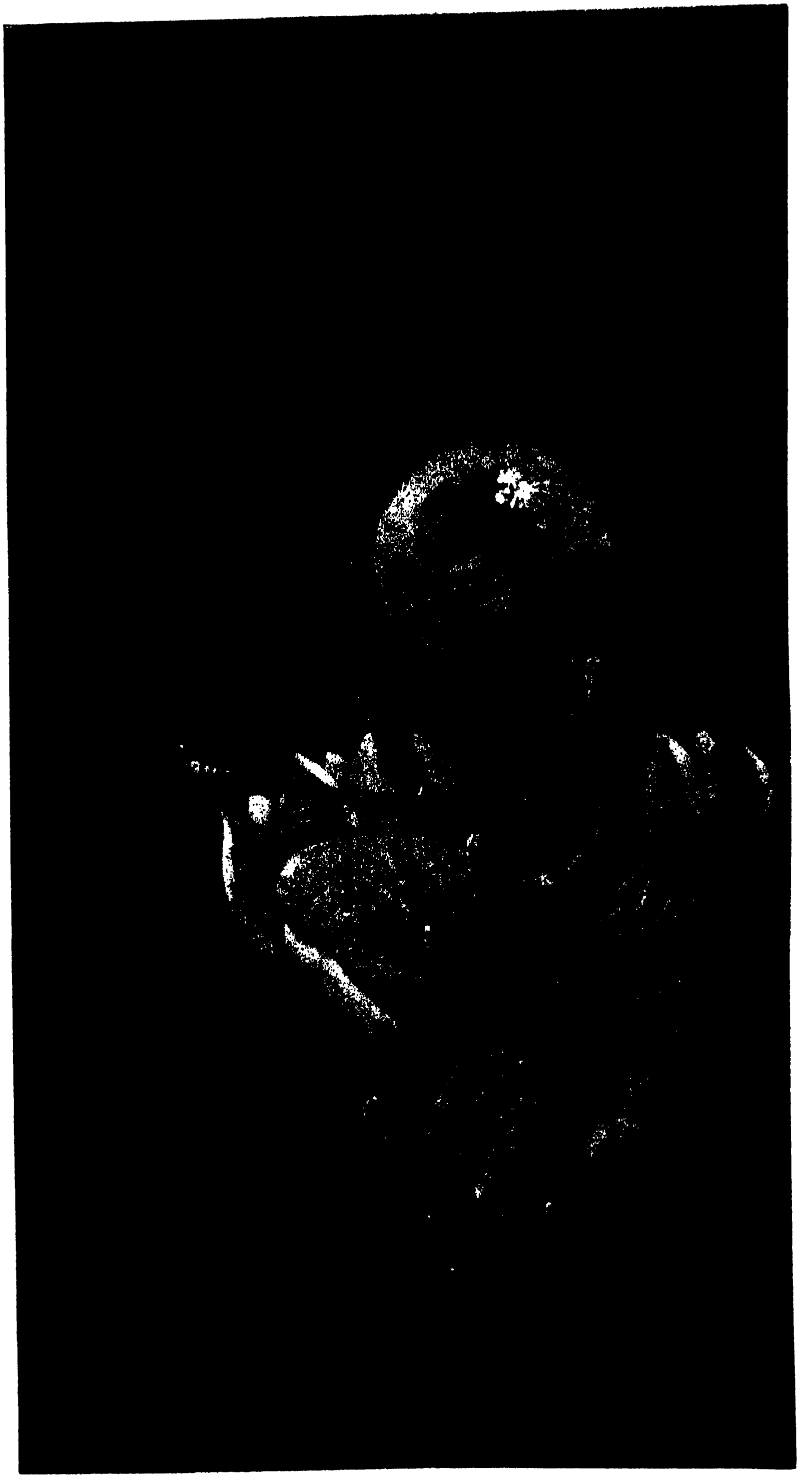
'ইন্দ্রিয়ানি মহাভাগ মাদকানি সুনিশ্চিতম্।
অদারস্য দুরন্তানি পঞ্চৈব মনসা সহ॥"

অর্থাৎ মানুষের ইন্দ্রিয়সকল নিশ্চয়ই উন্মত্ত; যারা বিবাহ করে না তাহাদের সেই পাঁচ ইন্দ্রিয়কে মনের সহিত জয় করা অত্যন্ত কঠিন হয়।

ব্যাসদেব অবশেষে শুকদেবকে উপদেশ লাভের জন্য রাজর্ষি জনকের নিকট পাঠালেন। সেখানে জনকের সহিত শুক-দেবের অনেক বিচার হ'ল। জনকও তাকে বল্লেন,—

"মনস্তু প্রবলং কামমজেয়মকৃতাত্মভিঃ।
অতঃ ক্রমেন জেতব্যমাশ্রমাত্মক্রমেণ চ।"

অর্থাৎ এই সংসারে মনকেই প্রবল শত্রু ব'লে জানবে,



কালিদাস ও সরস্বতী
শ্রীপ্রভাসনলিনী বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

দুর্ব্বলপ্রকৃতি মানুষেরা মনকে জয় করতে পারে না। সেজন্য গার্হস্থ্য প্রভৃতি এক একটি আশ্রমকে আশ্রয় ক'রে ক্রমে ক্রমে কামনা-সকল ভোগের দ্বারা তৃপ্ত ক'রে তবে মনকে জয় করতে হবে।

এই সকল বাক্যের উদ্দেশ্য এই, পুরুষ কিংবা স্ত্রীলোককে ধর্ম্মজীবন যাপন করতে হ'লে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হ'য়ে গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম পালন করতে হবে। সন্তানজননও বিবাহের একটা উদ্দেশ্য বইকি? তা না হ'লে বংশ রক্ষা হয় না, সৃষ্টি রক্ষা হয় না। আবার নারীর মা হওয়ার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা আছে, তার পরিতৃপ্তিও আবশ্যক। শাস্ত্রকারগণের মতে বিবাহের পর একটি পুত্র হওয়াই যথেষ্ট। এতে ক'রে বুঝতে পার, কেবল সন্তানজননই বিবাহের উদ্দেশ্য নয়। মানুষের ইন্দ্রিয়-গ্রাম স্বভাবতঃ প্রবল, বিশেষতঃ যৌবনকালে তারা অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ হ'য়ে উঠে। তাহাদিগকে ভোগের দ্বারা ক্রমশঃ দমন করতে হবে, সেজন্য বিবাহ করা উচিত; নচেৎ তারা কোন অতর্কিত মুহূর্ত্তে প্রবল অনর্থ ঘটাতে পারে। শাস্ত্রে এর বহু দৃষ্টান্ত আছে, তা বলবার প্রয়োজন নেই।"

আমি বলিলাম, "পণ্ডিত মশায়, আপনি গার্হস্থ্য ধর্ম্মের এত প্রশংসা করলেন, কিন্তু বিবাহ না ক'রেও ত সমাজের বা দেশের হিতের জন্য জীবন উৎসর্গ ক'রে মনুষ্যত্ব লাভ হ'তে পারে। যেমন স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি করেছিলেন।"

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, "স্বামী বিবেকানন্দ অসাধারণ লোক ছিলেন, তার পরে তিনি মহাপুরুষের কৃপা পেয়েছিলেন। তাঁর আচরণ সাধারণ নিয়মের বাইরে। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবও ত তাঁর অন্যান্য শিষ্যদের উপদেশ দেওয়ার সময় বলতেন, যেমন দুর্গে থেকে শত্রু জয় করা সহজ, সেইরূপ গৃহী লোকের পক্ষে ইন্দ্রিয় জয় করা সোজা। সাধারণ লোকের পক্ষে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম অবলম্বন করেই মনুষ্যত্ব লাভ করতে হবে। মনুষ্যত্ব-লাভ কিরূপে হয়? না, আত্মসংযম, আত্মত্যাগ, আত্মসম্প্রসারণ দ্বারা। আমি তোমায় দৃষ্টান্ত দ্বারাই ত বুঝাচ্ছি। তুমি যদি বিবাহ না ক'রে এরূপ চাকরি ক'রে জীবন কাটাও, তবে তা'তে ক'রে তোমার নিজের সুখস্বচ্ছন্দতা লাভ হবে সন্দেহ নাই, কিন্তু তোমার আত্মা কেবল নিজেকে নিয়েই সঙ্কুচিত হ'য়ে থাকবে। কিন্তু বিবাহ করলে তোমাকে নিজের সুখ-স্বচ্ছন্দতা অনেকটা সঙ্কোচ ক'রে স্বামী, সন্তান ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের সুখের জন্য অনেকটা আত্মত্যাগ স্বীকার করতে হবে, তা'তে ক'রে তোমার আত্মা ক্রমে সম্প্রসারিত হবে। এইরূপে পরার্থপরতা অভ্যাস করলে ক্রমে তা পারিবারিক গণ্ডী ছাড়িয়ে সমাজ, দেশ ও ঈশ্বরের দিকে ব্যাপ্ত হবে। এইরূপে মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "গার্হস্থ্য জীবনে স্ত্রীর কর্ত্তব্য কি?"

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, "সে-সম্বন্ধে মহর্ষি মনু বলেছেন,

"পতিং যা নাভিচরতি মনোবাক্ দেহ সংযতা।
সা ভর্ত্তৃলোকানাপ্নোতি সদ্ভিঃ সাধ্বীতি চোচ্যতে।।"

অর্থাৎ যে নারী বাক্য, মন ও দেহ সংযত করিয়া পতির সেবা করে, সে মৃত্যুর পরে স্বামীর সহিত স্বর্গসুখ ভোগ করে, তাহাকে সৎলোকেরা সাধ্বী বলেন।"

আমি বলিলাম, "কিন্তু স্বামী যদি দুরাচার হয়, স্ত্রীর উপর অত্যাচার করে, তখন স্ত্রীর কর্ত্তব্য কি? স্ত্রী কি সে স্বামীরও অধীন হয়ে থাকবে?"

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, "সকল অবস্থায়ই স্বামী-সেবা স্ত্রীর অবশ্যকর্ত্তব্য, কোন অবস্থায়ই স্বামীকে ত্যাগ করা উচিত নয়। তবে স্বামী যদি অধর্ম্মাচরণ করে, স্ত্রীর সেই অধর্ম্মাচরণের সহায়তা করা উচিত নয়, কারণ স্ত্রীর আর এক নাম সহধর্ম্মিণী। বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্যে পড়েও যে স্ত্রী তার কর্ত্তব্য হ'তে ভ্রষ্ট না হয় সেই ধন্য।"

আমি বলিলাম, "কিন্তু তাতে তার মনুষ্যত্ব লাভ হবে কিরূপে?"

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, "কঠিন পরীক্ষার মধ্যে প'ড়েও সংযম, সহিষ্ণুতা অবলম্বন করে কর্ত্তব্যে স্থির থাকতে পারলে তা'তে ক'রে আত্মার বল বৃদ্ধি হয় এবং মনুষ্যত্বের পথে অগ্রসর হওয়া যায়। আজ এই পর্য্যন্ত থাকুক। এখন তোমার পাঠ অধ্যয়ন কর।"

আমি সেদিনকার পড়া আরম্ভ করিলাম। পড়া শেষ হইলে পণ্ডিত মহাশয় গাত্রোত্থান করিলেন। আমিও স্নানাহার করিয়া যথাসময়ে স্কুলে গেলাম। সেদিন রাত্রে শুইয়া শুইয়া পণ্ডিত মহাশয়ের কথাগুলি চিন্তা করিতে লাগিলাম। তিনি প্রাচীন সমাজের লোক, শাস্ত্রকারদের মতে শিক্ষিত, তাঁহার নিকট সেকালের মতগুলি জানিতে পারিলাম। এগুলিও

জানা আমার প্রয়োজন ছিল। এই সকল শাস্ত্রীয় মতের সহিত আমাদের আধুনিক মতের অনেক বিষয়ে অনৈক্য হইলেও ঐগুলির মধ্যে আমাদের চিন্তার খোরাক যথেষ্ট আছে।

যাহা হউক, পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট আমি সংস্কৃত অধ্যয়ন করিতে লাগিলাম। ব্যাকরণকৌমুদী ৪র্থ খণ্ড একখানা আনাইলাম। পণ্ডিত মহাশয় আমার পাঠের উন্নতি দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। আমি জিজ্ঞাসা না করিলে কোন শাস্ত্রীয় বিষয় লইয়া আর লেক্‌চার দেন নাই। এইরূপে তিন মাস কাটিল।

৮

একদিন প্রাতঃকালে দেখি রাজবাড়ীতে মস্ত হৈচৈ পড়িয়া গিয়াছে। লোকজন ছুটাছুটি করিতেছে, ষ্টেশন হইতে গাড়ী গাড়ী জিনিষপত্র আসিতেছে। অনুসন্ধানে জানিলাম রাজাবাহাদুর দীর্ঘকাল প্রবাসের পর আজ রাজধানীতে শুভাগমন করিতেছেন। তিনি দীর্ঘকাল বিলাতে কাটাইয়া আসিয়াছেন, এখন আর তাঁহার এই পল্লীগ্রামে বাস করা পোষায় না, তাই অধিকাংশ সময় কলিকাতা অথবা দার্জ্জিলিঙে থাকেন। তিনি আজ সকালে দার্জ্জিলিং হইতে প্রত্যাগত হইলেন।

বেলা দশটার সময় আমি আহারাদি শেষ করিয়া স্কুলে যাইবার জন্য উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময়ে উর্দ্দিপরা তক্‌মা-আঁটা এক জন চাপরাসী একটি ঝুড়িতে কতকগুলি কমলা-নেবু, বেদানা, ন্যাসপাতি, আপেল, আঙ্গুর লইয়া আমার নিকট আসিল, এবং "মেমসাহেব, সেলাম," বলিয়া আমার সম্মুখে উহা রাখিয়া বলিল, "রাজা সাহেব আপনাকে সেলাম জানিয়েছেন, আর এই ডালি পাঠিয়েছেন। তিনি আজ বৈকালে সাড়ে তিনটার সময় আপনার স্কুল দেখতে আসবেন।"

আমি বলিলাম, "বহুৎ আচ্ছা। তাঁকে আমার নমস্কার জানাবে।"

আমি ঝুড়িটা ধরিয়া আমার শয়নঘরে লইয়া গেলাম এবং আমার নিজের জন্য কিছু ফল রাখিয়া অবশিষ্টগুলি বোর্ডিঙের মেয়েদের বাঁটিয়া দিলাম।

বেলা সাড়ে তিনটার সময় আমি স্কুলে বসিয়া রাজা সাহেবের আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছি, এমন সময় দেখিলাম হ্যাট কোট কলার নেক্‌টাই পরা এক গৌরবর্ণ শুষ্ক চেহারা দাড়িগোঁফ-কামানো যুবা পুরুষ স্কুলে প্রবেশ করিতেছেন আমি কর্ত্তব্যানুরোধে ও সৌজন্য দেখাইবার জন্য একটু অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলাম। তিনি মৃদু হাসিয়া কর বাড়াইয়া দিয়া বলিলেন, "আমি অনুমানে বুঝতে পারছি, আপনিই মিস্ চাটার্জ্জি।"

আমি মৃদু হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া তাঁহার প্রসারিত হস্ত গ্রহণ করিলাম। তখন তিনি একটু দাঁড়াইয়া তাঁহার হাতের মধ্যে আমার হাত রাখিয়া এবং আমার চোখের উপর চোখ রাখিয়া বলিলেন, "Oh splendid! I never expected such a glorious vision in the wilds of Chhota Nagpur" (কি চমৎকার! এমন অপরূপ সৌন্দর্য্য এই ছোটনাগপুরের জঙ্গলে দেখিব বলিয়া আমি কখনও আশা করি নাই")।

তাঁহার করস্পর্শে ও এই চাটুবাক্যে আমার সর্ব্বশরীরের মধ্যে যেন কেমন জ্বালা করিয়া উঠিল। আমি কোন কথা না বলিয়া তাঁহার সঙ্গে স্কুল-গৃহে প্রবেশ করিলাম। তিনি ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, "আমি আজ অনেক দিন পরে এখানে আস্‌ছি, আপনার ত এখানে এসে কোন অসুবিধা হয় নাই?"

আমি বলিলাম—"না।"

পরে তিনি স্কুলের কয়েকটা ঘর ঘুরিয়া বেড়াইলেন, এবং কোন্ ক্লাসে কত মেয়ে পড়ে, আমি কোন্ কোন্ ক্লাসে পড়াই ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিলেন।

পরে স্কুল ছুটি দিয়া লাইব্রেরী-ঘরে একটু বসিলেন এবং নিস্তারিণীকে স্কুল-সম্বন্ধীয় অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। নিস্তারিণী আমার কানে কানে বলিলেন, রাজা সাহেবের চা খাবার সময় হয়েছে, বোর্ডিঙে চায়ের বন্দোবস্ত করলে ভাল হয়। আমি একটি মেয়েকে দিয়া বোর্ডিঙের ঠাকুরকে চায়ের জল গরম করিতে বলিয়া পাঠাইলাম। চায়ের সরঞ্জাম আমার নিজেরই ছিল।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে রাজাসাহেব স্কুল পরিদর্শন শেষ করিয়া আমাকে ইংরেজীতে যাহা বলিলেন, তাহার মর্ম্ম এই,—"আপনার স্কুলের ম্যানেজমেণ্ট দেখে আমি অত্যন্ত খুশী হয়েছি। আপনি অল্প দিনের মধ্যেই পড়াবার যে সুব্যবস্থা

করেছেন, তা অনেক বহুদর্শী ও বিচক্ষণ হেডমাষ্টারেরও শ্লাঘার বিষয়। এই মাস থেকে আমি আপনার বেতন দশ টাকা বাড়িয়ে দিলাম।"

আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলাম এবং তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া বোর্ডিং দেখাইতে লইয়া চলিলাম। রাজাসাহেব অন্যান্য শিক্ষয়িত্রীদের ছুটি দিলেন।"

বোর্ডিং নূতন হইয়াছে, রাজাসাহেব এ-পর্য্যন্ত তাহা দেখেন নাই। তিনি আমার সঙ্গে চারিদিক ঘুরিয়া দেখিলেন, এবং ঘরগুলি যাহাতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা হয়, সে-বিষয়ে মেয়েদের উপদেশ দিলেন। স্নানাদি করার জন্য একটি স্নানাগারের অভাব আমি তাঁহাকে জানাইলাম। তিনি বলিলেন, "অবশ্য তাহা অবিলম্বে প্রস্তুত করা হবে।" পরে তিনি আমার বাসের কক্ষ ও বসিবার ঘরে আসিলেন। আমার আসবাবপত্র তেমন কিছু নাই দেখিয়া তিনি দুঃখ প্রকাশ করিলেন এবং সেই দিনই একটা ভাল খাট, আলনা, টেবিল, চেয়ার, ঈজিচেয়ার, টিপাই ইত্যাদি পাঠাইয়া দেওয়ার জন্য তাঁহার তোষাখানার কর্ম্মচারীকে স্লিপ লিখিয়া দিলেন।

আমি তাঁহার এই সকল অযাচিত অনুগ্রহে একান্ত অভিভূত হইয়া পড়িলাম। তাঁহার চা খাওয়ার সময় হইয়াছে বলিয়া আমি তাঁহাকে এক পেয়ালা চা খাইবার জন্য অনুরোধ করিলাম। তিনি আমার বসিবার ঘরে অমনি বসিয়া পড়িয়া বলিলেন, "I shall be only too glad to have a cup of tea with you, Miss Chatterjee" (আপনার সঙ্গে এক পেয়ালা চা আমি অতি আহ্লাদের সহিত খাইব।) কিন্তু আপনার এখানে তার সব জোগাড় আছে ত, না আমিই আপনাকে অনর্থক লজ্জা দিব?"

আমি বলিলাম, "আমার গরিবানা ভাবে আছে,—আপনার যোগ্য নয়।"

আমি তখন একটি মেয়েকে ঠাকুরের নিকট পাঠাইলাম, ঠাকুর গরম জলের কেট্‌লি ও চায়ের সরঞ্জাম এবং ডিশে করিয়া ফল বিস্কুট ইত্যাদি লইয়া আসিল। ইতঃপূর্ব্বে নিস্তারিণী আসিয়া সব ঠিক করিয়া দিয়াছিলেন। কি পরিমাণে দুধ ও চিনি দিতে হইবে তাহা রাজাসাহেবকে জিজ্ঞাসা করিয়া চা প্রস্তুত করিলাম। রাজাসাহেব আমাকেও তাঁহার সঙ্গে বসিয়া চা খাইতে আগ্রহের সহিত অনুরোধ করিলেন। আমি তাহাতে আপত্তির কোন কারণ না দেখিয়া তাঁহার সন্তোষের জন্য তাঁহার সঙ্গে এক টেবিলে চা খাইতে বসিলাম। যদিও সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তির সহিত একত্র বসিয়া এই আমার প্রথম চা খাওয়া, আমি তাঁহার অনুরোধ রক্ষা না করা অভদ্রতা মনে করিয়া খাইতে বসিলাম।

চা খাইতে খাইতে রাজাসাহেব আমার সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ করিতে লাগিলেন। তিনি ইংরেজীতে কথা বলিতে বেশী অভ্যস্ত, তবে এখন মধ্যে মধ্যে ইংরেজীর বুকনি দিয়া বাংলা কথা বলিতে লাগিলেন। তাঁহার সঙ্গে আমার এইরূপ কথাবার্ত্তা হইল।—

রাজা। To tell you the truth, Miss Chatterjee, I have never tasted such sweet tea for a long time (সত্য বলিতে কি, আমি বহুকাল এরূপ সুমিষ্ট চা আস্বাদন করি নাই)—It is splendid (ইহা চমৎকার)!

আমি। আমার আয়োজন অতি সামান্য, আমার চা খাওয়ার অভ্যাসও কম।

"আপনার বাড়ী কোথায়? আপনার বাড়ীতে আর কে কে আছেন?"

"আমার বাড়ী কলকাতায়। বাড়ীতে আমার দাদা আছেন, আমার মা বাবা কেউ নেই।"

"Oh I see, এই জন্যই বোধ হয় আপনি কলেজ ছেড়েছেন।"

"কলেজ ছাড়লেও আমি পড়া ছাড়ি নাই। আমি ঘরে পড়ে বি-এ পরীক্ষা দেবার চেষ্টা করছি।"

"I am very glad to hear it (আমি ইহা শুনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেম)। পড়া ছাড়বেন না। আর আপনি অন্য আত্মীয়ের গলগ্রহ না হয়ে নিজের চেষ্টায় পড়া চালাচ্ছেন, এটা আরও প্রশংসার বিষয়। বিলেতে অনেক বালিকা এরূপ করেন।"

"সে দেশের মেয়েদের বোধ হয় আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞানও যথেষ্ট আছে। তাঁদের রাইটস্ (অধিকার) সম্বন্ধেও বোধ হয় তাঁরা অত্যন্ত সজাগ হয়েছেন।"

"Quite so (ঠিক কথা), সে-সকল দেশে নারীরা তাঁদের অধিকার লাভ করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন।"

"আমি বেথুন কলেজে পড়বার সময় 'নারী-প্রগতি সমিতি' নাম দিয়ে একটি সমিতি গঠন করেছিলুম, অনেক গুলি মেয়ে তার মেম্বর হয়েছিল, আমরা কিছু কিছু কাজও আরম্ভ করেছিলুম।"

"আপনার এই সব চেষ্টা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। নারী জাতির উন্নতিসাধন আমার জীবনের একটা প্রধান লক্ষ্য, তা এ-স্থল থেকে কতকটা বুঝতে পারছেন। আমি আপনাকে এ-বিষয়ে যথাসাধ্য সাহায্য করব।"

"কিন্তু এখানে তার ফীল্‌ড (ক্ষেত্র) কোথায়? এ-বিষয়ে রাণী-সাহেবার মত কি? তাঁর কোন সাহায্য পাব কি?"

রাজা হাসিয়া বলিলেন, "সে অঞ্চলে এখনও আলোক প্রবেশ করে নাই।—They are on the other side of the globe (তারা পৃথিবীর বিপরীত পাশে)। আপনি একদিন গিয়ে আলাপ করলেই বুঝতে পারবেন। যাবেন? আমি গাড়ি পাঠিয়ে দেব। খোলা গাড়ীতে যেতে আপনার আপত্তি নেই ত?"

"না, তাতে আর আপত্তি কি?"

"আপনি এখানে এসে বোধ হয় এই ঘরেই আটক রয়েছেন, রাস্তায় বেড়াতে পারেন না। কার সঙ্গেই বা বেড়াবেন? কিন্তু স্বাস্থ্যের জন্য প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা একটু খোলা বাতাসে বেড়ান ভাল। বলেন ত আমার গাড়ী পাঠিয়ে দেব।"

"আপনার অসুবিধা না হ'লে মধ্যে মধ্যে পাঠাতে পারেন।"

"আপনার অনুমতি হ'লে আমি নিজেও আপনাকে বেড়িয়ে আনতে পারি। আচ্ছা, আজ তবে এখন উঠি।"

আমি উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলাম। তিনি আমার করস্পর্শ করিয়া হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া গেলেন।

পরদিন বেলা আটটার সময় একটি লোক আসিয়া বলিল, রাজাসাহেব আমার রাজবাড়ী যাওয়ার জন্য গাড়ী পাঠাইয়াছেন। কিন্তু তখন পণ্ডিত মহাশয়ের আসিবার সময়, আমি কি করিয়া রাজবাড়ী যাইব? অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া যাওয়াই স্থির করিলাম এবং একখানা ভাল শাড়ী ও সিল্কের ব্লাউস্ ও শাল পরিয়া বোর্ডিঙের একটি মেয়েকে সঙ্গে লইয়া গাড়ীতে উঠিলাম। আমরা রাজবাড়ীর প্রকাণ্ড ফটকের মধ্য দিয়া বাহিরের প্রাঙ্গণে পৌঁছিলে গাড়ী থামিল। তখন রাজাসাহেব স্বয়ং আসিয়া আমার হাত ধরিয়া আমাকে গাড়ী হইতে নামাইলেন এবং আমাকে সঙ্গে করিয়া অন্তঃপুরে লইয়া চলিলেন। একটার পর একটা এইরূপে তিনটা মহল পার হইয়া আমরা চলিলাম। প্রথম মহলে ঠাকুর-বাড়ী ও ফুলবাগান। দ্বিতীয় মহলে রাজার বৈঠকখানা ও কাছারি-ঘর, তৃতীয় মহলে সদর বাড়ী, তাহার পরে অন্তঃপুর। রাজার বৈঠকখানা হালফ্যাসানে তৈয়ারি। এতদ্ভিন্ন আর সমস্ত ঘরই প্রাচীন কালের প্রস্তুত। তবে রাজা যে অট্টালিকায় শয়নাদি করেন, তাহার দরজা-জানালাগুলি বড় বড় দেওয়ালে রঙ-করা ও ইংরেজী কায়দায় আসবাবপত্র দ্বারা সুসজ্জিত।

অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, একটি বড় ঘরে গালিচা পাতা, তাহার এক পাশে পালঙ্ক, তাহাও পুরু গালিচা-মণ্ডিত। সেই ঘরে একটি সুন্দরী রমণী একখানা সোফায় চুল খুলিয়া বসিয়া আছেন, একজন পরিচারিকা সুবর্ণমণ্ডিত হস্তিদন্তের চিরুণী দিয়া তাহার চুল আঁচড়াইতেছে, সুদীর্ঘ কেশকলাপ পৃষ্ঠদেশ ঢাকিয়া পড়িয়াছে, আর একটি পরিচারিকা তাঁহার পাশে রূপার পিকদানী হাতে দাঁড়াইয়া আছে। বলা বাহুল্য, ইনিই রাণী-সাহেবা। রাজাসাহেব আমাকে সঙ্গে করিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন, এবং রাণী-সাহেবাকে আমার পরিচয় দিয়া বলিলেন, "ইনি তোমার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছেন। তোমরা দুই জনে আলাপ কর, আমি আসি।" রাণী-সাহেবা আমার প্রতি সস্মিত কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া আমাকে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন, আমি তাঁহার সম্মুখের একখানা চৌকিতে বসিলাম, আমার সঙ্গের মেয়েটি মেঝের গালিচার উপর বসিল।

রাণী-সাহেবা সুভদ্রা দেবী মধ্যভারতের নয়াগড় রাজার কন্যা (আমি পরে জানিয়াছিলাম), তাঁহার বয়স প্রায় পঁচিশ বৎসর, সর্ব্বশরীর জরির পোষাক ও বিবিধ অলঙ্কারে ঝলমল করিতেছে। তিনি বিলাত-ফেরত স্বামী পাইয়াও রাজ-পরিবারের বনিয়াদি চালচলন ছাড়েন নাই। তবে কথা-বার্ত্তায় বুঝিলাম, লেখাপড়া কিছু শিখিয়াছেন, আমার সঙ্গে হিন্দী-মিশ্রিত বাংলাতে কথা বলিলেন। মধ্যে মধ্যে দুই-একটা ইংরেজী শব্দও ব্যবহার করিলেন। ঘরের বাহির না হইলেও তিনি বহির্জ্জগতের সংবাদ রাখেন। যেরূপ ভাবে আলাপ করিলেন, তাহাতে তাঁহাকে বুদ্ধিমতী বলিয়া বোধ হইল।

রাণী-সাহেবা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এখানে এসে কেমন আছেন? কোন অসুবিধা হয় নাই ত?"

আমি বলিলাম, "আমি ভালই আছি। আপনাদের কৃপায় আমার কোন অসুবিধা নেই।"

"শুনলাম আপনি থোড়া দিনের মধ্যে স্কুলের আচ্ছি তৌরসে বন্দোবস্ত করেছেন। রাজাসাহেব আপনার খুব তারিফ করলেন। কিন্তু আপনি বোধ করি এখানে বহুৎ রোজ থাকবেন না, হয়ত শাদি হলেই চলে যাবেন।"

"স্ত্রীজাতির উন্নতির জন্য আমি জীবন উৎসর্গ করতে চাই। আশা করি, আপনি আমাকে সে-বিষয়ে সাহায্য করবেন।"

"ঔরৎলোকের কিরূপ উন্নতির কথা বলেন? লেখাপড়া শেখা? সেজন্য ত স্কুলই করা হয়েছে।"

"আমি সর্ব্বপ্রকার উন্নতির কথা বলছি। আপনি বোধ হয় রাজাসাহেবের কাছে শুনে থাকবেন, বিলেতে মহিলারা পুরুষ জাতির অধীনতা থেকে আপনাদিগকে মুক্ত করবার জন্য কত প্রকার অনুষ্ঠান করেছেন।"

তিনি হাসিয়া বলিলেন, "ঔরৎলোক ত আলবৎ পুরুষ লোকের অধীন হোবেই। শাদি করলেই ত তার অধীন হ'লো।"

আমি বলিলাম, "যদি বিয়ে না করে? স্ত্রীলোককে যে বিয়ে করতেই হবে এমন কি ধরাবাঁধা কথা আছে?"

"শাদি না করলে ছালিয়া পয়দা হোবে কেমন করে। ছালিয়া না হ'লে বংশ থাকবে না।"

ইহার উত্তরে আমি কি বলিব ভাবিতে লাগিলাম। তিনি আরও বলিলেন, "ঔরৎলোকের বালবাচ্চা হওয়ার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা আছে। আমার বালবাচ্চা হয় নাই সেজন্য আমার মনের যে আপশোষ, তা হয়ত আপনি মালুম করতে পারবেন না।"

আমি বলিলাম, "কিন্তু এই মাতৃত্বের ক্ষুধা অন্য ভাবে মেটানো যায়। বিশ্বসংসারের সকল ছেলেকে নিজের ছেলে মনে ক'রে কাজ করুন।"

তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন, "তা হয় না। তা'তে মনের ভোখ মেটে না। পানীর পিয়াস কি দুধে মেটে?"

আমি বলিলাম, "বিলেতে স্ত্রীলোকেরা বিয়ে না ক'রে, নিজেদের উন্নতির জন্য দেশের উন্নতির জন্য কত সৎ কাজ করেছেন। আমরাও ত করতে পারি।"

"কিন্তু শাদি ক'রেও সে সব কাজ করা যায়। পুরুষদের সঙ্গে আমাদের ত কোন অদোতি (শত্রুতা) নাই, যে তাঁরা আমাদের কাজে বাধা দেবেন, বরং তাঁরা আমাদের সাহায্য করবেন।"

"কিন্তু এতকাল তাঁরা ত আমাদের অধীনতাশৃঙ্খলে বেঁধে রেখেছেন, আমাদের দাবিয়ে রেখেছেন, আমাদের নিজেদের অধিকার, নিজেদের স্বার্থ রক্ষা ক'রে চলতে পারি নি।"

"কই আমাদের দেশে ত সে রকম কিছু দেখতে পাই না। স্ত্রী স্বামীর অধীন বটে, কিন্তু সে নাম মাত্র। আমাদের শাস্ত্রে বলে শক্তিহীন শিব শবমাত্র, একটা মুরদা। সংসারের কোন কাজই ত স্ত্রীর বিনা অভিপ্রায়ে, স্বামার একলার ইচ্ছায় হয় না। স্ত্রী উপযুক্ত হ'লে বাহিরের বিষয়কর্ম্মেও স্বামী স্ত্রীর পরামর্শ নিয়ে কাজ করেন। আমাদের দেশে রাণী অহল্যা বাঈ, রাণী দুর্গাবতী, আরও কত ঔরৎ রাজ্য শাসন পর্য্যন্ত করেছেন।"

আমি ইহার সঙ্গে আর অধিক বাক্যব্যয় করা উচিত মনে করিলাম না। আমি বলিলাম, "আমি আপনার মত শুনে খুব খুশী হলুম। আমাকে আবার সাড়ে দশটার সময় স্কুলে যেতে হবে। আজ বিদায় দিন। আমি আর একদিন আসব।"

"আলবৎ আসবেন। আপনার আজ কোন খাতির করা হ'লো না। ওলো লছমী, পান আতর লিয়ে আয়।"

এই বলিতে একজন পরিচারিকা সোনার বাটায় করিয়া কয়েকটা পান ও সোনার আতরদানিতে করিয়া আতর আনিয়া আমার সম্মুখে রাখিল। আমি তাহা গ্রহণ করিলাম। পরে একজন পরিচারিকা আমাকে সদর দরজা পর্য্যন্ত লইয়া গেল। সেখানে গাড়ী প্রস্তুত ছিল। আমি সেই গাড়ীতে চড়িয়া বোর্ডিংএ আসিলাম।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

বাংলা করণ ও অপাদান কারক

শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে রাজা রামমোহন রায় তাঁহার ইংরেজী ভাষায় লিখিত বাংলা ব্যাকরণে লিখিয়াছিলেন যে, "বাংলায় বোধ হয় কারকের (case) সংখ্যা কমাইয়া চার করা যায়—কর্ত্তা, কর্ম্ম, সম্বন্ধ ও অধিকরণ।" সম্বন্ধকে এখন অনেক বৈয়াকরণ "কারক" পর্য্যায়ে ফেলিতে চাহেন না।* ঐটি বাদ দিলে, রাজা রামমোহনের কথায় বলিতে হয় তিনটি কারক হইলে চলিতে পারে। কিন্তু বাস্তবিক, শুধু কর্ত্তা, কর্ম্ম ও অধিকরণ লইয়া বাংলা ভাষা কেমন দেখাইবে? এ-বিষয়ে আমাদের সঞ্চিত সংস্কারে আঘাত লাগিলেও, একটু আলোচনা করিয়া দেখিতে বাধা নাই; কারণ ইহা দ্বারা কাহারও ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে না।

সংস্কৃত ও বাংলা

সংস্কৃত-ভাণ্ডার হইতে বাংলা ভাষা বহু রত্ন গ্রহণ করিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও করিবে। সংস্কৃত বাংলার জননী কি না, এ-বিষয়ে কাহারও কাহারও সন্দেহ থাকিলেও, সংস্কৃত যে বাংলার স্তন্যদায়িনী তাহাতে সন্দেহের কারণ নাই।

কিন্তু সংস্কৃত ব্যাকরণের ছাপ বাংলা ব্যাকরণে স্পষ্ট দৃষ্ট হইলেও, সংস্কৃত ও বাংলা ব্যাকরণে যে অনেক গুরুতর প্রভেদ আছে, তাহার সবিস্তার উল্লেখ বাহুল্য মাত্র। তবে, কয়েকটি স্থূল বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিলেই আমরা বুঝিতে পারিব যে সংস্কৃত ব্যাকরণের সহিত মোটা মোটা প্রভেদ সত্ত্বেও বাংলা ভাষা স্বচ্ছন্দ গতিতে চলিয়া আসিয়াছে। যথা:—

(১) বাংলায় দ্বিবচনের বিভক্তি (চিহ্ন) নাই (দ্বয় প্রভৃতি পৃথক্ শব্দদ্বারা দ্বিবচন প্রকাশ করা যাইতে পারে), সংস্কৃতে আছে।

(২) বাংলা ক্রিয়ায় একবচন, দ্বিবচন, ও বহুবচনে বিভক্তির পার্থক্য নাই যেমন সংস্কৃতে আছে।

(৩) সংস্কৃতে "ঔচিত্য" ও "আশীর্ব্বাদ" ইত্যাদি বুঝাইতে ক্রিয়ার পৃথক্ রূপ হয়।* বাংলায় সেরূপ কিছুই নাই।

(৪) নিজের জন্য কার্য্য করিলে, "আত্মনেপদ," পরের জন্য "পরস্মৈপদ" এ প্রকারের কোন পার্থক্য বাংলায় কোন কালেই ছিল না।

(৫) ভিন্ন ভিন্ন স্বরান্ত ও ভিন্ন ভিন্ন ব্যঞ্জনান্ত শব্দের রূপের ও লিঙ্গভেদে রূপের পার্থক্য বাংলায় নাই।

(৬) আধুনিক অনেক বাংলা ব্যাকরণকার বাংলায় সম্প্রদান কারকের আবশ্যকতা স্বীকার করেন না। (রাজা রামমোহনের কারক সম্বন্ধে এই মত এক্ষণে অনেকে গ্রহণ করিয়াছেন।)

সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলা ভাষার এতগুলি পার্থক্য নিজে নিজেই বাংলা ব্যাকরণের অঙ্গীভূত হইয়া পড়িয়াছে। সম্ভবতঃ, কেহ প্রকাশ্য চেষ্টা করিয়া এই প্রভেদগুলি স্থাপন করেন নাই বলিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণের পক্ষপাতী কাহারও মনে আঘাত লাগে নাই।

করণ ও অপাদনের বিশেষত্ব

সম্প্রদান কারক ব্যতীত আরও দুইটি কারক সম্বন্ধে সংস্কৃত ও বাংলা ব্যাকরণে গুরুতর প্রভেদ আছে বলিয়া মনে হয়। এই দুইটি—করণ ও অপাদান। অন্য কারকগুলিতে যে বিভক্তির চিহ্ন ব্যবহার হয়, তাহা শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া যায়। যথা,—রাম-কে, ঘরে-তে, আকাশ-এ। কিন্তু করণ ও অপাদান পৃথক্ শব্দ সংযোগ করিয়াই অনেক সময় প্রস্তুত হয়—কলম-দ্বারা, অথবা কলমের দ্বারা, ঘর-হইতে, আকাশ-থেকে। করণ ও অপাদানকে এই জন্য বাক্যাংশ কারক (phrase cases) বলা যাইতে পারে।

করণ কারকের কথা

একখানি বহুল প্রচলিত ব্যাকরণে† "দ্বারা" "দিয়া"

---

* ইংরেজীতে অবশ্য Genitive একটি case।

* বিধিলিঙ্ ও আশীর্লিঙ্।

† শ্রীনকুলেশ্বর বিদ্যারত্ন প্রণীত ভাবাবোধ বাঙ্গালা ব্যাকরণ।

সম্বন্ধে এই মন্তব্য আছে:—"দ্বারা" এই শব্দ করণার্থ প্রকাশ করে; "দিয়া" এই অসমাপিকা ক্রিয়া সময়ে সময়ে করণার্থ প্রকাশ করে।

"লাঠি দিয়া" এই করণ কারক সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"লাঠি দিয়া এই বাক্যাংশ করণ কারক বলিয়া তৎপরে "দিয়া" অসমাপিকা ক্রিয়া, লাঠি উহার কর্ম্ম এইরূপ পদপরিচয় দিতে হইবে।"

সাধারণ বাঙালী পাঠক এক্ষেত্রে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, উক্ত পদপরিচয়ে করণ কারকের প্রসঙ্গটুকু একেবারে বাদ দিলে কি ক্ষতি হয়? বোধ হয়, তাহা হইলে, অর্থের দুরূহত্ব অথবা ব্যাকরণের জটিলতাবৃদ্ধি, ইহার কোনটিই হয় না। বিখ্যাত শব্দতত্ত্ববিৎ ডাক্তার সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন যে, "দ্বারা" "কর্ত্তৃক" "দিয়া" ইত্যাদি "শব্দ"গুলি করণ কারকের (৩য়া বিভক্তির) অর্থ প্রকাশ করিবার জন্য অন্য শব্দের সহিত ব্যবহার হয়। এগুলিকে তিনি Post-Positions (অনু শব্দ অথবা বিভক্তিসূচক শব্দ?) এই নাম দিয়াছেন। "দ্বারা" 'দিয়া" "কর্ত্তৃক" সম্বন্ধে প্রাচীনপন্থী বৈয়াকরণেরাও উপরি উক্ত মতের সমর্থক। যথা—"দ্বারা এইটি সংস্কৃত 'দার'—শব্দের তৃতীয়া। 'দিয়া'—এইটি 'দ্বারা'র অপভ্রংশ মাত্র। 'রামকর্ত্তৃক দৃষ্ট' ইত্যাদিতে 'রাম কর্ত্তা যাহার' ঈদৃশ ব্যাসবাক্য হইতে পদগুলি উৎপন্ন। উত্তরকালে 'কর্ত্তৃক' এইটি স্খলিত হইয়া বিভক্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে।"* একটি পৃথক শব্দ সমস্ত পদ হইতে "স্খলিত" হইলে, অর্থাৎ অন্য শব্দ হইতে একটু দূরে বসাইয়া লিখিলে তাহা বিভক্তি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে কি-না তাহা শব্দতত্ত্ববেত্তারা বিচার করিবেন। কিন্তু উপরি-উদ্ধৃত কথা হইতে ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, "দ্বারা" "দিয়া" "কর্ত্তৃক" ইহারা যে মূলতঃ এক একটি শব্দ, বিভক্তি চিহ্ন নহে, তাহা সকলেই স্বীকার করেন। "করিয়া" শব্দ যোগেও সময় সময় করণার্থ প্রকাশ পায়—"হাতে করিয়া দাও"। এখানে "করিয়া" বিভক্তি নহে।

এইটুকু যদি স্বীকার করায় আপত্তি না থাকে, তবে পৃথক্ দুইটি শব্দকে পৃথক্ দেখাই অধিকতর সঙ্গত। "রাম দ্বারা" অথবা "রামের দ্বারা" ইত্যাদি বাক্যাংশকে "দ্বারা" শব্দ যোগে প্রথমা অথবা ষষ্ঠী* বলায় কোন গুরুতর ভ্রম হয় কি না, তাহা বিবেচনা করা উচিত। একই শব্দের যোগে একবচনে এক বিভক্তি আর বহুবচনে অপর বিভক্তি, এই আপত্তি উঠিলে, তাহাও খণ্ডন করা যায়। কর্ম্মের (দ্বিতীয়ার) "কে" বিভক্তি সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হয় না—"এমন ছেলে দেখি নাই," "তোমার ছেলেকে ডাক।" কর্ত্তার "এ" বিভক্তি একবচনে অনেক সময়ই লোপ হয়। "দশ জন যাহা বলে," "দশ জনে যাহা বলে।"† "রাম অপেক্ষা" অথবা "রামের অপেক্ষা শ্যাম ভাল" ইত্যাদিরও প্রয়োগ আছে। এই সব দৃষ্টান্তের অনুরূপ—"রাম দ্বারা" এই বাক্যাংশে "র" বিভক্তির লোপ (বিকল্পে) বলা যাইতে পারে।

অপাদানের কথা

করণ (৩য়া বিভক্তি) সম্বন্ধে যাহা বলা হইল অপাদান সম্বন্ধেও সেইরূপ বলা যায়। "হইতে" "থেকে" এই দুইটিকে পঞ্চমী বিভক্তির চিহ্ন বলিয়া সকল ব্যাকরণেই দেখান হয়। সুনীতিবাবুর গ্রন্থে‡ এগুলিকেও "বিভক্তিসূচক শব্দ" বলা হইয়াছে। বাস্তবিক, সাধারণ বুদ্ধিতেও ইহা স্পষ্টই ধরা পড়ে যে, "হইতে" "থাকিয়া (থেকে)" "চাহিয়া (চেয়ে)" ইত্যাদি ক্রিয়াপদ পঞ্চমী বিভক্তির অর্থ প্রকাশ করার জন্য অন্য শব্দের সঙ্গে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। "হইতে" প্রভৃতি শব্দকে যদি "বিভক্তি" বলা সঙ্গত হয়, তবে আরও অনেক শব্দকে ঐ একই কারণে "বিভক্তি" বলা যাইতে পারে। যথা—"রামের অপেক্ষা শ্যাম বড়"—এই বাক্যে "রামের অপেক্ষা" এই বাক্যাংশ, "রাম" শব্দে সংস্কৃত পঞ্চমী বিভক্তি যোগ করিলে যাহা হয় (রামাৎ) তাহাই প্রকাশ করিতেছে। সুতরাং "রামের অপেক্ষা" ও "রাম অপেক্ষা" এই দুই স্থলেই "অপেক্ষা" শব্দকে পঞ্চমী বিভক্তির চিহ্ন বলা যাইতে পারে। কোন কোন স্থলে "রামের কবুতে শ্যাম ভালো" এরূপ তুলনার্থক উক্তি ব্যবহৃত হয়।§ এখানেও

* বৃহৎ সাহিত্যপ্রবেশ ৭৫ সংস্করণ। কিন্তু এই পুস্তকেই "শব্দবিভক্তি" পর্য্যায়ে "দ্বারা" "দিয়া" ইত্যাদিকে তৃতীয়া বিভক্তি দেখান হইয়াছে।

* রাজা রামমোহন এই কথাই বলিয়াছেন।

† ভাষাবোধ ব্যাকরণ।

‡ *Origin and Development of the Bengali Language.*

§ *Origin and Development of the Bengali Language.* P. 767.

পঞ্চমীর অর্থ প্রকাশ পায়। "কাছ থেকে," "নিকট হইতে" এইগুলিও ষষ্ঠীর সহিত ব্যবহৃত হইয়া পঞ্চমীর অর্থ প্রকাশ করে।* কিন্তু এগুলিকেও কেহ বিভক্তি বলেন না। চতুর্থী বিভক্তির বিষয়েও এই প্রসঙ্গে বিচার করা যাইতে পারে। "জন্যে", "নিমিত্তে" এইগুলি ষষ্ঠীর সহিত ব্যবহার হইয়া চতুর্থীর অর্থ প্রকাশ করে।† চতুর্থীর নিজস্ব কোন চিহ্ন নাই বলিয়া অনেকে সম্প্রদান কারকই অস্বীকার করেন। "জন্য" প্রভৃতি দিয়া চতুর্থীর অর্থ প্রকাশ করা এক কথা, কিন্তু সেই কারণে "জন্যে" প্রভৃতিকে চতুর্থী বিভক্তির চিহ্ন বলা অন্য কথা। "বালকদের জন্যে" ও "বালকদের হইতে" এই দুই কথার ব্যাকরণ-ঘটিত আকার একই। "বালকদের জন্যে" এই স্থলে যদি "জন্যে" এই "অব্যয়" যোগে ষষ্ঠী বলা সঙ্গত হয়, ‡ তবে "বালকদের হইতে" এখানেও "হইতে" যোগে ষষ্ঠী এবং "বালক হইতে" এস্থলে একবচনে ষষ্ঠীর লোপ, অথবা "হইতে" যোগে প্রথমা § বলিলে কি দোষ হয় তাহা বুঝা কঠিন। "বালকদের মধ্যে" "বনের মাঝে" "বাড়ির ভিতরে" এই সব স্থলেও সংস্কৃত সপ্তমীর অর্থ প্রকাশ পাইতেছে, কিন্তু "মধ্যে" "ভিতরে" ইত্যাদি বিভক্তির চিহ্ন নহে। "মধ্যে" "ভিতরে" এগুলি বিশেষ্য, "হইতে"র সঙ্গে তুলনা হয় না. এইরূপ বলিলে "সুখের লাগিয়া" এইটি ধরা হউক। "লাগিয়া" শব্দ চতুর্থীর অর্থ প্রকাশ করার জন্য অন্য শব্দের (বিভক্তিশূন্য অথবা ষষ্ঠীযুক্ত) ** সঙ্গে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু "লাগিয়া" বিভক্তি নহে।

কেহ কেহ বলেন, "হইতে" প্রাকৃত "হিংতো" বিভক্তির অপভ্রংশ।§§ কিন্তু সুনীতিবাবু এ-কথার অসারতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, "দ্বারা" "দিয়া" "কর্তৃক" "হইতে" "থেকে" "চেয়ে" এগুলি তৃতীয়া ও পঞ্চমী বিভক্তির অর্থ প্রকাশ করার জন্য ব্যবহৃত হইলেও এগুলি পৃথক্ পৃথক্ শব্দ। "নিমিত্তে" "জন্যে" "তরে" "লাগিয়া" "অপেক্ষা" ইত্যাদি শব্দের যোগে যেমন অন্য শব্দের উত্তর "র" বিভক্তি হয়, আবার কখন কখন হয় না, তেমনি "দ্বারা" "দিয়া" "কর্তৃক" "হইতে" "থেকে" যোগেও শব্দের উত্তর কখন কখন "র" বিভক্তি হয়। যেস্থলে "র" বিভক্তি নাই, সেস্থলে "র" বিভক্তির লোপ, অথবা প্রথমা বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ করণ ও অপাদানকে (৩য়া ও ৫মী বিভক্তি) বর্জ্জন করিয়াও কাজ চলে।

এইরূপ করিলে, ভাষার ব্যবহার-কৌশলের অথবা রচনা-প্রণালীর কোন অঙ্গহানি হয় না ইহা নিশ্চয়। অপর কোন দিক দিয়া কোন অনিষ্ট অথবা অসৌষ্ঠব হয় কি-না তাহা বৈয়াকরণেরা ও শব্দতত্ত্ববিদেরা বলিতে পারেন।

রাজা রামমোহন এক শত বৎসর পূর্ব্বে যে বলিয়াছিলেন, "করণ ও অপাদান কারক বাদ দিলেও চলিতে পারে" * সে-কথার সত্যতা এখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে।

"এ" বিভক্তির কথা

"হইতে" "দ্বারা" "দিয়া" প্রভৃতি শব্দ বিভক্তি নহে বটে, কিন্তু "এ" সত্যই বিভক্তির চিহ্ন। সুতরাং ইহার সম্বন্ধে আলোচনা প্রয়োজন।

করণ কারকের (তৃতীয়া বিভক্তির) চিহ্নরূপে "এ" (রূপান্তর "য়") ব্যবহার হয়।† (সময় সময় অধিকরণের বিভক্তিই তৃতীয়ায় প্রযুক্ত হয় ইহাও কথিত হইয়া থাকে)। যথা—"এ কলমে বেশ লেখা যায়," "সে ছুরিতে হাত কাটিল"। এখানে কলমে = কলম দিয়া, ছুরিতে = ছুরির দ্বারা।‡ কখন কখন "হইতে" (অথবা "থেকে") প্রয়োগ করিয়া করণার্থ প্রকাশ করা হয়—"তাঁহা হইতে যে এত হইবে তাহা কে জানিত", "এ সন্তান হইতে আবার দুঃখ ঘুচিবে।" এস্থলে তাঁহা হইতে = তাঁহার দ্বারা, সন্তান হইতে = সন্তান দ্বারা।

* *Bengali Self-taught* by Dr. Suniti Chatterjee.

† *Origin and Development of the Bengali Language.*

‡ ভাষাবোধ—পদাশ্রয়ী অব্যয়ের যোগে "র" হয়।

§ রাজা রামমোহন "হইতে" যোগে প্রথমা অথবা ষষ্ঠী বলিয়াছেন।

** *Origin and Development of the Bengali Language*—"Bengali Post-Positions."

§§ বৃহৎ সাহিত্যপ্রবেশ।

* *Bengali Grammar written in the English Language.*

† *Origin and Development of Bengali Language.*

‡ ভাষাবোধ ব্যাকরণ।

অপাদান কারকে স্থানে স্থানে "এ" বিভক্তি ও "তে" বিভক্তি যোগ হয়—"পিতার মুখে এ কথা শুনিয়াছি," "মেঘে বৃষ্টি হয়," "খনিতে সোনা পাওয়া যায়," "কাজে ক্ষান্ত"।* এখানে "এ" ও "তে" = হইতে।

এ সকল স্থলেই বিভক্তি বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। "দ্বারা," "দিয়া" যে-বিভক্তির অর্থ প্রকাশ করে, সেখানে "হইতে" যে-বিভক্তির অর্থপ্রকাশক তাহা "এ" চিহ্ন দ্বারা ও "তে" দ্বারা সূচিত করা হইয়াছে।

যাহা হউক, এই সকল স্থলে "এ" বিভক্তিকে যদি করণ ও অপাদানের চিহ্ন বলা হয়, তবে "করণ ও অপাদান না হইলে চলে," এ-কথা বলা যায় না। কিন্তু এ আপত্তিরও একটা উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। হেতু ও নিমিত্ত অর্থে "এ" বিভক্তি হয়—"ব্রহ্মাদি সকলে কোপে (= কোপ হেতু) কম্পান্বিত কলেবর হইয়া প্রস্থান করিলেন," "তিনি বায়ু সেবনে (= বায়ু সেবন নিমিত্ত) বহির্গত হইয়াছেন।" সহার্থে "এ" বিভক্তি— "অপ্রতিহত প্রভাবে (প্রভাবের সহিত) রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন।" "ব্যাপ্তি" অর্থে "এ" বিভক্তি হয়—"শত যোজন (ব্যাপিয়া) বিস্তীর্ণ এই মহানদী।† ঐরূপ "দ্বারা" "দিয়া" "হইতে" অর্থে "এ" বিভক্তি বলা যাইতে পারে না কি? অর্থাৎ "এ কলমে লেখা যায়" এখানে এ কলমে = কলম দ্বারা, "মেঘে বৃষ্টি হয়" এখানে মেঘে = মেঘ হইতে, ইত্যাদি অর্থ প্রকাশ করিবার জন্য "এ" বিভক্তি (করণ অথবা অপাদানের উল্লেখ না করিয়া) হইয়াছে। এরূপ বলা যায় কি-না, বৈয়াকরণ ও শাব্দিক সমাজের সম্মুখে সভয়ে ও সবিনয়ে এই প্রশ্ন উত্থাপিত করিতেছি।

অধিকরণের অনধিকার প্রবেশ

অধিকরণ কারকের "এ" ও "তে" বিভক্তি কর্ত্তায় ও করণে সংক্রামিত হইয়াছে, ইহা প্রমাণিত হইয়াছে।‡ "এ কালিতে লেখা যায় না" এখানে "কালি দিয়া" এই অর্থে অধিকরণের "তে" বিভক্তি বসিয়াছে। "পিতার মুখে শুনিয়াছি" এখানে মুখে = মুখ হইতে, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। আবার দুই এক স্থলে "এ" বিভক্তি করণ ও অধিকরণ এই দুইয়ের কোন্‌টি বুঝাইতেছে বলা কঠিন—"ঘিয়ে ভাজা" (ঘিতে ভাজা), "হাতে না মারিয়া ভাতে মারিব।" "গরুতে ঘাস খায়" এখানে কর্ত্তৃকারক বুঝাইতে যদি অধিকরণের "তে" বিভক্তি প্রয়োগে দোষ না হয়, তবে করণ ও অপাদান বুঝাইতে অধিকরণের "এ" ও "তে" ব্যবহার হয়, এরূপ বলিলে চলে কি-না তাহা বিবেচ্য। অর্থাৎ "দিয়া" "দ্বারা" "হইতে" ইত্যাদি বুঝাইতে অধিকরণের "এ" ও "তে" বিভক্তি ব্যবহার হয়, এই উক্তি কি ব্যাকরণসঙ্গত? প্রথমা ও তৃতীয়াতে অধিকরণের "এ" "তে" অনধিকার প্রবেশ করিয়া বসিয়াছে, ইহা এক প্রকারে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে, অপাদান সম্বন্ধে ঐ প্রকার ব্যবস্থা মানিয়া লইলে খুব দোষ হয় বলিয়া মনে হয় না।

নূতন শব্দরূপ

এক্ষণে দেখা যাউক, করণ ও অপাদান বাদ দিয়া শব্দরূপ করিলে কেমন হয়, এবং সংস্কৃত করণ ও অপাদান অর্থাৎ তৃতীয়া ও পঞ্চমী বিভক্তির অর্থ প্রকাশের কি ব্যবস্থা হইল। উদাহরণস্বরূপ "বালক" শব্দ ধরা যাউক।

	একবচন	বহুবচন
কর্ত্তা	বালক	বালকেরা
কর্ম্ম	বালককে	বালকদিগকে
সম্বন্ধ	বালকের	বালকদিগের
অধিকরণ*	বালকে,	বালকদিগতে
	বালকেতে	বালকদিগেতে
		বালকগুলিতে
		বালকগুলাতে

করণ ও অপাদানের পরিবর্ত্তে এই নিয়ম থাকিবে— "দ্বারা" "দিয়া" "কর্ত্তৃক" "হইতে" "চেয়ে" "থেকে" এই সব শব্দের যোগে সম্বন্ধের "র" বিভক্তি ব্যবহৃত হয়। "র" কখন কখন উহ্য থাকে। "দ্বারা" "দিয়া" "ও" "হইতে" অর্থ প্রকাশ করিবার জন্য কখন কখন অধিকরণের "এ" ও "তে" বিভক্তির প্রয়োগ হয়।

বাংলায় সম্প্রদান ও কর্ম্মকারকে কোন ব্যাবহারিক পার্থক্য নাই। যেখানে সংস্কৃতের চতুর্থী বিভক্তির অর্থ প্রকাশ করা আবশ্যক হয়, সেখানে "জন্যে" "নিমিত্তে" "লাগিয়া" "তরে" এই শব্দগুলির প্রয়োগ হয় এবং উহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী শব্দে "র" বিভক্তি হয়। কখন কখন "নিমিত্ত" প্রভৃতি উহ্য থাকে এবং পূর্ব্ববর্ত্তী শব্দে "এ" বিভক্তি হয়।

* ভাষাবোধ ব্যাকরণ।
† ভাষাবোধ।
‡ *Origin and Development of the Bengali Language;* p. 789.

* ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের *Bengali Self-taught*এর "মানুষ" শব্দের অনুরূপ।

কেয়াবনের পথ

শ্রীরাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

দুই পাশে কেয়ার ঘন বন—তাহারই ভিতর দিয়া নিতান্ত ভয়ে ভয়ে একটি গ্রাম্যপথ রেখার পর রেখা টানিয়া আঁকিয়া-বাঁকিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত গিয়াছে। দক্ষিণ-পাড়া হইতে উত্তর-পাড়া আসিতে হইলে উজানী গাঁয়ের এইটিই সোজা পথ। কিন্তু বেশী রাত হইয়া গেলে এ-পথ দিয়া চলাচল করিতে স্বতঃই মনে ভয়ের সঞ্চার হয়—কারণ কবে নাকি এক দিন গ্রামের কাহাকে যেন এই পথেই সাপে কামড়াইয়াছিল। অবশ্য, কেয়াবনে সাপ থাকা এমন কিছু বিচিত্র ব্যাপার নয়; কাজেই ঐ ঘটনা যদি মিথ্যাও হয়, তবু ও-পথ এড়াইয়া চলাই সুবুদ্ধির পরিচয়; বিশেষ করিয়া যখন একটু ঘুর হইলেও আর একটি ভাল পথ আছে।

কিন্তু সেদিন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসা সত্ত্বেও উত্তর-পাড়ার মানি ওরফে মানদা তাহার ছোট ভাই বিজু ওরফে বিজনকুমারকে সঙ্গে লইয়া দক্ষিণ-পাড়ার মালা ওরফে মণি-মালাদের বাড়ি হইতে ঐ পথেই আসিতেছিল। মানির দুর্জ্জয় সাহস সত্য, কিন্তু অপরের সাহসের উপর নির্ভর করিয়া সন্ধ্যার পরে ঐ সাপবহুল পথে যাওয়া তো চলে না, কাজেই বিজু ও-পথে আসিতে প্রথম রাজী হয় নাই। কিন্তু মানি দুই ধমকে তাহাকে রাজী হইতে বাধ্য করিয়াছিল।

সে বলিয়াছিল,—যা তুই তবে একাই ও-পথ দিয়ে, আমি অত ঘুরে এখন যেতে পারি নে। মরণ তোমার! এত রাত পর্য্যন্ত মালাদের বাড়িতে পড়ে থাকা কেন, কি মধু ওখানে আছে শুনি? বাড়ির কথা আর মনে থাকে না, না? এই পথেই হতভাগা তোমাকে বাড়ি ফিরতে হবে, সাপে বাঘে কাটে তো কাটুক গে—কাটলে পরে মালাদের বাড়ি এত রাত পর্য্যন্ত আড্ডা মারা তোমার ঘুচে যাবে।

বিজু অমনি পট্ করিয়া আপনার অভিমান ভুলিয়া জিব কাটিয়া বলিয়াছিল,—দিদি, 'মা-মন্‌সা' বল্, 'মা-মন্‌সা' বল্ শীগ্‌গির, রাত ক'রে সাপ বলতে নেই রে।

মানির এ সত্য ভাল করিয়াই জানা ছিল, কিন্তু রাগের মাথায় মা-মনসার নাম করিতে সে ভুলিয়া গিয়াছিল, যে ভুল হইয়া গিয়াছে তাহা শুধরাইয়া লওয়ার কিছুমাত্র চেষ্টা না করিয়া সে বলিয়াছিল,—সাপের নাম নিলে মা-মনসা যদি চটেন তো চটুন গে। তোর পোড়ারমুখোর জন্যেই না এ-দুর্ভোগ আমার কপালে লেখা ছিল!

অগত্যা বিজু যতটা সম্ভব দিদির গা ঘেঁষিয়া পথ চলিতে লাগিল। আর মানি তাহা লক্ষ্য করিয়াই বলিল,—ভয় করে তো তুই আমার হাত ধরে চল না বিজু।

বিজু কি যেন একটু চিন্তা করিয়া লইয়া বলিল,—তুই এখন অনেক বড় হয়ে গেছিস দিদি, তোর গা ছুঁতে কেন জানি আজকাল ভারি লজ্জা করে। নইলে তোর হাত ধরেই চলতাম বইকি? আমার কিন্তু ভারি ভয় করচে।...... কেয়াফুলের ভারি মিঠে গন্ধ, না দিদি?

মানি সহসা বিজুর কথায় চকিত হইয়া উঠিল। মানির যে বয়স হইয়াছে তাহা মানি এতদিন ভাবিয়া দেখে নাই। বিজুর কথায় সহসা তাহার আপাদমস্তক কেমন অস্বস্তিকর এক জ্বালায় জ্বলিতে লাগিল। হতভাগা এসব আবার বলে কি!

বিজুর এতক্ষণে খেয়াল হইল যে, কথাটা সে নিতান্ত বেফাঁস বলিয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু যাহা একবার বলিয়া শেষ করা হইয়াছে তাহা তো আর ফিরাইয়া লইবার কোন উপায় নাই, থাকিলে না-হয় তেমন ব্যবস্থা করা যাইত। বিজু আপনাকে বিশেষ রকম বিব্রত মনে করিয়া তাড়াতাড়ি আবার বলিতে সুরু করিল,—আচ্ছা দিদি, ওই মিঠে কেয়ার খোস্‌বায়ু পেয়েই বুঝি মা-মন্‌সা এখানে ঠাঁই নিয়েচে?

মানি বিজুর পূর্ব্বোক্ত অপ্রত্যাশিত কথারই রেশ টানিয়া শ্লেষ হানিয়া বলিল,—আমি কি সর্ব্বজ্ঞ যে মা-মন্‌সা কিসের জন্যে এখানে ঠাঁই নিয়েচেন তাও ব'লে দিতে পারবো? তবে বন্‌বাদাড়েই তো মা-মন্‌সার ঠাঁই।

বিজু দিদির কণ্ঠ শুনিয়াই বুঝিয়াছিল যে, সে তাহার প্রতি একটু চটিয়া গিয়াছে, কিন্তু চটিয়া যাওয়ার বিশেষ কারণ সে তো কিছু আবিষ্কার করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। হুঁ, সত্যই তো দিদির গা ছুঁইতে আজকাল তাহার কেমন যেন একটু লজ্জা করে। দুই দিন আগেও এমন কথা সে ভাবিতে পারে নাই, কিন্তু যেদিন হইতে মানির বিবাহের কথা একটু-আধটু কাণাঘুষা হইতে সুরু করিয়াছে সেদিন হইতেই কেন জানি বিজু এই দুর্ব্বলতা আপনার মধ্যে অনুভব করিতেছে। ইহার কারণ সে নিজেও ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারে না, তবে ইহা সে বুঝিয়াছে যে, দিদির বয়স বাড়িয়াছে। আর সে-কথা বলায় এমনই বা কি অপরাধ হইয়া গেল তাহা তো সে ভাবিয়া পাইতেছিল না।

এমন সময় কেয়াবনের ভিতর হইতে একটা ডাহুক পাখী বোধ করি ডাকিয়া উঠিল। বিজু সভয়ে দিদির আরও কাছে আসিয়া তাহার হাতের কনুইয়ের কাছটা দুই হাতে চাপিয়া ধরিল।

মানি বিশেষ রকম চম্‌কাইয়া উঠিয়া ত্রস্তে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিল,—এই না বড় লজ্জা করছিল তোর হতভাগা, আর যেই ডাহুক্ ডেকে উঠা, অম্‌নি ভয়ে বুঝি তোর লাজলজ্জা সব চুলোয় গেল বিজু?

বিজু বিব্রত হইয়া অভিমান-জড়িত কণ্ঠে বলিল,—আমি তো এ-পথে এইজন্যেই আসতে চাইনি দিদি, তোর পাল্লায় পড়েই তো আসতে হ'ল।

মানি অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করিয়া বলিল,—দেব এইবার গালে তোর দুই চড় বসিয়ে। হতভাগা, কেন মরতে রাত পর্য্যন্ত মালাদের বাড়ি থাকা হয় শুনি? বয়েস হ'লে যে এতদিনে গাঁয়ে ঢি ঢি পড়ে যেত। আর কখ্‌খনও আমি পারবো না তোকে ওদের বাড়ি থেকে নিয়ে আসতে—এই আমি আজ ব'লে দিলাম।

বিজু মানির হাতটা আর একটু শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিয়া বলিল,—তোকে কে যেতে বলেছিল শুনি? আমি না-হয় খেয়ে-দেয়ে মালাদের বাড়িতেই শুয়ে থাকতাম, তারপর কাল ভোরে বাড়ি আসতাম। তুই না এলে আমাদের সেইরকমই ত কথা ছিল।

মানি মনে মনে একটু হাসিল, তারপর ঠাট্টার সুরে বলিল,—আমার গা ছুঁতে তোর লজ্জা করে, কিন্তু মালার পাশে শুতে তো তোর লজ্জা করে না।

বিজু মহাবিব্রত হইয়া বলিল,—কি জানি, অত জানিনে, তবে মালার তো তোর মত বয়সও হয়নি, আর বিয়ের সম্বন্ধও আসেনি যে লজ্জা করবে আমার।

মানি নির্জ্জন কেয়া-গন্ধ-কাতর গ্রাম্যপথ হাসিয়া মুখর করিয়া তুলিল।

পরদিন মালা তাহাদের বাড়ি আসিল। বিজু তখন বাড়ি ছিল না। মানি মালাকে দেখিয়াই হাসিতে সুরু করিয়া দিল। মালা মানির অত হাসি দেখিয়া প্রথমটা একটু বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল সত্য, কিন্তু পরক্ষণেই আবার নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া বলিল,—মানিদি, আমাকে দেখে তোমার অত হাসি কিসের শুনি?

মানি মালার একটা হাত ধরিয়া হাসিয়া গড়াইয়া পড়িয়া বলিল,—আয় ঘরের ভেতর তোকে একটা মজার কথা শোনাই।

মালা অতি ভয়ে ভয়ে মানির সঙ্গে একটা ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। সে ঘরে তৃতীয় ব্যক্তি আর কেহ ছিল না। মানি মালাকে একটা তক্তপোষের উপর বসাইয়া তাহারই গলা জড়াইয়া ধরিয়া নিতান্ত ঘনিষ্ঠ হইয়া বসিয়া মালার কানের কাছে মুখ লইয়া বলিল,—কাল রাত্তিরের কাণ্ড শোন্ তোকে তবে বলি। তোদের বাড়ি থেকে বিজুকে নিয়ে আমি যখন কাল ঐ কেয়াবনের পথ দিয়ে বাড়ি ফিরছিলাম, তখন বিজুটা তো সাপের ভয়েই মরে। ওটাকে বললাম, তোর যদি ভয় করে তো তুই আমার হাত ধ'রে চল বিজু। কিন্তু এমন হতভাগা ছেলে, বলে কি-না,—তোর এখন বয়েস হয়ে গেছে দিদি—তোর হাত ধরতে আমার কেমন যেন লজ্জা করে। শোন কথা, ডেঁপো ছেলের!—

মানি এই পর্য্যন্ত বলিয়াই মালার গায়ের উপর হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল। তারপর আবার নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া বলিতে লাগিল,—আমি তখন বললাম আমার হাত ধ'রে চলতে তোর লজ্জা করে হতভাগা, কিন্তু মালার পাশে শুতে তো তোর লজ্জা করে না।

—বললে তুমি?—বলিয়া মালা লজ্জায় আড়ষ্ট হইয়া গেল।

মানি বলিল,—হুঁ, বললাম বইকি! আর তাতেই তো টিট হ'য়ে গেল একেবারে।

মালা কি যে করিবে এবং কি যে বলিবে ভাবিয়া পাইতেছিল না। মুখের চেহারা তাহার এমন হইয়াছিল যে, মানি সেদিকে চাহিয়া সকৌতুকে মনে মনে না হাসিয়া থাকিতে পারিতেছিল না। কিন্তু আর বেশী ক্ষণ এ কৌতুক উপভোগ করিতে গেলে হয়ত মালা না কাঁদিয়া ফেলিয়া থাকিতে পারিবে না মনে করিয়াই মানি মালার লজ্জা-রঙীন গাল আস্তে ব্যঙ্গ করিয়া টিপিয়া দিয়া বলিল,—আচ্ছা বোকা মেয়ে তো তুই মালা। তাই কি আমি বিজুকে বলতে পারি নাকি? তোকে নিয়ে একটু রগড় করছিলাম।

মালা আশ্বস্ত হইল সত্য, কিন্তু লজ্জা একেবারে কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছিল না। বলিল,—য্-যাও তোমার যত সব বিচ্ছিরি কথা মানিদি।

—তা বটেই তো!—বলিয়া মানি উঠিয়া যাইতেছিল, এমন সময় কোথা হইতে বিজু ঝড়ের মত ছুটিয়া আসিয়া সে-ঘরে ঢুকিয়াই মালার চুলের মুঠি বাঁ হাতে ধরিয়া পট পট করিয়া তাহার গালে গোটা দুই চড় বসাইয়া দিয়া বলিল,—পোড়ারমুখি, তোমার জ্বালায় ও-পাড়ায় যে আমার পা ফেলাই দায় হ'ল দেখচি। দশ জনের কাছে যে বড় ব'লে বেড়াস, আমি তোর গলায় মালা দেব ব'লেচি—কবে, কোথায় বলেচি শুনি? না, আমি তোর গলায় কিছুতে দেব না, একটা কলাগাছের গলায় দিতে হয় সেওবি আচ্ছা, তবু তোর মত যার একটা কথাও পেটে থাকে না তার গলায় কিছুতেই না। আব্দার, উনি আমার বদনাম রটিয়ে বেড়াচ্ছেন সর্ব্বত্র!

মানি প্রথম ব্যাপারটা কিছু বুঝিতে না পারিয়া থতমত খাইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, এখন আর সে চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। বিজুর দিকে আগাইয়া গিয়া তাহার একটা হাত ধরিয়া তাহার গালে বেশ করিয়া কয়েক চড় বসাইয়া দিয়া বলিল,—সব তাতেই যণ্ডামি তোমার হতভাগা! এক-একটা কাণ্ড ক'রে আসবেন, নিজেই কোথায় সব কি ব'লে আসবেন, তারপরে এসে যাকে খুশী তাকে ধ'রে ধ'রে ঠেঙাবেন। বলি, একি মগের মুল্লুক?

বিজু বিশেষ চম্‌কাইয়া গেল দিদির সাহস দেখিয়া। দিদির গায়ে তাহার অপেক্ষা শক্তি বেশী থাকিতে পারে হয়ত, কিন্তু মেয়েমানুষের গায়ের শক্তি প্রয়োগ করার মধ্যে এতবিধ বাধা আছে যে তাহাদের সে শক্তি কোন কাজেই প্রায় আসে না। এ সত্য বিজু ভাল করিয়াই জানিত। কাজেই দিদির সাহস দেখিয়া তাহার চম্‌কাইবার কথাই তো।

তারপরেই বিজু দিদির চুলের আগা মুঠি করিয়া ধরিয়া তাহার পিঠে ঘাড়ে যথেচ্ছা কিল চাপড় বসাইতে সুরু করিয়া দিল। মানি তখন মহা মুস্কিলে পড়িয়া গিয়া কোনক্রমে কাপড়টাকে একবার সংযত করিয়া লইয়া বিজুকে একটা ধাক্কা দিয়া তাহাকে ঘরের মেঝের উপর ফেলিয়া দিয়া তাহার গলা চাপিয়া ধরিয়া বলিল,—উল্লুক, আর আসবি কখনও আমার সঙ্গে লাগতে? একি বোকা মালাকে পেয়েচিস্ যে যখন খুশী দু-ঘা দিবি বসিয়ে?

মালা বিজুর মুখ চোখের ভাব দেখিয়া বলিল,—আঃ মানিদি, ছাড়, বিজুদার মুখ দিয়ে রক্ত উঠে গেল যে।

মালার কথায় সহসা বিজুর মনে বীরত্বের সঞ্চার হইল। সে ত্রস্তে তাহার মুখের কাছে ঝুঁকিয়া-পড়া দিদির মুখের যেখানে পারিল সেখানে খিম্‌চি কাটিয়া রক্ত বাহির করিয়া ছাড়িয়া দিল। মানি তখন বিজুকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল।

বিজু তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল,—আর কখনও আসবি আমার সঙ্গে লাগতে?—বলিয়াই সে সেখান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

মানিও তখন হাঁপাইতেছিল। সে একটু দম লইয়া মালাকে বলিল,—দিন-দিন ওটা এমন যণ্ডা হয়ে উঠচে! মার আদর পেয়ে পেয়েই ওটা একেবারে গোল্লায় গেল।

মালা এই ব্যাপারে এতদূর ব্যথিত ও মর্ম্মাহত হইয়াছিল যে, তাহার মুখ দিয়া আর একটা কথাও বাহির হইতেছিল না। কিন্তু কথা না বলিলেও যে আর তাহার লজ্জায় অবধি থাকে না। সে তাড়াতাড়ি মানির গায়ের ধূলা ঝাড়িয়া দিতে দিতে বলিল,—বাবা, বাবা, বিজুদা কত বড় মিথ্যুক। একটা কথাও এর সত্যি নয়, মানিদি।

—সে আমি বুঝেচি।—বলিয়া মানি আবার বলিল,—একদিন এমন মার ওর কপালে লেখা আছে আমার হাতে—সেদিন ও

বুঝবে যে মানি বড় কম মেয়ে নয়। দশ জনে আস্কারা দিয়ে দিয়েই না ওর মাথাটি একেবারে খেয়েচে!

এ কথার পরে সেদিন মালা আর বেশী কথা বলে নাই। এক সময় কাহাকেও কিছু না বলিয়া না জানাইয়াই এই কেয়াবনের পথ ধরিয়া একা একা বাড়ি চলিয়া গিয়াছিল।

কেয়াবনের পথ ধরিয়া বিজু একা একাই স্কুল হইতে বাড়ি ফিরিতেছিল। আর সে ভাবিতেছিল, বহুদিন মালাদের বাড়ি যাওয়া হয় নাই। মালাদের লিচুগাছের লিচুগুলি এতদিনে হয়ত পাকিয়া গিয়াছে। সেগুলি এতদিনে হয়ত কাকে বাদুড়ে মিলিয়া প্রায় শেষ করিয়া আনিয়াছে। অথচ সেদিন মালাকে যে কারণে সে চড় বসাইয়া দিয়াছে তাহা যদি মালাদের বাড়ির কাহারও কাছে ফাঁস হইয়া গিয়া থাকে তো সেখানে সে যাইবে কেমন করিয়া? আর কি ফাঁস এতদিনে না হইয়াছে? মালাকে সে তো কতদিন কত কথাই বলিয়াছে, কিন্তু সে-সবের খোঁজ কেহ রাখিল না, আর ভুলে যাহা সে একদিন ফস্ করিয়া বলিয়া ফেলিল তাহারই যত খোঁজ রাখিতে গেল। লোকের এই ন্যায়হীনতা অসহ্য একেবারে। অথচ, সেই সব লোকেদের কিছু না করিয়া মালাকে সে চড় মারিতেই বা গেল কেন? মালার তো কোন অপরাধ নাই। সেই সব লোকেদের যে তাহার করিবার কিছু ছিলও না। যাহা হইয়া গিয়াছে তাহা গিয়াছে, সেজন্য আপ্‌শোষ করিয়া আর লাভ নাই। কোন মতেই তা বলিয়া মালাদের বাড়ির অমন লিচুর মায়া পরিত্যাগ করা চলে না। আজ সে বাড়ি ফিরিয়া বই-পত্তর রাখিয়া সমস্ত মান-অপমান যশ-অপযশ ভুলিয়া একবার মালাদের বাড়ি যাইবেই যাইবে। তারপর বরাতে যাহা আছে তাহা সে অকাতরে সহ্য করিবে।

সমস্তই যখন ঠিক, তখন কেয়াবনে কি যেন খস্ খস্ করিয়া উঠিল। বিজু চিন্তামগ্ন ছিল, কাজেই অধিকতর চম্‌কাইয়া একলাফে খানিকটা পথ আগাইয়া যাইতে গিয়া একেবারে হাল্তোজ্জ্বল মালার গায়ের উপর আসিয়া পড়িল। মালা পূর্ব্ব হইতেই চিন্তামগ্ন বিজুকে আসিতে দেখিয়াছিল, কিন্তু বিজু চিন্তামগ্ন ছিল বলিয়াই মালাকে দেখে নাই। উভয়ে উল্টা দিক হইতে আসিতেছিল এবং এখানে পথও অনেকটা সোজা, কাজেই না দেখার আর কোন কারণ বর্ত্তমান নাই।

মালা হাসিয়া উঠিল, বলিল,—বিজুদা এত বড়টি হ'লে, এখনও তোমার ভয় কাটলো না? আর কাটবে কবে শুনি? একটা ব্যাঙ লাফালো তাতেই এই?

বিজু অপ্রতিভ হইয়াও অপ্রতিভ হয় নাই এমন ভাব প্রকাশ করিয়া বলিল,—ব্যাঙ নয়, ওটা একটা শঙ্খচূড় সাপ। অনেকক্ষণ ধ'রে এই পথের 'পরেই বসেছিল। ঢিল মারতে তবে সরে গেল। নইলে ব্যাঙ দেখে লাফাবো আমি? স্কুল থেকে ফেরবার পথে প্রায়ই ওটাকে দেখি। ও কিন্তু কাউকে কোন দিন কিছু বলে না।

মালা বিজুর মিথ্যা সহজেই বুঝিয়া লইয়া বলিল,—লোকের সঙ্গে ওর অত মিতালি কিসের বিজুদা? তোমার সঙ্গে ঠাট্টাও ওর চলে যে দেখচি।

—কি রকম?

—আবার কি রকম! এই যেমন তুমি আমার সামনে একটু অপ্রস্তুত হ'লে। আবার বানিয়ে তার জন্যে দুটো মিথ্যেও বললে।

বিজু মহা ক্ষেপিয়া গিয়া বলিল,—আজকাল দিদির কাছে কি শিক্ষানবিশী হচ্ছে নাকি তোররে মুখপুড়ী? দু-দিন আগেও যার গালে চড় বসালে কাঁদতে পর্য্যন্ত সাহসে কুলোতো না তারও যে দেখি মুখ দিয়ে বড় কথা বেরোয়। দেব এক ধাক্কায় ঐ কেয়াকাঁটার ঝোঁপে পাঠিয়ে মুখপুড়ী।

মালা বিজুর কথা শুনিয়া হাসিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে সে বলিল,—আজকাল তোমার কি হয়েচে শুনি বিজুদা যে আমাদের বাড়ি একদিনও যেতে পার না? অগত্যা বাধ্য হয়ে আজ গাছ থেকে লোক দিয়ে লিচু পাড়িয়ে নিজেই তোমাদের বাড়ি গিয়ে দিয়ে আসতে হ'ল। মা বল্লেন, আমার মুখ নাকি ভারি খারাপ তাতে যে-কেউ রাগ করতে পারে, আর বিজুটা তো এমনিই অভিমানী ছেলে!…এদিকে মারও খেলাম, ওদিকে দোষও নিলাম। এ-কথা বললে কি কেউ বিশ্বাস করবে যে, তুমি নিজের বোকামির লজ্জাতেই আর আমাদের বাড়ি যেতে পার না?

বিজু তাড়াতাড়ি একটা ঢোক্ গিলিয়া লইয়া বলিল,—

ফের আবার ওকথা তুললেই দেব গালে তোর এম্নি চড় বসিয়ে যে আর ভুলেও কখনও ওকথা তুলবি না।

মালা মিষ্টি করিয়া একটু দুষ্টের হাসি হাসিয়া লইয়া বলিল,—কেমন ক'রে চড় বসাবে শুনি বিজুদা? মেয়েদের গা ছুঁতে তো তোমার আজকাল লজ্জা করে শুনি। দিদির হাত ধরতেই যার লজ্জা করে সে কেমন করে আবার পরের মেয়ের গা ছোঁবে শুনি? আর আমারও তো বয়েস কিছু কম হয়নি।

বিজু লজ্জায় একেবারে মরিয়া গেল। এ দুনিয়ায় কাহাকেও আর তবে বিশ্বাস করা চলে না। দিদিও এত বড় বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারে! এখন যেখানে তাহারা দাঁড়াইয়া আছে তাহারই কাছাকাছি একটা জায়গায় দাঁড়াইয়া যে-কথা সে এত একান্তে দিদির কাছে বলিয়াছে তাহাও মালার কাছে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। আর দুই দিন পরে হয়ত সকলেই এ-কথা জানিবে। কি লজ্জার কথা!

বিজু অনেকটা বেপরোয়ার মত বলিয়া উঠিল,—হুঁ, লজ্জা করে বইকি! শুধু লজ্জা নয়, এখন ঘেন্নাও বোধ হয়। একটা কথাও যে-জাতকে বিশ্বাস ক'রে বলা চলে না, সে জাতকে ছুঁতেও আমার ঘেন্না বোধ হয়।

মালা মহা কৌতুক অনুভব করিয়া বিজুর ক্রোধোত্তেজিত মুখের পানে চাহিয়া হাসিতে লাগিল। বলিল,—তা ঘেন্না করতে হয় কর গে, কিন্তু আজকালের মধ্যেই একবার আমাদের বাড়ি যেও, নইলে মার কাছে বকুনি খেয়ে খেয়ে জীবন আমার বেরিয়ে গেল।

—আচ্ছা যাব—বলিয়া বিজু মালার একটা হাত ধরিয়া আবার বলিল,—তার চেয়ে ফিরে চ, আমি বইগুলো বাড়িতে রেখেই তোর সঙ্গে তোদের বাড়ি যাব'খন।

মালা রাজী হইল। বিজু মালার হাত ছাড়িয়া দিয়া বলিল,—তোরা যে মিথ্যে কথা বলিস্ কেবল, দেখলি তো তোর গা ছুঁতে আমার একটুও লজ্জা করে না।

মালা মুখ টিপিয়া শুধু হাসিতে লাগিল, উত্তরে কিছুই বলিল না।

দুই তিনটা সম্বন্ধ ফিরিয়া যাওয়ার পরে একটা সম্বন্ধ এক-রকম পাকাপাকিই হইয়া গেল। মানিকে দেখিয়া এ-পর্য্যন্ত অপছন্দ কেহ করে নাই, তবে টাকা-পয়সার বনিবনাও হয় নাই বলিয়াই সে-সব সম্বন্ধ ফিরিয়া গেছে। যাহাদের সহিত কথা এক রকম পাকাপাকি হইয়া গেল তাহাদের টাকা-পয়সার দাবি একপ্রকার নাই বলিলেই চলে। তাহারা পছন্দসই পাত্রী পাইলেই সন্তুষ্ট। সেদিকে মানির একপ্রকার ত্রুটি নাই বলাই ভাল। মানির রূপ শুধু যে পছন্দ করিবার মতই তাহা নয়, প্রশংসা করিবার মতও। তাহারা মানিকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিয়াছিল। আর তদুপলক্ষে মালার মানিদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ ছিল। সকালবেলা বিজু মালাকে তাহাদের বাড়িতে লইয়া আসিয়াছিল এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাহাকে আবার বাড়ি পৌঁছাইয়া দিবার কথা ছিল।

বেলা দশটার মধ্যেই মানির আশীর্ব্বাদের কাজ শেষ হইয়া গেল। বারান্দায় আশীর্ব্বাদের কাজ হইয়াছিল। সেখান হইতে মুক্তি পাইয়া ঘরের মধ্যে আসিয়া মানি হাঁপ ছাড়িতেই মালা তাহার একটা হাত জড়াইয়া ধরিয়া বলিল,—মস্ত ফাঁড়া কাটিয়ে উঠলে কিন্তু মানিদি। বাবা, তোমার মুখ-চোখ এখনও যে লাল হয়ে আছে দেখচি।

বিজুও সেই ঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া মালার মতই আশীর্ব্বাদের কাজ দেখিতেছিল, আর দিদির বিপন্ন মূর্ত্তির পানে চাহিয়া মনে মনে পরম কৌতুক অনুভব করিতেছিল। মালার কথা শুনিয়া সে অত্যন্ত অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া বলিল,—ইঃ, ভারি তো ফাঁড়া! হুঁ হুঁ আমাদের মত বছর বছর এগ্‌জামিন দিতে হ'ত তো বুঝতাম! তাকে বলে গিয়ে ফাঁড়া! এঃ, এতো ভারি!

মানি তখনও চুপ করিয়াই ছিল। কারণ, তাহার ভাবী শ্বশুরবাড়ির লোকেরা বারান্দা হইতে চলিয়া গেলেও বাড়ি হইতে যে যায় নাই তাহা তাহার জানা ছিল। মালা মানির দিকে চাহিয়া বিজুর কথার উত্তর দিল,—হুঁ, হ'তে মেয়ে-মানুষ তো বুঝতে ফাঁড়া কিনা!

বিজু বলিল,—থাক, আর আমার মেয়েমানুষ হ'য়ে কাজ নেই। এক এগ্‌জামিনের ঠেলাই সাম্‌লাতে পারি না, তার আবার—। তারপরে দিদির দিকে ফিরিয়া বলিল,—দিদি, তোর হাতে ওরা কি দিলে রে?

মানি তাহার হাতের ছোট একটি ভেল্‌ভেটের খাপের

মধ্যে রক্ষিত একজোড়া কানের দুল দেখাইয়া বলিল,—কানের দুল্-টুল হবে বোধ হয়।

মানি লজ্জায় তাহা দেওয়ার সময় ভাল করিয়া লক্ষ্য করিতে পারে নাই।

মালা হাত বাড়াইয়া তাহা মানির হাত হইতে লইয়া তাহার উপর চোখের দৃষ্টি বুলাইয়া বলিল,—বাঃ, চমৎকার দুল দিয়েচে তো। দুর্গাপুরের রাঙাবৌদির ঠিক এই রকম এক জোড়া দুল আছে।

বিজু বলিল,—কিন্তু দিদির শ্বশুড়বাড়ির লোকগুলো একটাও দেখতে ভাল না। ওরা আবার নাকি শহুরে লোক। ঠিক যেন দেখতে সব রায়েদের গোমস্তাগুলোর মত।

মানি আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। বলিল,—তাতে তোর কিরে পোড়ারমুখো?

—না, আমার আর কি! তোকে নিয়ে গিয়ে ওরা যখন তামাক সাজাবে তখন বুঝবি!—বলিয়া বিজু আপন কৌতুকে হাসিতে লাগিল।

মালাও না হাসিয়া পারিল না। মানি রাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল।

মানিকে যাহারা আশীর্ব্বাদ করিতে আসিয়াছিল তাহারা আহারাদির পর অপরাহ্ণেই বিদায় লইয়া চলিয়া গেল। মালার কিন্তু যাই-যাই করিয়া সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। তখন বিজু মানিকে বলিল,—দিদি, চ' দু-জনে গিয়ে মালাকে ওদের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি। নইলে ফেরবার পথে একা আমার ভয় করবে।

মানি বলিল,—আমি তো যেতে পারব না। তুই বরং অন্য কাউকে সঙ্গে নিয়ে যা বিজু।

বিজু বলিল,—কেন তুই পারবি না? সাপের ভয় তো তোর নেই।

মানি বলিল,—সাপের ভয়ই কি দুনিয়ায় সব নাকি রে? সাপের চেয়ে আরও ভীষণ জানোয়ার সব এ দুনিয়ায় আছে। আর তা ছাড়া মা আমাকে কিছুতেই যেতে দেবেন না।

অগত্যা বিজু পাশের বাড়ির এক জনকে ডাকিয়া লইয়া লণ্ঠন ও লাঠি ঘাড়ে করিয়া মালাকে ঐ কেয়াবনের পথ দিয়াই তাহাদের বাড়ি পৌঁছাইয়া দিয়া আসিল।

ফেরার পথে বিজু ভাবিতেছিল, একদিন সে তাহার নির্ভীক দিদির সঙ্গে কত রাত্রেই না এ-পথে মালাদের বাড়ি হইতে ফিরিয়াছে। আর আজ যেই দিদির সম্বন্ধ ঠিক হইয়া গেল অমনি যত রাজ্যের বাধা ভয় আসিয়া দিদির ঘাড়ে চাপিয়া বসিল। দুনিয়াটা এত তাড়াতাড়ি বদ্‌লাইয়া যাইতেছে কেন? আর এক দিন মালাও হয়ত এ-পথে চলিতে সাহস পাইবে না। কেন, তাহাদের এত ভয় কিসের? সাপ নয়, বাঘ নয়, জন্তু-জানোয়ার নয়, তবে কি মানুষই তাহাদের ভয়ের কারণ? মানুষ মানুষকে ভয় পায়,—এও ত বড় অদ্ভুত! শেষে সে ভাবিল, হয়ত একদিন বয়স হইলে তাহার কাছে ইহা আর অদ্ভুত লাগিবে না, সে আশ্চর্য্যান্বিত হইবে না।

মানির বিবাহ হইয়া গেল। মানি ঐ কেয়াবনের পথ দিয়াই নিতান্ত অপরিচিত একটি ছেলের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধিয়া একই পাল্কীতে চড়িয়া চলিয়া গেল। বিজু দেখিয়াছিল দিদিকে চোখের জল ফেলিতে। এও অদ্ভুত! কোথাকার কে এক জন, জানা নাই শুনা নাই, হঠাৎ আসিল, দিদিকে তাহার লইয়া কোথায় চলিয়া গেল কে জানে! কে জানে কোথায় রামপুরহাট! কিন্তু দিদি তাহার অত কম কাঁদিল কেন? সে হইলে তো চোখের জলে দুনিয়া ভাসাইয়া দিত। অথচ সকলে সাদরে ঐ অপরিচিত ছেলেটির সঙ্গেই তো দিদিকে তাহার পাল্কীতে তুলিয়া দিল। কিন্তু সে যে-মালার এত পরিচিত, তবু সেই মালার গায়েও হাত ঠেকাইতে তাহার এত লজ্জা বোধ হয় কেন? লোকে দেখিলেও হয়ত তাহাকে মন্দ বলিবে। কি অদ্ভুত এই দুনিয়া! ভাবিয়া ইহার কূল-কিনারা করিয়া উঠা যায় না।

বিজু পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে কেয়াবনের পথে খানিক দূর গিয়াছিল। তারপরে দিদির ইঙ্গিতানুযায়ী সমস্ত ভাবনা জলাঞ্জলি দিয়া আবার বাড়ির দিকেই ফিরিয়া আসিল।

মালা এ কয়দিন বিজুদের বাড়িতেই ছিল এবং মানির বিবাহের হুল্লায় মাতিয়া ছিল। বিজু বাড়ি ফিরিতেই মালা বলিল,—বিজুদা, আমাকে এগিয়ে দিয়ে আসবে চল। মানিদি চলে গেল, মনটা আমার ভাল লাগচে না।

বিজু অকারণে রাগিয়া উঠিয়া বলিল,—আমারই যেন খুব ভাল। চ' তবু এগিয়ে দিয়ে আসি, আর দু-দিন পরে তো

আবার শ্বশুরবাড়ির পথেও এগিয়ে দিয়ে আসতে হবে। ছিল যত কর্মভোগ—

মালা বিজুর কথা শুনিয়া আর হাসি সাম্‌লাইতে পারিল না। বলিল,—অত বুড়োমির কথা সব শিখলে কোত্থেকে বিজুদা ?

বিজু মালার কথার কোন উত্তর না দিয়া কেয়াবনের পথ ধরিয়া আগাইয়া চলিল, আর মালাও তাহার পিছু পিছু হাঁটিতে লাগিল।

খানিকটা পথ আসিয়া বিজু বলিল,—দিদির কি দুর্জ্জয় সাহস ছিল, এ-পথ দিয়ে রাত ক'রেও আলো ছাড়া যাতায়াত করতে পারতো, সাপের নামে একটুও বুক কাঁপত না। আর এখন ? দিনের বেলায়ও যাবার সাহস হবে না। বিয়ে এম্‌নিই জিনিষ !

মালা বলিল,—তা তোমার অত মাথাব্যথা কিসের বিজুদা ?

—না, এমনিই বলছিলাম। আর দু-দিন পরে তোরও যে ঐ অবস্থা হবে কি-না, তাই।—বলিয়া বিজু থামিল।

মালা লজ্জায় আর কোন কথাই বলিল না।

বিজুর দিন-দিন সাহস বাড়িতেছে। এখন কেয়াবনের পথ দিয়া চলিতে তাহার আর সাপের ভয় করে না। একটা আলো ও লাঠি হাতে থাকিলে রাত্রেও সে এ-পথ দিয়া যাতায়াত করিতে পারে। মালা আগে যেমন প্রায়ই তাহাদের বাড়ি আসিত, এখন আর তেমন আসে না। একা তো কোনদিনই আসে না। বলিলে বলে, মা ভারি রাগ করেন। বলেন,—দিন-দিন মেয়ের যত বয়েস হচ্ছে তত বুদ্ধি কমচে।

বিজু শুনিয়া আর কিছু বলে না। মনে মনে ভাবে, সত্যিই তো মানুষের দিন-দিন বয়স যত বাড়িতে থাকে, বুদ্ধিও ঠিক সেই পরিমাণে কমিতে থাকে।

কাজেই বাধ্য হইয়া মালাদের বাড়ি গিয়া মালার খোঁজ-খবর লইয়া আসিতে হয়। আবার দিদির কুশল-সংবাদও তাহাকে জানাইয়া আসিতে হয়। কিন্তু এই যাতায়াতও এখন তাহার আর ভাল লাগে না। কেন-না, তাহার মনে হয়, দশ জনে তাহাকে এখন আর পূর্ব্বের সেই সমাদর ও বিশ্বাসের চক্ষে দেখে না। শুধু তাহার মনে হয়, কেয়াবনের নির্জ্জন নিঃসঙ্গ নিরালা পথ এখনও সেই পূর্ব্বের মতই তাহাকে সমাদরের চক্ষে দেখে, প্রয়োজন হইলে পূর্ব্বের মতই ভয় দেখায়, আবার পূর্ব্বের মত গন্ধ-বিধুর করিয়াও তোলে। সে-ই শুধু এ জগতে আজিও বদ্‌লায় নাই।

আবার একদিন মালারও সম্বন্ধ আসিল, ফিরিয়াও গেল। আবার আসিল। একদিন শেষে পাকাপাকি হইয়া গেল। বিবাহের দিন স্থির হইল।

মালাদের বাড়ি হইতে মানিকে আনার চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু মানির শাশুড়ী জানাইয়াছিলেন যে, বধূমাতার সন্তান-সম্ভাবনা, কাজেই হল্লার মধ্যে তাহাকে না-পাঠানই যুক্তিযুক্ত। মানি তাই আসিতে পারে নাই।

মালার বিবাহোপলক্ষে বিজু দিন রাত খাটিয়া খাটিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িল। এতদূর ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে, বিবাহের রাত্রে নিমন্ত্রিতদের যখন সে পরিবেশন করিতেছিল তখন তাহার পা কাঁপিতেছিল। তাহার কেবলই মনে হইতেছিল যে, আর বেশীক্ষণ হয়ত সে পরিবেশন করিতে পারিবে না। কার্য্যতও তাহাই হইল। নিমন্ত্রিতদের হাঁক-ডাকে তাড়াতাড়ি করিয়া পোলাওয়ের বাল্‌তি লইয়া উঠান পার হইতে গিয়া সে ধড়াস করিয়া পড়িয়া গেল। 'দেখ, দেখ' করিয়া লোকজন ছুটিয়া আসিল। ভিড় জমিয়া গেল। তেমন লাগে নাই সত্য, কিন্তু মাথাটা তাহার তখনও ঝিম্‌ ঝিম্‌ করিতেছিল। তাহাকে কয়েক জনে মিলিয়া একটা ঘরে তুলিয়া শোয়াইয়া দিয়া আবার তাহাদের নিজের নিজের কাজে চলিয়া গেল।

তখন আসিল মালা। ম'লা নববধূর বেশে সজ্জিতা, তাহাকে তখন অপরূপ দেখাইতেছে। মালার দিকে চোখ তুলিয়া বিজু চমকাইয়া উঠিল। মালাকে এ-বেশে যে এত অপরূপ দেখাইবে তাহা সে স্বপ্নেও কোন দিন ভাবিতে পারে নাই।

মালা তাহার কানের অতি কাছে মুখ লইয়া অতি আস্তে বলিল,—খুব যা হোক্‌ কেলেঙ্কারী করলে বটে বিজুদা। এ আর কোন দিন আমি ভুলতে পারবো না। মানিদিকে লিখে সব জানিয়ে দেব তোমার কীর্ত্তি। কিন্তু বেশী লাগেনি তো কোথাও ?

বিজু অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া লইয়া বলিল,—না।

মালা মনে মনে হাসিল।

রাত্রে না খাইয়াই বিজু কেয়াবনের পথ ধরিয়া বাড়ি ফিরিয়া চলিল। খাওয়ার স্পৃহা তাহার ছিল না, লোকে তাহা বিশ্বাস করে নাই, মালা করিয়াছিল। রাত তখন অনেক। আলো তাহারা সঙ্গে দিতে চাহিয়াছিল কিন্তু সে সঙ্গে আনে নাই। কেয়াবনের পথে চলিতে এখন আর তাহার ভয় করে না। সে-সব দিন এখন অতীত হইয়া গেছে। হউক কেয়াবনের পথ মৃত্যুর মত নিস্তব্ধ, হউক রূপকথার নাগ-কন্যার দেশের মতই সর্পসঙ্কুল, তথাপি সে আর ভয় পায় না।

কিন্তু মাঝপথে আসিয়া তাহাকে একবার দাঁড়াইতে হইল। তারপর ··কি যেন ভাবিল, তারপর ভাবাকুল কণ্ঠে কেয়াবনের পথকে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়া উঠিল, এখন ?...একমাত্র আমারই এই কেয়াবনের পথ দিয়ে নিঃশঙ্কচিত্তে একা চলার অধিকার কায়েমী হয়ে রইল। সেখানে আমি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। দিদি বহুদিন পূর্ব্বে সে অধিকার হারিয়েচে, মালাও আজ হারাল। এ-পথ একা আমার ; দিদিরও না, মালারও না।

নির্জ্জন কেয়াবনের পথ সহসা তন্দ্রা হইতে জাগিয়া উঠিয়া শুনিল, কে একটা উন্মাদ যেন দর্প করিয়া তাহার অন্তরের রিক্ততা ব্যক্ত করিতেছে। ব্যথায় তাই বনপথের প্রাণও কাঁপিল।

বিজু আবার হাঁটিয়া চলিল.........একা।

গুণ্টুর জেলায় নূতন বৌদ্ধশিল্পের আবিষ্কার

শ্রীনীহাররঞ্জন রায়

দক্ষিণ-ভারতের অমরাবতী, জগয্যেপেটা, ভট্টিপ্রলু, ঘণ্টশালা, নাগার্জ্জুনকোণ্ডা প্রভৃতি যতগুলি স্থানে প্রাচীন বৌদ্ধস্তূপ ও প্রাচীরবেষ্টনী ইত্যাদির ধ্বংসাবশেষ এ-পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার প্রায় প্রত্যেকটি স্থানই কৃষ্ণা নদীর তীরে অথবা নদীর অদূরেই অবস্থিত। স্তূপ-বেষ্টনীর বাহিরে ভিক্ষু-বিহারে যে-সকল ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীরা বাস করিতেন, তাঁহাদের সুবিধার জন্যই বোধ হয় নদীতীরের এই স্থানগুলি নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। কিন্তু বিশেষ করিয়া কৃষ্ণা নদীর তীরে ও অদূরবর্ত্তী স্থানেই এই বৌদ্ধ-প্রতিষ্ঠানগুলি স্থাপনের অন্য কারণও আছে। মাধ্যমিকপন্থীদের গুরু মহাস্থবির নাগার্জ্জুন খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে অর্দ্ধ শতাব্দীরও অধিক কাল (আনুমানিক ১৩৭-১৯৪ খৃষ্টাব্দ) * দক্ষিণ-ভারতের বৌদ্ধসংঘের আচার্য্যের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সদ্ধর্ম্মের প্রচারে তিনি দক্ষিণের সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন এবং বহু দেশকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। চৈনিক পরিব্রাজক য়ুয়ান্-চোয়াঙ্ অমরাবতীর বৌদ্ধতীর্থ দেখিতে আসিয়া নাগার্জ্জুনের কথা লিখিয়া গিয়াছেন। দক্ষিণ-ভারতীয় যুবক নাগার্জ্জুন যে 'ওডিবিশ' অর্থাৎ উড়িষ্যা রাজ্যকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষা দিয়াছিলেন এবং কোশল ও অন্ধ্রদেশে যে তাঁহার প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, য়ুয়ান্-চোয়াঙের ভ্রমণ-বৃত্তান্তেই তাহার পরিচয় আছে।† দক্ষিণ-ভারতে নাগার্জ্জুনের যখন খুব প্রতিষ্ঠা, সাতবাহন-বংশীয় রাজারা তখন অন্ধ্রদেশের অধিপতি ; আধুনিক পণ্ডিতদের কেহ কেহ মনে করেন, এই বংশের রাজা শ্রীযজ্ঞ অথবা পুলমাবী বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারে স্থবির নাগার্জ্জুনের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। অমরাবতীতে যে সুবৃহৎ বৌদ্ধস্তূপের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার প্রাচীর-বেষ্টনী

* *Report of the Archaeological Survey of Southern India*, Vol. I., p. 9,
Eitel—*Handbook of Chinese Buddhism*.
Ep. Indica., Vol. XV., p. 261.

† Beal—*Buddhist Records of the Western World*, Vol. II, p. 97 and 210-11.

তৈরি করাইয়াছিলেন নাগার্জ্জুন স্বয়ং।* এই সব কারণে মনে হয়, অন্ধ্রদেশে কৃষ্ণা নদীর তীরবর্ত্তী ভূমিতেই নাগার্জ্জুন স্থায়ী প্রচারকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকেই কেন্দ্র করিয়া, তাঁহার প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ উৎসাহ ও



ছদ্দন্ত জাতক

পোষকতায় এই কৃষ্ণা নদীর তীরে তীরে বহু বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছিল। সাতবাহন-বংশীয় রাজাদের পতনের পর কৃষ্ণাভূমিতে ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ইক্ষ্বাকু বংশীয়েরা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও সাতবাহনদের মতই বৌদ্ধধর্ম্মের অনুরাগী ও উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কাজেই নাগার্জ্জুনের মৃত্যুর পরও তাঁহার অনুবর্ত্তীরা বহুদিন পর্য্যন্ত কৃষ্ণা প্রদেশে তাঁহাদের প্রচারকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের পোষকতায়ও ঐ সময় আরও কতকগুলি বৌদ্ধপ্রতিষ্ঠান কৃষ্ণার তীরে তীরে নানা স্থানে গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই-সব প্রতিষ্ঠানই বহু বৎসর বহু শতাব্দী মাটির নীচে বিস্মৃতির আড়ালে গোপন থাকিয়া এতদিন পরে আবার আজ ধীরে ধীরে ভগ্ন, জীর্ণ ও বিক্ষিপ্ত অবস্থায় লোকলোচনের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। অমরাবতী, জগয্যেপেটা, ভট্টিপ্রলু প্রভৃতি স্থানের প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ বহুদিন আবিষ্কৃত ও আলোচিত হইয়াছে।

কিছুদিন আগে নাগার্জ্জুনকোণ্ডায়ও এক সুবিস্তৃত প্রাচীন বৌদ্ধকীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। নাম হইতেই বুঝা যায়, স্থবির নাগার্জ্জুনের স্মৃতির সঙ্গে এই প্রাচীন বৌদ্ধকীর্ত্তিটি বিজড়িত। প্রাচীন বৌদ্ধশিল্প ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে যাঁহারা চর্চ্চা করেন, তাঁহারা নাগার্জ্জুনকোণ্ডার নূতন আবিষ্কারের খবর জানেন। কিন্তু কিছুদিন হইল কৃষ্ণা প্রদেশে গুণ্টুর জেলায় গোলী গ্রামের কাছেই একটি প্রাচীন অপেক্ষাকৃত স্বল্পায়তন বৌদ্ধস্তূপের প্রাচীরবেষ্টনীর যে ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং মর্ম্মর-প্রস্তর নির্ম্মিত সেই বেষ্টনীতে উৎকীর্ণ ভাস্করশিল্পের যে নিদর্শন আমাদের চোখের সম্মুখে উন্মুক্ত হইয়াছে, তাহার সঙ্গে পরিচিত হইবার সুযোগ হয়ত খুব বেশী লোকের হয় নাই।

কৃষ্ণানদীর একটি শাখার উপরেই গোলী গ্রাম। নাগার্জ্জুনকোণ্ডা হইতে আঠার মাইল ভাটিতে এই গ্রামের



যশোধরার নিকট বুদ্ধদেবের আগমন

অবস্থান এবং গ্রাম হইতে কৃষ্ণা নদী মাত্র দুই মাইল। গোলী গ্রামের সংলগ্ন মাঠে এই প্রাচীন স্তূপটির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়; ইহার খনন ও আবিষ্কারের ভার লইয়াছিলেন পণ্ডিচেরীর ফরাসী অধ্যাপক ডক্টর জুভো-দুব্রেল্ (Dr. G. Jouveau-Dubreuil)। তাঁহার খননের ফলে এই ধ্বংসস্তূপের ভিতর হইতে প্রাচীন প্রাচীরবেষ্টনীর কয়েকটি অংশ আবিষ্কৃত হয় এবং পরে তাঁহারই চেষ্টায় মাদ্রাজের সরকারী চিত্রশালায়

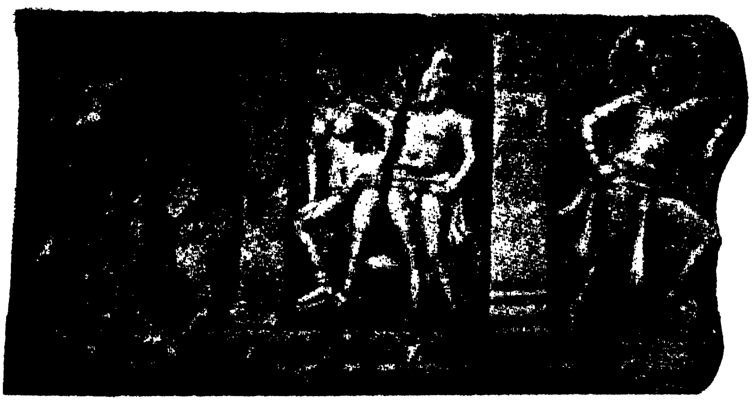
* *Report of the Arch. Survey of Southern India*, Vol. I, pp. 5 and 11; *Ep. Ind.* Vol., XV. p. 261.

সেগুলি স্থানান্তরিত হয়। তবে নাগমূর্ত্তি-উৎকীর্ণ সুবৃহৎ একটি প্রস্তরখণ্ড, ছোট স্তূপ ও বুদ্ধপদচিহ্ন-উৎকীর্ণ দুইটি ছোট প্রস্তর-খণ্ড এবং ভগবান্ বুদ্ধের জীবনের বিভিন্ন ঘটনাসম্বলিত একটি সুদীর্ঘ প্রস্তরখণ্ড এখনও গোলী গ্রামেই একটি নবনির্ম্মিত মন্দিরের মধ্যে রক্ষিত আছে। এই সুদীর্ঘ প্রস্তরখণ্ডটি পাওয়া গিয়াছিল স্তূপটির দক্ষিণ দিকে; বোধ হয় দক্ষিণ দিকের বেষ্টনীর ইহাই ছিল প্রধান অংশ (frieze)। অন্য তিন দিকের সুদীর্ঘ প্রস্তরখণ্ড তিনটি এই স্থানে প্রাপ্ত অন্যান্য শিল্প-নিদর্শনের সঙ্গে মান্দ্রাজের সরকারী চিত্রশালায় রক্ষিত হইয়াছে।



নলগিরি হস্তীদমন

স্তূপের একমাত্র পশ্চিম দিকের বেষ্টনীর প্রস্তরখণ্ডটিই অবিকৃত ও অভগ্ন অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। মর্ম্মরপ্রস্তরখণ্ডটি দৈর্ঘ্যে বারো ফিটেরও উপর, প্রস্থে এক ফুট সাড়ে তিন ইঞ্চি (১২´ ৩½"× ১´৩")। বরহুত, সাঁচী, অমরাবতী প্রভৃতি স্থানের প্রাচীন বৌদ্ধ শিল্পধারার সঙ্গে যাঁহাদের পরিচয় আছে,

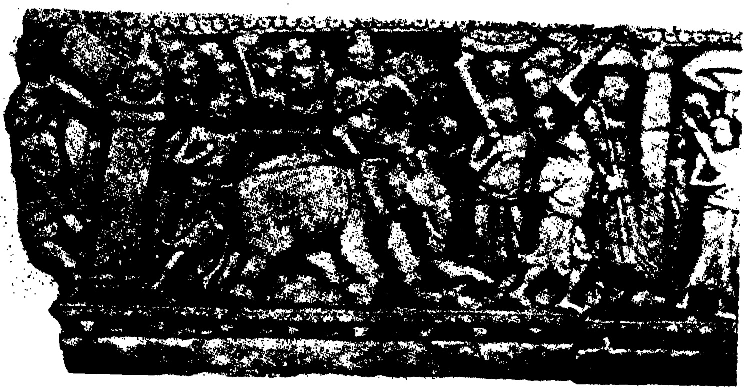


নর ও নারী নাগরাজ

তাঁহারাই জানেন আমাদের দেশের প্রাচীন শিল্পীরা কঠিন পাথরের গায়ের উপর কি করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের বিচিত্র কথা ও কাহিনীকে রূপদান করিয়াছেন। কত পৌরাণিক কাহিনী, জাতকের কথা, বুদ্ধদেবের জন্মবৃত্তান্ত তাঁহারা অমর অক্ষরে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। ভক্তদল যখন স্তূপ অথবা চৈত্য বা অন্য কোনো পবিত্র ধর্ম্মস্থান দেখিতে বা প্রদক্ষিণ করিতে

আসেন, তখন এই প্রস্তরচিত্রগুলি যেন এক একটি 'জীবন্ত ধর্ম্মকথা তাঁহাদের চোখের সম্মুখে মেলিয়া ধরে; এবং তাহার ফলে তাঁহারা ধর্ম্মজীবনে যে আনন্দ ও প্রেরণা লাভ করেন, কোনো উপদেশ বা উপাখ্যান শুধু মাত্র বর্ণনা করিয়া তাহার উদ্রেক করা যায় না। গোলী স্তূপের প্রাচীর-বেষ্টনীর প্রস্তরচিত্রে শিল্পীরা প্রাচীন শিল্পের এই প্রথাই অবলম্বন করিয়াছেন। পশ্চিম দিকের বেষ্টনীর সুদীর্ঘ প্রস্তরখণ্ডটির দুই প্রান্তে দুইটি পুরুষাকৃতি নাগরাজ রাজলীলা ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান, তাহাদের মাথার উপরে সাতটি ফণা বিস্তার করিয়া আছে একটি নাগ। নাগরাজের মূর্ত্তি দুইটি অবিকল একই প্রকার; কেবল বাম দিকের মূর্ত্তিটি একটু অসম্পূর্ণ। সময়ের অভাবে শিল্পী বোধ হয় সমস্ত খুঁটিনাটিগুলি ফুটাইয়া তুলিবার অবসর পান নাই। নাগরাজ একটি পা নাগের কুণ্ডলীর উপর এবং একটি হাত নাগদেহের উপর স্থাপন করিয়া, আর একটি হাত কটিদেশে ভর দিয়া গ্রীবা হেলাইয়া যেন একটু দৃপ্ত অথচ অলস ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান। বৌদ্ধ ধর্ম্মপীঠের ইহারা দ্বারপাল। বস্ত্র ও অলঙ্কারের প্রাচুর্য্য কিছুই তাহার নাই; কটিদেশে একটি বস্ত্রখণ্ড মাত্র যতটা সম্ভব স্বল্পবিস্তৃতভাবে জড়ানো, তাহার দুইটি প্রান্ত কটিদেশের এক প্রান্তে এবং আর এক প্রান্ত দুইটি পায়ের মাঝখান দিয়া কিছু দূর পর্য্যন্ত ঝুলিয়া

পড়িয়াছে। মাথার মস্তকাবরণের রূপ ও আকৃতি সমসাময়িক যুগের রাজরাজড়া ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মস্তকাবরণের মত। বরহুত, বুদ্ধগয়া, উদয়গিরি, অমরাবতী, সাঁচী প্রভৃতি স্থানের প্রস্তরচিত্রে ঠিক এই ধরণের বস্ত্রসজ্জা ও মস্তকাবরণ দেখা যায়। কিন্তু কি ইহাদের শিল্পরীতিতে, কি ইহাদের গড়নে ও মণ্ডনে, কি ইহাদের বস্ত্র ও অলঙ্কার সজ্জায়, মুখ ও দেহাকৃতিতে এই নাগরাজ দুইটির অপূর্ব্ব সাদৃশ্য রহিয়াছে অমরাবতীর প্রাচীরবেষ্টনীর নাগরাজ-মূর্ত্তিগুলির সহিত। ইহাদের মধ্যে পার্থক্য কোথাও একেবারেই নাই।



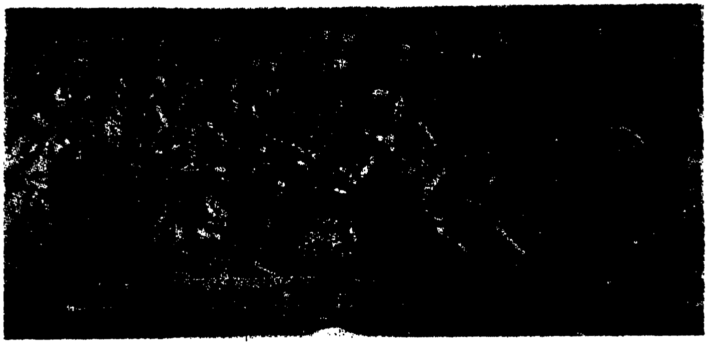
বেসসন্তর জাতক
রাজকুমার দান-গৃহে যাইতেছেন

যাহা হউক, পশ্চিম দিকের প্রাচীরবেষ্টনীর দুই প্রান্তের এই নাগরাজ-মূর্ত্তি দুইটি বাদ দিলে সমগ্র প্রস্তরখণ্ডটিতে তিনটি সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধকথার চিত্র আছে। একটি চিত্র হইতে আর একটি চিত্রকে অতি সুকৌশলে পৃথক করা হইয়াছে; শিল্পী এই উদ্দেশ্যে এক-একটি সম্পূর্ণ চিত্রের মাঝখানে একটি পুরুষ ও একটি নারীকে প্রেমলীলারত অবস্থায় চিত্রিত করিয়াছেন। কেহবা আবেশে কাহারও দেহ স্পর্শ করিতেছে, কেহবা কাহারও প্রেম-নিবেদনে ছলনাময় বিস্ময় প্রকাশ করিতেছে। এক দৃশ্য হইতে অন্য দৃশ্য, এক চিত্র হইতে অন্য চিত্র পৃথক করিবার জন্য অমরাবতীতেও এই কৌশল অবলম্বিত হইয়াছে এবং উভয় ক্ষেত্রেই শিল্পরীতি, স্বল্প বস্ত্রসজ্জা, দাঁড়াইবার লীলায়িত ভঙ্গী, নারী-নিতম্বের মেখলালঙ্কার, মস্তকাবরণ ইত্যাদি সমস্তই একই প্রকার। এই প্রস্তরখণ্ডটিতে যে তিনটি বৌদ্ধকথার চিত্র উৎকীর্ণ আছে, তাহার প্রথমটি ছদ্দন্ত জাতকের গল্প, দ্বিতীয়টি যশোধরার নিকট বুদ্ধদেবের আগমনের কাহিনী, তৃতীয়টি নলগিরি হস্তীদমনের দৃশ্য।

ছদ্দন্ত জাতকের গল্পটি একটু বলা প্রয়োজন। পূর্ব্বজন্মে একবার বোধিসত্ত্ব এক রাজহস্তী রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তাঁহার ছয়টি বড় বড় দাঁত ছিল, সেইজন্য তাঁহাকে বলা হইত ছদ্দন্ত (সং. ষড়দন্ত)। তাঁহার দুই পত্নীর একজন তাঁহার প্রতি একটু ঈর্ষ্যাপরায়ণ ছিলেন। মৃত্যুর পর তিনি নবজন্ম গ্রহণ করিয়া বারাণসীর রাজার পত্নীত্ব পদে বৃত হন এবং তখন তিনি পূর্ব্বজন্মের ঈর্ষ্যার চরিতার্থতা সাধন করিতে ইচ্ছুক হইয়া একবার অসুস্থতার ভাণ করেন। সেই ছদ্দন্ত হাতীর দাঁতগুলি না পাইলে যে তাঁহার অসুখ সারিবে না রাজাকে তাহাও জ্ঞাপন করেন। তৎক্ষণাৎ সুদক্ষ শিকারী ছুটিল বনে ছদ্দন্ত হাতী হত্যা করিয়া দাঁত আনিতে। শিকারী এক গর্ত্ত খুঁড়িয়া হাতীকে সুকৌশলে তাহার মধ্যে আনিয়া ফেলিল এবং তাহাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইল। হস্তীরাজ তখন তাহাকে এই হত্যার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। শিকারী সমস্তই খুলিয়া বলিল; হস্তীরাজ তখন নিজেই নিজের দাঁতগুলি কাটিয়া দিতে শিকারীকে সাহায্য করিল এবং অব্যবহিত পরেই পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল। শিকারী দাঁত লইয়া রাণীর কাছে গেল; কিন্তু দাঁত গ্রহণ করিবার আগেই রাণী শুনিলেন হস্তীরাজ মারা গিয়াছে, তখন তাঁহার মন দুঃখে ও অনুশোচনায় ভরিয়া গেল এবং তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু হইল।

দুইটি মাত্র দৃশ্যে এই গল্পটি প্রস্তরখণ্ডের উপর উৎকীর্ণ হইয়াছে। প্রথম দৃশ্যে দেখিতেছি, হস্তীযূথের লীলা, তাহাদের মধ্যে ছদ্দন্ত হস্তীরাজকেও দেখা যাইতেছে। তাঁহারই পার্শ্বে দেখি শিকারী সুকৌশলে হস্তীরাজকে এক গর্ত্তের মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছে, এবং করাত দিয়া একটি দাঁত কাটিতেছে,

হস্তীরাজ নিজের শুঁড় দিয়া তাহাকে সাহায্যও করিতেছে। ইহারই ঠিক উপরে দেখি শিকারী একটি লাঠির দুই মাথায় দুইটি দাঁত বাঁধিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া চলিয়াছে রাজপ্রাসাদের দিকে। দ্বিতীয় দৃশ্যে রাজপ্রাসাদের ভিতর সিংহাসনে বসিয়া আছেন রাজা, সম্মুখে শিকারী একটি পাত্রের মধ্যে দাঁত দুইটি রাখিয়া জানু পাতিয়া উপবিষ্ট, আর রাজার কোলে এলাইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছেন রাণী; পার্শ্বে পরিচারিকাবৃন্দ ক্লিষ্ট বিষণ্ণ মুখে দণ্ডায়মানা।



বেস্‌সন্তর জাতক
হস্তী দানের দৃশ্য

যশোধারার নিকট বুদ্ধদেবের আগমন — এই চিত্রে দেখিতেছি, স্মিত শান্ত বদন বুদ্ধদেব গায়ে উত্তরবাস জড়াইয়া অভয়-মুদ্রায় দক্ষিণ বাহু উত্তোলনপূর্ব্বক বাম বাহুতে উত্তরবাস ধারণ করিয়া ধীরপদে নারীপরিবৃত একটি গৃহের মধ্যে অগ্রসর হইতেছেন। তাঁহার মাথার চারিদিকে জ্যোতির্ম্মণ্ডল, সম্মুখে ভক্তিপ্রণতা কয়েকটি নারী। একটি বালক প্রায় বুদ্ধদেবের উত্তরবাস ধরিয়া তাঁহাকে



১
বেস্‌সন্তর জাতক
১। রাণীর গৃহে প্রত্যাগমন
২। পৌত্রদ্বয় সহ উপবিষ্ট পিতামহ
৩। বীণাহস্তে দণ্ডায়মানা যক্ষী

যেন আকুল আগ্রহে আহ্বান করিতেছে। এই বালক বুদ্ধদেবের পুত্র রাহুল। আর একটু অগ্রসর হইয়া দেখি একটি নারী ব্যস্ত হইয়া আসন ছাড়িয়া উঠিতেছেন, কিন্তু তাঁহারই পার্শ্বে আর একজন যেন অত্যন্ত গর্ব্বিত ভাবে আসনের উপর বসিয়াই আছেন, উঠিয়া সম্মান প্রদর্শনের ইচ্ছাও যেন তাঁহার নাই। ইনি প্রজাপতি গোতমী, তিনি তখনও বুদ্ধদেবের সিদ্ধিলাভ ও মহত্বের কথা জানিতেন না; তাই অভিমানভরে তিনি বলিয়াছিলেন, বুদ্ধদেব আগে আসিয়া তাঁহাকেই অভিনন্দন করিবেন। দৃশ্যের অপর প্রান্তে একটি স্বল্পালঙ্কারা, স্বল্পবসনা নারী দাঁড়াইয়া একটি শূন্য আসনের দিকে ইঙ্গিত করিতেছেন; সম্মুখে একটি বালক আসিয়া কি যেন তাঁহাকে বলিতেছে। বালকটি পুত্র রাহুল, সে আসিয়া মাতা যশোধারাকে পিতার আগমনবার্ত্তা জানাইতেছে; আর যশোধারা বুদ্ধদেবকে শূন্য আসনে আহ্বান করিতেছেন। সমগ্র দৃশ্যটি অতি সুন্দর ও সুবিস্তৃত ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং প্রত্যেকের ভাব ও ভঙ্গী অপূর্ব্ব লীলায়িত রূপ লাভ করিয়াছে। নারীদেহের রূপ ও বিভ্রম, তাহাদের মুখ ও দেহাকৃতি, তাহাদের ভাব ও ভঙ্গী, তাহাদের বস্ত্র ও অলঙ্কার সজ্জায় এমন সুন্দর ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম্মের সেই সুকঠোর সন্ন্যাসের আভাসও ইহাতে আর নাই। সমগ্র দৃশ্যটির জীবনলীলা এবং গতিচাঞ্চল্যও ইহাতে অপূর্ব্ব রূপলাভ করিয়াছে। এই দৃশ্যটি অমরাবতীর প্রাচীরবেষ্টনীতেও উৎকীর্ণ

হইয়াছে এবং শিল্পরীতি ও ঘটনাবিন্যাস দুই ক্ষেত্রেই একরূপ।

নলগিরি হস্তীদমন—একবার দেবদত্ত অসূয়াপরবশ হইয়া বুদ্ধদেবের অনিষ্ট করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। সেই সময় একদিন



১ ২ ৩

বেস্‌সন্তর জাতক

১। রাজা ও রাণী পুত্র দুটিকে বহন করিতেছেন
২। বেস্‌সন্তর পুত্র দুটিকে দান করিতেছেন
৩। বেস্‌সন্তর দানের পর ধ্যানাসনে বসিয়াছেন

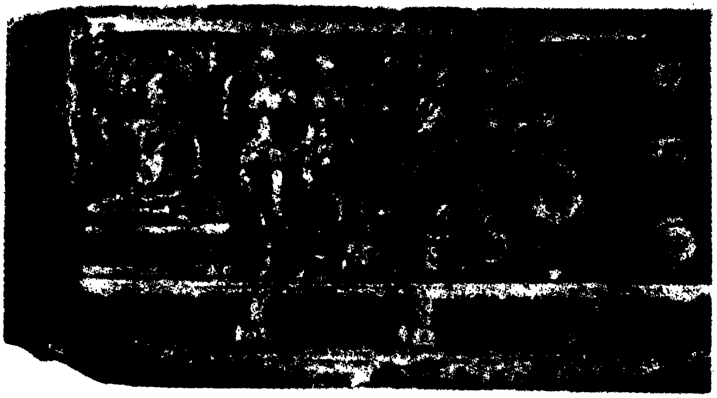
বুদ্ধদেব যখন রাজগৃহে এক শ্রেষ্ঠীর বাড়িতে সশিষ্য নিমন্ত্রণ-রক্ষায় যাইতেছিলেন তখন দেবদত্ত এক মত্ত হস্তীকে পথের উপর ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার ইচ্ছাপূরণের চেষ্টা করেন। আমাদের চিত্রের এক অংশে দেখিতেছি সেই মত্ত হস্তী পথে যাহাকে পাইতেছে তাহাকেই শুঁড়ে জড়াইয়া আছড়াইয়া ফেলিতেছে, পায়ের নীচে পিষিয়া মারিতেছে; মহা বিপদ, সকলে ভয়ে ত্রাসে অস্থির! চিত্রের অন্য অংশে দেখিতেছি শান্ত সৌম্যমূর্ত্তি বুদ্ধদেব সশিষ্য সেই পথে অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহার মুখে ও ভাবে ভয় বা ত্রাসের চিহ্নমাত্র নাই। অপর দিকে মত্ত হস্তী অগ্রসর হইতে হইতে সম্মুখে বুদ্ধদেবকে দেখিয়া হঠাৎ সংযত হইয়া গেল এবং মস্তক ভূমিতে লুটাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া ভীতত্রস্ত জনতা সানন্দে অধীর হইয়া হাত তুলিয়া বুদ্ধদেবকে অভিনন্দিত করিল। এই কাহিনীটিও অবিকল এই ভাবেই অমরাবতীর প্রাচীর-বেষ্টনীতেও উৎকীর্ণ হইয়াছে এবং দুই ক্ষেত্রেই প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি, প্রত্যেকটি ভাব ও ভঙ্গী অপূর্ব্ব লীলায় ব্যক্ত হইয়াছে।

পূর্ব্বদিকের প্রাচীর-বেষ্টনীর প্রস্তরখণ্ডটিও অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ (৭'৬" × ১১½"); কিন্তু তাহার একটি প্রান্ত ভাঙিয়া গিয়াছে। সমগ্র প্রস্তরখণ্ডটিতে বেস্‌সন্তর জাতকের গল্পটি বিস্তারিত ভাবে উৎকীর্ণ। প্রাচীন বৌদ্ধশিল্পের যতটা পরিচয় আমাদের জানা আছে তাহার মধ্যে কোথাও এতটা সবিস্তারে এই কাহিনীটি বিবৃত হয় নাই। তাহা ছাড়া সমস্ত গল্পটির ধারা একটির পর একটি দৃশ্যে এমন সজীবভাবে অক্ষুণ্ণ আছে যে, শিল্পীর কৃতিত্বে চমৎকৃত না হইয়া উপায় নাই। জীবনের একটা সচল গতিভঙ্গী যেন সমস্ত ঘটনা-স্রোতের ভিতর দিয়া আপনি বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। বেস্‌সন্তর জাতকের গল্পটিও খুব সুন্দর।

বেসসন্তর জাতক—যে জন্মে শুদ্ধোদন-পুত্র শাক্যসিংহ বুদ্ধত্ব লাভ করিলেন, তাহার ঠিক অব্যবহিত পূর্ব্বজন্মে বুদ্ধ কোন রাজগৃহে বেস্‌সন্তর নাম লইয়া রাজপুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করেন; বৈশ্য পল্লীর মধ্যে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার নাম হইয়াছিল বেসসন্তর। বেস্‌সন্তর খুব দাতা ছিলেন! তাঁহার পিতার একটি হাতী ছিল, হাতীটি যেখানেই যাইত সেখানেই বৃষ্টিপাত হইত। সেইজন্য রাজ্যের কৃষকেরা হাতীটিকে খুব মূল্যবান মনে করিত। একদিন কলিঙ্গদেশাগত কয়েকটি ব্রাহ্মণ রাজপুত্র বেস্‌সন্তরের নিকট এই হাতীটি ভিক্ষা চাহিলেন, আর রাজপুত্র বিনা দ্বিধায় তাহা দান করিয়া দিলেন। রাজ্যের কৃষকেরা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া রাজার কাছে নালিস করিল, ক্রুদ্ধ রাজা রাজপুত্রকে পত্নী ও দুই পুত্রসহ বনবাসে পাঠাইয়া দিলেন। পথেই ব্রাহ্মণেরা প্রথম তাঁহার রথের ঘোড়াগুলি ভিক্ষা চাহিয়া লইল; তাহার পর পুত্র দুইটিকেও লইয়া গেল, এবং সর্ব্বশেষে দেবরাজ ইন্দ্র আসিয়া তাঁহার পত্নীকেও ভিক্ষা চাহিয়া লইলেন। তাঁহার এই অপূর্ব্ব দানশীলতায় দেবরাজ প্রীত হইয়া তাঁহাকে তাঁহার পত্নী ফিরাইয়া দিলেন। এদিকে ব্রাহ্মণেরা যখন তাঁহার পুত্র দুইটিকে লইয়া যাইতেছিল তখন তাহাদের

পিতামহ তাহাদের চিনিতে পারিয়া মুক্তি দান করিলেন এবং তাহাদের সাহায্যে পুত্র ও পুত্রবধূকে নির্ব্বাসন হইতে ফিরাইয়া আনিলেন।

প্রথম দৃশ্যে দেখিতেছি রাজকুমার বেস্‌সন্তর তাঁহার পরিচারকদের সঙ্গে লইয়া দান-গৃহের দিকে যাইতেছেন; তাহাদের কাহারও হাতে তরবারি, কাহারও হাতে জলের ঝারি, কাহারও হাতে জলপাত্র। দান সম্পূর্ণ করিতে জল ও জলপাত্রের প্রয়োজন হয়। সঙ্গে সেই হাতীটিও রহিয়াছে। সকলের অগ্রগতির ভঙ্গীটি এই দৃশ্যে অতি সুন্দর ফুটিয়াছে। দ্বিতীয় দৃশ্যে পরিচারক-পরিবৃত রাজকুমার দণ্ডায়মান হইয়া হাতীর শুঁড়টি ব্রাহ্মণের হাতে তুলিয়া দিয়া হাতীটি দান করিয়া দিয়াছেন এবং দান সম্পূর্ণ করিবার জন্য জলের ঝারি হইতে ব্রাহ্মণের হাতে জল ঢালিয়া দিতেছেন। অন্যান্য ব্রাহ্মণ তাঁহার পশ্চাতে দণ্ডায়মান। তৃতীয় দৃশ্যে রাজকুমার পত্নী ও দুই পুত্রসহ দুইটি বলদে-টানা একটি গাড়ীতে চড়িয়া বনভূমির ভিতর দিয়া বনবাসে যাইতেছেন। বন বুঝাইবার জন্য শিল্পী সুকৌশলে সিংহ, ব্যাঘ্র ইত্যাদি কয়েকটি বন্যজন্তু নিম্নপীঠে উৎকীর্ণ করিয়াছেন। রাজকুমার নিজেই গাড়ীর চালক। চতুর্থ দৃশ্যে দেখি ব্রাহ্মণেরা বলদ দুইটি ভিক্ষা চাহিয়া লইয়া গিয়াছে। কাজেই বাধ্য হইয়া পুত্র দুইটিকে গাড়ীর ভিতর বসাইয়া রাজকুমার ও তাঁহার পত্নী নিজেরাই উহা টানিয়া লইয়া চলিয়াছেন। পঞ্চম দৃশ্যে গাড়ীটিও ব্রাহ্মণেরা চাহিয়া লইয়া গিয়াছে; রাজকুমার একটি ছেলেকে কাঁধে এব সমদুঃখভাগিনী স্ত্রী আর একটি ছেলেকে কোলে লইয়া প অতিক্রম করিতেছেন। ষষ্ঠ দৃশ্যে বনবাসের সেই কুটীর ঠিক এই রকম কুটীর অমরাবতীর প্রাচীরবেষ্টনীতে উৎকী



মারের কন্যাগণ কর্ত্তৃক ধ্যানাসনে উপবিষ্ট গৌতমকে প্রলুব্ধ করিবার চেষ্টা

বেস্‌সন্তর জাতকের কাহিনীটিতেও দেখা যায়। কৃষ্ণা প্রদেশে হয়ত এই ধরণের কুটীরনির্ম্মাণপদ্ধতি সেই যুগে প্রচলি ছিল। এই দৃশ্যে দেখিতেছি ক্ষীণজীবী কুব্জদেহ এ ব্রাহ্মণ রাজকুমারের পুত্র দুইটিকেও চাহিয়া লই যাইতেছে এবং রাজকুমার অম্লানবদনে তাহাদের দান করিয়া দিতেছেন। রা তখন কুটীরে ছিলেন না, বনের ভিত গিয়াছিলেন স্বামী ও পুত্রদ্বয়ের জ ফলমূল সংগ্রহ করিয়া আনিতে। সপ্ত দৃশ্যে দেখিতেছি, মাতার অনুপস্থিতিতে পুত্র দুইটিকে দান করিয়া দিয়া বেস্‌সন্তর ধ্যানাসনে বসিয়াছেন; এদিকে শ্রান্তক্লান্ত দেহে ফলমূল ভার বহন করিয় রাণী ফিরিয়া আসিয়াছেন। হায়, তখনও তিনি জানেন না তাঁহার পুত্র দুইটিকেও ব্রাহ্মণেরা লইয়া গিয়াছে। ক্লান্তি ও অবসাদের ভাব রাণীর মুখে ও সর্ব্বদেহে সুপরিস্ফুট। এই দৃশ্যের পরই দেখিতেছি গল্পটিকে খুব সংক্ষিপ্ত করিয়া ফেলা হইয়াছে দেবরাজ ইন্দ্র আসিয়া যে রাণীকেও উপহার চাহিয়া লইয় গেলেন সে কাহিনীটির উল্লেখ নাই; পরবর্ত্তী কাহিনীর খুব সংক্ষিপ্ত চিত্রই দেখিতে পাই। তাই, অষ্টম অথব



সুজাতা কর্ত্তৃক বোধিসত্ত্বকে খাদ্য ও পানীয় দান

শেষ দৃশ্যে দেখিতেছি, পিতামহ রাজসিংহাসনোপরি বসিয়া দুই পৌত্রকে দুই পার্শ্বে লইয়া সানন্দচিত্তে উপবিষ্ট।

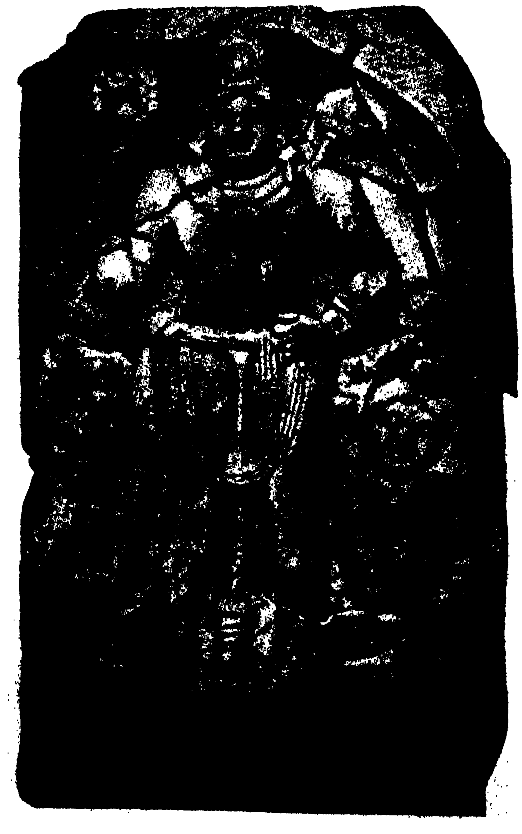
প্রস্তরখণ্ডটির শেষপ্রান্তে উন্নত-বক্ষা নিতম্বভারগ্রস্তা



প্রচারনিরত ভগবান বুদ্ধদেব

এক যক্ষী পদাঘাতে অশোককুঞ্জ মুঞ্জরিত করিয়া বিলাস-বিভ্রম ভঙ্গীতে বীণাহস্তে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার দেহের উদ্দাম যৌবন-বিলাসের লীলাকে শিল্পী এক উচ্ছলিত প্রাচুর্য্যের মধ্যে মুক্তি দান করিয়াছেন, কোথাও কোনো বন্ধন আর রাখেন নাই। প্রাচীন বৌদ্ধশাস্ত্রে ও ধর্ম্মগ্রন্থে বৌদ্ধধর্ম্মের যে রূপ আমরা দেখি ও অনুভব করি, এই যক্ষী মূর্ত্তিটি এবং অমরাবতী ও গোলীর প্রস্তর-চিত্রের প্রত্যেকটি নারী-মূর্ত্তি যেন তাহার জীবন্ত প্রতিবাদ। শিল্পরসিক কুমারস্বামী এই জাতীয় মূর্ত্তিগুলি দেখিয়া বিস্ময় মানিয়াছেন, বলিয়াছেন, "In their vivid pagan utterance of the love of life how little can we call them early Buddhist art!"*

স্তূপের উত্তর দিকে প্রাপ্ত বেষ্টনীর প্রস্তরখণ্ডটির দুইটি প্রান্তই ভাঙিয়া গিয়াছে; যতটুকু বর্ত্তমান আছে তাহার আয়তন খুব বড় নয় (৪'১"×১')। এই প্রস্তরখণ্ডটিতে দুইটি অতি জনপ্রিয় ও সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধকথা উৎকীর্ণ আছে। এই কথা দুইটি বুদ্ধদেবের জীবনকথা হইতে গৃহীত। প্রথমটি, মারধর্ষণ কাহিনী; দ্বিতীয়টি, সুজাতা কর্ত্তৃক বুদ্ধদেবকে খাদ্য ও পানীয় দান। বোধিবৃক্ষের নীচে গৌতম ধ্যানাসনে বসিয়া আছেন; মার সঙ্কল্প করিল—বুদ্ধদেবের ধ্যান ভঙ্গ করিতে হইবে, সংসারের প্রলোভনের পথে তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে মার তাহার কন্যাদের অপূর্ব্ব সাজে সাজাইয়া গৌতমকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য পাঠাইয়া দিল। তাহাতেও যখন কিছু হইল না, তখন মার তাহার কুৎসিতাকৃতি সৈন্যদের পাঠাইয়া দিল তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণের জন্য। তাহার



রাজকুমার সিদ্ধার্থ?

পর মার নিজেও আসিল হাতীতে চড়িয়া। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, সকলেই পরাজিত হইয়া ফিরিয়া গেল। চিত্রে

* Buddha and the Gospel of Buddhism, p. 325.

দেখিতেছি, গৌতম বোধিদ্রুমের নীচে ধ্যানাসনে বসিয়া আছেন; মারের কন্যারা তাঁহার দুইধারে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছে। গৌতম ঘৃণায় ও বিরাগে ডানহাত তুলিয়া ইহাদের প্রতি অবজ্ঞা জানাইতেছেন। প্রস্তর-চিত্রটির দক্ষিণে দেখিতেছি, মার হাতীতে চড়িয়া অপর দিকে মুখ করিয়া হাতজোড় করিয়া বসিয়া আছে। মনে হইতেছে, মার হার মানিয়া ফিরিয়া যাইতেছে এবং শ্রদ্ধায় বুদ্ধদেবকে প্রণতি জানাইতেছে। সঙ্গে তাঁহার পিছনে উপবিষ্ট মাহুতটিও হাতজোড় করিয়া প্রণাম করিতেছে।

সুজাতা কর্ত্তৃক বুদ্ধদেবকে খাদ্য ও পানীয় দান—এই উৎকীর্ণ চিত্রটির একটি প্রান্ত ভাঙিয়া গিয়াছে; তাহা ছাড়া প্রস্তরখণ্ডটিও জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। বুদ্ধদেব একটি প্রস্তরাসনের উপর বসিয়া আছেন, এবং উরুবেল গ্রামের শ্রমিক কন্যা সুজাতা আভূমিনত হইয়া বুদ্ধদেবকে খাদ্য নিবেদন করিতেছে এবং তাহার আর দুইটি সঙ্গিনী নারী অর্ঘ্য ও পানীয় দিতেছে। এই দুইজন ছাড়া আরও তিনজন সঙ্গিনী সুজাতার সঙ্গে আসিয়াছে, দেখিতেছি; যদিও এতগুলি সঙ্গিনীর উপস্থিতির কথা কোনো বৌদ্ধগ্রন্থেই দেখা যায় না।

এই চারি দিকের বেষ্টনীর চারিটি সুবৃহৎ প্রস্তরখণ্ড ছাড়া আরও কয়েকটি চিত্রোৎকীর্ণ প্রস্তরখণ্ড ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। দুইটি প্রস্তরখণ্ডে দুইটি জাতক কথাও উৎকীর্ণ আছে—একটি শশ জাতক, আর একটি মাতিপোসক জাতক। একটি প্রস্তরখণ্ডে সারনাথ মৃগদাবে বুদ্ধদেবের প্রথম ধর্ম্মপ্রচারের কাহিনী উৎকীর্ণ আছে। বুদ্ধদেবের আসনটি শূন্য, শুধু তাহার চিহ্ন পড়িয়া আছে। আসনের সম্মুখে প্রস্তরখণ্ডে দুইটি মৃগ উৎকীর্ণ। অন্য একটি প্রস্তরখণ্ডে একটি চৈত্যমন্দিরের চিত্র অঙ্কিত আছে; চৈত্যগৃহের রূপ সুপরিচিত, এবং অমরাবতীর প্রাচীরবেষ্টনীর গাত্রেও ঠিক এইরূপ চৈত্যগৃহ উৎকীর্ণ আছে। এই চৈত্যগাত্রে একটি শিলালিপি আছে। তাহার পাঠ এইরূপ—সি ক ম ল ত। অক্ষরগুলি নাগার্জ্জুনী-কোণ্ডায় প্রাপ্ত ইক্ষ্বাকু-বংশীয় শিলালিপির অক্ষরের অনুরূপ এবং অনুমান হয় খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকে এই লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। আর একটি ভগ্ন প্রস্তরখণ্ডে একটি রাজকুমার অথবা কোন রাজন্যের প্রতিমূর্ত্তি খোদিত আছে। মূর্ত্তিটি বোধ হয় রাজকুমার সিদ্ধার্থের। অমরাবতীর প্রাচীরবেষ্টনীর প্রস্তরগাত্রে উৎকীর্ণ যে বিস্তৃত বক্ষ, সুপুষ্ট দৃঢ়বপু হার-কুণ্ডলবলয়-বাজু-অলঙ্কৃত সুমণ্ডিত নরদেহের পরিচয় দেখিতে পাই, এই মূর্ত্তিটিও ঠিক তাহারই অনুরূপ। তাহার মাথার উপর রাজছত্র, সমসাময়িক যুগের সুপরিচিত মস্তকাবরণ ও বস্ত্রসজ্জা, ডানহাতে এক গুচ্ছ ফুল, বামহাত কটিতটে নিবদ্ধ। অন্য আর একটি প্রস্তরখণ্ডে বুদ্ধদেবের ধর্ম্মপ্রচারের দৃশ্য উৎকীর্ণ আছে। অমরাবতীর প্রস্তরচিত্রে এই দৃশ্যই বহুবার উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায় এবং উভয় ক্ষেত্রেই নর-দেহের রূপ, বস্ত্রসজ্জা ও দেহভঙ্গী এবং শিল্পরীতি ও বিন্যাস প্রায় একই প্রকার। এই প্রস্তরখণ্ডটি বৃহদায়তন (৪´১০´´×৩´১´´)। বুদ্ধদেব পদ্মাসনে উপবিষ্ট, তাঁহার বামহাত কোলের উপর স্থাপিত, ডানহাত অভয়-মুদ্রায়। তাঁহার দুই পার্শ্বে দুইজন দাঁড়াইয়া মাথায় হয়ত চামর দুলাইতেছিল; দুইটি মূর্ত্তিই এখন ভাঙিয়া গিয়াছে। সিংহাসনের সম্মুখে নীচে তিনটি শিষ্য বসিয়া করজোড়ে পূজারত অবস্থায় সেই উপদেশ শুনিতেছেন। তাঁহাদের মস্তকাভরণ, বস্ত্র ও অলঙ্কার সজ্জা সেই কালের রাজন্য ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদেরই অনুরূপ এবং অমরাবতীর প্রস্তরচিত্রেও ঠিক এই ধরণের মস্তকাভরণ, বস্ত্র ও অলঙ্কার সজ্জা দেখিতে পাওয়া যায়।

গোলী গ্রামের স্তূপটি অপেক্ষাকৃত স্বল্পায়তন। ভাস্কর্য্যের নমুনা দেখিয়া মনে হয় একদল শিল্পী একই স্থানে বসিয়া কয়েক মাসের মধ্যেই স্তূপ নির্ম্মাণ ও বেষ্টনীর তক্ষণকার্য্য সমাপন করিয়াছিল। এই দিক হইতে দেখিলে অমরাবতীর স্তূপ ও তাহার ভাস্কর্য্য-নিদর্শনের প্রাচুর্য্যের সঙ্গে নবাবিষ্কৃত গোলী-স্তূপের কোন তুলনাই হইতে পারে না। অমরাবতীর স্তূপটি সুবৃহৎ এবং ইহার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে যে প্রচুর ও বিচিত্র ভাস্কর্য্য-নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া মনে হয় বহু দিন বহু বৎসর ধরিয়া ইহার নির্ম্মাণকার্য্য চলিয়াছিল এবং ইহার প্রাচীরবেষ্টনী চিত্রিত করিবার জন্য বার-বার ভাস্কর-শিল্পী নিযুক্ত হইয়াছিল। সেইজন্যই অমরাবতীতে বরহুতের শুঙ্গ-যুগের ভাস্কর্য্যের সমসাময়িক শিল্পনিদর্শন

যেমন পূর্ণরূপে দেখা যায়, তেমনই খৃষ্টীয় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকের শিল্পনিদর্শনও প্রচুর। সেইজন্যই মনে হয়, প্রায় সুদীর্ঘ চারি শতাব্দী ধরিয়া অমরাবতীর স্তূপের বিচিত্র সজ্জা ও শোভন কার্য্য চলিয়াছিল। গোলীতে এত বিভিন্ন সময়ের ও এত বহুকাল-বিস্তৃত শিল্পনিদর্শন পাওয়া যায় না। এখানকার বেষ্টনীতে যে-কয়েকটি বৌদ্ধকথা উৎকীর্ণ আছে, তাহার প্রায় সবগুলিই অমরাবতীর প্রাচীরবেষ্টনীতেও দেখা যায়, এবং আগেই বলিয়াছি, দুই ক্ষেত্রেই ঘটনাবিন্যাসের রীতি প্রায় একই প্রকার। তাহা ছাড়া, শিল্পরীতি, নরদেহের আকৃতি ও রূপ, বস্ত্র ও অলঙ্কার সজ্জা, মুখাকৃতি ও দেহভঙ্গী, পাথরকে বিভিন্ন স্তরে কুঁদিয়া আলো ও ছায়ার লীলাবৈচিত্র্য দেখাইবার রীতি ইত্যাদি দিক হইতে একটু বিচার করিয়া দেখিলে সহজেই বুঝা যায় অমরাবতীর খৃষ্টীয় দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকের ভাস্কর্য্য-নিদর্শনের সঙ্গে গোলীর ভাস্কর্য্য-নিদর্শনের খুব একটা নিকট-সাদৃশ্য আছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাদৃশ্য এত প্রবল যে, চিহ্নিত না থাকিলে কোন্ নিদর্শনটি কোন্ স্থানের তাহা হয়ত নির্ণয় করাই কঠিন। বুদ্ধদেবের উত্তরবাস জড়াইবার ভঙ্গী, একচিত্র হইতে অন্য চিত্র পৃথক করিবার রীতি, প্রস্তরের পাদপীঠের নিম্নে উৎকীর্ণ সিংহমুখ ইত্যাদি আরও দুই-চারিটি খুঁটিনাটি তুলনা করিয়া দেখিলেই অমরাবতীর শেষযুগের শিল্প-নিদর্শনের সঙ্গে বর্ত্তমান শিল্প-নিদর্শনগুলির সাদৃশ্য খুব সহজেই ধরা পড়ে এবং গোলী-স্তূপের বেষ্টনী যে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের শেষভাগে অথবা তৃতীয় শতকে উৎকীর্ণ হইয়াছিল তাহাও অনুমান করা যায়। তাহা ছাড়া, একটি প্রস্তরখণ্ডে উৎকীর্ণ চৈত্যগাত্রে যে ব্রাহ্মী লিপিটি পাওয়া গিয়াছে, তাহার অক্ষর নাগার্জ্জুনকোণ্ডায় প্রাপ্ত ইক্ষাকু-বংশীয় লিপির অক্ষরেরই প্রায় অনুরূপ, এ-কথা আগেই বলিয়াছি; ইহা হইতেই অনুমান হয়, প্রায় এই সময়েই গোলী-স্তূপ নির্ম্মিত এবং তাহার ভাস্কর্য্য-নিদর্শনগুলি উৎকীর্ণ হইয়াছিল।

বোকা

শ্রীসীতা দেবী

রামনিধি ঘোষালকে ভগবান টাকাকড়ি দিয়াছিলেন বটে, তবে সৌভাগ্য দেন নাই। মৃত্যু যেন তাহাদের পরিবারে নিত্য আগন্তুক; এমন বছর যায় না, যখন একটি-না-একটি মানুষের ডাক পড়ে। রামনিধিকে জন্ম দিয়াই তাহার মা গেলেন, পিতা বিধবা ভগিনীর সাহায্যে কোনোগতিকে ছেলেকে মানুষ করিয়া তুলিতেছিলেন, তিনিও তিন দিনের জ্বরে বিদায় লইলেন, রামনিধি যখন মাত্র পাঁচ বছরের। তখন হইতে রামনিধির অভিভাবক হইলেন পিসী আর পিসীর সপত্নী-পুত্র যোগেশ চক্রবর্ত্তী।

যোগেশ চক্রবর্ত্তী এতদিন সৎমায়ের কোনো খোঁজখবর করেন নাই, কারণ অনাথা বিধবা মানুষ, তাহার খোঁজখবর লইতে গেলেই দু-পয়সা খরচ করিতে হয়, তাহার চেয়ে চুপচাপ থাকা ভাল। কিন্তু বিমাতা অমন একটি শাঁসাল ভাইপোর রক্ষণাবেক্ষণের ভার পাইয়াছেন শুনিয়া যোগেশ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, গ্রামের তল্পিতল্পা গুটাইয়া বিমাতার ঘরে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইলেন।

তবে যতটা সুবিধা করিবেন ভাবিয়া আসিয়াছিলেন, ঠিক ততটা হইল না। রামনিধির বুদ্ধিশুদ্ধি বিশেষ কিছু নাই, আছে পিসীর প্রতি অগাধ বিশ্বাস। পিসীর কথায় সে ওঠে-বসে। পিসীও সতীন-পোকে একটু ভালরকম চেনেন, কারণ রামনিধির তত্ত্বাবধান করিতে আসিবার আগে তিনি যোগেশের মাতৃভক্তির পরিচয় বিশেষ রকম পাইয়া আসিয়াছেন।

যাহা হউক, যোগেশ হাল ছাড়িল না। সৎমা কিছু চিরদিন বাঁচিয়া থাকিবে না, আর বোকা রামনিধিরও তিন-কুলে আপন বলিতে কেহ নাই। একদিন-না-একদিন সমুদ্রের

মেওয়া ফলিবেই ফলিবে। যোগেশের বিবাহ হইয়াছিল যথাকালেই, অর্থাৎ যথাকালের অনেক পূর্ব্বে, কিন্তু স্ত্রী একটু বেশী আদুরে মেয়ে, মা ছাড়িয়া বেশী দিন থাকিতে পারে না। নিজের ভিটায় থাকিতে যোগেশের তবু দুই-একবার বউ আনা ঘটিয়া উঠিয়াছিল, এখানে আসার পর তাহাও হয় না। সৎশাশুড়ীর ঘর, মা মেয়েকে পাঠাইতে চায় না, যোগেশেরও জেদ করিতে ভরসা হয় না, কি জানি যদিই অযত্ন-অনাদরে বউ চটিয়া যায়। এই একটি মানুষকে যোগেশ সত্যসত্যই ভয় করে।

বউ রাধারাণী নিজে না আসুক, উঠিতে বসিতে স্বামীকে ডাকিয়া পাঠায়। যোগেশ দু-বার যায় ত চার বার যায় না। টাকাকড়ি সব সময় হাতে থাকে না, আর বেশীদিন রামনিধিকে চোখের আড়াল করিতে ভরসা হয় না, কি জানি পিসী তাহাকে কোন কুবুদ্ধি দিয়া তালিম করিয়া রাখিবে। এখন তবু এতদূর হইয়াছে যে, পিসীকে লুকাইয়া টাকাটা-সিকাটা প্রায়ই যোগেশকে সে আনিয়া দেয়। তাহাকে লেখাপড়া শিখাইবার ছলে যোগেশ অনেকক্ষণ করিয়া নিজের কাছে আটকাইয়া রাখে। একটা হার্ম্মোনিয়ম কিনাইবার চেষ্টায় আছে, দোকানদার বলিয়াছে পূরাদামে যদি বিক্রী করিতে পারে তাহা হইলে লভ্যাংশের অর্দ্ধেক সে যোগেশকে ছাড়িয়া দিবে।

রামনিধিদের বাড়ি কলিকাতারই একটা শহরতলীতে। এখানে খোলার ঘর, টিনের ঘরই বেশী, পাকাবাড়ি দু-চারখানা মাত্র, তাও পুরাকালের। মাঠ, পুকুর, বন, বাদাড় এখনও এদিকে দুর্লভ নয়। এমন কি, সন্ধ্যাকালে শেয়ালের ডাকও শোনা যায়।

জমিজমাও দেশে যথেষ্ট আছে, তবে শরীর ভাল থাকে না বলিয়া গ্রামের বাড়িতে পিসী ভাইপো কেহই থাকিতে চায় না। জমি সব বিলি করা আছে, পিসীমা বছরে দুই বার গিয়া আদায়-উসুল বিধিমতে করিয়া আসেন। যোগেশের ইচ্ছা তাহাকে একাজে মাঝে মাঝে পাঠান হয়, তবে তাহার বিমাতা এখন পর্য্যন্ত তাহাকে আমল দেয় নাই।

দিন কাটিয়া চলিয়াছে, রামনিধিরও বয়স বাড়িয়া চলিয়াছে। পিসীমা একদিন কথায় কথায় বলিলেন, "বুড়ো মানুষ, কবে আছি কবে নেই। খোকার বিয়ে দিয়ে গেলে নিশ্চিন্ত হতে পারতাম।"

রামনিধি এবং যোগেশ তখন খাইতে বসিয়াছিল। রামনিধির কানে কথাটা ভালই লাগিল, তবে লজ্জায় মাথাটাও একটু নীচু হইয়া গেল। যোগেশ বলিল, "এরই মধ্যে বিয়ে কি মা? বয়স ত মাত্র ষোল না সতেরো, আর বিদ্যে যা সে কথা আর ব'লে কাজ নেই। ডুবুরি নামালেও পেটে ক অক্ষর মিলবে না।"

মা বলিলেন, "তা হোক বাছা, ওর অত বাছবিচার করলে চলবে না। বয়স কম, তা আর হয়েছে কি? তেমনি মানানসই ছোটখাট দেখে বউ আনব। আর বিদ্যে এর চেয়ে বেশী ওর কোনো দিনই হবে না; দরকারই বা কি? ওর ত রোজগার ক'রে খেতে হবে না? ওর পয়সাতেই কত লোকে ব'সে খাবে।"

যোগেশ রাগে আর কথা বলিল না, কারণ মায়ের কথাগুলির ভিতর তাহার সম্বন্ধে খোঁচা ছিল যথেষ্ট। কিন্তু তাহার ভাবনা ধরিয়া গেল। বিবাহ যদি রামনিধির হয়ই, তাহা হইলে এখন হইতে যোগেশের যথেষ্ট সাবধান হওয়া দরকার। পিসীমা যে-রকম যত্নে ভাইপোর বিষয়সম্পত্তি আগলাইতেছেন, বউ আসিয়া যে তাহার চেয়ে সে-বিষয়ে যত্ন কিছু কম করিবেন, তাহা বোধ হয় না। এক যদি দেখিয়া-শুনিয়া বোকাসোকা মেয়ে একটি আনিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে কাজের খানিক সুবিধা হয় বটে।

দিন দুই পরে একখানা চিঠি হাতে করিয়া যোগেশ ভাঁড়ার-ঘরের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। জিজ্ঞাসা করিল, "মা খুব ব্যস্ত না-কি? একটা কথা ছিল।"

মা কতকগুলা চাল-ডাল ঝাড়িয়া বাছিয়া হাঁড়িতে এবং টিনেতে ভর্ত্তি করিতেছিলেন। বলিলেন, "এইগুলো তুলে নিচ্ছি। তা কি কথা ওখানেই দাঁড়িয়ে বল না।"

যোগেশ বলিল, "সেদিন খোকার বিয়ের কথা বলছিলে না? একটি ভাল মেয়ে সন্ধানে আছে, বল ত কথা পাড়ি।"

তাহার বিমাতা বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করিলেন না। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাদের মেয়ে? কোথাকার?"

যোগেশ বলিল, "এই কাছাকাছির মধ্যেই আর কি; সম্পর্কে আমার শালী হয়, বউয়ের মামাতো-বোন। দেখতে-শুনতে বেশ ভাল, খোকার সঙ্গে ঠিক মানবে। চালাক-চতুর আছে, ঘর-সংসার বুঝেসুঝে চালিয়ে নিতে পারবে।"

মেয়ের বর্ণনা শুনিয়া রামনিধির পিসীমার উৎসাহ আরও যেন কমিয়া গেল। আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "মেয়ের বাপ কি করে? অবস্থা কেমন?"

যোগেশ একটু দমিয়া গিয়া বলিল, "বাপ আর আছে কোথায়? আমার শাশুড়ীর কাছেই আছে। তা ভাল অবস্থায় তোমার দরকার কি? শ্বশুরের টাকায় ত তোমার ছেলেকে খেতে হবে না?"

বিধবা বলিলেন, "তবু সকল দিক দেখে ত মানুষ কুটুম করে। খোকার আমার নিজের মা বাবা নেই, শ্বশুর-শাশুড়ীও না থাকলে চল্‌বে কেন? একটা কেউ মাথার উপর না থাকলে ও ছেলের চল্‌বে কি ক'রে? আমি কি আর চিরকালটা তার ভিটা আগলে বসে থাকব?"

যোগেশ মুখ বিকৃত করিয়া সরিয়া গেল। এই মেয়েটি হইলে সকল দিকেই ভাল হইত। বিনা পয়সায় শ্যালিকাটিকে পার করিয়া দেওয়াতে শ্বশুরবাড়িতে তাহার মানও বাড়িত, আর রামনিধির বউটিও তাহার খানিকটা হাতে-ধরা হইয়া থাকিত। বুদ্ধিশুদ্ধির বালাই সত্যিই তাহার বিশেষ নাই, বয়সও অত্যন্তই কম। কিন্তু মেয়েটি সম্পর্কে তাহার শালী শুনিয়াই বিমাতার যা মুখের ভাব দেখা গেল, তাহাতে বিশেষ আশা আছে বলিয়া আর যোগেশের বোধ হইল না।

কিন্তু সে হাল ছাড়িবার পাত্র নয়। নিত্য নূতন পাত্রীর সন্ধান আসিতে লাগিল, এবং মায়ের সঙ্গে রোজই এ বিষয়ে তাহার পরামর্শ চলিতে লাগিল। ঘোড়া ডিঙাইয়া ঘাস খাওয়ার চেষ্টাও যে দুই-একবার না হইল তাহা নহে। কিন্তু রামনিধিটা একেবারে আকাট মূর্খ, নিজের ভালমন্দ পর্য্যন্ত তাহাকে বোঝান শক্ত। আর লুকাইয়া কোন কাজ তাহাকে দিয়া করান ত একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার।

ভাইপোর বিছানা তুলিতে গিয়া একদিন পিসীমা দেখিলেন বালিশের তলায় তিন-চারখানি ফোটোগ্রাফ, সব কয়টিই কিশোরী বালিকার, সব কয়টিই মোটের উপর দেখিতে সুন্দর।

যোগেশ তখন পাড়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছে। পিসী রামনিধিকে ডাকিয়া চোখ পাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ-সব ছবি কার রে?"

রামনিধি অত্যন্ত নির্যাতিত ভাব দেখাইয়া বলিল, "তা আমি কি জানি বা রে!"

পিসীমা গলার স্বর আরও চড়াইয়া বলিলেন, "তুমি জান না কিছু, ন্যাকা ছেলে? তোমার বালিশের তলায় এল কি ক'রে?"

রামনিধি বলিল, "দাদা দিলে যে। বল্‌লে দেখ কোন্‌টা ভাল।"

পিসীমা হাসি চাপিয়া ছবিগুলি নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিতে লাগিলেন। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্‌টি সব চেয়ে ভাল ঠিক করতে পারলি?"

রামনিধি মাথা নাড়িয়া জানাইল যে, সে কিছু স্থির করে নাই, এবং অবসর বুঝিয়া ঘর হইতে পলায়ন করিল। পিসীমা ছবি কয়খানি উঠাইয়া লইয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন। যোগেশের আনা কোনো পাত্রী তাঁহার পছন্দ হইতেছিল না বটে, কিন্তু একলা বিধবা মানুষ তিনি, নিজেও বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। ইহার ভিতর খুঁজিয়া-পাতিয়া দেখিলে হয়। সকল দিক দিয়া ভাল একটাও না হওয়াই সম্ভব, যোগেশ কি আর সে দিক না দেখিয়া ছবি আনিয়াছে? তবে সুস্থ আর সদ্বংশের মেয়ে হইলেই এক রকম চলে, আর সব রামনিধির অদৃষ্ট। ছবিগুলির পিছনে ঠিকানা নাম সবই দেওয়া ছিল, পিসীমা স্থির করিলেন, তাহার এক সখীকে দিয়া খোঁজ করাইবেন।

সকাল-সকাল খাওয়াদাওয়া সারিয়া তিনি চাদরের তলায় ছবিগুলি লইয়া বাহির হইয়াও গেলেন। সখী চন্দ্রমুখী সেগুলি নাড়িয়া চাড়িয়াও দেখিলেন, তাহার পর বলিলেন, "ভাইপোর বিয়েই যদি দেবে, তা বন্ধুরই একটা উব্‌গার কর না ভাই, হেথা সেথা না খুঁজে?"

পিসীমা একটু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "তোমার ত দুই ছেলেই ছিল জানতাম, আবার মেয়েও হয়েছে না-কি?"

চন্দ্রমুখী তাঁহার গায়ে ঠেলা দিয়া বলিলেন, "আমার না হয় মেয়ে হয়নি, তাই ব'লে কি গুষ্টির মধ্যে কারও হয়নি? আমার বোনঝি সুশীকে মনে নেই?"

পিসীমা বলিলেন, "ও মা, সেই ফুটফুটে খুকিটা? মনে আবার নেই। তা তোমরা কি আর আমার খোকার

কাছে অমন সুন্দরী মেয়ে দিতে চাইবে? লেখাপড়া কিছুই করেনি যে?"

চন্দ্রমুখী বলিলেন, "তা না করুক, ঘরে খাবার পরবার ত অভাব নেই? এখন সবদিক খুঁজলে আর পাচ্ছি কোথা বল? অন্য পক্ষও যে তাহলে সব দিক খুঁজবে। বিধু হতভাগীর কপাল পুড়েছে গেল বছর, কোথা থেকে কি দেবে, বিধবা মানুষ।"

পিসীমা একটু ভাবিয়া বলিলেন, "আমার খোকার অদৃষ্টে মুরুব্বি লেখা নেই, যে-ক'টা সম্বন্ধ এল সব বাপখেকো মেয়ে। যাক্, এ তবু মন্দের ভাল, তোমার বোন্‌ঝি যখন। তোমরা ত আর তাদের ফেল্‌তে পারবে না? তা সে মেয়ে আছে কোথায়? অনেক বছর আগে দেখেছি, এখন একবার দেখতে ত হবে?"

চন্দ্রমুখী বলিলেন, "আছে কলকাতাতেই। তা দেরি ক'রে আর কাজ কি? রবিবারে ছেলেকে নিয়ে এস, এখানেই খাওয়া-দাওয়া ক'রো, ওদেরও আনিয়ে রাখব।"

পিসীমা বলিলেন, "সেই ভাল। বেলাবেলি আসব এখন।" বলিয়া তিনি বিদায় হইলেন।

রামনিধি এবার জলজ্যান্ত কনেরই সাক্ষাৎ লাভ করিল, এবার আর ছবি নয়। যোগেশের চেয়ে যোগেশের বিমাতার যে বুদ্ধি বেশী তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। সুশীলাকে দেখিয়া রামনিধি একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল। মেয়েটি সত্যই দেখিতে ভাল, বাঙালীর ঘরে এই রকম চেহারাই সুন্দর বলিয়া চলে। রং উজ্জ্বল, গোলগাল গড়ন, চোখদুটি বড় বড়। মুখে খুঁৎ নাই যে তাহা নয়, তবে এমন একটি শ্রী আছে যে অন্য সব ত্রুটি ঢাকাই পড়িয়া যায়।

পিসীমারও মেয়ে পছন্দ হইল। তবু বলিলেন, "একটু বেশী ডাগর হ'ল, আমার খোকার পাশে ঠিক মানানসই হবে না।"

চন্দ্রমুখী বলিলেন, "তা হোক গে ভাই, এটুকু খুঁতের জন্যে আর মেয়েটাকে পায়ে ঠেলো না। ভারি লক্ষ্মীমেয়ে, ঘরে নিলেই বুঝতে পারবে। একেবারে কচিখুকী ঘরে আনার ঠেলা আছে। নাকে কেঁদে হাড় জ্বালিয়ে তুলবে। সুশী আমার এরই মধ্যে ঘর-সংসারের সব কাজ করতে পারে, তোমার কত সাহায্যি হবে দেখো।"

বরের পিসী এবং কনের মাসী মিলিয়া সম্বন্ধ একেবারে পাকা করিয়া ফেলিলেন। বরের মুখের ভাব দেখিয়া মনে হইল না যে, তাহার ইহাতে বিন্দুমাত্রও আপত্তি আছে।

যোগেশ ত বিবাহের কথা শুনিয়া তেলেবেগুনে জ্বলিয়া উঠিল। রাগ সামলাইতে না পারিয়া মায়ের কাছে গিয়া তীক্ষ্ণস্বরে বলিল, "সেই বাপ-মরা মেয়েই আন্‌লে ত? তাহলে নীরুটা অপরাধ করেছিল কি? আমি কথাটা পেড়েছিলাম ব'লেই মেয়েটা কুপাত্রী হ'ল বুঝি?"

সতীন-পো'র এত ঝাঁঝের কারণ মার বুঝিতে দেরি হইল না। কড়া জবাব মুখে আসিয়াছিল, সেটা সামলাইয়া লইয়া বলিলেন, "তা যেটা বেশী পছন্দ হবে সেটা ত নেব? এ মেয়ে আমার নিজের জানা, ছেলেবেলা থেকে দেখছি।"

যোগেশের বলিবার ঢের কথা ছিল, কিন্তু এখন আর বলিয়া লাভ হইবে কি? বিবাহ ত স্থিরই হইয়া গিয়াছে। গণ্ডগোল পাকাইবারও উপায় নাই, কারণ দেনাপাওনা লইয়াই গণ্ডগোল বাধে। এ বিবাহে দেনাপাওনার যে কোনো কথাই নাই। বিধবার কন্যা, শাঁখা শাড়ী দিয়াই বিদায় করিয়া দিবে হয়ত। আত্মীয়স্বজন ইচ্ছা করিয়া কিছু দিতে পারে, না-ও দিতে পারে। আর মেয়ের বংশ কুল গোত্র সবই জানা, সে-সব দিক দিয়াও গোল করিবার উপায় নাই। যোগেশের মাথায় ফন্দির পর ফন্দি দ্রুতবেগে খেলিয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু কোনোটাই বেশ কাজের বলিয়া তাহার মনে হইল না। এদিকে বিবাহের দিনও দেখিতে দেখিতে আসিয়া পড়িল।

বিবাহের সময় পিসীমা রাধারাণীকে আসিবার জন্য লিখিলেন, কিন্তু তাহাকে না-কি শক্ত ম্যালেরিয়া জ্বরে ধরিয়াছে, এই ছুতায় বেহাই পাঠাইতে রাজী হইলেন না। পিসীমা আর উচ্চবাচ্য করিলেন না। যোগেশকে তবু বহু দিনের অভ্যাসগুণে তাঁহার সহিয়া গিয়াছিল, বউমাটিকে এখনও সে-পরিমাণ অভ্যাস হয় নাই।

যাহা হউক, রামনিধির বিবাহ হইয়া গেল, ভালয় ভালয়। ধুমধাম হইল না বটে, তবে উভয় পক্ষের আত্মীয়স্বজন মিলিয়া কোলাহল করিল বিস্তর। কন্যা বিদায় করিবার সময় চন্দ্রমুখী যোগেশের হাতে ধরিয়া মেয়েটিকে স্নেহের নজরে দেখিবার জন্য অনেক মিনতি জানাইয়া দিলেন। যোগেশের

ছাটা গোঁফের ভিতর দিয়া একটা হাসি বাহির হইবার চেষ্টা করিল বটে, তবে গোঁফের ভিতরই মিলাইয়া গেল।

বউ আসিয়া উঠিল। পিসীমা রামনিধির বিবাহ স্থির হইতেই বাড়ির সংস্কার আরম্ভ করিয়াছিলেন, বাড়ি এখন নূতনের মত ঝক ঝক করিতেছে। তাহার উপর মাঙ্গলিক সজ্জা এবং আত্মীয়বন্ধুর কলরবে বাড়িটিকে উৎসবের ক্ষেত্র বলিয়া বুঝিতে বিন্দুমাত্র দেরি হয় না।

বধূকে বরণ করিয়া ঘরে তোলা হইল, ঘন ঘন শঙ্খধ্বনি করিয়া পাড়াপ্রতিবেশীকে জানাইয়া দেওয়া হইল যে, এই লক্ষ্মীহীন গৃহে আজ লক্ষ্মী প্রবেশ করিলেন।

পিসীমা অগ্রসর হইয়া আসিলেন বধূর মুখ দেখিতে। হাতে তাঁহার একটি ভারি ক্যাস বাক্স। যোগেশ চোখ বিস্ফারিত করিয়া দেখিতে লাগিল। পিসীমা বাক্স খুলিয়া এক রাশ ঝকঝকে সোনার গহনা বাহির করিয়া একটি একটি করিয়া বধূর গায়ে পরাইয়া দিলেন। তাহার পর বধূর চিবুকে হাত দিয়া বলিলেন, "এগুলি কখনও যেন গা থেকে খুলতে না হয়, এই আশীর্ব্বাদ করি।"

সমবেত আত্মীয় ও নিমন্ত্রিতাবৃন্দ আবার কলরব করিয়া উঠিল। কম গহনা ত নয়! হাজার আট-দশের ত হইবেই। মেয়ের পয় বলিতে হইবে। বাপের বাড়ি হইতে আসিল বালুচরের সস্তা চেলীর শাড়ী এবং রুলি পরিয়া, শ্বশুরবাড়ি পা দিতে-না-দিতে অমনি অষ্ট অলঙ্কারে গা সাজিয়া উঠিল!

যোগেশ নিজের ঘরে বসিয়া ঠোঁট কামড়াইতেছিল। এত টাকা কোথা হইতে যে আসিল, তাহা আর তাহার জানিতে বাকি নাই। রামনিধির বাবা পাড়ারই এক ভদ্র-লোককে কয়েক হাজার টাকা ধার দিয়াছিলেন, তাঁহার বাড়ি বন্ধক রাখিয়া। সুদে আসলে টাকা দাঁড়াইয়াছিল অনেক, আর বছর দুই অপেক্ষা করিলেই বাড়িখানি হস্তগত করা চলিত। তাহা না করিয়া পিসীমা বদান্যতা করিয়া আসল টাকাটা মাত্র লইয়াই বাড়ি ছাড়িয়া দিয়াছেন। কিছুদিন ধরিয়া এ-বিষয়ে কথাবার্ত্তা চলিতেছিল, যোগেশ সর্ব্বদাই পিসীমাকে সাবধান করিয়াছে যেন তিনি দয়া দেখাইয়া বোকা রামনিধির পাওনাগণ্ডা না ছাড়িয়া দেন। ঠিক সেইটিই তিনি তলে তলে লুকাইয়া করিয়াছেন, না-হইলে হঠাৎ এত গহনার রাশ আসিল কোথা হইতে? যোগেশের মনে হইতে লাগিল, তাহারই মুখের গ্রাস যেন কে কাড়িয়া লইয়া গেল। বউকে দিবার জন্য সে অনেক চেষ্টায় বিনা-পয়সায় একজোড়া রোল্ড গোল্ডের ইয়ারিং জোগাড় করিয়াছিল। রাগের চোটে তাহাও বাক্সে বন্ধ করিয়া রাখিয়া শুধু ধানদূর্ব্বা দিয়া বধূকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আসিল।

বউভাতের গোলমাল চুকিয়া গেলে সে মাকে নিভৃতে ডাকিয়া বলিল, "এই যে সুদের অতগুলো টাকা ছেড়ে দিলে, এটা কি ভাল হ'ল? কি এমন তোমার দায়টা পড়েছিল?"

তাহার বিমাতা বলিলেন, "যাক্ গে, ঐ টাকা ক'টার জন্যে বামুনকে ভিটেছাড়া করলে কি আর বেশী ভাল হ'ত? আর টাকার দরকারও ছিল ত? বউমা আমার খালি গায়ে থাকবে, শুধু শাঁখা রুলি পরে কিসের দুঃখে? তাই প্রথম দিনেই গা সাজিয়ে দিলাম।"

যোগেশ চেঁচাইয়া বলিল, "প্রথম দিন না দিলে কি এমন বয়ে যাচ্ছিল, সময়মত দিলেই হ'ত। খোকা না হয় হাবা, কিছু বোঝে না, তোমার ত উচিত দেখা যাতে তার হকের ধন মারা না যায়।"

পিসীমার মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল, বলিলেন, "সেই চেষ্টাই দিনে রাতে করছি তা জেনে রেখো বাছা। আমাদের তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, আমাদের কিছু আর জানতে বাকি নেই।" বলিয়া যোগেশকে আর কোনো কথা বলিবার অবকাশ না দিয়া তিনি কর্ম্মান্তরে চলিয়া গেলেন।

যোগেশ ক্রমেই বুঝিতে লাগিল, একেবারে মরিয়া হইয়া না লাগিলে শীঘ্রই তাহার এখানকার বাস উঠাইতে হইবে। শুধু দু-বেলা খাইয়া, তক্তপোষের উপর ঘুমাইবার জন্য ত সে এখানে পড়িয়া নাই। খাইবার ভাত তাহার দেশেও আছে। স্ত্রী-পরিবার ছাড়িয়া সৎমায়ের মুখ ঝাম্‌টা সহিয়াও যে সে এখানে পড়িয়া আছে তাহার ফলে বিপদ আপদের জন্য নিজের যদি দুইটা পয়সারই সংস্থান না হইল, তাহা হইলে এত কষ্ট করিয়া লাভ কি? কিন্তু আগে ছিলেন সৎমা শত্রু এখন তাহার উপর জুটিয়াছেন বউ, এবং তাঁহার সাতগোষ্ঠী। বউয়ের জন্য পয়সা ত জলের মত খরচ হইতেছে। শুধু

গহনা দিয়াই ক্ষান্ত নয়, পিসীমা কাপড়েচোপড়ে, আসবাবপত্রে বধূর ঘরে একেবারে স্রোত বহাইয়া দিতেছেন। এ সবই একান্ত বাজে খরচ, কারণ টাকার রূপে থাকিলে যাহা কোনোও দিন-বা যোগেশের হাতে পড়িতে পারিত, গহনা বা কাপড়ে রূপান্তরিত হইলে চিরদিনের মত তাহা তাহার হাতছাড়া হইয়া যাইবে।

পিসীমা এই সময়ে রামনিধির বিবাহ দিয়া ভালই করিয়াছিলেন, কারণ এখন হইতেই ধীরে ধীরে তাঁহার শরীর ভাঙিতে আরম্ভ করিল। যোগেশের মনে একদিকে যেমন একটু আশার সঞ্চার হইল, আর একদিকে আশঙ্কাও হইতে লাগিল যে, বুড়ী যোগেশের সর্ব্বনাশের পুরা ব্যবস্থা না করিয়া মরিবে না। দেশের জমিজমাসুদ্ধ বিক্রয় করিয়া দিয়া পিসীমা কলিকাতায় আর একখানা বড় বাড়ি করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন দেখিয়া তাহার বুক আরও দমিয়া গেল। সে বাড়ি আবার হইবে না-কি বউয়ের নামে।

পূজা আসিয়া পড়িল। পিসীমার হঠাৎ সখ হইল, ঘরে মা-দুর্গাকে আনিতে হইবে। যোগেশ মুখ গোঁজ করিয়া বলিল, "কখনও ত বাড়িতে পূজো হয় নি, এখন আবার অত টাকা খরচ করা কেন? এখন নিধে সংসারী হয়েছে, একটু বুঝে-সুঝে চলতে হবে না?"

নিধের পিসীমা বলিলেন, "কতই আর খরচ? ওতে আমার খোকা ফতুর হয়ে যাবে না। ঘরে বউ এসেছে, এই ত এবার ক্রিয়াকর্ম্মের সময়। আমার চিরদিনের সাধ, এতদিন পারিনি, এবার আনব।"

রাধারাণী দেবরের বিবাহে আসে নাই, তাহাতে কথা উঠিয়াছে, এবারে পূজার নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করিতে পারিল না। আসিয়া উপস্থিত হইল। রামনিধির বধূর সাজপোষাকের বিবরণ স্বামীর কাছে চিঠিতেই পাইয়াছিল, পাছে তাহার কাছে একেবারে মুখরক্ষা না হয়, এই জন্য চাহিয়া-চিন্তিয়া গহনা-কাপড় বেশ কিছু জোগাড় করিয়াই আনিল।

যোগেশ একলা মানুষ, যে-ঘরে থাকিত সে-ঘরখানা কিছু ছোট। এতদিন সেটা তাহার অত চোখে পড়ে নাই, বউ আসিয়া চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিল। বলিল, "ব'সে ব'সে ভূতের ব্যাগার যে খাটছ, কিসের জন্যে? চাকরবাকরকেও ত লোকে এর চেয়ে ভাল ঘর দেয়।"

যোগেশ বলিল, "অস্থির হয়ে লাভ কি? সবুরে মেওয়া ফলে। বড় ঘর ত দুখানি মোটে, একটিতে বুড়ী থাকে আর একটি নূতন বউ দখল করেছেন, কা'কে ঘর ছেড়ে দিতে বলব?"

রাধারাণী বলিল, "পাতা-চাপা কপাল বটে ছুঁড়ির। একেবারে আঁস্তাকুড় থেকে রাজসিংহাসনে উঠে বসল। আর আমাদের দশা দেখ না, চিরকাল বাপের গলগ্রহ হয়েই কেটে গেল।"

যোগেশ শুধু বলিল, "দেখাই যাক।"

রাধারাণী বলিল, "দেখবে তুমি আমি যমের বাড়ি গেলে পর। সুশীলা-বউয়ের জন্যে নাকি পূজোর উপহার আসছে হীরের গহনা। আমি কেন যে এখানে মরতে এলাম!"

যোগেশ পাশ ফিরিয়া শুইল। ঘুম তাহার হইল না, কিন্তু পত্নীর সহিত বাক্যালাপে আর সে সময় নষ্ট করিল না।

যথোচিত ধুমধাম করিয়াই পূজা হইয়া গেল। সুশীলা-বউয়ের নূতন এবং পুরাতন গহনা লইয়া মন্তব্যও ঘরে বাহিরে কম হইল না। রাধারাণী রামনিধিকে খোঁটা দিয়া বলিল, "বলি ঠাকুরপো, সোনা হীরে কি একলা তোমার সুন্দরী বউই পরবে? আর একটা বউয়ের কাল অঙ্গে দু-একখানা কি উঠতে পারে না?"

রামনিধি লজ্জিত হইয়া বলিল, "আমি কি দিয়েছি? ও-সব পিসীমার দেওয়া।"

রাধারাণী বলিল, "তার মানে তোমারই দেওয়া। টাকা ত পিসীমা নিজের ঘর থেকে দিচ্ছেন না।"

রামনিধি খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া কি ভাবিল, তাহার পর "আচ্ছা দেখি," বলিয়া চলিয়া গেল।

বিজয়ার দিন সত্যই সে এক ছড়া সোনার হার আনিয়া রাধারাণীর হাতে দিয়া তাহাকে প্রণাম করিল। রাধারাণী বিস্ময়ের ভাণ করিয়া বলিল, "ওমা একি কাণ্ড ঠাকুরপো, আমি ঠাট্টা ক'রে বললাম, তুমি সত্যি ভাবলে না-কি?"

রামনিধি বলিল, "তা আমি কি ক'রে জানব যে ঠাট্টা? পিসীমাকে ব'লে তোমার জন্যে কিনে আনলাম।"

যোগেশ আড়ালে স্ত্রীকে ডাকিয়া তর্জ্জন করিয়া বলিল, "এমন ক'রে আমার মুখ হাসাবার দরকার? গহনা নেই ব'লে এবার ভিক্ষে করতে হবে নাকি?"

রাধারাণী চটিয়া বলিল, "থাক্, থাক্, তোমার আর বীরত্ব ফলাতে হবে না। অপদার্থদের যত বীরত্ব স্ত্রীর কাছে। সুশীলা-বউয়ের ঝিয়ের মত তার পিছন পিছন আমি বেড়ালেই তোমাদের খুব ভাল লাগে।"

যোগেশ বাহিরের ঘরে চলিয়া গেল। সারা দিনের ভিতর আর অন্দরমহলের দিকে পা বাড়াইল না। সন্ধ্যার সময় বলিয়া পাঠাইল বিশেষ কাজে তাহাকে মফঃস্বলে যাইতে হইতেছে, দু-তিন দিন দেরি হইতে পারে। রাধারাণীর মুখ একেবারে অন্ধকার হইয়া গেল, কিন্তু হাতের কাছে স্বামীকে না পাইয়া তাহার মনের ঝাল মনেই থাকিয়া গেল। রামনিধি কাছে আসিয়া নানাভাবে বউদিদিকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, তবে খুব বেশী আমল পাইল না।

চার দিন উৎসবের খাটুনি এবং উত্তেজনায় ক্লান্ত হইয়া পরিবারসুদ্ধ অঘোরে ঘুমাইয়া পড়িল। কিন্তু সুখ-নিদ্রা তাহাদের অদৃষ্টে ছিল না। নারীকণ্ঠের তীব্র চীৎকারে শুধু এ বাড়ির নয় পাড়া-প্রতিবেশীরও ঘুম ছুটিয়া গেল। চোখ মুছিতে মুছিতে, ভয়ব্যাকুল স্ত্রী-পুরুষের দল যখন রামনিধির বাড়িতে ভীড় করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল, তখন চোর পলাইয়াছে, কিন্তু শুধু-হাতে পলায় নাই। হা-হুতাশ, কান্নাকাটি, গালিগালাজ, সারা রাত ধরিয়া চলিতে লাগিল। সকাল হইবার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া জুটিল পুলিস এবং কিঞ্চিৎ পরে যোগেশ।

তাহাকে দেখিয়া পিসীমা গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, "ঘর ফেলে কোথায় গিয়েছিলি হতভাগা ছোঁড়া? এদিকে যে সর্ব্বনাশ হয়ে গেল?"

যোগেশের চোখ প্রায় ঠিক্‌রাইয়া বাহির হইয়া আসিল। জিজ্ঞাসা করিল, "কেন কি হয়েছে?"

পিসীমা জবাব দিবার আগেই রামনিধি কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, "রাত্রে ঘরে চোর ঢুকে বউদিদির সব গহনা নিয়ে গেছে।"

যোগেশের মুখ সাদা হইয়া গেল। জড়িত কণ্ঠে বলিল, "ঘরে একলা রইল কেন? মায়ের সঙ্গে শুলেই পারত?"

রামনিধি বলিল, "একলা ওদিককার ঘরে ভয় পাবেন ব'লে আমার ঘরে তাঁকে শুইয়েছিলাম, আমরা তোমার ঘরে শুয়েছিলাম।"

যোগেশ বারান্দার উপর ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল। ঘরের ভিতর হইতে রাধারাণীর আর্ত্তনাদ তাহার কানে যেন হুল ফুটাইতে লাগিল।

খানিক পরে উঠিয়া, রামনিধির হাত ধরিয়া তাহাকে সে বাহিরে টানিয়া লইয়া গেল। তীব্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "বউয়ের উপর অত দরদ দেখাতে তোমায় বলেছিল কে? মা বুঝি?"

রামনিধি হাবার মত তাহার মুখের দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, "বা রে, তা কেন? মা কেন বলবেন? বউ বল্লে, 'আজ দিদি শুক না এ-ঘরে, আমরা ওদিককার ঘরটায় যাই। ওটা বেশ নিরিবিলি, এদিকে ত গোলমালে চোখে ঘুম আসে না।'"

জলন্ত চোখে বোকাটার দিকে তাকাইয়া যোগেশ নিজের মাথার চুল মুঠা করিয়া ছিঁড়িতে লাগিল।

পুস্তক পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা—শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত ও সঙ্কলিত। ৬ নং পার্শিবাগান লেন, কলিকাতা কমার্সিয়াল গেজেট প্রেস হইতে প্রকাশিত। মূল্য তিন টাকা।

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত ও সঙ্কলিত শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা একখানি সুন্দর ও উপাদেয় গীতার সংস্করণ। ইহাতে মূল, অন্বয়মুখে অক্ষরার্থ বঙ্গানুবাদ, আশয়, শ্লোকার্থ, দার্শনিক এবং আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ও বহু পদার্থবিভাগচিত্রাদি সন্নিবেশিত হইয়াছে। দার্শনিক এবং আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা বাঙ্গলা পয়ারে বিরচিত এই সংস্করণের অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য বলিলে অণুমাত্রও অত্যুক্তি হয় না। এমন সরল ও সুন্দর বাঙ্গলা পয়ারে গীতার অন্তর্নিহিত গভীর তাৎপর্য্য প্রকাশ করিতে গ্রন্থকার যে অনন্য-সাধারণ প্রয়াস করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বথা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে এবং অদ্বৈতবাদীর দৃষ্টিতে এই দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক গীতা ব্যাখ্যা এ পর্য্যন্ত বঙ্গভাষায় আর কেহই প্রকাশ করেন নাই। এরূপ গ্রন্থরচনা ও তাহার এমন সুন্দর ভাবে মুদ্রণ দ্বারা বাঙ্গলা দার্শনিক সাহিত্য যে বিশেষ ভাবে বিভূষিত হইয়াছে, ইহা যে অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করিবেন, তাহা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারা যায়। জীব ও ঈশ্বরের বেদান্তদর্শন বর্ণিত স্বরূপ, অনির্ব্বাচ্যবাদ জ্ঞানমিশ্রা শুদ্ধভক্তি, রাগানুগাভক্তি অধ্যারোপাপবাদ-ন্যায়, গুণকর্ম্ম ও জাত্যনুসারী বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রভৃতি দুরূহ গীতাসিদ্ধান্ত-নিচয় নিতান্ত সরল ও মধুর পয়ারে এমন সুন্দর ভাবে বিবৃত হইতে পারে, এই গ্রন্থখানি যিনি না দেখিয়াছেন, তাঁহার এ ধারণা মনে উদিত হয় না—এইরূপ গ্রন্থরচনা ও সাধারণে যথাসম্ভব অল্পমূল্যে প্রচারদ্বারা, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় প্রত্যেক গীতাপ্রেমিক বাঙ্গালী সাহিত্যিকের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন ইহাতে সন্দেহ নাই। প্রত্যেক গীতাতত্ত্বানুসন্ধিৎসু শিক্ষিত বাঙ্গালীকে আমি এই গ্রন্থখানি পাঠ করিবার জন্য আন্তরিক অনুরোধ করিতেছি। ছাপা কাগজ মুদ্রণপ্রণালী ও সম্পাদনকার্য্য ইহার সকলই প্রশংসনীয়।

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ

সরল এঞ্জিন ও বয়লার শিক্ষা—(Engines and Boilers simply explained—An Introduction to Marine Engineering Practice)—জি. ডবলিউ. মুইর প্রণীত। প্রকাশক—দি বুক কোম্পানী লিমিটেড, ৪।৩ বি, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। পৃ. iii+২১৭, মূল্য ২৷৷০ টাকা।

গ্রন্থখানি দ্বৈভাষিক; বাংলা ও ইংরেজীতে ষ্টীমারের এঞ্জিন চালকদিগের জন্য লিখিত। প্রতি পৃষ্ঠার নিম্নে মূল ইংরেজী ও উপরে তাহার বঙ্গানুবাদ। যাঁহাদের নক্সা সম্বন্ধে সামান্য জ্ঞান আছে, তাঁহারা এই বই পড়িয়া সহজেই এঞ্জিন ও বয়লার সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি বুঝিতে পারিবেন। প্রথম তিন অধ্যায় বয়লার ও এঞ্জিন ও তৎসংক্রান্ত যন্ত্রপাতির বর্ণনা আছে, শেষের অধ্যায়ে ঐ সম্বন্ধে প্রশ্ন ও তাহার উত্তর আছে।

পুস্তকে যে-সমস্ত পারিভাষিক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার প্রায় সমস্তই ইংরেজী কতকগুলি শব্দ চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী জেলাবাসী এঞ্জিন-চালকদিগের কথিত অপভাষা, যথা—Boiler, Pump, Pressure প্রভৃতির প্রতিশব্দ 'বয়লাট,' 'বোম্বা,' 'এসপ্রেসার' ইত্যাদি করা হইয়াছে। আবার একই শব্দ বিভিন্ন স্থানে ভিন্নরূপে লেখা হইয়াছে—যথা, কোথাও 'এস্‌প্রেসার' বা কোথাও 'প্রেসার,' কোথাও 'বয়লেট' বা কোথাও 'বয়লার' ইত্যাদি। পরবর্ত্তী সংস্করণে এই ত্রুটিগুলি সংশোধিত হইলে গ্রন্থের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি হইবে।

শ্রীঅনঙ্গমোহন সাহা

বাংলার কৃষক ও শিল্পী বধ—শ্রীদক্ষিণাচরণ সেন, ব্রাহ্মণ-বাড়ীয়া, মূল্য বার আনা, পৃ. ৮৭।

বইখানিতে বাংলার কৃষকদের কথা, ও তৎসহ দেশবিদেশের ইতিহাসের বিষয়েও কিছু কিছু নিবদ্ধ হইয়াছে। কি করিয়া কৃষকের উন্নতি হইতে পারে তাহাও লেখক কিছু কিছু বলিয়াছেন। যাহাদের জন্য বইখানি লিখিত, তাহাদের দৃষ্টিতে ইহার মূল্য কিঞ্চিৎ বেশী হইয়াছে।

বর্ণধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা বিষয়ে প্রস্তাব—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন শর্ম্মা প্রণীত। ভবানীপুর ৪৫।৪এ, চক্রবেড়ে রোড, সাউথ। মূল্য ৶০ আনা, পৃ. ১৭৯+৶৵০।

দুই ব্যক্তির কথোপকথনচ্ছলে লেখক বর্ণতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বর্ত্তমান জাতিবিভাগ যে ঠিক শ্রুতিপ্রমাণিত চাতুর্ব্বর্ণ্য নহে, তাহা তিনি প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মতে শুদ্ধ শ্রুতি-সম্মত বর্ণ-প্রচলনই বর্ত্তমান দুর্দ্দশা দূর করিবার পক্ষে উৎকৃষ্ট উপায়। বর্ত্তমান অবস্থা হইতে কি উপায়ে শুদ্ধবর্ণ প্রবর্ত্তিত হইতে পারে তাহার বিষয়ে কিন্তু কোনও নির্দ্দেশ লেখক দেন নাই। যাহাই হউক, লেখকের দুইটি মূলগত মতকে আমাদের সন্দেহজনক মনে হইয়াছে। প্রথম, গুণ বংশগত হয় কিনা; দ্বিতীয়, মানুষে মানুষে বৈষম্য স্বভাবসিদ্ধ হইলেও তাহার দোহাই দিয়া তথাকথিত নীচজাতিকে সামাজিক সুযোগ-সুবিধা হইতে আমাদের বঞ্চিত করার অধিকার আছে কি-না। প্রথমটির সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য এই যে, মানসিক গুণ বংশানুক্রমে যায় কিনা তাহা বৈজ্ঞানিক মতে এখনও স্থিরীকৃত হয় নাই। অতএব অপ্রমাণিত তত্ত্বের উপর নির্ভর করিয়া সমাজ-ব্যবস্থা না করাই ভাল। তাহাতে অন্ততঃ সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা হয়। দ্বিতীয়তঃ, একজন নীচজাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া, পরীক্ষা না করিয়াই আমরা যদি তাহাকে শিক্ষা দীক্ষা ব্যবসায় প্রভৃতি সকল বিষয় হইতে বঞ্চিত করি তাহাতে উচ্চ জাতির স্বার্থ রক্ষিত হয় বটে, তবে মানুষের প্রতি প্রেম প্রকাশিত হয় না। যদি মানুষের প্রতি প্রেমের বশে আমাদের বর্ত্তমান বর্ণব্যবস্থা ভাঙিতেই হয়, তাহাতে দোষ কি? না-হয়, আমরা একটা ভুল করিয়াই দেখিলাম। শেষ পর্য্যন্ত তাহাতে লাভ ভিন্ন লোকসান হইবে না।

শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু

কাজের কথা—শ্রীকালীপ্রসন্ন সরকার প্রণীত। প্রকাশকের নাম নাই। একখানি উচ্ছ্বাসময় পুস্তক। দাম আট আনা।

নবান্ন—শ্রীসুহৃৎনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীবঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়, অভয় কুটির, বেহালা। দাম আট আনা।

একখানি ক্ষুদ্র নাটিকা। ইহার দ্বারা লেখক তাঁহার "হারিয়ে যাওয়া বাপমায়ের স্মৃতিপূজা" করিয়াছেন।

কচিপাতা—আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দীন প্রণীত। প্রকাশক—মোহম্মদী বুক এজেন্সী। ৯১, অপার সারকুলার রোড, কলিকাতা। দাম আট আনা।

গ্রন্থকার পুস্তকখানি শিশুপাঠ্য করিয়া লিখিয়াছেন। ইহাতে দুটি সুন্দর গল্প আছে। গল্প দুটি বিলাতী। ভাষা বেশ ঝরঝরে ও স্থানে স্থানে কবিত্বপূর্ণ; পড়িতে বেশ লাগে। কিন্তু দুটি গল্পই প্রেমের। সুতরাং শিশুদের হাতে দিবার উপযুক্ত নয়।

আরও একটি কথা। বইখানি আগাগোড়া বাংলায় লেখা; লেখকও বাঙালী, তবুও 'জলের' প্রতি এমন বীতরাগ কেন? 'পানী' কথাটি ব্যবহার না করিলে বাঙালী মুসলমান পাঠক-পাঠিকা কি 'জল' বোঝেন না?

পুস্তকখানির ছাপা ও কাগজ ভাল। মোটা মলাটের রঙীন ছবিখানিও বেশ, কিন্তু ভিতরের ছবিগুলি বর্জ্জন করিলে ভাল হইত।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

প্রেম—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক—এইচ্ চ্যাটার্জ্জি এণ্ড কোং, ৮৮, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। ডিমাই আট পেজী, চারি ফর্ম্মা। দাম এক টাকা।

এই কবিতার বইয়ের প্রতিপাদ্য বিষয় একটি, তাহা প্রিয়া ও প্রেমকে লক্ষ্য করিয়া। কবি তাঁহার বস্তুজগতে প্রেমকে ভোগের সীমা ছাড়াইয়া অসীম ঊর্দ্ধে লইয়া গিয়াছেন। সেই প্রেম অসীম ঊর্দ্ধ হইতে গ্রহনক্ষত্রকে ব্যাপ্ত করিয়া দিগ্‌দিগন্তে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। শুধু তাই নয়, জন্মজন্মান্ত ধরিয়া এই প্রেমের প্রবাহ। প্রিয়া এই কাব্যের মানসী মূর্ত্তি। দেহের গণ্ডী ভাঙিয়া প্রেম সৃষ্টি করিয়াছে এক অতীন্দ্রিয় মনোরাজ্য। সেখানে দেহের স্থূল ভোগ নাই; ভোগমুখী মন সেখানে দেহের মায়া হইতে মুক্ত হইয়া প্রেয়সীর ধ্যানে মগ্ন এবং প্রেম সেখানে মদিরা না হইয়া পূজার অঞ্জলি লইয়া প্রিয়ার অন্বেষণে অনন্তে ঝরিয়া পড়িয়াছে। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, এমন একটি ব্যাপক মধুর কবিতার চতুর্থ স্তরের প্রথম তিনটি ষ্ট্যানজা ও সপ্তম স্তরের প্রকাশভঙ্গী এবং তাহার বিষয়বস্তু হাল্কা হইয়া পড়ায় তাহা উৎকৃষ্ট আম্রফলের কীটকলঙ্কের ন্যায় কাব্যাস্বাদনের আনন্দভোগে মনকে আঘাত করে। এই খুঁতটুকু বাদ দিলে বইখানি কাব্যরসান্বেষী মনের উপভোগ্য হইবে সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট আর্ট পেপারে ছাপা, সে হিসাবে মলাট আরও ভাল হওয়া উচিত ছিল।

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র—শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত। দাম পাঁচ টাকা।

সাবিত্রীপ্রসন্ন বাবু বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে অপরিচিত নহেন, তাঁহার লিখিত "গৌড়রাজর্ষি" মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের জীবনী অতি উপাদেয়ই হইয়াছে। এই বিরাটকায় গ্রন্থখানিকে মোটামুটি চারি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম "কাশিমবাজারের প্রাচীন ইতিহাস"—এই ইতিহাসের 'মালমসলা' সংগ্রহ করিতে গ্রন্থকারকে যে কত পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছে, তাহা গ্রন্থখানি পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়। কাশিমবাজার-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কৃষ্ণকান্ত নন্দী ওরফে "কান্তমুদী"র প্রায় সম্পূর্ণ জীবনীও দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় ভাগে মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের বাল্যজীবন হইতে আরম্ভ করিয়া বৎসরের পর বৎসর ধারাবাহিকরূপে তাঁহার জীবনের প্রায় প্রত্যেক ঘটনাই অতি নিপুণতার সহিত সবিস্তারে বর্ণনা করা হইয়াছে। 'জীবন-স্মৃতি' ও 'জীবন-মালঞ্চ'—পুস্তকখানির তৃতীয় ভাগ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। 'রাজর্ষি'র জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটি ঘটনা এমন গল্পাকারে সরল ভাষায় বলা হইয়াছে যে, কেবল এই ঘটনাগুলি হইতেই বুঝিতে পারা যায় তিনি কত মহৎ ও কত উদার দয়ার্দ্রচিত্ত ব্যক্তি ছিলেন। ঘটনাগুলি এইভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া গ্রন্থকার কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, গল্পগুলি যথার্থই উপভোগ্য। চতুর্থ ভাগে দুই শত আট পৃষ্ঠাব্যাপী পরিশিষ্ট। পরিশিষ্টে 'উপাসনা' প্রভৃতি কয়েকটি মাসিক ও দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত মহারাজের জীবনী পুনর্মুদ্রিত করা হইয়াছে।

প্রাতঃস্মরণীয় মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাংলার জনসাধারণের খুবই পরিচিত ছিলেন। তাঁহার জীবনের অনেক ঘটনাই জানা থাকিলেও গ্রন্থকার এমন সুললিত ভাষায় তাঁহার নিঃস্বার্থ পরোপকার, অত্যদ্ভুত বদান্যতা, নির্ভীক স্বদেশসেবার কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন যে সেগুলি পড়িবার সময় মনে বাস্তবিকই আনন্দ হয়। অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াও তিনি নিজের ভোগসুখের জন্য অর্থব্যয় না করিয়া পরের অভাব দূর করিবার জন্য এবং দেশের ও দশের মঙ্গলের জন্য যে-ভাবে আপনার যথাসর্ব্বস্বই একপ্রকার দিয়া গিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। নিজেকে নিঃশেষ করিয়া এমন দানের উদাহরণ পৃথিবীর ইতিহাসে কয়টাই বা পাওয়া যায়। নামজাদা কত যে সাহিত্যিক তাঁহার নিকট হইতে গ্রন্থপ্রকাশের জন্য সাহায্য পাইয়াছিলেন, তাহা পড়িলে আশ্চর্য্য হইতে হয়।

তবে মহারাজের জীবনের প্রারম্ভে তাঁহার অভাব-অভিযোগের বর্ণনায় গ্রন্থকার যেন একটু বাড়াবাড়ি করিয়া ফেলিয়াছেন। গ্রন্থকার যেন দেখাইতে চাহেন, যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বা গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি মনীষীরা বাল্যে দুরবস্থার সহিত যে-ভাবে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, ঠিক সেই রকম অবস্থাতেও "মণীন্দ্রবাবুও" পড়িয়াছিলেন। অথচ যে-সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় বা গুরুদাসবাবুর মাসিক আয় পাঁচ ছয় টাকাও ছিল কি-না সন্দেহ, সেই সময় "মণীন্দ্রবাবু" কাশিমবাজার রাজ এষ্টেট হইতে নিয়মিত ভাবেই মাসিকবৃত্তি পাইতেছিলেন আড়াই শত টাকা এবং বার্ষিক সাহায্যেরও বরাদ্দ ছিল ছয় শত টাকার উপর। তাহা ছাড়া, মহারাণী স্বর্ণময়ীর নিকট হইতে সাহায্য চাহিয়া বার-বার প্রত্যাখ্যাত ও অপমানিত হইয়াও আবার সেই ভিক্ষাপাত্র হস্তে মাতুলানীর নিকট আবেদন-নিবেদন পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠায় অত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা না করিলেই ভাল হইত। গ্রন্থকার অবশ্য এখানেও কাঁচা হাতের পরিচয় দেন নাই, তিনি দেখাইবার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন যে, এই আবেদন-নিবেদন তিনি যাহা করিতেন, কেবল পরকে সাহায্য করিবার জন্যই। এ যেন কেবল অভাবগ্রস্তদের প্রতিনিধিরূপে ফলাকাঙ্ক্ষা না করিয়া আপন কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাওয়া।

শ্রীরঘুনাথ মল্লিক

যেমন শুনিয়াছি—(শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজীর উপদেশ), প্রথম ভাগ। ব্রহ্মচারী সম্বুদ্ধ চৈতন্য প্রণীত।

স্বামী অভেদানন্দের যে-সকল উপদেশ সম্বুদ্ধ চৈতন্য ব্রহ্মচারী লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন তাহাই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। জ্ঞানগর্ভ উপদেশে ইহা পরিপূর্ণ। তবে স্বামী অভেদানন্দের দুই চারিটি উপদেশ তাঁহার লোক-পাবন গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও জগদ্বিখ্যাত গুরুভ্রাতা স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশের বিরোধী বলিয়া মনে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ দুই একটি এখানে উদ্ধৃত হইল —"দেশের লোক খেতে পায় না কি ক'রে বেদান্ত চর্চ্চা করবে? পেটে অন্ন পড়লে ত বেদান্ত-চর্চ্চা করবে?"—এই প্রশ্নের উত্তরে

স্বামী অভেদানন্দ বলিয়াছেন, "এই সময় ত বেদান্ত চর্চা করবে বেশী করে।" তিনি বেদান্ত উপদেষ্টা। স্বামী বিবেকানন্দও একজন প্রসিদ্ধ বেদান্ত উপদেষ্টা এবং আচার্য্য ছিলেন। তিনি কিন্তু এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "আগে কূর্ম্মাবতারের (উদরের) পূজা চাই তবে ধর্ম্ম হবে।" শ্রীরামকৃষ্ণদেবও বলিতেন, "খালি পেটে ধর্ম্ম হয় না।" স্বামী অভেদানন্দ অন্যত্র বলিয়াছেন, "Politics নিয়ে যে থাকে, সে ত Hypocrite." পৌরাণিক যুগের কয়েক জন প্রাতঃস্মরণীয় ঋষি মহর্ষি হইতে বর্ত্তমান যুগের মহাত্মা গান্ধী পর্য্যন্ত যাঁহারা রাজনীতির সহিত জড়িত ছিলেন এবং এখনও আছেন—তাঁহারা কেহই স্বামীজীর এই মন্তব্য হইতে অব্যাহতি পান না। সুধীবৃন্দ কি তাঁহার এই উক্তির সহিত এক মত হইবেন ?

তথাপি, এই পুস্তকপাঠে সকলের উপকার হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

ধর্ম্মসাধন—(দ্বিতীয় সংস্করণ) শ্রীললিতমোহন দাস, এম-এ, প্রণীত।

প্রায় বত্রিশ বৎসর পরে এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার প্রতি ছত্রে প্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম আচার্য্য ললিতমোহন দাস মহাশয়ের গভীর জ্ঞান, ব্রহ্মনিষ্ঠা, অনুভূতি ও প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। ভাষা এত সুন্দর ও সহজ যে বালক-বালিকারাও ইহা অনায়াসে বুঝিতে পারিবে। ব্রাহ্মসমাজের তরুণ-তরুণীগণের জন্য লিখিত হইলেও প্রত্যেকেরই ইহা পাঠ করা কর্ত্তব্য। ভূমিকা-লেখক শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার সেন বি-এ, মহাশয় বোধ হয় ধর্ম্মসাধন গ্রন্থখানি ভাল করিয়া না পড়িয়াই ভূমিকা লিখিয়াছেন। কারণ মূল গ্রন্থের সহিত ভূমিকার সামঞ্জস্য নাই। শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকারের সাধন-প্রণালী সম্বন্ধে ভূমিকা-লেখক বলিয়াছেন, "এ সাধন প্রণালী......শুষ্ক বৈরাগ্যে...নয়।" কিন্তু "ধর্ম্মসাধনে"র ১৩৮, ১৩৯ ও ১৪১ পৃষ্ঠায় দৃষ্ট হয়—"কেবল যুবকদেরই যে অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়-চালনা দোষের তাহা নহে। যুবকই হউন আর বৃদ্ধই হউন, বৈধ কিংবা অবৈধ, স্বাভাবিক কিংবা অস্বাভাবিক রূপে অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় পরিচালনা করিলেই কর্ম্মফল ভোগ করিবেন। তবে যৌবনকালেই পাপের বীজ হৃদয়ে অঙ্কুরিত হয়, তাই সেই সময়েই বিশেষ সতর্ক হওয়া আবশ্যক।...পূজ্যপাদ ঋষিগণ ছাত্রাবস্থায় ব্রহ্মচর্য্যপালনের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন। আর আজ সেই ছাত্রজীবনে নানা প্রকার দুর্নীতি-ব্যাধি প্রবেশ করিয়া দেশকে উৎসন্ন দিতেছে। ধর্ম্মাচার্য্যগণ তাহা দেখিয়াও দেখেন না।"

এইরূপ ব্রহ্মচর্য্য বা ইন্দ্রিয়-ভোগ-বিরতির উপদেশ গ্রন্থের বহু স্থানে আছে। বৈরাগ্য অর্থে—বিষয়ে বিরাগ। বিষয়ে বিরাগ বা বিতৃষ্ণা না আসিলে ব্রহ্মচর্য্য সাধন হয় না। ইহা হিন্দু ও ব্রাহ্ম সাধক মাত্রেই অবগত আছেন। প্রকৃত বৈরাগ্য-সাধনে হৃদয় শুষ্ক হয় না, মহা প্রেমেরই উদয় হয়। বুদ্ধ, খৃষ্ট, চৈতন্য মহাবৈরাগী অথচ মহাপ্রেমিক ছিলেন। "ধর্ম্মসাধনে"র পরবর্ত্তী সংস্করণে ভূমিকা-লেখকের ঐরূপ অভিমত সংশোধিত না হইলে মূল গ্রন্থের সহিত ভূমিকার অসামঞ্জস্য থাকিয়া যাইবে।

স্বামী চন্দ্রেশ্বরানন্দ

পুনর্গঠন

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

পঞ্চবিংশ বর্ষ পূর্ব্বে ভারত-সচিব লর্ড মর্লি বড়লাট লর্ড মিণ্টোকে উপদেশ দিয়াছিলেন—

"ভারতবর্ষের মত দরিদ্র দেশে মিতব্যয়িতা, কামান ও দুর্গেরই (অর্থাৎ সামরিক ব্যবস্থারই) মত দেশরক্ষার উপায়।"

তিনি মিতব্যয়িতার কোন্ আদর্শ ভারত-সরকারের সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে মনে হয়, তিনি পারস্য ও তিব্বত প্রভৃতি দেশের জন্য ভারতের সামরিক ব্যয়ের প্রতি দৃষ্টি রক্ষা করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের সামরিক ব্যয়ের আধিক্য যাহাতে নিবারিত হয়, সে-কথা ভারতবাসীর সকল প্রতিষ্ঠানই গত অর্দ্ধশতাব্দীকাল বলিয়া আসিয়াছে। কেবল সামরিক বিভাগই নহে;—শাসন-বিভাগও যে বিশেষ ব্যয়সাধ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহাতেও ব্যয়হ্রাস করা ত দূরের কথা উত্তরোত্তর যে ভাবে ব্যয়বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। এই বিভাগদ্বয়ে ব্যয়-সঙ্কোচের প্রয়োজনও যেমন অধিক, কিসে দেশের ধনবৃদ্ধি করা যায়, তাহার উপায় করাও তেমনই প্রয়োজন। এতদিন সে-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য চেষ্টা হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

সেই জন্য এতদিন পরে বাংলার গভর্ণর স্যর জন্ এণ্ডার্সন পুনর্গঠন সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা বিশেষ ভাবে দেশের লোকের আলোচনার বিষয় হইয়াছে। আমরা লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি, স্যর জন্ বাংলায় সন্ত্রাসবাদের নিদান নির্ণয়ের চেষ্টায় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, দেশের আর্থিক

দুর্গতির সহিত ইহার সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। সেই জন্যই তিনি বাংলার শিল্পবিভাগ কর্ত্তৃক পরীক্ষিত কতকগুলি শিল্পের উন্নত উপায় শিক্ষা দিবার জন্য যাযাবর শিক্ষকদল প্রেরণের ব্যবস্থায় আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন।

বোধ হয়, সেই পথে অগ্রসর হইয়াই তিনি বুঝিয়াছেন, বাংলার পল্লীগ্রামের আর্থিক অবস্থার পুনর্গঠন ব্যতীত ঈপ্সিত ফললাভের কোন সম্ভাবনা নাই। তিনি মত প্রকাশ করিয়াছেন—এই জন্য চেষ্টা করা প্রয়োজন এবং সে-চেষ্টা করিতেই হইবে। কেন-না, এই পথ ব্যতীত অন্য কোন পথ নাই। তিনি বলিয়াছেন :—

"বাংলায় কৃষিই আমাদিগের প্রধান অবলম্বন এবং ইহাই এখনও বহুদিন আমাদিগের প্রধান অবলম্বন থাকিবে; এই বিষয়ে উন্নতি বাংলায় যত প্রয়োজন, অন্য কোন দেশে বা রাষ্ট্রে তদপেক্ষা অধিক নহে। কৃষিই যখন বাংলার সর্ব্বপ্রধান অবলম্বন, তখন আমাদিগকে এই কৃষিতেই মনঃসংযোগ করিতে হইবে। বাংলার লোকের শতকরা ৭০জন কৃষিজীবী, তাহাদিগের অবস্থার উন্নতি সাধিত হইলে শিল্পের সমৃদ্ধি, ব্যবসায়ের সুষ্ঠু অবস্থা, প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তার, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের হিন্দু ও মুসলমান যুবকদিগের কর্ম্মপ্রাপ্তির সুযোগ—এ সবই হইবে।"

বাংলার কৃষকের অবস্থা কত শোচনীয় তাহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। সে মহাজনের নিকট যে ঋণে বদ্ধ, তাহাকে নাগপাশ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সাধারণতঃ বলা যাইতে পারে, স্বাভাবিক ও প্রচলিত ব্যবস্থায় তাহার সে পাশ হইতে মুক্ত হইবার কোন উপায় পরিলক্ষিত হয় না। সমবায় সমিতিসমূহ সে-কার্য্যে সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই। এখন প্রস্তাব হইয়াছে—ঋণের টাকা কতকটা বাদ দিয়া মিটাইয়া ফেলা। অধমর্ণের পক্ষে যখন ঋণ শোধ করা অসম্ভব হয়, তখন যদি তাহাকে সর্ব্বনাশ হইতে রক্ষা করিতে হয়, তবে ইহাই একমাত্র উপায়। এ-দেশের প্রজাসাধারণের—অধিবাসিগণের শতকরা ৭০ জনের অবস্থা যদি এইরূপ শোচনীয় হয়, তবে সরকারের পক্ষেই এ-বিষয়ে সচেষ্ট হইতে হয়; নহিলে দেশব্যাপী বিশৃঙ্খলার পঙ্কে উন্নতির রথচক্র বদ্ধ হইয়া যায়। বাংলা-সরকার যদি এই কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে পারেন, তবে যে তাঁহারা দেশবাসীর ধন্যবাদভাজন হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কি ভাবে তাঁহারা অগ্রসর হইবেন, তাহা এখনও প্রকাশ পায় নাই। আপাততঃ তাঁহারা—পঞ্জাবে যেমন হইয়াছে, তেমনই—পল্লীর পুনর্গঠন জন্য একজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছেন এবং আবশ্যক অনুসন্ধান জন্য বেসরকারী ও সরকারী লোক লইয়া একটি সমিতি গঠিত করিয়াছেন।

পঞ্জাবে এই কার্য্যের ভার যে-কর্ম্মচারীর উপর ন্যস্ত হইয়াছে, তিনি কয় মাস পূর্ব্বে একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন, ইংলণ্ডে শতবর্ষকাল যে-ভাবে শিল্পের প্রসারবৃদ্ধি হইয়াছে, তাহাতে কৃষির ও পল্লীর ক্ষতিতে শহরের উন্নতি হইয়াছে। পল্লীগ্রাম শহরবাসীদিগের ক্রীড়াক্ষেত্র বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। এখন সে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে, এখন চিন্তাশীল লোকরা বুঝিয়াছেন, পল্লীগ্রামের অবনতিতে সমগ্র দেশের অবনতি অনিবার্য্য। তাই এখন পল্লীগ্রাম আবার সমৃদ্ধ ও শ্রীসম্পন্ন করিবার চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। যে-সব কারণে ইংলণ্ডে পল্লীগ্রামের সর্ব্বনাশ ঘটিতেছিল, ভারতবর্ষেও সেই সকল কারণ আবির্ভূত হইয়াছে; অথচ বিলাতে শিল্পের উন্নতিতে যে অর্থ সঞ্চিত হইয়াছে পল্লীগ্রামের পুনর্গঠনে তাহা প্রযুক্ত হইতে পারে; ভারতবর্ষের তাহা নাই।

সুতরাং ভারতবর্ষের অবস্থা আরও শোচনীয়। ভারতবর্ষে যে এই অবস্থার পরিবর্ত্তনসাধন সম্ভব হইতেছে না, তাহার কারণ প্রধানতঃ ত্রিবিধ :—

(১) পল্লীজীবন সুখময়, স্বাস্থ্যসুন্দর ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন করিবার উপায় সম্বন্ধে অজ্ঞতা;

(২) এই বিষয়ে যে জ্ঞান আছে, তাহাও কার্য্যে প্রযুক্ত করিবার উদ্যোগের অভাব;

(৩) পল্লীজীবনের উন্নতিসাধনের জন্য সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করিবার উপযোগী প্রতিষ্ঠানের অভাব।

পঞ্জাবে পল্লীগ্রামের পুনর্গঠন চেষ্টায় এই কারণ তিনটি দূর করিবার উপায় নির্ণীত হইতেছে। গত ৪ঠা জানুয়ারী তারিখেও সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তথায় কৃষকদিগকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে শিক্ষা ও সংবাদ দিবার জন্য বেতারের ব্যবহার-ব্যবস্থা হইয়াছে :—

(ক) কৃষি

(খ) স্বাস্থ্য
(গ) শিক্ষা
(ঘ) সমবায়
(ঙ) ফসলের সম্বন্ধে সংবাদ
(চ) আবহাওয়ার অবস্থা
(ছ) বাজার-দর ইত্যাদি

বক্তৃতা, প্রদর্শনী, সিনেমা-চিত্র, বেতার প্রভৃতির সাহায্যে যে উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথ সুগম করা যায়, তাহা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু পল্লীজীবন সুগঠিত করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে স্বাবলম্বী হইতে হইবে। মহাজনের ঋণজাল হইতে কৃষককে মুক্তি দিয়া তাহার নিরাশ হৃদয়ে আশার সঞ্চার করা যেমন প্রয়োজন, যাহাতে তাহার সেই আশা পূর্ণ হয়, তাহার উপায় করাও তেমনই প্রয়োজন। এই জন্য কৃষির ও অন্যান্য শিল্পের উন্নতিসাধনোপায় করিতেই হইবে।

পল্লীপ্রাণ ভারতবর্ষের পল্লীগ্রামগুলি শিল্পের জন্য কিরূপ প্রসিদ্ধ ছিল, তাহা সর্ব্বজনবিদিত। যখন প্লিনী দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, ভারতবর্ষ তাহার পণ্যের বিনিময়ে রোমক সাম্রাজ্য হইতে প্রতিবৎসর বহু অর্থ লইয়া যায়, তখন হইতে শত বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভারতের শিল্পীরা কেবল যে দেশের লোকের ব্যবহার্য্য দ্রব্য উৎপন্ন করিত, তাহাই নহে; পরন্তু তাহাদিগের উৎপন্ন পণ্য বিদেশেও রপ্তানী হইত। শতবর্ষ পূর্ব্বে মাদ্রাজের গভর্ণর স্যর টমাস মনরো মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, এদেশে অল্প কাল মধ্যে বিলাতী মালের অধিক ব্যবহার-সম্ভাবনা নাই। তিনি লিখিয়াছিলেন:—

"যে পণ্য কোন দেশ আপনি অল্পব্যয়ে উৎকৃষ্টরূপ প্রস্তুত করিতে পারে, তাহা সে দেশ কখনই অন্য দেশের নিকট হইতে গ্রহণ করে না। ভারতবাসীরা যে-সকল দ্রব্য ব্যবহার করে প্রায় সে-সকলই ভারতবর্ষে স্বল্পব্যয়ে উৎকৃষ্ট-রূপে প্রস্তুত হয়। কার্পাস ও রেশমের কাপড়, চামড়া, কাগজ, সাংসারিক প্রয়োজনে ব্যবহার্য্য লৌহের ও পিতলের বাসন, কৃষির জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি এই সকলের অন্তর্ভুক্ত। ভারতবাসীরা যে পশমী কাপড় প্রস্তুত করে তাহা মোটা হইলেও তাহার মূল্য অল্প, আর তাহাদিগের উৎকৃষ্ট কম্বল য়ুরোপে প্রস্তুত ঐ দ্রব্য অপেক্ষা অধিক গরম ও দীর্ঘকালস্থায়ী।

মনরো যে-সব পণ্যের উল্লেখ করিয়াছিলেন, সে সকলের মধ্যে কতকগুলির জন্য বঙ্গদেশ প্রসিদ্ধ ছিল; যথা— কার্পাস বস্ত্র, রেশমী কাপড়, পিতলের ও কাঁসার বাসন ও কম্বল।

ঢাকার সূক্ষ্ম বস্ত্রের কথা ছাড়িয়া দিলেও বলা যায়, বাংলায় অন্যান্য কাপড় যে পরিমাণে উৎপন্ন হইত, তাহাতে বাঙালীর প্রয়োজনাতিরিক্ত কাপড় বিদেশে বিক্রয় করা চলিত। ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে শেখ ভীক নামক মালদহের একজন ব্যবসায়ী তিন জাহাজ মালদহী কাপড় পারস্যোপসাগরের পথে রুষিয়ায় প্রেরণ করিয়াছিলেন।

মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, মালদহ ও বিষ্ণুপুরের রেশমী কাপড় একদিন বাংলায় ও বাংলার বাহিরে আদৃত ছিল। বহরমপুর (খাগড়া), দাঁইহাট, নবদ্বীপ, বাঁকুড়া, বরিশাল প্রভৃতি স্থানের কাঁসার ও পিতলের বাসন বাংলার ঘরে ঘরে ব্যবহৃত হইত।

একটি শিল্প যখন সমৃদ্ধ হইয়া উঠে, তখন তাহার আনুষঙ্গিক শিল্পেরও উদ্ভব ও শ্রীবৃদ্ধি হয়। আজ আমরা ফরকাবাদ ও লক্ষ্ণৌ শহরের ছাপাকাপড় দেখিয়া যখন তাহার শিল্পচাতুর্য্যের প্রশংসা করি, তখন আমাদের মনে করা উচিত, বাংলায় রেশমী কাপড় ছাপাইবার জন্য যে রঞ্জনশিল্প সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছিল, তাহা বাংলার গৌরবের কারণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

বাংলায় যে কাগজ ব্যবহৃত হইত, তাহাও বাংলার নানা স্থানে প্রস্তুত হইত। চামড়া সম্বন্ধেও সেই কথা বলা যায়। বাঁকুড়ায় মোটা ও জঙ্গীপুরে (মুর্শিদাবাদ) উৎকৃষ্ট কম্বল প্রস্তুত হইত।

শত বৎসরে অবস্থা কিরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে!

এই পরিবর্ত্তনের ফলে পল্লীগ্রামের শ্রীনাশ অবশ্যম্ভাবী। এখন কৃষিই পল্লীগ্রামের লোকের একমাত্র অবলম্বন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কৃষির অবস্থাও শোচনীয়। কৃষির অবস্থা শোচনীয় হইবার সঙ্গে সঙ্গে অনিবার্য্য কারণে কৃষকের অবস্থাও শোচনীয় হইয়াছে; এত শোচনীয় হইয়াছে যে, অনন্যোপায় হইয়া স্যর জন এণ্ডার্সন বলিয়াছেন, অতঃপর কৃষকের ঋণ কতকটা বাদ দিয়া মিটাইয়া ফেলিতে হইবে। এইরূপে সে ঋণ মিটাইতে হইলে যে টাকার প্রয়োজন হইবে, তাহার ব্যবস্থা

কিরূপ হইবে, তাহা পরে বিবেচ্য। বাংলা সরকার সে-টাকা জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ককে ধার দিতে পারেন। বর্ত্তমানে বাংলা সরকার অল্পসুদে টাকা পাইতে পারেন, সন্দেহ নাই। তাহার পর কৃষক যাহাতে পুনরায় ঋণ করিয়া জড়াইয়া না পড়ে তাহার ব্যবস্থাও করিতে হইবে।

কৃষির অবনতির কারণ ও শিল্পের অবনতির কারণ কতকটা এক। তাহার উপর জমির উর্ব্বরতা হ্রাস কৃষির উন্নতির অতিরিক্ত কারণ। যত দিন বাংলার নদী নালা বহু ছিল, ততদিন জমিতে যে পলী পড়িত, এখন আর তাহা পড়ে না। কিছুদিন পূর্ব্বে সার উইলিয়ম উইলকক্স স্বয়ং পরিদর্শন করিয়া বাংলার জলপথগুলির সংস্কার করিতে বলিয়াছিলেন। তিনি মিশরে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার পরামর্শ উপেক্ষা করা কখনই সঙ্গত হয় নাই। কৃষি ও শিল্প উভয়ের অবনতির অন্য কারণ—উন্নত উপায় অবলম্বনে শৈথিল্য।

উন্নত উপায় অবলম্বন করিলে শিল্পের কিরূপ উন্নতি হইতে পারে, তাহার পরিচয় এই বঙ্গদেশেই আমরা ঠকঠকি তাঁতের প্রবর্ত্তনে পাইয়াছি। এই তাঁতের প্রবর্ত্তনফলে তন্তুবায়দিগের আয় যথেষ্ট বাড়িয়াছে। অন্যান্য শিল্পে সেরূপ কোন চেষ্টা এতদিন হয় নাই। বাংলার শিল্পবিভাগ স্থাপনাবধি এবিষয়ে কোন কাজ করেন নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু চেষ্টা করিলে যে এই কাজ সহজসাধ্য হয়, সম্প্রতি শিল্পবিভাগের কার্য্যে তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। শিল্পবিভাগ ধান ছাটাই, ধান শুকান, শাঁকের চাকি কাটা ইত্যাদির জন্য যে-সব নূতন যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন, সে সকলে শিল্পীর লাভবান হওয়া সহজ। তদ্ভিন্ন বাসনেও বিভাগের ইঞ্জিনিয়ার নূতন উপকরণ ব্যবহার করিতেছেন। এদেশের কাঁসার বাসন যত ভালই কেন হউক না, তাহার মূল্য কিছু অধিক। নূতন যে মিশ্রধাতু আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার মূল্য অপেক্ষাকৃত অল্প। আবার বাসনের ক্ষণভঙ্গুরত্ব বর্জ্জন করিবার উপায়ও আবিষ্কৃত হইয়াছে। এইরূপ শিল্পবিভাগে লৌহের ছুরি কাঁচি ক্ষুর ইত্যাদিতে 'ধার' দিবার নূতন ব্যবস্থা হইয়াছে এবং কলাই-করা মৃৎপাত্রাদি প্রস্তুত করিবার জন্য যে উনান গঠিত হইয়াছে, তাহাতে পোর্সিলেন পর্য্যন্ত হইতে পারিবে, অথচ সে উনান গঠন করিবার ব্যয় অধিক নহে। বাংলার শিল্প বিভাগ এই-সব শিল্প মফঃস্বলে লোককে শিখাইবার জন্য কিছু টাকা পাইয়াছেন এবং শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

অল্প দিন পূর্ব্বে কৃষ্ণনগরে গিয়া শিল্প বিভাগের ডিরেক্টার শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত বলিয়া আসিয়াছেন, স্থানে স্থানে এখন এই-সব শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইতেছে; উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের সুব্যবস্থা করিবার জন্য জেলা বোর্ডকে সচেষ্ট হইতে হইবে। তাঁহারা এইজন্য এক জন স্বতন্ত্র কর্ম্মচারী নিযুক্ত করুন। এই ব্যবস্থায় ক্রেতা ও পণ্যোৎপাদক উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগ সাধিত হইবে এবং পণ্য বিক্রয় সহজসাধ্য হইবে। আমরা দত্ত মহাশয়ের এই প্রস্তাব সমীচীন বলিয়া বিবেচনা করি। ইতিমধ্যে বৃটিশ সাম্রাজ্যের পণ্য বিক্রয় ব্যবস্থা করিবার জন্য বিলাতে যে সমিতি বা বোর্ড স্থাপিত হইয়াছিল, তাহারই চেষ্টায় ভারতবর্ষ হইতে বিলাতে কল রপ্তানীর ব্যবস্থা হইয়াছে, এ বিষয়ে আয়ার্লণ্ডে যাহা হইয়াছে তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। তথায় সরকারের সাহায্য গ্রহণ না করিয়া কয়জন জননায়ক পল্লীশিল্পের পুনর্গঠনের যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহাতে অসাধ্য সাধন হইয়াছে।

বাংলায় সমবায় সমিতিগুলির দ্বারাও সেরূপ কাজ হয় নাই। এখন যদি জেলা বোর্ডগুলি এ-বিষয়ে বিশেষরূপ অবহিত হয়েন, তবে তাহাতে যেমন আমাদিগের স্বাবলম্বনের অনুশীলন হয়, তেমনই সরকারের নিয়ম-নিয়ন্ত্রণযুক্ত হইলে কাজও বোধ হয় ভাল হয়।

আমরা এই প্রবন্ধে পঞ্জাবের পল্লীগঠন কার্য্যে নিযুক্ত রাজকর্ম্মচারীর উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন, বিলাতের মত বৃহৎ শিল্পপ্রধান দেশও এখন বুঝিতেছে, পল্লীগ্রামের ধ্বংসে জাতির অশেষ অকল্যাণ অনিবার্য্য।

বোম্বাইয়ের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণরও এ-বিষয়ে তাঁহার মত প্রকাশ করিয়া লোককে পল্লীর পুনর্গঠন কর্ম্মে প্রণোদিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন।

বাংলার গবর্ণর আজ স্বীকার করিতেছেন- পল্লীগ্রামের পুনর্গঠন ব্যতীত দেশের অবনত অবস্থা নষ্ট করিয়া উন্নতি প্রবর্ত্তনের অন্য উপায় নাই। এই পুনর্গঠনকার্য্যে তিনি আবশ্যক অর্থনিয়োগের প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছেন।

কৃষির ও কৃষকের উন্নতির এবং শিল্পপ্রতিষ্ঠার ও শিল্পজ পণ্য বিক্রয়ের উপর এই কার্য্যের সাফল্য সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করে।

বাংলা সরকার অনুসন্ধান জন্য যে বোর্ড গঠিত করিয়াছেন, সেই বোর্ড আবশ্যক অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাদিগের সিদ্ধান্ত লোকের বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত করিবেন, আমরা এই আশা করি। আমরা ইহাও মনে করি যে, এই কার্য্যের জন্য যে কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছেন, তিনি এ বিষয়ে আবশ্যক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন এবং কৃষি, শিল্প, সমবায়—এই বিভাগত্রয়ে ঘনিষ্ঠ যোগ সাধন করিয়া গঠনকার্য্যের সর্ব্ববিধ উন্নতি সাধনের ব্যবস্থা করিবেন।

সঙ্গে সঙ্গে আমরা বলি, সমবায়-নীতির স্বরূপ যেন আমরা বিস্মৃত না হই। যে কাজ যাহার সে কাজ সে করিলে যত ভাল হয়, যত অল্প ব্যয়ে সম্পন্ন হয়, তত অপরের দ্বারা করাইয়া লইলে হয় না—হইতে পারে না। স্বাবলম্বনের সহিত আত্মসম্মানের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। আমরা যথাসম্ভব স্বাবলম্বী হইয়া কাজ করিলে সে কাজ সমাজে যেরূপ বদ্ধমূল হইবে, অন্য উপায়ে তাহা হইবে না।

বাংলা সরকারের চেষ্টা প্রশংসনীয় এবং উদ্যম আদরণীয়। সে উদ্যম সফল ও সে চেষ্টা জয়যুক্ত হউক। কিন্তু সেই চেষ্টা ও উদ্যম যদি বাংলার লোককে সমবায় নীতিতে কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইতে পারে, স্বাবলম্বী হইতে বদ্ধপরিকর করে, তবে তাহাতে যত উপকার হইবে, তত আর কিছুতেই হইবে না।

শৃঙ্খল

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী

২২

জীবনের সর্ব্বত্র দুঃখভোগের সঙ্গে বিরোধ সুরু করিবে বলিয়া প্রস্তুত হইয়াছিল, কিন্তু এই কয়দিন অজয়ের জীবনে এত বেদনা যতটা কেবল তাহার জীবনেই সম্ভব। দুঃখ ভোগ করিবার ক্ষমতায় নিজেকেও নিজে সে অতিক্রম করিয়া গেল। অসুস্থতার গ্লানি, সেই সঙ্গে সে যে অসুস্থ এই চিন্তার দুঃসহতর গ্লানি। প্রেম লইয়া বেদনা, এত করিয়াও নিজের জীবনে প্রেমের প্রদীপ যে সে জ্বালাইতে পারিল না সেই পরাজয়ের গভীরতর বেদনা। বুঝিতে পারিল না, যথাসর্ব্বস্ব দিয়া ভালবাসিয়াও প্রতিদানে কিছুই যে সে পাইল না সেই দীনতা তাহার বড়, না প্রতিদানে দিবার মত কোনও সম্পদ্ নিজের মধ্যে সে যে খুঁজিয়া পাইল না সেই দারিদ্র্যই তাহার অধিকতর লজ্জাকর।

এতদিন কেবল ঐন্দ্রিলাকে ভাবিয়াই বেদনা পাইত, হাস্যময়ী বীণার চিন্তায় তাহার বেদনাতুর মনের আশ্রয় ছিল, এবারে বীণা ঐন্দ্রিলা উভয়ের চিন্তাই তাহার কাছে সমান বেদনাময় হইয়া উঠিল।

ইন্দ্রিয়ের সমস্ত দ্বার জুড়িয়া যখন জ্বরতাপের অগ্নিশিখা দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিতেছে, তখন তাহার মধ্যে অনন্যচিত্ত হইয়া বসিয়া অগ্নিপরিবৃত তাপসের মত অজয় বহুদিন পর আবার একবার তাহার অন্তরের অনির্ব্বচনীয়তার সঙ্গে, অপরিমেয়তার সঙ্গে পরিচয় করিতে চেষ্টা করিল। ভাবিতে চেষ্টা করিল, এই দুঃখসুখ লাভক্ষতি, এসমস্তের হিসাব নিরুপায়তার হিসাব। তাহার জীবনের এই-সমস্ত ক্ষুদ্র সমস্যার একটি সহজ সমাধান কোনও একটি বৃহৎ উপলব্ধির মধ্যে নিশ্চয় কোথাও আছে, আশান্বিত চিত্তে এই চিন্তাকে প্রাণপণে সে ধরিয়া রহিল। নগরোপান্তের নিভৃত প্রান্তরে আসন্ন সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়াইয়া নিজের যে অতলস্পর্শ রহস্যরূপের সন্ধান সে একদিন পাইয়াছিল, অপরিচয়ের কাল অবগুণ্ঠন সরাইয়া সেই রহস্যের চোখে চোখে চাহিবার সাহস সেদিন তাহার হয় নাই। সেদিনও প্রাণপণ করিয়াই তাহাকে মনের কাছ হইতে সে দূরে ঠেলিয়া দিয়াছিল এবং জীবনব্যাপী তুচ্ছতাকে নিবিড় করিয়া জড়াইয়া ক্রমে তাহার কথা সম্পূর্ণ করিয়াই ভুলিয়া

গিয়াছিল। কিন্তু মাঝখানের এতগুলি দিন ব্যাপিয়া এত যে ঘটনা-পরম্পরা, এত সুখদুঃখ, আঘাত-বেদনা, মান-অভিমান, জয়-পরাজয় তাহার জীবনের উপর দিয়া বহিয়া চলিয়া গেল, তাহার মধ্যেকার আসল মানুষটাকে তাহারা কোন্ জায়গায় স্পর্শ করিয়া গেল? সঞ্চয়ের ভাণ্ডারে সত্যকারের সম্পদ্ কোথায় তাহার কি জমা হইয়াছে? লাভ-লোকসানের হিসাব যদি করিতেই হয়, নিজের মধ্যে কোন্ জায়গায় সে চাহিবে, কোন্ বিচারের মাপকাঠি দিয়া দেনা-পাওনার পরিমাপ করিবে?

তুচ্ছতাকেই যাহারা চরমতম করিয়া জানে, জীবন তাহাদিগকে তুচ্ছতার সম্পদ্ দিয়াই ধনবান্ করে। ছোট সুখদুঃখ আনন্দ-বেদনা লইয়াই জীবন তাহাদের কাছে সত্যের অন্ততঃ একটা পরিপূর্ণ রূপ লইয়া দেখা দেয়। কিন্তু পৃথিবীতে তাহার মত হতভাগ্য আর কে আছে, যাহার নিকট তুচ্ছতা তুচ্ছতা বলিয়া ধরা পড়িয়াছে, অথচ ধ্রুবের সন্ধানে অন্য কোনও দিকে তাকাইবার সাহসও যাহার নাই?

স্থির করিল এইবার তাকাইবে। আর নিজের নিকট হইতে পলাইয়া বেড়াইবে না। যদি দুঃখ পাইতে হয়, সে দুঃখ তাহার জীবনে সত্য হইবে, মোহগ্রস্তের যে সুখ তাহা লইয়া সে সুখী হইবে না। মনে পড়িল পাপের সঙ্গে কলুষের সঙ্গে পরিচয় করিয়াও একদা নিজেকে সে পাইতে গিয়াছিল, কিন্তু তাহার মধ্যেকার আসল মানুষটা সেদিনও তাহার সঙ্গে ছিল না বলিয়া সে পরিচয় ঘটিয়াও তাহার ঘটে নাই। তাহার পর তাহার জীবনে আর যাহা-কিছুই আসিয়াছে, সে-সমস্তও ঠিক তেমনই ভাবেই ব্যর্থ হইয়াছে। সে আনন্দ করিয়াছে, কিন্তু তাহা যেন তাহার নিজের আনন্দ নহে, দুঃখ করিয়াছে কিন্তু সে যেন নিজেকে ছলনা করিয়া দুঃখ দেওয়া, অভিমান করিয়াছে কিন্তু তাহার মধ্যে কে যেন তাহাই লইয়া লুকাইয়া হাসিয়াছে। বীণা-ঐন্দ্রিলাকে লইয়া এই যে এত বেদনা পাইতেছে, সহসা মনে হইল এও যেন তাহার সত্যবেদনা নহে। ঐন্দ্রিলাকে ভালবাসা, বীণাকে ভাল লাগা, এই উভয়েরই মধ্যে কোথায় যেন অতি গভীর আত্মপ্রবঞ্চনা অলক্ষ্যে মিশিয়া রহিয়াছে। নিজেকে পরিপূর্ণ করিয়া জানে না বলিয়া কিছুতেই এই আত্মপ্রবঞ্চনার আড়াল ঘুচিতেছে না, বীণা এবং ঐন্দ্রিলা উভয়েই তাহার জীবনে ব্যর্থ হইতেছে।

হ্যাঁ, ব্যর্থ হইতেছে। এতদিন ধরিয়া হৃদয়কে রক্তাক্ত করিয়া সে যে ভালবাসিল, সে ভালবাসা তাহার নিজের বা অপরের কোনও কাজেই ত লাগে নাই। তাহার এ ভালবাসাকে অবলম্বন করিয়া পৃথিবীতে কোথাও কাহারও জন্য কোনও কল্যাণের স্বর্গ রচিত হয় নাই। তাহার ভালবাসার মধ্যে কল্যাণের রূপ সান্ত্বনার রূপ কোথায় প্রচ্ছন্ন আছে সে পরিচয় না পাইলে ইহাকেই বা শ্রদ্ধার অর্ঘ্য দিয়া কেমন করিয়া অন্তরের মধ্যে সে গ্রহণ করিবে? মমতাময়ী বীণা, মূর্ত্তিমতী করুণা-রূপিণী বীণা, দৃঢ়হাতে তাহার আলিঙ্গন-পাশ যে সেদিন আলগা করিয়া দিয়া গিয়াছিল, সে ত ঠিকই করিয়াছিল। মিথ্যাকে মিথ্যা বলিয়া চিনিতে তাহার মুহূর্ত্তের বেশী দেরি লাগে নাই। অজয়ের স্পর্দ্ধা। কেবল নিজেকে ফাঁকি দিয়াই সে, তৃপ্ত হয় নাই, নিরপরাধা বীণাকেও ফাঁকির জালে জড়াইতে গিয়াছিল। অবশ্য সেইসঙ্গে ইহাও সে জানে, বীণাকে অদেয় সত্যসত্যই কিছু তাহার নাই, অন্ততঃ দিবার মত ধন এমন কিছু আছে যাহা দিয়া দিতে পারিলে জীবনধারণ সার্থক হয়। কিন্তু সে কি জিনিষ যাহা সে দিতে পারে, কিরূপেই বা সবদিক্ রক্ষা করিয়া তাহা দেওয়ার মত করিয়া দেওয়া যায়, যতদিন তাহা না বুঝিতে পারিবে, ততদিন বীণার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইবার অধিকারও তাহার আর রহিল না। নিজে হইতে বীণা আর আসিবে না, কেহ বলিয়া না দিলেও অজয় তাহা নিশ্চয় করিয়াই জানে।

এমনই করিয়া সবদিক্ হইতে সমস্ত রকমে যখন তাহার জীবনের একেবারে ভিত্তিমূলে ভাঙন ধরিয়াছে তখন বিমান একদিন সান্ধ্যভ্রমণ সমাধা করিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, মন্দিরা মরণাপন্ন অসুস্থ, হেমবালার দাসী শ্রীক্ষেত্র হইতে তীর্থ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে মহাপ্রসাদ খাইতে দিয়াছিল, তাহা হইতে বিষম বিপত্তির সূত্রপাত হইয়াছে। অজয়ের জ্বর তখন গত কয়েকদিনের তুলনায় অনেক কম, বিমানকে তাহার ভার বুঝাইয়া দিয়া সুভদ্র পড়ি কি মরি বালিগঞ্জে ছুটিয়া গেল।

তারপর কয়েকদিন ধরিয়া মন্দিরাকে লইয়া যমে-মানুষে লড়ালড়ি। সুভদ্র চিকিৎসার ভার লইয়াছে, হৃষীকেশ তাহাতে বাধা দেন নাই। কিন্তু অজয় সারিয়া উঠিয়া ভাত পথ্য করিল, তখনও মন্দিরাকে লইয়া দুশ্চিন্তার বিরাম নাই।

অজয় যাইতে চাহিয়াছিল, এবারে সুভদ্রই তাহাকে বাধা দিল, কহিল, "আমাদের সারবার মুখে হঠাৎ নিউমোনিয়ার লক্ষণ দেখা দিয়েছে, তোমার বুকের অবস্থা এমনিতেই ত ভাল নয়, এই সময় ছোঁয়াচ লাগলে অল্পেতেই বিপদ্ বাধতে পারে।" অতএব অজয় যায় না, কিন্তু অপর-সকলের অপেক্ষা মন্দিরার কল্যাণ-কামনা সে বেশী জোরের সঙ্গে করে। প্রার্থনা করে, কাঁদে। সুভদ্রকে নানা বিষয়ে উপদেশ দেয়, সর্ব্বদা সমস্ত দিকে তাহার মনকে সচেতন করিয়া রাখিবার চেষ্টা করে। সেই সঙ্গে নিজের মনকে বোঝায়, সে যে যাইতেছে না, বীণা তাহার এই অপরাধকে ক্ষমা করিবে না। হয়ত তাহার জীবনের জট ছাড়াইবার ইহাই এক উপলক্ষ্য হইবে। সে যে কত অযোগ্য তাহা বুঝিতে পারিয়া বীণা তাহাকে ভুলিয়া গিয়া বাঁচিবে। তাহার অসুস্থতায় বীণা প্রাণপাত করিয়া তাহার সেবা করিয়াছিল, আজ বীণার এই ঘোরতর বিপদের দিনে তাহার পাশে গিয়া যে সে দাঁড়াইল না, নিজের সেই অকৃতজ্ঞতার অপরাধকে এইরূপ নানা ছলনায় সে ভুলিতে লাগিল।

সুভদ্র কোনওদিন সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরিয়া আসে, তাহার ফিরিয়া আসিতে কোনওদিন বা গভীর রাত্রি হইয়া যায়। শেষের দিকে সবদিন রাত্রিতেও তাহার ফিরিয়া আসিবার অবসর হয় না। যখন আসে, ক্রমাগত ছটফট করিয়া কাটায়। শেল্‌ফ্ হইতে একটার পর একটা বই পাড়িয়া আনে, পাতার পর পাতা উল্টায়, কোনওটাতে মনোনিবেশ করিতে পারে না। তাহাকে এত চঞ্চল কেহ কখনও দেখে নাই। একদিন বিমানকে বলিল, "ভাই, তুমি গিয়ে ওঁদের বল, ওঁরা কেউ একজন ভাল ডাক্তার ডেকে আনুন, আমার ওপর নির্ভর করতে বারণ ক'রে এসো।"

বিমান বিরক্তিতে মুখ বাঁকাইয়া বলিল, "বল্‌তে হয় তুমি নিজেই গিয়ে বল না।"

সুভদ্র বলিল, "কিছুতেই নিজের মুখ দিয়ে কথাটা বেরবে না। প্রাণ ধ'রে ওর চিকিৎসার ভার আর কারও হাতে আমি দিতে পারব না। আমি জানি, আমি প্রায় নিশ্চয় ক'রে জান, ওকে সারিয়ে দিতে পারব। কিন্তু মরা বাঁচা ভগবানের হাত। যদি কিছু হয়, পৃথিবীকে কেমন ক'রে আমি মুখ দেখাব?"

বিমান বলিল, "তা যদি মনে কর তাহলে চিকিৎসার ভার নিজের হাতে না রাখাই ভাল। পাশ-করা ডাক্তার অতি বড় মারাত্মক ভুল করলেও তাকে সহজে কেউ কিছু বল্‌তে ভরসা পায় না, কিন্তু বলবার ছুতো পেলে তোমাকে কেউ রেয়াত করবে না, সেটা গোড়াগুড়ি জেনে রাখাই ভাল।"

পরদিন ভোরে সুভদ্র ভয়ে ভয়ে কথাটা বীণার কাছেও পাড়িল। বীণা বলিল, "এই কি আপনার এসমস্ত বাজে সেন্টিমেন্টের সময়? আমার মেয়ের ভালমন্দের দায় আমার একলার, আর কারুর নয়। আপনার চিকিৎসাই চল্‌বে।" কিন্তু সুভদ্র একবার তাহার মনে সংশয় ধরাইয়া দিয়াই বিপদ্ করিল। চিকিৎসকের নিজের উপর যদি নিজের শ্রদ্ধা না থাকে, অপরের পক্ষে সে-শ্রদ্ধাকে বেশী দিন বাঁচাইয়া রাখা কঠিন হয়। বিকালে মন্দিরার অবস্থা দেখিয়া ভয়ে বীণার হাত-পা আড়ষ্ট হইয়া আসিল। শুষ্ককণ্ঠে সুভদ্রকে আসিয়া কহিল, "আপনি কি সত্যিই মনে করেন, শেষ রক্ষা করতে পারবেন না?"

সুভদ্র বলিল, "আমার কতটুকুই বা শক্তি, অভিজ্ঞতাই আর কতদিনের, যে জোর ক'রে কিছু বল্‌ব। তবে যতটা সহজ হবে ভেবেছিলাম তা হচ্ছে না দেখতে পাচ্ছি। যদি আর কাউকে ডেকে দেখাতে চান, আমি বাধা দেব না।"

হেমবালার তরফ হইতে, নরেন্দ্রনারায়ণের তরফ হইতে চিকিৎসা-পরিবর্ত্তনের তাগিদ ছিল। বীণাই এতদিন দৃঢ়তার সঙ্গে সকলের সকল কথার প্রতিবাদ করিয়া আসিয়াছে। আজ সুভদ্র নিজেই তাহার সেই জোর অপহরণ করিয়া লইয়াছে, আর একমুহূর্ত্ত অপেক্ষা না করিয়া সে কম্পিত-পদে হৃষীকেশের মহলের দিকে চলিয়া গেল।

রাত্রিতে বাড়ী ফিরিয়া সুভদ্র বিমানের কাছে প্রায় কাঁদিয়া পড়িল, "বলিল, ভাই বৃথাই এতদিন এত মেহনত করলাম। যে-সময়টা সব-চেয়ে বেশী আমি ওর কাজে আসতাম তখনই তার কাছে আমি থাকতে পারলাম না।"

বিমান সব কথা শুনিয়া কহিল, "দোষটা যখন সম্পূর্ণ তোমার তখন তা নিয়ে নাকে কেঁদে আর কি হবে? তুমি যাদের কাছে থাক্‌তে পার না, এমনও ত অনেকেরই অসুখ শেষ অবধি সেরে যায়, আশা করা যাক্ ওরটাও যাবে।"

কিন্তু মন্দিরার অসুখ সারিল না। চার দিনের দিন সুভদ্রই শেষ সম্বাদ লইয়া আসিল। বিমানের বিছানার উপর লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া কহিল, "আমার চিকিৎসক-লীলা এই পর্য্যন্ত। তোমায় বলছি, ভালবাসতে পারা আমার স্বভাবে নেই তবু ওকে আমি কি ভাল যে বাসতাম! কিন্তু আমার ভালবাসায় সে জোর কেন ছিল না যে, ওকে আমি দাবী করতে পারি, সকলকে দুহাতে সরিয়ে দিয়ে বলতে পারি, ও বাঁচুক মরুক আমি দেখব, কারুর কোনো কথায় আমার কিছুমাত্র এসে যাবে না। আমার আত্মাভিমানের কাছে এই ফুলের মত কচি মেয়েটাকে আমি বলি দিলাম।"

তাহার পা হইতে জুতা খুলিয়া বিমান তাহাকে ভাল করিয়া শোয়াইয়া দিল। একটু থামিয়া সুভদ্র আবার কহিল, "তোমাকে আমার বলা রইল, আমার অনধিকার-চর্চ্চার যত কিছু তোড়াজোড়, বই খাতা শিশি বোতল যন্ত্র-পাতি, সব একটা গরুর গাড়ীতে চাপিয়ে কোথাও একটা পুরনো জিনিষের দোকানে কাল ভোরেই ফে'লে রেখে আসবে। ওগুলোকে আর না আমার চোখে দেখতে হয়।"

মন্দিরার মৃত্যু অজয়ের জীবনে যে অশ্রুর প্লাবন বহিয়া আনিল, একমাত্র দুঃখিনী বীণার তলহীন অশ্রুবারিধির সঙ্গে তাহার হয়ত কতক তুলনা চলে। হৃদয়ের সব কয়টি রুদ্ধদ্বার একসঙ্গে সে খুলিয়া দিল, চতুর্দ্দিক্ হইতে ঝড়ের হাওয়ার মত মন্দিরার জন্য হাহাকার, বীণার জন্য হাহাকার বহিয়া আসিয়া আছাড়ি পিছাড়ি খাইয়া ফিরিতে লাগিল। এবারে আর কোথাও কোনও আত্মপ্রবঞ্চনার আড়াল রহিল না। যাহার কাছে আর্ত্ত দেহমন লইয়া এতদিন কেবল সে আশ্রয়-কামনা করিয়া ছুটিয়া গিয়াছে, আজ সহসা তাহাকে আশ্রয় দিবার জন্য, সকল দিক্ হইতে সমস্ত প্রকারে তাহার দেহমন হইতে বেদনার শেষ চিহ্নটিও মুছিয়া লইবার জন্য তাহার হৃদয় ব্যাকুল হইল। তাহার সমস্ত অস্তিত্ব আলোড়িত করিয়া কেবল এই কথাই ধ্বনিত হইতে লাগিল, তুমি আমার কে তাহা আমি জানি না, তোমাকে ভালবাসি কি বাসি না সে তর্কের আজ আমার কাছে কোনও অর্থ নাই, তোমার দুঃখ আজ তোমা-অপেক্ষা আমার নিকট বড় হইয়াছে, আমার নিজের অপেক্ষা বড় হইয়াছে, এই দুঃখ হইতে কোনও দিকে এতটুকুও যদি তোমাকে আমি আড়াল না করিতে পারি আমি সর্ব্বতোভাবে ব্যর্থ হইব। এতদিনের মধ্যে একবারও গিয়া মন্দিরার খোঁজ লয় নাই, এই অনুশোচনা মৃত্যু-যন্ত্রণা অপেক্ষা তাহার বেশী হইল। মনে পড়িল, মাতৃ-গর্ব্বে মন্দিরা একদিন তাহাকে নিজের সন্তানরূপে দাবী করিয়াছিল, কৃতী সন্তানের উপযুক্ত ব্যবহারই সে করিয়াছে বটে!

শোকের প্রথম আবেগটা একটু কাটিয়া যাইবা মাত্রই অজয় বীণার সঙ্গে আসিয়া দেখা করিল। মনে করিয়াছিল, বীণা তাহাকে দেখিয়া একেবারেই মুহ্যমান্ হইয়া ভাঙিয়া পড়িবে। কিন্তু তাহার কোনও ব্যবহারে কিছুমাত্র অস্থিরতা প্রকাশ পাইল না। অজয়কে নীরবে একটি চেয়ার দেখাইয়া দিয়া নিজে খোলা জানালায় একদৃষ্টে বাহিরের দিকে চাহিয়া সে স্তব্ধ হইয়া বসিল। বহুক্ষণ নীরবে কাটিবার পর অজয় কহিল, "ক্ষমা চাইব না, কারণ জানি আমার অপরাধের ক্ষমা নেই। সমস্ত জীবন দিয়ে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে পারি সে-সুযোগ তুমি আমায় ক'রে দাও, এই ভিক্ষা তোমার কাছে আমি চাইতে এসেছি।"

বীণা নীরব রহিল দেখিয়া সে আবার কহিল, "আমি জানি তোমাকে দেবার মত বাইরের বিচারে কিছুই আমার নেই, কিন্তু আমার কাছে অন্ততঃ আমার নিজেটার চেয়ে বেশী মূল্যবান্ আর কি আছে? আমার শ্রেষ্ঠ যা দেবার তাই তোমাকে আমি দিতে চাইছি।"

বীণার ঠোঁট-দুইটা একটু কাঁপিল, অজয়ের দিকে সে চাহিল না, চোখ-দুইটাকে অল্প একটু নামাইয়া কহিল, "তা হয় না।"

অজয় ব্যগ্রকণ্ঠে কহিল, "কেন হয় না?"

"সে আলোচনা আজকের মত থাক না।"

"না, থাকবে না, আমি আজই শুনতে চাই। তোমাকে এমন ক'রে দুঃখ পেতে আর একদিনও আমি দেব না, যদি না-দেওয়া আমার সাধ্যে থাকে।"

বীণা বলিল, "হয় না এইজন্যে যে তুমি আমায় ভালবাস না।"

অজয় বলিল, "এই পৃথিবীতে অন্ততঃ তোমার কাছে আমি আত্মগোপন করব না। হয়ত বাসি না। কিন্তু তোমাকে এত যে ভাল লাগে, তার দাম কি কিছু নয়?"

বীণা বলিল, "তুমি জানো না, জান্‌বার তোমার কথা নয়। তার দাম এত নয় যে শুধু তাই সম্বল ক'রে দুজন মানুষ একসঙ্গে ঘর করতে বেরতে পারে।"

তাহার একটি হাতকে নিজের দুই হাতের মুঠায় চাপিয়া ধরিয়া অজয় কহিল, "কেন?"

হাতটিকে আস্তে ছাড়াইয়া লইয়া বীণা কহিল, "এইজন্যে যে আজ তোমার ভাল লাগছে, কাল আর ভাল না লাগ্‌তে পারে। দুজন কাছাকাছি থাকার কত যে বিড়ম্বনা তা ত তুমি জানো না? কেবল আমাকে নয়, পৃথিবীর কোনও মানুষকেই, কোনও কিছুকেই এরপর একদিন ভাল না লাগ্‌তে পারে। কি তখন বাকী থাকবে যা নিয়ে সেই চরম দুর্গতিকে ভুলবে?"

অজয় কহিল, "যদি ভালবেসে বিয়ে করতে চাইতাম, কি বাকী থাক্‌ত?"

বীণা কহিল, "ভালবাসাটাই বাকী থাকত। সে কখনো মরে না, তার বালাই নিয়ে মানুষ নিজে ম'রে যায়, সে মরে না। তার পরীক্ষাই ত ঐখানে।"

অজয়ের গলার স্বরে হঠাৎ কেমন অস্বাভাবিক জোর আসিয়া লাগিল, বলিল, "কিন্তু মর্‌তে আমি চাই না, আমি বাঁচতে চাই। তোমার কাছে এই প্রার্থনাও আমার যে তুমি আমাকে বাঁচতে দেবে।"

বীণার দুই চোখ ছাপাইয়া এতক্ষণে ঝর ঝর করিয়া কয়েক ফোঁটা জল ঝরিয়া পড়িল, বেদনার কোনও বিকৃতির চিহ্ন তাহার মুখে নাই, বড় করুণ একটু হাসি মুখে আনিয়া বলিল, "মরতে তুমি ভয় পাও বন্ধু?"

অজয় গলার স্বরে জোর দিয়াই কহিল, "হ্যাঁ, ভয় পাই। একথা আজ আমি স্বীকারই কর্‌ব, ভয় পাই। কিন্তু তুমি আমার বন্ধু, তোমার কাছে এই মিনতি আমার, আমাকে তুমি ভুল বুঝো না। ভয় পেতে সত্যিই আমার লজ্জা নেই। এদেশে মহা-সমারোহে মৃত্যুর সাধনা বহু যুগ ধ'রে ত চলেছে, এইবার চলতে হবে বাঁচবার তপস্যা। এই সত্যকেই আমার জীবনে আমি রূপ দিতে চাই, আমার সে সাধনায় তুমি হও আমার মন্ত্রসাথী।"

বীণা কহিল, "কি লাভ হবে, বাঁচবার মত ক'রে যদি বাঁচতে না পার?"

অজয় কহিল, "বেঁচে থাক্‌তে পারাটাই কি একটা লাভ নয়?"

বীণা কহিল, "আজ মনে হচ্ছে, হয়ত নয়।"

অজয় কহিল, "ম'রে যাওয়ার চেয়ে বেশী লাভ নয়?"

বীণা কহিল, "কি হিসেবে লাভ? দেশবিদেশের বড় বড় কথা আমি কখনো ভাবি না তা ত জানোই, কিন্তু সেইদিক্ দিয়েও যদি দেখ, পৃথিবীর অন্য দেশগুলি আমাদের চেয়ে বেশী কোন্‌দিকে কি লাভ করেছে? তারা বেঁচে আছে, তুমি কি চাও ভারতবর্ষ সেইরকম ক'রে বেঁচে থাকুক? মানুষকে মানুষ ব'লে সে মান্য করবে না, ভালবাসবে না, শাণিত হয়ে থাকবে তার নখর, লোলুপ হয়ে থাকবে তার রসনা, প্রেমহীন, দেবতাহীন সেই জীবনকে কি দেশের জন্যে তুমি কামনা কর?"

অজয় বলিল, "নখদন্তহীন আহত মৃগদেহ হয়ে থাকাটাই কি হবে আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য? কাউকে হিংসা করছি না সত্য, কিন্তু ভালই কি বাস্‌ছি? নির্ব্বিচারে সকলকে ভয় কর্‌ছি, সেইটেই কি মনুষ্যত্বের পরাকাষ্ঠা?"

বীণা বলিল, "তাও নয়। বাঁচবার মত ক'রে বেঁচে থাকবার সাধনা করতে হবে। সেই সাধনা তোমার হোক। সে-পথে ভালবাসাকে বর্জ্জন করলে চলবে না, তাতে বোঝা যতই দুর্ব্বহ হোক। সেই হবে তোমার সব-চেয়ে বড় পাথেয়।"

অজয় হঠাৎ নির্ব্বাক্ হইয়া গেল। বীণার শেষ কথার জবাব চট করিয়া তাহার মুখে জোগাইল না। যখন কথা কহিল, তাহার গলায় পূর্ব্বেকার সেই জোর আর অবশিষ্ট নাই, কেবল দুই হাত একসঙ্গে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া নতমস্তকে বলিল, "আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, তোমাকে আমি ভালবাসব।"

বীণা উঠিয়া পড়িল, তাহার ঠোঁটের এক কোণে আবার অত্যন্ত করুণ একটি হাসির রেখা, কহিল, "লোভ হচ্ছে, কিন্তু তবু বলছি, পারবে না, সে পারা যায় না।"

অজয় ছুটিয়া গিয়া তাহার দ্বার-রোধ করিয়া দাঁড়াইল, কাতর মিনতি কণ্ঠে ভরিয়া কহিল, "যদি পারি?"

আবার নীরবতা, আবার কয়েক বিন্দু অশ্রুজল, তারপর বীণা কহিল, "যদি পার, সেদিন আবার এসো। আমি অপেক্ষাই করব। অপেক্ষা করা ছাড়া আমার আর উপায় কি বল?"

বীণার পথ ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া অজয় কহিল, "কিন্তু তুমি

জানো না, জীবনব্যাপী কি দুঃখভোগের মধ্যে তুমি আমায় ফিরে পাঠাচ্ছ। দুঃখ পাওয়া মানুষের সব চেয়ে বড় পাপ, এই সত্যকে বহু দিনের বহু অশ্রুপাতের বিনিময়ে আমি লাভ করেছিলাম—"

বীণা বলিল, "অত ত জানি না, তবে আমার মনে হয়, দুঃখকে অতিক্রম করবার জন্যে যে দুঃখ পেতে হয়, ভালবেসে যে দুঃখ পেতে হয় তা পাপ নয়। দুঃখ যে আমরা পাই না সেই ত বিপদ্, তার সঙ্গে অতি সহজে সন্ধি ক'রে তাকে ভুলে থাকি। যাকে পাপ ব'লে বুঝেছ, তার সঙ্গে সন্ধি করতে তোমাকে আমি দেব না।"

অজয় তবু একবার শেষ চেষ্টা করিয়া কহিল, "হয়ত ভালবাসি না বলেছি, কিন্তু একথাও তোমার জানা দরকার, ভালবাসা কাকে বলে তাও খুব ভাল ক'রে আমি জানি না। এমনও হতে পারে, যাদের ভালবেসেছি ভাবছি, তাদের সত্যিই ভালবাসিনি, তোমাকে যা দিতে পেরেছি, দিয়েছি, সেইটেই সত্যিকারের ভালবাসা। এ ত আমি দেখেছি, অন্যদের কাছে কেবলই নিজকে বড় করি, একমাত্র তোমার কাছে এসে নিজকে ভুলে গিয়ে নিজেকে অতিক্রম করা আমার সহজ হয়। দেশকে ভালবাসি মনে করি, কিন্তু সত্যই কি ভালবাসি? দেশের দুর্গতি, হাজার দিকে তার হাজার রকম লাঞ্ছনা অবমাননা আমার হৃদয়কে স্পর্শ করবার আগে আমার আত্মাভিমানকে ঘা দেয়। আমি যে এই দেশের মানুষ, সে-অবমাননা তাই আমার গায়ে এসে লাগে, এরই নাম আমার দেশপ্রীতি। মানুষগুলি আমার কাছে কিছু না, আমার আত্মভিমানটাই আসলে বড়।"

বীণা বলিল, "অনিশ্চয়তা এ সমস্ত ব্যাপারে তোমার মনে খানিকটা আছেই তা আমি বিশ্বাসেই করি। নিজের মধ্যে নিজেকে খুঁজে পেতে এখনও তোমার দেরি আছে। সেও ত বিপদ্ কম নয়? তোমার মধ্যেই তুমি যখন নেই, কার ঘর আমি করব? কিন্তু কথাটা তা নয়। নিজেকে ভুলে যেতে পারাটাই কি খুব বড় কথা? মানুষকে নিজের মধ্যে ফিরে পাঠাবার ক্ষমতা এক ভালবাসারই আছে, আর সেই ত তার মূল্য।"

ঐন্দ্রিলার পরীক্ষা হইয়া গেল। যা করিয়া সে পরীক্ষা দিল, সে কেবল তাহার অন্তর্যামীই জানেন। শোকছায়াচ্ছন্ন গৃহ, অশ্রুবাষ্পে ভারাক্রান্ত গৃহের বাতাস, প্রতিদিনের প্রিয় জীবনযাত্রায় সহসা বিধাতার অকরুণ হাতের স্পর্শে কি মর্ম্মান্তিক কৃতঘ্নতার রূপ। এমন অবস্থায় জীবনধারণের জন্য অবশ্যকর্ত্তব্য কাজগুলিই কেমন যেন অর্থহীন, অন্তঃসারশূন্য বলিয়া বোধ হয়, প্রোফেসারের দেওয়া নোট, বিজাতীয় ভাষাতত্ত্ব, বহু নামতিথি সম্বলিত সেই ভাষার ইতিহাস, দুর্ব্বোধ্য ব্যাকরণ, এগুলি ত এখন পাগলের প্রলাপেরই নামান্তর।

ঐন্দ্রিলার চিত্তবিক্ষেপ ঘটাইতে চাহে নাই বলিয়া বীণা এই ক'দিন সাধ্যমত তাহার নিকট হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু দূরে থাকিবার জো কি? এবাড়ীতে এমন দ্বিতীয় প্রাণী আর ত কেহ নাই যাহার কোলে মাথা রাখিয়া কাঁদিয়া সে মনের ভার লাঘব করিতে পারে? স্বর্ণলতারাও সম্প্রতি কলিকাতার বাহিরে গিয়াছেন। অশ্রুর স্রোত উদ্বেল হইয়া উঠিলেই ছুটিয়া ঐন্দ্রিলার কাছে তাহাকে আসিতে হইয়াছে। দুই বোনে কোনও কথা হয় নাই, সান্ত্বনার্থে বলিবার মত কোনও কথা ঐন্দ্রিলা খুঁজিয়া পায় নাই, দুইজনে গভীর সমবেদনায় পাশাপাশি বসিয়া নীরবেই অশ্রুবর্ষণ করিয়াছে। হৃষীকেশ নিজের পুস্তকের রাশির মধ্যে আরও যেন ডুবিয়া গিয়াছেন, বাড়ীতে অতিথি রহিয়াছে, অতিথির প্রতি অমনোযোগ বশতঃ সাধারণ সৌজন্যের কোথাও অভাব ঘটিতেছে কি না, সে-বিষয়েও তাঁহার ভ্রূক্ষেপ মাত্র নাই। বীণা-ঐন্দ্রিলার সঙ্গে দিনান্তে একবার মাত্র তাঁহার দেখা হয়, দুইজনকে একই ধরণের অতি সাধারণ কুশল-প্রশ্ন করিয়া, নীরবে তাহাদের চিবুকে মাথায় হাত বুলাইয়া তিনি নিজের মহলে ফিরিয়া আসেন। কন্যাকে পর করিয়া দেওয়ার ফলে ভ্রাতুষ্পুত্রীকেও হেমবালা তেমন করিয়া কাছে টানিতে পারেন না, এবাড়ী হইতে তাঁহার প্রতিষ্ঠার আসন একেবারেই টলিয়া গিয়াছে। মন্দিরা তাঁহাকেও কিছু কম আঘাত দিয়া যায় নাই, কিন্তু বাহিরে তাহার কোনও প্রকাশ নাই, দিবারাত্র নিজের ঘরটিতে একলাই তিনি কাটান, ভক্তিতত্ত্ব বিষয়ক বইটি দ্বিতীয়বার পড়া চলিতেছে। তাঁহার মনের কোথায় যে কি অভিমান, যেন মন্দিরার জন্য প্রকাশ্যে অশ্রুবিসর্জ্জনেরও তিনি অধিকারী নহেন। ঐন্দ্রিলা মায়ের এই ব্যবহার

লক্ষ্য করিয়া বিরক্ত ও ব্যথিত হইতেছিল, বীণার কাছে এই লইয়া তাহার লজ্জাও ছিল কম নয়। কিন্তু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কোনও বিষয়ে কিছু বলা বা করা তাহার স্বভাব নহে বলিয়া উপলক্ষ্যের অভাবে মাতাকে এতদিন কিছু সে বলিতে পারে নাই। উপলক্ষ্য হেমবালাই জুটাইয়া দিলেন। ঐন্দ্রিলার পরীক্ষা শেষ হইবার দিন-পাচেক পর একদিন তাহাকে নিজের ঘরে ডাকাইয়া আনিয়া কহিলেন, "এইবার ত পড়াশোনা চুকল, এবারে দেশে ফেরবার ব্যবস্থা করা যাক, কি বলিস ?"

ঐন্দ্রিলার মন একে ত স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল না, থাকিবার কথাও নহে; মৃত্যুর অতি-সান্নিধ্য মানুষের অস্তিত্বের ভিত্তিমূলকে নড়াইয়া দিয়া যায়. ঐন্দ্রিলার বেলাতেও সে-নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই; তদুপরি মায়ের সম্বন্ধে তাহার এতদিনকার সঞ্চিত বিরক্তি। পলকে প্রলয় ঘটিয়া গেল। চোখ মুখ লাল করিয়া সে বলিল, "হ্যাঁ, তা বই কি। দিদির এই ত অবস্থা বাড়ীতে এমন একটা লোক নেই যে ওর দিকে একটু তাকিয়ে দেখে। এতদিন গণ্ডেপিণ্ডে তাদের খেয়ে নিজেদের কাজ উদ্ধার ক'রে নিয়ে সদলবলে প্রস্থান করবার এই উপযুক্ত সময় বটে। তোমার যোগ্য কথাই হয়েছে।"

হেমবালারও মনের এতদিনকার যতদিকের যত জমানো তাপ আজ একসঙ্গে কথার মুখে বাহির হইয়া আসিল, কহিলেন, "দেখ, তোকে কেউ কিছু বলে না ব'লে ভারি আস্কারা পেয়ে গিয়েছিস। দুপাতা বই প'ড়ে দেমাকে মাটিতে পা পড়ে না মেয়ের। কি এমন কথা হয়েছে যে আমাকে এই রকম ক'রে তুই বলবি ? আমার যোগ্য কথা হয়েছে মানে কি শুনি ?"

ঐন্দ্রিলা বলিল, "নিজের দিকটা ছাড়া আর কারও দিকে তাকিয়ে দেখা তোমার স্বভাব নয়, তা না হলে দিদির বিপদের সময় তাকে একলা ফেলে চ'লে যাবার কথাটা তোমার মনে আসত না।"

হেমবালা বলিতে পারিতেন, এখনই চলিয়া যাইতে হইবে এমন কথা ত আমি বলি নাই, যাওয়া যতদিন শোভন দেখাইবে না ততদিন থাকিয়া গেলেই হইল। কিন্তু উত্তেজনার মুখে কথার স্রোত বক্র পথে বহিয়া গেল, কহিলেন, "অন্যের দিকটা আমি দেখি না, তুই দেখিস, আর এ-অপবাদ তুই আমাকে না দিলে চলবে কেন ? মানুষের কৃতজ্ঞতার বালাই ব'লেও একটা জিনিষ থাকে, তোর তাও নেই। তোর জন্যে পৃথিবীতে এমন কোন্ দুঃখ আছে যা নিজেকে আমি দিইনি ?"

ঐন্দ্রিলা কহিল, "মা হয়ে পেটে ধরেছ সেজন্যে যতটা করবার তা করেছে, আর সেজন্যে সন্তানের কাছে সাধারণ কৃতজ্ঞতা হিসাবে যা তোমার পাওনা সে ত আছেই। কিন্তু তার বেশী কোন্‌দিকে কি আর তুমি আমার জন্যে করেছ ? প্রাণপণে হাড় জ্বালিয়েছ।"

ঐন্দ্রিলা চলিয়া যাইতেছিল, হেমবালা প্রায় চীৎকার করিয়া কহিলেন, "কি করেছি, কি করেছি আমি তোর, না ব'লে এঘর ছেড়ে যাস্ যদি ত আমার অতি বড় দিব্যি রইল।"

ঐন্দ্রিলা ফিরিল, হেমবালার একেবারে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া চাপা গলায় কহিল, "কি করেছ তা তুমি বেশ ভাল ক'রে জানো। আমার কাছে কেন জানতে চাইছ ? আমি যদি জানতাম তবে ত কথাই থাকত না, কিন্তু জানতে দিতে তোমার সাহস হয়নি। কেন জানতে দাওনি ? কি অধিকার আছে তোমাদের আমার কাছ থেকে লুকোবার ? যদি পুরোপুরি লুকোতে পারতে, কথা থাকত না। কিন্তু আমার ভালমন্দ বোঝবার বয়স হয়েছে, জানো সবটা লুকোতে পারনি এবং শেষ অবধি কিছুই লুকোতে পারবে না. তবু আমাকে সব বলনি কেন ? বললে তোমাদের কি ক্ষতি হত ?"

হেমবালা রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "যদি কিছু লুকিয়ে থাকি, তোরই ভালর জন্যে লুকিয়েছি।"

ঐন্দ্রিলা কহিল, "আমার ভালর জন্যে লুকিয়েছ ! অন্য মানুষের ভালমন্দ. তার নিজের চেয়ে বেশী বোঝে, কোনো মানুষেরই এতটা অহঙ্কার থাকা উচিত নয়।"

হেমবালা এবার একেবারেই ভাঙিয়া পড়িলেন, কাঁদিয়া কহিলেন, "তা বেশ, কি তুই জানতে চাস্, উনি ত এখানেই রয়েছেন, ওঁকেই না-হয় গিয়ে জিজ্ঞেস কর, আমায় কেন সবাই মিলে জ্বালাস্ ?"

ঐন্দ্রিলা তবুও কহিল, "আমাকে কিছু না বলবার ওঁর অধিকার আছে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উনি আমার কিছু ক্ষতি করেন নি, কিন্তু পৃথিবীসুদ্ধ লোকের কাছে তুমি আমার মাথা হেঁট করেছ, তুমি আমার নিজের প্রতি নিজের শ্রদ্ধা কেড়ে

নিয়েছ, আমার আনন্দ কেড়ে নিয়েছ, তুমি আমাকে বল্‌বে না কেন?"

নরেন্দ্রনারায়ণ দুজনেরই অলক্ষ্যে কখন দরজার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, একটুখানি কাশিয়া আস্তে দরজা ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিলেন। ঐন্দ্রিলা ছিট্‌কাইয়া মায়ের হইতে খানিকটা দূরে সরিয়া গিয়া কিছুক্ষণ নীরবে অপেক্ষা করিল, তারপর দ্রুতপদে বাহির হইয়া একেবারে ছাতে চলিয়া গেল।

হেমবালার প্রকৃতিস্থতা ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত নরেন্দ্র নীরবে অপেক্ষা করিলেন, তারপর নিজেই একটা আসন লইয়া বসিয়া কহিলেন, "আমি সবই শুনেছি। ও যখন এত ক'রে জান্‌তে চাইছে তখন ওকে সব জান্‌তে দেওয়াই আমাদের উচিত হবে।"

হেমবালা তীব্রস্বরে কহিলেন, "তাহলে তুমি এবং তোমার মেয়ে, দুজনেরই সঙ্গে আমার সম্পর্ক চিরকালের মত চুক্‌বে তা ব'লে রাখছি।"

নরেন্দ্র কহিলেন, "তবু ওকে বলতেই হবে। সেদিন এবিষয়ে তোমার সঙ্গে যখন কথা হ'ল, মনে করেছিলাম, যে-কোনো মূল্য দিয়ে হোক, তোমাকে ফিরে নিয়ে যেতে পার্‌লেই আমি সুখী হব। কিন্তু এই ক'দিন মেয়ের অবস্থা দে'খে দে'খে আমার মন একেবারেই ভেঙে গিয়েছে, তারপর আজকের এই ব্যাপার। আমি এখন বুঝতে পার্‌ছি, ওকে কাঁদিয়ে ফে'লে রেখে গিয়ে তোমাকে নিয়েও আমি সুখী হতে পার্‌ব না। তুমি ত সুখ দুঃখ এ দুয়েরই বাইরে, কিন্তু আমার কথা আমি বল্‌ছি, ওর দুঃখের পাশে নিজের কোনো সুখভোগই আমার কিছু নয়। আমাদের ত ঐ একটি বই আর নেই, ওকে পর ক'রে দিয়ে তারপর বেঁচে থাক্‌বার আমাদের কি অর্থ থাক্‌বে?"

হেমবালা কথার সুরে শ্লেষ ভরিয়া কহিলেন, "নিজের কীর্ত্তিকাহিনী সব ওকে বল্‌লেই মেয়ে এক মুহূর্ত্তে খুব আপন হয়ে উঠবে, এই আশা কি তুমি কর্‌ছ?"

নরেন্দ্র কহিলেন, "তা কর্‌ছি না। মানুষ পর হোক, আপন হোক, সেটা তত বড় কথা নয়, সম্পর্কটা সত্য হওয়াই আসল। অন্ততঃ ওর মনে কিছু একটা যে হয়েছে সে বিষয়ে ত আর সন্দেহ নেই? কল্পনায় আমার অপরাধকে হয়ত সে অনেকখানি বেশী বাড়িয়ে ভাবছে। নিজের দিক্ দেখেও তাকে আমার সব বলা প্রয়োজন। না বললে কোনোদিন আমাকে ও ক্ষমা করবে না, তা নিশ্চিত। অপরাধ যা তা ত থাক্‌বেই, তার ওপর সত্যগোপনের অপরাধ আর-একটা বাড়বে। যদি সব বলি, হয়ত সব বুঝে ক্ষমা শেষ পর্য্যন্ত সে আমাকে কর্‌তেও পারে। পারবার সম্ভাবনা যখন আছে, তখন সে-সুযোগ আমি ছাড়ব না। তাছাড়া ওকে মানুষ ক'রে তুলেছি যখন, মানুষের মত ব্যবহার তার সঙ্গে কর্‌ব এবং সেই রকম ব্যবহার প্রত্যাশাও কর্‌ব।"

হেমবালা লিখিবার চৌকিটার উপর মাথা গুঁজিয়া আকুল কান্নায় ভাঙিয়া পড়িতে লাগিলেন, বলিলেন, "মানুষের মত ব্যবহার আমারই কেবল এ পৃথিবীতে কোথাও পাওনা নয়। ভগবান্ জানেন, আমার যা দুঃখ তার কোথাও তুলনা নেই।"

নরেন্দ্র তাঁহার মাথায় ধীরে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন, আজ হেমবালা বাধা দিলেন না। নরেন্দ্র কহিলেন, "আমি জানি। আমি সত্য কথাই বল্‌ছি। তোমার যে কি দুঃখ তা আমি জানি। এই কথাটাই তোমাকে আমি বল্‌তে চাই, যে দুঃখ আমি তোমাকে দিয়েছি তা দূর করবার ক্ষমতাও একমাত্র আমারই আছে, পৃথিবীর আর কারও তা নেই। সেইটে বুঝে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার আমার যে ন্যায্য অধিকার তা তুমি আমাকে দাও। ইলুকে সব ব'লে সে প্রায়শ্চিত্ত সুরু হোক।"

হেমবালা কোনও কথা কহিলেন না, প্রাণপণে নিজেকে সংযত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। একটু থামিয়া নরেন্দ্র আবার কহিলেন, "তাছাড়া একটা দিক্ তুমি একেবারেই দেখছ না। যে অপরাধ আমার একলার, মেয়ের কাছে দুজনেই কেন তার জন্যে অপরাধী হয়ে থাকবে? সব বলবার ফলে আমি যদি ওকে চিরকালের মতই হারাই, তুমি আবার ওকে সম্পূর্ণ ক'রে ফিরে পাবে, আর সেইটেই হবে সব চেয়ে বড় লাভ।"

একতলার পিছনের দিকে একটা বড় ঘরে নরেন্দ্রনারায়ণের বাস নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। সেইদিনই সন্ধ্যায় ঐন্দ্রিলাকে একাকী সেই ঘরে ডাকিয়া লইয়া নরেন্দ্র বলিবার যাহা সমস্তই তাহাকে বলিলেন, নিজের অপত্যকে যেমন করিয়া সব বলা যায়।

নিজের ব্যবহারকে সমর্থন করিবার জন্য কোনও দিক্‌ হইতে কোনও যুক্তির অবতারণা করিলেন না, দণ্ড চাহিলেন না, ক্ষমাও চাহিলেন না।

বীণা বলিল, "এ কি কাণ্ড!"

একটা বড় গোছের স্যুটকেসে আরও কিছু কাপড়-চোপড় ঠাসিয়া ভরিয়া ঐন্দ্রিলা কহিল, "আমি চলেছি।"

বীণা কহিল, "সে কি, কোথায়? এ কি পাগলামি সুরু করেছিস? কি হয়েছে রে ইলু?"

ঐন্দ্রিলা কহিল "তোমার পায়ে পড়ি দিদি, আমাকে কিছু জিজ্ঞেস কোরো না. আমি কিছু বলতে পারব না।"

বীণা কহিল, "আমাকেও বলতে পারবি না, এমন কি ব্যাপার হঠাৎ ঘটল? লক্ষ্মীটি, বল্‌ কি হয়েছে।"

ঐন্দ্রিলা শক্ত হইয়া বলিল, "বল্‌তে পারব না, তার বেশী আর কিছু বলা আমার সাধ্যে নেই। তোমাকেও এই অবস্থায় ফে'লে যাচ্ছি, তার থেকে যতটা বুঝবার বুঝবে।"

ঐন্দ্রিলাকে বীণা যত জানিত এত আর কেহ নহে, তাছাড়া ব্যাপার অনুমানে কতক বুঝিল, তাহার গলা শুকাইয়া উঠিয়াছিল, কহিল, "কিন্তু কোথায় যাচ্ছিস্‌ তা ত বল্‌তে পারিস?"

ঐন্দ্রিলা কহিল, "সুলতাদিদের ওখানে।"

বীণা কহিল, "কিন্তু সুলতাদিরা এখানে নেই তা ত জানিস?"

ঐন্দ্রিলা কহিল, "জানি। তাঁদের দেশের বাড়ীতেই কিছুদিনের মত যাচ্ছি।"

"তারপর?"

"তারপর যদি কপালে থাকে ত আবার দেখা হবে।"

"বাবা! কি সুদিনই যে চলেছে আমার।" বলিয়া বীণা দুই করতলে মুখ ঢাকিয়া বিছানার পাশে মাটিতে বসিয়া পড়িল।

তাহার পাশ ঘেঁসিয়া বসিয়া শাড়ীর আঁচলে তাহার উদ্গত অশ্রু মুছাইয়া দিতে দিতে ঐন্দ্রিলা কহিল, "তোমার এমন দুঃখের দিনে আমি তোমার কোনো কাজে লাগলাম না এ ক্ষোভ আমার মরলেও যাবে না। কিন্তু একটা কথা ব'লে যাচ্ছি, আমাকে খুব নিষ্ঠুর হয়ে বিচার করবার আগে সেই কথাটা মনে কোরো। তুমি যা হারিয়েছ তার তুলনা নেই, কিন্তু যে জিনিষ আজ আমারই খোওয়া গেছে তার মূল্য আমার কাছে অন্ততঃ খুব কম ছিল না। কিছুদিন একটু বাইরে কোথাও যেতে না পেলে আমি নিঃশ্বাস আটকে ম'রে যাব।"

বীণা বলিল, "থাক, বলিস না, শুনতে চাই না, দরকারও নেই। তোকে নিষ্ঠুর হয়ে বিচার আমি করব না তা তুই ভাল ক'রেই জানিস্‌। যাচ্ছিস্‌ যে, কে তোকে নিয়ে যাচ্ছে?"

ঐন্দ্রিলা বলিল, "সুভদ্রবাবুকে বল্‌ব, আমাকে পৌঁছে দিয়ে আস্‌তে।"

বীণা একটুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, কহিল, "তা নিয়ে যে কথা উঠবে।"

ঐন্দ্রিলা কহিল, "কথা এমনিতেও কত ওঠে। আর সেইজন্যেই বিশেষ ক'রে আরও ওকে আমি নিয়ে যাচ্ছি।"

বীণা কহিল, "তুই ব'ললেই বলছি। যদিও আমার নিজেরও এতটা সাহস হত কিনা সন্দেহ। আগুপিছু ভাল ক'রে ভেবে দেখেছিস্‌?"

ঐন্দ্রিলা কহিল, "পরে ভাব্‌ব: ভাব্‌বার অবস্থায় আমার মনটা এখন নেই।"

বীণা কহিল, "সেইজন্যেই ত আরো বেশী ভয় পাচ্ছি।"

ঐন্দ্রিলা কহিল, "তুমি বৃথাই ভয় পাচ্ছ, আমার মনে সাহসের অভাব নেই তা ত জানো। দরকার হয়, প্রতিকারের জন্যে শেষ পর্য্যন্ত যেতেও আমি পেছপা হব না। তোমার গাড়ীটাকে একটু ব'লে দাও দিদি।"

"পিসীমা, পিসে-মশায়?"

"তাঁদের কাছে আমি বিদায় হয়ে এসেছি। মাকে তুমি একটু দেখো। তুমি দেখবেই জানি. তবু বলছি।"

"বাবা?"

"ঐ একটি মানুষ পৃথিবীতে আছেন, যাঁকে এ মুখ আমি এখন দেখাতে পারব না। আমার হয়ে তুমিই তাঁকে যা বল্‌বার বোলো।"

রাত দশটায় শিয়ালদহের ওয়েটিং-রুমে বীণার সঙ্গে আবার ঐন্দ্রিলার সাক্ষাৎ হইয়া গেল। এবার ঐন্দ্রিলারও অশ্রু বারণ মানিল না, বীণার বুকে মুখ লুকাইয়া বলিল, "দিদি, আবার তুমি আমার কাছে কেন এলে? তোমাকে ছেড়ে যেতে

এমনিতেই যে আমার কি হচ্ছে তা আমিই জানি, কেন সেটাকে আরও কঠিন ক'রে দিচ্ছ ?"

সে শান্ত হইলে বীণা কহিল, "আমি কেবল দেখা করতেই আসিনি। তখন বলা উচিত কি না ঠিক করতে না পেরে বলিনি, বলতে এলাম, সুভদ্রবাবু তোকে পৌঁছতে যাচ্ছেন, অজয় ত ব্যাপারটা ভুল বুঝবে না ?"

ঐন্দ্রিলা কহিল, "আর সবাই ভুল বুঝলে যতটা ক্ষতি তার চেয়ে বেশী কি ক্ষতি তাতে হবে ?"

বীণা কহিল, "এই শেষবার তোকে বল্‌ছি, তুই ভুল করিস নি। ও তোকে ভালবাসে।"

ঐন্দ্রিলা কহিল, "এ নিয়ে যাবার মুখে তোমার সঙ্গে আজ তর্ক করতে ইচ্ছে করছে না, তবু বল্‌ছি ভুল তুমিই করছ। আসল কথা, এই ভালবাসাবাসি ব্যাপারটার উপরেই আমার ঘেন্না ধ'রে গেছে, আমি তোমাকে সত্যিই বলছি। এই যে জিনিষটাকে অন্ধকারে গাঢাকা দিয়ে থাকতে হয়, এই যাকে নিয়ে সংশয়-সমস্যার শেষ থাকে না।...মানুষকে কেন ভালবাসতে হবে, জীবনে তার সত্যিকারের প্রয়োজন কতটুকু, কি সেই প্রয়োজন মিটাবার শ্রেষ্ঠ উপায়, কতটুকু তার ভাল কতটুকু মন্দ, সে-প্রয়োজন মেটাবার পথে সমাজের বিধানই বা কতটুকু মান্য কতটুকু নয়, যেজন্যেই হোক এই সব প্রশ্ন আজ আমার জীবনে এসে পড়েছে। যদি এ জিনিষটাকে বাদ দিয়ে চল্‌তে পারি, আমার অন্তর্য্যামী জানেন তাই চলতেই আমি চেষ্টা করব। যদি না পারি, শেষ পর্য্যন্ত চেষ্টা যদি বিফলই হয়, আমার মনে এই-সমস্ত দ্বন্দ্ব যতদিন না মিটবে ততদিন অন্ততঃ আমি এ-পৃথিবীর বাইরের মানুষ। আমার ভালমন্দ বুঝবার বয়স হয়েছে, আশৈশব একমাত্র সত্যকে আমি কামনা করেছি, সত্য যা ভাল ক'রে তাকে জেনে একমাত্র সেই পথ ধ'রে আমি চল্‌তে চাই, আমাকে কেউ তোমরা বাধা দেবে না।"

পথে আসিতে সমস্ত পৃথিবীর কি কুৎসিত ক্লেদলিপ্ত চেহারা। ভব্যতার বহিরাবরণের অভ্যন্তরে লোকালয়ে লোকালয়ে গৃহে গৃহে দিন হইতে দিনান্তরে কি জঘন্য কদর্য্যতার পুনরাবৃত্তি। বাহিরে ইহার সঙ্গে মানুষের বিরোধের শেষ নাই, কিন্তু অস্তিত্বের কোন্ একটা গভীরতম জায়গায় প্রতি মানুষ ইহার সঙ্গে কায়মনোবাক্যে সন্ধি করিয়া রাখিয়াছে। সমস্ত পৃথিবী জুড়িয়া এই নির্লজ্জ মিথ্যাচারই বা কি কুৎসিত।

ক্লান্তিতে চোখে তন্দ্রা জড়াইয়া আসিয়াছিল, আধ-ঘুম আধ-জাগরণে হঠাৎ ঐন্দ্রিলার সমস্ত বুকটা হাহাকার করিয়া উঠিল। যে-পিতাকে সে ফেলিয়া আসিয়াছে তাঁহার জন্য নয়, যে-পিতাকে সে হারাইয়াছে তাঁহার জন্য। দুই হাতে বুকটাকে চাপিয়া ধরিয়া সে উঠিয়া বসিল। ক্রমে তন্দ্রার ঘোরেই ভাবিতে লাগিল, যে-জিনিষটাকে কদর্য্য মনে করিতেছি, হয় ত কদর্য্যতাই তাহার সমস্তটা রূপ আসলে নয়। আমার যে পিতাকে আশৈশব আমি জানিতাম, হয়ত সত্যকারের কোনও কদর্য্যতা তাঁহার স্বভাবে সম্ভব নয়। হয়ত তাঁহার ব্যবহারের সপক্ষে যুক্তি সত্যসত্যই কিছু আছে। কিন্তু কি সে যুক্তি তাহা কে আমাকে বলিয়া দিবে ? কতদিনে তাহা আমি জানিতে পাইব ?

নৈহাটিতে সুভদ্র তাহার গাড়ীর জানালায় আসিয়া তাহার খবর লইল, বলিয়া গেল, "আপনি ব'সে থাকবেন না, নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোন।—গোয়ালন্দে গাড়ী পৌঁছলে আমি এসে আপনার ঘুম ভাঙাব।"

কিন্তু তাহার ঘুম আসিল না। আর-একটি মানুষের মুখ ক্রমাগত মনে পড়িতে লাগিল, সে মুখ অজয়ের। বুঝিতে পারিল, কত সহজে আজিকার এই দিনটি চির-বিদায়ের দিন হইতে পারে। সে ভারতবর্ষের নারী, পিতামাতার আশ্রয় তাহার টুটিয়াছে, ইহার পর কোথায় কোন্ মহা অন্ধকারে চিরকালের জন্য তাহার বাস নির্দ্দিষ্ট হইয়া আছে কে জানে ? জীবনের নিকট হইতে এখনই তাহাকে কোনও কারণে বিদায় লইয়া যাইতে হয় যদি, ত তাহা লইয়া তাহার মনে কোনও ক্ষোভই অবশ্য থাকিবে না, কিন্তু অনন্তকাল ধরিয়া আর কোথাও সেই গভীর দৃষ্টি, সেই গর্ব্বোন্নত কিন্তু চিন্তাচ্ছায়াচ্ছন্ন কপাল, কাল অগ্নিশিখার মত কেশরাশি, সুকুমার নাসিকার নীচে এক সঙ্গে দৃঢ়তা ও কারুণ্যে মণ্ডিত দুইটি ঠোঁট, সর্ব্বোপরি বিদ্যুৎগর্ভ সেই কণ্ঠস্বর তাহার জন্য কোথাও অপেক্ষা করিয়া থাকিবে না ভাবিতে তাহার হাসি পাইল।

সুভদ্র ঐন্দ্রিলাকে পৌঁছাইয়া ফিরিয়া আসিবার আগেই অজয় আবার একবার বীণার কাছে আসিয়া ধর্না দিল।



অভিসারিকা

শ্রীরামগোপাল বিজয়বর্গী

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

বলিল, "তুমি আমাকে কি বোঝাতে চাইছ আমি কিছুই বুঝব না। আমি কেবল একটি কথা বুঝি, তোমাকে প্রাণপণে আমি কামনা করি, তোমাকে না হলে আমার চল্‌বে না।"

বীণা মনে মনে হাসিল, ভাবিল, মনের মানুষটি দুদিন চোখের আড়াল হতেই এত রাগ, এখনই নিজেকে চরম শাস্তি কিছু একটা না দিয়ে দিতে পারলে তোমার আর চল্‌ছে না। তোমাকে জান্‌তে ত আমার আর বাকী নেই বন্ধু। কিন্তু মুখে কিছু বলিল না। অধোমুখে বসিয়া পায়ের আঙুলে কার্পেটের একটা ফুলকে নিপীড়িত করিতে লাগিল।

অজয় কহিল, "তোমার পায়ের ঐ আঙুলগুলি থেকে তোমার মাথার চুল পর্য্যন্ত এমন কিছু নেই যা আমার অকামযোগ্য, যা আমার চোখে অসুন্দর। তোমার হাসি, তোমার অশ্রু, এ দুয়েরই মধ্যে আমার অস্তিত্বকে যে-কোনো মুহূর্ত্তে আমি ডুবিয়ে দিতে পারি। তোমার রোজকার জীবনযাত্রার এমন কোনো খুঁটি-নাটি নেই যা আমার কাছে অসীম রহস্যের মূল্যে মূল্যবান্‌ নয়। তোমার সব নিয়ে আমার মুগ্ধদৃষ্টিতে তুমি যে কি সুন্দর, তা তোমাকে বোঝাতে পারব না। এগুলো কি কিছুই নয়, ভালবাসাটাই সব? আমার এই এত সত্য জীবন্ত কামনা, এর কোনো দাম নেই? এর উপরে আমার যে আনন্দের স্বর্গ আমি তৈরি কর্‌তে পারি, পৃথিবীর আর কোন্‌ কল্যাণ, আর কোন্‌ স্বর্গ তার চেয়ে বড়?"

বীণা তবুও নিরুত্তর রহিল দেখিয়া একটু থামিয়া অজয় আবার কহিল, "জীবনের সকল সমস্যার একটা সহজ মীমাংসা নিজেরই অজ্ঞাতে চিরকাল আমি ক'রে এসেছি, সে হচ্ছে আমার নিজের প্রতি নির্ম্মমতা। পৃথিবীর যেখানে যা-কিছু নিয়ে আমার বিরোধ বেধেছে, বিরোধ না ক'রে আমি জয়ী হয়েছি। আমি যে ইচ্ছে করলেই হাত বাড়িয়ে না নিতে পারি এই গর্ব্ব দিয়ে নিজের জীবনের শূন্যতা ভরিয়েছি। আজও আমি জানি, আমার জীবনের সমস্যা খুব সহজে মেটে, যদি তোমাকে আমি পরিপূর্ণ ক'রে ত্যাগ করি। কিন্তু কেন আমি তা করব? তোমাকে বাদ দিয়ে আমার জীবনে ভালবাসা যা আছে তা থাক্‌ না, তার সঙ্গে তোমাকে কোনো না কোনো রকম ক'রে আমি মিলিয়ে দেবই। সেই ত হবে আমার মনুষ্যত্বের পরীক্ষা।"

বীণা কহিল, "তোমার কোন্‌ কথার কতখানি মানে দাঁড়ায় তা তুমি ভেবে দেখছ না। আজ কোনো কারণে তুমি উত্তেজিত হয়ে এসেছ, এ আলোচনা আজ এই পর্য্যন্তই থাকুক।"

গভীর বেদনায় অজয়ের ঠোঁট দুইটা ভাঙিয়া আসিল। কহিল, "আমার মনে কোনো অন্যায় নেই, না জেনে অপরাধ করি যদি তুমি আমাকে ক্ষমা কোরো। আমি জানি না, এ আশা আমার কেন কিছুতেই যায় না যে এ-পৃথিবীতে একমাত্র তুমিই আমায় ঠিক বুঝবে, কোথাও কিছু নিয়ে ভুল করবে না।"

বীণা একটু অনুতপ্ত হইল কহিল, "না, আমি ভুল করিনি, তুমি বল কি বলতে চাও, আমি শুনছি।"

প্রায় আধঘণ্টা ধরিয়া অজয় একটা কথাকেই নানা রকম করিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বলিতে চেষ্টা করিল। বলিল, দুই হাজার বৎসর ধরিয়া এ দেশের মানুষ নিবৃত্তির মন্ত্র, বৈরাগ্যের মন্ত্র জপ করিয়াছে, তাহার ফলে চতুর্দ্দিকে সভ্যতার এই কঙ্কালাবশেষ অস্থিচর্ম্মসার মূর্ত্তি। আমার জীবনে সুরু করিতে চাই আমি তার বিপরীত সাধনা। প্রাণপণে যাহা কামনা করি তাহা লাভ করিতেও প্রাণপণ করিতে চাই, তারপর ফলাফল কি হয় তাহা দেখিব। বলিল, "তোমাকে নিয়ে নিজেকে আমি ভুলব এ তুমি ইচ্ছে কর না, কিন্তু যে-জীবনের মধ্যে আমাকে তুমি ফিরে পাঠাচ্ছ, তোমাকে না ভুললে সেখানেই বা নিজেকে পরিপূর্ণ ক'রে আমি পাব কি ক'রে? তুমি আমাকে হার মান্‌তে দিতে চাও না, কিন্তু তোমাকে ছেড়ে দেওয়া সেও ত আমার হার মানা? কেন হার মানব? কেন তোমাকে ছেড়ে দেব?"

বীণা কহিল, "কি করবে? সব দিক্‌ রক্ষা করা যায় না। তা যদি যেত, মানুষ মানুষ থাকৃত না, দেবতা হয়ে যেত। নিতান্ত রক্তমাংসের মানুষ বলেই তাকে কোথাও কোথাও কিছু ছাড়তে হয়, তোমাকেও হবে।"

অজয় কহিল, "এই কি সব?"

বীণা কহিল, "আর যা আমার বল্‌বার তা সেইদিনই তোমায় বলেছি।"

অজয় দুই করতলে মুখ ঢাকিয়া নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া আছে, এমন সময় বিমানের ছড়ির একটা প্রান্ত ধরিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া রাহু আসিয়া ঘরে ঢুকিল। কহিল, "পার্কে ভলান্টিয়ারদের প্যারেড ছিল, বিমানবাবুকে সেখান থেকে ধ'রে এনেছি।"

বীণা কহিল, "রাহু কি সর্ব্বভূতে বিরাজ করিস্? সকলের সঙ্গে সব-জায়গায় তোর দেখা হচ্ছে।"

বিমান কহিল, "শুনলে রাহুসর্দ্দার? তোমার দিদি তোমাকে ভূত ব'লছেন।"

রাহু বলিল, 'সর্ব্বভূত মানে বুঝি ভূত? সর্ব্ব মানে সকল, আর ভূত মানে পদার্থ।"

বিমান কহিল, "তা তুমি একজন ভদ্রলোক, তোমাকে পদার্থ বলাটাও কম অপমান নয়।"

ইহার কিছু পরে বিমানকে রাখিয়া অজয় একাকী বীণাদের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিল।

তারপর আর কি? থাকিয়া থাকিয়া যেমন করিয়া নিজেকে সে সম্পূর্ণ করিয়া হারাইয়া ফেলিত, নিজের কাছে নিজের ব্যক্তিত্বের তাহার কোনও অর্থ থাকিত না, তেমনই ভাবে বীণারও কোনও অর্থ তাহার কাছে আর রহিল না। বীণা বলিয়া কেহ যেন নাই, ঐ নামের কোনও মানুষ তাহার জীবনে কোনওদিন ছিলও না। সে যেন একটি মাধুর্য্যময় স্বপ্নের অবশেষ, দূরস্মৃতির একটি নামহীন আবেশময় সুরের ঝঙ্কার মাত্র। ভুলিয়া গেল তাহাকে কথা দিয়াছিল, তোমাকে আমি ভালবাসব। ভুলিয়া গেল বীণা বলিয়াছিল, অপেক্ষা করা ছাড়া আমার আর উপায় নেই, আমি অপেক্ষা করব বন্ধু। স্বপ্নে কাহাকে কি কথা দেওয়া হইয়াছে, তাহা কে কবে আবার মনে করিয়া রাখে? তাহা ছাড়া, ভালবাসব, এ-প্রতিশ্রুতিরই বা মূল্য কতটুকু? নিজের অন্তরের যে-সম্পদ্ ব্যাকুল আগ্রহে বীণাকে সে নিবেদন করিয়া দিতে গিয়াছিল, ভালবাসা হইতে কম মূল্যবান্ বলিয়া তাহাকে সে ত মনে করে না। সেই প্রত্যাখ্যাত নিবেদনের পাশে ভালবাসার নৈবেদ্য সা'াইতে তাহার মন উঠে না।

বীণাকে ভোলে, কিন্তু বীণার নিকট হইতে শোনা একটি কথা ক্রমাগত তাহার কানে বাজিতে থাকে। সবদিক্ রক্ষা করা যায় না, কোথাও কোথাও কিছু ছাড়তে হয়, তা না হ'লে মানুষ দেবতা হয়ে যেত। ভাবে, হয়ত দেবত্বের লোভই ছিল আমার জীবনে, কিন্তু তা হয় না। আমি মানুষ। ভঙ্গুর আমার জীবন, নশ্বর এই দেহ, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আমার দান করিবার এবং গ্রহণ করিবার ক্ষমতা। না দিলে আমার পাওয়া হয় না, না পাইলে আমার দেওয়া হয় না। এই দুয়েতে সীমাবদ্ধ হইয়া থাকিয়াই আমার মনুষ্যত্ব। কেবল আহরণের মধ্যে সত্য নাই, কেবল ত্যাগের মধ্যেও নাই। এ দুয়ের একটি সহজ সমাধান কোথাও আছে। আমার জন্যও আছে, আমার দেশের দেশের জন্যও আছে। সেই সত্যকে আবিষ্কার করা, হউক এখন হইতে আমার ব্রত, আমার অনন্যমনের তপস্যা।

বীণা বলিয়া তাহার মনে যে একটি স্বপ্নময় জ্যোতির মূর্ত্তি, মন্ত্রদ্রষ্টা বলিয়া জোড়হাত কপালে ঠেকাইয়া তাহাকে সে নমস্কার করে।

বিমান দেশের সবসেরা সমস্যা বলিয়া একটি জিনিসকে ধরিয়া রাখিয়াছিল, তাহা দেশের মানুষের গুণকর্ম্ম-বিভাগের বেহিসাব। বলিত, এ দেশের সর্ব্বত্র রামের কাজ শ্যাম করে, শ্যামের কাজ যদু, কারও কাজই তাই ঠিক মত করা হয় না। এ জীবনে কোনও কাজ তাহার করাই হইল না সেই দুঃখে। অসহযোগ-আন্দোলন পর্ব্ব একটু জমিয়া উঠিতেই সুভদ্রের বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে সে-ই প্রথম উৎসাহ করিয়া তাহাতে যোগ দিল। কহিল, "বাবাঃ, এতদিন পরে এমন একটা কাজ পেয়ে বেঁচে গেলাম যা অন্য কারুর ভাত না মেরেও আমি স্বচ্ছন্দে করতে পারি।" কহিল, "দেশের man powerকে জোয়ালে বেঁধে কাজের অভাবে অকাজে লাগিয়ে দিতে পারার ফলও আখেরে ভালই হবে। এতদিন ধ'রে অব্যবস্থায় এর অপচয়ই ত কেবল হয়ে এসেছে।"

সব চেয়ে বেশী সে অনুভব করিত ও বলিত, দেশের ক্ষাত্র-শক্তির অব্যবহার ও অপব্যবহারের কথা। তাই ডাক যখন আসিল, সে-ই প্রথমে সাড়া দিল। হইলই বা অহিংস সামরিকতা, ভাবিল, ইহারই মধ্যে দিয়া দেশের একটা বড় সমস্যার সমাধান হইবে। বাহিরে সে শিল্পী, কিন্তু অন্তরে সে সৈনিক, অন্ততঃ নিজে সে তাই ভাবে। সে বলে, ইংরেজ

রাজত্ব থাকুক কিন্তু এদেশের লোককে সামরিক শিক্ষা দিবার ভার লউন কর্ত্তারা। একটা জাতের অপৌরুষ হইতে সাম্রাজ্যের দাম ওঠা সম্ভব নয়। তাহার বিবেচনায়, এদেশের সামাজিক এবং অন্য সমস্ত প্রকার সমস্যার সমাধান বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা এবং তদানুষঙ্গিক discipline এবং অভেদনীতি।

শুভদ্রকে সে দলে টানিবার চেষ্টা করিয়াছিল, সে বলিয়াছে, "কোনো সমস্যার কথা ভাবতে হলেই তোমরা ত্রিশ কোটী মানুষের termsএ ভাবো, তাই সমাধানও কিছু হয় না। আমার আশেপাশের পরিচিত মানুষগুলির সমস্যার কথাই আমি ঠিক মত ভাবতে পারি না, সাধ্যে কুলিয়ে ওঠে না। সেইটে করতে পারি যদি, একটা জীবনের পক্ষে অতি বড় কাজ হবে। তার বেশী আর কিছু ভাববার আমার রুচি নেই, অবসরও নেই।"

অজয়ও কাছেই ছিল, বিমান কহিল, "নিজের আশপাশের মানুষগুলোর ভাবনা তুমি যে খুব বেশী ভাবো তা মনে করবার ত কোনো কারণ নেই, তুমি কি স্থির করলে? যাবে আমার সঙ্গে?"

অজয় যাইবে না। তাহার জীবনের লক্ষ্য আরও উর্দ্ধে নিবদ্ধ, উদ্দেশ্য বৃহৎ। কি সে উদ্দেশ্য তাহা সে জানে না, কিন্তু যে-জন্য তাহাকে আত্মত্যাগের মূল্য দিতে বলা হইতেছে তাহা অপেক্ষা সেটা বৃহত্তর। দেশের জন্য প্রয়োজন হইলে আত্মবিসর্জ্জন সেও একদিন করিবে, কিন্তু নিজেকে এত অল্পমূল্যে ছাড়িয়া দিতে সে চায় না।

বিমান বলিল, "হ্যাঁ, তোমার এত সাধের জীবন, তাকে নিয়ে এ রকম ফেলাছড়া করতে বলা আমারই অন্যায় হয়েছে।"

অজয় কহিল, "ঠাট্টা তুমি করতে পার, কিন্তু তোমাকে আমি এও বল্‌ছি, সত্যকেও নির্ব্বিচারে মেনে নেওয়া যে মিথ্যাচার আমাদের দেশ সেটা ভুলেছে, আমাদের অধোগতির মূলে এ জিনিষটাও বড় কম নেই। জীবনের একদিকে নির্ব্বিচার স্বীকৃতিকে প্রশ্রয় দেওয়ার ফলে অন্য সব জায়গায় নির্ব্বিচার স্বীকৃতি আমাদের সহজ হয়েছে। বিধি-বিধান শাসন অনুশাসনের সঙ্গে সঙ্গে বন্যা দুর্ভিক্ষ অজ্ঞান মহামারী দাসত্ব এ-সমস্তকেও অবলীলায় আমরা সয়ে যাচ্ছি। সত্যকে পরীক্ষা ক'রে বাজিয়ে নেবার মধ্যে যে পৌরুষ, স্বাস্থ্যসম্পন্নতা, আমাদের মধ্যে তার মারাত্মকরকম অভাব আর তারই ফলে দেশব্যাপী বুদ্ধির জড়তা, চেতনার জড়তা, হৃৎবৃত্তির জড়তা। Disciplineএর দোহাই দিয়ে সেই জড়তাকে তোমরা আরও বাড়াবে।"

আপাদমস্তক খদ্দরমণ্ডিত বিমান নূতন কেনা একটা বহরমপুরী বাঁশের লাঠি কাঁধে করিয়া বাহির হইয়া গেল, কিন্তু তিরস্কার করিয়া, তর্ক করিয়া, শ্লেষ করিয়া যে-সাড়া সে অজয়ের মনে জাগাইয়া রাখিয়া গেল, তাহা চিরকাল জাগিয়া থাকিবার মত। কয়েকদিন ধরিয়া ক্রমাগত নিজের মনের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া যখন হাঁফ ধরিয়া গেল তখন অজয় ভাবিল, বীণাও আর এক-রকম করিয়া এই ত্যাগের মন্ত্রেই আমাকে দীক্ষিত করিতে চাহিয়াছিল। তা বেশ, ছাড়িতেই যদি হয়, সব ছাড়িব। নিজেকে বিসর্জ্জন দিতে গিয়া অন্য কিছুও হাতে রাখিব না। কাহারও ভালমন্দে আমি নাই, অপরের পাপের ভার আমি লইব না। আমি আমার আত্মজনের কেহ নহি, পরিবারের কেহ নহি, ভারতবর্ষেরও আমি কেহ নহি। বাহিরের বহুকোটি সৌরমণ্ডল সম্বলিত আকাশের অসীমতা, অনাদ্যন্তকাল ব্যাপিয়া এই বিশ্বসৃষ্টির সার্থকতা হইতে সার্থকতায় বিজয়-অভিযান, ইহার মধ্যে কোথায় আমার স্থান, ইহাদের সঙ্গে কি লইয়া আমার যোগ তাহা আমি খুঁজিয়া বাহির করিব। আমার জন্য থাকুক, আকাশ বাতাস পৃথিবী, চন্দ্র সূর্য্য তারা, অসীমতা অসীমতার দেবতা এবং আমার মধ্যে তাঁহার পরমতম রূপ। আমার মধ্যে আমার চিরকালের সর্ব্বোত্তম যে শ্রেয়, জীবনের শ্রেষ্ঠ সুখেরও বিনিময়ে তাহাকেই আমি লাভ করিব।

নিজের যে রহস্যরূপ তাহার আজীবনের সমস্ত সঞ্চিত উপলব্ধিকে বারম্বার আলোড়িত বিপর্য্যস্ত করিয়া দিয়া যাইত, তাহার দিবসের আলোককে অর্থহীন করিত, রাত্রির বিশ্রামকে অপহরণ করিত, আজ তাহাকেই অবলম্বন করিয়া সে ভাবিতে লাগিল, আমি যে আমি, আমি একান্ত ভাবেই এত অভিনব, যে আমার সমস্যা আমি ছাড়া আর কাহারও পক্ষে সমাধান করা সম্ভবই নহে। এক মুহূর্ত্তে তাহার আজীবনের সাধনা, তাহার পুঁথিখাতাপত্র, তাহার আশৈশবের সঞ্চিত দেহমন-আত্মার সমস্ত আয়োজন, তাহার সমস্ত ভবিষ্যৎ-জীবনকল্পনা কি বিপুল ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়া গেল

এত বয়স ধরিয়া কত মহাপুরুষের জীবনীই ত সে পর্য্যালোচনা করিয়াছে, কত মহাকীর্ত্তি, কত অপরূপ আত্মত্যাগ, কত অভিনব আবিষ্ক্রিয়া, কত ভবিষ্যদ্বাণী, কত অনুপ্রেরণা, কিন্তু তাহার অস্তিত্বের একবারে অন্তরতম স্থানে এই যে অন্ধকার, সেখানকার জন্য একটি ক্ষীণ দীপবর্ত্তিকাও কোথাও হইতে সে আহরণ করিতে পারিল না।

বাহিরে অন্ধকারে ঘন হইয়া আসিতেছিল, জীবনের প্রবাহ তখনও কলিকাতার পথে প্রখর হইয়া বহিতেছে। চতুর্দ্দিক্‌টাকে সহসা তাহার অনাত্মীয়-সঙ্গমের মত অসহ্য অস্বস্তিকর বলিয়া বোধ হইল। জীবনের সুবিপুল সমস্যা শুদ্ধমাত্র নিজের আয়তনের বিশালতাতেই তাহার মধ্যেকার সুপ্ত সাহসকে জাগ্রত করিয়া তুলিতেছিল। বেদনায় অবসন্ন-চৈতন্য মানুষ যেমন করিয়া অবলীলায় আসন্ন-মৃত্যুর সম্মুখীন হয়, তেমনই ভাবে নিজের মধ্যেকার এই রহস্যময় অন্ধকারের সঙ্গে সে পরিচয় করিবে স্থির করিল। উঠিয়া গিয়া দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া ঘরের অন্ধকারকে আরও জমাট করিয়া লইল, তারপর বালিশে মুখ গুঁজিয়া শুইয়া আর্ত্ত হৃদয়ের সমস্ত শক্তিতে প্রাণপণে এই প্রশ্নটিকে আঁকড়িয়া ধরিয়া রহিল, আমি কে, আমি কি, আমার সঙ্গে কেমন করিয়া আমার পরিচয় ঘটিবে, সে-পরিচয়ের পরিণাম কি হইবে?

পরের দিন বিমানের সঙ্গে দেখা হইতেই অজয় তাহাকে সংবাদ দিল, সে সংসার পরিত্যাগ করিবে।

বিমান কহিল, "সংসার কোথায় যে-পরিত্যাগ করবে? সংসার কর আগে।"

অজয় কহিল, "দুদিক্ সামলানো যায় না, তুমিই একদিন একথা আমায় বলেছিলে। জীবনকে কায়মনোবাক্যে আঁকড়ে ধরবার পথটাই একমাত্র পথ একদিন ভেবেছিলাম, কিন্তু মোহ বড় বেশী, কিছুতে ওদিকে মনটাকে লওয়াতে পারিনি, কেবল ভেবেছি, আমি ব্যর্থ হব, আমার মধ্যে বহুযুগের ভারতবর্ষের সাধনা ব্যর্থ হবে। আজ বুঝেছি, অন্ততঃ আর একটা পথও আছে, এবং এই দুটো পথ কোথায় এক হয়ে মিলেছে যতদিন না জানতে পারব, ততদিন ভারতবর্ষের কৃচ্ছ্রসাধনার পথ, নিবৃত্তির সাধনার পথই আমারও পথ। আত্মার কারবারে নেমে সাংসারিক হিসাবের খাতায় ততদিন অন্ততঃ লাভক্ষতির জমাখরচ লিখব না।"

সন্ন্যাসাশ্রমের বদলে তাহার জন্য রাঁচীর আশ্রমবাস ব্যবস্থা করিয়া দিয়া বিমান উত্তেজনার মুখে বাঁশের লাঠিটাকে ঘুরাইয়াই বাহির হইয়া গেল।

অজয় দেবতাকে ডাকিয়া কহিল, কেবল তোমার কাছে আমার এই কথাটা নিবেদন করা থাকুক, একটি মানুষকে অন্ততঃ সত্যসত্যই আমি ভালবাসি। আমার কাছে তুমি যেমন সত্য, তোমার অসীমতা যেমন সত্য, ঐন্দ্রিলাও ঠিক ততখানি সত্য। এই দুইটি জিনিষকেও আমি কিছুতেই মিলাইয়া দিতে পারিতেছি না। কিন্তু জীবনে কোনও দুইটি জিনিষকেই একসঙ্গে করিয়া মিলাইতে পারিব না, এই অপযশ কি চিরকালের জন্য আমার ললাটে লেখা আছে? তুমি অনুমতি কর, শেষ একবার দুই চোখের দৃষ্টি ভরিয়া তাহাকে দেখিয়া লইয়া চিরবিদায় হইয়া আসি। তারপর চিরকাল আত্মা এবং বস্তু এই উভয়ের বিরোধের অনেক উপরে তোমাদের উভয়কেই আমি ধরিয়া রাখিব।

কলিকাতা ছাড়িয়া আসিবার দিন বীণা কহিল, "এই তাহলে শেষ?"

অজয় কহিল, "এখন অবধি ত তাই ভাবছি।"

অনেকক্ষণ নীরবে কাটিল। অজয়ের চোখে অশ্রুজল, বীণাও কাঁদিতেছি। তবু দুইজনেই মৃদু হাসিয়া পরস্পরকে বিদায় দিল।

হাসিতে মিনতি ভরিয়া বীণা বলিল, "আবার দেখা হবে বন্ধু।"

অজয় কহিল, "দেখা হবে না এমন কথা জোর ক'রে বলব কি ক'রে?"

ইহারই দিন দশ-বারো পরে বিমান একদিন অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া ওয়েলিংটন স্কোয়ারের বাড়িতে আসিয়া ঢুকিল। সুভদ্র স্নান করিতে যাইতেছিল, তাহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "শুনেছ খবর?"

সুভদ্র বলিল, "কোন্ খবর বললে শুনেছি কি-না বলতে পারি।"

বিমান কহিল, "তোমার প্রিয়দাদের গাঁয়ের ষ্টীমার-ষ্টেশন থেকে অজয়কে পুলিশ ধ'রে নিয়ে গেছে।"

সুভদ্র কহিল, "সে কি? হেতু?"

বিমান কহিল, "সেইটেই কেউ জানে না। কাছেই কোথায় ডাকাতি না কি হয়েছিল, সে এলাকায় অজয়ের তখন থাকবার কথা নয়। কেন এসেছিল, কার কাছে এসেছিল, তার কোনো সন্তোষজনক জবাব সে দিতে পারে নি।"

সুভদ্র কহিল, "প্রিয়দাদের গাঁয়ে? অজয় কি করতে গিয়েছিল সেখানে?"

বিমান কহিল, "তা যদি জানতাম তবে ত ওকে রক্ষা করবার উপায়ই হয়ে যেত। যা দেখছি, বেশ কিছুদিনের মত ঠেলবে।"

সুভদ্র কহিল, 'সে নিজে কি বলেছে?"

বিমান কহিল, "কিছুই নাকি প্রায় বলেনি। বলেছে, আমার কাজ ছিল, কিন্তু সেটা এমন একান্ত ভাবেই আমার নিজের কাজ যে তার কথা পৃথিবীর আর কাউকে বলা চলে না।"

সুভদ্র কহিল, "মাথাটা ওর একেবারেই গেছে।"

বিমান কহিল, "তা শুধু ওর কেন, আরো অনেকেরই গেছে, কিন্তু সেইটে প্রমাণ করাই সে সব-চেয়ে দুঃসাধ্য ব্যাপার এই দেশে।"

বীণা ঐন্দ্রিলাকে চিঠিতে লিখিল, "এত দুঃখের মধ্যেও একটা এই সান্ত্বনা যে এতদিন পরে নিঃসংশয়ে বোঝা গেল, তোকে সে ভালবাসে।"

ঐন্দ্রিলা জবাবে লিখিল, "কিন্তু একটা কথা একেবারেই নিঃসংশয়ে বোঝা গেল না। তুমি যা বলছ তাই যদি সত্য হয় তবে সেকথাটা চাপা দেবার জন্যে কারাবাসের মত এত বড় দুঃখ বরণ করবার কি প্রয়োজন ছিল? সুতরাং হয় তোমার সিদ্ধান্তে ভুল আছে, নয়ত সত্য যা তার সমস্তটাকে তুমি জানো না।"

(সমাপ্ত)

গ্রাম্যগীতি

শ্রীহেম চট্টোপাধ্যায়

ওরে কোন্ গেরামের গাঙের বুকে কোন্ দেশেরি নাইয়া,
বাঁশের বাঁশী বাজায় বসি দূরের পানে চাইয়া।
ওপারে এক হিজল গাছে ডাকে ঘুঘুপাখী,
(সেও বুঝি) তারই মত একা থাকে গো,
ও তার উদাস কেন আঁখি!
গলুইর 'পরে রাইখ্যা বাঁশী কি জানি গান গাইয়া,
রইল বসে গো কেমন করেই জানি দূরের পানে চাইয়া।
ঘাটের মাঝি ডাকে সবে (ওরে) কি হ'ল তোর আজ,
দেখ্ না চেয়ে আকাশ পানে কালা মেঘের সাজ,
আসবে রে ঝড় ভয় কি নাই ফেল্ল আকাশ ছাইয়া,
তবু তুই যে বসে আছিস দূরের পানে চাইয়া!
ওই পাড়ে ওর মন গিয়েছে,
আস্‌ল কে আজ ঘাটে,
তার সাথে ওর পরাণ গেল শিমুল তলার মাঠে,
জ্যোছনা ওরে কাঁদায় 'খনে কাঁদায় বালুচর,
চেয়েই থাকে কার পানে গো কেউ কি ভাবে পর!
কার কাছে ওর মন যে বাঁধা গেল না রে পাইয়া,—
দিন গেল হায় মিছামিছি দূরের পানে চাইয়া!

কষ্টিপাথর

বাঙ্গালার জমিদারবর্গ

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

এদেশের ইহাই চিরাচরিত প্রথা যে ধনী জমিদার বা ধনী ব্যবসায়ী হইলে সচরাচর তাঁহারা সরস্বতীকে একেবারে বর্জ্জন করিয়া ভোগ বিলাসে নিমজ্জিত থাকেন।...কিন্তু এখনও এমন দুই-একটি জমিদার-বংশ এদেশে আছে, যেখানে কমলা ও সরস্বতী উভয়েরই সমভাবে অর্চ্চনা হইয়া থাকে। এই প্রসিদ্ধি বা খ্যাতির কথা উল্লেখ করিতে গেলে কলিকাতার লাহা-পরিবারের কথা মনে হয়। স্বর্গীয় প্রাণকৃষ্ণ লাহা এই বংশের গোড়াপত্তন করিয়া যান, কিন্তু তদীয় পুত্র বিখ্যাত ধনকুবের মহারাজা দুর্গাচরণ লাহা ইহার যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন। তাঁহার অপর ভ্রাতৃদ্বয় শ্যামাচরণ ও জয়গোবিন্দ ব্যবসা ও জমিদারী কার্য্যে তাঁহাকে সহায়তা করিতেন। মহারাজা দুর্গাচরণ নিজের ব্যবসা ও জমিদারি পরিচালনা ব্যতীত বহুবিধ কর্ম্মের মধ্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার কর্ত্তালিকা এখানে দেওয়া অসম্ভব ইম্পিরিয়াল কাউন্সিলের মেম্বরস্বরূপ তিনি যে-সকল সুগভীর ও সুচিন্তাপূর্ণ বক্তৃতা করিয়াছেন তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। তিনি দেশের নানাবিধ সৎকার্য্যের জন্য অর্থদান করেন, তন্মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঞ্চাশ হাজার টাকা, মেয়ো হাসপাতালে পাঁচ হাজার টাকা এবং ডিষ্ট্রিক চেরিটেবল্ সোসাইটিতে ২৪০০০৲ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মধ্যম শ্যামাচরণ লাহাও ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে গমন করিয়া ব্যবসাক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা লাভ করেন। কলিকাতার মেডিকেল-কলেজ-সংলগ্ন দাতব্য চক্ষু-চিকিৎসালয় তাঁহারই অর্থে স্থাপিত হইয়াছে এবং এই কীর্ত্তি চিরদিন তাঁহাকে সজীব করিয়া রাখিবে। এতদ্‌ব্যতীত ডাফরিণ হাসপাতালেও তিনি ৫০০০৲ টাকা দান করেন। কনিষ্ঠ জয়গোবিন্দ লাহা ইনিও ইম্পিরিয়াল্ কাউন্সিলের মেম্বর ছিলেন। তিনি একাধারে লক্ষ্মী ও সরস্বতী উভয়েরই সাধনায় সমান ব্রতী ছিলেন; রসায়ন-শাস্ত্রচর্চ্চা ও জ্যোতির্বিদ্যা আলোচনা তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল, এবং এই জন্য একটি ক্ষুদ্র পরীক্ষাগার নিজ বাসভবনে নির্ম্মাণ করেন। তিনি প্রতি বৎসর যে ফুলের প্রদর্শনী করিতেন তাহাতেই তাঁহার কৃষ্টির (culture) সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। উদ্ভিদ্‌বিদ্যা ও প্রাণিবিদ্যায় ইঁহার প্রভূত অনুরাগ ছিল আলিপুরের পশুশালায় যে সর্প-গৃহ আছে তাহা ইনিই নির্ম্মাণ করিয়া দেন। তিনি নীরবে ও লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া দান করিতে ভালবাসিতেন। মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বে ইনি বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িতদের সাহায্যকল্পে গভর্ণমেণ্টের হস্তে এক লক্ষ টাকা অর্পণ করিয়া যান। তাঁহার পুত্র অম্বিকাচরণ লাহাও এই সকল সদ্‌গুণাবলির অধিকারী হইয়াছিলেন। অম্বিকাচরণ একজন পক্ষিতত্ত্ববিৎ এবং এটা তাঁহাদের বংশানুক্রমিক রুচি; বর্ত্তমানে তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র সত্যচরণ লাহাও পক্ষিতত্ত্ববিৎ বলিয়া স্বদেশে ও বিদেশে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন কনিষ্ঠ পুত্র বিমলাচরণও বিশেষ কৃতবিদ্য। মহারাজা দুর্গাচরণ লাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজা কৃষ্ণদাস লাহা বিবিধ লোকহিতকর কার্য্যে মুক্তহস্ত অর্থ দান করিয়াছেন চুঁচুড়া জলের কল নির্ম্মাণের জন্য ভ্রাতৃগণের সহযোগে এক লক্ষ টাকা, বেনারস্ হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭৫০০০৲ এবং রিপণ কলেজের সাহায্যকল্পে ১৫০০০৲ দান করিয়া যান। আমার বেশ স্মরণ আছে যে, যখন ১৯২১ সালে খুলনার দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের সাহায্যের জন্য আমি সাধারণের নিকট আবেদন করি, সেই সময় একদিন একখানি হাজার টাকার চেক্ রাজা কৃষ্ণদাসের নিকট হইতে প্রাপ্ত হই। ইনি চিন্তাশীল উদারপ্রকৃতি ও স্বধর্ম্মে আস্থাবান্ ছিলেন। বিপুল অর্থব্যয়ে ছান্দোগ্য, কণাদ প্রভৃতি উপনিষদের বঙ্গানুবাদ করিয়া বঙ্গভাষাকে সমৃদ্ধশালিনী করিয়া গিয়াছেন। পাছে লোকে ইঁহার নাম জানিতে পারে, সেইজন্য এই সকল গ্রন্থে তাঁহার নাম পর্য্যন্তও মুদ্রিত হয় নাই। রাজা হৃষীকেশ লাহাও নানাবিধ দেশহিতকর অনুষ্ঠানে সংযুক্ত থাকিয়া অদ্যাপি আমাদের মধ্যে বর্ত্তমান আছেন এবং ইঁহার পুত্র ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতসন্তান; "হৃষীকেশ সিরিজ" নামক যে গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয় ইনিই তাহার কর্ণধার।...

এইবার কলিকাতা জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বংশের দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যাক্। ভগবান্ তাঁর সমস্ত কৃপারাশি যেন ঐ এক পরিবারের উপরই বর্ষণ করিয়াছেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর হইতে আরম্ভ করিয়া ঠাকুর-পরিবারের প্রত্যেকেই এক-একজন ধুরন্ধর। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর দেশের একজন যুগপ্রবর্ত্তক। তাঁহার পুত্রগণও—দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্র প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা দরকার মনে করি না, কারণ তাঁহারা প্রত্যেকেই স্বনামখ্যাত। সর্ব্ব-কনিষ্ঠ রবীন্দ্রনাথের কথা বলা একবারেই নিষ্প্রয়োজন। তিনি যে অতুল কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়া দেশের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন তাহা চিরদিন তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। ইঁহাদের বংশেরই অপর শাখাসম্ভূত অবনীন্দ্র ও গগনেন্দ্রনাথ চিত্রবিদ্যায় বিপুল খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন।...

কিন্তু বড়ই দুঃখের সহিত ইহা বলিতে হইতেছে যে এই সকল দৃষ্টান্ত অতীব বিরল, ইহা কেবল Exception proving the rule অর্থাৎ ব্যতিরেককল্পে। দেশের বড় বড় বনিয়াদী জমিদার-ঘরের বংশধরগণ প্রায়ই নিষ্কর্ম্মা, অলস ও গণ্ডমূর্খ; কেহ কেহ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী আছেন বটে, কিন্তু একেবারে নিষ্ক্রিয়। পশুর জীবনে ও মনুষ্য-জীবনে পার্থক্য কি? পশুও মনুষ্যের ন্যায় ক্ষুন্নিবৃত্তি করে এবং যৌবনপ্রাপ্ত হইয়া সন্তানসন্ততি উৎপাদন করিয়া থাকে। ভগবান তাঁর অসীম করুণায় মানুষকে বোধশক্তি ও বিচারশক্তি দিয়াছেন, যাহার দ্বারা সে পশুপাখী ও অন্যান্য জীবজন্তু হইতে স্বতন্ত্র।...

কিন্তু আমাদের দেশের অধিকাংশ জমিদার যেমন অলস, নিষ্কর্ম্মা ও শ্রমবিমুখ, তেমনই জীবনযাত্রায় লক্ষ্যভ্রষ্ট ও বৈচিত্র্যবিহীন। বিখ্যাত Sir John Lubbock (Lord Avebury) একজন ধনী শেঠের (Banker) পুত্র ছিলেন। নিজের কাজকর্ম্ম যেমন ভাবে করিতেন, বিজ্ঞানচর্চ্চায়ও সেইরূপ ভাবে আকৃষ্ট ছিলেন। তিনি নিজে একজন বিশিষ্ট পতঙ্গবিৎ। তাঁহার অনেকগুলি পুস্তকের মধ্যে—Ants, Wasps and Bees, The Beauties of Life, The Uses of Life, The Pleasures of Life প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য তাহাতে তিনি এই বলিয়াছেন যে, জীবনধারা সুখকর করিতে হইলে এক একটি খেয়ালের (hobby) বশবর্ত্তী হওয়া প্রয়োজন আমি খেয়াল বলিতেছি, কিন্তু বদখেয়াল নয়। সঙ্গীতচর্চ্চা, উদ্যান-নির্ম্মাণ, পশুপালন, পাহাড়-পর্ব্বতে

আরোহণ ইত্যাদি। কিন্তু আমাদের ধনী জমিদার বা ব্যবসাদায়ের মধ্যে এর এ টিও দেখা যায় না। উদ্দেশ্যবিহীন জড়ভরত হইয়া তাঁহারা প্রকৃত পশুর ন্যায়ই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন।

৬০ বৎসর বা ততোধিক পূর্ব্বে এই কলিকাতা শহরে দেখা যাইত যে, রাজপথে বা গড়ের মাঠে ধনীর সন্তানগণ প্রাতঃকালে বা সন্ধ্যার পূর্ব্বে অশ্বারোহণে ভ্রমণ করিতেন। অনেকে আবার শিকারপ্রিয়ও ছিলেন। এখনও অনেক জমিদারের গৃহে ব্যাঘ্র ও অন্যান্য বন্যপশুর চর্ম্ম দৃষ্ট হইয়া থাকে। এস্থলে মহারাজা সূর্য্যকান্তের বিষয় বলা যাইতে পারে। তিনি এ-বিষয়ে অগ্রণী ছিলেন, তাঁহার সম্বন্ধে "বংশপরিচয়" নামক গ্রন্থ হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি—"তিনি বসন্তের প্রারম্ভে পর্ব্বতের উপত্যকাপ্রদেশে শিবির সন্নিবেশ করিতেন এবং কখনও খেদা করিয়া হস্তী ধরিতেন, কখনও হিংস্র ব্যাঘ্র ভল্লুক প্রভৃতি আরণ্য পশুর অনুসরণ করিয়া বিপুল আনন্দ অনুভব করিতেন। তাঁহার শতাধিক সুশিক্ষিত শিকারী হস্তী ছিল। ঐ সকল হস্তীর প্রতি তাঁহার এতাদৃশ যত্ন ছিল যে তিনি স্বয়ং উহাদিগকে লালনপালন ও পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। মৃগয়া ব্যাপারে তাঁহার অনন্যসাধারণ দক্ষতা ইউরোপের প্রসিদ্ধ শিকারীগণেরও বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল।" গোবরডাঙ্গার জমিদারদিগেরও শিকারের জন্য সবিশেষ খ্যাতি আছে।

বর্ত্তমান সময়ে দেখা যায় যে, রেড রোড, প্রিন্সেপ ঘাট, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল, ইডেনগার্ডেন প্রভৃতি স্থানে যাঁহারা প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যার সময় বিশুদ্ধ সমীরণ সেবন করিতে যান, তাঁহাদের মধ্যে শতকরা ৯৫ জন অবাঙ্গালী। ইহাতে বোঝা যায় যে ধনী বাঙ্গালী সন্তানগণ কি প্রকার অলসপ্রকৃতি হইয়া উঠিয়াছেন, এবং সেই কারণে তাঁহাদের স্বাস্থ্য ও আয়ুক্ষয় হইতেছে, অনেকেই ৩০।৪০ বৎসর পার না হইতে হইতেই বাত, ডায়াবিটস্ ও হৃদ্‌রোগগ্রস্ত হইয়া পড়েন।

তিন বৎসর অতীত হইল বিশিষ্ট শ্রমিক-নেতা ও ভারত-বন্ধু মিঃ ব্রেল্‌স্‌ফোর্ড ভারত ভ্রমণ করিয়া তদ্দেশীয় জমিদার এবং ভারতবর্ষের জমিদারদিগের তুলনা করিতে গিয়া প্রসঙ্গচ্ছলে বলিয়াছিলেন যে যদিও ইংরেজ জমিদারবর্গের প্রতি তাঁর বড়-একটা শ্রদ্ধা নাই, তথাপি মুক্তকণ্ঠে ইহা স্বীকার্য্য যে ইংলণ্ডের ভূম্যধিকারিগণ কৃষি ও গো-পালনের উন্নতিকল্পে অজস্র অর্থব্যয় ও শক্তিসামর্থ্যের নিয়োগ করিয়া থাকেন। কৃষি ও গোজাতির উন্নতির জন্য গভর্ণমেণ্টের দিকে তাঁহারা তাকাইয়া থাকেন না। কিন্তু ভারতবর্ষের জমিদারবর্গ এ-বিষয়ে একেবারেই উদাসীন।

আমাদের ধনাঢ্য জমিদারগণের জীবন কোন খেয়ালের পরিপোষক নয় বলিয়া তাঁহারা যে কি প্রকারে মহামূল্য সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে হয় তাহা জানেন না। ইউরোপের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, এই প্রকার ধনবহুল ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকে বিজ্ঞান বা সাহিত্যচর্চ্চা করিয়াছেন বা তাহার উন্নতিকল্পে বহু অর্থব্যয় করিয়াছেন। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক হেন্‌রি ক্যাভেণ্ডিশ্ একজন সর্ব্বপ্রধান আভিজাত বংশোদ্ভব (Duke of Devonshire) ব্যক্তি। তিনি নিজ পরীক্ষাগারে বিজ্ঞানচর্চ্চায় অধিকাংশ সময়ই নিমগ্ন থাকিতেন। তাঁহার বাহ্যিক কোন আড়ম্বর ছিল না, চালচলনও সাদা-সিধা ছিল। একদিন যখন তিনি গবেষণায় নিরত আছেন এমন সময় জনৈক ব্যাঙ্কের ম্যানেজার তাঁহার দরজায় করাঘাত করিলেন। ক্যাভেণ্ডিশ্ বাহিরে আসিলে সে ব্যক্তি তাঁহাকে অনুনয় সহকারে বলিলেন—মহাশয় আপনার প্রায় এক কোটি টাকা বিনাসুদে ব্যাঙ্কে মজুত আছে; যদি অনুমতি দেন তবে সুদে খাটাইতে পারি। তিনি তাঁহার প্রতি এমন ভ্রূকুটি-কুটিল কোপদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন যে, বেচারা তৎক্ষণাৎ সেস্থান পরিত্যাগ করিল। কিছুকাল পরে আর এক ব্যক্তি ঐ বিষয়ে তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিতে আসায় তিনি তাঁহাকে বলিলেন—দেখ পুনরায় যদি আমাকে এরকম ভাবে বিরক্ত করিস্ তাহা হইলে সমস্ত টাকাই ব্যাঙ্ক হইতে উঠাইয়া লইব। এই ঘটনা হইতে এইটুকু বোঝা যায় যে অর্থের উপর তাঁহার কিছুমাত্র লালসা ছিল না। তিনি অকৃতদার ছিলেন এবং বিজ্ঞান-চর্চ্চাই ছিল তাঁর জীবন-যাত্রার সম্বল। নব্য রসায়ন-শাস্ত্রের সৃষ্টিকর্ত্তা লাবোসিয়ার (Lavoisier) বিত্তশালী ছিলেন, কিন্তু তিনি অবসর সময় নিজব্যয়ে পরীক্ষাগার নির্ম্মাণ করিয়া রসায়ন-চর্চ্চায় আত্মনিয়োগ করিয়া মানব-জীবনের প্রকৃত সার্থকতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এইরূপ ভূরি ভূরি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।...

(ভারতবর্ষ পৌষ ১৩৪০)

ইংরেজী উচ্চারণ শিক্ষা

শ্রীফকিরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

মাতৃভাষায় আমরা যে-ভাবে উচ্চারণ শিখি তাহাই কোনও ভাষার উচ্চারণ-কৌশল আয়ত্ত করিবার প্রকৃষ্ট উপায়। অন্যে কথা বলিবে আমি কিছুকাল মুখ বুজিয়া শুনিয়া লইব। শুনিতে শুনিতে কান যখন কোন্‌টা ঠিক কোন্‌টা ভুল তাহার পার্থক্য বিচারে কথঞ্চিৎ সমর্থ হইবে তখন একটু একটু কথা বলিব। কান বলিবে 'ঠিক হইল না.' বাড়ির পাঁচ জনে সেই কথাই অন্যরূপে বলিবে, অথবা বলিবে 'ইহা নয় উহা'। এইরূপে কান ও ভাইবন্ধুর নির্দ্দেশমত জিহ্বাদির পুনঃ পুনঃ প্রয়াস ও তাহার ফলে যথাযথ উচ্চারণ সম্পাদন হইবে। উচ্চারণ-কৌশল প্রধানতঃ কর্ম্মজ, জ্ঞানজ নহে। উচ্চারণ শিখিতে হইলে উচ্চারণ করিতে হইবে ও ভাল উচ্চারণ শিক্ষা করিতে হইলে প্রথম হইতে ভাল উচ্চারণ করিতে হইবে। ইহা অভ্যাসের ব্যাপার।

মাতৃভাষায় উচ্চারণ-রীতি সহজে ও অল্প সময়ের মধ্যেই আয়ত্ত হয়। তাহার কারণ এখানে শিখিবার স্বাভাবিক পন্থাগুলি বর্ত্তমান। বিদেশীয় ভাষা শিখিতে গেলে প্রধান অসুবিধা

এই যে, ঐ উপায়গুলি অধিকাংশ স্থলেই দুষ্প্রাপ্য। ইংরেজী-ভাষী ইংরেজের আবাল্য সাহচর্য্যলাভ বাঙালীর ছেলের পক্ষে শুধু দুষ্প্রাপ্য নয়, অপ্রাপ্যই; কাজেই ইংরেজী উচ্চারণ স্বভাবনির্দ্দিষ্ট উপায়ে আয়ত্ত করা অসম্ভব, এবং অন্য উপায়ের অনুসন্ধান আবশ্যক। এ-কথা শুধু বাঙালী ছেলেমেয়ের ইংরেজী শিখিবার সম্বন্ধে নয়, যে-কোনও জাতির অন্য দেশের ভাষা শিক্ষা সম্পর্কেই খাটে। তবে এ-ক্ষেত্রে একটু বিশেষত্ব আছে। ইংরেজের ছেলে যখন ফরাসী বা জার্ম্মাণ ভাষা শেখে তখন তাহার পক্ষে ঐ ঐ ভাষার উচ্চারণ-রীতি আয়ত্ত করা যত কঠিন, বাঙালীর ছেলের পক্ষে ইংরেজী উচ্চারণ-রীতি আয়ত্ত করা তদপেক্ষা অনেক বেশী কঠিন। তাহার কারণ সকল বালক-বালিকাই অতি বাল্যকাল হইতে মাতৃভাষার কতকগুলি উচ্চারণ-রীতি অর্জ্জন করে। এইগুলি অন্য ভাষা শিখিতে গেলে জ্ঞানে বা অজ্ঞানে ঐ ভাষায় প্রযুক্ত হয়। এই জন্য মাতৃভাষার সঙ্গে উচ্চারণ-ভঙ্গীতে সৌসাদৃশ্যসম্পন্ন বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করা অপেক্ষাকৃত সহজ। বাংলা ভাষা এবং ভারতীয় যে-কোন ভাষাই ইংরেজী হইতে উচ্চারণ-রীতি ও অন্যান্য বিষয়ে এত অসদৃশ যে, বাংলা ভাষায় গঠিত-জিহ্বা বালক-বালিকার পক্ষে এই নূতন কৌশল সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করা একরূপ অসম্ভব। তবে ভাষা যখন শিখিতে হইবে তখন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া বলিতে না পারিলেও অন্যের বোধগম্য করিয়া বলা আবশ্যক। নচেৎ ভাষা শিক্ষার প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। কাজেই অন্ততঃ এমনভাবে ইংরেজী উচ্চারণ করিতে হইবে যাহাতে ইংরেজী ভাষা-ভাষী আর পাঁচ জন সহজে কোনও বিষয় বুঝিতে পারে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, উচ্চারণ-শিক্ষা সম্পাদ্য ব্যাপার ও এখানে অভ্যাস 'বোধাদপি গরীয়ান্'। অতএব এ বিষয়ে প্রথম কর্ত্তব্য হইবে শিক্ষার প্রারম্ভেই ঠিক উচ্চারণ আয়ত্ত করিবার কোনও বিশেষ উপায় নির্দ্ধারণ, ও সেই উচ্চারণের পুনঃ পুনঃ প্রয়োগের ব্যবস্থা করা। তাহা হইলে সঠিক উচ্চারণের অভ্যাস পাকা হইবে। 'ডাইরেক্ট মেথড' নামে বিদেশীয় ভাষা শিখাইবার যে ব্যবস্থা আছে তাহাতে ভাষা-শিক্ষার যে স্বাভাবিক উপায়ের কথা এইমাত্র বলা হইয়াছে সেই শোনা ও বলার ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া শিখাইবার প্রয়াস আছে কিন্তু তাহা ইংরেজ শিক্ষকের অভাবে এ-দেশে ফলপ্রদ হয় নাই। কাজেই 'অন্যঃ পন্থা' অন্বেষণ করিতে হইবে।

এ-সম্বন্ধে আমি কিছু চিন্তা করিয়াছি ও যৎসামান্য কাজও করিয়াছি। তাহার ফলে আমার বিশ্বাস যে, বাংলা হরফের সাহায্যে ইংরেজী উচ্চারণ শিখান সুকঠিন নহে। বাংলা হরফের সাহায্যে ইংরেজী উচ্চারণ শিখাইতে পারিলে তাহার ফলে অনেক সুবিধাও হইবে।

প্রথমতঃ ইংরেজী 'ফোনিক মেথড'এর বানান-বিভ্রাট রূপ প্রকাণ্ড অসুবিধা ইহাতে নাই। দ্বিতীয় সুবিধা, বাংলার বর্ণধ্বনি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্থির, কাজেই লিখিয়া দিলেই বোধগম্য হইবে। আরও অনেক বিষয়ে সুবিধা হইবে। তবে অসুবিধাও আছে, কিন্তু সেগুলি বোধ হয় অনতিক্রমণীয় নহে। অসুবিধার কথাই এখন বলিব।

১। প্রথম ও প্রধান অসুবিধা এই যে, ইংরেজীতে এমন কয়েকটি ধ্বনি আছে যাহা বাংলায় নাই এবং সেই সেই ধ্বনি-সূচক হরফও বাংলায় নাই। সেই সকল ক্ষেত্রে কি কর্ত্তব্য?

২। দ্বিতীয়, যে-সমস্ত হরফ বাংলায় আছে ও যাহা তত্তৎসদৃশ ইংরেজী হরফের অনুকল্পে ব্যবহৃত হইতে পারে, তাহাদের আকৃতিগত সমতা সত্ত্বেও ধ্বনিগত বৈষম্য বিদ্যমান রহিয়াছে। কাজেই হয় তাহাদের আকারে ধ্বনি-বৈষম্যসূচক কিছু পরিবর্ত্তন করিতে হইবে, নয় শিক্ষক মহাশয়ের উপর এই গুরুভার অর্পণ করিতে হইবে।

৩। শব্দাংশগত stress ইংরেজী শব্দোচ্চারণের প্রাণ-স্বরূপ। এই ব্যাপার বাংলায় নাই। ইহা বুঝাইবার জন্য কি করা যাইবে?

৪। কথন-ভঙ্গী (Intonation ও Rhythm)—

ইংরেজী বলার একটি বিশেষ ভঙ্গী আছে। তাহা বাঙালীর পক্ষে আয়ত্ত করা অত্যন্ত কঠিন অথচ উচ্চারণ ভুল বলার চেয়েও এখানে ভুল অনেক সময়ে বেশী মারাত্মক হয়। তাহারই বা কি করা যায়?

এই সকল অসুবিধা ছাড়াও কার্য্যক্ষেত্রে আরও দু-একটি অসুবিধা হয়ত হইবে। সেগুলি উপস্থিত বাদ দিয়াও উপযুক্ত চারটি অসুবিধার জন্য আমি কি করিতে চাই তাহার একটু আভাস দিতেছি:—

১। প্রথম অসুবিধা সম্বন্ধে আমি দেখিয়াছি কেবল

'ʒ' (ও ʒ) ও 'w' ছাড়া অন্য ব্যঞ্জনবর্ণগুলি বাংলায় মিলিবে। 'w' ও আমাদের দুইটি 'ব' এর একটির দ্বারা চলিতে পারে, তবে একটু পার্থক্যবাচক চিহ্ন চাই- তাহা সহজেই দেওয়া যাইবে। তবে 'ʒ' sound বাংলা হরফে নাই। ইহা ও ইহার আর একরূপ— ʒ (যেমন measure এর 'ʒ' sound) এই দুইটি হরফ, আমার মতে হুবহু বাংলায় চালাইতে হইবে। তাহাতে আমাদের ভাষার জাত যাইবে বলিয়া আমি মনে করি না। স্বরবর্ণ সম্বন্ধে সমস্যাটি আরও জটিল। আমাদের যাহা আছে তাহাদের মধ্যে অনেককেই রূপান্তরিত করিতে হইবে। আমাদের দীর্ঘ অ নাই, হ্রস্ব আ নাই, সুদীর্ঘ ও অন্তে ই ধ্বনিযুক্ত এ নাই (যেমন train) এবং ইংরেজীতে সর্ব্বদা আবশ্যক অতি হ্রস্ব এ (যেমন above এর আদি স্বর) নাই।

এগুলির জন্য নূতন হরফ না হইলেও নূতন কিছু কন্‌ভেন্‌শন্ সৃষ্টি করিতে হইবে। আমি তাহা একরূপ করিয়াছি। এখন বাংলা হরফে আবশ্যকমত এক-আধটু পরিবর্তন করিয়া সকল ইংরেজী শব্দই লেখা যাইবে। কিন্তু তথাপি গোল আছে :—

২। বাংলার ক গ ট ড প ব চ জ থ দ ফ ভ স শ হ য় যথাক্রমে ইংরেজীর k (বা c, যেমন case) g t d p b tsh (যেমন church), dz (যেমন Judge) th (যেমন thigh) t (যেমন themএর দ) f v s sh h j এর অনুরূপ ধ্বনিবিশিষ্ট এবং এই সমস্ত বাংলা হরফই ইংরেজীর ঐ সকল ধ্বনির বাহন হইবে। কিন্তু এখানে একটা মস্ত কথা আছে। ক গ ট ড প ব ইহারা স্পর্শবর্ণ, ইংরেজীতে ইহাদিগকে Plosive বলে। ইহাদের উচ্চারণের বিশেষত্ব এই যে, প্রথমতঃ উচ্চারণকারীর বাগিন্দ্রিয়াংশসমূহের স্পর্শ ও দ্বিতীয়তঃ তাহাদের বিয়োগ সাধন। যেমন প বলিতে হইলে ওষ্ঠদ্বয় প্রথমে সংযুক্ত করিয়া পরে বিযুক্ত করিতে হইবে। ইহার ফলে সংযোগ জন্য বাধাপ্রাপ্ত বায়ু বিয়োগ-মাত্রেই তৎক্ষণাৎ একটা শব্দ করিয়া বাহির হইয়া যাইবে। এই শব্দ বা explosion বাংলায় সব সময়ে হয় না। তা ছাড়া ইংরেজীতে ক ট প এই তিন বর্ণের পরে স্বরবর্ণ থাকিলে ইহাদের উচ্চারণের সময় স্বরবর্ণ উচ্চারিত হইবার কালে ইহাদের পরে একটি h ধ্বনি আসিয়া যায় তাহার ফলে kind, time, peril প্রভৃতি শব্দ খাইণ্ড, ঠাইম্, ফেরিল্ প্রায় এইরূপ শোনায়। বাংলায় খাইণ্ড লেখা বাড়াবাড়ি মনে হইবে অথচ কাইণ্ড বলিলেও চলে না। ক প ও ট এর এইরূপ উচ্চারণ দেখাইবার জন্য আমি প্রথমে ক্হ, ট্হ ও প্হ লিখিতাম, কিন্তু তাহাতে প্রথম শিক্ষার্থীদের সমূহ অসুবিধা হয়, উচ্চারণও ঠিকমত হয় না। তজ্জন্য ক ট ও প-কে ঐরূপই রাখিয়া উহাদের মাথায় stressসূচক চিহ্ন দিলে ও ঠিক stress উচ্চারিত হইলে h ধ্বনি নিজেই আসিয়া পড়িবে। এই বিশ্বাসে উহাদের আকারের কোনও পরিবর্ত্তন করিতে চাহি না। গ ড ব সম্বন্ধে এই কথা অনেকটা খাটে। চ জ চলিবে, তবে জ ও ʒ ও ʒএর পার্থক্য সকল সময়ে (বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গে) স্মরণীয় ও প্রত্যহ 'ড্রিল্' দেওয়া দরকার হইবে।

থ দ ফ ভ w স শ হ প্রভৃতির উচ্চারণে ইংরেজীতে একটা hissing sound হয়, বাংলার স শ হ উচ্চারণ করিতে এইরূপ শব্দ হইলেও থ দ ফ ভ উচ্চারণে সেরূপ শব্দ হয় না। কারণ ঐগুলিও আমাদের মতে স্পর্শবর্ণ এবং এই জাতীয় ধ্বনির বিশেষত্ব স্পর্শ ও বিয়োগ বাংলায় আছে সত্য, কিন্তু ইংরেজীতে এই স্পর্শবিয়োগ কিছুক্ষণ ধরিয়া ক্রমাগত চলিতে থাকে এবং আভ্যন্তর বায়ু বাহির হইতে হইতে একরূপ ধ্বনি উৎপাদন করে। ইহাদের উচ্চারণভঙ্গী ছবিদ্বারা জিহ্বাদির ক্রিয়া দেখাইয়া অভ্যাসের দ্বারা আয়ত্ত করিতে হইবে। এখানেও 'ড্রিল্' দরকার। বাংলার য় যথারীতি (অর্থাৎ ই অ এইভাবে) উচ্চারিত হইলে ইংরেজী য়-এর কাজ চালাইতে পারিবে [যেমন you য়ু]। w-এর উচ্চারণ ইংরেজীতে অনেকটা বাংলা ব এর মত, তবে ব-এর মধ্যে একটা ধ্বনির ভরাট ভাব আছে, তাহা w-এ নাই, সেইজন্য ব-এর ভিতরের সারাংশটা বাহির করিয়া লইলে যে ফাঁপা ব-ধ্বনি থাকে, তাহাই w-এর কাজ করিতে পারিবে। তাহার এই ফাঁপাত্ব দেখাইবার জন্য পেট কাটা যায়, কিন্তু তাহাতে নাগরী হরফের 'ব'য়ের পেট কাটার রীতির অযথা বিপর্য্যয় ঘটে ; (সেখানে পেট কাটিলেই বর্গীয় ব হয়) সেইজন্য আসামী ৱ চলিতে পারিবে।

৩। Stress ইংরেজীর ন্যায় দেখাইলে দোষ কি?

পদাংশের উপরের দিকে ঠিক stressed ধ্বনির আগে ´ এইরূপ রেফের ন্যায় চিহ্ন দিলেই চলে। রেফের সঙ্গে গোলমালের আশঙ্কা থাকিলে সোজা দাঁড়ি দেওয়া যাইবে।

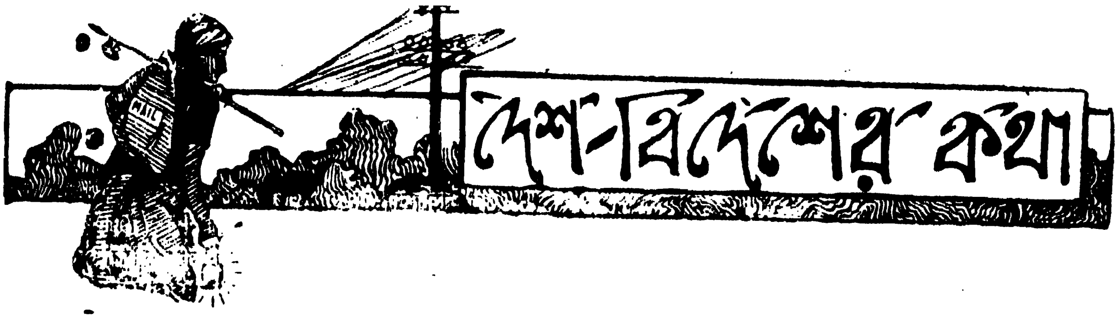
৪। Rhythm ও intonation সম্বন্ধে আমার মনে হয়, আমাদের ট্রেনিং কলেজে প্রবর্ত্তিত Dictaphone Records খুব উপযোগী। কিন্তু সকল স্কুলে গ্রামোফন থাকিবে এমন দুরাশা আমার নাই, কাজেই বর্ত্তমানে ইংরেজী রীডিং পড়ান ও সেইসঙ্গে pause চিহ্নিত করিয়া তালে তালে পড়াইবার রীতি প্রচার করিতে হইবে। পায়ের দ্বারা তাল দেওয়া চলিবে, সম্ভব হইলে, বাংলায় ইংরেজী বাক্য লিখিয়া ইংরেজীর ছেদ-রীতির পরিবর্ত্তে pause mark দেওয়া যাইতে পারে।

বিষয়টি খুব সহজ নয়। যাঁহারা ইংরেজী শিক্ষকের কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন, তাঁহাদের সমবেত চেষ্টা ও ধ্বনি-বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণের সাহায্য ব্যতিরেকে আমার উদ্যম কার্য্যে পরিণত করা অসম্ভব হইবে— এই জন্য এই প্রবন্ধে বিষয়টির অবতারণ মাত্র করিয়া এ-বিষয়ে তাঁহাদের সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিলাম।

রজনীর শেষ যাম সবার অধিক অন্ধকার

শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

হে পথিক, ধৈর্য্য ধর, শ্রদ্ধা রাখ বীর্য্যে আপনার।
রাত্রির তৃতীয় যামে ঐশ্বর্য্যে উদ্বেল অন্ধকার,—
তুমি ভয় পেয়ো নাকো। দীর্ঘ-নিশি-জাগরণ ফলে
আনন্দচন্দ্রমা যবে নিস্তেজ লুকায় অস্তাচলে,—
সন্দেহ-বন্ধুর পথ মনে হয় অনন্তবিস্তার,
বন্ধু করে গতিরোধ ; সঙ্গী কহে, "নাহিক নিস্তার,
হয় তমিস্রার সাথে হীনসন্ধি,—নয় পরাজয় ;
(হয় স্থূলবস্তুভারে চূর্ণদেহে ভাবের বিলয়,
নয় অবস্থার হস্তে আত্মদান-ভবিষ্যৎ আশে।")
আলোর সন্ধান নাই বিন্দুমাত্র মেঘান্ধ আকাশে
স্বজনের অস্থিস্তূপে পদে পদে ঘটে যাত্রাবাধা,—
তখন অস্থির চিত্তে অসুস্থ-আকাঙ্ক্ষা তোলে মাথা ;
মনে হয়, "সব ব্যর্থ, নিষ্ফল এ ব্রহ্মাণ্ডের বিধি ;
মিছে কেন পণ্ডশ্রম ? প্রেয়সীর অঞ্চলের নিধি
ঘরে ফিরে নিদ্রা যাই সংসারের সহস্রের সাথে।
যদি মৃত্যু থাকে লেখা গৃহদাহে কিম্বা বজ্রপাতে
তবে তার প্রতিকারে দেবতারে দিব কিছু ঘুষ।"
সে বড় সঙ্কট ক্ষণ। যে মানুষ আহত পৌরুষ
তখনও উন্নত রাখে, —নিষ্ঠা রাখে সঙ্কল্পের 'পরে,
বলে, "লোক যাহা হবে, যাহা করে করুক অপরে,
মোর লক্ষ্য স্থির আছে, মোর যাত্রা রবে অব্যাহত।"
প্রাণের প্রার্থনা তার সর্ব্ব বাধা করি প্রতিহত
তখন দাঁড়ায় গিয়া বিধাতার সিংহাসনতলে :
দাবি তা'র পূর্ণ হয়। প্রচণ্ড আলোক-বন্যাজলে
সহসা ভাসিয়া যায় রাত্রির প্রকাণ্ড অনীকিনী
ঘনতম তমিস্রার ! সহসা ধরেন রুদ্র তিনি
প্রসন্ন দক্ষিণ মূর্ত্তি ; দাক্ষিণ্যে আকাশ যায় ভাসি !
দিক হ'তে দিগন্তরে সহসা উঠেন তিনি হাসি ;
খসি পড়ে ছদ্মবেশ ! যাত্রাশেষে সফলপ্রয়াস
মুমূর্ষুর পাণ্ডুগণ্ডে পড়ে সেই হাসির আভাস
আরক্তিম ; হাসিয়া সে কহে শেষ কণ্ঠস্বরে তার,
"রজনীর শেষ যামে ঘনতম কেন অন্ধকার
এতক্ষণে বুঝিলাম। প্রতীক্ষা সার্থক হ'ল মম।
নমো, নমো হে নিষ্ঠুর,—হে সুন্দর,—নমো, নমো নমঃ!"



বাংলা

সাইকেলে হাজারিবাগ—

৩০।১ চন্দ্রনাথ চাটার্জ্জি ষ্ট্রীটস্থ ভবানীপুর স্বাস্থ্য-সমিতি হইতে নীলমাধব বাঁড়ুয্যে (ক্যাপ্টেন), দিলীপ রায়-চৌধুরী, অলোক রায়-চৌধুরী, কল্যাণ গুহ, সিদ্ধার্থ দত্ত, পান্নালাল বাঁড়ুয্যে, আশুতোষ ধর, সুবোধ বাঁড়ুয্যে, বিশ্বনাথ চাটুয্যে ও অমূল্য সরকার গত ১৭ই ডিসেম্বর রবিবার প্রাতে সাইকেলযোগে হাজারীবাগ (২৫০ মাইল) যাত্রা করে। তাহারা গড়ে প্রত্যহ ৬০ মাইল (সাইক্লিং) করিয়া চার দিনে



সাইকেল প্রতিযোগিতায় ভবানীপুর স্বাস্থ্য-সমিতির সভ্যবৃন্দ



ভবানীপুর স্বাস্থ্য-সমিতির দশজন বালক সভ্য



সাইকেলে হাজারিবাগ গমনে উদ্যত ভবানীপুর স্বাস্থ্য-সমিতির সভ্যগণ

তথায় পৌঁছে। প্রথম দিন সন্ধ্যায় গলসী (৮৬), দ্বিতীয় দিনে আসনসোল (১৩৭), তৃতীয় দিনে ইজরী (২০২) এবং তথায় একদিন বিশ্রাম করিয়া পরদিন বৈকালে হাজারীবাগ পৌঁছে। হাজারীবাগে দুইদিন বিশ্রাম করিয়া তথা হইতে তাহারা গিরিডী (৭৫) যাত্রা করে; গিরিডী হইতে পর দিন প্রাতে রওনা হইয়া তাহারা গত বৃহস্পতিবার চার দিনে কলিকাতা পৌঁছিয়াছে। দলের বালকদের এইরূপ উদ্যম ও কর্ম্মসহিষ্ণুতা সত্যই প্রশংসনীয়। তাহাদের সকলেরই বয়স তের হইতে ষোল বৎসরের মধ্যে।

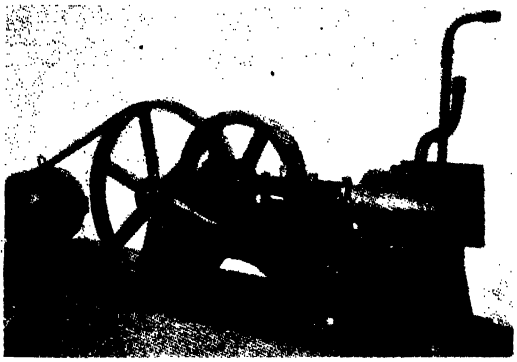
স্ত্রী-শিক্ষার সাহায্যে দান—

দমদম বিমানপোতের ঘাটির নিকটে পঞ্চাশ বিঘা পরিমিত এক খণ্ড জমি স্ত্রী-শিক্ষার সাহায্যার্থ দান করিবেন বলিয়া হাইকোর্টের এডভোকেট শ্রীযুক্ত হরিদাস মজুমদার বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট এক পত্র দিয়াছিলেন। তিনি এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, এই জমির উপর যেন একটি মহিলা শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় এই দান গ্রহণ করিয়াছেন। রায়-বাহাদুর বিহারীলাল মিত্র যে টাকা দিয়াছেন, তাহা দ্বারা সম্ভবতঃ এই জমির উপর কোন শিক্ষায়তন নির্ম্মিত হইবে।

ইঞ্জিন-নির্ম্মাণে বাঙালীর কৃতিত্ব—

শ্রীযুক্ত পি. ধাড়া কলিকাতা করপোরেশনের অধীন ইটালিস্থ কারখানায় শিক্ষানবিশী করিতেছেন। তিনি সম্প্রতি পাঁচ অশ্বশক্তিবিশিষ্ট একটি

ইঞ্জিনের 'ডিজাইন' করিয়া স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার কর্ম্মকুশলতার বিশেষ পরিচয় আছে। একটি বৈদ্যুতিক ডাইনামো



শ্রীযুক্ত পি. ধাড়া নির্ম্মিত ইঞ্জিন

এই ইঞ্জিন দ্বারা চালিত হইয়া তড়িৎ উৎপাদন করে এবং কতকগুলি আলো ও পাখাকে তড়িৎ সরবরাহ করে। কলিকাতার কতকগুলি প্রদর্শনীতে ইহা দেখান হইয়াছে। ইহা করপোরেশনের মিউজিয়মে রক্ষিত হইবে স্থির হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ধাড়া যাদবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র।

বিদেশে বাঙালীর কৃতিত্ব—

শ্রীযুক্ত সুকুমার চক্রবর্ত্তী প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সম্প্রতি ডি-লিট্ উপাধি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার গবেষণার বিষয় ছিল 'বাংলার চৈতন্য-যুগ'। তিনি বাংলার চৈতন্য-যুগের আলোচনা করিয়া লোকের নানা ভ্রান্ত ধারণা দূর করিয়াছেন। এইরূপ আলোচনার ফলে এ-যুগের সাহিত্যের দিকে বিদেশী পণ্ডিতগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে সন্দেহ নাই।



শ্রীযুক্ত সুকুমার চক্রবর্ত্তী

নিখিল-ভারত মহিলা সম্মেলন—

গত বড়দিনের ছুটিতে লেডী আব্দুল কাদেরের নেতৃত্বে কলিকাতায় নিখিল-ভারত নারী সম্মেলনের অষ্টম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে বিশিষ্ট মহিলা-কর্ম্মী সম্মেলনে যোগদান করিয়া ইহাকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছেন। অনেকগুলি প্রয়োজনীয় বিষয় সম্মেলনে আলোচিত হইয়াছে। যে-সব প্রস্তাব সম্মেলনে ধার্য্য হইয়াছে তন্মধ্যে এইগুলি উল্লেখযোগ্য,—

১। রাজা রামমোহন রায়ের শতবার্ষিকী উপলক্ষে এই সম্মেলন তাঁহার মাতৃভূমির সেবা, বিশেষ করিয়া ভারতীয় নারী জাতির উন্নতির চেষ্টার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাইতেছেন এবং ভারতমাতার এই কৃতী সন্তানের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিতেছেন।

২। "জাতি এবং শ্রেণীর কল্যাণ নির্ভর করে—নূতন করিয়া সমাজ গঠনের উপর।" এই কথা বিশ্বাস করিয়া—

(ক) জাতি, বর্ণ, ধর্ম্ম ও রাষ্ট্রগত বৈষম্য দূর করিয়া আন্তর্জ্জাতিক সহযোগ ও সদ্ভাব বৃদ্ধি করার জন্য যে সমস্ত চেষ্টা হইতেছে এবং ভবিষ্যতে হইবে তাহাতে আমরা সাহায্য করিব।

(খ) আমরা পুনর্ব্বার এই অভিমত প্রকাশ করিতেছি যে, যুদ্ধকে আমরা মনুষ্যত্বের বিরুদ্ধে অপরাধ বলিয়া মনে করি এবং পৃথিবীকে নিরস্ত্র করার জন্য যে সমস্ত নরনারী চেষ্টা করিতেছেন, এই সম্মেলন তাঁহাদের কার্য্য সম্পূর্ণ সমর্থন জানাইতেছে।

(গ) আমাদের দেশে আমরা আমাদের চতুর্দ্দিকে এবং আমাদের মধ্যে সত্যকার দেশপ্রেম ও মানবপ্রীতি সৃষ্টি করার ব্রত গ্রহণ করিতেছি। যাহাতে সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতার সঙ্কীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বৃহত্তর ভারত রাষ্ট্রসঙ্ঘের মধ্যে ন্যায্য স্থান গ্রহণ করিতে পারে, তজ্জন্যই আমরা চেষ্টা করিব।

৩। এই সম্মেলন দাবি করিতেছে যে, ভারতের নূতন রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় একটা নির্দ্দিষ্ট সোপান পর্য্যন্ত প্রত্যেক শিশুকে লেখা-পড়া শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৪। পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রস্তাবের পুনরাবৃত্তি করিয়া এই সম্মেলন দাবি করিতেছে:—

(ক) প্রত্যেক বিদ্যাপীঠে ছাত্রদিগকে সুশিক্ষিত লোকের দ্বারা শারীরিক শিক্ষা দিতে হইবে।

(খ) চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(গ) মিউনিসিপ্যালিটি ও লোকালবোর্ডসমূহের অধীনে নারী ও শিশুদের জন্য ভ্রমণস্থান ও খেলার স্থানের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৫। এই সম্মেলন এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় এবং কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষকে সহশিক্ষার বাধা দূর করিতে অনুরোধ করিতেছে এবং যে সমস্ত বিদ্যালয়ে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে সহশিক্ষা নাই, তথায় উহা প্রবর্ত্তন করার জন্য অনুরোধ করিতেছে।

৬। নিজস্ব বিশেষ আদর্শ অনুযায়ী ভারতীয় নারী বিশ্ববিদ্যালয়ে যে কার্য্য করিয়াছে তজ্জন্য তাহার প্রশংসা করা যাইতেছে এবং অধ্যাপক কার্ভে জনসাধারণের নিকট যে আবেদন জানাইয়াছেন সেই আবেদন সমর্থন করিতেছে।

শিক্ষাকার্য্যে মহিলার দান—

ফরিদপুর বালিয়াকান্দীর পরলোকগতা ক্ষীরোদাসুন্দরী রায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে এক হাজার টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। উহা হইতে বালিয়াকান্দীর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থিগণের মধ্যে যে প্রথম স্থান অধিকার করিবে প্রতি বৎসর তাহাকে একটি স্বর্ণ পদক দেওয়া হইবে।

অবনত শ্রেণীর ছাত্রের সাহায্য—

পরীক্ষার ফী না লইয়া অবনত শ্রেণীর ছাত্রদিগকে পরীক্ষা দিতে দেওয়া হউক, এই মর্ম্মে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক আবেদন করা হইয়াছে। তদনুসারে স্থির হইয়াছে, উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের আগামী পরীক্ষায় অবনত শ্রেণীর ছাত্রদের ফী বাবদে পাঁচ শত টাকা দান করিবেন।

প্রথম মাড়োয়ারী মহিলা ডাক্তার—

শ্রীমতী গঙ্গা আগরওয়ালা যোগ্যতার সহিত এ-বৎসর কলিকাতা মেডিকাল কলেজ হইতে এম-বি উপাধি লাভ করিয়াছেন। তিনি ১৯২৭-২৮ সনে মেডিকাল কলেজে ভর্ত্তি এবং তিন বৎসর বৃত্তি লাভ করেন। তিনি দিল্লীর এক সম্ভ্রান্ত মাড়োয়ারী পরিবারের কন্যা এবং প্রথম মাড়োয়ারী মহিলা ডাক্তার।

বাংলায় নারী-শিক্ষার বিস্তার—

পাঁচ বৎসরের সরকারী হিসাব। বাংলা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত পঞ্চ বার্ষিক বিবরণে প্রকাশ, নারীদের প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ সব শ্রেণীতেই ছাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ছাত্রী-সংখ্যা

	১৯৩১-৩২	১৯২৬-২৭
কলেজ	৭১২	৩৬৪
উচ্চ বিদ্যালয়	১০৬৫৫	৪৮০১
মধ্য বিদ্যালয়	৯৫০৬	৮২৬৯
নিম্ন বিদ্যালয়	৫১৮৫৪৪	৩৯৬০৫৬

কলেজের ছাত্রী-সংখ্যার মধ্যে চিকিৎসা শাস্ত্রে অধ্যয়নরতা ৪১টি ছাত্রী এবং ট্রেণিংএ কতকগুলি ছাত্রী অন্তর্ভুক্ত। ১৯৩২ সনে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ৮১টি বি-এ ও ১০টি এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছেন। ১৯৩২ সনে ডায়োসেসন কলেজ হইতে ১২ জন ও লরেটো হইতে ৮ জন বি-টি পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছেন। —হিতবাদী

ভারতবর্ষ

রবীন্দ্র-পদক—

"রবীন্দ্র-জয়ন্তী" উৎসবকে স্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য দিল্লীর বেঙ্গলী ক্লাব "রবীন্দ্র-পদক" নাম দিয়া প্রতিবৎসরে একটি করিয়া স্বর্ণ-পদক পুরস্কারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রবাসের বাঙালী ছাত্র ও ছাত্রীগণের মধ্যে রবীন্দ্র-সাহিত্যের অনুশীলন এই আয়োজনের অন্যতম উদ্দেশ্য।

প্রথম বৎসর

বিষয়—"রবীন্দ্র-সাহিত্যে বাংলার পল্লী-চিত্র"।

নিয়মাবলী :—

১। উপরোক্ত বিষয়ে বাংলা ভাষায় লিখিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য ঐ পদক দেওয়া হইবে।

২। প্রবাসের বাঙালী ছাত্র ও ছাত্রীগণের যে-কেহ এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারিবেন।

৩। প্রবন্ধ, কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট করিয়া লিখিতে হইবে এবং প্রবন্ধের শব্দসংখ্যা আট হাজারের অধিক হইবে না।

৪। আগামী ১লা চৈত্রের মধ্যে (১৫ই মার্চ্চ, ১৯৩৪) প্রবন্ধ, পদক-কমিটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত সোম, গন্দানালা, দিল্লী, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৫। লেখক বা লেখিকা নিজ নিজ প্রবন্ধে স্কুল বা কলেজের নাম এবং কোন্ শ্রেণীর ছাত্র বা ছাত্রী তাহার উল্লেখ করিবেন; এই উক্তির সমর্থন হিসাবে প্রবন্ধের সহিত হেড্‌মাষ্টার বা প্রিন্সিপাল মহোদয়ের স্বাক্ষর না থাকিলে, কোন প্রবন্ধই প্রতিযোগিতায় গৃহীত হইবে না।

৬। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরত লইতে হইলে উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠাইতে হইবে।

৭। ক্লাব কর্ত্তৃক মনোনীত তিন জন যোগ্য ব্যক্তি প্রবন্ধগুলি পরীক্ষা করিবেন। ইঁহাদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

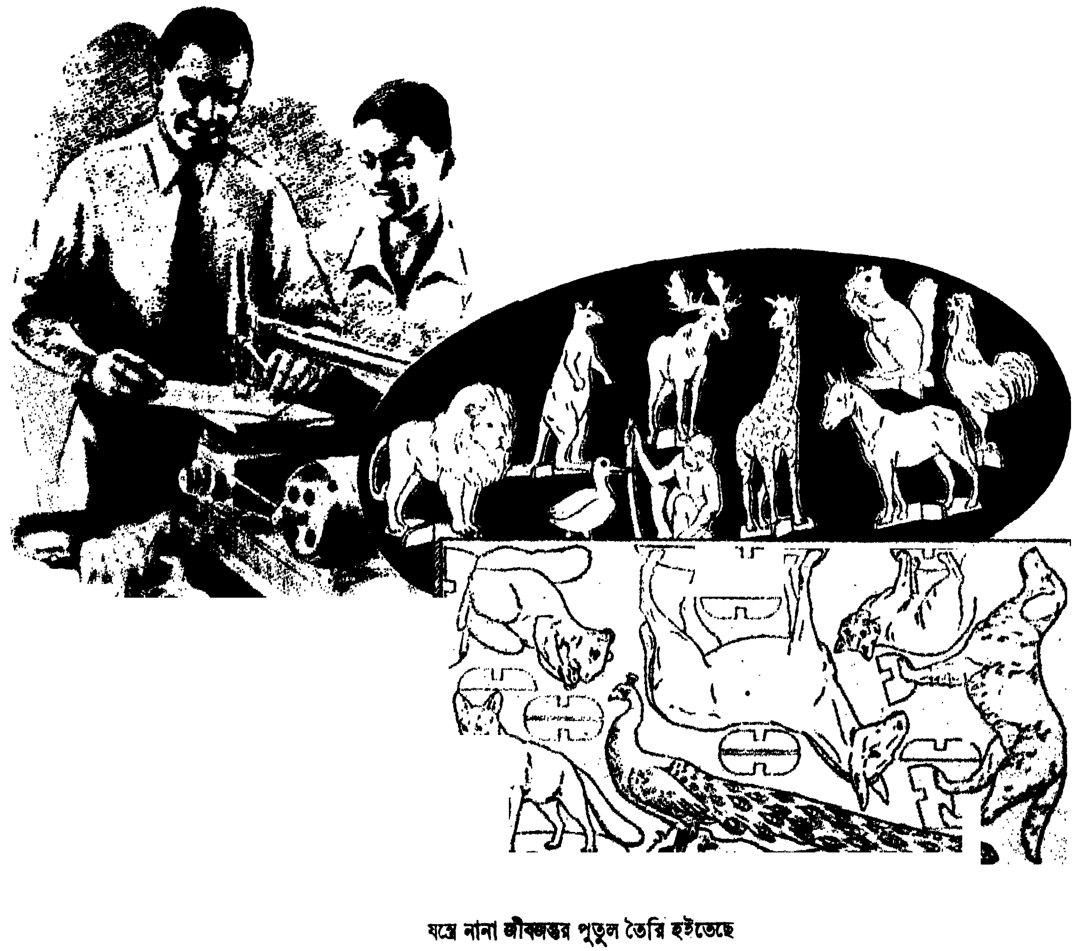
৮। আগামী ২৫এ বৈশাখ প্রতিযোগিতার ফলাফল বিজ্ঞাপিত হইবে এবং যথাসময়ে সংবাদ-পত্রাদিতেও প্রকাশিত হইবে। পুরস্কৃত প্রবন্ধ সর্ব্বপ্রথমে ক্লাব দ্বারা অনুষ্ঠিত কবির জন্মতিথি উৎসব-সভায় পঠিত হইবে এবং তৎপরে উহা কোন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশেরও ব্যবস্থা করা হইবে।

৯। পুরস্কৃত প্রবন্ধের সর্ব্বপ্রকার অধিকার কেবল ক্লাব কর্ত্তৃপক্ষেরই থাকিবে।

পাঠশালা

যন্ত্রসাহায্যে খেলনা তৈরি—

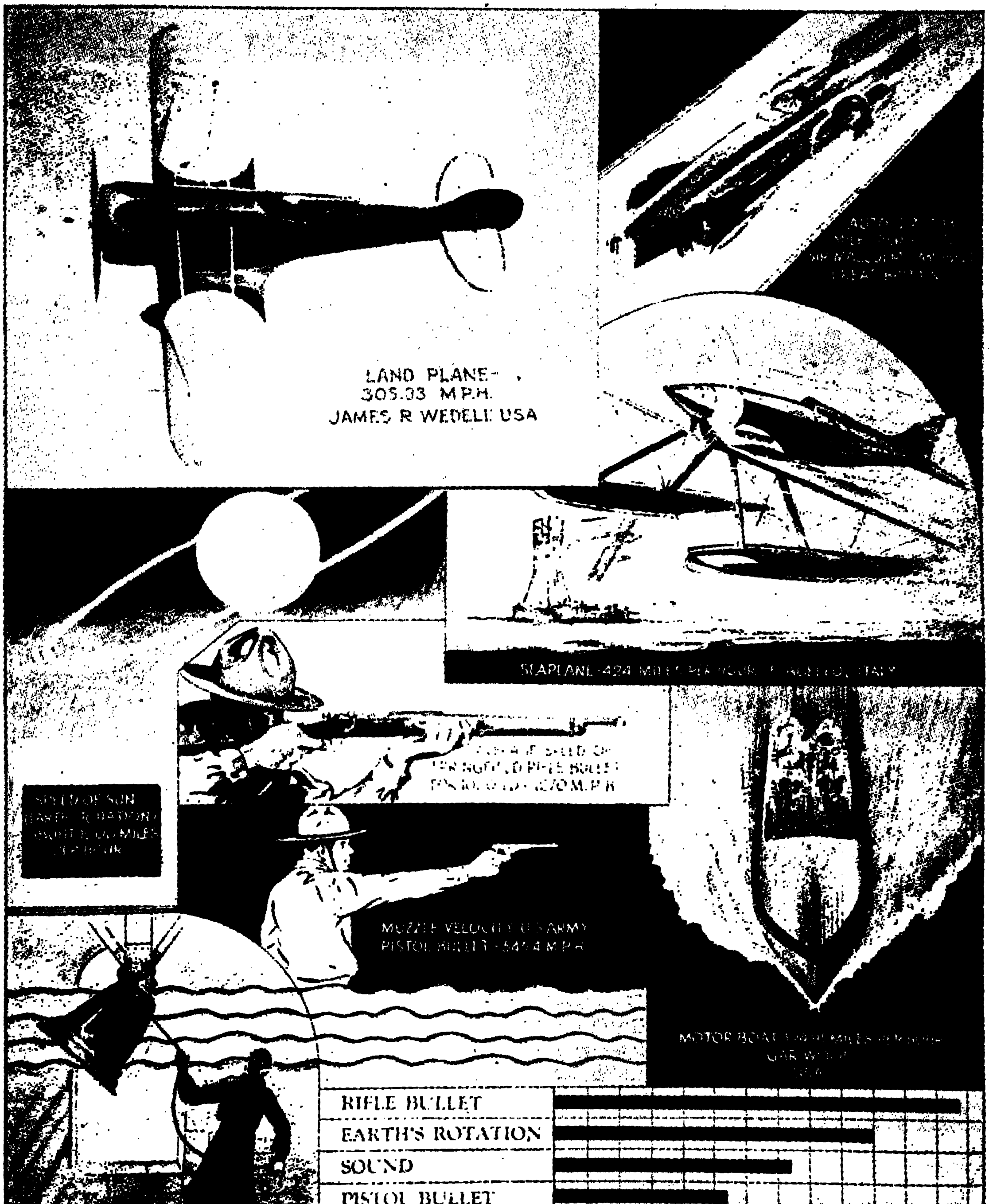
কতকগুলি কাষ্ঠখণ্ডের উপর প্রথমতঃ খেলনা, ছবি, পুতুল, জীবজন্তু প্রভৃতির চিত্র আঁকা হয়। একটি যন্ত্র সাহায্যে করাত দিয়া কাটিয়া এই সব তৈরি করিতে হয়। যাহারা গৃহে বসিয়া নানাবিধ খেলনা, পুতুল ইত্যাদি তৈরি করে তাহাদের এই যন্ত্রটি বিশেষ আবশ্যক।



যন্ত্রে নানা জীবজন্তুর পুতুল তৈরি হইতেছে

পৃথিবীর গতির সঙ্গে গোলা, শব্দ, এরোপ্লেন প্রভৃতির গতির তুলনা—

পৃথিবীর গতি ঘণ্টায় হাজার মাইল, রাইফেল-গুলির গতি তের শত মাইলের কাছাকাছি। শব্দ, পিস্তল-গুলি, জলযান, স্থলযান ও এরোপ্লেনের গতি যথাক্রমে কিঞ্চিদধিক সাত শত, পাঁচ শত, চারি শত ও তিন শত মাইল। ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের বৈজ্ঞানিকগণ চেষ্টা করিতেছেন যাহাতে ভবিষ্যতে এরোপ্লেনের গতি পৃথিবীর গতির সমান করা যায়।


LAND PLANE-
305.33 M.P.H.
JAMES R WEDELL USA
RIFLE BULLET
EARTH'S ROTATION
SOUND
PISTOL BULLET
SEAPLANE
LAND PLANE
AUTO
MOTOR BOAT

দেহের মধ্যে সূর্য্য-রশ্মি প্রবেশ করান হইতেছে—

রোগীকে রৌদ্রে রাখিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। ইহাকে ইংরেজীতে 'সান্-বাথ' বলে। শরীরের ভিতরেও রোগ দেখা দিলে রুগ্ন অংশে



শরীরে ভিতরকার রুগ্ন অংশে সূর্য্য-রশ্মি প্রবেশ করান হইতেছে

সান্-বাথ্ করান যায় কি-না কিছুকাল ধরিয়া তাহার চেষ্টা চলিতেছিল। উপরের চিত্রখানি হইতে বুঝা যাইবে, এই চেষ্টা কথঞ্চিৎ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। সূর্য্য-রশ্মি ধরিয়া রোগীর গলার ভিতরে প্রবেশ করান হইতেছে। ইহাতে কোনই যন্ত্রণা নাই। শরীরের ভিতরকার রুগ্ন অংশে এইরূপে সূর্য্য-রশ্মি অনায়াসে পৌঁছায়।

বৃক্ষের মধ্যে ভোজনাগার ও অতিথিশালা—

ওয়াশিংটনের সন্নিকটে আড়াই হাজার বৎসরের একটি প্রাচীন বৃক্ষ ছিল। ইহার উচ্চতা তিন শত ফুট এবং ইহার কাণ্ডের পরিধি কুড়ি ফুট। ইহার গোড়াকার অংশ দুই খণ্ডে কাটা হইয়াছে। একখণ্ড দাঁড়াইয়া আছে। তাহার ভিতরটা কাটিয়া কুড়ি ফুট পরিধিবিশিষ্ট একখানি গোলাকার ঘর করা হইয়াছে. কতকগুলি টেবিল ও আসবাবপত্র



বৃক্ষের মধ্যে অতিথিশালা



বৃক্ষের মধ্যে ভোজনাগার

দ্বারা ইহা সজ্জিত। অন্যটিতে ত্রিশ ফুট দৈর্ঘ্য ও আঠার ফুট প্রস্থ পরিমিত একখানি ভোজনাগার হইয়াছে।

বাংলার প্রথম মাসিক-পত্র

শ্রীহরিহর শেঠ

বাংলার প্রথম মাসিক-পত্র 'দিগদর্শন।' ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে জন্ ক্লার্ক মার্শম্যান উহা শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশ করেন। এই মার্শম্যান সাহেব বাংলা ভাষার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তদানীন্তন সুপ্রসিদ্ধ পত্রিকা 'সমাচার দর্পণ'ও ইঁহার দ্বারা পরে প্রকাশিত হয়।

দিগদর্শন কয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা আমার ঠিক জানা নাই। দুই খণ্ড আমার হস্তগত হইয়াছিল। * তাহার প্রথম খণ্ডে প্রথম হইতে দ্বাদশ ভাগ এবং দ্বিতীয় খণ্ডে ত্রয়োদশ হইতে ষড়বিংশ ভাগ আছে। প্রথম খণ্ডে কোন মাসের কাগজে প্রথম পৃষ্ঠায় মাস বা সাল কিছুই লেখা নাই, তবে ভিতরের পৃষ্ঠার শীর্ষদেশে মাস ও সাল লেখা আছে। তাহা হইতে জানা যায়, ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল হইতে ১৮১৯-এর মার্চ্চ পর্য্যন্ত প্রতি মাসে এক সংখ্যা করিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল।

পত্রিকার নাম প্রথম প্রথম 'দিগ্ দর্শন' লেখা আছে; পরে 'দিগদর্শন' এবং 'দিগ্দর্শন' উভয় প্রকারই দেখা যায়।

* চুঁচুড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত ভগবতীচরণ পাল মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহার দুইখণ্ড 'দিগ্দর্শন' আমাকে দেখিতে দেওয়ার জন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

আজকাল মাসিক-পত্রে "সংখ্যা" যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, তখন সে-স্থলে "ভাগ" এই কথা ব্যবহৃত হইত। পত্রিকার আকার ডিমাই বার পেজির অপেক্ষা কিছু বড়। প্রথম দুই সংখ্যা ১৬ পৃষ্ঠা করিয়া বাহির হইয়াছিল, পরে কিছু বেশী দেখা যায়। প্রথম বর্ষে নির্ঘণ্ট ও দিগ্‌দর্শনের অভিধান অংশ এগার পৃষ্ঠা বাদ মোট ২৭২ পৃষ্ঠা বাহির হইয়াছিল। দ্বিতীয় খণ্ডে ঐরূপ ৩৭ পৃষ্ঠা ছিল। সমগ্র বৎসরের সূচিপত্র নির্ঘণ্ট নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এই সূচিপত্রেরও কিছু বৈচিত্র্য দেখা যায়। প্রবন্ধের নাম ভিন্ন উহার অন্তর্গত বিষয়গুলিও পর পর অতিবিশদ ভাবে পত্রাঙ্ক সহিত দেওয়া আছে।

'দিগ্‌দর্শনের অভিধান' নাম দিয়া প্রত্যেক খণ্ডের শেষে অতি ক্ষুদ্রাকারের একখানি করিয়া বর্ণানুক্রমিক অভিধান আছে। উহা প্রথম খণ্ডে এগার এবং দ্বিতীয় খণ্ডে আট পৃষ্ঠা আছে। উহাতে প্রবন্ধান্তর্গত অপেক্ষাকৃত দুরূহ শব্দ ও তাহার অর্থ দেওয়া আছে। অবশ্য, অধিপতি—রাজা, কর্দম—কাদা, ক্ষত—ঘা, এরূপ শব্দেরও অভাব নাই।

পত্রিকার ছাপা সুন্দর, অবশ্য কোন কোন অক্ষর বেশ পরিষ্কার নহে। কাগজ কিছু মোটা খস্‌খসে। প্রথম হইতে চতুর্থ সংখ্যার মধ্যে প্রবন্ধের ভাষাতে একমাত্র পূর্ণচ্ছেদ ভিন্ন অন্য কোন ছেদ দেখা যায় না। পঞ্চম হইতে ষোড়শ সংখ্যার ৮৮ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত কমা, সেমিকোলন ও ফুলষ্টপ মধ্যে মধ্যে আছে। পরে পুনরায় শেষ পর্য্যন্ত একমাত্র পূর্ণচ্ছেদের ব্যবহারই দেখিতে পাওয়া যায়। এই বৈচিত্র্যের কারণ নির্ণয় করা সহজ নহে।

রচনার মধ্যে সমস্তই গদ্য প্রবন্ধ, কবিতা একটিও নাই। লেখকের নাম কোন প্রবন্ধের সহিত বা নির্ঘণ্টপত্রে দেখা যায় না। প্রথম খণ্ডে দশম সংখ্যা পর্য্যন্ত যে-সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে অনেকগুলি দেশ-বিদেশের, জীবজন্তু, ধাতব দ্রব্যের বিবরণ; কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্কারের কথা, বেলুনের কথা, পোর্তুগীজদের প্রথম ভারতে আগমনের কথা, জলপ্লাবন প্রভৃতির কথায় প্রায় পূর্ণ। এই সকল প্রবন্ধে তৎকালীন ভাষা ও সাহিত্যের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহাই উপভোগ্য, নচেৎ অন্য বিশেষত্ব কিছু নাই। 'হিন্দুস্থানের বাণিজ্য' ও 'ভারতবর্ষের স্বাভাবিক বৃক্ষ' এই প্রবন্ধগুলি হইতে সে সময়ের ব্যবসা-বাণিজ্য ও উৎপন্ন দ্রব্যাদির যে পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় অথবা 'বাষ্পের দ্বারা নৌকা চালান' এই প্রবন্ধে বাষ্পীয় পোত আবিষ্কারের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাহা আধুনিক মাসিক পত্রিকা-পাঠার্থীদের ভাল লাগিতে পারে মনে করিয়া তাহা হইতে নিয়ে কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

একাদশ হইতে ষড়্‌বিংশতি সংখ্যা প্রধানতঃ হিন্দুস্থানের ইতিহাস বিষয়ক প্রবন্ধেই পূর্ণ এবং উহা মুসলমানদের সময়ের কথা। ইহা ভিন্ন যে-কয়েকটি প্রবন্ধ আছে তন্মধ্যে 'বঙ্গভূমির মহাদুর্ভিক্ষ' এই প্রবন্ধটি জ্ঞাতব্য মনে হওয়ায় উহা হইতেও উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। ইহাতে ইংরেজী ফুলষ্টপের ব্যবহার লক্ষ্য করিবার বিষয়। ভাষার বিষয় আলোচনার দ্বারা বুঝাইবার প্রয়াস অপেক্ষা ভাষার নমুনা দেওয়াই শ্রেয়ঃ বিবেচিত হওয়ায় তাহাই করিলাম।

"হিন্দুস্থানের উৎপন্ন নানা দ্রব্য অন্য দেশীয় লোকেরদের অতিশয় উপকারক এদেশের ধনের এক প্রধান কারণ এই। এখানকার লোকেরা অন্য দেশের উৎপন্ন বস্তুর বড় আবশ্যক রাখে না অন্যত্র গ্রাহ্য বস্তু হিন্দুস্থানে বহুসংখ্যক উৎপন্ন হয় এই হেতুক অন্য২ লোকেরা এখানকার বস্তু ক্রয় করেণ বৎসর২ অনেক ধন এদেশে আনে।"—দিগ্‌দর্শন, প্রথম খণ্ড, ১০ পৃষ্ঠা।

"হিন্দুস্থানোৎপন্ন বস্তুদ্বারা অন্য২ দেশীয়েরদের বাণিজ্য হয় সে এই২ বস্তু। প্রথম নীল। ত্রিশ বৎসরের মধ্যে তাহার কৃষি বৃদ্ধি হইয়াছে এবং স্থানে২ প্রায় ইংগ্লণ্ডীয় সম্পর্কীয় নীলের কুটী হইয়াছে। সেই নীল কাপড়ে নানা প্রকার রঙ্গ করিবার কারণ আবশ্যক। এবং অনুমান হয় যে হিন্দুস্থানে প্রতিবর্ষ আশী হাজার মোন নীল উৎপন্ন হয় যদি প্রত্যেক মোনের মূল্য দেড়শত টাকা হয় তবে সমুদয় নীলের মূল্য বৎসরে এককোটি বিশলক্ষ টাকার অধিক উৎপন্ন হয়। সকল নীল প্রায় ইংগ্লণ্ডে যায় ও সেখান হইতে গিয়া সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হয়।"—দিগ্‌দর্শন, প্রথম খণ্ড, ১১ পৃষ্ঠা।

"তুলা প্রথম বাঙ্গালাতে অনেক উৎপন্ন হইত এখন দোয়াবে অর্থাৎ গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তি দেশে অধিক উৎপন্ন হয়। যখন কলিকাতা নগরে তুলা আইসে তখন সেই তুলার রাশি জাহাজে অল্পস্থানে রাখিবার কারণ একটা মহাকলের দ্বারা চাপিয়া অতিক্ষুদ্র করা যায়। তুলা চীন দেশে প্রতি বৎসরে অধিক যায় এবং তিন চারি বৎসর হইল ইংগ্লণ্ডেও অনেক যাইতেছে এবং সেখানে সেই তুলাদ্বারা বস্ত্র উৎপন্ন হয় তাহাতে অনেক লোকে কার্য্য পায়।"—দিগ্‌দর্শন, প্রথম খণ্ড, ১১ পৃষ্ঠা।

"মগধ ও কাশীতে অনেক আফিম প্রতি বৎসর জন্মে। তাহার বাণিজ্য কেবল কোম্পানি বাহাদুরের অধীন তাঁহার আজ্ঞা বিনা অন্যের কোন অধিকার নাই। * * * মহাজন লোকেরা তাহা ক্রয় করিয়া চীন ও মালাই প্রভৃতি দেশে লইয়া যায়।"—দিগ্‌দর্শন, প্রথম খণ্ড, ১১-১২ পৃষ্ঠা।

"বস্ত্র বৎসরের মধ্যে হিন্দুস্থানে অনেক জন্মে ঢাকা অঞ্চলে অতিসূক্ষ্ম বস্ত্র জন্মে। গঙ্গানদীর উত্তরভাগে খাসা বস্ত্র জন্মে। বাঙ্গালার দক্ষিণ পশ্চিম ভাগে লক্ষ্মীপুরের নিকটে বাপ্তা জন্মে মেদিনীপুর ও উড়িষ্যাতে ও তাহার নিকটস্থ মহারাষ্ট্র দেশে শান জন্মে বীরভূমিতে গড়া জন্মে। আমেরিকা দেশে অধিক লোক কৃষি কর্ম্মে নিযুক্ত শিল্পব্যবসায় অধিক নাই এই হেতুক তাহারা কলিকাতা হইতে অধিক টাকার বস্ত্র ক্রয় করিয়া লইয়া যায় তাহারা ক্রয় কারণ কেবল ডলার আনিয়া থাকে। কিন্তু সম্প্রতি কতক দিনের মধ্যে ইউরোপ ও আমেরিকাতে এতদ্দেশীয়েরা স্ব স্ব দেশে বস্ত্রের শিল্পকর্ম্ম স্থাপন করিবার নিমিত্ত অনেক উদ্যোগ করিতেছে।"—দিগদর্শন, প্রথম খণ্ড, ১২ পৃষ্ঠা।

"রেশম রামপুর বোয়ালিয়া ও কুমারখালি ও জঙ্গীপুর ও কাশীমবাজার ও মালদহ প্রভৃতি কোম্পানির-কুটীতে অনেক রেশম উৎপন্ন হয় সে যখন অন্য২ দেশে যায় সেই দেশে নানা রঙ্গ দিয়া নানা প্রকার বস্ত্র নির্ম্মাণ করে।"—দিগদর্শন, প্রথম খণ্ড, ১২ পৃষ্ঠা।

"হিন্দুস্থানের বস্তু উৎপন্ন সোরা তাহার দ্বারা বারুদ জন্মে। কোম্পানির বারুদখানাতে অনেক সোরা ব্যয় হয় এবং বিলাতেও অধিক চালান হয়।"—দিগদর্শন প্রথম খণ্ড, ১৩ পৃষ্ঠা।

"কোন২ স্থানে কোন২ বৃক্ষজন্মানেতে অত্যুপযুক্ত যেমন চা চীন দেশ ভিন্ন অন্য দেশে ভাল জন্মে না তৎপ্রযুক্ত চীন দেশের বাণিজ্যের এক প্রধান বস্তু চা।"—দিগদর্শন, প্রথম খণ্ড, ২৭ পৃষ্ঠা।

"ভারতবর্ষের উৎপন্ন চিনি ইংলণ্ডে গেলে বাণিজ্য চলিতে পারে এবং এই দেশে এত চিনি উৎপন্ন হয় যে ইংলণ্ড দেশের তাবৎ ব্যয়োপযুক্ত কিন্তু চিনি প্রস্তুত করিতে এতদ্দেশীয় লোকেরা সুন্দর পারগ নহে এই হেতুক এতদ্দেশীয় চিনি আমেরিকার নিকটস্থ উপদ্বীপজাত চিনির মত অন্য দেশে লইবার উপযুক্ত নয়।"—দিগদর্শন প্রথম খণ্ড, ২৮ পৃষ্ঠা।

"তামাকু ইংলণ্ডে তাহার কৃষি হয় না ভারতবর্ষেও পূর্ব্বে জন্মিত না কিন্তু আমেরিকা জানা গেলে পোর্ত্তুগীশেরা সেখান হইতে এদেশে আনিল।"—দিগদর্শন, প্রথম খণ্ড, ২৮ পৃষ্ঠা।

"তুলা এখানে অধিক জন্মে ইংলণ্ডে কিছুই জন্মে না অতএব এদেশ হইতে বৎসর২ অনেক তুলা ইংলণ্ডে যায়।"—দিগদর্শন, প্রথম খণ্ড, ২৯ পৃষ্ঠা।

"নীল ইংলণ্ডে জন্মে না আমেরিকাতে জন্মে যখন এদেশে নীল ব্যবসায় না ছিল তখন সেখান হইতে নীল ইংলণ্ডে যাইত কিন্তু এখন এদেশে অতিশয় ও উত্তম নীল জন্মানেতে এখান হইতেই এখন যাইতেছে আমেরিকা হইতে ইংলণ্ডে তাহার রপ্তানি নিবৃত্ত হইয়াছে।"—দিগদর্শন, প্রথম খণ্ড, ২৯ পৃষ্ঠা।

বঙ্গভূমির মহাদুর্ভিক্ষ

"বঙ্গভূমির প্রধান উৎপন্ন বস্তু ধান্য, তাহার অনেক অন্য২ দেশে প্রেরিত করা যায় দৈবাৎ কখন২ ফসল না জন্মিলে দুর্ভিক্ষ হয়. এইরূপ দুর্ভিক্ষ বঙ্গভূমিতে ও হিন্দুস্থানের অন্য২ ভাগে কখন২ হইয়াছিল. সন ১১৭০ সালে বাঙ্গালা দেশে এইরূপ অতিঘোর দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, তৎকালে নবাব ও অন্য২ ভাগ্যবান লোকেরা দরিদ্র লোকেরদের মধ্যে অনেক তণ্ডুল দান করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে তাঁহাদের ভাণ্ডার শূন্য হওয়াতে দান নিবৃত্ত হইল. ইহাতে অনেক দুঃখি লোক জীবনোপায় প্রত্যাশাতে তৎকালীন ইংলণ্ডীয়দের প্রধান বসতিস্থান কলিকাতার আইল. কিন্তু তখন কোম্পানীর ভাণ্ডারে দ্রব্যাভাবপ্রযুক্ত তাহারদের কোন উপায় হইল না. ইহাতে সে দুর্ভিক্ষারম্ভের দুই সপ্তাহ পরে সহস্র২ লোক রাজপথে ও মাঠে স্থানে২ পড়িয়া মরিল. এবং কুকুর ও শকুনি দ্বারা ঐ সকল মৃত শরীর ছিন্ন ভিন্ন হওয়াতে বায়ু অনিষ্টকারী হইল, তাহাতে সকলের ভয় জন্মিল যে এই দুর্ভিক্ষের পশ্চাতে মহামারী আসিতেছে. কোম্পানীর প্রেরিত একশত লোক নিযুক্ত ছিল, তাহারা ডুলি ও ঘোড়া দ্বারা ঐ সকল মৃত শরীর নদীতে ফেলিত, তৎপ্রযুক্ত নদীর জল এমত শবেতে পুরিল যে তাহার মৎস্য অখাদ্য হইল, এবং অনেক মৎস্যভোজী তৎক্ষণাৎ মরিল. * * *

এই মহাদুর্ভিক্ষ জলাভাবপ্রযুক্ত হইয়াছিল. বঙ্গভূমিতে দুই ফসল জন্মে, এক ফসল ক্ষুদ্র শস্য ও অন্য মহাফসল ধান্যাদি জন্মিল না, এবং সন ১১৭০ সালেও ক্ষুদ্র ফসল জন্মিল না ইহাতেই পূর্ব্ব লিখিত দুর্দশা উপস্থিত হইয়াছিল.

এই দুর্ভিক্ষ অদ্যাপি বঙ্গভূমিস্থ লোকেরদের মন হইতে লুপ্ত হয় নাই. এবং অনেক বৃদ্ধ লোকেরা আপনারদের যৌবনকালীন ক্রিয়ার সময় সেই দুর্ভিক্ষ বৎসরদ্বারা গননা করেন, সেই সময়ে কলিকাতার উচ্চপদস্থ একজন ইংলণ্ডীয় সাহেব দানার্থে তণ্ডুল সঞ্চয় করিতে উদ্যোগ করিলেন, এবং লোকেরা স্ব২ আহারার্থ স্ব২ সন্তান বিক্রয় করিতে উদ্যত হইল, ইহাতে স্নেহ বিনিময়ে যৎকিঞ্চিৎ কালের আহারমাত্র তাহারা পাইল. ঐ সাহেব আপন চাকরেরদিগকে আজ্ঞা করিলেন যে যত বালক বিক্রয় করিতে আসিবেক তাহারদিগকে ক্রয় কর, এবং যাবৎ দুর্ভিক্ষ থাকিবেক তাবৎ তাহারদিগকে আহার দেও. ইহাতে অনেকশত বালক তাহার দয়াপ্রযুক্ত মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইল. পুনর্ব্বার সুভিক্ষকাল হইলে সর্ব্বত্র ঘোষণা দিলেন যে যে২ লোকের সন্তান আমার এখানে আছে তাহারা লইতে চাহিলে বিনামূল্যে তাহারদিগকে পাইবেক. এই আশ্চর্য্য যে ইহা শুনিয়াও পুত্র লইতে কেহই আইল না, কেবল এক বৃদ্ধা স্ত্রী বধির ও বোবা আপনার পুত্রকে লইতে আসিল."—দিগদর্শন, দ্বিতীয় খণ্ড, ৮১-৮৪ পৃষ্ঠা।

বাষ্পের দ্বারা নৌকা চালানের বিষয়ে।

বাষ্পের জোর অতিবড় এই হেতুক ইউরোপ দেশে তাহার দ্বারা অনেক কল ঘুরাণ যায়। অনেক শিল্প কর্ম্মদ্বারা বাষ্পের কল হয় কিন্তু কল একবার প্রস্তুত হইলে পরে অনায়াসে খেলে এবং যে কল অন্যরূপে ঘুরাণ অতিদুষ্কর তাহা বাষ্পের দ্বারা অতি সহজে ঘুরাণ যায়। কতক বৎসর হইল আমেরিকা দেশে এক সাহেব বুঝিল যে দাঁড় ব্যতিরেকে এই কলদ্বারা নৌকা চালান যায় এই কারণ এক নৌকা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে দাঁড় না দিয়া এইরূপ কল তাহার মধ্যস্থানে দিল। এবং নৌকার দুই পার্শ্বে দুইটা চক্র দিল সেই চক্র কলের সহিত সংলগ্ন অথচ ঐ কলদ্বারা ঘোরে ঐ চক্রের বাহিরে কতক দাঁড় লাগাইল চক্রের ঘূরাণেতে ঐ দাঁড় জলের মধ্যে গমন করিল যখন কল ঘুরিল তখন ঐ চক্রও ঘূরিল এবং তাহার সহিত সংলগ্ন দাঁড়ের চলনেতে নৌকা অনায়াসে চলিল। এই প্রকারে কর্ম্মসিদ্ধি দেখিয়া অন্য২ লোকেও সেই রূপ করিল এবং ইউরোপ ও আমেরিকাতে সর্ব্বত্র তাহার প্রচার হইয়াছে এই কলযুক্ত যে নৌকা সে অতিবড় তাহার মধ্যে কোন২ নৌকায় দুইশত লোক অনায়াসে আহারাদি ও শয়ন প্রভৃতি করিতে পারে এ মহানৌকা ক্ষুদ্র জাহাজের তুল্য জলের ও বায়ুর প্রতিকূলেও দণ্ডে এক ক্রোশ চলে* এবং অতি স্থির রূপ দিবা রাত্র চলে চড়নদার লোকে জ্ঞান করে না যে নৌকা চলিতেছে।—দিগদর্শন, প্রথম খণ্ড, ৩০-৩১ পৃষ্ঠা।

* ভাটার সময়ে ঐ নৌকা দণ্ডে দুই ক্রোশ চলে ও চারি দিনে আড়াই শত ক্রোশের মঞ্জিল পঁহুছে।

দ্বীপময় ভারতের বৌদ্ধসাহিত্য ও মহাযান ধর্ম্মমত

শ্রীহিমাংশুভূষণ সরকার

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা দ্বীপময় ভারত বুঝিতে কেবলমাত্র জাভা ও বলিদ্বীপকে বুঝিব এবং 'বৌদ্ধসাহিত্য' বলিতে বৌদ্ধ লেখকদের রচনা না বুঝিয়া বৌদ্ধভাবমূলক সাহিত্যকেই বর্ত্তমান আলোচনায় গ্রহণ করিব। স্মরণ রাখা উচিত যে, কলসন অনুশাসনের সময় হইতে (আনুমানিক ৭৭৮ খৃঃ অঃ) ১৪৭৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কবি-সাহিত্যের যে অপূর্ব্ব বিকাশ ঘটিয়াছিল, তাহাতে বৌদ্ধ লেখকদের দানও সামান্য ছিল না। অনেক বৌদ্ধ লেখক হিন্দুশাস্ত্রীয় উপাদান অবলম্বন করিয়া কাব্য লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে কেদিরি-রাজ জয়বর্ষের রাজত্বকালে বৌদ্ধ লেখক ম্পু তন্তুলার অর্জ্জুনবিজয় কাব্য রচনা করেন, মজপহিতের শেষ হিন্দুরাজ ভ্র বিজয়ের পিতা ভ্র হ্যঙ বেকস্ ইঙ স্থকের রাজত্বকালে ম্পু পমুলুহ নামক জনৈক বৌদ্ধ পণ্ডিত হরিবংশ রচনা করেন। প্রবাদ আছে যে, ভারতযুদ্ধ নামক কাব্য, যাহাকে ফ্রিড্রিখ সাহেব দ্বীপময় ভারতের ইলিয়াড বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন,* তাহার শেষাংশ ম্পু পমুলুহ রচনা করেন। ভোমকাব্যের লেখক ম্পু প্রদ ও বৌদ্ধ ছিলেন। এরূপ আরও বৌদ্ধ পণ্ডিত হিন্দুশাস্ত্রের উপাদান অবলম্বন করিয়া কাব্য লিখিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন।

ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ্য এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মে যতটা প্রভেদ ছিল, দ্বীপময় ভারতে তাহাও ছিল না। ইহার প্রধান কারণ হইতেছে, শিববুদ্ধ নামক বিশিষ্ট ধর্ম্মমতের উদ্ভব। ফাহিয়ান্ যখন পঞ্চম শতাব্দীর গোড়ার দিকে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া চীনে ফিরিতেছিলেন, তখন দক্ষিণ-পূর্ব্ব সমুদ্রের ঝঞ্ঝামুখে পড়িয়া তাঁহাকে যে-পো-তি নামক স্থানে উপনীত হইতে হইয়াছিল। চীনা পণ্ডিত উক্ত ভৌগলিক সংজ্ঞায় কোন্ স্থান নির্দ্দেশ করিতেছেন বলা শক্ত; উহা জাভাও হইতে পারে, সুমাত্রা হওয়াও অসম্ভব নহে। তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, এখানে ব্রাহ্মণ এবং নাস্তিকেরা সম্মান প্রাপ্ত হয়; কিন্তু বুদ্ধদেবের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কোন কথা এখানকার লোকেরা জানে না। জাভাতে অষ্টম শতাব্দীর দিকে মহাযান বৌদ্ধধর্ম্ম বিশেষভাবে প্রচারিত হয় এবং কতকগুলি কারণের জন্য আমার মনে হয় যে, উহা বঙ্গদেশ হইতেই সেখানে প্রবেশলাভ করিয়াছিল। এই সময়েই ভাষা ও ধর্ম্মের সমন্বয় সাধিত হয়; ভাষার সমন্বয় হইতে কবি-সাহিত্যের উদ্ভব, ধর্ম্মের সমন্বয় হইতে শিববুদ্ধ-বাদের উদ্ভব। প্রথমটির নমুনা সর্ব্বাগ্রে পাওয়া যায় কলসন অনুশাসনে; দ্বিতীয়টির প্রমাণ মিলে সাহিত্যে ও সমসাময়িক শিলালেখ প্রভৃতিতে। আমরা বৌদ্ধসাহিত্য লইয়া আলোচনা করিতেছি বলিয়া গোড়াতেই শিববুদ্ধ-বাদের সম্বন্ধে একটু মুখবন্ধ করিয়া লইতে চাই।

প্রসিদ্ধ নাগরকৃতাগম নামক ঐতিহাসিক কাব্যের (১৩৬৫ খৃঃ অঃ) অনেক স্থলেই শিববুদ্ধ এবং শিব-বুদ্ধালয়ের উল্লেখ আছে। পররতন নামক ইতিহাসেও স্থানে স্থানে নৃপতিদের শিববুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইবার সংবাদ দেওয়া আছে। ঐরলঙ্গের সিম্পাং শিলালেখে লিখিত হইয়াছে, "শৈব সোগত ঋষি"—উহার তারিখ ৯৫৬ শকাব্দা। পূর্ব্বোক্ত নরপতির কলিকাতাস্থিত শিলালেখে উক্ত হইয়াছে, "সোগত মহেশ্বর মহাব্রাহ্মণ" (৯৬৫ শকাব্দা)। ১২৭৩ শকাব্দের সিংহসারি শিলালেখে নিম্নলিখিত বাক্যার্দ্ধ চোখে পড়ে, "মহাব্রাহ্মাণা শেব সোগত"। বস্তুতঃ নাগরকৃতাগম নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের একস্থলে স্পষ্টই উল্লিখিত হইয়াছে, "শিব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতা; ভগবান বুদ্ধ তাঁহা হইতে ভিন্ন নহেন, তাঁহারা তফাৎ হইলেও এক। কেননা, পৃথিবীর নিয়মে দ্বৈতবাদের কোন স্থান নাই।" 'সঙ্ হ্যঙ কমহাযানিকন' নামক বৌদ্ধগ্রন্থে লেখা আছে, "বুদ্ধ তুঙ্গল লবন শিব" অর্থাৎ বুদ্ধ এবং শিব অভিন্ন। এই জন্যই পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, শিব এবং বুদ্ধকে এক করিয়া দেখিবার

* Verhandelingen van het Bat. Genoot., p. 6., deel 22., voorlooping verslag van het eiland Bali.

চেষ্টা জাভা-বলিদ্বীপের ধর্ম্মের বিশিষ্ট লক্ষণ এবং সেখানে বুদ্ধকে শিবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া বিবেচনা করা হয়। ভারতবর্ষে শিব এবং বুদ্ধের সম্পর্ক এতদূরে আসিয়া পৌঁছায় নাই, যদিও ক্ষেমেন্দ্রের (১১শ শতাব্দী) সময়েই বুদ্ধ হিন্দু-দেবতাগণের মধ্যে আসন কায়েমী করিয়া লইয়াছিলেন।

এক্ষণে মূল বিষয়ের আলোচনা করা যাক্। দ্বীপময় ভারতে বৌদ্ধধর্ম্ম এক সময়ে খুব বিস্তার লাভ করিলেও স্থানীয় বৌদ্ধসাহিত্য একপ্রকার নগণ্য বলিলেই হয়। যাহা আছে তাহাতেও আবার শৈবমত ও সাংখ্য দর্শনের বিশিষ্ট ছাপ রহিয়া গিয়াছে। বেশীর ভাগ সাহিত্যই শৈব-সাহিত্য। নাম করিবার মত মাত্র তিনখানা বৌদ্ধ কাব্য আছে, যথা— সঙ্ হ্যঙ্ কমহাযানিকন, কুঞ্জরকর্ণ এবং নাগরকৃতাগম। সুতসোম কাব্যটি অর্দ্ধ বৌদ্ধ, অর্দ্ধ শৈব মতবাদে পূর্ণ ; ইহার সঙ্গে জিনার্থ প্রকৃতি নামক নীতিশাস্ত্র এবং বৃহবেদের নাম করিলেই আমাদের তালিকা প্রায় শেষ হইয়া যায়।

প্রথমে সঙ্ হ্যঙ্ কমহাযানিকনের আলোচনা করা যাক্। ইহার ৮নং পাতায়* নিম্নলিখিত সংস্কৃত শ্লোকটি আছে—

"এহি বৎস মহাযানম মন্ত্রাবার্য্যনরম বিধম্
দর্শয়িষ্যামি তে সম্যক, ভাজনে স ত্বম মহানয়ে"

কবি নিজেই বলিতেছেন যে, এই পুস্তক বজ্রাচার্য্যগণের সুবিধার জন্য রচিত হইয়াছে। যাঁহারা 'মণ্ডলে' আছেন এবং যাঁহারা বিশ্বাসী, তাঁহারাই এ পুস্তক পাঠ করিতে পারিবেন। অতীতে যাঁহারা বুদ্ধ ছিলেন এবং ভবিষ্যতে যাঁহারা হইবেন, তাঁহারা এই বজ্রযান নীতিতে বিশ্বাসী হইয়াই পৃথিবীতে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া পরিগণিত হন।

জাভায় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বৌদ্ধ তান্ত্রিক মতবাদের যে পূর্ণবিকাশ ঘটিয়াছিল, বর্ত্তমান পুস্তকে তাহার কথঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। তুম্পাং-এ আবিষ্কৃত অনেক তান্ত্রিক দেবতা আমষ্টার্ডাম প্রদর্শনীতে দেখান হইয়াছিল। নাগরকৃতাগম পুস্তকের বিভিন্নস্থলে (৫৭, ৬০ সর্গ প্রভৃতি) কবজ্রধরণ অর্থাৎ তান্ত্রিক বজ্রযানের পন্থাবলম্বী লোকের সাক্ষাৎ মিলে। বৌদ্ধদের শূন্যবাদও স্থানে স্থানে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে।

আবিষ্কৃত লণ্টার পুঁথির ৩৪ পৃষ্ঠায় দেখিতে পাই :—

"যাবন্তি সর্ব্ববস্তূনি দর্শনিক্ষমস্থিতানি চ
তানি শূন্য স্বভাবাণি প্রজ্ঞাপারমিতা স্মৃতঃ।"

এখানে যেমন প্রজ্ঞাপারমিতাকে শূন্য স্বভাব বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে,* নাগরকৃতাগমের প্রারম্ভিক যুক্তিও কতকটা এই ধরণের :—

বুদ্ধ = খ = আকাশ = শূন্য

এবং

শিব = আকাশ = খ = শূন্য

∴ বুদ্ধ = শিব = শূন্য

দর্শনশাস্ত্রের এই 'সর্ব্বং শূন্যং'-বাদ বেদান্তেরও লক্ষণ বটে। ছান্দোগ্য-উপনিষদে পাইতেছি "সঃ যঃ আকাশম্ ব্রহ্মেতি উপাস্তে।"† এখানেও ব্রহ্ম ও আকাশকে একই পর্য্যায়ে উন্নমিত করা হইয়াছে। শৈবসিদ্ধান্তের 'নিষ্কল'-এর কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

আলোচ্য গ্রন্থে বুদ্ধের শ্রেণীবিভাগও লক্ষ্য করিবার বিষয়। অনাগতবুদ্ধের মধ্যে মৈত্রেয়, এবং সমন্তভদ্রের নাম দেওয়া হইয়াছে, অতীতবুদ্ধের মধ্যে বিপশ্বী, বিশ্বভূ, ক্রকুচ্ছন্দ, কনকমুনি এবং কাশ্যপের নাম দ্রষ্টব্য। বর্ত্তমান বুদ্ধ হইতেছেন শাক্যমুনি। অনাগতবুদ্ধের মধ্যে মৈত্রেয় মানুষীবুদ্ধের পর্য্যায়ে পড়েন, সমন্তভদ্র ধ্যানীবোধিসত্ত্বের পর্য্যায়ে। তিব্বতী বৌদ্ধরা শেষোক্ত জনকে স্বর্গীয় বৈরোচনের সন্তান বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকে। শাক্যমুনি মানুষীবুদ্ধের মধ্যে চতুর্থ এবং তাঁহার ধ্যানীবুদ্ধের নাম অমিতাভ, বোধিসত্ত্বের নাম অবলোকিতেশ্বর।‡

২৭ পৃষ্ঠায় যে ছয়টি পারমিতার নাম করা হইয়াছে, তাহা দান, শীল, ক্ষান্তি, বীর্য্য, ধ্যান এবং প্রজ্ঞা। চতুষ্পারমিতার মধ্যে মৈত্রী, করুণা, মুদিত এবং উপেক্ষার উল্লেখ করা হইয়াছে। এই চারিটি পারমিতা লোচনা, মামকী, পাণ্ডুর-বাসিনী এবং তারার সংস্পৃষ্ট বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, ইহারা বজ্রপাণি রত্নপাণি, পদ্মপাণি বা অবলোকিতেশ্বর এবং বিশ্বপাণির শক্তি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। সমন্তভদ্রের শক্তির নাম বজ্রধাত্বীশ্বরী। ওয়াডেল সাহেব বলেন,—

* মূল লণ্টার পুঁথির।

* Bijdragen T. L. VK., 1907-8, p. 395*ff*.

† Chhandogya Upanisad, 7-12-2.

‡ Waddel, Lamaism, p. 131*ff*.

"Tantrism, which began about the 7th century A.D. to tinge Buddhism, is based on the worship of the active producing principle (Prakriti) as manifested in the Sakti or female energy of the primordial male...... wives were then allotted to the celestial Bodhisats, as well as to most of the other gods and demons and most of them were given a variety of forms, mild and terrible, according to the supposed moods of each divinity at different times—"*

ইহার পরে দশপারমিতা, চতুর্যোগ (যথা- মূলযোগ, মধ্যযোগ, বসানযোগ এবং অন্তযোগ), চতুর্ভাবনা এবং চারিটি আর্য্যসত্ত্বের কথা বলা হইয়াছে।

বর্ত্তমান পুস্তক হইতে মূর্ত্তিতত্ত্বের বিবরণও কিছু কিছু সংগ্রহ করা যাইতে পারে। লেখক বলিতেছেন যে, শাক্যমুনি শুভ্র বর্ণের এবং তাঁহার মুদ্রার নাম ধ্বজমুদ্রা; তাঁহার দক্ষিণ-পার্শ্ব হইতে লোকেশ্বর দেহ পরিগ্রহ করেন। লোকেশ্বরের রক্ত বর্ণ, তাঁহার চিহ্ন ধ্যানমুদ্রা। শাক্যমুনির বামপার্শ্ব হইতে বজ্রপাণি জন্মগ্রহণ করেন; তাঁহার বর্ণ নীল, মুদ্রার নাম ভূস্পর্শমুদ্রা। এই তিন জন বুদ্ধকে রত্নত্রয় বলা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত পাঁচ জন ধ্যানীবুদ্ধের সম্পর্কে পাঁচটি স্কন্ধ; অমিতাভ, অক্ষোভ্য এবং বৈরোচনের সম্পর্কে ত্রিখলের উল্লেখ করা হইয়াছে।† পঞ্চ তথাগতের সম্পর্কে পঞ্চভূতের কথা ব্যক্ত হইয়াছে। সকলের শেষে বৌদ্ধদের শববিধানের কথা লেখক লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

পূর্ব্বে যে-সমস্ত তথাগতের কথা বলা হইল, তন্মধ্যে শাক্যমুনি হইতে বৈরোচনের উদ্ভব; লোকেশ্বর হইতে অক্ষোভ্য ও রত্নসম্ভব; এবং বজ্রপাণি হইতে অমিতাভ এবং অমোঘ সিদ্ধের জন্মবিবরণ দেওয়া হইয়াছে। এই পঞ্চ তথাগতের সংস্পৃষ্ট বলিয়া হুম্, এম্, হ্রী, অ, হ্রামকে বৌদ্ধরা এত পবিত্র মনে করে। পুস্তকের এই অংশের নাম পঞ্চতথাগতজ্ঞান। এখানে পঞ্চধাতু, ত্রিফল, ত্রিরত্ন, ত্রিমল, ত্রিকায়, ত্রিপরমার্থ এবং পঞ্চদেহেরও বিশদ বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। এই সমস্ত শব্দের বিশেষ টীকা ওয়াডেল সাহেবের 'লামাইসম্' নামক পুস্তকের বিভিন্ন স্থলে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

বর্ত্তমান পুস্তকের যে স্থলের নাম পরমগুহ্য, সেখানে প্রাণায়াম, অদ্বয়জ্ঞান, বজ্রজ্ঞান, সপ্তসমাধি প্রভৃতির বিশেষ বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। লেখক অক্ষরের উল্লেখ করিয়াছেন ও তাহাকে দেহের মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। মুণ্ডকোপনিষদেও* অক্ষর পুরুষের উল্লেখ দেখা যায়। আলোচ্য গ্রন্থে অক্ষর-ময় দেহকে স্তূপ-প্রাসাদ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ডাঃ খোরিস্ মনে করেনা যে পুস্তকের যে স্থলে মহাপুরুষ, পঞ্চাত্ম, পঞ্চবায়ু, রহস্য এবং ব্রহ্মকুণ্ডের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, সেখানে যথেষ্ট হিন্দুপ্রভাব বর্ত্তমান রহিয়া গিয়াছে। তিনি পুস্তকের যে অংশকে "C" বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন তাহাও তাঁহার মতে মূল বৌদ্ধরচনার শৈব-রূপান্তর। আমরা যে স্থানকে পরমগুহ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, সেখানে সিদ্ধান্ত-বাদের ছায়া পড়িয়াছে। অগস্ত্যের নামও এই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য। পুস্তকে দিগ্‌নাগের নামও রহিয়া গিয়াছে। তবে তিনি অসঙ্গের শিষ্য (৬ষ্ঠ শতাব্দী) কিংবা ধর্ম্মপালের গুরুদেব, সঠিক বলা শক্ত।

পুস্তকের তারিখ বিভিন্ন পণ্ডিত দশম শতাব্দী হইতে চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ঠেলিয়া লইয়া গিয়াছেন। আমরা ইহাকে সাধারণভাবে একাদশ শতাব্দীর লেখা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি।

বুদ্ধবেদের ‡ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার নাই, ইহা মাত্র কয়েক পৃষ্ঠার পুথি। ইহার পাঁচ পৃষ্ঠায় অক্ষোভ্য, রত্নসম্ভব, অমিতাভ, অমোঘসিদ্ধ এবং বৈরোচন নামক পাঁচ জন ধ্যানী-বুদ্ধের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। কিছুদূর পরে সংস্কৃত শ্লোকে বলা হইয়াছে—নমো রত্নত্রয়ায়, নমঃ আর্য্যাবলোকিতেশ্বরায়। রত্নত্রয় হইতেছে বুদ্ধ, ধর্ম্ম এবং সঙ্ঘ; অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্বের নাম।

বুদ্ধবেদ বলিতে বোধ হয় বৌদ্ধধর্ম্মসম্পর্কিত মন্ত্র-তন্ত্র বুঝাইত। ডাঃ খোরিস্ বলেন, "বলিদ্বীপের লোকেরা বেদ বলিতে যে মন্ত্র-তন্ত্র ভিন্ন অন্য কিছু বুঝিত না, তাহার প্রমাণ অর্জ্জুনবিবাহ নামক কাব্য হইতে পাওয়া যায়। উক্ত পুস্তকের

* Lamaism, p. 129*ff.*

† *Ibid.*, p. 109. Description of terms.

*। মুণ্ডকোপনিষদ্ ২।১।১; এখানে 'অক্ষরাৎ' অর্থ অক্ষরপুরুষাৎ অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভাৎ।

† Ondjavaansche en Balineesche Theologie, p. 155.

‡ Cod. 4165, Beschrijving der Jav. Bai. en Sasaksche handschriften van dr. Van der Tuuk, 1, pp. 204-206.

বলিদ্বীপীয় অনুবাদে গূঢ় মন্ত্রকে 'বেহ্দ' শব্দ দ্বারা বুঝান হইয়াছে।"*

কুঞ্জরকর্ণ একখানি বিখ্যাত কবি-গ্রন্থ। জুইনবল সাহেব অনুমান করেন যে, কোরবাশ্রম, আশ্রমবাসপর্ব্ব এবং কুঞ্জরকর্ণ চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে পশ্চিম জাভায় রচিত হইয়াছিল;† ডাঃ কার্ণের অনুমান দ্বাদশ শতাব্দীতে।‡ মূল গল্পটি এইরূপ। যক্ষ কুঞ্জরকর্ণ বৈরোচনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে অভিলাষ প্রকাশ করায় বৈরোচন তাহাকে প্রথমে যমরাজার কাছে উপদেশ গ্রহণ করিবার জন্য পাঠাইলেন। সেখানে বাস করিবার সময় তাঁহার বন্ধু পূর্ণবিজয়ের পাপের শাস্তির আয়োজনের বিবরণ শুনিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ মর্ত্ত্যলোকের দিকে রওনা হইলেন। পূর্ণবিজয় ঘুমাইতেছিল; বন্ধুপত্নী দরজা খুলিয়া দিলে কুঞ্জরকর্ণ তাহাকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলেন। পাপী পূর্ণবিজয় ব্যাকুল হইয়া তাহাকে বৈরোচনের কাছে লইয়া যাইবার জন্য কুঞ্জরকর্ণের কাছে অনুরোধ জ্ঞাপন করিল; তিনিও স্বীকার করিলেন। সেখানে গুরুর কৃপালাভ করিয়া পূর্ণবিজয়ের দিব্যচক্ষু খুলিয়া গেল; তাঁহার নরকভোগের পরিমাণও কমিয়া গেল। সে বাড়িতে গিয়া পত্নীকে বলিল যে, সে দশ দিন মৃত্যু-সমাধিতে বসিবে; এই সময়ে কেহ যেন তাহাকে বিরক্ত না করে। একাদশ দিবসে সে আবার পরিত্যক্ত দেহ পুনর্গ্রহণ করিবে। সমাধি হইল।

যমরাজ যখন তাঁহাকে তপ্ত কটাহে নিক্ষেপ করিলেন, অমনি সেখানে কল্পতরুর সৃষ্টি হইল, তাহার নীচে পূর্ণবিজয় দাঁড়াইয়া। পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যের আভাস তাহার সর্ব্বাঙ্গে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে।

যমরাজ আশ্চর্য্য হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে পূর্ণবিজয় বলিল যে, ইহা বৈরোচনের কৃপাতে সম্ভবপর হইয়াছে। গৃহে ফিরিয়া পূর্ণবিজয় আর সংসারধর্ম্ম করিল না। সে ও কুঞ্জরকর্ণ মহামেরুতে কুটীর বাঁধিয়া দ্বাদশবর্ষব্যাপী তপস্যা করিয়া সিদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইল। ইহাই এই বৌদ্ধ উপাখ্যানের মূলভাগ।

নাগরকৃতাগম ঐতিহাসিক কাব্য, লেখক প্রপঞ্চ। তিনি হয়ম ভুরুকের রাজত্বকালে ১৩৬৫ খৃষ্টাব্দে এই পুস্তক রচনা করেন। এই পুস্তকের আর একটি নাম ছিল 'দেশবর্ণন'। তুমাপেলের রাজা কেন আংগ্রকের সময় হইতে (১১০৪-১১৬৯ শকাব্দ) হয়ম ভুরুকের রাজত্বকাল ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। কাব্য হিসাবে ইহার মূল্য খুব বেশী না হইলেও, ইতিহাস হিসাবে ইহার দাম খুব বেশী। তবুও মনে রাখিতে হইবে যে, যেখানে পররতন এবং নাগরকৃতাগমের মধ্যে তারিখ বিপর্য্যয় কিংবা অন্য কোন প্রকার গণ্ডগোল লক্ষিত হয়, সে স্থলে পররতনই বেশী নির্ভরযোগ্য। লেখক রাজ্যস্থ ধর্ম্মাধ্যক্ষের পুত্র ছিলেন এবং কালে তিনি নিজেও সেই পদ অলঙ্কৃত করিয়াছেন। তাঁহার পিতারও কবিখ্যাতি ছিল বলিয়া মনে হয়। বৌদ্ধ লেখকের রচনা হইলেও জাভার এই 'রাজতরঙ্গিণী'তেও হিন্দুধর্ম্মের প্রভাব প্রকট হইয়াছে। ডাঃ কার্ণ নাগরকৃতাগমের অনুবাদ করিয়াছেন; তাঁহার শিষ্য ডাঃ ব্রাণ্ডেস্ পররতনের অনুবাদকার্য্য নিষ্পন্ন করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, উভয়ই ডাচ ভাষায় নিষ্পন্ন হইয়াছে। উপরে যাহা বলা হইল, দ্বীপময় ভারতের বৌদ্ধসাহিত্যের উহাই মোটামুটি স্থূল ব্যাপার। ইহাও এই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, জাভা এবং বলিতে কোন পুস্তকই পালি ভাষায় লিখিত হয় নাই।

---

* Ondjavaansche en Balineesche Theologie, p. 144.

† Bijdragen T. L. VK., deel 72, 1916, p. 401 *ff.*

‡ Verhand. d. Kon. Acad. V. Wetenschappen to Amsterdan, Afd. Letterkunde, Nienwe reeks, dl III, 3.

ফোর্ড কি শুধু টাকায় বড় ?

শ্রীশরৎ ঘোষ, এম-এ

যান্ত্রিক সভ্যতা বহুবার অভিশপ্ত হয়েছে। কিন্তু তবুও সে মরছে না। বরং দিন দিন পৃথিবীকে সে আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধছে। আকাশ ভেদ করে উৎকট গর্জ্জন করতে করতে ব্যোমযান আজ গৌরীশঙ্করশৃঙ্গেরও ছবি তুলে নিয়ে আসছে। ইথার বেচারাকে তরঙ্গায়িত হয়ে এক মহাদেশের কথা আর এক মহাদেশে পৌছে দিতে হয়। অতবড় ভীমকায় বিরাট সমুদ্র! তারও বুকের ভিতর দিয়ে মানুষ চালিয়ে দিল টেলিগ্রাফের তার, যুদ্ধের সময় চালায় সবমেরিন, আর সব সময় উপর দিয়ে যে বাষ্পপোতগুলি চল্‌ছে, তাদের উপদ্রবের ত কথাই নেই।

যন্ত্র মানুষকে শক্তি দিয়েছে, প্রকৃতির উপর আধিপত্য দিয়েছে, এ বিষয় কারও সন্দেহ নেই। তবু মনীষীরা একে ভাল চোখে দেখেন না, তার কারণ মানুষ এর অপব্যবহার সুরু করে দিয়েছে। কল কারখানাকে আশ্রয় করেই আরম্ভ হয়েছে ধনিক ও শ্রমিকের বিবাদ। বিজ্ঞানের সব আবিষ্কারের ফলেই আধুনিক যুদ্ধ হয়ে উঠেছে উৎকট রকমের সাংঘাতিক। বহু জাতি—যারা অশিক্ষা ও অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিজেদের জীবন অসভ্য বা অর্দ্ধসভ্য ভাবে কাটিয়ে দিচ্ছে, যন্ত্রবলে বলীয়ান্ তথাকথিত সভ্য জাতিদের অভিযানে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। রেড ইণ্ডিয়ানদের মত ঢের জাতি আজ পৃথিবীর বুক থেকে একেবারেই লুপ্ত হয়ে যেতে বসেছে।

যন্ত্র সভ্যতাই যে এত ক্ষতি করেছে, তার কারণ কিন্তু যন্ত্রশক্তি ততটা নয় যতটা হচ্ছে মানুষের লোভ। ব্যক্তিগত ভাবে সব জাতির ভিতরে এমন ঢের মানুষ জন্মাচ্ছেন যাঁরা নির্লোভ, আধ্যাত্মিক জীবনে যাঁরা ঢের উন্নত, কিন্তু সমষ্টির উপরে তাঁদের প্রভাব বড়ই কম। আজ উন্নতিশীল জাতিদের প্রত্যেকের যদি একটা মানুষের মূর্ত্তি দিয়ে তাদের প্রকৃতির ছবি তৈরি করা যায়, দেখা যাবে তারা প্রত্যেকে হুবহু এক। অত্যন্ত বলিষ্ঠ তাদের দেহ, কিন্তু তাদের উদরের পরিধি বিসদৃশ রূপে বৃহৎ। মুখে প্রত্যেকের ভোগের বিলোলতা—এক চক্ষু তাদের প্রতিবেশীর অস্ত্র-ভাণ্ডারের দিকে, আর এক চক্ষু দুর্ব্বল জাতিদের খনিজ ও স্বভাব-সম্পদের দিকে। মুখে তাদের বাইবেল, অন্তরে ম্যামন। রাজনীতি তাদের এত কলুষিত যে, শয়তান কবে যে পাতালপুরী থেকে তার দপ্তর সরিয়ে এনে মন্ত্রীসভায় স্থাপিত করে নিয়েছে এ তাদের খেয়ালেই আসেনি।

লোভ মানুষের ষড় রিপুর একটি। অন্য রিপুর মত তাই লোভও তার শিকারের সদ্‌বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে তাকে দিয়ে সমাজের অহিতকর কাজ করিয়ে নিতে পারে। যেহেতু ব্যবসায় লোভমূলক সেই জন্য এযুগের যান্ত্রিকেরা বা ব্যবসায়ীরা যে-সব প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করছেন তা থেকে বিষবাষ্প উঠে ধরিত্রীকে ভারাক্রান্ত করে তুলছে। এবং এমন কোনও মানুষ অথবা প্রতিষ্ঠান আজ পাওয়া শক্ত হয়ে উঠেছে যার ভেতর গৃধ্নু তার চেয়ে সেবা বড় হয়ে উঠেছে। এমন মানুষ দুর্লভ যিনি যে-সব রন্ধ্র দিয়া যান্ত্রিকতার ভিতর অকল্যাণ প্রবেশ করে তাদের সযত্নে রুদ্ধ করে যন্ত্রশক্তি দিয়ে শুধু বিপুলভাবে, আরও নিপুণভাবে জনসাধারণের মঙ্গল ও সুবিধার পথ সুগম করে দিয়ে যাচ্ছেন। যদি ভাগ্যক্রমে এমন কোনও যান্ত্রিকের উদয় হয় যিনি তাঁর যন্ত্র-শক্তির সাহায্যে শুধু নিজের জমানো-টাকার অঙ্কের ডানদিকে শূন্য না বাড়িয়ে দেশবাসীর সত্যকার কোনও অভাব মোচনের চেষ্টা করেন, তার নিযুক্ত শ্রমিকদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যথাসাধ্য যত্ন করে থাকেন এবং অস্বাস্থ্য দুশ্চরিত্রতা প্রভৃতিকে কারখানার চতুষ্পার্শ্ব থেকে সযত্নে দূরীভূত করে থাকেন, যাঁর সমস্ত প্রচেষ্টার মূল কথা হয়ে ওঠে জনসেবা, আমরা বিপুল এক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচি। মনে মনে বলি,—হে শক্তিমান্, তুমি মানুষের পরে আবার আমাদের বিশ্বাস ফিরিয়ে এনেছ, মানুষের কোনও শক্তি যে মনুষ্যত্বকে পরাভূত করতে

পারে না, দুর্দ্ধর্ষ পার্থিব শক্তিতে শক্তিমান্ হয়েও মানুষের আত্মা যে তার দিব্যলোকের দিকে যাত্রাকে অবিচলিত রাখতে পারে এর নিঃসংশয় প্রমাণ তুমি আবার আমাদের কাছে উপস্থিত করেছ, তোমাকে নমস্কার! *

আমেরিকার হেন্‌রি ফোর্ড ঠিক এমনি একজন মানুষ। তিনি তাঁর কার্য্যাবলীর দ্বারা যান্ত্রিকতাকে অভিশাপমুক্ত করেছেন। তিনি বলেন, যান্ত্রিকতার সৃষ্টি হয়েছিল মানুষের শ্রমলাঘব করার জন্য এবং মানুষকে নিত্যনূতন সুখ সুবিধা দান করার জন্য। যদি, এই জনহিত লক্ষ্য রেখে সেবাভাব প্রণোদিত হয়ে কেউ যন্ত্রের ব্যবহার করে দেখা যাবে তার কার্য্যের ফলে তার সমাজে কোনও অকল্যাণের উদ্ভব ত হবেই না পরন্তু নানা দিক দিয়ে তার অনুষ্ঠান মঙ্গলমণ্ডিত হয়ে উঠবে। কিন্তু যান্ত্রিকের লক্ষ্য যেন নিজের গৃধ্নু তার পরিতৃপ্তি হয় না, তার লক্ষ্য যেন হয় সেবা। এই কথাটি তিনি পুনঃ পুনঃ নিজের জীবন কথায় জোরের সঙ্গে বলেছেন।

তাঁর অসাধারণ সফলতার ত জগতে তুলনা নেই। মোটরকারের মত জটিল ও মূল্যবান যন্ত্রযান তিনি যে পরিমাণে নির্ম্মাণ ও বিক্রয় করেছেন, তা শুন্‌লে বিস্ময়ে অবাক্ হয়ে যেতে হয়।

অতবড় নিপুণ ও মেধাবী যান্ত্রিক হয়েও তিনি চল্লিশ বৎসরের আগে সফলতার সন্ধান পাননি। ১৯০৩ সালে চল্লিশ বৎসর বয়সে তিনি ফোর্ড কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেই বৎসর ১৭০৮ খানি মোটরকার নির্ম্মাণ করেন। তখন গাড়ীর দাম ছিল হাজার ডলারের উপর। ১৯০৯ সালে তিনি তৈরি করেন ১৮৬৬৪ খানা, তখন তার দাম কমে আসে ৯৫০ ডলারে এবং ১৯২১ সালে তাঁর কারখানায় তৈরি হয় ১,২৫,০০০ খানা গাড়ী যার দাম ফোর্ড ধরে দেন মাত্র ৩৫৫ ডলার। এত সস্তা দিয়েও তিনি কোনও রকম লোকসান দেননি এবং সস্তা দিতে যেয়েও তাঁর গাড়ীর যে শ্রেষ্ঠতা তা কোনও রকমে ক্ষুণ্ণ করেননি। এই অসাধারণ সিদ্ধি তিনি অর্জ্জন করেছেন কোন্ নীতি অবলম্বন করে? সেটা তাঁর নিজের ভাষাতেই বলা যাক্—

"The putting of service before profit. Without a profit business cannot extend. There is nothing inherently wrong about making a profit. Well-conducted business enterprises cannot fail to return a profit, but profit must and inevitably will come as a reward for good service. It cannot be the basis—it must be the result of service."

অর্থাৎ—সেবাকে লাভের চেয়ে বড় করে দেখা। অবশ্য লাভ না পেলে কোনও ব্যবসায়কেই বাড়ান যায় না। লাভ করার ভেতর সত্যই যে মূলগত কোনও অন্যায় আছে তা নয়। কোনও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সুপরিচালিত হ'লে লাভ না দিয়ে থাকতে পারে না, কিন্তু সে লাভের আসা উচিত হিতকর সেবার পুরস্কার ভাবে। লাভের ইচ্ছাই যেন ব্যবসায়ের ভিত্তি হয় না সেবার আনুষঙ্গিক ফল ভাবেই যেন লাভ পাওয়া যায়।

এই সেবাবুদ্ধি প্রণোদিত হয়ে তিনি ব্যবসায়ে নেমেছিলেন ব'লে তাঁর সমস্ত অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে এক বিশেষ অসাধারণত্ব ফুটে উঠেছে। প্রথম জীবনেই তিনি সাধারণ রাস্তায় চলার উপযোগী একখানি যন্ত্রযানের অভাব বিশেষ ভাবে অনুভব করেছিলেন। তিনি ভাবতেন, রেলগাড়ী দিয়ে দূরত্বকে খানিকটা জয় করা গিয়াছে। এখন এক প্রদেশ থেকে আর এক প্রদেশ খুব বেশী দূরে নয়। কিন্তু সাধারণ পথের দূরত্ব, একে কি দিয়ে জয় করা যায়? মানুষ যদি এক ঘণ্টায় মাত্র ৩।৪ মাইলের জায়গায় ৪০।৫০ মাইল দূরের জায়গায় পৌঁছে যেতে পারে তার কর্ম্মশক্তি অনেকখানি না বেড়ে থাকতে পারে না। কি বেচা-কেনা ব্যাপারে, কি চাকরির দরকারে তার গণ্ডী আর ৫।৬ মাইলের মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। লোহার পাটী লাগে না, পথনিরপেক্ষ এই রকম সস্তা যদি কোনও যন্ত্রযান মানুষ পায় অবশ্যই মানুষ তার বিপুল ব্যবহার করবে। এই দৃঢ় ধারণা তাঁর গোড়াগুড়ি ছিল ব'লে তিনি ফোর্ড কোম্পানির প্রতিষ্ঠার পর থেকে যে প্রণালীতে মোটরকার নির্ম্মাণ আরম্ভ করলেন তাতে সমব্যবসায়ী মহলে হুলস্থুল পড়ে গেল এবং শীঘ্রই তাদের সঙ্গে ফোর্ডের এক উৎকট বিরোধের সৃষ্টি হ'ল।

ফোর্ড গাড়ী-নির্ম্মাণ ব্যাপারে যে তিনটি সূত্র অবলম্বন করে কাজ আরম্ভ করলেন তা সংক্ষেপে এই:—

১। গাড়ী যথাসম্ভব মজবুত করতে হবে। নৈলে যদি অনবরত বিগড়ে যেতে থাকে লোকের ব্যবহারে বিরক্ত ধরে যাবে।

২। গাড়ী যথাসম্ভব হাল্‌কা করতে হবে নইলে সে অল্প তেলে বেশী দূর যেতে পারবে না, গতিবেগ বাড়বে না, এবং অনায়াসে উঁচুনীচু পথে অথবা কর্দ্দমাক্ত পথে চলতে পারবে না।

৩। দাম যথাসম্ভব কমাতে হবে। নইলে সাধারণ লোক এই যান ব্যবহার করতে পারবে না। সাধারণ লোকেই যদি মোটরকারের সুখ-সুবিধা ভোগ করতে না পারল ফোর্ডের মতে তাহলে সমাজের পক্ষে মোটরকার নির্ম্মাণের কোনও সার্থকতা নেই।

প্রথম দুইটি সূত্র নিয়ে অন্য ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ফোর্ডের বিশেষ কোনও বিরোধ বাধল না যদিও ব্যবহারের পক্ষে হাল্কা গাড়ী ভাল এই প্রমাণ করতে ফোর্ডের অনেক বেগ পেতে হয়েছে। কিন্তু তৃতীয় সূত্র নিয়ে বহু মনোমালিন্যের সৃষ্টি হ'ল। কারণ অন্য ব্যবসায়ীরা গোড়াগুড়ি থেকেই ধরে নিয়েছিলেন যে, মোটরকার ধনীদের একটা বিলাস সামগ্রী হবে। এর দাম কিছুতেই এত কমান যাবে না যাতে এ সাধারণের নাগালের মধ্যে আসে। কাজেই এর বাজার যখন ধনীদের মধ্যেই একান্ত সীমাবদ্ধ তখন প্রত্যেক গাড়ীতে যথাসম্ভব বেশী লাভ করাই ছিল এঁদের উদ্দেশ্য। এঁদের সমস্ত ধারণা ভেঙে দিয়ে ফোর্ড যখন প্রতিবৎসর নিম্নতর মূল্যে হাজারে হাজারে মোটর গাড়ী নির্ম্মাণ ও বিক্রয় আরম্ভ করলেন তখন এঁরা ঈর্ষ্যার জ্বালা না সইতে পেরে ফোর্ডের নামে মোটরগাড়ীর পেটেণ্ট নিয়ে এক বৃহৎ মামলা রুজু করে দিলেন।

সে মামলায় ফোর্ডকে তাঁরা হারাতে পারেননি। সেবার উদ্দেশ্য নিয়ে দক্ষতার সঙ্গে ব্যবসায় পরিচালনা করে তাতে যে প্রচুর লাভ আপনাআপনি আসে ফোর্ডও প্রতিবৎসর এর জাজ্বল্যমান প্রমাণ দিয়ে যেতে লাগলেন।

এক বৎসর তিনি এই রকম সস্তা দিয়েও এত লাভ পেয়েছিলেন যে, বৎসরের শেষে তাঁর গাড়ীর প্রত্যেক ক্রেতাকে সত্তর ডলার করে ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন!

এই অসাধারণ সিদ্ধি ফোর্ড অর্জ্জন করেছিলেন কেমন করে? শুধু সাধু উদ্দেশ্যই তাঁকে এই সার্থকতা দেয়নি। তার জন্য তাঁকে ঘোরতর তপস্যা করতে হয়েছে। সে তপস্যা কি?

সে তপস্যা অপব্যয় নিবারণ। এই অপব্যয় যদি না থাকে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান অথবা ব্যবসায় লাভজনক হতে বাধ্য। অপব্যয় সাধারণতঃ যে তিনিটি জিনিষে হয়ে থাকে তাদের নাম—সময়, শক্তি ও সামগ্রী। এই তিন দিক দিয়ে অপব্যয় নিবারিত হলে ফোর্ড দেখিয়েছেন যে, মোটরকারের মত বহুমূল্য দ্রব্যও কত সস্তায় বিক্রয় করা যেতে পারে। তাঁর কারখানায় কত যত্নের সঙ্গে এই অপব্যয় নিবারণ করা হয় তার একটি উদাহরণ দিলে এ বিষয়ে তাঁর দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা ও মনোযোগের গভীরতার প্রমাণ পাওয়া যাবে।

পিষ্টন রড সাজান ব্যাপার এর একটা খুব ভাল দৃষ্টান্ত। আগের নিয়ম অনুসারেও এই ব্যাপারটায় লাগত মাত্র তিন মিনিট। কাজেই এ নিয়ে আবার মাথা ঘামানোর দরকার আছে বলে মনে হ'ত না। দু-খানা বেঞ্চ ছিল, তাতে বসত ২৮ জন। তারা ন' ঘণ্টায় ১৭৫ পিষ্টন সাজাত অর্থাৎ প্রত্যেক পিষ্টনটায় ঠিক তিন মিনিট পাঁচ সেকেণ্ড লাগত। তাদের ফোরম্যান্ একটা ষ্টপ ওয়াচ নিয়ে তাদের সমস্ত ক্রিয়া বিশ্লেষণ করলে। সে দেখলে যে ন' ঘণ্টার চার ঘণ্টাই যায় লোকগুলির যাতায়াতে। তারা যে বাইরে কোথাও যেত তা নয়, কিন্তু জিনিষ আনায় এবং সাজান পিষ্টন সরিয়ে রাখতে তাদের অতখানি সময় ব্যয় হ'ত। সমস্ত কাজটা করতে প্রত্যেক লোকের ছ' রকম ক্রিয়া করতে হ'ত। ফোরম্যন্ এর জন্য একটা নূতন পদ্ধতির প্রবর্ত্তন করলে। সে কাজটাকে তিন ভাগে ভাগ করলে এবং এক এক দলে তিন জন লোক দিয়ে এক বেঞ্চিতে দুই দল লোক পিঠাপিঠি বসিয়ে দিলে যাতে একজন ইন্‌স্পেক্টর এক প্রান্তে বসে দুই দলের কাজ ভাল ভাবে দেখতে পারে। এখন এক জন লোক সমস্তখানি কাজ করার পরিবর্ত্তে মাত্র কাজটার এক তৃতীয়াংশ করতে লাগল অর্থাৎ ঠিক ততখানি করতে লাগল যা সে পা না নড়িয়ে করতে পারে। আগে দলে ছিল ২৮ জন, এখন সেটা কমে দাঁড়াল ১৪ জন। আগে ২৮ জনের কাজের পরিমাণ ছিল ৯ ঘণ্টায় ১৭৫টা পিষ্টন, এখন ১৪ জনে ৮ ঘণ্টায় সাজায় ২৬০০টা পিষ্টন।

অপব্যয় নিবারণকল্পে তাঁর নিজের কারখানার ব্যবস্থা সম্বন্ধে ফোর্ড লিখছেন।

"এখানে হাত দিয়ে কোনও সামগ্রী নাড়াচাড়া করার ব্যবস্থা নেই। এমন কোনও কাজ নেই যা হাত দিয়ে সম্পন্ন করতে হয়। যদি কোনও যন্ত্রকে স্বক্রিয় (automatic) করা যায় তা'হলে তাই-ই করা হয়।... পৃথিবীর যে-কোনও কারখানার চেয়ে আমাদের কারখানার মেজের প্রতি বর্গ ফুটে বেশী যন্ত্রপাতি আছে। কারণ অব্যবহৃত প্রতি ফুট মেজের জন্য একটা অনাবশ্যক উপরি খরচা পড়ে যায়। আমরা সে ধরণের অপব্যয় চাই না। অথচ যেটুকু স্থান দরকার তা ঠিকই আছে, বেশীও নেই কমও নেই। প্রত্যেক কাজটিকে বিভক্ত ও পুনর্বিভক্ত করা—

সব সময় কাজ করিয়ে যাওয়ানো, এই হচ্ছে মঙ্গল নির্মাণের মূলমন্ত্র। ১৯০৩ সালে প্রতি গাড়ীর জন্য আমরা যত লোক লাগাতাম শুধু গুছিয়ে জোড়ার জন্য—আজ যদি আমরা সেই হিসাবে প্রতি গাড়ীর জন্য লোক লাগাই তাহলে দুই লক্ষের উপরে লোকের দরকার হয়। কিন্তু আমাদের ৫০,০০০এরও কম লোক আছে এবং তাদের দিয়েই সব চেয়ে বেশী কাজের সময়ও কাজ চলে যায়। যখন সব চেয়ে বেশী কাজ হয় তখন কারখানায় দৈনিক তৈরি হয় প্রায় চার হাজার মোটরগাড়ী।"

ফোর্ড অপব্যয় সম্বন্ধে এতখানি সচেতন ব'লে যে-কোনও প্রতিষ্ঠান তিনি হাতে নিয়েছেন তাই লাভজনক হয়ে উঠেছে। ডেট্রয়েট রেলওয়ে দিয়ে তাঁর মাল পত্র আসা যাওয়া করত। কিন্তু সুপরিচালনার অভাবে সেই রেলওয়ে দিয়ে মালপত্রের আনা নেওয়ায় অযথা বিলম্ব হ'ত। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এসম্বন্ধে লেখালেখি করেও যখন কোনও ফল হ'ল না তখন ফোর্ড কর্তৃপক্ষকে জানালেন যে, যদি তাঁরা ঐ রেলওয়ে বেচতে রাজি থাকেন তা'হলে তিনি তা কিনে নিতে প্রস্তুত আছেন। রেলের কর্তৃপক্ষ হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন, কারণ তাঁরা সবরকম চেষ্টা করেও প্রতি বৎসর বিপুল পরিমাণে ঘাটতি দেওয়ার হাত থেকে অব্যাহতি পাননি। তারা ন্যায্য দামের চেয়েও একটু অতিরিক্ত নিয়ে ফোর্ডের কাছে সেই রেওলয়ে বেচে দিলেন। বিক্রীর এক বছর পরে হিসাব নিকাশ করে দেখা গেল রেলওয়েতে ঘাটতি ত নেইই পরন্তু কিছু লাভও হয়েছে!

ফোর্ড এই অসাধ্য সাধন করতে পেরেছিলেন শুধু অপব্যয় নিবারণ ক'রে এবং তাঁর নিযুক্ত কর্মীরা আপ্রাণ পরিশ্রম করত ব'লে। ফোর্ডের নিযুক্ত রেলওয়ে গ্যাঙ্গ (Gang) আগের গ্যাঙ্গের তুলনায় বেশী নয়, মাত্র কুড়ি গুণ কাজ বেশী করত। ফোর্ড কি যাদু জানেন যার জন্য তার লোকজন এমন ক'রে সর্বান্তকরণে পরিশ্রম ক'রে যায়?

ফোর্ডের সে যাদুমন্ত্র কর্মীদের পর্যাপ্ত পারিশ্রমিক। তাঁর কারখানার সর্বনিম্নস্থ কুলী পায়—দৈনিক ছয় ডলার বেতন অর্থাৎ প্রায় আঠার টাকা!

ফোর্ডের মতে কারখানার মালিকের এ উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয় যে, যতদূর পারি তত কম মাহিনায় লোক রাখব। মালিকের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত তাঁর লোকজনকে যতদূর বেশী পারি মাহিনা দিয়ে যাব। ধনিক তার সমাজের কাছে তার ধনের জন্য ঋণী। সে ঋণ শোধ করতে পারে শুধু তার অনুষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট প্রতি লোকের সুখ-সুবিধার 'পরে যথাসাধ্য দৃষ্টি দিয়ে এবং তার ব্যবস্থা করে দিয়ে। ফোর্ড স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন,—

"Capital that is not continually creating more and better jobs is more useless than sands. Capital that is not constantly making conditions of daily labour better and the reward of daily labour more just is not fulfilling its highest function."

অর্থাৎ—যে ধন নিয়ত অধিকতর, উৎকৃষ্টতর কাজ সৃষ্টি করতে পারে না সে ধন বালি-রাশির চেয়েও নিরর্থক। যে ধন নিয়ত দৈনন্দিন শ্রমের অবস্থা উন্নততর ও তার পুরস্কার ন্যায্যতর না ক'রে যেতে পারে সে তার শ্রেষ্ঠ কর্তব্য থেকে ভ্রষ্ট হয়।

অসন্তুষ্ট শ্রমিক কখনও ভাল কাজ দিতে পারে না। অভাবগ্রস্ত ঋণনিপীড়িত শ্রমিকের কর্মশক্তি উদ্বেগে ও দুশ্চিন্তায় ক্রমশঃ পঙ্গু হয়ে ওঠে। বিশেষতঃ এক দিকে ধনিকের বিলাস-সৌধের ভোগোজ্জ্বল উল্লাস আর এক দিকে শ্রমিকের অভাবমলিন বস্তির নিত্য অশান্তি এর সংযোগে তীব্র বিদ্বেষ বিষই উৎপন্ন হয়। কারখানার যাতে উন্নতি হয়, তার সত্যকার চেষ্টা করার জন্য শ্রমিক কোনও প্রেরণা ভিতরে বোধ করে না! নিত্য বিরোধই ধূমায়মান হয়ে ওঠে।

এমনি করে শ্রমিকদের অসচ্ছলতার ঊর্দ্ধে স্থাপিত ক'রে তাদের কারখানায় অনুরক্ত কর্মী ক'রে নিয়ে—ধনিকতার বিকটতম সমস্যায় তিনি অপূর্ব্ব সমাধান করেছেন। নিজের অর্থলোভকে তিনি পদে পদে সংযত ক'রে তাঁর অসাধারণ প্রতিভা ও যন্ত্রজ্ঞান তিনি জনসাধারণের ও সহকর্মীদের সেবায় নিয়োগ করেছেন। যান্ত্রিকতা তাঁর হাতে গণকল্যাণে মণ্ডিত হয়ে উঠেছে।

কলকারখানার বিরুদ্ধে আর একটা মস্তবড় অভিযোগ এই যে, সাধারণতঃ কারখানাগুলি শহরে অথবা শহরের উপকণ্ঠে স্থাপিত ব'লে এবং সেখানে জমি যথেষ্ট সুলভ নয়, এই কারণে অতি সঙ্কীর্ণ স্থানের ভিতর শত শত কুলীর একত্র অস্বাস্থ্যকর বস্তির মধ্যে বাস করতে হয়। ফলে, তাদের স্বাস্থ্য ও চরিত্র দুই-ই নষ্ট হয়। মুক্ত প্রান্তরের ভিতর যে প্রশান্তি আছে, বিমল বায়ুর মধ্যে যে স্নিগ্ধতা আছে, উজ্জ্বল রৌদ্রের মধ্যে যে সঞ্জীবনী শক্তি আছে, সে সব থেকে বঞ্চিত হয়ে কুলীরা মদ ও তাড়ির উৎকট নেশার মধ্যে বিশ্রান্তি খোঁজে। ফলে, কারখানায় যোগ দেওয়ার কিছুকালের মধ্যে আলো ও মাটীর চাষী—যন্ত্র ও আঁধারের এক পশু হয়ে ওঠে।

আধুনিক কারখানার এই মস্ত সমস্যা ফোর্ডের চোখ এড়ায়নি। এর প্রতিকারের জন্য তিনি দুইটি পন্থা অবলম্বন করেছেন। প্রথমতঃ তিনি মোটরকারের সমস্ত অংশ এক কারখানায় তৈরি না করিয়ে বিভিন্ন স্থানে দূরে দূরে ছোট ছোট কারখানা প্রতিষ্ঠা করেছেন। এতে পঞ্চাশ হাজার লোকের এক জায়গায় ভিড় করার দরকার হয়নি। দ্বিতীয়তঃ তাঁর কারখানাগুলিতে মাত্র আট ঘণ্টা কাজ হয় ব'লে এবং যথেষ্ট বেশী মাহিনা পায় ব'লে কর্ম্মীরা নিজেদের বাসা থেকে কিছু খরচ ক'রে এসেও কাজ ক'রে যেতে পারে। বিশেষতঃ ফোর্ড যে নিম্নতম শ্রমিককেও রোজ ছয় ডলার দেন সে একটা কঠিন সর্ত্তে। সে সর্ত্ত এই যে—

"The man and his home had to come up to certain standards of cleanliness and citizenstip." অর্থাৎ কর্ম্মীকে এবং তার বাড়িকে পরিচ্ছন্নতা ও নাগরিক জীবনের দিক দিয়ে একটা নির্দ্দিষ্ট আদর্শ পর্য্যন্ত আগে পৌঁছাতেই হবে।

ফোর্ড কিন্তু এই পর্য্যন্ত করেই ক্ষান্ত হননি। তিনি এ সম্বন্ধে এর চেয়েও একটা বড় কাজ করেছেন। তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন যে মূলতঃ কৃষি ও কারখানার মধ্যে কোন বিরোধ ত নেইই বরং উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে পারলে কৃষক তার অবসর কালে অনায়াসে কারখানার কাজ ক'রে দিয়ে আয় বৃদ্ধি ক'রে নিতে পারে। বিশেষতঃ এই যন্ত্রের যুগে কৃষকেরও আগের মত পরিশ্রম করবার কোনও আবশ্যকতা নেই। সে মোটর ট্রাক্টরের সাহায্যে অল্প সময়েই তার চাষের সমস্ত কাজ সেরে ফেল্‌তে পারে। এই নীতির বাস্তব প্রমাণ স্বরূপ তিনি ডেট্রয়েট থেকে অল্প দূরে নর্থভিলায় (Northville) ভাল্‌ভ তৈরি করার জন্য ছোট একটা কারখানা নির্ম্মাণ করেছেন। এখানে পার্শ্বস্থ কৃষকেরা এসে অবসর সময়ে কাজ ক'রে দিয়ে যায়। কর্ম্মীর কোনও নিপুণতার দরকার হয় না, কারণ সমস্ত কাজই কলে নিষ্পন্ন হয়।

ডেট্রয়েট থেকে মাইল পনেরো দূরে ফ্ল্যাটরকে (flat-rock) আর একটা বৃহত্তর কারখানা আছে। সেখানে কর্ম্মীদের কারখানার কাজ বাদে চাষ করার জন্য জমি দেওয়ার ব্যবস্থা আছে এবং যেহেতু আজকাল শ্রমিকরা তাদের নিজেদের মোটরগাড়ীতে ক'রে কারখানায় আসতে সমর্থ এই জন্য এই চাষের জমি কারখানার চারিপাশে পনর-কুড়ি মাইল পর্য্যন্ত দূরে অবস্থিত হ'লেও তাদের যাতায়াতে কোনও অসুবিধা হয় না।

ফোর্ডের কৃতিত্ব অথবা শ্রেষ্ঠতা কিন্তু এখানেই শেষ হয়নি। তাঁর জীবনের ও কারখানার পরীক্ষাগারে তিনি দীর্ঘ ও সশ্রম অনুসন্ধানের ফলে অনেক বহুমূল্য তথ্যের সন্ধান পেয়েছেন। সেগুলি এত অভিনব ও বিপ্লবাত্মক যে, তাদের সম্মুখে আমাদের দীর্ঘকালের বহু সংস্কার বিচূর্ণিত ও ধূলিসাৎ হ'য়ে যায়।

প্রতিমা

শ্রীসুশীলকুমার দে

যাহারে ভালবেসেছ, কভু তাহার তরে কাঁদ না ?
কেবল বুঝি কাঁদাও তুমি তারে ?
মানস-মণি বুকের মাঝে বেদনা দিয়ে বাঁধ না
গাঁথিয়া তারে ব্যাকুল বাহু-হারে ?

নীরস নিরানন্দের হাসি অধরে রহে লাগিয়া,
কাঁপে না বুক, চরণ নাহি টলে;
আপনা-হীন নিমেষহীন-নয়ন রহে জাগিয়া,
পাষাণ-প্রাণ-পরশ নাহি গলে।

স্বর্গ কোথা আকাশে ভাসে আশার পথ চাহিয়া,
নীরব তার নয়ন-দীপ দহে ;
মর্ত্ত-মরু তবুও শুধু তাহারি পানে চাহিয়া
উর্দ্ধমুখে সে-দাহ বুকে বহে।

সেদিন ছিল রাগের মেলা ফাগের খেলা ফাগুনে,
জানি না হবে তোমার সনে দেখা ;
দাঁড়ালে যেন শুভ্রশিখা রক্তশিখা-আগুনে,
উৎসবের উৎসমাঝে একা।

অধীর করি' মদির রূপে মাধবী চাঁপা করবী
আনিল মধুমাসের মাদকতা,
তাহার মাঝে একটি যেন চামেলী ফোটে গরবী
শুভ্রমুখী সুরভী-উন্নতা।

সেদিন ছিল উচ্ছ্বসিত উচ্চহাসি পবনে,—
চকিতে সেথা স্মিতের রেখা রাজে ;
পাগল কলরবের ধারা, আগল নাহি ভবনে,—
মুদিত তব মৌন তারি মাঝে।

সবার সাথে এড়ায়ে সবে দাঁড়ায়ে তুমি একাকী,
নীরব আঁখি নিরবগুণ্ঠিত, —
জনতামাঝে একটি জন বিজনে দিল দেখা কি ?
কণ্ঠ মোর সহসা কুণ্ঠিত !

নিখুঁত কলা নিখর করি' পাথরে যেন গড়িতে
শিল্পী কোন্ খেয়াল কতদিন ;
ভাবিনু তবু—রাগের রেখা শিহরি' প্রাণ-তড়িতে
গোপন বুকে স্বপনে রহে লীন।

উদিত রবি আপন ছবি নয়নে দিল আঁকিয়া,
চিহ্ন তার লিখন নাহি বুকে ?
অশ্রুধারা রাখে না কভু চক্ষুতারা ঢাকিয়া ?
ফোটে না ভাব ভাবনাহারা মুখে ?

জড়িমাহীন রূপের রহে গরিমা দেহে বিহরি',
স্পন্দ তার নহে কি ছন্দিত ?
তন্দ্রা-জাগরণের কোনো সন্ধ্যাতলে শিহরি'
করনি কভু নিজেরে নন্দিত ?

দীপ্তিহীন-তৃপ্তি-লীন আঁধারে কোথা সাঁতারে
অচেনা প্রাণ অজানা উদ্দেশে ;
নিজেরে কোথা হারালে নিজ বিস্মৃতির পাথারে
আপনভোলা-স্বপন-নির্দ্দেশে।

ফুলের দিনে ভুলের মোহে দেখিনু তোমা' কি-খনে,
ভাবিনু বুঝি ভাগ্য মোর তরে
রচিল চির-রহস্যের ছবিটি দৃঢ় লিখনে
সবার মাঝে সবার অগোচরে।

তিমিরতলে মৌনলীনা জ্যোৎস্নাবীণা দাঁড়ালে,
বিলয় যেন প্রলয়তরে জাগে,
শক্তি কোন্ খেয়ায় যেন মুক্তি প্রাণ-আড়ালে,
সুপ্তিশিখা দীপ্তিলিখা মাগে।

জানি না তুমি কোথায় আছ আপনামাঝে আপনি,
নিজেরে ভুলি' নিজের অনাদরে ;
কখনো বুঝি কাহারো তরে বিরহ-নিশা যাপনি ?
মিলন-রস রসেনি অন্তরে ?

ভাবিনু—মোর প্রেমের দীপ জ্বলুক্ আজ জাগাতে
চেতন তব চকিত আলো-রাগে ;
প্রাণের বান ভাঙিয়া দিক আকস্মিক আঘাতে
প্রাণের পথে যে-বাধা যত যাগে।

অজিত তোমা' অজেয় তোমা' জীবন মোর জিনিবে,
তোমারে দেবে তোমার পরিচয় ;
নয়ননীরে নিজেরে তুমি নিমেষমাঝে চিনিবে
লভিয়া পরাজয়ের মাঝে জয়।

চোখের কোণে চঞ্চলতা, বুকের কোণে বেদনা,
যে-আশা প্রাতে যে-ভাষা জাগে রাতে,
জাগাবে তব তরুণ চিত্তে অরুণ-রাঙা চেতনা
সুখের স্মৃতি দুখের প্রীতি সাথে।

সংশয়ের লঙ্কা হতে তোমারে লব টানিয়া,
মুখর হবে বীণাটি সুরহারা ;
চোখের বারি-বন্যা নাশি' নিভৃতে দিবে আনিয়া
নিবিড় নিবেদনের নব ধারা।

সেদিন মোর তরে কি তুমি ওঠনি মৃদু চমকি'
অন্তরের অন্তরালে থাকি' ?
ক্ষণেকতরে প্রশ্নভরে থামিলে কেন থমকি'
নয়নে তবে নয়ন তব রাখি' ?

যে-ছিল তব সাথের সাথী তাহারে কেন ফেলিয়া
আড়ালে পথে দাঁড়ালে কাছাকাছি ?
শুধু কি পরিহাসের ছলে হেলিয়া, আঁখি মেলিয়া,
পরালে গলে হাতের মালাগাছি ?

উৎসবের কৌতুকের খেলাটি শুধু ছিল সে,
ভুলাল মোরে ভুলের ইঙ্গিতে ?
প্রথম তব পুলক নব-আলোকে তবু বিলসে,—
সাঙ্গ হবে অগীত সঙ্গীতে ?

সঙ্গী তব ভঙ্গীহীন পারেনি তোমা' ডাকিতে,
তাহারে তুমি দাওনি কভু ধরা ;
সীমন্তের সিঁদুরটুকু পারেনি কভু ঢাকিতে
প্রাণের যাহা ফাঁকিতে ছিল ভরা।

তোমারে রাখে গোপন করি' আপন তব সুরভি,
অরূপ তুমি রূপের মাঝখানে ;
বসন্তের পঞ্চমে কি মিশিবে মৃদু পূরবী ?
নিশার ভাষা দিবস নাহি জানে।

পাষাণ-বুকে বদ্ধ হ'য়ে একাকী রহে ঝরণা,
অকূল তবু আকুল তারে করে ;
গভীর সুরে দূরের দাবী আসিলে, সিক্ত-বরণা
কাছের বাধা মানে না দ্বিধাভরে।

ভাবিনু তাই—জড়তা-গড়া প্রত্যহের কারাতে
প্রাণের যত গানের সঞ্চয়
পড়িবে ঝরি' পাথর-ঠেলা ফেনোজ্জ্বল ধারাতে,
বাঁধন সব কাঁদনে পাবে লয়।

একটি দিন তবুও কভু দেখিনি জল নয়নে,
গলিত ধারা ললিত বেদনায় ;
শূন্যতার রাগিণী যেন চিত্ততল-শয়নে
নিশীথে ঢাকে তৃষিত চেতনায়।

শঙ্কাভরে দ্বিধার স্বরে একটু তুমি চলিলে
ছায়ার তটে একটু ছলছলি' ;
আক্ষেপেরে নিক্ষেপিয়া বিক্ষেপের সলিলে
আবেগ-বেগ উঠে না উচ্ছলি'।

কোথায় কঠিনতার তলে প্রাণের খেলা বিকশে,
অণুর খেলা জগত-তনু-তলে ;
চকিত জাগরণের ধারা ফুটিবে কোন্ নিকষে
তড়িত-শিহরণের কোন্ ছলে ?

মিলন-নিশি নিমিষে গেছে, বিরহ দিন গুনেছি,
সঞ্চারীতে গেয়েছি অন্তরা ;
দুপুরে তব নূপুরে শুধু আধেক ধ্বনি শুনেছি
পালাতে যবে আধেক দিয়ে ধরা।

দেহের পাশে বেঁধেছ দেহ, সরায়ে ল'য়ে তখনি ;
ভাবিনু—পলাতকার বুঝি খেলা ;
আত্মনিবেদনের ধারা আত্মহারা যখনি
তখনি যাবে অবোধ অবহেলা।

পিছনে তবু ফিরিয়া চাহ সমুখপথে চলিতে ;
কুড়ায়ে লও, ছড়ায়ে, অকারণ ;
মল্লারের মন্ত্র থামে অস্ফুট কোন্ ললিতে ;
বলিতে কথা বল না অবারণ।

যে-নদী ধায় অকূলপানে দু'কূল তার ভাঙিয়া,
পিছনে সে ত চাহে না কভু ফিরি' ;
আকাশ-বুকে বিকাশ-সুখে যে-আলো ওঠে রাঙিয়া,
আঁধার তারে কেমনে রাখে ঘিরি' ?

'যৌবনের যা' ছিল আশা যা' ছিল ভাষা হৃদয়ে
সুখের পথে দুখের রথে চলি,'
নাওনি কিছু, ছলেছ শুধু নেওয়ার ছলে, নিদয়ে,
দাওনি কিছু দেওয়ার ছলে ছলি'।

চক্ষে আর বক্ষে তব হঠাৎ-আলো-ঝলকে
ঊর্দ্ধশিখা উঠিল না ত জলি';
আগুন নহ, পোড়ায়ে তুমি পুড়িয়া নিজে পলকে
ভস্মভারে রচনি অঞ্জলি।

রূপের শুধু ছলনা তুমি, রসের নহ রচনা,
তুষার যেন জমাট হ'য়ে রয় ?
গহন-গুহা-বিহারী কোথা রহিলে, মৃদুবচনা,—
নিজে কি তুমি নিজেরে কর ভয় ?

ঝরিল ফুল বসন্তের, বর্ষাশেষ দোপাটি
হেমন্তের হিমানী-জর্জ্জর,—
কখনো মোর কাঙাল ফুল শোভেনি তব খোঁপাটি
লভিয়া লীলা-সহজ সমাদর।

কেবল ভালবাসার ভাণ ভঙ্গীটুকু দেখেছি,
ফেনিল হাসি ফেনায় দিনগুলি;
নয়নে শুধু আধেক কান্না আধেক ছায়া এঁকেছি
রচিয়া রঙে বুদ্বুদের তুলি।

মিথ্যা যাহা কেমনে তুমি মধুর কর তাহারে ?
তৃষ্ণা রচি' তৃষ্ণা নাহি জান;
ভাঙ না কভু তাহার তরে ভাঙিলে তুমি যাহারে;
মমতাহীনা, মমতা তবু আন।

সারাটি প্রাণ দলিয়া যাও কথাটি নাহি বলিয়া,—
নারীর মন কেমন নাহি জানি;
মাধুরী শুধু চাতুরী রচি' চলিয়া যায় ছলিয়া,
ব্যথা না পায় ব্যথাটি বুকে হানি'।

হেলার বশে খেলার রসে করিবে মোরে খেলনা
খেলার শেষে ঠেলিয়া একপাশে ?

দয়ার দাবী করি না, তবু একটু তুমি হেল না,
আপন দায় ভুলিয়া অনায়াসে।

তিমির-তুলি মুছিয়া দিল দীপ্ত প্রাণ-মণিটি,
রহিলে তুমি তেমনি উদাসীন;
উপেক্ষিত যৌবনের ধিক্কারের ধ্বনিটি
গোপন প্রাণে শোনোনি কোনোদিন ?

তোমার লাগি' আনিনু যাহা নিলে না তাহা বুঝিয়া,
যাবার কালে সহজে গেলে চলি';
অফুট ফুল অকালে ঝরে, ধূলায় তারে খুঁজিয়া
কে পাবে, হায়, উদাস পায়ে দলি ?

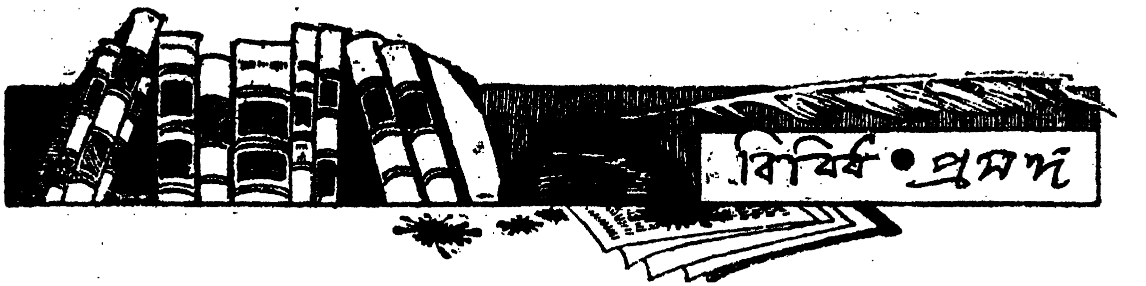
গোপন তার আপনি বাঁধি আধেক তা'রে পীড়িয়া
ঠেলিলে বিস্মৃতির নিকেতনে;
নিবিড় নিপীড়নের সুরে গেল না সে ত ছিঁড়িয়া,—
ছিঁড়িল, হায়, মৌন অযতনে।

ভগ্ন করি', মগ্ন করি' লুণ্ঠনের লীলাতে
দিলে না কেন দীর্ণ করি' হেসে' ?
ধন্য হ'ত তবুও সে ত ধূলার মাঝে মিলাতে
ক্ষণিক তব খেলনা খেলাশেষে।

নিঃশ্বাসের বাষ্পে ঢাকে বিশ্বাসের তপনে,
নিরাশা-নভে নিভিল আশ্বাস;
তিক্ত হ'ল রিক্ত প্রাণ স্বপন-ফুল-বপনে,—
নারীর প্রেমে এমন পরিহাস।

কেবল অনাদরের গ্লানি, আর ত কিছু ছিল না;—
আশার সে ত অসার আভরণ;
ভাগ্যপথে চরণ তব আঁকিয়া কেন দিল না
যে-দাগ কভু মুছে না আমরণ ?

বিদায়কালে গোধূলিতলে তারার মত ফুটায়ে
তুলিলে তব নয়ন দু'টি কালো,
অস্তরাগ বিফল রাগ ছায়ায় দিল লুটায়ে,—
দিনের শেষে আঁধার হ'ল আলো।



রামমোহন রায়

এক শত বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডের ব্রিষ্টল নগরে রামমোহন রায়ের মৃত্যু হয়। তাহার একষট্টি বৎসর পূর্ব্বে বাংলা দেশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাঙালীদের, ভারতীয়গণের এবং সমগ্র মানবজাতির যে সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া তাহা বাস্তবে পরিণত করিবার নিমিত্ত অধ্যয়ন, চিন্তা, অর্থব্যয়, এবং স্বার্থত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং লোকনিন্দা ও উৎপীড়ন সহ্য করিয়াছিলেন, সেই আদর্শ তাঁহার নিজের প্রতিভা ও চিন্তা হইতে প্রসূত। তিনি যে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ও জীবিত ছিলেন, তখন সেই আদর্শ অনন্য-সাধারণ ছিল, এবং তখনকার পক্ষে তাহা বিস্ময়কর। এখনও তদ্রূপ সর্ব্বাঙ্গীন আদর্শ উপলব্ধি করিয়া তাহার অনুসরণ করিবার লোক বিরল; তাঁহার মত ভগবদ্ভক্তি, মানবপ্রীতি, সত্যপ্রিয়তা, সাহস, বুদ্ধিমত্তা, শক্তিমত্তা, অদম্য উৎসাহ ও অক্লান্ত পরিশ্রমের সহিত সেই আদর্শের অনুসরণে সমর্থ একজন মানুষও এখন ভারতবর্ষে নাই। তাঁহার পূর্ব্বেও কোন ভারতীয় মহাপুরুষ তাঁহার মত আদর্শ মানসপটে অঙ্কিত করেন নাই বা তাহা বাস্তবে পরিণত করিতে চেষ্টা করেন নাই। কল্যাণের আদর্শের কোন কোন অংশের সাধনায় তাঁহা অপেক্ষা শক্তিমান্ ও কৃতী ব্যক্তি অবশ্য তাঁহার পূর্ব্বে ও পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

কল্যাণের আদর্শ অখণ্ড। দেশের মঙ্গল, জাতির মঙ্গল কোন একদিকে করিতে চাহিলে অন্য সকল দিকেও করা আবশ্যক। ধর্ম্মে, সামাজিক প্রথা রীতিনীতি ও আচার-ব্যবহারে, শিক্ষায় ও জ্ঞানে, সাহিত্যের সকল বিভাগে, ললিত-কলায় ও পণ্যশিল্পে, কৃষিবাণিজ্যে ও আর্থিক সকল বিষয়ে এবং রাজনৈতিক অবস্থায় ভারতবর্ষের উন্নতি আবশ্যক। এই সকল বিষয়ের কোন দিকে উন্নতি, অন্য কোন-না-কোন এক বা একাধিক [illegible]

[illegible] মানবজীবনের নানা বিভাগের উন্নতি ও প্রগতির পরস্পর-সাপেক্ষতা, তাহার অনুভূতি ও উপলব্ধি রামমোহন রায়ের চেষ্টা ও কৃতিত্ব হইতে বুঝিতে পারা যায়।

তাঁহার সকল চেষ্টার মূলে ছিল এই বিশ্বাস, যে, মানবে প্রীতি ও মানবের মঙ্গলসাধনের চেষ্টাই ভগবৎ ভক্তির প্রকৃষ্ট নিদর্শন ও তাঁহার সেবার শ্রেষ্ঠ উপায়। তিনি যে সাতিশয় প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও লোকনিন্দা ও উৎপীড়ন অগ্রাহ্য করিয়া, নানা দুঃখ বরণ করিয়া, প্রাণহানিকেও তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া, নানাবিধ সংস্কারকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, তাহাও এই বিশ্বাসে যে, তাঁহার জীবিতকালে হউক বা না-হউক, ন্যায় ও সত্যের জয় হইবেই হইবে, মঙ্গলসাধন চেষ্টা ফলবতী হইবেই হইবে। এই জন্য বিশ্বনিয়ন্তা মঙ্গলবিধাতা এক পরব্রহ্মে তাঁহার বিশ্বাসকে বাদ দিয়া তাঁহার সামাজিক, রাজনৈতিক, শিক্ষাবিষয়ক, সাহিত্যিক এবং অন্যবিধ কার্য্যাবলীর আলোচনা ও প্রশংসা করিলে বৃক্ষের মূলটি বিস্মৃত হইয়া পত্রপুষ্পফলের বর্ণনা ও প্রশংসার মত শুনায়।

শত বৎসর পূর্ব্বে রামমোহনের মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু তিনি ভারতীয় মহাজাতিকে, মানবজাতিকে, যে-অবস্থায় আরূঢ় দেখিতে চাহিয়াছিলেন, এখনও সে অবস্থায় আমরা উপনীত হই নাই। ইহা যদি সত্য হইত, যে, আমরা সকল বিষয়ে সেই অবস্থার দিকে অগ্রসর হইতেছি, তাহা হইলে দুঃখের কারণ থাকিত না। কিন্তু তাহা ত হইতেছে না। সমগ্র ভারতে একেশ্বরবাদের প্রতিষ্ঠা, একমেবাদ্বিতীয়মের আধ্যাত্মিক উপাসনা এবং তজ্জনিত চারিত্রিক উৎকর্ষ ও দৃঢ়তা ও জাতীয় ঐক্য ও একাগ্রতা তিনি আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন, এবং তাহার জন্য পরিশ্রম করিয়াছিলেন। এক পরব্রহ্মের আধ্যাত্মিক উপাসনা তাঁহার সময় অপেক্ষা এখন কিছু অধিকসংখ্যক লোক করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু এই সামান্য উন্নতি ও প্রগতিকে সন্তোষজনক [illegible]

তাঁহাদের উপাসনা কি পরিমাণে মৌখিক ও মতগত এবং কি পরিমাণেই বা জীবনগত, তাহার বিচার করিতে গেলে অসন্তোষ বাড়ে বই কমে না। তাহার উপর আবার ধর্ম্ম মাত্রেরই, ধর্ম্ম জিনিষটিরই প্রতি অনাস্থা ও ঔদাসীন্য বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং ধর্ম্মের অনাবশ্যকতা ও নাস্তিক্য ঘোষিত হওয়ায় ভারতে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সমস্যা গুরুতর হইয়া উঠিতেছে। অথচ ইহা ধ্রুব সত্য, যে, ধর্ম্ম অত্যাবশ্যক ও একান্ত আবশ্যক।

সতীদাহ নিবারণের জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবিত কালেই তাহা আইনের দ্বারা রহিত হয়। কিন্তু এখনও মধ্যে মধ্যে সহমরণ বা তাহার চেষ্টা হইয়া থাকে। সেই উপলক্ষে কাগজে পত্রে এবং মুখে মুখে যে-সব আলোচনা হয়, তাহাতে এই ধারণাই জন্মে, যে, সতীদাহনিবারক আইন না থাকিলে এখনও হয়ত সমাজের বৃহৎ এক অংশ স্বেচ্ছায়-সহমরণকে উৎকৃষ্ট আদর্শ বলিত ও তাহার সমর্থন করিত, যদিও বলপূর্ব্বক বা কৌশলপূর্ব্বক বিধবাদাহের অনুষ্ঠান করিত কি-না বলা যায় না। বস্তুতঃ, উহা যে উৎকৃষ্ট আদর্শ নহে, শাস্ত্রীয় আদর্শও নহে, সতীত্বের উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আদর্শ আছে, এই বিশ্বাস এখনও আমাদের অস্থিমজ্জাগত হয় নাই। উহা আদর্শ হইলেও পুরুষেরা স্ত্রীর মৃত্যু হইলে ঐ আদর্শের অনুসরণ না-করায় এবং অনুসরণ করিতে প্রস্তুত না হওয়ায়, ইহা বুঝিতে বাকী থাকে না, যে, পুরুষজাতি কর্ত্তৃক ঐ প্রথার প্রশংসা পুরুষস্বভাবের একটা মন্দ অংশ হইতে এবং নিষ্কারুণ্য হইতে উদ্ভূত। বর্ত্তমানে হিন্দু আইন বলিয়া গণিত বিধি অপেক্ষা অধিক ন্যায্য হিন্দুনারীর উত্তরাধিকার-বিষয়ক বিধান প্রাচীন শাস্ত্রে আছে। রামমোহন তাহা প্রদর্শন করেন। কিন্তু এখনও তাঁহার সময়ের অনুদার ও অন্যায্য বিধিই বলবৎ আছে।

সতীদাহ সম্বন্ধে বর্ত্তমান অনুমিত ঐ জনমত হইতে এবং দেশে নারীদের নানা নিগ্রহ ও লাঞ্ছনা হইতে মনে হয়, যে, যে-রামমোহন সতীদাহ নিবারণ করিতে চাহিয়াছিলেন এবং যিনি যে-কোন জাতির বয়সের ও অবস্থার দণ্ডায়মানা নারীর সমক্ষে আসন গ্রহণ করিতেন না, নারীজাতির প্রতি তাঁহার সশ্রদ্ধ ও সানুকম্প ভাবের দিকে অগ্রসর হইবার এখনও অবসর আছে। সহমরণ-বিষয়ক তাঁহার একটি পুস্তিকায় তিনি নারীদের উচ্চতম জ্ঞানলাভের অধিকার ও যোগ্যতা, তাঁহাদের সাহস, ধৈর্য্য, সংযম, এবং চারিত্রিক উৎকর্ষ প্রমাণিত করিয়াছেন। এরূপ মত কি এখনও দেশে ব্যাপকভাবে গৃহীত হইয়াছে?

জ্ঞানের, সভ্যতার ও স্বাধীনতার যে উচ্চ শিখরে তিনি ভারতবর্ষকে অধিষ্ঠিত দেখিতে চাহিয়াছিলেন, দেশ এখনও সেখানে পৌঁছে নাই। অতএব সেই সব দিকেও অগ্রসর হইবার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। ভারতবর্ষ এশিয়াকে জ্ঞানোজ্জ্বল করিবে, তিনি এই আশা পোষণ করিতেন। সেই আশা পূর্ণ হইতেছে কি? এখনও ভারতে শতকরা ৯২ জন নিরক্ষর, এবং জাপানে শিশুরা ছাড়া সবাই লিখন-পঠনক্ষম।

শাস্ত্রজ্ঞানের বিস্তার বিশেষ কি হইয়াছে? পুরাণ-উপপুরাণের প্রচার অনেক হইয়াছে বটে, কিন্তু যে উপনিষদ প্রচার তিনি আধুনিক যুগে আরম্ভ করেন, তাহার চেষ্টা যথেষ্ট হইতেছে কি?

রামমোহন সংবাদপত্রের ও মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা এখন সাতিশয় সীমাবদ্ধ ও শৃঙ্খলিত। তিনি স্বদেশবাসীদিগকে উচ্চ রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিবার উপযুক্ত মনে করিতেন। কিন্তু বাদশাহী ও নবাবী আমলেও দেশের লোকেরা সম্প্রদায়-নির্বিশেষে যে-সব উচ্চ কাজ করিতে পাইত ও পারিত, তাহারা এখনও তাহার অনেকগুলি হইতে বঞ্চিত।

রামমোহন জমীদার ও রায়ত উভয়েরই দেয় খাজনা স্থায়ী ভাবে নির্দ্ধারণের পক্ষপাতী ছিলেন এবং ষ্ট্যাটিষ্টিক্স দ্বারা নিজের মতের সমর্থন করিয়াছিলেন। তাহা অনুসৃত হয় নাই। কৃষকদিগকে অস্ত্র দিয়া যুদ্ধবিদ্যা শিখাইয়া "মিলিশিয়া" ভুক্ত করিয়া তিনি দেশরক্ষায় সমর্থ করিতে এবং সেই উপায়ে পরোক্ষ ভাবে পেশাদার স্থায়ী সৈনিকদের সংখ্যাহ্রাস ও সামরিক ব্যয় হ্রাস করিতে চাহিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে অনুসৃত ব্রিটিশ রাজনীতি এখনও এই অতি-সমীচীন প্রস্তাবের অনুকূল নহে। ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের অধীন। কৌশলী ইংলণ্ড অধীন ভারতবর্ষের নিকট হইতে কর বলিয়া কোন অর্থ গ্রহণ করে না। কিন্তু অন্য নানা উপায়ে ভারতবর্ষের রাজস্বের অনেক কোটি টাকা প্রতি বৎসর ইংলণ্ডে নীত হয়। এই তথ্যটি রামমোহন প্রথম হিসাব করিয়া যেখান

ভারতবর্ষের রাজস্বের বহুকোটি টাকা এখনও প্রতিবৎসর ইংলণ্ডে চালান দেওয়া হয়।

রামমোহন যে-সব কারণে ভারতবর্ষে ইংরেজী শিক্ষা চালাইতে চাহিয়াছিলেন, পাশ্চাত্য পদার্থবিদ্যা, রসায়নী-বিদ্যা, শারীরতত্ত্ব, যন্ত্রনির্ম্মাণবিদ্যা, চিকিৎসা-বিদ্যা ভারতীয়গণকে শিখান তন্মধ্যে প্রধান একটি কারণ। এই সব বিদ্যার জ্ঞান এখনও এ-দেশে অতি অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যে আবদ্ধ আছে।

পাশ্চাত্য নানা বিদ্যা শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভারতীয়দিগকে এরূপ ভাবে বেদান্ত শিক্ষা দিবার জন্য বেদান্ত-কলেজ স্থাপন ও পরিচালন করিয়াছিলেন, যাহাতে তাহা ঐহিক বিষয়ে ঔদাসীন্য না জন্মাইয়া পারত্রিক কল্যাণের মত ঐহিক কল্যাণেরও সহায় হয়। বেদান্তের চর্চ্চা এখনও এরূপ ভাবে ভারতবর্ষে হয় না। স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্তমত গ্রহণ সম্বন্ধে আপনাকে রামমোহনের পথের পথিক বলিয়াছেন এবং বেদান্তকে ঐহিক উদ্যমশীলতার পরিপোষক করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ব্যাখ্যাই বা কার্য্যতঃ কত লোক গ্রহণ করিয়াছে?

রামমোহন যে ধর্ম্মমতের প্রবর্ত্তক বা পুনঃ প্রবর্ত্তক, যে ধর্ম্মসমাজ তিনি স্থাপন করেন, সংস্কৃত "ব্রহ্মন্" শব্দ হইতে নিষ্পন্ন তাহার "ব্রাহ্ম" নাম হইতে, তাঁহার রচিত সঙ্গীত-নিচয় হইতে, তাঁহার ইংরেজী বাংলা ও হিন্দী অনুবাদ সহ বেদান্তসার ও কয়েকটি উপনিষদ প্রকাশ হইতে, খ্রীষ্টীয় মিশনরীদিগের সহিত তর্কবিতর্কে হিন্দু একেশ্বরবাদ সমর্থন হইতে, "ব্রাহ্মণসেবধি" ও "ব্রাহ্মিনিক্যাল ম্যাগাজিন" নাম দুইটি হইতে, বহু হিন্দু প্রতিপক্ষের সহিত বিচারে ভূরিভূরি হিন্দুশাস্ত্রবচন উদ্ধার হইতে, এবং আরও নানা প্রমাণ হইতে সহজেই বুঝা যায়, যে, তিনি হিন্দুত্ব হইতে একটুও বিচ্যুত হন নাই। অথচ—অথবা তিনি প্রকৃত হিন্দু এবং আদর্শ ভারতীয় ছিলেন বলিয়াই—তিনি মুসলমানের কোরাণের এবং ইহুদী ও খ্রীষ্টিয়ানের বাইবেলের সাত্ত্বিক বাণীগুলির প্রতি শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন। তিনি প্রধান প্রধান কয়েকটি ধর্ম্মসম্প্রদায়ের শাস্ত্র শ্রদ্ধার সহিত মূল ভাষায় অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। পরমত-অসহিষ্ণুতা ও পরধর্ম্মদ্বেষ তাঁহার বিন্দুমাত্র ছিল না। ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভের ও অন্য সর্ব্ববিধ উন্নতির অন্তরায় যে নানা সাম্প্রদায়িক কলহ, বিবাদ, ঈর্ষ্যা বিদ্বেষ ও রক্তপাত, তাহা তাঁহার মত আচরণ ও আদর্শের দ্বারা নিরাকৃত হইতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় মুসলমান বা হিন্দু কোন সম্প্রদায়ই এ-বিষয়ে রামমোহনের পদাঙ্ক যথেষ্ট অনুসরণ করেন নাই। রামমোহনের মত উদার জ্ঞানী সত্যদর্শী সমদর্শী নিরপেক্ষ দেশনায়কের প্রয়োজন এখন বিশেষভাবে অনুভূত হইতেছে—অন্তত হওয়া উচিত।

রামমোহন বাঙালী ছিলেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রবর্ত্তন ও পরোক্ষভাবে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কেবল ব্রাহ্মসমাজের বা কেবল বাঙালীর সম্পত্তি ও শিরোমণি নহেন। তাঁহার হিতচিন্তা ব্রাহ্মসমাজে ব বাঙালী সমাজে সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি ভারতীয়, তিনি এশিয়ার মানুষ, তিনি মহামানব, তিনি বিশ্বমানবের আত্মীয়। তাঁহার "বসুধৈব কুটুম্বকম্" ভাব শ্লোকে, কথার কথায়, আবদ্ধ ছিল না। তাঁহার সময়ে যে-ইটালীতে যাইতে ছয় মাস লাগিত, তাহার নেপলস্‌বাসীদের স্বাধীনতা অপহৃত হওয়ায় তিনি বিষাদমগ্ন হইয়াছিলেন, চীন পারস্য আফগানিস্থানের রাজনীতির আলোচনা নিজের সংবাদপত্রে করিতেন, ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের জয়গান সোৎসাহে করিতেন, আয়র্ল্যাণ্ডে দুর্ভিক্ষ হইলে চাঁদা তুলিয়া বিপন্ন লোকদের সাহায্য করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষ হইতে যে দক্ষিণ-আমেরিকা যাইতে তখন এক বৎসর লাগিত তাহার স্পেনীয় ঔপনিবেশিক-গণের নিয়মতন্ত্র শাসনপ্রণালী লাভ করিবার সংবাদ কলিকাতায় পৌছিলে তিনি টাউন-হলে ভোজ দিয়া-ছিলেন, ইংলণ্ড প্রবাসকালে বলিয়াছিলেন, যে, তথাকার রিফর্ম বিল (পার্লেমেণ্টের প্রতিনিধি নির্ব্বাচনবিধি সংস্কারের পাণ্ডুলিপি) আইনে পরিণত না হইলে তিনি ইংলণ্ডের সহিত সকল সংস্রব ত্যাগ করিবেন, এবং সাধারণ ভাবে এই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, যে, "স্বাধীনতার শত্রুরা আমাদের বন্ধু নহে, তাহারা পরিণামে কখনও জয়যুক্ত হইবে না।" নিখিল জগতের নাগরিক এই মহামানব শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে ফ্রান্সের বৈদেশিক মন্ত্রীকে লিখিত একখানি চিঠিতে বলেন যে, দেশে দেশে ঝগড়াবিবাদ মতানৈক্য হইলে যুদ্ধ ও রক্তপাত না করিয়া বিবদমান

দেশসমূহের প্রতিনিধিদের সভায় আলোচনা দ্বারা তাহার মীমাংসা করা যাইতে পারে এবং তাহা করা উচিত। তিনি পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি স্থাপনের এই যে উপায় নির্দ্দেশ করেন, প্রায় এক শতাব্দী পরে প্রধানতঃ সেই উপায় অবলম্বন দ্বারা পৃথিবীতে শান্তিরক্ষার জন্য লীগ অব নেশুন্স স্থাপিত হয়।

আধুনিক কালে অনেক মনীষী, রাষ্ট্রনীতিবিৎ ও অন্য অনেক লোক বুঝিয়াছেন সকল দেশের ও জাতির মঙ্গলামঙ্গল অন্য সব দেশের মঙ্গলামঙ্গলের উপর নির্ভর করে, কেহই সম্পূর্ণ অন্যনিরপেক্ষ স্বতন্ত্র জীবন যাপন করিতে পারে না। শতবর্ষ পূর্ব্বে রামমোহন রায় ইহা বুঝিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার অন্তর্জাতিকতা (ইণ্টারন্যাশন্যালিজ্‌ম্) প্রাণবান্ ছিল ও তাঁহার আচরণে প্রকাশ পাইত, এবং তিনি অতি দূরবর্ত্তী দেশের লোকদেরও সুখদুঃখভাগী হইতে পারিয়াছিলেন।

মানুষের হৃদয় মনের ঐশ্বর্য্য—ভাব ও চিন্তা—তাহার শ্রেষ্ঠ সম্পদ। একজন মানুষ যেমন অন্য এক জনকে নিজের এই সম্পদের অংশী করিয়া তাহাকে নিজের জ্ঞাতি বলিয়া স্বীকার করে, তেমনি দেশে দেশে জাতিতে জাতিতেও এইরূপ সম্পদের আদান-প্রদান দ্বারা তাহাদের মধ্যে মৈত্রী স্থাপিত হয়। যখন রেল ষ্টীমার এরোপ্লেন ছিল না, তখনও, পুরাকালেও, এই আদান-প্রদান ছিল;—তখনও দানে আতিথ্য এবং গ্রহণে ঔদার্য্য ছিল। অন্য প্রকার আতিথ্যের মত, এই মানস আতিথ্যও ভারতবর্ষের ছিল। কিন্তু এমন এক সময় আসিয়াছিল, যখন ভারতবর্ষ কেবল বিজেতার শক্তিতে পরাভূত হইয়া কিছু লইতে ও কিছু দিতে বাধ্য হইত—তাহাতে আদান-প্রদানের আনন্দ ও ঔদার্য্য ছিল না, এবং ইহা কেবল বিজেতার সঙ্গেই হইত।

রামমোহন যে ইংরেজী ভাষার সাহায্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করেন, তাহা আপাতদৃষ্টিতে বিজেতার কৃষ্টি স্বীকার বলিয়াই মনে হইতে পারে। কিন্তু এই ইংরেজী শিক্ষার দ্বারা ভারতবর্ষ জাগতিক ভাব ও চিন্তার স্রোতে আসিয়া পড়িয়াছে এবং জগতকেও নিজস্ব যাহা তাহা দিতে সমর্থ হইতেছে। রামমোহন নিজেই ইংরেজীর সাহায্যে, শুধু ব্রিটেনের নহে, অন্য পাশ্চাত্য ভাব ও চিন্তার সংস্পর্শে আসিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং পাশ্চাত্য জগতকে ভারতের প্রাচীন ও আধুনিক চিন্তার অংশী করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে ভারতবর্ষ পৃথিবী নামক বৃহৎ জড়পিণ্ডের অংশ ছিল বটে, কিন্তু জাগতিক মানস ঐশ্বর্য্যে ভারতীয়দের অধিকার ছিল না—তাহা হইতে তাহারা কিছু লইতে পারিত না; সেই ঐশ্বর্য্যে কিছু রত্ন সংযোগ করিতেও তাহারা পারিত না। পাশ্চাত্য শিক্ষার দ্বারা আমাদের গ্রহণ ও দান উভয়ই সম্ভব হইয়াছে, এবং এই প্রকারে ভারতবর্ষ আধুনিক জগতের অংশ হইয়াছে, ভারতবর্ষের আধুনিকতা উৎপাদিত হইয়াছে।

রামমোহনকে যে আধুনিক ভারতের জনক বলা হয়, তাহার এক কারণ, তিনি ভারতবর্ষকে আধুনিক হইবার পথে স্থাপন করেন, প্রাচীনের জরা পঙ্গুতা ও স্থাণুতার পরিবর্ত্তে তাহাকে নবীনের তারুণ্য, উদ্যম ও সচলতা দান করেন। অন্য কারণ, তিনি যুগপ্রবর্ত্তক; তিনি আধুনিক রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষাবিষয়ক, ধার্ম্মিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি বহু প্রচেষ্টার প্রবর্ত্তক।

—

রামমোহন রায় শতবার্ষিকী

এই মহাপুরুষের মৃত্যুর শত বৎসর পরে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের জন্য ভারতবর্ষের নানা স্থানে যে-সকল অনুষ্ঠান হইয়াছে, তাহার দ্বারা বুঝা যাইতেছে, যে, ভারতবর্ষের অন্ততঃ কতক লোক তাঁহাকে কিয়ৎ পরিমাণে বুঝিতে সমর্থ হইয়াছে। হয়ত যখন তাঁহার জন্মের দ্বিশত-বার্ষিকী হইবে, তখন আরও অনেক বেশী লোকে তাঁহার প্রতি আরও শ্রদ্ধান্বিত ও কৃতজ্ঞ হইবে, এবং ২০৩৩ খ্রীষ্টাব্দে যখন তাঁহার মৃত্যুর দ্বিশতবার্ষিক শ্রাদ্ধানুষ্ঠান হইবে, তখন ভারতবর্ষের অধিকতর স্থানে তাহা সম্পন্ন হইবে।

যেখানে যেখানে শতবার্ষিকীর অনুষ্ঠান হইয়াছে, তাহা ভাল। কিন্তু কেবল সভাসমিতি, আলোচনা, স্মারক-চিহ্ন স্থাপন, প্রভৃতিই যথেষ্ট নহে। রামমোহন যেমন দেশের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি চাহিয়াছিলেন, সকলে নিজ নিজ শক্তি ও সুযোগ অনুসারে তাহা সাধন করিতে চেষ্টা করিলে তবে শতবার্ষিকীর অনুষ্ঠান সার্থক হইবে।

রামমোহন বাঙালী ছিলেন, ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন,

অন্যান্য প্রদেশের চেয়ে বঙ্গে ব্রাহ্মের সংখ্যা বেশী। এই জন্য যদি বাঙালীদের দ্বারা ও ব্রাহ্মদিগের দ্বারা শতবার্ষিকীর অনুষ্ঠান বঙ্গদেশেই অধিকতম স্থানে হইয়া থাকে, তাহাতে বিস্ময় বা প্রশংসার বিষয় কিছুই নাই। কিন্তু যদি বঙ্গে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্থানে না হইয়া থাকে, তাহা দুঃখ ও লজ্জার বিষয় হইবে। শতবার্ষিকীর রিপোর্ট বাহির হইলে ঠিক তথ্য জানা যাইবে।

বাংলা দেশের কথা ছাড়িয়া দিয়া বিচার করিলে দেখা যায়, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্থানে ও অধিক সমারোহের সহিত শতবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ন্যূনকল্পে পঞ্চাশটি স্থানে উৎসব হইয়াছে, কোথাও কোথাও সাত আট দশ দিন ধরিয়া হইয়াছে। দশ বারটি জায়গায় প্রধান প্রধান রাস্তার নাম রামমোহন রায়ের নাম অনুসারে রাখা হইয়াছে। বহু স্থানের টাউন-হলে বা অন্য হলে তাঁহার চিত্র রাখা হইয়াছে। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর ভাষাগুলি বাংলা ভাষার সহিত একজাতীয় নহে, তথায় জাতিভেদের ও গোঁড়া হিন্দুয়ানীর প্রভাব খুব বেশী। অথচ সেখানেই রামমোহনের প্রভাব এত বেশী অনুভূত হইবার কারণ কি, তাহা আলোচনার যোগ্য। মান্দ্রাজকে তমসাবৃত (benighted) প্রদেশ বলা হয় বটে; কিন্তু সেখানকার শিক্ষিত লোকেরা পড়াশুনা খুব করেন, ইংরেজী পুস্তক ও মাসিক পত্রাদির কাট্‌তি সেখানে খুব বেশী। মান্দ্রাজ প্রদেশ-বাসীদের মধ্যে কৃতী বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, রাজনীতিজ্ঞ ও সাংবাদিক বিদ্যমান আছেন। ঐ প্রদেশে অন্ধ কুসংস্কারের প্রকোপ বেশী ছিল বা আছে বলিয়াই হয়ত প্রতিক্রিয়াবশতঃ তথাকার প্রগতিকামী লোকেরা সংস্কারের মর্য্যাদা বেশী বুঝিতে পারেন।

কলিকাতার শতবার্ষিক উৎসব যথাযোগ্যভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাতে নানা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বাঙালী, ভারতীয় ও অন্য দেশীয়েরা যোগ দিয়াছিলেন, বা দূর হইতে তাঁহাদের সহানুভূতিজ্ঞাপক বাণী পাঠাইয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম দিন কিছুকাল সভাপতিত্ব করেন এবং তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। অতঃপর মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া হিন্দুসমাজের পক্ষ হইতে রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে একটি অভিভাষণ পাঠ করেন। তাহার আগে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু একটি সুন্দর বক্তৃতা করেন। কলিকাতার মেয়র শ্রীযুক্ত সন্তোষ-কুমার বসু একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় ভারতবর্ষের ও বাহিরের নানা নগর হইতে প্রাপ্ত সহানুভূতিজ্ঞাপক বার্ত্তার উল্লেখ করেন। অধ্যাপক কালিদাস নাগ প্রথমে এই বার্ত্তাগুলির তালিকা পড়িয়া পরে তাহার কতকগুলির কোন কোন অংশ পাঠ করেন। যাঁহারা সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন, তাঁহাদের কয়েক জনের নাম নীচে লিখিত হইল।

মহাত্মা গান্ধী, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, লণ্ডন হইতে সি এফ এণ্ড্রুজ, সারনাথ হইতে বৌদ্ধ মহাবোধি সমিতির সেক্রেটরী দেবপ্রিয় বলীসিংহ (সিংহলী), দার্জ্জিলিঙের নিখিল-ভারতীয় বৌদ্ধ কন্‌ফারেন্স, জৈন সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নাহার, গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রিন্সিপ্যাল পণ্ডিত রামদেব শর্ম্মা, পঞ্জাবের মাননীয় সর্দ্দার স্যর যোগীন্দ্র সিং (শিখ), সর্দ্দার প্রতাপ সিং, আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌চ্যান্সেলার স্যর সৈয়দ রস মাস্‌দ কলিকাতার খ্রীষ্টীয় লর্ডবিশপ রাইট রেভরেণ্ড পা পেকেন্‌হ্যাম্‌ ওয়ালশ্‌ খ্রীষ্টীয় বিশপস্‌ কলেজের এ জে আপ্পাস্বামী, পাদ্রী ফাদার ভেরিয়র এল্‌উইন, অক্সফোর্ডের য়ুনিটেরিয়ান্‌ রেভরেণ্ড ডব্লিউ এইচ ড্রামণ্ড, রুমেনিয়া দেশের খ্রীষ্টীয় একেশ্বরবাদী বিশপ জর্জ্জ বোরোস, আমেরিকার ডক্টর জে টি স্যাণ্ডার্‌ল্যাণ্ড, আমেরিকার রেভরেণ্ড এফ সী সাউথওয়ার্থ ও তাঁহার পত্নী, আমেরিকার য়ুনিটেরিয়ান সভার রবার্ট সী ডেক্সটার, আমেরিকার যুবজনের ধার্ম্মিক সম্মিলনীর ("Young People's Religious Unionএর) ড্যানা ম্যাক্লীন গ্রীলী, আমেরিকার রেভরেণ্ড হেন্‌রী উইল্‌ডার ফুট, তথাকার এল্‌ ডি ওয়াল্ড ও এ এল্‌ লিস্‌বার্গার, অন্ধ্রদেশের একেশ্বরবাদীদের কন্‌ফারেন্স, ভী বরদারাজুলু নাইডু, আজমীরের দেওয়ান বাহাদুর হরবিলাস শারদা, জার্মেনীর কন্সাল জেনেরাল, চেকো-স্লোভাকিয়ার কন্সাল জেনেরাল, চিত্রশিল্পী ও দার্শনিক নিকলাস রোয়েরিক, প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর এস্‌ শার্লেটি, ফ্রান্সের পক্ষ হইতে লেফ্‌টেন্যাণ্ট কর্ণেল বোনো, ইংলণ্ড হইতে স্যর অতুল চট্টোপাধ্যায় এবং লণ্ডনের শতবার্ষিকী কমিটী।

ফ্রান্সের ম্যাডেম এল্‌ মোরিন রামমোহনের প্রতি ভক্তিমতী একজন ফরাসী লেখিকা। তিনি তাঁহার জীবনচরিত লিখিবার জন্য উপকরণ সংগ্রহ করিতেছেন। তিনি কলিকাতার শতবার্ষিকীতে ফরাসী জনসাধারণের পক্ষ হইতে কিছু বলেন, এবং প্যারিস হইতে সদ্যঃপ্রত্যাগত ডক্টর বটকৃষ্ণ ঘোষ অধ্যাপক সিল্‌ভেন লেভীর চেষ্টায় শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে যে-সব অনুষ্ঠান ফ্রান্সে হইয়াছিল তাহার বর্ণনা করেন। অধ্যাপক লেভীর মূল ফরাসীতে লিখিত বাণী সভাস্থলে পঠিত ও ব্যাখ্যাত হয়।

সেনেট হাউসে কলিকাতার শতবার্ষিকী সভার চারিটি অধিবেশন হইয়াছিল। বিনামূল্যে সেনেট হাউসে প্রবেশের সাধারণের অধিকার ছিল না। [illegible]

হল পূর্ণ হইয়াছিল। প্রথম অধিবেশনের কতক বৃত্তান্ত উপরে দেওয়া হইয়াছে। পরে তাহাতে এবং অন্য অধিবেশনগুলিতে যাহা হইয়াছিল তাহা সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে।

মৌলবী আবদুল করীম কর্ত্তৃক ধর্ম্মসংস্কারক রামমোহন সম্বন্ধে প্রবন্ধপাঠ, প্রিন্সিপ্যাল জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতা, ইহুদী ধর্ম্মের দিক হইতে ইহুদী মিঃ ঈ এ আরাকীর রামমোহন সম্বন্ধে বক্তৃতা, বৌদ্ধধর্ম্মের দিক হইতে ডক্টর বেণীমাধব বড়ুয়ার রামমোহন সম্বন্ধে বক্তৃতা, "অর্ডার অব দি গ্রেট কম্প্যানিয়ন্স"-ভুক্তা কুমারী মার্গারেট বারের "বিশ্বমানবিক রামমোহন" সম্বন্ধে প্রবন্ধপাঠ, রামমোহন ও আধুনিক ভারতবর্ষের পুনর্জাগরণ সম্বন্ধে রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী আদ্যানন্দের প্রবন্ধপাঠ, আর্য্যসমাজের দিক হইতে রামমোহন সম্বন্ধে আর্য্যসমাজের পণ্ডিত ঋষিরামের প্রবন্ধপাঠ এবং রামমোহন ও শিখধর্ম্ম সম্বন্ধে অমৃতসর খালসা কলেজের অধ্যাপক উত্তম সিংহের প্রবন্ধপাঠ। রেভরেণ্ড ডক্টর আর্কহার্টের প্রবন্ধের ("A Pilgrimage in Memory from a Christian Standpoint"), মিঃ ডি জে ইরাণীর প্রবন্ধের ("Rammohun and the Teachings of Zoroaster") এবং শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধের ("Rammohun Roy the Monotheist") সারমর্ম্ম, লেখকগণ অনুপস্থিত থাকায় অধ্যাপক কালিদাস নাগ পাঠ করেন।

ঐ দিন (২৯শে ডিসেম্বর) সন্ধ্যাকালে সেনেট হাউসে মহিলাদের শতবার্ষিকী কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন হয়। নিখিল-ভারতীয় মহিলা কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন এবার কলিকাতায় হইতেছিল। তাঁহারা শতবার্ষিকীতে যোগ দিবার সঙ্কল্প করেন। তদনুসারে উহার প্রতিনিধি ও সভ্যেরা সেনেট হাউসে আগমন করেন। শ্রীমতী কুমুদিনী বসুর প্রস্তাবে ও শ্রীমতী বাসন্তী চক্রবর্তীর সমর্থনে ময়ূরভঞ্জের মহারাণী সুচারু দেবী সভানেত্রী নির্ব্বাচিত হন। তাঁহার বাংলা প্রার্থনা ও ইংরেজী অভিভাষণের পর মান্দ্রাজের ডাঃ শ্রীমতী মুথুলক্ষ্মী রেড্‌ডী এই প্রস্তাব উপস্থিত করেন:—

"This conference of women pays its respectful homage to Raja Rammohun Roy during his centenary celebration for his inestimable and magnificent services to humanity, to his country and to the cause of Indian womanhood."

পঞ্জাবের শ্রীমতী রাজকুমারী অমৃত কুমার ইহা সমর্থন করেন, এবং শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, মিসেস্ কাজিন্স, ম্যাডেম এল্ মোরিন, শ্রীমতী হেমলতা সরকার, বেগম শামসুন নাহার মাহ্‌মুদ ও শ্রীমতী হেমলতা দেবী ইহার পোষকতা করেন। সময়ের অল্পতা বশতঃ শ্রীমতী শান্তা দেবী, সীতা দেবী, নিরুপমা দেবী, সরোজিনী দত্ত, শোভনা নন্দী, সুধা চক্রবর্ত্তী ও সরলাবালা সরকারের প্রবন্ধপাঠ ও বক্তৃতা হয় নাই।

৩০শে ডিসেম্বর শতবার্ষিকীর তৃতীয় অধিবেশনের প্রারম্ভে অধ্যাপক ডক্টর হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় প্রার্থনা করেন এবং ডাক্তার স্যার নীলরতন সরকারের প্রস্তাবে ও ডক্টর প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে আচার্য্য স্যার জগদীশচন্দ্র বসু সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। অতঃপর আচার্য্য বসু তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। অধ্যাপক রজনীকান্ত গুহ "রামমোহন ও রাজনীতি" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই সময় আচার্য্য বসু স্যার সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্‌কে সভাপতির কার্য্য করিতে বলেন। তিনি সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর ডক্টর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত "রামমোহন ও আইন" সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন। অতঃপর স্যার সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের অভিভাষণ হয়। তাহার বিষয় ছিল "Mysticism and Clarity as blended in Rammohun"। ইহার পর তিনি মান্দ্রাজের ইণ্ডিয়ান রিভিয়ুর সম্পাদক শ্রীযুক্ত জি এ নটেশনকে সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে বলেন এবং শ্রোতৃবর্গ তাঁহার অভিভাষণ শ্রবণ করেন। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ও অধ্যাপক নরেশচন্দ্র রায় "রামমোহন ও মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা" সম্বন্ধে তাঁহাদের প্রবন্ধদ্বয় পাঠ করেন। অতঃপর লাহোরের ফর্ম্যান খ্রীষ্টিয়ান কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ডক্টর এস্ কে দত্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া বক্তৃতা করেন, এবং অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর "রামমোহন ও সকল ধর্ম্মের ভিত্তিগত ঐক্য" সম্বন্ধে ও শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেন "শিক্ষাক্ষেত্রে প্রারম্ভিক কর্ম্মী রামমোহন" সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাহার পর মৌলবী ওয়াহেদ হুসেন "রামমোহনের একেশ্বরবাদের স্বরূপাবলী" সম্বন্ধে প্রবন্ধ পড়েন। ডক্টর সুবিমলচন্দ্র সরকারের প্রবন্ধ অধ্যাপক কালিদাস নাগ কর্ত্তৃক পঠিত হয়।

চতুর্থ অধিবেশনের প্রারম্ভে অধ্যাপক বিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রার্থনা করেন, এবং ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক সমর্থিত মৌলবী আবদুল করীমের প্রস্তাবে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু

সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন। ম্যাডেম এল্ মোরিন রামমোহনের অল্পদিনব্যাপী প্যারিসপ্রবাস বর্ণনা করেন এবং বলেন, যে, তাঁহার ভক্তেরা এখন প্যারিসে তাঁহার প্রবাস-চিহ্নগুলি খুঁজিয়া বাহির করিতেছেন। মৌলবী আবদুল করীম "রামমোহন আধুনিক ভারতের আদর্শ ও অগ্রদূত" বিষয়ক তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করেন। ইহার পর শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু বক্তৃতা করেন। অতঃপর তাঁহার অনুরোধে আচার্য্য স্যর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি দুর্ব্বল থাকায় অধ্যাপক কালিদাস নাগকে তাঁহার অভিভাষণ পড়িতে বলেন। তদনন্তর পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ "উপাসনা সম্বন্ধে রামমোহনের ধারণা" বিষয়ক এবং পণ্ডিত ধীরেন্দ্রনাথ বেদান্তবাগীশ "ঈশ্বর ও জগৎ সম্বন্ধে রামমোহনের ধারণা" বিষয়ক প্রবন্ধ পড়েন। ইহার পর মৌলবী আবদুল করীম সভাপতির আসন গ্রহণ করেন, এবং রাওসাহেব ডক্টর ভি রামকৃষ্ণ রাও "রামমোহন ও একমেবাদ্বিতীয়ম্" সম্বন্ধে ও ডক্টর সরোজকুমার দাস "রামমোহন ও বেদান্ত" সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন। শেষোক্ত প্রবন্ধটি পঠিত হইবার সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেনেট হাউসে আগমন করেন। তিনি তাঁহার স্বাস্থ্যের বর্ত্তমান অবস্থায় বেশীক্ষণ থাকিতে পারিবেন না বলিয়া নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি অপঠিত থাকে:—অধ্যাপক বিমানবিহারী মজুমদারের "Rammohun the father of Modern Political Movements in India," পঞ্জাবের অধ্যাপক রুচিরাম সাহনীর "Rammohun's Passion for Liberty," অধ্যাপক সুকুমার সেনের ও শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরীর "রামমোহনের বাংলা গদ্য" সম্বন্ধে প্রবন্ধদ্বয়, এবং অধ্যাপক পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনের "Rammohun the last link in the chain of India's Prophets"।

সর্ব্বশেষে বক্তৃতা করিয়া এবং তাঁহার বহুপূর্ব্বে রচিত "হে মোর চিত্ত, পুণ্যতীর্থে জাগ রে ধীরে" শীর্ষক কবিতাটি আবৃত্তি করিয়া রবীন্দ্রনাথ কলিকাতার রামমোহন রায় শত-বার্ষিকীর অনুষ্ঠান সমাপ্ত করেন।

কলিকাতার ও অন্য নানা স্থানের রামমোহন রায় শত-বার্ষিকীতে তাঁহার সম্বন্ধে যত বিষয়ে বক্তৃতা হইয়াছে এবং প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করিলে তাঁহার ব্যক্তিত্বের, চেষ্টার ও কৃতিত্বের বিশালতা ও বৈচিত্র্যে বিস্মিত হইতে হয়। রবীন্দ্রনাথের মত অসাধারণ মানুষ তাই শত-বার্ষিকীতে তাঁহার শেষ বক্তৃতায় বলিয়াছেন, "আমার ভক্তির সীমা নাই রামমোহন রায়ের প্রতি, কিন্তু আমার শক্তির সীমা আছে।"

গোরখপুর প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন

গত ডিসেম্বর মাসে ২৭শে, ২৮শে, ও ২৯শে তারিখে গোরখপুরে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের একাদশ অধিবেশন হইয়াছিল। গোরখপুর খুব বড় শহর নয়। এখানে বাঙালীর সংখ্যাও বেশী নয়। এই জন্য এখানে



শ্রীমতী প্রতিভা দেবী। শ্রীযুক্ত অসিত সেন কর্তৃক গৃহীত ফোটো

এরূপ একটি সম্মেলন ভাল করিয়া অনুষ্ঠিত হইতে পারিবে কি-না, সে-বিষয়ে অনেকের সন্দেহ ছিল। গোরখপুরের বাঙালীদেরই মনে আশঙ্কা ছিল, কিন্তু সুখের বিষয় কাজটি সুশৃঙ্খলার সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। সম্মেলনের অভ্যর্থনা

সমিতির কর্ম্মী ও সভ্যেরা প্রতিনিধিদের খুব যত্ন করিয়াছিলেন।

ইহার আগেকার বারে অধিবেশন হইয়াছিল এলাহাবাদে। এলাহাবাদ বড় শহর, হিন্দুদের তীর্থস্থান এবং এখানে বাঙালী আছেন কয়েক হাজার। সেই জন্য এখানে সম্মেলনের সময় লোকসমাগম প্রচুর হইয়াছিল। গোরখপুরে তাহা হইবার কথা নয়। কিন্তু বাহির হইতে আগত প্রতিনিধির সংখ্যা এলাহাবাদ অপেক্ষা গোরখপুরে কিছু বেশী বই কম হয় নাই এবং স্থানীয় প্রশস্ত কলেজ হলে কখনও শ্রোতার কম্‌তি হয় নাই। কাশী, প্রয়াগ, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, মীরাট, মথুরা, আকোলা, বরেলী, মজঃফরপুর, আগ্রা, বৈতালপুর, জয়পুর, কলিকাতা, বর্দ্ধমান, ফরিদপুর, জলপাইগুড়ি, কাসগঞ্জ ও বলরামপুর হইতে প্রতিনিধি আসিয়াছিলেন।

সেণ্ট এণ্ড্রু কলেজ-হলে অধিবেশনের স্থান এবং তাহার ছাত্রাবাস পুরুষ-প্রতিনিধিদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। তজ্জন্য কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ ধন্যবাদার্হ। মহিলা-প্রতিনিধিদিগের থাকিবার জন্য রাজা ইন্দ্রজিত প্রতাপনারায়ণ শাহী সাহেবের সৌজন্যে তাঁহার টাম্‌কোহী হাউস নামক অট্টালিকা পাওয়া গিয়াছিল। তজ্জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ।

সম্মেলনে যে-সব বক্তৃতা হইয়াছিল, যে-সব অভিভাষণ এবং প্রবন্ধ ও কবিতা পঠিত হইয়াছিল, তাহা আগের আগের বারের ঐরূপ জিনিষপত্রগুলির চেয়ে নিকৃষ্ট হয় নাই। আমরা 'প্রবাসী'র আগামী সংখ্যায় সম্মেলনের বিস্তৃততর বৃত্তান্ত দিব, যথাসময়ে সমুদয় তথ্য ও উপকরণ না পাওয়ায় এবারে দিতে পারিলাম না।

এক দেশের লোক অন্য দেশে যায় সাধারণতঃ ও প্রধানতঃ ক্ষুধার তাড়নায়, অন্নচেষ্টায়। ভারতবর্ষের এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে লোক যায় প্রধানতঃ সেই কারণে। সেইজন্য, অনেক 'ভুঁখা' বাঙালী বঙ্গের বাহিরে গিয়াছে, এবং তাহা অপেক্ষা সংখ্যায় অনেকগুণ বেশী ভুঁখা অবাঙালী বঙ্গে আসিয়াছে। কিন্তু বাঙালীরা বঙ্গের বাহিরে যে-যেখানে গিয়াছে, সেখানে সবাই কেবলমাত্র রোজগারেই মন দেয় নাই। অনেকে নিজ নিজ নিবাস-নগরের ও নিবাস-প্রদেশের হিতকর সার্ব্বজনিক কাজ করিয়াছে, এবং সাহিত্য প্রভৃতির চর্চ্চায় দ্বারা বঙ্গের কৃষ্টির সহিত যোগ রক্ষার চেষ্টা করিয়াছে। তাহারা যে-কেবল বঙ্গের বাঙালীদের সৃষ্ট সাহিত্যের চর্চ্চাই করিয়াছে, তাহা নহে; কেহ কেহ সাহিত্যভাণ্ডার পুষ্টও করিয়াছে। বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে, ললিতকলার ক্ষেত্রে, সংবাদপত্রের মধ্য দিয়া প্রবাসী কোন কোন বাঙালীর দান সামান্য নহে। প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে দর্শন, প্রত্নতত্ত্ব, ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, শিক্ষাদান-বিদ্যা, অর্থনীতি, কৃষিবিদ্যা, পণ্যশিল্প প্রভৃতিরও চর্চ্চা আছে। প্রবাসী বাঙালীরা কেবল গ্রহণ করিতেছে না, বঙ্গদেশকে ও ভারতবর্ষকে কিছু দিতেছেও। প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের কোন অধিবেশনে যোগ দিলে এই সব কথার যাথার্থ্য বুঝিতে পারা যায়।

ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের সকল জাতির সংমিশ্রণ ও একীভবন যদি কখনও ঘটে, তখন প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের মত স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠানের প্রয়োজন থাকিবে না। কিন্তু আপাততঃ দীর্ঘকালের জন্য ইহার প্রয়োজন আছে। বঙ্গের বাঙালী ও বঙ্গের বাহিরের বাঙালীদের মধ্যে যোগ রক্ষা ও সংহতি বৃদ্ধি দ্বারা কেবল যে বাঙালীদেরই লাভ, তাহা নহে; তাহারা যে ভারতীয় মহাজাতির একটি অঙ্গ, তাহারও লাভ আছে।

এ-পর্য্যন্ত প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন বঙ্গের বাহিরেই হইয়াছে। যখন যে প্রদেশে অধিবেশন হইয়াছে, প্রধানতঃ সেই প্রদেশের বাঙালীরাই তাহাতে যোগ দিয়াছে। বঙ্গের বাহিরের অন্যান্য প্রদেশের লোক তাহাতে অল্প আসিয়াছে, এবং বঙ্গের অধিবাসী বাঙালী আরও অল্প আসিয়াছে। এই জন্য বঙ্গের বাহিরের সব প্রদেশের বাঙালীদের ও বঙ্গের বাঙালীদের মধ্যে ইহার দ্বারা সাহিত্য ও কৃষ্টিগত যোগ এখনও ঘনিষ্ঠতর হয় নাই। এই নিমিত্ত কথা উঠিয়াছে, যে, আগামী বারের অধিবেশন কলিকাতায় হওয়া উচিত। তাহাতে ব্রহ্মদেশ-সংবলিত সমগ্র ভারতবর্ষের বাঙালীদের প্রতিনিধিস্থানীয় বাঙালীদের উপস্থিতি যাহাতে হয়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। আমরা এই প্রস্তাব সমীচীন মনে করি। এরূপ অধিবেশন হইলে, আমরা আশা করিব, যে, তাহাতে প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে যাঁহারা সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ললিতকলা, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, শিক্ষাবিজ্ঞান, সাংবাদিকী প্রভৃতির চর্চ্চা ও সেবা করেন, তাঁহারা বঙ্গের অধিবাসী বাঙালীদিগকে



শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। (মধ্যে)। শ্রীরাধারমণ সেন কর্ত্তৃক গৃহীত ফোটো।



উপন্যাসিক ও হাস্যরসিক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত অসিত সেন কর্ত্তৃক গৃহীত ফোটো।



শ্রীযুক্ত অতুলপ্রসাদ সেন। শ্রীরাধারমণ সেন দ্বারা গৃহীত ফোটো।



শ্রীমতী অনুরূপা দেবী। শ্রীরাধারমণ সেন কর্ত্তৃক গৃহীত ফোটো।

তাঁহাদের নানা সাধনার ও সিদ্ধির কথা জানাইবেন, এবং বঙ্গে যাঁহারা ঐ-সকল বিভাগের কর্ম্মী তাঁহারাও নিজ নিজ কার্য্যক্ষেত্রের পরিচয় দিবেন। কলিকাতা ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে বাঙালীদের প্রতিষ্ঠানসমূহের ও কীর্ত্তিনিচয়ের সম্বন্ধে জ্ঞান লাভও সেই উপলক্ষ্যে হইতে পারিবে।

কলিকাতায় এরূপ একটি অধিবেশন অসম্ভব নহে, দুঃসাধ্যও নহে। অবশ্য, ইহার জন্য কর্ম্মী চাই। তাঁহাদিগকে কয়েক হাজার টাকা সংগ্রহ করিতে হইবে, এবং নানা প্রকারের আয়োজন ও বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

এখন গোরখপুরের অধিবেশন সম্বন্ধে কিছু বলি। পাঠকেরা অবগত আছেন, ইহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন লক্ষ্ণৌয়ের বিখ্যাত ব্যারিষ্টার গায়ক ও কবি শ্রীযুক্ত অতুলপ্রসাদ সেন। অসুস্থতা ও কার্য্যাধিক্য সত্ত্বেও তিনি গোরখপুরে আসিয়া প্রথম দিন তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন এবং সেই দিন ও তাহার পরদিন সম্মেলনের কার্য্য পরিচালন করেন। মহিলা-বিভাগের সভানেত্রী কাশীর শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী সরস্বতী, সাহিত্য শাখার সভাপতি কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, বৃহত্তর বঙ্গ শাখার সভাপতি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক ডক্টর প্রসন্নকুমার আচার্য্য, দর্শন শাখার সভাপতি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক চারুচন্দ্র মিত্র, অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্ব শাখার সভাপতি কলিকাতা বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র মিত্র, ললিতকলা শাখার সভাপতি জয়পুর মহারাজার ললিতকলা ও পণ্যশিল্প কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কুশলকুমার মুখোপাধ্যায়, ইতিহাস শাখার সভাপতি বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, সঙ্গীত শাখার সভাপতি লক্ষ্ণৌয়ের সঙ্গীতবিদ্যাপারদর্শী শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ সান্যাল, কৃষি ও বিজ্ঞান শাখার সভাপতি কানপুর টেক্‌নলজিক্যাল ইন্‌স্‌টিটিউটের শ্রীযুক্ত ডক্টর হরিদাস সেন, এবং শিক্ষাবিজ্ঞান শাখার সভাপতি আগ্রা ট্রেনিং কলেজের অধ্যাপক দেবনারায়ণ মুখোপাধ্যায় নিজ নিজ অভিভাষণ পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত হরিদাস সেন তাঁহার বক্তৃতা বিশদ করিবার নিমিত্ত বহুসংখ্যক চিত্র যন্ত্রসহযোগে প্রদর্শন করেন। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ সান্যাল নিজে গান গাহিয়া তাঁহার অভিভাষণটি শিক্ষাপ্রদ ও উপভোগ্য করেন। সাংবাদিকী শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় অভিভাষণ লিখিতে না-পারায় সংবাদপত্র-পরিচালন সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। প্রত্যেক বিভাগে প্রবন্ধ পঠিত হয়। কলিকাতার শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী এক দিন ম্যাজিক লণ্ঠন সহযোগে চিত্র প্রদর্শনদ্বারা হিন্দী সাহিত্যে প্রেমের কবিতার একটি দিক্ বিশদরূপে বুঝাইয়া দেন।

খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই অধিবেশনে তাঁহার জীবনের সপ্ততিবর্ষ পূর্ত্তি উপলক্ষ্যে অভিনন্দিত করা হয় এবং অর্ঘ্য ও উপহার দেওয়া হয়।

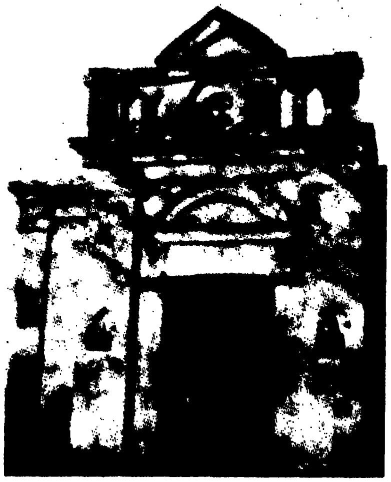
অভিনন্দনপত্র পাঠ করেন এলাহাবাদের শ্রীমতী প্রতিভা দেবী। এলাহাবাদে গত বারের অধিবেশনের মহিলা-বিভাগের নেত্রী শ্রীমতী অনুরূপা দেবী গোরখপুর অধিবেশনেও আসিয়াছিলেন এবং সাহিত্য-শাখায় একটি প্রবন্ধ পাঠ ও মহিলা-বিভাগে বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

এলাহাবাদের বিচারপতি স্যর লালগোপাল মুখোপাধ্যায় এবং কানপুরের ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ সেন উপস্থিত থাকিয়া নানা প্রকারে কার্য্যপরিচালনার সাহায্য করিয়াছিলেন। রামমোহন রায় শতবার্ষিকী এই সম্মেলনের একটি অঙ্গ ছিল। শতবার্ষিকী সভায় শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে সভাপতি রূপে বক্তৃতা করিতে হইয়াছিল। আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার গোরখপুরের অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত ডাক্তার রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রীতিসম্মেলনে গোরখপুরের প্রায় সকল বঙ্গমহিলাকে অধিবেশন-স্থান সেণ্ট এণ্ড্রুজ কলেজে মোটরযোগে আনয়ন ও বাড়ি পৌঁছাইয়া দিবার ভার লইয়াছিলেন। নিবারণবাবু, ২৯শে রাত্রে যে ত্রিশ জন প্রতিনিধি লুম্বিনী দেখিতে যান, তাঁহাদের রেলপথে ও মোটরপথে যাতায়াতের সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। ৩১শে তারিখে যাত্রীদের জন্যও সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। মহিলা-বিভাগের সম্পাদিকা শ্রীমতী সুজাতা দেবী অক্লান্তভাবে নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। অধ্যাপক ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক ললিতমোহন কর, অধ্যাপক চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি কর্ম্মীদিগকে বিশেষ পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। সকলের নাম জানা না-থাকায় উল্লেখ করিতে পারিলাম না।

—

লুম্বিনীর অশোকস্তম্ভ দর্শন

গোরখপুরে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দাসের অভিভাষণে যে-সকল দ্রষ্টব্য স্থানের উল্লেখ আছে, তাহার মধ্যে গোরখপুরের ২৫ ক্রোশ উত্তরে স্বাধীন নেপাল রাজ্যস্থিত লুম্বিনী উদ্যান প্রধান। এইখানে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করেন। ইহা এখন রুম্মিন দেঈ নামে পরিচিত। উদ্যান এখন নাই, কয়েকটি গাছ আছে, তাহাও বহু পুরাতন নহে। অশোকস্তম্ভটি প্রাচীনতম, খ্রীষ্টপূর্ব্ব ২৪৯ অব্দে অর্থাৎ ২১৮২ বৎসর পূর্ব্বে স্থাপিত ও উৎকীর্ণ। এই স্তম্ভে উৎকীর্ণ লিপিটি সম্পূর্ণ আছে। মূল পালিতে যাহা লিখিত আছে, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু



রুম্মিন দেঈতে (লুম্বিনীতে) মায়াদেবীর মন্দির।
শ্রীরাধারমণ সেন কর্ত্তৃক গৃহীত ফোটো

ও অধ্যাপক ললিতমোহন কর কাব্যতীর্থের "অশোক অনুশাসন" পুস্তকে তাহার বাংলা অনুবাদ এইরূপ দেওয়া আছে—

"দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা অভিষেকের বিশ বর্ষে স্বয়ং আসিয়া এই স্থানের পূজা করিয়াছেন। যেহেতু এই স্থানে শাক্যমুনি বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই স্থানে প্রস্তর-প্রাচীর স্থাপিত হইল এবং শিলাস্তম্ভ উত্থাপিত হইল, কারণ ভগবান্ এই স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই জন্য লুম্বিনী গ্রাম নিষ্কর ও অষ্টভাগী করা হইল (অর্থাৎ উৎপন্ন দ্রব্যের কেবলমাত্র অষ্ট ভাগের এক ভাগ মাত্র কর নির্দ্ধারিত হইল)।"

গোরখপুর হইতে লুম্বিনী যাইতে হইলে রেলে ৫২ মাইল নৌতনওয়া ষ্টেশন পর্য্যন্ত গিয়া মোটর গাড়ীতে বা মোটর 'বাসে ২২ মাইল যাইতে হয়। ষ্টেশন হইতে হাতী চড়িয়া গেলে ১২ মাইল হয়। ২৯শে একদল প্রতিনিধি লুম্বিনী গিয়াছিলেন। আমরা অধ্যাপক ললিতমোহন কর ও তাঁহার পরিবার ও আত্মীয়বর্গ, শ্রীযুক্ত রাধারমণ সেন, শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার রায়, শ্রীযুক্ত রামেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক কুমার বাহাদুর প্রভৃতির সঙ্গে ৩১শে ডিসেম্বর পূর্ণিমা রাত্রে ৯টায়



লুম্বিনীতে অশোকের স্তম্ভ। পাশে প্রবাসীর সম্পাদক। শ্রীযুক্ত রামেশ্বর চট্টোপাধ্যায় গৃহীত ফোটো হইতে।



লুম্বিনীর সাধারণ দৃশ্য। বাঁ-ধারে দূরে যে স্তুপটি তৈরি হইতেছে, তাহার সম্মুখেই অশোকের সেই স্তম্ভটি। ডান ধারে গাছের একটু আড়ালে মায়াদেবীর মন্দির দেখা যাইতেছে। ইহার ভিতর মায়াদেবীর মূর্ত্তি আছে। ফোটোগ্রাফ শ্রীযুক্ত রামেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক গৃহীত।



লুম্বিনীর মায়াদেবীর মন্দিরের ভিতর মায়াদেবীর মূর্ত্তি। শ্রীযুক্ত রামেশ্বর চট্টোপাধ্যায় গৃহীত ফোটো হইতে।

সময় রওনা হইয়া ১টার পর নৌতনওয়া পৌছি। তাহার পর রাত্রির অবশিষ্ট অংশ রেলগাড়ীতে ও ষ্টেশ্যনে কাটান হয়। জ্যোৎস্না থাকায় কোন অসুবিধা হয় নাই। শেষরাত্রে চা প্রস্তুত হয় এবং কিছু জলযোগ হয়। তাহার পর ১লা জানুয়ারী একখানা মোটর 'বাস ভাড়া করিয়া যাই। ষ্টেশ্যনে একদল লুম্বিনী-যাত্রী সিংহলী বৌদ্ধের সহিত পরিচয় হয়। নৌতনওয়া হইতে ৫ মাইল পরে নেপাল-রাজ্য আরম্ভ। রাস্তা কাঁচা, কিন্তু বিশেষ খারাপ বা বিপজ্জনক নয়। যাইতে কোন ক্লেশ অনুভব করি নাই। সঙ্গের বালক-বালিকারা খুব স্ফূর্ত্তিতে গিয়াছিল। আট-নয়টি সেতু পার হইতে হয়। সেগুলি কাঠের তৈরি, উপরে মাটী বিছান। লুম্বিনী পৌছিতে ঘণ্টা-দুই লাগে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, লুম্বিনীর স্তম্ভটিই প্রাচীনতম। তদ্ভিন্ন, সেখানে একটি মন্দির আছে, তাহা পুরাতন হইলেও অপেক্ষাকৃত নূতন। তাহা বুদ্ধদেবের মাতার নামে মায়াদেবীর মন্দির বলিয়া পরিচিত। তাহার ভিতর প্রস্তরফলকে মায়াদেবীর মূর্ত্তি আছে। তাহা প্রাচীন, কিন্তু কত প্রাচীন বলিতে পারি না। মায়াদেবী একটি শালগাছের ডাল ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, পাশে তাঁহার ভগিনী, এবং পাদদেশে শিশু বুদ্ধ। অন্য দু-একটি মূর্ত্তিও একই ফলকে আছে। কোন মূর্ত্তিরই নাক চোখ কান ঠিক্ বুঝা যায় না। মন্দিরের ভিতর যথেষ্ট আলোক না-থাকায় সহজে ভাল ফোটোগ্রাফ তোলা যায় না।

লুম্বিনীতে খনন ও অন্যান্য কাজ চলিতেছে। শ্রীযুক্ত গোকুলচাঁদ নামক একজন পঞ্জাবী এঞ্জিনীয়ারের অধীনে চারি শত মজুর খাটিতেছে। স্তম্ভটির ও মন্দিরের কিছু দূরে দুই পাশে উচ্চ মৃত্তিকারাশি একত্র করিয়া তাহার উপর ইটের উঁচু স্তুপ নির্ম্মাণ করা হইতেছে। এখানে যে-সব গোটা বা টুকরা ইট-পাথর পড়িয়া আছে বা খুঁড়িয়া পাওয়া যাইতেছে, রক্ষী নেপালী সৈনিকরা তাহার একটিও কাহাকেও লইয়া আসিতে দেয় না। যেগুলার সঙ্গে যেখানে-সেখানে প্রাপ্তব্য ইট-পাথরের টুকরার কোনও পার্থক্য নাই, তাহাও আনিতে দেয় না। নিকটে দর্শক ও যাত্রীদের জন্য একটি পাকা বিশ্রামগৃহ আছে। রুম্মিন দেঈতে খনন করিয়া যে-সব মূর্ত্তি, মূর্ত্তির অংশ, খোদিত প্রস্তরাদি পাওয়া গিয়াছে, তাহা একটি গৃহে রক্ষিত আছে। আমরা লুম্বিনী দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়া নৌতনওয়া ষ্টেশ্যনে রেলগাড়ীতে উঠিয়া বসিবার পর একটি

বাঙালী যুবক আসিয়া বলিলেন, যে, তিনি লুম্বিনীর প্রত্নতাত্ত্বিক কর্ম্মচারী। তাঁহার নাম কে. ব্যানার্জ্জি, বি-এ। তিনি বলিলেন, তিনি কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে নেপাল গবর্ন্মেণ্টের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর নিকট হইতে আদেশ পাইয়াছেন, যে, 'প্রবাসী'র সম্পাদক লুম্বিনী দেখিতে যাইতেছেন, যেন দেখাইবার বন্দোবস্ত করা হয়। তাহার পর তিনি এই বলিয়া মাফ চাহিলেন, যে, ঐ আদেশ বিলম্বে পাওয়ায় তিনি কিছু করিতে পারেন নাই। আমরা এ-বিষয়ের কিছুই জানিতাম না। তাঁহার সাহায্য পাইলে অনেক তথ্য জানিতে পারিতাম। তাহার সুযোগ না-হওয়ায় দুঃখিত হইলাম। কিছু কিছু খবর অবশ্য এঞ্জিনীয়ার গোকুলচাঁদ মহাশয়ের সৌজন্যে পাইয়াছিলাম।

একটা কথা লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছি। লুম্বিনী যাইবার পথে নেপাল পৌঁছিবার পরেই এক জায়গায় আমাদের 'বাস্'টা থামিল। আমাদের সঙ্গে নেপাল যাইবার অনুমতি-পত্র ছিল। একজন নেপালী কর্ম্মচারী আমাদের গাড়ীর প্রত্যেককে খুব তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখিল। পরে শুনিলাম তাহার কারণ, কোন ইংরেজ যাইতেছে কি-না দেখা। ইংরেজদিগকে না-কি সহজে নেপাল ঢুকিতে দেওয়া হয় না।

রাজপুত্র যেখানে জন্মগ্রহণ করিয়া জীবকুলের দুঃখমোচন ও পরিত্রাণের জন্য সর্ব্বত্যাগী হইয়াছিলেন, সেখানে রাজপ্রাসাদ দেখিবার আশা করি নাই। কিন্তু,

"উদিল যেথানে বুদ্ধ আত্মা মুক্ত করিতে মোক্ষ দ্বার,
আজিও জুড়িয়া অর্দ্ধজগৎ ভক্তিপ্রণত চরণে যাঁর,"

সেই স্থানটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সুশৃঙ্খল ভাবে সযত্নে রক্ষিত দেখিবার আশা করা অসঙ্গত নহে। এই স্থানটি রক্ষা করার দিকে যখন নেপাল-নৃপতির দৃষ্টি পড়িয়াছে এবং অর্থব্যয়ও হইতেছে, তখন আশা হয় ইহা অবিলম্বে সুরক্ষিতই হইবে।

খ্রীষ্টীয় বৎসরের প্রথম প্রভাতে বুদ্ধদেবের জন্মস্থান দেখিলাম। তাহার পুণ্য প্রভাব জীবনের বাকী দিনগুলি অনুভব করিতে পারিলে ধন্য হইব।

বুদ্ধের মহাপরিনির্ব্বাণ-স্থান দর্শন

গোরখপুর হইতে প্রায় ৩৪ মাইল দূরে বর্ত্তমান কাশিয়া নামক স্থানে বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্ব্বাণ স্তূপ অবস্থিত। ইহাই প্রাচীন কুশীনগর। এক দিন এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি স্যর লালগোপাল মুখোপাধ্যায় কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার পুত্রকন্যা ও একটি আত্মীয়া এবং মধ্যভারতের ব্যবহারজীব শ্রীযুক্ত মিত্রের সঙ্গে স্তূপটি দেখিতে যাইবার সুযোগ হইল। দুখানি মোটর গাড়ীতে যাওয়া গেল। রেলপথেও যাওয়া যায়।

কথিত আছে, বুদ্ধদেব কুশীনগরে একটি শালবনে দুটি শালগাছের মধ্যে শয়ন করিয়া মহাপরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন।



বর্ত্তমানে কাশিয়ার মহাপরিনির্ব্বাণ স্তূপ। ফোটোগ্রাফ শ্রীঅজিত সেন কর্ত্তৃক গৃহীত।

সেই স্থানের নিকট পরে একটি স্তূপ নির্ম্মিত হয়। স্তূপটি যখন আবিষ্কৃত হয়, এবং খননকার্য্য আরম্ভ হয়, তখন ইহা বেমেরামত অবস্থায় ছিল। তখনকার, ১৯ ৬ সালে তোলা, একটিমাত্র ফোটোগ্রাফ গোরখপুরের শ্রীযুক্ত রাধারমণ সেনের



কাশিয়ার মহাপরিনির্ব্বাণ স্তূপে মৃত্যুশয্যায় শায়িত বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি। ফোটোগ্রাফ শ্রীঅজিত সেন কর্ত্তৃক গৃহীত।

নিকট ছিল। তাহা বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার সৌজন্যে উহার প্রতিলিপি দিলাম। এখন স্তূপটি মেরামত হইয়াছে

এবং ব্রহ্মদেশীয় ভক্ত বৌদ্ধদিগের ব্যয়ে উহার বৃহৎ গুম্বজটি স্বর্ণমণ্ডিত হইয়াছে। এখনকার একটি ফোটোগ্রাফের প্রতিলিপিও দিলাম। স্তূপের মধ্যে মৃত্যুশয্যায় শায়িত বুদ্ধদেবের বৃহৎ মূর্ত্তি আছে। মস্তক হইতে পদাঙ্গুলি পর্য্যন্ত উহা ১৪ হাত লম্বা। গলদেশ হইতে পাদদেশ পর্য্যন্ত বৌদ্ধ ভক্তেরা উহা কিংখাপ বস্ত্রে আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছে, মস্তক ও মুখমণ্ডল সোনার পাতে মুড়িয়া দিয়াছে। কেবল অর্দ্ধ-নিমীলিত চক্ষুর্দ্বয়ের রং হইতে বুঝা যায়, যে, মূর্ত্তিটি শ্বেত প্রস্তরের। বুদ্ধদেব পাশ ফিরিয়া শুইয়া আছেন, এইভাবে মূর্ত্তিটি নির্ম্মিত হইয়াছে। স্তূপের দ্বার ও মূর্ত্তিটির মাঝখানে ব্যবধান এত অল্প, যে, মূর্ত্তিটির দৈর্ঘ্যের দিকের ফোটোগ্রাফ তোলা কঠিন। আমরা যে ফোটোগ্রাফটির প্রতিলিপি দিলাম, তাহা মূর্ত্তিটির পায়ের দিক হইতে তোলা। স্তূপের নিকটে পুরাকালে বিহার ছিল, তাহা খনন দ্বারা আবিষ্কৃত কক্ষ প্রাচীরাদি হইতে বুঝা যায়। স্তূপের নিকট একটি ছোট মন্দিরে বুদ্ধদেবের একটি প্রাচীন উপবিষ্ট মূর্ত্তি আছে। তাহাও ভক্তেরা সোনায় মুড়িয়া দিয়াছে।

যিনি সর্ব্বত্যাগী হইয়াছিলেন, স্বর্ণমণ্ডন দ্বারা তাঁহার প্রতি ভক্তি প্রদর্শিত হইতেছে!

—

গোরখপুরের অন্যান্য কিছু দ্রষ্টব্য

গোরখপুর নগর ও জেলা ও তাহার নিকটবর্ত্তী অঞ্চল বিস্তর সাধুভক্তের স্মৃতি বিজড়িত। সব দেখিবার সময় হয় নাই। আর যাহা দেখিয়াছি, তাহার বর্ণনা শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দাসের অভিভাষণ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি।

"বৌদ্ধধর্ম্মের ভাঙাগড়ার ফলে হীনযান এবং মহাযান ও পরে মহাযানের যোগাচার শাখার সৃষ্টি হয়। সেই শাখার বিবর্ত্তনে মহাপুরুষ গোরক্ষনাথ স্বীয় সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করেন। এই নগরের উপকণ্ঠে তাঁহার স্মৃতিমন্দির ও তাঁহার নাম হইতেই এই নগরের নামকরণ। এই নাথ উপনামধারী যোগাচারী সম্প্রদায় হইতে বঙ্গদেশের 'নাথ যোগী'রা আগত বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। গোরক্ষনাথের শিষ্যপরম্পরাগত ৮গম্ভীরনাথের বাংলা প্রদেশে অনেক শিষ্য আছেন। তাঁহারা গোরক্ষনাথ মন্দিরের পার্শ্বে গুরুর সমাধি মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।"

"প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ, প্রস্তরমূর্ত্তি প্রভৃতি এতৎপ্রদেশের বহুস্থানে লক্ষিত হয়। কারুকার্য্যে অপূর্ব্ববৈশিষ্ট্যসূচক একটি প্রাচীন বিষ্ণুমূর্ত্তি স্থানীয় পুষ্করিণী হইতে উদ্ধৃত হইয়া নগরের উত্তরভাগে একটি সুদৃশ্য মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।"



১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে কাশিয়ার (কুশীনগরের) মহাপরিনির্ব্বাণ স্তূপ।
ফোটোগ্রাফ শ্রীরাধারমণ সেন কর্ত্তৃক গৃহীত।

এই সুন্দর প্রাচীন মূর্ত্তিটি কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরের, ইহার কোথাও কোন অংশ বিন্দুমাত্রও ভগ্ন হয় নাই দেখিলাম।

—

কবীরের সাধনার স্থান ও সমাধি দর্শন

গোরখপুর জেলার মগহর নামক গ্রামে ভক্ত কবীরের সাধনার স্থান ছিল। তাঁহার সমাধিও সেখানে অবস্থিত। কবীর তন্তুবায় ছিলেন। মগহর গ্রামে এখনও অনেক তন্তুবায়কে বস্ত্রবয়ন-কার্য্যে ব্যাপৃত দেখিলাম। কথিত আছে, কবীরের মৃত্যুর পর মুসলমানেরা তাঁহার দেহ কবর দিতে এবং হিন্দুরা দাহ করিতে চায়, কিন্তু যে-বস্ত্রে তাঁহার শরীর আচ্ছাদিত ছিল, তাহা উত্তোলন করিলে দেখা গেল, তথায় দেহ নাই, পুষ্পরাশি রহিয়াছে!

তাঁহার স্মারক সমাধি-মন্দির পাশাপাশি দুটি—একটি হিন্দুদের, অপরটি মুসলমানদের। হিন্দুদের মন্দিরটিতে কবীরের

ও কমাল সাহেবের চিত্র রহিয়াছে। বাহিরে একটি ছোট পাকা মণ্ডপের মধ্যে তাঁহার চরণচিহ্ন ও খড়ম রহিয়াছে।

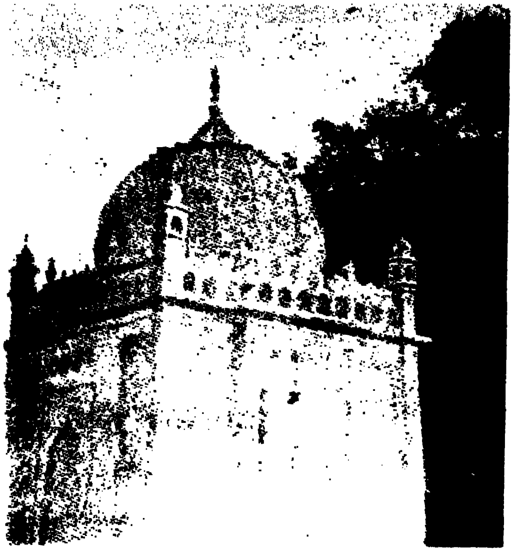
কবীরের মঠের পশ্চাতে একটি শস্যক্ষেত্র ব্যবধানে আর একটি মঠ আছে। তাহা এক পরলোকগত ভক্ত সাধুর।



মগহর গ্রামে কবীরের সমাধি (হিন্দুদের)।
ফোটোগ্রাফ শ্রীঅজিত সেন কর্ত্তৃক গৃহীত।

তাঁহার মঠটির ভিতরে ঢুকিয়া এক পাশে একটি ছোট দরজা দেখিলাম। প্রদীপ জ্বালিয়া একজন সন্ন্যাসী আমাদিগকে সেই ক্ষুদ্র দ্বারপথে অনেক ছোট ছোট ধাপ বাহিয়া ভক্ত সাধুটির সাধনা-গুহায় লইয়া গেলেন। কতক দূর নামিয়া দেখিলাম তাঁহার শয়নের স্থান। তাহার পর আরও নীচে নামিয়া দেখিলাম তাঁহার সাধন-ভজনের আসন। উপরে উঠিয়া আসিয়া সন্ন্যাসীটিকে হিন্দীতে সুধাইলাম, আপনিও কি ঐখানে সাধন ভজন করেন? তিনি উত্তর দিলেন, যাহাদের শরীর থাকে এক জায়গায় এবং চিত্ত থাকে অন্য স্থানে, তাহারা সাধুর গুহাতে ভজনসাধন করিতে পারে না। সত্য কথা। সন্ন্যাসীটি জটাধারী, শীর্ণকায়, ভস্মমাখা, যুবা পুরুষ।

—



মগহর গ্রামে কবীরের সমাধি (মুসলমানদের)।
ফোটোগ্রাফ শ্রীঅজিত সেন কর্ত্তৃক গৃহীত

সন্ত্রাসকদের উপদ্রব সম্বন্ধে বড়লাট

ইউরোপীয় সভার বার্ষিক ভোজে বড়লাট যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে তিনি বঙ্গে সন্ত্রাসকদের উপদ্রব সম্বন্ধে অনেক কথা বলেন। সন্ত্রাসকদের প্রচেষ্টার সম্পূর্ণ উচ্ছেদের জন্য গবন্মেণ্টের সমুদয় তোড়জোড় ও শক্তি প্রযুক্ত হইবে, এই অভিপ্রায় তিনি প্রকাশ করেন। যে-কোন গবন্মেণ্টকে বিপর্য্যস্ত করিবার চেষ্টা হইবে, তাহাই আত্মরক্ষার জন্য ইহা করিতে বাধ্য। গবন্মেণ্টের প্রধান ব্যক্তি যে এত বড় কথা বলিয়াছেন, তাহা হইতে সন্ত্রাসকদের বিভীষিকাকে গবন্মেণ্ট কত বড় মনে করেন, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে।

বড়লাট সন্ত্রাসকপ্রচেষ্টা উচ্ছেদের ব্যয়ের দিক্‌টা সম্বন্ধে যাহা বলেন তাহার তাৎপর্য্য এই :—

"সন্ত্রাসকপ্রচেষ্টা হইতে বিপদাশঙ্কা বিদ্যমান থাকায় গবন্মেণ্টকে যে-সব উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছে এবং যেগুলি উহা দূরীভূত না হওয়া পর্য্যন্ত অবলম্বিত থাকিবে, তৎসমুদয়ের জন্য এমন একটি প্রদেশকে (অর্থাৎ বাংলা দেশকে) প্রভূত ব্যয় করিতে হইতেছে যাহার আর্থিক অবস্থা ভাল নয়। এইরূপ খরচ করিতে হইতেছে বলিয়া বাংলা-গবন্মেণ্টের সাধারণ হিতকর কাজগুলি হইতে টাকা সন্ত্রাসকপ্রচেষ্টা উচ্ছেদের দিকে চালাইতে হইতেছে। এই প্রচেষ্টা বিদ্যমান থাকায় বঙ্গদেশকে তজ্জন্য এই মূল্য (অর্থাৎ শাস্তিরূপ জরিমানা) দিতে হইতেছে ও হইবে। আমি নিজেকে জিজ্ঞাসা করিতেছি,

যে-সব শ্রেণীর মধ্য হইতে সন্ত্রাসকরা নিজেদের দল পুরু করে, সেই সকল শ্রেণীর জনমত কখন্ পূর্ব্বোক্ত তথ্যগুলি উপলব্ধি করিবে এবং বুঝিবে, যে, সন্ত্রাসকরা তাহাদের দেশের সকলের চেয়ে বড় শত্রু ?"

সন্ত্রাসকপ্রচেষ্টার উচ্ছেদের জন্য গবন্মে্ণ্টকে যে অনেক টাকা ব্যয় করিতে হইতেছে ও হইবে, ইহা সত্য কথা। দমন ও শাস্তি দ্বারা উচ্ছেদচেষ্টা ছাড়া আরও যাহা যাহা করা দরকার, তাহাতে গবন্মেণ্ট যথেষ্ট মনোযোগী নহেন, সে-কথা অনেক বার বলা হইয়াছে। পুনরুক্তি না করিয়া এখন বড়লাটের উল্লিখিত বঙ্গের আয় ব্যয়ের কথাই বলি। বাংলা দেশের অবস্থা যে ভাল নয়, তাহা বড়লাট কি অর্থে বলিয়াছেন ? যদি তিনি বঙ্গের লোকসমষ্টি অর্থে "বাংলা দেশ" কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য, বাংলার লোকসমষ্টির আর্থিক অবস্থা খারাপ জানিয়াও গবন্মেণ্ট এই প্রদেশের লোকদের দেয় ট্যাক্স ও খাজনা কমান্ নাই কেন ? কিন্তু যদি বড়লাট "বাংলা দেশ" বাংলা-গবর্ণমেণ্ট অর্থে প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাদিগকে বলিতে হইবে, যে, বঙ্গদেশে যত সরকারী ট্যাক্স ও খাজনা আদায় হয় তাহার খুব বেশী অংশ ভারত-গবন্মেণ্ট লইয়া থাকেন বলিয়াই বাংলা-গবন্মেণ্ট দরিদ্র। অন্যান্য প্রদেশে সরকারী রাজস্ব যত আদায় হয়, তাহার যত অংশ ভারত-গবন্মেণ্ট গ্রহণ করেন, বাংলা দেশ হইতেও যদি তত অংশই লইতেন, তাহা হইলে বাংলা-গবন্মেণ্ট দরিদ্র হইত না। বাংলা-গবন্মেণ্টের দারিদ্র্য কৃত্রিম, বানানো দারিদ্র্য ; এবং ভারত-গবন্মেণ্টই বাংলা-গবন্মেণ্টকে দরিদ্র করিয়া রাখিয়াছেন।

বড়লাট বলিয়াছেন, সন্ত্রাসকপ্রচেষ্টার উচ্ছেদ সাধনার্থ অতিরিক্ত অর্থব্যয় করিতে না হইলে সেই টাকা হিতকর সরকারী কাজে ব্যয়িত হইত। এ-বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। যখন সন্ত্রাসকপ্রচেষ্টা দমনের জন্য বেশী টাকা ব্যয় করিতে হইত না, তখনও, বঙ্গে শিক্ষা প্রভৃতি লোকহিতকর সরকারী বিভাগে অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় কম ব্যয় হইত।

—

সন্ত্রাসকপ্রচেষ্টা ও বেকারসমস্যা

বড়লাট তাঁহার পূর্ব্বোল্লিখিত বক্তৃতায় ব্যবসা-বাণিজ্যের মন্দা ও বেকার-সমস্যার সহিত বৈপ্লবিক সন্ত্রাসকপ্রচেষ্টার সম্পর্কের উল্লেখ করেন এবং বলেন :—

তাৎপর্য্য। "এটা সত্য কথা, যে, বর্ত্তমান সময়ে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি হইতে অত্যধিকসংখ্যক যুবক ও যুবতী তাহাদের নামের শেষে 'বি-এ' উপাধি লইয়া বাহির হয়, এবং তাহারা যখন সরকারী বা সার্ব্বজনিক কাজে প্রবৃত্ত হইতে চায় তখন যথেষ্ট কাজ খালি দেখিতে পায় না। ফলে, এই বেকার অবস্থা তাহাদের মনে বিরক্তি, নৈরাশ্য ও প্রতিহিংসার উদ্রেক করে, এবং সন্ত্রাসকপ্রচেষ্টার নেতারা, যাহারা গোপনে ওৎ পাতিয়া বসিয়া থাকে, তাহাদিগকে সহজেই শিকার করে (অর্থাৎ দলভুক্ত করে)।"

ব্যবসা-বাণিজ্যের মন্দা বলিতে যে অবস্থা বুঝায়, গবন্মেণ্ট তাহার উন্নতির জন্য ও বেকার-সমস্যার সমাধানের জন্য প্রকৃত উপায় যদি অবলম্বন করেন, তাহার সমর্থন আমরা করিব। কিন্তু যদি গবন্মেণ্ট মনে করেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার বা ইস্কুলের শিক্ষার সঙ্কোচন দ্বারা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে তাহা হইলে সেটা ভ্রম। বি-এ পাস-করা বেকার যে, সে যেমন বেকার, সম্পূর্ণ নিরক্ষর বেকার যে, সেও তেমনি বেকার। প্রভেদ এই, যে, শিক্ষিত বেকারদের মনের মধ্যে যতটুকু জ্ঞানালোক, যত আধুনিক ভাব ও চিন্তা আছে, অশিক্ষিতদের মনের মধ্যে তত নাই। শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম, কিন্তু তাহারা জাগিয়াছে এবং সরব ও সক্রিয় হইয়াছে বলিয়া গবন্মেণ্ট মনে করিতেছেন "ভদ্রলোক"দের শিক্ষার সঙ্কোচন করিলেই বুঝি তাহাদের সরবতার সঙ্গে সঙ্গে বেকার-সমস্যার ও বৈপ্লবিক প্রচেষ্টারও বিনাশ সাধিত হইবে। কিন্তু যাহারা "ভদ্রলোক" বলিয়া কথিত হয় না, যাহারা শিক্ষা পায় নাই, যাহাদের সংখ্যা অনেক বেশী, যাহারা গরিব ও উপার্জ্জনহীন বা অতি সামান্য উপার্জ্জন করে, যাহাদের মরীয়া হইবার সম্ভাবনা ও ক্ষমতা অধিক, তাহারাও জাগিতেছে। তাহারা কি করিবে, গবন্মেণ্ট তাহার পূর্ব্বাভাস কিছু পাইতেছেন কি ? তাহার প্রতিষেধক কি উপায় অবলম্বন করিতেছেন ?

যাহারা এখন বি-এ পাস করে, তাহাদিগকে অশিক্ষিত রাখিলেও তাহারা বেকার থাকিবে এবং "ভদ্রলোক" থাকিবে, রাস্তার, রেলওয়ের, জাহাজঘাটার, কারখানার কুলি-মজুর, অন্ততঃ সদ্য সদ্য, হইবে না। সে অবস্থায় তাহারা কি সহজে সন্ত্রাসক-নেতাদের জালে পড়িবে না ?

ইংলণ্ডেও ত শিক্ষিত বেকার বহুৎ আছে। তাহারা সন্ত্রাসক হয় না কেন ? সন্ত্রাসকপ্রচেষ্টার উচ্ছেদ সাধন করিতে

হইলে বড় মন, নিঃস্বার্থ মন, সাহসী মন ও উদার রাজনীতিজ্ঞতা চাই, এবং এই দৃঢ় বিশ্বাস অনুসারে কাজ করা চাই, যে, ভারতীয়েরা ঠিক সভ্যতম দেশের মানুষদেরই মত প্রকৃতিবিশিষ্ট মানুষ।

—

বিহারে বাঙালী

বিহার-উড়িষ্যার লাটসাহেব গত ডিসেম্বর মাসের গোড়ায় ভাগলপুর যান। তথাকার বাঙালী অধিবাসীরা তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়া বিহারের অধিবাসী বাঙালীদের বিরুদ্ধে যে-সব রকম পক্ষপাত করা হয়, তাহার উল্লেখ করিয়া প্রতিকার চান। লাটসাহেব দুটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়া বলেন, যে, তিনি অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছেন, যে, ঐ দুই বিষয়ে বাঙালীদের অভিযোগের কোন ভিত্তি নাই। একটি এই, যে, যে-সব বাঙালী বিহারের স্থায়ী বাসিন্দা ("domiciled") বলিয়া গণিত হইবার সার্টিফিকেটের দরখাস্ত করে, নানা তুচ্ছ ও বাজে ওজুহাতে তাহাদের অনেকের দরখাস্ত না-মঞ্জুর হয়। লাটসাহেবের নিজের উত্তরেই দেখিতেছি, গত তিন বৎসরে ভাগলপুর জেলায় যতজন দরখাস্ত করিয়াছিল, তাহাদের দুই-তৃতীয়াংশের দরখাস্ত মঞ্জুর হইয়াছে, কেন-না, কোন কারণে বাকী এক-তৃতীয়াংশের দরখাস্ত মঞ্জুর হয় নাই। পাটনার 'বেহার হেরাল্ড' বলেন, এক এক জেলার কর্ত্তা এক এক রকমের কারণ দেখাইয়া দরখাস্ত না-মঞ্জুর করেন, এবং এ-বিষয়ে বাঙালীদের অভিযোগের যথার্থ কারণ আছে। আমরা বলি, ডোমিসাইল্ড্ হওয়ার, স্থায়ী বাসিন্দা বলিয়া গণিত হওয়ার, সার্টিফিকেট চাওটাতেই যে বাঙালীদের প্রতি অবিচার করা হয়। বাংলা দেশে ত কোন বিহারীর কাছ থেকে ডোমিসাইল্ড হওয়ার সার্টিফিকেট চাওয়া হয় না, অথচ সরকারী পুলিস-বিভাগে ও অনেক মিউনিসিপালিটিতে বিস্তর বিহারী চাকরি পাইয়া আসিতেছে। অতি অদ্ভুত, হাস্যকর ও অন্যায় ব্যবস্থা এই, যে, মানভূমের বাঙালীদের কাছ থেকেও এইরূপ সার্টিফিকেট চাওয়া হয়! মল্লভূম (বর্ত্তমান বাঁকুড়া জেলার বৃহৎ অংশ) ও বীরভূম যেমন ও যতদিন বাংলা দেশের অংশ, মানভূমও ততদিন বাংলা-দেশের অংশ, এবং তাহা যে কত শতাব্দী কেহ ঠিক্ করিয়া বলিতে পারে না। যদি অন্য কিছু জানা না-থাকিত তাহা হইলেও মানভূম, শিখরভূম, ধলভূম, মল্লভূম, বীরভূম— ইত্যাকার নাম হইতেই ঐ সব অঞ্চলকে একই দেশ বা প্রদেশের অংশ বলিয়া অনুমান করা চলিত। মানভূমের অন্তর্গত কয়লার খনি প্রভৃতিতে বিস্তর হিন্দীভাষী লোকের আগমন সত্ত্বেও এখনও মানভূম প্রধানতঃ বাংলা-ভাষী জেলা। তা ছাড়া, সিংহভূম, ধলভূম, সাঁওতাল পরগণা, রাঁচী প্রভৃতি জেলায় অনেক বাঙালী পরিবার আছে যাহারা অন্ততঃ কয়েক শতাব্দী তথাকার অধিবাসী। চৈতন্যদেব ঝাড়খণ্ডের মধ্য দিয়া যাইবার সময় অনেক বাঙালী দেখিয়াছিলেন।

বিহারে বাঙালীদিগকে ডোমিসাইল্ড হইতে বলা হয়, কিন্তু পঞ্জাবী, দিল্লীওয়ালা, আগ্রা-অযোধ্যা-বাসী ও মধ্য-প্রদেশবাসীদের নিকট হইতে স্থায়ী-অধিবাসিত্বের সার্টিফিকেট চাওয়া হয় কি?

বিহারের লাটসাহেব বিহারের অধিবাসী বাঙালীদিগকে বলিয়াছেন:—

"I am inclined to think that the less you insist upon the distinctness of your community and the more closely you identify yourselves with the native born Bihari, the better it will be in the long run."

তাৎপর্য্য: "আমার বোধ হয় আপনারা আপনাদের সমাজ বা সম্প্রদায়কে স্বতন্ত্র বিবেচনা করাইবার জেদ যত কম করিবেন এবং 'নেটিভ' বিহারীদের সঙ্গে যত ঘনিষ্ঠভাবে এক হইতে চাহিবেন, চরমে ততই ভাল হইবে।"

লাটসাহেবের, অন্য রাজপুরুষদের এবং বিহারীদের কয়েকটি কথা মনে রাখা দরকার। বিহারবাসী বাঙালীদের একটি আলাদা মাতৃভাষা আছে ও তাহার সাহিত্য আছে, এবং তাহাদের বৈবাহিক আদান-প্রদান বঙ্গনিবাসী ও বঙ্গের বাহিরের বাঙালীদের সঙ্গেই হয়। সুতরাং তাহারা তাহাদের মাতৃভাষা ও তাহার সাহিত্য, পরিচ্ছদ, খাদ্য, আচার-ব্যবহার প্রভৃতি ছাড়িতে পারিবে না। আর সব বিষয়ে তাহারা যে-যে প্রদেশে থাকে, তথাকার লোকদের সঙ্গে এক। সেই সব প্রদেশের মঙ্গলামঙ্গলের ও স্বার্থের দিকে তাহারা লক্ষ্য রাখে। বিহারের কথাই ধরুন। বিহারের অধিবাসী বাঙালীরা বিহারের কোন সেবা কি করে নাই? নিশ্চয়ই করিয়াছে। সুতরাং ভাষা প্রভৃতিতে আলাদা হইলেও তাহারা রাষ্ট্রীয় ও নাগরিক সব ব্যাপারে এক। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে তামিল তেলুগু কন্নাড মালয়ালম প্রভৃতি ভাষা, এবং বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে মরাঠী গুজরাটী কন্নাড সিন্ধী প্রভৃতি ভাষা

প্রচলিত। কিন্তু ঐ দুই প্রদেশে তথাকার প্রচলিত কোন ভাষাভাষীকে ডোমিসাইলের অর্থাৎ স্থায়ী-অধিবাসিত্বের সার্টিফিকেট লইতে বলা হয় না। সরকারী বিহারী-উড়িষ্যা-প্রদেশে, আদিম মুণ্ডা প্রভৃতিদের ভাষা বাদে, হিন্দী, ওড়িয়া ও বাংলা প্রচলিত; অর্থাৎ তথাকার হিন্দীভাষীরা ও ওড়িয়াভাষীরা যেমন ঐ প্রদেশের কোন-না-কোন অঞ্চলে আবহমান কাল বাস করিয়া আসিতেছে, বাঙালীরাও সেইরূপ তথাকার কোন কোন অঞ্চলে আবহমান কাল বাস করিয়া আসিতেছে। তাহারাও এই অর্থে 'নেটিভ' বিহারী। সুতরাং তাহাদিগকে ডোমিসাইলের সার্টিফিকেট লইতে বলা অযৌক্তিক।

লাটসাহেব তাহাদিগকে হিন্দীভাষী বিহারীদের সহিত এক হইতে বলিতেছেন, কিন্তু সরকারী ব্যবস্থা তাহাদিগকে পৃথক্‌ করিয়া রাখিয়াছে। পাটনার মেডিক্যাল কলেজে বৎসরে আটটির বেশী বাঙালী লইবার নিয়ম নাই কেন? এঞ্জিনীয়ারিং কলেজেও ঐ প্রকারের নিয়ম আছে কেন? যত জন শিক্ষার্থী হয়, সকলকে লইবার যদি স্থান না থাকে, তাহা হইলে যোগ্যতা অনুসারে যোগ্যতম নির্দ্দিষ্টসংখ্যক ছাত্রকে লওয়াই ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গত। তাহা না করিয়া কেবল কয়েক জন বাঙালী ছাত্র লওয়া হয়, এবং তাহার পর যোগ্যতর বাঙালী থাকিতেও অযোগ্যতর অবাঙালী এবং পাটনা ভিন্ন অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রও লওয়া হয়। যদি সরকারী নজরে বিহারী ও বাঙালী এক, তাহা হইলে বিহারী ও বাঙালী শিক্ষার্থীদের মোট তালিকা হইতে যোগ্যতমদিগকেই ভর্ত্তি করা উচিত।

বিহারী সংবাদপত্র "সার্চলাইট" বলিতেছেন, মেডিক্যাল কলেজে চল্লিশের মধ্যে সাত জন অর্থাৎ শতকরা সতের জনের উপর বাঙালী লওয়া হইয়াছে, যদিও বাঙালীরা প্রদেশের অধিবাসী-সমষ্টির শতকরা তের জন। কিন্তু, আমরা বলি, "শতকরা'র" কথা উঠে কেন? বিহারী ও বাঙালী যদি এক, তাহা হইলে যোগ্যতম চল্লিশ জন গ্রহণ কর, তাহারা সবাই বিহারী হইলেও কেহ আপত্তি করিবে না। আর যদি শতকরার কথা তুলিতেই হয়, তাহা হইলে যাহারা পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় তাহাদের, এবং যাহারা মেডিক্যাল ও এঞ্জিনীয়ারিং কলেজে শিক্ষার্থী হয় তাহাদের শতকরা কত জন বাঙালী তাহাই বিবেচনা করা উচিত।

"বেহার হেরাল্ড" দেখাইয়াছেন, শাসন, বিচার, পুলিস ও চিকিৎসা বিভাগের প্রাদেশিক শ্রেণীর চাকরিগুলিতে (Provincial Services-এ) কয়েক বৎসর আগে পর্য্যন্ত শতকরা ২০ জন বাঙালী নিযুক্ত করিবার দস্তর ছিল। আজ-কাল কিন্তু কচিৎ এক আধ জন বাঙালী লওয়া হয়। হাইকোর্টের জজিয়তীতে ১৯২৯ সাল হইতে একজন বাঙালীও নিযুক্ত হয় নাই।

বিহারের বাঙালীরা কৌন্সিলে কয়েকটি স্বতন্ত্র আসন চাহিয়াছিলেন। লাটসাহেব তাহার বিরোধী। আমরাও তাহার সমর্থন করি না। কিন্তু ব্রিটিশ গবন্মেণ্ট সকল অধিবাসীকে সমনাগরিক বলিয়া কার্য্যতঃ স্বীকার করেন না। নানা শ্রেণী, ধর্ম্মসম্প্রদায় ও বৃত্তিভেদে আলাদা আলাদা আসনের ব্যবস্থা হইয়াছে। ১৯১৯ সালে বিহারের বাঙালীদিগকে আলাদা প্রতিনিধি দিবার নীতি সরকার মঞ্জুর করিয়াছিলেন, প্রাদেশিক ফ্র্যাঞ্চিস্‌ কমিটিও তাহাতে রাজী ছিলেন, কিন্তু হোয়াইট পেপারে আরও কত ভাগাভাগি রক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও বাঙালীদিগকে বিহারে আলাদা আসন দেওয়া হয় নাই। সংখ্যালঘিষ্ঠদের স্বার্থরক্ষার জন্য অভিপ্রেত লীগ অব্‌ নেশ্যন্সের সন্ধিগুলিতে সংখ্যালঘিষ্ঠ ভিন্নভাষাভাষীদের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করা হইয়াছে। সুতরাং বিহারের বাঙালীদের বেলাতেই গবন্মেণ্ট গণতান্ত্রিকতার ও স্বাজাতিকতার পাণ্ডা সাজিলে তাহা সুশোভন হয় না। যাহা হউক, বিহারীভ্রাতারা যদি সত্য সত্যই বাঙালীদিগকে সম-ভারতীয়, সম-প্রাদেশিক ও সম-নাগরিকের অধিকার ও ব্যবহার কার্য্যতঃ দিতে রাজী থাকেন, তাহা হইলে কৌন্সিলে আলাদা আসন নাই বা রহিল?

আগা খান্‌ ও তেজ বাহাদুর সাপ্রুর উপাধি

নববর্ষের উপাধি বর্ষণের দুটি সমান বড় ফোঁটা আগা খান্‌ ও স্যর তেজ বাহাদুর সাপ্রুর শিরে পড়িয়াছে। তাঁহারা উভয়েই ইংলণ্ডেশ্বরের প্রিভি কৌন্সিলর হইয়াছেন এবং এখন হইতে তাঁহাদের নামের আগে রাইট অনারেবল্‌ অর্থাৎ ঠিক্‌-মাননীয় লিখিতে হইবে। প্রিভি কৌন্সিলর পদবীট

দুটি শব্দ লইয়া গঠিত, অর্থ অভিধানে দ্রষ্টব্য; শব্দ দুটির আলাদা আলাদা অর্থ ধরিলে বিষম ভ্রম হইবে।

ব্রিটিশ গবন্মেণ্ট যাঁহাদিগকে উপাধি বখ্‌শিশ দেন, তাঁহারা গবন্মেণ্টের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়াছেন বলিয়াই পুরস্কৃত হন। রাইট অনারেব্‌ল্‌ অর্থাৎ ঠিক্‌-মাননীয় আগা খান্‌ মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থ ও প্রাধান্য পুরাপুরি রক্ষা করিবার জন্য তথাকথিত গোলটেবিল বৈঠকে ও জয়েণ্ট পার্লেমেণ্টারী কমিটির সমক্ষে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি পুরস্কৃত হওয়ায় অনুমান হয়, গবন্মেণ্ট এরূপ চেষ্টার অনুমোদন করেন। রাইট অনারেব্‌ল্‌ অর্থাৎ ঠিক্‌-মাননীয় স্যর তেজ বাহাদুর সাপ্রু উল্লিখিত উভয়ত্র মুসলমান প্রতিনিধিদের অভিযান হইতে হিন্দুদের ন্যায্য অধিকার, প্রভাব ও স্বার্থ রক্ষার জন্য কোন চেষ্টা করেন নাই, বরং মুখে না বলিলেও, কার্য্যতঃ কতকটা মহাত্মা গান্ধীর মুসলমানদিগের দাবিতে আত্মসমর্পণ নীতির অনুসরণ করিয়াছিলেন। তিনিও ঠিক্‌-মাননীয় আগা খানের সমান সম্মান পাওয়ায় মনে হইতেছে, তাঁহার কর্ম্মনীতিও গবন্মেণ্টের অনুমোদিত।

একখানি কাগজে দেখিলাম, দিল্লীর গুজব এই, যে, উভয় ঠিক্‌-মাননীয় নেতাকে বিলাতী লর্ড বানাইবার কথা কর্তৃপক্ষের কল্পনায় উঠিয়া থাকিলেও, এই কারণে তাঁহারা লর্ড হইতে পারিলেন না, যে, হিন্দু ও মুসলমান আইন অনুসারে একাধিক জীবিত স্ত্রী থাকিতে পারে, অর্থাৎ বহুবিবাহ সিদ্ধ, খ্রীষ্টীয় ব্রিটিশ বিধিতে তাহা সিদ্ধ নহে। লর্ড করা হয় খ্রীষ্টীয় ও ব্রিটিশ রীতি অনুসারে।

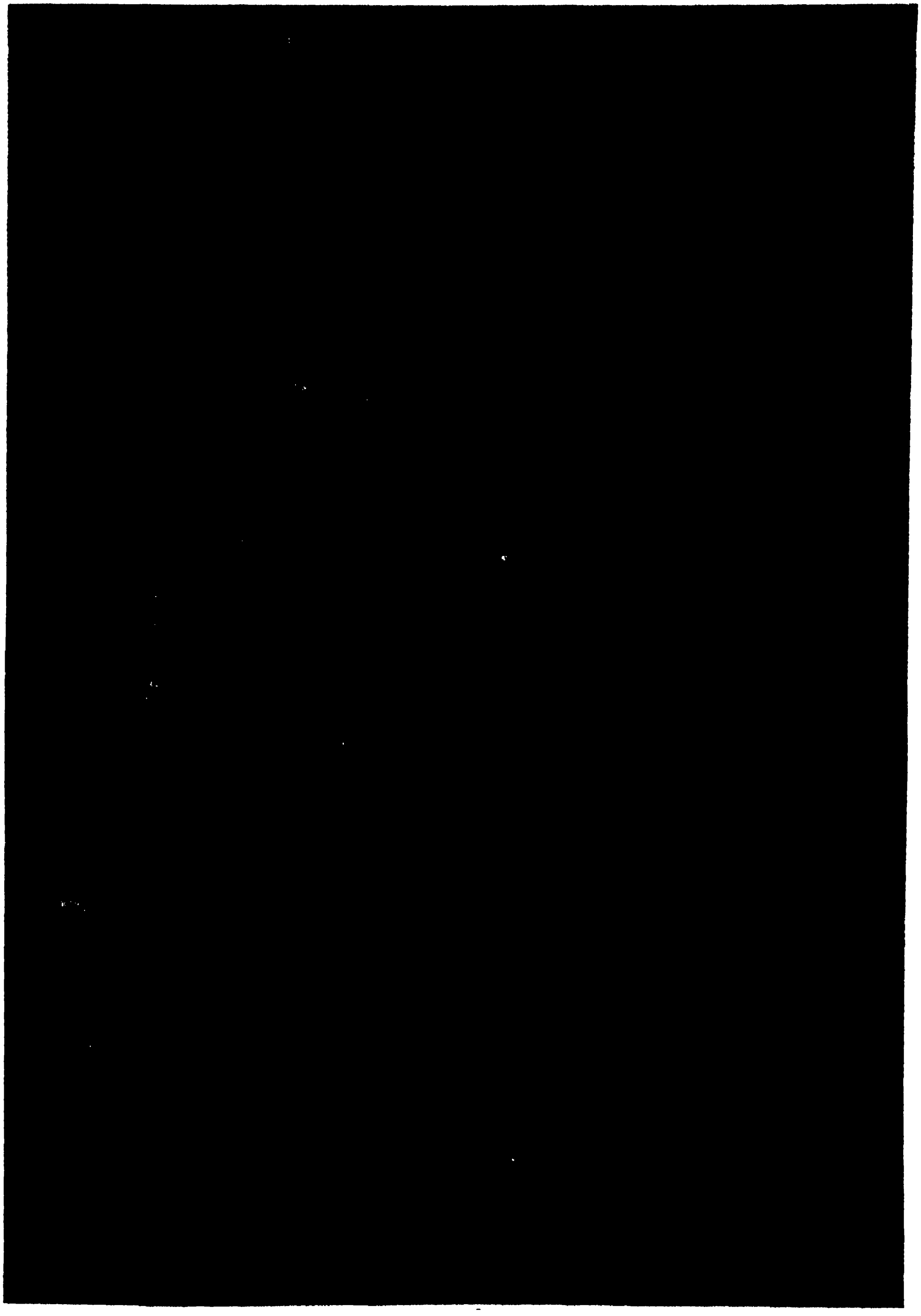
স্যর তেজ বাহাদুর সাপ্রুর সাধারণ আইনের জ্ঞান যেরূপ বিস্তৃত ও গভীর, নানা দেশের কন্‌‌‌‌‌স্টিটিউশ্যনের (অর্থাৎ মূল রাষ্ট্রীয় বিধির) এবং কন্‌‌‌‌স্টিটিউশ্যন্যাল আইনের জ্ঞানও তেমনি বিস্তৃত ও গভীর। তিনি তথাকথিত গোলটেবিল বৈঠকে অনেক তর্কবিতর্ক করিয়াছিলেন যাহার উত্তর দিবার ক্ষমতা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের ছিল না। হোয়াইট পেপারের সমালোচনাও তিনি এরূপ করিয়াছেন, যে, তাহার জবাব নাই। ব্রিটিশ গবন্মেণ্ট অবশ্য তাঁহার তর্কযুক্তি মানিবেন না। তথাপি, যেহেতু তিনি সহযোগী, অসহযোগী নহেন, এইজন্য গবন্মেণ্ট তাঁহাকে ঠিক্‌-মাননীয় করিয়া হাতে রাখিলেন।

বেঠিক্‌-মাননীয়েরা দারুণ শীতে, আশা করি, গাত্রদাহ অনুভব করিবেন না।

—

জাপান-ভারতীয় বস্ত্র-কার্পাস চুক্তি

ভারতবর্ষের গরিব লোকেরা পয়সার অভাবে যথেষ্ট কাপড় ব্যবহার করিতে পারে না। কিন্তু বর্ত্তমানে ধনীদরিদ্র যত কাপড় ব্যবহার করে, তাহার কতক দেশে প্রস্তুত হয়, কতক বাহির হইতে, প্রধানতঃ জাপান ও বিলাত হইতে, আসে; ভারতবর্ষের চরকা, হাতের তাঁত, এবং সূতা ও কাপড়ের মিলে ভারতীয়দের আবশ্যক অনুযায়ী সমুদয় কাপড় তৈরি হয় না। অথচ কাপাস এদেশে যত জন্মে ও জন্মিতে পারে, তাহা হইতে এদেশেই সূতা ও কাপড় তৈরি হইলে দেশের বস্ত্রের চাহিদা মিটাইতে পারা যায়। সুতরাং চরকা, হাতের তাঁত ও মিল যথেষ্ট বৃদ্ধি এবং তদ্দ্বারা ভারতীয় কার্পাস পূরামাত্রায় ব্যবহার করিয়া ভারতের আবশ্যক সব বস্ত্র যোগান ভারতের একমাত্র আত্মসম্মানসূচক ও স্বাবলম্বন-ব্যঞ্জক বস্ত্রসমস্যার সমাধান। কিন্তু আমরা এখন আমাদের সব কাপাস ব্যবহার করিতে পারি না, সব কাপড়ও যোগাইতে পারি না। আবার জাপানী কাপড়ের ভারতে আমদানী বন্ধ করিলে তাহারা আমাদের তুলা কিনিবে না, যা এখন কেনে। এ অবস্থায় জাপান ভারতের কত তুলা কিনিবে ও কত কাপড় ভারতে পাঠাইতে পারিবে সে-বিষয়ে চুক্তি হওয়া ভালই হইয়াছে। বিলাতী বস্ত্রনির্ম্মাতারা কেবল স্তোকবাক্য বা গায়ের জোরে কাজ সারিতে চায়। তাহারা যদি ভারতে কাপড় বেচিতে চায়, তাহা হইলে তাহাদিগকেও ভারতীয় তুলা কিনিতে বাধ্য করা উচিত।



বিরহিণী যক্ষপ্রিয়া

শ্রীরামগোপাল বিজয়বর্গীয়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড | ফাল্গুন, ১৩৪০ | ৫ম সংখ্যা

আমি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই যে সবার সামান্য পথ, পায়ে হাঁটার গলি
সে পথ দিয়ে আমি চলি
সুখে দুঃখে লাভে ক্ষতিতে,
রাতের আঁধার দিনের জ্যোতিতে।
প্রতি তুচ্ছ মুহূর্ত্তেরই আবর্জ্জনা করি আমি জড়ো,
কারো চেয়ে নইকো আমি বড়ো।
চলতে পথে কখনো বা বিঁধছে কাঁটা পায়ে,
লাগছে ধুলো গায়ে ;
দুর্ব্বাসনার এলোমেলো হাওয়া,
তারি মধ্যে কতই চাওয়া পাওয়া,
কতই বা হারানো,
খেয়া ধরে ঘাটে আঘাটায়
নদী পারানো।

এমনি ক'রে দিন কেটেছে, হবে সে দিন সারা
বেয়ে সর্ব্বসাধারণের ধারা।
শুধাও যদি সব শেষে তার রইল কী ধন বাকি,
স্পষ্ট ভাষায় বলতে পারি তা কি ?
জানি এমন নাই কিছু যা পড়বে কারো চোখে,
স্মরণ বিস্মরণের দোলায় দুলবে বিশ্বলোকে।

নয় সে মাণিক নয় সে সোনা,
যায় না তারে যাচাই করা, যায় না তারে গোণা।

এই দেখো না শীতের রোদে দিনের স্বপ্নে বোনা
সেগুন বনে সবুজ-মেশা সোনা ;
সজ্‌নে গাছে লাগল ফুলের রেশ
হিমঝুরির হৈমন্তী পালা হয়েছে নিঃশেষ।
বেগ্‌নী ছায়ার ছোঁওয়া-লাগা স্তব্ধ বটের শাখা
ঘোর রহস্যে ঢাকা।
ফল্‌সা গাছের ঝরা-পাতা গাছের তলা জুড়ে
হঠাৎ হাওয়ায় চমকে বেড়ায় উড়ে।
গোরুর গাড়ি মেঠো পথের তলে
উড়্‌তি ধুলোয় দিকের আঁচল ধূসর ক'রে চলে।
নীরবতার বুকের মধ্যখানে
দূর অজানার বিধুর বাঁশি ভৈরবী সুর আনে।
কাজ-ভোলা এই দিন
নীল আকাশে পাখীর মতো নিঃসীমে হয় লীন।
এরি মধ্যে আছি আমি,
সব হ'তে এই দামী।
কেন-না আজ বুকের কাছে যায় যে জানা
আরেকটি সেই দোসর আমি উড়িয়ে চলে বিরাট তাহার ডানা
জগতে জগতে
অন্তবিহীন ইতিহাসের পথে॥

ঐ যে আমার কুয়োতলার কাছে
সামান্য ঐ আমের গাছে
কখনো বা রৌদ্র খেলায়, কভু শ্রাবণ-ধারা,
সারা বরষ থাকে আপন-হারা
সাধারণ এই অরণ্যানীর সবুজ আবরণে ;
মাঘের শেষে যেন অকারণে

ক্ষণকালের গোপন মন্ত্রবলে
গভীর মাটির তলে
শিকড়ে তার শিহর লাগে,—
শাখায় শাখায় হঠাৎ বাণী জাগে
"আছি, আছি, এই যে আমি আছি।"
পুষ্পোচ্ছ্বাসে ধায় সে বাণী স্বর্গলোকের কাছাকাছি
দিকে দিগন্তরে।
চন্দ্র সূর্য্য তারার আলো তারে বরণ করে।

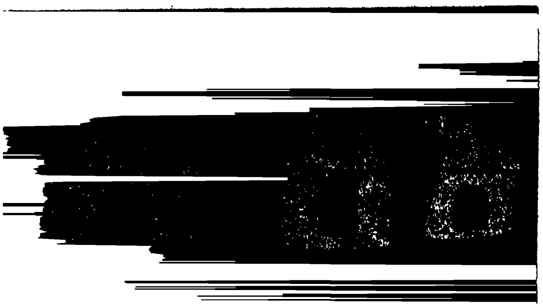
এমনি ক'রেই মাঝে মাঝে সোনার কাঠি আনে
—কভু প্রিয়ার মুগ্ধ চোখে, কভু কবির গানে—
অলস মনের শিয়রেতে কে সে অন্তর্যামী,
নিবিড় সত্যে জেগে ওঠে সামান্য এই আমি।

যে আমিরে ধূসর ছায়ায় প্রতিদিনের ভিড়ের মধ্যে দেখা,
সেই আমিরে এক নিমেষের আলোয় দেখি একের মধ্যে একা।
সে সব নিমেষ রয় কি না রয় কোনোখানে,
কেউ তাহাদের জানে বা না-ই জানে,
তবু তারা জীবনে মোর দেয় তো আনি'
ক্ষণে ক্ষণে পরম বাণী
অনন্তকাল যাহা বাজে
বিশ্বচরাচরের মর্ম্মমাঝে—
"আছি আমি আছি;"
যে বাণীতে উঠে নাচি'
মহাগগন সভাঙ্গনে আলোক অপ্সরী
তারার মাল্য পরি'।

নুলিয়া জাতি

শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু

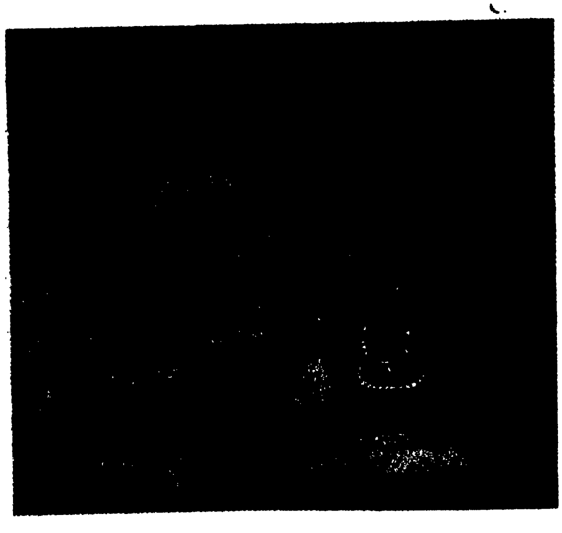
রীতে সমুদ্রের ধারে মাছ ধরিতে অথবা যাত্রীদের স্নান রাইতে যাহাদের আমরা দেখি তাহাদের যথার্থ নাম নুলিয়া হ।* তাহাদের মধ্যে দুইটি জাতি আছে। একটির নাম য়াডা-বালিজি, অপরের নাম জালারি। জালারিগণই যথার্থ লিয়া। ওয়াডা-বালিজিদের পূর্ব্বপুরুষগণ জাহাজে খালাসীর াজ করিত, কিন্তু স্বাধীন হিন্দুরাজ্য বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে



জলাদের গ্রামপ্রান্তে মন্দির

াহাদের কাজ যায়। তখন হইতে তাহারা মাছের ব্যবসায় ু করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে প্রবাদ আছে যে জালারিগণ থমে তাহাদিগকে জাল তৈয়ারী করা কিছুতেই শিখাইতে াজি হইল না। এমন কি, রাত্রে জাল পাছে চুরি করিয়া াইয়া যায় বলিয়া তাহারা প্রত্যহ কাজের শেষে জাল ড়াইয়া ফেলিত, আবার ভোরের আগেই জাল তৈয়ারী রিয়া লইত। অবশেষে সমুদ্রের কূলে পোড়া জালের াই পরীক্ষা করিয়া ওয়াডা-বালিজিগণ জালের বিদ্যা শিখিয়া ইল এবং তাহার পর হইতে মাছের ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া দিল। সত্য হউক মিথ্যা হউক, গল্পটির মধ্যে জালারি ও ওয়াডা-বালিজিগণের পারস্পরিক বিরোধের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

ইহাদের উভয় জাতির মধ্যে বিবাহ-সম্পর্ক নাই। জালারিগণ বলিয়া থাকে যে মর্য্যাদায় তাহারাই বড়। ওয়াডা-বালিজিগণকে জিজ্ঞাসা করিলে আবার তাহারাও তাহাই বলে। উভয়ের মধ্যে সামাজিক ব্যাপারে একত্র খাওয়া পর্য্যন্ত চলে না। শুধু তাহাই নহে, ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলে উভয়ের আর্থিক অবস্থা, আচার-ব্যবহার এবং পূজা-পার্ব্বণের মধ্যেও সামান্য সামান্য ইতর-বিশেষ দেখা যায়। তবে এই সকল পার্থক্য সত্ত্বেও উভয় জাতিই তেলুগু ভাষায় কথা বলে এবং মোটের উপর একই রকমের সংস্কৃতি পালন করে। সেই সংস্কৃতির সাধারণ পরিচয় দান করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।



মন্দিরের অভ্যন্তরে দেবী এবং হাতী ও ঘোড়ার মূর্ত্তি

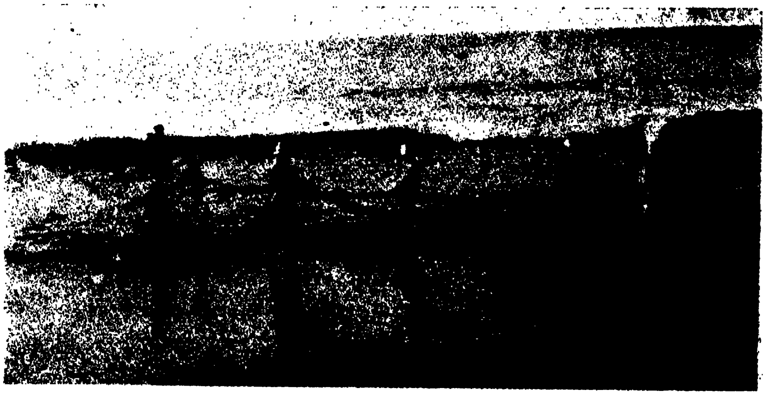
নুলিয়ারা যদিও সমুদ্রের ধারে থাকে, সমুদ্রেই নিজেদের জীবিকা অর্জ্জন করে, তথাপি তাহাদের পূজাপার্ব্বণ পরীক্ষা করিলে উড়িষ্যা বা মাদ্রাজের অরণ্যবাসী জাতিগণের সঙ্গে তাহাদের কোনও সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে হয়।

---

* গত বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অধ্যাপক হারাণচন্দ্র কলাদার মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে নুলিয়াদের মধ্যে নৃতত্ত্বের গবেষণা হয়। ই সময় উহাদের সম্বন্ধে যে-সকল তথ্য আবিষ্কৃত হয়, তাহারই উপর ত্তি করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধটি লিখিত। প্রবন্ধটি লেখা ও ফটোগ্রাফ- লি ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়ার জন্য আমি নৃতত্ত্ব-বিভাগের অধ্যাপক ঃ পঞ্চানন মিত্র ও শ্রীহারাণচন্দ্র চাকলাদার মহাশয়ের নিকট ঋণী।

আকারে তাহারা মান্দ্রাজের সাধারণ তেলুগু দেশবাসীরই অনুরূপ। ঝুলিয়ারা হিন্দু, কারণ তাহারা হিন্দু দেবদেবীর পূজা করে, এবং তাহাদের সামাজিক সংস্কারে ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবেরও স্থান আছে। ব্রাহ্মণ পুরোহিত শুধু বিবাহের সময়ে আসেন। দেবদেবীর পূজা ঝুলিয়ারা নিজেরাই করে, দেবপূজার জন্য কাহারও বংশগত অধিকার নাই, সে অধিকার গুরুশিষ্যপরম্পরায় চলিতে থাকে। কেবল গ্রামদেবীর পূজার জন্য একটি বংশ স্থির করা আছে; দেবী নাকি তাহাদেরই বংশে প্রথম আবির্ভূতা হন. সেই জন্যই তাহাদের এই অধিকার।

দেবগণের মধ্যে নৃসিংহ ও মহাদেব প্রধান। ইঁহাদের বিশেষ কোনও অত্যাচার উৎপীড়ন নাই, কিন্তু তাঁহাদের অনুচরবর্গকে সন্তুষ্ট করিতেই ঝুলিয়ারা প্রাণান্ত হইয়া থাকে। অনুচরগণের নামও সংস্কৃতে নহে, তেলুগু ভাষায়, যথা অঙ্কপলাম্মা, এনাগী-শক্তি, দাইবুম্ সম্বারম্ ইত্যাদি। ইঁহাদের খাঁই বড় বেশী। গ্রামে রোগ হইলে বুঝিতে হইবে পূজা দেওয়া দরকার, বাড়িতে উৎপাত হইলেও তাই। তাঁহাদের পূজার জন্য মুরগী, শূয়ার প্রভৃতি ঘটা করিয়া বলি দিতে হয়।



শীতকালে বড় টানা-জালে মাছ ধরা



জাল উঠান

একদিন এইরূপ একটি পূজা দেখিতে গিয়াছিলাম। শুনিলাম, একজন গৃহস্থের বাড়িতে পূজা। তাহার বাড়িতে নাকি দু-একটি দুর্ঘটনার পর বুঝিতে পারা গেল, গৃহস্থের পিতার আত্মা শান্ত হন নাই, তাহার জন্য পূজা দেওয়া দরকার। গুণী লক্ষণ দেখিয়া বলিয়াছে যে, সেই আত্মা নরসিংহ প্রভৃতি দেবতার মধ্যে লীন না হইয়া এনেগী-শক্তির সহিত রহিয়াছেন। সেইজন্য এনেগী-শক্তির নিকট একটি মুরগী বলি দিতে হইবে এবং একটি মাটির বা কাঠের ঘোড়াও দিতে হইবে, যেন পিতার আত্মা তাহাতে আরোহণ করিতে পারেন। ঝুলিয়াটির বাড়িতে গিয়া দেখিলাম যে গুণী শাড়ী পরিয়া ও বিনুনী বাঁধিয়া দেবীর রূপ ধারণ করিয়াছে এবং মুরগী, নৈবেদ্য, ঘোড়া প্রভৃতি লইয়া আরও জন-দশেক ঝুলিয়া তাহাকে ঘিরিয়া আছে।

ঘরের মধ্যে কিছুক্ষণ নাচিবার পর গুণী বাহিরে আসিয়া পথের উপর কাঠের তরোয়াল লইয়া নাচিতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিলাম যে, যতক্ষণ-না গুণী আবিষ্ট হইয়া গ্রামের প্রান্তে এনেগী-শক্তির মন্দিরের দিকে যায় ততক্ষণ নাচ চলিতে থাকিবে। চারিদিকে নাচের তাড়নায় ধূলা উড়িতেছে, তাহার উপর দ্বিপ্রহরের রৌদ্র। ইহার মধ্যে ঢাক, শানাই প্রভৃতির তীব্র আওয়াজ, তাহাতে সাধারণ লোকেরই মাথা ঘুরিয়া যাইবার কথা, গুণী

বা অপরাপর নর্ত্তকদের ত কথাই নাই। কিছুক্ষণ নাচার পর গুণীর বেগ খুব বৃদ্ধি পাইল এবং একজন লোক গান গাহিয়া গাহিয়া তাহার মুখের সম্মুখে একটি মুরগীর ডিম ধরিয়া যেন লোভ দেখাইয়া টানিয়া চলিল। গুণী একবার



শীতকালে ব্যবহৃত বড় নৌকা

আগাইয়া একবার পিছাইয়া যায়। এমনি করিতে করিতে হঠাৎ ডিমটিতে সে এক কামড় দিল। তখন নাকি বুঝা গেল যে দেবী ভর করিয়াছেন। বাজনা-বাদ্যও এক রকম থামাইয়া সকলে তাড়াতাড়ি এনেগী-শক্তির মন্দির পর্য্যন্ত ছুটিয়া গেল।

মুলিয়াদের গায়ে শক্তি বেশ, দেহের গঠনও ভাল। এরূপ অবস্থায় গুণীর নাচ মন্দ লাগিতেছিল না। কিন্তু একজন জোয়ান মানুষকে দেবীর সাজে দেখিয়া, তাহার উপর তাহার সুপুষ্ট গোঁফের দিকে নজর করিয়া আমার কেবলই হাসি পাইতেছিল। অথচ মুলিয়ারা সমস্ত ঘটনার মধ্যে হাস্যরসের কিছু ত পায়ই নাই, বরঞ্চ গভীর ভক্তির সহিত দেবী কখন আসেন, তাহাই নিরীক্ষণ করিতেছিল। হয়ত আমরা নিজেদের আচার-অনুষ্ঠানের দ্বারা এমনিভাবে অজ্ঞাতসারে অপরাপর জাতির পক্ষে হাস্যরসের খোরাক জোগাই, নিজের জাতিগত সংস্কারের মধ্যে এমনিভাবে জড়াইয়া আছি যে মুক্তভাবে তাহা মোটেই দেখিতে পাই না।

যাক্ সে কথা। এনেগী-শক্তির মন্দিরে পৌঁছিয়া মুরগীটিকে বলি দেওয়া হইল। দেবীর সম্মুখে মুরগীটিকে দাঁড় করাইয়া গুণী এবং যজমান সকলেই সাধারণ ভাষায় "দেবি, তুমি গ্রহণ কর। কত খরচ করিয়া পূজা দিতেছি, কেন লইতেছ না?"—প্রভৃতি বলিয়া নানাবিধ অনুনয়-বিনয় করিতে লাগিল। গুণী মাঝে মাঝে মুরগীটির গায়ে জল ছিটাইতে লাগিল। তাহাদের বিশ্বাস যে মুরগীটি যতক্ষণ না গা-ঝাড়া দিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত দেবতা বা তাহার পূর্ব্বপুরুষ তাহাকে গ্রহণ করেন নাই—এইরূপ বুঝিতে হইবে। বর্ত্তমান মুরগীটি মাঝে মাঝে শুধু মাথা ও ঘাড়ের পালক নাড়িয়া জল ঝাড়িয়া ফেলিতে লাগিল, কিন্তু তাহাতে হইল না। অবশেষে প্রায় আধঘণ্টা পরে সে একবার গা-ঝাড়া দিল। তখন তাহাকে বলি দেওয়া হইল।

মুলিয়াদের সকল অনুষ্ঠানেই তাই। যতক্ষণ না তাহারা দেবতার আবেশের লক্ষণ দেখে, ততক্ষণ তাহাদের কোন পূজাই সিদ্ধ হয় না। নমোনমঃ করিয়া পূজা সারিতে তাহারা পারে না, দেবতার সহিত সর্ব্বদাই সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ স্থাপনা করে। যাহাই হউক, মুরগীটিকে বলি দেওয়ার রীতিও বিচিত্র। গা-ঝাড়া দেওয়ার পর গুণী মুরগীটিকে তুলিয়া নিজের হাঁটুর



মুলিয়ারা ভেলায় চড়িয়া মাছ ধরিতে যাইতেছে

উপর তাহার পিঠ রাখিয়া দুই হাতে তাহার পা দু-খানি সজোরে টানিতে লাগিল। কিছুক্ষণ টানের পরে পেটের উপরকার চামড়া ফাটিয়া ছিঁড়িয়া গেল। তখন সে আঙুলে করিয়া মুরগীটির নাড়ীভুঁড়ি ও কলিজা বাহির করিয়া মুরগীর গলায় জড়াইয়া, কলিজাটি মুখে যথাসম্ভব গুঁজিয়া দেবীর সম্মুখে নিবেদন করিল।

মুলিয়াদের সকল বলিদানেই এইরূপ নিষ্ঠুর ব্যবস্থা দেখা

যায়। গ্রামদেবী অন্ধ-পলাম্মার পূজাতেও একটি কাঠের গাড়ীতে বাঁশের শূলে দুইটি শূকর-শাবককে জীবন্ত গাঁথিয়া দেওয়া হয়। শূকরগুলি তীব্র আর্তনাদ করিতে থাকে এবং গ্রামসুদ্ধ সকলে মহা কোলাহল করিতে করিতে গাড়ীটি



জনৈক নুলিয়া



নূতন বিদ্যা অভ্যাস

লইয়া গ্রাম প্রদক্ষিণ করিতে থাকে। নুলিয়াদের বলিদানের প্রথা এরূপ নিষ্ঠুর বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে তাহারা স্বভাবতঃ অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির। বস্তুতঃ তাহা ঠিক নহে। নুলিয়ারা অত্যন্ত ভদ্র ও সৎস্বভাবাপন্ন। তবে তাহাদের বিশ্বাস, যে-দেবী স্বয়ং নিষ্ঠুর, তাঁহার চাহিদাও তেমনই নিষ্ঠুর। তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে হইলে তেমনই নিষ্ঠুর কোনও আয়োজন করা দরকার।

বস্তুতঃ নুলিয়ারা যে নিষ্ঠুর আবেষ্টনের মধ্যে থাকে, সেখানে তাহারা যে প্রকৃতির রুদ্রমূর্তিরই পরিচয় পাইবে, তাহাকেই সমগ্র বিশ্বের মধ্যে একমাত্র সত্য রূপ বলিয়া বিবেচনা করিবে, ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছু নাই। সমুদ্রের সহিত তুমুল সংগ্রাম করিয়া ইহাদের অন্নসংস্থান করিতে হয়। পুরীতে শীত ভিন্ন অপর সকল ঋতুতেই সমুদ্রের ঢেউ অত্যন্ত প্রবল বেগে বহে। তাহার ভিতর দিয়া ছোট ছোট ভেলা ভাসাইয়া দিনের পর দিন নুলিয়ারা মাছ ধরিতে যায়। কোন দিন কিছু পায়, কোন দিন পায় না। হয়ত কয়েকদিন লহরীর প্রচণ্ড বেগে ভেলা পারই হইতে পারিল না। আবার হয়ত বা কয়েক দিন ধরিয়া মাছ কিছুই পড়িল না। তাহার উপর সমুদ্রে মাছ ধরিতে গিয়া বড় বড় হাঙ্গর, শঙ্করমাছ প্রভৃতি নানাবিধ জীবের আশঙ্কাও আছে। তাহাদের পাইলে নুলিয়ারা ছাড়ে না। হয়ত একবার বঁড়শিতে বড় শঙ্কর-মাছ গাঁথিয়া গেল। তাহার বিপুল টানে হু হু শব্দে নীল জল ভেদ করিয়া ভেলা ছুটিয়া চলিল। নুলিয়ারাও ছাড়ে না, মাছও ছাড়িবার পাত্র নয়। এমনি ঘণ্টাখানেক যুদ্ধের পর মাছ ডাঙ্গায় তোলা হইল। তখন গ্রামসুদ্ধ স্ত্রীপুরুষ সকলের কি আনন্দ! সবাই ঝুড়ি আনিল, কুড়ুল আনিল এবং পরমানন্দে মাংস ভাগ করিয়া যে যার ঘরে চলিয়া গেল।

বহুদিন সমুদ্রের সহিত কারবার করিয়া নুলিয়ারা এক দিকে যেমন সাহসী হইয়াছে, অপর দিকে সমুদ্রের বিষয়ে তাহারা অনেক জ্ঞানও লাভ করিয়াছে। ঢেউয়ের শব্দ শুনিয়াই তাহারা বলিয়া দিতে পারে, কি ভাবের স্রোত বহিতেছে। পাড়ের সমান্তরাল ভাবে না অন্যদিকে, শুধু উপরের স্তরে না নীচের দিকে, মাছ আসিবে কি না—সকল কথা নুলিয়ারা ঢেউ দেখিয়া এবং তাহার শব্দ শুনিয়া বলিয়া

দিতে পারে। এই জ্ঞানটুকু সম্বল করিয়া, ধৈর্য্য ও সাহসে ভর করিয়া মুলিয়ারা জীবনের যুদ্ধযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে।

কিন্তু ইহাতেও তাহাদের কুলায় না। সকল লক্ষণই হয়ত ভাল, পরিশ্রমও যথেষ্ট করা হইল, তবু জালে যথেষ্ট



জনৈক বলিষ্ঠ মুলিয়া

মাছ পড়িল না। কেননা, দৈব বলিয়াও ত কিছু আছে। তাহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য মুলিয়ারা কত-রকম পূজা-অর্চ্চনার ব্যবস্থা করিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় সমুদ্রকে তাহারা গঙ্গাদেবী নামে পূজা করে। তাহারা যে আগে মাটির সহিত বেশী সম্পর্ক রাখিত—সমুদ্রের সহিত নহে, ইহাতে তাহাই সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে। যাহাই হউক, প্রকৃতি এবং দৈব ভিন্ন মানুষের কাছেও মুলিয়ারা বিশেষ শান্তি পায় না। মহাজনের নৌকা ও জালের ভাড়া দিয়া, তাহার অন্যান্য নানাবিধ খাঁই মিটাইয়া তাহাদের বিশেষ কিছু বাকি থাকে না। তাই শহরের যাত্রীদের স্নান করাইয়া অথবা মেয়েদের মজুরের কাজে পাঠাইয়া তাহারা কোনও রকমে দুঃখে কষ্টে জীবনধারণ করে।

এরূপ অবস্থার মধ্যে পড়িয়া তাহারা যে প্রকৃতির মধ্যে শুধু আঘাতকেই বড় করিয়া দেখিবে, ইহাতে বিচিত্র কি? সেই আঘাতকেই তাহারা দেবতার আসন দান করিয়াছে, এবং নানাবিধ নিষ্ঠুর অনুষ্ঠানের দ্বারা তাহারই পূজার ব্যবস্থা করিয়াছে। মুলিয়ারা অবশ্য নরসিংহ, মহাদেব প্রভৃতি দেবতার শান্তমূর্ত্তি পূজা করে বটে, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ অর্ঘ্যই নীচের স্তরের নিষ্ঠুর দেবদেবীর নিকট নিবেদিত হয়। দারিদ্র্য ও প্রকৃতির অনিশ্চয়তার বেড়াজাল অতিক্রম করিয়া তাহাদের মন মুক্তির আস্বাদ গ্রহণ করিতে



লম্বা করোটিবিশিষ্ট মুলিয়া

পারে না বলিয়া তাহাদের চরিত্রও কোনদিন সহজ বিকাশ লাভ করিতে পারে না। হয়ত মানুষের অত্যাচার দূর হইলে, পরস্পরের মধ্যে সাহচর্য্যের ভাব বৃদ্ধি পাইলে তাহাদের মুক্তির পরিধি আরও একটু বিস্তৃত হইত, প্রকৃতির নিকট গ্রাসাচ্ছাদন আরও উন্নত কৌশলের সহিত আদায় করিতে পারিত, কিন্তু তাহার জন্য অন্যান্য মানুষের নিকট যে প্রেম ও সহানুভূতির প্রয়োজন, তাহা হইতে আজ তাহারা বঞ্চিত রহিয়াছে।

উইলের খেয়াল

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

দেশ থেকে রবিবারে ফিরছিলাম কল্‌কাতায়। সন্ধ্যার আর বেশী দেরি নেই, একটু আগে থেকেই প্ল্যাটফর্ম্মে আলো জ্বেলেচে, শীতও খুব বেশী। এদিকে এমন একটা কাম্‌রায় উঠে বসেচি, যেখানে দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই যার সঙ্গে একটু গল্পগুজব করি। আবার যার-তার সঙ্গে গল্প ক'রেও আনন্দ হয় না। আমার দরের কোনো লোকের সঙ্গে গল্প ক'রে কোনো সুখ পাইনে, কারণ তারা যে কথা বল্‌বে সে আমার জানা। তারা আমারই জগতের লোক, আমার মতই লেখা-পড়া তাদেরও, আমার মতই কেরাণীগিরি কি ইস্কুল মাষ্টারী করে, আমারই মত শনিবারে বাড়ি এসে আবার রবিবারে কল্‌কাতায় ফেরে। তারা নতুন খবর আমায় কিছুই দিতে পারবে না, সেই এক-ঘেয়ে কল্‌কাতার মাছের দর, এম্. সি. সি'র খেলা, ইষ্ট বেঙ্গল সোসাইটির দোকানে শীতবস্ত্রের দাম, চণ্ডীদাস কি সাবিত্রী ফিল্মের সমালোচনা—এসব শুন্‌লে গা বমি-বমি করে। বরং বেগুনের ব্যাপারী, কি কন্যাদায়গ্রস্ত বৃদ্ধ পাড়াগেঁয়ে ভদ্রলোক, কি দোকানদার—এদের ঠিকমত বেছে নিতে পারলে, কথা ব'লে আনন্দ পাওয়া যায়। কিন্তু বেছে নেওয়া বড় কঠিন—কন্যাদায়গ্রস্ত ভদ্রলোক ভেবে যাঁর কাছে গিয়েছি, অনেক সময় দেখেছি তিনি ইন্‌সিওরেন্সের দালাল।

একা বসে বিড়ি খেতে খেতে প্ল্যাটফর্ম্মের দিকে চেয়ে আছি, এমন সময় দেখি, আমার বাল্যবন্ধু শান্তিরাম হাতে একটা ভারী বোঁচকা ঝুলিয়ে কোন্ গাড়ীতে উঠবে ব্যস্তভাবে খুঁজে বেড়াচ্চে। আমি ডাকতেই 'এই যে!' ব'লে একগাল হেসে আমার কামরার সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়ে বল্‌লে—বোঁচকাটা একটুখানি ধর না ভাই কাইণ্ড্‌লি—

আমি তার বোঁচকাটা হাত বাড়িয়ে গাড়ীতে তুলে নিলাম—পেছনে পেছনে শান্তিরামও হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে আমার সাম্‌নের বেঞ্চিতে মুখোমুখি হয়ে বস্‌লো। খানিকটা ঠাণ্ডা হয়ে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে বল্‌লে—বিড়ি আছে? কিন্‌তে ভুলে গেলাম তাড়াতাড়িতে। আর ক'মিনিট আছে? পৌনে ছ'টা না রেলওয়ে? আমি ছুটেচি সেই বাজার থেকে—আর ঐ ভারী বোঁচকা! প্রাণ একেবারে বেরিয়ে গিয়েচে। কল্‌কাতায় বাসা করা গিয়েচে ভাই, শনিবারে শনিবারে বাড়ি আসি; বাগানের কলাটা, মুলোটা যা পাই নিয়ে যাই এসে—সেখানে তো সবই—হুঁ হুঁ—বুঝলে না? দাঁতন-কাঠিটা এস্তেক তাও নগদ পয়সা। প্রায় তিন-চার দিনের বাজার খরচ বেঁচে যায়। এই দ্যাখো ওল, পুঁই শাক, কাঁচা লঙ্কা, পাটালি—দেখি দেশলাইটা—

শান্তিরামকে পেয়ে খুশী হ'লাম। শান্তিরামের স্বভাবই হচ্চে একটু বেশী বকা। কিন্তু তার বকুনি আমার শুনতে ভাল লাগে। সে বকুনির ফাঁকে ফাঁকে এমন সব পাড়াগাঁয়ের ঘটনার টুক্‌রো ঢুকিয়ে দেয়, যা গল্প লেখায় চমৎকার—অতি চমৎকার উপাদান। ওর কাছে শোনা ঘটনা নিয়ে দু-একটা গল্প লিখেচিও এর আগে। মনে ভাবলাম, শান্তিরাম এসেচে, ভালই হয়েচে, একা চার ঘণ্টার রাস্তা যাব, তাতে এই শীত। তা ছাড়া এই শীতে ওর মুখের গল্প জম্‌বেও ভাল।

হঠাৎ শান্তিরাম প্ল্যাটফর্ম্মের দিকে মুখ বাড়িয়ে ডাকতে লাগল—অবনী ও অবনী, এই যে, এই গাড়ীতে এস—কোথায় যাবে?

গুটি তিন-চার ছেলে মেয়ে এবং পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের স্বাস্থ্যবতী ও সুশ্রী একটি পাড়াগাঁয়ের বৌ আগে আগে, পিছনে একটি ফর্সা একহারা চেহারার লোক, সবার পিছনে বাক্স-পেটরা মাথায় জন-দুই কুলী। লোকটি আমাদের কামরার কাছে এসে দাঁড়িয়ে হেসে বল্‌লে—এই যে দাদা, কলকাতা ফিরচেন আজই। আমি? আমি একবার এদের নিয়ে যাচ্চি পাঁচঘরার ঠাকুরের থানে। মসলন্দপুর ষ্টেশনে নেমে যেতে হবে; বাস্ পাওয়া যায়।

দলটি আমাদের গাড়ীর পাশ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে খালি একখানা ইণ্টার ক্লাস কামরায় উঠ্‌ল।

শান্তিরাম চেয়ে চেয়ে দেখে বল্‌লে—তাই অবনী এখানে এল না। ইণ্টার ক্লাসের টিকিট কি না? আঙুল ফুলে কলাগাছ একেই বলে! ওই অবনীদের খাওয়া জুটত না, আজ দল বেঁধে ইণ্টার ক্লাসে চেপে বেড়াতে যাচ্ছে—ভগবান যখন যাকে দ্যান্—আমাদের বোঁচকা বওয়াই সার।

গাড়ী ছাড়লো। সন্ধ্যার পাতলা অন্ধকারে পাম্পিং এঞ্জিনের শেড, কেবীন ঘর, ধূমাকীর্ণ কুলীলাইন, সট সট ক'রে দু-পাশ কেটে বেরিয়ে চলেচে, সামনে সিগন্যালের সবুজ বাতি, তারপর দু-পাশে আখের ক্ষেত, মাঠ, বাব্‌লা বন। শান্তিরামের গলায় সুর শুনে বুঝলাম সে গল্প বলার মেজাজে আছে, ভাল ক'রে আলোয়ান গায়ে দিয়ে বসলাম, উৎসুক মুখে ওর দিকে চেয়ে রইলাম।

শান্তিরাম বল্‌লে—অবনীকে এর আগে কখনো দেখ নি? নিশ্চয়ই দেখেছ ছেলেবেলায়, ও আমাদের নীচের ক্লাসে পড়তো আর বেশ ভাল ফুটবল খেলতো মনে নেই? ওর বাবা কোর্টে নকলনবিশী করতেন, সংসারের অভাব-অনটন টানাটানি বেড়েই চলেছিল। সেই অবস্থায় অবনীর বিয়ে দিয়ে বৌ ঘরে আনলেন। বল্‌লেন—কবে মরে যাব, ছেলের বৌয়ের মুখ দেখে যাই। বাঁচলেনও না বেশীদিন, এক পাল পুষ্যি আর একরাশ দেনা ছেলের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে সংসার থেকে বিদায় নিলেন।

তারপর কি কষ্টটাই গিয়েছে ওদের। অবনী পাস করতে পারলে না, চাকরিও কিছু জুটলো না, হরিণখালির বিলের এক অংশ ওদের ছিল অনেক কাল আগে থেকে—শোলা হ'ত সেখানে, সেই বিলের শোলা ইজারা দিয়ে যে-কটা টাকা পেত, তাই ছিল ভরসা।

ওদের গাঁয়ে চৌধুরী-পাড়ায় নিধিরাম চৌধুরী ব'লে একজন লোক ছিল। গাঁয়ে তাকে সবাই ডাকতো নিধু চৌধুরী। নিধু চৌধুরীর কোন কুলে কেউ ছিল না, বিয়ে করেছিল দু-দু'বার, ছেলেপুলেও হয়েছিল কিন্তু টেকেনি। ওর বাবা নেপালে নিমকির দারোগা ছিল, বেশ দু-পয়সা কামিয়ে বিষয়-সম্পত্তি ক'রে গিয়েছিল। তা শালিয়ানা প্রায় হাজার বারো-শ টাকা আয়ের জমা, আম-কাঁটালের বাগান, বাড়িতে তিনটে গোলা, এক একটা গোলায় দেড় পাট দু-পাট ক'রে ধান ধরে, জুটো পুকুর, তেজারতি কারবার। নিধু চৌধুরী ইদানীং তেজারতি কারবার গুটিয়ে ফেলে জেলার [illegible] আপিসে নগদ টাকাটা রেখে দিত। সেই নিধু চৌধুরীর বয়েস হ'ল, ক্রমে শরীর অপটু হয়ে পড়তে লাগল, সংসারে মুখে জলটি দেবার একজন লোক নেই। আবার পাড়াগাঁয়ের ব্যাপার জান তো? পয়সা নিয়ে বাড়িতে কাউকে খেতে দেওয়া—এ রেওয়াজ নেই। তাতে সমাজে নিন্দে হয়, সে কেউ করবে না। নিধু চৌধুরী তখন একবার অসুখে পড়ে দিন-কতক বড় কষ্ট পেলে—এ-সব দিকের পাড়াগাঁয়ের জান তো ভায়া, না পাওয়া যায় রাঁধুনী বামুন, না পাওয়া যায় চাকর, [illegible] দিলেও মেলানো যায় না। দিন দশবারো ভুগবার পর উঠে একটু সুস্থ হয়ে একদিন নিধু চৌধুরী অবনীকে বাড়িতে ডাকালে। বল্‌লে—বাবা অবনী, আমার কেউ নেই, এখন তোমরা পাঁচ জন ভরসা। তা তোমার বাবা আমাকে ছোট ভাইয়ের মত দেখতেন, তোমাদের পাড়ায় তখন যাতায়াতও ছিল খুব। তারপর এখন শরীরও হয়ে পড়েচে অপটু, তোমাদের যে গিয়ে খোঁজখবর করবো, তাও আর পারিনে। তা আমি বলচি কি, আমার যা আছে সব লেখাপড়া ক'রে দিচ্চি তোমাদের, নাও—নিয়ে আমাকে তোমাদের সংসারে জায়গা দেও। তুমি আমার দীনু-দার ছেলে, আমার নিজের ছেলেরই মত। তোমাকে আর বেশী কি বল্‌বো বাবা!

অবনী আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল। নিধু চৌধুরীর নগদ টাকা কত আছে কেউ অবিশ্যি জানে না, কিন্তু বিষয়-সম্পত্তির আয়, ধান—এ সব যা আছে, এ গাঁয়ে এক রায়েদের ছাড়া আর কারু নেই। সমস্ত সম্পত্তি লিখে দিতে চায় নিধু চৌধুরী তার নামে! অবনীর মুখ দিয়ে তো কথা বেরুলো না খানিকক্ষণ। তারপর বল্‌লে—আচ্ছা কাকা, বাড়িতে একবার পরামর্শ ক'রে এসে কাল বল্‌ব।

নিধু চৌধুরী বল্‌লে—বেশ বাবা, কিন্তু এ-সব কথা এখন যেন গোপন থাকে। পরদিন গিয়ে অবনী জানালে এ প্রস্তাবে তাদের কোন আপত্তি নেই। নিধু চৌধুরী বল্‌লে—বৌমা তাহ'লে রাজি হয়েচেন? দ্যাখো তা হ'লে আমার একটা সাধ আছে, সেটা বলি। আমার এত বড় বাড়িখানা পড়ে আছে, অনেক দিন এতে মা-লক্ষ্মীদের চরণ পড়েনি, ঠিকমত সন্ধ্যে পড়ে না। তোমাদের ও বাড়িটাও তো ছোট, ঘর-দোরে কুলোয় না, তা ছাড়া পুরোনোও বটে। তোমরা আমার

এখানে কেন এল না সবশুদ্ধ? তোমারই তো বাড়ি-ঘর হবে, তোমাকেই সব দিয়ে যখন যাব, তখন এখন থেকে তোমার নিজের বাড়ি তোমরা না দেখলে নষ্ট হয়ে যাবে যে!

এ প্রস্তাবেও অবনী রাজি হ'ল। একটা ভাল দিন দেখে সবাই এ বাড়িতে চলে এল। অবনীর বৌ নিধু চৌধুরীর বাড়ি কখনো দেখেনি, কারণ সে ও-পাড়ার বৌ, এ-পাড়ায় আসবার দরকার তেমন হয়নি কখনো। ঘর-বাড়ি দেখে বৌ যেমন অবাক্ হয়ে গেল, তেমনি খুশী হ'ল। নিধু চৌধুরীর বাবা রোজগারের প্রথম অবস্থায় সখ ক'রে বাড়ি উঠিয়েছিলেন—তখনকার দিনে সস্তাগণ্ডার বাজার ছিল দেখে অবাক হবার মত বাড়িই করেছিলেন বটে, পাড়াগাঁয়ের পক্ষে অবিশ্যি। কল্‌কাতার কথা ছেড়ে দেও। মস্ত দোতলা বাড়ি, ওপরে নীচে বড় বড় সাত আটখানা ঘর, বারান্দা, প্রকাণ্ড ছাদ, সান-বাঁধানো উঠোন ভেতর বাড়িতে, পাকা রান্নাঘর, ইঁদারা, বাইরে প্রকাণ্ড বৈঠকখানা। বাড়ির পেছনে ফলের বাগান, ছোট একটা পুকুর, বাঁধানো ঘাট—পাড়াগাঁয়ে সম্পন্ন গেরস্ত বাড়ি যেমন হয়ে থাকে।

ওরা বাড়িতে উঠে এসে জাঁকিয়ে সত্যনারাণের পূজো দিলে, লোকজন খাওয়ালে, লক্ষ্মীপুজো করলে! সবাই বল্‌লে অবনীর বৌয়ের পয় আছে, নইলে অমন বিষয়-সম্পত্তি পাওয়া কি সোজা কথা আজকালকের বাজারে? আবার অনেকেরই চোখ টাটালো।

এ-সব হ'ল গিয়ে ও-বছর ফাগুন মাসের কথা। গত বছর বোশেখ মাসে নিধু চৌধুরী মারা গেল। জ্বর হয়েছিল, অবনী ভাল ভাল ডাক্তার দেখালে, খুলনা থেকে নৃপেন ডাক্তারকে নিয়ে এল—বিস্তর পয়সা খরচ করলে, অবনীর বৌ মেয়ের মত সেবা করলে—কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। অবনী বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ করলে খুব ঘটা ক'রে, সমাজ খাওয়ালে—তা সবাই বল্‌লে দেখে শুনে যে নিজের ছেলে থাকলে নিধু চৌধুরীর—সেও এর বেশী আর কিছু করতে পারত না। এখন ওরাই সম্পত্তির মালিক, অবনী নিজেও খাটিয়ে ছেলে, কোনো নেশা-ভাঙ্ করে না, অতি সৎ। কাজেই বিষয় উড়িয়ে দেবে সে ভয় নেই, দেখে শুনে খাবার ক্ষমতা আছে।

তাই বল্‌ছিলাম, ভগবান্ যাকে দেন, তাকে এম্‌নি করেই দেন। ওই অবনীর বৌ আঁচল পেতে চাল ধার ক'রে নিয়ে গিয়েচে আমার মাসীমাদের বাড়ি থেকে, তবে হাঁড়ি চড়েচে—এমন দিনও গিয়েচে ওদের। আমার মাসীমার বাড়ি ওদের একই পাড়ায় কিনা? তাঁরই মুখে সব শুনতে পাই। আর তারাই এখন দেখো ইণ্টার ক্লাসে—ভগবান যখন যাকে—

অবনীর বৌটি খুব ভাল, অত্যন্ত গরিব ঘরের মেয়ে ছিল, পড়েছিলও তেম্‌নি গরিবের ঘরে। সে নাকি মাসীমার কাছে বলেচে যা কোনদিনও স্বপ্নেও ভাবিনি দিদি তাই যখন হ'ল, এখন ভাবি, ভগবান সব বাঁচিয়ে বর্ত্তে রাখলে হয়। গরিব লোকের কপাল, ভরসা করতে ভয় পাই দিদি। প্রথম যে-দিন বাড়িতে ঢুক্‌লাম, 'দেখি এ যেন রাজবাড়ি, অত ঘরদোর অত বড় জানলা দরজা, এতে আবার ছেলে-মেয়েরা বাস কত্তে পারবে, জান তো কি অবস্থায় ছিলাম, তোমার কাছে আর কি লুকুবো? এ যেন সবই স্বপ্ন ব'লে মনে হয়েছিল। এখন ব্রতটা নেম্‌টা ক'রে, দু-দশ জন ব্রাহ্মণের পাতে দু-মুঠো ভাত দিয়ে যদি ভালয় ভালয় দিনগুলো কাটাতে পারি, তবে তো মুখ থাকে লোকের কাছে। সেই আশীর্ব্বাদ করো তোমরা সকলে।

সন্ধ্যার অন্ধকার চারি ধারে খুব গাঢ় হয়েচে। ট্রেন হু হু ক'রে অন্ধকার মাঠ, বাঁশবন, বিল, জলা, আখের ক্ষেত, মাঝে মাঝে ঘন অন্ধকারের মধ্যে জোনাকী-জলা ঝোপ পার হ'য়ে উড়ে চলেচে, মাঝে মাঝে ছোট ছোট গ্রাম, খড়ে-ছাওয়া বিশ-ত্রিশটা চালাঘর এক জায়গায় জড়াজড়ি ক'রে আছে, দু-চার দশটা মিট্‌মিটে আলো জলে অন্ধকারে ঢাকা গাছপালায় ঢাকা গ্রামগুলোকে কেমন একটা রহস্যময় রূপ দিয়েচে।

একটা বড় গ্রামের ষ্টেশনে অবনী তার বৌ ও ছেলেমেয়ে নিয়ে নেমে গেল। ষ্টেশনের বাইরে একখানা ছইওয়ালা গরুর গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে বোধ হয় ওদেরই জন্যে। অবনীর বৌকে এবার প্ল্যাটফর্ম্মের তেলের লণ্ঠনের অস্পষ্ট আলোয় দেখে আরও বেশী ক'রে মনে হ'ল যে মেয়েটি সত্যিই সুশ্রী। বেশ ফর্সা রং, সুঠাম বাহু দুটির গড়ন, চলনভঙ্গী ও গলার সুরের সবটাই মেয়েলি, এমন নিখুঁত মেয়েলি ধরণের মেয়ে দেখবার একটা আনন্দ আছে, কারণ সেটা দুষ্প্রাপ্য। ট্রেনখানা প্রায় দশ মিনিট দাঁড়িয়ে রইল; এক জন

লোক হারিকেন লণ্ঠন নিয়ে ওদের আগিয়ে নিতে এসেছিল, ওরা তার সঙ্গে ষ্টেশনের বাহিরে যেতে গিয়ে ফটক খোলা না পেয়ে দাঁড়িয়ে রইল, কারণ যিনি ষ্টেশন-মাষ্টার, তিনিই বোধ হয় টিকিট নেবেন যাত্রীদের কাছ থেকে—ফটকে চাবী দিয়ে তিনি গার্ডকে দিয়ে প্ল্যাটফর্ম্মের মধ্যে আঁধারে লণ্ঠনের আলোয় কি কাগজপত্র সই করাচ্ছিলেন।

তারপর ট্রেন আবার চলতে লাগল—আবার সেই রকম ঝোপ-ঝাপ অন্ধকারে ঢাকা ছোট-খাট গ্রাম, বড় বড় বিল, বিলের ধারে বাগদীদের কুঁড়ে। আমার ভারি ভাল লাগছিল—এই সব অজানা ক্ষুদ্র গ্রামে ঘরে ঘরে অবনীর বৌয়ের মত কত গৃহস্থবধূ ভারবাহী পশুর মত উদয়াস্ত খাটচে হয়ত পেটপুরে দু-বেলা খেতেও পায় না, ফর্সা কাপড় বছরে পরে হয়ত দু-দিন কি তিন দিন, হয়ত সেই পুজোর সময় একবার, কোন সাধ-আহ্লাদ পূরে না মনের, কিছু দেখে না, জানে না, বোঝে না, মনে বড় কিছু আশা করতে শেখেনি, বাইরের দুনিয়ার কোনো খবর রাখে না—পাড়াগাঁয়ের ডোবার ধারের বাঁশবাগানের ছায়ায় জীবন তাদের আরম্ভ, তাদের সকল সুখ-দুঃখ, আনন্দ, আশা-নিরাশার পরিসমাপ্তিও ঐখানে।

অবনীর বৌ গৃহস্থ বধূদেরই একজন। অন্ততঃ ওদের একজনও তার সাধের স্বর্গকে হাতে পেয়েচে। অন্ধকারের মধ্যে আমি বসে বসে এই কথাই ভাবছিলাম। আমি কল্পনা করবার চেষ্টা করলাম অবনীর বৌকে, যখন সে প্রথম নিধু চৌধুরীর বাড়িতে এল—কি ভাবলে অত বড় বাড়িটা দেখে,... অত ঘরদোর!...যখন প্রথম জানলে যে সংসারের দুঃখ দূর হয়েচে, প্রথমে যখন সে তার ছেলেমেয়েদের ফর্সা কাপড় পরতে দিতে পারলে, আমি কল্পনা করলাম দশঘরার হাট থেকে অবনী বড় মাছ, সন্দেশ, ছানা কিনে বাড়িতে এসেচে... অবনীর বৌ এই প্রথমে সচ্ছলতার মুখ দেখলে তার সে খুশী-ভরা চোখমুখ অন্ধকারের মধ্যে দেখতে পাচ্চি।...

ট্রেন আর একটা ষ্টেশনে এসে দাঁড়িয়েচে। শান্তিরাম আলোয়ান মুড়ি দিয়ে জড়সড় হয়ে বসে আছে, মাঝে মাঝে ঢুলচে। ষ্টেশনে পানের বোঝা উঠচে। শান্তিরামকে বললাম—শান্তিরাম, ঘুমুচ্চ নাকি? আমি একটা গল্প জানি এই রকমই, তোমার গল্পটা শুনে আমার মনে পড়েচে সেটা—শুনবে?...

কিন্তু শান্তিরাম এখন গল্প শুনবার মেজাজে নেই। সে আরামে ঠেস্ দিয়ে আরও ভাল ক'রে মুড়িসুড়ি দিয়ে বসলো। সে একটু ঘুমুবে।

পূর্ণবাবুর কথা আমার মনে পড়েচে শান্তিরামের গল্পটা শুনবার পরে এখন। পূর্ণবাবু আমীন ছিল, পাটনায় আমরা একসঙ্গে কাজ করেছি। পূর্ণবাবুর বয়স তখন ছিল পঞ্চাশ কি বাহান্ন বছর। লম্বা রোগা চেহারা, বেজায় আফিম খেতো—দাঁত প্রায় সব পড়ে গিয়েছিল, মাথার চুল প্রায়ই শাদা,—নাক বেশ টিকল, অমন সুন্দর নাক কিন্তু আমি কম দেখেছি, রং না-ফর্সা না-কালো। পূর্ণবাবু খুব কম মাইনে পেত, এখানে কোন রকমে চালিয়ে বাড়িতে তার কিছু টাকা না পাঠালেই চলবে না—কাজেই তার পরনে ভাল জামা-কাপড় এক দিনও দেখিনি।

পূর্ণবাবু নিজে রেঁধে খেত। এক দিন তার খাবার সময় হঠাৎ গিয়ে পড়েচি—দেখি পূর্ণবাবু খাচ্চে শুধু ভাত—কোন তরকারী, কি শাক, কি আলুভাতে কিছু না—কেবল একতাল সবুজ পাতালতা বাটা-ওষুধের মত দেখতে—কি একটা দ্রব্য ভাতের সঙ্গে মেখে মেখে খাচ্চে। জিজ্ঞাসা ক'রে জানলাম, সবুজ রঙের দ্রব্যটা কাঁচা নিমপাতা-বাটা।

পূর্ণবাবুর বিবাহ হয় বাগবাজারে বেশ সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়ের সঙ্গে—তবে তখন তাদের অবস্থা খুব ভাল ছিল না। পূর্ণবাবুদের পৈতৃক বাড়িও নেই কলকাতায়, ভবানীপুরে খুব আগে নাকি প্রকাণ্ড বাড়ি পুকুর ছিল, এখন তাঁদের দু-পুরুষ ভাড়াটে বাড়িতে থাকে। পূর্ণবাবুর আঠার উনিশ বছর বয়সে পিতৃবিয়োগ হয়, তিনি ছেলের জন্যে শুধু যে কিছু রেখে যাননি তা নয়, ছেলেটিকে লেখাপড়াও শেখান নি। কারণ তিনিও জানতেন এবং সবাই জানত যে তার দরকার নেই, অত বড় সম্পত্তির যে মালিক হবে দু-দিন পরে তার কি হবে লেখাপড়ায়?

ছেলেটিও জ্ঞান হয়ে পর্য্যন্ত তাই জানত ব'লে লেখাপড়া শেখবার কোন চেষ্টাও ছিল না। পূর্ণবাবুর শ্বশুর তাই ভেবে মেয়েকে ওই গরিব ঘরে দিয়েছিলেন।

পূর্ণবাবুর বাবা তো মারা গেলেন, পূর্ণবাবুর ঘাড়ে রেখে গেলেন সংসার, নববিবাহিতা পুত্রবধূ, আর কিছু দেনা। কিন্তু পূর্ণবাবুর শ্রেষ্ঠিটি তখন পারাবারা—কি

বাজারে কি বন্ধুবান্ধব মহলে। টাকা হাত পাতলেই পাওয়া যায়—ধারে দোকানে জিনিষ পাওয়া যায়, নিত্য নূতন বন্ধু জোটে। পূর্ণবাবু খুশী, পূর্ণবাবুর তরুণী বৌ খুশী, আত্মীয়স্বজন খুশী, বন্ধুবান্ধব খুশী। কারণ, সবাই জানে বুড়ী আর ক'দিন ? না হয় মেরে কেটে আর পাঁচটা বছর !

অবিশ্যি পূর্ণবাবুর তখন বয়স অনেক কম, সংসারের কিছুই বোঝেন না, জানেন না—মনে উৎসাহ, আশা, অদম্য আনন্দের উৎস—চোখের সামনে দীপ্ত রঙীন ভবিষ্যৎ—যে ভবিষ্যতের সম্বন্ধে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই, আশঙ্কা নেই, যা একদিন হাতের মুঠোয় ধরা দেবেই—এ অবস্থায় যে যা বুঝিয়েচে পূর্ণবাবু তাই-ই বুঝেচেন, টাকাকড়ি ধার ক'রে দু-হাতে উড়িয়েচেন, বন্ধুবান্ধবদের সাহায্যও করেচেন, ধারে যতদিন এবং যতটা নবাবি করা চলে, বাকী রাখেন নি।

কিন্তু ক্রমে বছর যেতে লাগলো, দু-তিন বছর পরে আর ধার মেলে না - সকলেই হাত গুটিয়ে ফেললে। পাওনাদারের যাতায়াত সুরু হ'ল—এইজন্যে আরও বিশেষ ক'রে পূর্ণবাবু বাজারে ক্রেডিট হারিয়ে ফেললেন যে সবাই দেখলে পূর্ণবাবুর পিসিমা ওঁদের আদৌ বাড়িতে ডাকেন না, পূর্ণবাবুকেও না, পূর্ণবাবুর বৌ, ছেলেমেয়ে কাউকে না—পূর্ণবাবু একটু অপ্রতিভের সুরে বললেন—নিমপাতা-বাটা ভারি উপকারী, বিশেষ ক'রে লিভারের পক্ষে। ভাত দিয়ে মেখে যদি খাওয়া যায়—আমি আজ দু-বছর ধ'রে—আজ্ঞে দেখবেন খেয়ে শরীর বড় ঠাণ্ডা—তা-ছাড়া কি জানেন, লোভ যত বাড়াবেন, ততই বাড়বে—

উপকারী দ্রব্য তো অনেকই আছে, ডাল-ঝোলের বদলে কুইনাইন মিক্‌শ্চার ভাতের সঙ্গে মেখে দু-বেলা খাওয়ার অভ্যেস করতে পারলে দেশের ম্যালেরিয়া সমস্যার একটা সুসমাধান হয়, তাও স্বীকার করি। কিন্তু জীবনে বড় বড় উপদেশগুলো চিরকাল লঙ্ঘন ক'রে চলে এসে এসে আজ নীতি ও স্বাস্থ্য-পালন সম্বন্ধে এত বড় একটা সজীব আদর্শ চোখের সাম্‌নে পেয়ে খানিক ক্ষণের জন্যে নির্ব্বাক্ হয়ে গেলাম। আর এক দিন দু-দিন নয়, দু-বছর ধরে চলেচে এ ব্যাপার !

এক দিন পূর্ণবাবু নিজের জীবনের অনেক কথা বললেন। কল্‌কাতায় তাঁদের বাড়ি, ভবানীপুরে। তাঁর একজন পিসীমা আছেন, একটু দূর-সম্পর্কের—সেই পিসীমার মৃত্যুর পরে তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবেন পূর্ণবাবু। কিন্তু পিসীমা মরি-মরি করচেন আজ ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছর। পূর্ণবাবুর পিসীমার বিশ্বাস যে এরা তাঁকে বিষ খাইয়ে মারবে—যত বয়স হচ্চে, এ বিশ্বাস আরও দিন-দিন বাড়চে—এতে ক'রে হয়েচে এই যে পূর্ণবাবুর, কি পূর্ণবাবুর স্ত্রীর, কি পূর্ণবাবুর ছেলেমেয়ের পিসীমার বাড়ির ত্রি-সীমানার ঘেঁস্‌বার যো নেই। কাজেই অত বড় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়েও পূর্ণবাবু আজ ত্রিশ টাকা মাইনের আমীনগিরি করচেন।

আমি পূর্ণবাবুর এ গল্প বিশ্বাস করিনি। কিন্তু সেট্‌লমেন্ট ক্যাম্পে আমরা একসঙ্গে দেড় বছরের ওপর ছিলাম—এই দেড় বছরের প্রায় প্রতিদিনই সন্ধ্যায় কি রাত্রে একসঙ্গে বস্‌বার সুযোগ হ'লেই পূর্ণবাবু আমায় তাঁর পিসিমার সম্পত্তির গল্প করতেন। কখন কোন্‌টা হয়ত ব'লে ফেলেচেন ছ-মাস আগে তাঁর মনে থাক্‌বার কথা নয়, আবার আজ যখন নতুন কথা বল্‌চেন ভেবে বল্‌লেন তখন খুঁটিনাটি ঘটনা-গুলোও ছ-মাস আগের কাহিনীর সঙ্গে মিলে যেত—নানা টুক্‌রো কথার জোড়াতালি মিলিয়ে এই দেড় বছরে পূর্ণবাবুর সমস্ত গল্পটা আমি জেনেছিলুম—এক দিন তিনি ব'সে আগাগোড়া গল্প আমায় করেন নি, সে ধরণের গল্প করবার ক্ষমতাও ছিল না পূর্ণবাবুর। পিসীমার কাছে খাতির পেলে বাজারেও পূর্ণবাবুর খাতির থাক্‌তো—অনেকে বল্‌তে লাগলো পূর্ণবাবুর পিসীমা ওদের দেখ্‌তে পারে না, সমস্ত সম্পত্তি হয়ত দেবোত্তর ক'রে দিয়ে যাবে—একটি পয়সাও দেবে না ওদের।

সেই থেকে পূর্ণবাবুর দুর্দ্দশার সূত্রপাত হ'ল। বন্ধু-বান্ধব ছেড়ে গেল, শ্বশুরবাড়িতে খাতির কমে গেল, সংসারে দারিদ্র্যের ছায়া পড়্‌ল। দু-এক জন হিতৈষী বন্ধুর পরামর্শে পূর্ণবাবু আমীনের কাজ শিখ্‌তে গেলেন—ছেলেকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন।

এ-সব আজ ত্রিশ বছর আগেকার কথা।

এই ত্রিশ বছরে পূর্ণবা ... মোদপ্রিয়, সৌখীন-চিত্ত, অপরিণামদর্শী যুবক থেকে কন্যাদায়গ্রস্ত, রোগ-জীর্ণ, আবাল-বৃদ্ধ, দারিদ্র্যভারে কুব্জদেহ ত্রিশ টাকা মাইনের আমীনে পরিণত হয়েচেন—এখন আর মনে তেজ নেই, শরীরে বল নেই, খেলে হজম করতে পারেন না, চুল অধিকাংশই পেকে

গিয়েচে, কসের অনেকগুলো দাঁত পড়ে গেলেও পয়সা অভাবে বাঁধাতে পারেন না ব'লে গালে টোল খেয়ে যাওয়ায় বয়সের চেয়েও বুড়ো দেখায়।

বাড়ির অবস্থাও ততোধিক খারাপ। পনের টাকা ভাড়ার এঁদো ঘরে বাস করার দরুণ স্ত্রী ছেলে মেয়ে সকলেই নানারকম অসুখে ভোগে—অথচ উপযুক্ত চিকিৎসা হয় না। তিনটি মেয়ের বিয়েতে পূর্ণবাবু একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে গিয়েচেন, অথচ মেয়ে তিনটির প্রথম দুটি ঘোর অপাত্রে পড়েচে। বড় জামাই বৌবাজারে দরজীর দোকান করে, ঘোর মাতাল, কুচরিত্র—বাড়িতে স্ত্রীকে মারপিট করে প্রায়ই, তবুও সেখানে মেয়েকে মুখ গুঁজে প'ড়ে থাকতে হয়—বাপের বাড়ি এলে শোবার জায়গাই দেওয়া যায় না। মেজ জামাই মাতাল নয় বটে, কিন্তু তার এক পয়সা রোজগারের ক্ষমতা নেই—রেলে সামান্য কি চাকুরী করে, সে-সংসারে সবাই একবেলা খেয়ে থাকে, তাই নাকি অনেক দিন থেকে নিয়ম। আর একবেলা সকলে মুড়ি খায়। মেজ মেয়ের দুঃখ পূর্ণবাবু দেখতে পারেন না ব'লে মাঝে মাঝে তাকে বাড়িতে আনিয়ে রাখেন; সেখানে এলে তবুও মেয়েটা খেতে পায় পেট পুরে দু-বেলা। আজকাল প্রায়ই জরে ভোগে, শরীরও খারাপ হয়ে গিয়েচে, ডাক্তারে আশঙ্কা করেচে থাইসিস্। বুড়ী পিসীমা কিন্তু এখনও বেঁচে। এখনও বুড়ী গঙ্গাস্নানে যায়। নিজের হাতে রেঁধে খায়, বয়স নব্বই-এর কাছাকাছি, কিন্তু এখনও চোখের তেজ বেশ, দাঁত পড়েনি, বুড়ী একেবারে অশ্বত্থামার পরমায়ু নিয়ে জন্মেছে, এদিকে যারা তার মরণের পানে উৎসুক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে, তাদের জীবন ভাঁটিয়ে শেষ হ'তে চলল।

সেট্‌লমেন্টের কাজ ছেড়ে পাটনা থেকে চলে এলাম। পূর্ণবাবু তখনও সেখানে আমীন। বছর তিনেক পরে এক দিন গয়া ষ্টেশনে পূর্ণবাবুর সঙ্গে দেখা। দুপুরের পরে এক্সপ্রেস আসবার সময়ে ষ্টেশনের প্লাটফর্ম্মে পায়চারী করচি, একটু পরেই ট্রেনটা এসে দাঁড়ালো। পূর্ণবাবু নাম্‌লেন একটা সেকেণ্ড ক্লাস কামরা থেকে, অন্য কামরা থেকে দু-জন দরোয়ান নেমে এসে জিনিষপত্রের তদারকে ব্যস্ত হয়ে পড়্‌ল। আমি অবাক্ হ'য়ে চেয়ে রইলাম। পূর্ণবাবুর পরণে দামী কাঁচি ধুতি, গায়ে সাদা সিল্কের পাঞ্জাবী, তার ওপরে জমকালো পাড় ও কল্কাদার শাল, পায়ে প্যারিস গার্টার আঁটা সিল্কের মোজা ও পাম্প-শু, চোখে সোনার চশমা, হাতে সোনার ব্যাণ্ড‌ওয়ালা হাতঘড়ি।

আমি গিয়ে আলাপ করলাম। পূর্ণবাবু আমায় চিনতে পেরে বললেন—এই যে রামরতনবাবু, ভাল আছেন? তারপর এখানে কোথায়?

আমি বল্‌লাম—আমি এখানে চেঞ্জে এসেচি মাস-তিনেক, আপনি এদিকে—ইয়ে—

তাঁর অদ্ভুত বেশভূষার দিকে চেয়ে আমি কেমন হয়ে গিয়েছিলাম। পূর্ণবাবুকে এ বেশে দেখ্‌তে আমি অভ্যস্ত নই, আমার কাছে সূতীর ময়লা চিট্ সোয়েটার ও সবুজ আলোয়ান গায়ে পূর্ণবাবু বেশী বাস্তব,—তা-ছাড়া চুয়ান্ন পঞ্চান্ন বছরের বুড়ের এ কি বেশ!

কি ব্যাপারটা ঘটেচে তা অবশ্য পূর্ণবাবুর বল্‌বার আগেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম।

জিনিষপত্র গুছিয়ে নিয়ে পূর্ণবাবু ওয়েটিং রুমে ঢুকলেন; তিনি সাউথ বিহার লাইনের গাড়ীতে যাবেন। গাড়ীর এখনও ঘণ্টা-দুই দেরি। একজন দারোয়ানকে ডেকে বল্‌লেন—ভূপাল সিং, এখানে ভাল সিগারেট পাওয়া যায় কি না দেখে এস—নইলে কাঁচি নিয়ে এস এক বাক্স—

আমায় বললেন—ওঃ অনেক দিন পরে আপনার সঙ্গে দেখা। আর বলেন কেন, বিষয় থাকলেই হাঙ্গামা আছে। সাম্‌নে আসচে জানুয়ারী কিস্তী—তহশীলদার বেটা এখনও এক পয়সা পাঠায় নি, লিখেচে এবার নাকি কলাই ফসল সুবিধে হয়নি। তাই নিজে যাচ্চি মহালে, মাসখানেক থাক্‌বো। গাড়ীটা এখানে আসে ক'টায়? ভাল কথা এখানে টাইমটেবল্ কিন্‌তে পাওয়া যাবে? কিন্‌তে ভুল হয়ে গেল হাওড়ায়—

আমি জিগ্যেস করলাম—আপনার পিসীমা—

দারোয়ান সিগারেট নিয়ে এল। পূর্ণবাবু একটা সরু ও সুদীর্ঘ হোল্ডার বার করলেন—আমার দিকে একটা সিগারেট এগিয়ে দিয়ে বল্‌লেন—আসুন।

তারপর সিগারেট ধরিয়ে আরামে ধোঁয়া ছেড়ে বল্‌লেন—পিসীমা মারা গিয়েচেন আর-বছর কার্ত্তিক মাসে। তারপর থেকেই বিষয়-আশয়ের ঝঞ্ঝাটে পড়েচি—নিজে না দেখলে কি জমিদারী টেঁকে? আর এই বয়সে ছুটোছুটি ক'রে পারিনে, একটা ভাল কাজ-জানা লোকের সন্ধান দিতে

পারেন রামরতনবাবু? টাকা চল্লিশ মাইনে দেব, খাবে থাকবে—

ওয়েটিং রুমে ব'সে পূর্ণবাবু দু-বোতল লেমনেড খেলেন এই শীতকালে। একবার দারোয়ানকে দিয়ে গরম জিলিপী আনালেন দোকান থেকে, একবার নিম্‌কী বিস্কুট আনালেন। আর একবার নিজে ষ্টেশনের বাইরের দোকান থেকে এক ডজন কমলালেবু কিনে আনলেন। আমায় প্রতিবারই খাওয়ানোর জন্যে পীড়াপীড়ি করলেন, কিন্তু আমার শরীর খারাপ, খেতে একেবারেই পারিনে, সে কথা জানিয়ে ক্ষমা চাইলাম। একটু পরেই পূর্ণবাবুর ট্রেন এসে পড়ল। দিন পনের কুড়ি পরে আবার বেড়াতে গিয়েচি ষ্টেশনে। সেদিন শীত খুব পড়েচে, বেশ জ্যোৎস্না, রাত আটটার কম নয়। ষ্টেশনের রাস্তা যেখানে ঠেকেছে সেখানে নতুন চপকাটলেট-চায়ের দোকান থেকে কে আমার নাম ধ'রে ডাকলে—ও রামরতনবাবু—রামরতনবাবু—এই যে—এদিকে—ফিরে চেয়ে দেখি পূর্ণবাবু একটা কোণে টেবিলে ব'সে। পূর্ণবাবুর মাথায় একটা পশমের কানঢাকা টুপি, শালের কম্পর্টার গলায় জড়ানো, হাতে দস্তানা। আমায় বল্‌লেন—আসুন, বসুন কিছু খাওয়া যাক। আজ ফিরে এলাম মহল থেকে—এই রাতের গাড়ীতে ফিরব কলকাতায়—কিছু খাবেন না? ··না, না, খেতেই হবে কিন্তু, সেদিন তো কিছু খেলেন না—এই বয়, ইধার আও—

আমাকে জোর ক'রে পূর্ণবাবু চেয়ারে বসালেন। তার পর তাঁর নিজের জন্যে যা খাবার দিলে, তা দেখে আমার তো হৃৎকম্প উপস্থিত হ'ল। এত খাবেন কি ক'রে পূর্ণবাবু এই বয়েসে আর একটা অতি বাজে দোকানে, খান আষ্টেক চপ, খানচারেক কাটলেট, এক প্লেট মাংস, পাঁউরুটি, ডিমের মামলেট, পুডিং কেক, চা—তিনি কিছু বাদ দিলেন না। আমাকে দেখিয়ে বল্‌লেন—এই, বাবুকো ওয়াস্তে এক প্লেট মাটন্ আউর তিন্ পিস্—

আমি সবিনয়ে বল্‌লাম—আমার শরীর তো জানেন পূর্ণবাবু, ওসব কিছু আমি—

—আরে, তা হোক্, শরীর শরীর করলে কি চলে! খান্ খান্—মাংসটা বেশ করেচে—কল্‌কাতায় মাংস রাঁধতে জানে না কোথাই রেষ্টোরেন্টে—আমি ঝাল পছন্দ করি, কল্‌কাতায় শুধু মিষ্টি—খেয়ে দেখুন মাংসটা—কাট্‌লেটেও এরা কাঁচালঙ্কা-বাটা দিয়েচে—ভারি চমৎকার খেতে—এই বয়, আউর দুটো কাটলেট—

কথাটা শেষ হবার আগেই তাঁর বেজায় কাশির বেগ হ'ল—কাশতে কাশতে দম আটকে যায় কি!...

একটু সাম্‌লে বললেন—বড্ড ঠাণ্ডাটা লেগেচে মহালে—সেই জন্যে বেশ একটু গরম চা-চপ খেয়ে দেখবেন? ভারি চমৎকার চপ করেচে! এই বয়,—

আমি কথাটা মুখ ফুটে বল্‌লাম—পূর্ণবাবু, আপনার শরীরে এসব খাওয়া উচিত নয়—আর এ ধরণের দোকান তো খুব ভাল নয়? চা বরং এক কাপ খান, কিন্তু এত—এগুলো খেলে—

পূর্ণবাবু হেসে উড়িয়ে দিলেন।—খাবো না বলেন কি রামরতনবাবু, খাবার জন্যেই সব। শরীরকে ভয় করলেই ভয়, ওসব ভাবলে কি আর—আপনিও যেমন!...

রেষ্টোরেন্ট থেকে বার হয়ে এসে আমায় নীচু স্বরে বল্‌লেন—কিছু মনে করবেন না রামরতনবাবু, একসঙ্গে অনেক দিন কাজ করেচি এক জায়গায়। এখানে কোন ভাল বাইজীর বাড়িটাড়ি জানা আছে? থাকে তো চলুন না আজ রাতটা—শুনিচি পশ্চিমে নাকি ভাল ভাল—কল্‌কাতায় না হয় আজ নাই গেলাম—

আমি বুঝিয়ে বল্‌লাম, পশ্চিমের যে-সব জায়গায় ভাল বাইজী থাকে, গয়া সে তালিকায় পড়ে না। বিহারের কোথাও নয়। কাশী, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী ওদিকেই সত্যিকার বাইজী বল্‌তে যা বোঝায়, তা আছে।

পূর্ণবাবু বল্‌লেন—পাটনাতে নেই?

—আমার তাই মনে হয়।

—এদিকে আর কোথাও নেই? না হয় এম্‌নি আর কোথাও—

—কোথাও কিছু নেই। আমি ঠিক জানি।

পূর্ণবাবু ওয়েটিং-রুমে ঢুকে আমাকে বস্‌তে বললেন। পূর্ণবাবুকে আরও বেশী বৃদ্ধ দেখাচ্ছিল। আমি তাঁর বাড়িতে কে কেমন আছে জিজ্ঞেস করলাম। থাইসিসের রোগী সেই মেয়েটিকে বাড়িতে রেখেই চিকিৎসা করাচ্ছেন, বড় ছেলেটি বাপের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে

নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছে আজ বছর দুই—সম্পত্তি পাবার আগেই কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে তার খোঁজ করচেন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত এসব গল্প শুনলাম ব'সে বসে। পূর্ণবাবু গল্পের মধ্যে আরও দু-বার চা আনিয়ে খেলেন, ব্যাগ খুলে ওষুধ খেলেন তিন-চার রকম, কোনটা কবিরাজী, কোনটা বিলিতি পেটেণ্ট ওষুধ। দু-প্যাকেট সিগারেট শেষ করলেন।

দেখলাম পূর্ণবাবু চিরবঞ্চিত জীবনের সর্ব্বগ্রাসী তৃষ্ণায় ভোগলালসা মেটাতে উদ্যত হয়েছেন বিকারের রোগীর মত। চারি ধারে ঘনায়মান মৃত্যুর ছায়ার মধ্যে, স্বল্পতৈল জীবন-দীপের আলো যত সংকীর্ণ থেকে সংকীর্ণতর জ্যোতিঃবৃত্তের সৃষ্টি করচে উনি ততই উন্মাদ আগ্রহে যেখানে যা পাবার আছে পেতে চান—যা নেবার আছে নিতে চান। জীবনে ওঁর যখন সুবৃষ্টি এল, জল না পেয়ে তখন আধ-মরা, সেই এল—কিন্তু এত দেরি করে ফেললে!

* * *

আমায় বললে—একটু কিছু বাড়াবাড়ি খেলেই, ওষুধ খেয়ে রাখি। আর হজম করতে পারিনে এখন। আমাদের পাড়ায় আছে গদাধর কবরেজ—খুব ভাল চিকিচ্ছে করে, এক হপ্তার ওষুধ নেয় দু-টাকা, তারই কাছে ভাবছি এবার—পূর্ণবাবুর সেই নিমপাতা-বাটা মেখে ভাত খাওয়ার কথা আমার মনে পড়ল। আরও মনে পড়ল পূর্ণবাবুর প্রথম জীবনের সৌখীনতার কথা। এখন তিনি বুঝেচেন আর বেশী দিন বাঁচবেন না, চিরবাঞ্চিত জীবনের সর্ব্বগ্রাসী তৃষ্ণায় ভোগলালসা তাঁর বিকারের রোগীর মত অসংযত, অবুঝ।

শান্তিরামকে গল্পটা বলব ভেবেছিলাম, কিন্তু সে দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্চে।

চিরন্তনী

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

অজন্তার গিরিগর্ভে সুপ্তিমৌন আছে যত নারী,—
মনে হয়, সবারে চিনিতে আমি পারি
এক নিমিষের দৃষ্টিপাতে!
রমণীর বিচিত্র মোহন ভঙ্গিমাতে
ইঙ্গিতে জানায় তারা সুদূরের ভেদি' ব্যবধান
রমণীর স্বরূপসন্ধান।
মনে ভাবি তাই,
আজ আমাদের মাঝে
নিত্যকাজে
যারা জেগে নাই,
কালের তিমিররাত্রে একদা তারাই
থাকিত জাগিয়া,
হাস্য লাস্য কটাক্ষের অপরূপ মোহমন্ত্র নিয়া;
শিল্পীর অন্তরে শুধু নয়,—
বিশ্বমানবের মনে রূপে রসে হানিয়া বিস্ময়।

আজ কত শতাব্দীর পারে
নারীত্ব মুখর হয়ে উঠিয়াছে যবে চারিধারে
কল্পনার বিচিত্র বিলাসে,
নব নব সাজসজ্জা বর্ণে বাসে হাস্যে পরিহাসে,
চঞ্চল মদির মোহে মাতাইয়া মানবের মন,
—এদেরি করিয়া আবাহন,
অতীতের পার হ'তে তারা যেন কহিছে ডাকিয়া
ভাবাহীন মৌন কণ্ঠ দিয়া—
তোমাদেরও মাঝে মোরা আছি,
কালের নর্ম্মদাস্রোতে যুগে যুগে মোরাই যে বাঁচি!
অধীরা ধরণী,
নিরন্তর চলেছে যা নিয়ন্ত্রিত কালের সরণি
আবর্ত্তিত দিক্‌চক্রপথে
কোন্ সে আদিম যুগ-হ'তে,—
গতির মাঝারে সে ত স্থির,
বক্ষে বহি' লক্ষ কোটি সন্তানের সুনিশ্চিন্ত নীড়,
প্রেমের মতন,—
অচঞ্চল লক্ষ্যমাঝে বিচঞ্চল বিচিত্র যতন।
লীলায়িত গতিচ্ছন্দে আপনি হইয়া গতিহীন—
চেয়ে আছি চিরদিন চিরনারী কোমল-কঠিন।

সন্ধি

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ

৯

চতুর্থ খণ্ড

নীহারিকার কথা

সেদিন সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে একজন চাপরাসি আসিয়া বলিল, "মেম্‌ সাহেব, রাজা সাহেব গাড়ী নিয়ে এসেছেন, আপনি আসুন।"

আমি পূর্ব্বদিনের কথা স্মরণ করিয়া তাড়াতাড়ি বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া বাহির হইলাম এবং রাস্তায় গাড়ীতে রাজা সাহেবকে দেখিতে পাইলাম। তিনি আমার হাত ধরিয়া সেই খোলা ফিটন গাড়ীতে আমাকে উঠাইলেন এবং তাঁহার পাশে বসাইলেন। আমি তাঁহার পাশে না বসিয়া সম্মুখের সীটে বসিলাম। গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

তখন সোনালী রং মাখিয়া নীল পাহাড়ের গায় সূর্য্য অস্ত যাইতেছিল। আমরা লাল মাটির পাকা সড়কের উপর দিয়া বিচিত্র পার্ব্বত্য দৃশ্য দেখিতে দেখিতে চলিলাম। অগ্রহায়ণ মাস,—পথের উভয় পার্শ্বের মাঠে হৈমন্তিক ধান্য পাকিতে আরম্ভ করিয়াছে। ধরিত্রীর শ্যামল অঞ্চলে সোনালা রঙের কারুকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। গাড়ী চলিতে লাগিল, রাজা সাহেব আমার সঙ্গে গল্প আরম্ভ করিলেন।

তিনি বলিলেন, "আপনি বুঝি আর কখনও এদিকে আসেন নাই?"

আমি বলিলাম, "না, তবে দূর থেকে এই সুন্দর দৃশ্য উপভোগ করে থাকি।"

"কেবল সুন্দর দৃশ্য নয়, সকল সুন্দর বস্তুই মানুষের উপভোগ্য। কবি বলেছেন, "A thing of beauty is a joy for ever" (একটি সুন্দর বস্তু চিরদিনের জন্য আনন্দ দান করে)। কিন্তু সেই সৌন্দর্য্য দেখিবার উপযুক্ত কাল্‌চার (কৃষ্টি) কয়জনের আছে? আচ্ছা, ভাল কথা, আপনি রাণী সাহেবার সঙ্গে আলাপ করলেন, তাঁকে কেমন বোধ হ'ল?"

"তিনি বেশ বুদ্ধিমতী, অনেক বিষয়ের খবর রাখেন, আবার চিন্তাও করেন। তবে বড় ওল্ড-ফ্যাশ্‌ন্‌ড (সেকেলে)।"

রাজা সাহেব হাসিয়া বলিলেন, "আপনি ঠিক ধরেছেন। আমি অনেক চেষ্টা ক'রেও তাঁকে কিছুতেই শোধরাতে পারলাম না। এন্‌লাইটেণ্ড্‌ সার্ক্‌লে (ইংরেজীশিক্ষিত সমাজে) তাঁকে নিয়ে মুভ্‌ (চলাফেরা) করতে পারি না, এইটে আমার মস্ত আপসোস্‌।"

আমি বলিলাম, "তিনি ঘরের বাইরে এসে দেখে শুনে অনেক উন্নতি লাভ ক'রতে পারেন।"

"সেই ত মুস্কিল। অন্তঃপুরের চৌকাঠ পার হ'লে তাঁর নাকি জাত যাবে। আবার দেশের লোকগুলোও এমন অসভ্য, তারা একটা হৈ চৈ আরম্ভ ক'রে দেবে।"

"আমরা অনেক দূর এসে পড়েছি, এবার ফিরলে ভাল হয়।"

"মোটেই ত তিন মাইল। আচ্ছা, সেই ভাল, আপনার ঠাণ্ডা লাগতে পারে।"

এই বলিয়া তিনি গাড়ী ফিরাইতে কোচম্যানকে আদেশ করিলেন। এইরূপে আমি সান্ধ্য ভ্রমণ শেষ করিয়া গৃহে ফিরিলাম।

আমি বোর্ডিংএ ফিরিয়া আসিলে নিস্তারিণী আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। আমি তাঁহাকে দেখিয়া বলিলাম, "দিদি, এসময়ে কি মনে ক'রে এসেছেন?"

আমি তাঁহাকে এখন দিদি বলিয়া ডাকি।

তিনি বলিলেন, "আমি আপনাকে ছোট বোনের মত দেখি, একটা কথা বলতে এসেছি, কিছু মনে করবেন না।"

আমি একটু বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "কি কথা বলবেন, স্বচ্ছন্দে বলুন।"

তিনি আমার সম্মুখে চেয়ারে বসিয়া চুপে চুপে বলিলেন, "আপনি যে আজ রাজা সাহেবের সঙ্গে গাড়ীতে বেড়াতে গিয়েছিলেন, এ কাজটা ভাল করেন নি।"

আমি একটু রুষ্ট হইয়া বলিলাম, "দিদি, আপনিও কি এটা দোষের কাজ মনে করেন? পাড়াগেঁয়ে অশিক্ষিত মেয়েরা অবশ্য এটা নিন্দার কাজ বলতে পারে, কিন্তু আপনার ন্যায় সুশিক্ষিতা মহিলাও কি এটা নিন্দার বিষয় বলবেন?"

তিনি বলিলেন, "বাইরে বেড়ানো দোষের কাজ নয়, গাড়ীতে হাওয়া খাওয়াতেও দোষ নাই; কিন্তু আপনি যে-লোকের সঙ্গে গাড়ীতে গিয়েছিলেন, তাঁর সঙ্গে একলা গাড়ীতে বেড়ানোটাই নিন্দার বিষয়। এই নিয়ে নানা জনে নানা কথা বলবে, এই আমার ভয়।"

আমি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলাম, "আমার কিন্তু কোন ভয় নেই, আমি সে-সকল কুলোকের মতামতও গ্রাহ্য করিনে। যারা নিজেরা কুচরিত্র, তারাই অন্যকে সন্দেহ করে. এবং নানা রকম গল্প রচনা করে।"

তিনি বলিলেন, "কিন্তু বোন, একবার ভেবে দেখুন, আমাদের স্ত্রীলোকের অতি সামান্য কারণেই দুর্নাম রটে; সেটা কি রটতে দেওয়া ভাল?"

আমি রুষ্ট হইয়া বলিলাম, "মেয়েদের বেলায়ই যত দোষ, আর পুরুষের সাত খুন মাপ। এই যে সমাজের অত্যাচার, আমি এর বিরুদ্ধে লড়তে চাই। আমি নিজের আচরণ দ্বারা দেখাব, যে, এই অন্যায় অবিচারকে ডিফাই (অগ্রাহ্য) করবার মত মনের বল আমার আছে।"

নিস্তারিণী দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "আমি আপনাকে সাবধান করা উচিত মনে ক'রে এত কথা বললাম। এখন আপনি যা' ভাল বোঝেন, তাই করবেন।"

এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন!

পরদিন প্রাতঃকালে পণ্ডিত মহাশয় আমাকে যথাসময়ে পড়াইতে আসিলেন। তিনি উপবেশন করিয়া বলিলেন, "মা, কাল আমি এসে শুনলাম, তুমি রাজবাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলে।"

আমি বলিলাম, "আজ্ঞে হাঁ, রাজা সাহেব গাড়ী পাঠিয়েছিলেন, আমি রাণীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলুম।"

"আবার বৈকালেও শুনলাম রাজা সাহেবের সঙ্গে গাড়ীতে হাওয়া খেতে গিয়েছিলে?"

"হাঁ, তিনি নিজে গাড়ী নিয়ে এসেছিলেন, তাই গিয়েছিলুম।"

"মা, কাজটা ভাল হয়নি। তুমি হিন্দুর ঘরের মেয়ে, তোমার এতটা স্বাধীনভাবে পরপুরুষের সঙ্গে চলাফেরা করা আমাদের চোখে কেমন লাগে, তাই বললাম।"

আমি দুঃখিত হইয়া বলিলাম, "পণ্ডিত মহাশয়, আপনি আমার পিতৃতুল্য, আমার হিতৈষী, আপনি অবশ্য আমার ভালোর জন্যই এসব কথা বলছেন। কিন্তু আমার অবস্থাটাও একবার ভেবে দেখুন। রাজা সাহেব এখানকার অধিপতি, তিনি নানা প্রকারে আমার প্রতি অনুগ্রহই করছেন, তিনি নিজে এসে আমাকে এতটা খাতির করলেন, সেটা প্রত্যাখ্যান করা কি অভদ্রতা হ'ত না? আর তিনি উচ্চশিক্ষিত, মার্জ্জিতরুচি ভদ্রলোক. তাঁর সঙ্গে মেলামেশাতে দোষ কি?"

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, "মা, তুমি বুদ্ধিমতী, সুশিক্ষিতা বট, তুমি এ-কথাটা একবার ভেবে দেখ দেখি, এখানে নিস্তারিণীও ত অনেকদিন আছেন, রাজা সাহেব একদিনের তরেও ত তাঁকে এত খাতির করেননি, আর তোমাকেই বা এত খাতির করছেন কেন? তোমার সংসারের অভিজ্ঞতা কম, লোকচরিত্র এখনও বুঝতে শেখনি। এইসব কারণেই ত শাস্ত্রকারেরা স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা খর্ব্ব করেছেন। সেটা তাদের প্রতি অসূয়াপরবশ হ'য়ে নয়, তাদের নিজের মঙ্গলের জন্যে। বোধ হয় এ-সব কথা তোমার ভাল লাগছে না। যাক, এখন তোমার পড়া আরম্ভ কর।

এই বলিয়া তিনি পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। বাস্তবিকই তাঁহার কথাগুলি আমার বিরক্তি উৎপাদন করিতেছিল। স্ত্রীলোককে এতটা অবিশ্বাস! এই সকল গোঁড়া লোকের মন বড়ই সংকীর্ণ।

সেই দিন সন্ধ্যাবেলা রাজা সাহেব আবার গাড়ী লইয়া হাজির হইলেন। আজ আমার মন ভাল ছিল না, বেড়াইতে যাইব কি-না ইতস্ততঃ করিতেছিলাম। অবশেষে নিস্তারিণীর সঙ্গে আমার যে কথা হইয়াছিল, তাহা স্মরণ করিয়া অশিক্ষিত অনুদার লোকদিগের মত ডিফাই (অগ্রাহ্য) করিবার মতলবে সাজসজ্জা করিয়া গাড়ীতে গিয়া উঠিলাম। আজ রাজা সাহেব আমাকে সম্মুখের সীটে বসিতে না দিয়া তাঁহার পাশেই বসাইলেন এবং আমি জিদ করিয়া সেখানেই বসিলাম, তবে অবশ্য যতদূর সম্ভব ব্যবধান রাখিলাম। তিনি গাড়ীতে বসিয়া নানা কথা বলিলেন, অধিকাংশই তাঁহার

বিলাতের অভিজ্ঞতা। আমি কেবল থাকিয়া থাকিয়া হুঁ দিতে লাগিলাম। আমরা যখন বেড়াইয়া ফিরিলাম, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। আমার বসিবার ঘরে আলো দেওয়া হইয়াছে। তিনি গাড়ী হইতে আমার সঙ্গে নামিয়া আসিলেন, এবং আমার বসিবার ঘরে আসিয়া একখানা ঈজীচেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তিনি প্রথম দিন আসিয়াই আমার শুইবার ও বসিবার ঘর আসবাবপত্রে ভরিয়া দিয়াছেন। তিনি ঈজীচেয়ারে বসিয়া একটা সিগারেট ধরাইয়া বলিলেন, "আপনার এ ঘরটি ছোট হ'লেও চমৎকার। আই লাইক সাচ্ এ কোজি লিট্ল্ কর্ণার (আমি এই রকম একটি ছোট্ট আরামদায়ক কোণ ভালবাসি)। আপনি সামনের ঐ চৌকীটায় বসুন। এই সময় এক পেয়ালা চা হ'লে বড় ভাল হ'ত।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "সে আর বেশী কথা কি? আমি দশ মিনিটের মধ্যে আনিয়ে দিচ্ছি।"

তিনি বলিলেন, "না—না—আপনি যাবেন না, আপনার ঠাকুরকে বলুন, সেই নিয়ে আসবে।"

আমি ঠাকুরকে জল গরম করিতে বলিয়া চায়ের সরঞ্জাম লইয়া আসিলাম। রাজা সাহেব বলিলেন, "সে দিন আপনার হাতের তৈয়েরি চা অতি সুন্দর হয়েছিল। আমি সে লোভ সম্বরণ করতে পারছি নে।"

আমি কোন কথা না বলিয়া একটু হাসিলাম। কিন্তু তাঁহার এই অপ্রত্যাশিত আগমন আমার আদৌ ভাল লাগিল না। কিন্তু বাধ্য হইয়া আমাকে তাহা সহ্য করিয়া যথারীতি অতিথি-সৎকার করিতে হইল। ঠাকুর কেটলিতে করিয়া জল গরম করিয়া আনিল, আমি চা প্রস্তুত করিয়া তাঁহার সামনে টিপাইয়ের উপর দিলাম। তিনি চা খাইতে খাইতে নানা গল্প আরম্ভ করিলেন। কিন্তু আমি তাঁহার কথোপ-কথনে যোগ দিতে পারিতেছিলাম না, আমার মনের ভাব—তিনি উঠিলেই আমি বাঁচি। চা খাওয়া শেষ হইলে তিনি বলিলেন, "আমার বোধ হচ্ছে আজ আপনি টায়ার্ড (ক্লান্ত) হয়েছেন। আজ তবে আমি এখন আসি। গুড্ নাইট।" এই বলিয়া তিনি ছড়ি হাতে করিয়া বাহির হইলেন।

তাহার কিছুক্ষণ পরে নিস্তারিণী আসিলেন। তাঁহাকে এ সময় দেখিয়া আমি সন্তুষ্ট হইলাম না; তিনি আসিয়া বলিলেন, "আমি আর একবার এসেছিলাম, এসে দেখি রাজা সাহেব আছেন। কিন্তু আপনি এখানে একলা থাকেন, তা জেনে-শুনেও রাজা সাহেবের রাত্রে এখানে আসা কি ভাল? লোকে কি বলবে?"

তাঁহার এই কথা শুনিয়া আমার আপাদমস্তক ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। আমি বলিলাম, "দিদি, আজও আপনার সেই কথা? আমি কি অন্যায় কাজ করেছি, যে, লোকে আমার নিন্দা ক'রবে? একজন ভদ্রলোক আমার বাসায় এসেছিলেন, আমি কি ক'রে তাঁকে নিষেধ ক'রতে পারি? আপনি কি পারতেন?"

তিনি বলিলেন, "ভাই, রাগ করবেন না। আপনার কোন দোষ নাই আমি জানি। কিন্তু রাজা সাহেবের এভাবে আসা একেবারেই উচিত হয় নাই। তিনি কি সমাজের নিয়ম-কানুন জানেন না? আমাদের স্ত্রীলোকের দোষ যে পদে পদে।"

আমি বলিলাম, "আর পুরুষের বেলায় কোন দোষ নেই। সমাজের এই একচোখো বিচার, এই পক্ষপাতসূচক আইন-কানুন আমি ভাঙতে চাই। আর এখানে আমার সমাজ কোথায়? আমি এখানে সম্পূর্ণ স্বাধীন।"

তিনি বলিলেন, "সেই জন্যই আপনার আরও সাবধান হ'য়ে চলা উচিত। আজ যা হ'য়েছে হ'য়েছে, আর আপনি রাজা সাহেবকে সন্ধ্যার পর এখানে আসতে উৎসাহ দেবেন না।"

আমি বলিলাম, "উৎসাহ আজ ত আমি দিই নাই, কিন্তু ভদ্রলোক ইচ্ছা ক'রে ঘরে এসে ব'সে পড়লেন, আমি কি ক'রে নিবারণ করি? তাঁকে গলাধাক্কা দিয়ে বের ক'রে দেওয়া কি সম্ভব? একটা রুল অব্ এটিকেট (ভদ্রতার নিয়ম) আছে ত?"

তিনি আর কিছু না বলিয়া চলিয়া গেলেন। আমার মন নিতান্ত তিক্ত হইয়া পড়িল। আমার আর কিছু ভাল লাগিল না। আহারাদি করিয়া শুইয়া পড়িলাম। আমি বিছানায় শুইয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম, রাজার সঙ্গে গাড়ীতে বেড়ান ও এখানে তাঁর সঙ্গে মেলামেশা করার জন্য আমাকে সকলে নিন্দা করিতেছে। আমার আচরণ কি যথার্থই নিন্দার উপযুক্ত? রাজা ত এ-পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে কোন অভদ্র ব্যবহার করেন নাই, তিনি আমার সম্মান রক্ষা করিয়াই চলিতেছেন।

কিন্তু অন্যে ইহা বুঝিবে কি? রাজা পাশ্চাত্য দেশে শিক্ষালাভ করিয়াছেন, তিনি একজন কাল্‌চার্ড লোক, তিনি পাশ্চাত্য দেশে অনেক নারীর সঙ্গে মিশিয়াছেন, সেজন্য নারীর সম্মান রক্ষা করিয়া কিরূপে চলিতে হয়, তাহা বিলক্ষণ জানেন। কিন্তু তিনি আমার প্রতি যতটা মনোযোগ দিতেছেন, তাহা কি উচিত? তাঁহার ন্যায় পদস্থ ব্যক্তির পক্ষে ইহা কি স্বাভাবিক? আমি কিন্তু তাঁহার সদয় ব্যবহারে নিতান্ত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি। তাঁহার প্রভাবের মধ্যে এতটা ধরা দেওয়া কি আমার পক্ষে সঙ্গত হইতেছে? তিনি আমার প্রতি যেন আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন। প্রথম দর্শনেই আমার রূপে যেন মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার তখনকার সেই চোখের দৃষ্টিটা এখনও আমার মনে অঙ্কিত হইয়া আছে। ইহা কি লালসার দৃষ্টি, না সৌন্দর্য্যের প্রতি একজন রূপদক্ষের য্যাপ্রিসিয়েশ্যন্ ও য্যাডমিরেশ্যন (সৌন্দর্য্যানুভূতি ও প্রশংসা)? তাঁহার কথাবার্ত্তা ত বেশ সুসংযত, তাহাতে লালসার কোন চিহ্ন নাই। সুতরাং আমার ভয়ের কারণ কি? একথা ঠিক, তিনি আমার সঙ্গ পছন্দ করেন—শঙ্করও ত আমার সঙ্গসুখ উপভোগ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল। রাজা সাহেবও কি সেইরূপ? তা আমার বোধ হয় না। তাঁহার স্ত্রী সুশিক্ষিতা নহেন, তাঁহার ন্যায় এন্‌লাইটেণ্ড ('আলোকপ্রাপ্ত') স্বামীর অনুপযুক্ত। সেই জন্য তিনি এন্‌লাইটেণ্ড স্ত্রীলোকের সঙ্গ খোঁজেন। কিন্তু তাঁহাকে আমার সঙ্গে মিশিতে দেওয়া আমার পক্ষে ভাল কি মন্দ? আমি জীবনের যে আদর্শ গ্রহণ করিয়াছি, তাহার পক্ষে ভাল না মন্দ? আমি সেই আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিব কি? আমার অভিজ্ঞতা যতই বাড়িতেছে, ততই আদর্শ হইতে আমি যেন অল্পে অল্পে দূরে সরিয়া যাইতেছি। বিবাহ সম্বন্ধে কিশোরের সঙ্গে আমার যে তর্ক হইয়াছিল, তাহার সেই কাটা-কাটা কথাগুলি এখনও আমার মনে খোঁচা দেয়। তার পরে পণ্ডিত-মহাশয় বিবাহ সম্বন্ধে যে লেক্‌চার দিয়াছিলেন, তাহার ঝাঁঝ এখনও আমার মনে আছে। কিশোর এখন কোথায় আছে, কি করিতেছে, কে জানে। কিশোর কিন্তু আমাকে যথার্থ ই ভালবাসে। কিশোর চোখের জল লুকাইতে লুকাইতে আমার নিকট হইতে বিদায় হইয়াছিল, সে সময় আমার চোখেও জল আসিয়াছিল। আমার মনে কি তবে তাহার ভালবাসার ছোঁয়াচ লাগিয়াছে? কিশোরের আন্তরিকতা কিন্তু আমার বড়ই ভাল লাগিয়াছিল। কিশোর একটি খাঁটি সোনার মানুষ। কিন্তু এ-সব কথা আমি ভাবিতেছি কেন? আমার কি তবে আদর্শ ত্যাগ করিয়া বিবাহ করার ইচ্ছা হইতেছে? কিন্তু আমার আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কি বিবাহ করা চলে না? আমি কি তবে চিরদিন আমার আদর্শের জন্য কঠোর তাপসবৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকিব? নিস্তারিণী তাঁহার স্বামীর সঙ্গে কিরূপ সুখের সংসার বাঁধিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে যথার্থ প্রেম জন্মিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। সেই প্রেম স্মরণ করিয়া এখনও তিনি চোখের জল ফেলেন। শুনিয়াছি এই প্রেমের দ্বারাই যথার্থ নারীত্বের বিকাশ হয়। আবার রাণীর কথায় সেদিন বুঝিলাম, মা হইবার জন্য তাঁহার হৃদয় হাহাকার করিতেছে। এই মাতৃত্ব নারীর একটা আকাঙ্ক্ষার বস্তু। যে নারীর সন্তান হয় নাই, তাহার জীবন যেন অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। আর যাহাদের বিবাহ হয় নাই, তাহাদের ত কথাই নাই। যে নারী বিবাহ করে নাই, তাহার জীবনে প্রেমের সরসতা থাকে না, আবার মাতৃত্বের কোমলতাও জন্মে না। তাহার জীবন যেন শুষ্ক মরুভূমি। কিশোর বলিয়াছিল, আমার মন মতবাদের কণ্টক দ্বারা আবৃত, সেজন্য প্রেমের ফুল ফুটিতে পারিতেছে না। ফুলের কুঁড়ি হয়েছে কি?—কিন্তু আমি যে-সকল মতবাদ গ্রহণ করিয়াছি, তাহা নারী-প্রগতির জন্য একান্ত আবশ্যক। আমি কি তবে নারী-প্রগতির সার্থকতার জন্য আমার নারীজীবন বিফল করিব? কলিকাতায় নারী-প্রগতি সমিতি আমরা যাহা করিয়াছিলাম, তাহার অবস্থা শোচনীয়. অরুণা বলিয়াছিল। ইহার মধ্যেই অনেক মেম্বর খসিয়া পড়িয়াছে। আমার ক্ষুদ্র সামর্থ্য দ্বারা নারী-প্রগতি কতটা অগ্রসর হইবে?—এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তা করিতে করিতে আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম।

১০

রাত্রি প্রভাত হইলে, পণ্ডিত মহাশয় যথাসময়ে পড়াইতে আসিলেন। তাঁহার মুখ ভার ভার বোধ হইল। অন্য কোন কথা না বলিয়া তিনি বই হাতে লইয়া পড়াইতে আরম্ভ করিলেন এবং এক ঘণ্টা পড়াইয়া বলিলেন, "মা, আমার আর তোমাকে পড়ান সুবিধা হবে না। আমি কাল থেকে আর আসব না। কিন্তু একটা কথা বলে যাচ্ছি—ভবভূতি বলেছেন,—

"যথা স্ত্রীণাং তথা রাজ্ঞাং সাধুত্বে দুর্জনোজনঃ।"
"যেমন স্ত্রীলোকদিগের তেমনই রাজাদিগের চরিত্রের সাধুতায় লোকে সহজেই দুর্নাম রটনা করে।"

"এখানে স্ত্রী ও রাজা দুই-ই একত্রে মিলিত, কাজেই দুর্জন লোকেরও নানা কথা বলার খুব সুবিধা হয়েছে। আমি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মানুষ, আমার তফাৎ থাকাই ভাল।"

এই বলিয়া আমাকে কোন কথা বলার অবসর না দিয়া তিনি উঠিয়া পড়িলেন। আমারও মনে রাগ ও অভিমান হইল, আমি কিছু না বলিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম, তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

অন্য দিনের মত সেদিনও সন্ধ্যাবেলায় রাজা সাহেব গাড়ী লইয়া আসিলেন এবং আমাকে খবর দিলেন। আমার শরীর অসুস্থ বলিয়া আমি আর সেদিন বাহির হইলাম না। বাস্তবিক সেদিন আমার শরীর না হউক মন বড়ই খারাপ হইয়াছিল। কিন্তু আমি বাহির না হইলে কি হয়, রাজা নিজেই গাড়ী হইতে নামিয়া আসিলেন এবং আমার বসিবার ঘরে বসিলেন। আমাকে বাধ্য হইয়া সেখানে আসিতে হইল। আমাকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "আজ আপনার হয়েছে কি?"

আমি বলিলাম, "শরীরটা বড় ভাল বোধ হচ্ছে না।"

"এক কাপ্ চা খান, শরীর ভাল বোধ হবে'খন।" এই বলিয়া তিনি তাঁহার খানসামাকে ডাকিলেন, সে চায়ের দ্রব্যাদি লইয়া হাজির হইল। আমি এবার বুঝিলাম আমি ছাড়িতে চাহিলেও "কমলী ছোড়্‌তা নেহি।"—আমি অগত্যা ঠাকুরকে চায়ের জল গরম করিয়া আনিতে বলিলাম। তখন রাজা সাহেব আমার কৌতুক উৎপাদন করিবার জন্য দেশ-বিদেশের নানা গল্প জুড়িয়া দিলেন, কিন্তু তাহা শুনিবার মত ধৈর্য্য আমার ছিল না। আমি কেবল 'হাঁ', 'হুঁ' দিয়া সারিলাম। চায়ের জল আসিলে আমি চা প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে এক কাপ দিলাম ও আমি এক কাপ খাইলাম। আমার ভাব বুঝিয়া রাজা সাহেব আজ আর বেশীক্ষণ না বসিয়া "গুড্ নাইট" বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন, আমি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। নিস্তারিণী আজ আসিলেন না। বোধ হয় পণ্ডিত-মহাশয়ের মত তিনিও আমার সঙ্গে নন-কো-অপারেশন করিলেন। ভাগ্যিস্ আমি এখানে কোন সমাজের ধার ধারি না, নচেৎ সকলে আমাকে একঘরো করিত। ভবানীপুর স্কুলের সেই হেডমিস্ট্রেস্ আমাকে যেরূপ কর্মত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছিল, যদি নিস্তারিণীর সে ক্ষমতা থাকিত, তবে তিনিও নিশ্চয়ই আমাকে বরখাস্ত করিতেন। কিন্তু আমি ত মনে মনে জানি আমি তখনও যেরূপ নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক ছিলাম, এখনও সেইরূপ আছি।

ইহার পরের দিন যথার্থ একটা ক্রাইসিস (সঙ্কট) আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং তাহার দ্বারা আমার জীবনের গতি সম্পূর্ণ রূপে পরিবর্ত্তিত হইল।

রাজা সাহেব গাড়ী লইয়া আসিবেন সেই ভয়ে আমি বৈকালে পাঁচটার সময় বোর্ডিংএর মেয়েদের লইয়া বড় রাস্তায় বেড়াইতে বাহির হইলাম। আমার ধারণা ছিল, আমাকে বাসায় না পাইয়া রাজা সাহেব নিজেই বেড়াইতে যাইবেন এবং সেদিনের মত আমাকে তাঁহার সঙ্গ হইতে নিষ্কৃতি দিবেন। আমি মেয়েদের লইয়া রাস্তায় প্রায় এক মাইল বেড়াইয়া সন্ধ্যার সময় বোর্ডিংএ ফিরিয়া আসিলাম। কিন্তু ও হরি, কমলী ছোড়্‌তা নেহি—আমি আসিয়া দেখি রাজা সাহেব আসিয়া আমার বসিবার ঘরে হাত পা ছড়াইয়া ঈজি চেয়ারে বসিয়া আছেন। আমাকে দেখিয়া বলিলেন, "ও, ইউ লুক্ সিম্‌প্ল চার্মিং ইন্ দিস পিঙ্ক শাড়ী এণ্ড ব্লাউস্" (এই ফিকা লাল রঙের সাড়ী ও ব্লাউসে আপনাকে চমৎকার দেখাইতেছে)। আমি আপনার ঘরে আজ অনধিকারপ্রবেশ করেছি, আর আগেই ঠাকুরকে চা খাওয়ার বন্দোবস্ত করতে অর্ডার দিয়েছি। আপনি ব্যস্ত হবেন না, এদিকে এগিয়ে বসুন।"

আমি কোন কথা না বলিয়া দূরে একটা চৌকীতে বসিলাম। তিনি আবার বলিলেন, "কতদূর গিয়েছিলেন? মধ্যে মধ্যে মেয়েদের নিয়ে রাস্তায় বেড়ানো মন্দ নয়, এতে তাদেরও 'ওপন এয়ার এক্সারসাইজ' (খোলা বাতাসে অঙ্গ চালনা) হয়।

এই সময় ঠাকুর কেট্‌লিতে গরম জল আনিল,—চায়ের অন্যান্য সরঞ্জাম রাজা সাহেবই সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন আমি চা প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে খাইতে দিলাম, তিনি চা খাইতে খাইতে নানা কথা বলিলেন। কিন্তু আমি দুই-একটা হাঁ, হুঁ—ছাড়া আর কিছুই বলিলাম না।

চা খাওয়া শেষ করিয়া রাজা সাহেব আমাকে বলিলেন

"আপনি এদিকে স'রে আসুন, আমি আপনার জন্যে এই ব্রেস্‌লেট জোড়া এনেছি, আসুন আপনার সুন্দর হাতে পরিয়ে দিই।" এই বলিয়া তিনি পকেটের মধ্য হইতে এক জোড়া হীরা-মুক্তা-খচিত ব্রেস্‌লেট বাহির করিলেন।

এই কথা শুনিয়া আমার শরীর রাগে জ্বলিয়া উঠিল, আমি অনেক কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া বলিলাম, "আপনি কি বলছেন, রাজা সাহেব? আমি আপনার কাছে ব্রেস্‌লেট উপহার কেন নেব? আমাকে আপনি কি মনে করেন?"

তিনি হাসিয়া বলিলেন, "You see, Miss Chatterjee, there is nothing offensive or objectionable in this simple offer. You know, it is woman's right to be treated with respect by man. And it is beauty's right to extort admiration and homage from man. I make you this present in token of my admiration." (আপনি দেখুন, মিস্ চ্যাটার্জ্জি, এই সামান্য উপহারদানের প্রস্তাবে কোন আপত্তি বা দোষের কথা কিছু নেই। আপনি জানেন, প্রত্যেক স্ত্রীলোকের পুরুষের নিকট সম্ভ্রম পাওয়ার অধিকার আছে। আর সেই স্ত্রীলোক যদি সুন্দরী হন, তবে তাঁর পুরুষের নিকট প্রশংসা ও পূজা আদায় করবার যথেষ্ট অধিকার আছে। আমি এই জিনিষটি আমার সেই পূজার অর্ঘ্য স্বরূপ দিচ্ছি।) আমি বিলেতে কত সুন্দরী রমণীকে এরূপ উপহার দিয়ে তাঁদের ধন্যবাদ লাভ করেছি।"

আমি বলিলাম, "বিলেতের কথা ছেড়ে দিন। সে দেশের আচার-ব্যবহার ভিন্ন রকম। তাদের সঙ্গে আমাদের তুলনা হয় না।"

রাজা বলিলেন "Certainly. While in London, I spent five thousand rupees for a—for a mere kiss" (আমি লণ্ডনে থাকবার সময় কেবল একটি চুম্বন লাভের জন্য পাঁচ হাজার টাকা ব্যয় করেছিলাম)।

রাজার এই কথা শুনিয়া আমি ক্রোধে অধীর হইয়া বলিলাম, "রাজা সাহেব, নিশ্চয়ই আজ আপনার মাথার ঠিক নাই। এরূপ অশ্লীল কথা আপনার মুখ দিয়ে বেরুবে জানলে, আমি আপনাকে এখানে ঢুকতে দিতুম না। আপনি বিলাতে যাই ক'রে থাকুন, আমার এখানে আপনার সুসংযত হ'য়ে কথা বলা উচিত। আপনার মতলব নিতান্ত খারাপ দেখছি। আপনি আর আমাকে বিরক্ত করতে আসবেন না— আপনি এখনি আপনার ব্রেস্‌লেট নিয়ে প্রস্থান করুন।"

রাজা সপ্রতিভভাবে বলিলেন, "আপনি আমাকে ভুল বুঝলেন। আমি বিলেতে যাই ক'রে থাকি, আপনার এখানে আমি সেরূপ কিছু করতে ইচ্ছা করি নে, এবং আপনার নিকট সেরূপ কিছু প্রত্যাশাও করি নে। সত্য কথা বলিতে কি, আমি আপনাকে ভালবাসি। আমি আপনাকে বিবাহ করতে চাই। আপনি জানেন, আমার স্ত্রীর সন্তান হয় নাই, সেজন্য আমার আর একটি বিয়ে করা দরকার। আমার স্ত্রীর তা'তে অমত নেই, আমাদের রাজাদের মধ্যে বহুবিবাহ দোষের নয়। আমি আপনাকে আমার প্রেমের নিদর্শনস্বরূপ এই ব্রেস্‌লেট উপহার দিচ্ছি। আপনি অনুগ্রহ ক'রে এটা গ্রহণ ক'রে আমাকে কৃতার্থ করুন।"

এই বলিয়া রাজা আমার হাতে সেই ব্রেস্‌লেট পরাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আমি দূরে সরিয়া গিয়া বলিলাম, "আমি আপনার এই প্রস্তাব ঘৃণার সঙ্গে অগ্রাহ্য করছি। আপনি বিয়ে করতে হয় আর কাহাকেও বিয়ে করুন। আপনি আমার আশা ত্যাগ করুন। আপনি বাড়াবাড়ি করলে আজই আমি এখান থেকে চলে যাব।"

রাজা সাহেব তখন নরম হইয়া আবার বসিলেন, এবং বলিলেন, "আপনি আমার প্রস্তাবটি হঠাৎ এভাবে উড়িয়ে দেবেন না। একবার ধীর চিত্তে বিবেচনা ক'রে দেখুন। আমার মত এক জন রাজার রাণী হওয়া অত্যন্ত সৌভাগ্যের কথা আপনি কি অবস্থার লোক একবার ভেবে দেখুন। আমি আপনাকে পথ থেকে কুড়িয়ে নিয়ে আমার মুকুট ক'রে রাখতে যাচ্ছি। আপনি ব্রাহ্মণের মেয়ে তা জানি, কিন্তু আমি বিলাত-ফেরত, আমি জাত মানি নে, আপনি উচ্চ শিক্ষা পেয়েছেন, আপনারও মানা উচিত নয়। আমি আপনাকে ভালবেসে ফেলেছি, সেই জন্যই আপনাকে মাথায় তুলে রাখতে চাই। আমি আপনাকে কোন জোরজুলুম করছি না, আপনি আমাকে তত নীচপ্রকৃতি মনে করবেন না

এই আপদকে শীঘ্র দূর করিবার জন্য আমি শান্তভাবে বলিলাম, "দেখুন, রাজা সাহেব, আপনার রাণী হওয়া যে কত সৌভাগ্যের বিষয়, আমি কি তা বুঝি নে? কিন্তু আমার বড় ভাই আছেন, তিনিই আমার অভিভাবক। তাঁর অমতে আমি কোন কাজ ক'রতে পারি নে।"

রাজা উৎসাহিত হইয়া বলিলেন, "Oh certainly—you must consult your brother (নিশ্চয়ই আপনি আপনার ভাইয়ের মত নেবেন)। আপনি তাঁকে টেলিগ্রাম করুন, বা সব কথা বুঝিয়ে চিঠি লিখুন। সাত দিনের মধ্যে তাঁর উত্তর নিশ্চয়ই পাবেন। এই সাত দিন পরে আমি আবার আসব। আমি এই ব্রেস্‌লেট আর ফেরত নেব না। হা আমি আপনাকে উপহার দিয়েছি, উহা আপনার কাছেই থাকুক। গুড্‌নাইট।"

এই বলিয়া সেই ব্রেস্‌লেট জোড়া টেবিলের উপর রাখিয়া রাজা সাহেব প্রস্থান করিলেন। আমি এই আকস্মিক বিপৎপাতে একেবারে ভাঙিয়া পড়িলাম। আমি চৌকীতে বসিতে না পারিয়া সেই বসিবার ঘরেই মেঝের উপর শুইয়া পড়িলাম। আমি শুইয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিলাম,—হায় হায়, আমার আবার এ কি বিপদ উপস্থিত হ'ল! আমাকে এ বিপদ হ'তে কে রক্ষা করবে? আমি কাহার সঙ্গে এখান হ'তে পালিয়ে যাব? আমার আর এক মুহূর্ত্তও এখানে থাকা হ'বে না। দাদাকে টেলিগ্রাম করলে নিশ্চয়ই সে আসবে। কিন্তু রাজা যদি আমাদিগকে যেতে না দেয়? মুখে ভদ্রভাব দেখালেও তার অন্তঃকরণে কি আছে, কে জানে? এতদিন সে যে-ভাবে আমার সঙ্গে ব্যবহার করেছিল, তাহাতে কে জানত, তার ভিতরে এত সব কুমতলব বাসা বেঁধে আছে। নিস্তারিণী আমাকে পূর্ব্ব হ'তে সতর্ক করেছিল। পণ্ডিত মশায়ও আমাকে যথার্থ কথাই ব'লেছিলেন। আমি তাঁহাদের হিতোপদেশে কর্ণপাত না ক'রে নিতান্ত অন্যায় কাজ করেছি। কিশোর যথার্থই বলেছিল—স্বামীই স্ত্রীলোকের রক্ষাকর্ত্তা, স্বামীগৃহই তার আশ্রয়স্থল। কিশোর আমাকে প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিল, আমি নিতান্ত নিষ্ঠুর হয়ে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছি। আমি তা'কে প্রত্যাখ্যান ক'রে আমার মায়ের আদেশ লঙ্ঘন করেছি। আমার সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত অবশ্যই হবে। আমার মনে অত্যন্ত দর্প হয়েছিল, দর্পহারী ভগবান আমার সে-দর্প চূর্ণ না ক'রে ছাড়বেন না। আমি অহঙ্কারে মত্ত হ'য়ে, এপর্য্যন্ত এক দিনও ভগবানের নাম করিনি। শুনেছি, তাঁকে মনে প্রাণে ডাকলে তিনি বিপদ থেকে উদ্ধার করেন। হে ভগবান, আমাকে উদ্ধার কর, আমার যে রক্ষাকর্ত্তা আর কেউ নেই।

আমি এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলাম। একবার অস্ফুট স্বরে বলিয়া উঠিলাম—"কিশোর, তুমি কোথায়?" কত ক্ষণ এই ভাবে কাটিয়াছিল জানি না, হঠাৎ চক্ষু মেলিয়া দেখি, কে একজন আমার শিয়রে বসিয়া আছে। আমি তাহাকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিলাম, আমার চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। এই মূর্ত্তি কি আমার মানসকল্পিত? আমি যাহার কথা ভাবিতেছিলাম, হঠাৎ সে কিরূপে আমার শিয়রে আসিয়া বসিল!

আমাকে ভীতচকিত দেখিয়া সেই মূর্ত্তি কথা কহিল। সে বলিল, "তুমি ভয় পেয়ো না, নীরু। আমি কিশোর।"

"কিশোর! কিশোর! তুমি ঈশ্বরের প্রেরিত দূত? তুমি আমাকে বিপদ হ'তে উদ্ধার ক'রতে এসেছ? এস, এস, আমার হারানো মাণিক এস—আমি তোমাকে অনেক দুঃখ দিয়েছি, আর আমি তোমাকে দূরে ঠেলব না—"

আমি আবেগ ভরে এই বলিয়া কিশোরের কণ্ঠালিঙ্গন করিলাম। কিশোর আমার হাত ধরিয়া তুলিয়া আমাকে সেই ঈজি চেয়ারের উপর শোয়াইয়া দিল। আমি চক্ষু মুছিয়া তাহাকে ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলাম, তখনও যেন আমার স্বপ্নের ঘোর কাটে নাই। কিশোরও তাহার মনের আবেগ চাপিতে না পারিয়া চক্ষু মুছিতে লাগিল।

কতক্ষণ এই ভাবে কাটিল, বলিতে পারি না। অবশেষে কিশোর বলিল, "আমি কলকাতায় এসে সুকুমারের কাছে শুনলাম তুমি এখানে আছ। তোমাকে না দেখে আমি ক'দিন থাকতে পারি? তাই আজ সকালে এখানে এসে পৌঁছেছি। এখানকার হাই স্কুলের মাষ্টার যুগল বাবু আমার সহপাঠী বাল্যবন্ধু; তাঁর সঙ্গে দেখা হ'ল, তিনি আমাকে তাঁর বাসায় নিয়ে গেলেন। তিনি তোমার সম্বন্ধে অনেক কথা বললেন। শুনলাম, এখানকার রাজা নাকি তোমাকে নাগপাশে বন্ধন করবার চেষ্টায় আছেন।"

আমি বলিলাম, "তিনি ঠিকই বলেছেন। এখনই তিনি আমাকে ঐ ব্রেস্লেট উপহার দিয়ে তাঁর রাজরাণী করবার প্রস্তাব ক'রে গেলেন।"

কিশোর বলিল, "তা'ত আমি নিজের কানেই শুনেছি। আমি আজ বৈকালে পাঁচটার সময় তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসে শুনলাম তুমি মেয়েদের নিয়ে বেড়াতে গিয়েছ। আমি তোমার জন্য এই ঘরে ব'সে অপেক্ষা করতে লাগলাম। পরে রাজাকে আসতে দেখে আমি পাশের ঐ ঘরটার মধ্যে গেলাম এবং দরজা বন্ধ করে খড়খড়ি খুলে কি হয় দেখবার জন্য চুপ ক'রে বসেছিলাম। তোমার ঠাকুর আমাকে দেখেছিল, তাকে তোমার নিকট কিছু বলতে নিষেধ করেছিলাম। পরে তুমি বেড়িয়ে এলে, এবং রাজার সঙ্গে তোমার যে-সব কথাবার্ত্তা হয়েছে, আমি সব শুনেছি।"

আমি বলিলাম, "কিন্তু এখানে আসবার আগে হয়ত আমার অনেক দুর্নাম শুনেছিলে?"

কিশোর বলিল, "সেই সব কথা শুনেই আমার এরকম আড়ি পেতে থাকতে ইচ্ছা হ'ল। কিন্তু যে যা বলুক, আমি সে-সব কিছু বিশ্বাস ক'রতে পারিনি। তবে একথা ঠিক, দুর্দ্দান্ত ক্ষমতাশালী লোকদের অসাধারণ ক্ষমতা আছে, যা'তে ক'রে তারা অসম্ভবকেও সম্ভব করতে পারে।"

আমি বলিলাম, "আমিও ত সেই ভয়ে দাদার মত নেওয়ার ছলে সাত দিনের সময় নিয়েছিলুম, তা'ত তুমি নিজেই শুনেছ।"

কিশোর বলিল, "যাক সে কথা। টেলিগ্রাফ ফরম্ আছে? আমি সুকুমারকে আনবার জন্য এখনই তার ক'রে দিচ্ছি। আর তোমার এখানে বাংলা পাঁজি আছে?"

আমি ঠাকুরকে ডাকিয়া স্কুলের আপিস-ঘর হইতে একখানা টেলিগ্রাফ ফরম্ ও বাংলা পঞ্জিকা আনিতে বলিলাম ও চাবি তাহার হাতে দিলাম। ঠাকুর সেগুলি আনিয়া দিল এবং পাঁজি দেখিয়া কিশোর একটা টেলিগ্রাম লিখিয়া আমাকে দেখিতে দিল—

"My marriage with Niharika day after tomorrow. Come sharp with Pramila. Kishor" (আগামী পরশু নীহারিকার সহিত আমার বিবাহ স্থির হইয়াছে। প্রমীলাকে লইয়া অবিলম্বে আসিবে। কিশোর।)

আমি এই টেলিগ্রাম দেখিয়া হাসিলাম। তখন নারী-প্রগতির কথা একবারও মনে পড়িল না।

কিশোরকে বলিলাম—"তুমি রাজা সাহেবের দুর্গের মধ্যে ব'সে তাঁর বিরুদ্ধে দুর্গ রচনা করতে যাচ্ছ। এবার তিনি খুব জব্দ হবেন।"

কিশোর হাসিয়া বলিল, "তুমি এত দিনে আমার সেই কথাটা হয়ত বুঝতে পেরেছ—স্বামীর সঙ্গই স্ত্রীর প্রধান দুর্গ। টেলিগ্রাফ আপিস হয়ত বন্ধ হয়ে যাবে, এখনই এটা পাঠিয়ে দাও।"

ঠাকুর তখনই টাকা লইয়া টেলিগ্রাফ করিতে গেল। কিশোর বলিল, "আমি তবে এখন উঠি? যুগলের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে এই এক দিনের মধ্যে সব বন্দোবস্ত করতে হবে।"

আমি বলিলাম, "একটু ব'স। তোমার কাছে ত এপর্য্যন্ত কোন খবর শোনা হয়নি। আর এখানকার একজন শিক্ষয়িত্রী নিস্তারিণী ঘোষ আছেন, তাঁকে ডেকে পাঠ চ্ছ, তিনিও আমাদের অনেক বিষয়ে সাহায্য করবেন।"

আমি একটি মেয়েকে ডাকিলাম, সে নিস্তারিণীকে ডাকিতে গেল। ইতিমধ্যে কিশোর বলিল, "সব খবর ভাল। আমার মেডিক্যাল কলেজে পড়ার বাধা দূর হয়েছে। দাদা যে জজ সাহেবের পেস্কার, কৃষ্ণনগর গিয়া দাদার পরামর্শে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে আমার মোকদ্দমার সব কথা তাঁকে বুঝিয়ে বললাম। তিনি বললেন, তুমি ত অতি উত্তম কাজ করেছিলে,—a most chivalrous deed for which you deserve a reward, (স্ত্রীলোকের সম্মান রক্ষার জন্য তোমার বীরত্ব—এই জন্য তোমার পুরস্কার পাওয়া উচিত)। এ কাজের জন্যে তোমার পুরস্কার পাওয়া উচিত ছিল, তা না হয়ে তোমার জেল হ'ল, আবার কলেজে পড়াও বন্ধ হবে? Let me see what I can do for you. (আমি তোমার কিছু উপকার করতে পারি কি-না দেখিতেছি) এই বলিয়া তিনি মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের নিকট একটা চিঠি লিখে দিলেন। আমি সেই চিঠি নিয়ে কলকাতায় গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রলাম। তিনি পূর্ব্ব থেকেই আমাকে ভালবাসতেন। সেই চিঠি পেয়ে আমাকে কলেজে

পড়তে অনুমতি দিয়েছেন। আরও একটা সুসংবাদ, সুকুমারের ছেলে হবে।"

আমি এই সকল সংবাদ শুনিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলাম। ইতিমধ্যে নিস্তারিণী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বিবাহের কথা শুনিয়া বলিলেন, "ভগবান্ রক্ষা করলেন। ব্যাপার যেরূপ ঘোরালো হয়ে উঠেছিল, আমিত মনে করেছিলাম, আপনার আর উদ্ধারের উপায় নাই। আমি ত রাজা সাহেবকে জানি, তিনি যে কত মেয়ের সর্ব্বনাশ করেছেন, তার ঠিক ঠিকানা নাই (এ কথা চুপে চুপে বলিলেন)—আমি আপনাকে সাবধান করতে চেষ্টা করেছিলাম, আপনি তাঁর বাহ্যিক চাকচিক্যে ভুলে আমার কথায় কর্ণপাত করেন নাই। এখনও খুব সাবধান হয়ে থাকতে হবে। বিবাহের আয়োজন খুব গোপনে গোপনে ক'রতে হবে। আমার বাড়িতেই বিয়ে হবে।"

পরে কিশোরকে বলিলেন, "আপনি অবশ্য এ দুই দিন যুগলবাবুর বাড়িতেই থাকবেন। তাঁকেও বলবেন, একথা যেন জানাজানি না হয়। পরে বিয়ের একটু আগে আপনি আপনার কয়েকটি বন্ধুকে নিয়ে আমার বাড়িতে আসবেন। একবার বিয়েটা হয়ে গেলে রক্ষা।"

আমি বলিলাম, "বৃদ্ধ পণ্ডিত মশায়কে কিন্তু বলতে হবে।"

নিস্তারিণী বলিলেন, "তা' অবশ্য বলা যাবে। তিনি আপনার পরম হিতৈষী।"

পর দিন সন্ধ্যাবেলা দাদা আসিয়া পৌঁছিল। কিন্তু প্রমীলা আসে নাই, তাহার বর্ত্তমান অবস্থায় রেলে চড়া নিষিদ্ধ, তাহাকে বাপের বাড়ি রাখিয়া আসিয়াছে। দাদা সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া অত্যন্ত খুশী হইল এবং এত দিন পরে আমার সঙ্গে প্রাণ খুলিয়া আলাপ করিল। দাদা বলিল, "নীরী, মার আশীর্ব্বাদে তোর আর কোন বিপদ হবে না।"

মায়ের কথা মনে পড়াতে আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম এবং হাত যোড় করিয়া মায়ের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া মনে মনে বলিলাম—"মা, তোমার অবাধ্য হইয়া তোমার মনে কত কষ্ট দিয়াছি। এবার তুমি আমাদের প্রাণ খুলে আশীর্ব্বাদ কর।"

দাদা আবার বলিল, "শোনো কিশোর, এ ত আনন্দের ব্যাপার, এত ঢাকাঢুকির প্রয়োজন কি? এ কি মগের মুলুক যে এই জংলী রাজাকে ভয় করতে হবে? আমি কালই সকালে রাজার সঙ্গে দেখা ক'রে তাঁকে জানিয়ে আসব।"

পর দিন সকালে হাই স্কুলের হেড মাষ্টার সন্তোষ বাবুকে সঙ্গে করিয়া দাদা রাজা সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেল। দাদা ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আমি যখন রাজা সাহেবকে বলিলাম, 'আমার ভগিনী একটি যুবকের সহিত পূর্ব্বে আমার স্বর্গীয়া মাতা ঠাকুরাণীর দ্বারা বাগ্‌দত্তা হইয়া আছে, এবং সেই যুবক এখানে আসিয়াছে, আমি আজই তাহাদের বিবাহ দিব।'—রাজা সাহেব ক্ষণকাল কি চিন্তা করিয়া, গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, 'I am really glad to hear this. I must congratulate the young man on his good luck.' (আমি ইহা শুনিয়া বাস্তবিকই সুখী হইলাম। আমি সেই যুবকের সৌভাগ্যের জন্য তাঁহাকে অভিনন্দন করিতেছি।) আপনারা আজই শুভকার্য্য সম্পাদন করুন। আমার যদি কোন সাহায্যের প্রয়োজন হয় তবে বলবেন, আমি সব রকমে সাহায্য করতে প্রস্তুত আছি। আমাকে বিয়ে দেখার নিমন্ত্রণ করবেন না?' দাদা বলিলেন, "আমাদের কি সে সৌভাগ্য হবে, যে, আপনার ন্যায় একজন রাজাকে নিমন্ত্রণ করতে পারি?" রাজা বলিলেন, 'আমি নিশ্চয়ই যাব।' 'আমি সেই ব্রেসলেট রাজাকে ফিরিয়ে দিয়ে এসেছি।' আমি দাদার এই সকল কথা শুনিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলাম। রাজা আসিবেন শুনিয়া বিবাহসভার আয়োজন ভাল রকমই করিতে হইল। আমাদের স্কুল কম্পাউণ্ডে রাজবাড়ির সামিয়ানা খাটান হইল ও রংবেরঙের শতরঞ্জী পাতা হইল। হাই স্কুলের শিক্ষকগণ বরযাত্রী হইলেন। বৃদ্ধ পণ্ডিত মহাশয় বিবাহের পুরোহিত হইলেন। আমাদের বোর্ডিঙেই নিমন্ত্রিতদের জলযোগের ব্যবস্থা করা হইল। রাজা সাহেব বিবাহের সময় আসিলেন এবং তিনি সেই ব্রেসলেট আমাকে উপহার দিলেন। এবার আমি তাহা প্রসন্ন চিত্তে গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলাম।

সেখানে ফুলশয্যা শেষ করিয়া আমি দাদা ও স্বামীর সহিত কলিকাতা যাত্রা করিলাম। এইরূপে আমার চাকরী

জীবন শেষ হইয়া গার্হস্থ্য জীবন আরম্ভ হইল। দাদা বলিল, একটি সুন্দরী ও শিক্ষিতা মেয়ের সহিত শঙ্করের বিবাহ হইয়াছে। শঙ্কর যখন প্রমীলাকে লইয়া আমাদের বাড়িতে আসিল, সে লজ্জায় আমার সঙ্গে দেখা করে নাই। তখন আমিই তাহাকে ডাকিয়া বলিলাম, শঙ্করদা, আপনার হারানো মাণিককে আমি আবার খুঁজিয়া পাইয়াছি, আপনি তাহাকে গ্রহণ করুন। এই বলিয়া আমি দুই বন্ধুকে আবার মিলাইয়া দিলাম। তাঁহারা গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইলেন।

সমাপ্ত

জার্ম্মানীতে বস্ত্রশিল্প-শিক্ষা

শ্রীসুশীলচন্দ্র রায়

কংগ্রেস বরাবর আমাদের দেশের বস্ত্রশিল্পের উন্নতির চেষ্টায় আছেন। জাপানী ও ব্রিটিশ পণ্যের সঙ্গে আমাদের ভারতীয় কলের প্রস্তুত বস্ত্র প্রতিযোগিতায় দিন দিন হটে যাচ্ছে; তার একটা প্রধান কারণ, আমাদের কলকারখানাগুলি মোটেই আধুনিক ধরণের নয়। তা ছাড়া আমরা ফ্যাক্টরীগুলির উন্নতিরও চেষ্টা করি না। আর একটা কারণ এই যে, যাঁরা ফ্যাক্টরীর ম্যানেজার অথবা সুতাকাটা বা বয়ন বিভাগের অধ্যক্ষ আছেন, তাঁরাও আধুনিক কলগুলির সঙ্গে পরিচিত নন। সেজন্য আমার মনে হয়, ভারতীয়েরা যদি বস্ত্রশিল্পের উন্নতি করতে চান, তবে তাঁদের বিদেশে অর্থাৎ ইউরোপ কিংবা আমেরিকায় শিক্ষার জন্য আসা উচিত। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা প্রয়োজন। সেটা হচ্ছে এই, ইউরোপ অথবা ইংলণ্ডে যে-সব ভারতীয় উচ্চশিক্ষার জন্য আসেন তার মধ্যে অর্দ্ধেকের বেশী বাঙালী। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, এই বস্ত্রশিল্প শিক্ষা সম্বন্ধে বাঙালী ছাত্র নাই বললেও চলে, অথচ গুজরাট এবং অন্যান্য প্রদেশের অনেক ছেলে ইহা শিখিবার জন্যই ইউরোপ বা ইংলণ্ডে আসেন।

এখন জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে, বস্ত্রশিল্প শিখতে ভারতীয়দের ইউরোপের কোন্ দেশে যাওয়া উচিত। সব দিক দিয়া দেখতে গেলে দেখা যায়, জার্ম্মানীই হচ্ছে এ বিষয়ে শিক্ষা পাবার উপযুক্ত জায়গা; কারণ এখানে কার্য্যগত শিক্ষার যথেষ্ট সুযোগ পাওয়া যায়, যা ইংলণ্ডে একেবারে অসম্ভব এবং আমেরিকায় পাওয়া যায় না বললেও চলে।

এখানে কার্য্যগত শিক্ষার সুযোগ পাওয়া যায় একথা বলার কারণ এই যে, জার্ম্মানী চায় তার বস্ত্রশিল্পের যন্ত্রপাতি ভারতের বাজারে বিকাতে, কারণ সে বেশ ভাল করেই জানে যে, কাপড় সে কখনই ভারতের বাজারে বিকাতে পারবে না। এর কারণ হচ্ছে, জার্ম্মানীর প্রধান প্রতিযোগী জাপান ও ইংলণ্ড। ইংলণ্ডের ল্যাঙ্কাশায়ার ও ম্যাঞ্চেষ্টার শহরে কেবল ভারতে কাপড় সরবরাহ করার জন্য বিশিষ্ট কটন মিল অনেক আছে, যা এদের একেবারে নাই বলা চলে। সেজন্য এদের বিখ্যাত যন্ত্রনির্ম্মাণ-কারখানাগুলি ভারতে এদের প্রস্তুত কল বিক্রি করবার জন্য ব্যস্ত এবং প্রতি বছর প্রচুর কল ভারতের বাজারে বিক্রি ক'রে থাকে। এই কারণে এরা ভারতীয়দের কার্য্যগত শিক্ষার সাহায্য করতে রাজী আছে।

আমি যখন গত বছর হার্টম্যানে কাজ করি, তখন দেখতে পাই যে, এদের যে-সব সুতাকাটা যন্ত্র তৈরি হচ্ছে তার অর্দ্ধেকের বেশীর ভাগ অর্ডার ভারত থেকে এসেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সবই আমেদাবাদ ও বম্বের জন্য। এ বিষয়ে আমাদের বাংলা দেশ এখনও অনেক পিছনে প'ড়ে আছে। এখানে এসে দেখতে পাই, যে-সব অবাঙালী এ-বিষয়ে কাজ করছে, তারা চায় না যে বাঙালীরা এ-বিষয়ে কাজ করে। তারা বাঙালীকে বেশ একটু ঈর্ষার চোখেই দেখে।

ভারতীয়দিগকে জার্ম্মানীতে আসতে বলার আর একটা প্রধান কারণ এই যে, এখানে আমরা অন্ততঃ লাঞ্ছিত হব না, যেটা ইংলণ্ডে ভারতীয়রা তাদের ন্যায্য পাওনা ব'লে পেয়ে

থাকে। এখানে একজন বিদেশী যেরূপ ব্যবহার পেতে পারে সেরূপ ব্যবহার আমরা পেয়ে থাকি, বরং আমরা আর সব ইউরোপীয় জাতির চেয়ে ভাল ব্যবহারই পাই। ইংলণ্ডে ভারতীয়রা প্রায় প্রত্যেক দিনই অপদস্থ হন, কিন্তু আমাদের এটা এরূপ সহ্য হয়ে গেছে যে, আমাদের কোনই চৈতন্য হয় না। তার প্রধান কারণ বোধ হয় যে, আমরা আমাদের নিজেদের দেশেই ওটা পেয়ে থাকি। আজকাল পাউণ্ডের দাম ক'মে যাওয়ায় ভারতীয়দের এদেশে বেশ অসুবিধা হচ্ছে; কিন্তু তবুও ইংলণ্ড বা আমেরিকার চেয়ে এদেশে কম খরচে থাকা যেতে পারে।

অনেকে হয়ত বলতে পারেন জার্ম্মাণ জাতটা এখন বিপ্লবের মধ্যে আছে, কাজেই এখন জার্ম্মানীতে আসা মোটেই নিরাপদ নয়। কিন্তু এই বিপ্লবটা সম্পূর্ণ তাদেরই। এর জন্যে বিদেশীদের ভয়ের কোনই কারণ নেই। কিছুদিন আগে জার্ম্মান ছেলেরা আমাদের অর্থাৎ সমস্ত বিদেশী ছাত্রদের একটি সভায় নিমন্ত্রণ করেছিল। সে সভায় তারা তাদের বর্ত্তমান কার্য্যপদ্ধতি বুঝিয়ে দেয় এবং বিদেশীদের সহযোগিতা চায়। কার্য্যতঃ তারা বিদেশীর সঙ্গে এপর্য্যন্ত কোন কুব্যবহার করেনি, বরং আগেকার মতই ভাল ব্যবহার করে। সুতরাং এখানে যিনি পড়তে আসবেন, তিনি যদি কোন রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ না দেন তবে তাঁর কোনই ভয়ের কারণ নেই।

এখন দেখা যাক্, বস্ত্রশিল্প জার্ম্মানীর কোন্ কোন্ জায়গায় শেখা যেতে পারে।

বস্ত্রশিল্পকে প্রধানতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে; যথা,—সুতাকাটা, বয়ন ও রঞ্জন। জার্ম্মানীতে তিন রকম শিক্ষালয়ে বস্ত্রশিল্প শেখা যেতে পারে।

টেক্‌নলজিক্যাল কলেজ জার্ম্মানীর অনেক জায়গায় আছে, তবে সব কলেজে বস্ত্রশিল্প সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হয় না। কেবল ড্রেসডেন ও ষ্টাটগার্ট শহরের কলেজে এই বিষয় শেখান হয়। টেক্‌নলজিক্যাল কলেজে বস্ত্রশিল্প দুই ভাগে ভাগ ক'রে শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রথমটাতে সুতাকাটা ও বয়ন এবং সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রপাতি তৈয়ারী সম্বন্ধেও শিক্ষা দেওয়া হয়। এ বিষয়ের কোর্স্ চার বছর। তা ছাড়া অন্ততঃ এক বছর হাতে-কলমে শিক্ষা করতে হয়। সুতা ও কাপড়ের রসায়নী বিদ্যার কোর্সও চার বছর এবং সঙ্গে অন্ততঃ এক বছর কার্য্যগত শিক্ষা নিতে হয়। কাজেই ঐ দুটা বিষয়ে ডিপ্লোমা পেতে হ'লে পাঁচ বছর সময়ের দরকার হয়। এ ছাড়া ডক্টর উপাধি পেতে হ'লে আরও ছয় মাস থেকে এক বছর সময় লাগে। পরিশ্রমী ছাত্রেরা গ্রীষ্মের ছুটিতে কার্য্যগত শিক্ষার ব্যবস্থা করলে মোট সময় থেকে পাঁচ-ছয় মাস বাঁচাতে পারেন। কার্য্যগত শিক্ষাটা আবশ্যক; এ না নিলে ডিপ্লোমা বা ডিগ্রী পাওয়া যায় না। ষ্টাটগার্টের টেকনলজিক্যাল কলেজে বয়ন সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষালাভ করা যেতে পারে। ড্রেসডেনে সুতাকাটা বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা পাওয়া যায়।

টেক্‌নিকুমেও ডিপ্লোমা পাওয়া যায়, ডিগ্রী পাওয়া যায় না। তবে এখানে টেক্‌নলজিক্যাল কলেজের মত অত উন্নত প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হয় না। ইংলণ্ডে ম্যাঞ্চেষ্টারের কলেজগুলিতে যেরূপ ষ্ট্যাণ্ডার্ডে শিক্ষা দেওয়া হয় জার্ম্মানীর টেক্‌নিকুমেও সেরূপ ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। এখানকার কোর্স্ তিন বছর, কার্য্যগত শিক্ষা ছয় মাস। রয়টিঙ্গেন শহরের টেক্‌নিকুম বিশ্ববিখ্যাত।

ফ্যাক্‌শুলের ষ্ট্যাণ্ডার্ড টেক্‌নিকুমের চেয়ে কতকটা নীচু। এখানে ডিগ্রী বা ডিপ্লোমা পাওয়া যায় না; তবে পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হ'তে পারলে সার্টিফিকেট পাওয়া যায়। যাঁদের সময় কম, তাঁরা এখানে সুতাকাটা, বয়ন ও রঞ্জন এই তিন বিষয় চার বছরে শিখতে পারেন। যথা, সুতাকাটা এক বছর, বয়ন এক বছর এবং রঞ্জন দু-বছর। এ ছাড়া এই সব স্কুলেই কার্য্যগত শিক্ষার বন্দোবস্ত আছে। এখানে যে শিক্ষা পাওয়া যায় তাতে আমাদের দেশে সুতাকাটা, কাপড় বোনা কিংবা রঙানোর কাজ বেশ ভাল ভাবে করা যেতে পারে। এই রকম স্পেশ্যাল স্কুলের কয়েকটা নাম নীচে দিলাম।

Höhere Fachschule für Textil-Industrie in Chemnitz. এটি জার্ম্মানীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বয়ন-বিদ্যালয়। কেবল এখানকার বয়নের কোর্স্ দুই বছর।

রঞ্জনের জন্য ক্রেফেল্ড্ শহরের Fachschule বিশ্ব-বিখ্যাত। এ ছাড়া Berlin, München-Gladbach, Zittan, Planen প্রভৃতি শহরেও ফ্যাক্‌শুলে আছে।

জার্ম্মানীতে ইংলণ্ডের মত অত ডিগ্রীর ছড়াছড়ি নেই

এবং এদের কাছে ডিগ্রীর মূল্য নেই বললেও চলে। এদের মাত্র একটা ডিগ্রী আছে, সেটা হচ্ছে ডক্টর; কিন্তু এরা তাতে ডিপ্লোমার চেয়ে বেশী মূল্য দেয় না, কারণ ডিপ্লোমাতেই প্রকৃত শিক্ষা পাওয়া যায়। যে এ-দেশের ডিপ্লোমা পায় তার পক্ষে ডক্টর উপাধি পাওয়া বিশেষ কঠিন নয়।

পরিশেষে জার্মান ভাষা সম্বন্ধে দু-চারটা কথা ব'লে শেষ করতে চাই। এখানে সমস্ত শিক্ষা জার্মান ভাষার সাহায্যে দেওয়া হয়। যিনি জার্মানীতে আসতে চান, তিনি যদি ভারতবর্ষেই ভাষাটা আয়ত্ত করতে পারেন তবে ভাল হয়। জার্মান ভাষা অত্যন্ত শক্ত, ভারতবর্ষে ভাল রকম আয়ত্ত করলেও এখানে প্রথম ছয় মাস বেশ একটু বেগ পেতে হয়।

যাঁরা অত্যন্ত পরিশ্রম করতে পারবেন, তাঁরাই যেন এদেশে আসেন। ইংলণ্ড বা আমেরিকায় অল্প খাটলে চলে, কিন্তু এখানে খুব বেশী খাটা দরকার। সুতরাং যারা শ্রমবিমুখ তাদের জার্মানীতে না আসাই উচিত। অনেক ভারতীয় এখানে শ্রমবিমুখতার জন্য কৃতকার্য্য হ'তে পারেন নাই।

এ ছাড়া যদি কেহ বিশেষভাবে কিছু জানতে চান, তাহ'লে তিনি নিম্নলিখিত ঠিকানায় লিখতে পারেন।

Secretary, Deutsche Akademie,
Maximilianeum, Munich, Germany.

অথবা আমাকেও লিখতে পারেন।

ঠিকানা,— S. C. Roy
C/o Reisebüro Rohn,
Pragerstrasse 30, Dresden, Germany.

রায়রায়ানের দেউল

শ্রীমনোজ বসু

ক্রোশ-দশেকের ভিতর গ্রাম নাই, দিগন্ত-বিসারী পাকুসীর বিল। চৈত্র-বৈশাখেও এখানে-সেখানে পানাভরা জল, খানিকটা বা পাঁক—রাত্রে ঐ সব জায়গায় আলেয়া জ্বলে। তখন মানুষজন কেহ ওদিকে যায় না, যাইবার উপায় থাকে না। সুপারীকাঠের ছোট ছোট নৌকা ও তালের ডোঙা গ্রামের কিনারে ফাঁকায় পড়িয়া পড়িয়া শুকায়।

বর্ষায় ভরা-বিলের আর এক মূর্ত্তি! শোলা, কলমীতলা ও চেঁচো ঘাস জাগিয়া ওঠে; ডোঙা ছুটাছুটি করে হাজারে হাজারে। এ অঞ্চলের লোকের হামেশাই কিজাবাড়ির পথে যাইতে হয়; বিল ঘুরিয়া অতদূর যাইতে হাঙ্গামা অনেক। বর্ষার সময়টা সোজা বিল পাড়ি দিয়া যাওয়ায় বড় সুবিধা।

গ্রাম ছাড়াইয়া ক্রোশ-দুই আগাইলে দেখিতে পাইবে, অনেক দূরে জলের মধ্যে সবুজ সুউচ্চ দ্বীপের মত খানিকটা। তার উপর বড় বড় তালের গাছ আকাশ ফুঁড়িয়া দাঁড়াইয়া আছে। আরও আগাইয়া দেখিবে, ঝোপ-জঙ্গল, ঘরের মটকার মত উঁচু মাটির স্তূপ, মানুষে নাগাল পায় না এমনি অজস্র নলবন বাতাসে বাজিতেছে। সামনে পিছনে ডাহিনে বাঁয়ে সাঁ-সাঁ করিয়া জল কাটিয়া ডোঙা ছুটিতেছে ঠক-ঠক করিয়া কাঠের উপর লগির আওয়াজ...দ্রুত গমনশীল মানুষে মানুষে পলকের জন্য চোখোচোখি...কদাচিৎ দু-এক টুকরা আলাপন। নিঃশব্দতার অতলে কথার ধ্বনি ডুবাইয়া দেখিতে দেখিতে আরোহীগুলি মুহূর্ত্তমধ্যে নলবনের ফাঁকে ফাঁকে বিলুপ্ত হইয়া যায়।

—আস্তে ভাই, সামাল—পাথরে ডোঙার তলা ফাঁসবে!

তাইত বটে! নূতন কেহ ডোঙা চালাইতে আসিলে এমন জায়গায় পাথর দেখিয়া চমকিয়া ওঠে।

—পাহাড় নাকি?

—না, রায়রায়ানের দেউল।

বিলের সে দিকটা একেবারে ফাঁকা, একগাছি ঘাসের আগাও নাই। কিন্তু ভোরের দিকে সেখানে গিয়া পড়িলে আর চোখ ফিরাইবার উপায় থাকে না। সাদা বেগুনী লাল রঙের শাপলা ফুলের মধ্যে পথ হারাইয়া বিভ্রান্ত হইয়া যাইতে হয়।

জলের মধ্যে বড় বড় পাথরে-খোদা ভাঙা-চোরা কত মূর্তি… ময়ূরে সাপ ধরিয়াছে—ময়ূরের ঠোঁট আছে, পা নাই…পদ্মফুল—পাপড়িগুলি ভাঙিয়া থ্যাবড়া হইয়া গিয়াছে…হাত ও নাক ভাঙা, উড়ন্ত অপ্সরী অল্প অল্প মাথা জাগাইয়া আছে।

—আহা-হা, এমন দেউল ভাঙল কে গো?

—রায়রায়ান নিজেই।

এই যে ভাঙা দেউল, এখান হইতে অনেক—অনেক দূরে একটি গ্রাম; সে গ্রামের নাম আজকালকার লোকে বলিতে পারে না। একদিন শেষ রাতে সুন্দরী কাঠের ভরা আসিয়া লাগিল সেই গ্রামের ঘাটে। বর্ষার দুর্গম পথ, টিপটিপ বৃষ্টি পড়িতেছে, বাতাস বহিতেছে। সকলে মানা করিল, রাতটুকু নৌকায় কাটাইয়া সকালবেলা বাড়ি যাইও। রামেশ্বর শুনিল না,—সাত দিন আজ বাড়ি ছাড়া, ঘরে তরুণী বউ। আর মা-বাপ মরা ছোট বৈমাত্রেয় ভাইটি। যাবার বেলা বধূর চোখে জল দেখিয়াছিল, অনেক রকম আবদার ছিল তার। নৌকা খুলিয়া দিয়াও সেদিন রামেশ্বর ভাবিতেছিল—কাজ নাই এই কাঠের ব্যবসা করিতে গিয়া, নামিয়া যাই। ভাবনাকুল মনে ছপ-ছপ ছপ-ছপ দাঁড় ফেলিয়া পুরা আটটি দিন ও সাত রাত্রি আগে তারা গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল।…

পিচ্ছিল পথে আছাড় খাইয়া জলকাদা মাখিয়া অনেক দুঃখে অবশেষে রামেশ্বর বাড়ি আসিল। হঠাৎ চমকাইয়া দিবে এই মতলবে আগে কাহাকেও ডাকিল না, টিপি-টিপি খোড়ো ঘরের দাওয়ায় উঠিল। সবল দুটি বাহু দিয়া নড়বড়ে দরজায় দিবে এইবার প্রচণ্ড ঝাঁকি। ঘুম উড়িয়া গিয়া ঘরের মধ্যে উঠিবে ভয়ার্ত কোলাহল। তারপর বাহির হইতে পরিচিত উচ্চকণ্ঠের হাসি ফাটিয়া পড়িবে। তারপর দীপ জ্বলিবে। তারপর—

দরজায় ঘা দিতে রামেশ্বর হুমড়ি খাইয়া ঘরের ভিতর পড়িল। খোলা দরজা। কেহ নাই। বউকে আর কি বলিয়া ডাকিবে, অন্ধকারে ভাইটির নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিল—মধুকর, মধুকর!…

সে রাত্রি কাটিয়া দিন আসিল। এবং মধুকরেরও খোঁজ হইল; জ্ঞাতিসম্পর্কের এক খুড়া তাহাকে বাড়িতে লইয়া রাখিয়াছেন। খোঁজ হইল না কেবল বধূটির, যাবার দিন বড় কান্না কাঁদিয়া যে বিদায় দিয়াছিল। তারপর দু-দিন ধরিয়া গ্রামের মঙ্গলার্থীরা দলের পর দল অফুরন্ত উৎসাহে রামেশ্বরকে সমবেদনা জানাইয়া যাইতে লাগিলেন। বড় অসহ্য হইল। আবার এক রাত্রিশেষে পাঁচ বছরের ভাইটির ঘুম ভাঙাইয়া রামেশ্বর তাহাকে কাঁধে তুলিল, দীর্ঘ লাঠি গাছটি লইয়া তারার অস্পষ্ট আলোকে সাঁকোর উপর দিয়া সে চোরের মত গ্রাম-নদীটি পার হইয়া গেল। মনের ঘৃণায় দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

কুড়ি বছর পরে ঘোড়ায় চড়িয়া লোকজন সৈন্যসামন্ত লইয়া ফিরিয়া আসিলেন রায়রায়ান রামেশ্বর। আজমীরের এক বৃদ্ধ সেনানীর বুকে ছুরি মারিয়া ঘোড়াটি কাড়িয়া আনা; নাম তার কুণ্ডল,—সে কি ঘোড়া!—এক তাল উঁচু, ছুটিবার সময় যেন বাতাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলে। এই কুড়ি বছর রামেশ্বর ভাগ্যের সঙ্গে অবিরাম লড়াই করিয়াছেন, কপালের উপর বঙ্কিম বলিরেখায় অবোধ্য অক্ষরে সেই সব দিনের কত কি ভয়ঙ্কর কাহিনী লেখা রহিয়াছে। রায়রায়ান জায়গীর লইয়া আসিয়াছেন, সেই জায়গীরের দখল লইয়া প্রথমেই বাধিল ভরত রায়ের সঙ্গে।

ভদ্রার দক্ষিণ পারে খালের মুখে ভরতগড়। কিল্লাবাড়ি হইতে ফৌজদারের কামান আনিয়া প্রাকারের ধারে বসানো হইয়াছে। প্রথম দু-দিন খুব তোপ দাগা হইয়াছিল। এখন চুপচাপ। ভরত রায়ের লোক প্রাকারের মুখ কাটিয়া দিয়াছে, গড়ের চারিদিক নদীর জলে কানায় কানায় ভর্তি। ভিতরে কি একটা কাণ্ড চলিয়াছে, কিন্তু বাহির হইতে তাহার একবিন্দু আঁচ পাইবার যো নাই।

সে দিন বড় অন্ধকার রাত্রি। রায়রায়ানের ঘুম নাই। শিবির হইতে খানিকটা দূরে ভদ্রার কূলে আপনার মনে পায়চারি করিতেছেন। হঠাৎ খস্-খস্-খস্ — রায়রায়ানের কান খাড়া হইয়া উঠিল, কেয়া-ঝাড়ের ভিতরে অতিশয় ক্ষীণ যৎসামান্য আওয়াজ। প্রবল জোয়ারের টান

তাহাতে যে ঐ শব্দটুকু না হইতে পারে এমন নয়। রামেশ্বরের তবু সন্দেহ হইল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বিসারিত করিয়া দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন—ঠিক! কেয়া-জঙ্গলের নিবিড় ছায়ার মধ্যে আগাগোড়া আবৃত করিয়া একখানা বজরা অতি চুপি-চুপি উজান ঠেলিয়া যাইতেছে। কাহাকেও ডাকিলেন না, নিজের বিপদের আশঙ্কা মনে হইল না, ঐ দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তিনি আগাইতে লাগিলেন। পরিখার মুখে আসিয়া পথ আটকাইল। সেখান হইতে দেখিতে লাগিলেন,—চোখ অন্ধকারে জ্বলিতে লাগিল—দেখিলেন, নৌকা নিঃশব্দে গড়ের পিছনে সঙ্কীর্ণ নালার মুখে আসিয়া লাগিল; সঙ্গে সঙ্গেই কয়টি সাদা পুঁটলী নালায় গড়াইয়া আসিয়া নৌকায় পড়িল আর চক্ষের পলক ফেলিতে না ফেলিতে নৌকা পাক খাইয়া সুতীব্র জলস্রোতে বিদ্যুতের বেগে অদৃশ্য হইয়া গেল।

রায়রায়ান ছুটিতে ছুটিতে তাঁবুর দিকে ফিরিলেন। খানিকটা দূরে একটি কেওড়া গুঁড়িতে ঠেশ দিয়া মধুকর মৃদুস্বরে বাঁশী বাজাইতেছিল; বড় মধুর বাঁশী বাজায় সে। দ্রুত পদশব্দে চমকিয়া তার হাতের বাঁশী পড়িয়া গেল; নিঃশব্দে মধুকর দাদার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

—চলো—

—কোথায়?

—রাণায়ের মোহানায়।

রাণায়ের মোহানা ক্রোশ পনের ষোল দূর। গাঙটা সেখানে চারিমুখ হইয়া গিয়াছে। ভরত রায়ের সঙ্গে দেবগঞ্জার চাকলাদারের সম্প্রীতি খুব বেশী; নৌকা যদি সে দিকে যায় তবে রাণাই হইতে ডাহিনে মোড় ঘুরিবে। স্থল-পথে আগে গিয়া সেখানে ঘাটি দেওয়া দরকার।

মুহূর্ত্ত মধ্যে আটজন ঢালীসৈন্য প্রস্তুত হইয়া মাঠের প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল। অশান্ত কুণ্ডল মাটির উপর খুর দাপাইতে লাগিয়াছে। এতক্ষণে রায়রায়ানের মুখে হাসি ফুটিল। ঘোড়ার কাঁধে করাঘাত করিয়া বলিলেন—থাম্—থাম্ বেটা, সবুর সয়না বুঝি···আচ্ছা, আমি চললাম আগে আগে, তোমরা এস শিগগীর—

মাঠ ভাঙিয়া কুণ্ডল ছুটিল।

নদীকূলে ঘোড়া ছাড়িয়া দিয়া রামেশ্বর মোহানার মুখে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। মধুকরেরা পৌঁছিল যখন কৃষ্ণাদশমীর চাঁদ দেখা দিয়াছে। নিষুপ্ত জেলেপাড়া, ঘাটে অগণিত ডিঙা বাঁধা। এক একটা ডিঙার ছইয়ের মধ্যে সকলে প্রস্তুত হইয়া বসিলেন। রাত্রি শেষ হইয়াছে, ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা জ্যোৎস্না—সেই সময়ে জলের উপর বজরার ছায়ামূর্ত্তি দেখা দিতেই—গুড়ুম!

বজরা হইতেও জবাব আসিল। তীরের উপর গাছে গাছে পাখীরা ত্রস্ত হইয়া কলরব সুরু করিয়াছে। অকস্মাৎ অনেকগুলি কণ্ঠের আর্ত্তনাদ···ঝপ-ঝপ শব্দে মাঝনদীর জল ছিটকাইয়া উঠিল...বজরা চরকীর মত পাক খাইতে লাগিল। রামেশ্বর তীব্র আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—হাসিল্!

দশটি ডিঙা সকল দিক হইতে বজরা ঘিরিয়া ধরিল। জল রক্তে রাঙা হইয়া গিয়াছে। একটি শবের কাল চুল জলের টানে একবার ভাসিয়া সেই মুহূর্ত্তে অতলে তলাইয়া গেল। মাল্লা কয়জন গলুয়ে পড়িয়া কাতরাইতেছে। মধুকর লাফাইয়া ভিতরে ঢুকিল, ক্ষণপরে বাহির হইল ছোট একটি তোরঙ্গ লইয়া।

—সমস্ত এই?

মধুকর বলিল,—হাঁ দাদা, তন্নতন্ন ক'রে খুঁজে দেখেছি—আর কিছু নেই—

—এস দিকি।

রামেশ্বরও ঢুকিতে যাইতেছিলেন, ইঙ্গিতে মধুকর নিরস্ত করিল। মৃদুকণ্ঠে বলিল—ওর মধ্যে রয়েছেন ভরত রায়ের স্ত্রী-কন্যা আর গড়ের আরও জন পাঁচ-সাত মেয়েলোক—

বজ্রকণ্ঠে রামেশ্বর বলিলেন—ডাক দেও পুরুষলোক যে আছে—

মধুকর বলিল, পুরুষ কেউ নেই। ভরতের মেজ ছেলে ওঁদের নিয়ে পালাচ্ছিলেন, তিনি ঘায়েল হয়ে ভেসে গেছেন। ভয়ে সকলে এখন মড়ার মত। আপনি আর যাবেন না ও-দিকে।

মুহূর্ত্তকাল ভাবিয়া রায়রায়ান কূলে নামিয়া আসিলেন। একজনকে বলিলেন—খোল ত তোরঙ্গ; দেখি, আমাদের ছোট রায় কি নিয়ে এলেন—

ডালা তুলিতেই মণিমুক্তা ঝকমক করিয়া উঠিল। খুশীমুখে মধুকরের পিঠে থাবা দিয়া রামেশ্বর বলিলেন—বেশ, বেশ...

এবারে তুমি নিজে রামনগর চলে যাও—তোরজঙ্গুদ্ধ দেওয়ানজীর হাতে দাও গিয়ে—গড়ের কাজে টাকার অভাব আর হবে না। আর এঁরা থাকবেন বন্দীশালায়—কোন অসুবিধা না হয়, দেখবে—

মনের আনন্দে রামেশ্বর কুণ্ডলের পিঠে গিয়া বসিলেন।

সেই দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বেই রায়রায়ানের গোলায় ভরতগড় ধ্বসিয়া চুরমার হইয়া গেল; সেদিক দিয়া না আসিল কোন প্রতিবাদ, না পাওয়া গেল একটা মানুষের সাড়াশব্দ। অনেক কষ্টে পরিখা পার হইয়া সৈন্তেরা গড়ে ঢুকিয়া দেখে, যা ভাবা গিয়াছিল তা-ই—সকলেই পলাইয়াছে, জিনিষ-পত্র কিছুই পড়িয়া নাই, বারুদখানায় পয়ঃপ্রণালী খুলিয়া দিয়া খালের জল তোলা হইয়াছে, গড়ের শূন্য কক্ষগুলি খাঁ-খাঁ করিতেছে।

বিজয়োল্লাসে রামেশ্বর রামনগর ফিরিয়া চলিলেন।

নিজ নামে নগরের পত্তন মাত্র হইয়াছে, যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্যে কাজ বড় বেশী অগ্রসর হইতে পায় নাই। অসমাপ্ত চত্বরের প্রান্তে অতি প্রাচীন একটা বকুল গাছ। শ্রান্ত রামেশ্বর অপরাহ্ণ বেলায় প্রাসাদকক্ষ হইতে নবনির্ম্মিত নগরীর দিকে অলস দৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিলেন, অকস্মাৎ চমকিয়া উঠিলেন। দেখিলেন, চত্বরের প্রান্তে বকুলের ছায়াচ্ছন্ন তলদেশে অপ্সরীর মত লঘুগামিনী বড় রূপসী একটি মেয়ে। মধুকর কি কাজে সেইখানে আসিয়াছিল, রায়রায়ান জিজ্ঞাসা করিলেন—কে ও-টি?

—ভরত রায়ের মেয়ে।

রামেশ্বর ভাইয়ের দিকে তাকাইলেন, মুখের উপর দিয়া কৌতুক-হাস্য মৃদু খেলিয়া গেল। বলিলেন—বন্দীশালায় বন্দীদের রাখবার নিয়ম।—এ কি করেছ?

কিন্তু নিয়ম হইলেও এ ছাড়া যে অন্য উপায় ছিল না, মধুকর প্রাণপণে তাহা বুঝাইতে লাগিল। কারণ, বন্দী-শালাটা ঠিক নিরাপদ নয়...তা ছাড়া সেখানে থাকার অসংখ্য অসুবিধা...এমন অসুবিধা যে রাখাই চলে না...

রামেশ্বর তবু মৃদু মৃদু হাসিতেছেন দেখিয়া আরও বিব্রত ভাবে মধুকর বলিল—আপনি দেখেন নি তাই। দেখতেন যদি—সে যে কি ভয়ানক কান্নাকাটি—

—কান্নাকাটি? খুব ভয়ানক? রামেশ্বর সহসা সোজা হইয়া বসিলেন, মুখের কৌতুক হাস্য নিবিল, চোখ জল্-জল্ করিয়া উঠিল। ম্লান অপরাহ্ণ-আলোয় রহস্যাচ্ছন্ন অর্দ্ধসমাপ্ত বিস্তীর্ণ নগরী...পশ্চিমে মাঠের প্রান্তে রক্তিম আভা বিলের জলে ডগমগ করিতেছে...দূরে, আরও দূরে সীমাহীন নিবিড় অরণ্যশ্রেণী।..বিশ বছর আগেকার একটি গরিব খোড়ো ঘর অকস্মাৎ রায়রায়ানের চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল। ঘরের মধ্যে বিদায়যাত্রার আয়োজন, কথা নাই,—নির্ব্বাক বিদায়-চিত্র। ঘাটে সুন্দরী-কাঠ আনিবার নৌকা প্রস্তুত হইয়া ডাকাডাকি করিতেছে, ঘরের মধ্যে একটি কথা নাই, চোখ ভরিয়া গৌর গাল দুটি বহিয়া জল আসে, মুছাইয়া দিলে তখনই আবার ভরা চোখ...অফুরন্ত, বাধা দিয়া ঠেকাইবার জো নাই।...

সহসা হা-হা-হা করিয়া যেন স্বপ্ন ভাঙিয়া রায়রায়ান হাসিয়া উঠিলেন। হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন—ভরত রায়ের মেয়েটাকে দেখতে কেমন মধুকর?

মুখ লাল করিয়া অন্য দিকে চাহিয়া মধুকর কোন প্রকারে জবাব দিল—ভাল। তাড়াতাড়ি সে বাহির হইয়া গেল।

ভাইয়ের গমন-পথের দিকে গভীর স্নেহে তাকাইয়া রায়-রায়ান মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। কিশোর বয়সের ইহাদের এই পাগলামী বড় মিঠা লাগে। মধুকর চলিয়া গেলেও অনেকক্ষণ হাসি পাইতে লাগিল।

প্রাঙ্গণের কাছাকাছি একদিন মেয়েটার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হইয়া গেল। সে একাকী দিকপ্রান্তে একাগ্র চোখে তাকাইয়া ছিল।

—তুমি কে?

গম্ভীর কণ্ঠে মুখ ফিরাইয়া থতমত খাইয়া মেয়েটি বলিল—আমার নাম মঞ্জরী।

রায়রায়ান বলিলেন,—তুমি ত ভরত রায়ের মেয়ে। শুনেছ বোধ হয়, তোমাদের গড়ের ভিতর অবধি ঘুরে এসেছি।

কিন্তু অদৃষ্ট খারাপ, রায় মহাশয়ের দেখা পাই নি। বলতে পার, তিনি কোথায়?

আত্ম-গৌরবে রামেশ্বর যেন ফাটিয়া পড়িতে লাগিলেন। বলিলেন—চুপ ক'রে চোখ নীচু ক'রে রইলে বড়। জবাব দাও। গরজ আমারই। বীরবরের ঠিকানাটা পেলে তোমাদের বোঝা নামিয়ে অব্যাহতি পাই। ভয় নেই গো—আমরা কেউ যাচ্ছি না। খালি তোমাদের পাল্কী ক'রে পাঠাবো—

নিষ্ঠুর বিদ্রূপে মঞ্জরীর চোখ জ্বালা করিয়া জল আসিল। সুন্দরীর চোখের জল বড় পরিতৃপ্তির সঙ্গে রায়রায়ান উপভোগ করিতে লাগিলেন। বলিলেন—রাগ ক'রো না। ভাগ্যিস আমাদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, না হ'লে কোথায় আশ্রয় পেতে বল দিকি?

—ভদ্রার জলে।

কুমারী মুখ তুলিল। অশ্রুভরা চোখ যেন জ্বলিতেছে। বলিতে লাগিল—ভদ্রার জলে আশ্রয় হ'ত রায়রায়ান,—সে হ'ত ভাল আশ্রয়। আগে ত বুঝতে পারি নি যে আপনি—

রামেশ্বর দীর্ঘকাল ধরিয়া হাসিতে লাগিলেন। ব্যঙ্গের সুরে বলিলেন—কিছুই বুঝতে পার নি? দেওড় শুনে কি ভাবলে বল ত? ভাবলে, শ্বশুরবাড়ি থেকে ঘোড়া-পাল্কী নিয়ে মানুষ এসেছে—পটকা ছুঁড়ছে না?

মঞ্জরী বলিল—ভেবেছিলাম, জোলো ডাকাত। ঘুণাক্ষরে আপনাকে সন্দেহ হয় নি। তারপর চোখ মুছিয়া দৃপ্তকণ্ঠে কহিতে লাগিল—রায়রায়ান, আপনার সমস্ত খবর দেশের লোকে জানে। চিরকাল আপনাকে একঘরে হয়ে থাকতে হবে—ভেবেছেন কি? মিছামিছি এত জাঁক ক'রে এই সব গড় করছেন। আপনার ঐ গড়খাইয়ের জলে ডুবে মরা উচিত—

মেয়েটির দুঃসাহসে রায়রায়ান স্তম্ভিত হইলেন। কিন্তু তুচ্ছতম প্রতিপক্ষের সামনে হঠাৎ রাগ দেখাইবার ব্যক্তি তিনি নহেন। বরঞ্চ আঘাত যে যথাস্থানে গিয়া বাজিয়াছে, তাহাতে বড় আনন্দ হইল। সহাস্য নেত্রে তেমনি চাহিয়া বলিলেন—বটে!

মঞ্জরী বলিতে লাগিল—এই জায়গীর কেমন ক'রে আপনি নিয়ে এসেছেন,—লোকে সমস্ত জানে। চাকলাদারেরা আপনাকে ঘৃণা করে, তারা কোনও দিন আপনাকে দলে নেবে না। তারা সব চাকলা গড়েছে গায়ের জোরে, আমীর-ওমরাহের ঘরে মেয়েলোক ভেট পাঠিয়ে নয়—

—ভাল, ভাল—বলিয়া মৃদু হাসিয়া নির্লিপ্তভাবে রামেশ্বর ফিরিয়া চলিলেন। কয়েক পা গিয়া মুখ ফিরাইয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—সুন্দরী, তোমাকেও তবে একটা সুখবর দিয়ে যাই। আমীর-ওমরাদের ঘরে তুমিও যাবে, দুঃখ নেই, আমি কোন পক্ষপাত করি নে।

অবনতমুখী পাষাণ প্রতিমার ন্যায় শুনিতে লাগিল।

রামেশ্বর বলিতে লাগিলেন—সুখে থাকবে। বুঝলে? আগামী বুধবার যেতে হবে—প্রস্তুত থেকো।

কিন্তু ঐ মুখের কথাই। বুধবার তারপর দু-তিনটা কাটিয়া গেল, কিন্তু কোথায় বা রামেশ্বর আর কোথায় তাঁহার সেই যাওয়ার আয়োজন।...মানুষ ও পশু পাশাপাশি খাটিয়া দিনের পর দিন নগর গড়িয়া তুলিতেছে। বড় বড় নৌকায় দেশ-বিদেশের কাঠপাথর আসিয়া জড় হইতেছে, সেই পাথর ভাঙার শব্দ, করাতে কাঠ চিরিবার শব্দ।...আজ কোথায় নূতন একটা স্তম্ভ উঠিতেছে, এই কোন্‌দিকে কি একটা ধ্বসিয়া পড়িল লোকজন কাতারে কাতারে ছুটিতেছে—তাড়া খাইয়া আবার উল্টা দিকে ছুটিতে লাগিল।...দীর্ঘদিন কোন্ দিক দিয়া কাটিয়া সন্ধ্যা হইয়া যায়, রাত্রির অন্ধকার গভীর হইতে গভীরতর হয়, তখন শত শত কামারশালায় জ্বলন্ত হাপরের পাশে হাতুড়ীর ঘায়ে লোহার উপর আগুনের ফুলকি উড়িতে থাকে, হাতুড়ী বাজে ঠঙ্ ঠঙ্ ঠঙ্—

দেওয়ান জীবনলালের উপর জায়গীর ও গড় তৈরির সমস্ত ভার। তাঁর তিলার্দ্ধ বিশ্রাম নাই। জায়গীরের বিধি-ব্যবস্থা তবু কতক কতক হইয়াছে, কিন্তু গড়ের কাজ কবে যে মিটিবে, সে এক বিশ্বকর্ম্মা ছাড়া কেহ বলিতে পারে না। রাত্রে শুইয়া শুইয়া জীবনলালের মাথায় নূতন নূতন মতলব জাগে। পরিখা খোঁড়া হইয়াছে,—তার ওদিকে উঠিবে আকাশভেদী প্রাচীর, চারিদিকে চারিটি

সিংদরজা, দুর্গদ্বার হইতে চারিটি রাস্তা সোজা সিংদরজা ফুঁড়িয়া পরিখার সেতুর উপর পৌঁছিবে। গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত ভাবিয়া ভাবিয়া জীবনলাল মতলব খাড়া করেন; দিনের কাজকর্ম্মের শেষে প্রসন্নচোখে তাকাইয়া তাকাইয়া দেখেন, সুন্দর সুবৃহৎ রাজধানী আকাশের নীচে ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া উঠিতেছে।

নগরে ফিরিয়া ক'দিন অল্পকিছু বিশ্রাম লইয়া রায়রায়ানও এই-সব কাজের মধ্যে একেবারে ডুবিয়া গেছেন। খুব ভোরবেলা ঘড়াং করিয়া দরজা খুলিবার মুখে এক একদিন একটু আধটু তাঁহার গলার আওয়াজ পাওয়া যায়। বন্দিনীদের পাঠাইয়া দিবার তখনও কোন উপায় হয় নাই। মধুকর তাঁহাদের তদারক করে, সমস্ত দিন সেপ্রায় এই-সব লইয়া থাকে; তারপর গভীর রাত্রে সকলে শুইয়া পড়িলে অনেকক্ষণ অবধি নির্জ্জন অলিন্দে বসিয়া আপনার মনে বাঁশী বাজায়। সে সময়ে ঘুম-ভাঙা শয্যায় রামেশ্বরেরও এক একদিন মনে হয় তাঁহার বড় যত্নে বড় কঠিন শ্রমে গড়া নগরীর উপর মধুকরের বাঁশী নিষুপ্ত রাত্রে মাঠের দিগন্ত হইতে স্বপ্ন-কুহকিনীদের ডাকিয়া আনিতেছে।

একদিন নির্জ্জনে রামেশ্বর হঠাৎ আসিয়া মঞ্জরীর সামনে দাঁড়াইলেন।

—শোন—

সপ্রশ্নদৃষ্টিতে মঞ্জরী চাহিল।

এক মুহূর্ত্ত থামিয়া রামেশ্বর বলিতে লাগিলেন—সেদিন আমার সম্বন্ধে তুমি মিথ্যা অভিযোগ করছিলে। ও সব শত্রুদের রটনা।

এ কয়দিনে মঞ্জরী অনেক বুঝিয়াছে, চোখের জল একেবারে মুছিয়া ফেলিয়াছে। কৌতুক-চঞ্চল চোখ দু'টি নাচাইয়া সে চলিয়া যাইতেছিল। বাধা দিয়া রামেশ্বর বলিয়া উঠিলেন—বিশ্বাস করলে কি-না, বলে যাও—

মঞ্জরী কহিল—এ সাফাই-এর দরকার কি রায়রায়ান, আমি ত আপনার বিচারক নই—

রায়রায়ান বলিলেন—তুমি আমায় বিয়ে কর—

খিল খিল করিয়া মঞ্জরী হাসিয়া উঠিল। অনেকক্ষণ চাপিয়াছিল, আর পারিল না।

ক্রুদ্ধ হইয়া রামেশ্বর বলিলেন—তোমাকে আজই দিল্লী পাঠাতে পারি—জান? আর তার অর্থ কি, তা-ও বোধ হয় বোঝাতে হবে না—

—পারেন তা? বলিয়া চোখে মুখে হাসির দীপ্তি তুলিয়া তাঁহাকে নিতান্ত অগ্রাহ্য করিয়া প্রগল্‌ভা তরুণী চলিয়া গেল।

ইহার পর প্রায়ই দেখা হইতে লাগিল। দেখিলেই মঞ্জরী হাসিয়া পলাইত। একদিন রামেশ্বর তাহার হাত ধরিয়া ফেলিলেন। তখনই ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন—জোর করবার শক্তি আছে মঞ্জরী, কিন্তু মন তা চায় না। বলিতে বলিতে গলার স্বর ভারী হইয়া উঠিল,—এ যেন সে লোক নয়—সজল-কণ্ঠে রামেশ্বর বলিলেন—আমার জীবনের খবর তুমি জান না ...কিন্তু আর এই যুদ্ধবিগ্রহ ভাল লাগে না, এখন শান্তিতে একটুখানি মাথা গুঁজে থাকতে চাই—

মঞ্জরী শান্তভাবে শুনিতে লাগিল, পলাইবার চেষ্টা করিল না। রায়রায়ান বিশ বছরের কাহিনী বলিয়া চলিলেন। সমস্ত বলিয়া গভীর নিঃশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিলেন। ধীরে ধীরে মঞ্জরী চলিয়া গেল।

বিকালবেলা মঞ্জরী একখানা আয়না পাঠাইয়া দিল। সেই সঙ্গে ছোট্ট একটু চিঠি—

তারপরে যে বিশ বৎসর কেটে গেছে, রায়রায়ান। যুদ্ধ-বিগ্রহে ব্যস্ত ছিলেন, সম্ভবতঃ আয়নায় চেহারা দেখবার ফুরস হয়নি। তাই একটা আয়না পাঠিয়ে দিলাম।

চিঠি পড়িয়া রামেশ্বর অনেকক্ষণ গুম হইয়া রহিলেন। ভ্রূকুটি-ভীষণ মুখে শুধু বলিলেন—আচ্ছা!

ভরতগড়ের রাণীর কানে পৌঁছিল, তাঁর দুরন্ত মেয়ে রায়রায়ানের সঙ্গে একটা কাণ্ড করিয়া বসিয়াছে। এবারে রায়রায়ানের প্রতিহিংসা। ইহা যে কি বস্তু, রামেশ্বর অল্পদিন দেশে আসিয়াছেন তবু চাকলাদারের ঘরের শিশুটি অবধি তাহা বুঝিয়া ফেলিয়াছে। সকলের আহার-নিদ্রা বন্ধ হইল। কিন্তু যাহাকে লইয়া এতবড় ব্যাপার, সে দিন-রাত দিব্য হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল।

ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া সেই চিঠি শতকুটি করিয়া ফেলিয়াও রায়রায়ানের রাগ মিটে না। তারপর এক সময়ে সত্যসত্যই তিনি

আয়না দেখিতে বসিলেন। কুড়ি বছর ভাগ্যের সঙ্গে নিদারুণ লড়াই হইয়াছে, সর্ব্বাঙ্গে তার প্রতিটি আঘাতের চিহ্ন। সমস্ত মাথার মধ্যে একটি কালো চুল নাই, মুখের উপর যে ছায়া পড়িয়াছে তাহা দেখিয়া নিজেরই প্রাণ আতঙ্কে কাঁপিয়া ওঠে, এ তরুণী ব্যঙ্গ করিবে ছাড়া আর কি? বিশ বছর আগে বেদনাবিদ্ধ যে যুবক গৃহত্যাগ করিয়াছিল, তাহার একবিন্দু চেহারা আর খুঁজিয়া পাইবার উপায় নাই। সাদাচুলের রাশি দুই হাতে ঢাকিয়া ধরিয়া আয়নার সম্মুখে বসিয়া রামেশ্বর সেই সব দিনের কথা ভাবিতে লাগিলেন।

অকস্মাৎ সমস্ত রামনগর চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। পথে দু-জন লোক একত্র হইলেই একটিমাত্র কথা। একজন যাত্রীকে হীরার আংটি বকশিস দিয়া ভরতগড়ের রাণী বৃত্তান্ত শুনিলেন। শুনিয়া বুকের রক্তে ফুল রাঙাইয়া শ্মশানকালীর পূজার জন্য গোপনে পাঠাইয়া দিলেন। ভরত রায় অগ্রবর্ত্তী, সঙ্গে আরও চারি জন চাকলাদার; সকলে মিলিয়া রামনগর ধ্বংস করিতে আসিতেছেন। সৈন্য আসিয়া দুই ক্রোশের মধ্যে ঘাটি দিয়া বসিয়াছে।

অলিন্দে সেদিন আর মধুকরের বাঁশী বাজিতেছে না, সেইখানে গুপ্তমন্ত্রণা বসিয়াছে।

মধুকর শত্রু-শিবির আক্রমণ করিতে চায়। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, আকাশে চাঁদ উঠে নাই; মধুকর জেদ ধরিয়াছে— এই আঁধারে আঁধারে নিঃসাড়ে দলবল লইয়া শত্রুশিবিরে ঝাঁপাইয়া পড়িবে।

রামেশ্বর মাথা নাড়িলেন। অসম্ভব, একেবারে অযৌক্তিক কথা। পাঁচ চাকলাদারের সমগ্র শক্তি সমবেত হইয়াছে, তার সামনে রায়রায়ানের নব-নিযুক্ত ঢালির দল কয়টি বানের মুখে একেবারে কুটার মত ভাসিয়া চলিয়া যাইবে।

পদশব্দ।—কে? এতক্ষণে দেওয়ান জীবনলাল আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। জীবনলাল দৌত্যে গিয়াছিলেন, হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া খবর বলিতে লাগিলেন, দেবগজার চাকলাদার বলিয়া পাঠাইয়াছেন—সকলের আগে ভরত রায়ের পুরমহিলাদের সসম্মানে পাঠাইয়া দিতে হইবে। তাঁরা গিয়া যদি বলেন, কোন দুর্ব্যবহার হয় নাই, সন্ধির বিবেচনা তারপর—

মধুকর লাফাইয়া উঠিল—কাজ নেই, দাদা। ওঁদের পাঠানো হবে না। আমি সর্দ্দারদের ডাকি।

কিন্তু ইহা কাজের কথা নয়। রামেশ্বর ভাইকে শান্ত করিয়া বসাইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—দেওয়ানজী, গড়ের বাকী কত?

জীবনলাল বলিল—শেষ হ'তে অন্ততঃ আরও ছ-মাস। তখন পাঁচটা কেন পঞ্চাশটা চাকলাদার এলেও পিছু হটব না। কিন্তু এখন যা বলে মেনে নিতে হবে।

মধুকর গর্জ্জিয়া উঠিল—এই অপমান?

—উপায় নেই। বলিয়া জীবনলাল ম্লান হাসিল। বলিল— চোখের সামনে এই-সব ভেঙে ছারখার করবে—এ ত আমি বেঁচে থেকে দেখতে পারব না, রায়রায়ান।

মধুকর খানিক চুপ করিয়া বলিল—বেশ। কিন্তু হাঙ্গামার মধ্যে যাবার আগে গড়ের বন্দোবস্ত শেষ ক'রে ফেলা উচিত ছিল না কি? ওরা আসবে—এ ত জানা কথা

এবারে রামেশ্বর কথা কহিলেন। বলিলেন—জানা কথা কি বলছ মধুকর, এ ত স্বপ্নেও ভাবা যায় নি। চাকলাদারেরা চিরদিন নিজেদের মধ্যে লাঠালাঠি ক'রে আসছে। আজকেই কেবল এক হ'ল। এরা মতলব করেছে, সুবে বাংলায় আর নতুন জায়গীরদার ঢুকতে দেবে না।

জীবনলাল কহিল—আর ভরত রায়ও নানা মিথ্যে রটনা করেছে। স্ত্রী-কন্যা বেইজ্জৎ হয়েছে ব'লে সকলের কাছে কেঁদে কেঁদে বেড়িয়েছে।

মধুকর শেষ প্রস্তাব করিল—তবে আমরা পালাই। ভরতকে জব্দ করব। মেয়েদের নিয়ে ঢাকার দিকে চলে যাই—

জীবনলালের তাহাতেও মহা আপত্তি। বলিল—সে হয় না। তাহলে মানুষ না পেয়ে আক্রোশ গিয়ে পড়বে রামনগরের উপর। সমস্ত শ্মশান হয়ে যাবে। এবারে সন্ধি হোক। আমি কথা দিচ্ছি, ছোট রায়, ছ-মাস পরে দশগুণ শোধ তুলব—

আরও অনেকক্ষণ ধরিয়া অনেক জল্পনার পর রামেশ্বর সকালবেলায় শিবিকার ব্যবস্থা করিতে হুকুম দিলেন।

চত্বরের প্রান্তে বহুপ্রাচীন শাখাবহুল সেই বকুল গাছ,

ফুল ঝরিয়া ঝরিয়া বাতাসকে গন্ধমধুর করিতেছে! তাহারই ছায়াতলে দাঁড়াইয়া রায়রায়ান নিঃশব্দে বিদায়-যাত্রা দেখিতেছিলেন। সবুজ কিংখাবে মোড়া হাঙর-মুখো ঝাঝের ঝালরদার শিবিকাখানি—ঐটি মঞ্জরীর। রামেশ্বর একাকী দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন, হঠাৎ নূপুরের শব্দে পিছনে তাকাইলেন। মঞ্জরী রূপে অলঙ্কারে বেশের পারিপাট্যে ঝলমল করিয়া আসিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইল।

রায়রায়ানের মুখ কালিবর্ণ হইয়া গেল। ইহারা আজ বিজয়ী; তরুণীর মুখে-চোখে সেই অহঙ্কার যেন ফুটিয়া পড়িতেছে। মৃদুস্বরে মঞ্জরী বলিল—যাচ্ছি—

রামেশ্বর অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া রহিলেন। মঞ্জরী বলিতে লাগিল—আপনাদের যত্নে বড় সুখে ছিলাম! আপনাদের আতিথ্যের কথা বাবাকে বলব—

স্বরটা রায়রায়ানের কাছে ব্যঙ্গের মত ঠেকিল। রূঢ় স্বরে জবাব দিলেন—বেশ, ব'লো—একটা কথাও বাদ দিও না। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল। বলিতে লাগিলেন—আমার ইচ্ছে হচ্ছে কি—ডিঙায় ক'রে তোমাদের ভদ্রার মাঝখানে নিয়ে গিয়ে দিই তলা ফুটো ক'রে। ছটফট ক'রে ডুবে মর। কিন্তু সে ত হবার জো নেই, মধুকর আর জীবনলালের জ্বালায়—

সহসা মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন,—হয়ত বুঝিবার ভুল হইয়াছে—মঞ্জরী দু'টি আয়ত চোখের গভীর দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চাহিয়া আছে। চোখের কোণে অশ্রু টলমল করিতেছে। ঝর ঝর করিয়া সেই অশ্রু গণ্ড বহিয়া ঝরিতে লাগিল। রামেশ্বর সেই দিকে চাহিয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর ম্লান হাসিয়া বলিতে লাগিলেন—তুমি গিয়ে স্বচ্ছন্দে সব কথা বলতে পার। এই-সব অট্টালিকা জায়গীর স্বপ্নের মত এসেছে—আবার যদি চলে যায় আমার কিছু ক্ষতি হবে না।

রাজকন্যা তাড়াতাড়ি হেঁট হইয়া রায়রায়ানের পদধূলি লইল। বলিল—আমি সমস্ত শুনেছি। এই রাজ্যপাট আপনার বীরত্বের ইনাম। ইচ্ছে হ'লে এর চতুর্গুণ এখনই আজকেই আবার আপনি তৈরি করতে পারেন—

রামেশ্বর ম্লান হাসিয়া মাথার পলিত কেশের উপর হাত বুলাইতে লাগিলেন। বলিলেন—আর পারিনে। কুড়ি বছর পরে আয়নায় দেখলাম—সত্যিই বুড়ো হয়ে গিয়েছি; দেহে বল নেই, মনেও বল নেই।...এখন এ-সব শেষ ক'রে গরিবের ছেলে হয়ে আবার খোড়ো ঘরে যেতে ইচ্ছে হয়। তোমায় আমি দিল্লী পাঠাচ্ছিলাম—আরও কত অত্যাচার হয়েছে হয়ত—আমার সমস্ত অপরাধ তোমার বাবাকে ব'লো, মঞ্জরী—

মঞ্জরী দৃঢ়কণ্ঠে বলিল—মিথ্যা বলব কেন?

রামেশ্বর অবাক হইয়া চাহিলেন। মঞ্জরী বলিতে লাগিল—দিল্লীতে কখনও আপনি পাঠাতেন না, সে আমি জানি। আপনার মনের কথা সমস্ত জানি আমি। যাবার বেলায় তাই প্রণাম করতে এলাম।

বলিতে বলিতে সে থামিল। মুখের উপর এক ঝলক রক্ত নামিয়া আসিল। জোর করিয়া সঙ্কোচ কাটাইয়া বলিতে লাগিল—বাবা এবার অনেক আয়োজন ক'রে এসেছেন, আমি না গেলে অনর্থ হবে। আমি তাই ফিরে যাচ্ছি। আপনার রাজধানী গড় নাওয়ারা—সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক ক'রে আমাকে নিয়ে আসবেন। তাই বলতে এলাম।

—নিয়ে আসবো? সম্মোহিত দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া রামেশ্বর ধীরে ধীরে মাথা নাড়িতে লাগিলেন। বলিলেন—তুমি কি সত্যি কথা বলছ? আমি বুড়ো হয়ে গেছি, মন বড় দুর্ব্বল মঞ্জরী।

মঞ্জরী রায়রায়ানের দুই পায়ের মধ্যে মাথা গুঁজিয়া চুপ করিয়া রহিল। অশক্ত বৃদ্ধ নয়—রণশ্রান্ত মহাবিজয়ী বীর তার সম্মুখে। অনেকক্ষণ পরে মাথা তুলিয়া অশ্রুভরা চোখে কুমারী হাসিল—ম্লান, কিন্তু বড় মধুর হাসি। বলিল—নিয়ে আসবেন। জন্মাষ্টমীর রাত্রে আমরা প্রতিবছর গড়ের বাইরে শ্যামসুন্দরের মন্দিরে যাই। সঙ্গে জন-পঞ্চাশ মাত্র রক্ষী থাকে। এখনও তার ছ-সাত মাস দেরি। আপনি এর মধ্যে গড় শেষ করুন। কুণ্ডলকে নিয়ে যাবেন। আমি ভদ্রার কূলে কৃষ্ণচূড়ার তলায় অপেক্ষা করব—আপনি আর আপনার কুণ্ডল আমাকে উদ্ধার করবেন।

ঝুনঝুন নূপুর বাজাইয়া মঞ্জরী ধীরে ধীরে শিবিকায় গিয়া বসিল।

গড়ের কাজে পরদিন হইতে চতুর্গুণ লোক লাগানো

হইল। পুরীর সামান্য কর্ম্মচারীটি পর্য্যন্ত বুঝিয়াছে, রায়রায়ান প্রতিহিংসার জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছেন। জীবনলাল মহিলাদের পৌঁছাইয়া দিতে গিয়াছিল, ফিরিতে রাত হইল। তারপর গভীর রাত্রে আগের দিনের মত আবার গুপ্ত পরামর্শ। চাকলাদারেরা সসৈন্যে ফিরিয়া যাইতে রাজী হইয়াছেন; কিন্তু ভূষণার মধ্যে রামেশ্বরকে এই নূতন গড় গড়িতে দেওয়া হইবে না।

জীবনলালের পরামর্শ, ইসলামাবাদের দিকে গিয়া ফিরিঙ্গীদের শরণ লওয়া। সেখানে জায়গীরের বিলিব্যবস্থা করিতে বেগ পাইতে হয় না। বাদশাহের নিকট হইতে একটি নূতন ফর্ম্মান্ আনিবার অপেক্ষা মাত্র। কিন্তু রামেশ্বর ঘাড় নাড়িলেন। আর তাঁহার নূতন করিয়া ভাগ্য খুঁজিবার উৎসাহ নাই।

একদিন রামেশ্বর কিল্লাবাড়িতে ফৌজদারের সঙ্গে পরামর্শ করিতে গেলেন। তারপর অনেক দিন ধরিয়া এই রকম পরামর্শ চলিল। জীবনলাল ইতিমধ্যে ইসলামাবাদের দিকে চলিয়া গিয়াছে। গড়ের সমস্ত কাজকর্ম্ম বন্ধ; অর্দ্ধসমাপ্ত পরিখা ও নগর শ্মশানের মত খাঁ-খাঁ করিতেছে।

পাকসীর বিল ইদানীং মজিয়া গিয়াছে, চৈত্র-বৈশাখে প্রায় শুকাইয়া আসে। তখন দিগন্তব্যাপ্ত নিবিড়কৃষ্ণ অবিচ্ছিন্ন জলধারা ক্রোশের পর ক্রোশ তরঙ্গিত হইত। বড় শুকনার সময়ে গোটা বিশ-পঁচিশ চর মাত্র সীমাহারা বারিসমুদ্রের মাঝখানে অসহায়ের মত মাথা উঁচু করিয়া থাকিত। বিলের কিনারা দিয়া কিল্লাবাড়ি যাইবার পথ। মাসাবধি পরে কুণ্ডলের পিঠে চড়িয়া একদিন রামেশ্বর ফিরিয়া আসিতেছিলেন। ফৌজদার শেষ পর্য্যন্ত কোন সুবিধাই করিতে পারিলেন না। ফিরিবার পথে বিলের প্রান্তে আসিয়া বিদ্যুৎ চমকের মত একটি সঙ্কল্প হঠাৎ রামেশ্বরের মনে জাগিয়া উঠিল।

রামনগরবাসী এবং চাকলাদার মহলে রাষ্ট্র হইয়া গেল, পরাজিত অবমানিত রায়রায়ান মনোকষ্টে বিবাগী হইতে বসিয়াছেন, দিবারাত্রি অন্তঃপুরের মধ্যে শ্যামসুন্দরের উপাসনায় তিনি মাতিয়া থাকেন। তারপর অনেক দিন পরে একদিন কুণ্ডলের পিঠে রায়রায়ান বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সহস্র প্রজা সমবেত হইয়াছে। জীবনলালও সেইদিন ফিরিয়াছেন। সে চুপি চুপি বলিল—এ সবে কাজ নেই প্রভু, ইসলামাবাদ চলুন—

পর্টুগীজদের সঙ্গে সর্ত্ত হইয়া গিয়াছে; ইসলামাবাদে রাজ্যপত্তন করিতে আর গোল নাই। সেখান হইতে রাজ্য ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া একদিন ভূষণাকেও গ্রাস করিবে,—জীবনলাল সেই স্বপ্নে মাতোয়ারা।

কিন্তু রামেশ্বর রাজী নহেন। নিরন্ন সর্ব্বস্বহারা হইয়া পথে পথে ঘুরিতে হইয়াছে, বিনিদ্র কত রাত্রি অজানা প্রান্তরের মধ্যে অশ্বপৃষ্ঠে কাটিয়াছে, দিন মাস বৎসরগুলি দেহের উপর পদাঙ্ক আঁকিয়া রাখিয়া দ্রুত পলাইয়া গিয়াছে। জীবনের শেষপ্রান্তে আসিয়া নূতন করিয়া তিনি আর সংগ্রামে মাতিবেন না। হাসিয়া বলিলেন—জীবনলাল, ইসলামাবাদে তুমি রাজ্য কর। আমি ফর্ম্মান্ এনে দেব।

জীবনলাল জিব কাটিয়া বলিল—প্রভু, আমার কাজ রাজ্য গড়া – রাজত্ব করা নয়।

—তবে মধুকরকে নিয়ে যাও। সে দেশ অরাজক, মগ আর ফিরিঙ্গী ডাকাতদের মধ্যে আমি তিলার্দ্ধ বিশ্রাম পাব না। আমি পাকসীর বিলের মধ্যে দেউল গড়ে শেষ ক'টা দিন শান্তিতে থাকব।

কাছাকাছি পাঁচ-সাতটা সুদীর্ঘ চর, তাদের মাঝে অল্প অল্প জল-কাদা। কুণ্ডলের পিঠের উপর বল্লম উঁচু করিয়া রায়রায়ান। প্রথম যৌবনের দুর্দ্ধর্ষ বিক্রম বুকের মধ্যে আবার নাচিয়া উঠিয়াছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার সামনের দিকে তাকাইয়া রায়রায়ান মাটিতে বল্লম ছুঁড়িয়া মারিলেন। অমনি সারবন্দী হাজার কোদাল পড়িল—ঝপ্ পাস্। সেই হাজার হাত হইল দীঘির উত্তরসীমা।

বল্লম তুলিয়া লইয়া রায়রায়ান তীরবেগে কুণ্ডলকে ছুটাইলেন। কুণ্ডল উড়িয়া চলিল। একদমে আধ ক্রোশ গিয়া একলহমা ঘোড়া থামিল। রায়রায়ান বল্লম পুঁতিয়া রাখিয়া রামনগরে ফিরিয়া আসিলেন।

হাজার হাজার কোদাল দিনের পর দিন পড়িতে লাগিল। অবশেষে পোঁতা বল্লমের গোড়ায় আসিয়া দীঘি কাটা শেষ হইল। মাটির স্তূপে আকাশছোঁয়া পাহাড় হইয়াছে।

দেশ-দেশান্তর হইতে বড় বড় পাথরের চাঁই আসিয়া জমিতে লাগিল। দিনরাত্রি সেই পাথর মাটিতে বসানো হইতেছে, পাথরের উপর পাথর বসাইয়া দ্রুত এক অতি বিচিত্র দেউল রচিত হইতেছে। কত স্তম্ভ, কত চূড়া, কত মনোহর কারুকার্য্য তাহার উপর। সমস্ত জীবনের সঞ্চিত স্বর্ণভাণ্ডার উজাড় করিয়া রামেশ্বর পাক্‌সীর বিলের মধ্যে ঢালিতে লাগিলেন।

—আকাশ আলো ক'রে দাঁড়িয়েছে, চমৎকার! চমৎকার!

লোকে বলে, রায়রায়ানের সাধনপীঠ।

—কোন্ দেবতার প্রতিষ্ঠা হবে?

কেহ বলিতে পারে না।

ক্লান্তবর্ষণ মেঘান্ধকার ভাদ্র-অষ্টমীর সন্ধ্যাকালে রামেশ্বর যাত্রা করিলেন। মঞ্জরী ভুলে নাই—মন্দিরের লৌহ-সম্বদ্ধ সুদৃঢ় বেষ্টনীর বাহিরে কৃষ্ণচূড়ার তলে আঁচল ঝাঁপিয়া সে প্রতীক্ষা করিতেছিল, মুহূর্ত্তে ঘোড়ায় চড়িয়া রায়রায়ানের পৃষ্ঠ-লগ্ন হইল। রক্ষীরা সচকিত হইয়া দেখিল, দস্যু কন্যাকে লইয়া পলাইতেছে। কড়কড় করিয়া মেঘ ডাকিয়া মুষলধারে জল নামিল। কুণ্ডল তীরবেগে ছুটিল। কুণ্ডলের কে অনুসরণ করিয়া পারিবে? দেখিতে দেখিতে ঘোড়া নিখোঁজ হইয়া গেল।

রামনগরে যখন পৌঁছিল তখন শেষরাত্রি। পিঠের উত্তরীয় খুলিয়া রামেশ্বর কুমারীর দেহবল্লরী ধীরে ধীরে বাহুতে ধরিয়া তুলিলেন। পদ্মের পাপড়ীর মত চক্ষু দুটি মুদিয়া মঞ্জরী ক্লান্তিতে এলাইয়া রহিয়াছে; মেঘভাঙা ক্ষীণ জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িয়াছে তার ঘুমন্ত মুখের উপর। গভীর স্নেহে মুহূর্ত্তকাল রামেশ্বর সেই মুখের দিকে চাহিলেন, তারপর অতি সন্তর্পণে তাহাকে সুকোমল উষ্ণ শয্যার উপর শোয়াইয়া দিলেন।

মধুকরের ডাক পড়িল। আনন্দের প্লাবন রামেশ্বরের র ভরিয়া ছাপাইয়া বাহিরে আসিতেছে, পরাজয়ের সমস্ত গ্লানি এতক্ষণে নিঃশেষে ভাসিয়া গিয়াছে। রামেশ্বর বলিলেন—মঞ্জরী রইলেন। দিনের বেলায় নয়—কাল সন্ধ্যার পর আঁধারে আঁধারে বজরায় ক'রে ওঁকে পৌঁছে দিও। আমি দেউলের দরজায় প্রতীক্ষা করব—

মধুকর বলিল—এখনই যাচ্ছেন কেন? আপনি বড় ক্লান্ত, কিছুক্ষণ বিশ্রাম করুন।

রামেশ্বর কহিলেন—অবসর কোথা ভাই? এখনও মন্দিরের চূড়ায় সোনার কলসী বসানো হয় নি, কত কাজ বাকী—। কাল দেবীর প্রতিষ্ঠা হবে; এর মধ্যে প্রস্তুত হ'তে হবে ত?

হাসিয়া তখনই তিনি রওনা হইয়া গেলেন।

দীঘির জল কাকচক্ষুর মত টলমল করিতেছে; সকালের সোনার আলোয় দেউল জলের উপর ছায়া ফেলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। পরিতৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া রায়রায়ান অসমাপ্ত কাজটুকু সমাধা করিতে লাগিয়া গেলেন। লোকজন আর বেশী নাই, অনেকেই বিদায় হইয়া গিয়াছে। দেউল-শীর্ষে সোনার কলসী বসানো হইল, সারচন্দনে সমস্ত প্রকোষ্ঠ অনুলিপ্ত করা হইল, সহস্র ঘৃতের দীপ সাজান হইল—রাত্রে জ্বালান হইবে, ডিঙার পর ডিঙা ভরিয়া আসিতে লাগিল পাক্‌সী বিলের সমস্ত পদ্মফুল।

—এত ফুল?

রায়রায়ানের পূজায় লাগিবে।

রাত্রির দুই প্রহর অতীত হইয়াছে। রায়রায়ানের গুপ্ত পূজা, সেজন্য সন্ধ্যার আগেই সমস্ত লোক দেউল হইতে বিদায় করিয়া দেওয়া হইয়াছে, আর কেহ নাই। লোকালয় হইতে বহু দূরে প্রকাণ্ড বিলের নিঃশব্দ পাষাণ-পুরীর মাথায় অনন্ত তারকাশ্রেণী। কক্ষের দীপাবলী একের পর এক নিবিয়া আসিতেছে, হু-হু করিয়া নৈশ-বাতাসে বিলের জল ছল-ছল করিয়া উঠিতেছে, রামেশ্বর ছুটিয়া জলের প্রান্তে গিয়া দাঁড়ান; বুঝি বজরা আসিয়া ভিড়িল। আবার মেঘ জমিয়া তারা ঢাকিয়া অন্ধকার নিবিড় হইয়া আসিতেছে। সহসা রামেশ্বরের মনে হইল, মরিয়া প্রেত হইয়া তিনি যেন নির্জ্জন দ্বীপভূমিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন—কণ্ঠে ধ্বনি নাই, পদতলে মৃত্তিকা নাই, অন্ধকার ছাড়া দৃষ্টি করিবার বস্তুও কিছু নাই, প্রবল প্রবাহশীল অনন্ত বায়ুমণ্ডলে তিনি হাহাকার করিয়া বেড়াইতেছেন। অন্তরাত্মা সত্য সত্যই তাঁহার কাঁপিয়া উঠিল, হা-হা-হা করিয়া

অকস্মাৎ উদ্দাম হাসির সঙ্গে অমূলক ভয় তাড়িতে চেষ্টা করিলেন। মনে হইল, দূরের মসীকৃষ্ণ অন্ধকারের মধ্য দিয়া জলরাশি উত্তাল তাড়নে ভেদ করিয়া ক্রুতবেগে কি যেন আগাইতেছে। দুই চক্ষের সমস্ত দৃষ্টিশক্তি পুঞ্জিত করিয়া অন্ধকারের দিকে নির্নিমেষ চোখে চাহিয়া অধীর কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—মধুকর! মধুকর!

ফিরিয়া আসিয়া আবার দ্বারপ্রান্তে বসিলেন। দীপ নিবিয়া গিয়া অন্ধকারের মধ্যে বিশাল সৌধবক্ষ অপরূপ রহস্যাবৃত দেখাইতেছে। বাতাস উঠিয়াছে। ঝড়ের বাতাস নৈশ নিস্তব্ধতা মথিত করিয়া নবনির্ম্মিত দেউলের পাষাণ-প্রাচীরে আর্ত্তক্রন্দন তুলিয়া দাপাদাপি করিতে লাগিল।...ক্রমে রামেশ্বর কোন সময়ে ঘুমাইয়া পড়িলেন।

হঠাৎ বৃষ্টি-সিক্ত শীতল হস্ত আসিয়া লাগিল বাহুর উপর। মুহূর্ত্তে চমকিয়া জাগিয়া বলিলেন—এলি? চোখ মুছিয়া দেখিলেন,—মধুকর নহে—জীবনলাল। জীবনলাল নমস্কার করিল। উঠিয়া বসিয়া গম্ভীর কণ্ঠে রায়রায়ান বলিলেন—আবার ইসলামাবাদ গিয়েছিলে না? কবে ফিরলে?

জীবনলাল বলিল—আজ। সেখানে সমস্ত ঠিক ক'রে এসেছি। ছোটখাট গড়ের পত্তন হয়েছে—

একটু বিরক্তির সঙ্গে রায়রায়ান বলিলেন—সে-কথা আমার সঙ্গে কেন দেওয়ানজী, ছোট রায়ের সঙ্গে ব'লো।

জীবনলাল আবার নমস্কার করিয়া বিনীত কণ্ঠে বলিল—তিনি চলে গেছেন সেখানে। আমি শুধু খবরটা দিতে এসেছি—

—মঞ্জরী তাহ'লে তোমার সঙ্গে এলেন? ব্যস্ত হইয়া রামেশ্বর উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

জীবনলাল বলিল—না প্রভু, তিনিও স্বামীর সঙ্গে গেছেন। ছোট রায় সেই খবর দিতে আমায় পাঠিয়ে দিলেন।

নিবিড় অন্ধকারে কেহ কাহারও মুখ দেখিতে পাইলেন না। অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল, দু-জনেই পাষাণ মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া আছেন। তারপর রায়রায়ান বসিলেন। হঠাৎ হাসিয়া উঠিয়া প্রশ্ন করিলেন—মধুকর কি ব'লে পাঠাল?

—তিনি বললেন, মঞ্জরী তাঁর বাগদত্তা বধূ—আট মাস আগে রামনগর প্রাসাদের অলিন্দে চন্দ্র-সূর্য্য সাক্ষী ক'রে গোপনে তাঁদের মালা বদল হয়েছিল। ভরত রায়ের কঠোর শাসন থেকে তাঁকে ছিনিয়ে আনা—আপনি আর আপনার কুণ্ডল ছাড়া জগতে আর কারও সাধ্য হ'ত না। কৃতজ্ঞ চিত্তে তিনি তাই আপনাকে প্রণাম পাঠিয়েছেন।

—বেশ, বেশ! বলিয়া বিল কাঁপাইয়া রামেশ্বর আবার হাসিয়া উঠিলেন।—আর রাণী মঞ্জরী—তিনি কিছু বললেন?

জীবনলাল বলিল—রাণী ব'লে পাঠিয়েছেন, বাধ্য হয়েই তাঁকে আপনার সঙ্গে একটু ছলনা করতে হয়েছিল। আপনি তাঁকে ক্ষমা করবেন।

ভোর হইয়া গেলে জীবনলাল বিদায় লইতে আসিয়া দেখিল, রামেশ্বর জলের দিকে নিবিষ্ট মনে চাহিয়া আছেন। পদশব্দে মুখ তুলিয়া চাহিলেন; বলিলেন—জলে কেমন ছায়া পড়েছে দেখ। আমারও ছায়া পড়েছে—বড্ড বুড়ো হয়ে গেছি, না?

কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি, পাগলের মত।

জীবনলাল বলিল—প্রভু, বিদায় দিন এবার—ইসলামাবাদ যাব।

—এখনই?

—হাঁ। নতুন রাজ্য গড়ছি, অবসর নেই। আশীর্ব্বাদ করুন রায়রায়ান, এবার যেন সফল হই।

রামেশ্বর গম্ভীর কণ্ঠে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তারপর বলিলেন—আর একটা কাজ ক'রে দিয়ে যাও, দেওয়ান মশাই। যারা দেউল গড়তে এসেছিল, তারা রামনগরে এখনও পুরস্কারের প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করছে। তাদের একবার এখানে পাঠিয়ে দিয়ে যাও—কাজ আরও বাকী আছে।

লোকজন আসিয়া পড়িল। রৌদ্রোজ্জ্বল দেউল-চূড়ায় সোনার কলসী ঝক-ঝক করিতেছে, রামেশ্বর দেখাইয়া ইঙ্গিত করিলেন নামাইয়া আনিতে। কাল এমনি সময়ে কত কষ্টে কত কৌশলে কলসী ওখানে বসান হইয়াছে, গাঁতি দিয়া খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া আবার তাহা খসাইয়া আনা হইল। কলসী উপুড় করিয়া তাহার উপর বসিয়া রামেশ্বর হুকুম দিলেন—ভাঙো দেউল।

রায়রায়ান প্রকৃতিস্থ নাই, সকলেই বুঝিল। কেহ অগ্রসর হইল না। রামেশ্বর পুনরায় বজ্রকণ্ঠে হুকুম দিলেন। কয়েক

জন রামনগরে ছুটিল খবর দিতে, কাল রাত্রে পূজা করিতে গিয়া রায়রায়ান একেবারে উন্মাদ হইয়া গিয়াছেন। রামেশ্বর কলসী লইয়া ছুটিলেন কক্ষের মধ্যে; কুলুঙ্গীর টানা খুলিয়া সঞ্চয়ের অবশেষ সমস্ত স্বর্ণ-মুদ্রা বোঝাই করিয়া টানিতে টানিতে বাহিরে লইয়া আসিলেন। চীৎকার করিয়া কহিলেন —ভাঙো দেউল, ভাঙো দেউল—। মুঠি মুঠি করিয়া স্বর্ণ-মুদ্রা সকলের কোলে ঢালিয়া দিতে লাগিলেন, স্বর্ণ মুঠি নুলি মুঠির মত ছড়াইতে লাগিলেন; বলিতে লাগিলেন—ভাঙো, ভাঙো, ভাঙো -। তারপর নিজেই গাঁতি লইয়া উপরে উঠিলেন।

ঝুপ ঝুপ শব্দে ইট-পাথর টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া পড়িতে লাগিল। মাসের পর মাস বাটালির আঘাতে পাষাণখণ্ডগুলি জীবন্ত প্রতিমার রূপ ধরিয়াছিল। বৃদ্ধ রতনদাস শিল্পীদের সর্দার। নিজে সে গাঁতি ধরিতে পারিল না, প্রাঙ্গণের এক ধারে দাঁড়াইয়া চক্ষু মুছিতেছিল। উন্মাদ রামেশ্বর নামিয়া আসিয়া তাহাকে দেখিলেন। দেখিয়া মুখ হাসিতে ভরিয়া গেল। তাহার মুখের উপরে অতি সন্নিকটে মুখ আনিয়া রামেশ্বর বলিতে লাগিলেন—কাঁদ্‌ছ কেন? চুল পেকেছে ব'লে? এস আমার সঙ্গে—

কেহ কিছু বুঝিবার আগেই বিশাল তরঙ্গায়িত ঘোড়াদীঘির তলহীন ঘনকৃষ্ণ জলরাশির মধ্যে রামেশ্বর ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। হায়-হায় করিয়া আকুল চীৎকার উঠিল। শত শত লোক তাঁহাকে ধরিতে সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

এখন বুদ্ধ-বিগ্রহের দিনকাল নাই। সেকালের দুর্দ্ধর্ষ চাকলাদারেরা মরিয়া গিয়াছে; সুখ স্বচ্ছন্দ নিরুদ্বিগ্ন বাংলা দেশ। সেই অগ্নিবর্ষী তোপগুলিরও পরমগতি লাভ হইয়াছে। কামারের আগুনে পুড়িয়া কতক হইয়াছে কয়েদীর বেড়ি কিংবা রাস্তা তৈরির রোলার; কতকগুলি নদীর পলিমাটিতে একেবারেই লুকাইয়া গিয়াছে। গ্রামে ঘুরিতে ঘুরিতে তবু কদাচিৎ ধূলামাটি-মাখা দু-একটার হঠাৎ দেখা পাইয়া যাইতে পার। হয়ত কোন অশ্বত্থতলায় বিলুপ্ত-বংশ প্রাচীন অতিকায় কঙ্কালের মত রোদ বৃষ্টির মধ্যে পড়িয়া আছে, মহাকাল পদাঘাতে ঠেলিয়া রাখিয়া গিয়াছে, ইদানীং রাখালেরা গরু ছাড়িয়া দিয়া তাহার উপরে বসিয়া বাঁশী বাজায়। এমনি একটা কিল্লাবাড়ির ঘাটের উপর পড়িয়া রহিয়াছে, দেখিতে পাইবে। সেইটা থাকায় ডোঙা বাঁধার বড় সুবিধা হইয়াছে।

কিন্তু, সাবধান। ফুটফুটে জ্যোৎস্না দেখিয়া রাত্রে কোন-দিন ঐ ঘাট হইতে ডোঙা খুলিয়া দিও না, সহস্র সহস্র ফুটন্ত শাপলা তোমাকে দিগভ্রান্ত করিবে। লগি ঠেলিতে ঠেলিতে হঠাৎ এক সময়ে পাষাণ-স্তূপে ধাক্কা খাইবে, তাকাইয়া দেখিবে—একেবারে রায়রায়ানের দেউলের কাছে আসিয়া পড়িয়াছ। নিষুপ্ত রাত্রে দ্বীপের উপর তালগাছের ফাঁকে ফাঁকে তেরছা হইয়া পড়া জ্যোৎস্না...হঠাৎ বাতাস উঠিয়া নলবন বাজিয়া উঠিবে; মনে হইবে, নির্জ্জন ধ্বংসাবশেষ দেউলে রায়রায়ান হাহাকার করিয়া বেড়াইতেছেন। ত্রস্ত হইয়া যে-দিকে ডোঙা ঘুরাইবে, দেখিতে পাইবে সেকালের প্রস্তরীভূত অসংখ্য অপ্সরা, ময়ূর ও পদ্মফুল। অল্প অল্প মাথা তুলিয়া তাহারা তাকাইয়া থাকিবে, আলেয়ার মত পথ ভুলাইয়া সমস্ত রাত্রি তোমাকে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইবে—ফিরিবার পথ খুঁজিয়া পাইবে না।

বিদ্যাসাগর বাণীভবন

শ্রীসরলাবালা সরকার

বাংলা দেশে 'বিধবাশ্রম' স্থাপন সম্বন্ধে চেষ্টা অনেক দিন হইতে হইতেছে, কিন্তু কলিকাতার বিদ্যাসাগর বাণীভবন ব্যতীত ভদ্রপরিবারের বিধবার বিনাব্যয়ে আশ্রয় ও স্বাবলম্বী হইবার মত শিক্ষালাভের স্থান আর নাই বলিলেই হয়।

এই ভারতবর্ষেরই অন্যান্য প্রদেশে বিধবাদিগের যে-সকল আশ্রম আছে ও যে-ভাবে দুঃস্থা ও অশিক্ষিতা নারীদিগের শিক্ষার জন্য চেষ্টা চলিতেছে, তুলনায় বাংলা দেশ তাহার অনেক পশ্চাতে পড়িয়া আছে, একথা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। অনেকে হয়ত বলিবেন, বাংলা দেশ ভারতবর্ষের অন্যান্য বাণিজ্যপ্রধান দেশের তুলনায় দরিদ্র দেশ, এইজন্য অন্যান্য প্রদেশের পক্ষে বিধবাশ্রমের জন্য যেরূপ অর্থসাহায্য করা সম্ভব হয়, আমাদের দেশের লোকের আন্তরিক ইচ্ছা থাকিলেও আর্থিক অসঙ্গতির জন্য সেরূপ ভাবে সাহায্য করা সম্ভব হয় না।

এই কৈফিয়ৎ কতক সত্য হইলেও সম্পূর্ণ সত্য নয়। অত্যন্ত দরিদ্রও যে-কাজটি তাহার নিতান্ত আবশ্যক মনে করে তাহার জন্য প্রাণপণে অর্থব্যয় করে। বাংলা দেশের আর্থিক দুর্গতি সত্ত্বেও বিধবাশ্রম যে দেশের পক্ষে কতখানি প্রয়োজনীয় তাহা দেশবাসী যদি যথার্থভাবে অনুভব করিতেন তাহা হইলে বিধবাশ্রম স্থাপন ও তাহার উন্নতির চেষ্টা ইহা অপেক্ষা অনেকটা বেশী সফল হইত। বিধবাশ্রম স্থাপন দরিদ্র বিধবাগণেরই উপকারের জন্য এবং সহৃদয় জনগণ তাহাতে দান হিসাবেই অর্থসাহায্য করেন, এই সমস্ত আশ্রম সম্বন্ধে আমরা ইহা অপেক্ষা আরও অধিক গভীর ভাবে ভাবিয়া দেখি না। সেইজন্য বিধবাশ্রম সম্বন্ধে আমাদের চেষ্টা পরোপকার ও দানের পর্য্যায়েই থাকিয়া যায়, তদপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়তার স্তরে উন্নীত হয় না।

প্রয়োজন বলিতে লোকের স্বার্থের সহিত জড়িত একটি ব্যাপার বুঝায়। আজ সমগ্র ভারতবর্ষে জাতীয়তা-বোধ উদ্বুদ্ধ হইতেছে। শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই মনে সমগ্র জাতির সহিত তাঁহার নিজের কিরূপ সংযোগ সে সম্বন্ধে অনুভূতি জাগ্রত হইতেছে। এই অনুভূতির ফলে আমাদের স্বার্থ সম্বন্ধীয় জ্ঞান ব্যাপকতা লাভের দিকে অগ্রসর হইতেছে। দেশবাসিগণ আর নিজের ব্যক্তিগত বা পরিবারগত উন্নতিতেই সন্তুষ্ট থাকিতে পারিতেছে না, আর ইহার ফলে দেশের সর্ব্বত্র সমিতি, সঙ্ঘ, সম্মিলনী, আশ্রম ইত্যাদি স্থাপিত হইতেছে এবং শিক্ষা সম্বন্ধেও একটা চেষ্টা দেশের মধ্যে জাগ্রত হইয়াছে।

দেশবাসী আজ বুঝিতেছেন দেশব্যাপী অভাব, দারিদ্র্য, দুঃখ প্রভৃতির সহিত তাঁহার নিজেরও আবচ্ছেদ্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। জাতির উন্নতির জন্য দেশের আর্থিক দুর্গতির প্রতিকার, দেশের ধনবল বৃদ্ধি সর্ব্বপ্রথমে প্রয়োজন; কিন্তু কেবল ধনবল নয়, জনবলও প্রয়োজন, কেন-না মানুষই দেশের সম্পদ-সমৃদ্ধি গড়িয়া তোলে। জনসংখ্যা গণনায় অধিক হইলেই তাহাকে 'জনবল' বলা যায় না, প্রত্যেক 'জনে'র এমন হওয়া প্রয়োজন যেন তাঁহাদের দ্বারা দেশের ভার না বাড়িয়া শক্তি বৃদ্ধি পায়। এই বাংলা দেশে পনর হইতে ত্রিশ বৎসর বয়স্কা সাড়ে চারি লক্ষের অধিক হিন্দুবিধবা অপরের গলগ্রহ হইয়া গৃহের ও সমাজের ভারস্বরূপ দুঃখময় জীবন যাপন করেন। যদিও অনেকের মুখে শোনা যায়, 'হিন্দুবিধবাই হিন্দুগৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবীস্বরূপা, বিধবা হইতে আমাদের সংসারের ও সমাজের বহু কল্যাণ সাধিত হয়,' কিন্তু এ সকল উক্তির বেশীর ভাগই ভাবোচ্ছ্বাস মাত্র। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে, যাহাই হউক আমাদের বাংলা দেশে, "বিধবা হইলে তাহার মরাই ভাল" এটি একটি চিরপ্রচলিত বাক্য। বিধবার জীবন যে একেবারেই অসার্থক, তাঁহার নিজের দিক দিয়া ও সমাজের দিক দিয়া সেরূপ জীবনের যে কোন সার্থকতাই নাই, এই মনোভাব আজিও বঙ্গদেশের হিন্দুসমাজে অতি প্রবলভাবে বর্ত্তমান আছে। শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে—যখন সতীদাহ-প্রথা প্রচলিত ছিল, তখনও

অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাংলা দেশে অপেক্ষাকৃত অধিক সংখ্যক সতীদাহ হইত এবং তাহার মূলেও যে এই সমাজগত মনোভাব বিশেষ করিয়াই ছিল, ইহাতে সন্দেহ নাই।

এখন সমগ্র মানবজাতির চিন্তাপ্রণালীর অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে, সেই পরিবর্ত্তনের মধ্যে একটি বিশেষত্ব এই যে, কেবল এখন মানুষ আর ব্যক্তির দিক দিয়া চিন্তা করে না বা চিন্তা করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। নারীদিগের সম্বন্ধেও প্রত্যেক সভ্য সমাজে সামাজিক নিয়মাবলীর অনেক পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে। প্রাচ্যের জাপানে নারীদিগের শিক্ষার জন্য নারীবিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। তুরস্ক প্রভৃতি মুসলমান দেশেও অবরোধপ্রথার কঠিন প্রাচীর ভগ্নপ্রায়, তথায় নারীগণের স্বাধীনতা ও শিক্ষার প্রচেষ্টা বিশেষ ভাবে আরম্ভ হইয়াছে। ভারতবর্ষে বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে "মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয়" স্থাপিত হইয়াছে। অধুনা জাতির 'জনবল' হইতে জনসংখ্যার অর্দ্ধাংশ নারীগণকে বাদ দিয়া রাখা দেশ বা সমাজের পক্ষে ইষ্টকর বলিয়া মানুষ মনে করে না, তাই আজ বাংলা দেশে শহরে এবং পল্লীগ্রামেও নারীশিক্ষার চেষ্টার ক্রমশঃ বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে।

তের বৎসর পূর্ব্বে নারীশিক্ষা ব্যাপক ভাবে বিস্তারের উদ্দেশ্যে নারীশিক্ষা-সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়, 'বিদ্যাসাগর বাণীভবন' এই সমিতিরই অন্তর্গত হিন্দুবিধবাশ্রম। এই আশ্রমে প্রত্যেক শিক্ষার্থিনীকে হিন্দু আচার-পদ্ধতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কর্ত্তৃপক্ষের নির্দ্ধারণ অনুসারে নানা বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়া উপার্জ্জনক্ষম হইবার সুযোগ দেওয়া হয়। এই সুযোগ পাইবার জন্য বহু দূর দেশ হইতেও পল্লীগ্রামবাসিনী বিধবাগণ আবেদন করিয়া থাকেন, কিন্তু সকল আবেদনকারিণীর প্রার্থনা পূর্ণ করিবার মত 'ভবনে'র আর্থিক সঙ্গতি নাই। সেই জন্য যখন বহু আবেদনকারিণীর মধ্যে মাত্র কয়েক জনকে বাছিয়া লইয়া অপর সকলকে বাধ্য হইয়া ফিরাইয়া দিতে হয়, আশ্রমকর্ত্তৃপক্ষের পক্ষে তাহা অতিশয় দুঃখের কারণ হয়।

বাণীভবনে মধ্য ইংরেজী পর্য্যন্ত সাধারণ শিক্ষা দেওয়া হয়। এই সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সকলকেই তাঁতের কাজ ও জামার কাটছাঁট এবং সেলাই শিখিতে হয়। তাহা ছাড়া আরও নানা প্রকার শিল্প শিক্ষা দেওয়া হয়। শিক্ষার্থিনীগণকে এখানে সর্ব্বসমেত চারি বৎসর রাখা হয়। তিন বৎসর শিক্ষা লাভ করিয়া যাঁহারা উপযুক্ত হন তাঁহাদিগকে শিক্ষকতার জন্য গ্রামের বিদ্যালয়ে পাঠান হয়। সেখানে তাঁহারা গ্রাম্য বিদ্যালয়ে বালিকাগণকে শিক্ষাদান করিয়া শিক্ষাদানকার্য্যে অভিজ্ঞতা লাভ করেন। এই শিক্ষকতার সময় তাঁহারা মাসিক দশ টাকা বেতন পান। গ্রামের শিক্ষকতার পর শিক্ষাসমাপ্তির জন্য পুনরায় এক বৎসর বাণীভবনে থাকিতে হয়। ইহার পর যোগ্যতানুসারে কেহ ট্রেনিং কেহ নার্সিং শিখিতে যান এবং কেহ কেহ শিল্প-শিক্ষকতার কার্য্যেও নিযুক্ত হন।

বাণীভবনের শিল্পশিক্ষা-বিভাগে দৈনিক ছাত্রীও লওয়া হয়। অনেক গৃহস্থগৃহের কন্যা ও বধূ বর্ত্তমান অর্থসঙ্কটের সময় পারিবারিক সচ্ছলতা কিছু বাড়াইবার জন্য বাণীভবনে শিল্পশিক্ষা-বিভাগে কাপড় রং করা, সূচীশিল্প প্রভৃতি নানারূপ শিল্প শিক্ষা করিতে আসেন। এই বিভাগে জ্যাম, জেলী, আচার প্রভৃতি প্রস্তুত করা, বই বাঁধাই, তাঁতে বস্ত্রবয়ন, প্রভৃতি নানারূপ শিল্প শিক্ষা দেওয়া হয়। দেশী খেলনা প্রস্তুত করিবার জন্য একটি বিভাগ খোলারও চেষ্টা হইতেছে। এই-সব জিনিষের বিক্রয়লব্ধ অর্থের অংশ শিক্ষার্থিনীগণ পাইয়া থাকেন, বাণীভবনের বিধবাগণের হাতখরচ তাহাতেই চলিয়া যায়।

বাণীভবনের অধিবাসিনী বিধবাগণের দৈনিক কাজের তালিকা এইরূপ :—

১। সকালে ৫টায় ঘণ্টা দেওয়া মাত্র শয্যাত্যাগ।

২। ৫টা হইতে ৬টার মধ্যে প্রাতঃকৃত্য সমাপন সমবেত স্তব পাঠ, শয্যা তোলা ও ঘর ঝাঁট।

৩। ৬টা হইতে ৭টার মধ্যে স্নান এবং অসুস্থাদিগের বস্ত্র পরিবর্ত্তন স্নানান্তে নিজ নিজ সন্ধ্যা, পূজা ও গীতা পাঠ।

৪। সাড়ে সাতটায় জল খাবার। সাড়ে সাতটা হইতে সাড়ে নয়টা পর্য্যন্ত অধ্যয়ন।

৫। সাড়ে নয়টা হইতে এগারটায় মধ্যে ভাত খাওয়া ও নিজ নিজ বাসন ধোওয়া।

৬। ১১টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত ক্লাস। ক্লাসের পর পাঁচ মিনিটের মধ্যে ক্লাস তুলিতে হয়।

৭। ৪টা ৫ মিনিটের সময় বৈকালে জলখাবারের ঘণ্টা. সাড়ে চারিটায় খাওয়া শেষ। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বিশ্রাম ও খোলা পার্কে ভ্রমণ।

৮। সন্ধ্যায় ১৫ মিনিট স্তবপাঠ, এবং নিজ নিজ সায়ংসন্ধ্যাবন্দনা প্রভৃতি।

৯। সাড়ে আটটা পর্য্যন্ত অধ্যয়ন, সাড়ে নয়টার মধ্যে আহার ও বাসন ধোয়া শেষ।

১০। দশটায় শয়ন, শয়নের পর গল্প করা নিষিদ্ধ। অধ্যয়নের সময় বাজে কথা বলা নিষিদ্ধ।

১১। রবিবার দ্বিপ্রহরে দুই ঘণ্টা ধর্ম্মচর্চ্চা ও গীতার ক্লাস।

ইহা ছাড়া দৈনিক কাজের পালা আছে। তদনুসারে প্রত্যহ দুই জনের সাড়ে পাঁচটা হইতে সাড়ে ছয়টা পর্য্যন্ত বাড়ি ধোয়ামোছা করিতে হয়, প্রত্যেকের পালায় বাড়ি পরিষ্কার রাখার জন্য তাঁহারা দায়ী থাকিবেন। দুই জনকে পালাক্রমে তিন দিন সকাল ছয়টা হইতে সাতটা পর্য্যন্ত তরকারী কুটিতে হয় এবং অপর দুই জনকে পালাক্রমে ছয়টা হইতে আটটা পর্য্যন্ত রন্ধনের জোগাড় দিতে হয়। এইরূপ পরিবেশন, ক্লাস পাতা, ঘড়িতে চাবি দেওয়া, উনানে আগুন দেওয়া, ময়দা মাখা ও রুটি সেকারও পালা নিয়ম আছে। রবিবার বস্ত্রাদি পরিষ্কার করিবার দিন।

এইরূপ নিয়মাধীনে থাকায় আশ্রমবাসিনীগণের নিয়মানুবর্ত্তিতা ও সময়ের মূল্যজ্ঞান সম্বন্ধে যেমন বিশেষ ভাবে শিক্ষা হয়, অপর দিকে তাঁহাদের স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হইতে থাকে। যে-সব বিধবা তাঁহাদের নিজের বাটীতে থাকার সময় যথেষ্ট সবল ও কর্ম্মক্ষম ছিলেন না, আশ্রমে বাসকালে তাঁহাদের সে-সম্বন্ধে যথেষ্ট উন্নতি দেখা গিয়াছে। মোটের উপর আশ্রমবাসিনীগণের মধ্যে পীড়া বা অসুস্থতা বিশেষ দেখা যায় না। তাঁহাদের সর্ব্বদাই উৎসাহশীলা এবং প্রফুল্ল চিত্ত দেখা যায়। আশ্রম-তত্ত্বাবধায়িকা শ্রীযুক্তা শ্যামমোহিনী দেবী হিন্দু-গৃহের বালবিধবা। ইঁহার কর্ম্মতৎপরতা ও শৃঙ্খলা সম্বন্ধে জ্ঞান, আশ্রম পরিচালন ক্ষমতা এবং জননীর ন্যায় স্নেহ-মমতা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। এক দিকে নিয়ম সম্বন্ধে যেমন তিনি দৃঢ়ভাবে দৃষ্টি রাখেন, অপর দিকে প্রত্যেক আশ্রমবাসিনীর সুবিধা, আরাম ও শিক্ষার উন্নতির দিকেও তাঁহার দৃষ্টি সমভাবেই আছে। যাহাতে ব্যয়ের সঙ্কুলান করিয়া অধিক ছাত্রী লওয়া যাইতে পারে সেজন্য যতদূর সম্ভব মিতব্যয় ও সুশৃঙ্খলায় কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া তিনি নূতন ছাত্রী লইবার নানা ভাবে উপায় উদ্ভাবন করেন।

ছাত্রীগণ সম্বন্ধে একটি বিশেষ নিয়ম এই যে, তাঁহাদের প্রত্যেককেই হিন্দুবিধবার উপযোগী বস্ত্রাদি পরিতে হইবে এবং তাঁহাদের অঙ্গে কোন আভরণ থাকিবে না।

ধর্ম্মশিক্ষা সম্বন্ধেও মাঝে মাঝে ক্লাস বসে। তাহাতে উপনিষদ প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে আলোচনা অথবা কোন মহৎ চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা হয়। স্বাস্থ্য সম্বন্ধেও আলোকচিত্রের সাহায্যে বক্তৃতা এবং সাধারণ ভাবে উপদেশ দান করা হয়।

আশ্রমের নানা বিভাগের তত্ত্বাবধায়িকা ও শিক্ষয়িত্রীগণের প্রত্যেকেরই ছাত্রীদের প্রতি বিশেষ আন্তরিকতা দেখা যায়। একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথা লোপ হওয়ায় ভদ্র পরিবারের বিধবাগণ অনেক স্থলে একেবারে নিরাশ্রয়া হইয়াছেন। যাঁহাদের আত্মীয়স্বজন আছেন তাঁহারাও দারিদ্র্যবশতঃ সব সময় ইঁহাদের সাহায্য বা ভার গ্রহণ করিতে পারেন না, সুতরাং এ সময়ে এরূপ বিধবাশ্রমের যে কত প্রয়োজন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

দশ বৎসর পূর্ব্বে নারীশিক্ষা সমিতির সম্পাদিকা শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা অবলা বসুর পরিকল্পনায় সামান্য ভাবে দুইটি মাত্র বিধবাকে লইয়া এই বিদ্যাসাগর বাণীভবনের কার্য্য আরম্ভ করা হয়, ক্রমশঃ ১৫, ২০, ৩০ ও ৫০টি বিধবার থাকিবার ব্যবস্থা হয়। গত ফাল্গুন মাসে বাণীভবন বিধবাশ্রম ভাড়াটিয়া বাড়ি হইতে ইহার জন্য নবনির্ম্মিত গৃহে স্থানান্তরিত হইয়াছে এবং সম্প্রতি সেখানে বিভিন্ন জেলা হইতে আগত দুঃস্থা মধ্যবিত্ত গৃহস্থ-গৃহের বাষট্টিটি হিন্দু বিধবা বিনাব্যয়ে প্রতিপালিত ও শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেছেন।

এই বিধবাশ্রম যখন প্রথম স্থাপিত হয়, তখন ইহার আর্থিক সঙ্গতি খুবই কম ছিল। যাঁহারা এই আশ্রমের জন্য অর্থসাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে স্বর্গীয়া হরিমতি দত্তের নাম এইজন্য বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা উচিত, যে, তিনি হিন্দু গৃহের অন্তঃপুরবাসিনী মহিলা হইয়াও এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে প্রয়োজনীয়তা যে-ভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহা বাস্তবিকই আশ্চর্য্যের বিষয়। তিনি বিধবাশ্রমের গৃহনির্ম্মাণের জন্য এককালীন পঁচিশ হাজার টাকা দান করেন, ইহা ছাড়া নারীশিক্ষা-সমিতির জন্য তিনি আরও দশ হাজার টাকা দান করেন। বলিতে গেলে আজ যে বিদ্যাসাগর বাণীভবনের নিজস্ব বাড়ি হইয়াছে, হরিমতি দত্তের দানই তাহার ভিত্তিস্বরূপ।

বাণীভবনের কলিকাতায় নিজস্ব একটি গৃহ হইয়াছে বটে, কিন্তু যেভাবে গৃহ পরিকল্পনা হইয়াছে তাহাতে তাহার আংশিক কার্য্য মাত্রের পরিসমাপ্তি বলা যাইতে পারে, সম্পূর্ণ গৃহনির্ম্মাণ করিতে হইলে মোট এক লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকার প্রয়োজন হইবে। এইটিকে কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান করিয়া মফঃস্বলেও ক্রমশঃ বাণীভবনের শাখা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা প্রয়োজন।

বাণীভবনের আশ্রমবাসিনীগণের শুধু মাসিক ভরণপোষণের জন্য সম্প্রতি যে সাহায্য আছে তাহার উপর আরও মাসিক আড়াই শত টাকা সাহায্য প্রতিমাসে রীতিমত তোলা চাই; ইহা ছাড়া বাণীভবনের জন্য একটি স্থায়ী ধনভাণ্ডারেরও প্রয়োজন। স্বর্গীয়া হরিমতি দত্তের ন্যায় অনেক হিন্দুবিধবা আছেন যাঁহারা এই বিধবাশ্রমে ভগবানের নামে অর্থসাহায্য করিতে সমর্থ, তাঁহাদের সহানুভূতি লাভ করিলে বাণীভবনের উন্নতি হইবে এবং তাঁহারাও সৎকার্য্যজনিত আত্মপ্রসাদ নিশ্চয়ই লাভ করিবেন। ছাত্র ও ছাত্রীগণ যদি প্রত্যেকে তাঁহাদের মাসিক খরচ হইতে বাণীভবনের জন্য এক আনা করিয়া ব্যয় করেন ইহাতে তাঁহাদের কিছু ক্ষতি হইবে না, কিন্তু আশ্রমের প্রচুর লাভ হইবে। ইহা ছাড়া নানাবিধ অতিরিক্ত অপব্যয়ে বিবাহাদি উৎসবে অনেক খরচ হয়, প্রতি উৎসবের সময় যদি সকলেই সর্ব্বসাধারণের অতি প্রয়োজনীয় এই প্রতিষ্ঠানটিকে স্মরণ করেন তাহা হইলেও অনেক সাহায্য হয়। ভরসা করি, এই বিষয়ে প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তি চিন্তা করিবেন এবং অর্থের দ্বারা ও সদুপায় নির্দ্ধারণের দ্বারা এই প্রতিষ্ঠানটির উন্নতির জন্য সাহায্য করিবেন।

দৃষ্টি-প্রদীপ

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

১

জ্যাঠামশায়দের রান্নাঘরে খেতে বসেছিলাম আমি আর দাদা। ছোট কাকীমা ডাল দিয়ে গেলেন, একটু পরে কি একটা চচ্চড়িও নিয়ে এলেন। শুধু তাই দিয়ে খেয়ে আমরা দু-জনে ভাত প্রায় শেষ ক'রে এনেচি, এমন সময় ছোটকাকীমা আবার এলেন। দাদা হঠাৎ জিগ্যেস্ করলে—কাকীমা, আজ মাছ ছিল যে, মাছ কই?

আমি অবাক্ হ'য়ে দাদার মুখের দিকে চাইলাম, লজ্জা ও অস্বস্তিতে আমার মুখ রাঙা হয়ে উঠ্ল। দাদা যেন কি! এমন বোকা ছেলে যদি কখনো দেখে থাকি! আমার অনুমান ঠিকই হ'ল, কাকীমা একটু অপ্রতিভের সুরে বললেন—মাছ যা ছিল, আগেই উঠে গিয়েচে বাবা, ওই দিয়ে খেয়ে নাও। আর একটু ডাল নিয়ে আস্‌বো?

দাদার মুখ দেখে বুঝলাম দাদা যেন হতাশ হয়েচে। মাছ খাবার আশা করেছিল, তাই না পেয়ে। মনটায় আমার কষ্ট হ'ল। দাদা দেখেও দেখে না, বুঝেও বোঝে না—দেখ্‌চে এখানে আমরা কি অবস্থায় চোরের মত আছি পরের বাড়ি, তাদের হাত-তোলা দু-মুঠো ভাতে কটি ভাইবোন্ কোনোরকমে দিন কাটিয়ে যাচ্চি, এখানে আমাদের না আছে জোর, না আছে কোনো দাবি—তবুও দাদার চৈতন্য হয় না, সে আশা ক'রে বসে থাকে যে এই বাড়ির অন্যান্য ছেলেদের মত সেও যত্ন পাবে, খাবার সময় ভাগের ভাগ মাছ পাবে, বাটি-ভরা দুধ পাবে, মিষ্টি পাবে। তা পায়ও না, না পেয়ে আবার হতাশ হয়ে পড়ে, আশাভঙ্গের দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক চায়—এতে আমার ভারি কষ্ট হয়, অথচ দাদাকেও আসল অবস্থাটা খুলে বল্‌তে পারিনে, তাতেও কষ্ট হয়।

দাদা বাইরে এসে বললে—মাছ তো কম কেনা হয়নি, তার ওপর আবার মাঠের পুকুর থেকে মাছ এসেছিল,—এতো মাছ সব হরু আর ভুন্টিরা খেয়ে ফেলেচে! বাবা রে, রাক্কোস্ সব এক একটি! একখানা মাছও খেতে পেলাম না।

দাদাকে ভগবান এমন বোকা ক'রে গড়েছিলেন কেন তাই ভাবি।

সীতা এ-সব বিষয়ে অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। এই সে-দিনও তো দেখেচি সীতা রান্নাঘরে খেতে বসেচে—সামনেই জ্যাঠাইমাও খেতে বসলেন। জ্যাঠাইমাকে ভুবনের মা এক

কাঁসি মাছের তরকারী দিয়ে গেল, বড় বড় দাগা মাছ আট দশ খানা তাতে—আর সীতাকে দিলে তার বরাদ্দমত একটুকরো—জ্যাঠাইমা মাছ যত পারলেন খেলেন, বাকীটা কাঁসিতেই রেখে দিলেন, সেই পাতে তাঁর ভায়ে-বৌ বস্‌বে—কিন্তু কই, সীতার পাতে তো একখানা মাছও নিজের পাত থেকে দিতে পারতেন! তা নিয়ে সীতা তো কখনো কিছু বলে না, দুঃখ করে না, নালিশ করে না। আমি জানতে পারলাম এই জন্যে যে আমি সে-সময় নিতাই কাকার জন্যে আগুন আনতে রান্নাঘরে গিয়েছিলাম—সীতা কোনো কথা আমায় বলেনি।

এ বাড়ির কাণ্ডই এ রকম, আজ এক বছরের ওপর তো দেখে আসচি। অবিশ্যি নিজের জন্যে আমি গ্রাহ্যও করিনে, আমার দুঃখ হয় ওদের জন্যে।

মায়ের দুঃখও এ বাড়িতে কম নয়। অত খাটুনির অভ্যেস্ মার ছিল না কোনো কালে। এই শীতকালে মা'কে গোছা গোছা বাসন নিয়ে ভোরে পুকুরের জলে নাম্‌তে হয়, মাকে আর সীতাকে। খিড়কী পুকুরের জল সকালে থাকে ঠাণ্ডা বরফ, রোদ তো পড়ে না জলে কোনো কালেই, চারি ধারে বড় বড় আম আর সুপুরির বাগান। এতটুকু রোদ আসে না ঘাটে, সেই কন্‌কনে হিমজলে বসে বসে বাসন মাজা, যেমন তেমন ক'রে মাজলে তো এ বাড়িতে চল্‌বে না, কোথাও দাগ থাক্‌বার যো নেই একটু, জ্যাঠাইমা দেখে নেবেন নিজে। সে যে কি কষ্ট হয় মায়ের, মা মুখ বুঁজে কাজ করে যান, বলেন না কিছু, আমি তো বুঝতে পারি? ও-সব কাজ কি মা করেছেন কখনো?

সকলের চেয়ে কাজ বাড়ে পুজো-আচ্চার দিনে—এ বাড়িতে বার মাসের বারটা সংক্রান্তিতে নিয়মিত ভাবে সত্যনারায়ণের সিন্নি হয়। গৃহদেবতা শালগ্রামের নিত্যপূজা তো আছেই। তা ছাড়া লক্ষ্মীপূজা মাসে একটা লেগেই থাকে। এ-সব দিনে সংসারের দৈনিক বাসন বাদে পুজোর বাসন বেরোয় ঝুড়িখানেক। এঁদের সংসার অত্যন্ত সাত্ত্বিক গোঁড়া হিন্দুর সংসার—পুজো-আচ্চার ব্যাপারে পান থেকে চুণ খস্‌বার জো নেই। সে ব্যাপারের দেখাশুনো করেন জ্যাঠাইমা স্বয়ং। ফলে ঠাকুর-ঘরের কাজ নিয়ে যাঁরা খাটাখাটুনি করেন, তাঁদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে ওঠে।

পুজোর বাসন যে-দিন বেরোয় মা সে-দিন সীতাকে সঙ্গে নিয়ে যান ঘাটে। সে যতটা পারে মা'কে সাহায্য করে বটে, কিন্তু একে সে ছেলেমানুষ, তাতে তার ও-সব কাজে অভ্যেস নেই একেবারেই। জ্যাঠাইমার পছন্দমত পুজোর বাসন মাজতে সক্ষম হওয়া মানে অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া—বরং বোধ হয় শেষেরটাই কিছু সহজ। জ্যাঠাইমা বলবেন,—কোষাকুষি মাজবার ছিরি কি তোমার সেজবৌ? এতদিন ব'লে দিইচি তামার পাত্তরে তেঁতুল নেবু না দিলে ম্যাড়-ম্যাড় করবেই—শুধু বালি দিয়ে ঘষলে কি আর—ঠাকুরদেবতার কাজগুলোও তো একটু চেদ্দা ক'রে লোকে করে? সব তাতেই খিরিষ্টানি—

মা জবাব খুঁজে পান না। যদি তিনি বল্‌তে যান—"না বড়দি, নেবু ঘষেই তো ঠাকুর-ঘরের তামার বাসন বরাবরই—"

জ্যাঠাইমা বাধা দিয়ে বল্‌বেন,—আমার চোখে তো এখনো ঢ্যালা বেরুইনি সেজবৌ? অম্বলতা দিয়ে বাসন মাজলে অম্‌নি ছিরি হয় বাসনের? কা'কে শেখাতে এসেচ? কি বলব, ভুবনের মা হেঁসেলের কাজ সেরে সময় করতে পারে না, নইলে বাসন-মাজা কা'কে বলে—জ্যাঠাইমা নিজের কথার প্রতিবাদ সহ্য করতে পারেন না, আর কেনই বা পারবেন, তিনিই যখন এ বাড়ির কর্ত্রী, এ বাড়ির সর্ব্বেসর্ব্বা, পুত্রবধূরা, জায়েরা, ভায়েবৌ, মাসীর দল, পিসীর দল সবাই যখন মেনে চলে,—ভয় করে।

আমার স্কুলের পড়াটা শেষ হয়ে গেলে বাঁচি, এদের হাত থেকে উদ্ধার পেয়ে অন্য কোথাও চলে যাই তাহ'লে।

২

ভুবনের মা সকালে আমাকে ডেকে বললে,—জিতু, তুমি যখন স্কুলে যাও, ভুবনকেও নিয়ে যেও না? ওর লেখাপড়া তো হ'ল না কিছু, আমি মাসে মাসে আট আনা মাইনে দিতে পারি, জিগ্যেস্ করে এসো তো ইস্কুলে, তাতে হয় কি না?

আমি বললাম,—দেবেন কাকীমা, ওতেই হয়ে যাবে, ওর তো নীচু ক্লাসের পড়া, আট আনায় খুব হবে।

ভুবনের মা আঁচল থেকে একটা আধুলি বের ক'রে আমায় দিতে গেল। বললে, "তাহ'লে নিয়ে রেখে দাও, আর

আজ ভাত খাওয়ার সময়ে ভুবনকেও ডেকে খেতে বসিও। ও আমার কথা শোনে না—তুমি একবার ইস্কুলে ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিয়ে গিয়ে ভর্ত্তি ক'রে দিলে তারপর থেকে ভয়ে আপনি যাবে। মাথার ওপর কেউ নেই, বেজায় বেয়াড়া হয়ে উঠ্‌চে দিন দিন।"

তারপর আমার হাত দু-খানা খপ ক'রে ধরে ফেলে মিনতির সুরে বললে, এই উপগারটুকু তোমায় করতে হবে বাবা জিতু—আমার কেউ নেই, কাউকে বলতে পারিনে, বৌ-মানুষ, কপালই না হয় পুড়েচে, কিন্তু কি ব'লে যার-তার সঙ্গে কথা কই বলো তো বাবা? ব'লো একটু ভুবনকে বুঝিয়ে।

এই ভুবনের মা এ বাড়িতে কি রকমে ঢুকলো, মার মুখে সে কথা আমি শুনেচি। এই গাঁয়েই ওর বাড়ি। ওর এক সতীন আছে, স্বামী মারা যাওয়ার পরে সম্পত্তির অর্দ্ধেক ভাগ পাছে দখল করতে না পেরে ওঠে এই ভয়ে জ্যাঠামশায়ের নামে বুঝি লেখাপড়া ক'রে দেয়। কথা থাকে, এঁরা ওদের দু-জনকে চিরকাল খেতে পরতে দেবে। এ বাড়িতে ভুবনের মা আছে চাকরাণীরও অধম হয়ে। রাঁধুনীকে রাঁধুনী, চাকরাণীকে চাকরাণী। আর এত হেনস্থাও সবাই মিলে করে ওকে!

ভুবনের মা হয়েচে এ সংসারের অমঙ্গলের থার্ম্মোমিটার। অর্থাৎ মঙ্গল যখন আসে, তখন ভুবনের মায়ের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্কই নেই—অমঙ্গল এলেই কিন্তু ভুবনের মায়ের দোষ। জ্যাঠাইমা অমনি বলবেন, "যেদিন থেকে ও আমার বাড়ি ঢুকেচে, সেদিন থেকেই জানি এ বাড়ির আর ভাগ্যি নেই। সাত কুল খেয়ে যে আসে, তার কি আর—তখুনি কর্ত্তাকে বলেছিলাম, ও পাপ ঢুকিও না সংসারে, তা কাঙালের কথা বাসি হ'লে মিষ্টি লাগে।"

আমি নিজের কানে কত দিন এ ধরণের কথা শুনেচি। মা বলেন, ভুবনের মায়ের মত বোকা লোক তিনি কখনো দেখেন নি।

৩

চৈত্র মাসের গোড়ার দিকে মেজকাকার ছেলে সলিল বললে, "জানো নিতু-দা, মঙ্গলবারে আমাদের বাড়িতে গোপীনাথ জীউ ঠাকুর আসবেন? ও পাড়ার মেজ জ্যাঠা-মশায়দের বাড়ি ঠাকুর এখন আছেন, মঙ্গলবারে আসবেন, দু-মাস থাকবেন, তারপর আবার হরিপুরের বৃন্দাবন মুখুয্যের বাড়ি থেকে তারা নিতে আসবে। বছরে এই দু-মাস আমাদের পালা। দাদাও সেখানে ছিল, বললে,—খুব খাওয়ান-দাওয়ান হবে?

সলিল বললে, "যে-দিন আসবেন, সে-দিনও তো গাঁয়ের সব ব্রাহ্মণের নেমন্তন্ন, তা ছাড়া রোজ বিকেলে শেতল হবে, রাত্তিরে ভোগ—সে ভারি খাওয়ার মজা।

দাদা ও আমি দু-জনেই খুশী হয়ে উঠি। মঙ্গলবার সকাল থেকে বাড়িতে বিরাট হৈচৈ পড়ে গেল, ঠাকুর-ঘর ধোয়া সুরু হ'ল, বাসন-কোসন কাল বিকেল থেকেই মাজাঘষা চল্‌চে, ভুবনের মা রাত থাকতে উঠে রান্নাঘরে ঢুকেচে, পাড়ার অনেক ঝি-বউ অবিশ্যি যথেষ্ট কাজের সাহায্য করচে, একটি দল তো কাল রাত থেকে তরকারী কুটেচে এক রাশ।

কাকীমারা কাল বিকেল থেকে ক্ষীরের সন্দেশ ও নারি-কেলের লাড়ু গড়তে ব্যস্ত আছেন। ঝিটকিপোতার গোলা-বাড়ি থেকে গাড়ীখানেক আক, শসা, কলা, নারিকেল এসেচে, সেগুলো কাটা, ছাড়ানো ব্যাপারে বাড়ির ছোট ছোট মেয়েদের নাইয়ে ধুইয়ে ধোয়া কাপড় পরিয়ে লাগানো হয়েচে।

বাড়ির ছেলেমেয়েরা সকাল সকাল স্নান সেরে ধোয়া ধুতি-চাদর গায়ে ঠাকুর আনতে গেল কর্ত্তাদের সঙ্গে, তাঁরাও গরদের জোড় প'রে আগে আগে চলেচেন। ছেলেরা কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়ে বেলা দশটার সময় তাঁদের সঙ্গে ঠাকুর নিয়ে ফিরলো। জ্যাঠাইমা জলের ঝারা দিতে দিতে দরজা থেকে এগিয়ে গিয়ে ঠাকুরকে অভ্যর্থনা ক'রে নিয়ে এলেন। মেয়েরা শাঁক বাজাতে লাগলেন। ধূপধুনার ধোঁয়ায় ঠাকুর-ঘরের বারান্দা অন্ধকার হয়ে গেল। আমি এ-দৃশ্য কখনো দেখিনি—আমার ভারি আনন্দ হ'ল, ইচ্ছে হ'ল আর একটু এগিয়ে গিয়ে ঠাকুরঘরের দোরে দাঁড়িয়ে দেখি, কিন্তু ভয় হ'ল পাছে জ্যাঠাইমা বকুনি দেন, বলেন—তুই এখানে দাঁড়িয়ে কেন? কি কাপড়ে আছিস্ তার নেই ঠিক, যা সরে যা। এমন অনেকবার বলেচেন—তাই ভয় হয়।

বেলা একটা পর্য্যন্ত আমাদের পেটে কিছু গেল না। বাড়ির অন্যান্য ছেলেমেয়েদের কথা স্বতন্ত্র—তাদেরই বাড়ি,

তাদেরই ঘরদোর। তারা যেখানে যেতে পারে, আমরা তিন ভাইবোনেই লাজুক, সেখানে আমরা যেতে সাহস করি না, কারুর কাছে খাবার চেয়ে খেতেও পারিনে। মা ব্যস্ত আছেন নানা কাজে, অবিশ্যি হেঁসেলের কাজে তাঁকে লাগানো হয় না এ বাড়িতে, তা আমি জানি। কিন্তু ঝিয়ের কাজ করতে তো দোষ নেই? বাড়ির অন্যান্য মেয়েরা কোনোদিনই আমাদের খাওয়া-দাওয়ার খোঁজ করেন না, আজ অবিশ্যি সকলে মহাব্যস্ত।

বেলা যখন দেড়টা আন্দাজ, রান্নাঘরের দিকে একটা গোলমাল ও জ্যাঠাইমার গলার চীৎকার শুনে ব্যাপার কি দেখতে গেলাম ছুটে। গিয়ে দেখি, রান্নাঘরের কোণে ঢেঁকিতলার কাছে দাদা একটা লাউপাতা হাতে দাঁড়িয়ে। জ্যাঠাইমা বক্চেন—ওই ঝাড় তো, আর কত ভাল হবে তোমাদের? এখনো বামুন-ভোজন হ'ল না, দেবতার ভোগ রইল পড়ে, উনি এসেচেন ভোগের আগে পেরসাদ পেতে, দেবতা নেই, বামুন নেই, ওর শূয়োর-পেট পোরালেই আমার স্বগ্গে ঘণ্টা বাজবে যে! বুড়ো দাম্ড়া কোথাকার—ও-সব খিরিষ্টানি চাল এ বাড়িতে চল্বে না বোলে দিচ্চি, মুড়ো ঝাঁটা মেরে বাড়ি থেকে বিদেয় ক'রে দেবো জানো না? আমার বাড়ি বসে ও-সব অনাচার হবার যো নেই, যখন করেচ তখন করেচ।

মা কোথায় ছিলেন আমি জানিনে। পাছে তিনি শুন্তে পান এই ভয়ে দাদাকে আমি সঙ্গে ক'রে বাইরে নিয়ে এলাম। দাদা লাউপাতাটা হাতে নিয়েই বাইরে চলে এল। আমি বললাম,—ওখানে কি কচ্ছিলে? দাদা বললে,—কি আবার করবো? ভুবনের মা কাকীমার কাছে দু-খানা তেলপিটুলি ভাজা চাইছিলাম বড্ড খিদে পেয়েচে তাই। জ্যাঠাইমা শুন্তে পেয়ে কি বকুনিটাই—

ব'লেই লজ্জা ও অপমান ঢাক্বার চেষ্টায় কেমন এক ধরণের হাস্লে। হয়ত বাড়ির কোনো ছেলেই এখনো খায়নি, কিন্তু আমরা জানি দাদা খিদে মোটে সহ্য করতে পারে না, চা-বাগানে থাকতেও ভাত নামতে-না-নামতে সকলের আগে ও পিঁড়ি পেতে রান্নাঘরে খেতে বসে যেত। বয়সে বড় হ'লে কি হবে, ও আমাদের সকলের চেয়ে ছেলেমানুষ।

আজকার সমস্ত অনুষ্ঠানের ওপর আমার বিতৃষ্ণা হ'ল। এদের দয়ামায়া নেই, এই যে ঠাকুর-পূজার ধুমধাম, এর যেন কোথায় কি গলদ আছে। কোথায়—তা বোঝা আমার বুদ্ধিতে কুলায় না, কিন্তু গোটা ব্যাপারটাই যেন কেমন—মনের সঙ্গে আমার খাপ খেলো না আদৌ।

আর কিছুদিন পরে একটু বয়েস হ'লে আমি বুঝেছিলাম যে, এদের ভক্তির উৎসের মূল এদের বিষয়-বুদ্ধি ও সাংসারিক উন্নতি। ভগবান্ এদের উন্নতি করচেন, ফল বাড়াচ্চেন, মান খাতির বাড়াচ্চেন,—এঁরাও ভগবানকে খুব তোয়াজ করচেন, খুশী রাখবার চেষ্টা করচেন—ভবিষ্যতে আরও যাতে বাড়ে। প্রতি পূর্ণিমায় ঘরে সত্যনারায়ণ পূজা হয়, সংক্রান্তিতে-সংক্রান্তিতে দুটি ব্রাহ্মণ খাওয়ানো হয়, তাই নয় শুধু—একটি গরিব ছাত্রকে জ্যাঠাইমা বছরে একটি টাকা দিয়ে থাকেন বই কেনার জন্যে। শ্রাবণ মাসে তাঁদের আবাদ থেকে বছরের ধান, জালা-ভরা কই মাছ, বাজরা-ভরা হাঁসের ডিম, তিল, আকের গুড়, আরও অনেক জিনিষ নৌকা বোঝাই হয়ে আসতো। ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে তাঁরা প্রতি বার এই সময় পাঁঠাবলি দিয়ে মনসাপূজো করতেন ও গ্রামের ব্রাহ্মণ খাওয়াতেন। এদের সত্যনারায়ণ পূজো ঘরের সচ্ছলতা বৃদ্ধি করার জন্যে, লক্ষ্মীপূজো ধন-ধান্য বৃদ্ধির জন্যে, গৃহ-দেবতার পূজো, গোপীনাথ জীউর পূজো—সবারই মূলে—হে ঠাকুর, ধনেপুত্রে যেন লক্ষ্মীলাভ হয় অর্থাৎ তা হ'লে তোমাকেও খুশী রাখবো।

বাবার মুখে শুনেচি, এ-সমস্ত বাড়িঘর আমার ঠাকুরদাদা গোবিন্দলাল মুখুয্যের তৈরি। ঠাকুরদাদা যখন মারা যান, বাবার তখন বয়স বেশী নয়। তিনি মামার বাড়িতে মানুষ হন এবং তারপর চাকরি নিয়ে বিদেশে বার হয়ে যান। জ্যাঠামশাইয়ের বাবা নন্দলাল মুখুয্যে নায়েবী কাজে বিস্তর পয়সা রোজগার করেছিলেন এবং আবাদ-অঞ্চলে একশো বিঘে ধানের জমি কিনে রেখে যান। আবাদ-অঞ্চল মানে কি আমি এতদিনও জানতাম না, এই সে-দিন জ্যাঠামশাইয়েদের আড়তের মুহুরী যদু বিশ্বাসকে জিগ্যেস ক'রে জেনেচি।

জ্যাঠামশাই পাটের ব্যবসা ক'রে খুব উন্নতি করেছেন। এদের বর্তমান উন্নতির মূলেই এদের পাটের ও ধানের কারবার। জ্যাঠামশাইরা তিন ভাই—সবাই এই আড়তের

কাজেই লেগে আছেন দেখতে পাই। এঁরা বাবার খুড়তুত ভাই, বাবাই ঠাকুরদাদার একমাত্র ছেলে ছিলেন। বাবা কোনো কালেই এ-গাঁয়ে বাস করেন নি, জমিজমা যা ছিল তাও এখন আর নেই, বাবা বেঁচে থাকতে একদিন জ্যাঠা-মশায়কে বলতে শুনেছিলাম যে, সব নাকি রোডসেস্ নীলামে বিক্রী হয়ে গেছে। সে-সব কি ব্যাপার যত বুঝি আর না বুঝি, এটুকু আজকাল বুঝেচি যে এখানে আমাদের দাবি কিছু নেই, এবং জ্যাঠামশায়দের দয়ায় তাঁদের সংসারে মাথা গুঁজে আমরা আছি।

৪

জ্যাঠাইমাকে আমার নতুন নতুন ভারি ভাল লাগতো, কিন্তু এতদিন আমরা এ বাড়িতে এসেচি, একদিনের জন্যেও আমাদের ওপর তিনি ভাল ব্যবহার করেন নি—আমাকে ও দাদাকে তো নখে ফেলে কাটেন এমনি অবস্থা। অনবরত জ্যাঠাইমার কাছ থেকে গালমন্দ অপমান খেয়ে খেয়ে আমারও মন বিরূপ হয়ে উঠেচে। আজকাল আমি তো জ্যাঠাইমাকে এড়িয়ে চলি, সীতাও তাই, দাদা ভালমন্দ কিছু তেমন বোঝে না, ও নবান্নের দিন বাটি হাতে জ্যাঠাইমায়ের কাছে নবান্ন চাইতে গিয়ে বকুনি খেয়ে ফিরে আসবে, পুকুরের ঘাটে নাকি জ্যাঠাইমা নেয়ে উঠে আসছিলেন, ও সে-সময় ঝাঁপিয়ে জলে পড়ার দরুণ জল ছিটিয়ে তাঁর গায়ে লাগে, সেজন্যে মার খাবে, বাসি কাপড়ে জ্যাঠাইমার ঘরে ঢুকে এই সে-দিনও মার খেতে খেতে বেঁচে গিয়েচে। কেন বাপু যাওয়া?

কিন্তু না গেলেই যে বিপদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় তা নয়, এক সংসারে থাকতে গেলে ছোঁয়াছুঁয়ি ঠেকাঠেকি না হয়ে তো পারে না, অথচ হ'লেই আর রক্ষে নেই।

জ্যাঠাইমাদের রোয়াকে বসে আমি আর ভুবন খেলচি—এমন সময় জ্যাঠাইমা ওপরের দালান থেকে ঝিণ্টু, বাদল, উষা, কাতু—ওদের ডাক দিলেন। ডাকলেন কেন আমি তা জানি, খাবার খাওয়ার জন্যে—আমি আর ভুবন যে সেখানে আছি, তা দেখেও দেখলেন না। আমি ভুবনকে বসতে ব'লে মায়ের কাছ থেকে বড় এক বাটী মুড়ি নিয়ে এসে দু-জনে খেতে লাগলাম। কাতু ফিরে এলে বললাম—ভাই, একঘটি জল নিয়ে আয় না খাবো? খাবার-খাওয়া সেরে আমরা আবার খেলা করচি, এমন সময়ে জ্যাঠাইমা সেখানে এলেন কাপড় তুলতে। রোয়াকের ধারে আমাদের মুড়ির বাটীটার দিকে চেয়ে বললেন—এ বাটীতে হাত ধুয়েচে কে? এ ঠিক জিতুর কাজ, নইলে অমন মেলেচ্ছো এ বাড়ির মধ্যে তো আর কেউ নেই?

কি ক'রে ফেলেচি না জেনে! ভয়ে ভয়ে বললাম—কি হয়েচে জ্যাঠাইমা? জ্যাঠাইমা মার-মুখী হয়ে বললেন—কি হয়েচে দেখতে পাচ্ছো না? দুকুরবেলা কাপড়খানা কেচে আলনায় রেখে গিইচি, কাচা কাপড়খানা জল ছিটিয়ে এ টো ক'রে বসে আছো?

মেজকাকীমার এক পিসী না মাসী এ বাড়িতে থাকে, বুড়ী ভারি ঝগড়াটে আর জ্যাঠাইমার খোসামুদে। বয়েস পঞ্চাশ-ষাট হবে, কালো, একহারা, দড়িপাকানো গড়ন—সীতা আর আমি আড়ালে বলি—তাড়কা রাক্ষসী। নানা ছুতো-নাতায় মাকে অনেকবার বকুনি খাইয়েচে জ্যাঠাইমা কাকীমাদের কাছে। ওকে দু-চক্ষে আমরা দেখতে পারিনে। জ্যাঠাইমার গলার স্বর শুনে রান্নাঘরের উঠোন থেকে বুড়ী ছুটে এল। কি হয়েচে বৌমা, কি হয়েচে? জ্যাঠাইমা বললেন—সন্দেবেলা আহ্নিক ক'রবো ব'লে কাপড়খানা কেচে আলনায় দিয়ে রেখেচি মাসী—আর বুড়ো ধাড়ি ছোঁড়া করেচে কি, এখেনে মুড়ি খেয়ে সেই বাটীতেই জল দিয়ে হাত ধুয়েচে, আর এই রোয়াকের ধারেই কাপড়—তুমি কি বলতে চাও কাপড়ে লাগেনি জলের ছিটে?

বুড়ী অবাক্ হবার ভাণ ক'রে বললে—ওমা সে কি কথা! লাগেনি আবার, একশো বার লেগেচে।

আমি ভাবলাম, বারে! এতে হয়েচে কি? জল যদি লেগেই থাকে, দু-চার ফোঁটা লেগেচে বইতো নয়? জ্যাঠাইমাকে বললাম—জল তো ওতে লাগেনি জ্যাঠাইমা, আর যদিও একটু লেগে থাকে, এখনও রোদ রয়েচে এক্ষুনি শুকিয়ে যাবে'খন।

বুড়ী বললে—শোন কথা। ও ছোঁড়ার জ্ঞান-কাণ্ড একেবারেই নেই—একেবারে মেলেচ্ছো—ওর মাও তাই হিঁদুয়ানি তো শেখেনি কোনোদিন—

—তোমরা শোনো মাসী, আমি শুনে শুনে হদ্দ হয়ে গিয়েচি। ঘরে ঠাকুর রয়েচেন, আর এই সব অনাচার কি ক'রে বরদাস্ত করি বল তো তুমি? আমার কোনও ছেলেমেয়ে ওরকম করবে? অত বড় ধাড়ী ছেলে হ'ল, মুড়ির বাটীতে জল ঢাল্‌লে যে শকড়ী হয় সে ও জানে না। শুন্‌বে কোথা থেকে, মেলেচ্ছো খিরিষ্টানের মধ্যে এত কাল কাটিয়ে এসেচে, ভাল শিক্ষে দিয়েচে কে? হিঁদুর বাড়িতে কি এ-সব পোষায়? বল তো তুমি—

বুড়ী বললে—ওর মা জানে না তা ও জান্‌বে কোথা থেকে? সেদিন ওর মা করেচে কি, পুকুর ঘাটে তো বড় নৈবিদ্যির বারকোশখানা ধুতে নিয়ে গিয়েচে—যেদিন ঠাকুর এলেন (বুড়ী উদ্দেশে দু-হাত জোড় ক'রে নমস্কার করলে) তার পরের দিন—আমি দাঁড়িয়ে ঘাটে, কাপড় কেচে যখন উঠলি তখন ধোয়া বারকোশখানা আর একবার জলে ডুবো—না ডুবিয়েই অমনি উঠিয়ে নিয়ে যাচ্চে। আমি দেখে বলি, ও কি কাণ্ড বউ? ভাগ্যিস্ দেখে ফেললাম তাই তো—

মায়ের দোষ দেওয়াতেই হোক্, বা আমাকে আগের ওই সব কথা বলাতেই হোক্, আমার রাগ হ'ল। তা ছাড়া আমার মন বললে এতে কোন দোষ হয়নি—মুড়ির বাটীতে জল ঢালার দরুণে মুড়ির বাটী অপবিত্র হবে কেন? মা বারকোশ ধুয়ে জলের ধারে রেখে স্নান সেরে উঠে যদি সে বারকোশ নিয়ে এসে থাকেন, তাতে মা কোন অন্যায় কাজ করেন নি। বললাম, "ওতে কি দোষ জ্যাঠাইমা, মুড়িও খাবার জিনিষ, জলও খাবার জিনিষ—দুটোতে মেশালে খারাপ হবে কেন, ছুঁতে থাক্‌বেই বা না কেন?

জ্যাঠাইমা অগ্নিমূর্ত্তি হয়ে উঠলেন। "তোর কাছে শাস্তর শুন্‌তে আসিনি, ফাজিল ছোঁড়া কোথাকার—তোরা তো খিরিষ্টান্, হিঁদুর আচারব্যাভার তোরা জানিস্ কি, তোর মা-ই বা জানে কি? ওইটুকু ছেলে গাল টিপলে দুধ বেরোয়, উনি আবার আমায় শাস্তর বোঝাতে আসেন। শিখবি কোত্থেকে, তোর মা তোদের কি কিছু শিখিয়েচে, না কিছু জানে? পয়সা রোজগার করেচে আর দু-হাতে উড়িয়েচে তোর বাবা—মদ খেয়ে খিরিষ্টানি কোরে—"

মাসীমা বললেন, "মোলোও সেই রকম। যেমন-যেমন কর্ম্মফল, তেমন-তেমন মিত্যু। দশেধর্ম্মে দেখলে সবাই, যে কর্ম্মের যে শাস্তি—ঘর থেকে মড়া বেরোয় না, ও পাড়ার হরিদাস না এসে পড়লে ঘরের মধ্যে পড়ে থাকতো—"

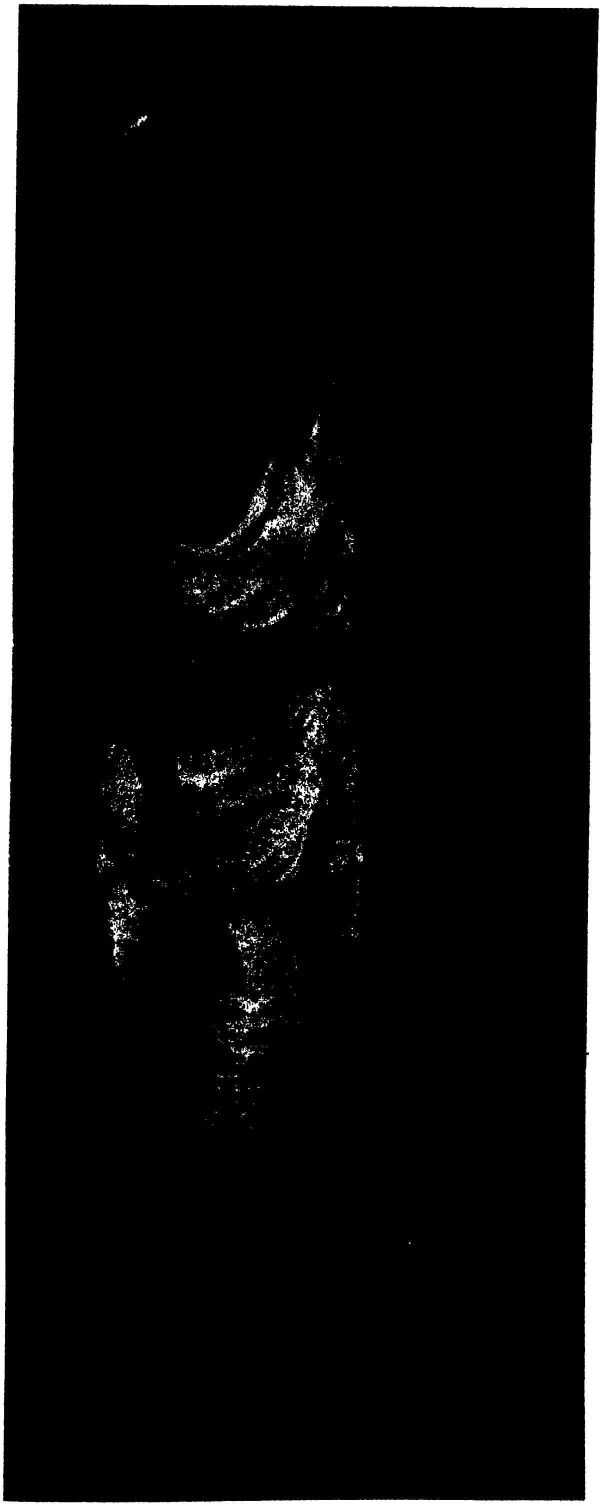
বাবার মৃত্যুর সম্পর্কে এ কথা বলাতে আমার রাগ হ'ল। তাঁর মরণের পরে এখন তাঁর কথা ভেবে আমার বড় কষ্ট হয়, যদিও সে কথা কাউকে বলিনে। বললাম, "ভাল মরণ আর মন্দ মরণ নিয়ে বাহাদুরী কি মাসীমা? এই তো মাঘ মাসে ওই তেঁতুলতলায় যাদের বাড়ি, ওই বাড়ির সেই বুড়ো গাঙ্গুলী-মশায় মারা গেলেন, তিনি তো খুব ভালমানুষ ছিলেন সবাই বলে, পুকুরের ঘাটে এক বেলা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আহ্নিক করতেন, তবে তিনি পেন্‌সন্ আনতে গিয়ে ও-রকম ক'রে সেখানে মারা গেলেন কেন? সেখানে কে তাঁর মুখে জল দিয়েচে, কে মড়া ছুঁয়েচে, কোথায় ছিল ছেলেমেয়ে, ও-রকম হ'ল কেন?"

আমার বোকামি, আমি ভেবেছিলাম ঠিকমত যুক্তি দেখিয়ে মাসীমাকে তর্কে হারাবো, কিন্তু মাসীমার ধরণের ঝগড়ায় মজবুত পাড়াগাঁয়ের মেয়ে যে অত সহজে হার মেনে নেবেন, এ ধারণা করাই আমার ভুল হয়েছিল। মাসীমা যুক্তির পথে গেলেন না।

"মরুক বুড়ো গাঙ্গুলি, তবুও খবর পেয়ে তার ছেলেজামাই গিয়ে তাকে এনে গঙ্গায় দিয়েছিল, তোর বাবার মত দোগেছের মাঠে ডোবার জলে আধপোড়া ক'রে ফেলে রেখে আসেনি। আমি সব জানি, আমায় ঘাঁটাস্ নে, অনেক আদ্যি নাড়ির কথা বেরিয়ে যাবে। কাঠ জোটেনি, খেজুরের ডাল দিয়ে পুড়িয়েছিল, সব শুনিচি আমি। দোগেছের মাঠে সন্দের পর লোকে যায় না, সবাই বলে এখন ও ভূত হয়ে—"

কথা সবই সত্যি, শেষেরটুকু ছাড়া। ঐটুকুর ওপরই জোর দিয়ে বললাম—"মিথ্যে কথা, বাবা কখনো—" তারপর যুক্তির অকাট্যতা প্রমাণ করবার জন্যে এমন একটা কথা ব'লে ফেললাম যা কখনো কারুর কাছে বলিনি বা খুব রেগে মরীয়া না হ'য়ে উঠলে বলতামও না এদের কাছে। বললাম, "জানেন, আমি ভূত দেখতে পাই, অনেক দেখেচি, বাবাকে তা হ'লে নিশ্চয়ই আমি দেখতে পেতাম, জানেন? চা-বাগানে থাকতে আমি কত—"

এই পর্য্যন্ত বলেই চুপ করে গেলাম। মাসীমা খিল্ খিল্



হাটের পথে

শ্রীশোভগ মল্ল গেহ্লোট

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

ক'রে হেসেই খুন। "হি হি, এ ছোঁড়াও পাগল ওর বাপের মত—হি হি—শুনেচো বউমা, হি হি—কি বলে শুনেচো একবার—"

জ্যাঠাইমা বললেন, "যা এখান থেকে এই মুড়ির বাটি তুলে ধুয়ে নিয়ে আয় পুকুর থেকে, এই গাড়ুর জল দিয়ে ধুয়ে দে। আমার কাপড়খানাও কেচে নিয়ে আয় অমনি, তোর সঙ্গে কে এখন সন্দে অবধি তক্কো করে? তবে ব'লে দিচ্চি, হিঁদুর ঘরে হিঁদুর মত ব্যাভার না করলে এ বাড়িতে জায়গা হবে না। পষ্ট কথায় কষ্ট নেই, কই আমাদের বুলু, ভুন্টি, হাবু কি সতীশ তো কখনও এমন করে না, যা বলি তখুনি তাই তো শোনে, কই এক দিনের জন্তেও তো—"

মাসীমা বললেন, "ওমা বুলু হাবু সতীশের কথা ব'লো না, তারা আমার বেঁচে থাক, সোনার চাঁদ ছেলে মেয়ে সব। তারা হিঁদুয়ানির যা জানে ওর মা তা জানে না তো ও! সে দিন সতীশকে বল্‌চি, সতু দাদাভাই, তেলের ভাঁড়টা বাইরের উঠোনে নিমু কলুকে দিয়ে এসো তো? তো বল্‌চে, 'আমার বিছানার কাপড় মাসীমা, আমি তো ভাঁড় ছোঁব না।' আমি মনে মনে ভাবলাম যে, দ্যাখো শিক্ষের গুণ দ্যাখো—কেমন ঘরে মানুষ তারা আহা বেঁচে থাক্—সব বেঁচে থাক্—

মনে মনে সতীশকে প্রশংসা করতে চেষ্টা করলাম। সতীশ যে স্বীকার করেচে তার কাপড় বাসি, এটা অবিশ্যি প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু বাসি কাপড়ে কিছু ছোঁয়া যে খারাপ কাজ, এ বিশ্বাস যার নেই, তাকেই বা দোষ দেওয়া যায় কি ক'রে, এ আমি বুঝতে পারিনে। যেমন, এখনই আমার মনে একটা প্রশ্ন এসেচে যে, নিমু কলু কি কাচা, ধোয়া, শুদ্ধ গরদের জোড় প'রে তেল বেচতে এসেছিল? সতীশের ভেবে দেখবার ক্ষমতা ও বুদ্ধির চেয়ে যদি কারুর বুদ্ধি ও বুঝবার শক্তি বেশী থাকে, তার জন্তে তাকে কি নরকে পচে মরতে হবে?

৫

তিন বছর এখনও হয়নি, আমরা এ গাঁয়ে এসেছি। তার আগে ছিলাম কার্সিয়ঙের কাছে একটা চা-বাগানে, বাবা সেখানে চাকরি করতেন। সেখানেই আমি ও সীতা জন্মেছি, (কেবল দাদা নয়, দাদা জন্মেচে হনুমান নগরে, বাবা তখন সেখানে রেলে কাজ করতেন) সেখানে আমরা বড় হয়েচি, এখানে আসবার আগে এত বড় সমতলভূমি কখনো দেখিনি। আমরা জানতাম চা-ঝোপ, ওক আর পাইনের বন, ধুরা গাছের বন, পাহাড়ী ডালিয়ার বন, ঝর্ণা, কন্‌কনে শীত, দূরে বরফে ঢাকা বড় বড় পাহাড়-পর্ব্বতের চূড়া, মেঘ, কুয়াসা, বৃষ্টি। এখানে প্রায়ই মাঝে মাঝে চা-বাগানের কথা, আমাদের নেপালী চাকর থাপার কথা, উম্‌প্লাঙের ডাক-বানার খড়্গ্ সিং আমাদের বাংলোতে মাঝে মাঝে ভাত খেতে আস্‌তো তার কথা, মিস্ নর্টনের কথা, পচাং বাগানের মাসীমার কথা, আমাদের বাগানের নীচে সেই অদ্ভুত রাস্তাটার কথা, মনে হয়।

সেই সব দিনই আমাদের সুখে কেটেচে। দুঃখের সুরু হয়েচে যে-দিন বাংলা দেশে পা দিয়েচি। এই জন্তে এই তিন বছরেও বাংলা দেশকে ভাল লাগ্‌লো না—মন ছুটে যায় আবার সেই সব জায়গায়, চা-বাগান, সেওলা-ঝোলা বড় বড় ওকের বনে, উম্‌প্লাঙের মিশন-হাউসের মাঠে—যেখানে আমি, সীতা, দাদা কতদিন সকালে ফুল তুলতে যেতাম, বড়দিনের সময় ছবির কার্ড আন্‌তে যেতাম, কেমন মিষ্টি কথা বলতো, ভালবাস্‌তো মিস্ নর্টন,। ভাবতে বস্‌লে এক-একটা দিনের কথা এমন চমৎকার মনে আসে! ··

* * *

শীতের সকাল।

বাড়ির বার হয়েই দেখি চারিধারে বনে জঙ্গলে পাহাড়ের ঢালুর গায়ে পাইন গাছের ফাঁকে বেশ রোদ। আমি উঠতাম খুব সকালেই, সীতা ও দাদা তখনও লেপের তলায়, চা না পেলে এই হাড়কাঁপানো শীতে উঠতে কেউ রাজী নয়।

শীতও পড়েচে দস্তুরমত। আমাদের বাগানের দক্ষিণে কিছু দূরে যে বড় চা-বাগানটা নতুন হয়েচে,যার বাংলোগুলোর লাল টালির ঢালু ছাদ আমাদের এখান থেকে দেখা যায় পাইন গাছের ফাঁকে, আজ তাদের লোকজনেরা চায়ের চারাগাছ খড়ের পালুটি দিয়ে ঢেকে দিচ্চে, বোধ হয় বরফ পড়বার ভয়ে। আকাশ পরিষ্কার, সুনীল, কোনোদিকে এতটুকু কুয়াসা নেই; বরফ পড়বার দিন বটে।

একটু পরে সীতা উঠল। সে রোগা, ফর্সা, ছিপ্‌ছিপে।

সে ও দাদা খুব ফর্দা, তবে অত ছিপ্‌ছিপে আর কেউ নয়। সীতা বললে, "থাপা কোথায় গেল দাদা? আজ ও সোনাদা যাবে? বাজার থেকে একটা জিনিষ আনতে দেবো।"

আমি বললাম, "কি জিনিষ রে?"

সীতা দুষ্টুমির হাসি হেসে বললে, "বলবো কেন? তোমরা যে কত জিনিষ আনো, আমায় বলো?" একটু পরে থাপা এল। সে হপ্তায় দু-দিন সোনাদা-বাজারে যায় তরকারী আর মাংস আনতে। সীতা চুপি চুপি তাকে কি আনতে ব'লে দিলে, আড়ালে থাপাকে জিগ্যেস ক'রে জানলাম জিনিষটা একপাতা সেফটি পিন্! এরই জন্যে এতো।

একটু বেলায় বরফ পড়তে সুরু হ'ল। দেখতে দেখতে বাড়ির ছাদ, গাছপালার মাথা, পথঘাট যেন নরম খোলো খোলো পেঁজা কাপাস তুলোতে ঢেকে গেল। এই সময়টা ভারি ভাল লাগে; আগুনের আংটাতে—গণগণে আগুন, হাড়কাঁপানো শীতের মধ্যে আগুনের চারিধারে বসে আমি, দাদা ও সীতা লুডো খেলতে সুরু ক'রে দিলাম।

এই সময় বাবা এলেন আপিস থেকে। ম্যানেজারের কুঠীর পাশেই আপিস-ঘর, আমাদের বাংলো থেকে প্রায় মাইলখানেক, কি তার একটু বেশী। বাবা বেলা এগারোটার সময় ফিরে খাওয়া-দাওয়া ক'রে একটু বিশ্রাম করেন, তিনটের পরে বেরোন, ওদিকে রাত আটটা ন'টায় আসেন।

বাবা আমাদের সকলকে নিয়ে খেতে ভালবাসতেন। সীতাকে ডেকে বললেন—খুকী থাপাকে বলে দে নাইবার জন্যে জল গরম করতে—আর তোরা সব আজ আমার সঙ্গে খাবি—নিতুকে বলিস্ নইলে সে আগেই খাবে। মা রান্নাঘরে ব্যস্ত ছিলেন। সীতা গিয়ে বললে—মা, দাদাকে আগে ভাত দিও না, আমরা সবাই বাবার সঙ্গে খাবো।

সীতার কথা শেষ না হ'তে দাদা গিয়ে রান্নাঘরে হাজির। দাদা খিদে মোটে সহ্য করতে পারে না—তাই আমাদের সকলের আগে মা তাকে খেতে দিতেন। এদিকে আমাদের ক' ভাই-বোনের মধ্যে বাবা সকলের চেয়ে ভালবাসতেন দাদাকে ও সীতাকে। দাদাকে খাওয়ার সময়ে কাছে বসে না খেতে দেখলে তিনি কেমন একটু নিরাশ হ'তেন—যেন অনেকক্ষণ ধরে যেটা চাইছিলেন, সেটা হ'ল না।

সীতা বললে—দাদা তুমি খেও না, বাবা আজ সকলকে নিয়ে খাবেন। বাবা নাইচেন, এক্ষুনি আমরা খেতে বসবো—

দাদা কড়া থেকে মাকে একটুকরো মাংস তুলে দিতে বললে এবং গরম টুকরোটা মুখে পুরে দিয়ে আবার তখুনি তাড়াতাড়ি বার ক'রে ফেলে, বার-দুই ফুঁ দিয়ে আবার মুখে পুরে নাচতে নাচতে চলে গেল। দাদাকে আমরা সবাই খুব ভালবাসি, দাদা বয়সে সকলের চেয়ে বড় হলেও এখনও সকলের চেয়ে ছেলেমানুষ। ও সকলের আগে খাবে, সকলের আগে ঘুমিয়ে পড়বে। ঘুরিয়ে কথা বললে বুঝবে না, অন্ধকারে একলা ঘরে শুতে পারবে না—ওর বয়স যদিও বছর চোদ্দ হ'ল, কিন্তু এখনও আমাদের চেয়ে ও ছেলেমানুষ, প্রথম সন্তান ব'লে বাপ-মায়ের বেশী আদর ওরই ওপর।

আমরা সবাই একসঙ্গে খেতে বসলাম। বাবা সীতাকে একপাশে ও দাদাকে আর একপাশে নিয়ে খেতে বসেচেন। মাংসের বাটি থেকে বাবা চর্বি বেচে বেচে ফেলে দিতেই সীতা বললে—বাবা আমি খাবো,—

দাদা বললে—তুই সব খাস্‌নে, আমাকে দু-খানা দে সীতা—

বাবা অত চর্বি ওদের খেতে দিলেন না। ওদের এক-এক টুকরো দিয়ে বাকী টুকরোগুলো বেরালদের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। আমায় বললেন জিতু, গায়ের মাপটা দিস তো তোর, ওবেলা সায়েবের দর্জি আস্‌বে, তার কাছে তোর জামা করতে দেবো—

সীতা বলল—আমার আর একটা জামা দরকার বাবা—

—তবে তুইও দিস গায়ের মাপটা,—ওই সঙ্গেই দিস্—

মা বললেন—তার দরকার কি, তুমি তাকে বাসায় পাঠিয়ে দিও না? আমি সব দেখে শুনে দেবো—আরও করাবার জিনিস রয়েচে—নিতুর মোটে ছুটো জামা, ওর ওভার-কোটটা পুরনো হয়ে ছিঁড়ে গিয়েচে—যেমন শীত পড়েচে এবার, ওর একটা ওভারকোট করে দাও—

বিকেলে মেমেরা মাকে পড়াতে এল।

মাইল দুই দূরে মিশনরীদের একটা আড্ডা আছে। আমি একবার মেমসাহেবদের সঙ্গে সেখানে গিয়েছিলাম। এখান থেকে খোসালডি চা-বাগানে যে রাস্তাটা পাহাড়ের ঢালু বেয়ে নেমেচে—তারই ধারে ওদের বাংলো। অনেকগুলো লাল

টালির ছোট বড় ঘর, বাঁশের জাফ্রীর বেড়ায় ঘেরা কম্পাউণ্ড, এই শীতকালে অজস্র ডালিয়া ফোটে, বড় বড় ম্যাগ্নোলিয়া গাছ। আমাদের বাগানেও বড় সাহেবের বাংলোতে দুটো ম্যাগ্নোলিয়া গাছ আছে।

এরা মাকে পড়ায়, সীতাকেও পড়ায়। মিস্ নর্টন দিনাজপুরে ছিল, বেশ বাংলা বলতে পারে। নানা ধরণের ছবিওয়ালা কার্ড, লাল সবুজ রঙের ছোট ছোট ছাপানো কাগজ, তাতে অনেক মজার গল্প থাকে। দাদার পড়াশুনায় তত ঝোঁক নেই, আমি ও সীতা পড়ি। একবার একখানা বই দিয়ে দিল – একটা গল্পের বই – 'সুবর্ণবণিক পুত্র'। এ কথায় আমি বুঝেছিলাম বণিকপুত্র সোনা দিয়ে গড়া অর্থাৎ সোনার মত ভাল। পাপের পথ থেকে উক্ত বণিকপুত্র কি করে ফিরে এসে খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করলে, এরই গল্প। অনেক কথা বুঝতে পারতাম না, কিন্তু বইখানা এমন ভাল লাগ্তো!...

মেম আসতো দু-জন। একজনের বয়স বেশী—মায়ের চেয়েও বেশী। আর একজনের বয়স খুব কম। অল্প বয়সী মেমটির নাম মিস্ নর্টন—একে আমার খুব ভাল লাগতো—নীল চোখ, সোনালি চুল, আমার কাছে মিস্ নর্টনের মুখ এত সুন্দর লাগতো, বার-বার ওর মুখের দিকে চাইতে ইচ্ছে করত, কিন্তু কেমন লজ্জা হ'ত—ভাল ক'রে চাইতে পারতাম না—অনেক সময় সে অন্যদিকে চোক ফিরিয়ে থাক্বার সময় লুকিয়ে এক চমক দেখে নিতাম। তখনি ভয় হ'ত হয়ত সীতা দেখচে—সীতা হয়ত এ নিয়ে ঠাট্টা করবে। ওরা আসতো বুধবারে ও শনিবারে। সপ্তাহে অন্যদিনগুলো যেন কাটতে চাইত না, দিন গুণতাম কবে বুধবার আসবে, কবে শনিবার হবে। মিস্ নর্টনের মত সুন্দরী মেয়ে আমি কখনো দেখিনি—আমার এই এগার-বার বছরের জীবনে।

কিন্তু মাঝে মাঝে এমনি হতাশ হ'তে হ'ত! দিন গুণে গুণে বুধবার এল, কিন্তু প্রৌঢ়া মেমটি সে দিন এল একা, সঙ্গে মিস্ নর্টন নেই—সারা দিনটা বিষাদ হ'য়ে যেতো, মিস্ নর্টনের ওপর মনে মনে অভিমান হ'ত, অথচ কেন আজ মিস নর্টন এল না সে কথা কাউকে জিজ্ঞেস করতে লজ্জা হ'ত।

মেয়েরা এক এক দিন আমাদের ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে শেখাতো। মা তখন থাকতেন না। আমি, সীতা, ও দাদা চোখ বুজতাম—মিস্ নর্টন ও তার সঙ্গিনী চোখ বুজতো। 'হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা সদাপ্রভু'—সবাই একসঙ্গে গম্ভীর সুরে আরম্ভ করলুম। হঠাৎ চোখ চেয়ে দেখতুম সবাই চোখ বুজে আছে, কেবল সীতা চোখ খুলে একবার জিব বার করেই আমার দিকে চেয়ে একবার দুষ্টুমির হাসি হাসলে—পরক্ষণেই আবার প্রার্থনায় যোগ দিলে।

সীতা ঐ রকম, ও কিছু মানে না, নিজের খেয়াল খুশীতে থাকে, যাকে পছন্দ করবে তাকে খুবই পছন্দ করবে, আবার যাকে দেখতে পারবে না তার কিছুই ভাল দেখবে না। ওর সাহসও খুব, দাদা যা করতে সাহস করে না, এমন কি আমিও যা অনেক সময় করতে ইতস্ততঃ করি—ও তা নির্ব্বিচারে করে। আমাদের বাংলো থেকে খানিকটা দূরে বনের মধ্যে একটা দেবস্থান আছে—পাহাড়ীদের ঠাকুর থাকে। একটা বড় সরল গাছের তলায় কতকগুলো পাথর—ওরা সেখানে মুরগী বলি দেয়, ঢাক বাজায়। সবাই বলে ওখানে ভূত আছে, জায়গাটা যেমন অন্ধকার তেমনি নির্জ্জন,—একবার দাদা তর্ক তুলে বললে আমরা কখনই ওখানে একা যেতে পারবো না। আমি ভেবে উত্তর দেওয়ার আগেই সীতা বাংলোর বার হয়ে চলে গেল একাই—কোনো উত্তর না দিয়েই ছুট দিলে পাহাড়ীদের সেই নির্জ্জন ঠাকুরতলার দিকে।...ওই রকম ওর মেজাজ।...

মিস্ নর্টন সীতাকে খুব ভালবাসে। মাঝে মাঝে সীতাকে সঙ্গে নিয়ে যায় ওদের মিশনবাড়িতে, ওকে ছবির বই, পুতুল, কেক, বিস্কুট, কত কি দেয়—ছবি আঁকতে শেখায়, বুনতে শেখায়—এরই মধ্যে সীতা বেশ পশমের ফুল তুলতে পারে, মানুষের মুখ, কুকুর আঁকতে পারে। ওরা আমাকেও অনেক বই দিয়েচে - মথি-লিখিত সুসমাচার, লুক-লিখিত সুসমাচার, যোহান-লিখিত সুসমাচার, সদাপ্রভুর কাহিনী—আরও অনেক সব। যীশু একটুকরা মাছ ও আধখানা রুটীতে হাজার লোককে ভোজন করালেন—গল্পটা পড়ে একবার আমার হঠাৎ মাছ ও রুটী খাবার সাধ হ'ল। কিন্তু মাছ এখানে মেলে না—মা ভরসা দিলেন খাওয়াবেন, কিন্তু দু-মাসের মধ্যেও সেবার মাছ পাওয়া গেল না, আমার সখও ক্রমে ক্রমে উবে গেল।

বাবার বন্ধু দু-একজন বাঙালী মাঝে মাঝে আমাদের এখানে

এসে দু-একদিন থাকেন। মেয়েরা মাকে পড়াতে আসে, এ ব্যাপারটা তাঁদের মনঃপূত নয়। বাবাকে তাঁরা কেউ কেউ বলেচেনও এ নিয়ে। কিন্তু বাবা বলেন—ওরা আসে, এজন্য এক পয়সা নেয় না—অথচ সীতাকে ছবি আঁকা, সেলাইয়ের কাজ শেখাচ্চে—কি ক'রে ওদের বলি তোমরা আর এসো না? তা ছাড়া ওরা এলে মেয়েদের সময়ও ভালই কাটে, ওদের কেউ সঙ্গী নেই, এই নির্জ্জন চা-বাগানের এক পাশে পড়ে থাকে—একটা লোকের মুখ দেখতে পায় না, কথা বলবার মানুষ পায় না—ওরা যদি আসেই তাতে লাভ ছাড়া ক্ষতি কি?

মায়ের মনের একটা গোপন ইচ্ছা ছিল, সেটা কিন্তু পূর্ণ হয়নি। বাবা অত্যন্ত মদ খান—এবং যেদিন খুব বেশী ক'রে খেয়ে আসেন, সে দিন আমাদের বাংলো ছেড়ে পালাতে হয়। নইলে সবাইকে অত্যন্ত মারধর করেন। সে সময়ে তাঁকে আমরা যমের মত ভয় করি—এক সীতা ছাড়া। সীতা আমাদের মত পালায় না—চা-ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে থাকতে যায় না। সে বাংলোতেই থাকে, বলে মারবে বাবা? ...না হয় মরে যাবো—তা কি হবে? এ রকম ছুটোছুটি রোজ করার চেয়ে মরে যাওয়া ভাল। বাবার এই ব্যাপারের জন্যে আমাদের সংসারে শান্তি নেই—অথচ বাবা যখন প্রকৃতিস্থ থাকেন, তখন তাঁর মত মানুষ খুঁজে পাওয়া ভার—এত শান্ত মেজাজ। যখন যা চাই এনে দেন, কাছে ডেকে আদর করেন, নিয়ে খেলা করেন, বেড়াতে যান—কিন্তু মদ খেলেই একেবারে বদ্‌লে গিয়ে অন্য মূর্ত্তি ধরেন, তখন বাংলো থেকে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া আর আমাদের অন্য উপায় থাকে না।

মা'র ইচ্ছে ছিল মেয়েদের ধর্ম্মের বই পড়ে যদি বাবার মতিগতি ফেরে। মেয়েরা মদ্যপানের কু-ফলের বর্ণনাসূচক ছোট ছোট বই দিয়ে যেতো—মা সেগুলো বাবার বিছানায় রেখে দিতেন—কে জানে বাবা পড়তেন কিনা—কিন্তু এই দেড় বৎসরের মধ্যে আমাদের মাসের মধ্যে তিন-চার বার চা-ঝোপের আড়ালে লুকানো বন্ধ হয়নি।

ক্রমশঃ

গ্রাম্যগীতি

শ্রীহেম চট্টোপাধ্যায়

১

ও রে নাছিমপুরের গাঙে
ঢেউ যে শুধুই ভাঙে,
ও-পারে তার ময়নামতীর চর।

২

ঘাটে সদাই বাঁধা ডিঙে
বকুল গাছে নাচে ফিঙে,—
ও রে তারই কাছে বঁধুর অচিন ঘর!

৩

সে আমারে দেখ্‌লে পরে
কলসী নিয়েই জল যে ভরে,
ঘোম্‌টা-ফাঁকে চেয়েই থাকে
অচিন গাঁয়ের 'পর।

৪

জলে তার যে ছায়া দোলে
গাঁয়ের মানুষ পথ গো ভোলে,
দেখ্‌লে তারে সবাই ফিরে
চেয়ে চেয়ে যায় ঘর!

৫

কেন আমি দেখ্‌লাম তারে
কাঁদি এখন গাঙের পারে,
মোর ব্যথা সে বুঝ্‌ল না রে
ভাবে মোরে সে পর!

৬

এ ব্যথা হায় রাখ্‌ব কোথা
জানাই কারে গো মনের কথা,
বড়ই দুঃখ রয়ে গেল রে
জান্‌ল না সে মনের খবর!

আলোচনা

সিলেট 'শুধুই ঘুমায়ে রয়'?

গত অগ্রহায়ণ মাসের 'প্রবাসী'তে দেখিলাম শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপদ ভট্টাচার্য্য মহাশয় "শ্রীহট্টের হিন্দু সমাজে অস্পৃশ্য জাতি ও নারীর স্থান" শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীহট্টের বিরুদ্ধে কতকগুলি অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন। শ্রীহট্টের বিরুদ্ধে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অভিযোগগুলি এই:—(১) "শ্রীহট্ট হইতে প্রায় প্রত্যেক দিনই দুই-একটি নারী হরণের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে।" (২) নারীনির্যাতন নিবারণে কর্ম্মীদের আগ্রহ নাই। (৩) "গোঁড়ার দল যে পাঁতি দিতেছেন তাহাতে এই ফল হইতেছে যে, অপহৃতা ধর্ষিতা নারী পাঁতির ধাক্কায় প্রকাশ্য স্থান অথবা অহিন্দুর অঙ্কলক্ষ্মী হওয়াকেই শেষ পর্য্যন্ত কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করে।" (৪) "শ্রীহট্টের কায়স্থগণের ক্ষত্রিয় হইবারও কোন লক্ষণ নাই।" (৫) অস্পৃশ্য জাতির প্রতি সহানুভূতির অভাব। (৬) "তরুণেরা পিতৃপিতামহের জীর্ণশীর্ণ লম্বা পুঁথির পাতাই উল্টাইতেছেন। সমাজসংস্কারের দুরূহ সমস্যার গ্রন্থিভেদ করা তাঁহাদের সাধ্যায়ত্ত নহে। সুতরাং শুদ্ধি-আন্দোলন করিবে কাহারা?"

আমরা প্রথমে এই অভিযোগগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিব। বলিয়া রাখা ভাল, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ন্যায় আমাদেরও জন্মভূমি শ্রীহট্ট।

১। শ্রীহট্টে নারীহরণ যে এরূপ বৃদ্ধি পায় নাই, শ্রীহট্টের জনমত, সংবাদপত্র ও পুলিস রিপোর্ট তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিবে। শ্রীহট্ট হইতে প্রায় প্রত্যেক মাসেই দুই-একটি নারী হরণের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে বলিলে মিথ্যা বলা হয় না, কিন্তু প্রায় প্রত্যেক দিনই দুই একটি নারী-হরণের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে বলিলে মিথ্যা বলা হয়।

২। নারীনির্যাতন নিবারণে কর্ম্মীদের আগ্রহ নাই ইহা কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব? নারীনির্যাতন নিবারণে কর্ম্মীদের যে আগ্রহ আছে, ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিজেই ইহার দৃষ্টান্ত। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পূর্ব্বেও শ্রীহট্টের কেহ কেহ নারীনির্যাতন সম্বন্ধে সংবাদপত্রে আলোচনা করিয়াছেন। নারী-রক্ষার জন্য শ্রীহট্টের কোন কোন ভদ্রলোককে অর্থ-সংগ্রহ করিতেও দেখা গিয়াছে। অপহৃতা নারীকে উদ্ধার করিবার চেষ্টাও যে শ্রীহট্টের যুবকেরা অনবরত করিয়া থাকেন, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রবন্ধে তাহার প্রমাণ আছে। কুলাউড়া-যুবকসঙ্ঘের শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার পাল চৌধুরী যে অপহৃতা প্রতিভাবালার অনুসন্ধানে গিয়াছিলেন তাহা ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিজেই স্বীকার করিয়াছেন।

৩। "গোঁড়ার দল যে পাঁতি দিতেছেন তাহাতে...অপহৃতা ধর্ষিতা নারী পাঁতির ধাক্কায় প্রকাশ্য স্থান অথবা অহিন্দুর অঙ্কলক্ষ্মী হওয়াকেই শেষ পর্য্যন্ত কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করে।" ইহা সত্য নহে। গোঁড়ার দলের পাঁতি বাংলার হিন্দু সমাজের ন্যায় শ্রীহট্টের হিন্দুসমাজও অগ্রাহ্য করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে নিগৃহীতা প্রতিভাবালার বিবাহ দেওয়া হইয়াছে।

৪। "শ্রীহট্টের কায়স্থগণের ক্ষত্রিয় হইবারও কোন লক্ষণ নাই।" ইহা সত্য। কিন্তু এইজন্য শ্রীহট্টের কায়স্থগণকে নিন্দা না করিয়া বরং প্রশংসা করাই উচিত। শ্রীহট্টের কায়স্থগণ যজ্ঞ-সূত্রকে গৌরবের সামগ্রী বলিয়া মনে করেন নাই, ইহা তাঁহাদের প্রশংসারই কথা।

৫। শ্রীহট্টে অনেক স্থলে ব্রাহ্মণ কায়স্থদের পুষ্করিণীর জল অস্পৃশ্য জাতির স্পর্শে দুষ্ট হয় এ-কথা আমরা কখনও শুনি নাই। ভট্টাচার্য্য মহাশয় আর যে-সকল কথা বলিয়াছেন তাহা মিথ্যা নহে। কিন্তু ঐ কথাগুলি যে-কোন স্থানের অস্পৃশ্য জাতি সম্বন্ধেই বলা যাইতে পারে। সুতরাং ইহা 'শ্রীহট্টের সমাজ-নাটকার প্রথম দৃশ্য' ইত্যাদি বলা সমীচীন হইয়াছে কি? শ্রীহট্টে অস্পৃশ্যতা দূর করিবার কোন চেষ্টা হইতেছে না, তাহাও নহে। অস্পৃশ্যতা দূর করিবার চেষ্টা যেমন অন্যান্য স্থানে হইতেছে তেমন শ্রীহট্টেও হইতেছে।

৬। "তরুণেরা পিতৃপিতামহের জীর্ণশীর্ণ লম্বা পুঁথির পাতাই উল্টাইতেছেন," এরূপ মন্তব্য করিতে ভট্টাচার্য্য মহাশয় দ্বিধাবোধ করেন নাই, ইহা সত্যই আশ্চর্য্যের বিষয়। যে-জেলায় বিধবা ও ধর্ষিতা নারীর বিবাহ হইতেছে, অস্পৃশ্যতা দূর করিবার চেষ্টা হইতেছে, সে-জেলার "তরুণেরা পিতৃপিতামহের জীর্ণশীর্ণ লম্বা পুঁথির পাতাই উল্টাইতেছেন" বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয় না কি? শ্রীহট্টে শুদ্ধি-আন্দোলন নাই, ইহা সত্য। কিন্তু বাংলা দেশের সকল জেলায় শুদ্ধি-আন্দোলন চলিতেছে কি-না সে-সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধের এক স্থানে লিখিয়াছেন, "যাহাদিগকে লইয়া আমাদের অস্তিত্ব, সেই অস্পৃশ্য জাতি ও নারীকেই যদি আমরা কুসংস্কারের বশীভূত হইয়া দূর করিয়া দি তাহা হইলে হিন্দু জাতির অস্তিত্ব শ্রীহট্টের বক্ষ হইতে একেবারেই মুছিয়া যাইবে। আমরা মুসলমান সমাজকে যতই অপরাধী ভাবি না কেন, তাহাদের অপরাধ অপেক্ষা আমাদের অপরাধ সবদিকেই বেশী।" হিন্দু সমাজ অস্পৃশ্য জাতি ও নারীজাতির প্রতি সুবিচার করিতে পারিতেছে না এজন্য হিন্দুসমাজ অবশ্যই নিন্দাভাজন। কিন্তু আমাদের অপরাধ সবদিকেই বেশী মনে করিবার কোনও কারণ আছে কি? স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে নিহত এবং নারী-হরণকারী মহীউদ্দীনকে পুষ্পমাল্যভূষিত দেখিয়াও কি বলিব আমাদের অপরাধ সবদিকেই বেশী? নারীহরণকারীদের অধিকাংশই যে মুসলমান তাহাও স্মর্ত্তব্য।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অপর মন্তব্যটি এই,—"নারীহরণের কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, অধিকাংশ স্থলেই পারিবারিক উৎপীড়নের জন্য স্ত্রীলোকেরা নিতান্ত অনিচ্ছাবশতঃও স্বামী-গৃহ ত্যাগ করে, এবং সুযোগ বুঝিয়া অহিন্দুরাও ফুসলাইয়া অথবা হরণ করিয়া তাহাদের সর্ব্বনাশ করে।" নারীহরণের সংবাদ 'সঞ্জীবনী'তে যত প্রকাশিত হয় অন্য কোন পত্রিকায় তত প্রকাশিত হয় না। গত দশ বৎসরের 'সঞ্জীবনী'তে যতগুলি নারীহরণের সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে আমরা তাহার প্রত্যেকটি মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছি। কিন্তু নারীহরণের মূলে অধিকাংশ স্থলেই নারীর গৃহত্যাগ বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ পাই নাই। কেননা, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখিয়াছি দুর্ব্বৃত্তেরা নারীকে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। যে

অল্পবয়স্ক নারীকে হঠাৎ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, তাঁহাদিগকে গৃহত্যাগিনী বলিয়া সন্দেহ করা যাইতে পারে। কিন্তু তাঁহাদেরও অনেককে, দুর্বৃত্তেরা মুখে কাপড় গুঁজিয়া প্রতারণা করিয়া অথবা অসহায় অবস্থায় পাড়াপড়শী-আত্মীয়স্বজনের অজ্ঞাতসারে ধরিয়া লইয়া যায় বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে কি-না, তাহা পাঠক-পাঠিকারাই বিচার করিবেন।

শ্রীজিতেন্দ্রমোহন চৌধুরী

—

বাংলা বর্ণমালা ও ইংরেজী উচ্চারণ

মাঘ মাসের 'প্রবাসী'তে শ্রীযুক্ত ফকিরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "ইংরেজী উচ্চারণ শিক্ষা" শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া কয়েকটি কথা আমার মনে উঠিয়াছে তাহাই সংক্ষেপে লিখিতেছি।

বিদেশী ভাষা শিখিতে গিয়া জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে মাতৃভাষার উচ্চারণপদ্ধতি ঐ ভাষাতে প্রযুক্ত হয় ইহা একটি স্বতঃসিদ্ধ সত্য। বাংলা বর্ণমালার মধ্য দিয়া বিদেশী ভাষার উচ্চারণ শিখিবার ব্যবস্থা হইলে শিক্ষার সুগমতা সাধিত হয়।

আমাদের বর্ণমালার কয়েকটি অক্ষর নিজের বিশেষত্ব হারাইয়া ভারস্বরূপ হইয়া পড়ায় বিদেশী ভাষা বাংলায় অক্ষরান্তরিত করা সমধিক কষ্টসাধ্য বা অসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, শ ষ স আজকাল তাহাদের পাণিনীয় উচ্চারণ হারাইয়া একমাত্র 'শ'য়ে পর্য্যবসিত হইয়াছে। বর্গীয় ব ও অন্তস্থ ব এখন শুধুমাত্র বর্গীয় উচ্চারণেই মূর্ত্ত হয়, ফলে উর্দু জওয়াব আজকাল বাংলায় জবাব রূপ ধারণ করিয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় অন্তস্থ 'ব'কে পৃথকরূপে পরিচিত করিবার জন্য ব় রূপে উপস্থিত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পরবর্ত্তী পণ্ডিত মহাশয়গণ উহাকে অনাবশ্যক জ্ঞানে নির্ব্বাসনে পাঠাইয়াছেন।

য় (ই অ) আজকাল প্রায় অন্তস্থ অ রূপে পরিচিত হইয়া থাকে, কাজেই উহার বিন্দুযুক্ত মূর্ত্তি যে উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা নিঃশেষে লুপ্ত হইয়াছে। আমার মনে হয় এই কয়টি অক্ষর এবং ন ও ণকে যথাশাস্ত্র উচ্চারণ করিলে বিদেশী ভাষাকে বাংলায় অক্ষরান্তরিত করা এবং মাতৃভাষায় শুদ্ধ বানান লেখা অনেক পরিমাণে সহজ হইয়া যাইবে। বাংলায় ণ দন্ত্যরূপে উচ্চারিত হইয়া থাকে, কিন্তু উহার কণ্ঠ্য উচ্চারণ কর্ণেলে পাওয়া যায়, উহা কড়্‌নেল ও করনেল এই দুয়ের মধ্যবর্ত্তী। এই পাঁচটি শব্দ যথারীতি উচ্চারিত হইলে অন্যান্য ভারতীয় ভাষাকেও বাংলায় অক্ষরান্তরিত করা সম্পূর্ণ সহজ হইয়া যাইবে।

বাংলায় দীর্ঘ অ, দীর্ঘ এ, দীর্ঘ ও নাই—মালয়ালম্ ভাষাতে আছে,—তাহা হ্রস্বের সহিতই একটি দাঁড়ী টানিয়া বোঝান হয়। আমার মনে হয় আমরাও ঐরূপ একটি হাইফেন-জাতীয় বা রেফ-জাতীয় রেখাদ্বারা ঐ উচ্চারণ সূচিত করিতে পারি।

আমাদের বর্ণমালায় হ্রস্ব আ নাই। Cup লিখিতে হইলে হয় কপ, না-হয় কাপ লিখিতে হয়—দুটিই ভুল। গুজরাটিরা কাঁপ লিখিয়া ঐ উচ্চারণটি বোঝায়। আমরাও কি এই পদ্ধতি অনুসরণ করিতে পারি না?

বাংলায় Fএর প্রতিরূপ নাই। ক, খ, গ, ঘ ইত্যাদির তীব্র উচ্চারণ বাংলা ভাষায় প্রচলিত নাই। হিন্দীতে উর্দু ভাষায় প্রচলিত এই শব্দগুলির উচ্চারণ ক়, খ়, গ়, ঘ়, ফ় এইরূপে দেখান হয়। আমরাও যদি ঐরূপে লিখি তবে h যুক্ত শব্দের উচ্চারণ সহজেই দেখান যায়।

Cat বাংলায় আমরা সাধারণতঃ ক্যাট লিখি। আমার মনে হয় এই পদ্ধতি ত্যাগ করা ভাল, কারণ উহা কতকটা কেয়াট উচ্চারণ জ্ঞাপন করে। বিশ্বভারতী এই বিষয়ে যে ে ও ে কারের ব্যবহার করিতেছেন তাহাকেই মানিয়া লইয়া যদি আমরা য়া টিকে শুদ্ধরূপে ব্যবহার করি তবে আমাদের ভাষা শব্দবিজ্ঞানের দিক দিয়া সমৃদ্ধ হয় এবং বিদেশী ভাষাকে বাংলায় অক্ষরান্তরণের কাজও সহজ হয়।

যদি Z ও z কে আমরা জ ও ঝ রূপে বাংলা ভাষায় ঢুকাইতে পারি, তবে উচ্চারণ সৌকর্য্য ও ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে কতকপরিমাণে সমন্বয়-সাধন উভয় কর্ম্মই সাধিত হয়

শ্রীঅমিয়মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

রামমোহন রায়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমাদের প্রাণ বিদ্রোহী। চারদিকে জড়দানব তার প্রকাণ্ড শক্তি ও অসংখ্য বাহু বিস্তার ক'রে বসে আছে। ক্ষুদ্র প্রাণ প্রতি মুহূর্ত্তে নানাদিক থেকে তাকে নিরস্ত ক'রে তবে আত্মপ্রকাশ করে। এই জড় তার চারিদিকে ক্লান্তির প্রাচীর তুলে তুলে তার প্রয়াসের পরিধিকে কেবলি সঙ্কীর্ণ ক'রে আনতে চায়। বারম্বার এই প্রাচীরকে ভেঙে ভেঙে তবে প্রাণ আপন অধিকার রক্ষা করতে পারে। তাই আমাদের হৃৎপিণ্ড দিনে রাত্রে এক মুহূর্ত্ত ছুটি নিতে পারে না, গুরুভার বস্তুপুঞ্জের নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে তার আক্রমণ ক্ষান্ত হ'লেই মৃত্যু।

প্রাণের এই নিত্য সচেষ্টতাতেই যেমন প্রাণের আত্মপ্রকাশ, মনেরও তাই। তার অনন্ত জিজ্ঞাসা। চারদিকে সত্যের রহস্য মূক হয়ে আছে। আপন শক্তিতে উত্তর আদায় করতে হয়। অল্প অনবধান হ'লেই ভুল উত্তর পাই। সেই ভুল উত্তরগুলিকে নিশ্চেষ্ট নিঃসংশয়ে স্বীকার ক'রে নিলেই মনের সাংঘাতিক পরাভব। জিজ্ঞাসার শৈথিল্যেই মনের জড়তা। যেমন জীবনীশক্তির নিরুদ্যমেই অস্বাস্থ্য, তাতেই যত রোগের উৎপত্তি, বিনাশের আয়োজন, তেমনি মননশক্তির অবসাদ ঘটলেই মানুষের জ্ঞানের রাজ্যে যত রকমের বিকার প্রবেশ করে। সত্য মিথ্যা ভালমন্দ সমস্ত কিছুকেই বিনাপ্রশ্নে অলস ভীরু মন যখন মেনে নিতে থাকে তখনই মনুষ্যত্বের সকল প্রকার দুর্গতি। জড়ের মধ্যে যে অচল মূঢ়তা, মানুষের মন যখনি তার সঙ্গে আপোষে সন্ধি করে তখন থেকে জগতে মানুষ মনমরা হয়ে থাকে, জড় রাজার খাজনা জুগিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়ে।

আমাদের দেশে একদিন মনের স্বরাজ গিয়েছে ধ্বংস হয়ে। পঙ্গু মনের ছিল না আত্মকর্তৃত্ব, প্রশ্ন করবার শক্তি ও ভরসা সে হারিয়েছিল। সে যা শুনেছে তাই মেনেছে, যে বুলি তার কানে দেওয়া হয়েছে সেই বুলিই সে আউড়িয়েছে। যখন কোনো উৎপাত এসে পড়েছে স্কন্ধে, তখন তাকে বিধিলিপি ব'লে নিয়েছে মেনে। নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে নূতন প্রণালীতে বর্ত্তমানকালীন সংসার-সমস্যার সমাধান করা তার অধিকার-বহির্ভূত ব'লে স্বীকার করার দ্বারা আত্মাবমাননায় তার সঙ্কোচ ছিল না। মনের আত্মপ্রকাশের ধারা সেদিন এদেশে অবরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। দেশ তখন সামনের কালের দিকে চলেনি পিছনের কালকেই ক্রমাগত প্রদক্ষিণ করেছে—চিন্তাশক্তি যেটুকু বাকি ছিল সে অনুসন্ধান করতে নয়, অনুসরণ করবার জন্যেই।

সুপ্তি যখন আবিষ্ট করে তখনি চুরি যাবার সময়। অন্তরের মধ্যে যখন অসাড়তা, বাইরের বিপদ তখনি প্রবল। চিত্তের মধ্যে যার স্বাধীনতা নেই বাইরের দিক থেকে সে কখনই স্বাধীন হ'তে পারে না। অন্তরের দিকে সব-কিছুকে যে অবিসম্বাদে মেনে নেয়, বাইরে অন্যায় প্রভুত্বকেও না-মানবার শক্তি তার থাকে না,—যে-বুদ্ধি অসত্যকে ঠেকায় মনে, সেই বুদ্ধিই অমঙ্গলকে ঠেকায় বহিঃসংসারে—নির্জীব মন অন্তরে বাহিরে কোনো আক্রমণকেই ঠেকাতে পারে না। তাই সেদিনকার ভারতের ইতিহাসে বারেবারে দেখা গেল ভারতবর্ষ তার মর্ম্মান্তিক পরাভবকে মেনে নিলে আর সেই সঙ্গে মেনে নিলে যা না-মানবার এমন হাজার হাজার জিনিষ। এই যে তার বাইরের দুর্দ্দশার বোঝা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠল এ তার অন্তরের অবুদ্ধির বোঝারই সামিল।

যখন আমাদের আর্থিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক শক্তি ক্ষীণতম, যখন আমাদের দৃষ্টিশক্তি মোহাবৃত, সৃষ্টিশক্তি আড়ষ্ট, বর্ত্তমান যুগের কোনো প্রশ্নের নূতন উত্তর দেবার মতো বাণী যখন আমাদের ছিল না, আপন চিত্তদৈন্য সম্বন্ধে লজ্জা করবার মতো চেতনাও যখন দুর্ব্বল, সেই দুর্গতির দিনেই রামমোহন রায়ের এদেশে আবির্ভাব। প্রবল শক্তিতে তিনি আঘাত করেছিলেন সেই দুরবস্থার মূলে, যা মানুষের পরম সম্পদ স্বাধীনবুদ্ধিকে অবিশ্বাস করেছে। কিন্তু তখন আমরা সেই দুরবস্থার কারণকেই পূজা করতে অভ্যস্ত, তাই, সেদিন আমরাও তাঁকে শত্রু ব'লে দণ্ড উদ্যত করেছি।

ডাক্তার বলেন, রোগ জিনিষটা দেহের অধিকার সম্বন্ধে দীর্ঘকালের দলিল দাখিল করলেও সে বাহিরের আগন্তুক, স্বাস্থ্যতত্ত্বই দেহের অন্তর্নিহিত চিরন্তন সত্য। রামমোহন রায় তেমনি করেই বলেছিলেন আমাদের অজ্ঞানকে আমাদের অন্ধতাকে কালের গণনায় সনাতন বলি,' কিন্তু সত্যের দিক থেকে তাই আমাদের অনাত্মীয় আগন্তুক। তিনি দেখিয়েছিলেন আমাদের দেশের অন্তরাত্মার মধ্যেই কোথায় আছে বিশুদ্ধ জ্ঞানের চিরপুরাতন চিরনূতন প্রতিষ্ঠা; মনের স্বাস্থ্যকে আত্মার শক্তিকে প্রবল করবার জন্যে, উজ্জ্বল করবার জন্যে ভারতের একান্ত আপন যে সাধন-সম্পদের ভাণ্ডার তারই দ্বার তিনি খুলে দিয়েছিলেন, সেদিনকার জনতা তাঁকে শত্রু ব'লে ঘোষণা করেছিল।

আজও কি রামমোহনকে আমরা শত্রু ব'লে অসম্মান করতে পারি? যার গৌরবে দেশ বিশ্বের কাছে আপন গৌরবের পরিচয় দিতে পারে এমন লোক কি আমাদের অনেক আছে? দেশের যথার্থ মহাপুরুষের নামে গৌরব করার অর্থই দেশের ভবিষ্যতের জন্যে আশা করা। সে গৌরব প্রাদেশিক হ'লে সাময়িক হ'লে তার উপরে নির্ভর করা চলে না। সে গৌরব এমন হওয়া চাই সমস্ত পৃথিবী যার সমর্থন করে। রামমোহনের চিত্ত, তাঁর হৃদয় স্থানিক ও ক্ষণিক পরিধিতে বদ্ধ ছিল না। যদি থাকত তবে দেশের সাধারণ লোকে অনায়াসে তাঁকে সমাদর করতে পারত। কারণ যে মানদণ্ড আমাদের নিত্য ব্যবহারের দ্বারা সুপরিচিত তা বিশেষ দেশকালের, তা সর্ব্বদেশ ও চিরন্তন কালের নয়। কিন্তু সেই পরিমাপের দ্বারা পরিমিত গৌরবের জোরে দেশ মাথা তুলতে পারবে না, সর্ব্বদেশ কালের সর্ব্বলোকের কাছে তাকে আত্মপ্রকাশ করাতে পারবে না। তার মহত্ত্বকে নিম্নভূমিবর্ত্তী জনতার আদর্শকে অনেক উপরে ছাড়িয়ে উঠতে হবে। তাতে ক'রে বর্ত্তমানকালের সাম্প্রতিক রুচিবিশ্বাস ও আচার তাকে নিষ্ঠুর ভাবে আঘাত করতে পারে, কিন্তু তার চেয়ে বড় আঘাত চিরন্তন আদর্শের আঘাত। দিঙনাগাচার্য্যের স্থূলহস্তের আঘাত উপস্থিতের আঘাত, সেই উপস্থিত মুহূর্ত্ত নিজেই সদ্য ধ্বংসোন্মুখ, কিন্তু ভারতীর সূক্ষ্ম ইঙ্গিতের আঘাত শাশ্বত কালের। সে আঘাতে যারা বিলুপ্ত হয়েছে তাদের সমসাময়িক জয়ধ্বনির তারস্বর মহাকালের মহাকাশে ক্ষীণতম স্পন্দনও রাখেনি।

ক্ষণিক অনাদরের তুফানে যাদের নাম তলিয়ে যায় রামমোহন রায় তো সেই শ্রেণীর লোক নন। বিস্মৃতি বা উপেক্ষার কুহেলিকা তাঁর স্মৃতিকে কিছুকালের জন্য আচ্ছন্ন রাখলেও সে আবরণ কেটে যাবেই। দেশে আজ নবজাগরণের হাওয়া যখন দিয়েছে, সরে যাচ্চে বাষ্পের অন্তরাল, তখন সর্ব্বপ্রথমেই দেখা যাবে রামমোহনের মহোচ্চ মূর্ত্তি। নব যুগের উদ্বোধনের বাণী দেশের মধ্যে তিনিই তো প্রথম এনেছিলেন, সেই বাণী এই দেশেরই পুরাতন মন্ত্রের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল; সেই মন্ত্রে তিনি বলেছিলেন, "অপাবৃণু", হে সত্য, তোমার আবরণ অপাবৃত করো। ভারতের এই বাণী কেবল স্বদেশের জন্যে নয়, সকল দেশের সকল কালের জন্যে। এই কারণেই ভারতবর্ষের সত্য যিনি প্রকাশ করবেন তাঁর প্রকাশের ক্ষেত্র সর্ব্বজনীন। রামমোহন রায় সেই সর্ব্বকালের মানুষ। আমরা গর্ব্ব করতে পারি স্থানিক ও ও সাময়িক ক্ষুদ্র মাপের বড়লোককে নিয়ে, কিন্তু যাঁদের নিয়ে গৌরব করতে পারি তাঁরা "পূর্ব্বাপরৌ তোয়নিধী বগাহ্য স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ।" তাঁদের মহিমা পূর্ব্ব এবং পশ্চিম সমুদ্রকে স্পর্শ ক'রে আছে।

ভারতবর্ষে রামমোহন রায়ের যাঁরা পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম কবীর নিজেকে বলেছিলেন ভারতপথিক। ভারতকে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন মহাপথরূপে। এই পথে ইতিহাসের আদিকাল থেকে চলমান মানবের ধারা প্রবাহিত। এই পথে স্মরণাতীত কালে এসেছিল যারা, তাদের চিহ্ন ভূগর্ভে। এই পথে এসেছিল হোমাগ্নি বহন ক'রে আর্য্যজাতি। এই পথে একদা এসেছিল মুক্তিতত্ত্বের আশায় চীন দেশ থেকে তীর্থযাত্রী। আবার কেউ এসেছে সাম্রাজ্যের লোভে, কেউ এল অর্থকামনায়। সবাই পেয়েছে আতিথ্য। এ ভারতে পথের সাধনা, পৃথিবীর সকল দেশের সঙ্গে যাওয়া আসার নেওয়া দেওয়ার সম্বন্ধ, এখানে সকলের সঙ্গে মেলবার সমস্যা সমাধান করতে হবে। এই সমস্যার সমাধান যতক্ষণ না হয়েছে ততক্ষণ আমাদের দুঃখের অন্ত নেই। এই মিলনের সত্য সমস্ত মানুষের চরম সত্য, এই সত্যকে আমাদের ইতিহাসে অঙ্গীভূত করতে হবে। রামমোহন রায় ভারতের এই পথের চৌমাথায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন, ভারতের যা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান তাই নিয়ে। তাঁর হৃদয় ছিল ভারতের

হৃদয়ের প্রতীক—সেখানে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান সকলে মিলেছিল তাদের শ্রেষ্ঠ সত্তায়,—সেই মেলবার আসন ছিল ভারতের মহা ঐক্যতত্ত্ব, একমেবাদ্বিতীয়ং। আধুনিক যুগে মানবের ঐক্যবাণী যিনি বহন ক'রে এনেছেন, তাঁরই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ভারতের আধুনিক কবি ভারতপথের যে গান গেয়েছে তাই উদ্ধৃত ক'রে রামমোহনের প্রশস্তি শেষ করি :—

হে মোর চিত্ত পুণ্যতীর্থে জাগো রে ধীরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।
* * * *
হেথা একদিন বিরামবিহীন মহা ওঙ্কারধ্বনি,
হৃদয়তন্ত্রে একের মন্ত্রে উঠেছিল রণরণি'।
তপস্যা বলে একের অনলে বহুরে আহুতি দিয়া
বিভেদ ভুলিল জাগায়ে তুলিল একটি বিরাট হিয়া।

সেই সাধনায় সে আরাধনার
যজ্ঞশালার খোলো আজি দ্বার।
হেথায় সবারে হবে মিলিবারে আনতশিরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে॥

এসো হে আর্য্য, এসো অনার্য্য হিন্দু মুসলমান,
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খৃষ্টান।
এসো ব্রাহ্মণ শুচি করি' মন ধরো হাত সবাকার,
এসো হে পতিত হোক অপনীত সব অপমানভার।
মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা,
মঙ্গল ঘট হয়নি যে ভরা,
সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থনীরে
আজি ভারতের মহামানবের সাগরতীরে॥*

* রামমোহন-শতবার্ষিকীর শেষ বক্তৃতা।

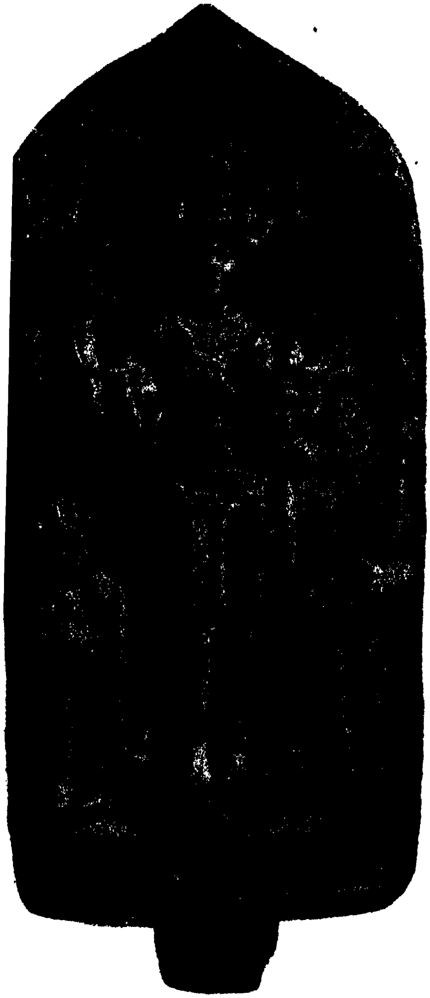
একটি গ্রাম্য চিত্রশালা

শ্রীরমেশ বসু

পাল ও সেন রাজাদের সময়ে ধর্ম্ম, শিল্প প্রভৃতি নানা বিষয়ে বঙ্গদেশ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ঐ যুগের লিখিত ধারাবাহিক ইতিহাস আবিষ্কৃত না হওয়ায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মালমশলা লইয়াই আমাদিগকে সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। মানুষের অযত্নে ও প্রকৃতির প্রভাবে প্রাচীন কালের যে-সব স্মৃতিচিহ্ন নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহার নামটুকুও জানিবার সূত্র খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। আরও দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, যে সব গ্রন্থে এই সূত্র পাওয়া যাইবার সম্ভবনা তাহা বঙ্গদেশের সীমানার মধ্যে অস্তিত্ব রক্ষা করিতে পারে নাই—তাহার জন্য নেপাল বা অন্যদেশে যাইতে হইয়াছে। একমাত্র সান্ত্বনার বিষয় এই যে, প্রাচীন মন্দির, মূর্ত্তি ও শিলা বা তাম্রলিপির অবশেষ এখনও একেবারে লুপ্ত হয় নাই। অধিকাংশ মন্দিরের চিহ্ন বহু খুঁজিয়া বা খুঁড়িয়া বাহির করিতে হয়, আর কখনও কখনও আকস্মিক ভাবে মূর্ত্তি ও লিপিগুলি বাহির হইয়া পড়ে। বর্ত্তমান যুগে মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইলে তাহা নানাকারণে স্থানান্তরিত হয়; বড় বড় চিত্রশালা এবং সংগ্রহকারীদের জন্য এ গুলি সংগৃহীত হয়। গত শতাব্দীতে এইরূপে একজায়গার মূর্ত্তি অন্য জায়গায় চলিয়া গিয়াছে, এখন তাহাদের আদিস্থানের নামটি পর্য্যন্তও জানিবার উপায় নাই। শিল্পের ধারা ও ইতিহাস বুঝিবার পক্ষে ইহা যে কত বাধা জন্মায় তাহা বলিবার নহে।

আর একটি কথাও ভাবিয়া দেখিবার যোগ্য। দেশের সাধারণ লোকেরা চিত্রশালায় যাইয়া অবাক্ হইয়া মূর্ত্তি বা অন্য কিছু দেখে; তাহারা ঐ গুলির সঙ্গে কোনরূপ আত্মীয়তা বোধ করিতে পারে না—ঐ গুলি যে তাহাদেরই পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তি তাহা ভাবিতেও পারে না। এই জন্য দেশের নানা অংশে প্রাচীন ইতিহাসের হিসাবে কেন্দ্রস্থল বলিয়া গণ্য অঞ্চলগুলিতে স্থানীয় চিত্রশালা স্থাপিত হইলে সাধারণ লোকেরা শুধু বিস্মিত না হইয়া ঐ সব প্রত্নবস্তুর সহিত একটা বিশেষ যোগ বোধ করিবে। তাহারা শুধু পূজা করিয়াই ক্ষান্ত থাকিবে না, ক্রমশঃ শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে যাহাতে প্রাচীন কালের ঐ সব অমূল্য সম্পদ কোনরূপে নষ্ট বা অপসারিত না হয়, তাহার জন্য সচেষ্ট হইবে। এইরূপ মনোভাব

। গঠিত হইতে পারে, তাহা আমরা কার্য্যতঃ লক্ষ্য করিয়াছি। উদাহরণ স্বরূপ বর্ত্তমান প্রবন্ধে পূর্ব্ববঙ্গের বিক্রমপুর অঞ্চলের একটি প্রাচীন গ্রামে যে চিত্রশালা-



সূর্য্য—ঢাকা সাহিত্য-পরিষৎ

গঠনের প্রশংসনীয় প্রয়াস চলিয়াছে, তাহার প্রাথমিক অবস্থার বিবরণ দিতে ইচ্ছা করি।

বিক্রমপুর প্রাচীনকালে একটি বিশেষ প্রসিদ্ধ কেন্দ্রস্থান ছিল। এখানকার প্রায় সমস্ত প্রাচীন গ্রাম হইতে মূর্ত্তি ইত্যাদি অনেক সময় আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহার অধিকাংশই এখন বিক্রমপুরের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। যাঁহারা ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের খবর রাখেন বা গবেষণা করেন, শুধু তাঁহারাই সেগুলির খবরাখবর জানেন। বিক্রমপুর-কেন্দ্র সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনার জন্য খাস বিক্রমপুরের মধ্যে একটি চিত্রশালা স্থাপিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিছুদিন পূর্ব্বেও যাহা কিছু বিক্রমপুর পরগণার মধ্যে পাওয়া যাইত তাহাই রামপালে প্রাপ্ত বলা হইত। এই জন্য অনেক জিনিষের আসল প্রাপ্তিস্থান জানা যায় নাই। ওরূপ না হইয়া মূল স্থানটির নামের সঙ্গে প্রাপ্ত জিনিষের যোগ থাকা উচিত। অথচ বিক্রমপুর অঞ্চলের জিনিষ বলিয়া বিক্রমপুর চিত্রশালায় তাহার বিশিষ্ট স্থান আছে। এই উদ্দেশ্যে আড়িয়ল গ্রামের "পল্লীমণ্ডল" অল্পদিন পূর্ব্বে স্থির করিয়াছেন যে সমস্ত বিক্রমপুর লইয়া একটি চিত্রশালা স্থাপন করা আবশ্যক। তাহা হইলে বিক্রমপুর সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক উপায়ে ধারাবাহিক গবেষণার অনেক সুবিধা হইবে। আর, সংগ্রহ ব্যাপারে গ্রামস্থ



গণেশ—আড়িয়ল চিত্রশালা

লোকদের সাহায্য ও সহানুভূতি পাইলে এখনও বহু জিনিষ সংরক্ষিত হইতে পারে, নতুবা সরকারী প্রত্নবিভাগের দৃষ্টি কবে পড়িবে সে আশায় বসিয়া থাকিলে অনেক জিনিষ নষ্ট বা

স্থানান্তরিত হইয়া যাইবে। বিক্রমপুরের প্রতি বিক্রমপুর-বাসীদের একটি সহজ মমত্ব বোধ আছে। সুতরাং আশা করা যায় এই কার্য্যে তাঁহাদের যথেষ্ট উদ্যম দেখা যাইবে।

নিজ আড়িয়ল গ্রামে আবিষ্কৃত যে-সব মূর্ত্তি সংগৃহীত হইয়া এই চিত্রশালায় স্থান পাইয়াছে, তাহার একটি তালিকা ও ক্ষুদ্র একটি বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল :—

(১) নূতন ধরণের বিষ্ণুমূর্ত্তি (বিশ্বরূপ)—বিষ্ণুর বহু রকমের মূর্ত্তির মধ্যে এই একটি অতি বিরলপ্রাপ্ত মূর্ত্তি। ইহার ৪টি মুখ, ২০টি হাত। এই ধরণের মূর্ত্তির



কল্কী (অশ্বমুখ)—আড়িয়ল চিত্রশালা

কোন উল্লেখই "বিষ্ণুমূর্ত্তি পরিচয়" নামক পুস্তকে পাওয়া যায় না। গোপীনাথ রাও লিখিত *Elements of Hindu Iconography* গ্রন্থে বিশ্বরূপের ধ্যান আছে বটে, কিন্তু কোথাও মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে কি না তাহার কোনই উল্লেখ নাই। এই মূর্ত্তি সম্বন্ধে ধ্যানসহ বিশেষ বিবরণ ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে।* মূর্ত্তিটিকে বেশ সুগঠিত বলা যাইতে পারে। দুঃখের বিষয়, ইহার দক্ষিণ দিকের হাতগুলি এবং জানুর নীচ হইতে পা দুটিই ভাঙিয়া গিয়াছে।

(২) বাসুদেব মূর্ত্তি—বঙ্গীয় শিল্প পদ্ধতির একটি বৈচিত্র্যবিহীন মূর্ত্তি।

(৩) একটি বিষ্ণুমূর্ত্তির মাত্র মস্তকটি পাওয়া গিয়াছে।

(৪) নূতন ধরণের কল্কী মূর্ত্তি (অশ্বমুখ)—বিষ্ণুর অবতারগুলির মধ্যে কল্কীর মূর্ত্তিতে একটু বিশেষত্ব আছে, ইনি ঘোড়ায় আসীন থাকেন। আমাদের এই মূর্ত্তির সহিত



গরুড়—আড়িয়ল চিত্রশালা

সূর্য্যের পুত্র রেবন্তের কিছু কিছু সাদৃশ্য মনে পড়ে; কিন্তু লক্ষ্য করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে ইহা কল্কীরই মূর্ত্তি। ইহার চারিটি হাত, ঘোড়ায় চড়িয়া আছেন; বুকে শ্রীবৎস চিহ্ন আছে। ইহার সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব এই যে ইহার মুখ অশ্বাকার, তাহা ভগ্ন অবস্থায়ও স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। এই ধরণের ধ্যান গোপীনাথ রাওয়ের *Elements of Hindu Iconography*তে সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু

* "পঞ্চপুষ্প"—বৈশাখ, ১৩৩৮, পৃঃ ২০-২২

এরূপ মূর্ত্তি কোথাও পাওয়া গিয়াছে বলিয়া অবগত হওয়া যায় না। বড়ই দুঃখের বিষয় এই মূর্ত্তির মুখ, একটি বাম হস্ত ও পা এবং ঘোড়ার মুখ ও পা ভাঙিয়া গিয়াছে।

এই মূর্ত্তিটি যে কল্কীরই মূর্ত্তি তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার জন্য যে বিশেষ ধ্যানের সঙ্গে এই মূর্ত্তিটি মিলিয়া যায় তাহা সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিলাম :—



বিষ্ণু (বিশ্বরূপ)—আড়িয়ল চিত্রশালা

কল্কিনং মধ্যমং দশতালমিতমশ্বাকারং মুখমন্তম্নরাকারং চতুর্ভুজং চক্রশঙ্খধরং খড়্গাখেটকধরমুগ্ররূপং ভয়ানকমেবং দেবরূপং কৃত্বা কৌতুকং বিষ্ণুং চতুর্ভুজমেব কারয়েৎ।—বৈখানস আগম। *

(৫) গরুড় মূর্ত্তি—বড়ই সৌভাগ্যের বিষয় আড়িয়ল গ্রামের সংগ্রহকারীরা এইরূপ একখানা অনিন্দ্যসুন্দর মূর্ত্তি পাইয়াছেন। আমরা যত গরুড় মূর্ত্তি দেখিয়াছি তাহার মধ্যে এরূপ সুন্দর মূর্ত্তি খুব কম দেখা যায়। ইহার বিশেষত্ব এই যে সুনিপুণ শিল্পীর হাতে গরুড়ের সারা মূর্ত্তিখানিতে যেন সজীবতা ও দেবভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। অঞ্জলিবন্ধের ভঙ্গিটুকুও শিল্পসৌষ্ঠব-যুক্ত। ইহা বঙ্গীয় শিল্পকলার একটি নিখুঁৎ ও উৎকৃষ্ট নিদর্শন বলিয়া গণ্য হইবে। যে শিল্পী এরূপ গরুড়মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছিল, তাহার রচিত বিষ্ণুমূর্ত্তি কত সুন্দর হইবার কথা—কিন্তু এ যাবৎ ইহার সঙ্গীয় বিষ্ণুমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয় নাই। অন্যান্য স্থানে প্রাপ্ত গরুড় মূর্ত্তির সহিত এখানা তুলিত হইলে ইহার উৎকর্ষ স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

(৬) উমা-মহেশ্বর—ইহা উমা-মহেশ্বরের একটি আলিঙ্গন-মূর্ত্তি। ইহাতে অন্যান্য আলিঙ্গন মূর্ত্তির সমস্ত লক্ষণই বর্ত্তমান



কার্ত্তিকেয়—আড়িয়ল চিত্রশালা

আছে। মূর্ত্তিখানা অভগ্ন। মুখশ্রীতে একটু বিশেষত্ব আছে, তাহা অনেক প্রাচীন মূর্ত্তিতে দেখা যায়।

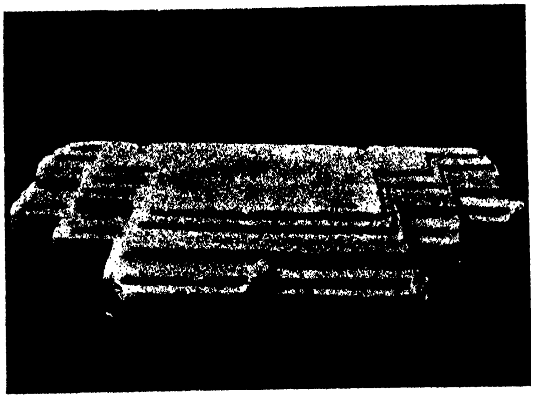
---

* *Elements of Hindu Iconography*—By T. A. Gopinath Rao—Vol. I, pt. II—appendix C (প্রতিমালক্ষণানি) —P. 49.

(৭) উমা-মহেশ্বর—আর-একখানা উমা-মহেশ্বর মূর্ত্তি এই সংগ্রহে আসিয়াছে।

(৮) নটরাজ শিব—এই মূর্ত্তিটি ভাঙিয়া গিয়াছে। ইহা বঙ্গীয় রীতিতে নির্ম্মিত।

(৯) কার্ত্তিকেয়—একটি সুন্দর কার্ত্তিকেয় মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। দুঃখের বিষয়, ইহার মুখ ও একটি হাত ভাঙ্গা।



মূর্ত্তির আসন—আড়িয়ল চিত্রশালা

কার্ত্তিকেয় তাঁহার বাহন ময়ূরের উপর মহারাজলীলা-ভঙ্গিতে বসিয়া আছেন—এই ভাবে মূর্ত্তিটি গঠিত। এই ধরণের মূর্ত্তি কাশীর ভারতকলা পরিষদ ও রাজশাহীর বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতিতে আছে।* এই মূর্ত্তি পূর্ব্ববঙ্গে বিরল। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালীর ঢাকা চিত্রশালার বিবরণীতে লিখিত হইয়াছে—'The only image of Karttikeya that has come to the writer's notice in the Dacca and the Chittagong divisions, is preserved in the Vaisnava monastery at Abdullapur, district Dacca."† আমাদের এই মূর্ত্তির বিশেষত্ব এই যে ইহা ষড়্ভুজ।

(১০) গণেশ—একটি গণেশ মূর্ত্তি এমন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে যে নিম্নার্দ্ধে কিছুই নাই। ইহা আউটসাহীর (রাণীহাটি হইতে প্রাপ্ত)* এবং মুন্সিগঞ্জেরা নটরাজ গণেশের মূর্ত্তির মত।

(১১) সূর্য্যমূর্ত্তি—একটি অতি ক্ষুদ্র সূর্য্যমূর্ত্তি সংগৃহীত হইয়াছে। ইহা একটি ১০ বৎসরের বালক কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

(১২) একটি প্রকাণ্ড সূর্য্যমূর্ত্তির পাদপীঠ মাত্র পাওয়া গিয়াছে।

(১৩) একটি মারীচি মূর্ত্তি ভগ্ন অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে।



উমা-মহেশ্বর—আড়িয়ল চিত্রশালা

(১৪) এই সব মূর্ত্তি ছাড়া একটি মূর্ত্তির প্রকাণ্ড আসনখানি মাত্র পাওয়া গিয়াছে। ইহা পঞ্চরথ ধরণের আসন। মূর্ত্তি

---

* Catalogue of Varendra Research Society (1919)—p. 12, no. c (g) 2/337

† Iconography of Buddhistic and Brahmanical Sculptures in the Dacca Museum—p. 147.

* *Ibid* pp. 146-47; Plate lvi (a)

† ঢাকার ইতিহাস—যতীন্দ্রমোহন রায় ২য় খণ্ড—চিত্র পৃঃ ২৯০

বসাইবার দুইটি ছিদ্র আছে। ইহা Graphite প্রস্তরের। এই জাতীয় প্রস্তর বঙ্গদেশে বেশী ব্যবহৃত হইত বলিয়া মনে হয় না। আসনের উপরিভাগ মোটামুটি মসৃণ বলা যাইতে পারে।

(১৫—১৬) দুইটি খাঁজ-কাটা বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড—দেখিবা-মাত্রই এই দুইটিকে কোন প্রাচীন প্রস্তরমন্দিরের ভগ্নাবশেষ বলিয়া মনে হয়।

(১৭) কাষ্ঠনির্ম্মিত চৌকাঠের একটি অংশ—প্রায় চারি হাত লম্বা হইবে। ইহাতে একদিকে দুইটি সাপ জড়াজড়ি



বিষ্ণুমূর্ত্তি—আড়িয়ল চিত্রশালা

করিয়া আছে, সাপ দুইটির গায়ের দাগগুলি (আঁশের মতন করিয়া ক্ষোদিত) অতি স্পষ্টভাবে দেখা যায়। অন্য দিকে একটি নারী অপূর্ব্ব ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া আছে।

অতি অল্পদিনের চেষ্টায় এবং আর্থিক অসচ্ছলতা সত্ত্বেও একটি গ্রামে এই সব মূর্ত্তি সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে গ্রামবাসীদের গৌরব করিবার কারণ আছে। বিশেষতঃ, এই সংগ্রহ বর্ত্তমানে ক্ষুদ্র হইলেও ইহার কতকগুলি সঞ্চয় বঙ্গীয় শিল্প পদ্ধতির অতি সুন্দর ও বিরল নিদর্শন হিসাবে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। এই সব মূর্ত্তি আবিষ্কৃত ও সংরক্ষিত হওয়ায় শুধু গ্রামবাসীদেরই উৎসাহ বর্দ্ধিত হয় নাই, : এখনই অন্যান্য নানাগ্রাম হইতে লোকেরা আসিয়া এই সংগ্রহ দেখে এবং মূর্ত্তি বা অন্য প্রত্ন-সম্পদের সন্ধান জানায়। নানা কারণে এখনও যে-সব মূর্ত্তি ইত্যাদি সংগৃহীত হইতে পারে নাই, আশা করা যায়, সে গুলিও ক্রমে এই চিত্রশালার শোভা ও মূল্য বৃদ্ধি করিবে।

আড়িয়ল গ্রাম প্রাচীন কালে যে সমৃদ্ধ ছিল এবং উহা যে একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল, তাহা এখানে প্রাপ্ত বহু প্রাচীন মূর্ত্তির সংখ্যা হইতে অতি স্পষ্টভাবেই বুঝিতে পারা যায়। এখানকার নানা পাড়া হইতে সংগৃহীত হইয়া কোনও কোনও মূর্ত্তি গ্রামের ব্যক্তিবিশেষের কাছে আছে, কিন্তু অধিকাংশই স্থানান্তরিত হইয়া গিয়াছে। নীচে মোটামুটি একটি তালিকা দেওয়া গেল। আড়িয়ল গ্রামবাসী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞান কলেজের ছাত্র সোদরোপম শ্রীমান্ জয়শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশংসনীয় অধ্যবসায়ের ফলে এই সব মূর্ত্তির সন্ধান সম্ভবপর হইয়াছে।

[১] বিষ্ণুমূর্ত্তি
[২] ঐ
} বহুকাল পূর্ব্বে উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়া ঢাকার কালেক্টরীর প্রাঙ্গণে রক্ষিত আছে।

[৩] বিষ্ণুমূর্ত্তি—উপরিভাগে দশ অবতারের ক্ষুদ্র মূর্ত্তি আছে। ইহা বরিশাল কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায় লইয়া গিয়াছেন।

[৪] বিষ্ণুমূর্ত্তি—ইহা সংগৃহীত হইয়া নিকটবর্ত্তী সিংহের নন্দন গ্রামে করের বাড়িতে রক্ষিত আছে।

[৫] বিষ্ণুমূর্ত্তি—এই সুবৃহৎ মূর্ত্তিটি ময়মনসিংহে চলিয়া গিয়াছে।

[৬] নটরাজ শিব—দ্বাদশ হস্তবিশিষ্ট ও তাণ্ডব নৃত্যশীল

ইহা নিকটবর্ত্তী ধীপুর গ্রামে শ্রীযুক্ত হরিপদ বসুর বাড়িতে আছে।

[৭] গৌরী—এই সুন্দর মূর্ত্তিখানি এখন ঢাকা চিত্রশালায় রক্ষিত হইয়াছে।*

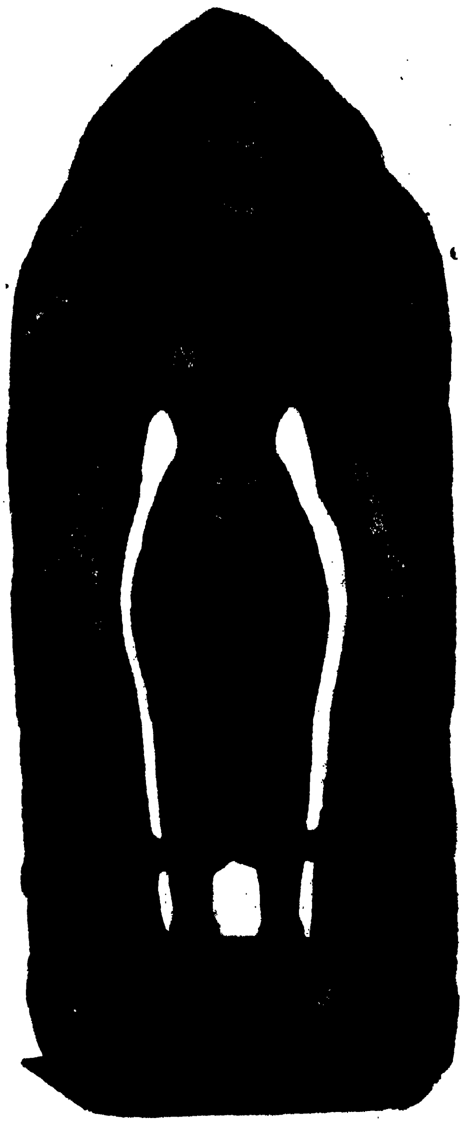
[৮] চণ্ডী—এই মূর্ত্তিখানা লিপিযুক্ত; লিপি অনুসারে ইহা লক্ষ্মণসেনের রাজ্যাঙ্কের ৩য় বৎসরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই মূর্ত্তিকে শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী তান্ত্রিক ধ্যান অনুসারে ভুবনেশ্বরী বলিয়া ধার্য্য করিয়াছেন।

[৯] বৃহৎ সূর্য্যমূর্ত্তি—এই মূর্ত্তিখানি উপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়া ঢাকা সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত হইতেছে।†

[১০] একটি অজ্ঞাত মূর্ত্তি নিকটবর্ত্তী মালধা গ্রামে ভট্টাচার্য্য বাড়িতে রক্ষিত আছে।

[১১] একটি অজ্ঞাত মূর্ত্তি বর্ত্তমানে নিকটবর্ত্তী গ্রামে আউটসাহীতে রক্ষিত আছে।

লক্ষ্মণসেনের তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ লিপিসম্বলিত চণ্ডী মূর্ত্তিটি সম্বন্ধে এ যাবৎ একটি ভুল ধারণা প্রচলিত ছিল। ইহা ঢাকা ডাল বাজারে আবিষ্কৃত বলিয়া পুনঃ পুনঃ লিখিত হইয়াছে।‡ কিন্তু ইহা ঢাকার শিক্ষাবিভাগের কর্ম্মচারী ৺বৈকুণ্ঠনাথ সেন কর্ত্তৃক ঢাকায় নীত হয় এবং তিনি উহা ঢাকার প্রসিদ্ধ জমিদার জীবনচন্দ্র রায়কে উপহার দেন। প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে বৈকুণ্ঠ বাবু আরও কয়েকটি মূর্ত্তি আড়িয়ল হইতে সংগ্রহ করিয়া ঢাকায় লইয়া যান। তাহা গ্রামবাসী বৃদ্ধেরা এখনও বলিয়া থাকে। এই মূর্ত্তিখানা সম্বন্ধে বিশেষ খোঁজ লইয়া জানিতে পারা গিয়াছে যে, পূর্ব্বে ইহা আড়িয়লের হাটখোলার পুকুরে প্রাপ্ত হইয়া হাটখোলায় বটগাছের নীচে রক্ষিত ছিল। সাধারণে তাহাকে 'কালী' বলিত এবং পূজা মানত করিত। বৈকুণ্ঠ বাবু একটি হাতী দিয়া এইটি ও আরও চার-পাঁচটি মূর্ত্তি আড়িয়ল হইতে লইয়া যান। আড়িয়লবাসী সপ্ততিপর ৺লালমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ইহা দেখিয়া ইহাকে আড়িয়লের উক্ত 'কালী' বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছিলেন। তিনি এই মর্ম্মে একটি মন্তব্য লিখিয়া দিয়াছেন।



গৌরী—ঢাকা চিত্রশালা

* Iconography of Buddhistic and Brahmanical Sculptures in the Dacca Museum—N. K. Bhattasali, p. 273, Plate lxviii (b)

† প্রবাসী—আষাঢ় ১৩২২ পৃঃ ৩৯৩

‡ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাঙ্গালার ইতিহাস', প্রথম ভাগ, চিত্র; যতীন্দ্রমোহন রায়ের 'ঢাকার ইতিহাস,' ২য় খণ্ডের ৩৯১ পৃঃ চিত্র এবং Inscriptions of Bengal—Vol. III, by N. G. Majumdar, pp. 116.

এইগুলি ভিন্ন আরও বহু মূর্ত্তির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। আশা করি, ক্রমে ক্রমে আমরা সেইগুলি সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ দিতে পারিব। উপরের লিখিত ক্ষুদ্র বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, এই গ্রামের চিত্রশালার কার্য্যক্ষেত্র ভবিষ্যতে সঙ্কীর্ণ না হইয়া বরং প্রশস্তই হইবে। চিত্রশালাটি মাত্র তিন বৎসর হইল স্থাপিত হইয়াছে। এখনই যেরূপ উৎসাহ দেখা যাইতেছে তাহাতে এই গ্রামে ভবিষ্যতে কোনও মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইলে তাহা সহজে বাহিরে যাইতে পারিবে না। এই কার্য্যে যুবকদের কথাই নাই, এমন কি, বৃদ্ধ ও বালকেরাও যথেষ্ট উৎসাহ দেখাইতেছেন। এই চিত্রশালাটি যেন তাঁহাদের প্রাণকে মাতাইয়া তুলিয়াছে।

চিত্রশালায় মূর্ত্তি ছাড়া অন্যান্য জিনিষও সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। পুঁথিশালার জন্য প্রায় ১০০ পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছে। মুদ্রা বিভাগে আকবরের একটি, সাজাহানের একটি, দ্বিতীয় আলমগীরের একটি, আহোম-রাজ লক্ষ্মীসিংহের একটি, গৌরীনাথ সিংহের একটি ও ইংরেজ ঈষ্ট ইণ্ডিয়া ও ফরাসী ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলের চার পাঁচটি মুদ্রা সংগ্রহ করা হইয়াছে।

আশা করি, এই ভাবে অনুসন্ধান ও গবেষণা চলিতে থাকিলে ভবিষ্যতে এই চিত্রশালা বিক্রমপুরের ঐতিহ্য আলোচনার কেন্দ্রস্থল হইয়া উঠিবে।*

* এই প্রবন্ধের চিত্রগুলির জন্য আমরা ফটোগ্রাফার শ্রীযুক্ত কানাই দাসের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ।

চন্দ্রোদয়

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

অপ্রত্যাশিত ঘটনা সংসারে অনেক ঘটে। অবনীনাথ ছয় মাসের মধ্যে যে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়া সংসার পাতিবেন, জামগাঁয়ের ইতর ভদ্র কেহই ইহা আশা করে নাই! তাও বিবাহ করিলেন ত্রয়োদশী কন্যাকে,—আজন্ম পাড়াগাঁয়ের মধ্যে যে বাড়িয়া উঠিয়াছে, শিক্ষার স্বল্প আলোকও যাহার ললাটে রেখাপাত করে নাই। বুদ্ধির দীপ্তিতে চক্ষু দুটি মোটেই সমুজ্জ্বল নহে। বালিকাসুলভ হাসিতে মুখখানি এতই তরল হইয়া উঠে, যে, ভিতরকার নির্ব্বোধ সারল্যটুকু অতিমাত্রায় চোখে ফুটিয়া উঠে। মাথায় ঘোমটা টানিবার সুচারু ভঙ্গীটুকু নাই, অঙ্গসঞ্চালনে কোথাও রহস্যের গন্ধটুকু পাওয়া যায় না। চোখের পানে চাইলে মনে হয়, এত শীঘ্র চেলি পরাইয়া মায়ের কোল হইতে রূপকথার এই শ্রোত্রীটিকে কেনই বা টানিয়া আনা হইল! এ-চোখ যাহা-কিছু কৌতুককর বিষয় দেখিয়াই বিস্ময়ে বিস্ফারিত হইতে পারে, সন্ধ্যার চাঁদ ধরিয়া দেওয়ার প্রলোভনে লোভাতুর হইয়া উঠে এবং রাত্রি গভীর হইতে-না-হইতে অনায়াসে ঘুমভারে আলস্যে মুদিয়া আসে!

অথচ শিক্ষিত অবনীনাথ ইহাকেই বিবাহ করিয়া বসিলেন। কলেজ হইতে পাস করিয়া কয়েক বৎসর উপযুক্ত পাত্রী না পাওয়ায় যে অবনীনাথ মায়ের কত অশ্রুমাখা মিনতি উপেক্ষা করিয়াছেন, কত জমিদারকন্যা শিক্ষিতা নহে বলিয়া রূপ ও রূপার বোঝা লইয়াও প্রত্যাখ্যাতা হইয়াছে।

অবশেষে সুদূর মফস্বলে শিকার করিতে গিয়া কোন বন্ধুর গৃহে আতিথ্য লাভ করিয়া তাহারই ভগ্নীকে দেখিয়া মুগ্ধ হন। নম্র ও ত্রুটিহীন আচরণে সে তরুণ জমিদারের মনে অল্প একটু আলোকপাত করিতে পারিয়াছিল। কোন পক্ষেরই আপত্তির হেতু ছিল না; কাজেই মৃদু আলোক উজ্জ্বল হইতে বিলম্ব হয় নাই।

তারপর, আটটি বৎসর। পুরাতন পৃথিবীতে নূতন পথিকেরা যখন ভালবাসিতে আরম্ভ করে, তখন অতীতে বা বর্ত্তমানে কেহ যে তেমন ভালবাসিতে পারিয়াছে বা পারে এ-ধারণা তাহাদের থাকেই না এবং মনে করে, বহু বর্ষের পৃথিবী যেন তাহাদেরই প্রেমসুধা-কিরণে স্নান সারিয়া

নবীনতর সম্পদে সার্থক হইল। আটটি বৎসরে অবনীনাথ মহাল পরিদর্শনে যান নাই, শিকার অভাবে বন্দুকে মরিচা ধরিবার জোগাড় হইয়াছিল, বন্ধুদের গানের মজলিসও নীরব হইয়া আসিয়াছিল। কি ঘরে কি বাহিরে স্ত্রৈণ আখ্যাটি তিনি ভাল করিয়াই লাভ করিয়াছিলেন।

সুজাতা যখন তখন অনুযোগ করিয়া কহিত, এ রকম সর্ব্বত্যাগী হ'য়ে কতদিন কাটাবে? অবনীনাথ হাসিয়া উত্তর দিতেন, অন্তর যার পরিপূর্ণ, বাইরের ত্যাগ তার পক্ষে কিছুই না। কোনদিন বা সুজাতা প্রশ্ন করিত, তোমার মহালের আয় কত? মাথা চুলকাইয়া অবনীনাথ অন্য কথা পাড়িতেন, চল সু—, মহালে বেড়াতে যাবে? সুজাতা হাসিয়া বলিত, তুমি মহালে যাবে প্রজা শাসন ক'রতে, আমার সেখানে কি কাজ?

অবনীনাথ উত্তর দিতেন, তাদের ব'লবো মহারাণীর কাছে দরবার করতে!

সুজাতা সহসা গম্ভীর হইয়া কহিত, ঠাট্টা নয়, মহাল দেখা তোমার দরকার। তবে আমায় যদি নিয়ে গিয়ে বনবাসে দিয়ে আসতে চাও ত সঙ্গে নিতে পার।

অবনীনাথ সবিস্ময়ে বলিতেন, তোমায় বনবাস দেব আমি!

সুজাতা হাসিয়া বলিত, প্রজানুরঞ্জনে সীতাদেবীকে যিনি বনে পাঠিয়েছিলেন তিনি ত তোমাদেরই আদর্শ!

অবনীনাথ ঈষৎ লজ্জিত হইয়া বলিতেন, আমি জানতুম না তোমার শরীর খারাপ।

এই হাস্যপরিহাস একদিন যে সত্য হইবে তাহা কে জানিত।

মাস-কয়েক পরে চন্দনী মহলের ব্যাপারটা এমন ঘোরালো হইয়া উঠিল যে, জমিদারের উপস্থিতি ভিন্ন সে গোলযোগের কোনো নিষ্পত্তিই সম্ভবে না। আসন্নপ্রসবা সুজাতাকে ফেলিয়া অবনীনাথ কিছুতেই প্রবাসযাত্রায় সম্মত হইলেন না। এদিকে পত্রের পর পত্র আসিয়া জমিতে লাগিল; ক্রমে কথাটা সুজাতাও শুনিল। শুনিয়া সে কাঁদিয়া কহিল, তোমার জন্ত আমার কি একটুও স্বস্তি নেই? এমন আনন্দের দিনে তুমি আমায় কাঁদাতে চাও!

অবনীনাথ সস্নেহে তাহার চোখের জল মুছাইয়া দিয়া কহিলেন, পাগল! সুস্থাবস্থায় আট বছর তোমার কাছ-ছাড়া হইনি, আর এখন—

সুজাতা কহিল, না গেলে বিষয় যাবে।

অবনীনাথ কহিলেন, যায় যা'ক, ওর চেয়ে বড় সম্পত্তি তুমি আমায় দিয়েচ।

এ-কথায় গর্ব্বিতা না হয় এমন নারী কোথায়ই বা আছে? তথাপি সুজাতা চোখের জল ফেলিয়া কহিল, বিষয়ের জন্য আমিও ভাবি না, কিন্তু যে আসচে তাকে কাঙাল সাজাতে তোমার এত সাধ কেন? সে আসার সঙ্গে যদি বিষয় যায়, লোকের কাণাকাণি আমি সইতে পারব না। তার সৌভাগ্যকে তুমি অমন ক'রে অন্ধকার ক'রো না।

অবনীনাথ যতবার সান্ত্বনা দিয়া চোখের জল মুছাইয়া দেন, বিগলিত তুষারের মত সে অবিরল ধারা ততই বহিতে থাকে। সুজাতা নিজে সমস্ত সহিতে পারে, কিন্তু সন্তানের দুর্ভাগ্য লইয়া অন্যে যে সহানুভূতি দেখাইবে ইহা তাহার অসহ্য।

অবশেষে নিরুপায় হইয়া অবনীনাথ যাত্রার আয়োজন করিলেন।

যাত্রাক্ষণে সুজাতা আসিয়া প্রণাম করিতেই হঠাৎ উচ্ছ্বাসে ভাঙিয়া পড়িয়া অবনীনাথ তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিলেন। সুজাতার অনেক কথা বলিবার ছিল, অবনীনাথেরও ছিল, কিন্তু সকরুণ অশ্রুপ্রবাহ কোনো কথাই বলিতে দিল না।

অবনীনাথ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছিলেন পাঁচ দিনে মহালের কাজ সারিয়া ফিরিবেন। হয়ত ফিরিতেনও, কিন্তু গোকর্ণনাথপুরের দ্বারিক বলিয়া এক অবাধ্য বর্দ্ধিষ্ণু প্রজা বড় গোল বাধাইল। রফা-নিষ্পত্তিতে সে রাজী না হইয়া প্রজার মধ্যে অসন্তোষের বীজ ছড়াইতে লাগিল। জমিদারের পাইক বরকন্দাজ দিয়া তাহাকে কাছারি-বাড়িতে বাঁধিয়া আনিয়া কিছু শাসন করা যায় না। শাসন করিতে গেলেই দাঙ্গার সম্ভাবনা। অপর পক্ষেরও লোক এবং অর্থ দুটি বলই প্রচুর। অথচ শাসন না করিলেও সমস্ত মহালের খাজনা আদায়ের আশা সুদূরপরাহত।

অবনীনাথ নায়েবকে কহিলেন, কি করা যায়? আমাকে শীঘ্রই ফিরতে হবে।

নায়েব বলিল, আদালতের আশ্রয় ছাড়া অন্য পথ ত

দেখি না। মামলার একদফা শুনানি পর্য্যন্ত আপনাকে অপেক্ষা করতেই হবে।

—সে কতদিন?

—প্রায় দিন-পনেরো লাগবে।

—কিন্তু ততদিন ত আমি থাকতে পারবো না। দু-চার দিনে শেষ হয় না?

নায়েব বলিল, না, হুজুর। এ মামলা অনেক দিন ধ'রে চলবে। কেবল জন-কতক দরকারী সাক্ষীর জন্যই এই ক'টা দিন আপনাকে থাকতে হবে। না হ'লে গোলযোগ হ'তে পারে।

সুজাতার অনুরোধ মনে পড়িল,—বিষয় যাওয়ার অপবাদ আমার সন্তানকে যেন স্পর্শ না করে। তার সৌভাগ্যকে তুমি অমন ক'রে অন্ধকার ক'রো না।

উপায় নাই, থাকিতেই হইবে।

পনেরো দিনের জায়গায় কুড়ি দিন হইল।

মামলার কয়েক দফা শুনানি হইয়া গেলে নায়েব যেদিন প্রফুল্ল মুখে জানাইল আর চিন্তার কারণ নাই, সেই দিনই অবনীনাথ গৃহযাত্রা করিলেন।

ভাদ্রের ভরা নদী। দুটি তীরের রুক্ষতাকে ঢাকিয়া উঁচু পাড় অবধি টল্‌টলে জলের ছলছলাৎ ধ্বনিটুকু ভারি মিষ্ট লাগে। কোথাও কচুরি পানার ফুলে, কোথাও বা কুমুদ-কহ্লারে নদী সাজিয়াছে। উপরের নীল আকাশে ইতস্ততঃ সঞ্চরণশীল টুক্‌রা মেঘ নৌকার গতির সঙ্গে যেন বাজি রাখিয়া ছুটিয়াছে। কাশ কেয়ার বনে অপরূপ শুভ্রতা; সাদা পাল তুলিয়া নৌকা ছুটিয়াছে। শুভ্রতর মন হাল্‌কা মেঘের সঙ্গে কেন ছুটিয়া চলে না? ভাটিয়ালি সুরে মাঝির এমন যে গান—অবনীনাথ কেন দু-কান ভরিয়া শুনিতেছেন না? দীর্ঘ দিন পরে প্রবাসী আজ গৃহমুখী। প্রতীক্ষমানা সুজাতা জানালার সেই কপাট ধরিয়া দুটি চক্ষুকে নদীর দিকে নির্নিমেষ করিয়া রাখিয়াছে। চোখে জল, মুখে উৎকণ্ঠা। হয়ত বা নবজাত শিশুক্রোড়ে হাসিমুখে সে প্রত্যহ এই দিক পানে চাহিয়া থাকে! এই প্রবহমান নদীজলে নিত্য তাহার দৃষ্টির স্পর্শ স্রোতে স্রোতে ভাসিয়া চলে। সেই দৃষ্টির শক্তিই কি তরণীর শুভ্রপালে বায়ুর বেগ লাগাইয়া স্ফীত করিয়াছে, গতি দিয়াছে? সুজাতা ত দূরে নহে! এই জলের স্পর্শে তাহার কোমল স্পর্শটি ঠিক যেন বিদায়দিনের অশ্রুমুখর স্পর্শের মত বিষণ্ণ।

অবনীনাথ নৌকায় শুইয়া হাত দিয়া নদীর জল ছুঁইয়া অস্থির হইয়া উঠিলেন। সুজাতা আছে ত? আটটি বৎসর যে চোখের আড়াল হয় নাই, কেন সে কাঁদিয়া বাহুডোর শিথিল করিল? কেন সে প্রিয়কে দূরে ঠেলিয়া দিল। রাত্রির অন্ধকারের মত মনেও অন্ধকার ঘনাইয়া উঠিতেছে। নদীর বাঁকে দপ্‌ করিয়া একবার আগুন জ্বলিয়া উঠিল। অবনীনাথ বহুক্ষণ সেইদিকে চাহিয়া বুঝিলেন, গ্রামের শ্মশানে চিতা জ্বলিয়াছে। কাহার প্রাণপ্রিয়তর ধন চলিয়া গেল! স্নেহভালবাসার সমস্ত সম্পর্ক চুকাইয়া কে অকরুণ রাত্রির অন্ধকারে চিতায় গিয়া উঠিল! অগ্নিমুখে, মানুষকে ভয় দেখাইতে, চিতার উপর কাঠ তুলিয়া দিতেছে কে উহারা? আগুন দেখিয়া প্রাণ কেন হু হু করিয়া উঠে? মনে হয়, কি যেন ছিল—কি যেন নাই। রাত্রির অন্ধকার দস্যুর মত কি যেন লুটিয়া লইয়াছে। ওই অগ্নিজিহ্ব চিতার ধূমে ও আলোয় সেই অশুভ ইঙ্গিত।—সুজাতা—সুজাতা—সুজাতা!

রাত্রি প্রভাতে পরিচিত ঘাটে আসিয়া নৌকা লাগিল। প্রাসাদ-বাতায়নে কোথায় সে মুখ? বাতায়ন বন্ধ। ঘাটে পরিচিত কেহ নাই। বিষণ্ণ প্রভাতের মত গ্রামখানি মৌন। অবনীনাথ একটিও কথা কহিতে পারিলেন না, ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে চলিলেন।

ভৃত্য দুয়ার খুলিয়া প্রণাম করিল। অবনীনাথ তাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিলেন না, একেবারে শয়নকক্ষে আসিয়া উপনীত হইলেন। কোথায় সুজাতা? কোথায়-বা নবজাত আগন্তুকের কলহাস্য! অটল মৌনতায় ঘরখানি মিনতি করিয়া বলিতেছে,—সে নাই—সে নাই।

বিকৃত কণ্ঠে অবনীনাথ চাকরটাকে ডাকিলেন। সে প্রভুর সামনে আসিয়াই কাঁদিয়া ফেলিল। অবনীনাথের চোখের সম্মুখে কল্যকার অন্ধকার রাত্রি দ্রুতবেগে অবতীর্ণ হইল, নদীর বাঁকে অমনি সেই চিতা জ্বলিয়া উঠিল এবং সেই চিতার আলোকে সুজাতা যেন স্পষ্টতর হইয়া দেখা দিল। অবনীনাথ মূর্চ্ছিত হইলেন না, সমস্তই শুনিলেন। মাত্র দিন দুই হইল মৃত সন্তান প্রসব করিয়া সুজাতা তাহার অনুবর্ত্তী হইয়াছে। বুঝি সন্তানের লালনাকাঙ্ক্ষায় সে তাহার পাছু পাছু গিয়াছে।

দীর্ঘ আটটি বৎসরের মধ্যে যেমন অবসর মিলিয়াছে অমনই সুজাতা পলাইয়া গেল! যাক, নিষ্ঠুর সুজাতা।

দিনকতক অবনীনাথ সেই ঘর হইতে বাহির হইলেন না, কাহারও সহিত কোন কথা কহিলেন না। সুজাতার এই আকস্মিক অন্তর্দ্ধান তখনও কৌতুক বলিয়া তাঁহার মনে হইতেছিল। মনে হইতেছিল, পাশের ঘর হইতে এখনই সে ছুটিয়া আসিবে; আসিয়াই চোখ টিপিয়া মৃদু হাসিয়া বলিবে, কেমন জব্দ? হাঁ, জব্দ, জব্দ, খুব জব্দই সে করিয়াছে!

আশ্চর্য্য কালের শক্তি।

কয়েক দিন পরে অবনীনাথ সহজ মানুষের মতই বাহির হইলেন। পরিবর্ত্তনের মধ্যে দেহের যৌবন প্রৌঢ়ত্বে আসিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে, গম্ভীর মুখের কথাগুলি সংক্ষিপ্ত এবং মধুর হাসিটির অন্তর্দ্ধান ঘটিয়াছে। তা হউক, দীর্ঘ আটটি বৎসর পরে অবনীনাথকে পাইয়া বন্ধুরা খুব সমবেদনা জানাইল, নায়েব আমলারা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল; মহালে মহালে খবর গেল জমিদার আসিবেন।

জমিদার সত্যই মহালে গিয়া জমিদারীর তত্ত্ব লইতে লাগিলেন এবং আশ্চর্য্যের বিষয় যে-চন্দনী মহালের দায়ে সুজাতাকে হারাইতে হইয়াছে, সেই চন্দনী মহালের অবাধ্য প্রজা দ্বারিককে তিনি এমন বশীভূত করিয়া ফেলিলেন যে, কোর্টের মামলার অকস্মাৎ নিষ্পত্তি হইয়া গেল। এই দ্বারিকেরই ত্রয়োদশী কন্যা চাঁপাকে তিনি বিবাহ করিয়া ঘরে আনিলেন!

মা ছিলেন না, মাসি-পিসির দল বধূ বরণ করিয়া ঘরে তুলিলেন। স্ত্রী-আচারের ত্রুটি কোথাও হইল না, কেবল বাহিরে ভোজন-প্রত্যাশীর দল মনঃক্ষুন্ন হইল। না বাজনা, না আলো, না জমিজ কোলাহল। জমিদার হইয়া এমন বিবাহ কি না-করিলে চলিত না!

চাঁপা প্রথমটা এত বড় বাড়ি দেখিয়া বিস্ময়ে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল। ঘরের যেন সংখ্যা নাই। যেমন বড়, তেমনই কি বিচিত্র সাজসজ্জা! যত রাজ্যের মনিহারী দোকান ঘরের মধ্যে সাজানো। প্রকাণ্ড আলমারীর পাশে দিব্য লুকোচুরি খেলা জমে। অত বড় খাটখানায় হাতখানেক উঁচু গদির উপর শুইয়া থাকিতেও যেন ভয়-ভয় করে। বড় একলা বোধ হয়। পাঁচ-ছয়টি খেলার সাথী জুটিলে গদির উপর হুড়াহুড়ি করিতে বেশ লাগে। উপরের বেলোয়ারী ঝাড়টা? কাচের কত রকমই যে রঙ!

উহারা বলিতেছে, এসব তোমারই মা,—দেখে শুনে নাও!

মাগো! এত জিনিষ নাকি দেখিয়া লওয়া যায়! ছবিতে, সোফায়, ঘড়িতে, গদি-আঁটা চেয়ারে, পাথর-বসানো টেবিলে, দেয়াল-আরসিতে ঘরগুলি যেন যাদুঘর! শুধু ঘণ্টা কেন, কয়েকটি দিন ধরিয়া দেখিলেও দেখার সাধ মেটে না। চাঁপা ইহারই মধ্যে দিশেহারা হইয়া যাইতেছে। এ বাড়িতে নাকি মানুষ বাস করিতে পারে!

বিবাহের কোন অনুষ্ঠানই বাদ দিবার উপায় নাই। ফুলশয্যার আয়োজনও হইল।

ফুলের গহনায় আগাগোড়া সাজিয়া চাঁপা আর এক জগতের মানুষ হইয়া গেল। একটু ফাঁক পাইয়াছে কি বড় আরসিটার সামনে দাঁড়াইয়া হাত-মুখ ঘুরাইয়া এই অপরূপ সাজসজ্জা দুটি বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়ন মেলিয়া দেখিতেছে। সুগন্ধি পান খাইয়া ঠোঁট দু-খানি কেমন লাল হইয়াছে, মাথায় ফুলের মুকুট—যেন যাত্রাদলের রাণীর মত! কিন্তু ভাল করিয়া দেখিবারই কি জো আছে! লোক পিছনে লাগিয়াই আছে। এ যায় ত ও আসে। ঘোমটা দিয়া বড়াই বুড়ীর মত বসিয়া থাকা—কতক্ষণই বা পারা যায়! লোকজন চলিয়া গেলে অবসর মিলিল যখন—তখন ঘুমে চাঁপার চক্ষু ঢুলিতেছে। ফুলে-ভরা উঁচু খাটখানায় বসাইয়া উহারা চলিয়া গেলে চাঁপা নামিয়া বড় আরসিটার সামনে দাঁড়াইতে পারিল না, সেই বিছানায়ই একটা পাশ-বালিশ মাথায় দিয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

নিয়ম রক্ষা করিতে অবনীনাথ আসিয়াছিলেন। ঘুম-বিবশা বালিকার সুপ্ত মুখের পানে চাহিয়া চক্ষুর দৃষ্টি অত্যন্ত কোমল হইয়া উঠিয়াছিল; যে-কেহ দেখিলে বলিত, সে দৃষ্টি অশ্রুপতনের নিকটতম মুহূর্ত্তের! পূর্ব্বস্মৃতি কিনা—কে জানে?

বেশীক্ষণ অবনীনাথ সে-দিকে চাহিতে পারেন নাই, সোটর উপর শুইয়া জীবনের এই স্মরণীয় রাত্রি কাটিয়া গেল।

প্রভাতে ঘুম ভাঙিতেই সবিস্ময়ে দেখিলেন, বালিকা-বধূ উঠিয়া আসিয়া আঁচল দিয়া তাঁহাকে বাতাস করিতেছে। চাঁপা তাঁহাকে চাহিতে দেখিয়া চাপা-গলায় বলিল, বড্ড ঘেমেছ কিনা—ঘুমোও—আমি বাতাস দিচ্ছি।

এক জাতের মেয়ে আছে, অতি শৈশব হইতে যাহারা

পাকিয়া যায় অর্থাৎ পাকা কথা ও পাকা আচরণে অভ্যস্ত হইয়া উঠে। বাবা মা আদর করিয়া সেই সব মেয়ের নাম দেন বুড়ী; চাঁপাও সেই জাতীয়া। বুদ্ধি কতটুকু আছে বলা যায় না, কিন্তু যেটুকু শেখে, মনে গাঁথিয়া রাখে। বিদায়-কালে মা বার-বার করিয়া উপদেশ দিয়াছিলেন—পতি পরমগুরু। দেখ মা, তাঁর সেবা ক'রতে ভুলো না, তাঁর পায়ে কাঁটা ফুটলে বুক পেতে দেবে। চাঁপা সে-কথার এক বর্ণও ভোলে নাই।

অবনীনাথ কিন্তু সেবা পাইবার জন্য বিবাহ করেন নাই। চাঁপার এই অকাল পক্কতায় প্রথমটা কৌতুক বোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু অকস্মাৎ তাঁহার মুখের সে কৌতুক-চিহ্ন মিলাইয়া গেল। গম্ভীর মুখে তিনি উঠিয়া পড়িলেন এবং একটিও কথা না বলিয়া বাহির হইয়া গেলেন। চাঁপা খানিকক্ষণ অবাক্ হইয়া থাকিয়া ঘর গুছাইতে মনোনিবেশ করিল।

অবনীনাথের শয়নকক্ষ হইতে বৃহৎ একটি পুষ্করিণী দৃষ্টিগোচর হয়। পূবধার খোলা, পশ্চিমে তার ঘন বাঁশঝাড়। উত্তর দক্ষিণে নারিকেল গাছ, স্নান করিবার ঘাট ওই দিকে। কাকচক্ষু স্বচ্ছ জলে খানিক সাঁতার কাটিয়া লাফালাফি করিয়া বেড়াইলে চাঁপা হয়ত, তৃপ্তি পাইত, কিন্তু বদ্ধ ঘরের মধ্যে সাবান ঘষিয়া গন্ধ তৈল মাখাইয়া, স্নান শেষ করাইয়া, সাজাইয়া, জল খাওয়াইয়া চাঁপাকে উঁহারা সেই জানালার ধারেই বসাইয়া দিয়াছেন—যেখান হইতে মায়ের মত স্নেহ-বাহু বাড়াইয়া পুকুরের জল আকর্ষণ করিতেছে। সেদিকে চাহিয়া চাঁপার চোখে জল আসে, কেবল মা'কেই মনে পড়ে।

দিন গেল, আবার রাত্রি আসিল; কিন্তু অবনীনাথ আসিলেন না। চাঁপার দুঃখ মায়ের জন্য। অবনীনাথের পানে তখনও সে পূর্ণ দৃষ্টি ফিরাইতে পারে নাই, কাজেই তাঁহার না-আসায় চাঁপার কোন কষ্ট হইল না।

দিন-সাতেক পরে বাবাকে দেখিয়া চাঁপা যেন হাতে স্বর্গ পাইল।

—বাবা, আজই আমরা যাব ত? মা কেমন আছে?—

দ্বারিক কেমন যেন ছল ছল চোখে চাহিয়া বলিলেন, তোর মা ভালই আছে, চাঁপা।

চাঁপা উৎফুল্ল হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ক'টায় সময় যাবে, বাবা?—

দ্বারিক চোখের উপর হাতের উল্টা পিঠ রাখিয়া হাতখানা টানিয়া লইলেন ও করুণ কণ্ঠে বলিলেন, আমি এখনই যাব, কিন্তু তোকে ত এরা পাঠাবে না, মা।

চাঁপা যেন আকাশ হইতে পড়িল, কেন বাবা?

—জমিদার-বাড়ির নিয়ম। বিয়ে হ'য়ে গেলে বউ আর বাপের বাড়ি যায় না।—

চাঁপা সহসা হাসিয়া উঠিল, না, যায় না! এঁরা তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করেছে বাবা।—

দ্বারিকও করুণভাবে হাসিয়া বলিলেন, ঠাট্টা করবার সম্পর্ক নয় রে, পাগলি! জামাই জানিয়েচেন তাঁদের বংশে আগে কি নিয়ম ছিল-না-ছিল সে কথা নয়, এখন থেকে এই নিয়ম হ'ল।

চাঁপা ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল, ইঃ, নিয়ম হ'ল! ব'ললেই হ'ল আর কি। দাঁড়াও বাবা—আমি আসচি। দ্বারিককে বসাইয়া চাঁপা সোজা লাইব্রেরী-ঘরে গিয়া ঢুকিল। ঢুকিয়াই পাঠরত অবনীনাথকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, তুমি নাকি আমার বাবার সঙ্গে যেতে মানা করেচ?—

অবনীনাথ মুখ তুলিয়া চাঁপার পানে চাহিলেন। নিতান্ত বালিকা! রাগিয়া গ্রীবাভঙ্গী করিয়া দুয়ারে হাত রাখিয়া এমন দাঁড়াইয়াছে! ভঙ্গী দেখিলে হাসি পায়। কিন্তু অবনীনাথ গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন,—হাঁ।

চাঁপা উদ্ধত কণ্ঠে কহিল, কেন?—

গম্ভীরভাবে উত্তর হইল, এ-বাড়ির এই নিয়ম। গম্ভীর কণ্ঠস্বরে চাঁপা থতমত খাইয়া গেল, আকস্মিক উত্তেজনা কাটিয়া সে কেমন অসহায়া হইয়া পড়িল। ভীতস্বরে বলিল, তবে কি আমি মাকে দেখতে পাব না? অবনীনাথ চাঁপার পানে চাহিলেন না। মাথা নীচু করিয়া উত্তর দিলেন, এ-বাড়ির যা নিয়ম তা-ই মানতে হবে; এর বেশী জিজ্ঞাসা ক'রো না।

বাক্যশেষে তিনি অন্য দুয়ার দিয়া বাহির হইয়া গেলেন। চাঁপা আর পারিল না, কাঁদিতে কাঁদিতে সেইখানে বসিয়া পড়িল।

মাস-কয়েক পরেই হইবে—অবনীনাথ সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতেছিলেন, চাঁপার কণ্ঠস্বরে ঈষৎ কৌতূহলী হইয়া উঁকি মারিয়া দেখিলেন, উঠানের উপর একটি স্ত্রীলোক এক অন্ধ বালকের হাত ধরিয়া বোধ হয় ভিক্ষার জন্য প্রার্থনা করিতেছে।

বামী ঝি ছোট রেকাবীতে ভরিয়া মুঠা দুই চাউল দিয়াছে, ভিখারিণীর তাহা পছন্দ হয় নাই। সে ভোজনদাবি জানাইয়া কাতরোক্তি করিতেছে। চাঁপা নীচের বারান্দা হইতে বামীকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিতেছে, তোর কি আক্কেল নেই, বামী। ওই দু-মুঠো চালে ওদের মা-ব্যাটার পেট ভরে? এদিকে আয়; আমি ভাঁড়ার থেকে চাল, ডাল, আলু, বেগুন দিচ্ছি, ওকে দে। আর বল্ আজ এইখানেই ও খাবে।

চাঁপার এই গৃহিণীপনা দেখিয়া অবনীনাথ হাসিলেন—হাসির সঙ্গে চোখের কোণে অশ্রুবিন্দু ফুটিয়া উঠিল। মেয়েদের বয়সের বিচার করিয়া বিজ্ঞতার পরিমাপ চলে না। গৃহিণী হইবার জন্য অতি শৈশব হইতে প্রকৃতি এই অমেয় দানে উহাদের সমস্ত বৃত্তিকে সুকোমল করিয়া গড়িয়াছেন। ত্রয়োদশী চাঁপার এই কোমল বৃত্তি বিংশবর্ষীয়া সুজাতার মধ্যে অবনীনাথ কতদিন প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এই গৃহিণীপনার উল্লেখে কত কৌতুক রহস্যই না জমিয়া উঠিত! অবাধ্য মন, অতীত লইয়া জাল বুনিতে ভালবাসে।

অবনীনাথ দ্রুতপদে উপরে উঠিতে লাগিলেন। লাইব্রেরী-ঘরে বসিয়া পাঠে মনোনিবেশ করিয়া জগৎ ভুলিতে চাহিলেন, কিন্তু অতীতের অনুসরণ সেখানেও!

সুজাতা সেখানেও পা টিপিয়া প্রবেশ করিতেছে, একখানা বই খুলিয়া উচ্চৈঃস্বরে পাঠ আরম্ভ করিয়াছে। অবনীনাথ হাসিয়া কাগজ বন্ধ করিলেন।

—আজ কি আমায় পড়তে দেবে না, সু?

—না, স্বার্থপরের মত মনে মনে পড়া আমি পছন্দ করি না। চেঁচিয়ে পড়, পড়তে পড়তে গল্প কর—তবে ত পড়ার আমোদ।

—তুমি জান না, মনে মনে পড়ায় সমস্ত অন্তর এক হয়ে যায়, গাঢ় অভিনিবেশ আসে; চেঁচিয়ে পড়লে আবৃত্তিটা হয়ে ওঠে মুখ্য—অন্তরের যোগ নষ্ট হয়ে যায়।

—আমি ত জানি তর্ক চললেই অন্তরের যোগ—

হাসিয়া অবনীনাথ বলিলেন, তর্ক না চললেও যোগসূত্র ছিন্ন হয় না, দেখ প্রমাণ।—বলিয়া বাহু বাড়াইলেন। অবনীনাথের বাহুবন্ধনে সুজাতা কখনও বাঁধা পড়িত, কখনও বা ছুটিয়া পলাইত। সেই লীলামুখর মুহূর্তগুলি কি রোমাঞ্চই বে আগায় অন্তে!

কেন সুজাতা না বলিয়া লুকাইল? সুজাতার আসনে ক্ষণিকের উত্তেজনাবশে এ কাহাকে আনিয়া বসাইয়াছেন? জীবনের সঙ্গিনীরূপে যাহাকে কল্পনা করিতেও মন বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠে, সে কি কোনদিন অন্তর-সান্নিধ্যে আসিয়া দাঁড়াইতে পারিবে? না, না। স্বারিকের অবাধ্যতার শাস্তি দিতে এ বালিকাকে জব্দ করা কেন? আবার করুণা! এ যে স্বারিকের কন্যা,—তেমনই ক্রূর, কপট, ছলনাপটু। নহিলে অতটুকু বালিকা কি সাহসে অবনীনাথের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে আসে! কি সাহসেই বা সুজাতা যে-আসনে বসিয়া এ বাড়ির সর্বময়ী হইয়াছিল, সেই আসনে বসিবার স্পর্ধা রাখে? সুজাতাকে মুছিয়া ফেলিবার জন্য বালিকা নির্বোধ সাজিয়াছে। সর্পের খলতা উহার অন্তরে।

উত্তেজনায় অবনীনাথ বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলেন ও বামীকে ডাকিয়া বলিলেন, বামী, এ বাড়ির যা নিয়ম, ভিখিরী এলে যেমন মুষ্টিভিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে তেমনি দেওয়া হয় যেন। একমুঠো খায় খাক, কিন্তু ভাঁড়ার লুঠ করবার কোন দরকার দেখি না।

আদেশ দিয়াই তিনি লাইব্রেরী-ঘরে পুনঃ প্রবেশ করিলেন।

চাঁপা এ আদেশ গায়েও মাখিল না। বামীকে বলিল, —পুরুষ মানুষের এত খোঁজের দরকার কি বাপু, ভাঁড়ার থাকবে মেয়েদের জিম্মায়। তুই দে বাপু, আহা! দেখলে মায়া হয়।

বহুদিন পরে চাঁপা লাইব্রেরী-ঘরে আসিয়া অবনীনাথকে বলিল, তুমি কি নিষ্ঠুর, অনায়াসে বললে কি-না ওদের মুষ্টি ভিক্ষা দাও!

অবনীনাথের মন ভাল ছিল না, রুক্ষকণ্ঠেই বলিলেন, আমি যা ভাল বুঝেছি, করেছি—কারও কথা মেনে আমায় চলতে হবে না-কি?

চাঁপা সহজ ভাবেই বলিল, বাঃ রে! আমি তাই বলচি না-কি? খানিক থামিয়া বলিল, এক গ্লাস সরবৎ খাবে?

—না।

—বড্ড ঘেমেছ যে! ঘরে একখানা টানা-পাখা রাখলেই ত পার।

—তুমি যাও, পড়ার সময় বিরক্ত করলে পড়া হয় না।

—আহা! আমি যেন তোমায় সর্বক্ষণই বিরক্ত করি কি বই ওখানা?

—তুমি বুঝবে না। যাও, ওখানে কি রান্না হচ্ছে দেখগে।

চাঁপা শশব্যস্তে উঠিয়া বলিল, যাই, যেটি না দেখব জলিয়ে-পুড়িয়ে রাখবে। হ্যাগা, তুমি না-কি চপ খেতে ভালবাস! করবো দুখানা মাছের চপ?

অবনীনাথ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, না। আমি কিছুই খেতে ভালবাসি না, তুমি যাও।

চাঁপা মৃদুস্বরে বলিল, শুনেচি দিদি না-কি রোজই চপ—

—চাঁপা।

রূঢ় আহ্বানে চাঁপা চমকিত হইয়া উঠিল। অবনীনাথের মুখে সমস্ত রক্ত আসিয়া জমিয়াছে। মুখখানি ফুলিয়া দ্বিগুণ হইয়াছে—সেদিকে চাহিলে বুক দুরু-দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠে।

রূঢ়স্বরেই অবনীনাথ বলিলেন, তুমি ছেলেমানুষ, জান না মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তা করলেই মস্ত বড় সান্ত্বনা দেওয়া হয় না। তোমার সেবা দিয়ে, দরদ দিয়ে, মিষ্টি কথা দিয়ে আমায় জালিও না। যাও।

চাঁপা নিরুত্তরে চলিয়া গেল।

অবনীনাথ তাহার গমনপথের পানে খানিক চাহিয়া থাকিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া টেবিলের উপর মাথা রাখিলেন এবং অস্ফুটস্বরে উচ্চারণ করিলেন, 'সুজাতা'।

চাঁপা কিন্তু এ বিরাগ গায়ে মাখিল না, বরং বেশী করিয়া অবনীনাথের সেবায় মনোযোগ দিল।

সকালে উঠিলেই গরম চা, টোষ্ট, ডিমসিদ্ধ আসিয়া হাজির হয়। কাপড় জামার জন্য সাতটা আলমারী ঘাঁটাঘাঁটি করিতে হয় না, জুতাগুলি চকচকে হইয়া দুয়ারের বাহিরে সাজানো থাকে। ভাতের থালারই কি কম পারিপাট্য? ঘন মুগের ডাল, উচ্ছে পলতার সুক্ত, মাছের কালিয়া এবং চপ, সরু সরু আলু মুচমুচে করিয়া ভাজা, পোস্ত বড়া, ইত্যাদি যত্ন করিয়া কে থালার পাশে সাজাইয়া রাখে।

খাইতে বসিয়া সুজাতার সেবানিপুণ দুটি করের পরিচর্য্যা মনে পড়িয়া প্রাণটা হু-হু করিয়া উঠে। সে কি নেপথ্যে থাকিয়া এই আয়োজন সম্ভারে অবনীনাথের প্রতি খরদৃষ্টি রাখিয়াছে?—ভাতের বাটিতে হাত দিতেই মনে হয়, সুজাতা সম্মুখে বসিয়া বলিতেছে, ও-টুকু খেয়ে ফেল, নিজে হাতে পুড়িয়ে যায় রাঁধলাম। মাছের ডালনায় বেশী ঝাল হয়েছে-বুঝি? না, না, চপ রাখতে পাবে না।

—তুমি খাবে, থাক্।

—ও হরি। আমি যেন না রেঁধেই তোমায় দিয়েছি।

—কই দেখি, কেমন রেঁধেচ!

—তোমার বাপু সব অনাসৃষ্টি। আবার হেঁসেল থেকে টেনে আনি। এই দেখ, হ'ল ত?

—এত খেয়ে আমার উঠবার ক্ষমতা থাকবে না সু! তোমায় কিন্তু টেনে তুলতে হবে।

সত্য সত্যই সুজাতা অবনীনাথের হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিত। খাওয়া আর হয় না, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া অবনীনাথ উঠিয়া পড়েন।

নেপথ্যচারিণী চাঁপার বুকেও সেই নিঃশ্বাস গাঢ় হইয়া উঠে। সাহস করিয়া সম্মুখে আসিয়া সে অনুরোধ করিতে পারে না।—সে জানে, অবনীনাথ তাহার সঙ্গ সহ্য করিতে পারেন না। চাঁপাকে এড়াইতে তিনি বৈঠকখানায় শয়নকক্ষ করিয়াছেন। তা করুন, চাঁপার তাহাতে ক্ষোভ নাই। কিন্তু চাঁপা এমন কি অপরাধী যে সম্মুখে আসিলেই অবনীনাথের সৌম্য মুখে কঠিন রেখা ফুটিয়া উঠে, বাক্য হইয়া উঠে কটু এবং মুখ না তুলিয়াই বিরক্তিভরে তিনি ঘরের বাহিরে চলিয়া যান। এঁরা বলেন, বোয়ের শোকে অমন হয়।

কিন্তু চাঁপা বুঝিতে পারে না এক জনের শোকে দগ্ধ হইলেই কি আর এক জনকে অকারণে দগ্ধ করিতে ভাল লাগে? যে-মানুষ হাসিয়া কথা বলিতে পারে সে-মানুষ কেমন করিয়া নির্দ্দয়ের মত পরমুহূর্ত্তে মুখে আষাঢ়ের মেঘ নামাইয়া আনে?

চাঁপার সাহস এক বিন্দু নাই। অবনীনাথের পায়ের শব্দ পাইলেই সে কোথায় লুকাইবে ভাবিয়া পায় না। অথচ তাঁর সুখ-সুবিধা আহার-পরিচ্ছদের সুবন্দোবস্ত করিতেও তার চেষ্টার অন্ত নাই।

বয়সের সঙ্গে চাঁপার ভয় বাড়িতেছে। সে বুঝিতেছে অনাহূত হইয়া সে এখানে আসিয়াছে। তাহার এই অবাঞ্ছিত আগমনে বাড়ির হাওয়া বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু উপায় কি? আকাশ-পাতাল ভাবিয়াও চাঁপা নিজের দোষ

খুঁজিয়া পায় না। এতই যদি অপ্রীতিকর সে, উহারা কেন তাহাকে বাবার কাছে পাঠাইয়া দিন না। মায়ের কোলে মাথা রাখিয়া সে দুই দিনেই এই দুঃস্বপ্ন ভুলিয়া যাইবে।

অবসর পাইলেই চাঁপা জানালায় বসিয়া পুকুরের পানে চাহিয়া থাকে। দুপুরের রৌদ্রে যখন চারিদিক উত্তপ্ত হইয়া উঠে, দূর মাঠে ধোঁয়ার মত সূর্য্যদেব রৌদ্রের জাল বুনিয়া চলেন, আতপ্ত গাছের পাতা দোলাইয়া অগ্নিপ্রবাহের মত বায়ু বহিয়া চাঁপার চোখ মুখ ঝলসাইয়া দেয়, তখন বাঁশঝাড়ের নীচে পুকুরের জল ছুঁইয়া যে ঝোপটা কুঞ্জ রচনা করিয়াছে তাহারই ছায়ায় অদৃশ্য এক ডাহুক-দম্পতির বিশ্রম্ভালাপ বড় মধুর হইয়া তার কানে বাজে। উত্তপ্ত গরাদে মাথা রাখিয়া একমনে সেই ডাক শুনিতে শুনিতে চক্ষু মুদিয়া ভাবে,—ঠাণ্ডা মেঝে জলে মুছিয়া আধ-অন্ধকার বারান্দায় তাহার মা তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া গুণগুণ স্বরে সংসারের কাহিনী বলিতেছেন—পতিসেবা পরমধর্ম্ম। সংসারে স্বার্থত্যাগ না করিলে সুখ মিলে না। সীতার কাহিনী, সাবিত্রীর পুণ্যগাথা, পদ্মিনীর জহরব্রত—কত সে মিষ্ট গল্প। হয়ত তন্দ্রা আসে; গরাদে হইতে মাথা উঠাইয়া মেঝেয় সে ঢলিয়া পড়ে এবং ডাহুক-দম্পতির সেই সুমিষ্ট ডাক শুনিতে শুনিতে একেবারে ঘুমের রাজ্যে—।

চাঁপার চলনে সে চঞ্চলতা নাই, বাক্যে বাহুল্য নাই, দৃষ্টিতে অসংশয়তাই বা কোথায়? ভরা নদীর মত অলস মন্থর; লজ্জার অবগুণ্ঠনে চাঁপা মুখের অর্দ্ধেক ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। সুজাতার প্রকাণ্ড ছবিটার পানে সে একদৃষ্টে তাকাইয়া তাকাইয়া কত দিন ভাবিয়াছে, কি গুণ থাকিলে অমনটি হওয়া যায়? চোখে হাসি, মুখে হাসি, সর্ব্বাঙ্গে হাসির তরঙ্গ।—জ্যোৎস্নামোড়া নদীর রূপালী স্রোত।

একদিন টুলটা এ-দিকে টানিয়া আনিয়া আঁচল দিয়া ঘষিয়া ঘাষিয়া ছবিটা সে পরিষ্কার করিতে লাগিল। মাথায় কি খেয়াল চাপিল, স্বামীকে ডাকিয়া বাগান হইতে ফুল তুলিবার আদেশ দিল। ফুল আসিলে সারা দুপুর না ঘুমাইয়া একমনে সে মালা গাঁথিল। গাঁথা মালা লইয়া আবার সে টুলে গিয়া উঠিল এবং ছবির ফ্রেম বেড়িয়া মালাটি পরাইয়া নীচে নামিয়া একদৃষ্টে সেইদিকে চাহিয়া রহিল। হাঁ, রূপ বটে। মা বলিতেন, ইন্দ্রাণী। সুজাতা সেই ইন্দ্রাণী। ঠাকুর-দেবতার মত সে প্রত্যহ এই ছবি পূজা করিবে এবং প্রার্থনা করিবে, হে দেবি, তোমার গুণের এতটুকু আমায় দাও। চক্ষুশূল না হইয়া স্বামীর উপকারে যেন লাগিতে পারি। তুমি ধূপের মত নিঃশেষ হইয়াছ, কিন্তু গন্ধে ঘর ভরিয়া আছে। সে গন্ধের একটুও কি আশীর্ব্বাদী স্বরূপ দিবে না?

দিন-দুই আগে বড় মামীমা একখানা বই পড়িয়া সকলকে শুনাইতেছিলেন। তাহাতে ধূপের গন্ধের ঐ উপমাটা অমনই সুন্দর করিয়া দেওয়া আছে। শুনিয়া চাঁপার মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল।

চোখে জল—কিন্তু চাঁপার মনে বড় তৃপ্তি।

ব্যথা জানাইবার সঙ্গিনী যেন সে এতদিনে খুঁজিয়া পাইয়াছে।—

সেইদিন অপরাহ্ণে অবনীনাথ সেই ঘরে কি প্রয়োজনে আসিয়াছিলেন;—অকস্মাৎ পুষ্পমাল্যভূষিতা ঐ প্রতিমূর্ত্তির পানে চাহিয়া তিনি বিমূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন। চকচকে ফ্রেমের মধ্যে সুজাতার মুখের হাসিটি আজিও ত অম্লান আছে। স্বাস্থ্যসুষমায় ভরা টলটলে মুখ, খুশীতে উজ্জ্বল আয়ত চোখ, এমন কি চিবুকলগ্ন বাঁ-হাতের ঐ পরিপুষ্ট আঙুলটি পর্য্যন্ত ভঙ্গীতে অপরূপ। সুন্দর করিয়া গাঁথা মালায় সুজাতা সুন্দরতর হইয়াছে। সুজাতা ত সুন্দরই; যে শ্রদ্ধা দিয়া তাহাকে সুন্দরতর করিয়াছে তাহার প্রতি মন যেন কৃতজ্ঞ হইতে চাহে। বালিকার যত প্রগলভতাই থাকুক পূজনীয়দের প্রতি প্রীতি সে পোষণ করে। অবনীনাথের পরিতুষ্টির জন্য তাহার নেপথ্যের আয়োজন বাহিরের লোক-ভুলানো নহে, সত্যই হৃদয়সম্পর্কে সম্পদশালী। তাঁহার সুজাতাকে যে অবহেলা করে না, তাহার যত কৃত্রিমতাই থাকুক, অবনীনাথের অন্তর এতটুকু ঋণস্বীকারে দ্বিধা বোধ করিতেছে না। চাঁপার রুচি-জ্ঞানের প্রশংসা করা যায়,—একমাত্র দোষ সে ঘারিকের মেয়ে।

কিন্তু সে যাহাই হোক, সেদিন রাত্রিতে তিনি বড় তৃপ্তিতেই আহার করিলেন। দুখানা চপ খাইয়াও আর একখানা চাহিয়া লইলেন; মাছের কালিয়াও বার-দুই পাতে পড়িল

পরিবেশনকারিণী আসিয়া চাঁপাকে বলিল, মা, আজ তোমার রান্না চমৎকার হয়েছে। বাবু, তরকারী, চপ চেয়ে খেয়েছেন।

আনন্দে চাঁপার চোখে জল আসিবার উপক্রম হইল। রুদ্ধকণ্ঠে সে বলিল, বামুনমাসী, আর কি চাই জিজ্ঞেস ক'রে এলে না কেন? হয়ত উঠে যাবেন।

বামুনমাসী বলিল, না, মা, তিনি পেট ভরে খেয়েই উঠে গেছেন। যাও পান দিয়ে এস।

দেবী প্রার্থনা শুনিয়াছেন। চাঁপা যে এ-আনন্দবেগ বহিতে পারিতেছে না। ফ্রেমে-বাঁধানো ছবির পায়ে মাথা রাখিয়া ইচ্ছা হইতেছে খানিকক্ষণ পড়িয়া থাকে। কিন্তু স্বামী হয়ত ওই ঘরেই বসিয়া শ্রান্তি দূর করিতেছেন; এখন কি ও-ঘরে যাওয়া যায়? আজ তাহার প্রসন্নতাকে নিজের অবাঞ্ছিত উপস্থিতি দিয়া সে ম্লান হইতে দিবে না। খাইতে তাহার মোটেই ইচ্ছা নাই। খাওয়াইয়া যে অতুল আনন্দ, খাইতে গিয়া সে তৃপ্তিকে মাটি করা কেন?

রাত্রিতে চাঁপা একাই বড় ঘরে গিয়া শুইল। আনন্দে চোখের পাতায় ঘুম নামে না, কেবলই মনে হয়, আরও কি দিলে—কি করিলে ওই বিষণ্ণ মানুষটিকে বেশী তৃপ্তি দেওয়া যায়? কি করিলে দিনের পর দিন উঁহার প্রসন্ন অন্তর নয়নের স্বাস্থ্য-সম্পদভরা দৃষ্টিপথে আসিয়া উদয় হইবে, বলিষ্ঠ বাহুতে রক্তের প্রাচুর্য্য রঙে ফুটিয়া উঠিবে এবং মন্থর চলনে গতির দৃঢ়তা আসিয়া ঋজু দেহকে সতেজ করিবে।

ভাবিতে ভাবিতে হয়ত একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল, মৃদু যন্ত্রণাব্যঞ্জক ধ্বনিতে সে-তন্দ্রা টুটিয়া গেল। চাঁপা বিছানায় খানিক কান পাতিয়া বুঝিল, সে-ধ্বনি নিদ্রার মায়া নহে, রোগের যন্ত্রণায় কেহ কাতরোক্তি করিতেছে। শয়নকক্ষের পূর্ব্বধারে একতলায় বৈঠকখানায় যেখানে অবনীনাথ শয়ন করেন সেইখানেই—তবে কি তিনিই? ধড়মড় করিয়া সে বিছানায় উঠিয়া বসিল এবং দুয়ার খুলিয়া ত্বরিতপদে বাহিরে আসিল।

রাত্রি গভীর। বিশাল অট্টালিকার জনপ্রাণী জাগিয়া নাই। ছেলেবেলায় বহুবার শোনা পাতালপুরীর ঘুমন্ত রাজকন্যার নিস্তব্ধ প্রাসাদের মতই ভীতিপ্রদ স্তব্ধ। উপরে গাঢ় নীল আকাশ অসংখ্য নক্ষত্রখচিত। চন্দ্র নাই, কৃষ্ণপক্ষের তিথি। হউক অন্ধকার, চাঁপা নিঃশব্দে নীচে নামিয়া গেল, এবং বৈঠকখানার দরজায় মিনিট-দুই কান পাতিয়া সেই কাতরোক্তি শুনিয়া তাহার মনের সংশয় দূর হইল। অবনীনাথই বটে। কিন্তু গভীর রাত্রিতে চাঁপা এ-ঘরে ঢুকিয়া কি সান্ত্বনাই বা তাঁহাকে দিবে? হয়ত চাঁপাকে দেখিয়া ললাটের কুঞ্চন বাড়িবে, বেদনার সঙ্গে ক্রোধ মিশিয়া তাঁহাকে আরও অস্থির ও অসুস্থ করিয়া তুলিবে। চাঁপার নিজের জন্য এতটুকু ভয় নাই। আনন্দের সুদৃঢ় বর্ম্মে আজ তাহার সারা দেহমন ঘিরিয়া আছে—লাঞ্ছনা বা কটুবাক্য সেখানে ঘেঁষিতেই পারে না।

মন বাঁধিয়া সে দুয়ারে হাত দিল, সঙ্গে সঙ্গে দুয়ার খুলিয়া গেল। স্তিমিত দীপশিখায় চাঁপা দেখিল, ঢালা ফরাসের উপর শুইয়া পাশ-বালিশটা বুকে চাপিয়া অবনীনাথ দেয়ালের দিকে ফিরিয়া কাতরোক্তি করিতেছেন। মাথার চুলগুলি বিছানার মতই বিশৃঙ্খল! বালিশের এ-ধার হইতে ও-ধার পর্য্যন্ত মাথা চাপিয়া, কখনও বা দেহ কুঁচকাইয়া, পাশ-বালিশের উপর হাতের চাপড় মারিয়া সেই যন্ত্রণাকে তিনি দমন করিবার প্রয়াস পাইতেছেন।

দ্রুতপদে সে অবনীনাথের শিয়রে আসিয়া বসিল এবং কোন দ্বিধা বা সঙ্কোচ না করিয়া আপনার ডানহাতখানি তাঁহার উত্তপ্ত ললাটের উপর রাখিল।

অবনীনাথের মুখ হইতে আরামসূচক ধ্বনি বাহির হইল,—আঃ!

তিনি একবার মাত্র রক্তচক্ষু মেলিয়া চাঁপার পানে চাহিলেন। কিন্তু কুঞ্চিত ভ্রূতে বিরক্তির রেখা ফুটিল না—ধীরে ধীরে চক্ষু মুদিয়া নিস্পন্দের মত পড়িয়া রহিলেন।

চাঁপা সেবার আনন্দে জিজ্ঞাসাও করিল না—কি হইয়াছে! দুটি ঠাণ্ডা নরম হাতের ছোঁয়ায় অবনীনাথের সমস্ত যন্ত্রণা মুছিয়া লইতে লাগিল। লঘুতম মুহূর্ত্তগুলি অত্যন্ত স্পষ্ট এবং সংক্ষিপ্ত। চাঁপার সারা দেহে রোমাঞ্চ জাগিল।

কিছুক্ষণ পরে অবনীনাথের উত্তপ্ত ডানহাতখানি চাঁপার সেবারত হাতের উপর ঘন হইয়া লাগিল এবং নরম মুঠায় ভরিয়া আনন্দে মুহূর্ত্ত ছুঁয়া চাঁপার বিকল করপল্লবখানি বিস্তৃত বুকের উপর টানিয়া আনিয়া নিশ্চল হইল।

রাত্রি রহস্যময়ী। তাহার স্পর্শের যাদুদণ্ডে অন্ধকারমাখা মুহূর্ত্তগুলি রমণীয় হইয়া উঠে। কিন্তু তাহার চেয়েও রহস্যঘন এই পীড়া ও সেবা। যন্ত্রণায় অতি অসহায় মানুষ সেবার স্পর্শ পাইতে সমস্ত দেহকে করিয়া রাখে উন্মুখ। সুখসন্ধানী চিত্তের এই নির্লজ্জ লোলুপতা দুর্ব্বলতম মুহূর্ত্তের মধ্যেই প্রখর হইয়া ফুটে।

কখন প্রভাত হইয়াছে, কখনই বা সূর্য্যদেব উঠিয়াছেন কেহ জানে না। রাত্রির সুকোমল অঙ্কে দুই জনেই সুপ্তি-মগ্ন। প্রথমে চক্ষু মেলিলেন অবনীনাথ। চক্ষু মেলিয়াই তিনি আবার চক্ষু মুদিলেন। স্মৃতির অনুসরণ চলিতেছে বুঝি? নহিলে বুকের এত কাছে সুজাতাকে গাঢ় করিয়া তিনি বাহুর বাঁধনে বাঁধিলেন কি করিয়া? তাঁহারই বুকে গন্ধভরা কেশরাশি এলাইয়া সুজাতা পরম আলস্যে নিদ্রামগ্ন। একটি হাত তেমনই গলদেশ বেড়িয়া কণ্ঠহারের মত শোভাময়—অন্যহাত বুকের নীচে প্রসারিত। নিঃশ্বাসতরঙ্গে সুজাতা সুপ্তিময়ী। কি জানি চক্ষু চাহিলে যদি স্বপ্ন মিলাইয়া যায়? আবেশভরে অবনীনাথ চাঁপার শিথিল দেহ আকর্ষণ করিতেই সে জাগিয়া উঠিল। অবনীনাথের আকর্ষণে চাঁপা নিমীলিত নেত্রে উষ্ণ বুকের কাছে সরিয়া আসিল। বুকের স্পন্দন এত ঘন ও উত্তাল যে চাঁপা বুঝি নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া মরে! হায়! এই দণ্ডে যদি সে মরিতে পারিত! মরিলেও এই মুহূর্ত্তব্যাপী অব্যক্ত অপরিমেয় সুখের তরঙ্গে দেহ ঢালিয়া হয়ত বা দেবলোকেই পৌছিত! কিন্তু অবনী-নাথ পুনরায় চক্ষু মেলিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অশুচি স্পর্শের দারুণ অস্বস্তিতে সমস্ত দেহ তাঁহার নিদারুণ ঘৃণায় সঙ্কুচিত হইয়া গেল। বিদ্যুদ্বেগে আপন গলদেশ হইতে চাঁপার এলায়িত বাহু ছাড়াইয়া ঠেলিয়া দিলেন এবং বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

রূঢ় আঘাতে চাঁপাও চক্ষু মেলিল। চক্ষু মেলিয়া দেখিল, সেই কঠিন মুখের সমস্ত শিরাই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, রূঢ়দৃষ্টিতে তেমনি সুতীক্ষ্ণ তরবারির ঝলক—দীপ্তিতে যার অন্তর টুকরা টুকরা হইয়া যায় এবং ঋজু দেহের কঠিন ভঙ্গিমায় অপরিসীম ঘৃণা।

শিহরিয়া চাঁপা চক্ষু মুদিল।

কিছুক্ষণ পরে চক্ষু চাহিয়া দেখিল অবনীনাথ নাই। চাঁপা মনে মনে প্রার্থনা করিল, এই দণ্ডেই হয় রাত্রি নামুক অথবা তাহার মৃত্যু হউক। নিতান্ত মরণ না হয়ত প্রবল জ্বর—একটা কঠিন অসুখ, নহিলে বাহিরের সূর্য্যালোকে সে মুখ দেখাইবে কি করিয়া? লোকে ত বুঝিবে না পীড়িতের সেবা করিতে সে এখানে আসিয়াছে। উঁহারা মুখ টিপিয়া হাসিবেন। উপযাচিকার আতিশয্য দেখিয়া অন্তরালে হয়ত কত রহস্যই করিবেন।

কেহই কিছু বলিলেন না অর্থাৎ বলিবার অবসর পাইলেন না। বাহিরে আসিতেই বামুনমাসী বলিলেন, আহা লক্ষ্মী! আবার যে কত দিনে এসে ঘর আলো করবেন কে জানে। শীগগির এস মা—

চাঁপা অবাক হইয়া তাঁহার পানে চাহিয়া রহিল।

তিনি বলিলেন, বাবু এইমাত্র হুকুম দিলেন ঘাটে নৌকো সাজাতে। সকাল সকাল খেয়ে দেয়ে নাও; পথ ত কম নয়—পৌছুতে সেই সন্ধ্যে।

চাঁপা আর সেখানে দাঁড়াইল না, নিজের শয়নকক্ষে আসিয়া দুয়ার বন্ধ করিল। এ কঠোর শাস্তি তাহার কেন? সেবার অনধিকারপ্রবেশেই কি উনি কঠিনতম দণ্ড দিলেন। ঐ ত সেই পুকুর—প্রভাতবায়ু হিল্লোলিত ছোট ছোট ঢেউয়ে ভরা; দেখিলেই কলস ভাসাইয়া খেলা করিতে ইচ্ছা করে। কত দিন সে মায়ের সঙ্গে বাড়ির পুকুরে এমনভাবে জলক্রীড়া করিয়াছে। কিন্তু হায় রে! পুকুর দেখিয়া আজ কেন তাহার মাকেও মনে পাড়তেছে না? তাঁহার মুখের মিষ্ট গল্প, শাসন, সোহাগ, সুশীতল কোল—না, কিছু না।

কেবলই মনে হইতেছে, সে সৃষ্টির আবর্জ্জনা। এ-জগতে কোন মূল্যই তাহার নাই। আরসির সামনে দাঁড়াইয়া দেহের সুগৌর বর্ণই হউক, ঘন ভ্রূযুক্ত কৃষ্ণতার আয়তনেত্রের অর্দ্ধনিমিলিত স্নিগ্ধ দৃষ্টিই হউক, তাম্বুলরাগ-রঞ্জিত পাতলা ঠোঁটের শ্রীযুক্ত টানই হউক,—এক কথায় নিখুঁত মুখের সঙ্গে নিটোল স্বাস্থ্য ভরা দেহের অপরূপ লাবণ্য—এ দেহের যাহা-কিছু সৌন্দর্য্য—সমস্তই বৃথা। তটবারিপ্লাবী জলভরা নদী যদি সমুদ্রগামিনী না হইল ত বৃথাই তাহার পরিপূর্ণতা! কি হইবে মায়ের কোলে ফিরিয়া? এই অবর্ণনীয় দুঃখব্যথার ইতিহাস কাহারও কাছে যে ব্যক্ত করিবার নহে। সৌভাগ্যবতীরা মুখে দিবেন সহানুভূতি,

অন্তরে থাকিবে অহঙ্কার। যে-গৌরব বহিয়া প্রফুল্লমুখী বধূ বাবা মায়ের কাছে নববিকশিত ফুলের মত ফিরিয়া আসে, চাঁপার সে-গৌরব কোথায়? সে কিছুতেই সেখানে যাইবে না। শুধু কাঁদিতে, কল্পনা কুড়াইতে, মুখ শুকাইয়া মায়ের আঁচলের তলায় ঘুরিয়া বেড়াইতে?

কিন্তু কঠোর অবনীনাথ, ততোধিক কঠোর তাঁহার আদেশ। বিবাহের পর যে-নিয়ম তিনি বাঁধিয়াছিলেন, আজ সে-নিয়মের ব্যতিক্রম তাঁহারই ইচ্ছায় হইতেছে। এই সুবিশাল প্রাসাদে এমন কেহ নাই যিনি বিধিলিপির মত অলঙ্ঘ্য এই আজ্ঞার বিরুদ্ধাচরণ করেন। অবাধ্যতার ফল লোকের উপহাস কুড়ানো। অথচ চাঁপা জানে, এই যাওয়াই তাহার জন্মের মত যাওয়া। সীতার মত নির্ব্বাসনে সে চলিল। সীতার মতই সেই চিরপরিচিত মাতৃক্রোড়ে তাহার জীবনের যবনিকা নামিয়া আসিবে।

হু হু করিয়া দু-চোখে অশ্রু নামিল। যুক্তকরে দেয়াল-বিলম্বিত সুজাতার আলেখ্যের পানে চাহিয়া কোন প্রার্থনার বাণীই সে উচ্চারণ করিতে পারিল না।

প্রাসাদের কোণের ঘর হইতে নদী দেখা যায়। নদীতে জমিদার-বাড়ির সেরা নৌকাখানি সাজানো হইতেছে। ফুল দিয়া, পতাকা দিয়া, রঙীন কাপড় ঘিরিয়া মানসম্ভ্রম-গৌরবের আয়োজনে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া নৌকার সজ্জা হইতেছে। অনুকূল বায়ুতে মৃদু তরঙ্গাঘাতে নৌকা যখন নাচিয়া চলিবে কূলে কূলে বিস্ময়ব্যাকুল দৃষ্টি মেলিয়া কত আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাই না চাহিয়া রহিবে। চোখে মুখে তাহাদের কি সে সম্ভ্রম! কত লোক এই সৌভাগ্যকে হিংসা করিবে, কত লোক বলিবে, কপাল। শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্যের অবগুণ্ঠনে শ্রেষ্ঠতম অভাগ্যের কাহিনী কেহই জানিবে না।

সকলের অনুরোধে মুখে কিছু দিতে হইল, চোখের জলও চাপিয়া রাখিতে হইল।

মেয়ে বাপের বাড়ি যাইবে হাসিমুখে—বাঙালী ঘরে এ-নিয়মের ব্যতিক্রম কোথাও নাই। হাসি না আসিলেও সহজ ভাবেই চাঁপা প্রণাম বা বিদায় সম্ভাষণ শেষ করিল এবং ধীর পদে গিয়া নৌকায় উঠিল। অবনীনাথ নৌকার সন্নিকটে ছিলেন না, চাঁপাও কোন দিকে চাহে নাই। নৌকা ছাড়িতেই সে উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল। তারপর নদীজলের সঙ্গে নয়নজল মিশিলেও সে দুর্ব্বলতার বা অবমাননার সাক্ষী কেহ নাই বলিয়াই চাঁপা তেমনই নিস্পন্দের মত পড়িয়া রহিল।

অবনীনাথের শরীর ভাল ছিল না বলিয়া নামমাত্র আহারে বসিয়া বহুদিন পরে আপনার শয়নকক্ষে আসিয়া দুয়ার বন্ধ করিলেন। শয্যায় শুইয়া সুজাতার আলেখ্যের পানে চাহিয়া মন অনেকটা হাল্কা হইয়া গেল। রাত্রির দুর্ব্বলতা তিনি কঠোর ভাবেই দমন করিয়াছেন। সুজাতাকে ঢাকিতে যে মেঘ ছায়া ও শীতল জলধারা লইয়া দেখা দিয়াছিল, অবনীনাথ ফুৎকারে তাহা উড়াইয়া দিয়াছেন। মনের কোথাও বাসনার বিষবৃক্ষ নাই, আছ কেবল তুমি সুজাতা পরিপূর্ণ দিনের আলোয় সমস্ত অন্তর ব্যাপ্ত করিয়া।

সুজাতার স্মৃতি ধ্যান করিতেই যেন অবনীনাথ চক্ষু মুদিলেন। অমনই সেই হাস্যমুখে বিষাদের রেখা ফুটিল, ভাসন্ত চোখ দুটিতে জলবিন্দু পতনোন্মুখ হইল, মূর্চ্ছাহতের মত সুজাতা ঠায় দাঁড়াইয়া রহিল। সান্ত্বনা দিতে গিয়া অবনীনাথ শিহরিয়া উঠিলেন। এ কার মুখ? এ যে সেবারূপিণী চাঁপা তাঁহারই রূঢ় বাক্যে মর্ম্মে মর্ম্মে মরিয়া গিয়াছে।

সভয়ে তিনি চক্ষু চাহিলেন। না, সুজাতা তেমনই হাসিতেছে। চাঁপা ত রাত্রির দুঃস্বপ্ন, সুজাতার হাসির আলোয় সে কি তিষ্টিতে পারে? কিন্তু ঐ আল্‌নায় খয়ের পাড়ের কাপড় ও ফুলকাটা সেমিজ ঝুলিতেছে, আয়নার ফ্রেমে অল্প একটু চুণ লাগিয়া আছে, আলমারিটায় নূতন বিবাহের যৌতুক থরে থরে সাজানো। এমন কি, জানালার ধারের মেঝেটুকু চাঁপা যেখানে দ্বিপ্রহরে ডাহুকের ডাক শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িত, সেখানটা বেশ চকচকে। এত অল্প দিনে ঘরখানিতে বহু চিহ্নই সে রাখিয়া গিয়াছে। কতক সরাইলে বা মুছিলে দূর হয় কতক বা স্থায়ী।

সেই সঙ্গে বালিকার নেপথ্যের আয়োজন মনে পড়িতেছে। ত্রস্তা হরিণীর মত তাহার দ্রুত পলায়ন অথচ সেবা দিবার সে কি আকুলতা! উঃ—সুজাতা কি নিষ্ঠুর তুমি? বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া দূরেই সরিতেছ? তোমার সুদীর্ঘ আটটি বৎসর এই কুটিল বালিকা অল্প একটি বৎসরে আত্মসাৎ করিয়া ফেলিয়াছে। তুমি আনন্দ দিয়া কত মুহূর্ত্তকে উজ্জ্বল করিয়াছিলে, এ অশ্রুভারনেত্রে বিষণ্ণমুখে সামান্য কয়টি মুহূর্ত্তকে উজ্জ্বলতর করিয়াছে। তোমার

আনন্দের অক্ষয় পরমায়ু ইহার বিষণ্ণ দৃষ্টিতলে নিবিয়া যায় কেন? তোমার প্রতি অগাধ ভালবাসা ইহাকে দেখিয়া সমবেদনার রূপ পরিগ্রহ করিতেছে যে!

দিনে দিনে অবনীনাথ অস্থির হইয়া উঠিলেন। সুজাতার স্মৃতি যত প্রাণপণে আঁকড়াইয়া ধরিতে চান, চাঁপার বেদনা-মলিন মুখের ছায়া ততই সে স্মৃতিমুকুরে উঁকি মারে। রাত্রিতে সুজাতা আসিয়া সেবা করে; কখনও হাসিয়া, কখনও বা অশ্রুমুখী।

কেবলই মনে হয়, বালিকার কি দোষ? একের অপরাধে অন্যকে এ গুরুশাস্তি দিবার কি প্রয়োজনই বা ছিল? পরক্ষণেই ক্রুদ্ধ মন হুঙ্কার দিয়া উঠে, ছিল বই কি! ষড়যন্ত্র করিয়া যাহারা সুজাতাকে কাড়িয়া লইয়াছে তাহারা হাসিমুখে ফিরিবে? না, তাহাদেরও বুকে আগুন জ্বলুক; দাহনের জ্বালা তাহারাও বুঝুক।

আবার তিনি মহাল পরিদর্শনে বাহির হইলেন। এক মাস, দু-মাস, চার মাস গেল। অবনীনাথ ফিরিবার নাম করেন না। যতক্ষণ হট্টগোলে কাটিয়া যায় ততক্ষণ তিনি ভাল থাকেন, সন্ধ্যা হইলেই বুকে কাঁপন লাগে। ঐ বুঝি রাত্রির পক্ষপুটে ভর করিয়া সুজাতা আসিল - পিছনে বিষণ্ণ বধূ চাঁপা। সারারাত্রি, কি জাগ্রতে কি স্বপ্নে, ইহাদেরই অভিযোগ অনুরাগ চলিবে। কাহাকে ভালবাসিয়া স্বর্গ পাইয়াছেন, কাহাকে বিবাহ করিয়া ভুল করিয়াছেন, কাহার হাসিতে বুক ভরিয়া উঠে, কাহার চাপাকান্নায় বা অনুতাপের আগুন জ্বলে; একবার বিবেক, একবার প্রতিশোধস্পৃহা শরতের মেঘ-রৌদ্রের মতই দেখা দেয়। সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তি দিয়াও অবনীনাথ সে বিচারের শেষ করিতে পারেন না।

এমনই করিয়া কয়েক মাস কাটিলে অবনীনাথ অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। মহালে ভাল ডাক্তারই ছিল। কয়েক দিন চিকিৎসার পর তিনি বলিলেন, অসুখ শক্ত, সময় নেবে।

শুনিয়া অবনীনাথ আকুল হইয়া উঠিলেন। নায়েবকে হুকুম দিলেন, যেমন করিয়া হোক আমাকে বাড়ি পৌঁছাইয়া দাও। আর এক দণ্ডও এখানে নহে।

মনে মনে বলিলেন, "শেষ নিঃশ্বাস ফেলিতে হয় সেই ঘরে গিয়াই ফেলিব। যে-ঘরে সুজাতার ছবি হাসিতেছে, যে-বাড়িতে সুজাতার স্মৃতি লক্ষ বাহু বাড়াইয়া সাদর আহ্বান জানাইতেছে।" সেই নদীর ধারে তেমনই একটি অগ্নিজিহ্ব চিতা জ্বলিবে, জলের বুক উজ্জ্বল করিয়া অবনীনাথ ছাই হইয়া যাইবেন।

প্রভুর সেবার জন্য দাসদাসী, আত্মীয়-স্বজন সকলেই তৎপর হইল; অবনীনাথ তৃপ্ত হইলেন না। এ কি সেবা! আহার নিদ্রা এবং সাংসারিক সমস্ত কাজ সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়া যে-যার অবসর মুহূর্তে আসিয়া বসিতেছে। কোথায় ইহার চেয়েও দুরারোগ্য ব্যাধি হইয়া কে কতদিন ভুগিয়া আরোগ্য-লাভ করিয়াছিল, দৈবপ্রাপ্ত ঔষধের মহিমা—সঙ্গে সঙ্গে নিজ নিজ সুখ-দুঃখের কাহিনী। অবনীনাথ উত্যক্ত হইয়া উঠিতেছেন। এই মুখের সহানুভূতি, প্রাণহীন করের যান্ত্রিক সঞ্চালন, অন্তরহীন সরব সান্ত্বনা—কতক্ষণ আর সহ্য করা যায়?

মৌনময়ী রাত্রির অর্দ্ধযামে ধ্যানরতা শুভচারিণী বালা দুটি কোমল করপল্লবে সারাদেহে নীরবে যে অভয় বা সান্ত্বনা দিয়াছে তাহার মূল্য কৃতজ্ঞতা দিয়া নিরূপণ করা চলে না। সেবার সঙ্গে একটি স্নিগ্ধ আবেশ, সারা দেহকে আরাম অবসন্নতায় ভরিয়া সুমধুর নিদ্রার রাজত্বে টানিয়া লইয়া যায়। মৃদু করচালনায় প্রাণের স্পর্শ নিবিড় করিয়াই পাওয়া যায়। যে-জিনিষ সুজাতার ছিল, চাঁপারও আছে; বাহিরের শত অসামঞ্জস্যের মধ্যেও সুজাতা ও চাঁপার কোন প্রভেদই ত নাই। না-ই থাকিল বিদ্যার ঔজ্জ্বল্য, বুদ্ধির দীপ্তি; সর্ব্বক্ষণের সহচরী হইবার যোগ্যতাও হয়ত নাই, তবু সেবার দিক দিয়া হৃদয়বৃত্তিতে সুজাতার চেয়ে চাঁপা কম মহিয়সী নহে। চাঁপা যেন বাংলা দেশের নিরাবরণ প্রকৃতির একটা অংশ। মুক্ত বায়ু, প্রচুর আলো, ও দূর্ব্বাসম্পদভরা শ্যামল মাঠ তাহার নিজস্ব সম্পদ। গ্রীষ্মের প্রভাতে ও অপরাহ্ণে অপূর্ব্ব, বর্ষায় ঘনশ্যামল এবং শীত-শরতের দিকেও মুগ্ধ করিবার সঞ্চয় তাহার প্রচুরতর। বসন্তের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাক, কেন-না, সে শুভদিনের সমারোহ এই শুষ্ক মালকে না-ও আসিতে পারে।

কিন্তু মরিবার পূর্ব্বে এমন অনাত্মীয় শুষ্ক সেবা লইয়া তিনি মরিবেন না। সুজাতার নিকটবর্ত্তী হইয়া তিনি তুচ্ছ পৃথিবীর প্রত্যহের গ্লানি, ক্ষোভ বা ক্রোধের ধূম সঞ্চিত করিয়া মালিন্য আনিবেন না। সমস্ত পৃথিবীর উপর তাঁহার প্রসন্নতা জাগিয়া উঠিতেছে। অনায়াসে, অক্লেশে তিনি

স্বামীকে ক্ষমা করিবেন,—চাঁপার অধিকার ফিরাইয়া দিবেন।

দেওয়ানকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ কি তিথি?

দেওয়ান উত্তর দিল,—ত্রয়োদশী।

অবনীনাথ বলিলেন, নৌকা সাজাও, চন্দনী মহালে যেতে হবে। তোমাদের রাণীজী আসবেন।

আনন্দে দেওয়ান বলিল, এই বিকেলেই নৌকা পাঠাবার ব্যবস্থা করছি।

একটু থামিয়া বলিল, ডাক্তার বাবু আজ ব'লে গেছেন— আপনি ভাল হয়ে উঠবেন।

অবনীনাথ বিমর্ষ হইয়া সুজাতার আলেখ্যের পানে চাহিলেন। তবে কি তিনি রহিয়া গেলেন? নদীর তীরে চিতা জ্বলিবে না? মুক্তির আলোয় সুজাতাকে ফিরিয়া পাইবেন না?

সুজাতা হাসিতেছে। সমস্ত অন্তরের মাধুর্য্য ও সারল্য সে হাসিতে উপচিয়া পড়িতেছে। যেন বলিতেছে, আমি ত মরি নাই; নারী মরে না। ভালবাসিয়া যে তোমার নিকট-বর্ত্তিনী হইয়াছে,—সে আমিই। বাহির লইয়া বিচার করিও না, অন্তরের প্রতি মনোযোগ দিও। দেখিবে নবকলেবরে তোমারই হৃদয়-সহকারে আমি মুঞ্জরিত মাধবীলতা। আমি ছাড়া তোমাকে কে আর তেমন ভালবাসিতে পারে? সুতরাং সমগ্র অন্তর দিয়া যে তোমাকে প্রার্থনা করিতেছে সে আমিই।

অবনীনাথের সংশয় কাটিয়া গেল; আনন্দপরিপূর্ণ দৃষ্টিতে জানালার বাহিরে চাহিলেন।

ত্রয়োদশীর চন্দ্র আকাশে হাসিতেছে। বাঁশঝাড়ের বক্ররেখায় আলোর ফুলকি, ঝোপে ঝোপে আলোর বন্যা। পুকুরের স্নিগ্ধ জল জ্যোৎস্নায় মণির মত চিক্ চিক্ করিয়া জ্বলিতেছে।

তিনি আপন মনে হিসাব করিতে লাগিলেন, কাল নৌকা লোকনাথপুরে পৌছিবে, পরশু চাঁপা আসিবে! সে দিন কি তিথি? কি তিথি?

মৃদু হাসির দীপ্তিতে মুখ ভরিয়া উঠিল। মনে মনে তিনি উচ্চারণ করিলেন,— সেদিন পূর্ণিমা।

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

'অহং' কথার অহঙ্কারে আদিম পিতা
এলেন নেমে বিশ্বে,
ব্রহ্ম থেকে রূপের ঠাকুর নামের মাঝে
প্রকাশ হলেন দৃশ্যে।
নামের মাঝে রূপের দেহ সৃষ্টি করি
অরূপ-রূপানন্দে,
প্রিয়ার মত 'শ্রী'য়ের বাঁধন নামের মালায়
দিলেন গেঁথে ছন্দে।
সুন্দর সে বন্দী নামে, দেহের সীমায়
প্রিয়ার লাগি ব্যস্ত,
আলিঙ্গিয়া 'শ্রী'য়ের দেহ ধরলো তাঁহার
ব্যাকুল দুটি হস্ত।
নরের দেহ নামের গেহ সুন্দরেরি
ছন্দ-ঢালা মূর্ত্তি,
সুন্দরী সে নামের দেহে 'শ্রী'য়ের বেশে
দিলেন হেসে স্ফূর্ত্তি।
অরূপ থেকে রূপের ঠাকুর ব্যাপ্তি-লীলায়
বিশ্বে হয়ে মুক্ত,
কল্যাণীরে আলিঙ্গিতে 'শ্রী'য়ের সাথে
হলেন যে শ্রীযুক্ত।

কষ্টিপাথর

পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

রামমোহন রায়কে সম্যক্‌রূপে বুঝিতে হইলে তাঁহার সমসাময়িক মনীষীবৃন্দের জীবনীও আলোচনা করা প্রয়োজন। রামমোহন রায়ের সহিত শাস্ত্রীয় বিচারে যে-সকল পণ্ডিত প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারাও আমাদের কম শ্রদ্ধার পাত্র নহেন। "ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার" নামে রামমোহন রায়ের একখানি পুস্তক আছে। ঐ পুস্তকের ভট্টাচার্য্যটি আমাদের পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের হিন্দুশাস্ত্রে গভীর জ্ঞান ছিল। এই জন্য তিনি সে যুগে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অর্জন করিয়াছিলেন। কেরী, মার্শম্যান, ওয়ার্ড প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় ইংরেজ পাদ্রীরা তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন।...কলিকাতায় বসবাস আরম্ভ করিবার পর রাজা রামমোহন রায় হিন্দুর প্রতিমা-পূজার বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন সুরু করেন, পুস্তকাদি প্রকাশ করিয়াও ইহার অসারতা প্রমাণ করিতে লাগিলেন। ইহার উত্তরে পণ্ডিতাগ্রগণ্য মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রতিমা-পূজার প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন করিয়া ১৮১৭ সালে "বেদান্ত চন্দ্রিকা" নামে একখানা পুস্তক লেখেন। ইহার আটাশ বৎসর পরে ১৮৪৫, জুলাই সংখ্যার 'ক্যালকাটা রিভিউ' নামক ইংরেজী মাসিকে "What is Vedant ?"—"বেদান্ত কি ?" শীর্ষক একটি দার্শনিক প্রবন্ধ বাহির হয়। এই প্রবন্ধে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ও তাঁহার "বেদান্ত চন্দ্রিকা" সম্বন্ধে নিম্নের প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি লিপিবদ্ধ আছে।...

"বেদান্ত চন্দ্রিকা সম্বন্ধে অল্পই জানা গিয়াছে। সমসাময়িক একজন ভারতীয়ের দর্শন সম্বন্ধে এরূপ নিগূঢ় আলোচনা বড়ই বিস্ময়কর। ১৮১৭ সালে পুস্তকখানি প্রকাশিত হয়। ইহার লেখক পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। তিনি কলিকাতা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। পরে সুপ্রিম কোর্টে স্যর ফ্রান্সিস ম্যাকনটনের অধীনে পণ্ডিতের কার্য্য করেন। তিনি তীর্থ দর্শন করিয়া কাশী হইতে ফিরিবার পথে মুর্শিদাবাদে মারা যান। তিনি ষড়দর্শনে সুপণ্ডিত বলিয়া সর্ব্বত্র আখ্যা পাইয়াছিলেন। তিনি ইংরেজী আদৌ জানিতেন না তবে তাঁহার পুত্রের কথা হইতে বুঝা যায়, স্যর ডবলিউ. এইচ. ম্যাকনটন বেদান্ত চন্দ্রিকার ইংরেজী অনুবাদ করিয়া দিয়াছিলেন। বেদান্ত চন্দ্রিকা মাত্র আড়াই শতখানা ছাপা হয়। এখন ইহা দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। আমরা মাত্র একখণ্ড পাইয়াছি।"

মৃত্যুঞ্জয় মেদিনীপুর-নিবাসী ছিলেন। তাঁহার জন্ম অনুমান ১৭৬২ সালে। সে কালে মেদিনীপুর উড়িষ্যার অন্তর্ভুক্ত ছিল, এ-কারণ কেহ কেহ তাঁহাকে উড়িয়া বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মৃত্যুঞ্জয় উড়িয়া ভাষা খুবই ভাল জানিতেন। খৃষ্টীয় শাস্ত্রগ্রন্থাদি উড়িয়া ভাষায় অনুবাদে তিনি কেরী সাহেবকে বিশেষ সাহায্য করেন। এ-কারণেও হয়ত তাঁহাকে উড়িয়া বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকিবে। বস্তুতঃ মৃত্যুঞ্জয় বাঙ্গালী ছিলেন এবং চট্টোপাধ্যায় বংশসম্ভূত ছিলেন। ১৮৮৯ সালে মৃত্যুঞ্জয় কৃত "রাজাবলি"র একটি সংস্করণ বাহির হয়। ইহার প্রকাশক বেহারীলাল চট্টোপাধ্যায় নিজেকে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের পৌত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

সরকারী কার্য্যোপলক্ষে ইংরেজ সিভিলিয়ানগণকে এ-দেশীয় লোকদের সঙ্গে অহরহঃ মিশিতে হইত। এই জন্য দেশীয় ভাষা শিখিবার প্রয়োজন অনুভূত হইলে বড়লাট লর্ড ওয়েলেসলী ১৮০০ সালে 'কলিকাতা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ' নামে সিভিলিয়ানদের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। সংস্কৃত, আরবি, ফার্সি, বাঙ্গলা, হিন্দুস্থানী ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য অধ্যাপক ও পণ্ডিত (অথবা মুন্সী) নিযুক্ত হইলেন। বাঙ্গলা ও সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক হইলেন কেরী সাহেব (১লা মে, ১৮০১) এবং প্রধান পণ্ডিত হইলেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার: মৃত্যুঞ্জয়ের দুই শত টাকা বেতন ধার্য্য হইল।

কলেজের তত্ত্বাবধানে পণ্ডিতগণ সিভিলিয়ান ছাত্রদের জন্য পুস্তক প্রণয়ন করিতেন। পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ছাত্রদের জন্য এইরূপ চারখানা পুস্তক প্রণয়ন করেন। ইহাদের মধ্যে দুইখানা সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে অনুবাদ, যথা—বত্রিশ সিংহাসন (১৮০২) ও হিতোপদেশ (১৮০৮); অন্য দুইখানি তাঁহার নিজস্ব মৌলিক রচনা, নাম—রাজাবলি (১৮০৮) ও প্রবোধ চন্দ্রিকা (১৮১৩)।...

পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের ভাষা সম্বন্ধে মার্শম্যান সাহেবের মতামত বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'প্রবোধ চন্দ্রিকা' পুস্তকে ছাত্রদের শিক্ষণীয় বিষয় সম্বন্ধে গল্পচ্ছলে নানা উপদেশ আছে। মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যুর পর ১৮৩৩ সালে মার্শম্যান সাহেব 'প্রবোধ চন্দ্রিকা' প্রকাশ করেন। ইহার ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন, "পুস্তকখানি খাঁটি বাঙ্গলা ভাষায় লিখিত, এবং বাঙ্গলা গদ্যের একটি সুন্দর নমুনা"। পুস্তকখানি সম্বন্ধে তিনি আরও বলেন, "যিনি এই পুস্তক পাঠ করিয়া ইহার সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন, তিনি নিজেকে বাঙ্গলা ভাষায় ব্যুৎপন্ন বলিয়া মনে করিতে পারেন।"

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'রাজাবলি' বাঙ্গলা ভাষার একটি বিশিষ্ট সম্পদ। একটি কারণে এই পুস্তকখানির মূল্য যথেষ্ট। বাঙ্গলা ভাষায় ধারাবাহিক ভাবে ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখিবার চেষ্টা এই প্রথম। হিন্দু, মুসলমান ও ব্রিটিশ যুগের প্রাক্‌কাল পর্য্যন্ত আলোচনা রাজাবলিতে আছে।...

মৃত্যুঞ্জয় পরবর্ত্তীকালে কলিকাতা সুপ্রিম কোর্টে পণ্ডিতের কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সুপ্রিম কোর্টে কার্য্য করিবার সময় তিনি জনহিতেও মন দিয়াছিলেন। কলিকাতায় হিন্দু সন্তানদের পাশ্চাত্য ভাষা ও বিজ্ঞানাদি শিক্ষা দিবার জন্য হিন্দুদের মধ্যে আন্দোলন আরম্ভ হয়। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যর এডওয়ার্ড হাইড ঈষ্টের গৃহে ১৮১৬ সালের ১৪ই মে হিন্দু পণ্ডিত ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের একটি সভা আহূত হয়। সভায় ইংরেজী ভাষা ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষা' সম্বন্ধে সাধারণভাবে আলোচনা হয় ও একটি কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব হয়। পরে ২১এ মে তারিখের সভায় প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের হিন্দুকলেজ নামকরণ স্থির হয়। সভায় বিদ্যালয় সংক্রান্ত নিয়মাবলী গঠনের জন্য আট জন ইংরেজ ও কুড়ি জন এদেশীয়দের লইয়া একটি কমিটি গঠিত হইয়াছিল। পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার এই কমিটির একজন সভ্য ছিলেন।...

কেরী সাহেবের সঙ্গে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। মৃত্যুঞ্জয়ের নিকট. কেরী প্রত্যহ দুই তিন ঘণ্টা সংস্কৃত ও বাংলা অধ্যয়ন

করিতেন। জে. সি. মার্শম্যান "History of Scrampur Mission" গ্রন্থে (পৃঃ ১৮০) লিখিয়াছেন —

'উড়িষ্যা-নিবাসী মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। সাহিত্যে তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল। বিখ্যাত অভিধানকার ডক্টর জনসনের ন্যায় মৃত্যুঞ্জয়ের গভীর পাণ্ডিত্য ও প্রখর বিচারবুদ্ধি ত ছিলই, পরন্তু তাঁহার ন্যায় কঠোর আকৃতি ও বিশাল বপুও ইঁহার ছিল। সংস্কৃত সাহিত্যে ইঁহার জ্ঞানের তুলনা নাই। সহজ, সরল ও তেজোব্যঞ্জক বাঙলা রচনায়ও ইঁহাকে কেহ ছাড়াইয়া যাইতে পারেন নাই। কলিকাতায় অবস্থান কালে ইনি প্রত্যহ কেরীকে দু-তিন ঘণ্টা পড়াইতেন। কেরী যে বিশুদ্ধ বাঙলায় পুস্তক লিখিতে পারিয়াছেন, তাহাও মৃত্যুঞ্জয়ের নিকট তাঁহার অধ্যয়নেরই ফল।

পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ১৮১৯ সালের মাঝামাঝি মুর্শিদাবাদে পরলোকগমন করেন।

দেশ, ২৯শে পৌষ, ১৩৪০]

—

আকবরের ধর্ম্মমত

আবদুল মওদুদ

আকবরের ধর্ম্মমত নির্দ্ধারণ করা এক জটিল সমস্যা।...একাধিক বার আকবরের ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। প্রথম বয়সে তিনি দৃঢ়বিশ্বাসী সুন্নী মুসলমান ছিলেন এবং শীয়া ও অমুসলমানদিগকে অতিশয় ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন (১৫৭৬ খৃঃ পর্য্যন্ত)। অতঃপর যুক্তিবাদী মুসলমানরূপে তিনি এসলাম ধর্ম্মে সন্দিগ্ধ-চিত্ত হন (১৫৭৬—৮২)। সর্ব্বশেষে শরিয়ত-সম্মত এসলাম ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তিনি বিভিন্ন ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব নির্ব্বাচনপূর্ব্বক এক নূতনধর্ম্ম প্রচার করেন ও নিজেকে ইহার প্রবর্ত্তকরূপে প্রকাশ করেন (১৫৮২—১৬০৫)।

প্রথম বয়সে আকবর মাতা হামিদাবানু বেগম, ধাত্রীমাতা মাহম্ অনাগ ও পিতৃষসা গুলবদন বেগমের প্রভাবে চালিত হইতেন এবং তাঁহাদের আদর্শ ও উপদেশে মুগ্ধ হইয়া প্রকৃত সুন্নীবাদসম্মত নিয়মানুসারে এস্লাম্ ধর্ম্ম অনুশীলন করিতেন। তিনি দিল্লী, আজমীর ও ভারতের অন্যান্য স্থানের মুসলমান সাধকগণের সমাধিক্ষেত্রে ভক্তিভরে জেয়ারৎ করিতে যাইতেন। তিনি সেলিম চিশ্‌তি ও খাজা মইনুদ্দীন্ চিশ্‌তির একজন প্রধান ভক্ত ছিলেন। মাতা ও অন্যান্য গুরুজনদের মক্কায় হজ্জব্রত পালন করিবার জন্য তিনি বিশেষ ব্যবস্থা করেন। তিনি আদেশ প্রচার করেন—যে-কেহ হজ্ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে রাজকোষ হইতে তাহার সমস্ত ব্যয় বহন করা হইবে। বহু ব্যক্তি এই সুযোগ গ্রহণ করিয়াছিল।...

১৫৭৬ খৃষ্টাব্দের পর হইতে আকবর ধর্ম্ম সম্বন্ধে সংশয়ী হইয়া ওঠেন। এই সময় হইতে ধর্ম্মালোচনায় তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত থাকিতেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার সংশয় বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। বাদাউনী বলেন—তিনি অতি প্রত্যূষে প্রায়ই নির্জ্জন স্থানে একাকী জীবনের অনন্ত রহস্য-চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন। সমসাময়িক লেখক নূরুল হক্ বলিয়াছেন—সত্য অনুসন্ধান করিতে তাঁহার হৃদয়ে দীপ্ত পিপাসা জাগিয়া উঠিয়াছিল। সেই চিরপুরাতন, চিরনূতন বাণী—"সত্য কি ও কোথায় আছে"—তাঁহার চিরচঞ্চল, যুক্তিবাদী ভাবপ্রবণ চিত্তকে অস্থির করিয়া তুলিত। তিনি কোন মীমাংসা করিতে পারিতেন না। মানুষের জন্মগত, ধর্ম্মগত বৈষম্য দেখিয়া তিনি গভীর বেদনা অনুভব করিতেন। সাম্য-মৈত্রী-প্রীতির মূর্ত্ত প্রতীক এস্লাম্-ধর্ম্মেও সুন্নী, শীয়া প্রভৃতি বিভাগ ও পরস্পরের মধ্যে তীব্র কলহ দেখিয়া [illegible]

[illegible] তাঁহার অসহ্য বোধ হইত। তিনি এই জাতিগত ও ধর্ম্মগত বৈষম্য কলহ, বিবাদ উচ্ছেদ করিয়া সকলের মধ্যে ঐক্যসাধনের উচ্চ আশা পোষণ করিতেন। এইজন্য তিনি বিভিন্ন ধর্ম্মের মূল-মন্ত্রগুলি সংগ্রহ করিবার জন্য গূঢ় ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনায় লিপ্ত থাকিতেন। ফলে তাঁহার ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তিত হওয়ায় সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়রূপে তিনি এক নূতন ধর্ম্মমত প্রচার করেন।

আকবরের ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তিত হইবার সমূহ কারণও ছিল। তিনি স্বীয় বাহুবলে ভারতে এক বিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রকাণ্ড সাম্রাজ্যে নানা ধর্ম্মাবলম্বী বিভিন্ন জাতি বাস করিত। তিনি তাহাদের প্রতি উদারনীতি অনুসরণ না করিলে তাঁহার সাম্রাজ্যের ভিত্তি দৃঢ় ও স্থায়ী হইত না। তিনি বহু হিন্দুরমণীর পাণিগ্রহণ করেন। তাহাদের সাহচর্য্য ও প্রভাব আকবরের ধর্ম্মমত ও জীবনযাত্রায় বহু পরিবর্ত্তন আনয়ন করে। সর্ব্বশেষে, শেখ মোবারক তাঁর বিশ্ববিখ্যাত পুত্রদ্বয় আবুল ফজল ও ফৈজীসহ তাঁহার দরবারে উপস্থিত হইলে তাঁহার ধর্ম্ম-তত্ত্ব আলোচনায় ও ধর্ম্মবিষয়ে উদারতার পূর্ণবিকাশ আরম্ভ হয়। তাঁহারা সুফীমতবাদী ছিলেন এবং ধর্ম্মের সত্য ও নিগূঢ় তত্ত্ব অনুসন্ধান করিবার আকাঙ্ক্ষা হইতেই এসলামে নানা শাখা উদ্ভব হইবার ধারণা পোষণ করিতেন। তাঁহারা ধর্ম্মের বাহ্য অনুষ্ঠান অপেক্ষা উহার আধ্যাত্মিক তত্ত্ব গ্রহণ করাই প্রকৃত ধর্ম্মপিপাসুর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলিয়া মনে করিতেন। আকবর সুফী-মত পছন্দ করিতেন; সেইজন্য মোবারক ও তাঁহার পুত্রগণের যুক্তি ও মত তিনি আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিলেন। দিল্লীর তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ সুফী-মতবাদী শেখ তাজউদ্দীনও আকবরের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেন। ফলে, আকবর শরিয়ৎসম্মত এসলাম ধর্ম্মমত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন।

কালক্রমে আকবরের ধর্ম্মপিপাসা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তাঁহার সত্যানুসন্ধান-প্রবৃত্তিও জাগরিত হইল। তিনি এবাদৎখানা নির্ম্মাণ করিয়া তথায় ধর্ম্মবেত্তাগণের মুখে ধর্ম্মের দুর্ব্বোধ্য রহস্যগুলির বিস্তৃত ও অভ্রান্ত আলোচনা শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক হইলেন। আকবর ফতেপুর সিক্রিতে বিভিন্ন ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মবেত্তাদিগের সম্মেলন করিবার জন্য তাঁহার ইতিহাসপ্রসিদ্ধ এবাদৎখানা নির্ম্মাণ করাইলেন (১৫৮২ খৃঃ)

প্রথমতঃ এবাদৎখানায় কেবলমাত্র মুসলমান ধর্ম্মবিদ্‌গণকে আহ্বান করা হইত। আকবর তাঁহাদিগকে (ক) শেখ্, (খ) সৈয়দ, (গ) আলেম্ সম্প্রদায় ও (ঘ) আমীরগণ এই চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া উপযুক্ত সম্মানার্হ আসন প্রদান করিয়া স্বয়ং সভাপতির আসন গ্রহণ করিতেন। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই ইহার অধিবেশন হইত। প্রায় পরদিন দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত তথায় আলোচনা চলিত।...এবাদৎখানার তর্ক ও আলোচনা তীব্রভাবে চলিত এবং ভিন্ন ভিন্ন মতবাদিগণ পরস্পরকে যুক্তি-তর্কে পরাস্ত করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন। অনেক সময় তাঁহারা ধৈর্য্যহীন ও অস্থিরমতি হইয়া অসংযত ভাষা ব্যবহার করিতেন। শেখ মখদুম্-উল্-মুল্ক ও শেখ আবদুল্-নবী সুন্নীদলের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিতেন এবং স্বাধীনমতবাদিগণ শেখ মোবারক্ ও তাঁহার বিখ্যাত পুত্রদ্বয়ের দ্বারা চালিত হইতেন। তাঁহাদের কূট আলোচনা সম্বন্ধে বাদাউনী বলিয়াছেন,—"(এবাদৎখানায়) জ্ঞানিগণ মতানৈক্যের যুদ্ধক্ষেত্রে জিহ্বার দ্বারা ভীষণ যুদ্ধ করিতেন এবং বিভিন্ন মজহাবের (সম্প্রদায়ের) শত্রুতা এতদূর বর্দ্ধিত হইত যে পরস্পর পরস্পরকে মূর্খ বলিয়া উপহাস করিতেন।"

অনন্তর আকবর অন্যান্য ধর্ম্মের প্রচারকগণকে এবাদৎখানায় আহ্বান করেন। তথায় হিন্দু পাত্রগণ স্বীয় ধর্ম্মের মূলমন্ত্রগুলি তাঁহাকে শ্রবণ করাইতেন। বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ ও ব্রাহ্মণগণ তাঁহার সহিত বিশদভাবে

হিন্দুধর্ম্ম আলোচনা করিতেন। তন্মধ্যে পুরুষোত্তম ও দেবী উল্লেখযোগ্য। দেবী তাঁহাকে হিন্দুধর্ম্মের আদিরহস্য, পুরাণাদি, মূর্ত্তিপূজার মূলকারণ, সূর্য্য ও অন্যান্য তেত্রিশ কোটী দেবতা এবং প্রধানতঃ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, শ্রীকৃষ্ণ ও মহামায়ার উপাসনার কারণ ও পদ্ধতির কথা অবগত করান। জৈনধর্ম্মের উপদেষ্টাগণও তথায় উপযুক্ত সম্মানে আহূত হইয়া নিজ ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতেন। তন্মধ্যে হরিবিজয় সুরী, বিজয়সেন সুরী, ভানুচন্দ্র উপাধ্যায় ও জীনচন্দ্র আকবরের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেন। ১৫৭৮ খৃঃ হইতে একজন জৈন ধর্ম্মবিৎ তাঁহার দরবারে সতত উপস্থিত থাকিতেন। কথিত আছে, জীনচন্দ্র তাঁহাকে জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। কিন্তু যেস্থট ধর্ম্মযাজকগণের তাঁহাকে খৃষ্টমতাবলম্বী করিবার অলীক প্রচারের ন্যায় ইহাও সর্ব্বৈব মিথ্যা। হরিবিজয় পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীগুলিকে মুক্ত করিতে ও নির্দ্দিষ্ট দিবসে প্রাণিহত্যা বন্ধ করিতে তাঁহাকে উপদেশ দেন (১৫৮২ খৃঃ)। তিনি নিজ ধর্ম্মাবলম্বীদিগের জন্য বহু সুবিধা প্রাপ্ত হন। আকবরের মাংসাহারে অনিচ্ছা ও প্রাণীহত্যার বিরুদ্ধে আদেশপ্রচার তাঁহাদেরই প্রভাবপ্রসূত। অগ্নিপূজক পারসী বা জোরোস্তার ধর্ম্মাবলম্বিগণও তাঁহার নিকট সমভাবে আদৃত হন এবং তাঁহারা এবাদৎখানায় নিজ ধর্ম্মমত ব্যাখ্যা করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। বাদাউনী বলেন—আকবর তাঁহাদের দ্বারা এতদূর আকৃষ্ট হন যে তিনি তাঁহাদের নিকট প্রাচীন পারসী ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বহু সংজ্ঞা ও নিয়মাদি শিক্ষা করেন এবং আবুল ফজলকে আদেশ করেন যে, যেন তাঁহাদের নিয়মানুরূপ দরবার-দিবসে সর্ব্বক্ষণ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত রাখিবার সুব্যবস্থা করা হয়। দস্তুর মেহেরজি রানা তাঁহাকে জোরোস্তার মত ভালরূপে অবগত করান এবং সম্মানস্বরূপ দুই শত বিঘা জমি জায়গীররূপে প্রাপ্ত হন। আকবর সূর্য্যকে বৃক্ষাদি সজীব পদার্থের জীবনতুল্য ও সর্ব্বঅগ্নির মূল স্বরূপে পূজা করিতে আরম্ভ করেন। এ সম্বন্ধে বীরবল তাঁহাকে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন।

সেই সময়ে গোয়ায় পর্ত্তুগীজগণ উপনিবেশ স্থাপনপূর্ব্বক খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। আকবর খৃষ্টধর্ম্ম অবগত হইতে আগ্রহান্বিত হইয়া যেস্থট ধর্ম্মযাজকগণকে সসম্মানে আহ্বান করেন। কিন্তু তাঁহারা অত্যন্ত কলহপ্রিয় ছিলেন এবং কোরান্ ও হজরত মুহম্মদের নামে এরূপ অশ্রাব্য ও অকথ্য ভাষা প্রয়োগ করিতেন যে, এক সময় ফাদার রডলেকের জীবনসংশয় ঘটিয়াছিল। ফাদার্ একুয়াভিভা ও ফাদার্ মনসারেট খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারকদের অধিনায়ক ছিলেন। ডাক্তার স্মিথ্ নিজ 'আকবর-চরিতে' গর্ব্বের সহিত উল্লেখ করিয়াছেন যে, তাঁহাদের শিক্ষাই আকবরকে এস্লামধর্ম্ম ত্যাগ করাইয়াছিল এবং এবাদৎখানায় তাঁহাদের ধর্ম্মালোচনা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল ইহা সর্ব্বৈব ভিত্তিহীন ও ভ্রমাত্মক। আকবর তাঁহাদের গোঁড়ামীতে উত্যক্ত হন এবং অসংযত উক্তির জন্য ক্ষিপ্ত সুন্নীসম্প্রদায়ের কোপ হইতে অতিকষ্টে তাঁহাদিগকে রক্ষা করেন।...তিনি শিখগুরুদিগকেও অত্যন্ত ভক্তি করিতেন এবং একবার এক শিখগুরুর অনুরোধে পঞ্জাবের প্রজাগণের এক বৎসরের কর মাপ করিয়া দেন। তিনি শিখ ধর্ম্মপুস্তক "গ্রন্থসাহেব"কে "অশেষ সম্মানের গ্রন্থ" বলিয়া সম্মান করিতেন।

এবাদৎখানায় ধর্ম্মালোচনা আকবরের মনে ও ধর্ম্মবিশ্বাসে বিশেষ প্রভাববিস্তার করিল। তাঁহার ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি আলেম সম্প্রদায়ের অপূর্ব্ব ক্ষমতাপ্রকাশে অত্যন্ত বিরূপ হইলেন এবং তাঁহাদের প্রতিপত্তি হ্রাস করিতে মনস্থ করিলেন। তজ্জন্য স্বয়ং রাজ্যের সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতার সহিত শ্রেষ্ঠ এমামের (ধর্ম্মোপদেষ্টা) স্থান গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিলেন। আকবরের এ কল্পনা মোসলেম জগতে নূতন নহে। তাঁহার পূর্ব্বে আরবে খলিফাদের যুগে দেশশাসক ও ধর্ম্মযাজক একই ব্যক্তি ছিলেন। হজরত আবুবকর, হজরত ওমর ফারুক, হজরত ওসমান ও হজরত আলী প্রভৃতি প্রত্যেক খলিফাই শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন এবং এমামরূপে নামাজাদিও পরিচালনা করিতেন।

আকবর তাঁহাদেরই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া এমামতি করিয়া ফতেপুর সিক্রির মসজিদে খোৎবা পাঠ করিলেন। তাঁহার বিখ্যাত সভাকবি আবুল ফয়েজ ফৈজী আরবী ভাষায় খোৎবা রচনা করিয়া দেন। খোৎবার শেষ অংশ এইরূপ ছিল—

"তাঁহারই নাম লইয়া আরম্ভ করিতেছি—যিনি আমাদিগকে সাম্রাজ্য দান করিয়াছেন যিনি আমাদিগের অন্তরে জ্ঞান ও বাহুতে শক্তি দান করিয়াছেন. যিনি আমাদিগকে ন্যায়পরায়ণতা ও সাধুতার সহিত চালিত করেন। তাঁহার মহিমা গৌরবান্বিত হউক—আল্লাহো আকবর!"

অনন্তর তিনি সাম্রাজ্যের শাসনভার ও ধর্ম্মবিষয়ের একমাত্র নিয়ন্তারূপে আপনাকে ঘোষণা করিতে মনস্থ করিলেন। এতদ্বারা তিনি নিজেকে এমাম আদেল্ অর্থাৎ ন্যায়পথপ্রদর্শকরূপে প্রচার করিয়া মোজ্‌তাহেদদেরও উচ্চাসন গ্রহণ করিলেন। অতঃপর ধর্ম্মবিষয়ে মতবৈষম্যস্থলে তাঁহারই মত অভ্রান্ত ও বাধ্যকরীরূপে গৃহীত হইবে। কেহই শাসনকার্য্যে অথবা ধর্ম্মকর্ম্মে তাঁহার আদেশ অবহেলা করিতে পারিবে না।...

যাহা হউক, ইহাতেও আকবরের সত্যানুসন্ধানী চিত্ত শান্ত হইল না। তিনি সেই চিরপুরাতন চিররহস্যময় বাণীর "সত্য কি ও কোথায়"—কোন মীমাংসা পাইলেন না। দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন মতবাদী অগণিত প্রজাগণকে কোন অচ্ছেদ্য মিলনে বন্ধন করিবার তাঁহার উচ্চতম আদর্শ সফল হইল না। অনন্তর তিনি বহু গবেষণা ও চিন্তার পর তাঁহার বিখ্যাত "দীন এলাহী" মত প্রচার করেন। এই ধর্ম্মমতবাদেই তিনি সমগ্র প্রজাকুলকে এক বন্ধনে বন্ধন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। আবুল-ফজল ও ফৈজী স্ব স্ব পুস্তকে 'দীন এলাহী'র নিয়ম ও পালন-শর্ত্ত সম্বন্ধে বিশদ বর্ণনা প্রচার করিয়াছেন। দীন-এলাহি-মতবাদিগণকে পরস্পর "আল্লাহো-আকবর"ও "জল্লা-জালালুহু" উচ্চারণ করিয়া সম্ভাষণ করিতে হইত। আকবরকে ইহার প্রবর্ত্তকরূপে সম্মান করিতে হইত এবং তাঁহার জন্য জীবন, সম্পদ, সম্মান ও ধর্ম্ম (দীন) ত্যাগ করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইত। দয়াদাক্ষিণ্য প্রকাশ করা, জন্মোৎসব পালন করা, মাংসাহার ত্যাগ করা, প্রাণিহত্যাকারিগণের সহিত আহার ত্যাগ করা প্রভৃতি দীন-এলাহী মতবাদীদের অবশ্যকর্ত্তব্য ছিল।

আকবর নূতন মতবাদ প্রকাশ করিলেন বটে, কিন্তু তিনি প্রচারকের স্থান গ্রহণ করেন নাই। তিনি স্বয়ং প্রেরিত পুরুষ নবী বা প্রচারকর্ত্তারূপে কোন দাবিও করেন নাই। তাঁহার প্রধান অভিমত ছিল যে, যাহার ইচ্ছা তাঁহার মতবাদে আকৃষ্ট হইবে, সেই উহা গ্রহণ করিবে। তিনি এতদ্বারা সাধারণের বিবেক, বুদ্ধি ও চিত্ত আকর্ষণ করিতে চাহিয়াছিলেন—লোভ ও ভয়ের দ্বারা তাঁহাদিগকে আকৃষ্ট বা বাধ্য করা তাঁহার অভিপ্রায় ছিল না। বাদাউনী বলেন—রাজা ভগবান দাস ও রাজা মানসিংহ উহা গ্রহণ করিতে অসম্মত হইলে আকবর তাঁহাদিগকে দ্বিতীয় বার অনুরোধও করেন নাই। উপরন্তু, অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই তাঁহার ধর্ম্মমত গ্রহণ করিয়াছিল। যদি 'দীন-এলাহী' মতবাদীর সংখ্যাবৃদ্ধি করাই আকবরের প্রধান উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে তাঁহার করায়ত্ত অসীম ক্ষমতা ও অতুল সম্পদের দ্বারা তিনি তাহাও সম্ভব করিতে পারিতেন।

মোহাম্মদী, মাঘ, ১৩৪০]

অর্থনীতি ও পুনর্গঠন

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

সমগ্র ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অবস্থার যে শোচনীয় পরিণতি ঘটিয়াছে, তাহা যে আর উপেক্ষা করা যায় না, তাহা ভারত-সরকার এবং প্রাদেশিক সরকারসমূহও বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতেছেন। বাংলার গভর্ণর এ-দেশে আগমন হইতেই আর্থিক দুরবস্থার সহিত সন্ত্রাসবাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের বিষয় উল্লেখ করিয়া আসিয়াছেন এবং কিরূপে দেশের লোকের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধন করা যায়, তাহার উপায়চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। প্রথমে তিনি সন্ত্রাসবাদের অন্যতম কারণ বলিয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বেকার-সমস্যার দিকে অধিক মনোযোগ দিয়াছিলেন এবং স্বল্পব্যয়সাধ্য শিল্পপ্রতিষ্ঠার দ্বারা সেই সমস্যার আংশিক সমাধানের চেষ্টায় সাহায্য করিয়াছেন। সে দিকে কতটুকু ফল হইয়াছে, তাহা পাঠকগণ অবগত আছেন। সে চেষ্টা যত প্রশংসনীয়ই কেন হউক না, তাহাতে বাংলার আর্থিক দুর্গতি দূর হইতে পারে না। কারণ, মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের লোক সংখ্যায় অল্প। নানাকারণে—সরকারের ও দেশের লোকের উপেক্ষায় ও অবজ্ঞায়ও বটে—বাংলার বিশাল কৃষক সম্প্রদায় সর্বনাশের কূলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তাহারা অপূর্ণ আহারে থাকিতে বাধ্য হয়—অজন্মা হইলে বা কৃষিজ পণ্যের মূল্য হ্রাস হইলে অনাহারে দিনযাপন করে। যাহারা এইরূপ দুর্দশায় দিনযাপন করে, তাহাদিগের স্বাস্থ্য ও শক্তি উভয়ই ক্ষুণ্ণ হয় এবং মনীষার স্ফুরণ হইতে পারে না। আর যে জাতির শতকরা সত্তর-পঁচাত্তর জন লোক এইরূপ দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত, সে জাতির উন্নতির উপায় কি? যখন লোকের অবস্থা এইরূপ হয়, তখন সমাজে বিষম বিপ্লবের সম্ভাবনা সর্বদাই শঙ্কার সঞ্চার করে। ইহা বুঝিয়াই বাংলার গভর্ণর স্যর জন এণ্ডার্সন বলিয়াছেন—সর্বাগ্রে কৃষির ও কৃষকের উন্নতি-সাধন করিতে হইবে। ঋণভারপীড়িত কৃষকের ঋণভার যথাসম্ভব লঘু ও বহনযোগ্য করিতে হইবে এবং যাহাতে সে তাহা বহন করিতে পারে, তাহার উপায় বিধান করিতে হইবে। তিনি এই মত প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার আর্থিক অবস্থার অনুসন্ধান জন্য এক সমিতি গঠনের জন্য এক প্রস্তাব করিয়াছেন সে সমিতি—(১) স্থানীয় সরকার যে-সব অর্থনৈতিক ব্যাপারের অনুসন্ধান করিতে পারিবেন, সে-সকল সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবেন এবং (২) সরকারের সম্মতি লইয়া অন্যান্য বিষয়েও অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন।

ভারত-সরকার ব্যাপকরূপে এই কাজ করিবার জন্য ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহারা বিলাত হইতে দুইজন বিশেষজ্ঞ আনিয়া তাঁহাদিগের সহিত তিনজন ভারতীয়কে একযোগে নিম্নলিখিত বিষয়ে নিযুক্ত করিয়াছেন :-

(১) যে উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে নির্ভর করিয়া দেশের বর্তমান আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান;

(২) ভারতবর্ষে অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ ও তাহা লিপিবদ্ধ করিবার সম্বন্ধে মত প্রকাশ;

(৩) দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে সব সংবাদ সংগ্রহ।

কলিকাতায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বড়লাট লর্ড উইলিংডন এই কার্য্যের গুরুত্ব স্বীকার করিয়া বলিয়াছিলেন, অর্থের অভাবে পূর্ব্বেই ইহাতে হস্তক্ষেপ করা সম্ভব হয় নাই। অথচ যে-সব বিভাগে ব্যয়সঙ্কোচ করিবার জন্য এদেশের লোকমত বহুদিন হইতে বলিয়া আসিয়াছে, সে-সব বিভাগে যে আশানুরূপ ব্যয়সঙ্কোচ হয় নাই, ইহা অস্বীকার করা যায় না। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার সম্যক্ উপলব্ধি ব্যতীত এবং আবশ্যক সংবাদের অভাবে যে কখন দেশের আর্থিক উন্নতিসাধন নিয়মিত ও পদ্ধতিবদ্ধভাবে হইতে পারে না, তাহা বলাই বাহুল্য। সেই জন্যই বিলাতেও এইরূপ অনুসন্ধান হইয়া গিয়াছে এবং রুশিয়া তাহার পর পাঁচ বৎসরে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা পুনর্গঠিত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে।

সে যাহাই হউক, এত দিনে যে ভারত-সরকার ও বাংলা-সরকার এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইহা আমরা আশার বিষয় বলিয়া বিবেচনা করি। আবশ্যক সংবাদ

সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে গঠনের কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া প্রয়োজন। কারণ, ব্যাধির বিস্তার যখন একটি সীমা লঙ্ঘন করে, তখন আর ভেষজ-প্রয়োগে কোন ফল হয় না।

সোভিয়েট রুশিয়া যে উপায় অবলম্বন করিয়াছে, আজও তাহার পরীক্ষা শেষ হয় নাই বটে, কিন্তু তাহার যে ফল ইতোমধ্যে ফলিয়াছে, তাহা বিবেচনা করিলে আমাদিগের পক্ষে কার্য্যের সুবিধা হইতে পারে। এ বিষয়ে আর সন্দেহ নাই যে, দেশকে অর্থনৈতিক হিসাবে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। যে স্থানে সম্ভব পুরাতনের ভিত্তির উপর নূতন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে; যে স্থানে তাহা সম্ভব নহে, তথায় ভিত্তি হইতে নূতন করিয়া গঠন আরম্ভ করিতে হইবে। কারণ, শত শত বৎসরের অবজ্ঞায় ও উপেক্ষায় ভারতবর্ষে উন্নতি স্তম্ভিত রহিয়া গিয়াছে, এবং পৃথিবীর আর সব সভ্য দেশ দ্রুত অগ্রসর হইয়াছে।

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। এরূপ দেশের প্রধান অবলম্বন কৃষিতে উন্নতর ফলে দেশের লোকের অবস্থার কিরূপ উন্নতি সাধিত হইতে পারে, তাহা ডেনমার্কে ও আয়ার্লণ্ডে দেখা গিয়াছে। ডেনমার্কে সরকারের সাহায্যে ও আয়ার্লণ্ডে সরকারের সাহায্য গ্রহণ না করিয়া দেশের লোকের অবস্থার উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

আয়ার্লণ্ডে যাঁহারা সরকারের সাহায্য গ্রহণ না করিয়া পুনর্গঠনের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারাও সরকারের সাহায্যের প্রয়োজন স্বীকার করিয়াছিলেন। বিস্তৃতভাবে গঠনপদ্ধতি স্থির করিলে তদনুসারে কাজ করিবার জন্য সরকারী সাহায্য কিরূপ প্রয়োজন হয়, তাহা বলাই বাহুল্য। সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজন অর্থের। সে জন্য সরকারের নূতন ভাবে নোট প্রচারের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন হইতে পারে—কেবল ঋণের উপর নির্ভর করিলেও হয়ত হইবে না। মজুত স্বর্ণ ও রৌপ্যের অনুপাতে নোটের প্রচলন অধিক করিয়া সমগ্র দেশে বিদ্যুতের শক্তি শিল্পের জন্য প্রযুক্ত করিবার ব্যবস্থা করা যায়; কলকারখানাকে সাহায্য করা যায়—ইত্যাদি।

কেবল যদি কৃষির কথাই ধরা যায়, তাহাতেও অনেক অর্থের প্রয়োজন। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে বিলাতে কৃষির উন্নতি সাধনোপায় আলোচনার জন্য যে সভা হয়, তাহাতে স্থির হয়, কৃষির উন্নতি প্রধানতঃ তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে:—

(১) সরকারের নেতৃত্বে কৃষিকার্য্যে বিজ্ঞানসম্মত উপায় অবলম্বন;

(২) কৃষকদিগের সমবায়-নীতিতে সঙ্ঘ গঠন;

(৩) পল্লীগ্রামের সুগঠন—যাহাতে শহরের ও পল্লীগ্রামের আকর্ষণে বিশেষ তারতম্য না হয় সে ব্যবস্থা করা।

এসব কাজও ব্যয়সাপেক্ষ। কেবল তাহাই নহে—সর্ব্বাগ্রে কৃষককে ঋণভারপিষ্ট অবস্থা হইতে অব্যাহতি দিতে হইবে। তাহার পর সে যাহাতে তাহার কাজের জন্য সুবিধায় আবশ্যক অর্থলাভ করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যাঁহারা বাংলার কৃষকদিগের ঋণের পরিমাণ জানেন, তাঁহারাই এই কার্য্যের বিরাটত্বে অভিভূত হইবেন। তাঁহারাই স্বীকার করিবেন, সরকারের সাহায্য ব্যতীত এ কাজ সম্পন্ন হইতে পারে না। জমী-বন্দকী ব্যাঙ্ক ও সমবায়-ঋণদান সমিতি উভয়েরই মূলধন প্রয়োজন। সেই মূলধন সংগ্রহ করিতে হইলে সরকারের জামীন হওয়া প্রয়োজন হইবে। জার্ম্মানীতে তাহাই হইয়াছে। রুশিয়া বিপ্লবের দ্বারা—রক্তে পূর্ব্বের ইতিহাস প্রক্ষালিত করিয়াছে। সে পথ আমরা গ্রহণ করিতে চাহি না। কাজেই ধীর ভাবে আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। তাহাতে, বোধ হয়, উন্নতির ভিত্তিও অধিক দৃঢ় হইবে।

এ দেশের অবস্থা বিবেচনা করিয়া তাহার উপযোগী ব্যবস্থা করিতে হইবে। যে স্থানে পুরাতন পদ্ধতির সংস্কার করিলেই তাহাকে কার্য্যোপযোগী করা যায়, সে স্থানে তাহাই করিতে হইবে; আর যে স্থানে তাহাতেও কার্য্য সিদ্ধির আশা নাই, সে স্থানে পুরাতনকে বর্জ্জন করিয়া নূতনের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। বিলাতের লোক স্বভাবতঃ রক্ষণশীল; তাহারা যে স্থানে পারিয়াছে, পুরাতন পদ্ধতির সংস্কার সাধন করিয়া লইয়াছে। মিষ্টার ডরম্যান বলেন, তাহাতেই ইংরাজের প্রথার শক্তি ও পারম্পর্য্য রক্ষিত হইয়াছে:—

"The fundamental idea of the English has always been that old methods are better than new ones, and that old institutions ought to be improved, if possible, but not abolished, and in this lies the strength and continuity of our system."

কোন্ পদ্ধতি এ দেশের অধিক উপযোগী ? সরকারের সাহায্য ব্যতীত, সরকার অগ্রণী না হইলে আমূল পরিবর্ত্তন সম্ভব হয় না। কিন্তু দেশের জনমত অনায়াসে প্রচলিত পদ্ধতিতে আবশ্যক পরিবর্ত্তন, পরিবর্জ্জন বা পরিবর্দ্ধন করিতে পারে। সে জন্য দেশের শিক্ষিত লোকের একাগ্র চেষ্টা প্রয়োজন।

যতদিন কৃষিই আমাদিগের একমাত্র অবলম্বন থাকিবে ততদিন পল্লীগ্রামের সংস্কার ও জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার উন্নতিসাধন দুষ্কর হইয়াই থাকিবে। কিন্তু কৃষির সঙ্গে সঙ্গে যদি স্বল্পব্যয়সাধ্য শিল্প প্রতিষ্ঠিত করা যায়, তবে কাজ অনেকটা সহজসাধ্য হইয়া আসিবে। এ দেশের শহর পূর্ব্বে শিল্পের কেন্দ্র ছিল। আজ সে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখন নানা নূতন যন্ত্রের সাহায্যে পণ্যোৎপাদনের উপায়ও নূতন নূতন হইয়াছে। যদি সরকার শতাব্দীব্যাপী উপেক্ষা ও অবজ্ঞা বর্জ্জন করিয়া সত্য সত্যই দেশের আর্থিক অবস্থা নূতন করিয়া গঠন করিতে আগ্রহশীল হন, তবে পল্লীগ্রামে শিল্পপ্রতিষ্ঠা সহজই হইবে। বিদ্যুতের শক্তি পল্লীগ্রামে সহজলভ্য করিলে ও পণ্য বিক্রয়ের সুব্যবস্থা হইলে অনেক শিল্প আবার পল্লীগ্রামে ফিরিয়া যাইবে। সম্প্রতি বাংলা সরকারের শিল্পবিভাগ কতকগুলি শিল্পে পণ্যোৎপাদনের উন্নত উপায় আবিষ্কার করিয়া মফঃস্বলে যাযাবর শিক্ষক দলের গঠন দ্বারা সেই সব শিক্ষা প্রদানের যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা পাঠকগণ অবগত আছেন। দেশের লোক আগ্রহ সহকারে সেই সব উপায় শিক্ষা করিতেছে। যাহারা শিক্ষিত হইতেছে, তাহারা শিক্ষা কার্য্যে প্রযুক্ত করিতেছে। ইহা যে সুলক্ষণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। কেহ কেহ বলিবেন, এ দেশের ভদ্র সম্প্রদায়ের যুবকরা কায়িক শ্রমবিমুখ। সে কথা সত্য কি না, তাহার বিচারে প্রবৃত্ত না হইয়া অনায়াসে বলা যায়, যদি পূর্ব্বে ইহা সত্যই থাকিয়া থাকে, তবে আজ আর নাই। গত আদমসুমারির যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলেই জানিতে পারা যায়, ভদ্র-সম্প্রদায়ের যুবকরা আজকাল কায়িক শ্রমসাধ্য কার্য্যে বিরত নহে। যে "খাটে খাটায়" সে যে কাজে অধিক সাফল্য লাভ করে, ইহা এ-দেশের লোক জানে ইহা 'খনার বচনেও' দেখা যায়। কলিকাতার উপকণ্ঠে বাংলা-সরকারের শিল্প-বিভাগের যে কারখানা আছে, তথায় গমন করিলেই প্রত্যক্ষ করা যায়, ভদ্রপরিবারের যুবকরা কায়িক শ্রমসাধ্য শিল্প শিক্ষা করিতেছে। ইহারা পল্লীগ্রামে আপন আপন গৃহে একক বা কয় জন একযোগে কারখানা স্থাপন করিতে পারে। তাহার পর ইহারা যদি সমবায় নীতিতে কাজ করে, সমবায় নীতিতে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে পণ্যের উপকরণ ক্রয় ও পণ্য বিক্রয় করে, তবে শিল্পের উন্নতি সাধনে ও সঙ্গে সঙ্গে শিল্পীর আর্থিক অবস্থা-পরিবর্ত্তনে বিলম্ব হয় না।

শিল্প বিভাগকে শিল্পে উন্নত পদ্ধতি প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া পরীক্ষালব্ধ ফল শিল্পীদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে। সে কাজ সরকারের। আমরা জানিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছি, শিল্প বিভাগ সংপ্রতি দুইটি কাজ করিয়াছেন :—

(১) বিভাগের পরীক্ষার ফলে মৃৎপাত্র পুড়াইবার যে নূতন পাজা বা পোয়ান আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাকে উৎকৃষ্ট মৃৎপাত্র, চিনামাটির বাসন প্রভৃতি ও পোর্সিলেনও প্রস্তুত হইতে পারিবে। এক একটি পাজা প্রস্তুত করিতে আনুমানিক ব্যয় পাঁচ শত টাকা, এতদিন চা'র পেয়ালা, পীরীচ, দুগ্ধপাত্র, ফুলদানী প্রভৃতি এরূপভাবে প্রস্তুত হইতে পারে না বলিয়াই লোকের বিশ্বাস ছিল। সেই বিশ্বাস হেতু বঙ্গদেশেও বিরাট কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু পঞ্জাবে এই শিল্প উটজ শিল্পরূপে পরিচালিত হয়। যে পদ্ধতিতে পঞ্জাবে এতদিন এই শিল্প পরিচালিত হইয়া আসিতেছে, তাহা ত্রুটিশূন্য নহে এবং সেই জন্যই তাহা প্রতিযোগিতায় আত্মরক্ষা করা দুঃসাধ্য বলিয়া মনে করিতেছে। কিন্তু এতদিন আমাদিগের দৃষ্টি বিদেশের দিকেই নিবদ্ধ থাকায়, বিশেষ সরকার এ বিষয়ে উদাসীন থাকায়, পদ্ধতিতে উন্নতি প্রবর্ত্তনের চেষ্টা হয় নাই। এখন পরিবর্ত্তিত অবস্থায় সেই চেষ্টাই হইয়াছে এবং তাহা ব্যর্থও হয় নাই। বাংলায় যে উন্নত চক্র আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে কুম্ভকার দ্রুত নানা দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারে। তাহার পর পাত্র দগ্ধ করিবার এই নূতন পাজা আবিষ্কারে শিল্পে যে পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী, তাহা বিপ্লব বলিলেও বলা যায়। মিনাকরা মৃৎপাত্র, টালি প্রভৃতি এ দেশেও প্রস্তুত হইত ; তাহা রঞ্জিত করিবার ও তাহাতে নানা নক্সা অঙ্কিত করিবার প্রথাও ছিল। যে ইরাকে ও তুর্কীতে এই শিল্প বিশেষ সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে

সেই দেশগুলিতেও ইহা উটজ শিল্পরূপে পরিচালিত হয়। যাঁহারা ইংরাজ জাতিকে প্রদত্ত প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী লর্ড লেটনের বাসভবন দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, তিনি শিল্পহিসাবে অত্যুৎকৃষ্ট বলিয়া এইরূপ টালি বিদেশ হইতে বহুব্যয়ে সংগ্রহ করাইয়া আনিয়া নিজ গৃহে ব্যবহার করিয়াছিলেন।

এখন বাংলায় এই শিল্পের প্রবর্ত্তন ও উন্নতিসাধন সহজেই হইতে পারিবে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, বিদেশ হইতে আমদানী যে চা-দানী বাজারে ১০ হইতে ১২ আনায় বিক্রীত হয় তাহার উৎপাদন ব্যয় ২ আনার অধিক নহে। যাহাকে "কড়ি কৌটা" বলে, তাহার ব্যবহারও অল্প নহে। দিল্লী প্রভৃতি স্থানে সে সকলও চিত্রিত হয়। তাহাতে জাতির স্বভাবিক শিল্প ও সৌন্দর্য্যজ্ঞান প্রকাশ পায়। বিখ্যাত শিল্প-সমালোচক কনওয়ে বলিয়াছেন, কোন কোন সময় সাধারণ নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যেও শিল্পনৈপুণ্য ও সৌন্দর্য্য বিকাশ দেখা যায়।—"Sometimes indeed the tools and objects of domestic utility of a country have all been beautiful and a high general level of decorative excellence has obtained."

তিনি ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য বিধ্বস্ত পম্পিয়াই নগরের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু সে নগরের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে—সঙ্গে সঙ্গে নগরবাসীদিগের সৌন্দর্য্যপ্রিয়তাও গিয়াছে। ভারতবর্ষে সর্ব্বত্র তিনি ইহা আজও প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। অতি তুচ্ছ নিত্যব্যবহার্য্য গৃহস্থালীর দ্রব্যেও এ দেশের লোক সৌন্দর্য্য বিকাশ করিয়া থাকে।

বিলাতে সারে যে রঞ্জিত মৃৎপাত্রাদির জন্য প্রসিদ্ধ সে রঞ্জিত মৃৎপাত্রাদি এ দেশে অতি সহজে প্রস্তুত হইতে পারে। নূতন উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে তাহা উৎপাদন করা আরও সহজ হইবে।

প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে হ্যাভেল এবং তাহারও পূর্ব্বে বার্ডউড এ দেশের শিক্ষিত লোকদিগকে বিদেশীর অনুকরণ না করিয়া স্বদেশীশিল্পের উন্নতি সাধন করিতে ও স্বদেশী আদর্শানুসরণ করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। সেই পরামর্শ গৃহীত হইলে এ দেশে এই মৃৎশিল্পের ভবিষ্যৎ যে সমুজ্জল, তাহা অনায়াসে বলা যায়।

(২) এ দেশে বিদেশ হইতে বৎসর বৎসর অনেক টাকার ডাক্তারদিগের ব্যবহার্য্য অস্ত্র ও যন্ত্রাদি আমদানী হয়। জার্ম্মান যুদ্ধের পূর্ব্বে যে এই সকল জার্ম্মানীতেই অধিক প্রস্তুত হইত, আমরা তাহা অবগত আছি—যুদ্ধকালেই আমরা তাহার প্রমাণ পাইয়াছিলাম। এখন শিল্পবিভাগের পরীক্ষাফলে এ দেশে এই শিল্প উটজ শিল্প হিসাবে পরিচালিত করা সম্ভব হইয়াছে। বিভাগ হইতে যে-সব শিল্প শিক্ষা প্রদান করা হয় এই শিল্প সেই সকলের তালিকাভুক্তও করা হইয়াছে। এই সব অস্ত্র ও যন্ত্র নির্দ্দিষ্ট আদর্শে প্রস্তুত হয়। ইহার উপকরণ এ দেশে সংগ্রহ করা দুঃসাধ্যও নহে। এ দেশে প্রস্তুত করিতে পারিলে এই সকলের মূল্যহ্রাসও অনিবার্য্য হইবে।

যাহাতে নূতন নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠার উপায় হয়, তাহার জন্য সরকারকে যেমন পরীক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে, দেশের শিক্ষিত লোককে তেমনই সে সব শিল্প প্রতিষ্ঠায় অবহিত হইতে হইবে।

এই সব শিল্প প্রতিষ্ঠায় আবশ্যক অর্থ প্রদান জন্য যে-সব প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হইবে, সে সকলে কম টাকা লেন-দেন হইবে না; সে সকলেও অনেক লোক কাজ পাইবে। পণ্য বিক্রয়ের জন্যও অল্পসংখ্যক লোকের প্রয়োজন হইবে না।

এইরূপে কাজ চলিলে যে দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

পল্লীগ্রামের পুনর্গঠনের সময় স্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মহীশূর দরবার আদর্শ পল্লীগ্রাম সংস্থাপনে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের পরীক্ষা-লব্ধ ফলে আমরা উপকৃত হইতে পারিব। গ্রাম যদি অস্বাস্থ্যকর হয়, তবে লোকের পক্ষে তথায় বাস করা দুষ্কর হয়—অসুস্থ ও দুর্ব্বল দেহে সুস্থ ও সবল মন ও মনীষার স্থান হইতে পারে না। এ দেশে ম্যালেরিয়া, বিসূচিকা, বসন্ত প্রভৃতি যে সকল রোগ লোকক্ষয় করে, সে সকলের মধ্যে ম্যালেরিয়াই সর্ব্বপ্রধান। প্রতিবৎসর বাংলায় তিন হইতে চার লক্ষ লোক ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কিন্তু যাহারা রোগভোগ করিয়া দুর্ব্বলদেহে বাঁচিয়া থাকে, তাহাদিগের সংখ্যা আরও অধিক। কোন কোন লোকের মত এই যে, ইহাই বাংলার উদ্যমহীনতার অন্যতম প্রধান কারণ। অথচ ম্যালেরিয়া যে দূর করা যায়, তাহা কেবল অন্যান্য দেশেই নহে বাংলাতেও

প্রমাণিত হইয়াছে। সুখের বিষয়, আজকাল কোন কোন পল্লীগ্রামে শিক্ষিত ব্যক্তিরা গ্রাম্যসমিতি গঠিত করিয়া এ বিষয় আবশ্যক চেষ্টা করিতেছেন। সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগও এ বিষয়ে তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতেছেন। বর্ত্তমানে বাংলায় এইরূপ অনেকগুলি সমিতির কাজ চলিতেছে। কলেরার টীকা আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিসূচিকারও টীকা আবিষ্কৃত হইয়াছে; বিশেষ বিসূচিকা জলবাহিত ব্যাধি বলিয়া ইহা নিবারণ করা দুঃসাধ্য নহে।

অজ্ঞতাই অনেক স্থানে অনাচারের কারণ এবং অনাচার হইতে স্বাস্থ্যের অভাব ঘটে। সেই জন্য লোককে স্বাস্থ্য রক্ষার বিষয় শিক্ষা দান করা প্রয়োজন। পল্লীগ্রামে ম্যাজিক ল্যানটার্ণ ও চলচ্চিত্রের সাহায্যে এই বিষয় শিক্ষা প্রদান করা যায় এবং তাহার ব্যবস্থা করাও প্রয়োজন। বোধ হয়, অল্পদিনের মধ্যেই বেতারবার্ত্তা পল্লীগ্রামে বহন করিবার ব্যবস্থা হইবে। গ্রামের লোক যাহাতে এক স্থানে সমবেত হইতে পারে এবং তথায় আমোদ ও শিক্ষা লাভ করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করাও প্রয়োজন সন্দেহ নাই। সেদিন সার জন এণ্ডার্সন বলিয়াছেন—এ দেশে লোক সরকারকেই সকল কল্যাণকর কার্য্যের উৎস ও সকল অনিষ্টের কারণ বলিয়া বিবেচনা করিবার প্রবৃত্তি-পরিচয় অত্যন্ত অধিক দিয়া থাকে। তিনি যদি কারণ অনুসন্ধান করিতেন, তবে তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইত, ইহার জন্য দেশের লোককেই দায়ী করিলে তাহাদিগের প্রতি অবিচার করা হইবে। এ দেশে পল্লীসমিতি প্রভৃতি যে সব গণতান্ত্রিক—স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান স্মরণাতীত কাল হইতে প্রচলিত ছিল, সে সকলের উচ্ছেদসাধন ও "মা-বাপ" সরকারের প্রবর্ত্তনের জন্য কি ইংরেজ সরকারের কোন দায়িত্ব নাই? এ দেশের শিল্পের অবনতিও যে সরকারের উপেক্ষায় দ্রুত হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

যে-সব কারণেই কেন বর্ত্তমান অবস্থার উদ্ভব হইয়া থাকুক না, ইহার পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। সে প্রয়োজন দেশের লোক অনেক দিন হইতে তীব্রভাবে অনুভব করিয়া আসিতেছে; এখন সরকারও অনুভব করিতেছেন।

সুতরাং এখন যে অবস্থা হইয়াছে, তাহাতে দেশের লোককে সমবেত হইয়া এই কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে এবং সরকারকেও দেশের লোকের সহিত সর্ব্বতোভাবে সহযোগ করিতে হইবে। দেশের লোক আপনাদিগের প্রয়োজন—অনিবার্য্য বোধে, এই কাজ করিবে। সরকার এজন্য প্রস্তুত আছেন কি না, তাহাই জিজ্ঞাস্য।

বাংলার আর্থিক দুর্গতি তাহার রাজনীতিক চাঞ্চল্যের অন্যতম কারণ এবং সেই দুর্গতি হইতে সন্ত্রাসবাদের উদ্ভব ও পরিপুষ্টি-সম্ভাবনা প্রবল মনে করিয়াই বাংলা-সরকার এই দুর্গতি দূর করিবার চেষ্টা করিতে উদ্যত হইয়াছেন। কারণ যাহাই কেন হউক না, চেষ্টার ফলে যদি বর্ত্তমান দুরবস্থার অবসান হইয়া উন্নতির আরম্ভ হয়, তবে তাহাতে বিশেষ আনন্দের কারণ হইবে।

দেশের আর্থিক অবস্থা যে বহুল পরিমাণে দেশের রাজনীতিক অবস্থার উপর নির্ভর করে, তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না। এ দেশের বয়নশিল্পের দুর্গতির আলোচনা-প্রসঙ্গে ইংরেজ লেখক উইলসন্ তাহা বুঝাইয়াছেন। মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কারে দেশের লোক যে ক্ষমতা পাইয়াছেন, তাহা যেমনই কেন হউক না, তাহার দ্বারাই দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠায় অনেক সাহায্য হইয়াছে ও হইতেছে। আর্থিক ব্যাপারে স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা এই কার্য্যে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে।

সরকারকে এ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে এবং দেশের লোককে স্বাবলম্বী হইয়া আপনাদিগের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধনে সাহায্য করিতে হইবে। সার জন এণ্ডার্সন্ পুনর্গঠন কার্য্যে দেশের সকল অগ্রণী সম্প্রদায়ের চেষ্টা সংযুক্ত করিবার কথা বলিয়াছেন। তাঁহার সরকার সে বিষয়ে আগ্রহ সহকারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেই দেখিতে পাইবেন, লোক আর সরকারকেই সকল কল্যাণকর কার্য্যের উৎস বলিয়া মনে করে না—তাহারা আপনারা কাজ করিতে আগ্রহশীল। তবে কতকগুলি বিষয়ে সরকারের সাহায্য—উপদেশ ও ব্যবস্থা—ব্যতীত কার্য্যসিদ্ধির সম্ভাবনা থাকে না।

বাংলা আবার সোনার বাংলা হইবে—স্বাস্থ্যে সবল, শিক্ষায় উন্নত ও শিল্পে সমৃদ্ধ বাংলার কল্পনা কোন্ বাঙালীকে আকৃষ্ট না করিবে? এই পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন দেশের লোক বিশেষভাবেই অনুভব করিতেছে। অন্নাভাবজীর্ণ, রোগশীর্ণ, উদ্বেগদীর্ণ বাঙালী আজ গঠনকার্য্যে—আপনার অবস্থার

উন্নতিসাধনে—নেতার প্রতীক্ষা করিতেছে। সে বিষয়ে কর্ত্তব্যের ও দায়িত্বের ভার দেশের শিক্ষিত লোকদিগকেই গ্রহণ করিতে হইবে। আজ মনে হইতেছে, বাংলা সরকার সে বিষয়ে তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত। যদি তাহাই হয়, তবে যে উন্নতির গতি দ্রুত হইবে, এমন আশা আমরা অবশ্যই করিতে পারি।

পথহারা

শ্রীসীতা দেবী

কৃষ্ণদয়াল অতি-আধুনিক যুগের মানুষ নন, এমন কি, ঠিক আধুনিক যুগেরও নন। তাঁহার বাল্যকাল কাটিয়াছিল পাড়াগাঁয়ে, অতি আচারনিষ্ঠ পিতামাতার ঘরে। তাঁহার পড়াশুনা আরম্ভ হইয়াছিল গুরুমশায়ের কাছে, তের বৎসর বয়সের আগে ইংরেজী অক্ষর-পরিচয়ও তাঁহার হয় নাই। স্ত্রীজাতিকে মানবরূপী গৃহপালিত পশু ভিন্ন অন্য কোনো পর্য্যায়ে পড়িতে বহুকাল তিনি দেখেন নাই। তবুও এহেন কৃষ্ণদয়ালের মনেও কয়েকটা আধুনিক দোষ কোথা হইতে প্রবেশ করিল কে জানে?

ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ছেলে, পৌরোহিত্য করিয়া বেশ খাইতে পারিতেন, তাহা না করিয়া তিনি ছাত্রবৃত্তির বৃত্তির সাহায্যে ইংরেজী পড়িতে লাগিয়া গেলেন। শুধু ব্রাহ্মণ নয়, খাঁটি কুলীন ব্রাহ্মণ, ইচ্ছা করিলে দশটা বিবাহ করিয়া বিভিন্ন শ্বশুরবাড়ি হইতে ট্যাক্স আদায় করিয়া আরামে দিন কাটাইয়া দিতে পারিতেন, তাহার পরিবর্ত্তে একটি মাত্র বিবাহ করিয়া পত্নী রাধারাণীকে লইয়া আত্মীয়স্বজনের আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া কলিকাতায় প্রস্থান করিলেন। শাস্তিস্বরূপ পিতা তাঁহার খরচ বন্ধ করিলেন, চিঠিপত্রও বন্ধ করিলেন, কিন্তু ইহাতেও কৃষ্ণদয়ালের দমিবার কোনো লক্ষণ না দেখিয়া নিজেই দমিয়া গেলেন। কৃষ্ণদয়াল মেধাবী ছাত্র, বরাবর বৃত্তি ত পাইতেই ছিলেন, তাহার উপর ছেলেপড়ানোর কাজ দুই-চারিটা সর্ব্বদা জুটাইয়া রাখিতেন, সুতরাং খুব বেশী আর্থিক কষ্ট তাঁহাকে ভোগ করিতে হয় নাই। দুটি মানুষ, এক রকম করিয়া তাঁহাদের চলিয়াই যাইত। যে-বৎসর এম্-এ পাস করিয়া কাজ পাইলেন, সেই বৎসরই তাঁহার প্রথমা কন্যা রাজেন্দ্রাণী জন্মগ্রহণ করিল।

ইহাতেও পাগলা কৃষ্ণদয়ালের মহা আনন্দ। পত্নী রাধারাণী এতকাল তাঁহার সঙ্গে বাস করিয়াও সঙ্গদোষে নষ্ট হন নাই, তিনি মুখ বাঁকাইয়া বলিলেন, "পোড়া দশা! মেয়েছেলে, তাও আবার কুলীনের ঘরে, ওকে নিয়ে এত সোহাগ কিসের? চিরটা জন্ম হয়ত ঘাড়ে ব'সে হাড় জ্বালাবে। আজকাল পালটি-ঘর পাওয়া মুখের কথা কি-না? দুটো পয়সার লোভে অঘরে-কুঘরে মেয়ে দিয়ে সব মাথা খেয়ে বসে আছে না?"

কৃষ্ণদয়াল বলিলেন, "বেশ ত, বাড়ি যদি চিরকাল থাকে খুব ভাল কথা। মেয়ে সন্তান পরকে দিয়ে দিতে হয় ব'লেই না লোকে এত আফশোষ করে?"

রাধারাণী কোমল কচি মুখখানাকে যথাসাধ্য গাম্ভীর্য্য-বিকৃত করিয়া বলিলেন, "ছেলের বাপ হয়েও এখনও খোকাপনা গেল না। কথার ওজন শিখবে কবে?"

কৃষ্ণদয়াল সময়োচিত রসিকতা করিয়া রাধারাণীর গাম্ভীর্য্য তখনকার মত উড়াইয়া দিলেন। কিন্তু কন্যাকে লইয়া ভবিষ্যতে যে স্বামিস্ত্রীর মতান্তর ঘটিবে এই সম্ভাবনাটা তাঁহার নিজের চিত্তে অনেকখানিই গাম্ভীর্য্য আনিয়া দিল।

যাহা হউক রাজেন্দ্রাণী পিতামাতার আদরে শশিকলার মত বাড়িতে লাগিল। তাহার ছোট দুইটি ভাইও জন্মগ্রহণ করিল, সুতরাং রাধারাণীর আফশোষ অনেকখানিই কাটিয়া গেল। তবু রাজেন্দ্রাণীর আদরের বাড়াবাড়ির জন্য স্বামীর

সঙ্গে মাঝে মাঝে ঝগড়া যে না-হইত তাহা নয়। তরুণী মা বলিতেন, "বড় যে আদর দিয়ে মেয়েকে ধিঙ্গি করছ, এর পর ওর দুর্গতির সীমা থাকবে না। মেয়েছেলেকে অত আহ্লাদ কখনও দিতে নাই, শ্বশুরবাড়ির ছেঁচানি সইবে কি ক'রে তাহ'লে?"

কৃষ্ণদয়াল বলিতেন, "কোনোকালে হয়ত অন্ন জুটবে না ব'লে গোড়ার থেকেই তাহ'লে ছেলেমেয়েদের খাওয়া বন্ধ ক'রে দিতে হয়।"

রাধারাণীর বাক্যের জোর যতটা ছিল, যুক্তির জোর ততটা ছিল না, সুতরাং "বাক্যবাগীশ, কথার নবাব," বলিয়া তিনি উঠিয়া চলিয়া যাইতেন।

রাজেন্দ্রাণীকে শুধু সোহাগ আহ্লাদ দিয়াই কৃষ্ণদয়াল নিশ্চিন্ত হন নাই। মেয়েকে রীতিমত সুশিক্ষা দিবারও তিনি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাহাকে নিজেও পড়াইতেন, এবং শিক্ষয়িত্রী রাখিয়া শেলাই গান বাজনা প্রভৃতি শিক্ষা দিবারও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এ-সব শিক্ষার প্রয়োজন তখনকার দিনে নিতান্ত উদারনৈতিক ব্রাহ্মপরিবার ভিন্ন অন্য কোথাও স্বীকৃত হইত না, সুতরাং খ্রীষ্টিয়ান বলিয়া গ্রামে তাঁহার নাম অবিলম্বেই রটিয়া গেল। আত্মীয়স্বজন গ্রামে ঘটা করিয়া তাঁহাকে ত্যাগ করিলেন বটে, তবে গোপনে চিঠি লিখিয়া অর্থসাহায্য চাওয়া এবং কলিকাতায় আসিলে তাঁহার বাড়ি মাসখানেক চাপিয়া বসিয়া থাকা, এ-দুটি কৃপা হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করিলেন না।

রাজেন্দ্রাণী বারো পার হইয়া তেরোতে পা দিতে চলিল। তাহার বাবা এবং মায়ে এইবার রীতিমত ঝগড়া বাধিয়া গেল। মা পণ করিলেন যেমন করিয়া হোক মেয়ের বিবাহ দিবেনই। স্বামীর সাংসারিক বুদ্ধি একেবারে নাই বলিয়া কি তিনিও তাঁহার তালে তাল দিয়া বাপ-পিতামহের নাম ডুবাইবেন? নিজের বাপের বাড়ির সাহায্যে কন্যার জন্য উপযুক্ত ঘরে পাত্র সন্ধান করিতে তিনি মহোৎসাহে লাগিয়া গেলেন। কৃষ্ণদয়াল ঠিক তেমনই উৎসাহ সহকারে সব কয়টি পাত্রের বড় বড় খুঁৎ বাহির করিয়া বিদায় করিয়া দিতে লাগিলেন।

রাধারাণী কোমর বাঁধিয়া ঝগড়ায় নামিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার মতলবখানা কি শুনি? মেয়ের বিয়ে দেবে না?"

কৃষ্ণদয়াল বলিলেন, "ভাল পাত্র কই? বিয়ে দিতে হবে ব'লে কি বানের জলে ফেলে দিতে হবে?"

রাধারাণী বলিলেন, "কেন সব ক'টা পাত্রই খারাপ কিসে? কি এমন তোমার মেয়ে রাজার দুলালী যে কেউ তাঁর যোগ্য নয়?"

কৃষ্ণদয়াল বলিলেন, "মেয়ের বিয়ে এত ছোটোতে আমি দেব না, তোমায় হাজার বার বলেছি। তবু তুমি যখন যত ভূত বাঁদর ধরে আনবে, তখন আমায় ছুতো ক'রে তাড়াতেই হবে। কুলীনের মেয়ে ষাট বছর পর্য্যন্ত কুমারী থাকলেও নিন্দে হয় না, এ ত তুমি নিজেও জান, তবে অত অস্থির হয়ে লাফালাফি করবার দরকার কি?"

রাধারাণী বলিলেন, "দরকার তুমি বুঝলে আর ভাবনা ছিল কি? মেয়েকে ত একেবারে ধিঙ্গি ক'রে তুল্‌চ, খ্রীষ্টিয়ান, ব্রাহ্মকেও সে হার মানায়। তারপর বুড়োধাড়ী হ'য়ে নিজের ইচ্ছামত বিয়ে করতে চাইবে ত? কোনো অঘরে যদি করতে চায়, তখন কি হবে?"

কৃষ্ণদয়াল বলিলেন, "নিজে ইচ্ছা ক'রে মানুষ যে-ঘরে ঢুকতে চায়, সেইটেই তার স্বঘর।"

রাধারাণী বলিলেন, "তা আর নয়? তোমার যা বুদ্ধি জাত কুল কিছু দেখবার দরকার নেই?"

কৃষ্ণদয়াল বলিলেন, "মেয়ে নিজেই দেখে নেবে। নিজের বুদ্ধিতে চ'লে মানুষ কষ্ট পায় সেও ভাল, তবু অন্যের হাতের পুতুল হয়ে আরামে থাকা কিছু নয়।"

মা-বাপের ঝগড়া চলিতেই থাকিল এবং রাজেন্দ্রাণীও বড় হইতে লাগিল। ইদানীং আর মেয়েকে পড়াইবার সময় পান না বলিয়া কৃষ্ণদয়াল তাহাকে বেথুন স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছেন। আর এক বছরের মধ্যেই ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়া কলেজে ঢুকিবে বলিয়া সে গর্ব্ব করিয়া বেড়ায়। ভাইদের চেয়ে সে পড়ায় ভাল বলিয়া কথায় কথায় তাহাদের ক্ষ্যাপাইতে ছাড়ে না। মেয়ের রকম দেখিয়া মায়ের হাসিও পায় অথচ গাও জ্বালা করে। এই বয়সে তিনি ছেলের মা হইয়াছিলেন, আর এ মেয়ের রকম দেখ।

কৃষ্ণদয়ালের শুধু যে স্ত্রীশিক্ষাতেই আপত্তি ছিল না তাহা নহে, স্ত্রীস্বাধীনতাতেও ছিল না। রাধারাণী অনাত্মীয় কোনো পুরুষের সামনে কিছুতেই বাহির হইতেন না, প্রৌঢ়ত্বের

সীমানার দিকে এক পা বাড়াইয়াও তাঁহার ঘোমটার বহর এখন পর্য্যন্ত কমে নাই। রাজেন্দ্রাণীর কিন্তু এসব কোনো আপদ-বালাই ছিল না। সে সকলের সামনেই যাইত, সকলের সঙ্গেই কথাবার্ত্তা বলিত। ভাইদের প্রাইভেট্ টিউটর রণেন্দ্রের সঙ্গে বসিয়া দিব্য গল্প করিত, দরকার হইলে নিঃসঙ্কোচে তাহার কাছে পড়াও বুঝাইয়া লইত। রাধারাণী দেখিয়া জ্বলিয়া যাইতেন, অথচ স্বামীর আস্কারা পাইয়া মেয়ে এমন মাথায় উঠিয়াছে যে, তাহাকে বাধা দিয়াও লাভ নাই। এমনিতে রণেন্দ্র ছেলেটি যে কিছু মন্দ তা নয়। ভদ্রঘরের ছেলে, শোনা যায় টাকাওয়ালা পরিবারেরই ছেলে, পড়াশুনায় ভাল, দিব্য ভদ্র, বিনয়ী। কি কারণে বাবার সঙ্গে একটু মনান্তর ঘটাতে বাড়ি ছাড়িয়া মেসে চলিয়া আসিয়াছে। প্রাইভেট্ ট্যুশানি করিয়া নিজের খরচ চালায়। কৃষ্ণদয়ালের দুই ছেলেকেই তাহার পড়াইবার কথা, কিন্তু রাজেন্দ্রাণীকে কার্য্যতঃ সে পড়ায় বেশী। আর সে শুধু দুই একদিন নয়, মাসের পর মাস একই ব্যাপার চলিতেছে।

প্রথম প্রথম রাধারাণী এ ব্যবস্থাটাতে মত না দিলেও কোনোমতে উহা সহ্য করিয়া যাইতেন। কিন্তু ক্রমেই তাঁহার মনে হইতে লাগিল, বড় বাড়াবাড়ি হইয়া যাইতেছে। মেয়েকে এখন না ঠেকাইলে সে একেবারে হাতের বার হইয়া যাইবে। স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করা বৃথা, কারণ যত সৃষ্টিছাড়া কার্য্যে প্রশ্রয় দেওয়াতেই তাঁহার আনন্দ।

ডিসেম্বর মাসে রাজেন্দ্রাণীর টেষ্ট পরীক্ষা। কাজেই নবেম্বর মাস হইতে ভীষণ পড়ার তাড়া লাগিয়া গিয়াছে। নিজেও সে বিশ্রাম লয় না, রণেন্দ্র আসিলে তাহাকেও বিশ্রাম দেয় না। মাঝ হইতে রাজেন্দ্রাণীর ভাই দুটি মহানন্দে ফুর্ত্তি করিয়া সময় কাটাইয়া দেয়।

রাধারাণী সন্ধ্যার সময় এক-একদিন রান্নার তদারক ছাড়িয়া ছেলেমেয়ের পড়ার তদারক করিতে আসিতেন। পাশের ঘর হইতে প্রায়ই দেখিতেন রাজেন্দ্রাণী পড়িতেছে, রণেন্দ্র পড়াইতেছে, হীরেন এবং বীরেন দুষ্টামি করিতেছে। রণেন্দ্রের সামনে তিনি বাহির হন না, কাজেই মনে মনে আপত্তি অনুভব করিলেও চুপ করিয়াই থাকিতেন। একদিন তাঁহার মনে হইল অসহনীয় রকম বাড়াবাড়ি হইতেছে। পড়িবার ঘরে দরজার আড়াল হইতে উঁকি মারিয়া দেখিলেন রাজেন্দ্রাণী একমনে অঙ্ক কষিতেছে, হীরেন ও বীরেন পরস্পরের সঙ্গে খুন্‌সুটি করিতেছে, এবং রণেন্দ্র বিশ্বসংসার ভুলিয়া একদৃষ্টে রাজেন্দ্রাণীর সুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া আছে।

রাধারাণীর আপাদমস্তক জ্বলিয়া গেল। সামলাইতে না পারিয়া পাশের ঘর হইতে তিনি উঁচু গলায় বলিলেন, "যাকে যে কাজের জন্য রাখা হয়, তাই করলেই ভাল। মেয়েকে পড়াবার দরকার থাকলে আমরা আলাদা মাষ্টার রাখব।" বলিয়া দুম্ দাম্ করিয়া পা ফেলিয়া চলিয়া গেলেন। খানিক পরে গিরি ঝি আসিয়া খবর দিল, "দিদিমণি, মা তোমাকে ভিতরে ডাকছেন।"

ব্যাপারটার ফল কিন্তু উল্টা হইল। রাজেন্দ্রাণীর মাষ্টারের কাছে পড়া অবশ্য বন্ধ হইল, কিন্তু পড়িতে যে পাইতেছে না, ইহার দুঃখে নিজের কাছে নিজের মনটা তাহার পরিষ্কাররূপে ধরা পড়িয়া গেল। নিজের অসহ্য মনোব্যথায় এবং চাঞ্চল্যে সে নিজেই অবাক্ হইয়া গেল। রণেন্দ্রও পূর্ব্বের ন্যায় পড়াইতে আসিত বটে, কিন্তু কোনো কাজে তাহার যেন আর মন ছিল না, কোনো গতিকে কাজ সারিয়া দিয়া সে চলিয়া যাইত। কোনোদিন রাজেন্দ্রাণীর সঙ্গে দুই-এক মিনিটের জন্য দেখা হইত, কোনোদিন হইত না। রাধারাণী স্বামীকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, রাজু গিয়া ছেলেদের পড়ার বড় ব্যাঘাত করে, সেই জন্য তিনি উহাকে আর রণেন্দ্রের কাছে পড়িতে যাইতে দেন না। কৃষ্ণদয়ালও তাহাই বুঝিয়া কন্যাকে বাহিরের ঘরে পড়িতে যাইতে বারণ করিয়া দিয়াছিলেন। রাজুকে আশ্বাস দিয়াছিলেন, প্রয়োজন হইলে তিনি নিজেই তাহাকে পড়াইবেন।

দুই তিন মাস কাটিয়া গেল। রাজেন্দ্রাণী কোনমতে টেষ্ট পরীক্ষায় পাস করিয়া ম্যাট্রিকও দিল, পাসও করিল। আশানুরূপ ভাল ফল কিছুই দেখাইতে পারিল না, শরীরও তাহার হঠাৎ কেমন যেন ভাঙিয়া পড়িল।

ব্যাপার আর কেহ বুঝিবার আগেই রাজেন্দ্রাণীর মা বুঝিতে পারিলেন। হাজার হউক মায়ের মন ত? ভীষণ উত্তেজিত হইয়া স্বামীকে বলিলেন, "নাও এখন হ'ল ত মনস্কামনা সিদ্ধ? এখন মেয়ের গতি কি হবে?"

কৃষ্ণদয়াল বলিলেন, "রোসো আজই অত ক্ষেপে যেও না। তোমার অনুমান যদি সত্যিও হয়, তাহলেই বা অত ভাববার কারণ কি আছে? রণেন্দ্রের সঙ্গে কি বিয়ে হ'তে পারে না?"

রাধারাণী বলিলেন, "ওর সঙ্গে কি ক'রে হবে? জাত কুল সব ভাসিয়ে দেব নাকি?"

কৃষ্ণদয়াল বলিলেন, "ভাষাতে হবে কেন? ও ত ব্রাহ্মণেরই ছেলে।"

রাধারাণী ঝাঁঝিয়া উঠিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, চক্কোত্তি আবার বামুন, তেলাপোকা আবার পাখী! এ সব কাণ্ড করবে ত আমি যেদিকে দুই চোখ যায় চলে যাব।"

কৃষ্ণদয়াল বলিলেন, "ঘরটাই ত বড় নয়, বরটা বড়। ভাল ঘরের একটা বাঁদর ধরে মেয়ে দিয়ে বেশী লাভ হবে, না, একটু নীচু ঘরের ভাল ছেলেকে দিলে বেশী লাভ হবে? কোন্‌টায় তোমার মেয়ে বেশী সুখী হবে?"

রাধারাণী বলিলেন, "সুখী হওয়া-না-হওয়া মেয়েমানুষের অদৃষ্ট। যারা খিষ্টীর মত স্বয়ম্বরা হয়ে বিয়ে করে তারাই কি সুখের সাগরে ভাস্‌ছে সবাই? না আমাদের, যাদের মা বাপে বিয়ে দিয়েছে, তারাই সবাই অসুখে হাবুডুবু খাচ্ছি? ও-সব সুখ-অসুখ কোনো কাজের কথা নয়। তাই ব'লে বাপপিতামহের ধর্ম্ম ছেড়ে দেব নাকি?"

কৃষ্ণদয়াল বলিলেন, "কোন্ নিয়মে সুখ বেশী হয় তা ত ঠিক করা শক্ত, কারণ এ বিষয়ে সরকারী বা বেসরকারী কোন হিসেব নেই। তবে আমার মত যা তা তোমায় আগেই বলেছি। মানুষ স্বাধীনভাবে নিজের পথ বেছে দুঃখ পায় সেও ভাল, তবু আরামে থাকবার আশায় পরের হাতের পুতুল হওয়া ভাল নয়।"

রাধারাণী হার মানিলেন না, ক্রমাগত উত্তেজিত হইয়া তর্ক করিতে লাগিলেন। বার-বার করিয়া বলিতে লাগিলেন, তিনি আর কাহারও কথা শুনিবেন না, এই বৎসরের ভিতর মেয়ের বিবাহ দিবেনই। কলেজে তাহাকে কিছুতেই পড়িতে দিবেন না। দেশে, গ্রামে, তাঁহার আর তাহা হইলে মুখ দেখাইবার উপায় থাকিবে না। কৃষ্ণদয়াল অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া চলিয়া গেলেন।

বাড়ির সমস্ত আব হাওয়া কেমন যেন গুমোট হইয়া রহিল। খোলাখুলি ঝগড়াও হয় না, কারণ কৃষ্ণদয়াল তাহার অবকাশ দেন না, আবার মিট্‌মাট্ হইয়া চুকিয়াও যায় না।

ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার হাঙ্গামাও নাই, কারণ এখন গ্রীষ্মের ছুটি, কি করিয়া যে মানুষগুলির সময় কাটে তাহাই এক সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় অবস্থা হইল রাজেন্দ্রাণীর। কোনো কাজ নাই, কোনো মানুষের সঙ্গ নাই, সংসার তাহার কাছে মরুভূমির মত হইয়া উঠিল। গ্রীষ্মের ছুটিতে রণেন্দ্রও দেশে চলিয়া গিয়াছে। তাহার বাবা নাকি তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন। ভাইদের কাছে তাহার ঠিকানা আছে, তাহারা অবশ্য চিঠিপত্র কিছুই রণেন্দ্রকে লেখে না। রাজেন্দ্রাণীর বুক ফাটিয়া যায় একটুখানি তাহার খবর পাইবার জন্য। রণেন্দ্রের হাতের লেখা দুইটা অক্ষর দেখিতে পাইলেই তাহার প্রাণের আকুল তৃষ্ণা একটু হয়ত মেটে, কিন্তু সে যে বাঙালীর মেয়ে, তাহার মুখ বুজিয়া সহ্য করা ভিন্ন দ্বিতীয় উপায় নাই।

ঘরের কাজ আগেও সে করিত, এখন পড়ার তাড়া নাই, মা আশা করেন এখন সে একটু বেশী করিয়াই তাঁহাকে সাহায্য করিবে, কিন্তু রাজেন্দ্রাণীর কোনো কাজেই মন লাগে না। ঘর-দোর পরিষ্কার রাখা আসবাবপত্রের ধূলা ঝাড়া, জিনিষপত্র ফিটফাট করিয়া গুছাইয়া রাখা প্রভৃতিতে আগে সে খুব উৎসাহ দেখাইত, এখন তাহাও আর রাজুর ভাল লাগে না।

তবু অভ্যাস-মত সেদিনও সে বসিবার ঘর, পড়িবার ঘর সব পরিষ্কার করিতেছিল। তাহার বাবার টেবিলটা সর্ব্বদাই এলোমেলোর মেলা হইয়া থাকে। রাজু এইটি গুছাইতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সময় দেয়।

আজও মোটা মোটা বইগুলি এক এক করিয়া ঝাড়িয়া সে থাক্ করিয়া রাখিতেছিল, এমন সময় একটা বইয়ের ভিতর হইতে ঠক্ করিয়া একখানা চিঠি মাটিতে পড়িয়া গেল। সেখানা কুড়াইয়া রাখিতে গিয়া রাজেন্দ্রাণীর হৃৎপিণ্ডটা হঠাৎ যেন আছাড় খাইয়া পড়িল। অতি পরিচিত অতি প্রিয় হস্তাক্ষর।

চিঠিখানা তাহার বাবার নামে। রাজেন্দ্রাণীর উচিত ছিল না তাহা খুলিয়া পড়া। কিন্তু মনের দুর্দ্দমনীয় আগ্রহ

তাহাকে উচিত অনুচিত ভুলাইয়া দিল। চিঠিখানা সে রুদ্ধশ্বাসে পড়িয়া ফেলিল।

সেদিন কাজকর্ম্ম তাহার আর কিছু হইল না। কোনোমতে যেখানকার চিঠি সেখানে রাখিয়া আসিয়া সে চুপ করিয়া শুইয়া পড়িল। রাধারাণী কার্য্যগতিকে ঘরে আসিয়া মেয়েকে অসময়ে শুইয়া থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর কি হয়েছে রে?"

রাজেন্দ্রাণী দেওয়ালের দিকে মুখ করিয়া বলিল, "আমার অসুখ করেছে।" দুই দিনের মধ্যে বিছানা ছাড়িয়া সে উঠিলও না, খাইলও না, কাহারও দিকে তাকাইলও না।

চিঠিখানা রণেন্দ্র কৃষ্ণদয়ালের কাছে লিখিয়াছিল বোধ হয় তাঁহার চিঠিরই জবাবে। তাহাতে সে জানাইয়াছে যে হীরেন্দ্র বীরেন্দ্রকে আর সে পড়াইতে পারিবে না। তাহার বাবা এখন কিছুদিন তাহাকে বাড়িতেই রাখিবেন, কারণ রণেন্দ্রের মা অত্যন্ত পীড়িত। আর কৃষ্ণদয়াল যে অনুগ্রহ করিয়া তাহার সঙ্গে রাজেন্দ্রাণীর বিবাহ দিতে চাহিয়াছেন, তাঁহার এ স্নেহের পরিচয় সে চিরকাল মনে রাখিবে, তবে দুঃখের বিষয় এ অনুরোধ পালন করা তাহার পক্ষে অসম্ভব। রণেন্দ্রের পিতা অন্য জায়গায় তাহার বিবাহ স্থির করিয়াছেন, তাঁহার মনের বর্ত্তমান অবস্থায় রণেন্দ্র আর অবাধ্য হইয়া তাঁহার মনে ব্যথা দিতে পারে না।

মানুষ চিরকাল শুইয়া থাকিতে পারে না, কাজেই রাজেন্দ্রাণী আবার বিছানা ছাড়িয়া উঠিল, কিন্তু বালিকা-বয়স হইতে একেবারে যেন প্রৌঢ়ত্বে গিয়া পৌঁছিল। হাসিখুশী, খেলাধুলা সব তাহার চুকিয়া গেল। রণেন্দ্রের বিবাহের চিঠি যেদিন দেখিল সেই দিন মায়ের ঝগড়াঝাঁটি, রাগারাগি সব উপেক্ষা করিয়া বাপকে টানিয়া লইয়া কলেজে গিয়া ভর্ত্তি হইয়া আসিল। তাহার পর পড়াশুনার ভিতর একেবারে ডুবিয়া গেল।

কিন্তু কোনো কিছু অবলম্বন করিয়া শান্তি পাওয়া বিধাতা রাজেন্দ্রাণীর অদৃষ্টে লিখেন নাই। বছর কাটিতে-না-কাটিতে কৃষ্ণদয়াল শক্ত অসুখে পড়িলেন। রাধারাণীর হা-হুতাশ ও কান্নাকাটিতে বাড়ির হাওয়া ভারি হইয়া উঠিল। স্বামী যে গলায় তাঁহার কত বড় পাথর ঝুলাইয়া পথে বসাইয়া যাইতেছেন, একথা ক্রমাগতই বিনাইয়া বিনাইয়া পাড়াপ্রতিবেশিনীকে শুনাইতে লাগিলেন।

রাজেন্দ্রাণীর একেবারে অসহ্য হইয়া উঠিল। মায়ের সঙ্গে কোনোদিনই তাহার বনিত না, তাহার উপর ক্রমাগত তাহাকে উদ্দেশ করিয়া এই খোঁচা দেওয়া তাহাকে যেন বিষের ছুরির আঘাতের মত বাজিতে লাগিল। সে রুখিয়া উঠিয়া বলিল, "বেশ ত দাও না বিয়ে দিয়ে, আমায় বিদায় করে। এবাড়ির চেয়ে কতই আর খারাপ হবে।"

রাধারাণী মেয়ের কথায় কান্নার স্রোত আরও বাড়াইয়া দিলেন, কিন্তু কথাটা ভুলিলেন না। বাড়িতে গৃহকর্ত্তার এই অসুখের মধ্যেও ঘটক পূরাদমে যাতায়াত করিতে লাগিল। কৃষ্ণদয়ালের মতামত দিবার মত অবস্থা ছিল না, কাজেই ব্যাপারটা অনেকটা রাজেন্দ্রাণীর মতেই হইল। ভাল, মন্দ, মাঝারী, সব ক'টি বরের ভিতর সে পছন্দ করিল একটি প্রৌঢ় ব্যক্তিকে, তিনি বিপত্নীক, তবে সন্তানাদি নাই।

সবাই মিলিয়া মেয়েকে বুঝাইবার অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু মেয়ে কিছুতেই বাগ মানিল না, কঠিন মুখে বলিল, "ঐখানে হ'লে আমি করব, নইলে তোমরা কিছুতেই আমার বিয়ে দিতে পারবে না।"

অগত্যা রাজেন্দ্রাণীর বুড়া বরেই বিবাহ হইয়া গেল। মেয়েকে বিদায় দিবার সময় মা খুব গলা ছাড়িয়া চীৎকার করিলেন, মেয়ের মুখে চোখে বিষাদের কোন চিহ্ন দেখা গেল না। অর্দ্ধ-অচেতন পিতাকে প্রণাম করিয়া বাহিরে আসিবার সময় কেবল সে চোখ দুটা সকলের অলক্ষ্যে একবার মুছিয়া ফেলিল।

শ্বশুরবাড়িও সেইরূপ পাষাণ প্রতিমার মত মুখ করিয়াই সে আসিল। বরণাদি হইয়া গেল, মুখদেখার পালা পড়িল। সম্পর্কে তাহার বড় এ-পরিবারে দুই-চারিটি মানুষের বেশী ছিল না, তাঁহাদের মুখদেখা শেষ হইতেই সম্পর্কে কনিষ্ঠের দল আসিয়া প্রণামের ধুম বাধাইয়া দিল। সম্পর্কে বড় ননদ একজন সকলের পরিচয় বলিয়া দিতে লাগিলেন। রাজেন্দ্রাণী অবিচলিত ভাবে, যত যুবক-যুবতী, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়ার প্রণাম লইতে লাগিল। একজনের দিকে খালি তীব্র দৃষ্টিতে একবার তাকাইয়া দেখিল। সে বিমর্ষ বদন একটি যুবক। ননদ

বলিলেন, "তোমার মেজ দেওরের ছেলে রণেন্দ্র।" রণেন্দ্র প্রণামের অভিনয় মাত্র করিয়াই ভীড়ের ভিতর ঢুকিয়া গেল।

বয়সে বড় মেয়ে, বাপের বাড়ি বেশী দিন থাকিতে পাইল না। জোড় ভাঙিতে গিয়া দুই চারি দিন থাকিয়া আবার স্বামীর ঘর করিতে চলিয়া আসিল। আর একদিন শুধু বাপের বাড়ি গেল, সে পিতার মৃত্যুদিনে। বড় সাধের মেয়ে তাঁহার স্বেচ্ছায় যে কেমন করিয়া জীবনব্যাপী তুষানলে দাহ বরণ করিয়া লইল তাহা ভাল করিয়া না বুঝিয়াই সৌভাগ্যক্রমে কৃষ্ণদয়াল পৃথিবী ত্যাগ করিলেন।

রাজেন্দ্রাণী পিতাকে শেষ দেখা দিয়াই চলিয়া আসিয়াছিল। একলা মানুষের ঘর, একদিনও সংসার ফেলিয়া কোথাও থাকা চলে না। ইহারই জন্য তাহার স্বামী দেখিয়া-শুনিয়া বড়সড় শিক্ষিতা মেয়ে বিবাহ করিয়াছেন, যাহাতে আসিয়াই গৃহিণীর আসন গ্রহণ করিতে তাহার কিছুমাত্র অসুবিধা না হয়।

চতুর্থীর দিন সে খুব ঘটা করিয়া পিতৃশ্রাদ্ধ করিল। আগের রাত্রে সারা রাত মাটিতে পড়িয়া কাঁদিয়া তাহার অশ্রুর স্রোত শুকাইয়া ফেলিল। পরদিন তাহার পাথরের মূর্ত্তির মত চেহারা দেখিয়া সকলে আড়ালে বলাবলি করিল, "ধন্যি মেয়ে বাবা। চোখে এক ফোঁটা জল নেই। মেয়েমানুষের এমন পাষাণ হ'তে নেই।"

সারাদিন খাওয়া-দাওয়ার কলকোলাহল চলিল, বিকালে একটু মন্দা পড়িল। রাজেন্দ্রাণী তাহার শয়ন-কক্ষের প্রশস্ত বারান্দায় একলা বসিয়া ছিল, তাহার স্বামী নীচে আত্মীয়-কুটুম্বের আপ্যায়নে ব্যস্ত। হঠাৎ রণেন্দ্র সোজা উপরে উঠিয়া আসিল। রাজেন্দ্রাণীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাকে এত দিনের মধ্যে একদিনও একলা পাইনি। জিজ্ঞাসা করি, এতখানির কিছু দরকার ছিল কি? আমাকে অবজ্ঞা ক'রে ভুলে যেতেও ত পারতে?"

রাজেন্দ্রাণী স্বামীর ঘরে আসিয়া এই বোধ হয় প্রথম হাসিল, বলিল, "আপনারই কাছে দুটো জিনিষ শিখেছি, এক—পিতৃমাতৃ আজ্ঞা একেবারেই অলঙ্ঘনীয়, আর এক—টাকার বড় জিনিষ জগতে কিছু নেই।"

রণেন্দ্র চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর বলিল, "আমার অপরাধে তুমি আমাদের সমস্ত পরিবারটার উপরে শোধ তুলবে? জানই ত জ্যাঠামশায়ই আমাদের ভরসা।"

রাজেন্দ্রাণী বলিল, "আমার নিজের স্বার্থ দেখতে হবে ত?"

রণেন্দ্র বুঝিল, আর বাক্যব্যয় বৃথা। তাহার বিশ্বাসঘাতকতার যথার্থ মূর্ত্তি আজ সে দেখিতে পাইল। যে ছিল ফুলের মত কোমল, ভোরের আলোর মত নির্ম্মল, সে-ই আজ পাষাণের মত কঠিন, সর্পের মত ক্রূর হইয়া দাঁড়াইয়াছে, রণেন্দ্রেরই পাপে। রণেন্দ্রের সাধ্য নাই আর এই পাথরকে মানুষ করিবার। সে ধীরে ধীরে নামিয়া গেল।

রাজেন্দ্রাণী এবং তাহার বাবার সাংসারিক জ্ঞান একেবারেই নাই বলিয়া রাধারাণী আক্ষেপ করিতেন। কিন্তু তিনিও এবার স্বীকার করিলেন যে, রাজু তাঁহাকেও হার মানায়। বছর ঘুরিতে-না-ঘুরিতে কেমন করিয়া বৃদ্ধ স্বামীকে ভুলাইয়া তাঁহার ধনসম্পত্তির অখণ্ড অধীশ্বরী যে সে হইয়া বসিল, তাহা শুধু ভগবানই জানেন। আশ্রিত আত্মীয়বর্গ একেবারে বঞ্চিত হইয়া অভিশাপে ও গালাগালিতে আকাশ ফাটাইতে লাগিল, তাহার কিছুই সে কানে তুলিল না। রাধারাণী মাঝে মাঝে শিহরিয়া উঠিতে লাগিলেন, কিন্তু কোনো প্রতিকার খুঁজিয়া পাইলেন না। মেয়ে তাঁহার সঙ্গে সকল সম্পর্কই তুলিয়া দিয়াছিল। কয়েকটা বৎসর কাটিয়া গেল। তাহার পর বিধবা রাধারাণী কাঁদিতে কাঁদিতে আর একবার মেয়েকে বাড়ি লইয়া আসিলেন। সেও তাঁহার বেশ ধরিয়াছে, কিন্তু তাহার চোখে আজও জল নাই। মাকে বরং বুঝাইয়া বলিল, "অনর্থক কাঁদ কেন বল ত? মানুষের যাবার সময় হ'লে সে যাবে না?"

রাধারাণী অবাক হইয়া বলিলেন, "হাঁ রে, তোর বুক কি পাথর দিয়ে গড়া? হাজার হোক স্বামী, ক'বছর ঘর করেছিস, তার জন্যেও চোখে জল নেই?"

রাজেন্দ্রাণী মুখটা বাঁকাইয়া অন্য ঘরে চলিয়া গেল।

মায়ের কাছে থাকিতে আর তাহার প্রাণ চায় না। এ বাড়ির এখন আর সে কেহ নয়। কিন্তু থাকিবে কোথায়? নিজের প্রসাদতুল্য বাড়ি শ্মশান হইয়া পড়িয়া আছে, কিন্তু একাকিনী সেখানে সে থাকিবে কেমন করিয়া? ঐশ্বর্য্যের অন্ত নাই, কিন্তু কোন্ কাজে তাহা আজ আর লাগিবে? তাহার পথ ত এখন সীমাহীন মরুভূমির ভিতর দিয়া?

রাজেন্দ্রাণী ক্রমেই যেন জমিয়া পাষাণ হইয়া যাইতে লাগিল। রাধারাণী তাহাকে বুঝাইতে লাগিলেন, "ওরে

মা, অমন করিস না, দেখ আমাকে। কপাল পুড়লেও মানুষকে বেঁচে থাকতে হয়।"

রাজেন্দ্রাণী হঠাৎ বলিল, "মা, আমার সেই দেওরপো রণেন্দ্রকে একবার ডেকে দিতে পার ?"

মা কঠিন মুখে বলিলেন, "তাকে আবার কেন ?"

রাজেন্দ্রাণী বলিল, "দরকার আছে।"

রাধারাণী অগত্যা ছোটছেলে বীরেন্দ্রকে দিয়া রণেন্দ্রকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন।

রণেন্দ্র প্রথম আসিতে চাহিল না, তাহার পর অনেক বলা-কহার পর আসিল।

তাহাকে বৈঠকখানায় বসাইয়া আসিয়া বীরেন্দ্র গিয়া দিদিকে খবর দিল। রাজেন্দ্রাণী বাক্স খুলিয়া একখানা মোটা খাম বাহির করিল, সেইখানা হাতে করিয়া বাহিরের ঘরে চলিল।

রণেন্দ্র তাহাকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল মাত্র, কোনো সম্ভাষণের চেষ্টা করিল না।

রাজেন্দ্রাণী খামখানা তাহার দিকে বাড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "এটা সাবধানে রাখুন।"

রণেন্দ্র একটু ইতস্ততঃ করিয়া খামখানা হাতে করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এটা কি ?"

রাজেন্দ্রাণী বলিল, "আমার দানপত্র। যা-কিছু আমি জোর ক'রে অন্যের মুখ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলাম, তা আবার ফিরিয়ে দিলাম।"

রণেন্দ্র মুখ লাল করিয়া বলিল, "না দিলেই হ'ত। দেখছ ত হাজার কষ্টেও আমরা এখনও মরিনি। তোমার শোধ-তোলা যে ব্যর্থ হয়ে গেল ?

রাজেন্দ্রাণী বলিল, "ব্যর্থ আর কই ? এতেই সম্পূর্ণ হ'ল। যে টাকার গর্ব্বে নারীহত্যা করতে তোমার বাধেনি, সেই টাকা আজ ভিখারীর মত আমারই হাত থেকে নিলে ত ?

রণেন্দ্রের ইচ্ছা করিতে লাগিল খামখানা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়, কিন্তু হাত আর তাহার উঠিল না। দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে তাহার মনুষ্যত্বের কিছু আর অবশিষ্ট ছিল না।

বীরেন্দ্র একটু দূরে দাঁড়াইয়াছিল। সে কাছে আসিয়া ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "সব ত খুব ঘটা ক'রে বিলিয়ে দিচ্ছ, নিজের জন্যে কি রাখলে ?"

রাজেন্দ্রাণী হাসিয়া বলিল, "ভয় নেই, তোদের ঘাড়ে চড়ব না। মা শিখিয়েছিলেন ক্রীতদাসীর মত বাধ্যতা, বাপ শিখিয়েছিলেন বনের হরিণের মত স্বাধীনতা। কোনো পথে ত শান্তি পেলাম না। এবার নিজে রাস্তা খুঁজে দেখব।" বীরেন্দ্র দুমদুম করিয়া মাকে খবর দিতে চলিয়া গেল।

রণেন্দ্র এতক্ষণে জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাবে, রাজেন্দ্রাণী ?"

রাজেন্দ্রাণী বলিল, "ভালবাসার পথেও ভুল করেছি, হিংসার পথেও ভুল করেছি, আর কোনো পথ আছে কি-না এবার দেখব। আজ রাত্রেই এখান থেকে চলে যাব।"

রণেন্দ্র বলিল, "তোমার ঠিকানাটা আমায় দেবে ?"

রাজেন্দ্রাণী সংক্ষেপে বলিল, "না।"

মহিলা-সংবাদ

শ্রীমতী হেমলতা দেবী সরোজনলিনী নারীমঙ্গল-সমিতির অবৈতনিক সম্পাদিকারূপে কার্য্য করিতেছেন। সরোজনলিনী নারীমঙ্গল-সমিতি নানাভাবে বাংলার নারীদের সাধারণ ও কার্য্যকরী বিদ্যাশিক্ষার সুবিধা করিয়া দিতেছেন। শ্রীমতী হেমলতা দেবী পুরীর লেডী বসন্তকুমারী বিধবাশ্রম ও অন্যান্য কয়েকটি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। তিনি সরোজনলিনী নারীমঙ্গল-সমিতির মুখপত্র 'বঙ্গলক্ষ্মী' নামে সচিত্র মাসিক পত্রিকার সম্পাদিকা।

শ্রীমতী মাই ওয়ারেরকর "মহিলা" নামে একটি মরাঠী মাসিক পত্রিকা সম্পাদন করিতেছেন।

শ্রীমতী বিমলা গডরে লণ্ডনের র‍্যাচেল ম্যাক্‌মিলান ট্রেনিং কলেজে কিছুকাল অধ্যয়ন করিয়া নার্সারী স্কুল টিচার্স ডিপ্লোমা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে কোন ভারতীয় মহিলা এই ডিপ্লোমা লাভ করেন নাই।



শ্রীমতী হেমলতা দেবী



শ্রীমতী মাই ওয়ারেরকর



শ্রীমতী বিমলা গডরে

গোরখপুরে প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলন

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলন সম্বন্ধে "প্রবাসীতে" আগে কয়েক বার লেখা হইয়াছে, পরেও লেখা হইবে। যাহাদের ভাষা এক, তাহারা যেখানেই থাকুক, তাহাদের পরস্পরের সহিত যোগ রক্ষা করা আবশ্যক। তাহারা যদি বৃহত্তর লোকসমষ্টির অঙ্গীভূত থাকে, যেমন বাঙ্গালীরা বৃহত্তর ভারতীয় মহাজাতির অঙ্গীভূত, তাহা হইলেও তাহাদের নিজেদের মধ্যে সংহতি আবশ্যক। ইহার প্রয়োজন আরও বেশী করিয়া অনুভূত হয়, যদি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর এই লোকসমষ্টি কোন প্রকারে অসুবিধাগ্রস্ত হয়। সেইরূপ অসুবিধা যে অধুনা বাঙালীদের ঘটিয়াছে, তাহা বিশেষ করিয়া বলা অনাবশ্যক। সমগ্রভারতীয় মহাজাতির সাধারণ যে-সব অসুবিধা আছে, বাঙালীদের তাহা ত আছেই। তদতিরিক্ত কতকগুলি স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয়, রাজনৈতিক ও আর্থিক অসুবিধা বাঙালীদের ঘটিয়াছে। এই জন্য বাঙালীদের ঐক্য খুব বেশী হওয়া দরকার। বলা বাহুল্য, এই ঐক্যের উদ্দেশ্য অন্য কাহারও অনিষ্টসাধন নহে—ইহা কেবল মাত্র আপনাদের কল্যাণসাধন এবং অপর সকলেরও কল্যাণসাধনের নিমিত্ত আবশ্যক।

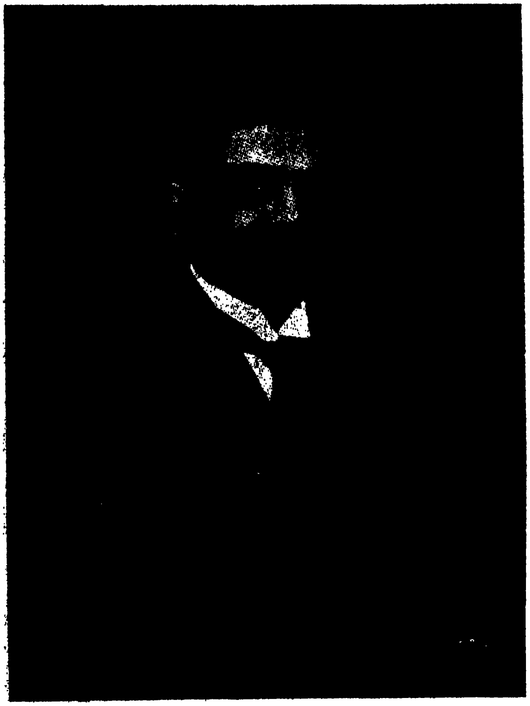
ভারতবর্ষের কোন প্রদেশের কোন জাতিই সমগ্রভারতীয় মহাজাতির অন্তর্ভূত অন্যান্য জাতি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে নিজ নিজ কল্যাণের পথে অগ্রসর হইতে পারে না। প্রত্যেক জাতিরই সমগ্র মহাজাতির অন্যান্য অংশের যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও কৃষ্টি হইতে কিছু শিখিবার, কিছু অনুপ্রাণনা লাভ করিবার আছে। আমরা বাঙালীরা বঙ্গে থাকিয়াও এই প্রকার কিছু শিখিতে ও অনুপ্রাণনা লাভ করিতে পারি; আবার যে-সব বাঙালী বঙ্গের বাহিরে বাস করেন, তাঁহাদের মারফতেও শিক্ষা ও অনুপ্রাণনা পাইতে পারি। ভারতীয় মহাজাতির অন্য সব অংশকে আমাদের যাহা দিবার আছে, তাহাও আমরা কিছু সাক্ষাৎভাবে, কিছু বঙ্গের বাহিরের বাঙালীদের হাত দিয়া দিতে পারি।

প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের দ্বারা যদি কেবলমাত্র নানা প্রদেশের বাঙালীদের আলাপ-পরিচয় ও সদ্ভাব-বৃদ্ধির সুযোগ হইত,তাহা হইলেও তাহা কম লাভ হইত না। কিন্তু তদতিরিক্ত অন্য লাভও আছে। এই সম্মেলনে যে-সব অভিভাষণ ও প্রবন্ধাদি পঠিত হয়, তাহা এইরূপ অন্যান্য সভার অভিভাষণাদি অপেক্ষা উৎকর্ষে হীন নহে। ইহাতে আলোচনাও যোগ্যতার সহিত হইয়া থাকে। সুতরাং নূতন নূতন স্থান দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে নানাবিষয়ক জ্ঞানলাভের এবং চিন্তার উন্মেষের সুযোগও সম্মেলনে হয়। যদি সমুদয় অভিভাষণ ও উৎকৃষ্ট প্রবন্ধাদি একত্র ছাপিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমাদের কথার যথার্থতা সহজেই উপলব্ধ হইত। কিন্তু তাহা করিতে পারা যাইবে না। আমি অভিভাষণগুলি হইতে কেবল কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করিব। তাহাও যে সকল স্থলে উৎকৃষ্টতম অংশ, তাহা নহে।

যাহা হউক, তাহা হইতে যদি ইহা বুঝিবার সুবিধা হয়, যে, বাঙালী যেখানেই থাকুন, সেখানেই বঙ্গের মানসিক পরিবেষ্টন কতকটা বিদ্যমান আছে, সেখানেই ছোট ছোট বঙ্গ বিরাজিত আছে, তাহা হইলে তাহাও কম লাভ নহে। জার্ম্যানদের একটি কবিতা আছে যাহা, "জার্ম্যানদের পিতৃভূমি কোথায়? তাহা কি প্রুশিয়া? তাহা কি সোয়াবেন?" এইরূপ প্রশ্নের উত্তরস্বরূপ। উত্তর কতকটা এই মর্ম্মের যে, যেখানেই অধিবাসীদের মাতৃভাষা জার্ম্যান, সেই স্থানই জার্ম্যানী। আমরা জার্ম্যানদের মত শক্তিমান্ ও জ্ঞানবান্ জাতি নহি—ভবিষ্যতে হয়ত হইতে পারি। কিন্তু আমরা যাহাই হই, আমরাও বলিতে পারি, যেখানেই কোন বাঙালী বাস করে ও বাংলা ভাষায় কথা বলে, তাহাই বাঙালীর পিতৃভূমিস্বরূপ ও বৃহত্তর বঙ্গের অংশ। ভারতবর্ষের কোন প্রদেশেরই সব অধিবাসীর মাতৃভাষা এক নহে, ভিন্ন ভিন্ন ছোট বড় অংশের মাতৃভাষা ভিন্ন ভিন্ন। এই জন্য তাহারাও যে-যে প্রদেশে বাস করে তাহা তাহাদের পিতৃভূমিস্বরূপ এবং বৃহত্তর গুজরাট, বৃহত্তর উড়িষ্যা, বৃহত্তর বিহার ইত্যাদির অংশ। এই প্রকারে ভারতবর্ষের সব অংশ সব ভারতীয়ের পিতৃভূমি।

উদ্বোধন সঙ্গীতের পর গোরখপুরে সম্মেলনের কাজ আরম্ভ

হয়। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি এডভোকেট শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দাস অসুস্থতানিবন্ধন তাঁহার অভিভাষণ স্বয়ং পড়িতে



শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দাস

পারেন নাই। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ললিতমোহন কর কাব্যতীর্থ, এম্-এ, বি-এল তাহা পাঠ করেন। দাস-মহাশয়ের অভিভাষণ হইতে কয়েকটি বাক্য গত মাসের প্রবাসীতে উদ্ধৃত করিয়াছি। তাহাতে গোরখপুরের প্রাচীন ইতিহাস বর্ণিত আছে, এবং গোরখপুর জেলায় ও তাহার সন্নিকটে বুদ্ধদেব, কবীর প্রভৃতি মহাপুরুষ ও সাধুসন্তদের জীবনচরিতের সহিত সম্পর্কিত স্থানসকলের উল্লেখ আছে। গোরখপুরের বাঙালীদের মধ্যে যাঁহারা বাঙালীদের এবং সর্ব্বসাধারণের হিতচেষ্টা করিয়াছেন, এই অভিভাষণে তাঁহাদেরও উল্লেখ আছে। যে-যে প্রদেশে প্রবাসী বাঙালী যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের সহিত সেই সেই প্রদেশের অধিবাসীদের ঘনিষ্ঠতা ও সদ্ভাব-বৃদ্ধি প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের অন্যতম উদ্দেশ্য। প্রবাসী বাঙালীরা কেবল স্থানীয় প্রবাসী বাঙালীদের হিতকর কাজই করেন, বা তাহাই তাঁহাদের কর্ত্তব্য, তাহা নহে। তাঁহারা সমগ্রভারতীয় এবং বঙ্গের বাহিরের প্রাদেশিক হিতকর কাজও করেন এবং তাহা করাও কর্ত্তব্য। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের "বঙ্গের বাহিরে বাঙালী" পুস্তকে এইরূপ নানা কাজের উল্লেখ আছে। কিন্তু এ-বিষয়ে তিনি কিংবা আর কেহ একটি আলাদা বহি লিখিলে ভাল হয়। তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, যে, বাঙালীরা যেখানেই থাকুন, প্রাদেশিকতা পরিহার করিয়া জনহিতকর কাজ তাঁহারা করিয়া থাকেন। এরূপ একটি বৃত্তান্ত-পুস্তক বাহির হইলে এবং তাহার মর্ম্ম ইংরেজী ও হিন্দীতেও প্রকাশিত হইলে বাঙালীদের সম্বন্ধে অবাঙালীদের কোন কোন ভ্রান্ত ধারণা দূর হইবার সুবিধা হইতে পারে।



অধ্যাপক শ্রীললিতমোহন কর ও সুজাতা দেবী

সম্মেলন অতঃপর যেখানে যেখানে হইবে, তথায় নিয়মিতরূপে এই একটি রীতি প্রবর্ত্তিত হওয়া আবশ্যক, যে, কোন একদিন অবাঙালীদের সহিত সমবেত ভাবে সম্মিলিত হইবার একটি সময় নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবে। তা ছাড়া, যে-সব অবাঙালী বাংলা পড়েন ও বুঝেন, সম্মেলনের সকল দিনেই তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিলে ভাল হয়।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ পঠিত হইবার পর সভাপতি লক্ষ্ণৌয়ের ব্যারিষ্টার কবি অতুলপ্রসাদ সেন তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি গোরখপুর আসিয়াছিলেন। সম্মেলনের "প্রবাসী" নামটি সম্বন্ধে তিনি বলেন :—

যদিচ আমরা বাঙ্গালা দেশের বাইরে বাস করি, তবু নিজেদের প্রবাসী বলতে আমি সঙ্কোচ বোধ করি। ভারতে বাস ক'রে ভারতবাসী নিজেকে পরবাসী কি ক'রে বলবে? সেটা বড়ই অশোভন। তাই আমি প্রথম থেকেই প্রবাসী আখ্যার বিরোধী। একবার কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার এ-সম্বন্ধে কথা হয়; তিনিও 'প্রবাসী' নামের পক্ষপাতী নন। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম 'বহির্বঙ্গ সাহিত্য-সম্মেলন' বললে কি রকম হয়; তিনি বলেছিলেন—বেশ ভাল কথা, 'বহির্বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলন' বলতে পার অথবা 'বঙ্গেতর সাহিত্য-সম্মেলন' বলতে পার। যদিও আমাদের এ সম্মেলনের একাধিক বার নাম পরিবর্ত্তন হয়েছে, তবু আমি এ-বিষয়ে পরিচালকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তবে এ-কথা বলতেই হবে, 'প্রবাসী' নামটা চলে গেছে, কেমন যেন ছাড়ানো যায় না। প্রবাস কথাটার মানে হয়ে দাঁড়িয়েছে বাঙ্গালা দেশের বাইরে। প্রবাসী নামে যত কিছুই আপত্তি উত্থাপন করি না কেন, এ-কথা স্বীকার করতেই হবে বাঙ্গালা দেশ আমাদের আপন দেশ, আমাদের মাতৃভূমি, বাঙ্গালা ভাষা আমাদের মাতৃভাষা। প্রতি বৎসর এ সম্মেলন আমাদের এ কথাটি নূতন ক'রে যেন মনে করিয়ে দেয়। এ দেশকে আমরা আপন দেশ ব'লে মনে করব, কিন্তু জন্মভূমি যে সকল দেশের চেয়ে আপন তা ভুললে চলবে কেন? তাতে এ দেশকে একটুও অবজ্ঞা করা হয় না। আমরা অনেক স্ত্রীলোককে 'মা' বলে সম্বোধন করি, তাতে মাতৃত্বের গৌরব বৃদ্ধি পায়, কিন্তু যে মা পেটে ধরেছে সে মা কিন্তু অন্য মা'দের চেয়ে একটু পৃথক: সে জননী, শুধু মা নয়। বাঙ্গালা দেশ আমাদের জননী এ-কথাটি মনে রাখা বড় দরকার।

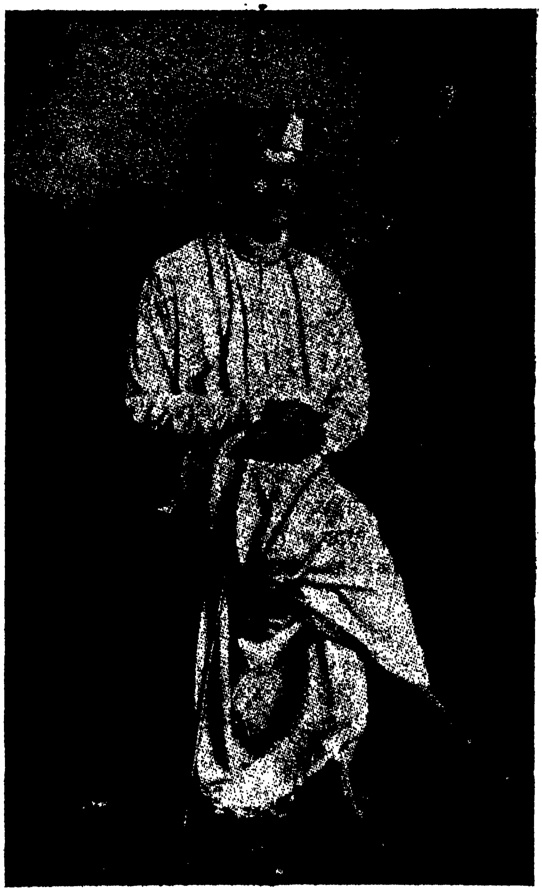
সেদিন আমার দেশের কয়েকটি ভাই আমাকে তাদের নবজাত পত্রিকার জন্য একটি কবিতা বা গান লিখে পাঠাতে বিশেষ করে অনুরোধ করেছিলেন। তখন আমার দেশের গ্রামখানির কথা মনে পড়ে গেল। সেই পদ্মানদীর ধার, সেই খোলা মাঠ, খোলা প্রাণ, পাখীর গান, বকুল ফুল হরির লুটের বাতাসা, মায়েদের ভালবাসা, ছেলেদের সঙ্গে খেলা, সব মনে পড়ে গেল। আমার সেই মিষ্টি দেশটি আমার চোখের সামনে আমার প্রাণের সামনে ভাসতে লাগল, ভাল করে মনে হ'ল আমি ভুলিনি ভুলিনি আমার দেশমাতাকে যদিও প্রায় পঞ্চত্রিংশ বৎসর সে গ্রামখানিতে যাইনি। দূর দেশে থাকলে কি হবে, মা'র টান বড় টান।

যদিও এ-দেশও আমাদেরই দেশ, এ-দেশেই আমরা অনেকে ঘর বেঁধেছি, নানা কাজে এ-দেশেই নিজেকে জড়িয়ে ফেলছি, এ-দেশের লোকদের বড় আপন মনে হয়, তাদের স্নেহ করি, তাদের স্নেহ পাই, তাদের সেবা করে আনন্দ পাই, কৃতার্থ হই, হয়ত এ-দেশেই ছাইটুকু রেখে যাব, তবু—তবু—সেই যে বড় বড় নদীর দেশ, বর্ষা ও ঝড়ের দেশ, সেই যে ম্যালেরিয়া-ক্লিষ্ট আমার ভাইবোনগুলি, সেই যে ভাটিয়ালী, বাউল ও কীর্ত্তন গান, সেই যে ভাবপ্রবণ জাতিটি, আর সেই যে আমার অতি মিষ্ট বাঙ্গালা কথা ও বাঙ্গালা ভাষা, সে যে আমার স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমি, তাকে ত ভুলতে পারি না।

তবে এ কথা আমাদের মনে রাখতেই হবে যে যদিও আমরা জন্মভূমি থেকে দূরে রয়েছি, তবু এ-দেশও আমাদেরই দেশ, এ আমাদের জন্মভূমি না হলেও কর্ম্ম-ভূমি অন্ন-ভূমি। এ দেশই আমাদের জীবিকার সংস্থান করে দিচ্ছে। অনেক বাঙ্গালী আছেন যাঁদের এ দেশই জন্মভূমি। এ দেশের অধিবাসীরা আমাদের ভাইবোন; ভাইবোন ভেবেই এদের বুকে টেনে নিতে হবে। অন্তরের ভালবাসা এদের দেওয়া চাই। মনে বা মুখে এ দেশের লোকেদের তাচ্ছিল্য করলে নিজেদেরই হীনতা ও অনুদারতা প্রকাশ পাবে। চাণক্য বলে গেছেন—'উদারচরিতানান্ত বসুধৈব কুটুম্বকম্'; মনে রাখবার কথা, জীবনে পালন করবার কথা।

"গোরক্ষপুরের সন্নিকটেই দেবদেব বুদ্ধদেবের জন্ম ও মহাপ্রস্থানের স্থান," এই তথ্যটিকে উপলক্ষ্য করিয়া সভাপতি মহাশয় বলেন:—

জানি না, আমার মনে হয় যদি বৌদ্ধ ধর্ম্ম এদেশ থেকে অপসৃত না হ'ত, তা হ'লে হয় ত এদেশের এত দুর্গতি হ'ত না। বৌদ্ধ ধর্ম্মের



শ্রীযুক্ত অতুলপ্রসাদ সেন

সাম্য ও একজাতীয়তা ভারতবাসীকে এত ছিন্নবিচ্ছিন্ন হ'তে দিত না। যে সাধনার উপায়গুলি বুদ্ধদেব নির্দ্দেশ ক'রে দিয়ে গিয়েছেন তা আজ আবার আমাদের মনে করবার দিন এসেছে—সদ্দৃষ্টি, সৎসঙ্কল্প, সদ্বাক্য, সদ্ব্যবহার, সদুপায়ে জীবিকা অর্জ্জন, সৎচেষ্টা সংস্মৃতি।' আমি আমাদের বাঙালী ভাইবোনদের বিশেষ করে আজ এ উপদেশ কয়টি মনে রাখতে অনুনয় করি। তা হ'লে আমরা এদেশীয়দের সঙ্গে সখ্যভাব রক্ষা করে চলতে পারব।

'বহির্বঙ্গীয়' বাঙালীদের মধ্যেও দলাদলি লক্ষ্য করিয়া সেন মহাশয় বলেন,

"প্রথম কথাই হচ্ছে বহির্বঙ্গীয় বাঙ্গালীদের মধ্যে মিত্রতাস্থাপন।"

"আমি আমার বাঙ্গালী ভাইদের বিশেষ করে মিনতি করি, এ দুর্ভাগ্যের হাত হ'তে নিষ্কৃতি পেতে যেন সকলেই চেষ্টা করেন।"

"আর একটি আমাদের প্রধান প্রয়োজন ও কর্ত্তব্য—বাঙ্গালার বাইরে বাঙ্গালা সাহিত্যের সাধনা ও প্রচার।" "ভারতের সমগ্র সাহিত্যের মধ্যে যে বাঙ্গালা সাহিত্য সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছে তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। কি করে করবে? জগৎ যে সে-কথা স্বীকার করে বসে আছে।" "এমন যে আমাদের ভাষা—আমাদের অপূর্ব্ব সম্পদ, তা আমরা বঙ্গের বাইরে বাঙ্গালীরা কি সম্ভোগ করব না? তাই বলি এদেশীয় বাঙ্গালী ভাইবোনেরা এদেশেও মাতৃভাষার পূজায় সমারোহ করো। এ পূজায় যে আমাদের শুধু আনন্দ তা নয়; এবিষয়ে আমাদের দায়িত্বও আছে। বাঙ্গালী ছোট ছোট মেয়েরা যখন বাঙ্গালা অলঙ্কারের সঙ্গে সামঞ্জস্য ক'রে এদেশীয় অলঙ্কারও পরে, বড় মধুর দেখায়। তেমনি আমরাও এদেশীয় সাহিত্যের ভূষণভাণ্ডার থেকে রত্ন সংগ্রহ করে বাঙ্গালা সাহিত্য-সুন্দরীকে নূতন ভূষণে অলঙ্কৃত করতে পারি। এদিকে আমাদের দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।"

অতঃপর সভাপতি মহাশয় "সাহিত্যের প্রধান তিনটি উপকরণ ভাব, ভাষা ও ভঙ্গী" সম্বন্ধে সংক্ষেপে তাঁহার মত ব্যক্ত করেন।

কয়েকটি আবর্জ্জনা আমাদের সাহিত্যসম্পদকে কিঞ্চিৎ পঙ্কিল করে তুলছে। কোনও কোনও লেখা অশ্লীলতাদোষে দুষ্ট। আর্টের দোহাই দিয়ে, বাস্তবতার দোহাই দিয়ে সাহিত্যে অশ্লীলতা প্রচলন ও প্রচার করলে অন্যায় করা হবে। বাস্তবতাকে বর্জ্জন করলে সাহিত্য চলে না একথা ত স্বতঃসিদ্ধ। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র কেহই বাস্তবতাকে উপেক্ষা করেন নি। সত্যের উপরেই সাহিত্যের আসন। তবে সব মলিন সত্য বা কুৎসিত বাস্তবতাই সাহিত্যের আধার নয়। কতকগুলি বাস্তবতা সুসাহিত্যে বর্জনীয়। কেন-না, সাহিত্যের আশ্রয় শুধু সত্য নয়, শিব ও সুন্দরও সাহিত্যের আশ্রয়। যে সাহিত্য অশিব, অসুন্দর, সে সাহিত্যের যত বাস্তবতাই থাক না কেন পরিত্যাজ্য।

বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যে আর একটি ত্রুটি কখনও কখনও লক্ষিত হয়। সেটি হচ্ছে ভাবের অস্পষ্টতা। অবশ্য এ-দলের লোকেরা হয়ত বলবেন, এ পাঠকের বুঝবার ক্ষমতার অভাব, লেখকের লেখার দোষ নয়। কোনও কোনও স্থলে হয়ত একথা সত্য কিন্তু আমার মনে হয় না যে একথা সম্পূর্ণ সত্য। কোনও কোনও স্থলে হয়ত লেখকেরা নিজেরাই ঠিক হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন না কি লিখেছেন। তাঁদের কাছে না বুঝতে পারা অথবা না বোঝাতে পারা সাহিত্যকলার একটা কৃতিত্ব।

সাহিত্যের ভাষা সম্বন্ধে গোঁড়ামী করা তাঁহার মতে ধৃষ্টতা।

আমার মতে ভাষার বৈচিত্র্য সাহিত্যের সম্পদ। ইহা লেখকদের রুচি, শিক্ষা ও অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। আমি নিজে যদিও সরল ও সুস্পষ্ট ভাষার পক্ষপাতী, তবু আমি মার্জিত ও সংস্কৃত ভাষা খুব সম্ভোগ করি। যে ভাষা শ্রুতিমধুর, যে ভাষা ভাবকে সুন্দররূপে প্রকাশ করতে পারে, যে ভাষা নিতান্ত আড়ষ্ট বা অস্পষ্ট নয়, তাই সাহিত্যের সমীচীন ভাষা। আমি নিজে সরল ভাষার পক্ষপাতী, কিন্তু তরল ভাষার বিরোধী। আমি নিজে লিখিত ভাষায় প্রাদেশিকতার আতিশয্য অপছন্দ করি। কলিকাতার ভাষা যদিও সাহিত্যের ভাষা হয়ে দাঁড়িয়েছে তবুও তারও আতিশয্য নিয়োজ্য নয়। ধরুন, যদি চট্টগ্রামবাসী কিংবা শ্রীহট্টবাসী এবং বঙ্গের অন্যান্য স্থানের সাহিত্যিকেরা জেদ করেন তাঁদের স্থানীয় ভাষাও বাঙ্গালা সাহিত্যে চালাতে হবে তাহ'লে বাঙ্গালা সাহিত্যের কি দুর্দ্দশা হবে বুঝতেই পারেন। মনে রাখতে হবে, বাঙ্গালা সাহিত্য সমগ্র বাঙ্গালার সাহিত্য, বাঙ্গালী যেখানে আছেন তাঁদেরই সাহিত্য। বড়ই গৌরবের বিষয়, আমাদের বাঙ্গালী মুসলমান ভাইদের মধ্যে অনেক সুসাহিত্যিকের আবির্ভাব হয়েছে। অধিক স্থলেই তাঁদের বাঙ্গালা ভাষা বড়ই মনোরম। তাঁরা অনেকেই সাহিত্যে উচ্চস্থান অধিকার করেছেন। তাঁরাও বাঙ্গালী, তাই তাঁদের ভাষাও বাঙ্গালা। আমি অন্তরের সহিত কামনা করি হিন্দু ও মুসলমান সাহিত্যিকদের ভাষায় যেন কোনও রূপ প্রকট পার্থক্য না এসে পড়ে, উভয়ের আদর্শের আদান-প্রদানে যেন বাঙ্গালা সাহিত্যের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি পায়।

"ভাষার ভঙ্গী অর্থাৎ ষ্টাইল্" তাঁহার মতে, "সাহিত্য-কলার এক প্রধান অঙ্গ।"

বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের একচ্ছত্র সম্রাট রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের প্রভাব বাঙ্গালী লেখক মাত্রেরই উপর অল্প-বিস্তর পড়েছে। শত চেষ্টায়ও যেমন প্রকৃত অনুকরণ সহজ নয় তেমনি শত চেষ্টায়ও প্রধান সাহিত্যিকদের রচনা-ভঙ্গীর প্রভাব এড়ানো সহজ নয়। তবু আমি নবীন লেখকদের বলি, তাঁরা যেন শুধু অনুকরণের চেষ্টা না করেন, তাঁদের নিজের প্রকাশ-ভঙ্গী যেটা আপনা হ'তে আসে সেটীকে যেন যত্নে রক্ষা করেন. অজ্ঞাতসারে অপরের প্রভাব পড়ে পড়ুক। সুলেখক মাত্রেরই রচনা-ভঙ্গীর স্বকীয়তা অক্ষুণ্ণ রাখা বাঞ্ছনীয় মনে করি। মুখোস পরে নিজের আকৃতির দৈন্য অনেক দিন ঢেকে রাখা যায় না। নিজের সাহিত্যের আকৃতিকেই সুপরিমার্জ্জিত করে স্বভাবিক উপায়ে তার সৌষ্ঠববর্দ্ধন করাই শ্রেয় মনে করি। তাতে অন্ততঃ হাস্যাস্পদ হ'তে হয় না।

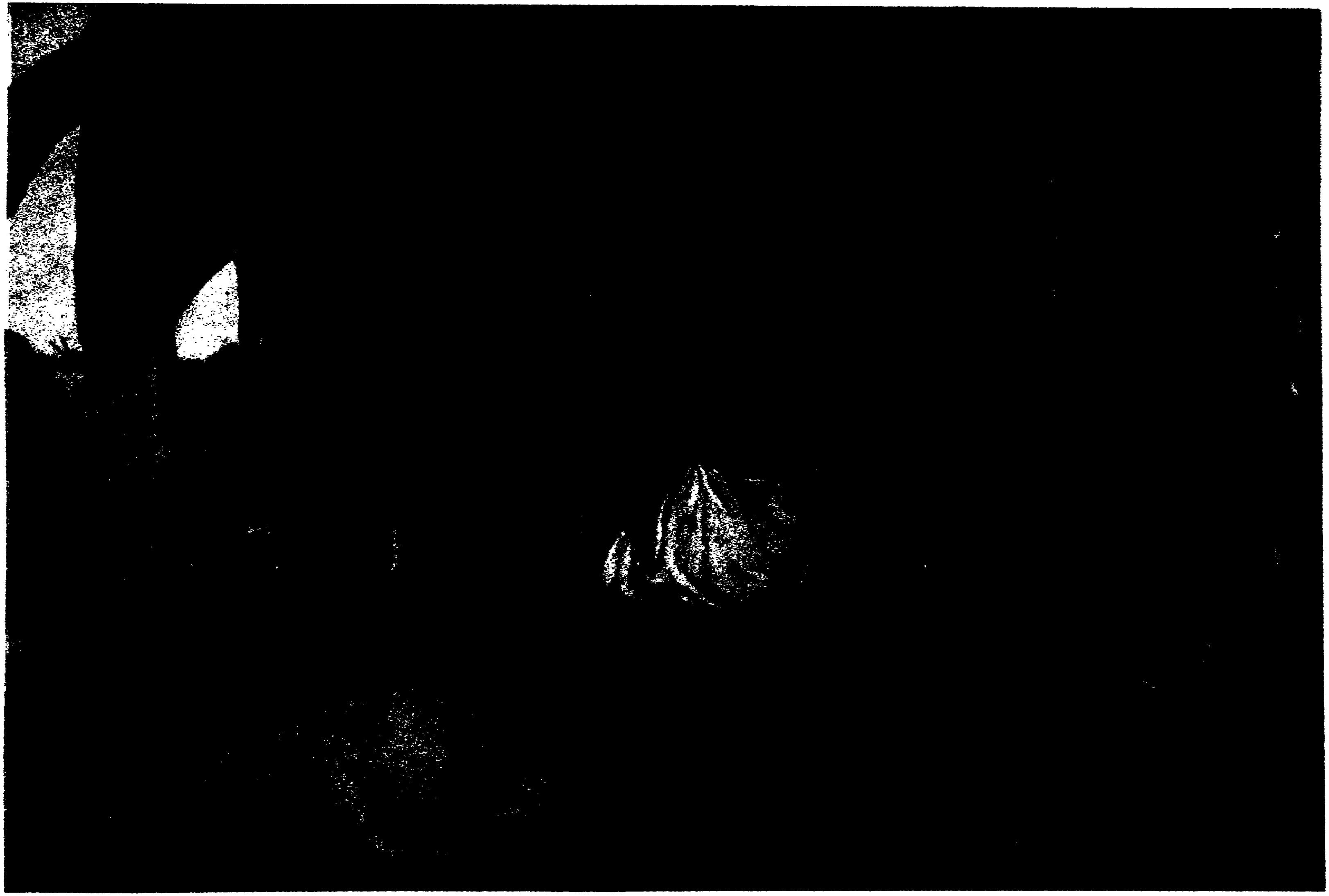
মহিলা-বিভাগের অভ্যর্থনা-সমিতির নেত্রী শ্রীমতী সুজাতা দেবী মহিলাদিগকে স্বাগত সম্ভাষণ করিয়া গোরখপুর যে পুণ্যভূমি তদ্বিষয়ে কিছু বলেন।

"এই নগরের পার্শ্ববর্ত্তিনী রোহিণী নদীর তীরে প্রাচীন কপিলবস্তু নগর। বুদ্ধদেব ঐস্থানেরই রাজপুত্র। তিনি জগতকে নিজের ধর্ম্ম অনুসারে মোক্ষের পথ দেখাইতেছেন শুনিয়া তাঁহার মাতৃস্থানীয়া মাতৃস্বসা তাঁহাকে বলেন, 'তুমি সকলকে মোক্ষের পথ দেখাইতেছ, আর আমাদিগকে দূরে রাখিবে?' তখন বুদ্ধদেব নারীশিষ্যা লইতে সম্মত হন।"

"অতীতের এই সকল কথা ছাড়িয়া বর্ত্তমানের দিকে দৃক্‌পাত করিলে দেখা যায় অনেক স্থানের মত এখানেও নারীদিগের শিক্ষা প্রভৃতি প্রগতির কোন উপায় নাই। এখানে বিশেষ করিয়া বাঙ্গালী মেয়েদের বিদ্যালয়ের অভাব আছে। সেস্থলে গৃহশিক্ষাই একমাত্র অবলম্বন। মেয়েদের শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা হওয়া অতিশয় বাঞ্ছনীয়।"

"আজ আমরা সমবেত হইয়া সাধারণতঃ নারীদিগের জন্য, ও বিশেষ করিয়া এইস্থানের নারীদিগের সর্ব্ববিধ উন্নতির জন্য কি কি করা আবশ্যক তাহার বিবেচনা ও বিচার করিতে পারি।"

মহিলা-বিভাগের সভানেত্রী শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী সরস্বতীর অভিভাষণে অনেক সদুপদেশ সমাবিষ্ট হইয়াছে। তিনি তাহাতে লিখিয়াছেন, প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে যখন গোরখপুরে আসিয়াছিলেন, তখন—



গার্হস্থ্য চিত্র
শ্রীযজ্ঞেশ্বর সাহা

"একটিও বঙ্গীয়া ভগিনীর অসূর্য্যম্পশ্য বদন সন্দর্শন করিতে সক্ষম হই নাই, আজ তাঁহাদের পরবর্ত্তিনীরা অন্তঃপুরের রুদ্ধ দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া পরস্পরের হৃদয়ের আকর্ষণে এখানে শোভায়মান হইয়াছেন। কি সুন্দর দৃশ্য! ইহা যুগমাহাত্ম্য বলিতে হইবেই।"

"কাশীতে এখন অবরোধ নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু উত্তর-পশ্চিমে পর্দ্দা একেবারে দূর হয় নাই। শিক্ষার সঙ্গে সকল নিয়মের



শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী সরস্বতী

পরিবর্ত্তন শোভন হয়। কিন্তু আর একটা দোষ পর্দাপ্রথার মধ্যে ঘটিয়াছে। বৃদ্ধা ও প্রৌঢ়ারা অবরোধ পালন করেন, এবং কিশোরী ও যুবতীগণ হইতে মুক্ত হইয়াছেন। ইহা মোটেই সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। বাহিরের পর্দা ভঙ্গ করিয়া অন্তরের পর্দা ঠিক রাখিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। রমণীর মনে সৎসাহস, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ইত্যাদি আবশ্যক। অসময়ে হঠাৎ বিপদে পতিত হইলে কি দশা হয়? পূর্ব্বে হইতে বাহিরের ভাবগতিকের সহিত পরিচিত হওয়ার অভ্যাস না-থাকিলে এবং পুরুষের সম্মুখে পড়িলে জড়তা দূর হয় না। এইজন্য ভদ্রসমাজে চরিত্রবান্ সম্ভ্রান্ত পুরুষগণের মধ্যে মেলামেশাতে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা দ্বারা আশা করা যায়, যে, তাহা হইলে পুরুষেরাও সংযত ভাবে এবং রমণীর সম্মান রাখিয়া তাঁহাদের সহিত মিশিতে পারিবেন।"

উচ্চশিক্ষায় নারীগণের উৎসাহ দেখিয়া তিনি আনন্দিত, কিন্তু "এই শিক্ষা যে-ভাবে চলিতেছে উহার আরও দ্রুত গতি বাঞ্ছনীয়। বর্ত্তমান কালে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্তা রমণীগণ সচেষ্ট না হইলে কেবল পুরুষদের স্কন্ধে সকল ভার দিলে কার্য্য অগ্রসর হইবে না।" কুটির-শিল্পের বিস্তার এবং সরোজনলিনী দত্ত সমিতির শুভচেষ্টার উল্লেখও তিনি করেন। শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সর্ব্ববিধ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তিনি বুঝাইয়া দেন। মানুষের গৃহপরিবার এবং মানব সমাজ যে উৎকৃষ্ট বিদ্যালয়, তাহাও তিনি বলেন। দশ বার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তিনি বালক-বালিকাদের সহ-শিক্ষার পক্ষপাতী, মেয়েদের সংগীত শিক্ষার এবং অল্পবয়স্ক মেয়েদের মধ্যে নৃত্যকলার প্রচলনের তিনি অনুমোদন করেন, কিন্তু যুবতী মেয়েদের নৃত্যপ্রদর্শনের প্রচলনের তিনি বিরোধী।

সাহিত্য-শাখার সভাপতি, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের অভিভাষণটিতে অবান্তর নানা কথারও



পণ্ডিত শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ

অবতারণা ও আলোচনা তিনি করিয়াছেন, কিন্তু বলিয়াছেন, "আমার অদ্যকার বক্তব্য দুইটি—রামায়ণ ও বিদ্যাসুন্দর।" তিনি বাল্মীকি রামায়ণে যে "ভেজাল জুটিয়াছে" তাহার

বর্ণনা করেন। যাহা কৃত্তিবাসী রামায়ণ বলিয়া প্রচলিত, তাহা যে কত প্রকার পরিবর্ত্তনের পর বর্ত্তমান অবস্থায় পৌছিয়াছে, তাহাতে কৃত্তিবাসী জিনিষ যে কত অল্প, এবং তাহা খুঁজিয়া বাহির করা যে কত কঠিন, তাহা তাঁহার অভিভাষণ পড়িলে বেশ বুঝা যায়।

বিদ্যাসুন্দর সম্বন্ধে তিনি বলেন, যে, উহার গল্প লইয়া হিন্দী, উর্দ্দু, ফারসী এবং ইংরেজীতে পর্যান্ত বই লেখা হইয়াছে, বাংলার ত কথাই নাই। তবে সকলের পূর্ব্বে লেখা হয় সংস্কৃতে, তাহা কাশ্মীরদেশীয় পণ্ডিত কবি বিহ্লণের লেখা।

শাস্ত্রের নামে কি রকম ভেজাল চলে তাহা বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মত নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণের অভিভাষণে প্রদত্ত দুটি দৃষ্টান্ত হইতে বেশ বুঝা যায়। পণ্ডিত মহাশয় বলিতেছেন :—

বাস্তবিকও দেবতারূপীদিগকে কতকটা প্রিভিলেজ দেওয়া ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ উচিত। এই দেখুন মহর্ষি ব্যাসদেব রচিত একখানি পুরাণ, নাম তাহার ভবিষ্য-পুরাণ, বোম্বের ক্ষেমরাজ কোম্পাণী নাগরাক্ষরে মুদ্রিত করিয়াছেন, উহার ৭৬ পৃষ্ঠায় আছে :—

"মহাদেবেন লোকার্থে ভবিষ্যং রচিনং শুভম্"

লোকহিতের জন্য দেবাদিদেব মহাদেব মঙ্গলকর ভবিষ্য-পুরাণ রচিত করিয়াছেন,—অর্থাত্ মহাদেবের রচিত-পুরাণ, মহর্ষি ব্যাসদেব লোকে প্রকাশ করিতেছেন। মহাদের ঐ গ্রন্থে কলিকাতার নাম করিতেছেন।

কলিকাতা-পুরী রম্যা প্রসিদ্ধাভূৎ মহীতলে'। ৪র্থ খণ্ড, ৯২ পৃষ্ঠা

উক্ত পৃষ্ঠারই চব্বিশ শ্লোকে শিবের উক্তিতে 'শান্তিপুর' পর্য্যন্ত পাইতেছি "গঙ্গাকূলে শান্তিপুরং রচিতং তেন ধীমতা।" 'তেন' অর্থাৎ রাজা শান্তিবর্ম্মা গঙ্গাতীরে শান্তিপুর নগর নির্ম্মাণ করিলেন। আবার ঐ শান্তিবর্ম্মার পুত্র রাজা নদীবর্ম্মা গৌড়দেশে 'নদীহা' অর্থাৎ 'নদীয়া,—নবদ্বীপ নির্ম্মাণ করিয়া ফেলিলেন, ইহা মহাদেবের কথায়ই পাইতেছি :—

"চকার নগরীং রম্যাং নদীহাং গৌড়রাষ্ট্রভাক্।" পৃষ্ঠা ৯২, শ্লোক ২৫

ইহা ছাড়া ত্রিকালদর্শী মহাদেব আরও অনেকের নাম করিয়াছেন, ত্রিনয়নের দেখিবার শক্তির ত ইয়ত্তা নাই! তাই 'রামানন্দ স্বামী,' 'শ্রীধরস্বামী' ও তাহার গীতার টীকা, 'জয়দেব ও পদ্মাবতী' এবং 'গীতগোবিন্দ', 'শচীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য', 'শঙ্করাচার্য্য', 'রামানুজাচার্য্য' 'ভট্টোজদীক্ষিত' ও তাহার 'সিদ্ধান্তকৌমুদী' ব্যাকরণ, 'বিল্বমঙ্গল', 'তুলসীদাস' 'আনন্দগিরি' ও তাহার গীতার টীকা, কবীর, নানক, নিত্যানন্দ প্রভৃতির উৎপত্তি—সমস্তই পঞ্চানন পঞ্চমুখে বলিয়াছেন। পৃথ্বীরাজের প্রতিমূর্ত্তির গলায় গুণবতী সংযুক্তার মাল্যদান, জয়চন্দ্র পৃথ্বীরাজের যুদ্ধ পর্য্যন্ত ত্রিলোচন প্রত্যক্ষবৎ বর্ণন করিয়াছেন। যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মাহাত্ম্যবর্ণনেও ভোলানাথের ভুল হয় নাই। তারপর, কৈলাসপতি শঙ্কর কৈলাস ছাড়িয়া একেবারে সমতলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন,—হিন্দু ছাড়িয়া অহিন্দুর দিকে মুখ ফিরাইয়াছেন। কুতুবুদ্দিনকে বলিয়াছেন—

'পৈশাচঃ কতুবুদ্দীনঃ'। (পৃষ্ঠা ৯৩)

পরেই অহিন্দুদের মধ্যে তুলনায় সমালোচনার ছলে ইংরাজদের নাম করিয়াছেন, তারা বড় ভাল লোক,—তারা—

"ঈশ-পুত্র-মতে সংস্থা তেষাং হৃদয়মুত্তমম্।

বাণিজ্যার্থমিহায়াতাঃ—" ঐ, পৃঃ ১২৪

ঈশ্বরের পুত্র যীশুর মতাবলম্বী, বাণিজ্যের জন্য এই দেশে আসিয়াছে এবং

'সর্গর্ষ্যাং কলিকাতায়াং স্থাপয়ামাসুরুত্তমাঃ' পৃঃ ঐ

তাহারা—কলিকাতা নগরীতে কারকারবার আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদের কে রাজা এবং সে রাজার সিংহাসন কোথায় এবং কেই বা তথায় অধিরূঢ়,—দেবাদিদেব তাহাও খুলিয়া বলিয়াছেন—

"বিকটে পশ্চিমে দ্বীপে তৎপত্নী বিকটাবতী"

বিকট অর্থাৎ অতি দুর্গম পশ্চিম দ্বীপে রাজার পত্নী বিকটাবতী—ভিক্টোরিয়া বাস করেন। সেখানে বসিয়া তিনি কি করিয়া এই সাত সমুদ্র তের নদী পারে রাজ্য-শাসন করেন? এ-প্রশ্নের উত্তর—মহাদেব মহাশয়ই দিয়াছেন—

'অষ্ট কৌশলমার্গেণ রাজ্যমত্র চকার হ।'

আটজন কৌশলী অর্থাৎ কাউনসিলারের সাহায্যে রাজ্য করিতেছেন।

ইহার পর বিদ্যাভূষণ মহাশয় একখানি ভেজাল তন্ত্রের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন।

এ দিকে তন্ত্রও বড় কম চলে না। যখন যাঁহার যাহা খেয়ালে উদিত হইয়াছে, তাহাই তন্ত্রের নামে চালাইয়াছেন। সত্য যত প্রকাশ পায় ততই মঙ্গল। বৃথা মোহের দুশ্ছেদ্য রজ্জুতে অষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধিয়া বাঁধিয়া একটা বিরাট জাতিকে দুর্দ্দশার চরম অবস্থায়,—পরম শোচনীয় দশায় আনিয়া ফেলা হইয়াছে। যাহা নিরবচ্ছিন্ন সত্যে পরিপূর্ণ ছিল, লোক-হিতার্থে সঙ্কলিত হইয়াছিল, তাহাতে অনুস্বার-বিসর্গ-যুক্ত কতকগুলি আজগুবি মিথ্যা ভরিয়া দিয়া,—এমন যে অনুপম পুরাণতন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থ তাহাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিতে পূর্ব্বেও যেমন কতগুলি লোক ছিল, এখনও তেমনি আছে। এইবার তন্ত্রের দিকে দৃষ্টি করুন।

প্রধানতঃ দেবাদিদেব মহাদেবের মুখ হইতে তন্ত্র নির্গত। কখনও পার্ব্বতী শুনিতেছেন, কখনও বা অন্যান্য দেবগণ শ্রোতা। কোথাও আবার এই দুইএর অতিরিক্ত শ্রোতাও আছেন।

হিন্দু শব্দের প্রকৃত অর্থ কি, উহা দ্বারা কি বুঝায়, কাহারা হিন্দু নহে,—ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তরে শঙ্কর শঙ্করীকে কৈলাসশিখরে বসিয়া কহিতেছেন :—'প্রিয়ে! তন্ত্রের পশ্চিমাম্নায়ান্তর্গত মন্ত্রসমূহ পারস্য ভাষায় উক্ত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা—আট হাজার আট শত। যে-সমুদয় মন্ত্রের সাধনা দ্বারা কলিকালে পাঁচ জন খান (খাঁ), সাত জন মীর এবং নয় জন শাহ মহাবল-পরাক্রান্ত হইয়া চক্রবর্ত্তী অর্থাৎ সম্রাট্ হইবেন, তাহারা হিন্দুধর্ম্মের বিলোপ সাধন করিবেন। হীন কার্য্যকে যাহারা দোষের চক্ষুতে দেখে তাহারাই হিন্দু। আবার তন্ত্রের পূর্ব্বাম্নায়ে—(তন্ত্রশাস্ত্র চারিভাগে বিভক্ত,—উত্তর, পশ্চিম, দক্ষিণ ও পূর্ব্বআম্নায়) 'পশ্চিমাম্নায়-মন্ত্রাস্তু প্রোক্তাঃ পারস্য-ভাষয়া। অষ্টোত্তরশতাশীতির্যেষাং সংসাধনাৎ কলৌ॥ পঞ্চ খানাঃ সপ্ত মীরা নব শাহা মহাবলাঃ। হিন্দুধর্ম্ম-প্রলোপ্তারো জায়ন্তে চক্রবর্ত্তিনঃ। হীনঞ্চ দূষয়ত্যেব হিন্দুরিত্যুচ্যতে প্রিয়ে! পূর্ব্বাম্নায়ে নবশতং ষড়শীতিঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ। ফিরঙ্গ-ভাষয়া মন্ত্রাস্তেষাং সংসাধনাৎ কলৌ। অধিপা মণ্ডলানাঞ্চ সংগ্রামেষ্বপরাজিতাঃ। ইংরেজা নবষট্‌পঞ্চ লনড্রজাশ্চাপি ভাবিনঃ॥ মেরুতন্ত্র, ২৩ পটল।)—যে সমুদয় মন্ত্র আছে তাহা ফিরঙ্গ-ভাষায় উক্ত, কলিকালে সেই সকল মন্ত্রের সাধনাদ্বারা পাঁচ শত উনসত্তর জন ইংরেজ সংগ্রামে অপরাজেয় হইয়া মণ্ডলের অধীশ্বর অর্থাৎ সম্রাট্ হইবেক। তাহারা লণ্ডুজ অর্থাৎ বর্ত্তমান লণ্ডন-নগর-জাত। সুতরাং তন্ত্রের মতে দেখিতেছি, মহাদেব পারস্যভাষাও একটু একটু জানিতেন, কতজন খাঁ-সাহেব কতজন মীর-সাহেব কতজন শাহানশাহ পারস্যে রাজত্ব করিয়াছেন ও করিবেন—বলিতে পারিতেন, ফিরিঙ্গীদের ভাষা-বিজ্ঞানেও শিবের বিলক্ষণ দখল ছিল, লণ্ডন-নগরে স্থিত ইংরাজদের সংখ্যা তাঁহার নখদর্পণে ফুটিয়া উঠিত এবং 'কৈলাসশিখরে রম্যে গৌরী পৃচ্ছতি শঙ্করং' এর পরই, তিনি হু হু করিয়া প্রিয়াকে সমস্ত ব লয়া যাইতেন।

পুরাণতন্ত্র প্রভৃতির বহু পূর্ব্ববর্ত্তী অপৌরুষেয় বেদবাক্যেও এইরূপ অদল

বদল ও নূতনের সমাবেশ দেখা যায়। যখন যেমন দরকার পড়িয়াছে, স্ব স্ব মতের অনুকূল ভাবে তেমন তেমন পদবাক্যের সমাবেশ করা হইয়াছে।

সম্মেলনের কার্য্যপদ্ধতি যে-প্রকার ছাপা হইয়াছিল, তাহার কিছু ব্যতিক্রম করা হইয়াছিল। মুদ্রিত কার্য্যক্রম এখন খুঁজিয়া পাইতেছি না, ব্যতিক্রমগুলিও আমার মনে নাই। অতএব কালক্রমের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া অভিভাষণগুলির কিঞ্চিৎ আভাস দিয়া যাইতেছি, কোন কোন অভিভাষণে ভাল কথা থাকিলেও তাহা হইতে খাপছাড়া ভাবে কিছু উদ্ধৃত করা কঠিন।

অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্ব শাখার সভাপতি অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র মিত্র বাংলা দেশের দুটি প্রধান সমস্যার আলোচনা করেন। প্রথমটি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিত্তহীনতা—যাহাকে চলিত কথায় ভদ্রলোকদের মধ্যে বেকার সমস্যা বলে। এই সমস্যার সমাধানকল্পে যে-সব প্রস্তাব করা হইয়া থাকে, তিনি স্বীয় অভিভাষণে তাহার প্রতিকূল সমালোচনা করেন। প্রথম প্রস্তাব "যুবকদিগকে কার্য্যকরী বৃত্তি শিক্ষা দিয়া কুটীর-শিল্পে লাগাইয়া দাও।" "ভদ্রলোকের ছেলেদিগকে কেবল কুটীর-শিল্প শিক্ষা দিলেই বৃত্তিহীনতার সমস্যার সমাধান হইবে না," কেন, তাহা তিনি দেখাইয়াছেন।

"তার পর একটা উচ্চ রব উঠিয়াছে—গ্রামে অর্থাৎ জমিতে ফিরিয়া যাও (back to the village)।" এই পরামর্শের অনুসরণ যে দুঃসাধ্য এবং অনুসরণ করিলেও যে তাহার দ্বারা বেকার সমস্যার সম্যক্ সমাধান হইবে না, তাহা তিনি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

উচ্চশিক্ষিত যুবকদিগের কর্ম্মাভাব দূর করিবার জন্য প্রস্তাবিত তৃতীয় উপায় বহুসংখ্যক বৃহৎ কারখানা স্থাপন। সে বিষয়ে যোগেশ বাবু বলেন :—

যথেষ্ট পরিমাণে কলকারখানা স্থাপন করিয়া যে-সব পণ্যের বেলায় আমাদের বিদেশীর সহিত প্রতিযোগিতা করিবার সুবিধা আছে, সেই সমস্ত পণ্য দেশে উৎপাদন করিবার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে এবং তাহাতে কর্ম্মচারীরূপে অনেক শিক্ষিত যুবকের কর্ম্মসংস্থানও হইতে পারে। কিন্তু সর্ব্বাবস্থায়ই এইরূপ কর্ম্মচারীর সংখ্যা সীমাবদ্ধ হওয়া ভিন্ন উপায় নাই। তাহাতে বহুসহস্র যুবকের কর্ম্মসংস্থান হইতে পারে না। বিশেষ বৃহদাকারের শিল্পপ্রতিষ্ঠান বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতবর্ষে, বিশেষ বঙ্গদেশে, কতদূর বাড়াইবার সুযোগ ও সুবিধা আছে, তাহা চিন্তার বিষয়।"

ভদ্রলোকদের মধ্যে বেকার-সমস্যার সমাধানের জন্য যোগেশ বাবুর নিজের প্রস্তাব নিম্নলিখিত বাক্যগুলির মধ্যে পাওয়া যায় :—

"চাষীরা কৃষিজাত দ্রব্য উৎপন্ন করিবে, কারিকর শিল্পোৎপন্ন দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ করিবে, এবং দেশেরই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকে উহার সংগ্রহ ও বণ্টনের ভার লইবে, পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থায় ইহাই স্বাভাবিক কর্ম্মধারা বলিয়া মনে হয়। বাংলা দেশে এই কর্ম্মধারা প্রবর্ত্তিত



শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র মিত্র

করিতে পারিলেই বহুসহস্র শিক্ষিত যুবকের বৃত্তিহীনতা দূর হইতে পারে। এবং তাহাদিগের অর্থসাচ্ছল্যের ফলে প্রচুর পরিমাণে মূলধন সঞ্চিত হইয়া দেশে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সর্ব্ব প্রকারে সুবিধা হইতে পারে।"

তাঁহার অভিভাষণে সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ ভাবে এই প্রস্তাবের সমর্থক যে-সব কথা আছে, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করা আবশ্যক।

কোন দেশেই অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যের দ্বারা দেশে যথেষ্ট পরিমাণে মূলধনের সংস্থান এবং চাহিদার পরিমাণ ও পণ্য বণ্টনের ধারা বিষয়ে একটা ধারণা হইবার পূর্ব্বে সেই দেশে যথেষ্ট পরিমাণে পণ্যউৎপাদক বৃহৎ কলকারখানা স্থাপিত হইয়াছে এরূপ বড় দেখা যায় না। কারণ বাণিজ্য ভিন্ন আবশ্যকীয় অর্থাগম ও বাজারের চাহিদা ও রুচির সন্ধান সাধারণতঃ হয় না। ইতিহাস এই কথার সাক্ষ্য দেয়। ইংলণ্ডের কলকারখানার যুগ আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বে বাণিজ্য, বিশেষ বহির্বাণিজ্য অতিশয় বিস্তৃত হইয়াছিল; এমন কি প্রাচ্য দেশের সহিত বাণিজ্যে ইংলণ্ডের ধনাগমের প্রচুর পরিমাণে সুবিধা হইতেই তথাকার পণ্য-উৎপাদক শিল্পপ্রতিষ্ঠানের আরম্ভ বলিতে হইবে। স্বাধীনতা-যুদ্ধের পর আমেরিকা ইংলণ্ডের সহিত বাণিজ্যশৃঙ্খলমুক্ত হইয়া পৃথিবীর সহিত ব্যবসা বাণিজ্যে প্রচুর পরিমাণে ধনলাভ করার পরেই তথায় কলকারখানার প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত হইয়াছিল। জাতীয় মূলধন অন্তর্বাণিজ্যে ও বহির্বাণিজ্যে সঞ্চিত হইয়া থাকে। প্রাদেশিক হিসাবে ধরিতে গেলে বঙ্গের সুবিধাজনক ভৌগোলিক অবস্থান উহাকে কিয়ৎপরিমাণে ঐ

সুবিধা প্রদান করিয়াছে। তাহাতে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা পূর্ব্বে তথায় ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসার লাভ করে। অন্যান্য প্রদেশের পূর্ব্বে ফলস্বরূপ তথায় মূলধন সঞ্চিত হওয়ায় ঐ প্রদেশ ভারতীয়গণস্থাপিত কার্য্যকর শিল্পপ্রতিষ্ঠানে অর্থাৎ পণ্য উৎপাদনে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের অগ্রণী হইয়াছে। এই বাণিজ্যের ব্যাপারে বাঙ্গালার লোক এখনও বম্বের সমকক্ষ হইতে পারে নাই। সুতরাং কেবল কলকারখানার প্রতিষ্ঠার দ্বারা উচ্চ-শিক্ষিত যুবকদের কর্ম্মের যোগাড় করিয়া দেওয়া খুব সীমাবদ্ধ ভাবেই সম্ভব। কারণ উপযুক্ত পরিমাণ মূলধন, যাহা দ্বারা কলকারখানা প্রতিষ্ঠা করিয়া পৃথিবীর অপরাপর দেশের সহিত প্রতিযোগিতায় কৃতকার্য্য হওয়া যাইতে পারে, তাহা উত্তর-ভারতে, বিশেষ বাঙ্গালা দেশে, এখনও সঞ্চিত হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারা যায় না।

ভারতের, বিশেষ বাঙ্গালা দেশের, বহির্বাণিজ্য বর্ত্তমানে অতিশয় বিস্তৃত, একথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু বাঙ্গালার এই বাণিজ্যে বাঙ্গালীর স্থান অল্প, এমন কি ইহার কোন কোন শাখায় বাঙ্গালী নাই বলিলেও চলে।

অতঃপর বক্তা বাংলা দেশে অন্তর্বাণিজ্যের কথা বলিয়াছেন।

উৎপাদিত পণ্য যাহা বিদেশ হইতে আসিতেছে এবং ভারতবর্ষে প্রস্তুত হইতেছে, তাহার বণ্টন কার্য্যে, অর্থাৎ তাহার ব্যবসায়ে, সহস্র সহস্র লোক নিযুক্ত আছে। এই অন্তর্বাণিজ্য চিরকালই বাঙ্গালীর হাতে ছিল এবং বহির্বাণিজ্য ইংরাজদের আমল হইতেই ইউরোপিয়ানগণ অনেক পরিমাণে দখল করিয়াছিলেন। বন্দর এবং উৎপত্তির স্থান হইতে সুদূর পল্লীর গৃহস্থ বাড়ী পর্য্যন্ত পণ্য বিতরিত হইতে কত প্রকারের কত ব্যবসায়ীর দরকার তাহা আমরা অনেকে ধারণা করিতে পারি না। কিন্তু এক বাঙ্গালা দেশেই বড় বড় সওদাগর অফিস হইতে মুদির দোকান পর্য্যন্ত গণনা করিলে দেখা যাইবে কয়েক লক্ষ লোক এই কার্য্যে নিযুক্ত আছে। কৃষ্যোৎপন্ন কিংবা শিল্পোৎপন্ন পণ্য সংগ্রহ করিয়া বিদেশে কিংবা দেশের অন্যত্র বণ্টনের জন্য প্রেরণের কার্য্যেও বহু সহস্র ব্যক্তি নিযুক্ত আছে। এই উভয় কার্য্যেরই যাঁহারা সংঘটক তাঁহাদের কার্য্য পৃথিবীর সর্ব্বত্রই অসম্ভ্রমজনক বলিয়া আর এখন পরিগণিত হয় না। কিন্তু আমাদের ভদ্রযুবকগণ, বলিতে গেলে, এই পণ্য বণ্টন ও পণ্য সংগ্রহ অর্থাৎ ব্যবসায়ের সহিত একরূপ সম্পর্কবিবর্জ্জিত। কৃষ্যোৎপন্ন দ্রব্যের সংগ্রাহক খরিদ্দার এবং বণ্টনকারী অনেক স্থলেই অবাঙালী। এই সকল সংগৃহীত মালের বিদেশে চালানকারীও সাধারণতঃ বাঙালী নয়। যে মাল বিদেশ হইতে আসে এবং যে মাল ভারতে উৎপন্ন হয়, তাহার উচ্চ স্তরের বণ্টনকারীও সাধারণতঃ অবাঙালী। মধ্যস্তর এবং নিম্নস্তরের কাজ হইতেও বাঙালীরা ক্রমে অপসৃত হইতেছে। ফলতঃ বাঙ্গালার ক্রমবর্দ্ধমান ব্যবসায়ের প্রসার এবং ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে পণ্য ব্যবহার হইতে থাকিলেও এই ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা যোগাইতে ক্রমবর্দ্ধমান শিক্ষিত বাঙালী কোনই অংশ গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। এরূপ অবস্থায় শিক্ষিত যুবকের কর্ম্মাভাব ঘটা স্বাভাবিক। আমাদের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের বৃত্তিহীন যুবকগণের পক্ষে এই ব্যবসাকার্য্যের উপযুক্ততা বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই, এবং তাঁহাদের শিক্ষা এবং বংশমর্য্যাদার দিক হইতে বিবেচনা করিলেও এই সব কার্য্যে তাঁহাদের আত্মসম্মানে কোনরূপ আঘাত লাগিতে পারে না। অসংখ্য যুবককে জানি যাঁহারা এইরূপ ব্যবসার কার্য্যে অতিশয় উৎসাহসম্পন্ন, কিন্তু এ কার্য্যের ভিতর তাঁহারা কোনরূপেই প্রকৃষ্ট হইতে পারিতেছেন না। যাঁহারা পারিতেছেন, তাঁহারাও অল্প সময়ের মধ্যে অকৃতকার্য্য হইয়া আসিয়া পুনর্ব্বার বেকারের দলে যোগ দিতেছেন। বাঙালীদের মধ্যে অতি অল্প-সংখ্যক যুবকই ব্যবসাবাণিজ্যে, বিশেষ খুচরা দোকানের মারফৎ পণ্য-বণ্টনে, কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

বক্তা পূর্ব্বেই বলিয়াছেন, যে, কৃষিজাত দ্রব্য এবং কারিকরদের দ্বারা উৎপাদিত সামগ্রী সংগ্রহ এবং তাহা নানাস্থানে প্রেরণ ও বিক্রয়ের কাজ দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের স্বাভাবিক কর্ম্মধারা; এই কাজ তাহাদের হাতে থাকিলে হাজার হাজার লোক ইহার দ্বারা পালিত হইতে পারে, তাহাদের হাতে টাকা জমিতে পারে, এবং তাহার সাহায্যে বড় বড় কারখানা স্থাপিত হইতে পারে। কিন্তু হয় না কেন? বাধা কি?

আমাদের শিক্ষিত যুবকগণ তাঁহাদের এই জন্মগত অধিকার হইতে বঞ্চিত থাকিতেছেন এবং বিদেশী এবং ভিন্নপ্রদেশীয় ব্যক্তিগণ তাঁহাদের হাত হইতে এই কার্য্য কাড়িয়া লইতেছেন।

কারণ ও বাধা বক্তা এইরূপ বলিয়াছেন।

জীবনযাত্রার প্রণালী (standard of living) বলিয়া অর্থনীতি শাস্ত্রে একটা বড় প্রসঙ্গ আছে এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ঐ জীবনযাত্রার প্রণালীর উপর অনেক বিষয়ে—বিশেষ অর্থনৈতিক বিষয়ে, কৃতকার্য্যতা ও অকৃতকার্য্যতা কিয়ৎপরিমাণে নির্ভর করে।

দক্ষিণ-আফ্রিকার শ্বেতকায় জাতিদিগের জীবনযাত্রা-প্রণালী তথাকার কৃষ্ণকায় ভারতীয় উপনিবেশিকগণের জীবনযাত্রা-প্রণালী অপেক্ষা উচ্চতর। তাহার ফল দাঁড়াইয়াছিল এই যে ঐ শ্বেতজাতীয় লোক অনেক প্রকার অর্থনৈতিক সংগ্রামে কৃষ্ণজাতীয় লোক দ্বারা পরাজিত হইয়া পড়িতেছিল: কারণ ব্যবসা ও কৃষিক্ষেত্রে শেষোক্তদের জীবনযাত্রার প্রণালী নিম্নস্তরে থাকায়, কি কৃষি, কি বাণিজ্যে প্রথমোক্ত সম্প্রদায় তাঁহাদিগের সহিত প্রতিযোগিতায় আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। শ্বেতজাতির হাতে তথায় রাজশক্তি—ফলস্বরূপ কৃষ্ণকায় জাতির তথা হইতে বিতাড়ন। ভারতের অবাঙ্গালী সম্প্রদায়ের, বিশেষভাবে দুই-তিনটি সম্প্রদায়ের, যে-সকল লোক বাঙ্গালা দেশে আসিয়া মধ্য ও নিম্ন স্তরের ব্যবসাকার্য্যে লিপ্ত হইতেছেন, তাঁহাদিগের জীবনযাত্রা-প্রণালী বাঙ্গালীদিগের জীবনযাত্রা-প্রণালী হইতে নিম্নস্তরের। ইহার ফল দাঁড়াইয়াছে, যে, ব্যবসাক্ষেত্রে বাঙ্গালীরা তাঁহাদিগের সহিত প্রতিযোগিতায় ক্রমাগত হটিয়া আসিতেছেন এবং ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বে ভারতীয়েরা দক্ষিণ-আফ্রিকায় এ-বিষয়ে শ্বেতকায়দিগকে যেরূপ কোণঠাসা করিয়াছিল, বর্ত্তমানে অন্যান্য প্রদেশের লোকেরাও বাঙ্গালীদিগকে সেই অবস্থায় ফেলিয়াছে। স্বতন্ত্র রাজ্য হইলে হয়ত বাঙ্গালা দেশ তাহার অর্থনৈতিক "শত্রুগণের" বিপক্ষে দক্ষিণ-আফ্রিকার অনুরূপ আচরণের ব্যবস্থা করিত। কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে এইরূপ কোন প্রস্তাব রাজনৈতিক এবং জাতীয় কারণে বিবেচনার বহির্ভূত। কেবল শ্রমবিমুখতার জন্য বাঙ্গালীর ছেলেরা তাহাদের উপযুক্ত সমস্ত প্রকারের বৃত্তি হইতে বিতাড়িত হইতেছে, একথার উপর আমার খুব আস্থা নাই। অস্বাভাবিক প্রতিযোগিতাই তাঁহাদের ব্যবসা-ক্ষেত্র হইতে অপসারিত হওয়ার কারণ। এই প্রতিযোগিতা কিরূপ তীব্র, তাহা বাঙ্গালার অবাঙ্গালীর সংখ্যা হইতেই বুঝিতে পারা যায়। এক কলিকাতা ও হাওড়ার মোট প্রায় ১৪ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে প্রায় ৬ লক্ষ অবাঙ্গালী। এই প্রতিযোগিতায় উভয় পক্ষকে সম অবস্থা সম্পন্ন করিতে হইলে আবশ্যকীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা আবশ্যক। কোন পক্ষেরই স্বার্থে আঘাত না করিয়া সেরূপ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা করা একেবারে অসম্ভব নয়। কিন্তু এখানে সে-বিষয়ের আলোচনার সুযোগ এবং সময় নাই।

কানপুরের হারকোর্ট বাটলার টেক্নোলজিক্যাল

ইন্‌ষ্টিটিউটের সহকারী রাসায়নিক গবেষক ডক্টর হরিদাস সেন, এম্‌-এ, পিএইচ-ডি, বিজ্ঞান ও কৃষিশাখার সভাপতি মনোনীত হন। তিনি চিত্রপ্রদর্শন-সহযোগে তাঁহার বক্তব্য বিষয় বুঝাইয়াছিলেন। তিনি প্রধানতঃ নানাবিধ পণ্যদ্রব্য উৎপাদনে



ডক্টর শ্রীহরিদাস সেন

ফলিত বিজ্ঞান কি প্রকারে প্রযুক্ত হইতেছে তাহা বর্ণনা করেন। নানা প্রকার ঔষধ প্রস্তুত করিবার জন্য পাশ্চাত্য দেশসকলে প্রভূত অর্থব্যয়ে যেরূপ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার নির্ম্মিত ও বৈজ্ঞানিক গবেষকদের দ্বারা পরিচালিত হয়, তাহার তুলনায় এদেশের আয়োজন অতি সামান্য। প্রাণিহত্যা না করিয়া কোন কোন ঔষধের গুণাগুণ পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত তিনি লণ্ডনের ইম্পীরিয়্যাল কলেজ অব্‌ সায়েন্সে একটি যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। তাহার চিত্র ও তাহার কার্য্যের চিত্র তিনি সম্মেলনে প্রদর্শন করেন। ইক্ষুর চাষ ও ইক্ষুরস হইতে শর্করা প্রস্তুত করা সম্বন্ধে তিনি অনেক কথা বলেন। বৈজ্ঞানিক কৃষি, পেঁপের চাষ এবং পেঁপে হইতে উদ্ভিদ পেপ্‌সিন সংগ্রহ দ্বারা ধনাগম, বিলাতী বেগুনের চাষের দ্বারা ধনাগম, প্রভৃতি অনেক বিষয়ে তিনি অনেক কাজের কথা বলেন। তাঁহাব বক্তব্যে বিস্তর ইংরেজী পারিভাষিক শব্দ থাকায় তাহা শুধু বাংলায় প্রকাশ করা কঠিন। সেই জন্য তাহার চুম্বক দিবার চেষ্টা করিলাম না।

... জয়পুর মহারাজার আর্টস্কুলের প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত কুশলকুমার মুখোপাধ্যায় ললিতকলা-বিভাগের সভাপতিত্ব করেন।



অধ্যাপক শ্রীকুশলকুমার মুখোপাধ্যায়

তিনি অন্যান্য কথার মধ্যে সাধারণ শিক্ষা প্রণালীতে ললিতকলার স্থান না-থাকার দোষ প্রদর্শন করেন। তিনি বলেন :—

"বিদ্যালয়ের স্থিরীকৃত শিক্ষার প্রণালীর মধ্যে ললিতকলার স্থান অবশ্য প্রয়োজনীয়রূপে প্রতিষ্ঠিত নয় বলেই শিক্ষা সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণতা লাভ করতে পারছে না। কলা-শিক্ষা মানেই যে শুধু চিত্রাঙ্কণের মধ্যে দিয়ে রূপকে মূর্ত্ত ক'রে তুলতে শেখা, দৃষ্টিশক্তিকে উন্মেষিত করে তোলা, সৌন্দর্য্য ও আকৃতির গুণাবধারণ করা, তা নয়; এ ছাড়াও এ শিক্ষা সকল রকমের সৃষ্টিক্ষম কর্ম্মক্ষমতাকে প্রবুদ্ধ করে, জাতিকে গঠিত করে তাকে বৈশিষ্ট্য প্রদান করে, তার আত্মাকে অভিব্যক্ত করে। আর্টের মধ্যে দিয়ে কল্পনা-

শক্তিকে, সৃজনীশক্তিকে উদ্বুদ্ধ ক'রে না তুলতে পারলে আমাদের শিক্ষার সকল আয়োজনই ব্যর্থতায় পরিণত হয়।"

"কলাবিদ্যা লাভ করলেই যে সব ছাত্রকে চিত্রকর হ'তে হবে, কিংবা চিত্রকর করবার জন্যেই কলাবিদ্যা শেখাতে হবে, এটি ভ্রান্ত ধারণা। একাগ্রতা, পর্য্যবেক্ষণ ও অধ্যবসায় এই তিনটি উপাদানের উপর মানবের মানবত্ব প্রতিষ্ঠিত। আর এই তিন সদ্গুণ একমাত্র ললিতকলার সাধনার অন্তর থেকেই লাভ করতে পারা যায়।"

বাণিজ্যের বিস্তারার্থ ললিতকলার প্রয়োগ ও তদ্দ্বারা অর্থোপার্জ্জন সম্বন্ধেও তিনি কিছু বলিয়াছিলেন। তিনি শ্রোতৃবর্গকে ইহাও জানান যে, জয়পুরের কর্তৃপক্ষ শিক্ষায় আর্টের উপকারিতা ও প্রয়োজন হৃদয়ঙ্গম করিয়া তথাকার প্রত্যেক বিদ্যালয়ে ললিতকলাকে অবশ্যশিক্ষণীয় বিষয়-সমূহের অন্তর্ভূত করিয়াছেন।

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসাধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র-



অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

নাথ ভট্টাচার্য্য ইতিহাস-শাখার সভাপতিরূপে "ইতিহাস ও ঐতিহাসিক" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তাঁহার মতে,

"ইতিহাসের মূল এবং মুখ্য উদ্দেশ্য সত্যনির্ণয়। ঐতিহাসিক উকীল নন্, তিনি বিচারক। কিন্তু ঐতিহাসিক মানুষ, ; কাজেই মানুষের দোষগুণ তাঁহার মধ্যে থাকিবে। কাজেই তাঁহার বিচারবুদ্ধি সংস্কারপীড়িত, স্বজাতির ও স্বধর্ম্মের প্রশংসায় তিনি উন্মুখ এবং বিধর্ম্মীর নিন্দা করা তাঁহার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। গ্রীক ঐতিহাসিক থুসিডিডীস্, সুলতান মামুদের সমসাময়িক আল-বেরুনী, চীন সভ্যতার ঐতিহাসিক গাইল্স্, বেরী ও লর্ড অ্যাক্টনের ন্যায় সত্যাশ্রয়ী ও নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক পৃথিবীতে বিরল।" "ইতিহাস কতকটা গল্প, কাহিনী, পুরাণ, বা উপন্যাসের পর্য্যায়ভুক্ত ছিল ; ইতিহাসকে বিজ্ঞানের পর্য্যায়ভুক্ত করিলেন জার্ম্মান্ ঐতিহাসিক নীবুর (Niobulır)।"

পাশ্চাত্য বহু ঐতিহাসিকের কৃতিত্ব কাহার কোন্ দিকে, ভারতবর্ষীয় ঐতিহাসিক লেখকদিগেরও কৃতিত্ব কাহার কিরূপ, বক্তা তাহা তাঁহার বক্তৃতায় পরিস্ফুট করিয়াছেন। ইতিহাস-রচনার আদর্শ, ইতিহাস-অধ্যয়নের উপকারিতা, প্রভৃতি বিষয়ও তাঁহার অভিভাষণে আলোচিত হইয়াছে। কহ্লনের "রাজতরঙ্গিনী"র দোষ তিনি প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন, যে, তাহা লিখিত না হইলেই ভাল হইত।

আগ্রা ট্রেনিং কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দেবনারায়ণ মুখোপাধ্যায় শিক্ষাবিজ্ঞান-শাখার সভাপতিরূপে "নবীন শিক্ষা-



শ্রীদেবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

বিজ্ঞানের গোড়ার কথা" বিষয়ে অভিভাষণ পাঠ করেন। ইহাতে তাঁহার মূল বক্তব্য বিষয় ছাড়া অন্য প্রয়োজনীয় অনেক কথাও ছিল। যেমন,—

"আমি বল্তে চাই, যে, অন্য অধ্যাপকেরা যাই করুন-না-কেন, প্রবাসী বাঙ্গালী অধ্যাপককে নিজের বাঁধা কাজ ছাড়া অনেক কাজ এমন করতেই হবে যাতে সকলে বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারে, যে, এ জাতের [অর্থাৎ বাঙ্গালীর] একটা নিজের বিশেষত্ব আছে যাতে ক'রে সে সকল অবস্থাতেই নূতন আদর্শ, নূতন কর্ম্মপ্রণালী, নূতন ভাবধারার সৃষ্টি ক'রে নিজের অতুল শক্তি ও বিশ্বপ্রাণতার পরিচয় দিতে পারে। হ'তে পারে, রাজা স্কুলকলেজগুলিকেও দোকানদারী হিসাবে সাজিয়ে রেখেছেন, হ'তে পারে অন্য জাতের অধ্যাপকমণ্ডলী ভিন্ন প্রণালীতে কাজ ক'রে থাকেন ;

কিন্তু স্বভাবভাবুক, স্বভাব-কর্ম্মী ও স্বভাবত্যাগীর জাত যে বাঙ্গালী, তার মধ্যে যাঁরা শিশুদের মানুষ করবার ও প্রবাসে জ্ঞানের বিস্তার করবার ব্রাহ্মণবৃত্তি বেছে নিয়েছেন, অন্ততঃ তাঁরা ত শুধু বেনের মত ব্যবসা চালাতে কোন মতেই পারেন না। আর কেউ যাই করুক না কেন, দু-কুড়ি সাত বজায় রেখে চলা মুষ্টিমেয় প্রবাসী বাঙ্গালী অধ্যাপকের শোভা পায় না। কারণ, তার চালচলন ও আচার-ব্যবহারের ওপর শুধু তার নিজের জাতীয় সন্তানদের কল্যাণ নয়, সমস্ত বাঙ্গালী জাতির সম্মান ও কল্যাণ নির্ভর করছে।"

অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় ব্যক্তিত্বের বিকাশ (development of personality) সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। শিক্ষাতত্ত্বের একটি মূলকথা যা মাদাম মণ্টেসরি বলিয়াছেন, তিনি তার চুম্বক এইরূপে প্রকাশ করিয়াছেন।

"আমাদের বর্ত্তমান যুগের অধ্যাপক ও পিতামাতা প্রভৃতি বড় বা গুরুজনদের ভাল ক'রে বোঝবার সময় এসেছে, যে, বালক-বালিকাদের জীবন একটি পৃথক ও বিশেষ শ্রেণীর জীবন, যার সঙ্গে বড়দের জীবনের তুলনা ক'রে প্রবীণত্বের মাপকাঠি দিয়ে তাকে মাপ করা বা তাকে অকালপক্কতার দিকে জোর ক'রে টেনে নিয়ে যাওয়া কোন মতেই চলে না। এতদিন যে-সমস্ত আদর্শ ও প্রণালী আমাদের অধ্যাপনা-কার্য্যের মূল সম্বল ব'লে স্বীকৃত হয়ে এসেছে সে-সব হয়ত একেবারে অলীক বা ভুল বলে বোঝবার সময় এসে পড়েছে। শৈশবে শক্তি ও অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার পূর্ণ ক'রে নেবার যা প্রাকৃতিক আয়োজন আগে থেকে ক'রে ভগবান মানব-সন্তানকে জগতে পাঠান, আমরা সে আয়োজনের বোধ হয় কোন সন্ধানই রাখি না; অথচ তার সঠিক সন্ধান না রেখে কি সাহসে যে আমরা তাদের মানুষ করবার ভার নিয়ে নি, তার অজ্ঞতাই বোধ হয় আমাদের তার লজ্জা থেকে বাঁচিয়ে রাখে।"

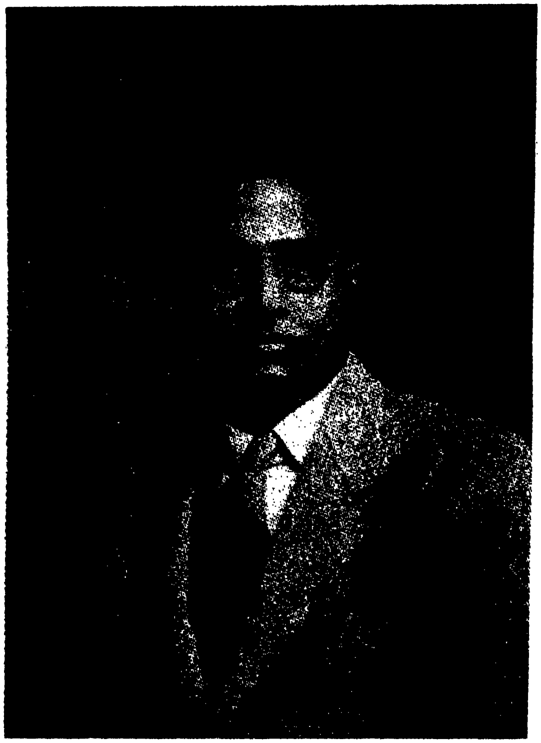
"শিশু বড় হচ্চে প্রকৃতির প্রেরণায়।"

বৃহত্তর বঙ্গ শাখার সভাপতিরূপে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত-বিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর প্রসন্নকুমার আচার্য্য "বাঙ্গলার ভবিষ্যৎ" সম্বন্ধে অভিভাষণ পাঠ করেন। তাহাতে সমালোচনামূলক কথা অনেক আছে যাহা সত্য। আবশ্যক হইলেও তাহার কোন অংশ উদ্ধৃত করিবার স্থান নাই। অন্য রকমের কথা কিছু উদ্ধৃত করিব।

"অতীত ও বাঙ্গলা সাহিত্যের কথা প্রবাসী বা স্থানীয় সাহিত্য-সম্মেলনের মুখ্য উদ্দেশ্য, ও সাহিত্য-শাখারই আলোচ্য বিষয়। 'বৃহত্তর বঙ্গ' শাখার পথপ্রদর্শকেরা সাহিত্যের সম্যক আলোচনা করেন নাই। কিন্তু বাঙ্গলার এই যুগপরিবর্ত্তনের সময় এবং বাঙ্গালী হিন্দুকে চারিদিক্ হইতে খর্ব্ব করিবার প্রচেষ্টার সময় একমাত্র বাঙ্গলা সাহিত্যদ্বারাই বাঙ্গালীর নাম ও গৌরব ৺ভগবানের কৃপা হইলে রক্ষা পাইয়া যাইতে পারে। অতীতের কথা বেশী বলিবার প্রয়োজন তেমন নাই। বর্ত্তমান সময়ে মুদ্রণযন্ত্রের প্রচলনে ও পৃথিবীর সর্ব্বত্র পুস্তকাগার স্থাপিত হওয়ায় প্রাচীন বা আধুনিক মূল্যবান্ বাঙ্গলা সাহিত্যকে রাষ্ট্রীয় চেষ্টার কিংবা সাম্প্রদায়িক বা প্রাদেশিক দ্বেষে একেবারে ধ্বংস করিয়া ফেলিতে পারিবে না।"

যাহারা বাংলা দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া বঙ্গের বাহিরে কৃতী ও কীর্ত্তিমান্ হইয়াছেন, মৃত ও জীবিত এরূপ অনেক বাঙালীর নাম উল্লেখ করিয়া ডক্টর আচার্য্য বলিতেছেন :—

"বস্তুতঃ এরূপ লোকের দ্বিতীয় তৃতীয় সংস্করণ বহির্বঙ্গে দেখা দিতেছে না। বহির্বঙ্গে জাত ও শিক্ষিত বিশেষ খ্যাতনামা বাঙ্গালীর সংখ্যা খুবই অল্প। যে-সকল অতীত সুযোগ ও সুবিধাবশতঃ বাঙ্গালী বহির্বঙ্গে আসিয়া বিখ্যাত হইতে পারিয়াছিলেন, সে-সকল সুবিধা প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও উৎকর্ষের দিনে আর পাওয়া যাইবে না। কিন্তু কর্ম্মজগতে যাহাদের অসাধারণ নৈপুণ্য থাকে, তাহাদের স্থান সর্ব্বত্র।



অধ্যাপক ডক্টর শ্রীপ্রসন্নকুমার আচার্য্য

নেতৃস্থানীয় উকীল, ডাক্তার, শিক্ষক, সিনেমা আদি বাণিজ্যব্যবসায়ী, এমন কি শর্টহ্যাণ্ড-রাইটার বা টাইপিষ্ট প্রভৃতিও স্বনামধন্য হইয়া বহির্বঙ্গে আত্মপ্রতিষ্ঠা ও বাঙ্গালীর নাম রক্ষা করিতে পারে। প্রবাসী বাঙ্গালীর পক্ষে আত্মরক্ষা ও বাঙ্গালীর গৌরবরক্ষার জন্য স্ব স্ব কর্ম্মক্ষেত্রে পারদর্শী হইতে চেষ্টা করাই একমাত্র উপায়। বহির্বঙ্গে পরের গ্রাস গ্রহণের লালসা এক্ষণে আর উচিত হইবে না, সম্ভাবনাও নাই।"

অতঃপর ডক্টর আচার্য্য পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের একটি কৃতিত্বের উল্লেখ করিয়াছেন।

"প্রয়াগে ও প্রয়াগ বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা বিষয়ে বাঙ্গালীর নেতৃত্ব থাকা সত্ত্বেও বাঙ্গালা সাহিত্য অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার ব্যবস্থা একমাত্র ঈর্ষ্যাবশতঃই হইতে পারে নাই। কিন্তু বিদ্যাভূষণ মহাশয় কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গলা পঠনপাঠনের সুব্যবস্থা করিয়া বস্তুতঃ এই অঞ্চলে বাঙ্গালাকে

একরূপ স্থায়ী করিয়াছেন। শুধু কথায় প্রবাসী বাঙ্গালী বিদ্যাভূষণের ঋণপরিশোধ করিতে পারিবে না। গুরুগিরি ইঁহাদের ব্যবসায়। বিদ্যাভূষণ মহাশয় যেন তাঁহার মহামন্ত্রে প্রবাসী বাঙ্গালীকে দীক্ষিত করিয়া শিষ্যপরম্পরায় চিরস্থায়ী হন। তাহা হইলেই এই অঞ্চলে বাঙ্গলা ভাষা সাহিত্য ও গান প্রভৃতি বাঁচিয়া যাইতে পারিবে।"

তদনন্তর বক্তা বিচারপতি স্যর লালগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণানন্তর প্রবাসী বাঙালীদের হিতকল্পে তাঁহার সময় ও শক্তি আরও বেশী করিয়া নিয়োগ করিতে অনুরোধ করিয়া তাঁহার অভিভাষণ শেষ করিয়াছেন।

সঙ্গীত-শাখার সভাপতি লক্ষ্ণৌনিবাসী সুগায়ক শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ সান্যাল তাঁহার "বাংলা গান" বিষয়ক অভিভাষণটির



শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ সান্যাল

নানা কথা গান গাহিয়া বোধগম্য ও মনোজ্ঞ করিয়াছিলেন। তিনি "হিন্দুস্থানী সঙ্গীত শিক্ষার বহুল প্রচার" চান। কিন্তু বলিয়াছেন :—

"আমি এটা পরিষ্কার ক'রে দিতে চাই, যে, প্রচলিত ভাবাপ্রধান গানের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই। আমি তাদের সঙ্গে একমত যারা বলে, যে, বাংলা দেশে ভাবাপ্রধান গানের আদর বেশী হয়। কিন্তু ভারতের সর্ব্বস্থানেই ভাবাপ্রধান গানই জনসমাজে আদৃত হয়। একথা অবশ্য মনে রাখতে হবে, যে, জনসাধারণ প্রকৃত সঙ্গীত বা উচ্চ সঙ্গীতের বোদ্ধা বা বিচারক নয়। সেইজন্য লোকসঙ্গীত কখনও প্রকৃত সঙ্গীতের স্থান দখল করতে পারে না।"

দিল্লীর দর্শনাধ্যাপক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র দর্শন-শাখার সভাপতিরূপে তাঁহার অভিভাষণে বর্ত্তমান কালে দর্শন-শাস্ত্রের



অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র

চর্চ্চা সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলেন। তাহার আগে তিনি বলেন :—

"বাংলা ভাষায় প্রাচীন দর্শনশাস্ত্রের যতগুলি পুস্তকের অনুবাদ আছে, ভারতবর্ষের অন্য কোন ভাষায় তাহা নাই—এই কথা আমি ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের পণ্ডিতগণের মুখে শুনিয়াছি। বাংলার মধ্যযুগের অবসানের পর মৌলিক গবেষণার ফলে যে নব্যন্যায়ের উদ্ভব হইয়াছিল, তাহা ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে স্থায়ী স্থান অধিকার করিয়াছিল।"

অধ্যাপক মিত্রের মত এই, যে,—

"বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে দর্শনশাস্ত্রের উন্নতি বিধান করিতে হইলে ও মৌলিক গবেষণায় সার্থকতা লাভ করিতে হইলে, নৈতিক দার্শনিকের কিছু কিছু গণিত ও বিজ্ঞানশাস্ত্র আলোচনা করা আবশ্যক। পূর্ব্ব যুগের গবেষণাপ্রণালী আর বর্ত্তমান যুগের গবেষণাপ্রণালী একরূপ নাও হইতে পারে। এক সময়ে মানুষ ধর্ম্মের দোহাই দিয়া সকল তর্ক করিত। আজ সকল বিষয়েই মানুষ বিজ্ঞানের দোহাই চায়। আজ সম্ভ্রান্ত বৈজ্ঞানিকেরা চরম তত্ত্ব উপলব্ধি করিবার জন্য দর্শনশাস্ত্রের আবশ্যকতা স্বীকার

করিতেছেন। তাঁহারা যে-ভাবে দর্শনশাস্ত্র মন্থন করিতেছেন, তাহাতে বিশেষ নিপুণতার পরিচয় পাওয়া যায়। কোন কোন বৈজ্ঞানিকের গ্রন্থে পাশ্চাত্য দর্শনেরই নহে, প্রাচ্য দর্শনেরও জ্ঞান লক্ষ্য করিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক জগতের চরম তত্ত্ব আবিষ্কারে দর্শন ও বিজ্ঞানের সহযোগিতা আবশ্যক।"

দর্শনের আদর্শ ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মত প্রকাশ করিয়া বক্তা তাঁহার অভিভাষণ শেষ করেন :—

"আমাদের দর্শন আধুনিক যুগের জীবনসমস্যা হইতে বিচ্ছিন্ন না হইয়া আপনার সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও ন্যায়নিষ্ঠার সাহায্যে অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি ইত্যাদির বিচারক্ষেত্রে উন্নত আদর্শের প্রতিষ্ঠা করুক এবং মানুষের বহুমুখী কর্ম্মচেষ্টার অন্তর্নিহিত ঐক্য দেখাইয়া দিয়া মানবজীবনকে সার্থক করিবার শক্তি দিক্।"

আমি সাংবাদিকী-শাখার সভাপতি মনোনীত হইয়াছিলাম এবং সে বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলাম।

"মধুরেণ সমাপয়েৎ" রীতি অনুসরণ করিবার নিমিত্ত শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সপ্ততিবর্ষ পূর্ত্তি উপলক্ষ্যে গোরখপুরে তাঁহার জয়ন্তীর খবরটি শেষের জন্যে রাখিয়াছি। তাহা তাঁহার বিনয়নম্র রসাল ভাষাতেই দিতেছি।

গত মার্চ্চ মাসে কানপুর হ'তে সংবাদ পাই—আমার নাকি 'জয়ন্তী'র কথা হচ্ছে। পরিহাস আর কাকে বলে! চঞ্চল হয়ে উঠি ও করজোড়ে সনির্ব্বন্ধ অনুনয়ে নিষেধ ক'রে পাঠাই—"আপনাদের ইচ্ছাটাই আমার কাছে 'পাওয়ার' অধিক ভাবে গৃহীত হয়েছে। 'জয়ন্তী' সকলের জন্য নয়—ওর মূল্য হ্রাস করবেন না"—ইত্যাদি।

গোরক্ষপুর-যাত্রার পথে কাশীতে 'অভিনন্দনের' আভাস পাই। চিরদিন চাকরি করেছি,—সার্টিফিকেটই বুঝি। আমার, ভবিষ্যৎ না থাকলেও, জন্মান্তর তো আছে। সম্মেলনের ও স্বতন্ত্রভাবে মহিলা-সম্মেলনের পক্ষ হইতে আমার কন্যাস্থানীয়া শ্রীমতী প্রতিভা দেবীর হস্ত হ'তে কৃতজ্ঞ অন্তরে দুইখানি-ই গ্রহণ করি। তাঁদের আন্তরিক ভালোবাসাপূত পত্রদ্বয় যে আমাকে কতটা ও কি দিলে এবং কতটুকু উপলক্ষ্য ক'রে, সেটা আমার দেবতাই জানেন।—এদের পশ্চাতে যখন কতকগুলি শাল-ঢাকা রূপোর দান-সামগ্রী উপস্থিত হ'ল, তখন অবাক হয়ে ভাবলুম—"এত বড় ভুলও করে! দু-দিন সবুর সইল না?—সাহিত্যিকের ঘটায় ষোড়শও হ'ত, শোভনও হ'ত, নতুন কিছুও হ'ত।" ("উত্তরা")

ভূমিকম্প

ডক্টর শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেন

স্মরণাতীত কাল হইতে পৃথিবীতে ভূমিকম্প হইয়া আসিতেছে। মাঝে মাঝে ইহার প্রকোপ এতই বৃদ্ধি পায় যে, পৃথিবীর উপরিভাগের কতক অংশ ভাঙিয়া-চুরিয়া পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। বিজ্ঞান বলেন, ভূপৃষ্ঠের (earth's crust) অংশ-বিশেষের স্থানচ্যুতি ঘটিলেই ভূকম্পন হয়। স্থানচ্যুতির সময় সমগ্র ভূখণ্ড এরূপ আন্দোলিত হয় যে, তখন আমরা তিন রকমের গতি অনুভব করি—ভূমি যেন ঊর্দ্ধ-অধঃ বা ইতস্ততঃ নড়িতে থাকে অথবা যেন পাক খাইতে থাকে। ভূমিকম্পের সময় ভূমি অত্যন্ত এলোমেলো ভাবে আন্দোলিত হইতে থাকে। তখন ভূমির অংশ-বিশেষের চিত্র লইলে দেখা যাইবে, একটি শিশু যেন ইহাতে কতকগুলি আঁচড় কাটিয়া দিয়াছে। হ্রদ বা নদীর জলের তরঙ্গের মত ভূমিকম্প যখন প্রবল হয় তখন ভূপৃষ্ঠেও তরঙ্গ দেখা দেয়। একবার ভূমিকম্পের সময় আমি অন্ততঃ এক ফুট উচ্চ তরঙ্গ দেখিয়াছি। প্রবল কম্পনে ভূপৃষ্ঠের স্থানে স্থানে ফাটল সৃষ্টি হয় এবং তাহা হইতে ভূগর্ভস্থ বায়ু, কর্দ্দমাক্ত জল, গন্ধকপূর্ণ গ্যাস বাহির হইতে থাকে। ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থলের নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে খুব বেশী পাকের সৃষ্টি হয়—এরূপ দেখা গিয়াছে, যে-দুইটি বৃক্ষ আগে পূর্ব্ব-পশ্চিমমুখী ছিল, ইহার ফলে তাহারা উত্তর-দক্ষিণমুখী হইয়া গিয়াছে।

বড় বড় ভূমিকম্পের সময় একরূপ শব্দ শোনা যায়।—যেন বন্দুক-ছোঁড়া, চলমান ট্রেন, দূরে বজ্রপাত, প্রবল বাত্যা বা জলপ্রপাতের শব্দ। সমতলভূমি অপেক্ষা পার্ব্বত্য অঞ্চলেই এই শব্দ অধিক শ্রুত হয়। লক্ষ্য করিবার বিষয়, পৃথিবীর উপরিভাগে কম্পন অধিক অনুভূত হয়, কিন্তু ভূগর্ভে একরূপ হয়ই না। প্রমাণ, ১৮৯৭ সনে আসামে ভূমিকম্পের সময় রাণীগঞ্জ কয়লার খনিতে ইহার শব্দ শুনা গিয়াছিল, কিন্তু কম্পন আদৌ অনুভূত হয় নাই।

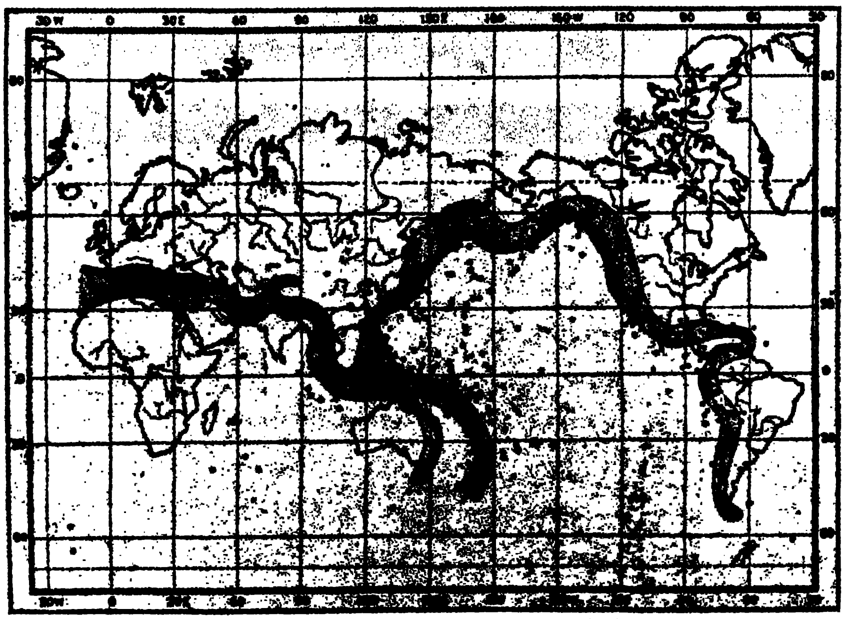
এযাবৎ যতগুলি ভূমিকম্প হইয়াছে তাহার একটা



উত্তর-বিহার ভূমিকম্পে
সীতামারির নিকটবর্ত্তী স্থানে ফাটল
শ্রীরাম শর্ম্মা কর্ত্তৃক গৃহীত ফোটো



ভূমিকম্পের তরঙ্গে ভূমি কিরূপ পাক খাইতেছে তাহার দৃষ্টান্ত। বামদিকে—আসামের একটি স্মৃতিস্তম্ভের ঊর্দ্ধ অংশ ভূমিকম্পে ঘুরিয়া গিয়াছে। দক্ষিণ দিকে—ভূমিও মোচড় খাইতেছে।



ভূমিকম্প-রেখা

আনুপূর্ব্বিক তালিকা করা সম্ভব হইলে দেখা যাইত পৃথিবীতে এমন কোনও স্থান নাই যাহা কোন-না-কোন সময়ে ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল বলিয়া পরিগণিত হয় নাই। আজ যেখানে ভূমিকম্পের বিন্দুমাত্রও আশঙ্ক নাই, কাল সেস্থান ইহার কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হইতে পারে। বস্তুতঃ অহরহঃ ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল পরিবর্ত্তিত হইতেছে; কিন্তু দেখা যায় যেখানে একবার বড় রকমের ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে, দীর্ঘকালের মধ্যে আর সেখানে হয় না। একারণ কোনও নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভূমণ্ডলকে প্রধানতঃ দুই অংশে ভাগ করা যাইতে পারে—এক অংশ ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থলবহুল, অন্য অংশে ইহার কেন্দ্র

আদৌ নাই। এই দুই অংশের মধ্যে কোন কোন স্থানে কেন্দ্রস্থল পরিলক্ষিত হয় বটে। ভূকম্প-বিজ্ঞান চর্চ্চার ফলে বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে জানা গিয়াছে, বর্ত্তমানে ভূমণ্ডলের উপরে দুইটি রেখায় ভূমিকম্প সাধারণতঃ হইয়া থাকে। একটি রেখা নিউজিল্যাণ্ডের সন্নিকট দক্ষিণ-প্রশান্ত-মহাসাগরে আরম্ভ হইয়া উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইতে হইতে পূর্ব্ব-চীনে উপস্থিত হয়। তথা হইতে উত্তর-পূর্ব্বমুখী হইয়া জাপান ও কামস্কটকার মধ্য দিয়া বেরিং-প্রণালী অতিক্রম করে এবং উত্তর-আমেরিকার পশ্চিম দিকস্থ পর্ব্বতশ্রেণী বাহিয়া দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে গিয়া শেষ হয়। অন্য রেখাটি ইহারই একটি শাখা। ইহা ঈষ্ট ইণ্ডিজে (সুমাত্রা, জাভা অঞ্চলে) আরম্ভ হইয়া বঙ্গোপসাগরের উত্তর দিয়া ব্রহ্মদেশ, আসাম, হিমালয়, তিব্বত, তুর্কীস্তান, পারস্য, তুরস্ক ও বল্কান উপদ্বীপ হইয়া ইটালী স্পেন ও পর্ত্তুগালে পৌছে। অতঃপর ইহা দক্ষিণ-পশ্চিমবাহিনী হয় এবং অতলান্তিক মহাসাগর পার হইয়া আমেরিকার ভিতর দিয়া মেক্সীকোতে প্রথম রেখার সঙ্গে মিলিত হয়। এই দুইটি রেখা ছাড়াও চীন মাঞ্চুরিয়া এবং মধ্য-আফ্রিকায় ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল আছে। ভারত-মহাসাগরের পশ্চিমভাগে, দক্ষিণ-অতলান্তিক ও উত্তর-মহাসাগরেও ইহার কেন্দ্রস্থল পাওয়া যায়।

পুরাণে ভূমিকম্পের কারণ সম্বন্ধে নানা কৌতুকপ্রদ কাহিনী বর্ণিত আছে। বসুন্ধরা বাসুকীর মস্তকে, কচ্ছপের পৃষ্ঠে বা দানব-বিশেষের স্কন্ধে অবস্থিত। ইহারা যখন বিশ্রাম লাভের জন্য অঙ্গসঙ্কোচ করে তখনই ধরিত্রী কাঁপিয়া উঠে। এ যুগে ইহা আর কেহই বিশ্বাস করিবে না। সুতরাং ভূমিকম্পের কারণ নির্দ্দেশে বিজ্ঞান কতদূর অগ্রসর হইয়াছে তাহাই এখানে বিবেচ্য। পৃথিবী-গর্ভে এক রূপ গ্যাস আছে, ইহা রাসায়নিক কারণে উপরে উঠিবার উপক্রম করিলেই ভূমিকম্প হয়—ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে এই মতবাদ প্রচলিত ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এ মতবাদ বদলাইয়া যায়; তখন আবার প্রচারিত হয় যে, বৈদ্যুতিক কারণেই ভূমিকম্প সংঘটিত হইয়া থাকে। কোন কোন স্থানে ভূমিকম্পের সঙ্গে সঙ্গে অগ্ন্যুদ্গীরণের জন্তই এই সকল ধারণা হইয়া থাকিবে। কিন্তু পরে দেখা গেল অগ্ন্যুদ্গীরণ না হইয়াও অনেক সময় ভীষণ ভূকম্পন হয়। দৃষ্টান্ত, হিমালয়ে আগ্নেয়গিরি নাই অথচ ঐ অঞ্চলে গত কয়েক বৎসরে কতকগুলি বড় বড় ভূমিকম্পের উদ্ভব হইয়াছে। অধিকন্তু, যে-সব অঞ্চলে আগ্নেয় (volcanic) ভূমিকম্পের উৎপত্তি হইয়াছে সে সকল স্থলেও ভূপৃষ্ঠের অতি সামান্য অংশ হইতেই অগ্ন্যুদ্গীরণ হইয়াছে। কাজেই প্রশ্ন উঠে, ভূপৃষ্ঠের স্তরের কোন অংশ স্থানচ্যুত হওয়ার জন্য এরূপ ভূমিকম্প হয় কি-না। এই প্রশ্নের সমাধানের জন্য ভূতত্ত্ববিদের সাহায্য প্রয়োজন হইল। দেখা গেল, পৃথিবীর যে-সব অঞ্চলের পর্ব্বতাদি অপেক্ষাকৃত অল্পদিনের এবং যাহাদের গঠনকার্য্য এখনও শেষ হয় নাই, সেই সব অঞ্চলে সাধারণতঃ ভূমিকম্প হইয়া থাকে। এই সকল অঞ্চলে পৃথিবীর স্তর খাড়া, এবং এইজন্য হঠাৎ পতনশীল। ভূগর্ভে শিলাখণ্ডের পতন হইলে, পর্ব্বতের চাপে ভূপৃষ্ঠের কতক ধ্বসিয়া গেলে অথবা পাহাড়ের উপর পাহাড় খসিয়া পড়িলে ভূপৃষ্ঠে বিপর্য্যয় উপস্থিত হয়। সুতরাং ভূকম্প-বিজ্ঞানে পর্ব্বতের অবস্থিতির কোণ বিশেষভাবে বিবেচ্য। এখন দেখা যাইতেছে—ভূপৃষ্ঠের স্থিতিস্থাপকতার সঙ্গে ভূমিকম্পের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। এইরূপ ভূমিকম্পের উৎপত্তি ভূপৃষ্ঠের গঠন মূলক (tectonic)। কতকগুলি আগ্নেয় ভূমিকম্পও এই একই কারণে উদ্ভূত।

উপরোক্ত মূল কারণ ছাড়াও ভূমিকম্পের কয়েকটি আনুষঙ্গিক উত্তেজক কারণের উল্লেখ করা যাইতে পারে, যথা—১। সমুদ্র-তরঙ্গের চাপ, ২। বায়ুমণ্ডলের চাপ (সাইক্লোনাদির সময়ে যেরূপ চাপ হয়), ৩। তাপের চাপ (শীত এবং উষ্ণ তরঙ্গের চাপ), ৪। উচ্চে অধিত্যকায় প্লাবন এবং সমতলভূমিতে সঙ্গে সঙ্গে জলের অবসরণ অথবা পর্ব্বতোপরি অত্যধিক তুষার-সংগ্রহ এবং ৫। দূরবর্ত্তী ভূকম্পনজনিত চাপ। আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন অথবা উক্ত অন্যান্য কারণ ভূমিকম্পের উৎপত্তির সহায়ক হইতে পারে। কিন্তু যতদিন ইহাদের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা না হয় তত দিন ইহাদের সম্বন্ধে জোর করিয়া কিছুই বলা যায় না। তবে চন্দ্রের কলার হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে ভূমিকম্পের উৎপত্তির যে কোন সম্বন্ধ নাই বৈজ্ঞানিকগণ ইহা স্থির করিয়াছেন।

ভূমিকম্পের দিক্ ও শক্তি নিরূপণের জন্য একটি যন্ত্র আবিষ্কৃত

হইয়াছে, বৈজ্ঞানিকগণ ইহার নাম দিয়াছেন সিস্‌মোগ্রাফ। ভূগর্ভে দশ ফুট নীচে এই যন্ত্র বসানো থাকে। যন্ত্রটি হইতে যে-সকল বিষয় প্রকাশ পাইয়াছে তাহা বড়ই বিস্ময়কর। মানুষের অনুভূতির অগোচরে যে বহু ভূমিকম্প হয় এই যন্ত্র-সাহায্যেই সর্ব্বপ্রথম আমরা তাহা জানিতে পারি। শীত-তরঙ্গ, স্থলের ও সমুদ্রের ঝটিকাময় আবহাওয়া প্রভৃতি জনিত পৃথিবীর কম্পনও এই যন্ত্রে ধরা পড়ে। হাজার হাজার মাইল দূরের ভূমিকম্পও এই যন্ত্রে অঙ্কিত হয়। ভূমিকম্পের স্পন্দন অনুভবের জন্য বিভিন্ন ধরণের সিস্‌মোগ্রাফ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভারতবর্ষে প্রধানতঃ যেরূপ যন্ত্র ব্যবহৃত হয় তাহার চিত্র এখানে দেওয়া গেল।

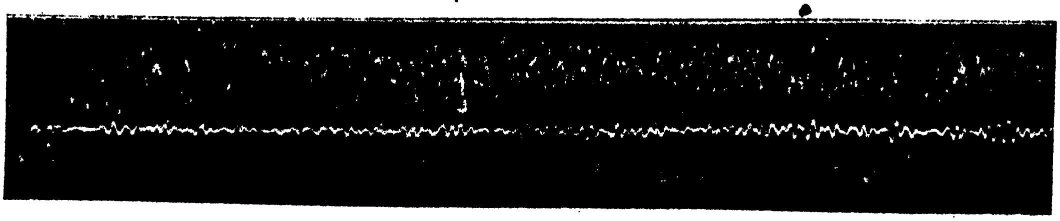


সিস্‌মোগ্রাফ্ যন্ত্র

যে-সব ভূমিকম্প আমাদের অনুভূতি সাপেক্ষ তাহা ছয় মিনিট কাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়, কিন্তু সূক্ষ্ম সিস্‌মোগ্রাফে কম্পন ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া অঙ্কিত হইতে থাকে। ভূপৃষ্ঠ বিভিন্ন বস্তুর সমবায়ে গঠিত, কাজেই ইহার স্তরের মধ্যে কম্পনের গতি খুব জটিল হয়। কম্পনকালে ভূমির ইতস্ততঃ গতি অপেক্ষা ঊর্দ্ধ-অধঃ গতি কম হয়। ভূমিকম্পের উৎপত্তি-স্থান হইতে কম্পন যত দূরে পৌছাইবে ততই ইহার ঊর্দ্ধ-অধঃ গতি ক্রমশঃ লোপ পাইয়া ইতস্ততঃ গতি বৃদ্ধি পাইবে। এই ইতস্ততঃ গতিতে যদি ভূমি অর্দ্ধ ইঞ্চি সরিয়া যায় তবেই বিপদের আশঙ্কা। ভূমিকম্পের সঙ্গে সঙ্গে বা ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বে শব্দ শোনা যায়—তাহাতে প্রমাণিত হয় যে, প্রধান কম্পনের পূর্ব্বেও ছোট ছোট কম্পন উঠিয়াছিল। কম্পনের কাল নির্ভর করে ভূমির প্রকৃতি উপর, উৎপত্তি-স্থান হইতে দূরত্বের উপর ও অন্যান্য নানা অবস্থার উপর। একারণ ভূকম্প-তরঙ্গের বিস্তৃতির নির্দ্ধারণ তেমন করিয়া এখনও করা হয় নাই।

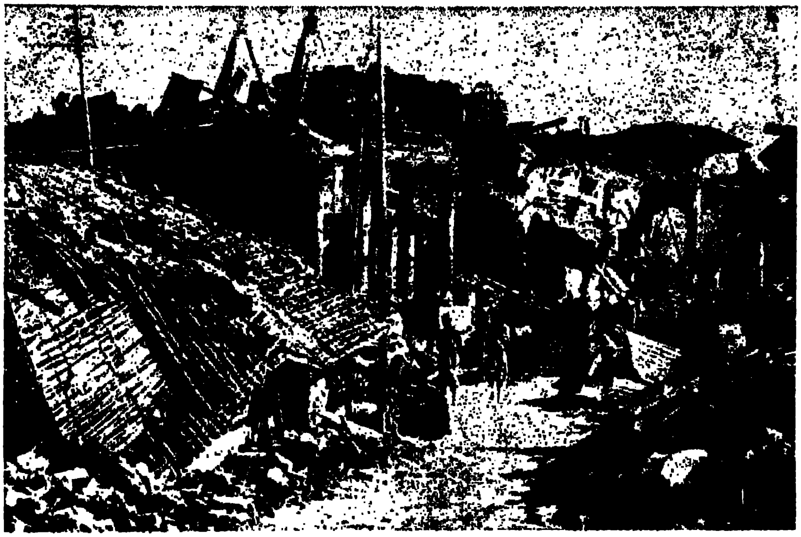
কয়েকটি ভূমিকম্পের চিহ্ন পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছ যে, কম্পনের সময় তিন রকম তরঙ্গ উত্থিত হয়, যথা—প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও দীর্ঘ। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক তরঙ্গ ভূগর্ভের দিকে গমন করে। ইহাদের গতিও একরূপ নহে। দীর্ঘ তরঙ্গ পৃথিবীর উপরিভাগে ধাবিত হয়, ইহার গতি অনেকটা একবিধ। প্রাথমিক তরঙ্গের গতি প্রতি-সেকেণ্ডে মোটামুটি ছয় মাইল অর্থাৎ দ্রুততম এরোপ্লেন অপেক্ষাও শতগুণ অধিক, মাধ্যমিক তরঙ্গের গতি ইহার অর্দ্ধেক এবং দীর্ঘ তরঙ্গের গতি ইহার এক-তৃতীয়াংশ।

ভূগর্ভে ভাঙন সুরু হয় বলিয়া ভূমিকম্পের উৎপত্তি। যেখানে ভাঙন সুরু হয় সেইস্থানকে ভূমিকম্পের কেন্দ্র (focus) ও তাহার ঠিক উপরে পৃথিবী-পৃষ্ঠকে এপিসেণ্টার (epicentre) বলে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও দীর্ঘ এই ত্রিবিধ



সিস্‌মোগ্রাফ্-রেকর্ড

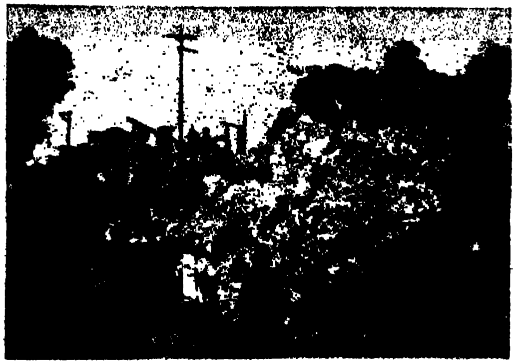
গত ২১ এ নবেম্বর (১৯৩৩) গ্রীনল্যাণ্ডের সন্নিকট বেফিন উপসাগরে যে ভূমিকম্প হয় আলীপুর মানমন্দিরে সিস্‌মোগ্রাফ-যন্ত্রে তাহার কম্পন এইরূপ অঙ্কিত হইয়াছে। বেফিন উপসাগর আলীপুর হইতে পাঁচ হাজার সাত শত মাইল দূরে অবস্থিত।







১। মুঙ্গের বাজার
২। রাজকুমারের প্রাসাদ—দ্বারভাঙ্গা
৩। রাজ-হাসপাতাল—দ্বারভাঙ্গা
৪। মজঃফরপুর
৫। সমস্তিপুর
৬। মুঙ্গেরের একটি পল্লী
৭। মুঙ্গের বিদ্যালয়
৮। কেশবপুর রাস্তা—জামালপুর
৯। বাজারের নিকটে একটি গৃহ —জামালপুর
১০। বাজারের পথে—মুঙ্গের
১১। কেশবপুর রাস্তা—মুঙ্গের
[১২—১৮ সংখ্যক চিত্র এখানে দেওয়া হয় নাই]
১৯। আর্ট-ষ্টুডিও, পাটনা
২০। মজঃফরপুর
২১। মোতিহারি
২২। মুঙ্গের
২৩। মোতিহারি
২৪। মজঃফরপুর
২৫। মোতিহারি
২৬। মোতিহারি
২৭। মজঃফরপুর বাজার



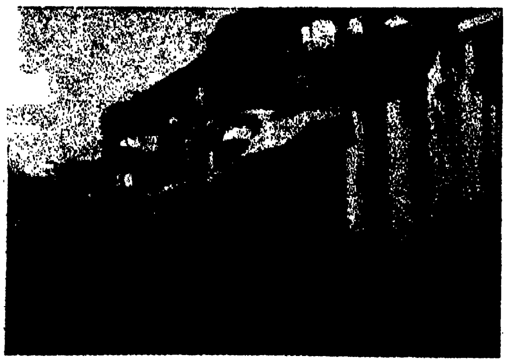








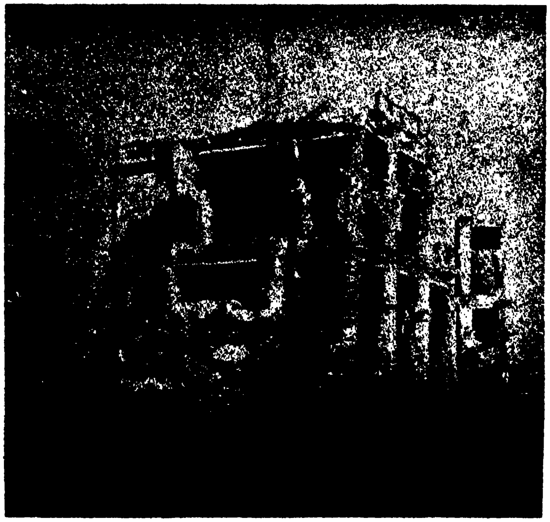








তরঙ্গ ভূকম্প-যন্ত্রে অনুভূত হয়। যন্ত্রে ভূকম্পের যে কোন দুইটি তরঙ্গ পৌছিলে ইহাদের অন্তরকাল ধরিয়া নির্দ্দেশ করা যায় এপিসেণ্টার ইহা হইতে কত দূরে। যে-কোন দেশে সমদূরবর্ত্তী তিন স্থলে—ভূমিকম্পের উৎপত্তি-স্থান হইতে



শ্রীযুত অশোক বসুর নব-নির্ম্মিত বাংলোর ধ্বংসাবশেষ,
মোতিহারী হইতে নয় মাইল দূরে

যাহারা কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থিত, তিনটি ভূকম্প-যন্ত্র রাখা হইলে প্রায় ভালরূপেই এপিসেণ্টারের স্থান নির্দ্দেশ করা চলে।



সীতামারি শহরের ধ্বংসাবশেষ
শ্রীরাম শর্ম্মা কর্ত্তৃক গৃহীত ফোটো

ভারতবর্ষে কলিকাতা, বোম্বাই, আগ্রা, কোদাইক্যানাল ও দেরাদুনে ভূকম্প-যন্ত্র কার্য্য করিতেছে। আমি যতদূর জানি, আমাদের দেশে এই বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে বা বিজ্ঞান কলেজে এখনও ভূকম্প-যন্ত্র স্থাপিত হয় নাই।

বড় বড় ভূকম্প কখনও একবারে শেষ হয় না। প্রধান কম্পনের পূর্ব্বে অল্পস্বল্প কম্পন হইলেও হইতে পারে, কিন্তু



কল্যাণবাজার, মুজঃফরপুর

ইহার পরে লঘুকম্পন বহুবার হইয়া থাকে। একারণ ভূমিকম্প-বিধ্বস্ত অঞ্চলে লোকের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। কিন্তু এ কম্পনগুলি স্বল্পক্ষণ স্থায়ী হয়, ইহার প্রচণ্ডতাও থাকে না। ভূমিকম্পে বিচ্ছিন্ন পৃথিবীর নানা অংশ আবার ক্রমশঃ সুসংবদ্ধ হইতে থাকে, ফলে পরবর্ত্তী কম্পনগুলি উদ্ভূত হয়। পরবর্ত্তী কম্পনগুলি উদ্ভূত না হইলেই ভয়ের কারণ হইত।

অনেকের ধারণা, আমাদের দেশে মন্‌সুনের সময়ে ভূমিকম্প হয়। গত আঠার বৎসর ভারতবর্ষে ভূমিকম্পের সংখ্যা দেখিয়া মনে হয় উত্তর-ভারতে অন্ততঃ মন্‌সুনের অন্তর্ধানকালে বেশীর ভাগ ভূমিকম্প হয়। কিন্তু এখনও এ-সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যায় না। উত্তর-ভারতে শীতকালে অনেকবার ভূমিকম্প হয়। অন্যান্য দেশের ভূকম্পবিদ্‌দেরও ইহাই অভিমত।

এখন গত ১৫ই জানুয়ারী তারিখের উত্তর-বিহার

ভূমিকম্পের বিষয় ধরা যাক। এই ভূমিকম্পের পূর্ব্বে ১৩ই এবং ১৫ই জানুয়ারীর মধ্যে তিনটি ক্ষীণ কম্পন ভূকম্প-যন্ত্রে রেখাপাত করিয়াছিল। এই তিনটি কম্পনের এপিসেণ্টারের দূরত্ব সাড়ে পাঁচ শত মাইল হইতে তিন শত মাইলের মধ্যে। ইহা কি আসন্ন বিপদের পূর্ব্বাভাষ ? যাহা হউক, ক্ষীণ কম্পন প্রধান কম্পনের পূর্ব্বাভাষ কি-না তাহা ধরা কঠিন। আলিপুর মানমন্দিরে ১৫ই ও ২০এ জানুয়ারীর মধ্যে প্রধান কম্পনের পর আটাশ বার মৃদু কম্পন হইয়াছে। ২২এ তারিখে চীনে এবং ২৯এ তারিখে মেক্সিকোতে ভীষণ ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। উত্তর-বিহারের ভূমিকম্পের সঙ্গে এই দুইটির কোনও সম্পর্ক আছে কি-না তাহা এখনও বিবেচনাধীন।

উত্তর-বিহারের ভূমিকম্পের উত্তেজক কারণ হিসাবে এইগুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে,—

(১) গত মন্সুনের সময় কুমায়ুন পাহাড়ে অতিরিক্ত, এবং খাসি-জয়ন্তিয়া পাহাড়ে অত্যল্প বারিপাত।

(২) গত ২১এ নবেম্বর (১৯৩৩) গ্রীন্‌ল্যাণ্ডের সন্নিকট বেফিন উপসাগরে প্রচণ্ড ভূমিকম্প।

(৩) উত্তর-পশ্চিম ভারতে বায়ুমণ্ডলের বিপর্য্যয় হেতু গত ১১ই হইতে ১৪ই জানুয়ারীর মধ্যে শীত-তরঙ্গের পঞ্জাব হইতে বঙ্গদেশে আগমন।

বর্ত্তমান ভূমিকম্পের এপিসেণ্টার একটি ত্রিভুজের মত— কাটমণ্ডু, ছাপরা ও ভাগলপুর ইহার তিনটি কোণ। ভূতত্ত্ববিদেরা ঐ স্থানের জরিপ না-করা পর্য্যন্ত ইহার প্রান্তরেখা নির্দ্ধারণ করা যাইবে না। যন্ত্রে কলিকাতায় যে কম্পন অঙ্কিত হইয়াছে তাহা ইহার নিকটতম ভাগলপুর অঞ্চল হইতে আসিয়াছে এবং আলিপুর মানমন্দির বিহারকেই ইহার এপিসেণ্টার ধার্য্য করেন। এই ত্রিভুজের রেখাগুলি হইতে আরও বুঝা যায় যে কম্পনের প্রচণ্ডতা পূর্ব্বদিকে আসাম অপেক্ষা পশ্চিমে রাজপুতানায় অতি অল্পই অনুভূত হইয়াছে। কম্পন দক্ষিণ দিকেও দ্রুত বিস্তৃত হইয়া হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল— ইহার কারণ নিম্ন বাংলার ভূমি অর্দ্ধস্থিতিস্থাপক রকমের এবং উর্ব্বর।

এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, কাটমণ্ডুর ছয় শত



মুজঃফরপুরে কাট্‌রা থানার নিকট ভূমিকম্প জনিত জলমুখী। ইহা হইতে জল ও বালু বহির্গত হইতেছে।
শ্রীরাম শর্ম্মা কর্ত্তৃক গৃহীত ফোটো

মাইল পশ্চিম-উত্তরে কাংগ্রাভ্যালিতে ১৯০৫ সনের ৪ঠা এপ্রিল ভীষণ ভূমিকম্প হয়। ইহার কেন্দ্রস্থান ছিল দুইটি এবং পরস্পরের দূরত্ব পঞ্চাশ মাইল। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ পরে বলিতে পারিবেন বর্ত্তমান ভূমিকম্পও এই ধরণের কি-না।

কেহ কেহ বলেন, উত্তর-বিহারের ভূমি আগ্নেয়গিরি উৎপাদনের অনুকূল হইয়াছে, কাহারও কাহারও মতে ঐ অঞ্চলে মৃত আগ্নেয়গিরি এখনও বর্ত্তমান। ভূমিকম্প যেরূপ বিস্তৃত ভূখণ্ডব্যাপী হইয়াছে তাহাতে ইহা ভূমির গঠনমূলক বলিয়াই মনে হয়। উত্তর-বিহারের নিম্নস্থ ভূপৃষ্ঠের কোন স্থানে নেপালের পাহাড়ের অংশবিশেষ পড়িয়াছিল এবং সেই জন্যই সম্ভবতঃ ভূমিকম্পের উৎপত্তি হইয়াছে। আগ্নেয়গিরির উৎপত্তির আশঙ্কা উত্তর-বিহারে নাই বলিলেই হয়।

ভূমিকম্পের তালিকা দৃষ্টে বুঝা যায়, বিহারে শীঘ্র আর প্রবল কম্পনের সম্ভাবনা নাই। তবে এখন কিছু কাল অল্প-স্বল্প কম্পন অনুভূত হইবে।

ভূমিকম্প শেষ হইলে ভূকম্পবিদের কার্য্য আরম্ভ হয়। স্পন্দন আরম্ভ হইলেই সিস্‌মোমিটারে রেখাপাত হয়। সূক্ষ্ম ধরণের যন্ত্রে দূরবর্ত্তী ভূকম্পও ধরা পড়ে, কিন্তু নিকটস্থ প্রদেশে প্রবল কম্পন হইলে ইহা আর কাজ



রেলপথের পুলের ভগ্নাবশেষ
শ্রীরাম শর্ম্মা কর্ত্তৃক গৃহীত ফোটো

করে না। মাত্র দুই শত বৎসর পূর্ব্বে ভূকম্প-বিজ্ঞানের চর্চ্চা সুরু হইয়াছে। কিন্তু ইতিমধ্যে এ বিভাগে যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। হাজার হাজার মাইল দূরে ভূমিকম্প হইলেও যন্ত্রের সাহায্যে তাহার এপিসেণ্টার নির্দ্ধারণ করা যায়। ভূতত্ত্ববিদ্‌ও এই যন্ত্রের সাহায্য লইতে পারেন। এই যন্ত্র দ্বারা অতি সূক্ষ্ম কম্পন ধরিয়া ভূকম্পবিৎ হাজার মাইল দূরবর্ত্তী কোন সাইক্লোনের গঠন নির্দ্দেশ করিতে পারেন। গত ১৯৩০ সনের ৫ই নবেম্বর আলিপুর মানমন্দিরে সূক্ষ্ম কম্পন ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয় দেখিয়া আন্দামানের দক্ষিণে সমুদ্রে সাইক্লোন হইবার কথা ইঙ্গিত করিয়াছিলাম। সে ইঙ্গিত সত্যে পরিণত হইয়াছিল।

ভূমিকম্প সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অতি অল্প। ভূমিকম্প সমস্যার সমাধান কল্পে ভূকম্পবিৎ, ভূতত্ত্ববিৎ, আবহবিদ্যাবিৎ পদার্থবিৎ, ইঞ্জিনীয়ার এবং গণিতবেত্তার একযোগে কার্য্য



শস্যক্ষেত্র হ্রদে পরিণত হইয়াছে
শ্রীরাম শর্ম্মা কর্ত্তৃক গৃহীত ফোটো

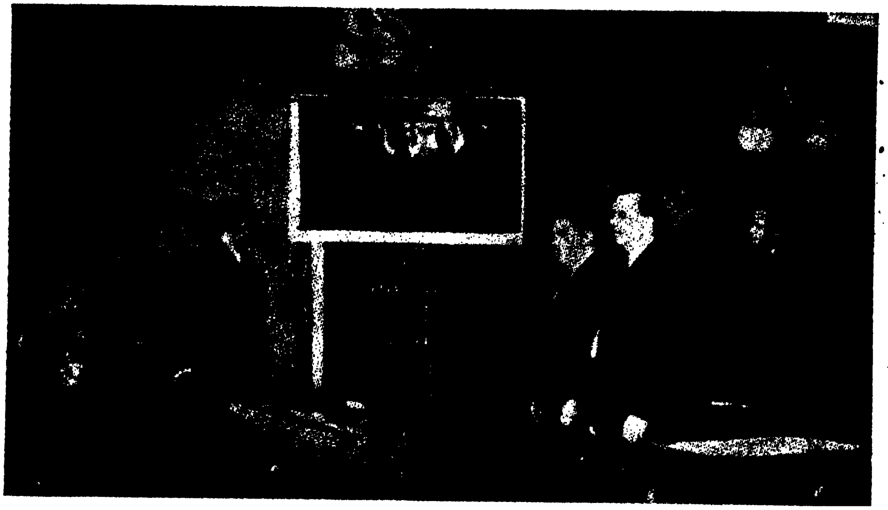
করা বিশেষ প্রয়োজন। ইটালী ও জাপানের ভূকম্পন সমিতির কার্য্যাবলী আমাদের এবিষয়ে প্রেরণা দিবে। বেতারবার্ত্তার যুগে অন্তর্জাতিক সহযোগিতায় ভূকম্প বিজ্ঞান চর্চ্চার দিন দিন উন্নতি হইবে সন্দেহ নাই।*

* গত ৬ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতা রোটারি ক্লাবে প্রদত্ত ইংরেজী বক্তৃতার সারাংশ।

পাঁচমিশালী

ডাকাতির সময়ে ফোটো তোলা—

ডাকাতরা নির্ভুল সনাক্ত বড় ভয় করে। ডাকাতির সময় ডাকাতদের কোনরূপ ফোটো লওয়া চলে কি-না, সে চেষ্টা বহুদিন যাবৎ চলিতেছিল। এখন দেখা যায়, খুব দ্রুত ফিল্ম ও জোরালো লেন্স—এই দুইটির সাহায্যে এরূপ

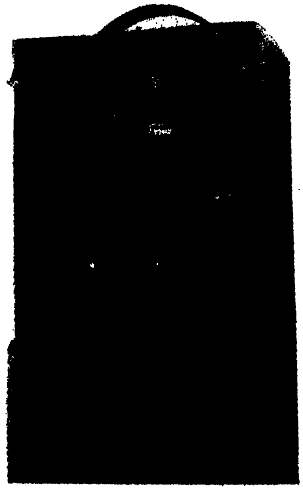


আদালতে ক্যামেরায়-তোলা ছবি দেখানো হইতেছে

ছবি তোলা সম্ভবপর। অবশ্য এই জন্য বহু যন্ত্রপাতি আবশ্যক। নানা দিক হইতে ছবি তুলিবার জন্য একাধিক ক্যামেরা স্থাপন করা প্রয়োজন। ক্যামেরা অতি কৌশলে লুকান থাকে—বাহির হইতে দেখিয়া ইহাকে ক্যামেরা বলিয়া মনে হইবে না। ফোটো তোলার

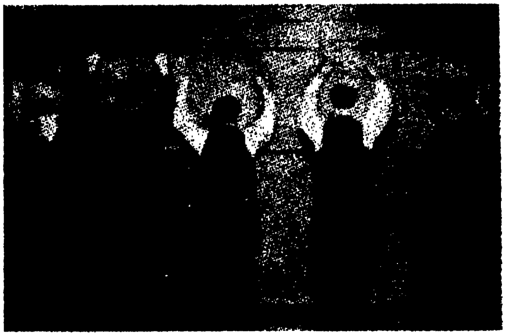


ক্যামেরার কাজ চলিতেছে



ক্যামেরার বহির্ভাগ

কাজ আরম্ভ হইয়া যায় ;—অপরাধী কিন্তু মোটে টের পায় না। ক্যামেরা একবার চলিতে আরম্ভ করিলে ছবি তোলার কাজ চলিতে থাকিবে, কাজ শেষ না হইলে কোন কারণেই তাহা বন্ধ হইবে না।



গুপ্ত ফোটোতে ডাকাতদের ছবি তোলা হইতেছে

যদি ডাকাতরা টের পায় ও তার কাটিয়া দেয় তবু কোন ক্ষতি নাই —কাজ চলিবেই। এমন একটা কাচের আবরণে লেন্‌স্‌টি থাকে যে গুলিতেও তাহা ভাঙে না। অবশ্য ক্যামেরা চলিবার জন্য মোটর চাই—কিন্তু বাহিরে তাহা থাকে না। শুষ্ক বেটারিতে তাহা চলে।

রেডিও টাইপরাইটার কলের সাহায্যে সংবাদ প্রেরণ—

নিউ ইয়র্কের একটি কারখানা সম্প্রতি এক যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তাহাতে অল্পসময়ের মধ্যে বহু দূরবর্ত্তী স্থানের সঙ্গেও টাইপরাইটার যোগে কাজ চলিতে পারে। একজন ষ্টেনোগ্রাফার নিজের টেবিলে বসিয়া টাইপ করিতেছেন—দূরবর্ত্তী বিভিন্ন শহরে যন্ত্রের সাহায্যে তাহার



রেডিও টাইপরাইটার কল। রেডিও সাহায্যে ইহা হইতে সংবাদ দূরবর্ত্তী স্থানে প্রেরিত হয়।



এই দণ্ডটি এলুমিনিয়ামে তৈরি। ইহা রেডিও টাইপ-রাইটারের শব্দ ধারণ করিয়া অন্যত্র পাঠাইতে সাহায্য করে।



পূর্ব্বের কলটি দ্বারা প্রেরিত সংবাদের ছাপ এই কলটিতে আসিয়া পড়ে এবং সংবাদ লিখিত হয়।

ছাপ উঠিতেছে। এই রূপে জরুরি চিঠিপত্রের নকল অতি অল্প সময়েই নানা স্থানে পৌঁছে। ব্যবসায়ীদের পক্ষে খুব সুবিধা। অন্যান্য নানা প্রকার সুবিধাও এই যন্ত্রের সাহায্যে হইবে। সংবাদদাতা ইহার সাহায্যে একই সময়ে নানা স্থানের পত্রিকায় সংবাদ প্রেরণ করিতে পারেন।

—

কয়েকটি পুরাতন জিনিষের নমুনা—

শিকাগোর ওরিয়েণ্টাল ইনষ্টিটিউটে একটি জ্যোতিষের যন্ত্র আছে। মিশরের রাজা তুতানখামেনের রাজ্যের জ্যোতিষিগণ এই যন্ত্রটির সাহায্যে আকাশের নক্ষত্রাদির অবস্থান ও গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। তথাকার পুরোহিতরাই সম্ভবতঃ জ্যোতিষচর্চ্চা করিতেন। চিত্রে দেখা যাইবে, একখণ্ড সীসা বা ঐ রকম কিছু দড়িতে ঝুলিতেছে। পর্য্যবেক্ষকের মস্তকের সমান্তরাল ভাবে বীক্ষণ-যন্ত্রটি রাখার জন্য এইরূপ সীসা ঝুলান হইয়া থাকিবে। কখন্ তারকা 'মেরিডিয়ান' অতিক্রম করে তাহাই এই যন্ত্র সাহায্যে ধরা যায়। চিত্রের কালো হাতাটি এবং সীসার খণ্ডটি পুরাতন।



জ্যোতিষের একটি পুরাতন যন্ত্র

অনেকটা আধুনিক যুগেরই মত, প্রাচীন যুগের মিশরীয়গণ বিলাস-



মিশরের রাজশয্যা
পাঁচ হাজার বছরের পুরানো

প্রিয় ছিল। তাহারা মদ্য পান করিত, নানারকম প্রসাধনদ্রব্য এবং ভাল ভাল আসবাবপত্র ব্যবহার করিত। কিন্তু ঘুমাইবার সময় যে-খাটে আশ্রয় লইত, তাহা আদৌ আরামপ্রদ ছিল না। নৌকায় দাঁড় বাঁধিবার জন্য যে রকম একটা উঁচু কাঠ থাকে, খাটেও সেই রকম এক খণ্ড ছিল; উহাই ছিল তাহাদের বালিশ। খাটটি এদিক হইতে



টোলেডো যাদুঘরে লিবে-টোলেডো পাত্র



পোর্টলাণ্ড পাত্র জোড়া দেওয়ার পর



ভিত্তি অংশ সহ পোর্টলাণ্ড পাত্র

ক্রমশঃ চালু; কিন্তু একটা পাদানি থাকাতে মানুষ মাটিতে পড়িয়া যায় না। সোনার মোড়া একটা খাটে রাণী প্রথম হেতপ-হেরস্ শয়ন করিতেন। কাইরো যাদুঘরে এখনও ইহা রক্ষিত আছে। বোষ্টন যাদুঘরে ইহার একটি নকল আছে—ছবিটি তাহারই।

পোর্টলাণ্ড পাত্র রোমের নিকট পাওয়া গিয়াছে। ইহা গাঢ় নীল রঙের স্বচ্ছ কাচে গড়া; তাহার গায় শাদা অস্বচ্ছ কাচের কারুকার্য্য—বোধ হয় পেলাস ও থেটিসের গল্পের একটা দৃশ্য। এক পাগল এটাকে ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ভাঙিয়া ফেলে। অতি যত্নে টুকরাগুলিকে জুড়িয়া নূতন করিয়া গড়া হইয়াছে।

মিডলওয়েষ্টের টোলেডো যাদুঘরে লিবে-টালেডো নামে পাত্র আছে। প্রাচীন কাচ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ডাঃ আইসেন বলেন, পোর্টলাণ্ড পাত্র হইতে এটি শ্রেষ্ঠ। তাঁহার মতে ইহা প্রস্তুতির সময় শিল্পীর মনে কোন একটা বিশেষ স্থানের কথা জাগিয়াছিল। সেই স্থানটি নেপল্‌স্ উপসাগরের লা গায়লো হইতে পারে। খুব সম্ভব প্রথম অবস্থায় পোর্টলাণ্ড পাত্রের একটা ভিত্তি অংশ ছিল। ঐ অংশ থাকিলে পোর্টলাণ্ড পাত্র কেমন দেখাইত তাহা ছবিতে দেখানো হইয়াছে।

বাংলা-সাহিত্যে এক শত ভাল বই

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

বাঙালীমাত্রের নিকটই বাংলা-সাহিত্য পরম আদরের ও গৌরবের বস্তু। আধুনিক যুগে বহুপ্রকার হীনতার পঙ্কে নিমগ্ন থাকিয়াও আমরা এই সাহিত্যের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া নিজেদের অন্তর্নিহিত মহত্বের কথা উপলব্ধি করি, স্বজাতির জন্য প্রীতি অনুভব করি এবং ভবিষ্যতের সম্বন্ধে একটা উজ্জ্বল চিত্র আঁকিতে শিখি। এই গৌরব যাহাতে নিতান্তই অর্থহীন না হয়, সেজন্য আমাদের দেখিতে হইবে যে বাংলা-সাহিত্যের শক্তি ও সৌন্দর্য্য যেন জীবন্ত হইয়া আমাদের সামনে উপস্থিত হয়, আমরা যেন প্রাচীন ও বর্ত্তমান সাহিত্যের ছবি স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাই।

যত দিন যাইতেছে, বাংলা ভাষায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত সদ্‌গ্রন্থের সংখ্যাও ততই বাড়িতেছে; এই ক্রমবর্দ্ধমান সাহিত্যের ভিতর হইতে কি বর্জ্জনীয় এবং কি-ই বা গ্রহণীয় তাহা যেন আমরা বিচার করিয়া দেখি। কারণ মানুষের আয়ু স্বল্প, জ্ঞানার্জ্জনের বিঘ্নও বহু,—সার গ্রহণ করিতে হইলে সদ্‌গ্রন্থের প্রতি লক্ষ্য নিবিষ্ট রাখিতে হইবে।

ইংরেজ লেখক লাবক্ বহুদিন পূর্ব্বে ইংরেজী ভাষায় এক শত সদ্‌গ্রন্থের তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সেই তালিকার আধারে আমিও নিম্নে বাংলা-সাহিত্যের অনুরূপ তালিকা দিলাম। যাঁহারা পাঠাগারের ভিতর দিয়া ও অন্যান্য উপায়ে সাহিত্যের রসধারা জনসাধারণের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দিতে চান, ইহা তাঁহাদের কাজে লাগিতে পারে মনে করিয়া তালিকাটি প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়াছি। বলা বাহুল্য, ইহা পুস্তক-বিশেষের বিজ্ঞাপন নহে, বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ লেখকগণের রচনা হইতেই শুধু নাম সঙ্কলন করিয়াছি।

অশ্বিনীকুমার দত্ত	... ১।	ভক্তিযোগ
অক্ষয়কুমার বড়াল	... ২।	এষা
অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়	... ৩।	সিরাজউদ্দৌলা
অতুলচন্দ্র গুপ্ত	... ৪।	কাব্য-জিজ্ঞাসা
অতুলপ্রসাদ সেন	... ৫।	গীতিগুঞ্জ
অনুরূপা দেবী	... ৬।	মন্ত্রশক্তি
অমৃতলাল বসু	... ৭।	বিবাহ-বিভ্রাট
অরবিন্দ ঘোষ	... ৮।	গীতার ভূমিকা
ইন্দিরা দেবী	... ৯।	স্পর্শমণি
উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	... ১০।	উনপঞ্চাশী
কামিনী রায়	... ১১।	আলো ও ছায়া
কালিদাস রায়	... ১২।	পর্ণপুট
কালীপ্রসন্ন ঘোষ	... ১৩।	নিশীথ চিন্তা
কেদার বন্দ্যোপাধ্যায়	... ১৪।	আমরা কি ও কে
গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী	... ১৫।	স্বামী বিবেকানন্দ ও বাংলার উনবিংশ শতাব্দী
গিরিশচন্দ্র ঘোষ	... ১৬।	চৈতন্যলীলা
	১৭।	প্রফুল্ল
	১৮।	পাণ্ডব গৌরব
চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়	... ১৯।	উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম
চারুচন্দ্র দত্ত	... ২০।	কৃষ্ণরাও
চিত্তরঞ্জন দাশ	... ২১।	কাব্যের কথা
	... ২২।	কিশোর-কিশোরী
জগদীশ গুপ্ত	... ২৩।	মহিষী
জলধর সেন	... ২৪।	হিমালয়

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ২৫। স্বপ্ন প্রয়াণ
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ... ২৬। সাজাহান
... ২৭। আষাঢ়ে
দীনবন্ধু মিত্র ... ২৮। নীলদর্পণ
দীনেন্দ্রকুমার রায় ... ২৯ পল্লীচিত্র
দীনেশচন্দ্র সেন ... ৩০ রামায়ণী কথা
৩১ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য
দেবেন্দ্রনাথ বসু ... ৩২ পরমহংসদেব
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ৩৩ আত্মচরিত
দেবেন্দ্রনাথ সেন ... ৩৪ অশোকগুচ্ছ
ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ... ৩৫। আমরা ও তাঁহারা
নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ... ৩৬। ব্রজনাথের বিবাহ
নবীনচন্দ্র সেন ... ৩৭। রঙ্গমতী
৩৮। পলাশীর যুদ্ধ
৩৯। রৈবতক
নলিনীকান্ত গুপ্ত ... ৪০। আধুনিকী
নিরুপমা দেবী ... ৪১। অন্নপূর্ণার মন্দির
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ... ৪২। দেশী ও বিলাতী
প্রমথ চৌধুরী ... ৪৩। আমাদের শিক্ষা
৪৪। চার-ইয়ারী কথা
৪৫। নানা চর্চ্চা
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ... ৪৬। আনন্দমঠ
৪৭। কপালকুণ্ডলা
৪৮। কমলাকান্তের দপ্তর
৪৯। কৃষ্ণকান্তের উইল
বিনয়কুমার সরকার ... ৫০। নিগ্রো জাতির কর্ম্মবীর
৫১। বর্ত্তমান জগৎ
বিপিনবিহারী গুপ্ত ... ৫২। পুরাতন প্রসঙ্গ
বিবেকানন্দ ... ৫৩। পরিব্রাজকের পত্র
৫৪। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য
৫৫। বর্ত্তমান ভারত
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৫৬। সংবাদপত্রে সেকালের কথা
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৫৭। পথের পাঁচালী
৫৮। অপরাজিত
বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী ৫৯। সারদামঙ্গল
ভূদেব মুখোপাধ্যায় ৬০। পারিবারিক প্রবন্ধ
শ্রীম— ... ৬১। শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত
মণীন্দ্রলাল বসু ... ৬২। রমলা
মাইকেল মধুসূদন দত্ত ... ৬৩ মেঘনাদবধ কাব্য
যতীন্দ্রমোহন সিংহ ... ৬৪ উড়িষ্যার চিত্র
যোগেশচন্দ্র রায় ... ৬৫ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ
রবীন্দ্রনাথ মৈত্র ... ৬৬ থার্ড ক্লাস
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ৬৭ জীবন-স্মৃতি
৬৮। গল্পগুচ্ছ
৬৯। নৈবেদ্য
৭০। প্রাচীন সাহিত্য
৭১। রাজা
৭২। লোকসাহিত্য
৭৩। রাজা ও রাণী
৭৪। গোরা
৭৫। চতুরঙ্গ
৭৬। ঘরে বাইরে
রমেশচন্দ্র দত্ত ... ৭৭। মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৭৮। পাষাণের কথা
রাজনারায়ণ বসু ... ৭৯। সেকাল ও একাল
রাজশেখর বসু ... ৮০। কজ্জলী
৮১ গড্ডলিকা
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ... ৮২
৮৩ চরিতকথা
৮৪ যজ্ঞকথা
শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ... ৮৫ চিঠি
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ... ৮৬ শ্রীকান্ত
৮৭ বিন্দুর ছেলে
৮৮ পল্লীসমাজ
শশাঙ্কমোহন সেন ... ৮৯ স্বর্গ ও মর্ত্ত্য
শান্তা দেবী ... ৯০ জীবনদোলা
শিবনাথ শাস্ত্রী ... ৯১ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ... ৯২। ঝড়ো হাওয়া
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ... ৯৩। অভ্র-আবীর
৯৪। কুহু ও কেকা
সীতা দেবী ... ৯৫। পরভৃতিকা
সুকুমার রায় চৌধুরী ... ৯৬। আবোল-তাবোল
সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ... ৯৭। বৈরাগ যোগ
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ... ৯৮। বেণের মেয়ে
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৯৯। কবিতাবলী
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ... ১০০। রঘুবীর

উপরে যে তালিকা দেওয়া হইল, তাহাতে বিবিধ জাতীয় পুস্তকের নাম দিতে চেষ্টা করিয়াছি। এই তালিকা যে সকলেরই ভাল লাগিবে, বা ইহা যে সম্পূর্ণ দোষবর্জ্জিত, এরূপ অসঙ্গত ও অসম্ভব দাবি আমি করি না। আমার উদ্দেশ্য, পাঠক-পাঠিকাদের নিকট নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী এই প্রশ্ন উপস্থাপিত করা,—"আমাদের সাহিত্যে এক শত উৎকৃষ্ট গ্রন্থের নাম করিতে বলিলে কোন্ কোন্ গ্রন্থের নাম করা যায়?" তবু ইহা—অন্ততঃ মিলাইয়া দেখিবার জন্য—অন্যেরও কাজে লাগিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

বলা বাহুল্য, উপরে লিখিত গ্রন্থ এবং গ্রন্থকারের নামের পৌর্ব্বাপর্য্য দোষগুণের তারতম্য বুঝাইতেছে না, যথাসম্ভব বর্ণানুক্রমে হইয়াছে।

পুস্তক পরিচয়

যুগগুরু—শ্রীমতিলাল রায়। প্রবর্ত্তক পাব্‌লিশিং হাউস, কলিকাতা। দেড় টাকা। ১৩৪০।

যে-সকল ধর্ম্মবীর যুগে যুগে আবির্ভূত হইয়া ভারতকে অধ্যাত্মসাধনার পথে অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন, তাঁহাদেরই কয়েক জনের জীবনকথা লইয়া এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে। হিন্দু বৌদ্ধ জৈন শিখ সকলের সাধনার পুতস্পর্শে ধন্য এ ভারতভূমি, এখানে হোমকুণ্ড জ্বালাইয়া রাখিবার জন্য বহু লোকের সাগ্রহ চেষ্টা। লেখক তাঁহাদের প্রতি আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিতে চাহিয়াছেন। পুস্তকের ছাপা ভাল, এবং কয়েকখানি চিত্র ইহার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে।

কিন্তু মুদ্রাকরপ্রমাদ যে একেবারে নাই তাহা নহে। পৌরহিত্য (১৮ পৃঃ) বণিদ্‌গয়কে (২৯ পৃঃ), ব্যাভিচার (৩৪, ৩৫ পৃঃ) ইত্যাদি তাহার দৃষ্টান্ত। "পশ্চাদনুবর্ত্তী" (২২ পৃঃ) কথাটায় লেখক কি বলিতে চান? ৩৭ পৃষ্ঠায় যে মহাপুরুষের কথা আছে, তিনি জোসেফট্, না, জোসেফস্?

বস্তির গল্প—শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত। খাদি প্রতিষ্ঠান, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। এক টাকা। ১৩৪০।

আটটি গল্পে সতীশবাবু হরিজনদের অবস্থা ও তাহার সংস্কারের চেষ্টার চিত্র পাঠকের সামনে ধরিয়াছেন। আমাদের অনেকেরই ধারণা যে, বাংলা দেশে হরিজন সমস্যা নাই, অস্পৃশ্যতা নাই; এই ধারণা যে কতদূর ভ্রান্ত তাহা সতীশবাবু দেখাইয়াছেন। শুধু রস-সাহিত্যের দিক হইতে এই গল্পগুলি পড়িলে লেখকের প্রতি কিছু অবিচার করা হইবে; রাজশেখরবাবু ভূমিকায় "এক বিচিত্র ভয়ঙ্কর বীভৎস নিরতিশয় করুণ রসের অবতারণা" বলিয়া পুস্তকের যথার্থ পরিচয় দিয়াছেন। মেথর ডোম ঝাড়ুদারদের সমাজে যে কি শোচনীয় অবস্থা, তাহাদের প্রকৃতির মধ্যে উন্নতির বীজও কেমন সুন্দর ভাবে নিহিত আছে, অনুকূল পারিপার্শ্বিকে তাহা কেমন পুষ্ট হইতে পারে, অন্ততঃ "মেথরের মেয়ে" গল্পটি পড়িলে তাহা বুঝিতে পারা যায়; ইহাই এই পুস্তকের মধ্যে দীর্ঘতম কাহিনী। বাংলা দেশের হরিজনসমস্যা ও তাহার প্রতিকার সতীশবাবুর লেখনীতে জীবন্ত হইয়া দেখা দিয়াছে; যাঁহারা যথার্থই এই সমস্যা বুঝিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে এই গল্পকয়টি পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

"সপ্তক"—শ্রীইলা দেবী, শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট। দাম ১৷০

বইখানিতে সাতটি গল্প—দুইটি লেখকের, বাকী পাঁচটি লেখিকার; কাজেই ইহাতে লেখার দুইটি বিভিন্ন ধারা বর্ত্তমান।

দুইটি ধারাই অতিরিক্ত ফেনসঙ্কুল। লেখকের গল্প "মানুষের জয়"-এ দামোদর, গরুর গাড়ি, ম্যালেরিয়া, কানুনগো—এই সবের ওপরই প্রায় সাত-আট পাতা ব্যয়িত হইয়াছে। গল্পাংশ নিরতিশয় অল্প, তাহাও ভালরকম রূপ পাইবার অবসর পায় নাই। "ননীলাল" গল্পটি একটি বিদেশী গল্পের ছায়া লইয়া। ছায়াটিকে অতিরিক্ত দীর্ঘায়িত করেন নাই বলিয়া গল্পটি জমিয়াছে। আশা করি লেখক সংযমের মূল্যটা এইখানেই বুঝিবেন।

রিফ্লেক্‌শন আর বর্ণনার নেশাটা কমিয়া আসিলে ইলা দেবীর মধ্যে আমরা একজন প্রকৃত গুণী পাইব বলিয়া আশা করি। চরিত্র, ঘটনা-সমাবেশ, ভাষা প্রভৃতি সকল দিকেই তাঁহার বেশ নজর থাকে। "লিপিপঞ্চক" খুবই চমৎকার লাগিল; একবারমাত্র পড়ায় আশ মেটে নাই। পাঁচখানি প্রেমপত্রের মধ্য দিয়া পাঁচটি যুগ যেন মূর্ত্তি ধরিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়াছে। "প্রত্যাবর্ত্তন"-এ কল্পনাকে খুব বেশী রাশ দেওয়ায়, গল্পটি আজগুবির কোটায় গিয়া পড়িয়াছে। আবার ঐ সংযমের কথা আসিয়া পড়ে। ছাপায় অল্প অল্প ভুল আছে; বাঁধাই ভাল।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

স্বাস্থ্য ও ব্যায়াম—শ্রীবিধুভূষণ জানা প্রণীত। তমলুক, মেদিনীপুর হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১৷৵০। ক্রাউন অক্ট, ১৪১ পৃঃ পেপার বোর্ড বাঁধাই, ২৫ খানি আর্ট পেপারে ছাপা চিত্র সম্বলিত।

লেখক নিজে শরীরচর্চ্চা করিয়া যে অভিজ্ঞতা আহরণ করিয়াছেন এবং অপরাপর স্বনামধন্য ব্যায়ামবীরদিগের নিকট যে উপদেশ লাভ করিয়াছেন তাহা এই পুস্তকে একত্র করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত জগতে বহু খ্যাতনামা মল্লের পরিচয় এই পুস্তকে পাওয়া যায়। রন্ধনকালে যেমন শুধু কোন্ কোন্ খাদ্য সামগ্রী ও মশলা একত্র করিতে হয় শুধু তাহা বলিয়া দিলেই রন্ধন সুখাদ্য হয় না,—তৎসঙ্গে আগুনের তেজ, কোন সময়ে কোন্‌টি মিলাইতে হইবে এবং কোন্ মশলা কতটা লাগিবে ইত্যাদি বহু আনুষঙ্গিক বিষয়ের প্রকৃষ্ট জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, তেমনি শরীরচর্চ্চার ক্ষেত্রেও শুধু কয়েকটি ব্যায়াম-যন্ত্র হাতে দিয়া কয়েক প্রকার অঙ্গ সঞ্চালনা শিখাইয়া দিলেই কার্য্যসিদ্ধি হয় না। শরীর-সাধনার অবশ্যপ্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিকগুলির জ্ঞান না হইলে বহু ব্যায়াম করিয়াও কোন ফল হয় না। জানা-মহাশয় এই সকল আনুষঙ্গিকের দিকে বিশেষ নজর দিয়াছেন। যথা সুপ্রজনন, খাদ্য, পোষাক, বাসস্থান, জলবায়ু, সূর্য্যালোক, নিদ্রা প্রভৃতি বিষয় এই পুস্তকে আলোচিত হইয়াছে। বিভিন্ন খাদ্যের পুষ্টিমূল্য, বিভিন্ন কার্য্যকলাপের ও জীবনযাত্রা প্রণালীর স্বাস্থ্যের উপর প্রভাবও এই পুস্তকে বিচার করা হইয়াছে। অধুনা ব্যায়াম-জগতে My Systom অর্থাৎ "আমার শক্তিলাভ প্রণালী" বলিয়া যে একটি জিনিষ দেখা দিয়াছে, বিধুবাবু সেই দোষে দুষ্ট নহেন। যেমন প্রকৃতির নিয়মাবলী কোন ব্যক্তি-বিশেষের সৃষ্ট নহে, তেমনি স্বাস্থ্যের ও শক্তিলাভের উপায়গুলিও চিরন্তন ও কোন ব্যক্তি-বিশেষের সৃষ্ট নহে। যে-সকল ব্যায়ামবীর নিজ নিজ My Systom প্রচার করিবার চেষ্টা করেন তাঁহারা একথা ভুলিয়া যান। অহমিকা রোগের ইহাই ধারা। সৌভাগ্যক্রমে বর্ত্তমান ক্ষেত্রে গ্রন্থকার এই রোগের বশীভূত হন নাই। তাঁহার পুস্তকে স্বাস্থ্য ও শক্তির চিরন্তন নিয়মাবলী উত্তমরূপে বিচার করা হইয়াছে।

বাংলা ভাষায় ঠিক এই রকম পুস্তক আর নাই। আমরা আশা করি স্কুল-কলেজে ও পিতামাতা-মহলে এই পুস্তকের আদর হইবে। ব্যায়ামকারিগণও ইহা পড়িয়া উপকার পাইবেন।

শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়

ব্যোমকেশের ডায়েরী—শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক—পি. সরকার এণ্ড কোং। ২, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম দেড় টাকা।

পুস্তকখানিতে চারটি রোমাঞ্চকর ডিটেক্‌টিভ গল্প আছে। কিন্তু ডিটেক্‌টিভ গল্পের দস্তুর মত কোনটিতেই যে-প্রকারে হউক গোয়েন্দাকে বাঁচাইয়া কেবল গুণ্ডাবধ নাই। প্রত্যেকটিই বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, ঘটনাসৃষ্টির কৌশল ও লিপি-চাতুর্য্যে উজ্জ্বল ও চরিত্রগুলি জীবন্ত। মাল-মশলা নির্ব্বাচনেও লেখক মার্জ্জিত রুচির পরিচয় দিয়াছেন। যে-শ্রেণীর ডিটেক্‌টিভ সাহিত্য এককালে বঙ্গসাহিত্যের বাজার দখল করিয়াছিল, আলোচ্য গল্পগুলি তাহার অনেক উচ্চে—ভদ্রসমাজে নির্দ্দোষ আনন্দ দিবার উপযোগী।

পুস্তকখানির সাজ-সজ্জা, ছাপা ও কাগজ ভাল।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

১। আধুনিক ভূচিত্রাবলী, ২। বঙ্গদেশের ভূচিত্রাবলী—শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু, এফ-আর-জি-এস কর্ত্তৃক অঙ্কিত ও সঙ্কলিত। বোস এণ্ড সন্স, ২৬।১, মাণিকতলা স্পার, কলিকাতা। মূল্য প্রত্যেকখানির এক টাকা।

বাংলা দেশে ভূগোলশিক্ষার প্রচলন এখনও তেমন করিয়া হয় নাই। উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত ভূগোল পাঠ আবশ্যিক বটে, কিন্তু তাহার পর ইহার সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীগণের সম্বন্ধ একরূপ ঘুচিয়া যায়। এরূপ অনেকে আছেন যে, 'লাসা' কোথায় জিজ্ঞাসা করিলে বিভ্রান্ত হইয়া পড়েন। অথচ জাতি-গঠনে যেমন ইতিহাস-চর্চ্চার প্রয়োজন, জাতির আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি সাধনের পক্ষে ভূগোল শিক্ষাও তেমনি আবশ্যক। একারণ ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মানী আমেরিকা প্রভৃতি দেশে ভূগোলের চর্চ্চা এত বেশী। ভূগোল শিক্ষার প্রধান সহায়ক—দেশ-বিদেশের মানচিত্র। এই মানচিত্রের যতই প্রচার হইবে ভূগোল শিক্ষা ততই অগ্রসর হইবে। বাংলা ভাষায় আধুনিক রীতিতে সঙ্কলিত মানচিত্রের যথেষ্ট অভাব আছে, অথচ বাংলা-মানচিত্রের প্রচার হইলে ভূগোল শিক্ষার প্রসার সম্ভব। এইজন্য শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ বসুর ভূচিত্রাবলী দুইখানি সময়োপযোগী হইয়াছে। প্রথম-খানিতে বিভিন্ন দেশের মানচিত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। দ্বিতীয়-খানিতে বঙ্গদেশের প্রত্যেক জেলারই স্বতন্ত্র মানচিত্র আছে। শুধু শহরাদি নহে, প্রসিদ্ধ গ্রামগুলির অবস্থান-নির্দ্দেশও ইহাতে করা হইয়াছে। বিভিন্ন জেলার অন্তর্গত সকল স্থানের সঙ্গে পরিচিত না থাকায় দুই-এক স্থলে অবস্থান-নির্দ্দেশে ভুল রহিয়া গিয়াছে, স্থানের নাম ওলট-পালট হইয়াছে ও কতকগুলি বাদ পড়িয়াছে। কিন্তু এ-সব সত্ত্বেও ইহার উপকারিতা যথেষ্ট। প্রত্যেক শিক্ষার্থীরই ইহাদের এক একখানি থাকা উচিত।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

কোচবিহার সাহিত্য-সভা গ্রন্থাবলী—(১ম—৬ষ্ঠ খণ্ড)। কোচবিহার সাহিত্য-সভা হইতে খাঁ চৌধুরী আমানত উল্যা আহমদ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

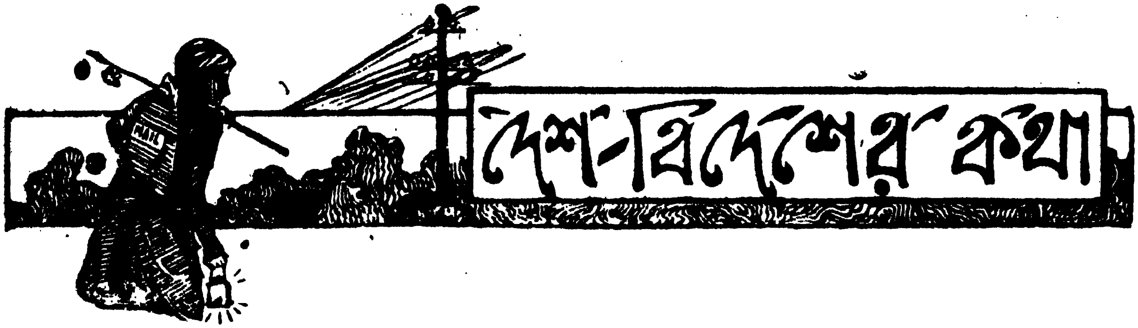
এই গ্রন্থাবলীর তৃতীয় খণ্ডে মহারাণী বৃন্দেশ্বরী দেব্যা বিরচিত বেহারোদন্ত নামক কুচবেহার-রাজবংশের ইতিহাস-বিষয়ক গ্রন্থ ভূমিকা ও টীকা টিপ্পনীসহ শ্রীযুক্তা নিরুপমা দেবী কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়াছে। অবশিষ্ট পাঁচখণ্ডে বৃন্দেশ্বরী দেবীর শ্বশুর বিবিধগ্রন্থরচয়িতা কুচবেহার-রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব অধীশ্বর মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের গ্রন্থাবলীর কিয়দংশ শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষাল, এম্‌-এ, বি-এল, সরস্বতী, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাভূষণ, ভারতী কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়াছে। এই পাঁচ খণ্ডের মধ্যে প্রথম খণ্ডে হরেন্দ্রনারায়ণের গীতাবলী, দ্বিতীয় খণ্ডে সংস্কৃত পদ্মপুরাণের ক্রিয়াযোগসার অংশের অনুবাদ, তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডে উপকথা নামে দুইটি আখ্যায়িকা এবং পঞ্চম খণ্ডে রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের সংরক্ষণ ও অনুশীলন কোচবিহার-সাহিত্য-সভার অন্যতম বিশিষ্ট উদ্দেশ্য। সেই সাধু উদ্দেশ্য অনুসরণ করিয়া সভার কর্ত্তৃপক্ষ বিদ্যানুরাগী কুচবেহার-রাজবংশের সাহিত্য-প্রীতির প্রত্যক্ষ নিদর্শনস্বরূপ রাজপরিবারবর্গের রচিত গ্রন্থাবলী সাধারণ্যে প্রচার করিবার কার্য্যে সর্ব্বপ্রথম হস্তক্ষেপ করিয়াছেন।

আশা করা যায়, তাঁহারা ক্রমে এই বংশের নরপতিবর্গের উৎসাহ, প্ররোচনা ও পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন সাহিত্যরসিক কর্ত্তৃক রচিত গ্রন্থসমূহ প্রকাশ করিয়া প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনা এবং কুচবেহার-রাজ্যের কৃষ্টিবিষয়ক ইতিহাস আলোচনার পথ প্রশস্ত করিয়া দিবেন। আলোচ্য ছয় খণ্ডে সাহিত্য-সভা যে-কয়খানি গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়াছেন অতিপ্রাচীন না হইলেও সেগুলি উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালা সাহিত্যের নমুনা হিসাবে বিশেষ মূল্যবান। এই গ্রন্থাবলীতে মূল পুথি অথবা অবলম্বিত প্রাচীন সংস্করণের বর্ণাশুদ্ধিগুলি সর্ব্বত্র অবিকল রক্ষিত হইয়াছে। তৎসমশব্দ-সম্পর্কে এই বর্ণাশুদ্ধি ভাষাতত্ত্বালোচনায় বিশেষ কোন সহায়তা করে না অথচ সাধারণ পাঠকের বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি করে। এগুলি সংশোধন করিয়া দিলে সম্পাদক কোনরূপ দোষদুষ্ট হইতে পারেন না। গ্রন্থাবলীর পঞ্চম খণ্ডে প্রকাশিত উপকথায় মূল পুথির পাটায় বর্ণিত গল্পের কয়েকখানি চিত্র অঙ্কিত ছিল। আলোচ্য সংস্করণে তাহাদের সুন্দর ত্রিবর্ণ প্রতিলিপি মুদ্রিত হইয়াছে। এগুলি বাংলার পুরাতন চিত্রবিদ্যার অনুশীলনকারিগণ বিশেষ আদর করিবেন সন্দেহ নাই।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

আমরা আগামী ১৩৪১ সালের গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা ও ডাইরেক্টরী প্রাপ্ত হইয়াছি।



বিদেশ

রোমে ইউরোপপ্রবাসী প্রাচ্যদেশীয় ছাত্রদের কংগ্রেস—

গত পৌষ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে রোমে ইউরোপপ্রবাসী প্রাচ্যদেশীয় ছাত্রদের একটি কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে জাপান, চীন, শ্যাম, ভারতবর্ষ, আফগানিস্তান, পারস্য, আরব, প্যালেষ্টাইন, সীরিয়া ও লেবাননের ৬০০ (ছয় শত) ছাত্রছাত্রী উহাতে উপস্থিত হয়। চীনের ছাত্রছাত্রীরই সংখ্যা ছিল দেড় শত।



রোমের জুলিয়স্ সীজার হলে ইউরোপপ্রবাসী প্রাচ্যদেশীয় কংগ্রেসে মুসোলিনী বক্তৃতা দিতেছেন

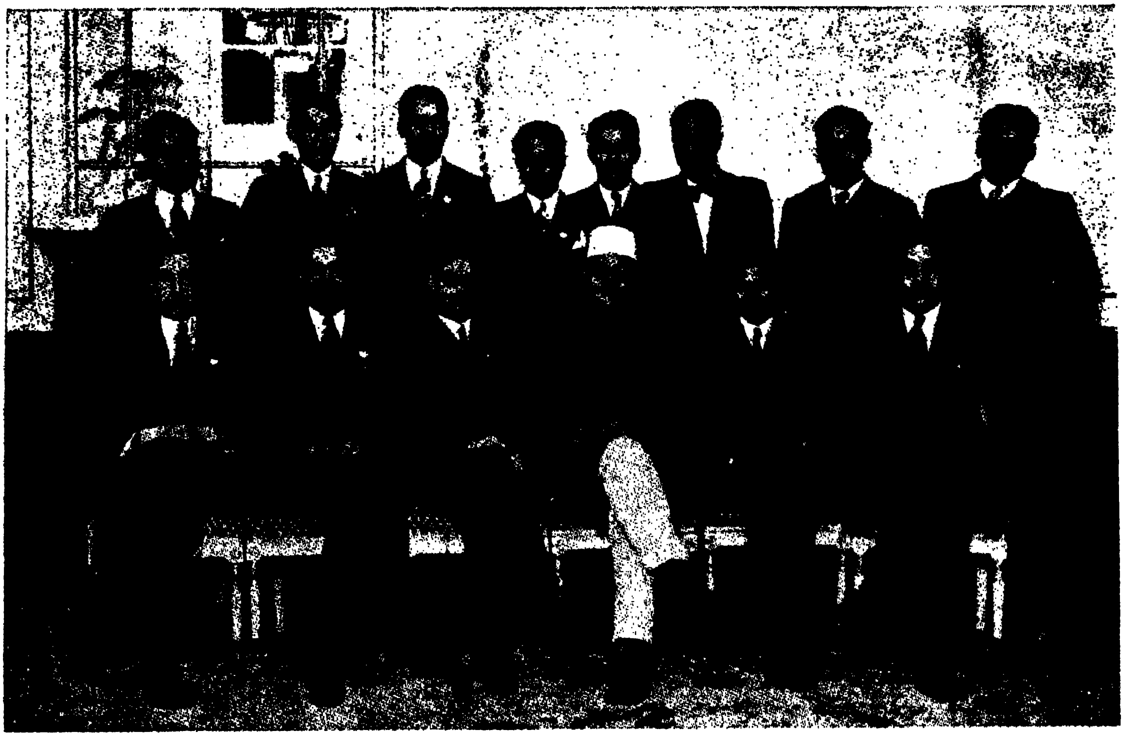
ভারতীয় ছাত্র-প্রতিনিধিদের সংখ্যা ছিল ছিয়াশী। তাহারা আসিয়াছিল বিশেষ করিয়া ইউরোপপ্রবাসী ভারতীয় ছাত্রছাত্রীদের ফেডারেশ্যনের তৃতীয় সম্মেলনে যোগ দিবার জন্য। রোমান কাথলিকদিগের ধর্ম্মগুরু পোপের প্রচার-কলেজের ত্রিশ জনের অধিক ভারতীয় খৃষ্টিয়ান ছাত্র কংগ্রেসে যোগ দিয়াছিল। এ-রকম কংগ্রেস এই প্রথম হইল। ইটালীর ছাত্রসভা এবং হিন্দুস্থান সঙ্ঘ একযোগে সব বন্দোবস্ত করিয়া প্রশংসা-ভাজন হইয়াছেন। ইটালীর কর্ত্তৃপক্ষ ইটালীর মধ্য সব রেলে প্রতিনিধিদিগকে দ্বিতীয় শ্রেণীর রিটার্ণ টিকিট দিয়াছিলেন, এবং প্রতিনিধিরা ইটালীর ছাত্রসভার অতিথি ছিলেন। কর্ত্তৃপক্ষ অপর্য্যাপ্ত অতিথিসৎকার করিয়াছিলেন। ওরিয়েণ্টাল ইন্‌ষ্টিটিউট, রোমবিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর, বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাসিষ্ট দল, ধর্ম্মগুরু পোপ মহাশয় এবং অন্য অনেক ব্যক্তি এক-একদিন প্রতিনিধিদিগকে স্বাগত সম্ভাষণ ও অভ্যর্থনা করেন। প্রধান প্রধান দ্রষ্টব্য জায়গা, প্রদর্শনী এবং অপেরাতে যাইবারও বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। দেশপতি মুসোলিনি স্বয়ং আসিয়া কংগ্রেসের প্রারম্ভদিবসে প্রাচ্যমহাদেশের ছাত্রদিগকে সম্বোধন করিয়া বক্তৃতা করেন। তিনি সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ কবি কিপলিঙের "প্রাচ্য হচ্ছে প্রাচ্য, প্রতীচ্য হচ্ছে



অখ্যাতনামা সৈন্যদের সমাধির উপর প্রাচ্যের ছাত্রগণ কর্তৃক পুষ্পমাল্য-দান



ইউরোপপ্রবাসী ভারতীয়-ছাত্র-ফেডারেশনের তৃতীয় অধিবেশনের প্রতিনিধিগণ, রোম



ফেডারেশ্যন কৌন্সিলের সভ্যগণ
বামদিক হইতে উপবিষ্ট—শ্রীজয়কুমার পাল, শ্রীগয়রোলা থান্না, শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু, ডক্টর কাট্যার, আলী
বামদিক হইতে দণ্ডায়মান—শ্রীঅমিয়নাথ সরকার, শ্রীঅশোক বসু, মিঃ পার্থি, মিঃ মাথুর,
মিঃ কামদার, মিঃ সিং, মিঃ পি. এন্. রায়, মিঃ ডি. এন্. দাস

প্রতীচ্য ; উভয়ের মিলন কখনো হ'বে না," এই উক্তিটাকে বাজে কথা বলেন। তিনি বলেন, উভয়ের মিলন ও সহযোগিতায় সভ্যতার সৃজনাত্মক কাজ অতীতকালে হইয়াছিল। পরেও হইবে ; এশিয়া ইউরোপের পদানত থাকিবে, কাঁচামাল যোগাইবে ও ইউরোপের কারখানায় পণ্যদ্রব্য কিনিবে, এই ধারণাটা আধুনিক এবং ইউরোপের কোন কোন জাতির ধারণা।

মুসোলিনীর বক্তৃতার পর এই কংগ্রেসের সভাপতি তাঁহাকে ধন্যবাদ দেন। তৎপরে সহকারী সভাপতি আরবদেশীয় অলজাত্রি এবং ভারতীয় প্রতিনিধিদের পক্ষ হইতে শ্রীমতী ভারতী সারাভাই বক্তৃতা করেন।

প্রত্যেক জাতির দুইজন করিয়া প্রতিনিধি লইয়া এই কংগ্রেসের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হয়, এবং ভারতবর্ষীয় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ জেহাংগিয়ানী সহযোগী সম্পাদক নিযুক্ত হন। এই কংগ্রেসের একটি স্থায়ী কর্য্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অমিয়নাথ সরকার ও চীনদেশীয়া শ্রীমতী সুজান্ লিয়াস যুগ্ম-সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন।

প্রাচ্য ছাত্রছাত্রীদের কংগ্রেসের সমকালে ইউরোপ প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রদের ফেডারেশ্যনের তৃতীয় সম্মেলনেরও অধিবেশন হয়। সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ইহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। মহাত্মা গান্ধী ইহার সম্মানিত আজীবন সভাপতি এবং পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহেরু ও শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ইহার সম্মানিত আজীবন সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। সুভাষবাবু স্থানকালোচিত একটি বক্তৃতা করেন। তাহার মধ্যে তিনি ছাত্রদিগকে বলেন, যে, ইউরোপ মহাদেশের (কন্টিনেন্টের) বিশ্ববিদ্যালয়গুলি অন্য কোথাকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলির চেয়ে নিকৃষ্ট নহে ; ভারতীয় ছাত্রদের এখানে আসা উচিত।

বিবিধ প্রসঙ্গ

ভারত-জাপানী চুক্তি লণ্ডনে স্বাক্ষরিত হইবে

জাপান ও ভারতবর্ষের মধ্যে যে চুক্তি হইয়াছে, তাহা লণ্ডনে স্বাক্ষরিত হইবে স্থির হইয়া গিয়াছে। লণ্ডনে স্বাক্ষরিত হইবার বিরুদ্ধে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় তর্ক উত্থাপিত হইয়াছিল। ব্যাপারটি যখন সম্পূর্ণরূপে জাপান ও ভারতবর্ষের মধ্যে বাণিজ্য-সম্পর্কিত, তখন চুক্তিটি ভারতবর্ষে স্বাক্ষরিত হওয়াই উচিত ছিল। ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের অধীন, সত্য; কিন্তু সেই কথাটা অকারণ উত্তমরূপে সমঝাইয়া দিবার চেষ্টা করা অনাবশ্যক, ও অনুচিত এবং ভারতবর্ষের স্বাধীন হওয়া যখন প্রার্থনীয়, তখন বিনা-রক্তপাতে, উপলক্ষ্য ঘটিলেই, ভারতবর্ষের আত্মকর্তৃত্ব স্বীকৃত হওয়া উচিত।

—

ভারতে বিলাতের ক্রিকেট খেলোয়াড়দল

কিছুদিন পূর্ব্বে হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে আরোহণ করিবার জন্য ইংলণ্ডের পক্ষ হইতে ইংরেজদের যে ক্ষুদ্র দল চেষ্টা করিয়াছিল, তাহার ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন একজন ইংরেজ মহিলা। তিনি যে এত টাকা খরচ করিয়াছিলেন, তাহার উদ্দেশ্য বলিয়াছিলেন ইহা ভারতীয়দিগকে দেখান, যে, ইংরেজদের এখনও পৌরুষ, দুঃসাধ্য কাজ করিবার সাহস এবং কষ্টসহিষ্ণুতা আছে। অর্থাৎ তিনি পরোক্ষভাবে ভারতবর্ষের লোকদিগকে বলিতে চাহিয়াছিলেন, "তোমরা ভারতের ইংরেজাধীনতা ঝাড়িয়া ফেলিতে চাহিতেছ হয়ত এই মনে করিয়া, যে, ইংরেজরা পৌরুষহীন নির্বীর্য্য হইয়াছে; কিন্তু দেখ, সে ধারণা সত্য নহে।" ভারতবর্ষে যে ইংরেজ ক্রিকেটার-দল খেলায় ভারতীয়দিগকে বিশেষ রকম পরাজয় স্বীকার করাইতে আসিয়াছে এবং তাহাতে সকলকামও হইতেছে, সেই খেলার অভিযানের মধ্যেও ঐ রকম মতলব আছে কিনা, কে জানে। ইংরেজদের খেলায় ইংরেজরা ওস্তাদ হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছু নাই। কিন্তু রণজিৎসিংহজী, দলীপ সিংহজী প্রভৃতি ভারতীয় ক্রিকেটার ইংলণ্ডেও খুব কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন, সুতরাং অবসরবিশিষ্ট বলিষ্ঠ লোকদের লইয়া দল বাঁধিতে পারিলে ক্রিকেটে ভারতীয় দলও যশস্বী হইতে পারে। তাহার পরোক্ষ প্রমাণ, ধ্যানসিংপ্রমুখ ভারতীয় হকীর দল জগতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। বিজয়নগরমের মহারাজকুমারের দল যে কাশীতে ইংরেজ ক্রিকেটারদিগকে পরাজিত করিয়াছে, ইহা আর একটা প্রমাণ। ইংরেজরা ও ইউরোপীয়রা তাহাদের পুরুষোচিত খেলায় প্রতিযোগিতা করিতে আমাদিগকে আহ্বান করে। ভারতীয়দের উচিত ভারতীয় পুরুষোচিত কোন খেলায় তাহাদিগকে প্রতিযোগিতা করিতে আহ্বান করা।

বাংলা দেশে ও অন্যান্য প্রদেশে অনেক ধনীর সন্তান বিলাসে ব্যসনে বা তাহা অপেক্ষা গর্হিত ব্যাপারে দেহ-মন নষ্ট করেন, কাজ কিছু না করিয়া অকাজ করেন। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে দেশী-বিদেশী সব পুরুষোচিত ক্রীড়ায় পারদর্শী হইতে পারেন।

—

পৌষে নানা সভার অধিবেশন

বহু বৎসর ধরিয়া পৌষ মাসে ভারতবর্ষে নানা রাজনৈতিক, সামাজিক, বৈজ্ঞানিক, প্রাচ্যবিদ্যাবিষয়ক, শিক্ষাবিষয়ক ও অন্যবিধ সভার অধিবেশন হইয়া আসিতেছে। সবগুলির বিবরণ দেওয়া এবং তাহাদের কার্য্যাবলীর আলোচনা করা মাসিক কাগজের পক্ষে অসম্ভব, এবং শুধু তাহাদের নাম করিয়া বিশেষ কিছু লাভ নাই। এত রকমের এত সভার অধিবেশন যে হয়, তাহা হইতে বুঝা যায় যে, নানাদিকে উন্নতি ও প্রগতির ইচ্ছা ভারতীয়দের জন্মিয়াছে। সকল চেষ্টায় সকলের যোগ দেওয়া অসাধ্য। কিন্তু যে-সব চেষ্টা অন্যদিগকে দাবাইয়া বা বঞ্চিত রাখিয়া নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য অভিপ্রেত, সেগুলি

ছাড়া অন্য সব চেষ্টার সহিত, হিতচেষ্টার সহিত, সহানুভূতি সকলেই করিতে পারে।

যাঁহারা কোন বিষয়ে বার্ষিক সভার অধিবেশনের আয়োজন করেন, তাঁহাদের দেখা উচিত যেন তাঁহাদের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির অনুকূল চেষ্টা সমস্ত বৎসর ধরিয়া হয়। কেবল বৎসরে একবার ঘটা করিয়া একত্র হওয়া, সম্পূর্ণ ব্যর্থ না হইলেও, তাহার দ্বারাই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। ইহাও মনে রাখা দরকার যে, ইংরেজী 'রিজলুসনে'র একটি মানে সংকল্প, প্রতিজ্ঞা। প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রতিজ্ঞা পালন কর্ত্তব্য। সম্বৎসর ঘুমান অকর্ত্তব্য।

—

বিজ্ঞান-কংগ্রেস

এ বৎসর বোম্বাইয়ে বিজ্ঞান-কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীযুক্ত মেঘনাদ সাহা তাহার সভাপতির পদে বৃত হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষের যে কয় জন বৈজ্ঞানিকের ভারতবর্ষের বাহিরেও সভ্য দেশসকলে খ্যাতি আছে, অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। বিজ্ঞান-কংগ্রেসে প্রায় ৫০০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইহাতে মনে হয়, প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে বিজ্ঞানের চর্চা কিছু হইতেছে। কিন্তু তাহাই যথেষ্ট নয়। প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে আরম্ভ করিয়া বিজ্ঞান-শিক্ষা ও বিজ্ঞানের অনুশীলন হওয়া উচিত।

সাহা মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে যে ইণ্ডিয়ান সায়েন্স একাডেমী বা ভারতীয় বিজ্ঞান-পরিষদ স্থাপনের প্রস্তাব করেন, আমরা তাহার পক্ষপাতী। এই পরিষদের প্রধান কার্য্যক্ষেত্র ও কার্য্যালয় কলিকাতায় হওয়াই সম্ভব। কারণ, এ-পর্য্যন্ত পদার্থ-বিদ্যা, রসায়নী বিদ্যা, উদ্ভিদ-বিজ্ঞান, জীববিদ্যা, নৃতত্ত্ব প্রভৃতি বহু বিজ্ঞানে গবেষণার সমষ্টি অন্য কোথাও কলিকাতা অপেক্ষা বেশী হয় নাই। প্রস্তাবিত এই পরিষদ সম্বন্ধে বিস্তারিত বৃত্তান্ত ফেব্রুয়ারী মাসের 'মডার্ণ রিভিয়ু'তে বাহির হইয়াছে।

ডক্টর সাহার অভিভাষণে বিবৃত একটি মত এই যে, আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি সমাধানের চেষ্টা করিলে পৃথিবীতে সব মানুষের সজ্জনতা ঘটিতে ও শান্তি স্থাপিত হইতে পারে। সব দেশের ক্ষমতাশালী রাষ্ট্রনীতিজ্ঞেরা যদি এরূপ প্রস্তাবে রাজী হন, যদি সব দেশের প্রধান বৈজ্ঞানিকেরা স্বজাতীয় পক্ষপাত ও স্বার্থপরতা বর্জ্জন করিতে পারেন, এবং এরূপ বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীর নির্দ্ধারণ জগতের গবর্ণমেণ্টসমূহ



ডক্টর শ্রীমেঘনাদ সাহা

মানিয়া চলেন ও কার্য্যে পরিণত করেন, তাহা হইলে ডক্টর সাহার প্রস্তাব সুফলপ্রদ হইতে পারে।

আপাততঃ এই সব "যদি" অসম্ভব-"যদি" মনে হইতে পারে, কিন্তু অন্য সব বড় জাগতিক আদর্শের চেয়ে ইহা বেশী অসম্ভব নয়। পৃথিবীর সকল দেশের ফেডারেশ্যন অর্থাৎ সঙ্ঘবদ্ধতা এরূপ একটি আদর্শ। তাহাও এখন অসম্ভব মনে হইলেও আলোচনার অযোগ্য নহে।

—

মহাত্মা গান্ধীর বঙ্গদেশে আগমন

মহাত্মা গান্ধী আগামী আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত কেবলমাত্র অবনত জাতিদের উন্নয়ন ও সেবার ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ ও স্থান পরিদর্শন করিবেন। তিনি শীঘ্র বাংলা দেশেও আসিবেন। রাজনৈতিক কোন আলোচনা বা আন্দোলন-করা তাঁহার অভিপ্রেত নহে। তিনি অবনত শ্রেণীর লোকদের উন্নয়নের জন্য যে চেষ্টা করিতেছেন, আমরা তাহার সমর্থক—যদিও তাঁহার কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে দু-একটা বিষয়ে আমাদের মতভেদ আছে। বাংলা দেশে তাঁহার শুভাগমন হউক, আমরা চাই।

যদি তিনি রাজনৈতিক কোন কাজে আসিতেন, তাহা হইলেও তাঁহার আগমনকে শুভ মনে করিতাম। কারণ, যাঁহাদের রাজনৈতিক মত ও কার্য্যপ্রণালী মহাত্মাজীর মত ও কার্য্যপ্রণালী হইতে **সম্পূর্ণ** আলাদা—আমাদের তাহা নহে, তাঁহারা নিরপেক্ষ বিবেচক ও সত্যবাদী হইলে তাঁহাদিগকেও স্বীকার করিতে হইবে, যে, রাজনীতি ক্ষেত্রে মহাত্মাজী ভারতবর্ষীয়দের মনে নৈরাশ্যের জায়গায় আশা, ভয়-বিহ্বলতার স্থানে সাহস এবং স্বার্থপরতা ও আরাম প্রিয়তার পরিবর্ত্তে আত্মোৎসর্গ ও দুঃখবরণের প্রবৃত্তি যে-প্রকারে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, সেরূপ আর কেহ করিতে পারেন নাই।

—

ভারতীয় লিবার্‌যালদের বার্ষিক অধিবেশন

ভারতীয় উদারনৈতিকদের কন্‌ফারেন্স এবার মান্দ্রাজে হইয়াছিল। কলিকাতার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু তাহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার অভিভাষণটি ফেনাইয়া বড় করেন নাই, সংক্ষেপে বিশদভাবে নিজের বক্তব্য বলিয়াছিলেন। তাহাতে প্রধানতঃ হোয়াইট পেপারের সমালোচনা ও দোষ প্রদর্শন ছিল। কন্‌ফারেন্সের প্রধান প্রস্তাবও হোয়াইট পেপার বিষয়ক। "ঠিক্-মাননীয়" স্যার তেজ-বাহাদুর সাপ্রু তাঁহার ঐ-বিষয়ক দীর্ঘ মন্তব্যে এবং গোলটেবিল বৈঠকের ব্রিটিশভারতীয় "প্রতিনিধি"দের মন্তব্যে তাঁহারা যাহা চাহিয়াছেন, উদারনৈতিকদের প্রস্তাবে তাহা অপেক্ষা বেশী চাওয়া হইয়াছে। তাঁহারা বলিয়াছেন, কোন সংস্কার-বিধিতেই ভারতবর্ষের প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে না এবং তাহা ভারতীয় মহাজাতির রাষ্ট্রীয় আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবে না, ও রাজনৈতিক অসন্তোষ দূর করিবে না, যদি তাহা ভারতবর্ষকে আইন দ্বারা নির্দ্দিষ্ট অল্পসময়ের মধ্যে ডোমীনিয়নের মর্য্যাদা ও ক্ষমতা না দেয়। 'ওয়েষ্ট মিনষ্টার ষ্ট্যাটিউট' নামক আইন বিলাতে পাস হওয়ার পর ডোমীনিয়নত্ব ও স্বাধীনতায় সারতঃ বেশী তফাৎ নাই। সুতরাং উদারনৈতিকরা ছোট দাবী করেন নাই। তবে সমালোচকরা বলিতে পারেন, "তোমরা সমালোচনা ও দাবী করিয়াছ, খুব রাজনীতিজ্ঞান দেখাইয়াছ, কিন্তু গবর্ন্মেণ্ট তোমাদের কথা না শুনিলে কি করিবে?" তাহা সত্য। তবে বর্ত্তমান অবস্থায় কংগ্রেসওয়ালারাও সমালোচনা ছাড়া আর কিছু করিতেছেন না—আগে করিয়াছেন বটে। অতএব সব রাজনৈতিক দল একত্র হইয়া হোয়াইট পেপারের অযথেষ্টতা, অসন্তোষজনকতা, ও দোষাবলী দেখাইয়া একটা সম্মিলিত জাতীয় দাবী করিলে ভাল হইত। কিন্তু "সাম্প্রদায়িক মীমাংসা" বাদ দিয়া সকল দলের কন্‌ফারেন্স করা অসম্ভব। তাহাকে সর্ব্বদল-কন্‌ফারেন্স নাম দিলেও তাহা সে নামের যোগ্য হইবে না; কেন না, তাহাতে সব দল যোগ দিবে না।

—

ভারতীয় সমাজসংস্কার-সভার অধিবেশন

আগে আগে প্রতিবৎসর কংগ্রেসের সঙ্গে ভারতীয় সমাজ-সংস্কার-সভার অধিবেশন হইত। তাহা কিছু দিন বন্ধ ছিল। এ-বৎসর তাহা মান্দ্রাজে হওয়ায় সুখী হইলাম। সার্ভেণ্টস্ অব ইণ্ডিয়া ("ভারত-ভৃত্য")-সমিতির সভাপতি প্রসিদ্ধ লোকহিতকর্ম্মী শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ দেবধর সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। তাঁহার অভিভাষণে তিনি "অস্পৃশ্যতা"কে হিন্দু সমাজের প্রধান কলঙ্ক ও দুর্ব্বলতা বলেন, এবং তাহা দূর করিবার নিমিত্ত মাহাত্মা গান্ধী যে চেষ্টা করিতেছেন, তাহার জন্য তাঁহার অতি ন্যায্য প্রশংসা করেন। কন্‌ফা-রেন্সেও এই বিষয়ে একটি প্রস্তাব ধার্য্য করা হয়। অন্যান্য সব প্রয়োজনীয় বিষয়েও প্রস্তাব ধার্য্য হয়।

—

ভারতীয় মহিলাদের কন্‌ফারেন্স

ভারতীয় মহিলাদের কন্‌ফারেন্স এবার কলিকাতায় হইয়াছিল। লাহোর হাইকোর্টের জজ স্যার আবদুল কাদিরের

পত্নী সভানেত্রী নির্ব্বাচিত হন। তাঁহার অভিভাষণে শিক্ষার বিস্তার, সমাজসংস্কার প্রভৃতির আবশ্যকতা বর্ণিত হইয়াছিল।

ভারতীয় মুসলমান পুরুষদের অধিকাংশ, প্রায় সকলেই, ব্যবস্থাপক সভায় আলাদা প্রতিনিধি চান। কিন্তু ভারতবর্ষের মহিলানেত্রীরা সম্মিলিত নির্ব্বাচনের পক্ষপাতী, মুসলমান নেত্রীরাও তাহা চান। মহিলাদের এই অসাম্প্রদায়িকতা সুলক্ষণ।

মহিলাদের কন্‌ফারেন্সে যুদ্ধের বিরুদ্ধে যে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এই কন্‌ফারেন্সে নারীদের উপর নানা অত্যাচার এবং তাহাদের বিরুদ্ধে নানা অপরাধের নিন্দা করিয়া তাহার প্রতিকারার্থ প্রস্তাব ধার্য্য করিবার চেষ্টা হয়। কিন্তু কন্‌ফারেন্সের কর্ত্রীপক্ষ তাহা হইতে দেন নাই। ইহা ঠিক্ হয় নাই। যাহা হউক, ভারতীয় নারী-সমিতির বঙ্গীয় শাখা এ-বিষয়ে কিঞ্চিৎ মনোযোগ করিয়াছেন, ইহা কিঞ্চিৎ সুলক্ষণ।

—

মিঃ জিন্নার ঐক্য প্রার্থনা!

মিঃ জিন্না বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া হোয়াইট পেপারের দোষ উদ্‌ঘাটন, এবং সকল ভারতীয় দলের একীভূত হইয়া সম্মিলিত চেষ্টা ও দাবী করিবার প্রয়োজন বর্ণনা করিয়াছেন। নূতন কথা নহে। কিন্তু তাঁহার বর্ণিত চৌদ্দ-দফাবিশিষ্ট মুসলমান সম্প্রদায়ের দাবী বিদ্যমান থাকিতে এবং নীলামের সর্ব্বোচ্চ ডাকে মুসলমান আনুগত্য ক্রয় করিবার ব্রিটিশ গবন্মেণ্টের ইচ্ছা ও সামর্থ্য বিদ্যমান থাকিতে ঐক্য কিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, তাহা তিনি বা অন্য কোন মুসলমান নেতা বা হিন্দু নেতা এপর্য্যন্ত বলিতে পারেন নাই।

—

রামমোহন রায়ের সমালোচনা

যাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন, তাঁহারা তাঁহাকে সকল জীবের, সকল মানুষের, চেয়ে বড় বলিয়া মানেন। কিন্তু ঈশ্বরও সমালোচকদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পান নাই। তাঁহার কত দোষ ত্রুটি অসঙ্গতি অবিচার পক্ষপাতিত্বই না তাহারা দেখাইয়াছে! এমন কি, ঈশ্বরের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত কেহ কেহ অস্বীকার করিয়াছে। সুতরাং কোন মানুষ যে সমালোচকের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাইবে, এরূপ আশা করা যায় না। বস্তুতঃ, সমালোচনা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া কাহারও পক্ষে ভাল নয়। সাধারণ মানুষ, যে-সে মানুষ, ত সমালোচিত হইতেই পারে। কিন্তু মনুষ্য-শ্রেষ্ঠ বলিয়া যাঁহারা বড়-বড় ধর্ম্মসম্প্রদায়ের দ্বারা এবং সেই সেই সম্প্রদায়ের বাহিরের অনেক লোকের দ্বারাও সম্মানিত, তাঁহারাও সমালোচিত হইয়াছেন। বুদ্ধদেবের সমালোচনা হইয়াছে, যীশু খ্রীষ্টের সমালোচনা হইয়াছে—কোন্ ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের সমালোচনা হয় নাই?

অতএব রামমোহন রায়কে যাঁহারা ভক্তি করেন, তাঁহারা এরূপ আশা কখনও করিতে পারেন না, যে, তাঁহার সমালোচনা হইবে না। তাঁহার সত্যপ্রিয় ভক্তেরা এরূপ আশা বা অভিলাষ করেন নাই; কেহ কেহ নিজেই তাঁহার সমালোচনা করিয়াছেন। তাঁহারা ইহাই চান, যে, তাঁহার বিরুদ্ধে যাহা কিছু বলিবার আছে সমস্তই বলা হউক এবং পরীক্ষিত হউক; তাহার ফলে, সত্য যাহা তাহাই প্রতিষ্ঠিত ও গৃহীত হউক। তাহাতে রামমোহনের মহত্ত্বের হ্রাস হইবে না।

মানুষ সাধারণ হউক, বা অসাধারণ হউক, তাহার বিরুদ্ধে কিছু বলিতে হইলে যথেষ্ট প্রমাণ-সহকারে বলা আবশ্যক, এবং প্রমাণগুলি পুরাপুরি সর্ব্বসাধারণের নিকট উপস্থিত করা আবশ্যক।

তা ছাড়া, সমালোচনার সময়-অসময়ও আছে। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে আমাদের দেশে কয়েক জন বিখ্যাত লোকের মৃত্যু হইয়াছে। লক্ষ লক্ষ লোক শ্মশান অভিমুখে তাঁহাদের শবের অনুগমন করিয়াছে এবং তাহার পর তাঁহাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ বহু স্থানে সভা হইয়াছে। কোন মানুষই পূর্ণ মানুষ নয়, সকলেরই অপূর্ণতা আছে। ইঁহাদেরও অপূর্ণতা ছিল। কিন্তু অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার প্রাক্কালে বা স্মৃতিপূজার সভার প্রাক্কালে তাঁহাদের অপূর্ণতাগুলি প্রদর্শন করা ভিন্নদলভুক্ত ভারতীয়েরাও শোভন ও সময়োচিত মনে করেন নাই। লোকমান্য টিলকের মৃত্যুর পর ষ্টেট্‌সম্যান তাঁহার অযথা দোষোদ্‌ঘাটন করায় উহার ভারতীয় অনেক গ্রাহক ও ক্রেতা উহা লওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন।

বিখ্যাত যে-সব লোক বহু পূর্ব্বে পরলোকগত হইয়াছেন,

তাঁহাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ বার্ষিক সভা হইয়া থাকে। অন্য সময়ে তাঁহাদের সমালোচনা হইলেও, ঠিক এইরূপ সভা হইবার প্রাক্‌কালেই সমালোচনা অশোভন বিবেচিত হইয়া থাকে।

এইরূপ নানা কারণে, আমরা রামমোহন রায়ের শতবার্ষিকীর বৎসরে ও তাহার প্রাক্কালে তাঁহার কোন সমালোচনা মুদ্রিত করা অনুচিত মনে করিয়াছিলাম। কেহ মুদ্রিত করিয়া থাকিলেও আমরা তাহার উত্তর দিতে অগ্রসর হই নাই। আমরা চাহিয়াছিলাম, রামমোহনের প্রতি যাঁহারা শ্রদ্ধাবান্ তাঁহারা অবাধে প্রাণ খুলিয়া শ্রদ্ধা প্রদর্শন করুন—শতবার্ষিকী ত দুইবার আসে না, আর আসিবে না।

শ্রদ্ধাপ্রদর্শনমূলক অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে দোষোদ্‌ঘাটন অশোভন বা অ-সময়োচিত বলিয়াই যে তাহা বর্জ্জনীয়, তাহা নহে; অন্য কারণও আছে। মধ্যাহ্নকালেও চোখের সামনে ছাতা খুলিয়া ধরিলে, এমন জ্যোতিষ্মান্ যে সূর্য্য তাহাকেও মানুষ দেখিতে পায় না। ছাতাটা কাল ও ছোট, সূর্য্য জ্যোতিষ্মান্ ও অতি বৃহৎ। কিন্তু ছাতাটা মানুষের খুব কাছে, সূর্য্য দূরে। তাই ক্ষুদ্র বৃহৎকে ঢাকিয়া ফেলে। সেইরূপ অতি বিখ্যাত ও কৃতী ব্যক্তিরও কোন সত্য, অনুমিত, বা কল্পিত দোষ যদি পাঠকদের সম্মুখে ধরা হয়, তাহা হইলে সেই প্রসিদ্ধ ব্যক্তির মহৎ চরিত্র এবং কীর্ত্তিও অন্ততঃ কিছু কালের জন্য পাঠকেরা ভুলিয়া যাইতে পারে, এবং তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত না হইয়া তাঁহাকে অবজ্ঞা করিতে পারে। রাম-মোহন রায়ের প্রতি যখন শ্রদ্ধা দেখাইবার আয়োজন হইতেছিল, তখন তাঁহার সত্য বা কল্পিত দোষ উদ্‌ঘাটন করা এই জন্য আমাদের বিবেচনায় অসমীচীন মনে হইয়াছিল। অবশ্য, যদি কাহারও মতে ইহাই সত্য হয় যে, রামমোহন মানুষের জন্য কল্যাণকর ও প্রশংসনীয় কিছুই করেন নাই, বা তাঁহার কার্য্য ও চরিত্রে প্রশংসনীয় অপেক্ষা অপ্রশংসনীয় অংশই বেশী ছিল, তাহা হইলে সময় অসময় শোভন অশোভন কিছুই বিবেচনা না করিয়া রামমোহনের দোষোদ্‌ঘাটন করা কোন সময়েই তাঁহাদের পক্ষে অনুচিত নহে।

সব মানুষই অপূর্ণ। রামমোহন রায় মানুষ ছিলেন, সুতরাং অপূর্ণ ছিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার যে-কোন দোষ যে-কেহ দেখাইয়াছেন বা দেখাইবেন, তাহাই সত্য বলিয়া আমরা মানিয়া লইয়াছি বা লইব, এরূপ ভয় কেহ যেন না করেন। উপযুক্ত প্রমাণ পাইলে মানিব, নতুবা মানিব না। এ-পর্য্যন্ত সম্প্রতি তাঁহার বিরুদ্ধে যাহা লেখা বা বলা হইয়াছে, তাহা আমরা সত্য বলিয়া স্বীকার করি নাই। পরে কি হইবে, জানি না।

—

ভূমিকম্প

গত ১লা মাঘ ১৫ই জানুয়ারী যে ভীষণ ভূমিকম্প হয়, তাহাতে প্রধানতঃ বিহার প্রদেশের উত্তর অংশ এবং নেপাল বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। এই দুই অঞ্চলে সম্পত্তি-নাশ কি পরিমাণ হইয়াছে, তাহার কখনও ঠিক্ অনুমান হইবে না। কত মানুষের মৃত্যু হইয়াছে, তাহার কতকটা ঠিক্ অনুমান হইতে পারিত, যদি ভূমিকম্পের পর হইতেই যত শব দাহ করা হইয়াছে, যত শব সমাধিস্থ হইয়াছে এবং যত নদীতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা লিখিয়া রাখা হইত, এবং যদি বিধ্বস্ত গৃহাদির মৃত্তিকা ইষ্টক কাষ্ঠাদির স্তূপের নীচে হইতে খুঁড়িয়া বাহির করা শবের হিসাব রাখা হইত। কিন্তু প্রথম হইতে তাহা করা হয় নাই—সরকারী বে-সরকারী সকল লোকে আকস্মিক বিপৎপাতে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলেন, এবং এখনও প্রায় একমাস পরেও মুঙ্গের প্রভৃতি শহরে ধ্বংসাবশেষ খুঁড়িয়া সকল শব বাহির করা হয় নাই। দুর্গন্ধ দ্বারাই বুঝা যাইতেছে, যে, এখনও অনেক শব ধ্বংসাবশেষের নীচে প্রোথিত আছে। প্রথম হইতেই এই দিকে গবর্ন্মেণ্টের আরও অধিক মনোযোগ করা উচিত ছিল—এখনও করা উচিত। নতুবা স্থানে স্থানে মহামারী অনিবার্য্য হইবে।

যাঁহাদের মৃত্যু হইয়াছে, তাঁহাদের ঐহিক ও দৈহিক কষ্ট শেষ হইয়াছে। যাঁহারা বাঁচিয়া আছেন, এরূপ অগণিত লোকদের দুঃখের অবধি নাই। শারীরিক অল্প বা অধিক আঘাতের যন্ত্রণা, অল্পাধিক সম্পত্তিনাশ বা সর্ব্বনাশ, পরিবারস্থ আর সকলের বা কাহারও কাহারও মৃত্যুজনিত শোক, গৃহহীনতা, অন্নবস্ত্রের অভাব, রোগ, শীত ও বৃষ্টিতে দুঃখভোগ, অসহায় ভাবে শিশুসন্তানদের ক্রন্দন শ্রবণ—কত প্রকারে যে লক্ষ লক্ষ লোক মর্ম্মান্তিক যাতনা ভোগ করিতেছে, তাহা বর্ণনা করা যায় না। বিপন্ন লোকদের দুঃখের

উপশম যাহাতে হয়, তাহার চেষ্টা হইতেছে। আপাততঃ যেরূপ সাহায্য সদ্য সদ্য দেওয়া দরকার, তাহাই দিবার চেষ্টা হইতেছে। গৃহহীনদের গৃহনির্ম্মাণ, রাস্তাঘাট প্রভৃতি মেরামত বা পুনর্নির্ম্মাণ, যাহাদের সর্ব্বনাশ হইয়াছে তাহাদের উপার্জ্জনের ব্যবস্থা করা—এসব বহুকোটি টাকার ব্যাপার। তাহা ভারত-গবর্ন্মেণ্টের সাহায্য ব্যতীত হইবে না।

বিহারের নেতা বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ মিঃ সী এফ্ এণ্ড্রুজকে তারযোগে ভূমিকম্পজনিত ক্ষতির নিম্নমুদ্রিত যে বর্ণনা পাঠাইয়াছেন, তাহা হইতে উহার কিঞ্চিৎ ধারণা হইবে।

যে সকল অঞ্চল ভূমিকম্পের ফলে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, উহার আয়তন ৩০ হাজার বর্গমাইল পরিমিত হইবে। তন্মধ্যে উত্তর-বিহার, বিশেষতঃ দ্বারবঙ্গ, মজঃফরপুর, চম্পারণ ও সারণ জেলা এবং ভাগলপুরের উত্তরাংশ গুরুতরভাবে বিধ্বস্ত হইয়াছে। এই সকল বিধ্বস্ত অঞ্চলের লোকসংখ্যা এক কোটী ২০ লক্ষ হইবে। তন্মধ্যে শহরগুলির অধিবাসীর সংখ্যা ৫ লক্ষ হইবে। মুঙ্গের, মজঃফরপুর, দ্বারবঙ্গ ও মোতিহারী প্রভৃতি সমৃদ্ধ শহরগুলি লইয়া মোট ১২টি শহর সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইয়াছে। খুব অল্প করিয়া ধরিলেও দেখা যায়, তিন হাজার বর্গ-মাইল চাষের জমি বিদীর্ণ ভূপৃষ্ঠ দিয়া ভূগর্ভ হইতে উৎক্ষিপ্ত জল ও বালুতে মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে। সমস্ত কূপই বালুকায় ভর্ত্তি হইয়া গিয়াছে এবং পানীয় জলের একান্ত অভাব উপস্থিত হইয়াছে। ভূগর্ভস্থ জলরাশিও খারাপ হইয়া গিয়াছে। পল্লীবাসীরা ভূগর্ভ-উৎক্ষিপ্ত অপরিষ্কার জলই পান করিতেছে। সংক্রামতার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। ক্ষেত্রে শস্যগুলির গুরুতর অনিষ্ট ঘটিয়াছে। ভূকম্প-প্রপীড়িত অঞ্চলমধ্যস্থ ১৫টি চিনির কলের মধ্যে ১০টি ধ্বংস হইয়াছে, অবশিষ্ট ৫টি কাজের অযোগ্য হইয়া রহিয়াছে। কাজেই দশ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের ইক্ষু কাজে লাগিতে না পারিয়া বিনষ্ট হইবে, এরূপ আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। ভূপৃষ্ঠের সমতা বিশেষ ভাবে বিপর্য্যস্ত হওয়ায় নদনদীসমূহের গতিপথ পরিবর্ত্তন ও আগামী বর্ষায় বন্যার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। ৬ হাজার লোক মরিয়াছে বলিয়া সরকার যে অনুমান করিয়াছেন, বস্তুতঃ মৃত্যুসংখ্যা উহার অনেক বেশী। অন্ততঃ ২০ হাজার লোক মারা গিয়াছে। একমাত্র মুঙ্গেরে ১০ হাজার লোকের মৃত্যু ঘটিয়াছে। সঠিক সংবাদ এখনও পাওয়া যায় নাই, এখনও ধ্বংসস্তূপের নীচে হাজার হাজার মৃতদেহ রহিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। বিপন্ন লোকেরা বাঁশের কুঁড়ে ও কাপড়ের ছাউনির মধ্যে নিদারুণ শীতে—অবশেষে বৃষ্টির বারিধারার মধ্যে, অশেষ কষ্টভোগ করিয়া কাল কাটাইয়াছে ও কাটাইতেছে। বৃষ্টিতে উহাদের দুঃখকষ্ট সহস্রগুণে বাড়াইয়া দিয়াছে।

ভূমিকম্প বৈকালের দিকে হইয়াছিল এবং অধিকাংশ পুরুষ কার্য্যোপলক্ষে বাড়ির বাহিরেই ছিল, এই জন্য নারী ও শিশুদের মধ্যেই মৃত্যুসংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হইয়াছে।

বিধ্বস্ত নগরীসমূহের পুনর্গঠন সমস্যাই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর সমস্যা; রাস্তা, সেতু, রেলপথ ও বাড়িগুলি নির্ম্মাণকল্পে সরকারকে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিতে হইবে, বিনষ্ট বাড়িগুলি পুনর্নির্ম্মাণে ও বিপন্নগণের সহায়তা কল্পে অবিরত পরিশ্রম করিতে হইবে। বিধ্বস্ত গৃহ নির্ম্মাণ, বিনষ্ট কূপ ও কৃষিক্ষেত্র সমূহের উদ্ধার ও শস্যনাশ জন্য খাদ্যাভাব দূরীকরণ কল্পে বিস্তর অর্থ ও পরিশ্রমের প্রয়োজন। আমি সর্ব্বত্র সাহায্য-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিতেছি এবং বিপন্নগণকে জীবনযাত্রাপথে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করণকল্পে সাহায্য করিতেছি।—ইউনাইটেড প্রেস

বাংলা দেশের এবং অন্য কোন কোন প্রদেশের পক্ষ হইতে আরও অনেক সাহায্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ব্যক্তিগত ভাবেও কেহ কেহ সাহায্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

যে-সব দেশে ভূমিকম্প প্রায় হয়, গৃহ-নির্ম্মাণে তাহাদের অভিজ্ঞতা বিহারে ও নেপালে কাজে লাগান সমীচীন হইবে।

নেপালের ক্ষতির প্রথম প্রথম বিশেষ বৃত্তান্ত পাওয়া যায় নাই। পরে জানা গিয়াছে, যে, সেখানেও রাজধানী কাঠমাণ্ডু ও আরও কয়েকটি নগর বিধ্বস্ত হইয়াছে এবং অনেক হাজার লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

—

বিহারে ভূমিকম্পের কেন্দ্র হইবে কি ?

বিহার ভূমিকম্পের কেন্দ্র হইবে, এইরূপ একটি আশঙ্কা প্রকাশিত হইয়াছে। সেখানে ভূমিকম্পের কেন্দ্র হইবে কিনা, তাহা বৈজ্ঞানিকেরাও এখনও ঠিক্ করিয়া বলিতে পারেন না। কিন্তু যদি হয়, তাহা হইলেও ভয়ে আড়ষ্ট হওয়া মনুষ্যত্বহীনতার কাজ হইবে। জাপান ভূমিকম্পবহুল দেশ। কিন্তু জাপানীরা তজ্জন্য দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করে নাই, নিরুদ্যমও হয় নাই। তাহারা পৌরুষের সহিত নিজের দেশেই আছে, ভূমিকম্প যথাসম্ভব সহ্য করিতে পারে, এরূপ ঘরবাড়ি তৈয়ার করিয়া তাহাতে বাস করিতেছে। তাহাদের উৎসাহ ও কর্ম্মিষ্ঠতারও অন্ত নাই। ইটালীতে ভিস্যুভিয়স আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে প্রাচীনকালে পম্পিয়াই ও হার্কুলেনিয়ম নগর দুটি বিধ্বস্ত ও প্রোথিত হয়। এখনও মধ্যে মধ্যে সেই অঞ্চলে ভূমিকম্প ও অগ্ন্যুদ্গম হইয়া থাকে। কিন্তু লোকেরা তাহা ছাড়িয়া পলায়ন করে নাই। যে পাহাড়ের চূড়া হইতে গলিত ধাতু আদি বাহির হইয়া পাশ দিয়া নীচে প্রবাহিত হয়, তাহার পাশে ও পাদ-দেশে মানুষ এখনও চাষবাস করে। অদৃষ্টবাদিতা ভারতবর্ষীয়-দের একটা দোষ বলিয়া গণিত। কিন্তু তাহার ভাল দিকও আছে। অদৃষ্টবাদী এই ভাবিয়া ধীর স্থির ভাবে নিজের কাজ করিয়া যাইতে পারেন, যে, দুইটা দিনে মৃত্যু হইতে পলাইয়া কোন লাভ নাই—প্রথম যে-দিন মৃত্যু হইবে বলিয়া

দলাটে লেখা আছে, এবং দ্বিতীয় যে-দিন মৃত্যু হইবে না বলিয়া লেখা আছে। যে-দিন মৃত্যু হইবে বলিয়া লেখা আছে, সে-দিন যেখানেই যাও মৃত্যু হইবে; সুতরাং পলাইয়া কি লাভ? আবার, যে-দিন মৃত্যু হইবে না বলিয়া লেখা আছে, সে-দিন যেখানে যে অবস্থাতেই থাক মৃত্যু হইবে না; সুতরাং পলাইবার আবশ্যক কি?

—

মানুষের পাপ ও ভূমিকম্প

মহাত্মা গান্ধী ভূমিকম্পটা মানুষদের পাপের—যেমন অস্পৃশ্যতাবোধের—ফল বলেন। তাহাতে আমরা গত ১লা ফেব্রুয়ারী প্রকাশিত মডার্ণ রিভিয়ুতে লিখিয়াছিলাম, যে, মানুষের পাপের সহিত ভূমিকম্পের সম্পর্ক আছে, এরূপ মত স্বীকার করা দুরূহ। কারণ, সেদিনকার ভূমিকম্পের বিষয় বিবেচনা করিলেও ইহা বলা যায় না, যে, বিহারের লোকেরাই সবচেয়ে পাপী, অথবা যে-সব শহর ও গ্রামের বেশী ক্ষতি হইয়াছে তৎসমুদয়ের অধিবাসীরাই সব চেয়ে পাপী, কিংবা সেই সব শহর ও গ্রামে যাহারা হত, আহত বা সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে তাহারাই সব চেয়ে পাপী। ভূমিকম্প আদি প্রাকৃতিক কারণে হয়।

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ-বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাও মহাত্মার মতের বিপরীত।

—

সন্ত্রাসক দমনার্থ আবার আইন

সন্ত্রাসবাদ ও সন্ত্রাসক দমন করিবার জন্য ইতিপূর্ব্বে গবন্মে‍র্ণ্ট একাধিক বার অর্ডিন্যান্স জারি করিয়াছেন, ব্যবস্থাপক সভার সাহায্যে অর্ডিন্যান্সবৎ আইন জারি করিয়াছেন। ঐ সব অর্ডিন্যান্স ও আইন হইবার আগেও অনেক স্থলে পুলিস ও শাসন বিভাগের কর্ম্মচারীরা তাঁহাদের আইন-সঙ্গত ক্ষমতার অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়াছেন। তাহাতেও সন্ত্রাসবাদ ও সন্ত্রাসকদল নির্ম্মূল না-হওয়ায় সরকার বাহাদুর আইন করিয়া আরও অধিক ক্ষমতা লইতে চান। সেই জন্য একটি আইনের খসড়া ব্যবস্থাপক সভায় পেশ হইয়াছে। গবন্মে‍র্ণ্ট ভয়ের দ্বারা দেশ শাসন করিবেন, বা কতকগুলি লোক গবন্মে‍র্ণ্টকে ভয় দেখাইয়া নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার চেষ্টা করিবে, ইহার কোনটাই আমরা চাই না। সন্ত্রাসবাদ ও সন্ত্রাসকদের উচ্ছেদ আমরা চাই। সেই উচ্ছেদসাধন কি প্রকারে হইতে পারে, তাহার আলোচনা অনেক বার করিয়াছি। আমাদের অনুমোদিত উপায় অনুসারে কাজ করিবার বা গবন্মে‍র্ণ্টকে করাইবার ক্ষমতা আমাদের না থাকায়, আলোচনায় কোন ফল হয় নাই। গবন্মে‍র্ণ্ট যে-সব উপায় অবলম্বন করিতে চান, তাহার আলোচনা ভাল করিয়া হইতেও পারে না। কারণ, খবরের কাগজগুলির যথেষ্ট স্বাধীনতা নাই। প্রস্তাবিত আইনের খসড়াটি সর্ব্বসাধারণের মতের জন্য প্রচারিত করিবার প্রস্তাবটি ব্যবস্থাপক সভায় নামঞ্জুর হইয়াছে। উহা প্রচারিত হয় নাই। উহা আমরা দেখি নাই। খবরের কাগজে উহার সম্বন্ধে যাহা বাহির হইয়াছে তাহা হইতে যে ধারণা জন্মিয়াছে, তাহা অবলম্বন করিয়া কিছু বলিব। আইনপ্রণয়ন যে-সব সরকারী কর্ম্মচারী করেন ও করান এবং ব্যবস্থাপক সভার অধিকাংশ যে-সব সভ্য সর্ব্বসাধারণের মত নির্দ্ধারণার্থ বিলটির প্রচারের বিরুদ্ধে মত দিয়াছেন, তাঁহারা বোধ হয় মনে করেন, যে, তাঁহারা অভ্রান্ত ও সর্ব্বজ্ঞ, এবং তাঁহারা ছাড়া আর কাহারও মতের কোন মূল্য ও আবশ্যক নাই। যে সিলেক্ট কমিটিকে বিলটি বিবেচনা করিতে দেওয়া হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ সভ্যের স্বাধীনচিন্ততার বদনাম নাই। বস্তুতঃ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিকাংশ সভ্য দেশের লোকদের প্রতিনিধি নহেন। অথচ, তাঁহাদের ভোটে যে আইনটি হইবে, বিলাতের লোকে ও বিলাতী পার্লেমেণ্ট ও গবন্মে‍র্ণ্ট ধরিয়া লইবেন, যে, বঙ্গের প্রতিনিধিরা বঙ্গের ভীষণ অবস্থা বিবেচনা করিয়া এই আইন করিয়াছে! তাহার এই ফলও হইতে পারে, যে, বিলাতী সরকারী ও বেসরকারী ধারণা এইরূপ জন্মিবে, যে, বাংলা দেশ কোন প্রকার স্বশাসনের অনুপযুক্ত। এই বিলটির সম্বন্ধে সেদিন আলবার্ট-হলে যে সার্ব্বজনিক সভা হয় তাহাতে মৌলবী আবদুল সমদ বলেন, যে, বিলাতে ঐরূপ ধারণা জন্মান এখন ঐরূপ আইন করিবার উদ্দেশ্য। এরূপ কিছু বলিবার মত প্রমাণ আমাদের নিকট নাই, সুতরাং আমরা সে-সম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ করিতেছি না।

বাংলা-সরকারের পক্ষ হইতে সন্ত্রাসবাদ সম্বন্ধে দু-রকম কথা বলা হইয়াছে। এক এই, যে, সন্ত্রাসবাদকে এখন আর অল্পকালস্থায়ী একটা ব্যাধি মনে করা চলিবে না, উহা

বদ্ধমূল হইয়াছে; উহা দমন ও বিনষ্ট করিবার জন্য যাহা কিছু করা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও সন্ত্রাসক দলের লোকসংগ্রহ চলিতেছে। আবার ইহাও বলা হইয়াছে, যে, সন্ত্রাসক কাজ আগেকার চেয়ে কমিয়াছে; গত বৎসর ম্যাজিষ্ট্রেট বার্জের হত্যা ছাড়া গুরুতর সন্ত্রাসক কাজ কিছু হয় নাই। এই দু-রকম উক্তির মধ্যে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য লক্ষিত হয় না। তবে, ভিতরে ভিতরে কিছু সামঞ্জস্য পাওয়া যাইতে পারে। উভয়ের মধ্যে ইহা উহ্য থাকিতে পারে, যে, যদিও বাহিরে সন্ত্রাসক দলের কাজ অনেকটা সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে, তথাপি উহার মূল নষ্ট করিতে পারা যায় নাই, এবং যাহারা সন্ত্রাসক তাহারা যে-মনোভাব হইতে এরূপ কাজ করে তাহাদের সেই মনোভাব নষ্ট হয় নাই; কারণ অল্পবয়স্ক লোকদের মধ্য হইতে লোক লইয়া এখনও তাহারা দল পুষ্ট করিতেছে। যাহা হউক, সরকারী দুই রকম উক্তির মধ্যে কি উহ্য আছে, তাহা অনুমান না করিয়া উভয়ের আলাদা আলাদা আলোচনা করা যাইতে পারে।

যদি সন্ত্রাসবাদ ক্ষণিক বা অল্পকালস্থায়ী ব্যাধি না হয়, যদি তাহা চিরকালিক (chronic) ব্যাধিতেই পরিণত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার যে চিকিৎসা ৫, ১০, বা ২৫ বৎসর ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে, সেটা যে ব্যর্থ হইয়াছে, সেটা যে সুচিকিৎসা নহে, চিকিৎসা-প্রণালীরই আমূল পরিবর্ত্তন দরকার, সহজ বুদ্ধিতে এইরূপই মনে হয়। ভাল চিকিৎসকেরা এরূপ ক্ষেত্রে চিকিৎসা বদলাইয়া থাকেন, কিংবা নিজের বিদ্যাবুদ্ধিতে না কুলাইলে অভিজ্ঞতর ও বিজ্ঞতর চিকিৎসকের পরামর্শ লইয়া থাকেন। কিন্তু গবর্মেণ্ট সেরূপ কিছু করিতেছেন না। যে চিকিৎসা-প্রণালীতে রোগের জড় মরে নাই, যে চিকিৎসা-প্রণালীতে উহা অল্পসাময়িক (ephemeral) অবস্থা হইতে চিরকালিক (chronic) অবস্থায় পৌঁছিয়াছে, সেই চিকিৎসা-প্রণালীকে তাঁহারা চিরস্থায়ী করিতে যাইতেছেন; এবং যে-ঔষধ রোগের বিষকে জড়কে মূলকে স্পর্শ করিতে পারে নাই, তাহারই অত্যুৎকট মাত্রা প্রয়োগ করিতে যাইতেছেন।

পক্ষান্তরে যদি সরকার-পক্ষের দ্বিতীয় উক্তি ঠিক্ হয়, অর্থাৎ গত বৎসরে কেবল ম্যাজিষ্ট্রেট বার্জকে হত্যাই একমাত্র গুরুতর সন্ত্রাসক অপরাধ হওয়ায় গবর্মেণ্ট সন্ত্রাসকদের কাজ অনেকটা সীমাবদ্ধ করিতে পারিয়াছেন, এই বিশ্বাস ঠিক্ হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে, গবর্মেণ্টের বর্ত্তমান ক্ষমতাতেই তাঁহারা ফল পাইতেছেন। তাহাই যদি হয়, তবে গবর্মেণ্টের বেশী ক্ষমতা গ্রহণ, ম্যাজিষ্ট্রেটদের ক্ষমতা বৃদ্ধি, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আরও কমান, শাস্তির কঠোরতা বৃদ্ধি করা—এ সকলের আবশ্যক কোথায়? বর্ত্তমান দমনাত্মক আইনকে চিরস্থায়ী করিবারই বা আবশ্যক কি? উহাকে না-হয় আরও বৎসর দুই বলবৎ রাখিলেই ত চলিতে পারে।

গবর্মেণ্ট কিরূপ আইন করিতে চাহিতেছেন, এখন তাহার কিছু আলোচনা করি।

যদি রিভলভার আদি অস্ত্র এরূপ কাহারও অধিকারে থাকে, যাহার উহা রাখিবার সরকারী লাইসেন্স নাই, কিংবা এরূপ কেহ উহা নির্ম্মাণ বা বিক্রয় করে, এবং যদি উহা নরহত্যার বা তাহার সাহায্যের জন্য ব্যবহার করিবার অভিপ্রায় তাহার থাকে, কিংবা যদি সে জানে, যে, উহা নরহত্যার জন্য ব্যবহৃত হইবার সম্ভাবনা আছে, তাহা হইলে তাহার ফাঁসী পর্য্যন্ত শাস্তি হইতে পারিবে। অস্ত্রটা যে নরহত্যার অভিপ্রায়ে রাখা হইয়াছে, সেই অভিপ্রায় প্রমাণ করিবার দায়িত্ব (onus) কাহার থাকিবে? গবর্মেণ্ট ইহা ঠিক্ মত প্রমাণ করিবেন, না, বিচারক উহা মানিয়া লইবেন? নরহত্যার জন্য ব্যবহৃত হইবার সম্ভাবনার জ্ঞান যে অস্ত্রের নির্ম্মাতা, বিক্রেতা বা অধিকারীর আছে, তাহা প্রমাণ করিবার ভার (onus) কাহার উপর থাকিবে এবং তাহা কি প্রকারে প্রমাণিত হইবে? নরহত্যার মানে সাধারণ নরহত্যা, না শুধু রাজনৈতিক নরহত্যা? দস্যুতা প্রতিহিংসা প্রভৃতির নিমিত্ত সাধারণ নরহত্যা করিবার নিমিত্ত কেহ অস্ত্র রাখিলেও সে খুন করিতে না পারিলে তাহার ফাঁসীর নিয়ম এ-পর্য্যন্ত নাই। নূতন আইন বিধিবদ্ধ হইয়া গেলে কি সেরূপ অপরাধীরও ফাঁসী হইবে? যাহারা বিনা লাইসেন্সে অস্ত্র রাখে, তাহাদের শাস্তি অবশ্যই হওয়া চাই। কিন্তু শাস্তির মাত্রা ঠিক্ রাখা দরকার। অতিশয় কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করিলে তাহাতে যে বিপরীত ফল ফলিবার সম্ভাবনা, প্রসিদ্ধ ইংরেজ লেখক ও রাজনীতিজ্ঞ লর্ড মর্লী ভারতসচিব থাকিবার সময় তাহা তৎকালিক বড়লাট লর্ড মিণ্টোকে লিখিয়াছিলেন, ইহা মর্লী

"রিকলেক্শান্‌স্" ("স্মৃতিকথা") বহি হইতে জানা যায়; যথা— "We must keep order, but *excess* of severity is not the path to order. On the contrary, it is the path to the bomb."

গবর্ন্মেণ্ট কি জানেন না, যে, প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্যও দুষ্ট লোকে অন্যের ঘরে অস্ত্র রাখিয়া দিতে পারে? গোয়েন্দাজাতীয় লোক এরূপ কাজ করিতে পারে? এ-সব স্থলে মানুষের ফাঁসী হওয়া বা ফাঁসীর সম্ভাবনা ঘটা কি উচিত? বিচারকদের ভুলে এপর্য্যন্ত অনেক নির্দ্দোষ লোকের ফাঁসী হইয়া গিয়াছে। এরূপ সাংঘাতিক ভ্রমের ক্ষেত্র বিস্তৃততর করা উচিত নয়।

এরূপ উৎকট আইন কোন দেশে নাই বলিয়াই আমাদের ধারণা। আইনজ্ঞ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার বসুও না-কি ব্যবস্থাপক সভায় এই কথা বলিয়াছিলেন। তাঁহার উক্তি উদ্ধৃত করিয়া "বম্বে সেণ্টিনেল্" বলিয়াছেন, "উহার যে নজীর নাই, ইহাই ত উহার সৌন্দর্য্য!"

সে দিন আলবার্ট-হলের সভায় আইনজ্ঞ ডক্টর নরেশচন্দ্র সেন-গুপ্ত বলিয়াছেন, যেরূপ আইন হইতে যাইতেছে তাহা "মার্শ্যাল ল" অর্থাৎ সামরিক তথাকথিত "আইনের" চেয়ে অপকৃষ্ট ও সাংঘাতিক।

আমরা আইনজ্ঞ নহি। কিন্তু সাধারণ বুদ্ধিতে আমাদের এইরূপ মনে হয়, যে, গুরুতর ও লঘুতর অপরাধ উভয়েরই শাস্তি যদি চরম হয়, তাহা হইলে অপরাধ-প্রবণ লোকদের কেবল লঘুতর অপরাধ করিবার ও গুরুতর অপরাধ হইতে নিবৃত্ত থাকিবার একটা হেতু (motive) লুপ্ত করা হয়। সিঁদকাটি রাখিলেও বেত্রাঘাত দণ্ড এবং তাহার সাহায্যে চুরি করিলেও বেত্রাঘাত দণ্ডের ব্যবস্থা যদি থাকে, তাহা হইলে হবু-চোরের ঝোঁক বাড়িবে চুরি করিয়া ফেলিতে—কারণ, বমাল সহিত ধরা পড়িলেও তাহার বেত্রদণ্ডের বেশী ত কিছু হইবে না।

কাহারও কাছে গবর্ন্মেণ্ট দ্বারা নিষিদ্ধ, বাজেয়াপ্ত বা সী কাষ্টমস্ আইন অনুসারে নিষিদ্ধ কোন পুস্তক, পুস্তিকা, সংবাদপত্রী, ছবি ইত্যাদি যদি থাকে, কিংবা এমন কিছু থাকে যাহা পড়িয়া দেখিয়া মানুষের মনটা বিপ্লববাদের দিকে ঝোঁকে, তাহা হইলে তাহার তিন বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড হইতে পারিবে। সী কাষ্টমস্ আইন ১৮৭৮ সালে পাস্ হয়। সে আজ ৫৩।৫৪ বৎসরের কথা। তদনুসারে কত ও কি কি বহি নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহার তালিকা আছে কি? থাকিলেও তাহা কিনিতে পাওয়া যায় কি? তাহার পর নানা অর্ডিন্যান্স ও আইন অনুজ্ঞাদি অনুসারে কত কি নিষিদ্ধ ও বাজেয়াপ্ত হইয়াছে, তাহারও কোন তালিকা নাই। সরকারী কোন কর্ম্মচারীই সবগুলার নাম জানেন না, বলিতে পারেন না। এ অবস্থায় কাহারও কাছে এরূপ কোন বহি থাকিলেই তাহার দণ্ড হওয়া সাতিশয় অসঙ্গত ও অদ্ভুত ব্যাপার হইবে। আর যদি কেহ শুধু কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য এরূপ কিছু রাখে, বিপ্লব ঘটাইবার উদ্দেশ্য তাহার না থাকে, তাহা হইলেও তাহার শাস্তি হওয়া উচিত নয়।

ফ্রান্সের বিপ্লব, রুশিয়ার বিপ্লব, ইটালীর বিপ্লব, স্পেনের বিপ্লব, জার্ম্মেনীর বিপ্লব, প্রভৃতির কত প্রসিদ্ধ ইতিহাস আছে। ইংলণ্ডেও বিদ্রোহ ও বিপ্লব হইয়াছে। আয়ার্ল্যাণ্ডে কত কি হইয়াছে। ইম্পীরিয়্যাল লাইব্রেরীতে এই সকলের ইতিহাস আছে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীতে আছে, প্রেসিডেন্সী কলেজে আছে, কত সরকারী বেসরকারী স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে আছে। এগুলার জন্য কাহার শাস্তি হইবে? এই সমস্ত লাইব্রেরী খানাতল্লাস করিয়া পুলিস কি এই সব বহি লইয়া যাইবে? অনেক বহির নাম হইতে তাহার ভিতরে কি আছে না-পড়িয়া জানা যায় না। সব বহি জজ ম্যাজিষ্ট্রেট পুলিস পড়িয়া লাইব্রেরীগুলি হইতে সরকারী আপত্তিজনক বহিগুলা সরাইয়া ফেলিয়া লাইব্রেরীগুলির "শুদ্ধি" করিলে ভাল হয়। অনেকের গৃহ-পুস্তকালয়ে এরূপ বহি আছে। ব্যক্তির লাইব্রেরীতে যত বহি আছে, তাহার অনেক বহি মালিকরা পড়েন নাই। অথচ পুস্তক-বিশেষ কাহারও বাড়িতে থাকিলেই তাহার শাস্তি হইবে!

যেমন দুষ্টলোকে কাহারও বাড়িতে তাহার অজ্ঞাতসারে অস্ত্রাদি রাখিয়া দিয়া তাহাকে বেফাঁদে ফেলিতে পারে, তেমনই গবর্ন্মেণ্টের চক্ষে আপত্তিজনক পুস্তকাদিও ত গৃহস্বামীর অজ্ঞাতে তাহার বাড়িতে আসিয়া পৌঁছিতে পারে। তাহাতেও তাহার দণ্ড হইতে পারে।

সংবাদপত্রের সম্পাদকদের ও পুস্তক-সমালোচকদের বিপদটাও

বিবেচ্য। আমাদের কাছে দেশবিদেশ হইতে পুস্তক-পুস্তিকা মুদ্রিত ছোট-বড় কাগজ কত কি আসে। অযাচিত ভাবে বিনামূল্যে আসে সবগুলার মোড়ক খুলিতেও দেরি হয়। অনেকগুলা খুলিলেও পড়া হয় না বা অত্যন্ত বিলম্বে পড়া হয়। সমালোচনার্থ বহি না পড়িয়াই সমালোচকদের নিকট পাঠান হয়। তাঁহারাও পাইবামাত্র পড়েন না। অথচ দেশবিদেশের লেখক ও প্রকাশকেরা অযাচিতভাবে এই যত সব মুদ্রিত জিনিষ পাঠান এবং সরকারী ডাকঘর অযাচিত ভাবে যত সব আমাদের কাছে পৌছাইয়া দেয়, তাহার মধ্যে গবর্মেণ্টের চক্ষে দোষের কিছু থাকিলে শাস্তি হইবে সম্পাদকদের বা সমালোচকদের, যে-বেচারারা ঐ সব জিনিষ পড়িয়াও দেখে নাই!

মনে রাখিতে হইবে, বাংলা দেশের বাহিরে কেহ ওরূপ জিনিষ রাখিলে তাহার শাস্তি হইবে না।

আজকাল নাকি কোন কোন কাগজে বিদেশী বিপ্লবের প্রশংসাপূর্ণ বৃত্তান্ত বাহির হয় ও তদ্দ্বারা সন্ত্রাসবাদের উপযোগী "হাওয়া" ("atinosphere") জীয়াইয়া রাখা হয়।

দ্রুত রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তনের নাম রিভলিউশ্যন বা বিপ্লব। বিপ্লবমাত্রেই যে খারাপ নয়, সেদিন চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার এক রায়ে একথা বলিয়াছেন বলিয়া খবরের কাগজে দেখিলাম। যাহা হউক, অতঃপর অতীত বিপ্লব বা ভবিষ্যৎ সমসাময়িক কোন বিপ্লবের বৃত্তান্ত বা সংবাদ যাহাতে বঙ্গের দেশী খবরের কাগজে না থাকে, সে-বিষয়ে বঙ্গের বাঙালী ও অন্য ভারতীয় সম্পাদকদিগকে সতর্ক থাকিতে হইবে; কারণ, কোন্ সংবাদের ভাষা যে গবর্ম্মেণ্টের অর্থাৎ কার্য্যতঃ পুলিসের চক্ষে প্রশংসাত্মক মনে হইবে, তাহা স্থির করা দুঃসাধ্য বা অসাধ্য। সাবধান না থাকিলে জামিনের টাকা দিতে হইবে, এবং তাহাও পরিণামে প্রেস পর্য্যন্ত বাজেয়াপ্ত হইবে। যদি রয়টার স্পেন, ফ্রান্স, ইটালী, জার্ম্মানী, মেক্সিকো, দক্ষিণ-আমেরিকা প্রভৃতিতে সংঘটিত ঐরূপ কোন ঘটনার সংবাদ পাঠান, তাহা হইলে সে-সংবাদ অমুদ্রিত রাখিয়া পুলিসের কর্ত্তাকে পাঠাইয়া দিতে হইবে এবং তাহার জায়গায় লিখিতে হইবে, অমুক দেশে গোলাপজল বৃষ্টি এবং রসগোল্লার ভোজ হইয়া গিয়াছে। অথবা সংবাদটা ছাপিয়া সঙ্গে সঙ্গে সেরূপ ঘটনার নিন্দা তীব্র ভাষায় করিলে চলিতে পারিবে কি? কিন্তু বাংলা দেশের বাহিরের ভারতীয়দের কাগজে ওরূপ কিছু বাহির হওয়াতে কোন বাধা হইবে না, এবং সে-সব কাগজ বাংলা দেশে আসিতে পারিবে!

সরকার বাহাদুরের ধারণা বাংলা দেশের দেশী কাগজগুলা আরও কোন কোন উপায়ে পরোক্ষভাবে সন্ত্রাসবাদ জীয়াইয়া রাখিতেছে। একটা হচ্ছে আণ্ডামানের রাজনৈতিক বন্দীদের এবং দেওলী হিজলী প্রভৃতির নজর-বন্দীদের জন্য অযথা ঔৎসুক্য ("undue concern") ও সহানুভূতি প্রকাশ। কতটুকু ঔৎসুক্য যথাযোগ্য ("due"), কতটুকুই বা অযথা ("undue"); তাহার মাপকাঠি ভিন্ন ভিন্ন পুলিস কর্ম্মচারী ও ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে থাকিবে, এবং সবগুলা এক মাপের হইবে না; কেন-না, "নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্"। আমরা অনেক খবরের কাগজ দেখিয়া থাকি। বিচারান্তে নির্দ্দিষ্ট-কালের জন্য বন্দী ও বিনা-বিচারে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বন্দীদের সম্বন্ধে ঔৎসুক্য ও সহানুভূতি যাহা খবরের কাগজে প্রকাশ পায়, তাহা তাহাদের প্রায়োপবেশন, প্রায়োপবেশন বা বলপূর্ব্বক খাওয়ান হইতে উৎপন্ন বলিয়া অনুমিত রোগে মৃত্যু, আত্মহত্যা, বন্দীদশায় কঠিন রোগে আক্রান্ত হওয়া, আত্মীয়রা তাহাদের দীর্ঘকাল সংবাদ না পাওয়া, তাহাদের আহারাদি ও পাঠ্যপুস্তকাদি আইন অনুযায়ী না পাওয়া, আইনে নির্দ্দিষ্ট কাল অন্তর অন্তর আত্মীয়দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে না পাওয়া, ইত্যাদি বিষয়ক সংবাদ প্রকাশ, আলোচনা, ও গবর্মেণ্টকে অনুরোধ করার আকার ধারণ করে। অন্য কোন রকমের ঔৎসুক্য প্রকাশ আমরা দেখি নাই। ঐগুলি কি অযথা ঔৎসুক্য-প্রকাশ? তাহা হইলে যথাযোগ্য ঔৎসুক্য-প্রকাশ কি প্রকার, তাহার দৃষ্টান্ত যেন গবর্মেণ্ট প্রস্তাবিত আইনটির যথাস্থানে বসাইয়া দেন।

ঐরূপ জিনিষ খবরের কাগজে প্রকাশিত হওয়ায় কেমন করিয়া পরোক্ষভাবেও সন্ত্রাসবাদ ও বিপ্লবী মনোভাবের পোষকতা হয়, বুঝা কঠিন। সম্পাদকেরা মনে করে, যে, ন্যায্য বিচারের পর প্রকৃত ঘাতক একজন প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইবার পর ফাঁসীর আগের কয়দিনও যদি জেলে আইন-নির্দ্দিষ্ট ব্যবহার না পায়, তাহা হইলে সেরূপ লোকের ন্যায্য ব্যবহার প্রাপ্তির জন্য আন্দোলন করা কর্ত্তব্য; তাহাতে জিঘাংসার পোষকতা করা হয় না। জেল-বিভাগ পুলিস-বিভাগ প্রভৃতির

বন্দোবস্ত একেবারে নিখুঁত এবং তাহাদের সব কর্ম্মচারীই সাতিশয় কর্ত্তব্যপরায়ণ আদর্শ পুরুষ, ইহা আমরা মনে করি না। আমরা ভ্রান্ত বা বদ্‌লোক, মানিয়া লইলাম। কিন্তু আমাদের অযথা ঔৎসুক্যটুকু, কিংবা তাহার অতিরিক্ত "আহা বাছারে" যদি আমরা বলি—যাহা কখনও বলি না, তাহা হইলে কেবল ঐ জিনিষগুলির লোভে বিপ্লবী হইয়া বা বিপ্লবী মনোভাব পোষণ করিয়া আণ্ডামানে বা দেওলী হিজলীতে নির্ব্বাসনের দুঃখ বরণ করিবে, এরূপ আহাম্মক যুবক বা বালক বাংলা দেশে কতগুলি আছে, তাহার সেন্সস্ কোন দেশী সম্পাদকের নিকট নাই।

আর একটা জিনিষ যাহা গবর্মেণ্টের মতে সন্ত্রাসবাদ জাগাইয়া রাখে, সেটা হচ্ছে বিপ্লবীদের মৃত্যু-দিবসে বার্ষিক স্মারক সভা আদি করা। বিচারান্তে দোষী বলিয়া প্রমাণিত কাহারও সম্বন্ধে এরূপ করা হইয়া থাকিলে গবর্মেণ্ট-পক্ষীয় লোকেরা সেরূপ দৃষ্টান্ত দিয়া নিজেদের যুক্তি বাস্তবিক প্রবল করিতে পারিতেন। সরকার-পক্ষ হইতে সেরূপ দৃষ্টান্ত দেওয়া হয় নাই; দেওয়া হইয়াছে যতীন দাস দিবস এবং হিজলী দিবস। কিন্তু যতীন্দ্রনাথ দাস বিচারান্তে দোষী কখনও প্রমাণিত হন নাই, দণ্ডিতও হন নাই। তিনি বিচারাধীন অবস্থায় জেলে দীর্ঘকাল প্রায়োপবেশন দ্বারা প্রাণত্যাগ করেন। তিনি প্রায়োপবেশনও করিয়াছিলেন মহৎ উদ্দেশ্যে। হিজলী দিবস বাঙালীদিগকে স্মরণ করাইয়া দেয় যে, ঐ দিন বিনা বিচারে বন্দী একাধিক যুবক রক্ষীদের গুলিতে নিহত হয়। এই ব্যাপারের তদন্ত সরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত সরকারী লোক লইয়া গঠিত কমিটির দ্বারা হইয়াছিল। তদন্তের রিপোর্টে সেক্রেটারিয়েট হইতে প্রকাশিত ঘটনাটির বৃত্তান্ত সমর্থিত হয় নাই, নিহত ব্যক্তিদের মৃত্যু তাহাদেরই দোষে হইয়াছে ইহা প্রমাণ হয় নাই, হিজলী আটকখানার বন্দোবস্তের নানা দোষত্রুটি বাহির হয়, রক্ষীরা যে সবাই সত্যবাদী ও নির্দ্দোষ ব্যক্তি তাহা প্রমাণিত হয় নাই। অতএব, সরকার-পক্ষের দৃষ্টান্ত দুটির জন্য তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করিতে পারা যায় না।

বঙ্গে সন্ত্রাসবাদ দমন ও বিনাশ করিবার নিমিত্ত কয়েক বৎসর ব্যাপী যে-সব ব্যবস্থা ছিল, সরকার এখন তাহা স্থায়ী করিতে চাহিতেছেন। তাহার কারণ এই দেখাইয়াছেন, যে, সন্ত্রাসকরা ভাবিতেছে আর কিছু দিন পরে যখন সরকারী লোকদের হাতে ঐ সব ব্যবস্থা-প্রদত্ত বিশেষ ক্ষমতা থাকিবে না তখন তাহারা অবাধে সন্ত্রাসক কাজ করিতে পারিবে, কিন্তু ব্যবস্থাগুলি চিরস্থায়ী করিলে তাহাদের সে আশা থাকিবে না। গবর্মেণ্ট ধরিয়া লইতেছেন, যে, সন্ত্রাসবাদ চিরস্থায়ী হইবে, সুতরাং তাহার সঙ্গে সংগ্রাম করিবার জন্য চিরস্থায়ী আইন চাই, এবং চিরস্থায়ী আইন থাকিলেই সন্ত্রাসবাদকে নির্মূল করা যাইবে। কিন্তু পৃথিবীর নানা দেশে পুরাকাল হইতে নরহত্যার জন্য প্রাণদণ্ডের চিরস্থায়ী আইন চলিয়া আসিতেছে। সেইরূপ আইন থাকাতেই কি সেই সব দেশে আর নরহত্যা হয় না? শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডে ২০০ রকম অপরাধের জন্য প্রাণদণ্ডের স্থায়ী আইন ছিল। তাহাতে অপরাধগুলা কমে নাই। এখন কেবল দু-একটা অপরাধের জন্য প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু প্রাণদণ্ড প্রায় হয় না, নরহত্যাও ইংলণ্ডে প্রায় হয় না। অনেক দেশ হইতে প্রাণদণ্ড উঠিয়া গিয়াছে, অথচ তাহাতে তথায় নরহত্যা বাড়ে নাই। মানুষের সুশিক্ষা, উপার্জ্জনের নানা উপায়ের অস্তিত্ব, প্রকৃত সভ্যতার প্রগতি, সর্ব্বসাধারণের রাষ্ট্রীয় অধিকার বৃদ্ধি, দেশের সুশাসন, প্রভৃতি কারণে এইরূপ সুফল ফলিয়াছে; উৎকট কঠোর বিশেষ রকম আইনের দ্বারা এরূপ ফল লব্ধ হয় নাই।

জাপানী সন্ত্রাসকরা কিছুকাল পূর্ব্বে জাপানের প্রধান মন্ত্রী প্রভৃতি বিখ্যাত লোকদিগকে খুন করিয়াছিল। জাপান গবর্মেণ্ট বিশেষ কোন আইন না করিয়াও তথায় সন্ত্রাসবাদ দমন করিতে পারিয়াছেন। অন্য কোন কোন দেশেও এরূপ দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু বাংলা দেশে গবর্মেণ্ট কেবল আইনের কঠোরতা ও স্থায়িত্ব বৃদ্ধি হইতে সুফল লাভ করিতে চান। অন্য উপায় অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বড়লাট হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক রাজপুরুষ অনেক কথা বলিয়াছেন বটে, কিন্তু তদনুযায়ী কাজ বড় কিছু হয় নাই।

বেআইনী ভাবে অস্ত্র নির্ম্মাণ, বিক্রী ও রাখা নরহত্যার জন্য হইলে কেন তাহার জন্য প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করিতে হইতেছে, তাহার কারণ এই বলা হইয়াছে, যে, সম্প্রতি এই দেশে প্রস্তুত অস্ত্রের সন্ত্রাসকদের দ্বারা ব্যবহারের কয়েকটা

দৃষ্টান্ত গবর্ন্মেণ্টের গোচর হইয়াছে। এরূপ অস্ত্রের ব্যবহারে মানুষ খুন হইয়াছিল কি-না, বলা হয় নাই। যাহা হউক, যদি এই কয়টা স্থলে ভারতে প্রস্তুত অস্ত্রের দ্বারা নরহত্যাই হইয়া থাকে, তাহা হইলেও মনে রাখিতে হইবে, যে, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী ক্ষেত্রে এবং ইতিপূর্ব্বে বরাবরই বেআইনীভাবে সংগৃহীত বিদেশী অস্ত্র দ্বারাই মানুষ খুন হইয়া আসিতেছে। কিন্তু সে-সব দৃষ্টান্ত গবর্ন্মেণ্টকে প্রস্তাবিত রূপ প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করিতে উদ্বুদ্ধ করে নাই। বিদেশের অস্ত্রনির্ম্মাতারা বেআইনী ভাবে অস্ত্র রপ্তানী এবং পরোক্ষভাবে নরহত্যার সাহায্য করিলে তাহাদিগকে দণ্ডিত করিবার কোন চেষ্টা গবর্ন্মেণ্ট করিয়াছেন কিনা জানি না। অবৈধ আচরণের জন্য দেশী ও বিদেশী অস্ত্রনির্ম্মাতাদের সমান দণ্ড পাওয়া উচিত।

নিষিদ্ধ খবর ছাপিলে তাহার জন্য জামিন চাহিতে, জামিন বাজেয়াপ্ত করিতে এবং পরে প্রেস পর্য্যন্ত বাজেয়াপ্ত করিতে বাংলা-গবর্ন্মেণ্টকে ক্ষমতা দেওয়া হইবে, এবং ইহা হইবে স্থায়ী ব্যবস্থা। কোন্ জাতীয় কোন্ খবর নিষিদ্ধ খবর বলিয়া গণিত হইবে, তাহা স্থির হইবে অবশ্য গবর্ন্মেণ্টের অর্থাৎ কার্য্যতঃ পুলিসের দ্বারা। খবরের কাগজে যা তা ছাপা উচিত, ইহা আমরা মনে করি না। কিন্তু সম্পাদকেরা নিজেদের বিবেচনা অনুসারে খবর ছাপিবেন এবং তাহাতে ভুলচুক দোষ করিলে সাধারণ আইন অনুসারে দণ্ড লইতে প্রস্তুত থাকিবেন, ইহাই ন্যায্য ও জনহিতকর ব্যবস্থা। সরকারী লোকেরা, কোন্ জাতীয় খবর প্রকাশ নিষিদ্ধ, তাহা স্থির করিবার ক্ষমতা পাইলে, অনেক অত্যাচার অবিচারের খবর অপ্রকাশিত থাকিয়া যাইবে, এবং তাহাতে সুশাসনের বাধা জন্মিবে। সঙ্কটকালে সংবাদপত্রের সংবাদ প্রকাশসম্বন্ধীয় পূর্ব্বোক্ত স্বাধীনতা নির্দ্দিষ্ট অল্পকালের জন্য সীমাবদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু বাংলা দেশ এখন সঙ্কটাপন্ন হইয়াছে, চিরকাল সঙ্কটাপন্ন থাকিবে, এবং যদি কখন তাহার সঙ্কটত্রাণ ঘটে তাহা এইরূপ কঠোর ব্যবস্থার দ্বারাই হইবে, ইহা স্বীকার্য্য নহে।

প্রাদেশিক গবর্ন্মেণ্টের কতকগুলি ক্ষমতা ম্যাজিষ্ট্রেট-দিগকে দেওয়া হইবে। নির্দ্দিষ্ট লিখিত ও মুদ্রিত আইন অনুসারে দেশ শাসনের একটি গুণ এই, যে, ইহাতে সকল স্থলে বিচারের নিরপেক্ষতা ও সাম্য অনেকটা রক্ষিত হয়। কিন্তু অনেক মানুষকে নিজেদের ইচ্ছা অনুসারে ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার দিলে তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে একই রকম আচরণের জন্য কেহ বা দণ্ডিত হইবে, কেহ বা হইবে না, কাহারও লঘু কাহারও বা গুরু দণ্ড হইবে। ইহাতে ম্যাজিষ্ট্রেটরা খামখেয়ালী হইবার সুযোগ পাইবে, বিচারসাম্য থাকিবে না, এবং লোকেরা উদ্বিগ্ন ও ভয়বিহ্বল থাকিবে। যে-দেশে মানুষ সাহসী স্বাধীনচিত্ত অথচ আইনানুগ থাকে, তাহাকেই কিন্তু সুশাসিত দেশ বলে।

—

বাংলা লাইনোটাইপ উদ্ভাবন

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার ও শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসুর বহুবর্ষব্যাপী চেষ্টায় ও উদ্ভাবনী শক্তিতে লাইনোটাইপের কলে বাংলা হরফের ছাঁচ বসাইবার আয়োজন হইয়াছে, এবং একটি কল বর্ত্তমান খ্রীষ্টীয় বৎসরের শেষ ভাগেই আমেরিকা হইতে প্রস্তুত হইয়া আসিবে। লাইনোটাইপে হিন্দী হরফের ছাঁচ বসান ইতিপূর্ব্বেই রাজপুতানা-নিবাসী ও আমেরিকাপ্রবাসী শ্রীযুক্ত হরি গোভিলের চেষ্টায় ও উদ্ভাবনী শক্তিতে হইয়াছে। এখন নূতন ধরণের লাইনোটাইপ কলের সাহায্যে ইংরেজী, হিন্দী ও বাংলা হাতে কম্পোজ করার চেয়ে অনেক দ্রুত কম্পোজ হইতে পারিবে।

এইরূপ লাইনোটাইপের অভাব আমরা বহু পূর্ব্ব হইতে অনুভব করিতেছিলাম। ১৯২৮ সালে আমরা মডার্ণ রিভিয়ুতে সংবাদপত্র-পরিচালন সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখি। তাহাতে এই অভাব ব্যক্ত করিয়াছিলাম। ১৯২৯ সালের য়্যান্যাল্স্ অব্ দি আমেরিকান য়্যাকাডেমি অব পলিটিক্যাল এণ্ড্ সোশ্যাল সায়েন্সের (Annals of the American Academy of Political and Social Science এর) ভারতবর্ষ ("India") খণ্ডে ভারতবাসীদের মধ্যে সংবাদপত্রের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি ("Origin and Growth of Journalism Among Indians") সম্বন্ধে আমার একটি প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়। তাহাতেও আমি লিখিয়াছিলাম :—

"A far greater handicap than the absence of satisfactory typewriting machines for our vernaculars is the non-existence of typecasting and setting machines

like the linotype, the monotype, etc. for our vernaculars. Unless there be such machines for the vernaculars, daily newspapers in them can never promptly supply the reading public with news and comments thereupon, as fresh and full as newspapers conducted in English." P. 166, Part II, Vol. CXLV of *The Annals of the American Academy of Political and Social Science.*

—

সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতি

গত জানুয়ারী মাসে সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ইহা শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত তাঁহার পরলোকগতা পত্নী শ্রীমতী সরোজনলিনী দত্তের স্মৃতিরক্ষার্থ স্থাপিত করেন। তিনি বিশেষভাবে নারী-হিতৈষিণী ছিলেন। প্রথমে এই সমিতির মোটে সাত আটটি শাখা মহিলা সমিতি ছিল; এখন প্রায় ৪৫০টি হইয়াছে। তাহাদের সভাসংখ্যা দশ হাজারের উপর। সমিতিগুলির চেষ্টায় নারীদের মধ্যে সামাজিক কাজে উৎসাহ জন্মিয়াছে। গৃহস্থালীর কাজ, স্বাস্থ্যরক্ষা, ধাত্রীবিদ্যা, প্রসূতি-সেবা, শিশু-কল্যাণ, নানাবিধ কুটীর-শিল্প, প্রভৃতি অনেক কাজ সমিতি-গুলি করিয়া থাকেন। মেয়েদের মধ্যে নানা পণ্যশিল্প শিক্ষার বিস্তার কলিকাতার সমিতির শিল্পবিদ্যালয়ের দ্বারা হইতেছে। ইহাতে দুই শতের উপর ছাত্রী শিক্ষা পায়। তাহাদের প্রায় অর্দ্ধেক সধবা ও বিধবা নারী। তাহাদিগকে সাধারণ শিক্ষা এবং সঙ্গীত শিক্ষাও দেওয়া হয়। রোগীর পরিচর্য্যা শিখাইবার ব্যবস্থাও হইয়াছে।

পরলোকগত স্যার প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্বর্গীয়া পত্নী বসন্তকুমারী দেবীর দানের সাহায্যে এবং শ্রীমতী হেমলতা দেবীর তত্ত্বাবধানে সমিতি পুরীতে বসন্তকুমারী বিধবাশ্রম স্থাপিত করিয়াছেন। এই আশ্রমে ১৬ বৎসরের অধিকবয়স্কা বিধবাদিগকে সাধারণ সাহিত্যিক শিক্ষা ও শিল্পশিক্ষা দেওয়া হয়। শ্রীমতী হেমলতা দেবী সমিতির অন্যতম সম্পাদক, এবং ইহার মাসিক পত্র "বঙ্গলক্ষ্মী"ও তিনি সম্পাদন করেন। অন্যান্য কোন কোন জনহিতকর কাজের সহিত তাঁহার কর্ম্মগত যোগ আছে।

—

খদ্দর সংরক্ষণ আইন

খদ্দর ও খাদি বলিতে বাস্তবিক চরখায় হাতে-কাটা সুতা হইতে হাতের তাঁতে বোনা কাপড়ই বুঝায়। কিন্তু বোম্বাইয়ের কলওয়ালারা একপ্রকার মোটা কাপড় মিলের সুতায় মিলে প্রস্তুত করিয়া খদ্দর বলিয়া বিক্রী করিয়া খুব লাভ করে। তাহাতে প্রকৃত খদ্দরের কাট্‌তি কম থাকে ও ক্ষতি হয়। এই জন্য বিহারের শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসাদ সিংহের উদ্যোগে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় এইরূপ আইন পাস হইয়াছে, যে, খদ্দর ও খাদি নাম দুটি হাতে-কাটা সুতায় হাতে-বোনা কাপড়ের জন্যই ব্যবহৃত হইবে, মিলের কাপড়ে তাহা প্রযুক্ত হইলে বেআইনী হইবে। ইহা প্রয়োজনীয় ও উত্তম ব্যবস্থা।

—

ভূমিকম্পে বিদেশী সাহায্য

ভূমিকম্পে বিপন্ন লোকদের সাহায্যার্থ বিদেশ হইতে অতি সামান্য টাকা আসিয়াছে। বিলাত হইতেই বেশী আসা উচিত ছিল; কারণ ইংরেজরাই ভারতবর্ষে শাসন ও বাণিজ্য চালাইয়া সকলের চেয়ে বেশী সমৃদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত বড়লাটের ফণ্ডে যে ১৮৬৫ পৌণ্ড (সম্ভবতঃ বিলাত হইতেই) আসিয়াছে, দেশী মুদ্রায় তাহা মাত্র হাজার পঁচিশেক টাকা হয়; ডলারে (সম্ভবতঃ আমেরিকা হইতে) যাহা আসিয়াছে, তাহা আরও কম। বিলাত হইতে সীম্প্যাথি অর্থাৎ সহানুভূতি প্রচুর আসিয়াছে। লণ্ডনের লর্ড মেয়র সাহায্যের জন্য আবেদনও করিয়াছেন। কিন্তু কথায় যেমন চিঁড়া ভিজে না, তেমনই কেবল সহানুভূতির কথায় বিহারের বিপন্ন লোকদের অন্ন, বস্ত্র, কম্বল, অস্থায়ী গৃহ, স্থায়ী গৃহ, কূপ, রাস্তাঘাট প্রভৃতি কিছুই হইবে না।

—

সাহায্যার্থ বড়লাটের ফণ্ডে বিনা কমিশনে মণিঅর্ডার

খবরের কাগজে দেখিতেছি, ভূমিকম্পে বিপন্ন লোকদের সাহায্যার্থ কেহ বড়লাটের ফণ্ডে মণিঅর্ডারে টাকা পাঠাইলে তাহার জন্য কমিশন লাগিবে না। এই ব্যবস্থাটি অংশতঃ ভাল; সম্পূর্ণ ভাল হয় যদি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের প্রমুখতায় সংগৃহীত বিহারের কেন্দ্রীয় সাহায্য ফণ্ড, কলিকাতার মেয়রের ফণ্ড, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের সংকটত্রাণ ফণ্ড, রামকৃষ্ণ মিশনের ফণ্ড, মজঃফরপুরের কল্যাণব্রত-সংঘের ফণ্ড প্রভৃতি সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য ফণ্ডগুলিতেও মণিঅর্ডারে টাকা পাঠাইবার জন্য

কমিশন না লাগে। বিশ্বাসের অযোগ্য লোকেও হয়ত টাকা সংগ্রহ করিতেছে। কিন্তু সে কারণে বিশ্বাসযোগ্য ফণ্ডগুলির সহিতও গবর্মেণ্টের অসহযোগিতা করা উচিত হইবে না।

মনিঅর্ডারের কমিশনের কথা যাহাই হউক, যাঁহারা কেবল মাত্র বিপন্নের সাহায্যের জন্য সাহায্য করিতে চান ও দেখাইতে চান, যে, সরকারী সানুগ্রহ দৃষ্টির আশার দ্বারা বা সরকারী প্রভাবের দ্বারা প্রভাবিত না হইয়া দান করিতেছেন, তাঁহারা আপনা হইতেই বেসরকারী কোন ফণ্ডে টাকা দিবেন। কেন-না, তাঁহারা সাহায্যদানকার্য্যে ব্যাপৃত বেসরকারী কোন-না কোন সমিতি বা ব্যক্তিকে নিশ্চয়ই বিশ্বাস করেন।

—

দ্বারবঙ্গের মহারাজাধিরাজের বদান্যতা

আন্তরিক প্রীতিপ্রসূত অতি-দরিদ্রের অতি সামান্য দান এবং ক্রোড়পতির প্রভূত দান তুল্যমূল্য। কিন্তু অনেক সময় দানে সমর্থ অতি-ধনবান্ লোকও দান করেন না। এই কারণে ভূমিকম্পে বিপন্ন লোকদের সাহায্যার্থ দ্বারবঙ্গের মহারাজাধিরাজের এক লক্ষ টাকা দান এবং দ্বারবঙ্গ শহর পুনর্নির্ম্মাণের জন্য ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট গঠিত হইলে তাহার মারফত পঁচিশ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত দিতে অঙ্গীকার সাতিশয় প্রশংসনীয়। তাঁহার নিজের পৈত্রিক প্রাসাদ বিনষ্ট হওয়ায় পাঁচ কোটী টাকা ক্ষতি হইয়াছে শুনা যায়। তদ্ভিন্ন তাঁহার বিস্তৃত জমিদারীতে আরও কত ক্ষতি হইয়াছে। এ অবস্থায় এরূপ দান অসাধারণ।

—

আগা খানের অসাম্প্রদায়িকতা

হিজ্ হাইনেস্ দি রাইট্ অনারেব্‌ল্ দি আগা খান (অর্থাৎ তাঁহার উচ্চতা ঐ ঠিক-মাননীয় ঐ আগা খাঁ) খাঁটি গণতন্ত্রবাদী এবং অসাম্প্রদায়িকতার অনুরাগী। নব-দিল্লীতে এসোসিয়েটেড্ প্রেসের একজন কর্ম্মচারীকে তিনি নিজের ভেজালবিহীন রাজনৈতিক মত জানাইয়াছেন। তাঁহার মতে, গণতান্ত্রিকতার সহিত সাম্প্রদায়িকতা খাপ খায় না। তিনি মনে করেন একথা এখন হিন্দু ও মুসলমানরা বুঝিতেছে না, নূতন শাসন-সংস্কার-বিধি প্রচলিত হইলেই তাহারা বুঝিবে, যে, পৃথক্ নির্ব্বাচন-প্রথা দ্বারা কোন পক্ষেরই লাভ নাই; কিন্তু আপাততঃ এই অন্যায় ও লাভহীন প্রথা মানিয়া লওয়া অপরিহার্য্য, এবং উহা সহিতে হইবে। চমৎকার কথা!

হিন্দুরা বরাবরই বুঝিয়াছে, যে, পৃথক নির্ব্বাচন-প্রথা খারাপ, তাহাতে কাহারও লাভ নাই। যাহারা গোড়া হইতে এ পর্য্যন্ত বরাবর উহা চাহিয়া আসিতেছে, তাহারা মুসলমান। এখনও অধিকাংশ প্রদেশের অধিকাংশ হিন্দু পৃথক নির্ব্বাচন-প্রথার বিরোধী। যদি কোথাও কোন শ্রেণীর হিন্দু পৃথক্ নির্ব্বাচন প্রথা চাহিয়া থাকে, তাহা মুসলমানদের কুদৃষ্টান্তে বা কুপরামর্শে। সুতরাং নূতন শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইলে তবে হিন্দুরা বুঝিবে পৃথক নির্ব্বাচন প্রথা খারাপ, ইহা বলিলে অন্যায়রূপে হিন্দুদিগকে নির্ব্বোধ বলা হয়।

অত্যুচ্চ ও ঠিক্-মাননীয় আগা খাঁ-প্রমুখ মুসলমান নেতারা যদি হিন্দুদের সহিত একমত হইয়া সাম্প্রদায়িক ভাগ-বাঁটোয়ারা ও পৃথক্ নির্ব্বাচনের বিরোধিতা বরাবর করিতেন, তাহা হইলে অন্যায় সহ্য করিবার কথাটাই উঠিত না। এখনও তিনি স্বাজাতিকদের সহিত মিলিত হইয়া উহার বিরুদ্ধে লড়ুন না। অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, উভয়েই দোষী। অন্যায় সহিবার লোক আছে বলিয়াই অন্য কতকগুলা লোকের অন্যায় করিবার প্রবৃত্তি ও সাহস বাড়ে। অন্যায় যতই সহ্য করা যাইবে, ততই অন্যায়কারীদের দুষ্প্রবৃত্তি বাড়িয়া যাইবে। যে ব্যক্তি মুখে গণতন্ত্রের প্রশংসা করে কিন্তু কার্য্যতঃ উহার বিপরীত প্রথার ব্যক্তিগত ও সম্প্রদায়গত লাভটা গ্রহণ করে, তাহার কথার কোন মূল্য নাই। নূতন শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইবার পর তাঁহার মত অন্য মুসলমানেরাও দশ বৎসর পরে হয়ত বলিবে, পৃথক্ নির্ব্বাচনটা খারাপ বটে, কিন্তু উহা "সহিয়া" যাওয়াতে আমাদের লাভ আছে।

—

নারীশিক্ষা সমিতি

নারীশিক্ষা সমিতির ১৯৩২-৩৩ সালের রিপোর্ট হইতে জানা যায় উহা কিরূপ অত্যাবশ্যক ও মূল্যবান্ কাজ করিতেছে। উহা এপর্য্যন্ত ৫০টির উপর বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছে এবং তাহা হইতে লিখন, পঠন ও হিসাবরক্ষা পাঁচ হাজারের উপর বালিকা শিখিয়াছে। এখনও ২৪টি বিদ্যালয় সমিতির কর্ত্তৃত্বাধীন আছে। এই সমিতির কলিকাতায় বিদ্যাসাগর

বাণীভবনে অনেক বিধবা হিন্দু মহিলা সাধারণ শিক্ষা লাভ করেন, কোন কোন ছাত্রী শিল্প শিখিয়া উপার্জ্জনক্ষম ও স্বাবলম্বী হন, এবং কেহ কেহ ট্রেনিং বিদ্যালয়ে গিয়া শিক্ষাদান কার্য্য শিখিয়া শিক্ষয়িত্রীর সার্টিফিকেট পাইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করেন। এই সমিতির আয় যত বাড়িবে, কাজও তত বাড়িবে ও উৎকর্ষলাভ করিবে। ইহার কার্য্যক্ষেত্রের সীমা নির্দ্ধারণ করা যায় না।

—

জলপথ ও জলসেচন সম্বন্ধে বঙ্গের প্রতি অবিচার

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বঙ্গের জলপথসমূহ সম্বন্ধে একটি আইনের খসড়া আলোচিত হইতেছে। তাহার অনেকগুলি ধারা অনুমোদিত হইয়া গিয়াছে। সরকার পক্ষের যাঁহারা এই আইনের খসড়া প্রস্তুত করিয়াছেন এবং সরকারী ও বেসরকারী যে-সব সভা ইহার আলোচনা করিতেছেন, তাঁহারা আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জয়ন্তী-স্মারক গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার লিখিত প্রবন্ধটি পড়িয়া দেখিয়াছেন কি-না জানি না। উহার নাম, "Need for a Hydraulic Research Laboratory in Bengal," অর্থাৎ "বঙ্গে প্রবহমান-জল-বিজ্ঞান সম্বন্ধে গবেষণার জন্য একটি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারের প্রয়োজনীয়তা"। এরূপ একটি পরীক্ষাগারের যে একান্ত আবশ্যক, তাহা তিনি ঐ প্রবন্ধে প্রমাণ করিয়াছেন। এরূপ একটি পরীক্ষাগারে গবেষণার অভাবে নদীর বাঁধ বাঁধা এবং সেতু নির্ম্মাণ ইত্যাদি এমন ভাবে হইয়াছে যাহাতে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের উর্ব্বরতা কমিয়া গিয়াছে ও তাহা ম্যালেরিয়ার আকর হইয়াছে এবং অন্য কোন কোন বিস্তীর্ণ ভূভাগ ক্রমশঃ নদীগর্ভে লয় পাইয়াছে।

এরূপ একটি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণ-মন্দিরের প্রারম্ভিক খরচ মাত্র দশ লক্ষ টাকা এবং বার্ষিক পরিচালনের ব্যয় দুই লক্ষ টাকা। এই টাকা বাংলা গবর্মেণ্টের দেওয়া উচিত।

প্রসিদ্ধ এঞ্জিনীয়ারদের লেখা হইতে ডক্টর সাহা যে-সব তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার কিছু এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। রেলওয়ে কোম্পানীর স্বার্থপরতা, এঞ্জিনীয়ারদের অজ্ঞতা প্রভৃতি নানা কারণের সমবায়ে মধ্য, পশ্চিম, উত্তর ও পূর্ব্ব বঙ্গের নানাদিকে যে-সব অনিষ্ট হইয়াছে, ডক্টর সাহা তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন। সবগুলির উল্লেখ করিবার স্থান নাই। কেবল পশ্চিম-বঙ্গের কথাই বলি।

মিশরের আসোআন বাঁধের প্রসিদ্ধ এঞ্জিনীয়ার এবং সেই দেশের কৃষিসম্পদের প্রধান পুনরুজ্জীবক স্যার উইলিয়ম কক্স এবং বঙ্গের স্বাস্থ্য-বিভাগের প্রসিদ্ধ ডিরেক্টর ভূতপূর্ব্ব ডাঃ বেণ্টলী প্রমাণসহ পশ্চিম-বঙ্গের স্বাস্থ্য ও সম্পদের অবনতির কারণ দেখাইয়াছেন :—

"The decline of this part in health and prosperity is due to the blocking of the Damodar and her branches by the bunds and canals erected to safe-guard the E. I. Railway. Wilcocks finds a surprising parallel between the fanshape alignment of the old Damodar branches and the alignment of the Cauvery system in the Tanjore district of Southern India ...both Burdwan and Tanjore formed the richest districts of India in 1815, and comparing the two, Hamilton wrote in 1815, 'In productive agriculture Burdwan stands first and Tanjore second.'"

১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে হামিণ্টন লিখিয়াছিলেন, যে, ভারতবর্ষের সব চেয়ে সমৃদ্ধ জেলা দুটির মধ্যে বর্দ্ধমান ছিল প্রথম, তাঞ্জোর দ্বিতীয়। তাহার পর উভয়ের কি দশা হইল শুনুন।

"In 1831, when the Cauvery works began to give way to ravages of time, Sir A. Cotton, engineer, courageously undertook to restore the old anicut across the Cauvery erected by the old Hindu kings, and distribute the waters evenly in the delta ...by erecting a new anicut and clearing up the headwaters for a considerable length upstream, and cause the waters to distribute evenly in the delta. The prosperity of the delta remained unimpaired, and it is now not only more prosperous than Burdwan, but entirely free from malaria."

মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর তাঞ্জোর জেলা এই প্রকারে খুব সমৃদ্ধ ও ম্যালেরিয়াবর্জ্জিত হইয়াছে। বর্দ্ধমানের বিপরীত দশা কি প্রকারে হইল শুনুন।

"The opposite process was undertaken by engineers in Burdwan. This was due to their dread of the Damodar. The devastating flood of the Damodar which occurred at intervals of 30 or 40 years was a thing of which everybody was afraid. But apart from the havoc which such catastrophic floods caused after great lengths of time, moderate floods as took place regularly were nothing but beneficial. They fortilized the soil and washed away malarial larvae. But when about 1850, the Government wanted to open the E. I. Railway, they determined to tame the Damodar in order that the railway might be safe. They shut up the river within watertight embankments, closed the headwaters of the various branches, and ***made breaches by men in the embankments, which were needed for irrigating their fields, a criminal act.*** The result was that, though a safe highway for communication with upper India was opened and the trade of Calcutta increased enormously and people from upcountry began to flood Calcutta in search of employment or adventure, it was done at a terrible cost to the people of the Burdwan division. Two years after the opening of the railway in 1859, a terrible malarial epidemic broke out, and in Hughli alone half the population, *viz.*, one million out of two, died within 10 years. The density of population fell from 750 per square mile to 500, and according to Bentley and other competent authorities who ascribe the outbreak of this terrible epidemic to the faulty system of railway embankments, the country has never been free from malaria up to the present time. The fertility of the soil fell by about 50 per cent. as the land was deprived of the riverborne silt."

ঈষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়েটাকে নিরাপদ করিবার জন্ত দামোদরকে এমন করিয়া বাঁধা হইয়াছে, যে, তাহাতে ম্যালেরিয়া মড়কে শুধু হুগলী জেলাতেই ১৮৫৯-৬৯ দশ বৎসরে অর্দ্ধেক অর্থাৎ দশ লক্ষ লোক মরে, বর্দ্ধমান ডিভিজনে বসতির ঘনতা বর্গ-মাইলে ৭৫০ হইতে ৫০০ হয়, ডিভিজনটা এপর্য্যন্ত কখনও ম্যালেরিয়াবর্জ্জিত হয় নাই এবং উর্ব্বরতা আগেকার অর্দ্ধেক হইয়া গিয়াছে। এই-সব ভীষণ অনিষ্টের জন্ত বর্দ্ধমান ডিভিজনের লোকদের ক্ষতিপূরণ পাওয়া উচিত। ঈ. আই. রেলওয়ে যাত্রীদের উপর টার্মিন্তাল বা থরোফেয়ার ট্যাক্স বসাইয়া তাহার আয় হইতে অভিজ্ঞ সুদক্ষ এঞ্জিনীয়ারদের পরিকল্পনা অনুসারে পূর্ত্তকার্য্য দ্বারা পশ্চিম-বঙ্গের প্রাচীন সমৃদ্ধি ফিরাইয়া আনিলে তবে এই ক্ষতিপূরণ হইতে পারে। ডক্টর সাহা অতঃপর দেখাইয়াছেন, যে, ক্ষতিপূরণের কথাটা তামাসা নয়, ইহা সত্যিকার পাওনা এবং সম্ভবপর।

বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা দেশকে সুজলা সুফলা শস্তশ্যামলা বলিয়া বর্ণনা করিয়া বাঙালীদের মনে স্বদেশভক্তি উদ্রেকের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু বহু পূর্ব্বে বাংলা যাহাই থাক, বহু বৎসর হইতে উহা সর্ব্বত্র সুজলা সুফলা শস্তশ্যামলা নাই। এখন এরূপ বর্ণনা কবিকল্পনা মাত্র। "বন্দেমাতরম্" গানের এই কথাগুলি এখন অবাঙালীদিগের মনে সমগ্র বাংলা দেশের উর্ব্বরতা সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা জন্মায়। পশ্চিম-বঙ্গের সব জেলাতে এবং অন্ত কোন কোন জেলাতেও কৃত্রিম উপায়ে জলসেচনের বন্দোবস্তের খুব প্রয়োজন আছে। কিন্তু বঙ্গের টাকা কোম্পানীর আমল হইতে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের ও অন্যান্য প্রদেশের ঘাট্তি পূরণ করিতে দীর্ঘকাল ব্যয়িত হইয়াছে, এবং এখনও ভারত গবন্মেণ্ট যত রাজস্ব বাংলা দেশ হইতে সংগ্রহ করেন, অন্ত যে-কোন দুই বৃহৎ প্রদেশ হইতেও মোট তত গ্রহণ করেন না। অথচ বঙ্গে জলসেচনের জন্ত অন্ত সব প্রদেশের তুলনায় কিছুই করা হয় নাই। ব্রিটিশ ভারতের যে ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল য্যাব্ষ্ট্রাক্ট গবন্মেণ্ট প্রকাশ করেন, তাহার দশম প্রকাশ ১৯৩৩ সালে হইয়াছে। তাহাতে ১৯৩০-৩১ পর্য্যন্ত নানা সরকারী বিভাগের নানা প্রকারের হিসাব আছে। তাহা হইতে লাভজনক বা উর্ব্বরতা-উৎপাদক (productive) জলসেচন-প্রণালী কোন্ প্রদেশে কত মাইল আছে তাহার তালিকা উদ্ধৃত করিতেছি।

প্রদেশ।	মাইলে জলপ্রণালীর দৈর্ঘ্য।	ব্যয়িত টাকা।
মাদ্রাজ	৩৭৪৯	১২,৬৫,৫৩,৯৪২
বোম্বাই	৪৯৮৬	১৯,৪৪,৭৫,৭৬৬
বঙ্গদেশ	শূন্ত	৬৭,৪৩,৫৪১
আগ্রা-অযোধ্যা	২৩৭২	২২,০০,২৫,৬৩৬
পঞ্জাব	৩১৬৬	৩২,৭৮ ০২,০৫১
ব্রহ্মদেশ	৩৫৪	২,১২, ২১,২৮১
উ-প-সীমান্ত প্রদেশ	৮৬	৭৪,০৭,৪৯০

যাহাতে লাভ হয় না বা উৎপাদিকা-শক্তি বাড়ে না, এরূপ জলসেচন-প্রণালীর (unproductive works-এর) দৈর্ঘ্য এবং তাহাতে ব্যয়িত টাকার পরিমাণ নীচের তালিকায় প্রদত্ত হইল।

প্রদেশ।	কত মাইল দীর্ঘ।	ব্যয়িত টাকা।
মাদ্রাজ	৭১৬	৪,০৩,৯৪,৫২৮
বোম্বাই	২৮৩২	১২,৮২,৮৭,০০৪
বঙ্গদেশ	৭০	৮৪,৯২,০৫৩
আগ্রা-অযোধ্যা	৪৪৭	৩,১১,৮৬,৮১২
পঞ্জাব	১০৪৭	৫৯,৬৭,১৯৮
ব্রহ্মদেশ	১৪০	১,৭০,৩০,৫০৯
বিহার-উড়িষ্যা	৭১৮	৬,২৭,৬৩,৯১৫
মধ্যপ্রদেশ	৩৫২	৬,৬৩,১৭,৬৭৮
উ. প. সীমান্ত প্রদেশ	১৩৮	২,২০,১৪,৬৪৭

উপরের দুটি তালিকায় লিখিত জলপ্রণালীর দৈর্ঘ্যের এবং তজ্জন্য ব্যয়িত মূলধনের সমষ্টি কষিলে দেখা যাইবে, বঙ্গে সর্ব্বাপেক্ষা অল্প জলসেচনের খাল আছে, এবং তাহা খনন ও নির্ম্মাণের জন্য ব্যয়ও সর্ব্বাপেক্ষা কম, অত্যন্ত কম, বঙ্গদেশে করা হইয়াছে। বঙ্গদেশ ভারত-গবন্মেণ্টের কামধেনু। আশ্চর্য্যের বিষয়, অনাহারে বা অত্যল্প আহারেও এই গাভী এখনও এত রাজস্ব-দুগ্ধ দিতে পারিতেছে।

১৯৩৩-এর পরের ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল য্যাব্ষ্ট্রাক্ট এখনও বাহির হয় নাই। তাহাতে যদি বঙ্গে খনিত ও নির্ম্মিত নূতন কোন খালের দৈর্ঘ্য ও ব্যয় দেওয়া থাকে, তাহা হইলেও দেখা যাইবে, যে, বঙ্গদেশ সকলের নিম্নস্থান দখল করিয়া বসিয়া থাকিবে।

নূতন জলপথ আইন পাস হইয়া গেলে এই সর্ব্বনিম্নস্থান হইতে বঙ্গের কিছু প্রোমোশুন হইবে কি? না, বাংলা দেশ ভারত-গবন্মেণ্টকে রাজস্বদানে বরাবর ফার্ষ্ট বয় এবং তাহার বিনিময়ে কিছু প্রাপ্তিতে বরাবরই লাষ্ট্ বয় থাকিয়া যাইবে?

মধুসূদন দাস

উড়িষ্যার প্রসিদ্ধ জনহিতকর্ম্মী শ্রীযুক্ত মধুসূদন দাস মহাশয় প্রায় ৮৬ বৎসরে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার মত কার্য্যতঃ ও আন্তরিক দেশহিতৈষী মানুষ, শুধু উড়িষ্যায় নহে, ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই বিরল। তিনি উড়িষ্যার জন্য যাহা যাহা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, উড়িষ্যাবাসীরা যদি সেই সকল চেষ্টা সফল করিতে অন্তরের সহিত যত্নবান্ হন, তাহা হইলেই তাঁহার প্রতি প্রকৃত কৃতজ্ঞতা ও সম্মান প্রদর্শন করা হইবে।

তাঁহার সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ সৌজন্য-সহকারে যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহা তথ্যবহুল, এবং তাহাতে তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব বেশ বুঝা যায়। নীচে তাহা প্রকাশিত হইল:—

"কটকের প্রসিদ্ধ কর্ম্মী মধুসূদন দাস গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তারিখে লোকান্তরিত হইয়াছেন। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ২৮শে এপ্রিল তারিখে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি কলিকাতায় অধ্যয়ন করেন এবং উড়িয়াদিগের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধি লাভ করেন। তিনি এম্‌-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বি-এল পরীক্ষা দিয়া উকীল হইয়াছিলেন। পঠদ্দশায় তিনি আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে পড়াইয়াছিলেন। তিনি উকীল হইলেও ওকালতীতে তাঁহার অখণ্ড মনোযোগ দেওয়া হয় নাই। উড়িষ্যার উন্নতিকল্পে তিনি সর্ব্বদাই সচেষ্ট থাকিতেন এবং দরিদ্র উড়িষ্যাবাসীর কল্যাণকল্পে তথায় নানা শিল্প প্রতিষ্ঠা করেন। উড়িষ্যা হইতে বৎসর বৎসর যে চর্ম্ম অপরিষ্কৃত অবস্থায় রপ্তানী হয়, তাহা পরিষ্কৃত করিয়া জুতা প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার জন্য তিনি য়ুরোপীয় পদ্ধতিতে উৎকল ট্যানারী প্রতিষ্ঠিত করেন। তদ্ভিন্ন তিনি উড়িষ্যার প্রসিদ্ধ স্বর্ণরৌপ্যের কাজ দেশে আদৃত করিবার চেষ্টা ও বেণ্ট-উডের চেয়ার প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার শিল্প প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি স্বয়ং খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু কখনও জাতীয়তা বর্জ্জন করেন নাই। ইংলণ্ডের যুবরাজ যখন এদেশে আসিয়াছিলেন, তখন তিনি বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের অন্যতম মন্ত্রী। তিনি ইংরেজের বেশে যুবরাজের দরবারে উপস্থিত হইতে অস্বীকার করেন এবং তাহার ফলে স্থির হয়, ভারতীয় মন্ত্রীরা ভারতীয় বেশে দরবারে উপস্থিত হইতে পারিবেন।

"দাস মহাশয়ের বিশ্বাস ছিল, এদেশের শিল্পে জাতিভেদের প্রভাব অত্যন্ত প্রবল। কারণ, পুরুষানুক্রমে একই শিল্পে রত থাকিলে তাহাতে শিল্পীর স্বাভাবিক দক্ষতা জন্মে। সেই দক্ষতার মূল্য অবজ্ঞা করা যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, তিনি বিলাতে এক বক্তৃতায় কটকের তারের কাজের শিল্পীদিগের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন,—ইহারা সূক্ষ্ম তার জিহ্বায় রাখিয়া প্রভেদ বুঝিতে পারে, এবং যেভাবে তারের কাজ করে, আর কেহ তাহা পারে না।

"শিল্পপ্রতিষ্ঠায় তাঁহার যথেষ্ট আর্থিক ক্ষতি হয় এবং শেষে তিনি সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

"যখন উড়িষ্যা বাংলার অন্তর্ভুক্ত ছিল, তখন তিনি চারি বার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হইয়াছিলেন; এবং ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে বিহার ও উড়িষ্যার ব্যবস্থাপক সভা হইতে বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তাহার পর মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসনপদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইলে তিনি বিহারে অন্যতর মন্ত্রী হইয়াছিলেন।

"উড়িষ্যায় তাঁহার অসাধারণ প্রতিপত্তি ছিল। মেদিনীপুরে প্রথম যে-বার বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনের অধিবেশন হয়, সেইবার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার সম্মতি না লইয়াই স্থির করিয়াছিলেন—কটকে পরবর্ত্তী অধিবেশন হইবে। দাস-মহাশয়ের আপত্তিতে উড়িষ্যায় সম্মিলনের অধিবেশন হয় নাই। তিনি এই ব্যাপারে সুরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু রাজনীতিক্ষেত্রে সুরেন্দ্রনাথের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধার অভাব ছিল না।

"মন্ত্রী হইয়া তিনি যে-কারণে পদত্যাগ করেন, তাহাতে তাঁহার মতদৃঢ়তা ও আত্মসম্মানজ্ঞান সপ্রকাশ হয়। তিনি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন-বিভাগের ভার পাইয়াছিলেন। ভারত-শাসন আইনের বিধান—মন্ত্রী শাসন-পরিষদের সদস্যের সমান বেতন পাইতে পারেন। সদস্যদিগের বেতন সেকালের সিভিলিয়ানী রীতিতে নির্দ্ধারিত ও অত্যন্ত অধিক। বেতনে তারতম্য হইলে সম্মানে তারতম্য হয়, এই ছল ধরিয়া মন্ত্রীরা অনেকেই বেতন হ্রাসের বিরোধিতা করিয়া আসিয়াছেন। বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে মন্ত্রীর বেতন হ্রাসের প্রস্তাব হয়। এই সময় দাস-মহাশয় প্রস্তাব করেন, তিনি বিনাবেতনে মন্ত্রীত্ব করিবেন, কিন্তু তিনি দরিদ্র—সুতরাং তাঁহাকে ওকালতী করিতে দেওয়া হউক। এই প্রসঙ্গে তিনি কতকগুলি যুক্তি দেখান। তিনি বলেন :—

'(১) বিহার ও উড়িষ্যা দরিদ্র প্রদেশ। এই প্রদেশে অর্থাভাবে অনেক জনহিতকর কার্য্য করা অসম্ভব হয়। সুতরাং যাহাতে ব্যয়সঙ্কোচ হয়, তাহার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

(২) স্বায়ত্তশাসন-বিভাগে বহু লোকই অবৈতনিক হিসাবে কাজ করিয়া থাকেন; অর্থাৎ জেলা বোর্ড, স্থানীয় বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সদস্য ও সভাপতি প্রভৃতি বিনাবেতনে কাজ করিয়া থাকেন। সে অবস্থায় সেই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বেতনভুক্ হইলে সমগ্র বিভাগের অবস্থার সামঞ্জস্য নষ্ট হয়—"In an organization in which all the workers are honorary a salaried Minister mars the symmetry and harmony of the organization."

'(৩) যখন দ্বারবঙ্গের মহারাজাধিরাজ ও মামুদাবাদের রাজা শাসন-পরিষদের সদস্য থাকিতে পারেন, অর্থাৎ এই-সব জমীদার আপনাদিগের সম্পত্তির কার্য্য দেখিয়া এবং মামলায় পক্ষভুক্ত হইয়া ও সাক্ষ্য দিয়া সদস্য থাকিলে দোষ হয় না, তখন মন্ত্রীর পক্ষে জীবিকার্জ্জনের জন্য ওকালতী করায় দোষ হইতে পারে না।'

"স্যার হেনরী হুইলার তখন বিহারের গভর্ণর। তিনি দাস-মহাশয়ের প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারেন নাই। তিনি বলেন, মন্ত্রী যখন সরকারেরই একজন, তখন তাঁহার পক্ষে সরকারের অধীন আদালতে উকীলরূপে হাজির হওয়া কখনই সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। এই যুক্তি দেখাইয়া তিনি দাস-মহাশয়কে জানান—তাঁহার প্রস্তাব গৃহীত হইতে পারে না।

"ফলে দাস-মহাশয় মন্ত্রীর পদ ত্যাগ করেন। তিনি দীর্ঘ কাল যে-ভাবে দেশের অবস্থা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার পদত্যাগে যে সরকারের ক্ষতি হয়, তাহা বলা যাইতে পারে। কিন্তু সরকার সেজন্য মত পরিবর্ত্তন করেন নাই।

"মন্ত্রীর পদ ত্যাগ করিয়া তিনি পুনরায় উড়িষ্যাবাসীর উন্নতিচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি উড়িষ্যাবাসীর স্বার্থের সহিত আর কাহারও স্বার্থের সংঘাত উপস্থিত হইলে সর্ব্বপ্রথমে উড়িষ্যাবাসীর স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করিতেন। সে-বিষয়ে তিনি উড়িষ্যার লোকই ছিলেন।

"এক সময়ে উড়িষ্যার সামন্ত রাজাদিগের উপর তাঁহার অসাধারণ প্রভাব ছিল এবং তাঁহারা তাঁহার পরামর্শেই চলিতেন। তিনিও তাঁহাদিগের স্বার্থ-বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন।

"তিনি সুশিক্ষিত ছিলেন এবং তাঁহার জীবনযাত্রার পদ্ধতিও অনেকটা য়ুরোপীয়দিগের মত ছিল। তাঁহার ফুলের সখ ছিল; তিনি অতিথিসৎকারপটু ছিলেন। সর্ব্বোপরি তিনি স্থির ও ধীর বুদ্ধি ছিলেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, উড়িয়াদিগের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। উড়িষ্যায় উচ্চশিক্ষা-বিস্তারে তাঁহার বিশেষ যত্ন ছিল।

"জীবনের শেষ কয় বৎসর তিনি জরাজীর্ণ ও আর্থিক ক্ষতিতে বিব্রত হইয়া জনসাধারণের কার্য্যে পূর্ব্ববৎ যোগ দিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু তিনি দীর্ঘকাল উড়িষ্যাবাসীদিগের হিতসাধনের জন্য যে কার্য্য করিয়াছিলেন, সেজন্য উড়িষ্যাবাসীরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ, সন্দেহ নাই।

"শেষ পর্য্যন্ত তিনি উদ্যম ও আশা হারান নাই—উড়িষ্যাকে শিল্পে সমৃদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কর্ম্মশক্তি অসাধারণ ও বিশেষ প্রশংসনীয় ছিল।

"তিনি আপনাকে উড়িয়া বলিয়া পরিচয় দিতে যেন গর্ব্ব অনুভব করিতেন।

"দাস-মহাশয় নিখিল ভারত খ্রীষ্টিয়ান সম্মিলনের সভাপতি হইয়াছিলেন।

"তিনি মনে করিতেন এদেশের লোক যে ধর্ম্মাবলম্বীই কেন হউন না—কখনও জাতীয়তা বর্জ্জন করিবেন না; কেন-না, জাতীয়তার সহিত আত্মসম্মান অচ্ছেদ্যরূপে বিজড়িত।"

—

রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার

মাদ্রাজের প্রসিদ্ধ ইংরেজী দৈনিক কাগজ "দি হিন্দু"র সম্পাদক শ্রীযুক্ত এ রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার ৫৭ বৎসর বয়সে পরলোকযাত্রা করিয়াছেন। এই অকালমৃত্যুতে সমগ্র ভারতবর্ষ, বিশেষতঃ মাদ্রাজ, ক্ষতিগ্রস্ত হইল। সাধারণতঃ সাংবাদিকদিগের যে-সকল বিষয়ের জ্ঞান থাকা দরকার, তাহা তাঁহার ছিল। অধিকন্তু ভারতবর্ষীয় রাজস্বসংক্রান্ত এবং কন্সটিটিউশুন (মূল রাষ্ট্রবিধি) সম্বন্ধীয় বিষয়সকলের জ্ঞানে তিনি বিশেষজ্ঞদের মধ্যে পরিগণিত ছিলেন। তাঁহার মাতুল পরলোকগত কস্তুরীরঙ্গ আয়েঙ্গার যখন "হিন্দু"র সম্পাদক ছিলেন, সেই সময়ে তিনি তাঁহার অধীনে সাংবাদিকের কার্য্যে শিক্ষানবীশী করেন, এবং ভারতীয় শাসনপ্রণালী বিখ্যাত তামিল সংবাদপত্রের সম্পাদক হন। তাঁহার মাতুলের মৃত্যুর পর তিনি "হিন্দু"র সম্পাদক-পদে নিযুক্ত হন। এই কাগজ মাদ্রাজের বিখ্যাত সাংবাদিক, রাজনীতিজ্ঞ ও অর্থনীতিজ্ঞ জী-সুব্রহ্মণ্য আয়ার কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও প্রথমে সম্পাদিত হয়। ইহার পরবর্ত্তী সম্পাদকদ্বয় করুণাকর মেনন এবং কস্তুরীরঙ্গ আয়েঙ্গার প্রসিদ্ধ সাংবাদিক ছিলেন। এরূপ লোকদের পদে অধিষ্ঠিত হইয়াও রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার কাগজখানির গৌরব ও মর্য্যাদা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি কংগ্রেসওয়ালা ও স্বরাজ্যদলভুক্ত ছিলেন। কংগ্রেসের এবং স্বরাজ্যদলের সম্পাদকের কাজ তিনি কিছুকাল করিয়াছিলেন। স্বরাজ্যদল ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হওয়ার বিরোধী ছিলেন না। তিনিও এক সময় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইয়াছিলেন এবং সেখানে অনেক সারবান্ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কংগ্রেসের কর্ত্তৃপক্ষ এক আদেশ প্রচার করেন, যে, সমুদয় ন্যাশনালিষ্ট অর্থাৎ স্বাজাতিক খবরের কাগজ যেন বন্ধ করা হয়। এই হুকুম তামিল করাইবার জন্য সে-সময় অমৃতবাজার পত্রিকা ও বসুমতীর আফিসে পিকেটিং হইয়াছিল। এই আদেশ বিবেচনা করিবার নিমিত্ত বোম্বাইয়ে সাংবাদিকদিগের এক কন্‌ফারেন্স হয়। রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার তাহার সভাপতি মনোনীত হন। তিনি এই আদেশের প্রতিকূল বক্তৃতা করেন এবং কন্‌ফারেন্সেও ইহার প্রতিকূল প্রস্তাব গৃহীত হয়। তিনি দ্বিতীয় তথাকথিত গোলটেবিল বৈঠকের তথাকথিত প্রতিনিধি হইয়া বিলাত গিয়াছিলেন এবং তাহার আলোচনা প্রভৃতিতে কন্সটিটিউশ্যন-বিষয়ক বিস্তৃত ও গভীর জ্ঞানের এবং তার্কিকতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

—

প্রভাসচন্দ্র মিত্র

স্যার প্রভাসচন্দ্র মিত্রের আকস্মিক মৃত্যুতে বাংলা দেশ নানা রাষ্ট্রীয় বিষয়ের বিশেষজ্ঞ একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সেবা হইতে বঞ্চিত হইল। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স প্রায় ৬০ হইয়াছিল। তাঁহার স্বাস্থ্য যেরূপ ছিল, তাহাতে তাঁহার আরও দীর্ঘজীবী হইবার সম্ভাবনা ছিল। রাজকার্য্য হইতে অবসর লইবার পর তিনি বাঁচিয়া থাকিলে দেশ অনেক বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান হইতে লাভবান হইতে পারিত। রাউল্যাট কমিটির সভ্যপদগ্রহণ ও তাহার রিপোর্টে স্বাক্ষর করায় তিনি স্বাজাতিকদিগের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। কিন্তু যে-সব বিষয়ে তাঁহার যোগ্যতা ও কৃতিত্ব ছিল, তাহা বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। বাংলার রাজস্ব, বাংলার শিক্ষাবিষয়ক নানা তথ্য, বঙ্গের জমীর খাজনা বিষয়ক নানা ব্যবস্থা, ইত্যাদি বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ ও নিখুঁত জ্ঞান তাঁহার মত কম লোকেরই ছিল, এবং তাহা তিনি নিজে এবং তাঁহার নিকট হইতে জানিয়া লইয়া অন্যে দেশের কাজে লাগাইয়াছিলেন। মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড শাসনসংস্কার বিধির কাঠামোটা প্রভাসচন্দ্রের মস্তিষ্কপ্রসূত। তিনি দু-বার

প্রতিনিধি হইয়া বিলাত গিয়াছিলেন। পাটরপ্তানী শুল্কের টাকাটা বাংলাকে দিবার সপক্ষে আন্দোলন তথায় প্রথমে তিনিই আরম্ভ করেন। বাংলা ঐ টাকা অংশতঃ পাইলেও তাহার প্রশংসা প্রথমতঃ প্রভাসচন্দ্রের প্রাপ্য হইবে। ভারতবর্ষে যত ইংরেজ সৈন্য কাজ করিতে আসে, তাহাদের সংগ্রহ ও শিক্ষাদান বাবতে ভারতবর্ষকে অনেক টাকা অন্যায়রূপে বরাবরই ইংলণ্ডকে দিতে হইয়া আসিতেছে। এই টাকাটার হিসাব সৈন্যদের মাথাপিছু ধরা হইত বলিয়া ইহার নাম ক্যাপিটেশ্যন চার্জ। ভারতবর্ষ যে ইহার কিয়দংশ হইতেও নিষ্কৃতি পাইয়াছে, তাহারও প্রশংসা স্যার প্রভাসচন্দ্র মিত্রের প্রাপ্য।

তিনি দীর্ঘকাল বঙ্গের অন্যতম মন্ত্রী ও অন্যতম শাসন-পরিষৎ-সভ্যের কাজ দক্ষতার সহিত করিয়া গিয়াছেন।

তিনি দীর্ঘকাল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশ্যনের সম্পাদক ও পরে সভাপতি ছিলেন। ভারত-সভারও সভাপতি ছিলেন। তিনি ভারতীয় উদারনৈতিক দলের একজন প্রধান সভ্য ছিলেন।

বঙ্গ ও আসামের অনুন্নত শ্রেণীসমূহের উন্নতিবিধায়িনী সমিতির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বা পরিচালিত প্রায় ৪৫০টি বিদ্যালয় আছে। তাহাতে প্রায় ১৮০০০ ছাত্রছাত্রী পড়ে। স্যার প্রভাসচন্দ্র মিত্র অনেক বৎসর ইহার সভাপতি ছিলেন। অনেক বৎসর ইহার কাজ চালাইবার জন্য থোক টাকা চাঁদা দিতেন।

—

বেকারসমস্যা ও বাঙালী ভদ্রলোকদের জীবনযাত্রার মান

বঙ্গের বাহির হইতে অনেক লক্ষ লোক আসিয়া এখানে শুধু যে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় নির্ব্বাহ করে তাহা নহে, তাহাদের মধ্যে অনেকে লক্ষপতি ক্রোড়পতিও হয়, অথচ বঙ্গের বহুলক্ষ সমর্থ লোক বেকার, ইহার নানা কারণ নির্দ্দিষ্ট বা অনুমিত হইয়াছে, এবং বেকারসমস্যা সমাধানের হদিস্‌ও অনেকে অনেক রকম দিয়াছেন। তাহার কিছু আলোচনা এই মাসের 'প্রবাসী'তে গোরখপুরে প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের বৃত্তান্তে আছে। তাহাতে এক জায়গায় বলা হইয়াছে, যে, বাঙালী ভদ্রশ্রেণীর যুবকেরা যে অনেকে অবাঙালীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হয়, তাহার একটি কারণ, বাঙালী ভদ্রশ্রেণীর লোকদের জীবনযাত্রাপ্রণালীর মান ("standard of living") তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী অবাঙালীদের ঐ মান অপেক্ষা উঁচু, অর্থাৎ তাহাদের ভদ্রভাবে সুস্থ শরীরে বাঁচিয়া থাকিবার খরচ বেশী। ইহা অন্ততঃ আংশিকভাবে সত্য। এখন বিবেচ্য এই, যে, বাঙালী ভদ্রশ্রেণীর যুবকেরা সুস্থ শরীরে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য, কর্ম্মিষ্ঠতা রক্ষা ও বৃদ্ধির জন্য সমান করিতে ও রাখিতে পারেন কি-না। নিজ নিজ বৃত্তি ও কর্ম্মে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে এবং একান্ত আবশ্যক আয় অপেক্ষা অধিক আয় হইবার পূর্ব্বে আমোদ-প্রমোদ এবং সামান্য রকমের বিলাসদ্রব্যও তাঁহারা চাহিবেন না, ইহা মানিয়া লইতে হইবে।

ইহার জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব আবশ্যক। কলিকাতার হিসাব এবং মফস্বলের নানা জায়গার হিসাব আলাদা আলাদা করিয়া বিবেচ্য।

—

দেশী রাজ্যরক্ষা আইন

"দেশী রাজ্যরক্ষা আইন" নামক একটি আইন হইতেছে। ইহার আসল মানে, দেশী রাজ্যসমূহের রাজাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য আইন। অথচ ইহা সবাই জানে, যে, দেশীরাজ্যের রাজাদের চেয়ে প্রজাদেরই রক্ষার ব্যবস্থার দরকার বেশী। দেশী রাজাদিগকে রক্ষা করিবার এই একটা ব্যবস্থা আইনে করা হইতেছে, যে, ব্রিটিশ ভারতবর্ষে প্রকাশিত সংবাদপত্রসমূহে তাহাদের ও উহাদের শাসন-কার্য্যের সমালোচনা করা অতঃপর খুব বিপৎসঙ্কুল হইবে। ভারত-গবন্মেণ্টের পক্ষ হইতে অবশ্য বলা হইতেছে, যে, যাহারা "অনেষ্ট" ("সাধু"?) সমালোচক, তাহাদের ভয় নাই। কিন্তু এই আশ্বাস-বাক্যের কোনই মূল্য নাই। ভারতবর্ষে ইংরেজ গবন্মেণ্টের সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে সমালোচনা করিয়া যে-সব কাগজওয়ালা কোন-না-কোন প্রকারে দণ্ডিত হইয়াছেন বা ধমক খাইয়াছেন, তাঁহাদের সকলের বা অধিকাংশের সমালোচনা ভিত্তিহীন, ইহা কখনও কোন সরকারী লোক দেখাইতে পারেন নাই, সমালোচনাগুলা যে "অনেষ্ট" নহে, তাহাও দেখাইতে পারেন নাই। ব্রিটিশ ভারতের কাগজওয়ালাদের স্বাধীনতা অল্প যাহা আছে, দেশী রাজ্যগুলির সম্পর্কে তাহা আরও কম করিয়া দিলে তাহার ফল এই হইবে, যে, উহার রাজারা এখন যতটা নিরঙ্কুশ আছে, পরে তাহা অপেক্ষাও নিরঙ্কুশ হইয়া উঠিবে। কারণ অধিকাংশ দেশী রাজ্যে সংবাদপত্র নাই, রাজাদের সমালোচনাও নাই; যেখানে যেখানে সংবাদপত্র আছে, ব্রিটিশ ভারতের সংবাদপত্রসমূহের সমান স্বাধীনতাও তাহাদের নাই।

ভারত-গবন্মেণ্ট গত কয়েক বৎসরের মধ্যে কয়েকটা দেশী-রাজ্য সম্বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাহার প্রকৃত কারণ, উহার রাজাদের কুশাসন বা অত্যাচার কিনা, বলিতে পারি না। কিন্তু প্রকাশ, যে, তাহাই কারণ। তাহা যদি হয়, তাহা হইলে কুশাসন ও অত্যাচার চরমে উঠিতে দিয়া তাহার পর কঠোর ব্যবস্থা করা অপেক্ষা তাহার আগে যথাসময়ে রাজাদিগকে জনসাধারণের পক্ষ

সিদ্ধির জন্য ব্রিটিশ ভারতের সংবাদপত্রসমূহের দেশী-রাজ্য সম্বন্ধীয় বিষয়ের ও ব্যক্তিদের সমালোচনা করিবার বর্ত্তমান স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকা আবশ্যক, দেশীরাজ্যসমূহে ভাল সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হওয়া আবশ্যক, এবং নৃপতিদের স্ব-স্ব রাজ্যে নিয়ম-তন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করা আবশ্যক।

দিল্লীতে সম্প্রতি দেশীরাজ্যসমূহের প্রজাদের যে কনফারেন্স হইয়া গিয়াছে, তাহার সভাপতি প্রবীণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত নটরাজন্ গবর্ন্মেণ্টকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, কোন্ কোন্ রাজা এরূপ আইন চাহিয়াছেন। সরকার বাহাদুর বলুন, কে কে চাহিয়াছেন। নতুবা লোকে এই সিদ্ধান্ত করিবে, যে, গবর্ন্মেণ্ট স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া রাজাদিগকে নিরঙ্কুশ করিতে চাহিয়াছেন। সম্ভবতঃ ভাল ও বড় রাজারা কেহই এরূপ আইন চান নাই।

প্রস্তাবিত আইনটার সমর্থনে বলা হইয়াছে, যে, ব্রিটিশ ভারতের অনেক কাগজওয়ালা কুৎসা ও সমালোচনা করিবার ভয় দেখাইয়া দেশী রাজাদের কাছ থেকে ঘুষ আদায় করে। কোন ভদ্র সম্পাদকই নিশ্চয় এরূপ কাজ করেন না, এবং যে-সব রাজা অভদ্র সম্পাদকদিগকে ঘুষ দেয় তাহাদের নিজেদের দোষ আছে বলিয়াই দোষোদ্ঘাটনের ভয়ে তাহারা ঘুষ দেয়। এই রকম ঘুষদাতা ও ঘুষগ্রাহক আছে বলিয়া অপর সকলের স্বাধীনতা হ্রাস ও কলঙ্ক হওয়া উচিত নয়।

আইনটা সম্বন্ধে তর্কবিতর্কের সময় ব্যবস্থাপক সভায় স্যার মুহম্মদ য়াকুব এইরূপ ঘুষ দান ও গ্রহণের কথা বলিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, সমালোচকদিগকে ঐ-সব রাজারা খুব ভোজ দেয় এবং মোটা মোটা নোটের তাড়া "উপহার" দেয়। এ-সব গোপনীয় ব্যাপারের জ্ঞান তাঁহার জন্মিল কি প্রকারে? ঘুষদাতা রাজাদের এবং ঘুষগ্রাহক সমালোচকদের সঙ্গে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদের দহরম থাকিবার ত কথা নয়। যাহা হউক, এইরূপ ভোজ ও উপহার যদি চলে, তাহা হইলে ঘুষদাতাদেরও ত শাস্তি হওয়া চাই। কারণ, সব সভ্য দেশের আইনেই এরূপ ক্ষেত্রে উভয় পক্ষেরই দণ্ডের ব্যবস্থা আছে।

ভারতীয় দেশী রাজারা যদি ব্রিটিশ ভারতের সংবাদপত্র-সমূহকে শৃঙ্খলিত করিবার অনুরোধ ভারত-গবর্ন্মেণ্টকে করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারা অকৃতজ্ঞ। কারণ, তাঁহাদের বিপদ-আপদের সময়, ব্রিটিশ-ভারতীয় সাংবাদিকেরা ন্যায়তঃ সম্ভব হইলে তাঁহাদের পক্ষ সমর্থন করিয়া থাকেন। কৃতজ্ঞতার কথা ছাড়িয়া দিলেও ইহা মনে রাখা উচিত, যে, এই প্রকারে ব্রিটিশ ভারতীয় সাংবাদিকদের ক্ষমতা কমিলে তাঁহাদের দেশী রাজাদের উপকার করিবার ক্ষমতাও ...

জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটির ব্যয়

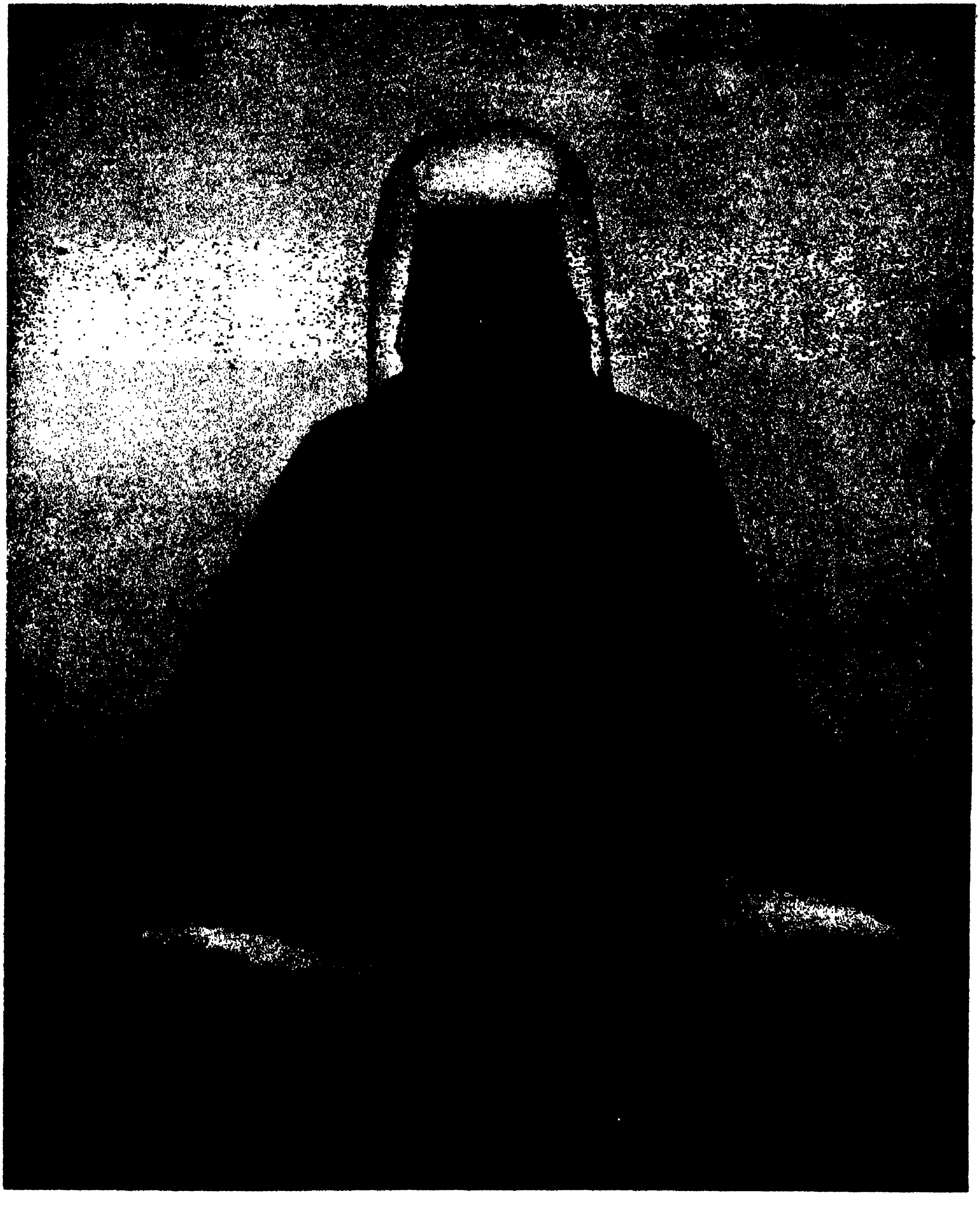
ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ শাসনপ্রণালী-বিষয়ক আলোচনার জন্য যে জয়েণ্ট পার্লেমেণ্টারি সিলেক্ট কমিটি বসিয়াছিল, তাহার ব্যয় এ-যাবৎ ২৪৭৯৭ পৌণ্ড হইয়াছে। বৃথা ব্যয়। সাইমন কমিশন ও তাহার সহযোগী ভারতীয় নানা কমিটি, কয়েকটা তথাকথিত গোলটেবিল বৈঠক ও তন্নিযুক্ত কমিটিসমূহ, প্রভৃতিতে বহুলক্ষ টাকা খরচ হইয়াছে। তাহাতে ভারতবর্ষের কিছু উপকার হওয়া ত দূরে থাক, অনিষ্টই হইবে। অথচ এরূপ অপব্যয় ও অনিষ্ট নিবারণে ভারতীয়দের কোন ক্ষমতা নাই।

—

আবার কি রুশ-জাপান যুদ্ধ হইবে?

কিছুদিন পূর্ব্বে রুশিয়ার কার্য্যতঃ ডিক্টেটর ষ্টালিন এবং অন্যতম নেতা লিটভিনফ যেরূপ বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাতে বুঝা গিয়াছিল, যে, রুশিয়া ও জাপানের মধ্যে যুদ্ধ ঘটিবার খুব সম্ভাবনা হইয়াছে। তাহার পর রুশিয়ার সমর-সচিব ও অন্যতম নেতা ভোরোসিলভ সম্প্রতি বলিয়াছেন, "সুদূর প্রাচ্য দেশে আমাদের যে রাজ্য আছে, তাহার এক ইঞ্চি জায়গাও আমরা ছাড়িয়া দিব না; আমরা আমাদের অধিকার রক্ষা করিব। ক্রমেই ইহা সুস্পষ্ট হইতেছে, যে, সুদূর প্রাচ্যের সমস্যা লইয়া জাপানই সর্ব্বাগ্রে সমরানল প্রজ্বলিত করিবে। পৃথিবীর বাজারে এখন জাপানই গোলা বারুদ এবং যুদ্ধের সরঞ্জামের প্রধান ক্রেতা। জাপানে এখন যুদ্ধের অনুকূল প্রবল প্রচারকার্য্য চলিতেছে। আমরা যদি ইহা লক্ষ্য না করিবার ভাণ করি, তবে বিস্ময়ের বিষয় হইবে। সোভিয়েটের স্বার্থ নাশ করিবার জন্য জাপানের চেষ্টার ত্রুটি নাই। ঈষ্টার্ণ চীন রেল পথে জাপানী স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য যে পরিমাণ সৈন্যের প্রয়োজন, তদপেক্ষা অনেক বেশী সৈন্য মাঞ্চুরিয়ায় রাখা হইয়াছে। সুতরাং সোভিয়েট গবর্ন্মেণ্টও সতর্ক হইতে বাধ্য হইয়াছেন। রুশ গবর্ন্মেণ্ট প্রাচ্য দেশে সৈন্যদলের সংখ্যা বাড়াইয়াছেন, দুর্গ-নির্ম্মাণের আয়োজন করিয়াছেন এবং সামরিক ঘাটিগুলিতে প্রতিরোধাত্মক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন।"

এই সকল খবর হইতে মনে হয় রুশিয়া ও জাপানের মধ্যে যুদ্ধ বাধিবার খুব সম্ভাবনা। যুদ্ধ না বাধিলেই ভাল। তবে জাপানের যেরূপ অতিদর্প হইয়াছে, তাহাতে সে সহজে নিরস্ত হইবে মনে হয় না—যদিও তাহার শিক্ষা হওয়া আবশ্যক। যুদ্ধ বাধিলে এই দুই রাষ্ট্র একা একা লড়িবে না। অন্য কোন কোন দেশ কোন-না-কোন পক্ষ অবলম্বন করিবে। তাহাতে যুদ্ধ সকল মহাদেশে পৌঁছিতে পারে।



বৈষ্ণব

শ্রীননীগোপাল দাশগুপ্ত

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩৩শ ভাগ
২য় খণ্ড

চৈত্র, ১৩৪০

৬ষ্ঠ সংখ্যা

মৌন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কেন চুপ ক'রে আছি, কেন কথা নাই,
শুধাইছ তাই।
কথা দিয়ে ডেকে আনি যারে
দেবতারে,
বাহির দ্বারের কাছে এসে
ফিরে যায় হেসে।
মৌনের বিপুল শক্তিপাশে
ধরা দিয়ে আপনি যে আসে
আসে পরিপূর্ণতায়
হৃদয়ের গভীর গুহায়।
অধীর আহ্বানে, রবাহূত
প্রসাদের মূল্য হয় চ্যুত।
স্বর্গ হ'তে বর, সেও আনে অসম্মান
ভিক্ষার সমান।
ক্ষুব্ধ বাণী যবে শান্ত হয়ে আসে
দৈববাণী নামে সেই অবকাশে।
নীরব আমার পূজা তাই,
স্তবগান নাই :

আর্দ্র স্বরে উর্দ্ধপানে চেয়ে নাহি ডাকে,
স্তব্ধ হয়ে থাকে।
হিমাদ্রিশিখরে নিত্য নীরবতা তার
ব্যাপ্ত করি রহে চারিধার,
নির্লিপ্ত সে সুদূরতা বাক্যহীন বিশাল আহ্বান
আকাশে আকাশে দেয় টান :
মেঘপুঞ্জ কোথা থেকে
অবারিত অভিষেকে
অজস্র সহস্রধারে
পুণ্য করে তারে।
না-কওয়ার না-চাওয়ার সেই সাধনায় হয়ে লীন
সার্থক শান্তিতে যাক্ দিন ॥

উপেক্ষিতা পল্লী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বেদমন্ত্র

সং বো মনাংসি সং ব্রতা সমাকূতীর্নমামসি।
অমী যে বিব্রতা স্থন তান্ বঃ সং নময়ামসি ॥

এখানে তোমরা, যাহাদের মন বিব্রত, তাহাদিগকে এক সংকল্পে এক আদর্শে একভাবে একব্রত ও অবিরোধ করিতেছি, তাহাদিগকে সনত করিয়া ঐক্য প্রাপ্ত করিতেছি।

সহৃদয়ং সাংমনস্যমবিদ্বেষং কৃণোমি বঃ।
অন্যোঽন্যমভিহর্য্যত বৎসং জাতমিবাঘ্ন্যা ॥

তোমাদিগকে পরস্পরের প্রতি সহৃদয়, সংপ্রীতিযুক্ত ও বিদ্বেষহীন করিতেছি। ধেনু যেমন স্বীয় নবজাত বৎসকে প্রীতি করে, তেমনি তোমরা পরস্পরে প্রীতি কর।

মা ভ্রাতা ভ্রাতরং দ্বিক্ষন্ মা স্বসারমুত স্বসা।
সম্যঞ্চঃ সব্রতা ভূত্বা বাচং বদত ভদ্রয়া ॥

ভাই যেন ভাইকে দ্বেষ না করে, ভগ্নী যেন ভগ্নীকে দ্বেষ না করে। একগতি ও সব্রত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে কল্যাণবাণী বল।

আজ যে বেদমন্ত্র পাঠে এই সভার উদ্বোধন হ'ল অনেক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতে তা উচ্চারিত হয়েছিল। একটি কথা বুঝতে পারি, মানুষের পরস্পর মিলনের জন্যে এই মন্ত্রে কী আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে।

পৃথিবীতে কতবার কত সভ্যতার অভ্যুদয় হয়েছে এবং আবার তাদের বিলয় হ'ল। জ্যোতিষ্কের মতো তারা মিলনের তেজে সংহত হয়ে প্রদীপ্ত হয়েছিল, প্রকাশ পেয়েছিল নিখিল বিশ্বে; তার পরে আলো এলো ক্ষীণ হয়ে; মানবসভ্যতার ইতিহাসে তাদের পরিচয় মগ্ন হ'ল অন্ধকারে। তাদের বিলুপ্তির কারণ খুঁজলে দেখা যায় ভিতর থেকে এমন কোনো রিপুর আক্রমণ এসেছে যাতে মানুষের সম্বন্ধকে লোভে বা মোহে শিথিল করে দিয়েছে। যে সহজ প্রয়োজনের সীমায় মানুষ সুস্থভাবে সংযতভাবে পরস্পরের যোগে সামাজিকতা রক্ষা করতে পারে ব্যক্তিগত দুরাকাঙ্ক্ষা সেই সীমাকে নিরন্তর লঙ্ঘন করবার চেষ্টায় মিলনের বাঁধ ভেঙে দিতে থাকে।

বর্ত্তমানে আমরা সভ্যতার যে প্রবণতা দেখি তাতে বোঝা যায় যে, সে ক্রমশই প্রকৃতির সহজ নিয়ম পেরিয়ে বহুদূরে চলে যাচ্চে। মানুষের শক্তি জয়ী হয়েছে প্রকৃতির শক্তির উপরে, তাতে লুঠের মাল যা জমে উঠল তা প্রভূত। এই জয়ের ব্যাপারে প্রথম গৌরব পেল মানুষের বুদ্ধিবীর্য্য, কিন্তু তার পিছন পিছন এল দুর্বাসনা। তার ক্ষুধা তৃষ্ণা স্বভাবের নিয়মের মধ্যে সন্তুষ্ট রইল না, সমাজে ক্রমশই অস্বাস্থ্যের সঞ্চার করতে লাগল, এবং স্বভাবের অতিরিক্ত উপায়ে চলেছে তার আরোগ্যের চেষ্টা। বাগানে দেখতে পাওয়া যায় কোনো কোনো গাছ ফলফুল উৎপাদনের অতিমাত্রায় নিজের শক্তিকে নিঃশেষিত করে মারা যায়,—তার অসামান্যতার অস্বাভাবিক গুরুভারই তার সর্ব্বনাশের কারণ হয়ে ওঠে। প্রকৃতিকে অতিক্রমণ কিছুদূর পর্য্যন্ত নয় তারপরে আসে বিনাশের পালা। য়িহুদীদের পুরাণে বেব্‌ল-এর জয়স্তম্ভ রচনার উল্লেখ আছে, সেই স্তম্ভ যতই অতিরিক্ত উপরে চড়ছিল ততই তার উপর লাগছিল নীচে নামাবার নিশ্চিত আকর্ষণ।

মানুষ আপন সভ্যতাকে যখন অভ্রভেদী করে তুলতে থাকে তখন জয়ের স্পর্দ্ধায় বস্তুর লোভে ভুলতে থাকে যে সীমার নিয়মের দ্বারা তার অভ্যুত্থান পরিমিত। সেই সীমায় সৌন্দর্য্য, সেই সীমায় কল্যাণ। সেই যথোচিত সীমার বিরুদ্ধে নিরতিশয় ঔদ্ধত্যকে বিশ্ববিধান কখনোই ক্ষমা করে না। প্রায় সকল সভ্যতায় অবশেষে এসে পড়ে এই ঔদ্ধত্য এবং নিয়ে আসে বিনাশ। প্রকৃতির নিয়মসীমায় যে সহজ স্বাস্থ্য ও আরোগ্যতত্ত্ব আছে তাকে উপেক্ষা করেও কী করে মানুষ স্বরচিত প্রকাণ্ড জটিলতার মধ্যে কৃত্রিম প্রণালীতে জীবনযাত্রার সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারে এই হয়েছে আধুনিক সভ্যতার দুরূহ সমস্যা। মানবসভ্যতার প্রধান জীবনীশক্তি তার সামাজিক শ্রেয়োবুদ্ধি, যার প্রেরণায় পরস্পরের জন্যে পরস্পর আপন প্রবৃত্তিকে সংযত করে। যখন লোভের বিষয়টা কোনো কারণে অত্যুগ্র হয়ে ওঠে তখন ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতায় অসাম্য সৃষ্টি করতে থাকে। এই অসাম্যকে ঠেকাতে পারে মানুষের মৈত্রীবোধ তার শ্রেয়োবুদ্ধি। যে অবস্থায় সেই বুদ্ধি পরাভূত হয়েছে তখন ব্যবস্থা-বুদ্ধির দ্বারা মানুষ তার অভাব পূরণ করতে চেষ্টা করে। সেই চেষ্টা আজ সকল দিকেই প্রবল। বর্ত্তমান সভ্যতা প্রাকৃত বিজ্ঞানের সঙ্গে সন্ধি করে আপন জয়যাত্রায় প্রবৃত্ত হয়েছিল, সেই বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে হৃদয়বান মানুষের চেয়ে হিসাব-করা ব্যবস্থাযন্ত্র বেশি প্রাধান্য লাভ করে। একদা যে ধর্ম্মসাধনায় রিপুদমন ক'রে মৈত্রী প্রচারই সমাজের কল্যাণের মুখ্য উপায় ব'লে গণ্য হয়েছিল আজ তা পিছনে সরে পড়েছে, আজ এগিয়ে এসেছে যান্ত্রিক ব্যবস্থার বুদ্ধি। তাই দেখতে পাই, একদিকে মনের মধ্যে রয়েছে রাষ্ট্রজাতিগত বিদ্বেষ, ঈর্ষা, হিংস্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা, অপরদিকে অন্যোন্যজাতিক শান্তি-স্থাপনার জন্যে গড়ে তোলা লীগ অফ নেশন্‌স্। আমাদের দেশেও এই মনোবৃত্তির ছোঁয়াচ লেগেছে ; যা-কিছুতে একটা জাতিকে অন্তরে বাহিরে খণ্ড বিখণ্ড করে, যে-সমস্ত যুক্তিহীন মূঢ় সংস্কার মনের শক্তিকে জীর্ণ ক'রে দিয়ে পরাধীনতার পথ প্রশস্ত করতে থাকে, তাকে ধর্ম্মের নামে সনাতন পবিত্র প্রথার নামে সযত্নে সমাজের মধ্যে পালন করব, অথচ রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা লাভ করব ধার-করা রাষ্ট্রিক বাহ্যবিধি দ্বারা, পার্লামেন্টিক শাসনতন্ত্র নামধারী একটা যন্ত্রের সহায়তায়, এমন দুরাশা মনে পোষণ করি ; তার প্রধান কারণ মানুষের আত্মার চেয়ে উপকরণের উপরে শ্রদ্ধা বেড়ে গেছে। উপকরণ বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির কোঠায় পড়ে, শ্রেয়োবুদ্ধির সঙ্গে তার সম্বন্ধ কম। সেই কারণেই যখন লোভরিপুর অতিপ্রাবল্যে ব্যক্তিগত প্রতিদ্বন্দ্বিতার টানাটানিতে মানব-সম্বন্ধের আন্তরিক জোড়গুলি খুলে গেছে, তখন বাইরে থেকে জটিল ব্যবস্থার দড়াদড়ি দিয়ে তাকে জুড়ে রাখবার সৃষ্টি চলেছে। সেটা নৈর্ব্যক্তিকভাবে বৈজ্ঞানিক। একথা মনে রাখতেই হবে, মানবিক সমস্যা যান্ত্রিক প্রণালীর দ্বারা সমাধান করা অসম্ভব।

বর্ত্তমান সভ্যতায় দেখি এক জায়গায় একদল মানুষ অন্ন উৎপাদনের চেষ্টায় নিজের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছে, আর এক জায়গায় আর একদল মানুষ স্বতন্ত্র থেকে সেই অন্নে প্রাণধারণ করে। চাঁদের যেমন এক পিঠে অন্ধকার, অন্য পিঠে আলো, এ সেই রকম। একদিকে দৈন্য মানুষকে পঙ্গু করে রেখেছে, অন্যদিকে ধনের সন্ধান, ধনের অভিমান, ভোগবিলাস সাধনের প্রয়াসে মানুষ উন্মত্ত। অন্নের উৎপাদন হয় পল্লীতে, আর অর্থের সংগ্রহ চলে নগরে। অর্থ উপার্জ্জনের সুযোগ ও উপকরণ যেখানেই কেন্দ্রীভূত, স্বভাবত সেখানেই আরাম

আরোগ্য আমোদ ও শিক্ষার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়ে অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক লোককে ঐশ্বর্য্যের আশ্রয় দান করে। পল্লীতে সেই ভোগের উচ্ছিষ্ট যা-কিছু পৌঁছয় তা যৎকিঞ্চিৎ। গ্রামে অন্ন উৎপাদন করে বহুলোকে, শহরে অর্থ উৎপাদন ও ভোগ করে অল্পসংখ্যক মানুষ; অবস্থার এই কৃত্রিমতায় অন্ন এবং ধনের পথে মানুষের মধ্যে সকলের চেয়ে প্রকাণ্ড বিচ্ছেদ ঘটেছে। এই বিচ্ছেদের মধ্যে যে সভ্যতা বাসা বাঁধে তার বাসা বেশিদিন টিঁকতেই পারে না। গ্রীসের সভ্যতা নগরে সংহত হয়ে আকস্মিক ঐশ্বর্য্যের দীপ্তিতে পৃথিবীকে বিস্মিত করেছিল কিন্তু নগরে একান্ত কেন্দ্রীভূত তার শক্তি স্বল্পায়ু হয়ে বিলুপ্ত হয়েছে।

আজ য়ুরোপ থেকে রিপুবাহিনী ভেদশক্তি এসে আমাদের দেশে মানুষকে শহরে ও গ্রামে বিচ্ছিন্নভাবে বিভক্ত করেছে। আমাদের পল্লী মগ্ন হয়েছে চিরদুঃখের অন্ধকারে। সেখান থেকে মানুষের শক্তি বিক্ষিপ্ত হয়ে চলে গেছে অন্যত্র। কৃত্রিম ব্যবস্থায় মানবসমাজের সর্ব্বত্রই এই যে প্রাণশোষণকারী বিদীর্ণতা এনেছে একদিন মানুষকে এর মূল্য শোধ করতে দেউলে হ'তে হবে। সেই দিন নিকটে এল। আজ পৃথিবীর আর্থিক সমস্যা এমনি দুরূহ হয়ে উঠেছে যে, বড় বড় পণ্ডিতেরা তার যথার্থ কারণ এবং প্রতিকার খুঁজে পাচ্ছে না। টাকা জমছে অথচ তার মূল্য যাচ্ছে কমে, উপকরণ উৎপাদনের ত্রুটি নেই, অথচ তা ভোগে আসছে না। ধনের উৎপত্তি এবং ধনের ব্যাপ্তির মধ্যে যে ফাটল লুকিয়ে ছিল আজ সেটা উঠেছে মস্ত হয়ে। সভ্যতার ব্যবসায়ে মানুষ কোনো-এক জায়গায় তার দেনা শোধ করছিল না, আজ সেই দেনা আপন প্রকাণ্ড কবল বিস্তার করেছে। সেই দেনাকেও রক্ষা করব অথচ আপনাকেও বাঁচাব এ হতেই পারে না। মানুষের পরস্পরের মধ্যে দেনাপাওনার সহজ সামঞ্জস্য সেখানেই চলে যায় যেখানে সম্বন্ধের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। পৃথিবীতে ধন-উৎপাদক এবং অর্থ-সঞ্চয়িতার মধ্যে সেই সাংঘাতিক বিচ্ছেদ বৃহৎ হয়ে উঠেছে। তার একটা সহজ দৃষ্টান্ত ঘরের কাছেই দেখতে পাই। বাংলার চাষী পাট উৎপাদন করতে রক্ত জল করে মরছে, অথচ সেই পাটের অর্থ বাংলা দেশের নিদারুণ অভাব মোচনের জন্যে লাগছে না। এই যে গায়ের জোরে দেনাপাওনার স্বাভাবিক পথ রোধ করা এই জোর একদিন আপনাকেই আপনি মারবে। এই রকম অবস্থা ছোট বড় নানা কৃত্রিম উপায়ে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই পীড়া সৃষ্টি ক'রে বিনাশকে আহ্বান করছে। সমাজে যারা আপনার প্রাণকে নিঃশেষিত করে দান করছে প্রতিদানে তারা প্রাণ ফিরে পাচ্ছে না, এই অন্যায় ঋণ চিরদিনই জমতে থাকবে এ কখনো হতেই পারে না।

অন্তত ভারতবর্ষে এমন একদিন ছিল যখন পল্লীবাসী অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে দেশের জনসাধারণ কেবল যে দেশের ধনের ভাগী ছিল তা নয়, দেশের বিদ্যাও তারা পেয়েছে নানা প্রণালী দিয়ে। এরা ধর্ম্মকে শ্রদ্ধা করেছে, অন্যায় করতে ভয় পেয়েছে, পরস্পরের প্রতি সামাজিক কর্ত্তব্যসাধনের দায়িত্ব স্বীকার করেছে। দেশের জ্ঞান ও ধর্ম্মের সাধনা ছিল এদের সকলের মাঝখানে, এদের সকলকে নিয়ে। সেই দেওয়া-নেওয়ার সর্ব্বব্যাপী সম্বন্ধ আজ শিথিল। এই সম্বন্ধ-ত্রুটির মধ্যেই আছে অবশ্যম্ভাবী বিপ্লবের সূচনা। এক ধারেই সব-কিছু আছে, আরেক ধারে কোন কিছুই নেই, এই ভার সামঞ্জস্যের ব্যাঘাতেই সভ্যতার নৌকো কাৎ হয়ে পড়ে। একান্ত অসাম্যেই আনে প্রলয়। ভূগর্ভ থেকে সেই প্রলয়ের গর্জ্জন সর্ব্বত্র শোনা যাচ্ছে।

এই আসন্ন বিপ্লবের আশঙ্কার মধ্যে আজ বিশেষ করে মনে রাখবার দিন এসেছে যে, যারা বিশিষ্ট সাধারণ বলে গর্ব্ব করে তারা সর্ব্বসাধারণকে যে পরিমাণেই বঞ্চিত করে তার চেয়ে অধিক পরিমাণে নিজেকেই বঞ্চিত করে—কেন-না শুধু কেবল ঋণই যে পুঞ্জীভূত হচ্ছে তা নয়, শাস্তিও উঠছে জমে। পরীক্ষায় পাস-করা পুঁথিগত বিদ্যার অভিমানে যেন নিশ্চিন্ত না থাকি। দেশের জনসাধারণের মন যেখানে অজ্ঞানে অন্ধকার, সেখানে কণা কণা জোনাকির আলো গর্ত্তে পড়ে মরবার বিপদ থেকে আমাদের বাঁচাতে পারবে না। আজ পল্লী আমাদের আধ-মরা, যদি এমন কল্পনা করে আশ্বাস পাই যে, অন্তত আমরা আছি পুরো বেঁচে তবে ভুল হবে, কেন-না মুমূর্ষুর সঙ্গে সজীবের সহযোগ মৃত্যুর দিকেই টানে। ৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৪ সন *

* শ্রীনিকেতনের বার্ষিক উৎসবে আচার্য্য রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণ

লিঙ্গোপাসনা

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য

পৃথিবীর বহু দেশে লিঙ্গোপাসনা প্রচলিত আছে, আমাদের ভারতবর্ষেও আছে। কখন হইতে ইহা আমাদের দেশে আরম্ভ হইয়াছে, পণ্ডিতেরা তাহা আলোচনা করিয়াছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বলিতে চাহেন, বেদের সময়ে ইহা প্রচলিত ছিল। ইহার প্রমাণরূপে তাঁহারা ঋ গ্বে দে র দুইটি মাত্র স্থানে (৭. ২১. ৫; ১০. ৯৯. ৩) প্রযুক্ত শি শ্ন দে ব এই শব্দটিকে উল্লেখ করেন। শিশ্নই অর্থাৎ লিঙ্গই দেব অর্থাৎ দেবতা যাহার সে শি শ্ন দে ব। এই শব্দের আক্ষরিক অর্থ যে ইহাই তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু আক্ষরিক অর্থই একমাত্র অর্থ নহে। লাক্ষণিক প্রভৃতি অর্থও আছে। কোথায় কোন্ অভিপ্রায়ে শব্দ প্রযুক্ত হয় তাহা দেখা আবশ্যক। অন্যথা বৃথা ভুল করিবার সম্ভাবনা থাকে। শব্দের অর্থনির্ণয়ে আগম, সম্প্রদায়, বা গুরুশিষ্য-পরম্পরাকে একবারে অবজ্ঞা করা চলে না। আগম অনুসরণ করিলে দেখা যাইবে, যাস্ক (নি রু ক্ত, ৪. ১৯) ও সায়ণ (ঋগ্বে দ, ৭. ২১. ৫; ১০. ৯৯. ৩) উভয়েই ঐ শব্দের অর্থ করিয়াছেন 'অব্রহ্মচর্য্য' অর্থাৎ 'ব্রহ্মচর্য্যহীন,' 'যাহার ব্রহ্মচর্য্য নাই।' ঋগ্বেদের যে দুই স্থানে ঐ শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে সেই দুই স্থানে এই অর্থ খুবই সঙ্গত হয়।

দে ব শব্দের সহিত সমাস করা এইরূপ অন্যান্য শব্দের অর্থ আলোচনা করিয়া দেখিলে যাস্ক ও সায়ণের করা ঐ অর্থটিই যে একমাত্র অর্থ তাহাতে কোন সন্দেহ থাকিবে না। তৈ ত্তি রী য় উ প নি ষ দে (১. ১১. ২) আছে :—

"মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব। আচার্য্যদেবো ভব। অতিথিদেবো ভব।"

এখানে শিব, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতাকে লোকে যে ভাবে উপাসনা করে মাতা, পিতা, আচার্য্য ও অতিথিকেও একেবারে ঠিক সেইভাবে উপাসনা করিতে হইবে, এ তাৎপর্য্য নহে; দেবতার প্রতি যেমন ভক্তি ও আদর থাকে, সেইরূপ ভক্তি ও আদরের সহিত পিতা ও মাতা প্রভৃতির সেবা-শুশ্রূষা, যত্ন-আদর, সৎকারাদি করিবে। 'দেব' শব্দ প্রয়োগ করিয়া বক্তা এখানে এইমাত্র বুঝাইবার ইচ্ছা করিয়াছেন। অতএব মাতা যাহার দেব অর্থাৎ দেবতার মত (সা ক্ষা ৎ দেব বা দেবতা নহে), সে মা তৃ দে ব। এইরূপ পি তৃ দে ব প্রভৃতি। শঙ্করাচার্য্য এখানে এইরূপই বলিতে চাহেন। তিনি স্পষ্টই লিখিয়াছেন, "দেবতাবদ্ উপাস্যা এব ইত্যর্থঃ", অর্থাৎ ইঁহারা দেবতার ন্যায় উপাসনীয়।

এইরূপ অপর একটি শব্দের অর্থ আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। বহু ব্রাহ্মণ গ্রন্থে ও তৈ ত্তি রী য় সং হি তা য় (৭. ১. ৮. ২) শ্র দ্ধা দে ব শব্দের উল্লেখ আছে। জার্মান ভাষায় লিখিত সুপ্রসিদ্ধ সং স্কৃ ত কো শে র (Böhtlingk und St. Roth: *Sanskrit Worterbuch*, St. Petersburg) প্রণেতারা তাহার অর্থ করিয়াছেন 'দেববিশ্বাসী' (gott-vertrauend); জানি না কিরূপে ইহার এই অর্থ হয়। ইহাও জানি না, এগ্গেলিঙ্গ (Eggeling) সাহেব কিরূপে ঐ শব্দটির অর্থ করিয়াছেন 'দেবভীরু' (God-fearing, শ ত প থ ব্রা হ্ম ণ, ইংরেজী অনুবাদ, ১.১.৪.১৬)। আমাদের দেশের ভাষ্যকারেরা ঐ শব্দটির অর্থ করিয়াছেন 'শ্রদ্ধালু' বা 'শ্রদ্ধাবান্'। তৈ ত্তি রী য় সং হি তা য় (৭.১.৮.২) সায়ণ লিখিয়াছেন—"শ্রদ্ধা দেবো যস্যাসৌ শ্রদ্ধাদেবঃ." অর্থাৎ শ্রদ্ধা যাহার দেব অর্থাৎ দেবতা সে শ্র দ্ধা দে ব। সায়ণ তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতেছেন—"যথা দেবতায়াম্ আদরস্তথা শ্রদ্ধায়াম্ ইত্যর্থঃ," 'যেমন দেবতায় আদর, তেমনি শ্রদ্ধায়,' ইহাই তাৎপর্য্য। শি শ্ন দে ব শব্দেরও অর্থ এইরূপ বুঝিতে হইবে—যেমন দেবতায় তেমনি শিশ্নে যাহার আদর, সে শি শ্ন দে ব।

এই প্রসঙ্গে স্ত্রী দে ব শব্দটির অর্থ অনুধাবন করিলে আলোচ্য বিষয়টি আরও পরিষ্কার হইবে। অ ধ্যা ত্ম রা মা য় ণে র (নির্ণয়সাগর) ৪র্থ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত ব্র হ্মা ণ্ড পু রা ণে (উত্তর খণ্ড, ১. ৯. ১১) লিখিত হইয়াছে—

প্রাপ্তে কলিযুগে ঘোরে নরাঃ পুণ্যবিবর্জিতাঃ।
দুরাচাররতাঃ সর্বে সত্যবার্ত্তাপরাঙ্মুখাঃ॥
পরাপবাদনিরতাঃ পরদ্রব্যাভিলাষিণঃ।
পরস্ত্রীসক্তমনসঃ পরহিংসাপরায়ণাঃ॥
দেহাত্মদৃষ্টয়ো মূঢ়া নাস্তিকাঃ পশুবুদ্ধয়ঃ।
মাতাপিতৃকৃতদ্বেষাঃ স্ত্রী দে বাঃ কামকিঙ্করাঃ॥

এখানে স্ত্রী দে ব শব্দের অর্থ যে 'কামুক' ইহাতে বিন্দুমাত্রও কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। শি শ্ন দে ব শব্দেরও অর্থ তাহাই, অর্থাৎ 'কামুক'।

অভারতীয় ব্যক্তি বা সংস্কৃত ভাষার বাক্‌পদ্ধতির সহিত যথাযথভাবে অপরিচিত ব্যক্তির পক্ষে শি শ্ন দে ব শব্দের আক্ষরিক বা যৌগিক অর্থ ধরিয়া 'লিঙ্গ-পূ জ ক' অর্থ করা অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু যাঁহারা ভারতীয় বা সংস্কৃত বাগ্‌বিন্যাসকে সম্যগ্‌ভাবে জানেন, তাঁহারা এইরূপ প্রয়োগের ভাবার্থের সহিত লৌকিক সংস্কৃতেই সুপরিচিত আছেন। সংস্কৃতে শি শ্নো দ র তৃ প্‌ ও শি শ্নো দ র ম্ভ র শব্দ প্রযুক্ত হয়। এই দুই শব্দের অর্থ 'কামুক' ও 'পেটুক', আর এই অর্থেই শি শ্নো দ র প রা য় ণ শব্দকেও প্রয়োগ করা হয়। এখানে প রা য় ণ শব্দের অর্থ ('পরম গতি,' 'পরম আশ্রয়') লক্ষণীয়, এবং তুলনীয় না রা য় ণ প রা য় ণ, আর কা ম ক্রো ধ প রা য় ণ।

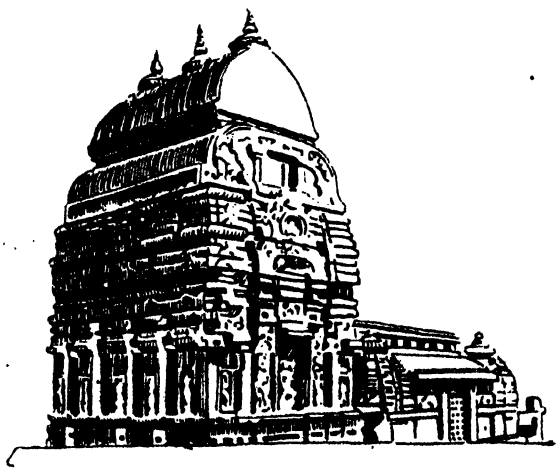
পূর্ব্বে যেমন আলোচনা করা হইল তাহাতে বুঝা যাইবে যে, বেদের শি শ্ন দে ব, আর লৌকিক শি শ্নো দ র প রা য় ণ, এই দুই শব্দের যথাক্রমে প্রযুক্ত 'দেব' ও 'পরায়ণ' শব্দের অর্থ একই এবং উভয় স্থানেই তাহার ভাবার্থ বা তাৎপর্য্যার্থ 'আসক্ত'। অতএব শি শ্ন দে ব শব্দে 'শিশ্নে আসক্ত', আর শি শ্নো দ র প রা য় ণ শব্দে 'শিশ্নে ও উদরে আসক্ত' এই অর্থ বুঝিতে হইবে।

পশ্চাল্লেখ :—

এই প্রসঙ্গে পালি সাহিত্যে প্রচলিত স স্‌ সু দেবা,[১] সংস্কৃত শ্ব শ্রূ দে বা, শব্দটিকেও উল্লেখ করিতে পারা যায়। যে স্ত্রীলোক শাশুড়ীকে ভক্তি-শ্রদ্ধা, যত্ন-আদর ও সেবা-শুশ্রূষাদি করেন, তিনি স স্‌ সু দে বা। ইহার অর্থ শাশুড়ী-পূ জ ক নহে

১ জা ত ক (Fansbol) ৪, পৃ. ৩২২ :
ইত্থিয়া জীবলোকস্মিং যা হোতি সমচারিণী।
মেধাবিনী সীলবতী সস্সুদেবা পতিব্বতা॥
সং যু ত্ত নি কা য (PTS) ১, পৃ. ৪৬ :
ইত্থীপি হি একচ্চিয়া সেয্যা পোসা জনাধিপ।
মেধাবিনী সীলবতী সস্সুদেবা পতিব্বতা॥

এখানে প্রথম গাথার প্রথম পঙ্‌ক্তিতে ই ত্থি য়া স্থলে মুদ্রিত পাঠ ই ত্থি যা; এবং দ্বিতীয় গাথার প্রথম পঙ্‌ক্তিতে এ ক চ্চি য়া স্থলে মুদ্রিত পাঠ এ ক চ্চী যা। সংশোধনের কারণ অন্যত্র বিচার করিয়াছি বলিয়া এখানে আবার তাহা করা হইল না।



দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতবাসী

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতীয়দিগের লাঞ্ছনার বিষয় কাহারও অবিদিত নাই। ইংরেজ যখন বুয়রদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন সে-দেশে ভারতীয়দিগের প্রতি বুয়রদিগের অনুষ্ঠিত অনাচার যুদ্ধের অন্যতম কারণ বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল। কিন্তু তাহার পর যখন বুয়রদিগকে স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার প্রদান করা হয়, তখন ভারতীয়দিগের অধিকার সম্বন্ধে কোন কথা বলা হয় নাই। আজ যখন সাম্রাজ্যবাদীরা সাম্রাজ্যমধ্যে বাস ভারতীয়দিগের কত সুবিধাজনক তাহা প্রচার করিতে ব্যস্ত, তখন কিন্তু তাঁহারা দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতীয়-দিগের লাঞ্ছনার কথা অবজ্ঞা করেন। সে-দেশে ভারতীয়দিগকে শ্বেতাঙ্গদিগের সমান অধিকার প্রদান করা হয় না; ভারতীয়দিগকে তথায় থাকিতে দেওয়া সে-দেশের সরকারের অভিপ্রেত নহে। এখন আবার যে-সব ভারতীয় তথায় বাসিন্দা তাঁহাদিগকে স্থানান্তরিত করিবার চেষ্টা চলিতেছে।

দক্ষিণ-আফ্রিকাবাসী ভারতীয়ের সংখ্যা প্রায় দুই লক্ষ; ইঁহাদিগের শতকরা পঁচাশী জন সে দেশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং সেই দেশের পারিপার্শ্বিক অবস্থায় অভ্যস্ত। অবশিষ্ট শতকরা পনের জন ব্যবসা-ব্যাপদেশে বা অন্য কারণে তথায় অস্থায়ীভাবে বাস করেন।

ভারতীয়রা তথায় শ্বেতাঙ্গদিগের জীবনযাত্রার পদ্ধতি অবলম্বন করিবেন, এই অসম্ভব সর্ত্ত ব্যতীত সে-দেশের সরকার তাঁহাদিগকে সে-দেশে থাকিতে দিতে প্রস্তুত নহেন। উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য সেই সরকার স্থির করিয়াছেন, যে-সব ভারতীয় ভারতবর্ষে ফিরিয়া যাইবেন তাঁহাদিগকে যাইবার পথখরচ ও সামান্য কিছু অর্থ দেওয়া হইবে। বর্ত্তমানে পৃথিবীব্যাপী অর্থকষ্ট দক্ষিণ-আফ্রিকায়ও অনুভূত হওয়ায় কোন কোন ভারতীয় ভারতের অবস্থা না জানিয়া অর্থকষ্ট হইতে অব্যাহতি লাভের আশায় সরকারের সাহায্য গ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। ইহার মধ্যে প্রায় তের হাজার ভারতীয় ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ভারতবর্ষে আসিয়া তাঁহারা বিশেষ বিব্রত হইয়াছেন। এদেশে অর্থকষ্টের অভাব নাই এবং এদেশের ব্যবস্থায় অনভ্যস্ততার জন্য তাঁহাদিগের অসুবিধার অন্ত নাই। এ যেন—"পাইনু অম্বল ডরে তেঁতুল আশ্রয়।" এমন কি এ দেশে আসিয়া তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর কোন লোক সামাজিক অসুবিধা হেতু খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্যও হইয়াছেন। যাঁহারা ভারতবর্ষে আসিয়াছেন, তাঁহাদিগের অধিকাংশই দক্ষিণ-আফ্রিকায় জন্মগ্রহণ করিয়া সেই দেশে বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। এদেশে আসিয়া তাঁহারা কিছুতেই আপনাদিগকে এদেশের সামাজিক অবস্থায় অভ্যস্ত করিতে পারিতেছেন না।

এত দিন দক্ষিণ-আফ্রিকা-প্রবাসী ভারতীয়রা সরকারের এই চেষ্টা প্রহৃত করিবার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কোন চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু বিপদের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া তাঁহারা এখন সে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহারা তথায় "কলোনিয়ালবর্ণ এণ্ড ইণ্ডিয়ান সেটলার্স এসোসিয়েশন" নামক এক সমিতি গঠিত করিয়াছেন। সে সমিতির উদ্দেশ্য :—

(১) দক্ষিণ-আফ্রিকার বাসিন্দা ভারতীয়দিগকে সে-দেশ হইতে দূর করিবার সব চেষ্টায় বিশেষভাবে বাধা প্রদান করা হইবে।

(২) যাহাতে ভারতীয়রা (শ্বেতাঙ্গদিগের তুল্য) ভোট ব্যবহারের অধিকার লাভ করেন, সেজন্য চেষ্টা করা হইবে।

(৩) ভারতীয়দিগের মধ্যে, অপেক্ষাকৃত দরিদ্রসম্প্রদায়ে শিক্ষাবিস্তার ও তাহাদিগের সামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে হইবে।

(৪) ভারতীয় শ্রমিকদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করা হইবে। সে দেশে শ্বেতাঙ্গরা যে শ্রমিকনীতি অবলম্বন করিয়াছে, তাহা ভারতীয় শ্রমিকদিগের স্বার্থের বিরোধী।

(৫) যাহাতে ভারতীয় বালক-বালিকারা কারিগরী ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষার সুবিধা লাভ করে সেজন্য দাবি করিতে হইবে।

(৬) ভারতীয় শিশুদিগকে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করিতে বলিতে হইবে।

(৭) উভয় সম্প্রদায়ের অর্থনীতিক সুযোগ যাহাতে সমান হয় তাহার জন্য আন্দোলন করিতে হইবে।

(৮) বয় স্কাউট ও গার্ল গাইড অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত করিয়া যাহাতে সে সকল শ্বেতাঙ্গদিগের অনুষ্ঠানের মত অধিকার পায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

যাহাতে দক্ষিণ-আফ্রিকার সরকার সে-দেশের বাসিন্দা ভারতীয়দিগকে ছলে-বলে-কৌশলে সে দেশ হইতে দূর করিতে না পারেন সমিতি তাহার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন।

ভারতীয়দিগকে দক্ষিণ-আফ্রিকা হইতে দূর করিয়া নূতন উপনিবেশে স্থানান্তরিত করা যায় কি-না, তাহা বিবেচনা করিবার জন্য দক্ষিণ-আফ্রিকার ইউনিয়ন সরকার এক কমিশন নিযুক্ত করিয়াছেন। সে কমিশনের কাজও আরম্ভ হইয়াছে। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, ভারতীয়রা নানাস্থানে সভা করিয়া এই কমিশন-গঠনে তীব্র প্রতিবাদ করিলেও সে-দেশের ভারতীয় কংগ্রেসের কমিটি সরকারের আহ্বানে কমিশনে একজন প্রতিনিধি সদস্যরূপে পাঠাইয়াছেন! ভারতীয়রা কমিশন-বর্জ্জনের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহারা মনে করেন, কমিশনে প্রতিনিধি প্রেরণ করিলে তাহার সহিত সহযোগ করা হয় এবং কমিশনের যে-উদ্দেশ্যের সহিত ভারতীয়দিগের কোনরূপ সহানুভূতি থাকিতে পারে না, সেই উদ্দেশ্যের—পরোক্ষভাবে—সমর্থন করা হয়। কিন্তু কংগ্রেসের কমিটির বিশ্বাস, ভারতীয় প্রতিনিধি কমিশনে থাকিলে কমিশনের কার্য্যে বাধা দিতে এবং কমিশনের সিদ্ধান্ত ভারতীয়দিগের কার্য্যের বিরোধী হইলে সে সিদ্ধান্ত যথাসম্ভব পরিবর্ত্তিত করিতে পারিবেন। এদেশে কংগ্রেস কর্ত্তৃক বহুমতে ব্যবস্থাপক সভা বর্জ্জনের প্রস্তাব গৃহীত হইলে স্বরাজ্যদল ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ জন্য যেরূপ যুক্তির অবতারণা করিয়াছিলেন, ইঁহারাও সেইরূপ যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে পূর্ব্বোক্ত সমিতি গঠিত হইয়াছে। সমিতির বিশ্বাস, ভারতীয়দিগকে স্বাবলম্বী হইয়া আপনাদিগের চেষ্টায় আপনাদিগের উন্নতিসাধন ও অধিকার রক্ষা করিতে হইবে। দক্ষিণ-আফ্রিকার বাসিন্দা যে শতকরা ৮৫ জন ভারতীয় সেই দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা যাহাতে সে দেশের অন্যান্য লোকের তুল্য অধিকার লাভ করেন, সেজন্য আন্দোলন করিতে হইবে।

এই সমিতির একজন প্রতিনিধি এদেশে আসিয়া ভারতাগত দক্ষিণ-আফ্রিকার ভারতীয়দিগের অবস্থা দেখিয়া সে-সম্বন্ধে বিবৃতি প্রদান ও এদেশের লোককে সে-দেশে ভারতীয়দিগের বিপদের গুরুত্ব জ্ঞাপন করিবার জন্য ভারতে প্রেরিত হইয়াছেন। তাঁহার বিবৃতিতে নির্ভর করিয়া সমিতি তথায় ভারতীয়দিগকে সরকারের দ্বারা প্রলুব্ধ হইয়া সে-দেশ ত্যাগের বিপদ বুঝাইয়া দিবেন।

সমিতির বিশ্বাস, দক্ষিণ-আফ্রিকায় বর্ত্তমানে যে প্রায় দুই লক্ষ ভারতীয় আছেন, তাঁহাদিগের তথায় স্থানাভাব হইতে পারে না। ভারতীয়রা সে দেশের উন্নতিসাধনে যে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা কিছুতেই উপেক্ষা বা অবজ্ঞা করা যায় না। এখন যদি তাঁহাদিগকে সেদেশ হইতে দূর করিয়া দেওয়া হয়, তবে যে অসামান্য অবিচার করা হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষের লোক যে প্রবাসী ভারতীয়দিগের প্রতি এইরূপ অবিচারের তীব্র প্রতিবাদ ও প্রতীকারচেষ্টা করিবেন, তাহা বলাই বাহুল্য। ভারতবাসীর পক্ষে এইরূপ অনাচারের প্রতিশোধ লইবার অধিকার থাকা আমরা মঙ্গল ও প্রয়োজন বলিয়া বিবেচনা করি।

সম্প্রতি সংবাদ পাওয়া গিয়াছে পূর্ব্বোক্ত কমিটি মত-প্রকাশ করিয়াছেন. (১) বর্ণিও ভারতের নিয়ন্ত্রণাধীন ভারতীয়দিগের উপনিবেশ করা হউক, (২) সেইরূপ অভিপ্রায়ে নিউগায়েনা গ্রহণ করা হউক, এবং (৩) ব্রিটিশ গায়েনাও ভারতীয় উপনিবেশ রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে।

যাহাতে দক্ষিণ-আফ্রিকার সরকার সেই দেশ হইতে ভারতীয়দিগকে আইনের বলে দূর করিতে না পারেন, সে জন্য ভারতবাসীকে সঙ্ঘবদ্ধভাবে চেষ্টা করিতে হইবে।

আমাদের 'রেশিও' সমস্যা

শ্রীঅনাথগোপাল সেন

রেশিও প্রশ্ন লইয়া ভারতব্যাপী একটা ঝড় বহিয়া গেল। এত প্রচণ্ড তার আকর্ষণ যে, কবি-সম্রাট্ রবীন্দ্রনাথ হইতে বিজ্ঞানাচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র পর্য্যন্ত টাল সামলাইতে পারেন নাই। আর আমরা অনেকেই ভালমন্দ বিশেষ কিছু বুঝিতে না পারিয়া পরস্পরের মুখ-চাওয়াচাওয়ি করিয়াছি। শাস্ত্রের কচ্‌কচি নীরব হইয়া আসিয়াছে, ঝড়ের বেগ কমিয়া গিয়াছে; সুতরাং সাধারণের পক্ষে ধীর ভাবে বিষয়টি বুঝিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। সেইজন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

প্রারম্ভে 'রেট অব্ এক্‌স্‌চেঞ্জ' বা বিনিময়ের হার. এই কথাটার অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করা যাক্। বিভিন্ন দেশের মুদ্রার ওজন নির্দ্দিষ্ট করা হইলেও এক এক দেশের মুদ্রার ওজন এক এক রকম। এই ওজনের পার্থক্যের দরুণ ইহাদের মূল্যের যে তারতম্য, 'রেট অব্ এক্‌স্‌চেঞ্জ' তাহাই গণিতের সাহায্যে নির্দ্দেশ করিয়া দেয় মাত্র। ইহাকেই সংক্ষেপে 'রেশিও' বলা হয়।

পৃথিবীব্যাপী মুদ্রাবিভ্রাট ঘটিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত একটি বিলাতি স্বর্ণমুদ্রা ফ্রান্সের ২৫·২২টি, জার্ম্মানীর ২০·৪৬টি এবং আমেরিকার ৪·৮৬টি স্বর্ণমুদ্রার সমতুল্য ছিল। একই ধাতুর বিভিন্ন মুদ্রামধ্যে বিনিময়ের হার নির্দ্ধারণ করা খুবই সহজ। কিন্তু এক দেশের মুদ্রা স্বর্ণনির্ম্মিত, অপর দেশের মুদ্রা রৌপ্য-নির্ম্মিত হইলে উভয় ধাতুর আপেক্ষিক মূল্যের অ-স্থিরতা হেতু উহাদের মধ্যে বিনিময়ের হার নিরূপণ করা কঠিন হইয়া পড়ে। ইংলণ্ডের স্বর্ণমুদ্রা ও ভারতের রৌপ্যমুদ্রার মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয় সেইজন্যই চিরকাল দুরূহতার সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছে। বর্ত্তমান আন্দোলন সেই বহু পুরাতন কলহেরই একটা নবপর্য্যায় মাত্র। ভারতের লেন-দেন প্রধানতঃ ইংলণ্ডের সহিত; তথাপি কেন যে ইংরেজ সরকার ভারতে স্বর্ণমুদ্রার পরিবর্ত্তে রৌপ্যমুদ্রা প্রচলন করিয়া উভয় দেশের আর্থিক সম্পর্কের মধ্যে এই নিদারুণ অনির্দ্দিষ্টতা বা ভেদের সৃষ্টি করিলেন তাহা বোঝা কঠিন। যাহা হউক, সেই আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিষয় নহে; এই সম্বন্ধে আমি অন্যত্র* বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। এক্ষণে মূল বিষয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করা যাক্।

কোন দেশের বাণিজ্যই আর এখন শুধু সেই দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে; গোটা দুনিয়ার সহিত এখন আমাদের কারবার। সেইজন্যই পরস্পরের দেনা-পাওনা স্থির করিবার জন্য বিভিন্ন দেশের মুদ্রামধ্যে বিনিময়ের হার নির্দ্দিষ্ট রাখা একান্ত আবশ্যক। এতকাল ছিলও তাই। বিগত মহাযুদ্ধের অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে ইউরোপের দেশসমূহ স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হওয়ায় এই নির্দ্দিষ্ট হারের নড়চড় হইয়া যায়। পরে শান্তিস্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে স্বর্ণমুদ্রা প্রতিষ্ঠিত হইলে স্বাভাবিক অবস্থা পুনরায় ফিরিয়া আসে। কিন্তু কিছুকাল মধ্যেই যুদ্ধের পরবর্ত্তী কুফল ধীরে ধীরে ফলিতে সুরু করে এবং ইংলণ্ড হৃতসর্ব্বস্ব হইবার অবস্থায় পড়িয়া ১৯৩১ সালে পুনরায় স্বর্ণমান পরিত্যাগ করে। সঙ্গে সঙ্গে জাপান, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিলাণ্ড প্রভৃতি অন্যান্য দেশও আত্মরক্ষার জন্য স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। তদবধি পৃথিবীব্যাপী এই মুদ্রাবিভ্রাটের পালা চলিয়াছে, ইহার শেষ কোথায় কি ভাবে কেহ বলিতে পারে না।

স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিয়া নিজ দেশের দেনা পরিশোধের জন্য স্বর্ণমুদ্রা দিবার দায় হইতে গবর্ণমেণ্ট রক্ষা পাইলেন, কেবল বিদেশের দেনা পরিশোধ করিবার বেলাই স্বর্ণমুদ্রা বা স্বর্ণথানের প্রয়োজন থাকিল। স্বর্ণমুদ্রার স্থান যখন কাগজের নোট অধিকার করিল, তখন মুদ্রার ধাতুমূল্য দ্বারা বিভিন্ন দেশমধ্যে বিনিময়ের হার নির্দ্ধারণের যে সহজ উপায়টি ছিল তাহা নষ্ট হইয়া গেল এবং আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের দেনা-পাওনা

* 'প্রবাসী'র কার্ত্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত "ভারতে মুদ্রানীতি" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

স্থির করা দুরূহ হইয়া পড়িল। স্বর্ণভ্রষ্ট হওয়ার ফলে ইংলণ্ড এবং ঐ পথাবলম্বী অন্যান্য দেশের মুদ্রার মর্য্যাদা বা কদর হ্রাসপ্রাপ্ত হইল। যেখানে একটি পাউণ্ড ষ্টার্লিং ৪·৮৬ ডলারের সমতুল্য ছিল সেখানে তাহার মূল্য দাঁড়াইল ন্যূনকল্পে ৩·৩০ ডলার।

আর্থিক জগতে ইংলণ্ডের মর্য্যাদা হানি হইল যথেষ্ট, কিন্তু সে প্রাণে বাঁচিয়া গেল। প্রথমতঃ তহবিলের অবশিষ্ট স্বর্ণগুলি তাহার রক্ষা পাইল। দ্বিতীয়তঃ, মুদ্রার মূল্য হ্রাস হেতু জিনিষের দর চড়িল। তৃতীয়তঃ, বিনিময়ের হার তাহার অনুকূল হওয়ায় রপ্তানি বৃদ্ধি ও আমদানি হ্রাস পাইয়া তাহার ধনাগম ও ব্যবসাবাণিজ্যের উন্নতি হইতে লাগিল। অন্ততঃ প্রতিকূল হাওয়া অনেকটা বাধাপ্রাপ্ত হইল। হাজার পাউণ্ডের জিনিষ ইংলণ্ড হইতে ক্রয় করিলে আমেরিকার বণিককে পূর্ব্বে দিতে হইত (১০০০ × ৪·৮৬) ৪৮৬০ ডলার, এক্ষণে দিতে হইল আনুমানিক (১০০০ × ৩·৩০) ৩৩০০ ডলার মাত্র। ইংলণ্ড তাহার পণ্যের দরুণ হাজার পাউণ্ডই পাইল বটে; কিন্তু আমেরিকাকে ১৫৬০ ডলার কম দিতে হইল। ফলে আমেরিকা ও স্বর্ণমান-বিশিষ্ট অন্যান্য দেশে ইংরেজের মাল কেবলমাত্র বিনিময়ের মারপ্যাচের দরুণ সস্তায় বিকাইতে লাগিল। পক্ষান্তরে উঁহাদের পণ্যের দর ইংলণ্ডের বাজারে চড়িয়া গেল। প্রবল প্রতিযোগিতার ফলে দুনিয়ার হাটে পণ্য বিক্রয় এমনি দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে; তদুপরি মুদ্রার অবনতি ঘটাইয়া বাট্টার সুযোগ গ্রহণে ইংলণ্ডকে লাভবান হইতে দেখিয়া এই মন্দার বাজারে আমেরিকাও সেই পথের পথিক হইতে বাধ্য হইল। ফলে চারি দিকে স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিয়া মুদ্রামূল্য হ্রাস করতঃ কে কাহাকে পণ্যের হাটে হটাইবে তাহার একটা রীতিমত দৌড় চলিয়াছে।

এই সম্পর্কে ভারতের অবস্থা সম্যক বুঝিতে হইলে অনভিজ্ঞের পক্ষে পারিপার্শ্বিক অবস্থাও কিঞ্চিৎ জানা আবশ্যক। সেইজন্যই দুনিয়ার আর্থিক সমস্যার এই দিকটা যথাসম্ভব সংক্ষেপে আলোচনা করা গেল।

ভারতের মুদ্রা রৌপ্য ধাতুর হওয়ায় পৃথিবীর স্বর্ণমুদ্রা-বিশিষ্ট প্রধান দেশসমূহের সহিত বিনিময়ের হার বা 'রেশিও' লইয়া তাহার গোলমাল যে চিরন্তন হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সোনা ও রূপার বাজারদরের পরিবর্ত্তন হেতু ষ্টার্লিঙের সহিত টাকার রেশিও স্থির করিবার কোন সহজ ও স্বাভাবিক উপায় না থাকায় ভারত-সরকার এই হার খেয়ালমত এক এক সময় এক এক রূপ নির্দ্দেশ করিয়া আসিয়াছেন। ইহার ফল ভারতের পক্ষে শুভ হইতে পারে নাই। প্রথম কথা—বিনিময়ের হার পরিবর্ত্তনশীল হইলে লাভালাভ হিসাব করিয়া বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্য করা কঠিন হইয়া পড়ে। দ্বিতীয়তঃ, যাহা এইমাত্র আলোচনা করা হইল, বিনিময়ের হার বা রেশিও নির্দ্ধারণের উপর জিনিষের দর ও বৈদেশিক বাণিজ্যের উন্নতি অবনতি অতি গুরুতররূপে নির্ভর করে। ১৮৯২ সাল হইতে ১৯১৭ সাল পর্য্যন্ত টাকার মূল্য ১ শিলিং ৪ পেনি নির্দ্দিষ্ট ছিল; তৎপরে ১৯১৯ সালে টাকার মূল্য বাড়াইয়া একেবারে ২ শিলিং করা হয়। তাহার ফল ভারতের পক্ষে অতিশয় মারাত্মক হইয়া পড়িলে পুনরায় ১৯২৬ সালে এক রয়্যাল কমিশন বসে এবং উঁহারা টাকার মূল্য ১ শিলিং ৬ পেনি নির্দ্ধারণ করিয়া দেন। এরূপ ঘাতপ্রতিঘাত ও অনিশ্চয়তার ভিতর দিয়া ভারতের মুদ্রা-সমস্যা এতকাল চলিয়া আসিয়াছে। পৃথিবীর বাণিজ্য তখন সম্প্রসারণের পথ বাহিয়া চলিতেছিল; ভারতের ক্ষতি তাই তেমন করিয়া তাহার গায়ে বাজিতে পারে নাই। কিন্তু আজ আর সেদিন নাই; আজ দু-কূল-ভাঙা খরস্রোতে উজান বাহিবার পালা সুরু হইয়াছে। আমাদের প্রভুদের অবস্থাও কাহিল। বড় বাড়ির আনন্দোৎসবের এতটুকু ছিটেফোঁটা পাইবার আশাও আজ আর দীন প্রতিবেশীর নাই। দুনিয়ার চারি দিকে প্রাণ বাঁচাইবার জন্য আজ কাড়াকাড়ি পড়িয়া গিয়াছে। 'কাজ চাই, অন্ন চাই' রবে ইউরোপ আমেরিকার আকাশ-বাতাস আজ ভারী হইয়া উঠিয়াছে। রাষ্ট্রপতিগণের চোখের নিদ্রা টুটিয়াছে। কোটি কোটি টাকার পণ্য পড়িয়া আছে; খরিদ্দার নাই, দর নাই। সকল দেশই নিজের পণ্য পরের দেশে চালান করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে ব্যস্ত; কিন্তু কেহই পরের পণ্য নিজের দেশে প্রবেশ করিতে দিবেন না। যিনি দরে আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছেন না, তিনি পরের পণ্যের উপর উচ্চ শুল্ক বসাইতেছেন। তাহাতেও আঁটিয়া উঠিতে না পারিলে, স্বর্ণমুদ্রা ত্যাগ করিয়া যথাসম্ভব কাগজ চালাইতে সুরু করিয়াছেন; নতুবা

মুদ্রার স্বর্ণ অপহরণ করিতেছেন। আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট মিঃ রুস্‌ভেল্ট কলমের এক খোঁচায় ডলারের ওজন সেদিন অর্দ্ধেক কমাইয়া দিয়াছেন। উদ্দেশ্য নিজের দেশের জিনিষের দর চড়াইয়া দেওয়া এবং বিদেশের হাটে প্রতিযোগিতায় অপরকে পরাস্ত করা। রাতারাতি আমাদের আধুলিগুলি টাকা হইয়া গেলে যা হয়, এ ঠিক তাই! অর্থশাস্ত্রের যাদুমন্ত্রে মানুষের হালকা পকেট যখন রাতারাতি দ্বিগুণ ভারী হইয়া উঠিবে তখন বাজারে ক্রেতার ভিড় নিশ্চয়ই কিছু বাড়িবে এবং নিজের পণ্য বিদেশে অর্দ্ধমূল্যে বিক্রয় করিবার সুবিধাও হইবে, ইহাই এই নীতির উদ্দেশ্য।

এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে, চারি দিকের অবস্থা ও ব্যবস্থা যখন এইরূপ, তখন আমাদের দেশের মুদ্রা-নীতি কোন্ পথে চলিয়াছে। ইহার সহজ উত্তর এই যে, আমাদের নির্দ্দিষ্ট পথও নাই, চলাও বন্ধ। আমাদের এই চরম নিশ্চেষ্টতার দিকে তাকাইলে পুরাতন সেই প্রবাদটির কথা মনে পড়ে, 'কাঙ্গালের আবার বাটপাড়ের ভয় কি?' সেই যে ১৯২৭ সালে সুদিনে আমাদের টাকার মূল্য ১ শিলিং ৬ পেনি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, দুনিয়ার এত ওলটপালটের পরও সেই বাট্টা বা রেশিও-ই এখন পর্য্যন্ত স্থির আছে। পার্থক্যের মধ্যে এইটুকু, এখন সম্পর্ক হইয়াছে পেপার ষ্টার্লিংয়ের সহিত; কারণ ইংলণ্ডের ষ্টার্লিং এখন স্বর্ণ হইতে সম্বন্ধচ্যুত। ১৯২৭ সালে রয়্যাল কমিশন কর্ত্তৃক ১ শিলিং ৬ পেনি রেশিও যখন নির্দ্ধারিত হয় তখনই কমিশনের একমাত্র ভারতীয় সদস্য অর্থনীতি-বিশারদ স্যর পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে, স্বর্ণ ও রৌপ্য ধাতুর পারস্পরিক মূল্য বিবেচনা করিলে বাট্টার হার কখনও ১ শিলিং ৪ পেনির বেশী হওয়া উচিত নহে। কিন্তু তাঁহার অভিমত অন্যান্য সদস্য গ্রহণ করেন নাই। সুদিনে যে বাট্টার হার অধিক এবং ভারতের পক্ষে অহিতকর বলিয়া ভারতীয়গণ কর্ত্তৃক বিবেচিত হইয়াছিল, আজ এই বিশ্বব্যাপী ঘোর দুর্দ্দিনেও তাহাই স্থির আছে।

আমরা কোন্ হিসাবে বা কি সূত্রে ১ শিলিং ৬ পেনি রেশিওকে বেশী বলিতেছি, এক্ষণে তাহাই বিচার করিয়া দেখা যাক। লড়াইয়ের পর ইউরোপের প্রধান দেশসমূহ যখন স্বর্ণমানে প্রত্যাবর্ত্তন করিল, তখন লড়াইয়ের পূর্ব্বে ষ্টার্লিংয়ের যে মূল্য ছিল ইংলণ্ড সেই মূল্যই গ্রহণ করিল। কিন্তু ফ্রান্স, জার্ম্মানী প্রভৃতি দেশ স্বর্ণের পরিমাণ বা ওজন পূর্ব্বাপেক্ষা কমাইয়া দিয়া তবে পুনরায় স্বর্ণমুদ্রা প্রচলন করিতে সাহসী হইল। মোট কথা, লড়াইয়ের পূর্ব্বে যে মূল্য ছিল তদপেক্ষা কেহই নিজ নিজ মুদ্রার মূল্য বৃদ্ধি করেন নাই, বরং হ্রাস করিয়াছেন। কিন্তু আমি পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, লড়াইয়ের পূর্ব্বে ২৫ বৎসর কাল আমাদের টাকার মূল্য ছিল ১ শিলিং ৪ পেনি; লড়াইয়ের পর হঠাৎ তাহা বৃদ্ধি পাইয়া হইল একেবারে ২ শিলিং! তার পর ইহার ফলে ধন নিঃসরণ হইয়া ভারতের যখন নাভিশ্বাস উপস্থিত হইল তখন ইহার মূল্য নির্দ্দিষ্ট হইল ১ শিলিং ৬ পেনি। তথাপি লড়াইয়ের পূর্ব্বকার মূল্য অপেক্ষা ইহার মূল্য ২ পেনি বেশী ধরা হইল। কেহ হয়ত বলিতে পারেন, পূর্ব্বে মূল্য কম ছিল; ২ পেনি মূল্য বাড়াইয়া দিয়া টাকা ও ষ্টার্লিংয়ের মূল্যের মধ্যে সত্যকার সামঞ্জস্য করা হইয়াছে। এইরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে বলিয়া আমরা স্বীকার করিতে পারিতাম যদি বিজ্ঞানসম্মত অন্যরূপ বিপরীত প্রমাণ কিছু না থাকিত।

এইরূপ বিজ্ঞানসম্মত বিচার করিতে হইলে উভয় দেশের পণ্যের মূল্য-তালিকার দিকে তাকাইতে হইবে। টাকা ও ষ্টার্লিংয়ের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট রেশিও যদি খাঁটি রেশিও হয়, তবে ইংলণ্ডে জিনিষের দর ষ্টার্লিংয়ের মূল্যের সহিত যেমন ওঠা-নামা করিবে ভারতেও টাকার মূল্য এবং জিনিষের দর অনেকটা সেই অনুপাতে ওঠানামা করিবে। কিন্তু ফলতঃ তাহা হয় নাই। ১৯৩১ সালে স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিবার পর ইংলণ্ডে জিনিষের দর কিছু চড়িয়াছে, কিন্তু আমাদের দেশে চড়া দূরের কথা, আরও খানিকটা নামিয়াছে। ভারতের ন্যায় সমাবস্থাবিশিষ্ট অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, নিউজিলাণ্ড প্রভৃতি অন্যান্য কৃষি-প্রধান দেশের মূল্য-তালিকার সহিত আমাদের মূল্য-তালিকার তুলনা করিলেও এই একই অবস্থা দেখিতে পাওয়া যাইবে। স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিবার পর ঐ সকল দেশে জিনিষের দর বেশ খানিকটা চড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু আমাদের রৌপ্যমুদ্রা স্বর্ণ হইতে সম্বন্ধচ্যুত হওয়া সত্ত্বেও এদেশে পণ্যের মূল্য হ্রাস ভিন্ন বৃদ্ধি পায় নাই।

এই-সব দেশের লড়াইয়ের পূর্ব্বেকার কয়েক বৎসরের মূল্য-তালিকার সহিত বর্ত্তমান মূল্য-তালিকা মিলাইলে দেখিতে পাইব ইহাদের পণ্যের মূল্য আমাদের দেশের তুলনায় অনেক কম হ্রাস পাইয়াছে। ইহা হইতে অনুমান করা মোটেই অসঙ্গত হইবে না যে, আমাদের দেশের মুদ্রার আপেক্ষিক মূল্য নিরূপণ ঠিক হয় নাই এবং ষ্টার্লিঙের সহিত তুলনায় ইহার মূল্য অধিক ধরা হইয়াছে।

তাহার আরও একটা প্রমাণ দিতে পারা যায়। ১৯৩০ সালের পূর্ব্বেকার কয়েক বৎসরের হিসাব আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, ভারতের রপ্তানি আমদানি অপেক্ষা প্রায় ৮৪।৮৫ কোটি টাকা বেশী ছিল। কিন্তু উহা বিগত তিন বৎসরে ক্রমান্বয়ে নামিয়া ১৯৩২-৩৩ সালের শেষে মাত্র ৪ কোটিতে দাঁড়াইয়াছে। বিশ্বব্যাপী ব্যবসা-মন্দার দোহাই দিয়া ভারতের বহির্বাণিজ্যের এই দুর্গতিকে চাপা দেওয়া যায় না। কারণ তাহাই যদি সত্য হইত, তাহা হইলে অন্যান্য দেশের, বিশেষতঃ কৃষি-প্রধান দেশের, বহির্বাণিজ্যেরও এরূপ অবনতি আমরা দেখিতে পাইতাম। কিন্তু ঐ সব দেশের বাণিজ্য-হিসাব পরীক্ষা করিলে তাহাদের রপ্তানির এতাদৃশ হ্রাস দেখিতে পাওয়া যায় না। দুনিয়ার সাধারণ অবস্থাই যদি শুধু ইহার জন্য দায়ী হইত, তাহা হইলে যে পরিমাণ রপ্তানি হ্রাস পাইয়াছে সেই পরিমাণ আমদানিও ত হ্রাস পাইত। কিন্তু তাহা ত হয় নাই। পূর্ব্বেই আলোচনা করা হইয়াছে, বাট্টার হার অধিক হইলে তাহা কি প্রকারে দেশের রপ্তানিকে খর্ব্ব ও আমদানিকে সহায়তা দান করে। সেই জন্যই কোন দেশের বাণিজ্য-গতিকে (balance of trade) বৎসরের পর বৎসর অধিকতর প্রতিকূল হইতে দেখিলে আমরা নিঃসংশয়ে ধরিয়া লইতে পারি যে, ঐ দেশের মুদ্রার বহির্মূল্য অতিরিক্ত ধরা হইয়াছে।

অন্য প্রকার পরীক্ষা দ্বারাও আমরা সেই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইব। ফ্রান্স, ইটালী, জার্ম্মানী, বেলজিয়াম প্রভৃতি কয়েকটি দেশ আজও স্বর্ণমান আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে। সেই জন্য উহাদের মুদ্রামূল্য হ্রাস পাইতে পারে নাই। কিন্তু আমাদের রৌপ্যমুদ্রা ষ্টার্লিঙের সহিত যুক্ত থাকায় স্বর্ণমুদ্রার তুলনায় তাহার মূল্য হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। তাই বিভিন্ন দেশ সম্পর্কে আমাদের আমদানি ও রপ্তানির হিসাব পৃথক করিয়া দেখিলে আমরা দেখিতে পাই, ফ্রান্স, জার্ম্মানী, ইটালী, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশ হইতে বিদেশী পণ্যের আমদানি এদেশে যে-পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে, ইংলণ্ড, জাপান প্রভৃতি দেশ হইতে আমদানি সেই পরিমাণ হ্রাস পায় নাই। পক্ষান্তরে, ১৯৩৩ সালের মাঝামাঝি বিশ্ব-ব্যবসার একটু উন্নতি দেখা গেলে, প্রথমোক্ত দেশসমূহে আমাদের পণ্যের রপ্তানি যে-পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, শেষোক্ত দেশসমূহে সে-পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে পারে নাই। ইহা হইতেও আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি যে ষ্টার্লিঙের তুলনায় আমাদের মুদ্রার মূল্য আরও কম হইলে, ঐ সব দেশেও আমাদের রপ্তানি অন্যান্য দেশের মতই আরও অনেক বেশী হইতে পারিত এবং ঐ সব দেশ হইতে আমাদের দেশে বিদেশী পণ্যের আমদানিও অনেক হ্রাস পাইতে পারিত।

বহির্বাণিজ্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও আমাদের দেশের কৃষিজাত পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া যে কি পরিমাণ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে তাহা আমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ দুরবস্থা হইতে হাড়ে হাড়ে বুঝিতে পারিতেছি। আমাদের দেশে কৃষকই প্রধানতঃ ধনোৎপাদন করে। কৃষকের মেরুদণ্ড ভাঙিয়া পড়ায় ডাক্তার, মোক্তার, ব্যবসাদার সকলেই আজ নিরুপায় হইয়াছেন। ১৯২১ হইতে ১৯৩০ সাল পর্য্যন্ত ১০ বৎসরের গড় ধরিলে দেখা যায়, বাংলার কৃষিজাত পণ্যের বাজার দর ৭০ কোটি টাকার উপর ছিল। তন্মধ্যে বাংলার কৃষককে দেনা ও খাজনা ইত্যাদি বাবদ দিতে হয় প্রায় ৩০ কোটি টাকা। তাহার মুনাফা থাকে ৪০ কোটি টাকারও বেশী। কৃষক নিজের প্রয়োজনে যে পরিমাণ জিনিষ ব্যবহার করে এই হিসাবে তাহা ধরা হয় নাই। সেই স্থলে ১৯৩২-৩৩ সালে বাংলার কৃষক তাহার ফসলের মূল্য পাইয়াছে মাত্র ৩২ কোটি টাকা! অথচ তাহার দেনার পরিমাণ সেইরূপই আছে। অবস্থা কিরূপ গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা শুধু ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে। ইহা হইতে আমরা আরও বুঝিতে পারিতেছি, কৃষিজাত পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির উপর আমাদের শুভাশুভ কতটা নির্ভর করিতেছে। এই উদ্দেশ্যেই আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট ডলারের মূল্য প্রায়

অর্দ্ধেক কমাইয়া দিয়াছেন। আমাদের আত্মকর্তৃত্ব থাকিলে আমরাও হয়ত তাহাই করিতাম। ইহাতে অন্য দেশকে আঘাত করিয়া নিজ দেশের স্বার্থকেই হয়ত শুধু বড় করিয়া দেখা হইত। কিন্তু সে রকম দাবি আজ আমরা করিতেছি না। ভুল করিয়া যেটুকু মূল্য বেশী ধরা হইয়াছে এবং যাহার জন্য আমরা অন্যায় রকমে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছি, শুধু সেইটুকু হইতে আজ আমরা মুক্তি প্রার্থনা করি। আমাদের দরবার—২ পেনির দরবার।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার এবং আরও দুই চারজন বাঙালী ছাড়া সারা ভারতবর্ষে এ সম্পর্কে দ্বিমত নাই বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি করা হইবে না। অধ্যাপক সরকারের অভিমতে আমরা বিস্মিত হই নাই। সর্ব্ববাদিসম্মত সত্যে তিনি সাধারণতঃ আস্থাবান নহেন; তিনি নূতন তথ্যের সন্ধানী। তাঁহার পক্ষে নূতন কিছু বলাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এ ব্যাপারে জনসম্মুখে আচার্য্য রায় মহাশয়ের মত লোকের অকস্মাৎ আবির্ভাবে আমরা বিস্মিত হইয়াছি। এ-বিষয়ে তাঁহাকে আমরা অনধিকারী বলিতে চাহি না; কারণ সকল বিষয়েই তাঁহার পড়াশুনা এবং অল্পবিস্তর অভিজ্ঞতা আছে। তাই বলিয়া যাঁহারা আজীবন এক্‌শ্চেঞ্জ, ক্রেডিট, ফাইনান্‌স লইয়া কাটাইলেন, যাঁহারা ইহা অবলম্বন করিয়াই যা-কিছু প্রতিষ্ঠা ও সম্পদ জীবনে অর্জ্জন করিয়াছেন—তাঁহাদের এবং সকলের সমবেত অভিমতের বিরুদ্ধে এইরূপ উত্তেজনা ও উৎসাহ লইয়া তাঁহার এই আত্মপ্রকাশ অনেকটা হেঁয়ালির মত ঠেকিতেছে। তাঁহার এই রুদ্র তেজ সম্বরণ করিবার জন্য কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে কি-না শেষে স্বস্তিবচন পাঠাইতে হইল!

উঁহাদের বিরুদ্ধ মতের প্রত্যুত্তর যোগ্য ব্যক্তিরা যথা-সময়ে যথাস্থানে দিয়াছেন। তাহার বিস্তারিত আলোচনা এখানে অনাবশ্যক। উচ্চ রেশিওর সপক্ষে সাধারণতঃ যে দুই তিনটি যুক্তি প্রয়োগ করা হইয়া থাকে তাহাই সংক্ষেপে আমরা এখানে আলোচনা করিব। আমরা দেখিয়াছি, বাট্টার হার উচ্চ হইলে বিদেশী জিনিষের দর সস্তা হয়। বাট্টার হার কমাইলে বিদেশী পণ্যের মূল্য চড়িয়া যাইবে, গরিব কৃষককুল ও জনসাধারণ এতটা সস্তায় আর জিনিষ কিনিতে পারিবে না, ইহা প্রতিপক্ষের একটি আপত্তি। কথাটা শুনিতে আপাততঃ বেশ ভাল শোনায়। কিন্তু গাছের গোড়া কাটিয়া আগায় জল দেওয়া যে রকম, কৃষকের ক্রয়শক্তি একেবারে নষ্ট করিয়া দিয়া তারপর তাহার সম্মুখে সস্তা বিদেশী জিনিষ উপস্থিত করাও প্রায় সেই রকম। যেখানে কেবল বাংলার কৃষকদের হাতে পূর্ব্বে ৪০ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত থাকিত, সেখানে তিন-চার কোটি টাকাও আর আজ তাহাদের হাতে থাকে না। জিনিষের দর অসম্ভব রকম সস্তা হইলেও তাহারা আজ আর কিছু কিনিতে পারিতেছে না। বর্ত্তমান সমস্যার প্রধান লক্ষণই এই যে, পৃথিবীতে কোন জিনিষের আজ অভাব নাই, চারি দিকে কল্পনাতীত পণ্য-সম্ভারের আয়োজন, বিলাসসামগ্রীর ছড়াছড়ি। কিন্তু ক্রয় করিবার শক্তি আজ কাহারও আর তেমন নাই। Water, water, everywhere, but not a drop to drink! এই সস্তার হাটে আমাদের কৃষক বিদেশী সৌখীন বা প্রয়োজনীয় জিনিষ কিছু ক্রয় করিতে পারিতেছে কি? চড়াবাজারে সে যাহা কিনিতে পারিয়াছিল, আজ তাহা ক্রয় করা তাহার কল্পনার অতীত।

এখানে আরও একটা কথা ভাবিবার আছে। সস্তা বিদেশী জিনিষের লোভে দেশীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি এবং দেশের স্থায়ী মঙ্গলকে প্রতিহত করা উচিত কি-না? অন্য কোন দেশ তাহা হইতে দেয় নাই। সেইজন্য তাহারা দিনের পর দিন শুল্ক-প্রাচীর উচ্চতর, মুদ্রামূল্য ন্যূনতর করিয়া বিদেশী পণ্যের আমদানি প্রতিরোধ করিবার মত চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। জাতিতে জাতিতে বিরোধ আজ সেইজন্যই দুর্ব্বার হইয়া উঠিয়াছে।

প্রতিপক্ষের আর একটি যুক্তি এই, বাংলা শিল্প-বাণিজ্যক্ষেত্রে একপ্রকার নূতন ব্রতী; তাহার এই নবীন উদ্যোগ ও প্রচেষ্টার সময় বস্ত্র, চিনি ও অন্যান্য কারখানার জন্য অনেক কলকব্জার প্রয়োজন। বাট্টার হার কমাইলে বিদেশ হইতে আমদানী কলকব্জা, যন্ত্রপাতির মূল্য চড়িয়া যাইবে। কয়টি কারখানার প্রয়োজনীয় কলকব্জার মূল্যের দরুণ আমাদিগকে যে টাকাটা অধিক দিতে হইবে, তাহার সহিত তুলনায় আমরা অন্তর ও বহির্বাণিজ্যের বিস্তার ও উন্নতি হেতু যে টাকাটা পাইব, এই উভয়ের তুলনা

করিলেই এই যুক্তির অসারতা বুঝিতে পারা যাইবে। যাঁহারা লক্ষ টাকা খরচ করিয়া কলকব্জা আনাইতে পারিবেন তাঁহারা 'রেশিও'র ২ পেনি পার্থক্যের দরুণ শতকরা ১২॥০ হিসাবে * ১২৫০০৲ টাকাও বেশী দিতে পারিবেন। যদি ধরা যায় ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর নূতন ইন্‌ডাষ্ট্রীর জন্য এক কোটি টাকার কলকব্জা বিদেশ হইতে আমদানি হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার জন্য আমাদিগকে ১২। লক্ষ টাকা অধিক দিতে হইবে। অথচ অন্য দিক দিয়া আমরা লাভবান হইব বহু কোটি টাকা।

তা ছাড়া এ সম্পর্কে আরও একটা দিক বিবেচনা করিবার আছে। বর্ত্তমান রেশিও যদি স্থির রাখা হয়, তাহা হইলে শুধু বিদেশী কলকব্জা কেন, বিদেশ হইতে আমদানী সব জিনিষের মূল্যই শতকরা ১২॥০ টাকা কম পড়িবে। ফলে যন্ত্রপাতি সস্তা পাওয়া যাইবে বটে, কিন্তু ঐ যন্ত্রপাতি দ্বারা প্রস্তুত পণ্যের মূল্য বিদেশী পণ্যের তুলনায় ১২॥০ টাকা শতকরা বেশী পড়িবে। এককালীন কলকব্জার জন্য শতকরা ১২॥০ টাকা বেশী দেওয়া অপেক্ষা সেই কলকব্জা হইতে প্রস্তুত পণ্যের উপর দিনের পর দিন ১২॥০ টাকা বেশী দেওয়া নিশ্চয়ই অধিকতর ক্ষতিকর। মূল্যের এতটা পার্থক্যের দরুণ ভারতীয় পণ্য হয়ত প্রতিযোগিতায় বাজারে টিকিয়া থাকিতেই পারিবে না এবং কারখানাটিও মূলেই বিনাশপ্রাপ্ত হইবে।

প্রতিপক্ষের তৃতীয় যুক্তিটি অধিকতর সারবান বলিয়া মনে হয়। বাট্টার হার ২ পেনি কমাইয়া দিলে ইংলণ্ডকে 'হোম চার্জ্জেস' দরুণ আমাদের বাৎসরিক যে দক্ষিণা দিতে হয় তাহা বৃদ্ধি পাইবে। দক্ষিণার পরিমাণ বাৎসরিক প্রায় ৩॥ কোটি পাউণ্ড ষ্টার্লিং অর্থাৎ প্রায় ৪৬॥ কোটি টাকা। টাকার মূল্য ২ পেনি হ্রাস পাইলে এই বাবদ আমাদিগকে শতকরা ১২॥ হিসাবে আনুমানিক ৫$\frac{১}{২}$ কোটি টাকা আরও বেশী দিতে হইবে ইহা সত্য। ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, ভারতে কৃষকের ঋণের পরিমাণ আনুমানিক ৮০০ কোটি টাকা। টাকার মূল্য ২ পেনি কমিলে তাহার ঋণভারও শতকরা ১২॥ টাকা হিসাবে এক শত কোটি টাকা লাঘব হইবে। কৃষিপ্রধান, কৃষিসম্বল ভারতের হিতাহিত বিচার করিতে হইলে, এই অসহায় মূক জীবদের কথা ভুলিলে চলিবে না। ইহা ছাড়া ব্যবসাবাণিজ্যের উন্নতি হইবে; আয়কর, শুল্ককর ইত্যাদি বাবদ সরকারী আয় অনেক বৃদ্ধি পাইবে; সুতরাং 'হোম্ চার্জ্জেস' বাবদ যে পাঁচ-ছয় কোটি টাকা আমাদিগকে অতিরিক্ত দিতে হইবে তাহা গায়ে লাগিবে না; বরং সাধারণ অবস্থার উন্নতির ফলে আমাদের মঙ্গলই হইবে।

ইংলণ্ডের নিকট আমাদের বহু টাকা ধার; যাহাকে ইংরেজীতে বলে debtor country, আমাদের অবস্থাও তাই। বিদেশে মাল রপ্তানি করিয়া তাহার মূল্য হইতে আমাদের দেনা পরিশোধ করিতে হয়। আমাদের রপ্তানি পড়িয়া গিয়া বাণিজ্যের গতি যদি আমাদের প্রতিকূল দাঁড়ায়, তাহা হইলে ঋণ দিবার জন্য সঞ্চিত তহবিল ভাঙা ভিন্ন আমাদের আর অন্য উপায় থাকে না। সেই জন্যই গত কয়েক মাসে আমাদের দেশ হইতে জাহাজ বোঝাই হইয়া ১৬৫ কোটি টাকার স্বর্ণ বাহিরে চলিয়া গিয়াছে এবং এখনও যাইতেছে। কিন্তু এ ভাবে কতদিন চলিবে? তাই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠাকল্পে ব্যবস্থা-পরিষদে রাজস্বসচিব যখন নূতন বিল উপস্থিত করিলেন, তখন ১ শিলিং ৬ পেনি স্থলে ১ শিলিং ৪ পেনি রেশিও নির্দ্ধারণ জন্য পুনরায় আন্দোলন সুরু হয়। অন্ততঃ বর্ত্তমান রেশিও ঐ বিলে কায়েম না করিয়া দেশের অবস্থানুযায়ী মুদ্রাব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করিবার ভার ঐ ব্যাঙ্কের উপর দেওয়া হউক, ইহাও অনুরোধ করা হয়। কিন্তু ফল কিছুই হয় নাই; রিজার্ভ ব্যাঙ্কের স্বাধীনতা খর্ব্ব করিয়া ষ্টার্লিং ও টাকার রেশিও পূর্ব্ববৎ ১ শিলিং ৬ পেনি পাকা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কোন দেশে মুদ্রার মূল্য এভাবে পাকাপাকি করিয়া বাঁধা নাই। আর্থিক জগতের কতকগুলি অবস্থার উপর তাহা কমিতেছে, বাড়িতেছে। আমরা দেখিয়াছি, বর্ত্তমান সময়ে মুদ্রামূল্য হ্রাস করিবার প্রবল চেষ্টা দেশে দেশে চলিয়াছে এবং প্রত্যহ ডলার, ষ্টার্লিং, ইয়েন প্রভৃতি মুদ্রার রেশিও স্বাভাবিক নিয়মে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। কেবল আমরাই আইনের নাগপাশে বাঁধা পড়িয়াছি। এই বাঁধন হইতে ছাড়া পাইলেই আমাদের টাকার স্বাভাবিক ও প্রকৃত মূল্য ধরা পড়িত। কিন্তু তাহা হইবার উপায় নাই; কারণ মা'র চেয়ে মাসীর দরদ বেশী।

* ১০০×২ পেনি=২০০ পেনি। ২০০ পেনি+১৬ পেনি=১২॥০ টাকা।

জল

শ্রীরাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

ষ্টীমার পাইলাম না। আমাদের নৌকাও আসিয়া ষ্টীমার-ঘাটে লাগিল, আর ষ্টীমারও তাহার নোঙর তুলিয়া কতকটা যেন আমাদের বিদ্রূপ করিবার মত ভঙ্গীতেই বাঁশি দিয়া তাহার ক্ষণিক-স্থগিত যাত্রা আবার সুরু করিল। মনটা আপনা হইতেই কেমন যেন বিষণ্ণ ভারাতুর হইয়া উঠিল।

নৌকায় আমি ও আমার স্ত্রী করুণা ছিল,—মাঝি ত ছিলই।

মাঝি বেচারী নিতান্ত বেকুব বনিয়া গিয়া কহিল,—কর্ত্তা, এখন উপায়?

সেই কথাই আমিও ভাবিতেছিলাম, করুণা ভাবিতেছিল কি-না জানি না। করুণা তখন পদ্মার দিগন্তপ্রসারী আকুল আত্মহারা অগাধ বারিরাশির পানে ভাবাকুল দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দিয়া অত্যন্ত উদাসীনের মত বসিয়া ছিল। হয়ত পদ্মার একটানা কূলভাঙা আর্ত্তনাদের কাছে সে আপনাকে বিসর্জ্জিত করিয়া দিয়া সমস্ত ভাবনার খেই হারাইয়া ভাবনা-বিহীন হইয়া উঠিয়াছিল।

ভাবিতেছিলাম, পদ্মার দু-কূল ছাপাইয়া আকুল সমারোহে সন্ধ্যা আসিতেছে...কাল ভোরের পূর্ব্বে কোন ষ্টীমার নাই... এখন উপায়?

কিন্তু এত দুর্ভাবনার কিছুই ছিল না, যদি-না করুণার সঙ্গে আমার মনোমালিন্য ঘটিত। সেইখানেই যত গোল বাধিল। বাড়ি হইতে ষ্টীমার-ঘাট প্রায় সাত মাইলের জলপথ। এই সাত মাইলের জলপথ আমরা একই নৌকায় বসিয়া আসিয়াছি, কিন্তু আমাদের উভয়ের মধ্যে একটিমাত্র কথারও আদান-প্রদান হয় নাই। জানি,—আমাদের কথা চিরদিনের মত শেষ হইয়া গিয়াছে এবং শেষ হইয়া যাওয়ার পূর্ব্বে সকালবেলা উভয়েই উভয়কে আমরা শেষ কথা শুনাইয়া দিয়াছি, আর তাহারই ফলে করুণাকে তাহার বাপের বাড়ি রাখিয়া আসিতে চলিয়াছিলাম। কারণ, যে অনর্থ, ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক—একবার ঘটিয়া গিয়াছে তাহার পরে আর কোন স্বামী-স্ত্রীতেই একত্র বসবাস কাহারও ঈপ্সিত হইতে পারে না।

তাই ভাবিতেছিলাম, এখন উপায়? এত যে পরিচিত স্বামী-স্ত্রী তাহারা একটি পূর্ণ রাত কেমন করিয়া একই নৌকায় নিতান্ত অপরিচিতের মত, মূকের মত বসিয়া কাটাইয়া দিবে, মাঝে শুধু অভিমানের ঠুন্‌কো প্রাচীর গড়িয়া তুলিয়া? এ অভিমানের জ্বালা যে কত গভীর তাহা এই আগতপ্রায় সন্ধ্যায় ভাঙন-মুখর উচ্ছ্বাস-বিহ্বল পদ্মার কূলে নৌকাবক্ষে না থাকিলে হয়ত কোনদিনই বুঝিতে পারিতাম না।

করুণা হঠাৎ গভীর উচ্ছ্বাসে নড়িয়া বসিয়া আমার দিকে মুখ ফিরাইল। মুখ তাহার পদ্মারই মত ভাব-গম্ভীর। আমিও করুণার দিকে মুখ তুলিয়া ক্ষণিকের জন্য চাহিয়া রহিলাম, কিন্তু পাছে আপনাকে সংযম-শাসনে বাঁধিয়া রাখিতে না পারি সেই ভয়েই মুখ আবার অন্য দিকে ফিরাইয়া লইলাম।

মাঝি কি বুঝিয়াছিল জানি না। সে নৌকাটিকে শক্ত করিয়া কাছি দিয়া পাড়ের একটা পতিত-গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বাঁধিয়া নৌকা হইতে নামিয়া গেল। সে হয়ত মনে মনে বুঝিয়াছিল যে, ভোরের ষ্টীমারের জন্য আমরা এইখানেই রাত কাটাইব।

মাঝি নৌকা হইতে নামিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের নীরবতা যেন আরও প্রকট, আরও মূর্ত্ত হইয়া উঠিল।

এ যেন কতকটা কলোচ্ছ্বসিত সাগরতীরে আদিম ভাষা-সন্ধানী নর ও নারী—আমি ও করুণা। সঙ্গে সঙ্গেই আবার মনে হইল, আহা! আদিম নর-নারীর মুখে যদি ভাষা দেওয়া না হইত তাহা হইলে বিশ্বসৃষ্টির অঙ্গহানি হইত কি-না জানি না, কিন্তু মানবজীবন যে অনেক সুখের হইত তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

অন্ধকার ক্রমেই গাঢ়তর হইয়া আসিল। মাঝিও নৌকায় ফিরিয়া আসিল।

মাঝি বলিল—কর্ত্তা, বলেন ত আমার ঝাঁখাটা জেলে দি, ভাত-ঠাত যা হয় চারটি রেঁধে নিয়ে নৌকোতেই আজকের রাত কাটাবার ব্যবস্থা করুন।

তারপর করুণার দিকে ফিরিয়া বলিল—মা'ঠান্, অমন মুখ গুঁজে ব'সে থাকলে ত চলবে না। যা-হয় একটা ব্যবস্থা করতেই হবে।

করুণা মুখ তুলিল না। আমিই উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলাম—দেখি, বাজারটা একবার ঘুরে আসি। তারপর কি পাওয়া যায়, না-পাওয়া যায় দেখে একটা ব্যবস্থা যা-হয় করা যাবে।

পাড়ে দাঁড়াইয়া সান্ধ্যান্ধকারে অস্পষ্ট ও-পারের পানে তাকাইয়া মনে হইল, আজ যেন করুণা ও আমার মধ্যে এপার ওপার ফারাক্ দেখা দিয়াছে, কিন্তু পূর্ব্ব দিনের দু-এর মাঝের মধুস্রোতা কলহাসিনী যোগাযোগের নদীটি একেবারে চিরদিনের মত শুকাইয়া মরিয়া গিয়াছে।

বাজার হইতে ফিরিয়া আসিতে অধিক বিলম্ব হয় নাই। প্রয়োজনানুযায়ী সকল জিনিষই বাজারে পাওয়া যাইবে, এমন কি হোটেল হইতে ভাত আনাইয়াও রাত কাটাইবার ব্যবস্থা করিতে পারিব জানিয়া আশ্বস্ত হইলাম। বুঝিলাম, তাড়াহুড়া করিবার কিছু নাই।

নৌকার কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই করুণা ভিতর হইতে কেমন অপরিচিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—দে—খু—ন...

কণ্ঠ তাহার সুস্পষ্ট দুর্ব্বলতায় কাঁপিতেছিল। আমি তাহার এই সম্পূর্ণ অপরিচিত সম্ভাষণে বিশেষ বিস্মিত হইলাম। করুণার হইল কি? করুণা কি জোর করিয়া আমাকে অপরিচিত করিয়া তুলিতে চায়?

পরক্ষণেই করুণা নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া বলিল—না,...দেখ, নৌক'য় দোলা পেয়ে পেয়ে গা আমার কেমন করচে। আমাকে পাড়ে তোল, নৌক'য় আর আমি এক মুহূর্ত্তও বসতে পারচি নে।

তাড়াতাড়ি আগাইয়া গিয়া বলিলাম—উঠে এস, আমি হাত ধ'রে তোমাকে পাড়ে তুলে নিচ্ছি।

করুণা উঠিয়া হাত বাড়াইয়া দিতেই তাহাকে ধরিয়া পাড়ে তুলিলাম।

ছোট বাদাম খাটাইয়া একটি কাজিল ছোক্‌রা নৌকার হাল ধরিয়া বসিয়া গান ধরিয়াছিল,—

আমার এ ঘর খালি,
ও ঘর খালি,
রঁসুই ঘর ক্যান্ খালিরে—এ-এ ?

অফুরন্ত এ-এ-এ...যোগ করিয়া কেমন করুণ মর্ম্মান্তিক একটি সুরের আবহাওয়া সৃজন করিয়া সে নৌকা বাহিয়া চলিয়াছিল। তাহার ছোট নৌকার পিছনে সুরের তালে তালে যেন জলের মূর্চ্ছনা জাগিতেছিল।

করুণা পাড়ে উঠিয়া বলিল—আমার যেন শরীর কেমন করচে।

তাড়াতাড়ি তাহার ছাড়িয়া-দেওয়া হাতটা আবার ধরিয়া ফেলিয়া বলিলাম—তবে উঠে এলে কেন? নৌকোতে শুয়ে থাকাই ত উচিত ছিল তোমার।

করুণার কণ্ঠ ক্রমেই করুণ হইয়া উঠিতে লাগিল। সে বলিল—আমি এর কিছুই এখন বুঝতে পারছি নে। এই যে আমাদের চিরদিনের মত ছাড়াছাড়ি—এ কেমন ক'রে সম্ভব হ'ল? আমাকে আর একবার সব বুঝিয়ে বলতে পার? আমার আগাগোড়া কিছুই যে এখন আর মনে পড়চে না।

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম—তোমার শরীর খারাপ ব'লেই হয় ত এ কথা এখন মনে হচ্ছে। আবার ভাল হ'লেই সব স্মরণ হবে।

করুণা তাড়াতাড়ি বলিল—না গো না, এ শরীর আর আমার কোনদিনই ভাল হবে না। অনন্ত নিঃসঙ্গতা... এ কি মানুষ কখনও ভাবতে পারে? সত্যি, আমি এখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারচি নে, আমাকে ভাল ক'রে সব বুঝিয়ে বল। আমরণ কি আমাকে এই পদ্মার মত নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতে হবে? আর এই পদ্মারই মত সর্ব্বগ্রাসী ব্যাকুলতা বুকে নিয়ে এপাশ-ওপাশ অনন্ত ব্যথায় ফিরতে হবে? কেন? কেন?

অদ্ভুত তাহার এই জিজ্ঞাসা! বলিলাম—চল, নৌকোতেই তোমাকে নিয়ে আবার শুইয়ে দি, তোমার শরীর বা মন কোনটাই সত্যি ভাল নয়।

করুণা নীরবে আত্মসমর্পণ করিল। তাহাকে আবার নৌকায় তুলিয়া শোয়াইয়া দিয়া বলিলাম—এখন কোন কথা ক'য়ো না, কথা কওয়ার সময় পরেও পাবে।

করুণা অতি কাতর ভাবে বলিল—আর কবে পাব? কবে?

—পাবে, পাবে, তুমি তোমার ভাবনা ছাড় করুণা, কাল ভোরের ষ্টীমারেও তোমার যাওয়া হ'তে পারে না।—বলিয়া তাহার মাথায় হাত রাখিতেই সে আমার হাতটা তাহার দুই হাত দিয়া কেমন ছোট মেয়ের মত আব্দারের ভঙ্গীতে জড়াইয়া ধরিল।

ভারি হাসি পাইল। এত যে দুর্ব্বল করুণা সে-ও কত দাপট দেখাইয়া না জানি বাপের বাড়ি চলিয়া যাইতেছিল। কিন্তু আমার এ-যাবৎ কালের অভিজ্ঞতা দিয়া করুণাকে এত দুর্ব্বল ত কোনদিনই ভাবিতে পারি নাই। আশ্চর্য্য কিন্তু!

পদ্মার প্রশস্ত ললাট ছুঁইয়া অন্ধকার চক্রবাল রূপান্বিত করিয়া সুন্দর শীর্ণ এক ফালি চাঁদ উঠিল। নৌকার গোলুইয়ে বসিয়া সেই নবজাত শিশু-চাঁদের পানে চাহিয়া ভাবিতেছিলাম সে-দিনের কথা—যে-দিন করুণাকে বিবাহ করিয়া গৃহে আনিয়াছিলাম। জল দেখিয়া তাহার কি ভয় ও আহ্লাদ! নৌকা দুলিয়া দুলিয়া ওঠে,—করুণা সব লাজ ভুলিয়া সভয়-আর্ত্তনাদ তুলিয়া আমাকে জড়াইয়া জড়াইয়া ধরে। বলে—বাবা বাবা! এম্‌নি জল তোমাদের দেশে! এই জলেই না-জানি আমার মরণ লেখা আছে। তারপরে নৌকার দোলা একটু থামিলে নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া অপরিচিত মৃদুহাসিযুক্ত মাঝিটির পানে সলাজ দৃষ্টি ফেলিয়া আবার বলে—ডুবে যদি যাই ত তোমারই লোকসান। ডুবতে কি আর দেবে তুমি! তবু ভয় দেখ না—বলিয়া রাঙিয়া উঠিয়া হাসে! পর মুহূর্ত্তেই—ও মাগো—বলিয়া বিশ্রী-রকমে মাঝিটাকে হাসিবার সুযোগ করিয়া দিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলে,—আমি কিন্তু মোটে সাঁতার জানি না।

সে-দিনের নিতান্ত ছেলেমানুষ করুণা আর নাই। সে এখন জল দেখিয়া ভয় পায় না, পদ্মার নিরবচ্ছিন্ন নিষ্ঠুর নিঃসঙ্গ মূর্ত্তিকে নিজের ভবিষ্যৎ জীবনের প্রতীক বলিয়া ভাবিতে শিখিয়াছে।

হঠাৎ করুণা উঠিয়া বসিতেই চম্‌কাইয়া উঠিয়া বলিলাম—কি, উঠে বসলে যে? শুয়ে থাকতে কি ভাল লাগচে না?

করুণা বলিল—না, এমন চুপ ক'রে আর শুয়ে থাকতে পারি নে। আমাকে পাড়ে তোল, আমি একটু ঘুরে বেড়াবো। এ যেন বড় নির্জ্জন বোধ হচ্ছে।

আবার করুণাকে পাড়ে তুলিয়া বলিলাম—চল, এ জায়গাটা ছাড়িয়ে একটু ওদিকে যাওয়া যাক। ওদিকে পদ্মার পাড় ধরে হেঁটে বেড়াবার রাস্তা আছে।

করুণা বলিল—চল, তাই চল।

খানিকটা অগ্রসর হইতেই খাড়া পাড় ছাড়িয়া আমরা ঢালু পাড় দেখিতে পাইলাম। সেই ঢালু পাড়ের বালুর উপর দিয়া অগ্রসর হইতেছিলাম। ক্ষণিকের জন্য আমাদের গায়ের উপর দিয়া কোন লঞ্চের খর-সন্ধানী আলো বোধ করি ঘুরিয়া গিয়া অন্য কোথাও পড়িল।

করুণা চম্‌কাইয়া উঠিয়া বলিল—এ কিসের আলো আবার?

করুণাকে বুঝাইয়া বলিলাম এবং পরমুহূর্ত্তেই দেখা গেল, দূরবর্ত্তী চরের আড়াল হইতে একখানি ছোট লঞ্চ বিপুল শব্দে আপন আগমন-বার্ত্তা ঘোষণা করিয়া আমাদের দৃষ্টির মধ্যে আসিয়া ধরা দিল, আর সঙ্গে সঙ্গেই তাহার বুক-কাঁপানো কর্কশ বাঁশি রি-রি করিয়া বাজিয়া উঠিল।

করুণা বলিল,—আঃ মরণ! সিটি ত দিচ্ছে না, যেন বুকে দাগা দিচ্ছে।

করুণার কথায় সে যে কতকটা সহজ অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়াছে তাহা অনুমান করিয়া বলিলাম পদ্মার এ-মূর্ত্তি দেখবার সৌভাগ্য এর আগে কখনও তোমার হয়নি, না?

করুণা বলিল—কোন্ মূর্ত্তির কথা বলচ?

বলিলাম—এই যে চতুর্দ্দিকে চিকির-চিকির আলো,—ঐ লঞ্চের খানিক, ঐ ফ্ল্যাটের কিছু, নৌকোগুলোর কতক,—ঐ যে আকাশের এক ফালি চাঁদ—তারায় ঝিলমিল আকাশ—বিরাট জল-থৈ-থৈ পদ্মা।

করুণা বলিল—তা কোনদিন দেখে থাকলেও আজকের মত ক'রে নিশ্চয়ই দেখিনি। এই যে পদ্মার পাড়ে দাঁড়িয়ে—মনের এমনি গুরু বোঝা নিয়ে দেখা—এ আর কোনদিন হয়ে ওঠেনি, কিন্তু এসব দেখে একটা কথাই শুধু আমার মনে জাগচে। এই যে এত ভাবে প্রক্ষিপ্ত আলো, এই যে হট্টগোলের আভাস, এই যে কত ভাবের চাঞ্চল্য, এই যে পদ্মার প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তি—এ সব ডিঙিয়ে ও যা মূর্ত্ত হয়ে উঠেচে, তা পদ্মার নিবিড় নিষ্প্রাণ ধ্যানগম্ভীর নিঃসঙ্গ একাকিত্ব। আর পদ্মার এই একাকিত্বই আমার প্রাণে যে ভীতি জাগিয়েচে, তা অসাধারণ।

তাই অবাক হয়ে ভাবি যে, কত বড় ভুলই না আজ জীবনে আমার হ'তে যাচ্ছিল। বাবার ব্যাঙ্কের টাকার অঙ্কের উপর নির্ভর ক'রেই তোমার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে বাপের বাড়ি চলে যাচ্ছিলাম, ষ্টীমার আজ পাওয়া গেলে হয়ত চিরদিনের মত আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যেত - আর কোনদিন হয়ত আমি তোমার কাছে ফিরে আসতেও পারতাম না। উঃ, সে কি দুঃসহ জীবন! বেঁচে থাকাই সব নয় দুনিয়ায়। টাকা দিয়ে হল্লা হৈ-চৈ বৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে পারতাম সন্দেহ নেই, কিন্তু বুকের তলায় অসহ নিঃসঙ্গতা যে অষ্টপ্রহর ডুকরে মরত। সে আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারতাম না। পদ্মার বৈরাট্যের চেয়ে, বৈচিত্র্যের চেয়ে, তার কাতরতাই আমাকে মুগ্ধ করেচে বেশী, এবং সে কাতরতা পরম নিঃসঙ্গতার।

করুণার একটি হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম—করুণা, ষ্টীমার না পেয়ে জীবনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েচি বহু বার, কিন্তু এমন লাভবান ত হইনি কোনদিন।

করুণা আমার কথা শুনিয়াছিল কি-না ঠিক বোঝা গেল না। সে তাড়াতাড়ি বলিল—কিন্তু...ভাল কথা, ভোরের ষ্টীমারে কলকাতা আমাকে পৌঁছে দিয়ে আসতেই হবে। এ নৌকায় বাড়ি ফেরা আমার হতেই পারে না। আর বাবার ওখানে ত আজ ক'বচ্ছর ধরে যাইনি। বল আপত্তি করবে না?

হাসিয়া ফেলিয়া বলিলাম—আপত্তি করলেই কি তুমি শুনবে এখন?

করুণা বলিল—খুব শুনব। আপত্তি করেই দেখ কেমন না শুনি?

বলিলাম—আচ্ছা, আপত্তি করচি।

করুণা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল—তুমি কি বোকা, আমি কি এখন যাই কখনও! তোমার মন দেখবার জন্যেই শুধু ও-কথা আমার বলা।

করুণার হাত ধরিয়া তাহাকে আরও কাছে, আরও বুকের কাছে টানিয়া আনিলাম। আমার কেন জানি কেবলই ভয় হইতেছিল, বুঝি-বা করুণাকে পদ্মার অতল উত্তাল জলে হারাইয়া ফেলিলাম। আর পদ্মার ঐ দিগন্ত-প্রকম্পী কল-আর্ত্তোচ্ছ্বাস যেন দুর্ব্বল ভীরু করুণারই।

করুণা নিতান্ত অসঙ্কোচে আমার কাছে আত্মসমর্পণ করিল, এবং পরমুহূর্ত্তেই আমার বুকের উপর মুখ গুঁজিয়া সহসা কাঁদিতে লাগিল। মানুষ যে কত সুন্দর করিয়া কাঁদিতে পারে তাহাই যেন সপ্রমাণ করিতে করুণা ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছিল।

বাঙালীর পুত্রকন্যাদের শিক্ষা

স্যর লালগোপাল মুখোপাধ্যায়

আজকাল যতগুলি সমস্যা আমাদের সমাজে উপস্থিত, তার মধ্যে অন্ন-সমস্যাই সমধিক কঠিন। আমাদের ছেলেরা কি ক'রে খাবে—গৃহে গৃহে এই প্রশ্ন। এই প্রশ্ন অনেক কারণে ও বহুদিন হ'ল উঠেছে, কিন্তু আমরা এ-বিষয়ে যতটা মনোযোগ দেওয়া উচিত ততটা দিয়েছি ব'লে মনে হয় না।

আমাদের সামাজিক গঠন হয়ত সে-কালের পক্ষে ভাল ছিল, কিন্তু কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সে গঠন না বদলানতে আজ আমাদের এই দুর্দ্দশা। আমাদের সমাজ বলতে হিন্দু সমাজই বুঝতে হবে।

হিন্দুর জাতিহিসাবে তাহার ব্যবসায় নির্দ্দিষ্ট ছিল। আরও পুরাতন কথা অর্থাৎ "কর্ম্মই জাতির প্রবর্ত্তক কি-না"—আপাততঃ সে কথা তোলবার প্রয়োজন নাই। জাতিহিসাবে ব্যবসায় নির্দ্দিষ্ট থাকায়, সমাজে একই রূপ কাজের জন্য সকলেই প্রতিযোগিতা করত না। ব্রাহ্মণ তাঁহার পঠনপাঠন, যজন-যাজন, দশকর্ম্ম ইত্যাদি নিয়ে থাকতেন। উঁহাদের মধ্যে যাঁরা নেহাতই মূর্খ তাঁরা দোকানে খাতা-লেখা প্রভৃতি সামান্য কাজ করতেন। কায়স্থরা বেশীর ভাগ সরকারী চাকরি বা জমিদারের চাকরি করতেন। বৈদ্যরা নিজের চিকিৎসা-

ব্যবসায় ব্যাপৃত থাকতেন। তেজারতী ব্যবসা; কেনা-বেচা, মাল চালান দেওয়া—বণিক, তিলি, তামুলি প্রভৃতি বৈশ্যদের হাতে ছিল। চাষীরা চাষ করতেন; ছুতোর, কামার, স্বর্ণকার ও তাঁতীরা নিজ নিজ জাতীয় কর্ম্ম নিয়ে থাকতেন। ছোটখাট জাতিদের উল্লেখ করলাম না; যথা—জেলেরা মাছ ধরত ও মাছ বিক্রয় করত। মোট কথা, সমাজের নিয়মের জন্য সকলের (এখন যেমন হয়েছে), চাকরির দিকে ঝোঁক ছিল না।

ইংরেজের রাজ্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য মহাশয়রা সহজেই একটু ইংরেজী শিখে ফেললেন; কারণ লেখাপড়া করা তাঁদের বংশগত অভ্যাস থাকায় সে কাজটা (ইংরেজী শেখাটা) তাঁদের পক্ষে শক্ত হ'ল না। ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে দরিদ্র ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যরা বেশ মানসম্ভ্রমের পদ পেতে লাগলেন। ওদিকে যাঁরা নিজ নিজ ব্যবসা করতেন, তাঁরা দেখলেন যে, বিলাতী মালের আমদানীতে আর তাঁদের অনেক মালেরই খরিদদার নাই। তাঁদের আয় কমে গেল। অপর দিকে তাঁরা দেখলেন যে, তাঁদের ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যদের মত লেখাপড়া শিখে চাকরি করতে কোনও বাধা নাই। কাজেকাজেই সকল জাতেরই মা-বাপের ইচ্ছা হ'ল "সন্তানকে ইংরেজী পড়িয়ে চাকরিতে দি।" সে ইচ্ছা কিছুকাল সফল হ'ল। ফলে ঐ আকাঙ্ক্ষা প্রসার পেতে লাগল। এখন যত চাকরি তার চেয়ে অনেক বেশী চাকরিপ্রার্থী। ডাক্তারী বা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে যত ছেলে ধরে, তার চেয়ে বেশী ছাত্র সেখানে প্রবেশ চায়। এ-সব ছাড়া অল্পস্বল্প ইংরেজী লেখা-পড়া জানা লোকের সংখ্যা এত বেশী, যে, তারা আপিসের চাকরিরও যোগ্য নয়, অথচ তারা অন্য কোনও কাজ করতে নারাজ। ফলে ঘরে ঘরে এই সমস্যা, আমাদের ছেলেরা কি করবে?

এখন সমাজের আইনের যে অবস্থা তাতে বলা চলে না, যে, 'ভাই ছুতোর, তুমি ছুতোরের কাজ ছাড়া অন্য কিছু করতে পাবে না,' 'ও ভাই তাঁতি, তুমি খালি তাঁতই চালাবে'—যার যা ইচ্ছা তাই খুশী করবার অধিকার আছে। আমাদের দেশে এ অধিকার অনেক দিন ছিল না। তাতে ভাল হয়েছিল কি মন্দ হয়েছিল আলোচনা ক'রে সময় নষ্ট করা বৃথা। যাতে উপস্থিত সমস্যার সমাধান হয় সেই চেষ্টা করাই যুক্তিযুক্ত।

সমস্যা কঠিন সে-বিষয়ে বোধ হয় কারও সন্দেহ নাই। কঠিন বলেই এর সমাধান-বিষয়ে অনেক মতভেদ হ'তে পারে। আমার মনে যা উদয় হ'ল তা আপনাদের কাছে উপস্থিত করছি; আগেই বলা ভাল যে, আমার বল্‌বার নূতন কিছুই নাই। আমার কথা যাঁদের পছন্দ হয় তাঁরা কাজে আনবেন। যাঁরা মনে করবেন যে আমার কথাগুলাকে ঘসে-মেজে নিলে, বা তাতে নানান্ কাটছাঁট করলে কাজে আসতে পারে তাঁরা তাই করবেন। অন্যরা আমার বক্তব্যকে ইচ্ছামত ত্যাগ করবেন। চিন্তার আদান-প্রদান জিনিষটাই স্বাস্থ্যের লক্ষণ। আমার সেইটুকুই উদ্দেশ্য। পরের উপকার করবার ক্ষমতা রাখি, এরূপ ধারণা আমার নাই।

আমার প্রথম বক্তব্য এই যে, 'উচ্চশিক্ষা' আমাদের মনে যে আদরের স্থান অধিকার ক'রে ব'সে আছে, সেটাকে তার উঁচুর আসন থেকে নামাতে হবে। শিক্ষা ভাল, জ্ঞান ভাল, সে-বিষয়ে কাহারও সহিত আমার মতভেদ নাই। কিন্তু যে শিক্ষা আমাদের খঞ্জ ও পঙ্গু করে, আমি তার পক্ষপাতী নই। আমাদের ছেলেদের খানিকটা জ্ঞানের খুবই দরকার। যেমন—নিজের ভাষায় লিখতে পড়তে পারা, খাতাপত্র ঠিক্ ক'রে লিখতে ও রাখতে জানা, ভূগোলের জ্ঞান, কোন্ দেশে কি জন্মায় সে-বিষয়ে জ্ঞান, কিছু দেশের ইতিহাস, এ-সব সব ছেলেরই নিজের মাতৃভাষায় মোটামুটি রকম জানা দরকার। এর উপর ইংরেজীতে একটু-আধটু বলতে-কইতে ও পড়তে-লিখতে জানাও ভাল। দেশীভাষা আমাদের দ্বিতীয় ভাষা (second language) না হয়ে প্রধান ভাষা (principal language) হবে, ও ইংরেজী আমাদের দ্বিতীয় ভাষা হবে। এটা আমাদের ধারণা হওয়া চাই যে, ইংরেজী কইতে বা লিখতে ভুল হ'লে তাতে অপমানের কোনও কারণ নাই। এখন নিজের ভাষায় লিখতে কইতে দোষ হ'লে সেটা অপমানের কথা হয় না, কিন্তু ইংরেজীতে ভুল হ'লে মনে হয় জীবনধারণই বৃথা, পরের ভাষা কয় জন ভাল কইতে বা লিখতে পারে? পার ভালই, না পার তাতে অগৌরবের কিছু মনে ক'রো না। জ্ঞান অর্জ্জন নিজের ভাষায় চলুক। অন্য দেশের লোকের সঙ্গে পত্রাদি বিনিময়ের জন্যে ইংরেজী বা অন্য ভাষা সময়-মত শিখলেই হবে। তা হ'লে, এখনকার শিক্ষার চাপে যত ছেলে পিশে যাচ্ছে তা হবে না, সুস্থ ও সবল শরীরে প্রায়

প্রত্যেক বালক-বালিকাই অনেকখানি জ্ঞানের পথে অগ্রসর হবে।

এইরূপ শিক্ষাদানের পর বাপ-মা স্থির করবেন তাঁদের ছেলে কি করবে। এখনও সব ছেলেই কিছু জজ্ ম্যাজিষ্ট্রেট বা লর্ড সিংহ হয় না, এর পরও হবে না। কিন্তু মা-বাপের চক্ষু আশার আলোকে অন্ধ হয়। তাঁরা ভাবেন, "যে করেই হউক বালককে পড়াতে পারলেই, ছেলের কপাল ফিরবে।" বাপ ও মা'র এখন কর্ত্তব্য হবে বাস্তবের জ্ঞান দিয়ে, চোখের ছানি কাটিয়ে, বোঝা যে তাঁদের ছেলে কি পারবে। তের-চৌদ্দ বৎসর বয়স হবার পূর্ব্বেই স্থির হওয়া চাই ছেলে কি করবে। ছেলের যে-দিকে ঝোঁক থাকে, তার দিকে নজর রেখে স্থির করতে হবে, সে কি করবে। "উচ্চ শিক্ষা" না হওয়াতে এটা সহজেই স্থির হবে, যে, জজ্ ম্যাজিষ্ট্রেট, বা উকিল, ডাক্তার বা সিবিল ইঞ্জিনীয়ার সে হবে না। এগুলা বাদ দিয়ে ভেবে দেখুন ছেলে কি করতে পারে। দেশে বা দেশের বাইরে এখন যতগুলা কাজ আছে, যা ক'রে লোক খাচ্ছে, সেইগুলা ভেবে দেখুন, তাঁদের ছেলে এর মধ্যে কি কাজ করতে পারে। যেমন—তাঁত বোনা, সেকরার কাজ, রাস্তা মেরামত করা, ছুতোরের কাজ, পুরান কাপড় বা জিনিষ সংগ্রহ করার কাজ, ইত্যাদি ইত্যাদি। "কোনও কাজই হীন নয়" এই মহামন্ত্র জপ ক'রে ছেলের জন্য যে কাজ স্থির করেছেন, সেই কাজ তাকে শিখতে দিন। যেমন এতদিন লেখাপড়া যোগ ভাগ গুণ শিখিয়েছেন, তেমনি ছেলেদের মিষ্টান্ন পাকের কাজ, ছুতোরের কাজ প্রভৃতি শিখতে দিন। কোনও কাজই না শিখে ভাল পারা যায় না। শুধু আমার নয় অনেকেরই এই বিশ্বাস, যে যে-কাজ ভাল ক'রে করবে, তাইতে সে উন্নতি করতে পারবে। ১৯২৯ সনে ইন্দোর সম্মেলনে গিয়ে জানলুম যে, ইন্দোরের মহারাণীর ইংরেজী খাবার তৈরি করবার জন্য যে ব্যক্তি পাচকদের নায়ক, সে বাঙালী ও ১২৫ টাকা মাহিনা পায়। আমাদের যুবক-বৃন্দের মধ্যে অনেকেই হয়ত এমন আছেন যাঁরা চাকরি ক'রে অবসর গ্রহণ করবার সময় অবধি ১২৫ টাকা মাহিনা অর্জ্জন করতে পারবেন না।

বেহারার মাহিনা পঁচিশ-ত্রিশ টাকা ত প্রায়ই হয়, ইহার অধিকও অনেকে মাহিনা পায়। ইংরেজী কইতে পারে এমন বেহারাকে ৫৫৲ মাসিক পেতে আমি দেখেছি। শুনেছি যে চীনামিস্ত্রি ছুতোরেরা ভাল কাজ ক'রে ৩৲ থেকে ৩া৹ প্রত্যহ মজুরি পায়।

উপার্জ্জনের পথ অনেক। আমরা উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে ও কুশিক্ষার ফলে সে-সব পথ দেখতে পাই না। হাতে কাজ করা যে অপমানজনক বা 'ছোটলোকের' কাজ এই হ'ল কুশিক্ষা, ও লেখাপড়া ছাড়া অন্য কাজ কি ক'রে ভদ্রলোকের ছেলে করবে, এই হ'ল উপযুক্ত শিক্ষার অভাব। নতুবা কলিকাতায় যত কাজ, মোটর চালান, রাঁধুনির কাজ প্রভৃতি থেকে বড় বড় দোকানদারি অবধি সব কাজ বাঙালীর হাত থেকে বার হয়ে যাচ্ছে কেন?

এই ত গেল হাতের কাজের কথা। তারপর অন্য অন্য বিষয়—দোকানদারি ব্যবসায় প্রভৃতি—অনেক শেখবার আছে, যা অল্পবয়সে শিক্ষা করতে গেলে মানুষ কর্ম্মক্ষম হয় ও উপযুক্ত বয়সে উপার্জ্জনক্ষম হয়।

আমরা বেশীর ভাগই মধ্যবিত্ত অবস্থার লোক। আমাদের ছেলেদের শেখাতে হবে যেন তারা তাদের চালটা না বাড়ায়। লম্বা কোঁচা, পাম্পশু, চোখে চশমা, হাতে পাতলা ছড়ি, কলেজে যাবার আগে দরকার মনে হয় না। যদি শতকরা ৯০ জন ছেলে কলেজে না যায়, তা হ'লে এসব উৎপাতও থাকবে না। এতে আমাদের যে সাধারণ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের মান (standard of living) সেটা কমবে না। তারা মোটা ভাত মোটা কাপড় আদর ক'রে নিতে পারবে। প্রত্যেক বালককে অল্পখরচে পুষ্টিকর রান্না কি ক'রে রাঁধতে পারা যায় 'হাতে-কলমে' শিখতে হবে, নতুবা প্রতিযোগিতায় কারও সমক্ষে দাঁড়াতে পারবে না। রাঁধাভাতের দিকে নজর থাকলে আসল কাজ হবে না। একজনের যোগ্য একটি ইক্‌মিক্ বা অন্য কুকার আট থেকে দশ টাকায় পাওয়া যায়। তাতে রান্নার খরচ নামমাত্র, অথচ তাতে সুপাচ্য, সুস্বাদু ও পুষ্টিকর আহার দু-বেলা তৈরি করতে সময় নামমাত্র লাগে। কেহ মনে করবেন না, যে, আমি কুকারওয়ালাদের এজেন্ট। আমি শুনেছি মাত্র, যে, কুকারে রাঁধলে সময়ের সাশ্রয় হয়। যদি তা না হয় ক্ষতি নাই। সাধারণ উনানে মোটামুটি পুষ্টিকর আহার প্রস্তুত করা শক্ত নয়। এ-কথা বুঝতে হবে যে বাঙালী ছাড়া কোনও জাতি জগতে 'পঞ্চ ব্যঞ্জন' দিয়া আহার করে না। অবস্থাপন্ন ইংরেজ সাধারণতঃ দু-কোর্সের বেশী ডিনার খায় না।

পশ্চিমে ভদ্রলোকের বাড়ি এক তরকারি ও রুটি বা ডালরুটি ছাড়া অধিক রান্না হয় না। আর আমাদের অধিক তেল ও ঝাল মসলা দিয়ে নানান্ তরকারি খাওয়ার ফলে অতিরিক্ত ভোজন হয়। সেই জন্য ঘরে ঘরে ডিস্‌পেপ সিয়া ও অর্থবান্ লোকদের মধ্যে বোধ হয় চৌদ্দ আনা লোকের বহুমূত্র রোগ। অধিক আহার হেতু শরীরে আলস্য আসে, কাজ করা যায় না। শরীরের সমস্ত শক্তি ভাত-তরকারি হজম করতে অপব্যয় হয়।

আমি যে-কথা খাবার বিষয়ে বললাম তা যে সম্পূর্ণ সত্য তা প্রমাণ করবার জন্যে কোনও প্রমাণ-বাক্য উদ্ধৃত করবার দরকার নাই। আমরা সকলেই একথা বুঝি, কেবল লোভ সম্বরণ করতে পারিনে ব'লে কথাগুলি কাজে আনতে পারি নে। অর্থবান্ লোকেরা মনে করেন, "আমার পয়সা আছে, আমি কেন ভাল খাব না।" কিন্তু তাঁদের বোঝা উচিত, যে, তাঁরা 'ভাল' না খেয়ে যথার্থ মন্দই খান। কারণ যে-খাদ্য শরীরের উপকার না ক'রে ক্ষতি করে, তা ভাল হতেই পারে না।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন—

> আয়ুঃ সত্ত্ব বলারোগ্য সুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
> রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ। ১৭।৮
> কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ।
> আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময় প্রদাঃ। ১৭।৯

অন্যত্র ভগবান লঘুভোজীর (১৮।৫২) প্রশংসা করেছেন।

তাহলে আমাদের ছেলেদের শিক্ষা দিতে হবে যে, অধিক খাওয়া রোগের মূল, ও শরীরকে কাজের অনুপযুক্ত করে। এক্ষেত্রে বাপ-মাকে নিজে কুভোজনের লোভ সম্বরণ করতে হবে, নতুবা শুধু মুখের কথা ফলদায়ক হবে না। ছেলেবেলা থেকে এক তরকারি ডাল ও ভাত খেতে শিখলে ছেলেরা বড় হয়ে অধিক খাওয়া চাইবে না।

খাওয়ার সমস্যা সহজে সমাধান হ'লে ছেলেরা তাদের কাজে মন দিতে পারবে। অল্প বয়স থেকে তাদের নিজের উপর নির্ভর করবার ক্ষমতা জন্মাবে, ও তা হ'লে প্রতিযোগিতায় তারা দাঁড়াতে পারবে।

তৃতীয় কথা এই, যে, উপার্জনক্ষম হবার পূর্ব্বে ছেলেরা বিবাহ করবে না। দরকার যদি হয় এ-বিষয়ে তারা মা ও বাপের অবাধ্য হলেও দোষের হবে না। অনেক উপার্জনক্ষম যুবক বেশ ভাল উপার্জন করলেও মনে করে, যে, তারা বিবাহ করবার মত উপার্জন করে না। অর্থাৎ তারা ভাবে যে, স্ত্রীকে সিল্কের শেমিজ শাড়ী না দিতে পারলে বিবাহ করাই বিড়ম্বনা। এই ভাবটি মন থেকে তাদের দূর করতে হবে। আমাদের দেশের উন্নতি যে-যুবকরা চায়, তাদের প্রত্যেকের উপার্জ্জন করতে পারলে বিবাহ করা উচিত। নতুবা দেশে অবিবাহিত যুবক ও যুবতীর সংখ্যা বেশী হ'লে দেশের যথার্থ উন্নতি সম্ভব নয়। এখানে ব'লে রাখি যে, বিবাহিত দম্পতি যতক্ষণ সন্তানকে পালন করতে না পারেন ততদিন তাঁরা সন্তান কামনা করবেন না। কারণ দরিদ্রের সংখ্যা আমাদের দরিদ্র দেশে বাড়াবার অধিকার কারও নাই। বুদ্ধিমান্ দম্পতির পক্ষে কাজটি বিশেষ শক্ত হবার কথা নয়। যুবক-যুবতী বিবাহিত হ'লে দেশে পাপের পথ অনেকটা রুদ্ধ হবে, সন্তানসংখ্যা কম হ'লে দেশের অন্নকষ্ট ঘুচবে।

চতুর্থ কথা, অভিভাবকরা দেখবেন যে, যদি কোন বালক বা বালিকা মেধাবী হয়, তবে সামর্থ্যে কুলাইলে, তাঁরা তাকে উচ্চশিক্ষা দিবেন। কারণ দেশে সকল রকম লোকই চাই। জ্ঞানের পথ রুদ্ধ হ'লে চলবে না। পুরান পন্থা এই ছিল, এক দল লোক অর্থাৎ যাঁরা ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মেছেন তাঁরা দারিদ্র্য ব্রত গ্রহণ ক'রে বিদ্যাভ্যাস করবেন। কিন্তু সকল ব্রাহ্মণসন্তানই কিছু জ্ঞানচর্চ্চার উপযোগী হয়ে জন্মান না। কাজেই আমাদের নূতন পথ গ্রহণ করতে হবে। যোগ্য দরিদ্র বালক-বালিকাদের উচ্চশিক্ষার জন্য জলপানি থাকবে, সেজন্য অর্থবান লোকদের ব্যবস্থা করতে হবে।

পঞ্চম কথা, দেশের বালক-বালিকারা যারা হাতে কাজ করবে তাদের হাতের কাজ কোথা থেকে আসে? তাহার উপায় আমাদেরই করতে হ'বে। দেশের তৈরি জিনিষ আমাদের ব্যবহার করতে হবে। অন্ততঃ এই জন্য—দরকার হলে আমাদের কিছু বিলাসিতা বর্জ্জন করতে হবে। হয়ত আমি এখন বেশী উপার্জ্জন করি ব'লে দেশের শিল্পীর তৈরি জিনিষ 'মোটা' ব'লে ব্যবহার করলুম না, কিন্তু আমার সন্তানেরা ত সকলেই বেশী উপার্জ্জন করবে না। তাদের উপায় কি হবে? তাদের উপার্জ্জনের পথ বন্ধ হবে, যদি আমরা দেশী জিনিষের প্রতি অনুরাগ না রাখি। এইজন্য দেশের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ

সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে দেশের তৈরি জিনিষ আমাদের ব্যবহার করতে হবে।

ষষ্ঠ কথা, বালকদের শিক্ষার জন্য আমরা যতটা যত্ন করি বালিকাদিগকেও সেইরূপ যত্নের সহিত শিক্ষা দিতে হবে। তাদের শিক্ষা লেখাপড়া ছাড়া সংসারের কাজেও হওয়া দরকার। লেখাপড়া ত তারা শিখবেই, তা ছাড়া তাদের রান্না, বোনা, কাপড় কেটে সেলাই করা ইত্যাদি শিখতে হবে। উপযুক্ত পুরুষের উপযুক্ত স্ত্রী হ'লে সংসারের অনেক সমস্যার সমাধান হবে, তাঁরা অল্প খরচে বেশী আরাম ও সৌষ্ঠবের সঙ্গে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করতে পারবেন।

মেয়েদের এখন আমরা পরমুখাপেক্ষী ক'রে রাখি। যদি তাঁদের স্বামীবিয়োগ হয় ত তাঁরা পরের গলগ্রহ হয়ে থাকেন। শিক্ষা হ'লে তা হ'তে হবে না, তাঁরা নিজের অন্নের সংস্থান নিজেরাই ক'রে নিতে পারবেন। ছবি আঁকতে শিখিয়ে, গানবাজনা শিখিয়ে, ছেলেমেয়ে পড়িয়ে, দরকার হ'লে দোকান ক'রে, তাঁরা অন্ন সংস্থান করতে পারবেন।

যে দিন-কাল আসছে তাতে অনেক মেয়েরই বিবাহ হবে না। যদি তা হয়, তাদের বাপ-মাকে এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে মেয়েকে অন্নের জন্য ভাই বা ভাজের গলগ্রহ না হ'তে হয়।

মেয়েরা স্বাধীন ও উপার্জ্জনক্ষম হ'লে তাঁদের বিবাহ-বিষয়েও সুবিধা হবে। যে-যুবক অল্প উপার্জ্জন করে, সে এমন স্ত্রী চাইবে যে দু-জনের জ্ঞান, বুদ্ধি ও উপার্জ্জনে সংসার সচ্ছল ভাবে চলে।

সপ্তম কথা, আমাদের পুরুষদের একটু সময়ের অধীন হয়ে চলতে হবে। আপাততঃ অনেক বাড়িতেই মেয়েরা যেন ক্রীতদাসী। পুরুষেরা যাঁর যখন ইচ্ছা খাবেন। তাঁদের জন্য মেয়েদের হাঁড়ি হেঁসেল আগলে ব'সে থাকতে হয়। পুরুষরা যখন অনুগ্রহ ক'রে খাবেন, তারপর মেয়েরা খাবেন ও রান্নাঘরের পাট উঠবে। অনেক সময় মেয়েদের খাওয়া শেষ হ'তে-না-হ'তে, বিকালের জলখাবার ও রাত্রে রান্নার জোগাড়ে মেয়েদের উদ্যোগী হ'তে হয়। ফলে মেয়েদের স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হয়। অনেক সময় মেয়েরা মূক। তাঁরা বলতে জানেন না যে, তাঁরা অসুস্থ। আর আমরা পুরুষরা অন্ধ ও বধির। চোখ দিয়াও দেখি না, কি ভাবে মেয়েরা জীবন যাপন করছেন, তাঁরা সুস্থ কি অসুস্থ। একটু-আধটু যদি কিছু শুনি, তা যেন শুনেও শুনি না। যদি আমরা পুরুষরা সেই জন্য সময়ের শৃঙ্খলার অধীন হই, ও পঞ্চব্যঞ্জনের লোভ সামলাতে পারি, মেয়েরা সময়-মত ছুটি খেয়ে কিছু বিশ্রাম লাভ করতে পারেন ও গৃহস্থালীর অন্য কাজে মন দিতে পারেন। ফলে ঔষধের ও ডাক্তারের বিল কমে, ও অনেক জিনিষ—যা আমরা দাম দিয়ে বাজারে কিনি, তা বাড়িতেই মেয়েরা তৈরি করতে পারেন।

অষ্টম ও শেষ বক্তব্য এই, যে, আমাদের বিলাসিতা বর্জ্জন করতে হবে। এ-বিষয়ে মেয়ে ও পুরুষ উভয়কেই যত্নবান হ'তে হবে। আমি কৃপণ হ'তে বলি না। পুষ্টিকর আহার ও দেহরক্ষার জন্য বস্ত্র অনেক সময় অল্প খরচে হয়। তার জায়গায় আমরা সকলেই অল্পবিস্তর বেশী খরচ করি। আমরা যে তা করি সেটা বেশীর ভাগ দেখাদেখি। অমুক ভাল পরে বা ভাল গাড়ি চড়ে, তাই ব'লে আমাকেও যে তাই করতে হবে তার মানে কি? মনকে স্থির ও বশে রাখতে পারলে, বিলাসিতা বর্জ্জন সহজেই হবে।

আমি একটি সত্য ঘটনার উল্লেখ ক'রে প্রবন্ধ শেষ করব। অনেক দিনের কথা। আমি তখন এই গোরক্ষপুরে সব-জজ। আমার একটি বন্ধু প্রায়ই আমাদের বাড়ি আসতেন। একদিন তিনি দেখলেন যে, আমার মেজ ছেলের—যেটি তখন বৎসর চারেকের, জামা একটু ছেঁড়া। তিনি আমোদ করবার উদ্দেশ্যে তাকে বললেন, "খুকুবাবু, তোমার জামা ছেঁড়া।" বালক উত্তর দিল, "মা বলেছেন গৃহস্থের ছেলেকে আস্তও পরতে হয়, আবার ছেঁড়াও পরতে হয়, কিন্তু ময়লা পরতে নাই।" উত্তরটি আমার বন্ধুর বড়ই পছন্দ হ'ল। আমি বাড়ি ছিলাম না, আমি ফিরলে তিনি ঐ গল্প আমার কাছে বলেন। ছেঁড়া কাপড় অবশ্য শেলাই হ'তে পারে ও বাড়ির লোকের শেলাই করাই উচিত। কিন্তু ছেঁড়া পরাতে অপমান নাই। ময়লা পরা স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর।

যে-বিষয়টি নিয়ে সামান্য একটু আলোচনা আপনাদের সামনে করলুম, সেটি খুবই বড় ও ঐ বিষয়ে দিস্তা দিস্তা কাগজ লেখা যায়। সেইজন্য বেশী বলা প্রয়োজন মনে করলুম না। যদি এ প্রবন্ধ পাঠের ফলে, একটি শ্রোতাও এ-বিষয়ে মনোযোগ দেন, তা হ'লে আমি আপনাকে কৃতার্থ মনে করব।

চোর

শ্রীপ্রতাপচন্দ্র ঘোষ

অসহ্য পুলকের আবেগে চোখে নিদ্রা ছিল না। একটি কেসে একেবারে ছয়-ছয়টি হাজার টাকা প্রাপ্তি। প্রায় আঠার বৎসর পূর্ব্বে ওকালতী আরম্ভ করিয়া একটি কেসে একসঙ্গে এতগুলি টাকা পাওয়ার কল্পনা করাতেও বাতুলতা প্রকাশ পাইত। আর আজ আঃ…। অসীম সাফল্যের পুলকে সারা অন্তর একেবারে অবশ। হাঁ, তাহা হইলে কত জমিল; প্রায় সাড়ে ছত্রিশ হাজার ছিল আর ছয় হাজার- প্রায় সাড়ে বেয়াল্লিশ হাজার হইল সর্ব্বসমেত। আচ্ছা, মাধববাবু আসিয়াছিলেন কবে? হাঁ, দিন-কুড়িক আগেই বটে। আঃ সেদিনটা আমার কি সৌভাগ্য বহন করিয়াই যে প্রভাত হইয়াছিল। তখনও ভাল করিয়া ভোর হয় নাই, তারাগুলি সবেমাত্র বোধ করি নিবিয়া গিয়া থাকিবে, এমন সময় মাধববাবুর ডাকাডাকিতে ঘুম ভাঙিয়া যায়। স্ত্রী সুরমা পাশ ফিরিয়া শুইয়া চাপা বিরক্ত স্বরে কহিল, "ওরা নিশাচর নাকি, দুপুর রাতে হল্লা ক'রে বেড়ায়?"

"যে চরই হোক একবার যেতে হবে" বলিয়া নামিয়া আসিয়া বাহিরের ঘরের দ্বার খুলিয়া দিলাম। মাধববাবু আমাকে দেখিয়া হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া কহিলেন, "একটু বিশেষ বিপদে পড়েই আপনার কাছে এসেছি, আপনাকে জ্বালাতন করলাম। হেঁ হেঁ, কিছু মনে করবেন না।" বিরক্ত চিত্তে মুখে একটু ভদ্রতার ক্ষীণ হাসি টানিয়া প্রতিনমস্কার করিয়া কহিলাম, "না না, মনে আর কি করব, আপনার কি প্রয়োজন বলুন।" "হাঁ" এই বলিয়া সুমুখের আরাম কেদারাখানিতে বসিয়া বেশ একটু দম লইয়া বলিতে লাগিলেন, "…বুড়ো রাত দশটায় মরেছে বুঝলেন, তা এখন…" তাঁহার কথার মাঝে বাধা দিয়া সবিস্ময়ে কহিলাম, "কি বললে, হরিধন-বাবু মারা গেছেন? কখন মারা গেলেন, কি হয়েছিল…আহা বড় ভাল লোক ছিলেন।" একটু শোকের ভাণ করিয়া উদাস স্বরে মাধববাবু বলিলেন, "কাল রাত দশটায় হঠাৎ হার্টফেল ক'রে মারা গেছেন…তা বটে, তা বটে, বড় ভাল লোক ছিলেন।" একটু পরে কহিলাম, "তা কি রকম উইল ক'রে গেছেন?" এবার বেশ একটু উৎসাহিত হইয়াই তিনি উত্তর দিলেন, "হাঁ সেই জন্যই ত আপনার কাছে আসা।" পরে স্বর নামাইয়া চুপি চুপি বলিলেন, "শুনেছেন মশাই, আমার এই তিন-চারটি ছেলেপিলে আর আমি তার অসময়ে এত করলাম, আমায় কি-না সম্পত্তির চার আনা আর ঐ বুড়ি আর বাচ্চা ছেলেটার বার আনা।" একটু কাঁদ-কাঁদ স্বরে কহিলেন, "একেবারে কি জলে ভাসব মশাই?"

কে যে কাহাকে অসময়ে সাহায্য করিয়াছিল তাহা বলা শক্ত। হরিধনবাবুর একমাত্র কন্যা প্রমীলা মাধববাবুকে চার বৎসরের রাখিয়া পরলোকে যাত্রা করেন, হরিধনবাবু দৌহিত্র মাধবকে বুকেপিঠে করিয়া পুত্রাধিক স্নেহে মানুষ করেন এবং সুদূর ভবিষ্যতে মাধবই যে তাঁহার সম্পত্তির অধিকারী হইবে একথা স্পষ্ট জানা ছিল। কিন্তু সৌভাগ্য-বশতঃই হউক, দুর্ভাগ্যবশতঃই হউক বৃদ্ধ বয়সে মাণিক জন্মগ্রহণ করে। সে যাহাই হউক, মাধববাবুর কথার উত্তর এখন দেওয়া বেশ শক্ত হইয়া উঠিল। হঠাৎ মাধব-বাবু করুণ কণ্ঠে অনুনয়ের সুরে কহিলেন, "আপনাকে এ উপকারটা করতেই হবে সত্যেনবাবু, কথা দিন আপনি করবেন।"—বলিয়া ব্যথাভরা চোখে আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। একটু চিন্তিত হইয়া কহিলাম, 'আচ্ছা, আমার সাধ্য থাকলে আপনার উপকার করব, কি কথা বলুন।" "এই বলি" বলিয়া একটু আশ্বস্ত হইয়া মাথা চুলকাইয়া কাশিয়া মাধববাবু কিছু সঙ্কুচিত হইয়া টানিয়া টানিয়া কহিলেন, "উইলটা সামান্য বদলানোর বিশেষ দরকার, নয় ত আপনি জানেন, আমার অবস্থা একেবারে শোচনীয়, অনাহারে পরিবারসুদ্ধ মারা যাই। তাই বলছিলাম কি…।" —বলিয়া একটু কাশিয়া গলা পরিষ্কার করিয়া কহিলেন, "ভাগ-বাঁটোয়ারার কথাটা একেবারে বদলাতে হবে বুঝলেন কি-না। আমার ভাগে রাখবেন পনের আনা, আর বুড়ির ভাগে এক

আনা।...ওদের কিছু না দিলেও ভাল দেখায় না, কি বলেন...” পরে হাসি টানিয়া টানিয়া কহিলেন, “ভয় নেই মশাই, আপনাকেও এর পারিশ্রমিক-স্বরূপ হাজার-চারেক দেওয়া যাবে...হেঁ হেঁ হেঁ, বুঝেছেন কি-না। রাজি ত...।” রাজি না হইয়া আর করি কি, অতগুলি টাকা ত আর ছাড়া যায় না। আর বিশেষতঃ কি-না কথা যখন দিয়াছি...। তবে মাত্র চার হাজারেই রাজি হইতে পারি নাই, অনেক দরকষাকষি করিয়া শেষ পর্য্যন্ত ছয় হাজারেই হইল। খানিক পরে কহিলাম, “তা এই উইল কি ক'রে জোগাড় করলেন?” মাধববাবু সাফল্যের আনন্দে এক গাল হাসিয়া বলিলেন, “আরে মশাই, আমরা কি আর মেয়েমানুষ যে দুঃখে শোকে অধীর হব। বুড়ি যখন একেবারে শোকে আকুল, সেই সময়ে এক ফাঁকে দেরাজ থেকে উইলখানা সরিয়ে ফেললাম। পুরুষ মানুষ বুঝলেন কি-না, আমাকেই ত সব সংসারটা দেখতে হবে; শোক-দুঃখ কি আর আমার শোভা পায় হেঁ হেঁ...। তারপর ওদের সঙ্গে শ্মশান পর্য্যন্ত গিয়ে শরীরটা হঠাৎ খারাপ হয়ে পড়েছে বলে এই ত আপনার কাছে আসছি।”

স্কুল হইতে অপরের হস্তলিপি নকল করা বিষয়ে বেশ একটু অদ্ভুত রকমের পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলাম। ক্রমে এ সুনাম বন্ধুমহলে বেশ ছড়াইয়া পড়ে। মাধবব ভাগ্যিস জানিতেন, তাই ত আমার আজ এতগুলি টাকা প্রাপ্তি ঘটিল। তবু মনে হইল টাকাগুলি যেন বড় অল্প হইল। অমুর বয়স হইল—তাহার বিবাহ দিতে হইবে, অজয়ের কলেজের খরচ যেন দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। সুরমা আব্দার ধরিয়াছে আর এক সেট গহনা চাই, একখানা মোটর না কিনিলেও আর মর্য্যাদা রক্ষা হয় কই?...এ আর কটাই বা টাকা। হঠাৎ ‘চোর চোর’ চীৎকারে চিন্তাবর্ত্তে বাধা পড়িল। ত্বরিৎপদে ভয়ব্যাকুলিত চিত্তে নীচে নামিয়া আসিয়া দেখি সুযোগ্য দরোয়ান হরি সিং চোরের বুকের উপর বসিয়া তাহার গলায় টুঁটি চাপিয়া ধরিয়া বজ্রনির্ঘোষে তাহার শ্যালক সম্বন্ধ প্রচার করিয়া আরক্তিম নেত্রে গুম্ফ ফুলাইয়া যষ্টি উত্তোলনপূর্ব্বক হুঙ্কার দিতেছে, “এক ডাণ্ডামে তোমকা হাড্ডি তোড় দেগা...” ভাল করিয়া চোরকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখি হরি সিং কেন, যে-কোন লোকের এক ঘা ডাণ্ডা তাহার কঙ্কালসার দেহকে ঠাণ্ডা করিয়া দিতে পারে। আমাকে দেখিয়া হরি সিং তাহার অসীম বীরত্ব প্রকাশ করিবার সুযোগ পাইল। কি করিয়া ক্ষিপ্রতা সহকারে ভাঁড়ার ঘরের দক্ষিণ জানালায় কোণ ঘেঁষিয়া সিঁদকাঠি বসাইবার সময় সে অদ্ভুত সাহসিকতার সহিত নিজ জীবন বিপন্ন করিয়া চোরকে ধরিয়া ফেলিল তাহারই বিবরণ ক্ষিপ্রগতিতে চলিল। হৈ-চৈ শুনিয়া পাশের বাড়ির রাখালবাবু আসিলেন, রাস্তার উপরের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণের বাড়ি হইতে গগনবাবু লাঠিতে ভর দিয়া আলো-হাতে চাকরের সহিত আসিলেন, অল্পকালের মধ্যেই বিজনবাবু, নরেশবাবু, হেমেনবাবু প্রমুখ ব্যক্তিরা আসিয়া জড় হইলেন।

চোরকে তখন জেরা করিতে আরম্ভ করিলাম, “হারামজাদা, কি চুরি করতে এসেছিলি এ রাত্রে?” অতি ক্ষীণ ও করুণ স্বরে চোর বলিল, “ভেবেছিলুম বাবু যদি কিছু সোনা রুপা সমান্ত পাই ত কয়দিন পেটভরে খেতে পাব, আর যদি তাও না পাই এই বস্তায় ক'রে চাল চুরি ক'রে নিয়ে যাব। আজ চার দিন খেতে পাইনি...কেউ ভিক্কেও দেয় না বাবু... কিছু খেতে দিন না বাবু, আপনার পায়ে পড়ি···” বলিয়া করুণ নয়নে আমার দিকে চাহিয়া রহিল। চোরের এই ঔদ্ধত্য আর সহ্য হইল না; দেহের সকল শক্তি প্রয়োগ করিয়া সশব্দে তাহার গণ্ডে এক প্রচণ্ড চপেটাঘাত করিলাম। তাহাতেই ফল হইল, কারণ চোরকে তৎক্ষণাৎ গোঁ গোঁ করিয়া মাটিতে আশ্রয় লইতে হইল। সেই অস্পষ্ট আলোকেও চোখে পড়িল তাহার ডান কপাল বাহিয়া রক্ত পড়িতেছে, সম্ভবতঃ পাথরে লাগিয়া কাটিয়া গিয়া থাকিবে। রাখালবাবু কহিলেন, “বেশ হয়েছে ব্যাটার, জেলে যাওয়ার চেয়ে উত্তম মধ্যম বেশ দু-চার ঘা দেওয়াই হচ্ছে ঠিক শাস্তি, এদের যাতে সারা জীবনটা বেশ মনে থাকে। জেলে আর শাস্তি কিই বা পাবে, বেশ বসে বসে খাবে আর দু-দিন বাদে বেরিয়ে কার উপর কৃপাদৃষ্টি ফেলবেন সে ওঁরাই জানেন···। জানেন মশাই, এই ব্যবসা ক'রে ক'রে বেশ টাকাকড়ি ঘরবাড়ি করে ফেলেছে···মন্দ নয় এ ব্যবসা।”

চোর এবার হাউ হাউ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিয়া আমার পদদ্বয় জড়াইয়া ধরিয়া অসীম কাতরতার সহিত বিনাইয়া বিনাইয়া কহিতে লাগিল, “আমায় মারবেন না বাবু,

মারবেন না, জেলে দিন আমায়, সেখানে ত খেতে পাব—আর মারলে মরে যাব যে বাবু।"

পথ দিয়া পাহারাওয়ালা ঝিমাইতে ঝিমাইতে যাইতেছিল। গোলমাল শুনিয়া এদিকে আসিয়া ঘটনার বিবরণ শুনিয়া তাহার কর্ত্তব্যপরায়ণতার নিদর্শনস্বরূপই বোধ করি চোরকে ভাল করিয়া না দেখিয়াই বলিয়া বসিল, "উ শালাকো হাম পাচ্ছান্তা হায়- বাবু। আউর এক বাজি চুরি কিয়া, হাম পাকড়াথা"—বলিয়া চোরকে হিড় হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া গেল।

বিজনবাবু বলিলেন, "আপনার মত ধর্ম্মপরায়ণ সজ্জন লোকের ঘরেও চুরি, কলি আর বলেছে কেন···।" রাখালবাবু উত্তরে কহিলেন, "আরে চোরের আবার ধর্ম্মনীতি।...সে যাক। তা সত্যেনবাবু আজ ত বেশ সেই কেসটি জিতে গেলেন, বেশ কিছু টাকাপ্রাপ্তিও ঘটল...তা আমাদের একদিন ভোজনে পরিতৃপ্ত করান। আজ ত সর্ব্বস্ব চোরের পকেটেই যেত।" একপ্রকার অনন্যোপায় হইয়া বলিলাম, 'তা বেশ ত কালই রাত্রে তার ব্যবস্থা করা যাবে।" রাখালবাবু অপরিসীম আনন্দে অধীর হইয়া কহিলেন, "আর কিছু ঔষধের ব্যবস্থাও করবেন, কি বলেন।"

ঔষধ কথাটার অর্থ যে মদ্য তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া সকলেই উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন। উত্তরে সম্মতি জানাইয়া বলিলাম, "তা হবে বইকি।"

সুস্থ স্বরে পরম আরামের সহিত রাখালবাবু বলিলেন, "সমাজের একজন মাথা হওয়া কি আর খেলা। দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন এরকম ক'জনাই বা করতে পারে। হ্যাঁ হ্যাঁ, চালাকি ত আর নয়।"

সকলেই একবাক্যে কহিয়া উঠিলেন, "তা ত বটেই, নিশ্চয়ই।"

সর্ব্বনাশের পর

শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

ধরণীতে ধ্বংসরাশি, আকাশে মৃত্যুর পাণ্ডুরতা;—দশ দিক কুহেলি-বিলীন।
স্তম্ভিত শীতের সন্ধ্যা পড়ে' আছে যেন বজ্রাহতা, শব্দহীন, প্রাণ-স্পন্দহীন।
বুকে তা'র এত কথা,—চোখে তা'র এত অশ্রু আছে,—শতবর্ষে হ'বে না তা' সারা।
ব্যথা বড় বেশী,—তাই প্রকাশের ভাষা ভুলিয়াছে; সর্ব্বহারা,—তাই অশ্রুহারা।

কোনোখানে শব্দ নাই,—অন্ধকার কাঁদিছে গুমরি, তবু যেন অন্তরে অন্তরে।
লক্ষ কোটি মৌনমূক জীবনের বেদনায় ভরি' নামে রাত্রি দিকে দিগন্তরে।
সমীরণ—যেন শুধু একটি অখণ্ড দীর্ঘশ্বাস—বঞ্চিতের অভিযোগধারা।
প্রকৃতি সে যেন কোন দুঃস্বপ্নের ক্ষণিক আভাস,—অর্থহীন,—আদিঅন্তহারা।

আহতের আর্ত্তনাদ বড় ক্ষীণ,—কানেও আসে না; শুনিবে তো প্রাণ দিয়ে শোনো।
নিহতের শবগন্ধ বড় মৃদু,—বাতাসে ভাসে না; বেঁচে আছে যাহারা এখনো
জীবন্ত সমাধি মাঝে নগরীর ভগ্নস্তূপ-তলে তাহাদের মর্ম্মভেদী সুর—
নিস্ফল, অস্ফুট শুধু অন্তর্গূঢ় অশ্রুবাষ্পজলে দিগন্তেরে করিছে বিধুর।

অন্নহারা গৃহহারা ধনজনপতিপুত্র-হারা,—পথে পথে পঙ্ক-শয্যা'পরে,—
নিষ্ঠুর মাঘের রাত্রে সিক্তবাসে ঝরে রক্তধারা,—কত বধূ,—কত মাতা মরে !
কত সদ্যোজাত শিশু,—নগ্নদেহ হিংস্র হিমবায়,—ছিন্ন-অঙ্গ শিহরিয়া কাঁপে !
নরনারী পশু-পাখী দুর্দ্দিনের সহজসভায় পাশাপাশি কালনিশি যাপে।

এ বড় দারুণ দিন ; পদতলে বসুন্ধরা নড়ে শত মুখ করিয়া ব্যাদান !
মানুষের সৃষ্ট শিল্প মানুষেরি শিরে ভাঙ্গি' পড়ে ; জন্মগৃহ চাহে নিতে প্রাণ !
রক্ষার দেবতা আজ সংহারের খেলা আরম্ভিল,—সহায়তা কা'র কাছে চাই ?
প্রভাতে যে কল্পনাও সুদূর স্বপ্নের পারে ছিল, অপরাহ্নে সত্য হ'ল তাই !

মধ্যাহ্নে দুলিতেছিল মাঠে মাঠে গোধূম-মঞ্জরী,—কুঞ্জে কুঞ্জে আমের মুকুল ;
মর্ম্মরিত শিশুবীথি শুষ্ক-পত্রে দিতেছিল ভরি' তৃণাঙ্কিত নদীর দু কূল।
হেনকালে ক্ষিতিগর্ভে মেঘমন্দ্রে বাজাল ডমরু,—নটরাজ,—গুরু গুরু গুরু
সুবিশাল শ্যামক্ষেত্রে মুহূর্ত্তে জাগায়ে মহামরু প্রলয়ের নৃত্য হ'ল সুরু।

চিরস্থির মৌন মাটি আচম্বিতে উদ্দাম কৌতুকে তরঙ্গিল রুদ্রতালে তারি।
বক্ষে তা'র প্রস্ফুরিল শত লক্ষ প্রস্রবণ-মুখে ভস্ম বাষ্প বালু পঙ্ক বারি।
লক্ষ কোটি দৈত্যশিশু বন্দী ছিল অতল পাতালে,—আচম্বিতে তারা পেল ছাড়া !
সৃষ্টির প্রভুত্ব ল'য়ে দিল মিলি পাগলে মাতালে নিখিলের ভিত্তিতলে নাড়া !

মুহূর্ত্তে টুটিয়া গেল শত লক্ষ আনন্দের নীড়,— স্নেহ প্রেম প্রীতির ঝুলায় !
মুহূর্ত্তে লুটিয়া গেল শত লক্ষ সমুন্নত শির— দীর্ণ দীন পথের ধূলায় !
সহস্র যুগের কীর্ত্তি মুহূর্ত্তে করিয়া ভূমিসাৎ,—শত লক্ষ শিল্পীর সাধনা—
শতাব্দীর মৃত্যু বহি' নিমেষে আসিল অকস্মাৎ প্রকৃতির অন্ধ উন্মাদনা !

ধরিত্রীর বক্ষ ভেদি হত্যা এল বাত্যাবেগে ছুটি—অচিন্তিত প্রচণ্ড প্রবল ;
সভ্যতারে নিষ্পেষিয়া রিক্ত করি' ল'য়ে গেল লুটি—যুগান্তের সঞ্চিত সম্বল !
মানুষের অন্ন-জল, ক্ষেত্র-কূপ, ঢাকিল নির্ম্মম পুঞ্জ পুঞ্জ মরু-বালুস্তরে।
মানুষের বাসগেহ শীতান্তের জীর্ণ পর্ণসম ঝরি' গেল নগরে নগরে।

বিধাতার রুদ্র দূত জীবে জড়ে রাখেনি প্রভেদ,—মরণের রাখেনি মর্য্যাদা।
কীটসম পিষ্ট করি তৃণসম করেছে উচ্ছেদ ; জানে নাই মানে নাই বাধা।
রোগশয্যাশায়ী বৃদ্ধ,- মাতৃঅঙ্কে শিশু হাস্যমুখ,—দয়া তা'র পারেনি জাগাতে ;
প্রাসাদে মরেছে ধনী,- পথপ্রান্তে মরেছে ভিক্ষুক,—অদৃষ্টের সমান আঘাতে।

জীবনে ঘটিয়াছিল যা'র 'পরে যত পক্ষপাত আজি বুঝি সব গেল ঘুচে !
কোথা হ'তে খেলাছলে একখানি সুনির্ম্মম হাত সব গণ্ডী দিল লেপে মুছে।
এই যদি ঈশ্বরেচ্ছা,—তবে কেন ঊর্দ্ধপানে চাই ? তা'রে ডাকি যে দেয় বেদন ?
এই যদি কর্ম্মফল,— এস তবে কর্ম্ম ক'রে যাই। কা'র কাছে মিছে আবেদন ?

রাত্রি দ্বিপ্রহর হ'ল ; কারাগারে বৃষ্টি নামিয়াছে। অন্ধকার বিভীষিকাময়ী !
তুষারশীতল কত নাসায় নিঃশ্বাস থামিয়াছে এতক্ষণে কেবা দিবে কহি ?
সহস্র বিদেহী যেন ভিড় ক'রে ভিজিছে দাঁড়ায়ে শোকোন্মত্ত প্রিয়জনপাশে।
রহি' রহি' বর্ষণের ঝিমি ঝিমি নিক্কণ ছাড়ায়ে প্রাসাদপতনশব্দ আসে।

রহি' রহি' দোলে মাটি, রহি' রহি' ক্রন্দনের রোলে দেবতার স্তবগাথা জাগে।
যেন অসহায় পান্থ কাঁদে ক্রূর দস্যুর কবলে, প্রাণভয়ে কৃপাভিক্ষা মাগে।
দেবতার দয়া চায় মানুষ,— সে এক পরিহাস ! ভক্ষ্য চাহে ভক্ষকের প্রীতি !
তার দ্বারে ভিক্ষা চায় যার 'পরে ঘুচেছে বিশ্বাস,— আছে শুধু নিদারুণ ভীতি।

তা'র দ্বারে দয়া চায়—যে দেবতা সর্ব্বস্বান্ত করি' পথপ্রান্তে ফেলেছে মাটিতে,—
চূর্ণ-শিরে দীর্ণবক্ষে বৃষ্টি হ'য়ে পড়িতেছে ঝরি'—মধ্যরাত্রে নিদারুণ শীতে,—
যে-দেবতা ভেঙে দিল খেলাছলে সাজানো সংসার—জন্মগেহে রচিল সমাধি—
মুহূর্ত্তের চাটুবাদে মূঢ় নর দয়া চাহে তা'র—নাহি জানে যার অন্তআদি।

মহাকাল মহেশ্বর মহাশূন্যে রয়েছেন জাগি, তাঁর কাছে ক্ষুদ্র দয়া কোথা ?
ক্ষুদ্র এই ধরণীর দু-দিনের দুঃখসুখ লাগি' অনন্তের কিসের মমতা ?
সীমাহীন শূন্যতলে কোথা কোন্ মৃত্তিকার কণা ধ্বনিল ক্ষণিক আর্ত্তনাদে
সৃষ্টির বিধাতা তাহা হয় তো হেলায় শুনিল না,— কী তাহার আসে যায় তা'তে ?

প্রকৃতির অন্ধশক্তি মানুষেরে দেয়নি সম্মান,—নাই দিল,—কিবা আসে যায় ?
পশুসাথে মরেছে যে পশুসম দেয়নি সে প্রাণ,—মরেছে নরের মহিমায়।
গৌরবে মরেছে মাতা বক্ষে ঢাকি' জীবিত সন্তান— এস তা'র পদধূলি ল'ব।
বাঁচাতে পরের ছেলে পুরুষ করেছে দেহ দান, শোনো তা'র কীর্ত্তিকথা ক'ব।

চাহেনি আপন মুক্তি,— আপন জীবন চাহে নাই,—অপরের কথা ভাবিয়াছে,
চূর্ণ-অস্থি দীর্ণ-অঙ্গ তাহাদের শবদেহ তাই পথে আজ কীর্ণ হ'য়ে আছে।
বাঁচিতে পারিত যারা,—তারা কেন পলাল না কেহ—শুধু আজ ভেবে দেখ মনে।
কেন বন্ধুসনে বন্ধু—প্রভুসনে ভৃত্য দিল দেহ,— প্রেয়সী মরিল প্রিয়সনে ?

ধরণীর প্রান্তে প্রান্তে শোনো আজ যে আছ যেথায়— কন্যা, মাতা, পিতা, পুত্র, ভাই,-
তোমার আত্মীয় আজ অন্নহীন বিপন্ন হেথায়, ত্রাতা কেহ কোনোখানে নাই।
খসে' গেছে লজ্জাবস্ত্র,—মরুভূমি হ'য়ে গেছে ধরা,—ধ্বসে গেছে সভ্যতা সমাজ !
আনো তব ক্ষুদ্র দান,—মুষ্টি-অন্ন অনুকম্পা ভরা,—আনো তব অশ্রু-আঁখি আজ।

ওদের কাঁদিতে বলো— কাঁদিতে গিয়েছে যারা ভুলে— কেঁদে নিক যত মনে সাধ।
ওদের থামিতে বলো—এ-শ্মশানে উচ্চ কণ্ঠ তুলে করে যারা বাদপ্রতিবাদ।
যারা ভূমিশয্যাশায়ী তাদের বসিতে বলো উঠে,— আঘাতের বেদনা ভুলাও।
যা'রা ক্ষুধা-তৃষ্ণাতুর তাহাদের শুষ্ক ওষ্ঠপুটে— দাও বারি,—দাও অন্ন দাও।

রমণীর লজ্জা রাখো,—পুরুষের দূর করো ক্লেশ,—মানুষের বাঁচাও জীবন।
নিয়তির ভিক্ষা নহে—জাগৃতির শিক্ষা চাহে দেশ,—কে কোথায় এস ভাই বোন।
প্রকৃতির ধ্বংসশক্তি যুগে যুগে করি' অস্বীকার সভ্যতার চলে অভিযান।
তোমার আমার মাঝে আছে তারি উত্তরাধিকার—এই সত্য করিব প্রমাণ।

দিকে দিকে ধ্বংসস্তূপ চেয়ে আছে উদ্যত অধীর, কি যে বলে—নাহি বুঝি কথা!
ঘটে' গেছে সর্ব্বনাশ,—প্রার্থনায় দেবতা বধির,—ধরিত্রীর বুকজোড়া ব্যথা।
এ কি প্রণামের ক্ষণ? এ কি প্রশ্নজিজ্ঞাসার বেলা?—একি শুধু তুষ্ট র'ব দেখি?
এ কি ন্যায়? এ কি দণ্ড? এ কি দয়া? এ কি শুধু খেলা? কে বুঝাবে,—কে বলিবে এ কি?

মজঃফরপুর

বন্ধু

শ্রীঅমিয়জীবন মুখোপাধ্যায়

কথা বল্‌ছেন শ্রীবাস্তব আর লালাজী।

শ্রীবাস্তব বল্‌ল—নতুন পেশেণ্ট এসেচে, দেখেচেন?

লালাজী বল্‌লেন—দেখেছি। কোত্থেকে এল?

—বাঙালী ব'লে মনে হচ্ছে।

—যাক্‌ ডাক্তার বাবুর দেশের আদ্‌মী তা' হ'লে এল একটি। যাও না, আলাপ ক'রে এস না।

—আপনি যান্‌।

—আমার বাপু দুধ খেয়ে পেট কামড়াচ্ছে, তুমিই যাও না।

শ্রীবাস্তব বল্‌ল—আর গিয়েই বা কি হবে, খানিকক্ষণ পরে তো এমনিই আলাপ হয়ে যাবে।

—তবুও যাও, বেচারা একলা চুপ ক'রে ব'সে আছে!...

অগত্যা শ্রীবাস্তব উঠল। আস্তে আস্তে আপিস-ঘরে নবাগত রোগীটির কাছে এল। নমস্কার ক'রে জিজ্ঞেস করল—আপনি কি বাঙালী?

নবাগত প্রতিনমস্কার কর্‌লেন—হ্যাঁ, আমি বাঙালী।

—কোত্থেকে আসছেন?

—কল্‌কাতা থেকে।

—কদ্দিন ধ'রে ভুগ্‌চেন?

—মাস তিনেক।

—আপনার নাম?

—দেবিদাস রায়।

দেবিদাস বল্‌ল—আচ্ছা, ডাক্তার বাবু কখন আস্‌বেন বল্‌তে পারেন?

শ্রীবাস্তব—বড় ডাক্তার শিবশম্ভু বাবুর আস্‌বার দেরি আছে। এখন আসবেন ছোট ডাক্তার। আপনি একটু অপেক্ষা করুন তিনি এই এলেন ব'লে। আচ্ছা, নমস্কার।

হাসপাতালটি এবারে আমরা সম্পূর্ণ দেখতে পাচ্ছি। খুব বড় নয়, এক রকম ছোটই বলা চলে। দোতলা দালান। নীচে একটি লম্বা, বড় হলের মত ঘর - জন-পনের রোগী থাকে। ওপরে গুটিদশেক ছোট ছোট আলাদা আলাদা ক্যাবিন। নীচের ওয়ার্ডে এবং ওপরের ক্যাবিনে টাকার তফাৎ এবং সব-কিছুরই তফাৎ। খাওয়ার তফাৎ, আরামের তফাৎ, খাতিরের তফাৎ, এমন কি চিকিৎসারও যে কিছু কিছু তফাৎ—এমন কথাও বলা চলে, খুব বেশী মিথ্যা না বলেও।

নীচে, ওপরে সমস্ত ঘরগুলিতেই প্রচুর জানালা—কাচের এবং বড় বড়। আলো, বাতাস প্রচুর খেল্‌ছে।

খাটের রেলিঙের সঙ্গে দুটো বালিশ কাৎ ক'রে রোগীরা যদি একটু উঠে হেলানো অবস্থায় বসে, তবে সামনের দিকে একেবারে দশ-পনের মাইল অবধি দেখ্‌তে পায় ; লাল মাটি, ঢেউতোলা মাঠ এবং অতিদূরে অস্পষ্ট বনের রেখা।

নীচের তলায় বড় হল-ঘরটি ছাড়া অবশ্য আরও তিনটে ঘর। একটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের আপিস, আর একটি কেরাণী (একাধারে কেরাণী এবং ষ্টুয়ার্ড) এবং ছোট ডাক্তারের জন্যে, আর একটিতে ডিস্‌পেন্সারী।

সমস্ত ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে। হাসপাতালের সামনে মস্ত ফুলের বাগান। যে-সব রোগী সুস্থ হবার পথে, তারা বাগানের ভেতরে বেড়াতে পারে, কিন্তু তাদের ফুল ছেঁড়বার নিয়ম নাই। তবে আমরা জানি দু-একটি সৌখীন পেশেণ্ট (তার ভেতরে শ্রীবাস্তবের নাম বিশেষ ক'রে করা যেতে পারে) চুরি ক'রে দু-একটি গোলাপ মাঝে মাঝে যে না ছিঁড়ে থাকে তা নয়। অবশ্য কেউ টের পায় না। শুধু হাসপাতালের চাকরগুলো মাঝে মাঝে দেখে ফেলে, তারা কিছু বলে না। শ্রীবাস্তব প্রত্যেক মাসে গুটিচারেক টাকা শুধু ওদের 'টিপ' দিতেই খরচ করে। সব চাকরই ওর ওপর খুশী। আর টের পেলেই বা কি, ডাক্তার একেবারে নেহাৎ ফাঁসির হুকুম অবশ্যই দেবেন না।

যাক্। ছোট ডাক্তার বাবু এসে পড়েছেন।

জিজ্ঞেস করলেন—আপনিই বোধ হয় আজ কলকাতা থেকে এসেছেন ?

দেবিদাস নমস্কার ক'রে বলল—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আসুন। এই রামরূপ!

ছোট ডাক্তার বাবু দেবিদাসকে সঙ্গে ক'রে ওপরে উঠ্‌তে লাগলেন। রামরূপ এসে দেবিদাসের সুটকেস বেডিং ইত্যাদি কোনটা ঘাড়ে, কোনটা হাতে নিয়ে পিছন পিছন উঠ্‌তে লাগল।

রামরূপই দেবিদাসের বিছানাটা ঠিকঠাক ক'রে পেতে দিল। দেবিদাস একটু সাহায্য করতে যাচ্ছিল, ছোট ডাক্তার বাবু বললেন,—থাক্ থাক্, আপনি নড়াচড়া করবেন না। ও-ই দেবে সব ঠিকঠাক ক'রে। আপনি শুয়ে পড়ুন। আজকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিন, কালকে এক সময়ে আপনার অসুখের হিষ্টিটা লিখে নেব। এখানকার সমস্ত নিয়মগুলি যা পেশেণ্টদের মেনে চলতে হয়, আপনাকে গিয়ে আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি। বিকেলের ওদিকে পড়ে নেবেন। নমস্কার।...

ছোট ডাক্তার বাবু নীচে এসে হাঁকলেন,—শিবপূজন! হেই শিবপূজন!

—জী

—নয়া বাবুকো দুধ, ডিম আউর টোষ্ট দে দেও আভি।

—বহুৎ আচ্ছা হুজুর।

হাসপাতালের পিছন দিকে আর একটি বারান্দা। এক কোণে একটি টেবিলের ওপর সারি সারি পেয়ালা সাজানো। শিবপূজন সমস্ত পেয়ালায় দুধ ঢালছে। পাশে একটি টিনের পাত্র বোঝাই-করা মাখন-মাখানো টোষ্ট, একটি ঝুড়িতে ডিম—রোগীদের সকালের খাবার।

শিবপূজন দুধ ঢালছিল, কিন্তু যতটুকু দুধ রোগীদের পাওয়া উচিত তার চাইতে আধ ইঞ্চি কম ক'রে ঢালছিল।

সবার গ্লাসে দুধ দেওয়া একেবারে শেষ হয়ে গেলে প্রায় দেড় গ্লাস দুধ বেঁচে গেল ; এবং শিবপূজন ঢক্ ঢক্ ক'রে সেটুকু নিজের গালে ঢেলে দিল।

শুনতে পাই শিবপূজন এসেছিল যখন, তখন ছিল বিরাশী পাউণ্ড। চেহারা দেখে বড় ডাক্তার শিবশম্ভু বাবু প্রথমটা ওকে কিছুতেই নাকি কাজ দিতে চাননি। তবে রামরূপের নাকি চেনালোক, রাঁধে ভাল এবং স্বভাবটাও খাঁটি। রামরূপ বিশেষ ক'রে সার্টিফিকেট দিল এবং শিবপূজন ডাক্তার বাবুর পা জড়িয়ে ধ'রে পড়ে রইল। শিবশম্ভু বাবুর নামটা কটমটে মনে হ'তে পারে, কিন্তু নামে কিছু এসে যায় না। বস্তুতই একেবারে সদাশিব লোক। বললেন,—আচ্ছা কর কাজ...।

পাউণ্ডটা বিরাশী বটে, কিন্তু হাড় শক্ত আছে, খাটতে পারে। চাকুরি টিকে গেল।

সেই শিবপূজন বর্ত্তমানে একশো বিরাশী। এই ক' বছরে একশো পাউণ্ড—তা এমন আর বেশী কি? একটা কল্কির মাথায় একটা আলু লাগিয়ে দিলে যেমন দেখতে হয় ছিল শুধু সেই রকম ; আর আজকাল সেই আলুটা হয়েছে তরমুজ, আর কল্কিখানা হয়েছে,—

যাক। এসব হিংসের কথা। তুমি আমি যা নই,

এবং যা হ'তে পারছি না, তা নিয়ে অনবরত ভেবে চোক টাটানো ভাল কথা নয়।

শিবপূজন মারে এদিক থেকে, রামরূপ মারে ওদিক থেকে—অর্থাৎ বাজার থেকে। চাল, ডাল, তেল, নুন থেকে স্থরু ক'রে মাংস পর্য্যন্ত। ফলটলগুলো যথাসম্ভব খারাপ দেখে একটু কম দামেই সে আনতে চেষ্টা করে—দামটা চড়িয়ে হিসেব দিয়ে ওরই ভেতর যে চায়টে আনা বাঁচে! ডাক্তারের কাছে ব'লে ব'লে রোগীরাও ত্যক্ত হয়ে গেছে, শুনে শুনে আর দেখে দেখে ডাক্তারও ত্যক্ত হয়ে গেছেন; কিন্তু উপায়হীন! এদের চাইতে ভাল লোক মেলে না। বার-বার তাড়ানোয় আর নূতন লোক আনায় আরও বিশৃঙ্খলা। খাবার জিনিষের পরিমাণ কম পেলে, বা কোনো জিনিষ খারাপ পেলে রোগীরাও উদাসীন থাকতেই চেষ্টা করে; আর শাসনের দরকার হ'লে ইয়ার্ড বাবু বড়জোর দু-একটা ধমক মেরে বেশী বাড়াবাড়িটাকে যথাসম্ভব নিয়ন্ত্রিত করতে চেষ্টা করেন।

তবুও সব দিক থেকে হাসপাতালের ব্যবস্থা অত্যন্ত নিন্দার নয়। রোগীরা উন্নতিই করছে, বিশেষভাবে শিবশম্ভু বাবুর ব্যবহার এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা তো সকল রোগীই কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করে।

শিবশম্ভু বাবুই এখানে একমাত্র বাঙালী। হাসপাতালটিও এক রকম তাঁর নিজেরই সম্পত্তি। নিজেই এটির সৃষ্টি করেছিলেন, চলছেও ভাল। কর্ম্মচারীদের ভিতরেও কেউই বাঙালী নয়। শুধু মাঝে মাঝে দু-একটি বাঙালী রোগী আসে—কোনক্রমে সন্ধান পেয়ে।

শিবশম্ভু বাবুর বাসা।

বাসাটি হাসপাতাল থেকে সিকি মাইল, অথবা তার সামান্য কিছু বেশী দূরে। ফাঁকা মাঠে দূরত্বটুকু চোখে পড়ে না। বাসা থেকে হাসপাতাল এবং হাসপাতাল থেকে বাসা স্পষ্টই দেখা যেত, যদি বাসাটা একটা ঢিবির আড়ালে ঢাকা না পড়ত।

বাসার ভিতরে বারান্দায় ব'সে ব'সে ডাক্তার বাবুর স্ত্রী কোলের ছেলেটিকে দুধ খাওয়াচ্ছেন। উঠানে রাণু, ডাক্তার বাবুর ছোট মেয়ে স্কিপ ক'রছে।

খোকন দুধ খেতে খেতে কাঁদছিল, ডাক্তার বাবুর স্ত্রী ঝিনুক দিয়ে বাটির গায়ে ঠন ঠন আওয়াজ ক'রে তাকে শান্ত করতে চেষ্টা করছিলেন।

রাণু লাফাচ্ছে আর ছড়া আওড়াচ্ছে!

কা—কা—কা—
ঘরে ফিরে যা
আপন লেজটি মুখে পুরে
চেটেপুটে খা।...

লাফাতে লাফাতে এল মায়ের কাছে। ভায়ের গাল দুটি টিপে ধ'রে আদর করল—লক্ষ্মী, সোনা, মাণিক, বুবু, দুধ খাও। দুধ খেলে গায়ে রক্ত হবে, হাতে পায়ে জোর হবে, সাঁতার শিখবে, আর দেখতে দেখতে তালগাছের মত বড় হ'য়ে যাবে। বুবু, লক্ষ্মী...দুধ খাও।

দিদির কথা বোধ হয় বুবু পছন্দ করল। ডাক্তারবাবুর স্ত্রী এক ঝিনুক দুধ গালে ঢেলে দিয়েছেন, দিদির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বুবু ঢক্ ক'রে সেটুকু গিলে ফেলল। তারপরে একটু হাসি।

রাণু বুবুর নরম, তুলতুলে পেটটা একটু চটকে আবার লাফাতে স্থরু করেছে, আর বলছে:—

আড়ি—আড়ি—আড়ি
কাল যাব বাড়ি—
পরশু যাব ঘর,
কি করবি কর।

ঘরের ভিতর থেকে শোনা গেল,—মা, আমার সেফটি-পিনটা কোথায়, দেখেছ? এই ত টেবিলের উপরেই কিছুক্ষণ আগে রেখেছিলাম, এখন আর তা খুঁজে পাচ্ছিনে। ভারি রাগ ধরে সত্যি...

মা ব'ললেন,—কই আমি তো দেখিনি তোমার সেফটিপিন...

রাণু সুর ক'রে ক'রে ব'লছে

রাগ ক'রোনা নলিনী—
রাঙা মাথায় চিরুণী
বর আসবে এক্ষুণি,
নিয়ে যাবে তক্ষুণি।...

ঘরের ভিতর থেকে চড়া গলা শোনা গেল,—বর আসবে এক্ষুণি, বার করছি; রাণু, আমার সেফটিপিন কোথা?

রাণু চীৎকার ক'রে উঠল—আমি জানি নাকি তোমার

সেপটিপিন কোথা? নিজে হারিয়ে ফেলে এখন আবার আমায় ধম্‌কানো হ'চ্ছে।

—বটে? আচ্ছা দেখাচ্ছি মজা...

রাণু একটু নাকে কান্নার সুরে—ঐ দ্যাখো মা দিদি আমায় মারতে আসচে—

দিদি ঝড়ের মত বাইরে ছুটে এল, রাণুর ঘাড় ধ'রে ঠেলতে ঠেলতে আবার ঘরে ঢুক্‌ল। শোনা গেল—খোঁজ শীগ্‌গীর, নইলে খুন ক'রে ফেল্‌ব।

বিদ্যুতের চমকের মত একটি মুহূর্তের জন্যে দিদিকে দেখা গেল, ছুটে আসতে আসতে খোঁপাটি খুলে গেল। গায়ের কাপড় কতকটা এলোমেলো। গায়ের রংটিকে খুব ফর্সা ব'লতে পারছি না। তবে সারাদেহে পূর্ণ স্বাস্থ্যের একটি স্বচ্ছন্দ লাবণ্য। মুখখানাতে বিরক্তির আভাস।

মা ব'ললেন—দুটি বোনে আবার মারামারি সুরু ক'রে দিয়ো না যেন। কোথায় আর যাবে, খুঁজলেই বেরুবে।

তারপরই একটু হাসি-মাখা গলার আওয়াজ এল—এই যে রে রাণু পেয়েচি; এই কাগজটার নীচে ছিল।

মা ব'ললেন—পেলি না কি মঞ্জু?

রাণু ফুলতে ফুলতে বেরিয়ে আসছে। মাকে ভেংচে বলল,—মঞ্জু! মঞ্জু!...নিজের জিনিষ নিজে হারিয়ে আমায় মারতে আসে, কিছু বলতে পারেন না—ভারি ওঁর আল্লাদে মেয়ে!...

মঞ্জুও হাসতে হাসতে বেরিয়ে এল, ব'লল,—না পেলে তোকে আজকে—

—ঘোড়ার ডিম ক'রতে। আমি বাবাকে ব'লে দিতুম, টের পেতে মজা।

বাবার ভয়ে মঞ্জু অবশ্য একেবারে অস্থির।

ছোট ডাক্তার বাবু দেবিদাসের অসুখের হিষ্ট্রীটা লিখে নিচ্ছেন। নাম, বাপের নাম, বাড়ি, জেলা—লেখা হ'য়ে গেল।

জিজ্ঞেস ক'রলেন,—বয়স?

দেবিদাস উত্তর দিল—বছর পঁচিশেক।

—কি কর্‌তেন?

—ইউনিভার্সিটিতে রিসার্চ ওয়ার্ক কর্‌ছিলুম।

—বাড়িতে আর কারুর এ অসুখ ছিল?

—না।

—এর আগে অন্য কোনো স্যানাটোরিয়ামে ছিলেন?

—না।

—আপনি ম্যারেড?

—না।

—চিলড্রেন?

একটু ইতস্ততঃ ক'রে দেবিদাস মাথা চুলকিয়ে পরমুহূর্ত্তে হেসে ব'লল,—নো চিলড্রেন ডক্টর!...

ছোট ডাক্তার বাবু আরও দুটো চারটে কথা চার্টের ছাপানো লেখাগুলি থেকে জিজ্ঞেস ক'রলেন, দেবীদাসের উত্তরগুলি খচ খচ ক'রে পাশে লিখে রাখলেন।

ফাউণ্টেন পেনটা পকেটে গুঁজে এবারে ডাক্তার ব'লছেন—আচ্ছা, আপনার শার্টটা খুলুন।

দেবিদাস শার্টটা খুলে ফেলতেই ডাক্তার প্রশংসার চোখে তাকিয়ে ব'ললেন,—বাঃ, আপনার চমৎকার শরীর তো!

দেবিদাস হাস্‌ল—আর চমৎকার! যে অসুখে ধ'রেচে, এইবারেই আন্‌বে ঠিক ক'রে।

ষ্টেথেস্কোপ কানে লাগিয়ে ডাক্তারবাবু বুক পিঠ দেখলেন। ব'ললেন,—আচ্ছা ফিস্ ফিস্ ক'রে বলুন তো, নাইনটি নাইন—

—নাইন্‌টি নাইন!

—আচ্ছা আবার—নাইন্‌টি-নাইন—

—নাইনটি-নাইন!

বাঁ-হাতের আঙুল বুকের ওপর রেখে ডান হাতের আঙুল দিয়ে কয়েক বার ঠুক্‌লেন।

—কিচ্ছু ভয় নেই দেবিদাস বাবু, তিন মাসে সেরে উঠবেন। বুকে আপনার কিচ্ছু নেই! যা' আছে তাও কিছু না।

আবার পকেট থেকে কলম খুলে নিয়ে চার্ট বইতে দেবিদাসের বুকের অবস্থা খস্ খস্ ক'রে টুকে নিলেন।

—এবারে আপনি জামা গায়ে দিন; খাওয়া-দাওয়া ভাল মতন করছেন তো?

দেবিদাস জামা প'রতে প'রতে একটু হেসে—আজ্ঞে হাঁ।

ডাক্তার বাবু বেরিয়ে পড়লেন।

শিবশম্ভু বাবুর কাছে মঞ্জু দেবিদাসের খবর পায়। একটা শুধু কৌতুহল, আর কিছু নয়।

বেড়াতে বেড়াতে বিকেলের দিকে হাসপাতালে এসে সামনেই রামরূপকে দেখতে পেল। জিজ্ঞেস করলে,—রামরূপ, একজন নতুন বাঙালী বাবু এসেছেন, কোথায় তিনি ?

—উপরমে দিদি

—কোন্ ঘরটাতে আছেন ?

—পাঁচ নম্বর মে।

মঞ্জু আস্তে আস্তে উপরে উঠে এসে পাঁচ নম্বর ঘরে ঢোকে। দেবিদাস একটু বিস্মিত হ'য়ে মঞ্জুর মুখের দিকে তাকাল।

মঞ্জু নমস্কার ক'রে বললে,—বাবার কাছে আপনার কথা শুনে একটু বেড়াতে এলুম। এখানে এসে কেমন বোধ করছেন ?

দেবিদাস উঠে ব'সল। বলল,—দয়া ক'রে চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসুন।

কিন্তু দেবিদাস অত সৌজন্য দেখানোর আগেই মঞ্জু চেয়ারখানিতে ব'সে পড়েছে।

—আপনার বাবাই বুঝি শিবশম্ভু বাবু ?

সলজ্জ ভঙ্গীতে ঘাড়টা একটুখানি কাৎ ক'রে ঠোঁট দুটিতে একটু হাসি মাখিয়ে মঞ্জু উত্তর দিলে—হাঁ।

—এখানে এক আপনারাই বুঝি শুধু বাঙালী ?

—হাঁ, আমরাই শুধু।...আপনি কি ক'রে এই হাসপাতালের সন্ধান পেলেন ?

—এখানে আমার আস্‌বার আগে একজন বাঙালী পেশেন্ট ছিলেন না ? বারীন বাবু নাম ক'রে ?

মঞ্জু স্মরণ করতে চেষ্টা করল।

দেবিদাস বলল—রোগা, ফর্সা মত একটি ভদ্রলোক, সেক্রেটারিয়েটে কাজ করতেন। জানতেন না ? এখানে ত প্রায় মাস-ছয়েক ছিলেন !

—ওঃ সে ত অনেক দিন আগেকার কথা। বছর দুই নিশ্চয়ই হবে, না ?

—মনে পড়েছে ?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওঃ, তারপরে আরও দু-তিন জন বাঙালী রোগী এসে গেছেন। যাই হোক্, তিনি বুঝি আপনার পরিচিত ? তাঁর কাছেই শুনেছিলেন বুঝি এখানকার কথা ?

দেবিদাস একটু হেসে—হ্যাঁ, তার কাছে খবর পেয়েই এসেছি। সে খুব প্রশংসা করেছে এই হাসপাতালের।

দেবিদাস মঞ্জুর মুখের দিকে তাকিয়ে আবার একটু পরে বলল,—সত্যি, আপনি যে কষ্ট ক'রে এসেছেন আমায় দেখতে, এজন্যে ভারি খুশী হলুম। যদি খুব বেশী অসুবিধা না হয় তবে মাঝে মাঝে আসবেন তো ?

মঞ্জুর গাল দুটিতে খানিক রক্তের ঝলক চকিতে ফুটে উঠে আবার মিলিয়ে গেল। আঁচলের একটা কোণ বাঁ-হাতের আঙুলে মোড়াতে মোড়াতে হেসে উত্তর দিল,—আসবো।

মঞ্জু মাঝে মাঝে প্রায়ই দেবিদাসের কাছে বেড়াতে যায়। হয়ত বা দেবিদাসেরই অনুরোধে !

যেদিনই যায়, উঠে আসবার সময়ে দেবিদাস আবার আস্‌বার জন্যে ব'লে দেয়।

কিন্তু এক একদিন হয়ত দেবিদাস সেকথা আর বার-বার স্মরণ করিয়ে দেবার প্রয়োজন বোধ করে না।

তবুও মঞ্জু আবার যায়।

ঘনিষ্ঠতাও ক্রমে ক্রমে আপনা হ'তেই নিবিড় হয়ে আসে। এর জন্যে মঞ্জুকে দোষ দেবার কিছু নেই।

আজকাল মঞ্জু এসে ধপ্ ক'রে দেবিদাসের খাটের উপরেই ব'সে প'ড়ে পাশের লকারের উপর থেকে চিরুণীটা তুলে নিয়ে বলে,- আহা, চুলের কি ছিরিই ক'রে রেখেছেন দেবী-দা, দাঁড়ান আমি ঠিক ক'রে দিচ্ছি—

দেবিদাস হয়ত একটু বাধা দিতে চেষ্টা করে; আচ্ছা, আমার কাছে দাও, আমিই আঁচড়াচ্ছি। তোমার আর কষ্ট করতে হবে না—

দেবিদাসের হাতখানা জোর ক'রে নিজের কোলের ওপর চেপে ধ'রে দেবিদাসের মাথার ভেতরে চিরুণী বসাতে বসাতে শাসনের ভঙ্গীতে মঞ্জু বলে—চোপ্...

শিবশম্ভু বাবুর বাসার দরজার সামনে খাকি শার্ট, প্যান্ট্ পরা,—মাথায় পাগড়ী-আঁটা পিওন।

রাণু বললে—কা'র চিঠি পিয়ন ?

পিওন একখানা খামের চিঠি বের ক'রে নামটা পড়ল—মঞ্জুলিকা দেবী।

—দাও।...

ছুটতে ছুটতে হোঁচট্ খেতে খেতে রাণু চিঠি এনে মঞ্জুর হাতে দিল। পড়া হয়ে যেতেই ওদের মা জিজ্ঞেস করলেন,—কে লিখেছে রে মঞ্জু ?

—আমার একটি বন্ধু। রাণু, তোর একটি দিদি আসছে রে, এই সামনের পরশু, বুঝেছিস ?

রাণু ভারি খুশী হ'য়ে উঠল ; বুবু, মা, দিদি আর বাবা— এ ছাড়া তার আর কোনো সাথী এখানে মেলে না। একজন নতুন মানুষ দেখার চাইতে বড় আনন্দ সে কল্পনাই করতে পারে না।

মা জিজ্ঞেস করলেন,—তোর বন্ধু তোর কাছে বেড়াতে আসছে বুঝি ? কোত্থেকে আসছে ?

—লাহোর থেকে আসছে। শুক্লা ব'লে একটি মেয়ের কথা তোমায় বলিনি মা ? সেই শুক্লা আসছে। ও কলকাতায় মাষ্টারি করে, ওর দাদা লাহোরে কাজ করেন, সেখানে গিয়েছিল বেড়াতে। কলকাতা ফেরার পথে নেমে আমার সঙ্গে দেখা ক'রে যাবে।

—আসুক। হাঁফ ছেড়ে তা হ'লে একটু বাঁচি। কথাটি কইবার মানুষ নেই, বাবাঃ এমন ক'রে টেঁকা যায় ? থাকবে তো কয়েক দিন ?

মঞ্জু বলল,—কয়েক দিন কোথায়, এক দিনের জন্যে মোটে থাক্‌বে লিখেছে।

—আচ্ছা, আসুক তো, বাঙালীর মুখখানা দেখলেও সুখ !

নতুন বাঙালী মেয়েটি দু-দিন পরেই দেখা দিল।

মঞ্জু হয়ত ক্ষুণ্ণ হ'তে পারে, কিন্তু একথা কিছুতেই অস্বীকার কর্‌বার উপায় নেই যে, শুক্লা মঞ্জুর চাইতে আরও বেশী সুন্দরী।

ট্রেন থেকে নেমে বাসায় এসে স্নান-টান ক'রে শুক্লা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছিল।

ফুলের পাপড়ীর গায়ে গন্ধটুকু যেমন লেগে থাকে, সাবানের মিষ্টি গন্ধটুকু ওর ভিজে একরাশ চুলে তেমনি লেগে রয়েছে। চুল আঁচড়াবার সঙ্গে সঙ্গে ওর শুভ্র নিটোল বাহুখানা এধারে-ওধারে দুলছে। ট্রেনে আস্‌বার কষ্টে প্রথমটা আমরা ওর মুখখানাকে একটু শুক্‌নো দেখেছিলুম, কিন্তু বিশ্রাম এবং স্নানের শেষে এখন ওর মুখখানা দেখাচ্ছে ঠিক এক পশলা বৃষ্টির পরে একটি সদ্যফোটা তাজা বড় গোলাপের মত।

মঞ্জুর মা বারান্দা থেকে বুবুর চোখে কাজল পরাতে পরাতে বল্‌ছেন,—শুক্লা ত হপ্তাখানেক অন্ততঃ আছেই, না ?

ঘরের ভিতরে শুক্লার একটু হাসি।—না কাকীমা, আমার ইস্কুল খোলা, আর তো দেরি কর্‌বার জো নেই।

—তাই ব'লে কাল্‌কে আমি কিছুতেই তোমায় যেতে দিতে পারূচি নে। অমন আসা না এলেই পারূতে ?

—আচ্ছা কাকীমা, আমি আবার যদি এদিকে আসি, তবে সেবারে অনেক দিন থেকে যাব। এবারে আমায় ছেড়ে দিতেই হবে, নইলে বড্ড ক্ষতি হবে। অনেক দিন মঞ্জুর সঙ্গে দেখা নেই, সেই জন্যেই নামলুম্।

রাণু প্যাক্ প্যাক্ ক'রে উঠল,—ইঃ, সেই জন্যেই নামলেন ! আমরা যেন ওঁর কিচ্ছু না, খালি মঞ্জুই সব ! না মা, শুক্লা-দিকে কিচ্ছুতেই যেতে দিও না।...তার পরে ঘরের ভিতরের উদ্দেশে—শুক্লা-দি, গেলে ভাল হবে না, ভাল হবে না, ভাল হবে না, হু।

শুক্লা খালি হাস্‌ল। মঞ্জু বল্‌ল,—সত্যি এলিই যখন অন্ততঃ গোটা পাচেক দিন থেকে যা ভাই।

বাইরে থেকে মঞ্জুর মা বল্‌লেন,—একেবারে বাঙালীর মুখ দেখি না, আজকে প্রাণটা একটু জুড়োলো। এক হাসপাতালে শুনি মাঝে মাঝে দু-একজন আসেন, এখনও এক জন আছেন। কিন্তু আশপাশে কারও কাছে গিয়ে যে একটু বসবও, কথা কইবও, কি কেউ আমাদের কাছেও একটু বেড়াতে আস্‌বে—এ আর হবার জো নেই। এসেছই যখন মা, যদি গুরুতর কোনো ক্ষতি না বোঝো, থেকে যাও দুটি দিন।

শুক্লার চুল আঁচড়ানো হয়ে গেছে। কাকীমার কাছে বাইরে এসে এবারে বস্‌ল। হাসিমুখে তার মুখের দিকে তাকিয়ে কাকীমা জিজ্ঞেস কর্‌লেন,—কেমন ?

শুক্লাও হাসিমুখে—আমার আর থাকতে কি কাকীমা, বেশ ত ভালই লাগচে ! আপনাদের হয়ত জায়গাটা একঘেয়ে হয়ে গেছে, কিন্তু আমি থাকি কল্‌কাতায়—এখানে এসে যেন ভাল ভাবে নিঃশ্বাস নিতে পারছি। বাঙালীর মুখ দেখে যেমন আপনাদের চোখটা মনটা জুড়োলো, এমন ফাঁকা মাঠ আর এমন সুন্দর দৃশ্য দেখে আমারও চোখ আর মন তেমনি জুড়োলো। কিন্তু ইস্কুলে আবার গোলমাল না করে সেই ভয়। কালকেই আমার ছুটি শেষ কি-না, হেড মিষ্ট্রেসটিও বড় সুবিধার লোক নন্।...

—নাও, এতে আর তোমাকে তিনি কি করবেন। এমন তো ভয়ানক কিছু অপরাধ করছ না! একটু বুঝিয়ে ব'লো, তাহলেই হবে।

অগত্যা শুক্লা তিনটে দিন থেকে গেল। এমন ক'রে কাকীমা বলছেন, বেশী কথা-কাটাকাটি করলে সেটা নিতান্তই ধৃষ্টতা হবে আর ক্ষুণ্ণিতও হবেন তিনি। মঞ্জুও বার-বার বলছে থেকে যেতে। আর ওই রাণুটা!...দুষ্টুর শিরোমণি! ভয় দেখাচ্ছে, যাবার কথা মুখে আনলে এমন জায়গাতে নাকি ওর সুটকেসটা লুকিয়ে রেখে দেবে যে খুঁজে পায় কার সাধ্যি!

বৈকালে শুক্লা, মঞ্জু মাঠে বেড়াতে বে'র হ'ল।

শুক্লা জিজ্ঞেস করলে,—আচ্ছা মঞ্জু, দূরে ওই যে বাড়িটা দেখা যাচ্ছে, ওটাই তো হাসপাতাল?

—হ্যাঁ অই-ই তো হাসপাতাল।

—দেখ্, মঞ্জু, আমার একটি বন্ধুর এই অসুখ হয়েছে। তিনি হচ্চেন আমার দাদার বন্ধু, দু-জনেই এক সঙ্গে পাস করেন। দাদার সঙ্গেই আমাদের বাসায় মাঝে মাঝে বেড়াতে আসতেন, সেই সূত্রেই আমার সঙ্গে পরিচয়। ডাক্তার সন্দেহ করচেন, এই খবরটুকুই কেবল দাদাকে দিয়েছিলেন কিছুদিন আগে; দাদাকে জিজ্ঞেস ক'রে জানলুম, কিন্তু তারপরে তাঁর আর কোনো চিঠি দাদা পায়নি। মনটা সত্যি ভাই বড্ড খারাপ বোধ হয় তাঁর জন্যে। চমৎকার ছেলে—দাদা লাহোরে কাজ নিয়ে এল, উনি ইউনিভার্সিটিতে রিসার্চ করছিলেন—

একটু চমকে মঞ্জু জিজ্ঞেস ক'রল—কি করছিলেন তিনি?

—ইউনিভার্সিটিতে রিসার্চ।

—তাঁর নামটা কি ভাই?

—দেবিদাস রায়।

মঞ্জু শুক্লার একটু পিছনে; মঞ্জুর মুখের চেহারাটা হঠাৎ কেমন একটু অন্য রকম হয়ে উঠেছে, সেটা শুক্লা লক্ষ্য করলে না। মঞ্জু জিজ্ঞেস করল—দেবী বাবুর সঙ্গে তোর খুব বন্ধুত্ব ছিল বুঝি?

—খুব আর কি, মোটামুটি একটু আলাপ হয়েছিল। কেম জানিনে ভাই, পুরুষছেলেদের সঙ্গে চট ক'রে বেশী মাখামাখি করতে আমি পারি নে। তা ছাড়া দাদার কাছেই আসতেন, দাদার কাছেই ব'সতেন, ওরই ভেতর দাদা একদিন আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল।—একটু থেমে শুক্লা ব'লল, তবে...

তবে ব'লে শুক্লা চুপ ক'রে রইল, আর এগুলো না। মঞ্জু জিজ্ঞেস করল—তবে কি?

শুক্লার ঠোঁটে শুধু একটু হাসির আভাস। উত্তর নেই।

মঞ্জু অসহিষ্ণু হ'য়ে উঠল,—তবে ব'লে চুপ ক'রে রইলি যে? কি ব'লতে যাচ্ছিলি, বল।

শুক্লা হেসে বললে,—কিচ্ছু না...

মাথা দুলিয়ে মঞ্জু বলল,—দেখ চালাকি করিস্ নি। আমার কাছেও লুকুতে হবে এমন কোনো কথা তোর আবার আছে না কি?

—ব'লব তাহ'লে?

—বল্।

—দেখ্ ভাই...

শুক্লা আবার হাসল মঞ্জুর মুখের দিকে তাকিয়ে। মঞ্জু অনুনয় ক'রে বললে—বল্ না!

—দেখ ভাই সত্যি ক'রে...

আবার শুক্লা থেমে গেল। মঞ্জুর বুকের ভেতর একটু দুর দুর ক'রে উঠল। একটা ঢোক গিলে মুখে খানিকটা হাসি টেনে এনে চেঁচিয়ে ব'লল—বল্ শীগ্‌গীর পোড়ামুখী, সত্যি ক'রে কি...

—দেখ দেবী-দাকে আমি ভালবাসতুম।

কথাটা ব'লে শুক্লা মঞ্জুর মুখের দিকে আর না তাকালেই পারতো, তবুও একবার তাকিয়েই চ'লতে চ'লতে মাঠের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল।

মঞ্জু নিজেকে একটু সামলেছে। জিজ্ঞেস ক'রল,—দেবিবাবু তোকেও বুঝি খুব ভালবাসতেন?

শুক্লা হেসে ফেলল—খুব তো দূরের কথা, আমাকে আদৌ ভালবাসতেন কি-না তাই জানিনে। আর সে-কথা জানবার সুযোগও কখনও হয়নি। তবে এইটুকু বলতে পারি—আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলবার তাঁর একটা বিশেষ আগ্রহ ছিল, এবং আমার সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে তিনি যে বিশেষ আনন্দিত হয়েছিলেন, এটুকু আমি বেশ বুঝতে পারতুম।

—তুই বুঝি তাঁর প্রেমে একেবারে হাবুডুবু খেতে লাগলি?

শুক্লা মঞ্জুর একখানা হাত ধ'রে হেসে ব'ল্‌ল,—তোর কাছে লুকোব না মঞ্জু, প্রায় তাই-ই।

—বুঝেছি...

—জান্‌লি, দেবিবাবুকে সত্যি আমার এত ভাল লাগতো যে তোকে আর কি বলি! শুধু তখনই যে লাগতো তাই নয়, এখনও আমি তাঁকে ভালবাসি—খুবই ভালবাসি। আর বল্‌তে লজ্জা নেই ভাই তোর কাছে। আবার যদি তাঁর সঙ্গে কখন সুবিধামত দেখা হয়, তবে তাঁকে আমি এ-কথা জানিয়ে দেব স্পষ্টভাবে।

শুক্লার বিহ্বল চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে মঞ্জু একটু শুক্‌নো হাসি হেসে বল্‌ল,—কিন্তু তুই না বল্‌লি তাঁর অসুখ হয়েছে?

—তা হোক্। হ'লেও খুব সম্ভবতঃ বেশী কিছু নয়, নিশ্চয়ই ভাল হয়ে যাবেন।...আর দেখ, তিনি যেখানেই থাকুন না কেন, আমি সব সময়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি তাঁকে সুস্থ ক'রে দেবার জন্যে...

শুক্লার মুখে হাসির রেখা, কিন্তু চোক্ দুটি চক্‌চক্ করছে।

মঞ্জু বল্‌ল—তুই-ই ম'রেছিস খালি দেখ্‌ছি। তিনি তো একখানা চিঠিও তোকে লেখেন না!

বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে শুক্লা উত্তর দিল,—তা না লিখুন, কিন্তু দাদার কাছে যখনই চিঠি লেখেন, আমার কথা জিজ্ঞেস করেন। আমিই কোনোদিন দেবী-দাকে চিঠি দিইনি, দিলে নিশ্চয়ই উত্তর দিতেন, সে আমি ঠিক জানি।...কিন্তু দ্যাখ ভাই কি মানুষ, অসুখ হবার পরে আর মোটে খবরই নেই, প্রায় মাস-তিনেক ত হ'ল।...তা হোক্, হয়ত ডাক্তার বেশী চিঠিপত্র লিখ্‌তে বা কোনো রকম পরিশ্রম করতে বারণ করেছেন, সেই জন্যেই হয়ত লেখেন না।

মঞ্জু আর বেশী কথা বাড়াতে সাহস করে না।

কিছুক্ষণ দু-জনেই চুপ।

এক সময়ে মঞ্জু সাম্‌নের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলে—সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে, দেখেছিস্? এখানকার এ একটা দেখবার জিনিষ।

শুক্লা তাকাল। দেখবার জিনিষই বটে। অত্যন্ত প্রকাণ্ড বহুদূরবিস্তৃত মাঠ, মাঠের ওপারে সূর্য্য ডুবে যাচ্ছে। সূর্য্যের জ্যোতি এখন আর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে না, শুধু একটা প্রকাণ্ড লাল আগুনের গোলা যেন দুল্‌তে দুল্‌তে নেমে পড়ছে। আকাশখানা আবীর-রাঙা, কিন্তু মেঘের প্রত্যেক স্তর স্বতন্ত্রভাবে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। দু-ধারে অতি অস্পষ্ট বনের রেখা। মাঝখানটার একটু ফাঁক—সেখানটায় মাঠ একেবারে আকাশে মিলিয়ে গেছে। ঠিক এই ফাঁকটুকুর ওপারেই সূর্য্য আস্তে আস্তে ঢলে প'ড়ে যেতে লাগল।

মুগ্ধ চোখে চেয়ে শুক্লা বল্‌ল,—ভারি চমৎকার দৃশ্য বাস্তবিক! আমি সমুদ্রেও সূর্য্যাস্ত দেখেছি, দুটো দৃশ্য যদিও আলাদা আলাদা—সবটা মিলিয়ে, কিন্তু সৌন্দর্য্যের দিক থেকে কোনটাই কারও চাইতে খাটো নয়!

মঞ্জু বল্‌ল,—আচ্ছা শুক্লা, তুই ত পুরী বেড়াতে গিয়েছিলি? সমুদ্রে ঝড় দেখেছিস্?

—হ্যাঁ, দেখেছিলুম ভাই ঝড় এক দিন। সে যে কি অদ্ভুত আর ভীষণ দৃশ্য, তোকে তা ব'লে বোঝাতে পার্‌ব না আমি। বুঝলি, প্রথমে তো একখণ্ড প্রকাণ্ড কালো মেঘ আমাদের বাসার ঠিক যেন পিছন থেকে উঠে এল, চল্‌ল সমুদ্রের দিকে এগিয়ে। দশ-পনের মিনিটের ভিতরেই সমুদ্রের ওপর একটা বিশাল ছাদের মত মেঘখানা ছড়িয়ে পড়ল—আর সঙ্গে সঙ্গেই বাতাস। তার পরে ভাই—

শুক্লা যেন ভাষা জুগিয়ে উঠতে পারছে না। মঞ্জু বল্‌ল,—ঢেউ বুঝি আরম্ভ হয়ে গেল?

—ঢেউ? ঢেউ ত সারাক্ষণই। ঢেউ তো নয়, সমুদ্রের ওপর যেন মহাপ্রলয় ঘটল। ওরে বাপ রে, সে যে কি গর্জ্জন, আর—

একটু থেমে ব'লল,—একখানা জাহাজ চাল নেবার জন্যে দিন-সাতেক এসে নোঙর ক'রে ছিল। এম্‌নি সাধারণ যে ঢেউ তাইতেই জাহাজখানা একটা নৌকোর মত দুলতো—অবিশ্যি ছোটও খুব। ঝড় আস্‌বার ঠিক আগের দিনটাতেই ওটা ছেড়ে চ'লে গেল। ঝড়ের সময়ে ভাবতে লাগলুম বেচারা যদি এখন এখানে থাকৃত, কি অবস্থা দেখতুম তার। ঢেউয়ের পর ঢেউ তালগাছের মত উঁচু হয়ে হয়ে পাগলের মত ছুটে আস্‌ছে—একেবারে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য। আর

সেইগুলো যখন একটার পর একটা ভীষণ শব্দ ক'রে ভেঙে পড়ছে—

মঞ্জু তেমন মনোযোগ দিয়ে শুক্লার কথা শুনছে না—কারণ শুক্লা যা ব'লছে, মঞ্জুর কাছে সেগুলি তেমন নতুন নয়, যদিও সে পুরী কখনও যায়নি। বইতে এসব সে যথেষ্ট পড়েছে, যাঁ'রা দেখেছে তাদের মুখে পূর্ব্বেই বহুবার শুনেছে। কিন্তু মঞ্জু শুক্লাকে বাধা দিল না।

শুক্লা ব'লল,—রাত্রির বেলাতেও সমুদ্র ভারি সুন্দর দেখতে। জোছনা রাতের কথা তো ছেড়েই দাও আঁধার রাত্রে দেখা যায় ঢেউগুলো ভেঙে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে একটা নীলাভ আলো ঠিক গলানো রুপোর মত ফেনার মাঝে ছড়িয়ে পড়লো—এত চমৎকার!

এ-সব কথাও মঞ্জু জানে। সবই অত্যন্ত পুরোনো খবর।

মঞ্জু অনেকটা সহজ ভাবে শুক্লার এ-সব কথায় যোগ দিতে পারে, কিন্তু মনের পূর্ব্বেকার স্বাচ্ছন্দ্য সে বহুক্ষণ আগে হারিয়ে ফেলেছে।

পরদিন বেড়াতে বেরিয়ে শুক্লা বল্‌ল,—আচ্ছা মঞ্জু চল্ না ভাই, হাসপাতালটা দেখে আসি। আর কে নাকি একজন বাঙালী পেশেণ্ট এসেছেন কাকীমা বল্‌ছিলেন, তাঁকেও দেখে আসা যাবে।

মুহূর্ত্তের জন্যে মঞ্জু সারাদেহে একটা অস্বস্তি অনুভব করল। পরক্ষণেই নিজের কণ্ঠকে সতর্কতার সহিত সংযত ক'রে বল্‌ল,—না, না, হাস্‌পাতাল দেখতে গিয়ে কাজ নেই।

—কেন?

—মোটেই নিরাপদ নয়।

—কেন?

—কেন মানে অসুখটাই খুব খারাপ কি-না!

—আহা তাই ব'লে আমাদের তো আর ধরচে না!

—তা বিচিত্রও নয়। এটা ছোঁয়াচে রোগ, আর যদি কোনোও গতিকে ধরে, তবেই শেষ! আর রক্ষে পেতে হবে না। তা ছাড়া হাসপাতালে দেখবার আছেই বা কি, দালানটা ত এখান থেকেই দেখ্‌তে পাচ্ছিস্। ভেতরে কতকগুলো রোগী পড়ে রয়েছে—এই ত! আর বাবা বলছিলেন সেদিন—এখন যে পেশেণ্টগুলো আছে, অত্যন্ত নাকি অ্যাডভান্‌স্‌ড্ ষ্টেজের সব কটাই; কাজেকাজেই ওদিকে না ঘেঁষাই ভাল।

শুক্লা জিজ্ঞেস করল,—তুই বুঝি কখনও যাস্‌নি হাসপাতালে?

মঞ্জু আরও অসহিষ্ণু হয়ে উঠ্‌ল—আমি? গিয়েচি অবিশ্যি; কিন্তু মাত্তর একবার। তাও বহুদিন আগে।

—আচ্ছা মঞ্জু, রোগীদের চেহারা কি খুব বিশ্রী হয়ে যায় না কি রে?

—বিশ্রী? বাবা সে একেবারে যাচ্ছেতাই! শরীরে রক্তের লেশমাত্র থাকে না, চোক দুটোর দিকে তাকালে ভয় হয়। বুকের পাঁজরাগুলো বেরিয়ে পড়েছে, একখানা একখানা ক'রে গোণা যায়। আর দিনরাত্তির কেবল খক্-খক্—খক্-খক্ - ক'রে সব কাশছে, সে কাশির শব্দ কানে গেলে গায়ের ভেতরে কাঁটা দিয়ে ওঠে। সাধে কি আর বলে ক্ষয়রোগ—যক্ষ্মা ব্যাধি!! ইংরেজীতে টি. বি. বললে তবুও একটু মিষ্টি শোনায়, কিন্তু অসুখটা কোনগতিকেই মিষ্টি নয় ভাই। ওটা 'যক্ষ্মা'ই সত্যি সত্যি।

শুক্লা একটু অন্যমনস্কের মত কি ভাবছে।

একটু পরে বল্‌ল,- কিন্তু ভাই আমি কোনো পত্রিকায় একটা প্রবন্ধে একদিন কতকগুলি স্যানাটোরিয়াম পেশেণ্টের ছবি দেখেছিলুম। সে তো ভাই ভারি সুন্দর চেহারা, সবাই হৃষ্টপুষ্ট, সকলেরই হাসিমুখ।

খানিকটা নির্লিপ্তের মত মঞ্জু উত্তর দিল,—কি জানি হয়ত তারা সেরে গেছে!

শুক্লার মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে—সেরে যায়, তাই না ভাই? আর অল্প একটু আক্রমণের সুরুতেই যদি ধরা পড়ে, আর ঠিক চিকিৎসা হয়, তাহলে বোধ হয় সম্পূর্ণই সুস্থ হয়ে যায়,—তাই না?

—যেতেও পারে। কি জানি, বাবার মুখেই শুনি, ওরকম ভাল অনেকেই হয়, আবার দু-দিন বাদেই যা তাই! যাক্ গে ভাই, ওসব আমি জানি-টানিনে, আমি ত আর ডাক্তার নই!

কিন্তু তবুও শুক্লা ছাড়ছে না।

সে বল্‌ল—আমার কিন্তু কেমন বিশ্বাস ভাই, দেবী দার বেশী কিছুই হয়নি, নিশ্চয়ই তিনি ভাল হয়ে যাবেন।

ঠিক এই নামের ভয়টাই মঞ্জু করছিল।

শুক্লা একটু মুচকি হেসে বলছে,—দেখ মঞ্জু—

—কি?

কাল রাত্তিরে দেবী-দাকে স্বপ্নে দেখেছিলুম!

মঞ্জু এই নিয়ে একটু রসিকতা করতে চেষ্টা করে, শুক্লাকে একটু ঠাট্টা করতে চায়। কিন্তু জিব্‌টা যেন কেমন আড়ষ্ট হয়ে এল।

শুক্লার এখন চুপ করাই উচিত। কিন্তু শুক্লা বলছে,—আচ্ছা বলত মঞ্জু, দেবী-দার সঙ্গে আবার কবে আমার দেখা হবে?

একটু কাষ্ঠ হাসি হেসে মঞ্জু বলল,—বা রে, তা আমি কি ক'রে ব'লব? আমি ত আর গণকঠাকুর নই!

মঞ্জু কোনোমতে সায় দিয়ে চলেছে। কিন্তু শুক্লার তা'তে যেন মোটেই ভাল লাগ্‌ছে না। মঞ্জুটা বড্ড গম্ভীর হয়ে গেছে আজকাল। দেবী-দাকে আর ওকে নিয়ে আর একটু জোরালো ঠাট্টাও করতে পারে না? ও তাকে দিতে পারে না আরও একটু সুখের আঘাত? গায়ে প'ড়ে শুক্লা মঞ্জুকে উস্কে দিতে চেষ্টা করে—

কিন্তু মঞ্জু জোর ক'রে দুটো-একটা কথা মাত্র বলছে, হাসছেও যেন ইচ্ছার বিরুদ্ধে। অধিকাংশ সময়েই নিজে বোবা সেজে শুধু শুনেই যাচ্ছে, প্রসঙ্গটাকে এড়িয়ে যাবার একটা প্রচ্ছন্ন প্রয়াস!

শুক্লা তিন দিনের বেশী আর কিছুতেই রইল না। কাকীমাকে তবু যাহোক্ ক'রে বোঝান গেল, কিন্তু রাণুকে নিয়েই হ'ল মুস্কিল। রওনা হবার সময়ে সে যে শুক্লার আঁচলের কোণটা শক্ত ক'রে ধ'রে রাখ্‌ল আর কিছুতেই ছাড়ে না। অগত্যা ওর মা লাগালো একটা ধমক।

শুক্লার দিকে একবার ছল ছল চোখে তাকিয়ে রাণু তার কাপড়ের আঁচলটা ছেড়ে দিল। তার পর হঠাৎ এক দৌড় মেরে বাড়ির ভেতরে ঢুকে দরজার আড়ালে লুকিয়ে রইল। শুক্লার ভারি কষ্ট হয় ওর জন্যে, কিন্তু না গিয়ে উপায় নেই। চেঁচিয়ে বলল,—রাণু, আবার আসব আমি, লক্ষীটি, রাগ ক'রো না, কেঁদো না। বুঝেছ তো?

মঞ্জু বলল,—তোরও যে তাড়াতাড়ি। কোথায় থেকে যাবি পাঁচ-সাতটা দিন—

মঞ্জু এ কথা বলল বটে, কিন্তু ওটুকু হ'ল নিতান্তই ভদ্রতা আর বন্ধুত্বের খাতিরে। আন্তরিকতার বাষ্প কিছু আছে ব'লে মনে হয় না। চলে যাবে এটা নিশ্চিত জানে বলেই যেন মঞ্জু ও কথাটা বল্‌ল, কিন্তু শুক্লা যদি সহসা তার মত পরিবর্ত্তন ক'রে থেকেই যেতে চায় আর কয়েকটা দিন, তাহ'লে মঞ্জু হয়ত এক্ষুণি চমকে উঠবে। মুখে কিছু বলতে পারবে না, মনে মনে হ'য়ে উঠবে বিব্রত!

চারিটি দিনের পরে।

মঞ্জু পা টিপে টিপে দেবিদাসের ঘরে ঢুকছে।

শব্দ পেয়ে দেবিদাস তাকাল।

মঞ্জু এসে দেবিদাসের বিছানার ওপর ব'সে—পড়ে, দেবিদাসের হাতখানা নিজের হাতের ভেতরে টেনে নেয়। সারা মুখে চোখে একটু দুষ্টু হাসি।

দেবিদাস তার হাতখানা ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করে, কিন্তু মঞ্জুর জোরের সঙ্গে পেরে ওঠে না। বলে, তোমার সঙ্গে আর আমি কথা কইব না।

বড় বড় সুন্দর দুটি চোখ দেবিদাসের মুখের 'পরে তুলে মুখ টিপে টিপে মঞ্জু জিজ্ঞেস করে—কেন?

—ছেড়ে দাও বল্‌ছি, লাগ্‌ছে—

—ছাড়ব না, লাগুক্।

—এ কয়দিন কেন আসনি, শুনি?

—রাগ হয়েছে?

—হয়েছেই তো!

মঞ্জু দেবিদাসের গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেল্‌ল। বল্‌লে,—সত্যি রাগ করবেন না, দেবিদাস-দা। অসুখ করেছিল ব'লে আসিনি।

একটু উদ্বিগ্ন স্বরে দেবিদাস জিজ্ঞেস করল,—অসুখ করেছিল? এর ভিতরে আবার কি অসুখ করল?

—সেই দিন আপনার কাছ থেকে গেলাম না? রাত্তিরে খেয়ে উঠবার পরে হঠাৎ কি রকম একটা যে পেটের ব্যথা সুরু হ'ল, এত কষ্ট পেয়েছি যে তা আর কি বলব। সে রাত্তিরে তো ঘুমুতে পারলুমই না, তার পরের দুটো দিনও ঠিক একই রকম চলল। সত্যি দেবী-দা, এত ভয় হয়েছিল—আমি তো মনে করেছিলুম য়্যাপেণ্ডিসাইটিস্-টাইটিস্ই হ'ল

না কি আবার! যা-হোক পরশু দিন রাত্তির থেকে ব্যথাটা একটু কম্‌ল, কাল আর কিছু টের পাইনি। আজ তো বেশ ভালই আছি।

দেবিদাসের রাগ জল হয়ে যায়। এবারে আর মঞ্জুর হাত থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিতে কোনো চেষ্টা তো কর্‌লোই না বরং নিজেই ওর হাতখানিতে একটু চাপ দিল।

মঞ্জু জিজ্ঞেস করল,—আপনি কেমন আছেন, দেবী-দা?

—আমি? ভালই আছি।

একটু ক্ষণ পরে মঞ্জু বল্‌ল,—আচ্ছা দেবী-দা, আমার একটা অনুরোধ রাখবেন?

—কি অনুরোধ?

—রাখবেন না-কি বলুন?

—অনুরোধটা কি তাই আগে বল।

—বাঃ রে, আমি কি আর এমন কোনো অনুরোধ কর্‌ব যে, যা আপনার পক্ষে রাখা সম্ভব নয়? আগে স্বীকার করুন, তারপরে বল্‌ছি; ঘাবড়াচ্ছেন কেন?

হেসে দেবিদাস বল্‌ল,—আচ্ছা রাখব। এবারে বল।

—ঠিক?

—হ্যাঁ, ঠিক।

—আচ্ছা দেবী-দা, হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আপনি আমাদের কাছে থাক্‌বেন, কিছুদিন?

—দুঃ পাগল!

দেবিদাসের হাতখানা নিজের গালের সঙ্গে চেপে ধ'রে মঞ্জু বল্‌ল,—দুঃ না, থাক্‌তেই হবে। কেন, আপনার আপত্তি কি শুনি? এখানকার স্বাস্থ্য ভাল, কিছু দিন কাটিয়ে গেলে আপনি একেবারেই সেরে যাবেন। এখনই যদি কলকাতা যান আর খুব আবার পরিশ্রম সুরু করেন, হয়ত অসুখ আবার বেড়ে যাবে।···বলুন থাক্‌বেন?

দেবিদাস হাসতে থাকে।

—ও হাসিটাসি বুঝি না। থাকলে দোষ হয়ে যাবে?

—আচ্ছা, আচ্ছা দেখা যাবে। হাসপাতাল থেকে বেরনোর তো এখনও দেরি আছে!

—না, কথা আপনার এক্ষুণি দিয়ে রাখতে হবে। আমার বাবা, মা কিছু ভাববেন তাই মনে করেছেন? তাহলে আপনি চেনেন না ওঁদের। তাঁরা কিছু মনে তো কর্‌বেনই না, মা বরঞ্চ খুব খুশীই হবেন। বাবা ত মাঝে মাঝে মা'র কাছে আপনার প্রশংসা করেন কত—

দেবিদাস হাসছেই খালি।

মঞ্জু রাগ ক'রে বলে,—হাস্‌ছেন কেন অত শুনি, কথার জবাব না দিয়ে? থাক্‌বেন তো? উ?

—হাস্‌ব না? বেশ মজা লাগছে তোমার কথা শুন্‌তে।··· হ্যাঁ, কি ব'ললে? থাকার কথা কি বল্‌ছ?

—এতক্ষণ পরে থাকার কথা কি বলছ! যত ঢং!...ওসব চালাকি নয়, থাক্‌তেই হবে।

মঞ্জুর দুটি চোখ অনুনয়ে ভ'রে ওঠে, বুকটা দুলতে থাকে। নরম সুরে বলে—না দেবী-দা, আমার কথাটা রাখতেই হবে। আপনার কি ক্ষতি হবে, সেইটেই শুনি? খাওয়া-দাওয়ার অসুবিধা হবে?

—হ্যাঁ, সেইটেই ভাবছি। আমাদের খাওয়া-দাওয়া একটু স্বতন্ত্র রকমের কি-না, উপকরণও আলাদা, নিয়মও আলাদা। তোমরা পেরে উঠবে না।

—আচ্ছা, উপকরণ আর নিয়মটা শুনিই দেখি?

—শুনে আর কর্‌বে কি, ঘাবড়ে যাবে।

—কিচ্ছু ঘাবড়াবো না, আপনি বলুন।

দেবিদাস বলে—বেশ, বল্‌ছি। চার বার আমাদের খাওয়ার নিয়ম, বুঝেছ? আর সেটা একেবারে কাঁটায়-কাঁটায় সর্ব্বদা ঠিক হওয়া চাই। এদিক-ওদিক হ'লে—

—তাই-ই হবে। আমি নিজে আপনার—

—শুনে নাও। কি আমাদের খেতে হয় জানো? সকাল-বেলাটা আমরা খাই—কি বলে, সেরখানেক বাঘের দুধ। দুপুরবেলা—

—হয়েছে, বাজে কথা এখন রেখে—

—তারপরে দুপুরবেলা খাই মঙ্গলগ্রহে যে ধান হয় তারই চালের ভাত; বিকেলে খানিকটা গণ্ডারের মাংসের জুস্ খাই। আর রাত্তিরের খাওয়াটা আমার একটু হালকা হয়—এক কাপ চাঁদের আলো, খানিকটে যুঁইফুলের গন্ধের সঙ্গে মিশিয়ে—উঃ···

মঞ্জু ভীষণ জোরে দেবিদাসের হাতে এক চিম্‌টি লাগিয়েছে।

—কেমন লাগে, আমার সঙ্গে দুষ্টুমি?

—উঃ, কি দস্যি মেয়ে। দেখ তো কি রকম লাল হয়ে ফুলে উঠেছে ?

—ও ত কিচ্ছুই হয়নি, কথা না শুনলে আর একটা এমন জোরে—যে কেটে রক্ত বেরিয়ে যাবে...

তারপরেই খিল খিল ক'রে হাসি। সত্যি দেবী-দা, এতও জানেন আপনি, মা গো! আচ্ছা বেশ, তাই হবে। এখানে যা খাচ্ছেন আপনি, আমরাও আপনার জন্যে তাই-ই জোগাড় করব, না-হয় হাসপাতালের সঙ্গেই বন্দোবস্ত ক'রে নেব। আর বাবা নিজেই যখন রয়েছেন আপনার ভাবতে হবে না—

মঞ্জু দেবিদাসকে প্রায় আদ্দেক পথে বাগিয়ে নিয়ে এল।

যাবার সময়ে জিজ্ঞেস করল,—এখন কি করবেন দেবী-দা ?

দেবিদাস বল্‌ল,—এখন আধঘণ্টাখানেক একটু বিশ্রাম নেবো। তারপরে ভাবছি খান-দুই চিঠি লিখব।

—কার কাছে লিখবেন চিঠি, বাড়িতে ?

—হ্যাঁ, বাড়িতে তো একখানা লিখবই। আর লিখব লাহোরে আমার এক বন্ধুর কাছে।

মঞ্জু একটু চমকে ওঠে। জিজ্ঞেস করে—পাঞ্জাবী বুঝি ?

—না, না, বাঙালী। আমারই ক্লাস ফ্রেণ্ড। ওর কাছে অনেক দিন চিঠি দিই নি, একটা খবর দেওয়া উচিত। বিশেষ ক'রে—

দেবিদাস থেমে হাস্‌ল।

মঞ্জুর মুখখানা অল্প একটু শুকিয়ে উঠেছে। জিজ্ঞেস কর্‌ল, কি বিশেষ ক'রে ?

—ওর এক বোনকে, শুক্লা নাম ক'রে, আমি বেশ ভালবাস্‌তাম। তার খবরটাই পেতে ইচ্ছে হচ্ছে বড়।

—দেখুন দেবী-দা, কিছু মনে করবেন না, আমি আপনাকে একটি কথা বলতে চাই।

—কি কথা বল। মনে আবার কি করব ?

—দেখুন যদিও আমার বলাটা উচিত নয়, তবুও—

—আঃ, ঐ সব গৌরচন্দ্রিকা ছেড়ে দিয়ে...

—বেশ, বল্‌ছি। আপনি এটা হয়ত জানেন না, এই অসুখ যার হয়েছে, সুস্থ লোকেদের শতকরা নিরনব্বই জন তাকে কি রকম ঘৃণা আর ভয়ের চোখে দেখে, বুঝেছেন! তা সে বন্ধুই হোক, আত্মীয়ই হোক, কুটুম্বই হোক, পরিচিতই হোক আর অপরিচিতই হোক। এই হাসপাতালের একটি পেশেণ্ট এক দিন বাবার কাছে দুঃখ কর্‌ছিল। সে তার নিজের বড় ভায়ের কাছে চিঠি লেখে—সেই চিঠি নাকি ডাকঘরের ছাপ দেখেই পড়া তো দূরে থাক একেবারে না খুলেই উনুনের ভিতরে দিয়ে তাঁর দাদা পুড়িয়ে ফেলেন। শুধু এটা ব'লে নয়, আরও আমি এমন সমস্ত ঘটনা জানি, যাতে ক'রে আমার মনে হয় বাইরের লোকের সঙ্গে আপনাদের কোন সংস্রব না রাখাই ভাল। অনেক বিষয়েই তাদের কাছ থেকে আপনাদের আঘাত পেতে হবে। কেন মিথ্যে—

একটু বাধা দিয়ে দেবিদাস বল্‌ল,—অবিশ্যি তুমি যা বলেছে ঠিকই। আমিও যে একটু একটু না জানি তা নয়। তবে এরা সে রকম নয়। আমার সঙ্গে—

ঘাড় নেড়ে মঞ্জু বল্‌ল,—মুখে কেউই হয়ত কিছু বল্‌বে না, চক্ষুলজ্জাও ত আছে! কিন্তু আপনাকে এড়িয়ে চল্‌বার জন্যে কেউই কোন চেষ্টার ত্রুটি কর্‌বে না। আপনার অল্পদিন হ'ল অসুখ হয়েছে, এখনও হয়ত অনেকের সহানুভূতি পাবেন, কিন্তু দিন যাবার সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পাবেন সবাই—এমন কি নিজের পরমাত্মীয়রাও এক এক ক'রে কেমন সরে পড়ে। সেরে উঠুন দেবী-দা, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, বন্ধুদের সঙ্গে বন্ধুত্ব তখন কর্‌বেন—অটুট থাকবে। ওসব কষ্টকর বন্ধুত্ব রক্ষার এখন কিছু দরকার নেই।

তারপরে হাসতে হাসতে—এমন কি কোনো শুক্লারো তখন অভাব ঘটবে না—

দেবিদাসও হাসতে লাগল। আর কোনো কথা বাড়াল না।

অনেক দিন পরে শুক্লা কল্‌কাতায়।

শুক্লা একেবারে বিরক্ত হয়ে উঠেছে—দিবারাত্তির স্কুল-কর্তাদের কাছ থেকে ট্রেনিং পড়বার তাড়নায়। ট্রেনিং না পাস ক'রে এলে চাকুরি থাকে না।

কিছু দিন এক রকম ক'রে এড়িয়ে চলে যখন আর কিছুতেই পারা যায় না, অবশেষে শুক্লা ট্রেনিং পড়ারই বন্দোবস্ত করে।

পাস ক'রে বেরিয়ে আসতেই লাহোর থেকে আসে ওর দাদার একখানা চিঠি।

দাদা লিখেছেন সে যদি চায় তবে ওখানে কোনো একটি ইস্কুলে সে ভাল কাজ নিয়ে যেতে পারে, মাইনে অনেক বেশী দেবে। স্কুল কমিটির লোক তাঁর বিশেষ জানা, আপত্তি যদি না থাকে তবে যেন একটা টেলিগ্রাম ক'রে দিয়েই সে দু-তিন দিনের ভিতর রওনা হয়ে আসে।

শুক্লা মন স্থির ক'রে ফেলে। নূতন দেশের, দূর দেশের একটা মোহ—তা ছাড়া ভবিষ্যতও ভাল। সে নিজের মত জানিয়ে দাদাকে তার ক'রে দেয়।

ওর মনে পড়ল মঞ্জুদের কথা। ওঃ, কতদিন ওদের খবর নেই।

ওদের ওখানে থেকে কল্‌কাতায় ফিরে আসবার পরে মঞ্জুর কাছ থেকে মাত্র খান-দুই চিঠি এসেছিল, তার পরে আর আসেনি। ওরও চিঠিপত্র লেখবার তেমন অভ্যাস নেই—তা ছাড়া এতদিন নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকতে হয়েছে সব সময়ে।

স্বপ্নের মত সেই জায়গাটিকে মনে পড়ে—বিশাল লাল মাটির মাঠ, সেই সূর্য্যাস্ত, হাসপাতাল, শিবশম্ভুবাবু, কাকীমা, মঞ্জু, রাণু, বুবু...

বুবুটা হয়ত এখন হেঁটে বেড়াতে পারে: হয়ত খুব দুষ্টু হয়েছে। আধ আধ কথাও ফুটেছে মুখে!

শুক্লা সেইদিনকার ডাকেই একখানা পোষ্টকার্ড মঞ্জুকে লিখে দেয়, সে অমুক ট্রেনে অমুক দিন লাহোর যাচ্ছে। ওদের ওখানে ট্রেন পৌঁছবে বিকেলবেলা, কাজেই অসুবিধাও কিছু হবে না—সে যেন রাণুকে সঙ্গে ক'রে আর বুবুকে কোলে ক'রে ষ্টেশনে প্ল্যাটফরমের ওপরে অবিশ্যি অবিশ্যি থাকে।

সমস্ত বন্দোবস্ত ক'রে শুক্লা দু-দিন পরেই রওনা হ'ল কল্‌কাতা থেকে।

* * *

প্ল্যাটফরমে গাড়ী ঢুকতেই শুক্লা উৎসুক নয়নে চারি দিকে তাকাল।

কিন্তু কাউকে দেখতে পাওয়া গেল না। মঞ্জুরা কি তাহলে আসেনি? চিঠি কালকের ডাকেই ওদের পাওয়া উচিত, কোনো গোলমাল হবারও তো কথা নয়!

গাড়ী থামে।

জানালা দিয়ে মুখ বের ক'রে শুক্লা দুটি চোখ দিয়ে সারা প্ল্যাটফরম খুঁজছে!

হঠাৎ ভিড়ের ভেতর দিয়ে গাড়ীর দিকে তাকাতে তাকাতে শিবশম্ভুবাবু আসছেন,—শুক্লা দেখতে পেল।

কাছে আসবামাত্র হাসিমুখে নমস্কার ক'রে বল্‌ল,—ভাল আছেন কাকাবাবু? মঞ্জু কই? রাণু কই? ওরা এল না কেন?

শিবশম্ভুবাবুও স্মিতমুখে শুক্লার কুশল জিজ্ঞেস করলেন, বল্‌লেন,—কতদিন পরে আবার দেখলুম তোমাকে!...হাঁ, মঞ্জুর কাছে তুমি যে চিঠিটা দিয়েছ সেটা পেলুম আমিই। মঞ্জু ত এখানে নেই, আর রাণুটার হয়েছে এমন জ্বর—

শুক্লা জিজ্ঞেস করল,—ও! মঞ্জু এখানে নেই? কোথায় সে?

—সে ত লক্ষ্নৌ গেছে কিছুদিন হ'ল—জামায়ের কাছে। কেন, তোমায় চিঠিপত্র দেয় না?

শুক্লা অত্যন্ত অবাক হ'য়ে জিজ্ঞেস করে,—জামায়ের কাছে? কবে ওর বিয়ে হ'ল কাকাবাবু? আমি ত কিছুই জানিনে! আমার কাছে ও আজকাল চিঠিপত্র মোটেই লেখে না। কার সঙ্গে বিয়ে হ'ল?

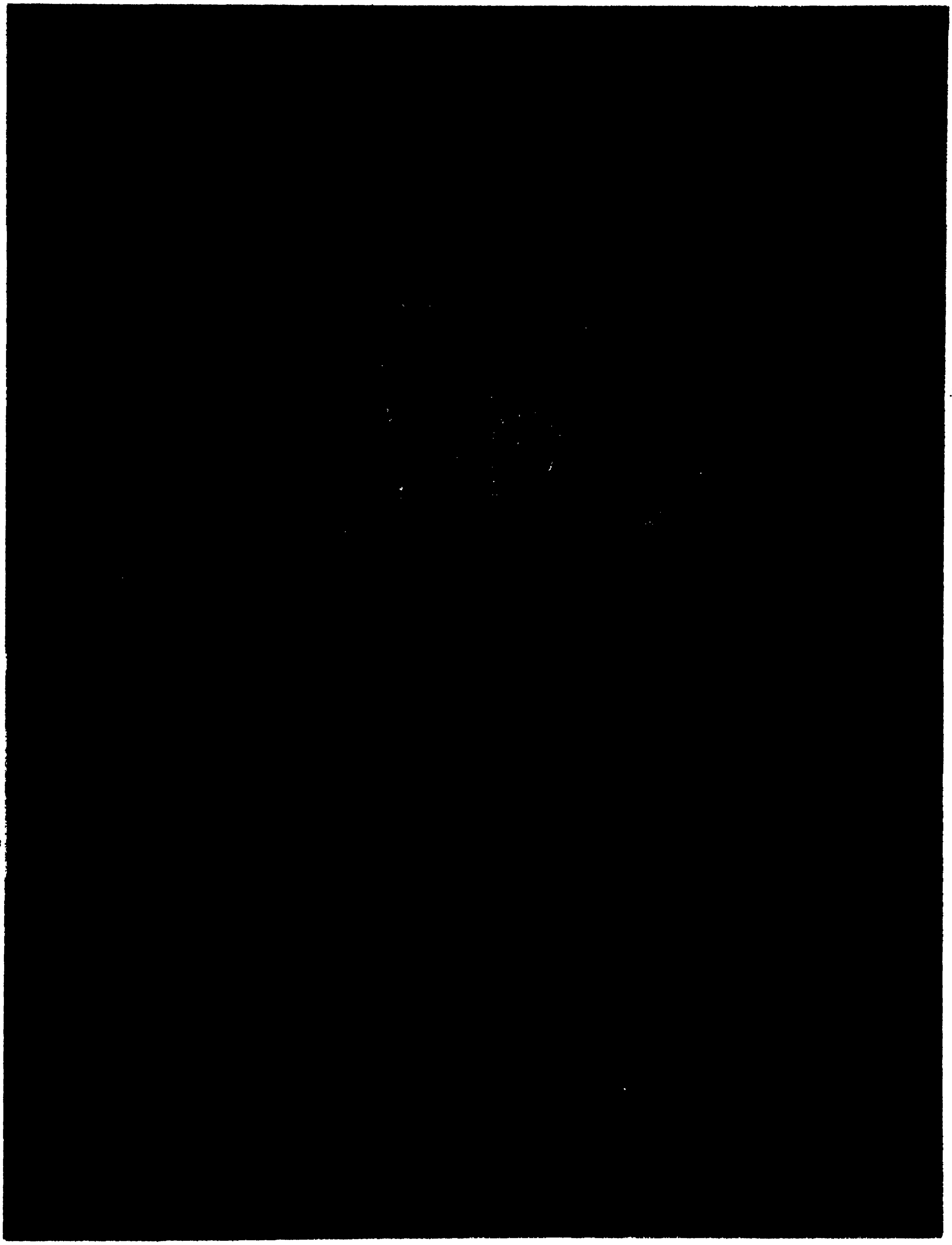
—বিয়েটা এক রকম হঠাৎই হ'ল, আর হ'ল, আমারই এক পেশেন্টের সঙ্গে। ছেলেটির নাম দেবিদাস রায়—

শুক্লার নিঃশ্বাস যেন চট্‌ ক'রে বন্ধ হয়ে আসে—

শিবশম্ভুবাবু বল্‌তে থাকেন—ছেলেটি বেশ ভাল, সম্পূর্ণ সুস্থও হয়ে গেছে। লক্ষ্নৌ কলেজে এই অল্পদিন হ'ল প্রফেসারী পেয়েছে, মঞ্জুকে সেখানেই নিয়ে গেছে।...একটু থেমে শিবশম্ভুবাবু বলেন,—ওঃ হোঃ, কেন মঞ্জু দেবিদাসের কথা তোমায় কিছু বলেনি? তুমি সেবারে যখন আমাদের এখানে দু-দিন ছিলে, দেবিদাস ত সেই সময়েই হাসপাতালে ছিল।

তারপরে মাথা চুলকে একটু হেসে বললেন,—আজকালকার মেয়ে মা, দেবিদাসের সঙ্গে আলাপ হয়ে তাকে ওর বড় মনে ধরে গেল। হাসপাতাল থেকে ডিস্‌চার্জ্‌ড্‌ হয়ে দেবী আমাদের কাছেই ছিল। তোমার কাকীমারও ছেলেটিকে পছন্দ হয়ে পড়ল বেজায়। আমিও দেখলুম—

সরল প্রাণ প্রৌঢ় হাসতে লাগলেন।



চিত্রাঙ্কন

শ্রীরামগোপাল বিজয়বর্গীয়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

একটা ঢোক্ গিলে শুক্লা জিজ্ঞেস করল,—বিয়ে কোথায় হ'ল ?

—বিয়েও লক্ষ্ণৌয়েই হয়েছে। সেখানে আমার ছোটভাই ওকালতী করে, তারই বাড়িতে হ'ল। সবাই সেখানেই একত্র হয়েছিলুম......

এর ভিতরে গাড়ী ছাড়বার ঘণ্টা পড়ে গেল।

শিবশম্ভু বল্লেন,—নেমে দুটো দিন থেকে গেলে পার্তে না, মা ? তোমার কাকীমা তো তোমাকে আবার দেখবার জন্যে অস্থির। ষ্টেশনেই আস্তে চেয়েছিলেন, কিন্তু রাণুটাকে আবার কেমন ক'রে ফেলে আসেন—

শুষ্ক দীপ্তিহীন মুখে একটু ম্লান হেসে শুক্লা বলল,—এবারে তো আমার নামা অসম্ভব কাকাবাবু, কাকীমাকে আমার কথা বলবেন। এর পরে কোনো এক ছুটিতে আবার এসে দেখা করব।

হুইস্‌ল্ দিয়ে গাড়ী ছেড়ে দিল।

শিবশম্ভুবাবু বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। শুক্লা টল্‌তে টল্‌তে জানালার উপর মাথাটা কাৎ ক'রে রেখে বেঞ্চের উপর কোনমতে বসে পড়ল, কোঁলের ওপর হাত দুখানা থর্ থর্ করে কাঁপতে থাকল।

ট্রেনখানা সিগন্যাল পেরিয়ে গতি বাড়িয়ে দিল, মাঠের খোলা বুকের ওপর দিয়ে ছুটতে ছুটতে চাকায় চাকায় শব্দ হ'তে লাগল—ঝক্ ঝক্ ঝক্, ঝক্ ঝক্ ঝক্, ঝক্ ঝক্ ঝক্···

কল্যাণব্রত সঙ্ঘ

শ্রীঅনুরূপা দেবী

যে আকস্মিক দৈবদুর্ব্বিপাকে উত্তর-বিহারের সমৃদ্ধ জনপদ-সমূহ দুই মিনিটের মধ্যে মহাশ্মশানে পরিণত হইল—অন্যূন পঁচিশ সহস্র নরনারী নিহত এবং লক্ষাধিক আহত হইল, সেই প্রলয়কাণ্ডের সহিত আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটিয়াছে। সেই পরিচয়ের ফলে আমার জীবনের ক্ষতির অঙ্ক যে কত বড়, তাহা আমিই জানি। যাহা আমার একান্ত পারিবারিক ঘটনা, যে শোক আমার একান্ত নিজস্ব তাহা লইয়া আলোচনা করিবার শক্তি বা প্রয়োজন নাই। আমি নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ হইতে ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিতেছি; এখনও শয্যাগত, এখনও ভাল করিয়া ভাবিবার বা কোনও কথা গুছাইয়া বলিবার ক্ষমতা ফিরিয়া পাই নাই। দুর্গতসেবার ক্ষেত্রে যেখানে আমি সাধারণের সহিত সম্পর্কিত, সেখানকার সম্বন্ধে দুই চারি কথা নিতান্ত প্রয়োজনবোধে বলিতেছি।

যখন বিপন্ন বিহারের সাহায্যার্থ বড়লাটের, মেয়রের বা কংগ্রেসের বিরাট সেবা প্রতিষ্ঠানের কোনও আয়োজন হয় নাই, যখন বাহির হইতে কোনও সাহায্যের আশামাত্র ছিল না,—যখন সহস্র সহস্র বিপন্ন নরনারীর শোক ও আঘাতের অতি তীব্রবেদনা নিজের দেহ-মনে অনুভব করিয়া আপনার অক্ষমতাকে ধিক্কার দিতেছিলাম, তখন আমার কোনও স্নেহাস্পদ আত্মীয় ও কলিকাতা হইতে আগত তাঁহার এক বন্ধুর উৎসাহে মজঃফরপুরের বাঙালী কর্ম্মিগণের কর্ম্মশক্তিকে একত্র করিয়া "কল্যাণব্রত সঙ্ঘ" স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা আমার মনে জাগে। প্রথমতঃ, আমার সেই শয্যাশায়ী অবস্থায় এক প্রকার শূন্যহস্তে এই ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের কাজ আরম্ভ হয়। তখন ভগ্নস্তূপের ভিতর হইতে মৃতদেহ বাহির করিয়া তাহার দাহের ব্যবস্থা করা, বিপন্ন পথবাসী নরনারীকে কাপড় ও কম্বল দিয়া সাহায্য এবং ঔষধ দিয়া সেবা করা এবং যাঁহাদের অন্যত্র আত্মীয়বন্ধু আছেন তাঁহাদিগকে সেখানে পাঠানোর গাড়ীভাড়ার ব্যবস্থা করা—ইহাই ছিল প্রধান কাজ। যেখানে নিজেদের সামর্থ্যে কুলায় নাই সেখানেই অপরের সাহায্য লইতে হইয়াছে। আমার আত্মীয়বন্ধুগণের সাহায্যে ও স্থানীয় কর্ম্মিগণের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে সঙ্ঘ যখন কার্য্যক্ষেত্রে কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছে তখন দৈনিকপত্রে আমার আবেদনের ফলে বাহিরের

সাহায্যও কিছু কিছু আসিতে আরম্ভ হয়। বাহির হইতে অর্থসংগ্রহের চেষ্টায় বিলম্ব ঘটিয়াছিল, পরিচিত ও আত্মীয়ের মধ্যেও অনেকে ইতিমধ্যে অন্যত্র সাহায্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেবার ক্ষেত্রে প্রথম হইতেই আত্মনিয়োগ করিতে



শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

সমর্থ হওয়ার ফলে অল্পবিত্ত কল্যাণব্রত সঙ্ঘের সেবকগণ অসময়ে বস্ত্র ও আচ্ছাদন দিয়া ধনীদরিদ্রনির্ব্বিশেষে শত শত বিপন্নের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন। তারপর একে একে ভিন্ন ভিন্ন সেবাপ্রতিষ্ঠান কাজে নামিলেন, কিন্তু বাহির হইতে আসিয়া চিরদরিদ্র ভিক্ষুক ও ভূমিকম্পে প্রকৃত বিপন্নের মধ্যে চিনিয়া লওয়ার সুব্যবস্থা করিতে না পারায় তাঁহাদের কাছে অনেকেই প্রয়োজনীয় ন্যায্য সাহায্য পাইল না। আবার অনেকে তৎকালীন প্রয়োজনের অধিক সাহায্য পাইয়া গেল। অনেক ক্ষেত্রে কাজের চেয়ে বিজ্ঞাপনের মোহ বড় হইয়া উঠিল। অনেক ক্ষেত্রে স্থানের সহিত পরিচয় না থাকায় বিপন্নের সন্ধান মিলিল না, স্বেচ্ছাসেবকদল শহরে কর্ম্মাভাবে বসিয়া বসিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, গ্রামে সাহায্য পৌঁছিল না। বিশেষ করিয়া মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়—কি বাঙালী, কি বিহারী,—যাঁহারা শহরের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে অধিকতম ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা পথের মধ্যে ভিক্ষার কোলাহলে যোগ দিতে অসমর্থ হওয়ায় সর্ব্বত্রই অবহেলিত হইতে লাগিলেন। তখন কল্যাণব্রত সঙ্ঘের কর্ম্মিগণ প্রয়োজনের তাগিদে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের দুঃখদুর্দ্দশার প্রতিকারে বিশেষভাবে লাগিলেন,—গোপনে সন্ধান লইয়া তাঁহাদের ঘরে ঘরে সাহায্য পৌঁছাইয়া দেওয়া হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে স্থানীয় বাঙালী-সাধারণের সম্পত্তি 'ওরিয়েণ্ট ক্লাবে'র মাঠে সারি সারি কুটীর নির্ম্মিত হইতেছিল। সেখানে বিভিন্ন সেবাপ্রতিষ্ঠানের সহযোগে চিকিৎসার, অন্নবস্ত্রের এবং বাসের সাধ্যমত সুবন্দোবস্ত করা হইল। যে-সমস্ত মধ্যবিত্ত পরিবার এখানে আশ্রয় লইলেন তাঁহাদের মধ্যে বিহারীও ছিলেন, কিন্তু অধিকাংশই ছিলেন বাঙালী; কারণ প্রথমতঃ, প্রবাসে গৃহহীন হইয়া আত্মীয়গৃহে আশ্রয় লওয়ার সুযোগ বিহারীদের মত তাঁহাদের ছিল না; দ্বিতীয়তঃ আমাদের সেবাসঙ্ঘের কর্ম্মিগণ প্রবাসী গৃহহীন বাঙালী পরিবারগুলির প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাত থাকায় তাঁহাদিগকে সাহায্য দিবার ব্যবস্থা করা সহজেই এবং শীঘ্রই সম্ভব হইল। কয়েক জন মধ্যবিত্ত ও সম্ভ্রান্ত বিহারী বন্ধুর মারফত বিহারী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের বাড়ি বাড়ি কম্বল ও কাপড় পৌঁছানো চলিতেছিল এবং



কল্যাণব্রত সঙ্ঘের কুটীরশ্রেণী (সম্মুখ দৃশ্য)

দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে স্থানীয় বাঙালী বিহারী সম্ভ্রান্ত ও বিশ্বস্ত বন্ধুগণের পরামর্শমত কম্বল ও কাপড় বিতরণ করা হইতেছিল। যাহারা নিজ নিজ ভগ্নস্তূপের নিকট কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দিতে বলিয়াছিলেন তাঁহাদিগের কথা রাখা তখন সম্ভব হয় নাই। কারণ প্রথমতঃ অর্থাভাব ও লোকাভাব

বশতঃ সর্ব্বত্র সুবন্দোবস্ত করা সম্ভব ছিল না; দ্বিতীয়তঃ, করোগেটেড আয়রণ দিয়া ঐ সকল স্থানে ভাল করিয়া ঘর ছাইয়া দিবার জন্ম চেষ্টা করা হইতেছিল। এই সময়ে বিপন্নের দুঃখের ভরা পূর্ণ করিতে বৃষ্টি নামিল। সদ্যপ্রসূত শিশু, আহত ক্ষুৎপীড়িত নরনারী দারুণ শীতে দিবারাত্র ভিজিতে লাগিল। আমাদের ওরিয়েণ্ট ক্লাবের মাঠে জল দাঁড়ায় না, কুটীরগুলির আচ্ছাদন পুরু ও বাসের সুবন্দোবস্ত মনোমত হওয়ায় যাঁহারা পূর্ব্বে আসিতে চান নাই এরূপ অনেকে আসিয়া সেখানে আশ্রয় লইলেন। কিন্তু সে কয়জন? মানুষের দুঃখ-ধৈর্য্যের সীমা ছাড়াইয়া গেল, সাম্প্রদায়িক সেবাদলগুলির সেবায় কোথাও কোথাও অত্যন্ত স্বাভাবিক অথচ বিপন্নের দৃষ্টিতে অত্যন্ত কুৎসিত প্রাদেশিকতা আত্মপ্রকাশ করিল। সেবাকার্য্যে প্রাদেশিকতার অভিযোগে এই সময়ে অনেকেই অভিযুক্ত হইয়াছেন, সেণ্ট্রাল রিলীফ কমিটির সম্বন্ধেও প্রাদেশিকতার অভিযোগ আনিয়াছিল। বাহিরের সংবাদপত্র নিয়মিত পাইবার বা পড়িবার সুযোগ সে-সময় আমাদের কর্ম্মিগণের



কল্যাণব্রত সঙ্ঘের কুটীরশ্রেণী (পিছনের দৃশ্য)
বাঙালী মহিলারা নূতন ঘরকন্না লইয়া ব্যাপৃত

ছিল না, যখনই একখানা কাগজ হাতে আসিত তখনই দেখিতেন অমুক ফণ্ডে এত লক্ষ টাকা উঠিল—অমুক প্রতিষ্ঠান এত হাজার কম্বল পাইলেন। মানুষ যখন শীতে জমিয়া মরিতেছে তখন কে কোথায় কি পাইল-না-পাইল তাহার খোঁজ লইবার আস্থা তাহার থাকে না। আমি পাইলাম না, সেবাসমিতিগুলির হাতে টাকা থাকিতে কম্বল থাকিতে আমি না খাইয়া বৃষ্টিতে ভিজিয়া মরিলাম—এই অভিযোগ সে যদি তখন তীব্রকণ্ঠে প্রচার করে তবে তাহাকে সমালোচনা করিবার অধিকার আর যাহার থাকে থাকুক, আমার নাই। অবশ্য সত্যের সহিত মিথ্যা মিলিয়াছে, প্রকৃত অবহেলিতের সহিত স্বার্থান্বেষী বিদ্বেষবুদ্ধিপরায়ণের কণ্ঠ মিলিয়াছে। কিন্তু অশুভের মধ্যেও



কল্যাণব্রত সঙ্ঘের কুটীর
কুটীরগুলি খড় ও ত্রিপাল দিয়া নির্ম্মিত

শুভের উৎপত্তি হয়। এই অবস্থার সৃষ্টি না হইলে হয়ত আজ সেবার সুবন্দোবস্ত করিবার জন্য দেশনেতৃগণ যেরূপ দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ও তৎপর হইয়াছেন তাহা হইতেন না। আমার মনে হয় অবস্থার গুরুত্ব বিহারের নেতৃগণ বা সরকার বুঝিতে পারেন নাই, না হইলে "বাহিরের কর্ম্মীর প্রয়োজন নাই" এ-কথা তাঁহারা বলিতে পারিতেন না। বাহিরের প্রকৃত কর্ম্মী, উৎসাহী কর্ম্মীর প্রয়োজন তখনও ছিল, এখনও আছে এবং আরও বহুদিন থাকিবে। তাঁহাদের আসিতে নিষেধ করায় তখন যে গুরুতর ভুল হইয়াছে তাহার ক্ষতিপূরণ আজ আর হওয়া সম্ভব নয়।

যাহা হউক, বাংলা দেশে এই সময়ে বাঙালী বিহারীর মধ্যে ভেদবুদ্ধির আন্দোলন অতি প্রবল হইয়া উঠে। ঐ আন্দোলনের গুরুত্ব সম্বন্ধে আমাদের কোনও ধারণাই ছিল না, সেণ্ট্রাল রিলীফ কমিটির স্থানীয় কর্ম্মকর্ত্তার নিকট সাধারণের জন্য কাপড় ও কম্বল এবং মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের জন্য কুটীর নির্ম্মাণের সাহায্য চাহিয়া চাহিয়া আমরা যখন একরূপ হতাশ হইয়াছি, তখন কলিকাতার মেয়র আসিয়া আমাদের কাজের সুবন্দোবস্ত দেখিয়া সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। ইহার পরেই শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত আসিলেন।

প্রদেশে প্রদেশে বিদ্বেষবুদ্ধির স্রোত যে কি ভীষণভাবে প্রবাহিত হইতেছে তৎসম্বন্ধে তিনিই আমাদিগকে সম্যকরূপে অবহিত করেন এবং উহা রোধ করিবার জন্য আমাদের সাহায্য চান। "কল্যাণব্রত সঙ্ঘ" কেবল বাঙালীর জন্য কাজ করিতেছে



কল্যাণব্রত সঙ্ঘের কুটীরশ্রেণী
আশ্রিত বাঙালী পরিবারের গৃহস্থালী।
ল্যাম্পপোস্টটি সঙ্ঘের দ্বারা প্রদত্ত

বলিয়া কথা উঠিয়াছিল, আমি তাহার প্রতিবাদ করি। "কল্যাণ-ব্রত সঙ্ঘে"র কাপড় কম্বল ও অন্যান্য সাহায্য বাঙালীর চেয়ে বিহারী বিপন্নই অধিক পাইয়াছে, কুটীরগুলি যে অধিকাংশই বাঙালী মধ্যবিত্তদ্বারা অধিকৃত হইয়াছিল তাহা নিছক প্রয়োজনের তাগিদে। বাংলা দেশের বিভিন্ন সংবাদপত্রে আমাদের সম্বন্ধে কোনও আলোচনা হইয়াছে কি না তাহা আমরা জানিতাম না। সেণ্ট্রাল রিলীফের নিকট সাহায্য না পাইয়া বিরক্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু সে সাহায্যও বাঙালী বিহারী সকলের জন্যই চাহিয়াছিলাম। সন্ধান লইয়া জানিলাম, বহু সম্ভ্রান্ত বিহারী-পরিবার সাহায্য চাহিয়াও তাঁহাদের নিকট কিছু পাইতেছেন না, অব্যবস্থা ও অনভিজ্ঞতার দোষে এবং কর্ম্মতৎপরতার অভাবে সেণ্ট্রাল রিলীফ কমিটির স্থানীয় কর্ম্মকর্ত্তারা বৃষ্টির কয় দিনের মধ্যে অনেকেরই বিরাগভাজন হইয়াছেন। এক্ষেত্রে বাঙালী-বিহারী যেখানে সমান ভাবেই অবহেলিত এবং শ্রদ্ধেয় রাজেন্দ্র-প্রসাদ, সতীশবাবুর মত দেশনেতৃগণ যেখানে সমস্ত অভাব-অভিযোগের আশু প্রতিকারে চেষ্টিত, সেখানে ভেদবুদ্ধিকে জাগাইবার চেষ্টা আমি অন্যায় বলিয়া মনে করিলাম। এই মহাশ্মশানে দাঁড়াইয়া ভারতের জাতীয় জীবনের সন্ধিক্ষণে এই প্রাদেশিকতার দ্বন্দ্ব জাগাইয়া তোলার চেয়ে সর্ব্বনাশকর আর কিছু নাই। তবে এ-সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, বাংলা দেশের সংবাদপত্রসমূহ বাদপ্রতিবাদে নিরস্ত হইলেও বিহারের সংবাদপত্রে বিপন্ন প্রবাসী বাঙালীকে এখন পর্য্যন্ত আক্রমণ চলিতেছে বলিয়া অভিযোগ আসিতেছে। তাহা সত্য হইলে দুঃখের কথা। যাঁহারা ভেদবুদ্ধির স্রোত বন্ধ করিতে সকলের আগে দাঁড়াইয়াছেন, তাঁহাদের কর্ত্তব্য হইবে উভয় পক্ষকেই মুখ বন্ধ করিতে উপদেশ দেওয়া এবং অতীত দ্বন্দ্বের স্মৃতি পর্য্যন্ত যাহাতে লুপ্ত হয় তাহার জন্য চেষ্টিত হওয়া। আশা করি সাহায্যদানে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ আর যাহাতে না-উঠে সেজন্যও দেশনেতৃগণ সতর্ক থাকিবেন।

যাহা হউক, গণ্ডগোল অনেকটা মিটিয়াছে, সেণ্ট্রাল রিলীফ কমিটি শ্রদ্ধেয় রাজেন্দ্র বাবু, সতীশ বাবু প্রমুখ দেশনেতৃগণের প্রেরণায় ও উপদেশে গ্রাম ও নগর পুনর্গঠনের কার্য্যে সুপথে পরিচালিত হইতেছে। এক্ষণে একটা কথা উঠিতে পারে, তবে একটা ক্ষুদ্র পৃথক সেবাপ্রতিষ্ঠানের, "কল্যাণব্রত সঙ্ঘের" অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা কি? সেই কথাই বলিব। গত দুর্ঘটনায় প্রবাসী বাঙালী মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছে যে,



ওরিয়েণ্ট ক্লাবের প্রাঙ্গণে কল্যাণব্রত সঙ্ঘের কুটীর নির্ম্মাণ

আকস্মিক নৈসর্গিক বিপৎপাতে সে কিরূপ অসহায় এবং সেই সময়ে পরহস্তগত লক্ষ লক্ষ মুদ্রা অপেক্ষা নিজহস্তগত দশ টাকার মূল্য কত বেশী। এ-কথা মুক্তকণ্ঠে বলা যায় যে, সময়ে সুব্যবস্থা হইলে কয়েক সহস্র জীবন উত্তর-বিহারে অতি অল্লায়াসে বাঁচানো যাইত। ভূমিকম্পের বহুদিন পর পর্য্যন্ত ভগ্নস্তূপ হইতে জীবন্ত মানুষ বাহির হইয়াছে, বিনা চিকিৎসায় বা নাম-মাত্র চিকিৎসায় বহু আহত মরিয়াছে। বিপদের সময়ে স্থানীয়

রামকৃষ্ণ মিশন, সংসঙ্ঘ প্রভৃতি এবং আমাদের সেবাসঙ্ঘের মত ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানগুলিও বিপন্নের যে উপকার করিতে পারিয়াছে বাহিরের কোনও বিরাট প্রতিষ্ঠান তাহা করিতে পারে নাই। যে-সমস্ত সেবা-প্রতিষ্ঠান (ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন, হিন্দুমিশন, নগেন্দ্র সেন সাহায্য সমিতি, ভোলানন্দ গিরি মিশন প্রভৃতি) সর্ব্বপ্রথম বিপন্নকে বাঁচাইতে আসিয়াছিল তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ কর্ম্মীই বাঙালী, মাড়োয়ারী রিলীফ প্রভৃতি বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক দলগুলির মধ্যেও বাঙালী কর্ম্মী ছিলেন। তাঁহারা বিপদের দিনে দেশভেদ সম্প্রদায়ভেদ যত সহজে ভুলিয়াছিলেন তাহা অন্যের পক্ষে সহজ বলিয়া বোধ হয় না। ভূমিকম্পের ধ্বংসলীলা এখনও শেষ হয় নাই, গ্রাম ও নগর পুনর্গঠনের কাজ এখনও বহুদিন ধরিয়া চলিবে। প্রয়োজনের শতাংশের একাংশও চাঁদা উঠে নাই। এই সময়ে সেবাপ্রতিষ্ঠান যত বেশীই থাকুক না কেন, তাহারা যদি প্রকৃতপক্ষে কাজ করিতে চায়, তবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত হইবে না। উত্তর-বিহারে প্রবাসী বাঙালীদিগের একটি স্থায়ী সেবাপ্রতিষ্ঠান থাকিলে বাঙালী বিহারী সকলেই তাহার সাহায্য পাইবেন, অধিকন্তু প্রবাসী বাঙালী নিজেকে বিপদের দিনে কিছু নিরাপদ বোধ করিবেন। যাঁহারা ভিক্ষায় অভ্যস্ত নহেন তাঁহাদিগের জন্যই এই সেবাসঙ্ঘ বিশেষভাবে চেষ্টিত থাকিবে। অন্য কোনও প্রতিষ্ঠানের সহিত ইহার বিরোধ নাই, কাহারও বিরুদ্ধে ইহার কোনও অভিযোগ নাই, কাহারও সহিত ইহার প্রতিযোগিতা নাই, ইহা নিছক প্রয়োজনের তাগিদে আরব্ধ, নিছক প্রয়োজনের তাগিদেই ইহাকে বাঁচানো দরকার। মজঃফরপুরের সমস্ত সম্ভ্রান্ত বাঙালীই ইহার সহিত প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে জড়িত। আমি সেখান হইতে চলিয়া আসিলেও সুযোগ্য বিশ্বস্ত লোকের হস্তে ভার অর্পণ করিয়া আসিয়াছি এবং নিয়মিত



কল্যাণব্রত সঙ্ঘের একটি কুটীর
একটি বাঙালী মহিলা রন্ধনকার্য্যে ব্যাপৃত

সংবাদ লইতেছি। আশা করি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশস্থ শিক্ষিত সহৃদয় বাঙালী এই ক্ষুদ্র সেবাসঙ্ঘটির উপর কৃপাদৃষ্টি রাখিবেন এবং অর্থ দিয়া ও উপদেশ দিয়া ইহাকে সাহায্য করিবেন। যাঁহাদের নিকট হইতে ইতিমধ্যে সাহায্য পাইয়াছি তাঁহাদিগকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি, বিপন্নের সেবায় তাঁহাদের অর্থের সদ্ব্যয় হইবে।*

* শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর ছবিটি ছাড়া এই প্রবন্ধের অন্য সমুদয় ফোটোগ্রাফ শ্রীযুক্ত প্রদ্যোৎকুমার সেনগুপ্তের তোলা এবং তাঁহাদের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

দৃষ্টি-প্রদীপ

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রায়ই আমি আর সীতা কার্ট রোড ধ'রে বেড়াতে বেরুই। আমাদের বাগান থেকে মাইল দুই দূরে একটা ছোট ঘর আছে, আগে এখানে পোষ্ট আপিস ছিল, এখন উঠে যাওয়াতে শুধু ঘরটা পড়ে আছে—উম্‌প্লাঙের ডাক-রাণার ঝড়-বৃষ্টি বা বরফপাতের সময়ে এখানে মাঝে মাঝে আশ্রয় নেয়। এই ঘরটা আমাদের ভ্রমণপথের শেষসীমা, এর ওদিকে আমরা যাই না যে তা নয়, কিন্তু সে কালেভদ্রে, কারণ ওখান থেকে উম্‌প্লাং পর্য্যন্ত খাড়া উৎরাই নাকি এক মাইলের মধ্যে প্রায় এগারো-শ ফুট নেমে গিয়েচে মিস নর্টনের মুখে শুনেচি—যদিও বুঝিনে তার মানে কি। আমাদের অত দূর যাওয়ার প্রয়োজনও ছিল না, যা আমরা চাই তা পোষ্ট আপিসের ভাঙা ঘর পর্য্যন্ত গেলেই যথেষ্ট পেতাম—দু-ধারে ঘন নির্জ্জন বন—আমাদের বাগানের নীচে গেলে আর সরলগাছ নেই—বনের তলা আর পরিষ্কার নেই, পাইন বন নেই, সে বন অনেক গভীর, অনেক নিবিড়, যেমন দুষ্প্রবেশ্য তেমনি অন্ধকার, কিন্তু আমাদের এত ভাল লাগে! বনের ফুলের অন্ত নেই—শীতে ফোটে বুনো গোলাপ, গ্রীষ্মকালে রডোড্রেণ্ডন বনের মাথায় পাহাড়ের দেওয়ালে লাল আগুনের বন্যা আনে, গায়ক পাখীরা মার্চ্চ মাসের মাঝামাঝি থেকে চারিধারের নির্জ্জন বনানী গানে মুখরিত ক'রে তোলে—ঝর্ণা শুকিয়ে গেলে আমরা শুকনো ঝর্ণার পাশের পথে পাথর ধ'রে ধ'রে নীচের নদীতে নামতাম—অতি সন্তর্পণে পাহাড়ের দেওয়াল ধ'রে ধ'রে, সীতা পেছনে, আমি আগে। দাদাও এক-একদিন আসতো—তবে সাধারণতঃ সে আমাদের এই-সব ব্যাপারে যোগ দিতে ভালবাসে না।

এক-একদিন আমি একাই আসি। নদীর খাতটা অনেক নীচে—তার পথ পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে নীচে নেমে গিয়েচে—যেমন পিছল তেমনি দুর্গম—নদীর খাতে একবার পা দিলে মনে হয় যেন একটা অন্ধকার পিপের মধ্যে ঢুকে গিয়েচি—দু-ধারে খাড়া পাহাড়ের দেওয়াল উঠেচে—জল তাদের গা বেয়ে ঝরে পড়চে জায়গায় জায়গায়—কোথাও অনাবৃত, কোথাও গাছপালা, বনফুল লতা—মাথার ওপরে আকাশটা যেন নীল কার্ট রোড—ঠিক অতটুকু চওড়া, ঐ রকম লম্বা, এদিকে ওদিকে চলে গিয়েচে, মাঝে মাঝে টুকরো মেঘ কার্ট রোড বেয়ে চলেচে, কখনও বা পাহাড়ের এ-দেওয়াল ও-দেওয়াল পার হয়ে চলে যাচ্ছে—মেঘের ওই খেলা দেখতে আমার বড় ভাল লাগত—নদী-খাতের ধারে একখানা শেওলা ঢাকা ঠাণ্ডা পাথরের ওপর ব'সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মুখ উঁচু ক'রে চেয়ে চেয়ে দেখতাম—বাড়ি ফিরবার কথা মনেই থাকৃত না।

মাঝে মাঝে আমার কি একটা ব্যাপার হ'ত। ওই রকম নির্জ্জন জায়গায় কতবার একটা জিনিষ দেখেচি।...

হয়ত দুপুরে চা-বাগানের কুলীরা কাজ সেরে সরল গাছের তলায় খেতে বসেচে—বাবা ম্যানেজারের বাংলাতে গিয়েচেন, সীতা ও দাদা ঘুমুচ্চে—আমি কাউকে না জানিয়ে চুপি চুপি বেরিয়ে কার্ট রোড ধ'রে অনেক দূরে চলে যেতাম—আমাদের বাসা থেকে অনেক দূরে উম্‌প্লাঙের সেই পোড়ো পোষ্ট আপিস ছাড়িয়েও চ'লে যেতাম—পথ ক্রমে যত নীচে নেমেচে, বন জঙ্গল ততই ঘন, ততই অন্ধকার, লতাপাতায় জড়াজড়ি ততই বেশী—বেতের বন, বাঁশের বন সুরু হ'ত—ডালে ডালে পরগাছা ও অর্কিড ততই ঘন, পাখী ডাকত—সেই ধরণের একটা নিস্তব্ধ স্থানে একা গিয়ে বসতাম।

চুপ ক'রে বসে থাকৃতে থাকৃতে দেখেচি অনেক দূরে পাহাড়ের ও বনানীর মাথার ওপরে নীলাকাশ বেয়ে যেন আর একটা পথ—আর একটা পাহাড়শ্রেণী—সব যেন মৃদু হলুদ রঙের আলো দিয়ে তৈরি—সে অন্য দেশ, সেখানেও এমনি গাছপালা, এমনি ফুল ফুটে আছে, হলুদ আলোর বিশাল জ্যোতির্ম্ময় পথটা এই পৃথিবীর পর্ব্বতশ্রেণীর ওপর দিয়ে শূন্য ভেদ ক'রে মেঘরাজ্যের ওদিকে কোথায়

চ'লে গিয়েচে—দূরে আর একটা অজানা লোকালয়ের বাড়িঘর, তাদের লোকজনও দেখেচি, তারা আমাদের মত মানুষ নয়—তাদের মুখ ভাল দেখতে পেতাম না—কিন্তু তারাও আমাদের মত ব্যস্ত, হলুদ রঙের পথটা তাদের যাতায়াতের পথ। ভাল ক'রে চেয়ে চেয়ে দেখেচি সে-সব মেঘ নয়, মেঘের ওপর পাহাড়ী রঙের খেলার ধাঁধা নয়—সে-সব সত্যি, আমাদের এই পৃথিবীর মতই তাদের বাড়িঘর, তাদের অধিবাসী তাদের বনপর্ব্বত সত্যি—আমার চোখের ভুল যে নয় এ আমি মনে মনে বুঝতাম, কিন্তু কাউকে বলতে সাহস হ'ত না—মাকে না, এমন কি সীতাকেও না—পাছে তারা হেসে উঠে সব উড়িয়ে দেয়।

এ রকম একবার নয়, কতবার দেখেচি। আগে আগে আমার মনে হ'ত আমি যেমন দেখি, সবাই বোধ হয় ওরকম দেখে। কিন্তু সেবার আমার ভুল ভেঙে যায়। আমি এক দিন মাকে জিগ্যেস করেছিলাম—আচ্ছা মা, পাহাড়ের ওদিকে আকাশের গায় ওসব কি দেখা যায়?...

মা বললেন—কোথায় রে?...

—ওই কার্ট রোডের ধারে বেড়াতে গিয়ে এক জায়গায় বসেছিলাম, তাই দেখলাম আকাশের গায়ে একটা নদী—আমাদের মত ছোট নদী নয়—সে খুব বড়, কত গাছপালা—দেখনি মা?...

—দুর্ পাগ্লা—ও মেঘ, বিকেলে ওরকম দেখায়।

—না মা, মেঘ নয়, মেঘ আমি চিনিনে? ও আর একটা দেশের মত, তাদের লোকজন পষ্ট দেখেচি যে—তুমি দেখনি কখনও?

—আমার ওসব দেখবার সময় নেই, ঘরকন্না তাই ঠেলে উঠতে পারিনে, জিতুটার আবার আজ প'ড়ে পা ভেঙে গিয়েচে—আমার মরবার অবসর নেই—ও-সব তুমি দেখগে বাবা।

বুঝলাম মা আমার কথা অবিশ্বাস করলেন। সীতাকেও একবার বলেছিলাম—সে কথাটা বুঝতেই পারলে না। দাদাকে কখনও কিছু বলিনি।

আমার মনে অনেকদিন ধ'রে এটা একটা গোপন রহস্যের মত ছিল—যেন আমার একটা কি কঠিন রোগ হয়েচে—সেটা যাদের কাছে বলচি, কেউ বুঝতে পারচে না, ধরতে পারচে না, সবাই হেসে উড়িয়ে দিচ্চে। এখন আমার সয়ে গিয়েচে। বুঝতে পেরেচি—ও সবাই দেখে না—যারা দেখে, চুপ ক'রে থাকাই তাদের পক্ষে সবচেয়ে ভাল।

আমাদের বাসা থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা সব সময়ই চোখে পড়ে। জ্ঞান হয়ে পর্য্যন্ত দেখে আসচি বহুদূর দিক্চক্রবালের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্য্যন্ত তুষারমৌলি গিরিচূড়ার সারি—বাগানের চারিধারের পাহাড়শ্রেণীর যেন একটুখানি ওপরে ব'লে মনে হ'ত—তখনও পর্য্যন্ত বুঝিনি যে ও-গুলো কত উঁচু। কাঞ্চনজঙ্ঘা নামটা অনেকদিন পর্য্যন্ত জানতাম না, আমাদের চাকর থাপাকে জিগ্যেস্ করলে বলত, ও সিকিমের পাহাড়। সেবার বাবা আমাদের সবাইকে (সীতা বাদে) দার্জ্জিলিং নিয়ে গিয়েছিলেন বেড়াতে—বাবার পরিচিত এক হিন্দুস্থানী চায়ের এজেন্ট ওখানে থাকে, তার বাসায় গিয়ে দু-দিন আমরা মহা আদরযত্নে কাটিয়েছিলাম—তখন বাবার মুখে প্রথম শুনবার সুযোগ হ'ল যে ওর নামটি কাঞ্চনজঙ্ঘা। সীতার সেবার যাওয়া হয়নি, ওকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে বাবা বাজার থেকে ওর জন্যে রঙীন্ গার্টার, উল আর উল বুন্বার কাঁটা কিনে এনেছিলেন।

এই কাঞ্চনজঙ্ঘার সম্পর্কে আমার একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা আছে।...

সেদিনটা আমাদের বাগানের কল্কাতা আপিসের বড় সাহেব আসবেন বাগান দেখতে। তাঁর নাম লিণ্টন সাহেব। বাবা ও ছোটসাহেব তাঁকে আন্তে গিয়েচেন সোনাদা ষ্টেশনে—আমাদের বাগান থেকে প্রায় তিন-চার ঘণ্টার পথ। ঘোড়া ও কুলী সঙ্গে গিয়েচে। তখন মেমেরা পড়াতে আস্ত না, বিকেলে আমরা ভাইবোনে মিলে বাংলার উঠোনে লাট্টু খেল্‌ছিলাম। সূর্য্য অস্ত যাবার বেশী দেরি নেই—মা রান্নাঘরে কাপড় কাচবার জন্যে সোডা সাবান জলে ফোটাচ্ছিলেন, থাপা লণ্ঠন পরিষ্কার কাজে খুব ব্যস্ত—এমন সময় আমার হঠাৎ চোখে পড়ল কাঞ্চনজঙ্ঘার দূর শিখররাজির ওপর আর একটা বড় পর্ব্বত, স্পষ্ট দেখতে পেলাম তাদের ঢালুতে ছোট বড় ঘরবাড়ি, সমস্ত ঢালুটা বনে ঢাকা, দেবমন্দিরের মত সরু সরু ঘরবাড়ির চূড়া ও গম্বুজগুলো অদ্ভুত রঙের আলোয় রঙীন—অস্তসূর্য্যের মায়াময় আলো যা কাঞ্চনজঙ্ঘার গায়ে পড়েচে তা নয়—তা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ও সম্পূর্ণ অপূর্ব্ব ধরণের।

সে-দেশ ও ঘরবাড়ি যেন একটা বিস্তীর্ণ নীল মহাসাগরের তীরে—কাঞ্চনজঙ্ঘার মাথার ওপর থেকে সে মহাসাগর কতদূর চলে গিয়েছে, আমাদের এদিকেও এসেচে, ভুটানের দিকে গিয়েচে, তার কূলকিনারা নেই; যদি কাউকে দেখাতাম সে হয়ত বল্‌ত ও আকাশ' ওই রকম দেখায়, আমায় বোকা বল্‌ত। কিন্তু আমি বেশ জানি যা দেখেচি তা মেঘ নয়, আকাশ নয়—সে সত্যিই সমুদ্র। আমি সমুদ্র কখনও দেখিনি তাই কি, সমুদ্র কি রকম তা আমি জানি। বাবার মুখে গল্প শুনে আমি যে রকম ধারণা করেছিলাম সমুদ্রের, কাঞ্চনজঙ্ঘার উপরকার সমুদ্রটা ঠিক সেই ধরণের। এর বছর দুই পরে মেমেরা আমাদের বাড়ি পড়াতে আসে, তারা দাদাকে একখানা ছবিওয়ালা ইংরেজী গল্পের বই দিয়েছিল, বইখানার নাম রবিন্‌সন ক্রুশো—তাতে নীল সাগরের রঙীন ছবি দেখেই হঠাৎ আমার মনে প'ড়ে গেল এ আমি দেখেচি, জানি—আরও ছেলেবেলায় কাঞ্চনজঙ্ঘার মাথার ওপর এক সন্ধ্যায় এই ধরণের সমুদ্র আমি দেখেছিলাম—কূলকিনারা নেই, অপার··· ভুটানের দিকে চলে গিয়েচে...

মিস্ নর্টনকে এ-সব কথা বল্‌বার আমার ইচ্ছে ছিল। অনেক দিন মিস্ নর্টন আমায় কাছে ডেকে আদর করেচে, আমার কানের পাশের চুল তুলে দিয়ে আমার মুখ দু-হাতের তেলোর মধ্যে নিয়ে কত কি মিষ্টি কথা বলেচে—হয়ত অনেক সময় তখন বুড়ী মেম ছাড়া ঘরের মধ্যে কেউ ছিল না—অনেক বার ভেবেচি এইবার বল্‌ব—কিন্তু বলি-বলি ক'রেও আমার সে গোপন কথা মিস্ নর্টনকে বলা হয়নি। কথা বলা ত দূরের কথা আমি সে-সময়ে মিস্ নর্টনের মুখের দিকে লজ্জায় চাইতে পারতাম না—আমার মুখ লাল হয়ে উঠত, কপাল ঘেমে উঠত...সারা শরীরের সঙ্গে জিবও যেন অবশ হয়ে থাক্‌ত...চেষ্টা ক'রেও আমি মুখ দিয়ে কথা বার করতে পারতাম না। অথচ আমার মনে হ'ত এখনও মনে হয় যদি কেউ আমার কথা বোঝে, তবে মিস্ নর্টনই বুঝবে।

মাস দুই আগে আমাদের বাড়িতে এক নেপালী সন্ন্যাসী এসেছিল। পচাং বাগানের বড়বাবু বাবার বন্ধু, তিনিই বাবার ঠিকানা দেওয়াতে সন্ন্যাসীটি সোনাদা ষ্টেশনে যাবার পথে আমাদের বাসায় আসে। সে একবেলা এখানে ছিল, যাবার সময় বাবা টাকা দিতে গিয়েছিলেন, সে নেয়নি। সন্ন্যাসী আমায় দেখেই কেমন একটু বিস্মিত হ'ল, কাছে ডেকে তার পাশে বসালে, আমার মুখের পানে বার-বার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাইতে লাগল—আমি কেমন একটু অস্বস্তি বোধ করলাম, তখন সেখানে আর কেউ ছিল না। তারপর সে আমার হাত দেখলে, কপাল দেখলে, ঘাড়ে কি দাগ দেখলে। দেখা শেষ ক'রে সে চুপ ক'রে রইল, কিন্তু চলে যাবার সময় বাবাকে নেপালী ভাষায় বললে—তোমার এই ছেলে সুলক্ষণযুক্ত, এ জন্মেছে কোথায়?

বাবা বললেন—এই চা-বাগানেই।

সন্ন্যাসী আর কিছু না ব'লেই চলে যাচ্ছিলেন, বাবা এগিয়ে গিয়ে জিগ্যেস্ করলেন—ওর হাত কেমন দেখলেন?...

সন্ন্যাসী কিছু জবাব দিলে না, ফিরলেও না চলে গেল।

আমি কিন্তু বুঝতে পেরেছিলাম। আমি মাঝে মাঝে নির্জ্জনে যে নানা অদ্ভুত জিনিষ দেখি, সন্ন্যাসী সেই সম্বন্ধেই বলেছিলেন। সে যে আর কেউই বুঝবে না, আমি তা জান্‌তাম। সেইজন্যেই ত আজকাল কাউকে ও-সব কথা বলিও নে।

৭

পচাং চা-বাগানের কেরাণীবাবু ছিলেন বাঙালী। তাঁর স্ত্রীকে আমরা মাসীমা ব'লে ডাক্‌তাম। তিনি তাঁর বাপের বাড়ি গিয়েছিলেন রংপুরে, সোনাদা ষ্টেশন থেকে ফিরবার পথে মাসীমা আমাদের বাসায় মায়ের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। মা না খাইয়ে তাঁদের ছাড়লেন না, খেতে-দেতে বেলা দুপুর গড়িয়ে গেল। আমাদের বাসা থেকে পচাং বাগান তিন মাইল দূরে, ঘন জঙ্গলের মধ্যবর্ত্তী সরু পথ বেয়ে যেতে হয়, মাঝে মাঝে চড়াই উৎরাই। আমি, সীতা ও দাদা তাঁদের সঙ্গে এগিয়ে দিতে গেলাম—পচাং পৌঁছতে বেলা তিনটে বাজল। আমরা তখনি চলে আসছিলাম, কিন্তু মাসীমা ছাড়লেন না, তিনি ময়দা মেখে পরোটা ভেজে, চা তৈরি ক'রে আমাদের খাওয়ালেন; রাত্রে থাক্‌বার জন্যেও অনেক অনুরোধ করলেন, কিন্তু আমাদের ভয় হ'ল বাবাকে না ব'লে আসা হয়েচে। বাড়ি না ফির্‌লে বাবা আমাদেরও

বকবেন, মা-ও বকুনি খাবেন। বনজঙ্গলের পথ হ'লেও আরও অনেক বার আমরা মাসীমার এখানে এসেচি। আমি একাই কতবার এসেচি গিয়েচি। আমরা যখন রওনা হই তখন বেলা খুব কম আছে। অন্ধকার এরই মধ্যে নেমে আস্চে—আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, ঝড়বৃষ্টির খুব সম্ভাবনা। পচাং বাগান থেকে আধ মাইল যেতেই ঘন জঙ্গল—বড় বড় ওক্ আর পাইন—আবার উৎরাইয়ের পথে নামলেই জঙ্গল অন্য ধরণের, আরও নিবিড়, গাছের ডালে পুরু কম্বলের মত শেওলা ঝুলচে, ঠিক যেন অন্ধকারে অসংখ্য ভূত প্রেত ডালে ডালে নিঃশব্দে দোল খাচ্চে। সীতা খুশীর সুরে বললে- যদি দাদা আমাদের সাম্‌নে ভালুক পড়ে ?...হি হি—

সীতার ওপর আমাদের ভারি রাগ হ'ল, সবাই জানে এ পথে ভালুকের ভয়, কিন্তু সে-কথা ওর মনে করিয়ে দেওয়ার দরকার কি ছিল ? বাহাদুরী দেখাবার বুঝি সময় অসময় নেই ?

অন্ধকার ক্রমেই খুব ঘন হয়ে এল, আর খানিকটা গিয়ে সরু পায়ে-চলার পথটা বনের মধ্যে অন্ধকারে কোথায় হারিয়ে গেল—সঙ্গে সঙ্গে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি সুরু হ'ল—তেম্‌নি কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়া! শীতে হাত পা জমে যাওয়ার উপক্রম হ'ল...গাছের ডালের শেওলা বৃষ্টিতে ভিজে এক ধরণের গন্ধ বার হয় এ আমরা সকলেই জানতাম, কিন্তু সীতা বার-বার জোর ক'রে বল্‌তে লাগল ও ভালুকের গায়ের গন্ধ।···দাদা আমাদের আগে আগে যাচ্ছিল, মাঝখানে সীতা, পেছনে আমি—হঠাৎ দাদা থম্‌কে দাঁড়িয়ে গেল। সাম্‌নে একটা ঝর্ণা—তার ওপরটায় কাঠের গুঁড়ির পুল ছিল—পুলটা ভেঙে গিয়েচে। সেটার তোড় যেমন বেশী, চওড়াও তেম্‌নি। পার হ'তে সাহস করা যায় না। দাদা বললে—কি হবে জিতু!...চল পচাঙে মাসীমার কাছে ফিরে যাই। সীতা বললে—বাবা পিঠের ছাল তুলবে আজ না ফিরে গেলে বাসায়। না দাদা, বাড়িই চলো। দাদা ভেবে বললে—এক কাজ করতে পারবি ? পাকদণ্ডীর পথে ওপরে উঠতে যদি পারিস—ওখান দিয়ে লিণ্টন বাগানের রাস্তা। আমি চিনি, ওপরে জঙ্গলও কম। যাবি ?

দাদা তা হ'লে খুব ভীতু তো নয়!

পাকদণ্ডীর সে পথটা তেমনি দুর্গম, সারা পথ শুধু বনজঙ্গল ঠেলে ঠেলে উঠতে হবে, পা একটু পিছ্‌লে গেলেই, কি বড় পাথরের চাই আল্‌গা হয়ে খসে পড়লে আট শ কি হাজার ফুট নীচে প'ড়ে চুরমার হ'তে হবে। অবশেষে ঘন বনের বৃষ্টিভেজা পাতালতা, পাথরের গায়ের ছোট ফার্ণের ঝোপ ঠেলে আমরা ওপরে ওঠাই সুরু করলাম—অন্য কোন্ উপায় ছিল না। কাপড়-চোপড় মাথার চুল বৃষ্টিতে ভিজে একাকার হ'য়ে গেল—রক্ত জমে হাত-পা নীল হয়ে উঠ্‌ল। পাকদণ্ডীর পথ খুব সরু, দু-জন মানুষে কোনাগতিকে পাশাপাশি যেতে পারে, বাঁয়ে হাজার ফুট খদ্, ডাইনে ঈষৎ ঢালু পাহাড়ের দেওয়াল খাড়া উঠেচে তাও হাজার-বার-শ ফুটের কম নয়। বৃষ্টিতে পথ পিছল, কাজেই আমরা ডাইনের দেওয়াল ঘেঁসে ঘেঁসেই উঠচি। পথ মানুষের কেটে তৈরি করা নয় ব'লেই হোক, কিংবা এ-পথে যাতায়াত নেই বলেই হোক—ছোটখাট গাছ-পালার জঙ্গল খুব বেশী কিন্তু ডাইনের পাহাড়ের গায়ের বড় গাছের ডালপালাতে সারা পথটা ঝুপসি ক'রে রেখেচে, মাঝে মাঝে সেগুলো এত নিবিড় যে সামনে কি আছে দেখা যায় না।

হঠাৎ একটা শব্দ শুনে আমরা ক'জনেই থমকে দাঁড়ালুম। সবাই চুপ ক'রে গেলাম। আমরা বুঝতে পেরে-ছিলাম শব্দটা কিসের। ভয়ে আমাদের বুকের স্পন্দন বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হ'ল। সীতাকে আমি জড়িয়ে ধ'রে কাছে নিয়ে এলুম। অন্ধকারে আমরা কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না বটে, কিন্তু আমরা জান্‌তাম ভালুক যে পথে আসে, পথের ছোটখাট গাছপালা ভাঙতে ভাঙতে আসে। একটা কোনো ভারী জানোয়ারের অস্পষ্ট পায়ের শব্দের সঙ্গে কাঠকুটো ভাঙার শব্দে আমাদের আর সন্দেহ রইল না যে, আমরা যে-পথ দিয়ে এইমাত্র উঠে এসেচি, সেই পথেই ভালুক উঠে আসচে আমাদের পেছনে পেছনে। আমরা প্রাণপণে পাহাড় ঘেঁসে দাঁড়ালাম, ভরসা যদি অন্ধকারে না দেখতে পেয়ে সামনের পথ দিয়ে চলে যায়···আমরা কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে আছি, নিঃশ্বাস পড়ে কি না-পড়ে—এমন সময়ে পাকদণ্ডীর মোড়ে একটা প্রকাণ্ড কালো জমাট অন্ধকারের স্তূপ দেখা গেল--স্তূপটা একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে বেঁকে বেঁকে আসচে—যতটা ডাইনে, ততটা বাঁয়ে নয়—আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখান থেকে দশ গজের

মধ্যে এল— তার ঘন ঘন হাঁপানোর ধরণের নিঃশ্বাসও শুনতে পাওয়া যাবে - আমাদের নিজেদের নিঃশ্বাস তখন আর বইচে না·· কিন্তু মিনিটখানেকের জন্তে—একটু পরেই আর সুপটাকে দেখতে পেলাম না— যদিও শব্দ শুনে বুঝলাম সেটা পাকদণ্ডীর ওপরকার পাহাড়ী ঢালুর পথে উঠে যাচ্চে। ··আরও দশ মিনিট আমরা নড়লাম না, তারপর বাকী পথটা উঠে এসে লিণ্টন বাগানের রাস্তা পাওয়া গেল। আধ মাইল চলে আসবার পরে উম্‌প্লাণ্ডের বাজার। এই বাজারের অমৃত সাউ মিঠাই দেয় আমাদের বাসায় আমরা জান্‌তাম—দাদা তার দোকানটাও চিন্‌ত। দোরে ধাক্কা দিয়ে ওঠাতে সে বাইরে এসে আমাদের দেখে অবাক হয়ে গেল। আমাদের তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে আগুনের চারিধারে বসিয়ে দিলে—আগুনে বেশী কাঠ দিলে ও বড় একটা পেতলের লোটায় চায়ের জল চড়ালে। তার বৌ উঠে আমাদের শুকনো কাপড় দিলে পরবার—ও ময়দা মাখতে বস্‌ল। রাত তখন দশটার কম নয়। আমরা বাসায় ফিরবার জন্তে ব্যাকুল হয়ে পড়েছি—বললাম—আমরা কিছু খাবো না, আমরা এবার যাই। অমৃত সাউ একা আমাদের ছেড়ে দিলে না, তার ভাইকে সঙ্গে পাঠালে। রাত প্রায় সাড়ে এগারটার সময় বাগানে ফিরে এসে দেখি হৈ-হৈ কাণ্ড। বাবা বাসায় নেই, তিনি সে-দিন খুব মদ খেয়ে ফেরেন নি, তার ওপরে আমরাও ফিরিনি, মা পচাঙে লোক পাঠিয়েছিলেন, সে লোক ফিরে এসে বলেচে ছেলেমেয়েরা তো সন্ধ্যের আগেই সেখান থেকে রওনা হয়েচে। এদিকে নাকি খুব ঝড় হয়ে গিয়েচে, আমরা আরও উঁচুতে থাকবার জন্তে ঝড় পাইনি— নীচে নাকি অনেক গাছপালা ভেঙে পড়েচে। এই সব ব্যাপারে মা ব্যস্ত হয়ে সাহেবের বাংলায় খবর পাঠান—ছোটসাহেব চারিধারে আমাদের খুঁজতে লোক পাঠিয়েচে। মা এতক্ষণ কাঁদেন নি, আমাদের দেখেই আমাদের জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠলেন—সে এক ব্যাপার আর কি!

কিন্তু পরদিন যে ঘটনা ঘটল তা আরও গুরুতর। পরদিন চা-বাগানে বাবার চাকরি গেল। কেন গেল তা জানি না। অনেক দিন থেকেই সাহেবরা নাকি বাবার ওপর সন্তুষ্ট ছিল না, সেল মাষ্টার বাগান দেখতে এসে বাগার নামে কোম্পানীর কাছে কয়েক বার রিপোর্টও করেছিল, বাবা মদ খেয়ে ইদানীং কাজকর্ম্ম নাকি ভাল ক'রে করতে পারতেন না, এই সব জন্তে। আমরা যে-রাত্রে পথ হারিয়ে যাই, সে রাত্রে বাবা মদ খেয়ে বেহুঁস্ হয়ে কুলী লাইনের কোথায় পড়েছিলেন—বড়সাহেব সেজন্তে ভারি বিরক্ত হয়। আরও কি ব্যাপার হয়েছিল না-হয়েছিল আমরা সে-সব কিছু শুনি নি।

বাবা যখন সহজ অবস্থায় থাকতেন, তখন তিনি দেবতুল্য মানুষ। তখন তিনি আমাদের ওপর অত্যন্ত স্নেহশীল, অত ভালবাসতে মাও বোধ হয় পারতেন না। আমরা যা চাইতাম বাবা দার্জ্জিলিং কি শিলিগুড়ি থেকে আনিয়ে দিতেন। আমাদের চোখছাড়া করতে চাইতেন না। আমাদের নাওয়ানো, খাওয়ানোর গোলমাল বা একটুকু ব্যতিক্রম হ'লে মাকে বকুনি খেতে হ'ত। কিন্তু মদ খেলেই একেবারে বদলে যেতেন, সামান্য ছল-ছুতোয় আমাদের মারধর করতেন। হয়ত আমায় বললেন—এক্সারসাইজ করিস্‌নে কেন? বলেই ঠাস্ ক'রে এক চড়। তারপর বললেন—উঠবস্ কর। আমি ভয়ে ভয়ে একবার উঠি আবার বসি—হয়ত ত্রিশ চল্লিশ বার ক'রে ক'রে পায়ে খিল ধ'রে গেল—বাবার সে-দিকে খেয়াল নেই। মা থাকতে না পেরে এসে আমাদের সাম্‌লাতেন। সেইজন্তে ইদানীং বাবা সহজ অবস্থায় না থাকলেই আমরা বাসা থেকে পালিয়ে যাই— কে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খাবে?

এই সবের দরুণ আমরাও বাবাকে ভয় যতটা করি, ততটা ভালবাসিনে।

দু-চার দিন ধ'রে বাবা-মায়ে পরামর্শ চল্‌ল কি করা যাবে এ অবস্থায়। আমরা বাইরে বাইরে বেড়াই, কিন্তু সীতা সব খবর রাখে। একদিন সীতাই চুপি চুপি আমায় বললে—শোন দাদা, আমরা আমাদের দেশে ফিরে যাব বাবা বলেচে। বাবার হাতে এখন টাকাকড়ি নেই কি-না—তাই দেশে ফিরে দেশের বাড়িতে থেকে চাকরির চেষ্টা করবে। শীগগীর যাব আমরা—বেশ মজা হবে দাদা—না?...দেশে চিঠি লেখা হয়েচে—

আমরা কেউ বাংলা দেশ দেখিনি, আমাদের জন্ম এখানেই। দাদা খুব ছেলেবেলায় একবার দেশে গিয়েছিল মা-বাবার সঙ্গে, তখন ওর বয়স বছর তিনেক— সে-কথা ওর মনে নেই। আমরা তো আজন্ম এই পর্ব্বত, বনজঙ্গল, শীত, কুয়াসা, বরফ-পড়া দেখে আসচি—কল্পনাই করতে পারিনে এ-সব ছাড়া

আবার দেশ থাকা সম্ভব। তা ছাড়া সমাজের মধ্যে কোন দিন মানুষ হইনি ব'লে আমরা কোন বন্ধনে অভ্যস্ত ছিলাম না, সামাজিক নিয়ম-কানুনও ছিল আমাদের সম্পূর্ণ অজানা। মানুষ হয়েচি এরই মধ্যে, যেখানে খুশী গিয়েচি, যা খুশী করেচি। কাজেই বাংলা দেশে ফিরে যাওয়ার কথা যখন উঠল, তখন এক দিকে যেমন অজানা জায়গা দেখবার কৌতূহলে বুক ঢিপ ঢিপ ক'রে উঠল, অন্য দিকে মনটা যেন একটু দমেও গেল।

থাপাকে বিদায় দেওয়া হ'ল। সে আমাদের মানুষ করেছিল, বিশেষ ক'রে সীতাকে। তাকে এক মাসের বেশী মাইনে, দুখানা কাপড় আর বাবার একটা পুরোনো কোট দেওয়া হ'ল। থাপা বেশ সহজ ভাবেই বিদায় নিলে, কিন্তু বিকালে আবার ফিরে এসে বললে সে আমাদের যাওয়ার দিন শিলিগুড়ি পর্য্যন্ত নামিয়ে দিয়ে তবে নিজের গাঁয়ে ফিরে যাবে। শিলিগুড়ি ষ্টেসনে সে আমাদের সবাইকে সন্দেশ কিনে খাওয়ালে—ওর মাইনের টাকা থেকেই বোধ হয়। মা রাঁধলেন, সে সব জোগাড় ক'রে দিলে। ট্রেন যখন ছাড়ল তখনও থাপা প্লাটফর্ম্মে দাঁড়িয়ে বোকার মত হাসচে।

কাঞ্চনজঙ্ঘাকে ভালবাসি, সে যে আমাদের ছেলেবেলা থেকে সাথী, এই বিরাট পর্ব্বতপ্রাচীর, ওক্ পাইনের বন, আর্কিড, শেওলা, ঝর্ণা, পাহাড়ীনদী, মেঘ-রোদ-কুয়াসার খেলা—এরই মধ্যে আমরা জন্মেচি—এদের সঙ্গে আমাদের বত্রিশ নাড়ীর যোগ।..তখন এপ্রিল মাস, আবার পাহাড়ের ঢালুতে রাঙা রডোডেনড্রণ ফুলের বন্যা এসেচে—সারা পথ দাদা বলতে বলতে এল চুপিচুপি—কেন বাবা অত মদ খেতেন, তা না হলে ত আর চাকরি যেত না···বাবারই ত দোষ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১

আমাদের দেশের গ্রামে পৌঁছলাম পরদিন বেলা ন'টার সময়ে। বাবার মুখে শুনেছিলাম গ্রামের নাম আটঘরা, ষ্টেশন থেকে মাইল দুই-আড়াই দূরে, জেলা চব্বিশ-পরগণা। এত বাঙালী পরিবারের বাস একসঙ্গে দেখে মনে বড় আনন্দ হ'ল। আমরা কখন ফসলের ক্ষেত দেখিনি, বাবা চিনিয়ে দিলেন পাটের ক্ষেত কোন্‌টা, ধানের ক্ষেত কোন্‌টা। এ ধরণের সমতলভূমি আমরা দেখিনি কখনও—রেলে আসবার সময়ে মনের অভ্যাসে কেবলই ভাবছিলাম এই বড় মাঠটা ছাড়ালেই বুঝি পাহাড় আরম্ভ হবে। সেটা পার হয়ে গেলে মনে হচ্ছিল এইবার নিশ্চয়ই পাহাড়। কিন্তু পাহাড় ত কোথাও নেই, জমি উঁচু নীচুও নয়, কি অদ্ভুত ধরণের সমতল! যতদূর এলাম শিলিগুড়ি থেকে সবটা সমতল—ডাইনে, বাঁয়ে, সামনে সবদিকে সমতল, এ এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। দাদা এর আগে সমতলভূমি দেখেচে, কারণ সে জন্মেছিল হনুমান নগরে—নতুন অভিজ্ঞতা হ'ল আমার ও সীতার।

আমাদের বাড়িটা বেশ বড়, দোতলা, কিছু পুরনো ধরণের। বাড়ির পেছনে বাগান, ছোট একটা পুকুর। আমরা যখন গাড়ী থেকে নামলাম—বাড়ির মেয়েরা কেউ কেউ দোরের কাছে দাঁড়িয়েছিলেন, তার মধ্যে জ্যাঠাইমা, কাকীমারাও ছিলেন। মা বললেন, প্রণাম করো। পাড়ার অনেক মেয়ে দেখতে এসেছিলেন, তাঁরা সীতাকে দেখে বলাবলি করতে লাগলেন, কি চমৎকার মেয়ে দেখেচ? এমন রং আমাদের দেশে হয় না, পাহাড়ের দেশে ব'লে হয়েচে। দাদাকে নিয়েও তারা খুব বলাবলি করলে, দাদার ও সীতার রং নাকি 'দুধে-আলতা'—আমার মুখের চেয়ে দাদার মুখ সুন্দর, এ-সব কথা এই আমরা শুনলাম। চা-বাগানে এ-সব কথা কেউ বলেনি। আর একটা লক্ষ্য করলাম আমাদের গাঁয়ের মেয়েরা প্রায়ই কালো, চা-বাগানের অনেক কুলীমেয়ে এর চেয়ে ফর্সা।

আমাদের থাকবার ঘর দেখে ত আমরা অবাক্! এত বড় বাড়িতে এ-ঘরটা ছাড়া ত আরও কত ঘর রয়েচে। নীচের একটা ঘর, ঘরের মেজেয় মাটির কড়িকাঠ ঝুলে পড়েচে ব'লে বাঁশের খুঁটির ঠেক্‌নো। কেন ও রে দোতলায় ত কত ঘর, এত বড় বাড়ি ত! অন্য ঘরে জায়গা হবে না কেন? এ খারাপ ঘরটাতে আমরা থাকবো কেন?

দেখলাম বাবা মা বিনা প্রতিবাদে সেই ঘরটাতেই আমাদের জিনিষপত্র তুললেন।

দিন-চারেক পরে জ্যাঠাইমা একদিন আমায় জিজ্ঞেস করলেন,—হ্যাঁ রে, তোর মাকে নাকি সেখানে মেমে পড়াতো?

আমি বললাম,—হ্যাঁ জ্যাঠাইমা। গর্ব্বের সুরে বললাম,

আমাকে, দাদাকে, সীতাকেও পড়াতো। জ্যাঠাইমা বললেন, তাদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া ছিল নাকি তোদের ?

আমি বাহাদুরী ক'রে বললাম—তারা এসে চা খেত আমাদের বাড়ি। আমাদের বিস্কুট দিত কেক্ দিত খেতে তাদের ওখানে গেলে—চা খাওয়াতো—

জ্যাঠাইমা টানা টানা সুরে বললেন—মাগো মা! কি হবে, আমাদের ঘরে দোরে ত যখন তখন উঠচে, হিঁদুর ঘরের জাতজন্ম আর রইল না।

আমি তখন বুঝতে পারিনি কেন জ্যাঠাইমা এ রকম বলচেন। কিন্তু শুধু এ-কথা নয়—আমি ছেলেমানুষ, অনেক কথাই তখন জানতাম না। জানতাম না যে এই বাড়িতে আমার বাবার অংশটুকু অনেক দিন বিক্রী হয়ে গিয়েচে, এখন যে এঁদো ঘরে আমরা আছি, সে-ঘরে কোনো ন্যায্য অধিকার আমাদের নেই—জ্ঞাতি জ্যাঠামশাইরা অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞার সঙ্গে থাকতে দিয়েচেন মাত্র। জানতাম না যে, আমার বাবা বর্ত্তমানে অর্থহীন, অসুস্থ ও চাকুরিহীন, সরিকের বাড়িতে আশ্রয়প্রার্থী। আরও জানতাম না যে, বাবা বিদেশে থাকেন, ইংরেজী জানেন ও ভাল চাকুরি করেন ব'লে এঁদের চিরদিন ছিল হিংসে—আজ এ-অবস্থায় হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়ে তাঁরা যে এত দিনের সঞ্চিত গায়ের ঝাল মেটাতে ব্যগ্র হয়ে উঠবেন সেটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও ন্যায়সঙ্গত। চাকুরির অবস্থায় মাকে নিয়ে বাবা কয়েক বার এখানে এসে চাল দেখিয়ে গিয়েছিলেন, এরা সে কথা ভোলেনি। ছেলেমানুষ বলেই এত কথা তখন বুঝতাম না।

আমরা কখনও দোতলা বাড়ি দেখিনি—গাঁয়ে ঘুরে ঘুরে দোতলা কোঠা বাড়ি দেখতে আমাদের ভারি ভাল লাগতো, বিশেষ ক'রে সীতার। সীতা আজ এসে হয়ত বলে—কাল যেও আমার সঙ্গে দাদা, ও-পাড়ার বাঁড়ুয্যে-বাড়ি কত বড় দেখে এসো—দোতলার ওপরে আবার একটা ছোট ঘর, সত্যি দাদা।

আমাদের গ্রামে খুব লোকের বাস—এক এক পাড়াতেই ষাট-সত্তর ঘর ব্রাহ্মণ। এত ঘন বসতি কখনও দেখিনি—কেমন নতুনতর মনে হয়, কিন্তু ভাল লাগে না। এতে যেন মন হাত পা ছড়াবার জায়গা পায় না, সদাই কেমন অস্বস্তি বোধ হয়—রাস্তায় বেজায় ধুলো, পুরনো নোনাধরা ইটের বাড়িই অধিকাংশ, বিশেষ কোনো শ্রী ছাঁদ নেই, পথের ধারে মাঝে মাঝে গাছপালা, সে-সব গাছপালা আমি চিনিনে, নামও জানিনে, কেবল চিনি কচুগাছ ও লালবিছুটি। এদের হিমালয়ে দেখেছি ব'লে নয়, কচুর ডাঁটার তরকারী এখানে এসে খেয়েছি বলে। আর আমার খুড়তুতো ভাই বিশু একদিন সীতাকে বিছুটির পাতা দেখিয়ে বলেছিল,—এর পাতা তুলে গায়ে ঘসতে পারিস্?···বেচারী সীতা জানতো না কিছু, সে বাহাদুরী দেখিয়ে একমুঠো পাতা তুলে বাঁ-হাতে আচ্ছা ক'রে ঘসেছিল—তারপর আর যায় কোথা!···

এ-সব জায়গা আমার চোখে অত্যন্ত কুশ্রী মনে হয়, মন ভরে ওঠে এমন একটা দৃশ্য এর কোনো দিকেই নেই—ঝর্ণা নেই, বরফে-মোড়া পর্ব্বত-পাহাড় নেই—আরও কত কি নেই। সীতারও তাই, একদিন সে চুপি চুপি বললে—এখানে থাকতে তোমার ইচ্ছে হয় দাদা? আমায় যদি এখুনি কেউ বলে চা-বাগানে চলো, আমি বেঁচে যাই। আর একটা কথা শোনো দাদা—জ্যাঠাইমা কি খুড়ীমার ঘরে অত যেও না যেন। ওরা আমাদের দেখতে পারে না। ওদের বিছানায় গিয়ে বসেছিলে কেন দুপুর বেলা? তুমি উঠে গেলে কাকীমা তোমায় বললে, অসভ্য পাহাড়ী ভূত, আচার নেই বিচের নেই, যখন তখন বিছানা ছোঁয়। যেও না ওদের ঘরে যখন-তখন বুঝলে?

ছোটবোনের পরামর্শ বা উপদেশ নিতে আমার অগ্রজগর্ব্ব সঙ্কুচিত হয়ে গেল, বললাম—আচ্ছা যা যা, তোকে শেখাতে হবে না। কাকীমা মন্দ ভেবে কিছু বলেন নি, আমায় ডেকে তারপরে কত বুঝিয়ে দিলেন পাছে আমি রাগ করি। জানিস্ তা?

বলা বাহুল্য আমায় ডেকে কাকীমার কৈফিয়ৎ দেওয়ার কথাটা আমার কল্পনাপ্রসূত।

আমাদের জীবনের যে অভিজ্ঞতা এই চার মাসের মধ্যেই আমরা সঞ্চয় করেচি, তা বোধ হয় সারাজীবনেও ভুলবো না। আমরা সত্যই জানতাম না যে, সংসারের মধ্যে এত সব খারাপ জিনিষ আছে, মানুষ মানুষের প্রতি এত নিষ্ঠুর হ'তে পারে, যাদের কাছে জেঠিমা, কাকীমা, দিদি ব'লে হাসিমুখে ছুটে গিয়েচি, তারা এতটা হৃদয়হীন ব্যবহার সত্যি সত্যিই করতে পারে, কি ক'রে জানবোই বা এসব?

মুস্কিল এই যে এত সাবধানে চললেও পদে পদে আমরা

জ্যেঠাইমাদের কাকীমাদের কাছে অপরাধী হয়ে পড়ি; আমরা লোকালয়ে কখনও বসবাস করিনি বলেই হোক্ বা এদের এখানকার নিয়ম-কানুন জানিনে বলেই হোক্, বুঝতে পারিনে যে কোথায় আমাদের অপরাধ ঘটছে বা ঘটতে পারে। রাত্রে যে কাপড়খানা প'রে শুয়ে থাকি, সেইখানা পরণে থাকলে সকালে যে আল্‌না ছুঁতে নেই, তার দরুণ আল্‌নাসুদ্ধ কাচা কাপড় সব নোংরা হয়ে যায়, বা বাড়ির আশপাশের খানিকটা সুনির্দ্দিষ্ট অংশ পবিত্র, কিন্তু তার সীমানা পেরিয়ে গেলেই হাত-পা না ধুয়ে বা গঙ্গাজল মাথায় না দিয়ে ঘরেদোরে ঢুকতে নেই—এসব কথা আমরা জানিনে, শুনিওনি—যুক্তির দিক দিয়েও বুঝতে পারিনে। আমাদের বাড়ির খিড়কীতে খানিকটা বন, একদিন বিকেলে আমি, সীতা ও দাদা সেখানে কুঁড়েঘর বাঁধবার জন্যে নোনাগাছের ডাল কাটচি—কাকীমা দেখতে পেয়ে বললেন, ওখানে গিয়ে জুটেচ সব? ভাগ্যিস্ চোখে পড়ল? এক্ষুণি তো অই সব নিয়ে উঠতে এসে দোতলার দালানে?···মা গো মা, মেলেচ্ছ খিরিষ্টানের মত ব্যাভার, আঁস্তাকুড় ঘেঁটে খেলা হচ্চে দ্যাখো!

সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে চরিধারে চেয়ে দেখলাম, আঁস্তাকুড়ের অন্য কোনো লক্ষণ ত নেই! দিব্যি পরিষ্কার জায়গা, ঘাসের জমি আর বনের গাছপালা। আমি অবাক্ হয়ে বললাম—কাকীমা, এখানে ত কিচ্ছু নোংরা নেই?···এসে দেখুন বরং, কেমন পরিষ্কার—

কাকীমার মুখ দিয়ে খানিক ক্ষণ কথা বার হ'ল না—তিনি এমন কথা জীবনে কখনো শোনেন নি। তারপর ব'লেন, চোখে কি ঢ্যালা বেরিয়েচে না কি? এঁটো হাঁড়িকলসী ফেলা রয়েচে দেখচ না সামনে?···কাচা কাপড় প'রে কোন্ ছেলেমেয়েটা এই বিকেলে পথ থেকে অত দূরে বনজঙ্গলের মধ্যে যায়? ওটা আঁস্তাকুড় হ'ল না?···আবার সমান তক্কো!

তারপর খুড়ীমা হুকুম দিলেন আমাদের সবাইকে এক্ষুণি নাইতে হবে। আমরা অবাক্ হয়ে গেলাম—নাইতে হবে কেন?

সাম্‌নে হাত তিনচার দূরে গোটাকতক ভাঙা হাঁড়িকুঁড়ি পড়ে আছে বটে, কিন্তু তার দরুণ গোটা বনটা অপরিষ্কার কেন হবে তা বুঝতে পারলাম না আমরা তিনজনের কেউই। বিশেষ ক'রে এটা আরও বুঝ্‌তে পারলাম না যে, পথ থেকে দূরে বনের মধ্যে বিকেলে কাপড় প'রে যেতে দোষটা কিসের। চা-বাগানে থাকতে ত কত দূর দূর আমরা চলে যেতাম, কার্ট রোড্, পচাঙের বাজার, এখানেই বা কি বন সেখানকার সেই সুনিবিড় বনানী পদচিহ্নহীন, নির্জ্জন, আধ অন্ধকার—কতদূরে যেখানে যেখানে গিয়েচি কাপড় প'রেই ত গিয়েচি?

দাদা একটু ভীতু, সে ভয়ে নাইতে রাজী হ'ল। আমি বললাম—সীতা, তুই আর আমি নাবো না, কখ্‌খনো না। আমি যা বলি তাই শোনা সীতার স্বভাব—সে বললে, খুড়ীমা খুন ক'রে ফেললেও আমি নাবো না দাদা।

খুড়ীমা আমাদের সাধ্যমত নির্য্যাতনের কোনো ত্রুটি করলেন না; বাড়ি ঢুকতে দিলেন না, তাঁর বড় ছেলে হারু-দাকে ব'লে দিলেন আমাদের শাসন করতে, মাকে বললেন—তোমার ওই ডাকাত মেয়ে আর ডাকাত ছেলেকে আজ কি দশা করি তা টেরই পাবে—আমার সঙ্গে সমানে সমানে তক্কো ত করলেই আবার আমার কথার ওপর একগুঁয়েমি?

মা ওঁদের বাড়িতে এখন এসে রয়েছেন, ভয়ে কিছু বল্‌তে পারলেন না। আমি সীতাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি থেকে চলে গেলাম। ও-পাড়ায় পথের ধারে শ্যাম বাগ্‌চীদের পোড়ো বাড়ি, পেছনে ওদের বাগান, সেও পোড়ো। সারাদিন আমরা সেখানে কাটালাম, সন্ধ্যার সময় দাদা গিয়ে ডেকে আন্‌লেন। বাড়িতে ঢুকতে যাব কাকা দোতলা থেকে হেঁকে বললেন—ওদের বাড়ি ঢুকতে দিও না বলচি—ওরা যেন খবরদার আমার বাড়ি না মাড়ায়, সাবধান—যেখানে হয় যাক, এত বড় আস্পর্দ্ধা সব—

মা কিছু বলতে সাহস করলেন না, বৌমানুষ। বাবা বাড়ি ছিলেন না, চাকরির চেষ্টায় আজকাল তিনি বড় এখানে-ওখানে ঘোরেন, কিছু পান না বোধ হয়—দু-এক দিন পরে শুকনো মুখে ফিরে আসেন—সংসার একেবারে অচল। আমরা এক প্রহর রাত পর্য্যন্ত দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে রইলাম। জ্যাঠাইমা, খুড়ীমা, জ্যাঠামশায়, দিদিরা কেউ একটা কথাও বললেন না। তারপর যখন ওদের দোতলায় খাওয়া-দাওয়া

সারা হ'ল, আলো নিব্‌ল, মা চুপি চুপি আমাদের বাড়িতে ঢুকিয়ে নিলেন, বল্লেন,—জিতু, খুড়ীমার কথা শুন্‌লি নে কেন? ছিঃ—

আমি বল্লাম—উনি যে কথা বল্লেন মা, তার কোনো মানে হয় না। আচ্ছা মা, তুমিই বলো আমরা সেখানে বনে বনে বেড়াতাম না? আমরা কি নাইতুম? আর বন কি আঁস্তাকুড়? অন্যায় কথা ওঁর কথ্‌খনো শুন্‌বো না মা। এতে উনি মারুন আর খুনই করুন—

মা অতি কষ্টে কান্না সাম্‌লাচ্ছেন মনে হ'ল। বল্লেন—তুই যদি এরকম করিস্ তা হ'লে এ বাড়িতে ওরা আমাদের থাক্‌তে দেবে না। আমাদের কি চেঁচিয়ে কথা বল্‌বার জো আছে এখানে? ছিঃ বাবা জিতু ওরা যা বলে শুন্‌বি। ওরা লোক ভাল না—আগে জান্‌লে ভিক্ষে ক'রে খেতাম, তবুও এখানে আস্‌তাম না। তোর বাবার যে একটা কিছু হ'লে হয়।

(ক্রমশঃ)

মায়া-মৃগ

শ্রীবিভূতিভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়

শিকারী! ও শুধু মায়া-মৃগ, ওই দূরে মিলায়;
নিশি অবসানে গহীন্ রাতের স্বপন-প্রায়
দূরে মিলায়!

আধেক দোলায়ে বন-অঞ্চল,
উদাসী মাঠেরে করি চঞ্চল
গিরি-দরী-নদী ফেলি নিরবধি
চপলার মত চকিতে ধায়—
দূরে মিলায়!

বন্ধু! ও শুধু ইন্দ্রধনুর বর্ণ,
বন্ধু! ও শুধু সন্ধ্যা-রাগের স্বর্ণ,
বন্ধু! ও শুধু রাতের আলেয়া
দিনে এসে লাজে ফিরিয়া যায়!

ঘন-গহনের মায়া-মৃগ—কা'র মনোগহনের মায়া-মৃগ—
ওরে ধরা কি যায়?
দূরে মিলায়!

কোথা—কত দূরে, নীল, ঘন নীল, ঘনতর নীল সিন্ধু-মায়া—
কেমনে ঘনা'ল ও-দুটি নয়নে তারি সুমধুর স্বপ্ন-ছায়া;
তাই নিশিদিন বিরাম-বিহীন সে অতল বুকে মরিতে ধায়!
দূরে মিলায়!

ও যে মায়া-মৃগ—শিকারী, শিকারী,
ফিরে এস, ওরে ধরা কি যায়?
সমুখে মরণ, পিছনে মরণ,
ঘুচায়ে দিয়েছে সব বন্ধন;
তোমার হাতের মরণ মানে না—মহামরণেই মরিতে চায়!
ধরা কি যায়?

মৃত্যুদূত

অধ্যাপক শ্রীনিরঞ্জন নিয়োগী

ভগবান যখন প্রথম মানুষকে সৃষ্টি করলেন তখন ব'লে দিলেন, "আমার এই সুন্দর পৃথিবীতে তোমরা ইচ্ছামত বিহার কর। চিরকাল তোমরা এখানে বাস করবে না বটে, তবু এখান থেকে কখন যেতে হবে তা আমি তোমাদের হাতে ছেড়ে দিলাম। যখন এ পৃথিবীর জীবন পূর্ণভাবে ভোগ ক'রে মন তৃপ্ত হবে, তখন তোমাদের ইচ্ছা হ'লেই আমার দূত মৃত্যু এসে তোমাদের পৃথিবী থেকে নিয়ে যাবে।"

মানুষ নিশ্চিন্ত হয়ে আলোক ও বৈচিত্র্যপূর্ণ পৃথিবীতে বিচরণ করতে লাগল। ভগবান অনেক দিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করলেন, কিন্তু কোনও মানুষই পৃথিবী ত্যাগ করার ইচ্ছায় মৃত্যুকে স্মরণ করল না। তখন ভগবান নিজে থেকেই মৃত্যুকে পাঠিয়ে দিলেন এবং ব'লে দিলেন, "যারা যারা পৃথিবী থেকে চলে আসতে চায় তাদের নিয়ে এস।"

মৃত্যু পৃথিবীতে এসে দেখ্‌ল যে, সকলে বেশ আনন্দে রয়েছে এবং পৃথিবী থেকে যাওয়ার আগ্রহ বা আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করা দূরে থাকুক, চিরকাল যে মানুষ এখানে বাস করতে পাবে না, সে কথাই তারা প্রায় ভুলে গিয়েছে। তখন মৃত্যু একটি পরিবারে গিয়ে উপস্থিত হ'ল; পিতামাতা, পুত্রকন্যা, পৌত্র পৌত্রীতে পরিবারটি সুন্দর ও আনন্দপূর্ণ হয়ে রয়েছে। মৃত্যু বৃদ্ধ গৃহকর্ত্তার নিকটে গিয়ে বলল, "হে বৃদ্ধ, তোমার ত সংসারের সকল কর্ত্তব্য শেষ হয়েছে, তোমার পুত্রকন্যাগণের সুব্যবস্থা করেছ। ভোগস্পৃহা আর তোমার মধ্যে থাকা সম্ভব নয়; তোমার শরীরও অশক্ত হয়েছে। চল, তোমাকে পৃথিবী থেকে নিয়ে যাই।" বৃদ্ধ বল্‌ল, "সত্য কথা, নিজের জন্য বাঁচবার আর আমার কিছুই নেই; কিন্তু দেখ, এতদিন আমার গিয়েছে কেবল সংসারের সঙ্গে সংগ্রাম করতে। অনেক কষ্ট ও পরিশ্রম ক'রে, অনেক দারিদ্র্য ও লাঞ্ছনা সহ্য ক'রে আমার এই সংসারটি আমি সুন্দর ক'রে তুলেছি। এই সবে আমি পুত্র-কন্যা, পৌত্রপৌত্রী, দৌহিত্রদৌহিত্রী নিয়ে সুন্দর ক'রে সংসারটি সাজিয়ে বসেছি, যে, এখন নিশ্চিন্ত হ'য়ে কিছুদিন পৃথিবীর জীবন ভোগ করতে পারব। এখনই আমি কি ক'রে এমন সাজান সংসার ছেড়ে চলে যাই, বল? হে মৃত্যু, আর কিছুকাল তুমি অপেক্ষা কর, আমি নিশ্চয়ই তখন তোমার সঙ্গে যাব।"

বৃদ্ধকে অনিচ্ছুক দেখে মৃত্যু তার পুত্রকে বল্‌ল, "তুমিও অনেক দিন পৃথিবীর সুখ-সম্পদ ভোগ করলে, এখন নিশ্চয়ই তৃপ্ত হয়েছ। তা ছাড়া তোমাকে এখন সংসারের সঙ্গে কত সংগ্রাম করতে হচ্ছে, এক মুহূর্ত্তও তোমার বিশ্রাম বা মনের শান্তি নেই। চল, তোমাকে এখন এখান থেকে নিয়ে যাই তাহ'লে সমস্ত কষ্ট ও জ্বালা থেকে নিষ্কৃতি পাবে।" সে উত্তর দিল, "হে মৃত্যু, তোমার কথা খুবই ঠিক; নানা চিন্তায়, নানা দুর্ভাবনায় আমি বিপর্য্যস্ত, কিন্তু তাহ'লেও আমি ত এখন তোমার সঙ্গে যেতে পারছি না। তুমি আর কিছুদিন অপেক্ষা কর, কেন-না, আমি এখনও আমার পোষ্যবর্গের সুব্যবস্থা বা আমার সন্তান-সন্ততির ভবিষ্যতের সংস্থান কিছুই করতে পারিনি। আমিই পরিবারের অবলম্বন ও ভরসাস্থল, আমি গেলে যে সকলে নিরুপায় হয়ে পড়বে। আমার বৃদ্ধ পিতামাতাকে দেখবার কেউ থাকবে না, আমার সন্তান সন্ততির দিকে মুখ তুলে চাইবার কেউ থাকবে না, সে-কথা একবার ভেবে দেখেছ কি? যাই হোক, এখন ত তোমার সঙ্গে আমার যাওয়া হতেই পারে না। তবে আশা করছি যে, আর কিছু দিনের মধ্যেই সমস্ত সুব্যবস্থা হয়ে যাবে, তখন তোমার সঙ্গে যেতে আমার কোনও আপত্তি থাকবে না।

তখন মৃত্যু বল্‌ল, "বেশ, তুমি যদি যেতে না পার তবে তোমার পুত্রকে নিয়ে যাই। সংসার প্রতিপালনের ভার ত তার মাথায় নেই, সে গেলে তোমাদের বিশেষ কোন ক্ষতির কারণ দেখি না।" তখন সে ব্যক্তি উত্তর দিল, "সে কি! তার এখন সবে শিক্ষাদীক্ষা আরম্ভ হয়েছে, সে

কত নূতন বিদ্যা লাভ করবে, সংসারে কত জ্ঞান বিজ্ঞান শিল্পকলা আছে, সে-সব আয়ত্ত ক'রে আনন্দ পাবে। জীবনের পথে কত উৎসাহে অগ্রসর হয়ে সে দেশের ও দশের কাজ করবে। কত আশা ও উদ্যমে তার হৃদয় আজ পূর্ণ, ভবিষ্যৎ তার কত উজ্জ্বল! সে কি এখন তোমার সঙ্গে যেতে পারে? এখন যদি সে পৃথিবী থেকে চলে যায়, তবে ত আমার এতদিনকার স্নেহ ভালবাসা যত্ন চেষ্টা সমস্ত নিরর্থক হয়ে যাবে।"

মৃত্যু বল্‌ল, "আচ্ছা, তোমার পুত্রকে যদি আমার সঙ্গে দিতে না চাও, তবে তোমাদের গৃহের এই শিশুটিকে আমি নিয়ে যাই, কেন-না, তার জন্যে ত এখনও তোমাদের বিশেষ কিছু চেষ্টা বা যত্ন করতে হয়নি, সুতরাং সে-সব নিরর্থক হওয়ার আশঙ্কা কিছু নেই। সে সংসারে বেশী দিন আসেও নি, যে, সে এখন চলে গেলে তোমাদের তেমন কষ্ট বা দুঃখ হবে, বিশেষতঃ সে নিজেও এখানকার কোন রস পায়নি, সুতরাং পৃথিবী ছেড়ে যেতে তারও তেমন কোন কষ্ট হবে না।" তখন বৃদ্ধ বল্‌ল, "হে মৃত্যু, এ কি রকম কথা তোমার! শিশুটি নূতন পৃথিবীতে এসেছে, এমন যে সুন্দর পৃথিবী—এখনও সে তার কিছুই জানতে বা ভোগ করতে পারেনি। এখন যদি তুমি তাকে নিয়ে যাও তাহ'লে তার পৃথিবীতে আসার অর্থই বা কি হ'ল, সার্থকতাই বা কি? তাকে এখন বড় হ'তে দাও, তার এই সুন্দর কমনীয় লাবণ্য দিয়ে আমাদের সংসারটি মনোরম করতে দাও, তার কলহাস্যে ও মধুর অঙ্গভঙ্গীতে সকলের চিত্ত প্রফুল্ল করতে দাও। সে চলে গেলে যে আমাদের সংসারের সমস্ত সুখ মুহূর্ত্তের মধ্যে অন্তর্হিত হবে, সব আনন্দ নিবে যাবে! এখন কি তাকে পৃথিবী থেকে নিয়ে গেলে চলে!"

নিরুপায় হয়ে মৃত্যু তখন অন্য গৃহে গেল, কিন্তু সেখানেও সেই একই কথা। এইভাবে গৃহ থেকে গৃহান্তরে ভ্রমণ ক'রে ব্যর্থকাম হয়ে মৃত্যু ভগবানের নিকট ফিরে গেল, গিয়ে নিবেদন করল, "বিধাতা, একে তুমি তোমার পৃথিবীকে এমন সুন্দর ক'রে সৃজন করেছ, আবার স্নেহ-ভালবাসা দিয়ে মিষ্ট ক'রে দিয়েছ, তার ওপর মানুষকে বলেছ যে সেখান থেকে চলে আসা তার ইচ্ছাধীন। দেবতা, আমি অনেক চেষ্টা করলাম, কিন্তু শিশু, যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ কেউই সংসার থেকে আসতে চায় না। সকলেই বলে, এখন নয়, পরে এস।" ভগবান তখন বল্‌লেন, "হে মৃত্যু, কোন্ সময়ে পৃথিবী থেকে কার চলে আসা উচিত মানুষ তা বুঝতে পারছে না, তাই আজ হ'তে সেখান থেকে আসা আর মানুষের ইচ্ছাধীন থাকবে না। যখনই আমি ইঙ্গিত করব তখনই লোকের সুখ-দুঃখ, সুবিধা-অসুবিধা, পিতৃমাতৃহীন নিঃসম্বল অনাথ শিশুর রোদন, সন্তানশোকবিধুরা মাতার গগনভেদী হাহাকার, স্বামিহীনার হৃদয়বিদারক করুণ বিলাপ, পুত্রশোকে উন্মত্তপ্রায় বৃদ্ধ পিতামাতার অশ্রুজল, কিছুই গ্রাহ্য না ক'রে, কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে, যাকে আনতে বলব পৃথিবী থেকে তাকেই নিয়ে আসবে। এই তোমার প্রতি আদেশ হ'ল।"

প্রথম শিশু

শ্রীবিমল মিত্র

শ্রীবিলাসের মনে হইল, তাঁবুর বাহিরে কে যেন বড় টানিয়া টানিয়া বলিতেছে—ওগো, দুয়োরটা একটু খোল না—শুনচ—খোল না একবার—খুলে দেও না—ওগো—

বিছানা ছাড়িয়া শ্রীবিলাস লাফাইয়া উঠিল। স্ত্রীলোকের গলা মনে হইতেছে। অনেকটা মাধুরীর গলার আওয়াজ।

মোমবাতি জ্বালাইয়া সর্ব্বাঙ্গে আলোয়ান জড়াইয়া শ্রীবিলাস তাঁবুর দরজা খুলিল।

শীতের রাত্রি, মাঠময় কুয়াশা পড়িয়াছে। চারিদিকে অন্ধকার, চোখ মুছিতে মুছিতে শ্রীবিলাস বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিল।

কেউ কোথাও নেই, তবে কি চলিয়া গেল না-কি! শ্রীবিলাস ডাকিল—কে, কে? ডাক্‌ছিলে? কে তুমি?

ও-পাশের তাঁবুতে যাহারা ঘুমাইতেছিল, তাহাদের একটানা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ আসিতেছে। বোঝা যায় কেহই জাগিয়া নাই। শ্রীবিলাস চুপ করিয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল।

যে-গাছের তলায় তাঁবু খাটান হইয়াছিল, সেই গাছের পাতাগুলি সর্ সর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। বাতাস লাগিয়া শ্রীবিলাসের শীত করিতে লাগিল। তবে হয়ত তাহাকে দেখিয়া সে লজ্জা পাইতেছে। শ্রীবিলাস আরও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু কোথাও কাহারও চিহ্নটুকুও নাই যে!

এবার শ্রীবিলাস বাহিরে আসিল।

দিনের বেলাকার সেই রুক্ষ মাঠটা রাত্রে যেন অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে। সেই মাঠের উপর নিদ্রিত পৃথিবী শীতে কুণ্ডলী পাকাইয়া পড়িয়া আছে। দূরে যেখানে চলনের বিল—আজ এখন মনে হয় সেখানে যেন জল নাই। সাদা থান পরিয়া ভূমিলক্ষ্মী যেন বিধবাবেশিনী! চারিদিকে কোথাও কেহ নাই যে।

ওধারের তাঁবুতে দলের লোকেরা আছে।

শ্রীবিলাস এধার-ওধার চারিদিক খুঁজিতে লাগিল। সে স্পষ্ট শুনিয়াছে কে যেন তাহাকে দরজা খুলিয়া দিতে অনুরোধ করিতেছে! ভুল ত হইবার কথা নয়।

ওধারের তাঁবুর কাছে গিয়া শ্রীবিলাস ডাকিল—নিধিরাজ, নিধিরাজ, ও নিধু—শুনলি—নিধুরে একবার ওঠ্ মাণিক—

নিধু সত্যই উঠিল। এতরাত্রে তাহাকে দিয়া যে বাবুর কি প্রয়োজন থাকিতে পারে তাহা নিধুকে বলিয়া দিতে হয় না। নিধিরাজ উঠিয়া শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া তামাক সাজিতে বসিল।

তাঁবুর কাছাকাছি যন্ত্রপাতি পড়িয়া আছে।—গ্রামে সরকারী টিউব-ওয়েল বসিবে তাহারই সরঞ্জাম। সেইখানে লম্প জ্বালাইয়া নিধিরাজ টিকে ধরাইতে লাগিল।

খানিক পরে শ্রীবিলাস বলিল,—তুই কিছু শুনেছিস্ না কি রে নিধু?

নিধিরাজ শুনিয়াছে। বলিল,—শুনেছি বইকি!—রাত্তিরে ত?

শ্রীবিলাস আশ্চর্য্য হইয়া গেল। এ ব্যাপার সকলেই শুনিয়াছে! বলিল, - তুই শুনেছিস্?—ঠিক তোর বউঠাকরুণের মত গলা নয়?—ঠিক একেবারে—নয়?...

নিধিরাজ তাচ্ছিল্য ভরে বলিল,—আজ্ঞে কিসে আর কিসে—এরা বেটাছেলে মেয়েলোক সেজেছে—সেকি আর তেমন হয়, তবে গান গাইছিল খুব ভাল, বুঝলেন, লখীন্দর মারা গেলে পর বেউলোর কান্না যদি শুনতেন—আপনি গেছলেন না কি?

এতক্ষণে শ্রীবিলাস বুঝিতে পারিল নিধিরাজ ও-পাড়ার ভাসানের গানের কথা বলিতেছে।

তামাক দিয়া নিধিরাজ চলিয়া যাইতেছিল—

শ্রীবিলাস ডাকিল—যাসনে শোন্—বলি—

নিধিরাজ পায়ের কাছে বসিল। শ্রীবিলাস বলিল,—তোকে একটা কাজ করতে হবে—বুঝলি, কলকাতায় যেতে পারবি—আজই সকালে—?

নিধিরাজ ঘাড় নাড়িল—সে পারিবে।

শ্রীবিলাস বলিল,—তা হ'লে আজই চলে যা—বুঝলি—বাড়িতে পুরুষ কেউ নেই ত—পিসিমা আর তোর বউঠাকরুণ—তুই যা—হ্যাঁ সেই ভাল—তুই যা—

আসিবার সময় শ্রীবিলাস মাধুরীর সঙ্গে একরকম প্রায় রাগ করিয়াই চলিয়া আসিয়াছে। এই টিউব-ওয়েলের কাজটা লইয়া পর্য্যন্ত মাধুরীর সঙ্গে তাহার কেমন দূরত্ব আসিয়া গিয়াছে। আজ এ-গ্রামে, কাল সে-দেশে, পরশু ওখানে—এমনি করিয়া শ্রীবিলাসের সঙ্গে মাধুরীর যেন আর পূর্ব্বেকার সে সম্বন্ধ নাই। মাধুরী দিন দিন কৃশ হইয়া যাইতেছে—এ-সব দেখিয়াও শ্রীবিলাস কোনও উপায় করিতে পারে নাই।

আজ রাত্রের ওই অদ্ভুত শব্দটা শুনিবার পর হইতে প্রাণটা তাহার বেদনায় টন্‌ টন্‌ করিয়া উঠিয়াছে। তাহার নিঃসঙ্গ জীবনে সে এতটুকু সুখ দিতে পারে নাই।

আসিবার দিন শেষ দৃশ্যটা শ্রীবিলাসের মনে আছে।

শিয়ালদহ হইতে ভোর ছয়টায় গাড়ী ছাড়ে; ভোর থাকিতে থাকিতে পিসিমা উঠিয়া রাঁধাবাড়া শেষ করিয়াছেন। বন্ধ দরজার বাহির হইতে পিসিমা বলিলেন,—বৌমা, অ বৌমা—বিলাস উঠেছে?—উঠিয়ে দাও বাপু, ভোর হয়ে গেল যে—কাককোকিল ডাকতে লেগেছে, খুব ঘুম বাছা তোমাদের—

কিন্তু পিসিমার ডাকিবার বহু পূর্ব্বে শ্রীবিলাস আর মাধুরী উঠিয়া পড়িয়াছে। মাধুরীর সে-দিন সে কি রাগ!

শ্রীবিলাস তাহার রাগ ভাঙাইতেছিল—তুমি ত অবুঝ নও মাধুরী, যাব আর আসব, এই দেখ না সে-বারের মত সাতটা দিন দেখতে দেখতে যাবে; দশ দিন নয় বার দিন নয়—এ ক'দিনের মধ্যে তোমার কিছু হবে না—

মাধুরী মুখ নীচু করিয়া বলিয়াছিল,—না গেলে কি হয় তোমার—কে খাবে তোমার অত টাকা—আমি মরে গেলে—:

শ্রীবিলাস আর বলিতে দেয় নাই, দুই হাত দিয়া মাধুরীর মুখ চাপিয়া ধরিয়াছিল। কিন্তু খানিক পরেই বুঝিয়াছিল, মাধুরী কাঁদিয়া ফেলিয়াছে।

—ও মাধু, ওকি, ছি কাঁদতে আছে বুঝি, এই দেখ ফের ছেলেমানুষী—

যা হোক সকালে সে-দিন যাওয়া হয় নাই। সন্ধ্যাবেলাও সেইরকম মাধুরীকে কাঁদাইয়া শ্রীবিলাস চলিয়া আসিয়াছিল।

মাধুরীকে শেষ বারের মত আদর করিতে যাইতেই মাধুরী বলিয়াছিল—তুমি চলে যাচ্ছ, আমিও যেতে জানি। আমি চলে যেতে পারিনে ভেবেছ—দেখো—ফিরে এসে দেখো না—

হাসিতে হাসিতে সে-দিন শ্রীবিলাস চলিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু আসিয়া অবধি মনটা তাহার খারাপ হইয়া আছে। চিঠি শ্রীবিলাস লিখিয়াছিল, কিন্তু পৌঁছিয়াছে কি-না সন্দেহ। নইলে পাঁচ দিন কাটিয়া গেল—উত্তর আসিল না কেন?... গ্রামের পোষ্ট আপিসও যেমন!

—বুঝলি নিধু, আজ সকালেই তুই যা—পারবি ত? তাই ভাল—বউঠাকরুণ যা বলে শুনবি পিসিমার কথায় রা করবি নে তা হ'লে তাই ঠিক—বুঝলি—বুঝলি ত?

মুখ দিয়া দগ্ধ তামাকের ধোঁয়া বাহির হইতে লাগিল। শ্রীবিলাসের বার-বার মনে হইল—সে-দিন ঠিক অমন করিয়া তাহার চলিয়া আসা উচিত হয় নাই।

মাধুরী যেমন অভিমানী, কি কাণ্ড করিয়া বসে কে জানে। বিশেষ করিয়া শ্রীবিলাসের মনে হইল মাধুরীর বর্ত্তমান শারীরিক অবস্থায় সেই অভূতপূর্ব্ব ঘটনাটি কখন যে ঘটিয়া বসে তাহার ত ঠিকঠিকানা নাই।

প্রথম সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে; কত আশঙ্কা—কত আনন্দ—কত বেদনা জননীকে ভোগ করিতে হয় তা ত শ্রীবিলাস শুনিয়াছে। এই সময়টায় কত সাবধানে থাকিতে হয়—শিশুদেবতার আবির্ভাবের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত জননীকে কত কঠোর আত্মসংযমের মধ্যে নিজেকে বাঁধিতে হয়, তাহা সে জানে! প্রতি মুহূর্ত্তে বিপদ—প্রতি পদক্ষেপে আশঙ্কা—প্রতি ক্ষণে চরমতম মুহূর্ত্তের জন্য কি ব্যাকুল প্রতীক্ষা! এই সময় মাধুরীকে ছাড়িয়া চলিয়া আসা তাহার কখনও উচিত হয় নাই।

নিধিরাজ চলিয়া যাইতেছিল।

শ্রীবিলাস আবার ডাকিল,—আর একটা কথা শুনে যা, বউঠাকরুণ যা বলে শুনবি বুঝলি, দরকার হ'লে ডাক্তারবাবুকে ডেকে আনতে ভুলিস্‌নে—আর দেখ, তুই-ই ত বাজার করবি—বউঠাকরুণ যা যা খেতে ভালবাসে তাই আনবি, এই

ধর, শীতের সময় এখন শিম, মাখন শিম, পালঙ শাক—এই রকম সব। তোকে আর কি বলব, আর হ্যাঁ, মোড়ের দোকানে সেই যে উড়েটা সিঙাড়া ভাজে গরম গরম, তাই আনবি জলখাবারের জন্যে · যা তা হ'লে—

নিধিরাজ যাইতেছিল।

শ্রীবিলাস আবার ডাকিল,—হ্যাঁ দেখ, বেশী খাটাখাটুনি যেন না করে বুঝলি, তুই-ই নিজে সব করবি—আর বাড়িতে থাকবি সব সময়, যেন সমস্ত দিন আড্ডা মারতে যাস্‌নে আবার।

নিধিরাজ চলিয়া যাইতেছিল।

শ্রীবিলাসের আবার আর একটা কথা মনে পড়িয়া গেল।—আর একটা কথা শোন্ নিধে—দুটো টাকা দিচ্ছি, সাকুরে গলির ষ্টীমার ঘাটে বেশ ভাল প্যাঁড়া পাওয়া যায়—ট্রেনে উঠবার আগে তাই নিবি সের-দুয়েক, বেশ ভাল দেখে—তোর বউঠাকরুণ খেতে ভালবাসে কি-না—আর একটা কথা—না, না, তুই যা—সে হবে'খন—

শ্রীবিলাস বলিতে যাইতেছিল—কালীঘাটে ষষ্ঠীতলায় গিয়া যেন পূজা দিয়া আসা হয়। তা সে পিসিমা আছে, পিসিমাই সব ব্যবস্থা করিয়াছে নিশ্চয়। ওসব মেয়েমানুষেরাই জানে ভাল।

শ্রীবিলাস উঠিয়া তাঁবুর দরজা বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িল।

দারুণ শীত পড়িয়াছে।

আচ্ছা, এমন হয় না স্বপ্নের মধ্যে আর একবার মাধুরী যদি আসে!

শ্রীবিলাস চোখ বুজিয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু এপাশ-ওপাশ ফিরিয়াও তাহার ঘুম আসিল না। যত রাজ্যের ভাবনা কি এই সময়েই আসিতে হয়!

আচ্ছা, মাধুরীর যদি একটা ছেলে হয়! ফুটফুটে গায়ের রং, মায়ের মতন গড়ন, সায়েবদের ছেলেদের মত স্বাস্থ্য। ছেলেকে সে বিলাত পাঠাইবে ব্যারিষ্টারি পড়িতে, কথাটা ভাবিয়াই শ্রীবিলাস হাসিয়া উঠিল। কোথায় ছেলে ঠিক নাই, ইহারই মধ্যে এত সাধ!

কিন্তু গোল বাধিবে নাম রাখা লইয়া। পিসিমা সেকেলে মানুষ, হয়ত একটা ঠাকুর-দেবতার নাম রাখিবে—কালীচরণ, শিবদাস, কি এই রকম কিছু। আজকাল ও-নাম আর ভাল লাগে না। 'হিরণ্ময়' নামটি বেশ।—বাগবাজারের বাঁড়ুয্যেদের ছেলে নূতন আই-সি-এস্ পাস করিয়া আসিয়াছে।—বেশ নামটি!

কিন্তু ছেলে না হইয়া ত মেয়েও হইতে পারে! শ্রীবিলাস ভাবিল, তা মেয়ে বলিয়া ফেল্‌না না-কি? আজকাল পথে ঘাটে কত মেয়েকে সে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিতে দেখিয়াছে। মেয়েকে সে লেখাপড়া শিখাইবে—এখনকার মত মেয়েদের বিবাহের জন্য অত ভাবিতেও হইবে না, তখন নিজেরাই নিজেদের বর বাছিয়া লইবে।

কিন্তু যে যাহাই বলুক, মেয়ের নাম সে রাখিবে 'উজ্জয়িনী'। 'উজ্জয়িনী' যদি মাধুরীর পছন্দ না হয় 'মৈত্রেয়ী' নামটাও ভাল।

লেপের ভিতর শ্রীবিলাসের আরও শীত করিতে লাগিল।

চারিদিকে দু-একটি পাখীর ডাক শোনা যায়। কি একটা পাখী আকাশের এপার হইতে ওপারে ডাকিতে ডাকিতে উড়িয়া গেল। উপরের অশ্বত্থ গাছ হইতে তাঁবুর উপর টপ টপ করিয়া জল পড়িতেছে। তাঁবুর একটা ফুটা দিয়া আকাশের একটি কণা দেখা যাইতেছে।

এখনে মাধুরী কি করিতেছে কে বলিবে!···

পিসিমা সকাল সকাল উঠিয়া ধোয়া-মোছা সুরু করিয়া দিয়াছে। পাশের বেনেদের বাড়িতে সারাদিনের মত চীৎকার আরম্ভ হইল। তারপর?

তারপর, পুব দিকের জানালাটা দিয়া বিছানার উপর একটু রৌদ্রের আমেজ আসিয়া পড়িতেছে; ঘড়িতে ছয়টা বাজে। মাধুরী উঠিয়াছে। পিসিমা এবার চান করিতে যাইবে—তারপর?...ছোট এতটুকু একটি খোকা—হিরণ্ময়—উজ্জয়িনী—মৈত্রেয়ী...

সকাল সকাল খাইয়া লইয়াই দলের লোকেরা কাজ আরম্ভ করিয়া দেয়। তারপর সেই কাজ সন্ধ্যা অবধি চলে। প্রতি গ্রামে দুই একটি করিয়া টিউব-ওয়েল বসিতেছে—

কাজ কম নয়।...

সকালবেলাই নিধিরাজ যাইবে। এখান হইতে পুরা দশ মাইল নৌকা, তারপর ষ্টীমারে চড়িতে হইবে, তারপর ট্রেন!

শেষরাত্রে ঘুম আসাতে শ্রীবিলাস তখনও ঘুমাইতেছিল। রৌদ্র উঠিয়া বেলা হইয়া গিয়াছে। টিউব-ওয়েলের বোরিং

চলিতেছে—গ্রামের ছেলেপিলের দল তাই দেখিতে জড় হইয়াছে। শুধু ছেলেই বা কেন, বুড়ারাও বাদ যায় নাই।

শ্রীবিলাসের তাঁবুর কাছে গিয়া নিধিরাজ ডাকিল,—বাবু, ও বাবু—

শ্রীবিলাস উঠিল—কি রে?

—আপনার চিঠি আছে একখানা।—

চিঠি! শ্রীবিলাস যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থায় লাফাইয়া উঠিয়াছে। শেষকালে মাধুরীর চিঠি সত্যসত্যই আসিল বলিতে হইবে। আর সে যা ঢিলা—চিঠি লিখতেই তাহার যত আলস্য। যাক্, চিঠি ত লিখিয়াছে, কিন্তু কি লিখিয়াছে কে জানে?...এতদিনে তাহা হইলে হয়ত একটি...।

কাপড় ঠিক করিয়া শ্রীবিলাস তাঁবুর দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিল।

কিন্তু চিঠি মাধুরীর নয়—আপিসের। উপরের ছাপ দেখিলেই বোঝা যায়। নিধিরাজের উপর তাহার রাগ হইল। হইবারই কথা। ভারি ত আপিসের চিঠি, সেই চিঠির জন্য তাহাকে এমনি ডাকিয়া তোলা। নিধিটার এতটুকুন বুদ্ধিও কি থাকিতে নাই?

শ্রীবিলাস ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া একটা স্বপ্ন দেখিতেছিল।... মাধুরীর স্বপ্ন। কাজ শেষ করিয়া যেন শ্রীবিলাস বাড়ি ফিরিয়া গিয়াছে। ছোট টুকটুকে একটি ছেলে কোলে করিয়া মাধুরী আসিল।...দেখিতে ঠিক মাধুরীর মতন—যেমন রং, তেমনি গড়ন—

শ্রীবিলাস বলিল,—কই বড় যে রাগ ক'রে বলেছিলে চলে যাবে তুমি—তা আর যেতে হয় না—ওকি—ও আবার কে? —কা'র ছেলে নিয়ে এলে? কই—ও মাধুরী—দেখি—

মাধুরী হাসিয়া হাসিয়া বলিতেছিল,—হ্যাঁ, অমনি অমনি ছেলের মুখ দেখতে হয় বুঝি—সোনার বালা চাই—আর আমার—

মিছামিছি শ্রীবিলাস পকেটে হাত পুরিয়া কি যেন বাহির করিতেছে এমনি ভাবে বলিল—কাছে সরে এস, তবে ত দেব—কাছে—আরও কাছে—এস—

মাধুরী কাছে আসিতেছিল; শ্রীবিলাস একটি দারুণ মজা করিতে যাইবে, এমন সময় নিধিরাজের ডাকাডাকিতে তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল।...নিধিরাজ যদি বোকা নয় তবে কি? আপিসের চিঠি যেমন আসিয়াছিল তেমনি পড়িয়া রহিল। শ্রীবিলাস খুলিয়াও দেখিল না।

ততক্ষণে নিধিরাজ তামাক সাজিয়া আনিয়াছে। মুখ হাত পা ধোয়ার আগে এটি তাহার চাই। কি যে অভ্যাস! বাবার নিকট হইতে এটি তাহার উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া।

তাঁবুর উপর অশ্বত্থ গাছটির ডালে একটা কাক কি বিশ্রী কর্কশ স্বরে ডাকিতেছে। কাকের ডাক অশুভ।...এখন কোথায় অনেক দূরে মাধুরী কি অবস্থায় আছে কে জানে।... শ্রীবিলাস বাহিরে আসিয়া কাকটিকে তাড়া দিয়া উড়াইয়া দিল। যত সব অমঙ্গল—অশুভ—অলক্ষণ! মাধুরী ভালয় ভালয় যদি উৎরাইয়া যায় তবেই...

এই কাকের কথাতেই শ্রীবিলাসের আর একটা কথা মনে পড়িল। মালদহতে একবার টিউব-ওয়েলের কাজ চলিতেছে। শিউচরণ তখন হেড মিস্ত্রি। কোথা হইতে কে জানে একটা কাক আসিয়া মাথার কাছে ডাকিতে সুরু করিল। কাক অমন কত ডাকে, কে খেয়াল রাখে! ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই কাকটাই কেবল ডাকিয়া ডাকিয়া যায়।—জ্বালাতন আর কি! শেষে বাঁশ কাঠি ঠেঙা দিয়া তাড়াইয়া তবে শান্তি!

তখনকার মত শান্তি হইল বটে, কিন্তু পরদিনই দেশ হইতে খবর আসিল—শিউচরণের ছোট ছেলেটি মারা গিয়াছে।

দলের লোকেরা সকাল সকাল রান্না করিয়া খাইয়া লয়। দু-একটা যা-কিছু দেখিবার মত শ্রীবিলাস দেখাইয়া দিল।—পাইপের মাপ লইল।—তারপর আবার সেই একভাবে বোরিং চলিল।

সরকারী রাস্তা বাহিয়া সোজা উত্তর দিকে গিয়াছে খেয়াঘাটের পথ। সেইখানেই নৌকায় উঠিতে হইবে।

নিধিরাজ প্রস্তুত হইয়াছে।

হাট হইতে কচু কিনিয়া রাখিয়াছিল। মানকচু, একটা এক পয়সা—বড় বড় দেখিয়া দুইটা—আর বেগুন লইয়াছে চার সের—চমৎকার বেগুন বটে, কলিকাতার সেই সাত-বাসি বেগুন—আর এ বেগুন—বউঠাকরুণ বেগুন দেখিয়া যা খুশী হইবে—তা সে জানে। আর মূলো লইয়াছে অসংখ্য; পাইকারী দর। যদি পচিয়া যাইবার ভয়ই থাকে—বেশ ত—কাটিয়া কাটিয়া শুকাইয়া রাখিলেও চলে, অসময়ের জন্য।

একটা ছালার ভিতর সব ক'টি জিনিষ পুরিয়া একটা বড় পুঁটুলি হইয়াছে।—আর আছে চার নাগরী গুড়।

বাস্ এই!

শ্রীবিলাস নৌকা পর্য্যন্ত যাইবে নিধিরাজের সঙ্গে। পোঁটলাটা কাঁধে ফেলিয়া নিধিরাজ পথে বাহির হইল।

দুগ্গা—দুগ্গা—

শ্রীবিলাসও আস্তে আস্তে বলিল, দুর্গা দুর্গা—

এখন গিয়া যে সেখানে নিধিরাজ কি দেখিবে কে জানে! যদি ভালয় ভালয় শেষরক্ষা হয়—তবেই ত! নহিলে...

একবার শ্রীবিলাসের মনে হইল—এ তাহার অহৈতুক উৎকণ্ঠা। পৃথিবীতে রোজই ত কত শিশু জন্মগ্রহণ করিতেছে—এ-ভয় করিলে সংসারে ত বাস করা চলে না। এই ত সে-দিন কলিকাতায়—তাহারই বাড়ির পাশের বাড়িতে—

স্বামী বেচারা আপিস চলিয়া গিয়াছে। হঠাৎ দুপুরবেলাই মহিলাটির বেদনা উঠিয়াছে। তারপর শ্রীবিলাস নিজে গিয়া ডাক্তার দাই ইত্যাদি দেখান সব ত করিল। শিশুও বাঁচিল, মাও বাঁচিল। সেই শিশু এখন বছর-তিনেকের হইয়াছে।

সে-দিন শ্রীবিলাস ছিল, তাই ত! ভগবান নিশ্চয়ই আছেন। শ্রীবিলাসের স্থির বিশ্বাস হইল—ভগবান নিশ্চয়ই আছেন!

নিধিরাজ হঠাৎ চীৎকার করিয়া বলিল,—দেখুন বাবু, ওই দেখুন—

—কি রে?

শ্রীবিলাস এদিক-ওদিক চাহিয়াও লক্ষ্য করিবার মত কিছুই দেখিতে পাইল না।

—দেখছেন না ঐ যে—খালি কলসী একটা দেখেছেন? যাত্রা শুভ—জানেন না খালি কলসী দেখলে যাত্রা শুভ হয় যে—

কথাটা সত্য বটে। শ্রীবিলাসও জানে।...সারাপথ শ্রীবিলাস এদিক-ওদিক চাহিতে চাহিতে চলিতে লাগিল।

একটা শুভচিহ্ন না-হয় দেখা গিয়াছে, অমঙ্গল আশঙ্কা কিছু কমিল—কিছু যদি আরও অমনি দু-একটা দেখা যায় তাহা হইলে অমঙ্গল সম্ভাবনাটা একেবারেই চলিয়া যায়।... কিন্তু এদিক-ওদিক কোথাও কিছু নাই।

শ্রীবিলাস নিধিরাজকে বুঝাইতে বুঝাইতে চলিল—বেরাল যেন বাড়ির ত্রিসীমানায় না আসে। হুলো বেরালের সেই অদ্ভুত আর্ত্তনাদ ক্লান্তকরুণ স্বর গর্ভবতীর পক্ষে না-কি ভারি অমঙ্গলজনক। কাছাকাছি যেখানে বেরাল দেখিবে যেন তখনি তাড়াইয়া দেওয়া হয়।...আর কাক!... শিউচরণের ছোট ছেলেটার মৃত্যু হইয়াছিল কেমন করিয়া তা ত নিধিরাজ জানেই!...

খেয়াঘাটের ওধারেই শ্মশান!

শ্রীবিলাস ভাল করিয়া নজর করিয়া চাহিয়া দেখিল—কোথাও আজ একটা শবদেহও ত নাই। শবদেহও ত শুভযাত্রার লক্ষণ। মাধুরীর মঙ্গলের জন্য কি কেহ একজনও মরিল না। অথচ অন্য দিন কত মৃতদেহে শ্মশান ভরিয়া থাকে।

নিধিরাজ নৌকায় উঠিল। বলিল,—গিয়েই চিঠি দেব, আপনি ভাববেন না, আর যাত্রা ত শুভ হয়েছে—ও কি মিথ্যে হয়?

নৌকা ছাড়িয়া দিল। গুড়ের নাগরী ও ছালার পোঁটলাটার পাশে দাঁড়াইয়া নিধিরাজ শ্রীবিলাসের দিকে নির্ব্বাক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। বলিবার কিছুই নাই, অথচ দু-জনেই বুঝিল কত জিনিষ বলা হইল না।

ক্রমে দূরে বাঁকের মুখে নৌকাটা অদৃশ্য হইয়া গেল।

ফিরিয়া আসার পথে শ্রীবিলাসের মনে হইল—ভগবানের এ বড় অবিচার। নারী সন্তানপ্রসবের সমস্ত বেদনা বহন করিবে, আর পুরুষ কেমন স্বচ্ছন্দে নির্ব্বিঘ্নে হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইবে, অথচ পুরুষের দায়িত্বটা কি কিছু কম! পুরুষ যে বেদনার এতটুকু ভাগও ত লইতে পারে না। নারীর উপর যেন বিধাতার বিশেষ আক্রোশ!

নিধিরাজ চলিয়া গিয়াছে—তামাক সাজিয়া দিবার কেহ নাই।

অলস মধ্যাহ্নে তাঁবুতে বসিয়া তাহার যেন শ্বাস রোধ হইয়া আসিতেছিল। ঠিক এই সময়ে মাধুরী সেখানে কি করিতেছে ভাবিতে বেশ লাগে!...

দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়া সারিয়া এখন হয়ত কাঁথা সেলাই করিতে বসিয়াছে। প্রথম শিশু আসিবে—সমস্ত কাঁথা

নূতন তৈরি করা দরকার। সুতার প্রত্যেকটি টানে টানে মাধুরীর হাতের চুড়িগুলি ঠুন্ ঠুন করিয়া বাজিতেছে—পশ্চিমমুখো বারান্দায় দ্বিপ্রহরের কড়া রৌদ্র আসিয়া পড়িয়াছে—সামনের নারিকেল গাছটা বাতাস লাগিয়া আমূল দুলিতেছে—আকাশের গায়ে অনেক দূরে গোটা-দুয়েক চিল মন্থর গতিতে উড়িতেছে—শীতের দিন উহাদের পাখার ভরে ক্লান্ত উদাস হইয়া উঠিল—

হঠাৎ শ্রীবিলাস বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল।

সকালবেলা আপিসের যে চিঠিটি আসিয়াছিল সেটা ত পড়া হয় নাই। শ্রীবিলাস টেবিলের উপর খুঁজিল।—সেখানে নাই। বিছানা, বালিসের তলা, জামার পকেট সব দেখা হইল, কোথাও নাই। সে চিঠিতে কি অর্ডার আছে কে জানে।

শ্রীবিলাস উঠিয়া আসিয়া নিজের বাক্সটা খুলিল। ইহার ভিতরেই হয়ত সে কখন তুলিয়া রাখিয়া দিয়া থাকিবে। কাগজপত্র প্রত্যেকটি তন্ন তন্ন করিয়া দেখিল। অনেক দিনের পুরান চিঠিপত্র আবার পড়িতে লাগিল।

হঠাৎ দেখিল একটা ফোটো। এখন ময়লা হইয়া গিয়াছে।

অনেক দিন আগে—শ্রীবিলাস তখন বিয়ে করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। বয়স তখন তাহার ত্রিশের কাছাকাছি, বিবাহ করিবার বয়স তাহা নয়। কিন্তু কোথা হইতে একটা সম্বন্ধ আসিল—শ্রীবিলাস প্রথমটা 'না' 'না' করিয়াছিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত মাধুরীর এই ফোটোটা দেখিয়াই কেমন যেন মনটা একটু ঝুঁকিয়াছিল। তার পরেই বিবাহ!

ফোটোটা এমন কিছু নয়। পিছনে সিন টাঙানো। মনে হয় মাধুরী যেন তালকুঞ্জের ভিতর দাঁড়াইয়া আছে; স্বভাবসরল সুন্দর মুখখানি।...ঢাকাই শাড়ীটি সর্ব্বাঙ্গে বেষ্টন করা—মাথায় ঘোমটা নাই—হাতের কব্জীতে একটা ঘড়ি—পরে শ্রীবিলাস শুনিয়াছে ও ঘড়িটা মাধুরীর দাদার—ফোটো তুলিবার সময় ওটি তাহার হাতে পরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

সেই কুমারী মাধুরী এখন কত বড়টা হইয়াছে। যে ছিল এক দিন অচেনা অজানা পর, আজ সে-ই কেমন করিয়া এত আপনার হইয়া গেল! তাহার এতটুকু অসুখ করিলে যে শ্রীবিলাসের চিন্তার অবধি থাকে না। শ্রীবিলাস ভাবিয়া পায় না কেন এমন হয়।

খুঁজিতে খুঁজিতে আর একটা চিঠি বাহির হইল। মাধুরীর চিঠি!

বিলাসপুরে থাকিতে মাধুরী লিখিয়াছিল; তখন নূতন বিবাহ হইয়াছে, চিঠিটির আগাগোড়া শ্রীবিলাস পড়িল। পুরান চিঠি পড়িতে বেশ লাগে। সেদিনকার মাধুরী—আর এদিনকার মাধুরী—তফাৎ এতটুকু নাই। কত অনুযোগ করিয়া লিখিয়াছে, বৃদ্ধ বয়সে বিবাহ করিয়াছে বলিয়া স্ত্রীর উপর শ্রীবিলাসের টান নাই—বাড়ি আসিতে না পারেন, চিঠি লিখিতে ত দোষ নাই ইত্যাদি ইত্যাদি—

চিঠি পড়িয়া শ্রীবিলাস খুব খানিকটা হাসিয়া লইল। মেয়েমানুষ হইয়া জন্মিয়াছে— চাকুরির যে কত জ্বালা তাহা ত বোঝে না।

তাঁবুর বাহিরে রৌদ্র পড়িয়া আসিয়াছে।

দলের লোকেরা সমস্বরে চীৎকার করিতে করিতে বোরিং করিতেছে। শ্রীবিলাস ঘুমাইবার চেষ্টা করিল।

কাল এমনি সময়ে নিধিরাজ সেখানে গিয়া পৌঁছিবে। পিসিমা তখন হয়ত পাশের বামুন-বাড়ি বেড়াইতে গিয়াছে। কড়া-নাড়ার শব্দে মাধুরী কাঁথা সেলাই ফেলিয়া রাখিয়া উঠিবে।

—কে—কে তুমি?

—আমি—আমি বউঠাকরুণ, আমি নিধিরাজ—

তাড়াতাড়ি মাধুরী কাপড়টা ভাল করিয়া গায়ে জড়াইয়া ঘোমটা দিয়া আসিয়া হাসিতে হাসিতে দরজা খুলিয়া দিবে! দরজা খুলিয়াই দেখিবে নিধিরাজ পৌটলা ঘাড়ে করিয়া একা; সঙ্গে আর কেহ নাই।

মাধুরী বলিবে—কই তুই একা এলি? আর কেউ নেই? হ্যাঁ রে নিধিরাজ, আর কেউ নেই?

তাঁবুর বাহিরে বিকাল হইয়া আসিল। শ্রীবিলাস বিছানা ছাড়িয়া উঠিল। আজ রাত্রে আসিয়া মাধুরীকে একটা চিঠি লিখিতে হইবে।

জুতা জোড়া পায়ে দিয়া শ্রীবিলাস বাহিরে আসিল।

টিউব-ওয়েল ঘিরিয়া ছেলেবুড়োর দল অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। এতদিন ধরিয়া দেখিয়া দেখিয়া তাহাদের সাধ আর মেটে না। যাহাদের বয়স বেশী তাহারা গাঁয়ের

জোরে ছোটদের তাড়াইয়া দিয়া নিজেরা সামনে গিয়া দাঁড়াইয়াছে। সামনে দাঁড়াইলে দেখা যায় ভাল।

শ্রীবিলাস দু-একটা জিনিষ দেখাশোনা করিয়া পথে নামিল, ভাবিল একবার পোষ্ট আপিসটা ঘুরিয়া দেখিয়া আসিলে হয়—কোনও চিঠি আসিয়াছে কি-না।

চারিদিকে সন্ধ্যা হয়-হয়। দেখিতে দেখিতে শ্রীবিলাস তখন বারোয়ারীতলায় গিয়া পৌঁছিয়াছে। চারিদিকে বটগাছ—মূল গাছটি আজ দশটা গাছে পরিণত হইয়াছে। কাল আরও হইবে। শ্রীবিলাস চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল—পোষ্ট আপিস, পাঠশালা এবং তাহারই দক্ষিণ দিকে মঙ্গলচণ্ডীর মন্দির। মন্দিরের দাওয়ার উপর বসিয়া কত লোক তখন গল্প করিতেছে।

নদীর ধারে আসিয়া তবে শ্রীবিলাসের যেন মাথা ঠাণ্ডা হইল।

সারাদিন তাঁবুর ভিতর বসিয়া বাড়ির কথা ভাবিতে ভাবিতে তাহার মনের সমস্ত শান্তি নষ্ট হইয়া যায়।—অনেক দূরে একটা লোক কেমন বাঁশী বাজাইতেছে। গ্রামের সীমানা ছাড়াইয়া মাঠ পার হইয়া ধানজমি, মেঠো পথ আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে। শেষে দিগন্তসীমায় গিয়া মিশিয়াছে।

মাধুরী তাহার উপর খুব রাগ করিয়াছে নিশ্চয়, রাগ করিয়া হয়ত চিঠির উত্তর দিতেছে না—নইলে শ্রীবিলাস কবে চিঠি লিখিয়াছে এখনও উত্তর আসিল না কেন?...নিখিরাজ সেখানে গিয়া কি দেখিবে কে জানে।

ছোট ভাড়াটে বাড়ি। সব দিন কলের জল আসে না। তাও ও-বাড়ির কল বন্ধ করিলে তবে এ বাড়িতে জল আসে। এই জল লইয়াই বাড়ির মেয়েদের মধ্যে দিনরাত ঝগড়া।

তারপর পাশের বাড়ির লোকেরা নিজেদের লজ্জা বাঁচাইবার জন্য দু-তলা সমান এক মস্ত পাঁচিল তুলিয়া দিয়াছে। সেই পাঁচিল দেওয়াতে ঘরের ভিতর আলো-বাতাস প্রবেশ করিতে পারে না। বিধাতার দেওয়া আলো বাতাস জল—তাও শহরে পয়সা দিয়া কিনিতে হয়।

এই আবহাওয়ার ভিতরে মাধুরীর জীবনযাপনের কথা ভাবিয়া শ্রীবিলাসের কষ্ট হইল। বিবাহ করিয়াছে বটে, কিন্তু এক দিনের জন্যও শ্রীবিলাস মাধুরীকে সুখী করিতে পারে নাই। এই রকম সারা জীবন তাহাকে টো-টো করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে, দু-দিন তাহার স্ত্রীর কাছে থাকিবারও অধিকার নাই।

এই ত সন্ধ্যা হইল, কলিকাতার সেই অপরিসর গলিতে হয়ত এখনও গ্যাস জ্বালা হয় নাই। চারি পাশের বাড়ি হইতে ধোঁয়া আসিয়া ঘরদোর একেবারে ভরিয়া যাইবে।... তারপর ঠাকুর-ঘর হইতে পিসিমা আহ্নিক সারিয়া শাঁখ বাজাইবে।—সারা বাড়ি গঙ্গাজলের ছিটা দিয়া প্রদীপ দেখাইয়া নামমাত্র গৃহের কল্যাণ-কামনা করা হইবে।

পাশের বাড়ির এক বৃদ্ধ হাঁফানি রোগী ঘড় ঘড় আওয়াজ তুলিয়া নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ফেলিবে। রাত্রির সঙ্গে সঙ্গে সে আওয়াজ বাড়িবে। সেই আওয়াজ শুনিয়া রাত্রে বিছানায় একলা শুইয়া মাধুরী হয়ত ভয়ে আঁৎকাইয়া ওঠে!

রাত্রি যখন দু-টা, ঠিক সেই সময় প্রতিদিন এক মাতাল চীৎকার করিয়া সমস্ত পাড়া সচকিত করিয়া তোলে। তারপর সেই মাতাল স্বামী আর তার স্ত্রী মিলিয়া সে কি বকাবকি চীৎকার।

নিত্যই এইরূপ!

কেন যে শ্রীবিলাস বিবাহ করিয়াছিল তাহাই আশ্চর্য্য ঠেকে! শুধু কষ্ট দেওয়া বইত নয়। এই যে মাধুরী এখন অসুস্থ—সারা বাড়ির কাজ হয়ত সবই সে করিতেছে, পিসিমা বারণ করিলেও কি শুনিবে? ··

জানালার পর্দ্দাগুলি একটু কালো হইলেই তাহার কাচিয়া পরিষ্কার করা চাই। ধোপার বাড়ি দিলে পাছে নষ্ট হইয়া যায়—মশারি বালিশের ওয়াড় মাধুরী মাসে দু-বার করিয়া নিজেই কাচিবে।

তারপর ঘর ঝাঁট দেওয়া। শুধু ঝাঁট দিলেই কি শান্তি? দুইবার জল দিয়া ধুইয়া মুছিয়া ফেলা চাই রোজ!

টেবিলে চেয়ারে কোথায় ধূলা জমিয়াছে—কোন্ ঘরে কোথায় ঝুল জমিয়াছে—ভাঁড়ার-ঘরে কোথায় আরশুলা জমিতেছে—সব মাধুরীর নিজের খোঁজ রাখা চাই। অথচ এই গৃহিণীপনা যে কি মূল্য দিয়া সে শিখিয়াছে তাহা কাহারও অজানা নয়।

ফুলশয্যার রাত্রে মাধুরী প্রথম কি কথা বলিয়াছিল, তাহা আজও শ্রীবিলাসের মনে আছে।

মাধুরী বলিয়াছিল—আমাকে তাড়িয়ে দেবে না?

নববধূর এই অদ্ভুত কথা শুনিয়া শ্রীবিলাস সে-দিন খুব হাসিয়াছিল। হাসি আসাই স্বাভাবিক।

কিন্তু পরে শ্রীবিলাস ভাবিয়া দেখিয়াছিল—যে বাপ-মায়ের স্নেহ-ভালবাসা পায় নাই, কাকার বাড়িতে তাচ্ছিল্যের ভিতর দিয়া মানুষ হইয়াছে, তাহার মুখ দিয়া অমন কথা বাহির হওয়া আশ্চর্য্য নয়।

কিন্তু—শ্রীবিলাস ভাবিল, আজ ত মাধুরীর সেই কথাই ফলিতে চলিয়াছে।

শ্রীবিলাস যখন দেশ হইতে দেশান্তরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তখন কলিকাতার ছোট একটি বাড়ির সারা ঘরময় একটি শিশু ঘুর ঘুর করিয়া বেড়াইবে।

—আয় আয়—হাঁটি হাঁটি পা পা—আয় আয়—হাঁটি হাঁটি—

—ও পিসিমা—দেখে যান কি দস্যি হয়েছে খোকা—সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল—ও খোকা, তুই এত দুষ্টু হ'লি কবে থেকে?

—ওগো দেখ দেখ—খোকাকে কোটপ্যাণ্ট প'রে কেমন দেখাচ্ছে—খোকা আমাদের সায়েব হয়েছে—ও খোকা, তুমি সায়েব হয়েছ?...ইংরিজী বল্‌তে পার?

—খোকা কি দুষ্টু জান—পুতুল দিলুম খেলনা দিলুম—কিছুতেই কিছু না—শেষে আমি পাশে শুলুম তখন ঘুমোয় ছেলে—দুষ্টুর শিরোমণি—

কলিকাতার সেই অপরিসর গলির বাড়িটিতে মাধুরীকে কেন্দ্র করিয়া শ্রীবিলাস অনেক স্বপ্নই গড়িয়া তুলিল।—

সন্ধ্যাবেলা ঠিক এমন সময় পিসিমা রান্নাঘর হইতে চীৎকার করিয়া বলিতেছে—ওই বুঝি গয়লানী এসেছে—অ বৌমা, দুয়োরটা খুলে দুধটা নাও ত বাছা—

গয়লানী দুধ ঢালিয়া চুপি চুপি বলিল—কি মা কেমন আছ, আজ ভাল? তা একটু সাবধানে থেক মা—অন্ধকারে চলাফেরা—ভয় করে মা—আমাদের পাড়ার একটা বউ সে-দিন বুঝলে—দেখাসাক্ষাৎ—

বলিতে গিয়া হঠাৎ থামিয়া বলিল—এবার তোমার ঠিক খোকা হবে মা—এবার সবাইয়ের খোকা—ও-পাড়ার সেনেদের বউয়ের খোকা—তারপর ওই যে নূতন উকীল এসেছে ওদের বউয়েরও খোকা—এবার তোমার ঠিক খোকা হবে মা, এই ব'লে রাখলুম দেখো।

দুধের বালতি লইয়া গয়লানী চলিয়া যাইতেছিল—

মাধুরী ডাকিয়া বলিল—ও দিদি—একটা কথা শোন—কাউকে বলো না, আমার মাথা খাও, আমার জন্যে বাজার থেকে আমসত্ব এনে দিতে হবে তোমাকে—আমি এখুনি পয়সা এনে দিচ্ছি—কিন্তু খেতে পারিনে—বড় অরুচি—

গয়লানী পয়সা লইয়া চলিয়া যাইতেছিল—

হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—হ্যাঁ মা বাবুর কোনও চিঠিপত্তর পেয়েছ?—পাওনি;—আসতে লিখে দাও মা—এ-সময় কি দূরে থাকলে চলে—পেরথম পোয়াতি—

ভাবিতে ভাবিতে শ্রীবিলাস যেন সশরীরে সেই কলিকাতার বাড়ি গিয়া পৌঁছিয়াছে।—

রাত্রিবেলা হঠাৎ মাধুরীর বেদনা উঠিয়াছে। ঘরের কোণে অস্পষ্ট আলোক জ্বলিতেছিল—পিসিমা উঠিয়া বলিলেন—অ বৌমা—বৌমা—দাই ডাকবো,—

বৌমা উত্তর দিল না।

ও-ঘরে সৌরভী শুইয়াছে, তাহাকে জাগাইয়া দিয়া পিসিমা বলিল—যা ত মা, একবার চট করে দাই মাগীকে ডেকে আনবি,—যা—যা—দেরি করিস নে—আবার ঘুমোয় —অ সৌরভী যা—

অন্ধকার ঘরের কোণে একটি প্রাণী যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে। বাড়িতে কোনও পুরুষমানুষ নেই।

মাধুরী মুখ তুলিয়া চাহিয়া অতি কষ্টে বলিল—ও পিসিমা, তাঁর কাছে একটা টেলিগ্রাম ক'রে দিন্ না—

পিসিমা বলিলেন,—ভয় কি মা, কিছু ভয় নেই—

দাই আসিল।

—কুথা গো মা কুন্ ঘরে? নাড়ী কাটতে চার টাকা লিব মা—তা বুলে রাখছি—

পিসিমা বলিল—তবে থাক বাছা তোমাকে করতে হবে না—বামুনপিসীকে ডাকলে অমনি খালাস ক'রে যাবে—

মাধুরীর বড় বিরক্তি বোধ হইতেছিল। সে এখন

যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে—আর এখনই কি-না দরদস্তর সুরু হইল!

যাহা হউক, দাই সমস্ত সাজসরঞ্জাম লইয়া ঘরে ঢুকিল।

ঘরের এক কোণে একটি মাটির প্রদীপ টিম্ টিম্ করিয়া জ্বলিতেছে। পিসিমা দুর্ব্বার আগ্রহে চুপ করিয়া অপেক্ষা করিয়া রহিল।..

ওদিকে শ্রীবিলাসও দেড়-শ মাইল দূরে নদীর ধারে অপেক্ষা করিতে লাগিল...

ঘরের ভিতর বাতাস যেন নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া আছে।—আর কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই বুঝি কোথায় প্রলয় সুরু হইবে। জানালার ফাঁক দিয়া আকাশের খণ্ড চাঁদ উঁকি মারিতেছে। ষ্টোভ জ্বলিতেছে...গরম জল...পাখা... একটি মুহূর্ত্ত .. তার পরেই যাহা হইবার তাহাই হইবে।

মাঝে মাঝে মাধুরী গোঙাইতেছে। ও-পাশের বাড়িতে হাঁপানি রোগীটা সেই রকম নিত্যকার মত ঘড় ঘড় আওয়াজ সুরু করিল।

হঠাৎ দাই চীৎকার করিয়া উঠিল—ওগো, বেটা ছানা হয়েছে মা, বেটা ছানা—

পিসিমা আনন্দে বলিল—অ সৌরভী—শাঁখ বাজা—শাঁখ বাজা- ছেলে হয়েছে রে—

দেড়-শ মাইল দূরে এক নির্জ্জন নদীতীরে দাঁড়াইয়া শ্রীবিলাস স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল...হিরণ্ময় জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

রাত্রে শ্রীবিলাস চিঠি লিখিল:—

—মাধুরী যেন বেশী খাটাখাটুনি না করে। কবচ পাঠান হইতেছে, ইহা যেন নিয়মিত ধারণ করা হয়। নিধিরাজকে ওখানে পাঠান হইয়াছে—সে যেন ডাক্তার দাই ইত্যাদি ডাকিয়া আনে। কোনও ভাবনার কারণ নাই। ওখানে কালীঘাটে ষষ্ঠীতলায় গিয়া যেন পূজা দিয়া আসা হয়। কিছু ভয় নাই, ভালয় ভালয় সব সম্পন্ন হইবে। মাধুরী যেন একা একা অন্ধকারে চলাফেরা না করে—শরীরের উপর সর্ব্বদা যেন নজর রাখা হয়। ডাক্তার যাহা বলে সেই মত কাজ যেন করা হয়, পয়সার উপর মায়া করিলে চলিবে না—পয়সা গেলে পয়সা আসিবে, প্রাণ আর ফিরিয়া আসে না—ইত্যাদি ইত্যাদি উপদেশপূর্ণ প্রায় চার পৃষ্ঠা চিঠি—

চিঠি লেখা যখন শেষ হইল, রাত্রি তখন এগারটা বাজিয়াছে। বাহিরে শীতার্ত্ত রাত্রি। অন্ধকার বুকে লইয়া কুয়াশা যেন জমাট বাঁধিয়া আছে। নিধিরাজ থাকিলে এখন তামাক সাজিয়া দিত; নল টানিতে টানিতে নিদ্রার আকর্ষণ বেশ লাগে। শ্রীবিলাস বাক্স হইতে চুরুট বাহির করিয়া তাহাতে আগুন ধরাইল।...

তাহার মনে হইল—কালকের মত আজও যেন কে তাহার তাঁবুর কাছে আসিবে। আসিয়া দরজা খুলিয়া দিতে বলিবে, হয়ত বা সে মাধুরীই!

শ্রীবিলাস চোখ মেলিয়া চুরুট টানিতে লাগিল। চুরুটের ধোঁয়ায় মন তাহার উড়িয়া চলিল অনেক দূরে—কলিকাতার অপরিসর একটি গলির ছোট্ট ঘরের এক কোণে।

আর তিন দিনের মধ্যেই এখানকার কাজ তাহার শেষ হইয়া যাইবে। তারপর শ্রীবিলাস বাড়ি যাইবে।

ছোট আঁতুড়-ঘর। তাহারই ভিতর বসিয়া রুগ্না মাধুরী খোকাকে লইয়া বসিয়া আছে। শ্রীবিলাস গিয়া চুপি চুপি বলিবে—কই, ও মাধুরী—দেখি খোকা দেখি—

মাধুরী খোকা দেখাইবে। তুলতুলে নরম দেহ; চোখ দুটি নিমীলিত।—কুলার উপর শোয়াইয়া রাখিয়াছে।

—ওগো, খোকা কেমন দেখতে শিখেছে জান, চোখ মিটি মিটি ক'রে চায়—আর রাতের বেলায় দু-চোখ যদি এক করতে পারি—কেবল কাঁদবে—বড় হ'লে খুব দুষ্টু হবে—বুঝলে—তুমি খুব জব্দ—এখন ঘুমুচ্ছে নইলে—ও খোকা, ওই দেখ জেগেছে—

রাত্রে খোকা খুব কাঁদিতেছে—

—ও-ও-ও, না-না-না—কে মেরেছে—মা রে মা, কি কান্নাই কাঁদতে শিখেছিস্ তুই—সৌরভী, ও সৌরভী—দেখেছ ঘুম দেখেছ, চীৎকারে সারা পাড়া জেগে গেল, আর উনি একটু আলোটা জেলে দেবেন তার - ও সৌরভী—

সকালবেলা আটটা বাজিলে উঠানের এক কোণে এক ফালি রোদ আসে। সেইখানে খোকাকে লইয়া মাধুরী বসিয়াছে। শীতকাল; থর থর করিয়া কাঁপিতেছে—খোকার গায়ের চারি দিকে ভাল করিয়া কাপড় ঢাকা দেওয়া।

বেলা বাড়িল; রৌদ্র উঠিয়া সারা উঠানখানি ভরিয়া গেল। খোকাকে দুই পায়ের উপর চিৎ করিয়া মাধুরী তেল মাখাইতেছে। খোকা সারা বাড়ি ফাটাইয়া চীৎকার করিতেছে।

কান্না শুনিয়াই শ্রীবিলাস ঘর হইতে ছুটিয়া আসিয়াছে। এক মাসও বয়স হয় নাই—ইহারই মধ্যে গলা দেখ না!

মাধুরী বলিতেছে—ওরে আর কাঁদিস্ নে—ও খোকা—গলা যে চিরে গেল—যেন ছেলেকে কত মেরেছি—ও ধন—ও মাণিক—কে মেরেছে রে—

খোকা বড় হইবে, হাঁটিতে শিখিবে—কথা কহিবে—দুষ্টামি করিবে, জীবনের প্রতি মুহূর্ত্ত তাহার নূতন নূতন আবিষ্কার।

—ওগো দেখ দেখ, খোকা আমার নাম ধ'রে ডাকছে, কে শেখালে ওকে বল ত, বুঝেছি, তুমি, নিশ্চয় তুমি, নিশ্চয়—

—ওগো কি-ভাগ্যি পড়ে যায়নি- ছাতের আলসে থেকে ঝুঁকে দেখছে—আমার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত কাঁপছে—না, ওকে এখন থেকে শাসন করতে হবে, পাড়ার ত এত ছেলে রয়েছে—এমন দুষ্টু কেউ না—ও খোকা, তুই আর করবি বল?

খোকাকে মারিতে গিয়া মাধুরী গাল ভরিয়া তাহাকে চুমু খাইয়া ফেলিল।

ছোট লম্বা বারান্দায় একটা বেতের দোলনা টাঙানো হইয়াছে—মাধুরী দোল দিতে দিতে গাহিতেছে—

খোকা আমাদের সোনা,
স্যাক্‌রা ডেকে মোহর কেটে গড়িয়ে দেব দানা,
তোমরা কেউ করো না মানা—

—ওমা তুমি বুঝি ড্যাব ড্যাবে চোখ মেলে জেগে আছ—না বাপু, তোমাকে নিয়ে থাকলে ত আর আমার—ও সৌরভী, জুজুবুড়ীকে ডেকে নিয়ে আয় ত, নিয়ে আয় ডেকে—আচ্ছা, না না ডাকবে না, তবে ঘুমো, ঘুম পাড়ানী মাসী পিসি ঘুম দিয়ে যা—

এক দিন খোকা আরও বড় হইবে। বাড়ির সদর দরজা খোলা পাইলেই রাস্তায় চলিয়া যাইবে।

গয়লানী দুধ দিতে আসিয়াছে।

—ও দিদি, একে নিয়ে যাও ত তোমাদের বাড়ি—নিয়ে গিয়ে ঘরে বন্ধ ক'রে রেখে দিও—যাবি ও খোকা, তোর মাসীর সঙ্গে যাবি—কি দুষ্টু হয়েছে দিদি বুঝলে, এত দুষ্টুমি যে ওকে কে শেখালে—

তারপর গয়লানী চলিয়া যাইবে।

মাধুরী বলিবে—ও দিদি দরজাটা যাবার সময় পা দিয়ে ভেজিয়ে দিও, দুয়োর খোলা পেয়েছে কি অমনি রাস্তায় ছুটে চলে যাবে—

প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি শ্রীবিলাস ভাবিতে লাগিল। এই ত জীবন—এমনি করিয়াই ত মানুষ বড় হয়। ভাবিতে ভাবিতে শ্রীবিলাস ভোরের দিকে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

ঘুম যখন তাহার গাঢ় হইয়াছে সকালবেলা টেলিগ্রাম আসিল।

ছোট টেলিগ্রাম, সব কথা খুঁটিয়া লেখা যায় না। তবু শ্রীবিলাস যেটুকু অর্থ বুঝিল তাহা তর্জ্জমা করিলে এই দাঁড়ায়—খোকা হইয়াছে, মাধুরীর অবস্থা বিপজ্জনক, শীঘ্র চলিয়া আইস।

শ্রীবিলাসের পায়ের তলায় তখন পৃথিবীতে যেন ভূমিকম্প হইতেছে—

নদীর দুই তীর জুড়িয়া ক্ষেত···

একদিককার পাড় ভাঙিতে সুরু হইয়াছে—রাখালছিটার বেড়ার ধারে একটা গরু চরিতেছে—ঘেরা ঘাটে কাহাদের বউ স্নান করিতে নামিল—রাঙা টুকটুকে বউটি—এক কৃষাণ ছাতি মাথায় এক পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এক ঝাঁক শামুক-ভাঙা শিমুল গাছে ভরা- জলের উপর একটা পানকৌড়ি হঠাৎ ডুব দিল, তীরের উপর কুঁচবনের ঝাড়—তারও ওপাশে একটা শাঁড়াগাছ একেবারে জলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে—গাছভর্ত্তি চড়াই পাখীর দল কিচকিচ করিতেছে—এইবার এক খেয়াঘাট, উপর দিয়া পুল, তারপর দুই তীরে পোড়ো জমি, জনহীন নদীতীর—

মাঘের শেষ।

নিরাভরণ গাছগুলি নির্লজ্জের মত ঠায় দাঁড়াইয়া, তীরের উপরে অনেকদূর হইতে কে যেন টানিয়া টানিয়া গান গায়—চরের উপর ঘূর্ণী হাওয়ার সাথে বালু উড়িতেছে—জলের উপর কাহার ছাড়িয়া দেওয়া একটা সোলার নৌকা ভাসিয়া যায়। একটা সরু কাটির উপর একটি ছোট্ট পাখী চুপ করিয়া বসিয়া আছে। একটা বাজ-পড়া তালগাছ—মাঝিদের কুঁড়ে—তারপরে বেড়া-ঘেরা বাগান, সজিনা গাছ, আগাছা, ঝোপ-জঙ্গল—তারপর আবার পাড় ভাঙিতে সুরু হইয়াছে—

শ্রীবিলাসের চোখের সম্মুখে চলচ্চিত্রের মত লাগিতেছে।

নৌকার ছইয়ের ভিতর বসিয়া শ্রীবিলাস জানালায় মুখ দিয়া আছে—অলস—নির্জ্জীব—ক্লান্ত মধ্যাহ্ন, ধূসর পাংশুল মাটি—জরাজীর্ণ তরু-শাখা—পৃথিবীর আনন্দ যেন নিঃশেষে ক্ষয় হইয়া গিয়াছে।

—বুড়ো বয়েসে বিয়ে—তার আবার টান থাকে না-কি—আমি ম'লে তুমি বাঁচবে—কেমন ?

—কেবল তামাক আর তামাক—কি যে নেশা—বুড়ো লোকের মত, এত তামাকও খেতে পার তুমি—

—যদি খোকা হয়, কি নাম রাখবে বল ত—খুব ভাল দেখে রেখো কিন্তু—ঠাকুর-দেবতার নাম না হয়—

—ও মা—কি কর, ছি, ঐ কে দেখে ফেলবে—সর সর, দেখছ না, কাজ করছি এখন—তোমার কি ?

—ইস্ মিছে কথা বইকি।—আমি বুঝি জানিনে—আমাকে লুকিয়ে কাল থিয়েটার দেখতে যাওয়া হয়েছিল।

হুইশল্ দিয়া ষ্টীমার ছাড়িয়া দিল।

ডেকের উপর জনারণ্য। যেখানে মেশিন গর্জ্জাইতেছে ওখানে দারুণ গরম। শ্রীবিলাস চুপ করিয়া বাক্সটার উপর বসিল, নদীর এপার ওপার দেখা যায় না। জল কাটিতে কাটিতে ষ্টীমার চলিল।

ওপাশে কে এক ভদ্রলোক স্ত্রী লইয়া চলিয়াছে, সঙ্গে একটি ছোট ছেলে।

কত হাসিগল্প দু-জনে করিতেছে। নিজেদের চারিপাশে যে এতগুলা অপরিচিত লোক রহিয়াছে, আনন্দে তাহারা সে-কথা ভুলিয়া গিয়াছে। ছেলেটি তাহাদেরই কাছাকাছি ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—

শ্রীবিলাসের মনে হইল—মাধুরী কখনও মরিবে না—নিশ্চয় সারিয়া উঠিবে। আচ্ছা, এমনও ত হইতে পারে দুষ্টামি করিয়া মিছামিছি তাহাকে শুধু একটু মনঃকষ্ট দিবার জন্যই মাধুরী এই টেলিগ্রাম করিয়াছে। পাড়ার কেহ লিখিয়া দিয়াছে হয়ত।—হইতেও পারে।

আর একবারের কথা শ্রীবিলাসের মনে আছে :—

সম্বলপুরে থাকিতে হঠাৎ চিঠি গিয়াছিল—মাধুরী ভীষণ পীড়িত—শীঘ্র চলিয়া আইস। ভাবনায় ত শ্রীবিলাসের ঘুম হইল না—খাওয়া হইল না।—কিন্তু বাড়ি আসিয়া দেখিল মাধুরী দিব্যি হাসিয়া-খেলিয়া বেড়াইতেছে—শুধু মজা করিবার জন্যই ঐ চিঠি পাঠাইয়াছিল। এবারও ত তেমনি কিছু হইতে পারে—

—এই—এই—এই—দুদু—

শ্রীবিলাস হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া দেখে—সেই শিশুটি টলিতে টলিতে তাহার সামনে আসিয়াছে—

—এই এই—দুদু—

আধ আধ কথা শ্রীবিলাসের বড় ভাল লাগিল। দুই হাত বাড়াইয়া হাসিয়া বলিল,—এস এস—ও খোকা—জুজু নেই—নেই—

খোকা আসিতেছিল। কিন্তু পিছন হইতে সেই ভদ্রলোক 'ওরে দস্যি ছেলে' বলিয়া হঠাৎ ছোঁ মারিয়া লইয়া গেলেন। তারপর স্বস্থানে লইয়া গিয়া আর ছাড়িলেন না।

অন্ধকার নীহারিকামণ্ডলীর ভিতর দিয়া এক কণা আলো আসিতেছে...শ্রীবিলাস চোখ মেলিয়া রহিল.. সাতরঙা রশ্মির ভিতর আলোর শিশুরা নাচিতেছে.. হাস্যচঞ্চল চটুলচপল শিশুর দল তাহার দিকে আসিতে লাগিল…তাহাদের চলার ছন্দে জ্যোৎস্না ছিটকাইয়া পড়ে—হাসির আবেগে বাতাস মাতিয়া ওঠে...শ্রীবিলাস তাহাদের হাতছানি দিয়া ডাকিতে লাগিল...হিরণ্ময়ী—উজ্জয়িনী—মৈত্রেয়ী…

ট্রেন ছাড়িয়া দিয়াছে।

চাকার ঘর্ঘর শব্দে শ্রীবিলাস অস্থির হইয়া নির্জ্জীবের মত কামরার এক কোণে পড়িয়া রহিল। সারা পৃথিবী ব্যাপিয়া যেন ভীষণ কোলাহল, কলহ, হাহাকার, আর্ত্তনাদ চলিয়াছে।

স্পষ্ট প্রত্যক্ষ অনুভূতির মত তাহার মনে হইল হয়ত সত্য সত্যই মাধুরী মরিবে না। নিশ্চয় সারিয়া উঠিবে! প্রতি পলে জগৎ জুড়িয়া কত শিশু জন্মগ্রহণ করিতেছে, কয়জন জননী মরিতেছে। মরিবে না—শুধু তাহার সহিত মজা করিবার জন্য ইহা একটা ছল মাত্র। শ্রীবিলাস তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছে বলিয়া হয়ত তাহার অভিমান হইয়াছে।

অনুরাগ কলহ. লজ্জা অভিমান...মাধুরীর সহিত প্রতি-দিনের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটির কথা আজ তাহার মনে পড়িল। একটি দিনের কথা শ্রীবিলাসের আজও মনে পড়ে—এক

দিন ঝড়ের মত দু-হাত পিছনে রাখিয়া মাধুরী ঘরে ঢুকিল। বলিল,—শীগ্‌গীর বল কোন্ হাতটা নেবে, ডান হাত, বাঁ—কোন্‌টা, দেখতে পাবে না, বল ঝপ ক'রে—

শ্রীবিলাস কিছু বুঝিতে পারে নাই। হাতে করিয়া কিছু আনিয়াছে নিশ্চয়ই। কি হইতে পারে? তাহার হারান মনিব্যাগ-সোনার বোতাম? ভাবিয়া ভাবিয়াও কূলকিনারা করিতে পারিল না—শেষে মাধুরীর দক্ষিণ হাতটা দেখাইয়া দিল।

ভুল হইয়াছে।

মাধুরী হাসিয়া জবাব দিল—পারলে না—আচ্ছা, আর একবার সময় দিলুম—এবার বল, কোন্ হাত?

এবার শ্রীবিলাস ঠিক উত্তর দিল—মাধুরীর বাম হাতটি দেখাইয়া দিল।...মাধুরী হাসিয়া আনীত চিঠিখানা শ্রীবিলাসকে দিল। এই চিঠির জন্য শ্রীবিলাস কয় দিন অপেক্ষা করিতেছিল। দরকারী চিঠি—সে-চিঠি পাওয়ার আনন্দে শ্রীবিলাস সে-দিন মাধুরীকে কি পুরস্কার দিয়াছিল সে-কথা শ্রীবিলাস কোনও দিন ভুলিবে না।

সকালবেলার রুক্ষ রৌদ্রে গলিটা শুষ্ক বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে।

মোড়টা ঘুরিয়াই শ্রীবিলাস বাড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল—ঠিক এমন সময় ঐ বাড়িটির একটি ঘরের ভিতর কি হইতেছে, কে জানে! সমস্ত গলিটা যেমন ছিল তেমনি আছে। পৃথিবীর কোন্ ঘরে একটা শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাতে কাহার কি আসিল গেল।

সামনের জানালাটা খোলা রহিয়াছে, ভিতরে কিছুই দেখা যায় না।

কেহ ত কই আর্তনাদ করিতেছে না, তবে হয়ত মাধুরী এখনও বাঁচিয়া আছে।

এতটুকু পথ; শ্রীবিলাসের পা যেন আর পারিতেছে না। বাড়ির কাছে আসিয়া শ্রীবিলাস কান পাতিল; কোথাও কোনও ঘরে একটি নবজাত শিশু কাঁদিতেছে না ত!

শ্রীবিলাসের কাছে এই অদ্ভুত নীরবতা যেন বিস্ময়কর মনে হইল। সে যে আসিতেছে—তাহার জন্য কি কেহ অপেক্ষা করিয়া নাই? জানালা খুলিয়া কেহ কি তাহার পথের উপর চোখ মেলিয়া বসিয়া নাই?

শ্রীবিলাস সোজা বাড়ির ভিতর ঢুকিয়া পড়িল।

কেহ কোথাও নাই। ঠিক এই সময় বাড়িতে ত চোর ঢুকিয়া যথাসর্বস্ব চুরি করিয়া লইয়া যাইতে পারে! চুরি করিবার মত অবশ্য তেমন কিছু নাই, কিন্তু তবু শ্রীবিলাসের কাছে বাড়ির এই বিশৃঙ্খলতা ভাল লাগিল না। কোথায় সে আসিয়াছে বলিয়া এতক্ষণ বাড়িতে স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়িবে—তা নয়, সব চুপ। সবাই যেন মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিয়া প্রহর গণিতেছে।

সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া শ্রীবিলাস দেখিল-সেখানেও কেহ নাই।

শ্রীবিলাস সোজা তাহার উপরের ঘরে চলিয়া আসিল। সেখানে পিসিমা বসিয়া আছে। মেজের উপর বিছানায় মাধুরী—মাধুরী শুইয়া আছে, ঘুমাইতেছে—

রোগশীর্ণ ম্লান মুখখানি পাণ্ডুর দুটি চোখ—চোখের চারিদিকে গোল হইয়া কালির দাগ পড়িয়াছে।

পিসিমা বলিল,—কে বিলাস এলি? যাক্, বৌমা এই তোর জন্যে ভেবে ভেবে এখন একটু ঘুমিয়েছে, নিধিরাজ আবার ডাক্তারের বাড়ি গেছে।

শ্রীবিলাসের মনে হইল মাধুরীকে ডাকিয়া দুটি কথা বলে—একটু ক্ষমা চায়—

পিসিমা বলিল,—এখন জাগাস্ নে যেন ওকে—টেলিগ্রাফ পেয়েছিলি ত? ওই কেবল বলছে, কই এখনও এল না—এখনও এল না—তুই এলি বাঁচলুম—

তারপর বলিল,—হ্যাঁ, বাবা বিলাস, তুই একবার এই পায়েই ডাক্তারের বাড়ি যা দিকিনি—গিয়ে একবার ডেকে নিয়ে আয়-বৌমাকে দেখে যাক—কাল সারা রাত মোটে ঘুমোয় নি।

শ্রীবিলাস দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতেছিল—এই ত জীবন। হয়ত মাধুরী ভাল হইয়া যাইবে—অনেক দিন ভুগিয়া ভুগিয়া ঔষধে পথ্যে বহুদিন ধরিয়া শয্যাশায়ী থাকিয়া শেষে এক দিন উঠিয়া বসিবে। এই ত জীবন!...এই আশা-আশঙ্কা আগ্রহ-উৎকণ্ঠা দিনের পর দিন—এই লইয়া মানুষ জন্মগ্রহণ করিল—আবার মৃত্যুর শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত এমনি চলিবে। বিপদ

আসিবে, উৎকণ্ঠা বাড়িবে, আবার ভাল হইবে—শান্তি আসিবে কিংবা আসিবে না। এইপূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাহার কি উৎকণ্ঠাই না ছিল। মাধুরীর দিকে চাহিয়া চাহিয়া শ্রীবিলাস অনেক কথাই ভাবিতে লাগিল।

পিসিমা আসিল খোকাকে কোলে লইয়া।

—এই দেখ বিলাস—দেখ কেমন রাজপুত্তুরের মত ছেলে - দেখছিস্—

শ্রীবিলাসের হাসি আসিল। হাসি আসিল এই ভাবিয়া, যেন রাজপুত্রের মত দেখিতে না হইলে ছেলেকে সে ভালবাসিত না!

নর ও বানর

শ্রীশরৎ চন্দ্র রায়

প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের কর্ত্তৃপক্ষ যে নৃতত্ত্ব অন্যতম আলোচ্য বিষয়রূপে গ্রহণ করেছেন, এটা আমার ন্যায় নৃতত্ত্ব-সেবীর পক্ষে বড় আনন্দের বিষয়। বস্তুতঃ নৃতত্ত্বের আলোচনা যে একেবারে নিষ্প্রয়োজনীয় বা নীরস, তা নয়। পৃথিবীর কোন্ দেশে এবং কেমন ক'রে ও কতকাল আগে মানবজাতির উৎপত্তি হ'ল—তখনকার পৃথিবীর আকার ও প্রাকৃতিক অবস্থা কেমন ছিল প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষের দৈহিক ও মানসিক অবস্থা কি রকম ছিল—কেন ও কি উপায়ে তারা জন্মভূমি হ'তে ক্রমে নানা দেশে ছড়িয়ে পড়ল, এবং কিরূপে একই মানবজাতি দেশভেদে নানা জাতিতে বিভক্ত হ'ল—কিরূপে তারা দলবদ্ধ হয়ে সমাজ সংগঠন ও রাষ্ট্র স্থাপন করল—কিরূপে নৈসর্গিক ও সামাজিক অবস্থাভেদে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকার জীবিকা, বিভিন্ন পরিচ্ছদ ও সাজসজ্জা, নানা রকমের গৃহনির্ম্মাণ-প্রণালী, জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ সম্বন্ধে বিভিন্ন আচার-ব্যবহার, বিভিন্ন রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতি এবং নানা রকমের ধর্ম্মবিশ্বাস ও পূজাপদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হ'ল,—এই-সব বিষয়ের ইতিহাস সুলেখকের দ্বারা রচিত হ'লে, সুললিত কবিতা বা মনোজ্ঞ উপন্যাসের চেয়ে কম চিত্তাকর্ষক হবার কথা নয়। আক্ষেপের বিষয় এই যে, সেরূপ ভাবে বর্ণনা করবার ক্ষমতা আমার নাই। এই প্রবন্ধে কেবল নৃতত্ত্বের বিষয়ে একটা সাধারণ ভ্রান্ত সংস্কার সম্বন্ধে একটু ব'লব।

নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে শিক্ষিতমণ্ডলীর মধ্যেও অনেকের একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, নৃতত্ত্ববিদেরা ও বিবর্ত্তনবাদীরা (Evolutionists) সিদ্ধান্ত করেছেন যে বানর হ'তে মানুষের উৎপত্তি হয়েছে। এমন কি মনীষী কারলাইলও এই ভ্রান্ত ধারণা বশতঃ এই কল্পিত মতকে "The monkey blasphemy of man" (মানুষের বাঁদরে অপবাদ) ব'লে বিদ্রূপ করেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নৃতত্ত্ববিদেরা বা ক্রমবিকাশবাদীরা মানুষের এরূপ অপবাদ দেন না। এ-সম্বন্ধে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত কিরূপ, তাই এই প্রবন্ধে সহজভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব।

এই পৃথিবীতে যখন মানুষের উদ্ভব হয়েছে, তার আগে হ'তেই মানুষের ইতিহাসের প্রথম অধ্যায়ের আরম্ভ। কারণ, কোন ব্যক্তির, সমাজের বা জাতির ইতিহাস বুঝতে গেলে যে-সমস্ত পূর্ব্ববর্ত্তী ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা তার গঠনের সাহায্য করেছে তা জানা দরকার। ঐতিহাসিকের গবেষণায় প্রধান উপাদান সমসাময়িক বিবরণ ও নিদর্শন—তাহা ভূর্জ্জপত্রে, তালপাতায়, তুলট কাগজে বা অন্য কোন আধারেই লিপিবদ্ধ হয়ে থাকুক কিংবা পাহাড়ের গায়ে উৎকীর্ণ বা পাথরের থামে, ধাতুফলকে বা মুদ্রার উপরে খোদা বা আঁকাই হউক। পুরনো ঘরবাড়ির ভগ্নাবশেষ ও মূর্ত্তি প্রভৃতিও ঐতিহাসিকের মালমশলা জোগায়। পরবর্ত্তী কালের লিখিত বিবরণ ও প্রচলিত প্রবাদও স্থলবিশেষে নির্ভরযোগ্য প্রমাণস্বরূপ নেওয়া যেতে পারে। এই সমস্ত উপাদান ঐতিহাসিকেরা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পরীক্ষা ও ঝাড়াই-বাছাই ক'রে ও যথাযথ সাজিয়ে-গুছিয়ে বিভিন্ন দেশের একটা ধারাবাহিক

ইতিহাস উদ্ধার করবার চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক তাঁর গবেষণার জন্য কোনও নির্ভরযোগ্য লিপিগত উপাদানের প্রত্যাশা করতে পারেন না। কারণ কোনও প্রকার লিপির আবিষ্কারের পূর্ব্ববর্ত্তী কালকেই প্রাগৈতিহাসিক কাল বলা যায়।

প্রাগৈতিহাসিককে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর বস্তুগত উপাদানের উপর নির্ভর করতে হয় এবং এই দুই শ্রেণীর উপাদানই প্রধানতঃ ভূগর্ভ হ'তে উদঘাটন ক'রে সংগ্রহ করতে হয়। এজন্য ভূবিদ্যার একটু সাহায্য প্রয়োজন। প্রাগৈতিহাসিক কালের বিভিন্ন স্তরে নিহিত নরকঙ্কাল, তার আশ-পাশের অন্যান্য জীবকঙ্কাল ও পাথর তামা প্রভৃতির নির্ম্মিত অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য জিনিষ প্রাগৈতিহাসের প্রধান উপাদান। ঐ কালের বানর, বনমানুষ ও মনুষ্যপ্রায় জীবের কঙ্কাল-গুলির বিভিন্ন অবয়বের মাপজোখ নিয়ে পরস্পরের সহিত তুলনা ক'রে তাদের শ্রেণীবিভাগ ও জাতিবিভাগ করা হয়। যে ভূস্তরে কোন কঙ্কাল পোঁতা ছিল, সেই স্তরের আনুমানিক কাল (approximate geological age) নির্ণয় ক'রে এবং তার পারিপার্শ্বিক অন্যান্য জীবকঙ্কালের জীবিত কালের পর্য্যালোচনা ক'রে যথাসম্ভব ঐ কালের বানর বন-মানুষ ও প্রাক্‌মানুষদের কাল নির্ণয় করা হয়। ঠিক একই শ্রেণীর কঙ্কাল যে-যে বিভিন্ন দেশে পাওয়া গেছে তার ফর্দ্দ ক'রে ও পৃথিবীর মানচিত্রের সঙ্গে মিলিয়ে ঐ জাতির মানুষের জন্মস্থান এবং সেখান থেকে দেশ-বিদেশে যাবার পথ (route of migrations) অনুমান করা হয় এবং তাদের ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসী জাতি জাতিদের পরস্পরের সম্বন্ধ (racial relationships) ঠিক করা হয়।

প্রাগৈতিহাসিকের গবেষণার আর এক শ্রেণীর উপাদান মানুষের হাতে তৈরি অস্ত্রশস্ত্র, অন্যান্য দ্রব্যসম্ভার ও চিত্র প্রভৃতি এবং সমাধিস্থান ও ঘরবাড়ির ধ্বংসাবশেষ। এই সমস্ত বস্তুগত উপাদান হইতে প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষের জীবিকা, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থা এবং ধর্ম্মবিশ্বাসের অল্পবিস্তর পরিচয় পাওয়া যায়।

মানুষের সঙ্গে বনমানুষের বা বানরের সম্বন্ধ নির্ণয় করতে হ'লে উপরে যে দুই শ্রেণীর উপাদান বললাম তার প্রথম শ্রেণীর অর্থাৎ কঙ্কাল প্রভৃতির সাহায্য প্রধানতঃ প্রয়োজন। এই দুই শ্রেণীর উপাদানের জন্যই ভূবিদ্যার সাহায্য দরকার। অধিকন্তু প্রথম শ্রেণীর উপাদানের পরীক্ষা ও বিশ্লেষণের জন্য অস্থিতত্ত্বের (Anatomyর) সাহায্যের প্রয়োজন।

প্রতীচ্য ভূতত্ত্ববিদ্‌ পণ্ডিতেরা মাটি খুঁড়ে ভিন্ন ভিন্ন স্তরশ্রেণী উদ্‌ঘাটন ক'রে ভিন্ন ভিন্ন যুগের ও অন্তর্যুগের (Geologic Periods and Systems) ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ করেছেন এবং তাদের স্থিতিকাল অনুমান করেছেন। যে-সমস্ত ভূ-স্তরে জীবের নিদর্শন পাওয়া যায়, সে-গুলিকে পাঁচটি যুগে বিভক্ত করা হয়েছে। ইহাদের সকলের আগের যুগকে জীবনের উন্মেষ যুগ (Archæan বা Eozoic) নাম দেওয়া হয়েছে; কারণ এই ভূ-স্তরে যে, উষাজীব (Eozon) বা রন্ধ্রী (Foramanifera) নামক জীবের নিদর্শন আছে, তাতেই জীবনের প্রথম স্পন্দনের প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহার স্থিতিকাল মোটামুটি দেড় কোটি বৎসর অনুমান করা হয়েছে। দ্বিতীয় যুগের নাম দেওয়া হয়েছে পুরাতন জীব-যুগ; (Primary বা Palæozoic)এর স্থিতিকাল আন্দাজ পঁয়ত্রিশ কোটি বর্ষ ধরা হয়। এই সময়ের ভূ-স্তরের প্রথম ভাগে মেরুদণ্ডহীন (Invertebrates), মধ্যভাগে মৎস্য জাতি (Fishes) এবং শেষভাগে উভচর (amphibions)এর প্রাদুর্ভাব ছিল। এই যুগের শেষ ভাগে সরীসৃপের প্রথম উদ্ভব দেখা যায়। তৃতীয় যুগকে মধ্য জীব-যুগ (Mesozoic) নাম দেওয়া হয়েছে। এই যুগের প্রথম ভাগের ভূ-স্তরে প্রচুর সরীসৃপের কঙ্কাল পাওয়া যায়, এই জন্য ইহাকে সাধারণ (popular) ভাষায় সরীসৃপ যুগ (Age of Reptiles) বলা হয়। ইহার স্থিতিকাল আন্দাজ এক কোটি বৎসর ধরা হয়। চতুর্থ যুগের নাম তৃতীয়ক যুগ (Tertiary Period)। এই যুগে স্তন্যপায়ী জীবের উদ্ভব ও পরিণতি হয়। সেইজন্য ইহাকে স্তন্যপায়ীর যুগ (Age of Mammals) এই নামও দেওয়া হয়। এই যুগের স্থিতিকাল মোটামুটি বিশ লক্ষ বৎসর ব'লে অনুমান করা হয়। এই স্তন্যপায়ী যুগকে আবার চার-পাঁচটি অন্তর্যুগে বিভক্ত করা হয়েছে। সকলের নীচের অন্তর্যুগের নাম উষাধুনিক উপযুগ (Eocene)।*

* কেহ কেহ এই অন্তর্যুগকে আবার প্রাচীন উষস্তর (Paloocene) ও উষস্তর (Eocene) এই দুই ভাগে বিভক্ত করেন।

তার উপরে ক্রমান্বয়ে অল্পাধুনিক মধ্যাধুনিক ও অন্ত্যাধুনিক (Oligocene, Miocene ও Pliocene) অন্তর্যুগ। ঊষাধুনিক অন্তর্যুগের ভূ-স্তরে ঘোড়া, হরিণ ও হাতীর প্রথম পূর্ব্বজদিগের কঙ্কাল দেখতে পাওয়া যায়। অল্পাধুনিক অন্তর্যুগের ভূ-স্তরে কুচদন্ত (Mastodon) নামক বৃহৎকায় হস্তী, কুকুর, বিড়াল ও বানরের কঙ্কাল প্রথম পাওয়া যায়।

১৯১১ খৃষ্টাব্দে মিশর দেশের ফাকুম (Faqum) জেলায় অল্পাধুনিক অন্তর্যুগের ভূ-স্তরে একটি গিবন (Gibbon) জাতীয় নরপ্রায় লাঙ্গুলবিহীন বানরের (anthropoid ape-এর) কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছিল। ইংরেজীতে ইহার নাম দেওয়া হয়েছে প্রোপ্লিওপিথেকস্ (Propliopithecus)। পরবর্ত্তী মধ্যাধুনিক অন্তর্যুগের ভূ-স্তরে জার্ম্মেনী দেশে একটি বনমানুষের কঙ্কাল পাওয়া যায়। উহা অল্পাধুনিক যুগের প্রোপ্লিওপিথেকসের এত অনুরূপ যে, উহাকে উহারই বংশধর সিদ্ধান্ত ক'রে উহার প্লিওপিথেকস্ (Pliopithecus) নামকরণ করা হয়েছে। ফরাসী দেশে ও হাঙ্গেরী দেশে ঐ মধ্যাধুনিক যুগের ভূ-স্তরে যে-জাতীয় বনমানুষের কঙ্কাল পাওয়া গেছে সেই জাতির ড্রায়োপিথেকস্ (Dryopithecus) নাম দেওয়া হয়েছে। ঐ অন্তর্যুগে ভারতে হিমালয়ের নিকটবর্ত্তী সিবালিক পর্ব্বতে দুই প্রকারের নরপ্রায় বনমানুষের কঙ্কাল পাওয়া গেছে। তার একটি নাম হয়েছে প্যালিওপিথেকস্ সিবালেন্সিস্ (Palaeopithecus Siwalensis), আর একটির নাম সিবাপিথেকস্ ইণ্ডিয়েন্স (Sivapithecus Indiens)। প্রথমটির দাঁতগুলি অনেকটা মনুষের দাঁতের মতন। আর দ্বিতীয়টির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের এত অনুরূপ যে, উহার আবিষ্কর্ত্তা ডাঃ পিল্‌গ্রিম্ উহাকে প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানবের সর্ব্বপুরাতন কঙ্কালবিশেষ ব'লে মনে করেন; কিন্তু অন্যান্য নৃতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা প্রায় কেহই এই মতের পোষকতা করেন না। সিবালিক পর্ব্বতে মধ্যাধুনিক ও অন্ত্যাধুনিক ও অন্তর্যুগের ভূ-স্তরে আরও কয়েকটি বনমানুষের কঙ্কাল পাওয়া গেছে। ঐ সমস্ত কঙ্কাল হ'তে অন্ততঃ এইটুকু অনুমান করা যায় যে, মানবজাতি ও লাঙ্গুলহীন নরপ্রায় বনমানুষ (anthropoid ape), ইহাদের উভয়েরই ঊর্দ্ধতন পূর্ব্বপুরুষ এক ছিল এবং সেই পূর্ব্বপুরুষ সম্ভবতঃ উত্তর-ভারতে বাস করত। নরপ্রায় বৃহদাকার বন-মানুষেরা (large anthropoid apes) সাধারণীভূত নরপ্রায় গোষ্ঠী (generalized humanoid stem) হ'তে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে ভিন্ন প্রশাখায় পারণত হ'য়ে। বনমানুষকে মানব-শাখার প্রশাখা কেন বলছি, তার কারণ এই যে, মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঙ্গে বনমানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের তুলনা ক'রে দেখা গেছে যে, মানুষের দেহে যে দুই শতখানা হাড় এবং তিন শতটি মাংসপেশী আছে, বন-মানুষেরও ঠিক তাই আছে; এবং উভয়ের অস্থি ও মাংস পেশীগুলো একই ভাবে সংস্থিত; দুইয়েরই বত্রিশটি দাঁত দুই পংক্তিতে একই ভাবে সাজান আছে; দুইয়েরই মস্তিষ্কের, হৃৎপিণ্ডের, পাকাশয়ের এবং জননেন্দ্রিয়ের গঠন অবিকল এক রূপ। প্রভেদ কেবল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের লম্বা চওড়াতে, পিঠের দাঁড়ার (মেরুদণ্ডের) গঠনে এবং মস্তিষ্কের জটিলতায়। মানুষের পিঠের দাঁড়া খুব সোজা (ঋজু), সেজন্য মানুষ সম্পূর্ণ সোজা হ'য়ে দাঁড়াতে ও চলতে পারে। বনমানুষের মেরুদণ্ড একটু বাঁকাটে, সেজন্য তারা ঠিক সোজা হ'য়ে দাঁড়াতে পারে না কিংবা বেশীক্ষণ দুই পায়ে ভর দিয়ে চলতে পারে না। বনমানুষের মস্তিষ্কের কুণ্ডলিত অংশগুলি (convolutions of the brain) মানুষের চেয়ে অনেক কম, কোন কোন অংশ অসম্পূর্ণ, যেমন মস্তিষ্কের যে সম্মুখস্থিত উদ্গত অংশ বাক্‌শক্তির কেন্দ্র। এই জন্য তার মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি (reason) প্রভৃতি উচ্চতর মনোবৃত্তি (higher faculties of the mind) ফুটে ওঠেনি; মানুষের মত কথা বলবার শক্তিও তার হয়নি। মানুষের মস্তিষ্ক-গহ্বরের পরিমাণ (cranial capacity) বনমানুষের মস্তিষ্ক গহ্বরের চেয়ে দ্বিগুণেরও বেশী; মানুষের মধ্যে সভ্য জাতিদের মোটামুটি ১৫০০ হ'তে ১৬০০ ঘন সেণ্টিমিটার (cubic centi-metre), আফ্রিকার নিগ্রোদের ১৪০০ হ'তে ১৫০০ পর্য্যন্ত; আফ্রিকার বুশম্যান (Bushman) জাতির এবং অষ্ট্রেলিয়ার কৃষ্ণকায়ের ও আণ্ডামান দ্বীপপুঞ্জের অসভ্য-দের (Mincopi) ১২৫০ হ'তে ১৩৫০ মাত্র। কিন্তু বন মানুষদের মস্তিষ্কাধারের আয়তন (cranial capacity) ৫০০ ঘন সেণ্টিমিটারের বেশী হ'তে দেখা যায়নি। পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে, মস্তিষ্ক-গহ্বরের পরিমাণ (cranial-capacity) প্রায় ১০০০ ঘন সেণ্টিমিটার না হ'লে বাক্‌শক্তির

স্ফুরণ হয় না। অন্ত্যাধুনিক অন্তর্যুগে যে মানবপ্রায় কয়েকটি জীবের কঙ্কাল পাওয়া গেছে তাদের মধ্যে তিনটির মস্তিষ্ক-গহ্বরের পরিমাণ ১০০০ ঘন সেন্টিমিটারের সামান্য বেশী। এদের প্রাপ্তিস্থান অনুসারে নাম দেওয়া হয়েছে পেকিং মনুষ্য, পিটডাউন মনুষ্য ও হাইডেলবর্গ মনুষ্য (Peking Man, Pittdown Man ও Hiedelberg Man) আর এদের চেয়েও পুরাতন অন্ত্যাধুনিক যুগের মনুষ্যপ্রায় যে জীবটির কঙ্কাল পাওয়া গেছে তার মস্তিষ্ক-গহ্বরের পরিমাণ (cranial capacity) ৯৪০ সেন্টিমিটার মাত্র। এগুলিকে প্রাক্‌মনুষ্য (pre-man) বলা যায়।

বনমানুষের সঙ্গে যে মানুষের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, তা উভয়ের রক্ত পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ হয়েছে। অধ্যাপক নুট্যাল পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন যে, মানুষের রক্তে যে রাসায়নিক দ্রব্য (chemical solution) মিশ্রিত করলে ছানার মতন এক রকম অধঃক্ষিপ্ত পদার্থ (precipitate) উৎপন্ন হয়, সেই রাসায়নিক দ্রব্য বনমানুষের রক্তে মেশালেও ঠিক একই রকম ছানার মত জিনিষ উৎপন্ন হয়; কিন্তু অন্য কোনও জীবের রক্তে মেশালে তা হয় না। আবার অধ্যাপক গ্রুনবৌম (Professor Grunbaum) ও আরও কোন কোন পণ্ডিত দেখেছেন যে, কয়েকটি রোগ—যা মানুষ ছাড়া অন্য জীবের দেখা যায় না, তার বীজ মানুষের শরীর থেকে শিম্পাঞ্জী বা ওরাং-ওটাং জাতীয় বনমানুষের শরীরে টীকা দিলে উহা সংক্রমণ করা যায়, কিন্তু অন্য কোনও জন্তুর শরীরে সে বীজ সঞ্চার করলেও কাজ করে না, বা ফলদায়ক হয় না। এই-সব পরীক্ষাদ্বারা মানুষের ও বনমানুষের যে শারীরিক প্রকৃতিগত সম্বন্ধ আছে তা বোঝা যায়। কিন্তু তাই ব'লে নৃতত্ত্ববিৎ বা অন্য কোনও বিবর্ত্তনবাদী একথা বলেন না যে, মানুষ বনমানুষের বংশধর। তাঁরা এই সমস্ত পর্য্যালোচনা ক'রে কেবল এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে, তৃতীয়ক যুগের উষাধুনিক অন্তর্যুগে যখন মানুষও ছিল না, বনমানুষও ছিল না, বানরও ছিল না, তখন কেবল তাদের সকলের পূর্ব্বজ এক প্রকার জীব ছিল যাদেরকে অ-বিশিষ্ট উপমানবিক (undifferentiated anthropoidea) অথবা মনুষ্যাকার গোষ্ঠী (Anthropoid stock) বলা যেতে পারে।

এখন প্রশ্ন হবে যে, বানর বা বনমানুষেরা মানুষ হ'তে পারেনি কেন? এ প্রশ্নের সমাধান করতে হ'লে সেই পুরাকালের পৃথিবীর প্রাকৃতিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করা দরকার। সেই সব পুরাতন যুগে ও অন্তর্যুগে প্রকৃতির প্রভাব আধুনিক যুগ থেকে অনেক বেশী কঠোর ছিল; সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে প্রাণীদের জীবনসংগ্রামও তদনুরূপ কঠোর ছিল। অন্ত্যাধুনিক অন্তর্যুগে ঘন ঘন ভয়ানক আকস্মিক ঋতুবিপর্য্যয় (oscillations of climate) ঘটত। অন্ত্যাধুনিক অন্তর্যুগের প্রারম্ভে ইউরোপের আবহাওয়া গ্রীষ্মমণ্ডলের নিকটবর্ত্তী অঞ্চলের মত ছিল; ঐ অন্তর্যুগের শেষের দিকে ক্রমে ঠাণ্ডা পড়তে আরম্ভ হ'ল। তার পর-যুগের প্রারম্ভে প্রথম তুষার যুগ (glacial period) আরম্ভ হ'য়ে মেরু প্রদেশের মত প্রচণ্ড শীত (arctic cold) পড়ল। আবার প্রথম অন্তস্তুষার (inter-glacial gundh-mindel) যুগে গরম ও খুব বর্ষার প্রাদুর্ভাব হ'ল। দ্বিতীয় তুষার যুগে আবার প্রচণ্ড শীত (arctic climate) পড়ল—তারপর আবার দ্বিতীয় অন্তস্তুষার (inter-glacial mindel-riss) যুগে গরম ও বর্ষার প্রাদুর্ভাব হ'ল। তৃতীয় অন্তস্তুষার যুগে আবার প্রচণ্ড শীত এবং ঐ যুগে শীতের হ্রাস হয়ে আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ হ'ল। আবার চতুর্থ তুষার যুগে মেরুদেশের মত শীত এল। তুষার যুগের পরে আধুনিক আবহাওয়া আরম্ভ হ'ল। দুইটি (বা কোন কোন পণ্ডিতের মতে তিনটি) তুষার যুগের আত্যন্তিক শীতের সময় জীবের প্রাণ রক্ষা করা দুরূহ হ'য়ে উঠেছিল। এই সময়ের শীতের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য যেরূপ শরীরের প্রয়োজন হ'য়েছিল তা ঐ কালের বিশালকায় খুব পুরু চামড়ায় ঢাকা অতিকায় হাতী (Elephas primigenius), গণ্ডার (rhinoceros mercki) প্রভৃতির ছিল। ঐ কালের প্রাক্‌মানব আত্মরক্ষার জন্য শীতের আতিশয্যে এ-দেশ সে-দেশ দৌড়াদৌড়ি করত। এই-সব যুগে শীত-গ্রীষ্মের পর্য্যায়-ক্রমে প্রবলতায় প্রাণিজগতে জীবনসংগ্রাম (struggle for existence) বিষম কঠোর হয়েছিল। সেই জন্য ঐ কালে প্রাক্‌মানুষের ও অন্যান্য জন্তুদেরও আত্মরক্ষার জন্য দেশ-দেশান্তরে গমনের (migrationএর) খুব প্রয়োজন হয়েছিল। ঐকালে অনেক নূতন জাতীয় পশুপক্ষী ও প্রাক্‌মানুষের আবির্ভাব ও তিরোভাব হয়। যে-সব জীবজাতি আপন আপন শারীরিক

ও মানসিক প্রকৃতির প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তন হাসিল ক'রে টিকে থাকতে পেরেছে তারাই যোগ্যতমের উদ্বর্তন (survival of the fittest) নিয়ম অনুসারে অবস্থার উপযোগী পরিবর্ত্তনের (suitable variations) বলে টিকে গিয়ে দৈহিক ও মানসিক উন্নতির পথে অগ্রসর হ'তে পেরেছে।

এখন দেখা যাক্, বানর, বনমানুষ ও প্রাক্-মানুষের সম্বন্ধে এই নিয়ম কেমন-কার্য্যকর হয়েছে। মধ্যাধুনিক অন্তর্যুগে পৌঁছে মানবকল্প গোষ্ঠীর একদল জীব পরিবর্ত্তনশীল পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে চলার উপযোগী শারীরিক পরিবর্ত্তন (suitable modifications) হাসিল করতে না পেরে আর অগ্রসর হ'তে পারল না। কাজেই তারা ক্রমোন্নতির সোজা পথ হারিয়ে পিছিয়ে পড়ল, ও গলিঘুঁজিতে ঢুকে একটু এগিয়েই আটকে থাকল; এবং ক্রমে ক্রমে পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক অবস্থার প্রভাবে অন্যপ্রকারের দৈহিক ও বৈজিক পরিবর্ত্তন (modifications এবং germinal variations) লাভ ক'রে 'বানর' হয়ে পড়ল।

আধুনিক বনমানুষদের পূর্ব্বজেরাও অ-বিশিষ্ট মানবকল্প গোষ্ঠীর দল থেকে অভিন্ন ভাবে আরও কিছু দূর সোজা উপরে উঠবার পথে এগিয়ে গিয়ে পরে তৃতীয়ক যুগের অল্পাধুনিক অন্তর্যুগে আরও পরিবর্ত্তনশীল পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে যুঝতে না পেরে পৃষ্ঠ ভঙ্গ দিল ও অবান্তর পথে সরে দাঁড়াল। আর খানিক দূর সেই অবান্তর পথে গিয়ে পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক অবস্থার প্রভাবে শিম্পাঞ্জী, গরিলা প্রভৃতি 'বনমানুষ' জাতিতে পরিণত হ'ল। আর ঐ মানবকল্প গোষ্ঠীর অবশিষ্ট অধিকতর উদ্যমশীল নাছোড়বান্দা জীবগুলি পরিবর্ত্তনশীল পারিপার্শ্বিক নৈসর্গিক অবস্থার সঙ্গে প্রাকৃতিক ও ঐন্দ্রিয়িক নির্ব্বাচনের (natural and organic selectionএর) সাহায্যে আপনাদিগকে মিলিয়ে নিয়ে বীজের প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তন হাসিল ক'রে সোজাপথে উন্নতির দিকে উঠতে লাগল। এরাই তৃতীয়ক যুগের শেষ ভাগের অত্যাধুনিক অন্তর্যুগে প্রাক্‌মানবে (proto-man-এ) পরিণত হ'ল। সম্ভবতঃ কোনও সরন্ধ্র গ্রন্থির (যেমন thyroid বা pitutary glandএর) প্রভাবও এই পরিবর্ত্তনের সাহায্য করেছিল। আগেই বলেছি, ভূ-স্তরে যে-কয়েকটি বনমানুষের ও প্রাক্‌মানুষের এবং অনেক বানরের কঙ্কাল পাওয়া গেছে তারই সাহায্যে মানবের প্রাগিতিহাসের এই প্রথম অধ্যায়ের মোটামুটি চিত্র উদ্ধার হয়েছে। ইংলণ্ডের সাসেক্স জেলার পিটডাউন গ্রামে প্রাপ্ত পিটডাউন মনুষ্য (Enthropus Dawsonu), প্রুশিয়া দেশের হাইডেলবর্গ গ্রামে প্রাপ্ত হাইডেলবর্গ মনুষ্য (Homo Heidelbergensis), চীনদেশের পেকিং শহরের নিকট প্রাপ্ত পেকিং মনুষ্য (Sinanthropus Pekinensis) এবং আফ্রিকা মহাদেশের রোডেশিয়া দেশের স্রোক্ হিল্ পাহাড়ের নিকটে প্রাপ্ত রোডেশিয়ান মানুষ (Homo Rhodensiensis) এইগুলিই মানবের প্রাগিতিহাসের প্রধান নায়ক। পিটডাউন মনুষ্যকে প্রাক্‌মানব (pre-man) এবং অন্যগুলিকে সবচেয়ে গোড়ার মানুষ (proto-man) বলা যায়। এরাই সবচেয়ে আদিম নরকল্প প্রাণী।

যদিও এদের আকৃতি মোটের উপরে মানুষেরই মত ছিল, কিন্তু এরা দেখতে খানিকটা হিংস্র পশুভাবাপন্ন (brutal looking) ছিল। তবু শরীরের গঠনে, বাক্-শক্তির এবং বুদ্ধিশক্তির স্ফুরণে এরাই প্রথমে 'মানুষ' পদবাচ্য হ'ল। কেবল পিটডাউন মনুষ্য সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা এখনও একমত নন। জীবনের সিঁড়িতে এরা বানর এবং বনমানুষ থেকে অনেক ধাপ এগিয়ে উঠেছিল।

অত্যাধুনিক অন্তর্যুগের শেষের এবং তৃতীয়ক যুগের ঊর্দ্ধতম অন্তর্যুগের প্রথম দিকের ভূ-স্তরে যে সর্ব্বপ্রথম অস্ত্রের মত ধারাল পাথরের টুকরাগুলি পাওয়া গেছে, সেগুলি এদেরই হাতের তৈরি ব'লে মনে হয়। এগুলিকে উষাশিলা (Eolith) নাম দেওয়া হয়েছে। সবচেয়ে গোড়ার মানুষের (proto-manএর) কঙ্কালগুলির প্রাপ্তিস্থানে যা-কিছু পাওয়া গেছে তা দেখলে মনে হয় এরা প্রায় পশুর মতই থাকত, ফলমূল ও কখনও কখনও কাঁচা মাংস খেত, ও পর্ব্বতগুহা প্রভৃতি স্বাভাবিক আশ্রয়-স্থানে বাস করত। আগুনের ব্যবহার জানত না। সমাজ সংগঠন করতে পেরেছিল এরূপ কোনও লক্ষণ দেখা যায় না। আত্মরক্ষার জন্য গাছের ডালপালা, ভাঙা পাথরও হয়ত 'উষাশিলা' ব্যবহার করত; মড়া ফেলে দিত; ঐ কালের কোনও কবরের চিহ্ন দেখা যায় না।

যাক, এ-সব কথা আরও বলতে গেলে পুথি বেড়ে যাবে। এই প্রবন্ধের বক্তব্য কথাটি এই যে, নৃতত্ত্ববিৎ ও বিবর্ত্তন-বাদীরা বানর থেকে মানুষের উৎপত্তি নির্দ্দেশ করেন, এ ধারণা ভ্রান্ত; এবং এরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে নৃতত্ত্বের প্রতি অশ্রদ্ধাবান হওয়া অন্যায়।' আর আমার এই অপরিমার্জ্জিত ভাষার শুষ্ক প্রবন্ধ থেকে নৃতত্ত্বকে নীরস মনে করাও নৃতত্ত্বের প্রতি অবিচার করা হবে।*

* গোরক্ষপুরে প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের একাদশ অধিবেশনে পঠিত।

বাঁকুড়া জেলার একটি প্রাচীন শিলালিপি

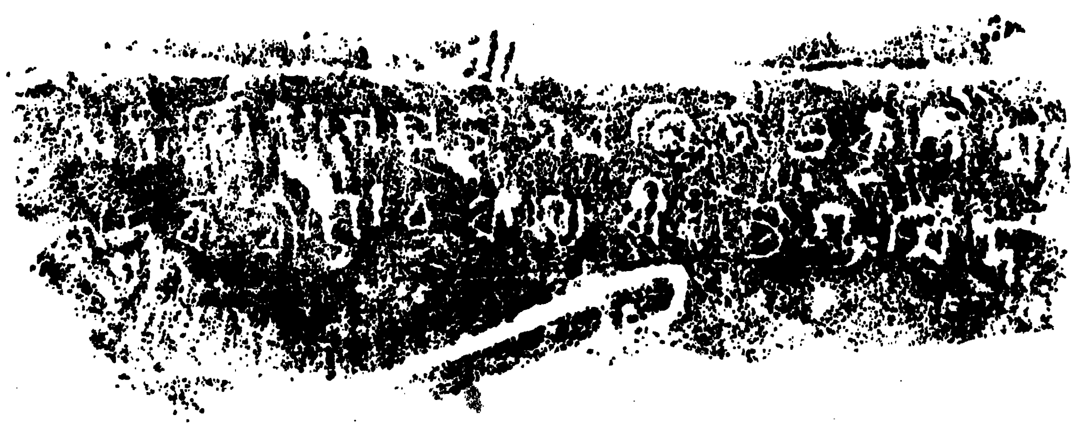
শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম-এ, বি-টি

বাঁকুড়া জেলার উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে, বাঁকুড়া শহর হইতে প্রায় পঁয়ত্রিশ মাইল দূরে তিলুড়ী গ্রাম। গ্রামটি ছোটবড় পাহাড়ে পরিবেষ্টিত ও প্রাকৃতিক শোভা-সম্পদে সমৃদ্ধ। গ্রাম হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে বিহারীনাথ নামে এক ১৪৬৯ ফুট উচ্চ পাহাড় আছে। ইহার অনতিদূরে মহেশারা বা মহিসারা নামক ক্ষুদ্র সাঁওতাল পল্লী। পাহাড়ের গায়ে এক পাশে একটি বহু পুরাতন শিবমন্দির আছে। এই মন্দিরস্থিত শিবের নাম বিহারীনাথ।

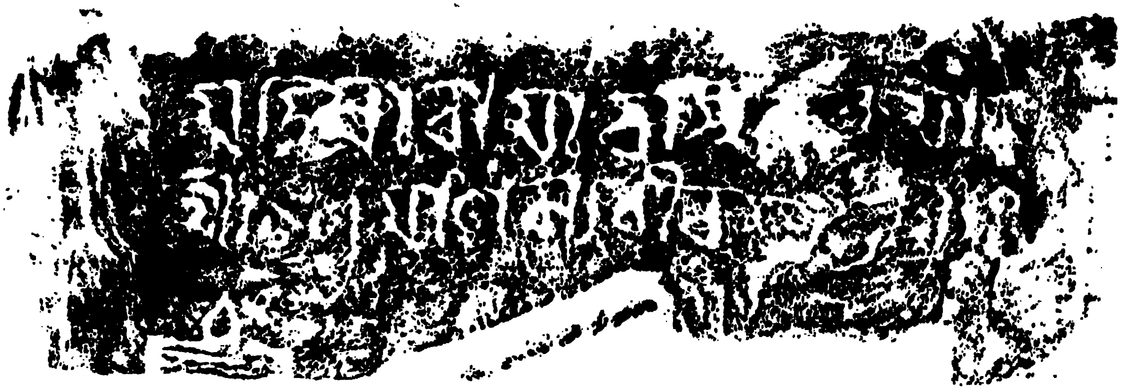
পাহাড়ের পশ্চিম দিকের পাদদেশ হইতে এক সমতল ক্ষেত্র অনেকখানি স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে। সেখানে এক বৃহৎ পুরাতন তেঁতুল গাছের নীচে কয়েকটি বড় বড় প্রস্তর-পট্ট অর্দ্ধপ্রোথিত অবস্থায় দেখা যায়। তন্মধ্যে দুইটি বড় প্রস্তর-পট্টের গাত্রে দুই লাইন করিয়া অক্ষর খোদিত আছে। প্রস্তরগাত্র অতীব বন্ধুর ও প্রস্তরলিপির কোন কোন অংশ মুছিয়া গিয়া অত্যন্ত অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাহাদের যথা-সম্ভব স্পষ্ট প্রতিলিপি এখানে প্রকাশিত হইল। ইহার দ্বারা বাংলার বা বিহারের কোন নূতন ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কৃত হইলে শ্রমসার্থক জ্ঞান করিব।

এতৎসংক্রান্ত স্থানীয় জনশ্রুতি সংগ্রহের চেষ্টা করিয়া যাহা পাইয়াছি, তাহাও দিতেছি।

তিলুড়ী-নিবাসী এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের নিকট শুনিলাম যে, তিনি তাঁহার পিতা পিতামহ প্রভৃতি বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিদের নিকট শুনিয়াছিলেন, যে, উক্ত স্থানে চতুর্দ্দিকে পরিখাবেষ্টিত এক প্রকাণ্ড গড়, প্রাসাদ ইত্যাদি ছিল; এবং তাহা কোন



১। শিলালিপি

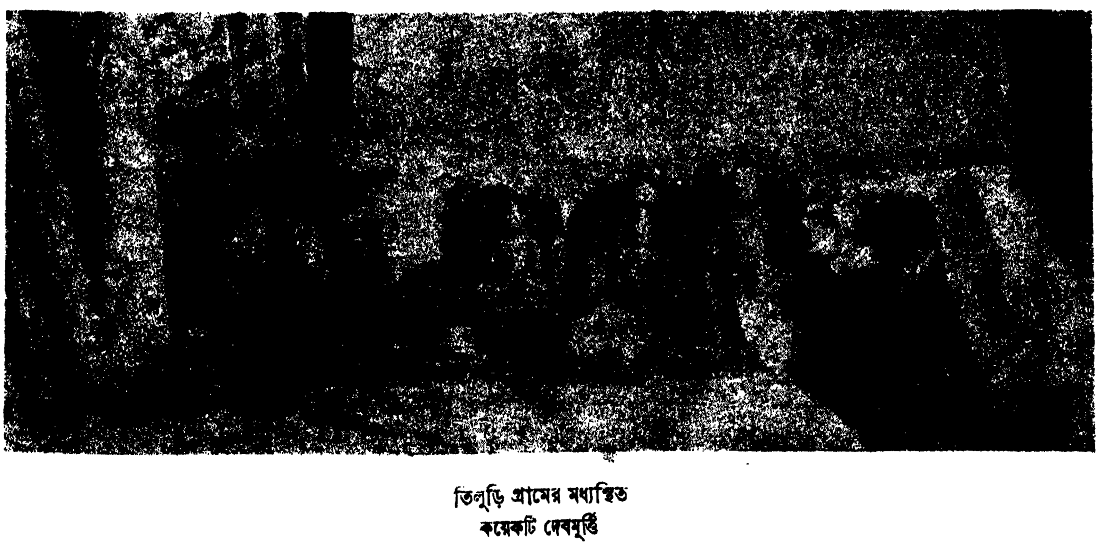


২। শিলালিপি

মানরাজার আবাসস্থল ছিল। মানরাজা বলিতে মান-বংশীয় রাজা বুঝান সম্ভব। শ্রীযুত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার 'বা লার ইতিহাস' ১ম ভাগ ২য় সংস্করণে ৩০১-৩০২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—'গয়া জেলার দক্ষিণ-পূর্ব্বাংশে যে বনময় প্রদেশ এখন হাজারীবাগ বলিয়া পরিচিত, সেই প্রদেশে খ্রীষ্টীয় ৯ম শতাব্দে মানবংশীয় রাজগণ রাজত্ব করিতেন।" উক্ত ইতিহাসে দু-চার জন মানবংশীয় রাজার নাম পাওয়া যায়, যথা—বর্ণমান, উদয়মান, শ্রীধৌতমান, অজিতমান ইত্যাদি। তিলুড়ী গ্রামটি বাঁকুড়া ও মানভূম জেলার শেষ সীমায় অবস্থিত এবং পূর্ব্বে ইহা মানভূম জেলার অন্তর্গত ছিল। এই মানভূম নামটিও মানরাজাদিগের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করে। যেমন-- ব্রাহ্মণভূম, মল্লভূম, শূরভূম, সেনভূম ঐ ঐ বংশীয় রাজাদের ভূমি বা রাজ্য বুঝায়, তেমনি মানরাজার রাজ্য বলিয়া মানভূম নাম হইতেও পারে।

বর্ত্তমানে ঐ স্থানে প্রাসাদ প্রাকার স্তম্ভাদির ধ্বংসাবশেষ স্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু স্থানে স্থানে অনেক কারুকার্য্যযুক্ত প্রস্তরখণ্ড আছে। ইহা হইতে মনে হয় ঐ স্থানে অট্টালিকা দুর্গাদিও ছিল। স্থানে স্থানে পুরাতন পরিখার চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়।

পাহাড়ের পাদদেশস্থ উপরিউক্ত স তলভূমির নিকটে একটি বিস্তীর্ণ দীর্ঘিকা আছে। ইহা আজও রাণার দীঘি নামে খ্যাত। গ্রামের নাম উদয়পুর, ভরতপুর ইত্যাদি। ঐ স্থানে এবং নিকটবর্ত্তী লোকালয়ে কতকগুলি প্রস্তরে উৎকীর্ণ দেবমূর্ত্তি দেখা যায়। তন্মধ্যে ভরতপুর গ্রামের



তিলুড়ি গ্রামের মধ্যস্থিত
কয়েকটি দেবমূর্ত্তি

প্রান্তস্থিত একটি বৃক্ষের নিম্নদেশে রক্ষিত মূর্ত্তিটির এবং তিলুড়ী গ্রামের মধ্যস্থিত বেদীর উপর সন্নিবিষ্ট মূর্ত্তিগুলির ছবি দেওয়া হইল। ভরতপুরের মূর্ত্তিটি মহাবীর হনুমানের বলিয়া এতদঞ্চলের লোকের ধারণা। কিন্তু উহা খুব সম্ভব



তিলুড়ির নিকটবর্ত্তী ভরতপুর গ্রামের প্রান্তস্থিত প্রস্তরগাত্রে খোদিত মূর্ত্তি

ক্ষত্রিয় শক্তির প্রতীকস্বরূপ কোন ক্ষত্রিয় বীরের মূর্ত্তি মাত্র। শিলালিপিযুক্ত প্রস্তর-পট্টের নিকটস্থিত আরও একটি প্রস্তর-পট্টের গাত্রে ঠিক ঐ রকমের আর একটি মূর্ত্তি খোদিত আছে। ১নং ও ২নং শিলালিপির এক স্থানে "বীরস্তম্ভমিদং" লেখা আছে বলিয়া মনে হয়। এই 'বীর' কথাটির সহিত ক্ষত্রিয় বীরের ঐরূপ মূর্ত্তির কোন যোগ থাকা সম্ভব। তিলুড়ি গ্রামের মধ্যস্থিত মূর্ত্তিগুলির মধ্যে যেটি ক্ষুদ্র অথচ সম্পূর্ণ ও অটুট অবস্থায় রহিয়াছে, সেটি বর্দ্ধমান মহাবীর অথবা পার্শ্বনাথের মূর্ত্তি বলিয়া সহজেই অনুমিত হয়। অন্যান্য মূর্ত্তিগুলি কোন দেবতার তাহা সঠিক বুঝা যায় না। ২নং শিলালিপির দ্বিতীয় পংক্তির প্রথম দুটি অক্ষর অস্পষ্ট। তার পরের অক্ষরগুলি 'মানস্য,' তার পরের গুলি 'বীরস্তম্ভমিদং'। প্রথম অক্ষর দুটি 'জিন' বলিয়া অনুমান হয়। যদি এই অনুমান সত্য হয়, তবে প্রস্তরপট্টটি জিনমান অর্থাৎ বর্দ্ধমান মহাবীরের উদ্দেশে কোন ক্ষত্রিয় বীরের [রাজের] দ্বারা স্থাপিত স্মৃতিস্তম্ভের অংশবিশেষও হইতে পারে।

আরও দু-এক জন অশীতিপর বৃদ্ধ মাত্র এইটুকু বলিতে পারেন যে, তাঁহারা এই স্থানে কোন স্বাধীন রাজা রাজত্ব করিতেন শুনিয়া আসিতেছেন ও ঐ বিহারীনাথ পর্ব্বতস্থিত শিবলিঙ্গের বাৎসরিক উৎসব হইতে ও মেলা বসিতে দেখিয়াছেন। এই উৎসব চৈত্র মাসে অনুষ্ঠিত হইত। এখন এই শিবের উৎসব হয় না। ঐ রাজার কোন নাম বা তাঁহার রাজত্বকালের সন তারিখ তাঁহারা দিতে পারেন না। এই স্থানে বা পর্ব্বতগাত্রে কোন সন তারিখ পাওয়া যায় নাই।

শিলালিপি দুইটির একটিতে যে 'মহিসারা য়াবাস' পড়া যায় তৎসম্বন্ধে যে সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহাও দিতেছি।

মহিসারা বহু বৎসর পূর্ব্বে পঞ্চকোটরাজের অধিকারভুক্ত একটি সুবৃহৎ পরগণা ছিল বলিয়া জানা যায়। বর্ত্তমানে ইহা বেঙ্গল কোল কোম্পানীর জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত। ইহার নাম পঞ্চকোটরাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত রঘুনাথ নারায়ণ দেবের বাংলা ১১৭৮ সালের নিষ্কর ও ব্রহ্মোত্তর জমিদারীর তালিকার মধ্যে পাওয়া যায়। তিনি এইরূপ অনেকগুলি পরগণা-বিশিষ্ট প্রকাণ্ড জমিদারী ইংরেজদিগের নিকট হইতে দশসালা বন্দোবস্ত মতে ভোগ করিতেন। ইহার বাৎসরিক আয় ৫৩৪৪৮৵/২ টাকা ছিল বলিয়া খোকা বহিতে উল্লিখিত আছে এবং বাঁকুড়া জেলার বর্ত্তমান সালতোড়া ও মেজিয়া থানার প্রায় সকল গ্রাম ও আরও অনেকগুলি গ্রামের নাম এই পরগণার অন্তর্গত মৌজা তালিকাভুক্ত দেখা যায়। এই মহিসারা পরগণার অন্তর্গত মৌজার সংখ্যা অন্যূন একশত ত্রিশটি।

আমি যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি ও যাহা যাহা সম্ভবপর বলিয়া অনুমান করিয়াছি তাহা ব্যক্ত করিলাম। শিলালিপি-পাঠে আমি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। সেই জন্য ভ্রমপ্রমাদ

* কেহ কেহ বলেন যে, এই অঞ্চল বল্লাল সেন কোন সামন্ত রাজাকে দান করেন এবং বিহারীনাথ পাহাড়ের পাদস্থিত এই গড় তাঁহারই ছিল বলিয়া জনশ্রুতি।

হওয়ার সম্ভাবনা। তাহা নবীন ঐতিহাসিক তত্ত্বান্বেষীর অজ্ঞতাপ্রসূত জানিয়া ইতিহাসবেত্তারা মার্জ্জনা করিবেন।*

শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ের মন্তব্য—

১নং লিপির ২য় পংক্তির শেষ অংশে "স্তম্ভমিদং" পড়া যাইতে পারে।

২নং লিপির প্রথম পংক্তির গোড়ায় "মহিবারা" পড়া যায় এবং দ্বিতীয় পংক্তিতে—"শ্রীজিনমানস্ত বীর" পর্য্যন্ত পরিষ্কার এবং তারপর "স্তম্ভমিদং" পড়া অসঙ্গত হইবে না।

মূর্ত্তিনিচয় :—বামদিক হইতে

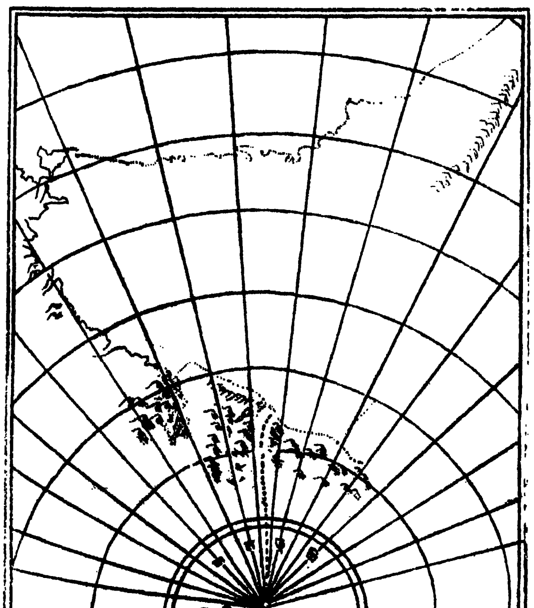
(১) দাঁড়ান তীর্থঙ্কর বা জিনমূর্ত্তির ভগ্নাংশ
(২) ঐ
(৩) উ বিষ্ট জিনমূর্ত্তি
(৪) দাঁড়ান জি মূর্ত্তি
(৫) দাঁড়ান কুবের-মূর্ত্তি। বড় সুন্দর।"

* পূজ্যপাদ রায়-বাহাদুর শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, এম-এ, বিদ্যানিধি মহাশয় আমাকে এই শিলালিপি, দেবমূর্ত্তির ছবি ও বিবরণ সংগ্রহের জন্য উৎসাহিত করিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধের শেষ দুইখানি চিত্র তিলুড়ি-নিবাসী শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

দক্ষিণমেরুর নূতন অভিযাত্রী

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

পৃথিবীর দুই প্রান্ত—উত্তর ও দক্ষিণ মানুষের অনুসন্ধিৎসাকে বিফল ক'রে বহুদিন অজ্ঞাত ছিল। অথচ এই দুটি প্রদেশই পৃথিবীর আবহাওয়ায় অল্প প্রভাব বিস্তার করে না—দক্ষিণমেরুর প্রভাবই কিছু বেশী। প্রায় পৌনে দুই শত বৎসর পূর্ব্বে দক্ষিণ সমুদ্রে পরিভ্রমণকালে ক্যাপ্টেন কুক কয়েকটি কারণে অনুমান করেন, পৃথিবীর দক্ষিণে এক সুবিশাল স্থলভাগ বর্ত্তমান, মানুষ তার কথা আজও জানে না! তাঁর পর থেকে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত পৃথিবীর প্রান্ত দুটি আবিষ্কারের চেষ্টা ইউরোপের কেউ কেউ করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা কৃতকার্য্য হন নি। মেরুচ্ছটার মত প্রদেশ দুটি এক গভীর রহস্যান্তরালে গুপ্ত থেকে যায়। ফলে অনুসন্ধিৎসা আরও প্রবল হয়ে উঠে এবং বিগত ত্রিশ বৎসরে কয়েকজন অসমসাহসী ইউরোপ ও আমেরিকাবাসীর প্রাণান্তকর চেষ্টায় প্রান্ত দুটি আবিষ্কৃত হয়ে পড়ে।



দক্ষিণমেরুপ্রদেশের মানচিত্র

পিয়ারীর উত্তর মেরুবিজয়, অ্যামানসেন ও নোবিলের আকাশপথে উত্তরমেরু অভিযান ও প্রত্যাবর্ত্তনের পথে নোবিলের বিমানে (Air Ship) নিদারুণ দুর্ঘটনার কাহিনী অনেকেরই বিদিত। অনেকেই পাঠ করে থাকবেন ক্যাপ্টেন স্কট দুবার দক্ষিণমেরু আবিষ্কারে যাত্রা করেছিলেন। কিন্তু প্রথমবারে বিফল হন। দ্বিতীয়বারে দক্ষিণমেরু আবিষ্কার ক'রে ১৯১২ সালের ১৮ই জানুয়ারী সেখানে তুষারবক্ষে ইংলণ্ডের পতাকা প্রোথিত করেন। কিন্তু বিজয়গৌরবে দেশে ফিরে আসতে পারেন নি, মেরুপ্রদেশেই পথিমধ্যে এক জায়গায় ভয়ঙ্কর

তুষারঝটিকা, প্রচণ্ড শীত ও অনাহারে তিন জন অনুসঙ্গীর সঙ্গে মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃত্যুর কয়েক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বের কথাও স্কট তাঁর নোটবইয়ে স্বহস্তে লিপিবদ্ধ ক'রে রেখে গেছেন। স্থৈর্য্য ও ধৈর্য্যের এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত জগতে অল্পই দেখা যায়।

অ্যামানসেন ও স্কটের অভিযানকালে বিমান ও বেতারের উদ্ভব হয় নি। তুষারপথে তাঁদের একমাত্র যান-বাহন ছিল এস্কিমো কুকুর ও স্লেজ। সে কারণ, নানা অসুবিধা ও কষ্টের মধ্যে তাঁদের আবিষ্ক্রিয়া সম্পন্ন করতে হয়েছিল। কিছুকাল তাঁরা ও তাঁদের অগ্রবর্ত্তী অভিযাত্রিগণ—পিয়ারী, শ্যাক্‌ল্‌টন্, উইল্‌কিস্ প্রমুখ—লোকসমাজের সঙ্গে যোগচ্ছিন্ন হয়ে সুদুর্গম পথে যাত্রা করেছিলেন। তাঁদের সাফল্য বা বিফলতার বার্ত্তা সেইক্ষণে পৃথিবীর লোকে জান্‌তেও পারে নি। যাহোক, স্কট্, অ্যামানসেন্ কেবল যে দক্ষিণমেরু আবিষ্কার করেছিলেন, তা নয়; ওখানকার কয়েকটি অঞ্চল, পর্ব্বতমালা, উপত্যকা ও বর্ত্ম ও আবিষ্কার ক'রে তাদের নামকরণ ক'রে গেছেন। এঁদের পূর্ব্বে শ্যাক্‌ল্‌টন্ প্রমুখ ব্যক্তিগণ কতকগুলি খাড়ি, পর্ব্বত, উপসাগর ও ভূখণ্ড আবিষ্কার করেছিলেন। দক্ষিণমেরু আবিষ্কারের গৌরবের অধিকারী তাঁরা না হলেও আবিষ্কারকের গৌরব তাঁদেরও কম নয়। তাঁদেরই প্রভূত চেষ্টা, ত্যাগ, সাহস ও



তুষার প্রাচীর

দুর্ভাগ্যবশতঃ দক্ষিণ-মেরুর প্রথম আবিষ্কর্ত্তার যে গৌরব তা তাঁর নয়। তাঁর এক বৎসর পূর্ব্বে ১৯১১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর অ্যামানসেন দক্ষিণ-মেরুর চিরতুষারময় বক্ষে নরওয়ের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছিলেন। বস্তুতঃ তাঁরই নির্দ্দেশমত পরবর্ত্তী আবিষ্কর্ত্তাগণ ওখানকার সুদুর্গম পথ অতিক্রম ক'রে মেরুর মালভূমিতে উপস্থিত হ'তে সমর্থ হন। ঐখানেই একটি পর্ব্বতে (Heiberg) তুষারস্রোতের ধারে একখানি পরিত্যক্ত স্লেজের পাশে কতকগুলি স্তূপীকৃত পাথরের নীচে টিনের কৌটায় তাঁর নোটবইয়ের একখানি পৃষ্ঠা এই সেদিনও ছিল।



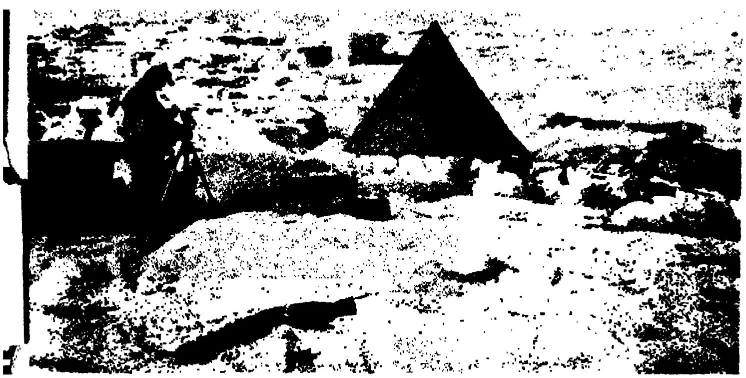
বিরাট তুষার স্তবক

অভিজ্ঞতা পরবর্ত্তীগণের অন্তরে গভীর অনুপ্রেরণা দান করেছে। এমন কি, শ্যাক্‌ল্‌টন্ দক্ষিণমেরু থেকে ১১১ মাইল দূরবর্ত্তী স্থানেও পৌছতে সমর্থ হয়েছিলেন।

কিন্তু এতগুলি অনুসন্ধিৎসুর যত্ন ও চেষ্টা সত্ত্বেও সমগ্র মেরুপ্রদেশটির দৈর্ঘ্য ও বিস্তার, ভূভাগের আকৃতি, পর্ব্বতগুলির উচ্চতা, তুষাররাশির গভীরতা, সমুদ্র ও স্থলের মিলনতট, ভূগর্ভের বার্ত্তা প্রভৃতি আজও পরিষ্কার জানা যায় নি। আজও দক্ষিণমেরুর মানচিত্র অসম্পূর্ণ; ইতিহাস গাঢ় তমসাচ্ছন্ন। ওখানেও কি একদিন শ্যামবনানী লীলায়িত হয়ে ওঠে নি? বিচিত্র অরণ্যচারিগণের পদশব্দে, চীৎকারে, উল্লাসে, যুদ্ধ কোলাহলে তা নিয়ত মুখর ছিল না? তারপর একদিন হিমযুগের মহাসন্ধিক্ষণে ঘন তুষারাচ্ছাদন বিস্তার করে প্রকৃতি পটপরিবর্ত্তন করেছে কি? এমনই নানা প্রশ্ন জাগে।



শত ফুট উচ্চ হিমশিলা ও তুষারতট



একটি তুষার স্রোত

স্কটের পর প্রায় ষোলবৎসর দক্ষিণমেরুতে আর কোন মানুষের পদচিহ্ন পড়ে নি এবং কোথাও অভিযানের কোন বিশেষ উদ্যোগ ও আয়োজন হয়েছে, একথাও শোনা যায় না। তারপর ১৯২৮ সালের ২৫শে আগষ্ট তারিখে আবার একদল অভিযাত্রী কমাণ্ডার বর্ডের (Byrd) নেতৃত্বে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র থেকে দক্ষিণমেরুর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। একটা কথা এখানে উল্লেখ করলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এই অভিযানের ব্যয়ভার ছিল বিপুল। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকখানি পত্রিকা, বিশেষ ক'রে National Geographical Magazine, তার বেশীর ভাগ বহন করেছিলেন। সমগ্র দেশই ছিল বীর্ডের এই অভিযানের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। তাদেরও উৎসাহ ও আগ্রহের অন্ত ছিল না। তাঁদের যাত্রাকালে সারা যুক্তরাষ্ট্রে সে কি উত্তেজনা! অবশ্য একথাও বিবেচ্য যে যুক্তরাষ্ট্র স্বাধীন ও বিত্তশালী।

আমরা আস্ত্র্ক ব্যবসায়ী, তবুও বলি বীর্ড যে জাহাজে

তাঁর দল-বল, রসদপত্র, যানবাহন নিয়ে যাত্রা করেছিলেন তার নাম ছিল—'সিটি অব নিউ ইয়র্ক'। জাহাজখানির বয়ঃক্রম তখনই ছিল ৪৩ বৎসর। আকারেও তেমন বিরাট নয়; মাত্র পাঁচ শত বার টনী। তার দেহ কাষ্ঠনির্ম্মিত, কিন্তু পাশের তক্তাগুলো পুরু ৩৪ ইঞ্চি—প্রায় দু-হাত। জাহাজখানার নির্ম্মাণ স্থান নরওয়ে, মালিকও ছিল একজন নরওয়েবাসী। বিগত ৪৩ বৎসর ধ'রে নানা ঝড়ঝঞ্ঝা তুচ্ছ ক'রে মেরুপ্রদেশের হিমশিলাসঙ্কুল সমুদ্রবক্ষে জাহাজখানি ভেসে বেড়াত, চলত বাষ্পে। বীর্ড ক্রয় ক'রে ঐ সঙ্গে জুড়ে দিলেন কতগুলি পাল। নাম দিলেন—'সিটি অফ নিউ ইয়র্ক'।

এই ক্ষুদ্র জাহাজখানি একটি চমকপ্রদ কাজ করেছিল। বীর্ডের সঙ্গে যে রসদপত্র গিয়েছিল তার পরিমাণ ছিল যেমন বিপুল, তালিকা ছিল তেমন দীর্ঘ। সবগুলির সম্ভব না হ'লেও কয়েকটির নাম করা যেতে পারে—দুখানা মাঝারি গোছের তিন এঞ্জিনওয়ালা এরোপ্লেন, মোটর ট্র্যাক্টর, বেতার যন্ত্র, স্লেজ, স্লেজবাহন ৮২টি এস্কিমো কুকুর, একটি ছোট লাইব্রেরী, ছোটখাট একটি হাসপাতাল, প্রায় শত মণ ময়দা, মাংস, জমাট দুধ, চা, কোকো, ডিম প্রভৃতি নানাপ্রকার খাদ্যদ্রব্য। এইগুলোর বিপুল ভার জাহাজখানির বহনসীমা অতিক্রম ক'রে তার সমস্ত ঠাঁই জুড়ে এমন অবস্থার সৃষ্টি করেছিল যে, মাঝ সমুদ্রে তরঙ্গাঘাতে, বিশেষ করে ঝড়ে, সহজেই ডুবে যাওয়া কিছুমাত্র অসম্ভব ছিল না।



গ্রামোফন-সঙ্গীত মুগ্ধ পেঙ্গুইন দল

কিন্তু যাত্রার চার মাস পরে, ২৫শে ডিসেম্বর, ৫২ জন অভিযাত্রীকে নিয়ে জাহাজখানি নিরাপদে মেরুকূলে উপনীত হয়। পথে মেরুপ্রদেশের সান্নিধ্যে একবার ভয়ঙ্কর তুষার ঝড়ও উঠেছিল। তাতে তার চলার বেগ কিঞ্চিৎ প্রশমিত হলেও তাকে লক্ষ্যচ্যুত করতে পারেনি।

যে জায়গায় জাহাজখানি দাঁড়িয়েছিল, তা অবশ্য মৃত্তিকা নয় তুষার প্রান্তর। মাটি সেখান থেকে কতদূরে কে বলবে? সমুদ্র জমে যে তটের সৃষ্টি করেছিল, তারই গভীরতা ৪০ ফিট। তার বিস্তৃতি সকল সময় এক রকম থাকে না, কখনও আরও কয়েক মাইল বেশী বা কম হয়। দূরে কঠিন বরফের পাহাড় সূর্য্যকিরণে নানা রঙে অভিরঞ্জিত হয়ে উঠছে। যত দূর দৃষ্টি চলে কেবল শ্বেত তুষার, এ ধারে নীল সমুদ্র। তার মাঝে মাঝে নানা আকারের তুষারপিণ্ড ভেসে বেড়াচ্ছে। আকাশে একটি পাখী নেই; বিচিত্র মেঘসম্ভারে পরিপূর্ণ। নির্জ্জন তুষার প্রান্তরে কোথাও নিস্তব্ধ পেঙ্গুইনের দল বা পেট্রেল পাখী, কোথাও দু-একটা সীল, সমুদ্রের এক কোণে দু-চারটি তিমি, এ ছাড়া সেখানে প্রাণের চিহ্ন নেই, প্রাণীর সাড়া নেই, যেন এক মৃত্যুলোক!

ঐ কূল থেকে কয়েক মাইল দূরে অভিযাত্রিগণ একটি অতি ক্ষুদ্র গ্রাম বা বিরাট আস্তানা নির্ম্মাণ করলেন। তাতে ল্যাবরেটরী, হাসপাতাল, জিম্‌নাসিয়াম্‌, ভাণ্ডার, মেস, অফিস, কারখানা, গ্যারেজ, কুকুরের ঘর ও বেতার-ষ্টেশন প্রভৃতি সবই প্রতিষ্ঠিত হ'ল। দীর্ঘকাল ঐ রকম স্থানে বাস করতে যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীদের পক্ষে যে সুবিধাগুলি আবশ্যক তাঁরা সে সকলেরই ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু বিজলী সরবরাহের কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হ'ল না। কেরোসিন তেলের আলোয় তাঁদের কাজ চলতে লাগল। তাঁদের ধারণা ছিল, তিন বৎসর সকলকে সেখানে বাস করতে হবে। বীর্ড এই

গ্রাম বা আস্তানার নাম দিলেন—'লিট্‌ল আমেরিকা।' এর বাসীন্দার সংখ্যা হল ৪২ জন মানুষ ; ৮২টি কুকুর এবং প্রতিবেশী হলেন পেট্রেল, পেঙ্গুইন, সীল ও তিমি।

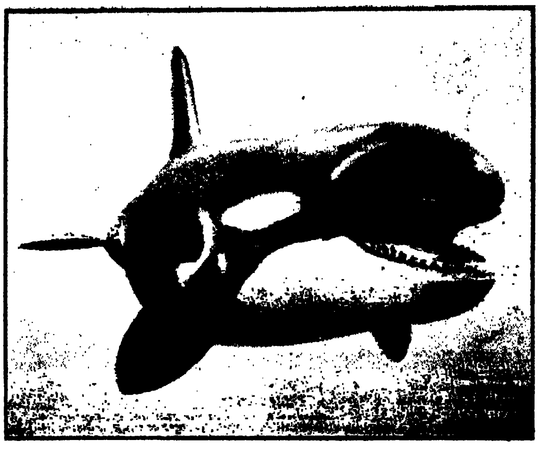
পেঙ্গুইনরা পরম অতিথিবৎসল ও নির্ভীক প্রাণী। মানুষ বা কুকুরকে এরা একটুও ভয় করত না, দুনিয়ায় এক রাক্ষুসে তিমি-(Grampus) ছাড়া আর কারুকে ভয় করে কি-না জানি না, নির্ভীক চিত্তে কুকুরদের সঙ্গে মিতালী করতে যেত। ফলে লাভ হ'ত মৃত্যু। কিন্তু তাতেও হতভাগ্যগুলির চৈতন্যোদয় হত না। এদেরই ডিম ও মাংস অভিযাত্রীদের একটি প্রিয় খাদ্য ছিল। সীল ও তিমিরাও মানুষকে আমলে আনত না। মাত্র হাত কয়েক দূরে বরফের ওপর আপন খেয়ালে শুয়ে বা উর্দ্ধমুখ হয়ে জলে ভেসে থাকত। অবশ্য রাক্ষুসে তিমি ছাড়া এদের স্বভাবও নিরীহ। এতদ্‌ভয়ই ছিল মানুষ ও কুকুরগুলির খাদ্য।



হিমশিলা

রাক্ষুসেতিমিজাতিকে দক্ষিণমেরুর হিংস্রপ্রাণী বলা যেতে পারে। মানুষ বা মেরুবাসী ঐ সকল প্রাণীর সাড়া পেলেই এরা শিকারের নেশায় ক্ষেপে ওঠে। শিকারের কৌশলও এদের তুচ্ছ নয়। যদি দেখে জলের ধারে বরফের ওপর কোন সীল দেহ এলিয়ে চক্ষু মুদে পরম নিশ্চিন্ত মনে স্তিমিত রৌদ্রটুকু উপভোগ করছে অমনি ডুব দিয়ে বরফের তলায় চলে যায়। তারপর নাকের এক ধাক্কায় বরফের চাপ ভেঙে বিস্মিত ভীত জলপতিত সীলটিকে পলায়নের কোন অবকাশ না দিয়ে নিমেষে মুখে পূরে ফেলে। এই অভদ্রজনোচিত ব্যবহারের জন্য সীল ও পেঙ্গুইনরা এদের কাছ থেকে সর্ব্বদা দূরে দূরে থাকে। পেঙ্গুইনরা আবার জলে নামবার পূর্ব্বে কিছুক্ষণ সার বেঁধে তীরে বসে কলরব করে। তাতেও যদি কোন রাক্ষসের সন্ধান না পাওয়া যায় হঠাৎ দলের একটিকে ধাক্কা দিয়ে জলে ফেলে দেয়। কাছেই কোথাও কোন রাক্ষস থাকলে সে বেচারীর আর নিস্তার নেই, মৃত্যু নিশ্চিত। ব্যাপার দেখে দলের সকলে তৎক্ষণাৎ সরে পড়ে, আর জলে নামে না। কমাণ্ডার বীর্ড স্বয়ং একবার এই রাক্ষসগুলোর কবলে পড়েছিলেন। কিন্তু পরম সৌভাগ্যবশতঃ তিনি রক্ষা পান।

দক্ষিণমেরু মনুষ্যবাসের অযোগ্য। কেবল মানুষ কেন, ঐ সকল প্রাণী ছাড়া আর কোন প্রাণীও সেখানে



রাক্ষুসে তিমি বা গ্যামপাস্‌

বসবাস করতে পারে না। তবে এস্কিমো কুকুরগুলোর সম্বন্ধে ঠিক করে কিছু বলা সম্ভব নয়। সর্ব্বনিম্ন তাপেরও ৫০ বা ৬০ ডিগ্রি নীচে ভীষণ তুষার-ঝটিকার মধ্যেও ওরা

বাইরে পরম আরামে ঘুমোতে পারে, নিদ্রায় এতটুকু ব্যাঘাত হয় না। তার একটা কারণ ওদের স্বাভাবিক শারীরিক আচ্ছাদন। অবশ্য সমুদ্রতীর ছাড়া মেরুর আর কোথাও কোন প্রাণী নেই, কেবল সীমাহীন তুষার। তার ওপর



তুষারাচ্ছন্ন পর্ব্বত

দিয়ে ঘোর রবে ভয়ঙ্কর ঝড় বয়ে যায়, চারিধার আচ্ছন্ন ক'রে গাঢ় কুয়াশা নামে, সমুদ্রবক্ষ থেকে কখন কখন বাষ্পরাশি ধূমায়িত হয়ে ওঠে। উত্তরমেরুর মত এখানেও ছয়মাস দিন, ছয় মাস রাত্রি।

অভিযাত্রিগণ যখন মেরুকূলে পৌঁছেছিলেন তখনও সেখানে দিন। কয়েক মাস মেরুবিজয়ের আয়োজনে তাঁদের কেটে গেল। এই সময় বার্ড আকাশপথে কয়েকটি ভূখণ্ড, পর্ব্বত ও খাড়ি আবিষ্কার ক'রে তাদের নানা নামকরণ করলেন। তারপর এল সুদীর্ঘ রাত্রি। এপ্রিল মাসের এক নিস্তব্ধ দিনান্তে (২২শে এপ্রিল) অন্তহীন তুষারমরুবক্ষে ম্লান রশ্মিজাল বিস্তার ক'রে রবি মেরুসাগরে ধীরে অস্ত গেল। চারিদিকে ক্ষীণ অন্ধকার। ক্রমে ক্রমে তা গাঢ় হয়ে এল। সেই সঙ্গে ফুটে উঠল বিরাট আকাশ-প্রাঙ্গণে অপূর্ব্ব মেরুজ্যোতি। এই সময়টা দক্ষিণমেরুর শীতকাল। সে ঠাণ্ডা কল্পনাতীত। ধাতুনির্ম্মিত কোন জিনিষ ত স্পর্শই করা যায় না; কোন-ক্রমে একটু আঙুল স্পর্শ করলেই মনে হয়, আঙুলটা দগ্ধ হয়ে গেল।

তাই বলে অভিযাত্রিগণ সেখানে ঘরে ব'সে গল্প-গুজবে, আহার-নিদ্রায় ও সুদূর যুক্তরাষ্ট্র থেকে বেতারে গান-বাজনা শুনে সময়টা বৃথা অতিবাহিত করেন নি। বরং নিদ্রার ভাগ আরও কমিয়ে নানা কাজ সম্পন্ন করেছিলেন। ঐ সময়েই দূরের এক পর্ব্বতক্রোড়ে তাঁদের একখানি এরোপ্লেন ঝড়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। সুখের কথা তাতে কোন প্রাণ বা অঙ্গহানি ঘটে নি। সে ঝড়ের বেগ ছিল ঘণ্টায় ১২০ মাইল।

শীতের সময় 'লিটল আমেরিকা'বাসীরা বাইরের ঠাণ্ডার কবল থেকে রক্ষা পাবার একটি অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করেছিলেন। গ্রামের মধ্যেই দূরে কয়েকটি ঘরে যাবার জন্যে তুষারনিম্নে সুড়ঙ্গ নির্ম্মিত হয়েছিল। তার মধ্য দিয়ে টর্চ্চ জেলে তাঁরা যাতায়াত করতেন। কুকুরগুলোও তুষার-সমাধি লাভ করেছিল। অবিরত তুষারপাতে সমগ্র গ্রামখানার মূর্ত্তি গিয়েছিল সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হয়ে। এমন কি, ঘরের মধ্যেও ছাদ থেকে তুষার-ঝালর সৃষ্টি হয়েছিল।

তারপর আগষ্ট মাসের শেষ ভাগে (২০শে আগষ্ট) আবার একদিন সুদীর্ঘ রাত্রির যবনিকা ধীরে অপসারণ ক'রে উত্তরে সূর্য্যোদয় হ'ল। অভিযাত্রিগণ উদাত্ত কণ্ঠে তার অভ্যর্থনা করলেন। আবার বাইরে পূর্ণোদ্যমে কাজকর্ম্ম চলতে লাগল। কয়েক মাসের মধ্যে আয়োজন সম্পূর্ণ হ'লে তাঁরা কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে কেউ রইলেন গ্রামে, কেউ গেলেন গ্রাম ছেড়ে শত শত মাইল দূরের পথে ভয়াবহ তুষারের মধ্য দিয়ে ছয়খানি স্লেজ নিয়ে, আর কেউ গেলেন বিমানে দক্ষিণ মেরুতে। এই শেষের দলে ছিলেন স্বয়ং এডমিরাল বার্ড। এঁদের প্রত্যেকের সঙ্গে যোগ রইল বেতারে। সুদূর যুক্ত-রাষ্ট্রের সঙ্গেও বেতারে রীতিমত কথা-বার্ত্তা চলল। কে কতদূরে গেলেন, পথের অবস্থা কেমন, উত্তাপ কতখানি ইত্যাদি নানা বার্ত্তার আদান-প্রদান চলতে লাগল।

বার্ড ঘণ্টায় প্রায় শত মাইল বেগে দীর্ঘ পথ অতিক্রম

ক'রে তুষারমণ্ডিত সু উচ্চ পর্ব্বত, তুষারাচ্ছন্ন বিশাল উপত্যকা পার হয়ে ১৯২৯ সালের ২৯শে নভেম্বর তারিখে দক্ষিণমেরুর মালভূমিতে ২৫০০ ফিট উর্দ্ধ থেকে আমেরিকার জাতীয় পতাকা নিক্ষেপ করলেন। তার সঙ্গে বাঁধা ছিল তাঁর প্রিয় বন্ধুর সমাধিস্তম্ভের একখণ্ড প্রস্তর। এঁরই সঙ্গে বীর্ড নিভৃতে বসে দক্ষিণমেরুবিজয়ের কল্পনা করেছিলেন, কর্ণেল লিণ্ডবার্গের পর এঁরই সঙ্গে বিমানে আটলান্টিক সমুদ্র পার হয়ে তিনি ফ্রান্সে উপনীত হ'ন।

মেরু অভিমুখে উড়ে যাবার পথে বীর্ডের প্লেনখানির ইঞ্জিন একবার সহসা বন্ধ হয়ে যায়, দু-বার অতিরিক্ত ভারের দরুণ নীচের দিকে নামতে থাকে। ঐ অবস্থায় একবার তাঁর মনে গভীর নৈরাশ্য এসেছিল। 'হায়! এ অভিযান বুঝি ব্যর্থ হ'ল! এই তুষারমরুতে মৃত্যু নিশ্চিত।' কিন্তু বুদ্ধিমান, ধৈর্য্যশালী ও সাহসী ব্যক্তির ললাট পরিশেষে জয়টীকায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

বীর্ড চৌদ্দমাস দক্ষিণমেরু প্রদেশে বাস করেছিলেন। সুখের বিষয়, এই সময়ের মধ্যে তাঁর অনুসঙ্গীগণের কেউ বিশেষ অসুস্থ হয়ে পড়েন নি। সকলেই সুস্থ, সবল ও কর্ম্মক্ষম ছিলেন। তবে প্রত্যাবর্ত্তনকালে ভয়ঙ্কর তুষারপাতে সকলে বিপদাপন্ন হন। কিন্তু সে সকল কথা এবং এই অভিযান সম্বন্ধে আরও নানা বিষয় এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধের অঙ্গীভূত করা গেল না। বীর্ডের দ্বিতীয় মেরু অভিযানও অনালোচিত রইল।*

* কোন কারণবশতঃ বীর্ড কর্ত্তৃক গৃহীত আলোকচিত্রগুলি মুদ্রিত করা গেল না।

ভাষা ও সাহিত্য

শ্রীশান্তা দেবী

ভাষাই সাহিত্যের বাহন, সুতরাং সাহিত্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভাষারও উন্নত ও মার্জ্জিত হওয়া প্রয়োজন। শুধু যে প্রয়োজন তাহা নয়, উন্নত সাহিত্যের একটি বিশেষ লক্ষণ সুমার্জ্জিত, সুসংবদ্ধ ও সুসমঞ্জস ভাষা। ভাষার গঠনে ও ভঙ্গীতে শ্রী না ফুটিলে সাহিত্য কখনও শ্রীমণ্ডিত হইতে পারে না।

বাংলা আমাদের মাতৃভাষা বলিয়া, অর্থাৎ বাংলা ভাষায় মা'র কোলে বসিয়া আমরা কথা বলিতে শিখিয়াছি বলিয়া, বাংলা ভাষার কোনো নিয়ম যে বাঙালীর অজানা থাকিতে পারে এ-কথা বোধ হয় আমরা বিশ্বাস করি না। তাই বাংলা ভাষাকে আয়ত্ত করিবার কোনো চেষ্টা না করিয়াই আজকাল আমরা অনেকে নির্ব্বিচারে কলম ধরিয়া বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিতে লাগিয়া গিয়াছি। স্কুলে বাংলার পরীক্ষায় যাঁহারা পাস-নম্বরও জোগাড় করিতে পারেন না, এমন অনেক বাঙালীকে আজকাল সাহিত্যিক, এমন কি সাহিত্য-সম্পাদকও হইতে দেখা যায়। এখনও যাহারা দশের জন্য কলম ধরিতে শিখে নাই, সেই বালক-বালিকাদের চোখের সম্মুখে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এই নমুনাগুলি পুস্তক পুস্তিকা ও সাময়িক পত্রের মধ্য দিয়া অষ্টপ্রহর বিরাজ করিতেছে। তাহার ফলে ইহাদের হাতে ভবিষ্যতে বাংলা সাহিত্য যে কি "জগা-খিচুড়ী" তৈয়ারী হইবে ভাবিতেই ভয় করে। আজকালকার নূতনপন্থী সাহিত্যের বাংলা শব্দ, শব্দ-যোজনা, বানান ভঙ্গী, বিদেশী শব্দ-ব্যবহার, বাক্য-রচনা (sentence তৈয়ারী) ইত্যাদির কোনো নিয়ম নাই। যে সাহিত্যিকের যেটা খেয়াল, তিনি সেইটাই চালাইতেছেন এবং সম্পাদক ও প্রকাশকেরা সুবোধ বালকের মত সকলের আব্দার মানিয়া চলিতেছেন। সাহিত্য রচনা যদি ছেলেভুলানো ব্যবসায় হইত, তাহা হইলে কাহারও বলিবার কিছু ছিল না। কিন্তু সাহিত্যিকেরা শিশু ত নহেনই, অধিকন্তু বৃদ্ধ লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকেরাও অনেকেই নিজ নিজ বিভিন্ন মতানুযায়ী বানান ও ভাষা ব্যবহার করেন।

মানুষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবসর বিনোদনের জন্য যে-সাহিত্য মাসিকপত্রাদির ভিতর দিয়া বাংলার ঘরে ঘরে ফিরিতেছে,

তাহার ভিতর সর্ব্বদা উচ্চ ভাবের গরিমা আশা করা যায় না, কিন্তু তাহার বাহ্যরূপে অর্থাৎ ভাষায় একটা চিরাচরিত শ্রীরক্ষা করিয়া চলিতে হইবে ত! দরিদ্রের কুলবধূ যখন আপনার রন্ধনশালায় উনানে আগুন দেয় কিংবা কলতলায় বাসন মাজিতে বসে, তখন সে ভদ্র পরিচ্ছন্ন ও মার্জ্জিত বেশ-ভূষার অলিখিত আইন না মানিতে পারে, কিন্তু যে-মুহূর্ত্তে প্রতিবাসীর গৃহে সে পা দিবে অমনি তাহাকে আট হাত কালিমাখা ছিন্নবাস ছাড়িয়া ধোপদস্ত দশ হাত শাড়ী পরিতেই হইবে। তেমনি আমার ধোপার হিসাবের খাতায় কিংবা মুদীর দোকানের ফর্দ্দে আমি বীণাপাণির প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ না করিলেও দশ জনের আসরে আমার বাণীকে যথোপযুক্ত সজ্জাতেই বাহির হইতে হইবে। এখানে অরাজকতা দেখাইয়া আমার স্বকৃত আইন ফলাইলে চলিবে না।

ভাষার সাজসজ্জার আইন-ভঙ্গ আজকাল নানা দিক দিয়া করা হয়। ইহার মধ্যে খুব বড় একটা উৎপাত হইতেছে, বাংলা ভাষার ঘাড়ের উপর অন্য ভাষার শব্দ চাপানো। স্বর্গীয় কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁহার কবিতায় সম্ভবতঃ প্রথম আর্বী ও ফার্সী শব্দ চালাইতে সুরু করেন। তাহার একটা প্রধান কারণ ছিল—কবিতাগুলি প্রায়ই সেই সেই ভাষা হইতেই অনূদিত; যেমন—ফার্সী কবিতার অনুবাদ—

> "সেলাম! সেলাম! আগা সাহেব হুকুম যদি হয়
> চৌকাঠে পা দিই তা' হলে নইলে পরে নয়;
> নওরোজে এই নূতন সালে হোক তোমাদের জয়।"

এক্ষেত্রে সেই দেশের অভিবাদন-প্রথা বুঝাইতে ও বিশেষ দিনটিকে স্মরণ করিতেই কবি সেলাম ও নওরোজ বলিতেছেন। নহিলে হঠাৎ বিজয়ার অভিবাদন করিতে আসিয়া যদি আমরা এইরূপে কবিতা আওড়াইতাম ত ভাষার উপর অত্যাচার করা ছাড়া কিছু হইত না।

> 'এ নির্ম্মাণ মেহেরবান প্রভুর প্রেম-চিন
> কৃপায় নীর হীরার তীর ভাস্বার দিন দিন।"

এইখানে কবিতাটি নিতান্ত সম্রাট্ সাজাহান লিখিত কবিতার অনুবাদ বলিয়াই আমরা "মেহেরবান" শব্দ সহ্য করিতেছি, নহিলে করা চলিত না। তা ছাড়া ভারতবর্ষের সহিত পারস্য ও অন্যান্য মুসলমান দেশের সম্পর্ক বহু দীর্ঘকালের এবং সেই মুসলমানেরা এ-দেশের রক্তের সহিত আপনাদের রক্ত মিশাইয়া ফেলাতে বহু আর্বী ও ফার্সী শব্দ বাঙালী মুসলমানদের ভিতর দিয়া বাংলা ভাষায় আসিয়া সঞ্চিত হইয়াছে। এই কারণে সেই সেই বিদেশী শব্দগুলিকে বাংলা ভাষার আভরণরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া যে-কোন শব্দকেই ত লওয়া চলে না। কিন্তু দেখা গেল সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদ কবিতার ভঙ্গীতে অল্পদিনের মধ্যেই বাংলার মুসলমান ও অ-মুসলমান অনেক নূতন কবি বাংলা কবিতায় যথেচ্ছা যে কোনো উর্দ্দু ও ফার্সী কথা চালাইতে লাগিলেন। বাঙালীর ধুতি চাদরের সঙ্গে পম্প-সু ও মোজা না-হয় চলিল, তাই বলিয়া শান্তিপুরী ধুতির উপর গলায় টাই এবং মাথায় সোলা হ্যাট পরিয়াও কি ভদ্র সমাজে চলিতে হইবে?

আজকালকার সাহিত্যিকেরা আবার অনায়াসে লেখেন "সিল্ক্-স্যণ সাদা আর ছোট পাণ্ডুললাট," অথবা "সম্মুখেতে দুঃস্বপ্নের মতো রুক্ষ কঠিন আকাশ পদতলে ষ্টিল নীল পারহীন গভীর সাগর।" বাঙালীর ঘরের মেয়ের মুখের তুলনা খুঁজিতে আজকাল বাঙালী সাহিত্যিককে লিখিতে হয় "মুখ ছিল ডিমের মতন, ঠোঁট ছিল পুরু, ইটালীয়ান প্রিমিটিভ ও প্রি-র্যাফে-লাইটের অদ্ভুত সংমিশ্রণ।" কবি কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথের দেশে বাংলা কবিতা ও গল্পে উপমা দিবার জন্য যদি "সিল্ক" "ষ্টীল" ও প্রি-র্যাফেলাইটের আশ্রয় লইতে হয় তাহা হইলে আমাদের এতকালের সাহিত্য-সাধনার ইতিহাস ভুলিয়া যাওয়াই ভাল। নূতনত্ব কিংবা মৌলিকত্বের জন্য যদি কেহ পুরাতন কবিদের পন্থা অনুসরণ না করিতে চান, প্রকৃতিদেবীর অক্ষয় ভাণ্ডার এবং অমরকোষের শব্দসমুদ্র তাঁহার জন্য উন্মুক্ত আছে। প্রবন্ধে অনেক ইংরেজী নাম ও শব্দ চলিলেও কাব্য ও কথা-সাহিত্যে তাহারা যে পাঠকের চোখে খোঁচা দেয় এ-কথা আমাদের ভুলিয়া গেলে চলিবে না।

আমি এইরূপ অপপ্রয়োগের তালিকা দিতে চাই না, চাই মাতা সরস্বতীকে বাংলার ঘরে বাঙালীর রত্ন-অলঙ্কারে সুসজ্জিত দেখিতে। বাস্তবিকই বাংলা কথা-সাহিত্যে যদি যখন-তখন দেখা যায় "হলে হণ্ড্রেড ক্যাণ্ডেল বল্‌ব্‌টার ষ্ট্রং লাইট ছড়িয়ে পড়েছে" কিংবা 'তার হেলিওট্রোপ রঙের ব্লাউসে সিল্কের এম্‌ব্রয়ডারী করা" তাহা হইলে সে-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ ভাবিতে হৃৎকম্প হয়। আরও দুঃখ হয় এই দেখিয়া, যে, কোন কোন খ্যাতনামা বৃদ্ধ সাহিত্যিকও নবীন সাহিত্যিকদের এই ছেলে-

খেলায় পরাস্ত হইয়া যাইবার ভয়ে অপূর্ব্ব সাহিত্য-সৃষ্টির ভিতরও এইরূপ ভেজাল চালাইয়া দিতেছেন। বাংলা কথার ভিতর ইংরেজী কথা চালাইয়া দেওয়া বাহাদুরি মনে করে আট-দশ বছরের ছেলেমেয়েরা যখন তাহারা প্রথম ইংরেজী পড়ে। "মা ভাত give" কিংবা "দিদি sit down" বলিয়া তাহারা আনন্দ পাইলেও প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ বাংলা ভাষায় সমস্ত মনোভাব প্রকাশ করিতে না পারিলে তাহা আপনার অক্ষমতা বলিয়া মনে করিবে ইহাই আমরা আশা করি। আমাদের সাহিত্যিকেরা যে "ষ্টীল, সিল্ক," ষ্ট্রং লাইট, প্রিমিটিভ ইত্যাদির অর্থ জানেন, এমন কি যথাস্থানে 'প্রি-র‍্যাফেলাইট' অথবা ফরাসীতে 'নেস-পা' পর্য্যন্ত বলিতে পারেন ইহা আমরা ত জানিই। যদি একান্তই ইহা সর্ব্বসাধারণকে ছাপার অক্ষরে জানানো প্রয়োজন হয়, তবে ইঁহারা ইংরেজীতে মাঝে মাঝে কবিতা গল্প এবং প্রবন্ধ লিখিলেই ত পারেন। দেবী বঙ্গভারতীর উপর অত্যাচার না করিলেও চলিবে, কেন-না বাংলা দেশে ইংরেজী মাসিক ত্রৈমাসিক পাক্ষিক সবই আছে।

শব্দ-চয়ন ও শব্দ-যোজনাতেও আজকাল আমাদের মধ্যে শৈথিল্য দেখা দিয়াছে। যে-কথা বাংলা ভাষায় আদৌ নাই অথবা যাহা থাকিলেও গ্রাম্যতা-দোষদুষ্ট এমন সকল শব্দ সাহিত্যের দরবারে চালানো অনেকে সাহসের ও মৌলিকতার পরিচয় মনে করেন। "মাথার চুলের ঝাঁপি" "গাল দুটি ট্যাপর ট্যাপর" "আকাশের বজ্রের মত ধমকাইল"—এই রকম কত অদ্ভুত কথাই যে আজকাল চোখে পড়ে বলা যায় না। "আকাশে ঘনায়মান মেঘের পুঞ্জ..." লিখিতে লিখিতে হঠাৎ কেহ শেষ করেন "মেঘের নাচন-লীলা চলেছে" বলিয়া।

ভাষা ও সাহিত্যের গতিও নদীর জলস্রোতের মত; তাহা চিরকাল একই খাতে প্রবাহিত হয় না। রাজা রামমোহন রায়ের বাংলা ভাষা যেরূপ ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের সময় তাহা রহিল না; আবার বঙ্কিমের ভাষা রবীন্দ্রনাথের যুগে হুবহু পাওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং আধুনিক তরুণ সাহিত্যিকেরা রবীন্দ্রনাথের মত

"জীর্ণ পুষ্পদল যথা ধ্বংস ভ্রংশ করি চতুর্দ্দিক
বাহিরায় ফল—
পুরাতন পর্ণপুট দীর্ণ করি বিকীর্ণ করিয়া
অপূর্ব্ব আকারে
তেমনি সবলে তুমি পরিপূর্ণ হয়েছ প্রকাশ
প্রণমি তোমারে।"

না লিখিয়া না-হয় লিখিতে পারেন,

"আমার কালো মেয়ের পায়ের তলায়
দেখে যা আলোর নাচন।
মায়ের রূপ দেখে দেয় বুক পেতে শিব,
যার হাতে মরণ বাঁচন।"

কিন্তু নদীর স্রোতের মতই এই লিখনভঙ্গী ও ভাষার একটা মাত্র নির্দ্দিষ্ট খাতে প্রবাহিত হওয়া স্বাভাবিক ও প্রয়োজন: নদীর মুখ ফিরিয়া যায়, গতি পরিবর্ত্তিত হয় সত্য, কিন্তু এলোমেলো ভাবে শতদিকে নদীর জল ত চলে না। দুঃখের বিষয়, বাংলা ভাষার অবস্থা আজ হইয়াছে এইরূপ। শতমুখী কথাটার অর্থ ভাল নয়, কিন্তু সেঅর্থটা ভুলিয়া আজ বাংলা ভাষাকে শতমুখী বলিলে অন্যায় হয় না।

বিদেশী-শব্দবাহুল্য এবং অন্যান্য অপপ্রয়োগের কথা ছাড়িয়া দিলে বাংলা ভাষার সাধু ও চলিত এই দুইটি রূপ আছে বলিয়া সাধারণতঃ আমাদের ধারণা হয়। কিন্তু চলিত অথবা চল্‌তি বাংলা আজ একাই এক-শ। আমাদের মত যাহারা বাল্যকালে সাধুভাষায় লেখাপড়া করিতে শিখিয়াছে এবং কথিত ভাষাও একটা মাত্র জানে, তাহারা আজ বাংলা ভাষার উন্মত্ত বন্যায় ভাসিয়া যাইবার উপক্রম করিয়াছে। চল্‌তি বাংলা ত লিখিতেই ভয় হয়, না জানি কখন কি লিখিয়া বসিব। প্রথম লিখিতে সুরু করিলে মনে হয় ক্রিয়াপদগুলি সংক্ষিপ্ত করা ছাড়া আর ত কোনো বালাই নাই, কি বা এমন কষ্ট! কিন্তু দেখা যায়, প্রথমতঃ এক ক্রিয়াই ত বহুরূপী। তাহার পর অন্য বিপদের কথা না-হয় পরে বলা যাইবে।

কয়েকটা নমুনা দেখা যাক্—

পুরাতন 'করিলাম'—এখন "করলাম, কর্‌লাম, কল্লাম, করলুম, করলেম।"

পুরাতন 'গিয়াছে'—এখন "গেচে, গেছে, গিয়েছে, গ্যাছে।"

পুরাতন 'করিতেছি'—এখন "করছি, কচ্ছি, কোরছি।"

পুরাতন 'হইল'—এখন "হ'ল, হোল, হোলো, হল।"

পুরাতন 'আসিতেছে'—এখন 'আসছে' 'আসচে'।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর বানানের একটা নির্দ্দিষ্ট ধারা পরিবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু সকলে তাহা অনভ্যাস, অনিচ্ছা অথবা স্বাতন্ত্র্যরক্ষার জন্য মানিয়া চলেন না। মুস্কিল আরও বেশী হয় যখন দেখি রবীন্দ্রনাথ

স্বয়ং শিশুপাঠ্য পুস্তকে লিখিয়াছেন "ঈশান বাবু ইঙ্গিতে ব'লেচেন," "নদীতে বন্যা নেমেচে" "জলে ছাপিয়ে গেচে" "বৃষ্টি নাম্‌লো দেখচি" আবার 'বাঁশরী' নাটিকায় লিখিয়াছেন, "সন্ন্যাসী বলছেন" "কাজের জন্য ডেকেছি," "তোমার মনটা নেমেছে—" "ভুল করেছি তোমাকে নিয়ে" ইত্যাদি। একই গল্পে আছে "মেরুদণ্ড গেল ভেঙে" আবার "শিশি ভেঙ্গে চূর্ণ হয়ে গেল।" বয়স্কদের ইহার জন্য বেশী আপত্তি করিতে দেখা যায় না, কিন্তু শিশুদের নিজেদেরই ইহাতে ঘোরতর আপত্তি দেখিয়াছি। পড়িবার সময় একটি শিশু 'গেচে' কাটিয়া 'গেছে' লিখিয়া তবে পড়ে।

সে যাহাই হউক বাংলা চল্‌তি ভাষার এই ক্রিয়া-সমস্যার শীঘ্র সমাধান হওয়া প্রয়োজন।

তো ত' ত
ধরো, ধ'রো, ধর,
নেবো, নেব, নোবো,
বলে, বোলে, ব'লে।

এই সকল অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেওয়া শক্ত।

দিল, দিলে
বল্‌ল, বল্‌লে, বল্ল—এই সব ত আছেই।

ক্রিয়া পদ ভিন্ন অন্য শব্দেরও বিভিন্ন রূপ আছে একথা হঠাৎ মনে হয় না। কিন্তু দুই-এক খানা বই খুলিলেই দেখিবেন,

সিন্দুক, সিন্ধুক
নৌকা, নৌক, নৌকো
নূতন, নোতুন, নতুন।

আমাদের চল্‌তি ভাষায় যদি আমরা "অপ্রমত্ত সত্যবোধ" "গাম্ভীর্য্যে, মর্য্যাদায় মহীয়সী" "আনন্দোজ্জ্বল কণ্ঠস্বর" ইত্যাদি লিখিতে পারি, তাহা হইলে সেই একই পংক্তিতে 'নোতুন' 'নারকোল গাছ' নাই লিখিলাম। আমরা যতই চল্‌তি ভাষার হইয়া ওকালতী করি না কেন, বাস্তবিক, কথা বলিবার সময় আমরা যে-ভাষা ব্যবহার করি দশজনের জন্য লেখনী ধারণ করিলে সেই ভাষা আমরা লিখি না। এমন বহু সংস্কৃত শব্দ আমরা সর্ব্বদা কলমের আগায় ব্যবহার করিতেছি, যাহা মুখে কখনও আমরা উচ্চারণ করি না, যদি-না নিতান্ত কোনো সভায় প্রবন্ধ কি কবিতা পাঠ করার ভার থাকে। সুতরাং আজকাল যদি আমরা চল্‌তি ভাষাতেই লিখিব ঠিক করি, তবে কেবল ক্রিয়াপদগুলি সংক্ষিপ্ত করিয়া বিশেষ্য ও বিশেষণ শব্দগুলির সাধু রূপ থাকিতে দিলে ক্ষতি কি?

অনেক সময় একই বানানের শব্দের দুইটি বিভিন্ন অর্থ ও উচ্চারণ থাকে বলিয়া আমরা তাহাদের বানান বদ্‌লাইয়া ফেলিতে চাই, যেমন—কর = হাত, করো = do। বল—শক্তি, বলো—tell। এইরূপ বানান পরিবর্ত্তনেরও বিশেষ প্রয়োজন আছে মনে হয় না। কারণ যাহার নাম নবকুমার, তাহাকে আমরা ডাকিবার বেলা ডাকি 'নবো' বলিয়া, কিন্তু লিখি 'নব'। নন্দ, ভব, অমূল্য সকলকেই আমরা ডাকি 'নন্দো' 'ভবো', 'অমূল্যো', ইত্যাদি বলিয়া, কিন্তু তাই বলিয়া লিখিত বানানে ওকারের প্রয়োজন বোধ করি না। সুতরাং ক্রিয়া বেচারীর বেলা এ বোঝা বাড়াইয়া লাভ কি? সমগ্র বাক্য অর্থাৎ sentence-এর অর্থবোধ হইলেই ত 'কর' 'বল' কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বোঝা যাইবে। দ্বিতীয়তঃ, ইংরেজী read, beat ইত্যাদি শব্দের দুই রকম অর্থে দুই রকম উচ্চারণ, বানান না বদলাইয়াও চলিয়া যাইতেছে দেখিতে পাই। tie, fly প্রভৃতি কত শব্দ ত এক বানান এবং এক উচ্চারণেও বিভিন্ন অর্থের কাজ বেশ চালাইতেছে। তবে বাংলা ভাষাতেই প্রত্যেক অর্থের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বানানের প্রয়োজন কেন হইবে?

অতিরিক্ত ওকার, যুক্তাক্ষর (বল্ল) এবং হসন্ত ব্যবহারে ভাষার বোঝা বাড়া এবং ছাপার কাজের গোলমাল বাড়া ছাড়া আর বিশেষ কিছু লাভ আছে বলিয়া মনে হয় না। আমাদের অক্ষর ও সঙ্কেতের বোঝা এখনই যথেষ্ট ভারী, এ-বিষয়ে 'প্রবাসী'তে অজয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের দীর্ঘ প্রবন্ধ পড়িলেই বুঝিবেন। এখন ইহাকে একটু হাল্কা করাই ভাল।

ক্রিয়া ভিন্ন অন্য শব্দের বিকৃত বানানের চলন আরম্ভ করিলে নানা লেখনীতে নানা রূপ দেখা যাইবে। সুতরাং যদি ক্রিয়াপদটুকু পরিবর্ত্তন করিতেই হয়, আমার মনে হয় সাহিত্য-পরিষৎ, বিশ্বভারতী, বিশ্ববিদ্যালয় এবং সংবাদপত্রের সঙ্ঘ (Journalists' Association) সকলে মিলিয়া

এক বানান ও এক উচ্চারণ পদ্ধতি প্রচলন করিলে মাতৃ-ভাষার প্রতি অনুরাগের পরিচয় দেওয়া হয়। মাসিক পত্রাদির সকল প্রবন্ধের এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পাঠ্যপুস্তকের একরূপ বানান না হইলে তাহাকে একটা সুপ্রতিষ্ঠিত ভাষা বলিতেই মানুষের লজ্জা বোধ হয়। ইংরেজী কি ফরাসী পুস্তক ও পত্রাদিতে এইরূপ বিদ্রোহী বানানের ছড়াছড়ি নাই। আমেরিকায় বানান বদল যাঁহারা করিয়াছেন, তাঁহারাও, আমার যতটা জানা আছে, একই পদ্ধতিতে পরিবর্ত্তনের কাজটা করিয়াছেন। আমাদেরই বা এ শুভবুদ্ধি না হইবার কি কারণ?

আমরা আশা করি অল্পদিনের মধ্যেই বাংলার ভাষাবিৎ ও শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণের চেষ্টায় এবং বাংলা পুস্তকাদির প্রকাশক সম্পাদক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের সহায়তায় বাংলা ভাষা একটি সুনির্দ্দিষ্ট পথে চলিবে। বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সাহিত্যের মঙ্গলের নিমিত্ত তাহার প্রয়োজন অন্য কোনো প্রয়োজন অপেক্ষা কম নহে।

পরিণয়

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

এখনও রয়েছে কিছু কাছে
দেখিলে দেখিতে পারি চোখে,
অচিরেই আসিছে সময়
চলে যাবে কোন্ দূরলোকে!
এখনও পশ্চিম নভতলে
ঝলকিছে অস্তরাগরেখা,
সুনীলে গোলাপী আভা লেগে
স্মিত সে হাসিটি যেন লেখা।
প্রান্তর প্রশান্ত প'ড়ে আছে
অন্তর-স্পন্দন গেছে থেমে,
অন্ধকারে অন্ধ করি আঁখি
ধীরে ধীরে সন্ধ্যা আসে নেমে।
আঁকাবাঁকা দূর গ্রামান্তের
ছায়াঘন তটসীমাকোলে
যেন কার দীর্ঘ বেণী খোলা
কুণ্ডলের তরঙ্গিণী দোলে।
রেখাঙ্কিত মসৃণ কোমল
ছিন্নস্তূপ শুভ্র মেঘে মেঘে
কাঁচা সেই অঙ্গ পেলবতা
এখনও রয়েছে কিছু লেগে।
দুলে ওঠে কুহেলি গুণ্ঠন
থর থর দিক্‌চক্রবালে
অশ্রুবাষ্পে আচ্ছন্ন আনন
আবরে কে বিদায় প্রাক্কালে।
ঊর্দ্ধশীর্ষ স্থির তালশ্রেণী
দাঁড়ায়ে নিরখে অপলক,
কেমনে অরণ্য পরপারে
মিলে শেষ আলোর ঝলক।

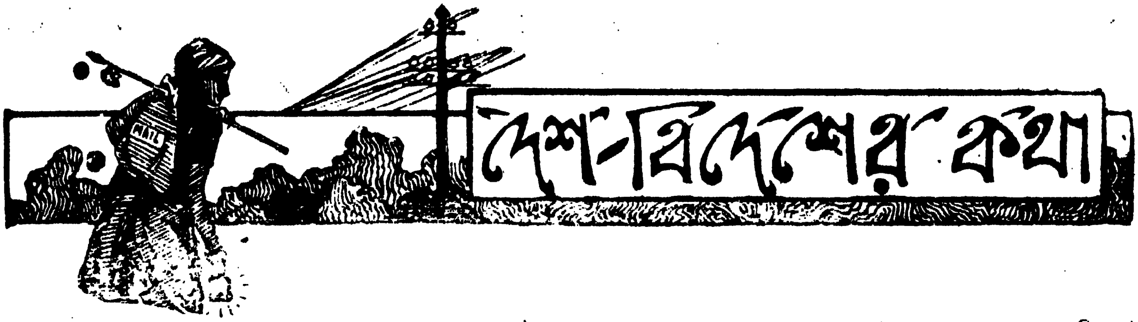
বাঁধে জল এল কালো হয়ে,
পাড়েতে অস্পষ্ট ঝোপগুলি,
কী যেন আশার ভাষা প'ড়ে
করে হোথা আকুলি ব্যাকুলি।
সে রয়েছে, রয়েছে এখনও
আরও কিছুকাল রবে কাছে,
এখনও দেখিতে চাই যদি
দেখার সুযোগও বুঝি আছে।
এ ক'টি মুহূর্ত্তে অন্য আর
যা-কিছুতে মন দিতে চাই,
মনে যে পড়িছে একই কথা,
কেমনে ভুলিব, সাধ্য নাই।—
"সে আছে, সে চলে যাবে কাল
চলে যাবে এই রাতি গেলে,"—
কী করিব, কী আছে করার
দেখে যাব দুই চক্ষু মেলে।
একটি কথাও যদি হ'ত
আধটি পলক বিনিময়,
এত ভাগ্য না-ই হ'ত, তবু
প্রাণ যাচে আর কিছু নয়,—
আছে মোরে ভুলে তাই ভাল;
জানি আমি নই স্মরণীয়,
কিন্তু সে জানিত যদি শুধু
তার স্মৃতি মোর কত প্রিয়!
ক্ষুদ্র প্রাণে এটুকুই সাধ,
এতেও কি হ'ত কারো ক্ষতি?
তাই যদি হয়, ওগো তুমি
একদিন রেখো এ মিনতি,—

একবার দেখ আঁখি মেলে
কোনো এক এমনি সন্ধ্যায়
কী ব্যথার আরতি যে ধরা
সাজাইছে রজনীগন্ধায় !
যে আলোক জোগায় দিবসে
মর্ম্মে তার সঞ্জীবনী রস
নিশার আঁধারে তারি ধ্যানে
উৎসর্গে সে বক্ষের কলস।
নীরব সে অর্ঘ্যনিবেদন,—
আশা আছে, নাই তার ভাষা,
শুভ্রদলে সুগন্ধ বিথারি
প্রকাশে গোপন ভালবাসা।
কোনোদিন তাই যদি দেখ,
দেখ যদি মর্ম্ম আঁখি দিয়ে,
বুঝিলেও বুঝিতে বা পার
আজি মোর যে-আকুতি, কী এ !
কাল তুমি যাইবেই চ'লে,
এর চেয়ে সত্য নাহি আর,
শেষ রাতি আজই শেষ রাতি !
রাত্রি বটে আসিবে আবার,—
কিন্তু আর তুমি থাকিবে না,
থাকিবে না আঁখিরও নাগালে,
হয়ত শ্রবণও নাহি পাবে,
লুকাবে চেতনা-অন্তরালে।
আর কত কী হবে না-হবে
কে বলিবে, শুনে কী বা লাভ !
ইচ্ছা ছিল শুধাব তোমারে,
থাক্ সেই শোনারই অভাব।
এখন এটুকু মাত্র জানি—
বাকী সব অজানা অচেনা,
আজ গেলে আসিবেই কাল
কাল গেলে আজ ফিরিবে না !
চলে যেয়ো, যাবেই তো চ'লে,
একটি কামনা কাঁদে চিতে,
একবার শুধু একবার
শেষের দেখাটি যদি দিতে !

যেভাবে যেমনি যেথা হোক্
খেলে যেত ঐ মুখখানি,
তারপরে মিলে যদি যাও,
বিচ্ছেদে কিছু না ভয় মানি।
মরমে মরমে গড়ি নিব
মায়া দিয়ে মোর স্বর্ণসীতা
জীবন্ত কবিতা সম তুমি
চিত্তে রবে চির-আনন্দিতা।
রে দুর্দ্দৈব, নিষ্ঠুরা নিয়তি
সে সাধে সাধিলি আজও বাদ,
থাক্ তবে, যা হ'ল তা হ'ল,
ঘৃণা করি করিতে বিবাদ।

* * *

এসেছ আঁধার নিয়ে শেষে
এস তুমি এস গো ত্রিযামা,
মৌন এ আঁধারই মোর ভাল,
রে চিত্ত, ক্রন্দন তোর থামা।
আজি হ'তে এ নিরন্ধ্র ঘোরে
মোর মাঝে ডুবে রব আমি,
দেখিব কে বঞ্চিবে আমারে,
রহিলাম বিরহেরই স্বামী।
আজিকেই সে বিবাহ মোর
সার্থক এ গোধূলি লগন,
ঐ আসে শুভ শঙ্খধ্বনি,
বিশ্ব হ'ল আনন্দে মগন।
জ্বলিল মঙ্গল দীপমালা,
ধূপগন্ধ আকাশে বাতাসে,
এ ললাটে লেপিল চন্দন
সন্ধ্যাতারা স্নিগ্ধ স্নেহোচ্ছ্বাসে।
মন্দিরে মন্দিরে শুনি সেই
বিবাহেরই বাদ্য মুখরিত,
অরুন্ধতী কীর্ত্তিকা এয়োতি
শূন্য মোর ক'রি পরিবৃত।



দেশ-বিদেশের কথা

বাংলা

বাঙালী যুবকের কৃতীত্ব—

শ্রীযুত লাবণ্যমোহন রায় জামশেদপুর টাটা টেক্‌নোলজিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউটে ধাতুদ্রব্য হইতে নানা জিনিষ তৈয়ারী করা শিক্ষা করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তি লইয়া ইংলণ্ডে ও জার্ম্মানীতে গমন



শ্রীযুত লাবণ্যমোহন রায়

করেন। তিনি সেখানে বিদ্যুৎ সহযোগে কিরূপে ইস্পাতাদি ধাতু কাটিতে হয় তাহা শিক্ষা করিয়াছেন। তিনি সেফ্‌টি ক্ষুরের ব্লেড, আলপিন, ছুঁচ ও অন্যান্য অনুরূপ নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষ প্রস্তুত করিতে পারেন। তাঁহার উদ্যম প্রশংসনীয়।

চিত্তরঞ্জন সেবা-সদনে দান—

কলিকাতার শ্রীমতী ফুলকুমারী দাসী চুণীলাল মল্লিক ও গোপাললাল মল্লিক নামে তাঁহার দুই পরলোকগত পুত্রের স্মৃতিরক্ষার্থ চিত্তরঞ্জন সেবা-সদনে চার হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

শর্করা প্রস্তুত-কার্য্যে বাঙালী—

ভারতবর্ষের নানা স্থানে শর্করা-শিল্পের উন্নতির চেষ্টা পরিলক্ষিত হইতেছে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে কলকারখানায় কিরূপে শর্করা প্রস্তুত



শ্রীযুত শৈলেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

হয় বাঙালীরা তাহা শিক্ষা করিলে অন্ন ও বেকার সমস্যার কথঞ্চিৎ সমাধান হইতে পারে। বর্দ্ধমানের শ্রীযুত শৈলেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় জার্ম্মানীর ম্যাগডেবুর্গস্থ চিনির কল প্রস্তুতকারক ক্রুপ কোম্পানীর সমুদয় কারখানায় শর্করা প্রস্তুত-কৌশল ও কলকারখানা নির্ম্মাণ ও পরিচালনা শিক্ষা করিয়াছেন।

চট্টগ্রাম কটন-মিলের ভিত্তি-প্রতিষ্ঠা উৎসব—

'প্রবাসী'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পৌরোহিত্যে

দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তা গত ১৩ই ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রাম কটন-মিলের ভিত্তিস্থাপন করেন। মাত্র দুই বৎসরের চেষ্টায় মিলের কর্ত্তৃপক্ষ শহরের উপকণ্ঠে কয়েকটি বিল্ডিংসহ এক শত পঁচিশ বিঘা জমি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। সম্প্রতি এই মিলে ১০,০০০ টেকো ও ২০০ তাঁত লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

পরলোকে যোগেশচন্দ্র ঘোষ—

গত ৩০এ জানুয়ারি যোগেশচন্দ্র ঘোষ পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি জলপাইগুড়ির অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার পিতা ৺গোপালচন্দ্র ঘোষ মহাশয় চায়ের ব্যবসায়ে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন



যোগেশচন্দ্র ঘোষ

করিয়াছিলেন। যোগেশবাবু কিছুদিন ওকালতী ব্যবসায় করিয়া পরে পিতার কার্য্যে আত্মবিনিয়োগ করেন এবং নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও প্রতিভা, কর্ম্মশীলতা ও অধ্যবসায়ের দ্বারা নিজকে ব্যবসাক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। প্রধানতঃ তাঁহারই চেষ্টায় জলপাইগুড়িতে ভারতীয় চা-কর সমিতি স্থাপিত হয়; তিনি আমরণ এই সমিতির সহ-সভাপতি ছিলেন। তাঁহারই যত্নে ও চেষ্টায় ১৯৩২ সনে অটাওয়াতে ইম্পিরিয়াল ইকনমিক কন্‌ফারেন্সে উক্ত সমিতিকে নিমন্ত্রণ করা হয়। ভারতীয় চা-কর সমিতির ভারতীয় প্রতিনিধিরূপে তিনি ভারতীয় চা-সেস্‌-কমিটিরও সভ্য ছিলেন। এক কথায়, তিনি বাঙালীকে চায়ের ব্যবসায়ে প্রধান আসনে বসাইয়াছিলেন। যে-সমস্ত ইংরেজ ব্যবসায়ী বাণিজ্যসূত্রে তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন তাঁহারা সকলে মুক্তকণ্ঠে তাঁহার কর্ম্মপটুতা ও সজ্জতার প্রশংসা করেন। ইহা ভিন্ন জলপাইগুড়ির মিউনিসিপ্যালিটি, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড ও অন্যান্য হিতকর অনুষ্ঠানের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। ঢাকা জেলায় তাঁহার নিজ গ্রামে তিনি ছেলেদের জন্য একটা উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়, মেয়েদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষালয় ও জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে চিকিৎসার জন্য দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। বঙ্গদেশের বহু প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করিয়া অভয়াশ্রম, বহুবার তাঁহার দানশীলতার পরিচয় পাইয়াছে।

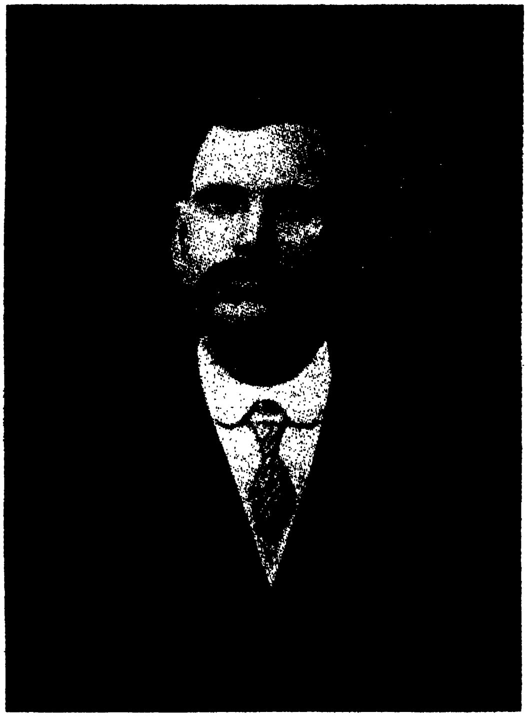
—

ভারতবর্ষ

পরলোকে ডাক্তার রঘুনাথ সিংহ—

'প্রবাসী'র পাঠকপাঠিকা ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত বেসিনের একমাত্র বাঙালী মহিলা অ্যাড্‌ভোকেট শ্রীমতী সুরভি সিংহের বিষয় অবগত আছেন। তাঁহার পিতা ডাক্তার রঘুনাথ সিংহ গত ১লা কার্ত্তিক (১৮ই অক্টোবর, ১৯৩৩) বেসিনে পরলোকগমন করিয়াছেন। নানা জনহিতকর অনুষ্ঠানের সঙ্গে যোগ থাকায় তিনি সেখানকার অধিবাসীদের শ্রদ্ধাভক্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

ডাক্তার রঘুনাথ সিংহ সূর্য্যবংশীয় রাজপুত। ইঁহার পিতামহ বাণিজ্যব্যপদেশে অযোধ্যা হইতে প্রথম বাংলা দেশে ও পরে উড়িষায় বসতি স্থাপন করেন। ব্যবসায়ে উন্নতি করিয়া তিনি সেখানে জমিদারী ক্রয় করেন। ডাক্তার রঘুনাথ সিংহ তাঁহার পুত্র নন্দলাল সিংহের দ্বিতীয়া পত্নীর সন্তান। রঘুনাথ ১৮৭০, ১০ই জুন উড়িষ্যার বায়ণাকোট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পাঁচ বৎসর বয়সে তাঁহার



ডাক্তার রঘুনাথ সিংহ

পিতৃবিয়োগ হয়। বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃদ্বয় তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করায় তাঁহার মাতা শ্রীমতী চম্পা বাঈ জমিদারীর ন্যায্য অংশের দাবি ছাড়িয়া দিয়া পুত্রকন্যা সহ কটকে আগমন করেন।

শৈশবে রঘুনাথ কিছুকাল 'সঙ্গৎ' স্কুলে ও পরে 'কন্‌ভার্ট' স্কুলে বিদ্যাভ্যাস করেন। কটকের টাউন স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৮৭ সনে উড়িষ্যা মেডিক্যাল স্কুলে ভর্ত্তি হন। নানারকম দারিদ্র্যের মধ্যেও যত্নসহকারে অধ্যয়ন করিয়া তিনি সম্মানের সহিত শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। মেডিক্যাল স্কুলে অধ্যয়ন কালে ১৮৮৮ সনে তিনি ব্রাহ্মসমাজে দীক্ষিত হইয়াছিলেন।

রঘুনাথ ১৮৯০ সনে কটকে ডাক্তারি ব্যবসা আরম্ভ করেন। পর বৎসর ব্রহ্ম সরকারের অধীনে চাকরি লইয়া তথায় গমন করেন। ১৯০৭ সন পর্যান্ত সরকারী কার্য্যে লিপ্ত থাকিলেও ইহার পূর্ব্বে এবং পরে তিনি স্বাধীনভাবে ঔষধ-তৈরি বিষয়ে নানা গবেষণা করিয়াছিলেন। ফলে তিনি দাদ, ম্যালেরিয়া, কলেরা প্রভৃতি বিনাশক নানা ঔষধ আবিষ্কার করেন। ইহা দ্বারা বর্ত্তমানে বহু লোক উপকৃত হইতেছে। পরবর্ত্তী জীবনে স্বাধীন ব্যবসা করিয়া তিনি বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

রঘুনাথ ১৯২৮ সনে বেসিন মিউনিসিপ্যালিটির সদস্য নির্ব্বাচিত হন। রেড ক্রস্ সোসাইটি ও সেণ্ট জন এ্যাম্বুলেন্স ব্রিগেডেরও তিনি সভ্য ছিলেন।

নৌচালন-বিদ্যা শিক্ষায় বাঙালী বালক—

ভারতবর্ষে একটি বাণিজ্য নৌবহর আছে। ইংরেজীতে ইহার নাম "Indian Mercantile Marine." নৌচালন-বিদ্যা শিক্ষা দিবার



শ্রীশিশিরকুমার মৌলিক

জন্য প্রতিবৎসর কয়েকজন ভারতীয় বালককে শিক্ষানবিশী হিসাবে নৌবহরে লওয়া হয়। এ-বৎসর 'ডাফরিন' নামক জাহাজে ইহা শিখাইবার জন্য তেত্রিশটি বালককে নির্ব্বাচিত করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে বাঙালী মাত্র একজন, নাম—শ্রীশিশিরকুমার মৌলিক। শিশিরকুমার লাহোর সনাতন-ধর্ম্ম কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুত প্রফুল্লনাথ মৌলিকের জ্যেষ্ঠপুত্র। নৌবহর-বিভাগে বাঙালী বালক যাহাতে অধিক-সংখ্যক প্রবেশ করিতে পারে সে-বিষয়ে প্রত্যেক বাঙালী পিতা মাতা ও অভিভাবকের অবহিত হওয়া উচিত।

প্রবাসী কৃতী বাঙালী ছাত্র—

শ্রীযুক্ত হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় (B. C. E., M. R. San, I., A. M. Inst. I. M.& Cy. E. A. M. I. San. Grad. I, Struct, E. etc.) পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন গুণী ও কৃতী ছাত্র। ইনি তথাকার বি-সি-ই পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া 'প্রিন্স অফ ওয়েলস্ স্কলারশিপ' নামক ৩০০০ টাকার বৃত্তি লাভ করেন, ও বৎসরাধিক কাল পূর্ব্বে শিক্ষা সম্পূর্ণ করিবার জন্য ইংলণ্ড যাত্রা করেন। এই অল্পকাল মধ্যেই তিনি উপরিলিখিত এতগুলি উপাধি লাভ করিয়াছেন। ইহা তাঁহার প্রতিভা ও বিদ্যানুরাগের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ইহার পূর্ব্বে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ছাত্রই আই-সী-ই ও বী-সী-ই উভয় পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার



শ্রীযুত হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়

করিতে পারেন নাই, 'A. M. Inst. I. M. & Cy. E.' উপাধি লাভ করিতে অথবা টেষ্টামুর (Testamur) পরীক্ষাও দিতে পারেন নাই। হরিহরবাবু এই শেষোক্ত কঠিন পরীক্ষার চারিটি বিভাগে পরীক্ষিত হইয়াছিলেন এবং সবগুলিতেই কৃতকার্য্য হইয়াছেন। এসেক্সের ডাগেনহাম আর্ব্বান ডিষ্ট্রিক্ট কৌন্সিলে এঞ্জিনিয়ার ও সার্ভেয়ার ডিপার্টমেণ্ট হইতে ইহার পূর্ব্বে অপর কোন ভারতীয় এঞ্জিনিয়ার উত্তীর্ণ হন নাই।

ঐ কৌন্সিলের অন্যতম সহকারী এঞ্জিনিয়ার রূপে কিছুকাল কার্য্য করিয়া হরিহরবাবু কার্য্যগত শিক্ষা (Practical Training) লাভ করিয়া আসিয়াছেন। একাধারে নির্ম্মাণ ও স্বাস্থ্যবিষয়ক এবং যান্ত্রিক এঞ্জিনিয়ারিং (Structural Sanitary ও Mechanical Engineering) প্রভৃতি ডিপ্লোমাতে ভূষিত হওয়াতে ইঁহার বিশেষ কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে।

অভিধানের জন্য পাঁচ লক্ষ টাকা দান—

গুজরাটী সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি দেওয়ান বাহাদুর কৃষ্ণলাল এম্ ঝাভেরী প্রকাশ করিয়াছেন যে, গোয়ালের মহারাজা স্যর ভগবান সিংজী পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি সুবৃহৎ গুজরাটী অভিধান সঙ্কলনের উদ্যোগ করিয়াছেন।

গোরখপুর প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলন—

গোরখপুরে প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশনে যাঁহারা অভ্যর্থনা সমিতির কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের ফোটোগ্রাফ বিলম্বে হস্তগত হওয়ায় গত সংখ্যায় মুদ্রিত হয় নাই, বর্ত্তমান সংখ্যায় মুদ্রিত হইতেছে।



১। শ্রীযুক্ত দিবাকর মুখোপাধ্যায়, এম্‌-এ (অ্যাকাউন্টেন্ট,) সহকারী সম্পাদক; ২। শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, (অ্যাসিষ্টাণ্ট অডিটার), কোষাধ্যক্ষ; ৩। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম-এ, বি-এস্‌সি (অধ্যাপক), সভাপতিস্থানীয় (ভাইস প্রেসিডেণ্ট): ৪। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন কর, এম্‌-এ, বি-এল্‌, কাব্যতীর্থ (অধ্যাপক), সহকারী সম্পাদক: ৫। শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি-এ (অ্যাসিষ্টাণ্ট অডিটর) সহকারী সম্পাদক: ৬। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এম্‌-এস্‌সি (অধ্যাপক), সম্পাদক ও সর্ব্বধুরন্ধর; ৭। শ্রীযুক্ত শৌরীন্দ্রমোহন সেন, বি-এ, এল-এল-বি (উকীল), সহকারী সভাপতি ও কর্ম্মনিয়ন্তা; ৮। শ্রীযুক্ত অমূল্যরত্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, (ডাক্তার), সহকারী সভাপতি ও মহানসাধিপতি।

মীরাট দুর্গাবাড়ি বালিকা-বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণ—

১৯৩১ সনের সেন্সস অনুসারে মীরাট জেলার মোট বাঙালী অধিবাসীর সংখ্যা ৭১৪—পুরুষ ৩৭০, স্ত্রীলোক ৩৪৪. শহরে কত জানি না। এই অল্পসংখ্যক লোকদের একটি বালিকা-বিদ্যালয় আছে, তাহার ছাত্রীসংখ্যা ১২৯। মীরাটনিবাসী বাঙালীদের বালিকাশিক্ষানুরাগ প্রশংসনীয়। বঙ্গের বাহিরে অন্য যে-সব জায়গায় ঐরূপ অল্পসংখ্যক বাঙালী থাকেন, তাঁহারাও চেষ্টিত হইলে এক একটি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালন করিতে পারেন। দিল্লীর "ন্যাশন্যাল কল্" নামক দৈনিকে দেখিলাম, সম্প্রতি এই বালিকা-বিদ্যালয়টির ছাত্রীদের পুরস্কার বিতরণ হইয়া গিয়াছে। সাধারণ পারদর্শিতা ছাড়া, সৎব্যবহার, সেবা, পরিচ্ছন্নতা ও সংগীতের জন্য চারিটি পদক দেওয়া হয়। ছাত্রীরা যে গান আবৃত্তি ও রবীন্দ্রনাথের "নটীর পূজা"র অভিনয় করিয়াছিল এবং বেহালা বাজাইয়াছিল, তাহা প্রশংসিত হইয়াছিল। মিষ্টান্ন খাইবার জন্য ছাত্রীদিগকে মীরাটের একজন হিন্দুস্থানী প্রধান উকীল পণ্ডিত প্যারেলাল শর্ম্মা দশ টাকা দিয়াছিলেন। তাহারা সেই দশ টাকা ও নিজেরা চাঁদা তুলিয়া ৬৫ টাকা ভূমিকম্পে বিপন্ন লোকদের সাহায্যার্থ দিয়াছে। প্রাদেশিক গবন্মেণ্ট এই বিদ্যালয়ে মাসিক ১৭৬ টাকা সাহায্য দেন এবং ইহাতে সমুদয় শিক্ষা বাংলা ভাষায় দিবার অনুমতি দিয়াছেন। আগ্রা-অযোধ্যা গবন্মেণ্টের এই ব্যবহার প্রশংসনীয়। বিদ্যালয়টি ১৯২৮ সনে স্থাপিত হয়। পরিচালক কমিটি এবং শিক্ষয়িত্রীগণের দক্ষতায় ইহার ক্রমিক উন্নতি হইতেছে।



"নটীর পূজা"র ভূমিকায় মীরাট দুর্গাবাড়ি বালিকা-বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ।

পিছনে দাঁড়াইয়া প্রথম সারিতে বাঁ-দিক হইতে—

শ্রীমতী সন্ধ্যা দেবী—রক্ষিণী; শ্রীমতী সুষমা মিত্র—রক্ষিণী; শ্রীমতী মেনকা দেবী—অনুচরী; শ্রীমতী মীরা চক্রবর্ত্তী—রক্ষিণী; শ্রীহেনা দেবী—রক্ষিণী।

দ্বিতীয় সারিতে দাঁড়াইয়া বাঁ-দিক হইতে—

শ্রীমতী উর্ম্মিলা বিশ্বাস—বাসবী; শ্রীমতী অশোকা মিত্র—রাজকন্যা; শ্রীমতী অনুপমা নিয়োগী—রাজকন্যা; শ্রীমতী সুষমা ঘোষ—মল্লিকা; শ্রীমতী আনন্দময়ী বসুমল্লিক—রাজকন্যা; শ্রীমতী উমা মৈত্র—রাজকন্যা; শ্রীমতী মানসী দেবী—রত্নাবলী।

চেয়ারে বসিয়া বাঁ-দিকে—

শ্রীমতী ভ্রমরী দেবী—লোকেশ্বরী; শ্রীমতী অমিতা দেবী—উৎপলপর্ণা।

নীচে বসিয়া বাঁ-দিক হইতে—

শ্রীমতী গীতা দেবী—রাজকিঙ্করী; শ্রীমতী মীরা চট্টোপাধ্যায়—সাহায্যকারিণী; শ্রীমতী লীলা বিশ্বাস—মালতী; শ্রীমতী নীহারকণা গুপ্ত—শ্রীমতী; শ্রীমতী অণিমাদেবী—তন্ত্রধারক; শ্রীমতী গৌরী সেনগুপ্ত ও শ্রীমতী প্রীতিময়ী দেবী—রাজকিঙ্করী।

কাশী আরতি সাহিত্য সম্মিলনী—

প্রায় দেড় বৎসর হইল কতিপয় বিদ্যোৎসাহী তরুণ যুবকের প্রচেষ্টায় কাশী বাঙ্গালীটোলায় 'কাশী আরতি সাহিত্য সম্মিলনী' নামে একটি সাহিত্য-সংসৎ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যাহাতে বাংলাসাহিত্য-চর্চ্চা দ্বারা যুবকদের মধ্যে সাহিত্যপ্রীতি ও দেশাত্মবোধ জাগিয়া উঠে এবং তরুণগণ সাহিত্য রচনা অনুশীলন করিয়া মাতৃভাষার সেবা করিতে পারেন, ইহাই 'সাহিত্য-সম্মিলনী'র মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রতি রবিবারে এই সম্মিলনীর একটি অধিবেশন হয়, তাহাতে আবৃত্তি, সঙ্গীত, প্রবন্ধ-পাঠ, সমালোচনা ও বক্তৃতাদি হইয়া থাকে। ইতিমধ্যে প্রায় এক শত যুবক ও বিশ জন মহিলা ইহার সভ্য হইয়াছেন। অনেক প্রবীণ সাহিত্যিকও সভায় যোগদান করিয়া তরুণদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করেন। তন্মধ্যে খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন সিংহ, অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, অধ্যাপক রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র রায়, কবি শ্রীযুক্ত কিরণচাঁদ দরবেশ, শ্রীযুক্তা শৈলবালা ঘোষজায়া, শ্রীযুক্তা পূর্ণশশী দেবী, শ্রীযুক্তা নিস্তারিণী দেবী সরস্বতী, শ্রীযুক্তা মনোরমা দেবী সরস্বতী, শ্রীযুক্তা উমাশশী দেবী, শ্রীযুক্তা বেলা দেবী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এই সম্মিলনী হইতে একখানা হস্তলিখিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়, তাহাতে অনেক তরুণ ও প্রবীণের প্রবন্ধাদি ও চিত্র প্রকাশিত হয়। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার সম্পাদক ও শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বিশী ইহার সহকারী সম্পাদক।

গত ৬ই মাঘ সরস্বতী পূজার দিন এই সম্মিলনীর সাম্বৎসরিক উৎসব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তাঁহার একটি পদ্য-গল্প ও অনেক লেখক-লেখিকার প্রবন্ধাদি পঠিত হয়। আবৃত্তি, হাস্য-কৌতুক, সঙ্গীত নৃত্য, বাদ্যাদি দ্বারা সভায় সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। অনেক লেখক-লেখিকা ও নিমন্ত্রিত ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার স্বভাবসুলভ কৌতুক রস-মধুর একটি অভিভাষণ পাঠ করেন এবং পরিশেষে 'সাহিত্য' সম্বন্ধে খুব সংক্ষেপে সুন্দর ভাবে পড়িয়া শুনান।

শিশুকল্যাণ-সমিতি, রেঙ্গুন—

গত ১৯৩২ সনের জুলাই মাসে রেঙ্গুনে শিশুকল্যাণ-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। তদবধি বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী বালক-বালিকারা ইহাতে যোগদান করিতেছে। সমিতির কার্য্যাবলী ত্রয়োদশ বা চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়সের অনধিক বালক-বালিকাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। নির্দ্দোষ আমোদ-প্রমোদ এবং ক্রীড়া-কৌতুকের ভিতর দিয়া বালক-বালিকাদিগের দৈহিক, মানসিক



"হরিশ্চন্দ্র" অভিনয়ে যাহারা প্রধান প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিল—
১। কুমারী মলিনা দাস (হরিশ্চন্দ্র); ২। কুমারী অনুভা দত্ত (বিশ্বামিত্র); ৩। কুমারী প্রতিমামন্নী চৌধুরী (শৈব্যা);
৪। কুমারী স্মৃতিকণা দাস (রোহিতাশ্ব); ৫। কুমারী আরতি ঘোষ; ৬। কুমারী জ্যোতির্ম্ময়ী ঘোষ (রোহিতাশ্বের সঙ্গী বালকদ্বয়)



বাল্মীকি প্রতিভা" অভিনয়ে বাল্মীকি ও দস্যুগণ :—১। কুমারী জ্যোতির্ম্ময়ী ঘোষ (বাল্মীকি) ২। শ্রীমান্ বিভূতিভূষণ চন্দ (প্রথম দস্যু) ৩। শ্রীমান্ ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ (দ্বিতীয় দস্যু) ৪। শ্রীমান্ ভবানীশঙ্কর ঘোষ (তৃতীয় দস্যু) ৫। শ্রীমান্ শ্রীপতিভূষণ চন্দ ৬। শ্রীমান্ অজয়শঙ্কর ঘোষ ৭। শ্রীমান্ নৃপতিভূষণ চন্দ (অন্যান্য দস্যুগণ)।



"বাল্মীকি প্রতিভা" অভিনয়ে বনদেবীগণ :—বামদিক হইতে। কুমারী রত্ন চৌধুরী, কুমারী স্বর্ণ সিংহ, কুমারী প্রীতি খাস্তগীর, কুমারী বিভা দত্ত, কুমারী প্রতিমাময়ী চৌধুরী, কুমারী আভা দত্ত, কুমারী স্বর্ণ চৌধুরী ও কুমারী জ্যোৎস্না দেবী।

ও নৈতিক চরিত্র গঠন এই সমিতির উদ্দেশ্য। বালক-বালিকাদের পিতামাতা বা অভিভাবকেরা সমিতির শুভানুধ্যায়ী ও উপদেষ্টা। তাঁহাদের পরামর্শ ও অনুমত্যনুসারে সমিতির বালক-বালিকাদের কার্য্য পরিচালিত হয়।

গত ২২এ অগ্রহায়ণ শিশুকল্যাণ-সমিতির সাহায্যকল্পে সমিতির বালক-বালিকাদের দ্বারা রবীন্দ্রনাথের "বাল্মীকি প্রতিভা" এবং সজীব মূকাভিনয়ে "হরিশ্চন্দ্র" অভিনীত হইয়াছিল। অভিনেতা ও অভিনেত্রীর বেশে বালক-বালিকাদের চিত্র এখানে দেওয়া হইল।

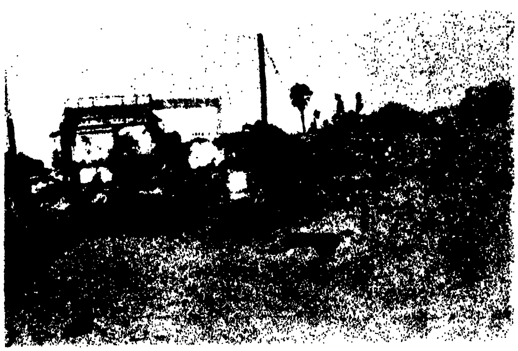


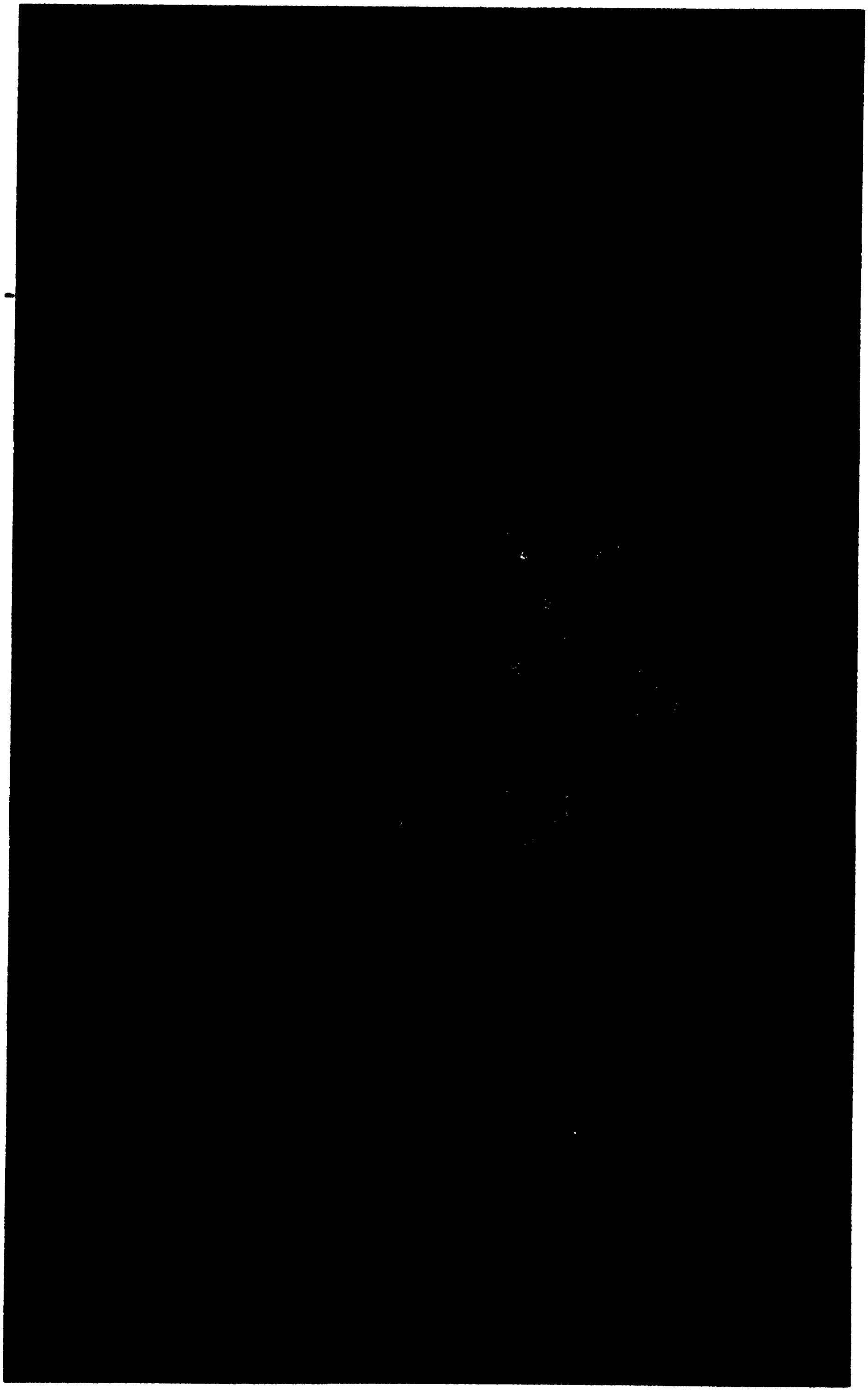
"বাল্মীকি প্রতিভা" অভিনয়ে লক্ষ্মী ও সরস্বতী
১। লক্ষ্মী—কুমারী রমলা কুণ্ডু, ২। সরস্বতী—কুমারী আরতি ঘোষ

ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত চকবাজার, মুঙ্গের
শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র ধর কর্তৃক গৃহীত ফোটো









নদী-সৈকতে

শ্রীরবীন্দ্রনাথ দত্ত

প্রবাসী প্রেস কলিকাতা

মহিলা-সংবাদ

কলিকাতার চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে একটি নূতন অস্ত্রোপচার-বিভাগ (সার্জ্জিক্যাল ওআর্ড) খোলা হইয়াছে। কলিকাতা-নিবাসিনী ডাক্তার কুমারী সরোজিনী দত্তের প্রভূত দানে ইহা সম্ভবপর হইয়াছে। গত তেইশ বৎসর চিকিৎসা করিয়া তিনি যাহা উপার্জ্জন করিয়াছেন, তাহা এই মহৎ কার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছে। তিনি ৭৫,০০০ টাকা মূল্যে জমী কিনিয়া ও লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করিয়া চিত্তরঞ্জন এভিনিউ-এর উপর একটি অট্টালিকা নির্ম্মাণ করান। তাহার মাসিক আয় বার শত টাকা। এই বাটী ট্রাস্টিদের হাতে অর্পিত হইয়াছে। তাঁহার মৃত্যুর পর ইহা চিত্তরঞ্জন সেবাসদনের হাতে যাইবে ও ইহার সমুদয় আয় সেবাসদনের নূতন অস্ত্রোপচার-বিভাগের জন্য ব্যয়িত হইবে। কুমারী সরোজিনী দত্ত যতদিন বাঁচিয়া থাকিবেন, ততদিন ঐ বিভাগের ব্যয় নিজে নির্ব্বাহ করিবেন। উহার অস্ত্রাদি সরঞ্জাম তিনি নিজের ব্যয়ে দান করিয়াছেন।

শ্রীমতী সুপ্রভা ঘোষ কৃতিত্বের সহিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তিনি শরীরবিজ্ঞানে (ফিজিওলজীতে) বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন এবং রোগনিরূপণ-বিদ্যায় (প্যাথলজীতে) সসম্মানে (অনার্স্‌সহ) উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। ইঁহার অন্য ভগিনী ডাঃ সুবর্ণা ঘোষের কৃতিত্বের সংবাদ পৌষের 'প্রবাসী'তে দেওয়া হইয়াছে। ইঁহাদের অপর ভগিনীও চিকিৎসা-বিদ্যা শিখিতেছেন।

জেনিভার লীগ অব নেশ্যন্সের অন্তর্জ্জাতিক শ্রম সম্বন্ধীয় বিভাগের অন্যতম কর্ম্মচারী ডক্টর রজনীকান্ত দাসের পত্নী শ্রীমতী সোনিয়া দাস পরীক্ষার্থ মৌলিক গবেষণা-মূলক সন্দর্ভ প্রদান করিয়া সসম্মান উল্লেখ সহ ("with honorable mention") প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর উপাধি লাভ করিয়াছেন।

এ-বৎসর কুমারী রজনীপ্রভা দাস কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম্‌-বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইনি আসামের প্রথম মহিলা ডাক্তার।

১৯৩৩ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৯ জন মহিলা এম-এ, ১ জন এম্‌-এস্‌সি, ৮৫ জন বি-এ, ৭ জন বি-এস্‌সি, ১৫ জন বি-টি এবং ৪ জন এম্‌-বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

এবার শীতকালে কলিকাতার কয়েকটি চিত্রপ্রদর্শনীতে অনেক মহিলার আঁকা ছবি প্রশংসিত হইয়াছে; তাঁহাদের সকলের নাম পাই নাই, কয়েক জনের দিতেছি :—রমা বসু, প্রভাময়ী মিত্র, সুধা দাসগুপ্তা, সুকুমারী দেবী, অণুকণা দাসগুপ্তা, সুনয়নী দেবী, হাসিরাশি দেবী, নিবেদিতা ঘোষ, চিত্রনিভা চৌধুরী, প্রভাননিনী বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্ম্মলনলিনী সাহা, ইলা মজুমদার, শৈলবালা ভট্টাচার্য্য, মীরা আম্বকত, অনুপমা ঘোষ, শান্তি রায়, পারুল ঘোষ, অরুণা দত্ত, সম্প্রীতি দেবী, নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী, এম্‌-এ, আর্য্যাস্থান ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর অন্যতম পরিচালক (ডিরেক্টর) হইয়াছেন।

কলিকাতা বধির-মূক শিক্ষালয়ে বধিরমূক বালক-বালিকাদিগকে শিক্ষা দিবার বিদ্যা শিখিয়া বিভূবালা মিত্র, মাত্রী সেনগুপ্ত, জগশোভা ভট্টাচার্য্য, ডি. কে. রাহুল্লা, সুহাসিনী দেবী, ও এ. এন. শাহ্‌ বধিরমূক বালক-বালিকাদিগকে শিক্ষাদানের কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছেন। এই শিক্ষয়িত্রীদের অধিকাংশ বধিরমূক।

কলিকাতায় ছাত্রছাত্রীদের রামমোহন রায় শতবার্ষিক প্রদর্শনীতে পঞ্চদশবর্ষীয়া কুমারী অরুণা বন্দ্যোপাধ্যায় এগার ঘোড়ার শক্তিবিশিষ্ট একটা মোটর গাড়ীর ঘণ্টায় ষাট মাইল গতির বেগ রোধ করিয়া অসাধারণ দৈহিক বল ও কৌশল প্রদর্শন করেন।

ফাল্গুনের 'প্রবাসী'র ৬৮৮ পৃষ্ঠায় গোরখপুরে প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের বৃত্তান্তে লিখিত হইয়াছে, যে, শ্রীমতী সুজাতা দেবী মহিলা-বিভাগের অভ্যর্থনা সমিতির নেত্রীরূপে তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। ইহা ভুল। শ্রীমতী সুজাতা দেবী মহিলা-বিভাগের সম্পাদিকা ছিলেন। মহিলা-অভ্যর্থনা-সমিতির নেত্রী ছিলেন শ্রীমতী মৃণালিনী দেবী চৌধুরাণী, এবং তিনিই নিজের অভিভাষণ পাঠ করেন।

পুস্তক পরিচয়

বঙ্গীয় শব্দকোষ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' নামে যে বৃহৎ অভিধান বিশ্বভারতী হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে তাহার পদ্ধতি সমগ্রভাবে বঙ্গভাষার উপযুক্ত। বিশ-পঁচিশ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে-সকল অভিধান রচিত হইয়াছে তাহাতে বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দেরই বাহুল্য আছে, কদাচিৎ দু-চারটি 'দেশজ' শব্দ পাওয়া যায়। এই সকল অভিধানে যে-অভাব আছে তাহা পূরণের নিমিত্ত শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি 'বাঙ্গালা শব্দকোষ' নামে সংস্কৃত-নিরপেক্ষ অভিধান প্রকাশ করেন। তাহার পর একাধিক ব্যক্তি বঙ্গভাষার প্রকৃতির অনুকূল অভিধান রচনার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু কেহই শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ন্যায় বিরাট কোষগ্রন্থ সঙ্কলনের প্রয়াস করেন নাই। 'বঙ্গীয় শব্দকোষে' প্রাচীন ও আধুনিক সংস্কৃতের শব্দ (তদ্ভব দেশজ বৈদেশিক প্রভৃতি) প্রচুর আছে। কিন্তু সঙ্কলয়িতার পক্ষপাত নাই, তিনি বাংলা ভাষায় প্রচলিত ও প্রয়োগযোগ্য বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দের সংগ্রহে ও বিবৃতিতে কিছুমাত্র কার্পণ্য করেন নাই। যেমন সংস্কৃত শব্দের ব্যুৎপত্তি দিয়াছেন, তেমনি অ-সংস্কৃত শব্দের উৎপত্তি যথাসম্ভব দেখাইয়াছেন। এই সমদর্শিতার ফলে তাঁহার গ্রন্থ যেমন মুখ্যতঃ বাংলা সাহিত্যের প্রয়োজন-সাধক হইয়াছে, তেমনি গৌণতঃ সংস্কৃতসাহিত্য-চর্চ্চারও সহায়ক হইয়াছে।

এ-কালে দু-চার জন সখ করিয়া সংস্কৃত রচনা করিলেও সাধারণে সংস্কৃত ভাষায় বক্তব্য প্রকাশ করে না। এই হিসাবে সংস্কৃত মৃত ভাষা, কিন্তু গ্রীক্ লাটিনের তুল্য মৃত নয়। সংস্কৃত বিশেষ্য বিশেষণ শব্দ মোটেই মরে নাই, এখনও তাহাদের যোগে নূতন শব্দ রচিত হইতেছে। ভাগ্যবতী বঙ্গভাষা সংস্কৃত শব্দের অক্ষয় ভাণ্ডারের উত্তরাধিকারিণী এবং এই বিপুল সম্পদ ভোগ করিবার সামর্থ্যও বঙ্গভাষার প্রকৃতিগত। আমাদের ভাষা যতই স্বাধীন স্বচ্ছন্দ হউক, খাঁটি বাংলা শব্দের যতই বৈচিত্র্য ও ব্যঞ্জনাশক্তি থাকুক, বাংলা ভাষার লেখককে পদে পদে সংস্কৃত ভাষার শরণ লইতে হয়। কেবল নূতন শব্দের প্রয়োজনে নয়, সুপ্রচলিত শব্দের অর্থ প্রসার করিবার নিমিত্তও। অতএব বাংলা অভিধানে যত বেশী সংস্কৃত শব্দের বিবৃতি পাওয়া যায় ততই বাংলা সাহিত্যের উপকার। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই মহোপকার করিয়াছেন। তিনি সংস্কৃত শব্দের বাংলা প্রয়োগ দেখাইয়াই ক্ষান্ত হন নাই। সংস্কৃত সাহিত্য হইতে রাশি রাশি প্রয়োগের দৃষ্টান্ত আহরণ করিয়াছেন। এই বিশাল কোষগ্রন্থে যে শব্দসম্ভার ও অর্থবৈচিত্র্যের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহাতে কেবল বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যের চর্চ্চা সুগম হইবে এমন নয়, ভবিষ্যৎ সাহিত্যও সমৃদ্ধি লাভ করিবে।

শ্রীরাজশেখর বসু

উজীর আল্-মন্‌সুর—মৌলভী আবদুল কাদের, বি-এ, প্রণীত। ৮১ পৃষ্ঠা, মূল্য দশ আনা।

দশম শতাব্দীতে স্পেনে মুসলমান রাজ্যের প্রসিদ্ধ উজীরের জীবনী এই গ্রন্থে সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। লেখক Dozy, Lane Poole প্রভৃতির গ্রন্থ আশ্রয় করিয়া এই পুস্তিকাখানি লিখিয়াছেন। স্পেনে মুসলমানদের কীর্ত্তি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। কিন্তু সে-সব বৃত্তান্ত পড়িতে পড়িতে একটা জিনিষ হয়ত অনেক পাঠকেরই চোখে ঠেকিবে যে, তখনকার সময়ে সে-দেশে রাজনীতিক্ষেত্রে মানুষের প্রাণ শিশুর ক্রীড়নকের মত ব্যবহৃত হইত। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থেও প্রায় প্রতি পৃষ্ঠায় এক বার করিয়া হত্যা বা হত্যার চেষ্টার কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। যথা, পৃষ্ঠা—১৭, ২৭, ৩৫, ৩৭, ৪৫, ৫৬, ইত্যাদি। তা ছাড়া যুদ্ধে লোকক্ষয় ত আছেই।

তবে বর্ত্তমান গ্রন্থের লেখক কোন ঐতিহাসিক সত্যেরই অপলাপ করেন নাই এবং তাঁহার উপসংহার হইতেও বুঝা যায় যে, তিনি তখনকার নৈতিক অবস্থার প্রশংসা করিতেও প্রস্তুত নহেন (৮১ পৃঃ)। ইতিহাস-লেখকের পক্ষে ইহা অত্যন্ত শ্লাঘনীয়, সন্দেহ নাই।

দুই-এক জায়গায় লেখকের ভাষা একটু ইংরেজী-ঘেঁষা হইয়া গিয়াছে,—যেমন গ্রন্থের বিশেষণ 'বিপজ্জনক' ইত্যাদির প্রয়োগ (২৭ পৃঃ)। তবে, মোটের উপর ইঁহার ভাষা প্রাঞ্জল ও সুখপাঠ্য।

স্পেনে মুসলমান কীর্ত্তির প্রতি যাঁদের শ্রদ্ধা আছে, তাঁরা এই গ্রন্থ পড়িয়া সুখী হইবেন।

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

রাজর্ষি রামমোহন—শ্রীশরৎকুমার রায়। প্রকাশক, রায় এণ্ড কোং, ২২০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য বার আনা। ১১২ পৃষ্ঠা পরিমিত। কয়েকখানি ছবি আছে।

লেখক রামমোহন রায় সম্বন্ধীয় পূর্ব্বপ্রকাশিত বাংলা ও ইংরেজী কয়েকখানি পুস্তক অবলম্বন করিয়া এই বহি লিখিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার নূতন কোন গবেষণা নাই। ইহার রচনা ভাল। পাঠকেরা ইহা পড়িয়া প্রীত ও উপকৃত হইবেন। ইহা সুমুদ্রিত।

শরীরগঠন—শ্রীপ্রফুল্লরঞ্জন সেনগুপ্ত। প্রকাশক শ্রীকুমুদনাথ ভট্টাচার্য্য, সিটি পাব্লিশিং হাউস, শিলচর। মূল্য এক টাকা।

শরীর সুস্থ ও সবল রাখা যে একান্ত কর্ত্তব্য, লেখক তাহা নির্দ্দেশ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। নৈতিক ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় যে-সব নিয়ম পালন করিলে এবং যে প্রকার ব্যায়াম করিলে শরীর সুস্থ, সবল ও সুগঠিত হইতে পারে, তিনি তাহাও সরল ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। ব্যায়ামগুলির যে-সব সুমুদ্রিত ছবি দিয়াছেন, তাহা দেখিয়া বালক ও যুবকেরা ব্যায়াম করিতে পারিবেন। এই বইখানি পড়িলে এবং ইহার উপদেশ অনুসারে কাজ করিলে বালক ও যুবকদের উপকার হইবে। ইহার কাগজ, ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর।

বিশ্বকোষ—সচিত্র ও সহমানচিত্র। দ্বিতীয় সংস্করণ। প্রথম ভাগ, প্রথম সংখ্যা। বঙ্গের প্রখ্যাতনামা সাহিত্যিকবৃন্দের সহযোগিতায় প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু সিদ্ধান্তবারিধি

তত্ত্বচিন্তামণি কর্তৃক সঙ্কলিত ও ৯ নং বিশ্বকোষ-লেন, বাগবাজার, কলিকাতা, বিশ্বকোষ কার্য্যালয় হইতে শ্রীবিশ্বনাথ বসু কর্তৃক প্রকাশিত। প্রতি সংখ্যার মূল্য আট আনা। প্রতিসংখ্যা বৃহৎ ৩২ পৃষ্ঠা পরিমিত।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যাঁহারা চর্চ্চা করেন এবং বঙ্গের, ভারতবর্ষের ও জগতের নানা বিষয়ের তত্ত্ব ও তথ্য জানিতে চান, বিশ্বকোষ বহু বৎসর হইতেই তাঁহাদের নিকট পরিচিত। অনেক বৎসর আগেই এই বিখ্যাত বৃহৎ গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। এক্ষণে ইহা আগেকার চেয়ে পরিবর্দ্ধিত আকারে আবার প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। নূতন অনেক বিষয় সংযোজিত হইতেছে। ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, লোকসংখ্যাবিষয়ক এবং অন্যান্য তথ্য যথাসম্ভব আধুনিক কাল পর্য্যন্ত সংশোধিত করা হইয়াছে। প্রথম সংস্করণ অপেক্ষাও এই দ্বিতীয় সংস্করণের আদর হওয়া উচিত।

বিশ্বকোষ অভিধানে কথার মানে দেখার মত করিয়া ব্যবহার করা যায়, আবার অন্যান্য বহির মতও পড়া যায়—পড়িয়া জ্ঞান লাভ ও আনন্দ লাভ দুই-ই হয়। অধিকন্তু, বিশ্বকোষ পড়িবার সুবিধা এই, যে, পাঠকের যখন যতটুকু অবসর থাকে—দু-দশ মিনিট, আধ ঘণ্টা, এক ঘণ্টা—তাহারই উপযুক্ত এক একটি টুকরা পড়িয়া থামিয়া যাওয়া যায়। এইজন্য এ রকম একখানি কোষগ্রন্থ সর্ব্বসাধারণের ব্যবহার্য্য প্রত্যেক পাঠগৃহ, ও লাইব্রেরী এবং স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে রাখা উচিত।

১৩৪০ ত্রিপুরা সনের (অর্থাৎ মোটামুটি ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের) ত্রিপুরা রাজ্যের সেন্সস্ বিবরণী—ঠাকুর শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মা, এম-এ (হার্ভার্ড) সেন্সাস্ অফিসার, সিনিয়ার নায়েব-দেওয়ান। ত্রিপুরা সেন্সাস অফিস হইতে প্রকাশিত।

ইহাতে আছে ভূমিকা ৯ পৃষ্ঠা, রিপোর্ট ১১৬ পৃষ্ঠা, ইম্পীরিয়াল ও প্রভিন্সিয়াল টেবল সমূহ ১৮১ পৃষ্ঠা, ত্রিপুরা রাজ্য ও চতুষ্পার্শ্বস্থ জিলাসমূহের বহুবর্ণ মানচিত্র, এবং অন্য অনেক প্রতিকৃতি ও ছবি। মূল্য লেখা নাই।

স্বাধীন ত্রিপুরার সকল রকম সরকারী কাজ বরাবর বাংলা ভাষায় হইয়া থাকে, ইহা বঙ্গের ও ত্রিপুরার গৌরব। সেন্সাস্ বিবরণীটিও বাংলায় মুদ্রিত হওয়ায় সঙ্গতি রক্ষিত হইয়াছে, এবং সকল লিখন-পঠনক্ষম বাঙালীর ও অন্য বঙ্গভাষাভিজ্ঞ লোকদের ব্যবহারযোগ্য হইয়াছে।

আমরা এবার এই বহু শ্রমসাধ্য তথ্যবহুল বহিখানির উল্লেখমাত্র করিলাম। ভবিষ্যতে ইহা অবলম্বন করিয়া আরও কিছু কিছু লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

মানুষের অধিকার—শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়। সরস্বতী লাইব্রেরী, কলিকাতা। মূল্য তিন আনা।

এই পুস্তিকাটির পৃষ্ঠাসংখ্যা ২৮, কিন্তু গুরুত্ব তার চেয়ে অনেক বেশী। লেখক অধ্যাপক হ্যারল্ড লাস্কির এতদ্বিষয়ক চিন্তাকে আশ্রয় করিয়া ইহা লিখিয়াছেন। লেখা বিশদ, প্রাঞ্জল এবং চেতনা-উৎপাদক হইয়াছে। সকল মানুষেরই বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার, জ্ঞানলাভ করিবার অধিকার, আনন্দলাভ করিবার অধিকার, সকল দিকে পূর্ণাঙ্গ ও পূর্ণ বিকশিত অধিকার লাভ করিবার অধিকার আছে। এই অধিকার সম্বন্ধে সর্ব্বসাধারণকে সচেতন করা এই প্রকার পুস্তকপুস্তিকার উদ্দেশ্য। কিন্তু ভারতবর্ষের শতকরা ৮ জন লিখিতে পড়িতে পারে, বঙ্গে ১১ জন। যাহারা পড়িতে পারে, বহি লিখিয়া তাহাদিগকে সচেতন করিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। কিন্তু যাহারা পড়িতে পারে না, তাহাদিগকে জ্ঞানী করিবার চেষ্টাও করিতে হইবে।

র. চ.

জেম্স্ আব্রাম্ গারফীল্ড—শ্রীবিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী। ক্যালকাটা পাবলিশার্স, ২১০।২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম ১।০। পৃষ্ঠা ৷৵০+১৯৭

"From Log-cabin to White House" নামক ইংরেজী গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া লিখিত। গ্রন্থকার বোধ হয় ভাষা সংশোধন করিবার যথেষ্ট অবসর পান নাই বলিয়া স্থানে স্থানে ভাষার জড়তা থাকিয়া গিয়াছে। তাহা সত্ত্বেও বিষয়বস্তুর গুণে বইখানি সমাদর লাভ করিবে বলিয়া আশা করা যায়। গারফীল্ডের মত কর্ম্মবীরের জীবনচরিত আমাদের সকলের পাঠ করা উচিত।

শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু

ওমর ফারুক—মুহম্মদ হবীবুল্লাহ্, বি-এ প্রণীত। প্রকাশক মহীউদ্দীন আহমদ, বি-এস্‌সি। বুলবুল সোসাইটি, ২৩, ক্রেমেটোরিয়াম ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম পাঁচ সিকা।

ওমর ফারুক ইস্‌লামের অভ্যুদয় কালে আরবের আকাশে একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। গ্রন্থখানি তাঁহারই চরিত-কথা। ইহার ভিতর দিয়া ঐ সময়কার একটু ইতিহাস পাওয়া যায় এবং ইস্‌লামের উদার আদর্শটিও চোখে পড়ে। লেখকের ভাষা মার্জ্জিত, সরস ও বেগবতী। গ্রন্থখানি ছেলেদের জন্য লেখা। কিন্তু ইহাতে এমন কতকগুলি আরবী-ফারসী শব্দ আছে, মুসলমান ছেলেদের কথা জানি না, হিন্দু ছেলেরা সেগুলির অর্থ জানা দূরের কথা, কখন শোনেও নাই। বোধ করি তাহাদের অভিভাবক মহাশয়রাও সেগুলির সহিত অপরিচিত। 'দোররা', 'জাহান', 'তেলাওত', 'দাওয়াত', 'শান-শওকত', 'রওশন' প্রভৃতি যে-সকল শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহাদের বাংলা প্রতিশব্দ কি নাই? অবশ্য ঐরূপ ত্রুটি সত্ত্বেও গ্রন্থখানি আমাদের ভাল লাগিয়াছে।

মোটা বোর্ড ও সিল্কে বাঁধানো, ছাপা ও কাগজ ভাল।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

বর্ত্তমান অর্থসঙ্কট—শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য। প্রাপ্তিস্থান—২৭।৩ হরিঘোষ ষ্ট্রীট, শক্তিপ্রেস, কলিকাতা। ১৩৪০। মূল্য চারি আনা।

এই পুস্তিকার মধ্যে লেখক, লোকের টাকাকড়ি আজকাল এত কমিয়া গিয়াছে বলিয়া কেন মনে হয়, তাহা আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার আলোচনা-প্রণালী সুন্দর। বাংলা সাহিত্যে এই প্রকার পুস্তিকার একান্তই অভাব ছিল। সরকারী প্রচার-বিভাগের লেখার ধরণ হইতে ইহার বক্তব্য যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তাহা বলা বাহুল্য। কারাগারে বসিয়া লেখক এই পুস্তিকা রচনা করিয়াছেন, তাঁহার বন্দী-জীবনের মুহূর্ত্তগুলি দেশজননীর পূজাকল্পেই ব্যয় করিয়াছেন। শুধু দুইটি বিষয়ে লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই; প্রথমতঃ, যদিও ইহা মুখ্যতঃ কর্ম্মীদের জন্যই লিখিত, তবু সর্ব্বসাধারণের পক্ষে ইহার ভাষা মাঝে মাঝে একটু কাঠিন্য দোষ-দুষ্ট হইয়াছে; দ্বিতীয়তঃ, যে-কয়েকটি ইংরেজী শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহাও না করিলে ভাল হইত। টাকশাল, ক্রয় করিবার সামর্থ্য, 'স্বর্ণমান', 'রাষ্ট্রীয়-সঙ্ঘ,' টাকার

'আসল,' 'দয়দস্তর'—ইংরেজী প্রতিশব্দ না থাকিলেও আমাদের কর্ম্মীরা ইহাদের অর্থ বুঝিতে পারে। শেষের দিকে বর্ণানুক্রমিক নির্ঘণ্ট দেওয়া হইয়াছে; ইহা উল্লেখযোগ্য বলিতে হইবে।

নীলকণ্ঠ—শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। ১৩৪০। মূল্য এক টাকা চারি আনা।

দারুণ অভাবের কঠোর নিষ্পেষণে তেজস্বিনী নারীর অবস্থায় কি প্রচণ্ড পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে তাহারই একখানি ছবি। ঔপন্যাসিকের বর্ণনাশক্তি আছে, দরদ আছে, স্থানে স্থানে অস্বাভাবিকত্ব একটু-আধটু থাকিলেও শ্রীমন্ত ও গিরির মর্ম্মন্তুদ কাহিনী পাঠককে পাইয়া বসে; বাস্তবিক ত মোড়ল মোড়লের পাপ আমাদেরই পল্লীসমাজের আর এক দিক। নীলকণ্ঠ ও শ্রীমন্তের মিলনদৃশ্য হৃদয়কে বিচলিত করিয়া তোলে।

স্বদেশ ও সাহিত্য—শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। আর্য্য পাবলিশিং কোং, ১৩৩৯। মূল্য ১॥০। ৩০+১৫৬ পৃঃ

সাময়িক পত্রে পূর্ব্বে প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধের সমষ্টি। ভূমিকায় প্রবন্ধগুলির সৃষ্টিরহস্য ব্যক্ত হইয়াছে। শরৎ চন্দ্র সাহিত্যে যেমন প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, স্বদেশের জন্যও তেমনই প্রাণের পরিচয় দিয়াছিলেন, অসহযোগ আন্দোলনের সফলতায় তাঁহার আত্মনিয়োগ আমাদের জাতীয় জীবনের এক অধ্যায়ে স্বর্ণাক্ষরে থাকিবে। সুতরাং সাহিত্যের দিক ও প্রকৃত স্বদেশসেবীর দিক তিনি যেমন ফুটাইয়া তুলিতে পারিবেন আর কাহারও পক্ষে তেমন সম্ভবে না। যে কারণে এই সব রচনার সৃষ্টি, সেই কারণ আর বিদ্যমান নাই; কিন্তু যে সুরে লেখকের অনুভবী হৃদয় স্পন্দিত হইয়াছে, তাহা তাঁহার লেখনীতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমাদের সাহিত্যের প্রকৃতি ও গতি সম্বন্ধে শরৎ চন্দ্রের মতামত অমূল্য: অবশ্য রাজনীতির প্রবন্ধগুলি তেমন নয়, তাহাতে একদেশদর্শিতার যথেষ্ট চিহ্ন আছে। প্রকাশক এই প্রবন্ধসমাবেশের প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়া পাঠকদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। শরৎবাবুর দুই বিভিন্ন বয়সের আলোকচিত্র গ্রন্থের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

পল্লীকবি রসিকচন্দ্র—শ্রীমণীন্দ্রনাথ মণ্ডল প্রণীত। ডবল ক্রাউন ১৬ পৃষ্ঠা; ১-৬+১—৫২। প্রকাশক শ্রীপরিমলকান্তি মণ্ডল; কশারিয়া, খেজুরী পোঃ, মেদিনীপুর। মূল্য তিন আনা।

খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মেদিনীপুরের কাঁথি অঞ্চলে প্রাদুর্ভূত এতদঞ্চলে চণ্ডীর গানের গায়করূপে প্রসিদ্ধ ফকিরচন্দ্রের পুত্র কবি রসিকচন্দ্রের বিস্তৃত বিবরণ এই পুস্তিকায় কবির পৌত্র মণীন্দ্রবাবু প্রদান করিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে অন্যান্য কয়েক জন কবির সহিত রসিকচন্দ্রের কাব্যের তুলনা করা হইয়াছে। কবির রচিত সাহিত্যের অতি অল্প অংশেরই সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ কয়েকটি গান ও কয়েকখানি পদ্যময় পত্র ছাড়া তাঁহার রচিত অন্য কিছুই এ-পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই! এই পুস্তিকা হইতে জানা যায় যে, ইহা ব্যতীত তিনি 'বৈদেহী-বিলাস' ও 'রসকল্লোল' নামক দুইখানি প্রসিদ্ধ উড়িয়া কাব্যের টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তিনি যে সাহিত্য-রসিক ছিলেন তাহার প্রমাণ—একাধিক প্রাচীন গ্রন্থের তৎকৃত অনুলিপি। তবে এইরূপ একজন প্রাচীন সাহিত্যিকের যতটুকু বিবরণ গ্রন্থকার সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদের অনুপ্রাসবহুল শব্দঝঙ্কারময় সাহিত্যের যতটুকু নিদর্শন দিয়াছেন, তাহার জন্য আমরা তাঁহার নিকট ঋণী। পরন্তু, এই বিবরণ পুস্তকাকারে প্রকাশিত না হইয়া সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধরূপে কোন প্রসিদ্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে সুশোভন হইত এবং তাহাতে কবির বৃত্তান্ত সাহিত্যিক-সমাজে বহুল পরিমাণে প্রচারিত হইবার সুবিধা হইত। পুস্তিকার বর্ণনা-বাহুল্য অনেক ক্ষেত্রে পাঠকের বিতৃষ্ণার সৃষ্টি করে।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

দিল্লীকা লাড্ডু—শ্রীসুনির্ম্মল বসু প্রণীত। প্রকাশক—এস্, কে, মিত্র, ১৯৮ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম আট আনা।

ছেলেদের বই। বইখানিতে এগারটি সুন্দর হাসির গল্প আছে। ছেলেমেয়েরা গল্পগুলি পড়িয়া খুব হাসিবে ও আমোদ পাইবে। প্রত্যেক গল্পের সঙ্গে একটি করিয়া মজার ছবি। ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই ভাল।

চালিয়াৎ চন্দর—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক—এস্, কে, মিত্র, ১৯৮ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম আট আনা।

একটি চালিয়াৎ ছেলের নানা রকম চালিয়াতির কাহিনী। অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ছেলেরা এই কাহিনী পড়িয়া খুব উপভোগ করিবে। ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই সুন্দর। অনেকগুলি ছবিও আছে।

শ্রীযামিনীকান্ত সোম

যক্ষ্মা

ডাঃ শ্রীসুন্দরীমোহন দাস

পুরাকালে আয়ুর্বেদে এই রোগের আখ্যা ছিল রাজযক্ষ্মা, শোষ, ক্ষয় এবং রোগরাট …

পাশ্চাত্য দেশে বুক পরীক্ষার যন্ত্র ষ্টেথোস্কোপ আবিষ্কার করিয়া লেনেক্ (Laennec, ১৭৮১—১৮২৬) যক্ষ্মা সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়া ছিলেন যক্ষ্মাগ্রস্ত রোগীর ফুসফুসে দানা বা টিউবার্কল্ হয়। তাঁহার মতে ঐ টিউবার্কলই রোগের কারণ। টিউবার্কল্ হইতেই টিউবারকুলোসিস্ নামের উৎপত্তি।

১৮৬৫ সালে ভিলেমন্ (Villemin) যক্ষ্মাদানা হইতে রস লইয়া অন্যদেহে যক্ষ্মা সঞ্চারিত করিয়াছিলেন। তিনি প্রমাণ করেন, এই রোগের একটা বিশেষ বিষ আছে। ১৮৮২ সালে জার্ম্মাণ পণ্ডিত ককের (Koch) যক্ষ্মার জীবাণু আবিষ্কারের পর রোগের কারণতত্ত্ব মীমাংসিত হইয়াছে।

আয়ুর্বেদে যেমন এই রোগের একটি নাম ক্ষয় তেমনি ইংরেজী পণ্ডিতেরাও ইহার কন্‌জাম্পশন বা থাইসিস্ নামকরণ করিয়াছেন।…

আয়ুর্বেদ মতে যক্ষ্মার কারণ অতিরিক্ত স্ত্রীসংসর্গ, অতিরিক্ত পরিশ্রম বা ভারবহন, অতিরিক্ত অধ্যয়ন, শোক, বার্দ্ধক্য, উপবাস প্রভৃতি। আয়ুর্ব্বেদে এই রোগ সংক্রামক বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। মাধব করের সংগ্রহে আছে :—"শোষ বা যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগ প্রসঙ্গ, গাত্রস্পর্শ, নিঃশ্বাস, এক শয্যায় শয়ন, একত্র ভোজন, এক বস্ত্র পরিধান বা একই মালা ব্যবহার দ্বারা একজন হইতে আর একজনে সংক্রামিত হয়।"

কলিকাতায় এ বিষয় যতদূর অনুসন্ধান করা গিয়াছে তাহাতে রোগ প্রসারের এই কয়েকটি প্রধান কারণ জানা যায় :—

(১) দারিদ্র্যবশতঃ খাদ্যাভাব ও অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস (২) উচ্ছিষ্ট ভোজন; (৩) আলোবাতাসহীন ঘরে বহুলোকের বাস; (৪) স্বাস্থ্যবিধি উপেক্ষাপূর্ব্বক অস্বাস্থ্যকর গৃহনির্ম্মাণের অনুমতি (কর্পোরেশন কর্ত্তৃক); (৫) আবর্জ্জনা সংগ্রহের স্থানে, খাটা পাইখানায় কিংবা খোলা নর্দ্দমায় মাছির বংশবৃদ্ধি এবং খাবারের দোকানেও বহুস্থানে মাছির দৌরাত্ম্য, (৬) রাস্তায় জলসিঞ্চনের অভাবে ধূলার সঙ্গে রোগবীজ ছড়ান; (৭) পুনঃপুনঃ গর্ভসঞ্চার ও আলো বাতাসবিহীন স্থানে বাসবশতঃ স্ত্রীলোকদের বিশেষ রোগ সম্ভাবনা. রোগের গুপ্ত অবস্থায় বিবাহ ও গর্ভ হইলে যে স্ত্রীলোকের রোগবৃদ্ধি হয় এ-বিষয়ে ভূরিভূরি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে; (৮) রোগগ্রস্ত পিতামাতা হইতেও রোগ শিশুতে, গর্ভে কিম্বা গর্ভমুক্ত অবস্থায় সঞ্চারিত হয় এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে।…

ইতিপূর্ব্বে বিলাত অঞ্চলে শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে যক্ষ্মার উপদ্রব এত বেশী ছিল যে, ইহার নামকরণ হইয়াছিল "শাদার প্লেগ"। এখন চেষ্টার দ্বারা ঐ অঞ্চলে ঐ রোগের অনেক হ্রাস হইয়াছে। এখন বরং যক্ষ্মার "কালোর প্লেগ" আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে।

কলিকাতায় ১৫-৪০ বৎসর বয়স্কা সন্তানসম্ভবা স্ত্রীলোকদের ঐ রোগে মৃত্যু পুরুষদের অপেক্ষা তিন গুণ অধিক। বিলাতে গ্রন্থিসংক্রান্ত (Glandular) যক্ষ্মায় মৃত্যুসংখ্যা অধিক, বিশেষতঃ শিশুদের মধ্যে। যক্ষ্মাটীকার প্রবর্ত্তক কালমেট (Calmette) বলেন, ইউরোপ ও আমেরিকা অঞ্চলে এক বৎসরের নিম্নবয়স্ক শিশুর যত মৃত্যু হয় তাহার তিন আনা মৃত্যুর কারণ যক্ষ্মা, এবং অধিকাংশ শিশুর যক্ষ্মা গ্রন্থিসংক্রান্ত। বালক-বালিকাদের যক্ষ্মা গলগণ্ড সংক্রান্ত শতকরা ৪৬·৫; চর্ম্মসংক্রান্ত ৫০·৮; অস্থিসংক্রান্ত ৪১·৩ এবং ফুসফুস সংক্রান্ত ১·৩। আমাদের দেশে শিশুদের ঐ প্রকার যক্ষ্মা কম হয়, কারণ জননীরা শিশুদিগকে স্তন্যামৃত পানে বঞ্চিত করেন না।

কি কি প্রণালীতে যক্ষ্মা বিলাত অঞ্চলে হ্রাস করা হইয়াছে তাহা জানা আবশ্যক :—

১। স্বাস্থ্যবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষকে রোগ ধরা পড়িলে জানান হয় (Notification)। ২। রোগীকে গৃহে কিংবা হাসপাতালে স্বতন্ত্র রাখা হয় (Isolation Hospitalization)। যক্ষ্মরোগীর থাকিবার স্থান বা Sanatorium ১৯২৪ পর্য্যন্ত বিলাতে ২০, ৭৫০টি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বাংলা দেশে যক্ষ্মারোগীর হাসপাতাল ৩টি। কলিকাতা মেডিকেল কলেজ, কার্ম্মাইকেল মেডিকেল কলেজ এবং মানিকতলায় জাতীয় আয়ুর্বিজ্ঞান পরিষদের অধীনে ন্যাশনাল ইনফার্ম্মারী। যাদবপুরেও একটি উৎকৃষ্ট স্যানেটোরিয়ম আছে। বঙ্গীয় যক্ষ্মাসমিতির অধীনে একটি বহির্ভাগে চিকিৎসাকেন্দ্র চিত্তরঞ্জন হাসপালে, একটী কলিকাতা মেডিকেল কলেজে, একটি হাওড়ায় এবং কলিকাতায় আরও দুইটি আছে। ১৯২৯ সালে ইঁহাদের রোগী সংখ্যা ছিল ২০০০; ১৯৩২ সালে ছিল ২৫০০০; ১৯৩৩ সালে ৪১,৯০০। ছাত্রসংখ্যা শতকরা ১৭।

(৩) রোগীর থুথু, বাসন-কোসন, ঘর, কাপড়-চোপড় প্রভৃতি শোধন (Disinfection)। যেখানে সেখানে থুথু ফেলিতে দেওয়া হয় না। এমন কি কোন-কোন দেশে রাস্তায় থুথু ফেলিলে শাস্তি হয়।

(৪) খাদ্য, বাসস্থান, কলকারখানা প্রভৃতির উন্নতি সাধন দ্বারা রোগাক্রমণ ব্যর্থ করিবার শক্তি বৃদ্ধি করাও রোগহ্রাসের একটি কারণ। বালক-বালিকাদের রোগহ্রাসের কারণ তাহাদের আহার-বিহার সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা।

(৫) স্বাস্থ্যসমিতি প্রভৃতি গঠন করিয়া জনসাধারণের স্বাস্থ্যতত্ত্বজ্ঞান বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

(৬) রুগ্ন স্ত্রীপুরুষের বিবাহ নিষেধ করিয়া শিশুদের যক্ষ্মা নিবারণ করা হইয়াছে।

আমাদের দেশে যদি স্থানে স্থানে ঐ প্রকার স্বাস্থ্যাবাস নির্ম্মিত হয়; রোগী যদি রোগের প্রথম অবস্থায় আসে এবং বহুকাল থাকে, স্থানে স্থানে আরও অধিক স্বাস্থ্যসমিতি গঠন করিয়া যদি সাধারণ স্বাস্থ্য ও যক্ষ্মা সম্বন্ধে জ্ঞান বিস্তার করা যায়; যক্ষ্মা রোগ যে প্রথম অবস্থায় আরোগ্য করা যায় এই কথা যদি সকলে জানে; যেখানে সেখানে থুথু ফেলা যদি অপরাধ বলিয়া গণ্য হয়; উচ্ছিষ্ট খাওয়ার কিম্বা যে-সে ব্যক্তি কর্ত্তৃক শিশুদিগকে চুম্বন করার প্রথা যদি নিষিদ্ধ হয়; মাছির উপদ্রব যদি হ্রাস হয়। কলিকাতার শহর-পিতৃগণ (City Fathers) এবং সহর-জ্যেষ্ঠভ্রাতগণ (Aldermen)

যদি বাড়ি নির্ম্মাণের সময় স্বাস্থ্য-বিধির নিয়ম লঙ্ঘন না করেন এবং কলকারখানায় ধূম নিবারণের চেষ্টা যদি করেন; ছাত্র ও ছাত্রীদিগকে সময়ে সময়ে খোলা মাঠে, জাহাজে কিংবা স্বাস্থ্যকর স্থানে যদি লইয়া যাওয়া হয়: তাহা হইলে আশা করা যায় এই ভীষণ সংক্রামক রোগের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি শীঘ্রই নিবারণ করা যাইতে পারে।...

চিকিৎসা-জগৎ—পৌষ, ১৩৪০]

বেকার

শ্রীচারুচন্দ্র রায়

বেকার-সমস্যা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়ে গেছে এবং হচ্ছে। কেউ বলেছেন যে, ইউনিভার্সিটি থেকে পালে পাল বি-এ, এম্-এ পাস-করা ছেলে বৎসর বৎসর বেরিয়ে বেকার-গোষ্ঠী বৃদ্ধি করে চলেছে, অতএব হয় পাস করা শক্ত কর, নয়, খুব কড়া রকম বাছাই করে কলেজে ছেলে ভর্ত্তি কর, নয় ত ইউনিভার্সিটীকে একেবারে ভেঙে আপদ নিশ্চিন্ত করে দাও।

কেউ বলেছেন, ছেলেদের "ভোকেশনাল" শিক্ষা দাও—হাতুড়ি পেটা, বাটালি চালান থেকে আরম্ভ করে চাটাই বোনা, ধুচুনী, চুবড়ী তৈয়ারী করা পর্য্যন্ত শেখাও, যা হোক করে তারা দুমুঠো খেতে পাবে।

আবার কেউ বলেছেন, চাষ করতে লেগে যাও সকলে, কত অনাবাদি মাঠ পড়ে রয়েছে, চালাও লাঙ্গল, ধর কাস্তে, আমাদের শস্য-শ্যামলা দেশ, তাকে আরও ধন-ধান্যে পূর্ণ করে তোল—আর কিছু না হোক ভাতটা ত খেতে পাবে।...

যুদ্ধের শেষ কামান বারুদ রসদ প্রভৃতি যন্ত্রপাতি, যখন সকলে মানুষ-মারার উপকরণ প্রস্তুতের কাজ ছেড়ে মানুষ-পোষণের কাজে লেগে গেল, তখন বিশ্ব জুড়ে একযোগে যে পণ্যসম্ভার তৈয়ারী হয়ে উঠল তার কাটতি হ'ল না বলেই আজ পণ্যের বাজারে এই ছটফট এসে পড়েছে—আজ যদি চাষের মাঠে, আর কালকারখানায় 'ভোকেশনাল'-শিক্ষাপ্রাপ্ত কারিগরের পাল ঢুকে প'ড়ে মাল তৈয়ারী করতেই থাকে, সে-মালের দাম কমে যাবে না-কি? শেষে সে মাল মাল-গুদামেই জমা হয়ে পচবে না-কি?

যে-দেশে বড় বড় শহর বড় বড় কারখানা গড়ে উঠেছে—টাটানগর, লক্ষ্ণৌ, জামালপুর, কাঁচড়াপাড়া, যাদবপুর, শিবপুর ইত্যাদি...সেই সকল কারখানায় ৩ বৎসর থেকে ৫ বৎসর পর্য্যন্ত হাতুড়ি পিটে আর বাটালি চালিয়ে যে-সকল যুবা শিক্ষালাভ করে বেরিয়েছে—গণনা করে দেখা হয়েছে কি, তাদের সকলে কাজে লেগে গিয়ে উদরান্নের সংস্থান করছে কি না? তারা বহু ক্ষেত্রে বেকার হয়ে বসে আছে—আবার বৎসর বৎসর এক এক পাল কারিগর তৈয়ারী করে তুলতে থাকলে তাদের গতি কি হবে? অতএব এ ধুয়া একেবারেই অজ্ঞানের চীৎকার মাত্র। কিন্তু যারা এই ধুয়াটা তুলেছে তাদের সকলকার দৃষ্টি সমান নয়: তার মধ্যে অনেকে এই সত্য কথাটা উপলব্ধি করেছেন, কিন্তু তাঁরা মনে করছেন যে বি-এ, এম-এ পাশ করেও খিদেয় মরেছে বটে—কিন্তু কথা কইছে বুঝছে। আর কারিগরগুলো খেতে পাবে না, কথাও কইবে না, অতএব খিদেয় যে মরে সে মরুক, কথা কয়ে যেন জ্বালাতন না করে, এমন কর, সব কারিগর বানাও।

এই বি-এ, এম-এ গুলোর উপর যে আক্রোশ তার মনস্তত্ত্ব এই। এ মহলে যে-দেশে শতকরা ১০টা লোক লিখতে পড়তে জানে সে-দেশে শতকরা একটা লোক বি-এ, এম-এ, পাস করে কি-না সন্দেহ। যদি ৯৯ জন উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত না হয়ে চোখ থাকতে কাণা আর কান থাকতে কালা হয়ে থাকে—ঐ ১টা লোকের জন্ত এত দুর্ভাবনা কেন? তার কারণ ঐ একটা লোকই কথা কয়, যাতে শয্যা-কণ্টকী হয়ে উঠে। আর আমরা, হোমরা-চোমরা বৈজ্ঞানিক থেকে আরম্ভ করে পথের লোক পর্য্যন্ত সুর ধরি, বি-এ, এম-এ পাশ করে কি হয়—২০ টাকা মাহিনা রোজগার হয় না। কি যে হয় তা যে বুঝেছে সেই মজেছে।

ঐ বি-এ, এম-এ পাস-করাদের মধ্যেই অনেকে প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী আগে বুঝেছিল যে, দেশের উন্নতি করতে গেলে অর্থাৎ দেশকে সমৃদ্ধ করতে গেলে রাজশক্তির সঙ্গে বোঝাপড়া করে দেশের সমৃদ্ধিকেই সবচেয়ে উচ্চস্থান দিতে হবে— দেশান্তরের কল্যাণে আমাদের দেশটাকে দুধলা গাই বা টাকার গাছ (Pagoda tree) করে রাখলে চলবে না। সেই ক'টা মুষ্টিমেয় বি-এ, এম্-এ এমন কথা কইতে সুরু করেছিল, বৎসরের পর বৎসর এমন সোরগোল তুলেছিল যে আজ হোয়াইট-পেপারের মধ্যে আমাদের দেশের সমৃদ্ধিকে বড় করে দেখা হবে এ আভাষ মাত্র পাওয়াও সম্ভব হয়েছে।

স্পষ্ট করে এই কথাটাই আজ সকল কথার সেরা হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, দেশের রাজশক্তি যতদিন না একমাত্র দেশবাসীর কল্যাণে নিয়োজিত হয়—দেশের লোক তাদের শুভাশুভের একমাত্র নিয়ামক হয়—মধ্যবর্ত্তীর মারফৎ যেমন ভগবদ্দর্শন হয় না—তেমনি পরের মারফত দেশের সমৃদ্ধির সহিত সাক্ষাৎ লাভ তত দিনে হবে না। কাজটা নিজেদের হাতেই নিতে হবে।

কিন্তু এই সকল উচ্চ রাজনীতির ভাবনা ভাবতে ভাবতে এ-কথাও ত ভুলে থাকা যাচ্ছে না যে, দেশের লোক বাস্তবিকই যথেষ্ট খেতে পারছে না —তার কি উপায় করা যায়?

আমি আমার দেশ বলতে বাংলা দেশই বুঝি, বাংলার বাইরেই আমার বিদেশ। এই সোনার বাংলা দেশে যে এখনও "এক পেয়ালা সরবৎ, আর একখণ্ড রুটি"র অভাব হয়নি তার প্রমাণ এই—যার দেশে অন্ন জোটে না সে-ই বাংলায় এসে উদরান্নের সংস্থান করে নেয়—যার দেশে "ছাতু" জোটে না যার দেশে "রোটি" জোটে না, যার দেশে "আপ্পা" জোটে না, যার মরুভূমিতে "জনার" "বজরা" জোটে না, সে-ই বাংলার বুকে এসে পড়ে তার অফুরন্ত স্তন্য পান করে ধন্য হয়—বেহারী আসে, পঞ্জাবী আসে, মান্দ্রাজী আসে, মাড়ওয়ারী আসে, রোজগার করে দেশে চলে যায়—আর বাংলার প্রতি নাসিকা কুঞ্চন করে, "বাঙালী মছলি খাতা" বলে সুখ্যাতি করতে ছাড়ে না। এই সকল "বিদেশী" আমাদের দেশে যে-যে স্থান জুড়ে বসে আছে সে স্থানগুলা ত আমাদেরই প্রাপ্য, সেখানে যদি আমরা বসতে পাই আমাদের দেশের বহুত বেকারদের ত স্থান হয়ই, অন্নসংস্থানও হয়।

তারা জুড়ে যখন বসে আছে, তখন এক কথায় তাদের তাড়ান যাবে না: কিন্তু তাদের এই দেশের লোক হয়ে না যাওয়া পর্য্যন্ত আমরা বিদেশী বলেই ভাবব, এবং তাদের উপর দেশের লোকের দাবি আদায় করতে ছাড়ব না। এখানে রাজশক্তি, যেটা এখনও জনশক্তিতে পরিণত হয়নি আমাদের অন্তরায় হবে। তা বলে আমরা আমাদের শক্তি যতখানি প্রয়োগ করতে পারি তা করব না কেন!

মনে করুন, পঞ্জাবী বাস চালায়—আমরা চাইব, প্রত্যেক বাসে যে দু-জন লোক থাকে, তার মধ্যে একজন হবে বাঙালী; যে বাসে দুইজনই বিদেশী অর্থাৎ অবাঙালী, আমরা সে বাসে উঠব না। বাস কোম্পানীর অর্দ্ধেক হবে বাঙালী কর্ম্মচারী – হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক, বাঙালী হওয়া চাই। ট্রাম কোম্পানী বাঙালীর পক্ষে বিদেশী, বাস কোম্পানী যেমন ঠিক তেমনি—সেখানেও সেই ব্যবস্থা হওয়া চাই। কোন বিদেশী অর্থাৎ অবাঙালী ব্যবসাদারের আপিস, সেটা ইংরেজের হোক, বা ভাটিয়ারই হোক, সেখানে কর্ম্মচারীর সংখ্যা অর্দ্ধেক বাঙালীর হওয়া চাই—এইটা আমরা যে দিক দিয়া সম্ভব আদায় করব। আমরা জানি, যে-সকল বিদেশী

কোম্পানীকে আমরা এতাবৎ বিদেশী বলে এসেছি অর্থাৎ ইউরোপীয় কোম্পানীসকল, সে-সকল কোম্পানীতে বাঙালী কর্মচারীর সংখ্যা যত, তার সিকির সিকিও তথাকথিত দেশীয় অবাঙালী কোম্পানীতে নাই—অনেক মাড়ওয়ারী বা ভাটিয়ার দোকানে বা আপিসে একটিও বাঙালী নাই—এই সকল মাড়ওয়ারী বা ভাটিয়ার দোকান বিদেশী, সুতরাং সকল বিদেশীকেই একই বাঁধনে বাঁধতে হবে - হয় বাঙালী পোষ, নয় ত আমরা তোমাদের ত্রিসীমানায় যাব না। বিদেশী বর্জ্জনের যদি কোন মানে থাকে ত তা এই।

ছোট স্থানীয় ব্যবসাদারের আপিসে বা কারবারের কথা ছেড়ে দিয়ে যদি বড় বড় ব্যবসায় বা ফ্যাক্টরীর কথা ভাবা যায় সেখানেও সেই ধরণের "স্বদেশী" আমরা না করলে আমাদের বেকারের সংখ্যা কমবেই না। আমরা চন্দননগরের লোকমতের জোরে এবং মিল কোম্পানীর সহায়তায় এই ব্যবস্থা করেছি যে, কুলি থেকে আরম্ভ করে কেরাণী বা কারিগর পর্য্যন্ত যতদূর সম্ভব চন্দননগরের লোককে চন্দননগরের গণ্ডীর ভিতর অবস্থিত গোন্দলপাড়া মিলে স্থানীয় বাঙালীকেই নিযুক্ত করতে হবে এবং এখন এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে একটা স্থান খালি হলে যদি দশখানা আবেদন পড়ে তার মধ্যে চন্দননগরবাসীকে আগে বেছে নেওয়া হয়।

শ্রীরামপুরে যে সকল মিল আছে—তার অধিকারী বাঙালীই হোক আর অবাঙালীই হোক—সেই সকল মিলে বাঙালী কুলি বা কর্ম্মচারীর সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করে দেওয়া উচিত—সবকে সব, বা দশ আনা ছয় আনা—বাঙালীকে নিযুক্ত করতেই হবে। এই রকম বাংলার সকল প্রতিষ্ঠানকে বাঙালীর মুখ চেয়ে এই ব্যবস্থা করতে হবে—কোন প্রতিষ্ঠানে হঠাৎ অবাঙালীকে উড়ে এসে জুড়ে বসতে দেওয়া হবে না।...

পাটের চাষীকে কেতার মূল্যে পাট বিক্রয় করতে হয়—সে বেচারা যে উপায়ে তার নিজের মূল্যে তার প্রাণপাত-করা পণ্যকে বাজারে উপস্থিত করতে পারে, তার ব্যবস্থা করে—পাটচাষীকে ঐশ্বর্য্যশালী করতে হবে—তা হলেই সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গে সকল শ্রেণীর ব্যবসায় সমৃদ্ধ হবে—সকলে খেতে পাবে। নীলের দাদনে এককালে চাষী টাকাওয়ালার গোলাম হয়ে গিয়েছিল—আজ পাটচাষীও টাকাওয়ালার গোলাম হয়ে গিয়েছে, তার সে গোলামী ঘোচাতে হবে। সে বেচারাও বেকার—বাধ্য হয়ে টাকাওয়ালার বেগারী করা তার নিত্য-নৈমিত্তিক হয়ে উঠেছে।

এই দুর্দ্দশার অন্ত করতে গেলে অনেকখানি শাসনযন্ত্রের কর্ত্তৃত্ব নিজের হাতে আনা চাই—সে কর্ত্তৃত্ব সম্পূর্ণ রকম নিজের হাতে না এলেও কেনা-না-কেনা যখন আমাদেরই হাত, তখন সে দিক দিয়ে আমরা যতখানি আত্মরক্ষা করতে পারি তা আমাদের করতেই হবে—সেটাই হবে উপস্থিত আমাদের একমাত্র স্বাদেশিকতা। এই হবে সত্যকারের মাতৃবন্দনা, মাতৃপূজা।...

বঙ্গশ্রী—ফাল্গুন, ১৩৪০]

মুক্তি

শ্রীমতী আশা দেবী

(১)

নির্ম্মলার বাবা দীক্ষিত ব্রাহ্ম নহেন, কিন্তু অনেক বিষয়ে রুচিতে এবং চালচলনে ব্রাহ্মের মত। কোন পূজাতে নিমন্ত্রণ হইলে যান্ না। প্রতি রবিবারে ব্রহ্মমন্দিরের উপাসনায় যোগ দেন এবং তাঁহার বন্ধু-বান্ধব অন্তরঙ্গ-মণ্ডলী সকলেই বেশীর ভাগ ব্রাহ্ম-ধর্ম্মাবলম্বী।

তাঁহাকে বাদ দিলে তাঁহার পরিবারের আরও যে অবশিষ্ট অংশ থাকে, সে অংশের সহিত তাঁহার লেশমাত্র মিল ছিল না। বাহিরের দিকে গুটি দুই ঘর লইয়া তিনি নিজের সংসারের মধ্যেই আপনার জন্য একটি স্বতন্ত্র সংসারের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সহজ কথায় নিজের স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর জীবনের কিংবা আদর্শের কোনও মিল ছিল না। নির্ম্মলার মা খাঁটি পল্লীগ্রামের মেয়ে। কলিকাতা শহরে এই ত্রিশ বৎসর বিবাহিত জীবন কাটান হইয়া গেল, কিন্তু এক দিনও রাঁধিবার জন্য মাহিনা দিয়া লোক রাখেন নাই; একটি ঠিকা-ঝি মাত্র সহায় করিয়া চিরদিন সংসার চালাইয়া আসিয়াছেন। সেকালের গৃহিণী, আপন গৃহস্থালীর সমস্ত বিধিবিধান তাঁহার হাতে। তিনি শীতকালে গরম জামা গায়ে দেন না, গরম কালে বরফের সরবৎ খাইতে খাইতে মাথার উপর বিজলী পাখা চালান না। অঙ্গনের এক পাশে একটু স্থান করিয়া খড় দিয়া ছাওয়াইয়া গরু রাখিয়াছেন দুই-তিনটি। নিজের হাতে তাহাদের যত্ন-তদ্বির করেন। দুধের সর হইতে ঘি প্রস্তুত করেন, নিজে মুড়ি ভাজেন। অটুট স্বাস্থ্য, নিরলস কর্ম্মতৎপরতা, কোন কাজে এতটুকু শ্রান্তি নাই, আলস্য নাই। তাঁহার সুব্যবস্থার গুণে সংসারের খরচ খুব কম হয়। কিন্তু তিনি সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত উদয়াস্ত পরিশ্রম করিয়া যেটুকু মিতব্যয়িতা করেন, চন্দ্রকান্ত নানা বাজে সখ এবং মজলিসিতে তাহার দ্বিগুণ খরচ করিয়া দেন।

কিন্তু স্ত্রী কোন দিন তাঁহাকে কিছু বলেন না। মনে হয় যেন তাঁহাদের মাঝখানে কোথাও খুব বড় রকম একটা বিচ্ছেদ আছে। তাহার এক দিকে সুশীলা নিজের ঘর সংসার ছেলে-পুলে লইয়া স্বতন্ত্র, নিজের মধ্যেই নিজে মগ্ন, নিঃশব্দ। কলের মত সংসারের কাজ চলিতেছে, কিন্তু দু-জনের মধ্যে বিশেষ যোগ কি বন্ধন নাই। তাহার কারণও নিশ্চয় ছিল। কিন্তু বাহির হইতে সেটা চোখে পড়ে না।

চন্দ্রকান্তের স্ত্রীর মনে যে কোনরূপ অভিমান ছিল বা জীবনের ব্যর্থতার জ্বালা ছিল, তাহা নয়। বস্তুতঃ সে ধরণের শিক্ষাদীক্ষাই তাঁহার নয়। চন্দ্রকান্তের যখন বিবাহ হয়, তখন তাঁহার বয়স ছিল অল্প; রিপণ কলেজে বি-এ পড়েন। সুশীলা ছিলেন আরও ছোট, বছর নয় দশের বালিকা। পল্লী-গ্রামের মেয়ে, সেই অল্প বয়সেই বার, ব্রত, পার্ব্বণ করিতে শিখিয়াছিলেন, নিঃশব্দ ধৈর্য্য এবং সহিষ্ণুতাও শিখিয়াছিলেন। আর সবচেয়ে বেশী শিখিয়াছিলেন জীবন যেমনই হোক, তাহার 'পরে অসন্তোষের কারণটা নিজেদের হাতে কিংবা নিজেদের বিচারবুদ্ধির উপর না রাখিয়া ভাগ্যের হাতে সমর্পণ করিয়া দিবার নির্ব্বিরোধ শান্তি।

কলেজে পড়িবার সময়েই চন্দ্রকান্তের মতামতের ধারা বদলাইতে সুরু হয়, চিন্তার সমুদ্রে জ্ঞানের বাতাস আসিয়া লাগিতেই কত রকমের তরঙ্গস্রোত, কত আলো-অন্ধকারের খেলা, কত জোয়ার-ভাটার উৎসব আরম্ভ হইল। সেই অনভিজ্ঞ সুদুর্গম মনোজগতের বিপর্য্যয়ের মাঝে সুশীলা প্রবেশ করিতে পারিলেন না; এক পাশে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সংসার-যাত্রার কোন ব্যাঘাত ঘটিল না। নারী নিজের একাকীত্ব অত অনুভব করিতে পারিল না, ঘরসংসার, সন্তানের মাঝে ডুবিয়া থাকিল। তাহার নীড় রচনা হইয়া গিয়াছে,—সেখানে মিল নাই থাকুক, আশ্রয় আছে, কাজ আছে। শূন্য ত আর নয়! নিজের কর্ম্মজালের মধ্যে ডুবিয়া গিয়া তিনি নীরবে দিন কাটাইতে লাগিলেন।

কিন্তু চন্দ্রকান্তের কাছে সংসার কোনদিন এত অব্যবহিত, এত প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে নাই। বোধ করি কোন পুরুষের কাছেই কোন দিন হয় না, বিশেষ করিয়া তাঁহার মত মানুষদের মনের গড়ন। যেখানে উনপঞ্চাশ বায়ুর রাজত্ব, সেখানে ঘরছাড়া পথবিবাগী আইডিয়া এবং ভাবনাগুলা মহাব্যোমের অতলতার মধ্যে ছুটাছুটি করিতেছে, সেইখানেই তাঁহাদের চিত্তের বিহার।

যৌবনকাল হইতে তাই চন্দ্রকান্তের নিঃসঙ্গ জীবনের একমাত্র আনন্দ ছিল রাশি রাশি বই পড়া, বন্ধু-বান্ধবদের ডাকিয়া ঘরের মধ্যে আড্ডা জমান, বিনা কারণে হৈ হৈ করিয়া ঘুরিয়া বেড়ান। তাঁহার মধ্যে একটা অশান্ত আবেগ ছিল, তাহাকেই যেন এই সকল উপলক্ষে গোলমালের মধ্যে নিঃশেষ করিয়া দিতে চাহিতেন। এমন করিয়াও অনেক দিন কাটিয়াছিল। বন্ধুরা মাঝে মাঝে হাসিয়া কহিতেন, "চন্দ্রকান্ত, ক্রমশঃ তোমার বয়স হচ্ছে, কিন্তু সংসারী হতে পারছ না কিছুতেই।"

বস্তুতঃ তাঁহাদের অনুযোগের মধ্যে সত্য ছিল। সংসারী হইবার মত প্রকৃতিই যেন চন্দ্রকান্তের ছিল না। অবস্থা ছিল তাঁহার মাঝামাঝি;—গোপাল ব্যানার্জ্জীর ষ্ট্রীটে একখানি দোতলা ছোট পৈত্রিক বাড়ি এবং ব্যাঙ্কে কয়েক হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ। চন্দ্রকান্তের বিদ্যাবুদ্ধির তখনকার কালে যে খ্যাতি ছিল তাহাতে তিনি একটু চেষ্টা করিলেই কলেজের অধ্যাপক হইতে পারিতেন, নিজের উপার্জ্জনের টাকাও সঞ্চয় করিতে পারিতেন, কিন্তু সে ধরণের হিসাবী প্রকৃতি তাঁহার ছিলই না। কিছুদিন আগে বছরখানেকের জন্য কোন এক বেসরকারী কলেজের অধ্যাপক হইয়াছিলেন; ভাল না লাগায় ছাড়িয়া দিয়া পশ্চিমে বেড়াইতে যান। ফিরিয়া আসিয়া কোনদিন আর চাকরি করেন নাই। ব্যাঙ্কের টাকার সুদ হইতে সংসার চলিত, কিন্তু যখনই কোন দরকার উপস্থিত হইত কিংবা চন্দ্রকান্তের কোন খেয়ালমত বেশী টাকার প্রয়োজন হইত, তখনই ব্যাঙ্কচেক কাটিয়া আসল টাকা বার করিতেন। সংসারের ভবিষ্য-ভাবনার কোন তাগিদ, কোন দুরূহ দায়িত্ববোধ যেন তাঁর ছিলই না।

২

এমনই করিয়া দিন কাটিতেছিল, কিন্তু তিন ছেলের পরে একমাত্র সকলের ছোট মেয়ে নির্ম্মলা যখন জন্মিল, একটু একটু করিয়া বড় হইল, তখন চন্দ্রকান্তের জীবনে একটা সুস্পষ্ট পরিবর্ত্তন দেখা দিল। এতদিন একা

কাটাইয়াছেন, কিন্তু এখন আর এক মুহূর্ত্তও একা থাকিতে পারেন না। নির্ম্মলাকে তাঁহার চাই-ই। ছোটছেলের কান্নায় গোলমালে তাঁহার ঘুম হয় না বলিয়া বরাবর রাত্রি-বেলায় তিনি নিজের ঘরে একা শুইতেন; কিন্তু নির্ম্মলাকে কাছে না লইয়া শুইলে এখন ঘুমের আরও ব্যাঘাত হয়। সমস্ত বাড়ির মধ্যে এই মেয়েটিকে আহারে বিহারে শয়নে শিক্ষায় তিনি নিজের কাছে একান্ত করিয়া টানিয়া লইয়া-ছিলেন। এতদিন যে ব্যক্তি মিল, বেন্থাম লইয়া দিবারাত্র আলোচনা করিয়াছে, আজ সে-ই সাত-আট বৎসরের মেয়েকে বোধোদয় এবং রয়্যাল রীডার পড়াইতে লাগিল। প্রকৃতির যে দিকটা চন্দ্রকান্তের মনে বহুদিন হইতে অস্বাভাবিক ভাবে রুদ্ধ ছিল আজ কেবলমাত্র এই মেয়েটির উপর দিয়াই যেন তাহা দ্বিগুণ বেগে প্রবাহিত হইল।

এমনই করিয়া এখন নির্ম্মলা সতেরো বৎসরেরটি হইয়াছে। বেথুন কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে সে পড়ে।

তাহার বাবা তাহার জীবনকে এমন করিয়া ঘিরিয়া ছিলেন, যে, সে-আবরণ ছিন্ন করিয়া আর কিছুর প্রবেশ-পথ নাই। তাই সতেরো বছরের কলেজে-পড়া মেয়ে যেমন হয়, যেমন হওয়া উচিত, নির্ম্মলা আদৌ সেরূপ ছিল না। কলেজে সে সকলের চেয়ে সামনের বেঞ্চিতে বসিত, প্রফেসরের লেকচার অবহিত হইয়া শুনিত। কমনরুমে গিয়া যখন বসিত, তখন সর্ব্বদাই হাতে থাকিত কোন একখানা বই। কলেজের মেয়েরা হাসি চাপিয়া বলিত "নির্ম্মলার কথা আর বল কেন?...ও বড্ড ভাল মেয়ে। কিন্তু দরকার নাই বাপু আমাদের অত ভাল হয়ে।"

সে হাসি অথবা সে ইঙ্গিতের কোন অর্থ নির্ম্মলা বুঝিত না। কারণ ও-সব তার কানেই যাইত না। কলেজের ছুটি হইলে উৎফুল্ল হইয়া ভাবিতে বসিত, এই ত আর একটুক্ষণ পরেই বাড়ি যাইতে পাইব। কলেজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া নির্ম্মলা বিকালের গা-ধোওয়া শেষ করিয়া যখন বাহিরে তাহার বাবার ঘরে সুইচ টিপিয়া ঘরখানি আলোকিত করিত, সেই আলোর রশ্মি তাহার শাদা কালো পাড়ের শাড়ীতে, হাতের দুইগাছি শাদা সাপ্টা বালায়, প্রশান্ত ললাটের স্বর্ণাভ রুচি কেশের দুই-একটি বিক্ষিপ্ত অংশে আসিয়া পড়িত, তখন সে ঘরখানি যেন একটি বিশেষ শ্রী পাইত। সে-ঘরের সমস্তই যেন তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়াছিল। নির্ম্মলাকে কেন্দ্র করিয়াই সেই ঘরটি যেন গড়িয়া উঠিয়াছে। টেবিলের উপর তাহারই হাতের কারুকার্য্য করা টেবিল-ঢাকা বাতাসে কাঁপিতেছে, শেলফের উপরকার বইগুলি সে নিজে বিশেষ পরিপাটি করিয়া সাজাইয়াছে। দেয়ালের গায়ের খানিকটা অংশ শালু দিয়া মুড়িয়া সেখানে চন্দ্রকান্তবাবুর ওভারকোট, বেড়াইতে যাইবার ছড়ি এবং শাল, কাঠের ঝোলান আলনায় টাঙান আছে। ঘরের মাঝে একটি বড় গোল টেবিল। চারি পাশে গুটিকতক চেয়ার সাজান। একপাশে একখানি তক্তাপোষের উপর শুভ্র বিছানা।

চন্দ্রকান্ত বাবুও সারাদিনের মধ্যে এই বিকালবেলাটুকুর অপেক্ষা করিয়া থাকেন কখন নির্ম্মলা আসিবে, কখন তাহার কলেজের ছুটি হইবে। এই মেয়েটি তাঁহার কাছে বিশেষ আকর্ষণ। সেই আট বৎসর বয়স হইতে আজ অবধি সহস্র কাজ থাকিলেও তাহাকে নিজে দু-বেলা না পড়াইলে চলে না। সে নিজের হাতে চা তৈয়ারী করিয়া না দিলে তাঁহার বিকালের মজলিস জমে না। তিনি যে-কাজ করুন, যে-কথা বলুন, যে-ভাবনা ভাবুন, সমস্তেতেই নির্ম্মলার সায় পাওয়া চাই। এমনি করিয়া পিতার সহিত কন্যার একটি রসসিক্ত স্নেহ-মধুর সম্পর্ক সৃষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। নির্ম্মলা তাহার মনের কথার ভাগ বাবাকে দিত, এবং তাহার বাবা তাঁহার বেদান্ত এবং দর্শনের মতামত হইতে শার্টের বোতাম ও কোর্টের কলার অবধি নির্ম্মলার হেপাজতে রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। তিনি অমুক বিষয়ে কি মনে করেন, বুধবার বিকালে হেদুয়ার ধারে বেড়াইতে গিয়া তিনি ছাড় ফেলিয়া আসিয়াছেন কি-না, চায়ে তিনি ক' চামচ চিনি খান, সোমবারে তাঁহাকে কোন একটা বিশেষ জরুরি চিঠি লিখিতে হইবে—এ সকল কথা নির্ম্মলাকে নিত্য স্মরণ রাখিতে হইত।

বাবার নিকট যে-পরিমাণে প্রশ্রয় পাইত, স্বল্পভাষী গৃহকার্য্যরতা মায়ের নিকট তেমনি সে একেবারেই আমল পাইত না। ম্যাট্রিক দিবার পরেও নিরস্ত না হইয়া চন্দ্রকান্ত যখন খরচপত্র করিয়া মেয়েকে কলেজে পড়িতে দিলেন, তখন জীবনের মধ্যে প্রথম সুশীলা স্বামীর কাজের মৃদু প্রতিবাদ

করিয়া কহিলেন, "মেয়েমানুষের অত লেখাপড়ায় কাজ কি? নিজেদের অবস্থার কথাটাও ত ভেবে দেখতে হবে। বড় বৌ-মার প্রায় বছর দুই যে হয়েছে, একদিনের জন্তও তত্ত্ব করতে পারিনি ...” চন্দ্রকান্ত তাঁহাকে কথা শেষ করিবার অবসর না দিয়াই কহিলেন, "তুমি যাও। ওসব কথা আমার সামনে উচ্চারণ ক'রো না। সুধাংশুর বিয়ে দিতে কে বলেছিল? আমার পরামর্শ নিয়েছিলে? পুরুষ মানুষে যতদিন না উপার্জনক্ষম হয়ে পরিবার প্রতিপালন করতে পারে ততদিন তার বিয়ে করা মহা অন্যায়।"

সুশীলা প্রতিবাদ না করিয়া সরিয়া গেলেন। বস্তুতঃ ছেলেদের ব্যাপারে কখনও তিনি চন্দ্রকান্তকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতেন না। ইদানীং আয় কমিয়া আসিয়াছিল, নানা আপদবিপদে ব্যাঙ্কের মজুদ টাকায় হাত পড়ায় সুদ কমিয়া গিয়াছে। দুটি ছেলে কলেজে পড়ে, একটি স্কুলে পড়ে। তাহাদের পড়ার খরচ আছে। চন্দ্রকান্তের বয়স হইয়াছে, এ বয়সে তিনি যে আবার নূতন করিয়া চাকরি করিবেন সে আশাও নাই। তাই সুশীলা ভাবিয়া-চিন্তিয়া বকুলবাগানের দত্তবাড়িতে বড়ছেলে সুধাংশুর বিবাহ দিয়াছেন। মেয়েটি দেখিতে চলনসই, সুন্দর নয়। কিন্তু তাহার বাবা আলীপুরের বড় উকীল এবং মেয়েটি ছাড়া তাঁহার আর ছেলেপুলে নাই। আশা আছে ল' পাস করিতে পারিলে শ্বশুরকে মুরুব্বি ধরিয়া সুধাংশু নিজের পথ করিয়া লইবে। মেজছেলের জন্তও এমনি কোন একটা ফন্দী সুশীলার মাথায় ছিল। কিন্তু তার দেরি আছে। আপাততঃ এ সংসার এমনই করিয়া দ্বিধাবিভক্ত হইয়া চলিতেছিল।

বাহিরের ঘরে যেখানে উজ্জ্বল আলো জ্বলিত, চায়ের সঙ্গে সরস আলোচনা চলিত, শেলী, বায়রনের সহিত বেন্থাম, মিল, কান্টেরও আলোচনার স্রোত বহিয়া যাইত, রবিঠাকুরের আধ্যাত্মিক মতবাদটা সুস্পষ্টরূপে যে কি, তাহাই নির্ণয় করিতে তর্ককারীদের মধ্যে হাতাহাতি হইবার উপক্রম হইত, যেখানে তাঁহার বন্ধুরা পরাধীন ভারতবর্ষকে কল্পনার উড়ো জাহাজে চড়াইয়া মুক্তির সাগরে অর্দ্ধেক পাড়ি জমাইয়া আনিতেন, যেখানে জ্ঞানের অবাধ বিস্তার, সংসারের মাধ্যাকর্ষণ যেখানে নাই বলিলেই চলে, সেখানে কেবল আইডিয়া আর আইডিয়াল, স্বপ্ন আর স্বপ্ন, আর অগাধ কল্পনার রাজ্য, সেইখানেই নির্ম্মলা স্থান পাইয়াছিল এবং অন্তঃপুরের মধ্যে রান্নাঘরে মিটমিটে প্রদীপের সামনে তাহার মা শুষ্ক নির্নিমেষ চক্ষে সেই ক্ষীণ আলোক শিখার দিকে চাহিয়া নিজের সংসারের বাকী সমস্ত ভাবনা চিন্তার মধ্যে মগ্ন হইয়া থাকিতেন। সে মহলে নির্ম্মলা কোন দিন ঢুকিতে পায় নাই। কারণ নির্ম্মলাকে ছাড়া বাকী সংসার সম্বন্ধে তাহার বাবার যেমন একটা স্বাভাবিক অচেতনতা ছিল, নির্ম্মলার বিষয়েও তাহার মায়ের তেমনি একটা নিঃশব্দ ঔদাসীন্য ছিল।

৩

নির্ম্মলা ঠিক বুঝিতে পারে না, কিন্তু মাঝে মাঝে অনুভব করে তাহার বাবা সুখী নহেন। নিজেরই জীবনের মাঝখানে কোনখানে তাঁহার একটা প্রত্যহ পুঞ্জীভূত সুগোপন ক্লেশ আছে, যাহাতে করিয়া তাঁহার এবং তাঁহার সংসারের মাঝে একটা বিদারণ-রেখা পড়িয়াছে। একদিকে তিনি নিঃসঙ্গ একলা, তাই যেন নির্ম্মলাকে ব্যগ্র ব্যাকুল স্নেহ-বন্ধনে কেবলই জড়াইয়া ধরিতেছেন। নির্ম্মলার বয়স তখন সবেমাত্র সতের। এ-সব বুঝিতে পারার তাহার কথাও নয় এবং এ ধরণের ভাবনাও তাহার মনে স্থান পাইবার কথা নয়। কিন্তু বাবার সম্বন্ধে তাহার অনুভূতি এবং চেতনা এত তীক্ষ্ণ ছিল যে, খুব ভাল করিয়া বুঝিতে না পারিলেও অনেক সত্যের আভাস পাইত। মা'র সহিত বাবাকে সে কোনদিন রাগারাগি করিতে দেখে নাই, কোনদিন একটা জোরে কথা বলিতে শোনে নাই, তবুও বাবার জন্ত মাঝে মাঝে তাহার ভয়ানক মন কেমন করে, কষ্ট হয়। সুশীলা তাঁহার পূজা-অর্চ্চনা, গো-সেবা, এত বড় একটা সংসারের সমস্ত কাজ লইয়া যেন নিজের মধ্যে একেবারে মগ্ন হইয়া আছেন। নিজেকে তিনি একেবারে ভুলিয়াই গিয়াছেন। কিন্তু চন্দ্রকান্ত? একটা দিনের কথা নির্ম্মলার মনে পড়ে, সেদিন কলেজে প্রথম ঘণ্টাপড়ার পরেই ছুটি হইয়া গিয়াছিল। বেলা তখন প্রায় বারোটা। বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া কি একটা বই লইতে বাহিরের ঘরে ঢুকিতে গিয়া সে

থমকিয়া দাঁড়াইল। চন্দ্রকান্ত জানালার কাছে একটা চৌকিতে বসিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া ছিলেন। বহুক্ষণ নিঃশব্দে তাঁহার দিকে তাকাইয়া থাকিয়া নির্ম্মলা চলিয়া গেল। বই লইতে ঘরে আর ঢুকিল না। সেদিন তাহার হঠাৎ মনে হইল, তাহার বাবার মত একলা বুঝি আর কেহ নাই। তাঁহাকে সকলে মিলিয়া দূরে সরাইয়া রাখিয়াছে। তাঁহাকে কেহ বোঝে না, বুঝিতে চায় না। কেহ কোন প্রশ্ন করে না, জবাবদিহি খোঁজে না। নিজের কাছে ভালমন্দ, নিজের জীবনের সুখদুঃখ, সমস্ত লইয়া তিনি স্বতন্ত্র একাকী বসিয়া আছেন। বেলা বারোটার সময় রৌদ্রপ্লাবিত নিস্পন্দ নীল আকাশের দিকে চাহিয়া আপন জীবনভারের শ্রান্তিতে তাঁহার চিন্তার গতি যেন থামিয়া গিয়াছে।

নির্ম্মলা কেবল কলেজের লেখাপড়া লইয়া ব্যস্ত থাকিত, মায়ের কাজের সাহায্য করিত না এমন নয়। কিন্তু সুশীলা তাহাকে ইচ্ছা করিয়া দূরে ঠেলিয়া দিতেন। মনে হইত মেয়ের প্রতি তাঁহার মনের কোমল ভাব যেন ছিলই না। কাল সন্ধ্যা হইতে সুশীলার একটুখানি জ্বরের মত হইয়াছে। পরের দিন সকালে নির্ম্মলা ভয়ে ভয়ে কাছে আসিয়া বলিল, "মা, আজ কলেজ নাইবা গেলুম, তোমার শরীর খারাপ, আমাকে দেখিয়ে দাও, আজকের মত আমি রাঁধি। সুশীলা উৎসাহ দেখাইলেন না; চুপ করিয়া থাকিলেন। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, 'না বাছা, সে হবে না; তুমি কলেজে যাও। তুমি যে কলেজ না গিয়ে হেঁসেলে হাঁড়ি ঠেলবে, বিধাতা-পুরুষ তেমন বিধান দেন নি।"

নির্ম্মলা মায়ের উত্তর শুনিয়া মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার বড় বড় নীল চোখে জলের আভাস দেখা দিল। তাহার পরে নিঃশব্দে আস্তে আস্তে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

মা যখন তাহাকে স্নেহহীন অকরুণভাবে ফিরাইয়া দিলেন, নির্ম্মলা নিজের হৃদয়ভার বহন করিয়া অভ্যাসমত বাহিরের ঘরের দিকে আসিতেছিল; শুনিতে পাইল চন্দ্রকান্ত উত্তেজিত ভাবে কাহার সহিত তর্ক করিতেছেন। এ ঘটনা এমন কিছু নূতন নয়। কোন একটা তর্ক করিবার মত বিষয়বস্তু পাইলেই তাঁহার তর্ক উদ্দাম হইয়া উঠে। পর্দার আড়ালে ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া সে চলিয়া আসিতেছিল। কিন্তু হঠাৎ ঠিক এই সময়টাতেই তাহার বাবা দ্বারের দিকে চাহিয়া চুড়িবালার টুং টাং শব্দ শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কে? ওঃ, নির্ম্মল বুঝি? তা, ঘরে এসে বোস না মা।"

নির্ম্মলা ঘরে ঢুকিয়া পিতার কাছে ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল।

নিজের কেশবিরল মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে তিনি কহিলেন, "নির্ম্মল, চট্ ক'রে এক পেয়ালা চা তৈরি ক'রে এনে আমাকে খাওয়াতে পারিস্ মা।" নির্ম্মলা আপত্তি করিয়া কহিল, "এত বেলায় এমন অসময়ে চা খেতে হবে না। তুমি ত আজ সকালে দুধ খাওনি। তার চেয়ে আমি বরঞ্চ হরলিক্স মল্টেড মিল্ক দিয়ে এক পেয়ালা দুধ নিয়ে আসি।"

বলিয়া চোখ তুলিয়া চাহিতেই দেখিল টেবিলের অপর প্রান্তের একখানা চেয়ারে বসিয়া একজন অপরিচিত মানুষ তাহার দিকে চাহিয়া আছে। তাহার দৃষ্টিতে বিস্ময়, মুগ্ধতা, সম্ভ্রম।

চন্দ্রকান্ত তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "দেখলে ত যামিনী, আমার নিজের কোন স্বাধীনতা নেই। ভেবেছিলুম তোমাকে তর্কে হারাব, কিন্তু চা মঞ্জুর হ'ল না।" "দেখুন," যামিনী বলিল, "চা খেতে যখন ইচ্ছে করে তখন তার বদলে দুধ দিলে সেটা রুচির প্রতি অত্যাচার করা হয়।"

নির্ম্মলার দিকে চাহিয়া তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই সে বলিল। নির্ম্মলা কোন উত্তর দিল না। চন্দ্রকান্ত বলিলেন, "নির্ম্মল, লজ্জা করচিস কেন? ও ত যামিনী।"

যামিনী হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "দেখলেন আপনার বাবার ধরণ? মনে করেন আমি এত বিখ্যাত ব্যক্তি, যে, আমার কেবল নামটা ব'লে দিলেই সব ব'লে দেওয়া হয়।" ইহারও উত্তরে নির্ম্মলা কিছু বলিতে পারিল না, কেবল সলজ্জ স্নিগ্ধ হাস্যে মুখ তুলিয়া নমস্কার করিল।

অবশ্য তাহার সঙ্কোচ করিবার কোন কারণ ছিল না। চন্দ্রকান্তের বাহিরের ঘরে যাহারা আসিত তিনি নির্ব্বিচারে সকলের সহিত নির্ম্মলার পরিচয় করিয়া দিতেন। শিশু-কাল হইতে বাবার কাছে কাছে থাকিয়া বাহিরের অপরিচিত পুরুষের সংস্পর্শে সে এমনই অভ্যস্ত হইয়াছে যে, ইহাতে তাহার অযথা কোন সঙ্কোচ আর নূতন করিয়া হয় না। কিছুকাল চুপ করিয়া থাকিয়া সে মৃদুস্বরে কহিল,

"রুচির অত্যাচারের কথা বলছিলেন ; কিন্তু এই বয়সে বাবার শরীরের উপর অত্যাচার কি সহ্য হবে ?"

"আপনার কাছে হার মানলুম। কিন্তু আসল কথাটা বলি, ইচ্ছে ছিল ওঁর দোহাই দিয়ে অসময়ে আমি নিজেও এক কাপ চা খাব।"

"কি মুস্কিল ! আমি এখনই তৈরি ক'রে আনছি।"

যামিনী বেতের চেয়ারে ভাল করিয়া নড়িয়া চড়িয়া বসিল। চাহিয়া দেখিলেই বোঝা যায় ছেলেটি অত্যন্ত চঞ্চল এবং তীক্ষ্ণধী। বয়স বোধ করি বাইশ-তেইশ। মিনিট পনের পরে নির্ম্মলা চা আনিল। ঘড়ির দিকে চাহিয়া চন্দ্রকান্ত কহিলেন, "দশটা যে বাজে। নির্ম্মল, তোমার কলেজের সময় হয়ে এল।'

"ভাবছিলুম আজ কলেজ যাব না"—নির্ম্মলা অস্ফুট কণ্ঠে কহিল, "মায়ের শরীর খারাপ।"

"আপনিও যে দেখচি একটুখানি ছুতো পেলেই কলেজ কামাই করেন।' যামিনী হাসিয়া বলিল।

"তাই না কি ?" নির্ম্মলার মুখেও হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল। একটুখানি আগে মায়ের উপর অভিমান হইয়া তাহার চোখের নীলাভ তারার কিনারায় যেটুকু অশ্রুজলের ঝিকিমিকি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল, স্নিগ্ধ হাস্য-পরিহাসে সে সমস্তই মন হইতে মিলাইয়া গেল।

যামিনী বলিল, "আপনি মনে করচেন আপনার দোষ ধ'রে আমি নিজে কেন উঠ্‌বার নাম করচিনে। আমার কি লেখাপড়া কিংবা কলেজের বালাই নেই ? কিন্তু আমার কি জানেন, কলেজ কামাই করতে পেলে ছাড়িনে !"

"ভালই তো। আমারও কলেজের উপর বিশেষ প্রীতি নেই।"

"কিন্তু আমি যে 'ল' পড়ি। ল' পড়ায় কলেজ যাওয়া কিংবা-না যাওয়ার কোন মানে হয় না।"

নির্ম্মলা উঠিয়া পড়িয়া কহিল, "কোন রকম পড়াতেই কলেজ না যাওয়ায় বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না, যদি লেক্‌চার শোনার বদলে বাড়িতে ব'সে সেই বিষয়ের ওপর ভাল বই পড় যায়। কিন্তু মিথ্যে বাড়িতে ব'সে থেকেই বা কি হবে, আমি যাই।" তাহার আবার মনে পড়িয়া গেল, মায়ের শরীর খারাপসত্ত্বেও তাহাকে কোন কাজ করিতে দেন নাই এবং দিবেন না। মনে পড়িতেই তাহার মন অভিমানে পূর্ণ হইয়া উঠিল এবং খাওয়া-দাওয়ার পরে প্রস্তুত হইয়া সে যখন বই-হাতে কলেজের বাসে উঠিতেছে, তখনও বাহিরের ঘরে যামিনী ও তাহার বাবার উত্তেজিত তর্কের রেশ শোনা যাইতেছে।

ক্রমশঃ

মথুরাপুর দেউল

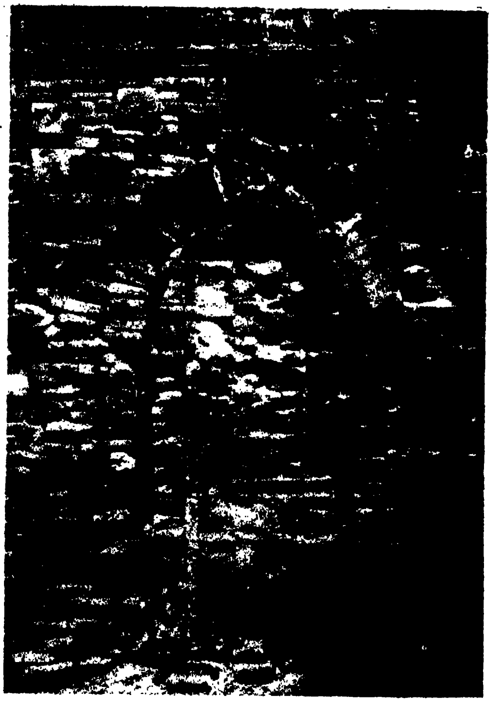
শ্রীগুরুসদয় দত্ত

মথুরাপুরে একটি অতি প্রাচীন অর্দ্ধভগ্ন দেউল আছে—বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্র শ্রীযুক্ত অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়ের নিকট এই সংবাদ শুনিয়া ইহা দেখিবার আকাঙ্ক্ষা আমার মনে জাগ্রত হয় ; গত পূজার ছুটিতে অজিত বাবুর পিতার আতিথ্য গ্রহণ করিয়া ইহা দেখিয়া আসিয়াছি।

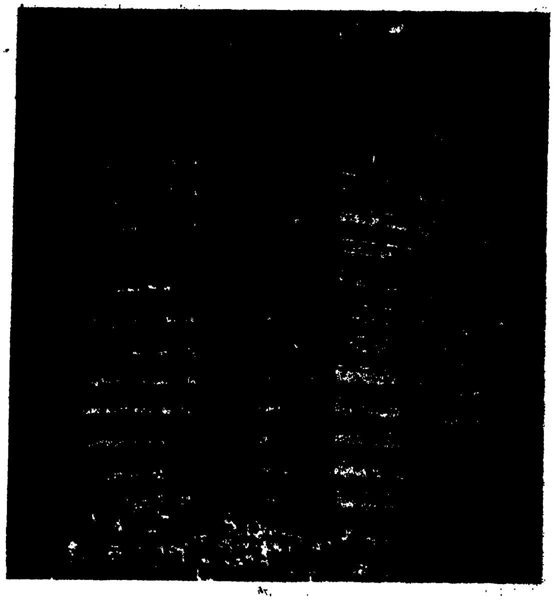
দেখিবার মত জিনিষ এই মথুরাপুর দেউল—স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য শিল্পে বাঙালীর বৈশিষ্ট্যের নিদর্শন।

(১)

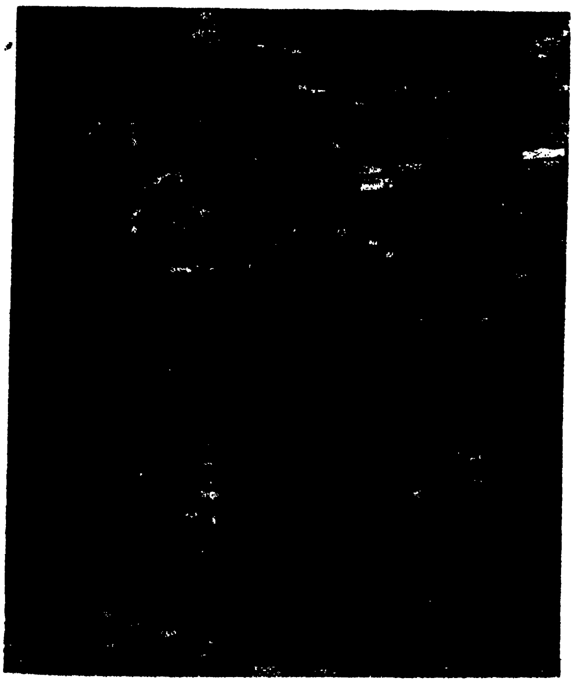
মথুরাপুর গ্রাম ফরিদপুর জিলার রাজবাড়ি মহকুমার অন্তর্গত। ইস্‌টার্ণ বেঙ্গল রেলপথের কালুখালি-ভাটিয়াপাড়া শাখার নলিয়াগ্রাম হইতে তিন মাইল ও কালুখালি হইতে এক মাইল দূরে ইহা অবস্থিত। পূর্ব্বে রেলপথ ও পশ্চিমে চন্দনা নদী হইতে প্রায় সমদূরবর্ত্তী স্থানে এই দেউল। শতাব্দীর পর শতাব্দী এই পল্লীগ্রামে এই উন্নত শিখর দেউল দাঁড়াইয়া আছে—কোন ঐতিহাসিক, ভাস্কর কিংবা প্রত্নতত্ত্ববিদের দৃষ্টি ইহার প্রতি আকৃষ্ট হয় নাই। আমি যখন প্রথম ইহা দেখিতে যাই তখন ইহার চারিদিকে প্রায় ১০ ফুট উচু কাঁটা জঙ্গল। অতি কষ্টে একটি সরু পথ ধরিয়া



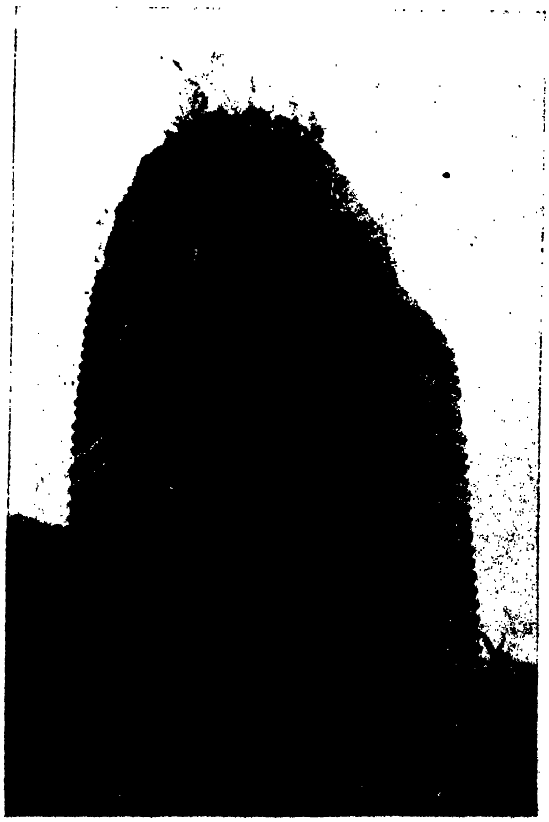
কৃত্রিম দ্বার—উত্তর



প্রাচীরগাত্রে কারুকার্য্য

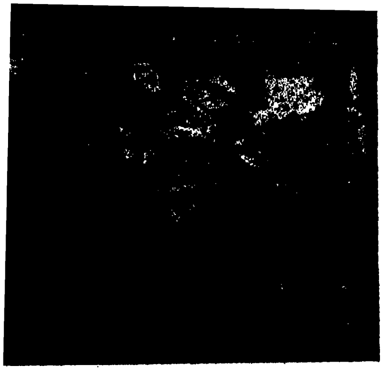


প্রধান দ্বার—পশ্চিম



মথুরাপুর দেউলের পশ্চিম দ্বার

ামি দেউলের পাদদেশে উপস্থিত হইতে সমর্থ হইলাম। াটায় আমার সর্ব্বাঙ্গে ভীষণ আঁচড় লাগিয়াছিল। দক্ষিণ কের দ্বারের উপরি ভাগের ও প্রাচীরগাত্রের চিত্রসমূহ আমার াখে পড়ে—ইহাতে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কিছু নাই। মন্দিরের সমাগমে শান্তি ভঙ্গ হওয়ায় কতকগুলি বাদুড় চঞ্চল হইয়া উঠিতে লাগিল—ইহা ব্যতীত অন্য কোন প্রাণী ছিল না। বাহির হইতে যত মনে করিয়াছিলাম, ভিতরটা কিন্তু তত অন্ধকার নহে। উপরের চূড়া ভগ্ন—আলো ভিতরে প্রবেশ



াম ও হনুমান



মন্দিরগাত্রে। মধ্যস্থলে [illegible]

অভ্যন্তরভাগ ভীষণ অন্ধকারময়, তবু আমি ভিতরে প্রবেশ করিতে মনস্থ করিলাম। ইহাতে যথেষ্ট বিপদের আশঙ্কা, কারণ হয়ত ঐ দেউল এখন বন্যপশুর বিশ্রামস্থান অথচ আমাদের সঙ্গে আত্মরক্ষার কোনই অস্ত্র নাই। কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করিয়া বুঝিলাম আমাদের আশঙ্কা অমূলক। অকস্মাৎ লোক-করিবার বেশ পথ পায়। আলোকে দেখিলাম—এই দক্ষিণ-দ্বার ব্যতীত পশ্চিম দিকেও একটি দ্বার আছে, কিন্তু এত জঙ্গল যে গমনাগমন অসম্ভব। লোক নিযুক্ত করিয়া পশ্চিম-দ্বারের নিকটবর্ত্তী জঙ্গল পরিষ্কার করিতেই একটি নূতন দৃশ্য ভাসিয়া উঠিল। দেউলের সম্মুখ দিকের প্রাচীরে স্তরে স্তরে নানা বিচিত্র মূর্ত্তি উৎকীর্ণ।



যজ্ঞকুণ্ড

বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া ভাল করিয়া পরীক্ষা করিবার জন্য আমি নিকটবর্ত্তী অশ্বত্থ বৃক্ষে আরোহণ করিয়া প্রায় ১৫ ফুট ঊর্দ্ধে উঠিলাম। এইবার মূর্ত্তিগুলির স্বরূপ আমার চক্ষে ধরা পড়িল, ইহাদের অনুপম সৌন্দর্য্য ও গুরুত্ব উপলব্ধি হইল। কিন্তু সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছিল; বেশীক্ষণ দেখিতে পাইলাম না, তাই প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

ক্ষণকালের দর্শনে আমার কৌতূহল পরিতৃপ্ত হইল না, বরং বৃদ্ধি পাইল। চারিদিকের জঙ্গল পরিষ্কার করিতে লোক নিযুক্ত করা হইল। দেউলটিকে চারিদিকে ঘিরিয়া প্রায় দশ ফুট স্থান এই ভাবে মুক্ত হইলে আমি পুনরায় গমন করিলাম। দেখিলাম ভূমি হইতে অন্ততঃ ৫ ফুট ঊর্দ্ধ পর্য্যন্ত প্রাচীরের বিশেষ অনিষ্ট হইয়াছে—কোথাও বা নোনা ধরিয়াছে, কোথাও বা গাছের শিকড়ে ফাটল ধরিয়াছে। পশ্চিম, পশ্চিম-দক্ষিণ,

উত্তর-পশ্চিম এই তিনটি সম্মুখস্থ দেওয়ালেই ভাস্কর্য্যের উৎকর্ষ। এই মূর্ত্তি ভাস্কর্য্যের তেরটি লম্বা লম্বা সারি, তন্মধ্যে পশ্চিম-দ্বারের উপরস্থ ছ'টি অটুট আছে।

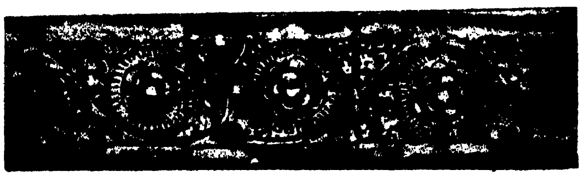
ভূমি হইতে সঠিক পর্য্যবেক্ষণ সম্ভবপর নহে বুঝিয়া আমি



ভরত ও রাম

কয়েকটি মাচা প্রস্তুতের উপদেশ দিয়া ফিরিয়া আসিলাম।

পরদিন মাচায় উঠিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে চমৎকৃত হইলাম। নিম্নভূমি হইতে একটি পশু-চিত্রের সারি দেখিয়া





মন্দিরগাত্রে কারুকার্য্য

আমার ধারণা হইয়াছিল বুঝি-বা এই পশুগুলি ঘোড়া! নিকটে আসিয়া দেখি এগুলি সিংহ।—পদ্মবনের ভিতর দিয়া নানা





কীর্ত্তিমুখ

বিচিত্র ভঙ্গীতে ইহারা চলিয়াছে—ইহাদের কেশর ও লেজ বীর্য্যবান্ ঢঙে উৎকীর্ণ,—তাহাতে পৌরুষ, সংযম ও গর্ব্বের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভাস্কর্য্যে এরূপ বীর্য্যবান মূর্ত্তি আর কোথাও আমি দেখি নাই। আমার নিঃসন্দেহ ধারণা হইল যে, এই দেউলটি বিজয়স্তম্ভ ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না।

এই তিনটি সম্মুখ দিকের দেওয়ালের দক্ষিণাংশে রামলীলা ও উত্তরাংশে কৃষ্ণলীলার নানাবিধ মূর্ত্তি।



কৃষ্ণলীলা

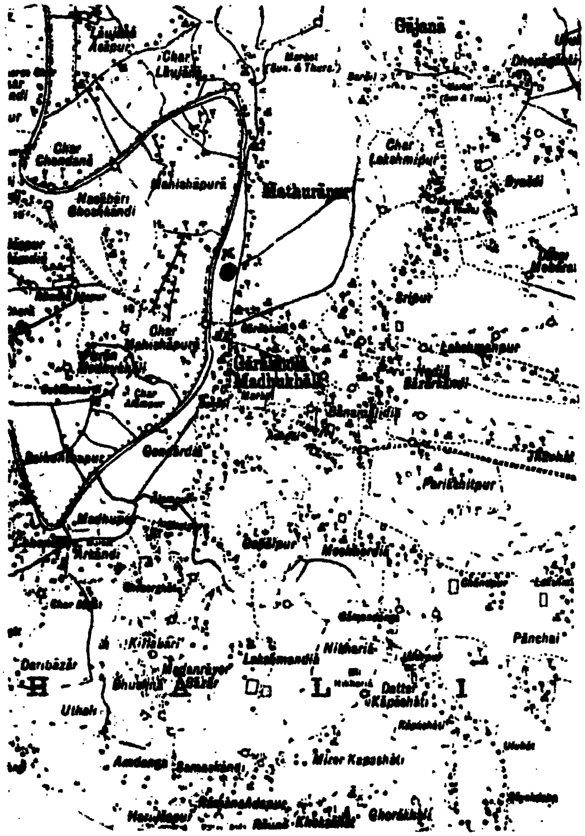
এই দেউলের ঐতিহাসিক, স্থাপত্যগত ও ভাস্কর্য্যগত মূল্য সম্পর্কে আমার মনে আর কোন দ্বিধা রহিল না। আমি আরও কয়েক দিন দেউলটি ভাল করিয়া পরীক্ষা করিবার সুযোগ গ্রহণ করিলাম।

২

এই দেউল যে অতি প্রাচীন এ-বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনই কারণ নাই। মেজর রেনেল তাঁহার জর্ণাল বা স্মৃতিকথায় লিখিয়াছেন—

৮ জুলাই ১৭৬৪—অদ্য অপরাহ্ণে দক্ষিণ-পূর্ব্বে দুই তিন মাইল দূরে একটি উচ্চ মন্দির দেখিলাম। ইহা মোত্রাপুর গ্রামের নিকটবর্ত্তী।

১০ জুলাই—মোত্রাপুরের মন্দিরের পাশ দিয়া গেলাম। গ্রামটি নদীর উত্তর তীরেই অবস্থিত। মন্দিরের দুই মাইল দূরে একটি বড় নদী পূর্ব্বদিকে বাঁকিয়া গিয়াছে। ইহা দিয়া সময় সময় বড় বড় নৌকা চলিতে



মথুরাপুর (রাজস্ব জরীপ মানচিত্র)

পারে, কিন্তু শীতকালে কোন কোন স্থানে একেবারেই জল থাকে না, শুকাইয়া যায়। নদীটি জয়নগর ও হবিগঞ্জের পথে চলিয়াছে; এই বাঁক হইতে নদীটি চন্দনা নামের পরিবর্ত্তে কুমার নামে পরিচিত।

মেজর রেনেলের জর্ণালের সম্পাদকগণ এইস্থলে একটি পাদটীকা জুড়িয়া দিয়াছেন (মেময়র্স অব্ দী এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, ভলুম ৩, নং ৮, পৃ ৯৫—২৪৮)

পাদটীকা—এই নদী ও কুমার নদীর সঙ্গমস্থলে মথুরাপুর অবস্থিত। এই সময়ের ৭০ বৎসর পূর্ব্বে বৈদ্যবংশসম্ভূত সংগ্রামশাহ নামক এক ব্যক্তি দ্বারা নির্ম্মিত। কিন্তু জনৈক মিস্ত্রী চূড়া হইতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করায় মন্দির অসমাপ্ত রহিয়া যায়।

মেজর রেনেলের মানচিত্রে মথুরাপুর বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। যদিও মানচিত্রে দেউলের উল্লেখ নাই, তথাপি ইহার অবস্থান-নির্ণয় কঠিন নহে। রেনেলের মানচিত্র হইতে লঘিমা ২৩°৩৩´ ও দ্রাঘিমান্তর কলিকাতা হইতে পূর্ব্বে ১° ১৫´ নির্ণয় করা যায়। ইহা আমি রেভেনিউ সার্ভে মানচিত্রে দেউলের অবস্থানের সহিত মিলাইয়া দেখিয়াছি।

স্থানীয় কিম্বদন্তীও সংগ্রাম শাহ কর্ত্তৃক এই দেউল নির্ম্মাণের কথাই সমর্থন করে, কিন্তু তিনি কোথা হইতে এই গ্রামে আগমন করেন সে-সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ বলেন, তিনি কাশ্মীর হইতে আসিয়াছিলেন, কেহ বলেন রাজপুতানা হইতে, কেহ কেহবা কোন বিশেষ দেশের নাম না করিয়া বলেন যে তিনি উত্তর দিক হইতেই আসিয়াছিলেন। স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে বর্ণশ্রেষ্ঠ কোন্ জাতি, তাঁহার এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি অবগত হইলেন যে ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ। যখন তিনি জানিলেন যে ব্রাহ্মণের নীচেই বৈদ্যবর্ণের স্থান, তখন তিনি বলিলেন—হাম বৈদ্য। স্থানীয় অধিবাসীরা তাঁহার



মথুরাপুর (মেজর রেনেলের মানচিত্র)

কথার অর্থ (আমি বৈদ্য) না বুঝিয়া ধারণা করিল যে, "হামবৈদ্য" স্বতন্ত্র একটি বর্ণ এবং সংগ্রাম শাহ সেই বর্ণের

লোক। কথিত আছে যে, তিনি বলপূর্ব্বক স্থানীয় এক বৈদ্য পরিবারে বিবাহ করেন এবং নিজের কন্যাগণকে পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহের বৈদ্য পরিবারেই বিবাহ দেন। ইঁহাদের বংশধরগণ এখনও "হামবৈদ্য" বলিয়া পরিচয় দিতে গর্ব্ব অনুভব করেন।

সংগ্রাম শাহ আদেশ করেন যে, ইহা এত উচ্চ করিতে হইবে যে, চূড়া হইতে যেন ঢাকা নগর দেখা যায়। দেউল নির্ম্মাণ যখন শেষ হইল তখন সংগ্রাম শাহ প্রধান মিস্ত্রীকে চূড়ায় আরোহণ করিতে ও ঢাকা নগর দেখা যায় কি-না বলিতে বলিলেন। মিস্ত্রী চূড়ায় উঠিয়া ঢাকা দেখিতে পায় নাই। সে নিজের দোষ স্খালনের জন্য বলিল, যে, সে আরও মাল মসলা পাইলে আরও উঁচু করিতে পারিত; তখন ঢাকা দেখা যাইত। ইহাতে সংগ্রাম শাহের ক্রোধ হইল। আরও জিনিষপত্র সে কেন চাহিল না এই অপরাধে তাহার প্রাণদণ্ড হইবে, সংগ্রাম শাহ এরূপ শাসাইলে মিস্ত্রী ঐ চূড়া হইতে লাফ দিয়া আত্মহত্যা করে।



কীর্ত্তিমুখ ও সিংহ



সিংহের বিজয়যাত্রা



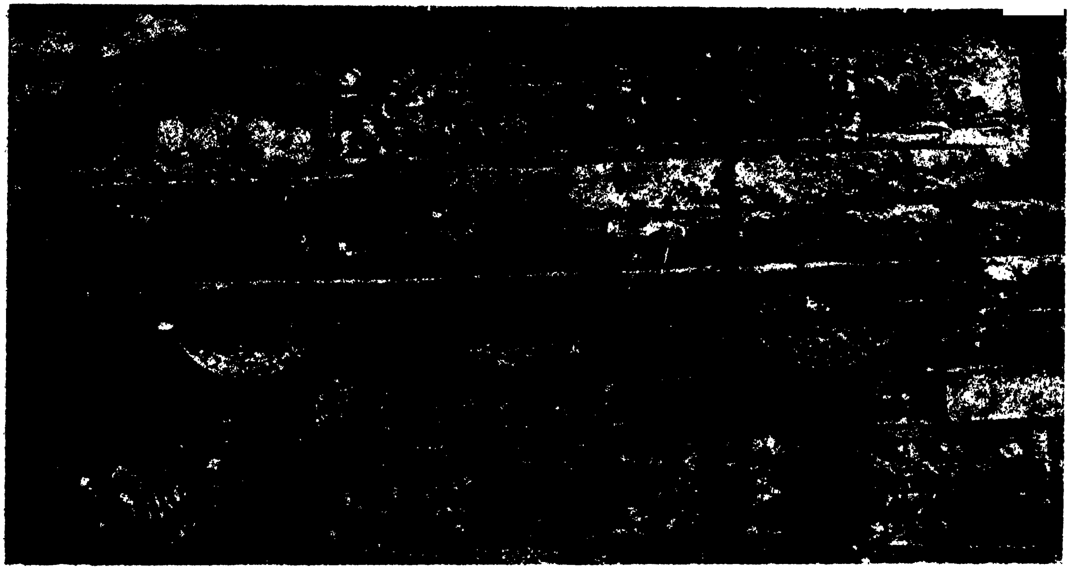
রামায়ণ দৃশ্য

এই শোচনীয় ঘটনার পর এই দেউল সম্পূর্ণ করা হইল না, কোন বিগ্রহ স্থাপনের প্রশ্নও উঠিল না।

রেনেলের স্মৃতি কথার সম্পাদক পাদটিকায় বোধ হয় এই কিম্বদন্তীর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

সীতারাম রায়ই এই দেউল নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, এরূপ একটি কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে; কিন্তু সংগ্রাম শাহ সম্পর্কে কিম্বদন্তী যতটুকু প্রবল সীতারাম রায় সম্পর্কে ততটুকু নয়।

আনন্দনাথ রায় প্রণীত ফরিদপুরের ইতিহাস গ্রন্থে এক সংগ্রাম শাহের বিস্তৃত বিবরণ আছে। টডের রাজস্থানে ঔরংজেবের মনসবদার বলিয়া এক সংগ্রাম শাহের উল্লেখ আছে এবং বাংলাদেশে এক সংগ্রাম শাহ বারভূঁইয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন ও জলদস্যুদিগকে দমন করিয়া শান্তি স্থাপন করিয়াছিলেন এবং জীবনের শেষ ভাগে রাঠোর সর্দ্দারদিগকে পরাভূত করিয়াছিলেন—রায় মহাশয়ের মতে এই তিন সংগ্রাম শাহ-ই এক। বাংলা দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠাতা ও



রামায়ণ দৃশ্য

মথুরাপুর দেউল প্রতিষ্ঠাতা সংগ্রাম শাহ যে অভিন্ন, এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে। স্থানীয় লোকেরও বিশ্বাস এইরূপ; এবং বহুকাল যাবৎ এরূপ কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। ফরিদপুরের ইতিহাসেও এইরূপ লিখিত আছে যে, তিনি মথুরাপুরে তাঁহার আবাস নির্ম্মাণ করেন। দেউলের দেওয়ালের মূর্ত্তিগুলিও ইহা সমর্থন করে। শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক রুক্মিণী হরণ ও পরিণয় এই সংগ্রাম শাহের বলপূর্ব্বক বিবাহেরই দ্যোতকরূপে স্থাপিত, এরূপ বিশ্বাস করিলে অন্যায় হইবে না। ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে বৃন্দাবন লীলার দৃশ্যাবলীতে শ্রীকৃষ্ণ রাখালমূর্ত্তিতেই চিত্রিত, কিন্তু রুক্মিণীহরণ ও বিবাহের দৃশ্যে শ্রীকৃষ্ণের পরিণত বয়স্ক ও পুষ্টায়তন মনুষ্য-রূপ। পুরাণে বর্ণিত মূর্ত্তির সহিত ইহার কোনই সাদৃশ্য নাই।

যদি এই কিম্বদন্তী সত্য হয় তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে, এই দেউল সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতাব্দীর উত্তরার্দ্ধের প্রথম ভাগে নির্ম্মিত হয়—হয়ত ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে। একটি সরকারী বিবরণে নির্ম্মাণের তারিখ ১৪৭২ খৃষ্টাব্দ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই তারিখ সমর্থন করিবার মত কোন কাহিনী আমি অবগত নহি।

(৩)

দেউলটির গঠনের বিশেষত্ব এই যে, ইহা ভিত্তি হইতে চূড়া পর্য্যন্ত সমদ্বাদশভুজ। ভূমি হইতে ইহার উচ্চতা প্রায় সত্তর ফুট। ভিত্তি ভূমিতে ইহার ব্যাস বাহিরের বৃত্তে ৩৪'১১" ও ভিতরের বৃত্তে ১২'১১" অর্থাৎ দেওয়াল ১১" পুরু। দ্বার মাত্র দুইটি—পশ্চিম ও দক্ষিণের দিকে; পশ্চিমেরটিই প্রধান দ্বার। উত্তর ও পূর্ব্ব দিকে নকল দরজা আছে। পূর্ব্বদিকের দ্বার পিপুল বৃক্ষটিতে সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে।

দেউলের ভিতরে প্রাচীরগাত্রে কোনও কারুকার্য্য নাই; নেহাতই সাধারণ ভাবে ২৯' পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। তারপর চূড়া পর্য্যন্ত "চষা ক্ষেত" পদ্ধতি অর্থাৎ প্রাচীরগাত্র সমান নহে, একবার উঁচু, একবার নীচু। ইহাতে সৌন্দর্য্য বাড়িয়াছে, সন্দেহ নাই- কোন দেউলে ইহার অনুরূপ আমি দেখি নাই। সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় সমদ্বাদশভুজ পদ্ধতি পরিত্যক্ত হইয়াছে। ইহা যেন বিপরীত ভাবে স্থাপিত জলপাত্রের তলদেশের ভিতর-দিকের ন্যায় ঈষৎ সমতল। এই ছাদের কিয়দংশ ভাঙিয়া পড়িয়াছে, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়।

ভিত্তিভূমিতে বাহির দিকে এই সমদ্বাদশভুজের প্রত্যেক

ভূজ ৯'১১´ মাত্র। একটি পঙ্‌ক্তির পর একটি পঙ্‌ক্তি— এই একই পদ্ধতিতে ভিত্তি হইতে চূড়া পর্য্যন্ত চলিয়াছে। তবে ভূমি হইতে ২৯'০´ পৌছিয়া সামান্য একটু বিরতি আছে—একটি কার্ণিস।

তারপর একই পদ্ধতিতে চূড়া পর্য্যন্ত প্রাচীর উঠিয়াছে— তবে গাত্রে কোন কারুকার্য্য নাই। চূড়ায় হয়তঃ শোভনীয় "মুকুট" ছিল; কিন্তু তাহা সম্পূর্ণরূপে ভাঙিয়া পড়িয়াছে। চূড়ার 'খিলানের'ও বৃহদংশ ভাঙিয়া পড়িয়াছে।

বাহিরের প্রাচীরগাত্রের অপর বিশেষত্ব ইহার 'পঞ্চরথ' পদ্ধতি— প্রত্যেকটি ভুজে বা প্রাচীরে ভিত্তি হইতে চূড়া পর্য্যন্ত পাঁচটি পগ (Pagas) চলিয়াছে। সাধারণতঃ এই জাতীয় স্থাপত্যে কেন্দ্রে উন্নত রাহাপগ (Rahapaga) এবং পার্শ্বে ক্রমনমিত অনর্থপগ ও কনকপাগ থাকে, কিন্তু এক্ষেত্রে ইহার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে।

এই দেউল যে কখনও দেবপূজার কার্য্যে ব্যবহৃত হয় নাই, বা দেবপূজার জন্য নির্ম্মিত হয় নাই বা দেবতার নামে উৎসর্গীকৃত হয় নাই—আমার এ বিশ্বাসের যথেষ্ট কারণ আছে। যতই ইহার কারুকার্য্য এবং স্থাপত্য-নৈপুণ্য পর্য্যবেক্ষণ করা যায় ততই যেন প্রতীয়মান হয় যে, এ দেউল কোন বিজয়ীর বিজয়স্তম্ভ। রামায়ণের ও কৃষ্ণলীলার চিত্রে যুদ্ধের ভঙ্গিমা উৎকীর্ণ আছে বলিয়াই যে উপরিউক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় তাহা নহে,—এই দেউলের সকল চিত্রই যেন যুদ্ধের ভাব প্রকাশ করে। ভূমি হইতে ২৮ ফিট উর্দ্ধে দ্বাদশ ভুজের মধ্যে নয় ভুজ ব্যাপিয়া যে সিংহশ্রেণীর মূর্ত্তি খোদিত আছে, তাহারা যেন গর্ব্বভরে পদ্মবন দলিত করিয়া বিজয়যাত্রায় চলিয়াছে এবং তাহাদের দীর্ঘ সূচীমুখ দন্ত দ্বারা পদ্মকলি ধ্বংস করিতেছে। শুধু তাহাই নহে, ইহার জল-নিকাশের নলেও সিংহেরই মুখ। উদ্দাম মল্লযুদ্ধের চিত্রও ইহাতে উৎকীর্ণ। কীর্ত্তিমুখ তিনটি বিভিন্ন আদর্শে উৎকীর্ণ— প্রত্যেকটি আদর্শই রণ-মনোবৃত্তির প্রতীক।



পূজারিণী ও বীরসেনা

এই দেউলের অপর বিশেষত্ব এই যে, একটির পর একটি স্তরে রামায়ণ ও কৃষ্ণলীলার সমগ্র কাহিনীই পর্য্যায়ক্রমে খোদিত। সম্মুখের তিনটি প্রাচীর গাত্রে পর পর তেরটি স্তরে এই মূর্ত্তির প্ল্যাক্ স্থাপিত। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যবদ্বীপে সুবিখ্যাত প্রাম্‌বানাম্ মন্দিরের ভাস্কর্য্যের সঙ্গে অপূর্ব্ব সাদৃশ্য ইহাতে দেখা যায়—উৎকীর্ণ মূর্ত্তিগুলির ঠিক সেইরূপ, এমন কি তাহার অপেক্ষাও বেশী, পুরুষোচিত দৃঢ়তার ব্যঞ্জনা। প্রভেদ এই যে, যবদ্বীপের মন্দির প্রস্তরনির্ম্মিত, দেউলটি বাংলার মাটিতে-গড়া ইষ্টকের।



নৃত্য ও বাদ্য

দেউলের স্থাপত্যে পরিকল্পনা ও গঠনপ্রণালী সম্পূর্ণরূপে

বাঙালী ভাবের পরিচায়ক। বাংলার পল্লীগ্রামের বাঁকা ছাদের (জুত) ঘর, বাংলার তৎকালীন রীতিনীতি ও জীবন-যাপনের চিত্র, বাংলার নরনারীর আকার প্রকারের বিশেষত্ব, বাংলার চালা হইতে ঝুলানো ধানের শীস, বাঙালী শাড়ীর প্রান্ত স্থপতি এমন ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছে, যেন বাংলার কুটীরে বাংলার নর-নারীই ইহাদের নায়কনায়িকা।

মথুরাপুর দেউল বাংলার গর্ব্বের জিনিষ। অনুপম ভাস্কর্য্য গৌরবে এই দেউল যে এই কলাজগতে একটি বিশিষ্ট ও



স্নান দৃশ্য

অনুপম লীলা মাধুর্য্য—সমস্তই বাঙালী গৃহস্থ ঘরের প্রতিদিনের দৃশ্য বাঙালী পুরুষের দৃঢ়তাব্যঞ্জক চিত্র, ও নারীর শ্রীসম্পন্ন মূর্ত্তি—এগুলি ইটের মধ্যে ফুটাইয়া তোলা সহজ কাজ নহে। এই দেউল একান্ত ভাবে বাংলার নিজস্ব—বাংলার পুরুষোচিত রুচির পরিচায়ক। বাংলার বাহির হইতে কোন প্রভাবই ইহাকে স্পর্শ করে নাই। লঙ্কা, মথুরা, বৃন্দাবন—বাংলার বাহিরের বহুঘটনার দৃশ্য, বাংলার এক শ্রেষ্ঠস্থান লাভ করিবে ইহাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহার রক্ষার বিশেষ প্রয়োজন। আমি এ-বিষয়ে সরকারী আর্কিওলজি বিভাগের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছি।

এই দেউল দর্শন ও তৎপর এই প্রবন্ধ প্রকাশে যাঁহারা আমার সহায়তা করিয়াছেন তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন-পূর্ব্বক আমি এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

প্রাচীন ভারতীয় নৃত্য

শ্রীমণি বর্দ্ধন

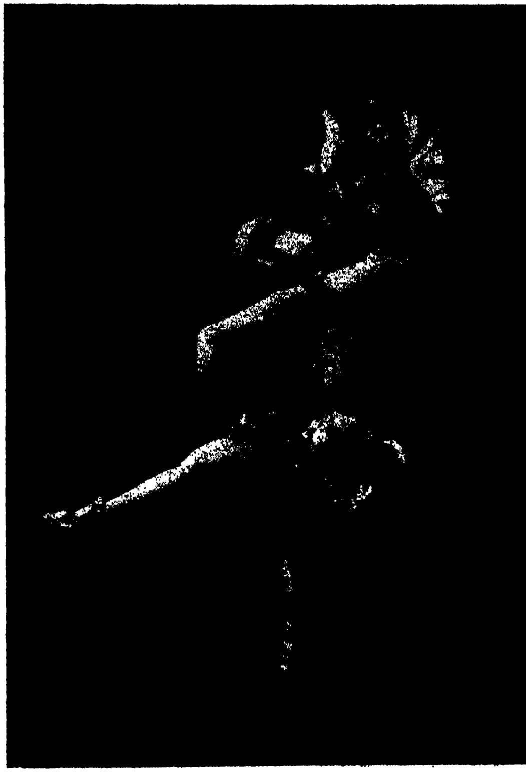
এক সময়ে ভারতবর্ষে নৃত্য কলাবিদ্যা বলিয়া গণ্য হইত। আজকাল ভারতীয় উৎসব-অনুষ্ঠান হইতে সেই সুকুমার কলা নির্ব্বাসিত হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, নৃত্য সম্বন্ধে সেই পুরাতন শ্রদ্ধা আমাদের অন্তর হইতে লোপ পাইয়াছে। আশ্চর্য্য এই যে, পুরাতনের প্রতি যাঁহারা সম্মান প্রদর্শন করেন, এমন কি অনেক সময় অকারণে অর্থহীন সম্মান প্রদর্শন করেন, প্রাচীন গৌরব-কাহিনীর কঙ্কালস্তূপের পার্শ্বে বসিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতেই যাঁহাদের বক্ষ আত্মগরিমায় স্ফীত হইয়া উঠে, সেই রক্ষণশীল লোকেরাই এই রূপসৃষ্টির প্রতি সর্ব্বাগ্রে অশ্রদ্ধার ভাব পোষণ করেন। কিন্তু যে-দিন হিন্দুজীবনের প্রত্যেক কাজটিই ছিল ধর্ম্মভাবের সহিত ওতঃপ্রোতভাবে বিজড়িত, সে-দিন ধর্ম্মজীবনের মধ্যেই নৃত্যগীতের স্থান ছিল। কথিত আছে, পুরাকালে ব্রহ্মা ইন্দ্রের প্রার্থনায় ঋকের গান, সামের শ্লোক, যজুর হস্তপদাদি সঞ্চালন ও অথর্ব্বের সার গ্রহণ করিয়া নাট্য-বেদ রচনা করেন। প্রথম গান পঞ্চাননের পঞ্চমুখ-নিঃসৃত; প্রথম নৃত্য ব্রহ্মার অনুরোধে মহাদেবের আদেশে তণ্ডুর তাণ্ডব নৃত্য।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর মতেও সমস্ত রূপশাস্ত্র ও কলা, নৃত্যবিধি ও নৃত্যকলা হইতে উৎসারিত হইয়াছে; এমন কি নৃত্যকলা হইতেই চিত্রকলা পুষ্টিলাভ করিয়াছে। বরাহ পুরাণে লিখিত আছে,

যাহারা দেবোদ্দেশে নৃত্য করে তাহারা সংসার-পাশ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া স্বর্গলোকে গমন করে। চৈতন্য মহাপ্রভুর পরমভক্ত গোপাল ভট্ট রচিত "হরিভক্তি-বিলাসে"ও অনুরূপ উল্লেখ দৃষ্ট হয়। শৈবতন্ত্রের মতেও চতুঃষষ্টি কলার মধ্যে প্রথম কলা গীত, দ্বিতীয় কলা বাদ্য ও তৃতীয় কলা নৃত্য। প্রাচীনেরাও দেবতার প্রীতির জন্য ভক্তিভাবে তাঁহার সম্মুখে নৃত্য করা দোষাবহ মনে করিতেন না।

আদিযুগে পৃথিবীর সকল দেশেই সকল জাতির মধ্যেই ধর্ম্মাচরণের সময় ও উপাসনার সময় নৃত্যগীত করা ধর্ম্মানুষ্ঠানেরই একটা অঙ্গ মনে করা হইত। প্রাচীন মিশরে সূর্য্যদেবের বেদীর চতুর্দ্দিকে নৃত্য করার প্রথা ছিল, এমন কি পুরোহিতেরাও তাঁহাদের দেবতা এসিসের সম্মুখে নৃত্য করিতেন। মিশরীয়দের অনুকরণেই বোধ হয় প্রাচীন গ্রীসে তারকানৃত্যের সৃষ্টি হয়। প্রাচীন রোমে শবাধার বহনকালেও নৃত্য করা হইত। খ্রীষ্ট ধর্ম্মের প্রারম্ভে এমন কি পঞ্চদশ শতাব্দীতেও গীর্জ্জায় উপাসনা-কালে নৃত্যের প্রচলন ছিল। নৃত্যকলা এককালে পৃথিবীর সকল জাতিরই যে আদরের বস্তু ছিল তাহা বিভিন্ন দেশের বিচিত্র নৃত্য হইতেই স্পষ্ট বোঝা যায়। সুইটজারল্যাণ্ডের মনফ্রেদা নৃত্য, স্কটল্যাণ্ডের হাইল্যাণ্ড নৃত্য, প্রাচীন ইংলণ্ডের মেপোল নৃত্য, আয়ার্লণ্ডের জীগ নৃত্য, স্পেনের ফান্দাগো নৃত্য ও গ্রীসের জাতীয় ওয়াল্ট্জ নৃত্য ইহার নিদর্শন।

নাট্যশাস্ত্র, নাট্যবেদবিবৃতি, নর্ত্তক-নির্ণয়, নৃত্যবিলাস প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠে আমরা প্রাচীন ভারতীয় নৃত্যের রূপবৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অনেক জানিতে পারি। সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে ভারতীয় নৃত্য একটা বিশিষ্টতা অর্জ্জন করিয়াছিল। তাহার কারণ, প্রাচীন ভারতীয় নৃত্য অনেক পাশ্চাত্য তথাকথিত নৃত্যের ন্যায় কেবলমাত্র অর্থহীন অঙ্গসঞ্চালন নয়। শিশুসুলভ হস্ত-প্রসারণ বা তালে তালে পদ-সঞ্চালন মাত্রই নাচ নয়, নাচে চাই অন্তরের সহযোগিতা; নমনীয় কমনীয় তনুদেহের স্পন্দন-হিল্লোল ও ছন্দের সাহায্যে খাঁটি ইমোশনকে, পার্থিবতার শত বন্ধন বিমুক্ত রহস্যময় অপার্থিব অনুভূতিকে ব্যঞ্জনা দেওয়া; যাহা দেখিলে প্রবৃত্তির তেজ হ্রাস হইয়া একটা মানসিক পবিত্রতা ও শান্তি আসে, যাহার প্রতি স্পন্দনে থাকে অনির্ব্বচনীয়ের ইঙ্গিত, প্রতি অঙ্গহারে থাকে অভূতপূর্ব্ব আনন্দ-রসসিক্ত একটা আধ্যাত্মিক শক্তি, যাহার সাহায্যে মানুষ সীমার মধ্যে অসীমের সুর শুনিতে পায়, অনন্ত জগতের সহিত যোগসূত্র স্থাপন করিয়া নিজের মহত্ব উপলব্ধি করিতে পারে। যে বিচিত্র দেহভঙ্গী অঙ্গহার স্থূলচিত্তেও চিন্তার হিল্লোল জাগায়, বহুদূরের বৃহত্তর বিশ্বের দিকে হৃদয়কে টানিয়া লয়—গতানুগতিক দৈনন্দিন ঘটনার একঘেয়ে মনোভাব যে রাজ্যের সন্ধান



তুরীয় নৃত্যে মণি বর্দ্ধন

দিতে পারে না, প্রাচীন ভারতীয় নৃত্যে সে-সমস্তই ছিল। হিন্দু-প্রাধান্য বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে এবং মুসলমান বিজয়ের প্রারম্ভে ভারতীয় নৃত্য-সম্পদের প্রায় সমস্তই হারাইয়া যায়।

প্রাচীন ভারতীয় নৃত্য তাহার বৈচিত্র্য লাভ করিয়াছিল, প্রাকৃতিক জগতের বিভিন্ন গতিছন্দকে অনুসরণ করিয়া—কমল-বর্ত্তনিকা, মকর-বর্ত্তনিকা, মায়ূরী নৃত্য, মৈনী নৃত্য, মৃগ নৃত্য, হংসী নৃত্য, রঞ্জনী গজগামিনী প্রভৃতি নামকরণই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ভারতীয় নৃত্য কেবল দেহাংশ-বিশেষের অর্থহীন সঞ্চালনে আবদ্ধ ছিল না, দেহের সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের

গতিশ্রীর প্রতি ইহার লক্ষ্য ছিল, তাই নৃত্যবিষয়ক গ্রন্থে—গ্রীবাভেদ, দৃষ্টিভেদ, পাদভেদ, মস্তক সঞ্চালন প্রভৃতি নৃত্যভাগের নিদর্শন আছে। অঙ্গহার বলিতে নৃত্যকালীন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঞ্চালন বুঝায়। ভরতমুনি করণ ও রেচক সংযুক্ত অঙ্গহার বর্ণনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে স্থিরহস্ত, পর্য্যস্তক, সূচীবিদ্ধ, অপবিদ্ধ, অক্ষিপ্তক, গতিমণ্ডল, পরাবৃত্ত, পার্শ্বচ্ছেদ প্রভৃতি



"অজন্তার নট" নৃত্যে মণি বর্দ্ধন

বত্রিশটি অঙ্গহারকে তিনি প্রধান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। নৃত্যকালে হস্তপদ সমাযোগের নামই করণ। করণ সংখ্যায় ১০৮টি, যথা—তলপুষ্প-পুট, বর্ত্তিত, সমনখ, কটিভেদ, কটিসম, বৃশ্চিক, কটিভ্রান্ত, ভুজঙ্গ-ত্রাসিত, চক্রমণ্ডল, ললাটতিলক, ইত্যাদি। ভারতীয় নৃত্যের নিয়মানুসারে নৃত্যকালে দণ্ডায়মান অবস্থা পর্য্যন্ত দেবলক্ষণ-সংযুক্ত হওয়া চাই। সমভঙ্গ, দ্বিভঙ্গ, ত্রিভঙ্গ, অতিভঙ্গ প্রভৃতি বিচিত্র ভঙ্গীতে দাঁড়ান, হস্তমুদ্রা দ্বারা ভাবপ্রকাশ, এই সমুদয়েরই অর্থ আছে যাহা কথিত ভাষার মতই সুস্পষ্ট অথচ যাহা বিদেশীদের এবং বিদেশী শিক্ষায় শিক্ষিত এদেশীয়দের কাছে কেবল অর্থহীন জটিলাবর্ত্তেরই সৃষ্টি করে। কুমারস্বামী ভারতীয় নৃত্যপ্রসঙ্গে বলেন, ভারতীয় নাচ "primarily one of gesture in which the hand plays the most important part." কিন্তু মুদ্রা বা হস্তসঞ্চালনই ভারতীয় নাচের প্রধান অঙ্গ বলিলে সম্পূর্ণ সত্য বলা হয় না। কটিভেদ, গ্রীবাভেদ, দৃষ্টিভেদ, পাদভেদ, করণ ও রেচক সংযুক্ত অঙ্গহার প্রভৃতি নাম হইতে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে হস্ত ব্যতীত অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি ভারতীয় নৃত্যে উপেক্ষিত হয় নাই; সমভঙ্গ, দ্বিভঙ্গ, ত্রিভঙ্গ, প্রভৃতি বিচিত্র স্থিতিবিলাস (pose) ইহার সাক্ষ্য দান করিতেছে।

তারপর ভারতীয় নৃত্যে কেবল ভাবের ও অঙ্গসঞ্চালনের দিকেই নৃত্যকারের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল না। ক্ষুদ্র পায়ের নূপুরটি পর্য্যন্ত নৃত্যশিল্পীকে তাহার যথাযোগ্য অবদান দিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। নৃত্যের আসরে নূপুর যে শব্দতরঙ্গের সৃষ্টি করিয়াছে সেই অতুল করুণ মধুর ধ্বনি-মাধুর্য্যের স্থান অন্য কোনও দেশের নৃত্যে নাই। তবলার বোলের সঙ্গে অনুরূপ শব্দতরঙ্গের সৃষ্টি এখনও উত্তরভারতের অনেক স্থানে দৃষ্ট হয়। আবার ভারতীয় নর্ত্তকের অঙ্গুলিহেলনে, অঙ্গসঞ্চালনে ও প্রসাধন-কারুতায় যে-কোনও দেশের নৃত্যের সৌন্দর্য্য মলিন হইয়া যায়। প্রাচীনকালে নর্ত্তকীর ও দেবদাসীর অপরূপ নৃত্যছন্দ ও লীলায়িত গতি রসাশ্রিত সংযম, স্থিরতা ও আন্তরিকতায় মনে কেবলমাত্র গভীর অনুভূতিই জাগায় নাই, রূপের ঝড়ও তুলিয়াছে, তাহার কারণ ভারতের দৃষ্টিতে সেদিন ইন্দ্রিয় ও অতীন্দ্রিয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না, বরং যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাহাকে ইন্দ্রিয়াতীত রূপে রূপায়িত করা এবং অতীন্দ্রিয়কে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধি করাই ছিল তাহার সাধনা, রূপ ও অরূপের মধ্যে শাশ্বত ঐক্য স্থাপনই ছিল তাহার কাম্য। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন প্রকারের নৃত্য হইতে আজও ঐ ঐক্যবোধের কথঞ্চিৎ নিদর্শন পাওয়া যায়।

মধ্যযুগে ভারতবর্ষে নৃত্যবিদ্যা কত সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল এবং কত আদরের জিনিষ ছিল তাহার আভাস পাওয়া যায় গুজরাটি গরবা নৃত্যে, লক্ষ্ণৌর নটীনৃত্যে, উত্তরভারতের নৃত্যে, দক্ষিণ-ভারতের মাদুরা, তাঞ্জোর, কোচিন অঞ্চলের বিভিন্ন প্রকারের নৃত্যে, বাংলার কাঠি, জারি, রায়বেঁশে, বাউল ও

অন্যান্য পল্লী-নৃত্যে, মণিপুর অঞ্চলের রাসনৃত্যে, এমন কি সাঁওতাল, ভীল, মুণ্ডা, প্রভৃতি অনার্য্যশ্রেণীতে প্রচলিত নৃত্যের সৌন্দর্য্যানুভূতিতেও মন বিমুগ্ধ হইয়া যায়।

যে ভারতের নৃত্য এমনভাবে পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল, জাতির চরম দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই ভারতবাসী আজ প্রাচীন পুঁথির গলিত পৃষ্ঠায়, পাষাণবক্ষভেদী জনপরিত্যক্ত মন্দির-ধ্বংসাবশেষের গাত্রে সেই সুকুমার নৃত্য-কলার কণামাত্র আভাস পাইয়া নিজের অতীত গরিমার নজীর দেখাইয়া তৃপ্তিলাভ করিতেছে, আজ তাহারা জানে না তাহাদেরই দেশের প্রাচীন ভাস্করেরা একাগ্র সাধনায় বিশ্বপ্রবাহের বিরাট মনোহর ছন্দকে নৃত্যের পরিকল্পনায় ধ্যানে রূপ দিবার চেষ্টা করিয়াছে। নটরাজের তুরীয় নৃত্যে, ইলোরা ও অন্যান্য গুহার খোদিত পাষাণ গাত্রে স্থিতি ও গতি এ দুইটির আলিঙ্গনে জগতের জাগ্রত সৃষ্টি, ছন্দই বিশ্বের গতিমূলক আরম্ভ, ভারতবাসী তাহা জানিত; তাই ছন্দ ও আবর্ত্তকে পরিকল্পনায় দেবরূপে রূপ দিতে সমর্থ হইয়াছিল। সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার ও তিরোভাব, অনুগ্রহ এই পঞ্চকৃত্য শিবের তুরীয় নৃত্যে সূচিত হইয়াছে। শুধু ধ্বংসের নৃত্যই শিবের নৃত্য নয়,—অসত্য ও অশিব কি করিয়া সৃষ্টির রমণীয় শ্রী লাভ করে, ক্ষুদ্র বৃহৎ হয়, অসুন্দর সুন্দর হয়, সেই-সমস্ত সৃষ্টিমূলক ব্যঞ্জনাকে সেই-সমস্ত অপরূপ সূক্ষ্মানুভূতিকে শিবের তুরীয় নৃত্যের রূপান্তরের মধ্য দিয়া প্রকাশ করার চেষ্টা করিয়াছে সেই ভারতবাসী, যাহারা নিজেদের অমৃতের সন্তান বলিয়া জানিত, যাহারা বিশ্ববাসীকে অমৃতের বাণী শুনাইতে চাহিয়াছিল। ভারতের নৃত্য শিল্পের এই দান কল্পনারাজ্যে মানুষের শ্রেষ্ঠতম দান। শ্রীকৃষ্ণের রাসনৃত্যেও বিশ্বছন্দ ও বিশ্বপ্রবাহকে অনুরূপ রূপ দেবার চেষ্টা এদেশেই হইয়াছে, ইউরোপে বা অন্য দেশে সম্ভব হয় নাই, তাহার কারণ জগতের সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যেই যে ঐক্যমূলক ঐশী লীলা রহিয়াছে এ সত্য উপলব্ধি করা অ-ভারতীয়ের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। আলো ও ছায়া, সুখ ও দুঃখ একই জিনিষের এদিক্ ওদিক্ এ সত্য ভারতবাসীই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিল। ভারতীয় নৃত্যের পরিকল্পনায়ও তাই বহির্মুখী ও অন্তর্মুখী দৃষ্টির মিলনের পরিচয় পাই। জাতির চরম দুর্ভাগ্য, যে-সমস্ত মন্দির গিরিগুহায় স্থিতি ও গতির রূপ দেওয়ার চেষ্টা হইয়াছিল, জাতির অমূল্য সম্পদ্ সেই ইলোরা, অজন্তা, বাগ, সিগিরিয়া, এলিফেন্টা, মমুল্লপুরম, উদয়গিরি, খণ্ডগিরি, কোণারক, কোন দেশে কোথায় অবস্থিত শিক্ষিত ভারতবাসীরা অনেকেই তাহা জানিয়াও জানেন না। সেই সাঁচি ভারুত,



"অজন্তার নট" নৃত্যে মণি বর্দ্ধন

অমরাবতীর বিলুপ্ত বৈশিষ্ট্যের কঙ্কালস্তূপ হইতে নূতন রূপসৃষ্টির প্রচেষ্টা হইতেছে না—সেই কঙ্কালস্তূপ শুধু জাতির সৃষ্টি-প্রতিভার গতগৌরবের সাক্ষীস্বরূপই দাঁড়াইয়া আছে। মুদ্রা, আসন, করণ, রেচক, অঙ্গহার প্রভৃতি নৃত্য-রীতিতে যে মহত্ত্ব, যে sublimityর মধ্যে দিয়া ভারতবর্ষ অতীন্দ্রিয়ের স্বাদ গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিল, যাহার আংশিক ব্যঞ্জনা অজন্তা, বাগ, সিগিরিয়ার চিত্রের মধ্যে পাইয়া সভ্য-জগত বিস্মিত ও বিমুগ্ধ; দুঃখ এই যে সেই মহত্ত্বের উত্তরাধিকারী ভারতবর্ষ নৃত্য বলিতে নটীর নাচই

শুধু বোঝে। ভারতীয়দের কাছে নৃত্যকলা উচ্ছৃঙ্খলতার অঙ্গ। তাহাতে সত্য সুন্দর কিছু থাকিতে পারে ইহা তাহারা ধারণাই করিতে পারে না। নৃত্য-শিল্পীর লীলাচঞ্চল তনুভঙ্গ তাহাদের কাছে সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যে শান্ত রস ও ভক্তিরসের সৃষ্টি না করিয়া পর্য্যবসিত হইয়াছে নটির বিলাস-বিভ্রম লালসা-উদ্দীপক চাহনিতে। প্রাচীন ভারতীয় নৃত্য যে রূপগরিমায় সমৃদ্ধ ছিল, বস্তুতান্ত্রিকতার জগৎ পরিত্যাগ করিয়া একটা বিরাট প্রাণ-জগতের সন্ধানের ইঙ্গিত যে সে দেশের নৃত্যশিল্পীর নৃত্যের ভঙ্গীতে সম্ভব হইত, আজ তাহা বিশ্বাস করাই আর সম্ভব নয়। কোন সুদূর ভবিষ্যতে ভারতের এই সৌন্দর্য্য সৃষ্টিকে নব-জীবন দান করিয়া যুগ-প্রতিভার আলোকপাতে গৌরবান্বিত ও সমৃদ্ধ করিয়া তোলা হইবে কে জানে?

কচিটার মুখ চেয়ে

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী, বি-এ

(১)

অনেক দিনের কথা। তখন কৃষ্ণনগর কলেজে পড়ি—থাকি বাঘাডাঙ্গা হিন্দু হোষ্টেলে। এখন যেমন কলেজের পাশেই ত্রিতল অট্টালিকায় হোষ্টেল হয়েছে, তখন তা ছিল না। আমাদের কলেজে আসবার পথটা ছিল রাজ্যের গরুর পাল নিয়ে যাওয়া-আসার প্রধান রাস্তা। কাজেই আমাদের প্রায়ই এক হাঁটু ধুলো মেখে বেলা এগারটায় "গোধূলি লগ্নে" কলেজে আসতে হ'ত। সেই পুরাতন হোষ্টেলে থাকা আমাদের প্রকারান্তরে বনবাস হ'লেও তার মধ্যে আমরা যথেষ্ট আনন্দ পেতাম। শহরের তথাকথিত ভদ্রতা জিনিষটা আমাদের স্বাভাবিক ব্যক্তিগত রুচিকে বিকৃত করতে পারত না। কিন্তু সে কথা যাক্—

সেদিন বিকালে প্রায় সব ছেলেরাই যে যার মত বেরিয়ে গেছে। একটা মতলব ছিল ব'লে আমি একটু দেরি ক'রেই বেরুব মনে করেছিলাম। সুধীরের মামার বাড়ি থেকে একথালা লিচু পাঠিয়ে দিয়েছিল। তার মতলব ছিল আমাকে ফাঁকি দেবে। বিকালে সুবিধে পেয়ে তাই খাটের উপর শুয়ে শুয়ে নির্ব্বিকার চিত্তে তার লিচু খেয়ে যাচ্ছি।...তখন থার্ড-ইয়ারে পড়ি। স্মিথ সাহেব প্রিন্সিপাল। বেজায় কড়া মানুষ। বৈশাখ মাস হবে। ম্যানুয়াল পরীক্ষা আরম্ভ হয়ে গেছে। মনে একটা খট্‌কা আটকে না যাই।.. লিচুর আঁঠি জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলছি আর মনে মনে ভাবছি—এই—এই আঁঠিটা যদি গরাদের ভিতর দিয়ে নির্ব্বিবাদে বেরিয়ে যায়, তা হ'লে ম্যাথেমেটিক্‌স্‌-এ নিশ্চয় পাস করব...এই যা! আট্‌কে গেল...আচ্ছা, এইবার এটা প্রসাদন্ত্র বাবুর ইকনমিক্‌স্‌—

ঠিক এমনি সময়ে কাতর কণ্ঠে বাইরে থেকে কে ডাকল, 'বাবা কে আছ?'

ইকনমিক্‌সে পাস-ফেলের খবর আর আমার জানা হ'ল না। তার পরিবর্ত্তে যা জানলাম তা এই—

বৃদ্ধা ভদ্রবংশসম্ভূতা এবং সম্প্রতি তিনি নাত্‌নী-দায়-গ্রস্তা। কলেজের ছেলেদের কাছে তিনি সাহায্য চান।

জিজ্ঞাসা করলাম আপনার আর কে কে আছেন? বৃদ্ধার চক্ষুতে জল এল। বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে তিনি বললেন, "বাবা রে, ঠিক তোদেরই মত এত বড় দুই ছেলে আমার এক সঙ্গে—!" কিছুক্ষণ নীরব থেকে বৃদ্ধা আবার বললেন—'তারা গেছে

কিন্তু পেছনে কিছু রেখে যায়নি, কিন্তু সেই যে বড় শত্রু,—আমার বড় ছেলে—সে গেল একটা মেয়ে, একটা কচি ছেলে আর বৌকে রেখে। বৌমা সতীলক্ষ্মী,—সে সেইবছরই গেল। আমাকে এই বুড়ো বয়সে রেখে গেল ওদের আগ্‌লাতে।" বৃদ্ধা কাঁদতে লাগলেন। শুনে বড় কষ্ট হ'ল। কিন্তু সে-দিন আর কেউ উপস্থিত ছিল না ব'লে তাঁকে পর দিন আবার আসবার জন্যে ব'লে-দিলাম।

পর দিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে বৃদ্ধা এলেন। সবিশেষ সংবাদ নেওয়া গেল। বৃদ্ধা এখানকার কোনও সুপরিচিত ডাক্তারেরই গাঁয়ের লোক। সেই ডাক্তারবাবুর বাসাতেই তিনি উঠেছেন। তাঁর নাত্‌নী অর্থাৎ বড় ছেলের মেয়েটির বয়স চৌদ্দ-পনের হয়েছে—তারই বিয়ের জন্যে তাঁকে অসমর্থ শরীর নিয়েও দশ দুয়ারে হাত পাততে হচ্ছে।

আমরা বৃদ্ধাকে যথাসাধ্য সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দিলাম। ডাক্তারবাবুর নিকট খোঁজ নিয়ে জানা গেল—বিবরণ সত্য। বৃদ্ধা সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণবংশীয়া, মামলা-মোকদ্দমায় এবং শেষে যমের তাড়নায় বৃদ্ধাকে একেবারে নিঃসহায় ও সঙ্গতিহীন ক'রে ফেলেছে।

প্রফেসরদের কাছ থেকে, হোস্টেল থেকে এবং অন্যান্য ছেলেদের কাছ থেকে রীতিমত চাঁদা তোলা আরম্ভ হ'ল।

২

রাত্রিতে রান্না ভাল হয়নি ব'লে হিমাংশু খুব হৈ-চৈ আরম্ভ করেছিল। মোহিত তাকে ধমক দিয়ে বল্‌ল "এটা ত শ্বশুরবাড়ি নয় বাপু—যা পেয়েছ লক্ষ্মী ছেলেটির মত খেয়ে নাও।" সুধীর আর একটু টিপ্পনি কেটে বল্‌ল—"বিলক্ষণ, কাণা ছেলের নাম পদ্মলোচন!—ওর আবার শ্বশুরবাড়ি হবে না-কি কোন কালে? পস্তাবে বাপু। এখনও বুড়ো বাপের কথা শোনো। সাধে বলেছে—কলিকাল। রামচন্দ্র পিতৃ-আজ্ঞায় চৌদ্দ বছর বনে কাটাতে পারল, আর তুমি বাপু একটা বিয়ে করতে পারছ না?"

এর একটু ইতিহাস আছে। হিমাংশু তার বাপের একমাত্র ছেলে। অবস্থা খুব ভাল। বছর দুই-তিন কংগ্রেসের কাজ ক'রে আবার কলেজে ঢুকেছে। বি-এস্‌সি পড়ে। তার বুড়ো বাপ-মায়ের একান্ত ইচ্ছা—ছেলেটির বিয়ে দিয়ে একটা হিল্লে ক'রে যান। কিন্তু ঐ বিয়ের হিমাংশুমোহন একেবারে চটা। কিছুদিন আগে তার বাবা হোস্টেলে এসে দু-একদিন থেকে তাকে অনেক বুঝিয়ে গিয়েছেন। এক ভদ্রলোক তার বাবাকে বিশেষ ক'রে ধরেছেন,—কিন্তু শ্রীমান্ সে ভদ্রলোকের উপর চটে গেছে—কারণ, তিনি নাকি টাকার লোভ দেখিয়েছেন! তার বাবা বল্‌লেন, "তা সে মেয়ে নাই বা হ'ল—এক পয়সা আমি কারও কাছ থেকে নেব না—তোর যেখানে পছন্দ হয় বে' কর্।" হিমাংশু নারাজ। তার বাবা দুঃখিত হয়ে ফিরে গেছেন।

সুধীর বল্‌লে, "দ্যাখ হিমাংশু, একটা বে' কর্।" মোহিত অমনি তড়াক্ ক'রে লাফিয়ে উঠে বল্‌লে, "পেয়েছি, পেয়েছি।" কোন একজন বড় বৈজ্ঞানিকও নাকি এই রকম 'পেয়েছি, পেয়েছি'—বলে একদিন লাফিয়ে উঠেছিলেন। মোহিতের কথার ভাবটা এই যে, সে কোন-একটা বিষয়ে একেবারে চরম সিদ্ধান্তে এসে পৌঁচেছে। সুধীর জিজ্ঞাসা করলে—অর্থাৎ

মোহিত বল্‌লে,—"আমাদের হাতে এই যে বুড়ী এসেছে, এর নাতনীকেই ওর বে' করতে হবে।"

কথাটা আমাদের বেশ মনে ধরল। বুড়ীর উপর আমাদের সকলেরই কেমন একটা সহানুভূতি এসেছিল। মোহিত অতি বিজ্ঞের মত মুখ ক'রে বল্‌ল—"দ্যাখ বুড়ীরা হচ্ছে চট্টোপাধ্যায়—কাশ্যপ গোত্র, আর এই হিমাংশুটা শাণ্ডিল্য। কাজেই এ বিয়ে হবেই।" তারপর সারারাত্রি আমরা এই নিয়ে জল্পনা-কল্পনা করে কাটালাম।

মোহিত আজকাল কোথায় ওকালতি করছে। পশার করতে পেরেছে কি-না জানি না; কিন্তু তখন থেকেই মোহিতের বক্তৃতা দিয়ে লোক বশীভূত করবার ক্ষমতা অসাধারণ ছিল। দু-দিনের মধ্যে আমাদের ছাত্রসমাজে একটা সাড়া প'ড়ে গেল। হিমাংশু কতকটা রাজী হয়েছে।—আমার আর মোহিতের উপর পড়ল মেয়ে দেখবার ভার।

মোহিত আমাকে বল্‌ল—"দ্যাখ-প্রকাশ্যভাবে মেয়ে দেখতে যাওয়া মানে তাঁদের মুস্কিলে ফেলা। গোপনে আমাদের মেয়ে দেখতে হবে।"

আমি বল্‌লাম—"তথাস্তু;—কিন্তু কেমন ক'রে দেখবে?" মোহিত বল্‌লে—"আমরা তাকে ঠিক স্বাভাবিক যেমনটি

তাই দেখতে চাই। সাজিয়ে গুজিয়ে আড়ষ্ট ক'রে মেয়ে দেখবার পক্ষপাতী আমি নই।"

বল্‌লাম—"সাধু! আমারও সেই মত। এখন বুদ্ধিটা কি বাতলিয়েছ বল দেখি!" মোহিত বল্‌লে—"দ্যাখ ছোট একটা ছেলে আছে সে বাড়িতে। আমি হব মনোহারী জিনিষের ফেরিওয়ালা। কাপড় দেখলে দরদস্তুর করা মেয়েদের স্বভাব—তুই যাবি কাপড় বেচতে।"

শুনে আমার হাসিও পেল ভয়ও হ'ল। মস্ত এক কাপড়ের গাঁট মাথায় করে—এই রোদ্দুরে গ্রামে গ্রামে ঘোরা—তারপর মেয়েমহলে শাড়ী কাপড় বিক্রী করা!—"মু সে পারিবিনা অবধর!" মোহিত মুখ ভেংচি দিয়ে বল্‌লে—'তুই একটি হবু চন্দোর!—মোট তুই বইতে যাবি কেন? সঙ্গে লোক থাকবে। আমি এখানকার দোকান থেকে কাপড় আর মনোহারী জিনিষ নেব। তাদের সঙ্গে চুক্তি থাকবে—যা বিক্রী না হবে তা ফেরত নেবে।"

৩

ইষ্টিশান থেকে নেমে তিন-চার মাইল পরে সেই গ্রাম। মোহিত তার বাঁশী, ঘুড়ী, কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল, লাটু, আম-কাটা ছুরি আরও সব কত কি নিয়ে বেশ দোকানদারী চালে আলাদা পথ দিয়ে গ্রামে ঢুকল। আমাকে ব'লে গেল গ্রামের নাম দেবীপুর। একটা পোড়ো শিবমন্দিরের কাছে একটা চাঁপাগাছ—তার পাশ দিয়ে একটা পথ, সম্মুখে একটা চালাঘর—চাটুয্যে বাড়ি। মনে রাখিস্।

কোত্থেকে যে মোহিত এই পেশাদারী মুটে জোগাড় করেছিল সে-ই জানে। গ্রামে ঢুকেই সে তার পেটেন্ট-সুরে চীৎকার আরম্ভ করলে—"ভাল ভাল শাড়ী—জামা শেমিজ চা—ই।"—আমার ত মুখে কাপড় দিয়ে হাসতে ইচ্ছে কচ্ছিল! এ যে একেবারে প্রভাতবাবুর উপন্যাস—ভাগ্যিস্ মোহিত বুদ্ধি ক'রে কাপড়ের গায়ে সব দাম লিখে দিয়েছিল।—কিন্তু পাড়াগাঁয়ে কি একদামে কাপড় বিক্রী হয়! যার দাম লেখা আছে দু-টাকা ছ'আনা—খরিদদার বলেন—"চৌদ্দ আনায় দেবে?" আমি বিনীত ভাবে জানাই—

'আজ্ঞে না।'

'এক টাকা?'

'উপায় নেই।—কাপড় তুলি—'

'আচ্ছা, দেড় টাকা।'

'পারলে দিতাম'—মুটে রওনা দেয়—

'আচ্ছা নিন, পুরোপুরি দু-টাকা।'

'মাপ করবেন'।

তারা অবাক্ হয়ে বলে,—'দু-টাকাতেও না!'

অথচ আমি জানি শহরেই সে কাপড় আড়াই টাকায় বিক্রী হয়। প্রতি কাপড়ে দু-আনা লস্ দেবে মোহিত আগে থাকতেই ঠিক ক'রে নিয়েছিল।

পথ বেয়ে চলেছি। মুটে হাঁক দিচ্ছে—'চা—ই—'

কত ছোট ছেলে ডাক দিচ্ছিল। কতজন দরদস্তুর করল—কত তরুণীকে ব্যর্থ মনোরথ ক'রে—তাদের পছন্দ-করা কাপড়খানি তাদেরি হাত থেকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হ'ল!

বেলা এগারটার সময় দেবীপুরে ঢুকলাম। মাত্র তিন খানা কাপড় বিক্রী হয়েছে। বেশী বিক্রী না হওয়াই আমার ইচ্ছা, কারণ যার জন্যে এত আয়োজন, তার কোন্ কাপড়টা পছন্দ হবে তা ত জানা নেই!

পাঠশালা ছেড়ে এলাম। এই ত পোড়ো শিবমন্দির, ঐ চাঁপাগাছ। মুটেকে বল্‌লাম, 'হাঁক দে'; সে হাঁকল—'ভাল ভাল কাপড়'—কিন্তু কেউই ত এল না! অগত্যা সেই জঙ্গলা পুকুরটার ধারে বসতে হ'ল।

একটা ছেলে পাঠশালা থেকে লাফাতে লাফাতে বাড়ি যাচ্ছিল,—'খোকা—শোনো, তোমার নামটা কি ভাই?'

'শ্রীঅমলকুমার চট্টোপাধ্যায়'

দরিদ্র বেশ; কিন্তু কি সুন্দর চেহারা! "খোকা, বড় জল তেষ্টা পেয়েছে—এক গ্লাস জল দিতে পার?—এই ঐ বাড়িই ত তোমাদের?" খোকা সম্মতি জানাল। আমি তার পিছন পিছন গেলাম। খোকা জল নিয়ে এল। পিছনে এক বুড়ো, তার মামা। হাতে একখানা বাখারি আর একটা দা। আমার পরিচয় চাইলেন।

ব্রাহ্মণের ছেলে দুপুর বেলায় শুধু এক গ্লাস জল? বল্‌লাম—"তা হোক সে জন্যে আপনি কিছু মনে করবেন না।"

ক্রমে পাড়াপড়শী দু একজন ক'রে জুটলেন। বৃদ্ধ মামা ডাকলেন—"আনি, অন্নপূর্ণা, মা, ভদ্রলোককে অন্ততঃ এক টুকরো মিছরী এনে দাও।"

অন্নপূর্ণা মিছ্ রী এনে দিল। সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণাই বটে!

মামাকে বল্লাম—"আপনি কাপড় নেবেন?"

"না, থাক্।"

"নিন, আমি খুব সস্তায় দিয়ে যাচ্ছি।" মুটে কাপড় খুলল। অন্নপূর্ণাকে বল্লাম—"নিন আপনার যেখানা পছন্দ হয়।"—কিন্তু অন্নপূর্ণা নেবে না—তার দরকার নেই। দোকান-দারী কথা অনেক বলতে হ'ল। সস্তায় বাড়ির উপর এমনটি ধার পাবেন না—এই সব কত কি! অন্নপূর্ণা বল্লে—"তার ঠাকুর-মা বাড়ি নেই কাজেই টাকা দেবে কে?" বল্লাম—"যখন হয় দাম দেবেন, আমি আবার আসব—ইচ্ছে করছি শীঘ্রই আসব। ছ-মাস ছ-মাস পরে দাম দিলেও আমার ক্ষতি নেই।" মামা বল্লেন,—"তা কি হয়? ও রাখা-টাখা হবে না।"

কিন্তু ষাট বছরের বুড়োর চোখের রং এবং আমার কাপড়ের রঙের মধ্যে বিরোধ সম্বন্ধ থাকলেও তরুণীদের কাছে আমার কাপড় বেশ পছন্দসই হয়েছিল হয়ত।

অনু তার মামাকে বল্লেন যে, তার কাছে একটা টাকা আছে।

"টাকা?...টাকা কোথায় পেলি?"—তারপর তাঁদের মধ্যে কি কথা হ'ল। অনু ছুটে টাকা আনতে গেল। কিন্তু এক টাকা ত নেই; চৌদ্দ আনা তিন পয়সা!—তার সুন্দর মুখে একটা ব্যর্থতার ছায়া ফুটে উঠল! মামা বল্লেন—"তাই ত! আজ থাক্ পরে—।" বাধা দিয়ে বল্লাম, "আপনি কাপড় বেছে নিন—দামের জন্যে কিছু আটকাবে না।" অন্নপূর্ণা চুপ ক'রে দাড়িয়ে রইল। মামা একখানা কাপড় বেছে নিলেন—একখানা লাল পেড়ে শাড়ী, দাম তার সব চাইতে কম।

একখানা নীল রঙের কাপড় অনুর হাতে দিয়ে বল্লাম, "আপনি এই খানা নিন—নীল কাপড়ে আপনাকে বেশ মানাবে।"

"কিন্তু এর যে মেলা দাম!" এইবার আমার সঙ্গে সোজাসুজি কথা হ'ল। কি পরিষ্কার কণ্ঠস্বর।

দেখি আপনার কাছে কত আছে? পয়সাগুলো অন্নপূর্ণা আমার হাতেই দিতে যাচ্ছিল—হঠাৎ কি মনে ক'রে তার মামার হাতে দিল। মামা আমার হাতে চোদ্দো আনা দিয়ে বল্লেন, 'এর বেশী ত এখন হচ্চে না অথচ ওর কাপড় নেওয়া চাই।'

চৌদ্দ আনা হাতে করে নিলাম, কিন্তু বুঝতে আমার বাকী ছিল না যে, এই চৌদ্দ আনা কত দিন ধরে মেলার খরচ, খাবারের পয়সা, কুমারীব্রতের দক্ষিণা—এই-সব থেকে বাঁচিয়ে তবে সংগ্রহ করা হয়েছে! ওদের কথা থেকে আমি এ-ও জানতে পেরেছিলাম যে, এক টাকাই ত ছিল কিন্তু অমলকুমার ম্যাজিক দেখবার জন্য দিদির কাছ থেকে পাঁচ পয়সা নিয়েছিল যে!—দিদির যা-কিছু সম্বল তা ত আজ আমি কুড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু এর পর যখন রাস্তা দিয়ে ঘুন্টি বাজিয়ে গোলাপছড়িওয়ালা হাঁক দিয়ে যাবে, তখন অন্নপূর্ণা আর আর ছেলেদের মাঝ থেকে কেমন ক'রে তার দরিদ্র ভাইটিকে সরিয়ে আনবে সেই কথাই আমি ভাবছিলাম। অথচ একেবারে কিছুই দাম হিসাবে না নিলে ওদের মন উঠবে না তাও জানতাম। আট আনা রেখে বাকী পয়সা ফিরিয়ে দিয়ে বল্লাম—"পড়তি দরে অনেক টাকার মাল আনায় আমাদের কোন কোন কাপড় বেশ সস্তা আছে। লাভ আমি একখানা কাপড়ে নাই বা করলাম? এর দাম পড়বে দেড় টাকা। আট আনা পেলাম—আর এক টাকা পরে যখন হয় দেবেন।" মামা বল্লেন, "কিন্তু আপনি যে-দিন আসবেন সে-দিন যদি হাতে টাকা না থাকে—ভদ্রলোকের ছেলে এসে না পেয়ে ফিরে যাওয়া—"

আমি একখানা কাগজে লিখে দিলাম—

"শ্রীহিমাংশু মোহন রায়—জমীদার, রাণাঘাট।"

কেউ তাগিদ করতে আসবে না। এই ঠিকানায় যে দিন যখন আপনাদের সুবিধা হবে মণি-অর্ডার ক'রে—দু-আনা কমিশন বাদে চৌদ্দ আনা পাঠিয়ে দেবেন। ইনিই আমাদের মহাজন।

৪

মোহিতের জন্য রাত্রে ইষ্টিসানে এসে অপেক্ষা করতে হ'ল। সন্ধ্যায় কি ঝড় জল! ভাগ্যে আগে থাকতে এসে পৌঁছে-ছিলাম!—রাত্রি দশটার সময় পুতুল এবং লাট্টু-বিক্রেতা মোহিতবাবু ভিজে কাকের ছানাটি হয়ে এসে হাজির! কিন্তু তার মুখে সে-দিন সে কি পরিতৃপ্তির চিহ্ন!—কলম্বস আমেরিকা আবিষ্কার ক'রেও বোধ হয় এত আনন্দ পাননি!

আমার একটা ভয় ছিল যে, একই দিনে দু-জন পর পর ফেরিওয়ালা হ'য়ে গেলে লোকের সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক এবং সে সন্দেহটা শেষের লোকের উপরই পড়বে। কিন্তু মোহিত পিছপাও হবার ছেলে নয়। সে সবাইকে বুঝিয়ে এসেছে যে, দেশের জিনিষপত্র বেচাটা একশ্রেণী লোকের একচেটে হয়ে পড়েছে। তারা যথেচ্ছা দাম নেয়। এইজন্য আমরা কতকগুলি কলেজের ছেলে মিলে এই 'ফ্রেণ্ডস্ ষ্টোর' খুলেছি। পালাক্রমে আমরা সপ্তাহে দু-জন ক'রে জিনিষ নিয়ে বেরুব। বাড়ির উপর ব'সে সস্তায় সব জিনিষই পাওয়া যাবে শুনে তার উপর সকলেই খুব খুশী হয়েছে। অন্নপূর্ণার হাতের মুড়ী আর গুড় পর্য্যন্ত সে খেয়ে এসেছে, তার সঙ্গে আলাপ ক'রে এসেছে। তার মত চমৎকার মেয়েটি!

আমার ইচ্ছা করছিল হিমাংশুর বাবাকে তখনই একটা টেলিগ্রাম করে দিই!—ভদ্রলোক ছেলের বিয়ের জন্যে কি ব্যস্তটাই না হয়েছেন! পথে আসতে আসতে ভাবলাম, দেবীপুরের লোকে অবাক্ হয়ে যাবে যখন অনুর বিয়েতে রসুন চৌকীর দল তাদের গাঁয়ে ঢুকবে। মোহিত বল্‌ল—"এ হবে একটা আদর্শ বিয়ে, কাগজে তুলে দেব।" বল্‌লাম—"তা দিও। কিন্তু বরযাত্রী হয়ে যখন দেবীপুরে ঢুকবে তখন গাঁয়ের ছেলেরা সব হৈ-হৈ ক'রে উঠবে আর বল্‌বে—"এই সেই ফেরিওয়ালা।"

হোষ্টেলে এসে সাজ সাজ রব তুলে দেওয়া গেল। অমল কবিতা লেখবার জন্যে ছুটাছুটি কর্‌তে লাগল। স্থির হ'ল বিয়েতে সবাইকে যেতে হবে—আগে থাকতে তাদের খরচ বাবদ টাকা পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা পর্য্যন্ত স্থির হয়ে গেল। সেখানে সমস্ত বন্দোবস্ত করতে আমাদের নিজেদেরই যেতে হবে। ধর্ম্মদাস বল্‌লে—"বরযাত্রীদের অভিনন্দন করবার জন্যে আমরা এক দল এক দিন আগে থাকতে গিয়ে ব'সে থাকব।"

পর দিন সকালে বৃদ্ধা ঠাকুরমাকে খুঁজে আনা গেল। তিনি শহরের জজ, মুনসেফ, উকিল প্রভৃতি ভদ্রব্যক্তিদের কাছ থেকে সাহায্য পাবার চেষ্টা করছিলেন। আমরা তাঁকে বল্‌লাম—"আর আপনার এখানে কারও কাছ থেকে কিছু সাহায্য চাইবার দরকার নেই, আপনি বাড়ি যান।"

বৃদ্ধা যেন ভগ্নমনোরথ হ'লেন। মেঝের উপর লাঠিগাছটি রেখে তিনি হতাশ ভাবে বল্‌লেন—"তবে তোমরা যা দিয়েছ তার বেশী আর দেবে না?—কিন্তু বাবা, তোমরা ত বলেছিলে—"

মোহিত অগ্রসর হয়ে বল্‌লে—"আপনার নাতনীর বিয়ের খুব ভাল ছেলে ঠিক ক'রে ফেলেছি—এখন আপনি মত দিলেই হয়। ছেলে এই কলেজেই বি-এস্‌সি পড়ে—অবস্থা বেশ ভাল—আমাদেরই বন্ধু—নাম হিমাংশুমোহন—"

"কার ছেলে?"

"সুরেন রায়।"

বৃদ্ধা চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে বল্‌লেন—'রায়?'

হিমাংশু তখন উপস্থিত ছিল না। মোহিত বল্‌লে—"হাঁ, তারা রাঢ়ীশ্রেণী শাণ্ডিল্য গোত্র।"

"সে হয় না—"

আমরা বিস্মিত হ'য়ে জিজ্ঞেসা করলাম—"কেন?"

"কুলীনের ছেলে চাই।"

আমরা একেবারে ব'সে পড়লাম। মোহিত গম্ভীর হয়ে বিজ্ঞের মত বল্‌লে—"কিন্তু আপনার আর অত কুলটুল দেখবার কি দরকার?"

"তা কি হয়? কচিটা রয়েছে তার মুখ চেয়ে আমার কাজ করতে হবে ত!"

সুধীর কথাটা ঠিক বুঝতে পারল না। মোহিতকুমার আমাদের বুঝিয়ে দিল—ঐ যে ছোট ছেলেটি রয়েছে, ওর দিদির খুব বড় কুলীনে বিয়ে হওয়ার সঙ্গে তার নিজের কুল নির্ভর করছে। তা হ'লে বড় হ'লে সেও বড় কুলীন ব'লে বিয়ের বাজারে খুব দামে কাটবে।

বুড়ী বললে—"ছেলে আমার ঠিক করাই আছে, বাবা। তারাও ফুলে মেল। কিন্তু টাকা চাই, সেই জন্যেই দশ জন ভদ্দর লোকের কাছে—"

আমার বড় রাগ হ'ল। এই বিংশ শতাব্দীতেও এই সব প্রেজুডিস্!

মোহিত জিজ্ঞাসা করল—"তা সে ছেলেটি কি করেন?"

"করে না কিছু। ওরা রায়গাঁর মুখুজ্যে। মস্ত বংশ, মামাদের অবস্থা ভাল। কুলীন ভাগনে মামার বাড়িতেই আছেন।"

বুড়ীর চাদার হিসাবে সুধীরের কাছে দু-চারটি টাকা

ছিল। সে টাকা ক'টি এনে বুড়ীকে বল্‌লে—"এই নিন আপনার এই টাকা আমাদের কাছে ছিল, আর আমাদের আদায় করবার সময় হবে না—আপনি নিজেই যা হয় করুন গিয়ে।"

বুড়ী কখন চ'লে গিয়েছিলেন জানিনে। অভিশাপ দিয়ে গিয়েছিলেন না আশীর্ব্বাদ ক'রে গিয়েছিলেন তাও মনে নাই। আমাদের এত উদ্যম, এত আনন্দ, এত আশা সবই পণ্ড হ'ল। পরীক্ষায় ফেল করলেও বোধ হয় কেউ এত দুঃখ পায় না।

যাক্—মিটে গেল।

৫

তারপর গরমের দীর্ঘ তিন মাস ছুটি। প্রথমটায় কিছু দিন এই ব্যর্থতা মাঝে মাঝে মনে একটু বিঁধত, কিন্তু আস্তে আস্তে বৃদ্ধা সম্বন্ধে সব কথা আমরা এক রকম ভুলেই গেলাম।

গরমের ছুটির পর পূজার ছুটিও কেটে গেছে। তখন একটু একটু শীত পড়েছে। 'অক্ষয় মেডিক্যাল ফারমেসি'র কাছ দিয়ে সেই বুড়ী দেখি লাঠিতে ভর দিয়ে গুড়ি গুড়ি যাচ্ছেন। বুড়ীকে দেখে তার নাতনীর বিয়ের খবরটা জানবার জন্যে কেমন আগ্রহ হ'ল। কাছে গিয়ে বল্‌লাম—"আমায় চিনতে পারেন?" বুড়ী চিনতে পারলে না। বল্‌লাম—"সেই যে হোষ্টেল থেকে আপনার নাতনীর বিয়ের জন্যে আমরা টাকা তুলে দিয়েছিলাম।" এইবার বুড়ী চিনতে পারলেন। হাত দিয়ে নিজের কপালে একটা আঘাত ক'রে বল্‌লেন—"বাবা, সে কথা আর ব'ল না!"

"কেন কি হ'ল"

বুড়ীর চোখ ফেটে জল এল। বল্‌লেন—"গ্যাঁজাখোর! মামা কি তার আপনার?—বিয়ের পরই তারা আমার দিদিকে নিয়ে হেঁশেলে পুরে দিলে!—পাঠাতে কি চায়? কত ক'রে তবে আনি। দেখি দিদি আমার তিন মাসে হাড় কখানি মাত্র হয়ে গেছে।"

জিজ্ঞাসা করলাম—"জামাই কোথায়?"

—"ভগবান জানেন! তারা তাড়িয়ে দিয়েছে। গ্যাঁজা খায়—গোমুখ্যু, মাথার ঠিক নেই। এপর্য্যন্ত আমার দিদিকে একটা লাল সুতো দিয়েও জিজ্ঞেস করলে না, ইটে নেই, ভিটে নেই—পরের দোরে প'ড়ে থাকত"—

মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেল। জিজ্ঞাসা করলাম—"তার আর আছে কে?"

"কেউ না। আগে জানলে এমনি ক'রে বাণী গাঙ্গুলীর কথায়"—বুড়ী কেঁদে ফেললেন।

বড় রাগ হ'ল। বল্‌লাম—"এর জন্য দায়ী সম্পূর্ণ আপনি নিজে। বাণী গাঙ্গুলী ত জোর ক'রে আপনার নাতনীকে নিতে পারত না? আমরা যে ছেলে ঠিক করেছিলাম তার সঙ্গে বিয়ে দিলে—যাক্ তা ব'লে আর লাভ নেই। আপনি যা ভাল বোঝেন করুন গিয়ে।"—হন্ হন্ ক'রে বড় রাস্তার দিকে রওনা দিলাম। পথে আসতে আসতে আমার মনে হ'ল—এটা যে ঠিক এই রকমই হবে এ যেন আগে থাকৃতেই ব্যবস্থা করা ছিল! বর্ত্তমান বাংলা যে এই কৌলীন্যের সংস্কার থেকে এখনও একেবারে মুক্তি পায়নি—আর সেই বল্লালী যুগের প্রভাব কেমন ক'রে একটা নিরীহ গ্রাম্য বালিকার উপর প'ড়ে তার জীবনটাকে প্রথম থেকেই ওলট-পালট করে দিয়ে একটা অভিশাপের বোঝায় পরিণত করল—এ-সব কথা ভাবতেও আমার কষ্ট হচ্ছিল।

৬

তারপর দীর্ঘ সাত-আট বছর কেটে গেছে। মোহিত উকীল হয়েছে, হিমাংশু কোথায় ত্রিকৃষ্ণিড খুলেছে, সুধীর কোন বড় লোকের মেয়ে বিয়ে ক'রে তার দাপটে নাকি বেচারী নাজেহাল হয়ে যাচ্ছে!—এই ভাবে আমাদের বন্ধুর দলটি এখন ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছে।

কিন্তু যে-ঘটনা উপলক্ষ্য ক'রে আমার এই সব পুরাতন কথা স্মরণ করা, সেটা এই—সে-বার বৈশাখ মাসে বিশেষ কোন কার্য্য উপলক্ষ্যে শান্তিপুর গিয়েছিলাম। বিকেলের দিকটায় বড্ড গরম। গঙ্গার ধারে বেড়াতে গেলাম। গঙ্গা অনেক দূরে সরে গিয়েছে। সন্ধ্যা হয়ে এল, ফিরব মনে করছি। এমন সময় দেখতে-না-দেখতে একখানা কালো মেঘ সমস্ত আকাশটা একেবারে ছেয়ে ফেলল। জোরে পা চালালাম। কিন্তু কিছুদূর আসতেই রাজ্যের পাতা আর ধুলোবালি উড়ে আমাকে পথহারা ক'রে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে রীতিমত ঝড়জল আরম্ভ হ'ল। মাঠের মধ্যে পথের ঠিক বাঁ দিকে কতকগুলা বড় বড় কৃষ্ণচূড়া ফুলের গাছ, কয়েকটা নেড়া

ঝাউগাছ—বোধ হয় পূর্ব্বে এখানে কারও সখের বাগানবাড়ি ছিল। এখন মাত্র অতি জীর্ণ একটা দ্বিতল বাড়ি বিদ্যমান আছে। মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে ঝড়জলে কষ্ট পাওয়ার চেয়ে সেই পুরাতন বাড়িটায় আশ্রয় নেওয়াই যুক্তিসঙ্গত ব'লে মনে করলাম।

অতিকষ্টে নীচের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠা গেল। একটা অতিজীর্ণ পুরাতন দরজা—ভেতর থেকে বন্ধ। ভাবলাম অর্গল ভেঙে ফেলি। হয়ত দেখব পরিচারিকার সঙ্গে একটি তরুণী!—ঐ শ্মশানেশ্বরের ওখানে পূজা দিতে যাচ্ছিল, পথে এই দুর্যোগ! তাঁরা ভীতা, ত্রস্তা!—তারপর ঘণাস আবা সম্ভব হবে না, কিন্তু আমি সমস্ত রাত্রি এই দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে তাদের বল্‌ব—"আমি ইউনিভারসিটির শিক্ষিত যুবক - এখনও বিয়ে করিনি—আমার দেহে এক বিন্দু শোণিত থাকতে কেউ তোমাদের কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারবে না।"

দরজায় ধাক্কা দিলাম।—"ভিতরে কে আছ?"

বামাকণ্ঠে নয়—নেহাৎ পুরুষোচিত গম্ভীর গলায় উত্তর এল—"কে?"

"ভিতরে আসতে পারি কি? আমি একজন পথিক, ঝড়জলে পথ হারিয়ে ফেলেছি।"

দরজা খুলল। বিমলাও নয়, তিলোত্তমাও নয়, একেবারে ইয়া দাড়িওয়ালা এক বাবাজী! আমি ভিতরে গেলে বাবাজী আবার দরজা বন্ধ ক'রে আসন পরিগ্রহ করলেন।…আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ ক'রে বাবাজী জিজ্ঞাসা করলেন—"কোথা থেকে আসা হচ্ছে?"

"গঙ্গার ধারে বেড়াতে গিয়েছিলাম, পথে এই বিপদ।"

"এখানে আসা হয়েছে কোথায়?"—দৃষ্টিতে সন্দেহ মাখা।

"এই শান্তিপুরেই।"

"কোন্ বাড়ি?"

"নৃসিংহ বাঁড়ুয্যের বাড়ি"

তারপর বাবাজী আমার চৌদ্দ পুরুষের পরিচয় নিলেন। লক্ষ্য করছিলাম—সাধুর ঘরে বিলাস এবং বৈরাগ্য দুই-ই আছে। সাধু বৈষ্ণব নয়—ঘোর শাক্ত। মাথায় জটা, মুখে বড় বড় দাড়ি—রুদ্রাক্ষের মালা গলায়—কপালে সিঁদুরের ফোঁটা—রক্তবস্ত্রধারী। ঘরের দেওয়ালে অনেকগুলি কাটাল—এক কোণে একটা গোপীযন্ত্র—খাঁচায় একটা টিয়া পাখী, একটা পান-সাজবার রেকাবী—এই-সব। অনেক ক্ষণ পরে সাধু বল্‌লেন, "বস।"

বুঝি জলটা থেমে গেল। বল্‌লাম—"দেখি এইবার বেরিয়ে পড়া যাক।" আকাশ অনেক পরিষ্কার, কিন্তু ভাঙা জানালা দিয়ে নীচেও কা'কে দেখলাম, এই ঝড় জলের মধ্যে ভিজে কাপড়ে বাসন মাজছে! গৈরিকবাসা একটি গৌরবর্ণা যুবতী! বুঝলাম এটা বঙ্কিমের যুগ নয়—শরচ্চন্দ্রের রাজত্ব!—এ ঠিক শ্রীকান্তের সাপুড়ে আর তার দিদি।—দিদি বাসনগুলো তুলে রেখে গাইটাকে বিচিলি দিয়ে এলেন। ঝড় থেমে গেছে—একটু একটু জল হচ্ছে। ভাবলাম, দেখা যাক্ যদি সাপের মন্তর টন্তর কিছু শেখা যায়!—সাধুজীর সংক্ষেপে পরিচয় এইরূপ—

সাধুর নিবাস—নিরুদ্দেশ।—'মহাপুরুষদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে নেই; কারণ তাঁরা একই সময়ে সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকতে পারেন।" খুব বড় কথা। ভাবলাম, জিজ্ঞাসা করি এখানে এখন বর্ত্তমান মহাপুরুষটি কি তা হ'লে স্থান, কাল এবং কার্য্যকারণ সম্বন্ধের অতীত? কিন্তু আধ্যাত্মিক আলোচনায় তখন আমার আগ্রহ ছিল না।

সাধু ব'লে যেতে লাগলেন—"তার যে নক্ষত্রে জন্ম তাতে মানুষ বদ্ধজীব হ'য়ে থাক্‌তে পারে না।" এ-কথা নাকি পাঁজিতে পরিষ্কার লেখা আছে। আমিও ঘাড় নেড়ে তাতে সম্মতি জানালাম। দশ বৎসর বয়স থেকে তিনি পশ্চিমে মুঙ্গের সীতাকুণ্ড তীর্থে। তারপর পূবে, আসাম লালমাটি পাহাড়ে পনর বৎসর। কামাখ্যা পাহাড়ে সাধুর সিদ্ধি লাভ হয়। তারপর গুম পাহাড়ে কুড়ি বৎসর গাছের পাতা খেয়ে সাধু সাধনা করেন। শিষ্যাটির সঙ্গে সাধুর কাশীধামে এক শ্মশানে সাক্ষাৎ হয়। অনেক কলেজের ছেলে, প্রফেসর, ডাক্তার সাধুর শিষ্য। কে উপরে আসছিল—সাধু চুপ করলেন।

এলেন দিদি—শ্রীকান্তের অন্নদা দিদি! বয়স একুশ-বাইশ হয়ত হবে। কিন্তু সংসারের কঠোর নিষ্পেষণে তার বয়স যেন আরও অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। মনে হ'ল একে কোথায় যেন দেখেছি—এ কি শ্রীকান্তের কমলিলতা? সাধুটি কি আখড়ার সেই বাবাজী, না, গহুর

পিরান জামা প'রে বসেছে?—না; সাপুড়ে ছাড়া সাধুকে আর কিছু মনে করা যায় না। গফুর মিয়া ত কবি ছিল। ওই রমণীটিকে অন্নদা, পিয়ারী কি কমলিলতা যাই হোক একটা মনে করা যেতে পারে।—সাপুড়ে অন্নদা!—না, এ যেন দেবীপুরের সেই অন্নপূর্ণা!—হাঁ তার সঙ্গে যেন এর অনেক সাদৃশ্য রয়েছে! সাধুর সঙ্গে এর কি সম্বন্ধ!—হাতে নোয়া নেই, কপালে সিঁদুরও নেই—ভাবছি—

"আপনি ভিজে জামাটা বরং ছেড়ে বসুন"—সন্ন্যাসিনী-দিদির শরীরে মায়া আছে দেখছি। গায়ে যে ভিজে জামা রয়েছে একথা আমার মনেই হয়নি!

"শান্তিপুর এসেছেন—আপনার বুঝি দিশী কাপড়ের ব্যবসা আছে?"

সাধু তাড়া দিয়ে বল্‌লেন—"ওগো না—শুনছ না পেটে বিদ্যে রয়েছে—চাকরি করলে এখন কত টাকা রোজগার করতে পারে।" বল্‌লাম—"ব্যবসায় ত খুব ভাল জিনিষ। চাকরির চাইতে ঢের ভাল। কিন্তু ছেলেবেলা থেকে ত শিখিনি!—একদিন সে আজ বছর সাত-আট আগে কাপড়ের দোকানদার হয়ে এক গ্রামে গিয়েছিলাম। সে যে কি দুর্ভোগ!—চার টাকার কাপড়, বলে এক টাকায় দেবে?"

দিদি স্মিতহাস্যে বল্‌লেন—"কেউ ধার-টার চায়নি ত?"

"না তা ঠিক চায়নি। তবে তাও আমাকে দিয়ে আসতে হয়েছিল।"

"তারপর বুঝি ব্যবসা ফেল হ'ল?"

"না, আসলে সেটা ব্যবসায় করতেই যাওয়া নয়। সে গিয়েছিলেম ছদ্মবেশে বন্ধুর বিয়ের মেয়ে দেখতে। বিয়ে হ'ল না। মাঝখান থেকে আমাদের কতকগুলা টাকা-পয়সাই নষ্ট।"

সাধু খিল খিল ক'রে হাসলেন—"সে না করালে কেউ কিছু করতে পারে?—সবই পাগলীর হাত। তাকে পেতে হলে সাধনা চাই—সাধনায় গুরু চাই"—

দিদি গম্ভীর হ'য়ে বল্‌লেন—"বিয়ে হ'ল না কেন? মেয়ে পছন্দ হয়নি বুঝি?"

"না, মেয়ে আমাদের খুবই পছন্দ হয়েছিল—তার নাম ছিল অন্নপূর্ণা—চেহারা ঠিক অন্নপূর্ণার মতই, কিন্তু তার ঠাকুর-মা ত ছেলে চাননি—চেয়েছিলেন বড় কুলীন—কাজেই সে বিয়ে হয়নি।"

খানিকক্ষণ সব চুপচাপ। তারপর দিদি নেমে গেলেন নীচে। সাধু আমাকে ইহকাল পরকাল সম্বন্ধে দুই-একটা বক্তৃতা দিয়ে কেমন উস্‌খুস্ ক'রতে লাগলেন। তারপর ঝোলার ভিতর থেকে একটা ছোট কোল্‌কে, একটু ছেঁড়া নেকড়া আরও সব কি বেরুল। বল্‌লাম, "রাত হবে—এখন তবে উঠি।"

সাধু অন্যমনস্কভাবে বললেন—"আচ্ছা।"

নীচে নেমে যাচ্ছিলাম। দেখি ক'টা আম আর এক বাটি দুধ দিয়ে দিদি উপরে আসছেন। আমাকে দেখে তিনি দাঁড়ালেন।

"আপনি এখনি চলে যাচ্ছেন—একটু কিছু মুখে দিয়ে গেলেন না?"

থমকে দাঁড়ালাম। বল্‌লাম—"দিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেয়ে যাচ্ছি। নইলে আবার রাত হয়ে যাবে।"

দিদি কিছু অন্যমনা। বললেন—'ঠাণ্ডা হাওয়া পড়েছে—খালি গায়ে এতটা পথ যাবেন, একটা কিছু দেব?"

বল্‌লাম—"না, বেশ আছি।" তারপর একটু ইতস্ততঃ ক'রে জিজ্ঞাসা করলাম—"আচ্ছা, ঐ সাধুটি কি তন্ত্রসিদ্ধ মহাপুরুষ লোক?"

"সাধু কে?—আপনি যেমন কাপড়ের মহাজন হয়েছিলেন উনিও তেমনি সাধু হয়েছেন।"

তারপর খুব আস্তে আস্তে বল্‌লেন, "দেবীপুরে মহাজনের নামে যে কাপড়খানা ধারে দিয়ে এসেছিলেন তা আজও নষ্ট হয়নি।—সেইখানাই না হয় গায়ে দিয়ে যান।"

"আপনি তবে সত্যিই সেই"—মুখের আম হাত থেকে পড়ে গেল।

"হাঁ, তবে সে পরিচয় আমার আর নেই—"

ভাবলাম, সেই—সেই অন্নপূর্ণা আজ এমন ভাবে কথা বলতে পারে!

"আমি অবাক হচ্ছি—আপনি—পেষে কেন—এ অবস্থায় আপনি কি ক'রে—"

সাধু দরজা খুলে উপর থেকে কর্কশ গলায় হাঁক দিয়ে বল্লেন—"উপরে তক্‌নো খুঁটে নিয়ে এস—কি হচ্ছে নীচে এখনও ?"

"যাই" ব'লে ত্রস্তপদে দিদি চলে গেলেন। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে আমিও আস্তে আস্তে বেরিয়ে পড়লাম।...আকাশ পরিষ্কার, শন্ শন্ ক'রে ঝাউগাছের ভিতর দিয়ে মেঠো হাওয়া বইছে। সাধু আমাকে নীচের দাঁড়িয়ে নিভৃত আলাপ করতে হঠাৎ দেখে ফেললে—ইচ্ছা হয়েছিল একবার লুকিয়ে দেখে আসি এর পর কি হয়—কিন্তু সে-দিকে পা বাড়াতে আর আমার প্রবৃত্তি হ'ল না। সেই দেবীপুরের অম্বু, বড় কুলীনের সঙ্গে যার বিয়ে হয়েছিল—তার সে পরিচয় আর নেই !...রাত্রের গাড়ীতেই কলকাতা যাওয়ার কথা আছে। নিশ্চল ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমি বাসার দিকে ফিরলাম।

মাহেন্দ্রক্ষণ

শ্রীনিরুপমা দেবী

প্রভাতে যখন দেখিনু ধরণীটিরে
আধেক আঁধার আধেক আলোকপটে
গগনের ঐ নীল পারাবার তীরে
তপন তখনো ভরেনি স্বর্ণঘটে।
কুসুমে কুসুমে পড়েনি ধুলার ছায়া
নব উন্মেষে বিকচ কোমল কায়া
জড়িত আছিল মোহের স্বপন মায়া
ভুবন গগন মিলন সন্ধিতটে।

আম্রবনের পত্রপুঞ্জ ভারে
শোভিত অদূরে কূজিত কুঞ্জবন
কুসুমে কুসুমে ফুল্ল মঞ্জু হারে
গুঞ্জিত অলি শিঞ্জিত আভরণ।
বনবালা বুঝি করচম্পক দলে
দীর্ঘ শালের সরণির তলে তলে
দিয়ে গেছে আজি সুনিপুণ কৌশলে
চন্দনঘন চূর্ণের আলিপন।

সুদূরে কোথায় বিরহিণী পিকবধূ
মিনতি জানায় সকরুণ ক্রন্দনে
ভ্রমর তখনো ফুলের বক্ষ মধু
খুঁজিতে আসেনি বিকশিত ফুলবনে।
নব পুষ্পিত বল্লরী বাহু তুলি
মধু মালতীর বিতানের শাখাগুলি
গুচ্ছ গুচ্ছ পুষ্পের ভারে দুলি
ললিত বিলাসে কাঁপিছে আপন মনে।

পলাশের বুকে বিদায়ের গৈরিক
লেগেছে ত্যাগের উদাস রাগের রেখা
পুলক আবেশে কাঁপিতেছে চারিদিক
অস্ত চাঁদের মোছেনি হস্তলেখা।
মদির গন্ধে আবেশবিভল বায়
অমৃত পরশ হরষে বুলায়ে যায়
মন্থর গতি অন্তর বেদনায়
হয়নি তখনো চঞ্চল লীলা শেখা।

চির দিবসের একি পুরাতন ধরা
দেখেছি যাহারে তপ্ত তপন তাপে
জীর্ণ কঠিন বেদনা ক্লান্তি ভরা
ক্ষুব্ধ মনের কম্পিত অভিশাপে !
উষার আড়ালে পরম গভীর স্নেহে
চির দিবসের পুরাতন এই গেহে
পরশ মাণিক বুলাল কে তার দেহে
অঙ্গ ভরিল নবীনানন্দ চাপে !

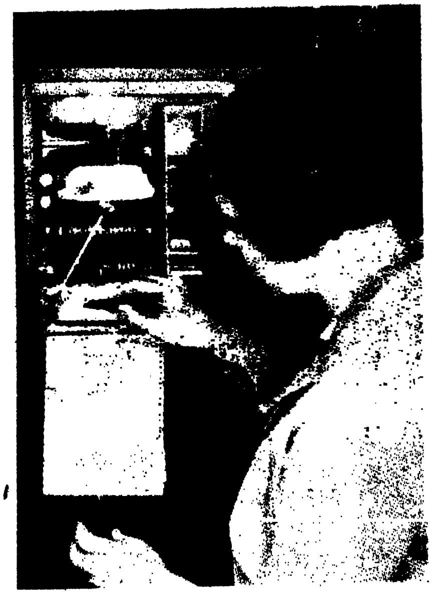
এই যে আমার ক্ষণিকের পরিচয়
নয়নে বচনে চিত্তের একাধারে
চির দিবসের সে দেখা এ দেখা নয়
যে দেখা দেখেছি ফিরে ফিরে বারে বারে
নবীন সত্তা-দৃষ্টির উল্লাসে
এ দেখা কেবল ক্ষণিকের তরে আসে
মনের আঁখির দিঠি-বাতায়ন পাশে
চির জীবনের ক্ষণ বসত পারে।

শহর ধোঁয়া ও ধুলা মুক্ত করা—

ধোঁয়া ও ধুলা যেন বড় বড় শহরের চিরসঙ্গী। ইহা দ্বারা বাতাস দূষিত হয়। ফলে শহরে যক্ষ্মা এবং এই জাতীয় রোগের প্রসার বৃদ্ধি পায়। কিছুকাল যাবৎ আমেরিকার পিটস্‌বর্গ ও অন্যান্য শহরে ধোঁয়া ও ধুলা দূরীকরণের চেষ্টা চলিতেছে। রান্নার উনন, কলকারখানা, চলমান ট্রেন প্রভৃতি হইতে ধূম বাহির হয়। যন্ত্র-সাহায্যে এই ধোঁয়া হইতে বাতাসকে মুক্ত রাখা হয়।



বায়ু-পরীক্ষণাগার



বায়ু দূষিত কি-না তাহা পরীক্ষা করা হইতেছে



একটি কারখানা। এখানে কয়লা ব্যবহৃত হইলেও যন্ত্র-সাহায্যে বাতাসকে ধোঁয়া হইতে মুক্ত রাখা হইতেছে

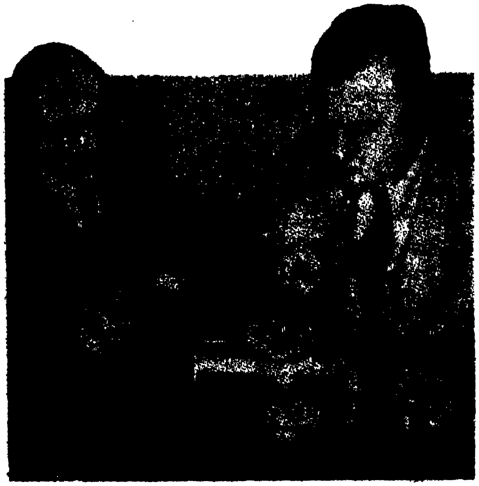


ধূমবিহীন চলমান ট্রেন

শহরের বায়ু যাহাতে ধূম ও ধূলি বিমুক্ত করিয়া স্বাস্থ্যপ্রদ করা যাই পারে সেজন্য বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসক, ইঞ্জিনীয়ার সকলেরই একযোগে কা করা প্রয়োজন।

ভূমিকম্পের সময় গ্যাস ও বিদ্যুৎ চলাচলের পথ রোধ করিবার উপায়—

ভূমিকম্পের সময় কোথাও কোথাও—যেমন জাপানে—অগ্নি উদ্গীরণ হয়। ইহার উপর যদি গ্যাস ও বিদ্যুৎ জনিত অগ্নি উদ্গীরিত হইতে থাকে তাহা হইলে বিষম বিপত্তি উপস্থিত হয়। এই কারণে ইহা নিবারণের একটি উপায়

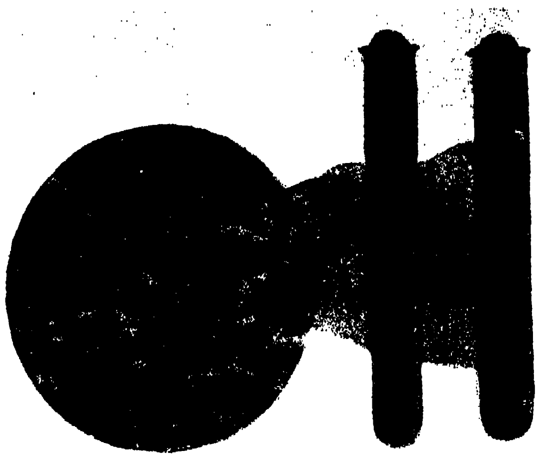


দক্ষিণ পার্শ্বে ধাতব গোলাটি দেখানো হইতেছে। এই গোলাটি ভূমিকম্পের সময় নলের মধ্যে পড়িয়া গ্যাস ও বিদ্যুৎ চলাচলের পথ রোধ করে

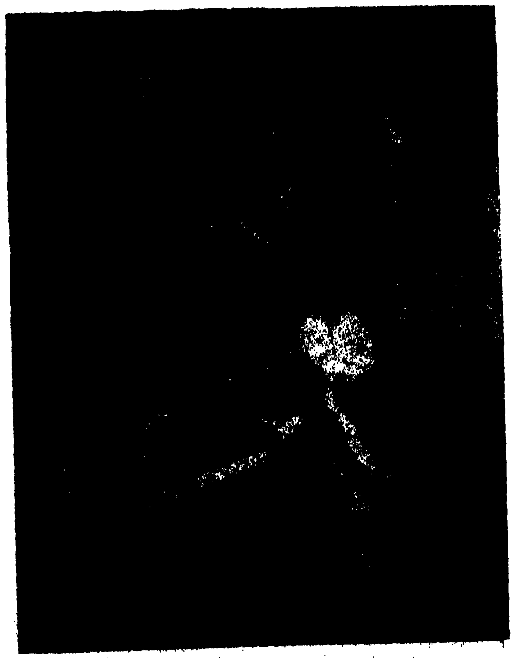
উদ্ভাবিত হইয়াছে। বিদ্যুৎ বা গ্যাস যে নল দিয়া যাতায়াত করে তাহার এক স্থলে একটি বাটি থাকে। এই বাটির উপর একটি দণ্ডে ধাতব গোলা বসান হয়। বাটির ভিতর দিয়া নলের মধ্য পর্য্যন্ত একটি ছিদ্র থাকে। ভূমিকম্পের সময় যখন খুব বেশী কম্পন হয় তখন গোলাটি নলের ভিতর পড়িয়া গিয়া বিদ্যুৎ বা গ্যাসের গতিরোধ করে।

শস্যের পোকা নিবারণে বিদ্যুৎ—

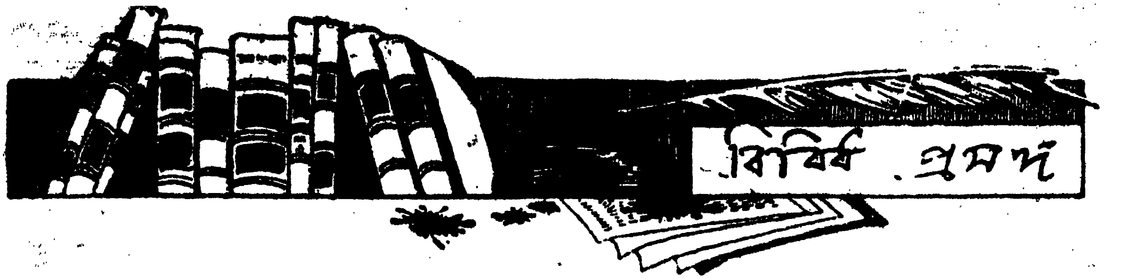
বিদ্যুৎ দ্বারা দিন দিন কি অসাধ্য সাধন হইতেছে ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। শস্য স্থানান্তরে পাঠাইবার বা গোলাজাত করিয়া রাখিবার পূর্ব্বে ইহার মধ্যে বিদ্যুৎ চালান হয়। বৈদ্যুতিক শক্তির প্রকোপে পোকা-মাকড় গম প্রভৃতি শস্য ছাড়িয়া চলিয়া যায়। এই প্রক্রিয়া দ্বারা বঙ্গদেশের ধান, চাউল ও অন্যান্য রবিশস্যও পোকার উপদ্রব হইতে নিস্তার পাইতে পারে।



কীটদষ্ট গম বিদ্যুৎ-চালিত গম কীটদষ্ট গম



যন্ত্র-সাহায্যে শস্যের মধ্যে বিদ্যুৎ-চালনা



পণ্ডিত জওআহরলাল নেহরুর কারাবাস দণ্ড

কিছুদিন পূর্ব্বে পণ্ডিত জওআহরলাল নেহরু কলিকাতায় আসিয়া কয়েকটি বক্তৃতা করেন। তাহার তিনটির জন্ম তিনি রাজদ্রোহ অভিযোগে কলিকাতায় প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে অভিযুক্ত হন। বিচারে তিনি দুই বৎসরের জন্ম অ-কঠোর কারাবাস দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে প্রথম দিন জামিনে খালাস দিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি তাহাতে রাজী না হওয়ায় তাঁহাকে হাজতে যাইতে হইয়াছিল। তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন করেন নাই, ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুমতি পাইয়া কিছু বলিতেছিলেন। কিছু বলা হইবার পর সরকারী উকীল আপত্তি করায় তাঁহাকে থামাইয়া দেওয়া হয়।

ভারতবর্ষীয় পীন্যাল কোডের ১২৪-এ ধারায় রাজদ্রোহ অপরাধের শাস্তির বিধান আছে। এই ধারার ব্যাখ্যা এবং সিডিশ্যন বা রাজদ্রোহের মানে হাইকোর্টের জজেরাও সকলে এক রকম করেন নাই। ১৮৭০ সালে স্তর জেম্স্ ষ্টিফেন ভারত-গবর্ণ্মেণ্টের আইন-সচিব থাকা কালে এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন,

"The offence would fall under this Section if only there was a disposition to resist the law by force. So long as a writer or speaker neither directly nor indirectly suggested or intended to produce the use of force, he did not fall within the sedition Section"

"অপরাধটা এই ধারার মধ্যে পড়িবে কেবল তাহা হইলে যদি বল-প্রয়োগ দ্বারা আইন প্রতিরোধ করিবার প্রবৃত্তি থাকে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত একজন লেখক বা বক্তা সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে বলপ্রয়োগ উৎপন্ন করিতে ইঙ্গিত বা ইচ্ছা না-করে, ততক্ষণ সে রাজদ্রোহ ধারার মধ্যে আসে না।"

স্তর জেম্সের এই ব্যাখ্যা মানিতে এখন সরকার বা জজেরা বাধ্য নহেন। নতুবা বলা যাইতে পারিত, পণ্ডিত জওআহরলাল বলপ্রয়োগ ইচ্ছা বা ইঙ্গিত করা দূরে থাক, কলিকাতার একটি বক্তৃতায় পরিষ্কার ভাষায় সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন ভারতবর্ষের স্বারাজ্য সমষ্টিগত প্রচেষ্টার দ্বারাই লভ্য এবং সেই প্রচেষ্টা অহিংস ("non-violent") হওয়া চাই। গবর্ণ্মেণ্ট কিন্তু বলপ্রয়োগসাপেক্ষ ও অহিংস উভয়বিধ স্বারাজ্য লাভ প্রচেষ্টারই বিরোধী।

ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্পূর্ণ রায় ইংরেজী অনেক কাগজে ছাপা হইয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট পণ্ডিতজীর যে-কথাগুলি উদ্ধৃত করিয়া তাঁহাকে দোষী স্থির করিয়াছেন, সেই কথাগুলি রায়ের যে-অংশে আছে, আমরা নীচে কেবল সেইগুলি উদ্ধৃত করিতেছি।

"In view of the statement made by the prisoner in pleading to the charges, it seems to me, it would be altogether superfluous to discuss a single line of any of the speeches. The accused has stated in Court that for many years his activities have certainly been seditious *if by sedition is meant the desire to achieve the independence of India and to put an end to foreign domination*; he has laboured to that end with all his strength for many years; as the years go by, his conviction has grown stronger within him that there can be no freedom for the Indian people so long as there is a trace of British rule left on the face of the country; he has, therefore, attempted in a small degree to put an end to British rule in this country; *if that is sedition, he admits he had been seditious for many years.*"

তাৎপর্য্য। অভিযুক্ত ব্যক্তি অভিযোগের উত্তরে যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা বিবেচনা করিলে তাঁহার বক্তৃতা তিনটির কোন একটির এক পংক্তিও আলোচনা করা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক হইবে। তিনি আদালতে বলিয়াছেন যে, যদি রাজদ্রোহের মানে হয় ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সম্পাদনের ইচ্ছা এবং বৈদেশিক প্রভুত্বের উচ্ছেদসাধনের ইচ্ছা, তাহা হইলে অনেক বৎসর ধরিয়া তাঁহার ক্রিয়াকর্ম্ম নিশ্চয়ই রাজদ্রোহাত্মক হইয়াছে; দীর্ঘকাল ধরিয়া তিনি সেই উদ্দেশ্যসাধনের জন্ত তাঁহার সমুদয় শক্তির সহিত পরিশ্রম করিয়াছেন: বৎসরের পর বৎসর গত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার এই দৃঢ় বিশ্বাস তাঁহার অন্তরে বলবত্তর হইয়াছে, যে, যতদিন দেশে ব্রিটিশ-শাসনের লেশমাত্রও অবশিষ্ট থাকিবে, ততদিন ভারতবর্ষীয় লোকদের স্বাধীনতালাভ ঘটিতে পারে না: সেই জন্ত তিনি এদেশে ব্রিটিশ-শাসনের উচ্ছেদসাধন করিবার জন্ত কিছু চেষ্টা করিয়াছেন; তাহা যদি রাজদ্রোহ হয়, তাহা হইলে তিনি স্বীকার করেন, যে, তিনি অনেক বৎসর ধরিয়া রাজদ্রোহিতা করিয়াছেন।

এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে, যে, ম্যাজিষ্ট্রেটের রায় অনুসারে, পণ্ডিতজী ইহা বলেন নাই, যে, যে-বক্তৃতাগুলির জন্ত তিনি অভিযুক্ত হইয়াছিলেন, সেইগুলি রাজদ্রোহাত্মক;

ম্যাজিষ্ট্রেটও সেগুলিকে রাজদ্রোহাত্মক বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টাই করেন নাই—তাহা তিনি অনাবশ্যক বলিয়াছেন। পণ্ডিতজী বলিয়াছেন, ‘রাজদ্রোহের মানে যদি ইহা হয়, তাহা হইলে আমি অনেক বৎসর ধরিয়া রাজদ্রোহিতা করিতেছি।” যে যে রকম কাজ বা চেষ্টার অর্থ রাজদ্রোহ



ভূমিকম্পের পর মুঙ্গেরে ধ্বংসস্তূপ পরিষ্কার কার্য্যে কোদালীস্কন্ধে শ্রীযুক্ত জওআহরলাল ও অন্যান্য কর্ম্মিগণ (আনন্দবাজার পত্রিকার সৌজন্যে)

বলিয়া মানিয়া লইলে পণ্ডিতজী আপনাকে অনেক বৎসর ধরিয়া রাজদ্রোহী বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন, প্রথমতঃ ধরা যাক্ যে, তাহা রাজদ্রোহ। তাহা হইলেও পণ্ডিতজীর স্বীকারোক্তির মানে এরূপ হয় না, যে, যত বৎসর ধরিয়া তিনি রাজদ্রোহী, তত বৎসর তিনি সাধারণ কথাবার্ত্তা, আহার নিদ্রা, বা শয়নে স্বপনে, বা অন্য অবস্থায় যাহা কিছু বলিয়াছেন, করিয়াছেন, সমস্তই রাজদ্রোহাত্মক। গত কয়েক বৎসরে যখন যখন তাঁহার কাজ বা কথা সরকার কর্ত্তৃক রাজদ্রোহাত্মক বা অন্য প্রকারে আইনবিরুদ্ধ বিবেচিত হইয়াছে, তখন তখনই তিনি কারারুদ্ধ হইয়াছেন—মোট ছয়-সাত বার বোধ করি তাঁহাকে জেলে পাঠান হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার আগেকার রাজদ্রোহিতা বা অন্যরূপ আইনভঙ্গের শাস্তি ত হইয়াই গিয়াছে। তাহার জন্য নূতন করিয়া তাঁহার বিচার বা শাস্তি হইতে পারে না। সম্প্রতি তাঁহার বিরুদ্ধে যে-বক্তৃতাগুলির জন্য অভিযোগ হইয়াছিল, সেইগুলি রাজদ্রোহাত্মক পণ্ডিতজী তাহা বলেন নাই, ম্যাজিষ্ট্রেটও তাহা দেখান নাই। সেই জন্য “রাজদ্রোহের মানে যদি ইহা হয়, তাহা হইলে অনেক বৎসর হইতে আমার কাজকর্ম্ম রাজদ্রোহাত্মক”, পণ্ডিতজীর এইরূপ একটি সর্ত্তাধীন, “যদি”র অধীন (conditional), সাধারণ (general) স্বীকারোক্তির (admissionএর) উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাকে দণ্ড দেওয়া আমাদের বিবেচনায় ঠিক্ হয় নাই। যে-বক্তৃতাগুলির জন্য তিনি অভিযুক্ত সেগুলি যে রাজদ্রোহাত্মক, তাহা দেখান দরকার ছিল ; কিন্তু তাহা দেখান হয় নাই। পণ্ডিতজী আপীল করিবেন না, সুতরাং ম্যাজিষ্ট্রেটের রায়ের আলোচনা উকীল ব্যারিষ্টার বা হাইকোর্ট জজদের দ্বারা হইবে না।

প্রথমতঃ, আমরা ইহা ধরিয়া লইয়া আলোচনা করিয়াছি, যে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভের ইচ্ছা বা বৈদেশিক শাসনের উচ্ছেদসাধনের ইচ্ছা রাজদ্রোহ। কিন্তু এরূপ ইচ্ছা যে রাজদ্রোহাত্মক তাহা ব্রিটিশ গবন্মেণ্টের ভারতীয় কোন আইনে লেখা আছে বলিয়া আমরা অবগত নহি। বস্তুতঃ, কংগ্রেসের শেষ লাহোর অধিবেশনে যখন ভারতবর্ষকে স্বাধীন করাই কংগ্রেসের মূল উদ্দেশ্য বলিয়া ঘোষিত হয়, এবং স্বাধীনতা লাভের অনুকূলে অনেক বক্তৃতা হয়, তখন কাহাকেও তাহার জন্য অভিযুক্ত বা দণ্ডিত করা হয় নাই। পরেও কংগ্রেসকে এ পর্য্যন্ত বে-আইনী সভা বলিয়া ঘোষণা করা হয় নাই। ইহা সবাই জানে, যে, কংগ্রেস দলের প্রত্যেক নেতার এবং অগণিত অনুচরের উদ্দেশ্য ও ইচ্ছা ভারতবর্ষকে স্বাধীন করা। কিন্তু শুধু এই কারণে কোন কংগ্রেসওয়ালার বিচার ও শাস্তি হয় নাই—বিচার ও শাস্তি হইয়াছে তাহাদের বিশেষ বিশেষ বক্তৃতা বা অন্য কাজের জন্য।

তাহার পর, বৈদেশিক প্রভুত্বের উচ্ছেদসাধনের ইচ্ছা ও চেষ্টা রাজদ্রোহ কি-না, তাহা বিচার্য্য। ভারতবর্ষে বৈদেশিক প্রভুত্বের অবসান হইতে পারে দুই প্রকারে ; (১) ভারতবর্ষ স্বাধীন হইলে, (২) ভারতবর্ষ কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতির মত ডোমীনিয়নত্ব পাইলে। স্বাধীনতালাভের ইচ্ছা প্রকাশ বা তাহা লাভের চেষ্টা মাত্রেই যে সরকারের মতে রাজদ্রোহ নহে, ইহা মনে করিবার কারণ আগে দেখাইয়াছি। স্বাধীনতা-লাভ করিবার জন্য বলপ্রয়োগ, বর্ত্তমান গবন্মেণ্টের প্রতি অবজ্ঞা ও বিদ্বেষ উৎপাদন, ইত্যাদি আচরণ আইনবিরুদ্ধ বটে। কিন্তু পণ্ডিতজী কলিকাতায় তাঁহার আধুনিক তিনটি বক্তৃতায় সেরূপ কিছু করিয়াছিলেন বলিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট প্রদর্শন করেন নাই। বক্তৃতাগুলির সরকারী রিপোর্ট প্রকাশিত না হওয়ায়

আইনজ্ঞ লোকদিগের বা সর্ব্বসাধারণের নিজেদের একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার উপায় নাই। অভিযোগের ভিত্তিভূত পণ্ডিতজীর একটি বক্তৃতায় আলবার্ট হলে আমরা উপস্থিত ছিলাম। তাহা শুনিয়া যে আমাদের তাহা রাজদ্রোহাত্মক মনে হয় নাই, ইহার অবশ্য কোন মূল্য নাই; কারণ আমরা আইনজ্ঞ নহি এবং সরকারনিযুক্ত বিচারকও নহি। কিন্তু ইহা সত্য যে, এরূপ অনেক বক্তৃতা ভারতবর্ষে হইয়াছে, এরূপ অনেক লেখা ভারতবর্ষে প্রকাশিত হইয়াছে যাহাতে সাম্রাজ্যবাদ (imperialism) নিন্দিত হইয়াছে, স্বাধীনতালাভ বা ডোমীনিয়নত্বলাভ বাঞ্ছনীয় বলিয়া সমর্থিত হইয়াছে, অথচ যাহার জন্য কাহারও বিচার বা শাস্তি হয় নাই।

ডোমীনিয়নত্বলাভ হইলে যে বৈদেশিক শাসনের, ব্রিটিশ শাসনের, উচ্ছেদ হয়, তাহার প্রমাণ এই, যে, কানাডা অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি ডোমীনিয়নগুলি কেহ স্বীকার করে না, কেহ স্বপ্নেও ভাবে না, যে, তাহারা বৈদেশিক শাসনের, ব্রিটিশ শাসনের অধীন। তাহারা এই সত্য কথা জানে, যে, তাহারা আত্মশাসক। ইহার একটা পরোক্ষ প্রমাণ দিতেছি।

গত ফেব্রুয়ারী মাসে গ্রেট ব্রিটেনের সঙ্গে রুশিয়ার একটি বাণিজ্যচুক্তি হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে, যে, রুশিয়ার মাল ডোমীনিয়নগুলি বাদে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে এবং ডোমীনিয়নগুলি বাদে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মাল রুশিয়ায় সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাপ্রাপ্ত জাতির প্রাপ্য ব্যবহার ("most favoured nation treatment") পাইবে। এই চুক্তিতে যে ডোমীনিয়নগুলিকে বাদ দেওয়া হইয়াছে, তাহার মানে কি? মানে এই যে, অন্য কোন দেশের ও জাতির সহিত ডোমীনিয়নগুলির জন্য চুক্তি করিবার অধিকার ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের নাই; কারণ, ডোমীনিয়নগুলিতে ব্রিটিশ শাসন, বৈদেশিক শাসন, প্রচলিত নহে—স্বশাসন প্রচলিত। সেরূপ কোন চুক্তি ডোমীনিয়নগুলি করিতে চাহিলে নিজেরা করিবে, অন্যকে করিতে বলিবে না, কারতে দিবেও না—তাহারা যে স্বশাসক।

দেখা গেল, যে, ডোমীনিয়নত্ব লব্ধ হইলে বৈদেশিক শাসনের, ব্রিটিশ শাসনের অবসান হয়। অথচ ডোমীনিয়নত্বলাভ যে ভারতবর্ষের চরম রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য, তাহা রাজপ্রতিনিধি লর্ড আরুইন (এক্ষণে লর্ড হ্যালিফ্যাক্স) রাজপ্রতিনিধিরূপেই স্বীকার করিয়াছিলেন। সেই স্বীকৃতি প্রত্যাহৃত হয় নাই; তিনি পরে কেবল ইহাই বলিয়াছেন, যে, উহা যে ভারতবর্ষের সদ্য সদ্য প্রাপ্য, তাহা তিনি বলেন নাই। নাই বলুন, কিন্তু উহা যত দূর ভবিষ্যতেই প্রাপ্য হউক না কেন, ডোমীনিয়নত্বলাভের (সুতরাং ঐ উপায়ে পরোক্ষভাবে বৈদেশিক ব্রিটিশ প্রভুত্ব ও শাসনের অবসানের) ইচ্ছা ও চেষ্টা যে আইনবিরুদ্ধ নহে, তাহা রাজপ্রতিনিধিরূপী লর্ড আরুইনের স্বীকৃতি দ্বারা বুঝা যায়। ডোমীনিয়নত্ব যে ভারতবর্ষের ভবিষ্যতে প্রাপ্য মর্য্যাদা, তাহা সম্রাট পঞ্চম জর্জের একটি ঘোষণাপত্রেও আছে।

ডোমীনিয়নত্বলাভ যে সাধারণতঃ মডারেট বলিয়া অভিহিত ভারতবর্ষীয় উদারনৈতিক দলের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, তাহা তাঁহারা তাঁহাদের দলের নিখিলভারতীয় ও প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্স-সমূহে, বক্তৃতায়, সভাসমিতির প্রস্তাবে এবং তাঁহাদের দলের খবরের কাগজে বার-বার ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু তাহার জন্য কাহারও বিচার হয় নাই, জেল হয় নাই। তাহার দ্বারা বৈদেশিক প্রভুত্বের অবসান যে ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোক চায়, তাহা মডারেট দলের একটি প্রধান দৈনিক, এলাহাবাদের লীডার, গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখেও লিখিয়াছেন। যথা—

"So far as the vast majority of people in India are concerned, they do not want to sever their connection with Britain but what they do want is that *the existing system of tutelage and domination should end* and that its people should be allowed full freedom to manage their affairs and that its status should be similar to that of the self-governing dominions."

তাৎপর্য্য। "ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোক ব্রিটেনের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে চায় না। কিন্তু তাহারা যাহা নিশ্চয়ই চায় তাহা এই, যে, ভারতবর্ষের অভিভাবকাধীন অবস্থা ও প্রভুত্বাধীন অবস্থা যে-শাসনব্যবস্থার ফল, তাহার অবসান হউক, এবং তাহারা তাহাদের দেশের সব কার্য্য পরিচালনের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করুক, এবং তাহাদের দেশের রাষ্ট্রীয় মর্য্যাদা স্বশাসক ডোমীনিয়নগুলির সমতুল্য হউক।"

এইরূপ লেখার জন্য লীডারের কোন বিচার বা শাস্তি হয় নাই।

ডোমীনিয়নত্বের মানে যে বৈদেশিক ব্রিটিশ প্রভুত্বের অবসান, তাহা ইংলণ্ডের সাম্রাজ্যবাদীরা ভাল করিয়া জানে বুঝে। এই জন্যই শ্বেত কাগজে ডোমীনিয়নত্বের উল্লেখ পর্য্যন্ত করা হয় নাই।

চট্টগ্রামে সুতা ও কাপড়ের কল

ইংরেজ কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের একটি কবিতাতে আছে—

"Two Voices are there; one is of the sea,
One of the mountains, each a mighty Voice:



চট্টগ্রাম কটন-মিল্‌সের প্রতিষ্ঠা-সভায় (১) শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়—সভাপতি, (২) শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তা (৩) শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার চক্রবর্ত্তী (৪) শ্রীমতী এস্‌, এল, খাস্তগীর, (৫) শ্রীযুক্তা কুসুমকুমারী সেনগুপ্তা, (৬) ডাঃ শ্রীমতী এন্‌, বি, মুখুজ্যে

In both fro n age to age thou didst rojoice,
They wore thy choson music, Lib rty !"

মুক্তিকে দেবতার রূপ দিয়া ও তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কবি বলিতেছেন, "পর্ব্বতমালার ও সমুদ্রের বাণী যুগে যুগে তোমাকে আনন্দ দিয়াছে, তাহারা তোমার মনোনীত সংগীত।" কবি রাষ্ট্রীয় স্বারাজ্যের উদ্দেশে এই পংক্তিগুলি লিখিয়াছিলেন।. কারণ, পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক দেশে ও নানা যুগে দেখা গিয়াছে, যে, পার্ব্বত্য ও সমুদ্রচারী জাতিরা স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় হইয়া থাকে।

কিন্তু তাহাদের এই স্বাবলম্বিতার ভাব কেবল যে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারেই দেখা যায়, তাহা নহে; অন্যান্য বিষয়েও অনেক সমুদ্রতটবাসী বা পার্ব্বত্য লোকদিগকে আত্মনির্ভরপরায়ণ ও উদ্যমশীল দেখা যায়। ইউরোপে সমুদ্রবেষ্টিত গ্রেট ব্রিটেনের লোকদের মধ্যে ও পার্ব্বত্য সুইস্‌দের মধ্যে এবং এশিয়ার সমুদ্র-বেষ্টিত ও পর্ব্বতবহুল জাপানের লোকদের মধ্যে স্বাবলম্বিতা ও উদ্যমশীলতা লক্ষিত হয়।

সম্প্রতি একটি সুতা ও কাপড়ের কলকারখানার প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে চট্টগ্রাম গিয়াছিলাম। শহরের নিকটেই সমুদ্র, সেখানে পাহাড়ও আছে, আবার নদীও আছে। জেলাটিও সমুদ্রতটবর্ত্তী, এবং তাহাতেও পাহাড় আছে। নিকটবর্ত্তী পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম জেলা একই অঞ্চলের অন্যতর ভাগ মাত্র,



চট্টগ্রামে শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তা

শাসনকার্য্যের সুবিধার জন্য আলাদা জেলা করা হইয়া থাকিবে।

চট্টগ্রামে পাহাড় ও তাহার নিকটে সমুদ্র দেখিয়া কবি ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থের কবিতাটি আমাদের মনে পড়িয়াছিল এবং মনে হইয়াছিল, এখানকার লোকদের স্বাবলম্বী ও উদ্যমশীল হওয়াই ত স্বাভাবিক।

চট্টগ্রামের "দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন কটন মিল্‌স্‌" প্রতিষ্ঠার বৃত্তান্ত কোন কোন দৈনিক কাগজে বাহির হইয়াছে, সুতরাং এই মাসিক কাগজে তাহা প্রকাশ করিবার আবশ্যক নাই, মাসিক কাগজের উদ্দেশ্যও তাহা নহে। কিন্তু প্রতিষ্ঠা-সভায় সভাপতিরূপে আমি যাহা বলিয়াছিলাম, সংক্ষেপে তাহার কিছু উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে। আমি যাহা বলিয়াছিলাম, অংশতঃ ও সংক্ষেপে তাহার তাৎপর্য্য এই :—

"আপনারা স্বাগত সম্ভাষণে উল্লেখ করিয়াছেন, যে, চট্টগ্রামের উপর দিয়া নানা বিপদ ও ঝড় বহিয়া গিয়াছে। আমি বিশেষ আনন্দ ও উৎসাহ বোধ করিতেছি, যে, তাহাতে আপনারা ভূমিসাৎ হইয়া যান নাই, ভগ্নোদ্যম না হইয়া পূর্ণ উদ্যমে এই কাজটিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

"ভাবপ্রবণ ও ভাবুক বলিয়া বাঙালীদের খ্যাতি বা অখ্যাতি আছে। কিন্তু ভাবপ্রবণ বা ভাবুক হইলেই যে মানুষ অকেজো হইবে, ইহা অবশ্যম্ভাবী নহে। বঙ্গে আগেও বড় কর্ম্মী ছিলেন, এখনও বড় কর্ম্মীর একান্ত অভাব হয় নাই। ষ্টীম এঞ্জিনের মধ্যস্থিত বাষ্প যখন যন্ত্রের মধ্যে থাকিয়া উহার যথানির্দ্দিষ্ট অংশগুলিতে শক্তিসঞ্চার করিয়া তাহাদিগকে গতিবেগ দেয়, তখন বাষ্প হইতে যে কাজ পাইবার কথা, তাহা পাওয়া যায়। কিন্তু বাষ্প ক্রমাগত এঞ্জিন হইতে বাহির হইতে থাকিলে, তাহা হইতে কাজ ত পাওয়া যায়ই না, অধিকন্তু যন্ত্রটা নানা রকমে বিগড়াইতে থাকে। ভাব, ভাবুকতা, ভাবপ্রবণতা কতকটা ষ্টীমের মত, বাষ্পের মত। উহার আতিশয্য যদি মানুষকে বাষ্পগদ্‌গদকণ্ঠ, বাষ্পাকুলিত নেত্র করে, যদি মানুষের পাটীগণিতকে হিসাবকে বাষ্পাচ্ছন্ন করে, ব্যবসাবুদ্ধির তীক্ষ্ণতা নষ্ট করে, কর্ম্মশক্তির হ্রাস করে, তবেই উহা অনিষ্টকর। কিন্তু উহা যদি ষ্টীমের মত অন্তরে থাকিয়া শক্তি যোগায়, প্রেরণা দেয়, তাহা হইলে ভাববান্ লোকেরা নীরস লোকদের চেয়ে অধিক শক্তিমান্ ও কৃতী কর্ম্মী হইতে পারে। অতএব চট্টগ্রামে কবি ছিলেন ও আছেন বলিয়া এখানে পণ্যশিল্পের প্রতিষ্ঠান সাফল্য লাভ করিবে না, এরূপ আশঙ্কার কোন কারণ নাই।

"আপনারা ভারতবর্ষের নানা কাপড়ের কল পর্য্যবেক্ষণ যেমন করিয়াছেন, আশা করি জাপানের মত দেশের কলকারখানা পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্যও তেমনি লোক পাঠাইবেন, জার্ম্মেনীতে শিক্ষালাভের জন্য বুদ্ধিমান্ উদ্যমশীল যুবকদিগকে পাঠাইবেন। জাপান ভারতবর্ষ হইতেই তুলা লইয়া গিয়া বিলাতী ও ভারতীয় কলের কাপড়ের চেয়ে সস্তা কাপড় কেমন করিয়া দেয়, তাহা নিজে দেখিয়া আসা দরকার। শুর লালুভাই শামলদাস নিজে দেখিয়া আসিয়া তাহার কিছু সন্ধান দিয়াছেন।

"পাশ্চাত্য দেশের কারখানা প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া একটা একটা পণ্যশিল্পের উন্নতির জন্য অনেক গবেষক রাখেন। তাহার ফলে নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত ও নূতন প্রক্রিয়া উদ্ভাবিত হইয়া কারখানাকে লাভবান্ করে। আপনারাও গবেষণার জন্য বুদ্ধিমান্ যুবকদিগকে নিযুক্ত রাখিবেন, আশা করি। তাহা হইলে বাঙালী যেমন কোন কোন বিজ্ঞানে জগৎকে নূতন কিছু দিয়াছে, কলকারখানাতেও তেমনি নূতন কিছু যান্ত্রিক উদ্ভাবন দ্বারা পণ্যশিল্পের ক্ষেত্রেও কৃতী, যশস্বী ও লাভবান্ হইতে পারিবে। আমরা চিরকালই ট্যারিফ বোর্ডের কৃপায় রক্ষণশুল্কের জোরে পণ্যশিল্পক্ষেত্রে টিকিয়া থাকিব, এরূপ আশা করা যায় না, এবং সেরূপ আশা করা কাপুরুষতাও বটে।

"নূতন নূতন কারবার ও কারখানা প্রতিষ্ঠা বেকার-সমস্যা সমাধানের একটি উপায় বটে; কিন্তু বেকার-সমস্যা মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই সঙ্গীন হইয়াছে। এক একটা মিল কারখানায় জন কতক কেরানীর স্থান হইলে কেবল তাহার দ্বারা এই শ্রেণীর লোকদের মধ্যে বেকার-সমস্যার সমাধান সামান্যই হইবে। যদি শিক্ষিত যুবকেরা মিলের শ্রমিকের কাজে নামেন, তাহাতে নানা রকমের লাভ আছে। তাঁহাদের একটা জীবিকা হইবে—আজকাল গ্রাজুয়েটরাও কাজ পাইলে যেরূপ সামান্য বেতন পান তাহাতে মিলের মজুরী রোজগারের দিক দিয়া তুচ্ছ নয়। দ্বিতীয়তঃ, বুদ্ধিমান শিক্ষিত লোকেরা এই সব কাজে নামিলে হয়ত যন্ত্রের ও প্রক্রিয়ার উন্নতি উদ্ভাবন করিতে পারিবেন। তৃতীয়তঃ, কোন সৎকাজই যে হীন নয়, এই বোধ মধ্যবিত্ত লোকদের মধ্যে জন্মিবে। বিলাতে মজুররা পার্লেমেণ্টের সভ্য হয়, জুতা মেরামতকারীর ভাগিনেয় মাতুলালয়ে প্রতিপালিত লয়েড জর্জ প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন।

"বলা হইয়া থাকে, যে রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে স্বাধীনতার (ইণ্ডিপেণ্ডেন্সের) চেয়ে পরস্পরনির্ভরতা (ইণ্টারডিপেণ্ডেন্স) বড় আদর্শ। সত্য কথা। কিন্তু পরস্পরনির্ভরতা সমান মর্য্যাদার লোকসমষ্টির মধ্যে হয়। একটা দেশ অন্য দেশের উপর নির্ভর করিবে, কিন্তু শেষোক্ত দেশ প্রথমোক্ত দেশের উপর নির্ভর করিবে না, ইহা পরস্পরনির্ভরতার দৃষ্টান্ত নহে। শিল্প-বাণিজ্যক্ষেত্রেও ইহা সত্য। আমরা কেবলই অন্য দেশে তৈরি কারখানার মাল কিনিব, আমাদের দেশের কাঁচা মালও অন্য দেশের কারখানা হইতে পণ্যদ্রব্যে পরিণত হইয়া আসিবে, ইহা ঠিক্ নয়। এমন জিনিষ আছে বা থাকিতে পারে, যাহার কাঁচা মাল এ দেশে হয় না, বা যাহা কারখানায় এদেশে প্রস্তুত হয় না। তাহা অন্য দেশ হইতে আসিতে পারে। কিন্তু কার্পাস তাহা নয়, কাপড়ও তাহা নয়। ভারতবর্ষের আবশ্যক সব কাপড় ভারতবর্ষে হইতে পারে। তাহা কেবল বা প্রধানতঃ বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতেই হইবে, এমন কোন কথা নাই। বাংলা দেশেরও উচিত, অনেক কাপড় তৈরি করা। তাহা করিলে বোম্বাইয়ের লোকদের ঈর্ষ্যান্বিত হওয়া উচিত নয়। আমাদের এক প্রত্যেক প্রদেশেরই উপযুক্ত ক্ষেত্রে নিজের পায়ের উপর দাঁড়ান উচিত।

"আপনারা বলিয়াছেন, চট্টগ্রামেই তিন লক্ষ মণ তুলা উৎপন্ন হয়। আরও অধিক হইতে পারে। উৎকৃষ্টতর তুলা উৎপাদনের চেষ্টাও আপনাদের করা উচিত। আমি অবগত হইয়াছি, বঙ্গীয় সরকারী কৃষিবিভাগ পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন, বঙ্গে উৎকৃষ্ট তুলা হইতে পারে। এই নির্দ্ধারণ কেন ভাল করিয়া প্রচার করা হয় নাই ঠিক্ বলিতে পারি না, কিন্তু অনুমান করিতে পারি। বঙ্গে যতদিন উৎকৃষ্ট তুলা না হইতেছে, এবং অন্য প্রদেশ বা দেশ হইতে উৎকৃষ্ট তুলা আনিয়া তাহা হইতে কাপড় প্রস্তুত করিয়া দরের প্রতিযোগিতায় যত দিন আমরা দাঁড়াইতে না পারিতেছি, তত দিন আমরা মোটা কাপড়ই পরিব। তাহাতে লাভ বই ক্ষতি নাই, গৌরব ভিন্ন অগৌরব নাই।

"ডিরেক্টরদিগের নির্দ্ধারণ অনুসারে আমি ঘোষণা করিতেছি, যে, এই মিল দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের নামে পরিচিত হইবে।"

চট্টগ্রামে কাপড়ের কল চলিবার নানা দিক্ দিয়া সম্পূর্ণ

সম্ভাবনা আছে। তিনটি রেলপথের সঙ্গম স্থলের নিকট শহরের উপকণ্ঠে ১২৫ বিঘা জমীতে কারখানা নির্ম্মিত হইতেছে। কাঁচা মাল পাইবার সুবিধা, মজুর কারিগর পাইবার সুবিধা, সুতা কাপড় প্রস্তুত করিবার উপযোগী আর্দ্র বাতাস, প্রস্তুত মাল রেলে ষ্টীমারে চালান দিবার সুবিধা এবং কেবল চট্টগ্রাম জেলাতেই দু-কোটি গজের অধিক কাপড়ের চাহিদা বিদ্যমান। অতএব, আশা করিতে পারা যায়, এই মিলের যথেষ্ট অংশ বিক্রয় অবিলম্বে হইবে।

—

চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে হিন্দুদের উপর "পাইকারী" জরিমানা এবং নানা কড়া বন্দোবস্ত হওয়ায় সহজেই মনে হইতে পারে, জায়গাটাতে বুঝি সন্ত্রাসকেরা গিজ গিজ করিতেছে। বাস্তবিক কিন্তু তাহা দেখিলাম না। সন্ত্রাসক সেখানে কত আছে জানি না, জানিবার উপায় নাই, জানিতে যাই নাই। কিন্তু সেখানে সাহিত্য-পরিষৎ, আর্য্য সঙ্গীত-সমিতি, ব্রহ্মমন্দির, ব্যাঙ্ক, ইলেকট্রিক সপ্লাই কোম্পানী, বেসরকারী বালিকা-বিদ্যালয়, মফস্বলের একমাত্র দৈনিক ('পাঞ্চজন্য'), জাহাজ কোম্পানী, প্রভৃতি সক্রিয় অবস্থায় রহিয়াছে। লজ্জার ও দুঃখের বিষয় জাহাজ কোম্পানীটি বাঙালীদের (মুসলমান বাঙালীদের) হইলেও এবং লাভজনক হইলেও গুজরাটীদের হাতে গিয়াছে।

স্বর্গীয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত এখন পরলোকে। কিন্তু তাঁহার চারিত্রিক প্রভাব এখনও বিশেষ ভাবে লক্ষিত হইতেছে। তিনি অহিংস্ অসহযোগী নেতা ছিলেন। দুইটি প্রতিষ্ঠানে তাঁহার চিত্ররক্ষা অনুষ্ঠানে লোকারণ্য হইয়াছিল। দুইটিতেই এডভ্যান্সের প্রধান সম্পাদকীয় লেখক শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল-কুমার চক্রবর্তী প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। একটিতে চিত্রের আবরণ উন্মোচন উপলক্ষ্যে আমিও কিছু বলিয়াছিলাম।

—

ভূমিকম্পে বিপন্ন লোকদের সাহায্য

ভূমিকম্পে বিপন্ন লোকদের সাহায্যের জন্য যত ফণ্ড খোলা হইয়াছে, তাহার মধ্যে বড়লাটের ফণ্ডেই সব চেয়ে বেশী টাকা জমিয়াছে। অন্য সব ফণ্ডের ব্যয় ও ভাণ্ডারা প্রভৃতি নিয়মিত প্রকাশিত হইতেছে, তাহা কোন-না-কোন কাগজে বাহির হইতেছে। কিন্তু বড়লাটের হাতের ফণ্ডের ব্যয় কি কাজে কি ভাবে হইতেছে, তাহাতে এ পর্য্যন্ত গরিব, মধ্যবিত্ত বা ধনীর কি দুঃখের লাঘব হইয়াছে বা হইতেছে, এ-পর্য্যন্ত তাহা খবরের কাগজে দেখি নাই।

'প্রবাসী'র অন্যত্র কল্যাণব্রতসঙ্ঘের উদ্দেশ্য প্রভৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার কাজের বিবরণ ও টাকার হিসাবও পাইয়াছি; স্থানাভাবে ছাপিতে পারিলাম না। বিপন্ন মধ্যবিত্ত লোকদের সাহায্য ও সেবা ইহার দ্বারা যে হইতেছে, তাহা বেশ বুঝা যায়। হইবারই কথা। কারণ, স্বয়ং শোকার্ত্তা, গুরুতর আঘাতপ্রাপ্তা, এখনও শয্যাশায়িনী শ্রীমতী অনুরূপা দেবী ও তাঁহার বিশ্বাসভাজন লোকেরা ইহা চালাইতেছেন।

বিহারের নেতা বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলিয়াছেন, এবং অন্য অনেকেও বলিয়াছেন, যে, বিহারে বিপন্ন লোকেরা অন্য লোকদের সাহায্য পাইবে বটে, কিন্তু তাহারা কেবল সরকারের বা স্বদেশবাসীর মুখ চাহিয়া থাকিলে চলিবে না, তাহাদিগকে আত্মনির্ভরশীল হইতে হইবে। তাহার পথপ্রদর্শক হইয়াছিলেন, পণ্ডিত জওআহরলাল নেহরু। তিনি স্বয়ং কোদাল লইয়া ধ্বংসস্তূপ খুঁড়িয়া জনসেবা করিতেছিলেন। তজ্জন্য, তাঁহার প্রতি যাঁহারা শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন, তাঁহাদের তাঁহার উপর শ্রদ্ধা বাড়িতেছিল; যাঁহারা তাঁহাকে জানিতেন না চিনিতেন না, এরূপ নিরক্ষর লোকেরাও তাঁহার প্রতি অনুরাগী ও শ্রদ্ধান্বিত হইতেছিলেন। তাঁহার জেল হওয়ায় এই সেবা হইতে বিহারবাসীরা বঞ্চিত হইল। অবশ্য, তাহাদিগকে বঞ্চিত করিবার জন্যই গবর্ন্মেণ্ট তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়াছেন, ইহা বলিবার বা মনে করিবার কোন কারণ নাই। জনসেবার দ্বারা নিজের প্রতি অপরের শ্রদ্ধা আকর্ষণ পীনাল কোডে দণ্ডনীয় নহে, এবং তিনি যে অভিযোগে অভিযুক্ত ও দণ্ডিত হইয়াছেন, তাহা ইহা নহে।

—

ভূমিকম্প ও বিদেশী সাহায্য

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যখন জাপানে ভীষণ ভূমিকম্প হয়, তখন নানা দেশ হইতে সেখানে অনেক সাহায্য গিয়াছিল, ভারতবর্ষ হইতেও গিয়াছিল। জাপান স্বাধীন দেশ। তথাকার যে মনুষ্যসমষ্টি গবর্ন্মেণ্ট নামে অভিহিত হয়, তাঁহারা এবং জাপানের সাধারণ অধিবাসীরা এক জাতির মানুষ এবং

তথাকার গবর্ন্মেণ্ট বহু পরিমাণে সর্ব্বসাধারণের দ্বারা নির্ব্বাচিত লোক লইয়া গঠিত। জাপানীদের মাথাপিছু গড় আয় ও গড় ধনশালিতা ভারতীয়দের চেয়ে বেশী। এই সব কারণে, যদি জাপানের উক্ত ভূমিকম্পের পর বিদেশী সাহায্য বিশেষ কিছু না যাইত, তাহা হইলেও ভূমিকম্পজনিত অনিষ্টের প্রতিকার হইতে পারিত। ভারতবর্ষের অবস্থা অন্যরূপ। এই জন্য বিধ্বস্ত বিহারের জন্য দেশী বিদেশী উভয়বিধ সাহায্যই খুব বেশী দরকার। দেশী সাহায্য এ-পর্য্যন্ত যাহা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা যথেষ্ট নহে, এবং তাহার খুব বেশী অংশ বড়লাটের ফণ্ডে গিয়াছে। তাহার ব্যয়ের উপর লোকমতের প্রভাব নাই, থাকিবে না, থাকিলেও যৎসামান্য। বে-সরকারী ফণ্ডসমূহে সামান্য টাকাই আসিয়াছে। বিহার গবর্ন্মেণ্ট সাধারণ বৎসরেও দরিদ্র, বর্ত্তমান এবং আগামী কয়েক বৎসর ত আরও স্বল্পবিত্ত হইবে। ভারত-গবর্ন্মেণ্ট বজেটে বিহারের সাহায্যার্থ যাহা বরাদ্দ করিয়াছেন, তাহা যথেষ্ট নহে। এ-অবস্থায় যদি বিদেশ হইতে কিছু বেশী সাহায্য আসিত, তাহা হইলে অনেক কাজ হইত। কিন্তু এ-পর্য্যন্ত তাহা আসে নাই।

তাহার নানা কারণ থাকিতে পারে। একটা কারণ এই, যে, ভারতবর্ষের বাহিরে ভারতবর্ষের খবর পৌঁছে প্রধানতঃ যাহাদের মারফতে, যাহারা সংবাদসরবরাহকারী, তাহারা বিদেশী। তাহারা ভারতীয়দের প্রতি এত বেশী সহানুভূতিসম্পন্ন নহে, যে, ভারতীয়দের পক্ষে বিশেষ দরকারী খবর ঠিক মত বিদেশে পৌঁছাইয়া দিবে। যদি কোন প্রকারের খবর সম্বন্ধে ভারতবর্ষের গবর্ন্মেণ্ট এবং ভারতবর্ষের জনসাধারণের মধ্যে মতভেদ থাকে, তাহা হইলে এংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজগুলি এবং বিদেশী সংবাদসরবরাহকারীরা গবর্ন্মেণ্টের মতানুযায়ী খবরই প্রচার করে, এবং তাহাই বিদেশে যায়। বিহারের ভূমিকম্পে হতাহত মানুষের সংখ্যার এবং বিনষ্ট সম্পত্তির পরিমাণ ও মূল্যের সম্বন্ধে গবর্ন্মেণ্টের ও বেসরকারী লোকদের অনুমানে খুব বেশী প্রভেদ আছে। সরকারী আন্দাজটাই কিন্তু বিদেশে গিয়াছে। বিদেশী সাহায্যের অল্পতার হয়ত ইহা একটি কারণ।

জাপান হইতে সাহায্য না আসিবার বা কম আসিবার অন্য একটি কারণ বাণিজ্যসম্পর্কিত। অনেক বৎসর পূর্ব্বে পঞ্জাবের কাংড়া উপত্যকা ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হইবার পর জাপান হইতেও সাহায্য আসিয়াছিল। এখন অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। "তোমাদের দেশে যত খুশী মাল যত সস্তা দরে সম্ভব বিক্রী করিয়া আমাদিগকে ধনী হইতে দিতে তোমরা রাজী নও, তাহা হইলে তোমাদের সহিত আমাদের সহানুভূতি কেন হইবে? তোমরা তোমাদের দেশের ধন অবাধ ভাবে শোষণ করিতে দিলে আমরা তাহার বিনিময়ে কিঞ্চিৎ ভিক্ষা তোমাদিগকে মধ্যে মধ্যে দিতে পারি।" জাপানের মনের ভাব যেন কতকটা এইরূপ।

ভারতবর্ষের সহিত রাষ্ট্রনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক দ্বারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাভবান হইয়াছে গ্রেট ব্রিটেন। কিন্তু তথাকার লোকেরাও, বাণিজ্যিক কারণ হইতে উৎপন্ন তর্কবিতর্ক বশতঃ অনেকটা জাপানের লোকদের মতই ভারতবর্ষের লোকদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন নহে। তাহার উপর, ভারতবর্ষের লোকেরা স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা চাহিতেছে। সুতরাং, যাহারা বিলাতী মাল অপর্য্যাপ্ত কিনিবে না এবং বিলাতী লোকদের অধীনে থাকিতেও অনিচ্ছুক, এরূপ বেআদব লোকদিগকে ইংরেজরা কেন বেশী ভিক্ষা দিবে?

অন্যান্য স্বাধীন এবং সভ্য দেশের লোকেরা মনে করে, ভারতবর্ষ ইংরেজদের জমিদারী. সুতরাং সেই জমিদারীর রায়তদের হেফাজত করা প্রধানতঃ ইংরেজদেরই কর্ত্তব্য। এই জন্য তাহারা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেকটা উদাসীন। তা ছাড়া ক্যাথারিন মেয়ো প্রভৃতি ভাড়াটিয়া লেখিকা ও লেখকদের দ্বারা ভারতবর্ষের লোকদের সম্বন্ধে এত কুৎসা প্রচারিত হইয়াছে, যে, যদি পাশ্চাত্য ইউরোপ আমেরিকা ভারতীয়দের মৃত্যুকে সাপ বেঙ মশা মাছির মৃত্যুর মত মনে করিয়া থাকে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় হইবে না।

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ইউরোপ হইতে অর্থসাহায্য সংগ্রহের জন্য মহাত্মা গান্ধীর অনুমোদন চাহিয়াছিলেন। তাহা তিনি পাইয়াছেন। কিছু অর্থ সংগৃহীত হইলে বিপন্ন লোকদের সাহায্য হইবে। সুভাষবাবু নিজেও ইউরোপে সুপরিচিত, কিন্তু তিনি বাঙালী এবং কংগ্রেসের বাম পক্ষের (লেফ্‌ট উইঙের) নেতা বলিয়া তাঁহার অর্থসংগ্রহের চিন্তা

উভয় ঘটনায় সম্ভাবনা ছিল বলিয়া তিনি মহাত্মা গান্ধীর সমর্থন লইয়া ভালই করিয়াছেন।

পরলোকগত স্বামী শিবানন্দ

পরলোকগত স্বামী শিবানন্দ যৌবন কাল হইতেই ধর্মপ্রবণ ছিলেন। রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের সংস্পর্শে আসিয়া তিনি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী হন। তিনি কিছুকাল সিংহলে ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের অনেক রামকৃষ্ণ আশ্রম তিনি স্থাপন করিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি বেলুড় মঠের অধ্যক্ষ এবং রামকৃষ্ণ মিশনের সভাপতি ছিলেন। তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইবার মত লোক সহজে মিলিবে না।

'প্রবাসী'র তেত্রিশ বৎসর

সন ১৩০৮ সালের বৈশাখ মাসে এলাহাবাদ হইতে 'প্রবাসী' প্রথম প্রকাশিত হয়। উহার মুদ্রাকণও সেখানেই হইয়াছিল। এই চৈত্রে উহার তেত্রিশ বৎসর পূর্ণ হইল। আগামী বৎসরের শ্রাবণ মাসে উহা এক শতাব্দীর এক-তৃতীয়াংশ অতিক্রম করিবে। আগামী শ্রাবণের সংখ্যাটি 'প্রবাসী'র চতুঃশততম সংখ্যা হইবে।

প্রথম সংখ্যা খুলিয়া দেখিতেছি, তাহার "সূচনা" সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা; "আবাহন" শীর্ষক কবিতা (পরলোকগত) কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের লেখা; "প্রয়াগধামে কমলাকান্ত" ও "আদর্শকবি" কমলাকান্ত শর্ম্মা ছদ্ম নাম লইয়া তিনিই লিখিয়াছিলেন; "অজন্টা গুহাচিত্রাবলী" সম্পাদকের লেখা; "প্রবাসী" শীর্ষক কবিতা রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন; "জীববিদ্যা" অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায় লিখিয়াছিলেন; "কীর্ত্তিস্তম্ভ" (চিতোরে রাণাকুম্ভের জয়স্তম্ভ) জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস লিখিয়াছিলেন; "শর্করাবিজ্ঞান" কৃষিবিদ্যাবিৎ (পরলোকগত) নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছিলেন; "বিবিধ প্রসঙ্গ" সম্পাদকের লেখা। এই সংখ্যায় ষোলখানি ছবি ছিল।

তখনকার 'প্রবাসী'র নিয়মাবলীতে লেখা ছিল, 'প্রবাসী'র প্রত্যেক সংখ্যা অন্যূন ৩২ পৃষ্ঠা পরিমিত হইবে। প্রথম সংখ্যাতে ছিল ৪০ পৃষ্ঠা। তখন বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ২৸০ টাকা এবং প্রতি সংখ্যার মূল্য ।৵০ ছিল। প্রথম সংখ্যার গোড়ায় আর্ট কাগজে ছাপা জয়পুরের মহারাজা মাধো সিং ও ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান রাওবাহাদুর কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ছবি ছিল।

আমি "সূচনা"য় লিখিয়াছিলাম :—

সর্ব্বসিদ্ধিদাতা পরমেশ্বরের নাম লইয়া আমরা "প্রবাসী" প্রকাশিত করিতেছি। বঙ্গ দেশের বাহিরে এরূপ মাসিকপত্র বাহির করিবার ইহাই প্রথম উদ্যম। বঙ্গদেশ হইতে দূরে থাকায় কি লেখা, কি ছবি, কি ছাপা, সকল বিষয়েই আমাদিগকে অনেক বাধা ও বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইবে। কিন্তু পরমেশ্বরের কৃপায় যদি লেখক এবং পাঠকবর্গের সহানুভূতি ও সাহায্য পাই, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাদের চেষ্টা ফলবতী হইবে।

প্রারম্ভের আড়ম্বর অপেক্ষা ফল দ্বারাই কার্য্যের বিচার হওয়া ভাল। এই জন্য আমরা আপাততঃ আমাদের আশা ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নীরব রহিলাম।

প্রথম সংখ্যায় "বিবিধ প্রসঙ্গে"র শেষে আমি লিখিয়াছিলাম—

কোন কাগজের প্রথম সংখ্যা মনের মত করা বড় কঠিন। আশা করি কেহ আমাদের প্রথম সংখ্যা দেখিয়াই আমাদের কাগজের দোষগুণ সম্বন্ধে চূড়ান্ত মীমাংসা করিবেন না। আমরা ক্রমে ক্রমে নানাবিধ জ্ঞানগর্ভ ও চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ও বিবিধ প্রসঙ্গ প্রকাশিত করিব।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "প্রবাসী" শীর্ষক কবিতাটি আরম্ভ করিয়াছিলেন এইরূপ—

সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি
সেই ঘর মরি খুঁজিয়া!
দেশে দেশে মোর দেশ আছে আমি
সেই দেশ লব যুঝিয়া!
পরবাসী আমি যে দুয়ারে চাই
তারি মাঝে মোর আছে যেন ঠাঁই,
কোথা দিয়া সেথা প্রবেশিতে পাই
সন্ধান লব বুঝিয়া!
ঘরে ঘরে আছে পরমাত্মীয়;
তারে আমি ফিরি খুঁজিয়া!

প্রথম সংখ্যার অনেক সমালোচনা পাইয়াছিলাম। সেগুলিতে প্রশংসার অভাব ছিল না। স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর সমালোচনাটি তৃতীয় সংখ্যার মলাট হইতে উদ্ধৃত করিতেছি।

প্রবাসীর প্রথম সংখ্যা অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। এই পর্য্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, প্রবাসীর সকল প্রবন্ধই পড়িয়াছি ও পড়িয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। একালকার অতি উচ্চ দরের মাসিক পত্রিকাও যাহা আদ্যন্ত পড়িয়া উঠিতে পারি না, প্রবাসীর গোল আনাই পড়িয়াছি। সর্ব্বাপেক্ষা ভাল লাগিল অজন্টা-গুহা চিত্রাবলী। প্রবন্ধলেখক অবশ্য ইংরাজি পুস্তক হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন কিন্তু সংগ্রহপ্রণালীতে বাহাদুরি আছে। এরূপ প্রবন্ধ আর কোথাও যে পড়িয়াছি মনে হয় না। প্রবন্ধে চিত্রগুলির নির্ব্বাচনও মন্দ হয় নাই। এইরূপ প্রবন্ধ পড়িলে আমাদের দেশের সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা কত আছে, তাহা বুঝা যায়। সুন্দর চিত্র এই-প্রকার প্রবন্ধ

অধিক লিখিত হয় না, অথবা লিখিত হইলেও ভাষা ও রচনাভঙ্গীতে সুপাঠ্য হয় না। কবতা ছুটির সম্বন্ধে কোন কথা লেখাই বাহুল্য, কেমনা আমি উত্তর কবিরই 'ভক্ত'। কমলাকান্তের পুনঃসাক্ষাৎকার অতি আশা ও আহ্লাদের বিষয়। আশার সহিত আশঙ্কাও আছে।

বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনায় সিদ্ধহস্ত যোগেশবাবুর ঘন ঘন সাক্ষাৎ পাইলে আনন্দিত হইব। বিবিধ প্রসঙ্গ ও ৺কান্তি বাবুর প্রতিকৃতি প্রবাসীর সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছে। ইক্ষুর চাষ ঘটিত প্রবন্ধও যখন আগাগোড়া পড়িয়াছি, তখন আর প্রবাসীর সফলতা সম্বন্ধে অধিক বাক্যব্যয় অনাবশ্যক। প্রবাসীর অনাড়ম্বর সূচনাটুকুও ঠিক্ যথাসাময়িক হইয়াছে। 'প্রথম সংখ্যা মনের মত করা কঠিন' বলিয়া সম্পাদকের আক্ষেপের কোন কারণ নাই। উত্তরোত্তর প্রবাসীর উন্নতি দেখিলেই সুখী হইব।

প্রবাসীর বর্ত্তমান সংখ্যায় কমলাকান্তী ছাড়া অন্য উপন্যাস নাই, সেটাও অনেকটা আশার কথা। তবে এ আশা কতদিন টিকিবে জানি না।

প্রথম সংখ্যা বা প্রথম বৎসর হইতে 'প্রবাসী'তে কাহারা লিখিতেছেন, তাহা জানা সহজ; সম্পাদক ত এখনও পাঠকদের খিদমতে হাজির। কিন্তু সর্ব্বপ্রথমে কে বা কাহারা গ্রাহক হইয়াছিলেন, তাহা এখন জানিবার উপায় নাই। সখ করিয়া কাগজ বাহির করিয়াছিলাম; প্রথম প্রথম ডাকে কাগজ পাঠাইবার সময় শিশু পুত্রকন্যারাও উৎসাহের সহিত মোড়কে আঠা লাগাইয়া কাগজ মুড়িয়া দিত; তখন বুঝি নাই এত বৎসর ধরিয়া ব্যবসা চালাইতে হইবে; সুতরাং তখনকার গ্রাহকদের নামঠিকানার খাতা, হিসাবের খাতা রক্ষিত হয় নাই। তবে যাঁহারা ১৩০৮ সালের ১লা বৈশাখের আগেই গ্রাহক হইয়াছিলেন, তাঁহাদের অন্ততঃ কাহারও কাহারও সে কথা মনে থাকিতে পারে। অনেকে হয়ত তখন হইতে এখন পর্য্যন্ত গ্রাহক আছেন। আমার এখন যত দূর মনে পড়ে, প্রথম সংখ্যা বাহির হইবামাত্র ঐ বৎসর ১লা বৈশাখ মোটামুটি আড়াই শত গ্রাহককে ডাকে কাগজ পাঠাইয়াছিলাম। তখন শ্রীআশুতোষ চক্রবর্ত্তী কার্য্যাধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি জীবিত থাকিলে কোথায় আছেন জানি না। আমি তখন এলাহাবাদের সাউথ রোডের ২।১ সংখ্যক ভাড়াটিয়া ছোট বাংলায় থাকিতাম। ঐ বাংলা এখন নাই। উহার জমী এলাহাবাদের এংলো-বেঙ্গলী ইণ্টারমীডিয়েট কলেজের মধ্যে পড়িয়াছে।

—

বাংলা দেশে আকের চাষ

তেত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে কৃষিবিৎ পরলোকগত নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় বাংলা, বিহার ও ছোটনাগপুরের ১৬টি জেলার আকের চাষের জমীর একটি তালিকা 'প্রবাসী'র প্রথম সংখ্যায় দিয়াছিলেন। তাহাতে দেখিতেছি, সকলের চেয়ে বেশী জমীতে, ৯৬৫০০ একর জমীতে, আকের চাষ হইত রংপুরে, তার নীচে বাখরগঞ্জে ৭২৯০০ একরে। তারপর ক্রমান্বয়ে পাবনা, ভাগলপুর, মানভূম, সারন, ফরিদপুর, মৈমনসিং, হাজারিবাগ, শাহাবাদ, ঢাকা, গয়া, দিনাজপুর, মোজফ্ফরপুর, বর্দ্ধমান, ও বাখরগঞ্জে। তিনি লিখিয়াছিলেন, "সমগ্র বঙ্গদেশে ৮,৩০,২০০ একর জমি এবং সমগ্র ব্রিটিশ ভারতবর্ষে ২৮,০ ,০০০ একর জমি ইক্ষুর চাষে নিয়োজিত, এইরূপ গণনা করা হইয়াছে।" তিনি আরও লিখিয়াছিলেন, "মুরশিদাবাদ, বীরভূম, হুগলী, বর্দ্ধমান ও নদীয়ার স্থানে স্থানে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ইক্ষুর জমি দেখিতে পাওয়া যায়।" তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, এক সময়, এবং তাহা প্রাচীনকালেও নহে, বাংলা দেশ আকের চাষের একটা প্রধান স্থান ছিল। এ-বিষয়ে বঙ্গের অধোগতির কারণ কৃষিতত্ত্ববিদেরা বলিতে পারিবেন।

—

মুসলমান ও অনগ্রসর হিন্দু বাঙালীর শিক্ষা

পঞ্চবার্ষিক শিক্ষাবিবরণীতে লিখিত হইয়াছে, "শিক্ষার আবশ্যকতা সম্বন্ধে 'অনগ্রসর' হিন্দুরা এখন সম্পূর্ণ সজাগ হইয়াছে। ১৯২১ সালে যেখানে তাহাদের একজন ইস্কুলে যাইত, তাহার জায়গায় এখন ৫ জনের বেশী যায়। মুসলমানদের মধ্যে অগ্রগতিও প্রায় ঐরূপ চমকপ্রদ; তাহাদের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে এবং ১৯২১-২২ সালে তাহাদের শতকরা ৩·৫ জন শিক্ষাধীন থাকার জায়গায় তাহা বাড়িয়া ১৯৩১-৩২ সালে শতকরা ৫·২ হইয়াছে।" ইহা সুসংবাদ—যদিও বঙ্গে শিক্ষার বিস্তার অত্যন্ত কম হইয়াছে বলিয়া এই উন্নতি ও অগ্রগতি মোটেই যথেষ্ট নহে—ইহাতে সন্তুষ্ট থাকা যাইতে পারে না।

—

বিনামূল্যে মাসিকপত্র পাইবার ইচ্ছা

বাংলা দেশে ও বঙ্গের বাহিরে অনেক পুস্তকালয় ও পাঠাগার আছে, যাহার পরিচালকগণ তাঁহাদিগকে বিনামূল্যে 'প্রবাসী' দিতে অনুরোধ করিয়া থাকেন। কোন কোন স্থলে পরিচালকগণ

করেন, তাঁহারা লোকহিতের জন্য প্রতিষ্ঠানগুলি চালাইতেছেন। তাহাতে সন্দেহ করিতেছি না। অন্যান্য মাসিকপত্রের সম্পাদকদিগের নিকটও এরূপ অনুরোধ আসিয়া থাকে। এই সকল পুস্তকালয় ও পাঠাগার যে-সব নগর বা গ্রামে অবস্থিত, তথাকার পাঠকেরা এক একখানি মাসিক কাগজের মূল্য চাঁদা করিয়া দিতে পারেন কিনা, তাহা স্থির করা আমাদের পক্ষে অসাধ্য বা দুঃসাধ্য। যদি তাঁহারা সকলে মিলিয়া অনেকগুলি কাগজের দাম দিতে না পারেন, তাহা হইলে যে কয়খানির দাম দিতে পারেন, তাহাই পূর্ণ মূল্যে ক্রয় করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য। মাসিকপত্র প্রকাশ করিতে ব্যয় এবং পরিশ্রম হয়। উপার্জ্জনের জন্য ইহা এক প্রকার ব্যবসা; মাসিকপত্রের স্বত্বাধিকারীরা অন্যান্য ব্যবসার মালিকদের মত নিজ নিজ আয় হইতে যথাধিক দান-খয়রাৎ করিয়া থাকেন। তাঁহারা কেহ কেহ বিনা পারিশ্রমিকে লোকহিতচেষ্টাও অবশ্য করিয়া থাকেন। তাহার উপর বিনামূল্যে বা ন্যূনমূল্যে কাগজ দিতে অনুরোধ আসিলে, তাঁহারা সে অনুরোধ যদি রক্ষা করিতে না পারেন, তাহা হইলে ক্ষমার যোগ্য। যে-সব খবরের কাগজ প্রধানতঃ বিজ্ঞাপনের আয় হইতে চলে, তাহাদের স্বত্বাধিকারীরা ডাকে বেশী কাগজ গেলে তাহার সংখ্যার জোরে বেশী বিজ্ঞাপন পাইতে পারেন, সুতরাং বিনামূল্যে কাগজ দেওয়া তাঁহাদের পক্ষে সম্পূর্ণ লোকসান্ নহে। মাসিকপত্রসমূহ এইজাতীয় খবরের কাগজ নহে।

কোন জায়গার লাইব্রেরী বা পাঠাগারে বিনামূল্যে কাগজ দিলে তাহাতে স্বত্বাধিকারীদের আরও এই ক্ষতি হয়, যে, সেখানে যাঁহারা কাগজ কিনিতে সমর্থ তাঁহারাও অনেকে বিনামূল্যে উহা পড়িয়া কাজ সারেন, গ্রাহক বা ক্রেতা হন না। সুতরাং কাগজের গ্রাহক না বাড়িয়া কমিতে থাকে। গ্রাহক না-বাড়া কোন কাগজের পক্ষেই সুবিধাজনক নহে, কমা ত আরও খারাপ।

এই সব কারণে বিনামূল্যে বা ন্যূনমূল্যে কাগজ দেওয়ার সমর্থন আমরা করি না।

যে জিনিষটি যাহাদের জীবিকা, সেটি তাহাদের নিকট বিনামূল্যে চাহিলে তাহাদের প্রতি সুবিচার করা হয় না। তন্তুবায়ের নিকট বিনামূল্যে বস্ত্র, গোপের নিকট বিনামূল্যে দুগ্ধ, মুদীর নিকট বিনামূল্যে তণ্ডুল লবণ, ময়রার নিকট বিনামূল্যে মিঠাই চাওয়া সাধারণ নিয়ম নহে।

—

বঙ্গে ও জাপানে শিক্ষার বিস্তার

বাংলা দেশের শিক্ষা-বিভাগের যে পঞ্চবার্ষিক বিবরণী (রিপোর্ট) ১৯৩৩ সালের ২রা নবেম্বর কলিকাতা গেজেটে বাহির হয়, তাহা সম্প্রতি পুস্তকাকারে বাহির হইয়াছে। কর্ত্তারা বেশ ধীরে সুস্থে কাজ করেন। ইহা ১৯২৬-২৭ হইতে ১৯৩১-৩২ সালের—ছয় বৎসরের—রিপোর্ট, যদিও ইহাকে পঞ্চবার্ষিক রিপোর্ট বলা হইয়াছে।

ইহাতে দেখিতেছি, ব্রিটিশ-শাসিত বঙ্গের মোট ৫,০১,১৪,০২ জন অধিবাসীর মধ্যে ১৯৩১-৩২ সালে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ২৭,৮৩,২২৫; অর্থাৎ অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৫·৫৫ জন শিক্ষাধীন ছিল বলিয়া রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী হইতে গ্রাম্য পাঠশালার ছাত্রছাত্রী, সকলকে ইহাতে ধরা হইয়াছে।

এখন শিক্ষা বিষয়ে জাপানের অবস্থা কিরূপ দেখা যাক্। ১৯৩০ সালের সেন্সস অনুসারে তথাকার লোকসংখ্যা ৬,৪৪,৫০,০০৫। 'জাপান ম্যাগাজিন' মাসিকপত্রের নববর্ষ সংখ্যায় লিখিত হইয়াছে, যে, তথাকার বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ হইতে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ পর্য্যন্ত সকল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীর মোট সংখ্যা ১,২৪,৪৭,৭৩০। অর্থাৎ, ঐ মাসিকপত্রে লিখিত হইয়াছে, জাপানের অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা কুড়ি জন শিক্ষাধীন।

তাহা হইলে জাপানে শিক্ষার বিস্তার হইয়াছে বঙ্গের মোটামুটি চারিগুণ। ইহা গেল শুধু সংখ্যার কথা। উভয় দেশের শিক্ষার উৎকর্ষের তুলনা না-করাই ভাল। কারণ, জাপানী শিক্ষাপ্রণালী পৃথিবীর উৎকৃষ্টতম শিক্ষা-প্রণালীসমূহ পর্য্যালোচনা করিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে জাপানে পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ হয়, ভারতবর্ষে তাহার তিনগুণেরও অধিক কাল পূর্ব্বে।

জাপানে ৭ হইতে ১৪ বৎসরের ছেলেমেয়েদিগকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাইবার বয়সের ছেলেমেয়ে বলা হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি অবৈতনিক। ঐ বয়সের সব ছেলেমেয়ে

স্কুলে যাইতে বাধ্য। বিকলাঙ্গ, ব্যাধিগ্রস্ত বা জড়বুদ্ধি ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে এই নিয়ম খাটে না। ১৯৩১ সালে জাপানে এই বয়সের ছেলেমেয়ে ছিল ১,০১,০৫,৯৪১ জন। তাহার মধ্যে ১,০০,৫৬,৫৩০ জন অর্থাৎ শতকরা ৯৯'৫১ জন স্কুলে যাইত।

জাপানে শিক্ষাবিস্তার হইয়াছে বাংলা দেশের চারিগুণ, ইহা বলিলে বাংলা দেশের লোকদের ও গবন্মেণ্টের অতিরিক্ত প্রশংসা করা হয়। কারণ, অনেক বৎসর ধরিয়া জাপানে যথেষ্ট এবং বঙ্গে নিতান্ত অযথেষ্ট শিক্ষাবিস্তারের ফলে জাপানে নিতান্ত শিশু ভিন্ন সকলেই লিখিতে পড়িতে পারে, অর্থাৎ প্রায় শতকরা ৯৯ জন লিখনপঠনক্ষম; বঙ্গে শতকরা ১১ জন লিখিতে পড়িতে পারে। সুতরাং বাংলার চেয়ে জাপানে ৯ (নয়) গুণ অধিক শিক্ষাবিস্তার হইয়াছে।

—

বোধনা-নিকেতনের পুরস্কার বিতরণ

মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রামে জড়বুদ্ধি ছেলেমেয়েদের সস্নেহ শিক্ষা ও তত্ত্বাবধানের জন্য বোধনা-নিকেতন নামক যে প্রতিষ্ঠানটি আছে, গত ফেব্রুয়ারি মাসে তাহার পুরস্কার-বিতরণ হইয়া গিয়াছে। বঙ্গের শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর মিঃ বটমূলী পুরস্কারবিতরণ-সভায় সভাপতির কার্য্য করেন এবং তাঁহার পত্নী পুরস্কার বিতরণ করেন। সভায় ঝাড়গ্রামের অনেক ভদ্রলোক, কলিকাতার অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ, আলিপুরের জজ মিঃ পার্কার, ষ্টেট্‌স্‌ম্যান কাগজের সম্পাদকীয় বিভাগের মিঃ ওআর্ডসওআর্থ প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। বোধনা-নিকেতনের ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষা ও যত্নের গুণে যেরূপ উন্নতি করিয়াছে, তাহাতে সকলেই সন্তোষ প্রকাশ করেন। প্রতিষ্ঠানটির মহিলা সম্পাদিকা শ্রীমতী কণিকা দেবী এবং সম্পাদক শ্রীযুক্ত গিরিজাভূষণ মুখোপাধ্যায় ইহার জন্য বিশেষ যত্ন, পরিশ্রম ও স্বার্থত্যাগ করিতেছেন। সর্ব্বসাধারণ সাহায্য করিলে ইহা স্থায়ী হইয়া দেশের উপকার করিবে। ইহা অত্যন্ত ঋণগ্রস্ত হওয়ায়, ইহার সাতিশয় অর্থকষ্ট হইয়াছে। সকলের নিকট আমরা ইহার জন্য অর্থসাহায্য চাহিতেছি। সাহায্য-প্রেরণের ঠিকানা—শ্রীগিরিজাভূষণ মুখোপাধ্যায়, এম্‌ এ, বি এল, বোধনা-নিকেতনের সম্পাদক, ৬৮৫ মির্জ্জা মুখুজ্যে গলি, ভবানীপুর, কলিকাতা।

—

"অগ্রসর" হিন্দু বাঙালী শিক্ষায় ভরপুর!

পঞ্চবার্ষিক শিক্ষাবিবরণীতে লেখা হইয়াছে, যে, শিক্ষা বিষয়ে অগ্রসর ("educationally advanced") হিন্দু বাঙালীরা শিক্ষায় প্রায় ভরপুর ("educationally almost saturated")! স্যাচুরেটেড কথাটার মানে বুঝা দরকার। এক বাটী জলে যদি অল্প অল্প করিয়া নূন মিশান যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে, কতকটা নূন বেমালুম মিশিয়া যাইবার পর আরও নূন দিলে তাহা জলে মিশিয়া অদৃশ্য হইবে না, আলাদা থাকিয়া যাইবে। তখন বুঝিতে হইবে, বাটী-পরিমিত জল নূনে ভরপুর হইয়া গিয়াছে। ইহারই নাম স্যাচুরেটেড হওয়া।

বঙ্গে শিক্ষায় অগ্রসর জা'তের হিন্দুরা কি বাস্তবিক এইরূপ শিক্ষায় ভরপুর হইয়া গিয়াছে? তাহাদের মধ্যে নিরক্ষর প্রাপ্তবয়স্ক লোক, নিরক্ষর বালক-বালিকা, নিরক্ষর যুবক-যুবতী (প্রৌঢ় ও বৃদ্ধদের কথা ছাড়িয়াই দিলাম) কি নাই? দেখা যাক্।

বাঙালী হিন্দুদের মধ্যে সকলের চেয়ে শিক্ষায় অগ্রসর জা'ত বৈদ্যেরা। কিন্তু তাহাদের মধ্যেও শতকরা ৩৮'৫ জন নিরক্ষর। এই নিরক্ষরদের মধ্যে বালক-বালিকা যুবক-যুবতীও আছে। বৈদ্যদের চেয়ে কম অগ্রসর ব্রাহ্মণেরা। তাহাদের মধ্যে নিরক্ষরের সংখ্যা শতকরা ৫৪'৮ জন—এই নিরক্ষরদের মধ্যে শিক্ষাধীন হইবার বয়সের বিস্তর লোক আছে। ব্রাহ্মণদের চেয়ে কম অগ্রসর কায়স্থেরা, তাহাদের মধ্যে নিরক্ষর শতকরা ৫৯'৯ জন—ইহাদের মধ্যে শিক্ষা পাইবার বয়সের অনেক মানুষ আছে। শিক্ষাবিষয়ে কায়স্থদের পরেই উল্লেখ্য সাহারা। তাহাদের মধ্যে নিরক্ষর শতকরা ৭৩'২। বলা বাহুল্য ইহাদের মধ্যেও নিরক্ষর অল্পবয়স্ক লোক বিস্তর আছে। তাহা হইলে হিন্দু বাঙালীদের মধ্যে শিক্ষায় "অগ্রসর" (!) মনুষ্যদের মধ্যে শিক্ষায় ভরপুর কাহারা? যদি বৈদ্যদিগকে (যাহারা মোট সংখ্যায় কম) শিক্ষায় ভরপুর মনে করা হয়, যদিও তাহা সত্য নহে, তাহা হইলে অপেক্ষাকৃত সংখ্যাধিক ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও সাহাদিগকেও কি

শিক্ষায় ভরপুর মনে করিতে হইবে, যাহাদের মধ্যে যথাক্রমে শতকরা ৫৪.৮, ৫৯.৯ এবং ৭৩.২ নিরক্ষর?

এই পঞ্চবার্ষিক রিপোর্ট বাংলা-গবর্মেণ্টের পক্ষ হইতে লিখিয়াছেন রায় সাহেব মনোরঞ্জন মিত্র এবং মিঃ কে জাকারাইয়া। শেষোক্ত ব্যক্তি অবাঙালী, তাঁহার বাংলা দেশের খবর না জানিবার কথা। বঙ্গের ১৯৩১ সালের সেন্সস রিপোর্টও তিনি না পড়িয়া থাকিতে পারেন। কিন্তু রায় সাহেব মনোরঞ্জন মিত্র নিশ্চয়ই বাঙালী এবং সম্ভবতঃ কায়স্থ। বাংলা দেশের সম্বন্ধে এবং "অগ্রসর" হিন্দু বাঙালীদের মধ্যে শিক্ষার অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার অজ্ঞতা শোচনীয়—বিশেষতঃ তিনি যখন বি-এ, বি-টি, এবং অক্সফর্ডের শিক্ষাবিষয়ক ডিপ্লোমাধারী। শিক্ষামন্ত্রী মিঃ কে নাজিমুদ্দিনের দায়িত্বে বাংলা-গবর্মেণ্ট পঞ্চবার্ষিক রিপোর্টটির অনুমোদন করিয়াছেন।

"অগ্রসর" হিন্দুদের আর শিক্ষার দরকার নাই, ইহা প্রমাণ করিতে পারিলে অবশ্য অনেকের সুবিধা হয়। কিন্তু কথাটা মিথ্যা। মিথ্যাকে সত্যে পরিণত করা কিঞ্চিৎ কঠিন কাজ। এই পঞ্চবার্ষিক রিপোর্টেই দেখিতেছি,

"It may be noticed here that the advanced Hindus have lost ground in the primary and secondary stages, in which their enrolment was 631,531 at the end of the quinquennium as against 640,309 in 1926-27."

তাৎপর্য্য। ইহা এখানে উল্লিখিত হইতে পারে, যে, "অগ্রসর" হিন্দুরা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় হটিয়া গিয়াছে, ১৯২৬-২৭ সালে ঐ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী ছিল ৬,৪০,৩০৯ জন, কিন্তু ১৯৩১-৩২ সালে হইয়াছে ৬,৩১ ৫৩১।

অতি সু-খবর!

শিক্ষা-লবণে-ভরপুর অগ্রসর-হিন্দুদের-মন অত শিক্ষা-নূন বরদাস্ত করিতে না পারায় শিক্ষা বর্জ্জন অর্থাৎ বমন করিতেছে! বেশী নূন খাইলে বমন ত হইবেই!

—

শিক্ষণে শিক্ষিত শিক্ষকের অল্পতা

পঞ্চবার্ষিক শিক্ষা-রিপোর্টের ১০৪ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে—

"When we consider how many schools there are in Bengal and how few trained teachers, the output of the training colleges seems a mere drop in the bucket; 78 per cent of the high school teachers in Madras are trained, and 81 per cent of the middle school teachers. In Bengal there are only 13 per cent trained teachers in high schools and only 27 per cent in middle schools."

তাৎপর্য্য। বঙ্গে কত বেশী বিদ্যালয় আছে এবং শিক্ষণবিদ্যায় শিক্ষিত কতগুলি অল্পসংখ্যক শিক্ষক আছেন, তাহা যখন ভাবা যায়, তখন ট্রেনিং কলেজ দুটিতে প্রস্তুত শিক্ষিত শিক্ষকদিগকে এক বালতী জলে এক বিন্দু মনে হয়। মাদ্রাজে উচ্চ বিদ্যালয়গুলির শতকরা ৭৮ জন শিক্ষণবিদ্যায় শিক্ষিত, মধ্যবিদ্যালয়গুলিতে শতকরা ৮১ জন, বঙ্গে যথাক্রমে শতকরা ১৩ ও ২৭ জন মাত্র।

এইরূপ মন্তব্যের পরোক্ষ অনুমোদন ও প্রতিধ্বনি শিক্ষা-রিপোর্টের উপর সরকারী মন্তব্যে ("resolution"এ) আছে। এ বিষয়ে বঙ্গের অবস্থা যখন এরূপ শোচনীয়, তখন মনে করা যাইতে পারে, যে, সরকারী শিক্ষা-বিভাগ ও শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষক প্রস্তুত করিবার জন্য অধিকসংখ্যক ট্রেনিং কলেজ স্থাপনে উদ্যোগী হইবেন, অন্ততঃ সরকারের কাছে টাকা না চাহিয়া অন্য কেহ উপযুক্তরূপ ব্যবস্থা করিয়া স্থাপন করিতে চাহিলে তাহাতে বাধা না দিয়া উৎসাহ ও সম্মতি দিবেন। কিন্তু বর্ত্তমান শিক্ষামন্ত্রীর আচরণ বিপরীত। ভবানীপুরের আশুতোষ কলেজ উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া ট্রেনিং কলেজ বা বিভাগ স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন। এ-বিষয়ে যাঁহারা বিশেষজ্ঞ সেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট ও সীণ্ডিকেট অনুমতি দিয়াছিলেন। কিন্তু শিক্ষামন্ত্রী মিঃ কে নাজিমুদ্দিন বাধা দেওয়ায় বালতীর এক বিন্দু জলে আর এক বিন্দু জল যুক্ত হইতে পারিল না। জল যদি জল না হইয়া পানী হইত, তাহা হইলে কি হইত জানি না। বলা বাহুল্য, প্রস্তাবিত নূতন ট্রেনিং কলেজে মুসলমানেরা পড়িতে পাইবে না, এমন কোন সর্ত্ত করা হয় নাই।

এ-বিষয়ে 'অমৃত' মাসিক পত্রে শ্রীযুক্ত হরিদাস মজুমদার লিখিয়াছেন:—

"ট্রেনিং কলেজ করতে গেলুম, টাকা যোগাড় হলো—বই যোগাড় হলো—বাড়ী যোগাড় হলো, সিনেট সিণ্ডিকেট দরখাস্ত পাস করলেন—কিন্তু শিক্ষামন্ত্রী মশাই আমাকে একবার ডাকলেনও না, কোন কথা জিজ্ঞাসা করাও দরকার বোধ করলেন না, একবার পরিদর্শনও করালেন না—ফাইল দেখে খেয়াল খুসীর ঠিক করে ফেললেন, সিনেট সিণ্ডিকেটের মতটা ঠিক হয় নাই! তাই আমাদের সব চেষ্টা কলমের এক খোঁচায় নাকচ করে দেওয়া হলো!"

বাংলা দেশের শিক্ষামন্ত্রী যখন শিক্ষামন্ত্রী, তখন আশুতোষ কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট ও সীণ্ডিকেটের সভ্যগণের চেয়ে তিনি নিশ্চয় অধিকতর বিদ্বান বুদ্ধিমান শিক্ষাভিজ্ঞ, বিদ্যোৎসাহী, দেশহিতৈষী, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

—

শিক্ষয়িত্রীদের জন্য ট্রেনিং বিভাগ

অন্য রকমের একটা দৃষ্টান্ত লউন।

মিশনরী ডায়োসেসান কলেজে মহিলা শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করা হইত। উহার কর্তৃপক্ষ আগামী মে মাস হইতে ঐ ব্যবস্থা বন্ধ করিবেন। সেই জন্য শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করিবার নূতন বন্দোবস্ত চাই। মিশনরী স্কটিশ চার্চ কলেজ তাহা করিতে প্রস্তুত হইলেন, এবং অনতিবিলম্বে অনুমতি পাইয়াছেন। সুব্যবস্থাই হইয়াছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, আশুতোষ কলেজকে শিক্ষক প্রস্তুত করিবার অনুমতি শিক্ষামন্ত্রী কেন দিলেন না? বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্তোষজনক টাকা, লাইব্রেরীর বহি, বাড়ী, অধ্যাপক—এসকলের ব্যবস্থা তাঁহারা করিয়াছিলেন। অবশ্য তাঁহারা শ্বেতাঙ্গ খ্রীষ্টিয়ান এবং রাজার জাতি নহেন, হিন্দু কালা আদমী।

অনাবশ্যক ছাত্রনিবাস নির্ম্মাণ

সরকারী পঞ্চবার্ষিক শিক্ষা-রিপোর্টের ৮২-৮৩ পৃষ্ঠায় আছে

"Hostels for Muhammadans are attached to practically all Government and some aided and other high schools. There are, besides, special hostels for Muhammadans...

"A considerable proportion of the accommodation provided in the Moslem hostels, with the solitary exception of the Rajshahi Madrasah, remained unoccupied during the period and a few hostels were also closed owing to the lack of boarders."

তাৎপর্য। কার্য্যতঃ সব সরকারী এবং সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত ও অন্যরকম কিছু বিদ্যালয়ে মুসলমানদের জন্য ছাত্রনিবাস আছে। তা ছাড়া, তাহাদের জন্য বিশেষ ছাত্রনিবাস আছে।...

একমাত্র রাজশাহী মাদ্রাসা ছাড়া অন্য সমস্ত মুসলমান ছাত্রনিবাসের অনেক জায়গা এই পাঁচ বৎসর খালি পড়িয়া ছিল, এবং ছাত্র অভাবে কয়েকটা ছাত্রনিবাস বন্ধও করিয়া দিতে হইয়াছে।

মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য বাস্তবিক যাহা আবশ্যক, সেরূপ ব্যয় গবন্মেণ্ট করুন; তাহাতে কাহারও আপত্তি করা উচিত নয়। কিন্তু যত ছাত্রনিবাস বা ছাত্রনিবাসে যত জায়গার দরকার নাই, তাহা করা অনাবশ্যক ও অপব্যয়। ইহাতে মুসলমানদের কোন উপকার হয় না, এবং শিক্ষাবিষয়ে তাহাদের ঔদাসীন্যের একটা পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়। তাহার সমালোচনাও নাই করিলাম; কিন্তু কোন খ্রীষ্টিয়ান, দল বা ব্যক্তি বিশেষের ব্যয়ে হিন্দু-মুসলমান প্রভৃতি সকলেরই জন্য আবশ্যক ও হিতকর কিছু (যেমন নূতন ট্রেনিং কলেজ স্থাপন) করিতে গেলে, শিক্ষামন্ত্রী তাহাতে কেন বাধা দেন?

কৃষিশিক্ষাদানে অবহেলা

অনেক বৎসর পূর্ব্বে দীঘাপতিয়ার কুমার বসন্তকুমার রায় রাজশাহী কলেজে কৃষিবিভাগ খুলিবার জন্য অনেক টাকা গবন্মেণ্টের হাতে দিয়া গিয়াছেন। তাহার সুদ জমিয়া এখন সুদে আসলে কয়েক লক্ষ টাকা হইয়াছে শুনিতে পাই। কাগজে দেখিয়াছি, তাহার সুদ হয় বৎসরে ষোল হাজার টাকা, কিন্তু দাতার ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ এখনও হয় নাই, অথচ সহজেই হইতে পারে, সরকারী আধ পয়সা খরচ না করিয়াও হইতে পারে। হয় নাই কেন? হয় না কেন?

বলা বাহুল্য, কুমার বসন্তকুমার রায় এরূপ কিছু উইল করিয়া যান নাই, যে, তাঁহার টাকায় প্রতিষ্ঠিত শিক্ষালয়ে কেবল হিন্দুরা পড়িবে, কেবল হিন্দুরা অধ্যাপক হইবে; কিন্তু হয়ত ইহা ঠিক, যে, তিনি ইহাও বলিয়া যান নাই, যে, তাহাতে হিন্দু ছাত্র ও অধ্যাপকের সংখ্যা শতকরা ৪৩·৪ এর বেশী হইতে পারিবে না।

পশ্চিম-বঙ্গে জমীর খাজনা

বঙ্গের ১৯৩২-৩৩ সালের ভূমির রাজস্ব সম্বন্ধীয় সরকারী রিপোর্ট সম্প্রতি বাহির হইয়াছে। তাহার একটি পরিশিষ্টে বর্গ-মাইলে সব জেলার আয়তন এবং তথাকার জমিদারদিগের নিকট হইতে গবন্মেণ্টের প্রাপ্য ভূ-করের পরিমাণ দেওয়া হইয়াছে। বর্দ্ধমান বিভাগের হিসাব এইরূপ:—

জেলা	বর্গমাইল	খাজনার টাকা
বর্দ্ধমান	৩,২৬৮	৩০,৪১,৭৬১
বীরভূম	১,৭০৯	১০,৪২,৫০২
বাঁকুড়া	২,৫৫৮	৫,০০,৫৩১
মেদিনীপুর	৫,৪০১	২৬,৫০,০৯৫
হুগলী	১ ৩০৭	৯,২৭,১০৪
হাবড়া	৩৪১	৪,৪৭,১৮০
মোট	১৪,৬৮৪	৮৩,০৯,১৭৩

ঢাকা বিভাগের সমগ্র তালিকাটিও নীচে দিয়েছি।

জেলা	বর্গ মাইল	খাজনার টাকা
ঢাকা	৩ ২১৮	৬,৩৭,৫৫৮
মৈমনসিং	[illegible]	[illegible]
ফরিদপুর	২,৩০০	১,১৩,৫১
বাকরগঞ্জ	৩,৬৪৭	২৮,৬৮,১৮০
মোট	[illegible]	৫৫,৩৮,৫৫৫

প্রেসিডেন্সী বিভাগের আয়তন ১২,৮০৩ বর্গ-মাইল, রাজস্ব ৩০,৫৩,০১৫ টাকা, চট্টগ্রাম বিভাগের ৫৬০৬ বর্গ-মাইল ও ৪০,৪৩,১৬১ টাকা, এবং রাজসাহী বিভাগের ১৮৮০৫ মাইল এবং ৬৬,৬৫,৫৫৮ টাকা।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় ঠিক কি নিয়ম অনুসারে এক এক জেলা, মহল প্রভৃতির খাজনা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল জানি না। সম্ভবতঃ চাষের জমির পরিমাণ ও উর্ব্বরতা এবং কোথায় কি ফসল হয় ও তাহার আপেক্ষিক মূল্য কিরূপ, এই সব বিষয় বিবেচনা করিয়া খাজনা নির্দ্ধারিত হইয়া থাকিবে। শতাব্দীর অধিক পূর্ব্বে পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গে সম্ভবতঃ পশ্চিম বঙ্গ অপেক্ষা বনজঙ্গল অপেক্ষাকৃত বেশী ছিল। এই জন্য পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গের মহল সকলের খাজনা কম ধরা হইয়াছিল। অতীত কালে বর্দ্ধমান জেলার উর্ব্বরতা বেশী থাকায় তাহার খাজনা বেশী ধরা হইয়া থাকিবে, কিন্তু এখন সে উর্ব্বরতা পশ্চিম-বঙ্গের নাই, অধিবাসীদের স্বাস্থ্য ও শ্রমশক্তিও আগেকার মত নাই। অন্যদিকে পূর্ব্ববঙ্গে জমিদার ও প্রজার চেষ্টায় বনজঙ্গল কমিয়া চাষের জমি বাড়িয়াছে, এবং উর্ব্বরতা অধিক; স্বাস্থ্যও ভাল। যাহাদের চেষ্টায় চাষের জমি বাড়িয়াছে, তাহাদিগকে ফলভোগ করিতে দেওয়া উচিত। কিন্তু বর্দ্ধমানের ও বর্দ্ধমান বিভাগের স্বাস্থ্য খারাপ হইয়াছে এবং জমির উর্ব্বরতা কমিয়াছে। এই কুফল অধিবাসীদের দোষে ফলে নাই। সুতরাং এখন জমিদার ও প্রজা উভয়েরই দেয় খাজনা পশ্চিম-বঙ্গে কমা উচিত।

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া গেজেটিয়ারের লেখক ওয়াল্টার হামিল্টন লিখিয়াছিলেন, যে, ভারতবর্ষে কৃষিসম্পদে বর্দ্ধমান প্রথম ও তাঞ্জোর দ্বিতীয় স্থানীয়। কিন্তু ঈষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়েকে নিরাপদ করিবার জন্য বাঁধ ও কৃত্রিম খাল (ক্যান্সাল) নির্ম্মিত হওয়ায়, ঐ রেল খুলিবার দুই বৎসর পরে ১৮৫৭ সালে ম্যালেরিয়া মহামারীর প্রাদুর্ভাব হয়। এক হুগলী জেলাতেই ১০ বৎসরে ১০ লক্ষ লোক মারা পড়ে। প্রতি বর্গমাইলে বসতির ঘনতা ৭৫০ হইতে ৫০০ হয়, এবং জমির উর্ব্বরতা আগেকার অর্দ্ধেক হইয়া যায়। এ-পর্য্যন্ত পশ্চিম-বাংলা পূর্ব্বের স্বাস্থ্য ও উর্ব্বরতা ফিরিয়া পায় নাই। [illegible] ও স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা করা হয় নাই।

ন্যায় ও ধর্ম্মবিধি অনুসারে পশ্চিম-বঙ্গের লোকদের ক্ষতি-পূরণের দাবি স্বীকার্য্য। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে হওয়ায় কলিকাতায় ভিন্-প্রদেশী ও বিদেশী শ্রমিক বণিকদের সুবিধা হইয়াছে। অতএব ঈষ্ট ইণ্ডিয়া রেলের কলিকাতা-আগন্তুক যাত্রীদের উপর বা অন্য কোন রকম ট্যাক্স বসাইয়া তাহার সাহায্যে স্বদেশী বিদেশী এঞ্জিনীয়ারদের পরামর্শানুযায়ী পূর্ত্তকার্য্যের দ্বারা পশ্চিম-বঙ্গের অতীত স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি পুনরানয়নের চেষ্টা হওয়া একান্ত আবশ্যক।

এই বিষয়ে আরও অধিক তথ্য আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থে ডক্টর মেঘনাদ সাহার প্রবন্ধে পাওয়া যাইবে।

—

বিপ্লবী ও সন্ত্রাসক দমন আইন

বৈপ্লবিক ও সন্ত্রাসক প্রচেষ্টা অধিকতর ফলদায়ক ভাবে দমন ও উচ্ছেদসাধনার্থ বঙ্গীয় ফৌজদারী আইন সংশোধন বিল এক সপ্তাহ ধরিয়া তাড়াহুড়া করিয়া আলোচনার পর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় গৃহীত হইয়াছে। গত শুক্রবার ২৫শে ফাল্গুন রাত্রি বারটা পর্য্যন্ত এবং শনিবার ২৬শে ফাল্গুন এক দফা বেলা ১০॥০টা হইতে ২টা এবং আর এক দফা সন্ধ্যা ৬॥০ হইতে রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত এই উদ্দেশ্যে সভার অধিবেশন চলে। এই বিলের দুটা ধারায় ভারতীয় অস্ত্র আইন ও বিস্ফোরক আইনের কোন কোন ধারার অপরাধে, কেহ নিহত না হইলেও, প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এরূপ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার বসু প্রমুখ অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক সদস্য খুব তর্কবিতর্ক করিয়াছিলেন; কিন্তু সরকারী ও সরকারের অনুগ্রহপ্রার্থী সদস্যরা দলে পুরু থাকায় মৃত্যুদণ্ডবিরোধীদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ, মানুষের প্রাণ সেক্রেড (sacred), এইরূপ তর্ক উত্থাপন করায়, হোম মেম্বার মিঃ রীড ওজস্বিতার সহিত জিজ্ঞাসা করেন, সন্ত্রাসকরা কি মনুষ্যজীবনকে সেক্রেড মনে করে? আমাদের বিবেচনায় মিঃ রীডের এরূপ তর্ক করা ঠিক হয় নাই। মানবজীবনের মূল্য সম্বন্ধে গবর্মেণ্টের ও সন্ত্রাসকদের মাপকাঠি এক হওয়া উচিত না। কেহ উত্তেজিত বা [illegible] হইয়া

অপরের প্রাণবধ করিবার নিমিত্ত সত্য সত্যই অস্ত্র নির্ম্মাণ, বিক্রয় বা সংগ্রহ করিয়াছে, ইহা নিশ্চিত প্রমাণ হইলেও সেই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মারিয়া না ফেলিয়া তাহাকে যাবজ্জীবন বন্দী করিয়া রাখিয়া নিজের ভ্রম বুঝিবার ও অনুতপ্ত হইবার সুযোগ দেওয়াই রাষ্ট্রের পক্ষে উচ্চতর আদর্শ। ফাঁসী দেওয়ার চেয়ে ইহাতে খরচ বেশী হয় বটে, কিন্তু ইহা সভ্যরাষ্ট্রোচিত এবং অধিকতর সমীচীন। একটা মানুষের প্রাণদণ্ড হইয়া গেলে তাহার আর প্রতিকার নাই, তাহাকে বাঁচান যায় না। খুন করিয়াছে বলিয়া অভিযোগে অভিযুক্ত এবং বিচারান্তে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত কোন কোন ব্যক্তি যে নির্দ্দোষ ছিল, তাহার বহু দৃষ্টান্ত আছে। নূতন আইন অনুসারে বিচারেও এরূপ ভুল হইবে। সুতরাং প্রাণদণ্ডের পরিবর্ত্তে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের ব্যবস্থা করিলে ভাল হইত। খুন করা ও খুনের জন্য অস্ত্র সংগ্রহ করা উভয় অপরাধের জন্যই মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা করায় কাজটা একেবারে খতম করিয়া দিবার দিকে জিঘাংসুদের ঝোঁক হইতে পারে, এরূপ তর্কও কেহ কেহ করিয়াছিলেন; তাহাতে কিন্তু কোন ফল হয় নাই।

খবরের কাগজে খবর প্রকাশ সম্পর্কে, প্রাদেশিক গবর্ন্মেণ্টের মতে যে-সব খবর "বৈপ্লবিক দলে লোক জোগাড় করার অনুকূল মানসিক অবস্থার সৃষ্টিকর বলিয়া বিবেচিত হইবে," তৎসমুদয়ের প্রকাশ নিষেধ করিবার অধিকার প্রাদেশিক গবর্ন্মেণ্টকে দেওয়া হইয়াছে।

অভিযুক্ত লোকদের হাইকোর্টে আপীল করিবার অধিকার ও আপীলে বিচার করিবার হাইকোর্টের অধিকার এই বিলে বিলুপ্ত করা হইয়াছে। হোম মেম্বর বলেন, গবর্ন্মেণ্ট এমন অনেক খবর জানেন, যাহা হাইকোর্ট না জানায় বা জানিতে না পারায় আপীলে ভ্রান্ত রায় দিতে পারেন। কিন্তু গবর্ন্মেণ্টের খবর অর্থাৎ কার্য্যতঃ পুলিসের দ্বারা গবর্ন্মেণ্টকে প্রদত্ত খবর যে ঠিক, তাহার প্রমাণ কি? আপীল হইতে দিলে এবং আপীলের সময় সরকার পক্ষ সেই সব খবর হাইকোর্টকে জানাইলে সেগুলার সত্যতা পরীক্ষিত হইতে পারিত।

বৈপ্লবিক সমিতিসমূহের সহিত মিলামিশা করিতেছে, ২১ বৎসরের কম বয়স্ক এরূপ যুবকদের আচরণ বা চলাফেরার প্রতিবন্ধকজনক বা নিরোধাত্মক ব্যবস্থা করিবার অধিকার এই বিল জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে দিয়াছে। রঘুবংশে দিলীপ রাজার চারিত্রিক প্রশংসায় কালিদাস লিখিয়াছেন—

> "প্রজানাং বিনয়াধানাৎ রক্ষণাদ্ ভরণাদপি।
> স পিতা পিতরস্তাসাম্ কেবলং জন্মহেতব।"

"প্রজাদের পিতারা কেবল তাহাদের জন্মহেতু ছিল তাহাদের বিনয়-বিধান, রক্ষা ও ভরণ তিনি করিতেন বলিয়া তিনিই বাস্তবিক তাহাদের পিতা ছিলেন।"

বাংলার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটদিগকে এই আইন, শাস্তি দেওয়ার দিক্ দিয়া, প্রায় দিলীপ বানাইতে চাহিতেছে।

আইনটাকে পাঁচ বৎসর স্থায়ী করিবার চেষ্টা বিরোধীরা করিয়াছিলেন কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। নরহত্যা, লুণ্ঠন, ডাকাতি, বা ভীতি প্রদর্শন অপরাধে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে উৎসাহদানমূলক কোন কিছু যাহাতে স্থান পাইয়াছে, এরূপ কোন খবরের কাগজ, পুস্তক, চটী বই, বা দলিল দস্তাবেজ কাহারও নিকট থাকিলে তাহার তিন বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড ও জরিমানা বা উভয়বিধ শাস্তির ব্যবস্থা এই আইনে আছে। ইহার সঙ্গে মিঃ রীড অভিযুক্ত ব্যক্তির এই নিরাপত্তাবিধায়ক ব্যবস্থা ("safeguard") জুড়িয়া দেওয়ায় রাজী হইয়াছেন, যে, ঐ রকম জিনিষ বৈপ্লবিক আন্দোলনের পরিপোষক নীতি প্রচার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিবার অভিপ্রায় অভিযুক্ত ব্যক্তির ছিল না, কিংবা সে জানিত না যে তাহার ঐ প্রকার ব্যবহার হইতে পারে, এবং বৈপ্লবিক আন্দোলনের সহিত নিঃসম্পর্ক কোন নির্দোষ গবেষণা ও অধ্যয়নের জন্য তাহা রাখা হইয়াছিল, ইহা প্রমাণিত হইলে সে অব্যাহতি পাইতে পারিবে। আমরা শুনিয়াছিলাম, ইংরেজী আইন-বিজ্ঞান বলে, কেহ অপরাধী প্রমাণিত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে নিরপরাধ মানিতে হইবে। কিন্তু এ আইনে বলিতেছে দেখিতেছি, যে, স্থল-বিশেষে মানুষকে অপরাধী বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে, সে যে নিরপরাধ তাহা প্রমাণ করিবার ভার তাহারই উপর!

শ্রীযুক্ত শান্তিশেখরেশ্বর রায় বলেন, হিন্দুজনমত এই বিলের বিরোধী, এবং কাহারা তর্কবিতর্কের সময় ইহার সপক্ষে বিপক্ষে ভোট দিতেছে, সংবাদপত্রে তাহাদের নাম প্রকাশ যদি বিলের সমর্থকদের অনুরোধ অনুসারে প্রেস অফিসার বন্ধ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহারা কতটা স্বাধীনভাবে ভোট দিতেছেন, তাহা তিনি ব্যবস্থাপক সভাকেই ভাবিয়া

দেখিতে অনুরোধ করেন। রায় মহাশয়ের এই ইঙ্গিতের মানে ঠিক্ ধরিতে পারিলাম না। ইহার মানে কি এই, যে, কোন্ সদস্য কোন্ পক্ষে মত দিতেছেন তাহা জানা পড়িলে তাঁহাদের নির্ব্বাচকমণ্ডলী তাঁহাদিগকে হয় মণ্ডলীর মত অনুসারে ভোট দিবার নতুবা ইস্তফা দিবার জন্য চাপ দিতে পারে, সেই জন্য প্রেস অফিসার তাঁহাদিগকে এইরূপ সঙ্কট অবস্থা হইতে রক্ষা করায় এই উপকারের বিনিময়ে তাঁহারা সরকার পক্ষে ভোট দিতেছেন? মানে যাহাই হউক, হিন্দুজনমত এবং মুসলমানদের কিয়দংশের জনমত এই বিলের বিরোধী, তাহাতে সন্দেহ নাই; অথচ ইংলণ্ডে ও অন্যত্র প্রচার করা হইবে, যে, বঙ্গীয় জনসাধারণের প্রতিনিধিদের অধিকাংশের মতে বিল পাস হইয়াছে। সরকার পক্ষের মনের ভাব কতকটা এইরূপ, যে, যাহারা বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা দমনার্থ সরকারী সব উপায় ও বিধানের সমর্থন না-করে, তাহারা উক্ত প্রচেষ্টার প্রচ্ছন্ন সহানুভূতিকারী। এরূপ সন্দেহ হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্যও হয়ত কোন কোন সদস্য সরকার-পক্ষে ভোট দিয়া থাকিবেন। যে-কারণে বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্র আদির মোকদ্দমায় সরকার-পক্ষের সাক্ষীদের নাম ধাম আদি প্রকাশ বন্ধ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে, সন্ত্রাসক আইনের সমর্থক সদস্যদের নাম কতকটা সেই কারণেও গোপন রাখা হইয়া থাকিবে।

উদারনৈতিক দলের নেতা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু বলেন, ভবিষ্যতে কি হইবে না-হইবে, অতীত ঘটনা হইতে যদি তাহার কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তাহা হইলে বলিতে হয়, যে, এই অসাধারণ আইন হইতেও বিশেষ কোন সুফলের আশা করা যায় না।

—

ভারত-গবর্মে´ণ্টের বজেট

ভারত-গবর্মেণ্টের রাজস্বসচিব নূতন ট্যাক্স বসাইয়া কোন প্রকারে ব্যয়ের চেয়ে আয় কিছু বেশী দেখাইয়াছেন। দরিদ্র ভারতে নূতন ট্যাক্সের আমরা বিরোধী—বিশেষতঃ যে-যে ট্যাক্সগুলি বসান হইয়াছে। চিনির উপর ট্যাক্স খাদ্যদ্রব্যের উপর ট্যাক্স বলিয়া আপত্তিজনক; তদ্ভিন্ন, ইহার দ্বারা চিনির কারখানাগুলির অনিষ্ট হইতে পারে। তবে, আকের আবাদকারীদের কাছে আক কারখানাওয়ালারা নির্দ্দিষ্ট মূল্যে কিনিতে বাধ্য হইবে, এই প্রকার নিয়মের আমরা অনুমোদন করি। ইহাতে ইক্ষুচাষীদের উপকার হইবে। এখন ফড়িয়ারা চাষীদিগকে খুব কম দাম দিয়া তাহাদের আক কিনে এবং বেশী দামে তাহা কারখানায় বিক্রী করে। প্রস্তাবিত চিনি আইনে এই ব্যবস্থা করা হইবে, যে, লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা সমিতি চাষীর নিকট আক কিনিবে; কারখানা-সমূহ লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা সমিতি ভিন্ন আর কাহারও নিকট হইতে কিনিতে পারিবে না। ইহাতে দালালি বা ফড়িয়াগিরি বন্ধ হইবে।

দিয়াশলাইয়ের উপর ট্যাক্সেরও আমরা বিরোধী। ইহাতে দিয়াশলাইয়ের দেশী কারখানাগুলির ক্ষতি হইবে, এবং গরীব লোককে পর্য্যন্ত বেশী দাম দিয়া দিয়াশলাই কিনিতে হইবে। এমন কোন ট্যাক্স বসান উচিত নয়, যাহা ধনী ও ও গরীবের উপর সমান হারে পড়ে, হয়ত বা গরীবের উপরই বেশী হারে পড়ে।

তামাকের উপর ট্যাক্সটা যদি এরূপ ভাবে এবং এরূপ তামাক, চুরুট ও সিগারেটের উপরই বেশী করিয়া পড়ে যাহা দ্বারা অল্পবয়স্কদের মধ্যে উহার ব্যবহার বন্ধ হয় এবং গরীব লোকদের উপর বেশী চাপ না-পড়ে, তাহা হইলে ভাল হয়।

—

নূতন বজেটে ডাক-মাশুল

অনেক বৎসর পূর্ব্বে পোষ্ট কার্ডের দাম ছিল এক পয়সা; অনেক দিন হইতে হইয়াছে তিন পয়সা। গরীব লোকেরা খবর লওয়া-দেওয়ার জন্য প্রধানতঃ পোষ্ট কার্ডই ব্যবহার করে। এই জন্য তিনগুণ দাম বৃদ্ধিতে তাহাদের বড় অসুবিধা হইয়াছে। পোষ্ট কার্ডের দামই সেই কারণে কমান উচিত ছিল। কিন্তু ভারত-গবর্মেণ্ট তাহা না করিয়া চিঠির ডাকমাশুল আধতোলা পর্য্যন্ত পাঁচ পয়সার জায়গায় চারি পয়সা করিয়াছেন। যাহারা পাঁচ পয়সা দিতে পারিত, তাহাদের এক পয়সা সাশ্রয়ের তত বেশী দরকার ছিল না, যত ছিল গরীবের পোষ্ট কার্ডের মূল্য হ্রাস। তাহার পর অপেক্ষাকৃত সচ্ছল অবস্থার লোকদের উপরই আরও এই দয়া প্রস্তাবিত হইয়াছে, যে, পাঁচ পয়সার ষ্ট্যাম্পযুক্ত ডাকঘরের খাম কিনিতে যে অতিরিক্ত এক পাই লাগিত, তাহা আর লাগিবে না। চিঠির

ডাকমাশুল হ্রাসের মধ্যেও কোন সঙ্গতি দেখিতে পাই না। আড়াই তোলা ওজনের চিঠির মাশুল লাগিবে পাঁচ পয়সা, কিন্তু চারি পয়সা মাশুলের চিঠি আধতোলার বেশী হইলে চলিবে না।

সরকার চিঠির মাশুল যেমন এক দিকে এক পয়সা কমাইয়াছেন, তেমনি আবার বুকপোষ্টের নিম্নতম মাশুল দু-পয়সার জায়গায় তিন পয়সা করিয়াছেন। এখন একখানা ৫ তোলা বা তন্ন্যূন ওজনের বর্ণপরিচয়ের বহি, ধারাপাতের বা শিশুশিক্ষার মত বহি দু-পয়সা মাশুলে যায়, ব্যবসাদারদের ৫ তোলা বা তন্ন্যূন ওজনের সার্কুলার ইস্তাহার আদি দু-পয়সায় যায়; অতঃপর লাগিবে তিন পয়সা। এই ব্যবস্থায় শিক্ষার ও জ্ঞানলাভের উপর ট্যাক্স বসান হইবে - কেন না, আগে দশ তোলা পর্য্যন্ত দু-পয়সায় যাইত, এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের উপরও ট্যাক্স বসান হইবে।

বাইবেলে দাতাদিগকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তোমাদের ডান হাত যাহা দেয় বাম হাত যেন তাহা জানিতে না পারে। কিন্তু ভারতের রাজস্ব-সচিবের ডান হাত চিঠির ডাকমাশুলে যে এক পয়সা দান করিলেন, তাহা তাঁহার বাম হাত জানিতে ত পারিয়াছেই, অধিকন্তু জানিয়াই ক্ষান্ত না হইয়া বুকপোষ্টের মাশুল বাড়াইয়া ডান হাতের দান কাড়িয়া লইয়াছে!

—

টেলিগ্রামের মূল্যহ্রাস

এখন টেলিগ্রাফ করিবার ন্যূনতম খরচ তের আনা। তাহাতে ১২টি কথা পাঠান যায়। রাজস্ব-সচিব ন্যূনতম খরচ নয় আনা করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। তাহাতে আটটি কথা পাঠান যাইবে। কিন্তু নাম ও ঠিকানা প্রভৃতিতেই ত কয়েকটা কথা যাইবে, সুতরাং এই ন্যূনতম মূল্যের সুবিধা বেশী পাওয়া যাইবে না। তা ছাড়া, ইহাতে গরীবের দুঃখ হ্রাস হইবে না; টেলিগ্রাফ তাহারা প্রায়ই করে না।

—

পাট রপ্তানি শুল্ক

পাট প্রধানতঃ জন্মে বঙ্গে, তাহার পর আসাম ও বিহারেও অল্প কিছু জন্মে। এইজন্য ইহাকে বঙ্গের একচেটিয়া ফসল বলা হয়। পাট রপ্তানির শুল্ক অনেক বৎসর আগে এই ওজুহাতে বসান হয়, যে, উহা একচেটিয়া জিনিষ, উহার ক্রেতাদিগকেই শুল্কটা দিতে হইবে, চাষীকে দিতে হইবে না। কিন্তু কার্য্যতঃ চাষীকেই দিতে হইয়াছে। কি প্রকারে এবং কেন, সে তর্কের ভিতর এখন যাইব না। এই শুল্কটা কাহার প্রাপ্য, উৎপাদক প্রদেশগুলির, না ভারত-গবর্ন্মেণ্টের? এ-বিষয়ে মতভেদ আছে। যাঁহারা বলেন উহা ভারত-গবর্ন্মেণ্টের প্রাপ্য তাঁহারা বলেন উহা বাণিজ্যশুল্ক, অতএব কেন্দ্রীয় গবর্ন্মেণ্ট উহাতে অধিকারী। তাহার উত্তরে বলা যায়, আমদানী পণ্য-দ্রব্যের উপর শুল্ক কেন্দ্রীয় অর্থাৎ ভারত-গবর্ন্মেণ্টের প্রাপ্য বটে; কিন্তু এটা যে রপ্তানি জিনিষের উপর শুল্ক। রপ্তানি শুল্কের টাকাটা সেই প্রদেশেরই পাওয়া উচিত, যে-প্রদেশে রপ্তানির জিনিষ উৎপন্ন হয়। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী এ-বিষয়ে অষ্ট্রেলিয়া ও ব্রাজিলের নজীর দেখাইয়াছেন। ঐ যুক্তির এবং এই নজীরের যথার্থ উত্তর নাই। কিন্তু যাহারা নিজেদের স্বার্থ ভিন্ন আর কিছুই বুঝে না এবং বঙ্গের ন্যায্য প্রাপ্য পাওয়াতেও ঈর্ষান্বিত হয়, তাহাদের মুখ বন্ধ কে করিতে পারে?

পাটের শুল্ক যে বঙ্গের পাওয়া উচিত, তাহা আগা খাঁ ও তথাকথিত গোলটেবিল বৈঠকে তাঁহার সঙ্গীরা বরাবর স্বীকার করিয়াছেন, শ্বেত কাগজেও স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু বোম্বাইয়ের অনেক লোক এবং পঞ্জাবের ও মান্দ্রাজের কেহ কেহ ভারত-গবর্ন্মেণ্ট পাটশুল্কের টাকার অর্দ্ধেকটা বাংলাকে দিবার প্রস্তাব করায় তাহাতেই ক্রুদ্ধ ও ঈর্ষান্বিত হইয়াছে।

এ পর্য্যন্ত পাটের শুল্ক হইতে ভারত-গবর্ন্মেণ্ট প্রায় ৬০ কোটি টাকা পাইয়াছেন। এদিকে যে-বাংলার চাষীরা ইহা উৎপন্ন করে, সেই বঙ্গদেশে ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বরের যথেষ্ট প্রতিকার হয় না, শিক্ষার জন্য খুব কম খরচ হয়, বিস্তর লোক অর্দ্ধাশনে অনাশনে ছিন্ন বস্ত্রে কাল কাটায়, এবং বেকার সমস্যায় সমাজ জর্জ্জরিত ও নৈতিক দিক দিয়া অধঃপতিত।

—

বঙ্গের রাজস্ব শোষণ

আমরা বারবার মডার্ন রিভিউ ও প্রবাসীতে দেখাইয়াছি, যে প্রধানতঃ বাংলা দেশের রাজস্ব হইতে কেবল যে গত শতাব্দীতে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপিত ও বিস্তৃত হইয়াছিল এবং অনেক প্রদেশের ঘাট্‌তি বঙ্গের রাজস্ব হইতে পূরিত হইত তাহা নহে, বর্ত্তমান শতাব্দীতে এবং এখনও

ভারত-গবর্ন্মেণ্ট বাংলা দেশ হইতে সকলের চেয়ে অত্যন্ত বেশী টাকা আদায় করেন। ইহা অন্যায় এবং ইহার ফলে সর্ব্বাপেক্ষা জনবহুল বঙ্গের গবর্ন্মেণ্ট সকল রকম সরকারী কাজের জন্য বড় বড় অন্য সব প্রদেশের চেয়ে কম টাকা পান। ইহার দুটা দৃষ্টান্ত আবার উদ্ধৃত করিতেছি। ১৩৩২ সালের বঙ্গীয় সরকারী ব্যয়সংক্ষেপ কমিটির রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে, যে, ১৯২১-২২ সালে ভারত-গবর্ন্মেণ্টের মোট রাজস্ব ছিল ৬৪,৫২,৬৬,০০০ টাকা। তাহার মধ্যে বাংলা দেশ হইতেই লওয়া হয় ২৩,১১,৯৮,০০০ টাকা। ভারত-গবর্ন্মেণ্ট নিজ রাজস্বের শতকরা ৩৫ টাকা কেবল বাংলা দেশ হইতেই আদায় করেন। শুধু ঐ এক বৎসরই যে বাংলা দেশ হইতে বেশী টাকা লইয়াছেন, তাহা নহে। তাহার পরও ঐরূপ চলিতেছে। ১৯২৮-২৯ সালের হিসাব লউন। ঐ বৎসর ভারত-গবর্ন্মেণ্ট ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে নিম্নলিখিত রূপ টাকা লয়েন।

প্রদেশ	টাকা
বাংলা	১৬,? ,০০,০০০
মান্দ্রাজ	৭,১৪,০০,০০০
আগ্রা-অযোধ্যা	৭,১৭,০০,০০০
বোম্বাই	৫,৮৪ ০০,০০০
পঞ্জাব	৩,৪৬,০০,০০০
বিহার-উড়িষ্যা	৫,৭৬,০০,০০০
মধ্যপ্র দশ-বেরার	২,২৫,০০,০০০
আসাম	১,২০,০০,০০০

এই ফর্দ্দে দেখা যাইতেছে, যে, বাংলার নীচে যে দুই প্রদেশ সকলের চেয়ে বেশী টাকা কেন্দ্রীয় গবর্ন্মেণ্টকে দিয়াছিল, তাহারাও উভয়ে মিলিয়া ১৪,৩১,০০,০০০ অর্থাৎ বঙ্গের চেয়ে ২,:৮,০০,০০০ টাকা কম দিয়াছিল।

আর একটা বৎসরের অন্য রকম একটা তালিকা লউন। বাংলা হইতে ভারত-গবর্ন্মেণ্টের অতিরিক্ত শোষণের ফলে অন্য সব বড় প্রদেশের চেয়ে বাংলার সরকারের হাতে কম টাকা থাকে, তাহা আগে বলিয়াছি। দু-বৎসরের ফর্দ্দ দিতেছি। আগে লউন ১৯৩১-৩২ সালের।

প্রদেশ	প্রাদেশিক রাজস্ব	লোকসংখ্যা	জনপ্রতি রাজস্ব
মান্দ্রাজ	১৮,২৯,৭০ ০০০	৪৬৭৭০০০০	৩.৯
বোম্বাই	১৫,২০,৪৭,০০০	২১৯৩১০০০	৬.৯
বাংলা	১০,৫২,৪২,০০০	৫০১১৪০০০	২.১
পঞ্জাব	১১ ৪৮,০৮,০০০	২৩৫৮১০০০	৫
আগ্রা-অযোধ্যা	১৩,২৬,৫০,০০০	৪৮৪০৯০০০	২.৭

এই তালিকায় প্রাদেশিক রাজস্ব মানে সেই প্রদেশে মোট যত রাজস্ব আদায় হয় তাহা নহে, সেই প্রদেশের গবর্ন্মেণ্টকে প্রদেশের খরচের জন্য যাহা রাখিতে দেওয়া হয়, তাহা। তাহাই জনপ্রতি কত, তাহাও দেখান হইয়াছে। বাংলা দেশের লোকসংখ্যা সকলের চেয়ে বেশী, ভারত-গবর্ন্মেণ্ট এখান হইতে গ্রহণ করেন সকলের চেয়ে বেশী টাকা, কিন্তু ইহার গবর্ন্মেণ্টকে রাখিতে দেন সকলের চেয়ে কম। ফলে বঙ্গে জনপ্রতি সকল প্রদেশের চেয়ে সরকারী খরচ হয় কম। যাহা হয় তাহারও বেশী অংশ পুলিস প্রভৃতির জন্য।

১৯৩৪-৩৫ সালের যে আনুমানিক প্রাদেশিক রাজস্ব ধরা হইয়াছে, তাহাতেও বঙ্গের দুর্দ্দশা সূচিত হয়।

প্রদেশ	লোকসংখ্যা	প্রাদেশিক রাজস্ব
পঞ্জাব	২৩৫৮১০০০	১০,৬৬,০০,০০০
আগ্রা অযোধ্যা	৪৮৪০৯০০০	১১,৫০,০০,০০০
বোম্বাই	২১৯৩১০০০	১৫,২২,০০,০০০
বাংলা	৫০১১৪০০০	৯,০৭,০০,০০০

এখানেও দেখিবেন, সকলের চেয়ে জনবহুল প্রদেশকে সকলের চেয়ে কম টাকা রাখিতে দেওয়া হইয়াছে। বঙ্গে মোট রাজস্ব আদায় কম হয় বলিয়া যে ইহা ঘটে, তাহা নহে। রাজস্ব খুব বেশী আদায় হয়, কিন্তু তাহার খুব বেশী অংশ ভারত-গবর্ন্মেণ্ট আত্মসাৎ করেন।

—

প্রাদেশিক স্বার্থপরতা ও অন্ধতা

দুঃখের বিষয়, বঙ্গের প্রতি এই অবিচার অন্যান্য প্রদেশের লোকেরা দেখিতে পান না, বা দেখিয়াও দেখেন না; অধিকন্তু বোম্বাই, পঞ্জাব, মান্দ্রাজের অনেক লোক বাংলা দেশকে আক্রমণ করেন ও কটু কথা বলেন। তাহার উত্তর দিব না।

—

প্রাদেশিক আবকারী আয়

অন্য প্রদেশের লোকেরা বলেন, বাংলা দেশে জমির খাজনার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থাকায় উহার প্রাদেশিক রাজস্ব কম হয়। তাহার বিষয় পরে লিখিতেছি। কেবল জমির খাজনা কম হয় বলিয়াই যে বঙ্গের প্রাদেশিক রাজস্ব কম, তাহা নহে। আরও কারণ আছে। বঙ্গের লোকসংখ্যা বোম্বাইয়ের প্রায় আড়াই গুণ। অথচ বোম্বাইয়ের আবকারী

আয় বঙ্গের চেয়ে ১ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা বেশী। বঙ্গের লোকসংখ্যা মান্দ্রাজের চেয়ে ৩০ লক্ষেরও বেশী। অথচ মান্দ্রাজের আবকারী আয় বঙ্গের চেয়ে তিন কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা বেশী। বাংলা দেশে মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের মত বেশী মাতাল বা নেশাখোর লোক নাই বলিয়াই কি তাহার অতি ন্যায্য পাট রপ্তানি শুল্কের টাকাটাও তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইতে হইবে?

—

ভূ-করের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কথা

জমির খাজনার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভাল কি মন্দ তাহার বিচার এখন করিব না। রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি অর্থনীতিজ্ঞ এবং শাসনকার্য্যে অভিজ্ঞ ব্যক্তি ইহা ভাল মনে করিতেন এবং সব প্রদেশেই ইহার প্রবর্ত্তন চাহিয়াছিলেন। আমরা তর্কের খাতিরে ধরিয়া লইতেছি, যে, ইহা মন্দ। কিন্তু এই বন্দোবস্ত ত বাংলা দেশের লোকে করে নাই, ভারত-গবন্মেণ্ট করিয়াছিলেন। ইহার পরিবর্ত্তনও ভারত-গবন্মেণ্টই করিতে পারেন। যে-সব প্রদেশের লোকেরা ইহা মন্দ বলেন, এবং বঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আছে বলিয়া সেই ওজুহাতে বাংলার প্রাদেশিক রাজস্বের অল্পতা ন্যায্য মনে করেন, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় তাঁহাদের প্রতিনিধিরা কেন এই ব্যবস্থা উল্টাইয়া দিবার প্রস্তাব করেন না?

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত না-থাকিলে খাজনার যত টাকা বাংলা সরকারের হাতে যাইত, সে টাকাটা ত বঙ্গের পাঁচ কোটি লোকের মধ্যে বণ্টিত হয় না, সেটা পান জমিদারেরা। তাঁহাদের সংখ্যা কত? ১৯৩২-৩৩ সালের জমির রাজস্ব-বিষয়ক রিপোর্টের প্রথম পরিশিষ্টে দেখিতেছি, সমগ্র বঙ্গে মহলের সংখ্যা ১,০১,৫৯৪। এক একজন জমিদারের একাধিক মহল আছে। সুতরাং জমিদারদের মোট সংখ্যা কয়েক হাজার। প্রধানতঃ তাঁহারা ও তাঁহাদের পোষ্যদিগের সুবিধা হইয়াছে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে। কিন্তু যদি ধরা যায়, প্রত্যেকের একটি করিয়া মহল আছে, তাহা হইলেও পাঁচ কোটি লোকের মধ্যে লাখখানেক লোকের হাতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের লাভটা যায়। তাহাও তাঁহারা বা তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা অধিকাংশ স্থলে টাকা দিয়া কিনিয়াছেন। এই অল্পসংখ্যক লোকের সুবিধা হইয়া থাকিলে বাকী ৪ কোটি ৯৫ লক্ষের উপর লোককে প্রাদেশিক রাজস্বের কৃত্রিম অল্পতার দুঃখ ভোগ করিতে বলা অন্ধতা, হৃদয়হীনতা ও অন্যায়পরায়ণতার শোচনীয় দৃষ্টান্ত।

—

অন্যান্য প্রদেশের সুবিধা

যদি মানিয়া লওয়া যায়, যে প্রত্যেক বাঙালী সরকারী চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে সুখ ভোগ করিতেছে, তাহা হইলেও অন্য প্রদেশের লোকেরা কেন ভুলিয়া যান, যে, তাঁহারা সরকারী অনুরূপ অনেক বন্দোবস্তে ও ব্যয়ে সুবিধা ভোগ করিতেছেন যাহা বাঙালীরা করে না? জলসেচনের দ্বারা অন্যান্য প্রদেশের কৃষিসম্পদ খুব বাড়িয়াছে, বঙ্গে সেরূপ কিছু নাই। লাভজনক বা উর্ব্বরতাবিধায়ক ('productive") জলসেচনের খাল বঙ্গে নাই, অন্যত্র কিরূপ আছে ও তজ্জন্য কিরূপ ব্যয় হইয়াছে দেখুন।

প্রদেশ	খাল ও শাখাদির দৈর্ঘ্য		কত একর জমি জল পায়	ব্যয়িত মূলধন
মান্দ্রাজ	১৩৪১৪	মাইল	২৩৪২৯৮৮	১২,৬৫ ৫৩,৯৪২
বোম্বাই	৫১৪১	„	২৩৭৯১০৩	১৯,৪৪,৭৫,৭৬৬
আগ্রা-অযোধ্যা	১৪০১৭	„	৩৭৩৭১৭৬	২৩,০০,২৫,৬৩৬
পঞ্জাব	১৯৯৬৭	„	১২৩৪১৩১৮	৩২,৭৮,৩৯,০৫১
বাংলা	শূন্য	„	শূন্য	৬৭,৪৩,৫৪১

এক একর্ তিন বিঘার কিছু অধিক।

ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল্ এব্‌ষ্ট্রাক্টের অন্য একটা তালিকায় বঙ্গে ক্যানালের জলপ্রাপ্ত জমির পরিমাণ দেওয়া আছে, বটে; কিন্তু তাহা সামান্য।

এই যে, কোটি কোটি টাকা অন্যান্য প্রদেশে খরচ করিয়া তাহাদের ধন বৃদ্ধি করা হইয়াছে, যাহা বাংলায় করা হয় নাই, ইহার জন্য ত বাঙালীরা কখনও বলে নাই, যে, অন্যান্য প্রদেশে সংগৃহীত রাজস্ব কাড়িয়া লইয়া তথাকার প্রাদেশিক অংশ খুব কম রাখা হউক।

ইহাই একমাত্র দৃষ্টান্ত নহে। বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর সুতার কাপড়ের মিলে যে কোটি কোটি টাকা লাভ হয়, তাহা একমাত্র বা প্রধানতঃ তথাকার লোকদের বাহাদুরীতে নহে। বিলাতী ও জাপানী সুতা ও কাপড়ের উপর বাণিজ্যশুল্ক না বসাইলে বোম্বাইয়ের ব্যবসা কোথায় থাকিত? অন্যান্য প্রদেশের, প্রধানতঃ বঙ্গের, লোকেরা বেশী দাম দিয়া বোম্বাইয়ের কাপড় কেনে বলিয়া তাঁহারা ধনী। গবন্মেণ্ট যদি বঙ্গের কয়েক হাজার জমিদারের সুবিধা করিয়া দিয়া থাকেন, সেরূপ এবং তার চেয়ে বেশী সুবিধা বোম্বাইয়ের কলওয়ালাদেরও করা হইয়াছে।

টাটা কোম্পানীর লোহা-ইস্পাতের কারখানা রক্ষার জন্য বিদেশী লোহা-ইস্পাতের জিনিষের উপর বাণিজ্যশুল্ক আছে। তাহার জন্য ভারতবর্ষের—প্রধানতঃ বঙ্গের লোকদিগকে বেশী দাম দিয়া লোহা-ইস্পাতের জিনিষ কিনিতে হয়। লাভটা পায় প্রধানতঃ বোম্বাইয়ের লোকেরা, কারণ জমশেদপুরের কারখানায় তাহাদেরই মূলধন বেশী খাটে। সেজন্য ত বাঙালীরা বলে না, যে, বোম্বাই-গবন্মেণ্টকে কৃত্রিম উপায়ে গরীব করা হউক।

গম সকলের চেয়ে বেশী পঞ্জাবে হয়। অষ্ট্রেলিয়া হইতে ভারতবর্ষে যে গম আসে, তাহা পঞ্জাবের গমের চেয়ে সস্তায় আমরা পাইতে পারিতাম; কিন্তু আমদানী অষ্ট্রেলিয়ার গমের উপর বাণিজ্যশুল্ক বসাইয়া তাহাকে মহার্ঘ করিয়া দেওয়া হয়। সুতরাং আমরা বেশী দামে গম কিনিতে বাধ্য হই। এক্ষেত্রেও গবন্মেণ্ট গম-উৎপাদক প্রদেশগুলির সুবিধা করিয়া দিয়াছেন; অন্যান্য প্রদেশের লোকেরা যে বেশী দাম দিয়া গম কিনিতেছে, তাহার লাভ গম-উৎপাদক প্রদেশগুলি পাইতেছে। তাহাতে ত আমরা জোর করিয়া তাহাদিগকে কোন প্রকার রাজস্ব হইতে বঞ্চিত করিতে চাহিতেছি না।

বঙ্গের বজেট

বঙ্গের ১৯৩৪-৩৫ সালের আনুমানিক আয় ব্যয়ের হিসাবে আয় অপেক্ষা ব্যয় সওয়া দুই কোটি বেশী হইবে অনুমিত হইয়াছে। আয় হইবে ৯ কোটির কিছু উপর। সুতরাং ঘাটতি হইবে, আয়ের সিকি। অন্যান্য প্রদেশের লোকেরা ভাবিতেছে, যেন এই ঘাটতিটা সন্ত্রাসক দমন ব্যয়ের জন্য। তাহা নহে। যখন সন্ত্রাসকভীতি ছিল না, তখনও বাংলা সরকারের অর্থকষ্ট কিংবা ঘাটতি হইত। তা ছাড়া, ঘাটতি হইবে ২২৫ লক্ষ টাকা, সন্ত্রাসন ও অহিংস আইন-লঙ্ঘন দমনের ব্যয় হইবে ৫২ লক্ষ টাকা। এই ৫২ লক্ষ শুধু সন্ত্রাসক দমনের জন্য নহে, অসহযোগ আন্দোলন দমনের জন্যও অংশতঃ বটে, যাহা দমন করিতে বোম্বাইয়ে ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী খরচ হইয়াছে। বঙ্গের বজেটে শিক্ষা, স্বাস্থ্যরক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতি প্রভৃতি জনহিতকর "জাতিগঠনমূলক" বিভাগের ব্যয় যেমন বরাবর কম ধরা হয়, ১৯৩৪-৩৫ সালের জন্যও সেইরূপ কম ধরা হইয়াছে। এরূপ বজেটের বিস্তারিত আলোচনা অনাবশ্যক।

পাট শুল্ক প্রাপ্তিতে বঙ্গের লাভালাভ

বাংলাকে পাট-শুল্কের অর্দ্ধেকটা দেওয়ার প্রস্তাব হইয়াছে, তাহাতে লাভ এই, যে, উহা যে ন্যায়তঃ বঙ্গের প্রাপ্য তাহা স্বীকৃত হইতেছে। অলাভ এবং অসুবিধা একাধিক রকমের। উহার সমস্তটাতেই বঙ্গের দাবি আছে। অর্দ্ধেকটা দিয়া এই ন্যায্য পুরা দাবিটা চাপা দেওয়া হইতেছে, এবং পুনঃ পুনঃ দাবি উত্থাপনে কতকটা বাধা পরোক্ষভাবে দেওয়া হইতেছে। শুল্কের অর্দ্ধেক হইতে যে টাকা পাওয়া যাইবে, তাহাও পুলিস, শাসনবিভাগ ইত্যাদির ব্যয়নির্ব্বাহঘটিত ঘাটতি পূরণেই ব্যয়িত হইয়া যাইবে; পাটচাষীদের ও জনসাধারণের অন্যান্য শ্রেণীর লোকের তাহাতে সাক্ষাৎ কোন উপকার হইবে না।

যে-উপায়ে বাংলাকে পাট-শুল্কের অর্দ্ধেক দিবার প্রস্তাব হইয়াছে, তাহাও সম্পূর্ণ অনিষ্টকারক। রাজস্ব-সচিব বলিয়াছেন, দিয়াশলাইয়ের উপর ট্যাক্স বসাইয়া এই টাকা দেওয়া হইবে। কাজেকাজেই, অন্য সকল প্রদেশের লোকেরা বলিতেছে, আমাদের উপর ট্যাক্স বসাইয়া বাংলাকে দয়া করা হইতেছে। প্রদেশে প্রদেশে ঝগড়া বাধান রাজস্ব-সচিবের অভিপ্রায় না হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার প্রস্তাবিত উপায়ের অবশ্যম্ভাবী ফল তাহাই হইয়াছে। আমরা আগেই লিখিয়াছি, দিয়াশলাইয়ের উপর ট্যাক্সের আমরা বিরোধী।

দার্শনিক কংগ্রেসের সভাপতি

বর্ত্তমান মার্চ মাসের শেষে পুনায় ভারতবর্ষীয় দার্শনিক কংগ্রেসের নবম অধিবেশন হইবে। তাহাতে বঙ্গের অধ্যাপক



অধ্যাপক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সভাপতি মনোনীত হইয়াছেন। তিনি বঙ্গীয় শিক্ষাবিভাগে দীর্ঘকাল যোগ্যতার সহিত কাজ করিয়া পেন্সান লইয়া এখন গুজরাটের আমলনেরের দার্শনিক প্রতিষ্ঠানের (Philosophical Institute-এর) ডিরেক্টরের পদে অধিষ্ঠিত আছেন। ইনি বিখ্যাত হন নাই, কিন্তু ইঁহার দার্শনিক জ্ঞান

অতি বিস্তৃত ও গভীর এবং দর্শন বিষয়ে ইনি বিশেষ প্রতিভাশালী।

—

সংবাদপত্রের স্বত্বাধিকারীদের সভা

কতিপয় সংবাদপত্রের স্বত্বাধিকারীদের একটা কনফারেন্স গত মাসে কলিকাতায় হইয়াছিল, আলবার্ট হলের কমিটি কক্ষে ভোজও হইয়াছিল, খবরের কাগজে দেখিয়াছি। সরকারী প্রেস আইনের আমরাও অধীন এবং প্রেস অফিসার আমাদিগকেও ধমক দিয়া থাকেন। সাংবাদিক সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসুর নানাবিধ ইস্তাহারও আমরা পাই। কিঞ্চিৎ চাঁদা আদায় আমাদের নিকট হইতেও হয়। তথাপি, আমরা দেশী ও বিদেশী ভাষায় মাসান্তে একবার মাত্র ছাপার অক্ষরে পাঠকদের সঙ্গে কথা বলি বলিয়া মনে করিয়াছিলাম, আমরা সাংবাদিক বা সংবাদপত্রের অধিকারী নহি। তাহার অন্য প্রমাণও আছে। অনেক ইংরেজী দৈনিক কাগজে সমসাময়িক খবরের কাগজের মত একটি স্তম্ভে উদ্ধৃত হয়, কিন্তু মডার্ণ রিভিয়ুর মত উদ্ধৃত হয় না। কারণ, বোধ হয়, ঐ মাসিকের সম্পাদকীয় পৃষ্ঠাগুলিতে অতীত যুগের ইতিহাস আলোচিত হয়, চল্‌তি সমসাময়িক ঘটনার নহে।

যাহা হউক, দেখিতেছি, মোড়লদের মতে শুধু মাসিক নহে, সাপ্তাহিক, অন্ততঃ কোন কোন সাপ্তাহিকও, সংবাদপত্র নহে। কারণ, "সঞ্জীবনী" লিখিতেছেন, "কলিকাতার অনেক [সংবাদপত্রের] অধিকারীকে যে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই, তাহা জানি।"

—

মথুরাপুরের দেউল

শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মথুরাপুরের দেউল সম্বন্ধে প্রথমে মডার্ণ রিভিয়ুতে সচিত্র প্রবন্ধ লেখেন, পরে প্রবাসীর বর্ত্তমান সংখ্যায় লিখিয়াছেন। তাঁহার অনুরোধক্রমে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের ডিরেক্টর-জেনেরাল ঐ দেউল আইন অনুসারে রক্ষিত প্রাচীন ইমারতের মধ্যে গণিত করিয়াছেন এবং বঙ্গের প্রত্নতত্ত্বকার্য্যের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার উহা পরিদর্শন করিতে গিয়াছেন।

—

অধ্যাপক প্রসন্নকুমার আচার্য্যের "মানসার"

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত-বিভাগের অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডক্টর প্রসন্নকুমার আচার্য্যের পাণ্ডিত্য, দীর্ঘকালব্যাপী পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের গুণে প্রাচীন ভারতবর্ষের স্থাপত্য ও মূর্ত্তিশিল্প সম্বন্ধীয় "মানসার" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের একটি উৎকৃষ্ট সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। তজ্জন্য তিনি পৃথিবীর সমুদয় প্রাচ্যবিদ্যানুরাগীর কৃতজ্ঞতাভাজন। ইহা আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের গবন্মে‍্ণ্টের ব্যয়ে এলাহাবাদের সরকারী ছাপাখানায় মুদ্রিত, এবং অক্সফর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা পাঁচ ভল্যুমে সম্পূর্ণ। দুই ভল্যুম আগে প্রকাশিত হইয়াছিল, সম্প্রতি আর তিন ভল্যুম প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে মানসারের মূল সংস্কৃত, সংস্কৃত পরিশিষ্ট, প্রত্যেক শব্দ কোন্ কোন্ পৃষ্ঠায় আছে তাহার অনুক্রমণিকা, প্রত্যেক অধ্যায়ের নানা পাঠভেদ ও টীকা, সমগ্র গ্রন্থখানির ইংরেজী অনুবাদ, ইংরেজীতে বিস্তারিত বিষয়সূচী ও শব্দসূচী, গ্রন্থকারের রচিত সংস্কৃত ও দীর্ঘ ইংরেজী ভূমিকা, এবং ১৫৭টি সুমুদ্রিত প্লেটে অনেক শত গৃহাদির নক্সা ও মূর্ত্তির চিত্র আছে। বহুসংখ্যক মূর্ত্তিচিত্র বহুবর্ণে মুদ্রিত।

আজকাল প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্যের প্রতি শিক্ষিত শ্রেণীর লোকদের কিছু দৃষ্টি পড়িয়াছে। কিন্তু স্থাপত্য ও মূর্ত্তিশিল্প সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতীয়দের গবেষণা, অনুশীলন ও জ্ঞান কিরূপ বিস্তারিত ও সুস্পষ্ট ছিল, তাহা কম লোকেই জানিতেন এবং সকলের জানিবার উপায় ছিল না। ডক্টর আচার্য্যের গ্রন্থ দেখিলে তাহা জানা যাইবে।

গ্রন্থখানির মূল্য লেখা নাই। সকলে কিনিতে পারিবেন না বটে, কিন্তু সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে, সকল বড় কলেজের, বিশেষতঃ এঞ্জিনীয়ারিং কলেজের লাইব্রেরীতে, আর্টস্কুল সকলের লাইব্রেরীতে, বড় বড় এঞ্জিনীয়রদের ও গৃহনির্ম্মাতা কোম্পানীদের পুস্তকসংগ্রহে ইহা রক্ষিত হওয়া একান্ত আবশ্যক।

এই বহুমূল্য গ্রন্থের বিস্তৃত পরিচয় পরে দিব।

—

পঞ্জাবে নারীহরণ

১৯৩২ সালে পঞ্জাবে ৫০৪ (পাঁচ শত চারি)টি নারীহরণ হইয়াছিল এবং ২৮১ জন নারীহরণকারী বদমায়েসের দণ্ড হইয়াছিল। পঞ্জাবের লোকসংখ্যা বঙ্গের অর্দ্ধেকের কম, এবং পঞ্জাবীরা ও অন্যেরা মনে করে পঞ্জাবীরা খুব বীর।

—

সৈন্যের সম্মান ও ব্রিটিশ পতাকাকে সেলাম

রাষ্ট্রপরিষদে হোম মেম্বর বলিয়াছেন, যখন সৈন্যেরা কোন দিক দিয়া দলবদ্ধভাবে যায়, তখন তাহাদিগকে সম্মান প্রদর্শন করিবার রীতি আছে। ইহা নূতন শুনিলাম।

ব্রিটিশ পতাকাকে সেলাম করাইবার চেষ্টা মেদিনীপুর অঞ্চলে খুব হইতেছে। হিন্দুরা দেববিগ্রহকে ও গুরুজনদিগকে প্রণাম এবং অন্য মানুষকে নমস্কার করে। মুসলমানেরা ঈশ্বরের নিকট নতজানু হয় এবং মানুষকে সেলাম করে।

...স্বরূপ জড়পদার্থকে সেলাম করা মুসলমান বা হিন্দু রীতি নহে।

—

আসামের আর্থিক অবস্থা

আসাম প্রদেশ ৫৩০১৫ বর্গমাইল পরিমিত। আসাম গবর্মেণ্টের আয় কিন্তু দু-কোটি টাকারও কম। ইহাতে এত বড় ভূখণ্ডের ব্যয় নির্ব্বাহ করা কঠিন। গত বৎসর ৫১ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়িয়াছিল, এবার পড়িয়াছে ৬০ লক্ষ। অথচ আসামের কেরোসীন তেলের শুল্ক হইতে ভারত-গবর্মেণ্ট ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা লইয়াছেন, ও তাহাকে প্রত্যর্পণ করিয়াছেন মাত্র ৪ লক্ষ। আসামকে নিশ্চয়ই আরও বেশী টাকা রাখিতে দেওয়া উচিত।

—

সারায় হার্ডিং সেতু

রেলযোগে উত্তরবঙ্গে ও দার্জ্জিলিঙে যাইবার জন্য ৪ কোটী টাকা ব্যয়ে সারায় পদ্মার উপর হার্ডিং সেতু নির্ম্মিত হইয়াছিল। এখন পদ্মা তাহা ভাঙিবার উপক্রম করিয়াছে। তাই ১৫ই জুন বর্ষার বন্যার আগেই সেতুরক্ষার উপায় করিতে হইবে। তজ্জন্য অনেক এঞ্জিনীয়ারের অধীনে ১১০০০ লোক দিনরাত খাটিতেছে। খরচ হইবে এক কোটী। নদীর গতিবিধি সম্বন্ধে বিশেষ গবেষণা না করিয়া ৪ কোটী টাকার যে সেতু নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল, তাহা ঠিক্ হয় নাই। তাই এত কর্ম্মভোগ এবং অর্থের অপচয়। এই যে অতিরিক্ত এক কোটী টাকা ব্যয় হইবে, তাহাও গবেষণানন্তর নহে। সুতরাং তাহাও ব্যর্থ হইতে পারে।

—

ইউরোপ ও আমেরিকায় রাষ্ট্রীয় উপদ্রব

ইউরোপের অষ্ট্রিয়া, স্পেন, জার্ম্মেনী প্রভৃতিতে নানা রাষ্ট্রীয় উপদ্রব হইতেছে; আমেরিকার কিউবা, নিকারাগুয়া প্রভৃতিতেও হইতেছে। এই সব দেশের লোকদের যদি সুবুদ্ধি থাকিত, তাহা হইলে তাহারা বাংলা দেশের প্রধান প্রধান সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে ডাকিয়া লইয়া গিয়া তাঁহাদিগকে আপনাদের প্রভু করিয়া দিত। তাহা হইলে সর্ব্বত্র স্থায়ী সুখশান্তি বিরাজ করিত।

—

ফিলিপাইন দ্বীপের স্বাধীনতা

ফিলিপাইন দ্বীপের লোকেরা আমেরিকার অধীন থাকিতে চায় না; তাহারা স্বাধীন হইতে চায়। সেই জন্য আন্দোলন ও আমেরিকার নেতৃনায়কদের সঙ্গে তাহারা আলোচনা চালাইতেছে। বলপ্রয়োগ না করিয়া এরূপ আন্দোলন ও আলোচনা চালান আমেরিকার পীন্যাল কোডে সিডীশ্যন নহে কিন্তু ইহারই বা প্রয়োজন কি? ভারত-সচিব স্যর সামুয়েল হোরকে ডাকিয়া লইয়া গিয়া ফিলিপিনোরা একটা "শ্বেত কাগজ"-অনুযায়ী শাসন-বিধি প্রস্তুত করাইয়া লউন না? তাহা গণতান্ত্রিকতার চরম সীমা এবং স্বাধীনতার চেয়ে ঢের ভাল।

—

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কন্‌ফারেন্স

দিল্লীতে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কন্‌ফারেন্স চলিতেছে। প্রারম্ভে বক্তৃতা করিয়া বড়লাট শিক্ষিত বেকারদের জন্য দুঃখ জ্ঞাপন করিয়াছেন। তাহাতেও কিন্তু বেকার-সমস্যার সমাধান হইয়া যায় নাই।

কোন্ কোন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন্ কোন্ বিজ্ঞানের প্রয়োগ দ্বারা পণ্যশিল্প শিখাইবার চেষ্টা হইতে পারে, তাহার আলোচনাও এই কন্‌ফারেন্সে হইতেছে। এ-বিষয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় খুব বেশী কাজ না করিয়া থাকিলেও অন্যান্য ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে বেশী করিয়াছে। অথচ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের ব্যবহারিক বিভাগের অভিজ্ঞ অধ্যাপকদিগকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কন্‌ফারেন্সে আহ্বান করা হয় নাই, শুনিতেছি। চমৎকার বন্দোবস্ত!

—

বায়োস্কোপে দুর্নীতি

আমরা বায়োস্কোপ দেখিতে যাই না, সুতরাং সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা হইতে তৎসম্বন্ধে কিছু বলিতে পারি না। কিন্তু "স্বচিকিৎসা" নামক মাসিকপত্র এবিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন তাহা সত্য হইলে শীঘ্র প্রতিকার আবশ্যক। উহাতে লিখিত হইয়াছে—

"এদেশে বিদেশী চিত্রনাটকের যেরূপ প্রচলন আরম্ভ হইয়াছে এবং যেরূপ অবাধ গতিতে যৌনরূপ গ্রহণ করিতেছে তাহাতে, এখন হইতে যদি বালকবালিকাগণের অভিভাবকগণ বিশেষ ভাবে সাবধান না হন তবে ইহার পরিণতি কোথায় কি ভাবে দাঁড়াইবে, তাহা চিন্তা করিলেও শিহরিয়া উঠিতে হয়।

—

২০।২ আপার সারকুলার রোড কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীমাণিকচন্দ্র দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত